









# সূচীপত্র

৩০শ বর্ষ]

১৩৫৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত

[ ১ম খণ্ড

| বিষয়                                    | লেখক                                    | পৃষ্ঠা                      | বিষয়                                           | লেখক                                         | পৃষ্ঠা                      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>যুগবাণী—</b>                          |                                         |                             | <b>চিত্র-কাহিনী—</b>                            |                                              |                             |
| ১। কথামৃত                                | শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব                     | ১, ১৩৭, ২৮১, ৪২৫, ৫৭৩, ৭১৩  | ১। সম্মোহন                                      | সুবীকেশ হালদার                               | ১৭, ২৪০                     |
| ২। শ্রীশ্রীলাট্ট মগবাজারের বাণী          | স্বামী সিদ্ধানন্দ                       | ৩২৩                         | <b>গল্প—</b>                                    |                                              |                             |
| <b>জীবনী—</b>                            |                                         |                             | ১। আত্মমান                                      | প্রভাত বসু                                   | ১৭১                         |
| ১। পবন পুঙ্খ                             | শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত | ২, ১৩৮, ২৮২, ৪২৬, ৫৭৪, ৭১৪  | ২। কলাবতীর উপাখ্যান                             | শ্রীজ্যোতিষ্ময় ঘোষ (ভাস্কর)                 | ১৬৪                         |
| ২। স্তার সৈয়দ আহমেদ                     | এল-আই-মুরোভিচ :<br>অনুবাদক—ললিত হাজরা   | ৭৬৭                         | ৩। গুরুমা                                       | শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র                      | ৫৩৫                         |
| <b>আখ্যান—</b>                           |                                         |                             | ৪। ছেলে                                         | জ্যোতিষ্ময়ী দেবী                            | ৬৮১                         |
| ১। জনাস্তিক                              | যাযাবর                                  | ১৭৭-১৫৩, ৩৮২, ৪৪৫, ৫১১, ৭১৩ | ৫। জল                                           | শ্রীসাধনা কর (শান্তিনিকেতন)                  | ৬৬৫                         |
| <b>গ্রন্থ—</b>                           |                                         |                             | ৬। জ্যোতিষ-বাকা                                 | শ্রীচিরন্তন মুখোপাধ্যায়                     | ২৭০                         |
| ১। বাংলা সাময়িক পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় | শ্রীব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়           | ৪৪, ২২৭, ৬৬৩, ৫৩০, ৬৩২, ৭৮৬ | ৭। জ্যোতিষী                                     | আর. কে. নাবায়ণ                              | ১৩                          |
| ২। রত্নমালা                              | শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক                        | ২৩, ১৬০, ২১৭, ৪৩৫, ৬০৫, ৭২৬ | ৮। দায়ম-সুন্দর                                 | সুখেন্দু দত্ত                                | ১০২                         |
| ৩। সাহিত্য-সেবক-মঞ্জুষা                  | শ্রীশৌরীকুমার ঘোষ                       | ৫৫, ১৮৪, ৩২১, ৫১৬, ৬৫১, ৭৬১ | ৯। দায়ম-সুন্দর                                 | নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়                        | ৮২                          |
| <b>ত্রিগুহ—</b>                          |                                         |                             | ১০। পাতাল-পুরী                                  | প্রেমচন্দ্র:<br>অনুবাদক—সুধাকর চট্টোপাধ্যায় | ৬৮৬                         |
| ২৪, ১৭৭, ২১৮, ৪৪১, ৫১৭, ৭২৮              |                                         |                             | ১। বাজে লোক                                     | "ভাস্কর"                                     | ১২                          |
| <b>চট্টোপাধ্যায়—</b>                    |                                         |                             | ২। বাদী                                         | অমরেন্দ্র ঘোষ                                | ৮২৬                         |
| ২১, ১৬৪, ৩০১, ৪৫৩, ৬০১, ৭৪১              |                                         |                             | ৩। বিদেশী গল্প                                  | শ্রীমুখীকুমার নন্দী                          | ৩৮৮                         |
| <b>বিজ্ঞান-জগৎ—</b>                      |                                         |                             | ৪। বিয়ে                                        | অনুবাদক—নিখিল সেন                            | ৫৪০                         |
| ১। আণবিক গবেষণায় আমেরিকা                | শ্রীঅমলেন্দু সেন                        | ২০৪                         | ৫। ভিন জাতের দিদি                               | শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব                           | ২৬০                         |
| ২। এ্যাটম                                | শ্রীম্মিনীমোহন কর                       | ৬৬২, ৭৮২                    | ৬। ভূতের গল্প                                   | বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়                    | ৩৮৬                         |
| ৩। পেট্রোলিয়াম                          | শ্রীশিখরকুমার কব                        | ৪৭১                         | ৭। বর্ণাঙ্গনে                                   | শ্রীধামিনীমোহন কর                            | ৩১৭                         |
| ৪। মেসন                                  | সাধনা মিত্র                             | ২০৫                         | ৮। রিকিউজি                                      | বিজন ভট্টাচার্য                              | ৬৭৪                         |
| যন্ত্র-বিজ্ঞানী মাহুয                    | শ্রীমন্কুমার সেন                        | ৩০০                         | ৯। শিল্প-সামগ্রী                                | অ্যাক্টন শেখভ. :                             |                             |
| স্বাভাৱিক শিল্পের ক্রমোন্নতি             | শ্রীঅমলকুমার বসু-রায়                   | ৩৬১                         | ১০। সুলতান                                      | অনুবাদক—অশু দত্ত                             | ১৫                          |
| অ্যাক্টিভিটি                             | সাধনা মিত্র                             | ১২২                         |                                                 | আম্মার্তো শাঠে :                             |                             |
|                                          |                                         |                             |                                                 | অনুবাদক—ললিত হাজরা                           | ৮৩                          |
|                                          |                                         |                             | <b>উপন্যাস—</b>                                 |                                              |                             |
|                                          |                                         |                             | ১। আকাশ-পাতাল                                   | অ, আ, ই                                      | ১১, ১৪৮, ১১১, ৪৪০, ৫৮৪, ৭৩৩ |
|                                          |                                         |                             | ২। প্রাইড এণ্ড প্রেজুডিস                        | জে. অস্টিন :                                 |                             |
|                                          |                                         |                             | অনুবাদক—শ্রীশিখর সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়কুমার ভাট্টা | ১১৭, ৩৪৫, ৫০১, ৬২৪, ৭৭৩                      |                             |

# সূচীপত্র

## বই-সংখ্যা—

|                             |                         |     |
|-----------------------------|-------------------------|-----|
| ১৩৯৭—১৩৯৮                   | ( চিত্রবিদ্যার )        | ১০৮ |
| অনুব্রূ. সমালোচনা           | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ৫৫৪ |
| আমাদের ক্রমশঃ অচল চলচ্চিত্র | প্রসাদ রায়             | ২৪৬ |
| ৪। এক শতাব্দীতে একবার       | "                       | ৩৭৯ |
| ৫। নাট্যকার ও দর্শক         | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ৬১৬ |
| ৬। যাত্রাপথে চলচ্চিত্র      | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ৮১১ |
| ৭। রাশিয়ার চলচ্চিত্র       | সুখেন্দু দত্ত           | ৩৮১ |
| ৮। লোলা মণ্টেজ              | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১০৬ |

## আত্মস্মৃতি—

|                   |                                  |     |
|-------------------|----------------------------------|-----|
| ১। আত্মস্মৃতি     | শ্রীহরিচন্দ্র শেঠ                | ৩১৩ |
| ২। আত্মস্মৃতি     | অন্নদাশঙ্কর রায়                 |     |
| ৩। আত্মস্মৃতি     | হারিয়েট বোচার ষ্টাউ :           |     |
|                   | অনুবাদক—জয়ন্তকুমার ভাট্টা       | ৭১৪ |
| ৪। পঞ্চাশ বছর আগে | শ্রীশ্রীকান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | ১৬১ |
| ৫। বছর কথা        | বঙ্কু—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত       | ৪৫৭ |

## কাহিনী—

|                      |                             |          |
|----------------------|-----------------------------|----------|
| ১। গল্প হলো সত্যি    |                             | ৩২২, ৬১৫ |
| ২। পঞ্চকল্পার ইতিহাস |                             | ৭২       |
| ৩। বিদ্রোহী          | শ্রীঅবিনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১০৫      |
| ৪। মৃত্যুপথে পালভোভ  |                             | ৭৮১      |

## আলোচনা—

|                          |                 |     |
|--------------------------|-----------------|-----|
| ১। প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ | শ্রীশুধীরচন্দ্র | ১৬৯ |
|--------------------------|-----------------|-----|

## শিকার—

|                                |                           |    |
|--------------------------------|---------------------------|----|
| ১। কুমায়ুনে নরখাদক বাঘ        | জিম করবেট :               |    |
|                                | অনুবাদক—হরকিশর ভট্টাচার্য | ৭৫ |
| ২। রক্তপ্রস্রাবে নরখাদক চিত্রা | জিম করবেট :               |    |
|                                | অনুবাদক—হরকিশর ভট্টাচার্য | ৬৪ |

## কবিতা—

|                          |                          |     |
|--------------------------|--------------------------|-----|
| ১। আগামী মানুষ           | বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু      | ২৪৫ |
| ২। কবি বঙ্কিম            | মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় |     |
| ৩। পদাবলী                | প্রমোদ মুখোপাধ্যায়      |     |
| ৪। বঙ্গ বিহঙ্গম          | শ্রীকরণাময় বসু          |     |
| ৫। বিদ্রোহী নজরুল        | প্রভাকর মাকি             | ৬৪  |
| ৬। ভন্দারলোকের ছেলে      | শ্রীবিমলচন্দ্র বোশ       | ৭১২ |
| ৭। ভাবত রাষ্ট্রের উদারতা | শ্রীকৃষ্ণদত্ত মল্লিক     | ৪৭৮ |
| ৮। মধ্যস্থদ              | শ্রীদুর্গাদাস সরকার      | ৩৭০ |
| ৯। মানব-মানবী            | সুবেশচন্দ্র চক্রবর্তী    |     |
|                          | ( পণ্ডিতের )             | ১০৯ |
| ১০। রডোডেনড্রন           | নিখিলকান্তি চক্রবর্তী    | ৩৩৫ |
| ১১। শ্রীরামকৃষ্ণদেব      | শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য   | ১২২ |

## উদ্ভূতি—

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| ১। উলকী |  | ৪২১ |
|---------|--|-----|

## প্রবন্ধ—

|                              |                              |          |
|------------------------------|------------------------------|----------|
| ১। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে    |                              |          |
| বাংলার স্থান,                | শ্রীমুখার চট্টোপাধ্যায়      | ৬৫       |
| ২। আমাদের ইংরাজী শিক্ষা      | শ্রীমুহাসেন রায়             | ৭        |
| ৩। আমাদের ইংরাজী শিক্ষা      | শ্রীমুহাধেন্দ্র সেনগুপ্ত     | ৩২১      |
| ৪। আমাদের ইংরাজী শিক্ষা      | অধ্যক্ষ পি, কে, গুহ          | ৬১৩      |
| ৫। আমাদের পল্লী-কাব্যে বর্ষা |                              |          |
|                              | শ্রীকামিনীকুমার রায়         | ৫১       |
| ৬। আমাদের লোকসাহিত্যে        |                              |          |
| নারী                         | শ্রীকামিনীকুমার রায়         | ৬৫৫      |
| আমেরিকায় স্বামী             |                              |          |
| তুরীয়ানন্দ                  | স্বামী জগদীশ্বরানন্দ         | ১১২      |
| ওয়েলফেয়ার ষ্টেট'এর রূপ     |                              |          |
| ও নীতি                       | শ্রীমনকুমার সেন              | ১৮০      |
| ১। গুরুজীবের জিজিয়া কর      | শ্রীরাম শর্মা                | ৬১৬      |
| ১০। গীতায় সাম্যবাদ          | শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী | ৪১       |
| ১১। পল্লী-সাহিত্যে পূর্বরাগ  | শ্রীকামিনীকুমার রায়         | ৭৫৭      |
| ১২। ফোট উইলিয়ম কলেজ         |                              |          |
| ও হিন্দী ভাষা                | শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন          | ৪৩৬      |
| ১৩। ফোট উইলিয়ম              | জয়ন্তকুমার ভাট্টা           | ৬৪৮      |
| ১৪। বিজয়া                   | শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়    | ৭১১      |
| ১৫। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী     |                              |          |
| কবিতা                        | ডাঃ মতিলাল দাশ               | ১৮১      |
| ১৬। বিশ্ববিজ্ঞান-রবীন্দ্রনাথ | অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র    | ৭৫৫      |
| ১৭। বিজ্ঞান-রবীন্দ্রনাথ      | শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী | ৪১৩      |
| ১৮। বিশ্ববী বাংলা            | শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী    | ৭৩       |
|                              | ২৪৩, ৩৬৭, ৫২৬, ৬১৩, ৮০২      |          |
| ১৯। ভক্ত কবীর                | শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস        | ৬১১, ৭১৬ |
| ২০। ভগ্নী নিবেদিতা           | শ্রীকালিদাস নাগ              | ৭৪৭      |
| ২১। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব  |                              |          |
| এশিয়া                       | শ্রীনরীনাথ চৌধুরী            | ৭৫০      |
| ২২। ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ   | শ্রীচিত্তবঞ্জন দেব           | ৪৬৭      |
| ভারতে শৈল্পিক লিথোগ্রাফি     | শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী    | ১৬৩      |
| মুক্তিপথে                    | পবিত্রমোহন প্রধান            | ৩২৭      |
| রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা       | শিবনারায়ণ রায়              | ৩৪৩      |
| ২৬। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ   | শ্রীমুখারচন্দ্র কর           | ৩৩       |
| ২৭। শিশুশিক্ষায় হস্তশিল্প   | শ্রীশিবনাথ বাগচী             | ৪৭৭      |
| ২৮। স্বাধীন ভারতে ইংরেজী     |                              |          |
| শিক্ষার স্থান                | শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন          | ২২৪      |
| ২৯। হালখাতা                  | শ্রীকামিনীকুমার রায়         | ৮১৫      |
| ৩০। হিন্দুদিগের লৌকিক ধর্ম   |                              |          |
| ও দেবদেবী                    | শ্রীনরীনাথ চৌধুরী            | ৩৩৬, ৫১১ |
| ৩১। হিন্দুর রাষ্ট্রবাদ       | শ্রীঅজিতকুমার নন্দী          | ৪৬১      |
| নাটক—                        |                              |          |
| ১। বোদাস্তকেশরী বিবেকানন্দ   | শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ৩১       |

| বিষয়                       | লেখক                           | পৃষ্ঠা                      | বিষয়                                                | লেখক                         | পৃষ্ঠা   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| <b>ছোটদের আসর</b>           |                                |                             | <b>অঙ্কন ও প্রাক্ষর</b>                              |                              |          |
| প্রবন্ধ—                    |                                |                             | প্রবন্ধ—                                             |                              |          |
| কবিতা                       | ইরাকিসব ভট্টাচার্য             | ৮১৬                         | আমাদের কর্তব্য                                       | হাসিবাশি দেবী                | ৬৩৭      |
| দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের |                                |                             | গৃহস্থালী                                            | হাসিবাশি দেবী                | ৮০১      |
| অবস্থা                      | শৈলেন ভট্টাচার্য               | ৭৮                          | ৩. নাবাব রূপসজ্জা                                    | শ্রীপরাবাণী সেন              | ৩৫৪      |
| ৩. শ্রবণীয় বৈশাখ           | শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দাস-কাছনগো    | ১১০                         | ৪. সেক্টর্যাল অব বৃটেন                               | শ্রীমতী শান্তি বসু           | ২১১, ৪১২ |
| বিবরণ—                      |                                |                             | ৫. দৈনন্দন কবি                                       | মালবিকা বায়                 | ৬৩৬      |
| ১। কিছুক্ষণের ভ্রমণ         | স্বপ্ন রায়                    | ৮১৬                         | ৬. যুগান্তার                                         | শ্রীমতী মাতা দেবী            | ৮৩       |
| উপভাস—                      |                                |                             | ৭। বরাদ-জমাতি                                        | শ্রীদামনা কব                 | ২১৬      |
| ১। একটি সত্য ঘটনামূলক       |                                |                             | ৮। বাধাবাণী দেবী ও অপবর্জিতা দেবী                    |                              |          |
| গোয়েন্দা কাহিনী            | শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়        | ৪১৪, ৪১৫                    | জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়                        | ৮০৪                          |          |
| কাহিনী—                     |                                |                             | ৯। শান্তি চাই কেন ?                                  | আশাপূর্ণা দেবী               | ৮০       |
| ১। অপরাধিতা                 | বিনয়ভূষণ মজুমদার              | ৩০৯                         | ১০। শ্রীমধুসূদনের কবি-কল্পনা নাবী                    |                              |          |
| ২। অশ্বিনীকুমার দত্ত        | তারানাথ রায়                   | ৬৪৪                         | লীনা মিত্র                                           | ৪৮৪                          |          |
| ৩। গল্প হলেও সত্যি          | শ্রীঅমিয়কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | ৭১                          | ১১। সব চেয়ে আতঙ্কজনক সময়                           |                              |          |
| ৪। " " "                    | শ্রীকিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়    | ৩৭৫                         | শ্রীইন্দিরা দেবী                                     | ৮০৬                          |          |
| ৫। " " "                    | শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত            | ৪১৭                         | ১২। স্বাধীন দেশের মেয়েদের কর্তব্য                   |                              |          |
| ৬। " " "                    | স্ববোধকুমার নন্দী              | ৫০০                         | শ্রীনিশাপতি মাঝি                                     | ৮০৮                          |          |
| ৭। ডিরোজিও                  | তারানাথ রায়                   | ৮১৪                         | ১৩। শ্রুতিসভা                                        | বাণী ঘটক চৌধুরী              | ৪১০      |
| ৮। বৃষ্টি গাড়ীর শ্রুতি     | জয়ন্তকুমার ভাট্টা             | ৮১৫                         | কাহিনী—                                              |                              |          |
| ৯। শুধু গল্প নয়            | শ্রীঅসীমকুমার বসু              | ২১২                         | ১। অথবা সমালোচনা করবেন না                            |                              |          |
| ১০। সাহসী যুবকের কাঁঠ       | শ্রীরঞ্জিতকুমার বায়           | ৩৭৪                         | ইন্দিরা দেবী                                         | ৮১                           |          |
| ১১। স্বামী বিবেকানন্দ       | শ্রীহরিন্দাস মজুমদার           | ৩৭২                         | ২। কেন আমি শিক্ষয়িত্রী আছি ? লৌলা গ্রেস আর্ডম্যান : |                              |          |
| জীবনী—                      |                                |                             | ৩। "সব" অথবা দিক—কেতকী                               |                              |          |
| ১। স্বামী রামী কান্ত        | মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়         | ৭৬, ২১২, ৩৭৬, ৪১৮, ৬৪৫, ৮১৫ | ৪। ভাগ্যলিপি                                         | শ্রীদামনা মিত্র              | ৩৬১      |
| ২। পুণ্যলোকা রাণী বাসমণি    | শ্রীরঞ্জিতাশ মণ্ডল             | ২০৮                         | ৫। সত্যিকার গল্প                                     | মীরা চট্টোপাধ্যায়           | ৩৫৬      |
| ৩। মোহাম্মদ ইকবাল           |                                | ৭২                          | গল্প—                                                |                              |          |
| বিবিধ—                      |                                |                             | ১। প্রেম                                             | সুলতা কব                     | ৬৩৬      |
| ১। কবি, বিষ না অমৃত ?       |                                | ৩২০                         | ২। অ্যাটম বোমার দেশে                                 | অমিতা দত্ত-মজুমদার           | ৮৫       |
| ২। কাচ                      |                                | ২১৬                         | ২২০, ৩৫৭, ৪৮৭, ৬৩৮                                   |                              |          |
| ৩। চোব ধরার ফল              |                                | ৫০৯                         | <b>রসরচনা—</b>                                       |                              |          |
| ৪। জনপ্রিয়তা লাভ করা যায়  |                                | ৬০০                         | ১। রাজনীতি                                           | দমদাস মুখোপাধ্যায়           | ৫৫০      |
| ৫। তোৎলামি কি সারে না ?     |                                | ৩২৬                         | <b>সাহিত্য-পরিচয়—</b>                               |                              |          |
| ৬। দেহ-বিজ্ঞান              |                                | ৫৪                          | ১। গ্রন্থাগার-পরিচালনা                               | শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়    | ১১৫      |
| ৭। নিষেধ থাকলে              |                                | ৫২৫                         | ২। প্রাপ্ত স্বাক্ষর                                  | ২৪৮, ২০১, ৫৫৭, ৬১৮, ৮৪৭      |          |
| ৮। বেটরো প্রচার-সম্ম        |                                | ৬৮                          | <b>রাজনৈতিক—</b>                                     |                              |          |
| ৯। লটারী খেলা               |                                | ৪৬৬                         | ১। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি                             | শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী      | ১২৪,     |
| ১০। "শ" এর বদলে "হ"         |                                | ৪২                          | ২৫২, ৪১২, ৫৫৮, ৬১১, ৮৪০                              |                              |          |
| ১১। স্বপ্ন ও সাহিত্য        |                                | ৪৭২                         | <b>সাময়িক প্রসঙ্গ—</b>                              | ১৩৩, ২৭৫, ৪১১, ৫৬৬, ৭০৮, ৮৪৮ |          |
| ১২। হাতীর দাঁতের দর ও কদর   |                                | ৩৮                          | <b>শোক-সংবাদ—</b>                                    |                              |          |
| ১৩। হিউম                    |                                | ৫৮৩                         | ১। স্বামী বিবেকানন্দ মহাবাহুর মহাপ্রয়াণ             | ২৭৪                          |          |

# রসুমতী-সাহিত্য-মান্দরের নূতন প্রকাশিত গ্রন্থরাজ

## ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগে সম্পূর্ণ

১ম ভাগ—আট টাকা

২য় ভাগ—পাঁচ টাকা

৩য় ভাগ—পাঁচ টাকা

তিন ভাগ একত্রে—১৫ টাকা

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

## উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী

নব্বাঁদিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্তমান সমস্যা জাতের বিভ্রম, পথের সন্ধান স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও কর্ম।

মূল্য

আড়াই টাকা।

## চণ্ডীদাসের পদাবলী

আড়াই টাকা

## ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

দুই টাকা

চারণ কবি

## যুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী

দুই টাকা

## দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ

২১

২য় ” ২১

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ দুই টাকা

২য় ” (যন্ত্রস্থ)

## বিজ্ঞানসুন্দর গ্রন্থাবলী

(৯ খানি বিজ্ঞানসুন্দর কাব্যের সমাবেশ)

পাঁচ টাকা

## উপেন্দ্রনাথের উপকারতা

৮তারকনাথ সাধু

আড়াই টাকা

## শ্রীমদ্ভাগবত

প্রাচীন ভক্তদের রচিত  
শুললিত বাংলা পয়ারে  
মূল্য পাচ টাকা মাত্র।

ইচ্ছাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ  
শ্রীমদ সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামৃতের  
অনুবাদ  
কবিচন্দ্রের

## শ্রীমদ্ভাগবতামৃত

ভাগবতচর্চা <sup>এক</sup> বিশ্বপ্রসিদ্ধ  
শ্রীকৃষ্ণ <sup>এক</sup> প্রমত্তরঙ্গিনী

সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ

“শুনিয়া তাহার ভক্তিব্যোগের পঠন।

আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥”

কৃষ্ণবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের  
মহাভারতের দ্বারা বাংলার প্রতি গৃহস্থের  
অবগুপাঠ্য হউক, এই নিবেদন

## ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস

১ম ভাগ

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য ৫

২য় ভাগ (যন্ত্রস্থ)

## শ্রীশ্রীচণ্ডী

মূল ও পয়ারে বঙ্গানুবাদ

মূল্য এক টাকা

## ভাগ্যলিপি

দ্বারেশ শম্ভাচার্য্য এম-এ

মূল্য ২১০ টাকা

## কীর্তিনাশা

(উপন্যাস)

শ্রীস্বামী লিখিত)

মূল্য ১১০

## আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী

(যন্ত্রস্থ)

## কাশীরাম দাসের মহাভারত

অতিকায় সংস্করণ

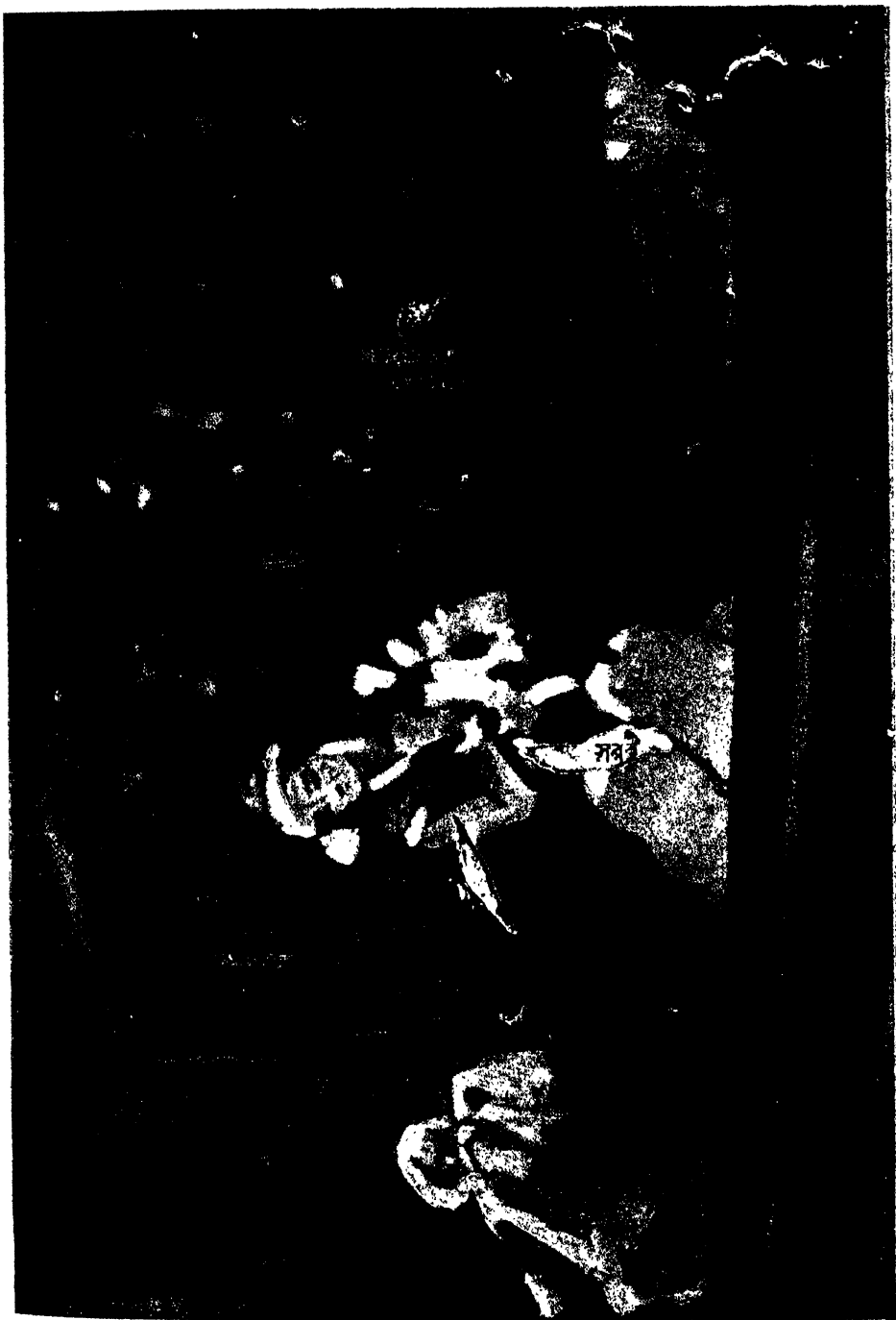
মূল্য দশ টাকা

## কৃষ্ণিবাসের

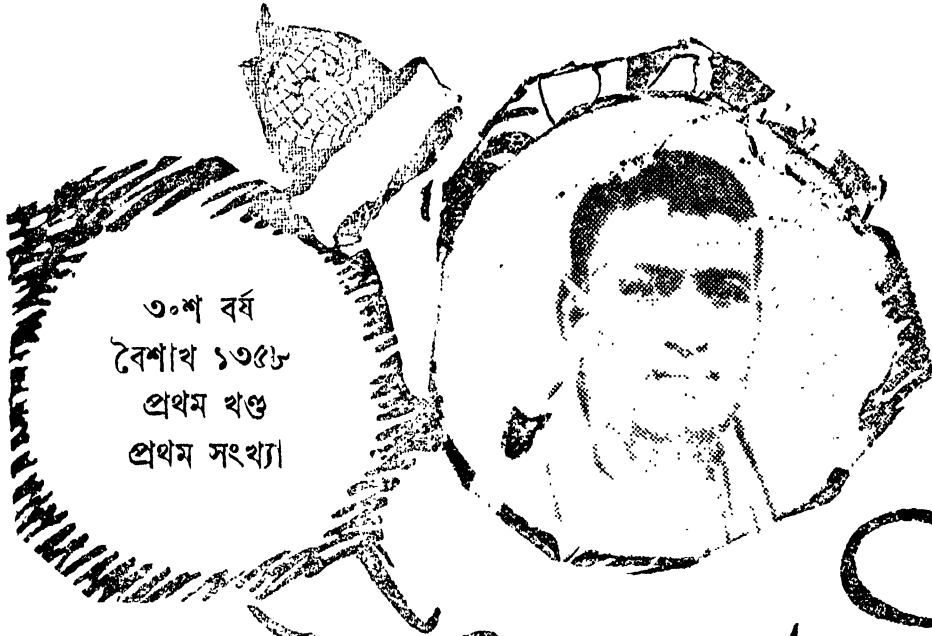
## রামায়ণ

স্বমনোহর অভিনব রূপ

মূল্য চারি







# স্বাস্থ্যকর জীবন

ক থা য় ত

আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক হাসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।

পূর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ পিশাচবৎ! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—ভুচি-অভুচির বিচার নাই! পূর্ণজ্ঞানী ও পূর্ণমূর্খ; দু'জনেরই বাইরে লক্ষণ এক রকম। পূর্ণজ্ঞানী হয়ত গঙ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ করলে না, ঠাকুর পূজা করবার সময় কলগুলি হয়ত একসঙ্গে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই।

কর কাটাই দিয়ে ফল পাইয়া যায়, তবে ফল তরুর গুলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চাঞ্চল্য,—ধর্ম, অর্থ, ক্রাম, মোক্ষ।

জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জানি? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে! চিদাকাশ, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না।

যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়;—চক্ষু ঝলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্তে ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে আসেন।

সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু ছ' রকম সাধক আছে;—এক রকম সাধকের বানরের ছা'র স্বভাব, আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছা'র স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেঁচা করে ভগবানকে ধরতে যায়।



# পারম পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আটত্রিশ

মথুরায় গেল রামকৃষ্ণ। দাঁড়াল ধ্রুব ঘাটে।  
স্পষ্ট দেখল সেই জন্মাষ্টমীর দৃশ্য। শিশু-কৃষ্ণকে  
বুকে করে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছে বনুদেব।

দিন পনেরো ছিল মোট বৃন্দাবনে। ছিল  
বৈষ্ণববেশে। গায়ে আলখাল্লা, পরনে ডোর-  
কোপনি। কপালে-গলায় বুকে-বাঁহতে তিলক জাঁকা।  
কাঁধে কাঁধার কুলি। কণ্ঠে তুলসী কাঠের মালা।

বামনিকে বললে, 'কোথায় মরবে? কাশী না  
বৃন্দাবন?'

'কাশী।'

তবে ফিরে চলো কাশীতে। স্বস্থানে গিয়ে  
অধিষ্ঠিত হও।

কাশীতে এসে রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শুনব।'

মদনপুরায় মহেশ সরকার ও...  
দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড নাম-ডাক। হৃদয় খবর নিয়ে  
এল। চল তবে যাই ওস্তাদের বাড়িতে। বীণ  
শুনে আসি।

মথুর বাবু বললেন, 'এখানে যাবে কেন? তাঁর...  
এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার  
যতো ইচ্ছে—

রাখো তোমার নিখো মর্যাদার চটকদারি। ঐও  
বড় যে বাজিয়ে সে তো প্রকাণ্ড সাধক, তার খেয়াল  
রাখো? স্বয়ং বিশ্বযত্নী ঈশ্বর তার স্পর্শে এসে  
বাংকুত হচ্ছেন। সে তো বিভূতি-ভূষিত। চল রে  
হুহু, শুনে আসি। যা-ই শোনা তাই দেখা।

"যাহা শুনি কর্ণপুটে গকলি মার মস্ত্র বটে।"

হুজনে এসে হাজির হল মদনপুরায়। সটান  
মহেশ সরকারের বাড়িতে। মহেশ সরকার বাইরের  
ঘরেই বসেছিল। রামকৃষ্ণ বললে, 'বীণ শোনাও।'

এ যেন স্বয়ং বীণাবাদিনীর আদেশ। মহেশ  
সরকার বীণ তুলে নিল। ঝংকার তুললে।

সুর-সাগরে অমৃতের ঢেউ খেলে গেল। মুহূর্তে  
ভাবাবেশে বিহ্বল হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ। বললে,  
'মি গো, আমায় বেহুঁস করে রাখিস নে, আমায়  
হুঁস দে! আমি ভালো করে বীণা শুনি।'

রামকৃষ্ণ সমাধি-ভূমি থেকে নেমে এল। নেমে  
এল অনুভূতির ভূমিতে। বাহাজ্ঞানের শেষ প্রান্তে।  
ঠায় তিন ঘণ্টা বীণ শুনলে এক টানা।

শুধু কি বীণা শুনলাম? শুনলাম এই সমস্ত  
বিশ্বস্থিতিটাই একটা অপূর্ব সুরঝংকার। গ্রহে-নক্ষত্রে  
বৃক্ষে-তৃণে, নীহারিকা থেকে ধূলিকণায়, প্রত্যেকটি  
পলায়মান মহূর্তকণায়, বাজছে এই গীতছন্দ।  
ছুটেছে ভুবনপ্লাবিনী সুরশৈবলিনী।

যা শোনা তাই আবার দেখা।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই সুরশব্দ যেন একটা উজ্জ্বল  
চৈতন্যের মত প্রতিভাত। যেন সূর্য উঠেছে রাত্রির  
আকাশে। ইন্দ্রিয়ের জগতে চৈতন্যের আবির্ভাব।  
হৃদয়াকাশে চিদাদিত্য।

বীণার সঙ্গে-সঙ্গে রামকৃষ্ণ গলা মিলিয়ে গান

বাবু বললেন, 'এখানে যাবে কেন? তাঁর...  
এখানে ডেকে আনি, ফরমাস মতো শোনো তোমার  
যতো ইচ্ছে—

সর্বনাশ গায় গলে এ দেহ কি আর  
থাকবে? জানো না আমার বাবার সেই স্বপ্নের  
কথা?

তাই গায় আর নামলেন না মথুর বাবু। জ্যোষ্ঠ  
মাসের মাঝামাঝি সবাইকে নিয়ে ফিয়ে এলেন  
দক্ষিণেশ্বর।

আবার সেই অনন্ত আনন্দ-তীর্থ।

রামপ্রসাদ গেয়েছে, এ সংসার ধোঁকার টাটি।  
রামকৃষ্ণ গাইলে, 'এ সংসার মজার কুটি। ও তাই  
আনন্দ বাজারে লুটি।'

বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড আর শ্রামকুণ্ড থেকে ধূলা

নিরে এসেছে রামকৃষ্ণ। কিছুটা পঞ্চবটীর চার দিকে ঝড়িয়ে দিল আর কতক পুতলে তার সাধন-কুটিরের মধ্যে। এই সেই কুটির যেখানে বসে হয়েছিল তার নির্বিকল্পসমাধি। হয়েছিল ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার।

‘ব্রহ্ম কেমন বল না?’

‘যি খেয়েছিস তো? বল তো কেমন যি? কেমন যি, না, যেমন যি। তেমনি ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম। তাকে বোঝাব কি দিয়ে?’

সেই পণ্ডিতের গল্প জানো না? এক রাজাকে রোজ ভাগবত শোনাত। আর পড়ার শেষে কেউই রাজাকে জিগগেস করত, রাজা, বুঝেছ? আর রাজাও রোজ বলত, আগে তুমি বোঝো। পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে ভাবত, রাজা অমন ধারা রোজ বলে কেন? ভাবতে-ভাবতে জ্ঞান হয়ে গেল—শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য সব মিথ্যে, আসল হচ্ছে হরিপাদপদ্ম। বিবাগী হয়ে চলে গেল সংসার ছেড়ে। রোজ কত বক্তৃতা ঝড়ত, আজ যাঁহার আগে বলে গেল দুটি কথা: ‘এবার বুঝেছি।’

তাই বলি, কলকলানি ছাড়ো। যতক্ষণ যি কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে। পাকা যিয়ে আর শব্দ নেই। খালি গাড়ুতে জল ভরতে গেলেই ভকভকানি ওঠে। কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না। বিচারবুদ্ধি কতক্ষণ? যতক্ষণ না তাঁর আনন্দের খবর পাওয়া যায়। মধুপানের আনন্দ পেলে মোমাছি আর ভনভন করে না।

‘আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা, বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক।’

শশধর পণ্ডিত জ্ঞানমার্গে গেলেন, ‘সে কি? আপনারো তবে ছিল বিচারবুদ্ধি?’

‘তা, একটু-আধটু ছিল বৈ কি।’

উৎফুল্ল হয়ে উঠল শশধর। বললে, ‘তবে বলে দিন আমাদের’ যাবে। আপনার কেমন করে গেল?’

ঠাকুর বললেন, ‘অমনি এক রকম করে গেল।’

আমি দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না।

সেই এক বেয়ান এসেছিল আরেক বেয়ানের সঙ্গে দেখা করতে। ঘরের বেয়ান তখন নানা রঙের সূতো কাটছে, বাইরের বেয়ানকে দেখে ভারি খুশি।

কত দিন পরে এলে, যাই তোমার জন্তে কিছু জলখাবার আনি গে। যেই জলখাবার আনতে গেছে সেই ঝুঁক বাইরের বেয়ান এক তাড়া রঙিন সূতো বগলের-লায় লুকিয়ে বৈলগ্নে। জলখাবার নিয়ে এসে ঘরের বেয়ান বুঝতে পারলে বাইরের বেয়ানের কাণ্ডখানা। তখন সে এক ফন্দি ঠাওরালে। বললে, কত দিন পরে এলে, এস আজ দুজনে একটু আনন্দ করি। কি আনন্দ? এস দুই বেয়ানে নৃত্য করি। ভালো কথা। দুই বেয়ানে নাচতে লাগল। ঘরের বেয়ান দেখল বাইরের বেয়ান হাত না তুলেই নৃত্য করছে। হাত না তুলে নাচ কি একটা নাচ? ঘরের বেয়ান তখন বললে, এমন আনন্দের দিনে এস আজ হাত তুলে নাচি। ভালো কথা। কিন্তু বাইরের বেয়ান এক হাতে বগল টিপে আরেক হাত তুলে নাচতে লাগল। ও আবার কেমন নৃত্য? এস, দু হাত তুলে নাচি। এই দেখ—ঘরের বেয়ান দু হাত তুললে। বাইরের বেয়ান যে-কে-সে। তেমনি বগল টিপে এক হাত তুলেই সে নাচতে লাগল। বললে, যে যেমন জানে বেয়ান—

আমি কিছুই জানি না। আমি তাই দু হাত ছেড়ে দিয়েছি। আমার সরল শরণাগতি।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামকৃষ্ণের শুধু সেই তীর্থের স্মরণ। তা ছাড়া আবার কি। মাতাল মদ খাওয়ার পর কেবল আনন্দেরই কথা কয়।

কী পেলেন তীর্থ করে?

কী পেলাম? জ্ঞান পেলাম। যতক্ষণ বোধ মূর্খ স্বর মেথা ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান। যা মন চায় তারই পিছে ধায়। কিন্তু ছুটেতে হবে কেন? যা মন চায় তাই মনের নখখানো। যা হাত চায় ধরতে তাই হাতের কাছাকাছি।

তামাক খাবে, তাই গেছে প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরতে। ঢের রাত হয়েছে, প্রতিবেশী ঘুমে অচেতন। অনেক ধাক্কাধুকি, অনেক হাঁক-ডাক। ঘুম ভেঙে গেল প্রতিবেশীর। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল—এ কি, এত রাত্রে কি মনে ক’রে। আর কি মনে ক’রে! তামাক খাব কিন্তু টিকে ধরাবার দেশলাই নেই। তারি জন্তে এত কষ্ট, এত হৈ-হল্লা। তোমার হাতে যে লণ্ঠন রয়েছে—সে আছে কি করতে?

হৃদাকাশে চিদাদিত্য। চলছি আমরা তবে  
আর কোন দেশে কোন সূর্যের সন্ধানে ?

কথাটা এই, বুড়ি ছুঁয়ে যা ইচ্ছে করলে বন্ধজ্ঞান  
লাভ করে, লালী, হাস্যদান করে  
বেড়াও। সাধু শহরে এসে হোথা-হোথা ঘোরাঘুরি  
করে নানা রকম আমোদ করে বেড়াচ্ছে। পথে  
আরেক মুসাফির সাধুর সঙ্গে দেখা। মুসাফির  
বললে, এত যে চার দিকে রঙ দেখে বেড়াচ্ছ, তা  
তোমার পৌটলাপুটলি কোথায় রাখলে ? কেন,—  
আগে বাসা ঠিক করলাম, তালা-চাবি কিনলাম, পরে  
পৌটলাপুটলি ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করলাম।  
বন্ধ করে রেখে তবে আমোদ করতে বেরিয়েছি।

জানো শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলুম। সেখানে খুব  
সংকীর্তন হল। বহু লোকের আসর বসল। মাকে  
বললুম, মা এ সব কি সত্য ? সত্য যদি হয় তবে  
দেশের জমিদার কেন আসবে না ? এসে গেল  
জমিদার। সেধে গায়ে পড়ে আদর করে কথা  
কইলে।

ওরে ছহু, একটি সুন্দরী ধরে নিয়ে আয়।

হৃদয় তো অবাক।

ওরে নিয়ে আয়। আমি পূজো করব।

বুঝি মামীর কথা মনে পড়ল হৃদয়ের। সেই  
তার পদদল দিয়ে পাদপদ্ম পূজো...  
কিন্তু কোথায় মামী !

চৌদ্দ বছরের একটি সুন্দরী সধবা কথা জোগাড়  
করল হৃদয়। কোন বাড়ির বউ বা মেয়ে।

কিন্তু রামকৃষ্ণ দেখল সাক্ষাৎ ভগবতী। পূজা  
করলে। প্রণাম করলে। ওরে তোর কেউ  
প্রণামীর টাকা এনে দে মাকে।

তাতেও তৃপ্তি নেই রামকৃষ্ণের। যখন ষোল  
কুমারী মেয়ে কাছে পায় তাকে ধরে এনে পূজো  
করে। হোক সে যত অকুলীন যত অপরিচ্ছন্ন।

শুদ্ধা কুমারীতেই ভগবতীর বেশি প্রকাশ।

রামলীলা দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। যারা রাম-  
লক্ষ্মণ সেজেছিল, হনুমান-বিভীষণ সেজেছিল  
সবাইকে পূজো করতে বসল। মনে হল আসলে-  
নকলে ভেদ নেই। নারায়ণই এ সব মানুষের রূপ  
ধরে রয়েছেন।

বৈষ্ণবচরণও তাই বলত। বলত, নরলীলায়  
বিশ্বাস হলেই তবে পূর্ণ জ্ঞান হবে।

বকুলতলার ঘাটের কাছে এক দিন দেখল  
নীলাশ্বরী পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের  
মেয়ে না পথের মেয়ে নজর করে দেখতেও চাইল  
না। মুহূর্তে শীতার উদ্দীপন এসে গেল। দেখল  
শীতা লক্ষা থেকে উদ্ধার পেয়ে রামের কাছে যাচ্ছে।

‘এমন ভাবও দেখিনি, এমন রোগও দেখিনি।’  
বলে হৃদয়রাম।

বললে কি হয়, কেবল জমি-জমি করে। এত  
যার সেবা-পূজা করছে তার সঙ্গ-স্পর্শেও যেন কিছু  
সুফল হচ্ছে না। রামকৃষ্ণ তার হাতের জিনিস,  
রামকৃষ্ণের পায়ে কাটকে হাত ঠেকাতে দিতে পর্যন্ত  
সে নারাজ, তবু হাতে পেয়েও আঙুলের ফাঁক দিয়ে  
বেরিয়ে যাচ্ছে রামকৃষ্ণ। হৃদয় টাকা খুঁজছে, জমি  
খুঁজছে, গরু খুঁজছে।

এক দিন ধরল গিয়ে শব্দ মল্লিককে। বললে,  
‘আমায় কিছু টাকা দাও।’

শব্দ মল্লিকের ইংরিজি মত। বললে, ‘তোমায়  
কেন টাকা দিতে যাব ? তোমার তো দিবিয়া শরীর  
আছে, তুমি তো খেটে খেতে পারো।’

‘দিবিয়া শরীর ?’

যা হোক কিছু রোজগার তো করছ। তোমায়  
দেব কেন ? যারা খুব গরিব, কিংবা কাণা-খোঁড়া  
তাদের দিলে কাজ হয়।’

খাক মশাই, ঢের হয়েছে।’ হৃদয় বললে  
উঠল : ‘আমার টাকায় কাজ নেই। ঈশ্বর করুন  
আমায় যেন কাণা-খোঁড়া হৃদয়দিদার না হতে হয়।  
ঈশ্বারা দিয় কাজ নেই, আমারো নিয়ে কাজ  
নেই।’

রামকৃষ্ণের দি... কি এমন ভাবের ঢেউ  
ঢিঁফিঁফ। তোমার মার কাছে গিয়ে কিছু সিদ্ধাই  
চাইতে পার না ? যাতে করে কিছু খাঁটি জব্বা লাভ  
হয় তার দিকে দৃষ্টি দিতে পারো না ? তোমার  
এ ভাব দিয়ে কি অভাব মিটবে ?

আবার ? ধমকে উঠল রামকৃষ্ণ। তোর পাল্লায়  
পড়ে সিদ্ধাই চাইতে গিয়ে আমি যা দেখেছিলাম তা  
আমি ভুলিনি। জানিস তো, ‘মাগনেসে ছোটো হো  
যাতা’। এমন যান ভগবান তিনি যখন ভিক্ষে  
করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁকে বামন রূপ ধরতে  
হয়েছিল। কেন মিছিমিছি চাইতে গিয়ে ছোট  
হবি ?

রাখো ওসব তত্ত্ব কথা। তত্ত্ব কথায় পেট ভরে  
না।

হৃদয় একটা এঁড়ে বাছুর কিনলে।

ঘাস খাওয়াবার জন্তে নিত্য সেটাকে বাগানে  
বঁধে রাখে। কত যত্ন-আত্তি করে। সোহাগ করে-  
গলায়-পিঠে হাত বুলায়।

“রোজ ওটাকে ওখানে বঁধে রাখিস কেন রে?”  
জিগগেস করলে রামকৃষ্ণ।

“ওটাকে দেশে পাঠিয়ে দেব।”

“কেন, সেখানে কী?”

“বড় হলে সেখানে ও লাঙল টানবে।”

কোথায় কামারপুকুর, শিওড়, আর কোথায়  
কলকাতা। বাছুরটা সেখানে যাবে ঐ পথ ভেঙে।  
সেখানে গিয়ে বড় হবে। বড় হয়ে লাঙল টানবে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ল রামকৃষ্ণ।

এরই নাম মায়ী, এরই নাম সংসার।

চালের আড়তে বড়-বড় ঠেকের মধ্যে চাল  
থাকে। যাতে ইত্থর ঐ চালের সন্ধান না পায়,  
আড়তদার একটা কুলোতে করে খই-মুড়কি রেখে  
দেয়। ঐ খই-মুড়কি খেতে মিষ্টি, ইত্থরগুলো তাই  
সমস্ত রাত কড়র-মড়র করে খায়। চালের সন্ধান  
আর পায় না।

ওরে, মায়াকে চিনতে চেষ্টা কর। মায়াকে যদি  
চিনতে পারিস, মায়ী আপনি লজ্জায় পালাবে।  
হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয়  
দেখাচ্ছিল। ছেলেটা বললে, আমি চিনেছি, তুই  
আমাদের হরে। হরিদাস তখন হাসতে-হাসতে  
চলে গেল।

হরিদাসকে চিনবে না। তার বাঘের ছালেই  
সে মাতোয়ারা।

উনচল্লিশ

আমার তো মামাই আছে। আমার আবাব  
ভাবনা কী। আমার আবার কিসের সাধন-ভজন।

হৃদয় ডঙ্কা মেরে বেড়ায় আর বিষয়-আশয়ের  
ফিকর খোঁজে। কোথায় একখানা জমি, কোথায়  
একটা গরু, কোথায় কটা টাকা। পরিবারের জন্তে  
একখানা গয়না, নিজের জন্তে একখানা শাল।

সাধক-ভক্তদের কাছ থেকে শোনে যখন রাম-  
কৃষ্ণের অলৌকিকের কথা, তখন বলে, ভালোই

তো, আমার মেহনৎ কমল। ঐ যে কথায় বলে  
না, মামার হলেই ভাগনের হল। আমরা হয়েছে  
তাই। এর হওয়াতেই আমার যোল আনা হয়ে  
আছে। মহাত্মার যখন পাত্র হবেন তখন নন্দী-  
ভৃঙ্গীকেও নিয়ে যাবেন পাত্র করে।

তার পরে পারিচর্য্য কম করছি? আমি না  
হলে ওর সাধুগিরি বেরিয়ে যেত। আমি আছি  
বলেই ওর এত জেল্লা-জমক। আমাকে কি অ'র ও  
ফেলতে পারে?

আমি তাই খাই-দাই আর তুড়ি মারি। আর  
আর যদি পারি তো এই ফাঁকে কিছু গুছিয়ে নিই  
চাল-কলা।

এমনি সময় তার স্ত্রী মরল।

মুহূর্তে মন কেমন উলটো-মুখো হয়ে গেল।  
সংসার যেন উড়ে গেল তাদের ঘরের মত। টাকার  
তোড়া মনে হল ধুলোর ঝোড়ার মত।

সেও খুলে ফেলল পরনের কাপড়, ছুঁড়ে ফেলল  
গলার পৈতে। উগ্র ভঙ্গি করে বসল ধ্যানাসনে।  
কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে এক দিন ধরল  
গিয়ে রামকৃষ্ণকে। বললে, ‘তোমার যেমন ভাব-টাব  
হত, তেমনি আমার করে দাও। আমাকে ভুবিয়ে  
দেও অতলে। দেখাও তোমার মহামায়াকে—’

সব মিলে, ‘তোমার ও সবে দরকার নেই।’

‘আলবৎ আছে।’ গর্জে উঠল হৃদয়। বললে,  
‘তুমিই ফল পাবে আর কেউ পাবে না? মা কি  
তোমার একলার?’

ও ‘ওরে, শুধু আমাকে সেবা করলেই তোমার ফল  
হবে।’

‘ঢের সেবা করেছি এত দিন। কিছু হয়নি।  
আমার এখন ভাব চাই। আমাকে ভাব দাও।’

‘কী বলিস পাগলের মত।’ রামকৃষ্ণ তাকে  
বোঝাবার চেষ্টা করল। ‘আমরা যদি দু'জনেই ভাবে  
বিভোর হয়ে থাকি, তখন কে কাকে দেখবে?’

‘তা আমি জানি না।’ হৃদয় ছাড়বার পাত্র নয়।  
তাকে তখন বৈরাগ্যে পেয়ে বসেছে। বললে,  
‘আমাকে তুমি বলে দিয়ে যাও, কি করে কি হবে—’

‘আমার ইচ্ছায় কিছুই হবার নয়। সব মার  
ইচ্ছে। মাকে গিয়ে ধর, মার যদি ইচ্ছে হয়, তোরও  
হবে। যদি ইচ্ছে করেন নিশ্চকেও তিনি বিখণ্ডী  
করতে পারেন।’

বেশ, তবে মাকেই ধরব। এই ধরলাম। এই বসলাম দৃঢ়াসনে।

আন্তে-আন্তে দর্শন হতে লাগল হৃদয়ের। পূজায় বা ধ্যানে বসে সুরু ইহা অর্ধবাহ্যদর্শন। কখনো বা নিবিড় ভাবাবেশ।

মথুর বাবু প্রমাদ গণলেন। জিগগেস করলেন রামকৃষ্ণকে, 'হৃদয়ের আবার এ সব কী হচ্ছে? চং না কি?'

‘না। খুব থাকুল হয়ে মাঁকে ধরেছিল, মা-ই এই ভাব এনে দিয়েছেন।’

‘সর্বনাশ। তা হ’লে কী হবে হৃদয়ের?’

‘কিছু ভয় নেই। মা-ই সব দেখিয়ে-বুঝিয়ে দু দিনে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।’

মথুর বাবু বুঝলেন এ সবই রামকৃষ্ণের খেলা। বললেন, ‘বাবা, তুমিই ওকে ভাব দিয়েছ, তুমিই আবার ওকে ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা তোমার ছুই ভৃত্য, নন্দী আর ভূপী, আমরা তোমার কাছে থাকব, তোমার সেবা-চর্যা করব। আমাদের আবার এ ছাড়া ভাব কি, এ ছাড়া কাজ কি। আমাদের আবার কিসের অদ্বৈত অবস্থা।’

পঞ্চবটীর দিকে চলেছে রামকৃষ্ণ। হয় তো দরকার হতে পারে। হৃদয় গাড়ু-গায়ুল নিয়ে চলল পিছু-পিছু। যেতে-যেতে অপর্য দর্শন-হৃদয়-ভিত্তি। অলোক-অবলোকিত দর্শন। দেখল রামকৃষ্ণ দেহ-ধারী মানুষ নয়, একটি চলমান জ্যোতি-বতিকা। দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচি। সেই আলাতে পঞ্চবটী প্রাবিত, উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। রামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় ছাখানি পা যেন মাটি স্পর্শ করছে না, শূণ্যের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। যেন শূণ্য সরোবরে রক্ত পদ্ম চলেছে ফুটে-ফুটে।

হৃদয় চোখ মুছল। সব ঠিক আছে। শুধু রামকৃষ্ণই আর দেখে নেই, শিখাময় হয়ে গিয়েছে।

তাকালো সে নিজের দিকে। এ কি। তারও দেখি দিব্যসত্তা, সেও দেখি নিরঙ্গ-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন ঐ সম্মুখবর্তী দিব্য-অঙ্গেরই অংশস্বরূপ। দেবতার পশ্চাতে দেবানুত্তর। দেবতার সেবা-সঙ্গ করবার ভঞ্জে দেববেশে তার এই পৃথকস্বত্তি।

হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল হৃদয়, ‘ও রামকৃষ্ণ! ওনহ? আমরা মানুষ নই, আমরা দেবতা।’

একবার চোঁচিয়ে ক্ষান্তি নেই হৃদয়ের। দিগ বিদিক জ্ঞান হারিয়ে আবার সে চোঁচিয়ে উঠল অবোধের মত : ‘ও রামকৃষ্ণ! দাঁড়াও! দেখছ আমরা কে! আমরা তবে কেন এখানে পড়ে আছি?’

‘ওরে থাম, থাম—চোঁচাস নে—’ রামকৃষ্ণ মিনতি করল।

‘কেন থামতে যাব? তুমিও যা আমিও তাই। আমরা দু জনেই অবতার।’

‘ওরে থাম, লোকজন সব এখুনি ছুটে আসবে।’ ‘আমুক না লোকজন।’ হৃদয় তবু থামবে না কিছুতেই। সমানে চোঁচাতে লাগল। ‘এ দেশে থেকে আর আমাদের লাভ কি? চলো অস্ত্র দেশে যাই। দেশে দেশে গিয়ে জীবোদ্ধার করি।’

কিছুতেই স্তব্ধ হবে না হৃদয়।

রামকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটে এল হৃদয়ের কাছে। তার বুকে হাত ঠেকিয়ে দিলে। বললে, ‘দে মা, শালাকে জড় করে দে।’

দিব্যদর্শন ছুটে গেল মুহূর্তে। আনন্দের সাগর এক খাসে শুকিয়ে গেল। সেই শরীরী শিখা নিবে গিয়ে মূর্ত হল রক্ত-মাংসের দেহ।

‘মামা, এ কী করলে?’ কেঁদে ফেলল হৃদয়। ‘আমাকে জড় বানিয়ে নিলে?’

‘তোকে শুধু একটু স্তব্ধ করে দিলাম।’

‘আমি আর দেখতে পাব না সেই দৃশ্য?’ নিঃশ্বের মত তাকিয়ে রইল হৃদয়।

‘তুই যে বড় গোল করিস। একটু কি দর্শন পেয়েই একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলি। দেশশুদ্ধ লোক তোকে খুঁজছে।’

দরকার নেই হৃদয়ের। আমি একাই পারব। রামকৃষ্ণ যশস্বিনী হয়ে থাকে, আমিই বা কম কিসে। ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়িয়ে দিল হৃদয়। গভীর রাত্রে উঠে-উঠে যেতে লাগল পঞ্চবটী।

ঠিক করল রামকৃষ্ণ যেখানে বসে জপধ্যান করত সেখানেই আসন করতে হবে। হয় তো সেই জায়গাটিই পয়মস্ত। হয় তো বা মাটির কোনো গুণ আছে। দেখি না কি ফল হয়।

যেই সেই জায়গাটিতে বসেছে আসন করে, অমনি চীৎকার করে উঠল : ‘মামা গো, পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। শিগগির বাঁচাও।’

সে আতর্জনাদ শুনে পেল রামকৃষ্ণ। ত্রস্ত পায়

ছুটে এল ঘর ছেড়ে। মুখে এক করুণ জিজ্ঞাসা :  
'কি রে, কি হয়েছে?'

'এইখানে ধ্যান করতে বসা মাত্র কে যেন এক  
মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে।' যন্ত্রণায় ককিয়ে  
উঠল হৃদয়। 'সারা গা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে।'

'তুই কেন এ সব করিস বল তো? তোকে  
বলছি না আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।  
কেন তবে এ সব ঝামেলা করছিস? নে, ঠাণ্ডা  
করে দিচ্ছি তোকে—' রামকৃষ্ণ তার গায়ে স্নেহকরুণ  
হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সেই স্পর্শে শান্তি হয়ে গেল হৃদয়ের।  
গঙ্গাস্নানের মত এল যেন শীতল নির্মলতা।

বুঝলে সেবা ছাড়া আর তার পথ নেই। শুশ্রূষা  
ছাড়া নেই তার আর কোনো জিজ্ঞাসা।

বেশ আছি। যেখানে আছি, সেখানেই আমার  
রামের অযোধ্যা। 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে  
হাততালি দিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমার শুধু হরিনাম।  
তা হলেই সব পাপ-তাপ চলে যাবে। পাপ-হরণ  
করেন বলেই তো তিনি হরি। দেহবৃক্ষে পাপ হচ্ছে  
পাখি আর নামকীর্তন হচ্ছে হাততালি। যেমন  
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে পাখি উড়ে  
যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ  
থেকে পালিয়ে যায় অবিজ্ঞা।

যা আমার হৃদয় নয় তার পিছনে ছুটি কেন?  
আমার শুধু ডাকের আশায় দাঁড়িয়ে থাকা।  
"হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।"

এই সব ভাবে বটে কিন্তু মনের অনাচে কোণের  
একটু অহং থেকে যন্ত্রণা। নান্দ্যক কোণায়  
লুকিয়ে থাকে অশ্বপের শিং, তা তাকে ফাঁকড়ি  
বেরোয়।

হৃদয় বললে, বাড়িতে এবার ছুর্গোৎসব করব।  
মা আমার পূজো নেন কি না দেখতে হবে। মথুর  
বাবুকে বললে, 'কিছু টাকা দিন।'

'তা দিচ্ছি।' মথুর বাবু রাজি হলেন একদাকো।  
বললেন, 'কিন্তু বাবাকে নিয়ে যেতে পাবে না।'

সে কি কথা? আমার বাড়িতে প্রথম পূজো  
মামা থাকবে না?

'নাই বা থাকলাম। তুই তার জন্তে ক্ষুণ্ণ  
হোস নে হুহু।' সাসুনা দিল রামকৃষ্ণ। বললে,  
'আমি রোজ স্নান দেহে তোর পূজো দেখতে যাব।

আর তোকে বলছি, আর-কেউ দেখতে পাবে না  
আমাকে, কিন্তু তুই পাবি।'

আরো শোন, বলে দিই, কাকে দিয়ে প্রতিমা  
গড়াবি, কে হবে ওস্তাদারক। নিজের ভাবে নিজেই  
পূজো করবি। আর শোন, একেবারে উপোস করে  
থাকিস না, দুধ গঙ্গাজল আর মিছরির সরবৎ খাবি।  
বুঝলি?

হলও তাই। রোজ পূজো-স্নানের পর রাতে  
আরাত করবার সময় হৃদয় দেখতে পেত রামকৃষ্ণ  
এসে দাঁড়িয়েছে প্রতিমার পাশে।

আশ্চর্য, প্রতিমা প্রতিমাই থাকে। কিন্তু  
করণাঘন রামকৃষ্ণ দাঁড়ায় এসে ভক্তের আঙিনায়।

চল তবে সেই করুণা-নিলয়ের কাছে। সেখানে  
গিয়ে তারই সেবারাধনায় মন দিই।

হৃদয়ও তাই ফিরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। শুধু  
মাঝখান থেকে আরেকবার বিয়ে করে নিলে।

চলিগ

সতেরো বছরের স্বরূপ ছেলে এই অক্ষয়।  
মা-বাপ-মরা ছেলে। বসেছে বিষ্ণুমন্দিরের পূজারি  
হয়ে। ধ্যানে নিম্পন্দ হয়ে বসে থাকে দু-তিন ঘণ্টা।  
নিজের হাতে রান্না করে খায়। সারা দিন গীতা  
পড়ে।

শুধু ভাই-পো বলে নয়, ভক্তির জোর দেখে  
তাকে বড় ভালোবাসে রামকৃষ্ণ।

সেই অক্ষয়ের বিয়ে হল। বিয়ের পরেই অশ্বথ  
পড়ল। ডাক্তার বললে, সামান্য জ্বর, সেরে যাবে।

কিন্তু হৃদয়কে ডেকে নিয়ে বললে রামকৃষ্ণ, 'হুহু,  
লক্ষণ বড় ঝারাপ। ছোঁড়া বাঁচবে না।'

'ছি মামা। তোমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরুলো  
কেন?'

'তার আমি কি জানি। মা যেমন বলান তেমনি  
বলি। নইলে, বল, আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় চলে  
যায়?'

হৃদয় উঠে-পড়ে লাগল কি করে ভালো করা  
যায় অক্ষয়কে। যত ডাক্তার আছে কাউকে বাদ  
দিলে না। কিন্তু যার ডাক পড়েছে ডাক্তার তার  
কী করবে।

মাস খানেক ভুগে এমন জায়গায় এসে ঠেকল  
যখন সলতে আর উস্কে দেওয়া যায় না। এল সেই

অন্তিম মুহূর্ত। রামকৃষ্ণ পাশে বসে অক্ষয়কে সম্বোধন করে বললে গাঢ়স্বরে, ‘অক্ষয়, বলো, গঙ্গা, নারায়ণ, ওঁ রাম।’ ঐ মন্ত্র তিন-তিন বার আবৃত্তি করল অক্ষয়। তার পর ধীরে-ধীরে লীন হয়ে গেল।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কাঁদতে লাগল হৃদয়। রামকৃষ্ণ চলে গিয়েছে ভবির্ভূমিতে। হৃদয় যত কাঁদে, তত হাসে রামকৃষ্ণ। নাচে, গান গায়। অমৃততীর্থে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে অক্ষয়। ক্ষয়হীন আনন্দধামে। এ দেখে যদি আনন্দ না হয় তবে কী দেখে হবে!

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বেশ স্পষ্ট দেখল চোখের উপর। দেখল কি করে মানুষ মরে, কি করে আত্মা বেরিয়ে আসে দেহ থেকে, কাণ্ডায় যায় সে আত্মা। দেখল খাপের ভিতর থেকে বাকবকে তরোয়াল এল বেরিয়ে। তরোয়ালের কিছু হল না, শুধু খাপটা পড়ে রইল। সেই উজ্জ্বল নির্ভীক তরোয়াল এই মায়-মিথ্যার তমসা ভেদ করে চলে গেল লোকাতীত আলোকতীর্থে।

কিন্তু সেই ভাবলোক ছেড়ে নেমে আসতে হল ফের স্থূল মাটিতে। পর দিন কালীবাড়ির উঠানের সামনের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ, দেখল, অক্ষয়ের নর-দেহ পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফিরে আসছে শ্মশানঘাতীরা। যেমনি দৈন্য অমনি বুক-ফাটা কান্না পেল রামকৃষ্ণের। গামছা যেমন নিঙেড়ায়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি কেঁদে নিঙেড়োচ্ছে। সমস্ত দুঃখ অবুধ্য অশ্রুর উচ্ছ্রাব্ধি উথলে উঠল।

সে জলধরকে রোধ করে।

‘মা, এখানে পরনের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়! তাই দেখাচ্ছি বটে।’

কখনো আমি-আমার বলে না রামকৃষ্ণ। সব ‘এখানে’, ‘এখানকার’!

‘আমি গেলে ঘুচিবে জঞ্জাল।’

‘কৃষ্ণকিশোরের ভবনাথের মত দুই ছেলে। ছোটো-আড়াইটে পাশ। মারা গেল। অতো বড়ো জ্ঞানী। প্রথম-প্রথম সামলাতে পারলে না। আমায় ভাগ্যিস ঈশ্বর দেননি।’ ঠাকুর বললেন আগ্রহের মত।

কে এক জন ভক্ত বললে, ‘ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তো বেশ হয়। শোক-টোক থাকে না।’

‘উহু। শোক ঠেলে দেয় ভক্তিকে।’

বিধবা ব্রাহ্মণী—তার একমাত্র মেয়ে, নাম চণ্ডী। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই প্রকাণ্ড জমিদার, খেতাব পেয়েছে রাজা বলে। থাকে কলকাতায়, জাঁক-জমকের সংসার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসে, সামনে-পিছে সেপাই-শাস্ত্রী নিয়ে আসে। মায়ের বুক দশ হাত হয়। কিন্তু পলতের বাতি নিবে গেল এক ফুঁয়ে। কি একটা সামান্য অকুখে অল্প কান্না ভুগে মেয়েটি চোখ বুজল।

বিধবা থাকে সেই বাগবাজার। কি করে এই অসাধ্য শোক শাস্ত করবে তারই জন্তে বাগবাজার থেকে থেকে-থেকে ছুটে আসে পাগলের মত। যদি ঠাকুর কিছু উপায় বলে দেন। যদি সেই শীতল শাস্তমূর্তি দেখে বুক জুড়ায়।

ব্রাহ্মণীর দিকে তাকালেন একবার ঠাকুর। বললেন, ‘সেদিন এক জন মজার লোক এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে থেকে বললে, যাই এখন একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখি গে। আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম, তবে রে শালা! ওঠ, এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?’

বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন ঠাকুর। কথা আছে নন্দ বোসের বাড়ি থেকে যাবেন ব্রাহ্মণীর বাড়ি।

‘সেই ঠাকুর আর আসেন না। ব্রাহ্মণী কেবল ঘর-বারি পরিষ্কার-স্বচ্ছন্দ আর এলেন না। অভাগিনীরা! অকল্যাণ, অগবানের পদার্পণের স্থান আছে?’

শেষকালে উচাটন হয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। গেল সটান নন্দ বোসের বাড়ির দিকে। খবর নিতে, চলে গেলেন না কি দক্ষিণেশ্বর? না কি নন্দ বোসের আনন্দ ভবন পেয়ে ভুলে গেলেন দুঃখিনীর শোকম্লান ঘরের কোণটি?

ব্রাহ্মণীও গেছে, আর অমনি ঠাকুর এসে পড়লেন ভক্তদের নিয়ে।

বাড়িতে ব্রাহ্মণীর ছোট বোন, সেও বিধবা। বললে, ‘দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে। এই এলেন বলে।’

ছাদের উপর সবাইকে নিয়ে বসেছেন ঠাকুর। ছেলে-বুড়ো পুরুষ মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণে-প্রাণে বয়ে চলেছে ভক্তির স্রোতস্বতী। এত লোক, তবু মনে হচ্ছে, এক জন কে নেই।

‘ঐ দিদি আসছেন।’ ছোট বোন উজ্জ্বল উঠল।

ছাদে উঠে ঠাকুরকে দেখে আশ্চর্য্য কি বলবে কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছে না। অস্থিরের মত এদিক-ওদিক করছে। বলছে, ‘আমি নিশিদিশি কাঁদি, কিন্তু, ওগো, আমি যে এখন আহ্লাদে আর বাঁচি না। তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি। ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল—সঙ্গে সেপাই-শাল্মী—পাহারা দিচ্ছিল বাড়ির দরজায়, তখনো যে আমার এত আহ্লাদ হয়নি গো। আমার এ কি হোল, চণ্ডীর শোক আর আমার এখন একটুও নেই গো! মনে করেছিলাম তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করেছি সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব। আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না, যেখানে আসবেন একবার অন্তর থেকে দেখে আসব। তাই, সকলকে বলি, আয় রে আমার সুখ দেখে যা, আমার ভাগি দেখে যা দেখে যা আমার ঘরে আজ কে এসেছে। ওগো, আমি মরে যাব, আমার এত সুখ সহিবে না। তোমরা সবাই মিলে আশীর্বাদ করো আমাকে, নইলে মরে যাব সত্যি-সত্যি -’

অক্ষয়ের মৃত্যুর পর থেকে রামকৃষ্ণ কেমন বিষন্ন। মথুর বাবু বললেন, চলে একবার আমার জমিদারিটা স্মরে আসবে।

তাই চলো। ওরে হুঁ, জমিদারি দেখবি চল।

চুপুঁর খালে নোকোয় করে বেড়াচ্ছে তিন জন। রানাঘাটের কাছাকাছি কলাইঘাটায় এসে রামকৃষ্ণের চোখ পড়ল দারিদ্র্যদলিত জনগণের উপর। রামকৃষ্ণ বললে, ‘এই তোমার জমিদারির চেহারা? এই হাল তোমার মহালের?’

কেন, কী হল?

দেখ দেখি ঐ লোকগুলোর দিকে। পরনে টানা, পেটে-পিঠে এক হয়ে রয়েছে। শোনো, সবাইকে একথানা করে কাপড় দাও, আর খাইয়ে দাও এক বেলা।

যেমন চিরদিনের অভ্যাস, তানা-না-না করতে লাগলেন মথুর বাবু।

তবে তোমার জমিদারি জাহান্নমে যাক। চল রে হুঁ, আর জমিদারি দেখে না। ফিরে চল দক্ষিণেশ্বর।

মথুর বাবুকে আবার তাঁর থলের মুখ কাঁদালো করতে হল। গ্রামের লোকদের অন্নবস্ত্র বিতরণ করলেন।

সাতক্ষীরার কাছে সোনাবেড়ে গ্রামে মথুর বাবুর পৈত্রিক ভিটে। তারই কাছাকাছি তালামাগরো গ্রাম। সে-গ্রামে তাঁর গুরুশ্বর। গুরুবংশে সরিকি অংশ নিয়ে ঝগড়া বেধেছে। আপোষনিষ্পত্তি করবার জন্তে তলব পড়েছে মথুর বাবুর।

এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। রামকৃষ্ণ আর হৃদয় চলেছে পাঙ্কিতে। আর মথুর বাবু হাতীর হাওদায়।

সহসা শিশুর মত হয়ে গেল রামকৃষ্ণ। বললে, ‘আমি হাতী চড়ব।’

মথুর বাবু বাহন বদলালেন। রামকৃষ্ণ আর হৃদয়কে হাতীতে চাপিয়ে নিজে এলেন পাঙ্কিতে। হাতীতে চড়ে রামকৃষ্ণের আনন্দ তখন দেখে কে।

সর্বভূতে নারায়ণের গল্প জানিস তো? গুরু শিখিয়ে দিয়েছে শিষ্যকে, শিষ্যকে আর পায় কে। পথ দিয়ে হাতী চলেছে, উপর থেকে মাছত বললে, সরে যাও। শিষ্যের তখন সর্বভূতে নারায়ণ—সে ভাবলে, সরব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, আমাদের মধ্যে বিরোধ নেই সরাসরি হাতীর সামনে এসে দাঁড়াল, সরল না এক চুল। হাতী তাকে শুঁড়ে করে ধরে দূরে ছুঁড়ে ফেললে। ঘা-বাধা সারবার পর গুরুর কাছে এসে নালিশ করলে। গুরু বললে—ভলো কথা, তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, আর মাছতটি নারায়ণ নয়? মাছত নারায়ণের কথা শুনবে না?

দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল দলবল। কলুটোলায় কালী দত্তর বাড়ি বৈষ্ণবদের প্রকাণ্ড হরিসভা বসে। সেখানে এক দিন নেমস্তন্ন হল রামকৃষ্ণের। আর, যেখানেই রামকৃষ্ণ, সেখানেই তরুচ্ছায়ার মত হৃদয়রাম।

ভাগবত পাঠ হচ্ছে। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই ভাগবত। রামকৃষ্ণও বসে পড়ল একধারে।

সামনে মহাপ্রভুর আসন। তার মানে বেদীতে যে আসন বিছানো তা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের আসন। বৈষ্ণবদের পূজা-পাঠের সময় থাকে এমনি আসন বিছানো। কল্পনা করা হয় সেখানে গৌরাজ দেব



এসে বসেছেন, শুনেছেন হরিকথা। ভক্তের মধ্যেই ভগবানের অধিষ্ঠান, এই ভাবটিরই প্রতীক ঐ আসনখানি।

রামকৃষ্ণকে পেয়ে ভক্তির স্রোত অ'রো উত্তরঙ্গ হয়ে উঠল। হরিকথায় এল আরো অতলতরো অনুরক্তি।

কোথা থেকে কি হয়ে গেল কেউ টের পেল না, রামকৃষ্ণ হঠাৎ সেই চৈতন্যাসনের উপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ। একখানি হাত উর্ধ্বে তোলা আর তার আঙুলে সেই বাক্যাতীত ভাবলোকের নির্দেশ। সর্বাঙ্গ নির্বায়ু-নিশ্চল দীপ-শিখার মত স্থির, মুখে প্রেমপূর্ণ প্রসাদ-শাস্তি। চৈতন্যদেবের সমস্ত চিহ্ন অঙ্গে-ভঙ্গে দেদীপ্যমান।

শ্রোতা-বক্তা সকলেই স্তম্ভিত হয়ে রইল। ভালো-মন্দ কোনো কথাই কার মুখ দিয়ে বেরুল না। ভয়ে-বিস্ময়ে কাঠ হয়ে রইল সবাই।

এ কি অঘটন!

জনতার উগ্র দৃষ্টি শাস্ত হয়ে এল ক্রমে ক্রমে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে এল কোমল মুগ্ধতা।

যেই নাম শুনে সমাধি সেই নাম শুনেই আবার বহির্জ্ঞান। স্মরণ কীতুন লাগাও। কীতুন শুনিয়ে প্রভুর ধ্যান ভাঙাও।

বৈষ্ণবের দল কীতুন শুরু করল। নাম-বাংকারে জ্ঞান এল রামকৃষ্ণের। ছ হাত তুলে শুরু করল নাচতে। মাধুর্যে উজ্জ্বল আবার উদ্দামতায় উত্তাল। সেই যে নৃত্য সে-নৃত্য নটশ্রেষ্ঠ মহাদেবের। সবাই তার চৈতন্যাসন।

নামসৌরভে বিভোর হয়ে উঠল, নয়নরঞ্জনকে দেখে হয়ে রইল নিম্পলক।

চৈতন্যদেবের আসন অধিকার করা রামকৃষ্ণের পক্ষে ত্রায় হয়েছে কি অত্ৰায় হয়েছে এ প্রশ্নের বাস্পটুকুও কার মনে রইল না।

কিন্তু ভাবের গিরিচূড়ায় কতক্ষণ থাকবে। নেমে আসতে হল দৈনন্দিন জীবনের সমতলতায়। তখন তর্ক উঠল এই আসন-অধিকারের ঐচ্ছিত্য নিয়ে। এক দল বললে, ঘোরতর অত্ৰায় হয়েছে। শুধু অত্ৰায় নয়, আত্মসমর্পণ। আরেক দল বললে, প্রাণ যেমন চায় ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু অত্ৰায় নয়, বাঞ্ছনীয়।

মীমাংসা হল না। সমস্ত বৈষ্ণব সমাজে বিষম আলোড়ন উঠল। এ যে ধর্মের কলঙ্কীকরণ। এর প্রতিকার কি?

সবাই গেল তখন কালনায়, ভগবানদাস বাবাজীর কাছে। ঘটনা শুনে ভগবানদাস তো রেগে কাঁই।

‘ভণ্ড, ধৃত’ কোথাকার।’ রামকৃষ্ণের উদ্দেশে তপ্ত-অঙ্গার গালাগাল। ছুঁড়তে লাগল বাবাজী। পারে তো নখে-দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে। বললে, ‘আর কোনো দিন ঢুকতে দিও না ওকে হরিসভায়।’

এ কি অঘটন!

আর যে অঘটনের ঘটনিতা, রামকৃষ্ণ, সে সাতোও নেই পাঁচোও নেই। সে কিছু জ্ঞানতেও পেল না।

সে এখন বসে আছে তৃণাসনে। সমস্ত তৃণাসনই তার চৈতন্যাসন। [ ক্রমশঃ। ]

### উন্টো বিপত্তি

এক জন বৈদেশিক, যে ভারতবর্ষের কোন ভাষার অক্ষর পর্যন্ত চেনে না, তার এক জন ভৃত্য ছিল যে ভারতবর্ষের অধিবাসী। বৈদেশিকটির ঘরের সকল কাজ করতো এই লোকটি। এক দিন কিছু উপহার এলো বৈদেশিকটির। কোন বস্তু তাকে পাটিয়েছে। উপহারের ভেতর অল্পাঙ্গ জিনিষের সঙ্গে ছিল একখানা তোয়ালে। ভৃত্যটি তোয়ালেখানি বিছিয়ে রাখলে টেবিলের ওপর। তোয়ালের গারে কি যেন ইংরেজীতে লেখা। লেখা রয়েছে “TAM HTAB.” বৈদেশিকটি কিছুতেই কথা হুঁটির অর্থ বুঝতে পারে না। বহু ক্ষণ পরে আবিষ্কৃত হ’ল লেখাটি “BATH MAT”, অর্থাৎ “স্নানের পাগোব”।

ইংরেজী-অনভিজ্ঞ ভৃত্যটি তোয়ালেখানা উন্টে রেখেছিল, তাই এই বিপত্তি।

# কোবান-পাড়া

অ, আ, ই

ইতিহাসের ধারা বদল হয়ে গেল।

এত দিন চলেছিল যে ধারায়, রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেল। যে-দিকে সূর্য উঠছিল, সেদিকে যেন আর উঠলো না। বন্ধন ছিঁড়ে গেছে আপনা থেকেই। ছেলেকে ত্যাগ ক'রে গেছেন মা। বস্ত্রের মত শাসন বীর কঠোর, কুসুমের মত সুস্থ হ'য় না সে একটি বারের মত? দয়া-মান্নার লেশু মাত্র নেই, এমনই ক্রমহীন। সেই সদাগজীর আর স্বল্পভাবীর কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে আর যেতে হবে না, স্বস্তির বাতাস লাগে যেন গারে। পাঠশালা, যেখানে আর কিছু নয়, শুধু লেখা আর পড়া, ব্যাকরণের সেই বিরস হাওয়ার সঙ্গে চুকে গেছে সম্পর্ক। দেবতাবার ধাতু শব্দের জটিলতার আর দ্বারাক্রান্ত করতে হবে না মন আর মস্তিষ্ক। ভটি, ভাস, বাণ আর মল্লিনাথের শরণাপন্ন হওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না। সন্ধির ঘন-ঘন বিচ্ছেদেরও চিন্তা নেই আর।

এখন বা মন চায় করতে পারো। বলবার কেউ আর রইলো না।

জ্ঞান-গোষ্ঠীর দৃঢ় বিশ্বাস ভেঙ্গে গেল খান-খান হয়ে। তাদের কেউ বিশ্বাস করতেই চাইলে না, বিশ্ববা বৌটার এই সেদিনের ছেলেটা মদ আর মেয়েমানুষের পাঞ্জায় পড়লো এই কাঁচা বয়সেই! একটা রাত যেতে না যেতেই হাওয়ার হাওয়ায় জানলো কেউ কেউ। আর আর শরিকদারেরা, নসিফদ্বিনের ছেলে বসিরই যত নষ্টের মূল জানলো। জানলো, সেই পথ দেখিয়েছে। কেউ কেউ বললো,—জিতা রও বৌটা!

ঘুমটা ভেঙ্গেছে টম কুকুরের লাকলাকিতে। ভোর হ'তে না হ'তেই কোথা থেকে এসে কি একখানা বই দাঁত আর নখের সাহায্যে ছিঁড়েছে কুটিকুটি। বেড়ালে তেলাপোকা হত্যা করে যে প্রক্রিয়ায়, ঠিক সেই ভাবে লাকিয়ে লাকিয়ে ছিঁড়েছে। কাগজের খড় মড় শব্দে চোখ মেলাতেই দেখলো টমের কপ্তি। টুকরো-টুকরো বইয়ের পাতা। ঘরের মেঝেয় ছড়াছড়ি।

বললে না কিছু। দেখেও।

বিছানার কাছাকাছি কোথায় পড়েছিল সরকারের কাঠ' বুকখানা! কে জানে, কিসের রাগে টম তার এই শতছিন্ন অবস্থা ক'রেছে। রাজভাষা ধুলায় লুপ্তিত করেছে।

জানলার ওপরে রঙীন কাচের নক্সা নর্দিস্ট্রাকারে। ভোরে প্রথম আলোর যে বার রঙ বিকিরণ করে। ফুল আর লতা-পাতার ডিজাইনে দেখা যায় সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত। অনেক দূরের থেকে ভেসে আসে সুবাসী ডাক। আন্তাবলে সইসদের শোবা-সুবাসীরা পাল। গমের কুটো খুঁটছে আর ডাকছে থেকে থেকে।

বড়-বড়ির রাত গেছে। জিজ্ঞে বাতাস বইছে এখনও।

বর্ষার আমেজে এখনও যেন ঘুমিয়ে আছে কলকাতা। শুধু মুগী ডাকছে। মুন্সিপালের গাড়ী যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে।

কিন্তু টম এ কি করলো! আর মনিবও দেখে বললে না কিছু।

বিছানা থেকে উঠে ঘরের বাইরের দালানে বেরিয়ে পড়লো মিষ্টি ভোরবেলায়। দালানে যেতেই দুটি পড়লো একখানা গাড়ী যেন রয়েছে ফটকের মুখে।

হাওড়া ট্রেনের একখানা ছাকরা গাড়ী কোন্ কেলানের। এই ভোরের ট্রেনে কিরছেন ম্যানেজার বাবু। বিহার থেকে পুণ্যাই সরে আদায়-পত্র ক'রে কিরছেন প্রচুর মাল সঙ্গে নিয়ে। একখানা গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছে তাই। সিপাই আর পাইকরা মাল নামাচ্ছে গাড়ীর মাথা থেকে।

মহলের ফেরতা ম্যানেজার বাবু। শুধু হাতে আসবেন? কলসী কলসী কই, ঘিরের মটকী, বালুসাই গজার চ্যাপারী, বস্তা বস্তা কড়াই আর অড়র। আরও কত কি। টাকার থলি, কারেজী নোট আর রোপ্যমুদ্রা। বিহারী প্রজাদের মাটির তলার পুঁতে-রেখে-দেওয়া টাকা। চৈত্র মাসের নগদান খাজনা আদায়ের টাকা। কিছু বা বকেয়া খাজনার।

সম্পত্তির মালিকানার গর্ব বোধ। অহঙ্কার হয়। যা-কিছু দেখছি সব আমার। এমন কি চাবিটিও। কুমুদিনী কত কষ্টে বাড়ী ছাড়া হলেন, তাতে কোন দুঃখ নেই। তাঁকে কিরিয়ে আনার চিন্তা নেই। বরং যেন স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। নিজস্ব দখলের জমিজমা হাতে পাওয়ার তৃপ্তিতে কৃতকর্মের ক্ষোভ আর থাকে না মনে। এখন যা-খুশী তাই করবে। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, যেমন তেমন ক'রে কাটিয়ে দিতে পারলেই একেবারে মালিক হয়ে বসবে গদীতে। জমিদারীর রপোর সিংহাসনে বসবে, যেটা আসন নয়, সিংহও নয়, তবুও রূপার। মা যেন ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। নাগাল পাওয়া যায় না। না পাওয়া থাক, গেছে যখন তখন আপদ গেছে। শাসনের কে কার ধার ধারে!

অনন্তরাম এসে বললে,—ম্যানেজার বাবু সদর থেকে কিরছেন। কত মাল-মশলা এনেছেন। তোলা-পাড়া ক'বার লোক কৈ? যে করতো সে তো—

অনন্তরাম বুঝতে পারে যে, রাতারাতি ভোল পালটে গেছে। চোখে আর মুখে যেন ফুটে উঠেছে প্রচ্ছন্ন স্বার্থপরতা। চালাক চতুর নয়, মুখে যেন স্বার্থমি মাখানো। জম্মাবধি দেখছে অনন্তরাম, চিনে কেলছে বধনই দেখেছে জখনই। যেখানে কাঁটা থাকে সেদিক পানি চলে অনন্তরাম। স্বর-দোহ পরিভার করবে।

দালান থেকে দূরের একটা জানলা, অজ্ঞ কাদের, দেখা যায়।

চোখ প'ড়ে বেতেই লক্ষ্য করে অনন্তরাম, সেই মেয়েটা না ? ভোরের আলোর ঝলসে গেছে জানলাটা। নতুন গুঁঠনে মুখখানার খানিক ঢাকা। তবুও চেনা যায়। সেই ভলী যাবে কোথায়। সেই অজ্ঞান। রামধনু রঙের কি একখানা সাজী পরেছে, তার সূর্যালোক।

ঘরে চুকে দেখলো অনন্তরাম, ঘরের মেয়ের কাগজের ছোঁড়া পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। টুকরো-টুকরো কাগজ। কি একখানা বই ; যেন ঝাঁতে কামড়ে কে ছিঁড়েছে কুটি-কুটি। পাঁতাগুলো দেখেই বুঝলে অনন্তরাম, য়েছ ভায়ার সেই প্রথম-ভাগখানা। ছোঁড়া কাগজের বুক কত টুকরো কথা, মুক হয়ে রয়েছে। হজুরের দেশী নয়, সখের বিদেশী কুকুরের খেলা, আশঙ্ক করে অনন্তরাম।

—যাক, বাঁচা গেছে। স্বগত করলে অনন্তরাম। হাসলে কৃত্রিম হাসি।

গৃহের যিনি কর্তা তিনিই নেই।

এক জন নারী। সারা বাড়ী কাঁকা হয়ে গেছে। যে দিকে দেখো সে দিকেই যেন তার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার অভাব যেমন মধ্যান্ত্রিক ভেমন চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক। তবুও যেন তার চলা-ফেরা আর নিখাসের শব্দ অমৃভূত হচ্ছে। কুছদিনী আছে যেন অশরীরী কোথায়। যেন যায়নি।

খোদ জমিদারকে দেখেই ম্যানেজার বাবু যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে একটি নমস্কার করলেন। বললেন,—মা চণ্ডীর কুপায় অহুমান করি, সকলে কুশলেই আছেন।

ডয়তার খাতিয়ে প্রতি-নমস্কার জানালো কৃষ্ণকিশোর। বললে,—হ্যাঁ! কিন্তু কিরতে এত দেরী হ'ল কেন ?

ম্যানেজার বাবু হাসলেন। হাসতে হাসতেই বললেন,—হজুর, নির্বাক্কাটেই মিটে যাচ্ছিল, চলেও আসছিলাম নির্দ্বারিত দিনে। সহসা, চণ্ডীপীঠ মৌজার প্রজ্ঞা হজুর খাজনা দিতে অস্বীকার করলে। হজুর, সে একেবারে একজোটে হয়েই। তিন-চারটে ষোমের প্রজ্ঞা, সর্বসম্মত শতাবধি হবে।

—কেন ? জিজ্ঞেস করলে বার প্রজ্ঞা সে। কাছারীর দালানে বেস্তের আরাম-কোয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

ঠোটেই কোণে চাপা-হাসির স্বর টেনে বললেন ম্যানেজার-বাবু,—সে আর বলেন কেন হজুর। আপনাদের সব শরিকদারী চাপায়। আপনাদের প্রতিপক্ষ, বারা হজুর আপনাদের গিয়ে ন'পরদার মালিক, তারাই না কি চণ্ডীপীঠ মৌজার মোড়লদের হাত করেছিল। খাজনা দিতে মানা করেছিল। বলেছিল, চণ্ডীপীঠ মৌজার স্বত্ব না কি তাঁদের। খাজনা তাঁরাই আদায় করবেন।

—তার পর ? যেন এ্যাডভোকেটের আভাস পেয়ে বললে বার প্রজ্ঞা।

নৌকা আর ট্রেনের ধকলে ক্লাস্ত ম্যানেজার বাবু। বিহারের রোজে মুখখানা যেন পুড়ে গেছে। তাঁমাটে রঙ মুখের। কিছুই যেন হয়নি এমনি একটা ভাব তাঁর কথায়। বললেন,—সরকারের হাতে এট্টে হজুর আপনাদের গিয়ে। সোজা গিয়ে নর্থব্রুককে

সকল বুভুক্ষু জানাতেই বারোটা আর্ম'ড-গার্ড দিলে সঙ্গে। একবারে হজুর আপনাদের গিয়ে তহমা-বাঁটা। তা হজুর আপনাদের গিয়ে ঐ বারোটা দোনলা দেখেই তার আর টু' শব্দটি পর্যন্ত করলে না। যে বার দেনা মিটিয়ে দিলে।

নর্থব্রুক সাহেব হচ্ছেন বিহারের একচ্ছত্র কমিশনার। একে খাশ-সাহেব, তার আট-সি-এস্ দেশের বাইরে ইংরেজের এমন স্বজাতি-বন্ধু আর ছ'টি আছে কি না, ইংরেজই জানে না। রাজভক্ত নর্থব্রুক, আগে নেটিভ ল্যাণ্ড, তার পর অস্ত্র কিছু। বুটেনের পক্ষ থেকে কাঞ্চিভার গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষে এসেছে। পলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট থেকে বদলী হয়েছে বিহারে। রেল কোম্পানির লাল নিশেনের ট্রিলিতে চেপেই গোটা বিহার দেখে নিয়েছে। আর দেখেছে একখানা ম্যাপ সরকারী ছাপাখানায়। বিহারের মানচিত্র। ভৌগোলিক।

নর্থব্রুক জানে রাজত্ব করতে হ'লে কোন দেশের জ্ঞান, মূঢ় আর মুকদের সঙ্গে মিতে পাতিয়ে কোন ফয়দা নেই। জাহাজ থেকে নেমেই দূরবীক্ষণের সাহায্যে ভারতবর্ষকে দেখেছে নর্থব্রুক। দেখতো না, তার পূর্বপুরুষদের দেওয়া শিক্ষায় দেখেছে। রাজত্ব করতে হ'লে চোখ মেলে রাখতে হয়।

দূরবীক্ষণের ভেতর থেকে দেখেছে নর্থব্রুক, ভারতবর্ষের জল আর মাটিতে পাশাপাশি ছ'রকমের বসতি। আকাশ-চুম্বী নগরসৌধ আর পূর্ণকুটির। বন্ধরে নেমেই দূরবীক্ষণের ভেতর মুসলিম রাজত্বের নিশানা দেখতে পায়েছে। মহম্মেডান আর্কিটেকচার, মুসলিম স্থপতি—শেখ মুসলমান রাজত্বের বাকী অবশিষ্ট।

আর এদের গায়ে গা মিলিয়ে কত যেন শব্দায় রয়েছে শত শত ঐ পূর্ণকুটির। যত সব জ্ঞান, মূঢ় আর মুক দেশবাসী। এই রাজ্যেরই আসল অধিবাসী।

ম্যানেজার বাবু প্রান্ত নর্থব্রুককে বেছে নিয়েছিল দেখে দেখে। বাদের চাল-চলো আছে তাদের বলে ভিড়ে গিয়েছিল। বাদের সাত-পুঙ্করের বৈঠকখানা আছে তাদের সঙ্গে ভাব। আর বাদের ঐ পাতার বর, তাদের সঙ্গে আড়ি নয়, কাজের সম্পর্ক। এসো, চাকরী কর', মাইনে নাও। চাকর হও।

ম্যানেজার বাবু লিখিত আবেদন-পত্রখানা পেয়ে নর্থব্রুক একবার শুধু স্লেটাটার মানচিত্র দেখেছে। তার পর কি একখানা সরকারী কেতাব দেখেই পেয়াদা পাঠিয়ে নিয়েছে ম্যানেজার বাবুর কাছে। সঙ্গে একখানা লেফাফা। 'আর্ম'ড, গার্ড দাও, জমিদারের পক্ষ থেকে।' কাঁড়ির অফিসারকে চিঠি দিয়ে দিয়েছে।

নর্থব্রুক আপিল শুনেই বুকে নিয়েছে এ দেশের ঐ নগর-সৌধের মালিক এরা।

বকলমের মালিক। কিন্তু মুসলমান নয়, হিন্দু।

জমিদারীর মালিক দেখে দেখে না ব'লে আর পারলে না। কাছারীর দালানের অর্ধেকটা ভ'রে আছে জিনিষ-পত্র। বললে,—কত কি এনেছেন।

ম্যানেজার বাবু বললেন,—সে হজুর আপনার গিয়ে থাকে বলে নাছোড়বান্দা। মানা শুনলে না।

কয়েকটা বাঁশের অঙ্কুর খুঁড়ি? কি আছে তাতে। খাজা না গজা। বললে,—ঐ চাফারীতে কি আছে ম্যানেজার বাবু?

ম্যানেজার বাবু যেন বলতে ভুলে গেছেন। বলতে মনে পড়তেই বললেন,—সে আর বলবেন না হজুর। ক'র বর প্রজা হুঁটো খাসি কেটে ছুঁড়ে পাঠিয়েছে হজুরের জন্তে। জিনিষটা আর বেলা হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে জানিয়ে দিন মা-ঠাকরুণকে।

ভাঁবেদারের দল বাস্তব নজরদারি জর্যাদি নিয়ে যায়। যেদিকে ভাঁড়ার সেদিকে।

কুক্কিশোর ম্যানেজার বাবুকে বলে,—কাছারীতে আক্রামুদ্দিনের ঠিকানা আছে? নায়েব মশাইয়ের কাছে খোঁজ করুন। তাকে ডাকতে পাঠাতে বলুন।

আক্রামুদ্দিন আবার কে?

অনন্তরাম কোথা থেকে এসে হাজির হ'ল। একেবারে মুখোমুখি হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ বললে যেন কি। শেষে জোড় হাত করে মিনতির ঢঙে বললে,—দোহাই, দাছ যেন ঘৃণাকরে জানতে না পাবেন। তিনি এই এলেন ব'লে! ফটকের সামনে আসতে দেখেই এসেছি।

দাছ আসছেন। জানবাঙ্গারের দাছ। জীবনে যিনি কখনও কাঁদেননি। হেসেছেন। জানবাঙ্গারের সেই আঙুটি-দাছ আসছেন। হাসতে হাসতে।

—দাছ! ছেলেবেলার খেলার হাসির সম্পর্ক দাছর সঙ্গে। জানবাঙ্গারের দাছর ঠিক সাহেবদের মত চেহারা। বয়সের আধিক্যের কোন পরিচয় নেই, সদাহাস্তে সদাই যেন মুখের হয়ে আছেন। সাহেবদের মত ফর্সা রঙ দাছর, রঙীন আঁদ্রির বুটিনার বেনিয়ান পয়েন। মাথায় একটা অর্গান্ডির মুসলমানী নজ্জা-তোলা টুপি। হাতের দশ আঙুলে দশ-দু'গুণে পচিশটা আঙুটি পরেন জানবাঙ্গারের দাছ। দেখলেই হাসেন। হাসান বাকি যখন দেখেন তাকেই।

—দাছ, পেস্তা লিবি? বানাম লিবি? মতিয়া লিবি? আসমান লিবি? ছুনিয়া লিবি?

দাছ এই কথাগুলি বলেন আর হাসতে হয় নাতিকে। দাছ বলেন আর সেই সঙ্গে হাসেন অটহাসি। দেখা হ'লেই বলেন। সেই ছেলেবেলার খেলা, হাসি-হাসি-খেলা দাছর সঙ্গে।

এখনও দাছ ভুগতে পারেননি। দেখা হ'তেই বললেন শুধু,—দাছ, পেস্তা লিবি? কেমন আছো দাছ?

প্রণাম করতে হয় এই দাছকে। দাছর অনেক বয়স। মাথায় চুল একেবারে শেকে গেছে। তবু স্ফিতি আছে। পাকা চুল হ'লে কি হবে, ডেউ খেলানো।

—চলুন, সদরের ঘরে চলুন। এখানে গরমে আপনি কষ্ট পাবেন।

—না দাছ। আর যাবো না। তোমার একখানা চিঠি আছে দেখানি পৌছতে এদায়। এই নাও তোমার চিঠি। বিয়ালি হোটেল থেকে পিটার পাঠিয়েছে তোমাকে। আমার চিঠির ভেতর পূরে দিয়েছে।

ইংলণ্ডের এক মহলের একটা হোটেলের নাম বিয়ালি। পিটার আছে সেখানে। পিটার হ'ল দাছর কনিষ্ঠ পুত্র। কণ্টিনেন্টে কৈশোর থেকে যৌবন অতিক্রান্ত করছে। পিটার যে গেছে আর একটা বারও দেশমুখো হয়নি। পত্র-ব্যবহারের সম্পর্ক রেখেছে এখানে। টাকা ফুরালেই পত্র আসে যেন যেন। জাহাজে ভাসতে ভাসতে চিঠি আসে সেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে।

—ফুলকাঁকা চিঠি দিয়েছেন? চিঠিখানা দাছর হাত থেকে নিয়েই খামের মুখ ছিঁড়ে ফেললে। চিঠি বের করতেই এক টুকরো কাগজ পড়লো মাটিতে। কাগজ নয়, একটি মুখ। আবক্ষ ছবি কার আবার।

দাছ মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন। আর দেখলেন না। ছবির পেছনে লেখা রয়েছে 'তোমার ফুলকাঁকা'। বরফ-নীল রঙের চোখের তারা, তাদেরই এক জনের ফটো। এক জন বিদেশিনীর। লজ্জা আর ভীড়ার আনত মুখভঙ্গী; যেন কেশের বিচিত্র কবরী হুঁপাশের বুকে এসে নেমেছে। বুকের কাছে মরুভূমি ফুলের তোড়া ধরা রয়েছে হুঁহাতে। বিদেশিনীর বিধাধরে বিনম্র হাসির ক্ষীণ রেখা।

দাছ সত্যিই আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকলেন না। অনেক দূরে গিয়ে একবার ফিরে বললেন,—দাছ, আমি ভাই আসলাম।

আসলেন না, সত্যিই চলে গেলেন কি এক মনের দুখে। দাছর কানেও এসেছে ঐ ছবির অধিকারিণীর কথা। পিটার গীর্জার গিয়ে বিয়ে করেছে যে তাকে। মন-উদাসী বিদেশিনী এক জন ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছে। পরসাতলা লোকের মেয়ে। বিয়ালিতে স্বামি-স্ত্রী রয়েছে। পিটারের কুছুর অভাব হয় না, মেয়েটির বাবা-মা সব কিছু তার নিয়েছে। অল্পফোর্ডে পড়তে গিয়েছিল পিটার। পড়া-শুনা আর হয়নি। পিটার তার বাবাকে টাকা পাঠাতে পত্র দেয়, পিটারের যখন মদের আর টাকা থাকে না। পিটার তখন যেন যেন পত্র ছাড়ে।

পিটারের এই কীর্তিতেই বত লজ্জা দাছর। যেন সহ করতে পারেননি। পিটার খুশান হয়েছে, পিটার এক জন যেতাজিনীকে—

সত্যি চলে গেলেন দাছ। পিটারের দুঃখে তিনি এখন আর হাসেন না। হাসেন যখন তখন সে-হাসিতে যেন মনের উল্লাস নেই। পিটার দাছর কলঙ্ক-স্বরূপ।

ফুলকাঁকা। শুধুই কি সে কলঙ্ক।

কৈ, কেউ বিলেতে গিয়ে রইলো না? ফুলকাঁকা সেই ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন বাধাবরী মনোবৃত্তির, বাঙলা দেশে পড়া শেষ ক'রে অল্পফোর্ডে পড়বেন স্থির করেছিলেন। ফুলকাঁকা পড়তে গিয়ে কিছু পড়লেন পাঠ্য-পুস্তক নয়। বত সব পড়ার বাইরের অপাঠ্য পুস্তক। ফুলকাঁকা সেখানে বই কিনে আর মদ খেয়েই ফতুর হচ্ছেন। বই আর মদ, মদ আর বই। আর এখন সেই সঙ্গে জুটেছে এক বিদেশিনীর সাহচর্য—যার রূপে না কি প্রাচ্যের লাভণ্য; প্রতীচ্যের রঙের সঙ্গে অঙ্কুর অসামঞ্জস্য।

ফুলকাঁকার পড়ার সখ অসামান্য।

বাঙলা সাহিত্যের খোঁজ রাখে না, অথচ কেমব্রিজের সর্বশেষ ক্যাটালগও সঙ্গে রাখে। ক্লাসিক হোক, আধুনিক হোক, বই

ছাপা হলেই কিনে ফেলেন। ফুলকাঁকার পৃথিবী বই-পড়া বিভাগ গ'ড়ে উঠেছে, বাস্তবের সঙ্গে জাই পদে পদে বাধে বিভাটি। ফুলকাঁকা বাড়ার জল আর বায়ু পান করতে পারিনি, লগুনের কি এক বিয়ালি হোটেলের সিঁড়ি বসবাস করছে। তিনিই পত্র দিয়েছেন তাঁর অভ্যাস মত। লিখেছেন :

‘আর চ’লে আর এখানে। একবার দেখলে আর ভুলতে পারবি নে। তুমিও রাঙ্কো শুধু মদ নয়, মার্ভেলাস সাইট দেখতে দেখতেই দিন কেটে যাবে। সভ্যতার শিখরে এরা বাস করছে; জীবন-বাত্রার আমাদের মত স্বাদেশিকতা বজায় রাখতে যেয়ে স্বদেশ হারায়নি। রাজ্যের জাতকে এসে একবার দেখে যা। তোমার ফুলকাঁকামার ফটা পাঠাগার, কনসারভেটিভ কুম্ভাকী যেন না দেখে। অন্তরের ভালবাসা রইলো।

ইতি—

চিঠি পাঠের পরেই চোখ তুলে দেখলে জানবাজারের দাঙ্গ কখন আশ্রয় হয়ে গেছেন। চ’লে গেছেন। বিপথগামী সন্তানের অপকর্ষিত যেন স্রিয়মাণ হয়ে আছেন সেই সদাশাস্ত্রমুখর মাম্বু। যেন হাসতেই ভুলে গেছেন।

কনসারভেটিভ কুম্ভাকী! ফুলকাঁকার স্বপ্নে আচ্ছন্ন মন নিয়ে সন্দের দিকে চলছিল কুক্কিশোর। হঠাৎ বসিকদ্দিনের কঠোর পেয়েই ধমকে যেন পেছন ফিরলো। বসিকদ্দিন! আবার এসেছে বসিকদ্দিন? পৃথ্য বীর গতিতে কখন এগিয়ে এসেছে আকাশের শেষ সীমা থেকে। রৌদ্রে উজ্জ্বল যেন।

—কেমন গান শুনে বস' গহরের?, বসিকদ্দিন এহাতে বিজ্ঞপ্তি করলো।

গহর, গহরজান? এতক্ষণ যেন মন থেকে মুছে গিয়েছিল গত দিনের সেই গায়িকার হাসি আর গান, গান, হাসি, আর—

বসিকদ্দিন কাছাকাছি আসে। বলে,—লাখ, লাখ, রূপেরা দিয়েও শুনেতে পাওয়া যায় না গহরজান বাইয়ের গান। নাম শুনে নেচে ওঠে কত লোক। গহরজানকে—

খামলো কেন বসিকদ্দিন? কি বলতে চাইছিল। এমনই ছুঁপা যে, টাকা দিয়েও পাওয়া যায় না গহরজানকে? তার মানে কি বার-বার পাওয়ার সৌভাগ্য হয় না!

গত দিনের কিছু কিছু ছবির মত ভেসে ওঠে মনশক্ষে বসিকদ্দিনকে দেখে। খুনী হওয়ার চেয়ে যেটা হয় সেটা এক বকমের লজ্জাই।

উত্তরের অপেক্ষায় থাকবার পাত্র বসিকদ্দিন? একথা থেকে সেকথা চললো যায়। বলে,—অর্গান না শুনিবে যাচ্ছি না। কিন্তু হজুর, শুধু বাজাবো। গাঠিতে বস' না।

অর্গান শোনাতে বসির? কথা কইবে না মনে করেও কথা বললে গীত-পিয়ালী। বলে,—অর্গান শোনাতে?

—বলছি তো শোনাতে। বসিকদ্দিন এম্বিক-সেদিক দেখে আর বলে,—শোনাতে আর খাবো-দুপুর বেলার। কি খাওয়াবে বল? কিমার বড়া খাওয়াবে? কাঁকড়া খাওয়াবে? চিড়ী না খাওয়াও, দাড়ার ঝাল? কি খাওয়াবে বল?

মুখ ফুট খেতে চাইছে বসিকদ্দিন। কিন্তু তাঁড়ারে এসেব মিলবে না যে।

—হ্যাঁ, খাওয়াবো। বাজনা শোনার কথায় সে সব আর মনে থাকে না।

বসিকদ্দিন কথায় কথায় কাছারীর আঙতা থেকে সরে যায়। একশো আটটা সিঁড়ি দেখে বলে বসিকদ্দিন। বলে,—যেন হিন্দুর খগোর সিঁড়ি! তা খাওয়াবো, মুখে বললে তো আর হবে না, তার বন্দোবস্তের হুকুমটাও হয়ে থাক।

অনন্তরাম এলো কোথা থেকে। কুখে যেন ঝাঁড়ালো। কথায় হাসির বেশ টেনে কথা বললে বসিকদ্দিন। অনন্তরামের সঙ্গে। বলে,—কোথায় থাকা হয়?

—যেখানে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে। অনন্তরাম বলে।

—ইটিকে আছেন হজুরের? বসিকদ্দিন অনন্তরামের এমন উত্তরটা আশা করেনি। কথায় ধরণ দেখে কে আছেন জানতে ব্যস্ত হয়। অথচ লোকটার পরনে ময়লা বসন।

অনন্তরাম কে তাই বলতে গিয়ে অনন্তরাম কে তা আর বলতে পারে না যেন। মাইনের চাকর, বলতে পারে না। অনন্তরাম কে?

কে অনন্তরাম? অনন্তরামই বলে,—আমি এক জন তাঁবেদার।

—তবে তুমি তো চূপ ক'রে থাকবে। তুমি বুঝি হজুরের নগিচ নগিচ ছাড়া থাকতে পারো না?

—চল' বসির, বাজনার ঘরে চল'। অনন্তরাম, বসির এখানে থাকে, ওর জন্তে কাঁকড়া, কিম্বা আর চিড়ি মাছের দাড়া বানাতে বল।

হাতা বোঝে না এই সব খাত্তরব্যের আবাদ কে-সে চায় না। যখন-তখন। আবার বার চায় তার আর অন্তের আবাদ চায় না। এদেরই ভালবাসে। বসিকদ্দিনের আহ্বারের মেয় শুনে অনন্তরাম বলে,—আমি তরজা শুনেতে যাচ্ছি। ছুটি নিতে এসেছি এক দিনের। কিরতে রাত হবে।

অনন্তরাম সত্যিই হয়তো তরজা শুনেতে চলে যায়। সত্যিই অনন্তরামের ভাল লাগে না এই ওস্তাদী কথা আর ঐ ওস্তাদকে। সে আর এক মুহূর্ত থাকে না ওদের কাছে। মুখখানা গভীর হয়ে যায় অনন্তরামের। অসম্ভব গভীর।

—তাই যাও। আর যাওয়ার আগে ব'লে যাও পাক-ঘরে। নকল হাসিতে মারানো বসিকদ্দিনের কথা। বলে,—অর্গান শুনেব হজুর। ঘরের চারিটা জানতে বল'।

বসিকদ্দিনের কথা যেন শুনেতেই পারিনি অনন্তরাম। আর এক মুহূর্ত থাকে না সে সেখানে। তরজা শুনেতে চলে যায়।

—তুমি চল' বসির, আমি চারি জানতে বলছি। অনন্তরামের কথা শুনে বিম্বিত হয়ে সলজ্জার বলে কুক্কিশোর।

বসিকদ্দিন চললো বেসিকে বাজনার ঘর সেদিকে। বসিকদ্দিন জানতো, আগে দেখেছে কয়েক বার। যন্ত্রের একজিবিদন দেখে তাচ্ছব ব'লে গেছে।

তখন অর্গান চলছিল পুরা দমে।

একখানা পাকী এসে অন্ধরের মুখে ভিড়েছে, খোঁতা আর বাস্তকার, কেউ জানতে পারেনি। কে এসেছেন? কুমুদিনী? না শিশীমা, হেমলিনী। কি একটা কথা বলতে এসেছেন। কি একটা কথা নিতে এসেছেন। কুমুদিনীকে আশঙ্কিত করে এসেছেন, —ছেলের পাকা কথা আমি এনে দেবো। সে জন্মে তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি সে ভার নিচ্ছি।

অর্গানের সুরে তখন বাজনার ঘর মাতোয়ারা। বসিকুদ্দিন বাহা বাহা কতকগুলো গানের সুর বাজিয়ে চলেছে। এমন সময় এক জন তাঁবেদার এসে বললে,—হজুর, শিশীমা এসেছেন। ডাকছেন আপনাকে।

বসিকুদ্দিন অর্গান থামায় না। কুফকিশোর শিশীমার আগমন-বার্তা শুনে তক্ষুণি উঠে পড়লো। বসিকুদ্দিন থামলো না কিছু। বাজিয়ে চললো যে-সুর ধরেছিল সেই সুর।

অন্ধরের মুখেই ছিলেন হেমলিনী। বাপের বাড়ী, তাঁর এত লজ্জা নেই। অপেক্ষা করছিলেন। দেখা হ'তেই বললেন,—কি আশঙ্কিত করেছো? মাকে রাখতে পারলে না? একটা কথা বলতে এসেছি। ব'লেই চলে যাবো।

হেমলিনী শিশীমার কথার সুর এমন রুদ্ধ কেন? এমন অশ্রুতর্পূর্ণ গাঙীঘোঁ-ভরা। কুফকিশোর চূপ-চাপ চেয়ে রইলো শিশীমার দিকে। ভয়ে-ভয়ে।

হেমলিনী বললেন,—তোমার কাছে একটা অমরোথ আছে। অমরোথ রাখতে হবে তোমাকে। আমি একটি পাত্রী দেখেছি, তোমাকে বিয়ে করতে হবে এই মাসেই। মনের মত মেয়ে, দেখে তুমিও খুশী হ'বে। বিয়ে করবে তো?

—হ্যাঁ। শুধু ঐ একটা কথা হঠাৎ বলে কুফকিশোর। যদি শিশীমা তাতেই খুশী হন, কথা বলেন আগের মত। শিশীমার কথার ধরণ শুনে বেশী কথা বেরোয় না মুখ থেকে। শুধু বলে,—হ্যাঁ।

হেমলিনীর মুখে যেন হাসির রেখা দেখা দেয়। নিশ্চিন্ত হওয়ার খুশীভরা হাসি। বলেন,—আর কোন কথা নেই। তুমি যেতে পারো। আমি চলে যাচ্ছি এখন। আমি বিয়ের সব জোগাড় করি।

—হ্যাঁ। আবার ঐ একটা কথা বললে কুফকিশোর। গমনোন্মত্ত শিশীমার পায়ের ধূলা মাথায় নিলে। প্রণাম করলে। হেমলিনী চিবুক স্পর্শ করলেন। বললেন,—ভবে আমি যাচ্ছি এখন। দেখো, যেন মত বদলে যায় না। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না আমি।

হেমলিনী কথার শেষে নিজের পাকীতে উঠে বসলেন ঘেরাটোপ সরিয়ে। আট জন ঘেরাঘর পাকী তুলে নিয়ে গেল কি একটা বলতে বলতে। বাজনার ঘর থেকে তখন অর্গানের তরঙ্গায়িত ধ্বনি ভেসে আসছে। ভারী মিঠে সুর ধরেছে বসিকুদ্দিন। একটা ইংরেজী সুর। বিশেষী যন্ত্রে বিশেষী গান।

কথা দেওয়ার পরে কথাটা যেন মনে পড়লো।

বিয়ের কথা দেওয়া হয়ে গেছে শিশীমার কাছে, সে-কথা আর

কোরানো চলবে না। আর হলেই বা বিয়ে। বিয়ে তো জানা-তনা সকলেরই হচ্ছে।

হেমলিনীও কুমুদিনীর কথার সার দিয়েছেন। বিয়ে দিয়ে দেওয়ার তিনিও পক্ষপাতী। ছেলেকে রাজী করাবার ভারও নিষেছেন তিনি। কুমুদিনী মনে মনে শুধু স্থির করেছেন, বিয়েটা দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়বেন। কান্দী কিংবা বৃন্দাবন কিংবা লছমনঝোলায় চ'লে যাবেন। তীর্থবাস করবেন।

কিছু বসিকুদ্দিন কেন যাচ্ছে না। বসিকুদ্দিনের সঙ্গে যেন আর ভাল লাগে না। অর্গান কেন থামছে না?

মুখে কাকেও বলা যায় বিদায় গ্রহণ করতে?

বসিকুদ্দিনকেও বলতে পারে না। বাজনার ঘরে গিয়ে বসে বসিকুদ্দিনের পাশে। নায়েবদের এক জনকে ডেকে বলে দেয়, বসিকুদ্দিন যা খেতে চেয়েছে তার ব্যবস্থা করতে। বসিকুদ্দিন অর্গান বাজিয়ে যার ইংরিজী সুরে—মুজ্জ'নায় ঘরখানা সরগরম হয়ে উঠেছে। বসিকুদ্দিনকে দেখেই বারে বারে মনে পড়ছে গত দিনের কলনাতীত অলৌকিক কাহিনী—আরব্য উপজ্ঞাসের মত মনে পড়ছে। এক জন বিবি, বেহইনের মত—চোখ দু'টোতে ইন্দ্রজাল যেন। মানকতা রূপজীতে।

ওস্তাদে বাবুকে নষ্ট করলে এমন কত কত দেখেছে কত কে। কাছারীতে তাই একটা চাপা গুজরগ চলতে থাকে। সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ঐ মুসলমান ওস্তাদের প্রতি। কুগ্রহের মত এসে জুটলো কোথা থেকে।

বাজনার সুর কমিয়ে কথা কইলে বসিকুদ্দিন। বললে,—আবার যে দেখতে চেয়েছে নাগরী। না দেখে মন না কি তার আনচান লেগে গেছে। হজুর যেন ভুলে না যান, বলতে বলেছে আমাকে।

বিবি গহরজান। তার মন আনচান।

লজ্জা আর বিষয়ের সঙ্গে বসিকুদ্দিনের কথাগুলো শুনে থাকে। সত্যিই কি বলেছে গহরজান এই সব মন-ভোলানো কথা। বসিকুদ্দিন বলে,—খাওয়া-দাওয়া হোক, রোদটা মরলেই বেলাবেলি একবার চল'না সুরে আসা যাবে। কে আর জানছে? আবে হেসে লাগে, দু'দিন বইতো লয়।

বসিকুদ্দিন হাসতে হাসতে শেষের ক'টা কথা বললে। কুফকিশোর শুনে শুধু এই বিচিত্র কথা। গহরজানকে দেখতে পেলে যেন চোখের সামনে। দেখতে পেলে গহরজানের বৌবনসম্ভার। কাঁচুলীর দরাহীন বন্ধন থেকে উন্মুক্ত।

হেমলিনী পাকীতে উঠেই পরমানন্দে হেসেছেন একবার। তিনি জানতেন তাঁর কথা উপেক্ষা করতে পারবে না। হেমলিনী একটি রূপার বাস্তু খুলে কয়েকটা পান খেলেন। আর হুর্গি। পাকীর ভেতরে ছিল একখানা হাতপাখা। পাখীর লেজের। হাওয়া খেতে খেতে চললেন হেমলিনী। কখনও বা ঘেরাটোপের কাঁক থেকে দেখছেন হু'পাশের রাজা। কোথায় এলো পাকী।

কুমুদিনীও জানতেন ঠাকুরবি একটা হেতুনেস্ত ক'রে আসবে। তিনি থাকবেন অন্তরালে। নেপথ্যে। তার পর তিনিও বিদায় নেবেন। থাকতে তিনি আসেননি, এসেছেন উপায়হীন হয়ে। উপায় হলই বখাসময়ে তিনি যাত্রা করবেন। তাই দিনের আলো ফুটেই পাঠিয়েছেন হেমললিনীকে। একটা হেতুনেস্ত ক'রে আসতে।

গত রাত্রির মধ্যরাত্রে যে-আশাতীত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন কুমুদিনী, স্বচক্ষে যা দেখেছেন, তা দেখেও আর থাকবেন এই ভিটের ত্রিনীমানার! কুমুদিনী দেখেছেন যা কখনও স্বপ্নেও দেখেননি। দেখেছেন ঐ ঠাকুরবি হেমললিনীকে। দেখেছেন গভীর রাত্রে, যখন তাঁর তন্ত্রা ভেঙ্গে গিয়েছিল কি যেন কিসের শব্দে। খুটখাট দরজা খোলা শব্দে।

দেখতে দেখতে চোখ দুটোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন কুমুদিনী। কি দেখলেন তিনি? কাকে দেখলেন, ঠাকুরবি হেমকে? দেখতে পাওয়া সত্ত্বেও ক'বার ক্ষণেকের জন্তে কুমুদিনীও ভেবেছিলেন, ঠাকুরবি যে স্বামীর সোহাগ পায়নি কোন দিন।

বিজ্ঞপদ নামে এক জন যুবক। মাঝে মাঝে আসে, এসে বেশ কয়েক দিনের জন্তে কাটিয়ে যায় এ-বাড়ীতে। হেমললিনীর কি সম্পর্কের দেওর বিজ্ঞপদ। শিক্ষিত যুবক এক জন। বেশ দেখতে। মাথায় কৌকড়ানো খাঁকড়া চুল। গালপাটা দুই গালে। কুমুদিনী কিছু কিছু শুনেছিলেন ইতিপূর্বে। শুনেছিলেন অল্প রকম। স্বচক্ষে দেখলেন।

হেমললিনী বিজ্ঞপদকে ঠিক যে কোন চক্ষে দেখেন অনেকেই জানে না। জানে শিক্ষিত এক জন, লক্ষণও একটা যা মেলে না, বিজ্ঞপদ তাই। সবাই জানে হেমললিনী তার শিক্ষার সমর্থক, আর কিছু নয়। শুনা যায় বিজ্ঞপদ সাহিত্যিক, সাহিত্যের সভা-সমিতির আমন্ত্রণ আসে বিজ্ঞপদের নামে।

দরজার বাইরে লঠনের আলো-অন্ধকারে দেখেছেন কুমুদিনী গত রাত্রির মধ্যরাত্রে, ঐ বিজ্ঞপদ আর হেমললিনী প্রেম-নিবেদন করছে যেন পরস্পরকে। হেমললিনীর বসনের অবাধ্যতাও দেখেছেন। দেখেই চোখ দুটোকে বন্ধ ক'রে ফেলেছিলেন। আর চোখ মেলেনি সারা রাত। ঠাকুরবির রূপের জৌলসও দেখেছিলেন, এখনও যেন যৌবনভারাক্রান্ত। যশধরে রঙ, নিটোল স্বাস্থ্য।

এই সব দেখেই, আরও যেন হটকট করছে কুমুদিনীর।

রোজ বখা সময়েই মরে। সূর্য্য অন্তাচলে নামে।

সাপের চামড়ার সেলিমের বদলে কুমীরের চামড়ার পাম্প

বোয়াল। আলমারী থেকে জ্বরির বন্ধা-দেওয়া বেনারসী শিরাণ। একখানা উড়ুনী। চুলের ঢেরী বাগাতেই আঁখ বঁটা লাগে। প্যারিসের কি-একটা এসেলের শিশি প্রায় খালি হয়ে যায়। চুনট-করা লাটিম পাড় ধুতির কোঁচা লুটোপুটি খেতে থাকে। দিন-শেষের প্রথম সন্ধ্যার ভাড়া-গাড়ীতে আর নয়, নিজেরে ভুড়ীতেই বেরিয়ে পড়ে হুঁজন। ওস্তাদ আর মজল।

দূর থেকে শোনা যায় বেলফুল আর মালাইওলার চীৎকার। জুড়ী এগোয় সেদিকে।

সন্ধ্যা ঘন হতেই কাছারীর দালানে যখন এক জন ফিরিজির আবির্ভাব হয় তখন গাড়ী প্রায় পৌঁছে গেছে। ফিরিজীকে বিতাড়িত ক'রে দিয়েছে বাড়ী থেকে তার পিতা। নর্দাণ বিনয়েস্ত সরকারী ট্রান্সলেটর, ছেলের রাজপ্রোহমূলক মতিগতিতে ওপর থেকে ছড়ো খেয়েছেন। ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তবেই সরকারী চাকরীতে থাকতে পাবে, ওপর থেকে পরোয়ানা এসেছে। নর্দাণ বিনয়েস্ত ছেলেকে তাই মানে মানে সবে পড়তে বলেছেন। নর্দাণ অরুণেন্দ্র সহাস্তে বরণ ক'রে নিয়েছে পিতৃ-আজ্ঞা। বেরিয়ে প্রথমে তাই এখানে এসেছে। কয়েকটা দরকারী কথা বলে যেতে এসেছে। কাছারীর দালানে তারই বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে। বসতেই হবে কথাগুলো, তাই বন্ধুর প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু বন্ধুর চোখে আর নেই নর্দাণ অরুণেন্দ্রের বিচিত্র পৃথিবীর স্পষ্ট কোন ছবি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রতীক্ষা-ব্যাকুল নর্দাণ অরুণেন্দ্রের বুটের মশ-মশ শব্দ হচ্ছে কাছারীর দালানে। আজ-বাজে কি সব বসছে। বলছে :

'Twill vex thy soul to hear what I shall speak ;  
For I must talk of murders, rapes, and  
massacres,  
Acts of black night, abominable deeds,  
Complots of mischief, treason, villainies,  
Ruthful to hear, yet piteously performed.

মশালচিত্রা লঠন আলতে বেরিয়েছে এদিকে-সেদিকে। কুরফুরে বাতাস বইছে বৈশাখী দিনের। ভোঁ-ভোঁ মশা উড়ছে। গোথুলির পর রাত্রি নেমেছে কলকাতার শহরে। কয়েকটা নতুন তারা অঙ্গ-অঙ্গ করছে আকাশে।

[ ক্রমশঃ ]

### বৈশাখের প্রচ্ছদ-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে সন্নিবিষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্র যুজিত হইল। এই ছবিতে আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ। (প্রথম সারি) ঠাকুরের ডান হইতে বামে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীমা; (দ্বিতীয় সারি) স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ; (তৃতীয় সারি) স্বামী যোগানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ; (চতুর্থ সারি) স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ; (পঞ্চম সারি) স্বামী অদ্বতানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ ও স্বামী অদ্বৈতানন্দ; (ষষ্ঠ সারি) স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। শিল্পী এন সি দাস অঙ্কিত। চিত্রখানি হুস্তাপ্য।

## পূর্বভাষণ

পারশুদেশীয় উপকথায় একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। গল্পের নায়ক—বিভাহীন, বুদ্ধিহীন ও বিভ্রান্ত এক রাখাল বালক সমুদ্রের বেলাভূমিতে ক্রীড়াচ্ছিলে শুক্তি আহরণ করতো প্রতিদিন। জানতো না, তার মধ্যে ছিল লক্ষহীরা মানিক। সে মানিক যার ঘরে আসে, তাকে রাজা করে, যার ঘর ছাড়ে, সে হয় ফকির। অপুত্রক অধিপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যের বৃদ্ধ উজীর বের হলেন ভাবী সুলতানের সন্ধানে। বহুদিনব্যাপী ব্যর্থ অন্বেষণের পর হতাশ হয়ে এক দিন শপথ করলেন, পরদিন জুম্মার নামাজের শেষে যার সঙ্গে প্রথম দেখা হবে, তাকেই রাজপদে মনোনীত করবেন। নামাজের পরে মসজিদের বাইরে এসে উজীর দেখতে পেলেন দ্বারের পাশে মীনারের ছায়ায় এক রাখাল বালক নিদ্রামগ্ন। ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। ঘোড়ায় চড়িয়ে উজীর নিয়ে এলেন তাকে রাজধানীতে। রাখাল বালককে বসিয়ে দিলেন বাদশাহের তক্তে। শাহজাদীর সঙ্গে ঘটলো তার পরিণয়।

নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অসামান্যতা লাভের এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধুমাত্র রূপকথার ভাণ্ডারেই নিবদ্ধ নয়। সত্যকার মানুষের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার ইতিহাসেও এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। ঐতিহ্য বললেই সে অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল আমাদের স্মরণে থাকে না। সে আমাদের আপন সৌভাগ্যের অনুকূল, তাই তাকে আমরা আপন যোগ্যতার অবধারিত পুরস্কাররূপেই গণ্য করি, প্রসন্ন ভাগ্য-দেবতার অকারণ পক্ষপাত বলে স্বীকার করিনে।

আমি লেখক নই। গ্রন্থ রচনার কোন উচ্চাভিলাষ কোনোকালে আমার কল্পনায় ছিল না। অথচ সম্প্রতি গ্রন্থকাররূপে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এটা একান্তই আকস্মিক। পাঠকজনের যে প্রসন্ন প্রশ্রয় লেখকজীবনের চরম পুরস্কাররূপে চিরকাল স্বীকৃত, সেই অভাবনীয় অনুগ্রহের দ্বারা যদি ধন্য হয়ে থাকি, তবে তাও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

কর্মের প্রয়োজনে আমি দিল্লী এসেছিলাম। সে অনেক দিন আগেকার কথা। বয়স তখন অল্প, কোতূহল প্রচুর এবং মনের স্বাভাবিক রসগ্রাহিতা পরিণত বুদ্ধি ও পরিপক্ব অভিজ্ঞতার অন্তরালে

# উল্লেখিত

যাযাবর

তখনও পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার অবকাশ পায়নি। জীবনের যে-অধ্যায়ে হৃদয় সহজে উদ্বেল, কল্পনা উদ্দীপ্ত ও রসনা মুগ্ধ হয়, যৌবনের সেই প্রারম্ভিকালে আধ্যাত্মিক এই মহানগরীতে আমার প্রথম পদার্পণ। আমার পক্ষে সেটা অবশ্যই অবিস্মরণীয় ঘটনা।

সর্বদেশেই কাব্য ও উপকথার মধ্য দিয়ে কয়েকটি স্থান অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাদের খ্যাতি তাদের আপন মাহাত্ম্য নয়, সাহিত্যিকের রচনানৈপুণ্যে। হারুন-অল্ রসিদের রাজধানী বোগদাদের সঙ্গে সত্যিকার ভূগোলিক সম্পর্ক সামান্য, তার যথার্থ পরিচয় আছে একমাত্র শেহরজাদী কথিত একাধিক সহস্র রজনীর কাহিনীতে। যে-উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-অলিন্দে একদা মৃগলোচনা জনপদবধূরা প্রবাসী প্রিয়জনদের প্রতীক্ষারতা ছিলেন, তার আসল ঠিকানা সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ম্যাপে মিলে না। শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

কাব্যলোকের মহিমামণ্ডিত এই নগরমালার মধ্যে দিল্লীর স্থান নেই। রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত অভিশপ্ত যক্ষের বিরহ-বেদনা বহন করে আষাঢ়-প্রথম দিবসে যে-পূর্বমেঘ যক্ষপ্রিয়ার কাছে উপনীত হয়েছিল, তার পরিক্রমণ-পথে দিল্লীর আকাশ ছিল কি না, সে কথা কালিদাস বলেননি। ইঙ্গ-বঙ্গ-অধ্যুষিত অতিআধুনিক দার্জিলিংকেও রবীন্দ্রনাথ কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে গল্পের স্বপ্নলোকে উন্নীত করেছেন, কিন্তু দিল্লীপথের ধূলি ছাড়া মহানগরীর আর কিছুই তাঁর রচনায় স্থান পায়নি, যদিও বজ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীকে জনশূন্য ক্যালকাটা রোড অপেক্ষা আজমিরী গেটের পাশে খুব বেমানান দেখাতো বলে মনে হয় না।

তবুও দিল্লীর গোরব তার নিজস্ব। সে তো একটি মাত্র নগরী নয়, বহু নগরীর ধ্বংস ও বিকাশ। একটি রাজ্যের রাজধানী নয়, বহু রাজ্যের শ্মশান ও



স্মৃতিকা। বিচিত্র সভ্যতা, বিভিন্ন ধর্ম, বহুবিধ জাতির সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে এইখানে। যুগ-যুগান্ত ধরে যে-তিনটি স্থান ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ধারণ, খ্যাতি বহন ও পরিচয় প্রসারিত করেছে, তার মধ্যে বারাণসীর পরিচিতি প্রজ্ঞায়, বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি ভক্তিতে, দিল্লীর গুরুত্ব ইতিহাসে। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও দিল্লীর ইতিবৃত্ত অনেকাংশে সমার্থক।

ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ অনেক। কাব্যের আবেদন মানুষের মনে। তার নায়ক-নায়িকার বিচরণস্থল আমরা কল্পনায় অনুভব করি। চোখ বুজে তাকে ভাবা যায়। ইতিহাসের সাক্ষ্য থাকে মাটিতে। তার ঘটনাস্থল প্রত্যক্ষ। চোখ মেলে তাকে দেখা যায়। দিল্লীর প্রাচীর ও প্রাস্তরে, দুর্গ-প্রাকার ও প্রাসাদ-অঙ্গনে, সমাধিক্ষেত্র ও সৌধ-মালায় অসংখ্য দর্শনীয় আছে। কিন্তু দর্শনের যে রস, সে শুধু নয়ননিবদ্ধ নয়, মননসাপেক্ষ। চক্ষু দ্বারা দেখি—একথা বাল্যকালে বিচারস্তরের প্রথম পর্বের পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি। কিন্তু চোখ চাইলেই যে দেখা যায় না, এ তথ্য ব্যোমকীর সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ জেনেছি। যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই, সে তো দেখা নয়,—তাকানো। দেখার সঙ্গে আনন্দের যোগ সাধন করতে সঙ্গীর প্রয়োজন। ভোগের বেলায় সংখ্যাধিক্যের ফলে বস্তুর হ্রাস ঘটে। একের পাতে যা পরিপূর্ণ এক, দুইয়ের পাতে তা বিভক্ত অন্ধক। উপভোগের বেলায় বহু দ্বারা রসের ঘটে বৃদ্ধি। এ জগতই ষ্টেথোস্কোপ হাতে রোগী দেখতে যাই একা, উড়নী গায়ে বিয়ের কনে দেখতে যাই সবাক্কেবে।

দিল্লীতে আমি দেখেছি অনেক, শুনেছি প্রচুর এবং জেনেছিও নেহাৎ কম নয়। কিন্তু সমস্তই একক। যার সঙ্গে দেখলে দেখার বস্তু দর্শনীয় হয়ে ওঠে, তিনি টুছিলেন অচর। তাঁকে নিয়ে দিল্লী পরিভ্রমণ সেদিন সম্ভব ছিল না। তবুও আমার চোখ দিয়েই তাঁকে দেখাবো, আমার মনে এই অভিলାষ ছিল। সে কাজটা সহজ নয়।

পুরাকালে হংসদূতের দ্বারা দূর দূরান্তরে বার্তা প্রেরণের রীতি ছিল। কিন্তু এ যুগের নলরাজেরা জানেন, বার্তাবাহী রাজহংস দময়ন্তীর উদ্যানে পৌঁছিতে পারবে না, মধ্যপথেই কোন শূনিপুণ

পাচকের হস্তে সুপক ব্যঞ্জনায় ভোজনরসিকগণের রসনাতৃপ্তির সহায়ক হবে। বর্তমানের মরালগামিনীরা মরালকে বাতিল করেছেন। তাঁরা এখন উদ্দিপরা সরকারী ডাক-হরকরার উপর নির্ভর করেন। সুতরাং আমার দেখাকে আমি রূপান্তরিত করলেম পত্রে। তার সংখ্যা অনেক এবং ক্ষাতি ভীতিজনক।

চিঠি জিনিষটা স্বভাবতঃই দ্বিবচনের ব্যাপার। তাঁকে বহু বচনের ব্যবহারে আনলে ব্যাকরণদৃষ্টি ঘটে। চিঠি চাঁদনী রাতে দু'টিমাত্র প্রাণীর গঙ্গা-বিহরণের ছোট পানসিটি। কুসুমগঞ্জের হাটের পথে বহু জনের নদী পারাপারের জন্তু পাঁচ মাল্লার খেয়া নৌকা নয়। দিল্লীর রৌদ্রদগ্ন আকাশের নীচে আমার বিস্তীর্ণ অবকাশক্ষেত্রে যে প্রচুর পত্রশয্য জন্মলাভ করেছিল, সেগুলি একটিমাত্র গৃহিণীর ভাণ্ডারে মরায় ভ'রে রইবে, এই ছিল কামনা। কোন দিন কোন কারণে সরকারী সিভিল সাপ্লাইর গুদামে সেগুলি সর্বসাধারণের স্বার্থ-সমস্তার সমাধান করবে, এমন আশঙ্কা ছিল না। পত্রগুলি যাকে লেখা, তাঁর কোমল করযুগলের মধ্যে কৈবল্য লাভ করলেই তাদের মোক্ষ। তারা যে ভবিষ্যতে কম্পোজিটারের স্থূল হস্তাবেলপনের দ্বারা সর্বোচ্চ ছাপাখানার মসীলিগু হয়ে সাহিত্যের বিচার-শালায় লেখকের দুষ্কৃতির অকাটা সাক্ষ্যরূপে দেখা দেবে, তা কল্পনাও করিনি।

মুদ্রণের দ্বারা পত্রের জাতিভ্রংশ ঘটে, যেমন সিনেমাকরণের দ্বারা উপস্থাপনের। পত্রের রস লজ্জানম্র নববধুর অমুচ্চ কণ্ঠে গীত সঙ্গীতের মতো, নির্জন শয়নকক্ষে একমাত্র স্বামীর কাছেই তার প্রকাশ। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে জনাকীর্ণ জলসার আসরে তাকে টেনে আনলে তারও দুর্গতি, অস্ত্রেরও দুর্ভোগ। কারণ, বঁধুর কানে যা কলস্বর, বহুর কানে তা কলরব।

অবশ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত পত্রের অভাব নেই, যদিও সিনেমায় বেশীর ভাগ যুদ্ধ-চিত্রই যেমন প্রচ্ছন্ন প্রোপাগান্ডা, সাহিত্যের অধিকাংশ পত্র-সঙ্কলনও তেমনি ছদ্মবেশী প্রবন্ধসংগ্রহ। পত্র-সাহিত্য নামেও সাহিত্যের একটা বিভাগ আছে। সাধারণতঃ দু'টি কারণে তার উদ্ভব। প্রথমটা তথ্যমূলক, দ্বিতীয়টা সাহিত্যিক।

কবি বা সাহিত্যিকদের লেখা পত্রে লেখকের দু'টি

বিভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়। কাব্যজীবনের বহির্দেশে প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর নিছক মানুষরূপে যে একটা সত্তা বর্তমান, এক শ্রেণীর পত্রে তারই পরিচয় থাকে। সেখানে পত্রলেখক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী বা বন্ধু প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা পরিচিত, সাহিত্যপ্রতিভার দ্বারা নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রগুলি পত্ররচয়িতার আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপকরণ। পত্ররচনা সেখানে একটা রীতি, ইংরেজীতে যাকে বলে ফর্ম। সেখানে যাকে লেখা হয় সে গোপন, যা লেখা হয় সেটাই মুখ্য। এই ফর্ম অবলম্বন করে সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, যেমন,—রোমানফের গল্প, তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, যথা,—লেটারস টু দি শেরিফ অব ত্রিষ্টল। নব শিক্ষার্থীদের জন্য সংক্ষেপে পৃথিবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে; প্রমাণ—লেটারস টু এ ফাদার টু এ ডটার। উপভোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে, উদাহরণ—শিলংএর চিঠি। প্রথম শ্রেণীর পত্র প্রকাশের কালে প্রকাশকের একটি চোখ থাকে জীবনীকারের দিকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পশ্চাতে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা: ‘ভাই ছুটি’ বলে যার আরম্ভ আর হিম্মত—এ দুই—এর রস যে আলাদা জাতের এবং গুরুত্ব যে পৃথক কারণে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

মুদ্রিত পত্রের আরও একটি শ্রেণী আছে। সেখানে লেখকের উদ্দেশ্যটা এতই সুস্পষ্ট যে, তাকে কেউ পত্র বলেই জ্ঞান করে না। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুযুধমান দুই পক্ষের মধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ‘খোলা চিঠি’র গোলা বর্ষণকে পাঠকেরা কুটনৈতিক কুস্তির প্যাচরূপেই গণ্য করে, চিঠি বসে ভুল করে না।

দ্বিতীয়ে লেখা পত্রগুলি মূলত: চিঠিই ছিল। কিন্তু সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের কালে সংকলয়িতা বাংলা চলচ্চিত্রের সেন্সার বোর্ডের উপযোগী অতিরিক্ত সতর্কতার সঙ্গে তার মধ্য থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গসমূহ, এমন কি তার ইঙ্গিত পর্যন্ত অসামান্য নিপুণতায় নিশ্চিহ্ন করেছেন। তাঁকে দোষ দিতে চাইনে। প্রত্যেক পত্রের মধ্যেই লেখক ও প্রাপকের সাংসারিক সম্পর্কে কেন্দ্র করে যে স্নেহ, শ্রীতি, রাগ, অনুরাগ প্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন থাকে, সর্ব-সাধারণের সমক্ষে তার উদ্ঘাটন বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে পরিণামে উভয়েরই বিব্রত বোধ করার সম্ভাবনা।

তবুও একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গ্রন্থাকারে গ্রথিত আমার পত্রগুলি কারও কাছে যদি প্রবন্ধসমষ্টি বা অন্ত্র আর কিছু মনে হয়ে থাকে, তবে তার জন্য একমাত্র সংকলয়িতার কাঁচিকেই দায়ী করতে হয়। ডাক্তারেরা জানেন, অস্ত্রোপচারের ফলে রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আংশিক বিকৃতি অবশ্যস্বাভাব্য।

কী কারণে পত্রাধিকারিণী চিঠিগুলিকে তাঁর নিজস্ব অন্তঃপুরের গোপনীয়তা থেকে টেনে এনে বহির্জগতে লোক-লোচনের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তা আমার জানা নেই। ফ্রেয়ডীয় তত্ত্বে নিশ্চয়ই এর একটি বুদ্ধিবিভ্রান্তকরী ব্যাখ্যা আছে। তাতেও আমার প্রয়োজন নেই। আমার মনে হয়, মেয়েদের স্বভাবের মধ্যেই একটা স্বাভাবিক প্রচার-প্রবণতা আছে।

সংসারে পুরুষের পরিচয় কীভাবে, সেটা স্বয়ং-প্রকাশ। নারীর গৌরব অধিকৃতির, সেটা প্রচারের অপেক্ষা রাখে। স্থায়ী আমানতে গচ্ছিত টাকার পরিমাপ প্রচুর, এই তথ্যটুকু জেনেই পুরুষ সন্তুষ্ট রয়; ব্যাঙ্কের পাশ-বই পকেটে নিয়ে বেড়ানো সে প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু অর্থের অন্তিমটাই নারীর কাছে যথেষ্ট নয়। তার প্রমাণটা যথোচিত পরিমাণে পরিষ্কৃত না হলে তার তৃপ্তি নেই। তাই জরোয়া গহনা সিন্দুক থেকে বেরিয়ে খুশী নয়, নিজের সর্ব্বাঙ্গে ঐশ্বর্যের বিজ্ঞপ্তি বহন করে, আপন ধনসম্ভারের প্রচারকার্যে তাদের দুর্জয় আসক্তি।

জানি, আমার পত্রগুলির প্রতি আমি অযথা মহাধাতা আরোপ করছি, এই অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু জবাব মূল্য তো শুধুমাত্র তার অন্তর্নিহিত গুণাগুণের দ্বারা নির্ণীত হয় না। এক খণ্ড বাবজত পুরাতন ডাকটিকিটের দাম আমার কাছে কানাকড়িও নয়, অথচ ডাকটিকিট সংরক্ষণ যার বাতিল, তিনি তার জন্য প্রয়োজন মতো হাজার টাকা দিতেও কার্পণ্য করেন না। সুতরাং সেদিনের পত্রগুলি অন্তত: পত্রাধিকারিণীর কাছে একেবারে মূল্যহীন ছিল না, এ বিশ্বাস যদি পত্রলেখকের মনে কখনও দেখা দিয়ে থাকে, তবে আশা করি, তা অবিনয়ের অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

কিন্তু মূল্য এক কথা, প্রচার আর। পত্র প্রকাশের সঙ্গে আত্মপ্রকাশে আমার প্রবল আপত্তি ছিল। প্রশ্ন করলে, নিশ্চিতরূপে হেতু নির্দেশ করা কঠিন। কারণ, মানুষের সকল কাজের পিছনেই

একাধিক হেতুর সমষ্টি থাকে, শুধু একটিমাত্র হেতু থাকে না, যদিও নিজের অভিরুচি, সুযোগ ও সুবিধানুযায়ী ঐ বহুবিধ কারণের মধ্যে বিশেষ একটিকেই আমরা একমাত্র কারণ বলে প্রমাণ করতে চাই। যে-সকল কারণে আত্মগোপনের প্রয়াস করেছিলাম, তার প্রধানতম বর্তমানে অর্থহীন। ১৯৪৭ সালের ৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অল্প অনেক পুরাতন বিধি-ব্যবস্থা, অন্তরায় ও অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে তারও অবনান ঘটেছে। সবিস্তারে আজ তার উল্লেখ নিম্প্রয়োজন। কিন্তু প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষকে শাসনব্যবস্থার স্বরাষ্ট্রে বিভাগীয় প্রবল প্রতিনিধিত্ব-পরায়ণতার সঙ্গে যাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে তার পরিপূর্ণ অর্থবোধ নিশ্চয়ই কঠিন নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল নিছক ভয়সঙ্গাত। মূল্য সম্পর্কে আমার মনে একটা সাজ্বাতিক শঙ্কা আছে। স্বয়ংবর-সভার রাজকন্ঠার মতো একমাত্র যোগ্যতমকেই ছাপার অক্ষর সম্মানে বাসরঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, নিষ্করণ নির্মমতায় বাকী আর সবাইকে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতরূপে দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে রাখে। সেই বার্থক্য উপহাসিতদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ ছিল না।

সমালোচকের উৎস্রুত্ব এখানেই নিবৃত্ত হয় না। তাঁরা ঘাড় নেড়ে সংশয়ের স্বরে বলেন,—তা যেন হোল; কিন্তু ঐ মৃত্যু-সংবাদ রটনাটা কেন? জবাবে আমি বলি, সেটা রটনা নয়; ঘটনা। সেদিনের পত্রলেখকের যে নিঃশেষে মৃত্যু ঘটেছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। দেহটাই যে বেঁচে থাকার নিদর্শন নয়, মিশরের মমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর দৈনিক মৃত্যুর পূর্বেই যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে, ইতিহাসে তারও নজীর আছে। রাম্ভঞ্জে ম্যাকডোন্টালডের সত্যকার মৃত্যু কি তাঁর দেহাবসানের অনেক আগেই ঘটেনি?

দিল্লীতে নবাগত যাযাবরকে অগ্গকার লেখকের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া পণ্ডিত্যম, ঠিক যেমন বিবাহোত্তর পত্নীর মধ্যে পূর্বরাগের প্রিয়াকে দেখতে চাওয়া বিড়ম্বনা। সেদিনকার রচনার সঙ্গে আজকের লেখা যদি কোন পাঠক তুলনা করেন, তবে তিনিই আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করবেন

অনিচ্ছাকৃত শত্রুতার স্বাদ অবশ্য একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়। মিত্রজনের মনোযোগও যে কোন কোন ক্ষেত্রে কতখানি অশ্রীতিকর হয়ে উঠতে পারে, তা ইতিপূর্বে জানা ছিল না। আত্মবিলুপ্তির জ্ঞান আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। তাতে লাভ হয়নি। পরিচয় গোপন রয়নি। ফলে, চায়ের নিমন্ত্রণে গেলে যথারীতি পরিচয় আদান-প্রদানের পরে অকস্মাৎ প্রশ্ন শুনতে হয়,—“ওঃ, আপনিই তো সেই—?” আত্মীয়-বাড়ীতে বিবাহ-সভায় সজ্জা-পরিচিতি অতিথিরা বইর নায়ক-নায়িকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য কণ্ঠে বলেন, “আচ্ছা সত্য কি—?” বন্ধুদের আড্ডায় উৎসাহী সাহিত্য-সমালোচকেরা পুস্তক-বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত ব্যাখ্যা দাবী করেন।

বন্ধুদের উদ্বেগ এর চাইতেও মারাত্মক। তাঁরা শুধু প্রশংসা করেই নিরস্ত নন, উপদেশদানেও সমান উৎসাহী। পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত ও অপরিচিতের দল যখন তখন বাড়ি বয়ে এসে অযাচিত পরামর্শ দেন। কেউ বলেন, এবার একখানা বড় উপন্যাস লিখুন। কেউ বা বলেন, উপন্যাস নয়,—ছোট গল্প। তাতেই আমার হাত খুলবে। আর এক দলের বিশ্বাস, প্রবন্ধ রচনাই আমার ক্ষেত্র। অধিকতর হিতাকাঙ্ক্ষীর দল বিষয়-নির্বাচনের ক্লেশ পর্যন্ত নিজেরাই স্বীকার করেন। তাঁরা কেউ বলেন দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে, কেউ বা বলেন, দিল্লী আর নয়, এবার কলকাতার উপরে একটা বই। ছ ছ করে কাটবে। সংসারে ডাক্তারের সংখ্যা অগুণতি, সে কথা আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে উপলব্ধি করেছি। মাথা ধরেছে—একথা বলা মাত্র প্রত্যেক পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকেই একটা অযুধের বা প্রতিক্রিয়ার নির্দেশ কে না পেয়েছি? সম্প্রতি আবিষ্কার করলেম, এ জগতে সাহিত্য-রসিকের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

শুধু উপদেশেই শেষ নয়। অনুরোধ এবং অনুযোগও আছে। সন্তোঃপ্রসূত মাসিকপত্রের তরুণ সম্পাদক আসেন লেখার বায়না নিয়ে। রিক্তহস্তে ফিরে যাওয়ার কালে মনে মনে গাল দিয়ে যান, লোকটা পয়লা নয়রের স্বব। পুরাতন পুস্তক-ব্যবসায়ী আসেন নতুন বইর দাবী নিয়ে। বিকল মনোরথ হয়ে সন্দেহ করেন, নিশ্চয়ই অপর কেউ

বেশী পারসেন্টে কবুল করেছ। নূতন প্রকাশক অল্পকালব্যবধায় বিরক্তির সঙ্গে সিদ্ধান্ত করেন, এ লেখকের অর্থগৃহুতা মেটানো তার শক্তির বাইরে।

অর্থে আসক্তি নেই যোগী ঋষির। আমি তাঁদের দলে নই। কিন্তু অর্থের কারণে গ্রন্থরচনা করেন অর্থ-বই লেখকেরা। আমি সে গোষ্ঠিরও বাইরে। নোট লেখা আমার কৰ্ম নয়। আসল কথা এই যে, আমার লেখার পশ্চাতে কোন প্রেরণা নেই।

আমি সাহিত্যিক নই। কল্পনাশক্তির যে-প্রাচুর্য্য কথাসাহিত্যিকের সর্বপ্রধান অবলম্বন, আমার মধ্যে তার বাস্পমাত্র নেই। নিজকে অসাহিত্যিক প্রমাণের আশ্রয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, আকাশের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর চোখে বাধা ধরে গেলেও, কারও নিবিড় কুম্বলদাম দূরে থাক, একগাছা চুলের আভাস পর্য্যন্ত কখনও তাঁর চোখে পড়েনি। শরৎচন্দ্রের খেয়াল হয়নি যে, ঐ বিনয়োক্তি লিপিবদ্ধ করার কালে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি অনবদ্য সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু আমার পক্ষে এটা নিতান্তই স্বীকারোক্তি। প্রস্তুতি পদ্ধতীকরণের পানে তাকালে কারো কমল-আননের কথা আমার মনে জাগে না। পদ্মধুর কথা স্মরণ করে প্রলুব্ধ রসনা জলসিক্ত হয়ে ওঠে।

আমি সাংবাদিক। সাংবাদিকেরা চেষ্টা করলে সাহিত্যসমালোচক বা প্রবন্ধকার হতে পারেন, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর কথাসাহিত্যিক হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। উইনষ্টন চার্চিলের গদ্য-রচনার ষ্টাইল যতই মনোহর হোক না কেন, Great Expectations তাঁর কাছে ছরাশা, Great Contemporaries নিয়েই তাঁর কারবার। সংবাদ-সাহিত্য নামক একটা বস্তু সম্প্রতি এদেশেও দেখা দিয়েছে বটে, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যের পংক্তিতে তার আসন আজও পাকা হয়নি। সেটা বড় জোর আর্ট ইন্‌ইণ্ডাস্ট্রী।

এর কারণ সুস্পষ্ট। রস-সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হওয়ার প্রয়োজন নেই। যা ঘটছে, তার চাইতে যা ঘটতে পারে তাই নিয়ে তার কারবার। সে সাহিত্যের জন্মস্থান সাহিত্যিকের মনে। সংবাদ-সাহিত্য একান্তভাবে বাস্তব-সর্বস্ব। যা ঘটেনি তা তার এলাকার

বাইরে। সে-সাহিত্যের সূচনা হয় সাংবাদিকের দেখায়। কথা-সাহিত্য রাফেলের চিত্র। সংবাদ-সাহিত্য সেসিল বিটনের ফটোগ্রাফ। সাহিত্যিক রচনা করেন আপন মনের প্রকাশ-ব্যাকুলতায়, কেউ পড়বে কি পড়বে না, সে-চিন্তা তাঁর পক্ষে অবাস্তব। সাংবাদিক রিপোর্ট লেখেন জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠক।

আমার চোখের সামনেও একটি ব্যক্তি আছেন। তাঁর নাম বলা নিষেধ। দিল্লীর পত্রগুলি তাঁকেই লিখত। আজ যা লিখছি, তাও তাঁরই জন্তে। আমার কাছে তিনি অধিক প্রত্যাশা করেন না। তিনি জানেন, আমি দ্রষ্টা নই, দর্শক। আমি গল্প বানাতে পারিনে, গল্প শোনাতে পারি। বলা বাহুল্য, আমার লেখা তাঁর ভালোই লাগে। প্রশংসা যা করেন, তাতে আর যাই থাক, অপ্রমত্ত সমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারশক্তির প্রমাণ থাকে না। নিশ্চিত জানি, তিনি আমার জীবনী রচনার ভার নিলে আক্ষেপের কারণ ঘটবে না।

অবশ্য মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, কোনো লোকই সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয়। মৌলিক হৃদয়বৃত্তির দিক দিয়ে মানুষ ম'এই এক, অনুভূতির যোগসূত্রে অল্প-বিস্তর একের সঙ্গে বহুর সাদৃশ্য আছে। সুতরাং হয় তো এক জনের কাছে যা রুচিকর, পাঁচ জনের কাছেও তা একেবারে বিস্মাদ নয়। বিচিত্র নয় যে, আমার লেখাও সেই একটি লোকের সঙ্গে অল্প আরও হ'—এক জন পাঠকের ভাল লাগবে। অবশ্য ভাল লাগার মাত্রা নিয়ে তারতম্য ঘটা অস্বাভাবিক নয়। মায়ের স্নেহে আর মাসির আদরে তফাৎ তো অবধারিত।

লেখার ইতিহাসটা কিন্তু নিতান্তই সাধারণ। বাংলাদেশের প্রত্যেক পুরুষকেই কোন এক বিশেষ বয়সে ঘটকের আক্রমণ সহিতে হয়। তাদের কেমন করে ঠেকাতে হয়, অভ্যাসের দ্বারা সে বিঘা আমার আয়ত্ত। শুভানুধ্যায়ী মুহম্মদ এবং অমুরাগী পাঠকদের কি করে রুখতে হয়, সে কৌশল আমার জানা নেই। একমাত্র তাঁদের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণায়ই এক দিন এক বন্ধুর সহায়তায় আমি এই বিরাট নগরীর প্রাস্তভাগে এক ক্লাবে যোগদান করলেম।

ক্লাব বস্তুটা এদেশে প্রাচীন বানপ্রস্থের আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তফাৎ শুধু এই যে, এর জন্ম

পঞ্চাশোদ্ধি অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। ক্রান্ত, মর্যাহত, তৃপ্তিহীন, লক্ষ্যহীন অভিজাত নরনারীর এটা আত্মবিশ্বস্তির অবলম্বন, ইংরেজীতে যাকে বলে এক্কেপ। তাই বেশীর ভাগ ক্লাবেই বিপত্তীক অফিসার, স্বামী-পরিত্যক্তা রমণী, বিগতযৌবনা কুমারী, রূপহীনা তরুণী এবং অবিবাহিত প্রৌঢ় ব্যক্তির আশ্রয়-স্থান। এদের জীবনে সুখমা নেই, অথচ আসক্তি আছে। তাই জীবনকে অপচয় করে এরা জীবনকে ভরাতে চেষ্টা করেন। রেসকোর্সে পর পর উইন-এ হেরে-যাওয়া জুয়ারী যেমন সমস্ত ক্ষতি একেবারে পূরণের আশায় প্রেসে-এ দ্বিগুণ বাজী রাখে।

এই ক্লাবটিতেও সে-ধরণের নরনারীর অভাব ছিল না। আর ছিল বিলাত-প্রত্যাগত তরুণ ব্যারিষ্টার, নতুন বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সচ আলোকপ্রাপ্ত মাড়োয়ারী নন্দন ইত্যাদি। এই ক্লাবেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো মিসেস মলী সেনের সঙ্গে।

প্রাণী-জগতের মতো নাম-জগতেও যে বিবর্তন আছে, মলী সেন তার জীবন্ত সাক্ষ্য। তাঁর মাতামহ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত কবিরাজ। ভৈষজ্যশাস্ত্রে তাঁর যেমন অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, সংস্কৃত কাব্যেও তেমনি প্রখর অনুরাগ। দৌহিত্রীর জন্মমাত্রই মাতামহ নামকরণ করলেন শ্রদ্ধামালিনী। কিন্তু এত দীর্ঘ নাম বানভট্টের কাদম্বরীতে যদি বা শোভা পায়, বিংশ শতাব্দীর গৃহস্থ পরিবারে চলে না। অচিরেই সকলের অলক্ষিতে নামের প্রথমার্দ্ধ বিশ্বস্তির গর্ভে অন্তর্হিত হলো। রইলো শুধু মালিনী। সেটা সম্বোধনে সহজ এবং শ্রবণেও মধুর।

মেয়ের ঘ্যাঠা মশায় অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলেজের ছাত্র ছিলেন। কার্লাইলের লেখা এখনও অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর পরম ভক্ত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যৌবনে উপনিষদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন। তুর্নীতি সম্পর্কে তাঁর গুচিবাই প্রায় হিন্দু বিধবার আচারপরায়ণতার কাছাকাছি। ভূদেব মুখো-পাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ ছাড়া অল্প কোন বাংলা বই অন্দরমহলে দেখলে তিনি আতঙ্কিত হতেন। তিনি ভ্রাতৃপুত্রীর নামে, ভারতচন্দ্রের অন্তর্যামলের গন্ধ আবিষ্কার করে আঁতকে উঠলেন। নাম পালটে করলেন মলিনা।

পরবর্তী সংশোধনের ভার কন্যা স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফিজ দাখিল করার কালে ফরমে ইংরেজী ধরণে নাম লিখলেন—মলোনী। উত্তরকালে বন্ধু ও ভক্তজনের অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে তার সর্বশেষ রূপান্তর ঘটিয়ে সোসাইটিতে আবির্ভূত হলেন মিসেস মলী সেন। এখানে বলে দেওয়া আবশ্যক যে, বাংলা সাহিত্য-জগতে শেষের কবিতার অমিত রে তখনও জন্মগ্রহণ করেনি।

মলী সেন হচ্ছেন সেই জাতীয় মেয়ে—না, থাক, সে কাহিনী বর্ণনা না করাই ভালো। তাঁর জীবন-আলেখ্য তার আপন উক্তি, আচরণ ও কর্মের মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হোক জনসমক্ষে। বহু চরিত্র সম্বলিত ঘটনা-বহুল সুদীর্ঘ ছায়াচিত্রের মতো। আমার জবানিতে তার ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র। সবাক চিত্রের তো কমেটোরী-প্রয়োজন হয় না। [ ক্রমশঃ। ]

চার্চিল জল পান করেন না

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট শেষ বয়সে যেখানেই যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন নিজের পানের জল জলের বোতল। তেহেরাণ কনকারণে এক দিন জর্জ ডিল্লন লক্ষ্য করলেন যে, উইনষ্টন চার্চিল বেন আগাম বোপ করছেন না। রুজভেল্ট বললেন যে, “চার্চিলের বোধ হয় তৃষ্ণা পেয়েছে।” সেই ভেবে রুজভেল্ট নিজের পানীয় জল চার্চিলকে পান করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল নেতিবাচক ভঙ্গীতে বললেন,—“আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি পানীয় জল কখনও খাই না।”

দুমড়ন—ভাঁজন, মোড়ন, জড়ান, পাকান ।  
 দুন্দুভ—মন্দভাগ্য, মন্দ আশ্রয়, দুর্ভাগ্য, অভাগ্য, মন্দাদৃষ্ট ।  
 দুর্ভাগ্য—দুঃখ, অশাশ্বত, উপদ্রবী ।  
 দুর্ভাগ্য—দুর্দশা, দুর্গতি, আপৎ কাল, ক্রোধ, দরিদ্রতা, দুর্দিন, কুসময় ।

দুর্ভাগ্য—কুব্যবহারী, অধাৰ্মিক, দুৰ্ভাগ্য, দুৰ্ভাগ্য, দুঃখ, মন্দ, খল, শঠ ।  
 দুর্ভাগ্য—নিদ্দয়, পাপী, দুর্দান্ত, দুৰ্ভাগ্য, নিলজ্জ, অত্রেপ, দুৰ্ভাগ্য ।

দুর্ভাগ্য—কটুবাণ্য, গালাগালি, দুৰ্ভাগ্য ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখিনী, জিঘাংসক, ঘেণী ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখপা, দুর্ভাগ্য, কষ্টে প্রাণ্য ।

দুর্ভাগ্য—পাপ, কিশিষ, দুষ্কৃত ।

দুর্ভাগ্য—গুণ, কঠিন, কষ্টসাধ্য, দুঃখ ।

দুর্ভাগ্য—গড়, পরিখা, দুর্ভাগ্য, কষ্টগম্য ।

দুর্ভাগ্য—দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ভাগ্যগ্রস্ত ।

দুর্ভাগ্য—মন্দগন্ধ, কুবাস, পুতিগন্ধ ।

দুর্ভাগ্য—কষ্টগম্য, অগম্যপ্রায় ।

দুর্ভাগ্য—ভগবতী, শিবানী, শিবের পত্নী ।

দুর্ভাগ্য—মন্দ ঘটনা, কষ্টসাধ্য, দুঃখ ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখ, খল, উপদ্রবী, কুর ।

দুর্ভাগ্য—কষ্টদম্য, কষ্টলব্ধ বিষয় ।

দুর্ভাগ্য—অপ্রত্যক্ষ, অস্পষ্ট, অপ্রকাশ ।

দুর্ভাগ্য—অধ্যাত্তি, অপযশ, নিন্দা ।

দুর্ভাগ্য—অবিনীত, কষ্টপ্রাপ্ত, দুর্ভাগ্য ।

দুর্ভাগ্য—মন্দনীতি, অজ্ঞায়, অবিচার ।

দুর্ভাগ্য—কুপথ, কদাচার, দুঃখ, অষ্টাচার ।

দুর্ভাগ্য—শক্তিহীন, অসমর্থ ।

দুর্ভাগ্য—অশান্ত, অকাল, ভক্ষ্যভাব ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখিনী, মন্দভাগ্যবতী ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখিনী, মন্দ ভাবনা ।

দুর্ভাগ্য—শত্রুদির অভাব, আকাল ।

দুর্ভাগ্য—মোহিত, মত্ত, তমোভগ্নযুক্ত ।

দুর্ভাগ্য—কটুভাবী, নিষ্ঠুরভাবী ।

দুর্ভাগ্য—মহার্য, বহুমূল্য ।

দুর্ভাগ্য—মন্দ মেধা, নিবোধ, অনিপুণ ।

দুর্ভাগ্য—মন্দ সময়, কুৎসিত সন্ধি ।

দুর্ভাগ্য—অশুভযুক্ত চিহ্ন, দুঃখ ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখপা, কষ্টপ্রাপনীয় ।

দুর্ভাগ্য—স্নেহপাত্র, অম্ময়োগ, প্রেম ।

দুর্ভাগ্য—যানবাহক, স্কন্ধবাহক ।

দুর্ভাগ্য—ক্লেশকর, কঠিন, শক্ত, বিষয় ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখিনী, কুক্রিয়া, পাপ কর্ম ।

দুর্ভাগ্য—পাপ, অধর্ম, কুক্রিয়া, মন্দ ।

দুর্ভাগ্য—পীড়া, ক্লেশ, দুঃখ, কষ্ট ।

দুর্ভাগ্য—দুঃখাচ্য, অপাচ্য ।

# বহুমালা

ত্রিপ্রাণতোষ ঘটক

দুঃখ—দুঃখ, অতরনাই, দুঃখরণীয় ।

দুঃখ—দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ ।

দুঃখ—দুঃখপা, দুঃখী, দরিদ্র, দীন ।

দুঃখ—কষ্ট, পুত্র, কুমারী, অদ্বৈত ।

দুঃখ—প্রেরিত, চর, ধাবক, সখাদবাহক ।

দুঃখ—অসম্মিকট, অস্তর, অসম্মীপ ।

দুঃখ—পরিণামদর্শী, বিজ্ঞ, দীর্ঘদর্শী ।

দুঃখ—সর্বত্র, নিকটানিকট ।

দুঃখ—তৃণবিশেষ ।

দুঃখ—দোষী করণ, দোষ প্রকাশন ।

দুঃখ—নিন্দনীয়, দুঃখ, অমুখোজ্য ।

দুঃখ—নিন্দনীয়, বস্ত্রগৃহ, তাষ ।

দুঃখ—চক্ষু, নেত্র, লোচন, দর্শন, দৃষ্টি ।

দুঃখ—দৃষ্টিপাত, অবলোকন, সাক্ষ্য ।

দুঃখ—শক্ত, কঠিন, অচল, নিষ্ঠ, স্থির ।

দুঃখ—নিষ্ঠবক্তা, সত্যভাবী, স্থিরবাক ।

দুঃখ—প্রত্যয়, নির্ণয়, নিশ্চয় ।

দুঃখ—কুপণ, অদাতা, বন্ধুদৃষ্টি ।

দুঃখ—চক্ষুগোচর, দর্শনীয়, সূত্রী ।

দুঃখ—দৈকিত, আলোকিত, প্রত্যক্ষ ।

দুঃখ—উদাহরণ, উপমা, তুলনা ।

দুঃখ—দর্শন, নিরীক্ষণ, আলোকন, দেখন ।

দুঃখ—গোচর—সাক্ষ্য, নয়নগোচর ।

দুঃখ—চক্ষুগোচর, নেত্রমণি ।

দেউল—দেবালয়, চড়ক, পুণ্ড্রকর্তা ।

দেউলিয়া—ঋণশোধাক্ষম, কৃতসর্কস ।

দেউল—দান করণ, অর্পণ, বিতরণ ।

দেউল—দর্শন, প্রকাশন, প্রত্যক্ষ করণ ।

দেউল—দৃষ্টি, প্রত্যক্ষ, দর্শনযোগ্য ।

দেউ—অর্ধেকের সহিত এক, সাক্ষ্য ।

দেউপ্যমান—জাজ্জল্যমান, প্রকাশমান ।

দেউ—দাতব্য, ধায়, ঋণ, দেয় ।

দেউয়া—দানপ্রাপ্ত, দত্ত, উৎসৃষ্ট ।

দেউয়া—অকৃত্রিম জলাশয়, নদাদি ।

দেউয়া—মেঘগর্জ্জন, বজ্রধ্বনি ।

দেউয়া—স্বর, স্বর্গবাসী, দেব ।

দেউয়া—দেবস্ব ভূমাদি, ঠাকুরভূমি ।

দেউয়া—দেবপ্রেরিত, দেবচর ।

দেউয়া—দেবরানী, দেবরত্ন ।

দেউয়া—পুণ্ডলিকারাদনা, প্রতিমাপূজা ।



## শালটি ব্রিটির চিঠি

[ যক্ষা একবার সে গৃহে প্রবেশ করে ছ'-একটি বলি না নিয়ে কখনই সে-গৃহ পরিত্যাগ করে না। যক্ষাকান্ত এমিলিকেও অকালে চিরবিদায় নিতে হয়েছে এ পৃথিবী থেকে। "জেন আয়ারের" লেখিকা শালটি ব্রিটির বোন এমিলি। এমিলিও একখানা উপন্যাস রচনা করেছিলেন—"উইদারিং হাইস্"—এবং এই একখানি উপন্যাসেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। জনৈক বান্ধবীকে লেখা শালটি ব্রিটির এই চিঠি ছ'খানির কোন পরিচয় দরকার হবে না। ]

২৩শে নভেম্বর, ১৮৪৮

আমার শেষ চিঠিতে জানিয়েছি এমিলি অন্তস্থ। এখনও সে ভাল হয়নি। অত্যন্ত পীড়িত সে। আমার বিশ্বাস, তুমি যদি তাকে দেখ তো বলবে বাঁচার আর কোনই আশা নেই। এমন ঝাঁঝ, রক্তলেশহীন অপচিত মূর্তি আর কখনো চোখে পড়েনি। বুকের গভীর থেকে গুঁঠা সেই নাছোড়বান্দা কাশিটা আছেই—সামান্যতম পরিশ্রমেই ইপাতে থাকে সে এবং সঙ্গে সঙ্গে বুকে আর পাঁজরায় ব্যথা। এই একটি মাত্র সময় সে নাড়ী দেখতে দেয় এবং তখন নাড়ীর স্পন্দন হয় মিনিটে ১১৫। এই অবস্থাতেও সে ডাক্তার দেখাতে দৃঢ় ভাবে অস্বীকার করছে। তার মনে: ভাবও খুলে বলবে না—সে সম্বন্ধে কাকুর ইংগিতও বরদাস্ত করতে চায় না। কয়েক সপ্তাহ ধাবৎ আমাদের অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। ভগবানই একমাত্র বলতে পারেন কেমন করে এই অসহনীয় অবস্থায় অবসান ঘটবে। বড় বাব এমিলিকে হারানোর সম্ভাবনার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু মাহুযেব স্বভাবই এমন যে এ চিন্তায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। এ পৃথিবীতে এমিলিই আমার জন্মের সব চেয়ে প্রিয়জন।

মঙ্গলবার

আরো আগেই লিখতাম যদি একটু আশার ক্ষীণতম রশ্মিও দেখতে পেতাম। কিন্তু কোনই চিহ্ন নেই। দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে এমিলি। ডাক্তারের মতামত এমন অস্পষ্ট যে কোনই কাজে আসেনি। তিনি কতগুলো ওষুধ লিখে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু এমিলি তা মুখে তুলবে না। এমন অন্ধকার মুহূর্ত আর কখনো দেখিনি জীবনে। ঈশ্বরের করুণাই এখন একমাত্র ভরসা—এত দিন তা তিনি দিতেও কার্পণ্য করেননি।

## নেপোলিয়ানের চিঠি

[ ফ্রান্সের রাজত্বকে আসীন হয়ে নেপোলিয়ান জোসেফিনকেও তাঁর স্বয়ং-সিংহাসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন তিনি গৌরবের বর্ণশিখরে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বরে অতুল জাঁকজমক

আব যথোচিত ধর্মাহুষ্ঠানের মধ্যে নেপোলিয়ান পুনর্বিবাহ করেন জোসেফিনকে। ভবিষ্যতের দিকে শ্যেন-দৃষ্টি সূচক নেপোলিয়ান সেদিন ইচ্ছা করেই সমস্ত অহুষ্ঠান থেকে একটি সামান্য অঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন। রাজক-পল্লীর কোন পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন না সে বিবাহ অহুষ্ঠানে। ছয় বছর পরে শুধু এই কারণ দেখিয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভবপর হয়েছিল। নতাবদাম দুর্গে ঐতিহাসিক উৎসবের বাজাদুঘরের মাদকতায় বিলাস জোসেফিনের চোখে এই ক্রটিটুকু ধরা পড়েনি। জোসেফিন তখন স্বামি-গণে আত্মহারা—বহু অশ্রুর ঈর্ষা ও অভিশাপের শব্দে বিভ্রা। নেপোলিয়ানের সম্মুখে বহু সংকট। ট্রান্সালপারের যুদ্ধ আসন্ন। জেনার ভাগ্যও হুম্ব হুম্বে ঝুলছে। এই রাজনৈতিক কটিকা ও কুট চক্রান্তের মাঝখানেও নেপোলিয়ানের কলম মুহূর্তের জ্ঞান স্তব্ধ হয়নি। মালমেইসন থেকে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নেপোলিয়ান লিখলেন—"...চমৎকার আবহাওয়া। বিশ্বাস কর, আমার ছোট্ট জোসেফিনের প্রতি হৃদয়বেগের মত আর কোন কিছুই এত অকৃত্রিম নয়। আমার সবই তোমার। ইতি বি।"]

ব্রান, ১১শে ডিসেম্বর, ১৮০৫

মহারাজী, ষ্ট্রাসবার্গ থেকে চলে যাওয়ার পর আর একখানিও চিঠি আসেনি তোমার। তুমি ব্যাডেন, ষ্টাটগার্ট, মিউনিকে গিয়েছিলে কিন্তু একটি ছত্রও আমায় লিখে জানাওনি। এ তো ভালবাসার, কোমলতার পরিচয় নয়। এখনও আমি ব্রানে আছি। রাশিয়ানরা চলে গেছে। আমি সন্ধি করেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে আমি কি হতে বাচ্ছি। তোমার ঐ আড়ম্বরের বর্ণশিখর থেকে এ অধম দাসের প্রতি একটু প্রসন্নতা-বারি বর্ণন করো।

নেপোলিয়ান।

## শেলীর চিঠি

[ যক্ষাকান্ত কীটসকে শেলী পিসার আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। ]

পিসা, ২৭শে জুলাই, ১৮২০

প্রিয় কীটস

অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে যি: গিসবোর্ণের নিকট তোমার ভীষণ বিপদপাতের কথা আমি শুনেছি। সে আরো বলেছে, তোমার চেহারা না কি এখনও ক্ষয় রোগের ছাপ স্পষ্ট। তোমার মত বারি চমৎকার কবিতা লেখে যক্ষা তাদেরই বেশী ভালবাসে, আর ইংলণ্ডের শীতের সহায়তায় পছন্দসই লোককে বেছে নিতে একটুও অস্বীকার হয় না তার। তাই বলে এ কথা বলছি না যে, তুমি এবং অমারিক কবিরাই যক্ষার একমাত্র প্রিয়পাত্র এবং

কাব্য-লক্ষ্যের সঙ্গে এ নিয়ে তাদের একটা চুক্তিনামা সই করা আছে। কিন্তু আন্তরিক ভাবে বলছি, যে-বিষয়ে আমি অন্ত্যস্ত উৎকণ্ঠিত তা নিয়ে আমি পরিচাস কবি না। আমার মতে শীতটা তোমার ইতালীতে কাটানই উচিত এবং এই ভাবে এই মহা অনিষ্টের হাত হতে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে। যদি প্রয়োজনীয় মনে কর, তাহলে পিসা বা পিসার আশে-পাশেই যত দিন ভাল লাগবে তত দিন থাকতে পার। মিসেস শেলীও আমার সঙ্গে তোমাকে সনিবন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছেন আমাদের এখানে থাকবার জন্য। সমুদ্র হয়ে তুমি দেগতর্বে আসতে পার। ইতালী অতি দর্শনীয় এবং তবল হৃৎপিণ্ডের পক্ষে সমুদ্র সত্যই ভাণী ভাল। সমুদ্র আমাদের এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। যে-বোন অবস্থাতেই তোমার ইতালী দেখা উচিত—যদি কোন উদ্দেশ্য আরোপ করতে দাও ত বলব তোমার স্বাস্থ্য তারই একটা অভ্যুত্থান। মর্মর মূর্তি, চিত্রকলা, প্রাচীন ধর্ম-সাম্রাজ্য—এ সব সম্বন্ধে বাগাড়ম্বর করতে বিরক্ত বইলাম। আর পাগোডা নদী মাঠ প্রান্তর আকাশ, আকাশের বর্ণালী—এদের সম্বন্ধে মৌনভাষ্য রীতিমত সচিবৃত্যব দরকার।

কিছু দিন ভোগ, তোমার 'এণ্ডিমিয়ান' আবার নতুন করে পড়লাম এবং কাব্য-ঐশ্বর্যেরও নতুন আশ্রয় পেলাম যদিও অলস্যে তার দাবা বধণ হচ্ছেই। সাধারণ পাঠকেরা সহজে এর মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং যথেষ্ট বই বিক্রী না হওয়ায় এইটাই প্রধান কারণ। তোমার মহৎ সৃষ্টির প্রতিভা আছে এ আমার দৃঢ় ধারণা এবং মহৎ সৃষ্টি হুমি করবই। অসিয়ারকে বলা আছে আমার সব বই তোমায় পাঠিয়ে দেবে। 'প্রমিথিউস আনবায়ণ্ড' তরুত এই চিত্রের মাঝে এক সময়েই পাবে। 'সেলি' এত দিনে নিশ্চিত পেয়ে গেছে আশা কবি! সম্পূর্ণ নতুন ঢঙে খুব যত্ন নিয়ে লিখেছি বইখানা।

কবিতায় আমি প্রচলিত পদ্ধতি ও ম্যানারিজম পছন্দ করি না। আমার চেয়ে বীরা আরো প্রতিভাবান তাঁরা এই রীতি অনুসরণ করবেন আশা করি। ইংলণ্ডেই থাক আর ইতালীতেই আস, যেখানেই যাও আর বাই কর—তোমার স্বাস্থ্য সুখ ও শাক্যল্যের জন্য আমি চির-উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলাম।

তোমার বিশ্বস্ত  
পি. বি. শেলী।

## কীটসের চিঠি

[১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে ভ্রমণ করে ইতালীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় শেলীর সঙ্গে কীটসের পরিচয় ছিল সামান্যই। পিসাতে গিয়ে বসার পর শেলী আবার কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। 'ওডস টু দি ওয়েস্ট উইণ্ড', 'টু এ স্কাইলাক' প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবিতাগুলি এই সময় ছাপা হয়েছে। শেলী তখন যশের তুঙ্গ শিখরে। এই সময় লণ্ডনে কীটসের একখানি নতুন কবিতা পুস্তক আত্মপ্রকাশ করেছে এবং বইখানি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। কবির খ্যাতির সংবাদ সাগর-পারে শেলীর কাছেও পৌঁছল এবং আরো খবর এল যে, কবির শারীরিক অবস্থা অতি শোচনীয়। কীটস তখন বন্ধার শয্যাশায়ী। শেলী কীটসকে পিসাতে আমন্ত্রণ করে লিপি পাঠালেন।

শেলীর আমন্ত্রণ-লিপির উত্তরে কীটস যে পত্র লিখেছিলেন তাতে কিছুটা রহস্য, কিছুটা বিজ্ঞপের আমেজ ঘোষান থাকলেও প্রগম্ভ কীটসের প্রীতি ও ভালবাসায় উজ্জল চিহ্নাঙ্কিত। পরে এক বন্ধুর সাথে কীটস ইতালী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু শেলীর সঙ্গে আর ইতালীর কীটসের দেখা হয়নি। কীটস *Pizza di spanga* তে একটি বাড়ী নিয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর অল্পাধিক অর্থের দিকে দৃষ্টি লাগল। পিসাতে বাওয়াব প্রেস্টাইটল নাম। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারী কীটস দারিদ্র্য বন্ধন ন্যসে ইতালীক ভ্রমণ করেন। বন্ধুর শব্দানুসৃত্যব ভ্রমণ এবং তাঁর প্রাতি সমালোচকদের নির্মম নির্বৃত্যব বিচলিত শেলী বন্ধুর উদ্দেশ্যে বচনা করেন তাঁর অমর কাব্যগ্রন্থ—*গ্র্যাভোনিদস*।]

হাম্পট্রেড, অগাস্ট ১৮২০

প্রিয় শেলী,

পরদেশে নানা কাজের ভিড়ের মধ্যেও তুমি যে এমন চিঠি লিখতে পার, সেখান থেকে পরম প্রীত হয়েছি। যদি তোমার এই সাদর আমন্ত্রণের স্বযোগ গ্রহণ না করি, জানবো এমন কোন ঘটনা তার অন্তরায় হয়ে উঠেছে যার ইংগিত কবিতাও আমার দৃক ফেটে যাচ্ছে। ইংলণ্ডের শীত যে আমার শেষ কবে দেবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই, আর শেষ কবে তিলে-তিলে অতি ঘুণা ভাবে। কাজেই সমুদ্র-পথেই হোক আর স্থল-পথেই হোক, ইতালীতে আমাকে যেতেই হবে যে ভাবে মৈনিক মার্চ করে এগিয়ে যায় কামানব মুখে।

বর্তমানে আমার মাসিক অবস্থাই সব চেয়ে বাধাপূর্ণ। যত চেষ্টা অবস্থাই আশ্রয় না দেন, চারপাশে শয়্যাগারের একঘেরে ঘনিত পরিবেশে দীর্ঘ কাল কাটানো আমার ভাগ্য নয় একথা ভাবি যখন মন আশ্রয় হয়। আমার কবিতা পড়ে তুমি অনন্দ পাও জেনে সুখী হলাম। সুনামের দিকে নজর দিয়ে যদি সম্ভব হোত আমি যেহায়া সেগুলি নতুন করে বচনা করতাম। হার্টের কাছ থেকে তোমার 'সেলি' এক কপি পেয়েছি। এর মাত্র একটি অংশেরই বিচার করতে পারি আমি—সে হোল এর কাব্যরস এবং নাটকীয় আবেদন—অধুনা অনেকের মতে যা আশ্রয়িক। আজকের যুগের দাবী হোল প্রত্যেক সৃষ্টিরই একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে—ঈশ্বরও সে উদ্দেশ্য হতে পারেন। শিল্পীকে সেবা করতে হবে কুবেরের—হতে হবে আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ স্বার্থপর। বন্ধনহীন কল্পনার মুক্তিকে সীমায়িত করে তুমি বড়ো শিল্পী হতে পার, ভাবের প্রতিটি বন্ধু ধ্যানের অমৃত ভরিয়ে তুলতে পার। আমার এই অল্পপট মন্তব্যের জন্য আশা কবি আমার ক্ষমা করবে। এই সীমানা-বৈশা চিন্তা নিশ্চয়ই তুচ্ছ-শীতল কীটস পরিচয় দেবে তোমার গলায়। যে তুমি ছ'মাসও এক জায়গায় ডানা গুটিয়ে নিশ্চল ভাবে বসে থাকতে পারো না।

আর এণ্ডিমিয়ানের লেখকের পক্ষেও এ বকম বলা কি খুব আশ্চর্যের নয়? বার নিজেই মন চারি দিকে ছড়ান তাগের মতো। কিন্তু আমাকে ওরা প্যাকেটে বন্ধ করে রেখেছে। আমার মন যে রাজ্যে বিহার করে সে যেন আশ্রম আর আমি সেই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী। প্রতিদিন প্রমিথিউসের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছি। ইচ্ছাকে যদি কাজে রূপায়িত করতে পারতাম এটি এখনও পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই থাকত অথবা দ্বিতীয় অংক ছাড়াই বেকত। মনে পড়ে



Hamp Stead Heath'র উপর আমার প্রথম ব্যর্থপ্রয়াস তুমি ছাপ্পতে নিষেধ করেছিলে। সে উপদেশ তোমাকেই ফেরৎ দিচ্ছি। এই সাথে যে বইখানা পাঠাচ্ছি তার বেশীর ভাগ কবিতা হু'বছর আগে লেখা এবং আর্থিক লোভের আশা না থাকলে কোন দিনই এটি চাপা হোত না। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, তোমার উপদেশ নেওয়া দিকেই আমার কোঁক বেনী। চিঠি শেষ করার আগে তোমার প্রীতি ও ভাববাসান জ্ঞাত পক্ষবাদ জানাচ্ছি। মিসেস শেলীকেও আমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও নমস্কার জানাইও। আশা করি, নীচের তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি

জন কীটস।

### সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

[ ১৯২৫ সালের মার্চ মাসে সার সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী উত্তরবঙ্গের পত্নী ভূপিতারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, বি, এল, সি, এস, আইর পৌত্র ও কুমার ওরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মিহিরী বাবু) জ্যেষ্ঠ পুত্র জীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এস, সি, সি, আই, ই, এম, বি, ই' (তৎকালীন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য) নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, নিয়ে তা উদ্ভূত করা হল। পত্রে যে পুস্তকের উল্লেখ করা হয়েছে, তার নাম "দি নেশন ইন মেকিং"। সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে ঝগড়া জানতে চান তাঁরা এই চিঠিখানি পড়বেন। ]

ব্যারাকপুর,

১০ই মার্চ, ১৯২৫

প্রিয় তারক বাবু,

আমার বই এখনো প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবতঃ এই মাসেই প্রকাশিত হবে। প্রকাশিত হলেই আমি আপনাকে একখানি কপি পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ইতোমধ্যে আপনি মন্ত্রীদের বেতন সম্বন্ধে কি করবেন। আমি আশা করি, আপনি মন্ত্রীদের বেতনের পক্ষের ভোট দেবেন : কারণ ভোট যদি না দেন এবং বেতন যদি নামঞ্জুর হয়, তাহলে বাঙ্গালার সংস্কার (শাসন) চাপা পড়বে এবং আমাদের প্রদেশ অমুন্নত অঞ্চল বলে গণ্য হবে। আপনার স্বনামধন্য পিতামহ বেঁচে থাকলে তিনি কি করতেন তা আমি জানি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁর স্মৃতির ও জ্ঞানের প্রেক্ষিতা আপনাকে পরিচালিত করবে ও এ বিষয়ে প্রেরণা দেবে।

অংশা করি, ভালই আছেন।

অকপটে আপনাব

সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী।

### জীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের উত্তর

জেন্দ্রভবন, উত্তরপাড়া,

১৫ই মার্চ, ১৯২৫

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১০ই মার্চ তারিখের পত্র পেলাম। আপনার পুস্তকের একখানি কপি আমাকে দিতে চেয়েছেন, এ জন্য আমি

আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, আমার ছায় বহু দেশবাসী তাদের মহান জাতীয় নেতার পুস্তক পাঠ করতে খুবই উদ্বীণ।

"মন্ত্রীদের বেতন" সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি, তা আপনি জানতে চেয়েছেন। আমি বলতে চাই যে, আমার মতে ঝগড়া আমাকে নির্দোষিত করেছেন এবং আমি যে দলের সদস্য, তাঁদের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত অমুখ্যায়ী কাজ করাই আমার ছায় তরুণের পক্ষে সম্ভব। এ জন্য আমি আমার নির্দোষকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছি।

তবে আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে আপনার উপদেশ আমি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবো।

অবস্থা যে খুবই সঙ্গীন, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং অবস্থা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার জন্য আমার ছায় তরুণের পক্ষে বিষয়টি বারংবার বিবেচনা করা দরকার।

শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লভিবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের

তারকনাথ বানার্জী।

### সার সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর

ব্যারাকপুর, ১৭ই মার্চ,

১৯২৫।

প্রিয় তারক বাবু,

আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। আপনি যে কারণ জানিয়েছেন, তজ্জনা আমি আনন্দিত, যদিও সেগুলি অচল। আপনি বলেছেন যে, আপনি আপনার নির্দোষকমণ্ডলীর নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হবেন এবং আপনি নির্দোষকমণ্ডলীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। আপনি একটি পুরাতন ও অচল নীতির পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলেন বার্ক। আমি আশা করি, আপনি তাঁর বই পড়েছেন। বৃষ্টলের নির্দোষকদের প্রতি এক পত্রে এই নির্দেশের নীতি সম্বন্ধে তিনি কি বলেছেন, তার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি একটি জল্পচ্ছদ উদ্ভূত করলাম :—

"নিজের যুক্তি ও বিবেক অমুখ্যায়ী সম্প্রদায় ধারণার পরিপন্থী হলেও সদস্যকে দলের আদেশ ও নির্দেশ অঙ্কের ছায় মেনে চলতে হবে—ইহা দেশের আইনে নাই এবং আমাদের শাসনতন্ত্রের সমগ্র পদ্ধতি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা মূলগত শাস্ত্র ধারণা থেকেই এর উৎপত্তি।"

বহু বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার আবগারী বিল সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনোভাব থেকে এই প্রস্তাব উদ্ভূতছিলো। তাঁরা উক্ত নির্দেশের নীতি দ্বারা তাঁদের আচরণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আপনার স্বনামধন্য পিতামহ মহা আমবা সকলে তার বিরোধিতা করেছিলাম এবং নৈতিক জয় আমাদেরই হয়েছিলো। মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে তার ফল কি হবে, তা একবার ভেবে দেখবেন। সম্ভাব্য বিভাগগুলি স্থায়ী ভাবে সংরক্ষিত হয়ে

ধাবে এবং সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের উপর বাঙ্গালার যে সামান্য কর্তৃত্ব আছে, তা নষ্ট হবে। মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে করবেন না যে, ভাঙ্গার কৌশল স্বরাজ্যের আবির্ভাবকে দ্বারপ্রদত্ত করবে। নিশ্চিত জানবেন যে, ব্রিটিশ গণতন্ত্র কেবল খালি দ্বারা সজ্জ হতে পারে না, পরন্তু বর্তমানে বাধা দানের পর দ্বারা তাদের বিরোধিতা অধিকতর তীব্র হবে।

আশা করি, ভাল আছেন। ইতি—

আপনার

স্বদেশনাথ ব্যানার্জী।

### কাথারিন ম্যানস্ফিল্ডের চিঠি

[জীবনের শেষ ক'টি বৎসর কাথারিন ম্যানস্ফিল্ডের কেটেছিল নিঃশব্দ মৃত্যু-যাত্রায়। দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি তখন স্বামী ও পরিচিত সমাজ থেকে ছিটকে গিয়ে স্বাস্থ্য লাভের আশায় দেশে-দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সার্বিক ছোট গল্প লিখিয়ে কাথারিনের মন ছিল প্রেম ও সৌন্দর্যের উপাসক। সে তীব্র সৌন্দর্যলিপ্সা। তাঁর অত বড় রোগ-কাতরতাতোও লুপ্ত হয়নি। স্বামীকে দেখা এই পত্রখানিতে সেই রোগজীর্ণা রূপ-পূজারিণীর গভীর নিঃসঙ্গতা ও আকৃতির যে স্নিগ্ধ রূপটি ফুটে উঠেছে, তা আমাদের চোখে অক্ষসঙ্গল করে, হৃদয়কে আগ্রত করে মমতার ও প্রভাব।]

১৫ই মে, ১৯১৫

সন্ধ্যা বেলা

বাতিওয়ালা তার নিত্য কাজে বেরিয়েছে দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারে বসে বসে। এই মাত্র একটু বেড়িয়ে ফিরলাম। নতরডামের গীর্জা অবধি গিয়েছিলাম আজ। একটু একটু আধা-আলোয়, সেই পড়ন্ত বিকেলে ফুটন্ত শাখার সৌগন্ধে মন যে কি অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছিল, বলতে পারি না। কেউ কোথাও নেই; শুধু একটি বোকে একটি মাত্র বৃক্ষ বসে তাঁর লাড়ীতে হাত বুলোচ্ছিলেন। আর ক'টি দুঃস্বপ্ন ছেলে-মেয়ে বল নিয়ে খেলা করছিল। তাদের হাত-পা আর তুলে-তুলে ওঠা মাথাগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই আবছা আলোয় কৃষ্ণবর্ণের শাখা আর পত্রগুলি, দেখতে কি সুন্দর লাগছিল! সেই সন্ধ্যার সঙ্গেতে তারা যেন কড়ির সুর লাগিয়েছে। আর সেই কৃষ্ণায়িত বৃক্ষগুচ্ছের উপরে নতরডামের গীর্জা-শীর্ষের মহিয়্য মূর্তিটি শোভা পাচ্ছে অপূর্ণ। মিনারের চারি পাশে ছোট ছোট পাখীরা কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে। জানো ত, সব প্রাচীন প্রাসাদের আশে-আশে এই সব ছোট ছোট পাখীদের নিত্য আনাগোনা অবিরাম লে। সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলাম যে, একটি সনেট রচনা করি। প্রাচীন একটি মানুষ আর তার মনে অতীত জীবনের বিচিত্র চিন্তা ও স্মৃতি-লহরী ঐ সব পাখীদের মত যাতায়াত করছে, ঐই সুন্দর রূপকটিকে ফুটিয়ে তুলব ভাবলাম। আজ হোল না, কিন্তু আর এক দিন লিখে ফেলব ঠিক।

বিকলে বসে পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। লেখার পথের স্রাস্তি কী মধুর লাগে।

নদীর ধারে প্রেমিক-প্রেমিকার দল ইতস্ততঃ বেড়াচ্ছে। নৃত্যপরা জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুলকিত হয়ে তারা মুখ ফিরিয়ে শ্রীয়া-মুখ চূষন করছে। হ'পারে এগোচ্ছে তারা হাতে

হাত দিয়ে, তার পর ধমকে ঝাড়িয়ে আবার চূষন করছে। সন্ধ্যা, আজকের রাত্রি আসল ভোগের মধু-লয়ই বুলি!

আজ তোমার চিঠি দেবার পরেই বৃষ্টি খেমে গিয়েছিল। কিন্তু এখনো বর্ষার বেশ কাটেনি। ঠাণ্ডা আছে মুহু মুহু। এক বোতল ভালো মদ কিনেছি পঁয়তাল্লিশ সেন্ট দিয়ে। রান্না-খরের জলের টবে সেটি ভুবিয়ে রেখেছি। সত্যি, কি যে সুন্দর আবহাওয়া এসেছে।

আমার চিঠি লিখো। বত পাগো তত। আমি জানি, আমার প্রত্যাশার তৃষ্ণা মেটানো কোন মানুষেরই সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি ত বুঝবে, ইংলেণ্ডে তুমি যে একাকীত্ব ভোগ করো, তার চেয়ে কত নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা বোধ করি আমি এই দূর প্রবাসে।

### গার্টুড বেলের পত্র

[আরব ও এশিয়া মাইনর অঞ্চলে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে শ্রীমতী বেল পৃথিবীর জ্ঞান-সমাজের জন্য অর্জন করেছিলেন। দুর্গম অঞ্চল অবধি তিনি তাঁর পথটনার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গেছেন এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েও পশ্চাৎপদ হননি কখনো। প্রাচ্য দেশগুলিকে তিনি ভাস-বেসেছিলেন গভীর ভাবে। যখন তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়, তখনো তিনি স্বদেশে ফিরতে সক্ষম হননি। বাগদাদের মিউজিয়াম তাঁর নিজের হাতে সজ্জিত বললে অত্যাশ্চর্য্য হয় না। সেই বাহুযের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অর্ধবৃত্তনিক ডিরেক্টর হিসাবে তিনি বাকী জীবন কাটিয়েছিলেন প্রিয় গবেষণা-কার্যে আত্মমগ্ন থেকে। যখন মারা যান, তাঁর ইচ্ছামুযায়ী শ্রীমতী বেলকে কবরস্থ করা হয় বাগদাদের মৃত্তিকাভাস্তরে।]

গত কাল সারা দিন প্রস্তাব-পথে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। দ্বিপ্রহরে একটি গিরি-শিখরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ আমরা দেখতে পেলাম। উটগুলিকে পাঠিয়ে, আমি একা দুর্গের সন্নী রেখে ম্যাপ আঁকে সমস্ত অঞ্চলটির ফটো তুলে নিলাম। মোটবাহী উটেরা সঙ্গে না থাকায়, আমাদের যথাসাধ্য সঙ্গে উটগুলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হোল। এখানে অনেকগুলি স্বর্ণা আছে। আর কি ফটিক-বছ তাদের জলধারা!

আজ সকালে আমরা কলর আজবাক এলাকায় এসে পৌঁছেছি। চারি পাশে পাম গাছের সারি আর মধ্যে মধ্যে স্বর্ণা-ধারা। উটগুলির তত্ত্বাবধানে সঙ্গে একটি মাত্র লোককে রেখে, আমি একাই গিরি-দুর্গেব দিকে যাত্রা করলাম। এখানে আরবরা বাস করে। দুর্গের বাইরে এক জন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হোলো। লোকটি পরম আতিথ্যের সঙ্গে আমার অভ্যর্থনা করলেন। কফি পান করতে দিলেন। সেইখানে বসে দুর্গের একটি ম্যাপ প্রস্তুত করতে লাগলাম আমি। কিন্তু কাজে বসতে না বসতেই এক দল আরব আমাকে ঘিরে তুহুল তাগুব সূত্র করল। তারা উচ্চ কণ্ঠে সম্মুখে আমার জানিয়ে দিলে যে, আমার নথিপত্রে যদি ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আমি এক আঁচড়ও টানি, তবে তারা আমার সমস্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে দেবে।

আমি তাদের আলির কাছে যেতে বললাম। আলি এখানে তিন বৎসর শিয়নের কাজ করেছে, সে আমার পথ-প্রদর্শক ও

একেট। পাখ বৃক্ষের নীচে বসে আমি নির্বিবাদে সিগারেট খেতে লাগলাম, আর আলি তাদের বোঝাতে লাগল। অনেকক্ষণ বোঝানোর পর আরবরা আমার সাহায্য করতে প্রতিক্রিয়া দিল।

আজ সারা দিন এখানে আমার কাজ করতে হবে। কালকেব দিনটিও যাবে এখানে। বসে বসে ভাবছি, এই দুর্গম অঞ্চলে এসে এত পরিশ্রমে কি সাফল্য আছে। কিন্তু কোন কিছু অসমাপ্ত ফেলে রাখা বিশেষতঃ যে সব এসাকায় আর ফিরে আসা সম্ভব নয়, আমার স্বভাব নয়, তা তুমি জানো। মনে হয়, নতুন এক গ্রীক লিপি আমি আবিষ্কার করেছি এখানে। কাল সেটিকে আমি মাজনা করে দেখব কি পাওয়া যায় তার মধ্যে।

এমনি করে আর একটি বসর গড়িয়ে গেল কাল-সন্ধ্যায়।

### দাস্তুর চিঠি

[ ১২১৫ খৃষ্টাব্দের কথা—দাস্তুর রাজনীতির পংকিল আরক্তে নিজেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। সম্মিলিত ইতালীর আদর্শ পূজারী দাস্তুরে যে দলভুক্ত ছিলেন, তাদের বলা হতে গিবেলিন। ওরা সানজার্বানী এবং এসো মূলমন্ত্র—ছোট ছোট ভূমিদারী ও সামন্ত রাজ্যগুলি একত্র গ্রথিত করে এক শক্ত বোম্ব সজ্জার অধীনে আনা। একতাবদ্ধ এক বিশাল রাজ্য—এক গীজার অধীন। এই ধর্মগাজা প্রতিষ্ঠাই ছিল দাস্তুরের স্বপ্ন। দুর্নীতি গিবেলিনরা যেমন চাইত সম্রাট হবেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র নিয়ামক, তেমনি প্রতিদলী প্যাপাল পাট্রিও সম্রাট দুর্নীতি গুয়লফা চাইত মহামায়া পোপ হবেন সর্ব ক্ষমতার অধিকারী—রাজা তবেন তাঁর অধুগত ভূত মাত্র।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে দলের নেতা সপ্তম তেনরীর মৃত্যুতে গিবেলিনরা অসহায় হয়ে পড়ে—প্রতিরোধ-ক্ষমতাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তার পর তিন বছর পরে নির্ধারিত গিবেলিনদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রচারিত হয়। দাস্তুর বন্ধুবা তখন দাস্তুরকে এই আদেশের শ্রবণে নেবার অসুযোগে কানান।

কিন্তু এই ক্ষমা ক্ষমাই নয়—যে সত্ৰ আবেগিত হয়েছিল, দাস্তুর মত গণিত অসুস্থমানী অভিমাত্রিক পক্ষে তা অত্যন্ত অপমানকর। যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন এবং গাধার টুপি মাথায় পরে অসুস্থদের দলে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা করে দেশে ফিরে চান তাহলে স্বদেশে ফিরে পাবেন। কিন্তু দাস্তুর আর যাচি কখন, এই তীনতা—এই অল্প অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। অপরিচিত বন্ধুবা ধীরে ধীরে এই প্রস্তাব মেনে নিতে সমর্থক অসুযোগে জানিহাঃগম, কানে নীরে স্থিরস্থির করে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন দাস্তুরে। ]

১৩১৬

সম্রাট ও প্রতিক্রিয়া চিত্রের কোমর পত্রে মর্ম গ্রহণ করেছি এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে পরবর্তী অবস্থিত কলাম যে, আমার ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে তুমি খুবই উৎকণ্ঠিত। এ অল্প অংশে কৃতজ্ঞতা আরো কৃতজ্ঞতা-পাশে আমার আরও কবেই এই অল্প যে, তবুই খটলেও নির্ধারিতেরও বন্ধু আছে, এ অবস্থা বড়

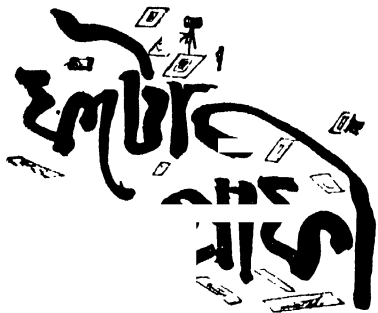
আনন্দেব। তোমার পত্রে উত্তর এই, বার দানের পূর্বে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত আমার অবস্থা যেন পরীক্ষা ও বিবেচনা করা হয় এই আমার একান্ত প্রার্থনা। জানি, আমার এই উত্তর হয়ত অনেক দুর্বল-চিত্তের আশাপ্রসূক হবে না।

তোমার ও আমার ভাগিনেয় এবং আরো অনেক বন্ধু-বান্ধবের পত্র থেকে এইটুকু সংগ্ৰহ করতে পেরেছি যে, নির্ধারিতদের ক্ষমা করা সম্বন্ধে সম্প্রতি ফ্লোরেন্সে এক আদেশ প্রচারিত হয়েছে। তার সত্ৰ-সাপেক্ষ আমিও মুক্তি পেতে পাবি এবং একুশি আমার প্রত্যাবর্তনের অমুমতি মিলতে পারে। সত্ৰ এই যে, আমাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে এবং প্রায়শ্চিত্তের অপমান মাথা পেতে নিতে হবে। সত্য কথা বলতে কি, প্রস্তাব দুইটি যেমন হাতকর তেমনি অববিবেচনাশ্রুত—অবিবেচনাশ্রুত তাঁদের পক্ষে ধারা এই প্রস্তাব জ্ঞাত করেছেন আমার। অবশ্য তোমার পত্র বিশেষ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সহিত লিখিত—তাতে এ বকম কোন ইঙ্গিত নেই।

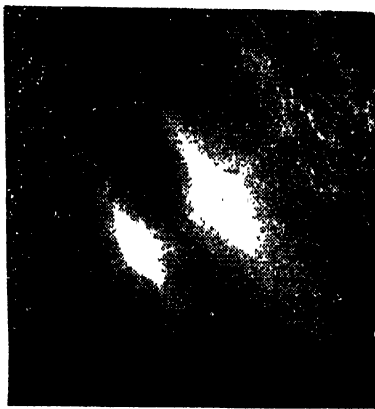
প্রায় পনের বছর নির্ধারিত-বেদনা সহ করার পর দাস্তুর আলিঘেরিকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার এই কি সাদর আহ্বান! এই কি নির্দোষিতা ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন-তপস্যার পুরস্কার! সিয়োলো ও অজ্ঞাত নরাদমবা যা করেছে—বন্দী করেদীর মত—এই প্রকার বহুতার যুগান্তে আত্মসমর্পণের নির্বোধ তীনতা স্বীকার—নৈব, নৈব চ। জায়ের প্রচারক যে এত নির্ধারিত ভোগ করেছে, সে দেবে অর্থদণ্ড তাদের—বাদরেই দ্বারা সে নির্ধারিত হয়েছিল—যেন এ তার কাছ থেকে জায্য পাওনা তাদের। তা হবে না।

এ সত্ৰ আমি আমার মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারব না! যদি তুমি প্রথম এবং অন্তরা আর কোন সত্ৰের সন্ধানে নিতে পার, এ সত্ৰে দাস্তুর যশ ও সম্মান বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না, সে-পথে নিশ্চিত আমার আকুল পদগুলি পড়বে। যদি এমন পথে ফ্লোরেন্সে ফেরা সম্ভব না হয়, আমি ফ্লোরেন্সে কখনই ফিরতে চাই না। কী! অল্প কোথাও কি আমি স্বর্ধ-তারার মুখ সন্দর্শন করতে পারব না! আমার দেশবাসীর চোখে অপমানিত, অসম্মানিত হয়ে ফ্লোরেন্সে না ফিরে কি অল্প কোন আকাশের নীচে সত্যের ধ্যান করতে পারব না! এমনশনে আমাকে নিশ্চিত কালাতিপাত করতে হবে না!

[ ফ্লোরেন্স থেকে এই প্রস্তাব আর কোন উত্তর আসেনি। প্রত্যাবর্তনের সত্ৰ মেনে না নেওয়ার দাস্তুর আর জীবনে কখনো ফিরে যাননি স্বদেশে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর লোরেন্সো দি ম্যাগনিফিসিমাস্ট কর্তৃক এই আদেশ নাকচ হয়। তাসকানির পুরানপনো ফ্লোরেন্সে নয় বাইজানটিয়ামে বিবাদ নগরী রাভেনাতে বসেই দাস্তুর সমাপ্ত করেন তাঁর 'The Divine Comedy'. সপ্তম তেনরীর মৃত্যুর পরই বইখানি লেখা শুরু হয়েছিল এবং কমেডীর আদর্শের সঙ্গে তাল রেখে 'প্যারাডাইস' বইটি ফ্লোরেন্সে বসে শেষ করতে পারলেই যেন মানাত সব দিক থেকে। কিন্তু তা তো হবার নয়। ছাপার বহু বয়সে যখন শনি চিরবিদায় নেন এ পৃথিবী থেকে, মর্তের মাপকাঠির বিচারে তিনি যেন নরকেই বন্দী ছিলেন। ]



—তড়িৎ পাল



—বমা মুগোপাধ্যায়



—বেবা ঘোষ

স্ব  
য্যো  
ক  
য়



—বিমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (প্রথম পুরস্কার)



কুমারিকা অন্তরীপে —বিমলেন্দু সরকার ( দ্বিতীয় পুরস্কার )



—মঞ্জুশ্রী মুখোপাধ্যায়

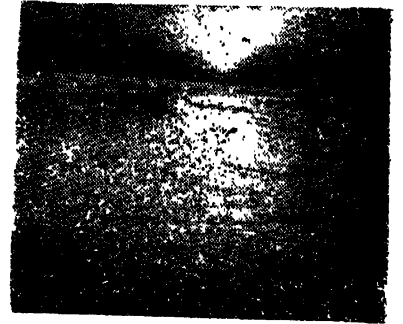


—হিমাংগু ঘোষ

যেঁ

দ

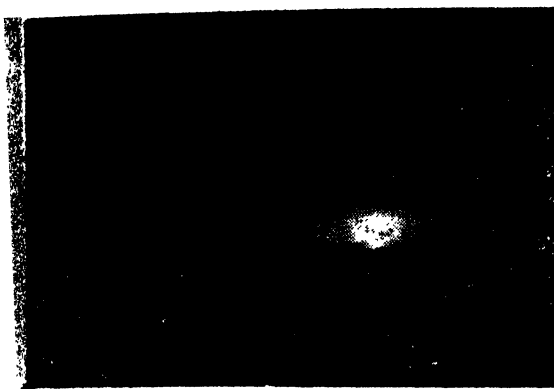
য়



—কিশলয় চৌধুরী

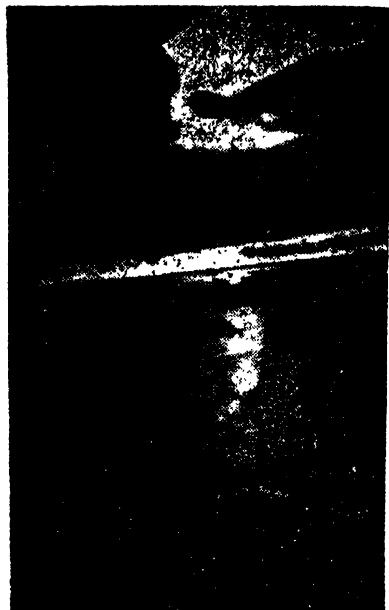


—অনিলকুমার বসু



টাইগার হিল থেকে

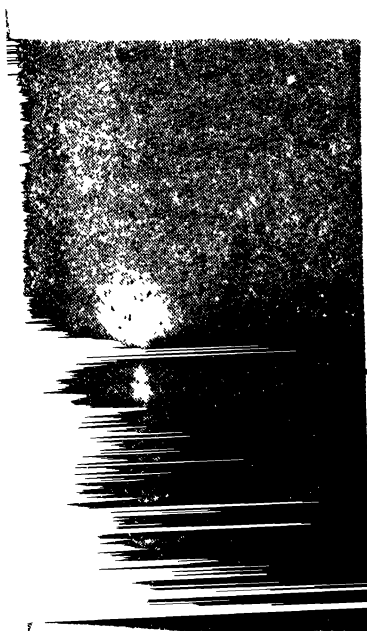
—মানস ঘোষ



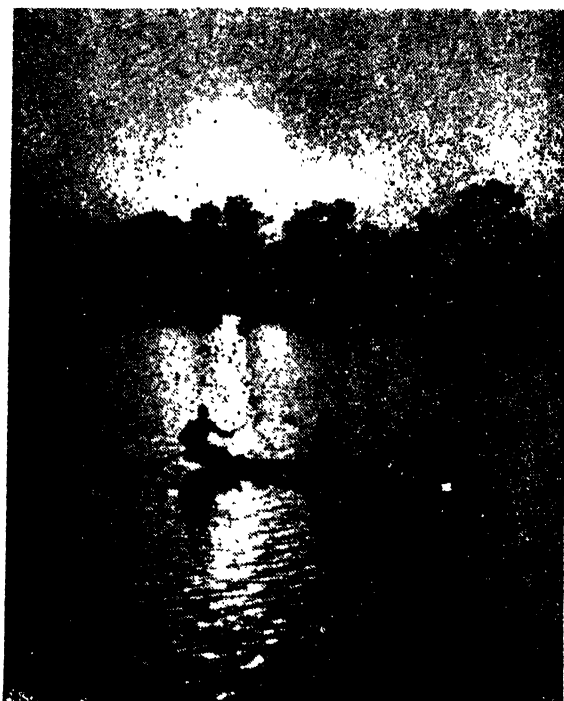
—অনীলচন্দ্র সরকার

“The sun  
rises in  
the East.”

সূ র্যো দ য়



—অজিত ভূষণাধ্যায়



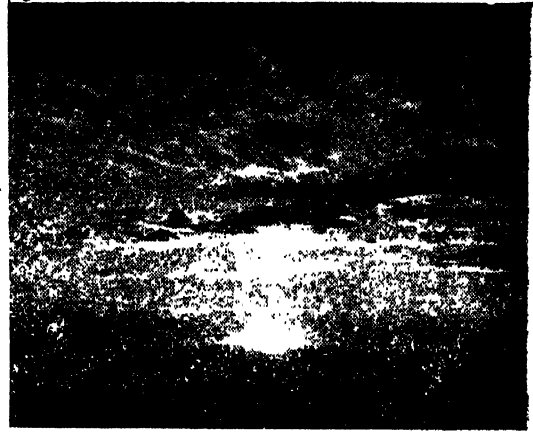
—মণীন্দ্রনাথ নন্দী



বিস্ফাটনে

—ববীন্দ্র নাগ ( তৃতীয় পুরস্কার )

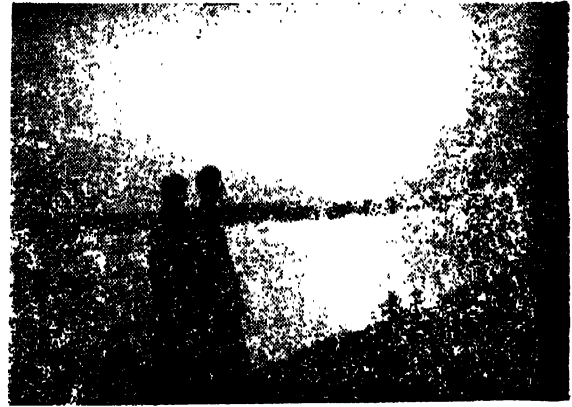
সু  
খ্যে  
দ  
য়



—দিলীপকুমার দাশগুপ্ত



—বীণা মুখোপাধ্যায়



—অমল কুমার



—হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

শিশু

ছবি পাঠানোর শেষ দিন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ  
প্রথম পুরস্কার—১৫, দ্বিতীয় পুরস্কার—১০,  
তৃতীয় পুরস্কার—৫

বাংলা সাহিত্যের সম্মানিত প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ

করেছিলেন কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৩৩ সালে “বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ” নামক প্রথম ভাষণে তিনি সাহিত্যাদ্যাপনার আদর্শ হিসাবে অধ্যাপক মর্লির কথা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেন। তখন কবির বয়স সাতেরো, বিলেত প্রবাস-কালে মাস তিনেকের জ্ঞান লগুন য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্র হয়ে মর্লির ক্লাসে তিনি যোগদান করেন, সেই সূত্রেই তাঁর শিক্ষাদান-রীতি ও অমুসরণ করবার সুযোগ পান। মর্লি আবৃত্তি করে যেতেন, তার থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ত পাঠ্যার্থে; ভাবার্থ। “সমস্তই এক দিন তিনি সমগ্র ভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনা-ব্যাখ্যা করতেন। তার পদাচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফ বিভাগ, শব্দ প্রয়োগের সূক্ষ্ম ক্রটি বা শোভনতা সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবাধ; তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেকনিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে” কবি স্মেনেছিলেন। উক্ত ভাষণেই কবি বলেছিলেন, “বয়স যদি পর্যবসিত-প্রায় না হোত, আর যদি আমার কতব্য হোত ক্লাসে সাহিত্য শিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ অমুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম।” সমগ্র বয়সে তাঁর আশ্রমের ক্লাসগুলিতে তাঁকে অধ্যাপনায় এই রীতিই অমুসরণ করতে দেখা গেছে,—এ সাধ্য তবনকাব অনেকেই দেবেন।

গুরু মলিকে ভালো লেগেছিল। একাদিক স্থলে কবি তাঁর কথা বলেছেন। কবির ছাত্রদের নিকটও কবি পবন প্রিয় ছিলেন। গুরুদেব বলেছেন কবিকে তাঁর ছাত্রেরা জানত তাদের বন্ধু বলে। চাঙ্গ-পরিহাসে গল্প গুজবে তিনি সময়ে-সময়েই এক জন হয়ে যেতেন। তাদের স্বাধীন মস্তকে স্মৃতি দিয়ে তিনি তাদের অকৃত্রিম মনকে কতখানি কাছে পেয়েছিলেন, প্রাপ্তন ছাত্রদের কাছে কিছু-কিছু তার গল্প শোনা যায়। তাদেরই এক জন প্রৌঢ়-প্রায় শ্রীযুক্ত শিবদাস দায় বর্তমানে শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। তিনি গল্পকালে বলেছিলেন,—“এক দিন বেথুনগুড়ে এসেছেন গুরুদেব। আমরা তাঁকে ঘিরে বসেছি, ছাত্রীও আছে দু’এক জন। গল্প চলেছে। কথা-কথায় মেয়েদের কথাও উঠল। বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা তখন খুবই কম। মেয়েদের বেশভূষা, চালচলন, স্বভাববৈশিষ্ট্য ও দৌলখের আলোচনা তুলনামূলক ভাবে দেশ-দেশ ধরে চলছিল। গুরুদেব নেপালী নরভূপ নামক ছাত্রটিকে দেখিয়ে বললেন, সকলেরই তো মত শোনা গেল, এবারে ভিন্ন প্রদেশবাসী এর কথা শোনা যাক। কী হে নরভূপ তুমি কী বল, কোন্ দেশের মেয়ের দেখতে সুশ্রী সব চেয়ে। নরভূপের পরিচয়ের মধ্যে একটু বিশেষণ আছে। পুরোনো আশ্রমের অনেক মজার গল্প আছে তাকে নিয়ে। আশ্রম-উপকণ্ঠে একাকী কুকরী দিয়ে বাঘ মাথা তার অস্ত্রতম একটি কীতি। সাহসের কাছে সে ছিল সবার আগে। তার সরল হৃদয়ভাব ও নিঃসংকোচ সপ্রতিভ আচরণের জন্ত সকলেই তাকে সমাদর করত। এই নরভূপ গুরুদেবের প্রশ্ন শুনে অবিলম্বে এবং অবলীলাক্রমে সোজা ছাত্রীদের এক জনকে দেখিয়ে বলে দিল, “বাউ বলুন, এই বাউলি মেয়েদের কাছে আর কেউ নয়।” গুরুদেব একটু হেসে সহজ ভাবেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তাঁর আলোচনায় ছাত্রদেরও তিনি এমন সহজ প্রবেশের স্বাধিকার দিয়ে রেখেছিলেন।

ছেলেদের সহজ নিমুক্ত মনই তিনি চাইতেন। পেয়েও ছিলেন তাই। সমবয়সীর কাছে যেমন ছেলেরা মনের কথা ভালো-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামার না, এখানেও ঘটেছে তাই, এই নিমুক্ততাই

# শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুগীচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

জানতেন কবি সকল মানসিক স্থানির প্রতিশোধক ও প্রতিবেদক বলে।

স্বপ্নমার অনেক বিষয় আছে, যায় চিন্তা বা আলোচনা অনেক সময় ছোটদের মধ্যে অস্বাভাবিক গোপন পথ নিয়ে অল্প মনোবৃত্তি ও দৃষ্ট স্বভাবের সৃষ্টি করে। সেগুলিকে সাধারণ ভাবের পথ দিয়ে এনে সহজ ভাবে আলোচনার বিষয় করলে প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যায় স্তিমিত হয়ে; যেমন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা-তত্ত্বের অন্তর্গত হয়ে মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সৃষ্টিক্রিয়ার কথাও সহজ ভাবেই চলে যেতে পারে,—মনে কোনো দাগ না রেখে। প্রতিক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। উপরের ঘটনাটিতে ছাত্রদের সঙ্গে কবির অন্তরঙ্গতা ছাড়াও একটি শিক্ষা-পরিবেশে কবির দিক থেকে বিজ্ঞানসম্মত এই শিক্ষা-প্রক্রিয়া অমুসরণেরও আভাস মেলে।

এই নরভূপেই আরেকটি গল্প। মণ্ডলীতে এক দিন একপ কথা-কথায় কী একটা হাঙ্গা মন্তব্য গুরুদেব করে ফেলেছেন, বাস্তব ভিত্তিতে যা একটু অসংগত। অমনি তাঁর এই স্পষ্টবাদী মুখ-ছাত্র গুরুদেবকে অতিক্রম করে বিনা দ্বিধায় বক্তৃতা-কটাক্ষ বলে উঠল,—“বাঃ গুরুদেব, বেশ,—বেশ বলেছেন! গুরুদেবের মুখের উপর এমনি জবাব শুনে আর সবাই তো হতবাক। ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন তখনকার ছাত্র-পরিচালক শিক্ষক সম্ভাব মজুমদার মহাশয়। তিনি যেমনি তাঁর অভ্যাস মতো মুখাণ্ডে অঙ্গুলি রেখে “হিস্” শব্দ উচ্চারণ দ্বারা ছাত্রটিকে সংবত ও নীরব থাকবার ইঙ্গিত করেছেন, গুরুদেব তা লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছেন; তিনিও অমনি বলে উঠলেন,—“ও কী, ওকে গুর কথা বলতে দাও। অমনি ক’রে ওদের বোবা বানাতে চাও না কি?”

১৯৩০ সনে লেখা কবির “রাশিয়ার চিঠি”-র অন্তর্গত ষষ্ঠ পত্রখানি এখানে উল্লেখযোগ্য। তাতে লিখছেন, “কত বার চেষ্টা করেছি আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতে, কিন্তু দেখতে পাই তাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। জানতে চাওয়ার সঙ্গে জানতে পাওয়ার-বে যোগ আছে, সে যোগ ওদের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো দিন জানতে চাইতে শেখেনি,—প্রথম থেকেই কেবলি বাধা নিয়মে ওদের জানিয়ে দেওয়া হয়, তাব পরে সেই শিক্ষিত বিজ্ঞান পুনরাবৃত্তি করে ওরা পরীক্ষার মাফি সংগ্রহ করে।” এ সঙ্গেই কবি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধি সে সময় মাত্র ফিরে এসেছেন দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার আগে কিছু দিন তিনি তাঁর এক দল ছাত্র নিয়ে বাস করছেন শান্তিনিকেতনে। সেই ছাত্রদের এক জনকে এক দিন কবি জিজ্ঞেস করেন, আশ্রমের অদূরবর্তী পারুল বনে সে বেড়াতে যেতে চায় কি না। ছাত্রটি বললে, “সে কথা আমি জানি নে, দলপতি জানেন।” নানা ব্যাপারে নানা সময়ে কবি নিজের ছাত্রদেরও মধ্যে কম হলেও কিছুটা ঐ রকমেরই মনের পরিচয় লক্ষ্য করেছিলেন। এই পরমুখাপেক্ষিতায় তিনি সন্তুষ্ট করেন, “কসারে এ রকম মনের মতো নিকপার মন আর হতে পারে না।”



মনের জড়তার প্রতিটি কবির সব চেয়ে বড়ো শিকার। জড় মন শিক্ষাকে ব্যাহত করে। জড় মনেই দেখা দেয় বুদ্ধির অভাব। কবি বলেন, “কৌতুহল থাকটাই যে জাগ্রত চিত্তের পরিচয়।” একদা আমেরিকা থেকে আশ্রমের জ্ঞান কবি একটি “বায়ুচল চক্রবর্ত্ত” (উইণ্ড, মিল) আনিয়েছিলেন। শান্তি-নিকেতনের বৃত্তো থেকে তার সাহায্যে জল তোলা হত। কিন্তু এই নতুন জিনিসটা সঞ্চয় ছাত্রমহলে উদাসীন লক্ষ্য ক’রে কবির “মনে বড়োই শিকার লাগল।” আশ্রমের বৈজ্ঞানিক আলোর কারখানা সঞ্চয়ও এই একই উদাসীন কবিকে ছাত্রদের মানসিক উৎকর্ষতা বিষয়ে হতাশ করে। তিনি বলেন, “বুদ্ধির জড়তা যেখানে, সেইখানেই কৌতুহল হ্রাস।” কৌতুহল হচ্ছে ছাত্রদের মানসিক প্রগতির প্রধান সহায়ক। কবির ইজিতমতে শিক্ষায় সঞ্চারিত এই জিনিসটা জাগিয়ে চলাই পরম আবশ্যক। “আশ্রমের শিক্ষা” (১৯৩৬) প্রবন্ধে কবি লিখেছেন : “নিরোৎসাহ্যই আন্তরিক নিজীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুই ‘পরে’ তাদের অপ্রতিহত উৎসাহ। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিন্তাশক্তি জয়ী হল সর্বত্র। ... প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের অব্যবহিত সম্পর্কলাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যারা চক্ষুমান, যারা সন্ধানী, যারা বিশ্বকুতুহলী, যাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জানে।”

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের দায়িত্ব-বোধও জাগানো চাই। তারা বড়ো হয়ে যেমন নিজের নিজের সংসারের ভার নেবে, তেমনি দেশের দেশের কাজের ভারও নিতে হবে তাদেরই। কবি সেই বড়ো দায়িত্ব-ভার সঞ্চয়ও ছাত্রদের যোগ্য শিক্ষার কথা বিশেষ ভাবেই ভেবেছেন। “রাশিয়ার চিঠি”র যষ্ঠ চিঠিখানিতেই উল্লিখিত আছে যে, তাঁর “আশ্রমের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকদের” অনেক বার এই কথাটি তিনি বলেছেন, যে,—“লোকচিত্ত এবং স্বায়ত্তশাসনের যে দায়িত্ব-বোধ আমরা সমস্ত দেশের কাছ থেকে দাবি ক’রে থাকি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যে তারই একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে চাই। এখানকার ব্যবস্থা ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবেত স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।”

আশ্রম একটি বড়ো সংসার; আবার বড়ো দেশের একটি ছোটো সঞ্চরণও তাকে বলা যেতে পারে তার নানাদেশীয় অধিবাসী ও বিচিত্র কর্মপ্রসার দিয়ে। “শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি একাধারে বিদ্যালয় এবং বহু জনের দ্বারা গঠিত একটি পরিবারময় গৃহ।” —মনোবিকাশের চন্দ্র, দেশ, কালিক ১৩৪৭। সর্বাঙ্গিক দিচ্ছেই এর শুভাশুভ হুঃখ-দৈব একে ছাত্রদের নিজের ক’রে ঘনিষ্ঠ ভাবে ভাবতে শেখাতে হবে, এবং তার মধ্য দিয়েই বহুর সঙ্গে মিলে বহুর জ্ঞান করার দায়িত্ব শিক্ষাও তাদের দেবার আছে, বহু পূর্বের রচনাতেও কবির এ ধরনের চিন্তার সূত্র পাওয়া যায়।

সতর বছর পূর্বে আশ্রমের আর্থিক দৈন্য নিয়ে এওজকে লেখা একবারি ইংরেজি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন,—“আমাদের

ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিটিও যেন জহুড়ব করে, আশ্রমের সব সমস্ত তার নিজেরই সমস্ত। ... আমাদের ঝাঝিছু হুঃখ-দৈব, এমন কি, ক্ষুদ্র শিশুটির কাছেও যেন আমরা তা গোপন না রাখি। আশ্রমের দায়িত্ব বহনে তাদেরও অংশ আছে, এ কথা মনে করেই তারা যাতে গৌরব বোধ করে, আমাদের তাই দেখা উচিত।”

বৃত্তিপারা শুরু হলে ছাত্রদের সঙ্গে দল বেঁধে গুরুদেব জলে ভিজতে বেরোতেন। চড়ুইভাতিতে সন্ধ্যা হতেন, আবার ঘর হলে ছাত্রদের নিজ হাতে দিতে কুইনি খাইয়ে। রাত জেগে করতেন সেবা। এ সব গল্প শিবদাস বাবুর মুখেই শোনা। শেষ দিকেও দেখা গেছে, ছেলেদের সকালবেলার লাইনে নিয়মিত “পঞ্চতিক্ত” খাওয়ানো বিষয়ে তাঁর যত্ন ছিল জাগ্রত। খেলাধুলায়ও তাদের সঙ্গে তাঁর মনের যোগ ছিল। মাঝে-মাঝে ফুটবল ম্যাচের দিন খেলার মাঠে এক পাশে দর্শকদের পেছনে দেখা দিত তাঁর মোটরখানি। “সর্বশ কাপ” জিতে ছেলেরা দল বেঁধে তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রসন্ন মনের প্রোৎসাহ নিয়ে আনন্দে মেতেছে। মেয়েরা অনিত রান্নাঘর থেকে নানা সময়ে তাদের তৈরি নানা খাবার। দোরগোড়ায় একে রেখে যেত আলপনা, বেধে যেত ফুল-পল্লব। তাদের রোগ-শোকে কবি যেমন থাকতেন উদ্বিগ্ন, তাদের সঙ্গে উৎসবে-জন্মঠান, নাচে-গানেও তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না।

সাধারণ লোকের ধারণায়, বৃষ্ট ছাত্রদের সংশোধনাগার ছিল শান্তিনিকেতন, আর ছিল যত সব মা-মরা বাপে-ভাড়া নো বড়ো লোকের ছেলের আশ্রম-স্থল। কবি এ নিয়ে রহস্যস্থলে গল্প করতেন। এর পেছনে সত্য কিছু না ছিল তা নয়, তবে কবির শিক্ষাবিধি এবং স্নেহ-সান্নিধ্যই ছিল হ্রস্ব ও নিঃসহায় ছাত্রের বাহুকরী সংশোধনের উপায় ও স্থানস্বর্ণ নির্ভর-স্থল। ছাত্রদের কটির থেকে শিক্ষকদের দায়িত্বই ছিল তাঁর কাছে বড়ো। বড়োদের বড়োই নিহিত রয়েছে ছোটদের অত্যাচার-সহনশীলতায় ও স্নেহে ধীর পরিচালনার মধ্যে,—এটাই কবির কাছে পাওয়া শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের শিক্ষকতার প্রথম পাঠ।

গুরুদেব ছাত্রদের ভালোবাসতেন, তেমনি তাদের জড়তা-মুক্তকোণে করতেন কল্যাণ। তাঁর শাসন ছিল মায়ের মতো। তিনি যে লিখেছেন,—“শাসন করা তারেই সঙ্গে সাহায্য করে যে গো”,—তাঁর শিক্ষাবিধি ছিল সেই সত্যটিরই পরিণামক।

কবির কাছে অহরহ অভিযোগ আসত আশ্রমের রান্নাঘরের অল্পপাত্রগুলির তলা ক্ষয়ে-বাওয়া নিয়ে। স্বদীর্ঘ পাক্তিভোজনের বেলা অনবরত টানটানি ক’রে ব্যবহার করায় মেঝের শানের সঙ্গে ঘষায়-ঘষায় এই ব্যাপারটা ঘটত। কবি এই ঘটনা উপলক্ষ্য ক’রে সকলের বুদ্ধি-প্রয়োগের শৈথিল্য ও কমতৎপরতার জটিল নিয়ে যথেষ্ট কটাক্ষ করেছেন। বলেছেন, একটু তৎপর হয়ে মাথা খাটালেই বিড়ের মতো কিছু একটা শক্ত জিনিসের উপর পাত্রগুলি বসিয়ে নিয়ে ব্যবহার করবার কার্যকরী উপায় মিলত। কিন্তু উত্তোঙ্গ হয়ে প্রতিকার করবার উত্তমেরই ছিল অভাব।

ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার সম্পর্কে দেহের স্বাস্থ্য এবং তার সঙ্গে চিন্তাদর্শ সম্পর্কে মানসিক স্বাস্থ্য সঞ্চয়ও কবি কতখানি গভীর ভাবে ভাবতেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় আশ্রমবাসী এওজকে

লেখা তাঁর একখানি ইংরেজি পত্র। পত্রখানি সংকলিত হয়েছে কবির "Letters to a friend" নামক ইংরেজি গ্রন্থে। আশ্রমের ছাত্রেরা এক সময়ে তাদের দৈনিক বরাহ খাবার থেকে যে ও চিনি বাদ দিয়ে তার উদ্বৃত্ত অর্থে একটি দরিদ্র-সেবাস্থাপন খোলে। কবি বাইরে ছিলেন, 'মডার্ন রিভিউ' মার্কে সে খবর পান। আশ্রা থেকে অমনি এতুজকে লিখছেন,—“ছেলোরা এই যে কাণ্ডটা করেছে, এটা নিশ্চিত স্বাধীন বৃত্তিতে নয়,—পরামুখরণে, তোমাদের দেশের ছেলেদের দেখাদেখি। দ্বিতীয়ত, তোমাদের দেশে যেটা চলে, এখানে সেটা চলে না। ইংলণ্ডে চিনির পরিবর্তে আছে মাংস ও চবিজাতীয় আরো সব জিনিস। এ দেশে ছেলেদের খাবারে পুষ্টিকর অংশ এমনিতেই মিলে কম। পড়ার বই যেমন তারা বর্জন করতে পারে না, এই খাদ্যাংশও তেমনি,—এই দরকারী সেটা তাদের স্বাস্থ্যের জ্ঞাত। দরিদ্র-ভাণ্ডারে পরসী দিতে চায় ভাল কথা, কিন্তু তার পথ অস্বাভাবিক নয়; তারা আত্মত্যাগের একটা কিছু কাজ যদি চায় তো, আশ্রমের জল-তোলা, বাসন-মাজা, ফা-বোঁড়া, স্বাস্থ্যের প্রতিপালন-স্বরূপ ঐ গর্তগুলি বোজানো ইত্যাদি দৈনিক খাটনি কিছু কিছু করুক না,—তাতে ভাগ্যে কিছু যেমন ক্ষমতে পারবে, তেমনি দিতে পারবে তাদের সন্ততারও পরিচয়। পরামুখরণ না করে, আরো এমন নিজে নিজে কী কাজ উদ্ভাবন করতে পারে তাই তারা যেন ভেবে দেখে।” (১৯১৪)

যে আহ্বানের বিষয় নিয়ে এতখানি, সেই “আহ্বানের রুচি ও মধ্যম দৃষ্টান্তে...কদাচার” নিয়ে আবার তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিদর্শনতাকে দায়ী করতে ছাড়েননি, গোটা বাংলা দেশই তাঁর নেকট এ অপরাধে অপরাধী। বলেছেন,—“পাকশালা এবং পাক-ত্বকে অনাবশ্যক আমরা ভারগ্রস্ত করে তুলেছি।...আমাদের প্রতিদিনের খাওয়া স্বাস্থ্যে আমাদের সমস্ত দেশের কাছে দায়িত্ব আছে এবং সে দায়িত্ব অতি গুরুতর—সম্পূর্ণ উপলব্ধির সঙ্গে এটাকে মনে রাখা পাশের মার্কার চেয়ে অনেক বড়ো।”

পূর্বোক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা থেকে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় গতে দেখা যাচ্ছে, প্রণালী নয়, মানুষ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ক্ষমতে বড়ো জিনিস। এক দীপ-শিখার থেকে যেমন আরেক দীপশিখা জ্বালানো হয়, তেমনি এক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কে জাগবে আরেক মানুষের ব্যক্তিত্ব। জ্ঞানের যোগে জাগবে জ্ঞান। তখন হাতের স্বভাব ও গ্রহণশক্তির যোগ্যতা পরিমাণ বুঝে দিতে হবে তাকে বিষয়ের পাঠ। দেহ ও মনে বৃত্তির স্বাধীন উদ্বেগ, বাহ্যিক আসবাব-জ্ঞাতা থেকে আন্তরিক সম্পদের মূল্যবোধ, বিশ্বের সর্বলোক-সমাজের দ্বা থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহ এবং সকলের প্রতি মৈত্রী থেকে সকলের সেবার কাজে স্বাধীন উদ্যোগী থাকা, বলিষ্ঠ উদার এই আদর্শের লক্ষ্যেই চলেছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনা।

শিক্ষাক্ষেত্রে কবির পথের বাক স্পষ্ট। ক্লাসের হীট-কাঠের বড়ো ছেড়ে তিনি শিক্ষাকে নিয়ে গেছেন উন্মুক্ত প্রান্তরে, গাছের স্লাম, প্রকৃতির কোড়ে। অথচ শহরের বিচিত্র মানব-কর্মোত্তোগের সম্পর্ক থেকে তা একেবারে বিবর্তিত নয়। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বসে-বসে পঠন-পাঠনের শিক্ষার চেয়ে শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবনে বেশি কালের হয়ে ওঠে সেই শিক্ষাটুকুই, যার হাওয়া আশ্রমের প্রতিদিনের জীবনের চলাফেরার মধ্য থেকে এসে নিয়তই লাগে।

এখানকার শিক্ষা পুঁথিগত ততটা নয়, যতটা পরিবেশগত। এ জন্ত পরিবেশকে কাঁদশাহুবাঘী পরিমণ্ডিত রাখাও বড়ো পথের তৎপরতা বেশি। সেই পরিবেশে যরও যেমন আছে, তেমনি তার গতি ছাড়িয়ে বাইরের যোগও আছে সমভাবেই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ যেমন সম্প্রদায়ের গতিমুখ, তেমনি মুক্ত তা প্রণালীর স্বদেশী বিদেশী সংস্কার থেকে। শিক্ষাক্ষেত্রে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে যে পরীক্ষণ চলেছে তার প্রতি মুক্তসজাগ মনে কবি ছিলেন সত্যতঃ সজাগ। তাঁর আশ্রমের মুখপত্র পুণ্যনো কালের “শান্তিনিকেতন পত্রিকা”তে নিয়মিত ভাবে এই সর্বদেশীয় শিক্ষার প্রতি আলোচিত হত। স্বরাজ-স্বাধীন প্রণালী মাঝেই কবি হাতে-কলমে নিজের বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখার জন্ত সরা সচেষ্ট থাকতেন এবং তার প্রয়োগক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ক্ষমকৃতি-ভরমুক্ত! এ জন্ত প্রথমে দেশীয় আধুনিক স্কুল-কলেজের ধারা ছেড়ে ঐতিহ্যগত ব্রহ্মচর্যশ্রমের পথে গিয়েও, আবার শেষটায় নিলেন তাঁর বিশ্বভারতীয় পথ। দেখানে প্রণালী বলতে বাধ্যধরা গতানুগতিক একান্ত একটা-কিছু নেই, বিশ্ব আছে, আছে ভারতও। তাঁর আয়োজন ছিল বিচিত্র; তাঁর বেগবতী প্রেরণা ছিল বহুমুখী। যে ক’দিন বেঁচেছিলেন, তাঁর মধ্যেই অদ্ভুত স্বাভাবিক-বলে সব দিকেই জীবনের অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়েছেন; কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত পথ সকল দিকে এখনো সকলের জন্য ততটা ফলদায়ক হয়ে দাঁড়ায়নি। সেই দাঁড় করাবার ভারটা রয়েছে ভবিষ্যৎ-বংশীহরের হাতে।

জীবনের সর্গজনক বিকাশের চিন্তায় ও চেষ্টায় গড়া কর্মবিভাগ-বহুল তাঁর আশ্রম “শান্তিনিকেতন”। সেখানে যারা রবীন্দ্রনাথেরই স্বভাবের আঁচে মানুষ, অর্থাৎ শক্তিসাধনার সহজ আগ্রহ নিয়ে যারা জন্মেছেন, ফাঁকি দেওয়া বা পল্লবপ্রাচিত্য বাদের ঘণার বস্তু, সেই ধরণের খাটি নিষ্ঠাবান স্বভাবগুণীরাই বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে একটা-নয়-একটা কোথাও মনোমত ক্ষেত্রে পেতে পারেন শান্তিনিকেতনে, যেটা সচরাচর অজুত ফলপ্রসূ।

হাতে ধরে ছাত্রকে বসিয়ে কিছু করিয়ে নেবার তাগিদ এখানে অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার পথ বাধ্যবাধকতা বা শাস্তির পথ নয়, তা হচ্ছে পরিবেশের থেকে উৎসাহ পাওয়ার পথ, স্বভাবজাত গুণ-বিকাশের সাহায্যকারী পথ।

হাতে-লেখা পত্রিকা, সাহিত্য-সভা, গানের জলসা, চিত্র-প্রদর্শনী, দৌড়-কাঁপাও খেলার প্রতিযোগিতা, ছাত্রদের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, দরিদ্রভাণ্ডার, লোকসেবা ও স্বাধীনতা আদর্শের অভিনন্দন-মূলক নানা সাময়িক অনুষ্ঠান,—এগুলি শান্তিনিকেতনের দ্বিগুণকৈ বিচিত্র রূপ-রস-জীবনপ্রবাহে ভরে নিয়ে বয়ে চলেছে। এর মধ্যে মানুষ আপনা থেকেই জন্মভব করে কিছু সৃষ্টি অথবা সমজ্ঞারিতার তাগিদ। দেখতে দেখতে গড়ে ওঠে এক-এক জনের মধ্যে দিয়ে এক-একটি শক্তি বা প্রেরণা। ক্লাসের পড়ানোর চেয়ে সেটা গড়ে ওঠে আবহাওয়ার গুণেই বেশি।

নেট-সার-করা যুগে ‘বই পড়া’র উপরেই এখন আমাদের চাত্রমহলে পাশ করা নির্ভর করে। অনেক স্থলে এ-ব্যাপারের মূলে আমাদের বড়রাই; ‘তাহা’ কতকগুলো বই ও কতকগুলো বিষয়

বাঁধিয়া দেন—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়, ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়।” ১৩১৩ সনের “আবরণ” প্রাক্কর পরিশেষে কবি এই প্রণালীর কুফল আলোচনা করেন। তাঁর মতে,—“বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এত অন্ধসম্মার ঘেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আচরিত হইয়াছে, অন্ততঃ হওয়া উচিত এবং সেখানে আমাদেরও অধিকার আছে, একথা পক্ষে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌপাখ্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এদেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও তাপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় না। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতির নহে মনেও মথোই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপাশিখা হইতে আর-এক দীপাশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পত্রের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে—তাহারা গুরুর কাছে যাঁতা শিখিবে, তাহাদের নিজেই দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ।... বালক অল্পমাত্রও গোটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ত চাপিয়া বসিবে।”

এখানকার শিক্ষার দৃষ্টিতে কঠিন, এর সার্থকতাও সেই কারণেই সাধারণের কাছে সম্পূর্ণ হোতে সময়ের অপেক্ষা করে। শিল্পী পাবেন—কলাভবন; জ্ঞানী পাবেন—শিক্ষাভবন, বিজ্ঞাভবন, চিন্তাভবন, হিসাবভবন; ধর্মী পাবেন—সম্রাট ভবন; কর্মী পাবেন—শ্রীমন্তেন; শিশু পাবে—শিশুবিভাগ, মেয়েদের আছে শ্রীভবন, আর এঁদের সকলেই পাবেন এর গ্রন্থভবন, এর ক্রীড়াকৌতুক, আনন্দের উৎস উৎসবগুলি; সম্প্রতি বাইরে থেকে সাধারণেরও এর সংস্রব পাবার ছাঁট পথ খুলেছে, একটি লোকশিক্ষা সংসদে, অল্পটি “বিশ্বভারতী পত্রিকা” থেকে। গ্রন্থনবিভাগের পথটি অবশ্য বহু-বিস্তৃত ও বহুকালের।

যিনি শাস্তিনিকেতনের যেখানেই থাকুন, অল্পের মধ্যে জটিল বৃহৎ সংসদারের আঁচটাও পাবেন নানা লোকের প্রাত্যহিক মেলা-মেলায়। এতে বিখ্যাত প্রবাহময় বড়ো জীবনের অল্পভবের মধ্যে সব সময়েই নিজের ক্ষুদ্র জীবনের গণ্ডিবদ্ধতাকে মুক্তি দেবার যেমন সুযোগ মিলবে, তার উল্টোটাও ঘটা কিছু বিচিত্র নয়, অর্থাৎ অসমর্থের পক্ষে আত্মসংকোচে সব সময়ে অস্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুদ্র হয়ে চলাও ঘটতে পারে স্বভাবতই।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পথ এই জগ্জেই সাধারণের পক্ষে দুর্গম। তিনি তো আয়োজন করেই গেছেন, কাজে লাগাতে পারে তা ক’জন? তাঁর সঙ্গে পা ফেলে চলা সকলের কর্ম নয়।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া ছাত্র-জীবনের পক্ষে বিয়কর বলেই কবি বরাবর দেখেছেন, ‘অসহযোগ আন্দোলন’ের সময়কার লেখাগুলি থেকে তা বোঝা যায়। ১৯২১ সনের ৪ই মার্চ চিকাগো থেকে এগু জকে লেখা একখানি পত্রে লিখছেন,—বাংলার স্বদেশী

আন্দোলনের সময় এক দল যুবক ছাত্র জোড়াসাঁকোর ‘বিচিত্রা’ গৃহের একতলায় কবির সামনে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে তাদের ‘স্বল-কল্জে’ বঙ্গবীরের আদেশ দিতে বলে। বলেই তাঁরা একযোগে তাঁর আদেশ পালন করবে, এই ফলস্রু উৎসাহের খরস্রোতের মুখে কবি তাদের বিমুগ্ধ করেন অস্বাভাব্যভাবে তাঁর অসম্মতি জানিয়ে। তারা কবিঃ দেশাত্মবোধ সন্দেহ করে ফিরে যায়। কবি বলেন, “তখন আমার স্বল বলতে পাঁচটি টাকাও হাতে নেই, অথচ কেউ জানিত না যে, ঠিক তখনই হাজার টাকা দিয়েছিলাম স্বদেশী একটি দোকানের পিছে। তাতে শেষটা দেউলিয়াও বসতে হয়।” কবি ঐ চিঠিতেই বলেন, আশ্রমের ছাত্রেরা তাঁর কাছে প্রতিলেকা মাত্র নয়। তাদের জীবন সকলের ও তাদের নিজস্বের পক্ষে একটা বড় জিনিস! কিছু না ব’রে পাততাড়ি শুটিয়ে বসে থাক। যদি সাময়িক ভাবেও হয়, সে যে-কারণেই হোক, তাকে কবি ব্যস্তির বালিশান ব’লে মনে করেন, জগত ভরে মোতের মুখোপপা নানা আশ্রমের নামে এই বালিশানই নিত্য চলছে। ছেলেদের কিছু-না-কিছু শিখতেই হবে, শেখার কাজের মধ্যে ছেলেদের নিয়ে নিয়ত রত থাকতে হবে,—এই বিপুল দায়িত্ব-বোধ সবারকিছুর উপরে বেবে কবি বলেছেন, “আমি আমার পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে থাকতে চাই, আশ্রমপাশের এই সহচর প্রাণীগুলিকে আমি ভালোবাসি, এদের ভালোবাসাই আমার সব। তাদের শিক্ষার ক্ষতি কিছুতেই স্বীকার নয়।” (Letters to a friend. P. 129—133)

স্বদেশে ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্র-স্বাধীনতার আন্দোলনের আবহাওয়ায় মগোই কবির শেষ দিনগুলি কেটেছে। শাস্তিনিকেতনের ছাত্র ও কর্মী অনেকে সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, কতক বাইরে গিয়ে, কতক ভিতরে থেকে। যারা বাইরে গেছে, তারা নানা কাজে কাব্যবরণও করেছে, যারা ভিতরে ছিল তারা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার, কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ এবং আনুষ্ঠানিক সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রেরণার দিকটি অগ্রবাহনেই নিয়েছে বেশি নিয়োজিত। বাইরে-বাওয়া ছাত্র ও কর্মীগণ আন্দোলনের ভাঁটার মুখে আবাহন যখন তাদের স্থগিত পাঠ বা কাজ নিয়ে বাশ্রমে যোগ দিতে এসেছে, তারা সাধারণের পেয়েছে স্থান। বাধা ছিল শুধু আশ্রমে যোগ রেখে সংগ্রামমূলক প্রত্যক্ষ আন্দোলন চালানোতে। পাঠে নিরত শৃঙ্খলাবদ্ধ ছাত্র-জীবনের কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়, সেই দিকে ছিল সর্বদা কবির সতর্ক লক্ষ্য। লোক-সমাগম ও আনন্দ-আজ্ঞাদের আকর্ষণে নানা গোলযোগের আশঙ্কা ক’রেই শাস্তিনিকেতনের অনতিদূরে রেলগড়ের ফ্লাগ-শৈলন স্থাপন বা সিনেমা-ঘর তুংতে দিতে তাঁর আপত্তি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে ছাত্র ছাত্রদের নিয়ে আশ্রমের বাহিরে উৎসব এই পৌষের মেলায় সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। আনন্দ-আজ্ঞাদ তিনিও চাইতেন, রাষ্ট্র-আন্দোলনের আবশ্যকতাও তিনি বুঝতেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিছু ব্যক্তিগত যোগ, সহায়ত্বও তাঁর ছিল। কিন্তু তিনি কাজ নিয়েছিলেন শিক্ষার। তার বিয়কর বিষয় তাঁর কাছে উৎসাহ পায়নি, একথাও সত্য।

শিক্ষার বিষয়কারী ছাত্র-নির্ধাতক গুপ্ত পুলিশবাহন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী শাসনের প্রতি কবির ঘৃণা ও বিচার প্রকাশের ঘটনাও নিত্যন্ত বিরল নয়। “কালান্তর” গ্রন্থের অন্তর্গত ‘ছোট ও বড়’ প্রবন্ধে

লিখছেন : “দেশের সমস্ত বালক ও যুবককে আজ পুলিশের গুলন্দলনের হাতে নিবিচারে ছাড়িয়া দেওয়া—এ কেমনতরো রাষ্ট্রনীতি ! এ যে পাশকে হীনতাকে রাক্ষসেরাধার তকমা পরাইয়া দেওয়া । এ যেন রাত দুপুরে কাঁচা ফসলের খেতে মহিষের পাল ছাড়িয়া দেওয়া ।...আমি একটি ছেলেকে নিজে জানি, তার যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিত্তা, যেমনি চরিত্র ; পুলিশের হাত হইতে সে বিক্ষত হইয়া বাহির হইল বটে, কিন্তু আজ সে তরুণ বয়সে উদ্ভাস হইয়া বহরমপুর পাগলা-গারদে জীবন কাটাতেছে ।...পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক । কিছু কাল পূর্বে শান্তিনিকেতনের ছেলেরা বীরভূমে জেলাফিল্ডে পরীক্ষা দিতে গেলে পুলিশের লোক আর-কিছুই না করিয়া কেবল মাত্র তাহাদের নাম টুকিয়া লইত । আর-বেশি কিছু করিবার দরকার নাই । উহাদের নিখাস লাগিলেই কাঁচা প্রাণের অঙ্গুর শুকাইতে শুরু করে । উহাদের খাতা যে গুলি খাতা, উহাদের চাল যে গুলি চাল । সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিশে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না । এমন কি, যে মরিয়া-মানুষকে বুদ্ধি ক্রম দরিদ্র কুশী কুচরিত্র কেহই পিছু হঠাইতে পারে না, বাংলা দেশের সেই কল্যাণদায়ক বাপও তার কাছে ঘটক পাঠাইতে ভয় করে । সে দোকান করিতে গেলে তার দোকান চলে না, সে ভিক্ষা চাহিলে তাহাকে দয়া করিতে পারি কিন্তু দান করিতে বিপদ গণি । দেশের কোনো হিতকর্মে তাহাকে লাগাইলে সে কর্ম নষ্ট হইবে ।” এই প্রবন্ধেই আর একটি ঘটনারও উল্লেখ আছে । “আমাদের আশ্রমে দুটি ছোটো ছেলে আছে । তাদের অভিভাবকদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল । বরাবর তারা এখানে থাকিবার খরচ চোগাইয়াছে । কিছুকাল হইল তাদের পরিবারের তিনজন পুরুষের একসঙ্গে অন্তরায় হইয়াছে । এখন আশ্রমবাসের খরচ জোগানো ছেলে দুটির পক্ষে অসম্ভব, আশ্রমে তাদের শিক্ষা ও আহাৰাদির ভার এখন আশ্রমকেই লইতে হইল । এই ছেলে দুটি কেবল যে নিজের গ্লানি বহিতেছে তা নয়, তাদের মায়ের যে দুঃখ কত তা তারা জানে । যে ব্যাধায় অভাবে ও নিরানন্দে তাদের ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে তা তাদের অগোচর নাই । বাপকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, মা ব্যাকুল হইয়া চেষ্টা করিতেছেন যাতে তাঁকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী রাখা হয়, এই সমস্ত দুশ্চিন্তার দুঃখ এই শিশু দুটিকেও লীড়া দিতেছে । এ সম্বন্ধে ছেলে দুটির মুখে একটি শব্দ নাই, আমরাও কিছু বলি না—কিন্তু এই ছেলেরা যখন সামনে থাকে তখন ধৈর্যের কথা, প্রেমের কথা, নিত্যধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা, সর্বমানবের ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলিতে আমার কুষ্ঠা বোধ হয়, তখন সেই সকল লোকের বিজ্ঞপ-হাতকুটিল মুখ আমার মনে পড়ে যাঁরা পাক্সার লাটের মতোই সাংঘাতিকতার অতিশৈত্যকে পরিহাস করেন । এমনি করিয়া রিপূর সহিত রিপূর চক্রমকি ঠোকায় আগুন জ্বলিতেছে ; এমনি করিয়া বাংলা দেশের প্রদেশে প্রদেশে দুঃখ আতঙ্কে মানুষ বাহিরের খেদকে অন্তরের নিত্য-ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতেছে । শাসনকর্তার অদৃষ্ট মেঘের ভিতর হইতে হঠাৎ সংসারের মাঝখানে যে বোমাগুলি আসিয়া পড়িতেছে তাহাতে মরিতেছে বিশ্বর অনাথা রমণী এবং অসহায় শিশু । ইহাদিগকে কি non-combatento বলিবে না ।” ( ১৩২৪ )

কবির মৃত্যুর বছর পাঁচ-ছয় আগে একবার বোলপুর ডাক-বালার মাঠে ব্রিটিশ সরকারের সৈন্ত-ছাউনি পড়ে । সৈন্তরা সাধারণকে কুচকাওয়াজ ও খেলা দেখাবে । পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল তার, মফস্বলে আতঙ্ক ধরিয়ে দিয়ে সরকার-বিরোধী কার্য থেকে জনসাধারণকে দূরে রাখা । দলভেদমর্শন এই সৈন্তসমারোহ ও ক্রীড়াকৌতুকের প্রতি সাধারণের মতো ছেলে-মহলে স্বভাবতই ব্যর্থতা জাগে অত্যধিক । এদিকে যেমন আশ্রমে যথেষ্ট-বিচরণশীল সরকারী চরের প্রাচুর্য্য ছিল অসংখ্য, বাইরে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং পথচারীদের উপরও ফোঁজী জুলুম ও বাণ-নিষেধ চলছিল তেমনি মাত্রা ছাড়িয়ে বেরোয়া রকমে । কবির উপস্থিতিতেও একরূপ উপেক্ষা ক’রেই অসংখ্য আসছিল আশ্রমে ফরমানের পর ফরমান । এই অত্যাচারের কথা নিয়ে উদ্বর্তন মহলে লেখালেখি করতে কবির মনে ঘুণা জাগল । কাউকে কিছু না বলে, বর্জন করলেন তিনি সেই ফৌজী-উৎসব । একটি ছেলেকেও যেতে দিলেন না সেখানে । ব্যাপার বুঝে দলের কান্তন মেজর সাহেব সাহুচর আশ্রমে এসে কবির কাছে ক্রটি স্বীকার করে যান ।

অনেকবারই আশ্রমে অনেক লাটি বড়লাটি এসেছেন । এ সম্বন্ধে একবার আশ্রমের শিক্ষক জগদানন্দ রায়কে কবি লিখছেন,— “আমাদের আশ্রমে রাক্ষসপুত্রদের গতিবিধি হতে চলল সেজন্য মাঝে-মাঝে মন উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু এ কথাও ভাবি যে আশ্রমের রক্ষা-ভার ঝাঁর উপরে আছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে । এর থেকে যদি কিছু ফল হয় সে ভাল ফলই হবে । কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার—এদের কারো মন জাগাবার ইচ্ছা যেন আমাদের প্রলুব্ধ না করে—আমরা যেন কোনো রকম হৃদ্যবেশ ধারণ করবার আয়োজন না করি । আমাদের ভাবে আমাদের কাজ আমরা করে যাব, তাতে যদি আপনাই কারো ভাল লাগে ত ভালই যদি না লাগে ত ক্ষতি নেই । কিন্তু তোমরা নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে যেন লেশমাত্র সন্দেহান হোয়ো না ।”—( বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪১, পৃঃ ২১১ ) লাটদের আসার আগে ১৫২০ দিন এমন কি মাসাধিক কাল আগ থেকেই আশ্রমে গোয়েন্দার দলের আমদানী হত । হঠাৎ দেখা যেত শান্তিনিকেতনে যেন বিশেষ কতকগুলি লোকের কাছে কয়েক দিনের জগতীর্থ হয়ে উঠেছে ; অনা-গোনা লেগেই রয়েছে অষ্টপ্রহর । মোলায়েম ভাবার আইন-জারী হত,—লাটদের আশ্রমে অবস্থিতি-কাল আশ্রমবাসীদের থাকতে হবে ঘরে বন্ধ হয়ে । তারা পথে বেরতে পারে না । কবি অবশেষে একবার বিক্ষুব্ধ হয়ে লাটের শুভাগমন দিনটিতে পাঠিয়ে দিলেন আশ্রমিকদের দূরবর্তী জীনিকেতনে । লাটসাহেব দেখে গেলেন শূন্য আশ্রম, অভ্যর্থনাও পেলেন তেমনি । কবির কথা ছিল, আশ্রমে আসবেন লাট, সে আসা কি হবে আশ্রমবাসীকে অপমান ক’রে ? এই যদি হয় ওদের ভজ্ঞতা, তবে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, এরাই আর-একটুকু বেশি আচরণে আপনা থেকে ঝাঁড়ায় গিয়ে ভজ্ঞতার যে স্মৃতির নয়না ! বলা বাহুল্য, এর পর থেকে বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি হল শিথিল, ভরপুর আশ্রমেই সকলের সুস্থস্থল উপস্থিতির মধ্যে চারি দিকে ঘুর বেড়িয়ে গেলেন পরবর্তী রাক্ষসপুত্র ।

ব্রিটিশের মার্ক-পাশ্চাত্যের শিক্ষার মিলনই কবি যেটুকু চেয়েছেন, চাননি ব্রিটিশের শাসন । আবার এ-ও সত্য, ব্রিটিশের আমলাতন্ত্র

দস্ত, আর তার কৃত অপমানকর শাসনকেই কবি বাক্যে কাজে নানা ভাবে বাধা দিয়েছেন, কিন্তু সে বাধা তার জাতি বা তার মানুষকে নয়; আশ্রমে সকল মানুষের যোগই তাঁর কাম্য ছিল।

১৯১৩ সনের ১১ অক্টোবর কলকাতা থেকে এশুজকেই লিখেছিলেন,—“ভারতবর্ষে আমাদের জীবনের পরিধি সংকীর্ণ ও অসংলগ্ন। এই ক্ষুদ্র জগতের মন এত প্রাদেশিকতার ভাবে বিভক্ত। আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে ছাত্রদের ভিতর যতদূর সম্ভব প্রেমার দৃষ্টি এবং বিশ্বমানবিক প্রীতি ও ঐক্যবৃত্তি জাগাতে হবে। এ জিনিসটা বই পড়া থেকে নয়, জাগাবে তা আপনা থেকে অবলোকন, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।”—(Letters to a friend P, 38)

কেবল আদর্শের মোট কথাগুলি বলেই কবি ক্ষান্ত হননি। ব'লে বোঝাবার জন্য প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা তো আছেই, পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে কবির হাতে-কলমে কাজও রয়েছে নানা দিকেই। ইন্সল চালানো এবং পড়ানোর সঙ্গে ঐ রকম কৃষ্ণ-সাধ্য কর্মের মধ্যে আরো একটি কাজ উল্লেখযোগ্য। কবি মৌলিক স্কুলপাঠ্য বইও অনেক লিখেছেন, সংকলন পুস্তকও তাঁর কৃত কয়েকখানিই আছে। অন্তর লেখা শিক্ষাগ্রন্থে তাঁর লেখা ভূমিকাও কম নেই। সংস্কৃত শিক্ষা, অমূল্য-শিক্ষা এবং ইংরেজ-শিক্ষার প্রাথমিক প্রণালী নিয়ে তাঁর চিন্তা ও চেষ্টার ফল রয়েছে কয়েকখানি পুস্তিকায়; “শিশু” কাব্য থেকে “সহজপাঠ” অবধি লিখে তার দ্বারা বাংলার ছেলে মেয়েদের শুধু ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার পথ সুগম করে গেছেন তাই নয়,—তাদের এক উৎসব জন্মিয়ে রেখে গেছেন। “ছড়ার ছবি”-তে বহুশ্রমসম্পূর্ণ “যোগীনন্দা” কবিতায় তাঁর ভূগোল-শিক্ষার মৌলিক প্রণালী লক্ষ্যবীণ। গল্প, গান, ছড়া, কবিতার যোগান তো আছে অসংখ্য, বিজ্ঞানেও শিশুদের মন টেনেছেন তিনি “বিশ্বপরিচয়” গ্রন্থে।

কেবল পুঁথিগত মানসিক শিক্ষাই নয়, দৈনন্দিক চর্চার শিক্ষা-আয়োজনও করেছিলেন তিনি নান! দিক দিয়ে। সংগীত নৃত্য কবির কাছে শুধু একটি বিভাগ-বিশেষ ছিল না, উপরন্তু মনকে বিতৃষ্ণ, রসবিন্দু ও একান্ত করে তুলে, দর্শনকার শিক্ষার অমূল্য করে দেয় বলে, সে সব বিদ্যার সার্থকতা ছিল কবির কাছে আরো বেশি; পূর্বোক্ত জাপানী ‘হ্যান চর্চা’ই মতো সংগীতের এই বিশেষ ক্রিয়ার দিকটি কবি লক্ষ্য করেছেন; ‘শিক্ষার স্বাস্থ্যকরণ’ পুস্তকখানির একটি প্রবন্ধে তা জানা যায়।

আবার ওদিকে হাতুড়ি-বাঁটাল, বাঁটা-কোদাল থেকে লাঠি-সোঁটায় হাত পাকানো এবং মুগুর-ভাঁজা, দৌড়-কাঁপেও ছেলে-মেয়েদের করিৎকর্মা করে তুলবার দিকে দেখা যায় তাঁর আয়োজন। এমন কি জাপানী যুযুতের পিছনেও এ জন্ত তিনি টাকা ঢেলেছেন এক সময়ে সাধ্যাতীত রকমে।

একটি কেন্দ্রে কয়েক জনকে গড়ে তোলা নিয়েই তাঁর চেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই দেশের সর্বসাধারণেরও মধ্য থেকে শিক্ষা দূর করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল ছিল। বিশ্বভারতী থেকে সাধারণের শিক্ষার জন্য লোকশিক্ষা সংসদের কাজ এখন যা দেশব্যাপী হয়ে দেখা দিয়েছে, এর মূলে কবিরই প্রবর্তনা। জনশিক্ষার আয়োজন জীবনদ্বারা তেমন কিছু করে যেতে না পারলেও পরিকল্পনা এবং তীব্র মনোবেদনা রেখে গেছেন নানা ভাষাধারী স্থানে স্থানে একান্ত আবেদনের মধ্যে।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা পাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয় চালনা করত, ছাত্রীরা গ্রামের মেয়েদের মহলে শেলাই শেখাত। মেসার জনতা নিয়ন্ত্রণ ও সেবা কাজেও ছেলেদের উদ্যম দেখা গেছে। গুরুদেবের প্রোগ্রামেই কলেজ বিভাগের অধ্যাপকগণ ছাত্রছাত্রী নিয়ে মাঝে মাঝে পল্লীসমাজের তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন। গান্ধিজীর পূণা-উপবাসের সময়ে অম্প্রত্নতাবর্জন আন্দোলনের গঠনমূলক দিকটি নিয়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীসমাজ দলে দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের কাজ করতে যেতেন! চরখায় সূত্রবস্ত্র এবং গানের আসর উপলক্ষ করেও তাঁরা সাধারণের সঙ্গে যোগ রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া তাদের বনভোজনের ক্ষেত্র প্রায়ই হয়ে পড়ায় সাধারণের যোগ-বিন্ধু পল্লীপরিবেশে। এ সকল অমূল্যতার মাধ্যমে, মানুষের প্রাণ ও কর্মের উচ্চ লক্ষ্য-মাথা সামাজিকতার মধ্যে রেখে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলবার চেষ্টা শান্তিনিকেতনে বরাবরই চলে আসছে। কবির শিক্ষায়তন জনতা থেকে দূরে থাকলেও, জন তার কাছে দূরের জিনিস হয়ে থাকেনি।

তাঁর শেষ দিকের এই একটি নির্দেশ দেশবাসীর চিরস্মরণীয়। ১৯৪৩ সনে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর শেষ ভাবণ “ছাত্র সম্ভাষণে” কবি বলেছেন,—“আজ আমাদের অভিধান নিজের অন্তর্নিহিত আশ্চর্য-শক্তির বিকশে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহু শতাব্দী নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি মূলে... নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্তের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্তের।”

## পদাবলী

### প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

টিপ টিপ শব্দা বৃকে, আমাকে ডাকলে যদি  
টিপ টিপ নরম পায়ে ছাদের ঐ আলসে ধরে,  
চুপ চুপ হাতছানিতে কতো বার নেই অবধি  
ছাত্রা-নীল সন্ধ্যাবেলা ঝিলমিল আঁচল ওড়ে।

এ স্বপ্ন আঁখাদে জল, ছলোছল বইলো নদী—  
সময়ের ক্রান্ত চাঁটে ভাঙা-বাঁধ জলের স্তরে,  
কি কথা কইলে যেন, বাসনার ঢেউ জাগানো  
দু'মুঠো স্নায়ের তারা ছড়ালে আকাশ জ্বরে!

তুমি তো কইলে কথা, ছড়ালে রাতের তারা—  
সে ভাবায় উঠলো তুলে স্বপ্নের নিদ্রাপুরী,  
এসো আজ আমরা তবে সাহসে বুক বেঁধে নি;  
চাঁদিনীর জ্যোৎস্নাটুকু হ'ল আমার করবো চুরি।

তোমার ঐ চোঁটের মতো জীবনের অনেক সময়—  
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা তাঁর চেয়ে রয় দিখলয়ে,  
কিছু তার কুড়িয়ে নিয়ে, কিছু তার ছড়িয়ে দিয়ে  
হাতে হাত আমরা দু'জন চলো বাই মাঠাল হয়ে।

# বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ

[ পূর্ণাহুতি ]

শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

## তৃতীয় অঙ্ক

### তৃতীয় দৃশ্য

( নরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাটার অন্দর-মহল । প্রাতঃকাল ।  
নরেন্দ্রের মাতা, দিদি, ভ্রাতৃদ্বয়, পরে পুরাতন  
বন্ধুগণ, প্রতিবেশিগণ প্রভৃতি । )

মাতা । ( পূজার পর ঠাকুরঘর বন্ধ করিয়া ঘরে প্রণাম  
করিবার সময় ) ভোলানাথ, আজ তোমার পূজার ভাল মন বসল  
না । তোমায় ধ্যান করবার সময় কেবল বিলের মুখই মনে পড়তে  
লাগল । ঠাকুর ! তুমি অন্তর্ধ্যামী, মায়ের এ দুর্বলতা ক্ষমা  
কোরে ।

দিদি । ( অশ্রুস্রবী মাতাকে তিরস্কার করিয়া ) আজ এই  
শুখের দিনে চোখে জল কেন বল ত ? আজ আমার জগজ্জরী  
বিলে ভাই ঘরে আসছে, কেবল আনন্দ কর । অনেক কৈদেছ,  
এবার হাস । তাই ত, এখনও সে এলো না কেন ?  
আজকাল তাকে নিয়ে লোকে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে ।

মা । সে নিশ্চয়ই আসবে । আমার কাছে কথা দিয়ে  
খেলাপ করবে না । কোন কাজের চাপে দেয়ী হচ্ছে । যে সব  
খাবার পোত সে ভালবাসত তার ব্যবস্থা করেছিস্ তো ?  
অনেক দিন সামনে বসে থাকনি ।

ভ্রাতা । ( ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাদে ) মা, দাদা  
আসছে গো !

মা । ( ব্যস্ত ভাবে ) কোথায় রে ?

ভ্রাতা । ঐ বড় রাস্তায় মস্ত বড় গাড়ী করে, কিচ্ছ—

দিদি । ‘কিচ্ছ’ কি রে ?

ভ্রাতা । গাড়ীতে বোড়া জোড়া নেই !

দিদি । ( রাগত স্বরে ) তবে রে, বাদর, জ্যাঠামি হচ্ছে ?  
সত্যি কথা বল ।

ভ্রাতা । সত্যি কথাই তো বলছি, তবু বিশ্বাস করছ না ।  
( অন্তরীক্ষে বহু কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি উঠিল—‘জয় গুরু মহারাজ কী  
জয় !’ ‘জয় স্বামিজী মহারাজ কী জয় !’ ) এবার হোল ?

মা । ( সম্মল কণ্ঠে ) ওরে, বা, বা, শীগ্গির তাকে স্তোত্রে  
নিয়ে আয় ।

দিদি । ( আনন্দাক্রম মুছিয়া ) আজ বাবা থাকলে তাঁর  
কত আনন্দ হোক, ও তাঁর নয়নের মণি ছিল । ঐ আসছে  
আমাদের বিলে ভাই । বাবা, কত লোক ঘিরে রয়েছে ও  
প্রণাম করছে ।

গৈরিকথারী সহানুভবদন স্বামিজী । [ প্রবেশান্তে মাতা ও  
দিদিকে প্রণাম করিয়া একটি পিঁড়ে টানিয়া রকে বসিলেন,  
অদূরে পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাগণ ও দ্বারের নিকট অসংখ্য জনতা )  
My mother & elder sister. ( তাঁরা নতভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন  
করিলেন ) ।

মাতা ও দিদি ( ব্যস্ত ভাবে ) । কাজের বেলায় বাড়ীর  
ছেলেগুলোর টিকি দেখতে পাওয়া যায় না । চেয়ার এনে দে ।

নিবেদিতা । ( মুহূর্ত্তে ) আপনি ব্যস্ত হবেন না । গুরুজী  
যখন নীচে বসে আছেন, তখন আমরা উঁচুতে বসতে পারি ?  
গুডউইন । আমরা সব ঘরের লোক ! ( সকলে ঐ স্থানে  
বসিল )

দিদি । ঝাঁড়াও বাছারা । একটা মাদুর পেতে দিও ।

মা । ( পাখা দিয়া বাতাস করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন ) পাগড়ি-  
জামা খোল না, বাপু ! ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্ যে !

দেবমাতা । আমরা থাকতে আপনি কষ্ট করেন কেন ?  
পাখাটি দিন ।

মা । অবাক কাণ্ড ! নিজের পেটের ছেলের উপরও আর  
জোর নেই !

স্বামিজী । ( সহাস্তে ) ওরা যে এখন তোমার ছেলে-মেয়ে,  
তাই ঠাকুরমা'র কষ্ট দেখতে ইচ্ছে করে না । ( দিদিকে একবার গামছা-  
খানা লাগু না দিদি-ভাই ! পান সাত্তা আছে ? ( ভ্রাতা ছুটিয়া  
ভিতর হইতে পানের ডিবা ও জবদার কোটা আনিয়া দিলে )  
ওরে, ভুলু ভাই যে ! কেমন আছিস, কাছে বস । এতক্ষণ তোকে  
দেখতে পাই না । তোর মেজদা কোথায় ? আর মতিম : ( দ্বারের  
নিকট জটনক বুড়াক লক্ষ্য করিয়া ) কে, ভাই পিসি না ? মা ও  
দিদির সঙ্গে দেখা শেষ করে পাড়ায় ঘুরে আসব ভেবেছিলাম ।

বুড়া । ( প্রৌঢ়ী সহ নিকটে আসিয়া কোমল স্বরে ) বেঁচে  
ছিলুম বলেই আজ আবার সোনারচাঁদকে দেখতে পেলাম ।  
ঘরের ছেলে ঘরে আসছে শুনে অবধি কেবল ঘর বার করেছি ।  
তোমা বিহনে তোমার মা'র যে কি ভাবে দিন কেটেছিল, তা  
জানেন ঠাকুর ও এই বুড়ী । ও কেবল কৈদে বলত—‘হে মা কালী !  
আমার বিলেকে কোলে ফিরিয়ে দিলে, বুক চিরে তোমার পূজো  
দোব ।’

স্বামিজী । তা আজই কালীঘাটে মাকে দর্শন করতে চল ।  
তবে বুক চিরে রক্ত নাই বা দিলে, মা !

মাতা । তা কি এখনও হয় ? মানিত করে না মানলে  
অকল্যাণ হবে যে !

স্বামিজী । তোমাদের যা ইচ্ছা হয় কর । ( পরে বুড়াকে )  
এ মেয়েটি কে ?

বুড়া । এ যে আমাদের পটার মেয়ে । মনে নেই তাকে ?  
ছেলেবেলায় সে রাজি এখানে খেলতে আসত ?

স্বামিজী । বটে ? সেই পটার বে হয়ে গেল—আবার সে মা-ও  
হোল !

দিদি । তা হবে না ? হিন্দু-ঘরে আইবুড়ো মেয়ে বেশি দিন  
রাখা চলে ? ঐ যে দোহের কাছে ঝাঁড়িয়ে আছি ।

স্বামিজী । তাই তো, খুব বড় হয়ে গেছে যে ! ওরে ও পটা,  
নিয়ে আয় পানের বাটা—তোপ মেদের বিয়েতে হবে খুব ঘট ।

(হাস্য)। (পুরাতন গয়লা দুখ দিতে আসিয়া বিশিষ্ট জনতা দৃষ্টে সন্মোচন করিতেছে দেখিয়া) কি হে ঘোষজ্ঞা, কেমন আছ ? বাড়ীর খবর ভাল ?

গয়লা। এজ্ঞে, আপনাব কেবলপায় সব কুশল। আপুনি কখন আইলেন ? কেমন আছেন ?

স্বামিজী। (দ্বারের নিকট পুরাতন পরামাণিক ও পশ্চাতে বৃদ্ধ রজককে লক্ষ্য করিয়া) আমাদের জীবন পরামাণিক না ? পেছনে ভদ্রুয়াও রয়েছে না ? তোমরা এমিকে এস ? ভদ্রুয়া এখনও বেঁচে আছিস ? (উভয়ে প্রণাম করিলে) তোমরা কর্তাদের আমলের লোক। দেখলে আনন্দ হয়। কিন্তু দু'জনেই পটকে গেছে।

পরামাণিক। আমার বয়সের অনেকেরই মেয়াদ খাটা শেষ হয়ে গেছে। এখন ছুটি পেলেই বাঁচি।

স্বামিজী। (বাড়ীর পুরাতন বৃদ্ধা ঝি বাজার করিয়া ফিরিতেছে) কি গো হরিণ মা, কি বাজার আনলে ? কুচো চিড়ি এনেছো তো। (মাতাকে) অনেক দিন তোমার হাতের রান্না 'বাটি-ফাট'ি' পাইনি ; একটু তেল-ঝাল দিয়ে করে দিও। (পরে নিবেদিতা প্রভৃতিকে) This is my home—this is my country. These are my countrymen—poor, ignorant, but pure and simple. They are God's weak miseries ! (দ্বারের নিকট পুরাতন বন্ধুগণকে লক্ষ্য করিয়া সন্তোষে) ঐ দেখো, 'মা, আগে যেমন ওরা দল বেঁধে আনার ডাকতে আসত, আজও ঠিক সেই ভাবে এসেছে। আরে চলে আও ভেঁইয়ারা। বৈঠিয়ে ভাই সাব। তবিরং আছা হোয় ? আও, পাখা লড়ো। আমি তোদের সেই বিলেই আছি বে। কি করছিস্ এখন ?

১ম বন্ধু। (বিমর্ষ ভাবে) সংসারের জোয়াল ঘাড়ে নিয়ে চলছি চিঃম-তোতালায়। তোর মত কি বরাত করে জন্মেছিলুম রে, দাদা ?

স্বামিজী। বুঝেছি। বে করে মরেছিল তো ? ক'টা বাচ্চা হোল ?

১ম বন্ধু। তা গোটা চারেক হবে। (সহাস্ত্রে) ছিলাম ষিপদ হলুম চতুষ্পদ, ক্রমশঃ পদোন্নতি ! কাঁড়া হাত-পা থাকলে জগৎকে খোড়াই কেয়ার করতাম।

স্বামিজী। তা বটে ! নিজের কোমরের জোর বুঝে কাজ করাই ভাল। (২য়কে-) তোর খবর কি ভাই ?

২য় বন্ধু। (সখেদে) মাছি-মারা কেরাণী। পান থেকে চুণ খসলেই গো টু হেল।

স্বামিজী। (করুণ ভাবে) তোদের মুখ দেখেই সব বুঝতে পারছি। সংসারে দাসখণ্ড লিখে দিয়েছিস্। পরমহংসদেবের কথায় আছে—'শালা এখন মেগের বাজার করছে।' কি অদ্ভুত শক্তির খেলা তিনি দেখিয়ে গেলেন। এই কষ্ট-নষ্ট করছেন, কিন্তু তবুনিই সমাপিতে যগ্ন। (ঈশ্বকে লক্ষ্য করিয়া, সাদরে) আশ্বন, মাষ্টার মশায়। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। কত অসমান-অমনি তফাৎ।

ঈশ্ব। সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না।

স্বামিজী। ঠিক কথা। সনৌয় মানুষের অহংকার করা বা কর্তাগিরি করা উচিত নয়। (গুডউইন প্রভৃতিকে) 'Pet of our Lord, the writer of the gospel.

গুডউইন। Bless us, Sir, you have left the whole humanity to debt।

ঈশ্ব। Man is a humble tool in the hands of this Law।

রাম দত্ত। (প্রবেশান্তে) কি রে, বিলে ভাই, অনেক দিন পরে দেখা হোল। কেমন আছিস ?

স্বামিজী। (প্রণাম করিতে বাধা পাইয়া) কেন বাধা দেবে ? আমি কি সেই বিলে নেই ? আমার কি বগলের পাশে চারটে হাত বেরিয়েছে, না ধড়ের ওপর আর একটা মুণ্ড গজিয়েছে ? বৌদির সঙ্গে দেখা হলে এর শোধ নোব। (নিবেদিতা প্রভৃতিকে) The chosen seed of our Lord, my elder brother। নিবেদিতা। আপনাব মধ্যে তিনি আছেন। আমরা আশীর্বাদ চাই।

রাম দত্ত। তিনি সবাব মধ্যেই আছেন, আর তোমাদের ওপর কৃপা না হলে এমন যোগাযোগ হবে কেন ?

ভক্তলোক। (প্রবেশান্তে) মহারাজ ! আজ 'এলবার্ট হলে' আমাদের একটা মিটিং হবে। আপনাকে সভাপতির আসন নিতে হবে।

স্বামিজী। কিন্তু আজ আমার মোটেই সময় হবে না। মাকে নিয়ে এখুনিই কালীঘাটে যেতে হবে। (বন্ধুদের) তোরা মঠে এক দিন বাস না ভাই ! মনের মানুষের সঙ্গে মনের কথা কইলে মনটা হাল্কা হবে। গল্পার ধারে বসে একটু ভজন-সঙ্গীতও চলবে।

বন্ধুরা। আর ঈশ্বর-ঈশ্বর মানি না।

স্বামিজী। শেষে মানতে হবে। A wild prodigal heart seeking shafe barbour.

[ বন্ধুগণের প্রস্থান। ]

মা। (ব্যস্ত ভাবে) মস্ত ভুল হয়ে গেছে রে ?

দিদি। আবার কি ক্যান্সাদ বাধালে ?

মা। (নিবেদিতা প্রভৃতিকে দেখাইয়া) আহা, এরা সব এলো, এদের মিষ্টিমুখ করান হোল না যে। বিলে, তোকে পেয়ে সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

নিবেদিতা। যিশুর জন্মস্থান জেরুসালেমে গিয়ে কেউ কি কেক খাবার কথা ভাবে ? আত্মার তৃপ্তিই পরম ধন। আপনাব আশীর্বাদই বড়।

দিদি। তবু একটি খাও। (একটি থালায় রসগোল্লা আনিয়া প্রত্যেককে দিল ; ভূপেন জল দিল)।

(সকলে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। মাতা ও দিদি ভিতরে গমন করিলেন)

স্বামিজী। (ঈশ্ব ও রাম দত্তকে) দেখুন, খুব শীগগির আমাদের একটা মিটিং হবে, আপনাদের যেতে হবে। মঠ সন্ধ্যায় সমস্ত সম্পত্তি পরমহংসদেবের নামে লিখে দলিল করা হবে। আবার বাইরে যাবার আগে এ কাজটা শেষ করা চাই। (ভিতরে

গমন করিবার কালে সহ্যে) আমাদের মেয়েদের কোথাও বেতে হলে আঠার মাসে বছর হয়। কই, দিদি-ভাই?

রাম দত্ত। বিলের স্বভাব কিছুই বদলায়নি। সেই আগেকার মত সরল। একটু অহঙ্কারও নেই।

শ্রীম। ঠিক কথা। ও কি সাধারণ পাত্র? ঠাকুর ওকে দিয়ে অনেক কাজ করাচ্ছেন, ওখানে অহঙ্কার হতে পারে না। গীতাতে আছে—‘বিমুঢ়াশ্চা কর্ত্তাহং ইতি মনুতে।’

শ্রামিজী। (পুনঃপ্রবেশান্তে) অনেক তাড়া দিয়ে বার করতে হয়েছে। চলুম রাম দত্ত! মাষ্টার মশায় যাবেন কিছু।

[মা, দিদি ভ্রাতাগণ সহ শ্রামিজীর প্রস্থান।

রাম দত্ত। A soulful dynamism—মহাকবিরূপে ভারতে ফিরে এসে rude shape up করে দিয়েছে।

শ্রীম। তাই আনি বেশান্ত ওর বিষয়ে লিখেছে—‘A warrior in the guise of an anchorite’ শান্ত সৌম্য সন্ন্যাসীর বেশে ভীষণ বিপ্লবী বোম্বা।

রাম। অথচ ঐ লোকই বিজ্ঞানসাগর মশায়ের খুলে মাষ্টারি করবার উপযুক্ত পাত্র হয়নি।

শ্রীম। কিন্তু আমাদের ঠাকুরের কি অদ্ভুত স্মৃতি দৃষ্টি ছিল, ওকে দেখেই এক দিন উনি বলেন, কেশব সেনের মধ্যে দেখলুম আটটা বাতি জ্বলছে, কিন্তু ওর ভেতরে আঠারটা বাতি জ্বল-জ্বল করছে! চলুন, বেলা হোল।

### চতুর্থ দৃশ্য

[প্রাতঃকাল। বাগবাজার—জমিদার বলরাম বহ্নর বাড়ীর বহির্ভাগের একটি বড় ঘরে ফরাস-পাতা বিছানার এক ধারে কয়েক জন যুবা ‘বেদ’ পাঠ করিতেছেন ও গত দিনের শ্রামিজীর ব্যাখ্যা আলোচনা চলিতেছে। অদূরে শূর ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বোষ গুরুভ্রাতাগণ ও প্রতিবেশী দল মধ্যে শালালাপ হইতেছে।]

১ম যুবা। (সঙ্গীকে) এ সূত্রের ব্যাখ্যা কাল ভাল ধরতে পারি নাই।

২য় যুবা। আমারও অবস্থা তইখব চ।

৩য় যুবা। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কাল মহারাজ যখন ব্যাখ্যা করলেন তখন জলবৎ তরল মনে হোল।

৪র্থ যুবা। সেটা ঠিক অদ্ভুত তপঃ-শক্তিতে হয়েছে। আচ্ছা, গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? উনিও তো মন্ত আধার।

১ম যুবা। হ্যাঁ, থিয়েটারে নাটকের মধ্য দিয়ে বোম্বাস্ত ভাবের কত ব্যাখ্যাও করেছেন।

২য় যুবা। তবে সন্দেহ হয় যে, উনি এখন রাজী হবেন কি না।

৩য় যুবা। যত্নে কুতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

৪র্থ যুবা। (সকলে গিরিশ বাবুর নিকট আসিয়া) মশায়! একটু দায়ে ঠেকে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

গিরিশ বাবু। কেন, কি হয়েছে?

১ম যুবা। এই প্রস্টার অর্ধ মাথায় আসছে না।

২য় যুবা। তোরা দেখছি ডাকাতের দল। সকাল বেলাই ‘ত্রুঙ্গ সন্ত্য জগৎ মিথ্যা’ করছিস।

৩য় যুবা। গালাগাল দিন, কিন্তু বুঝিয়ে দিতে হবে।

৪র্থ যুবা। নইলে পড়া জিজ্ঞাসার সময় মহারাজের কাছে হাঁ করে থাকলে মারা যাবে।

গিরিশ বাবু। জালালি বাবু, তবে তামাকটা ধরেছে! বেদ আমি পড়িনি।

গুরুভ্রাতা। দাঁও না বলে, ছেলেগুলো বড্ড বকুনি খাবে।

গিরিশ বাবু। বেশ বলেছ। নিজের ঘাড়ে না নিয়ে বোকাটা চাপালে। (যুবাদের) বেশ, তোদের প্রশ্ন কি?

১ম যুবা। ‘আজ্ঞে, জ্ঞান বড়—না প্রেম বড়?’

গিরিশ। ঠাকুর তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা কেমন সরল গ্রাম্য ভাষায় বলতেন। ওর একটি কথা ছিল—‘বেশী জ্ঞান চক্চকি করা ভাল নয়’। পণ্ডিত অনেক শ্লোক আওড়াতে পারে—কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ে। আর বলতেন—‘ভক্তিই মুক্তির দাসী’। ভক্তি যেন রাজার বেটা, সাত মহল পর্যন্ত যেতে পারে। উদ্বেগ ভগবান লাভ তো? তা নেতি নেতি বিচার করেই হোক, আর শুদ্ধ ভক্তি দিয়েই হোক—ফল সমান।

২য় যুবা। মশায়, বেদের ভাব ভিন্ন। এতে ভক্তির স্থান নেই। ‘তুমি—আমি’ নেই।

গিরিশ। জ্ঞান ও প্রেমে যদি বিভ্রমতা প্রমাণ করে থাকেন তবে অমন বেদ আমার মাথায় থাকুন।

শ্রামিজী। (প্রবেশান্তে—সহাস্যে)—কি রে, ওর সঙ্গে কি কথা হচ্ছিল?

১ম যুবা। মহারাজ, যদিও উনি বলেন যে, বেদ পড়েননি, তবু কি স্মরণ ব্যাখ্যা করলেন।

শ্রামিজী। (ঈর্ষ্য গভীর ভাবে) গুরুভক্তি থাকলে সব জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। পড়বার শোনার তত দরকার হয় না। ওর মত ভক্তি ও বিশ্বাস জগতে বিরল। কিন্তু কাউকে নকল করা ঠিক নয়। (স্বপ্ন পরে) জ্ঞানার্থীতে ম্যাক্স ম্যুলায়ের সঙ্গ করে মনে হোল যেন সেই পূর্বের সাধন ঠাকুরই নিজের ভাষা উচ্চার করতে বর্তমানে ঐ রূপে ঐ দেশে আবিস্কৃত হয়েছেন। এটা আমার অনেক দিনের ধারণা। তিনি আমাকে বলেন যে, পচিশ বছর ধরে তিনি কেবল লিখেছেন, আর বই ছাপাতে কুড়ি বছর লেগেছে। জীবনের এত সময় একটা কাজে লেগে থাকা সাধারণ মানুষের কাজ নয়।

প্রতিবেশী। বলেন কি শ্রামিজী? অদ্ভুত আদর্শ-নিষ্ঠা!

শ্রামিজী। দিন কতক ওর বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলাম। কি যত্নটাই করত বুড়ো-বুড়ী। দু’টিকে দেখলে মনে হোত যেন বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতী সংসার করছেন। আবার আমাদের পরমহংসদেবের ওপর কি অশেষ ভক্তি। ওকে অবতার বলে বিশ্বাসও করেন। ঠেঁশনে এসে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে কীদন্তে থাকেন দু’জনে।

প্রতিবেশী। আচ্ছা, মহারাজ, সাধনদেব কি এ দেশে ফের জন্মতে পারতেন না?

শ্রামিজী। এ দেশে ওরকম বিরাট কাজ করা অসম্ভব হোত। বিশেষতঃ বই ছাপাবার অত টাকা এ গরীব দেশ পাবে কোথা?



ই, আই, রেলওয়ে কোম্পানি খরচের জন্ত ন' লক্ষ টাকা দিয়েছিল। (গিরিশকে) এ সব তো পড়লে না ভাই, কেবল কেটে-বিটে, জপে গেলে।

গিরিশ। অত পড়বার সময়ও নেই, বুদ্ধিও নেই। তবে দাদা ঠাকুরের কুপায় ও সব বেদ-বেদান্ত মাথায় বেধে এবার পাড়ি মারবে। তোমাকে দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন, তাই ও সব পড়িয়েছেন। 'জয় বেদান্তরূপী শ্রীমকুঙ্কর জয়'!

স্বামিজী। (দীর ভাবে) ঠিক বলেছ ভাই! পরমহংসদেবই জীবন্ত বেদ! লেখাপড়া জানা নেই, কিন্তু যুগ দিয়ে বেদান্তের খৈ ফুটত! আর বলতেন, 'মা জ্ঞানের রাস ঠেলে দিচ্ছেন'।

যোগানন্দ। গিরিশ বাবু, কথাটার মোড় ফেরাও। নইলে আজকের মিটিং এর দফা রফা।

গিরিশ। আচ্ছা, নরেন, অনেক তো বেদান্ত খাটলে, দেশের অন্নভাব, বাড়িভাড়া, মতাপাতকাধি যে চোখের সামনে দিন-রাত চলেছে, তার উপায় কি বেদে কিছু লেখে?

স্বামিজী। কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না। এখনও মাথায় বেদরূপী ঐ পাগলা বামন রয়েছে।

গিরিশ। যেমন ধর, এমন ঘটনা ঘটছে যে, অমুক বাড়ীর গিন্নীর আজ ছুঁদিন উমুন অজলনি, অথচ আগে তার বাড়ীতে বোজ পক্ষাণখানা গাভা পড়তো। কিম্বা অমুক বাড়ীর বৌকে কতবড়লা গুণা ঘরে নিয়ে গেছে। কিম্বা কোন বড় ঘরের বিধবা গুপ্ত ভাবে একটা নষ্ট করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তোমার বেদে এর কোন ব্যবস্থা আছে?

স্বামিজী। ধাম, ধাম, আর নয়! (কিছু পরেই ঐ গুণের বাহিরে গমন করিলেন)

১ম যুবা। মশায়, জগতের কি সব ছাই-ভস্মের কথা তুলে আজ বেদ পড়া বন্ধ করলেন।

গিরিশ। ওরে, তোরা খই পড়ে কত শিখবি? দেখলি কত বড় প্রাণ! কত বড় শক্তির পরশমণিক! ওকে কেবল মহা পণ্ডিত বলে মানি না। জীবের দুঃখে সদা কাতর। শুধু দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেই বেদ-বেদান্ত উড়ে গেল। ওর মত Practical Vendantist কোথা?

স্বামিজী। (প্রবেশান্তে যুবাদের) ওরে, আজ আর পড়া হবে না। উনি মস্ত বড় কথা তুলেছেন। জীব-সেবার চেয়ে আর বড় ধর্ম নেই। নিদাম ভাবে এটা সাধনা করলে সংসার-বন্ধনও কেটে যার। (শিষ্য সদানন্দের প্রবেশ) ওরে, একটা সেবাপ্রম থুলতে পারিস? হিমালয়ে গিয়ে ভৃগুর্দেব যাত্রীদের একটা গাছ-তলার বসে এক লোটো জল বাসন্তিতে পারবি না?

সদানন্দ। হে! জুহু, মহারাজ!

(শ্রীম, রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী-ভক্তগণের প্রবেশ)

স্বামিজী। সেবা ধর্মের চেয়ে আর ধর্ম নেই। বেদান্তের সার কথা হাতে-নাতে কাজ করে প্রমাণ করতে হবে। জীবরূপী শিবকে সেবা করে নরজয় সার্থক কর। শুধু নিজের বুদ্ধির জন্ত নিজের বৈরাগ্য ভাব আশ্রয় করা মহাপাপ। সাহায্য-কেন্দ্র থুলে গ্রীব-দুঃখীদের সাহায্য করা চাই। রোগীদের ওষুধ ও পথ্য দিতে হবে। জাতবিচার চলবে না, উঠে-পড়ে সকলে কাজে

লেগে যা। নিজের বুদ্ধি ছুঁড়ে কেলে দে। সকলকে বুদ্ধি কর। [গিরিশকে], আচ্ছা, আমার মনে এ ভাব কেন হয় বলতে পার?

গিরিশ। ঠাকুরের খেলা। বড় আধারে বড় ভাবের ঢেউ ওঠে।

স্বামিজী। "বহজনহিতায় বহজনসুখায়" এই হোল সন্ন্যাসী-জীবনের ব্রত। সন্ন্যাস নিয়ে যারা এই উদ্দেশ্য ভুলে যায়—'বৃথৈ ওশ জীবনং'। পরের মঙ্গলের জন্ত প্রাণ দিতে, ব্যাধি-কবলে কাতর জীবকে শাস্তি দিতে, সকলকে শুভবুদ্ধি দিয়ে তাজা মাহুযরূপে গড়ে তোলবার জন্তই সন্ন্যাসীর জন্ম। শুধু গেলুয়া রংয়ের কাপড় পরলে মার দিয়া ফেলা হয় না। 'কাস্তানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' এই মূল মন্ত্র। কি করছিস বসে বসে? ওঠ, জাগ, অপরকে জাগ। Respect the dignity of man—live and love.

বলরাম। ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন তো এগিয়ে আসছে। কোথা হবে?

স্বামিজী (যুবাকে) ও রে, একটু তামাক খাওয়া না। উৎসবের কথা আমি ভুলিনি। কক্ষিণেশ্বরে না করে নীলাধর যুক্তেশ্বর বাগান-বাড়ীতে বা দাঁয়েদের ঠাকুর-বাড়ীতে করলে কেমন হয়? এবার বেশ জাকিয়ে পুজো করতে হবে। (ক্ষণ পরে) অনেক গ্রাম মাথার ভেতর টগবগ করে ফুটছে। জগতের অনেক স্থান ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে যে, সম্ভব ছাড়া কোন বড় কাজ করা যায় না। পরমহংসদেবের নামে একটা সম্ভব গড়ে দেশের ও দেশের মঙ্গল করতে হবে। তোমাদের মতামত জানাও।

শ্রীম। এটা বেন বিদেশী ভাবে কাজ করা হবে।

রাম। ঠাকুরের কথায় আছে—'তোড়ে ডোবায় দল বাঁধে'। ঠাণ্ড উদার মত ছিল।

গিরিশ। ওঁর উপদেশের মধ্য অনেক গভীর অর্থ থাকত।

যোগানন্দ। দল-টল করা ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল না।

স্বামিজী। (উত্তেজিত ভাবে) তুই কি করে জানলি যে, এই কাজে ঠাকুরের ইচ্ছা নেই? অনন্ত ভাবময় ঠাকুরকে তোদের ঐ ছোট বুদ্ধিতে মাপতে বাসুনি। আমার রক্ত অংশে জন্ম। অকেন্দ্রো পুরানো সংস্কারগুলো ধ্বংস করে, ছোট গভীর বেড়া চুরমার করে, তাঁর উদার ভাব ছড়াতেই আমার জীবন-ব্রত। নতুন সম্ভব গড়ে অপর সম্ভবের সঙ্গে লড়াই করতে ইচ্ছা নেই। তাঁর ভাব ছিল সর্বধর্মসম্বন্ধ। এই মহা ভাব কি সকলে ধরতে পারে? তোরা আমার সাহায্য করবি নি ভাই? বিবেকানন্দ কি করে গেল বুঝতে হলে আর একটা বিবেকানন্দ চাই। আমি চলে গেলে পরে একটু বুঝতে পারবি। কালে আবার শক্তির খেলা দেখবি।

গিরিশ। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, তোমার মধ্যে প্রভুর শক্তি খেলা করছে।

স্বামিজী। ঐ শক্তির লীলা আমিও জীবনে কত বার টের পেয়েছি। বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্টে সব সময়েই দেখেছি, তিনি আমার হাত ধরে আছেন, ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। এখনও তোরা এই কাজে সন্দেহ করিস? তাঁর শক্তির ইয়ত্তা করা যায় না। মাহুযের ছটাকী-বুদ্ধি চিরকাল হেরে বাবে। প্রভু, তোমারি জয়! (গৃহত্যাগ করিলেন)।

গিরিশ। নরেনকে কাজে আটকে রাখাই ভাল। ঠাকুরের জীমুখে শুনেছি যে, যখন ওর স্বরূপ দর্শনের ব্যাকুলতা বাড়বে, তখন আর দেহ থাকবে না।

জীম। আমরাও ঐ কথা শুনেছি। আত্মদর্শন হলে এসব কঁাকা হয়ে যাবে।

রাম। বিলে ভাই যখন আমাদের ঠাকুরের ভাব প্রচার করতে সজ্ঞা তৈরী করতে চাইছে, তাতে আমাদের অমত হবে কেন?

প্রকৃভাষা। সত্যি কথা। আর ঠাকুরও বলতেন—‘ও পুঙ্স, আমি প্রকৃতি’।

গিরিশ। তাহলে তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে সকলে মিলে ঐ কর্ণ-পাগলকে সাহায্য করাই ভাল নয় কি?

রাম। যা ধরবে তাই করবে। Challenging every difficulty of life. In a race of ‘yes’ men he dares to say ‘no’.

গিরিশ। নরেনের মুখ দেখলে অর্জুনের কথা মনে পড়ে—‘দুঃশ্রমক্যবদনং’। মহা কশ্মীর মূর্তি।

জীম। উদ্বিগ্নের সাগর-তীরের বন্ধন গ্রাস করে না—বন্ধনের বাধনও চায় না। নিখিল আত্মা মায়াগীত, সরা যুক্ত।

### পঞ্চম দৃশ্য

[পূর্বমহাসম্মেলনের স্মরণোৎসব দিবস—শুভ দ্বিতীয়া ফাল্গুনী, তিথি।

প্রাতঃকাল। ঠাকুরের প্রশস্ত ঠাকুর-বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। মস্তিকার কৃত্রিম পর্বতাকারে গঠিত উচ্চ শিখরে ফুল-মালা-শোভিত ঠাকুরের পট।

পুষ্পধার গন্ধে চারি দিক্ আয়োদিত। বহু যাত্রি-সমাগম হইয়াছে। কোথাও কীর্তন চলিতেছে, কোথাও ‘চণ্ডীপাঠ’ হইতেছে, কোথাও সন্ন্যাসী দল হোম করিতেছে।]

হামিজী। (নব-নীকিত সন্ন্যাসীজয়কে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ)—  
যাথ, আজ এই শুভ দিনে তোদের নবজন্ম লাভ হোল। নবপত্ত-ব্রহ্ম ঘুচে গেল। আজ থেকে তোদের সব পাপের ভার নিলুম। তোরা কেবল সবার মঙ্গল করবার চেষ্টা কর। ব্রহ্মসিংহকে জাগ্রত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম। আত্মজ্ঞানের চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান নেই। ন, ঠাকুরকে প্রণাম করে ওর আশীর্বাদ নে। (সন্ন্যাসীকে)—  
তবে, আজ যারা এখানে আসবে, তাদের পৈতে পরিণে দিতে হবে। যারা সবাই ব্রাহ্মণ হয়ে যাবে। আর শাস্ত্রে বলেছে—‘প্রায়শ্চিত্ত করলেই পতিত সংস্কার হয়’। দেশের সবাইকে ব্রাহ্মণ পদবীতে উন্নীত নিতে হবে। ‘ছোঁব না, ছোঁব না’ ভাবের জন্তাই হীনতা, নীচতা, মূর্খতা ও কাপুরুষতা চরমে উঠেছে। সাবধান, প্রতিশোধের প্রতিশ্রুতি হয়। মনের জাগরণেই আসল প্রাণের বিকাশ হয়। সকলকে শোনা, মা ভৈঃ। ভয়ই মৃত্যু, ভয়ই পাপ, ভয়ই নরক। যের ভয়কে জয় কর। দে পৈতে পরিণে। জয় গুরুজী!

[সকলকে গৈতা পরানো হইতেছে। শঙ্কররূপী হামিজী লক্ষ্য করিলেন যে, অসুরে কয়েক জন ‘হরিজন’ সভয়ে ঠাড়াইয়া আছে, পৈতা লইতে দ্বিধা করিতেছে।]

হামিজী। পৈতে পরে সকলে ঠাকুরকে প্রণাম কর।

প্রণাম। ও আদেশ করে না দ্যাবতা। মোরা ছোট নোক, নীচ জাত। অধ্যম্য করলে সাজা হবে।

হামিজী। এতে যদি তোদের পাপ হয়, আমি সে পাপের বোঝা নোব। আমিই পৈতে পরলাম। তোদের ভ্রাতৃত্বদায় ঘুচে গেল। কে বলে তোদের পতিত? তোরাই সমাজের আসল মেরুদণ্ড। নকল মাঘব নয়। আমি দিব্যচোখে দেখছি যে, তোদের জন্ম দেবতার দ্বার আর বন্ধ নেই। A new era of the common man has dawned. যারা রিক্ত, যারা সর্বস্বতারা, যারা বঞ্চিত, তাদের সুদিন এসে গেছে। (সকলকে)—শঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম পাতাড়ে ও জঙ্গলে বেখে যান, সেই ধর্মকে সংসারে ও সমাজের মধ্যে আনবার জন্তই আমরা জন্ম। নভা, সমিতি ও লেকচার দিয়ে সকলকে কখনই এক করা যায় না। ইতিহাসের কাঁটা উন্টো দিকে ঘোরালে বিপদ। শিখগুরু গোবিন্দ এটা বুঝে সবাইকে নিয়ে গাঙ্গসা সৈন্য গড়ে তুলে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি নাড়িয়ে দেন। মহামাতার রাজ্যে এসে জগৎ ভেঙেই সঙ্গে কত ভেঙেই দেখলাম। আর, সকলে এই মহাভীর্ণে বোস। গুরুভাষা। (হস্তে বিশুস, জটাঙ্গুট, বাঘহাল, কদ্রাক্ষমালা প্রভৃতি লইয়া সজাত্রে) আজ তোমাকে সন্যাসি বসাইব।

হামিজী। (সজাত্রে) বেশ বাবা, পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। (সজিত বেশে তানপুরায় ভজন ধরিলেন) ‘সীতাপতি রামচন্দ্র বনুপতি রাই’। (ভজনান্তে—গিরিশকে)—  
পূর্বমহাসম্মেলন একে ভৈরবের অংশ বলতেন। ঠেকে এসব দিয়ে সজাত্রে ও উনি আমাদের দলের লোক। ইনি ঠাকুরের কথা শোনাবেন।

গিরিশ। (বিনীত ভাবে) ও-বেশ তোমাকেই মানায় ভাল, ভাই! দয়াময় ঠাকুরের কথা এ অধম কি বেশী বলতে পারে ভাই? তোমাদের মত কামকাকনত্যাগী চিবকুমার সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একাসনে বসতে দিয়ে অপার করণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। জয় গুরু!

হামিজী। (গম্ভীর ভাবে) তাঁর ইচ্ছায় অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁর শুভ ইচ্ছাতেই আজ এই শত্মক্রেত্র প্রতিষ্ঠা হোল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নেমে গেল। এই মঠ হবে বিদ্যা ও সাধনার কেন্দ্রস্থল। Refuse to be blindfolded by superstition and prejudice—যুদ্ধ কুসংস্কার দূর কর। What India needs is iron muscles and strong nerves—চাই কঠোর বোধের সাধনা—চাই আত্মস্তম্ভ বলিদান। চাই আত্মবিলোপ—তবেই থামবে কামনার কোলাহল। তাজা মানুষ হয়ে দেশের ও দেশের মঙ্গল কর। শেষ কথা বলি—Renueiation and service are the two channels self-immolation হল স্বার্থত্যাগ ও জীবসেবাই জীবনের ব্রত! (হরিজনদের দেখাইয়া)—এদের তুলতে হবে, ভাগ্যতে হবে। ওরা চিরকাল নীচে পড়ে থাকবে না—খাকা উচিতও নয়। পথের কাঁটা বুকে তুলে নে। দুঃখকে কর পথের সাথী। দুঃখের কাঁটাই ফুল হবে ফুটেবে। তিমির-ঘেরা নিশি হবে শৈব, আবার ভাঙিবে নব গৌরবে রবি পূর্বাকাশে নব তেজে। পাবি পথ—পাবি শান্তি। ঐ শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!! জয় গুরু মহারাজ কী জয়!

সকলে। জয় গুরু মহারাজ কী জয়! জয় হামিজী মহারাজ কী জয়!

# বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

## বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ

যোগ আছে। ইং ১৮১৮ সনে (বাং ১২২৫) প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র—‘দিগ্‌দর্শন’ নামে মাসিকপত্র শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়া বাংলা দেশের সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগরণ আসিয়াছে, তাহা একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের প্রয়োজন আছে।

ইং ১৮১৮ সনে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি ১৮৬৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র উত্তর পর্যন্ত বাংলায় যে-সকল সাময়িক-পত্র আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় ‘বাংলা সাময়িক-পত্র’ গ্রন্থের ১ম খণ্ডে দিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে সেগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়া, ১৮৬৮ সনের এপ্রিল মাস হইতে শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত প্রকাশিত সমুদায় বাংলা পত্র-পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি তালিকা দিবার প্রয়াস পাইব। জালাচ্য যুগে শত্রু ও মকদ্দলে বহু পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ ও অকালমৃত্যু বরণ করিয়াছিল। আজিকার দিনে ইহার সকলগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নহে,—অধিকাংশই অযত্নে ও জল-বায়ুর দোষে লোপ পাইয়াছে। এই কারণে আমাদিগকে প্রধানতঃ সরকারী রিপোর্ট ও সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত নূতন পত্রিকার সমালোচনার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আয়াদের বিবরণে অসম্পূর্ণতা থাকা ঘোটেই বিচিত্র নহে।

ইং ১৮৬৮

## ১। সাপ্তাহিক সম্বাদ (সাপ্তাহিক...): বৈশাখ ১২৭৫ (এপ্রিল ১৮৬৮)।

ভবানীপুর হইতে মিশনারীগণ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৭০ সনে ইহা পাক্ষিক পত্রে পরিণত হইয়া ‘পাক্ষিক সম্বাদ’ নাম ধারণ করে। পর-বৎসর ১লা মে হইতে পুনরায় সাপ্তাহিক হইয়া পূর্বনামে প্রচারিত হইতে থাকে। ১৮৭৫ সনের জুলাই মাসে পত্রিকাখানি লুপ্ত হয়।

## ২। সমালোচনী (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৫।

বহুসম্পন্ন সত্যরস যুক্ত হইতে প্রচারিত। “ইংরেজী রিভিউর ধরণে ইহার লেখা।”

## ৩। পদ্যপ্রকাশিকা (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৫।

“পদ্যময়ী পত্রিকা।” পরিচালক—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

## ৪। প্রয়াগ দূত (পাক্ষিক...): বৈশাখ ১২৭৫।

শশিভূষণ মিত্র কর্তৃক এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জ হইতে প্রচারিত। ১২৭৮ সালের ৫ই বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

## ৫। পল্লীগাম বার্তাবহ (পাক্ষিক): শ্রাবণ (?) ১২৭৫।

বৈদ্যবাটী হইতে প্রকাশিত। “পল্লীগামের অবস্থা ও সংবাদ প্রকাশ করাই পল্লীগাম বার্তাবহের প্রধানোদ্দেশ্য।”

## ৬। উত্তরপাড়া মাসিক পত্রিকা: শ্রাবণ ১২৭৫।

“বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করা পত্রিকা-প্রচারকদিগের উদ্দেশ্য।”

সম্পাদক—রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

## ৭। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (মাসিক): শ্রাবণ ১২৭৫।

সম্পাদক—হেমলাল দত্ত, কলুটোলা।

## ৮। হিতসাধনী (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৫।

সম্পাদক—কেশবনাথ বোষ।

## ৯। বোধ-বিকাশিনী (পাক্ষিক): ১ আশ্বিন ১২৭৫।

“বদেশীয় রীতি, নীতি ও আচার-ব্যবহারের আন্দোলন,—দেশ-সাধারণের হিতকর কার্যে যথাসম্ভব পরামর্শ প্রদান,...ও (পাক্ষিক মহাশয়গণের বিরক্তিজনক হইলেও) ক্রমশঃ রচনাশক্তির অভ্যাসই আমাদিগের পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য।”

## ১০। কল্পলতিকা (পাক্ষিক): ১৫ পৌষ ১২৭৫।

সম্পাদক—রামসর্দার বিদ্যাভূষণ, পটোলভাঙ্গা ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের পণ্ডিত।

ইং ১৮৬৯

## ১১। হিন্দু হিতাকাঙ্ক্ষিনী (মাসিক): বৈশাখ ১২৭৬ (এপ্রিল ১৮৬৯)।

ভগসী অঙ্ক:পাতী জিরাট হিন্দুহিতৈষিনী সভার মুখপত্র।

## ১২। মুসল মুন্দার (সাপ্তাহিক): বৈশাখ (?) ১২৭৬।

যক্ষদ্বন্দ্ব হইতে প্রকাশিত।

## ১৩। অবলা বান্ধব (পাক্ষিক...): ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬।

ইহা চাকায় মুদ্রিত হইয়া লোনসিং হইতে প্রচারিত হইত। “সংসারে জীলোকের উপযোগিতা ও জী-শিক্ষার আলোচনা করাই এতৎ পত্রের উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৭০ সনের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ কলিকাতা আগমন করিলে এখান হইতেই ‘অবলা বান্ধব’ প্রকাশিত হইত। ৬ষ্ঠ বর্ষের পত্রিকা মাসিক আকারে ১২৮১ সালের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৭৪) প্রকাশিত হয় ও অল্প দিন পরেই অর্থাভাবে মুদ্র্যমুখে পতিত হয়। ১২৮৬ সালের বৈশাখ মাসে পত্রিকাখানি মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হইলেও দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই।

## ১৪। জ্যোতির্বিজ্ঞান (মাসিক): জুলাই ১৮৬৯।

“বালক-বালিকা ও জী-গণের এককালীন আমোদ ও নীতি-শিক্ষার নিমিত্ত” কলিকাতা ট্রাষ্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের লিখিত দুইটি কবিতা—“পুফলিয়া” ও “কবির ধ্বংসপুত্র” মুদ্রিত হইয়াছে।

## ১৫। বঙ্গদূত (সাপ্তাহিক): ২২ ভাদ্র ১২৭৬।

সম্পাদক—পাদরী সি, ই, ডিওবর্গ, টালীগঞ্জ মিশনের অধ্যক্ষ। “দেশের উন্নতি করা ও গবর্ণমেণ্টের সহৃদয় সাধারণকে বুঝাই দেওয়া” পত্রিকা প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য।

## ১৬। জ্ঞানলহরী (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৬।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র ও বিজয়কেশর বসু।

## ১৭। চিকিৎসা-সংগ্রহ (মাসিক): আশ্বিন ১২৭৬।

সম্পাদক—ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ডি, এল, ডি। “ইহাতে এতদ্দেশীয় এবং ইউরোপ খণ্ডের চিকিৎসাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ হইবে।”

## ১৮। জ্ঞানপ্রদায়িনী পত্রিকা (মাসিক): আশ্বিন (?) ১২৭৬।

## ১৯। দেশহিতৈষিনী (মাসিক): কার্তিক ১২৭৬।

সম্পাদক—রাজকৃষ্ণ দাস, পাথরিয়ামাটা।

ইং ১৮৭০

২০। মধুকরী (মাসিক...) : মাঘ ১২৭৬ (জামুয়ারি ১৮৭০)।

বহরমপুর সত্যরত্ন বস্ত্র হইতে প্রচারিত। “দেশের হিতসাধন ও বিশ্বশুভীর মনোরঞ্জন ইহার উদ্দেশ্য।” ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ‘মধুকরী’ পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়।

২১। বরিশাল বার্তাবহু (পাক্ষিক) : ফাল্গুন ১২৭৬।

ঝালকাটি হইতে প্রচারিত। সম্পাদক—মাণ্ডরা গ্রামনিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র কর। বরিশাল হইতে প্রকাশিত ইহাই বোধ হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

২২। বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৭।

মহিলা-সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র, জর্নকা “খিদিরপুর-নিবাসিনী” [ডবলিউ সি. বোনাক্সার ভগিনী মোসদায়েনী মুখোপাধ্যায়?] কর্তৃক সম্পাদিত। “জীলোকদিগের স্বয়ং প্রভুতির সমর্থন করা ইহার উদ্দেশ্য।” পরমায়ু প্রায় এক বৎসর।

২৩। পাক্ষিক প্রকাশিকা : বৈশাখ ১২৭৭।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

২৪। সঙ্গীত চিন্তাসমুদ্র (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৭।

পরিচালক—উমচন্দ্র সেন ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

২৫। আর্থিক প্রকাশিকা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৭।

ময়মনসিংহের হিন্দুধর্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত।

২৬। মিত্রে-প্রকাশ (মাসিক...) : ৩০ বৈশাখ ১২৭৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—“পূর্ববঙ্গের রাজকৃষ্ণ রায়” হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ইহা ২য় বর্ষে অল্প দিনের জন্য পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হয়।

২৭। রাজসাহী সম্ভার (পাক্ষিক) : ৩১ বৈশাখ ১২৭৭।

বোয়ালিয়ার রাজসাহী প্রেস হইতে প্রকাশিত।

২৮। নিত্যানন্দদায়িনী পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) : বৈশাখ-আষাঢ় ১২৭৭।

“বৈষ্ণব ধর্মের ঐশ্বর্য সম্পাদনাধ” ইহার আবির্ভাব।

২৯। শাস্ত্র-প্রকাশ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭৭।

ইহাতে পুরাণ, তন্ত্রাদি স্থান পাইত। অগমোহিন তর্কালঙ্কার কর্তৃক পরিশোধিত ও ভাষান্তরিত এবং বেদান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইত।

৩০। সজ্জনচিন্তাবিনোদিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭৭।

সম্পাদক—গোপালচন্দ্র মিত্র।

৩১। বঙ্গবন্ধু (পাক্ষিক...) : ১ শ্রাবণ ১২৭৭।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্গেন্দ্র রায়। ইহা কিছু দিন পরে সাপ্তাহিক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ স্থান পাইত।

৩২। সাহিত্য-সংগ্রহ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৭।

ইহাতে প্রথমে হরিনবংশের অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৩৩। মাসিক প্রকাশিকা : কার্তিক ১২৭৭।

পাণ্ডুরিয়াঘাটা হইতে যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৪। নারী-শিক্ষা পত্রিকা (মাসিক) : ১ কার্তিক ১২৭৭।

ঢাকা সুলভবস্ত্র হইতে “জীলোকদিগের শিক্ষোপযোগিনী” এই পত্রিকাখানি প্রচারিত হইত।

৩৫। যুগশিলাবাদ হিতৈষিনী (পাক্ষিক) : ১ কার্তিক ১২৭৭।

সম্পাদক—বেনারিয়াল মুখোপাধ্যায়, সৈন্যবাদ, বহরমপুর।

৩৬। সনাতন ধর্মোপদেশিনী (মাসিক) : কার্তিক ১২৭৭।

কলিকাতাস্থ ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার মুদ্রণতঃ। “বাঁহাতে হিন্দুধর্মের উন্নতি হয়, সেই সকল বিষয়ের অনুশীলন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

৩৭। সুলভ সমাচার (সাপ্তাহিক...) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভা হইতে মাত্র ১ পরসী মূল্যে এই উৎকৃষ্ট পত্রিকাখানি প্রচারিত হইত। “হিত উপদেশ, নানা সংবাদ, আয়োজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের পক্ষে জ্ঞান নিত্য আবশ্যক, চাল ডাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের মূল সভ্য সকল যত দূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে” এই পত্রিকায় স্থান পাইত। ১৮৮৬ সনের ২৭এ আগষ্ট (১৬ খণ্ড, ১ম সংখ্যা) ইহা ‘কুশদহ ও ভেদ্র’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ’ নাম ধারণ করে। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল ভীষিত ছিল। নব পঞ্চায়ে ‘সুলভ সমাচার’ প্রকাশ করেন—নরেন্দ্রনাথ সেন; ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—১ বৈশাখ ১৩১৮; পরমায়ু এক বৎসর।

৩৮। প্রচারিকা (মাসিক...) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

বর্ধমান হইতে প্রচারিত। অল্প দিন পরে ইহা পাক্ষিক পরিণত হয়। পাক্ষিক আকারে ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৪ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ‘প্রচারিকা’ সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে আবির্ভূত হয়। সম্পাদক—প্যারীলাল সিংহ।

৩৯। বিদ্যুৎক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

“বাঁহারা প্রকৃতির গতি ও মানুষের স্বভাব জানিতে আয়োজন বোধ করেন” তাঁহাদিগের জন্য এই রহস্য পত্রিকার জন্ম। সম্পাদক—ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক : ‘সংবাদ প্রভাকর’।

ইং ১৮৭১

৪০। বিশ্বদূত (মাসিক...) : পৌষ ১২৭৭।

৪১। সাহিত্য হুকুর (সাপ্তাহিক) : ৭ জামুয়ারি ১৮৭১।

“অবকাশকালে নির্দোষ আমোদ উৎপাদন করিয়া পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনই” পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল।

৪২। হিতবাদী (মাসিক) : মাঘ ১২৭৭।

ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্র। পরিচালক—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৩। শুভ-সাহিত্য (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৭৭।

ঢাকা, পূর্ববঙ্গ শুভ-সাহিত্য সভার মুদ্রণতঃ। সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইহাতে ধর্মবিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সাহিত্যালোচনাও হইত, সংবাদও থাকিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল ১ পরসী।

- ৪৪। হিতকরী (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৭৭।  
ঢাকা স্মলভ বঙ্গ হইতে ১ পয়সা মূল্যে প্রচারিত।
- ৪৫। প্রাত্যহিক সমাদ (দৈনিক) : ফাল্গুন (?) ১২৭৭।  
এক পয়সা মূল্যের এই দৈনিক পত্র কলিকাতা অবলা বান্ধব বঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইত।
- ৪৬। হিতমিহির (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন (?) ১২৭৭।  
খড়গ হইতে প্রকাশিত, ১ পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র।
- ৪৭। মদ না গরল? (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।  
কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভার "স্বরাপান ও মাদক নিবারণ"-বিভাগের মুখপত্র। তৎকালে কেশবচন্দ্রের অমুরকমণ্ডলীর অল্পতম শিবনাথ শাস্ত্রী কিছু দিন ইহার সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যেক সংখ্যা ২২পাণ ৭৩ মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।
- ৪৮। ভারত-পরিদর্শক (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।  
ইহাতে প্রধানতঃ সাহিত্য ও বিজ্ঞান-ঘটিত বিষয়ই স্থান লাভ করিত।
- ৪৯। বিভাকর (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।  
সাহিত্য-সংক্রান্ত পত্রিকা।
- ৫০। হুল্লভ সমাচার (সাপ্তাহিক...) : বৈশাখ (?) ১২৭৮।  
পুস্তক ও সংবাদপত্রের সমালোচনাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইত। পরবর্তী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে পরিবর্তিত আকারে পাক্ষিক পত্রে রূপান্তরিত হয়।
- ৫১। চিকিৎসা-দর্পণ (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।  
চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-সংক্রান্ত পত্র। সম্পাদক—বহুনাথ মুখোপাধ্যায়।
- ৫২। হালিশহর পত্রিকা (মাসিক...) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।  
"পল্লগ্রামস্থ লোকদিগকে সহপদেণ প্রদানার্থে নানা প্রকার নীতিগর্ভ ও চিণ্ডানুপ্রণ প্রবন্ধ" ইহাতে প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—জ্ঞানকোষ গাঙ্গুলী। 'হালিশহর পত্রিকা' ১ম বর্ষ মাসিক, ২য় বর্ষ পাক্ষিক এবং ৩য় বর্ষে সাপ্তাহিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। ৩য় বর্ষ হইতে ইহাতে সংবাদ ও রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত।
- ৫৩। হিতবাবিনী (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৭৮।  
বিশ্বাসের কুসকাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারপাশা রাম-নিবাসী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী।
- ৫৪। বিজ্ঞান-চক্রবাক্য (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৮।  
জোড়াসাঁকো, চাষাধোনা পাড়া হইতে সহ-সম্পাদক বিশাখলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৫৫। বহাগনগর বার্তাবতী (পাক্ষিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।
- ৫৬। হিন্দু প্রদর্শক (মাসিক) : আষাঢ় ১২৭৮ খ্র।  
"ইহাতে প্রধানতঃ হিন্দু-শাস্ত্র, হিন্দু-সমাজ, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব সমুদায় নিবেশিত হইবে, কিন্তু কোন বিষয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, অপ্রামাণিক বা পুরাতন প্রস্তাব গৃহীত হইবে না। প্রসিদ্ধ হিন্দু যোদ্ধার উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে সাধ্যমত পোষকতা করাও ইহার একটি প্রধান লক্ষ্য।" সম্পাদক—(যশোহর নিবাসী?) নীতানাথ ঘোষ।

- ৫৭। চুঁচুড়া প্রকাশিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৭৮।
- ৫৮। চিকিৎসা-সংগ্রহ (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।
- ৫৯। গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিধান (মাসিক) : জুলাই ১৮৭৯।  
সম্পাদক—উমাচরণ দে।
- ৬০। আর্ঘ্যোদয় (মাসিক...) : জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।  
বাংলাইল হইতে প্রকাশিত। কয়েক মাস পরেই পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদক—প্রিয়নাথ গুপ্ত।
- ৬১। ধুমকেতু (মাসিক) : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮।  
ঢাকা স্মলভ বঙ্গ হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কেবলমাত্র কথা-সাহিত্যই স্থান পাইত।
- ৬২। দেশহিতৈষী (পাক্ষিক) : ১ আশ্বিন ১২৭৮।  
সিরাজগঞ্জের জন্তঃপাতী ফুলকোচা চন্দ্রোদয় বঙ্গ হইতে প্রকাশিত।
- ৬৩। রস-তরঙ্গ (সাপ্তাহিক) : ১০ আশ্বিন ১২৭৮।  
এক পয়সা মূল্যের ক্ষুদ্র-কলেবর পত্রিকা। পরিচালক—সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার।
- ৬৪। বিজ্ঞান রহস্ত (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৮।  
বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম-এ।
- ৬৫। আর্ঘ্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৮।  
ধর্ম-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

## ইং ১৮৭২

- ৬৬। বিশ্বদর্পণ (পাক্ষিক...) : মাঘ ১২৭৮।  
"বঙ্গ-বালিকাগণের শিক্ষাপ্রদায়ী বিজ্ঞান সাহিত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব এবং রাজনীতি ধর্মনীতি সামাজিক নীতিনীতি সংক্রান্ত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করা প্রচারকদিগের অভিপ্রায়।" সম্পাদক—মোহন-লাল বিভাবাগীশ ও তারাকুমার কবিরত্ন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা হইতে 'বিশ্বদর্পণ' মাসিক আকার ধারণ করে।
- ৬৭। জ্ঞানপ্রভা (মাসিক) : চৈত্র ১২৭৮ খ্র।  
ফুলকোচা চন্দ্রোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ঘোড়াচরা হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
- ৬৮। বঙ্গদর্শন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৭৯।  
সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকবর্গের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল।" 'বঙ্গদর্শন'ের বিভিন্ন খণ্ডগুলির প্রকাশকাল :—
- |                    |              |                       |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| ১২৭৯—১২৮২ সাল      | ১ম-৪র্থ খণ্ড | বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত |
| ১২৮৪—১২৮৫ সাল      | ৫ম-৬ষ্ঠ খণ্ড | সতীশচন্দ্র-সম্পাদিত   |
| ১২৮৭               | ৭ম খণ্ড      | ঐ                     |
| ১২৮৮, বৈশাখ-আশ্বিন | ৮ম খণ্ড      | ঐ                     |
| ১২৮৯, বৈশাখ-চৈত্র  | ৯ম খণ্ড      | ঐ                     |
| ১২৯০, কার্তিক-মাঘ  |              | চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে |
- শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত।

৬৯। মধ্যাহ্ন (সাপ্তাহিক) : ২ বৈশাখ ১২৭৯।

সম্পাদক—মনোমোহন বসু। ইহা একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। ইহাতে কবিতা, উপভাষা, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রন্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, এমন কি রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত। দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (১ কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত সাপ্তাহিকরূপে চলিবার পর 'মধ্যাহ্ন' পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাসিকপত্রে পরিণত হয়। মাসিক আকারে ইহা ১২৮২ সালের আশ্বিন পর্যন্ত জীবিত ছিল।

৭০। সাপ্তাহিক পরিদর্শক : বৈশাখ ১২৭১।

প্রকাশক—দুর্গাচরণ গুপ্ত ও তৎপূর সত্যচরণ গুপ্ত। ইহার 'প্রথমার্ধে' পঞ্জিকা, স্রাবাদির আমদানি-বস্ত্তানি ও বাজারদর, বান-বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি... আর দ্বিতীয় অংশ কেবল ব্যাপারগুলি থাকিত।

৭১। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা (সাপ্তাহিক) : ১৫ বৈশাখ ১২৭৯।

বহুসম্পূর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রধানতঃ সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ের অনুশীলন হইত।

৭২। ধর্মসাধন (সাপ্তাহিক) : ২১ বৈশাখ ১৭১৪ শক।

সঙ্গত হইতে প্রকাশিত ১ পয়সা মূল্যের পত্রিকা। ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মসম্মিলনের উপদেশের সারমর্ম সন্নিবেশিত হইত।

৭৩। সর্বার্থ সঙ্কলন (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২৭১।

ইহাতে কাব্য, নাটক, পুরাণ, বেদ, শ্রুতি, সাংখ্য, পাঁচঙ্গল বহুদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ বাগবাজার-নিবাসী কালীক্লেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত ও সংশোধিত হইয়া বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইত।

৭৪। হিতব্রত (মাসিক) : ৩ আশ্বিন ১২৭১।

"হিন্দুদিগের বেদ দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনাই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।"

৭৫। পরিমলবাহিনী (পাক্ষিক) : শ্রাবণ, ২য় পক্ষ, ১২৭৯ (জুলাই ১৮৭২)।

বরিশালের কেওরা গ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বৈজ্ঞানিকোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায়, চক্রেপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার শরৎকুমার রায়ের পিতা।

৭৬। বঙ্গব্রহ্ম (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৭১।

পত্রিকার ১ম পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি মুদ্রিত হইত :—

"জন্মভূমি হুঃখে যার চক্ষে আসে জল,  
জানবান্ সেই তার জনম সফল।"

ইহা হইতেই পত্রিকাখানি কি ভাবে সম্পাদিত হইত তাহার অভাস পাওয়া যাইবে। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র মিত্র।

৭৭। ভারত ভূত্যা (সাপ্তাহিক) : ৩৭শ ১৮৭২।

এক পয়সা মূল্যের সংবাদপত্র। কিছু দিন পরে 'পিপলস ফ্রেণ্ড'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'পিপলস ফ্রেণ্ড ও ভারত ভূত্যা' নাম ধারণ করে।

৭৮। আসাম-মিহির (সাপ্তাহিক) : ১৪ ভাদ্র ১২৭৯।

আসাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র, প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে গৌহাটী হইতে প্রচারিত হয়। সম্পাদক বহুনাথ চক্রবর্তী।

৭৯। আর্য্য-প্রবর (মাসিক) : ১১ আশ্বিন ১২২৯ সন ৭।

"তত্ত্ব-বোধক মাসিকপত্র"। সম্পাদক—জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮০। জ্ঞানাক্ষুর (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭৯।

সম্পাদক—ঐক্য দাস। এই উচ্চাঙ্গের পত্রিকাখানির প্রথম দুই সংখ্যা রাজসাহী বোয়ালিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তারবনাথের 'স্বর্ণলতা' ইহাতেই ১ম বর্ষ বাৎসরিক ভাবে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ণ সংস্করণে "মঙ্গল-বাধা কাগজ"ও ইহাতেই প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রামসরস্ব বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত 'প্রতিবিম্ব' পত্র 'জ্ঞানাক্ষুর' সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। 'জ্ঞানাক্ষুর'ও 'প্রতিবিম্ব'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের "বনকুল", "প্রলাপ" ও প্রথম গদ্য-রচনা—"ভুবনমোহিনী" প্রতিভা, অবসর সত্যোজিনী ও দুঃখসাহিনী" স্থান পাইয়াছিল।

৮১। সঙ্গীত সমালোচনী (মাসিক) : আশ্বিন ১২৭১।

সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। পরমাণু ৬ মাস।

৮২। বঙ্গদর্শন (সাপ্তাহিক) : অক্টোবর (?) ১৮৭২।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত।

৮৩। সমাজদর্পণ (সাপ্তাহিক) : ২৯ কার্তিক ১২৭৯।

চোরবাগান, সরকার-মুদ্রায়ন্ত্রে মুদ্রিত হইত। সম্পাদক—যশোদানন্দন সরকার, ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, বুলনা, জেলা যশোহর। ছোট লাট ক্যাংছের প্রবর্তিত দেশীয় চিহ্নিত সার্ভিস-সম্পন্ন বিধি-ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া সম্পাদক সরকারী চাকুরী হারাষ্টয়াছিলেন।

৮৪। আর্য্যবোধক (মাসিক) : পৌষ (?) ১২৭৯।

'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'র ভারপ্রাপ্ত পরিচালিত ওজ্বলোৎসব পত্র। সম্পাদক—মথুরানাথ শর্মা।

ইং ১৮৭৩

৮৫। বরাহনগর পাক্ষিক সমাচার : জামুয়ারী(?) ১৮৭৩।

সম্পাদক—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮৬। অবকাশ-সহচরী (মাসিক) : জামুয়ারী ১৮৭৩।

সম্পাদক—ডেভিড হজুনীকান্ত বিশ্বাস।

৮৭। সর্বার্থসংগ্রহ (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৭১।

শ্রীরামপুর অংকুশ প্রেস হইতে প্রকাশিত। "বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সন্থা যচিৎ মাসিক পুস্তক।" সম্পাদক—অতুলনাথ তর্কবাগীশ ও কালীবর বোসদত্তবাগীশ।

৮৮। পুলিশ গেজেট ও বঙ্গবার্ত্তাবহ (মাসিক) : ১১ ফাল্গুন ১২৭১।

পুলিস-বিভাগের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে মুদ্রারূপে প্রস্তুত হইত।

৮৯। ভারত-সংস্কারক (সাপ্তাহিক) : ৭ বৈশাখ ১২৮০।

উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। সম্পাদক—মঞ্জিলপুর-নিবাসী উমেশচন্দ্র দত্ত, 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক।

৯০। দূত (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮০।

প্রকাশক—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বৈদিক প্রেসের স্বত্বাধিকারী।

১১। বঙ্গমিহির (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

“বাহাতে খ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে পারমাধিক জ্ঞান ও ভাব সম্বন্ধিত হয়, ঈদৃশ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাষ্ট পত্রখানির মুখ্য উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—জ্ঞাননাথ বঙ্গোপাধ্যায়, ভবানীপুর মিশন কলেজ।

১২। বাঙ্গাইপুর চিকিৎসাসত্ত্ব (পাদিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বাঙ্গাইপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দাস।

১৩। মহাপাপ বাল্য বিবাহ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। বাল্য বিবাহ নিগারণ করা পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য। সম্পাদক—নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

১৪। গ্রামবাসী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

রাণাঘাট হইতে প্রচারিত। দুই বৎসর পূর্বে ‘সাপ্তাহিক সমাচারের’ সহিত মিলিত হইয়া যায়।

১৫। বাল্যবিজ্ঞান (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ বঙ্গ হইতে প্রকাশিত। জ্যোতিষ পত্রিকা।

১৬। গ্রামদূত (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮০।

বাথরগঞ্জ জেলার একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

১৭। বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮০।

কলিকাতা বৈদ্যায়ন বঙ্গ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮। বঙ্গবিধান (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮০।

১৯। বিজ্ঞান-বিকাশ (পাক্ষিক) : ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

খড়দহ হইতে প্রতি পক্ষের চতুর্থীতে প্রকাশিত।

১০০। সহচর (সাপ্তাহিক) : ৩ আষাঢ় ১২৮০।

‘সোমপ্রকাশ’ের আদর্শে পরিচালিত। সম্পাদক—প্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০১। জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক) : আষাঢ় ১২৮০।

পাবনার সন্নিকটস্থ চাটমোহর হইতে প্রকাশিত। তত্ত্বাবধায়ক—মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী।

১০২। সাপ্তাহিক সমাচার : ৫ আশ্বিন ১২৮০।

“যে যে ভ্রষ্টান দ্বারা বাঙ্গালিয়া জাতিগত মহৎ লাভ করিতে পারিবেন, তজ্জ সেই সমস্ত ভ্রষ্টান এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের অমুমোদনীয়।” প্রধানতঃ বহুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা সম্পাদন করিতেন।

১০৩। সমবেদক (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৮০।

বহরমপুর ধনসিদ্ধ ব্রাহ্মণ হইতে প্রকাশিত।

১০৪। তমোলুক পত্রিকা (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

তমোলুক হইতে প্রকাশিত। সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত।

১০৫। অবকাশতোষিণী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

নিউ কলকাতা প্রেস হইতে প্রকাশিত।

১০৬। বঙ্গদর্শন (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র (?) ১২৮০।

চোরবাগান, নিউ সরকার প্রেস হইতে এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

১০৭। পল্লীদর্শন (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮০।

পাবনার অন্তর্গত চাটমোহরের জ্ঞানবিকাশিনী বঙ্গ যুজিত হইয়া হরিপুর হইতে ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত হইত।

১০৮। প্রেমোদিনি (চাতুর্মাসিক) : ১ আশ্বিন ১২৮০।

পাকুড় প্রেমোদিনি সভা হইতে প্রচারিত, কতকগুলি গদ্য-পদ্য রচনার সমষ্টি।

১০৯। সমাজ-দর্পণ (পাক্ষিক) : আশ্বিন ১২৮০।

চন্দ্রনগর হইতে প্রকাশিত ইহাই বোধ হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। সম্পাদকের নিবেদনে প্রকাশ, “ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গদ্য পদ্য রচিত কাব্য সম্মিলিত করিব, ইহা ভিন্ন কুংসিত গল্প বা লোকের কুংসা লিখিয়া পাঠকগণের বিরাগভাজন হইব না।”

১১০। পূর্ণ শশী (মাসিক) : কা্তিকী পূর্ণিমা ১২৮০।

প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১১১। ভারত-সুহৃদ (সাপ্তাহিক) : কা্তিক (?) ১২৮০।

এক পরসামুল্যের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

১১২। হেমলতা (পাক্ষিক) : ১ কা্তিক ১২৮০।

“দেশীয় জীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেক্টর প্রেস।

১১৩। সাধারণী (সাপ্তাহিক) : ১১ কা্তিক ১২৮০।

“রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের নক্ মিটাইবায় জন্ত” অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়া হইতে এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্র। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। এই ‘সাধারণী’ পত্রের ‘বঙ্গবাসী’র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর হাতেখড়ি হয়। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ‘নব-বিভাকর’ ‘সাধারণী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ‘নববিভাকর—সাধারণী’ ৪র্থ ভাগ, ২১শ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়া তিরোহিত হয়।

১১৪। কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা (মাসিক) : ১ অগ্রহায়ণ ১২৮০।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রকুমার রায়।

১১৫। স্রবোধিনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮০।

পাবনা চাটমোহর রামনগর হইতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১১৬। সিহাডসোল পত্রিকা (পাক্ষিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮০।

স্থানীয় সংবাদের সহিত ইংরেজী-বাংলা উভয়বিধ প্রবন্ধই ইহাতে স্থান লাভ করিত।

১১৭। ভারত-দর্পণ ও পুলিশ বার্ত্তাবহ (পাক্ষিক) : ৩ পৌষ ১২৮০।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত।

[ ক্রমশঃ ]

# গীতায়া মাধ্যম

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী

যে যুগে আমরা বাস করিতেছি ইহাকে সাম্যের যুগ বলিলেও অত্যাঙ্কি-হয় না। রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে সর্বত্রই সকলের মূখে সাম্যের কথা। সাম্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়া আজকাল কেহ কোন ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সাহসী হন না, কাজে যত দূর হউক বা না হউক, মুখে অবশ্যই সাম্যের স্মরণোৎসাহ থাকা চাই। এক পক্ষে ইহা ভালো, কেন না, মুখেও অন্ততঃ সাম্যের মহিমা স্বীকার করিতে হয়। আশ্রয় মুখে সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া কাল কাজে তাহা ভঙ্গ করিতেছি, কিন্তু চিপদিন এমন চলিবে না; সাম্যবাদ যখন স্বীকার করা হইয়াছে তখন এক দিন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইহাকে মানিতে হইবে; তবে তাহা সহজ পথে হইবে, কি বিপ্লবের পথে হইবে সে কথা পৃথক্।

সাম্যবাদের সহিত আমরা পরিচিত, আমাদের দেশে তাহা অতি প্রাচীন,—এত প্রাচীন যে, তাহাকে বিশ্বস্তির অক্ষরায়ণ-যুগ বলিলেই ভালো হয়। প্রজাপতি-কগণ অথবা আদমের যুগে এক অতি বিস্তৃত সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল, কিন্তু কালচক্রের আবর্তনে তাহার এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, বর্তমানে তাহার সম্পূর্ণ মূর্তি ধারণা করা অসম্ভব। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অপচেষ্টায় পৃথিবীময় সঙ্গল, অশান্ত-বিস্তৃত সাম্যানীতি বিস্তৃত হইলে এ যুগে ফ্যাসী জনসাধারণই তাহার প্রতিকারের প্রথম চেষ্টা করেন, ইতিহাসে ইহা ফ্যাসী বিপ্লব নামে প্রসিদ্ধ। বিপ্লবীরা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্বপ্নপতাকা উড়াইয়াছিল। সেই বিপ্লবের তরঙ্গের সহিত চিনিয়ার সর্বত্র সাম্যের স্রবোধিত নীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাবই ফলে আজ সর্বত্র—রাষ্ট্রে, সমাজে, গৃহে, দাস্তায়, ঘাটে,—পথে সাম্যের মহিমা-কীর্তন শুনিতে পাঠি। বলা বাহুল্য, ইহা হয় রাষ্ট্রবৈত, না হয় সমাজবৈত, না হয় কণ্ঠবৈত বা কামবৈত সাম্যবাদ। হিন্দুশাস্ত্রে ও ভগবদগীতায় যে সাম্যবাদ ঘোষিত হইয়াছে তাহা ইহাদের সকলের উপরে, ব্যবহৃত সাম্যবাদ তাহাব অংশমাত্র।

গীতার সাম্যবাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব হইতে রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ, কাম ইহাদের যে কোন একটাকে পরিত্যাগ সাম্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, এবং তাহাই সরল এবং স্বাভাবিক পথ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে সাম্যবাদ কীর্তিত হইয়াছে, সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে না পারিলে আশ্রয়ের অভাবে কোনটাই দাঁড়াইতে পারে না। যে যোগমার্গের চরম লক্ষ্য ঈশ্বর বা আত্মোপলব্ধি তাহাও প্রবর্তনতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—অভ্যাসযোগ ও বৈরাগ্যযোগ। বৈরাগ্যযোগ জোর করিয়া অধিকার করিবার বস্তু নহে, কিন্তু অভ্যাসযোগের বেলা খানিকটা জোর-স্ববদান্তিও চলে। রাষ্ট্র বা সমাজবৈত সাম্য গীতোক্ত চরম সাম্যে পৌঁছিবাই একটা পথ মাত্র, এই পথে বিচরণ অভ্যাসযোগের চর্চা মাত্র; কিন্তু যদি কেহ এই পথকেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তাহার সাধনাও নিরর্থক হইবে এবং বাস্তবিক বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত ক্ষোভে সেই পথও পরিহার করিতে হইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে

বর্তমানে বিভিন্ন পথে সাম্যের প্রোত প্রবাহিত, কিন্তু যদি এই সকল প্রোত সমুদ্রে প্রায় মহান আধ্যাত্মিক সাম্যের সহিত মিলিত না হয়, তাহা হইলে অতিবেট ইহা বিকৃত ও দুর্গন্ধ হইয়া বিস্তৃত হইবে,—সাম্যবাদের আদর্শভূমি বৈরাগ্যের এক মরুভূমিতে পরিণত হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী অকুণ্ঠিত ভাবে উচ্চারণ করিতে পারি।

বেদের সকল অংশই সার নহে, বেদে যাত্নালের প্রলাপ আছে, জুগারীদ বিস্ময় আছে—বেদের সার ভাগ উপনিষদ—এবং উপনিষদের সার গীতা, এই ক্ষুদ্র হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের সার গীতা। যদি কোথাও গীতার বিরুদ্ধ উক্তি থাকে তবে তাহা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নহে, এক কথায় গীতা শাস্ত্র-পরীক্ষার নিত্য প্রস্তর। ব্যবহৃত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-উপপুরাণ—গীতারই বিস্তার বা ব্যাখ্যা। ইহা বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, গীতার তাৎপর্য বিবৃত হইলে অজ্ঞান শাস্ত্রের বাক্যও উদ্ধার করিতে হইবে। মন বা গাফিলত যাহা বলিয়াছেন তাহাও গীতা, তবে যদি কোথাও তাহাদের উক্তিও গীতাব-বিরোধিতা হয় তবে তাহা গীতাও নহে, মনও নহে, গাফিলতও নহে—সে কেবল ব্যক্তিগত পণ্ডিত ব্যক্তির বিচিত্র কয়েকটা শ্লোক মাত্র। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিবার আছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি যে হিসাবে শাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি যে হিসাবে ইতিহাস, গীতা সে হিসাবে শাস্ত্রও নহে ইতিহাসও নহে; গীতাব যাহা অধীষ্টান অজ্ঞান শাস্ত্র ও ইতিহাসের তাহাই লক্ষ্য, শাস্ত্র ও ইতিহাসগুলি সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথ-মাত্র। এই ক্ষুদ্র মনু প্রভৃতিতে এমন বহু বিষয় আছে যাহা গীতার নাই। মানব জাতিকে একটা অভ্যাসযোগের মধ্য দিয়া, বিদ্যানান্দানে পরিচালিত করিয়া, এই লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত করাই শাস্ত্রাদিব কাজ। শাস্ত্র পথ, লক্ষ্য নহে, লক্ষ্যে পহা আছে পথে সর্বত্র তাহা নাই—তবে পথ যখন লক্ষ্য-ভেদ হয় তখন তাহা আদ্য পথই নহে। গীতা মহাভারতের একটি অংশ, আবার অংশ নহে বলাও চলে। মহাভারতের যে আখ্যানাংশে ইতিহাস ভাগ অবস্থিত গীতা তাহায় অংশ নহে, গীতা বাদ দিলেও আখ্যানাংশের কোনও ক্ষতি হয় না। এই ক্ষুদ্র গীতার বহু চিত্তাকার ইহার প্রথম অধ্যায় উপেক্ষা করিয়াছেন—কেন না, ইহা আখ্যান ও আখ্যানান্তিরক্ত বস্তুর একটা সংযোগ-মাত্র। কিন্তু গীতা ব্যতীত মহাভারতের পূর্ণতাও অসম্ভব—কেন না ইহার আখ্যান ও ইতিহাস যে সকল স্বীকৃতদর্শকে মানব জাতির দুষ্টির সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছে, গীতা না বুঝিলে তাহাদের বুঝা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতিতে বর্ণিত হইলে গীতা বুঝা প্রয়োজন,—এমনি কি দুর্ঘোষদকে বর্ণিত হইলেও। যুধিষ্ঠির “দধ্মময়ো মহাদমঃ” আর দুর্ঘোষদ “মদ্ব্যময়ো মহাদমঃ”—উভয়কেই বুঝিবার প্রয়োজন আছে।

সাম্যবাদের সম্বন্ধে গীতায় কি আছে মোটামুটি তাহার একটা বিবরণ দিতেছি—।



ভগবান স্বয়ং—“অবিভক্তক ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্ ॥”  
১৩।১৬ ( ভূতসমূহে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের দ্বারা বিরাজিত )।  
এবং—

সমং সর্বেষু ভূতেষু ঈশ্বরঃ পরমেশ্বরম্ ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যাত্ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।

সমং পশ্যন্তি স পশ্যন্তি সমবস্থিতমাত্মনম্ ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মনঃ ততো য়াতি পরং গতিম্ ॥ ১৩।১৭-২৮

( যিনি নশ্বর ভূতসমূহে অবিনশ্বর পরমেশ্বর সমভাবে বিরাজমান এইরূপ দেখিয়া থাকেন তাঁহার দৃষ্টিই প্রকৃত দৃষ্টি । সর্বত্র ঈশ্বরকে সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া যিনি স্বয়ং অল্প কাহারও হিন্দা করেন না, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন । )

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে গবি তত্বিনি ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতঃ সমদর্শিনঃ ।

ইহৈব তৈজ্জিতঃ স্বর্গো মেধা সাম্যে স্থিতঃ মনঃ ।

নির্দোষঃ হি সমঃ স্তব্ধঃ তথাপি তে স্থিতাঃ ॥ ১৩।১৮-২৯

( যাহারা প্রকৃতই পণ্ডিত তাহারা বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কুদ্বয়মাতোজী অস্ত্রাজ, হস্তী, গাভী ও কুদ্বয়সংগে এক বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন । যাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত তাহারা এই পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গ ভ্রম করিয়াছেন, কেন না সম বলিতে নির্দোষ ব্রহ্মবস্তুরকই বুঝায় এবং যাহারা সাম্যে অবস্থিত তাহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত । ) এই সমস্ত উপলব্ধি করিতে হইলে যোগযুক্ত হইতে হয় । সে যোগ কি ?—

যোগঃ কুরু দক্ষাণি সঙ্গং তাত্ত্বা পন্থয় ।

সিদ্ধাসিন্ধ্যোঃ সমো দ্বন্দ্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮

( হে ধনশ্রয়, আসক্তি বিবর্তিত হইয়া এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া যোগপন্থ হও এবং বাক্ষ্য কর । সমত্বই যোগ । ) এবং—

স্বথঃস্বমে সমে কৃতা কাভিলাভৌ জগদ্রয়ো ।

ততো যুক্তায় যুতায় নৈব পাপমবাপ্তাসি ॥ ২।৩৮

( স্বথ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, ভয় ও পরাজয় তুল্য মনে করিয়া সমদ্রব যোগে যুক্ত হইয়া কাজ কর, তুমিই কোন পাপ হইবে না । )  
পাপ তো হইবেই না, পরম—

সমগ্রঃস্বথঃ দীর্ঘঃ সৌম্যুত্বায় কল্পতে । ২।১৭

( যাহার নিকট স্বথ ও দুঃখ উভয়ই সমান তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন । )

সর্বভূতঃসমাশ্রানঃ সর্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈদৃশে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমধর্মনঃ ॥

যো মাং পশুতি সর্বত্র সঙ্গক ময়ি পশুতি ।

তস্যাং ন প্রণশ্যামি স চ যেন প্রণশ্যতি ॥ ৬।২১-৩০

( যিনি সর্বভূতে পরমাশ্রয়ক ও পরমাশ্রয় ভূতসমূহ সমযোগযুক্ত হইয়া সমভাবে দর্শন করেন, যিনি আমাকে সর্বত্র এবং বাহ্য কিছু আমাতে অবস্থিত অবলোকন করেন, তিনি আমাকে কখন হারান না, আমিও তাঁহাকে হারাই না । )

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীকতে ।

অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ১৮।২০

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮।৫৪

( সর্বভূতে যিনি এক বুদ্ধি ও ক্ষয়হীন অব্যয় ভাব বা সত্তা দর্শন

করেন, যে ভাব বিভক্ত বস্তুসমূহে ও অবিভক্তরূপে অবস্থিত, তাহাকে উপলব্ধি করেন তাঁহার জ্ঞান সাত্ত্বিক । যিনি সর্বভূতে সমভাবে পশ্যেন তিনি আমার আত্মাত্মিকী ভক্তি লাভ করেন । )

এই সকল উদ্ভূতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আজকাল বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে যে সাম্যবাদ ঘোষিত হয় তাঁহার সাম্যবাদ ঠিক তাহা নহে । ইহা হইতে যাহারা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয়, সামাজিক বা আর্থিক অধিকার সকলের সহিত সমভাবে লাভ করিবার জগা ব্যগ্র, তাহাদের আপাত পবিত্রতার কোন সম্ভাবনা নাই । গীতার সাম্যবাদ বুঝিতে হইলে একটু গীর ভাবে প্রবেশন করিতে হইবে ।

গীতায় যে সাম্যের কথা বলা হইয়াছে, হানোদ্যা উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ খণ্ডে তাহাকেই বলা হইয়াছে ভ্রমা । ভ্রমা সথক্ষে বলা হইয়াছে—“যে বৈ ভ্রমা তৎ স্তবং, নান্দ্রে স্তবমস্তি” বাহ্য ভ্রমা তাহা স্তব, অন্ত্রে স্তব নাই । ভ্রমা ও অন্ত্র সথক্ষে বলা হইয়াছে—

“যত্র নাশ্রয়ং পশুতি নাশ্রয়চ্ছ্রোতি নাশ্রয়বিজ্ঞানান্তি স ভ্রমা, অথ যত্রাশ্রয়ং পশুতি অশ্রয়চ্ছ্রোতি অশ্রয়বিজ্ঞানান্তি তদশ্রয়ঃ; যো ভ্রমা তদশ্রয়তমঃ, যদশ্রয়ং তদশ্রয়ম্ ॥”

অর্থাৎ মানুষ যখন সেই পরমাশ্রয়স্থল ঈশ্বরকে ব্যতীত অন্য কিছু দেখে না, শুনে না বা জানে না, সেই জানিই ভ্রমা জ্ঞান এবং যখন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু দেখে, শুনে বা জানে সেই জ্ঞান অশ্রয় । ভ্রমা অমৃত এবং অশ্রয় মর্ত্য । ইহার একটা দৃষ্টি সমগ্র ও বৈচিত্র্যহীন ও আর একটা দৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে পৃষ্ঠ—একটা সংশ্লেষণাত্মক (Synthetic) ও একটা বিশ্লেষণাত্মক (Analytic) । আমাদের আধুনিক সাহিত্য হইতে যাত্রা কিছু বিদ্যা তাহা এই অশ্রয় হইয়া, অশ্রয়ের দৃষ্টিতেই আমরা মগ্ন । বিজ্ঞান ও দর্শন শব্দ হইতে ভ্রমার দিকে যাত্রা করিয়াছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অশ্রয়ের কোলাহল এত বেশী যে, ভ্রমার স্রোতে স্রষ্টা বেশট প্রায় হারাইয়া যায় । এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে জলে, স্থলে, আকাশে; মানব, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ; স্বাভাবিক ও জঙ্গমে; বৃক্ষ ও তৃণ; নৃত্য ও নীপশিখায়; পদ্যতে ও লোকোপেক্ষায় সেই অশ্রয়, অবিভক্ত, অদ্বয় ঈশ্বরকে দর্শন করিতে বলিলে কেই বা তাহা বুঝিবে, কেই বা তাহাতে কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করিবে? যে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন “সমত্বমাবধানমচ্যুততঃ”—সমত্বই ভগবানের আরাধনা, তিনি পায়ের স্তম্ভেও ঈশ্বরদর্শন করিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহারই মুখে শোভা পায়, সকলে তো আশা প্রহ্লাদ নহে !

এই আপত্তি সমাচীন । যাত্রা কাথাক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব তাহার প্রয়োজনীয়তাও কম । দ্বিতীয়তঃ, গীতা ভগবানের উক্তি : সামান্য এক জন কৃষক ও মজুর-নেতাও যখন রামা ও শ্রামা মহামহিম রামচন্দ্র ও শ্রামচন্দ্র হইতে কোন অংশে নান নহে, পরন্তু সমান— ইহা না বলিয়া দলে লোক সংগ্রহ করিতে বা বক্তৃতা জমাইয়া পায় না—তখন ভগবানকেও দুই-একটা ঐ রকম কথা বলিতে হইবে বৈ কি? ইহা তো বক্তৃতার কৌশল । তৃতীয়তঃ, সদস্য ধর্মপ্রবক্তারাষ্ট এই ধর্মের কথা বলিয়াছেন, ইহাতে গীতার নূতনত্ব কি ?

এই সকল কথা উত্তর দিতে হইলে আমাদের হিন্দুশাস্ত্র

অগ্রহণও একটু দৃষ্টি দিতে হইবে। দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, ভগবান্ কৃষক ও মজুর-নেতার অধিকরণ করেন নাই, ভগবৎকৃষ্ণ মধ্য য়ে গভীর সত্য আছে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারেও আমরা তাহাই অবলম্বন করিয়া কাঁড়াইতে চাহি, তবে এক্ষেত্রে আমরা মূল্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সাম্যের শাখা-প্রশাখা লইয়া টানাটানি করি মাত্র। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, গীতা ব্যতীত আর কোথাও 'যাহা কিছু সমগ্রই ঈশ্বর' এ কথা বলা হয় নাই। বাইবেল বা কোরাণে ঈশ্বর এক হইলেও ভক্ত ও ভগবান্ দুই—ভক্তও যে ভগবান্, সাম্যও একটা কীট ও ঈশ্বরের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নাই এ কথা গীতা ও উপনিষদেই আছে, অথ কোথাও নাই। বাইবেল ও কোরাণের মতে ভূমি জ্ঞান অপরাধ, 'আনালিহক্' বা 'সোতহম্মা' বলিলে সেই অপরাধে শিরাজ্ঞেয় হয়। সকলে ঈশ্বরের সম্মান, অতএব ভাউ ভাই; এই জ্ঞান অপেক্ষাও সকলেই ঈশ্বর ইহা আরও উপরের কথা। ভ্রাতার মনো পিতার অংশ মাত্র অবস্থিত নহে, ভ্রাতৃত্বপে পিতাই অবস্থিত, ইহাই গীতায় উপদেশ।

এইরূপ আমরা প্রথম আপত্তিটির যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। আমাদের পিতামহেরা তাঁটার সাহেবের ইতিহাস পড়িতে পড়িতে শিখিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ অপেক্ষা বড় কলঙ্ক নাই, লোকের জ্ঞান অত্যাচারী কেহ কখনও হয় নাই। আজ যদি বলা হয় যে, জাতিভেদ হিন্দুশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে এবং হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা গীতায় লক্ষ্যে পৌঁছিবীর জন্য অভ্যাসযোগের দ্বারা, তাহা হইলে অনেকের কানেই তাহা নূতন শুনাইবে।

গীতার লক্ষ্য প্রতিপাদ্য উক্ত লক্ষ্য—কিন্তু সেই উক্ত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে তাহার জন্য প্রস্তুতি চাই, এই প্রস্তুতির জন্য চাই গুণাগুণ বা যোগ্যতা ও অযোগ্যতা দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ। যাহা আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ (Scientific classification) তাহাই প্রাচীন-বালকের জাতিবিভাগ। অধিকার বিবেচনা করিয়াই গীতামতে, প্রত্যেক অধিকারভেদে হিন্দুসমাজ গোড়া হইতেই গীতার কার্যকরী হইয়াছে। যে বালক আজ পাঠশালায় অষ্টম ইংরেজি কণ্ঠে কালে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষার উত্তীর্ণ উক্ত হইয়া বালকের পিতা ও শিক্ষক উভয়েরই কাম্য কিন্তু ক্রমে যে সে ব্যক্তিত্ব না করিয়া তাহাকে তো আর প্রথমেই চরম শ্রেণীতে লাইয়া দেওয়া যো না। হিন্দু জীবনের লক্ষ্য চারিভাগে ভাগ দিয়াছে—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জন্মান্তরীণ স্মৃতি বা ক্রমের প্রস্তুতি ব্যতীত কেহ মোক্ষের অধিকারী হয় না—কিন্তু অপর তিনটিতে সকলেরই অধিকার, এই জন্য চতুর্গুণ অপেক্ষা ত্রিবর্গের বৃদ্ধি প্রথমে বিবেচনা করা উচিত। এক্ষেত্রে হিন্দুশাস্ত্র মত দেখাইয়াছে—সামান্য শিক্ষার বা সাম্যমাত্র দীক্ষিত হইবার এই স্থানে। ত্রিবর্গের মধ্যে কোনটি ছোট বা কোনটি বড়—কেন কি অর্থ বা কাম হইতে ধর্মও বড় নহে। মনু এ ক্ষেত্রে বলিয়াছেন—

ধর্মার্থব্যক্ত্যন্তে শ্রেয়ঃ কামার্থো ধর্ম এব চ।

অর্থ এবং বা শ্রেয়ঃস্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ। ২।২২৪

কাহারও মতে ধর্ম ও অর্থ, কাহারও মতে কাম ও অর্থ, এবং কাহারও ধর্ম বা অর্থ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পরস্পরের অবিরোধী ধর্ম, অর্থ

ও কামের সমভাবে উপাসনাই প্রকৃত শ্রেয়ঃ। এই বিষয়ে যদুভগীতার একটি উক্তি আরও বিশদ ও তন্দ্রা। শ্লোকটি এই—

ধর্মার্থকামাঃ সমদেব সেবা—

নো হোকসন্তঃ স নরো জঘনঃ।

তয়োঃ দাক্ষ্যঃ প্রবদন্তি মদা

স উত্তমো যোহতিব্রতস্ত্রিবর্গে। (৪।১ শ্লোক)

(ধর্ম, অর্থ ও কামের সমভাবে সেবা করা উচিত। যে ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে কেবল একটিতে আসক্ত সে অতি নিকৃষ্ট, যে দুটিতে আসক্ত সে মধ্যম, এবং যে তিনটির প্রতি সমভাবে আসক্ত সে উত্তম পুরুষ।) জীবনের প্রতি কক্ষে যদি এইরূপ সমতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে ভারসাম্য বক্ষিত হয়, কেহ অসাম্য (unbalanced) হইয়া পড়ে না। ইহার পর জাতি ও বর্ণানুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা। জাতি কথটি বৈয়াকরণ, নৈয়ামিক ও মার্দেরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ জন্ম হইতে জাতি, ভ্রাতৃগণের পুত্র ভ্রাতৃগণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। জাতি অপেক্ষাও বর্ণ আরও প্রয়োজনীয়—কেন না শাস্ত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের ব্যবস্থা রক্ষাছে, জাতিশ্রম বলিয়া কোন কথা নাই। এই ধর্ম সম্বন্ধে গীতায় বলা হইয়াছে যে—

চাতুর্য্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্মা কর্তব্যমপি মাং বিদ্বাকর্ন্ত্যায়মব্যয়ম্। ৪।১৩

(গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমিই চতুর্গুণ সৃষ্টি করিয়াছি। যদিও আমি কিছুই করি না, তথাপি ইহার কর্তা আমাকেই বলিতে পার।) এই উক্তির তাৎপর্য্য গীতার অর্চনায় অধ্যায়ে যে স্থানে লোকাদির গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারা যায়। সে স্থানে—

শমোদনশুপঃ শৌচং স্বাশ্রিত্যর্জ্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্ম কশ্মলভাবকম্। ১৮।৪২

এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকের কর্মকেই স্বভাবজ বলা হইয়াছে। এ স্থলে স্বভাব বা প্রকৃতিই কর্তা। যেতাত্ত্বের উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

স্বভাবমেকৈ কবচো বদন্তি কাংসং তথাগ্রে পরিমৃত্যমানাঃ।

দেবশ্রেয়ঃ মহিমা তু লোকৈ যেন্দং ভাস্মাতে ব্রহ্মচক্রম্। ৬।১

(যে দেবতা এই ব্রহ্মচক্র প্রামিত করিতেছেন তাহাকে কোন কোন বিদ্বান্ স্বভাব, কেহ বা মোহিত হইয়া তাহাকে কাংস বলিয়া থাকে, ফলতঃ এই অগদ্যব্যাপার—সেই ঈশ্বরেরই মহিমা-প্রসূত।) স্বভাবরূপী ভগবান্কে কর্তা বলাও যায়, নাও বলা যায়, কেন না যাহা স্বাভাবিক তাহার কর্তা কল্পনা করা বৃথা।

বর্ণ—মাতা-পিতা বা বাস্তব উপর নির্ভর করে না, ইহা লোকের স্বাভাবিক গুণ; পক্ষান্তরে জাতি মাতা-পিতার উপরই নির্ভর করে। গৌতম ধর্ম উপনিষদ-প্রসিদ্ধ সত্যকামকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই; কিন্তু সত্যকাম যে বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ তাহার তিনি যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াই বলিয়াছিলেন—“অবাক্ষণ নহ তুমি তাত।” কিন্তু সাম্যভাব বিনষ্ট হইয়া স্বয়ং বৈশ্যময় উদয় হইয়াছে তখন হইতে এই উদারতাও লুপ্ত হইয়াছে। “তেন তুল্যং ক্রিয়া চৈব বতিঃ” পানিনির এই সূত্রে ভাষ্যকার পতঞ্জলি, “শব্দমাত্রের অর্থ তাহার গুণ

সমূহকে বুঝাইয়া থাকে' ইহার উদাহরণ দিতে যাইয়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণের গুণাগুণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“তপঃ ক্রতং চ যোনিশ্চ এতদ্ ব্রাহ্মণকারণম্।

তপঃ ক্রতভাৱা যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ।

তথা গৌরঃ শুচ্যচারঃ পিঙ্গলঃ কপিল কেশ ইত্যোতানপ্যভ্যন্তরান্ ব্রাহ্মণ্যে গুণান্ কুর্কন্তি।” (কেহ তপস্বী বলে, কেহ বিদ্যা বলে এবং কেহ ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণদের এই তিনটি কারণ, তবে যাহার তপস্বী বা বিদ্যা নাহি সে মাত্র জাতি ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ, শুদ্ধাচার, পিঙ্গল বা কপিল কেশ ইত্যাদি আভ্যন্তর গুণগুলিও ব্রাহ্মণের লক্ষণ।) বিধিবিধান ক্রিয় হইয়াও তপস্বী দ্বারা, কাকীবাণ প্রভৃতি শূদ্র-গণকে উপপন্ন হইয়াও বিদ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহার না আছে তপস্বী, না আছে বিদ্যা সেই জাতিব্রাহ্মণ কি সত্যই ব্রাহ্মণ? ভাব্যের টাকাকার আচাৰ্য্য কৈয়টট্টহার উত্তরে বলিয়াছেন—

“নার্দো পরিপূর্ণো ব্রাহ্মণঃ! জাতিস্বৰ্ণৈকদেশাশ্রয়স্ত তত্র ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগঃ। অতএব চ তস্য সৰ্বাস্থ ব্রাহ্মণক্রিয়ান্ন নাস্ত্যধিকারঃ” (অর্থাৎ মাত্র জাতি-ব্রাহ্মণ—পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ নহে, মাত্র ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্ম বলিয়া লক্ষণের একদেশানুসারে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়, অতএব ব্রাহ্মণাচারিত সকল কার্যে তাহার অধিকার নাই।)

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য—এক জন জাতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, কিন্তু বর্ণানুসারে নহে; আর এক জন বর্ণানুসারে ব্রাহ্মণ, কিন্তু জাতি অনুসারে নহে—ইহাদের মধ্যে কাহার গৌরব অধিক? মত্ব ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—

অনার্য্যমাধ্যাক্ষাণমার্য্যকানার্য্যকাম্রণম্।

সম্প্রদার্য্যবীক্ষ্যাহ ন সম্যো না সমাবিতি। (১০।৭৩)

(যা তা আর্য্যকপ্পা অনার্য্য ও অনার্য্যকপ্পা আর্য্য—উভয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা দুই জনে সমানও নহে, অসমানও নহে।) বলা বাহুল্য, উত্তরটিতে দাতার দোহাই দেওয়া হইলেও ইহা স্পষ্ট নহে, বেদে তপস্বী ও বিদ্যার প্রভাবে অত্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণ হইতে দেখা গিয়াছে। মহাভারতের ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে (শাস্তি ১৮১ অঃ) যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অস্পষ্ট। সে স্থলে বলা হইয়াছে যে, এরূপ অবস্থায় শূদ্রও শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। যদি ইহার এইরূপ অর্থ হয় যে শূদ্র শূদ্র নহে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে—অর্থাৎ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা হইলে অর্থ অনেকটা পরিষ্কার হয়। বর্তমান কালে যে মনুসংহিতা প্রচলিত তাহার মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ভঙ্গন ধরিবার যথেষ্ট পরিচয় আছে—এই যুগেই গীতার উদার আদর্শ হইতে আমাদের সমাজ একটু একটু বিচ্যুত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এ স্থানে অপ্রাসঙ্গিক।

একটু প্রশিধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, গীতার সাম্য-বাদের কথা বলিতে যাইয়া জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইল তাহা বার্ষ্য আলোচনা নহে। গীতা ভগবদ্ভক্তি হইলেও ইহা বলিবার জন্য শীতলগনকে শরীর ধারণ করিতে হইয়াছিল, একটা দেশে ও সমাজে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে তাহা বলিতে হইয়াছে।

অথচ যে দেশে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণাশ্রমের দেশ, শ্রুতির বিধানে সে স্থানে এক বর্ণের সহিত অত্র বর্ণের বিস্তর ভেদ, অতএব এত ভেদের মধ্যে কিরূপ সাম্য প্রচারিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, গীতার জাতি অপেক্ষা বর্ণের উপর বেশী নির্ভর করা হইয়াছে, বর্ণ স্বভাব-নির্দিষ্ট। ভগবানের উদ্দেশ্য এমন সাম্য প্রচার করা যে, মাত্রেই মাত্রেই দূরে থাকুক—জগতের কোন পন্থার সহিত মাত্রেই ভেদ-জ্ঞান না থাকে। কিন্তু এই জ্ঞান তো সহজে উপপন্ন হইবার নহে—ইহার জন্য চাই সংস্কার বা শিক্ষা। শিক্ষা দিতে হইলেই অধিকারী ভেদ নির্ণয় করা উচিত। স্বভাবনির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমে সেই ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং তীব্রবর্ণ বা নিম্নাধিকারীকে শিক্ষার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উন্নীত করিয়া লইবার জন্যই বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় দেখিতে পাই, যতই উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই ভোগ সঙ্কচিত ও সংযম বর্ধিত হইয়া চলে। আহা-বিহারে শূদ্র যেরূপ যথেষ্টাচার হইতে পারে ব্রাহ্মণ তাহা পারে না। শূদ্র-পথায় হইতে ব্রাহ্মণ-পথায় আসিতে গেলে শেষে জ্ঞান মাত্র সম্বল ও অতি-সংযত হইতে হয়—বলা বাহুল্য, এই অবস্থাই উচ্চতম জ্ঞান ও অমুক্তির পক্ষে অনুকূল। গীতার উক্তির তাৎপর্য্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, আস্ত্রা যথোচিত সংস্কার লাভ করিলে এক বর্ণ হইতে অত্র বর্ণে গমনের উপায় ছিল। তপস্বী ও বিদ্যার সাহায্যে নীচ উচ্চের সমতা লাভ করিতে পারিত। সাম্য তখন অজ্ঞান করিতে হইত, কাজেই তাহার মূল্য ছিল—আইন করিয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার বিধান তখন হয় নাই। বেদে ও পুরাণে বর্ণপরিবৃত্তির যথেষ্ট উদাহরণ আছে, বাতল্য বোধে তাহার উল্লেখ করিলাম না। পরবর্ত্তী কালে বর্ণ ও বর্ণাশ্রম গাত্র আধারবর্ত্তে সীমাবদ্ধ হইয়াছে, ইহার বাহিরে সকলেই স্নেহ। ঐবিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে, আধারবর্ত্তের বাহিরে পৃথিবীর সর্বত্রই চতুর্দণ্ড ও বর্ণাশ্রম ছিল—সে স্থানে স্নেহের প্রসঙ্গও নাই, গীতার সময়েও বোধ হয় সর্বত্রই বর্ণবিভাগ ও বর্ণাশ্রম ছিল: স্মরণ্য ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ থাকিলেও সমগ্র মানব জাতির পক্ষেই উহা প্রযোজ্য। আধুনিক কালে নৃতত্ত্ববিদগণ চক্ষুর তারকা, মস্তক, ললাট ও গাণ্ডের অস্থি, কেশ ও গাত্রবর্ণ প্রভৃতি দেখিয়া যেমন মানবের শ্রেণী বিভাগ করেন ও এই শ্রেণী বিভাগে মঙ্গোলীয়, প্রোটো অস্ট্রিক বা ককেশীয় হওয়া যেমন গুণেরও নহে, দোষেরও নহে, গীতার অভিপ্রায় অনুসারে গুণানুসারে তেমনই ব্রাহ্মণাদি শ্রেণী নির্দেশ করা উচিত। মঙ্গোলীয় কিছুতেই ককেশীয় হইতে পারে না, কিন্তু শারীরিক পরিবর্ত্তন না হইলেও মানসিক পরিবর্ত্তনে শূদ্র তখন ব্রাহ্মণ হইতে পারিত। গীতার এই সাম্যনীতি আমরা বহু কাল তুলিয়াছি। নিম্নবর্ণ হইতে ক্রমেগ্নয়নের দ্বারা উচ্চবর্ণে উন্নীত করার জন্যই যে বর্ণাশ্রম-বিধির প্রবর্ত্তন হইয়াছিল—সাময়িক প্রয়োজনে বা বুদ্ধির জোবে তাহাই বর্ণবিমুক্ত হইয়া জাতির অমুকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত জাতি অনুসারেই ব্রাহ্মণ-কৃত্রিম প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের ধর্ম্ম পালন করিত ও এই ভাবে জাতির সহিত বর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক সময় বাহা ছিল ভূষণ, কালক্রমে তাহাই শূন্যে পরিণত হইয়াছে। এই জাতীয় সামাজিক বিপ্লবের ফলেই আমরা

গীতার সাম্যবাদকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে পারি নাই, এবং আমাদের জাতীয় অধঃপতন হইয়াছে।

গীতার সাম্যবাদের প্রসঙ্গে একটা কথা বলিবার আছে। গীতার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল ভেদ এক বটেই—স্ত্রী-পুরুষও কোন ভেদ নাই। কথাটা হিন্দুর কানে একটু কেমন কেমন শুনাইবে, তথাপি বলিবার কারণ এই যে, অনেকে হয়তো জানেন না যে, কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে নারীদের মুক্তিভেদও অধিকার নাই। অবশ্য হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রীচুড়পূঙ্গা যথেষ্ট আছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উক্তি হইতে এই দৃষ্টান্ত শাস্ত্রের উক্তির ভাৎপর্ঘ্য বৃদ্ধিতে পায়া যাইবে। আসক্তি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতে পতনের কারণ। পুরুষ ও নারীর পরম্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আসক্তি আছে, এই আসক্তিকে ভাগবতে স্বয়ংগ্রহি বলা হইয়াছে। হৃদয়গ্রহি হইতে মুক্তিরূপের চক্র পুরুষ ও নারীর পরম্পরের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উভয়ের অধিকারই সমান। পুরুষও নারীর পক্ষে যতটা ত্যাজ্য, নারীও পুরুষের পক্ষে ততটাই ত্যাজ্য। ভাগবতের প্রোক্তটি এই—

পুংঃ স্ত্রীয়া মিথনীভাবমেতং

তয়োর্মিথো স্বয়ংগ্রহিমাভঃ।

অতো গৃহক্ষেত্রমত্যাগুচিতৈঃ

জনস্ত মোহোহয়মহং মনেন্দি ॥ ৫।৪।৮

(পুরুষ এবং নারীর এই যে মিথনী ভাব ইহাকেই তাহাদের স্বয়ংগ্রহি বলা হয়। অতএব মানবে গৃহ-ক্ষেত্র-পুত্র-আত্মীয় ও সম্পদ তেঁজু আম ও আমার এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়)। গীতারও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

মাং তি পার্থ বাপাশ্রিত্যঃ যেহপি স্ত্র্যাঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রীয়ো বৈষ্ণবাস্থা শূদ্রাস্তেহপি বাস্তি পরাং গতিম্ ॥ ১।৩২

(হে পার্থ, আমাকে আশ্রয় করিয়া নারীগণ, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ এমন কি যাহারা পাপযোনি তাহারাও মুক্তিরূপে করিয়া থাকে)। গীতোক্ত লক্ষ্যে পৌছিতে জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্বিষয়ে নরনারী সকলেই অধিকার আছে। সমাজের মধ্যে যতটা বৈচিত্র্য, যতটা ভেদের সৃষ্টি, তাহা কেবল পরম সাম্যে উপস্থিত হইবার চক্র প্রস্তুতি মাত্র।

আর্থিক সাম্য বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নারীদের উক্তিরূপে যাহা কথিত হইয়াছে, আজ পর্যন্ত কোনও সাম্যবাদী তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নারদ বলিয়াছেন—

যাবদ্বিষ্যতে চর্য্যং তাবৎ স্বধ্বং হি দেহিনাম্।

যোঃধিকমভিমন্যোত স স্তেনো দণ্ডমহতি ॥

(যে পর্যন্ত না উন্নয় পূর্ণ হয়, সেইটুকু থাকে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে। তাহারও অধিক বস্তুতে অধিকার আছে বলিয়া যিনি মনেও করেন তিনি চোর এবং দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য)। সাম্যের লক্ষ্যে উপস্থিত হইতে হইলে এই সকল পথ মাত্র—গীতার সাম্যবাদের সহিত ইহার কোথাও বিরোধ নাই বলিয়া ইহাকেও গীতোক্ত সাম্যবাদ বলিতে পায়া যায়।

শেষ কথা এই—গীতা বলিতেছেন সকলেই সমান। জগতে অসীম বৈচিত্র্য, কিন্তু এই অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও একই বস্তু অবস্থিত এবং সে বস্তু স্বয়ং ভগবান্। তিনি বিভক্তের মধ্যে

বিভক্তবৎ প্রতীয়মান, বস্তুতঃ তিনি অখণ্ড অবিভক্ত। সর্বভূতে ভগবদ্বর্শনই সাম্য। সম শব্দের অর্থই পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর, তাহা ব্যতীত বাহা কিছু জ্ঞান হয় সকলেই অসম বা বিষম। সর্বত্র সম বিদ্যমান, এই সমকে উপলব্ধি করা ও তাহার সেবা করাই সাম্য। দরিদ্রকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা বা দয়া করিবার অধিকারও আমাদের নাই, ধনীকে ঈর্ষ্যা করিবার অধিকারও নাই। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, স্বাভাব, জন্ম সকলই ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ। আমার মধ্যেও যিনি সকলের মধ্যেই তিনি। সকলকে আপনার মত দেখিতে হইবে—ইহাই যোগীর কর্তব্য।

আত্মোপায়ো ন সর্বত্র সমঃ পৃথগ্ভিৎ যোহর্জুন।

অথ বা যদি বা দুঃখঃ স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬।৩২

গীতার সাম্যবাদে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ বা বস্তুপাতের স্থান নাই। জগতে কেহ কাহারও প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে না—ঈশ্বর জ্ঞানে, আসক্তি-বিরহিত হইয়া সকলে সকলের সেবা করিবে, ইহাই গীতার সাম্যবাদ।

পৃথিবীময় আজ যে সাম্যবাদ প্রচলিত ইহার মূলে আছে অর্থ, কাম, সমাজ, রাষ্ট্র—বড় জোর মানব; ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। এই সাম্যবাদ আসক্তি-বিরহিত নহে, তাই ইহাতে আছে ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ, হিংসা ও বস্তুপাত। ইহার ভিত্তি অতি চঞ্চল—যে কোন মুহূর্ত্তে ইহার পতন হইতে পারে। বর্তমান যুগে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের আবশ্যক হয় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যও বৈষম্যকে প্রেরণ দান করিতে হয়। প্রাচীনদের ভাষায় ইহা হস্তি-মানের জায় যুধা, হস্তি মন করিয়াই ধূল্য গড়াগড়ি দেয়। আসক্তিতা ও প্রেমের উপর যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত নহে, যে সাম্যবাদের সহিত নানাপ্রকার স্বার্থ এবং আসক্তি বিজড়িত, তাহার স্থানিতির কোন আশা নাই, বালুকার উপর গঠিত হস্তের স্তর তাহা এক দিন ভাঙ্গিয়া পড়িবেই। আধুনিক সাম্যবাদ গীতার ভাষায় আত্মরিক সাম্যবাদ। আত্মরিক ভাবের কথা বলিতে বাইরা ভগবান্ বলিয়াছেন—“যাহারা অস্বভাবাপন্ন তাহারা ঈশ্বরকেও স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরই যে জগতের একমাত্র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা তাহাও মনে করে না। ইহাদের মতে জগৎ আপনা-আপনি হইয়াছে, এবং ইহা একমাত্র ভোগের জগৎ। ইহাদের কামনার সীমা নাই; দম্ভ, মান ও মদেও অবধি নাই, মোহ বশতঃ যে পথ পরিত্যাগ তাহাই ইহার আশ্রয় করে। ইহাদের চিন্তার শেষ নাই, আশার অন্ত নাই, কাম ও ক্রোধ ইহাদের অধিকার করিয়াই আছে, কামোপভোগই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। যাহা পাইয়াছে তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট নহে, মাস্তুরের মধ্যে কাঠকেও শত্রুবেদ ও তাহাকে হত্যা করিবার বাসনাও ইহাদের প্রবল। ইহারা নিজেদের ঈশ্বর মনে করে।” (গীতা ১৬।৬—২০ টীকা) “প্রবৃত্ত্যাগ্রকম্পাণঃ ক্রয়য় জগতোহহিতাঃ”—অতিশয় উগ্রবদ্বা ও জগতের ক্ষয়ের জন্তই অমঙ্গলস্বরূপ ইহারা প্রোতুভূত হয়।

বস্তুমানে জগতে সাম্যবাদের কোলাহল প্রচুর, কিন্তু যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই আত্মরিক ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হিংসা, দম্ভ ও অনাসক্তিকতার পূর্ণ—ইহা কি প্রকৃত সাম্য? অবশ্য রাষ্ট্রে ও সমাজে নানা ভাবে, নানা পথে সাম্য প্রবর্তনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যে সাম্য অন্তর হইতে বাহিরে আসে না, তাহা তো সাম্য

নহে। বাহির হইতে বলপূর্বক অন্তরে সাম্য প্রবেশ করানো যায় না। সাম্য স্বপ্নের সামগ্রী, অসি-সি, অস্তিকতা ও অনাসক্তি তাহার স্বরূপ। গীতার সাম্যবাদ অমরা অনেক দিন ভুলিয়াছি, যে সাম্যবাদের ধ্বনি চারি দিকে শুনিতে পাঠিতেছি তাহাও অবহেলার

বশ্ত নহে, কিন্তু গীতৌক্ত আদর্শ যে পর্যন্ত আমরা এই অবিভক্ত সাম্যবাদকে শুদ্ধ করিয়া কাঁথো পরিণত করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমাদের ও জগতের কল্যাণ নাই। জগতের কল্যাণের জন্তই আজ গীতার সাম্যবাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

## -দেহ-বিজ্ঞান-

দৈব চিকিৎসা, টোটকা, হাকিমী, কবিরাজী ও আরও কত রকমের ওষুধ ও অস্ত্র নিরাময়ের দারাই না আছে ভাবতবর্গে। এখনও কত গৃহস্থ শিশুদের অসুখ-বিস্মখে জলপড়া খাওয়ান। গ্রামে এখনও ঝাড়-ফুক দিয়ে কত মৃতকল্পের পুনর্জীবন লাভ হাচ্ছ। কত গাছের শেকড় কত দুরারোগ্য ব্যাধি সাবিয়ে তুলছে। স্বপ্ন-প্রাপ্ত ওষুধ তো আমাদের দেশে ছড়াছড়ি। তা ছাড়া, হত্যা, মানিত, মানসিকের অত্যাচার্য ফলের কথা অনেকেই জানেন। কত ওষুধি বুদ্ধের জ্যোত্তসে কত ওষুধ তৈরী হচ্ছে, তাও কারও অজানা নেই।

কিছু বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রতীচ্য ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেহনি মানুষের এই আদিম বিশ্বাস আর সংস্কারকে? বিজ্ঞান কি শুধু ধ্বংসের দীলাগেলায় সাধারণমুষ্টি গ্রহণ করেছে? মারণাজ্ঞ তৈরীতেই কি শেষ হয়েছে বিজ্ঞানের অভিধান? মানুষের জীবন যাতে সহজ ও সারলীল গতিপথে আগ্রাম ও আয়াসের জীবন হয়, বিজ্ঞানের দান তাতে পূর্যপূরি, কে তা অস্বীকার করবে? আধুনিকতম চিকিৎসা-পদ্ধতি, বিভিন্ন ধরনের ওষুধ আর ওষুধের ফরমুলা আবিষ্কার বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হিসাবে গণ্য হয়েছে পৃথিবীর সকল দেশে।

আদিম সভ্যতার কত ভাস্কর্য্য ধারণাকে ধুলিসান্য ক'রেছে বিজ্ঞান! বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রভাব এখনও যে-সব দেশে বর্তায়নি সেই সব দেশের লোক এখনও বিশ্বাস করে ঝাড়-ফুক, তুক-স্তাক। নীচে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কতকগুলি সত্যাসত্য নির্ণয় করা হয়েছে মানুষের শরীর সম্বন্ধে। শেষ পর্যন্ত পড়লে দেখবেন, আপনারও মনের অনেক বন্ধন ভাঙি দূর হয়ে যাবে। পাঠের শেষে যে কোন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করলে দেখবেন তাঁরাও আমাদের সঙ্গে একমত হবেন। একে একে বলে যাচ্ছি।

(১) পরিষ্কার ও শুদ্ধ দীত কখনও নষ্ট হয় না।

মিথ্যে কথা। ক্যালসিয়ামের অভাব হলেই দীত নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ স্বাস্থ্য খাওয়া হলে কিংবা সন্তানজাত্য দীত বিনষ্ট হয়।

(২) সামান্য একটু এ্যালকোহল অনেক বেশী এ্যালকোহলের মতই খাওয়া এবং মানুষের পরমায়ু হ্রাস করে।

মিথ্যে কথা। যারা সামান্য পরিমাণে এ্যালকোহল ব্যবহার করে তারা—যারা আদর্শেই ব্যবহার করে না তাদের চেয়ে কিছু বেশী দিন বাচে এবং পঁড়ি মাতালদের চেয়ে অন্ততঃ ছ'বছর বেশী বাচে।

(৩) প্রতি রাতে অন্ততঃ আট ঘণ্টার জন্তে নিদ্রায় প্রয়োজন।

সত্যি কথা। খুব কম লোককে চিকিৎসকের দেখেছেন আট ঘণ্টার চেয়ে কম সময়ের জন্তে নিদ্রা যায়। যারা তা করে, তারা দিনের বেলায় কিছুটা সময়ের জন্তে ঝিমিয়ে নেয় নিশ্চয়ই।

(৪) দুগ্ধ, সব চেয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য সকলের পক্ষেই সমান ভাল।

মিথ্যে কথা। যদিও দুগ্ধ অধিকাংশ লোকেরই উপকারে আসে; কিন্তু কয়েক জনের খাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত করে ও তাদের হাঁপানিতে ভোগায়।

(৫) কৈশোরে ও যৌবনে মাথায় জল ঢাললে মাথায় টাক পড়ে। টুপী কিংবা পাগড়ী ব্যবহারেও টাক পড়ে।

মিথ্যে কথা। সাধারণতঃ টাক পড়ে তাদের বাদের বংশানুক্রমিক টাক আছে। আর কয়েক জনের টাক পড়ে মাথায় কোন রকম ক্ষত থাকলে। এই ক্ষত সাপাতে পারলে টাক পড়ে না।

(৬) ইংরেজীতে একটা কথা আছে "A lean horse for a long race." মানুষের মধ্যেও যারা কৃশকায় তাদের পরমায়ু অধিক হয়।

সত্যি কথা। শতকরা বাট জন বয়স্ক লোক হয় কৃশ। আর কৃশকায় ব্যক্তির ফসফাস এবং স্নায়ুর গুণে শুলকায়দের চেয়ে বেশী দিন বাঁচতে পারে।

(৭) নারী কি পুরুষ অপেক্ষা বেশী কষ্টসহিষ্ণু?

মিথ্যে কথা। কয়েকটি হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে। পুরুষাই তাদের স্বভাবজাত উচ্ছ্বাস এবং ইন্দ্রিয়গ্রহণের প্রাবল্যে অধিকতম কষ্টসহিষ্ণু হয়।

(৮) ঠাণ্ডা সহ্য করার শক্তি পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক?

সত্যি কথা। নারীর দেহের চামড়ার ঠিক তলায় এক রকম চর্বি থাকার দরুন ঠাণ্ডাকে তাঁরা সহ্য করতে পারেন। আরও একটা কারণ, নারী পুরুষ অপেক্ষা কম ঘোষাক ব্যবহার করেন।

(৯) অতিরিক্ত কার্যিক পরিশ্রম কি স্বাভাবিক দৌরবল্যের কারণ?

মিথ্যে কথা। কোন কারণে চিন্তাগ্রস্ত না থাকলে যে-কোন মানুষ অবিখ্যাত রকমের কঠিন পরিশ্রম করতে পারে।

(১০) দেহের ওজন অস্বাভাবিক বেশী কি অস্বাভাবিক বেশী খাওয়া-দাওয়ার জন্তেই?

সত্যি কথা। শতকরা তিন জন হয়তো অসম্ভব মোটা হয় বংশগত শরীরিক গ্রন্থির দোষে, বাকী সকলেই অতি-ভোজনের নিমিত্তে।

(১১) বিনা কষ্টে সন্তান-জন্ম কি সম্ভব হয়?

সত্যি কথা। একেবারে স্বাভাবিক ধারণা এবং বিনা কষ্টভোগে সন্তান-জন্ম হয় কোন ওষুধ না খেয়েও। আধুনিক ওষুধের গুণেও কষ্ট না পেয়ে হচ্ছে এ যুগে।

(১২) চল্লিশের অধিক বয়সের লোকের চলন্ত ট্রেন, বাস কিংবা ট্রাম ধরতে সচেষ্ট হওয়া উচিত নয়।

সত্যি কথা। কারণ এই বয়সে হৃদযন্ত্র এমন অবস্থায় আর থাকে না যে, হঠাৎ দৌড়ে গতির বেগ সহ্যেতে পারে। এ চেষ্টা তাদেরই করা উচিত যাদের হৃদযন্ত্র কোন রকম দোষ নেই।

অমরেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—বিয়োগান্ত,  
অলিভার টুইষ্ট।

অমরেন্দ্রনাথ রায়—সাহিত্যিক। সম্পাদিত গ্রন্থ—শান্ত-  
পদাবলী (১৩৪৭), সমালোচনা সংগ্রহ (১৯৩৭)।

অমরেন্দ্রনাথ রায়—গ্রন্থকার। নিবাস—সুখডিয়া, হুগলী।  
গ্রন্থ—হিন্দুমহিমা, বীরবাসাকাব্য, বসন্তরোগ-চিকিৎসা নবনারী,  
বঙ্গের বঙ্গকথা, সহজ কবিরাজী শিক্ষা, দ্রব্যগুণ-তত্ত্ব, বন্ধিন-  
পরিচয়।

অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অমিয় (১৯০১)।

অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—পণ্ডিত। গ্রন্থ—গীতাঞ্জলি (সংস্কৃতে  
অনুবাদ)।

অমরেশ কাঞ্চীলাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লাভজনক কবি,  
জাতীয়তার অনুভূতি, রং ও বস্ত্রন বিজ্ঞা, মাধব হৈমায়ীর মঙ্গলা।

অমরেশ্বর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিবচরিত-পঙ্কতি।

অমলচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানচিত্রে বঙ্গদেশ ও  
পৃথিবী।

অমল হোম—সম্পাদক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১৩ খৃঃ ১৩ই  
আশ্বিন। পিতা—গগনচন্দ্র হোম। সহ-সম্পাদক—The  
Panjab (লাহোর), The Tribune (লাহোর),  
Independent (এলাহাবাদ), Indian Daily News  
(কলিকাতা), অস্থায়ী সম্পাদক—The Tribune (লাহোর)।  
সম্পাদক—Calcutta Municipal Gazette, রচিত গ্রন্থ—  
Rammohan Roy, the man & his works  
(১৯৩৩ খৃঃ), Some Aspects of Modern Journalism  
in India (১৯৩৫), অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য।

অমলা নন্দী (শঙ্কর)—নৃত্যশিল্পী। জন্ম—কলিকাতা। স্বামী—  
উদয়শঙ্কর। গ্রন্থ—সাত সাগরের পারে।

অমলা দেবী (চন্দ্রানন্দ)—ঐনসিভিলিস্ গুপ্ত, অধ্যাপক  
বাহুড়া কলেজ। গ্রন্থ—ভিখারিণী, বাদিনী'র দিবস, সমাপ্তি (গ)।

অমলানন্দ বাদি—গ্রন্থকারী। গ্রন্থ—রামেশ্বর দুর্গা (হিন্দী)।

অমলানন্দ দত্ত—অষ্টদেবতাবলী পণ্ডিত। জন্ম—১৩শ শতাব্দী  
মহারাষ্ট্রে। গ্রন্থ—বেদান্ত কল্পসূত্র (প্রথম মুদ্রণ ১৯১৭ খৃঃ),  
শাস্ত্রদর্শন (প্রথম মুদ্রণ ১৯১৩), পঞ্চপাদিকাদর্পণ।

অমলানন্দ ব্যাসাশ্রম—দার্শনিক-পণ্ডিত। টীকাগ্রন্থ—বাচস্পতি  
মিশ্রের ভামতীর টীকা; শাস্ত্রদর্পণ, বেদান্তকল্পসূত্র, পঞ্চপাদিকা-  
দর্পণ।

অমলানন্দ সরস্বতী—ব্যাখ্যাকার। গ্রন্থ—কল্পতরুব্যাখ্যা।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত—সংবাদিক। গ্রন্থ—বন্ধাকাম্পন,  
ডেটিনিউ (উ)।

অমলেশ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লীলা-মুকুল।

অমিতগতি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রুতিবিত্ত রত্নসম্ভাষ  
(১৯৪ খৃঃ), শ্রাবকচারণ, ভাবনাধাঞ্জিংশতি, পঞ্চসংগ্রহ, জম্বুদ্বীপ-  
প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্রদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি, সাধুধর্মপ্রজ্ঞপ্তি, ব্যাখ্যা-প্রজ্ঞপ্তি,  
যোগসারপ্রভৃতি, ধর্মপত্রিকা।

অমিতপ্রভ—আত্মবেদ-শাস্ত্রবিদ। গ্রন্থ—যোগশতকটিকা।

অমিতকুমার বাগচী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মৌনজীবন।

অমিয়কুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ।

অমিয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বীণা।

সাহিত্য

অমিয়নাথ সাক্ষাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-  
চিন্তা (১৩৫২)।

অমিয়বাল সরকার—গ্রন্থকারী। গ্রন্থ—মা ও মেয়ে।

অমীয়চন্দ্র পণ্ডিত—গ্রন্থকার। জ্যোতিষগ্রন্থ—ভাবিজ্ঞানগ্রন্থ।

অমীর সিং—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানসকোষ (হিন্দী)। সহ-  
সম্পাদক—শঙ্করসাগর (নাগরী প্রচলিত সভা, বেনারস)।

অমূল্যচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—পণ্ডিত ও অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থ—  
বেদান্তসারঃ (সদানন্দ যোগীন্দ্র কৃত। ১৮৬০ খৃঃ), ঘটকনিরূপণ  
প্রভৃতি পুস্তকপঞ্চকঃ (পূর্ণানন্দ গোখরী কৃত। ১৮৫৬ খৃঃ),  
বৃহৎকথা (সোমদেব কৃত। ১৮৫৭ খৃঃ) মহাভারতীয়  
শাক্তলোপাখ্যান (১৮৫৭ খৃঃ)।

অমূল্যচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Schools and Sects  
of Jain literature.

অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ—কৃত্তবাহিনী পণ্ডিত ও গ্রন্থকার।  
জন্ম—১৮৭৭ খৃঃ ৫২২, বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মৃত্যু—১৯৪০ খৃঃ  
ঘাটশিলায়। পিতা—উদয়চাঁদ ঘোষ। শিক্ষা—জেনারেল গ্র্যাসেমেরী  
এবং কালীধামে। ইনি দেশীয় ও বিদেশীয় মোট ছাব্বিশটি  
ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ Translating  
Bureau (বিিন্ন ভিন্ন ভাষার পত্রাদি অনুবাদ কার্যালয়)  
স্থাপন। ১৯০১ খৃঃ Edward Institution (প্রথম ভাষা  
শিক্ষার বিদ্যালয়) স্থাপন ও ইহার অধ্যক্ষ। ১৯০৬-১৯০৭  
খৃষ্টাব্দে The National Council of Educationএ

ফ্রেঞ্চ, জার্মান, পার্সি, বাংলা প্রভৃতির অধ্যাপক। ১৯০৫—৪০ খৃঃ  
Metropolitan Institutionএর (অধুনা বিজ্ঞানসাগর কলেজ)  
অধ্যাপক। গ্রন্থ—সরস্বতী ১ম খণ্ড (১৩৪০), আগ্নিশীলী শিক্ষা  
(১৩৪২), চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ (১৩২১), মহাভারতের গল্প, সাহিত্য-  
সংস্করণ (পাঠ্য), ব্যাকরণ-প্রবেশিকা, সাহিত্য-মঞ্জরী (পাঠ্য), প্রবন্ধ-  
কৌমুদী, ১ম, ২য় (পাঠ্য), আধুনিক বাংলা-রচনা (পাঠ্য), সাহিত্য-  
বোধ (পাঠ্য)। সম্পাদিত গ্রন্থ—জৈন-জাতক (Punjab-  
Sansk. Series), Sheir Mutakserin, Vol. 1.,  
শ্রীকৃষ্ণবিলাস (১৩২৬), শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (১৩২৮), শ্রীশ্রীসংকীর্তনা-  
মৃত (১৩০৬), বিভাপতি (১৯৩১ খৃঃ)। সম্পাদিত সাময়িক  
পত্র—বাণী (মাসিক—১৩১১—১৩১৭), ভারতবর্ষ (১৩২০-২১),  
Indian Academy of Arts (১৩২১—২৩), সঙ্কল্প (১৩২১),  
মর্মবাণী (সাপ্তাহিক—১৩২২), গৌরান্দ্রসেবক (১৩২৬—১৩৩৪),  
কায়স্থ-পত্রিকা, পঞ্চপুষ্প (১৩৩৬—১৩৪০)। (শ্রীভারতী  
(১৩০৪—১৩৪৭), বঙ্গীয় মহাকাব্য (১৩৪১—১৩৪৭)। বিভিন্ন  
সাময়িক পত্রে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ—দেবী দুর্গা, লক্ষ্মী, গণেশ,  
কার্তিকেশ্বর, বিষ্ণু, জাতিবিজ্ঞান, ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের গোড়ার কথা,

অগ্নি, বাঙালার প্রথম, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, ভারতীয় অন্ধ, বুদ্ধ-চরিত্রের অম্ববাদ, শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য ও মাদ্রমত।

অমৃতচরণ সেন—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা—পত্রিকা (১৩০৭—১৩০৯), অধ্যা, অর্চনা (মাসিক)। সহ—কেশবচন্দ্র গুপ্ত; ১৩২৬—২১)।

অমৃত্যধন মুখোপাধ্যায়—বাসা ছন্দের মূলমন্ত্র।

অমৃত্য শাস্ত্রী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্ধমানের ভূগোল (পাঠ্য)

অমৃতচন্দ্র স্মৃতি—জ্ঞান গ্রন্থকার। জন্ম—১৬২ সংবত। গ্রন্থ—সময়সারসীকা, প্রবচনসারসীকা, পরাস্তিবারসীকা, তত্ত্বাধার, পুরুষার্ধসিদ্ধোপায়, তত্ত্বাদেশিকা।

অমৃতলাল—তিন্দী-গ্রন্থকার। জন্ম—উদয়পুর। গ্রন্থ—বিচার-পরিধায় (তিন্দী)।

অমৃতলাল গুপ্ত, কবিভূষণ—চন্দ্রিকা ও গুপ্তকাব। গ্রন্থ—আত্মপরিচয় (কলি, ১১১৩), পাতাবিজ্ঞান, অল্পপান-দর্পণ, জ্যোতিষপরিচয়, পুথ্যপাণ্ডিত্য। সম্পাদক—যোগবল। (১৩২২-২৩)।

অমৃতলাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ছোট গল্প (১৩৪০), সোনার বনির সন্ধান (১৩৪০)। তাপসী; ছোটদের নই।

অমৃতলাল সরকার—সম্পাদক। সম্পাদিত মাসিকপত্র—বিজ্ঞান (১৩২১—১৩২২)।

অমৃতলাল সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মানবজীবনের লক্ষ্য ও প্রকাশ (বিশ্বব্রহ্ম গোষ্ঠীমণ্ডি প্রদত্ত ২টি বক্তৃতা। কলি, ১৩১১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৬)।

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দ্রনগর। গ্রন্থ—মাধব-মহাভারত বা কাশ্মীরে কৃষ্ণলীলা (১১০১)। স্বাস্থ্যবিবরণ (১২১৪), কৃষ্ণলীলা (১২১৭), নিকুঞ্জলীলা (১২১৯), গোপিকা প্রেম (১৩০০), বহুভবন (১৩০৩), রাসলীলা (১৩০৩), ব্রজলীলা অবসান (১৩০৫), বাচ-উন্মাদিনী (১৩০৩), প্রভাস-মিলন (১৩০৭)।

অমৃতলাল বসু—নাট্যকার এবং নাট্যাচার্য। জন্ম—১২৬ বঙ্গাব্দ, ৬ই শ্রাবণ, ৮৮ নং বর্ণভাগলিগ ষ্ট্রীটে, কলিকাতা। মৃত্যু—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ১৮ই আশ্বিন, ৩০ নং জামদোয়ার ভবনে। পিতা কৈলাসচন্দ্র বসু। শিবা—জামদোয়ার বঙ্গ বিজয় (বর্তমান জামদোয়ার এ, ডি, জুল), হিন্দুধর্ম, দুই বৎসর পরে ওয়েস্টার্ন সেমিনারী হস্তে এন্ট্রান্স পাস (১৮৬৮ খৃঃ), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ (ভাণ্ডার বার্ষিক শ্রেণী পরিত্যক্ত), হোমিওপ্যাথী শিক্ষা করিতে কালী গমন। বাঁকিপুরে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতে থাকেন। ১৮৭২ খৃঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন এবং নটজীবন আরম্ভ (১১ বৎসর বয়সে)। ১৮৭৭ খৃঃ পুলিশের চাকুরী লইয়া পোর্টব্লেকারে গমন। ১৮৭৮ খৃঃ প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় নটজীবন আরম্ভ।

গ্রন্থ—হীরকচূর্ণ (১২৮২), বিবাহ-বিভাট (১২৯১), বিষয়-বসন্ত (১৩০০), হৃদয়-ক্ল (১৩০৬), আদর্শবন্ধু (১৩০৭), তরুণাল (১২১৭), খামদখল, (১১১২), নব-যৌবন (১১১৪), ব্যাপিকা-বিদায় (১১২৬), যাক্সেসনী (১১২৮), চাটুজ্য-বাঁড়ুঘা (১৮৮৪), চোয়ের ওপর বাটপাড়ী

(১৮৭৬), ডিস্মিস (১৮৮৩), কৃপণের ঘন (১৩০৭), যাদুকরী (১৩০৭), কালাপানি (১২১১), বাবু (১৩০০), সাবান-আটাশ (১৩০৬), সাবান-বাজালী (১৩১২), বাজা বাহাদুর (১২১৮), গ্রাম্য-বিভাট (১৩০৪), বোমা (১৩০৩), অবতার (১৩০৮), বাহবা বাতিক (১৩০৮), তিলতর্পণ (১৮৮১), একাকার (১৩০১), সম্মতি-সঙ্কট, নবজীবন, (১৩০৮), তাজব-বাপার (১২১৭), হৃদয় মাতনম (১৩০৩), ব্রজলীলা (১২৮১), বিলাপ (খানমাটা-১২১৮), বৈষ্ণবস্বাস (স্মৃতি-নাট্য-১৩০৭), কৌতুক-সৌভাগ্য (১২২৬), অমৃত মদিরা (কবিতা-১৩১০), নাট্যকর্তা গ্রন্থ—চন্দ্রশেখর (১২২৫), রামসিঙ (১২২৬), বিষক (১২২৫), সরল (তারকনাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের অর্পিত অপ্রকাশিত)। অম্ববাদ গ্রন্থ—ঐহবের রত্নাবলী (অধুনালুপ্ত 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা)। ইহা ব্যতীত বহু প্রবন্ধ তাত্বেয়িক প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। সম্পাদিত পত্রিকা ও গ্রন্থ—গাওঁস্বা-বিজ্ঞান (১২১৩), বীণার বজ্রাব (১৩১৯)।

অমৃতলাল রায়—সম্পাদক। সম্পাদক—'ট্রিবিউন' পত্রিকা, লাহোর।

অমৃতানন্দ—বৌদ্ধ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দশকোষ-সংগ্রহ।

অমৃতানন্দ তীর্থ—বেদান্তিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তাত্বেয়-দীপিকা, তারকোপদেশব্যাখ্যা, পঃমপদ-নির্ণায়ক, ভগ্নাতিভূষণ, শিবতত্ত্ববিবেক, শিবব্রহ্মলীলাব্যাখ্যা, তরিরোপাধিবিবেচন, অমৃতানন্দীয়।

অমৃতানন্দনাথ—প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক। গ্রন্থ—তত্ত্বদীপন, অজ্ঞান-বোধিনীটিকা, যোগিনীহৃদয়দীপিকা।

অমৃতানন্দ দামোদর বোশী—সাহিত্যিক। নিবাস—কপটগঞ্জ, বোম্বাই ও গ্রন্থ—সংসার সার আনে লক্ষ্যবায়ী (জৈষ্ঠ্যভী ভাষ্য ১১১৫)।

অমৃতচরণ গুপ্ত—অম্ববাদক। গ্রন্থ—পারিতোষ পল্লী (The Deserted Village) এবং অন্যান্য—১৮৭১ খৃঃ), গৃহস্থজীবন (১১০১), সম্পাদক—হিতবোধ (সাময়িকপত্র—১৮৭৪)।

অমৃতচরণ গুপ্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—ভাগ্যমোড়া (ভগলী)। গ্রন্থ—পরলোকের পত্র (১৩০১), আমার চিন্তা (১২৮৭), ছোট বো (১২৮৮), কল্যাণী, শান্তিগ্রাম (১৮৮৫), জয়কৃষ্ণচরিত (১১০১), সুধাগম, বুদ্ধোদায়ালা, পুণ্য কাণ্ড, মহাগাণী ভিত্তোরিয়া, ধর্মাত্ম কৃষ্ণগতি, ব্রহ্মলীলা, ভগলী (১৩২১), জজ দিগম্বর বিশ্বাস, কোম্পানীর রাজত্ব বাংলা-সাহিত্য।

অমৃতচরণ ঘোষ—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—বিক্রমপুরের ইতিহাস (কলি—১৮৬১ খৃঃ)।

অমৃতচরণ চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিগু (১৮৭১)।

অমৃতচরণ নাথ—সম্পাদক। মাসিকপত্র—যোগিসংখ্যা (১৩২৫—১৩২১)।

অমৃতচরণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নীতিগু (১৮৬৮)।

অমৃতচরণ মজুমদার—প্রসিদ্ধ উকিল এবং জননেতা। জন্ম—১২৫৭ বঙ্গাব্দ, ২৩ই পৌষ ফরিদপুরে। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গাব্দ, ১২ই পৌষ। Indian National Congress এর লক্ষ্য

অধিবেশনের সভাপতি ( ১১১৬ খৃ: )। গ্রন্থ—Indian National Evolution.

অধিকাচরণ রক্ষিত—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চিকিৎসা-তত্ত্ব ( ১ম—৭ম খণ্ড, ১৮৭৫ খৃ: )।

অধিকাচরণ রায়—সাহিত্যিক ও সম্পাদক। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—কুসুমকলি (ঢাকা, ১৮৭৩), সম্পাদক—পাকিজাত (পত্রিকা)।

অধিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিশুরঞ্জিকা (ঢাকা, ১৮৬১), স্মৃতি (সম্পাদিত ও অনূদিত, ১৮৭৫)।

অধিকাচরণ শর্মা—সম্পাদক। মাসিকপত্র—ক্রিশ্ণ ( ১৩২৭-৩০ )।

অধিকাচরণ মিশ্র—ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা। গ্রন্থ—বৈধ-হিংসাবিহীন-মার্গদর্শন ( ১৮৫৪ খৃ: )।

অধিকাচরণ বাজপেয়ী—হিন্দী সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভারতমিত্র (হিন্দী দৈনিক), স্বতন্ত্র। হিন্দী গ্রন্থ—ব্যাকরণ, হিন্দু্যে। কী রাজকল্পনা, ভারতীয় শাসনপদ্ধতি, শিক্ষা, নরসিংহ।

অধোধ্যনাথ—সম্পাদক। জন্ম—১৮৪০ খৃ: আগ্রা। মৃত্যু—১৮৯২ খৃ:। আইন ব্যবসায়ী, যুক্তপ্রদেশ। সম্পাদিত ও পরিচালিত পত্র—Indian Herald ( ১৮৭১ খৃ: এলাহাবাদ ; Indian Union ( ১৮৯০ খৃ: )।

অধোধ্যনাথ পাকড়াশী—সঙ্গীত-রচয়িতা। সম্পাদক—‘তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা’।

অধোধ্যনাথ রায়, কবিচন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সত্যনারায়ণের কথা, গঙ্গার বন্দনা, দাঁতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণ।

অধোধ্যনাথ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসতরঙ্গিনীটাকা, নৌকা নারী বৃহৎরত্নাকর টাকা।

অধোধ্যনাথ বাজপেয়ী—হিন্দী কবি। ছন্দনাম—অবধ। জন্ম—যুক্তপ্রদেশের রায়বেড়েলী জেলার সাতনপুর গ্রামে। ১৮৩৩ সালে ইনি জীবিত ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ—ছন্দানন্দ, সাহিত্যসুধাসার, রামকবিতাবলী।

অধোধ্যনাথ উপাধ্যায়—হিন্দী পণ্ডিত ও কবি। জন্ম—১৮৬৫ খৃ: আজমগড়। কর্ম—কাহ্নমগো। হিন্দী গ্রন্থ—রসিক-রহস্য, প্রিয়প্রবাস, ঠোট হিন্দী কী ঠাট, প্রদ্বান-বিজয়, ভেনিস কা ব্যাপারী, অধখিলা ফুল, রিপভ্যান উটনকল, বৃক্ষকান্ত কা দপ্তর, মহাকান্তা, কাব্যোপবন উদ্বোধন, প্রেমোষুবারিধি, প্রেমোষুপ্রভ, প্রেমপ্রণক, প্রেমশতক, নীতিনিবন্ধ, বিনোদবাটিকা, উপদেশ-কুসুম।

অয়কান্ত বন্দী—নাট্যকার। নাট্যগ্রন্থ—ভোলা মাষ্টার, খুনি, ডা: মিস্ কুয়ুদ।

অরবিন্দ ঘোষ, ঋষি শ্রীঅরবিন্দ—মহাপুরুষ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭২ খৃ: ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা। মৃত্যু—৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫০ খৃ: পশ্চিমবঙ্গে। পিতা—ডা: কে.ডি. ঘোষ। শিক্ষা ১৮৭১ খৃ:—ইংলণ্ডে গমন, ১৮৯০ খৃ: সিনিয়র ক্লাসিক্যাল বৃত্তি। সিলি সার্ভিস পরীক্ষা। ১৮৯৩ খৃ: বরোদায় কর্মগ্রহণ। ১৮৯৩ হইতে ১৯০৬ খৃ: পর্যন্ত গাইকোবাড়ে কর্ম এবং পরে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যাপক। ১৯০৫ খৃ: হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান। এই সময়ে বন্দে মাতরম্ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। ১৯০৭ খৃ: রাজকোষের জন্য অভিযুক্ত। ১৯০৮ খৃ: আলিপুর বড়োয়ামালার

ঘৃত এবং ১৯০৯ খৃ: মুক্তি। ১৯১০ সাল হইতে বৃত্ত্য পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সাধনা ও আধ্যাত্মিক জীবন বাসন।

সম্পাদিত সাময়িক পত্র—কর্ম-যোগিন্ ( ইংরেজি ), ধর্ম ( বাংলা ), অর্ধ ( ১৯১৪ ); গ্রন্থসমূহ—Isha-upanishad, Essays on Gita, Life Divine, Synthesis of yoga. The Mother ( কলি, ১৯১৮ )। The Yoga and its objects, Yogic Sadhana, Ideal and Progress. The Superman, Evolution, Thoughts and Glympsies, Ideals of the Karmogagin ( চন্দ্রনগর, ১৯২১ )। War and self-determination, The Renaissance in India ( চন্দ্রনগর, ১৯২০ )। The Brain of India ( চন্দ্রনগর, ১৯২৩ )। A system of National Education, The National value of art, The need in nationalism, Rishi Bankimchandra, Uttarpura Speech, Songs to Myrtlla, Love and death, Outway of life, Bajc Prabhon, The Ideal of Human unity, The age of Kalidasa, Kalidasa's season, Dayanand and the Veda, Katha-upanishad speeches, Ahava Urvasic, Hero and the nymph, Riddle of this world ( কলি, ১৯৩৩ )। ধর্ম ও জাতীয়তা, সীতার ভূমিকা, কারা-কাহিনী, অরবিন্দের পত্র, জগদ্বাত্তের রথ, কর্মযোগী, ভারতের নবজন্ম। Speeches of Aurobindo Ghosh ( চন্দ্রনগর, ১৯২০ )।

অরবিন্দ দত্ত—ঔপন্যাসিক। জন্ম—খুলনা জেলার খেখরা গ্রামে। পিতা—স্বাক্ষরনাথ দত্ত। গ্রন্থ—প্রণয়-প্রতিমা ( ১৩২৬ ), বায়ুনবাগ্দি ( ১৩৩২ ), রক্তের টান ( ১৩৩৮ ), শিপাসা ( ১৩৪৩ ), কামিখোর ঠাকুর ( ১৩৪৪ )। বৃদ্ধ সম্পাদক—তপোবন ( ১৩৪৫ )।

অরিসিহ—প্রাচীন কবি। ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান। কাব্যগ্রন্থ—স্মৃতি সংকর্তন। এই গ্রন্থ George Buchler ১৮৮৯ খৃ: সম্পাদনা করেন।

অরুণচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। নিবাস—চন্দ্রনগর। গ্রন্থ—সুগের বাংলা ( ১৩৪০ ), প্রাচ্যের জাগরণ ( ১৩৩১ ), অরবিন্দ মন্দিরে ( ১৯২১ ), উক্তি ও উৎসর্গ গীতা ( ১৩২৫ ), অমূল্যলীলা, ১ম খণ্ড ( ১৩৪১ ), Spiritual Communism ( ১৯২২ )। সম্পাদক—Standard Bearer ( ইং ), নবসম্ম।

অরুণচন্দ্র গুহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনের বসন্ত ( গল্প ), রূপকথা ( প্রবন্ধ ) ১৩৫৭ ) বিজয়ী প্রাচ্য, ভারী এসিয়া।

অরুণ দত্ত—আত্মবিশ্লেষণবিদ। পিতা—সুগাক দত্ত। গ্রন্থ—‘অষ্টাঙ্গস্বয়ং’ সর্বজনস্বয়ং নামে টাকা, স্মৃতিটাকা।

অরুণেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রয়েল অক্সন ব্রিজ। অচট—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। অপার নাম—ধর্মোত্তরচর্চা। আবির্ভাব কাল ৮৪৭ খৃ:। নিবাস কাম্বীর। গ্রন্থ—হেতুবিম্ববিবরণ, তর্কটাকা।

অর্জুন মিশ্র—টাকাকার। টাকাগ্রন্থ—ভাবদীপ, কুসুমাজলির টাকা।



অর্জুন মিশ্র—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক জন টীকাকার ।

অর্জুন মিশ্র—টীকাকার । জন্ম—(আনু: ১৪০০ খৃঃ) বঙ্গদেশের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের চম্পাভিট্টীয় (চম্পাটিগাঞি) কুল । পিতা—ঈশান মিশ্র । টীকাগ্রন্থ—মহাভারতার্থসংগ্রহ (প্র) নৈপিকা, ভারতার্থনৈপিকা ।

অলক—গ্রন্থকার । পিতা—রাজানক সন্ন্যাসিক । গ্রন্থ—বিসমপ্রদোদত, অলঙ্কারসংগ্ৰহটীকা ।

অলকা মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক । গ্রন্থ—নিবন্ধনা, তোমারই, নন্দিতা, বিচিক্রিতা (সম্পাদিত) ।

অবনীকৃষ্ণ বসু—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—বাঙালীর সার্ভিস ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—শিল্পী এবং সাহিত্যিক । জন্ম—১৮৭১ খৃঃ কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় । পিতা—গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর । শিক্ষা—সমুদ্র কলেজ এবং Signor Gilhardi ও Mr. Palmer এর নিকট চিত্রবিজ্ঞা শিক্ষালাভ । কলিকাতা সরকারী চিত্রকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও কিছু কাল অধ্যক্ষ (১১০৫—১১১৬) । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণেশ্বরী অধ্যাপক । বিশ্বভারতীর আচার্য, সি, আই, ই, (১১১২) এবং ডক্টর উপাধিলাভ । Society of Oriental Art-এর প্রতিষ্ঠাতা । ইহার শ্রেষ্ঠ শিল্প—‘নির্দাশিত বন’, শাহজহানের মৃদু । গ্রন্থ—এজকাচিনি ১ম, ২য়, স্বীকের পুতুল, তুতপাড়ার দেশ, বাঙ্গার ব্রত (১৩৫০), ভারতশিল্পে মূর্তি (১৩৫৪), আলোর ফুলকি (গল্প), সহজ চিত্রশিক্ষা, পথে বিপথে (গল্প), ঘরোয়া (শ্রীরাণী চন্দ্র সহ), জোড়াসাঁকোর ধারে (শ্রীরাণী চন্দ্র সহ) । খাতাঙ্গীর খাতা (শিশু), আমাদের বিশ্বকবি (নূপেন বসু সহ), আপন কথা (শি), শকুন্তলা (শি), The Parrot's training (চিত্রগ্রন্থ) । নন্দলাল বসু সহ) ।

অবনীনাথ রায়—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—অতীশ দি গ্রেট, পাটমিশেলী, বঙ্গপ্রতিভা, অমৃত্যুরিত, প্রবাসী বাঙ্গালী ।

অবলাকান্ত সেন—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—সংসারনীতি (কলি: ১২১৬)

অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল—সাহিত্যিক ও সম্পাদক । গ্রন্থ—তরুণাচ (১৩৪০), ঝড়ের পরে, সব মেয়েই সমান, সম্পাদিত সাপ্তাহিক—বাতায়ন ।

অবিনাশচন্দ্র দাস—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার । জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ বাঁকুড়া জেলার কোতালপুর গ্রামে । মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর । পি-এচ, ডি—১৯২০ । বাঁকুড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষকতা ও পরে স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, আজিমগঞ্জ ষ্টেটের ম্যানেজার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । গ্রন্থ—সুখখ্যা (প্রবন্ধ ১৩০০ বঙ্গ), সীতা (প্রবন্ধ), পলাশন, কুমারী, অরণ্যবাসী, দুর্গারাগী (উপগ্রন্থ), নাটক—প্রভাবতী, দেবব্রত । বৈশ্যজাতি (ইংরেজি ১৯০৩) । সম্পাদন—স্বদেশ (সাপ্তাহিক), বেঙ্গলী সংবাদপত্র (সহ-সম্পাদক) । Rigvedic India (১৯২৭), Rigvedic culture (১৯৩৫) ।

অবিনাশচন্দ্র নিয়োগী—সাহিত্যিক । সম্পাদক—দর্শক (১৮৭৫) ।

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার—অমুবাদক । জন্ম—কানপুর । কর্মক্ষেত্র—লাহোর । মৃত্যু—১৩৩২ বঙ্গ । অমুবাদ গ্রন্থ—‘রপকী’র অমুবাদ (এলাহাবাদ), জগজী, রহরাস । সম্পাদিত ইংরেজি পত্র

অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—গীতা, চণ্ডী ।

অশোক আচার্য—বৌদ্ধ গ্রন্থকার । গ্রন্থ—সামান্তদ্বৈতমীক-প্রকাশিকা (ভায়গ্রন্থ) ।

অশোক গুহ—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—দেশ-বিদেশের লেখা ১ম, ২য়, ৩য় (১৩৫৪) । এক যে ছিল বাহুবল (গ), অগ্নিগর্ভ (উ) ।

অশোক মল্ল—আত্মবৈদবিদ । গ্রন্থ—নিষ্টাসার ।

অশোক মেটা—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—আঠারো শ’ সাতায়ন বিজ্ঞোহ (ইতিহাস) ।

অশ্বঘোষ—বৌদ্ধ গ্রন্থকার । জন্ম—খৃঃ ১ম শতাব্দীর শেষভাগে সাক্যে নগর । পিতা—স্ববর্ণাঙ্গী । ইনি মহারাজ কণিকের সভাকবি । প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ, পরে বৌদ্ধ হন । গ্রন্থ—বুদ্ধচরিত, মহাবান-শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রম্ ।

অশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—টোটকা চিকিৎসা, ১—৫ ভাগ । শুক্রা ও নাসিঃ শিক্ষা, ১ম, ২য় । আকস্মিক বিপদাপদ চিকিৎসা, প্যান ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা ।

অশ্বিনীকুমার ঘোষ—গ্রন্থকার । গ্রন্থ—পঞ্চচন্দ্রিকা ।

অশ্বিনীকুমার দত্ত—দেশভক্ত জননেতা ও গ্রন্থকার । জন্ম—১৮৫৬ খৃঃ ২৫ জামুয়ারী বরিশাল জেলার বাটাজোর গ্রামে । মৃত্যু—১৯২৩ খৃঃ ৭ই নভেম্বর কলিকাতা, ৫১ নং চক্ৰবেড়িয়া রোড নর্থ ভবনে । পিতা ব্রজমোহন দত্ত । শিক্ষা—বি, এ (কলকাতার কলেজ—১৮৭৮ খৃঃ), এম-এ (১৮৭৯ খৃঃ), বি-এল (১৮৮০), কম—শিক্ষকতা ও ওকালতি । ১৮৮৪ খৃঃ ২৭এ জুন—ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন স্থাপন, ১৮৮১ খৃঃ ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান (১৯০৫), কারাবাস (১৯০৮—১০) । গ্রন্থ—ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রেম, দুর্গোৎসব-তত্ত্ব, ভারতগীতি ।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক । গ্রন্থ—বরলা ডাক্তার, জমাখচ, দ্বী, পথের স্মৃতি, মাটির স্বর্ণ, মুক্তাধারী । রসের নাড়ু (শি), জগদীশের দিগদারী (না), মিসু মায়ার বোর্ডিং হাউস (উ) ।

অসিতবরুণ মুখোপাধ্যায় (ডক্টর) গ্রন্থকার । গ্রন্থ—লাভজনক কুবি ।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকারী । গ্রন্থ—ভারতের বনৌষধি (১৩৫৩) ।

অহিভূষণ ভট্টাচার্য—গীতিনাট্যকার । নিবাস—কল্যাণপুর (হাওড়া) । গ্রন্থ—উত্তরা পরিণয় (১৯০১), দণ্ডীপর্ব, তুলসীলালা, রাই উদ্ভাদিনী, বামনভিক্সা, সুরথউদ্ধার, রঞ্জাবতী, বোধনে বিসর্জন, রামাশ্রমেধ, কংসবধ (১৯০৮) ।

আইনাথ—নাথগন্থী সাধু । গ্রন্থকার—আইনাথ কৃষ্ণকুল ।

আউলিয়া মনোহর দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা । জন্ম—১৬শ শতাব্দী । গ্রন্থ—পদসমুদ্র (সংগ্রহ গ্রন্থ), দিনমণি চন্দ্রোদয় ।

আজিম আলী (মীর)—মুসলমান কবি । জন্ম—আগ্রা । গ্রন্থ—‘সিকান্দার নামা’র অনুবাদ (১৮৪৪) ।

আজুরি (শেখ)—কবি ও সাধু । প্রকৃত নাম—জলালুদ্দিন হামজা । জন্ম—১৩৮০ খৃঃ খোরাগান । মৃত্যু—১৪৬২ খৃঃ । গ্রন্থ—জবাহির উল আস্বার, তুখরাই হুয়ায়ুন, সন্ডাটিকল, বাহমন-নামা (দীবান) । [ক্রমশঃ ।

মিঃ বেনেটের নিজের সম্পত্তি বছরে দু'হাজারের মতো।

তাও সব ক'টি মেয়ে থাকার জন্য এবং পুরুষ-সন্তান না থাকায় কোন এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের হাতেই শেষ অবধি বাবে। মা উত্তরাধিকার-স্বত্রে পেয়েছিলেন চার হাজার। কিন্তু তাতে এ সংসারের অভাব মোচন হত না।

মেয়েদের এক মেসো মশায় থাকেন অনতিদূর মেরিটন সহরে। মেরিটন থেকে শুভবার্ণ এক মাইল। সুতরাং মেয়েগুলি সপ্তাহের মধ্যে তিন-চার বার এই সামান্য পথ অতিক্রম করে মাসীর কাছে যাতায়াত করত। বিশেষ করে কনিষ্ঠ দু'টি ক্যাথরিন ও লিডিয়া এই ভাবে নিজেদের কর্মহীন দিনগুলিকে যথাসম্ভব নূতনত্ব ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করত। মাসীমা'র কাছে পাওয়া নূতন নূতন খবর নিয়ে তারা স্মিত বাড়ীতে, সেখানে আলোচনা হোত সকলের মধ্যে।

সম্প্রতি সে গল্পের খোরাক বেড়েছিল। মেরিটনে সদর অফিস করে এক সৈন্যবাহিনী অবস্থান করছিল। সারা শীতকাল তারা এখানে থাকবে এই বকমই খবর।

মেসো মশায় ফিলিপস এখানকার অফিসার-মহলে খুবই পরিচিত। তার মারক্‌স মেয়ে দু'টি অফিসারদের সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ সব সন্দেহ বহন করে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে পরিবেশন করত আনন্দের সঙ্গে। এমন করে দিনে দিনে অফিসাররা তাদের চেতন-অবচেতন মানসকে এমন গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করে তুলল যে, ক্যাথরিন ও লিডিয়া'র শয়নে-স্বপনে, ঘুমে-জাগরণে আর কোন কথা বা চিন্তা রইল না অফিসারদের বিষয় ভিন্ন। মাসের চিন্ত-বিমোহনকারী যে নাম ও সম্পত্তির পরিমাণ, সেট বিংশে তাদের চোখে নিশ্চয় হলে গেল কখন। অফিসারদের সজ্জাভূষণ তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল একেবারে।

তাদের কথাবার্তায় এক দিন মিঃ বেনেট শাস্ত কণ্ঠে মন্তব্য করলেন—‘আগে আমার অনুমান মাত্র ছিল কিন্তু এত দিনে আমি স্থিরনিশ্চয় হল্যাম যে, এ গাঁয়ের সব মেয়ের মধ্যে আমার দু'টি ছোট মেয়েই অতি অবাচীন।’

মা স্বামীর কথা'র প্রতিবাদ করলেন—‘কি করে যে নিজের মেয়েদের বোকা ভাবতে পার আমি তু'ঠাওরাতে পারি না। নিজের মেয়েদের সম্বন্ধে—’

‘নিজের মেয়েরা বোকা হলে তাদের বিষয়ে আমার মন সজাগ থাকাই উচিত আশা করি।’

‘কিন্তু সত্যি ত তারা কিছু নির্বোধ নয়।’

‘এ একটি বিষয়ে তোমায় আমার মতে মেলে না।’

‘কিন্তু এ কথা ভুলো না যে, আমাদের মত বিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে না তারা ঐ কচি বয়সে। আমাদের বয়স যখন ওরা পাবে, তখন আর অফিসার সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল অত উদগ্র থাকবে না। আমারও এক সময় বয়স ছিল যখন একটা লাল আমার ভারী লোভ ছিল, আজও সে লোভ বায়নি মন থেকে। তা ছাড়া কোন চার-পাঁচ হাজারী কর্ণেল যদি আমার কস্তার পারিপার্শ্বী হয়, আমি তাকে বিবুধ করব না নিশ্চয়ই।’

এমন সময় এক জন বেয়ারা এসে ঘরে প্রবেশ করায় এঁদের কথাবার্তায় সাময়িক বিরতি ঘটল। নেদারল্যান্ড থেকে বেয়ারা



এসেছে জেনের সঙ্গে চিঠি নিয়ে—হাতে জবাব নিয়ে যাবার জন্যে। মিসেস বেনেটের দু'টি চক্ষু উজ্জল হয়ে উঠল আনন্দে। পত্র পড়ছিল যতদূর জেন, তিনি মেয়েকে উদ্দেশ করে বলছিলেন—‘কি মা—কে দিয়েছে? কি লিখেছে সে। বল না মা, আমি যে আর থির থাকতে পাচ্ছি না। কি লিখেছে পড়ে শোনো আমার।’

‘মিসু বিংশে লিখেছে’ বলে জেন চিঠিখানি উজ্জ কণ্ঠে পড়ে শোনাল—

প্রিয় বাব্বা,

‘আজ যদি তুমি ভাই এসে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার টেবিলে না বসো, তা হলে আমরা দু'টি মেয়ে এমন ঝগড়া করব যে আর চিরজন্মে আমাদের ভাব হবে না। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে ভাই। দাদা আর আমাদের অতিথি মাহুয়াটি আজ অফিসারদের সঙ্গে খানাপিনা করবেন। ইতি

ক্যারোলিন বিংশে।

‘অফিসারদের সঙ্গে খাবেন ওরা? বই, মাসী ত আমাদের বললে না।’ লিডিয়া'র বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল।

‘বাইরে খাওয়া-দাওয়া হ'বে’ বললে মা—‘তবে আর কি হবে?’

‘আমি পাড়ী নিয়ে যাবো মা।’ জেনের মিনতি শোনা যায়।

‘না মা, তার চেয়ে বরং ষোড়া নিয়ে যা। যেমন করে আছে আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে। তাহলে তোকে ত সারা রাত ওখানে থাকতে হবে।’

‘সে ভারী মজার হবে’ বললে এলিজাবেথ, ‘বদি না ওরা ঝড়-বান্ধলেও ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যায়।’

শেষ অবধি তাই স্থির হোল। ঘোড়ায় চড়ে বাওয়াই মনস্থ করলেন সকলে। মা জেনকে ধরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। পূলকিত মুখে ঝড়-বান্ধলের প্রত্যাশা করে তাকে বিদায় দিলেন।

মায়ের কথাটি ফসল। কিছু দূর বাবার পরেই বৃষ্টি নামল জোরে। বৃষ্টি দেখে বোনেরা ব্যস্ত হলেও মায়ের খুশীর অন্ত রইল না। সারা সন্ধ্যা অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ হতে থাকল। আজ আর জেন ফিরতে পারবে না।

কত বার বললেন তিনি—‘ঘোড়া দিয়ে পাঠিয়ে কি বৃষ্টি ঝাটিয়েছি বল ত?’—যেন আজকের এই ঝর বর্ষা তাঁরই ইচ্ছা-শক্তির ফল!

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশের পর জেনেব চিঠি এল এলিজাবেথের নামে।

‘প্রিয় বোনটি,

গত কাল ঐ পরিমাণ ভেজার ফলে আজ সকালে শরীর ভারী খারাপ হয়েছে। বেশ সুস্থ না হওয়া অবধি এরা আমার ছাড়তে চাইছে না। এরা ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছে, এবং তিনি এসে না দেখা অবধি এরা কোন কথা আমার স্ননতে চায় না। তোরা কিছু ভাবিস না, সামান্য গলায় ব্যথা আর মাথা-ব্যথা ভিন্ন আমি বেশ সুস্থই আছি।’

‘দেখলে ত’ বললেন মি: বেনেট চিঠির মর্মার্থ শুনে—‘দেখলে ত কি হোল! এখন যদি তোমার মেয়ে ভারী অসুখে পড়ে কিংবা যদি তার ভালো-মন্দ কিছু হয়, আমি এই জেনে সুখী থাকব যে, ঐ বিংলার জগেই মেয়ের আমার অমন হোল আর সে তোমার বৃষ্টি মত।’

‘অমন অলুকাবের ভয় আমার নেই। জানো। অত সামান্য অসুখে লোকে মরে না। যেখানে আছে সেখানে তার যত্নের অভাব হবে না। দরকার হলেই আমি নিজেকে গিয়ে তাকে দেখে আসব যদি গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারি।’

সব থেকে বিচলিত দেখাল এলিজাবেথকে। গাড়ী না পাওয়া গেলে সে পদব্রজেই বাবে দিকিকে দেখতে। কেন না ঘোড়ায় চেপে বাওয়া তার হবে না, ঘোড়ায় সে উঠতে পারে না।

তার কথা শুনে মা আশ্বস্ত হয়ে বললেন—‘কি যে বলিস তুই ছাইভয়! এই ধুলোয় এত পথ হেঁটে গিয়ে যে চেহারা হবে তা নিয়ে আর ভয়সমাজে তুই দাঁড়াতে পারবি না।’

‘অন্ততঃ দিদির সামনে দাঁড়াতে আমার বাধে না।’

বাবা বললেন—‘তুমিও কি ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলছ মা আমার?’

‘না বাবা। হেঁটেই যাব আমি। ঐটুকু পথ ইচ্ছে করলেই হেঁটে বাওয়া যায়।’

‘তোমায় মেরিটন অবধি আমরা পৌঁছে দিতে পারি’ বললে ক্যাথারিন আর লিডিয়া। স্তব্ধতা তিন বোন যাত্রা করল।

মেরিটনে এসে তারা ভিন্ন পথ ধরল। দু’টি ছোট বোন এক অফিসারের দ্বারী বাসায় গিয়ে উঠল আর এলিজাবেথ একা মাঠে পেরিয়ে, খানা ডিঙিয়ে ক্ষত পায়ে এগিয়ে গেল। কত দূর বাবার

পর বিংলদের বাসা চোখে পড়ল। তখন তার পারে রীতিমত ব্যথা লাগছে। মোজাগুলি ধুলায় ধূসর হয়েছে। পরিশ্রমে সারা মুখ লাল হয়ে উঠেছে ডালিমের মতো।

এ বাড়ীতে তখন প্রাতঃরাশের টেবিলে সবাই সমবেত হয়েছে কেবল জেন ভিন্ন। তাকে দেখে সবাই রীতিমত চমকিত হলেন। এলিজাবেথ যে এই দীর্ঘ তিন মাইল পথ একলা হেঁটে এসেছে এই সকাল বেলা এই বিশ্রী আবহাওয়ায়, এ যেন দু’টি দ্বীলোকের কাছে অবিশ্রান্ত বোধ হতে লাগল। দু’জনেই তাকে শান্ত সৌজতের সঙ্গে গ্রহণ করলে ভিতরের ভাব গোপন করে। বিংলে এটো মেরিটনের প্রতি মমতায় ও কৌতুকে পূর্ণ হয়ে উঠল। ডারসি কথা বললে খুব কম। এই স্তম্ভরী মেরিটনের মুখে যে পরিশ্রমের লাভ্য ফুটে উঠেছিল, তাই দেখতে লাগল সে চেয়ে চেয়ে নির্বাক মুখে।

সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি জেনের। আজও সকালে সে ঘর ছেড়ে আসেনি বাইরে। এলিজাবেথ তখনি ভগিনী সন্দর্শনে গিয়ে উপস্থিত হোল। এত বহু ও নৈহের উপরে আরও কিছু প্রত্যাশা করে অপেক্ষা করার ভয়ে যদিও এ অবধি জেন কোন কিছু বলেনি, কিন্তু এলিজাবেথের এই অপ্রত্যাশিত প্রীতির পরিচয়ে সেই সর্বাধিক খুশী হয়ে উঠল। যদিও শরীরের জ্বর সে খুব বেশী আলাপ করতে পারল না কিন্তু দুই বোনে নীরবে পরস্পরকে ভালোবাসল সেই সকাল বেলা।

প্রাতঃরাশের পর সকলে এসে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণে এলিজাবেথ দেখলে এরা সবাই কত ভালোবাসে জেনকে। তাই তারও ভালো লাগল এই পরিবারকে। ডাক্তার এসে তাকে পরীক্ষা করে পূর্ণ বিশ্রামের উপদেশ দিলেন। ঔষধ ও পথ্যেরও ব্যবস্থা করে দিলেন। বেলা মত বাড়তে লাগল রোগীর অস্বস্তিও বাড়তে লাগল। পুরুষেরা বাইরে গিয়েছিলেন সব। স্তব্ধতা এলিজাবেথ আর এ-বাড়ীর দু’টি নারী—তিন জনে জেনের সেবার আশ্রয় হলো। তাদের আর কিছু কাজও ত ছিল না সংসারে।

বিকেল তিনটে বাজলে এলিজাবেথ বাড়ী ফেরার কথা ভুললে। মিসু বিংলে তৎক্ষণাৎ তার জ্বর, গাড়ীর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিদায়-ক্ষণে জেন এমন উত্তাল হয়ে উঠল বোনের জ্বর বে বাধ্য হয়ে এলিজাবেথের সেদিন বাওয়া হতে উঠল না। তার পরিবর্তে এক জন চাকর লওবর্গে যাত্রা কলঙ্ক তাদের সংবাদ পৌঁছে দিতে ও ফেরার সময় দুই ভগিনীর কিছু পরিধেয় বাস নিয়ে আসতে।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঁচটার কিছু পরেই দুই জনে বৈকালিক প্রসাধন সেরে এলিজাবেথকে আহ্বারে আমন্ত্রণ করলে। বিংলের কণ্ঠেই দৃষ্টান্তীয় স্বতঃকৃত প্রকাশ অস্বভাব করতে পারলে এলিজাবেথ। তাকেই বিশেষ করে জানালে সে যে, জেন বিকালের দিকেও এতটুকু সেরে উঠতে পারেনি। দুই বোনে কত বার করে দুঃখ প্রকাশ করলে যে এমন ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার কত কষ্ট, তাদের নিজস্বের হলে কি বিশ্রী লাগত তাদের। তার পর সে সব কথা ভুলে গেল, এখন তাদের মজলিস বসল বসার ঘরে। এলিজাবেথের মন বিবিধে গেল তাদের এই লঘু-চিত্ততায়।

বাওয়ার পরেই এলিজাবেথ দিদির ঘরে ফিরে এল। সে ঘর

থেকে নিজস্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হোল এলিজাবেথকে নিয়ে।

মেয়ে দুটি কটু কঠে এলিজাবেথকে নিন্দা করতে লাগল।

‘তিন মাইল হোক, চার মাইল, পাঁচ মাইল—মাইল বংই হোক না কেন, ঐ ধূলো-কাদায় ঐ ভাবে একলা চলে আসা রীতিমত অসভ্যতা বলব আমরা। কি বোঝাতে চায় সে আমাদের? আমার ত মনে হয়, এ এক বকম আধা-সহরে নারী-প্রগতির নমুনা। ভ্রমস্তর লেশ মাত্র নেই মেয়েটার।’

‘দিদির প্রতি ওর প্রীতি-মমতা দেখে আমার ত ভারী ভালো লেগেছে’ বললে বিংলে।

বিংলের বোন ডারিসিকে অর্ধফুট বরে বললে—‘আমার ত মনে হয় ওর, দু’টি ডাগর চোখট আপনার মনকে এমন করে আচ্ছন্ন করেছে—আর কিছু নয়।’

‘না না, তা নয়। ঐ পরিশ্রান্ত যুগের আশ্রয় স্থলর সুখমা আমার মনে সত্যি যাদু লাগিয়েছে বলতে পারেন।’

বড় বোনটি বললে—‘আমার নিজেরও ভারী ভালো লাগে জেনকে। ভারী মিষ্টি মেয়ে। ভালো ঘর-সংসারে ওর বিয়ে হোক এই আমার ইচ্ছা আন্তরিক। কিন্তু এমন মা-বাপ আর এই সব অসভ্য আত্মীয়-পরিজন থাকতে কোন অভিজাত সমাজে ওকে স্থান দেবে বল আমার ত মনে হয় না।’

জেনকে অনেকটা সুস্থ করে ঘুম পাড়িয়ে এলিজাবেথ নেমে এল বসার ঘরে। তখন তাদের খেলা চলেছে পুরা ঘরে। সুত্তরাং ঘীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে সে একখানা বই নিয়ে তাতে মন দিলে।

‘সে কি! তাদের চেয়ে বই পড়া আপনার বেশী ভালো লাগে মিসু বেনেট?’

বিংলের ছোট বোন স্নেহ মিশিয়ে বললে—‘মস্ত জানি মেয়ে। বই পড়া ভিন্ন আর সব কিছুতেই ওর বিরক্তি, জ্ঞানেন না বৃথি?’

‘এ ভাবে নিন্দা-প্রশংসার যোগ্যা আমি নই। অস্ত্র অনেক কিছুর মত বই পড়াতেও আমার মন আনন্দ পায়।’ বললে এলিজাবেথ।

‘কেন, বড় বোনটির সেবান্তেও ত উৎসাহের কাপণ্য দেখছি না—’ উত্তর দিলে বিংলে—‘সত্যি, আমরা সবাই আশা করছি যে তিনি শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠবেন!’

তাকে সন্তুষ্ট ধন্যবাদ জানিয়ে এলিজাবেথ আর একটু এগিয়ে গেল টেবিলের ধারে, যেখানে কয়েক খণ্ড বই এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিল। বিংলে তৎক্ষণাৎ তার পাশে এসে ঝাঁড়াল, ‘বদি অম্মতি করেন ত আমার ছোট্ট লাইব্রেরীটুকু দেখাতে পারি আপনাকে। সত্যি, খুবই ছোট। সামান্য লোক ত আমি, তার উপর এক দম অলস ত।’

তাকে বিরত করলে এলিজাবেথ। ‘ঠিক আছে। মিছিমিছি আপনি কষ্ট করবেন না মি: বিংলে।’

কতক্ষণ পড়ার পর এক সময় খেলার আকর্ষণে এলিজাবেথ এসে বসল টেবিলের পাশে। খেলার সঙ্গে সঙ্গেই গল্প হচ্ছিল।

‘কত বড়ো হয়েছে আপনার বোন মি: ডারিসি? আমার মতো লম্বা হয়েছে?’

‘তা হয়েছে। মিসু বেনেটের মতোই হবে কিংবা আর একটু বেশীই হবে।’

‘ভারী দেখতে হচ্ছে হয় তাকে। এমন সুন্দর মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি। যেমন রূপসী তেমনি গুণাবিতা। ঐ বয়সে কি মিষ্টি হাত পিয়ার্যোয়।’

‘আমার ত অবাক লাগে, তোমরা সবাই অল্প বয়সে কত মার্জিত হয়ে উঠতে পারে তাই দেখে,’ বিংলে বোনকে বললে।

‘সবাই? তার মানো?’

‘কেন, সবাই নয় কেন? সবাই টেবিলে ফুল তোলে, পর্দা সাজায়, পুতিবাগ বোনে। এমন কোন মেয়ে আছে বলে আমি ত জানি না যে এ সব কাজ না জানে। আর এমন কোন মেয়ের কথা আমি শুনিনি, প্রথম দর্শনে যাকে সবাই মতা রূপসী আর মার্জিতা মেয়ে বলে লোকে রায় দেয়নি।’

ডারিসি এ কথায় সায় দিল না—‘আমার পরিচিত মহলে তেমন মেয়ের সংখ্যা দশ জনও নয়।’

‘আমারও তাই মত’ বিংলের বোনও এ কথায় যোগ দিল।

‘সে ক্ষেত্রে গুণবতী মেয়েদের সখ্যে আপনার ধারণার মর্মগ্রহণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন।’ বললে এলিজাবেথ।

‘নিশ্চয়ই। অনেক কিছু হলে তবেই তাকে গুণবতী বলব।’

বিংলের বোনও যোগ দিলে—‘সত্যিই ত। আশে-পাশের আরও দশ জনের চেয়ে যে ভালো হবে তাকেই গুণবতী মেয়ে বলব। যে মেয়ে অত বড়ো সুখ্যাতি পাবার যোগ্যা, সে নাচ-গান-আঁকা সব বিষয়ে পারদর্শিনী হবে। তা ভিন্ন তার চলনে-বলনে-ব্যবহারে এমন একটা সিন্ধুতা থাকবে যা সচরাচর চোখেই পড়ে না।’

ডারিসি এর সঙ্গে যোগ দিলে আবার—‘আরও কিছু প্রয়োজনীয় থাকা চাই। মানসিক বৃত্তিগুলির উন্মেষের জন্য তার সুপাঠিকা হওয়াও প্রয়োজন।’

‘জানা মেয়েদের মধ্যে তাই অত কম জনকে আপনার মনে ধরেছিল। এমন মেয়ে এক জনও পেলেন কি করে ভাবি?’

‘কেন নিজের সখ্যে আপনি এমন নিষ্ঠুর ভাবে নিরাশাবাদী?’

‘কেন না, এমন মেয়ে আমার কখনো চোখে পড়েনি। এমন কান্তি, এমন রুচি, এমন গুণ, সর্বসম্বিতা যেমন আপনি বর্ণনা করলেন এখুনি।’

এলিজাবেথের এ কথায় দুই বোনই তার উপর আক্রমণ করার উপক্রম করল, কিন্তু ঠিক সেই সময় বিংলে এদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তাদের টেবিলে। সুত্তরাং সেইখানেই কথাবার্তা সাক্ষ হোল।

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে এলিজাবেথ তার দিদির ঘরের দিকে পা বাড়ালে। তার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোন বললে—‘এলিজাবেথ কেমন মেয়ে জ্ঞানেন, মেয়ে জাতকে ছোট করে ও নিজের দাম বাড়াতে চায়। অনেক পুরুষের কাছে এ কৌশল দিবি পাটে। কিন্তু তা খাটলেও আমি বলব তার মধ্যে সুরুচি নেই।’

‘নিশ্চয়ই।’ ডারিসি কথার কাঁচ নিজের উপর টেনে নিয়ে জবাব দিলে—‘মেয়েরা যত রকম ছলা-বলার পুরুষকে ভোলায় তার সব ক’টিতেই এই কুসূচির পরিচয়। হল-চাতুরী জিনিষটাই ত নিন্দার।’

এর পর আর সে সখ্যে আলাপ অগ্রসর হল না।

সে রাতে জেনের অন্তঃস্থতা ত্রাস পেল না এতটুকুও। বিংশ শতাব্দীতে দৃষ্টিভঙ্গিগ্ৰস্ত হয়ে সহরের বড়ো ডাক্তারকে আহ্বান করার প্রস্তাব করলে। কিন্তু স্থির হোল যে, সত্যিই যদি তেমন প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় ডাক্তারই কাল সকালে এসে দেখবেন, তার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। বার বার করে বিংশ শতাব্দীকে সতর্ক করে দিলে, এ বাড়ীর অন্তঃস্থ অতিথির কোন অসুবিধা না ঘটবে, তার সেবা-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয়, সেদিকে যেন সকলে লক্ষ্য রাখে।

### নবম পরিচ্ছেদ

১ প্রায় সারা রাত্রি এলিজাবেথ ভগ্নিনীর সেবার কাটাল। প্রভাত বখন হোল অন্তঃস্থ এইটুকু সে আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারলে বিংশের প্রেরিত দাসীকে যে জেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। দুই বোনও এসে খবর নিয়ে গেল গোঁগাীর একটু পরে। কিন্তু তবু এলিজাবেথ স্বস্তি পেল না। লঙবোঁর্গে মায়ের কাছে একটা খবর পাঠানো তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। যেন তিনি নিজে এসে জেনকে দেখে ইতিকর্তব্য স্থির করেন। সেই মত পত্র পাঠান হোল। দুপুরের দিকে দুই ছোট মেয়ে সঙ্গী করে মা' নিজে এসে পড়লেন।

যদি জেন সত্যিই গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ত, মায়ের মন সত্যিই দৃষ্টিভঙ্গি ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু জেনকে অনেকটা সুস্থ দেখে, তিনি তার পূর্ণ নিরাময়ের বিলম্ব কামনা করলেন। কেন না সুস্থ হোয়ে উঠলেই তাকে এ সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এদের নিকট-সান্নিধ্য থেকে। সুতরাং বাড়ী যাবার সমস্ত মিনতি জেনের মা না করলেন। ডাক্তারও এ অবস্থায় রোগীকে স্থানান্তরের উপদেশ দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ জেনের সঙ্গে কাটিয়ে তিন মেয়েকে নিয়ে মা মিসু বিংশের আমন্ত্রণে খাবার-ঘরে গিয়ে বসলেন। বিংশ সেখানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এই প্রত্যাশায় যে, অন্তঃস্থ মিসেস বেনেট মেয়েকে বিপণ্ডিত দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

‘না, না, এ অবস্থায় জেনকে নড়াচড়ার পক্ষপাতী নই আমি। ডাক্তারও তাই বলেন। এ অবস্থায় আপনার আতিথ্যের উপর আর কিছু ভুলুম আমার করতে বাধ্য হব।’

‘সে কি! ও ধারণা মন থেকে মুছে ফেলুন। আমার বড় বোন এ অবস্থায় মিসু বেনেটকে কিছুতেই স্থানান্তরিত করতে সম্মত হবে না।’

‘এখানে সকলে—’ মিসু বিংশে ঠাণ্ডা গলায় আশ্বাস দিলেন—‘বত হুব সম্বয় সেবা-যত্ন হবে বলেই আমরা আশা করি। সে বিষয়ে আপনি নির্ভর করবেন আমাদের উপর।’

মিসেস বেনেট পর্দাশূন্য বস্ত্রবাহি দিয়ে বললেন—‘সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনার মত সজ্জন স্ত্রী না হলে জেনের যে কি হোত তাই ভাবি। এমন বস্ত্রণা নিয়েও কি আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে যে ও সহ্য করতে পারে, তাতেই বোঝা যায় কতো শান্ত মেজাজ আমার ঐ মেয়ের। অল্প মেয়েদের আমি তাই বলি যে, জেনের যুগ্ম তোরো কেউই নস। আর কি খাসা বাড়ী! এমন বাড়ী বাগান বড়ো দেখা যায় না। এমন পরিচ্ছন্ন বাসা সহজে ছাড়বেন না যে মিঃ বিংশে, তা বত অল্প মেয়েদেরই হোক না লীজ নেওয়া।’

‘সে বলা যায় না, আমি ভারী ব্যস্তবাগীশ লোক। রৌক হলে পাঁচ মিনিটেই আমি এ বাসা ছেড়ে চলে যাব। তবে এখন যা মনে হচ্ছে এখানেই আমি চিরস্থায়ী হলাম।’

‘আপনার সম্বন্ধে আমারও তাই ধারণা।’ বললে এলিজাবেথ।

‘আপনি ত দেখছি আমার চরিত্র বুঝে নিয়েছেন।’

‘নিশ্চয়ই। আপনাকে আমি পুরোপুরি চিনে নিয়েছি।’

‘ভারী ধূসী হলাম। কিন্তু এত সহজে চিনে নেওয়া আমার কাছে ভারী মর্মান্তিক লাগে।’

‘সত্যিই তাই। তবে আপনার মত স্বচ্ছ চরিত্রের লোককে সহজেই বোঝা যায়।’

‘আমি জানতাম না মিসু বেনেট যে আপনি এক জন মানব-চরিত্র অধ্যয়নে পারদর্শিনী মহিলা। চরিত্র-অধ্যয়ন এক মজার শাস্ত্র না?’

‘জটিল যাদের চরিত্র, তারাই গবেষণার পাত্র হিসাবে অধিক আনন্দদায়ক।’

ডারসি বললে—‘কিন্তু পল্লীগ্রামে তেমন বিচিত্র চরিত্র মানুষ পাওয়া যায় ক’টি। এ সকল জায়গায় মানুষ সেই-কুজ পরিচিত গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে।’

‘তা হোক। তবু প্রত্যেকটি মানুষ এমন বদলায় যে, সব সময়ই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণের খোরাক যুগিয়ে চলে।’

মিসেস বেনেট ডারসির এই পল্লীগ্রামের সাক্ষীতার উল্লেখে ঈর্ষ তপ্ত কণ্ঠে বললেন—‘কিন্তু সে বদল ত সহরের মত পাড়াগায়েও হয়।’

এ প্রত্যুত্তরে সবাই বিস্মিত হোল। মিসেস বেনেট বিজয়িনীর মত সকলের মুখে দৃষ্টিপাত করে বলে চললেন—‘সহর লণ্ডন আমাদের গাঁয়ের চেয়ে কি যে আরাম-স্থল, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অগোচর। এতকগুলো দোকান আর বাজার ছাড়া সেখানে এখন-কার চেয়ে আরামের ও সুবিধের কি আছে বলুন ত মিঃ বিংশে?’

বিংশে জবাবে বললে—‘আমিও যখন গাঁয়ে থাকি মনে হয় আর সহরে ফিরব না। আবার যখন নগরবাসী হই, মনে হয় না যে, আর গাঁয়ে দেশে ফিরি। সহর ও গ্রাম দুইয়েই নিজস্ব আরাম ও সুবিধা আছে। আমি ত সর্বত্র সমান সুখ পাই।’

‘তার কারণ, আপনার মধ্যে সেই সুস্থ-বোধ আছে। কিন্তু ঐ ভ্রমলোক—’ ডারসির দিকে অঙ্গুলি হেলন করে বললেন মিসেস বেনেট—‘উনি ত ভাবেন যে, পাড়াগাঁ কিছুই নয়।’

মায়ের তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে লম্ভিত হয়ে এলিজাবেথ দ্রুত কণ্ঠে বললে—‘তুমি ভুল করেছ মা। মিঃ ডারসি বলেন যে, সহরে মানব-চরিত্রের বত বৈচিত্র্য দেখা যায় আমাদের এখানে তা দেখা যায় না। এ কথা তুমিও নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।’

মায়ের অব্যর্থ আচরণে এলিজাবেথ রীতিমত শঙ্কা বোধ করছিল। একথা সে-কথায় সে মাকে আড়াল করে রাখল। তার পর এক সময় দুই বোনকে নিয়ে মা চলে গেলে এলিজাবেথ জেনের ঘরে ফিরে এসে বসল। সে জানল যে তার অবর্তমানে এদের সঙ্গায়ে কথার বড় উঠবে তাদেরই ক’জনকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বিংশের ছোট বোনের সহস্র কৌতুক-পরিহাসেও ডারসি কিছুতেই এদের সকলের সঙ্গে এলিজাবেথের কটু সমালোচনায় যোগ দিল না।

## দশম পরিচ্ছেদ

আর এক দিন একই ভাবে অতিবাহিত হল। দুই বোন দিনের কয়েক প্রহর বোগীর ঘরে কাটাল যেখানে জেন অতি মন্থর ভাবেই সুস্থ হয়ে উঠছিল। সারা দিন বোগীর কাছে কাটিয়ে সন্ধ্যা বেলা এলিজাবেথ বসার ঘরে এসে বসল। লেখার টেবিলের ধারে ডারসি চিঠি লিখছিল আর বিংলের ছোট বোনটি তার অতি নিকটেই বসে তার চিঠি লেখা দেখছিল এবং মধ্যে মধ্যে বড় বোনকে কোন বিষয়ে টেচিয়ে বলে পত্রলেখকের কাজে বিঘ্ন ঘটছিল। বিংলে ও তার ভগিনীপতি হাষ্ট' দু'জনে তাস খেলছিল। বড় বোনটি তাই দেখছিল বসে।

সেলাই নিয়ে বসে এলিজাবেথ ডারসি ও তার সঙ্গিনীর মনোরম কথাবার্তা শুনে লাগল। যে ভাবে অবিশ্রান্ত প্রশংসা বর্ণন করছিল মেয়েটি, সেই একতরফা সংলাপ শুনে এলিজাবেথের মনে অদ্ভুত কৌতুক সঞ্জাত হতে লাগল।

‘আপনার চিঠি পেয়ে বোন খুব খুশী হবে না?’

কোন জবাব দিলে না ডারসি।

‘উঃ, কি তাড়াতাড়ি লেখেন আপনি।’

‘তাড়াতাড়ি কই? আমি ত বরং আন্তেই লিখি।’

‘আচ্ছা, বছরে কত চিঠি লেখেন আপনি? ব্যবসা-সংক্রান্ত চিঠি-পত্র সমেত বলছি। উঃ, আমার ত ভাবতে ভয় লাগে।’

‘বোনকে লিখবেন যে আমি তার দেখার অভিলাষিণী।’

‘কলমের মুখটা ভোঁতা হয়ে গেছে। দিন না আমি ঠিক করে দি। আমি খুব সন্মর করে কলম কাটতে পারি।’

‘কি করে এত চিঠি লেখেন আপনি?’

ডারসি নিঃশব্দে আপন কাজে মগ্ন রইল।

‘আপনি ওকে লিখে দিন যে বীণায় ওর হাত আরো দক্ষ হয়ে উঠছে বলে মিস্ বিংলে আন্তরিক খুশী হয়েছে। আর যে টেবিল-ক্লথের প্যাটার্ন পাঠিয়েছেন তিনি, সেটি ভারী চমৎকার।’

ডারসি অস্বস্তির সঙ্গে বললে—‘এ সব কথা আমি পরের পত্রের জন্তে তুলে রাখলাম। এ পত্র-তরীতে আর ঠাই নাই, ঠাই নাই।’

‘তাতে কি হয়েছে। জাহ্নবীর মাসেই ত তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আচ্ছা, বোনটিকে আপনি বুঝি প্রতিবারেই এমনি দীর্ঘ লিপি পাঠান মিঃ ডারসি? আর এমন মনোহরা চিঠি?’

‘মনোহর কি না জানি না, তবে অনেক লিখি এ কথা ঠিক।’

‘আমার ত মনে হয়, বারা অনেক লিখতে পারে তাদের হাতের লেখাও ভাল হয়।’

বিংলে থেলা থেকে মুখ তুলে বললে—‘ক্যারোলিন, তুমি খাম দেখি। ডারসি চার অক্ষরের শব্দ নির্বাচন করতে অভিধান হাতড়ে বেড়ায়। তাই নয় বন্ধু?’

‘তুমি আর বলো না দাদা’, বললে ক্যারোলিন, ‘তোমার ত অর্ধেক কথা পড়া যায় না, আর বাকী অর্ধেক জ্যাবড়ে যায়।’

বিংলে হেসে বললে বোনকে, ‘আমি বখন লিখি আমার মন এমন দ্রুত ছুটে থাকে যে, অনেক সময় আমার চিঠি পড়ে কিছু বোঝা যায় না।’

‘এ আপনার অভিযন্ত্র বিনয়’—এলিজাবেথ হেসে তাকে নিবৃত্ত

করার চেষ্টা করলে। ‘তার চেয়ে বরং মিঃ ডারসি চিঠিখানি শেষ করে কেনুন সুস্থ ভাবে।’

ডারসি এ মেয়েটির কথা মত কাজ করে শেষ করলে চিঠি। তার পর ক্যারোলিন আর এলিজাবেথকে একটু সঙ্গীত-উৎসবের জন্য অনুরোধ জানাল।

তার অনুরোধে ক্যারোলিন প্রথমেই গিয়ে বসল পিয়ানোর একটু যেন ব্যস্ত ভাবেই। মুখে একবার এলিজাবেথকে অনুরোধ করে, সে নিজে পিয়ানোর হাত রাখলে সামান্য প্রতিবাদ কোরেই।

ক্যারোলিন ও তার দ্বিধা দু'জনে দ্বৈত ভাবে গান করলে। আর এলিজাবেথ টেবিলের উপর থেকে একখানি গান ও স্বরলিপির বই নাড়াচাড়া করতে করতে আড়চোখে দেখলে যে, ডারসি তার দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে আছে। সে ত ভেবেই পার না, অন্ত বড়ো একটি মানুষ তার মত সামান্য মেয়েকে এমন গভীর শ্রীতির চক্ষে দেখেন কি করে! তার প্রতি যদি বিরাগী হবেনই তিনি, তবে অমন করে নানা ছলে কথার সূত্রে তাকে বাঁধবেনই বা কেন, তাকিয়ে দেখে দেখে তার আশা মিটেছে নাই বা কেন? অবশেষে অনেক ভেবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল মনে মনে যে, লোকটির জীবন-দর্শনের পূর্ণ ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত বলেই হয়ত সে অত নিরীক্ষণের পাত্রী হয়েছে মানুষটির। অবশ্য এ অনুমান তার চিন্তকে এতটুকু বেদনার্ত্ত করতে পারলে না।

কয়েকটি ইতালীয় গান গেয়ে ক্যারোলিন হাঙ্কা স্বচ গানের সুরে ঘরের বাতাসকে লব্ধ করে তুলল। তার পর ডারসি এলিজাবেথের কাছে এসে বললে—‘এই উৎসব-লগ্নে সকলের মন হরণ করার জন্য একটু নাচতে লোভ হচ্ছে না আপনার?’

একটু হেসে এলিজাবেথ নিরুত্তর রইল। ডারসি পুনরায় প্রশ্ন করলে কিছুটা বিস্মিত হয়ে।

‘আপনার প্রশ্ন আমি শুনেছি,’ বললে সে, ‘কিন্তু কি বলব জেবে পাচ্ছিলাম না। একবার ভাবছিলাম বলব হাঁ, যাতে আপনি আমার ঘুণা করতে পারেন। ঘুণা করে পৈশাচিক উল্লাস বোধ করতে পারেন। কিন্তু আমার বিশেষ আশ্রয় লাগে লোকের এই প্রকার বাসনাকে মার খাওয়াতে। তাই বলছি যে, আমি নাচব না আপনাদের সামনে—ইচ্ছে হয় আমার ঘুণা করুন, যদি সাহস থাকে।’

‘না, সে সাহস আমার নেই।’

লক্ষ্যায় ফেলার চেষ্টায় বিফল হয়ে এলিজাবেথ এই পুঙ্খবিস্তার সাহসিকতায় মুগ্ধ হল। তার চরিত্রে শ্রদ্ধতা ও কটুতায় এমন এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ আছে যে, কাউকে সত্যি দুঃখ দেওয়া তার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অপর পক্ষে, ইতিপূর্বে অন্ত কোন মেয়ে এমন করে ডারসিকে কোন দিন মুগ্ধ করেনি। ডারসির এই আশংকা ছিল যে, জাগিয়াস এই মেয়েটির জীবনে আভিজাত্যের জৌলুহ নেই, নইলে হয়ত ডারসির নিরাপদ দুর্গ বিপন্ন হত।

এ সবই লক্ষ্য করত ক্যারোলিন আর মনে মনে অস্বাভাবিক হোত। প্রিয়সখী জেন সুস্থ হয়ে ওঠার শুভেচ্ছার সঙ্গে তার এলিজাবেথের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার বাসনা জড়িয়ে উঠত।

এই মেয়েটির প্রতি ডারসির চিত্তবিরাগ বনিয়ে তোলায় অন্ত সে কখনো কখনো তার সঙ্গে এলিজাবেথের কল্পিত বিবাহের কথা উত্থাপন করত।

ক্যারোলিন বলছিল এক দিন বাগানে বেড়াতে বেড়াতে—  
‘বিবাহের পর আপনি নিশ্চয়ই শান্তিডিকে একটু বসনা সংবত  
করতে উপদেশ দেবেন মিঃ ডারসি! আর ছোট-ছোট শালীদের  
একটু সতর্ক করে দেবেন ঐ ভাবে অফিসারদের মরীচিকার  
পিছনে ছুটতে। আর ভবঙ্গ বলা উচিত কি না বুঝতে  
পারছি না, আপনার ভাবী বধূর ঐ মুখের স্বভাব ও গুণভ্য  
সবকিছু তাকে একটু সজাগ করে দেবেন নিশ্চয়ই।’

‘আমার পারিবারিক জীবন সবকিছু আর আপনার কি উপদেশ  
বাকী রইল মিস্ বিংলে!’

‘আমি বলছিলাম যে, আপনাদের বসার ঘরে এলিজাবেথের  
মাসী ও মেসো মশায়ের ছবি দু’টি টাঙাবেন আপনার জ্যেষ্ঠা মশায়ের  
ছবির পাশে। আপনার জ্যাঠা হচ্ছেন জজ ও উনি এটর্নি  
অফিসের কেরাণী। পদমর্যাদা সমান না হোক অন্ততঃ একই  
বিষয়ের মানুষ দু’জনেই। আর ভাবছি এলিজাবেথের কোন  
ছবিখানি আপনি রাখবেন। এ শেষের কোন শিল্পী যে ঐ  
সুন্দরী মেয়েটির অমন সুগনয়ন আঁকতে পারবে ঠিক করে, তা  
আমার বিশ্বাস হয় না।’

ডারসি এবারে বললে, ‘ঠিকই বলেছেন মিস্ বিংলে!  
চোখ, ভুরু, আঁখিপদ্ম সবই হয়ত বা শিল্পীর রঙ-বেধায় প্রতিবিম্বিত  
হবে, কিন্তু সে দৃষ্টির গভীর ব্যঞ্জনা আঁকবার শিল্পী সত্যি হলো।’

অপর দিক থেকে এগিয়ে এল বিংলের বড় বোন আর  
এলিজাবেথ।

‘আপনারাও বেরিয়েছেন! আমি ভেবেছিলাম হয়ত আপনারা  
আজ আর বেরোবেন না’—বললে ক্যারোলিন কিছুটা খতমত ভাবে।  
নিজের কথা এরা শুনেছে কি না তাই ভেবে সে আলাপের মূহুর্ত  
পালটালে দ্রুত কণ্ঠে।

‘তোমরা ভারী স্বাধীনতার মত বেরিয়ে এসেছ’—বললে  
ক্যারোলিনের দিদি। তার পর ডারসির বাহ অবলম্বন করে সে  
ক্যারোলিনের সঙ্গে এগিয়ে চলল সঙ্কীর্ণ উদ্ভান-পথ ধরে।

ভাঙের ব্যবহারের রুক্ষতায় ডারসি মনে মনে অশ্রুস্ত হ’ল।  
সে তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানিয়ে বললে—‘এ পথ বড়ো সঙ্কট।  
চার জনের বেড়াবার পক্ষে অসুবিধা। চলুন বড়ো রাস্তার  
পথ ধরি।’

এলিজাবেথের একটুও ইচ্ছা ছিল না এদের সঙ্গে বেড়াবার।  
সে কোঁতুক হাতে জবাব দিল—‘না, না, ঠিক আছে। আপনারা  
তিন জনে দিব্যি দল পেয়েছেন। এমন ছবির মত সমাবেশ এক জন  
বাইরের লোকের উপস্থিতিতে নষ্ট হতে দেবেন না! আমি চলি।’

লঘু পদক্ষেপে এলিজাবেথ ফিরে আসতে লাগল। তার মন  
এই আশায় দোল খাচ্ছে যে, দু’এক দিনের মধ্যে সে দিদি জেনকে  
নিরে গৃহে প্রত্যাভর্তন করতে পারবে। ইতিমধ্যে অনেক স্নেহ  
হয়ে উঠেছে জেন। আজ সন্ধ্যায় সে ঘরের বাইরে ঘণ্টা দুই থাকার  
অনুমতি পেয়েছিল ডাক্তারের কাছে। [ ক্রমশঃ ]

অনুবাদক—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীঃস্বস্তকুমার ভাট্টা।

## বিদ্রোহী নজরুল

প্রভাকর মাঝি

বিদ্রোহী ওঠো জেগে।

ধূলি ধূসরিত দীন নারায়ণ যায় যে তোমারে ডেকে।

উৎপীড়িতের ক্রন্দন-ধ্বনি

আকাশে-বাতাসে আজো উঠে রণি’

আজো ঢেকে আছে নবীন সূর্য্য হিংসার কালো মেঘে।

পাপ দানবের খর্কর নাশিতে বিদ্রোহী ওঠো জেগে।

তোমার মা ভৈঃ বাণী

মহাবিশ্বের মহাকাশ ফুঁড়ি করিতেছে কানাকাণি।

ভূগম গিরি-মক্ষ-কান্তারে,

কারা ছুটে যায় ঘন আধিয়ারে—

নিরুদ্ধশের ইজিতে ছুটে কোন বাধা নাহি মানি।

দুঃসাহসীয়ে দুঃস্বপ্ন করে তোমার মা ভৈঃ বাণী।

অশান্ত ধূমকেতু।

হিন্দু-মুসলমানের পরাণে বাঁধিলে মিলন-সেতু।

গাহিলে শিকল ছিঁড়িবার গান,

ডাক শুনে এলো লক্ষ জোয়ান,—

নবীন বাঙলা উদ্ভাস হোত—আজি বুঝি তার হেতু।

চকিতে আসিয়া চকিতে গেলে কি অশান্ত ধূমকেতু!

আজ তুমি নির্দাক!

কণ্ঠে তোমার আর নাহি শুনি প্রলয়ঙ্কর ডাক!

বিবশ শরীর রোগে শোকে জ্বরে

তুমি বেঁচে আজো মরণের তরে—

কোন সাগরের অন্তল ভূবেছে বিদ্রোহী মৈনাক।

ওগো বুলবুল! সুখর কণ্ঠ কেন হোল নির্দাক!

জেগে ওঠো বিদ্রোহী!

অন্ধদিনের বাসরে তোমার একান্ত মনে কহি।

প্রার্থনা করি তরুণের দল—

তুমি জেগে ওঠো দীপ্ত উজ্জল,

আগ্নেয় গানে আন্দোলি লাও ভূধর-সিঁদু-মহী।

উদ্ধার হতো বলে ওঠো আজ, জেগে ওঠো বিদ্রোহী।

# আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান

১০

শ্রীমুখার চট্টোপাধ্যায়

## গল্প-সাহিত্য

গল্প-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাংলার প্রভাব ও অম্লসরণ-কাহিনী দিয়েই আমার লেখা শেষ কোরব। আমরা দেখেছি যে, হিন্দী গল্প যেদিন উর্দু ও সংস্কৃতের মাঝখানে পড়ে আপনার ভার-সাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, সেদিন বাংলাকে অবলম্বন করেই তার আদর্শ স্থির হয়েছিল। বাঙ্গালী ও বাংলা গল্প হিন্দী গল্পকে অঙ্কুর হোতে আলোকের পথে পরিচালিত কেমন করে করেছে, তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করেছি। হিন্দী গল্পের বিভিন্ন শাখাতে বাঙ্গালীর দান কম নয়।

## প্রবন্ধ

প্রবন্ধ বা নিবন্ধ-সাহিত্য বাংলার প্রবন্ধ বা নিবন্ধ-সাহিত্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য অত্যন্ত বিকশিত হয়েছে উঠেছিল। বাংলাতে বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র রূপ দেখিয়েছিলেন, মোটামুটি তাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল হিন্দী প্রবন্ধ-সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ‘ধর্মতত্ত্ব’র মত প্রবন্ধ এবং ‘কমলাকান্তের দপ্তর’র মত তুচ্ছপত্র পরিহাস-মধুর রচনা নিয়ে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। হিন্দীতে ‘ধর্মতত্ত্ব’র ও ‘কমলাকান্তের দপ্তর’র (‘চৌবেকা চিঠি’) অনুবাদ হোলো হিন্দীর আদর্শ স্থির করার জন্য, হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য। হিন্দী প্রবন্ধ-সাহিত্য বাংলা হোতে আরও অনেকের অনুবাদ নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। আর শুধু অনুবাদ নয়, মৌলিক রচনার ভিতরেও বঙ্কিমের প্রভাব রয়েছে, বাংলার অন্যান্য প্রবন্ধ-লেখকদের প্রভাব আছে। ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর হিন্দী ‘চৌবেকা চিঠি’র পথ ধরে মৌলিক রচনা ‘শিব-শঙ্কর’ বা ‘চিঠি’ বেরোল। বাবু বালমকুল গুপ্তের ‘শিবশঙ্কর’ বা ‘চিঠি’র কিছু অংশ নিচে উদ্ধার করছি:—

“ইতনে মৈ দেখা কি বাদল উমড় রহে হৈ। চীল নীচে উত্তর রহী হৈ। তবীয়ত তুরতুরা উঠী। ইধর ভংগ, উধর ঘট—বহার মৈ বাহার। ইতনে মৈ বায়ু কা বেগ বড়া, চীল অদৃশ হই। অধেরা ছায়া, বৃন্দে গিরনে লগী; সাধ হী তড় তড় ধড় ধড় হোনে লগী। দেখা ওলে গির রহে হৈ।... ‘বম ভোলা’ কহকর শর্মাঝীনে এক লোটা ভর চড়াই।... পর বহ চীল কহী গই হোগী।... শিবশঙ্কর কো ইন পক্ষিরী। কী চিন্তা হৈ। পর বহ য়ন নহী। জানতা কি ইন অজ্ঞানপাণী ভটালিকারে। সে পরিপূরিত মহানগর মৈ মহাপ্রাণ। অভাগে রাত বিতানে কো ঝোপড়ী ভী নহী রখতে।”  
অনুবাদ:—

দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইল। কয়েকটা চিল নামিতে লাগিল। মন মাতিয়া উঠিল—এদিকে সিঁদ্ধি ওদিকে মেঘ। বাহিরে কি বাহার! দেখিতে দেখিতে বায়ুর বেগ বাড়িল, চিল অদৃশ হইল। আধার করিয়া আনিল, বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে তড়-তড় তড়-তড়। দেখিল শিল পড়িতেছে। ‘বম ভোলা’ বলিয়া শর্মা এক লোটা ভর্ত্তি সিঁদ্ধি চড়াইল। কিন্তু ঐ চিল কোথায় গেল? শিবশঙ্কর এই সকল পক্ষীর জ্ঞান চিন্তা হইল। কিন্তু তাহার জানা নাই যে, অজ্ঞানপাণী ভটালিকা পরিপূরিত মহানগরে মহাপ্রাণের রাত কাটাইবার কুণ্ডে ঘরও নাই।

‘শিবশঙ্কর’ বা ‘চিঠি’ বা ‘শিবশঙ্কর দপ্তর’ বিশ্লেষণের দ্বারা পড়বে ‘কমলাকান্তের দপ্তর’-এর প্রভাব। এ প্রভাব গল্পের style-এ, বিষয়-বস্তুতে, সমাজদর্শন-জ্ঞাত প্রতিক্রিয়াতে।

চন্দ্রশেখর ও আরও অনেকে যে উচ্ছ্বাস-প্রবণ গল্পের পথ বাংলাতে খুলে দিয়েছিলেন, তারই পথ ধরে হিন্দীতে এসেছিল ‘প্রলাপ শৈলী’। এই উচ্ছ্বাস-প্রবণতার পথ ধরে অনেক হিন্দী সাহিত্যিকই সারস্বত-কুঞ্জে প্রবেশের প্রয়াস পেয়েছেন। এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত গুরু অত্যন্ত সচেতন হোয়ে বলেছেন:—

“...ভাবপ্রবণতা সে প্রেরিত কল্পনা কে বিপ্লব ঠর বিক্ষেপ আঁকিত করনেবাণী এক প্রকার কী প্রলাপ শৈলী ভী ইন্দ্রহোনে নিকালী জিসমে রূপবিধান কা বৈলক্ষ্য্য প্রধান থা, ন কি শব্দবিধান কা। ক্যা অচ্ছা হোতা যদি ইস শৈলী কা হিন্দী মৈ স্বতন্ত্র রূপ সে বিকাশ হোতা। তব তো বঙ্গ সাহিত্য মে প্রচলতি ইস শৈলী কা শব্দ প্রধান রূপ, জো হিন্দী পর কুছ কাল সে চড়াই কর রহা হৈ ঠর অব কাব্যক্ষেত্র কা অতিক্রম কর কতী কতী বিষয় নিরূপক নিবন্ধো তক কা অর্থাগ্রাস করনে দৌড়তা হৈ, শায়দ লগহ ন পাতা।”

কাব্যাত্মক গল্প-প্রবন্ধের দ্বারা হিন্দীতে চলল কেমন করে সে সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন, “যদি किसी রূপ মৈ গল্প কী কোই নই গতিবিধি মিথ্যাই পটী তো কাব্যাত্মক গল্প প্রবন্ধো কে রূপ মৈ। পহলে তো বঙ্গভাষা কে ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ (চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কৃত) কো দেখ কুছ লোগ উসী প্রকার কী রচনা কী ওর ঝকে, গীছে ভাবাত্মক গল্প কী কই শৈলিরী। কী ওর। ‘উদ্ভাস্ত প্রেম’ উস বিক্ষেপ শৈলী পর লিখা গয়া থা জিসমে ভাবাবেশ জোতিত করনে কে লিয়ে ভাষা বীচ বীচ মৈ অসম্বন্ধ অর্থাৎ, উথড়ী হই হোতা থী। কুছ দিনে। তক তো উসী শৈলী পর প্রেমোঙ্গার কে রূপ মৈ পত্রিকার্যে। মৈ কুছ প্রবন্ধ নিকলে জিনমে ভাববৃত্তা কী বলক রহী সে বহী তক রহতা থী। গীছে

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় আমাকে ‘হৈ’, ‘বহ’, ‘রহ’, ‘মৈ’ প্রভৃতি রূপান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন। হিন্দীর ‘ব’ (व) আসামী অক্ষর দিয়ে দেখান যেতে পারে। কিন্তু ওর নির্দেশ প্রেসকে বিড়বিত্ত কোরবে বলে তা আর কোরলাম না।

\* পরম পূজনীয় গুরুদেব ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশক্রমে হিন্দী বানানই রাখা গেল। বাংলাতে ‘হর’, ‘উরহ’, ‘ইহ’, ‘মায়’, সর্জনজনবোধ্য বোলে নিখতাম, কিন্তু পরম পূজনীয়



ঐ চতুরসেন শাস্ত্রী কে 'অন্তঃসল' মে' প্রেম কে অতিরিক্ত ঔর দূসরে ডাবো কী ভী প্রবল ব্যক্তা অলগ অলগ প্রবন্ধে। মে' কী গদ্য জিনমে কুছ দূর তক এক টগ পর চলতী থাযা কে বীচ বীচ মে' ভাব কা প্রবল উত্থান দিখাই পততা থা। ইস প্রকার ইন প্রবন্ধে কী ভা।। তরসংগী ধারা কে রূপ মে' চলী থী অর্থাৎ উসমে 'ধারা' ওর 'তরঙ্গ' দোনো কা যোগ থা। যে দোনো। প্রকার কে গজ বঙ্গালী থিয়েটারো কী বঙ্গভূমিকে ভাষণে। কে সে প্রভাত ২৭।

সমালোচনামূলক প্রবন্ধও বাংলার দেখাদেখি শুরু হয়েছিল হিন্দীতে। এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধের ইতিহাসে মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীজীর নাম প্রস্তাব সঙ্গ শ্রবণযোগ্য। 'সরস্বতী' পত্রিকার সম্পাদক হয়ে তিনি বাংলাকে আদর্শ করে হিন্দীর আধুনিকীকরণ শুরু করেছিলেন। এক বকম তাঁরই নিদে'শক্রমে হিন্দী কবিতা পুরাতন ধারা হোতে বাংলা অমুসরণ করে নতুন পথে এগুল। মৈথিলীশরণের বাংলা কবিতাসমূহের কথা বোলতে গিয়ে আমি এ প্রসঙ্গে আশোচনা করেছি (ভাস্ক, ১৩৫৬, বহুমতী)। আবার 'সরস্বতী' পত্রিকাতে হিন্দী ভাষায় বাংলা কবিতা অমুবাদের একটা ধারা চলছিল ১১১০ খৃষ্টাব্দ হোতে। উৎসাহ ছিল দ্বিবেদীজীর আর অমুবাদক ছিলেন পাসনাথ সিংহ। মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদীজী 'সরস্বতী' পত্রিকাতে যে সমালোচনার ধারা প্রবাহিত কোরলেন, তা বাংলায়ই তুলনামূলক সমালোচনারই অমুসরণ।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের গজকে আদর্শ করে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস হিন্দীতে বেশ চালু হোয়েছে। সমালোচক লিখেছেন, "পীছে রবীন্দ্রবাবুকে প্রভাব সে কুছ রহস্তোমুখ আধ্যাত্মিকতা কা রপ লিএ জিস ভাষাত্মক গদ্য কা চলন হয় বহ বিশেষ অলঙ্কৃত হোকর অস্ত্রোক্তি পদ্ধতি পর চলা।"

হিন্দী নিবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাস হোলো তাহ'লে এই যে, হিন্দী সাহিত্যিকেরা নিবন্ধ ও রচনার জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র হোতে শুরু কোরে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত একাধিক বাঙ্গালী লেখকের রচনার আদর্শ গ্রহণ কোরে হিন্দী নিবন্ধ-সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশে পরম সহায়তা কোরেছেন। এই সকল নিবন্ধের ভিতর মৌলিক লেখাও আছে, আবার মৌলিক নামে চলিত অমৌলিক লেখাও আছে। অমুবাদের কথা না হয় নাই ধরা হোলো।

### নাটক

১৮' হিন্দীতে যে বাংলার দেখাদেখি গজিয়ে উঠেছিল তার বিস্তৃত আলোচনা আমি কোরেছি (ফাল্গুন ১৩৫৬, বহুমতী) পূর্বেই। সমালোচক গুরু স্পষ্ট কোরে তারই স্বীকৃতি দিয়েছেন হিন্দীতে। তিনি বলেছেন, "যহ তো স্পষ্ট হৈ কি আধুনিক কাল কে আরম্ভ সে হী বঙ্গালী কী দেখা-দেখী হমারে হিন্দী নাটকো কে টাচে পাশ্চাত্য হোনে লগে।"

হিন্দীর নব জাগরণ হোলো বিশেষ কোরে নাটক ও উপন্যাসে। বিশেষ কোরে নাটক ও উপন্যাস এ দু'টিই হিন্দীর গৌরবের বস্ত। হিন্দীর কবিতা বাংলা কবিতার গুরে উঠনি, কারণ রবীন্দ্রনাথ একাই একশ'। উপন্যাসে প্রেমচন্দ্র আর নাটকে জয়শঙ্কর প্রসাদ হিন্দীর গৌরব। তাই হিন্দী আধুনিক নাটকের প্রথম যুগে

বাংলার অমুসৃতির মূল্য যে কতখানি, তা সকলের স্বীকৃতি পাওয়া উচিত। আধুনিক হিন্দী নাটকের প্রথম যুগে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের নাম প্রস্তাব সঙ্গে শ্রবণযোগ্য। হরিশ্চন্দ্রের পূর্বে হিন্দীতে নাটকের অস্তিত্ব বিশেষ ছিল না, ছিল 'জলীক কুনটি'। ভারতেন্দু বাংলা হোতে অমুবাদ কোরলেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'পাবণ-বিড়ম্বন', 'ধনঞ্জয়বিজয়' প্রভৃতি নাটক। তিনি গ্রহণ কোরলেন মৌলিক নাটকেও বাংলা নাট্যাদর্শ। ভারতেন্দু প্রবর্তিত পথে চললেন বাবু রামব্রহ্ম বর্মা এবং আরও অনেকে। অমুবাদ হোতে লাগল 'বীর নারী', 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', বদনীর, 'ব্রহ্মবাহন', 'দেবদশা', 'ধানজাহা', গিরিশচন্দ্রের নাটক, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলী, রবীন্দ্রনাথের নাটক, বোণেশ চৌধুরীর নাটক। হিন্দীতে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক অমুবাদ করার কারণ হোলো, "ইনশব রচনো"। সে পাঠক জান সত্যে হৈ কি দ্বিজেন্দ্রলাল কিস শ্রেণীকে নাট্যকার থে ঔর উনকে এসে অচ্ছে নাটক রচনাসে হিন্দী ভাষাকো আভূষিত করনকী কিতনী বড়ী আবশ্যকতা হৈ।"

এই অমুবাদের ধারাতে অব্যক্ত 'তেজী মন্দি' আছে। কখনও অমুবাদ বেশ জোর চলেছে। কখনও দীর্ঘ দিন আর বাংলা হোতে অমুবাদ হয়নি। কিন্তু অমুবাদ ছাড়া মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে বাংলা যে প্রভাব বিস্তার কোরল তা হোলো এই :—

(ক) তৎসম শব্দপ্রধান উচ্ছাসময়ী ভাষা।

(খ) মঙ্গলাচরণ প্রভৃতির বিলোপ। প্রবেশক-বিকৃতকান্নির বিলোপ।

(গ) গর্তাক—Scene অর্থে ব্যাক্ত।

(ঘ) ট্রাজেডির প্রবর্তন।

(ঙ) বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে প্রথমে হিন্দীর আদর্শ হোলো বাংলা প্রথম যুগের নাটকের বিষয়-বস্ত। পরে বাংলা জায় সামাজিক ও বিশেষ কোরে ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুর প্রতি আকর্ষণ। প্রথম যুগের বাংলা নাটকে ছিল ইংরাজীমানার প্রতি ব্যঙ্গ আর পুরোনো টিকিওয়ালাদের ভণ্ডামি প্রকাশ। রমুত্থানে- 'একেই কি বলে সভাভা', 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ', কালীপ্রসন্ন- 'বাবু', নাটকীয়-মণ্ডিত 'আলালের ঘরের দুলাল', সোসাইটি- 'নবাববুকিলাস বা 'হুতোম প্যাচার নম্মা' প্রভৃতি হিন্দীর প্রথম যুগের নাটকের বিষয়-বস্তকে অমুপ্রাণিত কোরেছে। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের মৌলিক নাটক 'বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি' গ্রহসন এতে 'ধর্ম' ঔর উপাসনাকে নাম সে সমাজ মে' প্রচলিত অনেক-অনেক অনাচারোঁ কা জঘন্ত রূপ দেখানো হয়েছে। ভারতেন্দু 'প্রেমযোগিনী' নাটকে 'পাবণময় ধর্মিক ঔর সামাজিক জীবন'চিত্র। চৌধুরী বরীন্দ্রনাথের 'বারান্দা রহস্ত মহানাটক' কিশোরীলাল গোস্বামীর 'চৌপট চপেট' গ্রহসন। এতে 'চরিত্রহী ঔর ছলকপট সে ভরী দ্বিষ্টো' তথা লুটো-তুর্গো আদি কে বীতং ঔর অলীল চিত্র' দেখান হয়েছে। এর পর সামাজিক আঁ ঐতিহাসিক নাটক বাংলাতে যখন বিকশিত হোয়েছে, হিন্দীতেও তা ধারা চলেছে। হিন্দীতে কীর্ত্তনপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা গিরিশচন্দ্র-নাটক গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছিল। অব্যক্ত বাংলা নাটকে অমুবাদ উপভাসের মত অন্ত নির্বিচারে হয়নি। তাই সমালোচ

গুরু বোলছেন, 'বঙ্গলাকে নাটকীয় কুহু অমুবাদ বাবু রামকৃষ্ণ বর্মা কে বাধ ভী হোতে রহে পর উত্তনী অধিকতা সে নহী' জিতনী অধিকতা সে উপভাসে। কে। ইসসে নাটক কী গতি বহুৎ মন্দ বহী...ইসকে উপরাস্ত বঙ্গলা মে' ঐষিক্সেল্লাল রায়কে নাটকীয় কী ধুম হই ওর উনকে অমুবাদ হিন্দী মে' খড়াখড় হু। ইনী. প্রকার রবীন্দ্রবাবুকে কুহু নাটক ভী হিন্দীরূপমে' লাএ গএ।"

আধুনিক হিন্দীর নাট্যক্ষেত্রে যিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনার অপরিণীম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সেই জয়শঙ্কর প্রসাদও বাঙ্গালী ঐজ্ঞেল্লালের নিকট অন্ন-বিস্তর খনী। অবশ্য জয়শঙ্কর প্রসাদ অপূর্ণ মৌলিকত্ব দেখিয়ে একাধিক স্বন্দর ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গীর সঙ্গে এবং দৃশ্য-পরিচয়নার সঙ্গে ঐজ্ঞেল্লালের নাটকবলীর অভূত মিল দেখা যায়।

### উপভাস

উপভাস হোলো ইংরাজী নভেলের বাংলা নাম। মরাঠাতে নাম নিয়েছে 'কাদম্বরী', হিন্দীতে বাংলা হোতে নাম নিল উপভাস (বসুমতী, কাল্পন ১৩৫৬)। আর শুধু নাম নিয়েই ক্ষান্ত হলো না, খড়াখড় বেকুতে লাগল অমুবাদ, অমুকরণ অমুসরণ। বাংলা অমুবাদের সম-সময়ে বা কিছু পূর্বে যে 'তিলিম, আইয়ারী' লেখা চলছিল, যেমন দেবকীনন্দন খজীর 'চন্দ্রকান্তা', 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি', 'বীরেন্দ্রবীর' প্রভৃতি, সেগুলো এত অখ্যাত-খরণের লেখা যে, সেগুলোকে সাহিত্য বলতে ইচ্ছা করে না। এই রচনাগুলো হিন্দীর পাঠক-পাঠিকারা গোপ্রাসে গিলেছেন সেদিন অবধি। আমি যখন থাকতাম সিউড়ীতে তখন এ কলেক্তের পুরোনো লাইব্রেরিয়ান রামচন্দ্র রায় আমাকে এই 'চন্দ্রকান্তা'র এক গালা বই পড়তে দিয়েছিলেন হিন্দীর চমৎকার বই হিসেবে। পড়ে মনে হোলো এত গালা, এত অখ্যাত রচনা কি কোরে ছাপা হোরে থাকে। আর শুধু ছাপাই নয়, সমাদরও পেয়ে থাকে। হিন্দীতে এখনও 'ইন্টরওয়ালী', 'তুফান মেল' প্রভৃতি যে খরণের বই প্রেক্ষাগৃহে দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি এরই উন্নত সংস্করণ।

হিন্দীতে বাংলার অমুবাদ-বুগ সুরু হোলো ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের কাল থেকে বিশেষ কোরে। বাংলাতে তখন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির উৎকৃষ্ট রচনা বেরিয়েছে। স্তবরাং ঐ গালা-গল্প মরুপথে ধারা হারিয়ে ফেলল। হিন্দী সাহিত্যে এল সত্যিকার উপভাস, যার মধ্যে চরিত্র-চিত্রণ আছে, সমাজ-চিত্র আছে, আর আছে সাহিত্য-বোধ ও জীবনদর্শন। 'ঈশ্বর প্রদর্শিত কোরলেন সত্য-সাহিত্যের পথ এই অমুবাদের মাঝখান দিয়ে'—এমন কথা সমালোচক-প্রবর পণ্ডিত রামচন্দ্র গুরু নিজেই বলেছেন। তাঁর মতে, "বঙ্গলাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক, পারিবারিক ওর ঐতিহাসিক উপভাসে। কে লগাতার আতে রহনে সে কচি পরিস্কৃত হোতী রহী, জিসসে কুহু দিনে কী তিলিম, আইয়ারী ওর জামসী কে উপরাস্ত উচ্চ কোটিক সঙ্গে সাহিত্যিক উপভাসে। কী মৌলিক রচনা কা দিন ভী ঈশ্বর নে দিখায়ী।"

ভারতেন্দুর বুগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত উপভাসের অমুবাদ বেরোতে লাগল। অমুবাদ হোতে লাগল 'বর্ণলতা', 'মরতা ক্যা ন মরতা', 'ইলা', 'প্রমীলা', 'মধুমালতী', 'চতুরচকলা', 'ভায়মতী'.

'নয়ে বাবু', 'বড়া ভাই', 'সেবাবী জেঠানী', 'সো. বহিন' ইত্যাদি। অমুবাদ হোতে লাগল 'দীপনির্বাণের'। অমুবাদ হোতে লাগল বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু কোরে একাধিকের উপভাস।

'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস'-লেখক বলেছেন, "ইস উপান কে ভীতর বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হারানচন্দ্র রক্ষিত, চণ্ডীচরণ সেন, শরৎ বাবু, চাক্রচন্দ্র ইত্যাদি বংগভাষা কে প্রায় সব প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপভাসকারে। কী বহুৎ নী পুস্তকোকে অমুবাদ হো হো হী গএ, রবীন্দ্রবাবুকে ভী 'আখ কী কিরকিরি' (চোখের বালি) আদি কই উপভাস হিন্দী রূপমে' দিখাই পড়ে জিনকে প্রভাব সে ইস উপানকে অমুমে' আবিভূত হোনেবালে হিন্দী কে মৌলিক উপভাসকারে। কা আদর্শ বহুৎ কুহু উচা হুজা।"

উপভাসের ক্ষেত্রে হিন্দীর হাতেখড়ি বাংলাকে নিয়ে। আবার পরবর্তী কালের মৌলিক উপভাসের সাহিত্যিক উন্নতিও নির্ভর কোরেছে বাংলা আদর্শ নিয়ে। এ ছাড়া বাঙ্গালী সাহিত্যিক মৌলিক হিন্দী উপভাসও রচনা কোরেছেন। হিন্দীতে উদাসেবী মিত্র বুগাস্তকারী উপভাস রচনা কোরেছেন। বাংলার দেখাদেখি হিন্দীতে 'সামাজিক', 'ঐতিহাসিক' প্রভৃতি উপভাস চালু হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপভাসের পথ দেখিয়েছিলেন বাঙ্গালী লেখক। "ঐতিহাসিক উপভাস জিস্ ঢাসে লিখনা চাহিএ, বহ প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ ঐরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়নে অপনে 'করুণা', 'শশাংক', ওর 'ধর্মপাল' নামক উপভাসে। দ্বারা অচ্চী তরহ দিখা দিয়া।" আজকের হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচন্দ্র, কৌলিক, হুভদ্রাকুমারী চৌহান, ঐরাবন্তব, জৈনেন্দ্রকুমার প্রভৃতি যে সকল মৌলিক উপভাস লিখেছেন, সেগুলির অনেকগুলিই বাংলা উপভাসাদির দ্বারা গভীর প্রভাবাবিহিত।

### ছোট গল্প

হিন্দী ছোট গল্পও বাংলাকে অবলম্বন কোরেই এক দিন গজিয়ে উঠেছিল। হিন্দীর 'সরস্বতী' পত্রিকাতে বাংলা হোতে অমুবাদ করা গল্পের একটি ধারা দ্বিবদ্যাজীর নির্দেশক্রমে চলছে দীর্ঘ দিন। এ ছাড়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের গিরিজাকুমার ঘোষ 'লালা পার্বতী নন্দন' নামে একাধিক বাংলা গল্প অমুবাদ কোরেছেন। মৌলিক হিন্দী ছোট গল্পের ক্ষেত্রে মির্জাপুরের রামপ্রসন্ন ঘোষের কল্প 'বংগ মহিলা' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কোরে আছেন।

হিন্দীতে আধুনিক কালে কত যে বাংলা গল্পের অমুবাদ হোয়েছে ও কত মৌলিক গল্প (?) যে বাংলার মাল, তা আর বলে শেষ করা যায় না। হিন্দীর সত্যিকার মৌলিক ছোট গল্প ধারা লিখছেন, তাঁদের লেখাতেও বাংলার প্রভাব এত স্পষ্ট যে, তাই নিয়েই মাসের পর মাস বসুমতীর পাতায় আলোচনা চালান যেতে পারে। কিন্তু ঐযুক্ত প্রাণতোষ ষটক মহাশয় এই কিত্যোতেই হিন্দী সাহিত্যের ব্যাপার খতম কোরে ফেলতে চান বলে আর এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব হল না।

আমার এত দিনকার লেখার মধ্যে কিছু কিছু ভুল আছে। পূজনীয় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর কিছু আমাকে দেখিয়েছেন। ১৩৫৭ অগ্রহায়ণে আমি লিখেছি যে, পণ্ডিত

বুগলকিশোর সম্পাদিত ‘উদভ্রমার্গ’ (খৃষ্টাব্দ ১৮২১) কানপুর হোতে বেরিয়েছে। এটি আমার মন্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। বুগলকিশোর কানপুরের লোক হোল্ডে কোলকাতা থেকেই তাঁর ‘উদভ্রমার্গ’, হিন্দীর প্রথম স্ববাদপত্র, ‘বেরিয়েছে। এর সন তারিখও ভুল করেছে। ১৮২১ খৃষ্টাব্দ না হয়ে হবে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ। ডক্টর চট্টোপাধ্যায় আমার এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।

আরও কিছু কিছু ভুল আমার নিজের নজরে এসেছে। ১৩৫৬৩

আমি বাঙালি গল্পের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য যে পত্রটি উদ্ধার করেছি, তা ‘কার্তিকপ্রসাদ খরীর’ পত্র নয়। কার্তিকপ্রসাদ খরীকে লিখিত ক্ষেত্রবিক পত্রটি সাহেবের পত্র। আর একটি কথা—চাকচর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘গাড়ীর আড়ি’ বিষয়ে যিনি ‘বহুমতী’ অফিসে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর চিঠি ‘বহুমতী’ থেকে হারিয়ে গেছে বোধ হয়। তিনি আমাকে যদি পুনরায় কষ্ট কোরে ‘গাড়ীর আড়ি’ বিষয়ে সংবাদ পাঠান, তাহলে খুশী হব।

## বেটরো প্রচার-সঙ্ঘ

ক্যালিন কিংবা স্যামোয়া, বহু কিংবা কলকাতা, যেখানে আপনি বাজার করতে যান, সেখানেই আপনি জানতে পারবেন, ইংরেজ এসেছে, ইংরেজ আসছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইংরেজ যে সওয়া নিয়ে আসে তার মধ্যে প্রধান হল বাইসাইকেল, চুলের কঁস, রেডিও, টোটোর আর আর স্বচ ছইছি। তাদের, মানে ঐ ইংরেজদের এই সব সওয়া বিক্রী করতেই হবে, নয় তো অনাহারে অনিশ্চিত মৃত্যু।

ব্যবসা আর বাজার, বাজার আর ব্যবসা, এই দুয়ের মাঝে স্থান পেতেই হবে, যেন তেন প্রকাশ্যে। নয় তো ইংরেজ জাতির অর্থনৈতিক মরণ অবশ্যজারী। এই দুঃসহ চিন্তায় আকুল হয়ে ইংরেজ বৃত্তে পারলে রমণীর ও চৌখর্খানো সওয়া আর সওয়া দামই যথেষ্ট। য ব্যবসার পক্ষে। এই সব কিছুই সঙ্গে প্রধান প্রয়োজন যে বস্ত, সেটি হল “সেলসুয়ানসিপ। পৃথিবীর বাজারে সর্বাপেক্ষা দক্ষ “সেলসুয়ান” হতে হবে। বিক্রী-কিনির ব্যাপারে পাকা “সেলসুয়ান” না হলে আব কোন উপায় নেই।

এই চিন্তায় আকুল হয়ে এবং মনের ভেতর এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা গঠন করলো বেটরো বা *Betro*।

বেটরো বা *Betro* কথাটি আর কিছুই নয়, *British Export Trade Research Organisation* এর আভ অক্ষরগুলির একত্র মিলন-কথা। বেটরোর মূল উদ্দেশ্য হল এবং বেটরো গঠিত হল বিলেতী ব্যবসায় প্রচার-মাধ্যম হিসাবে, যাতে সমগ্র হুনিয়ার বাজারে বিলেতী পণ্যের এক নতুন চাহিদা হয়। বেটরো লক্ষ্য রাখবে পৃথিবীর লোকের কি প্রয়োজন হতে পারে, কি প্রয়োজন হবে এবং কি কি প্রয়োজন হওয়াতে পারা যায়। তার পর সেই প্রয়োজনীয় জবাব দি হুনিয়ার বাজারে সরবরাহ করবে ইংরেজ ব্যবসায়ী।

বেটরোর কাজ যাতে সহজে চলতে পারে সে জন্য সারা হুনিয়াকে বেটরো ‘সম্ভব শৃঙ্খলে’ জড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক সম্ভব থাকবে উদ্ভূত একেকটি দল, যারা পৃথিবীতে উড়ে বেড়িয়ে পরীক্ষা করবে সেই সব বাজার, যাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। পোষাক-পরিচ্ছদ, আবহাওয়া, রঙ, শিলা, কচি, ধর্ম এবং আশা কাদের কি রকম তাই-বাচাই করবে বেটরো সম্ভ। এই ভাবে বাজারের অবস্থা বুঝে বেটরো উপদেশ দেবে বিলাতী ব্যবসায়ীদের, কি করতে হবে, কোথায় কি পাঠাতে হবে এবং কত মূল্য নির্ধারণ করা বাবে বিলেতী পণ্যের।

বেটরোর সমগ্র পরিচালন-পদ্ধতির পেছনে আছে সমগ্র ইংরেজ সরকারের আন্তরিক আশীর্বাদ। বেটরোর টাকা-পয়সা যোগাবে সত্তর জন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাদারের দেয় চাঁদ। আর কয়েক কোটি ডলারের একটি মিলিত মূলধন। প্রায় সাত বছর হল এই বেটরো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা। বেটরোর দু’টি চোখের একটি আমেরিকার বাজারে নিবন্ধ, অপরটি স্বদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এত দিন পরেও ব্রিটেন এখনও তার অর্থনৈতিক হ্রসবতা সামলে উঠতে পারেনি। ব্রিটেনের অধিবাসী এখনও ক্ষুধার্ত। ব্রিটেনের কর্মরত যন্ত্রপাতিগুলো পুরানো। তার ওপর যুদ্ধপূর্ব দিনের বাজারও এখন আর নেই। তা ছাড়া, ইংরেজ যেখানেই বাজার খুলতে যায়, ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া, আফ্রিকা, মধ্য-প্রাচ্য এবং প্রাচ্যের সব বাজারেই দেখে আমেরিকা এই সব দেশের বাজারে আগে-ভাগেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এখন চলেছে ইংরেজ আর আমেরিকানদের চরম ব্যবসাদারী প্রতি-যোগিতা। কার জয়-আর কার প্রাধান্য হয়, লক্ষ্য করছে সমগ্র হুনিয়া।

আমেরিকার টাকা, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের পদ্ধতির সঙ্গে পালা দিতে পারছে না ইংরেজ। আমেরিকার বিজ্ঞাপন-ব্যয় ‘পৃথিবীতে সর্বাধিক। ইংরেজ আমেরিকার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত আক্সাৎ করতে পেছপাও হচ্ছে না। কিছু দিন পূর্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজ একটি বিজ্ঞাপন প্রচার করে, যেটি হুবহু আমেরিকার একটি পুরাতন বিজ্ঞাপনের নকল। বিজ্ঞাপনটি নারী জাতির প্রতি আহ্বান চাকরীর জন্য। বিজ্ঞাপনটি হচ্ছে মাত্র একটি কথা,—“Women | Be one of fifty thousand !” অর্থাৎ নারী, তোমরা সেই পঞ্চাশ হাজারের একেক জন হও।

এই বিজ্ঞাপনটির পুনরাবৃত্তি দেখে আমেরিকানরা হেসেছে প্রচুর। হাসতে হাসতে বলেছে,—কোন নারী কখনও কি সেই পঞ্চাশ হাজার নারীর সমান হতে চায়? “Would any woman want to be the same as fifty thousand others?”

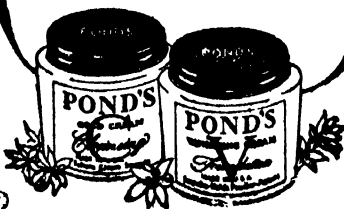
বাই হোক, এই বেটরো প্রকারান্তরে এক প্রচার পরিষদ, ইংরেজ বার প্রতিষ্ঠায় এই চরম প্রতিযোগিতার মধ্যেও দেখতে পেরেছে আশার আলো।



**স্বপ্ন-সাধনার দৈনন্দিন নিয়ম :**

রোজ রাতে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম দিয়ে মুখখানিকে পরিষ্কার করুন। এই তৈলাক্ত ক্রীম সারা মুখে মাথিয়ে মালিশ করুন, তাতে সোমকুপের ময়লা সব বেরিয়ে আসবে। তারপর মুখে কেলসেই মেথসেম, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

রোজ ভোরে পণ্ডস ক্যানিসিং ক্রীম মেখে সারা দিন মুখশীতল রাখুন। খুব পাতলা করে সারা মুখে মাখবেন। মাথার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে কিন্তু অল্প একটু হস্ত তর মুখখানিকে অবশিষ্ট রাখবে বিনতোর।



*আরো সুন্দর,  
আরো কমনীয়  
...পণ্ডস পণ্ডস ক্রীমের গুণে*

মুখশীতল মনুষ্য ও মনোরম রাখতে হলে প্রাতে ও রাতে স্বপ্ন-সাধনার দৈনন্দিন নিয়ম মেনে চলা দরকার। প্রাতঃস্নান চাই এমন একটি তৈলাক্ত ক্রীম যা পরের দিনের তরে মুখখানিকে পরিষ্কার ও কোমল করে রাখবে—বেশন পণ্ডস কোল্ড ক্রীম। আর তোরবেলা চাই—চট্‌চটে নয় এমন একটি তুষারগুত্র ক্রীম যা দিনভোর রং-কালো-কব্জা-হৃদ্যা-লোকের হোঁচ-ধেকে মুখখানিকে ঝাঁটাবে—বেশন পণ্ডস ক্যানিসিং ক্রীম।

**পণ্ডস**

# আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-২

শ্রীমহীশচন্দ্র রায় (অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

স্বাধীন ভারতে অল্প-সময়তঃ বঙ্গ-সমস্কার মত ভাষা-সমস্কারও অল্প-বিস্তার অর্থনৈতিক আকারে দেখা দিয়াছে। আঞ্চলিক ভাষা, রাষ্ট্রভাষা, শিক্ষার মাধ্যম প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া গুরুতর বাগ্ম-বাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে ভারতের গণপরিষদ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। এখন হইতে হিন্দীই ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু শুধু গলার জোরে বা কলমের আঁচড়ে রাতরাতি একটা ভাষা প্রচলিত করা যায় না। এত দিন ইংরাজ-শাসনে ইংরাজী সারা ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল; হঠাৎ তাহাকে বিতাড়িত করিলে বিসম কঁাক থাকিয়া যায়। সুতরাং আপাততঃ আপোষ করিয়া ইংরাজীর মেয়াদ ১৫ বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইতিমধ্যে হিন্দী ভাষা রীতিমত বলসঞ্চয় করিয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে—এইরূপ প্রত্যাশা অনেকে করিতেছেন।

আমরা বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও ইংরাজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তা রহিয়া গিয়াছে। ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ-জীবনে ইংরাজীর স্থান কোথায়—এই প্রশ্নের সন্ধানমাংসা করিতে না পারিলে এই অন্তর্গতী ১৫ বৎসর ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া অত্যন্ত এলোমেলো হইয়া পড়িবে। ইংরাজী জানিতে হইবে কি না, কিসের জ্ঞান জানিতে হইবে, এবং কতখানি জানিতে হইবে—এ বিষয়ে তাহার যদি বড়দের নিকট হইতে একটা সুনির্দিষ্ট হিন্দী না পায়, তাহা হইলে তাহার যে জ্ঞান-সাগরে হাবুডুব খাইবে, কিংবা হুকোকাহ পা দিয়া একেবারে অতল-তলে তলাইয়া যাইবে, এইরূপ সম্ভাবনা আছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পক্ষে ইহা বড় সঙ্কটজনক অবস্থা; এই অবস্থা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে, ইংরাজীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ও সুচিস্তিত সীমাংসা করা দরকার।

ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ধূয়া উঠিল—ইংরাজ যখন ভারত-ছাড়া হইয়াছে, ইংরাজীকেও সাগর-পার করিয়া দাও। স্বাধীনতা লাভের প্রথম ধমকে আমাদের স্বাদেশিকতা স্বভাবতঃই একটু উগ্র ও উৎকট হইয়া উঠিল। ইংরাজ-সংশ্লিষ্ট সব কিছু তাড়াইবার জ্ঞান আমরা কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলাম। হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া, রাস্তা-ঘাটের নাম পাল্টাইয়া দিয়া, একসঙ্গে বিদেশী বিতাড়ন ও স্বদেশী বীরপূজা—এই দু'টো কাজ সম্ভার সাহিয়া লইলাম। সৌভাগ্যক্রমে এই উগ্রতা বেশী দিন রহিল না। বরং এখন দেখি, অল্প অনেক বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্য রীতি-নীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। শুনিতে পাই, ভারতের রাজধানীতে আজকাল সাহেবী স্ট্রাট পরার খুব রেওয়াজ হইয়াছে। (অবশ্য, কোনও স্থলে মোজা ও নেকটাই বর্জন এবং চম্পল-সহযোগে বিলাতী স্ট্রাট কিঞ্চিৎ শোধন করিয়া লওয়া হয়!) সিনেমার ছবিতে, বিশেষতঃ হিন্দী চিত্রে, স্ট্রাট না পরিলে “জীরো”ই হওয়া যায় না। পুলিশ ও মিলিটারীর কথা ছাড়িয়া দিই—খুতি-চামর বা চোগা-চাপকান পরিহিত অফিসারের কথা তো ভারিভেই পারি না—আজকালকার সখের ব্যাণ্ড-পার্টিরও সকলে সাহেবী পোষাকের পরম পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সকল ব্যাপারে ঝানিকর বা অপমানজনক কিছুই দেখি না। কারণ, দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে—নিজের সুবিধা-অসুবিধা বুঝিয়া বেছায় আমরা পোষাক বাছিয়া লইতে পারি; বিদেশী শাসকের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। তাহা ছাড়া, “বৃগধর্ষ” প্রভাব তো আছেই, স্বাদেশিকতার মোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা সহজ নহে। বিলাতী খেলাধুলা, বখা—ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান প্রকোপ দেখিলেই সেটা সহজে অনুমান করিতে পারা যায়।

ইংরাজী সম্বন্ধেও এইরূপ আপোষের চেষ্টা কিছু কিছু দেখিতেছি। ইংরাজী New Year's Day-র বদলে Bank closing Day নাম দিয়া ছুটি ও উৎসব বাহাল রাখা হইয়াছে—ইংরাজী Calendar অনুযায়ী এখনও কাজকর্ম চলিতেছে। ইংরাজী সংখ্যার অক্ষরগুলিকে “International form of Indian numerals”—এই গাল-ভরা আখ্যা দিয়া সচল করিয়া লওয়া হইয়াছে। “বনকে খাঁ ঠারিবার” এই চোঁটা কাহারও কাহারও মনে কৌতুক উদ্রেক করিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাও “বৃগধর্ষ”; বলিবার কিছু নাই। বাহা হউক, এগুলি ছোটখাটো ব্যাপার। এখন, আসল ইংরাজী ভাষার দশা কি হইবে, তাহাই একটু অকপট ও অগ্রমস্ত ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

ইংরাজীর ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে হইলে গোড়ার তাহার অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ, এই অতীতের উপর তাহার ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজী শাসক সম্প্রদায় নিত্যন্ত গায়ের জোরে আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন নাই; বরং আমাদের ভারতীয়দের অনেকেই ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগে ইংরাজী শিখিবার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইহার ফলেই এত শীঘ্র ও এত সহজে ভারতীয় জীবনের সকল বিভাগে—ঋণ, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্পে—পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

সংসারের সকল জিনিষের মত এই ইংরাজী শিক্ষাতেও আমাদের লাভ-লোকসান দুইই হইয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যাব্জির আমরা আমাদের জাতীয় ভাব প্রায় হারাইতে বসিয়াছিলাম। এমন দিন গিয়াছে যখন পিতা পুত্রকে চিঠি লিখিতেন ইংরাজীতে; বন্ধুতে বন্ধুতে আলাপ হইত ইংরাজী ভাষায়। হাতেখড়ি হইয়া গেলেই “অ আ ক খ”র সহিত ছেলেকে শিখিতে হইত “a b c”। ইহুতে সংস্কৃত বা পালির ব্যাখ্যা করিতে হইত ইংরাজীতে। যে কোনও জাতির জীবনে এইরূপ ব্যবস্থা শুধু অনাস্থ্য নহে—অনাচার। সুখের বিষয়, ব্রিটিশ-শাসনের শেষ যুগে এই সকল অনাচার অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। অধুনা স্বাধীন ভারতে এইগুলির পূর্ণ সংশোধন হইবে—সহজেই আশা করা যায়।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার শুধু লোকসান নয়, লাভও কিঞ্চিৎ হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, ইংরাজী শিক্ষা পশ্চিমের প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিল। সমগ্র দেশে নূতন জীবনের বজা বহিয়া গেল। স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনতার প্ৰাণ দেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। অবশ্য, এখানেও প্রথম সফাতে অনুভূতির সহিত হলাহলও উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ পরাধীনতার চেয়েও বাহা ভয়ঙ্কর—পরনির্ভরতা ও আত্মবিস্ময়ন কিছু দিন দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার

জালো-মল বা উৎকর্ষ-নিকর্ষ লইয়া বিতর্ক করিয়া লাভ নাই। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, ভালই হউক আর মন্দই হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতা এখন আমাদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাকে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া অসম্ভব; তাহাকে মানিয়া লইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে।

ইংরাজী সাহিত্য ও সভ্যতা ছাড়া শুধু ইংরাজী ভাষারও একটি নিজস্ব অবদান আছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাবের আদান-প্রদান হইল। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের বর্ণ ও সামাজিক জীবনে বটিল “একাকার”—কিন্তু ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আমাদের রাজনৈতিক জীবনে সুরু হইল—ঐক্যসাধন। “খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত” ভারত যে এক অখণ্ড হিন্দুস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহা কতকটা ইংরাজ-শাসনের ফল বটে, কিন্তু এ বিষয়ে ইংরাজী ভাষার কৃতিত্বও কম নহে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস আগাগোড়া ইংরাজী ভাষায় লিখিত। ইহা ছাড়া, “গোবন্দ-নিবারণী” হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শন, বিজ্ঞান পর্যন্ত যত কিছু “নিখিল ভারতীয়” কংগ্রেস বা কনফারেন্স এ বাৎসরিক ঘটনা—সকলের কার্যকলাপই ইংরাজী ভাষায় সমাধা হইয়াছে। বস্তুতঃ, উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর ভাববিনিময়ের ভাষা এত দিন ইংরাজীই ছিল। দেশে এতগুলি সুপরিচালিত ইংরাজী মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রের প্রচলনও এই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

“নিখিল ভারতীয়” ব্যাপার ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও ইংরাজীর প্রসার বড় কম ছিল না। আদালত-আদালতে ইংরাজী অপরিহার্য। ডাক্তারী, ওকালতী, বড় ব্যবসায় প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। এক কথায় উল্লেখ্য যে, ইংরাজী তাহাকে অন্ততঃ কিছু ইংরাজী শিখিতে হইবে—এই ধারণা সর্বত্র বলবৎ ছিল। আবার, ভাল ইংরাজী বলিবার ও লিখিবার ক্ষমতা অনেক ছাত্র আশপাশে চোঁকা করিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ইংরাজী ভাষা আজ দেড় শত বৎসর ধরিয়া আমাদের অস্থি-চৰ্ম্ম ভেদ করিয়া প্রায় মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে—বাহীন ভারতে তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যাইবে? এক পক্ষের চরমপন্থীরা বলিতেছেন, ইংরাজীকে সমূলে উৎপাটন করো। অপর পক্ষের চরমপন্থীরা, বাহারা এত কাল ইংরাজী জ্ঞানের দৌলতে অগাধ ও একচেটিয়া প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা—অনেকটা তাহাদের মূলধনের স্বার্থের খাতিরে—আশা করিতেছেন যে, ইংরাজীর পূর্বসৌর্যব হ্রস্ব বজায় থাকিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, অকপট ও অপ্রমত্ত ভাবে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে হইবে। বাহীন ভারতে ইংরাজী পূর্বের ভায় অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতে পারে না। ভারতীয় ভাষাগুলি অনেক দূরেই তাহাকে স্থানচ্যুত করিবে, সন্দেহ নাই। সাধারণ, ব্যবহারিক জীবনে তাহাদের দাবী অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। কিন্তু আবার কয়েকটি কঠিন সত্যও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বাহারা ইংরাজী শিখিয়াছে, তাহারা সহসা অস্বীকার করিয়া দিয়া যাইতে পারে না; কারণ ভাষা শিক্ষা করা যেমন শক্ত, ভাষা ফুলিয়া বাড়াও তাহার চেয়ে কম শক্ত নহে। আবার

বাহারা ভবিষ্যতে ইংরাজী শিখিবে, তাহাদের কাছেও ইংরাজীর সহিত অপর কোনও ভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কথার বলে, শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। এই হিসাবে কর্তারা ইংরাজীর মেয়াদ ১৫ বৎসর বাড়াইয়া দিয়া বোধ হয় ফুল করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে হয়তো তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। কিন্তু ইংরাজী বিত্তা একবার পেটে পড়িলে আর কোনও ভাষা খাতে সহিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, অজ্ঞিত বিদ্যা কেহ ধুচুনি দিয়া চাপিয়া রাখে না—উহা সময়ে-অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেই। ফলে, পনেরো বৎসর পরে ইংরাজীর মেয়াদ হয়তো আরও পনেরো বা পঁচিশ বৎসর বাড়াইয়া দিতে হইবে।

আর একটি কথা। ভাষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রসভার বিধান খুব সুস্পষ্ট ও সুসমঞ্জস নহে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার পদে উন্নীত করা হইয়াছে—ভালই হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলিকেও যথেষ্ট কৌলীজ্ঞ ও স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, কর্তারা “এক বৃন্তে দুটি ফুল” ফুটাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শাসন ও শিক্ষা ব্যাপারে ইংরাজীকে স্থানচ্যুত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার জন্য হিন্দী ও আঞ্চলিক ভাষা—উভয়েই সমপরিমাণে চেষ্টা করিবে। এখন এই আন্দোলনের প্রতিযোগিতায় যে সকল আঞ্চলিক ভাষা হিন্দীকে আগাইয়া যাইবে—বিশেষতঃ, যে ভাষাগুলি (যেমন তামিল, তেলেগু ইত্যাদি) হিন্দীর সহিত সম্পর্ক-রহিত, তাহারা যে সহজে হিন্দীর আধিপত্য মানিয়া লইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার ফলে একটা অন্তর্বিরোধ ও মনোমালিন্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু বৃটিশ-শাসনের চাপে ও ইংরাজী ভাষার আওতার ভারতের যে একা গড়িয়া উঠিয়াছে—ভাষা-বিরোধের দ্বারা যদি সেই একেটা ভাঙ্গন ঘটে, তাহা হইলে ডাই দুঃখের বিষয় হইবে। একেই তো প্রাদেশিকতার বিষ বনানা দিক্ দিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার উপর আবার ভাষা লইয়া এই রেবারেবি সুরু হইলে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধন আরও নিখিল হইয়া বাওয়া সম্ভব। এরূপ পরিণাম বাহিনীর কি না, রাষ্ট্রনেতাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত।

ইংরাজীকে কিয়ৎ পরিমাণে বর্তমান অবস্থায় রাখিয়া দিলে এ বিষয়ে সব গুণ্ডগোল চুকিয়া যায়। অবশ্য ইংরাজীকে ভারতের সার্বজনীন ভাষা করিবার কথা বলিতেছি না। প্রথমতঃ, ইংরাজী আমাদের মাতৃভাষা নহে, সুতরাং আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার মত এখানে ইহা কখনই আমাদের শিক্ষা-সূচীতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ আমলেও ইহা কখনও সার্বজনীন ভাষা হইবার স্পর্শা করে নাই। আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানে ইহা শুধু উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে—বস্তুতঃ উত্তর ভারতে—হিন্দীই ছিল কথাবার্তার বাহন। এক প্রকার বাজার-চলন হিন্দী আমরা সকলেই ব্যবহার করিতে পারিতাম বা করিবার চেষ্টা করিতাম। এই ব্যবস্থা এখনও বাহাল রাখিলে কি ক্ষতি হইবে, বুঝিয়া উঠা দুষ্কর—বিশেষতঃ যখন ইংরাজী শিক্ষা একেবারে উঠাইয়া দিতে পারিতেছি না। University Commissionও তাহাদের রিপোর্টে বলিত (বোধ হয়, কতকটা মানের বা প্রাণের দ্বারা) সমগ্র ভারতের

এক ভাবরূপে হিন্দীর উজ্জল ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, উচ্চতর শিক্ষায় ইংরাজী অপরিহার্য। ইংরাজী বর্জন করিলে আমরা বহির্বিধ হইতে সংসর্গ-চ্যুত হইয়া আবার কৃপমণ্ডকে পরিণত হইব। সুতরাং শিক্ষার একটি স্তরে পৌছাইয়া আমাদের ইংরাজী শিখিতেই হইবে। কিন্তু ইংরাজী শিখিব অথচ ব্যবহার করিব না, অথবা শুধু আন্তর্জাতিক ব্যবহারের জন্য শিক্ষায় তুলিয়া রাখিব, এরূপ বৃত্তি সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে—ইংরাজের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া আমাদের ইংরাজী এমন উদ্ভট হইয়া পড়িবে যে, ক্রমশঃ স্বভাবতই তাহার অবসান ঘটয়া যাইবে। কিছুটা অবনতি হয়তো ঘটিতে পারে, কিন্তু ইংরাজী আমলেও তো আমরা সকলেই কিছু সরোজিনী নাইডু বা জহরলাল নেহরুর মত ইংরাজী বলিতে বা লিখিতে পারিতাম না। সে সময়েও আপিসের কেয়ারী, মাড়ওয়ারী সওয়ারী, কলেজের অধ্যাপক ও আই, সি, এস অফিসার-ভেদে রং-বেড়ার ইংরাজী প্রচলিত ছিল। নিতুল ইংরাজী না জানিয়াও অনেকে উন্নতির চরম শিখরে উঠিতেন। আমরা বাঙালীরাই শুধু শুধু ইংরাজীর উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। পূর্বের ভায় চলনসই ইংরাজী এখনও অনায়াসে চলিতে পারে। তবে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজীর বিস্তৃত মান অব্যাহত রাখিতে হইবে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলি

এ বিষয়ে একটু অবহিত থাকিলেই চিন্তার আর কোনও কারণ থাকিবে না।

আসল কথা এই যে, স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের পর্যাপ্ত ও ব্যাপক শিক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে যত দূর সম্ভব বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে। মুক্ত-ভারতের রাষ্ট্রভাষা নামতঃ হিন্দী হউক, ক্ষতি নাই; বরং ইহাতে আমাদের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে—উচ্চশিক্ষার, উচ্চ আদালত বা আপিসের কার্যে এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ইংরাজীকে স্থানচ্যুত না করিলে আমাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না। তাহের আভিষেচ্য বা উচ্চ আদর্শের প্রলোভনে যদি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ-শ্রমবিধিকে ৭৫ ও ৭৬ করিয়া দিই, তাহা হইলে দেশমাতৃকা কখনই আমাদের ক্ষমা করিবেন না।

ভাষা-সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে গিয়া একটা কথা আমরা কখনও কখনও ভুলিয়া যাই। মাহুয়, গাছপালা, জীবজন্তুর মত ভাষারও প্রাণ আছে। আইন করিয়া বা ফরমাস দিয়া নতুন জীবন্ত ভাষার সৃষ্টি হয় না, যেমন “বোঁটায় আঘাত করিয়া ফুল ফোটাতে” পারা যায় না। আবার পুরাতন চলন্ত ভাষা প্রোতঃপ্রতী নদীর মত নিজেই নিজের পথ কাটিয়া বহিয়া যায়। কেহ তাহার গতিরোধ করিতে গেলে “মৃণালিনী”র মনোরমার ভাষায় বলিতে হয়—“ভাই, এই গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও, গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, ‘গঙ্গে, তুমি পর্বতে ফিরিয়া যাও’!”

## পঞ্চকন্যার ইতিকথা

ইংরেজী ১১৩৪ সালের মে মাসের এক ভোর চারটেয় তারা সকলে জন্মগ্রহণ করে। তিন মাইল দূরে ডাক্তারের বসবাস। যুম থেকে উঠে, তিনি তাঁর গাড়ী চালিয়ে এসে দেখেন ছ’টি শিশু। তার পর তাঁর চোখের সমুখে আরও তিনটি শিশুর জন্ম হ’তে দেখা যায়। সর্বসমেত পাঁচটি কন্যা, অর্থাৎ পাঁচ বোন পৃথিবীর আলো দেখলো।

এদের গিঁতা-মাতা হলেন ফরাসী-কানাডা জাতের দরিদ্র কৃষক। পঞ্চকন্যা লাভের পূর্বে আরও ছ’টি সন্তান তাঁদের ছিল। মা ডিওল্লি কোমায় অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। কিন্তু পঞ্চকন্যা এবং তাদের গর্ভধারিণী ডিওল্লিও শেষ পর্যন্ত স্বস্থ শরীরে বেঁচে রইলেন। ডাক্তার এ্যালান ড্যাফো দেখলেন, তিনি এবং তাঁর কুগিণীরা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তু হয়ে পড়েছেন। “Quintuplets” কথাটি তথাকার অধিবাসীদের কথোপকথনে এক নতুন কথা হিসাবে চালু হয়ে পড়লো।

পঞ্চকন্যার বয়স তিন দিন হতে না হতেই তাদের জন্মদাতা শিতা মিঃ ডিওল্লি চিকাগো প্রদর্শনীতে তাদের দেখাবার জন্য এক চুক্তিপত্রে সই করলেন। বহু রকমের উপহার এসে পৌছিতে শুরু করলো। তাদের প্রথম জন্মোৎসব পালিত হল তাদেরই জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী এক হাসপাতালে। জন্মোৎসবের উপহার-স্বরূপ ঐ পঞ্চকন্যা ৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থ লাভ করলো। ডিওল্লি-দম্পতি কৃষকের কাজে তৎপর হইয়া দিলেন।

সখন তাদের বয়স হল মাত্র দুই, তার! অয়কর দিলে ২০০০ পাউণ্ড এবং সরকারের পক্ষ থেকে আর্মান্বিত হয়ে ওনটারিও প্রটেক্টর রাজবাড়ীতে আশ্রিত্যের গ্রহণ করলো। ডাক্তার ড্যাফো, যিনি গুদের জন্ম থেকে চিকিৎসা করছেন, তিনি তো ও, বি, ই উপাধি লাভ করলেন এবং Who’s Who এর নাম-তালিকায় তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেল।

পঞ্চকন্যার বয়স বখন তিন, তখন তাদের মুখে কথা ফুটলো। লক্ষ লক্ষ লোক দেখতে আসে তাদের। এমন কি তারা যেখানে থাকতো সেখানে নতুন হোটেল, রাস্তা এবং গ্যারেজ তৈরী হয়ে উঠলো। ১১৩৭ সালে প্রথম তাদের ঠাণ্ডা লাগে। এবং চার বছর বয়সে তাদের টনসিল অস্ত্রোপচারে সারিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ভাগ্য তখন ১০০,০০০ পাউণ্ড।

পঞ্চম জন্মোৎসবের কিছু পূর্বে টোরোন্টোর রাজা এবং রাণীকে তাদের উপহার দেওয়া হল। ১১৪২ সালে অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ডিওল্লি-দম্পতি তাঁদের পঞ্চকন্যাকে ফেরৎ পেলেন।

অন্তঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এলো। পঞ্চকন্যাকে তুলে গেল সকলে। সুবাসপত্রের পৃষ্ঠা থেকে মুছে গেল তাদের খবরাখবর। পৃথিবীর সর্বাধিক প্রচারিত এই শিশুরা এখন বোলো বছরের। অর্থাৎ কি না ষোড়শী। এদের সর্বশেষ সংবাদ শোনা যায়, যা ডিওল্লির পোপের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের পর থেকেই ঐ পঞ্চকন্যা না কি Nun বা সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

ভারতবর্ষে দুই শত বৎসরের বিদেশী শাসন

অবসানের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের জয়গানে যুগ্ম হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু যে সকল আত্মভোলা মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙ্গালী সশক ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৬ পর্যন্ত সশস্ত্র বিপ্লবের পথে দেশমাতৃকাকে বন্ধন-মুক্তির সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, অপরিমিত বেদনার বিষপাত্র পান করিয়াছেন, ঐহিকের সর্বস্বকে জলাঞ্জলি দিয়া বাহ্যিক সর্বভারতের মুক্তির জগ্ন হৃদয় তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন, সেই সকল খ্যাতি ও অখ্যাতি কীর্তিমান নৈনিকদের সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ নীরব।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা-স্বাধী পলাশীর প্রান্তরে ভূবিদ্যা বাটবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবাসীর জীবন হইতে আলোক নিবিয়া গিয়াছিল। দুর্ঘ্যোগের ঘনঘটা ও গাঢ় তমিস্রার ভিতর দিয়া বাঙ্গালী যে বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছিল, তাহা এক শত বৎসর পরে ১৮৫৭ সালে দানী বাঁবিয়া ওঠে। বাংলার মাটিতেই বিপ্লবের পবিত্র হোমানল প্রাণলিত হইয়া দাব্যরূপে সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

যে বাংলার স্বাধীনতা-স্বাধী অন্তর্মিত হইয়াছিল, সেই বাংলা দেশেই ১১০৫ সালে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে। সাহিত্যিক, শিল্পী, ও চাবণ কবি দল বাঙ্গালীকে অগ্রিমাত্র দীক্ষা লাভের জন্ত প্রেরণা প্রোগায়; পদ্যবিদ, সমাজবিদ ও বাঙ্গালীকরণ বাঙ্গালীর রাষ্ট্র-চেতনাকে দাসত্বের পঙ্কজিলক-মুক্ত করিয়া রক্ততিলক পরাইয়া দেন। বাংলা দেশ সারা ভারতবর্ষকে এক নূতন জাগরণী মধ্যে উদ্ভূত করিল। আপন হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করিয়া বাংলার যুগ পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল, সেই আন্দোলনের ডেটে ভারতীয় জন-সমূহে এক নূতন প্রবাহ আনিল।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের বার্ষিক্যের পর যে বিপ্লব-আন্দোলন ফল্গুবারায় কায় বহিত্তেছিল, তাহা ১৯৪২ সাল হইতে যোতধীনরূপে আসন্ন-সিমাচল প্রাবিত্ত কবিল। ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাংলার বিপ্লবীগণের কার্য সাময়িক ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কার্য সম্পূর্ণরূপে এক হয় নাই। বিপ্লবীগণের নিকট ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে নৈপ্লবিক ভাবধারা আনয়ন করা আজীবন সাধনা ও স্বপ্নের বিষয়-বস্তু ছিল। সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে '৪২ সালের বিপ্লব, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নৌ-বিশ্রোহের ভিতর দিয়া, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যাহা সম্পূর্ণরূপে বার্থ হইয়াছিল নেতাজী স্বভাষ তাহার পরিপূর্ণ রূপ দিয়াছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

এই বাংলা দেশের তরুণেরাষ্ট বন্ধনের নিরাপদ জোড়কে আঁকড়াইয়া থাকেন নাই, লাভ-ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব রাখেন নাই, পাথের এক পথের বিচার করেন নাই। তাঁহারা তীরের সক্ষমকে পিছনে ফেলিয়া তরঙ্গস্রুজ কুলতীর সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাইয়া-ছিলেন—আপনাদের সর্বস্ব বিপন্ন করিয়া। তাঁহারা আজ মরদেহে বাঁচিয়া নাই, কিন্তু তাঁহাদের রক্তের পবিত্র ধারায় জাতির ললাট হইতে দাসত্বের কালিমা মুছিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অপরাধের আত্মার অগ্নিশিখা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৌহজালকে পুড়াইয়া দিয়াছে, তাঁহাদের গরিমাময় মৃত্যুবরণ পরাধীনতার তমসাহুয় দিগন্তে স্বাধীনতার সূর্য্যোদয়কে সজ্জ করিয়াছে।

# বিস্মৃতি বাংলা

শ্রীতাপ্তবীন্দ্র চক্রবর্তী

পলাশী ও বঙ্গার যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্দ্যের পর ইরাজ বণিকের মানদণ্ড প্রভুতরূপে দেখা দিলেও বাংলার জনগণ এই পরাজয় সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। ইরাজ বণিক বাণিজ্য লোভে বঙ্গদেশে আসিয়া উদরারের সংস্থান করিতে চাহিয়াছিল। দেশের সন্তিক, শাসন-কর্মতার সন্তিক, বাংলার জনগণের স্বত্ব-স্বত্বের সন্তিক, যোগল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের সন্তিক কোন সংশয় ছিল না। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্বেও ইরাজ বণিক মুর্শিদাবাদের রাক্ষসে সন্তয়ে পরিভ্রমণ করিত।

বাংলার ভাগ্য-বিপর্দ্যের পর মীরজাফর রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইরাজ সেনার সহায়তা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মাসিক তন্থা প্রদান করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজমুকুটের মূল্যবস্তুর রাজকোষের সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল। মীরজাফরের কৃতকর্মের ফল ইরাজের লগ্ন অপরিমোদনীয় হইয়া উঠিল।

মীরকাসিম বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার পর স্বপ্নমুক্তির মূল্যবস্তুর ১৭৬০ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর ঢাকলা, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইরাজকে "ইজারা-বন্দোবস্ত" করিয়া দিলেন। এই তিন স্থান হইতে রাজ্য আদায় হইবে তাহা ইরাজগণ পাইবে এবং নবাব-সরকার হইতে আর কিছুই পাইবে না। ১৫ই অক্টোবর এক সনন্দ প্রদান করিয়া মীরকাসিম ইরাজ বণিকের শক্তি আরও বৃদ্ধি করিলেন। এ প্রদেশে ইরাজ অধিকারের উহাই প্রথম দলিল। ঐ সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত (১) বগড়ী (২) জামগড়ম (৩) বরদা (৪) চন্দ্রকোণা (৫) চিত্রা (৬) জাহানাবাদ (৭) মণ্ডলঘাট (৮) খারিজা মঙ্গলঘাট ও (৯) তুরহুট পরগণা ঢাকলা বর্ধমানের অন্তর্গত ছিল এবং ৫৪ পরগণা লুইয়া ঢাকলা মেদিনীপুর গঠিত ছিল। ইরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মেদিনীপুর ও বরদম অঞ্চলে অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় জঙ্গল মহালের জমিদারগণ ইরাজের অধিকার স্বীকার করিল। ১৭৬০ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন মার্টিন কোয়াইটের অধীনে এক দল গোরা ও দেশী সিপাহী এবং কতকগুলি গোলন্দাজ সেনা মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রেরিত হইল। ১৭৬১ খৃঃ ফাল্গুন মাসে আর এক দল সৈন্য জনাইনের অধিনায়কত্বে প্রেরিত হইল। ঐ সময় মেদিনীপুর ও বর্ধমান অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান মহারাজাদের অধীনস্থ ছিল এবং ইরাজ-শক্তি ঐ সব অঞ্চলে প্রবেশ করিতেও সমর্থ হয় নাই।

১৭৬৬ সালে কোম্পানী সার্বভূম্য করেন, জেলার উত্তর ও পশ্চিম ভাগে জঙ্গল মহালে সৈন্য পাঠাইয়া স্থানীয় জমিদারগণকে রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে এবং তাহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সৈন্য সংগ্রহে বিলম্ব ঘটায় কার্যটি সত্তর অগ্রসর হইতে পারে নাই।



সংবাদ দেশ মধ্যে প্রচারিত হওয়ার ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই প্রায় এক শত ক্রোশাবাসী সমস্ত জঙ্গল প্রবেশে পোরতর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। তখন মেদিনীপুরের তৎকালীন রেজিডেন্ট গ্রেগাম সাহেবের আদেশে লেফটেনেন্ট ফাণ্ডসন সাহেব এই বিদ্রোহ নয়নের জগা এক দল সৈন্য হইয়া জঙ্গল মহালে প্রবেশ করেন। কোম্পানীর দলগুলি বিবিচারে জঙ্গল মহালের অধিবাসিগণের উপর অকথা অত্যাচার ও তুর্কনে প্রবৃত্ত হয়। কাড়গ্রাম, ঘাটশীলা, লাগগড়, রামগড়, কানীছোড়া, মননা, নয়াগ্রাম, জামিরপাল প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ বিকিস্ত ভাবে ইংরাজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অশিক্ষিত কোম্পানী-সৈন্যের বিরুদ্ধে অল্প বিক্রমে যুদ্ধ করা সাহেব ইংরাজ পক্ষেই পরাজিত হন। পরাজিত হইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা কাঁচারা স্বকীয় বাসস্থান ও দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভূতভায়া স্বরণে আত্মপোষন করেন।

গ্রেগামের নির্দেশক্রমে ফাণ্ডসন বিদ্রোহী জমিদারগণকে দমনের জগা অত্যাচারের ভাণ্ডার সৃষ্টি করেন। ইংরাজের বগতা স্বীকার না করায় অপরাধে অপরাধী জমিদারগণের সম্পত্তি সমুদ্র বাতুল্যাপ্ত করিয়া কোম্পানীর সহায়তাকারী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যে সমস্ত সৈনিক বিনা খারনার জমি ভোগদখল করিতেছিল, তাহাদের সমাজ্য কারণে ও অজ্ঞান্যে উক্ত জমি হইতে উৎখাত করা হয়। ইটা ছাড়া দেশের স্বাধীনতাকামী মেদিনীপুরের অধিবাসিগণকে বিবিচারে কোম্পানীর লোকেরা হত্যা করে। ১৭৬৭ সালের ৩শে জানুয়ারীতে লিখিত গ্রেগামের এক পত্রে জানা যায় যে, কোম্পানীর দেশী সৈন্যদের ভিতর মধ্যে মধ্যে সেই সময় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং বাহাদুর সিং নামক জনৈক সৈনিক ক্যাপ্টেন হোয়াইটের সহিত দেশীর অধিগণা দলনের অভিযানে যোগদান করিতে অস্বীকার করে।

ফাণ্ডসন সাহেব ১৭৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কল্যাণপুরে উপস্থিত হইলে স্থানীয় জমিদার কোম্পানীর বগতা স্বীকার করিয়া বর্ধিত রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কাড়গ্রামের রাজার সহিত কোম্পানীর প্রবল সংঘর্ষ দেখা দিল। ফাণ্ডসন প্রথমে কাড়গ্রামের রাজাকে এবং তাঁহার দুই ভ্রাতাকে গ্রেগামের নির্দেশসম্মত পত্র দিয়া তাঁহার ভাবিতে আদিয়া বগতা স্বীকারের প্রস্তাব পাঠাইলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব রাজা খণ্ডিতের প্রত্যাখ্যান করেন এবং ভাবী সংঘর্ষের জগা প্রস্তুত হইতে থাকেন। তিনি বগতা স্বীকার অপেক্ষা কাঁচারা স্বাধীনতা বক্ষার জগা সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ফাণ্ডসন সাহেব কাড়গ্রামের রাজাকে শাস্তে ক্রিয়ায় জগা বাপদমহুল গভীর অববান্যে ভিতর দিয়া কাড়গ্রামরাজের প্রাণাদ অভিযে ব্যাধা করেন। কাড়গ্রামের বৃদ্ধ তেজস্বী রাজা তাঁহার বিশস্ত ও সাহসী সৈনিকদের উপর দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া, দুর্গে বর্ধিত ধন-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। এই অভিযান ফাণ্ডসনের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। চূয়াড় সৈন্যদিগের বিবাক্ত ভাবে কোম্পানী-সৈন্যের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। বহু প্রচেষ্টার পর ফাণ্ডসন কাড়গ্রামরাজের দুর্গ অধিকার করিয়া উপলব্ধি করেন যে, জমিদারের সৈন্যদল অসক্ত অবস্থায় দুর্গের

আশে-পাশে গোপনে লুক্কায়িত আছে। দুর্গ জয় করিয়াও তিনি এই ভাবে জয়লাভের গৌরব হইতে বঞ্চিত হন।

অবশেষে পুনরায় কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজার নিকট চরম পত্র প্রেরিত হয়। এই চরম পত্রে ইংরাজের সহিত অনর্থক বিবাদ ও যুদ্ধের নিশ্চয়াজনীযতার কথা উল্লেখ করিয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বলা হয়। অজ্ঞাধ্য তাহাকে তাঁহার জমিদারী হইতে বিতাড়িত করা হইবে, এ কথাও জানান হয়। কোম্পানীর অশিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে একক শক্তি হিসাবে যুদ্ধ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৭৬৭ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী কাড়গ্রাম-রাজা কোম্পানীর সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

কাড়গ্রাম অভিযান সমাপ্ত কালের মধ্যে নিম্পন্ন হইলেও ঘাটশীলা অভিযান ফাণ্ডসনের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠিল না। যখন তিনি বলরামপুর থানায় ছাউনী স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের আলোচনা অথবা ভয় দেখাইয়া বগতা স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় ঘাটশীলার রাজার যুদ্ধের প্রস্তুতি সংবাদ আসিল। ১৭৬৭ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী ফাণ্ডসন গ্রেগামকে বলরামপুর থানা হইতে এক পত্রে লেখেন যে, এ পর্যন্ত যে সকল সংবাদ আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে জানা যায়, ঘাটশীলার রাজা কোম্পানীর সৈন্যের আগমন সংবাদে রাজ্যের তৎক্ষণাত্বে স্থানান্তরিত করিয়া দেশের জগা সমগ্র প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং বাহাতে একটিও ফিরঙ্গী সৈন্য প্রবেশ করিতে না পারে, সে সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। পত্রের শেষাংশে ঘাটশীলার লৌহ, মোম, তৈল, ও আরব্য সম্পদের বিষয় উল্লেখ ছিল।

জঙ্গল-জমিদারদিগের মধ্যে ঘাটশীলার জমিদার সর্বাপেক্ষা সমতাশালী ছিলেন। তাঁহার সৈন্যবলও অধিক ছিল এবং একটি সুবক্ষিত দুর্গ ছিল। ফাণ্ডসন এই দুর্গটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— “উহা জঙ্গলের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অবস্থিত। উহার ভূমি-পরিমাণ ১১৫০ বর্গ-ফিট এবং উহা সুবৃহৎ ও সুগভীর পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত। চতুর্দিকে বঙ্গরময় গড়-প্রাচীর। উত্তর দিকে প্রধান দরজা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অল্প একটি ক্ষুদ্র দ্বার। দুইটি দ্বারের সম্মুখেই দুইটি কাষ্ঠনির্মিত সেতু বিস্তৃত। প্রথম পরিখার পরেই লোকের বাস ও বাজার, তৎপরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিখা। দুর্গের কেন্দ্রস্থলে জমিদারের বাটা। উগর বৈদ্য উত্তর দক্ষিণে ২৮৮ ফিট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৪০ ফিট। গড়টির মধ্যে তিনটি কূপ আছে এবং বাহিরের পরিখাটির উত্তর-পশ্চিম কোণে দুইটি ভড়াগ আছে।”

কোন প্রকাব চরকাহিতা না করিয়া ফাণ্ডসন কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিযানের এক সূচিস্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, ঘাটশীলা অভিযান কাড়গ্রামের জায় এত সহজে সম্পন্ন হইবে না। স্থানীয় জমিদারগণ কাঁচারা পূর্বেই কোম্পানীর বগতা স্বীকার করিয়াছেন তিনি তাহাদের সহযোগিতায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযানে বাহির হন।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ ঘাটশীলা-রাজের সহিত প্রথম সংঘর্ষ বাধে। দুই সহস্র চূয়াড় সৈন্য বর্ষা-কলকের জায় জামবুনি

নিকট স্বদীর্ঘ প্রাচীর স্থাপিত করিয়া প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ সংগ্রামের পর তাহার নালায় পরিবার ভিতর আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী-সৈন্যের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত থাকায় এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। রাজার সৈন্যদলের সহিত এক প্রবল সংঘর্ষের পর ফাউন্সন বিন্দগ্রাম অধিকার করেন। এই গ্রাম অধিকার করার পর জঙ্গল-পথে মণ্ডলকুড়ায় উপস্থিত হইলে চুয়াড় সৈন্যদলের সহিত এক হাতাহাতি সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষে বিস্তর সৈন্য হতাহত হয়। রাজার সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ কোম্পানী-সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া গভীর অরণ্যের ভিতর হইতে গুলীবর্ষণ করে। ইহা ছাড়া “গরিলা যুদ্ধ” ইংরাজ সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। প্রবল প্রতিরোধের ভিতর দিয়া কোম্পানী-সৈন্য ৩২ মাইল পথান্ত জঙ্গল-পথ অতিক্রম করিয়া পুরুগ্রামে উপস্থিত হইলে তথায় রাজার সৈন্যদলের সহিত পুনরায় সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিল না। রাজ-সৈন্যের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া ফাউন্সন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া পশ্চাৎ, সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত করেন।

যুদ্ধের এই পথায় ঘাটনীলা-গ্রামের পক্ষ হইতে এক জন উকিলকে দিয়া ৫০০০ টাকা উৎকোচ স্বরূপ ফাউন্সনের নিকট প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ফাউন্সন উৎকোচ গ্রহণে অস্বীকার করিয়া যুদ্ধ আরও জোরে চালাইয়া গেলেন। রাজপক্ষ মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ করা সংগ্রহ বিজয়লক্ষ্যী কোম্পানী-সৈন্যকে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

রাজা সসৈন্যে নিকটস্থ এক পাগড়ে আশ্রয় লইবার পূর্বে তাঁহার দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন। অগ্নির লেলিতান শিখা সমগ্র দুর্গ-অঞ্চল গ্রাস করার ফলে বহু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পরীত-কন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও রাজা কোম্পানী-সৈন্যদলের বিরুদ্ধে “গরিলা যুদ্ধ” চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে কিছু দিন পর বাংলার অল্পতম স্বাধীনতাকামী বুদ্ধ রাজা ইংরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। এই তেজস্বী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার ভাতৃস্বত্বকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

মেদিনীপুর অঞ্চলে যে সকল জমিদারগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হন, তন্মধ্যে ঋৎগপুরের নরহরি চৌধুরী অন্যতম। তিনি মেদিনীপুরের রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য করিয়া স্বকীয় স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং ইংরাজ সম্পর্কে তাঁহার অনমনীয় মনোভাব বর্তমান ছিল। উক্ত সময়ের এক পত্রে এই জমিদারের তেজস্বিতা ও স্বাধীন মনোভাবের বিষয় জানা যায়।

ঋৎগপুরের নরহরি চৌধুরী সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ হস্তগত হওয়ায় আমি তাঁহাকে কাছারী বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাই। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেন যে, তিনি আমাদের প্রজা নন। ইহার পর আমি কোন প্রকার চরম পন্থা গ্রহণ না করিয়া আমার নাজিরকে এক পরওয়ানা সমেত পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু

তিনি নাজির তওয়ার পরিবর্তে দুই শত পাঠিক সৈন্য লইয়া জঙ্গলে আত্মগোপন করেন।\*

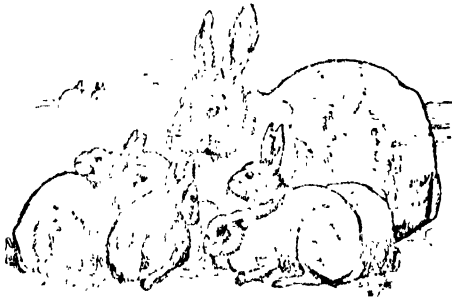
মেদিনীপুরের বিদ্রোহী দলকে শাস্তা করিতে যখন কোম্পানীর সৈন্যদল ব্যস্ত ছিলেন, তখন বীরভূমের জমিদার আসদ্ জমান খাঁ প্রকাণ্ড ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ক্যাপ্টেন হোয়াইট মেদিনীপুরে অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সেনাদল লইয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্য দিকে মীরকাসিম স্বয়ং সিপাহী-সেনাপ অধিনায়ক হইয়া ইংরাজ সেনানায়ক মেজর ইয়র্ক ও তাঁহার সৈন্যদলের সহিত বর্তমান একলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ বাহুবলে ইংরাজ সৈন্যকে পরাস্ত করিবার আশায় সাধাচার্য্যে সেনা সংগ্রহ করিয়া আক্রমণাত্মক সতর্ক ভাবে রাজ্য বক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সেনাদল বীরভূমের দুর্গম প্রদেশ কড়িয়া নামক স্থানে গড়াই করিয়া দানা দিয়া বসিয়াছিল। আসদ্ জমান খাঁ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার প্রবল প্রত্যাপে বীরভূমের নান্য মাথক হইয়াছিল। তিনি বিশ্বেশিত সহস্র পদাতিক ও পাঁচ সহস্র অশ্বাঘোচী লইয়া কড়িয়াতে ছাউনী ফেলিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার প্রতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জঙ্গলবাসী-সেনা কিছু দিনের জগৎব্যয়ানে ছাউনী ফেলিতে বাধ্য হইল।

মীরকাসিম ও মেজর ইয়র্ক বৃন্দগ্রামে এবং ক্যাপ্টেন হোয়াইট বর্তমানের উত্তরে চাউনী ফেলিয়া বসিয়া রহিলেন। উভয় সেনাদল লইয়া আসদ্ জমান খাঁকে যুগপৎ আক্রমণ করা স্থির হইলে ক্যাপ্টেন হোয়াইটকে উত্তর-পূর্বাংশ দিয়া বীরভূমের দিকে অগ্রসর হইবার আদেশ করা হইল। ক্যাপ্টেন হোয়াইট দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসদ্ জমান খাঁ যেখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম; সম্মুখদেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুতরাং তিনি সসৈন্য একরূপ নিশ্চিন্তস্থানে কাগ্যপান করিতেছিলেন। এমন সময়ে ক্যাপ্টেন হোয়াইটের সেনাদল সহসা তাঁহার শিবিরের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া শিবির মধ্যে প্রবেশলাভ করিল। সাময়িক ব্যাপারে এইরূপ অকস্মাত শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইলে যাহা হইয়া থাকে আসদ্ জমান খাঁর সেনাদলের তাগাই হইল; তাহারো ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। সেই সময়ে মেজর ইয়র্ক এবং মীরকাসিম সসৈন্যে অগ্রসর হওয়ায় পলায়নপর বিদ্রোহী সেনাদলের পলায়ন সহজেই সম্ভব হইল। এই ভাবে বীরভূমি অর্থাৎ বীরভূম, বর্তমান ও মেদিনীপুর কোম্পানীর পশ্চাত হইল।\*

[ ক্রমশঃ।

\* এই প্রবন্ধ রচনার নিম্নলিখিত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে : (1) Seir Mutakherin Vol. 2 (2) Broome's Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. 1. (3) Aitchison, Vol. 1. (4) Firminger's Midnapore Record, 1763-64. (5) District Gazetteer, Midnapore. (6) মেদিনীপুরের ইতিহাস। (7) মীরকাসিম।

# ছোতিদের আসর



## বাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাল্যলীলা

ইংরেজের তখন দোদণ্ড প্রতাপ। প্রায় সারা ভারতবর্ষের রাজপাটগুলি তারা দখল করে বসেছে। কলকাতা হয়েছে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। একশো বছর আগেও এই ইংরেজ এ দেশে বণিক-বেশে এসে বাণিজ্যের বেসাতি করত—তার কুঠি নির্মাণের জন্তে স্থানের প্রত্যাশায় এ দেশের রাজাদের দরবারে হাঁটু গেড়ে বসে কত ধর্না দিত, প্রার্থনা জানাত। কিন্তু কালের এমনি আশ্চর্য গতি আর নিয়তির অদ্ভুত পরিহাস যে, সেই রাজাদের অপদাৰ্থ বংশধরেবাই এখন ইংরেজের কাছে কৃপা-ভিখারী! কেউ রাজপাট রক্ষায় অসমর্থ হয়ে—রাজ্য প্রজা ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে বৃত্তি পেয়েই সন্তুষ্ট। কেউ বা ইংরেজের অভিপ্রেত অবমাননাকর সঙ্গে আট্টে-পুঠে বন্ধ হয়ে কোন রকমে রাজপাট বজায় রেখেছেন। কথায় কথায় এঁদের ইংরেজ রেসিডেন্টের মন যুগিয়ে চলতে হয়—পান থেকে যদি চুপটুকু খসে তাহলে আর নিজের থাকে না—এমনি তাঁদের অবস্থা। কিন্তু রাজ্যের মায়ায় রাজারা নত-মস্তকে ইংরেজের প্রভু স্বীকার করলেও, রাজপরিবার বা রাজসভায় এমন অনেক স্বাধীনচেতা বিচ্ছিন্ন মনোবীও ছিলেন, যারা এ ভাবে বিদেশী শাসকের মন জুগিয়ে রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ পদ আঁকড়ে পড়ে থাকতে আর রাজি হলেন না—রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে তাঁরা বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। এদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। হিন্দুরা রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে হলেন কাশীবাসী। আর মুসলমানরা মন্ডায় বা ভারতের বাহিরে মুসলমান-রাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

মহারাষ্ট্র চক্রের নেতা পেশোয়ার দ্বিতীয় বাজীরায় যখন তাঁর রাজপাট ইংরেজকে অর্পণ করে বৃত্তি নিয়ে বিটুরে বসবাস করতে গেলেন, তখন তাঁর রাজধানী পুণায় হঠাৎকার পড়ে গেল; সেই হুসময়ের পেশোয়ার মেহেত্তা বহু পদস্থ রাজপুরুষ রাজনীতির সঙ্গ্রহ ভিন্ন করে বিধবাবের চরণে আশ্রয় নেবার আশায় কাশী যাত্রা করলেন। এই দলে ছিলেন ভূতপূর্ব পেশোয়ার অমুখ চিমনজী আপ্পা এবং তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন কথচারী মোরপস্থ তাচ্ছে। এঁর পিতা বলরাজ রাও পেশোয়ার জৈনিক সেনানায়ক ছিলেন। পেশোয়ার পতনের পর পুণায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যখন বিটুরে তাঁর অশ্রুগমন করেন, সে সময় চিমনজীও আহুত হয়েছিলেন।

কিন্তু এই দারুণ বিপর্যয়ে চিমনজী এমন গভীর ব্যথা পেয়েছিলেন যে, ইংরেজের বৃত্তিভোগী অগ্রজের সম্পর্কও তাঁর পক্ষে বিধের মত অসহ্য হয়েছিল। তিনি ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কাশীবাসই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

চিমনজী আপ্পার বাসভবনেই\* মোরপস্থ তাচ্ছে বাস করতে লাগলেন। কাশীর এই নিভৃত অঞ্চলটি উদাস্ত বহু মারাঠী-পরিবারের সমাগমে অল্প দিনের মধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। মোরপস্থ সপরিবার চিমনজী আপ্পার সঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। চিমনজী আপ্পার মত মোরপস্থজাও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, উভয়েই তেজস্বী ও ধর্মশীল—শাস্ত্র ও ধর্ম-চর্চার ভিতর দিয়ে সম্ভাব্যেই তাঁদের দিন কাটতে লাগল।

কিছু কাল পরে পৃথকী পত্নী ভাগীরথী বাঈ এক পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করলেন। এই কন্যাই ঐতিহাস-প্রসিদ্ধা কাঁচীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। কিন্তু পিতা কন্ডার নাম রাখলেন—ময়ূবাঈ। এই নামেই ইনি পরিচিতা হলেন।

সাধারণতঃ মারাঠী কন্ডারা স্বাস্থ্যবতী, রূপসী ও বলশালিনী। কিন্তু পৃথকীর এই কন্যাটি বাল্যকালেই স্বাস্থ্য, রূপ ও শক্তিতে সম-বহুলা মেয়েদের প্রত্যেককে অতিক্রম করে অতুলনীয় হয়ে উঠলেন। এই অপূর্ণা বালিকা যেন বিধাতার এক অপূর্ণ সৃষ্টি। শুধু রূপে নয়, দৈহিক শক্তি ও নানা প্রকার বিশিষ্ট গুণের জন্তে শৈশবেই তিনি সবার আলোচ্য হয়ে উঠলেন। কিন্তু পৃথকীর অদৃষ্টক্রমে প্রবাস-জীবনের এই সুখটুকুও আকস্মিক এক শোকের আঘাতে বিকৃত হয়ে গেল—তাঁর সাধনা সহধর্মিণী ভাগীরথী বাঈ অকালে কাশীলাভ করলেন। পৃথকী একসঙ্গে পিতা ও মাতার স্নেহ নিয়ে কন্যা মম্বকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। শৈশবেই মল্ল ধর্মশীলা ও দেব-দেবীর প্রতি ভক্তি মতী হয়ে ওঠেন। অমূল্য পরিবেশেই এ শ্রবোণ ঘটে। বাড়ীর সামনেই মহামায়ীর মন্দির, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনির সঙ্গে শত শত ভক্তকণ্ঠের 'মা মা' ধ্বনি অন্তরে জাগায় ভক্তির প্রেরণা; বাড়ীতেও দেবর্চনার নিত্য নিয়মিত ব্যবস্থা, পণ্ডিতদের পূজাপাঠ, শাস্ত্রালোচনা; বাড়ীর নিম্নেই কাশীর পবিত্র গঙ্গা—সেখানেও ভক্তবৃন্দের মধুর বন্দনা জলের তালে-তালে প্রাণে আনন্দের স্পন্দন তোলে। এমন বিচিত্র পরিবেশের প্রভাবে বালিকার শিশু-মন যেমন ধর্মভাবে অমুপ্রাণিত হয়, পক্ষান্তরে শক্তিরূপা মহামায়ীর মন্দিরে অহুষ্ঠিত শক্তির প্রতীকগুলিও বালিকাকে শক্তিময়ী করে তোলে। শাস্ত্র পুরোহিত যখন তারথরে ভক্তকালীর স্তোত্র পাঠ করেন, বালিকা তখন তন্ময় হয়ে শুনে থাকে। প্রত্যহ বিপ্রহবে চৌবাট ঘোগিনীর মন্দিরে চণ্ডীপাঠের সময় বালিকা মল্ল সব কাজ ফেলে সবার আগে সেখানে গিয়ে ঈড়ান—মনোযোগ দিয়ে শোনেন রণচণ্ডীর রণলীলার অপূর্ণ আখ্যান। বালিকার সর্বত্র যোমাঞ্চ হয়ে ওঠে—নিত্য নিয়মিত ভাবে শুনে-শুনে চণ্ডীর দুর্গম শ্লোকগুলিও কঠিন হয়ে যায়। এর ফলে শিশু-বয়সেই বালিকা নিজেকে শক্তিরূপা মনে করে সমবয়স্ক সকলের উপরেই প্রভুত্ব স্থাপন করতে চাইতেন। শিশুদের সঙ্গে খেলাতেও তাঁর শক্তির লীলা প্রকাশ

\* কাশীর চৌবাট ঘোগিনী মন্দিরের সামনে সংকীর্ণ রাস্তার অপর পারে সেই পুরাতন বাড়ী আজও বিদ্যমান। এই বাড়ীখানির মধ্যে বহু কক্ষ; নিয়ন্তরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিগুলি আজও পূজিত হয়ে থাকে।

পেত ; খেলা-ঘরের খেলার খায়া মনুই মাথা খেলিয়ে বার করেন ; সেই খেলার এক জন হবে রাণী, তার পরে মন্ত্রী সেনাপতি নগরপাল পাত্র-মিত্র রাণীট দল থেকে বেছে নেবেন। তার পর থাকবে সৈন্ত প্রহরী প্রজা। এদের মধ্যে অভিযোক্তা, অপরাধীও থাকে চাই—কেন না, রাণী তাদের বিচার করবেন। দলের প্রত্যেকেই চায় রাণী হোতে—কিন্তু চাইলেই ত আর রাণী হওয়া যায় না ; তার জন্তেও পরীক্ষা থাকে। পরীক্ষায় জয়ী না হলে রাণী হবার বো নেই। এর জন্তে এক-এক দিন এক-এক বকমের পরীক্ষা হয়। এক দিন হয়ত দৌড়ের ব্যবস্থা হলো। একটা স্থান ঠিক করে বলা হলো—একসঙ্গে সবাই দৌড়তে শুরু করে সবার আগে সেই স্থানটিতে যে পৌঁছাতে পারবে—সেই হবে সেদিনের জ্যেষ্ঠ রাণী। এর পর বালক-বালিকাদের দল বেঁধে একসঙ্গে ছোটবার কি ধুম ! কিন্তু এই দৌড়-বাজীতে মনুই সবার আগে ঘূঁটি ছুয়ে সবাইকে হারিয়ে দিয়ে সেদিনের রাণীর আসনটি দখল করে নেন, আর দলের সকলেই তাঁর ভকুম মানতে বাধ্য হয়। এখানে কেউ অব্যর্থ হলেই মুন্সিঙ্গ ; রাণী তখন রণমুখী হয়ে তাকে এমন শাস্তি দেবেন যে, কাকুর সাধ্য হয় না তাতে বাধা দিতে। এই জন্তে দলের সকলেই মনুইকে ভয় করে, তাঁকে ঝাঁটাতে কেউ বড় একটা সাহস পায় না।

এক দিন এমনি একটা খেলায় রাণী হয়ে মনুই একটা অব্যর্থ ছেলেকে বিজিত শাস্তি দেন। ছেলেটি তখন সরোমনে বলতে থাকে : বাদের মেয়ে কি না, তাই এমনি মারকুটে।

মনুর শ্রদ্ধা ছিল, ছেলেটিকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করবেন—কেন সে তাকে বগীর মেয়ে বললে ! কিন্তু ছেলেটি কথটা বলেই পাথরের আসন থেকে মনুব ওঠবার আগেই ছুটে পালিয়ে যায়। কথটা কিন্তু মনুর মনে ব্যথা দেয় ; তাই তিনি তখন খেলা ভেঙে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

চিমনজী আগ্না তখন বৈঠকখানার বসে পহুজীর সঙ্গে শাজ্জালোচনা করছিলেন। সেখানে আরও কয়েক জন পণ্ডিত বসেছিলেন। এমন সময় মনু তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকে পহুজীর কোলের কাছে বসে পড়ে বললেন : বাবা, একটা ছেলে আজ আমাকে বগীর মেয়ে বলেছে। আমি তাকে শাস্তি দেব ; কিন্তু তার আগে জানতে চাই—কেন আমাকে ও-কথা বললে ? আমরা কি বগী ? এ কথার মানে কি বাবা ?

পাঁচ বছরের মেয়ের মুখে এই ধরনের কথা শুনে ঘরভিত্ত সকলেই অবাক হয়ে মনুর আরক্ত মুখখানার দিকে চেয়ে রইলেন। পহুজী আন্তঃ-আন্তঃ মেয়ের মাথায় হাতখানি রেখে শ্রদ্ধেয় চিমনজীর দিকে চেয়ে স্নেহাস্রু স্বরে বললেন : তোমার কথা বাপুজী শুনেছেন, উনিই বলবেন মা—বগী কাদের বলা যায়, আর—ও কথার মানে কি ?

চিমনজীকে মাঝামাঝি সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বাপুজী বলতেন। সৌম্যমূর্তি, দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ ; মিষ্টভাষী সদাশয় ব্যক্তি ইনি। মুখখানি প্রশস্ততার ভায়া, সরুফণই যেন মিষ্ট হাসির অভায় বলমল করছে। মনু তাঁরও পরম স্নেহের পাত্রী—মহাভারতের ও মহারাষ্ট্রের বোদ্ধাদের কত গল্পই তিনি তাকে প্রত্যহ শুনিতে থাকেন। বালিকার কথা শুনে এখন তাঁর মনে পড়ল—এ-সবকিছু কিছুই

তিনি মনুকে বলেননি। তাই অপরাধীর মত মুখভঙ্গী করে তিনি মনুর দিকে চেয়ে বললেন : এর ভিত্তেই তোমার বাপুজীই দায়ী মা, কেন না, বগীদের কথা কোন দিনই তোমাকে বলিনি ; এখন বলছি মা, শোনো : শিবাজী মহারাজের গল্প তোমাকে বলছি—মনে আছে ত ?

খড় নেড়ে স্বীকার করে মনু সেই মহাপুরুষকে বোড়াহাতে প্রণাম জানালেন। বাপুজী বলতে লাগলেন : শিবাজী মহারাজের অনেক বকমের সৈন্য ছিল। যারা মাটির ওপর দাঁড়িয়ে লড়াই করত, তাদের বলা হোত পদাতিক। আবার ঘোড়ায় চড়ে যারা যুদ্ধ করত যেত, তারা অশ্বরোহী বলে গণ্য হোত। এদের আবার দু'টো দল ছিল। যে-সব মারামি বোদ্ধা রাজ্যের পর্বোরা না করে দেশের খাতিরে নিজেবাই হামরাই হয়ে ঘোড়া, অস্ত্র-শস্ত্র ও সাক্ষ-শোবাক নিয়ে যুদ্ধের সময় হাজির হোত, তাদের নাম ছিল—‘শিলাদার’। আর যারা সরকার থেকে ঘোড়া, সাক্ষ-শোবাক, অস্ত্র-শস্ত্র ও নিয়মিত বেতন পেত, তাদের বলা হোত—‘বারগীর’। এই বারগীর কথটিই কালে ‘বগী’ হয়ে দাঁড়ায়। এদের গল্প তোমাকে পরে বলব মা।

এ সব কথা সেই বয়সে মনু কত দূর বুঝেছিলেন বলা যায় না ; কিন্তু এই প্রশ্ন থেকে বালিকার অমুসন্ধিৎসা দেখে সকলেই আশ্চর্য হোলেন। এক মারামি জ্যোতিষী সেদিন চিমনজীর কাছে এসেছিলেন ; তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতকণ বালিকাকে দেখছিলেন। চিমনজীর কথায় পর তিনি মনুকে কাছে ডেকে তার হাতের রেখাগুলি নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করতে লাগলেন। খানিক পরে তিনি পহুজীকে লক্ষ্য করে বললেন : আপনাব মেয়ের হাতে যে চিহ্ন দেখছি পহুজী, তাতে রাজরাণী হবার কথা।

পহুজী অবিশিষ্ট কথটা প্রত্যয় করলেন না ; তাঁর মত পরাশ্রিত বিদ্বত্বীনের কথা রাজরাণী হবে, এ যে কল্পনারও অতীত। সাধারণত তিনি উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, হুয়াশাকেও মনে স্থান দিতেন না। যুদ্ধ হেসে তিনি জ্যোতিষীর কথাকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু জ্যোতিষী তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে দৃঢ় স্বরে বললেন : আমার কথা মনে রাখবেন পহুজী, ভবিষ্যতে এ কথা মিলিয়ে নেবেন—ঠিক সময়েই আমি দেখা করব।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে চিমনজী আগ্না কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি বৃকতে পারলেন, এ ব্যাধি থেকে এ যাত্রা আর দফা পাবেন না। আশ্রয়দাতার এই অবস্থা দেখে পহুজীও ভেঙে পড়লেন। মনু খেলা ঘুসা সব ছেড়ে বাপুজীর শিরে বসে অক্লান্ত ভাবে সেবা করেন ; একটু অঙ্গের গেলেই ছুটে গিয়ে মন্দিরে দেবী প্রতিমার সামনে জাহ্নু পেতে বসে অর্পিত স্বরে প্রার্থনা করতে থাকেন ; তুমি ত মঙ্গলময়ী মা—সর্বমঙ্গলা তুমি, আমার বাপুজীকে ভালো করে দাও !

এ কথাও বাপুজীকে কানে যায়, তিনি মনুর মুখালের মতন হাত দু'খানি ধরে গাঢ় স্বরে বলেন : আমার জন্তে না কি মন্দিরে মহামায়ীর কাছে ভারি কান্নাকাটি কর, মাথা খেঁড় ! ছি মা, তাতে যে দেবী ব্যথা পান। এখানে থাকার দিন যদি শেষ হয়ে থাকে আমার, মা কি তার রক্ষ করতে পারেন ? তাঁকেও যে নিয়ম মেনে চলতে

হয়। দেখো মা, এই নিয়ে যেন মন্দিরের মায়ের উপর অভিমান কোর না, বিধান চাখিয়ে না! তিনি মঙ্গলমতী, যা কখন মঙ্গলের জন্তই।

বাপুজীর কথা শুনে মনুষ্য নাম মুখখানি অশ্রুধারায় ভরে যায়—তার বুকের ভিতরে কে যেন চাপাকার করে ওঠে।

মৃত্যুর আগে চিমনকী আপা পত্নীকে ডেকে শ্রোত্রস্থির বলে: আমার মৃত্যুর পরে জাদু শাস্তি শেষ হলে তুমি মনুষ্যকে নিয়ে পিঠুরে যেও। অভিমান করে এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। তুমি গেলে আমার দাশ তোমাকে সাধরে গ্রহণ করবেন। মনুষ্য জন্মেই তোমাকে পেতে হবে—এ কথা মনে রেখো!

এর পর চিমনকী আপা ঈশদেবতার নাম নিয়ে একদা দেহত্যাগ করলেন। এই সদাশয় মহাপ্রাণ পবিত্রা মনুষ্যের মৃত্যুতে কানীয়াসী মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে তাহাকার পড়ে গেল। কানীয়ার মত বিটুর ও পুণ্যের তাঁর আত্মীয় স্বজন ও গুরুগুরুগণ শোকে অভিভূত হলেন। বিটুর ইংরেজের বৃত্তিভোগা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরও অমূল্য আপ্রাণীয় মৃত্যুসংবাদে নিদারুণ আঘাত পেলেন; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আত্মীয়স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কানীতে পাঠালেন আপ্রাণীয় পরিজনদের সঙ্গে তাঁর পরিবারভুক্ত সকলকেই সাধরে বিটুরের প্রাসাদে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে। এবার তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। অমূল্য হয়ে পত্নীও মনুষ্য আপ্রাণীয় পরিজনবর্গের সঙ্গে বিটুরে গেলেন।

[ ক্রমশঃ ]

## দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা

শৈলেন ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রদ্রোহী আক্রমণ দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা হইতেছে। বহু দিনকাব প্রপীড়িত, নিপীড়িত ভারতবাসীর আজ জেগেছে। যে আগুন মহাত্মা গান্ধীর আমল হতে ধিক-ধিকে জ্বলছিল, আজ তা ভীষণ আকার ধারণ করেছে। কেউ আজ আর দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের হায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করতে পারবে না।

আমাদেরই দেশের প্রবাসীদের কথা আজ তোমাদের বলব। ভূগোলে লেখা আছে, আফ্রিকাকে বলে অন্ধকারের দেশ। আমার মনে হয়, ভূগোল-রচয়িতার আরও লেখা উচিত ছিল যে, আফ্রিকা এশিয়াবাসীদের কাছে অন্ধকারের দেশ, কারণ আফ্রিকা এমন কয়েকটি স্থান আছে, যেখানে এশিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ। বর্ণ-বৈষম্যের ফলে ভারতীয় বা এশিয়ার অন্ত দেশের লোকদের সেই সব স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বহু ভারতীয় স্থায়ী ভাবে বাস করেন। জেনারেল ম্যাটসু যিনি না কি বিখ্যাত শাস্তিবাদী এবং তাঁরই স্বযোগ্য ছাত্র ডাঃ মালান এশিয়াবাসীদের উপর নিম্নলিখিত নিয়মগুলি বাধ্যতামূলক ভাবে প্রয়োগ করেন। নিয়মগুলি পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা।

(১) এক জন অ-ইয়োরোপীয় তাহার নিজের ইচ্ছামত সিনেমার

টিকিট কিনিতে পারিবে না। 'এশিয়াবাসীদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সিনেমা-গৃহ আছে, সেগুলি ছাড়া অন্য সিনেমায় প্রবেশ করিলে আইনত দণ্ডনীয় হইবে।

(২) এক জন এশিয়াবাসী হোটেল বা রেইলুয়েটে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৩) তাহাকে কোন ট্রেনের টিকিট কিনিতে হইলে ২৪ ঘণ্টা আগে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হইবে। তাহার টিকিটে বিশেষ নম্বর থাকিবে। কোন ইয়োরোপীয়ের পাশে কখনও বসিবে না। যদি সে প্রথম শ্রেণীতে বাইতে চায়, তবে তাহাকে সারা প্রথম শ্রেণীই ভাড়া করিতে হইবে, কেন না, একই কামরায় তাহার সহিত কোন ইয়োরোপীয় বাইবে না।

(৪) ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কেন না সেখানে কোন ইয়োরোপীয় তাহার পাশে বসিবে না।

(৫) রেস-ট্রেন বা পার্কে বোকে বসিবে পারিবে না, কারণ সেগুলি ইয়োরোপীয়দের জন্য।

(৬) পোষ্ট অফিসের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না, কারণ তাহা ইয়োরোপীয়দের প্রবেশ-পথ। স্থানীয় অধিবাসী বা এশিয়াবাসীদের জন্য পশ-দরজা আছে, যেখান দিয়া তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে।

(৭) তাহার ছেলেমেয়েরা ইয়োরোপীয়দের স্কুলে বাইতে পারিবে না। হয় নিগ্রোদের স্কুলে, নচেৎ অন্য কোন স্কুল দেখিয়া লইতে হইবে।

(৮) এক জন ইয়োরোপীয় এক জন এশিয়াবাসী দ্বারা 'সার' বলিয়া অভিহিত হইবে; কারণ সে সাদা লোক।

(৯) একটু কাজের মাহিনার তফাৎ আছে। যে কাজের জন্য এক জন ইয়োরোপীয় এক পাউণ্ড পাইবে, সেই কাজের জন্য এক জন এশিয়াবাসী তাহার এক-তৃতীয়াংশ পাইবে।

(১০) এক জন অ-ইয়োরোপীয় এক জন ইয়োরোপীয়ের গৃহের নিকট গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না। এমন কি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ও মাননীয় ব্যক্তি মহামান্য আপা বা দক্ষিণ-রোডেসিয়ার এক স্বাস্থ্যকর স্থানে গৃহ নির্মাণের অধুমতি পান নাট।

(১১) বাসগুলি ইয়োরোপীয়দের জন্য।

(১২) এক জন খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী এশিয়াবাসী ইয়োরোপীয়দের গীর্জায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি সে প্রার্থনা করিতে চায়, তবে সে গীর্জার সীমানার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিবে, কিন্তু প্রার্থনার সময় এই বিষয়ে সর্ব-সর্গদাত সত্যক থাকিতে হইবে যেন সে রাস্তা বন্ধ করিয়া না থাকে। অন্তর্কর্ত্ত হইলে বা কোনও ইয়োরোপীয়ের সামান্য বিরক্তির কারণ হইলে সে যে কোন দৃষ্টান্তে গ্রেপ্তার হইতে পারে।

এই নিয়মগুলি পালন করিতে কিরূপ লাগে বল ত? আমাদের জাতির শিতা মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের অহিংস আন্দোলন দ্বারা এই নিয়ম লংঘন করিবার প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দেন। আজ মহাত্মার অবর্ত্তমানে সেখানে ভারতীয়দের চালনা করছেন তাঁরই স্বযোগ্য পুত্র মহাত্মা মণিলাল গান্ধী।

আজ দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে সব ভারতীয় লড়াইছেন, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই।

## মোহাম্মদ ইকবাল

ইকবাল ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী শিয়ালকোটে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পরিবারের আদি বাসভূমি ছিল কাশ্মীর। গোড়ার দিকে তিনি শিয়ালকোটে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শিয়ালকোটের মাঝে কলেজ হইতে তিনি আই-এ পাশ করেন। ১৮৯৫ সালে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে তিনি লাহোর গমন করেন। ১৮৯৯ সালে ত্রাণ ইকবাল এম-এ ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু কাল পরেই তিনি লাহোরের গবর্নমেন্টাল কলেজে ম্যাকলিউড আরাবি ক রীডারশিপ লাভ করেন। উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৫ সালে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। তিনি কেম্ব্রিজ হইতে ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং লিংকনস্ ইন হইতে ব্যারিষ্টার হন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে মিউনিকে তিনি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পারস্তে দর্শন-শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্পর্কে খিসিস লিখিয়া তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার এই খিসিস সংগ্রহে প্রকাশিত হয়।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পূর্বক লাহোর হাইকোর্টে এডভোকেটরূপে তিনি আইন ব্যবসায় আশ্রয় করেন এবং অবসর সময়ে কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ছাত্র-জীবনেই তাঁহার উদ্ভূত কবিতা লিখিবার ঝোঁক দেখা দেয়। পারস্যী ভাষায় কবিতা লিখিবার পূর্বে উর্দু ভাষায় তিনি কয়েকটি উচ্চ ধরনের কবিতা লেখেন। তাঁহার প্রথম পারস্যী কবিতা “তাসাবের খুনী” ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব. এ. নিকোলসন ১৯২০ সালে ইহা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বৃহত্তর দিন পর্যন্ত তিনি জমাগত কবিতা লিখিতে থাকেন। “আসগার”—এর পর লেখেন “কমুজ্জ বেখুদী” ১৯১৮ সালে। “কমুজ্জ”র পর প্রকাশিত হয় “পায়ামে নাশরেক”। সেটের ওয়েষ্ট অস্ট্রেলিয়ার দেওয়ার্থ—এর ভাষ্যাবে কতিপয় কবিতায় সক্ষমরূপে “পায়ামে নাশরেক” প্রকাশিত হয়। ইহার পর প্রকাশিত হয় “জুরে আজম” এবং “ফাওয়াযদনামা”। অতঃপর ইকবাল পুনরায় উদ্ভূত লিখিতে শুরু করেন এবং “বাল-ই-জিব্রিল” ও “বারবে কালীম” নামক দু’খানা কবিতার বই প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার “মুসাফির” ও “পাস চারে বায়েদ কাদ” নামক দু’টি ক্ষুদ্র পারস্যী কবিতাও প্রকাশিত হয়। তাঁহার শেষ কবিতার বই “আরমুগানে হেজাজ”। ইহা উর্দু ও পারস্যী কবিতার সংগ্রহ।

ইকবাল সাগা জীবন দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তাঁহার এই বক্তৃতাসমূহ “দি রিকনস্ট্রাকশন অফ রিসিভিয়াস থট ইন্ ইসলাম”রূপে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে তাঁহার এই বক্তৃতাসমূহ পরিবর্তিত সংস্করণরূপে পুনরায় প্রকাশিত হয়। ত্রাণ ইকবাল সাগা জীবন রচনোত্তিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১৯২৭ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি পদে বৃত্ত হন। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে ইকবাল বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে

যোগদান করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মুসলিম সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিছুকাল রোগভোগের পর ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল ত্রাণ মোহাম্মদ ইকবাল পরলোক গমন করেন। তাঁহার দাকন-কাফন একদা জাঁক-জমকের সাথে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, তাহা রাজা-বাদশারও দরবার উল্লেখ করে।

—প্রচার বিভাগ, পাকিস্তান।

## গল্প হলেও সত্যি

### শ্রীঅমিয়কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ কয়েক দিন হল ভীষণ শীত পড়েছে।...মাকে-মাকে বরফও পড়েছে। রাস্তায় একটাও লোক নেই। বিরাট একটা সরস্বতীর মত প্রকাণ্ড পথটা পড়ে আছে।

রাস্তার ধারেই একখানি বাড়ি। বাড়ির সামনের ঘরটার ছ’টি মেয়ে বসেছিল। এক জন ছাত্রী, অপর জন শিক্ষয়িত্রী। শিক্ষয়িত্রীটি বাব বাব আশ্রনের কাছে গিয়ে হাত দু’টি গরম করছিল। কারণ, এই প্রচণ্ড শীত নিবারণ করবার মত কোন আচ্ছাদনই তার ছিল না। সমস্ত মুখখানা সাদা হয়ে গেছে। যেন এক ফোঁটাও রক্ত নেই। ঠোঁট দু’টি থির-থির করে কাঁপছে। ছাত্রী পড়িয়ে সামান্য যে কয়টি টাকা সে পায়, তাতে তার সংসার চলে না। অনন্ত অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাকে সংসার চালাতে হয়।

ঠাণ্ডা এক দিন সেই শিক্ষয়িত্রীটির জীবনে এল সম্পূর্ণ আনন্দ আর স্মৃতির জোয়ার।

ছাত্রীর দাদা শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে বললেন—“আমি যদি তোমায় বিয়ে করি, তোমার আপত্তি আছে?”

—“আপত্তি!” এত বড় আনন্দের কথা সে কল্পনাও করতে পাবেনি। আলাপ তাদের দিন-দিন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে লাগল। ভবিষ্যতের কত রঙ্গীন ছবি আর কল্পনা ভেসে উঠল তার সামনে।...

...কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

এই কথা শেষ পর্যন্ত ছাত্রীর বাবা শুনলেন। ডেকে পাঠালেন তিনি শিক্ষয়িত্রীকে। বললেন—“তোমায় দয়া করে পথের ধার থেকে কুড়িয়ে এনে উপকার করেছিলাম। তুমি এই ভাবে তার অসম্মান করলে? আমাদের আভিজাত্যের কঠিন বাধা ভেঙ্গে জেতার মতন একটা পথের পরিচয়হীন মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হতে পারে না। তুমি এই মুহূর্ত্ত আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাও, আর কোন দিন এ বাড়িতে এস না।”

বাহিরে ভীষণ বরফ পড়েছে। সোঁ-সোঁ করে বইছে হাড়-কাঁপানো ঝাড়া বাতাস।...মেয়েটি পথে এসে দাঁড়াল। আজ তার মত দু’ভাগিনী, তার মত এক,—বাধ হয় কেউ নেই। বড়লোকের ছেলের সখ মেটাতে আজ হল সে পথের ভিখারিণী। তার একমাত্র অবলম্বন চাকরি পর্যন্ত গেল।...চোখের সামনে ঘনিষ্ঠে এল তার আশাহীন কালো মেঘ।

...কিন্তু না—মেয়েটির জীবন এইখানেই শেষ হয়ে বায়নি। কারণ তা’হলে আমরা পেতাম না ‘রেডিয়ার’—আমরা পেতাম না ‘মারাম কুরি’কে। সেদিনকার সেই অসহায় মেয়েটি আজকের—মাদাম কুরি।



শান্তি চাই কেন ?

আশাপূর্ণা দেবী

আজকের এই সভায় কিছু বলবার জন্যে অন্তরুদ্ধ হয়েছিলাম।

বলতে আমি অভ্যস্ত নই তবু এসেছি। এসেছি শুধু এই জগতে—যে আবেদন নিয়ে এই সভা, সে আবেদনের মধ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই—তা' সে যতো ক্ষুদ্রই হোক—কিছু অংশ ঠাকা উচিত মনে করে। কিন্তু কোন কিছু বলবার আগে এই প্রশ্নটাই মনে জাগছে—কেন এই আবেদন? কেন আমরা 'শান্তি'র প্রার্থনার এমন করে আর্ন্তীচাঁক্য তুলেছি? কেন আমরা ধারে-দ্বারে ডাক দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের মায়াদের ভগিনীদের কণ্ঠাদের কাছে—এই প্রার্থনার তবে স্রব মেলাতে? কেন আমরা আসন্ন যুদ্ধের বিভীষিকায় কম্পিত হতে?

নারীচিত্ত কি সংগাম-ভীক? সে কি কেবল মাত্র বিপ্লব-বিত্তন ক্ষুদ্র গৃহস্থের কাঙাল?

তখন হয়তো আপনাগে অবাচ্ হয়ে ভাববেন—এ আবার একটা প্রশ্নের বন্ধ না কি? নারী কল্যাণী, নারী সমতাময়ী, নারী গৃহকালী, তার শান্তি প্রার্থনার মধ্যে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়?

কথাটা হয়তো ঠিক, নারীচিত্ত শান্তিকামী। তা' বলে সংগাম-ভীক নয়। সভ্যতার প্রয়োজনের যুগ্মমুখি ঝাঁপাতে হলে—সে বিনা খিঁচায় বরণ করে নিতে পাবে পবন তুফান—চরম ক্রেশ। ক্ষুদ্রের জগৎ বৃহৎকে বসি দেবার ক্ষুদ্রতা তার নেই।

তাই—যুগ্ম-যুগ্মস্তের ইতিহাসের নিকে তাকালে দেখতে পাই—দেশ বধন রাক্ষসের মুখে পড়ে, নারী তখন দেশকে রক্ষা করতে রাক্ষসের মুখে অনায়াসে এগিয়ে দেয় আপন স্বামীকে, সন্তানকে, প্রাণাধিক প্রিয়তমকে।

নারী শান্তি চায়, কিন্তু পলাতকের শান্তি নয়।

কবে—কোন জাতির পতন-উত্থানের ইতিহাসে লেখা আছে—বিপ্লবের দিনে, প্রয়োজনের দিনে, ক্রোধের নিষ্ঠুর ডাক বধন দ্বারে এসে আঘাত হেনেছে, নারী তখন পুরুষকে আটকে রাখতে চেয়েছে—

প্রলোভনে? কি সাক্ষ্য দেয় বিগত কাল? কি সাক্ষ্য দিচ্ছে বর্তমান পৃথিবী?

তাই বলি নারীচিত্ত যুদ্ধ-ভীক নয়। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে যা ঘটছে এ কি যুদ্ধ?

যুদ্ধের অর্থ—মাহুয়ে মাহুয়ে শক্তির লড়াই, দিবিজরীর দস্তের সঙ্গে দেশাঙ্ঘবোধের লড়াই, সাম্রাজ্যলোভীর লুকলোপুণতার সঙ্গে আশ্রয়ক্ষার লড়াই। কিন্তু এ কী? একে কি লড়াই বলে?

এ তো—সাম্রাজ্যলোভীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের ক্ষুধা নয়, এ যে বৃহৎশক্তি উন্নাদ মাহুয়ের সর্বনাশা ধ্বংসের ক্ষুধা।

যুক্তিহীন বিচারহীন নীতিদণ্ডহীন রাক্ষসী ক্ষুধা।

এই সর্বনাশী ক্ষুধার দ্রুস্ত আগুনে জলে যাচ্ছে—পৃথিবী, জলে যাচ্ছে—পৃথিবীর সভ্যতা।... ধ্বংস হচ্ছে—সংসার, সমাজ, সৌন্দর্য, সম্মত,—ধ্বংস হচ্ছে মাহুয়ের শুভবুদ্ধির। মৃত্যু হচ্ছে—লক্ষ লক্ষ মানবেরই শুধু নয়—মৃত্যু হচ্ছে—মানবতার। যুদ্ধ আজ আর যুদ্ধক্ষেত্রেই শুধু আবদ্ধ নেই, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে তার লেলিহান শিখা।

পরবর্তী কালের ভক্ত কি রেখে যাবে—আজকের বিজ্ঞান-মদমত্ত দান্তিক মাহুয়?... যে সভ্যতার দস্তে সে সৃষ্টিকর্তার প্রভু হয়ে উঠতে চায়, সেই সভ্যতার দস্তাবশেষে ভয়মুষ্টি?

কিন্তু 'পরবর্তী কথা' বলেই কি কিছু থাকবে?

বর্ধিততার প্রতিযোগিতায় নতি স্বীকার করবে কে?...

বিজ্ঞান তার সহায়। বিজ্ঞান তার দাস। তাই আণবিক বোমাও আজ তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে; নারীশক্তির পব তৈরি হচ্ছে নূতনতরো নারীশক্তি। কি কবে, আবার হচ্ছে আবার তাড়াতাড়ি আবার বেশী মৃত্যু ঘটনা যার, অতরত চলছে তারই সাধনা।

বহু কোটি মাহুয়ের শত শতাব্দীর পরিশ্রমে-গড়া বিশাল একটা দেশ মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার কৌশল শিখে নিয়েও আজ মেরু-নি তার, আবার চাই।

নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক না একটা জাতি, একটা মহাদেশ। সেই তো চরম উন্নতি বিজ্ঞানের, পবম দান সভ্যতার। কেউ জানে না কে জয়ী হবে এই প্রলয়স্তর খেলায়।

কেউ বলতে পারবে না—এই সর্বগ্রাসী আগুনে দস্ত হতে হতে পৃথিবীর শেষ ভয়কথা এক দিন মহাশূন্যে বিদীন হয়ে যাবে, না—দস্তাবশেষে পৃথিবীর বুকে আপন হাতে রচা অশান-শয্যায় পড়ে পড়ে ধুকবে—এক দল দুহুর্ প্রেত?

কিন্তু সত্যিই কি তাই হবে?

মুষ্টিমেয় উন্নাদ দানবের এই সংতারলীলা ঝাঁড়িয়ে দেখবো—আর নিরুপায় আর্ন্তনাদ করবো আমরা বহু শত কোটি স্রব-মস্তিষ্ক মাহুয়?... কারুর কিছু করবার থাকবে না? অনেকেই হয়তো বলবেন—“কিন্তু উপায় কি? করবার পথ কোথায়? ক্ষমতা যে ওদের হাতে। মুষ্টিমেয় হলেও—ওদেরই বজ্রমুষ্টির মধ্যেই যে আটক পড়ে আছে বহু শত কোটির প্রাণ-পাখী। ওদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে না পারলে—” কথাটা হয়তো ঠিক, কিন্তু ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না? চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে—তাদের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনবার, কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেবার।

এ কাজ দেশনেতার নয়, এ কাজ মহাপুরুষের নয়, এ কাজ

মানুষকে শুভবুদ্ধির প্রেরণা দেবার। ‘আমরা ক্ষণ, আমরা দুর্বল, আমাদের কী সামর্থ্য’—এ বলে বসে থাকলে চলবে না।

পৃথিবীর জনসংখ্যা যাত্রা অর্ধেক, পৃথিবীর সমস্ত উপস্থানের যাত্রা আট আনার ভাগীদার, কতো দিন আর বসে থাকবে তারা—নীরব দর্শকের ভূমিকায়? কেন স্বীকার করবে না তারা বিপ্লবস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করবার দায়িত্ব?

নারীর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হবে কি শুধু পুরুষের সঙ্গে—“সমান অধিকারের” স্বপ্নে? পুরুষের সঙ্গে সমান কর্তব্যবোধের দ্বারে নয়?

অশান্ত বিশেষ শান্তি ফিরিয়ে আনবার কঠিন কর্তব্য সমগ্র বিশ্বের নারীর।

কর্তব্যের সৌখিন চিন্তাবিলাস নয়, চাই সত্যিকার কর্তব্যবোধ। ‘যা তোক একটা কিছু করা থাক’ বলে দু’দিনের ছুছুগ নয়, করতে হবে সফলতার সাধনা।...অবিচলিত নিষ্ঠায় চালিয়ে যেতে হবে বিরাম-বিহীন আন্দোলন। সংগ্রামের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম।

অবশেষে যেদিন যুদ্ধ-কান্ত পৃথিবী নতুন কৃতজ্ঞতায় নারীর পায়ে দেবে শ্রদ্ধা, সে দিন হবে তার সংগ্রামের শেষ। সেই হবে তার সংগ্রামের পুরস্কার। শুধু উৎপীড়িত জাতির আর্ন্ত চাংকারে কাজ হবে না, কাজ হবে না—নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের করুণ আবেদনে।

আক্রমণকাণ্ড উৎপীড়ক জাতির নারীকেই ধরতে হবে রাশ। আপন আপন ঘর শাসন করবার দায়িত্ব নিতে হবে তাদের।...বাতাস মুখর করে তুলতে হবে ‘শান্তি’র দাবীতে।

জানি—: কাজ সহজ নয়!

জগতের কোনো দুর্বোধ্যনই কখনো কোনো গাফারীর আবেদনে কর্পাত করেনি। তাই আজ কোটি গাফারীকে এগিয়ে আসতে হবে—‘আবেদন’ নিয়ে নয়—‘দাবী’ নিয়ে।

হত্যাচারীর রক্ত-রঞ্জিত কঠিন হাত চেপে ধরতে হবে নারীর প্রতিজ্ঞা-বলিষ্ঠ কঠোর মুষ্টিতে।

যে অস্ত্র দিয়ে পুরুষ তার ভবিষ্যৎ বাণধরের কবর খুঁড়ে, কেড়ে নিতে হবে সেই অস্ত্র।

প্রমাণ দিতে হবে—নারী শুধুই মমতাময়ী কল্যাণী নয়, মহাশক্তির অংশ।

এ কাজ সহজ নয়। কিন্তু অসম্ভবও নয়।

বিশ্বের সমস্ত নারী যদি আজ ‘শান্তি’র প্রস্তাব নিয়ে পুরুষের সঙ্গে অ-সহযোগিতার স্বপ্নে নামে, কতো দিন আর অটল থাকতে পারবে পুরুষ?

নারীকে বাদ দিয়ে কতো দিন মেতে থাকবে তারা সর্বনাশের নেশায়?

নারীর প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ না পেলে, তার সাম্রাজ্য-জয়ের মূল্য কি?

আর একটি কথা বলবার আছে—আমার কাছেই বোনেদের কাছে।...এই যে ‘শান্তি-আন্দোলন’ এ যেন একটা মিথ্যা প্রহসনে পরিণত না হয়। এর পিছনে যেন থাকে অবিচলিত নিষ্ঠা।...অথবা—

‘শান্তি-আন্দোলন’কে হাতিয়ার করে আমরা যেন অশান্তিকে তেঁকে আনবার হুঁড়ি না।

মনে রাখতে হবে—

জাণ্ডা আজ আমাদের ঘরের উঠোনে এসে পৌঁছেছে। সত্যক যদি না হই স্বর বলবে আমাদেরই।...যতোই আমরা জোর-জুলায় বলি—আমরা। আগে ‘মানুষ’ পরে ‘মেরমানুষ’, তবু অস্বীকার করে লাভ নেই আমরা মেয়েমানুষই। প্রকৃতির বিধানে ‘ঘরের’ প্রয়োজন আমাদেরই বেশী। সেই ঘরকে সামলাবার চেষ্টার বদলে স্ব-ভাঙার বুদ্ধি যেন না আসে আমাদের।

জানি—অনেক সমস্ত অনেক প্রশ্নের আঘাতে আমরা আজ অর্জ্বরিত। এই প্রশ্ন-কৃত হৃদয় যুদ্ধরত জগতের মতোই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, তবু অসহিষ্ণু হলে চলবে না।

মনে রাখতে হবে—এ দুর্বলতা আজ বিশ্বের সর্বত্র।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে—বাহ্য্য-প্রচাদের রঙিন আলোয় দূর থেকে যা দেখি, হয়তো তার সবটাই সত্য নয়।...সেই মিথ্যা আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে আজ যদি আমরা ক্ষমতালোভীর হাতের অঙ্ক হয়ে ঝাঁড়াই, সেটা হবে আত্মহত্যারই নামান্তর।

সেই আত্মঘাতী নেশায় মেতে শান্তিকে যেন আমরা চিরতরে নির্কাসন না দিই।\*

## অযথা সমালোচনা করবেন না

ইন্দিরা দেবী

[দুপুরের অবসরে স্বঘন আমরা কোনও ভাল বই পড়তে পারি, কিছা চারপাঁচ জন প্রতিবেশিনী মিলে অবসর-মুহূর্ত্তগুলিকে নানা কাজে-কস্মে, আলাপ-আলোচনায় ব্যয় করতে পারি, কিছা এমন কোনো শিল্পস্রব্য উপভোগ করতে পারি যে বর্তমানে মধ্যবিত্ত সাধারণ পরিবারে তার বিনিময়ে কিছু স্বচ্ছল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ তা আমরা করি না। গাল-গল্প-সমালোচনা সত্যিই বড় মুখরোচক ও আনন্দদায়ক—তাই এ পেলে আমরা আর কিছুই চাই নে। একটা বাড়ীর এক দিনের ঘটনার একটি ছবি আপনাদের সম্মুখে ধরবার চেষ্টা করছি।]

পানের কোটা খুলে মোটা দেখে দু’টি পান মুখে দিয়ে এক অগন্ধি জরদার ক’টি দানা মুখে ফেলে সুরো দিদি বললেন : তা বাই বল ভাই, মেয়েটি কেমন হয়েছে—

—এঁদের ভিতর বয়ঃকনিষ্ঠা হলেন রায়-বাড়ীর ছোট বৌরাণী, বাধা দিয়ে তিনি বলেন—তার মানে কি সুরো দিদি?

—মানে আর কি, মেয়েটা আসলে ভালো নয়—বুঝি ছোট বউ।

—কি দেখে বুঝলেন? ছোট বৌরাণীর কণ্ঠে অল্পযোগ।

—আর কি দেখে, আমি প্রমাণ করে দিতে পারি—বিকৃত কণ্ঠে সুরো দিদি এ কথা বলেই পানের পিচ ফেললেন।

এবার সুরো দিদির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন চট্টোপাধ্যায়, পুঁহী : হ্যাঁ, দেখছ না, একলা থাকে একটা ঘরে।

\* গত ৮ই মার্চ “আন্তর্জাতিক নারীদিবস” উপলক্ষে কলিকাতা ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে’ অহুষ্ঠিত ‘শান্তি-আন্দোলন’ সভায় গঠিত।



—তাতে হয়েছে কি? তাকে তো জীবিকা নির্বাহ করতে হবে—কেউ যদি না দেখে কিছা না থাকে, তাহলে তার অবস্থা আর কি হবে। অলকার অনেক গুণ বলতে হবে—তাই কাজ করে, নিজে লেখাপড়া করে, আবার নিজের বা কিছু-বা নিজেই করে বেচার। রাভা মাসী বললেন : ও, তাই বলা। ও ছুঁড়ীর সঙ্গে যে ছোট গিল্মির ভাব আছে।

—তাই তো ভাল লাগছে না কথাগুলো—বলেই সরো দিদি আবার পানের পিচ ফেললেন।

ছোট বৌরাণী বৃদ্ধ কণ্ঠে বললেন—আপত্তি আমার ঐখানেই। কারণ আলাপ থাকুক আর না থাকুক—লোককে অবধা কেন আমরা দোষারোপ করবো বলুন তো, যার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না।

—আরে, থাম থাম—তুমি তো সেন্নিনের মেয়ে—কি বোঝ। লোকের কথা আর আমাদের চোখই যথেষ্ট।

—মোটাই যথেষ্ট নয়, বিশেষ এই ধরনের পরচর্চা—যার সম্বন্ধে কিছুই জানি নে। কুংসা রটান সহজ কিন্তু যার কুংসা রটান হয় তার কত কৃতি করেন আপনারা? অথচ এর মূলে আছে কতকগুলি লোক আর চারটি আঙ্গুণি গল্প।

সরো দিদি বললেন : আর নিজে যদি কিছু সত্যি দেখে থাকি?

—কিন্তু তাতেও ভাববার আছে—আর যদি কেউ না জানতে চায়, অবধা আলোচনা করও আপনার কর্তব্য নয়।

—অনেক দেখেছি বলেই তো বলতে এলাম। আমি নিজে চোখে দেখেছি, ও রাত ১১টায় বাড়ী ফিরছে।

ছোট বৌরাণী হেসে বললেন—ওঃ, তা তার কোনো কাজ থাকবে না বুরি? আপনারাও তো স্মৃতি করে সিনেমা দেখে বাড়ী করেন সাড়ে ১১টা বাগেটার—তাহলে?

—অত ব্যক্তি দেখালে হবে না—তবু তো বলিনি, ও কি ভাবে একা-একা বেড়ায়। অত কম বয়স—

—কি করবে বলুন, হাত দিয়ে বয়েসটাকে টেনে বাড়ানো যায় না, কি না—ওটা নেহাই—পঞ্জিকার চালে চলে। আর একা থাকা তো আসেই বলেছি।

সরো দিদি আর চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আর একবার হাসলেন।

বুধ চাওয়া-চাওয়ি করে : বুঝলি ছোট বউ, আমরা সবই জানি, ধারণা না হলে আর কথাটা ওঠে না। আমাদের ধরকার কি। কথাটা উঠলো তাই বললাম।

—কথাটা তুললো আর কে, অঙ্ক-পরিচিত বা অল্প-পরিচিত যে

—তাকে নিয়ে কুংসা করা ছাড়া বুরি আর কাজ নেই?

রাভা মাসী বললেন : তা তোরই অত রাগ কেন যে ছোট বৌ—তোর ভাব আছে বলে।

ছোট বউরাণী এবার অসহিষ্ণু হয়ে বললেন : কি যে বা-তা বলেন রাভা মাসী, আমার সঙ্গে ওর কতটুকু পরিচয় যে বলছেন? কিন্তু সে কথা নয়, কাজ-কর্ম না থাকলে বাব-তার নামে কুংসা রটাবো—এ আবার কেমন কথা! আমি ভাবছি ওকে এক দিন ডাকবো আপনারদের সামনে—জিজ্ঞাসা করবো সব।

—তাতে কি হবে? মনে ভেবেছিল কিছু বলতে পারবো না। তোর মত মেয়ের ইচ্ছা পড়িনি, কিন্তু কাকে কি বলতে হয় তা জানা জানি। স্মৃতিভ্রম বলে আমার ভাব আছে।

—তার বুরি এই নমুনা! প্রতিবেশী একটি মেয়ে—কত চুপ-কপ

তার থাকতে পারে সে সব গেল, না খোঁজ না খবর, শুধুই নিশ্চয় করা—সরো দিদি তো তাকে জানেনই না, তবে কেন এ সব বলছেন?

রাভা মাসী বললেন—তা সত্যি কতটুকুই বা ওকে জানা আছে! তবে হাব-ভাব ভালো না বলেই হয়তো সরো বলেছে।

সরো দিদি তাঁর বিশাল দেহ নোড়া দিয়ে বললেন : প্রায়ই তো কত লোকজন আসে দেখি—আরো কত কি দেখি—কিছুই দৃষ্টি এড়ায় না—বোঝা যায়—বুঝলে ছোট গিল্মি।

বাধা দিলেন রাভা মাসী : আরে দেখো দেখো—ঐ যে মেয়েটা যাচ্ছে।

ছোট বৌরাণী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন—ও বি, ডাক তো, ঐ যে দিদিমণি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে।

সরো দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী আরো ভালো ভাবে বললেন কিছু রসাল ও তীব্র ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা।

—এসো অলকা, এসো—ছোট বৌরাণী অভ্যর্থনা জানালেন।

অলকা নবাগতা, সঙ্কুচিত—বিশেষ করে এই বয়ঃকোষ্ঠী নারীদের মাঝে অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে বললেন : আমাকে ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, তোমার সম্পর্কে আমরা কথা বলি—এঁদের সকলের জানান ইচ্ছা তুমি কি কর, কেনই বা একা থাক। ছোট বৌরাণী বললেন।

—ওঃ, একা থাকি—কেউ নেই বলে। দিদি আছেন তাঁর সংসারে, অবধা ব্যয়ের বোঝা বাড়তে চান না আমায় রেখে। বাবা মারা গেলেন—কাজেই একা না থেকে কি করবো বলুন?

—ওঃ, বেচার! কি কর ভাই তুমি?

—সেদিন তো বলেছি, বি-এ ক্লাসে পড়ি, সকালে পড়াই, বিকেলে সংবাদপত্রের অফিসে কাজ করি।

—এত কর কি করে অলকা? সহ্যহুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে ছোট বৌরাণীর।

বুধ হেসে অলকা বললে : না করে কি করবো বলুন? বেঁচে থাকতে হবে। বাবার ইচ্ছা ছিল ভালো করে পড়াশোনা করি, সেটার চেষ্টা করা আমার কর্তব্য—তাই এ সব না করে উপায় কি?

—তা না হয় হলো বাছা—কিন্তু ঐ লোকগুলো কে? তোমার সোমস্ত বয়স—এ সব বাছা—চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণীর জিজ্ঞাসা বিব উৎসর্গ করলো।

লজ্জিতা ছোট বৌরাণী বললেন—না ভাই শোনো, ঐ যে মাঝে-মাঝে বাঁরা আসেন—তাঁদের কথাই বলছেন ওঁরা।

অপমানিতা লজ্জিতা অলকার বৃদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—দিদির ছেলে অজিত আসে মাঝে-মাঝে, কাকামণির ছেলে নিখিলও আসে—খুব কম। আর যদি অফিসে খুব জরুরী প্রয়োজন হয় তাহলে কেউ সংবাদ আনেন—কিন্তু তা তো অত্যন্ত কম। এরাও আসে কম—আজুলে গোণা যায়, কিন্তু—

নরম কণ্ঠে বৌরাণী বললেন—না ভাই, কিছু মনে করো না—মাছের কোতুলক বজ্র ভালো আর বজ্র ধারণা জিনিস—।—আচ্ছা তুমি এখন এসো—রবিবার তোমার ছুটা থাকে, এই রবিবার তুমি নিশ্চয় আমার কাছে আসছো—হুঁজনে একসঙ্গে খাবো—কেমন?

ছোট হাত ছুঁটি যুক্ত করে বিনীত নমস্কার করে অলকা চলে গেল। বয়সীদের ঐশ্বর্য্যিক সভায় তখন একটা বহুপাত হয়ে গেছে।

বৌরানীর চোখে তখনও ভাসছে—অপমানিতা লজ্জিতা বিনীতা  
অলকার মুখছবি—আর বার বার মনে হলো—

অপমানিতা জান না তুমি নিজে

মাধুরী এলো কী সে

সরম ভরা সভার মাঝখানে—

## যুগাবতার

শ্রীমতী যান্না দেবী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্কে এ-পর্ষান্ত বহুবলী প্রবন্ধ, জীবনী, আলোচনা ইত্যাদি রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের যতগুলি আমি দেখিয়াছি সে-সকলের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য ও তাহার সার্থকতা সঙ্কে ঠিক পথে মূল বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার চেষ্টা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যাহারা এ বিষয়ে লিখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানী ব্যক্তি, তাঁহাদের ভুল ধোঁধান বা তাঁহাদের জ্ঞানের অল্পতা নির্ণয় আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার মনে হয়, একটি বিরাট জিনিষকে প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি অনুসারে বিভিন্ন দিক দিয়া দেখে, উপলব্ধি করে। প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও অমুদৃতিরও পার্থক্য আছে এবং সেই কারণেই সেই বিরাটের সঙ্কে যত বেশী আলোচনা হয় ততই মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পায়, উপলব্ধির চেষ্টা অগ্রসর হয়। তাই আজ আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই বিরাটকে দেখিবার চেষ্টার অগ্রসর হইয়াছি।

যুগাবতার বা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কেন, তাহা আর এক মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—“যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত গ্লানির্ভবতি”—শুধু তখনই ভগবানকে আসিতে হয় ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া সংস্থাপিত করিতে, আর বাহ্যার ধর্ম্ম পালন না করিয়া ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করার পাশে লিপ্ত, সেই দুঃস্থকারীদের ধ্বংসের জন্ত। ইহার পর প্রশ্ন ওঠে—কোন ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিতে ভগবানকে মর্ত্যে নামিয়া আসিতে হয়? যে ধর্ম্মে অবতার নাই সে ধর্ম্মে কি কখনও গ্লানি দেখা দেয় নাই এবং যে ধর্ম্মে যত বেশী অবতার সে ধর্ম্মে তত গ্লানি ঘটিয়াছে? কিন্তু তাহা নহে, কারণ, সকল ধর্ম্মের মধ্যে অবতারের কথা নাই, কিন্তু গ্লানি সকল ধর্ম্মেই ছিল এবং আছে। তবে এ কোন্ ধর্ম্ম? এ ধর্ম্মের রূপ কি? আমার মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তরটিও ভগবান সরল ভাষাতেই দিয়াছেন গীতায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানকে ধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিতেছেন। এ ধর্ম্ম পালন করিতে হইলে মুক্তকণ্ঠ বা শিখা ধারণ কিছুই করিতে হয় না কিংবা জর্জনের জল মাথায় দিয়া গির্জায়ও যািতে হয় না। আর কেহ নমাজ পড়িতে গেলে কোন্ ব্যয়ের নমাজে কয় বার উবু হইয়া বসিতে হইবে বা কয় বার গাটু গাড়িতে হইবে কিংবা কোন্ দেবতার পূজার কোন ফুল প্রয়োজন আর কোন দেবীর উপাসনার যতী বাজাইতে হয় কি কীসর বাজাইতে হয়, সে-সকলে বিশদ ভাবে জান লাভ

করিয়া বহাবধ নিভুল ভাবে করিলেও এ ধর্ম্ম পালন করা হয় না।

তবে এ ধর্ম্ম কিরূপ? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—আপনার কর্তব্যই আপনার ধর্ম্ম এবং তাহা পালনই ধর্ম্ম পালন। কিন্তু আমার কর্তব্য কি, তাহা জানিবার উপায় কি? আপনার জন্ত অর্থ উপার্জন করা, না পরের জন্ত প্রাণ দান—কেনিটি আমার কর্তব্য হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দেখিতে হইবে আমি কে? আমি প্রথমে একটি জীব, অতএব আমার ধর্ম্ম জীবের ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্ম আত্মরক্ষা। তাহার পরেই আমি শুধু জীব নহি, জীবের মধ্যে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সবই আছে। কীটের ধর্ম্ম কীটধে, পশুর পতঙ্গে—ভেমনি আমি জীবের মধ্যে মানব জাতি, আমার ধর্ম্ম মানবধ। অল্প সকল জীবের সঙ্গে মানুষের বিশেষরূপে পার্থক্য আছে। মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানে, তাহার কারণ মানুষের অত্যন্ত জীবের অপেক্ষা বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি আছে আর আছে স্বদয়। এই স্বদয় জিনিষটিই মানুষকে অনেক উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে। যে মানব যত স্বদয়কে প্রচারিত করিয়াছে সে ততই উন্নতি লাভ করিয়াছে, তত মহৎ হইয়াছে। মানব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে প্রত্যেক মানবের স্বদয়কে বিস্তৃত করিতে হইবে। স্বদয়কে সঙ্কুচিত ও নিষ্ক্রিয়, শক্তিহীন করিলেই মানুষ আর মানুষ থাকিবে না।

—মনো মিত্র প্রহীত



• নিখিল এসিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এক তৃতীয় স্থান অধিকারীদের এরা তিন জন মাল্যদান করেছেন।

মানুষের প্রথম কর্তব্য আত্মরক্ষা!। সেই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাহাকে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত এই সমাজকে রক্ষা করিতে হয়। নিজের প্রতি যেমন কর্তব্য আছে, তাহার পর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, মাতা, পিতা ইত্যাদি আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি কর্তব্য আছে, তেমন সমাজের প্রতি কর্তব্যও মানবের ধর্ম। প্রত্যেক মানুষই অপর মানুষের সুখ-সুবিধা, জীবন-মরণের জন্ত দায়ী। যত দিন মানুষ সমাজের প্রতি এই দায়িত্ব পালন করে তত দিন পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে ক্ষমতার তারতম্য আছে, আর আছে কয়েকটি রিপু, তার মধ্যে লোভ রিপুটিই প্রবল। মানুষের এই লোভ তাহাকে সর্বদাষ্ট অজ্ঞাতের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে যদি এই লোভকে সন্তুষ্ট করা না হয়, তাহা হইলে সে ক্রমেই প্রবল হইয়া মানুষকে প্রকৃত হিতের দিকে অন্ধ করিয়া ফেলে, তার মানবত্বের সারবস্তু হ্রাস তখন শক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন সেই লোভোন্মত্ত শক্তিমান ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দুর্বল ও অক্ষমদের প্রতি কর্তব্য ত্যাগ করে, তখনই ধর্মে গ্লানি জন্মায়। সেই হ্রাসহীন, স্বধর্মচ্যুত দানবেরা দুর্বলদের ক্রমে আরও দুর্বল করিয়া অক্ষমতার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আপনি অধিকতর সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লয় তাহাদিগকেই শোষণ করিয়া। এইরূপে ক্রমে এই লোভীদের ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা সংখ্যাগুরু হইয়াও মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশকেই শোষণ ও হর্দশাগ্রস্ত করিতে থাকে। আর লোভীদের ঐর্ষ্যের কোন পরিমাপ থাকে না, তাহাদের ভাণ্ডারে সম্পদ ধরে না।

এই নিদারুণ অসামঞ্জস্য ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে ভীর্ণ করিয়া আনে। মানব-সমাজের মধ্যে আনে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা। দিকে দিকে অশান্তির ধুম পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, মাঝে-মাঝে বিপ্লবের আগুনের শিখা চমকিয়া উঠিতে থাকে। মাতা ধরিত্রী ব্যথিত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ সঙ্কটের মহা মুহূর্তেই প্রয়োজন হয় ভগবানের আবির্ভাবের। তখনই তিনি আসেন ধর্মের এই গ্লানি দূর করিয়া মানব-সমাজকে আবার স্বধর্মে সংস্থাপন করিতে আর বাহারা ধর্মে গ্লানি আনিয়াছে, সেই স্বধর্মচ্যুত দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংস করিতে।

ঈশ্বরামকুষ্মদেবকে সকলেই মহাপুরুষ ও যুগাবতার, বলিয়াই স্বীকার করেন। তাহার আবির্ভাবের কাল এখন হইতে এক শতাব্দীর কিছু বেশী। সে সময়ে ঠিক এতখানি না প্রকাশ হইলেও, বর্তমান সঙ্কটময় যুগের আগমনবার্তা তখনই অল্প অল্প অনুভূত হইতেছিল। বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এই মহা সঙ্কটের জন্ত সতর্কতার প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু লোভের কাছে এ সতর্কতার কোন মূল্য নাই। তাই প্রয়োজন হইল যুগাবতারের।

ঈশ্বরামকুষ্মদেব সকলকে স্তনাইলেন—মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। ধর্ম অর্থ কিছুই কোন মানুষকে অপর মানুষ হইতে পৃথক করিতে পারে না। প্রত্যেকেই সেই একই ভগবানের অংশ, একই স্থান হইতে প্রত্যেকের আগমন ও একই ভাবে বিলয়। কোন মানুষকেই ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা যায় না, সকলকেই করিতে হয় শ্রদ্ধা। একে অপরকে

সাধ্য নহে। দয়া করিও না, তোমার মতন তাহার মধ্যেও নারায়ণ বাস করেন তাই প্রত্যেককে শ্রদ্ধা কর আর সেবা কর। হীন পতিত যে, সেও সেই মহাশক্তির অংশ, তাহাকে তোমার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবার দ্বারায় তাহার আপন অবস্থা প্রদান কর, স্বমহাদান প্রতিষ্ঠিত কর, সেও মানব-ধর্ম পালন করিতে পারিবে। এই তোমার ধর্ম, এই মানব-ঐতিহ্যই মানবের স্বধর্ম। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রীষ্টান সকল মানবের এই একই স্বধর্ম—এই সত্যই তিনি নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করিয়া জগতে দান করিয়া গেলেন।

তাঁহার সর্বধর্ম-সম্বন্ধ বা অস্ত সমস্ত উপদেশের মধ্যে এই একটি কথাই বার বার ধনিয়া উঠিয়াছে—“ভরে, মানুষ কি কম রে? তুই তাকে দয়া করবি কি, সেবা!—সেবা করিয়া ধর্ম হ’!” তাই তিনি দীন কাঙালীর উচ্ছিন্ন পরিধার করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহারা হীন নহে, তাহাদের মধ্যেও সেই একই শক্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তাঁর এই বাণী, এই পরম সত্য জগতকে স্তনাইতে হইবে, উহা ভারতের এক ক্ষুদ্রতম গ্রামে আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না, অথচ মহাপুরুষের স্থিতিকাল বহুক্ষণ স্থায়ী হয় না। লগ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, এদিকে ধরণী ব্যাকুল হইয়া খব-খব কম্পমানা, দিকে দিকে আগুনের আভাস দেখা যাইতেছে, কখন অগ্নিয়া উঠিয়া সৃষ্টি ধ্বংস করিয়া দেয়। তাই তিনি ব্যাকুল ভাবে আহ্বান করিলেন—“ভরে তোরা কে কোথায় আছিসু আর না রে, আর যে সময় নাই।” সেই আহ্বানে আসিলেন বাহারা, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শক্তিধর নরেন্দ্রনাথ। তিনি সেই মহাসত্য প্রচারের ভার আপন মস্তকে ধারণ করিলেন। নারায়ণের পাকজন্ত তপস্যায় অর্জুন করিয়া তিনি জগতে বাহির হইলেন এই মহাসত্য বিশ্ববাসীকে স্তনাইতে। দুঃখী, হীন, পতিত, উৎপীড়িত মানবগোষ্ঠীকে তিনি মহা শত্রুগণে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“ভয় নাই, ওঠ, জাগ্রত হও। এই ভগবানের রাক্ষসে পক্ষপাতিত্ব নাই, কেহ হীন নাই, কেহ ক্ষুদ্র নাই! ক্ষমতা অর্জন কর। নিজেকে ছোট মনে করিও না। চাহিয়া দেখ, সকলের মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করিতেছে, অতএব কিসে তুমি হীন?” আর লোভীদের সেই মহাশত্রুর গর্জনে স্তনাইলেন সতর্কবাণী,—“ঐ দেখ, দিকে দিকে অশান্তির আগুনের আভা, কান পাতিয়া শোন ক্রন্দনের আগমনের বথধ্বনি। এখনও সাবধান হও। বাহাদের হীন পদদলিত করিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের মধ্য হইতেই তোমার ধ্বংসের বহুধনও উদ্ভূত হইবে, তাহারই আয়োজন দিকে দিকে লক্ষিত হইতেছে। এই বেলা সংযত হও, বিলাইয়া দাও পুঞ্জীভূত ঐর্ষ্যা, নিজেকে মিশাইয়া দাও এই সন্ত নরনারায়ণের মধ্যে—বাহাদের তুমি হীন বলিয়া ঘৃণা কর আর বাহাদের শোণিত হইতে তোমার ঐর্ষ্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, তাহাদেরই এক জন হইয়া তুমি বাঁচিতে পার, তাহা না হইলে তোমার পরিত্রাণ নাই।”

ইহাই ঈশ্বরামকুষ্মদেবের একমাত্র বাণী। আজিকার এই বিশ্বব্যাপী অগ্নির মধ্য হইতে সেই মঙ্গল-শত্রুর ধ্বনি কানে বাজিয়া উঠিতেছে! উৎপীড়িতের নারায়ণ এ আগিয়া উঠিয়া পাড়াইয়াছেন। আর রক্ষা নাই! তাই আজ লোভী দানবকুল ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের ঐর্ষ্যের ভাণ্ডার রক্ষা করিতে, আরও সঞ্চয় করিতে বিপুল আগ্রহে ছুটিতেছে। কি করিয়া এই জাগ্রত

কিন্তু বলের দ্বারা আবার ধ্বংস করিবে, সেই চেষ্টায় দিশাহারা হইয়া পথের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু বুধা এ সব, সময় থাকিতে সাবধান হও নাই, আজ তোমাদের ধ্বংস হইতে পরিভ্রাণের কোন পথই নাই! যাহাদের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী অত্যাচার চালাইয়াছে আজ তাহাদের অন্তরস্থ নারায়ণ জাগিয়াছেন, কে তোমায় রক্ষা করিবে তাঁহার সমুখিত মহাচক্রের হাত হইতে?

## অ্যাটম বোমার দেশে

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

অমিতা দস্ত-মজুমদার

ওয়াশিংটন যাত্রা।

প্রায় ১টা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ সহযাত্রীদের মধ্যে একটা বাস্তবতার সাদৃশ্য ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়িতে দেখি সাড়ে ৪টা বেজেছে। ভাবলাম রাত ২টার আমাদের দামাস্কাস পৌছবার কথা ছিল, তা তো পৌছলাম না। তা হলে বোধ হয় আমরা সময় মতন রেতে পারছি না। যা হোক, সবাই নামবার জন্য তৈরী হচ্ছে দেখে আমিও ঠিকঠাক হয়ে বসলাম। আলোর অন্ধরে আবার সেই নির্দেশ ফুটে উঠলো—Fasten your seat belts. No smoking. আমরা এবার দামাস্কাসে নামছি। নামবার সময়ে প্রত্যেক বাইরেই লক্ষ্য করছি যে, এরোপ্লেনটা কেমন একটা বাঁকির মত আওরাজ করে, মনে হয় যেন কোথাও হাওয়া ভরা ছিল, সেই হাওয়া কোনো কীক দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছে বীরে বীরে। নামবার পরে কানে তালা-লাগা আরেকটা লক্ষণীয় ব্যাপার। প্রথম দিন যত বার নেমেছি, দেখেছি যে কানে-তালা লেগে গেছে। দ্বিতীয় দিন সেটা কমে গেল, বোধ হয় সঙ্গে গেল। শুনলাম ওটা blood pressure এর উপর বায়ুর চাপের আকস্মিক পরিবর্তনের দৃশ্য হয়।

দামাস্কাস! সেই আরব্যোপকাসের দামাস্কাস নগর। সহরটা দেখতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু রাত দুপুরে তো আর তা সম্ভব নয়। রাত দুপুর বলছি এই জন্ত যে, যদিও আমার ঘড়িতে তখন ৪টা বেজে গেছে, কিন্তু এ জায়গার সময় তখন দেড়টা মাত্র। যা হোক, সব যাত্রীরা প্লেন থেকে নেমে চলেছি চা খেতে। যেতে যেতে পাশ থেকে হঠাৎ এক জন ইংরাজীতে বললেন, “আপনি কি বাঙালী?” আমি বললাম, “হ্যাঁ”। তখন তিনিও বাংলায় কথা বলতে লাগলেন। তিনি চটগ্রামবাসী মুসলমান; কি একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারের অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি-স্বরূপ যাচ্ছেন আমেরিকায়। তিনি নিজের পরিচয় দিলেন “পাকিস্তানী” বলে, কিন্তু বিদেশী বলে ভাবতে পারলাম না মোটেই; বিশেষতঃ যখন অতগুলো বিদেশী মানুষের মাঝে তিনি আমার মাতৃভাষার কথা কইতে লাগলেন। এরোপ্লেনের প্রাঙ্গণ স্বজালাকিত; কয়েকটা পাকা ইমারতের মাঝখানে দিয়ে হেঁটে গিয়ে আমরা একটা আলোকিত কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে গোটা কয়েক ঘণ্টার টেবিল সাজানো রয়েছে। যে যেখানে পারেন বসে গেলেন। আমি যে

টেবিলে বসলাম তাতে সেই বাঙালী ভ্রমলোক, আর এক পশ্চিম-ভারতীয় মুসলমান এবং এক ইংরাজ ভ্রমলোক, এই ক’জন ছিলাম। পাঞ্জাবী ভ্রমলোকটি বললেন, “এই শেষ ভাল চা খাওয়া। এর পর আর কোথাও ভাল চা খেতে পাবেন না। দার্জিলিং চায়ের সৌরভ আর বেশী দূর পশ্চিমে পৌছয় না।” বাক, চা খেতে খেতে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখি ঘড়িতে দেড়টা বেজেছে। সঙ্গে ভ্রমলোকরা বললেন—“এখানে বাস্তবিকই এখন রাতে দেড়টা, ঘড়ি বন্ধ নয়। আমরা কীক দিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় বাড়তি পেয়ে গিয়েছি।” ব্যাপারটা অবশ্য কাগজে-কলমে জানতাম আগেই, এখন প্রত্যক্ষ দেখে খুব আশ্চর্য উপভোগ করলাম। শুনলাম, দামাস্কাস সহরটি তার পুরানো রূপ অনেকটাই বজায় রেখেছে, আবার পাশ্চাত্যের ধরণের সঙ্গেও অপরিচিত নয়। ভাবছিলাম সেই গম্বুজ ও মিনারের সহরটি আকাশ থেকে দেখতে পেলো বেশ হতো। রাত্রির অন্ধকারে তা অবশ্য দেখতে পাইনি, তবে আকাশ থেকে যা দেখছি তাও স্বপ্নপূরীর মত। এক পাহাড়ের পারের কাছে থেকেই আমরা উঠলাম; দামাস্কাস সহরের আলো পাহাড়টির কোল বেঁধে মালার মত ঝলমল করছিল; সেই পাহাড়েই আর খানিক উঁচুতে আবার সারি সারি আলো,—বোধ হয় আরেকটা সহর। তার পরে পাহাড় গেছে নেমে, তার পিছনে আরেকটা পাহাড় অন্ধকারে মাথা উঁচু করে উঠেছে;—দুই পাহাড়ের ঝঞ্জের মধ্যে আবার আলোর মালা,—এ বোধ হয় আরেকটি সহর। সম্ভবতঃ তিন ধাপে সাজানো এই সহরগুলি একই দামাস্কাস সহরের বিভিন্ন অংশ; আবার তা না-ও হতে পারে। নিজের মনে এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এর পর নামলাম ইস্তাম্বুলে। তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী, ইয়োবোপের মধ্যযুগের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত—কন্সট্যান্টিনোপল; তার পরে কামাল আতাতুর্কের দেশের বড় সহর। এরও নামের সঙ্গে কিছু ইস্তম্বাল জড়িত আছে। ভিতরে আমাদের ঘড়িতে তখন সাড়ে ১টা কিন্তু বাইরে তখনো ফরসা হয়নি। এরোপ্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নেমেই উঠলাম একটা বাসে। সেই বাস আমাদের নিয়ে গেল এরোপ্লেনের বাইরে সহরের মধ্যে এক হোটেল। সেখানে প্রান্তরভোজনের আয়োজন তৈরী ছিল। দামাস্কাস ও ইস্তাম্বুলের সময় একই; সুতরাং এখানেও আমাদের ঘড়ির সঙ্গে সময়ের পার্থক্য সাড়ে ৩ ঘণ্টাই। এখানে এখন ৬টা বেজেছে—প্রান্তরভোজের পক্ষে একটু বেশী সকাল বটে; কিন্তু এর পর আমাদের দিতে হবে সন্ধ্যা পাড়ি; তাই এখানে প্রান্তরভোজের আয়োজন।

প্রান্তরভোজের পরে হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। কাছেই কোথাও হল্যাং-হল্যাং করে জল আছড়ে পড়ার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমরা সবাই সেদিকে অগ্রসর হলাম; দেখলাম যে, বসফোরাসের জল হোটেলের পাথর-বাঁধানো ভিত্তিপাত্রের আছড়ে পড়ার শব্দটা হচ্ছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে জলের খেলা দেখে আমরা আবার বাসে উঠে বসলাম। এবার ভোরের আলোয় সহরটির চেহারা কিছু দেখতে পেলাম। পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাস্তার দু’পাশে ইউক্যালিপটাস গাছের মত সাদা-সাদা গাছ

সারি-সারি ঝাঁড়িয়ে। বাড়ি-ঘর ও রাস্তা বেশ ঝকঝকে ও গোছানো। অল্পক্ষণের মধ্যেই এরোডোমে পৌঁছে গেলাম। আবার বাত্মা শুরু হোলো।

এবার দিনের আলো। আকাশে রোদ বলমল করছে। পরিষ্কার দিন, মেঘমুক্ত আকাশ থেকে নীচে দেখতে পেলাম, কোথাও নীল সমুদ্র, কোথাও জমি। বহু উর্দ্ধে ছিলাম বলে সমুদ্রের বিরাট বিস্তৃতি সক্ষিপ্ত আকারে বহুক্ষণ ধরে দৃষ্টির গোচর রইল। দক্ষিণ ইরোবোশের উপবীপগুলোর উপর দিয়ে আমরা তখন যাচ্ছি। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভূমধ্য সাগরের গাঢ় নীলের সঙ্গে ক্রান্ত উপকূলের মেঘামেঘির নয়নমোহন রূপ দেখলাম।

এরোগ্লেনের একটানা দোলানোতে দূর আসে সহজেই। হঠাৎ ঘুর ভেঙে গেল; তখনলাম আমরা আলসের উপর দিয়ে যাচ্ছি। নীচে চেয়ে দেখি অপূর্ব। অনেক নীচে—যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু-নীচু পর্বত-স্তুপ একেবারে ঝাঁক বেঁধে রয়েছে—সারি বেঁধে রয়েছে বললে ভুল হয়। সে-দৃশ্যের মহিমা ও শোভা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, সে শুধু দেখেই বোঝবার। অনেকক্ষণ এই দৃশ্য উপভোগ করার পর মেঘের আবরণ এসে পৃথিবীর দৃশ্যকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল করে দিল। এর ঘণ্টা চারেক পরে, ইস্তাম্বুল ছাড়বার ১ ঘণ্টা পরে লণ্ডনের সময় বেলা দেড়টাতো আমরা লণ্ডনে নামলাম। ঘন কুয়াশার আবরণে ঢাকা লণ্ডন সহরের কিছুমাত্র আভাস উপর থেকে আমরা পাইনি। প্লেন ছিল মেঘরাশির উর্দ্ধে রোজ-নীপ্ত আকাশে। এক সময়ে সে মেঘ-সমুদ্রের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ভুব দিল একেবারে মেঘের মধ্যে। তার পর মাটির কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম এরোডোমের ঘর-দুয়ার। নামলাম বখন, তখন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা, আর কুয়াশায় এত অন্ধকার হয়ে রয়েছে চারি দিক যে, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা হয়ে এল। লণ্ডনের-যে mist-এর গল্প শুনেছি সে এই। লণ্ডন সহরে নামলাম, ঘণ্টা দুই সময় বিলাতের মাটিতে কাটালামও, কিন্তু ঐ কুয়াশা আর এরোডোমটি ছাড়া লণ্ডনের আর কিছুই দেখা হোলো না। এই এরোডোমটির নাম “ক্রয়ডন এয়ারপোর্ট।” মস্ত বড় ব্যাপার; দম্ভমের চেয়ে অনেক বড় সে কথা বলাই বাহুল্য; করাচী বন্দরের চেয়েও ঢের বেশী বড়। এখানে কয়েক বার এ-বাড়ী থেকে ও-বাড়ী আনা-গোনা করতে হোলো একটা বাসে চড়ে; একবার পাশপোর্টটাও দেখতে হোলো। শেষে একটা tea-room-এ আমাদের পৌঁছে দিল। বেশ গরম ঘণ্টা, চুকে বেশ আরাম লাগছিল। এখানে কিছু কোম্পানীর ঘরচে চা খাওয়ালাও না। দেখলাম সবাই নিজে নিজে কিনে খাচ্ছেন। এখানে ডলারও চলে না, টাকারও চলে না; আগেও সে কথা জানতাম, তাই কিছু শিলিং সংগ্রহ করে এনেছিলাম। তাই দিয়ে চা কিনে খাব ভাবছি এমন সময়ে পূর্ব-সংগৃহীত পাতিস্তানী বন্ধু এক পেয়লা চা এনে দিলেন। বহু ধন্যবাদের সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম। ইনি আপাততঃ লণ্ডনেই নেমে গেলেন, কয়েক দিন পরে আমেরিকা যাবেন। আরো অনেক ব্যক্তি এখানে নামলেন এবং অনেক নতুন ব্যক্তি উঠলেন। এবার

লণ্ডনের পর আয়ারল্যান্ডের স্থান বন্দরে নামলাম। এখানে খুব আরামের বন্দোবস্ত আছে। ক্রয়ডন এরোডোমের খালি পাখরের মেরে ট্রেনের প্রাটিকর্মের মত। আর বসতেও দিয়েছিল কাঠের বেঞ্চিতে। স্থাননে চমৎকার গরম ও আলোকোজ্জ্বল ঘর। তাতে গুরু কার্পেট পাতা ও ভালো ভালো আসবাব দিয়ে সাজানো প্রশস্ত ওয়েটিং-রুম। তার পরে প্রকাণ্ড খাবার ঘর, আলোর ও সজ্জা মনোহারী। এখানে আমাদের ডিনারের বন্দোবস্ত ছিল। আমি সারা দিন কিছুই খেতে পারিনি। ভোরে ইস্তাম্বুলে যে খাটটুকু গ্রহণ করেছিলাম, তাও ধারণ করতে পারিনি। ক্ষুধার মুখে এখানকার লঘুপাক খাতা বেশ সুস্বাদু বোধ হোলো। খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার এরোগ্লেনে উঠলাম। গত রাত্রির মত আজও আমার পাশের চেয়ারটি এই সময়ে খালি হয়ে গিয়েছিল; আমিও তাই পূর্ব রাত্রির মতই আরামে ঘুমোলাম। কয়েক ঘণ্টা ঘমানোর পরে আমরা নিউকাস্টল-এ এসে পৌঁছলাম। ঘুমের মধ্যেই কখন আমরা অ্যাটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছি। নিউকাস্টল-এও ভয়ানক শীতের দেশ। তার উপর গভীর রাত্রি—সেখানে তখন রাত প্রায় আড়াইটা। বাইরে বেরিয়ে দেখি খড়ির গুঁড়োর মত গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ মাটিতে পড়ে রয়েছে। যে সব লোকেরা বাইরে কাজ করছে তাদের মাথায় কান-ঢাকা চামড়ার টুপি, পায়ে হাঁটু অবধি চামড়ার জুতো, আর গায়ে চামড়ার কোট। আমি কলকাতা থেকে যে পোষাকে উঠেছিলাম লণ্ডনের কিছু আগে পর্যন্ত তাই পরেই ছিলাম। লণ্ডনে পৌঁছবার আগে গরম জামা আর মোজা পরে নিয়েছিলাম; ওভারকোটটা প্রত্যেক ভ্রম্যগাতেই নামবার সময়ে ব্যবহার করতে হয়েছিল। নিউকাস্টল-এ নামবার পূর্বে আমার নতুন-কেনা চামড়ার দস্তানা জোড়াও পরে নিলাম। অনেকক্ষণ আমরা একটা বড় ওয়েটিং-রুমে বসে রইলাম। সেখানে একটি অল্পবয়সী আট্টারিশ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হোলো। সে প্রথম বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছে আমেরিকায়; সেখানে শিকাগোতে ওর মাসী নানীপসী কে আছেন—তার বাচ্ছ যাচ্ছে। যদি ভালো লাগে ওখানেই কাজ কামে চুক পড়বে ও, ওয়েলশেই থেকে যাবে। বন্ধু থেকে এক বুড়ো মেম আসছিলেন; তার সঙ্গে পথে আরো দুয়েক ভ্রম্যগায় হুঁচরটে কথা বলেছি। তিনি এখন সেই মেয়েটিকে ও আমাকে কাঁক ও স্যাণ্ডুইচ খাওয়ালেন। তার পরে বসে ভাবছি কতক্ষণে আবার বাত্মা শুরু হবে; হঠাৎ সেই ঘরের দেওয়ালে সংলগ্ন লাউড্-স্পীকারে ঘোষণা শোনা গেল—“প্যান আমেরিকানের যাত্রীদের ত্রেকফাই খাবার নিয়ন্ত্রণ জানাচ্ছি; পাশেই তোলে আছে, সবাই চলে আসুন।” স্থাননেও এমান ডাইনিং হলে ও ওয়েটিং-রুমে দেওয়াল-সংলগ্ন লাউড্-স্পীকার দ্বারকং যান্ত্রিক পরে পরেই যাত্রীদের জন্ত বিভিন্ন প্রকার ঘোষণা করা হচ্ছিল শুনেছিলাম। এখন কিন্তু এই ঘোষণা শুনে পার্শ্ববর্তী হোটেল প্রান্তরালেশের নিয়ন্ত্রণ খেতে যেতে লাগে হোলো না মোটেই; কারণ এই centrally heated waiting roomটির বাইরেই জল-জমানো শৈত্য ও মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণটি ঝুঁকো বরফে আবৃত—সেটা এক-বার দরজার কাঁক দিয়ে দেখে নিয়েছিলাম। কাজেই বখন অস্ত্রাণ

গরম গৃহটির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। এরোপ্লেনের বন্ধ বায়ুতে দীর্ঘ সময় কাটানোর পরে আমি বড় অস্বস্তি বোধ করছিলাম সারা দিনই; তাই প্রযোগ পেলেই ভাল করে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে নিচ্ছিলাম। এখানেও সেই উদ্বেগে লেডেজ ক্রমে গেলাম। গিয়ে দেখি গ্যাণ্ডারের (এই বন্দরের নাম) লেডেজ ক্রমটি বেশ বড় একটি মহল। অনেকগুলো বাথরুম ও হাত-মুখ ধোবার বেসিন তো আছেই; তাছাড়া দেওয়াল-জোড়া আয়না, এ-কোণে ও-কোণে হাত-পা ছড়িয়ে শোবার মত বড় বড় ডিভানও রয়েছে। সেখানে বিশ্রাম করবার সময়ে ইচ্ছা করলে চারি দিকে পর্দা ঘিরে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে দেখলাম। সহগাত্রীরা সবাই আহার সেরে এলেন; আবার প্লেনের কোটরে গিয়ে বসলাম। অসীম শৃঙ্খল নিশ্চিন্ত অন্ধকার, তারি ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা, নীচে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গমালা, আর চার পাশে তীব্র হিমবায়ু। কিন্তু আমরা বেশ আরামেই আছি; পোলানিতে খুম আসছে; শরৎ-ঘরের উপযুক্ত স্নান আলো জ্বলছে, ঈষৎ কোটরে পশমী কবল গলা অবধি টেনে দিয়ে ঝিমোচ্ছি। ঘণ্টা চারেক পরে নিউ ইয়র্কের উপর পৌঁছলাম। বাইরে তখন আলো হয়ে উঠেছে, নীতের প্রভাতের কুয়াশা-স্নান আলো। তারি মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্কের আকাশভেদী বাড়িগুলোর কিছু-কিছু দৃষ্টিগোচর হলো। তার পরেই একটা মুহূর্তকালীন টের পেলাম মাইতে নেমেছি। এইখানে এই বড় প্লেনের যাত্রা শেষ হলো! প্রথমটা আমাদের প্লেনের ভিতর বসিয়ে রাখা হলো। মেডিক্যাল অফিসার এসে আমাদের প্রত্যেকের টিকা নেবার সার্টিফিকেট দেখে গেলে পরে নামবার অনুমতি পেলাম। আমাদের সঙ্গে যা ছোট জিনিস ছিল তা সঙ্গে নিয়ে নামতে হবে। দেশে হলে কুলী ডাকতাম, কিন্তু এখানে কুলী ডাকতে কাউকেই দেখলাম না। কুলীর মত চেহারার কাউকে দেখতেও পেলাম না। যাক, নামবার আগে থেকেই এক চিন্তা ছিল যে, এতক্ষণ তো কোম্পানীর লোকেরাই আমাদের তত্ত্বাবধান করেছে; এব পরে কাষ্টমসের পরীক্ষার পর এরা যখন আমাদের ছুটি দেবে তখন স্বাধীন হয়ে যাব কোথায়। আমার শেষ গন্তব্য ওয়াশিংটন। এরোপ্লেনের টিকিট সে পর্যন্তই; কিন্তু এই প্লেন ওয়াশিংটন যাবে না; অল্প প্লেনে যেতে হবে এবং সে প্লেন কয়েক ঘণ্টা পরে ছাড়বে অপর এরোপ্লেন থেকে। এ খবর আগেই জানতাম; সেই জন্য আমি কলকাতা থেকেই ডাঃ দত্ত-মজুমদারকে ফোন করে জানিয়েছিলাম নিউ ইয়র্কে এসে আমাকে নিয়ে যেতে। ভাবনা হচ্ছিল সেই বৈতরণ্যে বসাসময়ে ওঁর কাছে পৌঁছেছে কি না। যা হোক, দলের সঙ্গে সঙ্গে কাষ্টমসের পরীক্ষা গৃহে গিয়ে বসলাম। সেখানে গিয়ে বসবার মিনিট পাঁচেক পরেই এক জন আমার নাম বিকৃত ভাবে উচ্চারণ করল; আমি উঠে দাঁড়ালে সেই মেয়েটি ছোট এক খণ্ড কাগজ আমার দিল; দেখলাম কর্তা লিখেছেন—বাইরে অপেক্ষা করছেন, কাষ্টমস্-এর ঘরের ভিতর আসবার নিয়ম নেই। পড়ে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, তাহলে এই বিরাট নগরে একলা চলার দায় আমার হইল না।

তার পর আরম্ভ হলো কাষ্টমস্-এর পরীক্ষা। ইতিপূর্বেই

আমাদের পাশপোর্টগুলো ওরা নিয়েছিল, এবং যেতকার বাত্রীদের সেগুলো ফেরৎ দিয়ে আমার ও বর্গা থেকে আগত দুই ভ্রমস্রোতের পাশপোর্ট রেখে দিয়েছিল। খানিক পরে আমাদের তিন জনকে ডাকলো। যে ডাকলো তাকে অনুসরণ করে আমরা অল্প একটা কক্ষে গেলাম; দেখলাম সেখানে মুখে থার্মোমিটার নিয়ে অনেকে বসে আছেন। আমাদের তিন জনের মুখেও তিনটি থার্মোমিটার দেওয়া হলো। তার পর আবার টিক-নেওয়ার সার্টিফিকেটখানা দেখাতে হলো। তখন আবার আগে যেখানে বসেছিলাম সেখানে ফিরে এসে বসলাম। এবার যেতে হবে অল্প দিকের দুরার দিয়ে। প্রথমে কলকাতার আমেরিকান কনসাল্টে থেকে যে সার্টিফিকেট দিয়েছিল সেখানা দিতে হলো,—সে মস্ত একতাপা কাগজ। তার পর সেখানকার কাউন্টার থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে এক জন গম্ভীর চেহারার অফিসারের সামনে বসতে হলো। তিনি ঐ সব কাগজপত্র ও পাশপোর্টখানা মিলিয়ে দেখে পোর্টকার্ড সাইজের একটি হলদে রঙের কার্ড দিলেন। পাশপোর্টটাও দিলেন, কিন্তু অনেকগুলো টাকার বদলে ও অনেক ঘোরাঘুরি করে কলকাতার American Consulate থেকে সংগ্রহ-করা কাগজের তাড়াটি রেখে দিলেন। তার পর তিনি একটা দরজা দেখিয়ে দিলেন। নিজের তল্লিতলা বয়ে সেই দরজার কাছে গিয়া দেখলাম যে, দরজার মুখ আটকে একটি ঢাকাওয়ালা টেবিল নিয়ে এক জন দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আট ডলার দিতে হলো, একে বলে Head Tax; তখন সে একটি রসিদ দিয়ে অতি বিনীত ভাবে পথ থেকে টেবিল সরিয়ে নিয়ে আমাকে বেরিয়ে আসতে দিল। এর পরে মাল-পরীক্ষা। লম্বা একটা ঘরের এক দিকের দেওয়াল লম্বালম্বি জুড়ে দীর্ঘ কাউন্টার, তার উপর বাত্রীদের মাল—যা এরোপ্লেনের নীচেকার hold-এ ছিল—সাজানো রয়েছে। নিজেরটি চিনে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়লাম। কাউন্টারের অপর পার্শ্ববর্তী এক জন লোককে মালের রসিদখানা দিতে সে বলল “অপেক্ষা কর, নাম তাকা হবে।” অপেক্ষা করতে লাগলাম; পাশেই এক মেমের মাল-পরীক্ষার ব্যাপারটা দেখলাম। তিনি বিলত থেকে আসছেন; কয়েকটি আপেল ও কিছু মাংসের পাই ছিল তাঁর বাস্কে। সেগুলো ওরা বের করে দিল; বাইরের খাজদ্রব্য দেশের ভিতর আনিবার নিয়ম নেই জাতীয় স্বাধীনতার খাতিরে। ‘আমারও ছিল কিছু বে-আইনী জিনিস,—কিছু ভাজা মসলা, লেবুর আচার, জোয়ানের বড়ী; মনে মনে এ সবের আশা ছেড়ে দিলাম। একটু পরে স্তব্ধ হলো আমার মাল-পরীক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম, “বড় ব্যাগটা খুলব না কি?” সে বলল, “না, ছোটটার ভিতর দেখতে চাই। তাতেই ছিল আমার মশলা ইত্যাদি, শাল ও দড়ানা ছিল তার উপর চাপা দেওয়া। ব্যাগের মুখটি খুললাম—সেই মুহূর্তে লোকটির নজর পড়ল কালো কাপড়ের খলেতে আমার সেতারটির উপর। বলল ওটার চেহারাটা একবার দেখতে চাই। ধীরে ধীরে শব্দ বাধন ধুলে খলের মুখ উন্মোচন করলাম; ততক্ষণে লোকটির মন ব্যাগ থেকে সরে এসেছে, আমার রসনা-স্বস্তিকর জিনিসগুলোও বেঁচে গেল। পরীক্ষার পালা শেষ হলে এক জন নিরো পোর্টার তার ঠোঁটগাফিতে

## মাসিক বহুমতী

৮৮

আমার মালগুলো তুলে নিল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর ডোরো-ক্রমে পৌঁছলাম—বন্ধানে উনি অপেক্ষা করছিলেন। এই ঘরটারও মাঝে গোল কাউন্টার ও চারি দিকের দেওয়ালেই কাউন্টারে অনেক লোক বসে কাজ করছেন ও অনেক যাত্রী বা সস্তাব্য যাত্রীগণ সেখানে নানা কাজে ভীড় করে রয়েছেন। আমাদেরও কাজ ছিল সেখানে। ওয়াশিংটন বাবার plane কখন ছাড়ে সেই সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া হোলো। জানা গেল ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। এই ৩।৪ ঘণ্টা শুধু শুধু অপেক্ষা করার মত শরীরের অবস্থা তখন নয়। আর প্রায় ৫৬ ঘণ্টা এরোগেনে কাটাবার পরে আবার সেই অস্বস্তিকর আবহাওয়ার বন্ধ অবস্থায় শূন্যমার্গে ভ্রমণ করতে দেখ-মন চাইছিল না। ঠিক হোলো, এখন এখানে এরোগেনের টিকিট refund করার ব্যবস্থা করে আমরা দিনের বেলা নিউ ইয়র্ক স্নানাহার বিশ্রাম করে বিকেল বেলা ট্রেনে ওয়াশিংটন যাব। টিকিটের ব্যাপারে স্বভাবতঃই অনেকটা সময় কাটিলো। তার পর আমরা ট্যাক্সি করে সহরের এক হোটেল অভিমুখে চললাম। পথে নিউ ইয়র্ক সহরের যেটুকু নমুনা দেখলাম তাতেই তাক লেগে যায়। তার পর সহরের প্রধান অংশে “ট্যাক্সি হোটেল” আমরা গিয়ে উঠলাম। এখানে উনি এসে উঠেছেন ও আমার জন্ত অপেক্ষায় দুই রাত্রি কাটিয়েছেন। আজ সকালে এখানে আর কিয়বেন না এই হিসাব করেই এখানকার দেনাপত্র চুকিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে ঘর তখন পর্যন্ত খালিই ছিল, আমরা সে ঘরের চাবী নিয়ে লিফটে চড়লাম। এই বাড়িটি কুড়ি তলা। আমরা যে ঘরটি পেলাম সেটি সপ্তদশতম তলায়। লিফট (এ দেশে বলে এলিভেটর) বিদ্যুৎ, বেগে এই ১৭ তলা উঠে দাঁড়াল। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল হোটেলের ভূত্ব বা “বেলবয়”। কোরিডর কয়েকটি পেরিয়ে যেতে যেতে উনি এক জায়গায় জানলা দিয়ে আমাদের বাইরের দৃশ্য দেখালেন—উঁচু উঁচু স্বাইজেরপারে সমাকীর্ণ সহরের আকাশ।

হোটেলের ঘরে মার্বেল-বাঁধানো স্নানাগার, গরম ও ঠাণ্ডা জলের শাওয়ার ও টবের ব্যবস্থা। হুঁদিন পরে স্নানটি খুব উপভোগ্য হোলো। তার পর আশা সঙ্গ্রহের প্রয়োজন। বাজালীর নাড়ী অল্প বিহনে কাতর হয়ে উঠেছিল। অল্পের ব্যবস্থাও হয় শুনলাম। সিংহলী হোটেল একটি কাছেই আছে, সেখানে গেলাম। সন্ধ্যার প্রাচ্য আশ্বাবপত্রে সাজানো খাবার-স্বরটি। সেখানে ভাতের সঙ্গে ডাল তরকারী মাংস ইত্যাদি বেশ ভৃগ্নিকর খাদ্য পরিবেশন করলে। শেষে মিষ্ট তিন-চার রকম ছিল, তার মধ্যে আইসক্রীমই আমার পছন্দ হোলো। বলতে ভুলে গিয়েছি যে, পানীয় জলও ছিল বরফ-শীতল। আমার স্নানার চেয়ে পিপাসার উদ্বেগই বেশী

হয়েছিল, প্রচুর বরফ-জল পান করেছিলাম, তার পর আইসক্রীম খেলাম। এ সব দেশে প্রাত্যহিক আহািরের পর কফি বা কখনও কখনও চা খাওয়ার রীতি আছে। আমি তাতে অনভ্যস্ত, সুতরাং শীতল জল ও আইসক্রীমই আমার শেষ খাওয়া। তার পর যখন হোটেল ফিরব বলে রাস্তায় নামলাম তখন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বৃষ্টির কণার সঙ্গে বরফের কণাও দেখা যাচ্ছে। বাইরে এই বরফকণা-মিশ্রিত বৃষ্টি এবং ভিতরে বরফ-জল ও আইসক্রীম; ভিতরে ও বাহিরের এই যুগপৎ আক্রমণে আমি বাস্তবিকই কঁপতে লাগলাম। হোটেলের Revolving gate-এ যখন পৌঁছেছি তখন শীতাতিক্রমে আমার দাঁতে-দাঁতে লেগে যাচ্ছে। উষ্ণ লবীতে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত আরাম বোধ করলাম।

ঘণ্টা-দেড়েক বিশ্রাম করার পর ওয়াশিংটনগামী ট্রেন ধরবার জন্ত ট্রেনে গেলাম। এই ট্রেনটির নাম পেনসিলভ্যানিয়া ট্রেন। সহরের মাঝখানে অর্ধ সাধারণ রাস্তা-ঘাটের নীচে মাটির তলায় সমস্ত ট্রেনটি। একটি ঢালু পথ বেয়ে ট্যাক্সি নেমে গেলো, প্রবেশ করলাম পাতালে। সে এক পাতালপুরী—ট্রেনের ভিতরে গিয়ে দেখে অবাক হলাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে কুলির জন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হোলো। বাইরে অনেক কুলি ছিল কিন্তু তারা ট্রেনের ভিতরে যেতে পারে না। ভিতরের কুলিরা ঠাণ্ডা-গাড়ী করে মাল নিয়ে যায়। কাচের আবরণের বাইরে মুক্ত গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ভিতরে কুলিরা ভিনিসপত্র ঠোলে আনাগোনা করছে। কিন্তু ঠাণ্ডাগাড়ীর অপ্রতুলতার জন্ত অনেকক্ষণ কেউ এল না। বাইরের শীতল বায়ু অনেকক্ষণ ভোগ করার পর এক জন এল আমাদের মোট বেয়ে নিয়ে যেতে; তখন ট্রেনের উষ্ণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম যদিও পাতালে প্রবেশ করেছি, তবু এ জায়গা অন্ধকারও নয় হিমও নয়। এত চমৎকার সাজানো আলো-স্বচ্ছল দোকানপাট—একেবারে মস্ত বাজার! ট্রেনের খাওয়ার দোকান, অফিস ইত্যাদি তো আছেই, তা ছাড়াও বহু দোকানপাট। ট্রেন চলে আরো একতলা নীচে দিয়ে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে স্ট্যাটকম্প পেলাম, টিকিট প্রবেশ-পথেই পাওয়া গেল। ট্রেন এলে চড়ে বসলাম।

খানিকক্ষণ পর্যন্ত ট্রেন স্ট্রাডের মধ্যে দিয়েই চলেতে থাকল। তার পর সহর ছাড়াবার পর মাটির তলায় পথ শেষ হোলো; ট্রেন খোলা জায়গায় এলো, কিন্তু অপরাহ্নের আলো দ্বান, কুয়াশার ষোমটা-পরা। দেখে মনটা দমে যায়। ক্রমে সন্ধ্যা হোলো প্রাণী বেলা এটাতেই। রাত্রি সাড়ে ৭টায় ওয়াশিংটন পৌঁছলাম। বাসায় পৌঁছতে আটটা বাজল। [ ক্রমশঃ ]

## ষ্টালিন-পুত্রের দস্তোক্তি

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকাল। এক দল রুশ-সৈন্য জাৰ্মানদের হাতে বন্দী হয়ে বলশিভার চলেছে লুবেক শহরে। তাদের মধ্যে এক জন রয়েছে অত্যাচারের কষ্টে রুগ্ন ও শীর্ণ, তার নাম জেকব জুগাসভিলি, কোসেক ষ্টালিনের পুত্র। সৈন্যরা চলেছে। পথে এক জন জাৰ্মানীর সামরিক অফিসারের সঙ্গে দেখা। সকলে তাকে

সেলাম জানালে, শুধু ঐ জেকব জুগাসভিলি জানালে না, অর্থ সামরিক রীতি সেলাম করা।

জুগাসভিলি কেন সেলাম করলে না ভিজ্ঞেস করতে সে উত্তর দিলে, আমি মাত্র বন্দী হয়েছি, কিন্তু আমাকে এখনও জয় করতে পারেনি। “I am only captured, not conquered.”

হালখাতা ব্যবসায়-বণিজ্যের একটি  
অপরিসীম ক্ষেত্র। বণিক সম্প্রদায়

# হালখাতা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

এক মাসে বেলোকান হইতে ভাল-তেল-মসলা  
আনা হইল,—ডালটি প্রসিদ্ধ হইলে, তেলটা  
ভেজাল বলিয়া মনে না হইলে, মসলায়ও  
কোনরূপ ব্লা-পোকা না থাকিলে পরবর্তী  
মাসেও আমরা একরূপ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই

পাকে তাহাকে বলা হয় হালখাতা। এই অর্থে ‘হাল’ শব্দটি আরবী  
এবং ‘খাতা’ শব্দটি ফারসী হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরব ও  
পারস্যের বণিকদের সঙ্গে ভারতীয় বণিকদের এক কালে ঘনিষ্ঠ  
যোগাযোগ ছিল এবং এই দুইটি দেশের ভিতর দিয়া ভারতীয়  
পণ্যসম্ভার ইউরোপের বাজারে এবং ইউরোপীয় দ্রব্যসামগ্রী ভারতের  
বাজারে প্রবেশ লাভ করিত। তদুপরি ১০০ বৎসরের মুসলমান  
রাজত্বের প্রভাবে বহু শত আরবী ফারসী শব্দ, বিভিন্ন রীতি-নীতি  
আখ্যায়ের ভাষা-সাহিত্য, সংসারে সমাজ, কারবারে ও দরবারে  
অনিকার লাভ করিয়াছে। হালখাতা মহাবৎ প্রভৃতি কথাগুলি  
এই সকল সূত্রেই পাওয়া।

হিন্দুদের প্রত্যেক কাৰ্যই ঈশ্বরোদ্ভূত। ‘বখা নিযুক্তোহমি  
তথা কংবামি’—নিরংবান্ হিন্দুমাতেই ইহা স্বপ্নের কথা।  
শ্রীভগবানের আশীর্বাদ চাই! ক্ষুদ্র-শক্তি মানুষের কিছুই করিবার  
নাই,—তিনি বল্লী আমি যন্ত্র—এই ধারণা তাঁহাদের মজ্জাগত।  
তাই শুভদিনে শুভক্ষেণে দেবতার পূজা-অর্চনা না করিয়া তাঁহার  
কোনও শুভকাৰ্য্য আরম্ভ করেন না; শুণু তাহাই নহে, তাঁহাদের  
সে কার্য্যে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলের শুভেচ্ছা ও  
সহযোগিতা থাকা চাই। এ অল্প তাঁহাদের সামান্য ব্যক্তিগত  
মাপাটটিও সমষ্টিগত হইয়া উৎসবের আকার ধারণ করে।  
হালখাতাও বৎসরের প্রথম যেদিন লিখিতে আরম্ভ করা হয়, সেদিন  
যে সমস্ত বিপণিতে বিপণিতে মনোজ্ঞ অমুষ্ঠান, পূজা-অর্চনা, গ্রাহক,  
মহাগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, ব্যবসায়ী সকলের শ্রীতি-সম্মেলন। হাল-  
খাতা সেদিন তাহার ব্যুৎপত্তিগত নীরস অর্থ হারাইয়া আনন্দঘন  
মহুতানে পরিণত হয়।

কোন কারবারই ছুট-এক দিনে বড় হইয়া উঠে না। আজ বে-  
লোকানের দৈনিক বিক্রয় দশ হাজার টাকা, প্রারম্ভে হয়তো তাহার  
শুধু টাকাও ছিল না। এইরূপ অসামান্য সাফল্যের জন্য ব্যবসায়ীকে  
দীর্ঘকাল দৈব ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়; শুণু অপেক্ষা করিলেই  
হয় না; ব্যবসায়িক বুদ্ধি, হান-নির্বাকচন, ক্রেতাদের প্রয়োজন ও  
কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা অলঙ্ঘন, সন্ধান, সততা, ভদ্র-ব্যবহার, ব্যক্তি-  
গত প্রতিভা প্রভৃতি অনেক কিছুই একক এবং সম্মিলিত ভাবে এক-  
একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতির পথে সাহায্য করিয়া থাকে।  
প্রত্যেকের কেবল নূতন নূতন খরচদার দ্বারা লোকান চলে না,  
লিঙ্গও তেমন জাঁকিয়া বাসিতে পারে না; উহার পশ্চাত্ত থাকা  
চাই বিরাট এক স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠী। কিরূপে এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি  
হয়? কামরা সাধারণতঃ কি করি? প্রথম বার একটি জিনিষ  
বেলোকান হইতে কিনি, সে জিনিষটি ভাল হইলে, সেখানে  
ব্যবহার ভাল পাইলে, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে তাহা আবার সেই  
লোকানেই কিনিতে যাই, পরিচিত আরও দশ-পাঁচ জনকে  
সেখানে কিনিতে অনুরোধ করি। যে-স্বর্ণকারের লোকানে  
একবার চাঁদ গাছা চুড়ি গড়ানো হইল, কোনও অনুরোধ-  
নিবেদন না থাকিলে গৃহস্থি আবার সেই লোকানেই নেকলেসের

সেই লোকানেই স্বর্ণ পাঠাই। এইরূপে কালক্রমে এক-এক জন  
ব্যবসায়ীর পক্ষে এক-একটি স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠী গাঁড়িয়া যায়;  
অল্প লোকানে কিঞ্চিৎ স্থলভে পাইলেও, তাঁহার পুরাতনটি  
আর পান্টাইতে ইচ্ছা করেন না; দীর্ঘ দিনের কারবার-দরবারে,  
মিষ্টি-মুখর ব্যবহারে ক্রেতাদের মনটা যেন কেমন আকৃষ্ট হইয়া  
পড়ে; ইচ্ছাই হইতেছে কোনও প্রতিষ্ঠানের Good-will. এই  
Good-willএর জন্য এক জন ক্রেতা যোজে গুড়িয়া, জলে  
ভিজিয়া বালিগ্রহ হইতে কল্হে স্বাধারে ঢুটিয়া যান, অথচ  
অনেক সুবিধা পাইয়াও পার্শ্ব বিপণি হইতে তুল্য-মূল্যে জিনিষ  
ক্রয় করেন না। এই স্থায়ী ক্রেতা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া অনেক  
সময় তাঁহার বিশেষ উপকৃতও হন। অনেক লোকানেই বড় বড়  
হরকে লেখা থাকে, “ধারে বিক্রয় নাই”। “খাণ চাহিয়া সজ্জা দিবেন  
না” ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবসায়ী মাঝেই জানেন, ব্যবসায়ের প্রসারের  
থাকিলে সর্বদা এই নীতি-বাক্যে অচল থাকা যায় না, অবস্থা  
বিবেচনায় ব্যবস্থা করিতে হয়; স্থায়ী পুরাতন ক্রেতাদের সাময়িক  
প্রয়োজনে আদায় হইয়া আসিবে স্থলে ধারণ দিতে হয় এবং দশ  
টাকার ধারে কখনো কখনো শত টাকার কল্লও হইতা থাকে।  
জীবনে কখনো অভাব ঘটিবে না,—অবস্থা চির দিন সচ্ছল থাকিবে,  
ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রত্যেকেরই কোনও  
সময়ে ধারে জিনিষ নিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু নিত্য-  
নূতন লোকান হইতে সওদা করিলে সে-প্রয়োজন মিটাইতে বেগ  
পাইতে হয়।

এই যে ক্রেতা-গোষ্ঠীর কথা বলা হইল, প্রতি বৎসর শুভ হাল-  
খাতা অমুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বণিক-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের  
বৈয়য়িক বন্ধন আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়া উঠে, শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা  
লাভের আরও নূতন নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই উপলক্ষে এক-  
একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান উহার স্থায়ী গ্রাহকবর্গকে স্বরম্য লিখিতে  
আমন্ত্রণ করেন,—“মনীয় গদিতে শুভাগমন-পূর্বক হালখাতা মহরতাদি  
করাইয়া বাধিত করিবেন।” এই আহ্বান-লিপি ক্রেতা-গোষ্ঠী  
উপেক্ষা করিতে পারেন না; যাহার পুকাশ টাকা ধার আছে, তিনি  
এই সময়ে ১০-১৫ টাকাও শোধ করিতে চেষ্টা করেন। আবার  
যিনি কিছুই ধারেন না, তিনিও ভদ্রতার থাকিলে শুণু হাতে যান  
না, কয়েক টাকা আমানত জমা রাখিয়া আসেন। এইরূপে  
কারবার চলে—বছরের পর বছর, ক্রেতা ও বিক্রেতার বন্ধন সূত্র  
আর ছিন্ন হইতে চায় না। হালখাতায় প্রতি বৎসর তাঁহাদের  
প্রত্যেকের হিসাব নূতন করিয়া ভোলা হয়। কিন্তু ব্যবসায়ী সেদিন  
কেবল টাকা-আনার হিসাবই করেন না,—যাহাদের লইয়া তাঁহার  
নিত্য কারবার, যাহারা তাঁহার ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি মূলে, তাঁহাদের  
মিষ্টি-মুখরও যথাসাধ্য ব্যবস্থা করেন, আদর-আপ্যায়নের সীমা থাকে  
না, গান-বাজনাও বাদ যায় না; দোকানে মনে হয় যেন এক  
সামাজিক কৃত্য চলিয়াছে।

হালখাতা-অমুষ্ঠানের ‘পূর্বদিন’ ব্যবসায়ীদের সালসামান্য।



taking,—কোন পদ কি আছে, তাহার গণনা, ওজন ইত্যাদি। সন্ধ্যাবেলায় দোকানটি কাড়িয়া-মুহিয়া জিনিষপত্রগুলিকে আবার যথাস্থানে সন্মার ও সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

হালখাতার দিন সকালে হয় দোকানে গদির উপরে শ্রীশীগণেশ-পূজা। গণপতির মূর্তি স্থাপন করিয়া, ধূপ-দীপ জালিয়া, আশ্রপল্লব সহ চন্দ্রঘট বসাইয়া, মালা-চন্দন দিয়া যথাযথ পূজা করা হয়। অতঃপর মূল ব্যবসায়ী দেবমূর্তির পদপ্রান্ত হইতে 'খাতাটি' গঠন করিয়া তাহাতে সিন্দূর-রঞ্জিত টাকার ছাপ ও সিন্দূরের ফোঁটা দেন, বস্ত্রিকা ছিঁ আঁকেন, শ্রীশীগণেশায় নমঃ লিখিয়া প্রণতি জানান, সিদ্ধি কামনা করেন। বিকালে হয় পূন্যোক্ত শাস্ত্রোক্ত ক্রোড়াদেব ভক্তাগমন, শ্রীতি-সংস্থান।

অভাবত মনে প্রায় জাগে, ব্যবসায়ীরা এই উপলক্ষে গণেশের পূজা করেন কেন! দৈনন্দিনের আদর্শতী দেবী তো লক্ষ্মী। অবশ্য হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায় হালখাতা-অঙ্কনে লক্ষ্মীরও পূজাচর্চা করিয়া থাকেন; কিন্তু দেখা যায়, গণেশের পূজাই সর্বত্র মুখ্য স্থান লাভ করে।

গণেশের গভর্মুণ্ডের পৌরাণিক কাহিনী সকলেই জানেন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু, কাহারো মতে শিব হস্তি-মুণ্ড আনিয়া তাঁহার স্বক্ষে সংযোজিত করেন এবং সকল দেবতার পূজার আগে তাঁহার (গজাননের) পূজা হইবে,—এই বিধান দেন। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, গণেশ সর্ববিঘ্নবিনাশকারী, সর্বসিদ্ধিদাতা। তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া, তাঁহার মূর্তি দেখিয়া, তাঁহাকে পূজা করিয়া কোন কাৰ্য্য আরম্ভ করিলে সৌকর্য্য নির্ভয়ে সম্পন্ন হয়, আরেই সিদ্ধিলাভ ঘটে। গণপতিতত্ত্ব গ্রন্থে গণেশকে পরমাত্মা পরব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; বিঘ্নরূপাণ্ড তাঁহা হইতেই উদ্ভূত, তাঁহাতেই লয় পাইবে; ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই তাঁহার কণাশ্রু, বিভিন্ন মূর্তিতে তিনি বিভিন্ন জীব-গোষ্ঠীকে প্রতিপালন করেন। তন্ত্রে গণেশের পঞ্চাশটি রূপ ও পঞ্চাশটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। গণেশের আরাধনা করিলে ইহুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাতব্য। যাহা, তন্ত্রপথে ইহারও উল্লেখ আছে। গণেশ পৃথবীর আদি লিপিকার, Modern sienographer, সংক্ষেপ-লিপ্যনের প্রবর্তক, বেদব্যাসকে তিনি মহাভারতের পাণ্ডুলিপি রচনার সাহায্য করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি আর নাই কার, তন্ত্র পুরাণ প্রভৃতি ছাড়া গণেশ সব্বদে অবস্থিত হইবার আমাদের আর কি-ই বা আছে।

পুরাণের কথা—গণেশ সর্ববিঘ্নবিনাশক, সর্ব কার্য্যে সিদ্ধিদাতা। যদি তাহাই হয়, ব্যবসায়ীরা যে ইহার পূজা করেন, আমরা তো মনে হয়, চিহ্নিত করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেই তো বাণা-বিঘ্ন সব চেয়ে বেশী; দেশ বিদেশের অবস্থার সঙ্গে উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কখন যে সেই অবস্থা কোন ব্যবসায়ের অঙ্কুলে কিংবা প্রান্তকূলে বাইবে, তাহা পূজাছুই বলা কঠিন। কিন্তু ইহা চিন্তা করিলে আর ব্যসার করা চলে না, বড় কারবার তো মোটেই নয়। ব্যবসায় চালাইতে হইলে বাবতীয় বাণা-বিঘ্নের, বাজারের উন্নত-পড়তির কৃৎক লইতেই হইবে। ব্যবসায়ীরা তাই কাহারো সর্ববিঘ্নবিনাশকারী দেবতা শ্রীগণেশের পূজা করেন। তাঁহার রূপায় বাণিজ্য-পথের সমস্ত বাধা বিদূরিত

গণেশ শুধু বিঘ্ননাশকারী নহেন, তিনি গণসমূহের তথা জনগণের অধিপতি—জননেতা! নেতা হইবার অনেক গুণই তাঁহার মধ্যে আছে। তিনি যেমন বীর, তেমনি স্থির বীর। করিমুণ্ড ধারা তাহাই কতকটা অনুরূপিত হয়। ইহুর যে গণেশের বাহন, তাহারও একটা তাৎপর্য্য আছে। ইহুর একটি ভীষণ রকমের থল প্রকৃতির জীব; আড়ালে আবডালে অনিষ্ট করিয়া বেড়ানই তাহার কাজ। গণপতি এই ইহুরকে পদতলে চাপিয়া রাখিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত দুষ্ক-শক্তি ও বিরুদ্ধ-শক্তিকে আপন বশে রাখিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে এইরূপ এক জন জননেতা পূজা আকামিক নহে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ লইয়াই তাঁহাদের কারবার; জনগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপরই ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও প্রসার-প্রতিপত্তি নির্ভর করে। এমনতাবস্থায় স্বয়ং গণপতি যদি তুষ্ট থাকেন, তাঁহার অধীন জনসমূহ আপনাই আকৃষ্ট হইবে। 'যাশ্চিন্ পক্ষে জনানন্দঃ' জনানন্দকে পক্ষে আনিতে পারিলে ভক্তেরা আপনাই আসিবে, ইহাই হয়তো ব্যবসায়ীদের মনোভাব।

এইবার আমি বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহলে 'হালখাতা' বৎসরের যে যে দিন অঙ্কিত হইয়া থাকে, তৎসম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

হালখাতা-অঙ্কন সকলে এক তারিখে করেন না; বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বৎসরের বিশেষ বিশেষ দিনে ইহা অঙ্কিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যিনি যে-তারিখে কারবার প্রথম আরম্ভ করেন, প্রতি বৎসর সেই তারিখেই তাঁহার হালখাতা হয়। এই হিসাবে 'হালখাতা'কে এক-এক জনের ব্যবসায়ের জন্মবাবিকী বা প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবও বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ১লা বৈশাখ তারিখে শুভ হালখাতা (মহরৎ) করেন। বাঙ্গালী মাঝেই এই দিনটিকে শুভ ও পাবক মনে করে এবং সর্বতোভাবে ইহার সম্ব্যবহার করিতে চায়; এই দিনটি বাঙ্গালীর নববর্ষের প্রথম দিন। স্মৃতঃ প্রবাদিত হইয়াই অনেকে এই দিন ব্যবসায়াদি শুভকার্য্য আরম্ভ করেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, ১লা বৈশাখ হইতে বৎসর গণনার রীতি খুব প্রাচীন নয়। আমাদের বর্তমান পাঞ্জির গণনা ২৪১ শকে ইংরেজি ৩১১ সালে আরম্ভ হইয়াছে; সৌর-বৈশাখ হইতে বৎসর গণনার রীতিও সেই সময়েই প্রবর্তিত হয়; কিন্তু ভারতের সকলে তাহা গ্রহণ করে নাই। পূর্ব-ভারতে ও ত্রাণিড় অঞ্চলে সৌরমাসই ব্যবহৃত হয়, পশ্চিম-ভারতে চান্দ্রমাস গণিত হইয়া থাকে। শুক্লা-প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা, কিংবা কৃষ্ণা-প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমাস পর্যন্ত কাল এক চান্দ্রমাস। সূর্য্যের এক-একটি রাশি-স্থতিকাল এক-একটি সৌরমাস। শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দ দুইই সৌরবর্ষ,—দুইয়েরই আরম্ভ সৌর-বৈশাখে। অনেকে বলেন, কোনও এক শক-সম্রাট—(শকাধিত্য, শালিবাহন কিংবা কনিষ্ক) হইতে শকাব্দের প্রচলন হয় এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে বরাহ-মিহির সর্বপ্রথম এই অক্ষ প্রবর্তন করেন; ৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা গণিত হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে যে 'সং' প্রচলিত আছে, তাহা চান্দ্রবর্ষ; চৈত্রের শুক্লা প্রতিপদ হইতে

গণনা প্রচলিত হইয়াছে এবং বর্তমানে ২০০৮ সংবৎ চলিতেছে। মানবগণই না কি এই সংবৎ-এর প্রবর্তক।

বাঙ্গালী আদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে হালখাতা করে, নববর্ষ-উৎসবে সাজা দেয়। কিন্তু এক কালে—এই সেদিন পর্য্যন্তও বঙ্গাব্দ বলিয়া তাহার নিম্নর কোন বৎসর ছিল না। লৌকিক ব্যাপারে এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে তাহারা সৌরমাস ও সৌরবর্ষ শকাব্দ অনুসরণ করিত; কিন্তু অজ্ঞান বৈবয়িক ব্যাপারে ও সবকারী কাজে মুসলমান আমলে চান্দ্রবর্ষ হিজরীর শরণাপন্ন হইতে হইত। বাংলার মুসলমান তখন বাংলাকে আপনাব দেশ এবং নিজেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। ১০৩ হিজরী সালে মুসলমান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ বাংলার মসনদে উপবেশন করেন। তিনি বাঙ্গালী জনসাধারণের অন্তর্বিধার কথা হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং অচিরেই (খৃঃ ১৬শ শতকের প্রারম্ভে) পশ্চিতিদিককে ডাকাটীয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত সৌরমাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া হিজরী চান্দ্রবর্ষকে সৌর-বঙ্গাব্দে পরিণত করিলেন। বাঙ্গালীর এক সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অক্ষপালে; আর হিজরীর এক চান্দ্রবর্ষ ৩৫৫ দিন ৮ ঘট্টা ৪৮ মিনিটে। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই রাজ হইতে হিজরী সাল গণনা করা হইতেছে কিন্তু বাংলা সাল আজ ১৩৫৮ হইলেও প্রায় ১ শত বৎসর তাহাতে অজ্ঞাতবাসেই কাটাঠিতে চইয়াছে। বাঙ্গালীর নববর্ষ-উৎসবেব সূচনাপ্রথম বেশী দিনের নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় কবি ঈশ্বর গুপ্তই না কি এ বিষয়ে প্রথম উজ্জাগীত হইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলে আমরা ১লা জানুয়ারীতেই নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাইতাম, ১লা বৈশাখের তখন তেমন কোন আকর্ষণ ছিল না। বঙ্গাব্দের পূর্বাধার ব্যবস্থার ‘সন’ এবং ‘সাল’ কথা দুইটিও মুসলমানী; ‘সন’ শব্দটি আরবী এবং ‘সাল’ শব্দটি ফারসী।

পূর্বোক্ত মালবীর অক্ষ সংবৎ-এর অমুগামী ষাঠায়া, তাঁহাদের অনেকে খ্রীষ্টীয়ামনবমী দিবসে হালখাতা করতেন। চৈত্রের এই শুক্লাবমীতে বাসন্তীপূজা এবং রামনবমী ব্রত হইয়া থাকে; এই দিনে খ্রীষ্টমতন্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিনটিকে হিন্দু নাক্তে শুভপ্রদ ও পবিত্র মনে করে।

ওড়গাত এবং পশ্চিম ও উত্তর-ভারতের অপর বহু ব্যবসায়ী দেওয়ানীর পরদিন অর্থাৎ কর্ত্তিকের শুক্লা-প্রতিপদ হইতে তাঁহাদের বৎসর গণনা আরম্ভ করেন, সেদিন হয় তাঁহাদের কাঃবারের নূতন

খাতাপত্র, হালখাতা মতরং। এক সময়ে আর্গা ঋষিরা শবৎ ঋতুর প্রবেশ হইতে বর্ষারম্ভ ধরিতেন, তাহাকে বলা হইত শবৎ বর্ষ। এখনো আশীর্বাদ করা হয় ‘শতং শবৎঃ জীবতু।’ প্রাচীন কালে যে যে ভিখিতে এই বর্ষের আরম্ভ দরা হইত, তাহাদের মধ্যে কর্ত্তিকের শুক্লা-প্রতিপদ একটি। বণিকদের হালখাতার ভিত্তর দিয়া সে-স্মৃতি এখনো রক্ষিত হইতেছে।

অনেকে অপর বিশেষ বিশেষ শুভদিনেও তাঁহাদের হালখাতা করিয়া থাকেন। হয়তো সেই দিনটি তাঁহাদের বাণিজ্যিক বৎসরের (financial year) প্রথম দিন। শুভ অক্ষয় তৃদীয়াতে, অর্থাৎ বৈশাখের শুক্লা-তৃতীয়াতে অনেক ব্যবসায়ীকে হালখাতা অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। এই দিনটি বাস্তবিকই অতি পবিত্র, এই দিনে কোন সে অতীতে সত্যযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি বহন করিয়া এখনো স্থানে স্থানে উৎসব হয়, মেলা বসে।

বখায়া-দিবসেও কেহ কেহ কাঃবার আরম্ভ করেন এবং প্রতি বৎসর সেই দিনে তাঁহাদের হালখাতা হয়। স্বয়ং ভগবানের যাত্রা-দিবস কখনো অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না, এই মনোভাবই অনেককে শুভ কাঃবারে প্রেরণা দেয়। একদাতীত জ্যোতিষ বচন অনুযায়ী শুভদিন, শুভমণ এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্র বা শুভ দেখিয়া অনেকে ব্যবসায় আরম্ভ করেন, হালখাতাও তদনুযায়ী হয়।

ইংরেজ বণিকরা এবং অনেক বড় বড় সৎসঙ্গারী প্রতীষ্টান তাঁহাদের বাণিজ্যিক বৎসরের প্রথম দিন উপলক্ষে উৎসব করেন না বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর তাঁহাদেরও হালখাতা হয়, নূতন খাতায় নূতন বৎসরের হিসাব উঠে। অনেকেরই সে-বৎসর আরম্ভ হয় ১লা এপ্রিল হইতে এবং সাল-সামান্য হয় ৩১শে মার্চ তারিখে।

হালখাতা-অনুষ্ঠানের সহিত ‘পূণ্যাহ’ অনুষ্ঠানের তুলনা করা যাঠিতে পারে। নূতন বৎসর উপলক্ষে নিম্ন নিম্ন প্রজা-গোষ্ঠী হইতে জমিদার তালুকদারদের প্রথম থাকনা-আদায়-কর্ত্তৃষ্টানের নাম পূণ্যাহ। অনেকে প্রতি বৎসর একই নির্দিষ্ট দিনে এই উৎসব করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা আদায়-ততনীলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তারিখের পরিবর্তন করেন। এই উপলক্ষে প্রজাসাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহাদের ভাল-বকেয়া হিসাব নূতন খাতায় লেখা হয়; প্রত্যেকে সে-হিসাবে কতক টাকা জমা দেন। জমিদার সেদিন প্রজাদের হস্ততার সহিত অভ্যর্থনা করেন, মিষ্টিদ্রব্য করাইয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন।

## -জেনে রাখুন-

১৩৫৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যা মাসিক বসুমতীর একখানিও আর অবশিষ্ট নেই। উক্ত সংখ্যাগুলি পাওয়ার জন্য আমাদের নিকট কেউ আর আবেদন জানাবেন না—এই অনুরোধ।

# বাজে লোক

ভাস্কর

হৃদয় বাবু একটু খুঁসে পড়িয়াছেন। তাঁহার একটি নিকট-আত্মীয় একটি বিষয়-সংক্রান্ত মামলায় জড়ায়িত-পড়িয়াছেন এবং এমন একটি অবস্থা পীড়িত হইছে যে, দুই-এক দিনের মধ্যেই নগরায় চাকার টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিছু দিন পরে অবশ্য তব বিপণ টাকা আত্মীয়টির হস্তগত হইবে, কিন্তু বর্তমান সপ্তাহ টাকার টাকার কোন উপায় খুঁজিয়া পাঠিতেছেন না। হৃদয় বাবু ধনী না হইলেও এই টাকার দায়িত্ব লইতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার গড়েও বর্তমানে টাকা নাই। হৃদয় বাবু আত্মীয়টিকে বলিলেন, আমি নিজে তো এখন এত টাকা দিতে পারব না, তাই আমি আমিই হয়ে তোমার জন্য এই টাকা জোগাড় করতে পারি কি না, একবার চেষ্টা করে দেখি। তোমার গহনা বন্ধক দেবার আমার মোটেই ইচ্ছে নেই।

হৃদয় বাবু প্রথমে গেলেন তাঁহার পরিচিত একটি জমিদার মহাশয়ের বাড়ী। তিনি মনোযোগ দিয়া সব স্তনিয়া বলিলেন, টাকাটা তো তেমন বেশি কিছু নয়, তবে কি না মেয়েছেলের ব্যাপার, বড় গোলমেলে।

হৃদয় বাবু বলিলেন, সে ক্ষমতা তো আমিই জামিন হচ্ছি। হৃদয় বাবু মনে আপন টাকা নিশ্চয় ফেরত পাবেন।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু মেয়েছেলের ব্যাপার কি না। দেখি, ম্যানেকার বাবু কি বলেন।

এই বলিয়া তিনি ম্যানেকার বাবুকে ডাকাইলেন এবং হৃদয় বাবুকে একটি বাজিরের সবে বলিতে বলিয়া ম্যানেকার বাবুর সৎ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হৃদয় বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন অনেক মেয়েটির পরামর্শটি অনেক আছে। তা হাজার কুড়ি টাকার গহনা যদি বন্ধক গণে, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

সুখমার কাছে—মেয়েটির নাম সুখমা—তাঁহার গহনাকুলির মূল্য যে কতখানি, কত কতখান মূল্য যে শুধু টাকার দ্বারা নিশীত হয় না, এ কথা আর কে না জানিলেও হৃদয় বাবু জানিতেন। তিনি জমিদার বাবুকে বলিলেন, দেখুন, আপনি যদি অগ্রহণ করে আমার জামিনে টাকাটা লেন, তাহলেই খুব ভাল হয়।

জমিদার বাবুর সত্যিকার আরো দুই-চারটি কথা হইবার পর হৃদয় বাবু নিবারণ হইয়া দেখা হইতে চলিয়া আসিলেন।

এর পর হৃদয় বাবু তাঁহার বন্ধু মনের পরিচিত আর একটি বন্ধুর নিকট গেলেন। ইনি বিত্তশালী এবং ধার্মিক। পূজা, পূজাবান, ঐনোম-কীর্তন প্রভৃতি লইয়াই সময় অতিবাহিত করেন। হৃদয় বাবুর নিষ্পত্তি সব স্তনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যাপার তো সবই বুঝেছি, কিন্তু স্বতন্ত্র না টাকা একটা মেয়েছেলের—

আমি তো জামিন হচ্ছি, আপনার কোন চিন্তা নেই।

তোমার সম্পর্কে অবশ্য আমার কোন দৃষ্টিভঙ্গ নেই, কিন্তু—

আপনার ভ্রাতৃ ধর্মক্রান্ত ব্যক্তি, মেয়েটির বিপদের কথা মনে করে যদি একটু বিবচনা করে দেখেন তো খুব উপকার হয়। আপনার কাছে ওকটা টাকা এমন আর বেশি কি?

ধার্মিকতা, আপনার উদারতা কে না জানে? এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে মেয়েটি আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু—

আপনি আর বার বার কিছ-কিছ করবেন না। রাজি হোন, আমি বসিদের কাগজ-টাকার নিয়ে আসি। আপনি যদি চান, তবে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখে রেজিস্ট্রীও করে নিতে পারেন।

সে তো হতেই পারে, সে তো হতেই পারে, কিন্তু—

হৃদয় বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া ধার্মিক বন্ধুর ধর্মভাব বিকশিত করিয়া তাঁহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কিছুর নিবসন কিছুতেই হইল না। তিনি সর্বশেষে বলিলেন, সবই বুঝছি, আমার টাকাটা যে যখনসময়ে ফেরত পাব, সে সবকিছু আমার মনে কোন সংশয় নেই, কিন্তু—

হৃদয় বাবু, 'আচ্ছা, নমস্কার' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

হৃদয় বাবু বড়ই বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি সুখমাকে এক প্রকার কথা দিয়াছিলেন যে, ও টাকাটা তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবেন। তিনি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহার পরিচিত একটি ধনী ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মহেশ বাবুর সত্যিকার হৃদয় বাবুর পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ঠ নহে। তবে পরস্পরকে চেনেন এবং ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেকগুলি ব্যাপারে ইহার একযোগে কাজ-কর্ম করিয়াছেন। এই ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি এত ধনী যে, নয় হাজার টাকা ইহার নিকট অজ্ঞি ভুচ্ছ। হৃদয় বাবু ইহার নিকট সব কথা বলিলেন। তিনিও মনোযোগ দিয়া সব স্তনিলেন। পরে বলিলেন, অবশ্য টাকাটা কিছুই নয়, সামান্য নয় হাজার টাকা। কিন্তু—

হৃদয় বাবু মনে-মনে বলিলেন, জাবাব সেটী কিন্তু।

মহেশ বাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, দেখুন, ও টাকাটা দিতে পারলে খুবই ধর্মী হতুম। কিন্তু সম্প্রতি সাড়ে পঁচিশ লাখ টাকার কয়েকটা কন্ট্রাক্ট আছে এসেছে। তাহলেই আমাকে খুব বিব্রত হতে হচ্ছে। এ সময়ে আমার পক্ষে কাগজও টাকা দেওয়া সম্ভব নয়।

হৃদয় বাবু বলিলেন, এই সামান্য টাকা, তাও আপনি ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই পাবেন। একে আপনার বড় বড় কন্ট্রাক্টের গায়ে একটুও আঁচড় পড়বে না। আমার এই বর্তমান বিপদ থেকে আপনি একটু উদ্ধার করুন।

আচ্ছা, আমি খুবই উৎসাহিত। আপনাকে এ বিষয়ে আমি কোন সাহায্য করতে পারলুম না।

হৃদয় বাবু নমস্কার করিয়া সেখানে হইতে বিদায় লইলেন।

সুখমা মাঝে-মাঝে খবর লইতেছে, হৃদয় বাবু কিছু করিতে পারিলেন কি না। হৃদয় বাবু কুণ্ঠিত ভাবে জানাইতেছেন, এখনও কিছু কিনারা কবিত পাবেন নাই।

কোথায় কাহার নিকট বাওয়া বাইতে পারে, হৃদয় বাবু শুধু এই চিন্তায় কবিত হইতেছেন। সহসা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল এই অঞ্চলের তিনকড়ির কথা! তিনকড়ি লোকটাকে সবাই বলে, লোকটা একবারে বাজে, তবে মনটা ভাল। তিনকড়ি কি করে, এবং কি করে না, তৎসবন্ধে কাহারই মনে কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। সকলেই দেখে তিনকড়ি সর্বদাই খুব ব্যস্ত। আবার ভীষণ আড্ডাধারীও বটে। তাসের আড্ডা, গানের আড্ডা, নানান আড্ডা, সর্বত্রই তিনকড়ি। ধনী না হইলেও

আনন্দও আছে। হরিহর বাবু ডাবিলেন, তিনকড়িকে একবার কথাটা জানাইলে কেমন হয়। অত টাকা তাহার আদৌ আছে কি না এবং তাহা শুধু হরিহর বাবুর জামিনে ধার দিবে কি না, সে বিষয়ে হরিহর বাবুর মনে খুবই সন্দেহ। তবু অন্তোপাস্য হইলে মানুষ অসন্তবকেও সম্মত মনে করে।

হরিহর বাবু গেলেন তিনকড়ির বাসায়। শুনিলেন, তিনকড়ি একটা নাচের জলসায় গিয়াছে। কখন কিরিলে কেহ বলিতে পারে না। গরজ বড় বালাই। হরিহর বাবু ঠিকানা জানিয়া লইয়া সেই নাচের আগরে গিয়া তিনকড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনকড়ি সব শুনিয়া হরিহর বাবুর সহিত বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যান্সি ডাকিয়া বাড়ী কিরিয়া আসিল। হরিহর বাবুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে বাড়ীর ভিতর গেল এবং স্ত্রীকে বলিল, চেক-বইখানা দাও তো।

কেন, এখন চেক বই কি হবে?

দাও না, আমার কথা বলবার সময় নেই।

কেন, এত তাড়াহাড়ি কিসের?

আবার দেখি করে! চেক-বইটা দাও, আর তুমি তৈরি

হবে নাও। নাচটা বেশ জমেছে। তুমিও দেখে আসবে চল।

তিনকড়ির স্ত্রী চেক-বই আনিয়া দিয়া কাপড় পরিত্তে গেল।

তিনকড়ি বাহিরে আসিয়া হরিহর বাবুকে বলিল, ক্রসুড, চেক দেবো, না অমনি বেয়ারার চেক দেবো।

বেয়ারারই দাও।

এই নিন।

একটা রসিদ—

কি যে বলেন, আপনার কাছ থেকে আবার রসিদ! আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি।

সত্যিই তোমাকে চিনতুম না, তিনকড়ি।

তিনকড়ির স্ত্রী সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া পড়িতেই হরিহর বাবু চেকখানি পকেটে করিয়া বিদায় লইলেন। তিনকড়ি দ্রুতকৈ জলসা অভিমুখে যাত্রা করিল।

নির্ধারিত দিনে হরিহর বাবু সুরমার নিকট হইতে টাকা লইয়া তিনকড়িকে দিয়া আসিয়াছেন। টাকা শোধ হইয়াছে। কিন্তু এখন শোধ হইয়াছে কি?

## জ্যোতিষী

আর কে নারায়ণ

[ঈংরেজী ভাষায় গল্প লিখে যে কয়জন ভারতীয় লেখক খ্যাতিলাভ করেছেন, আর কে নারায়ণ জাঁদেব মধ্যে অন্যতম। ঐযুক্ত নারায়ণ ভারত ছেড়ে ইংলণ্ডের দিকে কোন দিন পাড়ি না লম্বালেও সম্প্রতি তিনি ইংলণ্ডে বেশ প্রশংসা অর্জন করেছেন।]

ঠিক দুপুরে সে তার খলিটি খুলে সাজ-সরঞ্জামগুলো বিছিয়ে বসলো। সবজাম বৎসামান্তট—ভজন গানেক কড়ি, এক টুকরো চৌকো কাপড়, তাতে চূর্বোধ্য রহস্তময় ছক আঁকা, একটি নোটবই আর এক গোছা পুঁথি। কপালে তার সিঁদুর আর পূত বিভূতির রেখা, চোখে ভীক্ষু অব্যভাবিক জ্যোতি। অবিরাম খরিকার অধেষণের ফলেই দৃষ্টিতে এই অব্যভাবিক দেখা দিয়েছে, বিজ্ঞ খরিকাতমের ধারণা, এ মহাপুরুষের দৃষ্টি আর এই ধারণা নিয়ে তারা খুসী হত। তিলক-চর্চিত কপালে আর মুখের হ'পাশে যন কালো গালপাটা—এর মাঝখান থেকে চোখ জোড়া যেন আরও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। তার ওপর আবার মাথার জাকরাণী রঙের পাগড়ী জড়ানো। যুগের এই খেলা কখনও ব্যর্থ হত না। মৌমাছি যেমন ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তেমনি লোকে ছুটে আসতো তার কাছে। প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছের নীচে তার আশ্রয়। পাশেই একটি সঙ্কর রাস্তা টাউন হল পার্কের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। বহু দিক থেকে জায়গাটির বৈশিষ্ট্য আছে। অজস্র লোক দিবারাজি এই সর্গীয় পথটির ওপর দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে চলাফেরা করে। পথটির দু'ধারে নানা জাতের ব্যবসায়ী দোকানে পসরা সাজিয়ে বসে আছে—ওষধ-ব্যবসায়ী, লৌহ-ব্যবসায়ী ইত্যাদি। এক জায়গার স্তম্ভ কাঁপনের নীলিমা যায়। স্তম্ভ জিন জিন বিজ্ঞ বোম্বাশালা সদা

সহর মুখরিত হয়ে থাকে। এদিক থেকে এর পুঠি নাম করতে হয় চীনাবাদামগুলাটির। সে তার পাণের নিভানুতন গালভরা নাম দেয়। এক দিন তরত ইঁদুর পাড়ে 'বোম্বাই আইসক্রিম' বলে, কোন দিন বলে 'দিল্লীকা লাডু', আবার কোন দিন বা গাঁকে 'রাজার খানা চাই বাবু'! লোকে ভীড় করে গিয়ে দাঁড়ায় তার চার ধারে।

জ্যোতিষীকে বিবেও এমনি ভীড় জমে। মিউনিসিপ্যালিটি এ অঞ্চলটিতে আলোর ব্যবস্থা করেনি, দোকানের আলোগুলো বেটুকু আঁধার ঘুর করতে পেরেছে মাত্র; ফলে জায়গাটি যেন একটু রহস্তময় হয়ে উঠেছে। হ'—একটি দোকানে গ্যাসের আলো সোঁসোঁ শব্দ করে চলেছে, কতকগুলো দোকানে পুরানো সাইকেলের আলো মিটমিট করছে, আবার জ্যোতিষীর মত আরও হ'—এক জন বিনা আলোতেই চালিয়ে দিচ্ছে। আলো-ছায়াব খেলায় এখানে বিহ্বলতা জাগে।

জ্যোতিষীর পক্ষে জায়গাটা বেশ ছুতমত, কারণ জীবন-সংগ্রাম শুরু করার সময় জ্যোতিষী হওয়ার বাসনা তার আদৌ ছিল না। পরমুহুর্তে নিজের কি ঘটবে, এ বিষয়ে যেমন সে কিছু বসতে পারে না, অপরের ভবিষ্যৎও তেমনি তার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার নিরীহ মঞ্চেরা যেমন গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে গুহাকিবহাল নয়, তেমনি সে নিজেরও একের সঙ্গে পরিচিত নয়। তবুও সে বা বলে দিত, লোকে ভাতে মুক্ত হত, বিস্মৃত হত! এমন কিছু কঠিন নয়—একটু অভ্যাস, ভীক্ষু নিরীক্ষণ-শক্তি আর অধ্যাবসান-ক্ষমতা চাই এর জন্তে। সে বা হোক, আর সব পেশার মত তারও এ সংপথে উপার্জন; তাই দিনের শেষে বা হ'পরসে সে বাড়ী নিয়ে যায়, সে তার যোগাই।

কোন কিছু চিন্তা না করেই সে গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল।  
র থাকতে হ'লে তাকে বাপ-পিতাম'র পেশাই আঁকড়ে থাকতে  
—চা' করতে হত, ক্ষেত-খামার আর বাপ-পিতাম'র ভিটের  
গা-গুনো করেই বুড়ির বেতে হত।...কিন্তু তা হবার নয়।  
ই তাকে ভিটে ছাড়তে হয়েছিল, অথচ কেউ এ কথা ঘণাক্ষরেও  
নতে পারেনি, আর কয়েক শ' মাইল দূরে সরে না গিয়ে সে  
শ্রিত্ত হতেও পারেনি।

মামুষের স্তম্ভ-স্তম্ভ তার নখদর্পণে : বিবাহ, অর্থযোগ, মানব-  
বনের জটিলতা, সব নিয়েই তার কারবার। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের  
ল জ্যোতিষীর অমূল্য-বৃত্তি শাণিত হয়ে উঠেছে। গোল  
ধার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সে তা ধরে ফেলতো। প্রপ্ন-  
তি তিনটি পরস্পর তার প্রণামী; কিন্তু প্রপ্নকর্তা মিনিট দশেক  
র কথা না বললে সে নিজে স্থপ খুলতোই না, কারণ এ থেকে  
নন থাকেন উত্তরের তদ্বি তার মিলে যেত। মজেসের দিকে  
কিয়ে যখন সে বলে যেত : 'আপনি যে ভাবে কাজ করে  
ছেন, তার পুরো ফল কিন্তু আপনি পাচ্ছেন না', তখন  
র অধিকাংশ উজ্জ্বলোই মিলে যেতো। হঠাৎ সে প্রপ্ন  
রে বসে : 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কি এমন কোন দ্বীলোক  
ছেন, যিনি আপনাকে খুব শ্রীতির চোখে দেখেন না? তিনি  
কান দূর সম্পর্কের আশ্রয়ও হতে পারেন', অথবা সে চব্বির  
ব্বেষণ করে : 'আপনার প্রকৃতির জন্তই আপনি বা-কিছু কষ্ট  
াচ্ছেন। শনি যেখানে রয়েছে, তাতে অল্প রকম হবার জো  
ই। কি জানেন, প্রকৃতিটি আপনার অমূল্য-বৃত্তি, আবেগময়,  
খচ বাইরেটা আপনার রক্ষ।' মজেলের অন্তর জর কংবার  
এ একেবারে 'মোক্ষম অস্ত্র, কারণ অতি শাস্ত্র প্রকৃতির  
নাককেও যদি বলা যায়, বাইরেটা তার খুব কঠোর, তাহলে সে  
ুদীই হবে।

বানামওয়ালা তার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বাড়ী যাবার জন্তে  
উঠে পাড়ায়। জ্যোতিষীর কাছে এটা পাততাদি গুটাবাব সঙ্কেত!  
বাদামওয়ালা চলে গেলে জ্যোতিষী একেবারে অন্ধকারে পড়ে  
যায়, শুধু কোথা থেকে সঙ্গ একফালি সবুজ আলো এসে পড়ে তার  
গমনে জমিটার ওপর। জ্যোতিষী তার কড়ি আর অঙ্গ সাল-  
সরঞ্জামগুলো থলির মধ্যে ভরতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে সবুজ  
আলোর ফালিটা কোথায় মুছে গেল। মুখ তুলে তাকালো জ্যোতিষী;  
তার সামনে পাঁড়িয়ে আছে একটি লোক। ভাবলো কোন মজেসই  
হবে। 'আপনাকে বড় চিন্তাধিত দেখাচ্ছে। আগ্রন না, আমার  
সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ গল্প ককন, তাতে ভালই হবে আপনার',  
বললো জ্যোতিষী। লোকটি বিরক্তির সঙ্গে অস্পষ্ট ভাবে কি বললে।  
জ্যোতিষী আবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। এবারে  
লোকটি তার হাতখানা জ্যোতিষীর নাকের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে  
বললো : 'জ্যোতিষী বলে নিজের পরিচয় দাও?' জ্যোতিষীর গর্বে  
আবাত লাগলো। লোকটির হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে  
বললো : 'আপনার প্রকৃতি...'

—'আরে থামো, থামো,' লোকটি বাধা দিয়ে বলে, 'পারো

জ্যোতিষী কষ্ট হয়। 'প্রপ্ন-প্রতি তিন পরস্পর আমি নিয়ে  
থাকি। পরস্পর যেমন দেবেন উত্তরও মিলবে তেমনি।'

আগন্তক এবার ওর দিকে একটি আনি ছুঁড়ে দিয়ে বলে :  
'গোটা কতক প্রপ্ন করবো। তোমার উত্তর মিথ্যে প্রমাণ হলে  
সুদ সমেত ঐ আনিটা ফেরৎ দিতে হবে।'

—'কিন্তু আমার উত্তর সত্যি হলে আমাকে পাঁচ টাকা দেবেন?'  
—'না।'

—'আচ্ছা বেশ, আট আনা দেবেন?'

—'আচ্ছা রাজী, কিন্তু ভুল হ'লে তোমাকে দ্বিগুণ ফেরৎ দিতে  
হবে।' বলে আগন্তক।

একটা চুকট ধরালো আগন্তক। দেশলাইয়ের আলোর জ্যোতিষী  
একবার লোকটির মুখখানা দেখে নেয়। জনতার কোলাহলে আধ-  
অন্ধকার পাকটা মুখরিত হয়ে ওঠে। লোকটি বসে বসে চুকট  
টানতে থাকে। জ্যোতিষী কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে।

—'আপনার আনি ফিরিয়ে নিন...আজ আমার দেয়ী হয়ে  
গেছে...' বলে সে নিজের তল্লি বাঁধতে আরম্ভ করে।

আগন্তক ওর হাতটা চেপে ধরে বলে : 'তা হবে না। এখন  
তুমি যেতে পারো না। তুমিই আমাকে ডেকে বসিয়েছো।'

জ্যোতিষী ওর হাতের মধ্যে কাঁপতে থাকে। ভগ্ন স্বরে বলে :  
'আজ আমাকে ছেড়ে দিন, কাল বলবো।'

লোকটি বললো, 'তা হয় না।'

জ্যোতিষী শুক কণ্ঠ বলতে আরম্ভ করে, 'আপনার সঙ্গে  
এমন কোন দ্বীলোক...'

—'থামো', ধমক দিয়ে ওঠে আগন্তক, 'ও-সব কথা আমি শুনে  
চাই না। ব' দেখি যা খুঁজে বেড়াচ্ছি তাতে সফল হ'ব কি না?  
না হলে তোমাকে বেতে দেবো না।'

জ্যোতিষী বিড়-বিড় করে কি বললো, তার পর উত্তর দিল,  
'আচ্ছা বলছি। কিন্তু যা বলবো বিশ্বাসযোগ্য হলে একটা টাকা  
দিতে রাজী আছেন? না হলে আগি মুখ খুলছি না।'

কিছু সময় বাক-বিতণ্ডার পর আগন্তক রাজী হল।

—'একবার আপনি ছুরিকাঁহত হয়েছিলেন', জ্যোতিষী বললো।  
বিশ্ময়বিষ্ট হয়ে লোকটি নিজের বুখানা থলে স্কতচিহ্ন দেখালো।

জ্যোতিষী বলে চলে, 'তার পর কাছেই মাঠের মাখখানে একটা  
কুয়ার মধ্যে আপনাকে কেলে দেওয়া হয়। আততায়ী আপনাকে  
মৃত্ত ভেবে চলে যায়।'

আগন্তক এবার উৎসাহের আতিশয্যে টেচিয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,  
একটি লোক সেই সময় কুয়ার মধ্যে উঁকি মেয়ে না দেখলে আমি  
মায়া যেতাম বৈ কি।' মুষ্টি দৃঢ়-সংবদ্ধ আগন্তক জিজ্ঞেস করে,  
'কবে তার দেখা পাবো বল তো?'

—'পরলোকে,' জ্যোতিষী উত্তর দেয়, 'চার মাস আগে দূরে  
কোন এক সহরে তার মৃত্যু হয়। তার দেখা আর পাবেন না।'

একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল আগন্তকের মুখ থেকে।  
জ্যোতিষী এবার আগন্তককে নাম ধরে সম্বোধন করলো : 'ওক  
নায়ক...'

—'তুমি আমার নাম জানি!' আগন্তক বললো। বিশ্ময়ে

—‘হ্যাঁ, যেমন অল্প সব কিছুই আমি জানি। শুধু গুরু নায়ক, বা বলছি মন দিয়ে শুধু। এই সহর থেকে উত্তরে দু’দিনের পথ আপনার গ্রাম। পরের ট্রেনেই বাড়ী চলে যান। দেশের বাইরে গেলে আবার আর একবার আপনার জীবনে দারুণ বিপদ আছে দেখছি।’ অল্প একটু ভাব নিয়ে লোকটিকে দিয়ে জ্যোতিষী বললো, ‘এটা কপালে মেখে বাড়ী যান। দক্ষিণে যাবেন না কোন দিন, তাহলে আপনি শতায়ু হবেন।’

—‘দেশের বাইরে যাবার ‘কি দরকার আমার?’ আগন্তুক কতকটা নিজের মনেই বলতে থাকে, ‘মায়ে মায়ে কেবল সেই লোকটার খোঁজেই বেড়াই। একবার যদি তার দেখা পেতাম গলা টিপে শেষ করতাম’—আফশোসের সঙ্গে আগন্তুক মাথা নাড়তে থাকে, ‘আমার হাত থেকে পালালো। বাক, সমুচিত ভাবেই সে মরেছে।’

—‘হ্যাঁ, একটা সরীর নীচে দেহটা তার গুঁড়ো হয়ে যায়’, জ্যোতিষী বলে। শুনে আগন্তুক খুসী হয়।

জ্যোতিষী তার মালপত্র তুলে নিয়ে খলির মধ্যে ভরতে থাকে। হানিট ইতিমধ্যে নির্জন হয়ে গেছে। সবুজ আলোর ফালিটাও অদৃশ্য হয়েছে। চারি দিক নিঃস্বপ্ন অন্ধকার। জ্যোতিষীকে এক মুঠো পরগা দিয়ে আগন্তুক রাস্তার আঁধারে মিশিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে জ্যোতিষী বাড়ী ফিরলো। তার বউ দরজার দাঁড়িয়েছিল...কৈকিয়ৎ চাইলো। জ্যোতিষী পরসাগুলো তার

দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ‘গুণে দেখ। এক জনের কাছ থেকে পেরেছি।’

—‘সাত্বে বারো আনা’, বউ গুণে বললো। ভারী খুসী হয়েছে ও। ‘গুড় আর নারকেল কিনবো কাল। যেহেঁটা ক’দিন থেকে মিষ্টির লজ্জা আঁকার ধরেছে।’

—‘ব্যাটা আমাকে ঠিকিয়েছে। এক টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল’, জ্যোতিষী বললো।

বউ ওর দিকে তাকালো, ‘তোমাকে বেন বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে। কি হয়েছে?’

—‘কিছু না।’

বাঁওয়া-বাওয়ার পর জ্যোতিষী স্ত্রীকে বললো, ‘জান, আজ একটা ভারী বোঝা বাড় থেকে নেমে গেল। রক্তমাখা হাতে এক বছর ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই জন্তেই তো বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে এখানে বাসা বেঁধেছিলাম।...বাক সে বেঁচে আছে।’

—‘তুমি খুন করতে গিয়েছিলে।’ জ্যোতিষীর বউ কৃত্ত্বাসে বলে।

—‘হ্যাঁ, আমাদের গাঁয়ে। এক দিন মদ আর জুয়ার জুবে থেকে আমাদের দু’জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাধে...বাক, সে সব কথা আর এখন ভেবে লাভ কি? চল, রাত অনেক হল, ঘুমোই।’ জ্যোতিষী দেহটাকে বিছানার এলিয়ে দেয়।

অনুবাদক : শ্রীপ্রভাতকুমার বল্লভোপাধ্যায়

## শিক্ষা-সামগ্রী

অ্যাটন শেখভ,

প্রবরের কাগজে মোড়া কী একটা জিনিষ বগলে পূরে এক মায়ের এক ছেলে শাশা ঈশ্বর্ভ সসকোচে ডাক্তার কোশেলকভের অফিসে ঢোক।

ডাক্তার সোজাসে ঢেঁচিয়ে ওঠেন : ‘এই যে খোকা! আজ কেমন আছ? সুখবর কিছু আছে?’

শাশা চোখ পিট-পিট করে উঠলো—তার পর হাতটা ওর বুকের ওপর রেখে অশ্রুতিভ ভাবে তোলতে থাকে; ‘আমার মা আপনাকে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেছেন...খন্ডবাদ জানিয়েছেন। আমি মায়ের একমাত্র ছেলে আর আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। জানি না কেমন করে আপনাকে ধন্যবাদ দেব।’

অজ্ঞানে গলে গিয়ে ডাক্তার বাধা দিয়ে ওঠেন : ‘হয়েছে—হয়েছে। ও-সব কথা আবার কেন? আমার জায়গায় অল্প এক জন ডাক্তার বা করতেন, আমিও ঠিক সেটুকুই করেছি।’

—‘আমি মায়ের একমাত্র...আমরা গরীব লোক। আপনার কঠোর শ্রম শোধ করি এমন অবস্থা আমাদের নয়।...তবু ব্যাপারটা আমাদের বড় শীড়া মিচ্ছে। ডাক্তার বাবু? মা আর তাঁর একমাত্র ছেলে আমি দু’জনেই আমাদের কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসাবে এই জিনিষটা গ্রহণ করতে আপনাকে অনুরোধ করছি...জিনিষটা দুর্মূল্য, সেকলে ব্রোঞ্জের তৈরী এক অপূরণ স্মৃতি।’

ডাক্তার মুখ বিকৃতি করলেন : ‘না ভাই। এ জিনিষে কোন দরকার নেই আমার।’ শাশা তোতলিয়ে বলে : ‘না ন-না-ন না—। দয়া করে নিন্ এটা...’ মোড়কটা খুলতে খুলতে সে অমন-বিনয় করতে লাগলো। ‘আপনি যদি এটা না নেন তবে আমি আর আমার মা দু’জনেই খুব আশাত পাবো। এ এক তুল্য কাকুশিল—সেকলে ব্রোঞ্জের জিনিষ। বাবা মারা যাবার সময় এই স্মারক রেখে গেছেন। বহুমূল্য স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবেই আমরা এর দাম দেই। আমার বাবা পূর্বানো ব্রোঞ্জের জিনিষপত্র কিনে ও-সব জিনিষ যারা ভালবাসে তাদের কাছে বিক্রী করতেন। উনি মারা যাবার পর আমি আর আমার মা এই কারবার চালাচ্ছি।’

মোড়কটা খুলে শাশা সোংসাহে জিনিষটা টেবিলের ওপর রাখে। সেকলে ব্রোঞ্জের নীচু এক বাতিদান—সত্যিকারের শিক্ষা-সামগ্রী...দেখা যাচ্ছে এক দল লোক। একটা বোদীর ওপর দু’জন স্ত্রীলোক ইভ, মাতার পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ...এমন ভঙ্গীতে তারা দাঁড়িয়ে আছে যা বর্ণনা করার মতো ঔদ্ভত্য বা মেজাজ আমার নেই। চটুল হাসি হেসে এই মুক্তিগুলো এমন ভাব দেখাচ্ছে যে মনে হয়, তারা যদি বাতিদানটা না ধরে রাখতো তবে তাদের বোদী থেকে বৃকে পড়ে এমন কর্ম

হয়তো...পাঠক-পাঠিকা মাপ করবেন এমন চিন্তা করতেও আমি লজ্জা পাচ্ছি।

ডাক্তার উপহাসটি দেখে মাথা চুলকোলেন। তার পর নাক ঝেড়ে গলা-খাঁকাই দিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলেন,—“হ্যাঁ, সত্যিই খুব সুন্দর জিনিষটা। কিন্তু কী করে বলি...মানে এটা তো ঠিক প্রমাণ মত নয়...অর্থাৎ কি না...তুমি তো জানোই সব...”

—“কী রকম?”

—“বেলডারব নিজেও এর চাইতে কুৎসিত কিছু করনা করতে পারছেন না। এই রকমের মাথা গুরিয়ে দেওয়া জিনিষ যদি টেবিলে রাখি, তবে সমস্ত বাটীটাকে কলুষিত করা হবে।”

শাশা অস্থিত হয়ে বলে: “ডাক্তার বাবু! শিল্প সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী অদ্ভুত! সত্যি সত্যি অনবদ্য সৃষ্টি এটা। দেখে দেখুন। এর সুসমঞ্জস সৌন্দর্য এমন যে, এর কথা ভাবলেও আনন্দে মন ভরে ওঠে—উৎলে-ওঠা কারা খামিয়ে দেয়। এ রকম সৌন্দর্য পাখির সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। দেখুন—দেখুন। কী প্রাণ-আগে—কী গতি-চঞ্চল—কী অপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী।

ডাক্তার বাবা দিয়ে বলেন: “আমি বুঝি সব। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমি বিবাহিত। ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে বাওয়া-আসা করে ত। আর মহিলারা তো অনবরতই আসছেন।”

শাশা বলে: “অবশ্য ইভার লোকের চোখ দিয়ে দেখলে এই মহৎ সৃষ্টি একবারে অন্ধ আলোকে দেখা যায়। কিন্তু ডাক্তার বাবু! আপনি তো সে সবার উদ্ভেদ, বিশেষ করে আপনি এই উপহার প্রত্যাখ্যান করলে মা আর তাঁর একমাত্র ছেলে আমি দু’জনেই গভীর আঘাত পাবো। আপনি আমার জীবন দিয়েছেন। তারই প্রতীক্ষানে আমাদের সব চাইতে প্রিয় জিনিষ আপনাকে দিচ্ছি...দুঃখ রইলো এরই জোড়া বাতিনানটা আনতে পারলাম না।”

—“বস্ত্রবান বহু! অনেক বস্ত্রবান। তোমার মাকে আমার কথা বোলো।” কিন্তু ভগবানের মোহাই...আর তুমি তো নিজেকে দেখতে পাচ্ছো...ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে আসা-বাওয়া করে...মেয়েরা সব সময়ই এখানে আসেন...যাক গে রেখে যাও। তোমার সাগে তাকে পারবো না।”

শাশা আনন্দে টেঁচয়ে উঠলো: “আর কথাটি নয়। এইখানে ঠিক এই পাঞ্জের পাশে বাতিনানটা রাখুন। কিন্তু কী দুঃখের কথা বলুন তো। এরই জুড়ীটা আনতে পারলুম না। বাক, আর তো কিছু করার নেই। আচ্ছা ডাক্তার বাবু। এখন আসি। বিদায়!”

শাশা চলে গেলে ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বাতিনানটার দিকে চেয়ে রইলেন...মাথা চুলকোতে লাগলেন। ভাবলেন: “সত্যি চমৎকার! জিনিষটা ফেলতে মায়া হয় অথচ রাখতেও সাহস ক’বি না। হু...পৃথিবীতে আর আমার কে আছে বাকি এটা উপহার পাঠাতে পারি বা দিয়ে দিতে পারি।”

অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে এক জন লোককে ঠিক করলেন। তিনি এর বহু উকাল উষ্ম—এর কাছে আইনের ব্যাপারে ডাক্তার স্বপী ছিলেন।

ডাক্তারের মন ভরলো। ভাবলেন: “বেশ হোলো। ঘনিষ্ঠ

বহু হিসেবে আমি তো ওকে টাকা দিতে পারি না। এর বদলে তাই এই অপোভন জিনিষটা দেই।...এর যোগ্য লোকই হচ্ছে সে...অবিবাহিত মানুষ আর বেশ দিলখোলাও বটে।”

বেয়ন ভাবা ভেমনি করা। কাপড়-চোপড় পরে বাতিনানটা নিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে পড়েন উষ্মের বাড়ীর দিকে।

—“সুপ্রভাত! তোমার কণ্ঠের জন্তে ধন্যবাদ দিতে এসেছি... টাকা তো তুমি নেবে না। কাজে কাজেই এই অশরুপ শিল্প-সামগ্রী দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করবো। এবার নিজেই বোলো... এটা কী যন্ত্রের মত সুন্দর নয়?”

উকীল ভল্ললোক এর দিকে চোখ ফেরাতেই সৌন্দর্যে তাঁর চোখ ঝলসিয়ে যায়। তিনি উচ্ছ্বাস করে উঠলেন: “ওহো কী, অপূর্ণ সৃষ্টি! ওঃ ভগবান, শিল্পীরা কী ভাবই না পাবে! কী মনোবদ্য স্রী! এটা তুমি পেলে কোথায়?”

কিন্তু একটু পরেই তাঁর উচ্ছ্বাস মিলিয়ে গেল। ভীত-সজ্জ হতে চুপিসাড়ে দোরের দিকে বেঁধে নিয়ে বলেন: “কিন্তু আমি তো এটা নিতে পারবো না। তুমি এ এখনই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।”

সত্যে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন: “কেন?”

—“কারণ...কারণ...মা প্রায়ই এখানে আসেন। মকেলরাও আছেন...এ ছাড়া এটা থাকলে চাকর-বাকরদের চোখেও আমি ছোটো হয়ে যাবো।”

ডাক্তার অগভঙ্গী করে বিকট চীৎকার করে উঠলেন: “কোন কথা আর শুনি না। সিনে কথা, তোমাকে এটা নিতে হবে। এ রকম অপূর্ণ শিল্প! কী গতিবেগ! কী তার ভাব... যদি এটা না নাও তবে খুবই আশাত পাবো।”

—“হ্যাঁ নিতাম, যদি কোন-কিছু দিয়ে এটা টাকা দেওয়া যেত।”

কিন্তু ডাক্তার তাঁর কথা আর শুনেতে রাজী হন না। বিকটতর অগভঙ্গী করে তিনি উষ্মের বাড়ী থেকে ছুটে বার হয়ে গেলেন। ভাবলেন, জিনিষটার হাত থেকে এবার মুক্তি পেলেন।

ডাক্তার চলে গেলে, উকীল বাবু সমস্ত জিনিষটা পরীক্ষা করলেন। তার পর ডাক্তারের মত তিনিও ভাবতে লাগলেন: এটা নিয়ে কী করা যায়।

—“এমন চমৎকার জিনিষটা কেলে দিলেও মনে লাগে কিছু রাখাও হচ্ছে অসম্মানজনক। তার চাইতে কালকে উপহার দেওয়া বাক...ঠিক! এ-ই করতে হবে। আজ-ই সন্ধ্যা বেলা শাশকিন্কে দিয়ে আসবো। বোকাটা এ সব জিনিষ ভালোবাসে। তা ছাড়া তার নাটকের এখন অভিনয় চলছে।”

বেয়ন ভাবা ভেমনি কাজ। সেদিন বিকেলে বাতিনানটা ভালো করে মোড়া অবস্থায় কমেডিয়ান শাশকিনের কাছে এলো।

সারাটা সন্ধ্যা ধরে কমেডিয়ান শাশকিনের ডেসিং-রুম লোকে ভরা...সবাই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উপহারটা দেখতে এসেছে...আর সর্বকণ্ণ যোড়ার তাকের মত অটহাস্তে ঘরটি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউ যদি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে: “চুকেতে পারি?” অমনি শাশকিনের কর্কশ গলা শোনা যায়—“না, না। চুকেবে না। এখনও আমার কাপড়-পরা হয়নি।”

অহুটান শেষ হয়ে গেলে, কমেডিয়ান কাঁধ-কাঁকুনী দিয়ে হাড

নাড়া-চাড়া করেন। তার পর বলেন : “এখন এ জিনিষটাকে নিয়ে কী করা যায়? আমি নিজের আলাদা ধরে থাকি। অভিনেত্রীরা প্রায়ই সে ঘরে আসেন। আর জিনিষটা একটা কটোগ্রাফও নয় যে ড্রয়ারে লুকোনো যায়।”

পরচুলা বসায় যে লোকটি সে বলে : “বিক্রী করে দিন না। শ্রিগীর্ভা বলে এক বুড়ী পুরোনো রোজের জিনিষ কেনে। ওর কাছে সোজা চলে যান। সবাই তাকে জানে—বললেই দেখিয়ে দেবে।”

কমেডিয়ান ওর পরামর্শ শুনলেন।

দু’দিন বাদে কৌশেলকর্ত হাতে মাথা ভর দিয়ে নিজের অফিসে বসে ওষুধের শিল তৈরী করছিলেন। তর্পাৎ দোর খুলে গেল। শাশা ছুটে ঘরে ঢোকে—মুখে তার উজ্জল হাসি—আনন্দে ওর বুক ফুলে

উঠেছে—কাগজে-মোড়া কী একটা জিনিষ সে হাতে করে নিয়ে এসেছে।

দম বন্ধ হওয়া উচ্চাসে ও চেষ্টা করে : “ডাক্তার বাবু! দেখুন—দেখুন, কী আনন্দ! ভাগ্যবশে আপনার বাতানটায় জোড়া পেয়ে গেছি। মা এতো খুশী হয়েছেন কী বলুন! মায়ের একমাত্র ছেলে আমি—আর আপনি আমার আমায় প্রাণ দিয়েছেন।”

শাশা কৃতজ্ঞতার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে ডাক্তারের সামনে একটি বাতান নানিয়ে রাখে। আর ডাক্তার বাবু কিছু বলবার জগেই যেন চোঁট চটো কঁক করেন—কিন্তু একটা শব্দও মুখ দিয়ে বেরায় না—কৃধা বজার শক্তি ওঁর চলে গেছে।

অনুবাদক—অংশু দত্ত।

## সম্মোহন

(পূর্বানুবৃত্তি)

(সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী)

অধীকেশ হাসদার

অন্ধকার আর অন্ধকার! পৃথকত শব্দকার! সেই অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে দু’টি ছায়ামূর্তি—মাথের ছায়ামূর্তিকে তড়া করে পিছনের ছায়ামূর্তি দু’টি আসছে একটা অমাব্যবিক গজ্ঞনের সঙ্গে। ব্যবধান তাদের কমেই কমে আসছে—এমন সময় তর্পাৎ পনের ধারে একটা শব্দ গলির মধ্যে চুকে পড়ে প্রথম ছায়ামূর্তি—পিছনের ছায়ামূর্তি গলির মুখে এসে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়।

তাদের আগে পিছনে ছুটে আসতে দেখা যায় আর দু’টি ছায়ামূর্তিকে। তারা বিভাস আর দেবব্রত। গলির মোড় এসে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি যখন থমকে দাঁড়ায়—তারা তখন তার অনেক কাছে এসে পড়েছে।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি এবার গলির মধ্যে প্রবেশ করলো—গতি তার মন্তর, লখা লখা পা তর্পানো যেন টেনে সে চলেছে প্রথম ছায়ামূর্তির সন্ধানে। গলির ভিতর একটা কোণের মাথা থেকে একটা মাথা বেরিয়ে উঁকি নিয়ে দেখছিলো পথের দিকে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তিকে গলির মধ্যে প্রবেশ করতে দেবেই মাথাটি কোণের মধ্যে অস্তিত্ব হলো।

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ঝোঁপটা অতিক্রম করে এগিয়ে চললো—ক্রমে ক্রমে তার মূর্তি মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারে। দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি ঝোঁপ অতিক্রম করে চলে যেতেই প্রথম ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে কোণের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে একবার তার জন্মসংস্কারীর গমন-পথের দিকে ফিরে চাইলো—তার পর নিঃশব্দে, ব্রহ্মপদে বৈদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে চলতে শুরু করলো।

বিভাস আর দেবব্রত গলির মধ্যে এসে পড়েছিলো। ঠিক গলির মুখে দ্বিতীয় ছায়ামূর্তির সঙ্গে হলো তাদের মুখোমুখি দেখা।

বিভাস তার মুখের ওপর টানার আলো ফেললো। মুহূর্তের মধ্যে বিজ্ঞান চতুর্দশ হয়ে গেলো বিভাস আর দেবব্রত। গুহ্মশব্দ—মুণ্ডিত একগামনি শব্দ—সীমা প্রান্তের মুখ—কিন্তু তার চোখে-মুখে কখনো উঠেছে নিদাকল হংসরা!

বিভাস বসে উঠলো : কে, হে আপনি?

দেবব্রত বসে উঠলো : চৌধুরী মশাই! কী আশ্চর্য! আপনি তা’হলে যেঁচে আছেন? তবে আপনার বাগান-বাড়ীতে থুন হয়েছিলো কে? আর আপনিই বা এখানে এলেন কোথা থেকে?

চৌধুরী মশাই নিঃবলতে ব্যঞ্ছিলেন, এমন সময় পিছনে অল্প দূরবৈ শোনা গেলো ভাবী পদশব্দ আর গজ্ঞন-ধ্বনি। প্রথম ছায়ামূর্তি আগায় এলিকৈ কিসে আসতে! চৌধুরী মশাই ভীত কণ্ঠে বললেন : সাংকথা হবে শুনো দেবব্রত! এখন আর কোন কথা নয়। হাত-কাড়ি এখন থেকে না পাল্লালে প্রাণ বাঁচানো দায় হবে।

তিনি-বিভাস আর দেবব্রত তাত বসে টেনে নিয়ে পালাবার উদ্যোগ বরলেন! কিন্তু বিভাস সা দেবব্রত—কেউই তার এই ভীততাকে প্রেরা দিলে না।

দেবব্রত দূর কণ্ঠে বললে : উঠটো বালো বিভাস। দোকটার স্বরূপ আমরা দেখতে চাই।

দীর্ঘ ছায়ামূর্তি তখন গজ্ঞন করতে করতে এসে পড়েছে একেবারে ওদের সামনে। বিভাসের টর্কের আলো সহসা প্রতিকলিত হলো তার ফলফলে দু’টো চোখের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা মধ্যভেরী করুণ আর্কানাম—আকাশ-বাতাস যেন সেই আর্কানামে কঁপে উঠলো! ছায়ামূর্তি ত’হতে চোখ-মুখ ঢাপা দিয়ে সামনের দিকে উদ্ধাসে ছুটলো। চৌধুরী মশাই তার গতিবোধ করতে গিয়ে ধূল্যবলুপ্তিত হলেন।



সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেলো মাত্র ডাঁ-একটি মুহূর্তের মধ্যেই।  
এত দ্রুত ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটলো যে ভিত্তি বা দেবব্রত,  
কেউই জামো করে কথা, মনো সাংলো না চৌধুরী মশাইয়ের  
আক্রমণকারীর মুখ। দেবব্রত বসন্তের মূর্তিটির অগ্রসরণ করতে  
হাচ্ছিলো—কিন্তু চৌধুরী বসন্তী ততক্ষণে ধূসরময় থেকে উঠে  
পড়েছেন। দেবব্রত তার উড়ি দাঁড় অসুস্থতরায় তবু তিনি  
বললেন : আমায় খাওয়া জামো দেবব্রত, খোঁসরা ভেঙে কলসরণ  
কোণো না। আমায়ের আক্রমণকারীকে আমি চিনতে পেরেছি—  
যেকোন মুহূর্তে, যখন উচ্চা আমায় তাকে হাতের কাছ পেতে  
পারি। কিন্তু এখন, এই গভীর রাতে নয়। সবার আগে আমার  
সব কথা শোনাগেল শোনা দরকার। আমার একটু বিবেচনা  
করতে হবে, অতঃপর আমি কি করবো, আমায় কি করা উচিত।  
তোমরা বাড়ী ফিরে চলে।

আমুগল আগতে মলয়া বৈঠকখানা ঘরে বসে প্রতীক্ষা করছিলেন।  
বিভিন্ন আর দেবব্রত। অনেকসময় হয়ে গেলো, কথা ফিটফিট  
না বের? তবে কি করা কোন বিপদে পড়লো? তবে  
কি করে প্রাণ-সংরক্ষণ হলো? .....কি তবে হাতের মলয়ার?  
জনিয়ায় পাতা বিন্দু ছাড়া আর কেউ যে তার নেই? আর  
দেবব্রত? তরুণ মান-তার যে এক ধাপে অবয়, কাজে সাহায্য  
সে কি করে দিবে? কি করে তার এই অশিশু সম্পদ? এর চেয়ে  
যে তার সেই প্রাণ-সংরক্ষণ হলো অনেক ভালো। সে জামো ছিলো  
কটোর দাঁড় দাঁড়, এঁকে থাকার জগো মীল সংগ্রামে সিন্দু দেবব্রত না  
এমন প্রতি পাল-সংরক্ষণ বিন্দু মৃত্যুর আশঙ্কা, এমন আশঙ্কা-বাকী  
বহুসময় পরিত্যক্ত। এই বৈঠকের বিন্দু-ময় এক চাকুরী পাতা  
যায় না সেদিনের দেবী নিকটস্থ যত্নে বাকী জীবন?

গোবিন্দকে যা ব্যাপার হাতের আশঙ্কা করতে দেবব্রতের জগো।  
কোথায় একটু মানবিক এক যত্নের কথা ছুটি যাব দরকার। কিন্তু,  
ভাবো—এই ব্যাপারের জন্যে। বাকী তবুই দাঁড় এক সমস্ত তত্বের  
প্রতীকার পরিসমাপ্তি ঘটলো। কিন্তু বাকী ভিত্তি আর দেবব্রত।  
সঙ্গে তাদের চৌধুরী মশাই। মলয়া শুকল আগতে দুটে গিরে বলে :  
দাদা, দেবব্রত....

গোবিন্দ সামনে চৌধুরী একে গঠে : দাদাবাবু। এমন সময়  
মলয়ার লক্ষ্য পড়ে সবার পিছনে কুঁচিলো। দক্ষিণময় চৌধুরী  
মশাইয়ের বিবেচনা। মলয়া কি কখনও করে বলে : ইনি আমায় হে?  
আমাদের ব্যাপারের মন মশাইটা বোধ হয়....

দেবব্রত একটু কুঁচিলো তবুই বলে : আমায় যে বলে মলয়া,  
ইনিই শোনাগেল আমি আমুগল চৌধুরী। আমায়ের চৌধুরী মশাই!

দেবব্রতের কথা শুনে বিষয়ে বিচলিত হলো মলয়ার ভাগ্য  
কালো গোধ উড়ি। গোবিন্দ কিংবা মলয়ার মলয়ার ধবে তার  
পিছনে আশ্বাসপান করলো। এতগুলো লোকের উপস্থিতিতে সে  
মনে কোন ভরসা পায় না। সে মাল্লব বন হয়ে গেছে, তার  
প্রত্যাবর্তন সে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারে না।  
এ সব অপদেবতা মায়া নয় তো! অশুভ হবে সে বলে গঠে :  
দোহাই চৌধুরী মশাই, যিরে যাও বাঙাল্য, তোমার গরায় পিণ্ডি  
দেবো।

—ততনাগা! যম্কে গঠে দেবব্রত গোবিন্দকে। তার পরে  
চৌধুরী মশাইকে লক্ষ্য করে বলে : আশ্রম, এতবার আপনার ইতিহাস  
শোনা যাক। তার পর যা স্থিতিবেচনা হয়, করা যাবে।

চৌধুরী মশাই একটা সোফার উপবেশন করেন তাঁর আশ-পাশ  
যিরে বসে পড়ে বাকী, মলয়া আর দেবব্রত। চৌধুরী মশাই তাঁর  
কাহিনী শুরু করেন :

—সংসারে আপনার একচেতন জীবন এক ছোট্ট বোন, আর এক খুঁড়-  
তুলা ভাই চিন্তার। ছোট্ট বোন সরসাকে আমি ভালবাসতাম  
প্রাণের চেয়ে, তাই যখন তার শিরে হালো এক সুন্দর সচ্ছত্র গরীবের  
ছেলের সঙ্গে, তখন আমি তাকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছিলাম।  
কিন্তু সে কিছুতেই আমার কোন এক সাহায্য নিতে রাজী হলো  
না। তার স্বামী সুরঙ্গনও ছিলো তেমনই একগুঁয়ে মানুষ।  
কারণে দয়ার দান নিতে সে রাজী নয়। বললে : নিজের স্বামীকে যদি  
ভরণ-পোষণ না-ই করতে পারলাম, তবে ভীষনই বুধা! দিল্লীতে  
একটা চাকরী নিয়ে সংসারে সন্তু হবে সে ভাল গোলা বিদেশে।  
খাড়াই একেবারে খালি হয়ে গেলো। এত বড় বাড়ীতে আর মন  
বসছিলো না। কতজন—আমার চাকর বস, মানী বস, সব কিছু  
ছিন্তা সেট—তাকে বললুম : চল, দিন কাক বিদেশে গুরে আসি।  
গেলেই বেড়োতে সোজা গিয়ে হাফির গগাম বন্দাবনে!

চাকরীবেদ নিজেও চাকরকারী কম ছিলো না। কিন্তু যেস  
কোলা নেশায় সব বুড়িয়ে সে হাতের চাকরী নিজেও করে গিয়েছিলো।  
তার আর বোন খোজের আমায় পাইনি। বন্দাবনে এসে দেখলাম,  
সে মস্ত এক সাদু বসে গেছে। বুধে ইয়া-হুয়া গাড়ি-গোঁড়, মাথায়  
জা। প্রথমটা বোকা চিনতেই পারিনি। তার পর চিনতে পেরে  
বললুম : কি ব্যাপার তে? বাগা দাবু বসে গেছিসু দেখছি!

সে বললে : দি বিবি দাদা। পেটে দায়ে। কোন কাজকর্ম  
তো শিখিনি, সম্পত্তি যা ছিলো তাও ফুঁকে দিয়েছি, এখন চলে  
কি করে? ভেদ নষ্টলে আরো প্রক্ষেপ যে কেউ দেয় না!

বললুম : যিরে চল আমায় বাগানে একা থাকি, তোব  
ফোন বস্ত্র হবে না দেখানে। আমিও অতঃ চুঁদন্ত কথা বলবার  
মতো একটা সঙ্গী পাওয়া।

সে তখনি বাগান হতে গেলো। বুধাবন থেকে সোজা চলে  
এলো বেলাসয়ে কানবটী সঙ্গে। সৌন্দর্যে এই একটা ভুল—মহা  
ভুল আমি করেছিলাম—যদি ফলে আমার মৌলনটাই বিষয়ে উঠলো  
মৌলিগিট। ততনাগা যে মলয়াই হয়ে গেবিয়ে যাবার পর সম্মোহন  
বিভার চলে করলো, একথা কে জানতো বলা! এখানে আসার পরই  
সে তার ঐ বিজের অপপ্রয়াগ আরম্ভ করলে আমার ওপর।  
আমায় সম্মোহিত করে সে তিনে তিনে আমার অর্থ শোষণ করতে  
শুরু করলো। অন্যতম চাকর সে গড়ে তুললে নিজের বাড়ী, কিনলে  
গাড়ী। আমার শুরু করলে বেস খেলতে আর নিজের বদখেয়াল  
চলিতার করতে। যখন আমার সামনে থেকে সে চলে যায়, তখন  
আমায় সঙ্ঘর্ষ ফিরে আসে। ভাবি আর তাকে আমার সামনে  
আসতে বোঝা না। কিন্তু যখন সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়,  
তখন আমি যেন কেমন হয়ে যাউ। তার সব আদেশ নির্বিচারে  
পালন করি। আর একটা কথাও বেশ ভালো করেই বুঝতে

পারলুম—হতভাগা সবলাকে রীতিমত শত্রু বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। আমার অবস্থিমান সবলাই সব সম্পত্তি পাবে। আমাকে দিয়ে সব কিছু সে বিক্রি করিবে নেবে, আরও উপায় নেই, সব জ্বার সম্পত্তি দোজ্ঞে সরাই। সুতরাং পাছে সে সরলার কোন ক্ষতি করে, এই ভয়ে আমি সবলাকে চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করে দিলাম। তাহলে চিঠি কোন উত্তর কো দিতামত না, এমন কি, শুভঞ্জন যখন বাপাপা বিবুদ্ধে না পেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল্লী থেকে দুটো চাকর বোহাগায়, তখন তার সঙ্গে দেখা পথান্ত করলাম না। চিরজীব গতে বুনীত হলো। সে মান করলে, আমি বোধ হয় কোন কারণে সবলাকে ওপর কত বিরক্ত হয়েছি, যাতে করে তার মনে সব সম্পত্তি দেয়া হয় গেছে। হঠাৎ আমি বাধা পেয়েছি যথেষ্ট, কিছু মনে মনে সন্তোষিত পেয়েছি কখনও—চিরজীব অসহ্য সবলাকে কোন অনিষ্ট করবে না।

মল্লার চৌধুরী মশারের কথাই নাগুনানে বর্ণনা দিয়ে বলে উঠলো : পালিশের কোন সাহায্য নেই নি কেন মশা ?

—প্রমাণ যে কিছুই ছিলো না মা। করণ স্বপ্নে বলেন চৌধুরী মশার : স্মৃতি-অভ্যাসে মশার কথা গাথা হয় না। আমি নালিশ করতে আসা এমন কথা যা চৌধুরী মশার টা নয় দিলে।

চৌধুরী মশার কীধাস দেখে নীচ হলে। বিভাস বললো : তার পর কি আসা যায় ?

—তার পর ? চৌধুরী মশার বলেন : তার পর এখন তার শোষণ আর অব্যাহত। এমন করে কইলো, তখন তার হাত থেকে মুক্তি উপায় খুঁজতে লাগলাম। আমার এক জন মাত্র বন্ধু ছিলো এ অপদায়, অকৃত্রিম বন্ধু। সে হলো ডাক্তার সেন। তাকে সব কথা বলে বললাম। প্রথমে সে আমার কোন কথাই বিশ্বাস করতে চায়নি, ভাবলে বন্ধি আমার মাথা গরত হয়ে গেছে। তার পর যখন তাকে আমার ব্যাকের পাতা দেখালি, দেখালি যে দীর্ঘ কবছর পর সে কেমন করে চৌকের মত আমাকে শোষণ করে চলেছে, তখন ডাক্তারের বোধ হয় বিশ্বাস হলো। ডাক্তার আমাকে উপদেশ দিলে তার বাড়ীতে বাস করবাম। ডাক্তারের উপদেশ মেনে নিয়ে তার বাড়ীতেই রয়ে গেলাম বয়েক দিন।

—আমার বাড়ীতে আমার কোন দোজ্ঞ না পেয়ে চিরজীব দুটিলো ডাক্তারের বাড়ী। প্রথম প্রথম ডাক্তার তাকে দরজা থেকেই দিলে তাড়িয়ে। তবু তাই দরজা নেই। সে বার বার ডাক্তারের কাছে অবেদন করতে লাগলো এবার আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে। ডাক্তার সে কথাই কান দিলে না।

—বত বার চিরজীব ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, আমার বোধ হয় তত বারই সে সম্মোহিত করার চেষ্টা করেছে ডাক্তারকে। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি আমার চেয়ে প্রবল, তার মানসিক গঠন আমার চেয়ে দৃঢ়। তাই বোধ হয় প্রথম প্রথম প্রবিশ করত বেনি চিরজীব। কিন্তু কীর্গগিষ্ট লক্ষ্য করলাম, যৌর ধীরে ডাক্তার কেমন হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো কোন কদু শত্রুকে লক্ষ্য করে দুইতে থাকে আর বলে : না, না, শতান, হোর এত ক্ষি নেই যে আমাকে সম্মোহিত করবি। আমাকে করবি তোয় সি। হাঃ হাঃ হাঃ...

—ভয় হয়ে গেলো আমার। এ কি করছি আমি ? ডাক্তারের স্ত্রী আছে, সংসার আছে। আমি কি করে চিরজীব সেন ধ্বংস করবে তাকে ? এমন ভাবে তাকে ধ্বংসের পরে আমারে দেখায় কি অধিকার আছে আমার ? ডাক্তারের বাবা লতন আবার চলে এসাম নিজের বাড়ীতে, আবার চরম তার নিম্নম শোষণ।

—কিছু দিন পরেই আমি ডাক্তার আর বাড়ী থেকে দরজার পর বেয়েই না তাকান টাকা পেলে। বাপাপা কি ? এক দিন সিজিয়া করলাম তাকে। সে হেসে উত্তর দিলে : সে না কি মিছে ওই সময়ে ওই মতি-মেঘ ঢেঁকা করছে। লোকের কাঁধ থেকে সম্মোহনের ডু নামিয়ে দিলে, নিজে তবু প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চলে না। এমন বিধোনি এক বাক্য দরকার।

—তার পর এক দিন আমার বাড়ীতে গভীর রাতে কে এসে হতভজনকে বুন করে দেবার। শত্রু গলা টিপে ঘেরে তার পর তার মূর এমন ভাবে জোঁকা দেয়া গেলো বুনী, যাতে কাশ সনাক্ত করার আর বেনি উপায়ই ছিলো না। বেচারা গভীর হতভজন ! তাকে ঘেরে কার কি লাভ হবে ? হঠাৎ আমাকে দারত্রে এসে চিরজীব তাকে ছুর করে মনে বোধ গেছে। জাম বিচে থাকতে এসঙ্গে সব সম্পত্তি আর করবার প্রবিশা দৃষ্টি না তার। উচ্চারণ আর নৈতিক গঠন প্রমাণ তার হতভজনের সাদৃশ্য ছিল যথেষ্ট, যাতে করে এক ভয়। দুপানি বে বকম বীভৎস হয়ে গেছে, তাতে কাঁদে মূর তা সনাক্ত করার কোন উপায় নেই যখন, তখন হতভজনকে আমার বোমারী চাকিয়ে জেগেই ঠিক করলাম। নীলো প্রমাণ অত্যাশুত কানকেই হত্যাকারী বলে মনে করবে। জা, যদি বা পুষ্টিদের হাত থেকে মুক্তি পাই, চিরজীব যখন জানতে পারবে আমি মর্মান, মরেছে হতভজন, তখন নিশ্চয়ই আবার সে আমাকে বুন করবার চেষ্টা করতে পারে। অগত্যা আমার জামা-কাপড় তাকে পরিবে, তার জামা-কাপড় নিয়ে পাবে, আমার বাক্যানার তাকে শুভীয়ে, যাতে স্তিমিষপত্র ফেলে ছড়িয়ে বিস্ময়কর করে পড়লাম। পুষ্টি হতভজনা বাধ্য হলো, আমিই বুন হতেছি। হতভজন আমাকে বুন করে সরে পড়েছে।

—সরলকে কোন চিঠিপত্র না স্থিহামত গোপন সব সব যবই রাখলাম। স্ববজনের মৃত্যু আমার বৃদ্ধ শোষণের মতো বিদেহিলো, সবলা অবশেষে দিন চানাজে তখন এক একবার আত্মকথা করার ইচ্ছা পথান্ত জাগত আমার মনে। কিন্তু তবু কোন সাহায্য করার ভরসা পাইনি। পাছে যেই হুঁর যবে হতভাগা চিরজীব সরলার সন্ধান পায়। তার পর সরলাও মার গেলো। আগের মতো নতুনকে নিয়ে একখান উইল কবিয়ে রেখেছিলাম, যাকে অন্তঃ আমার অবশিষ্ট সম্পত্তি বিতাস আর মল্লারই পায়। আমি মারা গেছে মনে করে এটানী দত্ত ভদের চৌকগার্ম করে আনলেন। কিন্তু আমি পৈতৃক ভিটের মাথা চাড়তে পারলাম না। তাহাড়া হতভাগা চিরজীব যাতে বিতাস তার মল্লার কোন অনিষ্ট করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার। কাজেই মল্লার হয়ে চাকরিতে ছুলাম এখান।

—আজ রাত্র যা ঘটলো তেমনি সপ্ত দেখাচ্ছে। কিন্তু আততায়ীকে চিনতে পেরেছে কি না জানি না। আমি কিন্তু চিনতে

পেরেছি, আর চিনতে পেরে অবাক হয়ে গেছি। এখনো বুঝে উঠতে পারছি না, এর পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে!

—কে, কে সেই হতভাগা? বিভাস প্রশ্ন করলো! চিরঞ্জীব!

—না! চৌধুরী মশাই হান হান হাসির সঙ্গে বললেন: সে এমন এক জন লোক, যে ছিলো এত দিন সব সন্দেহের অতীত।

—তার নাম বলুন দাদা, বিভাস ব্যগ্র কণ্ঠে বললে: সেই শয়তানের খুপোস খুলে দিয়ে আমরা তার ক্রিয়াক্ষেত্রের ব্যবস্থা করি।

চৌধুরী মশাই কি বলতে বাঙ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো ক্রিংক্রিং করে। এত রাতে ফোন করে কে? বিস্মিত ভাবে মলয়া রিসিভারটা তুলে নিল।

—কে, ডাক্তার সেন? হ্যাঁ, আমি মলয়া। মলয়া উত্তর দেয়: কি বলছেন, ফোনটা দাদার হাতে দেবো? দাদা...

মলয়া রিসিভারটা বিভাসের হাতে দেয়। বিভাস ফোন ধরে: হ্যাঁ, আমি বিভাস। কি সন্ধান, কি সব খবর বলছেন?

ফোনের ওপারে শোনা যায় দৃঢ় কণ্ঠ: হ্যাঁ বিভাস! আমি বিষ পান করেছি! তীব্র বিষ! বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হচ্ছে আরো কিছুক্ষণ দেরী আছে! তুমি দেবব্রতকে আর মলয়া মাকে সঙ্গে নিয়ে শীগগির এখানে এসো। চৌধুরী মশাই ছেঁও দরজা করে এখানে আসতে বলবে। পৃথিবীর সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দেবার আগে আমি শেষ বার তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আর দেরী নয়, শীগগির! আমি পুলিশ আর ম্যাজিস্ট্রেটকেও ফোন করেছি আমার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেবার জন্তে।

সকলে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি ডাক্তার সেনের বাড়ী যাবার জন্তে।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে দেবব্রত বলে: আমাদের আততায়ীর নাম কিছ্র এখনো জানতে পারিনি চৌধুরী মশাই!

—তোমার প্রেমের উত্তর এখন পাবে দেবব্রত, চৌধুরী মশাই বলেন: আগে ডাক্তার সেনের বাড়ীতে চলো।

ডাক্তার সেনের বাড়ী। তাঁর শোবার ঘর। ম্যাজিস্ট্রেট আর পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘরের এক কোণে বসে। বিছানায় শুয়ে আছেন ডাক্তার সেন। এক কোণে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন ডাক্তারের স্ত্রী অপরী।

ডাক্তার সেন সাশ্বনার স্বরে বললেন: কেঁদো না, কেঁদো না অপরী! আমার জন্তে মিথ্যে শোক করে লাভ নেই। আর এ বৈষম্যবান বইতে পারছি না। শান্তি চাই, শান্তি! আর সে শান্তি মুড়া ভাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। উঃ, বড় যন্ত্রণা, বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, হা-হা-হা—বড় যন্ত্রণা.....

ডাক্তার সেন উপেক্ষার হাসি হাসতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করেন। একটু নীরব থেকে আবার বলেন: কিছ্র ওরা যে এখনো এলো না। বিভাস, দেবব্রত, মলয়া আর চৌধুরী মশাই। আর তো ধেরী করা চলে না। সময় যে বড় সংকেপ। আপনাবা লিখতে শুরু করুন। আমি ডাক্তার পরেশ সেন, এম-ডি, কৃতবিদ্য চিকিৎসক, কত খ্যাতি, কত সম্মান, কত প্রীতিপত্র..... হা-হা-হা.....কিন্তু—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি একজন ক্রিমিকাল, সমাজের এক দুঃস্থ ক্ত! হ্যাঁ, আমি ধনী, আমি পিশাচ, আমি.....

—কি বলছো তুমি...আর্জ স্বরে চীৎকার করে উঠলেন অপরী দেবী।

বাদা দিয়ে না অপরী! আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও। ডাক্তার সেন যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে বলেন: আর একটু পরেই আমার কণ্ঠ নীরব হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এমন এক শত্রু নিষ্কটক হয়ে উঠবে, যার ধরা-ছোঁয়া আর কেউ কোন দিন পাবে না। আমি যদি আজ সব কথা না বলে বাই, তাহলে আমার মতো, চৌধুরীর মতো আরো অনেকের সর্বনাশই সে করবে। ডাক্তার সেনের কথার মান্যখানে সদলে, প্রবেশ করলেন চৌধুরী মশাই।

ডাক্তার খুসী কণ্ঠে বলে উঠলেন: এই যে অতুল, এসেছো। বসো, বসো। বসো মা মলয়া, বসো বিভাস। আমার সময় বড় অল্প। সব কথা শুঁচিয়ে বলতে পারবো না। অতুল, তুমি এদের বলো কেমন করে মেসমেরিজমের সাহায্য নিয়ে দিনের পর দিন চিরঞ্জীব তোমায় শোষণ করে গেছে, কেমন করে নষ্ট করে দিয়েছে তোমার জীবনের সুখ-শান্তি। আমার বক্তব্য তার পরের ঘটনা নিয়ে—যখন তার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্তে আমি তোমায় নিয়ে এলাম আমার নিজের বাড়ীতে, চিরঞ্জীব এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসার পর তাকে বার বার দিলাম তারিফ। যখন সে বুঝলে, আমার জন্তেই তোমার মত সোনার হরিণ তার হাতছাড়া হতে বসেছে, তখন সে আমাকে তাব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজের বশীভূত করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

—আমি হস্ত রোগী দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছি, দেখি পথে সে দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে এক অদ্ভুত রহস্যময় দৃষ্টি নিয়ে। কোন পাটি, উৎসব সম্মেলন—এমন কি রোগী দেখতে আমি যেখানেই যাই, দেখি ছারার মত পিছনে পিছনে সে আমার অহুসরণ করছে। এত ভাবেই কেটেছে দিনের পর দিন। এক এক সময় এক অদ্ভুত তন্দ্রাবশে আমার শরীর বিম্-বিম্ করে উঠতো, কি যেন একটা আত্মবিশ্মতির ভাব এসে ভুলিয়ে দিতো আমার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এমন কি পারিপার্শ্বিক সব কিছুই। তার পর আবার মনের সমস্ত শক্তি এক করে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠতাম অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টার পর।

—সেই সময়ে অতুল আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেলো। সে হয়তো ভেবেছিলো, চিরঞ্জীব যখন তার জন্তেই আমার অনিষ্টের চেষ্টায় আছে তখন সে আমাকে ছেড়ে গেলেই আমি রেহাই পাবো। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিলো। শয়তানের দৃষ্টি একবার যাব ওপর পড়ে, সে কি অত সহজে রেহাই পায়!

—শীগগিরই আমার অবস্থা হয়ে উঠলো আরো শোচনীয়। আমি উদ্ভ্রাণ হয়ে গেলাম—হ্যাঁ, বড় উদ্ভ্রাণ। সে উদ্ভ্রাণতা এক অদ্ভুত, বিচিত্র ধরণের—যার কোন উদাহরণ আমাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রে মেলে না।

—সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে যেন একটা রক্তলোলুপ পশুর আত্মার আবির্ভাব ঘটতো। সেই দুর্ভাগ্য পশুবৃত্তি কিছ্র রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শান্ত সমাহিত হয়ে যেতো—আমি ফিরে পেতাম আমার নিজের সত্তা। আরো একটা বিচিত্র জিনিষ লক্ষ্য কবেছি। সন্ধ্যার পরই আমার

সমস্ত শরীরে এমন এক অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দিতো, যার ফলে আমি আত্মনির্ভর করতে থাকতাম। তখন আমার মনে কোন ভিৎচাংসা স্থান পেতো না। কিন্তু আলো নিবিয়ে দিলেই সে যন্ত্রণার অবসান ঘটতো—সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হতো এক বিচিত্র উদ্ভাসভাৱ। ঘরের জিনিষ ভেঙে-চূরে, হিংস্র পশুর মতো গর্জ্জন করে বাকের সামনে পেতাম, তাকেই হত্যা করতে যেতাম। অথচ যদি কেউ সে সময় আলো জ্বালতো, আমি তখন কিংবা পেতাম আবার পূর্ণ জ্ঞান, আবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুব চেয়ে কঠিন সেই যন্ত্রণাও আবার হতো শুরু। উদ্ভাস অবস্থায় কি যে করতাম আমি, নিজেই সে কথা জানতাম না। বুদ্ধিগাম, শয়তান আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন করে আমাকে ক্রমশঃ বেশী করে তার করতলগত করছে।

—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনো শুনেছেন যে, নিজেকে বেঁধে রাখবার জন্তে কেউ নিজেকে তৈরী করিয়েছে তার বন্ধন-শৃঙ্খল? আমি কিছ কবিয়েছি। সন্ধ্যার সময় আলো জ্বলবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন আমি টাংকার করে উঠেছিঃ বাধো, বাধো আমাকে! বেঁধে অন্ধকারে ভরিয়ে দাও ঘর! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তার পর অপর্ণা আর আমার পুরোনো চাকর চলধর—হুজনে আমাকে বেঁধে নিবিয়ে দিয়েছে ঘরের আলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি উদ্ভাস বজ্রপিপাস রাক্ষসের মতো গর্জ্জন শুরু করেছি—যার কি যে করেছি, কি না করেছি, কিছুই স্থাপ করতে পারিনি পরের দিন! ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে নেমে এসেছে ঘুম। কিন্তু ঘুম আমার ভাগ্যে লেগা নেই। ভোর হতে না হতেই রোগীর দগা আসতে শুরু করেছে। তারা যে জানে ডাক্তার সেন অচিকিৎসক, ডাক্তার সেন সপাশয়, মহৎ লোক! তা-হা-তা-.....ডাক্তার আবার দগা-গদায় চেঁসে উঠলেন—ও'চোখ তাঁর অশ্রুসঙ্গম!

—সন্ধ্যার পর কোন বোগী দেখতে না যাওয়ায় আবার বাড়ী থেকে না বেরানোর ফলে চার বিকে একটা হৈ-টৈ শোনা যাচ্ছিলো। ডাক্তার একটু থেমে আবার বসতে লাগলেন: অনেকে দেখা করতে এসে ফিরেও গেছে সদর থেকেই। বাধ্য হয়ে গুজব রটানো হলো, একটা গবেষণার কাজেই রাতটা আমাকে কাটাতে হয়। লোকে সহজেই বিশ্বাস করলে সে কথা। নইলে সত্যি কথা প্রচার হলে আমার পশার তো যেতোই, তার ওপর এত দিন ধরে গড়ে তুলেছি যে সন্ধান-প্রতিপত্তি, তার টুসব কিছুই হারাতে হতো।

—এমনি সময়ে এক রাতে বাড়ীর সকলে যখন নিদ্রায় অচেতন, তখন আমি শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে। কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। পরের দিন ভোর বেলা যখন চৈতন্য হলো, দেখলাম আমি একটা বাগানের দারে ঝোপের আড়ালে পড়ে আছি। বাগানটা আমার বন্ধু অতুলের। হাতের হাতকড়া আর নিজের অবিকল বোধ দেখে বড় ভয় হলো। যদি এই অবস্থায় কেউ দেখে ফেলে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম নিজের বাড়ী। ভোরের আলো তখন সবে ফুটে উঠছে। বাস্তব লোকজন চলাচলও তেমন শুরু হয়নি। কাজেই আমার দিকে লক্ষ্য পড়লো না কারো। বাড়ীতে এসে চুপি-চুপি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম। অপর্ণা আর চলধরও তখন ঘুমোছে। স্তবরাং কেউ জানলো

না আমার নিশীথ-ভ্রমণের কথা। তারা শুধু আমার বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলো।

—গানিক পুরেই যখন বোগী দেখতে চেঁসে এলাম, তখন কানে গেলো এক বিষম হুঃসব্দ। অতুলকে কে না কি খুন করেছে। চমকে উঠলাম! সে কি আমি? সে কি আমি? হে ঈশ্বর, আমি কি খুনী? আমি আমার মনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেললাম। মাঝে মাঝে আমি যে কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তাও করিনি—কিন্তু উদ্ভাস অবস্থায় এ কি করলাম! কাজেই বসতে পাললাম না কোন কথা—এমন কি অপর্ণাকেও না। কে বিশ্বাস করবে, সংশ্লিষ্ট অবস্থায় অপরের উদ্ধাকেই আমি কাজে রূপ দিয়েছি? বাধ্য হয়ে নিজের মনের আগুনে নিজেকে পুড়ে মরতে লাগলাম।

—কিন্তু এর পরেই এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। আমি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর আলোয় না দেখা দিতো কোন যন্ত্রণা—অন্ধকারেই উদ্ভাসভাব কোন লক্ষণ নেই। অপর্ণা খুব খুশী হলো আমাকে আবার শূন্য হতে দেখে। বোধ হয় বেশির কোটি দেব-দেবীকে কেউই তার নমস্কার আর মাননত থেকে বাদ পড়লেন না।

—তবুও আমি সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে যাঁই না। কি জানি, যদি কোন দিন আবার উদ্ভাসভাব দেখা দেয়। তর্ক্য এক দিন ঠিক সন্ধ্যা বেলা বোগী দেখে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় চিরজীব এলো আমার চেঁসারে। ভয় পেয়ে গেলাম। কি ব্যাপার? হতভাগারা আবার আমার চেঁসারে কি মনে করে?

—সে বললে, রাতে তার ঘুম হয় না, একটা ওয়ুপ চায়।

—আমি ধমক দিয়ে বললাম: তার জন্তে এত দূরে ডাক্তার দেখাতে আসবার দরকার ছিলো না। তোমার চিকিৎসা করবো না আমি। এই সামান্য বোগে যে-কোন ডাক্তারের সাহায্য নিতে পাগো তুমি।

—কিন্তু তোমাকে আমার চিকিৎসা করতেই হবে ডাক্তার, অন্য কারো ওপর আমার বিশ্বাস নেই। চিরজীব বললে: আমাকে তুমি পছন্দ না করো, তাহলে আমার হুঃসব্দ নেই। কিন্তু মনে রেখো তুমি চিকিৎসাতরী। লোকটা ভাল কি মন্দ, তাতে তোমার কি আসে-যায়? রোগটা ভালো কি মন্দ বিচার করে ওয়ুপ দেওয়াই তোমার পবিত্র কর্তব্য।

—ততঃলাগাটা নাছোড়বান্দা। কাজেই তাড়াতাড়ি তাকে বিদায় করবার জন্তে ওয়ুপ দিয়ে দিলাম। চলে গেল সে। কিন্তু বাবার আগে আমার দিকে চেয়ে ওঠল কিছুক্ষণ এক রহস্যময় দৃষ্টিতে। তার চোখের ভাবায় কি ছিলো জানি না, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শিউবে উঠলো একটা অজ্ঞাত ভয়ে।

—তাড়াতাড়ি ওপরে এসে বললাম: আমার বেঁধে রাখো অপর্ণা, আমার বেঁধে রাখো।

—অপর্ণা ভয়ে শিউরে উঠে হিজড়াসা করলে: আবার কি তোমার সেই অসুখ করলো না কি?

—এখনো করেনি, উত্তর দিলাম আমি: কিন্তু ভয় হচ্ছে, আবার সেই অসুখটা দেখা দিতে পারে।

—আমার পীড়াপীড়িত সেই শূন্য অবস্থাতেই আমাকে বেঁধে

রাবলে গুরা। রাত আটটা পর্যন্ত সেদিন জেগেছিলাম আমি। তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বাগবে সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ভরানক তুষাৎ। কড়, কল আর বিজ্ঞাতের চমক। অপর্ণাও পড়েছে ঘুমিয়ে, চন্দ্রবরও। তারা বোর তস সেদিন আমাকে বুঝতে দেখে সকাল সকালই তুয়ে পড়েছিলো। তার পর কি ঘটেছে জানি না। হঠাৎ আমাব চমক ভাঙলো—আমি জ্ঞান কিরে পেলাম। দেখি আমি দু'হাত তুলে হাটা করতে যাচ্ছি কাক, আর যে আমার চোখে টাটকা আলো ফেলেছে। ভয়ে চীৎকার করে দু'হাতে চোখ চেপে পালিয়ে এসাম নিজের বাড়ীতে। বার বার শ্রবণ করবার চেষ্টা করলাম—কখন, এমন কবে লোটার শেকল ছিঁড়ে বেগিয়ে গেছি বাড়ী থেকে—কেনন করে পৌছলাম আমার অভূতপূর্বই বাগান-বাড়ীতে? কিছু মনে পড়লো না। পরের সকালে আমার আশ্রয়ন এসে বাবেই চিকিৎসা করবার, বাকে তত্যা করবার চেষ্টা করেছিলাম আমিই।

—মাঝে মাঝে মনে ততে সাগলো, এ চন্দ্রবেশ আর নয়—এবার আত্মহত্যা করে সব ছালা ছুড়োয়া। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ? আমাকে যন্ত্র করে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করবার চেষ্টা করতে যে, সে আমার অভাবে ক্ষান্ত হবে না। আমার পরিবর্তে আর এক জনকে যন্ত্র পরবে শুই নিখুম বন্দী। তার ওপর লক্ষ্য করলাম, চিরঞ্জীব ও-বাড়ীতেও হানা দিয়েছে বিভাসের কাছে। এটানী মন্ত তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিভাসের সঙ্গে। গান তো আর জানেন না, চিরঞ্জীব মাহুষ নয়, সাক্ষাৎ শয়তান! সেদিন বার বার বিভাসকে আর দেবদ্রতকে বারণ করেছিলাম ওদের সঙ্গে মিশতে। নইলে, হয়তো আমা-ই মতো ওদের জীবনও এক দিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

—এই ঘটনার পরই সম্মোহন বিভা নিয়ে নিজে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করি। উদ্দেশ্য ছিলো, চিরঞ্জীবের অপপ্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর সেই সঙ্গে সম্ভব হলে তার শয়তানীর কবল থেকে রক্ষা করা ডাট ফুলেব মত শূন্যব নীরো তরুণ-রক্তবীক। কিন্তু সম্মোহন বিভা চর্চা করতে করতে দেখলাম নিজের লাক্ষ্য দিয়ে অশরকে এর প্রভাবমুক্ত করা গেলেও নিজেই নিজের কোন উপকার করা সম্ভব নয়। তাই যেদিন মলয়া চিরঞ্জীবের বাড়ী গিয়ে সম্মোহিত হয়ে খুন করতে গিয়েছিলো বিভাসকে, সেদিন বাড়ী ফেরার পর তাকে আমি সম্পূর্ণ শ্রুহ করতে পেরেছিলাম; কিন্তু শ্রুহ করতে পারিনি নিজে।

—অনেক, অনেক বার ভেবেছি, যেমন করে হোক মুখোস খুলে দেবো শয়তানটার। কিন্তু তা আমি পারিনি। আমার হাতে তখন কোন প্রমাণ ছিলো না—আজ্ঞেও নেই। কিন্তু আজ যখন আবার উন্মত্ততার বোরে বাড়ীর সকলের অজান্তে লানলার গরদ ভেঙে পথে বেরিয়ে পড়ে হানা দিই নিজের অজান্তেই অতুলের বাগান-বাড়ীতে, তখনও আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন ছিলো। আবছা-আবছা মনে পড়ে, কাকে যেন ত্যাগ করে চলেছি। তার পর কি যে হলো, চোখে একটা আলোর কলক—সম্মোহনের প্রভাব কেটে গেলো মুহূর্তের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে শুভ্রভব করলাম—বিভাস আর দেবদ্রত আমার সামনে দাঁড়িয়ে, পাশে অতুল—যাকে আমরা মৃত বলেই জানিতাম, জানতাম খুন হয়েছে।

—চোখে আলোর কলক লাগার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম, তমনি শুরু হলো আমার সেই স্বাভাবিক যন্ত্রণা। ছুটে চলে এসাম বাড়ীতে। তার পর সকলের অজান্তে বিখপান করেছি। নতুনো বাবা পাবার সম্ভাবনা ছিলো। অতঃপর আমার শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে আমি অন্ততঃ এটুকু আশা করে যাবো, আমাব প্রতিটি কথাই সাক্ষী বাগা আছে, অপর্ণা, অতুল, চন্দ্রবর, বিভাস, দেবদ্রত, মলয়া—তারা সবাই চিরঞ্জীবের মুখোস খুলে দেবার জন্য আমার কথাগুলো যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ দেবে। অন্ততঃ সকলে আমার অজানিত অপরাধ ক্ষমা করবে। মনে করবে—ডাক্তার সেন খুনী নয়, পাগল নয়—সে মাহুষ, সাধারণ ভ্রম এক জন মাহুষ মাত্র। সম্মোহনের প্রভাবে সে যা করেছে, তা তার নিজের কাজ নয়—নিজের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তিও নয়—তার জগে দানী চিরঞ্জীব। বিভার, বিভা-য়.....

ডাক্তার সেনের শেষের কথাগুলো যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছিলো। শ্বাস নেবার ভঙ্গে বারো বাবে তিনি ধামছিলেন। মুহূর্তের সঙ্গে যেন নিজের সবটুকু শক্তি দিয়ে সংগ্রাম করছিলেন শেষ কথা ক'টি বলে যাবার জন্যে।

কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিকারের ঘোবে ডাক্তার উঠে বসতে গেলেন—কিন্তু পারলেন না। অকৌপিত দেহ তাঁর বিছানার ওপরই পুটিয়ে পড়লো। শেষ হয়ে গেলো এক মহৎ জীবন অতি শোচনীয় ভাবে।

ঘরের এক কোণে গোপ্তমানা অপর্ণা—কেউ মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইতে পারলো না। সকলের চোখের পাতাই তখন ভিক্ষে গেছে এক অভূতপূর্ব বেদনায়। [ ক্রমশঃ ]

## ত্রৈনে-বাসে

সুখেন্দু দত্ত

সেই তখন থেকে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে মিনিট গুণেই সুকান্ত। কিন্তু শিয়ালদহের বাসের আর দেখা নেই। দশ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। আশে পাশে লোকও ভ্রমতে শুরু করল মোড়টায়। এর পর বাস যখন আসবে, আসবে বোকাই হয়ে। তার পর আগে ওঠা নিয়ে লাগবে মারামারি, ঠেলাঠেলি আর ঝগড়াঝাঁটি। উঃ, জীবনটা একেবারে দুঃক্লেশ হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়েই! বিরক্ত হল সুকান্ত।

সামনেই কোন হলে যেন সিনেমা ভাঙলো। উজ্জ্বলিত আলোচনা করতে করতে এক দল সিনেমা-করতা যুবক ফুটপাথ দিয়ে চলেছে। তাদের কারো হাতে অঙ্গুলি সিগারেট, কারো ঠোটে সস্ত-কনে-আলা সিনেমার গান—লারে লাগ, পার—

আরো দু'জন এসে ভিড়টা বাড়ায় বানষ্টপেজে।

অনেক পরে পরে এক-একটা ট্রাম বা বাস শীতের জড়তা আর নিঃশব্দতা ভেঙ্গে দেবা দিচ্ছে! কুশাশয় একটু দূর থেকে

ট্রামের আলোটা দেখায় মরণাশ্রম বোগীর ঘোলাটে চোখের মত।  
হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ছোট্ট সেগুলো।

কিন্তু শিয়ালদহের বাসেব কি হল আজ? অসহিষ্ণু হয়ে  
উঠল সুকান্ত।

এরই মধ্যে দু'জন ভক্তলোক আবার পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা  
শুরু করে দেন এক সময়। সুকান্ত হাসে মান-মনে। শীতের রাতে  
বাসের অপেক্ষায় বাস্তব দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শরীর গরম রাখার  
সহজ উপায়ই বটে!

...কাবিয়া...চীন...আমেরিকা...এটম বোমা...বৃহৎ পক-  
শক্তি...

যাক, আশঙ্ক্য হল সুকান্ত—বাস আসছে এতক্ষণে। অনেক কষ্টে  
আগের ষ্টপেজগুলোর মায়া কাটিয়ে একটা বাস কর্কশ চাঁকাবে  
আজ্ঞাঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় মোড়টার। অপেক্ষমান  
লোকগুলোর মধ্যে একটা সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। কোরিয়ার  
সমস্যা চিত্রিত এবং বিচলিত ভক্তলোক দু'জন তাঁদের সেই  
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থগিত বেনে বাসের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড বেগে  
ছুটলেন এবার। আগে থেকেই বোকাই গাড়ী। হাতলটা কোন  
রকমে ধরে সিঁড়িতে একটা পা রেখেই আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরটা  
ভেতরে ছুঁড়ে দেন তারা। এদিকে কণ্ঠকূটার হাঁকতে শুরু করে—  
ইস্পানেড...বহুমতল্লা...শিয়ালদহ...গ্রিসিন রো—ডু!

উঠবার জন্ত প্রস্তুত হয় সুকান্ত। কিন্তু সে আয়োজনটুকুই  
শুধু সাব হয় তার। সিঁড়ির দিকে একটা পা বাড়াতে গিয়েই  
হঠাৎ চিত্তকে এক পাশে গিয়ে পড়ে সে। আর পেছন থেকে  
কয়েক জন এগিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে পা মাড়িয়ে উঠে পড়েন  
বাসটার। দেখতে দেখতে সিঁড়িতে লোক কুপড়ে শুরু করে।  
উঃ, এতক্ষণ বাদে সাড় বা একটা বাস পাওয়া গেল তাও শেষ  
পর্যন্ত পায়তারা করত সাড় ত'ও, উঠেই পাওয়া গেল না হাই!  
বহা বিরক্ত হয় সুকান্ত।

পাশের পাঞ্জাবী কণ্ঠকূটার কবরত হাঁকছে—আইয়ে, আইয়ে,  
মোজালি...তিব্বন কোড...পালি গাড়ী...আইয়ে!...

পদনদবাসীর সেই উল্লসিত আনন্দে অপ্রত্যাশিত হয়ে আর  
এক জন এগিয়ে গিয়ে আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে বাসের হ্যাণ্ডলেটা  
ধরে কুলে পড়ে। তার পর কয়েক জন হতভাগ্যের বিমূঢ় দৃষ্টি  
সামনে দিয়ে কলস্ত মানুষ সহ বাসটা এক সময় দেয় ছেড়ে। আবার  
গুনতে পাওয়া যায় পাইলটের মতর কঠোর—আগে বট বাইয়ে,  
আগে বট বাইয়ে! এবার অবশ্য বাস্তব লোকগুলোর উদ্দেশ্যে  
নয়, বাসের মালিকদের উদ্দেশ্যে। পবেব ষ্টপেজের জন্ত প্রস্তুত  
হচ্ছে পাঁজী!

বিষম বিরক্ত হয়ে সুকান্তর। আবার যে কখন আসবে বাস!  
মিনিক হাশক তো নিশ্চিত বটেই। ককমারি আর ফি! বাস-  
ষ্টপেজটার আরো কয়েক জন দাঁড়িয়ে ছিলেন—সুকান্তর মতই  
হতভাগ্য। হঠাৎ করুণ স্বরে আর্ন্তনাদ করে ওঠেন তাঁদের মধ্যে  
এক জন—আমার মানিবাগ!

তাড়াতাড়ি পকেট হাতডাতে থাকেন তিনি বার বার।

ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট। বাস আসতেই সেটার দিকে এগিয়ে  
যান উনি, সিঁড়ির কাছে গিয়েও নৌছান ভিড় ঠেলে। কিন্তু

তার পরই ধাক্কা পেয়ে আবার পেছনে হটে আসেন। আর এরই  
মধ্যে কোন স্তবোগাধমী...

তাড়াতাড়ি নিজের বুক-পকেটটার হাত দেয় সুকান্ত। না,  
ঠিকই আছে—নিশ্চয়ই হয় সে। ভক্তলোকের জন্ত দুঃখ হয় তার।  
সমবেদনাও জানান দু'এক জন। কেউ প্রশ্ন করেন—কত ছিল  
মশাই-বাগে? কেউ বা অবাচিত উপদেশ দান করেন বাস্তা-ঘাটে  
আর একটু সাবধান হয়ে চলবার। ভক্তলোক কিন্তু কারো কথাই  
গুনছেন বলে মনে হয় না।

আর একটা বাস আসছে বলে মনে হয় যেন? এত তাড়াতাড়ি  
তো আসবার কথা নয়? কিন্তু জোড়া লাইট দেখেই বোকা যায়  
যে, শিয়ালদহগামী বাসট বটে। কাছে আসতে নিশ্চিত হয়  
সুকান্ত। বুঝতে পারে, আগের বাসটাকে তাড়া করে চলেছে এটা,  
তাই এত তাড়াতাড়ি।

এবার আগে থাকতেই তৈরী হয়ে নেয় সুকান্ত। এটাকে  
মিসু করা চলবে না কোন মতেই। সত্যি, ট্রামে-বাসে উঠবার জন্ত  
বত কায়ালা করতে হয় আজকাল, সেটা আগে থেকে জানা থাকলে  
ছেলেবেলায় জিমনাস্টিকটা শিখে রাখত সুকান্ত, বেশ কিছুটা কাছ  
দিত এই দুঃসময়ে।

কিন্তু ভাবনার সময় নেই আর, বাস এসে পড়ে মোড়টার।  
চটপট উঠে পড়ে এবার সুকান্ত। শুধু তাই নয়, রীতিমত  
দ্বিতীয় হান অধিকার করেই ওঠে। দুর্গন্ধ ঘোঁরা ছেড়ে আর  
কর্কশ চাঁকবার করে বাস আবার ষ্টপেজ ছেড়ে এগোয়।

এতক্ষণ শুধু কোন মতে বাসে উঠবার কথাটাই ভাবছিল  
সুকান্ত। উঠতে পেরে এখন আবার মনে হল, একটু বসতে পেলে  
বেশ ভাল বিষ। এত দূরবে বাস্তা!

বাসের ভেতর নানা ধরনের মানুষ। গোটা দুই মাতালও  
আছে আবার। যাত্রীদের মধ্যে কয়েক জনের সঙ্গে গাঁটির, বোচকা  
আব টিনের স্তম্ভকেশ। শিয়ালদহ স্টেশনের যাত্রী নিশ্চয়ই।  
কণ্ঠকূটারের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়েই মাল সংগে নিয়ে উঠেছে  
মনে হয়। উঠবার সময় এই সব গাঁটি-বোচকা পাঞ্জাবী  
কণ্ঠকূটারের চোখে পড়লে এগুলো সে ড্রাকভারের পাশে চালান  
না করে ছাড়িত বলে মনে হয় না। তাড়াও বাদায় করত  
তার জন্ত।

—গোপাইচা, তর টিকিট আঁমি লাইসি রে! বোচকাধারী  
এক জন অবশ্যই সিঁড়ির কাছে দাঁড়ান 'গোপাইচা'র উদ্দেশ্যে  
চেঁচিয়ে ওঠে।

—বাবু টিকিট!...টিকিট আপুকা!...টিকিট ভাই?

—টিকিট দাদা!...টিকিট সাব?

কণ্ঠকূটার সাহেব তার নিজস্ব হিন্দুস্থানীতে নিজস্ব বাংলা  
মিশিয়ে তাতে পাঞ্জাবী সুর দান করে সাবনয়ে টিকিট প্রার্থনা  
করতে থাকে যাত্রীদের কাছ থেকে।

যারা বসেছিলেন তাদের কারো হাতে এক আনার টিকিট দেখা  
যায় কি না লক্ষ্য করতে থাকে সুকান্ত। উদ্বেগ, সে বকম কাউকে  
পেলেই তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, তার পর তিনি উল্লেই ভায়গাটা  
দখল করে বসবে। এ সব ব্যাপারে আগে থেকে তৈরী হয়ে  
থাকলে সুবিধা হয় অনেক।

এক আনার টিকিট কাটেন এক ভদ্রলোক। তাঁর হাতে টিকিটটার নীল রঙে মুগ্ধ না হয়ে পাঁবে না শুকান্ত।

মাতাল ভাঁটোর একটা আবেল-তাবোল বকতে শুরু করে। ওর বিব্রত সঙ্গী বুখাই চোঁকা করে শুকে থামাবাব। পাঁশের সিটে বসে লোকটা বিড়ি ধরান একটা, সন্দ্বীকে একটা দান করে। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল দেখছি! হাঁপিয়ে ওঠে শুকান্ত।

এক সময় এদিকে তাকিয়ে চোঁকা বড় বিরক্ত হয়ে ওঠে শুকান্ত। এক আনার টিকিটবারী টিকিটটা নিয়ে অত নাড়াচাড়া শুরু করেছে কেন? শুটা অত দেখিয়ে রাখবার কি আছে? টিকিটের নীল রঙে আকৃষ্ট হয়ে আবার এক জন ছদ্ম তার মত এগুই মন্তসব নিয়ে সিটটার সামনে এসে দাঁড়াতে চাইবে। তার পর সিটটা খালি হলেই তখন আবার দু'পক্ষই অস্বস্তি অশোভন ভাবে এ ওকে ঠেলে আগে বসতে চাইবে। সে আবার এক বিলী ব্যাপার! কি যজ্ঞাট!

—লিঙ্গিয়ে পোন্না আনা! আর একখানা টিকিট হয় এক আনার।

অকস্মাৎ সিঁড়ির কাছে আর একটা সাধা গলা শোনা যায়—  
ধরমতলা...শিয়াল...হিরিসন বা—...

কণ্ঠাকটার একা সব দিক সামলে উঠতে পারে না, তাই এ্যাসিষ্টাণ্ট হিসাবে এক ছোকরাকে রেখেছে সে। পাণ্ডারী কণ্ঠাকটারে টিকিট ফাঁকি দেবার মত চুসাননী যাত্রীরও অভাব নেই, তাদের ভুলেই বিশেষ করে এটি ব্যবস্থা। তাছাড়া কণ্ঠাকটার ভেতরে টিকিট কাটতেই বাস্তব থাকে দেবীর ভাগ সময়, তাই তখন ঈপেক্ষলগ্নে সামলায়। ঈপেক্ষের সামনে বাস হলেই চোঁকা করে ওঠে—আইয়ে...খালি গাড়ী, খালি গাড়ী!...ধরমতলা...শিয়াল... তার পর যাত্রী কুল নিয়েই ডাইভারের ডাক্তার প্রচণ্ড হয়ে থাকে—  
টিক হায়! সংগে সংগে বাসের টিনের বড়ির ওপর হাজ্জারে ছুঁটো চড়ও পড়বে। ওর এই কষ্টস্বরূপ খাঁ ডাইভারের কর্তৃত্বকে প্রবেশ না করে, তবে টিনের আতঙ্কনা তো নিশ্চয়ই পৌঁছবে! কণ্ঠাকটারের কথা শুনে শুকান্ত বৃক্বে পারে ছোকরার নাম 'বিরিজাস'।

বদবার জায়গা পাওয়া যায় একটা এবার। আশান করে বসে শুকান্ত।

মিউজিয়মের সামনে বাস থামলে এক জন মহিলা ওঠেন। সিঁড়ির বা নিকের সেডিক্স সিঁটটা চাব ঘন পুরুষ বেদখস করে বসে আছেন। চার জনই তীতে দেখতে না পাশের ভাগ করে বসে থাকায় অগত্যা কণ্ঠাকটারকেই হস্তক্ষেপ করতে হয় এদিকে।

—জানানা সিট জোড়, লিঙ্গিয়ে, সাব!

চার জন 'সেউসু' বিবস মুখে উঠে দাঁড়ান এবার। 'সেডি' গিয়ে একা চার জনের সিটখানা দখল করে বসেন।

এক-একটা ঈপেক্ষ এসে গাড়ী যেন আর ছাড়তে চায় না। অতিষ্ঠ যাত্রীদের বিকল্প মজরা কানেক তোলে না ডাইভার। নির্দিষ্ট সময়ের আগে ডিপোয় গিয়ে ওঠা চলে না। এদিকে বাস থামাবার লক্ষ্য যখন ঘটা দেখা হবে, তখন তারাই আবার উল্টো সুর গেয়ে বলবে, বাব বাব গাড়ী থামিয়ে শেষে সেট ফটিন...  
...উচ্চা ওদের বিন্যাস নেই। বাড়ী-বাড়ী দরজায় যে বাস

থামতে পারে না, সেটাও আপনাকে সবিনয়ে নিবেদন করতে ভুলবে না।

বাক্স, এসপ্লানড এল এতক্ষণে। চোঁকা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে শুকান্ত। ওকে, অনিমেব বাবু না? এই বাসেই তো উঠছেন দেখি! সারলে এবার। ভদ্রলোকের সংগে এখন দেখা হওয়া মানতে এত কষ্টে লোটার সিটটা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান আর সেই সংগে মুখে হাসি ফুটিয়ে (মনে মনে অবশ্য ভদ্রলোকের মৃগপাত করে) বলা—আরে, অনিমেব বাবু যে? বহন, বহন! বিপদ এড়াবার এক মাত্র উপায় হিসাবে অগত্যা জানালা দিয়ে বাইরে বৃষ্টি নিবন্ধ করতে হয় শুকান্তকে। বাস্তব পাশে বাড়ীগুলোর দিকে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ওঠে সে চোঁকা!

কিন্তু ভাগ্য মন্দ।

—আরে, শুকান্ত না?

না, নিস্তার নেই। সব বুঝেও চমকে উঠবার ভাণ করে কিরে তাকাত্তে হয় শুকান্তকে।

—অনিমেব বাব? কখন উঠলেন? আরে, বহন বহন!

—না, না, সে কি কথা? বস ভূমি!

মুখে বলেন বটে কথাটা, কিন্তু শুকান্ত লক্ষ্য করে, বলতে বলতে একটু এগিয়েও আসেন উনি সিটটার দিকে।

—তার পর, সব ভাল তো? শুকান্তর সিটটায় গ্যাট হয়ে বসে শুকান্তরই কুশল প্রশ্ন করেন তিনি।

—হ্যাঁ, তা ভালই। জোর করে একটু হাসি টেনে এনে জবাব দেয় শুকান্ত।

গাড়ী এবার এসে থামে ধ্বংসলয়।

—একটু অসুখা দেখেন ভাল, একটা প্যা বাবব শুধু! সিঁড়ির কাছে গমন জনের বাকুতি শোনা যায়।

—হবে না মশাই, পবের গাড়ীতে আসুন! 'দাদা'র কষ্টস্বরূপ ডাইয়ের প্রতি বিন্দু মাজ হেতের লক্ষণও দেখা যায় না। এমন কি সম্প্রদেয় অতীকার করে বসেন উনি সোকাশুতি।

অনিমেব বাবু বেশ আগাম করেই বসে আছেন সিটটায়। কিন্তু ভদ্রলোকের কপালে এতটা ধারাম ন্যূন লেখা নেই—

...বাব...বাব...বাব...বাব...বাব...বাব...বাব...বাব...

সর্বনাশ, ইঞ্জিন বিগড়েছে দেখছি! মুখ শুকিয়ে যায় শুকান্তর। এখন যদি আবার এরকম তাণ্ড ঘটত...

বাস-ভর্তি লোকের মুখ কালা হয়ে ওঠে দেখতে।

ডাইভার সাতের চিত্তিত মুখে এটা-সেটা নাড়ে কিছুক্ষণ। গাড়ীর আলোটা নিকিয়ে দিয়ে ষ্টাট নেবাব চোঁকা করে একবার। ফল হয় না অবশ্য তাতে কিছু। নেবে গিয়ে ইঞ্জিনটা পরীক্ষা করে আসে কিছুক্ষণ। তার পর সিটে এসে বসে আবার। একটা সিংহনাদ করে অকস্মাৎ।

—আরে বি-বি-জ-লা-ল!

—জী হো-ও!

—হাণ্ডিল মাঝ শালা!

আলোটা আর একবার নিবিয়ে দেয় পাণ্ডারী ডাইভার। ইঞ্জিনের একটা বিকট শব্দ আর পেট্রোলের কটু গন্ধ।

‘বিরিঞ্চালোর’ সহায়তার এর পর গাড়ী চলে গতি। বাসন্ত লোক  
জন্মের নিশাস ফেল একটা।

টাইম মেক-আপ করতে হবে। এতক্ষেণে জোরে চলতে শুরু করে  
বাস। হঠাৎ এক সময় স্রুতান্তর কানে আসে ‘বিরিঞ্চালোর’ কণ্ঠস্বর।

—আ গিয়া মৌল্লি...মৌল্লি...

—চ্য-লো-পু...ঠিক হ্যায়।

হঠাৎ চমকে ওঠে স্রুতান্তর। জারে, বাস যে বাড়ীর পথ ফেলে  
চলে দেখতি। হড়হড় করে দরজার দিকে ছোট্ট সে। কারো  
পা মাড়িয়ে দেয়, কাউকে লাগায় কহুইয়ের গুতো। কানে আসে—

কে যেন মধুর একটা সর্বাধনে আপ্যায়িতও করে বসে। কিন্তু  
তখন আর অত কিছু দেখবার সময় কোথায় স্রুতান্তর?

—এই য়োক্কে...য়োক্কে কণ্ডাক্টার সাহেব...এক দম  
বান্কে।

আর বান্কে। কণ্ডাক্টার সাহেব নির্ঝরকার। এমনিত্তেই  
তো লেট অবধারিত আজ। গাড়ী ধামে একেবারে সেই বহুভাষারে।

এতটা পথ এখন আবার যেটেই ফরতে হবে স্রুতান্তরকে। বাজলো  
ক’টা? শিখালদহ ষ্টেশনের বড় ঘাড়টার দিকে একবার তাকিয়ে  
নিম্নে জোরে পা চালায় স্রুতান্তর।

## বিজ্রোহী

শ্রীঅরবিন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়িয়ার এক অখ্যাত গ্রাম—নাম তার চমুখন্দ। এখানে একটি  
পুত্র-পাড়ে আশ্রয় নিয়েছে বাঙ্গালার পাঁচটি বিপ্লবী। চারি পার্শ্বের  
আগাধাগুলি স্থানটিকে করে রেখেছে সুরক্ষিত দুর্গের মত। বড় রাস্তা  
আজ তারা...। সুদূর বাঙ্গালা থেকে বহু বিপদ অতিক্রম করে  
আজ তারা এখানে উপস্থিত, ফলক বিশ্রামের আশায়।

হঠাৎ সেই নিঃশব্দ বনভূমিকে কম্পিত করে গর্জ্জে উঠল অজ্ঞপ্ত  
বন্দুক। চারি দিক হোতে আসতে লাগলো ঝাঁক-ঝাঁক গুলী...।  
চমকে উঠলেন বিপ্লবীরা। বুঝতে পারলো সাম্রাজ্যবাহী ব্রিটিশের  
ধারা তারা আজ পরিবেষ্টিত। মুহূর্তের মধ্যে তাদের রাস্তা দেহের  
মধ্যে ভেগে উঠল উষ্ণ রক্ত। শিরা-উপশিরার মধ্যে দিয়ে বইতে  
লাগল তাইই প্রবল শ্রোত। বুঝলেন পলায়ন করার সমস্ত পথ  
রুদ্ধ। অতএব...। আত্মসমর্পণ করা তাঁরা কর্তব্য করতে  
পারেন না। প্রত্যেকে সঙ্কল্প করলেন তাদের আত্মজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে  
শিথিলে যাবেন পরাধীনতার বন্ধন মোচন করার জন্য দিতে  
আত্মবলি।

দলের নেতার আদেশে শত্রুকে তারা জানিয়ে দিলেন তারা  
যে-কোন অস্থায়ী সম্মুখীন হোতে প্রস্তুত।

যুদ্ধ চলল অবিশ্রান্ত গতিতে...।

এক দিকে বাংলার পাঁচ জন বীর বিপ্লবী সংগ্রামের উদ্ভাসনার  
বেপথ্যে গুলী ছুড়ে চলেছে—জীবন পণ করে অত্যাচারী শাসকের  
মলোচ্ছেদ করার জন্যে, আর অল্প দিকে ব্রিটিশের পদলেহী এক দল  
প্রাণসর্পক সেপাহী।

সারা আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হোতে লাগল বন্দুকের শব্দে।  
গুলীর আঘাতে নিবিড় বনানীর বৃক্ষরাজির ছিন্ন পত্রাবলি ঘোরে  
পড়তে লাগলো। পাখীরা শব্দ ফেলে পালাল ডানা ঝটপটিয়ে।  
সারা বনভূমি তার গেল বাকুদের গর্জে। বিপ্লবীদের হাতে মরতে  
লাগলো বহু সেপাই। সুযোগ বুঝে তারা ঢুক পড়লো আরো  
গভীর জঙ্গলে। শত্রুরা আরো জোরে চেষ্টা ধরল তাদের সাঁড়াশির  
মত।

এমন সময় একটি গুলী এসে বিছ ছেল বিপ্লবীদের এক জনের  
বক্ষ-পঙ্কে। বিপ্লবী তরুণের উষ্ণ রক্ত ছিটকে পড়ল বনভূমির সারা  
প্রান্তরে। সবুজ বৃক্ষ-সতার বৃক্কে আঁকা রইল তার রক্তদানের স্বাক্ষর।

তৃকার্ত্ত ধরিত্রীর কোলে লুটিয়ে পড়ল বিপ্লবী। মহাকালের কোলে  
আশ্রয় নেবার পূর্ব্বে বলে গেলেন দু’টি কথা—“জয়ী হতেই হবে।”

বিশ্রান্ত কর্মীর মৃত্যুতে দলের নেতা একটু বিচলিত হলেন।  
কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যে। পূর্ণ উত্তরে আবার তারা  
আরম্ভ করিলেন গুলী ছুড়তে। তাঁরা ভাবলেন—এই রকম আর  
আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চালাতে পারলে তাঁদের পলায়নের পথ সুগম হবে...

কিন্তু বিধাতা হাসলেন ক্রুর হাসি। ধসে গেল তাদের কল্পনা।  
একটি বুলেট এসে লাগলো নেতার ডান উরুতে। ফোয়ারার মত  
রক্ত ছুটলো। উষ্ণ শোণিতে ভেসে গেল তাঁর সারা অঙ্গ। কম্পিত  
দেহে লুটিয়ে পড়লেন তিনি বনভূমির কোলে। ক্ষতস্থান থেকে  
চুইয়ে-চুইয়ে পড়তে লাগলো রক্ত। নেতার এই অবস্থা দেখে বিপ্লবীরা  
একেবারে হুসড়ে পড়লেন। এক জন নিজের জামার হাতা ছিঁড়ে  
বেঁধে দিলেন নেতার ক্ষতস্থান। কিন্তু অত্যধিক রক্তপাতে  
তিনি হোরে পড়লেন একেবারে শক্তিহীন। আদেশ দিলেন যুদ্ধ  
ধামাতে, আত্মসমর্পণ করতে...

মুহূর্তের মধ্যে তাদের ঘিরে পীড়াল বৃষ্টির পদলেহী দল।  
আহতদের পাঠান হোল বালেশ্বরের হাসপাতালে।

১০ই সেপ্টেম্বর...

পূর্বাংশে সূর্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী দলের নেতার  
জীবনের উপর যবনিকা নেমে এলো ধীরে-ধীরে। পরপারের ডাক  
এলো তাঁর। সাধ্য নেই তাঁর অবহেলা করার এই আহ্বানকে।  
বিপ্লবী-বাংলার অমর বোদ্ধা চিরনিজায় নিমগ্ন হলেন। বাংলার  
স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের উপর নেমে এলো কৃষ্ণ-  
যবনিকা...

চিনতে পারলে কারা এই পুঙ্ক বিজ্রোহী? বাবা এক দিন সারা  
ভারতের বৃক্কে আলিয়ে দিয়েছিল বিজ্রোহের লোলহান শিখা—এ  
হলো তাঁদেরি কাহিনী। এঁদের নাম—চন্দ্রপ্রিয়, মনোজ্ঞন,  
নীলেন এবং যতীশ। আর এঁদের নেতার নাম—যতীন্দ্রনাথ  
মুখোপাধ্যায়। বীর আর এক নাম বাবা যতীন।

মৃত্যু আজ এঁদের গ্রাস করেছে জানি, কিন্তু এঁদের আত্মা  
বাংলার প্রতি ধূলি-কণার, আকাশ-বাতাসে—মানবের মনের  
মণিকোঠার—পল্লী-বাউলের একতারার ঝংকারে রইবে বেঁচে।





লোলা মণ্টেজ

ত্ৰিহেমেন্ত্ৰকুমাৰ দাস

নৰ্ত্তকী ও গণিকা থিয়োডোৰা ৰাজপথৰ পৰা কেমন ক'ৰে পূৰ্ব-বোম-সাম্ৰাজ্যৰ সিংহাসনে উঠি বসেছিলেন, কিছু কাল আগে সম্ভাৱে তা বৰ্ণনা কৰেছি।

আজ বলব আৰ এক জন বিজয়িনী ও ৰশবিনী নৰ্ত্তকীৰ কাহিনী। নট্যৰ বৃত্তি ত্যাগ কৰোৱাৰ পৰা বৰ্খাৰ্শ্ব সুলীলা নাৰীৰ মত জীৱন ৰূপন ক'ৰে থিয়োডোৰা ঐতিহাসিকদেৱ অভিনয়ৰ লাভ কৰতে পেরেছিলেন। কিন্তু আজ যাৰ কথা বলব, বাংলা ভাষাৰ তাৰ উপাধি হওয়া উচিত 'ৰায়বাৰিনী'। য়োৰোপেও তাৰ একটো উপাধি ছিল—'মেয়ে-সয়তান'।

কিন্তু তাৰ নাম হ'ছে, লোলা মণ্টেজ। ঔপন্যাসিকৰা কল্পনায় অনেক উৎকট নাৰীৰ চিত্ৰ এঁকেছেন। লোলা কিন্তু বাস্তব জগতে জন্ম নিয়ে প্ৰগতি কৰেছে ঐতিহাসিকদেৱ কল্পনাকেও।

এক দিন য়োৰোপেৰ দেশে দেশে যাৰ নাম ফিৰবে লোকেৰ মুখে মুখে, যাৰ পায়ৰে তলায় লুটোবে ৰাজা-ৰাজড়াসেৰ মুকুট এবং শ্ৰেষ্ঠ কবিৰ দল যাৰ নামে কৰবে শ্ৰদ্ধাশ্ৰী ৰচনা, সেই লোলাৰ শৈশৱ ও প্ৰথম যৌৱন কেটে গিয়েছিল এই কলকাতায় এবং ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত নগৰেই। এ সময়ে তাৰ চৰিত্ৰে বিশেষ বিস্ময়কৰ কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে সৌন্দৰ্য্যে ও লীলা-চাপল্যে চিৰদিনই সে ছিল অসাধাৰণ।

লোলা মণ্টেজ তাৰ পিতৃদত্ত নাম নয়। তাৰ বাপেৰ নাম এনসাইন গিলবাট, শিশু কল্যকে নিয়ে কলকাতায় এসে তিনি মাৰা পড়েন। তাঁৰ বিধৱা স্ত্ৰী আবার বিবাহ ক'ৰে লোলাকে (এ নাম সে নিজেই গ্ৰহণ কৰেছিল) বিলাতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে বয়োবৃদ্ধিৰ সঙ্গে সঙ্গে তাৰ তমূলতায় ফুটে উঠতে থাকে বৌবনেৰ ফুল। মেয়েৰ বিয়েৰ স্ত্ৰে মা ব্যস্ত হন। হবু-জামাইৰূপে নিৰ্ব্বাচন কৰেন কলকাতা হাইকোৰ্টেৰ এক জজকে। নাম তাঁৰ স্ত্ৰী আত্ৰাহাম লামুলি। ধনী, কিন্তু বয়সে লোলাৰ ঠাকুৰদাদা হবাব ৰোগ্য। বুড়ো বৰ নামজব্ব ক'ৰে লোলা লেকটেনাণ্ট টমাস জেমস নামে এক যুবকেৰ সঙ্গে চম্পট দেয়। তাকেই সে বিবাহ কৰে। তাৰ পৰা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আবার কলকাতায় ফিৰে আসে।

আফগানিস্থানে অশান্তি। লেকটেনাণ্ট জেমস স্ত্ৰীকে নিয়ে যুদ্ধযাত্ৰা কৰলে। পথে মহাৰাজা ৰঞ্জিৎ সিংহেৰ আমন্ত্ৰণে স্বামীৰ সঙ্গে লোলা তাঁৰ দৰবাৰে গিয়ে হাজিৰ হয়।

যুদ্ধ শেষ হয়। স্বামীৰ সঙ্গে লোলা যাৰ ভাৰতৰ এ দেশে-সে দেশে। স্বামী ক্ৰমে কেবল মদিয়া নয়, পৰস্ৰীতেও আসক্ত হয়ে পড়ে। এক দিন সে লোলাকে ফেল আৰ এক নাৰীকে নিয়ে

লোলা কঁদলে না, ভয় পেলে না। সে

সৌন্দৰ্য্যেৰ জয় সৰ্ব্বত্র। নিজেৰ কৰ্ত্তব্য হিৰ ক'ৰে কম্পি-পনি পাৰ হয়ে আবার সে চলে গেল বিলাতে। তাৰ পৰা থেকেই বুকু হ'ল লোলাৰ জীৱনেৰ আসল বোম্বাৰ্জ।

লণ্ডন সহৰেৰ "হাৰ ম্যাগেজিন্স অপোৰা হাউস" থেকে বিজ্ঞাপিত হ'ল—'স্পেনীয় নৰ্ত্তকী লোলা মণ্টেজৰ নৃত্য।' সেখানে লোলা নাচ দেখাতে লাগল বটে, কিন্তু বিলাতে সে বিশেষ সন্নিধা ক'ৰে উঠতে পাৰলে না। কিন্তু সে হয়ল না। লণ্ডন থেকে বিদায় নিয়ে দেখা দিতে লাগল য়োৰোপেৰ নানা সহৰেৰ ৰঙ্গালয়ে। ক্ৰসেল্‌স্, ওয়াৰিস, বাৰ্লিন, ও সেন্টপিটাৰ্গবাৰ্গ। এ-সব জাহগায় তাৰ অভিনয়ৰ অভাব হ'ল না। যদিও তাৰ নাচ দেখে লোকেৰ চোখ ভুলত না, কিন্তু তাৰ ৰূপ-লাবণ্য দেখে সকলেই হাৰিয়ে ফেলত হয়।

ইতিমধ্যেই য়োৰোপ-বিখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পী ফ্ৰান্স লিস্‌জুট লোলাৰ পায়ে লিখে দিয়েছেন দাসতথ্য। য়োৰোপ সফৰেৰ সময়ে তিনি তাৰ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ছায়াৰ মত। অত বড় প্ৰতিভাধৰ তাৰ গোলাম, লোলাৰ গৰ্ৰু আৰ ধৰে না। কিন্তু তাৰ ব্ৰত মধুকৰেৰ মত, শিল্পীৰ আলিঙ্গনও তাৰ কাছে ক্ৰমে একেয়ে হয়ে এল।

সে সৰে পড়ল প্যারিস সহৰে। ৰঙ্গালয়ে নেচে প্ৰভাব বিস্তাৰ কৰতে লাগল নব নব ছন্দেৰে উপৰে। তখন তাৰ প্ৰকৃতি কেমন, লোলাৰ নিজেৰ লেখা এই কথাগুলি পড়োঁই বুকেতে পাৰা যাবে : "তিনি, পুৰুষকে ভালোবাসে 'ও তাৰ কথায় ওঠে-বসে, এমন বোকা মেয়েও না কি আছে। আজব কথা, বিশ্বাস হয় না। আমি পুৰুষদেৰ শাসন কৰি নয়ন-বাণ দিয়ে।"

প্যারিসেৰ অধিকাংশ পুৰুষ বখন লোলাৰ নয়ন-বাণেৰ দ্বাৰা শাসিত হবাব স্ত্ৰে আত্ৰাহ প্ৰকাশ কৰেছে, তখন এক জনেৰ কাছে তাৰ গৰ্ৰু হ'ল বৰ্ক। তিনি হ'ছেন এমিল গিয়াৰ্ডিন, ফ্ৰান্সী দেশেৰ প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁৰ ছন্দকে বিগলিত কৰোৱাৰ স্ত্ৰে লোলা বাছা-বাছা অন্ত্ৰপ্ৰয়োগ ক'ৰেও ব্যৰ্থ 'হয়ে নিজেৰ ডায়েরিতে লিখে ৰাখলে : "আমাকে হাৰ মানতে হ'ল। কি ৰকম পুৰুষ এ? যত আবেগভৰে আমি তাকাই, গিয়াৰ্ডিন মুখ ফিৰিয়ে নেয় ঘুণাভৰে। সিংহেৰ দৃষ্টি ছাড়া আৰ কিছু তাকে অভিভূত কৰতে পাৰবে না। আমাৰ সাথে কুলালো না।"

কিন্তু লোলাৰ বাতুল চৰণেৰ তলায় আপন আপন প্ৰাণকে বিছিয়ে দিলেন আলেকজাণ্ডাৰ ডুমা, ইউজিন স্ক্ৰ, থিয়োফাইল গোটুয়েৰ, জাৰ্নিন, জুজাৰিয়াৰ ও ফিয়েৰোটি টোনে প্ৰভূতি সন্নিধাত সাহিত্যিকৰা।

লোলাৰ চোখ দেখে এক ভক্ত কবি উচ্ছসিত হয়ে বলেছেন :

Eyes as blue as vaults of heaven,

Sunlit as the summer air !"

আৰ এক ভক্তেৰ উক্তি : "বুকে তাৰ হৃদয়াৰে কঁপিত হ'টি পূৰ্বত আপেল।"

লোলাৰ নাচ দেখে এক সমালোচক কটু ভাষাৰ নিন্দা কৰলেন। ক্ৰুছা লোলাৰ উচ্ছানিতে সাহিত্যিক জুজাৰিয়াৰ বন্দনুখে আহ্বান কৰলেন সমালোচকে। জুজাৰিয়াৰ মাৰা পড়লেন। গোটা সহৰ মাৰমুখে হয়ে উঠল। লোলা প্যারিস থেকে পলায়ন কৰলে।

তাৰ পৰা সে হাজিৰ হ'ল গিয়ে জাৰ্মানীৰ বেডেন-বেডেন সহৰে। সেখানে ৰাজা হেনৰিৰ সঙ্গে দেখা। ৰাজ্য ক্ষুদ্ৰ হ'লেও তিনি

লোলা কঁদলে না, ভয় পেলে না। সে

লোলা প্রাসাদে বাস করে ও রোজ চাবুক হাতে বোড়ার চড়ে বেড়াতে বেরোয়। তার অদ্ভুত সাজ-পোশাক ও ভাব-ভঙ্গি দেখে ক্ষুদ্রে সহরের বাসিন্দারা রাস্তার ভিড় ক'রে অশ্রু বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ভিড় দেখে লোলার মেলাজ গরম হয়ে ওঠে, জনতার বার-তার শিঠের উপরে চালাতে থাকে সপাসপ চাবুক। সবাই পালিয়ে পিঠি বাঁচায়।

রাজার চমৎকার বাগান। অনেক টাকা খরচ করেছেন তিনি বাগানের পিছনে। তাঁর সখ, সবস্তু পুষ্পশয্যা রচনা করা, কিন্তু লোলাও সখ অল্প রকম।

এক দিন সে ফুলের বিহানার উপরে বোড়া ছুটিয়ে প্রাণ ভাঁরে বেড়িয়ে নিলে। দেখতে দেখতে সব ফুলগাছ সাবাড়। সখ মিটিয়ে লোলার মুখে হাসি আর ধরে না।

লোলার রূপের মোহ এত দিন রাজা হেনরিকে পেয়ে বসেছিল, তার নামে কোন নালিস তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। কিন্তু নিজের সাধের বাগানের চরম হৃদ্বংশ দেখে তাঁরও মোহ ছুটে গেল। লোলাকে বললেন, “বিদায় হও।”

লোলা হাসতে হাসতে বললে, “তথাস্তু!”

এই তো লিলিপুটের রাজ্য আর তার ক্ষুদ্রে রাজা! এখানে বন্দী হয়ে থাকবার জন্তে তার জন্ম হয়নি। সে বিদায় নিলে।

ছুটল এক ইংরেজ ভক্ত, উঠল তাব সঙ্গে গিয়ে মিউনিক সহরের এক হোটেলে। সেখানেও সে থাকে-তাকে চাবুক মেরে আদর করে, সকলে শ্রদ্ধাশ্রদ্ধ। তার উপরে সে পুষেছে মস্ত বড় একটা মাস্তিক কুকুর, কেমন ক'রে মানুষকে কামড়াতে হয়, তাকে তা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এক দিন কোন ধনী হোটেলের হল-বরে ভোজসভার আয়োজন করেছেন। অতিথিরা পান-ভোজনে নিযুক্ত, আচরণে লোলার আবির্ভাব। গায়ে প'ড়ে সকলকে সে গালি-গালাজ করতে লাগল।

হোটেলের ম্যানেজার প্রতিবাদ করতে এলেন, লোলা তাঁর মুখের উপরে বসিয়ে দিলে বিবম এক ঘসি।

অতিথিরা ফাপা হয়ে তেড়ে এল, লোলা দিলে কুকুর সেলিয়ে।

কিন্তু পরদিনই লোলাকে সে হোটেল ছাড়তে হ'ল।

মিউনিক থিয়েটারে নাচবার জন্তে লোলা ভোড়ভোড় করতে লাগল। কিন্তু সে তখন রীতিমত কুবিখ্যাত হয়ে উঠেছে, কর্তৃপক্ষ তাকে থিয়েটার ছেড়ে দিতে রাজি হলেন না।

লোলা বললে, “চললুম আমি রাজ্যের কাছে নালিস করতে।”

মিউনিক হচ্ছে বাভেরিয়ার সহর এবং সে সময়ে বাভেরিয়া হচ্ছে জার্মানীর সব চেয়ে বড় রাজ্য। রাজ্যের নাম লাউউইক, বয়স বাট বৎসর, কিন্তু তাঁর প্রাণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় প্রেমের তুফান। রাজ্যের পত্নী আছেন, কিন্তু তখন তাঁর উপপত্নীর আসন ছিল খালি।

আগে আবেদন ক'রে অমুমতি না পেলে কেউ রাজপ্রাসাদে ঢুকতে পার না। দায়বান লোলাকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিলে না। লোলাও কেপে গিয়ে স্তব্ব ক'রে দিলে গালাগালি।

এমন সময়ে সর্দার-ভৃত্যের আবির্ভাব। সে সমস্ত দেখে-তখন রাজ্যের কাছে গিয়ে বললে, “মহারাজ, এক ছিনে জৌক নর্তকী আপনায় সঙ্গে দেখা করতে চায়।”

—“তাকে দূর ক'রে দাও।”

—“মহারাজ, সে পরমা সুন্দরী।”

—“তবে সে আসতে পারে। আমি নিজেই তাকে ধমক দেব।”

কিন্তু লোলাকে ধমক দেবেন কি, তাকে দেখেই রাস্তার চক্ষুস্থির। লোলার বয়স ত্রিশ বৎসর, কিন্তু তখনও তার পেলব তরুণ রূপধৌবন যেমন কচি, তেমনি কাঁচা।

সবাই বলত, লোলার দেহের মধ্যে সব চেয়ে ঈর্ষ্য হচ্ছে, পীকর বুকোর বাহার। সেই দিকে লাউউইক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু তার পরেই তাঁর সন্ধিগত দৃষ্টিতে জেগে উঠল যেন একটা প্রশ্ন—কোন অস্বাভাবিক উপায়ে এই বক্ষকে অমন উঁচু ক'রে তোলা হয়নি তো?

সে নীরব প্রশ্ন বুঝতে লোলার বিলম্ব হ'ল না, বহু পুরুষের মনের বনে-বনে এত দিন সে শিকার ক'রে এসেছে।

পালেশ টেবিলে সে দেখতে পেলে একখানা কাঁচি। বিনা বাধ্যব্যয়ে হাত বাড়িয়ে কাঁচিখানা নিয়ে সে স্তম্ভশাণ্ড নিজের জামার কাপড় কেটে বক্ষকে করল নগ্ন।

লাউউইকের দৃষ্টি হয়ে উঠল বুভুক্ষু। মুখ তাঁর বোবা।

লোলাকে আর নাচতে হ'ল না। তার মস্ত প্রাসাদ, গাড়ী-ঘোড়া, অসংখ্য দাস-দাসী। দোকানে দোকানে সে সখের জিনিস কেনে এবং দোকানীর কাগজে সই ক'রে এই বলে নিজের পরিচয় দেয়—“মহারাজের উপপত্নী।”

নানা লোকে নানা কথা কয়। বুড়ো লাউউইক তাকে ডেকে বলেন, “মহারাজের উপপত্নী পদবী নয়। আজ থেকে তুমি হ'লে ‘কাউন্টেস্ অফ ল্যাংস্ফোর্ড’। সই করবার সময়ে এই নামই ব্যবহার কোরো।”

আগে ছিল মিসেস্ জেমস, তার পর নর্তকী লোলা মস্টেজ, তার পর মহারাজের উপপত্নী, তার পর এখন সে কাউন্টেস্ অফ ল্যাংস্ফোর্ড। সে উপরে উঠেছে ধাপে-ধাপে। লাউউইকই তাকে আর একটি উপাধি দিয়েছিলেন—“মেরে-সয়তান”।

পরাক্রান্ত স্বাধীন ভূপতির আশ্রয় লাভ ক'রে লোলার প্রকৃতি হয়ে উঠল অধিকন্তর বস্ত্র। তার হাতের চাবুক চলে আরো যন-মন, তার পোষা মাস্তিক কুকুর মানুষ কামড়াতে শিখেছে আরো ভালো ক'রে। লোলা পথে বেকলে পথিকেরা চটপট সরে পড়ে নিরাপদ ব্যবধানে। রাজা লাউউইক জানতেন, সুযোগ পেলে যে কোন দিন দ্রুত ও অত্যাচারিত প্রজারা লোলাকে আক্রমণ করতে পারে। তাই তাঁর প্রাসাদের ফটকে পাহারা দেয় সশস্ত্র পুলিশ। রাজপথেও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে অস্ত্রধারী পাহারাওয়াল।

লোলা রাজনীতি নিয়েও মাথা ঘামাতে ছাড়েন না। তার মুখের কথায় বড় বড় রাজকুশলীর চাকরি যায়। রাজ্যের কাছে কোন দরখাস্ত পেশ করতে হ'লে লোকে আগে তার কাছে এসে ধরনা দেয়। বুড়ো রাজা হয়েছেন তার খেলার পুতুল, ওঠেন-বসেন তারই ইচ্ছাতে। সারা যুরোপ এই অভাবিত ও বিচিত্র প্রহসন দেখে অটহাস্ত করতে লাগল। বাভেরিয়ার সম্মান লুটোতে লাগল পথের ধূলোয়।

একটা ঘৃণা গণিকা ও নর্তকী হয়েছে যুক্তরাজ্যের মহারাণী, তার স্বজ্ঞাচারে ও অত্যাচারে সবাই হয়ে উঠেছে চঞ্চলিত, তার খেয়াল মেটাবার জন্তে রাজা উড়িয়ে দিচ্ছেন লাখো-লাখো টাকা,—প্রজারা

এ দৃষ্ট আর সহ্য করতে পারলে না। অবশেষে রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ উপস্থিত হ'ল। কেবল লোলার তাসের প্রাসাদই ভেঙে পড়ল না, লাউউককেও ত্যাগ করতে হ'ল সিংহাসন।

মিউনিক থেকে বথাসময়ে সরে প'ড়ে লোলা আবার গিয়ে দেখা দিলে লগুনে। আবার ক'লে এক জন সৈনিককে বিবাহ। ও দেশে এক স্বামী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করলে শাস্তিভোগ করতে হয়। লোলার প্রথম স্বামী তখনও জীবিত ছিল। তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্তে ওয়ারেন্ট বেরুলো। কিন্তু আবার সে স্পট দিলে বথাসময়েই।

এবার তার আবির্ভাব হ'ল আমেরিকায়। সেখানে তৃতীয় বার বউ সঙ্গে সংবাদপত্রের এক সম্পাদককে বিবাহ করলে। কিন্তু তাকেও তার বেশী দিন ভালো লাগল না। অষ্টেলিয়ায় গিয়ে

আবার কিছু দিন ধরলে নর্তকীয় পেশা। তার পর দেখি পুনর্বার লগুনে গিয়ে সে "সৌন্দর্যের আর্ট" নিয়ে বস্তুতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। লগুন থেকে পুনর্বার আমেরিকায়। সেখানে গিয়ে সে দুই বৎসর ধরে পতিতাদের উদ্ধার করবার দ্রুত পালন করে। তার পর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তেতাঙ্গি বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে মারা পড়ে।

লোলার কার্য-স্থল হয়েছে ভারতবর্ষ, যুরোপ, আমেরিকা ও অষ্টেলিয়া। তার অঙ্গুলিনির্দেশে শাসিত হয়েছে প্রকাণ্ড রাজ্য এবং তার জন্তে খসে পড়েছে এক স্বাধীন রাজ্যের মুকুট। পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিকরাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাকে সাধারণ নটা ব'লে ভাবলে ভুল করা হবে। সে হচ্ছে অত্যন্ত অসাধারণ নারী, একবারেই অতুলনীয়।

## ১৩৫৭—১৩৫৮

বিস্ত ১৩৫৭ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙলা ছায়াচিত্র মুক্তিলাভ করেছে তাদের জাতি-শিটার করা হয়েছে। যথা, \* প্রথম শ্রেণী, \* \* দ্বিতীয় শ্রেণী, \* \* \* তৃতীয় শ্রেণী, \* \* \* \* নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং \* \* \* \* \* নিকৃষ্টতম শ্রেণী বুঝতে হবে।

|               |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| ১। ১ বৈশাখ    | কংকাল               | *         |
| ২। ১ বৈশাখ    | সন্ধ্যাবেলার রূপকথা | * * * * * |
| ৩। ২২ বৈশাখ   | আগ্রস্ত ভারত        | * * * * * |
| ৪। ২১ বৈশাখ   | একই প্রেমের ছেলে    | * * * * * |
| ৫। ১২ জ্যৈষ্ঠ | দিগ্ভ্রান্ত         | * *       |
| ৬। ১১ জ্যৈষ্ঠ | পথহারার কাহিনী      | * * * * * |
| ৭। ২৬ জ্যৈষ্ঠ | বড় বৌ              | * * *     |
| ৮। ২৬ জ্যৈষ্ঠ | রক্তের টান          | * * * * * |
| ৯। ১ আষাঢ়    | সীমন্তিক            | * * * *   |
| ১০। ৮ আষাঢ়   | মহাসম্পদ            | * * *     |
| ১১। ২২ আষাঢ়  | কীকনতলা             |           |
|               | লাইট বেলওয়া        | * * * * * |
| ১২। ২২ আষাঢ়  | অপবাদ               | * * * * * |
| ১৩। ২১ আষাঢ়  | মাইকেল মধুসূদন      | *         |
| ১৪। ২৬ শ্রাবণ | বানপ্রস্থ           | * * * * * |
| ১৫। ২ ভাদ্র   | ১০১ ধারা            | * * * * * |
| ১৬। ৮ ভাদ্র   | সুধার প্রেম         | * * * * * |
| ১৭। ২২ ভাদ্র  | দুধারা              | * * * * * |
| ১৮। ২১ ভাদ্র  | যুগদেবতা            | * *       |
| ১৯। ১২ আশ্বিন | বিভাসাগর            | *         |
| ২০। ১১ আশ্বিন | রূপকথা              | * * * * * |
| ২১। ১১ আশ্বিন | সমর                 | * *       |
| ২২। ৩ কার্তিক | পঞ্চায়েৎ           | * * * *   |

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| ২৩। ১৭ কার্তিক   | গরবিলী          | * * *     |
| ২৪। ২৪ কার্তিক   | মেজদিদি         | *         |
| ২৫। ৮ অগ্রহায়ণ  | শেষ বেশ         | * * * * * |
| ২৬। ১৫ অগ্রহায়ণ | দৈবধ            | * * * * * |
| ২৭। ২২ অগ্রহায়ণ | সত্যী সীমন্তিনী | * * * * * |
| ২৮। ৬ পৌষ        | সহোদর           | * * * * * |
| ২৯। ৬ পৌষ        | মর্যাদা         | * * * * * |
| ৩০। ১৩ পৌষ       | ইন্দ্রজাল       | * * * * * |
| ৩১। ২০ পৌষ       | কুসহারা         | * * *     |
| ৩২। ১২ মাঘ       | ভক্ত রত্ননাথ    | * * * * * |
| ৩৩। ১১ মাঘ       | ওরে যাত্রী      | * * * * * |
| ৩৪। ১১ মাঘ       | অভিশপ্ত         | * * * * * |
| ৩৫। ১১ মাঘ       | অপরাজিতা        | * * *     |
| ৩৬। ৪ ফাল্গুন    | ভিষ্ণুমূল       | * * *     |
| ৩৭। ৪ ফাল্গুন    | বরযাত্রী        | * *       |
| ৩৮। ১১ ফাল্গুন   | দর্পচূর্ণ       | * * * * * |
| ৩৯। ১১ ফাল্গুন   | রত্নদীপ         | *         |
| ৪০। ২৫ ফাল্গুন   | রূপান্তর        | * *       |
| ৪১। ২৫ ফাল্গুন   | সহযাত্রী        | * * * * * |
| ৪২। ১ চৈত্র      | সে নিল বিদায়   | * * * *   |
| ৪৩। ১৬ চৈত্র     | ভৈরব মন্ত্র     | * * * *   |
| ৪৪। ২৩ চৈত্র     | পরিভ্রাণ        | * * * *   |
| ৪৫। ৩০ চৈত্র     | নিয়তি          | * * *     |

# মানব-মানবী

(অপ্রকাশিত)

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী



[পশ্চিমবঙ্গের সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বাঙলা দেশের সাহিত্য-রস-  
পিপাসুদের অজানা নয়। গত ১৪ই বৈশাখ তিনি পরলোক যাত্রা  
করেছেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে এই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন।  
মনে হয় এই তাঁর শেষ রচনা।]

শান্ত্রি এট মধু সন্ধ্যা বেলা  
এসো বসি দু'জনায় সাগর-সৈকতে  
তুমি আমি মানব-মানবী ;  
আমি—দুগুণ জীবনের ভীম আলোড়ন,  
তুমি—শান্ত্রি সমাহিত কল্যাণরূপিণী।  
হুয়ে কেন ? কাছে এসো—আরো কাছে—আরো কাছে,  
এইখানে কাছে বসো শুভ্র আর স্নেহময় হাতখানি তব  
( স্নিগ্ধ আর নম্র-নত পল্লবের মতো )  
লঘুভাবে রাখি' মোর হাতে,  
এলায়িত করি' কেশ বাতাসে বিখারি' দাঁও কুন্তল-স্রবতি,  
অকল নামায়ে রাখো বালুকার 'পরে,  
তার পর শান্ত্রি সমাহিত  
কৃষ্ণতারি স্নেহভীরু আঁখি দু'টি তব  
রাখো মোর আঁখি 'পরে—  
মোর দু'টি আঁখি 'পরে পুঞ্জীভূত স্মৃতির দর্পণে।  
মোর দু'টি আঁখি-তারি পুঞ্জীভূত স্মৃতির দর্পণে—  
সেখায় কি নেহারিছো আজি এই শান্ত্রি সঁখ বেলা  
কোনো দূর অতীতের ছবি অরি আয়ত-লোচনা ?  
দেখিছো কি পৃথিবীর আদিম প্রভাতে ঘন বন-অন্তরালে কোনো  
তরী-তরু তুমি ছিলে তরুণী রূপসী  
প্রকৃতির আপন দুলালী বেন, অনাবৃত-দেহ।  
আবরণ-অভরণ-হীনা ?  
আমি ছিহু যাবাবর, বনে বনে ফিরি  
বিস্তার-বিলসে আর বাস্তবের স্পষ্টতার মাঝে,  
নাই স্রব নাই গান নাই কোনো ছবির আভাস  
দিকে দিকে সমাপ্তির নিষ্ঠুর সীমানা ;—  
কি জানি কি মনে ভাবি'  
পুষ্পিত করিলে তব কুন্তল নিবিড়,  
নীবিবন্ধ বিরি' দিলে পল্লবের জালে,  
প্রকোষ্ঠ সাজিয়ে নিলে বস্ত্র-বলয়ে,  
বনফুলে মালা গাঁথি' কণ্ঠেতে দোলায়ে দিলে  
বন্ধের তারুণ্য বিরি' ;  
তার পর এক দিন গুতা-দ্বার হ'তে তব আঁখি দু'টি তুলি'  
চাহিলে আমার পানে কী এক রহস্য-যেরা সলজ্জ নয়নে—  
কী বেন ঘটনা গেলো !  
দিকে দিকে উঠিল সজ্জাত,  
সুরের মূর্ছনা জাগি' করিল আকুল  
অবশ্যানী জল হল আকাশ বাতাস  
ফুলের সৌরভ আর পাখির কাকলি

অলির শুভ্রন আর পত্রের মর্মর,  
কী বেন লাগিল দোল বন্ধের শোণিতে  
কী বেন গহন বাণী কহিল অন্তর,  
নিষ্ঠুর সমাপ্তি কোথা গেলো মিলাইয়া  
একটি অভূতপূর্ব ব্যঙ্গনার মাঝে,  
কী বেন স্বপন ছিল স্রুপ্ত হ'য়ে জীবনের বিরি'  
তাহারি সজ্জাত-রেশ ছেয়ে দিল তম্ব-মন অপূর্ণ পুলকে,  
জীবন লভিল তার গভীর সন্ধান—  
আজি এই শান্ত্রি সঁখ বেলা  
দেখিছো কি সে-কাহিনী মোর দু'টি নয়ন-দর্পণে ?

আজি এই শান্ত্রি সঁখ বেলা  
দেখিছো কি মোর দু'টি নয়ন-দর্পণে  
অন্ত এক দিন  
বনানী-উপান্তে স্নিগ্ধ কুটীর-অঙ্গনে  
তুমি ছিলে ব্যাধ-বালা,  
আমি ছিহু বনে-ফেরা ব্যাধের বালক ?  
ভীক নত তব দু'টি নয়নের মাঝে  
কী এক আলোক হেরি' লাগিল বিষয়,  
আঁখির পল্লব ঘেরি' কী বেন কোমল মায়ী রচে স্বপ্ন-তরু  
জীবন-উদাস-করা,  
উদাস বাশির স্রব বাজি' ওঠে আকাশ-বাতাসে  
বাজি' ওঠে দিবসে-নিশীথে  
বাজে বেন জীবনের সকল অতীতে ;  
ভাবি মনে—এত কাল কি ল'য়ে আছিহু ময়,  
কোন্ অর্ধহীন যত খেলা-ধুলা আর  
উপহাসে-পরিহাসে ভেবেছিহু সরস জীবন  
কোন্ স্নিগ্ধতার মাঝে ভাবিতাম সার্থক সকল !  
তোমাতে ঘেরিয়া মন করে ঘুর-ঘুর  
প্রাণ মোর কিরি' ফিরি' যার  
তোমার অঙ্গন-তলে,  
চিন্তা পায় অপূর্ণ বিলাস এক কী অতুল সজ্জাতের রেশে,  
কী পুলকে মাতি' ওঠে গহন অন্তর।  
তার পর এক দিন তোমার পুলক মেশে আমার পুলকে  
তোমার আঁখির আলো খোঁজে তোমার নয়নের আলো  
আমার জীবন মেলে তোমার জীবনে—  
আজি এই শান্ত্রি সঁখ বেলা  
অরি স্বপ্ন-পসারিণি।  
মনে পড়ে সে-কাহিনী চাহি' মোর নয়ন-দর্পণে ?

তার পর অন্ধ এক দিন,  
মনে পড়ে  
পাখি-ডাকা ছায়া-ঢাকা নিবিড় স্নিগ্ধতা-ঘেরা কানন-অন্তরে  
ঋষির হুহিতা তুমি ফুটেছিলে বনফুল সম  
লোকচক্ষু অন্তরালে আপন মাদুর মাঝে আপন সৌরভে ?  
তুমি ছিলে আশ্রম-দ্রুহিতা,  
আমি ছিলাম জ্ঞানার্জনে রত এক কিশোর তরুণ—  
বোড়শ বসন্ত ভব তম্বু-লতা ঘিরিয়া সন্ধ্যাতে  
বিহ্বল করেছে দিক দেশ বাসন্তী বিলাসে যেন,  
যোলটি শব্দ তার স্বর্ণাভ জ্যোতির ভালে  
তবু তম্বু-তটে-তটে আঁকিয়াছে স্নকোমল আলিঙ্গন-রেখা,  
বক্ষ আর নাহি রহে বক্ষ-শাসনে,  
নয়ন মানে না বুঝি ঝড়ার বক্ষন,  
গভীর পঞ্চল সম তব দুটি আঁখির গহনে  
কোন সে জগৎ এক ধীরে ধীরে জাগে  
গহন ব্যাধির আর গভীর পুলকে  
অনাহত গীতের ভাষায় !—  
তার পর এক দিন কোন এক বসন্তের দিনে  
কোন এক মধু স্তব্ধকণে নিবিড় নির্জনে  
বিশ্বব্যাপী এক মহা অপেক্ষার মাঝে  
তোমার নয়ন মেলে আমার নয়নে :  
চকিতে বিষয়ে  
বিশ্বব্যাপী মধুর সায়েরে এক ওঠে প্রভঞ্জন !  
মধু মধু মধু মধু মধুর তরঙ্গে দোলে আকাশের সীমা,  
মধু করে সমীরের দোলে,  
মধু স্বরে শাখার দোলায়  
পাতার কাঁপনে আর প্রবৃনের বাসে,  
মধু স্বরে আমের মঞ্জরী হ'তে অলির গুঞ্জন সাথে  
মুক্তিকার অগুণ্ডে অগুণ্ডে,  
মধু মধু মধু মধু মধুর মধু মহোৎসব  
এ নিখিল বিশ্বের অঙ্গনে,  
মধু স্বরে স্বর, স্বর, স্বর, স্বর,  
স্রবের গহন কন্দরে !  
আজি এই শাস্ত্র সাঁঝ বেলা  
মনে পড়ে সে-কাহিনী হে স্বপ্ন-সঙ্গিনি  
চাহি' মোর নয়ন-দর্পণে ?

তার পর অন্ধ এক কাহিনীর স্মৃতি ।  
তুমি ছিলে বাজবালা—আমি ছিলাম রাজার কুমার,  
তুৎসমে চড়ি' আমি ফিরি দেশে দেশে  
ফিরি আমি পথে পথে প্রান্তরে প্রান্তরে—  
অনাদি অনন্ত পথ ডাকে—মোরে ডাকে—  
কী এক রহস্য ঘন অসীম মায়ায়,  
সে মায়া-অঙ্গন চোখে আমি চলি দিগন্তের পানে  
প্রভাতে প্রমোদে বসন্তে বাসনে  
শরতের সোনালী আলোকে

শীতের হিমেলী হাওয়ার  
কোন এক স্নহের মরীচিকা-টানে—  
আমি চলি—চলি—চলি,  
মোরে ডাকে—ডাকে—ডাকে  
পথের ইসারা শুধু,  
প্রতিটি পথের বঁকে কে যেন রাখিয়া গেছে হাতছানি তার,  
তাহারি রহস্য মোরে করেছে উন্মাদ !  
সহসা একদা এক গোষ্ঠুলি-বেলায়  
পশ্চিম-গগন হবে ছেয়ে গেছে পদ্মরাগ-রাগে,  
পাখিরা ফিরিয়া গেছে তাহাদের দূর কোন কানন-আবাসে,  
প্রকৃতি হয়েছে মৌন,  
হেরিলাম প্রাণাধ-শিখরে  
আমার সকল স্বপ্ন সর্ব মরীচিকা  
মৃতিমতী হ'য়ে যেন ফুটিয়াছে একখানি মানবীর রূপে  
একখানি স্নকুমার তম্বুর সন্ধ্যাতে !  
খামিল তুরঙ্গ মোর ।  
সেই রাজপথ 'পরে  
ভব নত নয়নের দৃষ্টি হ'তে নামে  
কী যেন সান্ত্বনা এক পরমের রূপে,  
পরম সান্ত্বনা সেই দেবতার আশীর্বাদী সম  
জুড়াইয়া ধরে যেন তম্বু ঘন প্রাণ  
জুড়াইয়া দেয় যেন সকল জীবন :  
ভাবি মনে—তুমি কি রাজার মেয়ে,  
তুমি কি রাজার মেয়ে শুধু ?  
কিন্তু হবে সুরাসুরে ধৌহে মিলি' করেছিল সাগর মধুন,  
মদ্যিত সে সিদ্ধ হ'তে উঠেছিল লক্ষ্মীরূপে তুমি ?  
উবশীর রূপে তুমি সুরসভা তলে  
পুলক হিল্লোলে  
মঞ্জীর ঝঙ্কারে আর গতির লাভণ্যে  
বিচ্ছুরিয়া দিয়েছিলে জিহ্বাবনে সৌন্দর্যের গীতি ?  
তপোবনে কথের আশ্রমে  
তুমি কি ফুটিয়াছিলে শকুন্তলারূপে  
মাদুরী ও লালিত্যের চরম প্রকাশে ?  
তুমি কি পার্বতীরূপে গিয়েছিলে ভূলাইতে পিনাকপাণিরে  
তম্বুরে করিয়া পুষ্পকেতু-নিকেতন ?  
তার পর নিম্নারূপ কোভে হুঃখে অসীম লজ্জায়  
তপস্তা করিলে ঘোর  
প্রেমেরে করিতে সত্য দেহের ওপারে ?  
তুমিই কি শতখানে শত গৃহে শত শত রূপে  
কিশোরীর মূর্তি ধরি'  
ফুটিতেছ প্রেমের কমল সম যুগ-যুগান্তরে ?  
সেই রাজপথ 'পরে  
বচন-অতীত আমি রহিম চাহিয়া এক গভীর বিষয়ে !  
আজি এই শাস্ত্র সাঁঝ বেলা  
বহু বহু শতাব্দীর দীর্ঘ ব্যবধানে  
মনে পড়ে সে-কাহিনী হে মৌনভাষিনি ?

তার পর মনে পড়ে

\* শিখাভীরে উজ্জয়িনী মহানগরীতে  
তুমি ছিলে নাগরিক। আর আমি ছিলাম নাগরিক ?  
লোভের গুণে মাঝি' অলস পলে,  
পুষ্পদামে সাজিয়ে কবরী,  
কর্ণমূলে ভাসিয়ে কুণ্ডল,  
বাহুতে প্রকোষ্ঠে ঘিরি' কেশ কেশ,  
কটিতে ঘিরিয়া কিকিণি,  
শ্রোণিভারে দোলায়ে মেথলা,  
চরণে সিঁজিনী-তালে কণ্ঠস্থ কণ্ঠস্থ তুলিয়া নিভণ।  
তুমি চল যেতে হবে রাজপথ 'পরে,  
ভ্রমিতে শিখার কূলে,  
দাঁড়াইতে মন্দির-দ্বারে  
কী এক মধুর রসে তোমার সান্নিধ্যখানি উঠিত ভরিয়া ;  
সন্ধ্যার বহুভরা প্রথম আধারে  
তোমার নয়ন দু'টি কি-যেন-কি রহস্যের হ'ত নিকেতন ;  
শরীর বুকে  
তব সর্ব অঙ্গ হ'তে বিচ্ছুরিত হ'ত মত্ত চম্পক-সৌরভ ;  
তব কেশ-পাশ হ'তে, নয়ন-পল্লব হ'তে,  
অগ্নির চাহনি হ'তে,  
প্রীতির ভস্মি আর অধর-শোণিমা হ'তে,  
বস্ত্রের তরঙ্গ হ'তে,  
নীবিবন্ধ শ্রোণিভার উরু সজ্জা পদাঙ্গুল সর্বদান হ'তে  
সহস্র নিখর সম  
ঝরিয়া পড়িত বিধে রঙিন উৎসব—  
উজ্জয়িনী মহানগরীতে  
তুমি ছিলে নাগরিক। প্রদীপ্ত-বোঁবন।  
আর আমি ছিলাম এক মুগ্ধ নাগরিক।  
আজি এই শান্ত সাঁঝ বেলা  
সে-কথা কি মনে পড়ে হে বিলোল-হিলোল-লোচনা ?

তার পর অন্ধ দিন

তুমি ছিলে এক পারে খজনা নদীর তীরে অজনা প্রেমের  
কিশোরী বালিকা এক,  
আমি ছিলাম ওই পারে অন্ধ এক পল্লীর কিশোর—  
হুই তীরে যেন দু'টি কপোত-কপোতী,

কেনি স্বপ্নলোক যেন সুখরিত তাহাদের কুঞ্জে কুঞ্জে !  
বিজ্ঞান দুপুং বেলা—ঐজ্যেষ্ঠের দুপুর—যেরে যেরে কঙ্ক ধার,  
আমি আসি' বসিতাম ছিপ ল'য়ে হাতে  
এই পারে নগীকূলে বটমূলে শীতল ছায়ার,  
তুমি সূচতুরা লাল সাড়িখানি পরি'  
ওপারে নদীর কূলে কত ছলে আসিতে বাইতে :  
দূরে বাজে রাখালের বেণু,  
ডাহক-ডাহকী বত শরবনে ভাসে আর ডোবে,  
বস্ত্র কপোতের ডাকে উদাস প্রান্তর,  
তারি মাঝে মধুর রসে চলে সেতুর রচনা  
এপারে ওপারে—দু'টি স্বপ্নের ব্যাধানে।  
সন্ধ্যার প্রান্তরে যবে মৃৎলয়ের ডিম-ডিম বোলে  
ওপারে উঠিত হরি-কীর্তনের বোল,  
এপারে আমার চোখে উঠিত ভাসিয়া  
সূচতুরা একখানি কিশোরীর মুখ,  
শফরীর সম দু'টি চকল নয়ন,  
একটি প্রীতির মধু ললিত ভস্মিমা,  
একটি মুখের হাসি নন্দন-বিজয়ী।  
গভীর নিশীথে  
আমি যবে এই পারে বিচ্ছুরিত বাঁশবির সুরে  
উজ্জয়িনী তুলিতাম এ-পল্লীর আকাশ-বাতাস,  
ওপারে কি ও-পল্লীর একটি কিশোরী মেয়ে  
ঘুম ভাঙি' জাগি' উঠি' হইত উন্মনা ?  
তবুর উল্লাসে  
মনে মনে বুনিত কি রঙিন স্বপ্ন ?  
খজনা নদীর তীরে অজনা প্রেমের  
তুমি ছিলে কিশোরী বালিকা,  
আমি ছিলাম অন্ধ পারে কিশোর-বয়েসী।

কিন্তু থাক্ অতীতের কথা—

শান্ত এই মধু সন্ধ্যা বেলা

দিকে দিকে নামিতেছে যবে লগ্ন আধারের মায়াবিনী মায়া  
সাগরের কূলে এই বসি' মোর কাছে  
মোর হাতে লগ্নভার রাখি' তব হাত  
চাহি' মোর নয়নের পানে—দেখা,  
বুঝিতে কি পারো এক মধুর ভবিষ্যের মাধুর্য-কাহিনী।

আগামী সংখ্যায়

আত্ম-স্মৃতি

ঐশ্বরীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



## রেডিও-অ্যাকটিভিটি

সাধনা মিত্র

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া (Artificial Radio Activity) প্রথম

আবিষ্কৃত হয় আজ থেকে বোল বছর আগে। কুরী আর জোলিয়ট উনিশশো চৌত্রিশ সালে বেতার' ক্রিয়ালব্ধতা আবিষ্কার করেন। আলফা কণিকার সাহায্যে পোলোনিয়াম চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তা থেকে অ্যালনিয়াম টেনে বার করা—এই ছিলো কুরী আর জোলিয়েটের পরীক্ষার বিষয়বস্তু, আর এই পরীক্ষা করেই তাঁরা দেখালেন যে, এই ক্রিয়াকালীন যে পজিট্রোনগুলো নির্গত হচ্ছিলো, সেগুলো আলফা কণিকাগুলো সরিয়ে নেওয়ার পর যে খেমে যায় তা নয়, সেগুলো সমভাবেই নির্গত হতে থাকে। এটা একটা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার—কারণ আলফা কণিকাগুলোর উৎসটার সাহায্যেই ওগুলো বেরোতে আরম্ভ করে অথচ উৎসটা সরিয়ে নিলেও ক্রমাগতই পজিট্রোন বেরোতে থাকে, শুধু তাই নয় সমান ভাগে আবার। এমন একটা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ক'রে তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি লাগালেন। আর এই আবিষ্কারটি অনুসরণ করেই কয়েক জন বৈজ্ঞানিক আরো অনেক বেতার তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কার করলেন। নানা ধরনের খুব বেশী ভোল্ট-সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, এক কথায় হাই ভোল্টেজ অ্যাপারেটাস ব্যবহার করলে ক্রিয়াটি খুব তাড়াতাড়ি হতে থাকে। কুরী আর জোলিয়েটের পরবর্তী কালে কক্‌সফ্ট, গিলবার্ট আর ওয়েলটন এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। আলফা কণিকার তাড়িত নিষ্ক্ষেপণ (Charged Projectile) গুলোকে খুব বেশী দ্রুত গতিময় করেছিলেন লরেন্স নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও তাঁর সমসাময়িক কন্সটান্স সাইক্লোট্রনের মধ্য দিয়ে ওগুলোকে ব্যবহার করে। সাইক্লোট্রন হচ্ছে চৌম্বক প্রতিক্রিয়া (Magnetic Resonance) অ্যাক্সিলারেটর একটা। তড়িৎ-শক্তিকে জিইয়ে রাখার প্রয়োজনে টাভ, আর হাক্‌ট্রাভ, নামক বৈজ্ঞানিকের একটা স্থৈতিক বিদ্যুৎ-উৎপাদক (Electro-static Generator) ব্যবহার করেছিলেন পরীক্ষা কালীন। উনিশশো চৌত্রিশ-পঁত্রিশ সালে ফার্মী আর তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক কন্সটান্স দল শুধু সোলোনিয়াম নয়, মৌলিক 'পদার্থগুলোর তেজস্কর্য্য নিউট্রনগুলোকে বিক্ষত করে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয়া তৈরী করলেন। বলা বাহুল্য, এর কলে রেডিয়ো অ্যাকটিভিটি সঞ্চারী আমাদের এ পর্য্যন্ত জ্ঞাতব্য তালিকাটি অনেক বড়ো হয়ে গেল—অনেক নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব জানা গেল। উনিশশো চৌত্রিশ সালের প্রথমে রেডিও অ্যাকটিভিটি আবিষ্কৃত হোল মাত্র আর উনিশশো পঁত্রিশ সালের শেষেই প্রায় হাজারটা বেতার মৌলিক পদার্থের (Radio elements) বিষয়ে জানা গেল। এই হাজারটি মৌলিক পদার্থের অন্তর্ভুক্তি নিউট্রনকে বিক্ষত করে কৃত্রিম বেতার তেজস্ক্রিয়া উৎপাদন করা

আর প্রবর্তিত বেতার তেজস্ক্রিয়ার একটা সম্পূর্ণ তালিকা করা হোল, যাতে পূর্বোক্ত হাজারটা বছর মধ্যে প্রায় আটশোটা বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হোল। আলোচ্য বিষয়টির ক্ষেত্রে এত বিরাট এবং ব্যাপক কাজ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে যে, এই ছোট প্রবন্ধটিতে তাদের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব।

রেডিও এলিমেন্টস বা বেতার মৌলিক পদার্থগুলোর বিষয়ে কিছু জানতে হলে আগে আইসোটোপ কাকে বলে জানা দরকার। কারণ কৃত্রিম বেতার মৌলিক পদার্থগুলোর রাসায়নিক পরিচিতির ভিত্তিই হচ্ছে এই আইসোটোপের ধর্মের ওপর। দু'টো মৌলিক পদার্থ বাদের আণবিক ওজন (Atomic weight) এক, কিন্তু আণবিক সংখ্যা (Atomic Number) আলাদা—যেমন ধরা যাক, হেভি হাইড্রোজেন ও সাধারণ হাইড্রোজেন—আইসোটোপের দৃষ্টান্ত। আইসোটোপগুলো সাধারণ রাসায়নিক ক্রিয়াতে ভালো ভাবে পৃথকীভূত হয় না—আর একটা বিশেষ মৌলিক পদার্থের বেতার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলো সাধারণ স্বাভাবিক আইসোটোপগুলোর মতোই গুণাগুণসম্পন্ন। Szilard and Chalmers প্রথম দেখালেন যে, ইথিল আয়োডাইডের মতো একটা নন-আয়োনিইজিং জৈব (Organic) যৌগিক পদার্থ যদি নিউট্রনের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করে বলে দীপ্তি ধারা অলঙ্কৃত করা যায়, তাহ'লে ইথিল আয়োডাইডের ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{I}_2$ ) মধ্যকার সাধারণ আয়োডিনের থেকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন বিচ্ছিন্ন করা যায়। ক্রিয়াটির পরে কিছুটা অব্যবহৃত আয়োডিন স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় আয়োডিন বহনকারী হিসাবে যুক্ত হয়। তার পর আইয়োডিন আয়তনে যথেষ্ট কমে যায় এবং সিলভার আয়োডাইডে পুরো রেডিয়ো অ্যাকটিভিটিটাই জমা হয়। এই ভাবে ঘনীভূত করণকে "Szilard-Chalmers" প্রক্রিয়া বলা হয়। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলোকে ঘনীভূত করার ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াটারই প্রচলন আছে।

এরপর দু'টোর মধ্যে একটা সীমা-প্রাচীর দিলে রেডিয়ো-অ্যাকটিভ আইসোটোপ একেবারে ঋণী অবস্থাতে পাওয়া যায়—বাহক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। গ্রোহাম্ আর সীবোর্গ এই পার্টিশনটা ব্যবহার করেছিলেন, ইথার আর ড'নখাল হাইড্রোজেনারিক অ্যাসিডের মধ্যে—জিক থেকে রেডিয়ো গ্যালিয়াম্ আর লোহা হতে রেডিয়ো কোবাল্ট এবং রেডিয়ো ম্যাঙ্গানিজ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে।

উনিশশো উনচল্লিশ সালের জাহ্নুয়াতীতে হানু আর স্ট্রাসমান নামক দুই বৈজ্ঞানিক একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন যে, স্রো অথবা যার্ট, নিউট্রন দিয়ে যদি ইউরেনিয়াম্ বিক্ষত করা যায় তাহাঁকারি আণবিক ওজনসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় উৎপাদক জোড়ার জোড়ার বিদীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাবে। ফার্মী এবং সহকর্মীরা নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম্ বিক্ষত (Bombard) করে এক পারম্পর্য্য ধারা রেডিও অ্যাকটিভিটি পেলেন, যেগুলো রাসায়নিক পরীক্ষা জ্ঞান গেল, "ফ্রান্স-ইউরেনিক্" মৌলিক পদার্থ হিসাবে। মৌলিক সমস্ত বাতুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আণবিক সংখ্যা (atomic number) হচ্ছে তো ইউরেনিয়ামের—বিরানকই? কিন্তু এই পদার্থ বেতুলো পাওয়া গেল, এগুলোর আণবিক সংখ্যা বিরানকইয়ের চেয়ে বেশী, সুতরাং এরা ফ্রান্স-ইউরেনিক্। ইউরেনিয়ামকেও ছাড়িয়ে গেছে। তেজস্ক্রিয় বেরিয়াম্ আইসোটোপ, যে পাওয়া যায় নিউট্রন-ইউরেনিয়ামের ক্রিয়ায় তাও পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণিত হোল তাদের

মোটামুটি ভাবে আমার জ্বলের দিনগুলো কেটেছে যথেষ্ট  
নৈরাশ্রজনক ভাবে। আমার সহপাঠীরা সকলেই আমাদের  
ছোট অগতের পরিবেশের সঙ্গে সব রকমেই আমার চেয়েও বেশী  
ভাল কোরে নিজদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল বলে মনে হয়।  
খেলাধুলা এবং লেখাপড়া দুই ব্যাপারেই তারা আমার চেয়েও ঢেব  
বেশী ভাল ছেলে ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতার শুরুতেই একেবারে  
সকলের পেছনে পড়ে যাওয়া খুব আনন্দের ব্যাপার নয়।

আমার বয়স যখন সবে ন' বছর, তখনই সর্ব প্রথম আমাকে জ্বল  
পাঠানো হবে বলে ভয় দেখানো হয়। বড়রা কথায় কথায় যাদের  
বলে 'বেয়াড়া ছেলে', ন' বছর বয়সেই আমি তেমনি বেয়াড়া হয়ে  
উঠেছিলাম। যদিও জ্বল সন্ধেয়ে যত কথা আমি শুনেছিলাম, তাতে  
আমার মনে একটা বিরক্তিকর ধারণা সঞ্চিত হয়েছিল, এবং প্রকৃত  
অভিজ্ঞতার সেই ধারণা বহুদূর হয়ে উঠেছিল, তবুও আমার  
মনে হত বাড়ির বাইরে অনেক ছেলের সঙ্গে একত্রে বাস করা বেশ  
মজার ব্যাপার হবে এবং আমরা বড় বড় এ্যাডভেঞ্চার করতে  
পারব। আমাকে বলা হয়েছিল যে, "ভীষনে সব চেয়েও সুখের  
সময় হল জ্বলো দিনগুলি"। সব ছেলেই জ্বল-জীবন উপভোগ  
করে। আমাকে আশ্রয় বলা হয়েছিল যে, আমার মাসতুতো  
বুড়ুতো ভাইরা ছুটি সময়ও জ্বল ছেড়ে বাড়ী আসতে কষ্ট পায়।  
অবশ্য তাইব কাছের যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন তারা  
এ কথা স্বীকার করেনি, বরং দাঁত বাঁক করে হেসেছিল।

নভেম্বরের এক ধূসর অপরাহ্নে যখন আমাদের বিদায়ী গাড়ীর  
আগরাজ ঘোরে ঘোরে মিলিয়ে এল কানে, তখন আমাকে একটি ক্রম  
ঘরে ঢুকিয়ে ডেকের সামনে বসতে বলা হল। অজান্তে ছেলেরা  
সকলেই তখন ঠাঙ্গ বাইরে। ঘরে শুধু ক্রম মাঠারের সঙ্গে আমি  
একা। তিনি একখানা কটা সবুজ মসারের পাতলা বই বার করলেন।  
"এটা হচ্ছে ল্যাটিন আমার।" বইটা খুলে বুড়ো আঙুল দিয়ে  
একটা পৃষ্ঠা ভাল করে চেপে ধরে তিনি লাইনের কয়েকটি শব্দ দেখিয়ে  
বললেন, "এ সব তোমাকে শিখতে হবে। আমি আশ্রয় ঘণ্টার  
মধ্যেই ফিরে এসে দেখাচ্ছি তুমি কতটুকু জানো।"

কল্পনা করুন একবার আমাকে। বিষয় সন্ধ্যায় ব্যথিত হ্রসবে  
মেনসা'র শব্দরূপ সামনে নিয়ে বসে আছি।

এ সবের মানে কি? আমার কাছে সবই অর্থহীন প্রলাপের  
ত লাগল। বাই হোক, একটা জিনিষ আমি সব সময়ই পারতাম  
—মনে মনে শিখে নিতে পারতাম।

যখন সময়ে মাঠার মশাই ফিরে এলেন।

"শিখেছ কি?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

বললাম, "আমার মনে হয় আমি ওটা পড়তে পারি সার,"

। মনে এল পড়ে ফেললাম হুড়বড় করে।

তিনি বেজায় খুশী হয়েছেন বলে মনে হল। আমিও সাহস  
পরে একটা প্রশ্ন করে ফেললাম।

"এর মানে কি, সার?"

"ওতে যা বলা হয়েছে, ওর মানেটাও তাই। মেনসা'—একটি  
টবল।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "তাহলে মেনসা'র মানে 'ও টবল'ও হয়  
কন, আর 'ও টবল' মানেই বা কি?" তিনি বললেন, "মেনসা,  
ও টবল, হচ্ছে ভোকেটিভ কেস। টবলের সঙ্গে কথা বলবার  
যয় তুমি অমনি করে বলবে।"

# আত্ম-স্মৃতি

উইনষ্টন এস চার্চিল

বাল্যকাল

"কিন্তু আমি কখনও অমন বলি না"—সহজ বিষয়ে টেচিয়ে  
উঠলাম আমি।

এই হচ্ছে ক্লাসিকের (ল্যাটিনের) সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।  
শুনেছি, আমাদের মধ্যে অনেক চালাক লোক এই ক্লাসিক পড়ে  
প্রচুর লাভবান হয়েছেন এবং গভীর আনন্দলাভও করেছেন।

বার্চ গাছের বেত দিয়ে ছাত্রদের ঠেংগানো ছিল জ্বলের প্রধান  
বৈশিষ্ট্য। মাসের মধ্যে দু'-তিন বার জ্বলের সমস্ত ছাত্রকে লাইব্রেরীর  
মধ্যে ঢোকানো হত। সেখান থেকে দু'-তিন জন অপরাধীকে  
পাশের ঘরে টেনে নিয়ে বেত মারা হত সমানে, যতক্ষণ না তাদের  
শরীরে বেপারোয়া রক্তপাত হয়। বাকী ছেলেরা পাশের ঘরে বসে  
তাদের আর্ন্তনাদ শুনত আর বসে বসে কাঁপত ঠকঠক করে। ওঃ,  
আমি যে কি প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম এই জ্বলকে এবং দু'টি বছর  
কি উৎসাহময় জীবন কাটিয়েছি! সব চেয়েও বেশী আনন্দ পেতাম  
পড়াশোনায়। সাড়ে ন' বছর বয়সে বাবার কাছ থেকে 'ট্রেনার  
অয়ল্যান্ড' বই পেয়েছিলাম। বইটা যে কি ভীষণ আনন্দের  
সঙ্গে পড়েছিলাম, তা শব্দও মনে আছে। জ্বলের পড়ায় বেশী দূর  
এগোতে পারিনি। মাঠার মশাইরা দেখলেন, পড়াশোনায় তেমন  
সুবিধা করতে পারছি না কিন্তু বেশ এঁচড়ে পেকে গেছি—যমের  
সব চেয়েও নীচু ক্লাসের ছাত্র হয়েও বড়দের বই পড়ি। তাঁরা  
ক্লান্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের হাতে অনেক বাধ্যতামূলক আইন-  
কানুন ছিল, কিন্তু আমিও ছিলাম জেনী।

যাতে আমার যুক্তি, কল্পনা অথবা উৎসাহের স্থান নেই তা  
আমি শিখব না, শিখতে পারব না। যে বারো বছর আমি জ্বলে  
পড়েছিলাম, তার মধ্যে একটি দিনও কেউ আমাকে দিয়ে একটি  
ল্যাটিন পদও লেখাতে অথবা এক বর্ণমালা (এ্যালাফাবেট)  
ছাড়া একটি গ্রীকও শেখাতে পারেনি। আমার শিথিল উৎসাহে  
উত্তেজনা দেবার জন্য তাঁরা বলতেন, মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন মজা পাওয়ার  
জন্য হোমর পড়তেন। আমারও মনে হয়, তাতে তিনি উপকৃতই  
হয়েছিলেন।

বরস বারো বছর পেকতে না পেকতেই অবাঞ্ছনীয় পরীক্ষার  
রাজত্রে প্রবেশ করতে হল। পরীক্ষাগুলো আমার কাছে ছিল  
ভারী সঙ্কট-সঙ্কুল। পরীক্ষকের কাছে যে যে বিষয়গুলি ছিল সব  
চেয়েও প্রিয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলোকে আমি সব চেয়েও বেশী  
অপছন্দ করতাম। আমি চাইতাম ইতিহাস কবিতা এবং রচনা  
লেখার ওপর পরীক্ষা নেওয়া হোক, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষপাতিক ছিল  
ল্যাটিন এবং অঙ্কের ওপর। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে হত, আমি যা  
জানি তার থেকে প্রশ্ন করা হোক। কিন্তু তাঁরা সব সময়ই আমার  
অজানা বিষয় থেকে প্রশ্ন করতেন। যখন আমি নিজেই আমার



জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ করতাম, তখন তাঁরা আমার অজ্ঞানতা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেন। এই ব্যবহারের একটি মাত্র ফল ফলত—আমি পরীক্ষায় ভাল করতে পারতাম না।

ছাত্রের এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার সময় এই সত্য প্রকট হয়ে ওঠে। হেড-মাষ্টার ডাঃ ওয়েলডেন অবশ্য আমার ল্যাটিন গত সম্পর্কে উদার মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি আমার সাধারণ দক্ষতা বিচারে তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেন। এ কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ ল্যাটিনের পেপারে আমি একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারিনি। পাতার মাধ্যমে নিজের নাম লিখেছিলাম। পরে লিখলাম প্রশ্ন—১। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেই নম্বরের পাশে একটা ত্র্যাক্ট দিয়ে দিলাম—(১)। ব্যাস! তার পর প্রাসঙ্গিক এবং সত্য বলে মনে হতে পারে, এমন কিছু সঙ্গ এয় যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারলাম না কিছুতেই। হঠাৎ পাতার ওপর দুই-একটা এলো-মেলো দাগ পড়ল। পুরো ছ'ঘণ্টা তাকিয়ে রইলাম এই করুণ দৃশ্যের দিকে। অতঃপর পরম দয়ালু শিক্ষক মশাই ফুলস্কেপের কাগজখানা চেয়ে নিলেন। ছাত্রবৃত্তির এই সামান্য অভাব থেকেই ডাঃ ওয়েলডেন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ছাত্রোক্ত প্রবেশ করবার যোগ্যতা আমার আছে। এটা সত্যি তাঁর পক্ষে রীতিমত দক্ষতা। এর থেকেই বোঝা যায়, ভুল্লোক বাহ্যিকার ভেদ করে ভিতরটা দেখবারও ক্ষমতা রাখতেন। কাগজে কোরামতির উপর তিনি নির্ভর করতেন না। আমি চিবকালই তাঁর প্রতি হৃদয় স্রব্ধাশীল।

বাসায় আমি সর্বনিম্ন ফর্মের সর্বনিম্ন ডিভিশন পাই। প্রায় বছর খানেক এই অস্বস্তিকর অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। বাই হোক, অনেক দিন ধরে সর্বনিম্ন ফর্ম পড়ে থাকার ফলে চালক ছেলেদের উপর টেকা দেবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলাম। তারা সকলেই ল্যাটিন, গ্রীক এবং ঐ ধরনের দামী দামী জিনিষ শিখতে গেল, কিন্তু আমাকে শেখানো হল ইংরাজি। আমরা এমন নির্বোধ বিবেচিত হলাম যে, ইংরাজি ছাড়াই আর কিছু আমাদের শেখানো যায় না। আমি তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে অকৃত্য ছেলেদের চেয়েও তিন গুণ বেশী সময় কাটিয়েছি, তাই তাদের চেয়েও তিন গুণ বেশী ইংরাজি শিখেছিলাম এবং বেশ ভাল করেই শিখেছিলাম। এই ভাবে আমার অস্থিতে-অস্থিতে মজার-মজার চুকে গিয়েছিল সাধারণ ইংরাজি বাক্য রচনার কলা-কৌশল। তাই ল্যাটিন ভাষার কবিতা লিখে এবং গ্রীক ভাষার বাঙ্গ-কবিতা রচনা করে পুরস্কার পাওয়া আমার স্কুলের বন্ধুদের ভরণ-পোষণের জন্য পরবর্তী কালে আমার নেমে আসতে হয়েছিল সাধারণ ইংরাজিতে, কিন্তু আমাকে তা করতে হয়নি। আমি কোন অসুবিধাই বোধ করিনি।

এটা খুবই অসঙ্গত মনে হয়েছিল সকলের কাছে যে, আমি যখন অনেক দিন ধরে সর্বনিম্ন ফর্মের বসটিাছিলাম, ঠিক সেই সময় হেড-মাষ্টারের কাছে একটি মাত্র ভুল না করেও ম্যাকুলের "লেইস অফ এনসিইটেড রোম" থেকে ১২০০ লাইন আবৃত্তি করে যে প্রাইজটা পেলাম, সেটার জন্য প্রতিযোগী ছিল স্কুলের সমস্ত ছেলে। তা'ছাড়া প্রাথমিক ফোঁজী পরীক্ষায়ও আমি পাশ করে গেলাম, অথচ আমার চেয়েও উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা অনেকেই ফেল করে বসল। আমার বরাতটাও ছিল ভাল। আমরা জানতাম, অকৃত্য প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের যে কোন দেশের

একটি মানচিত্র আঁকতে দেওয়া হবে। পরীক্ষার আগের দিন, কেন জানি না, আমি নিউজিল্যান্ডের ভূগোল এবং মানচিত্রটাকে ভাল করে তৈরী করে ফেলেছিলাম। পরদিন গিয়েই দেখি, প্রথম প্রশ্নটাই হচ্ছে "নিউজিল্যান্ডের একটি মানচিত্র অঙ্কন কর"। এর পর থেকে আমার সমস্ত শিক্ষাই ফোঁজী ক্লাস থেকে শ্রাওহাউসের দিকে পরিচালিত হয়। সরকারী ভাবে আমি ছাত্রের নিম্ন স্কুল থেকে কখনই পাশ করে বেরুইনি।

শ্রাওহাউসে ঢোকবার আগে আমার তিন-তিন বার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। পরীক্ষার বিষয় ছিল মোট পাঁচটা। তার মধ্যে অঙ্ক, ল্যাটিন এবং ইংরাজি ছিল বাধ্যতামূলক আর অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে আমার ছিল ফরাসী ভাষা এবং রসায়ন বিভাগ। অন্তত তিনটি বিষয়ে ভাল ফল না হলে পাশ করা যাবে না। কাক্সেই আমাকে অঙ্ক দিকে জোর দিতে হল। ল্যাটিন আমি শিখতে পারব না। ফরাসী ভাষা মন্দ নয়, তবে তার মধ্যে বেশ একটু প্রভাবনা আছে। থাকল শুধু অঙ্ক। আমি বেগরোয় ভাবে অঙ্ক নিয়ে পড়লাম।

অবশ্য অঙ্ক বলতে সেই জিনিষই এখানে বোঝাচ্ছি যা খুব একটা প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করতে হলে জানা থাকার প্রয়োজন হয় বলে সিভিল সার্ভিস কমিশনাররা মনে করেন। যখন অঙ্ক নিয়েই লেগে পড়লাম, তখন হঠাৎ দেখতে গেলাম 'সাইন' 'কোসাইন' এবং 'ট্যানজেন্টের' এক বিচিত্র দরদালানে এসে ঝাঁড়িয়েছি। বাইরে থেকে দেখলোকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, বিশেষ করে যখন তাদের পরস্পরের গুণফল কথা হয়। আমার তৃতীয় এবং শেষ পরীক্ষায় এই 'কোসাইন' আর 'ট্যানজেন্ট' নিয়ে উঁচু নম্বরের স্মার-কট-কথা একটি প্রশ্ন ছিল। হয়ত এটি আমার সমগ্র পরবর্তী জীবন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বয়ে আনত। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমি কয়েক দিন আগেই এর কুংসিত মুখ দর্শন করেছিলাম এবং প্রথম দর্শনেই চিনতে পেরেছিলাম।

তার পর থেকে আর কখনও এই জীবন্তলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। তৃতীয় পরীক্ষায় পাশ করার পর তারা হাওয়া হয়ে গেল দুঃখপ্লের ছায়াবাজির মত। শুনেছি, ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যাপ্টনমি এবং ঐ জাতীয় ব্যাপারে ওগুলোর একান্ত প্রয়োজন হয়। বড়ই আশঙ্কের বিষয় যে, পৃথিবীতে এ সব সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী বহু লোক জন্ম গ্রহণ করেন, যেমন জন্মান বড় বড় দাবা-খেলোয়াড়—এক নাগাড়ে ১৬ দান খেলে মারা যান সন্ন্যাস রোগে।

আসল কথাটা হল এই যে, আমাকে যদি কেউ কোসাইন এবং ট্যানজেন্ট নিয়ে কোন প্রশ্ন করত, তা'হলে বোধ হয় আমি সেই বয়সেই গীর্জায় গিয়ে গোড়া ধর্মতত্ত্ব প্রচার করে বেড়াতাম। অথবা সহরে গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতাম।

এক কথায় বলা চলে, আমার স্কুলের সময়টা জীবনের সব চেয়েও নিষ্ক্রিয় এবং অসুখী অবস্থায় কেটেছে। আমি যদি রাজমিস্ত্রীর যোগানদার অথবা চিঠি-বওয়া শিশু হতাম, তা'হলে সেই হস্ত স্বাভাবিক এবং বাস্তব। তাতে অনেক কিছু শিখতে পারতাম।

আমি পাবলিক স্কুলের পঞ্চপাতী বটে, তবে আর আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই না।

অনুবাদক—সুনীল ঘোষ।

গত ২০শে কানুন তারিখের 'বঙ্গমহা-সাহিত্য-সভায়'—'জন-

সাধারণের গ্রন্থাগার" নামে যে প্রবন্ধ বার হয়েছে, তাতে গ্রন্থাগার জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি ও পার্থিব সুখের জন্তে কত দূর প্রয়োজনীয় তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি যারা পড়েছেন, আশা করি তাঁরা অন্ততঃ এটুকু বুঝেছেন যে, গ্রন্থাগারের কাজ কেবল বই দেওয়া ও বই ফেরৎ নেওয়া নয়। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব-মনের ও মানব-সমাজের উন্নতি করা, সুতরাং গ্রন্থাগার যাতে ভালো ভাবে পরিচালনা হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার।

গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে চিন্তা করবার আগে একটা কথা মনে রাখতে হবে—গ্রন্থাগারের একটা প্রধান চরিত্র হচ্ছে যে, গ্রন্থাগার মানুষের মত ক্রমবর্ধমান। শিশু জন্মায়, সে বড় হয়, ক্রমশঃ তার বোঁদন ও বার্তিক্য আসে এবং শেষে আসে মৃত্যু—কখনও স্বাভাবিক মৃত্যু কখনও অকাল-মৃত্যু। গ্রন্থাগারের পরিচালনার অভাবে অকাল-মৃত্যু হতে পারে কিন্তু তার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। সুতরাং যত দিন যাবে, পুস্তকাগারের কলেবরও বাড়তে থাকবে।

কোন গ্রন্থাগারের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করতে গেলে তা সব সময় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে। তা না করলে পরিচালনের ব্যবস্থাকে বার বার ভেঙ্গে গড়তে হবে।



## গ্রন্থাগার পরিচালনা

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা এ প্রবন্ধে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে যা বলবো তা সকল প্রকার গ্রন্থাগারের পক্ষেই প্রযোজ্য, এমন কি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পক্ষেও তা কাজে লাগবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্যকে নিম্নলিখিত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় :—

- বই কেনা বা সংগ্রহ করা।
- পত্রিকার হিসাব রাখা।
- বই দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়া।
- পুস্তকের যত্ন লওয়া।

গ্রন্থাগার পরিচালনার আরও অজ্ঞাত দিক আছে কিন্তু তাহা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের বিষয়ভূত করা ঠিক হবে না।

### (ক) বই কেনা

নতুন বই বা-কিছু কেনা হয় তার বেশীর ভাগই প্রথম গ্রন্থাগারিকের দ্বারা নির্বাচিত হয়। পুস্তক নির্বাচন করা বড় সোজা কাজ নয়। বই কেনা হলো অর্থাৎ সে বই যদি কাজে না লাগে তাহলে সে বকম বই মঞ্চে ভরে রাখার কোন মানে থাকে না। পুস্তক নির্বাচন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা পরে আর একটি প্রবন্ধে বলবো। এখানে কেবল এইটুকু মাত্র বসে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে, যাদের জন্তে বই কেনা, তাদের কাজে লাগবে একরূপ বই যাতে কেনা হয়, সব সময় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

কতকাংশ বইয়ের প্রস্তাব পাঠকদের কাছ থেকে আসে।

### প্রস্তাব কার্ড

প্রস্তাবিত পুস্তকের বিবরণ নিম্ন-অঙ্কিত একখানি কার্ডে লিখে রাখতে হয়। পাঠকদের প্রস্তাবের জন্ত একখানি খাতা রাখা প্রয়োজন। পাঠক নিজের হাতে তার প্রস্তাব খাতায় লিখে দেবে। গ্রন্থাগারিক তার নির্বাচিত বইয়ের বিবরণ সরাসরি "প্রস্তাব কার্ডের" উপর লিখবেন। "প্রস্তাব কার্ডে" প্রস্তাবকারীর নাম ও ঠিকানা থাকা চাই, কারণ পাঠকের দ্বারা প্রস্তাবিত বই কেনা হলে, পাঠককে সে সংবাদ দেওয়া দরকার। তাতে পাঠককে বই পড়বার জন্তে উৎসাহিত করা হয়।

### প্রস্তাব কার্ডের নমুনা

কার্ডখানির অপর পিঠে থাকবে প্রস্তাবকারীর নাম, ঠিকানা ও প্রস্তাবের তারিখ।

পুস্তকের প্রস্তাবের জন্ত পর পৃষ্ঠার নমুনা অনুযায়ী কার্ড ছাপিয়ে রাখতে হয়। পুস্তকের প্রত্যেক প্রস্তাব অনুযায়ী কার্ডে লেখকের নাম, পুস্তকের নাম, প্রকাশকের নাম ও মূল্য লেখা হলো। পরে কার্ডগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী একটি ট্রেতে রাখতে হয়।

আজ-কাল পুস্তকাগারের বা কিছু কাজ সবই কার্ডের আর ট্রে দ্বারা হয়ে থাকে। খাতা লেখার পাট অনেক দিন উঠে

ডাক নং.....প্রবেশ তা:.....প্রবেশ নং.....

লেখকের নাম.....

বইয়ের নাম.....

প্রকাশকের নাম.....

মূল্য.....কমিটির মত.....

অর্ডারের তা:.....বিক্রেতার নাম.....

মূল্য দেওয়ার তারিখ.....মূল্য.....

গেছে, অবশ্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারে এখনও খাতার প্রচলন রয়েছে, তার কারণ এ দেশের জনসাধারণ এখনও গ্রন্থাগারি সম্বন্ধে সচেতন নয়।

নিচের নমুনা অমুদ্রার একটি ট্রে'র প্রয়োজন। ট্রে'র ভিতর ৮টি খাপ থাকবে। প্রস্তাব কার্ডগুলি বর্ধাবধ ভাবে পবিপূরণ করে প্রথম খাপে রাখুন কমিটির অমুদ্রার জন্তে। যে বইগুলি কমিটির দ্বারা অমুদ্রিত হলো, সেই বইয়ের কার্ডগুলিতে কমিটির অমুদ্রার তারিখ দিয়ে দ্বিতীয় খাপে রাখুন। যে বইগুলি অমুদ্রিত হলো না, সেগুলি "বাতিল"-এর ঘরে রাখুন।

এর পর বই কেনা আরম্ভ হলো। যে যে বইগুলি কিনতে হবে সেগুলির আর একখানি করে কার্ড লিখুন। কার্ডগুলি প্রস্তাব কার্ডের মতই হবে, কেবল প্রস্তাবকের নাম-ঠিকানা কিছু থাকবার প্রয়োজন নেই। যে দোকান থেকে বই কেনা হবে, সেই দোকানের নাম দুইখানি চ্যাট্রেট লিখুন। প্রথম কার্ডখানি তৃতীয় খাপে রাখুন এবং দ্বিতীয় কার্ডখানি অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যে কার্ডগুলি লেখা হলো, সেগুলি একখানি পত্র সমেত বিক্রেতার নিকট পাঠিয়ে দিন।



প্রস্তাব কার্ডের ট্রে  
পত্রের নমুনা

মহাশয়!

পত্র-সংগ্রহ কার্ড অমুদ্রার বইগুলি যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিলে বাতিঘ চটক। এখানে বইয়ের সজ্জা বইয়ের কার্ডগুলি

ফেরৎ দিবেন। প্রত্যেক বইয়ের মূল্য নির্দেশ করা আপনার বিলের দুই প্রহ পাঠাইবেন। কোন পুস্তকের সংস্করণ নির্দেশ করা না থাকিলে পুস্তকের নবতম সংস্করণ পাঠাইবেন।

ইতি—

গ্রন্থাগারিক।

এবার বই আসিতে আরম্ভ হলো। বই যেমন যেমন আসবে সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের ভিতরের কার্ডগুলি তৃতীয় খাপে রাখা কার্ডগুলির সহিত মিলাইয়া দুইখানি কার্ডেই পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ নম্বর লিখিয়া তৃতীয় খাপের কার্ডগুলি চতুর্থ খাপে রেখে বইগুলি পুস্তকের জাতি-বিচারকের কাছে পাঠিয়ে দিন। বইয়ের সহিত যে কার্ডগুলি ফেরৎ আসছে সেগুলি একটি ট্রে'র ভিতর পুস্তক প্রবেশের তারিখ ও প্রবেশ নম্বর অমুদ্রার সাজিয়ে রাখুন। এ কার্ডগুলি পরে কাজে লাগবে।

যে বইগুলি জাতি-বিচারের জন্ত পাঠানো হলো, সেগুলি ফেরৎ এলে বইগুলির ডাকনাম দুইখানি কার্ডে লিখে চতুর্থ খাপের কার্ডগুলি পঞ্চম খাপে রেখে বইগুলি পাঠিয়ে দিন তালিকা প্রস্তুত করবার জন্ত।

বইগুলির তালিকা প্রস্তুত হয়ে কিংব এলে, পঞ্চম খাপের কার্ডগুলিতে ও অষ্ট ট্রে'তে রাখা কার্ডগুলিতে তালিকা প্রস্তুতের তারিখ (তালিকা কার্ডের পিছনে থাকবে) বসিয়ে দিন। এখন বইখানি আপনার পুস্তকাগারের মজুত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো। বইয়ের প্রস্তাব থেকে আরম্ভ করে পুস্তকের তালিকা পর্যন্ত প্রত্যেক বই সম্বন্ধে সমুদয় সংবাদ সম্বিষ্ট হয়ে আপনার হাতে প্রত্যেক বইয়ের দক্ষ হ'খানি করে কার্ড জমলো।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে পরিচালনার জন্ত দু'টি তালিকা রাখা এতদন্ত প্রয়োজন: ১। পুস্তকগমনের তালিকা ও ২। মজুত তালিকা। মজুত তালিকার কথা আমরা পরে বলবো।

১। পুস্তকগমনের দৈনন্দিন তালিকা: এই তালিকা থেকে শেষ বইখানির সংখ্যা দেখে বলা যায়, আল পথ্য পুস্তকাগারে কত বই কেনা হয়েছে। শেষ সংখ্যাটি যে পুস্তকাগারের পুস্তক-সংখ্যা নির্দেশ করবে তার কোন মানে নেই, কারণ পুস্তকাগারের বই মাঝে মাঝে বাতিল করা হয়। তবে আনুমানিক সংখ্যা নির্দেশ করে বলতে পারেন।

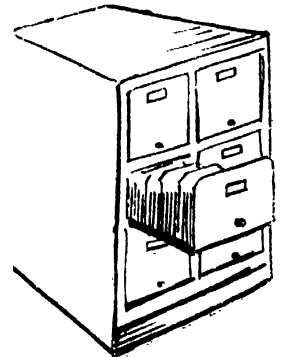
বইয়ের আগমনের সংখ্যা কার্ডের উপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বই কেনার কাজ শেষ হলো।

এইবার কার্ড দু'খানির একখানিকে পুস্তকগমনের দৈনন্দিন তালিকারূপে ও আর একখানিকে শেল্ফ তালিকারূপে ব্যবহার করুন।

এই দু'টি তালিকা কাজের উপযোগী করে রাখবার জন্ত টানা-দেওয়া দু'টি দেয়াল চাই:—

একটি দেয়ালে প্রত্যেক

বইয়ের কার্ড পুস্তকগমনের দৈনন্দিন সংখ্যা অমুদ্রার সাজিয়ে রাখুন।



আর একটি দেওয়াজে কার্ডখানি পুস্তকের জ্ঞাতির সংখ্যা অমুখ্যায়ী সাজিয়ে রাখুন।

এক কাজে ছ' কাজ শেষ করার এই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

আধুনিক গ্রন্থাগারের পরিচালনার বেশীর ভাগ কাজই কার্ড-ট্রে-দেওয়াজ এই পন্থায় হয়ে থাকে।

## ২। বই দেওয়া-নেওয়া

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখবার নানাবিধ উপায় আছে। যে রকম উপায়ই আমরা অবলম্বন করি না কেন, বই দেওয়া-নেওয়ার উপায় থেকে অন্তত তিনটি বিষয়, প্রয়োজন হলে অনতিবিলম্বে জানতে পারা যাওয়া চাই। ১। কার কাছে বই আছে; ২। কি বই কার কাছে আছে; ৩। কি বই কখন কে ফেরৎ দেবে।

বই দেওয়া-নেওয়ার হিসাব রাখবার উপায়ের প্রয়োজনীয় কয়েকটি শিনিষ:—

ক। নির্গত বইয়ের ট্রে (১১" × ২২" × ৩ ১/৪")

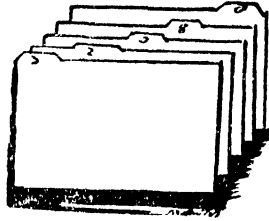
খ। তারিখ নির্দেশক।

প্রতি দিনের নির্গত বইয়ের পরিচয়-পত্র এই নির্দেশক-গুলির পিছনে, পুস্তকের জ্ঞাতি-বিচ্যাবের সংখ্যা অমুখ্যায়ী সাজিয়ে রাখা হয়।

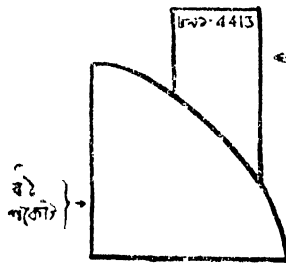
গ। কার্ডের ঠেকনা।

কার্ডগুলিকে সোজা করে রাখবার জন্য ট্রে ভিতর এই ঠেকনা রাখার প্রয়োজন হয়।

ঘ। পুস্তকের পরিচয়-পত্র: একখানি ২" × ১ ১/২" পরিমিত



তারিখ নির্দেশক



বই-কার্ড

পুরু ও শক্ত কার্ড বইয়ের পিছনের মলাটের ভিতর দিকে রাখা থাকবে। পরিচয়-পত্রের উপর লেখকের নাম বইয়ের নাম ও বইয়ের নম্বর থাকবে। এই কার্ডখানিকে একটি ট্রে ভিতর নম্বর অমুখ্যায়ী সাজিয়ে রাখলেও চলে।

ঙ। গ্রাহকের পরিচয়-পত্র: পরিচয়-পত্রে গ্রাহকের নাম-ঠিকানা ও প্রয়োজন

গ্রাহকের

নাম

ঠিকানা

তারিখ

পুস্তকাগারের

নাম

হলে গ্রাহকের নম্বর ও নিচের দিকে পুস্তকাগারের নাম। কার্ডের নিচের দিক থেকে কিছু উঁচুতে একটি পকেট।

চ। বইয়ের প্রচ্ছদপত্রের ভিতর দিকে একটি তারিখ-নির্দেশক পত্র থাকবে। এই পত্রের উপর বই-নির্গমন সম্পর্কে নিয়ম লেখা থাকবে।

পনের দিনের মধ্যে বইখানি ফেরৎ দিতে হবে। ১৫ দিনের বেশী রাখলে সপ্তাহে এক আনা হারে জরিমানা দিতে হবে।

এইবার মনে করুন আপনি বই দিচ্ছেন। গ্রাহক একটি ছাপা কাগজে তার কি বই চাই লিখে দিল। এই কাগজখানি এইরূপ হবে:—

## পুস্তকাগারের নাম

লেখক.....

বইয়ের নাম.....

বইয়ের নম্বর.....

গ্রাঃ নাম.....

ঠিকানা.....

গ্রাঃ নং.....তারিখ

বইখানি আপনার কাছে এলো। আপনি বইখানির পিছন দিক হতে বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি খুলে নিলেন। পুস্তকের পরিচয়-পত্র যদি বইয়ের ভিতর না রেখে ট্রেতে রাখা হয়, তাহলে ট্রেখানি আপনার পাশেই থাকবে এবং সেই ট্রে ভিতর পুস্তকের পরিচয়-পত্রগুলি বইয়ের নম্বর অমুখ্যায়ী সাজান আছে। বইখানির নম্বর দেখে, ট্রে থেকে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিন। গ্রাহকের পরিচয়-পত্রখানি চেয়ে নিন। তার পর বইয়ের প্রচ্ছদপত্রে আঁটা তারিখের লেবেলে যেদিন বই ফেরৎ দিতে হবে সেই দিনের তারিখ

দিয়ে বইখানি গ্রাহককে দিয়ে দিন। তার পর গ্রাহকের টিকিটের পকেটে বইয়ের টিকিটখানি রেখে, মিলিত পত্র দু'টি তারিখ

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| গ্রাহকের<br>নাম<br>ঠিকানা               | { গ্রাহকের<br>পরিচয়-পত্র |
| ৮১১. ৪৪১৩<br>শেখের কবিতা<br>রবীন্দ্রনাথ |                           |
| পুস্তকাগারের<br>নাম                     | { পুস্তকের<br>পরিচয়-পত্র |

নির্দেশকের পিছনে রেখে দিন। পুস্তকাগার বন্ধ হবার আশ ঘটা আগে মিলিত পত্রগুলিকে নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ট্রের পিছন দিকে রেখে দিন। ট্রের পিছন দিকে নতুন ও সামনের দিকে ক্রমশঃ পুরাতন তারিখের মিলিত পত্রগুলি থাকবে। ফলে যেদিন যে বই ফেরৎ আসবার কথা, সেই সেই বইয়ের মিলিত পত্রগুলি আপনা থেকে সমুখে এসে পড়বে। সকালে পুস্তকাগারে এসে সামনের তারিখ-নির্দেশক পত্রের পিছনে যে মিলিত পত্রগুলি পাবেন, সেগুলি বার করে নিয়ে গ্রাহককে পত্র দিন। চিঠিখানি একটু মিষ্টি করে লিখবেন। রুচতা যেন একটুও থাকে না। জরিমানার কথা, চিঠি পাঠানর খরচা সবই লিখবেন কিন্তু সবই মিষ্টি করে লিখবেন। চিঠিতে বিন্দুমাত্র হুকুমের ভাব থাকলে গ্রাহক চটে যাবে।

বই দেওয়ার কাজ তো শেষ হলো। এইবার বই ফেরৎ নেওয়া। গ্রাহক বই নিয়ে এলো। আপনি মিলিত পত্রখানি বার করে নিয়ে, বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে গ্রাহকের পরিচয়-পত্র গ্রাহককে ফিরিয়ে দিয়ে, বইয়ের পরিচয়-পত্রখানি বন্ধস্থানে রেখে দিন। এইখানেই বই দেওয়া-নেওয়ার কাজ শেষ হলো। একটি কথাও আপনাকে লিখতে হলো না অথচ কার কাছে কি বই আছে এবং কবে বইখানি ফেরৎ আসবে, তার সব সন্ধানই আপনার কাছে রইলো।

গ্রাহক যে কাগজে বইয়ের জমা প্রার্থনা করল, সে কাগজগুলি এইবার বইয়ের নম্বর অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলুন। প্রতি মাসের শেষে এই কাগজগুলির (প্রার্থনা-পত্র) সাহায্যে পুস্তক নির্গমনের বিবরণী তৈরি হবে। পুস্তক নির্গমনের বিবরণী অতি প্রয়োজনীয়—ইহা লাদারদের পুস্তক-চাহিদার মাপকাঠি।

### গ্রাহকের নাম রেজিস্ট্রি

কেহ গ্রাহক হইতে চাহিলে তাকে প্রথমে একটি আবেদন করতে হবে। আবেদন-পত্র নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী ছাপা থাকবে :—

আবেদন-পত্রখানি পূরণ করে দেবার পর গ্রাহককে একখানি পরিচয়-পত্র দেওয়া হবে। সেই পরিচয়-পত্রে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও

### পুস্তকাগারের নাম

(গ্রাহক হবার আবেদন-পত্র)

পুরা নাম.....  
ঠিকানা.....  
কর্মস্থলের ঠিকানা.....  
তারিখ.....

গ্রাহক নং.....জন্ম.....তারিখ.....

আমি গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধে সমুদয় নিয়ম পড়িয়া পরিচয়-পত্রের জমা আবেদন করলাম। গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সম্বন্ধীয় সমুদয় নিয়ম জানিতে বাধ্য রইলাম।

গ্রাহকের আবেদন-পত্রগুলি নামেব বর্ণমালা অনুযায়ী একটি দেবাজের টানায় সাজিয়ে রাখুন।

গ্রাহকের পরিচয়-পত্র সাধারণতঃ প্রতি বৎসর নতুন করে করে নিতে হয় এবং নতুন করে নেবার সময় গ্রাহককে নতুন করে আবেদন করতে হয়। গ্রাহকের নম্বর প্রতিবার নতুন করে না করে একই নম্বর বছরের পর বছর চালানো যায়। এইরূপ করতে হলে নিম্নলিখিত নমুনা অনুযায়ী একখানি খাতা ব্যবহার করতে হয়।

| নং | ১৯৪৮<br>নাম   | ১৯৪৯<br>নাম                    | ১৯৫০<br>নাম                |
|----|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| ১  | অক্ষয় নন্দী  | অক্ষয় নন্দী<br>১, ডিসেম্বর    | অক্ষয় নন্দী<br>৪, নভেম্বর |
| ২  | অমলা দেব      | চন্দ্রনাথ বন্দ্যো<br>৪ঠা আগষ্ট |                            |
| ৩  | চিত্ত বন্দ্যো |                                |                            |
| ৪  |               |                                |                            |

আবেদন-পত্রের নাম প্রথম সারির যে নং গালি আছে সেই নম্বরে লিখুন। এই নম্বরটি আবেদন-পত্রে ও গ্রাহকের পরিচয়-পত্রে দিন। তারিখ লিখুন নামের উপরে। অক্ষয় নন্দী যখন তার পরিচয়-পত্র নতুন করে নিলে, ২য় সারিতে তারই নং এ তার নাম লিখুন, তারিখ দিন তার নামের নিচে। অমলা দেব নতুন করে গ্রাহক হলো না, তার স্থানটি নতুন কোন গ্রাহককে দিন

নতুন করে গ্রাহক হবার ক্ষেত্রে এখনও আবেদন করেনি—আবেদন করার সময় আছে, সেই ক্ষেত্রে তার স্থান খালি পড়ে আছে।

যে পরিচয়-পত্রগুলি নতুন করা হলো না, সেই সব গ্রাহকের আবেদন-পত্র নষ্ট করে ফেললেই কাজ মিটে গেল এবং তাদের পরিচয়-পত্রের স্থলে নতুন আবেদনকারীদের আবেদন-পত্রগুলি নাম রেজিস্ট্রার নম্বর সমেত রেখে দিল।

টিকিট নতুন করে নেবার নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষাও অন্ততঃ আরও তিন মাস অপেক্ষা করার পর-তবে গ্রাহকের নাম কেটে দিতে হয়।

### পত্রিকার হিসাব

সাধারণ ছোট-খাটো পুস্তকাগারে যেখানে কয়েকখানা মাত্র পত্রিকা নেওয়া হয় সেখানে পত্রিকার হিসাব রাখা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়, কিন্তু বড় বড় পুস্তকাগারে কিংবা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাগারে পত্রিকার হিসাব রাখা একান্ত দরকার। কোন পত্রিকা বর্ষাসময়ে এলো কি না, পত্রিকা না আসার ক্ষেত্রে প্রকাশককে

কার্ডগুলি ট্রেস "দৈনিকের" বাপে, সাপ্তাহিক "সাপ্তাহিকের" বাপে থাকবে।

দৈনিকের বেলা কার্ডের ঘরগুলি উপর নিচে ব্যবহার বন্ধন এবং প্রতিদিন যেমন কাগজ পাচ্ছেন একটি করে \* চিহ্ন দিন।

দৈনিক পত্রিকার হিসাব একখানি কার্ডের উপর দুই বৎসরের রাখা যাবে।

সাপ্তাহিকের বেলায় ঘরগুলি আড়াআড়ি ভাবে ব্যবহার বন্ধন।

মাসিক পত্রিকার বেলা প্রতি ঘরে একটি করে X দিয়ে দেওয়া যাত্রা কাজ।

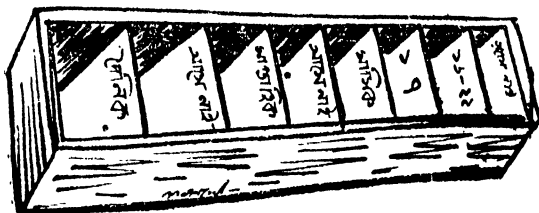
যে দিনেব, যে সপ্তাহের ও যে মাসের যে কাগজ এলো না, সেই কাগজের কার্ডখানি তুলে নিয়ে "আসে নাই" ঘরে রাখুন এবং প্রকাশককে তাগিদ-পত্র দিন।

প্রতিদিন সকালে এসে একবার করে পত্রিকার ট্রে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কি কাগজ আসতে বাকি আছে। মাসিক পত্রিকার বাপ; হুঁটি-একটি ১ হতে ৭ তারিখের মধ্যে যে পত্রিকাগুলি

| বহুমতী      |           | মাসিক       |       |             |               |             |            |        |            |           |         |          |
|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|-----------|---------|----------|
| ৭ তারিখ     |           | ১২, বাৎসরিক |       |             |               |             |            |        |            | ব: সা: ম: |         |          |
| বৈশাখ—চৈত্র |           | সূচি চৈত্র  |       |             |               |             |            |        |            |           |         |          |
|             | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল      | মে            | জুন         | জুলাই      | আগস্ট  | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর   | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
| ১১৫০        | * * *     |             |       | * * *<br>সা | * * *<br>প্তা | * * *<br>হি | * * *<br>ক |        |            |           |         |          |
| ১১৫১        | * * *     |             |       |             | মা<br>*       | সি<br>*     | ক<br>*     | প<br>* | ত্রি<br>*  | কা<br>*   | *       | *        |
| ১১৫২        | * * *     |             |       |             |               |             |            |        |            |           |         |          |
| ১১৫৩        | * * *     |             |       |             |               |             |            |        |            |           |         |          |

পত্র লেখা, কোন পত্রিকার কত খণ্ড আছে—কোন খণ্ড নাই এ সম্বন্ধে সংবাদ নথি-দপ্তরে থাকা চাই।

পত্রিকার হিসাব রাখবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন উপরের নমুনা



অস্থায়ী ছাপা বোর্ড, আর একটি ট্রে। প্রত্যেক কার্ড উপরের নমুনা অস্থায়ী পত্রিকার বিবরণ লেখা থাকবে। দৈনিকের

আসে, আর একটি ১৬ হতে ২২ তারিখের মধ্যে যে সব পত্রিকা আসবে, আর একটি ২৩ হতে ৩১ ঘর থাকলে ভালো হয়। পত্রিকা পাবার আনুমানিক তারিখ কার্ডের উপর লেখা থাকবে এবং তারিখ অনুযায়ী কার্ডগুলি তারিখের গাপে থাকবে।

### দান গ্রহণের দ্বারা পুস্তক সংগ্রহ

দান গ্রহণের দ্বারা বেশী পুস্তক সংগ্রহ হয় না সত্য, কিন্তু জনসাধারণের পুস্তকাগারে দান গ্রহণ সময়ে সময়ে বিশেষ একটি সমস্যা হয়ে পড়ায়। সাধারণতঃ কাছ থেকে দান গ্রহণের দ্বারা খুব বেশী মূল্যবান বই পাওয়া না গেলেও, জনসাধারণের কাছে স্থানীয় গ্রন্থাগারে যাওয়া উচিত, এবং তাদের দানে পুস্তকাগার যে বিশেষ উপকৃত হবে এ বিষয়ও জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া

দরকার। কিন্তু মনে রাখবেন, দান করার চেয়ে দান গ্রহণ করা অনেক সমস্তা জনক। সেই জন্তে দান গ্রহণ করা না করার ক্ষমতা গ্রন্থাগার কমিটির উপর জন্ত থাকে। দান করে অনেক মনে করেন পুস্তকাগার সাধারণের কাছে দাতার নাম চিরস্মরণীয় করে রেখে দেবে, কিন্তু একথা তাঁরা ভুলে যান যে, বিশ শতাব্দীর পুস্তকাগারে খুব কম বই চিরস্থায়ী হয়। কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক পুস্তকের মূল্য নষ্ট হয়ে যায়। যে বইয়ের কোন মূল্য নেই এমন বই আজকালকার পুস্তকাগারে রাখার মানে থাকে না।

বই কেনার সময় আমরা যে উপায় অবলম্বন করেছি, এখানেও ঠিক সেই উপায় অবলম্বন করা দরকার। দান গ্রহণের দ্বারা যে বইগুলি পুস্তকাগারে আসবে সেগুলির একখানি করে কার্ড লিখে ফেলুন। এ কার্ডগুলি বঙ্গীয় কার্ড হলে ভালো হয়, তাতে কার্ডগুলি দেখলেই বোঝা যাবে দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইয়ের কার্ড। ছোট-খাটো পুস্তকাগারে “বই কেনার ট্রেট” “দান গ্রহণের ট্রেট” হিসাবে ব্যবহার করা চলে। বড় পুস্তকাগারে “দান গ্রহণের” একটি আলাদা ট্রেট ব্যবহার করলে ভালো হয়।

“বই কেনার” কার্ডগুলি যেমন এক এক ধাপ উঠে শেষ পর্যন্ত “দৈনন্দিন” পুস্তকগমনের তালিকা হিসাবে ব্যবহার হয়, “দান গ্রহণের” কার্ডগুলিও ঠিক সেইরূপ ধাপে ধাপে উঠে শেষে পুস্তকগমনের দৈনন্দিন তালিকা হিসাবে ব্যবহার হবে।

দান গ্রহণের দ্বারা পাওয়া বইগুলির জন্তে গ্রন্থাগারে আলাদা কোন স্থান ঠিক না করাই ভালো। পুস্তকাগারের সাধারণ পুস্তক-সম্ভারের সঙ্গেই সে বইগুলিকে স্থান দেওয়া উচিত এবং সে বইগুলির আলাদা কোন তালিকা না করে সাধারণ তালিকাতন্ত্র করা ভালো। তবে যে ক্ষেত্রে দান মূল্যবান এবং পুস্তকের সংখ্যা বেশী, সে ক্ষেত্রে অন্ততঃ দানের ও দাতার মধ্যাদা বন্ধায় রাখবার জন্তে আলাদা ব্যবস্থা করা উচিত।

### বইয়ের যত্ন

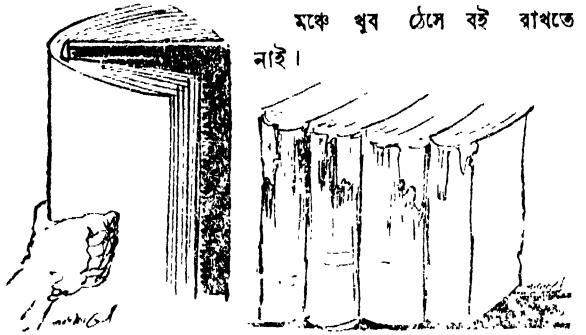
পুস্তকাগারের আয়ের শতকরা সাত ভাগ বই বাঁধাই করতে খরচা হয়। পাঠকদের ও পুস্তকাগারের কর্মীদের গাফিলতির জন্ত বৈশ্বী ভাগ ক্ষেত্রে বইয়ের ক্ষতি হয়ে যায়, সেই কারণে পাঠকদের ও কর্মচারীদের বইয়ের যত্ন নেওয়া সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বই খোলা : প্রথম দুই হাতের অনামিকা ও মধ্যমার দ্বারা করে রাখানি পাতা-সম্মত বইয়ের মলাট ধরিয়ে মলাট দুইখানিকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলুন। ঠিক সেই অবস্থায় বইখানিকে বন্ধ করে বন্ধাস্থিরে রাখা আর কিছু পাতা আলাগা করে ধরুন। বইখানি আবার খুলুন—বইয়ের মাঝামাঝি এসে পড়লেই কাজ শেষ হলো।

পাতা কাটা : পাতা কাটবার জন্ত খুব ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে নেই। প্রায়িকের বা হাড়ের বই-কাটা ছুরি ব্যবহার করা ভালো। পাতাগুলি সম্পূর্ণ ভাবে বইয়ের শিরদাঁড়া পর্যন্ত কাটবেন—একটুও বাকি যেন না থাকে। বইয়ের পাতা কাটবার জন্তে পাঠক যত্ন নেবে না—সমুখে বা পাবে তাই দিয়ে সে পাতা

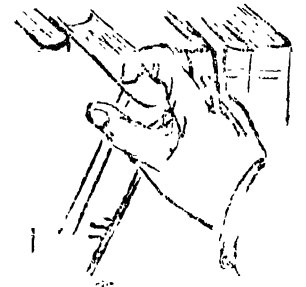
পত্র-নির্দেশক : বইয়ের পাতা মোড়া—পাতার কোণ মোড়া, দাঁত-খোঁটার কাটি পাতার মধ্যে রাখা পাঠকদের অভ্যাসগত দোষ। “পাতা মুড়িবেন না” এ কথা পাঠকদের বলায় কোন লাভ নেই। পাঠকদের অভ্যাস দূর করতে গেলে তাদের অভাব দূর করতে হয় অর্থাৎ প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে একটি করে পত্র-নির্দেশক দিতে হয়। প্রত্যেক বইয়ের সঙ্গে পত্র-নির্দেশক বিশেষ কিছু কষ্টকর নয়। প্রকাশকদের বিজ্ঞাপন-জ্ঞাপা পত্র-নির্দেশক প্রকাশকদের কাছ থেকে চাইলেই পাওয়া যায়।

### মঞ্চ হতে বই বার করা



ঠাসে বই রাখলে তাড়াতাড়ি বই বার করবার সময় দ্বিতীয় নম্বরের ছবির মত বইয়ের অবস্থা হয়।

মঞ্চ হতে বই বার কব-বার সময় তৃতীয় নম্বরের ছবিকে বই বার করা যেমন দেখান আছে তেমনি ভাবে বার করতে হয়।



### বই ধরবার নিয়ম

১ নং এর ছবির মত বই ধরলে বইয়ের শেলাই কম-জোড়ী হয়ে যায়, ফলে পাতাগুলি আলাগা হয়ে যায় এবং নিজ হিঁড়ে যায়।

ধূলা : বইয়ের ধূলা ঝাড়া একটি নিত্য-প্রয়োজনীয় কাজ। মনে রাখবেন, ধূলা ঝাড়তে হয়—ঘসতে নাই। ধূলা ঝাড়বার জন্ত লাস ব্যবহার করা ভালো। ঝাড়ন ব্যবহার করলে ধূলা বইয়ের পাতার ভিতর ঢুকে যায়।

আর্জ/তা : বইয়ের মঞ্চ কখন দেয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে নেই। মঞ্চের পিছন দিকে হাওয়া যাতায়াত করবার যথেষ্ট স্থান থাকা দরকার। শেলফের নিচেকার থাক মাটি থেকে অন্তত ১ই ফুট উঁচু হওয়া চাই। আর্জ/তা বইয়ের বাঁধাই, প্রচ্ছদপট, প্রচ্ছদপটের রং, বইয়ের পাতার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

ধোয়া : মঞ্চের ঘরের ভিতর ধূমপান করা নিষেধ থাকা চাই, তাতে অগ্নিভীতি অনেকটা দূর হয়। আর মনে রাখবেন, তামাকের ধোঁয়ায় বাঁধাই-করা বইয়ের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়।

আলো ও উত্তাপ : বইয়ের উপর সোজা সূর্য্য-ভাবে আলো

শুভ্র বইয়ের উপর উত্তাপ বেশী লাগে—তাহতে বই বাঁকিয়া যায় এবং বইয়ের নমনীয়তা ও রং ধারাপ হয়ে যায়।

### বইয়ের ঠেকনা

আমরা আগেই বলেছি, শেল্ফে বেশী ঠেসে বই রাখতে নেই। অনেক সময় একখানি বই টেনে বার করতে গিয়ে শেল্ফ শুধু বই মাটিতে পড়ে যেতে পারে। নূতন বইকে স্থান দিবার জন্য শেল্ফে ১৫ সময় কিছু জায়গা রাখতে হয়। শেষের বইখানিকে খাড়া করে রাখবার জন্য একটা ঠেকনা ব্যবহার করা দরকার।

বই সারা : কোন পাতা ছিঁড়ে গেলে জোড়া দেওয়া, একটি হবির প্লেট খুলে গেলে তা পুনরায় জোড়া দেওয়া, এই সব সামান্য কাজ পুস্তকাগারের কর্মীদের সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলা দরকার।

বই বাঁধাই : বই বাঁধাই দপ্তরীর কাজ, কিন্তু যিনি বই বাঁধাতে দিবেন তাঁর বই বাঁধাই সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান চাই। কোন বইয়ের কিরূপ বাঁধাই হওয়া দরকার, নিদর্শন অনুযায়ী বাঁধান হলে কি না, যুগ্ম শেলাইয়ের জায়গায় ফুঁড়ে শেলাই করা হয়েছে কি না, এ সব বিষয় তাঁর জানা প্রয়োজন। পুস্তক বাঁধাই সম্বন্ধে আমরা এখানে কিছু বলবো না, কারণ পুস্তক বাঁধাই হচ্ছে পুস্তক-বিজ্ঞানের অঙ্গ। এখানে কেবল আমরা বলবো বই বাঁধাতে দেওয়া ও তা কেবল নেওয়ার হিসাব রাখার কথা :

বই বাঁধতে দেওয়ার সময় দপ্তরীকে জানিয়ে দিতে হয় কোন বইখানি কি রকম বাঁধাই হবে।

বই বাঁধাইয়ের হিসাব রাখবার জন্য প্রয়োজন একটি ট্রে ও কতকগুলি নিম্নের নমুনা অনুযায়ী ছাপা কার্ড :—

### প্রোগ্রামারের নাম

ছাপার আদর্শ.....

ক্রমিক নং

রং.....

শিরদাঁড়ার রং

মূল্য.....তারিখ

৫ ৬

৫ ৬

৫ ৬

বই বাঁধাই করতে পাঠাবার আগে বইয়ের ভিতর হতে পুস্তকের পরিচয়-পত্রখানি বার করে নিয়ে একটি ট্রে'র ভিতর রাখুন।

প্রত্যেক বইয়ের জন্য উপরের নমুনা অনুযায়ী দুইখানি করে কার্ড করুন, একখানি বইয়ের সঙ্গে দপ্তরীকে দিয়ে দিন। আর যে কার্ডখানি নিজের কাছে রাখলেন, তার শিঁহনে দপ্তরীর বা তার প্রেরিত লোকের স্বাক্ষর করে নিন। পরে কার্ডগুলিকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী একটি ট্রে'র ভিতর সাজিয়ে রাখুন। বই ফেরৎ এলে আপনাদের কাছে রাখা কার্ডের বিবরণের সহিত বই মিলিয়ে নিয়ে, বইয়ের ভিতর পুস্তক পরিচয়-পত্রখানি বসানো যেনে দিন। এবার বই মঞ্চে পাঠিয়ে দিতে পারেন। প্রতি বৎসরের শেষে বই বাঁধাই করতে কত খরচা হলো তার হিসাব করা হলে বই বাঁধাইয়ের কার্ডগুলি নষ্ট করে ফেলতে পারেন।

### পুস্তক নির্গমনের তুলনামূলক হিসাব

কোন জাতীয় বই কত বার হচ্ছে তার একটি তুলনামূলক হিসাব প্রতি বৎসর করা প্রয়োজন। এই হিসাব দেখে বোঝা যায় কোন জাতীয় বই কি রকম ব্যবহার হচ্ছে, কোন জাতীয় বই পুস্তকাগারে আরও বেশী রাখা দরকার, গ্রাহকের সংখ্যা অনুযায়ী বইয়ের চাহিদা হচ্ছে কি না, কোন বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, বইয়ের ব্যবহার অনুযায়ী পুস্তকাগারে কাজ হচ্ছে কি না, কর্মী কমানো বা বাড়ানো প্রয়োজন কি না, এ সব বিষয়ই পুস্তক নির্গমনের হিসাব থেকে বোঝা যায়। পুস্তক নির্গমনের হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আমরা পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলবো।

মনে রাখতে হবে পুস্তকাগার সাধারণের, সেই জন্য সাধারণের সব সময়েই জানবার অধিকার আছে তাদের পরস্য কি রকম ব্যয় হচ্ছে। প্রতি বৎসরে বই নির্গমনের হিসাব, গ্রাহকের হিসাব এবং পুস্তকাগারের কর্মীদের কাজের হিসাব ছাপিয়ে বার করা প্রয়োজন।

### পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া

প্রতি বৎসর পুস্তকাগারের পুস্তক-সম্ভারের হিসাব নেওয়া দরকার। মঞ্চ-তালিকার সঙ্গে, মঞ্চে সঞ্চিত বই, নির্গত বইয়ের তালিকা ও যে-সকল বই বাঁধাই করতে দেওয়া হয়েছে, তা মিলিয়ে দেখতে হয় কি কি বই হারালো বা কি কি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই জন কর্মচারীর দ্বারা এই কাজ সম্ভব হয়। এক জন মঞ্চে বঞ্চিত বইয়ের নাম ডাকতে থাকে আর এক জন শেল্ফ-তালিকার কার্ডগুলি নামের সঙ্গে মিলিয়ে বেতে থাকে। মঞ্চে বইগুলি ঠিক যে হিসাবে সাজান আছে, মঞ্চ-তালিকার কার্ডগুলিও ঠিক সেই হিসাবে সাজানো থাকে, সেই জন্য মিলানোর কোন অন্তর্বিধা হয় না। যে বইখানির নাম ডাকা হলো না, সেই বইয়ের কার্ডখানির উপর একটি (✓) দাগ দিলেই হলো। মঞ্চে বই মেলানোর পর, পুস্তক নির্গমনের তালিকা ও বই-বাঁধাইয়ের তালিকার সঙ্গে শেল্ফ-তালিকা মেলানো হলো। পরে যে কার্ডগুলোর উপর ১/ চিহ্ন বসিলো, সেইগুলির একটি তালিকা করে কেসেই পুস্তক-সম্ভারের হিসাব সম্পূর্ণ হলো।



## বইয়ের শিরদাঁড়ায় ডাক নাম লেখা

ডাক নাম লেখা দু'রকম ভাবে হয়ে থাকে। সোজামুজি বইয়ের আবরণের উপরেই কালি দিয়ে লেখা হয়, না হয় আলগা চোকা বা গোল না হয় অল্প কোন আকারের কাগজের উপর ডাক নাম লিখে বইয়ের শিরদাঁড়ার উপর আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে হয়। কিন্তু কাগজের ডাক নামফলক শীঘ্র ময়লা হয়ে যায় এবং অনেক সময় পালিশ করা চামড়ার উপর বা কাগজের উপর যারা মুদ্রিত হয়—ঠিক আটকে থাকে না। সেই জন্তে যে স্থানে ফলকটি যারা হবে সে স্থানটিকে বেশ করে ভিজিয়ে নিতে হবে, না হয় শিথিল কাগজ দিয়ে ঘসে নিয়ে পালিশ তুলে কেলেতে হবে, তার পর ভালো করে আঠা লাগিয়ে ফলক যারতে হবে। ফলকের সংখ্যাগুলি এক রকমের হলে, এবং তলা দিক থেকে একই দূরত্বে থাকলে শেল্ফ-এর দৌলদায় বাড়ে। নিচের দিক থেকে ১" হতে ৩" দূরে ফলকগুলি যারা হয়। মোটা বইয়ের পিছনে অর্থাৎ শিরদাঁড়ায় ফলক আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া চলে, কিন্তু চটি বইয়ের পিছন দিকে উপরের দক্ষিণ কোণে লেবেল যারতে হয়; তার কারণ,

কত নম্বরের বই তা দেখবার জন্তে বইখানি একটু টেনে বার করলেই নম্বর চোখে পড়বে।

বই বাঁধতে দেবার সময় অর্ধাঙ্গের বইয়ের ডাক নম্বর ছাপিয়ে দেওয়া ভালো।

কম খরচায় বইয়ের ডাক নম্বর লিখিয়ে দেবার উপায় হচ্ছে "Stylo lectie" কলম ব্যবহার করা। গাভের চামড়ায় উঁকি পরানর মত ঠিক এই কলমের দ্বারা কাজ হয়। সাত রকম রঙে ছাপা ১" কাগজের কোটা পাওয়া যায়। এক একটি কোটায় ১২০টি ডাক নম্বর লেখা হয়। এক একটি ডাক নম্বর লিখতে খরচ পড়ে ১ পেনির ২½ অংশ।

পুস্তকাগার পরিচালনার কথা এখানে শেষ হলো। শেষ জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিচালনার অভাবে পুস্তকাগারের নাম খারাপ হয়ে যায়, গ্রাহক বিরক্ত হয়ে পুস্তকাগারে আসে না, এবং পুস্তকাগারের উদ্দেশ্য—জনসাধারণের সেবা—ফল হয় না। পুস্তকাগার ঠিকমত চালাতে গেলে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার :

শৃঙ্খলা      তৎপরতা      কর্তব্যবোধ

## “শ্রীরামকৃষ্ণদেব”

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

প্রেমের ঠাঁকুর ভূমি।

সংসৃতি-দাবদস্ত জনের ছারাসাঙ্কল ভূমি।

তরাতে শ্রান্ত ভ্রান্ত বন্ধ এসেছিলে তুমি সাধু।

অজ্ঞান-মোহ-স্বাস্থ্য, আলোকে প্রোজ্জ্বল করি শুধু।

জাতি ছুটেছিল হৃৎসহ পথে নিশীথ অন্ধকারে।

ধর্মের নামে বেচ্ছাচারিতা যুদ্ধ করেছে তারে।

নাহি প্রেম, নাহি মানব-ধর্ম উদার শান্তি গাথা।

মিথ্যার জালে বন্দী তখন আপনি মহান খাতা।

মনোরাগ্নোর উদাত্ত বাণী শ্রেষ্ঠ সে সমাধান।

ভুলেছিল সবে, হিন্দুধর্ম, দৈব প্রাণধান।

কর্মফলের অজিত ভারে সত্যত আত্মাহীন।

নাস্তিকবাদী নেমেছে অতলে শূন্য-প্রবাদলীন।

বিস্তৃত মানব করে সাহায্যকার এসো তুমি দয়াময়।

নবধর্মের ভিত্তি বিবচি হোক তব পুনঃ জয়।

বাঙালীর ঘরে তাই যে “তীর্থ” ভুবনমোহন শ্রাম।

ছাড়িয়ে ভারত বিধে ব্যাপ্ত বাঁহার পাবন নাম।

দিলে বাঁধ আসি পাপের প্রবাহে ধমকি ধামিল ধরা।

দেখেছি দেবতা, দেখাতেও পারি এ কথা কহিছে কারা ?

আদি-প্রসূতির অঙ্ক-দুলাল মাতৃ-প্রেমিক যোগী।

আত্ম-সাধন-মহা যোগরত অদ্বুত বৈরাগী।

বসন্ত মত আছে তত পথ হেথা কহেন পুলকজের।

তুল কিছু নয় একই আবারে সকলে বাইবে কিরে।

পথ শুধু হয় ভিন্ন ভিন্ন বাবে সেই রাজবাড়ী।

পৃথক আখ্যা, চুকা প্রশমে ওয়াটার, পানি, বারি।

তুমি না আসিলে কি যে হতো তাহা ভাবিতে

পারে না কেহ।

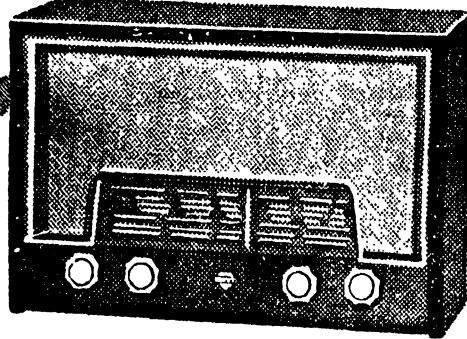
আর কে জাতির ঐক্য ধর্ম এতই কবিত স্নেহ।

সুগ-অবতার হে রামকৃষ্ণ ! পরম ব্রহ্মবিৎ।

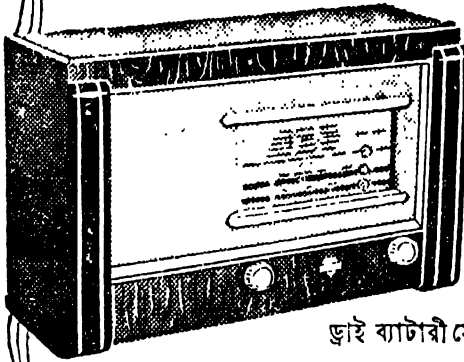
# মুলার্ডের বৈশিষ্ট্য

## দামে আর গুণে

সত্যি,—রূপ, গুণ ও দামের অপূর্ণ সমন্বয়ের জন্যই “মুলার্ড” রেডিওর এত আদর। এর ক্যাবিনেটও যেমন মূল্যবান—আওয়াজও তেমন নিখুঁত এবং দামও তেমন সস্তা। রেডিও কিনিবার বা বদলাইবার সময় একবারটি “মুলার্ড” দেখিয়া লইবেন।



এম্-ইউ-এস—২৫৯৮: (MUS 2598): ৫-ভালভ্ ও ৪-ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত “মুলার্ডের”-র এই এসি-ডিসি সুপারহেট মডেলটি রেডিও জগতে খুবই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। নিখুঁত আওয়াজ এবং অতি সহজেই পৃথিবীর যে-কোনো স্টেশন ধরা যায় বলিয়াই ইহার বিশেষ খ্যাতি। মূল্য মাত্র ৫৫৫/-



ড্রাই ব্যাটারী সেট

এম্-বি-এস—২৫৯৯: (MBS 2599): গ্রাম অথবা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা (ইলেকট্রিসিটি) নেই এইরূপ সময়ের পক্ষে “মুলার্ড” এর এই অল্-ওয়েভ্ ড্রাই ব্যাটারী সেটটি বিশেষ উপযোগী! ইহা ৪-ভালভ্ ও ৩-ওয়েভ ব্যাণ্ডযুক্ত। স্টেণ্ডে ১৩.৫ ইইতে ২৮ মি: ও ৩০ ইইতে ২০ মি: পর্যন্ত এবং মিডিয়াম ওয়েভে ১৮৭ ইইতে ৫১৫ মি: পর্যন্ত।

মূল্য মাত্র ৪২৫/-

MFB-1



# মুলার্ড

Mullard — কিলে খুসী হবেন!

প: বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার একমাত্র পরিবেশক :—

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্ লিঃ

৩নং ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা, ফোন-সিটি ৫২২১

প: বাঙ্গলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার সর্বত্র অনুমোদিত ডিলার আছে।

# ঐতিহাসিক পরিস্থিতি

## শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

### ম্যাকআর্থারের বিদায়—

গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিষাচেন। এমন আকস্মিক ভাবে এই পদচ্যুতির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, উহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ না করিয়া পারি নাই। জেনারেল ম্যাকআর্থারের অপসারণ শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতই হয় নাই, উহার প্রত্যেক কোণ কোণ কাঁটজার দ্বিতীয় উইলসনের কর্তব্য বিসমর্কের পদচ্যুতির সঙ্গিতও তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার পদচ্যুতি সমগ্র পৃথিবীবাসী এমন একটা বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে যাহার তুলনা শুধু সিরোশিমা এবং নাগাসিকিতে পরমাণু বোমা ফাটার সঙ্গিতও তুলনা করা যায় না। ১১ই এপ্রিল তারিখের প্রত্যেক সন্ধ্যাপত্রগুলিতেও এই পদচ্যুতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোন উজ্জিত পর্যাপ্ততা পাওয়া যায় নাই, বরং ১১ই এপ্রিল প্রায়ঃকালে সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত বিবরণ হইতে ইহাট বৃথা গিয়াছিল যে, জেঃ ম্যাকআর্থারের সঙ্গিত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিবাদের একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই দিনই প্রিন্সটনের পর বিশ্বাসী অকস্মাৎ স্তবিত পাইল, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্দেশ জেঃ ম্যাকআর্থার পদচ্যুত হইয়াছেন। তিনি পদচ্যুত হইবেন, জেঃ ম্যাকআর্থারের মনে ভুলেও বোধ হয় ইহা স্থান পায় নাই। তিনি ইহার আভাসইজিত পর্যাপ্ততা না কি পান নাই। পদচ্যুতির নির্দেশ সরকারী ভাবে তাঁহার হস্তস্বাক্ষরিত পত্রের দ্বারা তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার পদচ্যুতির সংবাদ পাইয়াছিলেন।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি যে একটা অঘটন ঘটন, তাহাচেন সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাস্ত মহাসাগরীর উপকূল হইতে অবস্থ করিয়া রাশিয়ার সীমান্ত পর্যাপ্ত অঞ্চলে জেঃ ম্যাকআর্থারের মত অপ্রতিভত ক্ষমতা আর কাহারও ছিল না। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গর্বঘোষিতও নয়, এ কথা বলিলে ভুল হইবে না। ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পণের পর হইতে শ্রবণ প্রাচ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল ম্যাকআর্থারী সাম্রাজ্য এবং এই সাম্রাজ্যের তিনিই ছিলেন অপ্রতিভত ডিক্টেটর। জাপানে তিনিই হইয়া উঠিয়াছিলেন মার্কিন মিকাদো। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া সম্মিলিত জাতিপুত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার হাতে নিরঙ্কুশ ভাবে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গর্বঘোষিতের অধীন তাহা বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। স্বাধীন ভাবে যাহা খুসী তাহাই তিনি করিতেন। তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার এক সুসময়

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাহা করেন নাই। বোধ হয় অল্প প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করিবার জন্ত জেনারেল ম্যাকআর্থারের মত অবরুদ্ধ লোকের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। জেঃ ম্যাকআর্থার গর্ব করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "গত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমি প্রাচ্যবাসীর মন লইয়া গবেষণা করিয়াছি। যে-কোন রাষ্ট্রনীতিবিদ বা সেনাপতি অপেক্ষা প্রাচ্যবাসীর মন আমি ভাল করিয়া জানি।" এশিয়ার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও তিনি গোপন রাখেন নাই। চারি বৎসর পূর্বে 'চিকাগো টাইমসের' প্রতিনিধির নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, "The conflict between Mongol-slav hordes of the East and the civilized people of the West will be resolved in the battle field." অর্থাৎ 'মঙ্গল-স্লাভ দলের সহিত পাশ্চাত্য সভ্য জাতির বিরোধের মীমাংসা হইবে সংগ্রামক্ষেত্রে।' সুতরাং এ-চেন লোকের প্রয়োজনীয়তা যদি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিশ্বের বিষয় হইবে কেন? কিন্তু অবশেষে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানই তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতিতে পৃথিবীর কল্পনামিষ্ট অকল্পনামিষ্ট লোক সকলেই যে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে, এ কথা যেমন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তেমনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত রিপাবলিকান দলের বিরোধও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। জেঃ ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতিতে বিশ্ববাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল কেন, কি জন্য তাহার স্বস্তি বোধ করিল, এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। বামপন্থীরা জেঃ ম্যাকআর্থারের এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে বিশ্বের জনমতের চাপের প্রভাব দেখিতে পাইয়া থাকেন। বিশ্বের জনমতের চাপে পড়িয়াই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার সংসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের কোনও বামপন্থী পত্রিকা লিখিয়াছেন, "Peace-lovers the world over.....rightly saw in MacArthur's downfall a victory for common people." অর্থাৎ 'বিশ্বের শান্তিকামীরা ম্যাকআর্থারের পতনের মধ্যে সাধারণ মানুষের জয়ই দেখিতে পাইবেন।' কি কারণে ইহা বিশ্বের জনমতের জয় বলিয়া মনে করা হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। জেঃ ম্যাকআর্থার যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে ছিলেন তাহা চীনের মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধ সম্প্রসারণের নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পদচ্যুতির নির্দেশ দিবার কারণ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস, কয়েকটি গুরুতর কারণে যুদ্ধ কোরিয়ার সীমান্ত রাখা প্রয়োজন। আমাদের সৈন্যদের মূল্যবান জীবন বাহাতে বৃথা নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে; আমাদের দেশ এবং স্বাধীন-বিশ্বের নিরাপত্তা বাহাতে বিপর্যস্ত না হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম প্রতিরোধ করিতে হইবে। কতকগুলি ঘটনা ঘরা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাকআর্থার এই নীতির সহিত একমত নহেন।" তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, চীনে যুদ্ধ সম্প্রসারিত করিবার যে চক্রান্ত জেঃ ম্যাকআর্থার করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিশ্ববাসী প্রতিবাদ

যে, বিশ্বের জনমতের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে। ইহা সত্যই সম্ভব কি না, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যিক যে, ম্যাকআর্থারের পতনে পশ্চিম-ইউরোপ সম্বন্ধে হইয়াছে কেন? পশ্চিম-ইউরোপ মনে করে, কম্যুনিজম নিরোধের ব্যাপারে পশ্চিম-ইউরোপেরই প্রাধান্য এবং জেনারেল মার্শাল এবং মিঃ একিসিন এই মন্তব্য পৃষ্ঠপোষক। মার্কিন গবর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহারা পশ্চিম-ইউরোপের এই অগ্রাধিকার নীতিই কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জেঃ ম্যাকআর্থার যে নীতি অমুম্বরণ করিতেছিলেন তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপের এই অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছিল। কাজেই জেনারেল ম্যাকআর্থারের অপসারণ পশ্চিম-ইউরোপের খুশী হওয়ার কারণে পরিণত হইয়াছে। চীনে যুদ্ধ প্রসারিত হইলে সূর্য প্রাচ্যের যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন গভীর ও ব্যাপক ভাবে জড়িত হইয়া পড়িবে যে, কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে পশ্চিম-ইউরোপকে শক্তিশালী করিয়া তোলা আর সম্ভব হইবে না। জেঃ ম্যাকআর্থার অপসারিত হওয়ার এই আশঙ্কা আর রহিল না, ইহা পশ্চিম-ইউরোপের খুশী হওয়ার কারণ। ম্যাকআর্থারের পতনে খুশী হওয়ার আরও একটা কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে কিছু বলিবার আছে, এত দিন তাহা ব্যর্থতার কোন উপায়ই ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই কোরিয়া যুদ্ধের নীতি নির্ধারণ করিতেছিল। অনেক মনে করেন, জেঃ ম্যাকআর্থারের পতনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সূর্য প্রাচ্যের বিরোধ মীমাংসার দ্বার হইয়াছে উদ্ঘাটিত। কিন্তু ইহাতেও জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নাটকীয় সিদ্ধান্ত কেন করিলেন, তাহার কারণের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় সন্ত্রাসবর্গ, বিশেষ করিয়া বৃটেন চীনের সহিত সর্বব্যাপী যুদ্ধ বাধাইবার বিরোধী। ইহা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের মনান্তর হওয়ার কথাও শোনা গিয়াছিল। অনেক মনে করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটিশের এই মনান্তর দূর করাই জেঃ ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সিদ্ধান্ত করিবার প্রধান কারণ। এ সম্পর্কে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছে ফ্রান্স। ফ্রান্স মনে করে, জেঃ ম্যাকআর্থারের অপসারণ ব্যাপারে তাহার কৃতিত্বও বড় কম নয়। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বথন আমেরিকা গিয়াছিলেন সেই সময় মঃ স্যামান মার্কিন গবর্নমেন্টকে বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হন যে, চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে আটলান্টিক শক্তিবর্গের সহিত নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার পূর্বে পর্য্যন্ত জেনারেল মার্শাল এবং মিঃ একিসিন না কি চীনের সহিত যুদ্ধ করিবারই পক্ষপাতী ছিলেন। জেঃ ম্যাকআর্থার অপসারিত হওয়ার কৃতিত্ব বৃটিশের না ফ্রান্সের, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয়। ফরাসী পত্রিকা 'লি মোঁ' (Le Monde) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "Great Britain and all the allies can congratulate themselves that the United Nations' policy is not made exclusively in Washington." অর্থাৎ 'গ্রেটব্রিটেন এবং সমস্ত মিত্রশক্তি ইহা তাহারা আশ্চর্য্যজনকভাবে করিতে পারিবেন

কানাই নালদিত্তের  
**সোমরাজ**  
কবিরাজী কেশতৈল  
দ্বাথার সোণের দ্ব্যধৌষট্  
দ্রুগন্ধে অসর্বশ্রেষ্ঠ

খবরমূল্য :-

\* তিল তৈল \* কদম্ব তৈল  
\* কদম্ব বাহির্ডিন

\* সোমরাজ বীজ  
\* মহাভূষ্মরাজ  
\* বস্ত্র ও শ্বেত চন্দন  
\* ব্রাহ্মী \* গ্রামল্যা

\* ঘাস্ক (কুম্ভুরী) \* চন্দন তৈল  
\* সেলা তৈল \* চামেলী তৈল  
\* বার গুমেট \* ল্যাভে গুমেট  
\* ইত্যাদি বিশ্বদাত সেন্ট

উপকারীতা :-

\* দ্বাথার সোণে  
\* চুল ওঠা বন্ধ করিতে  
\* চুল বাড়াইতে  
\* অনিদ্রা, নিদ্রাঘ্রাসে

'সোমরাজ কেশতৈল'  
\* সর্বোৎকৃষ্ট \*

যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি একমাত্র ওয়াশিংটনেই নির্ধারিত হয় না।' কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিতে কেন সিদ্ধান্ত করিলেন, তাহা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা বড় সহজ নয়। বুটেন এবং ক্রাফের চাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন করিবে, ইহা স্বীকার করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন ঘটয়াছে, এ কথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি এ কথাও ঠিক নয় যে, জে: ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন ঘটনা করিতেছে।

গত আগস্ট মাসে (১৯৫৭) প্রবীণ সৈনিকদের সম্মেলনে জে: ম্যাকআর্থার যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে কম বিব্রত হইতে হয় নাই। ইহার ভিত্তিই গত অক্টোবর মাসে (১৯৫০) ওয়েক বীপে ট্রুম্যান-ম্যাকআর্থার সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত ২১শে এপ্রিল (১৯৫১) প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিবরণে প্রকাশ যে, প্রবীণ সৈনিকদের নিকট প্রেরিত বাণীতে প্রেসিডেন্টকে বিব্রত করা হইয়াছে বলিয়া জে: ম্যাকআর্থার না কি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তিনি এখন মার্কিন গবর্নমেন্টের নীতি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐ সময় জে: ম্যাকআর্থার এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোরিয়ার ব্যাপারে কি কমান্ডিট চীন কি সোভিয়েট ইউনিয়ন কেহই হস্তক্ষেপ করিবে না। এই ধারণার ভিত্তিতেই অষ্টম বাহিনীকে বড়দিনের পূর্বেই জাপানে ফিরাইয়া আনা, দশম করপসকে কোরিয়ার রাখা এবং দ্বিতীয় ডিভিসনকে জাম্বুয়াসী মাসে ইউরোপে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সম্মেলনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছিলেন যে, তিনি এবং জে: ম্যাকআর্থার পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। ওয়েক সম্মেলনের প্রায় এক মাস পর কমান্ডিট চীন কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং আরম্ভ হয় নতুন যুদ্ধ। বোধ হয় সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং জে: ম্যাকআর্থারের মধ্যে নতুন মতভেদও আরম্ভ হয়। এই মতভেদের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করে। গত ২৪শে মার্চ জে: ম্যাকআর্থার কমান্ডিটদের নিকট এক আপোষ-আলোচনার প্রস্তাব করেন। সেই সময় হইতেই না কি জে: ম্যাকআর্থারকে পদত্যাগ করিবার জন্য অমুরোধ করার কথা উঠে এবং ইহাও না কি স্থির হয় যে, জাপান শান্তিচুক্তি না চওয়া পর্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বলা হইবে না। অতঃপর এই এপ্রিলের (১৯৫১) সংবাদে প্রকাশ, জে: ম্যাকআর্থারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা বর্ষণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কে ক্ষমতা দিয়াছে? প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, উহা সামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত গোপনীয় বিষয়। ইহার পূর্বেই জে: ম্যাকআর্থারের বাহিনী গত ৩১শে মার্চ ৩৮শ অক্ষরেখা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ১ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কোরিয়া সম্পর্কে আর কোন রাজনৈতিক বিবৃতি দিতে বিরত থাকিবার জন্য জে: ম্যাকআর্থারকে নরম-গরম ভাষায় এক নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুই দিন পরেই তাঁহাকে পদচ্যুত

করা হয়। সতর্ক করিয়া দিবার পর তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল কেন? ২৪শে মার্চের বিবৃতি উহার কারণ হইতে পারে না। রিপাবলিকান দলের নেতা প্রতিনিধি পরিষদের সমস্ত মি: মার্টিনের নিকট জে: ম্যাকআর্থার যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা ২৪শে মার্চেরও পূর্বেই ঘটনা। ২০শে মার্চ তারিখে তিনি এই পত্র লিখেন। এই এপ্রিল মি: মার্টিন প্রতিনিধি পরিষদে এই পত্র পাঠ করেন। এই পত্রে তিনি কর্মমোসাম্মিত চিন্তায় কাউন্সেলের সৈন্যবাহিনী চীনা কমান্ডিটের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিবার দাবী করেন। এই পত্রে মিত্রশক্তিগণ সম্পর্কেও তীব্র মন্তব্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "Here we fight Europe's wars with arms, while diplomats there still fight it with words" অর্থাৎ 'এখানে আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইউরোপের যুদ্ধ করিতেছি, আর কূটনীতিবিদরা সেখানে এখনও বাকযুদ্ধ করিতেছেন।' অর্থাৎ গত ডিসেম্বর (১৯৫০) মাসে ইহাদের নিকটেই তিনি অতি কষ্টপূর্ণ ভাষায় সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং সাহায্য পাইয়াছিলেন বলিয়াই প্রতী-আক্রমণ রোধ করা সম্ভব হইয়াছিল। এই পত্র ২০শে মার্চ তারিখে লেখা হয় এবং এই এপ্রিল উহা পঠিত হয় প্রতিনিধি পরিষদে। জে: ম্যাকআর্থারকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় ১ই এপ্রিল। কাজেই এই পত্রের ভিত্তিই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে, এ কথাও স্বীকার করা কঠিন।

জে: ম্যাকআর্থারের বিবৃতিগুলি যেমন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বিশ্ববাসীর কাছে হাত্তাস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল তেমনি রিপাবলিকান দলও ম্যাকআর্থারের পক্ষ হইয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেও কম কসুর করে নাই। তাঁহারা এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, কোরিয়ার যুদ্ধ-সম্প্রদায়, কমান্ডিট চীন এবং সুরুর প্রাচ্যের অবস্থা অবগত হইবার উদ্দেশ্যে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হউক। এই সকল ঘটনা মিলিয়াই যে ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির কারণ খটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রদপ্তর হইতেই না কি ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার জন্য যথেষ্ট চাপ দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু জে: ম্যাকআর্থার যে-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কি মার্কিন গবর্নমেন্টের নিদেশ ও সম্মতি ব্যতীত এবং তাঁহাদের অজ্ঞাতে গৃহীত হইয়াছিল? জে: ম্যাকআর্থার দাবী করিয়াছেন যে, কোরিয়া যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে তাঁহার মত মার্কিন সেনানীমণ্ডলী (American Joint Chiefs of Staff) সামরিক দিক হইতে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার এই দাবী প্রমাণ করিবার জন্য দলিলপত্রও না কি তাঁহার হাতে আছে। স্মরণ্য এগুলি যে গোপনীয় দলিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। জে: ম্যাকআর্থারের এই দাবীর উত্তর দিবার জন্য মার্কিন গবর্নমেন্ট না কি অনেক দলিলপত্র কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত করিবেন। এই সকল দলিলপত্র প্রকাশিত হইলে কোরিয়া যুদ্ধের অনেক গোপন রহস্য যে প্রকাশ পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। নীতিগত দিক হইতে মার্কিন গবর্নমেন্ট ও ম্যাকআর্থারের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে বলিতে হয়, জে: ম্যাকআর্থার এই নীতি কাঙ্ক্ষণী করিতে বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে

পারেন নাই এবং উহাই তাঁহার পরিত্যাগের কারণ। কিন্তু কি কি ভাবে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন?

মার্কিন গবর্ণমেন্টের নীতি এবং ম্যাকআর্থারের নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকিলে, ম্যাকআর্থারের নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্রত্ব অসম্ভব হওয়ার এবং তাহাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ত্যাগের আশঙ্কা অর্ধহীন। তবে প্রত্যক্ষ্যে বিবৃতি দিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে যে লোকের চক্ষে হাম্যান্পন করিয়াছেন এবং ইহা যে আদেশ অমান্য করার গুরুত্ব অপরাধ তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জে: ম্যাকআর্থার হস্ত এমন ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন বাহার ফলে মার্কিন গবর্ণমেন্টের ঈপ্সিত সময়ের পূর্বেই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া আমেরিকার বাঁধ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ইহা একটা সমস্ত যুক্তি বটে। ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতি সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বাইয়া 'প্রভা' তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, কোরিয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্ষ হওয়ার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির মধ্যে। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, ৮শ মাসের মধ্যেও ম্যাকআর্থার সমগ্র কোরিয়া দখল করিতে না পারাই তাঁহার পদচ্যুতির কারণ। ইহাও অসম্ভব কিছু নয়। ম্যাকআর্থারকে পদচ্যুত করিবার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইহাও জানাইয়াছেন, কোরিয়া সন্ধি উহাদের নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই।


ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির পর—

জে: ম্যাকআর্থারের পদচ্যুতির পরেও কোরিয়া যুদ্ধ বিজিত হওয়ার সম্ভাবনা দূর হয় নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী কোরিয়া ত্যাগ করিয়া আসিলে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। অবশ্য আবার পূর্ন অবস্থায় অর্থাৎ উত্তর-কোরিয়া ও দক্ষিণ-কোরিয়ায় কিরিয়া আসাও বাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কি চীন কেহই রাজী হইবে না। সমগ্র কোরিয়াকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পরিচালনাধীন আনার চুইটি পথ আছে। এক পথ চীনের সহিত আপোষ করা। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আপন এবং কংগ্রেসের অধিকার না পাইলে কয়ানিট চীন কোন আপোষ-প্রস্তাবেই রাজী হইবে না। দ্বিতীয় পথ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বাহিনী কর্তৃক সমগ্র কোরিয়া দখল করা। যুদ্ধ কোরিয়ার সীমাবদ্ধ রাখিয়া এ-পর্যন্ত সমগ্র কোরিয়া দখল করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই জে: ম্যাকআর্থার যুদ্ধ চীনের ভূখণ্ডে বিজিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পরিণামে কোরিয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরিবর্তে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামও আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

গত ১৪ই এপ্রিল (১৯৫১) ডেমোক্রেটিক দলের এক সমাবেশে ম্যাকআর্থারের সমর্থকদের সমালোচনার উত্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, "তাঁহার বলেন, ইউরোপে সৈন্ত পাঠাইলে রাশিয়াকে যুদ্ধে উৎকানি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহার স্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন,

# সুন্দর ডিজাইন ও নিখুঁত ব্লক এ দুয়ের সমন্বয়

—১৯৫৬—



**বেঙ্গল ফটো টাইপ কোঃ**  
সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত

৪৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা - ৯ ফোন-১৭০২ বি.বি

মাকুরিয়ার বোমা বর্ষণ করিলে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। চীনারা কোরিয়া যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবে না, এই মর্মে খুব প্রামাণিক অভিমত আমার কাছে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং আমিও উহা বিশ্বাস করিয়াছিলাম।" তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, কোরিয়া যুদ্ধ চীনে বিস্তৃত হইলে রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় মনে করেন না। তিনি চীনে যুদ্ধ বিস্তৃত হইতে দিবেন কি না তাহারই উপরেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে।

### ম্যাকআর্থারের স্মূহর প্রাচ্য-নীতি —

মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতার এবং মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি ( Foreign Relation Committee ) এবং সশস্ত্র বাহিনী কমিটির ( Armed Service Committee ) যুক্ত অধিবেশনের নিকট সাক্ষ্য জেনারেল ম্যাকআর্থার স্মূহর প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার নীতির যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ ছয় দফা কথস্থতীর উপর প্রতিষ্ঠিত। স্মূহর প্রাচ্য সম্পর্কে তাঁহার নীতি যে মার্কিন গবর্ণমেন্টের নীতি হইতে পৃথক্, তাহা অবশ্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্যটা ধাঁড়িয়াছে এই নীতিকে কার্যকরী করিবার কথস্থতী লইয়া। জে: ম্যাকআর্থারের উল্লিখিত ছয় দফা কথস্থতী সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে এই নীতিতে কি পরিবর্তন হইয়াছে এবং কি জন্ত পরিবর্তন হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জে: ম্যাক-আর্থারের অভিমত উল্লেখ করা প্রয়োজন। জে: ম্যাকআর্থার গত ১১শে এপ্রিল (১৯৫১) মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদ এবং সিনেটের যুক্ত অধিবেশনের সম্মুখে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, এশিয়ায় এক নূতন শক্তির অভ্যুত্থান হইয়াছে। এই শক্তি একই সঙ্গে নৈতিক এবং বৈষয়িক এবং এই শক্তি ক্রমশঃই সহিত হইয়া উঠিতেছে। এই উক্তির মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছেন। বোধ হয়, এই জন্তই কেহ কেহ ইহাকে ক্লাসিক্যাল বক্তৃতা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এশিয়ায় এই নবজাগরণ জে: ম্যাকআর্থারের তথাকথিত প্রগতিশীল মনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্মূহর প্রাচ্য-নীতির কিরণ পরিবর্তন করিতে প্ররাসী করিয়াছে, তাহাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

জে: ম্যাকআর্থার বলিয়াছেন, "ঔপনিবেশিক নীতিতে কেহ বিশ্বাস করুন আব নাই করুন, এশিয়ায় এই অগ্রগতিকের রোধ করা বাইবে না।" তিনি মনে করেন, যে-এশিয়া মহাদেশ এক দিন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহের উৎস ছিল সেই প্রবাহ আবার এশিয়াতেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে এবং পৃথিবীর অর্ধ-নৈতিক কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হইতেছে এশিয়ায়। এশিয়ায় এই পরিবর্তিত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া জে: ম্যাকআর্থার বলিয়াছেন, "এইরূপ অবস্থার পূণাত্মন ঔপনিবেশিক যুগ শেষ হইয়াছে এবং এশিয়াবাসী এখন স্বাধীন ভাবে নিজদের ভাগ্য নিজেদেরই নির্ধারণ করিতে চাহে, এই বাস্তব অবস্থা সত্যকে অন্ধ হইয়া থাকিয়া কোন নীতি অন্ধসরণ করার পরিবর্তে মৌলিক বিবর্তন দ্বারা সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের দেশকে নূতন

আজ্ঞাস তিনি দিয়াছেন, তাহা আগলে পুরাতন ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তে নূতন ঔপনিবেশিক নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এশিয়া-বাসীর চিন্তাধারার মধ্যে বিশ্বের আদর্শবাদগুলির স্থান অতি নগণ্য, তাঁহার এই ধারণার উপরেই তিনি তাঁহার নূতন ঔপনিবেশিক নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জনসাধারণ বাহাতে আরও কিছু বেশী খাদ্য পায় ( a little more food in their stomachs ), তাহাদের পরিবেশ বজ্র বাহাতে আরও একটু ভাল হয়, তাহাদের মাথা ঝুঁজিবার স্থান বাহাতে আরও একটু বৃদ্ধ হয় এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা বাহাতে পূর্ণ হয়, এশিয়াবাসী আজ তাহারই স্বযোগ চায়।" কি ভাবে এই স্বযোগ তিনি দিতে চাহিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওরা যায় তাঁহার প্রশস্ত মহাসাগরীয় নীতির মধ্যে। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি এই নীতির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

জে: ম্যাকআর্থার মনে করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের ফলে স্মূহর প্রাচ্যের অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটয়াছে এবং এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার পন্থা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম সীমান্ত ছিল আমেরিকার সমুদ্র উপকূল-রেখা ( littoral line of Americas ) এবং হাওয়াই, মিডওয়ে এবং গুয়াম হইয়া ফিলিপাইন পর্যন্ত বিস্তৃত বীপাবলী ছিল প্রসারিত উন্মুক্ত অঞ্চল ( exposed island salient )। তিনি মনে করেন, এই অঞ্চল তাহাদের শক্তির বাঁটির পরিবর্তে দুর্বলতার রাজপথে পরিণত হইয়াছিল। জে: ম্যাকআর্থারের উক্তির অর্থ এই যে, প্রশান্ত মহাসাগর আক্রমণকারী শত্রুর পক্ষে বাধা-দ্রবণ না হইয়া সীমান্তবর্তী স্থানকে আঘাত করিবার সম্ভাবিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। এ কথা অবজ্ঞাই স্বীকার্য যে, জাপানের পাল'হারবার আক্রমণ মার্কিন সাম্রাজ্যের উপর আঘাত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এই মার্কিন সাম্রাজ্যও ছিল মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্তী। জাপান নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করিবে, এরূপ কোন আশঙ্কাই দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সময় দেখা দেয় নাই। কিন্তু জে: ম্যাকআর্থার মনে করেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে জয়লাভের পর সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজিক সীমান্ত সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরব্যাপী হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা ইহাকে ( প্রশান্ত মহাসাগরকে ) এলেট্রান হইতে মেরিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত বীপ-শৃঙ্খল দ্বারা এশিয়ায় সীমান্ত পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছি। এই বীপ-শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করিয়া আমরা রাডিভার্ক হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত প্রত্যেক বন্দরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ।" ইহা যে মার্কিন গবর্ণমেন্টেরই স্মূহর প্রাচ্য-নীতি, তাহাতেও সন্দেহ নাই। যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, এই রক্ষা-ব্যবস্থা শুধু এশিয়া হইতে লুণ্ঠনমূলক আক্রমণ ( predatory attack from Asia ) প্রতিরোধের জন্তই, তথাপি এই

হওয়ার আশঙ্কা এশিয়াবাসী উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশ্ব সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরই আজ আমেরিকার সীমান্তে পরিণত হইয়াছে জে: ম্যাকআর্থার কেন ইচ্ছা মনে করেন, তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

জে: ম্যাকআর্থার কম্যানিষ্ট চীনের মধ্যে এশিয়ার এক নূতন প্রভাবশালী শক্তির উদ্ভব দেখিতে পাইয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে চীন ছিল সে চীন আর এখন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চীন ছিল ঐক্যবোধ শূন্য এবং পদস্খার বিবদমান নানা দলে ছিল চীন বিভক্ত। তাহারা অল্পদণ্ড করিত বনফুসিয়ান শক্তির আদর্শ। কিন্তু সে-চীন আর এখন নাই। আদর্শ ও নীতির দিক হইতে এই চীন সামরিক ভাবধারায় অভিযুক্ত। চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদের বিকাশ হইয়াছে, কম্যানিষ্টরা তাহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছে, চীন পরিণত হইয়াছে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় শক্তিতে। তাহাদের সৈন্য সেনাপতি সকলেই উৎকৃষ্ট। এই নূতন চীনই এশিয়ার প্রভাবশালী নূতন শক্তি। কিন্তু এশিয়ায় নূতন প্রভাবশালী শক্তির উদ্ভবে মারিণ যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তিত হওয়ার কারণ কি? জে: ম্যাকআর্থার মারিণ কংগ্রেস তথা আমেরিকাবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, এই নূতন চীন সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার আক্রমণ-প্ৰগণ্ড ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নূতন চীনের অভ্যুদয় এশিয়ায় মারিণ সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে যে বাধা স্বরূপ হইয়াছে এ কথা তিনি স্বীকার করিবেন তাহা আশা করা অসম্ভব। বাস্তবে নূতন চীনকে তিনি শুধু মারিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাধীন দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী

বলিয়াও চিন্তিত করিয়াছেন। এই স্বাধীন দেশগুলি বা আমেরিকার তাঁবোয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়, এশিয়ার জনসাধারণ তাহা ভাল করিয়াই জানে। এই সুদূর প্রাচ্য-নীতির ভিত্তির উপর জে: ম্যাকআর্থার যে সামরিক বল-কৌশল গঠন করিয়াছেন, মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে এবং সিনেটের যুক্ত তদন্ত কমিটির নিকটে তাহারই ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন। সিনেটের যুক্ত তদন্ত কমিটির নিবট তাঁহার সাক্ষ্য ওরা মে (১৯৫১) আদালত হয় এবং ৫ই মে তাঁহার সাক্ষ্য শেষ হইয়াছে।

মারিণ কংগ্রেসের সম্মুখে এবং যুক্ত তদন্ত কমিটির নিকটে একই কথাই তিনি বলিয়াছেন। যে ছয়টি কথাটুকু তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা অহমরণ করিলে যথাসম্ভব কম সৈন্যসংখ্যা করিয়া কোরিয়া যুদ্ধের অবসান এবং সেই সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের সমস্ত সমস্তার সমাধানই যে সম্ভব, তাহাই জে: ম্যাকআর্থার বুঝাইতে চোঁ করিয়াছেন। এই ছয়টি কথা নির্দেশ করিতে যাইয়া তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, মোভিয়েট রাশিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। কারণ রাশিয়ার সৈন্য-সংস্থাপন ব্যবস্থা শুধু আত্মরক্ষামূলক। সুতরাং রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ যদি অনিবার্য না হয়, তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম ব্যতীতই সুদূর প্রাচ্যের সমস্তার সমাধান এবং কম্যানিষ্টম-নিরোধের কাধ্য সম্পন্ন হইতে পারে। শুধু তাই নয়, বিজয় লাভ হইবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এবং সস্তায়। রাশিয়া হস্তক্ষেপ করিবে না, এই দৃঢ় ধারণাই জে: ম্যাকআর্থারের প্রদর্শিত পন্থার মূল ভিত্তি। অবশ্য এ কথাও তিনি বলিয়াছেন যে, রাশিয়া

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা :- 'বি.বি.জরকার' সৌত্র . নারায়ণ জরকারের \*  
পরিচালনা



বি.বি.জরকার  
কোম্পানি লিমিটেড

১৬০-১.বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন:-বি.বি. ১২৬৩



যদি হস্তক্ষেপ করিতে চায়ও, তাহা হইলেও রাশিয়ার সামরিক শক্তি এমন নয় যে, এই বিরাট বৃদ্ধি রাশিয়া সইতে পারে। রাশিয়া যদি হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে চীনকে আক্রমণ করিয়া অতি দ্রুত কোরিয়া যুদ্ধ শেষ করিতে আপত্তি কি কারণ থাকিতে পারে?

মার্কিন স্থলসৈন্য চীন আক্রমণ করিলে, এইরূপ কোন প্রস্তাব জে: ম্যাকআর্থার করেন নাই। তিনি চান, ফার্মোসাস্থিত চিয়াং কাইশেকের সৈন্য-বাহিনীকে চীন আক্রমণে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাই তাহার চরম দৃষ্টি প্রস্তাবের অন্তিম প্রস্তাব। চীনা কমুনিষ্টদের সহিত যুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের বাহিনীর বিপুল পরাজয়ের কথা অগ্রণ করিলে উহার উপর ভরসা করা সম্ভব নয়। এই বাহিনীর সৈন্যরা চীনা কৃষক-পরিবারের হত্যা চীনে প্রবেশ করিবার পর তাহারা যে কমুনিষ্টদের পক্ষে যোগদান করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জে: ম্যাকআর্থারের দাবী একটি প্রস্তাব—নৌবাহিনী দ্বারা চীন অবরোধ। কিন্তু কাংহুও: এখনও এই অবরোধ চলিতেছে। তাহার ভূমিত্য প্রস্তাব—চীনের আর্থনৈতিক অবরোধ। চতুর্থতঃ, তিনি চীন নাকুরিয়ায় বোমবর্ষণ এবং পক্ষমত্য, চীনের উপকূল ভাগের উপর বোম্বার্ডিংয়ের বিমানে পক্ষমতা। এই পাঁচটি কল্প-পদ্ধতি গ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়াতেও সৈন্যসহা বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাই তাহার ২ষ্ঠ দৃষ্টি প্রস্তাব। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মার্কিন সেনানী মরফী তাহার এই কল্প-পদ্ধতি অমুমোদন করিয়াছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র কমিটির নিকট সাক্ষ্যে তিনি বুটেনের বিরুদ্ধে কমুনিষ্ট চীনেও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করার এবং ফরমোসা কমুনিষ্টদের হাতে সম্পূর্ণ নীতি অত্যাচার করার অভিযোগ করিয়া বলিয়াছেন যে, বুটেন তাহার নিজের পক্ষ নিজেই কাটিবার ব্যবস্থা করিতেছে। চীন আক্রমণের অন্ত্যস্ত-ধরূপ তিনি কোরিয়াবাসীদের উপর দরদ প্রদর্শন করিতেও জতি করেন নাই। শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষ কোরিয়াতে যে প্রাসঙ্গীক অস্ত্রাধীন করিয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার উপায় হিসাবে উহা অকাঙ্ক্ষ্য। কিন্তু কোরিয়া প্রসঙ্গ হওয়ার দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং কোরিয়ায় গৃহ-যুদ্ধের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি যে সকল দেশ সমর্থন করিয়াছে, তাহাওও এটি দাবি হইতে মুক্ত নহে।

### ইরাণের তৈলশিল্প-সমস্যা—

ইরাণের তৈলশিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণের প্রস্তাব মজলিস কর্তৃক অমুমোদিত হওয়ার পর ব্যাপক শ্রমিক দমনঘট যে সফট স্ট্রিক করিয়াছিল, তাহার অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণের সফট পুনর্ব্যবস্থা রহিয়াছে। গত ১৪ই মার্চ (১৯৫১) বুটেন ইরাণের গবর্নমেন্টে নিবন্ধিত যে পত্র দিয়াছে, গত ৮ই এপ্রিল ইরাণ গবর্নমেন্ট তাহার উত্তর দিয়াছেন। এই উত্তরে তাহারা জানাইয়াছেন যে, মজলিস এবং সিনেট তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণের নীতি অমুমোদন করিয়াছেন। এক্ষণকে বিস্তৃত পরিকল্পনা না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ব্যতীত আর কোন উপায় তাঁহাদের নাই। অতঃপর গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৫১) মজলিস তৈল কমিটির বিশেষ অধিবেশনে ইরাণের তৈলখনি সমূহকে অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার পরেই

২৭শে এপ্রিল প্রধান মন্ত্রী হোসেন আলী তাহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ-পত্র শাহের নিকট দাখিল করেন। ২৮শে এপ্রিল মজলিস ডাঃ মতম্মন মোসাদ্দিককে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন করে। তিনি এক জন প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং পূর্বে একবার প্রধান মন্ত্রীও হইয়া-ছিলেন। তিনি জাতীয় ফণ্টের নেতা এবং মজলিস তৈল কমিটির চেয়ারম্যান।

ইরাণের তৈলশিল্প জাতীয় করণের প্রস্তাব ২৮শে এপ্রিল মজলিস কর্তৃক এবং ৩০শে এপ্রিল সিনেট কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অমুমোদিত হয়। ইরাণের শাহ ২রা মে তারিখে তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণ বিল স্বাক্ষর করেন। গত ১লা মে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মরিসন ইরাণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, চাপে পড়িয়া বুটেন তৈলশিল্প সাক্ষাৎ বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনা করিতে রাজী হইবে না। ইরাণ গবর্নমেন্টকে তৈলের মালিকানা দেওয়া বন্ধ করিবার প্রস্তাবও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বুটেন অত্যাচার কি করিলে, ইহাই প্রশ্ন। একটি ব্রিটিশ নৌবহর পারস্য উপসাগরে প্রেরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইরাণ তাহাতে ভীত হয় নাই। এটি ব্যাপারে বুটেনের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে হস্তক্ষেপ করিবে, সে সম্বন্ধে কোন ভরসা দেখা যায় নাই।

বিশ্ববাস্তব 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমেরিকাবাসীরা বুঝিতে পারিতেছে না যে, আজ ইরাণে যাহা ঘটয়াছে, কাল সৌদী আরবে তাহা ঘটতে পারে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের তৈলশিল্প জাতীয় করণের প্রস্তাব কতক পরিমাণে সমর্থন করিতে রাজী আছে বলিয়াই মনে হয়। কয়েকটি মার্কিন তৈল কোম্পানী ইরাণ গবর্নমেন্টের নিকট না কি এই সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণের প্রস্তাব কাগ্যাক্রী করার ব্যবস্থা হইলে তৈলখনিগুলি পরিচালনের দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিতে রাজী। আমেরিকার দাবী যে কোথায় তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

### ইজরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ—

সম্প্রতি ইজরাইল-সিরিয়া সীমান্তে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা খুব সহজ নয়। ১৯৪৮ সালে নবজাত ইজরাইল রাষ্ট্রের কাছে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রসমূহের বিপুল পরাজয়ের পরেও আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরাইলের সহিত আর এক দফা লড়াইর আশা পরিত্যাগ করেন নাই, এক কথা সত্য। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলিকে সজাবদ্ধ করিবার জন্য যে ঐকত্রিক নিরাপত্তা চুক্তি (Collective Security Pact) হইয়াছে, তাহা কাগজে-পত্রেই আবদ্ধ রহিয়াছে। এদিকে আর্থনৈতিক দিক হইতে ইজরাইল রাষ্ট্রকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টাও কম হইতেছে না। ইরাক তাহার তৈল হাইফাস্থিত তৈল-শোধনকেন্দ্রে প্রেরণ করা বন্ধ করিয়াছে। মিশর ইজরাইলগামী কোন জাহাজকে স্রোজ ক্যানেলের ভিতর দিয়া যাঁতে দেয় না। কিন্তু ইহাতেও ইজরাইলকে ভয় করা সহজ হইতেছে না। কিন্তু ইজরাইলের সহিত আর এক দফা লড়াইর পক্ষে ইহা সুসময়, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। আর লড়াইতে চাহিলেও আমেরিকা এবং বুটেন তাহা সহ্য করিবে না। তবে কেন এই সংঘর্ষ?

বর্তমান সংঘর্ষের কারণ সম্বন্ধে দেখা যায়, ইহার উৎপত্তি হইয়াছে গত ৪ঠা এপ্রিল। তৎকালে, হুদের চারি দিকে যে জলা জমি আছে, তাহার জননিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তল্প ব্যয়ে শস্ত উৎপাদনের জন্য উর্বর জমি পাওয়া যাইবে। যুদ্ধবিবর্তি কমিশনের নির্দ্বিগ্ন অনুসারে এই অঞ্চল ইজরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িয়াছে এবং উহা সিরিয়ার সীমান্তবর্তী। ইহুদী কৃষকরা যখন এই জলাভূমির জননিকাশের কাজ করিতেছিল, সেই সময় গত ৪ঠা এপ্রিল অসামরিক অঞ্চলস্থিত সিরিয়ার সীমান্ত-রক্ষীরা তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে। ইহাব ফলে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় তাহাতে ইজরাইলের সাত জন পুলিশ নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য পরের দিন গ্যালেলী সাগরের নিকটবর্তী অসামরিক অঞ্চলস্থ অবস্থিত স্থানের উপর ইজরাইল বিমান কর্তৃক বোমা বর্ষিত হয়। সিরিয়া এই অভিযোগও করিয়াছে যে, ইজরাইল বিমান বাহিনী দামস্কাসের উপরেও বোমাবর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই ব্যাপার লইয়া সিরিয়া ও ইজরাইল উভয়েই নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এই অন্তিম পর্যন্ত গত ৫ই মে তারিখে (১১৫১) আবার সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল কেন?

ইজরাইলের সহিত পূর্বাঙ্গ সংগ্রাম আরম্ভ করাই এই সংঘর্ষের উদ্দেশ্য, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সিরিয়ার প্রধান মন্ত্রী নাজিম এল কুশনী যে আরব যুদ্ধরাষ্ট্র গঠনের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। নিবিল আরব কমিটি এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন এবং আগামী জুন মাসে এই পরিকল্পনা সম্পর্কে তাহাদের সুপারিশ আরব লীগের নিকট পেশ করা হইবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবে গৃহীত হয়, তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই এই সংঘর্ষ বাধাইবার উদ্দেশ্য হওয়া বিচিৎ নয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালের রাজা আবদুল্লা ইজরাইলের সহিত একটা মীমাংসা করিতে ব্যর্থ হইল। ইজরাইল-সিরিয়া সংঘর্ষ এই মীমাংসার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া সিরিয়া ও মিশরের উদ্দেশ্য সিদ্ধিও সঠায় হইতে পারে।

### ব্রহ্মদেশে সাধারণ নির্বাচন—

ব্রহ্মদেশের নির্বাচন পরিদর্শন কমিশন (The Election Supervisory Commission) গত ১০ই মার্চ (১১৫১) অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন অমুষ্ঠিত হওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৭৮ সালের ৪ই জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, স্বাধীনতা লাভের আঠার মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অমুষ্ঠিত হইতে হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য এ-পর্যন্ত দুইবার সাধারণ নির্বাচন স্থগিত রাখা হইয়াছে। যদি আবার স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে আগামী ১২ই ও ১৯শে জুনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অমুষ্ঠিত হইবে। গত ৪ঠা এপ্রিল (১১৫১) নির্বাচন পরিদর্শন কমিশন এই মত্রে ঘোষণা করেন যে, মোট ৫০০ নির্বাচন-কেন্দ্রের মধ্যে ১১২টি নির্বাচন-কেন্দ্রে বর্তমানে নির্বাচন অমুষ্ঠিত হইবে। অতঃপর উহার সংখ্যা আরও হ্রাস হইয়া ৭৬টি করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের



## শঙ্খাবাগী

স্থখে ছুখে জলে স্থলে মহাশঙ্খ ডাকে,  
ডাকে নিরবধি, ডাকে তোমাকে-আমাকে।  
কোন কালে শঙ্খাবাগী থামেনি কখনো,  
কি বলে এখানে শঙ্খ কান পেতে শোনো ॥

পাঁচড়া? যা? আর কিছুতে পাননি কোন ফল?  
একবার স্মরণ লাগান দেখি “কণ্ডুদাবানল।”  
খতম্ হবে ফি-জোগান বজি কিম্বা ডাক্তারের,  
সব মহলেই জানতে পারেন প্রচণ্ড নামডাকটা এর ॥

বৈশাখ মাসে জাগে আকাশের চাঁদ,  
আপনারও ঘুম নেই চুলকান দাদ।  
আপনার প্রেয়সী কি দেয়নি ভাষণ,  
কাল কিনে এনো “সর্বদ্রব্ধতাশন” ॥

দন্তশূল, বাত ব্যথা কিম্বা মাথাধরা  
“শূলাগ্রন” আছে কেন আহা-উছ করা।  
অন্ধকার দূর হয় আলো জেলে দিলে,  
দাঁত-বাত-ব্যথা যায় “শূলাগ্রন” লেপিলে ॥

লালমোহন শাহ শঙ্খনিধির:

জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কার

## কণ্ডুদাবানল

পাঁচড়া, ফোড়া, বা ক্ষতে অব্যর্থ মলম

সর্বদ্রব্ধতাশন

দাদ, ছুলী ও চর্মরোগের শ্রেষ্ঠ মলম

শূলাগ্রন

দন্তশূল, মাথাধরা ও বাতবেদনার মহৌষধ

এল, এম, শাহ শঙ্খনিধি:

এণ্ড কোং লিমিটেড্

৩২-ই জ্যাকসন লেন, কলিকাতা—১

ফোন : বি, বি.—৮৩৮৪

ওরিয়েন্ট পাথারিসিটি সার্ভিস, কলিকাতা—১

যে অবসান হই নাই, নিরীচন হইবে নহে। যার মধ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গভং, গত ১৩ই মার্চ (১৯৫১) ত্রুক্ষ গবর্ণমেন্টে পার্লামেন্টে ঘোষণা করেন যে, ৩০টি জেলায় ২৮টি মহাবিধানসভা কমিউনিষ্টদের দল প্রত্যাখ্যান করিবে। ১৯৫১ সালের শেষ ভাগে কমিউনিষ্ট অধিকৃত অঞ্চলে ছোট গণতন্ত্র প্রচলিত হইয়া আসিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

সদ্যে এই নিরীচন আঞ্চলিক ভিত্তিতে হইলে, তথাপি ইতিমধ্যে নিরীচনোৎসাহিত কৃষক-পুত্রতা মধ্যেই বুদ্ধি পাঠিয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যে সকল আঞ্চলিক বেল ছিল, সেগুলিকে তা পুনরুদ্ধারিত করা হইয়াছে, তা ছাড়া আরও নতুন দল গঠিত হইয়াছে। মহাবিদ্যালয় অধীন ১৩৪১ ত্রুক্ষ দল, গোয়া দল এবং মাদ্রাসা দল পুনরায় প্রাথমিকভাবে ক্রিয়াকলাপে। দিল্লি ও অর্ধাং দিল্লিস্থ জাতিগত পুনর্গঠনশীল নারীদল প্রতিনিধিত্ব করিবে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি নতুন দল গঠিত হইয়াছে। একটি ইউনিয়ন সীমা, আর একটি ত্রুক্ষ ডেমোক্রেটিক দল। সোশালিস্ট বা এক্সপ্লোইট-এস'র সমর্থক। কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ভাঙ্গন ধরিয়া ত্রুক্ষ প্রমিত ও কৃষক দল গঠিত হইয়াছে। দলের সংখ্যা বেশী হওয়ায় নিরীচনে এক্সপ্লোইট-এস দলেই জয়লাভের বেশী সম্ভাবনা।

কমিউনিষ্ট সম্পর্কে এক গবর্ণমেন্টের মনোভাব কিছু অল্পতরকমের। অধিকাংশ একদাসীরাই না কি দাবী যে, বৌদ্ধধর্ম কমিউনিষ্টদের প্রতিবেদন। এক গবর্ণমেন্টে অভ্যন্তরীণ কমিউনিষ্টদের সহিত লড়াই করিতেছেন। কিন্তু আঞ্চলিক কমিউনিষ্টদের প্রতি তাঁহারা বন্ধুত্বাপন্ন। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫১) জেন্দুনে কমিউনিষ্ট টানের রাষ্ট্রদ্রোহ প্রত্যাখ্যান হইয়াছে। সম্প্রতি কমিউনিষ্টদ্রোহ প্রাপ্ত হইল। গত শরৎ কালে ইন্দোনেশিয়ার সো টি মেন গবর্ণমেন্টের একটি মিশন জেন্দুনে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে এই মিশন নামের রাজনীতিতে প্রসিদ্ধ ছিল। নামের গবর্ণমেন্ট বাণ্য দাই গবর্ণমেন্টকে স্বীকার করার পর এই মিশন গাঙ্ক হইতে জেন্দুনে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

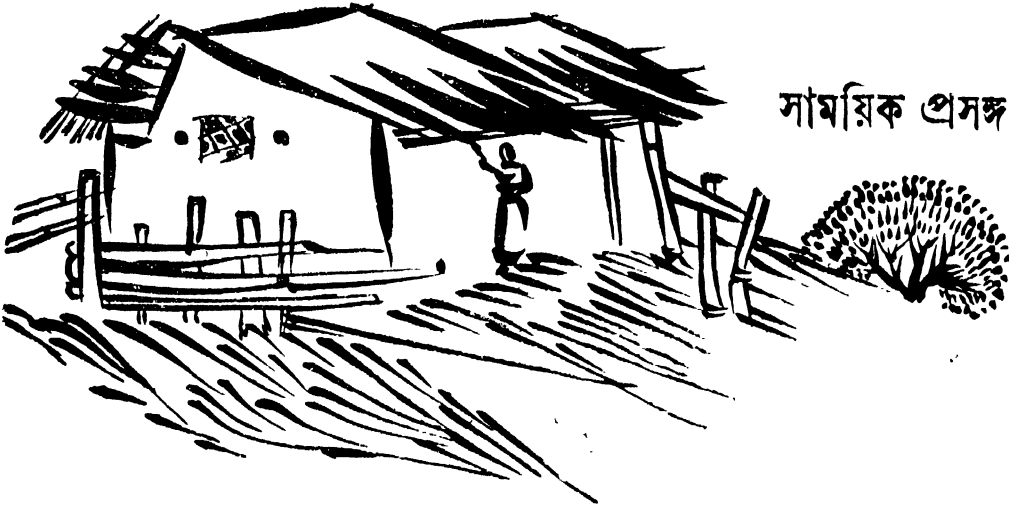
### নেপালে গণতন্ত্রের সঙ্কট—

নেপালে অল্পসত্তী গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই মাস পার না হইতেই উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান হইয়াছিল, উহার মধ্যে আপোষ মীমাংসার চক্করও বিশেষ ভাবেই পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেন্ট ভাড়াছাড়া প্রণোদিত হইয়া রাণা-গোষ্ঠী এবং নেপালের জনসাধারণের মধ্যে যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অত্রিকর্তী গবর্ণমেন্ট গঠনে সন্মত হইয়াছিলেন, সেই সামঞ্জস্যের স্বযোগ হইয়াছে রাণা-গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান গবর্ণমেন্টকে প্রায় ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কেবল নেপালের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত বিবেকব্রহ্মসান কৈবল্যের দৃঢ়তা, নেপালী মুক্তি সেনা, কামিয়ার জনসাধারণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহায়তার জগুই এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান বার্থ হইয়াছে। এই

অভ্যুত্থানকে প্রাসাদ-বিপ্লবের সহিত তুলনা করিতে পারা যায় এবং উহা কোন আঞ্চলিক ঘটনা নয়। নেপালের প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের জঙ্গবাহাদুর রাণা যখন ব্যক্তিগত যে, আপোষ মীমাংসার পথে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা না করিয়া আর উপায় নাই সেই সময়েই, নতুন গণতান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারত সমশের কুর্কী দল নামে একটি দল গঠন করেন। এই ভারত সমশের নেপালে প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশেরের ছোট ভাই বাবর সমশেরের পৌত্র। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অন্তর্গতী গবর্ণমেন্টে প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এবং বাবর সমশের জঙ্গ দেশরক্ষা-সচিব। প্রধান মন্ত্রী আবার নেপাল সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

এই কুর্কী দলের স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হয় প্রধান মন্ত্রীর শরীররক্ষী দল হইতে। ইহার আট পাগড়ীয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কয়েক জন সাময়িক অফিসারও এই দলকে সমর্থন করে। ভারত সমশের পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দল গঠনে নেপাল মন্ত্রিসভার দুই জন মন্ত্রীর কার্য্যকরী সাহায্য তিনি পাইয়াছেন। এই দুই জন মন্ত্রী কে কে, তাহা অজ্ঞান করা কঠিন নয়। কুর্কী দলের স্বেচ্ছাসেবকরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫১) অন্তর্গতী গবর্ণমেন্ট গঠিত হয়। কুর্কী দলের নেতারা এক গোপন সভায় সমবেত হইয়া দলের নাম পরিবর্তন করেন। কুর্কী দলের নতুন নামকরণ হয় বীর গুপ্তা দল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনেকেই এই দলের কার্য্যকলাপের কথা স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত কৈবল্যকে জানাইয়াছিলেন। শ্রীযুত কৈবল্যও গত ১ই এপ্রিল (১৯৫১) জাতীয় ঐক্য নিবন্ধ উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, নবজাত গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার জন্য একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বীর গুপ্তা দলই যে এই ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। ইহার দুই দিন পরেই ১১ই এপ্রিল এই ষড়যন্ত্রকে অল্পেরেই বিনাশ করিবার জন্য ভারত সমশের জঙ্গকে প্রেরণ করা হয়। পরদিন অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল বীর গুপ্তা দল জেলখানা ভাঙ্গিয়া ভারত সমশেরকে মুক্ত করে এবং শ্রীযুত কৈবল্যকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার বাস-গৃহও আক্রমণ করিয়াছিল। এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেপালিগণপতি নেপাল সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন।

নেপালের শিশু গণতন্ত্র অল্পের জন্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সঙ্কট এখনও কাটে নাই। বঙ্গভং মন্ত্রিসভায় রাণা-গোষ্ঠী যেন-পাশ্চাত্য থাকিবে, সে-পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে ধ্বংস করিবার শ্রেষ্ঠ স্বযোগ তাঁহাদের হাতে থাকিবেই। দীর্ঘ দিন বৈরতন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহারা গণতন্ত্রের সহিত নিজদের খাপ খাওয়াইতে পারিবেন, ইহা ভরসা করা যায় না। সেই জন্য নেপালী কংগ্রেস বর্তমান মন্ত্রিসভার পরিবর্তে একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য নেপালিগণপতির নিকট আবেদন করিয়াছেন। মন্ত্রিসভার সঙ্কট সমাধানের জন্য ভারত গবর্ণমেন্টেরও সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।



## সাময়িক প্রসঙ্গ

[ বঙ্গমতীর মাননীয় কর্তৃপক্ষ আমার নাম মাসিক বঙ্গমতীর সম্পাদক হিসাবে যুক্ত করেছেন। কিন্তু স্বর্গত রামানন্দ চৌপাধ্যায়ের মত 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লিখতে না পারলে সম্পাদকীয় লেখার অর্থ হয় না। সেজন্য আমি বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্র পত্রিকার সম্পাদকদিগের মূল্যবান মতামত মাসিক বঙ্গমতীর সাময়িক প্রসঙ্গে জ্ঞাত করতে চাই। আমি বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় এমন কেউ নয় যে আমাকে তীক্ষ্ণদার ভাষায় সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে হবে। তাই সম্পাদকীয় লেখায় বিরত থাকলাম।—স ]

### গুলীবর্ষণ ! গুলীবর্ষণ !!

“দেশে আত্ম খাত-বস্ত্রের প্রচণ্ড হাহাকার দেখা দিয়াছে, দেশের লোক অভাব-অনটনে সঞ্চারিত এবং বিক্ষুব্ধ। পূর্ব ত্যাগী রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের কাজ গুছাইতে এতই ব্যস্ত যে, লোকের দুর্দশা মোচনের কোন ব্যবস্থা করিবার সময় তাঁহাদের নাই। এই অবস্থায় করণীয় বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, সরকারী কর্তারা তাহাই করিতেছেন। ব্রিটিশ আমলের মত পুলিশের হাতে তাঁহারা তুলিয়া দিয়াছেন অবাধ ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতার নেশায় মাতাল হইয়া শাস্তি ও শৃংখলা রক্ষায় পূরম পুষ্টিপুলিশবাহিনী যথেষ্ট ভাবে লোককে ঠাঙ্গাইয়া বেড়াইতেছে। কোচবিহারে ভূখা মিছিলের উপর লাঠি ও গুলী চালানো এই পুলিশী বৈরাচরিতার নবতম দৃষ্টান্ত। কোচবিহারে চাউলের দাম সম্প্রতি ১০ টাকা পর্যন্ত চড়িয়া গিয়াছে। চাউল এই রকম অগ্রিমূল্য হওয়াতে জনসাধারণের অবস্থা যে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, এই কথাটাই তাঁহারা দল বাণিজ্য সরকারী প্রতিনিধিকে জানাইতে গিয়াছিলেন। আর এই ‘মহা অপরাধের’ প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদের করিতে হইয়াছে নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে। যে গভর্ণমেন্ট ম’হুয়ের অতি প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের নিয়ম-শৃংখলার অজুহাতে, আইনের ধারা আক্ষরিক ভাবে প্রয়োগের অন্তর্গত অনাহারক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত জনসাধারণকে হত্যা করিবার কোন অধিকার আছে কি? বাহারা দেশের মানুষের বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না—তাঁহাদের দেশ-শাসনের

অধিকার তো নাই-ই, শাস্তি ও শৃংখলার বুলি ঠোঁটের ডগায় নাচাইয়া বাহাদুরী দেখাইতে তাঁহাদের লজ্জিত হওয়াই উচিত।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

“ঘটনা যে ভাবেই বা বাহাদের দোষেই এরূপ সাংঘাতিক আকার ধারণ করিয়া থাকুক, সারা অঞ্চলব্যাপী প্রচণ্ড খাত-সঙ্কটের মুখে ভূখা মিছিলের উপর গুলী চালানো এবং তাহাতে এতগুলি লোকের হতাহত হওয়া এমনই একটি বিষম ব্যাপার যে, অতি স্থিরবুদ্ধি ম’হুসুও ইহাকে বন্ধুকের সাহায্যে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের মূগ বন্ধ করার চেষ্টারূপেই অভিহিত করিবেন এবং এই হঠকারিতাকে শুধু অবিরোধনীয় নয়, প্রগাঢ় অমানুষিকতারও পরিচায়ক বলিয়াই নিশ্চয় করিবেন।

“ভূখা মিছিল বাহির করিয়া খাত-সঙ্কটের সমাধান হইবে এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবশ্য বিশ্বাস করেন না। অধিকন্তর ধীরতার সহিত সমস্তার স্বরূপটি উপলব্ধি করা এবং স্বাধীনস্বত পক্ষে তাহার সমাধান দাবী করা সমীচীন। বিহারে নিদারুণ খাতাভাব চলিতেছে, মুর্শিদাবাদ এবং জলপাইগুড়ির অনেক স্থানেও খাতের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ত্রিবাঙ্কুর এবং মাজাজের কোন কোন অঞ্চলেও খাতবস্তুর বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। এই দেশজোড়া খাতসঙ্কটের সমাধান কি ভাবে ও কোন পক্ষে হইতে পারে, তাহা সম্ভব এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যাকে শোভাযাত্রা ও শ্লোগানের মাধ্যমে প্রকাশিত কি সমাধানের একমাত্র উপায়? শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল এবং উহা শান্তিপূর্ণ ভাবেই দণ্ডবৎখানার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, আর জনতাও নিরস্ত ছিল—ইহা যেমন লক্ষ্য করিবার বিষয়, তেমনি তাহারা খাতাভাবজনিত ক্লেশেরই প্রতিবার চাহিতেছিল। জনসাধারণের দ্বায্য দাবী সম্বন্ধেই সরকারকে অবহিত করিতে চাহিতেছিল, ইহাও উপেক্ষা করিবার নয়। এ অবস্থায় লাঠি এবং বন্দুক চালানো তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া কেন?

“এই প্রতিকারহীন দুর্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেই যদি বন্দুক বাহির হয় এবং অর্ধ উত্তন নিহত ও দেড় উত্তন আহত হয়, তাহা হইলে মানুষ কেমন করিয়া ও কোন্ প্রাণে ক্ষমতাবীরাণের হুঁহাত তুলিয়া আশীর্বাদ জানাইবে? কটপতঙ্গদের মতো

পদে পদেই আমরা মানুষের মৃত্যু দেখিতে ও ভাঙত হইয়াছি, তথাপি এই শ্রেণীর বন্ধুবান্ধবকে নিঃশব্দে পরিপাক করা অসম্ভব।

—যুগান্তর।

“ক্ষুধার্তের মিছিলের উপর গুলীবর্ষণের দ্বারা মিছিলকে ছত্রভঙ্গ এবং জনতাকে অপসারিত করা যায়, কিন্তু ক্ষুধা এবং ক্ষুধার্তের দাবী অপসারিত হয় না। এই সাধারণ সত্যটি ইতিহাসের বহু ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ক্ষমতাবান শাসকের অত্যাচারে ক্ষুধার্তের শোণিত পথের ধূলা বজ্রিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে ক্ষুধার্তের দাবীর মীমাংসা হয় নাই, বরং দেখা গিয়াছে, জনসাধারণের দুঃখ ও ক্লেশের প্রতি উদাসীন শাসকের সকল সমাজ উদ্ধৃত্যের চরম মীমাংসা করিয়া দিয়াছে অত্যাচারিত ক্ষুধার্তের দাবী। কিন্তু কোচবিহার হইতে যে মর্মান্তিক ঘটনার বিবরণ আমরা পাওয়াই তাহাতে মনে হয় যে, কোচবিহারের সরকারী ক্ষমতার পদে সমাসীন থাকিয়া যাহারা জনসাধারণের অদৃষ্ট নিহতনের অধিকার উপভোগ করিতেছেন, তাঁহারা এই ঐতিহাসিক শিক্ষা বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহারা এই শিক্ষার কোন ধার ধারেন না। ‘বল্যাণ রাষ্ট্র’ গঠনের নীতি লইয়া যে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শে রাস্তা পরিচালনা করিতেছেন বলিয়া সন্তত আশ্বাসনা কর্তন করিতে থাকেন, সে সরকারের পুলিশকে আজ ভুলা মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করিতে হইতেছে। অপর বা কিং-ভবিষ্যতি।”

—আনন্দবাহাদুর পট্টনাথ।

“কোচবিহারের মাটি বাসাইয়া দিয়া যে ছয়টি অমূল্য জীবন চিতাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জীবন দান বাধা হয় নাই, হইবে না। আজ ১৪৪ ধারা কোচবিহার হইতে উঠিতে পারিল। মাইক ও টোপা ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাশিত হইতে পারিল—সারা জেলায় আংশিক খাজ-বরাদ্দ-ব্যবস্থারও প্রচলন হইল। কিন্তু কি মূল্য? কেন অর্ধচতিন সরকারের ভুলের খেসারৎ যোগাইতে এতগুলি অমূল্য জীবন বলি দিতে হইল? যাহাদের সংকট-ত্রাণের কাণাকড়ি বুদ্ধিও ঘটে নাই, তাহারা কোন্ লক্ষ্যের গদী আঁকড়াইয়া থাকিলে আজও চাহিতেছে? কোন্ সাহসে আশ্রিত ও নলহাটিতে বসিয়া আশ্রিত বলিতেছে সাড়ে তিন বৎসরে কংগ্রেস যাহা করিয়াছে, তাহাতে সৌরব করিবার কিছু না থাকিলেও লজ্জিত হইবার কিছুই নাই? বোম্বাচারে নারী শোভাযাত্রাকারিণীদের বক্ষভেদ করিয়া, বীণাপানিকে হত্যা করিয়া সর্বশেষ ছয়টি তরুণ-তরুণীর বক্ষপঙ্ক্তর ভাসিয়াও যাহারা চলিতে পারে, তাহাদের লজ্জিত হওয়ার কিছুই নাই, সেই নিলক্ষ্যদের মুক্তিও দ্বারা লক্ষ্য-স্থলা কাহাকে বলে বা সমস্ত ও অসমস্ত আচরণ কোনটি তাহা কখনও বুঝানো যাইবে না। ইহার নিষ্পত্তিই নিষ্পত্তির সৃষ্ট সঙ্কটকালে জড়াইয়া যাইতেছে। অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি জনসাধারণের যে ললাটলিপি, ইহা তো দেখাই যাইতেছে। সে দুর্গতির মূলে যে এই আপেক্ষ ওয়াস্তে জনকল্যাণ কর্মীর দল, ইহাও বুঝিতে আর বাকী নাই। তবে ইহার শেষ কি ফল হবে—ইহাই আজ জনগণের প্রশ্ন। কোচবিহার যে ইজিত

বহন করিয়া আনিতেছে, অস্তিত্ব জেলায়ও চাউলের মূল্য যে হারে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাই কি শেবাক্ষের সন্ধান দিতেছে?”

—লোকসেবক।

“সারা পশ্চিম-বাংলার আজ নানা অভাবের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। সন্ধ্যাপ্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটে দেখা যায় চাউলের দর জলপাইগুড়িতে ৩৫।°, শিলিগুড়ি ৩৩।°, হাওড়া ২৬।৮, হুগলি ২৭।৮, মুর্শিদাবাদ ২৬।°, ২৪ পরগণা ২৭।°, নদীয়া ২৬।°, সমগ্র প্রদেশে গড়ে ২৬।°/ আনা। কুচবিহারের এক সপ্তাহের মধ্যে ৪২° টাকা হইতে ৭° টাকায় চাউলের দর উঠে, সংবাদপত্রে তাহা দেখিয়াছি। এই দারুণ অত্যাভাবের প্রতিকার দাবী করিবার অধিকার নিশ্চয়ই বৃদ্ধিকৃত জনসাধারণের আছে। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার গণমন্তের দ্বারা ও বৈধ অভিব্যক্তিকে সব সময়ে সহ্য করিতে পারেন না। তাই কুচবিহারে শত শত নবনারী যখন তাহাদের দাবী জানাইবার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া সেক্রেটারিয়েটের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী লাঠি ও পুরে গুলী চালায়। ফলে পাঁচ জন নিহত এবং বহু শোভাযাত্রী অঙ্গ-বিস্তার আহত হয়। নিহতদিগের মধ্যে একটি ৭ বৎসরের বালক ও দুইটি ১৫ ও ১৬ বৎসরের বালিকাও রহিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বাংলার সর্বত্রই বিক্ষোভ দেখা গিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে জনসভায় এই অন্যাচারের প্রতিকার দাবী করা হইয়াছে। কুচবিহারের ডেপুটি কমিশনার, এসু ডি ও, পুলিশ সুপার ও ডেপুটি সুপারের প্রকাশ্য আপালতে বিচার দাবী করা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রেসনোটে অবশ্য বলা হইয়াছে যে, জনতার পক্ষ হইতে প্রথমে ইট-পাটকেল নিষ্পত্ত হইলে আত্মরক্ষার জন্য পুলিশ ও মিলিটারী প্রেরিত করিতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ আমলের মামুলী কৈফিয়তের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। ইংরাজ শাসনের অবসান হইলেও শাসন-কাঠামোর ‘নলিচা ও খোল’ পূর্ববৎ রহিয়া গিয়াছে। সেই আমলাতান্ত্রিক মনোভাবেরও কিছুমাত্র পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কুচবিহারের বিশিষ্ট নাগরিকদিগেরও তাঁহাদের মধ্যে বংগসের সভাপতি, সহ-সভাপতিও রহিয়াছেন—উক্তি অপেক্ষা আমলাতন্ত্রের কথা পশ্চিম-বাংলার মন্ত্রিসভার নিকট অধিক নির্ভরযোগ্য। আর বাংলা সহজে ন্যায়দিক্কা সম্পূর্ণ উদাসীন, নতুবা স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী জীরাঙ্গাগোপালচাঁদী কিরূপে পালিয়ার্মেন্টে বলিতে পারেন যে, কুচবিহার সঙ্কটে না কি সংবাদ তিনি পান নাই। বিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টেলিফোন-রেডিওর যুগে তাঁহার এই কৈফিয়তে আমরা হতবাক হইয়াছি। অমুগত দলবিশেষের হস্তে শাসন-ভার রাখিয়া নির্দায়ক-বৈতরণী সহজে পার হইবার ব্যবস্থা হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। বাংলার ভাগ্যে আর যাহাই হউক।”

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

“আজ পশ্চিম বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে এই কথাই অনিত হইতেছে—কেন কুচবিহারের এমন হয়? কুচবিহারের বা সমস্ত তা কি কুচবিহারেই সীমাবদ্ধ? না, এই সমস্ত আজ বাংলার প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মানুষের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামের প্রত্যেকক্ষেত্রে প্রকাশিত? সাধারণ মানুষের খাওয়া-পাওয়ার যে দাবী,

# মুদ্রিত কলঙ্ক

রূপচর্চায় রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে... নৃতন এসে করে  
পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তন নারী—  
সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে  
জোগে রয়েছে চিরদিন..... কেশই যে তার অদ্বৈত  
রূপ। সে রূপ সাধনায় এ-যুগের দলিতাধিত আদিক  
জ্বাকুস্ম।



# জৈববুদ্ধি

কেশ তৈলে

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জ্বাকুস্ম হাউস, কলিকাতা  
CKU-BI/CPS

তাঁহা প্রতিটি সভা শেষের সরকারেরই নিজস্ব দাবী বলিয়া চিহ্ন-  
দিন সুপরিচিত। কিন্তু কুচবিহারের এই বাঁচার দাবীতে  
সেখানের সাধারণ মানুষ, শিশু ও ব্যক্তিকদের উপর গুলী  
চালাইয়া তাঁহাদিগকে নিঃশব্দ ভাবে হত্যা করা হইল কেন? এই  
হত্যা কাঁহার করিল এবং এই নিলক্ষ হত্যা কাণ্ডের জন্ত দায়ী কে?”

“যে কুচবিহার সহরে মাত্র ১৫ দিনের চাইল, সরকারী গুদাম  
ভর্তিতে বাড়ির করিয়া দিবার ভর্তুকা দিলে স্থানীয় সমস্ত লোক এক সাঁঝ  
খোঁরাক খাইয়া বাঁচিয়ার আশায় ফিরিয়া যাইত, সেখানে গুলী  
করিয়া পাঁজর ভাঙ্গিয়া ফিরাইবার ব্যবস্থা কেন করা হইল? আজ  
বকুল তালুকদার, বশনা, সবিতা বসু, বালাল বিশ্বাস ও সতীশ  
দেবনাথের বৃকের রক্ত জমাট করিয়া যে তত্ত্ব তৈরী করিয়া বাঙ্গালীর  
হাতে তুলিয়া দিল, তাঁহা কি বাঙ্গালী এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার আপন  
অস্তিত্বকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার জন্ত প্রয়োগ করিবে না?  
তাঁহার কি শিক্ষা-জীবনের অবদান হইয়া শিক্ষাদানের জীবন শুরু  
হইবে না? নিশ্চয় হইবে। নচেৎ বাংলার মাটিতে ক্ষুদ্রিগণের,  
নেতাজী সত্যজিৎসেতার ও অরবিন্দের জন্ম সার্থক হয় কি করিয়া?  
এই জন্তই ইতার স্মৃতি-স্বরূপ দেখা যাউতেছে যে, কুচবিহারের দিকে  
আজ অত্যাচারী বংশের সৎকারের কক্ষচারীদের দৈনন্দিন  
জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করিয়া তোলা হইয়াছে, বয়কট-অসহযোগ  
করা হইয়াছে এবং সরকারী প্রেসসনদুলক তদন্ত কমিটি দৃঢ় ভাবে  
বল্ধন করিয়া জনসাধারণের দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিটির দ্বারা তদন্ত  
করিয়া খুনী কক্ষচারীদের বিচারের দাবী উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে  
এবং বাংলার প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের দ্বারা এই দাবী বক্তৃকটে  
সমর্থিত হইতেছে।”

—বীরভূমের ডাক।

### সত্যজিৎসেতার বিবাহ

“সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে  
আলোচনা প্রসঙ্গে নেতাজী সত্যজিৎসেতার বিবাহ সংবাদ প্রকাশিত  
হইবার পর সমগ্র ভারতবর্ষে এ বিষয়ের জননা-কল্পনার তরঙ্গ  
বহিয়া গেল। নেতাজী অমুগামী বলিয়া পরিচিত কেহ কেহ  
বিবৃতি দিলেন, ইহা একটা অপপ্রচার; কেহ বলিলেন, সাধারণ  
নিরীক্ষকের পক্ষে ইহা এম কংগ্রেসী চাল—নচেৎ এত দিন চূপচাপ  
থাকিয়া দীর্ঘ দশ বৎসর পরে এই সংবাদ প্রকাশ করা হইল কেন  
এবং এত দিন তাঁহা চাপিয়া রাখিবারই কারণ কি?”

“সত্যজিৎসেতার বিবাহ-সংবাদকে প্রকাশ না করার পক্ষে যে  
সমস্ত যুক্তিই দেখানো হউক, ভারতবর্ষের ছোট-বড় অধিকাংশের  
মন সংস্কার-বিস্তৃত নহে। এত দিন বাঁহাকে তাঁহারা আজন্ম  
সন্ন্যাসী চিংকুমার বলিয়া গোখামীর দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছেন,  
হঠাৎ তাঁহাদের পক্ষে এক জন বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ যেন  
বিশ্বাস্য নহে এবং হইলেও তাঁহা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়। যেন  
সত্যজিৎসেতার একটা কুকাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন, অতএব তাঁহার  
এই অপবাদকে চাপা দিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই  
কুসংস্কারোদ্ভূত মনোভাবের জন্ত এই সংবাদকে এত দিন প্রকাশ করা  
হয় নাই এবং বিবৃতির এই অংশের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত

এবং তাঁহাদের সহিত বর্ধ মিলাইয়া বলিতেছি—“দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-  
সম্পন্ন মমতাময়ী এই নারী ভারতের স্বাধীনতার জন্ত বহু বৎসর  
সংগ্রাম করিয়াছেন এবং যিনি নেতাজীর শক্তি ও উদ্দীপনার উৎস  
ছিলেন, তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ করার আমরা গর্প অস্বভাব  
করি। আমরা জানি, নেতাজী যখন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের  
অধিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব করিবার জন্ত জাগ্রামী হইতে  
বিপদমস্থল পথে যাত্রা করেন, স্রীমতী শেফাল তখন দুই মাসের  
শিশুকন্যা ক্রোড়ে লইয়া পুরাকালের যুদ্ধযাত্রী স্বামীকে বিদায়দাত্রী  
নারীর মতই নেতাজীকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। এ জন্ত  
আমরা তাঁহাকে ধন্য করি, আমরা নেতাজীর সহধর্মিণী এবং  
কন্যাকে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।”

—দামোদর।

“সত্যজিৎসেতার পরিবার” অর্থাৎ নেতাজীর বিবাহিত জীবন ও  
তাঁহার পত্নী-কন্যা-সম্বন্ধিত এই পরিবার রচনার সংবাদে এতখানি  
বিম্বিত হইবার কি হেতু আছে, এ কথা ভিজ্জাসা করিলে সে প্রশ্নের  
উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে খুব সহজ বা সুখকরও হইবে না।  
সত্যজিৎসেতার জায় আরও বহু দেশমাতার মুষ্টিপ্রতী দেশকর্মী, ভারতের  
স্বাধীনতা সংগ্রামে চিহ্নিত সৈনিক অথবা সেনানীরূপে বাঁহারা  
দেশ হইতে বিদেশে গিয়াছেন, তথায় বৈপ্লবিক যুদ্ধযাত্রা, স্বাধীন  
রাজ্য হইতে অজ্ঞাদি সংগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াছেন, সেই দীর্ঘ প্রবাস-  
জীবনে কোথাও স্বপ্নের দায়ে, কোথাও বা ঘটনাক্রমে অর্থাৎ  
শীকারী রাজশক্তির সন্ধানী দৃষ্টির উপর ধূলিনিক্ষেপে উহাকে  
এড়াইবার জন্তই তাঁহাদের বিবাহ করিয়া সেখানে সংসার  
পাতিতেও হইয়াছে—ইহা আমরা জানি বটে, আর তৎসঙ্গে  
ইহাও জানি যে, পুরাণ-কথিত কচের দ্বায় দেবজননীর অসন্তান  
যাঃ বিদেশে দৈত্যগুরু ভ্রূচাচাধ্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী  
বিদ্যা আয়ত্ত করিতে গিয়া তথায় রূপদী দেবতাবালার অনিন্দ্য  
প্রেমের আকর্ষণে ধরা না দিয়া বহু তাঁহার জন্ত দারুণ  
অভিশাপ কুড়াইয়াও মুক্তহৃদয়ে অতীষ্ট সিদ্ধ করিয়া স্বদেশে  
ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন—এমন প্রভাতকুমারের মত  
অনাদ্রাত জীবনের সংখ্যা দুর্লভ, অত্যন্ত, অজুলির অগ্রভাগেই  
গণনীয়। সে ক্ষেত্রে নেতাজী সত্যজিৎসেতার বলিতেই আমাদের চিত্তে  
এই ‘কোটিতে গুটিক’ শেফাল জন্তর আসধারণ গোষ্ঠীই এক জন  
আকুমার ব্রহ্মচারী, জনবীরেরই জ্যোতির্ময়ী অগ্নিমূর্তি ফুটিয়া উঠে।  
তাই বিশ্বের উপর বিশ্বের জাগে, স্বপ্ন অবসাদে নৈরাশ্রে ভাঙ্গিয়া  
পড়ে—যখন তুমি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ও স্বরূপে সংগঠিত,  
আমাদের নেতাজীর কোন মানবীর প্রতি প্রেমাত্মক কথ্য, তাঁহার  
পরিণয়-বন্ধনের কথা। মন সশব্দের বিবরণে ভরিয়া উঠে ও  
অভিমনে বলিয়া উঠিতে হয়—হয়ত ইহা কোনও হীনমতি দুঃখেরই  
মিথ্যা প্রচার—কোনও বিশ্বনিষ্ঠের মুখ দিয়া সত্যজিৎসেতার শত্রু-  
পক্ষের তরফ হইতে অতি চমৎকার বুদ্ধিমত্তার সহিত তাঁহার অপা-  
বিত্ত চরিত্রে ও নামে কলঙ্ক-মণী লেপনের চক্রান্তমূলক এক কুটকৌশলী  
অপচেষ্টা। তাই আর্ন্তকণ্ঠেই আমরা প্রশ্ন করিতেছি—এই প্রচারিত  
সংবাদের সকল অসম্মান ব্যঞ্জনা নিবসন করিয়া, ভারত গর্ভমেষ্ট  
কি সবিস্তার সমস্ত অবগত ঘটনা প্রকাশ করিবেন?

“সুভাষচন্দ্র যদি বিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহার সে পরিণীতা পত্নী অথবা তাঁহাদের আদরিণী কন্যা-সন্তানকে দেশবাসী সমাদরেই দেশের বৃক্কে স্থান দিবে—ইহা খুব স্বাভাবিক। এই দিক দিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু যদি শ্রীমতী বসুকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি দেশের প্রতিভারূপে যোগ্য কাজই করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। সেইরূপ সর্দারজী প্যাটেল তাঁহাদের জ্ঞাত ‘নেতাজী’ চলচ্চিত্রের বিক্রয়স্বত্ব সমুদয় আয় সংগ্রহ পূর্বক বিশেষ ঋণভাণ্ডারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়া থাকেন, তাহাও সমীচীন কাজই হইয়াছে—ইহাও আমরা বলিব এবং তুলিয়া যাইব যে, নেতাজীর কণ্ঠের জন্তই স্ট্রাইকরলাগেওরই গিরিনগরীতে এক দিন সর্দারজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেল মহোদয়ের যে লক্ষ টাকার তহবিল দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া শুনা গিয়াছিল, তাহার অধিকারও লইয়া পরে যে আইন-সম্পর্কিত কূট তর্কের ঝটিকা উঠিয়াছিল ও তাহার শেষ পরিণাম যাহা ঝাঁড়াইয়াছিল, সে সবই আমরা তুলিয়া যাইব। কিন্তু সর্বপ্রথমে আমরা সঠিক ভাষায় জানিতে চাই—সুভাষচন্দ্র সঙ্কে ভারত গবর্নমেন্টের সকল সন্ধান—সংবাদেব মূল তথ্যগুলি তাঁহার জীবন-শেখরের সংগৃহীত সমস্ত আসল নিছক সত্য—এই প্রামাণিক তথ্য ও সত্যের উপরই বাঙ্গালী তাহার ক্ষতস্থতি স্বপ্নমন্দিরের ‘নেতাজী’কে বুলিয়া লইবে—কোনও কূট-কৌশল চাতুরী দিয়া সুভাষচন্দ্রের পবিত্র চরিত্র মলীলপ্ত করার অপচেষ্টা বাঙ্গালী সহ্য করিবে না।

“ভারত গবর্নমেন্টকে আবার আমরা জানাইতেছি—তাঁহারা সুভাষচন্দ্র সঙ্কে সকল জানা তথ্য প্রকাশ করুন—আমাদের ও দেশবাসীর হৃদয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করুন।”

—নবসংঘ।

“নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে কংগ্রেসী নেতারা অনেক মিথ্যা প্রচারই এ-পর্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের সমাপ্তি-দিবসে নেতাজীর পত্নী ও শিশুকন্যার ভরণ-পোষণের প্রস্ন তুলিয়া তাঁহারা অপপ্রচারের যে জয়ঢাক ঝাঁড়াইয়াছেন, তাহার নিন্দা করিবার মত কর্তার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহাদের এই অপপ্রচার কার্ণের আর একটি নিকুট কৌশল এই যে, স্বর্গতঃ সর্দার প্যাটেলের নাম ইহার সজ্জিত জড়িত করা হইয়াছে। সর্দারজী বাঁচিয়া নাই। কাজেই তাঁহার নাম করিয়া নেতাজীর নামে মিথ্যা প্রচার করা কত প্রবিধা! ভারত গবর্নমেন্ট যখন নেতাজীর স্মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেন, তখন সর্দারজী জীবিত ছিলেন। তিনি যদি জটনৈক কুটীয়ান মহিলাকে বিবাহ করিয়া থাকেন এবং যদি তাঁহার একটি কন্যা-সন্তান থাকিয়া থাকে, তবে সেই সময় সর্দারজী তাহা প্রকাশ করেন নাই কেন? কেন তিনি তখন নেতাজীর স্ত্রী ও কন্যার ভরণ-পোষণের জন্ত আড়াই লক্ষ টাকার তহবিলের কথা বলেন নাই? শ্রীযুক্ত নেহেরু যদি নেতাজীর পত্নীকে কন্যা সহ ভারতে চলিয়া আসিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া থাকেন, তবে ইতিপূর্বে তিনি সেই কথা প্রকাশ করেন নাই কেন? সাধারণ নির্দোষের পূর্বে নেতাজীর নামে এইরূপে মিথ্যা প্রচার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। নির্দোষের জয়লাভের জন্ত এইরূপ পন্থা গ্রহণ করিতে কংগ্রেসী নেতারা লক্ষ্যবোধ করিবেন, এতখানি

হুশাশা আমাদের নাই। কিন্তু দেশের লোক তাঁহাদের মিথ্যা প্রচারে ভুলিবে না।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## কবিগুরু বিশ্বভারতী

“বিশ্বভারতী এ যুগের ভারতীয় কৃষ্টিতে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীই গৌরবের বিষয় হইয়া আছে। উহার বক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির সাহায্য করিয়া সেই ঐতিহ্যকে টিকাইয়া রাখা ও বর্ধিত করার প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকেই আন্তরিক ভাবে সমর্থন করিবে। তবে সরকারী কর্তৃক ও পরিচালন বিষয়ে অথবা হস্তক্ষেপে বাহাতে বিশ্বভারতী বক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত না হয় আইন-কানুন প্রভৃতি গ্রহণ কালে তৎসম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আবশ্যকীয় উন্নতি ও মানে পৌঁছিতে হইলে দেশে আরও অধিক সংখ্যক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্তমানে যেভাবে অধিক সংখ্যক ছাত্র একই স্থানে প্রয়োজন অপেক্ষা ক্ষুদ্র সংখ্যক অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছে বা অন্তর্বিধ চর্চায় রত আছে—তাঁহারা প্রয়োজনীয় শিক্ষামানে পৌঁছিতে পারিতেছে না; অথচ গৃহ-সমস্যাদির জন্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক ছাত্র লইয়া আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুবিধাও নগরাকলে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া নগরাকলের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির দিকে সরকার ও জনসাধারণের

## উকনের নতুন ঔষধ

### আশ্চর্য্যাকর ক্ষমতা

“মহাশয়: দুই আনার ডাকটিকিটের ঔষধে আমার মাসীমার নিষ্কৃতি হোয়েছে—উকনের হাত হতে। সামান্য দুই আনার যে এত সুন্দর কাজ হয়—তাহা আশ্চর্য্য।”—শ্রীমনিকুন্ডলা দেবী; C/o. A. S. M. Sajnipara Stn. Murshidabad.

“নিউট্রল-লাইসাইড পাউডার ব্যবহার করে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। চুল ও মাথার চামড়ার কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

অনুগ্রহ করে দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাবেন। এক জনের উপযুক্ত একমাত্র ত্রাণশাল পাঠাবো।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় এই “লাইসাইড” পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চ হারে কমিশন দেবো।

# নিউট্রল

Dept. M.B.; ১৯, বঙ্গেশ রোড; কলিকাতা—১৯



উৎসাহ ও সাহায্য থাকিলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও মানের অনেক উন্নতিই হইতে পারে।” —লোকসেবক।

“বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে রক্ষা করিবার জন্য ভারত সরকার যে অর্থসহ হইয়াছেন ইহা একটা সাধারণ ব্যাপার নহে, মামুলী কর্তব্যসাধন মাত্র নহে, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা, অস্বাভাবিক ঘটনা। স্বাধীন ভারত যেরূপ কার্যের দ্বারা আত্মপরিচয় দিতে পারে, আপনাদের স্বাধীনতাকে রূপ দিতে পারে ইহা সেটরূপ একটি ঘটনা। পশ্চিম বাংলায় বিধান-সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, বিহারের বিধান-পরিষদে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্থাবৎ আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু ভারতীয় সংসদে বিশ্বভারতীর জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন ইহা হইতে স্বতন্ত্র ঘটনা।

“বরীন্দ্রনাথের বিদ্যা-প্রভা” বা শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতিরূপে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করণের শিক্ষার, জ্ঞানের ও অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসে এক নূতন পরীক্ষা। সরকারী আইনের বাধা দ্বারা কাঠামোর মধ্যে ফেলিয়া শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনা রচনা করা ইহার লক্ষ্য নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত সাধনার প্রভাবে বাঁহাদা নিজেদের জীবনে সত্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সাধনার আলোকে বিশ্বের মানব-সমাজকে নূতন পথ দেখাইবার এবং নূতন পথে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ। এই প্রয়াসের সাফল্য অবশ্যই উত্তরসাপেক্ষের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিবে, তথাপি মানব-সমাজে বিশ্বব্যাপী বিভাস্তির মধ্যে সত্যের ও অধ্যাত্মের আলোক বিস্তারের অধিকার যে ভারতই পাইয়াছে, ইহা তাঁহার পরম গৌরব।” —অনিন্দবাজার পত্রিকা।

### সমস্যা-সঙ্কুল কাশ্মীর

“কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব, দিল্লীর আকাশে অজ্ঞাত বিমান, পাকিস্তানী দুর্খসোধক বক্তৃতা ও ভারতীয় পার্লামেন্টে ভীষণ বাদামুবাদ দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ইঙ্গ-মার্কিনী একান্তই যত্ন ও পাকিস্তানের সম্মতি ছাপনের ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এক বহুতময় দুঃস্থ পরিস্থিতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি বি. এন. রাও ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা দুই কারণে ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ব্রিটেন ও আমেরিকা গায়ের জোরে ভারতের উপর এই প্রস্তাব চাপাইয়া দিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিরোধের সূচনা করিয়াছে, উভয়ের সম্প্রতিই উহার সমাধানের জন্য আপোষ প্রস্তাব আনীত হইতে পারে। বার বার আপোষ সীমাসার চেষ্টা ও মধ্যস্থতা ব্যর্থ হইবার পরেও

পুনরায় গায়ের জোরে এই প্রস্তাব ভারতের দ্বারা চাপাইয়া দিবার ফলে ইঙ্গ-মার্কিন উদ্বেগ সযত্নে ভারতবাসীর মনে সন্দেহ জাগরক হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব কাঙ্ক্ষিত করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিনের অগায় ও অভ্যন্তরীণ জিদের ফলে দুই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন পথে ধাবিত হইবে, তাহা অজ্ঞাত।” —বর্ধমান।

### শোক-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী লেডী অবলা বন্দ্যোপাধ্যায় ইহজগতে নাই। গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার আপার সাকুলার গোল্ডেন জাহার বাসভবনে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। লেডী অবলা বন্দ্য ১৮৬৪ সালের ৮ই আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও হুগোমোহন দাশের দ্বিতীয়া কন্যা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। তিনি ছাত্রীজীবনে মাস্তাজ মেডিক্যাল কলেজে কিছু কাল অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৭ সালে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। বহুবার তিনি স্বামীর সহিত ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণায় অশেষ সহায়তা করিতেন। লেডী অবলা বন্দ্য নারী ও শিশুর সেবায় ও তাহাদের কল্যাণে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে অক্ষয় আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা দেশের ভাবী বংশধরদিগের অমূল্যবস্তু। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

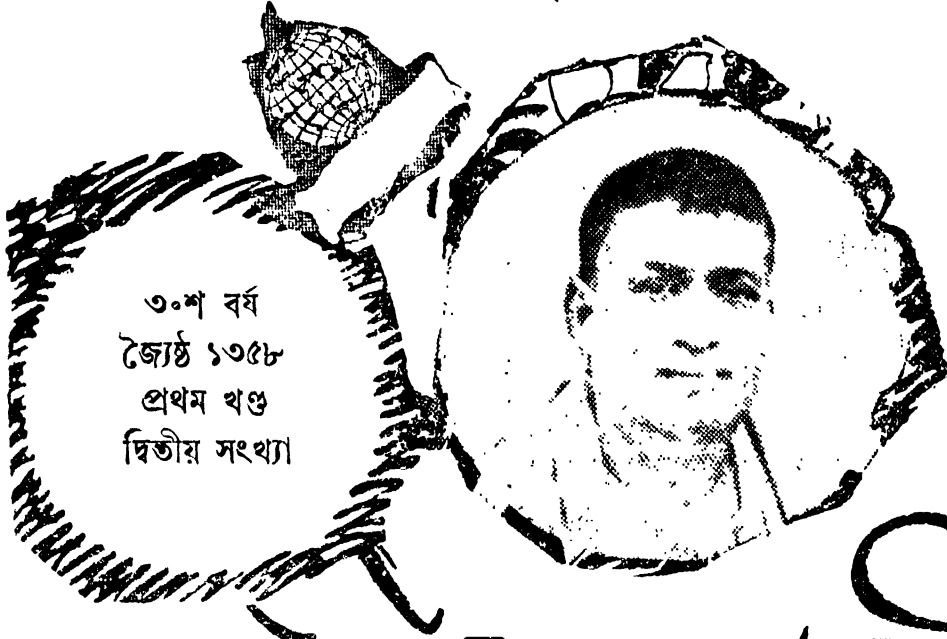
আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, কৃতী সাহিত্যিক শ্রীঅরবিন্দ চক্রবর্তী আপ ইহজগতে নাই। গত ২৮শে এপ্রিল রাতে তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। সর্বপ্রথম শ্রীঅরবিন্দের নিকট বাঁহাদা শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী অগ্রতম ছিলেন। আধুনিক প্রগতিবাদী সাহিত্যিক-গোষ্ঠী অগ্রতম চিন্তানায়ক শ্রীচক্রবর্তী তাঁহার শক্তিশালী রচনা, ছোট গল্প এবং গীতি-কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের পরিপূষ্টি সাধন করিয়াছেন। মাসিক বন্ধুভাষীতে তাঁহার বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সংখ্যাতোও একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পরলোকগতের আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা



“বানে বানে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে  
নব নব বেশে ।”—স্ববীজনাথ

—ঈশমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী





৩০শ বর্ষ  
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮  
প্রথম খণ্ড  
দ্বিতীয় সংখ্যা

# স্বাসক পুঁইতী

যু গ বা নী

রামদয়াল। আমি কাল শশধরের কাছে গিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কই, আমি ত বলি নাই। তা বেশ ত, তুমি গিছিলে।

রামদয়াল। এক জন খবরের কাগজের সম্পাদক ( Indian Empire ) আপনার নিন্দা করছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা করলেই বা।

রামদয়াল। তার পর শুনুন। আমার কথা শুনে তখন আর আমায় ছাড়ে না, আপনার কথা আরও শুনে চায়।

\* \* \* \* \*  
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। আচ্ছা, আমার কি রকম অবস্থা?

মাষ্টার (সহাস্ত্রে)। আজ্ঞা, আপনার উপরে সহজাবস্থা—ভিতর গভীর। আপনার অবস্থা বোঝা ভারী কঠিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে)। হাঁ; যেমন floor করা মেজে, লোকে উপরটাই দেখে, মেজের নীচে কত কি আছে, জানে না।

\* \* \* \* \*  
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)। তাঁকে লাভ করতে হলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু করে থাক। তাই। তপস্যা। তা এ জন্মেই হোক আর পূর্ব জন্মেই হোক।

জ্যোপদীর যখন বস্ত্রহরণ করছিল, তার ব্যাকুল হয়ে ক্রন্দন শুনে ঠাকুর দেখা দিলেন। আর বললেন—‘তুমি যদি কারকে কখনও বস্ত্র দান করে থাক, ত মনে করে দেখ—তবে লজ্জা নিবারণ হবে।’ জ্যোপদী বললেন, ‘হাঁ, মনে পড়ছে। এক জন শ্রমি স্নান করছিলেন,—তাঁর কপনী ভেসে গিছিলো। আমি নিজের কাপড়ের আখধান ছিঁড়ে তাঁকে দিছিলাম।’ ঠাকুর বাকল—‘জ্যোপদী! জ্যোপদী! জ্যোপদী! জ্যোপদী!’

# পবন পুরুষ শ্রী শ্রী রামায়ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একচলিশ

‘আশ্রমে কে এল বল দেখি।’ ভগবানদাস  
বাবাজী তাকাতো লাগলেন চার দিকে।

কে আবার আসবে।

‘না, একজন কে মহাপুরুষ এসেছেন আশ্রমে।  
নিখাসে তাঁর সুগন্ধ টের পাচ্ছি। তোরা সব একটু  
ছাখ দেখি এগিয়ে।’

কত লোকই তো আসছে-যাচ্ছে আশ্রমে।  
কালনার সিদ্ধবাবাজীর নাম ভারত প্রসিদ্ধ। এমন  
কৃষ্ণভক্ত থাকতে আবার কার গায়ের গন্ধে বাতাস  
আমোদ হবে।

কত ঢঙের মানুষই আসে আজকাল। কে  
একজন দেখ না এসেছে একেবারে কাপড়ে মুড়িমুড়ি  
দিয়ে। মুখ-হাত-গা কিছুই দেখবার উপায় নেই।  
পুরুষমানুষের আবার এ কোন ছিরি! কোনো  
অসুখ-বিসুখ নাকি?

‘না, এটা ওঁর ভয়-লজ্জার ভাব।’ সঙ্গের  
লোকটি বললে। ‘ওঁর বালকস্বভাব কিনা। অচেনা  
নতুন জায়গায় এলে এমনি ওঁর ভাব হয়।’

‘তোমার কে হন?’ জিগগেস করলেন বাবাজী।

‘আমার মামা। সারাক্ষণ ঈশ্বরভাবেই আছেন।  
আপনার এ আশ্রম ঈশ্বরভাবের আশ্রম—আপনার  
নামটিও ভগবান। দেখতে এসেছেন আপনাকে।’

বোসো এক পাশে। কত ভাবের লোকই আসে  
আজকাল। কী-না-কী একটু ভাব হল, অমনি  
ঈশ্বরভাব। মোগল-পাঠান হৃদ হল ফারসি পড়ে  
ঠাঁতী।

‘কিন্তু কে এল বল তো আশ্রমে। এমন দিবা-  
সৌরভ টের পাচ্ছি কেন?’ বাবাজী উন্নয়ন হয়ে  
উঠলেন।

কোথায় কে। তেমন আবার কে আসবে  
আচমকা।

বাবাজীকে প্রণাম করে এক পাশে বসল দুজনে।  
হৃদয় আর রামকৃষ্ণ। বসল একান্ত দীনভাবে।  
বিনম্র-বিনত হয়ে।

দিবা গন্ধের উৎস কোথায় বুঝতে পারলেন না  
বাবাজী।

যাক, উপস্থিত প্রসঙ্গেই নেমে আসা যাক।  
হ্যাঁ, যা নিয়ে কথা চলছিল এতক্ষণ। সেই বৈষ্ণব  
সাধুটির কথা। যে গহিত কাণ্ড সে করে বসেছে  
তার সম্বন্ধে এখন কি করা উচিত। কোন শাস্তিটি  
বিধেয়?

‘আমি বলি কি’, ভগবানদাসের কণ্ঠে শাসক-  
রোষ গর্জে উঠল: ‘আমি বলি কি, ওর গলার কণ্ঠি  
কেড়ে নিয়ে ওকে দল থেকে বার করে দাও।’

বাবাজীর যা অভিমত, তাই প্রত্যাদেশ।

মালা ফেরাচ্ছেন বাবাজী।

‘আপনি আর অকারণ মালা রেখেছেন কেন?’  
জিগগেস করলে হৃদয়: ‘আপনার সিদ্ধিলাভ তো  
কবেই হয়ে গেছে।’

এ প্রশ্ন কি হৃদয় করল, না, আর কেউ করাল  
তাকে দিয়ে?

‘নিজের জন্তে কি আর করি? লোকশিক্ষা  
তো দিতে হবে আমাকে।’

‘লোকশিক্ষা?’

‘তা ছাড়া আবার কি। তারি জন্তেই তো  
আছি। আমাকে দেখে আর সবাই যদি অমনি  
মালা-তিলক ছেড়ে দেয় তবে দল-কে-দল গোপ্তায়  
যাবে।’

ওরে, এ যে সোহং বলছে। কী সর্বনাশ!  
ওরে, দা লাগা। দা বসা। সোহং-এর আগে  
দা জুড়ে দে। বল দাসোহং। দেহবুদ্ধিতে দাসোহং  
ছাড়া পথ নেই।

বল আমি দাস, আমি ভক্ত, আমি বালক।

জ্ঞান হলে আবার অহং কি। সূর্য যদি ঠিক মাথার উপর থাকে তবে আর ছায়া কোথায়? কিন্তু অশ্রু সময়? সূর্য যখন এদিকে-ওদিকে? যখন চলছে দেহের ছায়াবাজি? যখন তার জ্ঞান নেই? তখন? তখন ভক্তি, তখন প্রেম, তখন সেবা। সেবা-প্রেম না নিয়ে মানুষ কী নিয়ে থাকবে? কী করে তবে তার দিন কাটে?

যার অটল আছে তার আবার টলও আছে। এই আঁচিস স্থির হয়ে অমনি আবার তুই কাজ করছিস। তোর স্থিরতা কতটুকু। তোর চাক্ষু্যই বেশি। সূর্য মাথার ওপর কতক্ষণ? বেশিক্ষণই সে ডাইনে-বাঁয়ে। তাই জ্ঞান নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকবি? ভক্তিতে ছুটে চল। ভক্তিতে গলে যা। ওরে যা জ্ঞান তাই ভক্তি। জ্ঞান বলে, এ জল; ভক্তি বলে, জানি না কে—এ শুধু শীতলতা। একে ছুঁতে ঠাণ্ডা, খেতে ঠাণ্ডা।

জ্ঞান বস্তু, ভক্তি স্বাদ। কিন্তু যেখানে একা-একা নয়, জীব-জগৎ নিয়ে থাকবি সেখানে স্বাদ দিয়ে যা জ্বল-জ্বল। স্বাদ নিয়ে যা ক্ষণ-ক্ষণে।

তাই বলে এই অহংকার! এত প্রতাপতা!

নিমেষে কি হয়ে গেল কে বলবে। মুখের কাপড় খসে পড়ল রামকৃষ্ণের। রাগের বজ্র দিয়ে উঠে দাঁড়াল আগুনের মত। বললে, 'তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি লোক তাড়াবে? তুমি ধরবে-ছাড়বে? কে তুমি? যঁার এই জগৎসংসার তিনি যদি না শেখান, তিনি যদি না তাড়ান, তিনি যদি না ধরেন-ছাড়েন, তোমার সাধ্য কি! কেন, কিসের এত অহংকার?'

কটিতট থেকে খসে পড়ল বস্ত্রখণ্ড। মুখে দিব্য জ্যোতি, দেহে দিব্য তেজ, কণ্ঠে দিব্য বাণী। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ।

চোখ মেলে তাকালেন একবার বাবাজী। নিখাস নিলেন বুক ভরে। বুঝলেন সেই দিব্য গন্ধের উৎস কোথায়।

এ সংসারে কেউ কোনো দিন তাঁর মুখের উপর কথা বলেনি। সাহস পায়নি প্রতিবাদ করতে। তিনি যা বলেছেন তাই সবাই মেনে নিয়েছে হেঁটমুণ্ডে। কিন্তু কে এ উত্তমদণ্ড মহাশাসন? অথচ এর প্রতি সেই স্বাভাবিক ক্রোধ হচ্ছে না কেন? কেন জাগছে না প্রতিহিংসার

প্রবৃত্তি? আমি কি বদলে গেলাম নিমেষে? কিন্তু এ কে?

এ সেই বিশ্বভুবনের তমোহর। তোমার অভিমানের তমোনাশ করতে এসেছেন। এসেছেন তোমার অন্তঃকণ্ঠ ফুটিয়ে দিতে। বুঝিয়ে দিতে তুমি কে, তুমি কতটুকু। তোমাকে ঠাণ্ডা করে দিতে।

ভাবমোহিত হয়ে গেলেন ভগবান। বললেন, কণ্ঠে বিনয়নম্র মধুরতা: 'আমার এমনি নাম ভগবান বটে কিন্তু আজ থেকে আমার আসল নাম ভাগ্যবান। ভাগ্যবান বলেই আমি আপনাকে পেয়েছি, আমাকে দেখা দিয়েছেন—'

সত্যিই দেখা দিয়েছেন! বাবাজী দেখলেন মহাপ্রভুর মহাভাবের যে লীলাবর্ণন আছে তাই তাঁর দিব্য অঙ্গে প্রকাশিত।

বন্দনার আনন্দস্রোত বইতে লাগল আশ্রমে।

কে এ? কে এ বন্ধনমুক্ত বিভাবসু? অহঙ্কারের সংহত তুষারকে গলিয়ে দিলেন ভক্তির স্রোতস্বিনীতে।

উনিই সেই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস। কলুটোলার হরিসভায় উনিই সেদিন ভাবাবেশে দাঁড়িয়েছিলেন চৈতন্যসনে।

করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন বাবাজী। বহু কটু-কাটব্য করেছি সেদিন। বুঝতে পারিনি। যিনি সমস্ত জীবের চৈতন্য এনে দিয়েছেন চৈতন্যসনে তো তাঁরই একমাত্র অধিকার।

মথুর বাবু আর হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে কালনায় বেড়াতে এসেছিল রামকৃষ্ণ। এসেছিল নোকো করে। কেন এসেছিল কেউ জানেনি। মথুর বাবু গেলেন বাসা দেখতে, রামকৃষ্ণ বললে, চল রে হুহু, শহরটা একবার ঘুরে আসি। কত দূর এসেই পথের লোককে ডেকে জিগগেস করলে, 'আচ্ছা মশাই, ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমটি কোন দিকে?'

সেই আশ্রমে এসে এই কাণ্ড।

তোতাপুরীকে ক্রোধ জয় করতে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভগবানদাস বাবাজীকে শিখিয়ে দিল অহঙ্কার জয় করতে, প্রতিহিংসা জয় করতে।

মথুর বাবুকে বললে, 'এইখানে একটি মচ্ছব লাগিয়ে দাও।'

মথুর বাবু বললেন, 'তথাস্তু।'

সেখান থেকে চলো এবার নবদ্বীপ। চলো একবার দেখে আসি নিমাইয়ের জন্মভূমি।

কেউ বলে নিম্ন গাছের নিচে জন্মেছিল বলে নিমাই। কেউ বলে যমের মুখে তেতো লাগবে বলে নিমাই। কেউ বলে আট-আটটি কণ্ঠা মরে যাবার পর নবম গর্ভে জন্মেছিল বলে নিমাই।

কিন্তু এমন কাঁঠনে ছেলে, কিছুতেই শাস্ত হতে চায় না। পাড়ার স্ত্রীলোকদের কত জনের কত রকম চেষ্টা, কিছুতেই নিবৃত্তি নেই। অগত্যা অনুপায় হয়ে হরিনাম শুরু করে দেয় সবাই। বাস, শিশুর মুখের খিলখিল হাসি।

পরম সঙ্কট পেয়ে গেল সকালে। শিশু কাঁদলেই হরিনাম করতে হবে। আর শিশুও এমন হুঁদে, তার কেবল থেকে-থেকে কান্না।

কিন্তু নেড়া-নেড়ীদের এ সব কী কাণ্ড বলে দেখি? সত্যিই কি চৈতন্য অবতারণা? না, নেড়া-নেড়ীরাই টেনে-বুনে বানিয়েছে একটা? চলো নিজে গিয়ে দেখে আসি।

হ্যাঁ, নিজে সেখানে গেলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে। চৈতন্য যদি অবতারণা হয়ই তবে সেখানে কিছু-না-কিছু প্রকাশ থাকবেই, আর ইসারা ঠিক মিলে যাবে চট করে।

রামকৃষ্ণ এল নবদ্বীপে। বড় গৌসাইয়ের বাড়ি, ছোট গৌসাইয়ের বাড়ি দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে। হোখা-হোখা হেন-তেন কত ঠাকুর-দেবতার থান। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। সর্বত্রই শুকনো হাঁড়ি ঠনঠন করছে। কোথাও দেবভাব নেই। সব জায়গাতেই এক-এক কাঠের মূরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে আছে শুধু। দূর! এখানে তবে এলুম কী করতে। চল ফিরে চল নৌকোয়।

তাই সই। ফিরে চলো।

কিন্তু নৌকোয় যেই উঠেছে রামকৃষ্ণ, অমনি বদলে গেল দৃশ্যপট। অলৌকিক দর্শন হল তার। ঐ এলো, ঐ এলো—বলতে বলতে চকিতে সমাধিস্থ হয়ে গেল।

জলে পড়ে যাচ্ছিল, হৃদয় ধরে ফেললে।

কী দেখলে অকস্মাৎ?

‘দেখলুম তুটি সুন্দর ছেলে—আহা, এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে আকাশ-

খোলটার মধ্যে ঢুকে গেল, আর আমার কিছু হুঁস রইল না। ওরে, ওরাই হচ্ছে নিমাই-নিতাই। নিমাই যে অবতার, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে?’

কিন্তু এ ভাব নবদ্বীপে না এসে এই গঙ্গাবক্ষে এল কেন?

মথুর বাবু বললেন, ‘যে নবদ্বীপে মহাপ্রভুর জন্ম তা গঙ্গায় ভেঙে গেছে। এই যে বালুর চড়া দেখতে পাচ্ছ এই ছিল আসল নবদ্বীপ। তাই হালের শহরে না হয়ে এই বালুর চড়ার কাছে এসে তোমার ভাব হল।’

তুমি ভাবাবুনিধি। তুমি সর্বগুণেশ্বর।

আমি কেউ নই। আমি আবার কে।

বিয়াল্লিশ

কর্মযোগে অঙ্গারও হীরক হয়।

মথুর বাবুও ভক্তিতে-বিশ্বাসে অত্যাচ্ছল হয়ে উঠলেন।

সন্ধ্যাতরে বললেন রামকৃষ্ণকে, ‘বাবা, আমাকে ভাবসমাধি দাও।’

হাসল রামকৃষ্ণ। বললে, ‘দিব্যি তো আছিস।

সুখে থাকতে ভূতের কিল খাবি কেন?’

‘না, ও সব শুনছি না আমি—’

‘না শুনলে চলবে কেন? তোর এদিক-ওদিক ছদিক চলছে। ভাব হলে যে অঁখে জলে পড়বি। সংসার থেকে মন যে তখন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-আশয় কে দেখবে-শুনবে? বারো ভূতে যে লুটে খাবে সর্বস্ব।’

মথুর বাবু তবুও নাছোড়বান্দা।

‘ওরে কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁততে-পুঁততেই কি গাছ হয়? আর গাছ হয়েই কি ফল পাওয়া যায়?’

ভক্ত, ভৃত্য আর ভাগুরী এই মথুর বাবু। কখনো প্রভুজ্ঞানে ইষ্টপূজা, কখনো বা সম্মান-ভাবে স্নেহস্রাবণ। কখনো অভিভাবক জ্ঞানে সতর্ক সম্মান, কখনো বা মিত্রবুদ্ধিতে সমতা-মমতা। আর যিনি বিশ্বজনক, যিনি আত্মীয়ের চেয়েও আত্মীয় সর্বত্র যার ক্ষমা, দয়া, বিশ্বাস আর আশীর্বাদ, তাঁকেই মাঝখানে রেখে দুই পাশে শুয়েছেন দুই জনে। মথুর বাবু আর জগদদ্বন্দ্ব। একই ধৈর্যের শয্যা।

রামকৃষ্ণ ভাব দিতে রাজি হল না বলে মরমে মরে রইলেন মথুর বাবু। মাকে বললেন, মা, আমাকে বঞ্চনা করে তোর লাভ কি।

কি খেলা দেখাবার জন্তে মথুর বাবুকে মা নিয়ে এসেছিল রামকৃষ্ণের কাছে তা কি মথুর বাবু জানেন? বারে-বারে রামকৃষ্ণকে যাচাই করে দেখবার জন্তে। সাথে কি আর মথুর বাবু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে? দেখলেন যতই আগুন আনেন ততই সোনা টকটকে রং ধরে। একলা ধরে সুন্দরী মেয়ে মানুষ এনে দিলেন, রামকৃষ্ণ দুর্গাস্তব শুরু করলে। শাল-দোশালা চাপিয়ে দিলেন গায়ে, তার গায়ে থুতু ছিটোতে লাগল। রূপোর সাজ আর গড়গড়া দিলেন কিনে, বললে গামছা পরে ডাবা হুকো খেতে দোষ হল কি। বিষয় দিতে চাইলেন, এই মারে তো সেই মারে। তাঁর নিজের সংসারের উপরে দিলেন তাকে অপ্রতিহত প্রভুত্বের অধিকার, এক নজর তাকিয়েও দেখল না। কামার-পুকুরের সংসারের জন্তে কত অর্থব্যয় করলেন, এতটুকু কাতরতা-কৃতজ্ঞতা নেই।

এ কে তুমি বৈরাগ্যবারিনিধি। আমি অনেক দুর্দ্ধার্য করেছি, জমিদারি বজায় রাখতে খুনখারাপি করতেও কসুর কবিনি, এবার দাও আমাকে নৈরস্যের নিষ্কৃতি আমাকে ভাব দাও।

তদভাবে তদভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ।

‘ওরে ঠিক-ঠিক যে ভক্ত সে কি তাঁকে দেখতে চায়? সে শুধু তাঁর সেবা করে।’ প্রবোধ দিল রামকৃষ্ণ। ‘তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার বেশি আর সে কিছু চায় না।’

তবু মন ওঠে না মথুর বাবুর।

‘তা কি জানি বাপু। মাকে তবে গিয়ে বলি। দেখি তাঁর কি-ইচ্ছে।’

এর দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন মথুর বাবুর ভাবসমাদি উপস্থিত। তিন দিন ধরে ঠায় জড় অবস্থা।

ডেকে পাঠালেন রামকৃষ্ণকে। দেখে যাও কোথায় এসে উঠেছি শেষ পর্যন্ত।

রামকৃষ্ণ দেখল, আশ্চর্য, এ কী হয়ে গিয়েছে মথুর। যেন আরেক দেশের মানুষ। চেনা যায় না চট করে। হুঁ চোখ লাল, কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মুখে শুধু ঈশ্বরের কথা। শুধু অধ্যাত্মরতি।

কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখেই হুঁ পা জড়িয়ে ধরলেন মথুর বাবু। আকুল কণ্ঠে বললেন, ‘বাবা, ঘাট হয়েছে। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।’

‘কেন, কি হল?’

‘সব তছনছ হয়ে গেল। তিন দিন ধরে এই অবস্থা, বিষয়কর্মে মন দিতে পারছি না, চেষ্টা করলেও মন উঠে-উঠে যাচ্ছে। তিন দিনেই বারো ভূত ছেড়ে তেত্রিশ ভূত এসে লেগেছে—’

‘কেন, তখন যে খুব ভাব চেয়েছিলে সখ করে? এখন ফের দিলে চলবে কেন?’

‘এদিকে সব যে যায়।’

‘কেন, আনন্দ নেই?’

‘আছে, কিন্তু সে আনন্দ, যিনি নিত্যানন্দ, তোমারই সাজে। আমাদের ও সব কাজ নেই। আমাদের পদসেবা। পর-জ্ঞানে পরা-সেবা।’

হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ। বললে, ‘তাই তো বলেছিলাম আগে।’

‘তখন কি অতশত বুঝেছি? তখন কি জানতাম যে ভাবের গোঁয়ে চকিবশ ঘণ্টাই ফিরতে হবে? ইচ্ছে করলেও তার কিছুতেই মন দিতে পারব না?’

তখন আর রামকৃষ্ণ কি করে। মথুর বাবুর বুকে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে। ধাতস্থ হলেন মথুর বাবু।

ওরে, কী হবে ও সব ভাব-টাবে। শুধু তাঁর নাম কর, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর তাঁর কাছে। কী চাইবি? শুধু আশ্রয়, শুধু শাস্তি, শুধু প্রসন্নতা। ওরে ধ্যান ধর, প্রেম লাগা।

সাধন-ভজন কেবল ডানা বেদনা করবার জন্তে। আকাশে উড়তে-উড়তে ডানায় ব্যথা হলেই পাখি কোথাও কোনো উঁচু জায়গায় এসে বসে। সেই উঁচু জায়গাটিই তিনি। আর তাঁরই জন্তে সাধন।

চিঁড়ে কোটো, মন রেখো টেকির মুন্সলের দিকে। তুলসীদাস পড়েছিস? তুলসী য়াসা ধ্যান ধর, য়াসা বিয়ানকা গাই। যু মে ত্ব চানা টুটে চেং রাখয়ে বাছাই। প্রসূতি গাভী মুখে ঘাস খেলেও যেমন তার মন পড়ে থাকে বাছুরের উপর, তেমনি সংসারকর্মে লেগে থাকলেও মন ফেলে রাখ ঈশ্বরে।

মথুর বাবুর অসুখ, ফোড়ার যন্ত্রণায় ছটকট করছেন। হৃদয়কে দিয়ে বলে পাঠালেন, বাবা যেন একবারটি আসেন।



রামকৃষ্ণ বললে, ‘আমি গিয়ে কি করব। আমি কি তার ফোড়া ভালো করতে পারব?’ —

গেল না রামকৃষ্ণ। মথুর বাবু আবার লোক পাঠালেন। বাতাসে পাঠালেন তার যন্ত্রণার কাতরতা।

অগত্যা যেতে হল রামকৃষ্ণকে।

অনেক কষ্টে তাকিয়ায় চেস দিয়ে উঠে বসলেন মথুর বাবু। বললেন, ‘বাবা এসেছ? আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।’

‘তুমি কি ভেবেছ আমার পায়ের ধুলোয় তোমার ফোড়া ভালো হবে?’

সারা অন্তরে হি-হি করে উঠলেন মথুর বাবু। বললেন, বাবা আমি কি এমনি? আমি কি আমার ফোড়ার জন্য তোমার পায়ের ধুলো চাই? দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে এল। ‘আমার ফোড়ার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি তোমার শ্রীচরণের ধুলো চাই এই ভবসাগর পার হবার জন্যে।’

শুনতে শুনতেই ভাবাবেশ হল রামকৃষ্ণের। স্বচ্ছ ভক্তির স্পর্শে উথলে উঠল ভাবতরঙ্গ।

সেই সুযোগে মথুর বাবু রামকৃষ্ণের যুগ্মপদে মাথা ঠেকালেন। দেহের চিকিৎসার জন্যে আয়ুর্বেদী আছে, তুমি ভবরোগীবৎ।

তুমি অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্রাট-বিরাট স্রাট হয়ে আবার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অধিপতি। তুমি স্নেহে মাতা, পালনে পিতা, জীবনের খেলার সাথী।

একেক সময় একটা গৌ আসে মথুর বাবুর।

যেমন সেইবার এসেছিল। বিজয়াদশমীর দিন বলে বসলেন, প্রতিমা বিসর্জন দেব না নিত্যপূজা করব।

কার কথাই কান পাতেন না। জীবর কথা পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন। বিপদ বুঝে রামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠালেন জগদম্বা। স্বামীর নিশ্চয় মাথা বিগড়েছে। নইলে এমনতরো চেহারা হয় আকস্মিক?

মুখ চোখ লাল, কেমন একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিক-ওদিক। না, কিছুতেই ফেলে দিতে পারব না মাকে। মাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

রামকৃষ্ণের অনুরোধ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করে

‘মাকে ছেড়ে বাঁচতে পারব না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে ততক্ষণ কেউ নিয়ে যেতে পারবে না মাকে।’

রামকৃষ্ণ তখন তাঁর বুকে হাত বুলুতে লাগলেন। বললেন, ‘মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে এ কথা কে বললে? আর বিসর্জন দিলেই বা মা যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি থাকতে পারেন কখনো? তিন দিন বাইরের দালানে বসে পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে একেবারে ভিতরের দালানে বসে পূজা নেবেন। হ্যাঁ, ভিতরের দালান। তোমার অন্দর মহল। আরো নিকট হবেন তিনি। বসবেন এসে তোমার অন্তরের অন্দরে।’

বাস, হাতের ঝোঁয়ায় নরম হয়ে গেলেন মথুর বাবু। সত্যদৃষ্টির সৌম্য শাস্তি নেবে এল হু চোখে।

‘কথা কইতে-কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস?’ ভক্তদের বললেন এক দিন ঠাকুর। ‘যে শক্তিতে ওদের ওই গৌ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক-ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।’

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষ দিকে মথুর বাবু জরে পড়লেন। দেখতে-দেখতেই বিকারে দাঁড়িয়ে গেল জ্বর।

রামকৃষ্ণ গিয়েছে দেখা করতে।

মথুর বাবু বললেন, ‘আচ্ছা বাবা, সেই যে তুমি বলেছিলে তোমার অনেক ভক্ত আসবে, কই, তারা তো আজো এল না?’

‘কি জানি বাপু, কত দিনে আসবে সব। মা যত কিছু দেখিয়েছেন সব ফলেছে, শুধু এইটেই বৃথা ফলল না।’ রামকৃষ্ণের মুখে পড়ল ঈষৎ বিবাদ-ছায়া।

জানো না সেই ভূতের সঙ্গী খোঁজা। ভূত একা-একা ঘোরে, সঙ্গী-সাথী জুটেছে না একটাও। শনি-মঙ্গলবারে কেউ যদি অপঘাতে মরে, তাকে ধরে আনবার জন্যে দৌড়ে যায়। ভাবে যেহেতু শনি-মঙ্গলবারে মরেছে ভূত হবে নির্ধাৎ। সঙ্গী পাওয়া যাবে এত দিনে। কিন্তু যেই সামনে ছুটে যায় দেখে, হয় লোকটা শেষ পর্যন্ত মরেনি, নহতো বার শুনতে ভুল হয়েছে। ভূতের আর সঙ্গী মেলে না।

আমারো হয়েছে সেই দশা। আমার কথা নাও কে? আমি তাই সঙ্গী খুঁজছি—খুঁজছি

আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। কিন্তু, না, কত দিন হতেই সে আরেক রকম হয়ে যায়। তরোয়াল দিয়ে সে দাড়ি চাঁছে।

‘মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা। দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।’

কথায় কেমন যেন একটা করুণ বেদনা। মথুর বাবু বললেন, ‘তারা আশুক আর না আশুক, আমি আছি। আমি একাই একশো ভক্তের সমান। তাই মা হয় তো আমাকে দেখিয়েই তোমাকে বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে—’

‘কে জানে বাপু, মা-ই জানেন।’

কিন্তু রামকৃষ্ণ বুঝতে পারল মা-ই এবার নিজে এসেছেন মথুরকে নিয়ে যেতে। যা, মার কাছেই যা। দেখ গে সেই দেবীলোক।

নিজে আর এল না রামকৃষ্ণ। খোঁজ নিতে রোজ পঠায় হৃদয়কে।

কালীতে রামকৃষ্ণের অনুরোধে মথুর বাবু কল্লতরু সেজেছিলেন। যে যা চাইল তাই দান করলেন অকাতরে। রামকৃষ্ণকে বললেন, ‘তুমি কিছু চাও?’

চন্দ্রমণি এক আনার দোক্তা চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ বললে, ‘আমাকে একটি কমণ্ডলু দাও।’

সেই কমণ্ডলু করে আমাকে একটু এখন গঙ্গাজল দেবে না? রূপণ মথুরকে মুক্তহস্ত করে দিয়ে, হে রূপানিধি, তুমি আজ নিজে রূপণ হয়ে গেলে?

কোনো দরকার নেই। স্বয়ং গঙ্গা আসছেন তোকে নিয়ে যেতে: আসছেন সেই বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। তৃপ্তিকরী ভবতারিণী। তাঁর এগিয়ে আসার শব্দ শুনে পাচ্ছিস না?

পয়লা শ্রাবণ, আজ মথুর বাবুর শেষ দিন। আজো রামকৃষ্ণ গেল না জানবাজারে। তাঁর ভক্তিব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে, মা তোকে কোলে তুলে নিতে নিজে এসেছেন।

কালীঘাটে নিয়ে গেল মথুর বাবুকে। ঘনিয়ে এসেছে জীবনের অন্তিমা।

রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ। তার সূক্ষ্ম দেহ জ্যোতির পথ ধরে চলে এল মথুরের শয্যাপার্শ্বে। চোখের পাতা শেষ বারের মত বোজবার আগে মথুর বাবু দেখলেন রামকৃষ্ণকে।

বিকেল পাঁচটার সময় ধ্যান ভাঙল। হৃদয়কে

ডেকে বললে, ‘ওরে, মথুর রথে উঠল। খুব বেগে উড়ে গেল সেই রথ। চলে গেল দেবীলোকে।’

অনেক রাতে খবর এল দক্ষিণেশ্বরে, বিকেল পাঁচটার সময় মথুর বাবু লোকান্তরিত হয়েছেন।

‘আমাকে দেখে সে কী বলত জানিস?’ ঠাকুর এক দিন বললেন ভক্তদের। ‘বলত, বাবা, তোমার ভেতরে আর কিছু নেই— শুধু সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা একটা খোল, বাইরে কুমড়োর আকার, কিন্তু ভেতরের শাঁস-বিচি কিছু নেই। তোমায় দেখলাম, যেন কেউ ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছে।’

তবু তুমি মনে করো না। সেজ বাবু, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। মানুষ কী করবে। ঈশ্বরই তাকে মানাবেন। ঈশ্বরীয় শক্তির কাছে মানুষ খড়-কুটো।

কী জলন্ত বিশ্বাসই ছিল। কী উজ্জী ভক্তি! কর্ম করতে গেলে আগে একটি বিশ্বাস চাই। একটি আনন্দময় বিশ্বাস। মাটির নীচে মোহরের কড়া আছে এই আনন্দময় বিশ্বাস থাকলেই তো মাটি খুঁড়ব। খুঁড়তে-খুঁড়তে যদি ঠং করে একটা শব্দ হয়, বুকের ভেতরটাও আনন্দে টং করে ওঠে। তার পর যদি ঘড়ার কাণা দেখা যায়, তা হলে তীব্রতর আনন্দ। খোঁড়ার বেগ তখন আরো বাড়ে। সাধু গাঁজা সাজছে, তার সাজতে-সাজতে আনন্দ। টানবার আগে থেকেই আনন্দ।

হনুমানের রাম নামে বিশ্বাস। বিশ্বাসের গুণে সে সাগর লঙ্ঘন করলে। আর স্বয়ং রামচন্দ্র, তাঁকে সাগর বাঁধতে হল।

‘আচ্ছা, মশাই, মৃত্যুর পর মথুরের কী হল?’ এক দিন কে এক জন জিগগেস করল ঠাকুরকে।

‘তার নিশ্চয়ই আর জন্মাতে হবে না।’

‘কে বললে? সে নিশ্চয়ই কোথাও একটা রাজা-টাজা হয়ে জন্মেছে। তার মধ্যে যে ভোগবাসনা ছিল।’

যোগভ্রষ্ট হলে ভোগ্যবানের ঘরে জন্ম হয়—তার পরে আবার ঈশ্বরের জন্তে সাধনা করে। পূর্বজন্মে ঈশ্বর চিন্তা করতে-করতে হঠাৎ হয় তো ভোগ করবার লালসা হয়েছে। তাকেই বলে যোগভ্রষ্ট। কামনা থাকতে, লালসা থাকতে মুক্তি নেই।

‘ওরে বাস্‌নায় আগুন দে।’ এই কথা শুনেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন লাল বাবু। সাত লাখ টাকার আয়ের সম্পত্তি ছেড়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে।

ধর্মের সুস্ব গতি। ছুঁতে সূতো পরাচ্ছ, সূতোর মধ্যে একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর আর ঢোকে না। কামনা থাকলে আর ভগবান নেই। --

কী চাইবি ভগবানের কাছে? ভক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-বৈরাগ্য—ও সব কিছু নয়। শ্রীমা বললেন, 'চাইবি শুধু নির্বাসনা।'

হে হামিল

‘তোমরা সব কোথায় চলেছ?’

‘কলকাতায় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি।’

‘কলকাতায়?’

‘হ্যাঁ, কালী পূর্ণিমায় প্রকাণ্ড যোগ সেখানে। ঐ দিন জন্মেছেন গোরাক্ষদেব।’

‘আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে?’

‘ও মা, স্নানে যাবি তুই?’ আত্মীয়া বয়স্ক মহিলারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

‘না, একবারটি দক্ষিণেশ্বরে যাব। তাঁকে দেখতে বড় মন কেমন করছে।’

‘তোর বাবাকে গিয়ে বল। তোর বাবা না বললে যাবি কি করে?’

লজ্জায় মরে গেল সারদা। একটু বা ভয়-ভয় করতে লাগল। যদি বাবার কানে ওঠে! হি হি, বাবার কানে গেলে তিনি কি ভাববেন।

সেই কত দিন আগে দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। চার বছর আগে। গেল পৌষে সারদার আঠারো বছর পূর্ণ হয়েছে। ভরস্তু বয়সের চটুল চাপলা নেই, স্বভাবটি প্রশান্ত গম্ভীর। হৃদয়ের মধ্যে সব সময়ে আনন্দের একটি পূর্ণঘট বসানো। উল্লাসটি উছলিত নয়, উল্লাসটি নিয়তনিশ্চল।

সত্যি-সত্যি বাবার কানে উঠল কথাটা। সারদা দক্ষিণেশ্বরে যেতে চায়। মিলতে চায় তার স্বামীর সঙ্গে। তার পুরুষের সঙ্গে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। মনে-মনে বললে, তোমার কাছে যেতে চাই, তুমিই আমাকে রক্ষা করো।

রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন সারদাকে। বললেন, ‘বেশ তো। যাবে। আমিই তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। গোছগাছ করে নাও চট করে।’

হৃদয়স্থ আনন্দঘটের দিকে সারদা তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কৃতজ্ঞকরণ চোখে প্রতীক্ষার প্রশান্তি।

কোথায় জয়রামবাটি আর কোথায় কলকাতা! পায়ে-হাঁটা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সাত রাজ্যে ইঞ্জিনের বাঁশি শোনেনি কেউ। এদিকে বিষ্ণুপুর, ওদিকে তারকেশ্বর—সব বাঁঝা করছে। ঘাটালের যে নদী সেখানেও ইষ্টিমার আসেনি। সর্বদিকে একটা স্থান আর সময়ের বিস্তীর্ণ হাহাকার। কোথা দিয়ে কোথায় যাব, কত দিনে কোন দিকে গিয়ে পৌঁছুব—সমস্ত একটা ধূসর অস্পষ্টতা। কিছুই ধরা-হোঁয়ার নেই, সব যেন ঐ দিগন্তের কাছাকাছি।

তবু চলো। চলা ছাড়া অমুপায়ের আর উপায় কি। শুধু এগিয়ে চলো। যেমন পদে-পদে বিপদ, তেমনি পারে-পায়ে উপায়।

সারদা শুধু স্বামীদর্শনে যাচ্ছে না, সে যাচ্ছে তীর্থদর্শনে। হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে।

কোনো দিন পথে বেরোয়নি সারদা। হাঁটেনি কোনোদিন দূরের পাড়িতে। তবু ভয় পাবে না সে। থাকবে না পেছিয়ে পড়ে। যিনি তীর্থপতি তিনিই তীর্থ পথিককে টেনে নেবেন।

কোথাও-কোথাও রাস্তার খেঁই হারিয়ে গেছে। ধান কাটা হয়ে গিয়েছে মাঠে, কোথাও বা সেই শুকনো মাঠ ভাঙো। ঢেঁলা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে চলো। গাভের ছায়া পাও তো, জিরিয়ে নাও একটু। তালপুকুর মিলেছে কোথাও, জল খেয়ে নাও পেট ভরে। সূর্যদেব গো, তোমার রশ্মিজাল একটু স্তিমিত করো।

কমলকোমল পা ফেলে-ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সারদা। মুখখানি রোদে আমলে গেছে, আর যেন পারছে না চলতে। পা ভেঙে পড়ছে পথজমে। শরীর ঝিমিয়ে পড়ছে।

‘চলতে কষ্ট হচ্ছে রে সারু?’ জিগগেস করেন রামচন্দ্র।

‘না, বাবা।’ মুখে হাসি আনে সারদা, পা দুটোকে টানে জোর করে।

‘তবে অমন পিছিয়ে পড়ছিস কেন?’

‘এই একটু দেখতে দেখতে চলেছি সব—’

মেয়ের মুখের দিকে তাকান রামচন্দ্র। স্বামরে গেছে মুখ-চোখ। যেন টলে-টলে পড়ছে। হৃ-তিন দিনেই এই, এখনো আছে আরো কত দিনের দীর্ঘ শ্রম। উপায় কি, এমনি করেই চটি থেকে

চিঠিতে বিশ্রাম নিতে-নিতে এগুতে হবে। বিশ্রামটা না-হয় আরো একটু বড় করা যায়, কিন্তু পথ তো আর ছোট করা যাবে না।

হু-হু করে জ্বর এসে গেল সারদার। মেয়ে পথের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। চোখে আঁধার দেখলেন রামচন্দ্র। মেয়েকে নিয়ে এখন করি কি।

আর সব সহযাত্রীরা থামতে চাইল না। তোমার মেয়ের জন্তে আমাদের গঙ্গান্নান মারা যাক আর কি! আমরা চললুম এগিয়ে। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সামনের চটিতে গিয়ে ওঠো।

তা ছাড়া আর পথ নেই। রুগী মেয়ে হাঁটবে কি করে? পালকি কই এ অঞ্চলে? অগত্যা রামচন্দ্র সারদাকে নিয়ে সামনের এক চটিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

ছুঃখের আর অবধি নেই সারদার। নিজে তো অসুখে পাড়লুমই, বাবাকেও বিপদে ফেললুম। তোমাকে দেখবার দিনটিও পিছিয়ে গেল।

গ্রাম্য বধূ, লজ্জা-সরমের কত ছিরি-ছাঁদ। এখন জ্বরে বেহুঁস হয়ে বিদেশের চটিতে সব ঢলাঞ্জলি গিয়েছে। লজ্জানিবারণ হরি, তাঁর মেহদুটির ছায়ায়ই তার আচ্ছাদন।

সারদা দেখল, কে একটি মেয়ে তার পাশে এসে বসল।

গায়ের রঙটি কালো, কিন্তু কালো অমন অপরূপ নয়, কালোর যে অমন আলো থাকে, স্বপ্নেও কোনো দিন দেখেনি সারদা! মেয়েটি পাশে বসে ঠাণ্ডা মেহে সারদার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নরম হাতের ছোঁয়ায় মুছে দিতে লাগল তপ্ত গায়ের দাহ। ছুটি টানা-টানা বিশাল চোখের নমতাটিও কত ঠাণ্ডা!

সারদা জিগগেস করলে, 'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?'

'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।'

বলো কি? দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমিও ভেবেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব। সেই আশা করেই বেরিয়েছিলুম বাড়ি থেকে। তায় রাস্তায় এই জ্বর। আচ্ছা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখেছ? ঠাকুরকে?

'দেখেছি বই কি।'

'বড় সাধ ছিল, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব।

আমার ভাগ্যে সে আশা আর মিটল না। জ্বর এসে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে দিলে।'

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না, না, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি। তুমি ভালো হবে, সেখানে গিয়ে দেখবে তাঁকে। তোমার জন্তেই তো তাঁকে আটকে রেখেছি সেখানে।'

'বটে? ভালো হয়ে সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখব?' সারদা তাকাল একবার সেই মমতাময়ীর পানে। 'তুমি আমাদের কে হও গা?'

'আমি তোমার বোন হই।'

'সত্যি? তাই বুঝি তুমি এসেছ আমার অসুখ শুনে? বাঃ, বেশ।' বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়ল সারদা।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখল বোন কোথায় চলে গেছে। বোনের সঙ্গে-সঙ্গে জ্বরও অন্তহিত।

আবার শুরু হল পথ হাঁটা। কত দূর এসে, কি আশ্চর্য, একটা পালকি মিলে গেল। বোনটিই হয় তো পাশের কোনো গাঁ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে পালকি।

আবার জ্বর এল হুপূরের দিকে।

'কেমন আছিস রে সারু?'

'বেশ, ভালো আছি বাবা।' পালকি পেয়েছে, আবার রোগ-বালাই কী সারদার! চলেছি তো এখন সর্বরোগপাবনের কাছে।

পথের শেষ হল এক সময়। রাত নটার সময় দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নৌকো লাগল।

রামকৃষ্ণের কাছে খবর পৌঁছুল। রামকৃষ্ণ ডেকে পাঠাল হৃদয়কে। বললে, ও হুহু বারবেলা নেই তো? প্রথম বার আসছে।'

এ কথা হয়ে গেছে আগেই। সারদা গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেছে।

আর সকলে এদিক-সেদিক গেল—নহবতের ঘরে চন্দ্রমণি আছেন, সেখানে কেউ-কেউ। সারদা সটান চলে এল রামকৃষ্ণের ঘরে। মুখে সেই সজ্জ ঘোমটা।

'তুমি এসেছ?' উৎফুল্ল হয়ে উঠল রামকৃষ্ণ। বেশ করেছে।' বলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'হরে, ওকে একখানা মাছুর পেতে দে। কত দূর থেকে আসছে। তার পরে আবার অসুখ করে এসেছে।' বলেই নিজের মনে খেদ করতে লাগল : 'এখন কি

আর আমার সেজ বাবু আছে যে, তোমাকে যত্ন করবে ? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তোমাকে আমি এখন কোথায় রাখি ? আমার সেজ বাবু হলে তোমাকে অট্টালিকায় রাখতেন। এলে তো এত দেরি করে এলে। আমার সেজ বাবুকে দেখতে পেলো না।’

মাছুর বিছিয়ে দিল হৃদয়। জড়সড় হয়ে বসল তাতে সারদা।

চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন করল। কত কি শুনেছিল দেশে থাকতে। পাগল হয়ে গিয়েছেন, পরনে কাপড় নেই, মুখে শুধু অসহ্য প্রলাপ। তাঁর সম্বন্ধে এই বিবরণটাই পাগলের বিবরণ। একেবারে পরমানন্দ মহাপুরুষের মত বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, সারদাকে তিন ভোলেননি, ঠিক মনে করে রেখেছেন। শুধু মনে করে রাখেননি নয়, তার প্রতি করুণায় অজস্র হয়ে আছেন।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে ইচ্ছে করে না সারদার। তবু বললে, ‘আমি মার কাছে নবতের ঘরেই যাই।’

‘না, না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধে হবে।’ রামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে উঠল। ‘তুমি এ ঘরেই থাকো। আমি নইলে ওষুধ-পথ্য দেবে কে ?’

চন্দ্রমণি আগে কুঠিঘরের একটি কেঠায় থাকতেন, অক্ষয়ও থাকত তাঁর সঙ্গে। সেই ঘরেই অক্ষয় মারা যায়। অক্ষয় মারা গেলে চন্দ্রমণি ছেড়ে দিলেন সেই কুঠিঘর। বললেন, ‘আর আমি ওখানে থাকব না। আমি নিচে এই নবতের ঘরেই থাকব। গঙ্গা পানে মুখ করে রইব। কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।’

তখন রাতের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। দু-তিন ধামা মুড়ি নিয়ে এল হৃদয়। যেমন অসময়ে এসেছে তেমনি মুড়ি চিবাও বসে-বসে।

রাত্রে সেই ঘরেই শুলো সারদা। শুলো ভিন্ন শয্যায়, সঙ্গে আরেকটি মেয়ে নিয়ে। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ভাবল সারদা, এ কি ঘুম, না, জাগরণ।

পর দিনেই ডাক্তার আনালো রামকৃষ্ণ। তিন-চার দিন সারদাকে রাখল তার খবরদারিতে। নিজের হাতে খাওয়াতে লাগল পথ্য। ঘড়ি ধরে ওষুধ। নিজের সেবা-যত্নে ভালো করে তুলল। বললে, ‘এবার তুমি যেতে পারো মার কাছে।’

নবতের চলে এল সারদা। লাগল শান্তি

সেবায়। যতটুকু উনি নেন ততটুকু রামকৃষ্ণের সেবায়।

সেবার মত আনন্দ আর কী আছে ! সেবা ছাড়া আর কী আছে জীবনের কবিতা।

রামচন্দ্র দেখে বড় শান্তি পেলেন। ফিরে গেলেন স্বস্থানে।

কিন্তু সারদাকে নবতে পাঠিয়েই রামকৃষ্ণের মনে হল, কেন, কেন ওকে দূরে সরিয়ে রাখব। ওকে কি আমার ভয়, না, ঘৃণা ? ও কি আমার তাক্ষিলের, না, অনুকম্পার ? প্রতিমায় ঈশ্বর পূজা হয় আর জীৱন্ত মানুষে হবে না ? আমি কি যুটো কলসী যে জল রাখলে জল সব বেরিয়ে যাবে ? আমি কি বালির বাঁধ যে আবারে বন্যাকে রোধ করতে পারব না ?

মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী বলেছিল, ‘তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি ? জীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। জীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।’

এবার তো সেই পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। জোর করে নিজের বীরত্ব জাহির করবার জগ্রে তো তিনি করছেন না, তাঁর কাছে সুযোগ এসেছে বলেই তিনি পরীক্ষা করছেন। সমস্তই মহামায়ার ইজিত।

রামকৃষ্ণ বলে পাঠালো, ‘সারদা আমার ঘরে এসে শোবে।’

সারদার ভয় করতে লাগল। এ আবার কী হল রামকৃষ্ণের। কিন্তু ‘না’ বলবার উপায় নেই। শান্তি বললেন, ‘যাও যখন ও বলছে।’

ঘরের মধ্যে একান্তে ডেকে এনে রামকৃষ্ণ জিগগেস করলে সারদাকে, ‘তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ ?’

ঘোমটা-ঢাকা মুখে হেঁট হয়ে দাঁড়াল সারদা। বললে, ‘না। তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব ? তোমাকে ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।’

তবে বোস পাশটিতে, শোনো।

খই ভাজবার সময় যে খৈটি খোলার উপর থেকে ঠিকরে বাইরে পড়ে তাতে কোনো দাগ লাগে না, কিন্তু গরম বালির খোলায় থাকলে কোনো না কোনো জায়গায় কালো দাগ লাগবেই। যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা মাই হোক আর

জ্বীই হোক, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের মতন কিছু নেই।

রাবণ সীতার জন্তে মায়ার নানা রূপ ধারণ করছে, তবু সীতা টলে না। এক জন বললে, “একবার রামরূপ ধরে যাও না কেন?”

রাবণ বললে, ‘রামরূপ একবার হৃদয়ে ধরলে ব্রহ্মপদই তুচ্ছ হয়, পরজী তো কোন ছার। তা রামরূপ কি ধরবো।’

‘কিন্তু আমি তোমার কে?’ গভীর-সরল অন্তরে জিজ্ঞেস করলে সারদা।

‘তুমি আমার বিছা। তুমি সারদা, সরস্বতী। তুমি রূপ নিয়ে আসোনি, বিছা নিয়ে এসেছ। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকলাপ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছ। এসেছ বিছার আলো জ্বালিয়ে। তুমি জ্ঞানদাত্রী।’

অতঃপর কি বোঝে সারদা? বুঝে কাজ নেই কাণাকড়ি। তার চেয়ে সেবা করি। জ্ঞান বুঝি না, বুঝি ভক্তি, বুঝি সেবা। রামকৃষ্ণের পা টিপতে বসল সারদা।

পা টেপবার পর সারদাকে রামকৃষ্ণ প্রণাম করল।

ও কি। ছি। সর্বাপ্রাণে কুণ্ঠিত হল সারদা। বললে, ‘আমি তোমার দাসী।’

‘তুমি আমার আনন্দময়ী। যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন। তিনিই সম্প্রতি আছেন নবতে আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। তুমি কি শুধু এই ঘরের মধ্যে আছ? তুমি আছ আমার বিশ্বব্যাপিনী হয়ে।’

[ ক্রমশঃ।

### কান দিয়ে শুনুন

কান না থাকলে কোন শব্দই শোনা যায় না। আবার শুধু কান থাকলে চলবে না; কর্ণগটাহ আর শ্রবণ-শক্তি না থাকলে কান থেকে কোন লাভ নেই। কানের অভাবে মধুর মিষ্টি কথাও যেমন শুনতে পাওয়া যাবে না, তেমনি বক্তৃপাতের শব্দ পর্যন্ত কানে পৌঁছবে না। কান সত্বে কয়েকটা জ্ঞাতব্য ভেদে রাখার প্রয়োজন আছে। বীদের কান আছে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

শব্দ-তরঙ্গের বৈজ্ঞানিক পরিমাণ হয়েছে। যে কোন একটা ক্যান্টারীর শব্দ-মান যদি হয় ১০০ থেকে ১১০, যে কোন জনবহুল রাস্তার শব্দ-মান হবে ৬০; নায়েরা জলপ্রপাতের ১৫; রেডিওর পূর্ণমাত্রার ঘরের ভেতর নায়েরার শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়।

কানের ভিতর দিরা মরমে পশে কথাটি একেবারে মিথ্যা। মরমে পশে না, মাংসের ভেতর পশে। মিষ্টি শব্দে যেমন পুলকিত হওয়া যায় তেমনি বিক্ষোভের শব্দে সাময়িক বধিরত্ব-প্রাপ্তিও সম্ভব নয়। জ্ঞাতব্যগুলি শুনুন এবার :

১। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কি শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পায়? সত্যি কথা। বৈদ্যর ভাগ মানুষেরই তাই হয়। ত্রিশ বছরের পর থেকেই উচ্চ স্থানের শব্দ কম শোনা যায়। নীচ স্থানের শব্দ অধিক বয়স পর্যন্ত শোনা যায়।

২। আপনার কানে যদি প্রবেশ করে কিছু একটা, তখন কি করবেন আপনি? খোঁচালেই বেরিয়ে আসবে? মিথ্যা কথা।

আঙুলের সাহায্যে যদি না বের করতে পারেন, ডাক্তারের কাছে যাবেন। কোন রকম ধারালো বা ছুঁচালো কিছু কানে প্রবেশ না যেন। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

৩। বেসদ সচরাচর কানে শুনতে পাওয়া যায় না, তাও কি কানে পৌঁছতে পারে?

সত্যি কথা। ঋতুপঞ্জের বাউবের কোন-কিছুর শব্দ পর্যন্ত অবশ্যই কানে পৌঁছয়। উঁচু এবং নীচ স্থানের অশ্রুত শব্দও কানকে পীড়া দেয়।

৪। পর্জা-ফেটে-বাওয়া কানও কি আপনা-আপনি সেরে যায়? সত্যি কথা। অনেক হয়তো এ কথাটি বিশ্বাস করেন না। শ্রবণ-শক্তি অনেক সময়ে অতি দ্রুত ফিরে আসে। কানের কোন কোন ক্ষতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তাররা কখনও কখনও বোজার রোগীর কানের পর্জা কাটিয়ে দেন।

৫। কানে জল ঢোকা কি বিপদজনক? সব সময়ে নয়। কিন্তু সাঁতারের সময়ে সাবধান না হ’লে বিপদের সম্ভাবনা আছে। কাহণ, সব জায়গার জল পরিষ্কৃত হয় না। যদিই আপনার কানে জল ঢোকে, তা হ’লে কাপড় পুরে সে-জল বের করতে সচেষ্ট হবেন না যেন। আপনার মাথাটা তখন এলিয়ে রাখবেন, জল আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে।

৬। কানে আঙুল দিলে কি আর শোনা যায় না? সত্যি কথা। কানের গর্ভে ঢাকা দিলেই আর শোনা যায় না। কানে তুলো দেওয়া কথাটি যার থেকে সৃষ্টি।

# জোবান-পাণ্ডা

৮, আ, ৫

আশা করেনি গহরজান।

দেখেই তার বাজিল বৃক্ক সুখের মতো বাধা। তবে ঈঙ্গিতকে দেখলে বৃক্কের মাঝে যে সুখানুভূতি হয়, ঠিক সেই সুখের আলোড়ন নয়। মুক্কেশে, যানবেশে বসেছিল গহরজান। কোলের কাছে বসেছিল ডালিম, নিজামত। স্বপ্নাভীতকে চোখের সমুখে দেখতে পেয়েই এক লাফে উঠে পড়লো। ধূসী-ভরা সহাস্ত সন্তানগণ জানিয়েই বিদ্যাহুগিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গেল পাশের ঘরে, একেবারে আয়নার সামনে। রূপোপজীবিনী, ফান্সি রূপে দেখা দিতে চায় না। তাই নকল রূপের সম্ভ্রাস্ত্রায় নিয়ে সাত-তাড়াভাড়া সাজতে থাকে। চোখে আর মুখে রঙের পরশ দেয়। কাল্ল আর খড়ির গুড়ো। হোটে অলতা। কাঁচা ঘূমে ব্যাঘাত হওয়ায় ডালিম বিকৃত হয়ে পায়ের কাছে এসে মিউ-মিউ করে। আয়নার গহরজান দেখে পেছনের দরজায় মাসী এসে ঝাঁড়িয়েছে। পান-রাঙা দাঁত দেখিয়ে হাসছে মিটি-মিটি। আনন্দের আতিশয্যে। আর পারে না মাসী, ঠিকে গদেব জোগাড় করতে। দালালের পায়ে তেল মাখাতে। গহরের একটা পাকাপাকি হিলে হয়ে গেলে মাসীও নিশ্চিত্তায় বাকী দিনগুলো কাটাতে পারে একটু-আনটু পুণ্য অর্জন করে। গল্পাশ্রম আর বাগা আশানুশবের মাধ্যম ফল চাপিয়ে।

—কি প'রবো মাসী? হোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে জিজ্ঞেস করে গহরজান।

মাসী চোখ দুটো মুদে থাকে খানিক। বলে,—কেন, জঙলা পর না একখানা। সেই খয়েরী রঙের বেনারসীটা পর না। বেতের বেলায় মানাবে চমৎকার। আর সেই লাল শলমার জামাটা পর। আয়দাবের স্তর গহরজানের কথায়। বলে,—তুমি তবে তোবল থেকে বের করে দাও।

মাসী পানের পিক গগাধঃকরণ করে। কড়া দোক্তার পিক। মাখাটা ঘেন কিম্ব-কিম্ব করছে। বলে,—র'স তবে, আমি বসিরকে বোতল দিয়ে আসি। ততক্ষণ বাবুকে বেতলা কলক। সাধা চোখে থাকলে—

মাসীর একটা ঈতিবৃত্ত আছে। গহরজানের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

যৌবনে মাসীরও না কি দেবদার মত রূপ ছিল। এখন না হয় বয়স হয়েছে। মাখাট চুলে পাক ধরেছে। ক'টা দাঁতও পড়েছে। নয় তো এমন শিন ছিল যখন হাসলে মাসীর গালে ঠোঁল খেতো একটা নয়, অনেকগুলো। আলসেয় ঝাঁড়ালে যে কোন লোকের চোখ কপালে উঠতো। মাসীকে পাওয়ার লোভে হাতাহাতি বেধে যেতো রসিক-সমাজে। ক'বার তো প্রায়

চলেছিল। আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল সে সব ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত মাসীকে নিয়ে বাতাহাতি হাওয়া কেটেছিল যে, তার স্বেচ্ছা সারাটা জীবন কাটিয়েছে মাসী। এক জন পাঞ্জাবী মুসলমান। অনেক টাকার মালিক ছিল সে। হীরে আর মানিকে মুঁড়ে দিহেছিল মাসীর সর্বাঙ্গ। মাটিতে পা ফেলতে দিতো না, চক্কফেননিভ পাঞ্জাব বসিয়ে রাখতো সর্বাঙ্গ। মেওয়ার রেকাবী ধ'রে রাখতো মুণ্ডে কাছে। মসলিনের শালোয়ার-পাঞ্জাবী পরিয়ে রাখতো দিবা রাত্রি।

পাঞ্জাবী মুসলমানটি ছিল বিপত্নীক। নাম শের আহমেদ খান। একটি মাত্র কস্তাসন্তান উপহার দিয়েই বিবি তার প্রস্তাবনা যোগে ভূগ-ভূগ অবশেষে মৃত্যুপথযাত্রী হয়। বিত্তবান স্বামী অসময়ে বিবিকে হারিয়ে কিছু দিনের জন্য বৈরাগ্যব্রত পালন করে বিবির শোকে বিহ্বল হয়ে শিল্পকলাটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে বেড়াই দেশ দেশান্তরে। দু'ব বেলুচ আর আফগানিস্তান থেকে পায় আর তুর্কীস্থানে চলে যায় বৃত্তে-বৃত্তে। সেখান থেকে ফিরে এসে লাহোরে আর অন্ততসরে কাটায় কয়েক বছর। শেষ পর্যন্ত ককিরা জীবন যাপন করতে দেখে এক গুজরাতি বন্ধুর আশ্রয়ে চলে আসে বরুণা আর অসির সম্মত-স্থল কানীতে। কানীর চকবাজার তখন হাসি আর হল্লায় মাতোয়ারা! গুজরাতি বন্ধু চকবাজারের তখন এক জন নামডান মহাজন—চাল আর ডাঙে ঝাড়তে বিশ-পচিশ লক্ষ টাকার কারবারী। গদিত্তে বসলে সে লোক ছিল না যে, যেতে-আসতে সেলাম জানাতো।

এই গুজরাতি যখন শূন্য হাতে ভাগ্যাধেষণে ঘর তত্তে ঘোর-ফের করছে, তখন ঐ শের আহমেদ খান বিনা সর্ভে কর্ত্ত দিয়েছিল কয়েক হাজার টাকা, কেবল মাত্র বন্ধুত্বের বিনিময়ে। জাতিগত ও স্বভাবজাত ব্যবসাদারী বৃত্তির প্রেরণায় কয়েক বছরের মধ্যে গুজরাতি ঐ কয়েক হাজার টাকা কয়েক লক্ষে পরিণত করে এবং ধাবের টাকা পরিশোধ দিতে চায় শের আহমেদ খানকে। কিন্তু বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করে সেই আবেদন! বলে,—প্রকারান্তর শোধ দিও ঐ অর্থ। টাকা আমি চাই না।

বন্ধু প্রকারান্তরে শোধ দিয়েছিল বন্ধুকে কোন মিছৌ বন্দ না এক জীবন্ত রমণী। কানীর অলিতে-গলিতে কোথাও তার বয়সের কোন বারজনার বাসা, তাদের এক জনও জন্ম নেই ছিল না এই গুজরাতির। শের আহমেদ খানকে বিপত্তি দেখে পরিচয়-বৃত্তে আবদ্ধ করে দিয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসী তখন পরিপূর্ণ যৌবন। কানী শহরে রূপানী সৌরামিনী নাম তখন কোটি আর লক্ষপতিদের মুখে-মুখে। এখন না হয় মাসী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপ আর যৌবন হারিয়েছে, কিন্তু তখন? সৌরামিনীর সঙ্গে যখন, বাহাছানি পর্যন্ত হয়ে গেছে আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল সৌরামিনীর নাম। শেষে ঐ পাঞ্জাবী মুসলমান শের আহমেদ খান মাসীর রূপে আত্মহারা হয়ে মৃত পত্নী

বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতারাতি চম্পট দিয়েছিল মাসীকে নিয়ে। কানী থেকে একেবারে লাগোরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল বোরখায় আঁপারমস্তক ঢেকে।

শিশুকৃত্যটির তখনও জ্ঞান হয়নি। মাসীকেই জেনেছিল একমাত্র আপন।

শের আহমেদ খান স্বয়ং শুধু নয়; টাকা, পয়সা সব কিছু তুলে নিয়েছিল সৌদামিনীর হাতে। আর নিয়েছিল ঐ শিশুকৃত্যকে। কিন্তু সৌদামিনী সব নিয়েও দেখনি শুধু একটি জড় বস্ত্র, নিজের মন। মনটা মাসী অনেক আগে দিয়ে দিয়েছিল এক জনকে—যে মাসীকে ঘর থেকে বাইরে বের ক'রে এনেছিল তাকে। সে মাসীরই এক আত্মীয়, সম্পর্কে গ্রামতুলো দাদা। সৌদামিনীরের চালার খানকয়েক চালার ওরিকে সে থাকতো; নাম ভজ্জহরি সামন্ত। সেই ভজ্জহরি সঙ্গে বড়বস্ত্র ক'রে মাসী অবশেষে শের আহমেদ খানকে মনের সঙ্গে এক রাতে খাইয়ে দেয় মৌকো বিষ। ভজ্জহরি দারোগার হাতে ক'খানা তাজ্জার টাকার নোট গুঁজে দিয়ে লেখায়,—অত্যধিক মজাদার পরিণামে হৃদরক্ত ফাটরা মারা গিয়াছে। মৃতের সকল স্বাবর এবং অস্বাবর সম্পত্তির মালিক তাহার রক্ষিতা সৌদামিনী দাদী। সে মৃত্যুর পূর্বি-মুহূর্ত্তে মৃতের একমাত্র শিশুকৃত্যকে পালন করিবার জন্য সৌদামিনীর হস্তে ক্রান্ত করিয়া গিয়াছে। মাসী কেবল মাত্র ভজ্জহরি সামন্ত, সৌদামিনীর গ্রামের সম্পর্কে ভাই।

কিন্তু সৌদামিনীও রাখতে পারেনি এত টাকার সম্পত্তি। ভজ্জহরিই সব ফুঁকে দিয়েছে দিনের পর দিন বাঁসে বাঁসে খেয়ে। তার পর এক দিন ভজ্জহরি মরে গেছে রক্তায় আক্রান্ত হয়ে। সৌদামিনী যখন ফতুর হয়ে যায় তখন ভজ্জহরি তাকে এনে তুলেছিল গরানহাটির ঐ বাড়ীতে। দিনে-দিনে মাসীর যৌবন ক্ষয়ে গেছে, কিন্তু তিলে-তিলে তিলোত্তমা হয়েছে শের আহমেদ খানের শিশুকৃত্যটি। সে কতটা এখন আর শিশু নেই, মোড়লীর রূপ ধারণ ক'রেছে।

দেই এই গহরজ্ঞান। আর এই হল মাসীর ইতিকথা। ঘটনা এবং দৃষ্টিনায় পরিণত হয়েছে এক রোমহর্ষক কাহিনীতে—যার পরিচয় জানতো শুধু ভজ্জহরি। আর কিছু-কিছু জানে বসিরুদ্দিন। ছাড়া ছাড়া শুনেছে মাসীর কাছে, মাসী যখন মনে জ্ঞান হারিয়ে বলে ফেলেছে নেশার কোঁকে কিছু-কিছু।

পাশের ঘরে একটা হাতির রোল গুঠে। হো-হো শব্দ হাংসে কাগা যেন।

হাসছে বসিরুদ্দিন। আর হাসছে মাসী, কৃষ্ণকিশোরের কথাই ধর্য শুনে। তারের হাসির শব্দে আয়নার সামনে কাঁচেলের 'পরে আঁচলের বেটন দিতে দিতে গহরজ্ঞানও হাসে। ডালিমের এবিষয় বিয়ক্তিপূর্ণ মিউ-মিউ ডাক শুনে কিছু বা দয়ার উজ্জেক হয় তার মনে। ডালিমকে পুতুলের মত এক হাতে তুলে নিয়ে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে চেপে ধ'রে চুমু খায় পর-পর অনেকগুলো প্রথম স্নেহভরে। তার পর নামিয়ে দেয় ঘরের মেঝের। বলে,—বাও, নিদ্ বাও। ফুসস নেই আবি হামারি।

পাশের ঘরে হাতির কলরোল উঠেছে মাত্র এক দিনের কাণ্ডেরেই 'কর-কাতর' মন্তব্যে। ঘরের আবহাওয়া আর মাসীর তৈলচিকণ

বিব্রী মুখাকৃতি দেখে কেমন ভয় ভয় ক'রেছে। মাসীকে দেখাচ্ছে যেন রাক্ষসী। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল ঝুলছে শনের মত। চোঁটের দু'পাশে রক্তধারার মত পানের গড়ন্ত শিক। চোঁখ দু'টো কেমন ঘোলাটে; যেন এই মাত্র উঠেছে ঘুর থেকে। ঘন ঘন হাই তুলছে মাসী। পরনে একখানা ময়লা শাড়ী শুধু, আর কিছু নয়। দেওয়ালের বাতিনানের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ঘরখানার মধ্যে। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল,—বসির, চল, এখান থেকে চ'লে চল। আমার ভয় করছে এখানে থাকতে। কি বিব্রী একটা গন্ধ আসছে!

এই কথাগুলিই বত হাতির উৎস। ভয় পেয়েছে শুনে বসির আর মাসী হেসে উঠেছে একসঙ্গে। নাচতে নেমে লজ্জা পাওয়া! বসিরুদ্দিন হাসতে হাসতেই বলে,—আরে ভাই, ড'রো মাং। বিবিজ্ঞানকে দেখলে আর ভয় লাগবে না। মাসী, বিবিজ্ঞান কোথায় ডুব মারলো বল তো?

মাসী তখন ফ্যাসের এক পাশে ব'সেছে পানের সরঞ্জাম পেড়ে। গেলসে ঢালছে পানীয়। তারই উগ্র গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভরে গেছে। মাসী বললে,—গহর এই এসো ব'লে। গেছে শুধু পোষাক বদলাতে। তোমরা ততক্ষণ খাও না লেমনোন্ট। ভয় কিসের? পেথম পেথম ভয় এমন করে।

মুহূর্ত্তের অপেক্ষা যেন আর সময় না। বসিরুদ্দিন একটা গেলস তুলে নেয় টোঁ মেরে। বলে,—পেটের ভেতরটা যেন আইসটাই করছে। হজুর খাইয়েছে অনেক। কিমা, কাঁকড়া, চিজ্‌ডী, কত কি খাইয়েছে! একটা মোড়া না গেলে চল!

কৃষ্ণকিশোর বলে,—তুমি খাও বসির, আমি আর খাবো না লেমনোন্ড। পেলে আমার শরীর খারাপ লাগে। মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। লোক চিনতে পারি না।

আবার হেসে ফেললে বসিরুদ্দিন কথাগুলো শুনে। হাসি চাপতে চেষ্টা ক'রে মাসীও হেসে ফেললে চোঁট কামড়ে। বলে,—একেবারে ছেলেমানুষ। ও সব মনের ভুল। লেমনোন্ট খেলে কখনও কারও শরীর খারাপ হয়! গেলে বং চাক্সা হয়ে ওঠে।

দরজায় গহরজ্ঞানের আবির্ভাব।

শেষ রাতের অন্ধকার বাগিচার সহসা যেন ফুটলো এক গুলু। কি এক স্বপ্নের গন্ধ ছড়ালো বাতাসে। গহরজ্ঞানের পোষাকের শলমা আর জরি বাতিব আলোয় বালমলালো। গহরজ্ঞান কয়েক মুহূর্ত্ত নির্নিমেয় থাকিয়ে বললে,—তোমরা এখান থেকে বিদেয় হও দেখি। আমি দেখছি কার মাথা ঘোরে, গা গুলোয়। কে লোক চিনতে পারে না। তোমরা দু'জনে স'রে পড়।

—সেই ভাল, সেই ভাল। কথা বলতে বলতে গেলস হাতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। বলে,—লে মাসী, আমরা পাশের ঘরে থেয়ে দু'দণ্ড দাবা খেলি গে চল। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দাবায় বসিনি।

গানের একটা মুহূর্ত্তেই তেঁসে আসছিল কোথা থেকে। সঙ্গে হারমনিয়ম আর ডুগী-তবলায় সম্ভব বন্ধার। বসিরুদ্দিন খানিক কান পেতে বললে,—কে এমন মিঠে সুরে ইমন ধ'রেছে মাসী?

—কে আবার, তিন তলায় পটল গাইছে। মেয়েটার আর



কিছু না থাকে, মিষ্টি গলাধান আছে তো! মাসীও একটা গেলাস তুলে নেবে। কথার শেষে ঈশার গহরজ্ঞানকে কি একটা ব'লে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। বসিকদ্দিন পিছু নেয় তার। মাসী ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা ভেঙিয়ে দেয় বাইরে থেকে।

এক ঝালক হেসে গহরজ্ঞান ব'সে পড়ে ফরাসে। একটা তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ে বুক চিত্তিয়ে।

গহরজ্ঞানের রূপে ছিল সম্ভ্রান্ত রক্তের ছাপ; মুখাবয়বে ছিল না সাধারণ বারবনিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু তাদের আদব-কায়দা আর ব্যাবহারের শিক্ষা পেয়েছিল সৌদামিনীর কাছে। পাখী-পড়া ক'রে বাপে-ধাণে শিখিয়েছিল মাসী, কখন কি বলতে হয়, কখন কি করতে চয়। কখন হাসতে হয়, আর কান্দতে হয় কখন। নববিবির বিলাস? আশ্রমের সাচ্চর্য; দিবা-রাত্রির সম-দোষে রক্তে না থাকলেও বাধ্য হয়ে সব কিছু শিখেছে গহরজ্ঞান। দিনের পর দিন দেখে আর ঠেক শিখেছে—মাসী যেমন ভরহরির সঙ্গে পালিয়ে কানীশ চকবাজারে উঠে শিখেছিল এই জীবন-ব্যতিরাজ্ঞান।

গেলাসটা যেমনকার তেমনি রাখা ছিল। গহরজ্ঞান ঘরের মানুষের মুখের কাছে ধরলো তুলে গেলাসটা। বললে,—আমি বাইরে দিছি। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে।

গহরজ্ঞানের এই কাকুতিতেও মন যেন সাড়া দেয় না কুক-কিশোরের। একদৃষ্ট তাকিয়ে থাকে গহরজ্ঞানের চোখে। আশ্চর্য লাগে যেন। জানা নেই, শোনা নেই, কোথাকার কে, সে এমন কেন পরমাত্মার মত কথা বলছে এত কাছাকাছি এসে। বিষম বোধ করে গহরজ্ঞানের এই আকুল আবেগনে। তাকিয়ে থাকে অগতঃ হয়ে গহরজ্ঞানের চোখে। দয়ার সঞ্চার হয় যেন মনে। গেলাসটা হাতে নিয়ে বলে,—খেয়ে আমার কষ্ট হয় যে। কি করি, কি বলি তার ঠিক থাকে না। বাড়ী কিং কি সব কেলেকারী করেছিলাম।

—তাই না কি! হাসির তরঙ্গ তোলে গহরজ্ঞান। হাসি খামিয়ে বলে,—সেই গিনিশ নয়, অল্প রকমের আছে। কিছু হবে না। না খেলে আমার মনে কষ্ট হবে। কি কেলেকারী হয়েছিল, খেতে খেতে বল। আমি শুনবো।

কেলেকারী? ছায়া-ছায়া ভাসতে থাকে যেন চোখের সামনে। স্পষ্ট কিছুই মনে পড়ে না। মনে পড়ে শুধু, যাকে। কুমুদিনীকে। সে গৃহভাগী হয়ছে তাই কি এক দু'ব্যবহারে। বাড়ীর হাওয়া যেন বললে গেছে একটা বাত। মাহুগুণির চাল-চলনেও পরিবর্তন দেখা গেছে। সকলেই যেন কাতর হয়ে পড়েছে কি এক অব্যক্ত দুঃখে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজ্ঞানের কথা যেন এড়াতে পারে না। কুক-কিশোর মুখে তোলে গেলাস। মুখ বিকৃত ক'রে ধীরে ধীরে পান করে ঐ রঙিন তরল পদার্থ। মরিচ নয়নে চেয়ে থাকে গহরজ্ঞান। শাড়ীর জরিদার আঁচল পাকায় আনমনে!

হাটার লোকের কলকণ্ঠ আর কেরীওয়ালদের কণ্ঠের বন্ধ দরজা-জানলা ভেদ ক'রেও পৌঁছয় ঘরের ভেতর। দিবাবসানে এ

তলাটের কুলে-কুলে জেগেছে নিশাচর। অন্ধকারের স্বাদ পেয়ে উদ্ভূত হয়েছে শিকারের সন্ধানে। পান আর সোডা-জলের লোকানীর নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। তঁড়ির লোকানে যেন গাঁদা লেগে গেছে বত অমৃতলোভী। হোটেলগুলোর চুল্লিতে গম-গমে আঁচ, ডিম আর মাংসের সপিণ্ডীকরণ শ্রাব্দ হচ্ছে। যুঁই, বেল ফুল আর রক্তনের মিশ্রিত উগ্র গন্ধে ঠিক যেন মৌমাছির মত কাঁকে-কাঁকে উড়ে আসছে অগণিত লোক। কেউ কারও তেয়াজা করছে না, কারও দিকে কেউ দৃকপাত করছে না। ছড়ড় মাতালরা মনের সুরে কেউ গান গাইছে, কেউ বারান্ডার নর্দমাকে স্বর্গভ্রম শব্দ্য ক'রে নিয়েছে। আরজ কুকুগুলোর যেন মরশুম লেগে গেছে। হাঁক-ডাক খামিয়ে এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরা করছে। নর্দমায় গড়িয়ে-পড়া চুর মাতালদের নাক-মুখ আর পা চাটছে। হোটেলের চাতালের তলার গিয়ে কখনও বা খোঁজাখুঁজি করছে যদি কিছু খাওয়াব পাওয়া যায়। আর এ-পাড়ার বারা আসল মালিক, সেই সব নটী নারীরা যার যার এলাকায় অস্বাভাবিক সাজ-সজ্জার সহায় বদনে লজ্জার মাথা খেয়ে বিরাজ করছে। বেলোয়ারী ঝড় আর বেল-লঠনের হরেক রকম প্রদর্শনী দেখা যাচ্ছে বদিকে চোখ পড়ছে সেদিকেই।

জুড়ীর চালক আবহুল এতক্ষণে যেন বুঝতে পেয়েছে ছড়ুর কোথায় এলেছেন। গাড়ীর মাথার ব'লে সহসের সঙ্গে একান্ত আফ-শাসের সুরে কি সব সে বলাবলি করছে। কিন্তু সে মাইনের চাকর, যুঁষে কিছু বলতে পারছে না। নয় তো আবহুলের ইচ্ছা হচ্ছে, এখন গিয়ে ছড়ুরের কান ধ'রে তুলে নিয়ে আসে আসর থেকে।

গহরজ্ঞান যে কখন এত কাছাকাছি স'রে এসেছে যেন বুঝতে পারেনি কুক-কিশোর। হঠাৎ লক্ষ্য করে গহরজ্ঞান আর তার মধ্যে ব্যবধানের শূন্য স্থান কখন পূর্ণ হয়ে গেছে। নিঃশেষ হয়ে বাওয়া গেলাসটা ছুঁড়ে ফেল দেয় সে। কাচের পাত্র, সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায় ঘরের দেওয়ালে বা খেয়ে। সামান্য গেলাস, কতই বা মূল্য। একটা গেছে, আরেকটা আসবে। গহরজ্ঞান খিদ-খিদ শব্দে হাসে সে দৃগু দেখে। হাসে সর্সকি কাঁপিয়ে। বাতির কণ আলোক-রশ্মিতে দাঁতগুলো তার দেখায় যেন মুক্তার সারি।

বিশ্রী লাগে এই আনন্দের মেলা। হাসি আর গান, সুরা আর নারী, অধিকাংশ মানুষের সব চেয়ে কামনার স্থান আর পাত্র—কমল যেন বিড়কা আসে তবুও মন থেকে। কি মনে হয়, হঠাৎ কুক-কিশোর বলে,—আমি এখন বাবো। বসিরকে ডাকো, আমাকে গাড়ীতে পৌঁছে দেবে।

—গান শুনবে না? ব্যাহত সুরে শুধায় গহরজ্ঞান।—কি কহুর হয়েছে?

—না। গান তো শুনিছি তোমার। খুব ভাল গাও তুমি। কথা বলতে বলতে বিমুগ্ধ শ্রোতা টেনে নেয় একটা তাকিয়া। বাব বলে এমন ভাবে এলিয়ে পড়ে যেন তুলে গেছে নিজের পূর্ক উত্তি। সত্যিই তার চোখে দৃষ্টি যেন প্রতি মূহুর্তে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কথায় যেন ফুটে উঠছে জড়তা। গহরজ্ঞানের চোখ থেকে চোখ

দৃষ্টিতে দেখেছে বেওয়ারিস-গাঙ্গের সারি-সারি ছবি। একখানা ছবিতেই কি নিবন্ধ হয়ে যায় চোখের তারা! এমন কি আছে দেখবার ঐ ছবিতে?

ছবিখানা আর কিছুই নয়, বৈকুণ্ঠের সীমার স্নেহের গৃহত্যাগের রঙীন বর্ণনা। শতী দেবী বাহুতে মাথা রেখে পালকে নিদ্রামগ্ন। শিরের কাছে অঙ্গস্ত বস্ত্রিকা। সুগাবতার গৌরবদেব গমনোত্তম। আকর্ষণবিশিষ্ট আবির্ভূতগলে তাঁর নিঃকোমল দৃষ্টি। কৃষ্ণকিশোর দেখে সেই ছবিখানা।

কিছু গহরজানের তখন কল্লিত চকল বক, চক্ষু ছল-ছল। তবু উজ্জল মুখে যেন রক্তিমবর্ণ। ঘরের মাথায় বাওয়ার নামে আর কিছু বলছে না দেখে সে বসে থাকে চূপ-চাপ। নিখাসে যেন তার অভিমানের হাওয়া।

কত জানলা-দরজা ভেদ করেও থেকে থেকে বাতাসে ভেসে আসছে সারেসারি করুণ ক্রন্দন। কাছাকাছি কে কোথায় গাইছে কে জানে। এখন শুধু তিনতলায় পটল নয়, অনেকই অনেকের ঘরে হাত-লাত আর গানে চকল হয়ে উঠেছে। গহরজান স্তিমিত নয়ন মেলে ব'লে আছে যেন বপনপুরীর রাজকন্যার মত। শুধু তার চোখ দু'টোতে চাকচিক্য, অক্ষর সজল রেখা।

—গান গাইবে না? গহরজানের শাড়ীর আঁচল ধ'রে দেখতে দেখতে বললে কৃষ্ণকিশোর।—ঠেক, গান গাইলে না?

শাড়ীখানা দেখবার মতই লোভনীয়। দেখলেই মনে হয় অনেক যেন দামো। সতরাচর দেখা যায় না এমনটি, এমনি তার বাহার। পাঁচটা আরও কাজ জমিতে। শূচীশিল্পের অনবদ্য নিদর্শন। শাড়ীখানা গহরজানের নয়, সৌদামিনীর। বহু দিনের পুরাতন, তবুও জৌলস তাব হ্রাস পায়নি এত দিনেও। শের আহমেদ খান এক বছর সবেবগাতের দিনে উপহার দিয়েছিল সৌদামিনীকে। তখনই দাম নিয়েছিল না কি হাজার খানেক রোপ্যরুজা। উত্তরাধিকারপুত্রে গাতি করেছে গহরজান।

খাঁ, না, কোন কিছুই বললে না গহরজান। টেনে নিলে হারমনিয়মটা। বানিক বাজিয়ে বীরে-বীরে সুর ধরলে কি একটা গানের। বৈকুণ্ঠী কাস্তিন ধরলে একখানা। জোতার চোপ থেকে তখন মুছে গেছে কিরে বাওয়ার কল্পনা। রঙীন তরল পলারের প্রতিক্রিয়ায় বেহ আর মন বিভোর হয়ে গেছে। গহরজানের কণ্ঠে বাওয়া ভাবার আদিম সুগের বাক্যরাশ শুনে বিশ্বরে যেন গুরু হয়ে গেল। গহরজান দেহ হিজোলিত ক'রে মুহু স্বপ্নে গাইলে:

কহত কহত সখি                      বোলত বোলত রে  
হমারি পিয়া কোন্ দেশ রে।  
যখন শরানলে                      ই তু জরজর  
কুশল তনইত সন্দেহ রে।

রাজির মন্থর গতি। দীর্ঘস্থখনিশা?

সন্ধ্যার অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে রাজির ভাসল নেমেছে দিকে দিকে। চিত্রপুত্রের মনজিরে আঁজানের সমবেত স্নানিতে বিরাম প'ড়েছে অনেকগুলো আগে। আলো অলোকে পথের দু'পাশের আলোকস্তম্ভে।

দিবাঙ্ক পেচকের পাল কোটির ত্যাগি উড়েছে আকাশে। তীব্র কর্ণক স্বরে ডাকছে শহরের হেথায়-সেথায়। গরাণহাটার গণজনের অনিশ্চয়তার আঁঠুনাৎ পেঁচকের ডাক কানে আসছে না কারও।

গহরজান গেয়ে চলেছে অস্তরের দরদের সঙ্গে। গহরজানের এই বিচিত্র জীবনে এত দরদী সুরে বোধ করি আর কখনও সে গায়নি। কিন্তু গান গাইবে তো হাসতে-হাসতে। চোখের কোণে জলবিন্দু কেন। সৌদামিনীর দেওয়া শিক্ষা এতটা আয়ত্ত ক'রেছে গহরজান? কথায়-কথায় শিখেছে কানতে, যখনই প্রয়োজন হয়েছে? বৈকুণ্ঠন সত্যিকার নয়, আসল নয় যে-কালো সেই রকম কালো কান্দে গহরজান। আবার সঙ্গে সঙ্গে গানও গাইছে। বাইরের নকল আবরণ না দেখে যদি ভেতরটা দেখতে পেতো কৃষ্ণকিশোর, তা হ'লে ধোখ করি সহ্যহুত্বিতে কণামাত্র ভিজে যেতো না তার মন। গহরজানের সজল নয়ন দেখে কেমন যেন বিসম্মত লাগে। অতিমানিনীর প্রতি বৃষ্টি বা মনে-মনে দয়ার উদ্বেগ হয়। বলে,—ধুব ভাল গান গাও তুমি।

দেওয়ালের এক জায়গায় ছিল একটা সস্তা দামের লুক-বড়ি। টিকটিকির মত টিক-টিক শব্দে তার ক্ষণ-সঞ্চরণ। ঘটায়-ঘটায় বীর সুরের সময়-জ্ঞাপন শোনা যায়। সহসা বাজতেই ঘড়ির দিকে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। দেখে আটটা বাজে। পানীয়ের উগ্র প্রতি-ক্রিয়ায় চোখে যেন ঝাপসা দেখে। কুমুদিনী বাড়ীতে নেই, তবুও মনের কোথায় যেন ভেসে ওঠে মায়ের মুখ। কানে যেন ভাসে তাঁর স্নেহ কথা। চোখের সমুখে ছবির মত দেখতে পায় যেন, অন্দরে ভাঁড়ারের দরজার কাছে নিজের স্থানটিতে ব'লে রয়েছে কুমু। একেক বার হ'ল ক'রে ওঠে সত্যিই বুকের ভেতরটা। তবুও গহরজানের চোখের জল দেখে, মিথ্যা কালো দেখেই তাকিয়াটা এগিয়ে নেয় খানিক। এগিয়ে আসে গহরজানের একেবারে কাছে। বলে,—গান থাক, তুমি—

অন্দরে কেউ কোথাও নেই।

আক্ষরী শুধু উম্মের সামনে ব'লে রাতের আহাির প্রস্তুত করে। গৃহের মালিক কিরে এসে যদি দয়া ক'রে যান। কি আর বাউড়িয়া জটলা করে কিসকাল, সিঁড়ির তলায় ব'লে। আক্ষরী রান্না করে আর গিল্লোমার জন্তে চোখের জল ফেলে মধ্যো-মধ্যে। তিনি থেকেও রইলেন না।

আর সদরে, কাছারীর দালানে অপেক্ষারিত নর্থান অক্ষপেত্র এতক্ষণে একটা বসবার কেদারা পায়। ম্যানেজার বাবু তাকে লক্ষ্য ক'রে দেখেন অনেকগুলি নলের কামরা থেকে। ফিরিস্তি দেখে কাছাকাছি এসে কথা বলেন। বলেন,—Who are you? What are you? Take your seat.

নর্থান অক্ষপেত্র বললে,—মালিকের বন্ধু আমি। I have few talks with him. আমাকে এই রাতের ট্রেইনই লুধিয়ানা যেতে হ'বে।

—লুধিয়ানা! বিশ্বরে প্রশ্ন করেন ম্যানেজার বাবু।—লুধিয়ানার কেন? সেখানে কে আছে?

খানিক চূপচাপ থাকে নর্থান অক্ষপেত্র। ঐ-সুগল কুচিত ক'রে

দেখে ম্যানেজার বাবুকে। দেখে হঠাৎ এ লোকটির কাছে কোন কথা ব্যক্ত করা যাবে কি না। বস,—Secret matter. আপনাকে বলতে পারি?

—Secret!—বাণা থাকলে কেন বলবে? বলেন ম্যানেজার বাবু।—তবে বললে কীস হবে না কথা।

নন্দান অরুণেন্দ্র আশ্চর্য বলে,—I hope, you are the appointed manager of this Estate of that minor chap?

—Yes, you are right. ম্যানেজার বাবুর মুখে যেন কোঁকরুল ফুটে ওঠে ফিরিঙ্গী বাছার কথা শুনে। পাশের চেয়ারে আসন্ন গ্রহণ করেন তিনি। বলেন,—How do you come to touch with that chap? মালিকের সঙ্গে কোথা থেকে আলাপ হ'ল?

হাসিলো নন্দান অরুণেন্দ্র। বললে,—গড়ের মাঠে প্রথম আলাপ হয়। We met each other. Then I found, he comes of a rich family. আমার টাকার দরকার, And I made friends with him.

টাকার দরকার! আরও যেন বিস্মিত হ'লেন ম্যানেজার বাবু। —You need money? Why?

নন্দান অরুণেন্দ্র যেন ভাবিছিলেন বলবে কি বলবে না। অনেক চুপ ক'রে থেকে অবশেষে বললে,—আমরা একটা Party form করেছি, just alike the Nihilists of Russia, for the freedom of our motherland. সেই Partyর কাজের জন্য দরকার huge money, for collecting arms and ammunitions.

—তা লুবিয়ানায় যাওয়া হবে কেন? ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞেস করেন ঘোরে ঘোরে।

নন্দান অরুণেন্দ্র একটা বার্ডসাই ধরায়। এক মুখ বোঁয়া ছেড়ে বলে,—To unite the Panjabis and the Bengalees. আমাকে তার দিয়েছে party আর—

কথা বলতে বলতে থেমে যেতে দেখে কথাটা ধরিয়ে দেন ম্যানেজার বাবু। বলেন,—আর?

—আর আমাকে আমার father থাকতে দিলে না তার কাছে। সরকারী চাকরী। বললে যে, anarchism করলে আমার কাছে জায়গা নেই। কথার শেষে বার্ডসাই মুখে তোলেন নন্দান অরুণেন্দ্র।

এবার ম্যানেজার বাবু চুপ করেন। আর কোন বাক্যব্যর না ক'রে ব'সে থাকেন একদৃষ্টে তাকিয়ে। সহসা কি মনে হ'তে বলেন,—বন্ধুর সঙ্গে কিসের দরকার? What kind of secret talk? টাকার দরকার?

নন্দান অরুণেন্দ্র বললে,—না, টাকার দরকার নেই। আমি কিছু Document রেখে যাবো তার কাছে, few days পরে আমাদের এক জন worker এসে নিয়ে যাবে তার কাছে থেকে। কিন্তু Where is he? সে কেন এখনও আসছে না? I can't wait any more. ট্রেন ধরতে পারবো না।

মনে মনে কি বুঝলেন কে জানে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে থানিক

বসে রইলেন ম্যানেজার বাবু। তিনিও সব শুনেছেন মালিকের বীর্জি-কাহিনী। মত্ত পানে আসক্ত হয়েছে শুনে তিনিও আর খুশী নন মালিকের প্রতি। কাছারিতে হুকুম দিয়েছেন, তাঁর বিনা অনুমতিতে যেন একটি আংলাও না দেওয়া হয় মালিককে। কিন্তু যখনই ভেবেছেন, সাবালকত্ব প্রাপ্তির আর বেশী দেরী নেই, তখনই মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছেন। ম্যানেজার বাবু আন্তরিক স্নেহ করেন মালিককে। তাই তার দুঃস্বপ্নের সত্যিই আঘাত পেয়েছেন মনে। হঠাৎ কথা বলেন তিনি,—আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক। আমি তাকে নিয়ে দেবো।

নন্দান অরুণেন্দ্র কথাগুলি শুনে সরল বিশ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে,—Will you? Kindly, will you?

—Yes, yes. Rest assure, ঠিক জায়গায় যাবে। Handover to me without hesitation. কথার শেষে ম্যানেজার বাবু উঠ পড়েন বেদারা থেকে।

বার্ডসাই মুখে ধ'রে খুশীর হাসি হাসতে-হাসতে পকেট থেকে একখানা আটা খামের লেফাফা বের ক'রে দেয় নন্দান অরুণেন্দ্র। ম্যানেজার বাবু সেটি নিয়ে বলেন,—Now you can go being assured.

—Many, many thanks with all my true love to you. Please do it my friend. বলতে বলতে কাছারীর সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে যায় নন্দান অরুণেন্দ্র। দ্রুতবেগে চলে যায় ম্যানেজার বাবুর দৃষ্টির অন্তরালে। পরম পরিতৃপ্তি হাসি দেখা দেয় তার মুখে। আনন্দের বিকাশ। যেতে যেতে বলে :

"True love's the gift which God has given

To man alone beneath the heaven

It is not fantasy's hot fire,

Whose wishes, soon as granted, fly ;

It liveth not in fierce desire,

With death desire it doth not die ;

It is the secret sympathy,

The silver link, the silken tie,

Which heart to heart, and mind to mind,

In body and in soul can bind."

যশোদাকারে শহর তখন প্রায় প্রাপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। আকাশের নিঃসঙ্গে কুক্ষিবর্ণ মেঘের সঞ্চয় যেন। হয়তো বর্ষণ হবে, কিছুক্ষণের মধ্যে। গাছের শাখা শোভাশ্রম। মাঝে-মাঝে হাওয়া বইছে এসোমেসো। ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্যবিনের দাবদাহের পবে স্বস্তির শ্বাস কেলছে শহরবাণী। সঞ্চরমান ছিন্ন মেঘের আশ্রয়ণে লুকাচুরি খেলছে নন্দনরা।

লেফাফাখানা ধ'রে ম্যানেজার বাবু হুকুম চিত্তে দাঁড়িয়ে থাকেন কাছারীর দালানে। মালিক এখনও কিরে আসে না। গৃহকর্ত্তীকে মনে পড়ে তাঁর। স্বদ্ধ, গভীর ও বৈশ্যের প্রতীক তিনি, ছেলের অপকর্মে ত্যাগ ক'রে গেছেন এই গৃহ। মনে-মনে ইতস্তত করেন ম্যানেজার বাবু, লেফাফাখানা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবেন, না

অনার্যুটি, বজ্রবাত ও বজ্রা নিত্যসুই প্রাকৃতিক  
দুর্ঘটনা। এদের উপজীব আকস্মিক, কলাকল  
অনাকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আগমন অনিশ্চিত নয়।  
বাংলা দেশে। দোল, দুর্গোৎসবের শ্রায় এগুলিও  
বাৎসরিক। কখনও বাঁকুড়ায়, কখনও বাথরগঞ্জে,  
কখনও বা তিস্তা কি দামোদরে। দৈনিক সংবাদ-  
পত্রের সচিত্র বিবরণীর মধ্য দিয়ে তাদের বহু ব্যাপ্ত  
ধ্বংসসাধনের সঙ্করণ কাহিনী দেশ দেশান্তরে  
পরিচিত।

দৈব ছবিপাকে ক্ষতি ঘটে বহুর। সেক্ষতি  
অতি বিস্তৃত। বর্ষার প্রাবনে অকস্মাৎ জলমগ্ন  
হয় গ্রামের পর গ্রাম, বিনষ্ট হয় স্বল্পবিত্ত জনগণের  
সমস্ত সম্বল, শস্তনাশে সর্বস্বান্ত হয় ঋণভার-  
জর্জরিত দরিদ্র কৃষককুল। কারো ধন যায় কারো  
বা জন। শোকভারাক্রান্ত অসহায় নরনারীর  
সম্মিলিত কণ্ঠের কাতর অভিযোগ ও ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস  
নিশ্বাস ভাগ্যদেবতার রুদ্ধ দ্বারপ্রান্তে চরম নিফলতায়  
পুঞ্জীভূত হতে থাকে দিনের পর দিন, মাসের শেষে  
মাস, বৎসরান্তে বৎসর। সেই সর্বব্যাপী দুঃখের  
তিমিরে শুধু স্বল্প সংখ্যক সেবাত্রতীরা আপন  
পরিমিত শক্তি ও সামর্থ্যমুখায়ী আর্ন্তপ্রাণের  
প্রয়োজন দ্বারা কোনক্রমে জ্বালিয়ে রাখেন মানব  
করণার ক্ষীণ দীপশিখা, মর্ত্যালোকে বিধাতার  
সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

কিন্তু সুযোগও আসে কারো কারো। বজ্রাভূতদের  
দুঃখে সুচতুর দেশহিতৈষীরা সভা সমিতিতে সঘন  
করতালির মধ্যে প্রচুর অগ্রপাত ও প্রচুরতর  
বাগবিস্তারের দ্বারা খবরের কাগজে নাম ও  
এসেখনীতে আসন পালা করার ব্যবস্থা করেন,  
চলমান ট্রামে বাসে পেশাদার চাঁদা-প্রার্থীর দল  
যাত্রীদের সামনে চাঁদার বাস্তব এগিয়ে ধরে বারম্বার  
এবং লাল শালুর কাপড়ে সাদা অক্ষরে ঘোষিত  
একাধিক সংকটত্রাণ সমিতির সদস্যবৃন্দ হারমোনিয়াম  
গলায় ঝুলিয়ে ডি, এল, রায়ের একটি অতিপরিচিত  
সুরে রচিত সংগীত সহযোগে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা  
সংগ্রহে নির্গত হয়।

দুর্গতেরা, অর্থাৎ তাদের নামটা, আরও একটা  
বিশেষ কাজে লাগে। অভিজাত সম্প্রদায়ের  
মৌখিক নাট্যাভিনয়ের সেটা বিশেষ সহায়ক।  
নিগূহের অক্ষরস্তু অবসরক্রান্ত সন্তানবিহীনা প্রৌঢ়া  
মণী বা আলোকপ্রাপ্তা নব্যা তরুণীদের উৎসাহে

# জনোন্মিতিক

যাযাবর

আখ্যান

অধুনা অধিকাংশ নাচের আসর, ভারাইটি শো বা  
অভিনয়-আয়োজন হয়। কলেজে প্রস্তু দেওয়া  
তরুণ ছাত্র, ত্রীকহীন ব্যারিষ্টার, পিতৃবিরোধে হঠাৎ  
হাতে টাকা-পাওয়া জমিদার-নন্দন ও নারীসাম্রাজ্য-  
ব্যাকুল আর্ট-ভক্ত বেকার যুবকের দল তার  
বর্ষকর্তা। গেরুয়া বস্ত্রের আবরণে ভণ্ড সন্ন্যাসীর  
শ্রায় জনহিতৈষ্যতার তিলক ললাটে নিয়ে এদের  
এই নাট্যপ্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তিগত প্রমোদামুগ্ধতার  
অকিঞ্চিৎকরতা মুক্ত হয়ে সংস্কারের সনন্দ লাভ  
করে। উজোক্তারা তাই দুভিক্ষ বা বজ্রার শরণ  
নেন, অভাবে কোন বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধান,  
মৃত ব্যক্তির স্মৃতিরক্ষা এমন কি হাতের কাছে  
সন্তোষজনক আর কিছুই না পাওয়া গেলে সর্বশেষে  
কন্যাদায়প্রস্তুর উপকারার্থেও অভিনয় এবং টিকেট  
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। বেশীর ভাগ মন্ত্রীদের  
দেশসেবার মতো এ-সকল সাহায্য-রজনীর  
সাহায্যটাও লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং  
বজ্রাণ্ডিতদের সাহায্যার্থে সম্প্রতি মিসেস মলী  
সেন যে নাট্যাভিনয়ের প্রয়াস করেছেন আশা করি  
তার সার্থকতা নিয়ে অনর্থক গবেষণায় কেউ সময়  
নষ্ট করবেন না।

অভিনয়টা নিউ এম্পায়ারে হলেই ঠিক মানাতো।  
সাধারণতঃ তাই হয়। কিন্তু অধুনা সিনেমার চাপে  
একমাত্র সকালবেলা ছাড়া সেখানে হল খালি  
পাওয়ার জো নেই। সময়টা এ ধরণের অমুষ্ঠানের  
পক্ষে খুব উপযোগী নয়। সপ্তাহে একমাত্র রবিবার  
ছাড়া সে সময়ে অবকাশ আছে কার? আর  
রবিবারেই বা সকালে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও কিছু  
সংখ্যক আপিস আদালতের কেরানীবাবু ব্যতীত  
অভিনয় দেখতে আসবে কে? তাদের মধ্যে এক  
টাকা দামের উপরে টিকেট কিনবে ক'জন? তার

চাইতেও বড় কথা,—সাসাইটির সেরা নর-নারীরাই যদি না দেখলো তবে অভিনয় করে সুখ কোথায়? মলী সেন তচ্ছিলোর সঙ্গে মুখ বঁকিয়ে বললেন।

“সকালবেলা থিয়েটার করতে পারবো না। সে যেন রাত সাতটায় চায়ের নিমন্ত্রণ কিম্বা জামুয়ারী মাসে ফুটবল মাচ। রিডিক্লাস।”

এখানে বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, মে-জুন মাসে ফুটবলের মাঠে পশ্চিম দিকের মেম্বারস্ গ্যালারীতে সাদা জেনের সান্ গ্লাস চোখে-আঁটা রঙ্গিন ম্যাকিটন হাতে মলী সেনকে প্রত্যহই দেখতে পাওয়া যায়, যদিও সেখানে তার এই নিয়মিত উপস্থিতি কতটা নিছক ক্রৌড়ানুগপ্রণোদিত আর কতটাই বা ফ্যাশানের তাগিদে তা নিয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধবীদের মধ্যেও মতবৈধ আছে। এমন কি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি আড়ালে এমনও বলে থাকেন—

“ও তো দেখতে যায় না, দেখাতে যায়।”

অসম্ভব নয়। আপনাকে উদ্ঘাটিত করার প্রেরণা আছে বিশ্ব-প্রকৃতিতে, আছে মানব-চরিত্রে। তাই বীজ আপনাকে অঙ্কুরিত করে বৃক্ষে, তরুণতা বিকশিত হয় ফুল-ফলে, মানুষ পরিব্যস্ত হয় স্বীয় আচার আচরণে। নিজকে ব্যস্ত করার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা যখন সহজ ও সুসমঞ্জস হয় তখন তাকে বলি আত্মপ্রকাশ। আতিশয্যের দ্বারা সে যখন কলুষিত হয়, তখন তাকে বলা হয়, আত্মপ্রচার। বিকৃত বলেই সেটা শিক্ত।

ইংরেজ কবি বলেছেন, এ জগতটা নাট্যশালা; মানুষ মাত্রই সেখানে জীবন-নাট্যের কুশীলব। মলী সেন বিলাতী কনভেন্টের ছাত্রী ছিলেন, সিনিয়র কেমব্রিজের বেড়া ডিগ্রিয়ে সেখানে কলেজে প্রবেশের পথ মেলে। তাই যে-বয়সে বাঙ্গালী ছেলেরা নেস্ফিল্ডের ব্যাকরণ মুখস্ত করে, সে বয়সে তিনি ইংরেজী নাটক পড়েছেন। তাঁর কাছে ঐ কাব্যোক্তি অবিদিত নয়। কিন্তু তাতে মন ওঠে না। সুবৃহৎ পৃথিবীর বিশাল নাট্যমঞ্চে কোটি কোটি অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্ষান্তিবিহীন অভিনয়-পর্বের মধ্যে একটি মাত্র মলী সেনের পার্ট কতটুকু? নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চরাচর বিস্তৃত সেটের মধ্যে সে তো শুধু একজন ‘এক্সট্রা’; সে তো ‘ষ্টার’ নয়। জনতার কোন বিশেষ ভূমিকা নেই, তাদের অভিনয় নিরবধি কাল এবং

বিপুল। পৃথিবীর অঙ্গীভূত। কোথায় যে তার প্রস্তাবনা আর কোনখানেই বা যবনিকা পতন তা সকলের অলক্ষিত। নাট্যিকার জগৎ চাই নির্দিষ্ট নাটক—তার পরিধি পরিমিত এবং আরম্ভ ও সমাপ্তি ছুই-ই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ফুটবল সম্পর্কে যাই হোক না কেন, নাটকে দেখাবার প্রগতিই প্রধান। সে-কথা মলী সেনের জানা আছে। তার জগৎ আবশ্যক যথোচিত মঞ্চ ও প্রেক্ষাগার।

উত্তর কলকাতায় মাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া পাওয়া শক্ত নয়। কিন্তু তার কোলীজ নেই। সেখানে কাষ্টমস্ বা পুলিশ ক্লাবের সদস্যদের মেবার পতন বা বঙ্গে বর্গী অভিনয় চলে, যাতে মিহি স্বরের পুরুষেরা নকল চুল মাথায় চাপিয়ে শাহজাদী সাজে। সেখানে অভিজাতদের অভিনয় সম্ভব নয়। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে তো? গুলু ওস্তাগরের গলিতে কি বাড়ি তুলবেন স্মার বীরেন মুখার্জী? মির্জাপুরের হোটেলে হবে চীফ মিনিষ্টারের ডিনার?

তার চাইতে বাড়িতে ষ্টেজ বেঁধে অভিনয় করা বরং ভালো। তাতে সাহেবপাড়ার থিয়েটার হলের ডিগনিটি না থাকলেও, ডিষ্টিংশন আছে। দামী জর্জেটের অভাবে মোটা খদ্দেরের শাড়ির মতো। অল্প লোকের কথা কই, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একাধিক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

মলী সেনদের বাড়িটা অতিশয় প্রাচীন। চক মিলানো গড়ন। মাঝখানে বৃহৎ উঁচু দালান। চণ্ডীমণ্ডপ। সেকালে দুর্গাপূজা হতো মহা সমারোহে। সামনে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। সেখানে বসে সমবেত জনতা ভক্তিভরে শ্রবণ করতো মহাষ্টমীর দিনে পূজামণ্ডপে কুল-পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডী পাঠ। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমার রাত্রে যাত্রাভিনয় হতো। “রাই উন্মাদিনী” পালায় অধিকারী অঘোর সামন্ত নিজে আসরে বসে বৃন্দাবনতীকে বাঁপ তালে গানের খেই ধরিয়ে দিতেন—“গোকুল ত্যাজি শ্যাম রায়, তুমি এলে মধুরায়, শ্রীরাধিকার প্রাণ যায়, তোমার বিহনে-এ-এ-এ।” প্রাঙ্গণের তিন দিকে ঘেরা দালানের দোতলার বারান্দায় চিকের আড়ালে বসে মহিলারা বিরহিনী রাধার হৃৎখে ঘন ঘন চোখ মুহুতেন। সে দীর্ঘ দিন আগেকার কথা।

মলী সেনের শিশুর বৈকুণ্ঠনাথের কুখ্যাতি ছিল অর্থগুরুতর। পাড়ার ফুটবলের ক্লাবে চাঁদাবদ্ধিত ক্রীড়াযুবকের দল তাঁর নামের ঈর্ষ্য পরিবর্তন করে সব নামকরণ করেছিলো ব্যয়কুণ্ঠ সেন। তিনি প্রথমে পূজা-পার্বণের রাজসিক অংশ কাট-ছাঁট করে নেহাৎ অবজ্ঞনীয় শাস্ত্রীয় অমুষ্ঠানটুকু বজায় রাখলেন। খাজা হলো বন্ধ, কথকতা গেল উঠে, কাঙালী-বিদায় পেল লোপ।

পূজারও আয়ু বেশী দিন রইল না। সে-বার সবমুঠে দিনে বলির পশু আটকে গেল খড়্গে। শ্রীধর ঘাটীর এ বাড়ীতে খাঁড়া ধরছেন এই বাইশ বছর; এক কোপে মোষ নামিয়েছেন কতবার। তাঁর হাতে এমন দুর্ঘটনা এই প্রথম। তিনি হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে, কপালের ঘাম মুছে, প্রতিমার পানে হাত জোড় করে বললেন,

“মা করুণাময়ী, রোষ করিসনে। দেখিস, কঠার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে, ভালোয় ভালোয় বছর পার হোক, আসছে বছর জোড়া মোষ মানত রইল তোর পায়ে।”

হায়, একসঙ্গে একাধিক মহিষের কৃষিরপানের এমন লোভনীয় সম্ভাবনার প্রতিও মায়ের আসক্তির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া গেল না। করুণাময়ীর করুণা রইল সম্পূর্ণই অপ্রকাশ। মাস খানেকের মধ্যে টাইফয়েডের ব্যাপক আক্রমণে মারা গেল পর পর বৈকুণ্ঠের বড় দুই ছেলে। একুশ দিন যমে-মাহুয়ে টানাটানির পর কোন মতে বেঁচে গেল অধিশিষ্ট পুত্র শিবনাথ,—পটলডাঙ্গার পুরাতন সেন পরিবারের একমাত্র বংশধর। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সঙ্গে বসিবিভ্রাটে রুগা ভবানীর প্রকৃত সম্পর্ক কতখানি, সে কথা তিনিই জানেন। কিন্তু শোকে মুহূর্তমান বৈকুণ্ঠনাথ রাগ করে বললেন,

“এ বাড়ীতে আর ভগবতীর পাট নেই, এবার থেকে পূজা বন্ধ।”

তার পর থেকে গৃহে আর পাতা হয়নি দেবীর আসন, স্থাপনা হয়নি অর্চনার ঘট। পূজার দালান ব্যবহৃত হয়েছে বৈকুণ্ঠের ব্যবসায়ের গুদামঘর হিসাবে। পদ্ধতি বাজারে মাল কিনে তিনি সেখানে মজুদ করেছেন উচ্চতি বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। এক পাশে জড়ো-করা জীর্ণ তরুপোষ, বাগুস বাঁধা পুরানো আমলে বৃহৎ ভোজের দিনে ব্যবহৃত

কুশাসনের স্তূপ, ডালাভাঙ্গা চীনের বাস, দেয়ালে কলি ফেরাবার পাটের মোটা তুলিসমেত চুণের কেমেন্টারা এবং গৃহস্থালীর অগ্ন্যাশ্রয় বহু পরিত্যক্ত অব্যবহার্য উপকরণ।

সে-সমস্ত দূর করে আজ কদিন ধরে থিয়েটারের ষ্টেজ তৈরী হচ্ছে। ঠেলাগাড়ি বোঝাই আসছে শাল কাঠের তক্তা, বস্তা বোঝাই রঙ্গিন কাপড়, ইলেকট্রিকের তার, বিভিন্ন বর্ণের আলো ও নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম। হাতুড়ি পেরেকের ঠকা-ঠক শব্দে দালানের কার্নিশে অতি পুরাতন বাসিন্দা মালিকহীন পারাবতের দল সচকিত ভীত ও সন্ত্রস্ত চিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নরত।

যাঁর উপরে রঙ্গমঞ্চ তৈরীর ভার তিনি সার্টিফিকেট দিয়েছেন, এ বাড়ির সদর দালানটা ষ্টেজের পক্ষে খুবই উপযোগী। মনে হয় যিনি বাড়ি তুলেছিলেন তিনি যেন এই অভিনয়ের কথা ভেবেই এমন উঁচু মণ্ডপ ও সামনে প্রেক্ষাগারের উপযোগী প্রাঙ্গণ পরিকল্পনা করেছিলেন।

শুনে মলী সেন খুসি হলেন। সেকেলে ধরনের এই অতি পুরাতন কক্ষগুলিও যে কোনো দিন কোনো উপলক্ষ্যে কাজে লাগতে পারে একথা এই প্রথম তাঁর মনে হলো।

এ বাড়িটার প্রতি মলী সেনের তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। পনের বৎসর পূর্বে বৈশাখের এক উৎসব-মুখরিত সন্ধ্যায় বধূবেশে তিনি এই গৃহে প্রথম পদার্পণ করেন। প্রচলিত পঞ্জিকার শুভদিন-নির্ঘণ্টের তালিকা অনুসারে সে-দিনটা অবশ্যই মঙ্গলদায়ক ছিল। কিন্তু পাঁজির নিদান ও ভাগ্যের বিধান যে অনেক ক্ষেত্রেই হাতে হাত দিয়ে চলে না সত্ত্ববিবাহিত দম্পতির পরবর্তী জীবনে তারই দুঃখজনক প্রমাণ রইল। সে-কাহিনী যারা জানেন তাঁদের কাছে আজ তার পুনরাবলম্বন অনাবশ্যক। যারা জানেন না তাঁদের জ্ঞান স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথেষ্ট নয়। স্মৃতরাং সে চেষ্টা না করাই ভালো। বরং বাড়ির প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক।

মলী সেনের বিয়ের বছর পাঁচেক পরে এক ক্রিসমাসের রাত্রিতে ফারপোর ড্যান্স থেকে তাঁকে বাড়ি রেখে আসতে যাচ্ছিলেন সুধাংশু। ডক্টর সুধাংশু মিটার। তিনি চিকিৎসকই বটে, তবে দেহের নয়, দাঁতের। শিবনাথের অনুজ। অতি

দূর সম্পর্কীয়। আত্মীয়তায় মলী সেনের দেবর।  
স্বত্বতায় কী তা এক কথায় প্রকাশ করা কঠিন।  
ইংরেজীতে ফ্রেণ্ড, ফিলসফার অ্যাণ্ড গাইড বলে  
একটা কথা আছে। তার বাংলা তর্জমা ঠিক  
জানিনে। জানলে ব্যাখ্যা করা সহজ হতো।  
গাড়িতে উঠে স্তব্ধ বসলো,

বউদি, তোমাদের এই মাহাত্ম্যের আমলের  
বালাখানাটা ছাড়বে কবে?”

ঠিক বুঝতে না পেরে মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন,  
“কিসের কথা বলছে?”

“আর কিসের? তোমাদের এই পটলডাকার  
রাজমহলটির। আজকের দিনেও যে কোন ডিসেন্ট  
রুটির ভদ্রমহিলা এই ঘিঞ্জী পুরানো নোংরা গলির  
মধ্যে বাস করতে পারে এ আমার ধারণায়ই আসে  
না। ভাড়াটে বাড়িতে থাকে এমন সাধারণ চাকরে,  
উকীল, প্রফেসরের স্ত্রীরাও তো আজকাল উত্তর  
কলকাতায় থাকতে চায় না। চৌরঙ্গী পাড়ায় থাকা  
সবার সাধা নয়, তবুও তাঁরা অন্ততঃ লেক রোড কিম্বা  
সাদার্ণ এভেনিউতে বাড়ী খোঁজে।”

মলী সেন ক্ষীণ স্বরে বললেন,

“পুরানো আমলের বাড়ি—”

স্তব্ধ বাধা দিয়ে বললো;

“দোহাই তোমার, বউদি, ওটাকে বাড়ি বলা  
না। সিন্দুক বলতে চাও বলা, এমন কি গৌরবে  
ভূর্গ বললেও আপত্তি করবে না। কিন্তু বাড়ি—  
কখনই নয়, নেভার।”

এ বিষয়ে অধিক বলা বাজ্জল। মলী সেন  
নিজে কতদিন সত্যপরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে ঠিকানা  
দিতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করেছেন। লাউডন স্ট্রীট,  
মালিন পার্কের ড্রিং রুমে বসে রামকান্ত মিস্ত্রী  
লেনের নাম উচ্চারণ করতে হলে স্বভাবতঃই লজ্জায়  
অধোবদন হতে হয়। বললেন,

“তোমার কথা সত্যি। আমি নিজেও যে  
এই স্বাপর যুগের বাড়িটাতে একেবারে আনন্দে  
গদ গদ হয়ে আছি, তা ভেবে না। কিন্তু সাহেবী  
পাড়ায় বাড়ি পাচ্ছি কী করে?”

“অন্য আর দশজনে যেমন করে পায়। হয়  
ভাড়ায়, নয় কিনে। এ ছুটোর একটাও না হলে  
তৃতীয় পন্থা আছে, সেটা সব চেয়ে ভালো,—  
নিজেরা তৈরী করে।”

“বাড়ি তৈরী করা কি চারটিখানি কথা হলো।  
তার কতো খামেলা।”

“টাকা কম কমালে খামেলা থাকে না। শিবুদা  
একবার মুখের কথাটি বের করুন দেখি, সাতদিনে  
তোমাদের বাড়ির জায়গা কিনে সাত মাসে বাড়ি  
তুলিয়ে দিতে পারি কিনা দেখো।”

শিবুদার অসুস্থতায় সময়সাপেক্ষ। দেবর আর  
ভ্রাতৃজ্ঞায়া মিলে পরামর্শ করলেন দিন দুই, গাড়ি  
চেপে দালালের মারফতে এখানে ওখানে জায়গা  
দেখলেন দিন দশেক।

এখন চৌরঙ্গীর আর সেই পুরাতন অভিজাত্য  
নেই। পাট কোম্পানীর সাহেব, বিলাতী ডিগ্রী  
ওয়ালা স্ত্রীরোগের ডাক্তার ও রেডিওলজিষ্টেরা সে  
অঞ্চলে ফ্লাট নিয়ে তার কুলীনত্ব অনেকখানি  
ঘুটিয়েছে। ময়রা স্ট্রীট বা উড স্ট্রীট এখন আর  
ফ্যাশান নয়। এখনকার খাঁটি অভিজাত পল্লী—  
আলিপুর।

পোর্টল্যাণ্ড পার্কে জমি পছন্দ হলো মলী  
সেনের। ব্যালাডি টমসন-ম্যাথুসকে দিয়ে প্ল্যান  
করানো হলো বাড়ির। সর্বসাধুনিক এমেরিকান  
রীতির স্ট্রীমলাইনড ডিজাইন। স্পেগলার থেকে  
আসবে বাড়ির লিফট, ফিলিপস থেকে ফ্রুয়েসেন্ট  
বাতি এবং স্ত্রাক্স থেকে স্যানিটারী ফিটিংস। বার্ডস্  
করবে ফ্লোর, ল্যাক্সারাস দেবে ফার্ণিচার। বসার ঘরে  
দেয়ালে দেয়ালে ছবির ডিজাইন করবেন যামিনী  
রায়। বাকী রইলো শুধু গৃহকর্তাকে বলা। টাকার  
প্রয়োজন।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ ব্যবসায়  
সংক্রান্ত কাজ করার অভ্যাস আছে শিবনাথের।  
দিবাভাগে ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনা ও অস্বাভাবিক  
কাজের তাড়ায় কোন কিছুতে নিরবচ্ছিন্নরূপে মন  
দেওয়ার উপায় থাকে না। নিশীথে নিজকক্ষের  
নিভৃত আবেষ্টনে ধীর চিন্তে হিসাবপত্র পরীক্ষার  
সুযোগ মেলে। সে-দিন তাতে বাধা পড়ল।  
মলী সেন এসে বললেন,—

“একটা দরকারী কথা আছে।”

তা না বললেও চলতো। দরকার না থাকলে  
সন্ধ্যাকালে মলী সেন সিনেমায় বা ক্লাবে না গিয়ে  
বাড়ি থাকবেন কেন? দরকারটা যে শিবনাথের  
নয়, তাও অসুমান করতে কষ্ট হয়নি। ট্রায়েল

ব্যালেন্সের পাতা থেকে মুখ তুলে জীর পানে তাকিয়ে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—

“কী ব্যাপার?”

ব্যাপার,—নতুন বাড়ি।

মলী সেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। এ বাড়ি পরিত্যাগের সংকল্প, সাহেবী পাড়ায় নতুন গৃহ নির্মাণের আভিযাত্র্য, তার জ্ঞাত স্থান অন্বেষণ, জমি নির্বাচন, নক্সা তৈয়ার ইত্যাদি সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। টেবিলের উপরে প্ল্যান খুলে সযত্নে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কোনখানে হবে শয়নকক্ষ, কোথায় হবে অতিথির ঘর, কত বড় হবে ড্রয়িং রুম, কত দূরে থাকবে গ্যারেজ ও ভৃত্যদের বাস ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলতে বলতে উৎসাহে, উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলেন মলী সেন।

শিবনাথ সমুদয় প্রস্তাব অখণ্ড মনোযোগে শুনলেন, সযত্নে প্ল্যানটি দেখলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন,

“নতুন বাড়ি কার জ্ঞাত?”

হায়, অদৃষ্ট! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠান্তে অবশেষে প্রশ্ন করে কি না “সীতা কার পিতা।”

এর পরে সংঘম রক্ষা করা অথবা যে কোন মহিলার পক্ষেই শক্ত হতো। কিন্তু মলী সেন আজ স্থির করেছিলেন কিছুতেই ধৈর্য্যচ্যুত হবেন না। গম্ভীর স্বরে উত্তর করলেন,

“আমার—মানে, আমাদের জ্ঞাত।”

শিবনাথ সংক্ষেপে বললেন,

“তোমার জ্ঞাত যদি হয়, করতে পারো।

আমাদের জ্ঞাত যদি হয়, তবে প্রয়োজন নেই।”

“তার মানে?”

“খুব সহজ। আমি তো এখানেই বেশ আছি।”

“কিন্তু আমি যে এখানে সুখী নই, তা জানো?”

“জানি। কিন্তু সুখ কি আছে রাজমিস্ত্রীদের বুলিতে? নতুন বাড়িতে গেলেই কি সমস্ত দুঃখ দূর হবে?”

“না, হবে না। তবে নিজের পছন্দ মতো একটা বাড়িতে বাস করছি, অন্ততঃ সেটুকু তো জানবো।”

“বেশ ত তুমি নতুন বাড়িতে থাকতে চাও, থাকো। আমি বাধা দেবো না।”

ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি আর থাকে না। কহ কণ্ঠে

আত্মসংবরণ করে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন মলী সেন,—

“বাধা দিতে চাইলেই যেন বাধা দিতে পারতে। তুমি জানো আমি কারো বাধাই মানিনে, তোমার তো নয়ই।”

শিবনাথ নিরুত্তরে আপন খাতাপত্র টেনে নিয়ে পুনরায় হিসাব পরীক্ষা কার্য্যে মনোনিবেশের উদ্যোগ করলেন।

এ ভঙ্গিটুকু মলী সেনের অজানা নয়। বিতর্কের মধ্যপথে অকস্মাৎ একরূপ মৌনতার দ্বারা অশ্রীভিকর বাদ্যবাদের পরিসমাপ্তি ঘটানো শিবনাথের একটি পরিচিত পুরাতন কৌশল।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের একটা চূড়ান্ত পরিণতি না ঘটিলে মলী সেন আলোচনা বন্ধ করতে প্রস্তুত নন। তাই তিনি উদগত ক্রোধ দমন করে যথাসম্ভব শাস্ত্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,

“তোমার আপত্তি কি কারণে? জায়গাটা কি পছন্দ নয়?”

খাতায় নিবন্ধদৃষ্টি শিবনাথ উত্তর দিলেন—  
“এর চেয়ে ভালো জায়গা কলকাতায় খুব বেশী পাওয়া যাবে, মনে হয় না।”

“তবে?”

শিবনাথ নিরুত্তরে পেন্সিল চালনা করতে লাগলেন ডেবিট-ক্রেডিটের অঙ্কে।

উত্তরের প্রত্যাশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন মলী সেন,

“বাড়ির প্ল্যানটা ভালো নয়?”

“প্লানে তো কোন দোষ দেখছি নে, ডিজাইনটি চমৎকার, ড্রয়িংও নিখুঁত।”

“তা হলে?”

“বলেছি তো, তুমি নিজে থাকতে চাও তো বাড়ি শুরু করে দাও। কন্ট্রাক্ট দেওয়ার আগে এন্টিমেটটা একবার আমাদের দোকানের এঞ্জিনিয়ারকে দেখিয়ে নিও, কোন ভুল চুক থাকবে না।”

“দেখ, এ বাড়ি তৈরী তোমার ইচ্ছা নয়, সে কথা অত ঘুরিয়ে বলার দরকার কি? সোজাসুজি বলার সাহস নেই কেন?”

শিবনাথ উত্তর দিলেন না, আপন মনে হিসাব পরীক্ষায় ব্যাপ্ত রইলেন। সাহসের কথাটা না



তোলাই ভালো ছিল। সে কথা মলী সেনও মনে মনে জানেন। যদিও মুখে স্বীকার করেন না। কথা উঠলে বলেন,

“একে সাহস বলে না, বলে গোয়ারতুমি, পিগহেডেনেস্।”

মিনিট দুই অপেক্ষান্তে মলী সেন আপন অভিযোগের পরিশিষ্ট হিসাবে বললেন, “স্বামী জী ছুজন আলাদা বাড়িতে থাকলে আর পাঁচজনে যে তার কি ব্যাখ্যা করে তা তুমি বোঝ না এমন নয়। তুমি থাকবে পটলডাঙ্গার বাড়িতে আর আমি থাকবো পোর্টল্যাণ্ড পার্কে—লোকনিন্দায় তা হলে কান পাতা যাবে কোথাও?”

টাকা আনা পাইর অঙ্কে লাল পেন্সিলের টিক্ দিতে দিতে প্রায় স্বগতোক্তির মতো অমুচ্চ কণ্ঠে শিবনাথ বললেন, “লোকনিন্দার কথা ভেবেই কি আমরা সব সময়ে সব কাজ করি?”

“‘আমরা’ মানে আমি তো? না করিনে। যে-নিন্দা অকারণ, যে-নিন্দার পেছনে থাকে অক্ষমের ক্রোভ আর বঞ্চিতের ঈর্ষা, তাকে আমি কেয়ার করিনে। আমি ক্লাবে পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বসে ব্রিজ খেলি বা রেসে যাই বলে তোমার যে সকল মাসি, পিসি, দিদি, দিদিমার দল ছুবেলা আমার অখ্যাতি না করে জল স্পর্শ করেন না, তাঁদের আমি বরাবর অগ্রাহ্য করবো। কিন্তু আমি একা একটা ভিন্ন বাড়িতে গিয়ে বাস করলে কেউ যদি অপ্রিয় কিছু বলে, তাকে দোষ দেবো না।”

“অর্থাৎ যিনি আসামী তিনিই বিচারক হয়ে রায় লিখবেন। আদালতে—”

অসহিষ্ণু স্বরে বাধা দিয়ে মলী সেন বললেন,

“তোমার ওসব আইন আদালতের ব্যাখ্যান রাখো। তুমি যে ল’ক্লাশে কিছুদিন পড়েছিলে তা অত ঘটা করে প্রমাণ না করলেও চলবে। তা নিয়ে কিছু কম কাজ হয়নি যে, পুরানো বলেই সে কাহিনী আমি আজ ভুলে যাবো। তুমি কষ্ট করে শুধু এইটুকু বল যে, এই পুরানো অন্ধকার কুঠরী ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে বাস করতে রাজী আছো কি না?”

“কষ্ট করে নয়, স্পষ্ট করে বলছি,—এ বাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী বাস আমার ইচ্ছা নয়।”

কণ্ঠে দৃঢ়তার আভাস, ভক্তিতে চরম সিদ্ধান্তের লক্ষণ।

মলী সেন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ কণ্ঠে বললেন,

“তা হবে কেন জমির বায়না দেওয়া হয়েছে, মালিক কাল আসবে পুরো টাকা নিতে, পরশু সেল ডিড্ রেজেষ্ট্রি হবে। এখন তাকে বলতে হবে, জমি কেনা হবে না, কেন না আমার স্বামীকে না জানিয়ে এতদূর এগিয়েছিলুম। এখন দেখছি, তাঁর মত নেই। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমার। আমাকে ক্ষম করার এত বড় সুযোগ কি তুমি হাতে পেয়ে ছাড়তে পারো? তোমাকে কি আমি পনের বছরেও চিনি নি?”

শিবনাথ এবার খাতা বন্ধ করে জীর পানে তাকিয়ে বেদনাক্রিষ্ট কণ্ঠে বললেন,

“সেটাই সত্যি, মলী, এই পনের বছরে তুমি আমাকে এতটুকুও চেননি, চিনতে চাওনি। কিন্তু সে কথা থাক। তুমি যে জমির বায়না করেছ তা তো এতক্ষণ আমাকে বলোনি। আমি এ বাড়ি ছেড়ে অস্থায়ী বাস করবো না। তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অভিপ্রায়ে নয়। এই বাড়ি আমার পিতামহের নিজের হাতে গড়া। এ বাড়িতে আমার মা একদিন লাল চেলী পরে সিঁথিমোর মাথায় বউ হয়ে এসেছিলেন। দেহান্তে এই বাড়ি থেকেই তাঁকে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্রদ্ধাধানে। এই বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ফেলেছেন আমার কত প্রিয় পরিজন, এই বাড়ির প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে আমার ভাইদের স্পর্শ, বোনদের চিহ্ন, বাবার স্মৃতি। কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে, জমি নিশ্চয়ই কেনা হবে।”

মলী সেন বললেন,

“থাক, তোমাকে দয়া করতে হবে না। আমার নিজের গয়না বিক্রী করলে অন্তত হাজার পঞ্চাশ টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সে টাকা দিয়ে আপাতত জমির দাম আমি দিতে পারবো। তোমার কাছে জীবিত জীর অমুরোধের চাইতে যখন মৃত পিতামহের স্মৃতিই বেশী মূল্যবান—”

শিবনাথ বাধা দিয়ে বললেন,

“মূল্য কম বেশী নিয়ে কথা নয়, মলী; সেটিমেন্টের কথা। সেটা যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায় না, হৃদয় দিয়ে বুঝতে হয়। এ বাড়ি আমাদের পয়মন্ত। এ বাড়ি তৈরীর পরেই

নানাভাবে ঠাকুর্দা মশায়ের সৌভাগ্য বেড়েছে, এ বাড়িতে থেকে বাবা ব্যবসায় আশাতীত উন্নতি করেছেন।”

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মল্লী সেন মন্তব্য করলেন,

“আধুনিক কালেও যে, কোন পুরুষ মানুষের এমন কুসংস্কার, সুপারিশ্ঠেশন থাকতে পারে তা জানা ছিল না। বসন্ত বাড়ির উপরে ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করে একথা যে বিশ্বাস করে তার পাড়াগাঁয়ে থাকা উচিত ছিল।”

“বোধ হয় তাই। কিন্তু সুপারিশ্ঠেশন তো কেবল পুরুষেরই মনোপলি নয়। বাড়ির সামনের রাস্তাটার নামের উপরই যে বাড়ির ভিতরের মানুষগুলির দাম নির্ভর করে, সে তো মেয়েরাই বিশ্বাস করে এবং এই আধুনিক কালেই।”

রোষে মল্লী সেনের সর্বাপেক্ষ দৃঢ় হতে থাকলো। কিন্তু মুখে যথোচিত কঠোর অথচ যোগ্য প্রত্যুত্তর জোগালো না। কোন কথা না বলে ক্রুদ্ধ ক্রান্ত পদক্ষেপে ঝড়ের বেগে নিজস্ব হলেন শিবনাথের কক্ষ থেকে।

তারপরে ক্রমাগত সপ্তাহখানেক ধরে একাধিকবার চেষ্টা করেছেন। পর্যায়ক্রমে যুক্তি, তর্ক, অনুরোধ, অনুন্নয়, অনুযোগ, তিরস্কার ও অশ্রদ্ধার

প্রয়োগ করেছেন মল্লী সেন। শিবনাথ অবচল। তাঁর ঐ এক কথা,

“আমরা এ বাড়ি ছাড়লে লক্ষ্মীও আমাদের ছাড়বে।”

পরাজিত হয়ে অবশেষে হাল ছেড়েছেন মল্লী সেন। মে-জমি কেনা হয়েছে। পরিবর্তিত মানে সেখানে বৃহৎ চারতলা বাড়ি উঠেছে মে-বছরই। তাতে বারোটা ফ্ল্যাট। বাংলা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী, পোর্ট ট্রাস্টের বড় সাহেব, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট প্রভৃতি ক্লাইভ স্ট্রিটের রথী মহারথীরা সেগুলিতে বাস করে। প্রতি মাসের পহেলা তারিখে শিবনাথের কারেন্ট একাউন্টে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা ভাড়া জমা হয়।

তিস্তা স্মৃতি মনে রেখে লাভ নেই, আছে মনস্তাপ। মল্লী সেন তা জানেন। কিন্তু বিশ্বাস তো মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। নতুন জুতার ফোস্কা যেমন প্রতি পদক্ষেপেই পথচারীকে পায়ের ক্ষতস্থানের কথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে, তেমনি পটলডাঙ্গার সেই পুরাতন বাড়িতে বিতৃষ্ণ অবস্থিতি ক্ষণে ক্ষণে মল্লী সেনের মনে আনে সেদিনকার সেই পরাভবের অপমান। তার বেদনা গভীর। জ্বালা হুঃসহ।

[ ক্রমশঃ

### প্রথম পাঁচ জন

বই কত রকমের ছাপা হয়। কত বিষয়ের 'পরে কত রকমের বই। একটা বিষয়ের 'পরেও কত রকমের বই ছাপা হচ্ছে। কিন্তু এক জন মানুষের সম্বন্ধে কত রকমের বই ছাপা হ'তে পারে, সে-সম্বন্ধে কি কারও কিছু জানা আছে? আমাদের দেশে বহুমুদ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই একাধিক বই আছে। কত কে লিখেছেন।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন পাঁচ জন লোকের নাম করা যায় যাদের সম্বন্ধে এত অধিক বই ছাপা হয়েছে যে, শুনলে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের দেশের যে-কোন একটা গ্রন্থাগারে সব শুদ্ধ এত বই থাকে কি না সন্দেহ হয়। নীচে পাঁচ জনের নাম আর বইয়ের সংখ্যা দেওয়া হচ্ছে :

| নাম                  | সংখ্যা |
|----------------------|--------|
| বীণেশ্বর             | ৫,১৫২  |
| উইলিয়াম সেন্সপীয়ার | ৩,১৭২  |
| আব্রাহাম লিঙ্কন      | ২,৩১১  |
| জর্জ ওয়াশিংটন       | ১,৭৫৫  |
| এব্রাহাম লিঙ্কন      | ১,৭৩৫  |

# বহুমালা

শ্রী প্রাণতোষ ঘটক

দেববাণী—দৈববাণী, ঈশ্বরোক্তি।  
 দেবমাতৃক—বৃষ্টি দ্বারা জাত শস্ত-বিশেষ।  
 দেবযোনি—উপদেবতা, দেবজনিত।  
 দেবর—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেঅর, দেওর।  
 দেবরাজ—ইন্দ্র, সুরপতি, স্বর্গরাজ।  
 দেবল—দেবপুত্রাজীবি, পুত্রারি ব্রাহ্মণ।  
 দেবলোক—স্বর্গ, দেবগণের বাসস্থান।  
 দেবস্থল—দেবালয়, দেবগণের বাসস্থান।  
 দেবস্থ—দেবতার দ্রব্য, দেবত্ব ধনাদি।  
 দেবহিংসক—অসুর, সুরারি, দৈত্য।  
 দেয়—দানযোগ্য, দাতব্য, পরিশোধ্য।  
 দেলুক—দোশদার, দীপবৃক্ষ, দীপাধান।  
 দেশ—পৃথিবীর ঋণ্ড, স্থল, দেহাংশ।  
 দেশময়—পরিপূর্ণ, ব্যাপ্ত, সর্বত্র।  
 দেশাধিপ—দেশাধিপতি, রাজা।  
 দেশান্তর—বিদেশ, অন্য দেশ, প্রবাস।  
 দেশীয়—দেশজাত, দেশগত, দেশজ।  
 দেহ—শরীর, কায়, প্রকৃতি, অঙ্গ।  
 দেহপাত—শরীর পতন, মরণ, মৃত্যু।  
 দেহহীন—অভৌতিক, অনঙ্গ, অশরীরী।  
 দেহাঙ্গবাদী—আত্মানিবেশক, নাস্তিক।  
 দেহী—মহুয়াদি, শরীরী, জীব, প্রাণী।  
 দেহোদ্ভূত—শরীরজ, আভাবিক।  
 দৈত্য—অসুর, দেবারি, দানব, সুরারি।  
 দৈত্যগুরু—গুরুচাৰ্য্য।  
 দৈগ্য—দরিদ্রতা, কুপণতা, দীনতা।  
 দৈব—অদৃষ্ট, দেবধীন, ঐশ্বরিক।  
 দৈবকৰ্ম্ম—যজ্ঞাদি, স্বস্ত্যয়ন।  
 দৈবজ্ঞ—গণক, আচার্য্য, জ্যোতিষী।  
 দৈবযোগ—বিধাতৃকৰ্ম্ম, দৈব ঘটনা।  
 দৈবযোগে—দৈবাৎ, হঠাৎ, অকস্মাৎ।  
 দৈবা—হঠাৎ ঘটনা, ঐশ্বরিক দণ্ড।  
 দৈবোৎপাত—কৰ্ম্মবিনাক, দৈবোপদ্রব।  
 দৈর্ঘ্য—দীর্ঘতা, দ্রাঘিমা, লম্বাই।  
 দোকর—পুনর্বার, বিশৃঙ্খল, পুনঃকৃত।  
 দোটানা—দ্বৈধ, দুই দিকে মনাকর্ষ।  
 দোঠকা—শঠ, খল, প্রবঞ্চক, নিন্দুক।  
 দোহুল্যমান—খুলনিয়া, খুলখুলিয়া।  
 দোপড়া—দ্বিবিবাহিতা, দ্বিকৃত কস্তা।

দোল—কলংগুৎসব, পর্কবিশেষ।  
 দোলন—ঝুলন, লড়ন, হেলন, ঝাঁকন।  
 দোলনা—ঝোলনা, দোলা, দোলা।  
 দোলা—শিবিকা, ঝোলা, ডুলী।  
 দোলায়মান—ঝুলনিয়া, লড়নিয়া।  
 দোলবাহক—দোলিয়া, ডুলীবাহক।  
 দোষ—অপরাধ, ত্রুটি, পাপ।  
 দোষকর—অনিষ্টকর, হিংস্রক।  
 দোষক্ষেত্র—অপরাধস্থান, অপরাধী, দোষী।  
 দোষগায়ক—দোষগাথা, নিন্দক।  
 দোষগ্রাহক—দোষগ্রাহী, অপবাদক।  
 দোষাদোষী—পরস্পর অপবাদ করণ।  
 দোসর—দ্বিতীয়, সঙ্গী, সহচর।  
 দোহদ—গর্ভ, সূত্র, বাহা, ইচ্ছা।  
 দোহন—দুগ্ধ নিঃসারণ, নিদড়ন।  
 দোহা—শ্লোক, পদ্যবিশেষ।  
 দোহার—গায়কাদির সহায়।  
 দোড়ন—ধাবন, বেগে চলন।  
 দৌত্য—দূতের কৰ্ম্ম, প্রেরিতজ্ঞ।  
 দৌবারিক—দ্বারপাল, দ্বাররক্ষক, বাঃস্ব, দ্বারস্থিত, দ্বারী।  
 দৌরাড্য—দুরাশ্রয়তা, উৎপাত, দুটামি।  
 দৌর্জন্ম—দুজন্মতা, খলতা, অসৌজন্য।  
 দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র, নাতী, নতি।  
 দৌহিত্রী—দুহিতার কস্তা, নাতনী।  
 দ্যুত—পাশক্রীড়া, পাতি।  
 দ্যুনিশ—দিবারাত্রি, অহোরাত্র।  
 দ্রব—গলিত রস, দ্রুত, তরল।  
 দ্রব্য—বস্তু, পদার্থ, সামগ্রী।  
 দ্রুম—দ্রুম, বৃক্ষ, গাছ, তরু, পাদপ।  
 দ্রোণকাক—দাঁড়কাক, বায়স।  
 দ্রুম্ব—যুগ্ম, কলহ, ঘোড়, দুই।  
 দ্রাপর—তৃতীয় যুগ, সন্দেহ।  
 দ্বিকর—দুই হস্ত, দ্বিকরবিশিষ্ট।  
 দ্বিজ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পক্ষী, দত্ত।  
 দ্বিজিহব—সর্প, অহি, ভৃঙ্গ।  
 দ্বিধা—দুই প্রকার, সন্দেহ, দ্ব্যর্থ, দ্বৈধ, সংশয়, বিকল্প।  
 দ্বিপ—দ্বিরদ, হস্তী, গজ, হাতী।  
 দ্বিরাগমন—পুনরাগমন।  
 দ্বিরুক্তি—পুনঃকথন, আশ্রয়ণ।  
 দ্বীপ—চড়া, অলমধ্যবর্তী বৃহৎ স্থান।  
 দ্বেষ—হিংসা, হিংসেচ্ছা, দ্রোহ।  
 দ্বৈমাত্তুর—দ্বিমাতৃসন্তান।  
 দ্ব্যর্থ—অর্থদ্বয়বিশিষ্ট, বিবীর্ণ।  
 দ্ব্যর্থ—অর্থদ্বয়যুক্ত, ব্যাখ্যোক্তি।

[ক্রমশঃ]

আত্মজীবন-চরিত লিখতে বসছি না, তবে পঞ্চাশ বছর

আগে যখন দশ বছর আত্মজীবন বয়স ছিল, তখনকার দিনের জীবনের আত্মজীবনের একটা ছবি দেবার চেষ্টা করবো। ১৯০১ সালের কথা, তখন কলকাতায় ইন্ডুলে বর্ষ শ্রেণীতে পড়ি, এটান্স পরীক্ষা দেবার ছয় বছর আগেকার ক্লাস। আত্মজীবনকার হিসেবে মত পঞ্চম শ্রেণী। তখন কলকাতা শহরের চেহারা ছিল একেবারে অজ্ঞ রকমের, আর জীবন-যাত্রার পদ্ধতিও ছিল আলাদা।

তিন পুরুষে কলকাতার বাসিন্দে আমরা—অর্থাৎ আমি। ঠাকুরদাস বাবা, প্রপিতামহ ভৈরব চট্টোপাধ্যায়, মহাকুলীন ছিলেন। তিনি নাকি ফরিদপুর জেলার পাংশা গ্রাম থেকে এসে কলকাতা জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে সিংটি-শিবপুর গ্রামে বাস করতেন। তাঁর নাকি বাটী বিবাহ ছিল। অন্ততঃ ছেলে বয়সে ঠাকুরদাস যুখে সে কথা শুনেছি। কানও কারণে ঠাকুরদাসের উপর ঠাকুরমা চ'টে গেলে তাঁকে গল্পনা দিতেন, তোমরা ত বাটের বংশ, জীব হ'ত, ভাত-কাপড়ের কথা চিন্তা করা তোমাদের ধাত্রে লেখে না। ঠাকুরদাস আপত্তি করতেন—দুট ভাবে ব'লতেন, না, অতগুলি নয়, ঠাট্টা মাত্র বিয়ে ছিল, কিন্তু মনে হ'ত, যেন তাঁর আপত্তি তেমন জোরের হ'ত না। বিজ্ঞাপনের মতামত বহুবিবাহকারী কুলীনদের একটি তালিকা দিয়েছিলেন, তাতে কিন্তু ভৈরব চট্টর নাম নেই।) ঠাকুরদাস আমার বাড়ীতেই দুঃখে-কষ্টে মানুষ হ'য়েছিলেন। সিংটি-শিবপুরে আমাদের দু'ব সম্পর্কের জাতি করেক ঘর ছিলেন। "দেশ" ব'ললে, শিবকালে এট সিংটি-শিবপুর গ্রামকেই বুঝতুম, কারণ ঠাকুরদাস "দেশান থেকেই কলকাতায় এসে বসবাস করেন। ইটারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে একবার এই "দেশ" দেখবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল। ১৯০১ সালের কথা। আমার এক মেসোমশাই ছিলেন, এক দিকে মেসোমশাই আবার অল্প দিকে জাতি। সিংটি-শিবপুরে তাঁর বাড়ী ছিল। তিনি ঘট ক'রে কালীপূজা করতেন। "দেশ" দেখতে তার সঙ্গে একবার কালীপূজায় আমি বাই। গ্রামে আমাদের নিজের কিছুই আর নেই—আমি গিয়েছিলুম মেসোমশাইয়ের বাড়ীতে। সেখানে কিন্তু আমার পরিচয় দিতে হ'ল গায়ের ভঙ্গ-সজ্জনের কাছে, "বাঙালদের বাড়ীর ছেলে" বলে। কথাটা আমার কাছে বড় কৌতুককর লেগেছিল—কলকাতার আর পাচ-জন ছেলের মত পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা ক'রেছি, আর আমিই হ'লুম নিজের দেশে "বাঙালদের বাড়ীর ছেলে"। আত্মজীবন-চরিতের মধ্যে কারো কারো কথায় পূর্ববঙ্গের টান তুমতুম। ছেলে বয়েসেই আবছা-আবছা মনে হ'ত, সারা বাংলা জুড়েই আমাদের স্থান। পূর্ব বঙ্গ আর পশ্চিম বঙ্গ সর্বত্রই আমাদের ঘর।

ঠাকুরদাস ছেলেবেলার বা যৌবনকালের ইতিহাস জানি না। তবে তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি ফারসী প'ড়েছিলেন আগে, পরে ইংরিজী। "গোলেন্ডান," "পল্লনামা" প্রভৃতি ফারসী গ্রন্থাৎ বই থেকে বয়েং বা শ্লোক আউটে তিনি আমাদের শোনাতেন। আরও বয়েংও দু'চারটে জানতেন, তার বহুদার এখনও যেন কানের মধ্যে শুনেতে পাই। "করীমা ব-বগু" আরে বর, হাল-ই-মা" আর "ইজা ইসল ইনুদান তাগল বসান" প্রভৃতি। পাবলী কালে প্রথম ফার্সী বয়েংটা বে মতাকবি শাহী পল্লনামার প্রথম

আত্ম-জীবন

পঞ্চাশ বছর আগে

শ্রীমতী শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্লোকের আরম্ভ তা সেনেছি; দ্বিতীয়, আরও ছত্ৰটি, আর একটা বিকৃত রূপ এখনও এইভাবে মনে আছে, সেটার মূল পাইনি।

ঠাকুরদাস তখনকার দিনের বাঙালীর পক্ষে বোধ হয় নিজের চোঁয় ভালো ইংরিজী শিখেছিলেন। তাঁর নিজের কতকগুলি ইংরিজী আর বাঙালা বই ছিল। ইন্ডুলে প'ড়তে প'ড়তে সেই বইগুলি আমবা নাড়া-চাড়া ক'রতুম। বইগুলির মধ্যে "ফুদে" ফুদে" কাঠ-খোঁয়া ছবিতে ভরা একখানি "আয়েবিসান নাইটস্" এটারটেইনমেন্ট" ছিল—আরব্য-রজনীর অমর রোমান্সের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল এই বইয়ের মাধ্যমে। সব বুঝতে পারতুম না, কিন্তু প'ড়ে যেতুম। আর ছিল একখানি ইংরেজ কবি গোল্ডস্মিথের গ্রন্থাবলী। তা থেকে পরবর্তী কালে গোল্ডস্মিথের নাটক আর গল্প রচনা প'ড়েছিলুম। অল্প ইংরিজী বইয়ের কথা এখন তেমন মনে আসছে না—হয় তো একটু ভেবে দেখলে স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। "রাসতন্ত্রের" "অন্নদামঙ্গল" তাঁর সংগ্রহের মধ্যে একখানি ছিল, আর একখানি মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্য।" ইন্ডুলের ছাত্র অবস্থায় এগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আর ছিল, একখানি সংস্কৃত "হিতোপদেশ"—১৮৪০ সালের দিকে ছাপা, মোটা বাঙলা হরফে মূল সংস্কৃত, তার তলায় ছোট হরফে বাঙলা অনুবাদ। এখানিও খুব ছোটো বয়সে প'ড়ে ফেলেছিলুম। ঠাকুরদাস বই পেলেই প'ড়তেন, কি ইংরিজী কি বাঙালা। তিনি "জন্মভূমি" পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এই পত্রিকা আমরাও প'ড়তুম, বাড়ীতে আ-বাধা এর অনেকগুলি সংখ্যা ঠাকুরদাসের আলমারীতে ছিল। খুব ভাল লাগত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা "আমার জীবন"—যাতে অতি চমৎকার ভাষা লেখক উত্তর ভারতে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা ক'রেছেন। বইয়ের সখ বাবারও ছিল, ঠাকুরদাসের পড়বার জন্ত এবং নিজের পড়বার জন্ত তিনি সুযোগ পেলেই বই কিনতেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত বাবা বিরাট তিন খণ্ডে এক সেট কিনেছিলেন, সে বই ঠাকুরদাস প'ড়তেন, আমিও মাঝে মাঝে তার পাতা উলটাতুম।

শুনেছি, ঠাকুরদাস সিপাহী বিদ্রোহের সময় পশ্চিমে ছিলেন। ফিরে আসেন সঙ্গে নাকি অনেক টাকা নিয়ে। সে-সব ইতিহাস কিছুই জানি না। তিনি ভাষণ স্বরূপে লোক ছিলেন। লোক-জনকে খাওয়াতে ভালোবাসতেন। সব টাকা তিনি যখন প্রায় শেষ ক'রে দেন, তখন কলকাতায় এক সত্তাপগরী আপিলে কাজ নেন। বোধ হয় ইংরিজী, কোম্পানীর "হোস"-এ। ঠাকুরদাস

চেঁটার ক'লকাতার বাড়ির-শিমুলিয়া বা বাঁর-শিমুলে অঞ্চলে চালতাবাগান পল্লীতে তিন কাঠা জমিতে দু'টা কোঠাবর আর তার সামনে খোলার চানের একটু দালান আর খোলার চালের বাগা-বর তৈরী করেন। এটা বাড়ী আমাদের পৈত্রিক ভিটা—আগেকার ৬৪ সংখ্যক স্কিকিয়াস্ ট্রাট, এখনকার ৩ সংখ্যক স্কিকিয়াস্ বো। ঠাকুরদাশ খুব দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন, বিশেষ সুশুকর, গোধ তরু ছব ফিট লম্বা ছিলেন, আর তেমনি গৌরবর্ণ, আর টিকালো নাক। ঠাকুরদাশ বাঙ্গালীর ঘেয়ের পক্ষে বেশ লম্বা ও গৌরী ছিলেন।

আমার পিতার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বৃদ্ধ বয়সে ঠাকুরদাশর চোখে ছানি পড়ে। লেখাপড়ার কাজে কিছু কাল তিনি অক্ষম হ'য়ে পড়েন। সেট জন্ত তাঁর চাকরী যায়। সেকলে গ্রাম্য নাপিতকে দিয়ে তিনি চোখ অস্ত্র করান—তখন অজ্ঞান ক'রে বা চোখে ওষুণ দিয়ে ছানি কাটা হ'ত না। দু'জন লোক বোগীর হাত ধ'রে থাকত, আর কতকটা ছোর কোরে বোগীর জ্ঞানভঃ চোখে অস্ত্র দেওয়া হ'ত। এতেও তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। পরে তিনি আবার চাকরীর চেষ্টা করেন, দখখাল লিখে এ-আকিস দে-আকিস ঘুরে বেড়ান। বাবার বোধ হয় তখন মাসিক চল্লিশ টাকা মাইনে। তিনি ভীষণ বাগারাগি ক'রতেন, তিনি নিজের উপায় ক'রতে বড়ো বয়সে ঠাকুরদাশ যে চাকরী ক'রতে যাবেন, সেটা তাঁর পছন্দ ছিল না। বাবা মা মাইনে পেতেন, ঠাকুরদাশ হাতে এনে দিতেন, আর তাতে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, খাণ্ডী-বউয়ে সংসার চালাতেন। বাবার কোন ভাই ছিল না, ছয় বোনের একমাত্র ভাই ছিলেন তিনি। তিন বোন শিশু কালেই গল হন। আর তিন-জনের বিবাহ হয়, সন্তানবিধি ছিল।

ঠাকুরদাশ আমাদের ছেলেবেলার ইংরিজী পড়াতেন, সকালে। তাঁকেও মাঝে-মাঝে ইংরিজী বই বা কাগজ প'ড়ে আমাদের শোনাতেন হ'ত। তিনি চাকরী করতেন না, কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর সব কিছু দেখতেন। আটটার মধ্যে ভাত খেয়ে বাবাকে অকিস যেতে হ'ত, আর তিনি কিরতেন সন্ধ্যায়। স্তরবাং বৈশীর ভাগ আমরা ঠাকুরদাশই সঙ্গ পেতুম। সকাল বেলা ঠাকুরদাশ আর মা, বাবার জন্ত ভাত-তরকারী ক'রে দিতেন। দুপুর বেলায় জলখাবার ক'রে দিতেন—লুচি, আলু বেগুন বা পটল ভাজা, মোহনভোগ—একটা টিনের কোটো ক'রে বাবা নিয়ে যেতেন। একটা বিষয়ে ঠাকুরদাশ আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষায় সহায়ক হ'য়েছিলেন। তাঁর নিজের শরীর সাধারণতঃ খুবই ভালো থাকত। বাবা ছেলে-বেলার কুস্তি ক'রতেন আর গায়ের জোরের জন্তে আর বাইরে ব'লে পাড়ার তাঁর নাম ছিল। ঠাকুরদাশ সারা মাসের জন্ত “মাসকাবারীর বাজার” ক'রতেন—আমাদের ছোট সঙ্গারে সারা মাসের জন্ত ঢাল, দাল, বি, তেল, মসলা, গুড়, চিনি প্রভৃতি কিনে আনা হ'ত। বাড়ীতে একটা ব্যবস্থা তিনি করেন—আর কিছু ছুটুক আর না ছুটুক, ছেলেদের ভাতের সঙ্গে এক খামচা ক'রে দি খেতে হবে। আট সের কি দশ সের বি প্রতি মাসেই আসত। তখন ঘিয়ের মণ ছিল ৩০ টাকার উপরে নয়। চন্দ্রকোণার মটকি বা হাখরাসের আমদানী টিনের বি—সেই সুরতি কাঁচা ভরসা দি এখন দুর্লভ বস্তু। পরম ভাত, ঠাকুরদাশ

হাতের বাগা বিউলির ডাল কিংবা সোনায়ুগের ডাল, বেশ বড়ো এক খামচা সুগন্ধি দানাদার ভরসা দি, আর আলু ভাজা—সে ভুস্তির সঙ্গে খেতুম তা এখনও মনে আছে। এই সারা শিশু কাল, কৈশোরের এক প্রথম ধোঁবনে এই ঘিটুকু বোধ হয় শরীর বাঁধতে খুব কাজ ক'রেছিল। উত্তর কালে কিছু কিছু শারীরিক ব্যায়াম করার অভ্যাসও হ'য়েছিল। এই দুইয়ে মিলে, মোটেব উপর সারা জীবন স্বাস্থ্যটা বেশ ভালোই রেখেছে, এখনও এই বাট বছর বয়সে শরীরে যে স্বকল সময়, ঘটায় পর ঘটায় যেভাবে কাজ ক'রে যেতে পারি, তা দেখে আমাদের চেয়ে কমবয়সী অনেকের হিংসা হয়।

ঠাকুরদাশ ১১-৬ সালে ৮১ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অল্প কয়দিনের অনুরোধে। শেষের দিকে তাঁর ভীমরথী হ'য়েছিল, কিন্তু দেহের শক্তি অটুট ছিল। ঋাত কতটা তাঁর সব গিয়েছিল, কিন্তু মাত্ৰী দিয়ে ছোলা-ভাজা চিবিয়ে খেতেন দেখেছি। আমাদের বাশ মোটের উপর বেশ দীর্ঘজীবী। ঠাকুরদাশ দেহত্যাগ করেন ১১ বছর বয়সে। বাবা মারা যান ৮৪ বছর বয়সে। আর সেদিন ছোটো পিসীমা (অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ বোবালের মাতা) ১৪ কি ১৫ বছর বয়সে মারা যান—শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের দৃষ্টি আর জ্ঞানগোচর অক্ষুণ্ণ ছিল।

ছেলেবেলায় সব চেয়ে আগেকার কথা আমার মা মনে আছে তা হ'চ্ছে বোধ হয় আমার চার বছর বয়সের কথা, কি তারও আগেকার হ'তে পারে। বেশ মনে আছে, আমার পায়ে তখন রপোর মল ছিল; মা চোখে কাজল পরিয়ে দিতেন; মাথার চুল লম্বা ছিল, চুলের বিহীনী ক'রে তাতে একটা সোনার পুঁটে বেঁধে দেওয়া হ'ত সব চেয়ে পুরানো স্মৃতি হ'চ্ছে মায়ের মুখের গান—

“বাঙা পায়ে রাতা জবা কে দিলে মা মুঠো মুঠো,

সাধ হ'য়েছে, দে না মা পরিয়ে ছুটো—

ঘুরে কিরে নাচ'বো আমি, দেখে তুই মা হাস'বি কতো।”

মায়ের মুখে শুনে শুনে শিশুর কণ্ঠে এই গান আমিও গাইতুম। মায়ের মুখের সঙ্গল সুর আর তার স্বাভাবিক উচ্চারণ এখনও যেন কানে বাজছে। এই গান আধুনিক এক জন বড়ো গাইয়ে অনেক আসরেও গেয়েছেন এবং গেয়েও থাকেন, এবং তার রেকর্ডও হ'য়েছে। এই আধুনিক গানে অনেক কর্তব্য আছে। উচ্চারণের আড়ষ্টতা একটু কানে লাগে, কিন্তু বখনই এই গানের রেকর্ড শুনি, তখনই সেই অতি শিশুকালে শোনা মায়ের মুখের সুরের আর কথার জন্ত প্রাণের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আবার জেগে উঠে।

তার পরের স্মৃতি হ'চ্ছে, কি একটা কঠিন অনুরোধে আমার আর ছয় মাস শয্যাশারী হ'য়ে থাকতে হয়। এই অনুরোধটির একটা মন্ত বড় ডাক্তারী লাটিন নাম শুনেছিলুম। সে নাম মনে নেই। কতকটা পক্ষাঘাতের পর্যায়েই অনুরোধ। আমাদের বাড়ীর চিকিৎসা ক'রতেন সেকালের এক প্রবীণ ডাক্তার বাবু। বেশ মনে আছে, ঠনঠনের কালীবাড়ীর পশ্চিমে তাঁর বাড়ী ছিল। সপ্তাহে বোধ হয় দু'দিন, তিন দিন তিনি আসতেন। লম্বা, পাউসা চোরাঁর লোকটা, চোখে চশমা, গৌর ছিল, পায়ে বেঁটেই আসতেন,—তাঁর ডিজিট ছিল দু'টাকা, বোধ হয় আমাদের কাছে এক টাকা নিতেন—মনে হ'ত বজ্র বৈদ্য টেচি ১৬ কথা কন। বাইরে এসে তিনি মাঝ ধ'রে

ভারতে এখনো শৈল্পিক লিথোগ্রাফিকে বৈখ্যমূলক হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে মূল (original) প্রিন্ট

সংগ্রহের সখ্য অতি তল্প লোকের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এরূপ নমুনা সংগ্রহের প্রকৃত আগ্রহ না থাকলে বিভিন্ন বৈখ্য-শিল্পের মাধ্যমে শিল্প-সৃষ্টির বিকাশ হতে পারে না। শিল্প হলার নিদর্শন সংগ্রহে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্রায়ই আমাদের বলে থাকেন যে, তাঁরা কালীতে আঁকা ছবি পছন্দ করেন না, তাঁরা চান নানা বর্ণে সুশোভিত চিত্র। চিত্রের উচ্চ মূল্যের জন্য তাঁরা মধ্যে মধ্যে বিবক্ষিত প্রকাশ করে থাকেন এবং এরূপ মন্তব্য করে থাকেন যে, চিত্রশিল্পীরা কেবল ধনী ব্যক্তিদের কাছেই তাঁদের ছবি বিক্রয় করতে চান। অবস্থা এ কথাও সত্য যে, কম দামে অনেক ভাল ছবি পাওয়া যায়। যদি অন্ততঃ কুড়ি থেকে ত্রিশখানি ভাল মূল প্রিন্ট বিক্রয় হয়, তাহলে মূল প্রিন্ট অনেক কম দামে পাওয়া যেতে পারে। নইলে প্রচুর পরিমাণে একখানি প্রেট বা পাথর তৈরী করে তা প্রিন্ট করা শিল্পীর পক্ষে নিরর্থক হয়ে পড়ে। কম দামে ভাল রঙীন প্রিন্টের চাহিদা হলে লিথোগ্রাফ প্রিন্টের সাহায্য লওয়া উচিত। এগুলি সাধারণতঃ পাথরের উপর করা হয়। রঙীন লিথো পেপার ও কালী দিয়ে শিল্পীরা এই ছবি তৈরী করেন। শিল্পীর তত্ত্বাবধানে সতর্কতার সঙ্গে প্রিন্ট করা হলে ছবিগুলি ঠিক পেপার স্কেচের মতই হয়। সমস্ত পরীক্ষার পর অল্প কয়েকখানি প্রিন্ট রেখে দিয়ে বাকীগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়। শিল্পী প্রত্যেকখানি প্রিন্টের উপর স্বাক্ষর করেন ও তার নম্বর দেন। রঙীন লিথোগ্রাফের জন্য পৃথক পৃথক পাথর ব্যবহার করা হয়।

ভারতীয় লিথোগ্রাফ এখনো জনপ্রিয় হয়ে না উঠলেও এমন পথ্যানে উপনীত হয়েছে যে, উৎকৃষ্ট প্রিন্টের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বর্ত্তক প্রাচ্য কলার পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সময় অর্ধাৎ ত্রিশ বছরেরও অধিক কাল আগে প্রিন্ট তৈরীর কাজ শুরু হয়। শিল্পীরা নিজেরাই মোনোট্রাম ও রঙীন মূল প্রিন্ট তৈরী করতেন। প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু ও অজান্তের তৈরী প্রিন্ট দেখতে পাওয়া যেত। পরে হামিনো রায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য লিথোগ্রাফ সৃষ্টি করেন। আমরা মনে পড়ে, স্মরন করণ কয়েকখানি রঙীন লিথোগ্রাফ তৈরী করেন। এগুলি খুব উঁচু মর্যের প্রিন্ট এবং তিনি নিজে শাস্তি-নিকেতনে এগুলি প্রিন্ট করেন। সেই সময় (১৯২২-২৩) আমি তাঁর এক জন সহকারী ছিলাম। আমরা এক সঙ্গে বহু প্রিন্ট তৈরী করেছি। দুঃখের বিষয়, প্রিন্টগুলি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কোন শিল্পীমুরগীও এগুলি রক্ষা করার জন্য যত্ন নেননি। তরুণ বয়সে আমরা বন্ধুদের প্রিন্ট উপহার দিতাম, কারণ তখন পয়সা দিয়ে প্রিন্ট কেনার কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। মধ্যে মধ্যে আমরা মাসিকপত্রে ছাপাবার জন্য প্রিন্ট পাঠাতাম। কিন্তু তখনকার দিনে সম্পাদকরা হাফটোন ছাড়া অন্য ছবির কোন মূল্য দিতেন না। তাঁদের কাছ থেকে প্রিন্টগুলিও ফেরত পাওয়া যেত না।

## ভারতে শৈল্পিক লিথোগ্রাফি

শ্রীযুক্তনাথ চক্রবর্তী

(অধ্যক্ষ, গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস, কলিকাতা)

লিথোগ্রাফির জন্য আমরা কখনও কোন দক্ষিণা পাঠি না, ফলে এই শিল্পটি অসমর সময়ে চিত্র-বিনোদনের উপাদানে পরিণত হয়েছে। শিল্পীরা পর্যাপ্ত জ্ঞানে না যে, এই শিল্পকে যদি তাঁরা জীবিকা অর্জনের পথ বলে গণ্য করেন, তাহলে এই শিল্প কত দূর সাফল্য অর্জন করা যেতে পারে। আমি আজ সাহসের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের মধ্যে এমন কয়েক জন শিল্পী ও তরুণ ছাত্র আছেন, যারা প্রকৃতই ভাল লিথোগ্রাফ সৃষ্টি করতে পারেন এবং সৃষ্টি করেছেন—যার তুলনা অপর দেশের বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টির সঙ্গে করা যেতে পারে। এটা হয়তো না যেন নেওয়া হতে পারে, কারণ আমরা মূল প্রিন্টের জন্য কোন যত্ন লই না, এ বিষয়ে আমাদের ভাবায় লেখা কোন সাহিত্যও নেই এবং প্রিন্টগুলি সংগ্রহ করেও রাখা হয়নি।

১৯২৬-৪৭ সালে আমি যখন প্যারিস ও লন্ডনে বাই, তখন আধুনিক ভারতীয় চিত্রাবলীর সঙ্গে কতকগুলি বৈখ্য-চিত্রও নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে বোম্বাই, শাস্তিনিকেতন, কলিকাতা ও দিল্লীর কতকগুলি মনোরম লিথোগ্রাফ ছিল। বহু দর্শক এবং কতিপয় বিখ্যাত শিল্পী আমাদের প্রিন্টগুলির প্রশংসা করেন এবং লিথোগ্রাফিতে ভারতীয় শিল্পীদের দক্ষতায় বিষম প্রকাশ করেন।

গত ত্রিশ বছরের মধ্যে যে সব ভাল লিথোগ্রাফ তৈরী হয়েছে, সেগুলি যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করে সংগ্রহ করেন, তাহলে সেগুলি এ বিষয়ে একখানি ভাল প্রামাণ্য পুস্তকের উপকরণ হবে এবং প্রত্যেক দেশে তার আদর হবে।

আমাদের সমালোচকরা এবং জনসাধারণ এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিল্পের নিদর্শনগুলি অল্প মূল্যে পাওয়া দরকার। কিন্তু ভাল প্রিন্টের দাম যদি কম করা হয়, তাহলে তার প্রতি কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। শিল্পীমুরগী কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখেছি যে, এই শিল্প উপলব্ধি করার মত চোখ তাদের নেই আর প্রিন্ট কিনে তাঁরা পয়সা নষ্ট করতে চান না। সেই জন্য এখন এই ধরনের বৈখ্য-শিল্পের প্রচারকাণ্ড একটু বৈধী করে চালান দরকার।

শৈল্পিক লিথোগ্রাফ ঠিক মূল চিত্র বা স্কেচের মতই স্মরণীয়। এই জন্য প্রিন্টগুলিকে মূল প্রিন্ট বলা হয়। আমাদের সাধারণ বা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানগুলি খুব অল্প দামে এই সব মূল প্রিন্ট দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান, পাবলিক হল, লাইব্রেরী এবং বাড়ির বৈঠকখানায় যদি কয়েকখানি ভাল প্রিন্ট সজ্জিত ভাবে টাঙ্গিয়ে রাখা যায়, তবে তা দেখতে বেশ ভালই লাগবে। এতে সংস্কৃতি, মর্যাদা ও মার্জিত রুচি প্রকাশ পাবে এবং আমাদের দায়ব পক্ষে আরামদায়ক হবে।

শৈল্পিক ডাকতেন, "ঈশ্বরবাবু", আর আমি তাঁর আসার খবর শুনি। তাঁকে বড় ভয় করতুম, একটু সংবত হয়ে থাকতুম। এই ডাক্তার বাবুর মত বড় এক বড়ী ছিল আর একটা মোটা সেনার চেন। এই চেনতল ঘড়ীটা আমাকে আকৃষ্ট করত। সাধারণ

শুয়ে শুয়ে চিনের তৈরী ঘোড়া আর গাড়ী নিয়ে আমার দিন কাটত। তখনই, এই অন্তরের ফলে একটা অঙ্গহানি হবেই। আমার চোখের দৃষ্টিকোণ—মাইওপিয়া—এই অন্তরের অন্ততম ফল। এই দৃষ্টিকোণ আমার পূর্বে বাড়ীতে কারও ছিল না।



ভাত —তারকনাথ মুখোপাধ্যায় ( কলিকাতা )  
( প্রথম পুরস্কার )



বিস্ময় —রূপীজ্জকুমার আঢ়া ( কলিকাতা )



আনন্দ —দেবপ্রসাদ সরকার ( বালি )



শীতের বেলায় —সত্যরত্ন বার ( কলিকাতা )



ଆ ଓ ଶିଳ୍ପ  
( ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ )

—ଜୀବନ ଦର୍ଶନ (କଳାକାନ୍ଦ)





সুপ্তি

—বিজনকুমার মিত্র (কলিকাতা)



তন্ময়

—শান্তিনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)



অবাক

—সুবকুমার বোস (কলিকাতা)



বিস্ত

—অজয় বোস (কলিকাতা)



বিশ্বল ( দ্বিতীয় পুরস্কার )

—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী ( কলিকাতা )

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

বিখ্যাত মূর্তি

প্রথম পুরস্কার—১৫১

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০১

তৃতীয় পুরস্কার—৫১





মাতৃস্নেহ

—দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

### —প্রচ্ছদপট—

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আমরা বিরজানন্দ মহাপাত্রের প্রতিকৃতি মুদ্রিত হ'ল। তিনি সম্প্রতি বেলুড মঠে মহাপদার্থ লাভ করেছেন।

### —রচনা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে—

রচনা প্রতিযোগিতার পর্যাপ্ত পরিমাণে লেখা না পাওয়ায় কা'কেও পুরস্কার দেওয়া হ'ল না। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা মাসিক বঙ্গমতীর বর্তমান এবং আগামী কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যায় শ্রীচিন্তরঞ্জন দেব (শান্তিনিকেতন), শ্রীচিরন্তন মুখোপাধ্যায় (ভাগলপুর) এবং শ্রীপ্রভাত বসু (কলিকাতা) প্রভৃতির রচনাগুলি প্রকাশিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু তথ্য-সম্বলিত একটি রচনা লিখেছিলাম।

‘মাসিক বনুমতী’তে তার তিন কিস্তি পড়ে, সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত মলুটি-নিবাসী লীযুক্ত দৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন “.....‘প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ’ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি.....একটি বিষয় জানাবার আছে—শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র, অধুনা কামসেদপুর-নিবাসী শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণিত পিতৃদেব মলহাটি-নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম এই প্রবন্ধের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমেও কেন উল্লিখিত হয়নি—কারণ ব্রহ্মণ্য না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঘোর বাবুকে শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক ও আচার্য-পদে নিযুক্ত করেন। তখন সেখানে বিজ্ঞান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে অঘোর বাবু ‘মেয়েলি ব্রতকথা’ নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। এবং ইনি নানা বিষয়ে শান্তিনিকেতন তথা কবির সহিত সন্নিহিত ছিলেন।.....” রচনাটি তখনো ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ছিল। পরবর্তী অংশে গত ফাল্গুন-সংখ্যাতই অঘোরনাথ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই পিতা-পুত্রের লেখা ‘শান্তিনিকেতন-আশ্রম’ নামক বহু তথ্যপূর্ণ নব প্রকাশিত পুস্তকের কথাও বলা হয়েছে। পত্র পাওয়ার পূর্বেই, এ সম্পর্কে জ্ঞান বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তার ফলে গুরুদেবের সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু আমাদের জানাবার সুযোগ হয়। তাঁর পিতার লিখিত পুস্তক ও জ্ঞান বাবুকে লেখা গুরুদেবের হাতের কয়েকখানি পত্র ইতোমধ্যে দেখতে পাই। অতঃপর এই বর্তমান রচনা ‘রবীন্দ্র-প্রগণ্ডে’ হস্তক্ষেপ করি। জ্ঞান বাবুর নিকট হতে শোনা অনেক তথ্যও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যে অনুপ্রাণের কথা সকলেই জানেন। সহজ, স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে সাধারণের আনন্দ-বেদনার সম্ভাব্য অনুরূপিত দেখানে শতধারার প্রবাহিত, যার মধ্যে জাতীয় ঐতিহ্য ও সমাজ-ব্যবস্থার নানা তথ্য ও রসমাধুর্য নিত্য জীলারিত, সেই ছড়া, কিংবদন্তী, কবিসংগীত, পাঁচালি ইত্যাদি নিয়ে এককালে কবি যথেষ্ট কাজ করেছেন। সেগুলি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করে প্রবন্ধ ও ক্রমে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারে সেগুলিকে রক্ষা করেছেন, এবং সরস ও সুগভীর ব্যাখ্যার নব নব আলোকপাতে তাদের প্রতি সর্বলোকের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন,—এ সব কাজেরই সাক্ষ্য বহন করে তাঁর স্মরণীয় ‘লোকসাহিত্য’ গ্রন্থ। কিন্তু সে গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তাঁর একাধিক অগব্যসায়ের ফল। তিনি সাধারণত সম্মেলনে, ছাত্রসম্মেলনে, দেশের সাহিত্য পরিষদে, সভাসমিতি নানা স্থলেই সাধারণকে, বিশেষ ভাবে ছাত্র ও যুবকদের, এ কাজে অগ্রসর হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন;—তিনি অল্প লোককেও এ কাজে উৎসাহিত করে ব্রতী করেছিলেন এবং তা থেকেও অনেকটা কাজ হয়েছিল; প্রসিদ্ধ সাহিত্যচ্যাব দৌলেন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ রচনার উপলক্ষে কবির পত্রাদি ও সমালোচনা সাহিত্যিকদের কাছে সুবিদিত আছে। তা থেকে সেই কালে “বঙ্গসাহিত্যের রাজার অভিনন্দন সেই রাজ্যে নতন প্রবেশাচারী পক্ষে বত আদর সম্মানের, তাহা সংক্ষেপে অহুমান” করতে পারি। তাঁর পরিচিত অনেক ব্যক্তি তাঁর উৎসাহ পেয়ে লোকসাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হয়েছিলেন,—তাঁদের এক জন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পত্রলেখক ঠিকই বলেছেন। অঘোরনাথ ব্যাপক ভাবে

# প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ

(আলোচনা)

শ্রীমদীরচন্দ্র কর (শান্তিনিকেতন)

[“প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ” বিষয়ের লেখাটি ধারাবাহিক কয়েক সংখ্যায় মাসিক বনুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে যে-আলোচনা চলতে থাকে এই আলোচনা তারই ব্যাখ্যা। লেখক যে-সকল পত্র পেয়েছেন তাদেরই ক্ষণিকের আছে এই লেখাটিতে। রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-জীবনের উদ্ঘাটিত নতুন তথ্য সম্বলিত। কবিত্বকর কয়েকটি আদৌ অপ্রকাশিত চিঠিও লেখাটির অন্ততম সম্পদ।—স]

সাহিত্যচর্চা করতেন। পত্রলেখক ‘মেয়েলি ব্রতকথা’ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানির নাম ‘মেয়েলি ব্রত’। আর, তথ্য ‘রবীন্দ্রনাথের উপদেশ অনুসারে নয়’, রবীন্দ্রনাথের লিখিত একটি নাস্তির্ঘর্ষ ভূমিকার সন্নিবেশ নিয়েও, পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়, ১৩০৩ সালে। বইখানির এক খণ্ড মাত্র জ্ঞান বাবুর সংগ্রহে রক্ষিত আছে। ভূমিকাপত্রখানি স্থলিত ও এমন জীর্ণ যে, তা অচিরেই চূর্ণ হয়ে যাবে। কবির রচনাটুকুরও সে সঙ্গে চির-অন্তর্ধান হবার সম্ভাবনা থাকায়, সেটুকু নিয়ে উদ্ধার করে রাখা গেল :

## ভূমিকা

সাধনা পত্রিকা সম্পাদন কালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোর বাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হান্তকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা গভীর প্রকৃতির লোক এবং একদম হুঃসহ গাভীয়া বর্তমান কালে বঙ্গ-সমাজে অতিশয় মূল্য হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাঁহারা বাল্যসম্পর্কার সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কাণ্ড সকলও তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাঁহারা সর্দা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোন মূর্ত্তে কেহ তাঁহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কুপাকটাকপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অন্তলম্পর্শ গাভীয়া এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্যন্তরীণ মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোন লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

যুগোপায়ী পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সন্ধান বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জা

যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তঃপুরের সতিত ভাঙ্গিয়াছে তাহারা স্বদেশের সতিত সর্বোচ্চভাবে অন্তঃপুরে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যক্তিগে লেই পণ্ডিত কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাদনায় বহন আমি গ্রন্থি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোন প্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুপাতাগুলি যে অন্তঃপুর, তাহাইই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ব বশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের দ্বী কহা সহোদরদের খোমল-ছদয় পালিত মধুর কণ্ঠললিত চিস্তন কথা-গুলিকে স্থায়ী ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোর বাবুকে এই সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীরপ্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোন প্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ প্রচলিত পার্বণগুলির উৎসল ও স্মরণ চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেশকুমার বাবু সেগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কাসিয়া

৭ই কার্তিক

১৩০৬।

শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অঘোরনাথের লেখা আরো বই আছে। সমসাময়িক সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকদের দ্বারা সেগুলি সমাদৃত হয়েছিল। অঘোরনাথ সাহিত্য ও ধর্ম-অনুশাসনে বৈষ্ণব সাধনা ও সাধকদের জীবনী নিয়ে সলজ্জ সরস স্তম্ভিপুণ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে থেকেও তার জ্ঞান সাধুবাদ এসেছিল। ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাদনা'তে 'ভক্তচরিতামৃত' গ্রন্থের সমালোচনায় কবি লিখেছেন: "সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোর বাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবধর্মের নিগূঢ়ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধর্মবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সতিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুধু শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাউতে পারে, কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য—মানব-জীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অমৃতত্ব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের কথা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়, অতএব বৈষ্ণবধর্মের সুগভীরত্ব সকল বীহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা অঘোর বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইবেন।" অঘোরনাথ প্রচলিত অর্থে উচ্চশিক্ষা বলতে বা বোঝায় তাঁর স্বযোগ পান নাই। তাঁর সাংসারিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। তবু

দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর সাহিত্য-সাধনা আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রতিভার সম্মান তিনি দিয়েছেন। কবি উপদেশ তাঁকে উৎসাহিত করেছিল। 'মেয়েলি ব্রত' ছাড়াও নানা গ্রন্থ রচনাতেও সে-উৎসাহের বোগ যে অব্যাহত ছিল, এই পুস্তক সমালোচনাই তার আভাস দান করে। 'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় অঘোরনাথ লিখেছেন:—

"পরম শ্রদ্ধাশ্রম কবির শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিশ্রম ও উপদেশ অনুসারে এই গ্রন্থোৎসাহিত মেয়েলি ব্রতের বিবরণগুলির অধিকাংশই ইতঃপূর্বে 'সাদনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাই উপদেশ মত ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তিনি অমুগ্রহপূর্বক এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"এস্থলে বলা আবশ্যক, হুগলি, বর্ধমান ও বীরভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত কয়েকটি মেয়েলি ব্রতের বিবরণ এই গ্রন্থে সংলিখিত হইল। স্থানভেদে এই সমস্ত ব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ছড়ার কিছু কিছু রূপান্তর ও পাঠান্তর পলিলক্ষিত হইয়া থাকে।"

অঘোরনাথের 'পরম শ্রদ্ধাশ্রম' ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যালয় এসেছে তার অনেক পরে। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক ব'লেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তা'হলেও বিচক্ষণ লোক মাত্রেই তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাঁকে 'গুরুদেব' এই শব্দটি দ্বারা কে প্রথম অভিহিত করেন, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। শোনা যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এ সম্বোধনের প্রবর্তক। শান্তিনিকেতনের অস্বত্থম প্রথম ছাত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে ব্রহ্মবান্ধবের কথাই বলেন। প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনের প্রাচীন যুগের অধ্যাপক স্বর্গত কবি সতীশ রায়ের লিখিত একখানি পত্রের অংশ-বিশেষ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনিকেতন থেকে ১৩০১ সনের ফাল্গুন (?)এ স্বর্গত অমিত্রকুমার চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে সতীশ বাবু লিখেছেন: "রবি বাবু Porse-এ কলম ধরিয়েছেন এবার আমার বাল্লভার আর এক চমৎকার কবিত্ব-মন্দিরের সিংহদ্বার খুলিবে (খুলিবে?)। গুরুদেবের রচনা ঠিক প্রকৃতির মত। আমি এই প্রান্তব-পারে অজুত শালবনে বেড়াইয়া প্রকৃতির যে ছন্দস্বর যুগ দেখিতে পাই উহার লেখার ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। 'গুরুদেব' বলিয়াছি— কারণ কি জান? এই দেখ চারিদিকের ছপুয়ের রৌদ্রে (রৌদ্র?) নিঃশব্দে পড়িয়া আসিতেছে—এই সময়ের এমনি একটি করুণ দৃষ্ট আছে তাহা বুঝানো যায় না—এমনি একটি নরম দৃষ্টি ঐ স্রুত্ব আকাশ হইতে আমাদের উপরনে আমাদের প্রাণের উপর চাপা ফুলের জ্যোতিঃ ফেলিয়াছে—মাঠের এক দিক হইতে বাতাস নামিয়া আরেক দিকে পালাইতেছে—যে এই সময়ে কেবলমাত্র গভীর অনুরাগগুলিই ছন্দয়ের মধ্যে বসিয়া থাকে—কত শালবন মনে পড়িতেছে—আর মনে পড়িতেছে অন্তর-বাহিব-স্বন্দর আমার ললাটের দেবতা রবিবাবুকে। সেই জ্ঞান ইচ্ছা হইতেছে উ'হাকে নানা মধুর নামে জ্ঞাপিত করি। তাই ইটি উটি বলিয়া শেষে

‘গুরুদেব’ বলিলাম—কিন্তু উচ্চাস ষাউক।—(বিশ্বভারতী পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ১৮৭—৮৮)।

অমুমান করা যেতে পারে, লিখিত ভাবে সতীশচন্দ্রই এই প্রথমে “গুরুদেব” আখ্যা ব্যবহার করেন। এর আগে কারো লেখাতে এই আখ্যা আর চোখে পড়ে না। কিন্তু যিনিই এ নামের প্রবর্তন করে থাকুন, একটি প্রিয় এবং যথাযোগ্য শব্দের সদ্যব্যবহার তিনি কয়েক ছিলেন। কবি সকলের কাছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই “গুরুদেব”, কিন্তু আধ্যাত্মিক দীক্ষাভ্যাসের একটি বিশেষ পরিচয়ও যে তাঁর আছে, অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। কবির কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্প ব্যক্ত করে জ্ঞানেন্দ্রনাথ কবিকে একখানি পত্র দেন। কবি তাতে যে উত্তর দেন, তার মধ্যে এক দিকে ফুটেছে তার স্নেহ, অপর দিকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্যকে প্রত্যক্ষ করার পথে সমস্ত ভয় লঙ্কা সফোচন দূরীকরণ অগ্রদূত হবার জন্য উদাত্ত আহ্বান। কবি লিখছেন :

ও

গোলপুর

কল্যাণীয়েশু

অজ্ঞ তোমার চিঠি পাঠিয়া আনন্দিত হইলাম। অনেক দিন হইতে মনে মনে যে ধখে তুমি বিশ্বাস পোষণ করিতেছ, সেই ধখে দীক্ষা গ্রহণ যে তোমার কর্তব্য, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। অল্পকরণে যদি সত্যের আবির্ভাব হয় তবে সর্বপ্রকারেই তাহাকে স্বীকার করিতে আমর বাধ্য। সমস্ত জীবনকে সত্যের অন্তর্গত না করার মত এমন গ্রানি আর কিছুই নাই। তুমি নিশ্চয়ই তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে প্রয়াস হইয়াছে, ইহাতে আমি বিশেষ আনন্দপ্রাপ্ত করিয়াছি। যিনি জগতের ধন মান খ্যাতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহাকে গোপন করিব কেন? বাতি যেমন তাহার আলোকশিখাকে সকলের উদ্ভে তুলিয়া ধরে এবং একরূপে পরিদীপক আলোকিত করিতে থাকে, তেমনি করিয়াই আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আবির্ভাবকে কোনো কারণেই প্রচ্ছন্ন না রাখিয়া তাহাকেই সকলের উদ্ভে প্রকাশ করিব এবং তাহার আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে থাকিব। আলো যখন ভালো করিয়া না ধরে তখনই ঘোঁরা বাহিব হইয়া কান্দিমায় সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে—আলো যখন ধরয়া উঠে তখন সমস্ত সৌন্দর্যকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সমস্ত সংশয় সঙ্কোচকে কাটিয়া এলিয়া প্রকৃতিতে তেজে দীপ্যমান হইয়া প্রকাশিত হয়। তোমার জীবনের যে শ্রেষ্ঠ সত্য তাহাও তোমার জীবন-বস্তিকার মুখে এমন প্রকাশিত হইয়া প্রকাশ পাক। তাহার সমস্ত ভয় লঙ্কা করিয়া এক দুহুর্ভে দূর হইয়া যাওয়ার সঙ্গে তোমার অনন্ত জীবনের পথ তাহাকেই তোমার সমুখে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিক—তোমার কণ্ঠ ও আকাজক্ষা সত্য হউক—সত্যের দ্বারা সম্পূর্ণ হইয়া এই আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি।

তোমার যদি দান করিবার মত কোন সম্বল থাকে তবে তুমি এমনি করিতে আসিলে তাহা লাভ করিবে। ইতি ৪ঠা পৌষ ১৩১৫

সত্যানুধারী

ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘোরনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের সম্পর্কে ‘মলুট’র পত্রলেখক দৌরীন্দ্র বাবু লিখেছেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। অনেকের ধারণা এইরূপই। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ এখানকার প্রাক্তন ছাত্র নন, ছাত্র ছিলেন তিনি বোলপুর স্কুলের। সে স্কুল ছিল তখন বাঁধপোড়ায়। তাঁরা শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পর শান্তিনিকেতনে স্কুলের ব্যবস্থা হয়। অঘোরনাথ তখন আশ্রমের কাজ নিয়ে আছেন; বালককে পড়তে হত ভূবনডাঙ্গা বাঁধের পাড় দিয়ে ঝেঁটে গিয়ে। তাঁর সেই দিনের স্মৃতি থেকেই জ্ঞান বাবু “প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথের” অন্তর্গত কয়েকটি কথা সংশোধন করে দিয়েছেন। ভূবনডাঙ্গার আদি নাম ছিল ভূবননগর। ভূবনডাঙ্গার আদি বাদিন্দা লিখেছিলেন,—দ্বারিক ডোম। জ্ঞান বাবুর কাছে জানা গেল,—গাঁয়ের পশ্চিমপাড়ার মুসলমান-পরিবারই সেখানে অধিষ্ঠিত ছিল আগে থেকে, দ্বারিক আসে পরে। দ্বারিক ডাকাত ছিল না, ছিল সাধারণ গৃহস্থ, পেশা ছিল বরকন্দাজগিরি। নবীনচন্দ্র যুগোপাধ্যায়ের ‘ভূবননোতিনী প্রতিভা’র দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়নি। সাহিত্যসাধক-চরিত গ্রন্থমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে বেরিয়েছে মাত্র উক্ত কাব্যের কবি নবীন বাবুর পরিচয়। আর সেটি যে প্রথম সংস্করণ, এ তথ্যটিতেও জ্ঞান বাবু সেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আশ্রম বিদ্যালয়ে আগমন সম্বন্ধ তাঁর পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবির পত্রখানি নিয়ে দেওয়া গেল। এর মধ্যে অঘোরনাথের প্রতি কবির আন্তরিকতা প্রকাশমান; বীরভূমের জঙ্গলকণ্ঠের কথা ইত্যপুর্বেই আলোচিত হয়েছে, কিন্তু তার উপর কুপথননের লোকাভাবের কথা এখানে সম্প্রদ; অন্তর্য্য এখানকার গ্রীষ্মকালের অবস্থা সহজেই অন্তর্ময় এবং কবির কাজের চক্ৰহতাও সেই সঙ্গে বোধগম্য। কবি লিখছেন :

ও

গোলপুর

সবিনয় নমস্কার

তোমার পুত্র বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম।

যে পর্য্যন্ত সে আইন শিক্ষায় প্রবৃত্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে এখানকার বিদ্যালয়ে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছি ইহাতেও আনন্দ লাভ করিলাম।

এখানে সে যখন ইচ্ছা আসিতে পারে এবং যত দিন ইচ্ছা থাকিতে পারে, কোনো বাধা নাই।

এখানে তার খরচ ত কিছুই লাগিবে না, যদি কোনো প্রয়োজন ঘটে বিদ্যালয় হইতে সাহায্য লইবে।

বিদ্যালয়ের কাজ ভালই চলিতেছে। তুমি তোমার ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একবার দেখিয়া যাইয়ো।

তোমার সন্ধানে ওখানে ইদারা খননে অভিজ্ঞ ভাল লোক আছে কি? গভীর ইদারা খুঁড়িতে হইবে—১০০০/১২০০ টাকা খরচ হইবে কিন্তু লোক পাওয়া ভাল হইয়াছে। ইতি ১১ ফাল্গুন ১৩১৫।

বাঃ ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্ঞানেন্দ্রনাথ যৌবনে শান্তিনিকেতনের কবির প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে যোগদান করেন। প্রায় তিন বৎসর তিনি

আশ্রমের সেবার নিযুক্ত ছিলেন, পরে আশ্রমের কাজেই কলকাতায় বান। আশ্রমগুরু কবির আশীর্বাদ, উপদেশ, উৎসাহ তাঁর এক জন আশ্রমকর্মীর জীবনের গতি বিশেষ-বিশেষ পর্বে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে, অতঃপর খানকয়েক পত্রের মধ্য দিয়ে সেই ইতিহাস এখানে উদ্ঘাটিত হবে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদার প্রভাব আশ্রমের গুটিকয়েক ছাত্রের জীবনেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাইরের বিস্তৃত সংসারের মধ্যেও বাতে তা কার্যকরী হতে পারে, সেদিকে আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি পরিকল্পনার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সেটি প্রকাশ পেয়েছে একখানি পত্রে। শিলাইদহ থেকে আশ্রমমাসিক ১৩১৭ সালে তিনি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন—

কল্যাণীয়েষু,  
তোমার চিঠি পেয়েছি—কিছু জবাব দেবার সময় পেয়ে উঠিনি। তারপরে কাল অজিত [ ৮ অজিত চক্রবর্তী ] এসে পড়েছে—তার সঙ্গে বে বকম আলোচনার ভিড় পড়ে গেছে, তাতে শীঘ্র আর সময় পাবও না। তোমাদের বিতালয়ের ভূগোল প্রভৃতির শিক্ষার ব্যবস্থা এবার ফিরে গিয়েই করব—বোধ হয় নতুন লোকের প্রয়োজনই হবে না।

\*\*\* বলে একটি ছেলে তোমাদের ওখানে গেছে। তার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তাকে কিছু দিন আমি আর্থিক সাহায্য করেছিলুম। তারপরে তাকে কিছুদিন তোমাদের কাছে থাকবার সম্মতিও দিয়েছিলুম। আমি মাঝে মাঝে অল্প বয়সের যুবক ও ছাত্রদের বিতালয়ে অতিথিরূপে রাখতে ইচ্ছা করি। আমাদের বিতালয়ের ভিতর যে spirit কাজ করছে সেটা এই বকম করে বাইরেও কতকটা বিস্তৃত হবে—এটা দরকার। আমাদের সেকালের আশ্রমেও এই আনাগোনার নৃত্রে দেশে অনেক ideal ছাড়িয়ে পড়বার সুবিধা পেত। এইটে হলে আমাদের আশ্রমের উপযোগিতা আরও অনেকটা বেড়ে উঠবে। এই ছেলেটিকে কিছুদিন তোমাদের মাঝখানে স্থান দিতে পারলে ভাল হয়। সবাইকে আহ্বান কর, সবাইকে টেনে নেও, সকলেরই মধ্যে উত্তেজনা হোক। আমাদের ভিতরের সঙ্গে বাইরের যোগ প্রসারিত হতে থাক—নইলে ক্রমে আমাদের এটাও একটি দলের মত সঙ্গী হয়ে পড়াবে। আমাদের ওখানে যারা অতিথিরূপে আসবে তাদের কেবল রান্নাঘরে খাওয়া দেওয়া বা কোথাও শুতে দেওয়া নহে—তাদের কাছে টেনে নিয়ে তাদের চিন্তার অঙ্গ দেবার চেষ্টা করো। তারা কেবল খবর মধ্যে নয়, যথার্থ আমাদের আশ্রমের মধ্যে আশ্রয় পায়, এইটেই আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত। কাউকে যেন আমরা দূরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা না করি। আমাদের আশ্রমের দুই বাহু সকলের দিকে প্রসারিত হোক এই আমি কামনা করি।

তত্ত্বাধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর থেকেই আমরা জানতে পারি,—শান্তিনিকেতনের শিক্ষা কোনো দল-বৈধ নয়, স্থানের বিশেষ গণী ঘেঁষেও তা নেই; এখানে থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ও সংগঠনের প্রয়াস চলেছিল বাইরেও—যুবক ও ছাত্রমহলের সহযোগে বেচে। পত্রোদ্ধৃতি

রূপায়িত করতে চেয়েছেন। তাঁর 'প্রসারিত দুই বাহুর প্রীতি-আহ্বান চিরদিনের মতো রয়ে গেল এই পত্র মাসিক সকলের জন্ত। আশ্রমের ও বাইরের বহু ছাত্র-ছাত্রী এবং অতিথি-অভ্যাগত মিলে অগণিত লোকের আসা-যাওয়া অহরহই ঘটছে শান্তিনিকেতনে। কতৃপক্ষ এবং কর্মসংঘও রয়েছে সেখানে নিত্যই বহু কর্মরত। সকলের পক্ষেই সকল-কিছু সার্থকতার আগে আশ্রমগুরু এই আহ্বানটি শ্রবণীয়। আশ্রমের যোগে সকলের মধ্যে উদারতা বৃদ্ধি পেলে তবে আশ্রম সার্থক হবে।

কবির সঙ্গে এককালে অচ্যুত শ্রীহরিনাথ সরকারের শিক্ষা-সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পাটনা থেকে কলকাতা যাবার পথে কখনো কখনো তিনি শান্তিনিকেতনে অবস্থান করে যেতেন। আশ্রমে একটি ম্যাজিক ল্যাক্টার্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে সেটি এনেছিলেন। কিছু যথাযথ যুক্ত প্রাইডের অভাবে জিনিষটির তেমন ব্যবহার ছিল না। একবার যত্ন বাবু এলে জ্ঞান বাবু তাকে লন্ঠনটি দেখান। যত্ন বাবু অল্পকাল পরেই সেটিকে কাজে লাগাবার জন্য ভারত-ইতিহাসের বিখ্যাত স্থাপত্য ও বিবিধ স্থানের চিত্রযুক্ত বহু প্রাইড আশ্রমকে উপহার দেন। সন্ধ্যার বিনোদন-পর্বে প্রাইডগুলির সাহায্যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গল্প বলে বলে ছেলেদের শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করতেন জ্ঞান বাবু। তিনি দূরবীণ সহযোগেও উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের বিনোদনের কাজ করতেন। বিনোদন-পর্বে আনন্দদাতাদের কথা প্রবন্ধান্তরে অন্তর [ "শান্তিনিকেতনের বিনোদনপর্ব," যুগান্তর ৫, ৬, পৃষ্ঠা ১৩৫৭ ] বলা হয়েছে; এক জনের কথা সেখানে বাদ পড়েছিল। জ্ঞান বাবু মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এঁদের এক জন ছিলেন শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন। জীবন কেটেছে তাঁর আশ্রমে শিশুদের অধ্যাপনায়। আন্তো শান্তিনিকেতনে 'তেজেশ' নামে সকলের চেয়ে বেশি চেনে-জানে এবং ঘিরে থাকে শিশুর দল। গুরুদেব যে আশ্রমের শিক্ষা-ব্যাপারে খুঁটিনাটি কত বিষয় নিয়ে ভাবতেন, কত কাজে কত যত্ন নিতেন নানা ক্ষেত্রেই তাঁর পরিচয় আছে। জ্ঞান বাবুকে লিখিত চিঠির আরেকখানির অংশবিশেষ থেকে তাঁর নিদর্শন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। ভূগোলের কথা পূর্বোক্ত চিঠিখানির মধ্যে আছে; ইতিহাস শিক্ষা এবং অজ্ঞাত বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাবে এইখানিতে।

পূজার ছুটিতে জ্ঞান বাবু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তাঁর সঙ্গে শিলাইদহ গিয়েছিলেন। কয়েকটি ছাত্র আশ্রমে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; গুরুদেব তাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে জ্ঞান বাবুকে এক বকম জোর করেই আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ছুটির মধ্যেই। কবি ছাত্রদের ইতিহাস শিক্ষার কথা ভাবছেন, নাটক লেখার ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহাসিক রেখালিপিও প্রস্তুত করেন। নাটকখানি খুব সম্ভব 'অচসায়ন'। ১৩১৮ সনের আশ্বিন-সংক্রান্ত 'প্রবাসীতে' এটি প্রকাশিত হয়।

বিতালয়ের অকিস তখনো গড়ে নাই, গুরুদেব হিসাবের কথাও ভাবছেন। এই অকিস আরম্ভ হলো, জ্ঞান বাবুকে আরো অনেক ভাব নিতে হলো। তাঁর ইতিহাস একটুখানি শ্রীযুক্ত কিতানেন্দ্র সেন 'প্রবাসীতে' লিখেছেন। জ্ঞান বাবুর লেখা ইংরাজি প্রবন্ধ 'Rabindranath and His Ashram School (Vibhag

নাম গোপন ক'রে বিবরণটির উল্লেখ তাতে আছে। আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন-নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ঘণ্টা বাজাবার ব্যবস্থা আছে, তার প্রবর্তন করেন জ্ঞান বাবু। গণিতের শিক্ষক হয়ে এলেও তাঁর উপর ক্রমে ভূগোল এবং ইংরেজি পড়াবারও ভার পড়ে। অমুখ্যদের কাজেও কবির নির্দেশে অধ্যাপকদের সঙ্গে জ্ঞান বাবুকেও রত থাকতে হয়েছিল, সে-প্রসঙ্গ পরে আসবে।

ছেলেদের হাত-খরচ ও খাতাপত্র টুকিটাকি কেনার খরচ বাবদ অভিভাবকগণ সামান্য কিছু অর্থ আশ্রমের কতৃপক্ষের হাতে জমা রাখেন। জিনিস কেনাকাটা ও হিসাবপত্র রাখার কাজ কতৃপক্ষের তদারকানে ছেলেরাই করে থাকে। এই ব্যবস্থায় রক্ষিত অর্থ-ভাণ্ডারের নাম 'ডিপোজিট'। গুরুদেবের অসংখ্য ভাবনার মধ্যে তুচ্ছ সেই ডিপোজিটও স্থান পেয়েছে। পক্ষে ইতিহাসের রেখাসিঁথির প্রসঙ্গের পর ডিপোজিটের কথাটিরও তিনি উল্লেখ করেছেন। লিখছেন :—

শিলাইলা

"কল্যাণীয়েষু

আশ্রমে গিয়ে বেশ আনন্দে আছি শুনে সুখী হলাম। \* \* \* \*  
\* \* \* ঐতিহাসিক রেখাসিঁথির একটা শব্দ খসড়াই কাল তোমার কাছে পায়িয়ে দেওয়া যাবে—ছেলেদের পূরণ করতে দিলে তাতে তাদের ইতিহাস চর্চায় সুবিধা হতে পারবে। আর একটি কাজ আছে। ছেলেদের দিয়ে সমস্ত মুসলমান ও ইংরেজদের ভাষ্যত-ইতিহাসের একটা Synopsis আমি চাই। তার থেকে ইতিহাসের একটা Analytical Table আমি তৈরী করে দিতে চাই—তাতে খুব উপকারের আশা করি।

নাটকটাকে হাত থেকে খেঁড়ে না ফেলতে পারলে নিয়মাবলী রচনার সুবিধা হবে না। বোধ হয় সেটা আর বড় দেরী নেই।

Deposit ব্যাপারের একটা কার্যপ্রণালী ঠিক করে দাও এবং তার পর্যবেক্ষণ ও চালনার ভারটা তুমি নাও—ওটা বিভাগয়ের ভারি একটা উৎপাত হয়েছে।

সন্তোষ কেমন আছে ?

ছেলেদের আমার আশীর্বাদ দিয়ে। ইতি ২২শে কার্তিক ১৩১৭

গুভাকাজী

যাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিভাগয়ের ছাত্রদের বিনোদনের জন্যই কবির প্রথম ঋতু-নাটকের উৎপত্তি। দ্বী-ভূমিকা-বর্জিত ঋতু-নাট্য শারদোৎসব, কালন্দী এবং অস্ত্র ধরণের অচলারতন, ডাকঘর ইত্যাদি বাইরেও বহু জায়গায় স্থল-কলেজে অভিনীত হয়ে থাকে। এরূপ, 'হাস্যকৌতুক' 'ব্যঙ্গকৌতুক' আছে আরেক ধরণের, মনে হয় যেন বিশেষ ক'রে বিভাগয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্যই সেগুলি লেখা। ইংরেজি ধরণের অমুকরণে এদের রচনা, সে কথা কবি ভূমিকাতাই বলেছেন ; "ইরোপে শারাদ, Charade নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অমুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেয়ালি বঙ্গা করিতে গিয়া লেখা সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছিল—আশা করি সেই হেয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট

স্বীকার করিবেন না। এই হেয়ালিনাটোর কয়েকটি বিশেষ ভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।"—(হাস্যকৌতুক) ইতঃপূর্বে লিখিত পত্রাদির মধ্যেও পরিবারে 'শারাদ' অভিনয়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা থেকে লিখছেন প্রমথ চৌধুরী মশায়কে : "গত দুদিন ধরে শারাদ, অভিনয় চল্চে, তাতেও আমাদের বর্ষার সভা খুব সরগরম হচ্ছে।"—(১৬ জুন ১৮১৪, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪)

কিছু ইংরেজি ধরণের নাট্যখেলা শুধু বাংলাতেই নয়, ইংরেজিতেও কবি রচনা ও অভিনয়ের নৃত্রপাত কবেছিলেন তাঁর বিভাগয়ের ছাত্রদের জন্য। শিক্ষকদের মধ্যে অজিতকুমার ক্রৈবর্তীকে তিনি এ কাজের ভার দিয়েছিলেন ; নিজে আদর্শস্বরূপ ছোট একটি নাট্যের খসড়াও তৈরী করে দেন। বাঁধানো একটি ক্ষুদ্র খাতায় সেটি পেজিলে লেখা ছিল। খাতাখানির মালিক ছিলেন তৎকালীন শিক্ষক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুধু মালিক নন, ছাত্রগণকে বই-বাঁধানো শেখাবার সময়ে নিজেই সেটি তৈরি করেছিলেন। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর নাম লেখা সেই পাণ্ডুলিপিখর খাতাখানি বক্ষিত আছে। এ সবই জ্ঞান বাবুর শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-জীবনের কথা।

কিছু দিন পরে কবি কতৃক কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষরূপে জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিযুক্ত হন ; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রেসের পরিচালনার ভারও তাঁর উপরেই সে সময় তুলত হয়। তখন তাঁকে শান্তিনিকেতনের বিভাগয় রতে আদি ব্রাহ্মসমাজে পাঠানো বিষয়ে, ১১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ তারিখে গুরুদেব শিলাইদহ হ'তে একখানি পত্র লেখেন। তাঁর আশ্রমের প্রেরণাকে সমাজের মধ্যে নানা দিক দিয়ে প্রসারিত করবার আগ্রহ কীকরণ প্রবল, এবং লেজন্ত কাণ্ডকারী পন্থায় তিনি কী ভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে লেখা ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত করা একখানি পত্রে তা কিছু জানা গেছে ; সেখানে তিনি চাইছেন, বাহিরের ছাত্র ও যুবকদের আশ্রমে আহ্বান ক'রে এনে মাঝে মাঝে অতিথি-স্বরূপ রাখবেন ; তাদের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাটাই বাহিরে আশ্রমের প্রচারের কাজ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। কিছু কবির পত্রিকল্পনার সেটি একটি দিক, আরেকটি দিকের কথাও তাঁর মনে ছিল। অমনি তরোই আশ্রমের ভিতরকার কর্মীদের এক-এক জনকে সুযোগমতো বাহিরে পাঠাবেন ; নানা স্থানে তাঁরা সমাজের মধ্যে জীবিকার নৃত্রে নানা কাজে ব্যাপৃত থাকবেন। সে সব কর্মীদের সত্যম্যেও বত দূর সম্ভব আশ্রমের আদর্শ ও আচরণ দূরে দূরান্তে ছড়িয়ে পড়তে পারবে,—এ আকাঙ্ক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোদ্ধৃত পত্রে :

ও

কল্যাণীয়েষু

তোমার সঘন্থে একটি নূতন ব্যবস্থা করা হবে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কাণ্ডকার তোমাকে না নিলে চলবে না। ব্রাহ্মসমাজের সঘন্থে আমাদের শৈথিল্য হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত অস্বস্তি। আমার ইচ্ছা আশ্রমের সঙ্গে সমাজের একটি ঘনিষ্ঠ নাড়ির সম্পর্ক



স্থাপিত হয়—আশ্রমের কোনো লোক সমাজের ভার পেলে সেইটে সম্ভবপর হবে। ক্রমে ক্রমে সমাজকে সচল করে তুলতে হবে—একবার তুমি ওখানে বসে জমি শ্রম করে নাও, তারপরে আমরা সকলেই ওতে সাগব। এটা একটা বড় কর্তব্য কাজ এবং আমাদের আশ্রমেই কাজ।

\* \* \* \*

আশ্রম থেকে বুরে যেতে হবে মনে কোনো না। ব্রাহ্মসমাজেও আমরা আশ্রমকে ক্রমশঃ বিস্তার করব—প্রথমে তার বাণী বিস্তার—নৌবে বীরে ঈশ্বরের প্রসাদ সমস্ত কাটিয়ে উঠতে হবে। এই মহৎ কর্তব্যের ভার তুমি প্রসন্নচিত্তে ও সমস্ত মনের শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে আনন্দ গ্রহণ কর—ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে ঈর্ষাও তিনি তোমার জীবনকে সার্থক করে তুলবেন। ইতি ১১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

শ্রীকাক্সী

বা: শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিম্নের চিঠিখানিও জ্ঞান বাবুকেই ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১১তে লেখা। তিনি তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের ভার নিয়েছেন। গুরুদেব শাস্তিনিকেতন থেকে লিখছেন। বিষয়—আদি ব্রাহ্মসমাজের বেনীতে অত্রাঙ্গণ বসান নিয়ে আলোচনা। কিন্তু এর মধ্যে সমাজ-বিপ্লবী বীন্দ্রনাথের বহুগুণী বাণী আমাদের সচেতন করে তোলে। তাঁর দর্শন ও সামাজিক মতের স্পষ্ট নির্দেশ এর সাহায্যে পাওয়া যায়। সেই অর্থে পত্রখানি বিশেষ মূল্যবান সন্দেহ নাই।

কল্যাণীয়েষু

\* \* \*

—যদি আদি সমাজে আক্ষণপুত্রটি চালাতে চান তবে তেরিশ কোটি কি অপবাদ করল ? \* কে আমার নাম করে বোলো পুতুলপুত্র। তেমন দোষের নয় কারণ তাকে symbol বলে গণ্য করা যায়, কিন্তু আক্ষণকে অজ্ঞান সকল মানুষের চেয়ে পুত্র্য বলে গণ্য করা ঈশ্বরের নিকট যথার্থ পাপ—কারণ তাতে অজ্ঞান মানবকে অপমান করা হয়, এই পাপ আমি আদি সমাজে কিছুতেই রাখতে দেব না।

বা: শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর একটি বিশেষ ঘটনা। জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছে—অসবর্ণ বিবাহ—জনে তাঁকে পত্র লিখছেন—। সামাজিক পরিবেশ বিরূপ। কিন্তু যেমন একেই উপলক্ষ্য করে দীক্ষার বেলায় জীবনের শ্রেষ্ঠ 'আবির্ভাব'কে প্রকাশের জন্ত কবির আশীর্বাদী অভয় ও কল্যাণের দীপ্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, একেই জীবনের পূর্ণতাকে গ্রহণ করবার পথ সন্ধিক্ষণে সমস্ত সংগ্রামের সম্মুখে নবীন বাতীর প্রতি পত্রের ছত্রে ছত্রে কবির শব্দাহরা আনন্দবাণী প্রকাশ পেয়েছে দেখা যায়।

৫

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

কৃতিমোহন বাবুর কাছে থেকে তোমার সমস্ত সবাদ পেয়ে খুশি হলাম। ঈশ্বর তোমার সম্মুখে যে দান উপস্থিত করেছেন

তা তুমি নির্ভরে মাথায় তুলে লও। অবশ্য, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমাকে একটা তুমুল সাংসারিক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে—তাতেও তোমার মঙ্গল হবে। যে জিনিস আমরা নিত্যসহজ ও নিরাপদে পাই তার মূল্য থাকে না। তোমার জীবনের যে পূর্ণতাকে তুমি সহসা দেখতে পেয়েছ, তাকে তুমি পূর্ণ মূল্য দিয়েই গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছ এ তোমার সৌভাগ্য। ঈশ্বর তোমাকে একদিক থেকে যে বেদনা দেবেন আর দিক থেকে তার চের বেশি পূরণ করে দেবেন। যে ভীক সে যথার্থ মঙ্গলের অধিকারী নয়। তুমি নির্ভয়ে সত্যের উপরে নির্ভর করে আনন্দের সঙ্গে দুর্গম পথে যাত্রা কর—নিশ্চয়ই জয়ী হবে। ঈশ্বর যে তোমার হাতে হাঁচ এমন দুঃসাহ্য ভার অর্পণ করেছেন, এতেই তোমার সমস্ত জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠুক। যারা সংসারকে ভয় করে চলে তাদের ভয়ের অন্ত নেই—তারা সংসারকে সত্যের চেয়ে বড় মনে করে বলেই সংসারের খাতিরে সত্যকে বিসর্জন দেয়—তারপরে সত্যকে অপমানিত করে এই যে আত্মবিস্ময়নার আশ্রয়কে অর্জন করে এখানে তার পদে পদে দুর্গতি। তুমি মনকে আনন্দিত রাখো—তাকে অবসন্ন হতে দিয়ো না। ঝড় যত বড়ই হোক না কেন কেটে যায় কিন্তু যে ঐক্য পৃথিবীর উপর ঝাঁড়িয়ে থাকে তা স্থির থাকে। তোমার মাথার উপরে দিয়ে এক চোট কড়বল্লা হয়ে গিয়ে আবার সমস্ত শান্ত স্বন্দর হয়ে যাবে—মনে তুমি ভয় বা সংকট দেখো না।

\* \* \* \*

ইতি ২১শে আষাঢ়, ১৩১৮

শ্রীকাক্সী

বা: শ্রীবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুরুদেবের একখানা বই ছাপা হচ্ছে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে। গুরুদেব যত্নযোগ করেছেন, বাংলা ছাপাখানায় নিভুল ছাপা হয় না। বিলাতী ছাপাখানায় লেখককে প্রক্ষণ দেখতে হয় না, কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বই নিভুল ছাপা হয়। বাংলা ছাপাখানায় লেখককে প্রক্ষণ দেখতে হয় ইত্যাদি। ছাপায় ভুল বের হয়েছিল, কিন্তু জ্ঞান বাবু দারিদ্র স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেছেন বাংলা ছাপাখানায় প্রক্ষণ দেখার ব্যবস্থা নাই, লেখক কিংবা পত্রিকা-সম্পাদক প্রক্ষণ দেখার ভার নিয়ে থাকেন। এই জন্তে বাংলা ছাপাখানায় দরও অত্যন্ত সস্তা। কলকাতারই অনেক বিলাতী লোকের ছাপাখানায় প্রক্ষণ দেখার জন্তে যথায়োধ্য বেতন দিয়ে এমন লোক রাখা হয়, যাদের ভাষাজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে আছে, এবং সেই জন্তে সে সব প্রেসের দর সাধারণ বাংলা প্রেসের দরের অন্তত তিন গুণ। এই সব 'রীডার'দের হাত দিয়ে ভুল গলতে পারে না। এইরূপ দর দিলে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রেসও নিভুল কাজ দেবে। এবং ভুল থেকে গেলে ছাপা পৃষ্ঠা বদলে দেবে। প্রচলিত দর এসব হতে পারে না—লেখক যেমন প্রক্ষণ দেখে দেবেন, ছাপা তেমনি হবে। দর সস্তা রাখতে গিয়ে কাজের অবস্থা এমনি ঝাঁড়িয়েছে। ভালো 'রীডার' না রাখলে কাজ নিভুল হবে না। এই পত্র পেয়ে গুরুদেব যে পত্র লেখেন তার প্রতিশব্দে মহাহুভবতার পরিচয় আছে। শেষে যে 'পুঃ' যোগ করেছেন, তা জ্ঞান বাবু যে লিখেছিলেন আসন্ন বিয়ের জন্তে তিনি অন্তমনা হয়ে নেই—তারই উত্তরে। বিয়ে হয়েছিল ১৪ই বৈশাখ ১৩১৯। সকল লোকের

সঙ্গে তিনি কী স্মৃতিচারণ ও দরদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার পরিচয় এই পাত্রে আছে। সহজ স্বমধুর রসের আঁকর রবীন্দ্রনাথ। এই সঙ্গে তাঁর রহস্য-প্রিয়তার পরিচয় বিশেষ ভাবে উপভোগ্য।

ও

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকেই শরীরটা খারাপ চলেছে বলে মেজাজটা বিগড়ে রয়েছে—মানসিক নয়। অতএব যখন বিরক্ত হয়ে উঠি তখন মনক্ষুণ্ণ হইয়া না। \* \* \* না কি একটু বন্ধ করে খরচ করে ছাপচে সেই জন্তে ওতে কোনো ক্রটি থাকলে সেটা অতিরিক্ত পরিমাণে অশ্রুত করে। নইলে \* \* \* এর কল্যাণে ও অজ্ঞান প্রকাশকদেরও আশীর্বাদে আমার গ্রন্থাবলী একেবারে আপাদমস্তক স্নেহের শরশযায় শয়ান। তারপরে আমি থাকতেই যখন এই দশা, তখন স্নানাব অগোচরে কি হবে সেই কথা স্মরণ করলে গ্রন্থকারের মন খলিবতই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেইজন্তেই সমুদ্রের এপারে থাকতে থাকতেই বইগুলো ছাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্তে মনের মধ্যে খুব একটা ভাড়া আছে—অথচ জোমাদের ছাপাখানায় সে ভাড়াটা দেখতে পাইনি—তাহেই শরীরের বায়ু প্রকৃপিত হয় এবং পিডটাও উন্মাদ পিডে থাকে—সেটা আমার পক্ষেও যেমন মন্দ সমুখে যারা উপস্থিত থাকে তাদের পক্ষেও তেমনি অপ্রীতিকর। একপ ক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, ‘অক্রোধেন জয়েৎ কোপঃ’—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে—বিরক্ত না হয়ে বিরক্তিকে পরাস্ত করবে—এবং সেই সঙ্গে হাত চালিয়ে কাজ করবে এবং সফল হয়ে চক্ষু দেখবে।

\* \* \* ইতি ১৮ই চৈত্র ১৩১৮

স্বভািকান্তী

স্বাঃ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুঃ—একটা কথা তুমি ভুল বুঝেছ। আসন্ন স্তববিবাহ উপলক্ষ্যে মন্ত্রিসভার মন যে চকল হয়ে থাকে সেটাকে আমি অপরাধ বলে গণ্য করিনি। তুমি খুব পেট ভরে বিবাহ কব এবং তা দিয়ে তোমার হৃদয়ও সুগলে যথোচিত স্পন্দন সকার হোক না—আমি বৃদ্ধ হয়েছি বলে এই স্বাভাবিক আন্দোলনটার পরে আমার লেশমাত্র বিষয় নেই এ তুমি নিশ্চয় জেনো—মনের মধ্যে এখনো কবিত্বের কিছু সংরক্ষণ আছে। এমন কি ছাপাখানার আপিস পর্যন্তও এই প্রসঙ্গ যদি পৌছয় তাহলেও আমি আতঙ্কিত হব না—তবে কি না এই দীক্ষার সময়ে আপিসটাকেও খুব একটু শক্ত হয়ে থাকতে হবে। তাই হোক প্রজ্ঞাপিত যখন উড়ে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর দুই পক্ষের পক্ষ্য আমার কাছে এখনো মনোরম বলেই বোধ হয়।

গুরুদেব বিলাতে গেছেন। তাঁর স্বাভাবিকের সঙ্গে না বনাতো মন বাবুকে ক্ষুণ্ণ মনে আদি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করতে হয়। নিশ্চয়ই গুরুদেব এটা স্থানেন, একটা কারণে এইরূপ ভেবে তাঁকে জ্ঞান বাবু কিছু লেখন নাই, কিন্তু কস্তার জন্মের পর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে যে সব লেখেন তার এই উত্তর। আশ্রমেব প্রতি বৈদেশিকদের অগ্রহ এবং গুরুদেবের কাছে এগুজের বাগদানের পূর্ণাভাস এতে পাওয়া যাবে।

ও

Massers  
c/o Thomas Cook & Son  
Ludgate Circus  
London

কল্যাণীয়েষু

জ্ঞান, তুমি আদি সমাজের কাজ থেকে কখন যে অবসর গ্রহণ করেছ তা আমি জানতেও পারিনি। বোধ হয় অভিজ্ঞের পক্ষে বহুকাল পরে আমি সে খবর পাই। যা হোক এখন সে বিষয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই অতএব যা যাটছে তাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে কোনো বিরক্তি বা প্রতিকূলতা নেই—এবং সর্বতোভাবে তোমার কল্যাণ হোক এই আমার আন্তরিক কামনা এ কথা নিশ্চয় জেনো।

তোমার একটি কল্যাণে শুনে আনন্দিত হলাম। তোমার এই নবকুমারী তোমার সংসারে এবং জগৎ সংসারে আনন্দ ও মঙ্গল বিকীর্ণ করতে থাকুক, এই আমি আশীর্বাদ করি।

আমি কিছুকাল আমেরিকায় যাপন করে সম্প্রতি লণ্ডনে ফিরে এসেছি। এখানে কতদিন থাকব এখনো কিছুই স্থির করি নি। এখানকার কাজ শেষ হলে একবার ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করে তবে দেশে ফেরবার ইচ্ছা আছে।

ইতিমধ্যে এগুজ সাহেব শান্তিনিকেতন গিয়ে আমাদের বিতালয় দেখে এসেছেন। বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন। তিনি আমার অল্পপস্থিতি কালে মাঝে মাঝে বিতালয়ে গিয়ে আমার কর্মভার গ্রহণ করবার প্রস্তাব করেছেন। আমি বিদেশীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ সহায়তা ও সহায়ভূতি পেয়েছি এমন বেশের লোকের কারো কাছ থেকে পাইনি। আমেরিকাতেও বিশ্বের লোক আমাদের এই বিতালয় সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর যে কোনো জাতিগায় যে কোনো নতুন পদ্যিকা বা সন্দর্ভান চলবে তার প্রতি এদের এট একান্ত চিত্তের আকর্ষণ দেখলে অন্ত্যস্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। মঙ্গলের প্রতি নিষ্কাম অনুরাগ ত একই বলে। শুধু ঘরের কোণে বসে গীতার শ্লোক আওড়ালেই ত হয় না। এদেশে এসে এই বিষয়ে আমি বিশ্বর উপকার পেয়েছি। কি করে যে আপনাকে উৎসর্গ করতে হয় তা এরাই জানে—আর কি করে যে বিনা সোপানায় অহঙ্কার করতে হয় এবং বিনা বক্তব্যে বক্তৃতা করা যেতে পারে, সে বিদ্যায় আমরা পারদর্শী।

তোমার স্বীকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে। ইতি ২৫ এপ্রেল ১৯১৩।

স্বভািমুখ্যাতী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন কাটে জামসেদপুরে। “প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধটি তিনিও পড়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :—সত্যি বলতে, গুরুদেব ছিলেন শান্তিনিকেতনেই লোক। তিনি শিলাইদহেরও। কিন্তু সেখানে ছিলেন জমিদার। চার পাশের লোকেরা তাঁকে পেয়েছিল প্রধানত বৈবয়িক যোগে।

ষড়ি কোথাও তিনি বিষয়ে ভুবে থাকতেন না। সেই জন্ত তাঁর যে সব দিন ক্ষমিদারিতে কেটেছে তাও তাঁর উচ্চাঙ্গের বহু সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তবু, তিনি ছিলেন যে-মার্গের লোক, শাস্তি-নিকেন্তনই দিয়েছিল তাঁকে সেই বৈচিত্র্যময় বিশ্বমানবিক আবেষ্টন। অর্থ ও উচ্চম এখানে অক্ষয় টেলেছেন। তাঁকে এদিক দিয়ে বেহিসেবী মনে হবে। কিন্তু গুরুদেব যে কত বড়ো, কী উদার দৃষ্টিতে তিনি সব ভিনিসকে দেখতেন, সে সাধারণ ধারণার বিষয় নয়। ছ'—একটা ঘটনার কথা ভাবি। তাঁর বিদ্যালয়ের গোড়ার কথাটা ধরা যাক। মহাগুরুদেব জীবিতকালে মাসোহারা মাত্র সম্বল, তখন থলে বসলেন এই ডাঙায় তাঁর বিদ্যালয়; বলে বসলেন, গুরুগৃহ করবেন, ছাত্রেরা বিনা পয়সার প্রতিপালিত হবে, যেমনটি ছিল ভারতের সেই গৌরবময় জ্ঞানের যুগে। নিজের স-সার আছে, এতে অনেক খরচ। তাঁর উপর আছে ঋণ।\* ঐ অস্থায়ী ক'জন এমনটি ভাবতে পারে! এ যুগে সে কি সম্ভব? কিন্তু নিজের স্বর পুঁজি নিয়ে এ কথা ভাবতেও যেমন সাহস করেছিলেন,—কাজও তো তাই দেখিয়েছিলেন। ছাত্রদের খরচ চালায়েছিলেন। তাতে প্রয়োজন হয়েছিল,—কেবল তাঁর নিজের ত্যাগ নয়, পরিবারের আরো অনেকের। কী সাধারণ ভাবেই না চালাতে হয়েছে জীবনযাত্রা।

এক সময়ে আশ্রম থেকে মাসে মাসে 'প্রবাসী'র জন্তে লেখা জোগানো হত; সে কেবল 'গোরা' প্রভৃতি সাহিত্যসৃষ্টি ধার্য নয়, সাহিত্যের কৃচ্ছকর্মও তার অন্তর্গত ছিল। রামানন্দ বাবু সে সময় বিদ্যালয়ে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তিনি রাশি রাশি বৈদেশিক সাময়িক পত্র পাঠাতেন, শাস্তিনিকেতনেও কবির কাছে কিছু কিছু জমা হত। সেগুলি পড়ে নানা প্রসঙ্গ হল কবি নিজে অনুবাদ করতে, পেছলে চিহ্নিত করে কিছু কিছু কয়েক জন অধ্যাপককেও দিতেন পাঠিয়ে। অধিকাংশ ছিল তার ইতিহাস, বাস্তব বা বৈজ্ঞানিক বিষয়ক বিবরণী। জগদানন্দ বাবুকেও পাঠাতেন। 'অজিতকুমার চক্রবর্তী ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের অনুদিত বৈজ্ঞানিকগুলি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হত,—সেগুলির নীচে স্বাক্ষর 'অ' ও 'জ'। এই থাকত সাংকেতিক চিহ্ন। পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুদিত লেখাও যখন ঐরূপে 'প্র' দিয়ে বেরতে লাগল, তখন গুরুদেব রহস্য করে বলতেন, "আগে ছিল 'অজ্ঞ'দেব কারবার, এবার তোমরা যাহোক 'প্রাজ্ঞ' হয়েছ।" এ বিষয়ে ১৩১৬-১৭ সালের 'প্রবাসী' প্রবৃত্তি। ১৩১৭ সালে পুরো নামের ব্যবহারে জ্ঞান বাবুর বহু প্রবন্ধ এবং একটি গল্পও 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত হয়েছে। তাছাড়াও তৎকালীন শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই যে এ কাজে ব্রতী ছিলেন, 'প্রবাসী'তে ব্যবহৃত সাংকেতিক লেখক-নামের থেকে তার পরিচয় মেলে। 'কি,' 'তে,' 'শ' 'ব' স্বাক্ষরকে ক্ষিতিমোহন সেন, তেজেশচন্দ্র সেন, শংকরকুমার রায় ও বঙ্কিমচন্দ্র রায় ইত্যাদি অধ্যাপকগণের কথা স্বরণ করায়।

\* "মহাজ্ঞানের এবং উইলের দোষায় যে বকম জড়িয়ে আছি"...

—চিঠিপত্র ৫ম, পৃ: ২৩৬—লেখক।

† "ছেলেদের অনেকেই দুদশায় পড়ে বহুকাল বেতন মূলতুবি বেখেছে।"—চিঠিপত্র ৫ম, পৃ: ২৩৬—লেখক।

'প্রবাসী'র অনেকগুলি পাতা এক সময়ে এই ক'রে শাস্তিনিকেতন থেকেই ভরানো হতো। রামানন্দ বাবুর বহু এলাহাবাদের মেসর বামনদাস বসুর লাইব্রেরীর পত্রিকা-সংগ্রহ সেদিন পুর কাজে লেগেছিল। টাকা বা পাওয়া গিয়েছিল তা উপলব্ধ মাত্র, গুরুদেব এড়ত আনন্দ লাভ করেছিলেন নতুন নতুন লেখক সৃষ্টি করে। কোনো কোনো ছাত্রও এই কাজে যোগ দিয়েছিল।

তাঁর বৈষয়িক জীবনের ঘটনাও বিস্ময়কর। জমিদারির ভার নিলেন। কিন্তু সেখানেও মামুলি ধারায় অর্থ ও এড়তই হিসাবের বড় বিষয় হল না। খারিজ ওয়াসিল নজরানায় তাঁর নজর বাঁশ পড়ল না। তিনি চাইলেন মামুষের হিত। প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে অনেক জমিদারই তো বাবুগিরি করে। তিনিও কি ধরা দেবেন তাতে? পাশ্চাত্যের সমবায়-ব্যবস্থার তখন চলেছে জয়জয়কার। জমিদারির ধারাই মিলেন পাটটে। প্রজাদের দাঁড় করবেন স্বাবস্থায় ক'রে, পদের অমুগ্রাহের উপর নির্ভর তাদের ত্যাগ করাবেন সেই প্রথার প্রবর্তন,—এই হল তাঁর চেষ্টা। নানা কর্মীদের লাগালেন কাজে, নানা বস্ত্র গড়া হল। অনেক আগে থেকেই তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ছেলে, জামাই এবং বন্ধুপুত্রকে শিক্ষার কাজে পাঠিয়েছেন বিদেশে। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সাহায্য করবেন, এই একান্ত আশা। আজ শ্রীনিকেতনের দিকে চাইলে তাঁর হিসাবের অর্থ বোকা ধাবে। সাময়িক আলোচনায় বেহিসাবী তাঁকে যে বলবে ব্লুক:—হিসাব দিতে তাঁর দূরকাল। এইখানেই তিনি বড়ো।

শিলাইদহের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত প্রজা। খাজনা বা দেনার দায়ের জোতজমি খরদোর সব বিক্রিয়ে যেতে বসেছে। এসে ধরে পড়ল সোজাসজি গুরুদেবকে,—জোড়াসাঁকার বাড়িতে। তিনি সব শুনলেন। নিয়মানুবর্তী গুরুদেব। বোধ-জমিদারির আইনক বিধিব্যবস্থায় হাত দিতে গেলেন না। সেখানে কর্মচারীর মার বাধলেন। ঘরের থেকে ব্যক্তিগত তহবিল ক্ষীণ করে দোর-বসা প্রজাকে ধরে এনে দিলেন তার দায়ের টাকাগুলি। প্রজা ঋণমুক্ত হয়ে যাবে ফিরল।

গুরুদেবের খাটুনির অস্ত ছিল না। নিজের লেখাপড়া, বিদ্যালয়ের কাজ। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে জমিদারির দেখাশোনা, দেশবিদেশ যোরাবরি,—কত কাজ!\*

কাজে রথী বাবু তখন সাহায্য করছেন। একান্ত সচিব মিলেছে পরে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গানগুলি রচিত হয়েছে। সে তো শুধু সাহিত্যিক প্রতিভার দান নয়। জীবনের নিগূঢ় সাধনার জিনিস। তার গভীরতা প্রত্যক্ষ হয়েছে প্রাত্যহিক উষাকালীন উপাসনায়। মন্দিরের বাইরে পূর্ব দিকের যেখানে এসে বসতেন। সে কি তন্নয়তা! পরবর্তী জীবনে বিশ্বভূবনে নানা কাজের মধ্য দিয়ে গ'লে গ'লে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর আনন্দঘন সেই দিব্য অমুভূতি।

\* "এক-এক বার ক্লান্ত হয়ে ভাবি একটা সেক্রেটারি রাখা যাক, কিন্তু সে আমিরীটুকুও হিসাবে কুলার না দেখতে পাই।"—চিঠিপত্র ৫ম, পৃ: ২৩২। লেখক।



## শ্যামুয়েল জনসনের চিঠি

[ ইংরেজী ভাষার শব্দকোষ সংকলন কবে যে অধ্যবসায়, ধৈর্য ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন জনসন, তার কোন মূল্য তিনি পাননি তদানীন্তন ইংল্যান্ডের অভিজাত ও তথাকথিত বিদগ্ধ সমাজের কাছে থেকে। আসলে প্রয়োজন মত স্ততিবাদ দ্বারা তিনি বড়লোকদের কৃপা অর্জন করতে পারেননি। দারিদ্র্য, হতাশা এবং দৃষ্টিক্ষীণতা এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে একাকী নিঃশঙ্কে লড়াই করে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের সব থেকে প্রামাণ্য শব্দকোষ রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী যুগে তাকে অসামান্য কৃতিত্বমান সাহিত্যের গৌরব দান করেছে। ]

১৭৪৭ সালে জনসন তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করে তৎকালীন সেক্রেটারী অফ টেট লর্ড চেষ্টারফিল্ডের কাছে পত্র লেখেন। প্রত্যুত্তরে তিনি পান দশ পাউণ্ডের একটি সাহায্য উপহার। কিন্তু সাক্ষাৎপ্রাপ্তি হয়ে জনসন প্রত্যাখ্যাত হন। কিন্তু তাতে ক্ষতবিক্ষত না হয়ে জনসন সাত বৎসর অমাত্রবিক পরিশ্রম করে তাঁর কার্য সমাধা করেন। শেষ হবার পর তিনি চেষ্টারফিল্ডের কাছে হতে যত্নসহকারী পত্র পান, যার আন্তরিক প্রত্যাশা হোল বইখানি তাঁর নামে উৎসর্গিত হোক। কিন্তু জনসন সে সম্মান দেননি এবং পরিবর্তে নীচের চিঠিখানি পাঠান লর্ডকে। ]

১৭৫৫, ৭ই ফেব্রুয়ারী

গণ্য শ্রদ্ধাভাজন,

ওয়ার্ল্ড প্রতিষ্ঠানের কর্তারা আমার সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, আমার অভিধানকে জনসাধারণের কাছে সুপারিশ করে দু'টি রচনা আপনি লিখেছেন। শ্রেষ্ঠ লেখকের কাছে কৃপালাভে অনভ্যস্ত আমি আপনার ধৈর্য্য এই বিশিষ্ট সম্মানের কি ভাবে মর্মান্বিত বক্ষা করব অথবা কি ভাবে তার যথোচিত সমাদর করব ভেবে পাচ্ছি না।

সামান্যতম উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে যখন আমি আপনার দ্বায়ে প্রার্থীরূপে পিড়িয়েছিলাম, তখন আপনার সামাজিক মর্মান্বিত্য পরিচয় লোকের মত আমিও বিনয়বত হয়েছিলাম। কিন্তু এ ভাবে আমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, তার ফলে তাতে আমার মর্মান্বিত্য ও মর্মান্বিত্য গভীর ভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। রাজদরবারের শিলাপত্র-এ অনভিজ্ঞ এক জন বৃদ্ধ সাহিত্যসেবীর গর্বে যতখানি স্ততি ও প্রশংসা করা সম্ভব, তাই দিয়ে আমি আপনার কাছে প্রকাশ্য পত্র পাঠাই। আমার সাধ্যমত আমি করেছি। চেষ্টা বত সামান্যতম হোক, অন্যদিক সহ করতে পারে না কোন লোকই।

আপনার দ্বার হতে প্রত্যাখ্যাত হবার পর সাত বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘকাল নানা প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়ে আমি অগ্রসর হয়ে সেই সংকলন শেষ করেছি এবং এক্ষণে সেটি

প্রকাশ্যাপেক্ষায়। এই সময়ের মধ্যে অসংখ্য সাহায্য, একটি সাহসের কথা অথবা একটি প্রশংসা-হাস্ত আমি পাইনি। এ ব্যবহার আমি প্রত্যাখ্যাত করিনি।

ভার্জিলের মেঘশালক অবশেষে ভালবাসার পাত্র পেল আর জানল সে পূর্বতবাসী। মানুষ যতক্ষণ জলে হাবুডুবু খাচ্ছে ততক্ষণ যে সাহায্যকারী উদাসীন এবং ডাঙায় তীরের পর যে সর্বপ্রকার সাহায্য অগ্রসর, তার নামই কি পৃষ্ঠপোষক? এত দিনে আপনি যে আমার প্রতি সদয় হয়েছেন, তাতে আমি অতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এক্ষণে আমি বৈধের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি, তাই আমার আগ্রহও কমে গিয়েছে। এখন আমি লোক-পরিচিত হয়েছি, পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন নেই আমার। যে উপকার আমি পাইনি, তার স্বীকৃতির অঙ্গস্বত্বিত্তে কি সিনিকের অপরাধ আমার স্পর্শ করবে? আমার অধ্যবসায়ের পুরস্কার ঈশ্বর আমার যা দিয়েছেন, তা কোন পৃষ্ঠপোষকের দয়া বলে আমি জনসাধারণকে জ্ঞাত করতে রাজী নই।

বিদগ্ধ শ্রেণীর উপকারী কোন লোকের অমুগ্রহভাজন না হয়েই আমি সাক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়েছি। যে প্রত্যাশায় এক দিন আমি দত্ত করে বেড়াইতাম, তার হৃৎস্পন্দ আমার কবে ভেঙে গিয়েছে। ইতি

আপনারই

শ্যামুয়েল জনসন।

## টুর্গেনিভের চিঠি

[ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল রুশিয়ার লৌহ-মানব জার প্রথম নিকোলাসের জীবনে। সিবাশপোল অবরোধের সময় তাঁর যুদ্ধরত সৈন্যদের হৃৎক-বেদনার কয়েকটি চিহ্ন বা আখ্যায়িকা পড়ে তিনি এত দুঃখ বিচলিত হয়েছিলেন যে, আখ্যায়িকার রচয়িতা তরুণ লেখককে তৎক্ষণি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনার আদেশ দিয়েছিলেন। এমন প্রতিভাকে হেলার হারাতে দিতে পারে না রুশিয়া। অতএব লিয়ো টলষ্টয়কে ছুটি নিয়ে ফিরে যেতে হয় সেট পিটার্সবার্গে এবং সেখানে সর্বপ্রথম তাঁর পরিচয় হয় ইভান টুর্গেনিভের সাথে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের বহুদর্শী বোঝার বয়স তখন ছাব্বিশ আর টুর্গেনিভ তখন তাঁর চেয়ে বয়স বহুদূর বড় এবং রুশ সাহিত্যক্ষেত্রের একচ্ছত্র সম্রাট। ছ'জনের হোল মিলন কিন্তু প্রশংসোলা নয়—হয়ত দশ বছরের ব্যবধানই এর জন্ত দায়ী। পরে টুর্গেনিভ তাঁর এক বন্ধুকে হৃৎক করে লিখেছিলেন—‘আমি টলষ্টয়কে হৃদয়ের আরো কাছে টেনে আনতে পারিনি বলে হৃৎকিত—আমাদের আদর্শ এত পরস্পক-বিরোধী।

বস্তুতঃ একমাত্র রুশীয় পটভূমিকা ছাড়া ছ'জনের লেখার কোণায় মিল ছিল না। সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিক থেকে তাঁরা বিচার করতেন

প্রতিটি বিষয়। টুর্গেনিভের দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্নতার কোন স্থান ছিল না, কিন্তু টলষ্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। জন্ম মূহ লিখেছেন—‘টুর্গেনিভ চাষীকে জানতেন যেমন এক জন ভদ্রলোক চাষীকে জানেন। তিনি ভদ্রলোককে জানতেন যেমন এক জন ভদ্রলোক আর এক জন ভদ্রলোককে জানেন। সিনিকের দৃষ্টিতে নয়, জানী, দার্শনিকের মন নিয়ে বিচার করতেন উভয়কে।’ অর্থাৎ টলষ্টয়ের আদর্শ-ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কোনই মিল ছিল না। আকৃষ্টিতও টলষ্টর তাঁর চেয়ে ঢের বেশী পেশীবদ্ধ, সবল বিরাট ব্যক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ‘যত বয়স বাড়ছে ততই একে কম ভালবাসছি।’ লিখেছিলেন টলষ্টর।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে টলষ্টর আর টুর্গেনিভের মধ্যে গভীর মতান্তর ঘটে—এমন কি এক সময় মনে হয়েছিল বৃষ্টি বন্দ-যুদ্ধে এর শেষ পরিণতি ঘটবে। এই ভাবে চৌদ্দ বছর আর চ’জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বা ভাবের আদান-প্রদান হয়নি। এর পর টলষ্টর যোগক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন এবং মৃত্যু প্রত্যঙ্গ ভেবে টুর্গেনিভের কাছে কমা চেয়ে এক পত্র লেখেন। টুর্গেনিভও তৎক্ষণি তাকে সর্বাঙ্গতঃ করণে কমা করে পত্রোত্তর দিতে ভোলেন না। সে-বছর কয়েকটি দিনও তাঁরা কাটিয়েছিলেন একসঙ্গে। টলষ্টয়ের মাথা এসেছে বিরাট পরিবর্তন—টলষ্টর হয়ে পড়েছেন বাক-সংকট, নিঃশব্দ। মানসিক উৎকর্ষতাও স্তম্ভাত্মক। কিন্তু তাঁদের এ পুনর্মিলনে কৃত্রিমতা না থাকলেও কোথাও যেন একটু বাধা ছিল। জীবনের শেষ বছরগুলিতে টুর্গেনিভকে কাটাতে হয়েছে বিদেশ—তার প্রধান কারণ শেষ বছরের রচনাগুলি, বিশেষ করে পিতা-পুত্র (Father and Sons) রূপ পাঠক-মতলে তেমন সমাদৃত হয়নি বলা তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাছাড়া গীতকার পলাতিন সিয়াদো গার্সির নিকট-সান্নিধ্যে থাকার তাঁর একান্ত বাসনা ছিল। পলাতিনের অল্প পুজাবী ছিলেন টুর্গেনিভ। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই অবস্থায় অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। টুর্গেনিভ শয্যা নিলেন—রোগশয্যায় টলষ্টরের চিন্তা বাহুর বাহুর তাঁকে ক্রিষ্ট করতে লাগল। আধ্যাত্মিক অসমতার দরুণ টলষ্টর বহু দিন লেখনী সংবরণ করেছেন, হয়ত চিরকালের মতই। টুর্গেনিভ তাই রোগশয্যা থেকে নীচের এই চিঠিখানি লিখেছিলেন টলষ্টরকে লেখার সনির্বন্ধ অহুরোধ জানিয়ে।]

বুগাইভাল, ২৭শে অক্টোবর ১৮৮৩

লিভ নিকোলাইয়েভিচ, প্রীতিনিয়স্—

বহু দিন আপনাকে পত্রদ্বাৰায়ণ করিনি। তার কারণ এখনও আমি মুহূর্তশয্যায় শুয়ে। আর সুস্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই—এমন কি সে-চিন্তাও পরাজিত। আপনাকে চিঠি লিখছি শুধু এই কথাটি জানাতে যে, আপনার সমকালীন হতে পারায় নিজেকে আমি গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনাকে আমার শেষ এবং সনির্বন্ধ অহুরোধ—‘প্রিয়বন্ধু, আবার ফিরে এস সাহিত্যসাধনায়।’ জানেন তো এ ক্ষমতা আপনি পেয়েছেন, সকল ক্ষমতার আদি উৎস থেকে। আমার এ অহুরোধ আপনার উপর নিশ্চিত প্রভাব বিস্তার করছে জানতে পারলে কত ধূসী হব।

আমি তো নিঃশেষিত মানুষ। ডাক্তারেরা পৃথক ভাবে না আমার রোগটা কি। না পারি হাঁটতে, না পারি যেতে বা ঘুমে—

রোগের কথা পুনরাবৃত্তি করাও একঘেঁয়েমি। ‘রাশিয়ার সম্রাট লেখক, হে প্রিয় বৃন্দ! আমার এ মিনতি রেখো।’

[ এই চিঠি লেখার পাঁচ সপ্তাহ পরে টুর্গেনিভ চিরবিদায় নেন এ পৃথিবী থেকে। সদ্য সদ্য না হলেও টলষ্টর পরে তাঁর এ অহুরোধ রক্ষা করেছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ দান বা দেবান তা দেওয়া হয়ে গেছে। তবুও ‘রেকারেকসান’, ‘ক্রয়জার সোনটা’র মত জনপ্রিয় বইগুলি তখনও লিখতে বাকি। তাঁর সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য বই—‘জোয়াট ইজ আর্ট’ লেখা হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে। এটিকে ধর্মতত্ত্ব সংক্ষেপে তার নবতম অবদান বলা যেতে পারে, কিন্তু যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকই স্বীকার করবেন যে, চল্লিশ বছর আগে টুর্গেনিভ টলষ্টরের রচনা সংক্ষেপে যে মন্তব্য করেছিলেন এবং যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিস্ত বিপর্য হয়েছিল, তা কতখানি সত্যি। ‘টলষ্টর তাঁর লেখার দার্শনিকতা না মেনেছিলেন বদি, তা হলে খুব চমৎকার হোত।’—মন্তব্য করেছিলেন টুর্গেনিভ। ]

## পল গৌগের পত্র

[ ১৮৪৮ থেকে ১৯০৩ অবধি পল গগ মতভূমে ছিলেন। বিদ্রোহী শিল্পী গগ সারা জীবনে নানা অভিজ্ঞতা সাভ করেছিলেন। পৃথিবী আর সভ্যতা তাঁর আত্মাকে করে তুলেছিল শ্রান্ত। তাঁর সমালোচক ও সমসাময়িক বিদগ্ধ জন বলেন যে, শিল্পী আসলে ছিলেন আদিম যুগের মানুষ। তাঁর রক্তে ছিল বাসাবরষ। সমাজ সভ্যতা পরিত্যাগ করে শিল্পী তাক্তিত হীপে পলায়নপর অবস্থায় স্ত্রীনবার্গের কাছে এক পত্রে অহুরোধ পাঠান, তার শিল্প-সম্পদের এক বর্ণনাময় প্রকাশ প্রাপ্ত করে দিতে, যাতে সেগুলি ভাল দামে বিক্রী হতে পারে। স্ত্রীনবার্গ পত্রোত্তরে যা লেখেন, শিল্পী তাঁর তালিকার সঙ্গে সেটিও প্রকাশ করেন। বিক্রয়-মূল্য বার হাজার ফ্রাঙ্ক নিয়ে গগ পালিয়ে যান তাক্তিত হীপে। আট বৎসর পরে একান্ত দারিদ্র ও হৃৎকীর্ণতার মধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু জীবনের শেষ নিশ্বাস অবধি গগ তার কটু ক্ষুব্ধ আক্রোশ জানিয়ে গেছেন সভ্যতার উপর, যার প্রকাশ তাঁর প্রত্যেকখানি ছবিতে। ]

আজ আপনার পত্র পেলাম, যে পত্র আমার তালিকার মুখবন্ধ স্বরূপ। কয়েক দিন আগে আমার টুডিয়োতে প্রাচীরের চিত্রগুলির দিকে আপনার উত্তর দেশের নীল চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গীটার বাজিয়ে গান করছিলেন, তখনই আমার শিল্প-তালিকার কৃত্রিম আপনার কাছে একটি মুখবন্ধের অহুরোধ জানানোর কথা আমার মনে আসে। তখন আমার মনে এক বিদ্রোহের প্রাক-চেষ্টা জাগছিল, যা আপনার সভ্যতা ও আমার আদিমতার সংঘর্ষ।

আপনি সভ্যতার ব্যাধিতে ভুগছেন। আদিমতা আমার সার্বভৌমকে পুনরুজ্জীবিত করে।

আমার ইচ্ছা—অল্প এক জগতের রূপ ও ব্যঙ্গনায় থাকে আমি সৃষ্টি করেছি—তবুও আপনার মনে অতীতের বেদনাবোধ জাগিয়েছে। আপনাদের সভ্য কল্পনার ইতি আমাদের সঙ্গ-মিসোগাইনিষ্ট করে তোলে প্রায়। আমার টুডিয়োতে যে আদিম নারী দ্বন্দ্ব আপনাকে শক্তিত করে এখন, তারই হাসি হয়ত আপনাকে

কোন দিন আর তত তিক্ত রকবে না আপনার। যে জগতকে আমি যত্নে ও বেখায় সৃষ্টি করেছি, তা কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারবেন না বটে, কিন্তু সে হোল স্বর্গরাজ্য। এ বেখাচিত্র থেকে সেট স্বপ্ন-সম্ভব অনেক দূর। কিন্তু তাতে কি? অনিশ্চয়পন্থিক, সে কি নির্বাণের পূর্ণ স্বাদ নয়?

আমি যে নারী স্তম্ভ সৃষ্টি করেছি, নগ্নতার দাবী একমাত্র তাই আছে। আপনার ক্ষেত্রে সে লজ্জায় পা বাড়তে পারত না, হয়ত বা তার অশার সৌন্দর্যে একটি পাপ ও একটি বেদনাই মুখর হয়ে উঠত। ইতি

## লুই পাস্তরের চিঠি

[“বিশ্বপ্রকৃতির মূল সূত্রগুলির অনুধাবনের দ্বারা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত জীব-জগতের সীমানাকে দূরপ্রসারী করিয়া তুলিতেছে”—মন্তব্য করেছিলেন লুই পাস্তর এবং এই সীমানাকে সম্ভারনের চেষ্টাও তিনি করে গেছেন আজীবন। বস্তুতঃ পশুরোগ (এ্যানথ্রাক্স), হুংগারী কলেরা, জলাতঙ্ক ও গুটিপোকার রোগের প্রতিবেদক আবিষ্কার, পচন-ক্রিয়ার কারণ নির্ণয় এবং সহজে পচনশীল খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের সূত্র-সন্ধান লুই পাস্তরকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও জীবগুণবিদ্যে গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অজ্ঞ, বুদ্ধাশ্রয়হীন জনসাধারণের প্রতিবন্ধকতা, এবাস্ত প্রিয় বন্ধুবান্ধব ও গ্রামাভ্যন্তরীণ অন্ধ সায়েন্সের বিশৃঙ্খল সদস্যগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও নির্ভীক চিত্তে একক সাধনার দ্বারা পাস্তর তাঁর গবেষণা-কাণ্ড চালিয়ে গেছেন এবং জীবিত কালেই গবেষণার অসামান্য সাফল্যের দ্বারা বিক্ষুব্ধবাদীদের মুখ চিববন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পশুরোগের কারণ ও প্রতিবেদক আবিষ্কারের গবেষণায় যখন তিনি ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অনেকেই তাঁর কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু একক সাধনার দ্বারা পাস্তর যে সকল তথ্য আবিষ্কার ও প্রমাণিত করেছিলেন, তার ফলে সংশয়বাদীদের সংশয় অমূলক, ভ্রান্ত পথচালিত প্রতিপন্ন হয়েছিল। নীচের চিঠিখানি গবেষণা-কাণ্ডের সাফল্যের বার্তা জানিয়ে পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে লেখা। পত্রটির মধ্যে এমন এক সরল হৃদয়ের পরিচয় আছে, যা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-তপস্বীর পক্ষেই সম্ভব।]

২রা জুন, ১৮৮১

আজ সবে মাত্র বৃহস্পতিবার, কিন্তু এর মধ্যেই চিঠি লিখতে বসেছি। গবেষণায় এক বিরাট সাফল্য লাভ হয়েছে। মিলান থেকে তারাবাতার্য সে খবর পাওয়া গেল। গত মঙ্গলবার, ৩১শে মে তারিখে টিকা দেওয়া ও টিকা না-দেওয়া প্রত্যেক ভেড়ার দেহে মাপাত্তক প্রীতি-জন্মের জীবাণু প্রতিষ্ঠা করান হয়। আটচল্লিশ ঘণ্টার আগেই টেলিগ্রাম-বার্তায় জানতে পারলাম, আজ বিকেলে ছুটির সময় যখন সেখানে পৌঁছব, টিকা না-দেওয়া সবগুলি ভেড়াই প্রাণত্যাগ করেছে দেখতে পাব। এর মধ্যেই আঠারটি মারা গেছে এবং বাকি ক’টিও মরণাপন্ন। কিন্তু টিকা দেওয়া

সব ক’টিই সুস্থ আছে। ‘অভূতপূর্ব সাফল্য’—এই মন্তব্যের দ্বারা শেষ হয়েছে টেলিগ্রামটি। তারটি পাঠিয়েছেন পত্র-চিকিৎসক সার্জন এম. রসিনল।

অবশ্য চূড়ান্ত রায় প্রদানের সময় এখনও আসেনি। টিকা দেওয়া ভেড়াগুলি এখনো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু রবিবার অবধি যদি সব ভাল ভাবে যায়, তবে কল্পমান করা যেতে পারে যে, তার তাদের অন্তর্য করবে না। এ সাফল্য সত্যিই বিষ্ময়কর। মঙ্গলবার চূড়ান্ত ফলের জন্য আর একবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। শনিবার ও রবিবার টিকা দেওয়া পঁচিশটি ভেড়া থেকে ছ’টিকে এবং টিকা না-দেওয়া অল্প পঁচিশটি থেকে আরো ছ’টিকে নির্বাচন করে আবার তাদের দেহে মারাত্মক জীবাণু প্রবেশ করান হয়। মঙ্গলবার সকল পরীক্ষক যখন উপস্থিত হলেন, দেখা গেল টিকা না-দেওয়া ভেড়া ছ’টি মারা গেছে, কিন্তু অল্প ছ’টি দিবি সুস্থ আছে।

আমি তখন উপস্থিত ভেটারনারী সার্জনদের এক জনকে বললাম—‘আপনারই নাম সই-করা খবরের কাগজে কি পড়েছিলেন না?’ ‘তা সত্যি’—তিনি সুবোধের মত মেনে নিলেন। ‘কিন্তু আমি আমার মত বলেছি—আমি অসুস্থ পানী।’ আমিও তখন বললাম—‘সুসমাচারের দাবী স্বীকার করুন। নিরানব্বই জন সাধু ব্যক্তি অপেক্ষা এক জন পানী যদি অনুতাপ করে, স্বর্গে অধিকতর জটোয়াস ওঠে।’ উপস্থিত আর এক জন সার্জন বললেন—‘মিঃ কলিন নামক আর এক জন ভক্তলোককে নিয়ে আসব।’ এর উত্তরে আমি বললাম—‘মিঃ কলিন প্রতিবাদের জন্যই শুধু প্রতিবাদ করেন এবং বিশ্বাস করবেন না বলেই বিশ্বাস করেন না। স্বাধীন রোগের চিকিৎসা যার করতে হবে, আপনি তার কি করতে পারেন?’ প্রয়োগশালা ও গৃহে আনন্দোৎসব চলুক। তোমরা সবাই আনন্দ কর।

[টমাস হেনরী হাক্সলী একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, পশুরোগ ও হুংগারী কলেরার প্রতিবেদক আবিষ্কারের মূল্য যদি অর্থের মাপ-কাঠিতে বাচাই করতে হয়, তবে করাসী-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল জার্মানীকে, তার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান বলতে হবে এ আবিষ্কার। কিন্তু লুই পাস্তর এই আবিষ্কারের খ্যাতি নিয়েই সম্বুধি থাকেননি। তাঁর সর্বশেষ কীর্তি জলাতঙ্ক রোগের প্রতিবেদক আবিষ্কার। এই উদ্দেশ্যে নিয়েই পাস্তর ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল। এইখানে এমন এক জন লোক কাজ করতে থাকে কিশোর বয়সে পাগলা কুকুরে কামড়েছিল। তার উপর দ্বিহ্নেই পাস্তর প্রথম পরীক্ষা করেন তাঁর ওষুধ। পাস্তর ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের দিন যুদ্ধ ও বিজ্ঞানের তুলনা করে পাস্তর মন্তব্য করেছিলেন—‘বিজ্ঞান একটি মাত্র জীবনকে সব-কিছুর উর্ধ্বে আসন দেয়, আর যুদ্ধ একটি মানুষের দুরাকাংখাকে সহস্র সহস্র মানুষের বলিদানের মধ্য দিয়ে সকল করবার চেষ্টা করে।’

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তিম শয্যার শায়িত পাস্তর প্রিয় ছাত্রদের ডেকে বলেছিলেন—‘কোথায় তোমরা? কি করছ? কাজ কর, কাজ কর।’]

আমরা ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ভারত-রাষ্ট্রের আদর্শরূপে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিতেছেন। বস্তুতঃ কংগ্রেসের গত নাসিক অধিবেশনে এইরূপ একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের রাষ্ট্রদর্শ কি, তাহা নূতন করিয়া ব্যাখ্যানের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার অনুগামীগণ সহস্র বার একথাই বলিয়াছেন যে, 'শ্রেণীহীন শোষণহীন গণতন্ত্র'ই ভারতীয় রাষ্ট্র-সাধনার লক্ষ্য। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর আদর্শ নিতুণ অনর্থকই নয়, অব্যবহিকও বটে। কৃষক-মজদুর-বাক্স প্রতিষ্ঠার সকল অবশ্যে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' নামীয় জাতির অনুকূলে পরিত্যক্ত হইল কি না, এই দ্বিজ্ঞানাত বহু জ্ঞানর মনে জাগিবে। বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের মূল রাষ্ট্রদর্শন সঙ্গে ওয়েলফেয়ার স্টেট-এর প্রচলিত সংজ্ঞার কুরাপি সঙ্গতি না থাকায় বরং এতদ্বারা ভ্রান্ত মনোভাব সৃষ্টিরই অবকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা। বিদেশ এবং বিদেশীর সঙ্গে তুলনামূলক নির্বিচার দোহাই তুলিবার কৌক্য আবার নূতন করিয়া এক শ্রেণীর দায়িত্বশীল ভারতীয়ের মধ্যে দেখা যাঠিহেছে, যাহার ফলে আমাদিগকে গুনিতে হয় যে, অমুক অমুক দেশে ট্রেন দুর্ঘটনায় সংখ্যা অত পার্সেন্ট বেশী, ভারতে বেগের ভাড়া অমুক অমুক দেশে হইতে এত পার্সেন্ট কম, অমুক অমুক দেশের রেশন বরাদ্দ হইতে ভারতের রেশন বরাদ্দ গড়ে এত ছটাক অধিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্য হইলেও এবিধ দোহাই তোলা একটা দুঃস্বপ্ন বলিয়াই বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশের আচার-বির্যব অবস্থা-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়াই নূতন কল্পনীতি ও সম্পূর্ণ নূতন রাষ্ট্রদর্শন মনোবী মহাপুরুষগণ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তাহাই সমুখে রাখিয়া রাষ্ট্রজীবন বিকাশের পথে অগ্রদব হইবার প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের আদর্শ অতীব উঃসাধ্য হইতে পারে, আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলগণ উহাকে অসীক বলিয়াও ভাবিতে পারেন। তথাপি গৃহীত কল্পনায় ও তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রতি যদি অবিচল আস্থা থাকে, তবে আমাদের উক্তি প্রত্যাঙ্ক-ঘোষণাদির সম্পূর্ণরূপে তাহার সহিত সামঞ্জস্য থাকাই সম্ভব। আমেরিকার ধনতাত্ত্বিক গণতন্ত্র, বুটেনের পুঁজিবাদী 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' কিংবা রাশিয়ার নিবন্ধ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রশক্তি—উহার কোনটিই যে ভারতীয় আদর্শ ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবদ্ধ নহে, উহার কোনটিই যে ভারতের অভিল্পেত নহে, আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের শোষণার এবং নূতন ভারতীয় সংবিধানের সকলব্যাক্যে প্রকারান্তরে তাহাই স্পষ্ট করিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' প্রভৃতির ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর তাৎপর্য : 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' কথাটি অতি সহজ ও সরল অর্থবোধক,—উহার অর্থ বলা যায়—'জনকল্যাণ রাষ্ট্র'; কিন্তু এই 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র' কথাটির তাৎপর্য সুদূর-প্রসারী। টম্যান-এ্যাটলি-ষ্ট্যালিন-হিটলার-মুসোলিনি প্রমুখ রাষ্ট্র-নেতাগণের প্রত্যেকের অভিধাতেই নিজ নিজ রাষ্ট্র জনকল্যাণ

## 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর রূপ ও রীতি

শ্রীমন্তম্বর সেন

রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠাত; কিন্তু রাষ্ট্রের জনসাধারণের জীবনকে ঠুঁড়াইয়া পিষাইয়া—কোথাও ক্ষমতার অভিসন্ধিতে সিদ্ধ করিবার জন্ত, কোথাও বা একটা উদ্ভূত আদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্ত—হিটলার-মুসোলিনীর রাষ্ট্রযন্ত্র মুহূর্ত্ত কালের জন্ত উদ্ভাবনে আত্মপ্রকাশ করিয়া

আবার আত্মবিলোপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'এক নায়ক' কিংবা 'এক দল' রাষ্ট্রের যাবতীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ত করিলে যে বিঘ্নমতা ও বিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহারই মুখে রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। সুতরাং হিটলার-মুসোলিনীর দ্বায় অসীম শক্তিবরগণের 'জনকল্যাণ রাষ্ট্র'ও বখাৰ কল্যাণকর কল্পনীতির অভাবেই ইতিহাসের পাতা হইতে দ্রুত মুছিয়া গেল। ইহা তো গেল 'জনকল্যাণ রাষ্ট্রের' আভিধানিক ও রাজনৈতিক অর্থ; কিন্তু বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বা বুটেনকেই সমসাময়িক বুদ্ধিজীবী সমাজ একমাত্র আদর্শ 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'রূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার কারণ, রাষ্ট্র-জীবনে জনকল্যাণমূলক সরকারী পরিকল্পনার প্রবর্তনে বুটেনই সর্বাধিক প্রয়াস পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণমানসেই সরকারী অর্থব্যয়ে বুটেন নাগরিকের জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি ('from cradle to grave') কতকগুলি বিশেষ নিরাপত্তামূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। বোড়শ শতাব্দীতে 'গুয়োরল' প্রবর্তন হইতে শুরু করিয়া অভাববিধ নাগরিকের নিরাপত্তামূলক কতকগুলি বিশেষ সরকারী ব্যবস্থার সাহায্যে বুটেন সরকার ক্রমেই নাগরিক-জীবনে রাষ্ট্রীয় কণ্ঠধারাকে প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। ১৮৩৩ সালে নূতন শিক্ষা আইন ১৮৬৬ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯০৮ সালে বৃদ্ধ বয়স পেনশন আইন, ১৯১১ সালে প্রথম জাতীয় বীমা আইন প্রমুখ সরকারী বিধানের ফলে নাগরিক-জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটয়াছে এবং তাহার ফল হয়ত ভালই হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, এইরূপ সরকারী ব্যবস্থার শুধু ব্যাখির উপশমই হয়, মূলোচ্ছেদ হয় না। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে ভাবা প্রয়োজন, আদৌ সমাজের তথা নাগরিক-জীবনের নিরাপত্তার অভাব হইবে কেন? কারণ এই অভাবই দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সরকারকেও বিবিধ আইনানুগ ব্যবস্থা ও বিপুল অর্থ-সাহায্যের দ্বারা এই অভাব পূরণে অগ্রসর হইতে হইতেছে। গোপীক চিকিৎসা যদি সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন তাহার প্রশংসা করা চলে, তবে আদৌ রোগ বাহাতে দেহে প্রবেশ করিতে না পার, তদনুযায়ী ব্যবস্থায় সরকার উত্তমোগী হইলে সেই সরকার উজ্জ্বলিত প্রশংসা পাইবার অধিকারী। বৃদ্ধিতে হইবে সেই সরকারের দৃষ্টি দূরপ্রসারী, সরকারী নিদান একেবারে গোড়ার গলদ ধরিয়া।

বুটেন ও আমেরিকার অবস্থা : বুটেন এবং আমেরিকাকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শীর্ষদেশে আদৌ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই উভয় দেশেই ব্যক্তিগত শিল্প-প্রচেষ্টা ও ও মনোভাবান্তির অবাধ স্বযোগ বর্তমান। উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়াছে এবং বাহার ফলে স্বত্বনির্ভর কারখানা-শিল্পের ব্যাপক প্রসার

ঘটনাছে, তাহাতে ব্যক্তির উত্তোকে উৎসাহিত ও প্রায় সীমাহীন মুনাফা অর্জনের সুযোগ বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহারই সঙ্গে স্বাভাবিকরূপেই সরকারী রাজস্ব-তহবিলও ক্ষীণ হইয়াছে, এবং এই ক্ষীণতায় তহবিলের সাহায্যে উন্নয়ন দেশের সরকার বিবিধ সরকারী পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপের সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন। যদিও শিল্পোন্নতির বিচারে আজ আমেরিকা বৃটেনকে বহু দূর ছাড়িয়া গিয়াছে, 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর হিসাবে কিন্তু আমেরিকা বৃটেনের পশ্চাদ্ভাবী। এইরূপ বিপুল শিল্প-সমৃদ্ধি উন্নয়ন দেশের বহিজীবনে এমন একটা চমকের সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে সন্দেহই মনে হয়, বৃষ্টি বা উক্ত দেশদ্বয়ের প্রত্যেকটি লোকই স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশীল! এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। স্বল্প-বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি শ্রমিকের মতো অবনতি বা শ্রমিক-চাহিদায় অভাব সৃষ্টি করিতেছে, ফলে শিল্প-ব্যবসায়ের চরম উন্নতি হইলেও কদাপি বৃটেন, আমেরিকা তথা পৃথিবীর কোন দেশই কেন্দ্রীভূত শিল্পনীতি অক্ষুর রাখিয়া বেকার-সমস্যা বোল আনা সমাধান করিতে পারিবে না।

সরকার প্রবর্তিত 'পূর্ণ কর্মসংস্থান নীতি' (full employment policy) ব্যাপক ভাবে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও বৃটেনের বেকার-সমস্যা তীব্রতা মোটেই উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পায় নাই। গত দুই বছর 'মধ্যবর্তী' কালে বৃটেনের বেকার শ্রমিকের হার ছিল মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হইতে ২২ ভাগ পর্যন্ত। ১১৩১—৩৩ সালে গড়ে শতকরা ২১.৩ জন এবং ১১৩৫—৩৮ সালে ১০.১ জন শ্রমিক ছিল বেকার। অর্থনৈতিক দিক্ হইতে যেযাক্ত সময়টি অপেক্ষাকৃত সুসময়রূপে কাটিলেও এই সময়েও মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকরা ১৩ জনেরও অধিক বেকার থাকা রীতিমত কঠিন সমস্যা বিবয় বলিতে হইবে। ১১৩১ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ কালেও বৃটেনের শ্রমিক-বেকারের সংখ্যা শতকরা ১০.৩ জন বলিয়া জানা যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও এই সমস্যা রীতিমত তীব্রপ্রদ—বিশ্বাস করা কঠিন বৈ কি! ১১৩১—৩৩ সালে আমেরিকার মোট শ্রমিক-সমাজের শতকরা ২২.৮ ভাগ বা ১ কোটি ১৮ লক্ষ জন ছিল বেকার; ১১৩৬—৩৯ সালে ছিল শতকরা ১৬.৩ ভাগ বা ৮৬ লক্ষ জন এবং ১১৪০ সালেও শতকরা ১৩.৮ ভাগ বা ৭৫ লক্ষ জন। সুতরাং পূঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার এই বেকার-সমস্যা যে একটা স্থায়ী সমস্যারূপেই রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং যে রাষ্ট্র পূঁজিবাদী প্রধারণ পরিবর্তন করিবে না, আবার 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' আখ্যাটিও পাইতে চাহে তাহাকে অবশ্যই বেকার-বীমার ব্যবস্থা কাপিয়া গণতন্ত্রের মুখ বন্ধ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিজ হস্তেই যদি কোন রাষ্ট্র ধনাত্মক উৎপাদনের পথে জনসাধারণের যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সন্ধাননা সন্ধানিত করিয়া পুঁজিবাদী জনগণেরই অর্বে কল্পহীনের জন্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে, তবে তাহার 'ওয়েলফেয়ার' বৃদ্ধি বা স্বরক্ষিততার প্রসঙ্গ করা কঠিন নহে কি?

ইহা তো বেকারের বীমা প্রসঙ্গ—জন্ত দিকের সমস্যাও আছে, বাহা আরও বহু গুণ মারাত্মক অথচ আধুনিকতার মায়াজন বাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। বেকারের

বীমা সংস্থানের জার অসুস্থ, উদ্বাদ প্রভৃতি শ্রেণীর নাগরিকের জন্তও ওয়েলফেয়ার স্টেটগুলিকে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিতে হয়। একমাত্র মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এত অধিক যে, শুধু তাহার কথা ভাবিলেও অস্থির মানুষের মন অসুস্থ হইবার কথা। শহরকেন্দ্রিক অসুস্থ কারখানা-শিল্প সমগ্র দেশের আবহাওয়ারকে এতই দূষিত, অসুস্থ ও পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে যে, সভ্যতার এই অবদানের কথা ভাবিলে বিষ্মিতই হইতে হয়। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের মধ্যে মানসিক ব্যাধির প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। জানা যায়, একমাত্র আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেটেই প্রতি ২২ জনে এক জন উদ্ভাদনাগরের রোগী। বিভিন্ন হাসপাতালে মানসিক দুর্বলতাগ্রস্ত রোগী এবং সম্পূর্ণ মানসিক বিকারগ্রস্ত বা উদ্ভাদ রোগীর সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে ৮১ হাজার এবং ৪০ হাজার। প্রায় ৪ লক্ষ ছেলেমেয়েই জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তি এত অপরিপুষ্ট যে, বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠ্যতালিকা অধ্যয়ন করিতেও তাহাদের কষ্ট হয়। সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যত্না রোগী যত জন, তাহার প্রায় আট গুণ অধিক রোগী হইতেছে মানসিক পঙ্গুতাজনিত। কর্মী সমাজের দেহ ও মনে কেন্দ্রীভূত কারখানা উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা যে অস্বাভাবিক ও অপরিমিত চাপ পড়িতেছে, তাহাই এবিধ মানসিক বিকারের কারণ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং এই জাতীয় বিকারগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসার সরকারী ব্যবস্থা থাকিলেই আমেরিকাকে 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'-এর আখ্যা ভূষিত করা চলে। কি না, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। মানসিক বিকৃতির মূলোচ্ছেদ না ঘটাইয়া এইরূপ বিপরীত ব্যবস্থা দ্বারা আমেরিকা প্রকৃতই 'ওয়েলফেয়ার' করিতেছে, না 'ওয়েলফেয়ার'-এর বিকলতা করিতেছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিবার নীতিকে আমরা স্মরণিত বলিব, না দুর্নীতি বলিয়া নিন্দা করিব? আমেরিকা পূঁজিবাদের উৎস, পূঁজিবাদিগণের নিরঙ্কুশ স্বর্গরাজ্য। তথায় পূঁজিবাদীগণ প্রভূত মুনাফা অর্জন করিতেছেন, সরকার তাহাদের উপর হইতে মোটা কর আদায় করিতেছেন, এবং পূঁজিবাদী ব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ লোকের যে মানসিক বিকৃতি ঘটতেছে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন! আমরা বিশেষ ভাবে বেকার-ব্যাধি এবং মানসিক ব্যাধির কথা উল্লেখ করিতেছি বলিয়া অপরাধের ব্যাধির তথ্য উল্লেখ হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। বস্তুত: কারখানা-শিল্পের ঘোঁরা যে দেশে বত প্রবল, বত ব্যাপক, সেই দেশের জনগণের আধি-ব্যাধির বহরও ততই বেশী। তবে আমরা পূর্বেই বলিয়াছি—সরকারী ব্যবস্থায় ব্যাধির চিকিৎসারও চেষ্টা হয়—ইহাই বা সন্দেহ!

ভারতের অবস্থা: ভারতে আমরা যেমন কেন্দ্রীভূত বা পূঁজিবাদী উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করিতে পারি নাই, তেমনি বিকেন্দ্রিক উৎপাদনেও এ যাবৎ কোন নতন পথের কার্যকরী ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই। বৃটেন-আমেরিকার রোগ সৃষ্টি করিয়া রোগীর জন্ত হাসপাতাল করিবার ক্ষমতা আছে, আমাদের উহার কোনটাই নাই। কিন্তু ওজ্জ্বল রোগ বসিয়া নাই, বেকার-রোগীর সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান! বস্তুত: আমেরিকা-বৃটেনের অসুস্থরূপে বৃহৎ কেন্দ্রীভূত শিল্পের পথে আমাদের দেশেও বেকারসংখ্যা ক্রমেই পূর্ণাপেক্ষা



বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত। ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুখার্জির মতে, ভারতে ১৯১১ সাল ও ১৯৩৬ সালের মধ্যে কারখানার সংখ্যা ২ হাজার ৭ শত হইতে ১ হাজার ৩ শততে দাঁড়ায়, আর এই ২৫ বৎসরে কারখানা-শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিক-সংখ্যায় শতকরা ১১ ভাগ হইতে শতকরা ১৪ ভাগে এবং মোট জনসংখ্যায় শতকরা ৪.৫ ভাগ হইতে শতকরা ৮ ভাগে দাঁড়ায়। ওয়ার্ধার অধ্যক্ষ শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ১০ লক্ষের মধ্যে বিবিধ কর্মে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ জন এবং তন্মধ্যে উক্ত বৎসরে মাত্র ১৬ কোটি ৮০ জনের কর্ম ছিল, ২ কোটি ৭০ জন ছিল কর্মহীন বা বেকার। আংশিক কর্মে নিযুক্ত লোকের হিসাব পরিলে উক্ত বৎসরে বেকার-শ্রমিকসংখ্যা দাঁড়ায় অনুন ২ কোটি। তদুপরি রহিয়াছে ১১ কোটি ৪০ লক্ষ কৃষক—গাভারের বৎসরে গড়ে ৫ মাস বেকার থাকিতে হয়। কান্ট্রি আমাদের সমস্তা কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ বেকার লোকের বোমা নহে, কয়েক কোটি লোকের কর্ম-সংস্থান, জীবন বাপনের ব্যবস্থা। অগ্রে লোকসংখ্যায় বৃহত্তর অংশের কর্মসংস্থান হইলে, তাহাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার স্বাভাবিক নিয়মে ব্যবস্থা হইলে তবেই শুধু অবশিষ্ট অংশের ক্ষত্র সরকারী নিয়ন্ত্রণমূলক ও সাহায্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করার চেষ্টা হইতে পারে। দেশটাকে আগাগোড়া রোগী বানাইয়া তাহার ক্ষত্র হাসপাতালের ব্যবস্থা করার চিন্তা করাও মারাত্মক রোগের লক্ষণ। কান্ট্রি আমাদের অগ্রে বিবেচ্য বিষয় হইতেছে, রোগী সংখ্যা বত দূর সম্ভব নিয়ম হারে রাখা। উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার সেই মাগে পৌছবার পরেই শুধু তথাকথিত ওয়েলফেয়ার স্কীমের কথা ভাবা হইতে পারে।

**গঠনমূলক পরিকল্পনায় সরকার :** 'ওয়েলফেয়ার ট্রেট'-এর নাম ধারণ না করিলেও আজিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই কতকগুলি মৌলিক ওয়েলফেয়ার স্কীম বা গঠনমূলক পরিকল্পনায় অগ্রণী হইতে হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার উক্ত খাতে প্রতি বৎসরই মোটা অর্থ বরাদ্দ করিয়া আসিতেছেন। নিম্নবর্ণিত হিসাবে এই বরাদ্দের একটা কিরিস্তি পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই, শুধু বিভিন্ন রাজ্য-সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায় প্রভৃতি বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহারই মোট অঙ্ক সন্নিবিষ্ট হইল :

( হাজার টাকার হিসাব )

| গঠনকর্মে ব্যয় | মোট ব্যয় | গঠনকর্মে মোট ব্যয়ের শতাংশ |
|----------------|-----------|----------------------------|
| ১৯৩৭-৩৮        | ২৭,১৭,১১  | ৩৪.১৮                      |
| ১৯৩৮-৩৯        | ২৮,৭১,০৮  | ৩৫.৬৬                      |
| ১৯৩৯-৪০        | ২৯,৭৫,৬৬  | ৩৫.৭০                      |
| ১৯৪০-৪১        | ৩১,২৭,৩৬  | ৩৫.৪২                      |
| ১৯৪১-৪২        | ৩৩,৪০,৩৫  | ৩৪.৮২                      |
| ১৯৪২-৪৩        | ২৯,২৪,১২  | ৩০.৩০                      |
| ১৯৪৩-৪৪        | ৪১,০৪,১০  | ২৭.৮৬                      |
| ১৯৪৪-৪৫        | ৫২,০৪,৩৭  | ২৭.০২                      |

( হাজার টাকার হিসাব )

| গঠনকর্মে ব্যয় | মোট ব্যয়  | গঠনকর্মে মোট ব্যয়ের শতাংশ |
|----------------|------------|----------------------------|
| ১৯৪৫-৪৬        | ৫৩,৪১,৫৯   | ২১.৩২                      |
| ১৯৪৬-৪৭        | ৬৬,০০,০০   | ৩২.২৬                      |
| ১৯৪৭-৪৮        | ৭৫,১১,৭৮   | ৩৫.৩৬                      |
| ১৯৪৮-৪৯        | ১,০০,১৫,৭৭ | ৩৯.১৫                      |
| ১৯৪৯-৫০        | ১,৩০,৭০,৭০ | ৪৪.১৮                      |
| ১৯৫০-৫১        | ১,৩২,০৮,৭৬ | ৪৬.৪৬                      |

(বাজেট বরাদ্দ)

ভারত-বিত্তিক ও তজ্জনিত সমস্তাদির ফলে ব্যয়ের যে মাত্রাধিক বৃদ্ধি ঘটয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে স্মরণীয়। আবার বিভিন্ন ব্যয়-বহুল গঠনমূলক-পরিকল্পনায় সতর্কতা ও দূরদর্শিতার অভাব হেতু বিপুল অপচয়ের কথা অধুনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সমস্তার অপর একটি দিক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা আজ স্পষ্টই আমরা দেখিতেছি যে, সরকারী গঠনকর্মের ব্যাপকতা সত্ত্বেও দেশের বেকার-সমস্তা, স্বাস্থ্য-সমস্তা ও শিক্ষা-সমস্তা তথা জাতির সামগ্রিক গঠন-সমস্তার এক-শতাংশও আমরা স্পর্শ করিতে সক্ষম হই নাই। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হেতু (পূর্বোক্ত বেকার-সমস্তা সত্ত্বেও) আমেরিকা বুটেন প্রভৃতি দেশে মাথাপিছু আয় ভারতের জনসংখ্যার গড়পত্র মাথাপিছু বার্ষিক আয় (১৯৪৭) অপেক্ষা কত বেশী, তাহা জ্ঞাপ্য করিবার বিষয় :

|            |      |                |      |
|------------|------|----------------|------|
| আমেরিকা :  | ৪৬৪৩ | অষ্ট্রেলিয়া : | ২১৬০ |
| কানাডা :   | ২৮২৬ | সিংহল :        | ৩০০  |
| ডেনমার্ক : | ২৬৪৭ | ফিলিপাইন :     | ২২৮  |
| বুটেন :    | ২৩৫৬ | পাকিস্তান :    | ২২৫  |
|            |      | ভারতবর্ষ :     | ২১৩  |

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিভ্রান্ততাকে স্বীকার করিয়া লইলেও সরকারী রাজস্ব আদায়ের বা আয়বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতে এখনও কত সর্কারী তাহা সহজেই উল্লিখিত তথ্য দৃষ্টে উপলব্ধি করা যাইবে। আমেরিকা, বুটেন প্রভৃতি দেশের সরকার পুঁজিবৃত্ততায় বাধার স্রষ্টা না করিয়াও 'ক্রমবর্ধিত হারে কর আদায়ের' ('progressive taxation policy without hindering capital formation') নীতি' বলবৎ করিতে পারিয়াছেন, ভারত সরকার সে সুবিধা হইতেও বঞ্চিত। সরকারী স্বর্ণ আদায়ের ক্ষেত্রেও ভারত আর বুটেনের অবস্থার বিপুল পার্থক্য। বুটেনের আয়তন অবিভক্ত ভারতের মাত্র এক-অষ্টমাংশ, আর সেই অল্পাংশে এক জন বুটেনের আয় এক জন ভারতীয় অপেক্ষা প্রায় ৭৮ গুণ বেশী। রাষ্ট্রের নাগরিক-সমাজ সমৃদ্ধ না হইলে, তাহাদের যথোপযুক্ত আর্থিক সম্ভ্রতি না থাকিলে সরকার কেবল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বা লব্ধিকারকের উপর কতটুকু নির্ভর করিতে পারেন? উপরন্তু, পুঁজিপতি হইলেও বুটেন-পুঁজিপতিগণের নিজ দেশের উপরেও খানিকটা দয়দ আছে, ভারতীয় পুঁজিপতিগণের তাহাও নাই, তাহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থই এক এবং অধিতীয় স্বার্থ এবং এই স্বার্থেরই প্রেরণায় সরকারী স্বর্ণে অর্থ লব্ধি করা অপেক্ষা

কাঁহারা অর্ধেক পথে অধিক সুরের চিন্তাকেই অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। দেখা যায়, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ২ হাজার ৫ শত কোটি পাউণ্ড ঋণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, আর তাহার আট গুণ আয়তনযুক্ত ভারতের সরকার উক্ত বৎসরেই সর্বসাকুল্যে পাউণ্ডের হিসাবে ১ শত কোটি পাউণ্ডের অধিক মূল্যের টাকা ঋণরূপে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা উচ্চ মার্গে পৌঁছিতে পারিলেও যদি বা বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা যাইত এবং তদ্বারা 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' হস্তক্ষেপ করা সম্ভবপর হইত, বর্তমানে ভারত সে সুযোগ হইতেও বঞ্চিত। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, শিল্পোন্নতির নামে দেশের কোটি কোটি মানুষের ধন-সম্পদ জন কয়েক কোটিপতির হাতে কয়েক শত কারখানার গাভীতে আবদ্ধ করিবার সুযোগ দেওয়া মারাত্মক। এইরূপ কেন্দ্রীভূত শিল্পনীতির বিবক্ষণ পরিণাম আজ আমরা আতঙ্কপ্রাপ্তিক পরিহৃতির মধ্যেই লক্ষ্য করিতেছি। সুতরাং এই নীতিতে দেশকে শিল্প-ব্যবসায়ে সমৃদ্ধত করিয়া দেশের আর্থিক সম্ভ্রতি বাড়াইব এবং ওয়েলফেয়ার স্টেটের জন্তও তখন অর্থসংস্থানে অনুরোধ হইবে না এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি যেন আমরা বজ্রন করিতে পারি। বস্তুতঃ পুঁজিবাদ বজায় রাখিয়া 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'রূপে নাম জাহির করার মধ্যে সততা নাই, আছে বকনা ও বুদ্ধির বিকৃতি। শিল্পোন্নত দেশগুলি শুধু পুঁজিবাদের সমর্থন করিয়াই ওয়েলফেয়ার স্টেট-এর অর্থ সংগ্রহ করিতেছে এমন নহে, অপরাপর অসংগত পথেও সরকারী রাজস্ব আদায়ের সর্ববিধ প্রয়াস চলিতেছে। 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' বা জনকল্যাণকর পরিকল্পনা প্রবর্তনের জন্ত যদি জনগণের সর্বনাশকর পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তখন 'ওয়েলফেয়ার' অপেক্ষা জনগণকে মরিতে দেওয়াও শ্রেয়ঃ। অপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ মিঃ জি. ডি. এইচ. কোল তাহার অধুনাপ্রকাশিত 'British Social Services' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকার বুটেনে খালি সরবরাহ ও অন্যান্য 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' খাতে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ৩৬ কোটি পাউণ্ড, আর 'it was getting back much more than it was paying out by high taxation on beer, tobacco

and other non-necessaries that are widely consumed by the working people।' আমরাও কি এইরূপ অনাবশ্যক ও অপ্রতিকর দ্রব্যাদির জনপ্রিয়তার দ্বারা সরকারী তহবিল স্ফীত করিয়া 'ওয়েলফেয়ার স্টেট' চালাইব? অপর এক জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ Mr. Malane এই প্রশ্নকেই বলিতেছেন : "In short the continuation of the Welfare State which is intruded to improve the physical, mental and moral condition of the average citizen depends, to a decisive extent, upon his continuing to drink, smoke, gamble and go to the cinema." বাহার মোট অর্থ হইতেছে এই যে, যে নাগরিকের দৈহিক, মানসিক এবং নৈতিক কল্যাণ করাই 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'র আদর্শ, ঠেট অর্থ সংগ্রহের জন্ত সেই নাগরিককেই মত্তপান, জুয়া প্রভৃতিতে মগ্ন রাখা দিতেছে! আমাদের রাজ্যগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঘোষিত নীতি ও আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলে স্বাভাবিক নিয়মেই সমগ্র ভাষ্যের অর্থনীতি একটা সহজ ও সমৃদ্ধ রূপ লাভে সমর্থ হইবে। ভারতীয় সংবিধানের 'directive principles' অধ্যায়ে রাজ্যগুলির কর্মনীতির নির্দেশ স্পষ্ট ভাবেই উল্লিখিত আছে এবং বিকেন্দ্রিক নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই যে এই কর্মনীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাও সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ রাজ্যগুলি উহাকে কতটুকু অনুসরণ করিতেছে? আজ অবধি বিকেন্দ্রিক পন্থার উৎপাদন ও বন্টনের কোন নব-জাগরণ লক্ষ্য করা যাইতেছে কি? গতামুগতিক কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় জনগণের আর্থিক জীবনের মান উন্নত হইবে কিরূপে, সরকারী বা তাঁহাদের জনকল্যাণ পরিকল্পনা চালু করিবার উপযোগী অর্থ পাটবেন কোথা হইতে? 'ওয়েলফেয়ার'-এর মূল আদর্শ স্বীকার করিয়া লইয়াও আমরা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, আর সেই বিরুদ্ধাচরণের ফলে দেশ ও সমাজব্যাপী যে ব্যাপক রোগ-শোকের উদ্ভব হইতেছে, তাহা নিরাময়ের জন্ত পুনরায় বিদেশী রাষ্ট্রের হাঁচ আদর্শ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আমদানি করিতেছি!—কিমান্বধ্যমতঃপরম্?

### বাক-সংযম

কলকাতা শহরের এক পল্লিতে এক জন সাহিত্যিকের বাস। তাঁর গৃহের এক ঘরে প্রায়ই সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকদের মিলন হয়। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, সাহিত্যালোচনা। এক দিন সায়াহ্নে আগন্তুকরা এসে দেখলেন আলোচনার ঘরের দেওয়ালে একটি লিপি টাঙানো রয়েছে। লিপিতে লেখা রয়েছে, "পেন্সিল কাটিতে বাইরা হাতের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিয়াছি। টিন্চার আইণ্ডিন দেওয়া হইয়াছে। ভয়ের কিছু নাই।"

আগন্তুকরা ঐ লিপি পাঠের শেষে ঘরের মালিকের প্রতি দৃকপাত করেন। দেখেন সত্যিই আঙ্গুলে ব্যাণ্ডেজ। এই সাহিত্যিক আর কেউ নন, গড্ডালিকা, কজ্জলী ও হনুমানের অপ্লেথ রচনাকার ঐরাবলেশ্বর বসু, বীর ছদ্মনাম 'পরশুরাম'।

# সাহিত্য

মেঘনা মল্লিক

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশ্যামসুন্দর দাশ

আত্মপ্রাম—টীকাকার। গ্রন্থ—কামলকৌটীক, গীতগোবিন্দ-টীকা, নাগানন্দটীকা, মহাবীরচরিতটীকা, বিলম্বমুখমণ্ডন-টীকা, বৃত্তবন্ধকরটীকা, শালিবাহনসমুদ্রতটীকা।

আত্মপ্রাম মুখোপাধ্যায়—কবি। নিবাস—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—স্মৃতিচরিত্রবিদ্য।

আত্মপ্রাম ব্যাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চণ্ডীমাহাত্ম্যটীকা।  
আত্মপ্রাম—কবি। কাব্যগ্রন্থ—শ্রমস্তকমণিহরণ (বা কৃষ্ণ-বজ্র)।

আদিত্য সুরি—জৈন জ্যোতিষবিদ। গ্রন্থ—কালদর্শন।  
আদিত্যচাঁদ—ধর্মগ্রন্থকার। নামান্তর—কোশিকচাঁদ। গ্রন্থ—অশৌচনির্ণয় বা 'বদ্বনীতি'।

আনবার খাঁ—কবি। জন্ম—১৭২৩ খৃঃ। গ্রন্থ—'সতসঙ্গ' বিহারীলাল-কৃত) টীকা—আনবারচন্দ্রিকা।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২২ খৃঃ কলিকাতা।  
মৃত্যু—১৮৯৭ খৃঃ ১৪ই সেপ্টেম্বর। পিতা—মদনমোহন বসু।  
শিক্ষা—হিন্দু কলেজ। ইনি 'শব্দকল্পদ্রুম' ও 'বিষকোষ' বহু প্রবন্ধ লেখেন।

আনন্দ গিри—গ্রন্থকার। শ্রীশঙ্করাচার্যের শিষ্য। গ্রন্থ—শঙ্কর-বিজয়, সূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য।

আনন্দচন্দ্র কান্তগিри—গ্রন্থকার। নিবাস—মালদহ। গ্রন্থ—মানব-জন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিজ্ঞা, ১ম ও ২য় ভাগ (মালদহ, ১৮৬৯), Theory and Practice of Midwifery (১৮৬৮)।

আনন্দচন্দ্র দেব—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নভাণ্ডার (কুমিল্লা, ১১০১)।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ—অমুবাদক। গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবতের অমুবাদ (মুক্তরাম বেদান্তবাগীশ সহ—১৮৫৫—৬৫ খৃঃ), তাণ্ড্রাক্ষর (কলি, ১৮৬১—৭৪ খৃঃ, পৃঃ ১৮৪২), পঞ্চদশী (১৩২৪, পৃঃ ৫৬৩)।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৩ বঙ্গ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গ। গ্রন্থ—হেলেনাকাব্য, মিত্রকাব্য, প্রেমানন্দ, ভারতমঙ্গল, মাতৃমঙ্গল, প্রবন্ধসার, ভিক্টোরিয়া-গীতিকা (১১০১), বাণ্যকবিতা, পদ্মসার, পাঠসার, গণশিক্ষাসার।

আনন্দচন্দ্র শিরোমণি—কবি ও পাঁচালীকার। জন্ম—১২১০ বঙ্গ, ভটপলী। মৃত্যু—১৮৮৭ খৃঃ। পিতা—কান্দীনাথ বিত্তা-বাচস্পতি। পাঁচালী গ্রন্থ—স্ববল-সংবাদ, অক্রু-সংবাদ, কলক-ভঞ্জন, উদ্ধব-সংবাদ।

আনন্দচন্দ্র সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জ্ঞানাজন (কলি, ১৮৭৪ খৃঃ)।

আনন্দচন্দ্র সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গৃহস্থের কতব্য।

আনন্দ চান্দ, পি—ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিবিদ। জন্ম—১৮৪২ খৃঃ মাদ্রাজ। মৃত্যু—১১০১ খৃঃ। রায় বাহাদুর ও নবদ্বীপ হইতে বিত্তাভিনোদ উপাধিলাভ। ১৮৯১ খৃঃ কংগ্রেস সভাপতি (নাগপুর), সম্পাদক—Peoples Magazine.

আনন্দ তীর্থ—বৈদান্তিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১১১১ খৃঃ। মৃত্যু—১১১১ খৃঃ। গ্রন্থ—কৃষ্ণকর্ণামৃতমহার্ণব, আরাধিতোজ, উপাধিগুণ, উপনিষদ্ সমূহের ভাষ্য ও টিপ্পনী, জয়ন্তীকল্প, তত্ত্বসার, জ্ঞানবিবরণ, প্রমাণসংগ্ৰহ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি।

আনন্দ দাস—পদ্যকর্তা। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জগদীশ-চরিত্রবিজয়।

আনন্দনাথ রায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬২ বঙ্গ ফরিদপুর জেলার জেপুসা গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩১ বঙ্গ। পিতা—হরনাথ রায়। গ্রন্থ—ললিতকুম্ব (নাটক, ১২৮৮ বঙ্গ—ছদ্মনাম রামকান্ত সেন নামে প্রকাশিত), বারভূঞা (ইতিহাস), ফরিদপুরের ইতিহাস ১ম, ২য় খণ্ড।

আনন্দ পণ্ডিত—টীকাকার। গ্রন্থ—দেবীমাহাত্ম্যটীকা।  
আনন্দপূর্ণ বিত্তাসংগ্ৰহ—টীকাকার। গ্রন্থ—কঙ্কাকাবিভঞ্জন, তায়চন্দ্রিকা, ভাবতত্ত্ব, সমবয়স্কবিবৃতি, টীকারত্ন, তায়কল্পলতিকা।

আনন্দবোধ পরমহংস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রায়দীপাবলী, প্রমাণ-বজ্রমালা (টীকা), শ্রায়মকরন্দ, শ্রায়োপদেশমকরন্দ।

আনন্দবোধিন্দ্র সরস্বতী—টীকাকার। গ্রন্থ—যোগবাস্তিষ্ঠ তাৎপর্য-প্রকাশ।

আনন্দবোধেন্দ্র ভট্টাচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১২২৮ খৃঃ (আহু)। গ্রন্থ—শ্রায়মকরন্দ, প্রমাণমালা, শ্রায়দীপাবলী, যোগবাস্তিষ্ঠ রামায়ণ-টীকা।

আনন্দ ভট্ট—গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বঙ্গালংকৃত (১৫১০ খৃঃ)।

আনন্দময়ী দেবী—মহিলা কবি। জন্ম—১৭৫২ খৃঃ বিক্রমপুর জপসা গ্রামে। পিতা—লালা রামগতি সেন। স্বামী—অধোয়ারাম সেন (কবীন্দ্র)। গ্রন্থ—হরিলীলা (লালা জয়নারায়ণ সেন-সহ—১৭৭২ খৃঃ)।

আনন্দমোহন সরকার—গ্রন্থকার। নিবাস—বহরমপুর। গ্রন্থ—প্রাচীন অক্ষরবলী (A selection of ancient nomenclature—১৮৭১)।

আনন্দরঙ্গ পিলে—ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৭৭১ খৃঃ মাদ্রাজ প্রদেশের পোরোহরে। মৃত্যু—১৭৬১ খৃঃ। পিতা—ভিক্রমচন্দ্র পিলে। গ্রন্থ—হিম্মত বহাদুর (মরাঠা ভাষায়), অমুবাদ গ্রন্থ—উগাটা জমাদানী।

আনন্দরাম চক্রবর্তী—কবি। জন্ম—১৭৭০ খৃঃ শ্রীহট্ট। মৃত্যু—১৮৪০ খৃঃ। গ্রন্থ—পদ্মপুর্ণাণ (কবিতা)।

আনন্দরাম চেকিয়াল ফুকন—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩০ খৃঃ গোঁহাটা, আসাম। মৃত্যু—১৮৫১ খৃঃ। পিতা—হালিরাম চেকিয়াল। গ্রন্থ—আইন ও ব্যবস্থা, অসমীয়া লরার মিত্র।

আনন্দরাম বড়ুয়া—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫০ খৃঃ গোঁহাটা। মৃত্যু—১৮৮১ খৃঃ। পিতা—গর্গরায় বড়ুয়া। গ্রন্থ—ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, মহাবীরচরিতের আনন্দরাম ভাষ্য, অমরকোষের টীকা, শাক্তকল্প, Bhavabhuti.

আনন্দরাম মুখলিস—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—তজ্জিকিয়া (১৭৪৮ খৃঃ)। এই গ্রন্থে নাদির শাহের ভারতে অবস্থান-কালের ঘটনা বিবৃত আছে।

আনন্দরাম বাজ্রিক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বজ্রব্দীয় সংস্কারপদ্ধতি।

আনন্দ রায়—প্রসিদ্ধ কবি। মৃত্যু—১৭৫১ খৃঃ। ‘দিবান-ই-সদেহে’ ইহার বহু কবিতা আছে।

আনন্দরায় মথী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—বিভাপতি-পরিণয়, জীবনন্দ।

আনন্দরায় শাস্ত্রী—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—শতকোটিখণ্ডন (ভায়গ্রন্থ)।

আনন্দ শর্মা—টীকাকার। পিতা—দ্রাব্যক। গ্রন্থ—ব্যাসার্থ-কৌমুদী নাম্নী রসমঞ্জরী টীকা।

আনন্দ সিংহ—আয়ুর্বেদবিদ। গ্রন্থ—আনন্দমালিকা বোগশাস্ত্র।

আনন্দামৃতভব আচার্য—টীকাকার। গ্রন্থ—তর্কদীপিকা, ভায়-কলানিধি (ভায়সারের টীকা), রসদীপিকা (বৈভক্তগ্রন্থ)।

আনি বেসান্ট (Annie Besant)—বিদ্যা ইংরেজ মহিলা। জন্ম—১৮৪৭ খৃঃ ১লা অক্টোবর। মৃত্যু—১৯৩৩ খৃঃ ২০এ সেপ্টেম্বর। পিতা—উইলিয়ম পেজ উড। স্বামী—রোডারেল ফ্রান্স বেসান্ট। শিক্ষা—প্রবেশিকা (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭১ খৃঃ), বি, এস, সি (লণ্ডন), ডি, এল (বারাঘনৌ হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়)। সভাপতি—Indian National Congress (১৯১৭ খৃঃ), Theosophical Society. সম্পাদক—Theosophy (Theosophical Societyর মুখপত্র)। যুগ্ম-সম্পাদক—National Reformer. গ্রন্থ—Introduction to Yoga (মাস্ত্রাজ, ১৯২৭, পৃঃ ১৪৫), Indian Ideals in Education (কলি, ১৯২৫, পৃঃ ১৩৫), সম্পাদিত গ্রন্থ—Sreemad Bhagawat Gita (মাস্ত্রাজ, ১৯২২, পৃঃ ২৬৪), Universal Text Books of Religions & Morals, ১ম খণ্ড (লণ্ডন), ২য় খণ্ড (লণ্ডন, ১৯১১), ৩য় খণ্ড (মাস্ত্রাজ, ১৯১৫)।

আপদেব—দার্শনিক ও মীমাংসক। জন্ম—১৭শ শতাব্দী। পিতা—অনন্তদেব। গ্রন্থ—মীমাংসা ভায়প্রকাশ, বাগবোধিনী (বেদান্তসারের টীকা)।

আপ্তাবুদ্দিন—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জামিল দিলারাম (বাংলা ভাষায়)।

আপ্তে, বামন শিবরাম—আভিধানিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Students Guide to Sanskrit. Composition (পুনা, ১৮১০ খৃঃ, পৃঃ ৩৬৩), Sanskrit-English Dictionary (বোম্বাই, ১৯১০), English-Sanskrit Dictionary (বোম্বাই, ১৯১৬)।

আবদর রহমান—গ্রন্থকার। জন্ম—ঢাকা জেলার শরাৎগঞ্জ। গ্রন্থ—গমের দরিয়া (১২১০ বঙ্গ)।

আবদুর রউক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথের ডাকে, অশ্রু-সেতায়।

আবদুর রহিম—গ্রন্থকার। জন্ম—ময়মনসিংহের অন্তর্গত গলাচিপা হসেনপুরে। গ্রন্থ—বিলওয়ালী (বাংলা ভাষায়, ১২৬৮ বঙ্গ), শেক খরিব (১২৯১ বঙ্গ)।

আবদুল আজিজ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সংক্ষিপ্ত মহম্মদ চরিত, ১ম ভাগ (কুটুয়া, ১৯৩১)।

আবদুল ওদুদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পথ ও বিপথ (না), হিন্দু মুসলমানের বিরোধ।

আবদুল করিম, মুন্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—১১শ শতাব্দী। গ্রন্থ—তারিখ ই-অহম্মদ (ফা), ওয়াকিব-ই-ছরানী (১৮৭৫), মুহাররা-ই-কাবুল ও কান্দাহার।

আবদুল করিম মুন্সী, সাহিত্যবিদ্যার—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৭ খৃঃ খ্রীষ্ট। বি, এ (১৮৮৩), সহকারী ও পরে বিভাগীয় ইনস্পেক্টর। গ্রন্থ—ভারতে মুসলমান রাজ্য, আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (এনামল হক সহ); সম্পাদিত গ্রন্থ—গৌরববিজয় (সেখ ফরজুল্লা প্রণীত), যুগলুক-সংবাদ (রামরাজ্য বিরচিত)।

আবদুল করিম, মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্ম—করিমপুর জেলার চরসিমুলিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—নসি হতে করিমা (১৩০০ বঙ্গ), কল্যায়েল হরমায়েল (১২৮৩ বঙ্গ), কলিলাতে হয (১৩০০ বঙ্গ) মফিদল খালেয়েক (১৩০০), মফিদল ইসলাম (১৩০১ বঙ্গ)।

আবদুল কাদির—গ্রন্থকার। নিবাস—লক্ষ্মী দেবীগ্রাম। গ্রন্থ—(পায়ন্ত ভাষায়) পাতঞ্জলের বোগশাস্ত্রের অম্ববাদ।

আবদুল কাদের—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। গ্রন্থ—বকরবালা মাতম হুসেন (১২১৬)।

আবদুল কাদের—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উহির অল্ মনসুর, মোস্লেম কীর্তি, ১-৩য় খণ্ড, শের শাহ, সোলতান মামুদ, তুরস্কের ইতিহাস।

আবদুল গনি—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—ময়মনসিংহ। গ্রন্থ—শাহ কামাল স্মৃতিভানু বিবি (১২১০)।

আবদুল মজিব—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—কটক। গ্রন্থ—রবাহার (১২৭১), বোবাটার বমন্ (১২১৬)।

আবদুল রহমান—কবি। নিবাস—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—কাবামতে এবামায়েন (মৈমনসিংহ, বাংলা পত্র, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ২৪), নূতন নহিত্তেল মোমিন (কবিতায় নীতিকথা, মৈমনসিংহ, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ৪৮)।

আবদুল লতিক—গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর। গ্রন্থ—মানব সংস্কারক। সংসার ও ধর্ম (মেদিনীপুর, ১২৮৫ বঙ্গ, পৃঃ ৮৬)।

আবদুল শুকুর—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—পাবনা জেলার শাহজাদপুরে। গ্রন্থ—নূরুল বসল (১২৯৭), গোলবকাওলি (১৩০০), গোল-সানে নববাহার (১৩০৪)।

আবদুল হকিম—গ্রন্থকার। জন্ম—চট্টগ্রাম। গ্রন্থ—লালমতি সরকল মুদ্রক (১২১৫), ইউনুফ দেসো।

আবুনাছের সৈয়দুল্লা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আফগান আমীর চরিত, ১ম—২য় খণ্ড।

আবুল কাশেম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিজ্ঞানের জয়রহস্য, মানসী।

আবুল হাছান—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৌদ্বিজ্ঞান।

আবুল হুসেন—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ হুগলী জেলার বাগনান গ্রামে। শিক্ষা—কলিকাতা, লণ্ডন, ও

আমেরিকা। এম-ডি (আমেরিকা)। কাব্যগ্রন্থ—বর্গারোহণ, বমজ ভগিনী, জীবন্ত পুতুল। পাঠ্যপুস্তক—ইংরেজি শিকা সোপান, এসলামের ইতিহাস, স্পেন বিজয়, সত্যদাতা।

আমরাজ—জ্যোতির্বিদ ও গ্রন্থকার। ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান। গ্রন্থ—খণ্ড-খাত গ্রন্থের (ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত) টীকা।

আমানত উল্লাহ, মৌলভী হাতেজ সৈয়দ—গ্রন্থকার। জন্ম—২৪ পবগণার বসিরহাট গ্রামে। গ্রন্থ—(বঙ্গভাষায় লিখিত) কেরামত নাম।

আমানত মুন্সী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। কাব্যগ্রন্থ—ইঙ্গরাজ।

আমীহুদীন—গ্রন্থকার। নিবাস—ঢাকা। গ্রন্থ—প্রবোধ-সুধাকর, ১ম ভাগ (১৮৭১)।

আমীর আলি, সৈয়দ—ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ ৬ই এপ্রিল চুঁচুড়া গ্রামে। শিক্ষা—হুগলী কলেজ, বি, এ (১৮৬৭ খৃঃ), এম, এ (১৮৬৮), বি, এল, বার এট ল (১৮৭৩), অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সি-আই-ই উপাধিলাভ (১৮৮৭ খৃঃ), হাইকোর্টের বিচারপতি (১৮৯০—১৯০৪), প্রভিক্টাউকিলের সদস্য (১৯০১)। গ্রন্থ—The Spirit of Islam, Ethics of Islam, Life and Teachings of Mahamad, The History of Saracens, Mahamadan Law, Law of Evidence, Bengal Tenancy Act.

আমীরুদ্দিন মিয়া—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সচিত্র দ্বীপাঠ (ঢাকা, ১৯০১)।

আব্রাহেম হুরি—জৈন পণ্ডিত। গ্রন্থ—মণিকোষ গ্রন্থের টীকা (১৩৩৩ খৃঃ)।

আয়জদ্দিন মুখী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। জন্ম—হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে। গ্রন্থ—গোল আদাম (১২১০ বঙ্গ)।

আব্দেব—বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্মস্থান—দাক্ষিণাত্যে ৩য় শতাব্দীতে। গ্রন্থ—চতুঃশতক, চিত্ততত্ত্বপ্রকরণ, হস্তবলপ্রকরণ।

আব্দিউল্লাহ (প্রথম)—গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ। জন্ম—৩৭৬ খৃঃ কুসুমপুরে (বর্তমান পাটনা)। গ্রন্থ—কুটকবিধি, আব্দিউল্লাহ, আব্দিউল্লাহ, বীজগণিত।

আব্দিউল্লাহ (দ্বিতীয়)—জ্যোতির্বিদ। জন্ম—১৫০ খৃঃ। গ্রন্থ—আব্দিউল্লাহ দশগীতিকাবি।

আবদুর—বৌদ্ধ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—৪র্থ শতাব্দীতে। গ্রন্থ—জাতক-মালা (সংস্কৃত)।

আলাউল পণ্ডিত, সৈয়দ—বঙ্গীয় মুসলমান কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৬২৫ খৃঃ ফরিদপুরের কতোরাবাদ পরগণার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানে। গ্রন্থ—হস্তপরকর (সম্পাদিতকর। ১১৬০ বঙ্গ), সত্যী মহনা (কাজী দৌলত পণ্ডিত সহ—১১৪১ বঙ্গ), দারাসেকন্দরনামা (১১১৫ বঙ্গ), পদ্মাবতী (১১৮৭ বঙ্গ), সরকল মুদ্রক, বজ্রউজ্জ্বাল, লোরচন্দ্রাবী, তাতিকা (বঙ্গমুদ্রাবাদ), কুফলীলা বিবরক পদ্মাবতী।

আলিমুদ্দিন মুন্সী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দিল্লীর রাজাদিগের নাম (বরিশাল, ১৮৭৫)।

আলী মোল্লা, মৌলভী—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্র—সভারাজেন্দ্র (বাংলা ও ফার্সী ভাষায়—১৮৩১ খৃঃ)।

আলী, মৌলভী—পত্রিকাসম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—জাননীপক (বাংলা, ইংরেজি, হিন্দী ও ফার্সী ভাষায় ১৮৪৬ খৃঃ)।

আলীরাজা—গ্রন্থকার। নামান্তর—কাম্ব ফকির। নিবাস—চট্টগ্রামের অধীন ওলাখাইন গ্রামে। গ্রন্থ—জ্ঞানসাগর, ধ্যানমালা, জ্ঞানকুলপ, বটচক্রভেদ, সিরাজকুলপ, কুফলীলা-বিবরক পদ্মাবতী, জামাসঙ্গীত।

আশক মুহম্মদ—কবি ও গ্রন্থকার। জন্মস্থান—বংপুর জেলার শীতলগাড়ী। গ্রন্থ—একদিল শাহ (১২৪১ বঙ্গ)।

আশরফ আলি, মীর—চিকিৎসক। গ্রন্থ—খাত্রীবিজ্ঞ। (১৮৬১ খৃঃ)।

আশাধর—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—গ্রন্থবন্ধ (১১৩২ খৃঃ), গ্রন্থবন্ধ-শাণ্ডী।

আশাধর—জৈন কবি ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্মামৃত, জিন-বস্ত্রকল্প (১২১৮ খৃঃ)।

আশালতা দেবী—ঔপন্যাসিকা। গ্রন্থ—হে বন্ধু বিদায়, জীবনের যাত্রাপথে, যৌবনের সিদ্ধান্তে, কলঙ্কের ফুল, কালের কপোলতলে। জনতা, ছলোপতন, মন নিয়ে খেলা।

আশালতা সিংহ—ঔপন্যাসিকা। গ্রন্থ—আবির্ভাব, অমিতার প্রেম, সহরের মোহ, সমর্পণ, অন্তর্ধামী, বিহের পরে, বাস্তব ও কল্পনা, অভিনয়, যুক্তি, কলেজের মেয়ে, পরিবর্তন, জীবনধারা, স্নরের মোহ।

আন্তোয় ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কান্তারকুসুম বা হরিদাসের মৃত্যুশয্যা (কলি, ১৮৮০ খৃঃ, পৃঃ ১১২)।

আন্তোয় মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ। সব-জ্ঞান, বংপুর। গ্রন্থ—আনন্দময়ী, জ্যোতিষশাস্ত্র, Unity of Religion.

আন্তোয় মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য—শিক্ষাতত্ত্ববিদ, ব্যবহারজীবী ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ ২১এ জুন ভবানীপুরে। মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ ২৫এ মে। পিতা—ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস—জীরট-বলাগড় (হুগলী)। এম-এ (১৮৮৫), পি আর এস (১৮৮৬)। ডি এল (১৮৯৪), হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯০৪—১৯২৩)। সি এস আই (১৯০৭), নাইট (১৯১১), সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, সন্ধ্যাগমচক্রবর্তী ইত্যাদি উপাধিলাভ। গ্রন্থ—Geometry of Conics, Law of Perpetuities in British India (Tagore Law Lecture)।

আন্তোয় মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক। সম্পাদিত পত্র—অবকাশবন্ধু (১৮৭১)।

আন্তোয় মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রথমপত্রিকা, মেয়েদের ব্রতকথা। নিত্যপূজাপদ্ধতি, রাক্ষসখোঁস, জুড়পেটী, বিবাহের খ্রীতি উপহার, বিশ্ববৈচিত্র্য, ছেলোভুলানো ছড়া, চিত্ত-রঞ্জন উপন্যাস, খেলাধুলা, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য, পূরীযাত্রা, Leisure Hours.

আন্তোয় শিরোরত্ন—অনুবাদক। গ্রন্থ—সামায়ণ ৪ খণ্ড (অব্যোধ্যানাথ তত্ত্বনিধি, ভ্রামচরণ তর্কবাগীশ সহ—বর্ধমান, ১৮৬৬—

৭১, আদি ও অবোধাধ্যায়) এই গ্রন্থ বর্ধমান মহারাজা কর্তৃক বিতরিত হয়।

আন্তবোধ বিভাষণ—পণ্ডিত ও গ্রন্থ-সম্পাদক। সম্পাদিত গ্রন্থ (নিভাবোধ বিভাষণ সহ)—সাংখ্যকারিকা (ইং, কলি, ১১১১ খৃঃ, পৃঃ ৫২)। উত্তররামচরিত (কলি ১১১১, পৃঃ ২৪৪), বিরূপাক্ষী (কলি, ১১১১, পৃঃ ১৪১), মুক্তারাক্ষস (কলি, ১১১১, পৃঃ ২৩৫) মুক্তকটিকম্ (কলি, ১১১১, পৃঃ ৩৫৫)। কাব্যাদর্শ (কলি, ১১১১, পৃঃ ২৮৫)।

আসামত উল্লা খোন্দকার—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—বগুড়া জেলা। গ্রন্থ—ফতেমার জহরানামা (১৩০০ বঙ্গ)।

আসির উদ্দিন মৌলভী—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—২৪ পরগনার অন্তর্গত খাজখোলা মোহনপুর। গ্রন্থ—বগড়ানামা (১২৭২ বঙ্গ)।

আহম্মদ আলী খোন্দকার—গ্রন্থকার। জন্মস্থান—২৪ পরগনা। গ্রন্থ—কালুগাজী ও চম্পাবতী (১২৮৫ বঙ্গ)।

আহম্মদ খাঁ ত্তর সৈয়দ খাঁ বাহাদুর—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮১৭ খৃঃ দিল্লী। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। গ্রন্থ—The Archeological History of Delhi.

ইন্দ্রিা দেবী—মহিলা সাহিত্যিক। জন্ম—১২৮৬ বঙ্গ, আষাঢ় বাগবাড়ারে (মাতুলালয়ে)। মৃত্যু—১৩২১ বঙ্গ আশ্বিন। পিতা—মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়। স্বামী—ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (হুগলী)। গ্রন্থ—ফুলের তোড়া, স্পর্শমণি (১৩২২), প্রত্যাবর্তন, স্রোতের গতি, মাতৃহীন, পরাজিতা, সৌধরহস্ত (Mysteries of the blunder Hall এর অনুবাদ), নির্মাণ (১৩১১), কেতকী, শেষ দান।

ইন্দ্রীবরকৃষ্ণ দেবশর্মা—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুধোৎসর্গচন্দনধেনুগার (সান্নিধ্য। কলি, ১৩১৫)।

ইন্দ্রনাথ সরকার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বালকসগা, ১ম (বরিশাল, ১১০২ খৃঃ)।

ইন্দু ভট্ট—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ। গ্রন্থ—অষ্টাঙ্গসংগ্রহের টীকা।

ইন্দুভূষণ সেন, কবিরাজ—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—নদীয়া জেলার শান্তিপুুরের নিকট হরিপুর গ্রামে ১৩০১ বঙ্গ, জ্যৈষ্ঠ। পিতা—কবিরাজ কবিরঞ্জন সত্যচরণ সেনশাস্ত্রী। শ্রীমাদাস বৈজ্ঞানিক পীঠের অধ্যাপক। ইনি আয়ুর্বেদশাস্ত্র ও ভিষগ, রক্ত, এল. এ. এম. এস উপাধি লাভ করেন। গ্রন্থ—বাক্সালীর খাত (১১২৮), পারিবারিক চিকিৎসা, ডিসপেনসারি, (১৩৪১) বাক্সালা দেশের গাছপালা, ১ম (১৩৩৮), ২য় (১৩৪১), ৩য় খণ্ড (১৩৪৫), নেশা (১৩৩৪), সরল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান। সম্পাদক—আয়ুর্বিজ্ঞান সম্মিলনী (মাসিক ১৩৩১)। সহঃ সম্পাদক—আয়ুর্বিজ্ঞান (১৩৩৩—৩৫), বাহ্য, বক্ষীয় মহাকোষ। যুগ্ম-সম্পাদক—কৃষ্ণকেন্দ্র (মাসিক)।

ইন্দ্রনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল, এম, ডি (কলিকাতা)। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক প্রণালী, বিলাত ভ্রমণ, চীন বঙ্গ।

ইন্দুলেখা—মহিলা কবি। গ্রন্থ—সুভাবিতাবলী, শাঙ্গধর পঞ্চতি।

ইন্দ্রপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনের স্মৃতি, কবি কৃষ্ণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধুর চরিত। সম্পাদক—মাননী (১৩১৫—১৩১৭)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—আইনজীবী ও সাহিত্যিক। জন্মস্থান—পকানন্দ। জন্ম—১৮৪১ খৃঃ বর্ধমানের পাত, গ্রামে (মাতুলালয়ে)। নিবাস—গঙ্গাটিকুরী। মৃত্যু—১৩১৭ বঙ্গ ১ই চৈত্র। পিতা—রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি, এ (কাথিডেল কলেজ), বি, এল। কর্মক্ষেত্র—হেতমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষক। পূর্ণিয়ার ওকালতী। মুনসেফ এবং পরে বর্ধমানে স্বায়ী ভাবে ওকালতী। গ্রন্থ—উৎকৃষ্ট কাব্যম্ (১২৭৭), কল্পতরু (১২৮১), ভারত উদ্ধার (ব্যঙ্গকাব্য, ১২৮৪), ক্ষুদ্রায়ম, পাঁচুঠাকুর (৫ম খণ্ড, ১২৮৬)।

ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্যিক ও সম্পাদক। সম্পাদিত পত্রিকা—ধরকী (১৩০১—২)।

ইন্দ্রভূতি—তত্ত্বাচার্য ও গ্রন্থকার। জন্ম—সম্ভবতঃ ৬৮৭ খৃঃ উড়িষায়। গ্রন্থ—জ্ঞানসিদ্ধি।

ইন্দ্রমুখী—বঙ্গীয় প্রাচীন পদাবলী রচয়িত্রী। ১৫শ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন।

ইকগণ—বৈয়াকরণিক। গ্রন্থ—নানার্থ-রত্নমালা।

ইয়াসিন মহম্মদ—গ্রন্থকার। নিবাস—নাটোর। গ্রন্থ—মাতঃ ভিক্টোরিয়া (নাটোর, ১১০১)।

ইব্রাহিম খাঁ—নাট্যকার। নাটক—আনোয়ার পাশা।

ঈশানচন্দ্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বর্ণশ্রুতর (কবিতা)।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জাতক, ৬ খণ্ড (১৩২৩—২৭, পৃঃ ২১৭৩), মহাপুঙ্ক-চরিত।

ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাল্মীকি।

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। কাব্যগ্রন্থ—চিত্তবিক্ষিপ্ত (১৮৭২)।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬২ বঙ্গ হুগলী জেলার গুলটিয়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৪ বঙ্গ। আইন-জীবী, হুগলী। পিতা—কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ—যোগেশ (কাব্য), সুরধামন্ত্রী (উপন্যাস)।

ঈশানচন্দ্র বসু—কবি ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীদিগের প্রতি উপদেশ (কলি, ১৮৭৪), উপদেশ (১৮৭২), নারীনীতি (কলি, ১১০১), চিত্তবিনোদ (কাব্য ১৮৬৮)।

ঈশানচন্দ্র বিভাবাগীশ—বৈয়াকরণিক। জন্ম—রাজশাহী জেলায় হঠিয় গ্রামে। গ্রন্থ—কাব্যচন্দ্রিকার টীকা।

ঈশানচন্দ্র বিশারদ—আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ। গ্রন্থ—ভৈষজ্যবিজ্ঞান।

ঈশান নাগর—বৈষ্ণবগ্রন্থকার। জন্ম—১৪১২ খৃঃ জ্যৈষ্ঠ জেলার সুনামগঞ্জ উপবিভাগে লাউর পরগনার নবগ্রামে। গ্রন্থ—অষ্টমতপ্রকাশ (১৫৬৮ খৃঃ)।

ঈশ্বর—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণকৃত, রামস্তোত্র।

ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য—সংস্কৃত গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সাংখ্যকারিকা। ইনি ২য় খৃঃ-পূঃ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবি ও সম্পাদক। জন্ম—১২১৩ বঙ্গ (১৮১০ খৃঃ ১ই মাচ) ২৪ পরগনার কাঁচড়াপাড়ায়। মৃত্যু—১২৬৫ বঙ্গ ১০ই মাঘ। পিতা—হরিনারায়ণ গুপ্ত। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—সংবাদ-প্রভাকর (সাপ্তাহিক ১৮৬০), সংবাদ-রত্নমালা, দৈনিক প্রভাকর (১২৪৫ বঙ্গ, ১লা আষাঢ়), পাণ্ডু-

পীড়ন (মাসিক পত্র, ১৩৫০, ৭ই আর্ষাঢ়), সাধুরঞ্জন (১২৫৪ বঙ্গ) প্রভাকর (মাসিক, ১২৬০, বৈশাখ)। গ্রন্থ—প্রবোধ-প্রভাকর (১২৬৪), বোধেন্দুবিকাশ, হিতপ্রভাকর (১২৬৭), ভারতচন্দ্রের জীবনী (১২৬২), কলি নাটক (অসমাপ্ত রচনা), কবিতাবলী ১ম (১৮৭০), ২য় (১৮৭১), ৩য় (১৮৭২), ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ (১৮৭৩), ৭ম (১৮৭৪)।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—শিক্ষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও সমাজ-সংস্কারক। জন্ম—১৮২০ খৃঃ ২৮এ সেপ্টেম্বর, হুগলী (বর্তমান মেদিনীপুর) জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে। মৃত্যু—১২১৮ বঙ্গ ১৩ই আশ্বিন। পিতা—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—ভগবতী দেবী। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজে (১৮২৯, ১লা জুন), বিদ্যাসাগর উপাধিলাভ (১৮৪০ খৃঃ), প্রধান পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮৪১ খৃঃ), সহকারী কার্যাব্যাক (১৮৪৬), অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক (১৮৫৫), চাকুরী ত্যাগ (১৮৫৮), হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন স্থাপন (১৮৬৮ খৃঃ)। গ্রন্থ—বাল্মদেব-চরিত (অপ্র), বেতালপঞ্চবিংশতি (১৮৪৬), বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবন-চরিত (১৮৪৯), সীতার বনবাস (১৮৬১), ভ্রান্তিবিলাস (১২৭৭), বর্ণ পরিচয় ১ম ও ২য় (১২৬২), কথাখালা (১২৬৩), বোধোদয় (১২৫৮), চরিতাবলী (১২৬৩), আখ্যানমঞ্জরী ১ম ও ২য় (১২৭১), ৩য় (১২৭৫), উপক্রমবিকা (১২৫৮), ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম—৩য় (১৮৫০-৫৪), ৪র্থ (১৮৬২), ঋজুপাঠ ১ম (১২৫৮), ২য় (১২৫৯), ৩য় (১২৬০), সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (১২৬০), বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ (১২৬০), বিধবা-বিবাহ প্রবন্ধ ২য় (১২৬১), মহাভারত (১২৬৭), শব্দমঞ্জরী (১৮৬৪), রামের রাজ্যাভিষেক (অপ্র। ১৮৬১), বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ১ম, (১২৭৮), ২য় (১২৭৯), শিশুশিক্ষা ১ম ও ২য় (১২৬০), ৩য় (১২৬১), ৪র্থ (১২৬১), পাঠমালা (১৮৫৯)। বায়নাখ্যানম্ (১৮৭৩), সংস্কৃত রচনা (১৮৮৫), নিষ্কলিভপ্রয়াস (১৮৮৮), শ্রৌকমঞ্জরী (১৮৯০), বিদ্যাসাগর-চরিত (আম্ভাচরিত, ১৮৯১), ভূগোলখণ্ডগোলবর্ণনম্ (১৮৯২), বাঙ্গালিকর রামায়ণ। সম্পাদিত গ্রন্থ—সর্বদর্শনসংগ্রহ (১৮৪৮), কীরাতাজুর্নীর (১৮৫৩), শিশুপালবধ (১৮৫৭), কুমারসম্ভব (১৮৬১), মেঘদূত (১৮৬৯), অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১), হর্ষচরিত (১৮৮২), কাদম্বরী (১৯৩১), অন্নদামঙ্গল ১ম ও ২য় (১৮৪৭), রঘুবংশ, উত্তরচরিত (১৮৭০); ইংরেজি গ্রন্থ—Selections from the writings of Goldsmith, Selections from English Literature, Poetical Selections, Marriage of Hindu Widows (১৮৫৬)।

ঈশ্বর বৈদিক—কুলগ্রন্থরচয়িতা। গ্রন্থ—সংবৈদিক কুলপঞ্জিকা। সম্ভবতঃ ইনি ১৭শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক—গ্রন্থকার। নিবাস—কলিকাতা, বড়বাড়ার। গ্রন্থ—জানোলাস (১৮৫৪ খৃঃ)।

ঈশ্বরচন্দ্র রায়, রাজা—সঙ্গীত-রচয়িতা। নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা। গ্রন্থ—সারসামঙ্গল।

ঈশ্বরচন্দ্র সরকার—অমুবাদক। গ্রন্থ—প্রভাসখণ্ডের অমুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্র সার্বভৌম—ভাষিক পণ্ডিত। নিবাস—নদীয়া জেলা। গ্রন্থ—দুর্গাচর্চাবারিধি।

ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাজকীয় ব্যবস্থা (১৮৬৪)।

ঈশ্বরীপ্রসাদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Short history of Muslim Rule in India (এলাহাবাদ, ১৯৩৩, পৃঃ ৭২৫), লোকমাত্র বালগঙ্গাধর তিলক (কলি, ১৯৭৮ (সং), পৃঃ ১২৪)।

উইলসন, হোরেস হেয়ান (Horace Hayman Wilson)—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অমুবাদক। জন্ম—১৭৬৮ খৃঃ লণ্ডনে। মৃত্যু—১৮৬০ খৃঃ। কর্মক্ষেত্র—ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার (১৮০৮)। সম্পাদক, এসিয়াটিক সোসাইটি (১৮১১—৩৩), অধ্যাপক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি (১৮৩০), গ্রন্থাধ্যক্ষ, ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী (১৮৩৬)। অমুবাদ গ্রন্থ—মেঘদূত (১৮১৩), Theatre of the Hindus (অমুবাদ গ্রন্থ—মুচ্ছকটিক, মালতীমাধব, বিক্রমোর্বকী, রত্নাবলী, মুক্তারাক্ষস), বিষ্ণুপুরাণ, উত্তররামচরিত, ঋগ্বেদ; গ্রন্থ—Historical Account of Burmese war, Lectures on Religions & Philosophical systems of Hindu (১৮৪০), A Sanskrit Grammar, Sanskrit English Dictionary, The Ariana Antiqua, A glossary of Indian Terms. সম্পাদিত গ্রন্থ—Macnaghten's Hindu Law, Mill's History of British India.

উজ্জ্বল দত্ত—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। গ্রন্থ—উপনিষদ্ব্যবহার বৃত্তি।

উড়রক্ষ, শ্রব জন—বিচারপতি ও গ্রন্থকার। ছদ্মনাম আর্বার এ্যাভেলন। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ লণ্ডন। মৃত্যু—১৯৩৫ ডিসেম্বর। আইনজীবী কলিকাতা হাইকোর্ট (১৮৯০ খৃঃ), বিচারপতি (১৯০৪), অধ্যাপক, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। গ্রন্থ—Sakti and Shakta, Garland of letters, The World as Power, ১—৭ খণ্ড, Is India civilised? The Seed of Race, Bharat Shakti. (আর্বার এ্যাভেলন ছদ্মনামে)। সম্পাদিত গ্রন্থ—Hymns to the Goddess, Principles of Tantra ১ম-২য়, Wave of Bliss (আনন্দ-লহরীর অমুবাদ), Greatness of Shiva এবং ১৯খানি তন্ত্রগ্রন্থ।

উৎপল ভট্ট—জ্যোতির্বিদ। জন্মস্থান—কাশ্মীর। গ্রন্থ—বৃহৎসংহিতার টীকা (১৮৬৬ খৃঃ) বৃহজ্জাতকের টীকা, বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি, প্রব্রজ্ঞান, মূলপুলিশিসিদ্ধান্ত (টীকা)।

উৎপলাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। নিবাস—কাশ্মীর। ১০ম শতাব্দীতে বর্তমান। গ্রন্থ—ঋক্ষপ্রদীপিকা (টীকা), প্রত্য্যভিজ্ঞাকারিকা।

উদয়চরণ আচ্য—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২১ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৫৬ খৃঃ মার্চ, কলিকাতা। গ্রন্থ—ইংরেজি বাঙ্গলা অভিধান, শব্দাবুধি, নূতন অভিধান। সম্পাদিত গ্রন্থ—‘সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়’ পত্রিকা (১৮৩৭ খৃঃ), ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত।

উদয়নাচার্য—টীকারকার। জন্ম—(১৪৪১-১৪৪৪ খৃঃ) দ্বারভাঙ্গা জেলার করিয়ন-বলাহা গ্রামে। গ্রন্থ—ভায়ত্যাংগপর্বপরিভাষি, আশ্বত্থবিবেক, লক্ষাবলী (১৮৪৪ খৃঃ), কিরণাবলী, কুম্ভমাঙ্গলি ব্যক্তিকতাংগপর্বপরিভাষি (টীকা)। [ক্রমঃ]

বুটিন আজ পতন-অস্থায়-বজ্র ভারতের জীবনের জয়যাত্রা  
হইতে চিরতরে চলিয়া গিয়াছে। আজ হমত প্রসন্ন উঠিতে

পারে, ইংরেজি সাহিত্যের আলাপ ও আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু  
ইহা একান্তই-ভ্রান্ত ধারণা। ইংরেজী সাহিত্য আজ পৃথিবীর সেরা  
সাহিত্য, ইংরেজীর প্রভাব জগৎব্যাপী, ইহার অতুলনীয় সম্পদ আপন  
মহিমায় আচ্ছাদিত। তাই যে-সাহিত্য এক দিন আমাদের  
জীবনে জিয়াছিল নব জন্মের পরিকল্পনা, আমাদেরকে স্বদেশিকতার  
উদ্ভুদ্ধ করিয়াছিল, চরিত্র লাভ্য গড়িবার জন্ত প্রেরণা দিয়াছিল,  
তাহাকে তুলিতে পারি না, ভুলি না; বরং চির সমাদরে চিরদিনই  
অন্তরের নিভৃত পূজার পুষ্পাঞ্জলি দিব।

বিংশ শতাব্দীর অর্ধ অবসান। আজ এই অর্ধ শতাব্দীর কাব্য-  
সাহিত্যের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া ইহার নূতনত্ব, ইহার আশা ও  
আদর্শের কথঞ্চিৎ পরিচয় লইবার চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দী সমগ্র যুরোপের জীবনে এক অত্যাশ্চর্য  
বিশ্বায়ের মত। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে সর্বত্রই এক বিরাট  
পরিবর্তন। মানুষের কল্পনার পরিধি মানুষের গভীরতম আশাকে  
ছাড়াইয়া দিগ্‌দিকান্তে অক্ষণচ্ছটা মেলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই  
বিপুল পরিবর্তনও বিংশ শতাব্দীতে পৌছিয়া মানুষকে স্থির থাকিতে  
দিল না। আলাপ ও রচনার রীতি, বৈশিষ্ট্য ও ভঙ্গী প্রাণহীন  
হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে নূতন কালের নূতন কবিরা গাহিয়া  
উঠিলেন।

ও সানেসি উনবিংশ শতাব্দীর এক জন নগণ্য কবি—কিন্তু  
তাঁহার একটি চমৎকার কবিতায় তিনি বিগত শতাব্দীর স্বপ্নময়  
ভাবালুতাকে রূপ দিয়াছেন :—

আমরা গাহি গান,                      আমরা রচি গীতি  
স্বপ্নলোকের মাঝে স্বপন দেখি নিতি,  
বালুবেলার তটে                      আমরা দ্রুি ফিরি,  
বিজন নদীতীরে আমরা রহি যিরি।  
জগৎ ছাড়া মোরা                      হারাই ধরাধানি  
চাঁদের আলো মাঝে তুনি অমর বাণী।

এই যে নিভৃত নিরালা জীবনের আশা ও আনন্দ, এই যে মাধুর্যের  
মহৎ লোকে প্রত্যহ নব জন্ম—ইহা স্বন্দর, কিন্তু জীবন-সংগ্রাম আজ  
কঠোরতর, এই স্বপ্ন-বিলাসে মুগ্ধ হইবার সময় আমাদের নাই। কবি  
যুগ-মানব এবং একাধারে যুগোত্তর মানব। নিজের উপলব্ধির  
মোহ দিয়া তিনি আপন যুগকে রাস্তান, এবং ভাবী যুগের নবীন  
মেঘের আবরণ জড়ান। উনবিংশ শতাব্দীর পধ্যাপ্ত পতিত্বপ্ত,  
দুঃখের হাত হইতে পলায়নের মনোবৃত্তি বিংশ শতাব্দীতে চলি না।  
বর্তমান কালের কবি সজাগ। তিনি প্রাত্যহিক জীবনের সংশয়,  
বিতর্ক, ভয় ও ভাবনাকে নির্ভয়ে গ্রাস করিয়াছেন। অতিব্যস্ততার  
যে মোহন রূপ, তাহাই দেখিয়া বর্তমানকে ভালবাসিয়াছেন—  
বর্তমানকে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল গোলাপই তাঁহার কাব্যে কোটে  
নাই, তিনি রোলস্‌রয়েসকে, এঞ্জিনকে, কয়লার ধূলি-ধূমকে নিঃশব্দ  
আনন্দে গ্রহণ করিয়া কবিতার অমর স্থলোকে স্থাপিত করিয়াছেন।  
বিগত অর্ধ শতাব্দী দুইটি মহাবুদ্ধির বিপদ্যয়ের মধ্যেই আপনাকে  
অগ্রগতির পথে চালাইতে পারিয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব, যুদ্ধ-মধ্য এবং  
যুদ্ধ-তির এই পঞ্চাশ বৎসর মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষায়, কল্পনা  
এবং চেষ্টার এক বিষয়কর নবীনতা আনিয়াছে। অতিপরিচয়ের  
আবরণে আমরা যেন আধুনিক কবিতায় এই বিশিষ্টতা না ভুলি।

## বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী কবিতা

ডাঃ মতিলাল দাশ

এই অতিআধুনিক কবিতার ভঙ্গী বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব,  
ইহাদের মধ্যে রোমান্টিক যুগের ভাবালুতা নাই, ভক্তি-গল্পগা  
আকুলতা নাই—ইহারা সবলেই বর্তমান পরিবেশের দৃষ্টি, তাই  
ইহারা অবিশ্বাসী—ইহারা দ্বিভাষ্য, ইহারা তাত্ত্বিক ও সংশয়ী।  
ইহারা সবাই নূতন একটি মতবাদের আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ  
করিয়াছে। সেই মতবাদের নাম Imagism বা ছায়াবাদ।  
কবিতা ছায়ার মতই পাঠকের হৃদয়ে প্রতিকলিত হইবে—  
চোখের তারকায় যেমন বোধের ক্ষণস্থূর্ত্তে বিরাট একটি  
সম্ভাবনা এবং পরিবেশ লইয়া ছায়া প্রতিকলিত হয়। কণিকের  
বস্ত্র বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে চোখ বাহা কিছু দেখে, সবই যেন  
রহিয়াছে।

ইহাদের আদর্শ :—“A poem is an image on a  
succession of images, and an image is that  
which presents an intellectual or emotional  
complex in an instant of time.”

কবিতা ছবি বা চলচ্চিত্রের ছবির মত ছবির পরস্পর।  
কণিকের মাঝে বাহা বুঝির বা হৃদয়ের মাঝে কোলা দেয়।

এই মতবাদ আনিল ভাষার নূতন আকৃতি, গঠনের  
নূতন পারিপাট্য, বলার নূতন রীতি, সজ্জা ও অভ্যর্থনের  
অপূর্ব গতি—ইহার জন্ত তাহাদের রূপকের আশ্রয় লইতে  
হইল—ব্যঙ্গনা এবং ইঙ্গিতের পরিপূর্ণ আশ্রয় ইহাদের  
প্রকাশের পছন্দ হইল। কবি বাহা বলিতে চাহেন, সোজাসুজি  
তাহা বলা চলে না। সরল বর্ণনায় অন্তরের নিভৃত আকৃতি  
প্রকাশ পায় না। অতএব এমন কথা, শব্দমালা তাঁহাকে  
চয়ন করিতে হইবে, বাহারা ভাবানুযায়ে পাঠকের চিত্তে  
নানা কল্পনা ও ইঙ্গিত জাগাইয়া দিবে।

সেলামে নামক এক জন কবি লিখিয়াছেন—“My aim is to  
evoke an object in deliberate shadow, without  
ever actually mentioning it, by allusive words,  
never by direct words.” বাহা অব্যক্ত, বাহা অনির্ভরনীয়,  
তাহাকে ভাবে, ভঙ্গিতে, ছন্দে, ব্যঙ্গনায় এবং রূপকে প্রকাশ  
করিতে হইবে। সোজাসুজি তাহার কথা না বলিয়া ঘুরাইয়া  
ফিরাইয়া তাহাদের ইঙ্গিত করিতে হইবে।

বর্তমান জীবন স্ফট-আবস্তে দোহুল, নানা তরঙ্গের যান্ত্র-  
প্রতিঘাতে উদ্বেল, তাহার প্রতিচ্ছবি ফোটানো দুঃসাধ্য ব্যাপার।  
সেই ব্যাপারে এই ইঙ্গিত ও ব্যঙ্গনার রীতি অনেকটা সহায় হইল।

বর্তমানের কবিরা বর্তমান যুগের ধূলি-ধূম-ধূসর জীবনকে বাস্তব  
নগ্নতায় প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাই চিরকালের জ্যোৎস্না,  
কোকিল, মলয় এবং শতদল-কৌতুক বিদায় লইতে বসিয়াছে।  
এই নব ভঙ্গীর নব মনোভাবের প্রথম বসিষ্ঠ পরিচয় পাই  
ইলিয়টের প্রেমের কবিতায়। কবি শুরু করিলেন—

এস গৌতে বাই—তুমি আর আমি  
আকাশের বুক ভরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সন্ধ্যা—  
যেন হাসপাতালের টেবিলে স্ফোরোক্ষণ-করা রোগী।



ইহার অদ্বুতৎ বিজ্ঞী লাগে, কিন্তু বর্তমান নাগর-জীবনের নিকট হইতে উপমা লইতে গিয়া একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই যেন ইহা কবির কলমে আসিয়াছে। এই মনোভাব না লইয়া পড়িতে বসিলে আধুনিক কবিতা আমাদের কাছে পীড়া ও ব্যথা দিবে—তাহার অন্তর্নিহিত আশ্বাদ আমরা আদৌ উপভোগ করিতে পারিব না।

আধুনিক কবিদের মধ্যে ইলিয়ট রচনা-গৌরবে, স্বকীয়তায় এবং শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার রচনার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তাঁহার কবিতায় অধিকাংশই দীর্ঘ, নীচে একটি ছোট কবিতার অনুবাদ দিতেছি—

ন্যাঙ্গি

কুমারী জাঙ্গি এলিকট  
দীর্ঘ পদক্ষেপে ডিঙ্গান শৈলমালা এবং বিদীর্ণ করেন তার বুক,  
অম্বারোহণে পার হন গিরিশিখর—পরাজিত শৈলশিখর  
নৃতন ইংলাণ্ডের শূন্য অক্ষরর পাঁহাড়শ্রেণী,  
গোশালায় পাশে পাশে  
চলেন সারমেয়ের দিকে।  
মিস্ জাঙ্গি ছাড়েন সিগারেটের ধূমায়িত শিখা,  
নাচেন আধুনিক সব ছন্দোমধুর নাচ  
তার পিসীরা আর মাসীরা তাকে নিয়ে ভেবেই আকুল  
তথু এইটুকু তারা জানে—জাঙ্গি নব্যা তরুণী।  
সানি বসানো তাকের উপর থাকে পাহারায়  
ম্যামিউ আর এয়াভো—হুঁজনেই স্বর্ধধরজী,  
বারা অপরিবর্তনীয় নীতির সাহসিক ঘোড়া।

ইলিয়টের পরে এজরা পাউণ্ডের নাম মনে আসে। তাঁহার সম্বন্ধে এক জন কবি-সমালোচক ইয়েটস বাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ভূত করিতেছি :—

Ezra Pound has made flux his theme ; plot characterization logical discourse, seem to him abstractions suitable to a man of his generation. He is midway in an inverse poem in verse litre called for the moment 'The Cantos', when the metamorphosis of Dionysus, the descent of odysseus into hades, repeat themselves in various disguises, always in association with some third that is not repeated \* \* There is no transmission through time, we pass in that comment from ancient Greece to modern England, from modern England to medieval Chinas, the symphony, the pattern is to me less flux eternal and therefore without movement \* \* style and its opposite can alternate, but form must be full, sphere-like, single. Even where there is no interruption, he is often content, if certain verses and lines have style, to leave unabridged transitions,

unexplained ejaculations, that make his meaning unintelligible.

এজরা পাউণ্ডের প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে ইলিয়টের পরেই বহুব্যাপক ছিল। ইংহাদের লেখার সব চেয়ে বড় দোষ যে, তাঁহাদের অধিকাংশ কবিতাই অস্পষ্ট এবং অর্থহীন। বাংলা সাহিত্যে যে সব নবীন কবি ইলিয়ট ও পাউণ্ডের অনুকরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই দিকে অপরাধ আরও অধিক। ইংরেজী কবিদের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্ত আর ইংহাদের অনুকৃতির দোষ। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার অনেকগুলিই একান্ত দুর্গাণ্য হইয়াছে। কাল এই সব আবর্জনা দূর করিবে, তথাপি স্বদেশবাসীর উত্তম ইংহারা সাহিত্যের পবিত্র বেদী কলুষিত করিয়াছিল, তজ্জন্ত ইংহাদের অস্বাভাবিক অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

এজরা পাউণ্ডের একটি কবিতার স্বচ্ছল ভাবানুবাদ দিতেছি। পাউণ্ড লিখিতেছেন যে, কবিতাটি চৈনিক কবি রিচাকু হইতে লওয়া। কবিতাটির নাম—নৌ-সদাগরের বৌ।

বখন আমার ছোঁহল বেশ ছিল কপাল থেকে সোজা খণ্ডিত,  
তখন আমি খেলতাম সদর দরজায়, তুসতাম ফুলের রাশি।  
তুমি তখন আসতে বাঁশের চটা হাতে, ঘোড়া ঘোড়া খেলতে  
আমার আসনের পাশে চুপে চুপে বসতে আর হাতের কুল দেবার  
ছুঁড়িতে,

তখন আমরা দু'টি ছিলাম চোখান নামক গাঁয়ে  
ছোট দু'টি বালক-বালিকা—ছিল না বাঁদের অধীতি বা ভলয়।  
চৌদ্দ বছর বয়সে তোমার পেলাম পতি  
হাসি এল না কোনও দিন, কারণ আমি চির চঞ্চলবতী।  
মাথা নীচু করে চেয়ে রইতাম দেওহালের পানে,  
কিরতাম না সমুখ পানে পথ-ভোলানো হাজার গানে।  
পঞ্চাশ বছর বয়সে আমি ভুলে গেলাম স্বগড়াকাঁটি,  
চাইলাম তোমার সাথে আত্মার আত্মায় গভীর মিলন,  
চিরদিনের তরে, চিরকালের তরে, অচ্ছেদ্য অভেদ  
বাইরে কেন দৃষ্টি পাবে বা চাওরায় অসাম্য।  
বোল বছর বখন বয়স, তখন তুমি গেলে দূর-দূরান্তর,  
তুমি গেলে কুটুয়েন, হাজার নদ-নদী হল অন্তর  
তুমি গেছ পাঁচ মাসেরও বেশী,  
মাথার উপর বাঁদরের শুধু অসহ কিচির-মিচির।  
বে দরজা দিয়ে গেলে দেখানে বেখে গেছ চরণ-চিহ্ন,  
সেখানে জমেছে শেওলা, নানা ধরণের শৈবাচদাম,  
এত ঘন হয়ে জমল যে তাদের যায় না তুলে ফেলা,  
এবার হেরাঙেই পাতা পড়া হয়েছে সূর্য ;  
প্রজাপতির দল, এখনই মরণ-কাতর।  
শক্তিমের কুণ্ঠনে বাঁসের উপর পড়েছে ঢলে।  
তাদের দেখে বুক আমার করছে হুক-হুক,

ব্যথায় যেন বুড়ী হতে চলেছি,

দোহাই তোমার পায়ে পড়ি, কিরে এস কিয়াদ নদী বেয়ে  
ববর দিও আগে বঁধু, এই পাগলিনীর মুখ চেয়ে,  
আমি যাব বলছি...তোমার পানে এগিয়ে  
যাব চোকুসায়, যাব, চোকুসা গাঁয়ের ধারে।

ক্লাক ও কনোবের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল বিলাতে—তাহার দীর্ঘ  
আয়ত চোপ, তাহার বিধানী আশাতুর বোঁবনবৃত্ত ভঙ্গী আজিও  
আমার মনে আছে। ব্যথার কবি তিনি নহেন—তিনি বীর্যের  
পূজারী। নীচের কবিতাটিতে তাহার ব্যক্তিত্বের ছোঁয়াচ নাই—  
ইহাতে শুধু ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার সংশয়ী আত্মা—

অগ্নি চতুরিকে নারী,      ফিরে লও তব কোমল পরশ,  
আর তুলিব না সখি      তব প্রেমে হব না সরস।  
মেথ আজ সাধা কেশ      মেথ আজ গলিত এ অঙ্গ,  
মেথ হিঁস রক্ত-ধারা,      বল সখি কিবা চাহ রজ ?  
ভেব না কঠিন মোরে,      কর না কর না শির তব নীচে  
খাক স্থির ভালবাসা      হে নিষ্ঠুরে অমৃতের পিছে !  
ফিরে লও মুখখানি      হে পিশাচী কর না চূষন,  
আজ হোক ছাড়াছাড়ি      দূরে থাক কাম আলসন।  
তোমার কবরীখানি,      আঁধি হুঁটি শিশির সজল,  
তব উচ্চ বক্ষতট,      কামনার করিছে বিহ্বল,  
আজ হবে এল জরা      ছেড়ে দাও বাসক শয়ন  
অগ্নি চতুরিকা বালা      লহ মোর আত্মসমর্পণ।

মার্গট রাতকের একটি প্রেমের কবিতা তুলিতেছি—সংক্ষিপ্ত,  
রোমাঞ্চহীন অথচ আধুনিক মনোভাবের দিক দিয়া অনবত্ত।

ভাবতে আমি ভালবাসি ভালবাসি ভাবনা,  
তোমায় তবু প্রাণের বাঁশী ! মোটেই সখি ভাবব না।  
তোমার মিষ্টি স্বপ্নখানি, আমার প্রাণের বালা  
তোমার আলিঙ্গনে রাণি ! নাইকো কোনই আশা।  
মনের গ্লানি রইবে সখি যত দিবস মনে  
আসবো নাকো তোমায় দেখি ভালবাসার সনে  
তার পরেতে ক্ষুদ্র হবে মুক্ত হবে মম,  
ফিরে দেব তোমায় তবে ওগো অমৃগম !

এই বার এক জন মহিলা কবির কথা বলি। নাম তাহার ডোরথি  
ওয়েলসলি। তাহার রচনা-রীতি সুন্দর, তাহার পৌকবমর ছন্দ  
স্বপ্নগ্রাহী এবং প্রকৃতির সহিত সন্ধ তাহার বর্তমানের সংশয়  
ও আশায় ব্যাকুল।

বারাকাস আর জুডাস ইয়াক্যারিয়ট  
যে রজনীতে মৃত্যু হ'ল বিধাতার দূত খুঁটের  
যে রাত্রিতে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন  
“ওরা জানে না ওরা কি করছে”  
তোমরা তখন কি করেছিলে  
তোমরা হুঁজনে মিলে ?  
উদ্ভাস উজ্জ্বল বারাকাস  
লম্পট বারাকাস  
খেয়েছিল মদ, করেছিল চুরি, দিয়েছিল গালি  
ফিরে এল পর দিন তাই কারাগারে—নিভা পরিচিত ভোগে  
একটি বারবনিতার অভিযোগে।  
জুডাস ইয়াক্যারিয়ট, সূর্য তখন অর্ধেক ওঠেনি  
সেই অন্ধকারেই সে চলে গেল,  
সুন্দর জুডাস, বনস্পতি  
চৈত্র-লক্ষ্মীকে করে পুষ্পে মধুমতী।

বিংশ শতাব্দীর দু'টি বৃদ্ধ, অনিশ্চয়তা ও বেদনা মানুষকে পাগল  
করিয়া তুলিয়াছে বলা চলে, তাই দেশে দেশে ভাবপ্রবণ কবিরা নূতন  
পথে সত্যের সন্ধান করিয়াছেন এবং আচরণের এবং আদর্শের নূতন  
দৃষ্টিভঙ্গীকে কাব্যরূপ দিয়াছেন।

ব্রাউনিং ছিলেন আশার কবি, তিনি লিখিয়াছিলেন :—

কত মধুময় মানব-জীবন, বেঁচে থাক! কত না সুন্দর,  
চিরকাল চিরদিন ভরে দেয় মানুষের ব্যথিত অন্তর  
কে বলে এ মিছা ? আমি যে দেখেছি চোখে  
আমি গাহি গান, আমি যে বুঝছি লোকে।

এই আশার পূলক বর্তমানের জীবন ইহাতে যেন চলিতে  
বসিয়াছে। রোমাটিক মনোভাব মানুষের আদৌ নাই—  
মানুষ বাস্তবায় ছটফট করিতেছে। সমস্যার পর সমস্যা  
তাহাকে বিচলিত ও কাতর করিতেছে। তাই মানুষ  
সংশয়ী ও অবিবাসী। এই তমসার ও দুর্বলতার মাঝে  
বার্কারের নীচের কবিতাটি উৎসাহের দীপ্তিতে চিন্তকে পূর্ণ  
করিয়া তোলে।

কবে পুনরায়      ধরায় মানুষ  
তুলিবে অভয় হস্ত ?

পলাবে না ভয়ে      বাবে রণজয়ে,  
একে অপরেরে      সাথে লয়ে লয়ে  
করিবে মহানু মন্ত।

অনেক মানুষ      মনে মনে ভালো  
তবু তারা বাধা পায়,  
শোণিত ঝরিয়া      ব্যথা পায় শত,  
পতনের কোলে      মাথা করে নত  
পরাজিত বেদনার

ওই দেখ চেয়ে      পাখরের বৃকে  
লুটায় বিহ্বল চিতে

পাঁজর ভেঙ্গেছে,      তবু সাহে মুখে  
নব আশা-ভরা গীতে।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রদীপ্ত দেয় আনি পূর্ণতার জ্যোতি  
আকাশের তারা-নল মনে-প্রাণে দীপ্ত করে মোতি  
বক্ষতলে অজানিতে জেগে ওঠে শুদ্ধতার আলো,  
তারা কি রহিবে পিছে ?

কবে পুনরায়      ধরায় মানুষ  
মেলিবে অভয় হস্ত

পাহাড় ডিঙাবে      প্রাচীর লাফাবে  
বাধা সব করি দ্রুত ?

এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর নানা রূপের পরিচয় দেওয়া  
সম্ভব নহে, অল্প বাহা দিলাম তাহাতে একটি কথা পূর্ণভাবে প্রতিভাত  
হইবে। তাহা এই, যুগে যুগে কালে কালে সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে  
আকাশ-পাতাল প্রভেদ নাই, প্রত্যেক যুগেই সমগ্রতা এবং সমকর্মী  
শিল্পী এবং রূপকঙ্ক জন্মগ্রহণ করে। অবশ্য সর্বাতিশায়ী প্রতিভা  
বিরাট যুগের অবদান, তাহার কথা বলিতেছি না—তাহা বাদ  
দিলে বিংশ শতাব্দীর কাব্য-সত্তারকে উপেক্ষা করিবার উপায়  
নাই।

কবি তাঁহার পরিবেশকে আপন প্রতিভার পরিপূর্ণ ও প্রোজ্জল করিয়া তোলেন, ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব। আধুনিক কবিদের শ্রেষ্ঠতম ইলিয়ট লিখিয়াছেন :—

"When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamative disparate experience; the ordinary man's experience is chaotic, irregular, fragmentary. The latter falls in love, or reads Spinoza, and these two experiences having nothing to do with each other, or with the noise of type-writer or the smell of cooking, in the mind of the poet these experiences are forming new wholes."

ইহাই কবিতার চিরকালের কথা। কবি তাঁহার অমৃতভূতির আবেগে সমগ্রকে দেখিতে পান, বিচ্ছিন্নের সহিত পূর্ণতার, খণ্ডের সহিত অখণ্ডতার যে ঐক্যতান তিনি গড়িয়া তোলেন, তাহাই তাঁহার রচনাকে শাস্ত এবং চিরস্থায়ী করে।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিতা টাইপ-রাইটার, কলের চিমনি, রাজপথ, মোটর, ট্রাম, বাস প্রভৃতি গল্প জিনিষকে পক্ষে দেখিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর তাবতম্যের সহিত সার্থক করিয়া একটি সমগ্র ভাবরূপকে ফুটাইতে পারিয়াছে—ইহাতেই তাহাদের সার্থকতা। বাংলায় নবযুগের রস-রসিকেরা এই নূতন কালের নূতন ফোটা ফুলকে সমাদর করিবেন—পল্লফুল নহে বলিয়া তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না—এই নিবেদন করিয়াই আজিকার মত বিদায় প্রার্থনা করি।

## আমেরিকায় স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

সানফ্রান্সিস্কোতে স্বামী বিবেকানন্দের শেষ বক্তৃতাবলী ১১০০ খৃঃ মে মাসে প্রদত্ত হয়। সানফ্রান্সিস্কো হইতে বামিজী নিউ ইয়র্ক হইয়া প্যারিসে আসেন। সানফ্রান্সিস্কো ত্যাগের পূর্বে তিনি ভক্ত-বন্ধুদিগকে নম্র ভাবে বলেন, "আমি তোমাদের কাছে আমার একটি গুরুভাইকে পাঠাবো যিনি আমার চেয়েও বড়। আমি যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তিনি তাহা জীবনে পরিণত করেছেন। আমি স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠাবো।"\* স্থানীয় ভক্ত-বন্ধুগণ দিশিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, সেই মহাপুরুষ কেমন, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ এত প্রশংসা করিলেন। সকলে সাগ্রহে স্বামী তুরীয়ানন্দের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বামিজী নিউ ইয়র্ক হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে উপস্থিত হইলেন। তিনি গেলেন শিশু-সুলভ মধুরভাষা ও নম্রতার শোভিত এবং আধ্যাত্মিক অগ্নিতে প্রদীপ্ত হইয়া, ঠাকুরের ভাবায় সত্ত প্রফুটিত পুষ্পবৎ বা প্রাতঃকালীন শিশিরবিন্দুবৎ বিমল। তিনি ভক্তগণের জীবন-ভূমিতে নাথিয়া আসিয়া তাহাদিগকে প্রেমের প্রেরণার স্পর্শ দিলেন এবং আলোকময় অনন্তের পথে তাহাদিগকে চালিত করিলেন। জনৈক পাশ্চাত্য ভক্ত বলেন, "স্বামী বিবেকানন্দের ও স্বামী তুরীয়ানন্দের আলৌকিক আধ্যাত্মিক তীব্র জ্যোতিতে বহির্মুখী জড়বাহী পাশ্চাত্যবাসিগণের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্তের সমগ্র ভূমির পরিচয় দিলেন। তাহাতে পাশ্চাত্য মানবের নব জন্ম লাভ হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দের পূতস্পর্শে পাশ্চাত্য-মনের মৃগ সজাবনারাশি আগ্রত হইয়া উঠিল।

\*সংপ্রাপ্ত প্রেরণাকে জীবনে সজীব করিবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দ

পাশ্চাত্য-মনকে স্নানিত ও সঞ্চালিত করিলেন। তাঁহার শুভাগমনে শান্তি আশ্রমের উদ্ভব। সানফ্রান্সিস্কোতে নব-স্থাপিত বেদান্ত সমিতির একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এই নূতন অধ্যায়ে পূর্ব-প্রচারিত বেদান্ত-ভূমিকার বিভিন্ন দিক বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ছিল না। ইহা ব্যক্তিগত সংস্পর্শকে সুস্পষ্ট করিয়া আত্মমুগ্ধকানের শক্তি জাগ্রত করিল। আধ্যাত্মিক অমরাগের মূলোদ্ভূত বিচারশক্তি ও স্ব-প্রবেশ সক্রিয় করিল। আমাদের জীবন স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক যে ভাবধারার অভিযুগে ফিরিল, আমাদের মানসিক শক্তিসমূহকে সেই ভাবে শিক্ষিত করিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ।"

স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ও প্রেরণায় আমেরিকায় মনে যে প্রতিক্রিয়া স্রব হইল, তাহাকে কি ভাবে স্থায়ী ও ব্যাপক করা যায়? বেদান্তের অমরাগিণ বখন উক্ত সমস্তার সমাধানে সমাকুল, ঠিক এমন অবস্থায় স্বামী তুরীয়ানন্দ যাইয়া সমগ্র ভার গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের প্রাণে আশার আলোক জালিলেন। কেবল বক্তৃতা শোনার দিন শেষ হইল। তাঁহারা স্বামী তুরীয়ানন্দের বনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বেদান্ত সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বখন দ্বিতীয় বার আমেরিকায় যান তখন নিউ ইয়র্কে তাঁহার শিষ্য কুমারী মিনি বুক বেদান্ত সাধনার উদ্দেশ্যে আশ্রম স্থাপনার্থ কলিকাতাশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে ১৬০ একর (প্রায় ৫০০ বিঘা) নিষ্কর ভূমি দান করেন। বামিজী শিষ্যার বিপুল দান গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু স্থানটি পরিদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে তথায় যাইয়া আশ্রম স্থাপন করিতে বলিলেন। বামিজী গুরু-ভাতাকে বলিলেন, 'হরি ভাই, সেখানে বাণ, কাজে প্রাণ ঢালিয়া দাও, সন্ন্যাসীর মত থাক এবং ভারতকে তুলিয়া যাও।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ বামিজীর আদেশ শিরোধার্য করিলেন। কিন্তু ভারতকে তুলিতে পারিলেন না। তিনি এক দিন শান্তি আশ্রমে

\* 'প্রবন্ধ ভারত' পত্রিকার (মে, ১১১৮) এক এস য়োড হ্যামেল লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

বলিয়াছিলেন, 'তোমরা জান, আমি তোমাদের সকলকে কিরূপ ভালবাসি, কিরূপ তোমাদিগকে অন্নিয় জান করি, তোমাদিগকে পরমাশ্রয় মনে করি। বস্তুতঃ আমি ভুলিয়া যাই যে, আমি বিদেশে আছি। কিন্তু ভারতকে একবারে ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' ভারতকে বিস্মৃত না হইলেও স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকাকে স্বদেশ ভূত্য ভালবাসিতেন এবং উহার গুণাবলীর প্রশংসা করিতেন। কথাশ্রঙ্গের এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের যেহেতু কেমন সবল ও স্বাধীন! তোমাদের সমাজে জ্ঞা ও পুঙ্খের সম্বন্ধ কি স্নন্দর! তোমরা চাকরদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার কর আমি তা খুব পছন্দ করি। তাঁর কর্ম সম্বন্ধে তোমরা বাক্যে কেমন সংযত! তোমাদের কথায় চীৎকার নাই, উচ্ছ্বাসপাত নাই। তোমরা শৃঙ্খলাপ্রিয় ও সময়াবুয্য। তোমরা সব জিনিষ কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ!...''

আশ্রমের ভূমিদাত্রী কুমারী বৃক্কের সহিত স্বামী তুরীয়ানন্দ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলসে যান। উক্ত সহরে স্বামিজী যাত্রীদের অতিথি হইয়াছিলেন তাঁহাদের বাউতেই উঠিলেন। উক্ত গৃহে তিনটি সঙ্গোদয় ভগিনী থাকিতেন। তাঁহারা সকলে বোস্তান্ধারগিণী ছিলেন। স্বামিজী তাঁহাদিগকে পরিত্রাসঙ্কলে 'তিনটি বক্রুণা' (three Graces) বলিতেন। ভগিনীত্রয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাইয়া আনন্দে অগীর হইলেন এবং নবাবগত সন্ন্যাসীকে সমুদ্র-তীর, পাখবর্তী সতরগুলি এবং কমলা লেবুর বড় বড় বাগান দেখাইলেন। ক্যালিফোর্নিয়া কমলা লেবুর জন্ম প্রসিদ্ধ। লস্ এঞ্জেলসেও স্বামী তুরীয়ানন্দ জগন্মাতার চিন্তায় ও প্রসঙ্গে নিমগ্ন ছিলেন। ধর্মশিক্ষা, ধর্মপাণ ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তাঁহার দিনগুলি কাটিত। তথায় তিনি প্রভাবশালী প্রচারকরূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহাকে সেখানে রাগিবার ক্ষমতা বহুগুণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি ত স্বামিজী কর্তৃক অল্প কার্যের ক্ষমতা প্রেরিত। তিনি তথায় কয়েক সপ্তাহ কাটাওয়া ১৯০০ খৃঃ ২৬শে জুলাই সানফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছিলেন। উক্ত সহরে তিনি সশ্রদ্ধ স্বর্জননা পাইলেন। কারণ, স্বামিজী এইখানেই স্থানীয় ভক্তাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কেবল বক্রুণাই দিলাম। কিন্তু আমি আমার এমন এক গুরুভাইকে পাঠাইব যে দেখাইবে ও শিখাইবে আমি বা বসেছি তা কিরূপে কার্যে পরিণত করিতে পারা যায়।'

স্বামিজীর অল্পসংখ্যক অনুসারী বক্রু মিলিত হইয়া সানফ্রান্সিস্কোতে বোস্তান্ধ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বক্রুগণ নিয়মিত ভাবে মিলিত হইয়া উক্ত সমিতিতে বেদান্ত অধ্যয়ন ও আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের লঠাইই স্বামী তুরীয়ানন্দ কাজ আরম্ভ করেন। অচিরে তাঁহার ক্লাশে শ্রোতার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তন্মধ্যে যে বাব জন বেদান্ত সাধনার জন্ম প্রদেহাশ্রিত ছিলেন তাঁহাদের লঠিয়া তিনি সান আন্তোনি উপত্যকায় শান্তি আশ্রম স্থাপনার্থ যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ১৯০০ খৃঃ ৩রা আগষ্ট যাত্রার দিন নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান জোস উপত্যকা বড় দূর। সানফ্রান্সিস্কো হইতে সান জোস পর্যন্ত ট্রেনে, তথা হইতে বাইশ মাইল চারি-ঘোড়ার গাড়িতে চড়াই-উৎরাই পথে ৪৪০০ ফুট উচ্চ হামিলটন পর্বত-শিখরে অবস্থিত জগদ্বিখ্যাত লেক অবভার্টেটোরী পর্যন্ত। সমুদ্র-তীরবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে

হামিলটন সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সান জোস হইতে হামিলটন পাহাড়ে উঠিতে হয়। সাপ্তাহিক উপত্যকায় অবস্থিত জাদু, কমলা প্রভৃতি কলের বড় বড় স্নন্দর বাগান। তথা হইতে নিম্নপথে দক্ষিণ-পূর্বে আঠারো মাইল সান আন্তোনি উপত্যকায় বাইতে হয়। কিন্তু এই শ্রমোপার্জিত কষ্টকর হয় নাই। রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, ক্লাস্তির শীতল বায়ু, ফলের বাগান, অলিউ উদ্যান, জাদু বাগান, বাগিচাগুলির উৎসাহ, স্বামী তুরীয়ানন্দের সংযত শ্রোতাবৃত্তি ও চিন্তাকর্ষক ধর্ম-প্রসঙ্গ উক্ত যাত্রাকে সুখকর করিয়াছিল। সান জোসে শেষ রেলওয়ে স্টেশন ও বাজার অবস্থিত। এই স্থান হইতে সান আন্তোনিয়ো পঞ্চাশ মাইল পথ।

লীজীঠাকুর বলিতেন, 'পদ্মপত্রের মত হও। পদ্মপত্র জলের উপর ভাসে, কিন্তু জল উঠাতে লাগিয়া থাকে না। অথবা নদীর তুল্য হও। নদী হ্রদের উপর ভাসে, কিন্তু উহার সহিত মিশ্রিত হয় না। চিত্ত শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বর দর্শন কর। তখন সংসারে থাকিলেও আসক্ত হইবে না।' স্বামী তুরীয়ানন্দ সানফ্রান্সিস্কোতে এক দিন ক্লাশে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে প্রথমে ঈশ্বরলাভ করিতে এবং তদন্তে সংসারে বাস ও কর্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুযায়ী হরি মহারাজ ঈশ্বরলাভকেই স্বীয় জীবনের প্রধান কর্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ছাত্র ছাত্রীগণকে তাহাই করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। শান্তি আশ্রমের যাত্রী দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা একটি তরুণী ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা! ইড়া, তুমি আমাদের সঙ্গে এলে কেন? তুমি ত অল্পবয়স্ক। বলিও মাত্র? তুমি আশ্রমে যাইয়া কি করিবে?' 'ও! স্বামী, আমি ওখানে বাছি এই জন্ম যে, আমি নদীর মত হইতে চাই।' তাহার সরল উত্তরে হরি মহারাজ অতিশয় দ্রুত হইয়া বলিলেন, 'হী, নিশ্চয়ই তুমি নদীর মত হইতে পারিবে যদি সাধ্য মত চেষ্টা কর।'

দ্রীতিপ্রদ যাত্রার শেষে যাত্রী দল সান আন্তোনি উপত্যকায় উপস্থিত হইল। মানব-নিবাস হইতে সূর্যের পর্বতপরি জললাকীর্ণ উচ্চ-নীচ স্থান-সমূহ এই উপত্যকা। গুরু, পাইন, চাপারাল মানজানীতাদি বৃক্ষ উহার একাংশ পরিপূর্ণ। অল্প অংশ সমতল ও ভূগাছানিত। সূর্যের চির-তুষারচ্ছন্ন সন্ধ্যা সিয়ায়া নেবাদা পর্বতশ্রেণী। শান্তি আশ্রমের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দেড় মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল প্রস্থ। ইহার চারি দিকে কাঁটা তারের বেড়া, ইহা জল-হীন ও অশুষ্ক, ঘোয়ে অতি উষ্ণ ও হীতে অতি শীতল হয়। প্রায়কালে ইহার তাপ ১১৮° ফারেনহাইট অথবা তরিলেও নামে। কোন কোন বৎসর বরফ পড়ে। শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়, তার পর সব শুষ্ক হইয়া যায়। একটি খাড়া উহার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত। কিন্তু উহা বৎসরের অধিকাংশ সময় শুষ্ক থাকে। এক প্রকার ছোট বাস সারা জমিতে হয়। এই বাস খাড়া অসংখ্য পশু বাঁচিয়া থাকে। ইহা পচচারণ মাঠক্ষেপে ব্যস্ত হইয়া থাকে। গৃহপালিত পশুগুলি এখানে চরিয়া বেড়াইত এবং বাস বাঁচিয়া বাড়িত, বড় হইলে কসাইদের দাড়ে বিক্রীত হইত। ক্ষীণকায় প্রস্রবণ কয়েকটি আছে দূবে দূবে। এই নির্জন আরণ্য আশ্রমে কয়েকটি নরনারী বেদান্ত সাধনের জন্ম তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সারিধে বাস করিতে গিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনে ইহা অভিনব

প্রচেষ্টা। স্বামী তুরীয়ানন্দ্রের সঙ্গে এসেছে তাঁহাদের জীবন উন্নত ও পরিবর্তিত হইয়াছিল। যে যেমনটি আশিয়াছিল সে তেমনটি কিরিয়া যায় নাই। একতরু অগ্নির পাশে বসিলে শীতল শরীর উত্তপ্ত হইত। দিবা ক্ষুধিত প্রত্যেকের সাধন-কৌশল জ্বলিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ্র আশ্রমটির নাম রাখিলেন শান্তি আশ্রম।

একটি পুণ্যস্থান কাঠের ঘর বাকীত আশ্রম-গৃহ তখন কিছুই ছিল না। এতগুলি লোক কোথায় থাকিবে ও শুইবে? জল কোথায় পাওয়া যাইবে? অনেক দূর হইতে জল আনিতে হয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ্র কিঞ্চিৎ নিকটবাস হইলেন। আশ্রম-ভূমির একদিক হইতে ওপার তিনি ঘুরিয়া দেখিলেন। তিনি ভগ্ন-স্থলদ্বয়ে জনৈক ছাত্রকে পাললেন, 'তোমরা আমাদিগকে কোথায় এনেছ?' কিন্তু আমেরিকান ছাত্র-ছাত্রীগণ হতোত্তম হইলেন না। তাঁহারা কষ্টদহিয়ু, সাহসী, শ্রমশীল ও কর্মঠ ছিলেন। কাহারাও কাহারাও তাঁবুতে বাস করার অভ্যাস ছিল। সাময়িক ব্যবস্থা অচিরে করা হইল। কিন্তু হরি মহারাজ ভয় করিলেন যে, কঠোর পরিশ্রমে তাহাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতে পারে। তিনি প্রাঙ্গণে পাথরচাটী করিতে করিতে জগদ্ধাতাকে অভিযোগ পূর্বক বলিলেন, 'মা, এ কি করলে? তোমার অভিপ্রায়ই বা কি? এই লোকগুলি এক্ষণ কঠোরতা অভ্যাগ করিলে মারা যাবে! আশ্রয় নাই, জল নাই। তাহা এই অবস্থায় কি করিবে?'

একটি ছাত্রী তাঁহার গভীর ভাব বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, স্বামী যথেষ্ট তরু বিশ্বাস হারাইয়াছেন। সে তাঁহার নিকট যাইয়া বলিল, 'স্বামী, আপনি তখন হইলেন কেন? আপনি স্বগম্যতার উপর বিশ্বাস হারাইলেন না কি? আপনি চিন্তিত হইবেন না। তিনি সব ঠিক করিয়া দিবেন।' স্বামী তুরীয়ানন্দ্র আশ্চর্য্যাবিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'স্বধ-বাহুস্বাধূর্ণ গৃহে বাস এবং নাগরিক জীবন বাপন করিয়া এই সময়ে এত সাহসী!' তিনি বাড়ি সোজা করিয়া সেখানেই বলিলেন, 'ভূমি ঠিক বলেছ। মা আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। তোমার কি বিশ্বাস! এখন হইতে তোমার নাম হইবে 'শ্রদ্ধা'।

প্রথমে সকলেই তাঁবুতে থাকিতেন। পরে কাঁচা ইটের এবং কাঠের কেবিন নির্মিত হইল। স্বামী তুরীয়ানন্দ্রের সময়ে তিন-চারিটি কাঠের কেবিন তৈরী হইয়াছিল, বাকীগুলি ছিল ইটের। কাঠের কেবিনগুলি একতরু গুরুদাস এবং মিঃ বোয়ার কৰ্ম্মক নির্মিত। এক-একটি কেবিনে মাত্র এক-এক জনের বাসযোগ্য ছিল। কাঁচা ইটের একটি কেবিনে ভগিনী দীরা ও ভগিনী প্রসুতি একত্রে থাকিতেন। ক্রমশঃ শাবককীর ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কয়েকটি তাঁবু খাটান হইল। একটি কুপ খনন করা হইল। একটি ধান-ঘরও নির্মিত হইল। এক জনের সাহায্য বিশেষ ভাবে কাষাকরী হইল। তিনি উত্তমশীল, আত্মবাহু ও শিল্পকাণ্ডে নিপুণ ছিলেন। যেখানে সাহায্য দরকার সেখানে তিনি অচিরে উপস্থিত হইতেন। তাহার সেবাপরায়ণতা দশনে প্রীত হইয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ্র তাহার নাম রাখিলেন সাধুচরণ। স্ত্রতরায় অল্প কালের মধ্যে স্থানটি বাসযোগ্য ও আশ্রমপ্রাণ হইল। নৈনন্দিন কায্যতালিকা প্রচলিত হইল।

আশ্রমবাসিগণ প্রাতে পাট্টার শয্যাভ্যাগ করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ্র ও পুরুষগণ প্রধান তাঁবু হইতে একটু দূরে স্থান সারিতেন। শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রাতঃস্থান চলিল। শীত-কালে প্রাতে স্থানার্থে কুপ সমীপে বাইবার সময় এত অন্ধকার থাকিত যে পথ দেখিবার ক্ষমতা নষ্ট হইতে হইত। শীতও তখন এত শরীত ছিল যে, স্থানান্ত্রে কিরিয়া আসিয়া দেখা যাইত, সিন্ধু তোরণে-কি-ঠাণ্ডায় বরফ সম্মতে শক্ত হইয়া গিয়াছে! তৎপরে ধ্যান-ব্যস্ত আশ্রম বাসিয়া সকলে উহার চতুর্দিকে বসিতেন। গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি-তলে প্রাতঃকালীন ধ্যান হইত। শীতকালে সকালের ধ্যানের পূর্বে স্বামী তুরীয়ানন্দ্র সঙ্কৃত লোক পাঠ ও অর্থ করিতেন। পরে সকলকে লইয়া তিনি এক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। ধ্যানান্তে ছাত্রী-গণ প্রাতর্ভোজ প্রস্তুত করিতেন এবং ছাত্রগণ জল আনা, কাঠ কাটা, শাক-সবজী লাগান ও কেবিন নির্মাণ কাণ্ডে নিযুক্ত হইতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ্র আশ্রমের সকল কাজেই আগ্রহ দেখাইতেন ও সাধ্যমত যোগ দিতেন। বেলা আটটার সময় ক্যান্টিন-নির্মিত আহার-কক্ষে প্রাতর্ভোজ পরিবেশিত হইত। পাহাড়ের তাওয়া ও শারীরিক পরিশ্রমে সকলের বেশ ক্ষুধা হইত এবং সকলের স্বাস্থ্যোন্নতি দেখা গেল। প্রাতর্ভোজের ঘটটি বিশেষ উপভোগ্য ছিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ্র নানা বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতেন। সকলে সেই প্রসঙ্গে যোগ দিত। আলোচনা-স্রোতের গতিটি স্বামী তুরীয়ানন্দ্র সর্বদা সর্বা রক্ষা করিতেন। হাত ও আমোদ সন্তোষ জীবনের লক্ষ্য কখনও দৃষ্টির বহির্ভূত হইত না।

প্রাতঃরাশের পরে প্রত্যেকে স্ব স্ব কার্য্য করিতেন। দশটা হইতে এগারটা 'গীতা' ব্যাখ্যা হইত। তৎপরে পুনরায় এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় বিপ্রহরের আহার, সন্ধ্যা সাতটায় নৈশ ভোজন এবং তৎপরে সন্ধ্যা ধ্যান। রাত্রি দশটায় প্রত্যেকে স্ব স্ব তাঁবুতে শয়নার্থ যাইতেন। ইহাই ছিল আশ্রমের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দ্র সর্বা কর্ম্মরত থাকিতেন। তিনি কখনও ইহাকে, কখনও বা তাহাকে কিছু বলিতেন। সর্বদা তিনি জগদ্ধাতার প্রসঙ্গই করিতেন। তিনি অল্প প্রসঙ্গ ভালবাসিতেন না। কখনো কখনো তিনি বলিয়া উঠিতেন, 'মায়ের চিন্তায় মগ্ন হও, আগতিক বিষয় ভুলিয়া যাও। আশ্রমে কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলুক। সন্তরের ভাব এখানে আনিও না। সে সব ভুলিয়া মাকেই ডাক, মাকেই ভাব।'

যখন ছাত্র-ছাত্রীগণের কয়েক জন মিলিত হইয়া আলাপ করিতেন, তিনি সত্যন্তে তাঁহাদের কাছে যাইয়া বলিতেন, 'তোমরা কি বিষয়ে আলাপ করছ? সকলে মিলিয়া তাঁর চিন্তাই কর, তাঁর সান্নিধ্যে যাইবার চেষ্টা কর।' স্বামীর উপদেশ কোন বিশেষ ক্ষণের বা দিনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁহার ধর্ম্ম রবিবার বা কোন নির্দিষ্ট দিনের জন্য নহে। তিনি বাহ্য তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কথা শ্রোতব্য নির্গত হইত নব নব প্রবাহে। অকৃত্রিম নির্বিরণীর ভাবস্রোত অনর্গল প্রবাহিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে দিবা ভাবে আবিষ্ট করিত। কখন তাঁহার ভাবাবেগ আসিবে কেহ জানিত না, ইহার জ্ঞান সময়ের নির্দিষ্টতা ছিল না। সেই জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীগণ সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেন বাহাতে তাঁহার

অন্তানিহিত উৎস হইতে নির্গত সকল বাফাই শুনিতে পান। স্বামী তুরীয়ানন্দ শান্তি আশ্রমে সগা নিবাভাবে এত আবিষ্ট থাকিতেন যে, মঙ্গলের মনে হইত, জগন্নাথ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে বিহ্বালনয়ন পূর্বক আশ্রমবাসিগণকে শিক্ষা দান করিতেছেন। তিনি আশ্রমবাসিগণকে জগদম্বার সন্তান বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাঁহার এই আহ্বান শ্রোতাদের কর্ণে মধু বর্ষণ করিত, তাহাদের হৃদয়ে আশার আলোক জ্বলিয়া দিত।

একদা রাত্রি-বরে প্রবেশ করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ দেখিলেন যে, আহার পাক করিবার সময় একটি ছাত্রী পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ আত্যা তুলিয়া লবণের মাত্রা ঠিক হইয়াছে কি না জানিবার জন্ত আত্যা দিলেন। তাহা দেখিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, “আমরা ভাংতে কখনও আত্যা পাক করিবার সময় আত্যা দান করি না। কারণ, ইহা ঈশ্বরকে নিবেদিত হয়। আমরা নিজেদের জগা বা পরিবারবর্গের জন্ত রন্ধন করি না, ঈশ্বরকে নিবেদন করিবার জন্ত আমরা অন্ন রন্ধন করি। ঈশ্বরকে অন্ন নিবেদিত হইলে বাড়ীর সকলের মধ্যে বিতরিত হয়। সেই জন্ত আমরা রাত্রি ১১ ও তৎসম্পর্কিত সকল বস্তু পরিষ্কার রাখি। আমরা স্নান ও উপাসনা সমাপনান্তে গৌতম বস্ত্র পরিধান করিয়া রাত্রি-বরে বাই। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাণ্ড ঈশ্বরকে নিবেদনার্থ সম্পাদন করা উচিত। তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই আধ্যাত্মিক-তায় উন্নত হইব।” যখন তাঁহাকে ফুল উপহার দেওয়া হইত, তিনি সেইগুলি আত্যা না করিয়া বা কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ক্রীড়ামঞ্চের প্রতিমূর্তির সম্মুখে স্থাপন করিতেন। একবার গুরুদাস মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘স্বামী, আপনি ফুল পছন্দ করেন না?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘হাঁ, নিশ্চয়ই; নচেৎ কিরূপে সেগুলি আমি ঠাকুরকে দিতাম? কিন্তু আমরা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ফুল আত্যা করি না।’

কখনও কখনও নূতন ছাত্র বা ছাত্রী আসিত। একবার একটি তরুণী ছাত্রী আসিল। সে শুনিয়াছিল, ভারতে শিবাগণ সমিৎ-পাণি হইয়া অন্তর্যবাসী গুরুর কাছে বাইতেন। ছাত্রীটি আশ্রম-সংলগ্ন অঙ্গনে ঢুকিয়া কয়েক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ পূর্বক স্বামী তুরীয়ানন্দের তাঁবুতে গেল। স্বামী বলিলেন, ‘ভিতরে এস।’ নবাগতা তাঁবুতে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডগুলি সম্মুখে রাখিয়া আদান গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্বামী নবাগতায় ভাবটি বুলিলেন এবং উচ্চ-শিক্ষিতা তরুণীর সরলতা ও নম্রতায় মুগ্ধ হইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের মাতৃহৃদয় স্নেহে আশ্রম-জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীগণ অচিরে আশ্রমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন। আলস্য কাহাকেও স্পর্শ করিত না, জীবনের বাহিরে ও অন্তরে কর্ম-তৎপরতা ছিল। স্বামী আধ্যাত্মিক অগ্নির তোমকুণ্ডল ছিলেন। সেই দিব্য অগ্নি আশ্রমবাসিগণের জীবনে জ্বলিয়া উঠিল। পরম উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার বলে প্রত্যেকে ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবিতে চেষ্টা করিলেন।

আশ্রমে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-কায়দা ছিল না, একদা একটি ছাত্র মতাব্যক্ত করে একটি নিয়ম নির্ধারিত করিতে বলিলেন। স্বামী বলিলেন, ‘তোমরা নিয়ম চাও কেন? তুমি কি দেখছ না, প্রত্যেকে কেমন সময়াবৃত্ত? আমরা সকলে কেমন

নিয়মাবৃত্ত? কোন ধর্ম-প্রসঙ্গে বা ধ্যানে কেতু রূপস্থিত হয় না।’ মা নিজেই তাঁর আশ্রমের সব নিয়ম করে রেখেছেন। তাহাতেই আমাদের সমস্ত ঠাট্টা উচিত। আমরা তেন আমাদের নিয়মাদি করিতে বাইব? আশ্রমে স্বাধীনতা থাকুক, কিন্তু যথেষ্টচাপিতা যেন আশ্রমে না ঢোকে। ইহাই মায়ের শাসন-নীতি। আমাদের কোন সংঘ নাই। কিন্তু দেখ, আমরা কেমন সংঘবদ্ধ। এই প্রকার সংঘট স্বাধীন হয়। অজ্ঞ প্রকার যে কোন সংঘ কালে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ সংঘই মাহুধকে মুক্ত করে। সংঘের ইহাই শ্রেষ্ঠ বরুণ। কারণ ইহা আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।”

অজ্ঞ এক সময় স্বামী তুরীয়ানন্দ এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন। অপর এক সময় আর একটি ছাত্র মন্তব্য করিলেন, ‘স্বামী, কি আশ্চর্য্য যে, এত বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীগণ একত্রে শান্তিতে থাকিতে পারে!’ স্বামী তুরীয়ানন্দ বলিলেন, ‘এর এক মাত্র কারণ এই যে, আমি প্রেমের দ্বারা শাসন করি। তোমরা সকলে ঐতিহ্যে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। অজ্ঞ কি উপায়ে ইহা সম্ভব হতে পারে? তুমি কি দেখছ না, আমি সকলকে বিশ্বাস করি এবং সকলকে স্বাধীনতা দিই। আমি যে এইরূপ করি তাহার কারণ, আমি জানি, তোমরা সকলে আমাকে ভালবাস। কোথাও সংঘর্ষ নাই, সবই নির্বিঘ্নে চলে যাচ্ছে। কিন্তু মনে রেখো, এ সব মাই করছেন। এতে আমার কিছু করিবার নাই। তিনি আমাদেরকে সেই পারম্পরিক ঐতিহ্য দিয়াছেন, যাতে তাহার কাজ ঠিক ভাবে চলে ও বাড়ে। বতস্পন আমরা তাঁর অমুগত থাকি ততক্ষণ কোন অনিষ্টের আশংকা নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা তাঁকে ভুলে বাই তখনই মহা বিপদের ভয় আসে। সেই সময়েই ত আমি তোমাদিগকে সর্দা বলি, মায়ের চিন্তা কর।’

ক্রীষ্টান সায়েন্সে বিশেষজ্ঞ একটি ছাত্র একবার স্বামী তুরীয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমাদের শরীরটাকে স্বাস্থ্যবান রাখা কি আমাদের কর্তব্য নয়?’ স্বামী উত্তর দিলেন, ‘হাঁ। কিন্তু সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেহধারণ ত মহা ব্যাধি, মহা বিষ। আমরা দেহজ্ঞানের সমতীত হইয়া অনুভব করিতে চাই আমরাই অজ্ঞর অমর আত্মা। সে উচ্চতর অবস্থায় আমরা জানিতে পারি, আমি এই দেহ নহি, আমি নিত্য তত্ত্ব বুদ্ধ মুক্ত আত্মা, দেহ মায়িক, মিথ্যা, সেই অবস্থা লাভের পথে দেহজ্ঞানই বড় বাধা। যত দিন আমরা দেহকে ভালবাসবো, তত দিন আমাদের আত্মজ্ঞান হবে না, এবং আমরা বার বার জন্ম গ্রহণ করবো। যখন আমরা দেহকে ঠিক ঠিক ভালবাসি তখন দেহের প্রতি উদাসীন আসা অবশ্যজ্ঞাবী। দেহাসক্তি দূরীভূত হইলেই মাস্তব দিব্যালোক দৃষ্টিগোচর হয়।’

একটি ছাত্রী প্রেততত্ত্ববাদিনী ছিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক দিন দেখিলেন, তিনি বস্তুচ্যুত লেখন অভ্যাস করিতেছেন। মনকে জড়বৎ নিষ্ক্রিয় করিয়া স্বতঃচালিত লেখনে জন্ত হাতে একটি পেঙ্গল লইয়া বসিলেন। হাতটি প্রেত-চালিত হইয়া পড়িতে ও লিখিতে আরম্ভ করিবে এবং তিনি উক্ত লেখা স্বস্ত হইয়া দেখিবেন। এই উপায়ে কাগজে স্বন্দর স্বন্দর লিখিত হয়। ছাত্রীটিকে উক্ত কর্মে প্ররোচিত করিয়া দেহের স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ ভঙ্গনা করিয়া বলিলেন, ‘একি তোমার

বোকামী? তুমি কি প্রোত-চালিত হইতে চাও? এই নিরর্থক ব্যাপার ছেড়ে দাও। আমরা চাই মুক্তি। এই জগৎ এবং অজ্ঞাত সকল জগতের পারে আমরা যাঁহাতে চাই। প্রোত-চালিতের সহিত যোগাযোগ করিতে চাও কেন? তাদের শাস্তিতে থাকিতে দাও। এই সব মায়া মার। মায়াবর বাহিরে যাও এবং মুক্ত হও।

গুরুদাস মহারাজ বলেন, “স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে শাস্তি আশ্রমে আমরা নিরন্তর আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পাইতাম। তাঁহার নিকট সর্বাঙ্গ সংশ্লিষ্ট লাভ হইত। আমরা সকলেই অনুভব করিতাম, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সদা সচেষ্ট। আধ্যাত্মিক ভাবে সদা আকৃষ্ট হইয়া তিনি কখনও স্বকোমল, স্নেহ ও শ্রদ্ধা পিতৃভুল্য এবং কখনও গর্জনকারী বেদান্ত-কেশরীও ব্যবহার করিতেন। আশ্রমে একটি মুহূর্ত অবসাদ বা অলপভাব ব্যয়িত হইত না।” ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই কোন না কোন কঠোরতা অভ্যাস করিতেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ কাহাকেও কঠোরতা অভ্যাস করিতে বলিতেন না। তাপসের তপঃপ্রভাবে স্বতঃপ্রসূত হইয়া কোন কোন ছাত্র বা চাত্রী তপস্চর্যায় ব্রতী হইতেন। কেহ আহার-সংযম, কেহ মৌনাবলম্বন, কেহ বা নিষর্জন-বাস করিতেন। বেদান্তপ্রণোদিত তপস্যার প্রত্যেকে বিপুল আনন্দ পাইতেন। আধ্যাত্মিকতার মূর্তি তপস্বীর কাছে কেহ উল্লাস বা অবস্থানীয় থাকিতে পারিত না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ সময়ের আশ্রমবাসিগণ নিয়ামিতাশী ছিলেন। আশ্রমে কাহাকেও পশু-পক্ষী শিকার করিতে দেওয়া হইত না। কিন্তু এই অতিশয় নীতি কতদূর কি ভাবে পালন করা উচিত? বিশেষ উপলক্ষ না হওয়ায় এই বিষয়টি কাহারও মনে উঠে নাই। এক দিন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সে তাঁবুতে থাকিতেন উহাতে কাঠের মেজে ছিল। মেজে ও মাটির মধ্যে একটু ফাঁক ছিল। এক দিন স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন তাঁবুতে চুকিতেছিলেন তখন একটি বড় ব্যাটল সর্প\* মেজের নিচে লুকাইল। কি করা যায়? সাপটি ত যে

কোন সময় তাঁবু মধ্যে ঘাইতে পারে! লম্বা লম্বা লাঠির দ্বারা উহাকে উহার গুপ্ত স্থান হইতে সহজে তাড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তার পর? সাপটিকে মারা বাঁধবে কি না? পরামর্শ-সভা বসিল। স্বামী তুরীয়ানন্দ সিদ্ধান্তের ভার আশ্রমবাসীদের উপর ছাড়িয়া দিলেন। সামান্য মতভেদ হইল। কিন্তু অধিক সংখ্যক ব্যক্তি সাপটি মারিবার পক্ষে ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, ‘এস, আমরা সাপটি ধরে পাহাড়ের উপরে ছেড়ে দিই? সেখানে আর সে আমাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।’ কিন্তু সাপটি ধরিতে কে? একটি বৃহৎ বিষধর সর্প ধরিয়া দূরে লইয়া যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে সাপটি ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সাপটিকে তাঁবুর তলা হইতে তাড়ান হইল। সকলে লাঠি হাতে করিয়া দূর-দূরে উহাকে বিধিয়া পাড়াইলেন। সে সজোরে ঝম্-ঝম্ শব্দ করিতে লাগিল এবং ক্রুদ্ধ হইলেও আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। সে সতর্ক ও কুণ্ডলীকৃত রহিল। কেহ একটু কাছে আসিলে সে কণা তুলিয়া কৌসু-কৌসু শব্দ করিতে লাগিল।

প্রথমতঃ সাপটিকে লাঠির ভয়ে দেখাইয়া লইয়া যাওয়া উঠিল। পরে কৌশলে উহার গলায় দড়ির কীস পরাইয়া দুই জন সেই সুরীষ দড়ির দুই প্রান্ত ধরিয়া উহাকে শূন্যে তুলিয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া তথায় সাপটিকে নামাইয়া দড়ির দুই দিক ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল। সাধুচরণ নামক আশ্রমবাসী এই কার্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। সাপটি দূরে ফেলিয়া সকলে নিরাপদ ভাবিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দুই-এক দিনের মধ্যেই সাপটিকে পূর্ব স্থানে আবার দেখা গেল। উহার গলায় দড়ি থাকায় সহজে উহাকে চেনা গেল। পূর্ব প্রকারে উহাকে আরও দূরে লইয়া ফেলা দেওয়া হইল। পরে উপহাসরূপে সকলে উহাকে ‘নেকটাই’-পরা সাপ বলিয়া উল্লেখ করিতেন।\* এরূপ ছোট ছোট সাময়িক ব্যতিক্রম ব্যতীত শাস্তি আশ্রমে ধ্যান-তপস্যার স্রোত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে বহিতে লাগিল।

\* আমেরিকার এক জাতীয় বিষধর সর্প। ইহার লেজ কতকগুলি এরূপ গ্রন্থি থাকে যাহা গমন কালে ঝম্-ঝম্ শব্দ করে।

\* With the Swamis in America পুস্তকে ৮০০৮১ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বিবৃত।

### কথার মূল্য

টেলিগ্রামে কথার সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কে কত কম কথায় কত বেশী মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে, তারই পরীক্ষা হয় টেলিগ্রামে। আর টেলিগ্রামে যত কম কথা দেওয়া যাবে তত কম তার মূল্য বার্ষিক হবে। কথা বাড়ালেই টাকার অঙ্কটাও বাড়তে থাকবে। কিন্তু আমেরিকায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, টেলিগ্রামে কেবল মাত্র দু’টি কথার অতি-ব্যবহারের জন্যেই বছরে ডাকঘর অতিরিক্ত ১০,০০০,০০০ ডলার আয় করে।

কথা দু’টি হচ্ছে ‘অনুগ্রহপূর্বক’ আর ‘ধন্যবাদ’। অর্থাৎ Please আর Thank you.

আগরাস্তে মহিলারা অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ ছুটি গেল দিদির কাছে। দেবল, ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেকে সে বেশ সাবধানেই রেখেছে। তাকে সঙ্গে করে ড্রয়িং-রুমে নিয়ে এল এলিজাবেথ—সেখানে দুই বন্ধু তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ভ্রাতৃলোকদের আগার আগে এদেরকে এমন খ্রীতিময়ী আর কখনো দেখেনি এলিজাবেথ। এদের আলাপের ক্ষমতা অসীম। যে-কোন গল্প সরস করে বলার, যে-কোন উৎসবের নিখুঁত বর্ণনার অসামান্য নিপুণতা আছে এদের। এক কথায় যেমন মধুসংলাপী তেমনই সুরসিকা।

পুরুষেরা ঘরে আসার পর দেখা গেল জেন আর মধ্যমশি নেই। ক্যারোলিনের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গেই ডার্সির উপর নিশ্চিন্ত হোল—আরো অগ্রসর হবার আগেই তাকে কিছু বলার ইচ্ছা তার। ডার্সি ভ্রত অভিনন্দন জানাল এলিজাবেথকে। মিঃ হাস্টিও ছোট নমস্কার করে বলল—‘ভারী খুশী হলাম।’ কিন্তু মিসু বিলের জন্তই বৃষ্টি জমা ছিল যত কিছু সরসতা, আন্তরিকতা। আজ সে আনন্দময়—সকলের প্রতি স্নিহা। প্রথম আধ ঘট্টা আন্তরিকতার জাঁকিয়ে তুলতেই কাটল, পাছে কক্ষ পরিবর্তনে জেনের ঠাণ্ডা লাগে। হাস্টিওর ইচ্ছাতেই সে গনগনে আগুনের বিপরীত দিকে গিয়ে বসল দরজার কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে বলে। হাস্টিও এসে বসল তার পাশে কিন্তু কাকুর সঙ্গেই কথা বললে না সে। এলিজাবেথ সামনে বসে গভীর আনন্দে লক্ষ্য করতে লাগল সব।

চা-পানের পর হাস্টি জালিকাকে তাসের কথা শ্রবণ করিয়ে দিতে লাগল বার বার—কিন্তু বুধাই। ডার্সির যে তাস খেলার আদৌ ইচ্ছা নেই, এ বুঝে নিতে দেবী হোল না ক্যারোলিনের। তাই সে বললে, তাস খেলার কাকুর অভিকিচি নেই—সমবেত নৈশকেই তার প্রমাণ। বাধ্য হয়ে হাস্টি তখন একটি সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে নিজাদেবীর শরণাগত হোল। ডার্সিও একখানা বই তুলে নিলে,—ক্যারোলিনও অশ্রুশ্রবণ করল তাকে। এতক্ষণ সে হাতের চুড়ী আর ব্রেসলেট নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত ছিল—মাঝে মাঝে ভায়ের সঙ্গে এলিজাবেথের আলাপে কোড়ন কাটছিল। মিসু বিলে যেমন নিজের বইতে চোখ বুলাতে লাগল তেমনই ডার্সি কত দূর পড়ছে তাও লক্ষ্য করতে লাগল। হয় নিজের বইয়ের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ, নয় ত অনবরত প্রশ্ন-বাণে সজ্জ্বিত করতে লাগল ডার্সিকে। কিন্তু এত করেও কিছুতেই ডার্সিকে আলাপে টেনে নামাতে পারলে না। ডার্সি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েই জবাব পাঠে মন দিতে লাগল। অবশেষে বইতে নিজেকে মগ্ন করার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে সে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—‘এই ভাবে সন্ধ্যা কাটান কত অপূর্ব। বই পড়ার মত আনন্দ আর নেই। একমাত্র বই ছাড়া আর সব কিছুতেই তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে। নিজের যখন বাড়ী হবে সেখানে ভাল লাইব্রেরী না থাকলে একেবারে মরে যাব আমি।’

কিন্তু কেউই একথা শ্রবণ দিলে না। তখন সে হাই তুলে বইটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিত্তবিনোদনের নতুন কিছুই সন্ধানের ঘরের চারি দিকে তাকাতো লাগল। এমন সময় ভাইকে বল নাচ নিয়ে এলিজাবেথকে কি বলতে শুনে তার দিকে ফিরে বলল—



‘কথাই যখন উঠল, দাদা, তুমি কি সত্যিই নেদারল্যান্ড নাচের জন্ত খুব উদ্গ্রীব? সে ক্ষেত্রে কিছু স্থির করার আগে সকলের মতামত নিও। আমার ত ধারণা, এ দলে বল-নাচ কাকুর কাকুর পক্ষে আনন্দকর না হয়ে অত্যাচারে ঠাঁড়তে পারে—এ আমি হালফ করে বলতে পারি।’

—‘তুমি কি ডার্সির কথা বলছ? ইচ্ছা হলে সে নাচের আগে শুতে যেতে পারে। বল-নাচ হবেই।’

—‘বল-নাচ আমিও খুব ভালবাসি’—বললে ক্যারোলিন—‘যদি তা একটু আলাদা ধরণের হয়। কিন্তু সেই এক ধরণের জলসায় মন যেন তিতি-বিবক্ত-হয়ে ওঠে। নাচের বদলে আলাপ-পরিচয়ের আসর হলেই যেন ভাল লাগে।’

—‘তা হয়ত, কিন্তু বল-নাচের তুলনা হয় না।’

ক্যারোলিন এর আর কোনই জবাব দিলে না। একটু পরেই ওঠে সে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। শুশ্রী তার হতু-দেহ—ইটলে অতি রমণীয় দেখায় তাকে।

কিন্তু ডার্সি বার জন্তে এত কথা, তখনও কর্তার অধ্যয়ন-তপস্যায় রত। মরীয়া হয়ে আর, একবার সে শেষ চেষ্টা করলে। এলিজাবেথের দিকে ফিরে বললে—‘শ্রিয় এলিজা, আমার সঙ্গে আর একটু ঘরটা ঘুরে দেখি। মায় এক ভাবে বসে থাকার পর বেশ আরাম পাবি।’

বিমিত হলেও তক্ষুনি সায় দিল এলিজাবেথ। ক্যারোলিনের উদ্দেশ্য এবার সফল হোল। সঙ্গে সঙ্গে ডার্সিও বই থেকে মুখ



তুলে তাকাল। এলিজাবেথের মত সেও ঘরের ঐ দিকটার অভিনবত্ব সচেতন হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই বইটা কখন বন্ধ করে ফেলল। তাকেও আশ্চর্য করা হোল তাদের দলে যোগ দিতে। কিন্তু ডার্সি কি মনে করে সায় দিল না এ আশ্চর্যে। কারণ, এই ভাবে ঘরে পাঠচরী করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে তার মনে হোল। সে যোগ দিলে হয়ত সিদ্ধ হবে না সে উদ্দেশ্য। ডার্সির এই প্রত্যাখানের কারণ জানবার জন্য কারোলিন কৌতুহলে মরে যেতে লাগল। এলিজাবেথকে জিজ্ঞেসাও করলে, সে কিছু বুঝতে পেরেছে কি না।

—‘একটুও নয়। মনে হয়, আমাদের প্রতি উনি ঔদাসীন্য দেখাতে চান। আর সে ক্ষেত্রে ওকে ইতঃশ করার একমাত্র উপায় ওকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেসা না করা।’

কিন্তু কারোলিন ঐ লোকটিকে হতাশ করতে চায় না।

কথা বসার স্বযোগ পাওয়া মাত্রই বলল ডার্সি—‘বলতে আমার একটুও বাধা নেই। আপনাদের এই ধর্মের সত্য বাপনের পিছনে ছুটো কারণ থাকতে পারে। আপনাদের দু’জনের মধ্যে হয় খুব সখি এবং কোন গোপন বিষয় দু’জনে আলোচনা করতে চান। অথবা ইটলে আপনাকে সন্মত দেখায় এ সম্বন্ধে সচেতন আপনি। প্রথমটা সত্যি হলে আমি সেখানে বাধা-বরপ আর শেষের ক্ষেত্রে আমি বলব, আগুনের ধারে বসেই আমি তার বেশী তারিফ করতে পারি।’

—‘জঘন্ট! এ রকম কুৎসিত কথা আমি জীবনে কখনো শুনি। এ রকম কথা বলার জন্য কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে একে?’

—‘খুবই সহজ’—মন্তব্য করে এলিজাবেথ।

—‘আমরা পরস্পরকে নিন্দা বা প্রশংসা করতে পারি, হয়ত বা শাস্তিও দিতে পারি। কিন্তু ওকে রগাতে মজা—ব্যস্ত করতেও। কিন্তু কি করে করা যাবে সে তুমি বুঝবে ভাই। তোমার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বেশী।’

—‘দ্বিবি করছি, ওর সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠতাই নেই আমার—থাকলেও এত দূর অগ্রসর হতে পারিনি আজও। ওর মত ঠাণ্ডা মেজাজ বার আবার অমন চোখে-মুখে কথা বলে যে, তাকে খাপান সহজ নয়। না, না—তাহলে ও আমাদের ঠাটা করবে। আর বাজে হাসি-ঠাট্টায় নিজেকে হাত্ত্যাপন করতে রাজী নই আমি।’

—‘ওকে নিয়ে ঠাটা করা চলবে না? উঃ, কি মহা সৌভাগ্যবান উনি। এ রকম সঙ্গী বেশী জুটলে কিন্তু আমার ভাল লাগবে না। আমি হাসি-ঠাটা খুবই ভালবাসি।’

ডার্সি বললে—‘মিসু বিলে কিন্তু আমার তারিফের অতিশয়োক্তি করছেন। মানুষের মধ্যে বিজ্ঞতম ও গুণী ব্যাং তাদের ক্রিয়াকলাপেও পরিহাস করতে পারে তারাই, যাদের জীবনের মূলমন্ত্র হোল কৌতুক-ক্রীড়া।’

—‘সে লোক অবশ্যই অনেক আছে’—উত্তর দেয় এলিজাবেথ—‘আমি অবশ্য সে গোষ্ঠীর নয়। সত্যি বা ভাল বা স্বেচ্ছা, তা নিয়ে আমি কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করি না। মানুষের বোকামি আর বোকাগিরি, খেয়াল আর অসংলগ্নতায় আমোদ পাই আমি—এ নিয়ে

হাসি-ঠাটাও করি যখন পারি। আপনার নিশ্চয়ই এ সব দোষ নেই।’

—‘সকলের পক্ষে তা হয়ত সম্ভবপর নয়। লোকে আমার পরিহাস করতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমানকে হাত্ত্যাপন করার চরিত্রের তেমন দৌর্বল্য পরিহারের চেষ্টাই আমার জীবনের সাধনা।’

—‘যেমন ধরুন গর্ভ আর দেমাক’—

—‘দেমাক দোষ বই কি। কিন্তু মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে গরিমা-বোধ নিশ্চিন্দ নয়।’

এলিজাবেথ হাসি লুকানোর জন্য মুখ ফেরাল।

—‘মিঃ ডার্সিকে পরীক্ষা করার পালা শেষ হয়েছে? কি ফল পাঁড়াল?’ জিজ্ঞেসা করলে কারোলিন।

—‘মিঃ ডার্সি দোষাভীত। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বললে এলিজাবেথ।

—‘না, তেমন দণ্ড আমার নেই’—প্রতিবাদ জানায় ডার্সি। ‘আমার অনেক দোষ আছে কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির খুঁত নেই আশা করি। আমার মেজাজ নিয়ে অবশ্য আমি দ্বিবি করতে পারি না। আমার মেজাজ সহজে বশ মানতে চায় না। জগতের পক্ষে তা খুব সুবিধের নয় বলতেই হবে। অস্ত্রের দোষ বা বোকামি আমি সহজে ভুলি না, বা ভোলা উচিত আমার। আমার প্রতি অন্তর্য আচরণও আমি ভুলি না। আমার অহুত্বটিকে চট করে কাহ্নস কাঁপান যায় না। মেজাজটা রোযপ্রবণই বলতে পারেন। আমার মতামতকে একবার উপেক্ষা করলে চিরকালের মতই হারাতে হয়।’

—‘এটা অবশ্যই অন্তর্য।’—বাধা দেয় এলিজাবেথ—‘দুর্গাশা রোয চরিত্রের কালিমা। কিন্তু অতি অল্প ভাবে আপনি আপনার দুর্গলতা প্রকাশ করেছেন। এ নিয়ে ঠাটা চলে না। আমার দিক থেকে আপনি নিরাপদ।’

—‘প্রত্যেকেরই বিশেষ দোষ-প্রবণতা আছে যাকে প্রকৃতিগত বলা চলে—শিক্ষায়ও যাকে বশ মানান যায় না।’

—‘আপনার দোষ হোল প্রত্যেককে ঘৃণা করার যৌক।’

—‘আর আপনার’—হাসতে হাসতে বলে ডার্সি—‘ইচ্ছা করে পরকে ভুল বোকা।’

—‘এবার একটু গান হোক।’ নিজের যোগ নেই যে আলোচনার, তা ক্লাস্তি আনে কারোলিনের। ‘হাসটিকে জাগাতে তোর আপত্তি নেই তো লুসি।’

লুসি বাধা দেয় না। পিয়ানোর ঢাকা খোলা হয়। একটু কি ভেবে নিয়ে ডার্সিও আপত্তি করে না। এলিজাবেথের প্রতি অতি মনোযোগের বিপদের সম্ভাবনা শংকার ছায়া ফেলে মনে।

## বারো

ছই বোনেতে বৃষ্টি করার পর পরদিন সকালে জেন মাকে গাড়ী পাঠাতে লিখল—সেই দিনের মধ্যেই আসে যেন। কিন্তু মিসেস বেনেট ভেবে রেখেছিলেন মেয়েরা মঙ্গলবার পর্যন্ত নেদারফিল্ডে থাকবে—তাহলে জেনের সেখানে এক সপ্তাহ থাকে হয়। তাব আগেই তাদের চলে আসাটা তিনি মোটেও প্রায় চিন্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। কাজেই তাঁর উত্তর বিশেষ করে এলিজাবেথের পক্ষে অস্বস্তিকর হোল না। এলিজাবেথ

বাড়ী ফেরার জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। মিসেস্ বেনেট লিখে জানালেন, মঙ্গলবারের আগে খুব সম্ভবতঃ গাড়ী পাঠান সম্ভবপর হয়ে উঠবে না এবং এও লিখে দিলেন যে, ক্যারোলিন আর তার বোন যদি থাকার জন্ত গাড়ীপাড়ি করে তাঁর আদৌ ক্ষমত নেই। কিন্তু আর থাকা সম্বন্ধে এলিজাবেথ স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে—তাদের যে আর থাকতে বলা হবে এমন প্রত্যাশাও করে না সে। বরং আরো বেশী থাকাটা অনাহুত ভাবেই থাকা হবে। মিঃ বিংলের গাড়ী চাইবার জন্ত সে বললে জেনকে এবং স্থির করা হোল, পরদিন সকলেই নেদারফিল্ড ছাড়ার কথা জানিয়ে গাড়ীটা চাওয়া হবে।

এই সংবাদ রটনার সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে উৎকর্ষার সাড়া পড়ল। জেনের শরীরের কথা ভেবে অন্তঃস্বঃ সেদিনটা থেকে যাওয়ার জন্ত বার বার অমুরোধ এল। স্মরণ্য পরদিন পয়স্র তাদের যাওয়া মুলতবী রইল। ক্যারোলিন সব থেকে বেশী দুঃখিত হোল এই থেকে যাওয়ার ব্যাপারে, কেন না সেই তাদের থাকতে বলার জন্ত দায়ী। এক বোনের প্রতি ভালবাসার চাইতে আর এক বোনের প্রতি অস্থ্যা যেন বেশী উগ্ররূপে দেখা দিয়েছিল।

গৃহস্থামী তাদের চলে যাওয়ার জন্ত মত্যা সত্যই দুঃখিত হলেন। নানা ভাবে তিনি জেনকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এ ভাবে যাওয়া নিরাপদ নয়—এখনও সে ভাল করে সেের ওঠেনি। কিন্তু জেন একবার যা স্থির করে তার আর নড়চড় হয় না।

এদের বিদায় নেওয়ারটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে ডার্সির কাছে মনে হোল। এলিজাবেথ অনেক দিন নেদারফিল্ডে আছে। বড় বেশী সে তাকে আকৃষ্ট করেছে। মিস বিংলেও তার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করছে এবং তার বিজ্ঞপ বর্ষণের মাত্রাও বেড়ে গেছে। এবার থেকে সে খুবই সতর্ক হবে যাতে না লুশাকেরও এলিজাবেথ সম্বন্ধে কোন প্রশংসা-বাণী নিঃসৃত হয় তার মুখ থেকে। তার সম্বন্ধে সে যেন না কোন আশা পোষণ করে এবং যদিও পোষণ করে থাকে, শেষ দিনের আচরণে তা যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সংকল্প মত সারা শনিবার ডার্সি নশটির বেশী কথা বললে না এলিজাবেথের সঙ্গে এবং এক সময় যদিও তারা আধ ঘণ্টার চেয়ে বেশীকণ একাকী ছিল, সে কঠোর ভাবে নিজেকে বইতে নিবদ্ধ রেখেছিল। এমন কি, তার দিকে ফিরেও তাকায়নি।

রবিবার উপাসনার পর বিদায়ের পালা এল। অবশেষে জেনের প্রতি ভালবাসা আর এলিজাবেথের প্রতি শিষ্টাচারের মাত্রা বেড়ে গেল বহু গুণ। লংবোর্ণে বা নেদারফিল্ডে সব সময়ই তাহা স্বাগতম। জেনকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলে ক্যারোলিন—এমন কি এলিজাবেথের সঙ্গেও কর্মমর্দন করতে দ্বিধা বোধ করলে না। এলিজাবেথ সকলের কাছ থেকেই বেশ খুশী মনে বিদায় নিল।

বাড়ী পৌছলে মা কিন্তু তাদের খুব প্রসন্ন চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন না। তাদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিষয় প্রকাশ করলেন তিনি—এতখানি রজ্জট পাকানো অস্থায় হয়েছে তাদের। জেনের যে আবার ঠাণ্ডা লাগবে সে বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয়। মিতভাবী পিতা কিন্তু তাদের দেখে খুশীই হয়েছেন মনে হোল।

এদের অভাব বড় বোধ করতেন তিনি। বিকেলে সবাই একত্রিত হলে, এলিজাবেথ আর জেনের অমুপস্থিতির দক্ষণ সম্ভাবতা আর আনন্দের অভাব অমুভূত হোত খুবই।

মেরী তেমনি খারা সংগীতের সুর আর মন্থ্য-প্রকৃতি অমুধাবনে মহা মশগুল। ক্যাথারিন আর লিডিয়া কিন্তু অজ্ঞ ধরণের সম্বেশ জমিয়ে রেখেছে তাদের জন্তে। গত বুধবার থেকে অনেক কিছু ঘটে গেছে সেনা-শিবিরে। মেশো মশায়ের সঙ্গে কয়েক জন অফিসার খানাপিনা করেছে—এক জন সৈন্ত চাবুক খেয়েছে—এমন কি এমন ইংগীতও করলে যে, কর্ণেল কষ্টারের শীগগির বিয়ে হবে।

### ভের

পরদিন সকলে প্রাতরাশ খাওয়ার সময় মিঃ বেনেট জ্বীকে বললেন—‘আজকের আহা-পর্ব একটু ভাল করেছ ত? এক জন অতিথির প্রত্যাশা করছি।’

—‘কে, কে? কেউ আসবে বলে তো জানি না। এলে এক শালটি লুকাস আসতে পারে। তা আমার ভীনার তার মর্যাদার অমুপস্থিত হবে না। বাড়ীতে সে এর চেয়ে নিস্তা ভাল খায়, মনে হয় না।’

—‘আমি যে অতিথির কথা বলছি তিনি এক জন অপরিচিত ভ্রমলোক।’

মিসেস্ বেনেটের চোখ ঝকঝক করে উঠল। ‘অপরিচিত ভ্রমলোক! নিশ্চয়ই মিঃ বিংলে। আচ্ছা জেন, তুমি তো একবারও বলসনি এ কথা। মিঃ বিংলে এলে খুব খুশী হবে। কিন্তু—হা ভগবান! ঘরেতে এক টুকরো মাছ নেই! গিডিয়া ঘণ্টাটা বাজা তো—পামি হিলের সঙ্গে এখুনি কথা বলতে চাই।’

—‘মিঃ বিংলে নয়।’—স্বামী জানালেন—‘হিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে আমি কখনো চোখে দেখিনি।’

এ কথায় একটা বিষয়ের রোল পড়ে গেল। জ্বী ও পাঁচ মেয়ে সম্বন্ধে উদ্গ্রীব কণ্ঠে প্রশ্ন করল—‘কে, কে সে?’

তাদের গুংস্ক্য নিয়ে খানিকক্ষণ মজা করে শেষটায় বললেন মিঃ বেনেট—‘এক মাস আগে এই চিঠিখানি পেয়েছি। পনের দিনের মধ্যেই উত্তর দিয়েছি। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। চিঠি এসেছে ভাইপো কলিন্সের কাছ থেকে, সে আমার মৃত্যুর পর যক্ষুনি ইচ্ছা করবে তোমাদের এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে।’

জ্বী আতর্নাদ করে উঠলেন—‘ও অনুক্ষণে কথা শুনেতে পারি না। লোকটার কথাও আর বলো না তুমি। তোমার সম্পত্তি তোমার নিজের মেয়েদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেবে এর চেয়ে নিম্নম কথা আর কি আছে! আমি যদি পুঙ্খ হতাম, কবে এর বিলি-ব্যবস্থা করে ফেলতাম।’

জেন আর এলিজাবেথ মাকে সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থা করার ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল—আগেও চেষ্টা কবেছে কিন্তু এ এমন একটা ব্যাপার, যা নিয়ে তিনি বুদ্ধিত্বের খাখ ধারণে চান না। তাঁর পাঁচ মেয়ের কাছ থেকে সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে এমন এক জনকে দেওয়া হবে যাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি। এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে তিনি তাঁর বাক্যবাণ বর্ষণ শুরু করলেন।

—‘এটা অবশ্যই খুব অস্থায় ব্যাপার’—বললেন মিঃ বেনেট

—‘কিছু লংবোর্ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণের অপরাধ থেকে কলিকাতা কোন মতেই বঞ্চিত করা যায় না। তবে ধৈর্য ধরে যদি তার চিঠিটা শোন, তার বক্তব্যের ধরণ দেখে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করতে পারবে।’

—‘না, না—কিছুতেই স্থিতি পাব না। চিঠি লেখাটাই তার পক্ষে ধুঁটতা—চরম ভণ্ডামি হয়েছে। এ রকম মিথ্যা বন্ধুদের আমি ঘৃণা করি। তার বাপের মত সেও তোমার সঙ্গে বিবাদ করুক না কেন?’

—‘শোনোই না তার চিঠিটা—তাহলেই বুঝতে পারবে তার মস্তিষ্কে অপত্যভুলত বিবেক-বুদ্ধি কিছুটা আছে।’

হালকার্ড

প্রজ্ঞাভিজ্ঞন—

১৫ই অক্টোবর।

আপনার ও আমার পরমাধাধ্য বর্গীয় পিতৃদেবের মধ্যে মনোমালিন্য সর্বদাই আমাকে গভীর পীড়িত করিয়াছে। এক্ষণে তাঁর মৃত্যুতে সেই কলণে চিরাবলান ঘটাইবার ইচ্ছা প্রায়শই জন্মগ্রহণ করিতেছি। তবে আজীবন বার সঙ্গে তাঁর মতান্তর ছিল মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেই তাঁরই সঙ্গে সন্তাব স্থাপন করিলে মৃতের আত্মার প্রতি অসন্মান করা হইবে—এই সন্দেহে এত দিন সে চেষ্টায় বিরত ছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছি। ঈশ্বার হইতে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি। আর লুইস ও বার্গের বিধবা পত্নী লেডী ক্যাথারিন ও বার্গের দাসিন্য ও মহানুভবতার আমি এখানকার ধর্মবাজক হইয়াছি। এক্ষণে আমার সতত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা হইবে, সমস্ত চিন্তে সেই মহীয়সীর অমূল্য হইয়া থাকা এবং ইংলণ্ডের গৌরবের অনুশাসন-সম্মত ভাবে উৎসব ও ধর্মোৎসাহ কাৰ্য্য সূচকরূপে সম্পাদন করা। ধর্মবাজক হইবার পর হইতে আমি আমার জানা প্রত্যেক পরিবারের সহিত মতাব ও সম্প্রীতি বজায় রাখা উচিত মনে করিতেছি। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত আমার এই শুভেচ্ছা প্রজ্ঞা-নিশ্চয়ই প্রশংসাই বিবেচিত হইবে এবং আপনি আমার লংবোর্ণের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণ উপেক্ষা পূর্বক এই শাস্তি-প্রজ্ঞা-প্রত্যাখ্যান করিবেন না নিশ্চয়ই। আপনার স্মৃতি-তনয়গণের ক্ষতির কারণ হওয়ায় দুর্ভিক্ষিত আছি এবং এ জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—পরে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিবার ঐকান্তিক মানস রইল জানিবেন। যদি আপনার গৃহে আমার গ্রহণ করিতে আপত্তি না থাকে ১৮ই নভেম্বর সোমবার চার ঘটিকার সময় আপনার গৃহে গমনের অভিল্যাপ আছে এবং আপনাদের আতিথ্যের উপর শনিবার পথন্ত জুলুম করিব। যদি রবিবারের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনের জন্ত অল্প কোন ধর্মবাজকের ব্যবস্থা করিতে পারি তাহা হইলে লেডী ক্যাথারিন এই সাময়িক অনুপস্থিতিতে বাধা প্রদান করিবেন না। আপনার দ্বী ও কন্যাগণকে আমার সম্রাট নমস্কার ও প্রীতি জানাইবেন। ইতি

বিনীত—

আপনার বন্ধু ও হিতাকাংখী

উইলিয়ম কলিক।

—‘কাজেই আজ চারটের সময় এই শাস্তিকামী ভরলোককে আমরা আশা করতে পারি—চিঠি ভাঁজ করতে করতে মস্তব্য করলেন মি: বেনেট।’ ‘বোধ হচ্ছে, বুঝক অতি বিনয়ী ও ধর্মভীক।

লেডী ক্যাথারিন তাকে আসার অনুমতি দিলে তার সাহচর্য নিঃসন্দেহ অতি মূল্যবান হবে।’

—‘মেয়েদের সম্বন্ধে ও যা মস্তব্য করেছে ভাতে ওর কিছুটা বিবেক-বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। যদি ও মেয়েদের কিছু দিতে চায় আমি নিরুৎসাহ করব না ওকে।’

—‘কি ভাবে উনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান যদিও তা অনুমান করা কঠিন, তবুও এই ইচ্ছাটাই প্রশংসনীয়।’

লেডী ক্যাথারিনের প্রতি তার অত্যাশ্রয় প্রজ্ঞাই বিশেষ ভাবে মোহিত করল এলিজাবেথকে। ওখানকার অধিবাসিগণের দীক্ষা দান, বিবাহ ও কবর অনুষ্ঠান সম্পাদনের সাধু সংকল্পও মুগ্ধ করল তাকে।

—‘উনি নিশ্চয়ই এক জড়ত লোক হবেন?’ বললে সে—‘আমি ওকে ঠিক বুঝতেই পারছি না। ওর আচরণের দাস্তিকতা স্পষ্টকট। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় মাল্যনা চাইবার কি অর্থ থাকতে পারে? ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।’

—‘আমার তা মনে হয় না। সম্পূর্ণ বিপরীত একটি লোককে দেখতে পাব আশা করছি। আশ্চর্য্যভর ও চাটুকারিতার মিশ্রণ আছে চিঠিতে বা আশা প্রদ। আমি তাকে দেখবার জন্য অধীর হয়ে আছি।’

—‘পত্র-রচনার দিক থেকে বিচার করলে—’বললে মেয়ী—‘নিখুঁত হয়েছে চিঠি। শাস্তি প্রসঙ্গেও অভিনব কিছু নেই বটে কিন্তু অতি সূচকতার প্রকাশ হয়েছে।’

না পত্র-লেখক, না তার চিঠি কোনটিরই প্রতি লিডিয়া ও ক্যাথারিনের কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তবে কলিকের চিঠি তাদের মায়েদের দুর্ভাবনা অনেকখানি দূর করেছে। এমন একটা বিশেষ সৈন্যের সঙ্গে তিনি প্রজ্ঞা হতে লাগলেন যে, স্বামী ও কন্যার প্রত্যেকেই বিম্বিত হয়ে গেল।

ঠিক সময়েই মি: কলিক এসে উপস্থিত হলেন এবং প্রত্যেকে সৌজন্যের সহিত স্বাগতম জানাল। মি: বেনেট অবশ্য খুব কম কথা বললেন কিন্তু মেয়েরা কথা বলার জন্য তৈরীই ছিল। কলিকের যেমন কথা বলার উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না, তেমনি নিঃশব্দ থাকতেও ইচ্ছুক নন তিনি। ভারি চোখা—বয়স হবে প্রায় পঁচিশের কোঠায়। স্বভাবে গাভীর ও অভিজাত্য ধরা পড়ে—আবার আচরণ অতি সাদাসিধে। এতগুলি বিহুবিদী কন্যার জননী হিসেবে সে মিসেস বেনেটকে অভিনন্দন জানাল, বললে—‘এদের সৌন্দর্যের খ্যাতি অনেক আগেই শুনেছি—কিন্তু এখন চোখে দেখে বুঝলাম খ্যাতি রূপের অর্ধেকও নয়। স্বা-সময়ে এরা যে সুযোগ্য পাণ্ডে অর্পিত হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।’ তার এই স্তুতিবাদ শ্রোত্রীদের কান্নাই মনোযোগী হোল না কিন্তু মিসেস বেনেট যিনি প্রশংসার ভাল-মন্দ বিচার করেন না, পাণ্ডা উত্তর দিলেন তখন—‘অতি হৃদয়বান তুমি, কামনা করি সেই হৃদয়ের উদারতার পরিচয় বেন দিতে পার। না হলে আমার মেয়ে ক’টি একেবারে ভেসে যাবে। সব কিছুই এমন বিপ্লী বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গেছে।’

—‘আপনি বোধ হয় সম্পত্তির কথা বলছেন?’

—‘হ্যাঁ। হতভাগিনী মেয়েদের পক্ষে এটা অতি হৃৎকলক

ব্যাপার হয়েছে। অবশ্য এর জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। সবই ভাগ্যের লিখন।’

—‘সুন্দরী বোনদের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। এ বিষয়ে অনেক কথাই বলতে পারি। তবে ঠরংবাদিতা করে আগে থেকেই কিছু বলতে চাই না। তরুণী মহিলাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে আমি প্রস্তুত। এখন আর বেশী কিছু বলব না—পরে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে—’

খাবারের ডাক এসে পড়ায় আলোচনার বাধা পড়ল। মেয়েরা হাসি বিনিময় করল। কিন্তু দেখা গেল, তারাই একমাত্র কলিকের প্রশংসার পাত্র নয়, হল-ঘর, খাবার ঘর, আসবাব-পত্র সব কিছুই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হোল। তার এই প্রশংসা মিসেস্ বেনেটের অন্তঃস্থল স্পর্শ করতে যদি না কলিক সব কিছুই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পত্তি বলে প্রশংসা করছে—এই মর্মান্তিক চিন্তা তাতে ব্যাঘাত ঘটাত। রান্নারও বিশেষ প্রশংসা হোল। কলিক ভানতে চাইলে তার কোন সুন্দরী ভগ্নী এই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারিণী। কিন্তু এখানেই মিসেস্ বেনেট একটু কর্কশ স্বরেই ভুল শুধরিয়ে দিলেন এই বলে যে, রাঁধুনি রাখবার ক্ষমতা তাঁর আছে এবং মেয়েরা রান্না-ঘরের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। তাঁর মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে কলিক। মিসেস্ বেনেট নরম-গলায় বললেন বটে তিনি একটুও অসন্তুষ্ট হননি, তবুও পনের মিনিট ধরে এই ক্ষমা চাওয়ার পাগা চলল।

### চৌদ্দ

থেকে বসে মিঃ বেনেট আদৌ বাঁকাব্যয় করেননি, কিন্তু চাকর-বাকররা বিদায় হলে তিনি আলাপের সংকল্প করলেন এবং এমন এক বিষয়ের অবতারণা করলেন যা অতিথির মুখরোচক। কলিকের আশ্রয়দাতার মত লোক অনেক ভাগ্যে মেলে। তার স্বথ-সুবিধে কৃতি-অভিজ্ঞতার প্রতি লেডী ব্যাথারিনের মত মনোযোগ সত্যিই দুর্লভ। লেডী ব্যাথারিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললে সে, এমন সম্ভ্রান্ত মহিলার কাছ থেকে এমন অমায়িক ব্যবহার ভাবনে আর পায়নি সে কখনো। যে দু’টি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক বক্তৃতা সে দিয়েছে তাও তাঁর অনুমোদন লাভ করেছে—দু’বার তিনি তাকে রসিগে তাঁর গৃহে আহারেরও আমন্ত্রণ করেছেন। এই তো গত শনিবারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন একটি নাচের ব্যবস্থাপনায় উপদেশ নিতে। অনেকে লেডী ব্যাথারিনকে দান্তিক বলে, কিন্তু সে তাঁর মধ্যে অমায়িকতা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলা-মেলায় মাঝে মাঝে সন্তোষ-ভালের ছুটি নিয়ে আশ্রয়-স্বজনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতও বাধা দেন না তিনি। এমন কি, দেখে-শুনে কাউকে বির্য করতে দিতেও আপত্তি নেই তাঁর। একবার তিনি তার ‘পূর্ণ-বুসিরেও’ পদার্পণ করেছিলেন।

—‘এ তো অতি সৌজ্ঞাত্যের পরিচয়’—বললেন মিসেস্ বেনেট—‘বহিলাটি যে চমৎকার তাতে অমুত্রেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিচাপ এই যে, এদের মত লোক বিরল সংসারে। উনি কি কাছের থাকেন?’

—‘তাঁর বাড়ী রসিগ পার্ক আর আমার কুঁড়ের মধ্যে মাত্র একটি গলির ব্যবধান।’

—‘বিধবা হয়েছিলেন শুনেছি। সংসারে কে কে আছে তাঁর?’

—‘একটি মেয়ে—তাঁর বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।’

—‘তাহলে বহু মেয়ের চেয়েই ভাগ্যবতী সে। মেয়েটি কেমন? খুব সুন্দরী দেখতে?’

—‘খুবই মনোরমা মেয়েটি। লেডী ব্যাথারিন নিজে বলেন, সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে মেয়েদের মধ্যে সে রাণী। তার চেহারায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অজিজ্ঞাত্যেই পরিচায়ক। দুর্ভাগ্য বশতঃ বড়ই রুগ্না মেয়েটি—তাই সর্বশূলসম্মত হয়ে উঠতে পারেননি। তবে অতি মধুভাবী—প্রাচীরে নিজের ফটনে আমার ‘কুঁড়ের’ পাশ দিয়ে দয়া করে বান।’

মিঃ বেনেটের ধারণাই সত্য হোল—সত্যিই ভাইপোটি অতি বেকুব। তিনি খুব উৎসাহ দেখিয়ে অথচ অটল গাভীর বজায় রেখে তার কথা শুনে লাগলেন এবং মাঝে মাঝে অলঙ্কিতে এলিজাবোথের দিকে চেয়ে তার সায় নিতে লাগলেন।

চায়ের আসরের আগেই ওয়ুথ ধরেছিল। মিঃ বেনেট তাকে ডিরেক্টমে নিয়ে গেলেন এবং চা-পানের শেষে মেয়েদের কিছু পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। কলিকও সাগ্রহে রাজী হলেন। কিন্তু বই হাতে নিয়েই চমকে উঠল সে—আপত্তি জানাল যে, উপগ্রাস সে স্পর্শ করে না। কেউ অবাক হয়ে ক্যাল-ক্যাল করে তাকিয়ে রইল তার দিকে—লিডিয়া মুখে কি একটা শব্দ করে থেমে গেল। তার পর আরো অনেক বই নিয়ে আসা হোল—তা থেকে সে ফন্ডাইসের ‘ধর্মোপদেশ’খানা বেছে নিল। বইটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই হিডিয়া হাই তুলতে লাগল এবং ক্রান্তিকর শব্দে পড়া হতে-না-হতেই সে বাধা দিয়ে বলল—‘শুনেছ মা, ফিলিপ মেসো হিচার্ডকে তাড়িয়ে দেবেন। আর তাহলেই বর্ণেল স্বর্গার তাকে নিয়ে নেবেন। শনিবার মাসিমা নিজে আমায় বলেছেন। কাল মেরিটনে গিয়ে আরো খবর শুনে আসব। ডেনী কবে সহর থেকে ফিরবে তাও শুনে আসব।’

লিডিয়াকে দু’বোন চূপ করে থাকতে বললে কিন্তু কলিক অত্যন্ত আহত হয়ে বই বন্ধ করে রাখলে—‘আমি প্রায়ই লক্ষ্য করে দেখছি, অনবয়সী মেয়েদের সত্বপালনের বইতে ভরা অনিচ্ছা। আশ্চর্য লাগে আমার, অথচ এই বয়সেই ওদের শিক্ষার দরকার বেশী। অবশ্য আমি আর বোনটিকে বিরক্ত করতে চাই নে।’

—‘তার চেয়ে বরং দাবায় বসা থাক’—বলল সে মিঃ বেনেটকে। মিঃ বেনেটও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। নিজেদের তুচ্ছ আনন্দ নিয়ে মত্ত থাকতে দেওয়াই ভাল মেয়েদের, এই মত পিতার। সুতরাং তারা তাই থাক। লিডিয়ার বাধা দেওয়ার জন্য মিসেস্ বেনেটও অল্প মেয়েরা ক্ষমা চাইলে এবং আবার পড়া আরম্ভ করতে অনুরোধ করলে কলিককে। এমন ঘটনার আর বাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তারও প্রতিশ্রুতি দিলে সবাই, কিন্তু কলিক বললে—‘কমবয়সী তার এই বোনদের কাকুর প্রতিই তার কোন অভিযোগ নেই।’ এই বলে সে মিঃ বেনেটের সঙ্গে আর এক টেবিলে বসে দাবা খেলার উত্তোগে মন দিলে।

## পনের

কলিঙ্গ নিজে কিছু জানেও নয় ; সামাজিকতা বা শিক্ষায় তার বুদ্ধিও ধারালো হতে পারেনি। তার জীবনের স্রেষ্ঠতম অংশই কেটেছে এক নিরঙ্কর ও রূপগণিতার বঠোর শাসনে, যে শাসনে তার মনে হীনমত্ততার শিকড় গেড়ে বসেছিল। এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে দুর্বল মস্তিষ্কের অসমিকার-বোধ এবং জনসমাজ হাতে নির্দাসিত জীবন যাপনের ফলে হঠাৎ বড় লোক হওয়ার দুরাশা। ছায়াফাঁড়ির পান্ডুর পদশূন্য হলে ভাগ্য কুশায় সে লেডী ক্যাথারিনের স্নানক্ষেত্রে পড়ে। তাঁর পদমবদার প্রতি ভক্তি, নম্রতা এবং তাঁর অমুগ্রভাজন হওয়ার নিজেকে ধন্ত জ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ ও পান্ডা হিসেবে অপ্রতিহত ক্ষমতা-বোধ—এই সব কিছু মিলে অসমিকা ও গোদামদপ্রিয়তা, আত্মসম্মতি আর হীনমত্ততার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ পরিণত করেছে তাকে।

এখন একটি ভাল বাড়ী ও পর্যাপ্ত উপার্জনের ব্যবস্থা হওয়ার বিষয়ে ইচ্ছে হয়েছে কলিঙ্গের। লংবর্ণ-পরিবারের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলার উদ্দেশ্য—এই পরিবারের মেয়েদের মাজিত-কৃতি ও সৌন্দর্যের প্যাতি শুনে নিজের চোখে-কানে তা প্রত্যক্ষ করে এদের এক জনকে পত্নী হিসেবে মনোনয়ন করা। বাপকে সম্পত্তির অধিকার ভোগ করতে দেওয়াই হোল তার ক্ষতিপূরণ বা প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তন। মতলবটি তার খুব মনোমত হয়েছে এবং তার স্তরফ থেকে নিঃসার্পণতা ও মহানুভবতার চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করে সে।

মেয়েগুলোকে চাক্ষুস দেখার পর আর মত বদলানোর কারণ ঘটল না। জেনের স্নানর মুগ্ধী মনে রাং খরাল কলিঙ্গের এবং বড় থেকেই সুরু করা উচিত এই নীতির সার মর্ম উপলব্ধি করলে সে। প্রথম সন্ধ্যাতেই তার পছন্দ চূড়ান্ত হয়ে গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার পছন্দের একটু অদল-বদল করতে হোল। প্রাতরাশের পূর্বে মিসেস্ বেনেটের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে লংবর্ণে পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে বলায় মিসেস্ বেনেট শ্রিত হাত্রে জেন সম্বন্ধে একটু সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করলেন—‘ছোট মেয়েদের সম্বন্ধে এখনো কিছু স্থির করা হয়নি,—তবে বড় মেয়েটির সম্বন্ধে এ কথা জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে শীগগিরই অল্প কাকুর বাগদত্তা হতে যাচ্ছে।’

সে ক্ষেত্রে কলিঙ্গের পছন্দ জেন থেকে এলিজাবেথে নামাতে হোল। মিসেস্ বেনেট যখন আগুন উজ্জ্বল দিচ্ছিলেন তখনই শুভ লগ্ন বুকে কলিঙ্গ প্রস্তাব পেশ করল। বয়সে ও সৌন্দর্যে এলিজাবেথ ঠিক জেনের পরই।

মিসেস্ বেনেট এ ইংগিত যত্নের সঙ্গে মনের মণিকোঠায় জমা করে রাখলেন। অন্ততঃ তাঁর ছুটি মেয়ের বিয়ে এক রকম পাকা হয়ে গেল। কালকে যে মহামুখের নামোচ্চারণ পর্বন্ত তিনি সহ করতে পারছিলেন না, আজ তাকে কত ভাল লাগছে।

মেরিটোনে হেঁটে যাওয়ার কথা লিডিয়া ভোলেনি—একমাত্র মেরী ছাড়া সবাই তার সঙ্গে যেতে সম্মত হোল। মিঃ বেনেটের অমরোষে কলিঙ্গও তাদের সহযাত্রী হোল। তার কবল থেকে রেহাই পেতে উদ্গ্রাব হয়ে উঠেছিলেন মিঃ বেনেট—তাহলে তিনি লাইব্রেরীতে নিজের পড়া নিয়ে বসতে পারেন। প্রাতরাশের পর কলিঙ্গ সেই যে বিবাত তালিকা হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে হ্যান্সফোর্ডে

তার বাড়ী ও বাগান নিয়ে এমন গল্প জুড়ে দিগেছিল যে, তার তার বিবর্তিত ছিল না। লাইব্রেরী-ঘরটি মিঃ বেনেটের বিভ্রাম ও শান্তির নিভৃত নিলয়। অল্প কোন কক্ষে বাজে বকনি ও আত্মপ্রাণের গল্প শোনা বরদাস্ত করতে পারেন তিনি—কিন্তু এই ঘরটিকে তিনি সব থেকে মুক্ত রাখতে চান। কাজেই কলিঙ্গের সঙ্গে কলিঙ্গকে বেড়াতে যেতে অমরোষ করার সুযোগ নিতে কলিঙ্গ করলেন না তিনি। কলিঙ্গ পড়ার চেয়ে ইটাই পছন্দ করে, মেয়েদের সঙ্গে যেতে পারায় খুশীই হোল সে।

কলিঙ্গের বড়-বড় কথা আর মেয়েদের ভক্ততানুচক মাথা নাড়ায় মেরিটোনে পৌছানোর সময় কেটে গেল। সেখানে পৌঁছে ছোট বোনরা আর তার দিকে একটু নজর দিলে না। দোকানে দোকানে সাজান মেয়েদের মাথার টুপি ভাল ভাল মসলিনে তাদের দৃষ্টি নেচে বেড়াতে লাগল। কিন্তু রাস্তার উল্টো পথ দিয়ে ভক্ত-দর্শন সুরাস্তি এক যুবককে এক জন অক্ষিসারের সঙ্গে যেতে দেখে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হোল। যুবকটিকে আর কেউ দেখেনি এবং পূর্বে। অক্ষিসারটি হোল ডেনী, যার লগুন থেকে ফেরার কথা জানতে এসেছে লিডিয়া। যেতে যেতে নমস্কার করল সে। অপরিচিতের চাল-চলন বিমুগ্ধ করল সবাইকে—কে হতে পারে এই লোকটি, ভাবতে লাগল তারা? কেটি আর লিডিয়া অক্ষিসারটির পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে রাস্তার অপর পারে গেল সেমিককার দোকান থেকে কিছু কেনার ভান করে। ফুটপাথে পা দেওয়ামাত্রই তারা দু’জনে কিছু ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হোল। ডেনী সোজামুজি পরিচয় করিয়ে দিলে বন্ধুকে তাদের সঙ্গে। বন্ধুটির নাম উইকহাম—কালকে সতর থেকে একসঙ্গে এসেছে এবং এখানকার সৈন্তদলে যোগ দিয়েছেন। এই রকমই হওয়া উচিত। চেহারাটাকে আরো সুদর্শন করার উদ্দেশ্যেই সৈন্তদলে যোগ দিয়েছেন উইকহাম। সৌন্দর্যের সব কিছুই ছিল তাঁর দেহে—সুচারু মুখাবয়ব, সঠিক দেহ-গঠন, বাচনভঙ্গীতেও রমণীয়তা। পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল অকুচিত অকপট আলাপ তারা সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে সহজ ভাবে কথা বলতে লাগল এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে তারা ফিরে দেখল ডার্সি ও বিংলে ঘোড়ায় চেপে আসছে। মেয়েদের চিনতে পেয়ে তারা সোজা এগিয়ে এল তাদের দিকে। সুরু হয়ে গেল সৌভাদান-প্রদান। বিংলেই প্রধান বক্তা এবং এলিজাবেথই মম কেন্দ্র। লংবর্ণে যাচ্ছিল তারা এলিজাবেথের খোঁজে। ডার্সি ছোট নমস্কার করে সাই দিল তার কথায় এবং মনে মনে স্থির করে ফেলল যে, কিছুতেই তাকে বা না এলিজাবেথের দিকে। হঠাৎ অপরিচিতের উপর তাদেরও নজর পড়ল এবং এলিজাবেথ লক্ষ করল—পথম বিষয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল দু’জনে। দু’জনেরই মুখে রাং দু’রকম হয়ে গেল—এক জনের শাদা আর এক জনের রক্তিম কয়েক মুহূর্ত পরে উইকহাম টুপি খুলল—ডার্সিও প্রান্তি-নমস্কার করলে। এ সকলের অর্থ কিছুই বুঝলে না তারা।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিংলে বন্ধুর কাছে বিদায় নিলে—যা চা গেলে, কিছুই যেন লক্ষ্য করেনি তারা।

মিঃ ডেনী আর উইকহাম মেয়েদের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পথ এলেন। কিন্তু লিডিয়ার একান্ত অমরোষ—এমন কি মিঃ

ক্লিপস্ বৈঠকখানার গবাক উগুজ করে সাদর আহ্বান জানান :  
স্বপ্নে তারা নমস্কার করে বিদায় নিল।

মিসেস্ ক্লিপস্ বোনবাদের দেখে খুশীই হলেন—অশ্রুধার পর  
৫ ছ'জনকে দেখে আরো আনন্দ প্রকাশ করলেন। জেন নতুন  
তথ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে, তাকে মহা সমাদরে আহ্বান  
নালেন—কলিঙ্গও ততোধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রতিনিমস্কার করে,  
দুর্দ-পরিচয় না থাকে সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে আসার চেষ্টা চাইলে।  
হানদের সম্পর্কে তাকেও এতখানি সমাদর করার নিজেই কৃতজ্ঞ  
ন করছে সে। মিসেস্ ক্লিপস্ও তার কথার মাধুর্যে একেবারে  
হাসিত হয়ে গেলেন। অপরিচিত আগন্তুক উইকহামের কথা  
জানতে তিনি মেয়েদের জানালেন যে, ডেনীর সঙ্গে সন্ত সে এসেছে  
ওন থেকে—অচিরেই সামরিক কমিশন পাবে। আগামী কাল  
তে কয়েক জন অফিসারের এখানে খাওয়ার কথা আছে—মেয়েরা

বদি আসে উইকহামকেও নিমন্ত্রণ করতে বলবেন তিনি দামীকে।  
সকলেই রাজী হয়ে গেল এ প্রস্তাবে।

বাড়ী ফেরার পথে এলিভাবেথ জেনকে বলল ডার্সি ও  
উইকহামের মধ্যে যা সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কোনই হৃদিস করতে  
পারলে না তারা এই বিষয়কর আচরণের।

কলিঙ্গ বাড়ী ফিরে ক্লিপস্-গিল্লীর উচ্চ প্রশংসা করতে লাগল  
মিসেস্ বেনেটের কাছে। একমাত্র লেডী ক্যাথারিন ও তাঁর মেয়ে  
ছাড়া এমন মাজিত-কৃচি মহিলা সে আর দেখেনি কখনো জীবনে।  
অশেষ সৌজন্তের সহিত তিনি সমাদর করেছেন তাকে—এমন কি,  
আগামী কাল সন্ধ্যায় সেখানে আহ্বানেরও নিমন্ত্রণ করেছেন। অথচ  
আগে তার সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। চমক এ-বাড়ীর সম্পর্কের  
মতই সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তবুও এমন আদর-আপ্যায়ন মেলেনি  
কখনো জীবনে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও অরুণকুমার ভাদুরী

## বহু-বিহঙ্গম

(বিড়তি বঙ্গো)

শ্রীকরণায় বসু

শরতের শেষ সপ্ত :

স্বপ্নবয়ী আকাশের গগন বিহ্যতের ক্ষণনিস্তি,

দেখলাম নক্ষত্রগতি আকাশে একটি স্তম্ভসং ডানা বিস্তার করেছে।

কতো দূর-দেশান্তর থেকে উড়ে আসছে সে,

কতো জন্মান্তর পার হয়ে,

হয়তো মঙ্গল গ্রহের লাল অরণ্য-বীথিকাছায়ায় ;

ওই দ্ব্যতম নক্ষত্রলোকের উপর দিগে

অশ্রান্ত অপরায়ে ডানার উদ্ভূত গতি তার।

নিচের এই পৃথিবীলোক তার কাছে অস্পষ্ট বিস্ম হয়ে গেছে,

অসমতল পার্বত্যপথ,

খন শাল মহড়া বনের বিস্তার,—

যার ভিতর দিয়ে বারবার সে যাওয়া-আসা করেছে ;

খন বাঙ্গালোকে স্মৃষ্ণ শৈলচূড়া, শুক্ক অরণ্যানী

নীলাঞ্জন রেখার দূরে, আরো দূরে বীরে বীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল।

কতো কোটাল পূর্ণিমায় হুঁহু করে উঠেছে ক্যাপা হাওয়ার কলক ;

কতো ডালপালা ভিতর দিয়ে কী অশ্রান্ত মর্মরাশি !

সে শুনেছে আরণ্য বাণী তার,

যে বাণী শাখত, যে বাণী চিরন্তন রসে চির চিহ্নিত,

যে বাণী পুষ্পবীথিকার, যে বাণী ভালাবাসার,

যে বাণী অশ্রু-হাসির দোলনায় চির দৌড়ল,

সে আতরণ করেছে এটি অসুত রস।

বহু বিহঙ্গমের আজ যাত্রা শেষ :

সে চলেছে কোন ধ্রুবতীর্থলোকে,

মানস সরোবরের উপর দিয়ে যে তীর্থপথ

চলে যায় সুদূর অমরাবতীর উদ্দেশে,—

সেই পথে শোনা যায় উচ্চৈশ্বর্য পক্ষধ্বনি তার।

যাবার বেলায় রক্ত মেঘে ছবি এঁকে দিয়ে যায়,

বহু কুসুমের বেশরে বেশরে মধু মোটাকের স্বপ্ন জাগায় ;

চঞ্চল বাতাসে তার যাওয়া-আসার জলের আলনা দাগ

এক মুহূর্তেই উড়ে যায় ;

রেখে যায় অদ্ভুত আবশেষ ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন-মন্দির বিহ্বলতা,

মুহূর্তের বর্ণ চিত্রে অনন্তের রক্তচিহ্ন।

সহস্র বৎসর পার হয়ে চলে থাক,

তবু বেঁচে থাক স্মৃষ্ণ-স্মৃষ্ণের এই বিচিত্র মহাকাব্য ;—

বেঁচে থাক অগুর একবিন্দু অজ্ঞান ;

মাছুবের কাছে কবি হয়তো এই প্রার্থনাই রেখে গেল।



## আণবিক গবেষণায় আমেরিকা

শ্রীঅমলেন্দু সেন

আজ থেকে এগার বছর আগে, ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, পরমাণুকে চূর্ণ করলে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়, তা কয়লা পেট্রোল বিদ্যুৎ অথবা ডিনামাইটের শক্তির চেয়েও অনেক সহস্র গুণ বেশী। সেই থেকে এ বিষয়ে অল্পান্ত্র গবেষণা করা হয়ে আসছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে আজ এ বিষয়ে কাজ চলছে দেশজুড়ে-ছড়ানো ব্যাবশ্যের বেশী প্রতিষ্ঠানে। এর মধ্যে আছে কলেজের ছোট-ছোট ল্যাবরেটরী থেকে শুরু করে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অসাধারণ কারখানা পর্যন্ত। এই কাজে আমেরিকা আজ পর্যন্ত ৩৫০ কোটি ডলার খরচ করেছে (আজকালকার হিসাবে এক ডলার আমাদের চার টাকা বাতোর অনানুর সমান। ১৯৪৬ সন থেকে বছরে গড়ে ৫০ কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে এর পিছনে। হাজার-হাজার লোক খাটেছে এই কাজে। এদের কাজ হল যুদ্ধান্ত্র নির্মাণ, তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন এবং পরমাণু-ভাঙা শক্তিকে শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান-ঘটিত কি কি কাজে লাগান যেতে পারে, তার গবেষণা করা।

এ ব্যাপারে কর্তৃত্ব করেন একটি সরকারী দপ্তর,—অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (সংক্ষেপে এ-ই-সি)। ১৯৪৭ সনের গোড়াতেই এঁরা সামরিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে পরমাণু-শক্তিসংক্রান্ত সকল কাজের ভার নিয়ে নেন, এবং সমস্ত জিনিষটাকে টেলে সাঙতে শুরু করেন। এক গৃহনির্মাণের কাজেই এঁরা খরচ করেছেন ৭০ কোটি ডলার। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুড়িটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা দিয়ে, তার কোন-কোনটিতে ১৫০০০ পর্যন্ত লোক কাজ করে। এ-ই-সি নিজেরা কোনও গবেষণা করেন না, বেশীর ভাগ কাজই করান বেসরকারী কল-কারখানা এবং কলেজ ল্যাবরেটরী ইত্যাদির সঙ্গে চুক্তিতে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ বড়-বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। ক্যান্সার রোগে, খাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তির ক্রিয়া পরীক্ষা করান হচ্ছে অনেকগুলি হাসপাতালে। এর জন্ত প্রায় ১০০ রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর ১৫০ রকম তেজস্ক্রিয় পদার্থ-ঘটিত দ্রব্য নিয়মিত ভাবে উৎপাদন করে বিতরণ করা হচ্ছে শত শত গবেষণাগার থেকে। গবেষণার উদ্দেশ্যে আমেরিকার বাইরে ২২টি দেশেও তা পাঠান হচ্ছে।

এই যে পরমাণু নিয়ে গবেষণার কাজ, এর এক-এক অংশ চালান হয় এক-এক জায়গায়। ইলিনয় প্রদেশের আর্গোন সহরে ৮৮ জন গবেষণাগারটি এ-ই-সি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার পরিচালনা

করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। এ কাজে সাহায্য করেন অন্যান্য ৩০টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিশেষ করে অণুগুলিকে বিভিন্ন করার এবং পরমাণুগুলিকে চূর্ণ করার আধুনিকতম সব যন্ত্রপাতি। আর আছে একটি বাগান, সেখানকার সমস্ত গাছ, ফল আর পাতার তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগ করে নানা রকম পরীক্ষা চালান হচ্ছে। উদ্ভিদ এবং ইতর জীবের দেহের উপরে এই ফল ইত্যাদির ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে শক্তিশালী নানা রকম ঔষধ তৈয়ারী করা হয়ে থাকে এখানে। নিউ ইয়র্কের কাছে একহাভেন-এর বীক্ষণাগারেও আদ্যপালের সব বিশ্ববিদ্যালয় সহায়তা করেন। এখানে পরমাণু চূর্ণ করার জন্ত একটি ৩০০ কোটি ডোল্ট-শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র স্থাপিত হচ্ছে। টেনেসী প্রদেশের ওক-রিজ-এর গবেষণাগারে প্রধানতঃ করা হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন এবং সে-বিষয়ে গবেষণা। এর প্রধান বাড়ীটি না কি এক মাইল লম্বা আর তিনশো হাত চওড়া। এর দু'তাল্লার বিঘা হাতার মধ্যে আরও ৭০টি বাড়ীতেও কাজ চলছে, তাতে কাজ করছেন ৪৭০০ জন কর্মী। এ ছাড়াও আছে নিউ মেক্সিকো প্রদেশের লস্‌আলামোস সহরের নারগান্স সম্পর্কিত গবেষণাগার; আইওওয়া প্রদেশে আমেস সহরে ধাতুতত্ত্বসংক্রান্ত গবেষণাগার; ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে সহরের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজস্ক্রিয়করণ সম্পর্কিত গবেষণাগার; নিউ ইয়র্কের রচেষ্টার-এর বীক্ষণাগার, যেখানে চিকিৎসা ব্যাপারে ও জীববিজ্ঞান পরমাণু ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ চলছে।

বলিও অসামরিক উদ্দেশ্যে পরমাণু-শক্তিকে নিয়োগ করার পথও খুঁজছেন এ-ই সির বৈজ্ঞানিকেরা, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার অধিকাংশই ব্যর্থিত হচ্ছে যুদ্ধের জন্ত মারণাস্ত্র নির্মাণেরই কাজে। এটা অংশে পরিতাপের বিষয়, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্ত কোনও উপযুক্ত রকমের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হচ্ছে না বলেই আণবিক গবেষণাকে এই পথ নিতে হয়েছে। ফলে, আগের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৮ সনের মে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে এনিওয়েটক নামক প্রবাল-বলয়ে যে তিনটি উন্নত ধরনের অ্যাটম-বোমা পরীক্ষিত হয়, তার তুলনায় হিরোশিমা নাগাসাকিতে ব্যবহৃত অ্যাটম-বোমা না কি নিতান্তই একটি প্রাথমিক আবিষ্কার মাত্র।

এই অ্যাটম-বোমার নানা অংশ আমেরিকার নানা জায়গায় তৈয়ারী হয়ে হিসাব মত নির্দিষ্ট সময়ে একটা কেন্দ্রীয় কারখানা এসে অল্পটাকে চরম রূপ দেওয়া হয়। কি নতুনায় সেটা হতে ঠিক করে দেওয়া হয় লস্‌আলামোস গবেষণাগার থেকে নিউ মেক্সিকোর এক জনবিরল প্রান্তে ৭৫০০ ফিট উঁচু এ পাঠাডের মাধ্যমে প্রায় ১১ বর্গ-মাইল জায়গা জুড়ে এই গবেষণাগার অবস্থিত। এর কাছাকাছি এক মরুভূমি, সেখানেই ১৯৪৫ সালে জুলাই মাসে প্রথম অ্যাটম-বোমা ফাটিয়ে তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছিল। আলবুকার্ক বলে একটা জায়গায় একটি শাখা-গবেষণাগার আছে। এই দু'জায়গায় মিলিয়ে ক করেন ৩০০০ কর্মী, তাঁদের অর্ধেকই বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রশিল্পী।

সব পদার্থের পরমাণুকে তো ভাঙা যায় না। ভাঙবার পরমাণু পাওয়া যায় প্রধানতঃ দু'টি ধাতু থেকে,—প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম। প্রথমটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়

এই বিপুল প্রচেষ্টার সবটাই যদি মানব-কল্যাণে নিয়োজিত  
করা যেত তাহলে কি না হতে পারত ? কিন্তু তা বোধ হয়  
হবার নয় ।

જાધના મિત્ર

হাইড্রোজেন গ্যাসের আণবিক ওজন অল্প সমস্ত পদার্থের থেকে হালকা। সুতরাং এটোনেট একক ধরা হয়েছে মান-নির্ণয়ের (standardisation) সুবিধার খাতিরে। আচ্ছা, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ক্যাথোড যে হতে উদ্ধৃত কণিকাগুলো আমাদের এ-পর্যন্ত জানা সব থেকে হালকা। গ্যাস হাইড্রোজেনের একটা পরমাণু ততো অনেক অনেক বেশী হালকা, যেহেতু, এই কণিকার আয়তন হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর ততো ভাগ। এগুলোকেই ইলেকট্রোন বলা হয় আর যে-কোনো পদার্থ হতেই এদের পাওয়া সম্ভব বটে। ধরে নেওয়া হয়েছে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থের সাধারণ উপাদান হচ্ছে এই ইলেকট্রোন। এরা যে ধাতাত্মক ধর্মবিশিষ্ট তা আগেই বলেছি। কিন্তু যেহেতু পদার্থের সাধারণ ভাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ (Electro-Neutral) সুতরাং এই ইলেকট্রোনের নিশ্চয়ই কোনো ধনাত্মক (Positive) অংশ আছে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এই ধনাত্মক অংশের অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে যার নাম 'প্রোটন'। এই প্রোটন কিন্তু ইলেকট্রোনের মতো অত ছোট নয়, এর আয়তন একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সম-আয়তনবিশিষ্ট। প্রোটনই যে সব শেষ অংশ তা নয়, কিন্তু এটাও আবার দু'টো এককে বিভক্ত—নিউট্রন আর প্রজিট্রন। প্রজিট্রন ইলেকট্রোনের সমান আয়তনের আর একক ধনাত্মক তড়িৎশক্তি বহনকারী। নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ আর একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর সম-আয়তনসম্পন্ন। এক-একটা পরমাণু ঠিক যেন একটি কচি সৌর-জগৎ। নিউক্লিয়াসরূপ সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরূপ ইলেকট্রোনগুলো বিভিন্ন বক্ষে প্রাক্ষিপ্ত করতে থাকে। পরমাণুর ঠিক কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের অবস্থিতি—নিউক্লিয়াস বিশেষ



হাতী-ঘোড়া কিছুই নয়—প্রোটন আর ইলেকট্রোনে ঠাসা একটি মাত্র বস্তু। ধনাত্মক তড়িৎবহনকারী!

উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে উকাও নামক এক জন জাপানী পরাধীনবিজ্ঞানবিদ একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধে নিউট্রন এবং প্রোটনের পারমাণবিক আকর্ষণের বিষয়ে একটা তথ্য জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতামতানুযায়ী অ্যাটমকে একত্র করে রাখে যে শক্তিসমূহ, তাদের পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা চলে যদি ইলেকট্রোনের সমতড়িৎগুণ কিছু বৃহদাকার আয়তনবিশিষ্ট কোনো নতুন কণিকাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

পরবর্তী কালে ‘কসমিক রে’ সম্বন্ধীয় গবেষণাতে এই নতুন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এই নতুন কণিকার নামট হচ্ছে ‘মেসন্’ অথবা মেসোট্রোন।

‘কসমিক রে’ জিনিষটা আর কিছুই নয়—তীব্র ভেদনক্ষম শক্তি বিকীরণের এক নমুনা মাত্র। খুব বেশী বীজিত তড়িৎ চৌম্বক (electro-magnetic) বিকীর্ণ শক্তির মিশ্রণ এই ‘কসমিক রে’। নানা রকম—যেমন কোনো তড়িৎসম্পন্ন বস্তুকে বাতাস কিংবা বাতাস-পূর্ণ স্থান (Vacuum) স্থাপন করে তার ক্রমবিকীরণ লক্ষ্য করা ইত্যাদি প্রকারের পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, এই অজানিতপূর্ণ বিকীরণের উৎস পৃথিবীর মধ্যে কোথাও নেই, পৃথিবীর বর্তমানমণ্ডলের বাইরে আছে।

উনিশশো সালে প্রাক্ক কোনো উত্তম বস্তু হতে তাপবিকীরণ-জনিত স্পেকট্রামের বিভিন্ন অংশে শক্তি বিতরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটা বড়ো আবিষ্কার করেন এবং এই নবাবিষ্কৃত অমূল্যজ্ঞানের নাম দেন ‘পরিমাণ তত্ত্ব’ (Quantum theory)। তিনি বলেন যে, যখন কোনো পরমাণু শক্তি বিকীরণ কিংবা শোষণ করে, তখন এক-এক বারে এক বাস্তবের মতো নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি বিকীরণ কিংবা শোষণ করে। এই রকম প্রত্যেক বাস্তব বা প্যাকেট পরিমাণ শক্তিকে কোয়ান্টাম বলে।

আইনষ্টাইন উনিশশো পাঁচ সালে এই তথ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান আরো বিস্তৃত করেছেন। তাঁর মতামতানুযায়ী কোনো উৎস হতে বিকীর্ণ শক্তি তরঙ্গাকারে বহির্গত হয় না, বরং বুলেটের মতো নিক্ষিপ্ত হয়

তা হতে। আলোর শোষণ, বিকীরণের খিঙরী হতে কোয়ান্টাম খিঙরীর প্রভেদ হচ্ছে এই যে, আলোর ও-দুটো ধর্মই অব্যাহত কিন্তু তড়িৎশক্তি সবিরাম ও প্যাকেটাকারে বার হয়। শক্তির এই প্যাকেটগুলোকে বলা হয় ‘ফোটন’।

‘কসমিক রে’ অথবা জাগতিক রশ্মি দুটো উপাদানে গঠিত—একটা নরম, আরেকটা শক্ত। নরম উপাদান ইলেকট্রোন, পজিট্রোন আর ফোটন দিয়ে গড়া। এই তিনটে জিনিষেরই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছি আগেই যে, এরা কী কী। “Bethe-Heitler” theory—‘কসমিক রে’ সম্বন্ধীয়—সুধু নরম উপাদানগুলোতেই পাটে, শক্তগুলোর বেলাতে নয়। ‘কসমিক রে’র ভেদনক্ষম উপাদান হচ্ছে নতুন ভারী কণিকাগুলো—মেসোট্রোন অথবা মেসন। মেসোট্রোনের আয়তন খুব বেশী—প্রায় এক-একটা ইলেকট্রোনের দু’শো গুণ। এত বেশী আয়তন যে, বিকীরণজনিত তড়িৎ-শক্তির ক্ষয় গুরুত্বের মধ্যেই নয় এর। সম্ভবতঃ মেসন্ স্থিতিশীল নয়। উকাও আর ভাবা দু’জনেই বলেছেন যে, অল্প কোনো কণিকার উপস্থিতি ব্যতীতই মেসোট্রোন মৌলিক অংশ সমূহে বিশ্লিষ্ট হতে পারে। একটা বিশেষ মাত্রার শক্তির কম মেসোট্রোন প্রাপ্য দেখা যায়নি, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই মাত্রাটি অর্থাৎ  $2 \times 10^7$  ই, ভিন্ন নীচে পৌঁছলেই মেসোট্রোন বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। মেসোট্রোন যে ইলেকট্রোনে বিশ্লিষ্ট হয় এসম্বন্ধে ১৯৪০ সালে উইলিয়ামস্ বেষ ভালো একটা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন।

পাখি বা জাগতিক রশ্মিতে মেসোট্রোনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বললাম, এবারে দেখা যাক এর উৎপত্তি সম্বন্ধে। তিনটি সম্পূর্ণ ক্রিয়ায় এর উৎপত্তি সম্ভব :

১। প্রাথমিক—ফোটন, নিউট্রন :

২। মাধ্যমিক—নিউট্রন ফলতঃ মেসন্ এবং প্রোটনে পরিণত অবস্থা :

৩। সমাপ্তি স্তর—স্বাধীন মেসোট্রোন।

দেখা যায় যে, নিউট্রনটো প্রথমে নির্ভরযোগ্য গঠিত কণিকা দ্বারা শোষিত হয়, তার পরে সেটাই পরিবর্তিত হয়ে মেসন্ উৎপন্ন করে। মেসন্ বিজ্ঞান-জগতের নবতম আবিষ্কার এবং এখনো পর্যন্ত এর অনেক রহস্যই তাই অজানা।

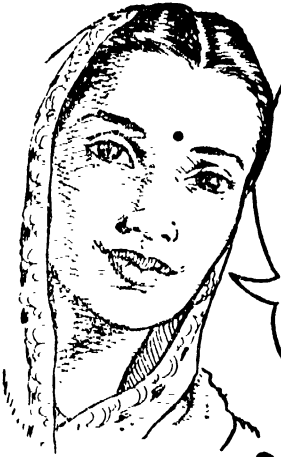
### হেলেন কেলারের একমাত্র ইচ্ছা

বিহুই হেলেন কেলার। এই জন্মদ্য এবং জন্ম-বধির মহিলাটি একটি বিশিষ্ট আসরে আমন্ত্রিত হন তাঁর বক্তব্য জানাতে। তিনি অনেক কষ্টে জড়িত হয়ে তাঁর ভাষণ দিলেন। এমন সময় প্রধান বক্তাকে সমবেত অধিষ্ঠিতা বললেন যে, হেলেন কেলারকে যদি তাঁর যে কোন একটি ইচ্ছাকে জানাতে বলা হয়, তা হ’লে তিনি কি জানাবেন?

প্রশ্ন বলার পর অধিষ্ঠিতা উত্তরের আশার অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কেউ মনে করলেন যে, এই প্রতিভাশালী রমণী নিশ্চয়ই বলবেন যে, তিনি যাতে স্পষ্ট বাকুশক্তি পান; কেউ

মনে করলেন যে, চোখের লুপ্তদৃষ্টি তিনি যাতে ফিরে পান। আবার কেউ মনে করলেন তিনি যাতে শ্রবণশক্তি লাভ করেন, সেই ইচ্ছাই জানাবেন। বাই হোক, প্রতিজ্ঞা-কাতর অধিষ্ঠিতা বসে থাকেন শুধু-বিশ্বয়ে হেলেনের উত্তরের আশায়।

এমন সময় হেলেন কেলার অতি কষ্টে বললেন,—“আমাকে যদি আমার একটি মাত্র হনোবাক্ষা জানাতে অনুমতি দেয়া হয়, তা হ’লে আমি বলবো, সমগ্র পৃথিবীতে যেন শান্তি ফিরে আসে। এই আমার একমাত্র ইচ্ছা।”



# জীবাণু-সংক্রমণ কাকে বলে ডাক্তারবাবু ?

তরুণী বধূটি জিজ্ঞাসা করলেন—



## ডাক্তার তখন জীবাণু-সংক্রমণের

খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন : আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে রোগবাহী জীবাণু এই ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে বিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রথম থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই বিক্রিয়া ত্বরক্বে হয়ে যায় ও সারা শরীরের রক্ত বিধাক্ত হয়ে ওঠে। রোগবাহী জীবাণুগুলি আকারে এত ক্ষোট হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। এই দেখুন, একজন রোগী জীবাণুর চেহারা — স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো করে এই প্রকল্প দেখা যায়।



কেটে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন :

চান উঠে পোনো, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আশ্রয়দাতার সর্বপ্রথম উপায়।



চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়—'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে :



সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার খায়ের যন্ত্রণা কমে ও যা শুকিয়ে যায়।

মাথার চুলকানিতে :

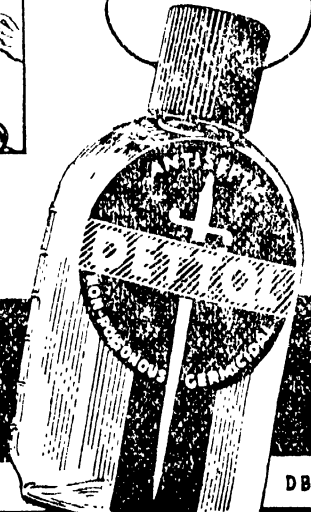
মাথার চুলকানি ভয়ানক জোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথা টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।



এই পুস্তিকাটির জন্য লিখুন—বিনামূল্যে পাবেন :

'ডেটল' এর কথা মনে রাখুন অবশ্য — এজন্য মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষা এর তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মহার্ণ হার্মিন ফর উটমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্য লিখুন।

'ডেটল'  
জীবাণুর  
হাত থেকে  
মুক্ত রাখে এবং  
সংক্রমণের  
বিপদ হটতে  
দেয় না



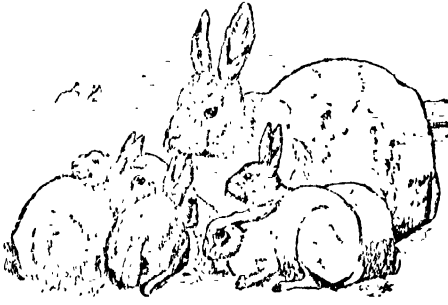
# 'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলাটিস (ইন্স) লিমিটেড, পো: বক্স ৬৬৪, কলিকাতা

DBI-4

# ছোঁটদের আসর



## পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি

শ্রীরঞ্জিতাশ্রম মণ্ডল

১৮ কালক্রমে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির তিরোধান দিবস। তাঁর জীবনের পূর্ণ চিত্রিত্ব আত্মপ্রকাশিত হয়নি। কোন কোন পুস্তকে তাঁর উল্লেখ পাঠ্য মাত্র। তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। তিনি চর্কেত যবনিকার অন্তরালে সারিয়ে যাচ্ছেন। সত্যি বারালী বড় আত্মবিশ্বস্ত জাতি। রাণীর নারীশলভ কর্মজীবন ছিল অন্তঃপুরে। তাঁর বশগোবর গৃহের প্রাচীর ভেদ করে সাধারণের কাছে কঠিন পৌঁছাত। উপরন্তু যুগদেবতা পরমহংসদের ও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গম্যাপী প্রতিভার সেদিন সবাই চম্প, তম্বুর ও অভিভূত ছিল। তাঁদের চমক-আকর্ষণে লোকের তাঁকে ভুলে ছিল। কিন্তু মায়ের নীরব স্বার্থত্যাগ ও অকুসুম আলোকিত সন্তানবৎ জুড় পাতায়। এ প্রেমদায়ক উৎসের কোন দিন অভাব হয়নি। প্রকাশের আলো না গেলেও তাঁর অসীম আত্মবিকার বপা ব্যাপ্ত হয়ে থাকবেই। চিরতারের দিকপালস্বয়ের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি তাঁর প্রার্থার স্বীকৃতিকে বহন করেছে। তিনি ভাবনের সঙ্গতি ও ঐতিহ্যের স্রষ্টা প্রতীক ছিলেন।

ভারতীয় অগ্নি কৃষ্টিব্রহ্মাণ্ড পূজারিণী ছিলেন রাণী রাসমণি। ইহা তাঁর জীবন রূপায়িত ও প্রকটিত হয়েছিল। জীবন শিব। উপনিষদ বলেছে নিমিল জগৎ ব্রহ্মময়। গীতা, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ব্রহ্মের গুণগানে মুগ্ধিত। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে রাণী এ ধর্ম, নীতি ও শিক্ষার অগ্রগতি ও প্রসারতাকে অব্যাহত ও স্থায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি ভক্তগণকে খুঁজে বার করেছিলেন। পরমহংসদের টানার স্পর্শ লাভ করে নাস্তিক নরেন আত্মিক বিবেকানন্দে রূপায়িত হয়েছিল। রাণীর ধর্মমুগ্ধগণপুত্র সন্তুল ব্যবস্থা ও প্রাথমিক প্রস্তুতি পরবর্তী কালীন বিবর্ত উদ্বেগ ও পরিচর্য্যাকে সহায়তা করেছিল। তিনি নবীন প্রাণের আধারকে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক, চার্য্যোপনিষদ ও বাসিন্দিকদের ভার তাঁর ওপর ছিল। তাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে যথাক্রমে ফুল ও ফলরূপে পেয়েছি। তাঁর মঙ্গল-স্বট প্রতিষ্ঠা সাধক হয়েছে। সাধনাই ব্রহ্মত্ব। ধর্মের অনুশাসন তাঁর নৈমন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতো। ভাবী সমাজকে তিনি অধর্ম ও অবিশ্বাস প্রভাবমুক্ত করতে সচেষ্ট ছিলেন। অন্তঃসত্ত্বা ও ধর্মভাট সমদৃষ্টিকে তিনি উচ্চ স্থান দিতেন। ভাস্কর্য্য প্রজাতন্ত্র লৌকিক রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হলেও ধর্মহীন নয়। একে ধর্মনিরপেক্ষ বলে কোন ক্ষতি নেই। ধর্মের নামে অত্যাচার ও

নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হলে, এ কলুষিত ও পরিভ্রান্ত হতে পারে না। মুক্তার অশব্দ্য ধর্মের জঘন্য মনের পরিচয় দেয়; মুক্তার কোন দোষ পাঁড়ায় না। মুক্তাকে জীবন থেকে বাদ না দিয়ে এর অণুচয়ের স্বীকৃতিকে অবকাশ না দেওয়া সমীচীন। আত্মার সবলতা ও পরিপূর্ণি আমাদের লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিকগণও এটা স্বীকার করেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জেমস্ জিন্স বলেন, “নৈতিক সংঘর্ষের ভয়াবহ অভাব জগতে চরম সংকট সৃষ্টি করে।” “Tragedy comes from the absence of man's control over himself.” বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কৃষ্ণ নিবারণার্থে ধর্মের অনুকূলতা গ্রহণীয়। “Men of Science need the balance of religion,” মন্দির রাণীর দৃবদৃষ্টির সাক্ষ্য দিচ্ছে। ইহা আদর্শ-বিচ্যুতির মত পাপ হতে ভাবতকে রক্ষা করেছে এবং ভাবী কালের প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হতে ডাক দিচ্ছে। অতীতকে অগ্রাহ্য করে অগ্রগতি শ্রোত স্বচ্ছতা লাভ করতে পারে না। “অতীতের গর্ভে ভবিষ্যতের জন্ম। ...পশ্চাতে যে অনন্ত নিকরী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া তাহার সলিল পান কর; তার পর সমুখে প্রবাহিত দৃষ্টি দইয়া সমুখ অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীন কালে যত দুর্ভ উচ্চ গৌরবশিখরে আরুঢ়, তাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্বময় ও মহিমামালা করিবার চেষ্টা কর। ...প্রশিষায় ধর্মই ঐক্যের মূল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐচ্ছ সাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয়।”—(স্বামীজী)। সকল ধর্ম একেশ্বরবাদী, এ অধিতীয়ে সাধনাই ঐক্যের ভিত্তি। “যত মত—তত পথ” থাকা দোষের নয়। মধুর প্রাণেপের আশ্রয় না নিয়ে মূল ধরে সমাল-ব্যাধির চিকিৎসা করতে হবে। এ পটভূমিকায় শিক্ষামন্দির চাই। এর দ্বারা আত্মোপলব্ধি জন্মতে পারে। এ বিষয়ে রাণী সচেতন ছিলেন। তাই মন্দিরকে তাঁর জাগ্রত কল্যাণম্পর্কতার মূর্ত বাচক ও মুখপত্র বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বকবির ভাষায়—

“এই তব হৃদয়ের ছবি,

এই তব নব মেঘদূত

অপূর্ণ অন্তর,

ছন্দে ও গানে

উঠিয়াছে অসংখ্যর পানে।”

নীতিহীন ও আত্মকেন্দ্রিক ভোগবিলাসম্পর্ককে তিনি ঘৃণা করতেন। ধর্ম, ত্যাগ এবং সংঘর্ষের আদর্শকে তিনি স্মৃতি দিতে চেয়েছিলেন। যে পবিত্র মন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপূর্ণ বিলাসবাসন-চরিতার্থে প্রমোদোজান নির্মাণ না করে দেশের ও দেশের হিতার্থে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, তার পরিচয়ের স্নেহ-শীতল প্রেরণা থেকে দূরে থাকা মারাত্মক ও বিপরজনক। দেশের অশান্তি ও বিক্ষোভ আদর্শখলনের ফল। তাই ভারতীয় আদর্শের পূর্ণতা ও ব্যাপ্তির উদ্দেশ্যে সত্যান্বয়ী ও কর্মতৎপর কর্মীসমূহের উপস্থিতি চাই। “যারা ঐতিহ্য-উজ্জল ভিত্তি না দিয়ে মন্দিরের স্তম্ভীকৃত আবার্জনা-বালিকে অপসারিত করবে; সকলের জীবনযাত্রার পথকে প্রশস্ত ও বিশ্বশৃঙ্খল করবে।”

সন ১২০০ সাল ১১ই আশ্বিন ত্রিবেণীর নিকটস্থ হালিসহরের পার্শ্বে কোনো গ্রামে মহিষ্য-পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা হরেকৃষ্ণ দাস গরীব অথচ ধর্মপরায়ণ ছিলেন। রাণী অত্যন্ত গুণবতী ও রূপবতী ছিলেন। কলিকাতা-নিবাসী শ্রীতিরাম দাসের দ্বিতীয়

বুড় রাজচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বত্ত্বাঙ্গের পতির নিকট দিনের মধ্যে নিজ অধ্যবসায়-বলে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করেন। পত্নীর অশিক্ষিত মা-বোনদের এ পথ অন্বেষণীয়। তাঁর প্রতিভা ছিল অসাধারণ। পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত রাজচন্দ্র কোন কাজে হাত দিতেন না। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবার ক্ষেপে পালন করেন এবং বিপুল ঐর্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ঐচ্ছ্যাসজ্ঞাত ক্ষমতার মাদকতা তাঁর চরিত্রের চিত্তকে প্রশ্ন করতে পারেনি। চিন্তের দৃঢ়তা ছিল তাঁর ভূষণ। গণিতগণকে আমন্ত্রণ করে তিনি শাস্ত্রালোচনা শ্রবণ করতেন। স্বয়ং নির্মল বৈরাগ্য থাকলেও সংসারের তুচ্ছ বিষয়টির প্রতিও তাঁর গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হতো। জনহিতকর কাজ করেও তিনি স্বামীর সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁর সরল ও প্রীতিপূর্ণ গৃহীণীপণা সকলকে মুগ্ধ করতো। তিনি সংসারিণী যথেষ্ট সম্মানিত ছিলেন।

ধর্ম অটল বিশ্বাস, দেবদেবীতে অচলা ভক্তি, জীবে দয়া, স্বদয়ে গাফিল, ভাগ্য ও সংঘম ইত্যাদি গুণের একত্র সমাবেশ তাঁর চরিত্রে দৃষ্টতে পাওয়া যায়। কত কষ্টাশ্রয়গ্রস্ত শিশুকে দায়মুক্ত করেছেন, কত চাক্রে অত্যাচার, বাসস্থান, বিজ্ঞানায়ের বেতন, পুস্তকের মূল্য ও বস্ত্রাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কৃষির উন্নতি ও প্রজার মঙ্গলের জন্ত তিনি অর্ধ মাইল ব্যাপী টোনার খাল ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খনন করান। তাঁর মত কৃষক-দরদী জমিদারের একান্ত অলব। তাই জমিদারী কুফলে দেশ জর্জরিত। এর উচ্ছেদ দৃষ্টে চাইছে। তিনি দৈনিক দরিদ্র-নারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করে যান। অতিথিসত্র তার জাফল্যমান দৃষ্টান্ত। এক সময় বিস্তর অর্থ ও জব্যাদি নিয়ে রাণী কাস্মীতীর্থ ভ্রমণের আয়োজন করতেন। এমন সময় দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলো। শত শত লোক মৃত্যুর কবলে আক্রান্ত। এ স্তনে তিনি কর্মচারীকে আদেশ দিলেন—“আমার তীর্থভ্রমণে যে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্যার্থ দাও। তাহা হইলে আমার তীর্থ-দর্শনের ফল হইবে?” জীবে প্রেমই ঈশ্বর-সেবা। দয়া-দাক্ষিণ্যের আলোকে উদ্ভাসিত এরূপ নজির ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রাচীনা হলেও আধুনিক গণসেবিকা। গণদেবতার প্রদত্ত রাণী নামের সার্বকতা এখনও পল্লী-গীতিতে শুনতে পাই—

“ধন্য রাণী রাসমণি রাণীর মণি।

বাল্যের ভাগ যশ রাণিলে আপনি।

দীনের দুঃখে দেখে কাঁদিলে আপনি।

দিয়ে যবেব টাকা পরের জন্ত বাঁচালে রাণী।”

তাই সেবার আদর্শ প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ-শক্তিও অন্তরায় হই করতে পারেনি। তিনি “ক্ষমাতীন শক্তের অপরাধকে”ও বর্ণনা করেন না। একবার সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার নিষেধাদি অধিকার স্বর্গ করে প্রজাগণের ওপর কর ধার্য হতো। এ অধিকার অপতরণে প্রজাগণ রাণীর শরণাপন্ন হন। অনুরোধের তরে রাণী ১০,০০০ টাকা দিয়ে গঙ্গার ইজারা গ্ৰহণ করেন এবং প্রজাগণকে মাছ ধরার অধিকার আদেশ দেন। বন্ধুমতী রাণী বয়স বয়স শিকল দিয়ে নদীমুখ বন্ধ করে দেন। এতে সরকার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কারণ দর্শাতে আদেশ

দেয়। রাণী উত্তর দেন—“আমি মাছের জন্ত দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা ভাড়া প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ ধরবার জন্ত আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।” অবশেষে সরকার সন্তোষিত একটি স্বীকার করে জলকর তুলে নেন। তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত মকিমপুর পরগণায় নীলকর সাহেবদের উৎপাত দৃঢ়হস্তে দমন করে তিনি প্রজাবৃন্দকে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচান। বাল্যের দৈন্দ-দারিত্রের স্মৃতি তাঁকে প্রজার দুঃখে সক্রিয় সহায়ত্বসম্পন্ন করে তুলেছিল। তিনি সীতা, সারিজী, দময়ন্তী ও বেঙ্কলায় মত পত্রিকাণা; গাঙ্গী, মৈত্রেরী, জীলাবতী ও খনার মত বুদ্ধিমতী; জীলাবতী ও রাণী দুর্গাবতীর মত সাহসী; অহল্যাবতী ও রাণী ভবানীর মত প্রজাব্রতক, ত্যাগী; সংঘমী ও লানশীল এবং মৌরাবতী-এর মত ধর্মপ্রাণা রমণী ছিলেন। ঐশ্বর্যমুগ্ধদের বলতেন—“রাণী রাসমণি দেবীর অষ্ট নারিকার মধ্যে এক জন এবং কলিযুগে দেবীমাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্ত মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।”

দেশ স্বাধীন হয়েছে। সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে। জাতিগঠনের অপরিহার্য তাগিদ পড়েছে। এ সন্ধিক্ষেপে নারী জাতির আদর্শ ভারত ভূগতে পারে না। গৃহ-জীবনই বিশ্ব-জীবনের সহায়ক ও পরিপোষক। গৃহের জননীবৃন্দ কর্তব্যনিষ্ঠ হলে প্রকৃত নাগরিক-জীবন অচিরে গঠিত হবে। একমাত্র জননীর স্নেহ-শীতল প্রভাব মনুষ্যকে মুকুলিত ও প্রস্তুত করতে পারে। নেপোলিয়ান বলতেন—“নারীর হাতে বলিষ্ঠ জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত।” “Give me good mothers and I will give you a good nation.” বর্তমানে দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যাকো রাণী রাসমণির জায় মহাবতী মহিলাবৃন্দের আদর্শের উপস্থিতিকে ঘরে-ঘরে আমরা আদরণীয়, বর্জনীয় ও হীননীয় করবো। শুভ বুদ্ধির স্বারাই অন্তরের নাশ করবো। দরিত্রের কুটীরে তাঁর মত শত শত নারীরও উদ্ভব ও বিকাশ লাভ করুক। তবে দেশ আকালমুক্ত হবে।

## অপরাজিতা

বিনয়ভূষণ মজুমদার

পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী হুগ রাজ্য থেকে আওরঙ্গজেবের বিজয়ী সেনা দিল্লীতে দিকে প্রত্যাগমন করলে শাহবুলন্দ একবার দারা শুকোকে বন্দী করে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে শাহজাদা দারা আর ভাগ্যবান নন, তিনি বন্দী এবং শৃঙ্খলিত। তাঁর অজ্ঞ দুই স্ত্রী ও সন্তানগণও বন্দী হয়ে চলেছেন দিল্লীর অভিমুখে। তাঁর প্রশানা বেগম পরভেজ-কছা নাদিরা পতির অবর্তমানে আওরঙ্গজেবের অঙ্কশায়িনী হবার কল্পনায় শিউরে উঠে পূর্বেই বিষপানে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

প্রায় মাসাদিক কাল পরে বন্ধিগণ দিল্লীতে উপস্থিত হলেন অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত সৈন্যগণ পরিবেষ্টিত হয়ে।

একটি নিরাভরণ বৃদ্ধ হস্তীপুষ্ট বন্দী দারা চলেছেন শৃঙ্খলিত অপমানিত হয়ে।

“বিধবা, ইসলামের চিরশত্রু” এই অভিযোগে দারা শুকোর

মৃত্যুদণ্ড হল এবং তাঁর শিরশ্ছেদ করে পাঠান হল বন্দী সম্রাট বুদ্ধ শাহজাহানের নিকট আওরঙ্গজেবের উপহার-স্বরূপ। বুদ্ধ সম্রাট মুগ্ধিত হলেন তাঁর প্রিয় পুত্রের এই নিষ্ঠুরতম ও নিদারুণ পরিণামে।

দাদা শুকার বন্দীরা দুই স্ত্রী—উদীপুত্রী বেগম ও রাণাদিল বেগম। উদীপুত্রী বেগম ছিলেন গৃহী বর্ষাবলম্বিনী এবং তাঁর মাতৃভূমি ছিল স্ক্রিজিয়া। রাণাদিল বেগম ছিলেন নীচকুলোদ্ভবা নর্তকী এবং হিন্দু-তনয়া। দাদা শুকা তাঁর রূপে ও নাচে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন সম্রাট শাহজাহানের অনুমতিতে।

বিজয়ী আওরঙ্গজেব উদীপুত্রী বেগমকে তাঁর সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহণ জানালেন। উদীপুত্রী বেগম সাক্ষাৎ করলেন এবং আওরঙ্গজেবকে বিবাহ করলেন।

এক দিন বেগম রাণাদিলও আওরঙ্গজেব কর্তৃক আমন্ত্রিত হলেন।

রাণাদিল জানতে চাইলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমন্ত্রণের কারণ। সম্রাট জানালেন যে, তিনি রাণাদিলকে বিবাহ করতে চান। রাণাদিল আবার জানতে চাইলেন যে, তাঁর কি গুণ আছে যাও লজ্জা সম্রাট আওরঙ্গজেবের তাঁর পাণিগ্রহণ। সম্রাট উত্তর দিলেন যে, রাণাদিলের মেঘবরণ ঘন বেশ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। প্রত্যুত্তরে রাণাদিল সম্রাটকে পাঠালেন তাঁর ঘন বেশের গুচ্ছ এবং লিখলেন, “জাঁহাপনা এই গ্রহণ করুন আমার ঘন বেশের গুচ্ছ—যা আপনাকে মুগ্ধ করেছে।”

অদমনীয় ভাবে আওরঙ্গজেব আবার লিখে জানালেন যে, তিনি বেগম রাণাদিলের অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ এবং রাণাদিলকে বিবাহ করে তাঁর অগ্রতমা সম্রাজ্ঞীরূপে পেতে চান।

রাণাদিল পত্রপাঠ ছুরিকাঘাতে তাঁর মুখ ক্ষত-বিক্ষত করে একখানি রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্র আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করে জানালেন, “সম্রাট, আমার আর সেই রূপরাশি নেই—যে রূপে মুগ্ধ হয়ে আপনি আমাকে আপনার অগ্রতমা সম্রাজ্ঞী করবার অভিলাষ করেছিলেন। আমার প্রেরিত এই রক্ত-রঞ্জিত বস্ত্রখানি তার সাক্ষ্য দেবে। আপনার নিকট আমার একান্ত অনুরোধ যে, আমাকে শাস্তিতে দিন যাপন করতে দিন।”

অপরাজিতা রাণাদিলের নিকট বিজয়ী আওরঙ্গজেব পরাজিত হলেন।

কিছু দিন শোকার্ণব জীবন যাপন করার পর রাণাদিলের মৃত্যু ঘনিয়ে এসে এবং তিনি পরপারে মিলিত হলেন তাঁর দয়িতের সঙ্গে।

রাণাদিল ছিলেন ভারতের শাস্ত হিন্দুজ্ঞার প্রতীক।\*

## অরুণীয় বৈশাখ

শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দাস কাহ্ননগো

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মাসের মত মাস—বৈশাখ, কথায় আছে—

“বৈশাখে বীকুড় খাবি খাবি পাকা আম,

জলেতে দিবি রে ডুব কমিবে যে ভাম।”

\* বিবর-বন্ধ অধ্যাপক শ্রীমধনলাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের “কাহ্ননার আত্মকাহ্ননী” হইতে গৃহীত।

তথ্য যে কিশোরীরা আনন্দ করবে, আর কিশোরীরা শুদ্ধ, শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে মাসটির দিকে—তা নয়, কিশোরীদের লজ্জাও তার পিতা-মাতারা বিধি-ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—“হরি-চরণ ব্রতের।” এ ব্রত দীর্ঘ দিন হতে প্রচলিত। ব্রত করা মানে নিয়ম-নিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষা নয়, এই নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে যে শুদ্ধাচার তারই মধ্যে রয়েছে স্বাভাবিকতা। আর এই স্বাভাবিকতা পালন করবার ব্যবস্থা ব্রতে, এতে গুণ আকাঙ্ক্ষাই নয়, রয়েছে সর্ব দিকে উপকার। আরও তাই এ ব্রত প্রতি ঘরে ঘরে সত্যিকার হবার মন্ত্ররূপে রয়েছে চলিত। অনেকে মনে করবেন—গোলোকপতি শ্রীহরির শ্রীচরণ প্রাপ্তিই “হরিচরণ ব্রতের” উদ্দেশ্য। কিন্তু তা নয়, এ ব্রতের উদ্দেশ্য—রাজ-রাজেশ্বর স্বামী, অমর-বর-পুত্র, সভা-উজ্জল জামাই, গুণবতী কন্যা ও রূপবতী বোঁ প্রভৃতি সুখ-সম্পদ লাভ। তাই কুমারীদের এতে সম্পূর্ণ অধিকার, অধিক বয়স্কাদের তিক্তমাত্র এতে অধিকার নেই, ব্রতের বিধি নাই বা বলশাম। কেন না, গেরস্থ মাত্রই বিধি সম্বন্ধে অবহিত। এ ব্রত চলে সারা মাস ধরে। তাই প্রতিদিন প্রাতঃকালে কিশোরীরা স্নান করে একটি রেকাবে শ্বেতচন্দনের লেপনের পর চন্দন-লিপ্ত রেকাবের উপর অঙ্গুলি দিয়ে হুঁখানি চরণ একে ধান, দুর্কো ও পুষ্প দিয়ে এই পাদপদ্ম অর্চনা করতে করতে ব্রত-কথা বলতে থাকে—

‘হরি বোলেচেন—ওগো মা।

আজ কেন আমার শীতল পা?’

মা বোলেচেন—

‘কোন সতী ভাগ্যবতী

সেই পূজেন তোমার পা।’

‘সে কি বর চায়?’

‘আপনাকে স্নান চায়,

রাজ-রাজেশ্বর স্বামী চায়,

গুণবতী বি চায়,

সভা-উজ্জল জামাই চায়,

অমর-বর-পুত্র চায়,

মেনকার মত মা চায়,

হুর্গার মত আদর চায়।’ ইত্যাদি। ইত্যাদি।

দিকে দিকে শুভ নববর্ষের প্রাতঃকালে ধ্বনিত হয় আকাঙ্ক্ষা-বাণী। এই বাণী এককালে কিশোরীদের কচি জীবনকে করে সৌন্দর্যমণ্ডিত, দৃঢ়, পূর্ণাঙ্গ।

তার পর দিকে দিকে বেজে ওঠে শঙ্খ। নূতন দিনকে দেশবাসী জানায় আহ্বান হাসিমুখে। “অন্তরে আনন্দ ধ্বনি,

প্রাণে বাজে সুরধনী,

শুভদিন এলো ওগো লয়ে শুভবাণী।”

মাহুয় কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। দুধে-চোখে ফুটে ওঠে এক আশার স্বপন। যেন মাহুয়ের জীবনে এসেছে নূতন জীবন।

এত আনন্দের মধ্যেও কোথায় যেন অন্তত বীণার স্বরকার ওঠে বেজে। বাংলার দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পল্লীর গৃহ-গৃহে নিরাশার স্বপ্নে চাবী-মজুর চলে নব উদীপনা লয়ে মাঠের মাঝে; কাঁধে লাজল মাধার পাগড়ী, হাতে লাঠি, চলে গরু সাঁথে লয়ে। অতীতের লাহিত জীবন হতে যেন দারিদ্র্য ধুয়ে-মুছে যায় নূতনের

আবির্ভাবে। শুধু দিকে-দিকে উঠে আগি—নূতন আশা, উঠে ধ্বনি নূতন গান! ওগো শুধু নূতনের গান!

এ হলো বাংলার আপন বৈশিষ্ট্য! এই যেন সনাতন! এই যেন শাশ্বত! এই যেন যুগে-যুগে ছড়িয়ে রেখেছে আপন কীৰ্ত্তি। তাই ত কবি প্রকৃতির শ্রামল ফ্রোড়ে বসে “চির জ্যোতিষ্ময়ে”র আহ্বান দিয়ে বলেছিলেন—

“হে চির নূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে  
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার প্রাণে।”

বৈশাখ মাস! পূণ্য মাস! বছরের প্রথম মাসটি বলেই নয়, এই মাসে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়েছেন ভারতের কত ধর্মীরা! তাঁদেরই কীৰ্ত্তি-গাথার বৈশাখ যেমন হয়েছে স্মরণীয়, তেমনি সামাজিক বিধি-নিয়মেও। যেদিন প্রতিটি দেশবাসী বিধি-নিয়মের মত তাঁদের কল্প-আদর্শকে মনে চলবে, সেদিন আমাদের চলার পথের বাঁকা পথ হবে সোজা। এমিক পরিহার করলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য!

জল পরিসরে যেটুকু আলোচনা করছি এইটে বৃহৎ নয়, বৃহৎকে জানাবার জন্য এ চূষক মাত্র!

১শ বৈশাখ শুধু নববর্ষ নয়, এটি দিনে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন অযোধ্যায় বহু বছর আগে। রাম-গাথা লিপিবদ্ধ রামায়ণে। তাই আর বিশেষ কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি না।

৩রা বৈশাখ—সুদূর পাশ্চাত্যের এক গৌরবাঙ্কিত দেশে সারা প্রাণবীর দরিদ্র-বন্ধু মহাত্মা হানিমান জন্ম নিয়েছিলেন জাম্বাবীর কোন এক নগরে। বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ভাস্করী পড়তে থাকেন ও এসোপ্যাথিক ডাক্তার হন। উপার্জন করেছেন প্রচুর। খ্যাতিও পেয়েছিলেন অধিক। সুখ সম্ভোগের মধ্যে থেকেও যখন দেখলেন যে, গরীবরা ওষুধ নিতে আসে খুব কম, তখন তাঁকে নানান প্রস্নে জর্জরিত করেছিল ও ঘর থেকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে জানিয়েছিল গরীবদের অবস্থার কথা। তাই তিনি দুনিয়ার দরিদ্র, কল্প, রোগাক্রান্তদের দুখে নূতন পথের সন্ধানে বেরুলেন ‘তাঁদের দুঃখ নিবারণে’। পথ খুঁজে পেলেন। আবিষ্কার করলেন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। যা আজ আমাদের দৈনন্দিনের ব্যবহৃত ঔষধ—সেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আবিষ্কর্তা তিনি। এই ঔষধের আবিষ্কার করে কোটি কোটি দরিদ্রের রোগ-জ্বালা নিবারণ করেছেন। তাই ধর্মীরা তাঁর আবিষ্কৃত ঔষধকে বলেন “গরীবের জল-পড়া।” বাই হোক, তিনি আজ প্রতিটি লোকের কাছে স্মরণীয়।

১৫ই বৈশাখ—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দুর্গাদাস লাহিড়ী জন্ম নেন বর্তমান মেসার চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-বাংশে ১২৭০ সালে। দারিদ্র্যের অভিলাপে ঠেলে বাণীর একনিষ্ঠ পূজক দুর্গাদাস ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের রূপ বিলম্বণ করে ভারতবাসীকে করতে চেয়েছিলেন সব দিক দিয়ে বড়। তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল। এর সঙ্কত তাঁর প্রতিটি পুস্তকে। গুরুপ্রায় বেদ-চর্চার পথায়সরণ করবার জন্য অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বৈদ্যের বঙ্গাবাদ করেন ও একটি বেদ-সভা প্রতিষ্ঠা করে সাধারণের মধ্যে বেদ-প্রচার করতে থাকেন। ক্রমে এই বেদ-সভা ভারতের

চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বেদ-চর্চার শ্রেষ্ঠ ভূমিরূপে নবদ্বীপে একটি বিরাট সভার স্থাপনা করেন। এই সভার সদস্যরা বাংলার দিকে-দিকে বেদ-সভা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ও কাশীতে বেদ-সভার একটি কেন্দ্র স্থাপনা করেন। শুধু এই নয়, সাহিত্যের উপজ্ঞানে, নাটকে, প্রবন্ধে তাঁহার যথেষ্ট দান। ‘বঙ্গবাসী’ পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি অদ্ভুত খ্যাতি অর্জন করেন ও হাওড়া হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে দীর্ঘকাল কাজ করেন। শাশ্বত ভারতের হিন্দু-গরিমায় তাঁর নাম রয়েছে স্বর্ণাক্ষরে খচিত।

২২শে বৈশাখ—বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ভ্রাম্যনক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-দিবস। ইনি স্বর্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাঙ্গ। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে চরিশ পরগণার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্ম নেন। প্রথমে ডেপুটি ও পরে সাব-রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ। বাঙ্গালীর হীন আচরণের চিত্র তাঁর সাহিত্যের পাতায়-পাতায়। দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার সম্পাদনা করেন। “পাতামৌ” এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রচনাভঙ্গি স্বচ্ছ, সরল ও প্রঞ্জল। বাঙালীর জাতীয় চরিত্রে তাঁর প্রভাব সমধিক।

২৫শে বৈশাখ—বিষকবি, কবিগুরু ববীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে ১২৬৮ সালে। স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যশিক্ষা পিতা ও ভ্রাতাদের নিকট। এই জন্ম তাঁর উপর পারিবারিক প্রভাব অধিক ভাবে প্রতিকলিত। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম থেকে অশীতি বর্ষ বয়স পর্যন্ত একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় মগ্ন ছিলেন। মধ্যে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এশিয়ার মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। ‘বিষভারতী’ তাঁরই স্থাপিত। বিশ্বের বহু দেশ ভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দান অনন্তসাপারণ।

২৭শে বৈশাখ—ভারত-পথিক শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব দিবস। দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে কাল্যাড়ি গ্রামে লিঙ্গুদেবী ব্রাহ্মণবাংশে তাঁর জন্ম। বালক-বয়সে পিতার মৃত্যুতে চতুঃ সাংসারিক গোলযোগের দরুণ তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং মাত্র আট বৎসর বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করেন। শোনা যায়, অষ্টম বৎসর বয়সের মধ্যে ইনি সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। গৃহত্যাগ করেই নানা দেশ, নদ, নদী, প্রান্তর, পর্বত লঙ্ঘন করে ও ভ্রমণ করে ইনি ভারতের লুপ্তপ্রায় তীর্থস্থান, মন্দির উদ্ধার করেন এবং ভারতের চতুর্দিকে বেদান্ত ধর্মের প্রচার করেন। বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করে ইনি প্রশংসা অর্জন করেন। রামেশ্বর, পুষ্কোত্তম, দ্বারকা, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সাংসার-ধর্মের প্রচারক। ধর্মপ্রচারে এই যে মঠ-ব্যবস্থা—ইনিই তা প্রথম প্রবর্তন করেন। আজ যে দিকে-দিকে “সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্” ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে, এ তাঁরই কণ্ঠ-বাণী।

বৈশাখী পূর্ণিমা—ভগবান বুদ্ধ কপিলাবত নগরে আবির্ভূত হন। পিতার নাম শুদ্ধোধন, মাতার নাম ময়ামায়া। এর শৈশবের নাম সিদ্ধার্থ। ইনি বয়স্কালে গোষ্ঠীময় হয়ে প্রতিপালিত হন। কৈশোরে ও যৌবনে চিন্তাশীলতা, সুগয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে বিতৃষ্ণা, সংসারে বিরাগ, জীবের দুঃখে করুণা, দেবদত্ত ও হংস

কাহিনী। সংসারে বীতশ্রুতা, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্তদের দুখে নিবারণের সন্ধানে তিনি গৃহত্যাগ করেন ও দীর্ঘকাল তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করেন, তখন তাঁর নাম হয় বুদ্ধ। সিদ্ধিলাভ করেন বুদ্ধসদ্বায়। কাশীর উপকণ্ঠে সায়নাথে পাঁচ জন শিষ্যকে দীক্ষা দেন, এবং নব ধর্মমত প্রচারার্থে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ইঁহারই প্রচারিত ধর্মের নাম—বুদ্ধধর্ম।

## শুধু গল্প নয়

শ্রীঅসীমকুমার বসু

প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলছি : বিক্রম-পুরের নিকটে এক গ্রাম থেকে পনেরো-দশ বছর বয়সের একটি ছেলে এক দিন পঞ্চাশটি টাকা সংগে নিয়ে চুপি-চুপি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য—প্রথমে সে যাবে বোখাঠি, তার পর সেখান থেকে জাহাজে করে একবারে পাড়ি দেবে বিলেতে। সেখান থেকে পড়া-শুনা করে নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য শিখে নিজের দেশে ফিরে এসে নতুন করে জীবন আঁচ করবে। তোমরা ভাবো একবার, মাত্র পঞ্চাশটি টাকা সম্বল করে বিলেত যাওয়া! এ কি চাটিখানি কথা! কিন্তু ছেলেটির ছিল অদম্য উৎসাহ আর নিজের ওপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীলতা। সে ঐ পঞ্চাশ টাকা নিয়েই বেরিয়ে পড়ল। আজকাল ত চার-পাঁচশ'র কম বিলেত যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। যাই হোক, ছেলেটি বোখাঠি গিয়ে বিলেতগামী একটা জাহাজে কাজ জুটিয়ে নিল। জাহাজে সন্ত ছিল এত : তাকে বিনা টিকিটে বিলেত নিয়ে যাবে, বিনা পয়সায় গাওয়া আর সেই সংগে সামান্য কিছু হাত-খরচা। জাহাজের কণ্টপক্ষরা তাই তাকে দিতে প্রাক্তক্ষণিত দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে জাহাজ বিলেতে নোঙ্গর করল। ছেলেটি ক'দিন শহরটা ঘুরল। সে বুঝতে পারল, তার উদ্দেশ্য এখানে সফল হবে না। উদ্দেশ্য সফলের জন্তে তাকে আমেরিকা যেতে হবে। আবার খোঁজ খুঁজ হ'ল—কবে কেন্ জাহাজ আমেরিকা যাবে। ক'দিন ধ'রে ছেলেটি ঘুরল প্রত্যেক জোটতে-জোটতে। শেষটায় সে কৃতকায হল। প্রথমে ক্যাপ্টেন তাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে রাজী হলেন না। ছেলেটি অনেক মিনতি করল। শেষটায় সে জাহাজের খোঁড়া-খাকা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে মোটা রকমের হাত-খরচাও সে পেতে লাগল।

...তার পর এক দিন সে আমেরিকার মাটিতে পা দিল। প্রথম ক'দিন ঘুরে-ঘুরে কাটল। এর মধ্যেই সে তার পূর্ব-উদ্দেশ্য বদলে ফেলছে। সে দেখল, যদি সে দাঁতের ডাক্তার হতে পারে তবে সে একাধারে দেশ-সেবাও করতে পারবে, অল্প দিকে যশ, মান, খ্যাতি সবই সে পেতে পারবে। তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে এক জনও ভাল দাঁতের ডাক্তার ছিলেন না। ছেলেটি শীঘ্রই একটি চাকরী খুঁজে নিল এবং রাতমত পড়া-শুনা এবং হাতে-কলমে কাজ করতে আরম্ভ করল।

অল্প দিনের মধ্যেই সে অনেকগুলি পাশ করে ফেলল। তার পর একটা অবিদ্যমত জাহাঙ্গা বেছে নিয়ে স্বাধীন ভাবে কাজে মন দিল।

কিছু দিনেই আমেরিকাতেই তার পসার বেশ বেড়ে উঠল। কিন্তু ছেলেটি বেশী দিন আর সেখানে থাকতে পারল না। এক দিন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে সে দেখল, স্বদেশ তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

পরদিনেই সে স্বদেশের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ী জমাল।

তোমরা বল ত—এই একাধাচিত্ত, অধ্যবসায়ী ছোলাটির নাম কি? ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত দস্ত-চিবিৎসক ডাক্তার এ. আত্মদ!

## বাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

২

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিঠুরে এসে অসি-খেল।

জাঁরাজীর আত্ম বাণী বর্ণে বর্ণে ফলে গেল; তাঁর অদ্বৈত-বিতীর্ণ বাণীরাও পৃথকী ও তাঁর আদর্শগী কল্পা মনুবাটিকে পরমাদর্শে গ্রহণ করলেন। বাজপাতি ইংরেজের হাতে চমৎকার করে বিঠুরে এসেও ইনি বিরাট জাঁকজমকে অতীতের বাহিরে ঐশ্বর্যময় সব বজায় রেখে বিপুল ঐশ্বর্যশালী বিলাসী রাজার মতন বিশেষ দপদপায় জীবনযাপন করছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, দেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্তে কোন রাজ্যের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হলে তাঁর অদ্বৈত নানা ছুড়োগুটি ঘটে থাকে—যুদ্ধবন্দীরূপে বিজিতের কাছে পদে পদে তাঁকে অপদস্ত হতে হয়। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত রাজ্যচ্যুত পেশোয়ার সম্বন্ধে চিরচিরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে পৃথকী ও তাঁর দক্ষা মনুবাটিকে অবাক হয়ে গেলেন। বালিকা হলেও, বাপুজীর কাছে নানা দেশের যুদ্ধ-বিগ্রহের গল্প শুনে মনুর মান-এই দাবী-চোঁহল যে, বাপুজীর মতন তাঁর দাদাও যুদ্ধে বিঠুরে এসে খুব সমাদ্রণ ভাবেই কালযাপন করেন। কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে সে ভুল তাঁর ভেঙে গেল। বড় বড় রাজাদের রাজৈশ্বর্য, নানা প্রথম জাঁকজমক আর দপদপার খেসার গল্প মনু বাপুজীর কাছে শুনেছিলেন, বিঠুরে এসে তার প্রত্যেকটি চামুখ দেখে চমকে উঠলেন। রাজবাড়ীর সেই প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, দ্বার-মুখে সশস্ত্র প্রহরী, বিশাল প্রাঙ্গণে পাহাড়ের মত কত সব অতিক্রম-হাতী, কত জাতের কত ঘোড়া; গল্পের সেই চমৎকার বাগান-কত রকমের বাতানী গাছ, কত রঙ-বেগুনের ফুটন্ত ফুলের বাগান, রক্তিম পাহাড়ের কেমন সুন্দর করণা—যেন সত্যিকার পাহাড় থেকে ঝুরঝুর করে জল পড়ছে; কত সুন্দর সুন্দর হরিণ, ময়ূরগুলো প্যাখিম ভুয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ছুটেছে—খেলা করছে। শুদিকে কত বড় বাড়ী, এবং মহলের পর আর এক মহল, তার পর আর এক মহল, যেন শেষ হয় না; রাজবাড়ী ত নয়—যেন মস্ত একখানা সহর। তার পর ঘরগুলি কি সুন্দর; ঘরে ঘরে কত সব ছবি, কত দামী দামী মহাধন-আসবাব-পত্র—হাতী-দাঁতের খাট-পালঙ্ক, বসবাব আসন,—আরো কত কি! কত রকমের বাতিদান, দেওয়ালগিবি, বুলানে আলোর ঝড়। দরজার গায়ে জানালার গরাদের উপরে কিংবাণে-পরদা বুলছে। কত অসুত অসুত বসন-ভূষণ—মণি-মুক্তার বাতান। অক্ষর-মহলে যেমন অসংখ্য পরিজন, তেমনি তাদের পরিচর্যা-জন্তে কত দাসদাসী। বাইম'হলে কি অপূর্ব মান্দর—মাথার চুড়োখা

নানা দিয়ে মোড়া, ভিতরের কাঁকাজ দেখলে চোখ ঝলসে যায় ;  
এব যেমন অল্পম দেবমুখি, তেমনি অপরূপ তাঁর সাজ-সজ্জা—  
পর্যচ্ছিন্ন রত্নালঙ্কারগুলির আভা বুনি সূর্যের প্রভাকেও মান  
করে দিচ্ছে। দেউড়ীর উপরে নহবতখানা—প্রহরে প্রহরে ঘণ্টাধ্বনির  
রঙ্গ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে নানাবিধ বাজের সুর। এক দিকে দেওয়ান  
গাহেবের সেরেস্তা ও মহাফেজখানা। সেখানে নানা ধরনের লোক-জন  
এব গিস্-গিস্ করছে। মহাফেজখানায় বাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ,  
বিচার-সংক্রান্ত নথী ও কাগজপত্র। অত্র দিকে দেওয়ানী ও  
ফৌজদারী বিচারালয়—প্রত্যাহ দুই বেলা বিচারকার্য সম্পন্ন হয়।  
এর পরে কিছুটা ভিতরে পেশোয়ার সভাগৃহ। রাজসভার যে  
সব গল্প মহু শুনেছেন—জাঁকজমকপূর্ণ এই সভাগৃহের সঙ্গে যেন  
মিলে যাচ্ছে। পুণায় যে রাজকীয় আসনে বসে মহাপরাক্রান্ত  
পেশোয়ারগণ একদা আসমুদ্র-হিমালয় ভারতের উপর শাসনদণ্ড  
চাঙনা করতেন, পতনের পরও রাজ্যচ্যুত পেশোয়া সেই মহান  
আসন বিহুরের আসনে এনে নতুন করে 'পেশোয়ার গদা' স্থাপিত  
করেছেন। এই আসনে বসে তিনি এখন বিহুরের জাইগীর  
শাসন করে দুদের সাথ খোলে মিটিয়ে থাকেন।

আগেই বলা হয়েছে, পেশোয়া সক্তা পত্নীকে সাদরেই তাঁর  
এই বিপুল জাঁকজমকপূর্ণ আসনে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু  
আশ্রিত ভাবে গ্রহণ করা নয়, তাঁকে সেরেস্তার একটি বিশিষ্ট  
পদে নিয়োগ করে যথেষ্ট মর্যাদা দানেও কার্য্য করেননি।  
পেশোয়ার সভায় পত্নীকে বিশিষ্ট সভাসদরূপে স্বীকার করে নেওয়া  
হয়, আর পত্নীকে কত মনোবাসি প্রথম দিনেই পেশোয়াকে  
দেখেবাবে যেন বিশ্বাসে অভিভূত করে ফেলেন। বালিকাকে  
দেখেই সভার সকলের সামনেই পেশোয়া বলে ওঠেন : বা, বা !  
কি চমৎকার মেয়ে আপনার পত্নী ? এমন রূপ ত কখনো দেখিনি !

পিতার পাশেই কত মনোবাসি প্রভাবে ষাঁড়িয়েছিলেন। পেশোয়া  
কতাকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার নাম কি মা ?

মুহু হেসে কত উত্তর দিলেন : মনুবাঈ।

পেশোয়া বললেন : এ রূপের সঙ্গে ও নাম মানায় না, তুমি  
যেন 'ভবেসী'—আমরা তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব। কেমন ?  
এ নাম তোমার পছন্দ হয়েছে মা ?

তেমনি মুহু হেসে বালিকা তাঁর সুন্দর শ্রীবাটি একটু ঢুলিয়ে  
মুখটি ডানালেন। মারাঠা ভাষায় ছবেলী শব্দের অর্থ 'মুগ্ধ'।  
পেশোয়ার কথা সবাই যেনে নিলেন—বিহুরে মুহু ছবেলী নামেই  
পরিচিতা হলেন।

পেশোয়ার সভায় তাঁর দুই পুত্রও উপস্থিত ছিলেন। আসলে  
পেশোয়া ছিলেন অপুত্রক। কালক্রমে আশ্রিত পরমাত্মীয়দের দু'টি  
পরম সুন্দর গুণবান পুত্রকে মন্তকরূপে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এঁদের  
মধ্যে জ্যেষ্ঠ হচ্ছেন—ধুলুপুছ নানা, আর কনিষ্ঠ—গঙ্গাধররাও।  
এরাই পরে 'নানা সাহেব' ও 'রাও সাহেব' নামে স্বাধীনতা  
সংগ্রামের ইতিহাসে বিখ্যাত হন। এঁরা দু'জনেই নবাবগতা  
বালিকাকে দেখে ঝুপী হয়ে ভাবতে থাকেন—তাঁদের সঙ্গে খেলবার  
এক সঙ্গিনী এলেন !

ধুলুপুছ নানা শৈশব থেকেই অত্যন্ত জেদী ও সগালাপী। পরম  
সুন্দর প্রিয়দর্শন বলিষ্ঠদেহ কিশোর। নানা আগেই এগিয়ে

কিন্তু হেলেন মিলের

# সোমবাজ

বহুব্রাজী কেশতৈল

দ্রাঘাচরোণের দ্রাঘোষ

সুগন্ধি সর্বশ্রেষ্ঠ

যাবমূল্য :-

তিল তৈল • কপাটবতায়োল

• কপাটবতাইডিন

• সোমবাজ বীজ

• দ্রাঘাচরোণ

• বস্ত ও স্ত্রী চন্দন

• স্নায়ী • স্নায়ল্যা

• স্নায়ু (কন্দুরী) • চন্দন তৈল

• বেল্লী তৈল • স্নায়ল্যা তৈল

• স্নায়ু স্নায়ী • স্নায়ু স্নায়ী

• ইতাদি বিধিভাত স্নায়ী

উপকারীতা :-

• দ্রাঘাচরোণ

• চুল ওঠা বন্ধ করিতে

• চুল বাড়াইতে

• অনিদ্রায়, নিতদ্রায়

সোমবাজ কেশতৈল

• স্নায়ী স্নায়ী



এসে বালিকা মল্লকে সন্দ্বন্দ্বিতা করে বললেন : আমরাত তোমাকে ছবেলী বলে ডাকব, কেমন? আমাদের বোন নেই—তুমি আমাদের বোন হবে?

স্বন্দর ছেলেটিকে দেখে, তার মুখে এ ভাবে মিষ্ট সন্ধান শুনে মল্লর মনটিও আনন্দে ভরে গেল; হাসিমুখে বললেন : বেশ ত, আমরা ভাই নেই, তুমি আমার ভাই হবে—কেমন?

প্রথম দেখা ও দু'টি কথাতেই দু'জনের মধ্যে দ্বিভাব হয়ে গেল। নানা জানলেন, ছবেলী তাঁর পরম স্নেহের বোন হলেন; ছবেলীও বুঝলেন যে, এখানে এসেই স্বন্দর একটি ভাই পেয়ে গেলেন। তাহ'লে কান্ধীর মতন এখানেও খেলতে পাবেন।

এর পরেই ছোট ভাই রাওএর সঙ্গেও মল্লর আলাপ হয়ে গেল। ইনি পেশার কনিষ্ঠ দস্তক পুত্র—বয়সে নানার চেয়েও দু'তিন বছরের ছোট। ইনিও মল্লকে ছোট বোন বলে মনে নিলেন। মল্লকে সঙ্গে করে দুই ভাই বিটুরের ব্রহ্মবর্ত প্রাসাদের বিভিন্ন মহল প্রাঙ্গণ উদ্ভান সব দেখালেন, দেখতে দেখতে মল্ল কোন কিছু বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে নানা বেশ সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন—কোনটির কি নাম, তার পিছনের কাহিনী। শুনে মল্লর কি আনন্দ!

খানিক পরে মল্ল দেখলেন, নানা ভাইটি আগের পোষাক বদল করে ঘোড়ার মতন আঁট-সাঁট করে পোষাক পরে প্রাঙ্গণের দিকে চলেছেন—তাঁর কোমরবন্ধে দ্বিবি রঙচঙে খাপে-ভরা তলোয়ার ঝুলছে। দেখেই মল্ল চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দের ঝলকে; ছুটে গিয়ে নানার হাত ধরে বললেন : গল্পের রাজপুত্রের মতন কোমরে তলোয়ার বেঁধে কোথা চলেছ ভাই?

মল্লর কথাগুলি নানার বড় ভালো লাগলো। তাঁর পথটি ধরে হাসিমুখে এমন একটি মিষ্ট ভঙ্গিতে মল্ল কথাগুলি বললেন, নানাকে তখন থমকে দাঁড়িয়ে কথার জবাব দিতে হলো। তিনিও বীর বালকের মতন গোপা হয়ে মুখখানি দৃষ্ট করে বললেন : লড়াই করতে চলেছি বোন! তবে সত্যিকার লড়াই নয়—কি করে তলোয়ার চালিয়ে লড়াই করতে হয়, ওস্তাদজীর কাছে তাই শিখি কি না! এই সময়ে নিতাই আমরা তলোয়ার খেলি যে। চলে না আমার সঙ্গে ছবেলি—তলোয়ার খেলা দেখবে। বাবে?

বুধখানা অমনি গম্ভীর করে মল্ল বললেন : বা রে! তোমরা তলোয়ার খেলো, আর আমি বুঝি খালি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব? তা হবে না ভাই, আমিও খেলব।

মুখে বিষ্ময়ের রেখা ফুটিয়ে নানা বললেন : তুমিও খেলবে বলছ! কিন্তু এ খেলা যে তলোয়ার নিয়ে হয়—তুমি তলোয়ার চালাতে পারবে?

মুখে মিষ্টি হাসিটুকু ফুটিয়ে মল্ল বললেন : কেন পারব না—তবে তোমার বোন হয়েছি কি জন্মে? শীগগির আমার জন্মে একখানা ছোট তলোয়ার এনে দাও—একসঙ্গে আমরা খেলব।

ছবেলীর মুখে এ-রকম সাহসের কথা শুনে নানা খুব খুশি হলেন। ঠিক এই সময় সেজে-গুজে রাও সাহেবও এসে পড়লেন।

তাঁকে দেখেই নানা বললেন : ভাই রাও, ছবেলী বলছে আমাদের সঙ্গে তলোয়ার খেলবে—তুমি ছুটে গিয়ে তোবাখানা থেকে আমাদের আগেকার একখানা ছোট তলোয়ার নিয়ে এসো।

সহর্ষে রাও সাহেব বললেন : বা, বেশ হবে তাহ'লে—আমি এখনি ছবেলীর মতন তলোয়ার আনিছি।...এক-নিমেষে কথাগুলি বলেই রাও সাহেব তোবাখানার দিকে ছুটলেন।

নানা এই সময় জিজ্ঞাসা করলেন : কান্ধীতেও কি তলোয়ার খেলতে বোন?

মল্ল উত্তর দিলেন : না, সেখানে বাপুজীর কাছে তলোয়ার খেলায় গল্প শুনতুম। আর, আমি কি খেলতুম শুনবে—লুকাচুরি, দৌড়োদৌড়ি, দড়ি-টানাটানি—এই সব। আচ্ছা, তোমরা এখানে দৌড়োদৌড়ি খেল না?

নানা বললেন : খেলি—তবে পাওদলে নয়,—আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঐ খেলা বোজ খেলি।

শুনেই বালিকা চোখ দুটো বিফারিত করে বললেন : তাই না কি! ঘোড়ায় চড়ে খেল? দেখো ভাই, আমি কত দিন স্বপ্ন দেখিছি, যেন ঘোড়ায় চড়ে ছুটিছি...সেই থেকে ঘোড়ায় চড়তে আমার ভারি সাধ। তুমি যখন ঘোড়ায় চড়ে খেলবে, আমাকেও কিন্তু ঘোড়ার পিঠে তুলে নিতে হবে। এক ঘোড়ায় চড়ে দু'জনে ছুটবো—কি মজা!

এমন ভঙ্গিতে কথাগুলি বললেন মল্ল, যেন নানার সঙ্গে তেজস্বী একটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে দু'জনে চলেছেন। এই সময় রাও সাহেব খাপে-ভরা ছোট একখানি তলোয়ার কোমরবন্ধে গুদ্র এনে বললেন : দাদা, তোমার ছোটবেলার তলোয়ারখানি বেছে-বেছে এনেছি ছবেলীর জন্মে—এই নাও তুমি ওর কোমরে বেঁধে দাও।

তলোয়ার দেখে মল্লর মনে আনন্দ ধরে না—বছর কয়েক আগে দশ বছর বয়সে এই তলোয়ার কোমরে বেঁধে নানা টহল দিয়ে বেড়াতে—এই তলোয়ার নিয়েই তাঁর শিক্ষা শুরু হয়। সে ইতিহাস শোনাতে শোনাতে তিনি মল্লর কোমরে সেই তলোয়ার বেঁধে দিলেন। মারামি মেয়েরা পুরুষদের মতন কাছা দিয়ে লম্বা সাড়ী দ্বিবি গুছিয়ে আঁট-সাঁট করেই পরে থাকেন। মল্ল সেদিন একখানা রক্তবর্ণের কাপড় পরে বেরিয়েছিলেন। সেই কাপড়ের উপরে স্বর্ণখচিত সুদৃশ্য কোমরবন্ধের সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের খাপে-ভরা তলোয়ারখানি ঝুলতেই তাঁর সে সম্ভা বেন আরো মনোরম হলো।

এর পর খেলার মাঠে গিয়ে মল্লও সেদিন অস্ত্র-চালনার দীক্ষা নিলেন ওস্তাদের কাছে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা শুরু হলো। বালিকা মল্লর হাতের শক্তি ও কল্পিতা দেখে গুরু পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন।

খেলার পর আফ্রাদে নাচতে নাচতে নিজেদের মহান্নায় এসে মল্ল পিতাকে বললেন : বাবা, দেখ নানা ভাই আমাকে কেমন তলোয়ার উপহার দিয়েছেন। আমিও ওঁদের সঙ্গে আজ তলোয়ার খেলিছি বাবা! এখন থেকে বোজ খেলব।

[ ক্রমশ: ]

# তুর্দৈক কুপজী..

রূপচর্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে...নূতন এসে করে  
পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তন নারী—  
সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে  
জেগে রয়েছে চিরদিন.....কেশই যে তার অর্দ্ধেক  
রূপ। দে-রূপ সাধনার এ-যুগের মর্যাদাগানিত আদিক  
জবা কুসুম।



সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জবা কুসুম হাউস, কলিকাতা।  
৫৭১-৪১/৮৫



## রবীন্দ্র-জন্মতিথি

শ্রীশ্রীদত্তা কর

মা'র সঙ্গ মা'র সঙ্গ সখ্যে পদে পদে বৈষম্য—ভৌগোলিক কারণে সংকীর্ণতা, ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্তে ভেদ, ধর্মকর্মে পার্থক্য, বৃগেরও তারতম্য,—এই সব কারণে এক মা'র সঙ্গ আর-একের মিলন দুষ্কর হয়ে ওঠে। অর্থের পার্থক্য আজকের দিনে সব চেয়ে বেশি ল্পষ্ট। তবু মা'র মিলে। বৈষম্যের অন্তরালে ভিতরে-ভিতরে চলে অন্তঃসঙ্গিতা মিলনের বেগ। না হলে জগতের বিস্তৃতিই তো ঘটতো না। মিলনের এই ব্যাপকতাই শ্রীকৃষ্ণ। সেই জগৎই বাইরে থেকে যত রকম চেষ্টা ও আয়োজন করে, যতই না মা'র সঙ্গ জানা থাকে, ভিতরের জানাটী জানা। কারণ—

সে অন্তরময়

অন্তর মিশালে তবে তার পরিচয়।

\* \* \*

ক'রনে জীবন যোগ কয়

না তাকে কদম পুষ্পে ব্যর্থ হয় গানের পদ্যগ।

অন্তরের প্রাণের প্রকৃতি এবং মা'র সঙ্গ মিলনই ছিল রবীন্দ্রনাথের সাধনা। তার অন্তরের নিপুট কামনা ছিল—‘যখন নয় মান নয় শুধু ভালোমান’। “শাস্ত্র পরিচয়” গ্রন্থেও আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলেছেন যে, অন্তরালে স্বকনই কবির কান্না এবং কবির বা প্রাণ্য—“তাহা শব্দা নহে ভক্তি নহে, তাহা হৃদয়ের ঠাটী।”

যত সাধক যত গোমক যত কবি আজ অবধি জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে কম জনই ভোগ্য জীবনকালে রবীন্দ্রনাথের মতো এক গৌরব সমাদর লাভ করেছে। তাঁর পক্ষে দেশ-বিদেশের প্রশংসা স্বাভাবিক। তাঁর সব ঘটনা বাদ দিয়েও শুধু যদি তাঁর জন্মদিনের সন্মিলন চর্চাই করা যায়, বিশ্ব লাগে।

১৩১৭ সনে কবি পঞ্চাশ বছরের পূর্ণাবস্থা করেন। সে উপলক্ষেই প্রথম রবীন্দ্র-জন্মতিথি পালিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আনন্দিকরণ তা ঘরোয়া ভাবে উদ্‌যাপন করেন। ‘রাঙা’ নাটক

অভিনীত হয়, কলকাতা থেকেও বেশ অতিথি-সমাগম ঘটেছিল। সেদিনকার ভাষণে কবি প্রথম বলেন,—তাঁর পারিবারিক জন্মের সংকীর্ণতা ঘুচল, তাঁর জন্ম হল নূতন করে সবার মধ্যে। তার পরে ৫১তম জন্মতিথিতে তাঁর দেশের বিধ্বস্ত জননেত্র প্রকাণ্ডে শ্রদ্ধার ডালি। কলকাতা টাউন-হলে অমুঠানটি হয়, রামেন্দ্রচন্দ্রের ত্রিবেণী ছিলেন সভাপতি। সেই থেকে কবির জন্মদিনের যে ধারা শুরু হল, প্রতি বছর দেশ-বিদেশে কত জায়গায় কত ভাবেই না তা অমুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। কত বার জন্মদিন এসেছে সহস্রাব্দে। জাহাঙ্গীর কানুনে ও বহু যাত্রীর শ্রদ্ধার সেই উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। প্রাচ্যের পারস্য, চীন, জাপান, রেঙ্গুন এবং প্রাচ্যের লণ্ডন, প্যারিস, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি নানা দেশে জন্মদিনের এই বিশেষ তারিখটিতে যেখানেই কবি অবস্থান করেছেন, নানা সমারোহে তাঁর দিন কেটেছে। রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডে কবির একসপ্ততিতম জন্মতিথির বর্ণনা-স্থলে উদ্বৃত্ত আছে—“ইরানরাজের আদেশে বাগেনয়ারের দোলেহ-তে সমস্ত দিন উৎসব হয়। সমস্ত দিন লোকজন খাওয়ানো, কয়েক হাজার লোকের অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ ও দেশ-বিদেশ থেকে টেলিগ্রামের রাশি পাওয়া, প্রাসাদের সমস্ত ফুল দিয়ে সাজানো এবং বহু লোকের অভিনন্দন পত্র, ফুলের ডালি এবং অসংখ্য উপহার গ্রহণে সমস্ত দিন সকলের অবিশ্রান্ত খাটুনি চলে।”

বর্তমান ‘প্রবাসী’ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন কবির সঙ্গে তেহারালে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরই লেখা থেকে এ খবর জানা যায়।

যে দেশে, জন্মদিনে কবি উপস্থিত থাকেননি, সে-দেশ থেকেও এই দিনের উপলক্ষে এসেছে কত শ্রীতি-উপহার, তার একটি বিশেষ নিদর্শন আছে। ১৯২১, ৬ই মে কবি লুসার্নে থাকতে খবর পান যে, তাঁর একষটিতম জন্মদিনে জার্মানীর বিধ্বস্ত সমাজ জার্মেন সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রত্নাবলী তাঁকে উপহার দিচ্ছেন।

শুধু বিদেশেই নয়, দেশেও তাঁর জন্মদিনের সমাদর ছিল। জন্মদিনে (১৩০৫) রবীন্দ্রনাথের ‘তুলানান’ অমুঠান ঘটে। পাল্লার এক দিকে তাঁর বই রেখে তাঁকে গুজন করা হয়। বিশ্বভারতী পরে সেই বইগুলি নানা পাবলিক লাইব্রেরিতে দান করেন। অমুঠানটি হয় কলকাতায়।

৬৫তম জন্মোৎসবের অমুঠান-স্থল শান্তিনিকেতনে। কিন্তু এই উৎসবে যে কত দেশের কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের দেশের অভিনন্দন নিয়ে এসেছিলেন, তার বিবরণ পাই রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডে। উৎসব-ক্ষেত্রে যোগ দেন ইতালীয় অধ্যাপক তুচি, সজ্জক ইতালীয়ান কন্সাল এবং সজ্জক ফরাসী কন্সাল; বিশ্বভারতীর চীনা ভাষার অধ্যাপক মিঃ লীম্ চীনদেশের উপদ্রোকন দেন, মিঃ এণ্ড্রু দক্ষিণ ও পূর্ব-আফ্রিকার অধিবাসীর প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন, ডাঃ কাজিনস্ আইরিশ জাতির তরফ থেকে প্রশান্তি বাণী শুনান এবং পোরবন্দরের মহারাজা কবির জন্মোৎসব উপলক্ষে কলা-ভবনের জঙ্ঘা অর্ধ দান করেন। সেই রাঙেই শান্তিনিকেতনে ‘নটীর পূজা’ প্রথম অভিনীত হয়। এবং এ-প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, শুধু বাংলা দেশে নয়, আজ সমস্ত ভারতে যে স্মৃতি শালীনতাময় নৃত্যধারার প্রচলন দেখি তার সূচনা হয় ‘নটীর পূজা’র অপরূপ নৃত্যে, এই দিনটি থেকেই।

দেশ-বিদেশের লোকের এই যে এত শ্রদ্ধা-শ্রীতির প্রাবল, এ কী রহস্য অমনি? আপন অন্তরের শ্রীতিমানের দ্বারাই কবি এ তি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। কবি “আত্ম-পরিচয়” গ্রন্থে লিখেন, “বুদ্ধির জোরে নয়, বিজ্ঞার জোরে নয়, সাধুস্বের গৌরবে, যদি অনেক কাল বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই কোনো ঠটা সুরে আপনাদের হৃদয়ের সেই শ্রীতিকে পাইয়া থাকি তবে, মিথ্য হইয়াছি।”

মানুষের শ্রীতির মালা তাঁর চিত্তকে অহংকারে ক্ষীণ করে গেলেন, সমস্ত অন্তরকে করেছে দীন নম্র; করেছে ভালোবাসার নন্দে মধুরতরো। রিক্ত হস্তে তিনি কোনো দিন সে-শ্রীতি গ্রহণ করেননি। কিছু পেলেই প্রত্যেক বার জানিয়েছেন তাঁর যো শ্রীতি দেবারই দায় বাড়ল। “এই যে অজস্র ভালবাসা ছি এ ব কি পুরো দায় কোনোদিন দিয়েছিলুম? \* \* \* মার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম জননী ধর্মজীর? আশীর্বাদ আমি নম হয়েই গ্রহণ করব।”—চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড।

“আত্ম-পরিচয়” গ্রন্থে লিখেন, “...আজ আপনাদের নিকট হইতে সমাদর লাভ করিয়া তাহাকে এমন দুর্ভাগ বলিয়া শিরোধার্য করা লইতেছি। ইহা স্তুতিবাক্যের মূল্য নহে, ইহা শ্রীতিরই পহার।”

জার্মানি থেকে গ্রন্থাবলী উপহার পেয়ে লিখছেন—“The generous greeting and the gift that have come to me from Germany on the occasion of my 61st birthday are overwhelming in their significance for myself. I truly feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country who have accepted me as their own.”

জীবনের শেষ বেলাতেও কবি বলে গেলেন—মানুষের জন্মদিন কট দিনের মধ্যে নয়, একটি পরিবারের মধ্যে নয়, বিশেষ কোনো দেশে নয়, জন্মদিন সেই ক্ষণেই—যখন সমস্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের দ্বিতীয় মিলন ঘটে—

“এ কথা বুঝি মনে

যেখানেই বন্ধু পাঠি সেখানেই নবজন্ম ঘটে

আনে সে প্রাণের অপূর্ণতা।

আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তাঁর আত্মীয়তা

অবারিত পায় অভ্যর্থনা।”

পারিবারিক সম্বন্ধের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি মূল্য পেয়েছে এই আত্মীয়তার সম্বন্ধ। এক জন্মদিনে তিনি ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন—“কোন মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে গড়ে পেছে বলেই সে যে অস্ত্র মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়। পরিবারের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যাদের আমি বিশেষ ভালবাসি—কিন্তু সে তারা পরিবারের লোক বলে নয়। \* \* \* সেটা স্বার্থ আত্মীয়তা, পারিবারিকতা নয়। \* \* \* তাই বল আমার মন যে কেবলমাত্র মানব সাধারণের আশ্রয়বাহরেই দিন কাটাতে ভালবাসে তা নয়—বিরাট মানবের মধ্যেই আমার আত্মা কৈবল্য লাভ করেছে তা বলতে পারি নে—আমার মধ্যে

থুই একটা প্রবল ব্যক্তিসত্তা আছে। বিশেষ মানুষ এবং বিশ্ব-মানুষ দুটোই আমার কাছে সব চেয়ে সত্য।”

এত যিনি দিয়েছেন, পেয়েছেনও যিনি এতখানি, জীবনের শেষ-সীমার উপনীত হয়ে তিনি বললেন—

“আমার কবিতা জানি আমি  
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এসো কবি অখ্যাতজনের  
বসলেন : নির্বাক মনের।”

“তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।

আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে  
মিল হবে কী করিয়া—আমি না নিশ্চিত পদক্ষেপে  
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বৃষ্টি, বৃষ্টি তার রসাস্বাদ  
ভারিয়েছে পূর্ব পরিচয়, বৃষ্টি আদানে প্রদানে  
রবে না সম্মান। তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে  
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা মাঝে তোমাদের ডেকে বসি,

তোমরাও যোগ দিও জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে  
সে অন্তিম অমুঠানে \* \* \*।”

অমুভূতির আবেগে এই কবিই এক দিন বলেছিলেন—

সব ঠাই ঘোর ঘর আছে

আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।

সে ঘর যে কত বড় নয়, আর কত ছোটো খোপে তা বিভক্ত, তাঁর উপলব্ধি কাব্যে এবং জীবনে দু’দিক দিয়েই তাঁর নিজের কাছে পরিষ্কৃত হয়েছিল। সে ঘরের সর্বত্র তিনি পৌছতে পারলেন না। অক্ষমতার এই স্বীকৃতিই তিনি রেখে গেলেন। তাঁকে সিঁড়ির অপরূপ পরিচয়ে সে লেখাতেই। সে রচনারই এখন বহুল সমাদর চলছে,—এক দিন এই পথেই কবির আরো বেশি পরিচয় স্তম্ভ হবে।

এ শব্দাবলী শ্রেষ্ঠ চিন্তার অল্পমিত হয়েছিল যে, মানুষ এক দিন দেহের সীমার বন্ধ থাকবে না, তার সত্তা হবে চেতনার তেজপুঞ্জ রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই পরিণতিই জীবনের পরিচয় হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর অমুভূতির ভূমিকাতে দৃষ্ট রেখে তিনি শেষ জীবনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ হলো না। পৃথিবীর সকল শ্রেণীর সমগ্র মানুষের জীবনের সঙ্গে একীভূত হওয়া রয়ে গেল বাকি। সমস্ত মানুষের বিচিত্র ব্যাধা, গভীরতম কথা তাঁর সুরে সংগত হয়ে বেজে উঠল না। ভাবীকালের মানুষ সে অসম্পূর্ণতা ক্ষমা করে সত্য মূল্যে তাঁকে নিজেদের চিত্তে স্থান দেবে কি না, সেই হল তাঁর সম্বন্ধ। সংকীর্ণ স্থান তো তিনি চাননি মানবের মধ্যে, জন্মের মালাতেও ছিল না লোভ, চেয়েছেন তাদের বরণমালা, সে-মালা সমস্ত কালের সমস্ত মানুষের অন্তরের। তাই তিনি নিজের অসম্পূর্ণতা নিয়েই স্বীকার করে বলে গেলেন “জীবনে জীবন যোগ করা,”—সে শুধু একার সাধনার হয় না, মহামানব-মিলনের সাধনাতে চাই সমস্ত মানবের সহযোগিতা :

“তোমরাও যোগ দিও জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে।”

এ শুধু রবীন্দ্রনাথের একান্ত আহ্বান নয়, রবীন্দ্র-বাণীতে সহস্র হস্তে বেজে উঠেছে সমস্ত মৃত্যুঞ্জয় মহাপুরুষের উদাত্ত আহ্বান,—তাদের বিশ্বদানব সাধনায় সমস্ত মানবকে যোগ দিতে হবে। এই বিশেষ স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে বেজে উঠেছে বর্তমান কালেরই আবহাওয়ায়। শুধু রাষ্ট্রের একীকরণের প্রস্তাবে নয়, আর্থিক অবস্থার সমস্যার দাবিতে নয়, সাহিত্যে ধর্ম সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের নানা সীমার মধ্যে মিলনের নিগূঢ় সূত্রটি আবিষ্কার করার কাজই চলেছে নানা বাধা-বিপত্তি ঠেলে ঠেলে।

মহাভারতে একটি গল্প আছে। ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন,—ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ লাভ করা চাই। কী সে আশ্চর্য তপস্কারী, উচ্চতর আত্মপ্রকাশের কী প্রচেষ্টা! বিশ্বামিত্র সেদিনই পুনর্জন্ম লাভ করলেন, যেদিন তাঁর অহমিকা হুটল, যেদিন আত্মবোধের মধ্যে তিনি পরম সত্যকে পেলেন। তখন কে তাঁকে অস্বীকার করবে, কে হুটাবে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব! মানুষের সাধারণ জন্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের জন্মের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ আখ্যানের মধ্যে সেন্সিটিভিটি বাক্য লাভ করেছে।

বিশ্বামিত্রগণ অহং জ্ঞানের তেজে জৈবিক জন্মের অবস্থায় স্থবী থাকতে পারেন না, তাঁদের কেবলই চেষ্টা বড়ো হবার দিকে, তাঁদের মন কেবলই বলে—আরো চাই। মানুষের স্বাভাবিক বাধায় তাঁরা তাঁদের অহং ত্যাগ করতে পারেন না, লোভে-মোহে তাঁদের জড়িয়ে ধরে। ক্ষমা এবং নম্রতার সিঁধির ঘারা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য আর লাভ হয় না। তবু তার মধ্যেও দেখা যায় কখন এক-এক জন মানুষ এই জন্মেই আর এক জন্ম অর্থাৎ বিজ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন, সবার সঙ্গে একাত্মতার আবাদনে তাঁরা পান মুক্তির আনন্দ। যুগ-যুগে সেই লোকোত্তর পুরুষদের আগমন হয়েছে। কিন্তু দিনে-দিনে দেখা গেল সেই ব্যক্তিবিশেষের প্রকাশ মানব-জীবনে সম্পূর্ণ মূল্য পেল না।

খৃষ্টের সাধনাকে বৃন্দের বোধিসত্ত্ব লাভকে মানুষ তাদের সমবেত জীবনের অম্লত বৈষম্যে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। অবশেষে ধীরে ধীরে সে আজ বৃষতে পারছে এককের বিজয়-লাভে নয়, সমস্ত মানবের বিজয়-লাভেই মানব জাতির নব জন্ম, “মানব-অত্যাশ্রয়” হবে বিধে। কিন্তু মানুষের এই ঐক্য-চেতনার অগ্রগতির মুখেই মানুষের বস্তু আসত্য উন্নত হয়ে উঠে পক্ষে-পক্ষে বস্তু বিপর্যয় বাধিয়ে তুলছে। তার কামান গজাচ্ছে, তার পালিশ নষ্ট হয়ে হিংস্রতা বেরিয়ে পড়ছে উৎকট রূপ নিয়ে; তার রক্ত নাচছে মরণ-যজ্ঞে আহুতি হ’তে। কিন্তু সেই কামান-গজের নুনে কবি বলে গেলেন ঐ কামান গজের জয়লাভ নয়, সে নবজন্মের আগমনী উজ্জ্বল দিন বদল হচ্ছে—

“দামামা ঐ বাজে

দিন-বদলের পালা এসে

ঝোড়ো যুগের মাঝে।

পালিশ করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজ

দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।”

বললেন—

“অসম্ভব বিধাতার

ওরা দূত বুঝি

শত শত বর্ষের পাণের পুঁজি

বীভৎস তাণ্ডবে

এ পাণ-যুগের অন্ত হবে,

মানব তপস্বী বেশে

চিত্রা ভঙ্গ শয্যাতলে এসে

নব-সৃষ্টি ধ্যানের আসনে,

স্থান লবে নিরাসক্ত মনে

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান

ঘোষিছে কামান।”

ইতিহাসের বাক-বাকি মানুষের আছে লোকোত্তর মহামানবদের দানের অমূল্য সঞ্চয়;—সে মানব জাতি কখনো নিঃশব্দ নয়, কোনো মতেই তার বিশ্বাস হারাবার কারণ নেই। এক-একটা যুগ-বিপর্যয়ের সীমা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ দেখবে,—এক-এক বার যুদ্ধাবসানে তাদের মনে আরো অধিক মানুষের আসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মহাপুরুষদের সাধনা ধাপে-ধাপে সফল হতে চলেছে। কবি বলে গেছেন—

“নানা হুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে

বাহাদুর জীবনের ভিত্তি যায় বার বার কঁপে

যারা অস্তমনা, তারা শোনে

আপনারে তুলে না কখনো।

মৃত্যুঞ্জয় বাহাঘের প্রাণ

সব ভুচ্ছতার উর্ধ্ব দীপ যারা জালে অনির্বাণ

তাহাদের মাঝে যেন হয়

তোমাদের নিত্য পরিচয়।”

যুগপুঙ্ক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি এক সময় জনসমাজের এক অংশের চিত্তবিক্ষোভ কবি ভ্রমরান করেছিলেন; তখনই এ কবিতাটি লেখা হয়। কিন্তু এর মধ্যে শাশ্বত স্মৃতি ধনিত হয়ে উঠতে দেখে তিনি এইটিকে জগদ্বিনের কাব্য-অর্থ্যে ধরে দিলেন ‘জগদ্বিনে’ গ্রন্থে।

আজ আমরা যারা এ কাব্য পড়ছি, নানা হুঃখে চিত্তবিপর্যয়ে আমাদের জীবনের ভিত্তি সত্যি গেছে কঁপে, আমরা আজ অস্তমনা।—এ-সময়ে কবির কথা শোনবার দৈর্ঘ্য আছে কি না সন্দেহ। তবু এখন তাঁর জগদ্বিন এল, ঘাটে-ঘাটে ঘট ভরে উঠেছে দেখতে পাই—মঙ্গল-শব্দে সাড়া বাজল বিচ্ছিন্নের নয়, নির্বাণের নয়, অপরিচয়ের নয়—সাড়া বাজল একটি স্ফুটনশীল পরম ঐক্যের,—প্রাণের স্রবজীরেও যার ধারা বস্তুর মতো অদৃশ্য হয়ে প্রবাহিত;—তখন সবার আগে এই কথাটিই আবার মনে পড়ছে—মৃত্যুঞ্জয়দের মাঝে আমাদের যে নিত্য পরিচয় রয়েছে,—নানা হুঃখের ভিতর দিয়ে চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও আমাদের সাধারণ সকল মানুষের মাঝেও যেন সেই পরিচয় ফুটে ওঠে; চিন্তার কথায় কাজে এই ভাবেই জন-জীবনের প্রতিটি ব্যক্তি আমরা তাঁদের জীবনকে আমাদের জীবনে ফুটিয়ে তুলব। তাঁদের জগদ্বিনকে আমাদের প্রতিদিনের মধ্যে নূতন যুগের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করে মানব-যাত্রাকে মহোজ্জ্বল অক্ষর পথে অগ্রসর করে চলব।

১৯২২ সন। মহাস্বামী তখন কারাক্ষ, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-ভারত ঘুরে দেখতে বেরিয়েছেন, সাবরমতি জায়েম গেলেন এবং মহাস্বামীর প্রতি অঙ্ক নিবেদন করে তাঁর জায়েমবাসীদের উৎসাহ

য় এলেন। সেদিনকার ভাষণে ঠিক এই কথাই তাঁর কাছকে শোনা গিয়েছিল :—“পশুর সহিত এই যে পার্থিব জীবন আমরা বাণন করি, এই জড় জগতই কেবল জগৎ নহে, কিন্তু আমাদের মধ্যে ইহাপেক্ষা আরও উচ্চতর যে-জীবন লুক্কায়িত আছে, ই জীবনের জ্ঞান আরও উচ্চতর জগতের প্রয়োজন। আমাদের ই লুক্কায়িত জীবন অবিনশ্বর—অমর অক্ষয় ও অব্যয়। যে ব্যক্তি ই জড় জগতের স্বার্থকে জয় করিতে পারিয়াছে কেবল সেই ই এই অমর জীবন উপভোগ করিতে পারে। প্রত্যেক মানুষকে স্বপ্ন হইতে হইবে, একবার দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তার সত্যের আলোক লইয়া অমর জীবনের সন্ধান পাইয়া নূতন জন্ম লাভ করিতে হইবে। বাহারা আপনার মধ্যে অসীমকে ভোগ করিতে পারে—তাহারাই অমর হয়।” \*

## ফেষ্টিভ্যাল্ অব ব্রুটেন

শ্রীমতী শান্তি বসু

অনেকেই হয়ত শুনেছেন যে, এ বছর গ্রেট ব্রুটেনে Festival of Britain উৎসব হচ্ছে। Festival কথাটা চিরপরিচিত, কিন্তু Festival of Britain নামটিতে নূতনত্ব আছে না? নূতনত্ব তো থাকবেই, কেন না ঠিক এ ধরনের উৎসব পূর্বে কোথাও হয়নি। ‘ব্রুটেনের মহোৎসব’ অভূতপূর্ব, অভিনব এর বিশেষত্ব। সারা দেশব্যাপী এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটি একটি প্রচারমূলক উৎসব। অর্থাৎ কি না সকলের চিরপরিচিত ধর্মসংক্রান্ত বা আনুষ্ঠানিক উৎসব নয় এটি। এই উৎসবের মধ্যে দিয়ে ব্রুটেন আপনাকে প্রতিবিম্বিত করে তুলে ধরবে অপরের সামনে। এরূপ প্রচার করতে গেলে প্রচারের বিষয় হয় অসংখ্য, আর প্রচারের পন্থাও হয়ে যায় অনেক রকম। এই উৎসব তাই হয়েছে জটিল ও বহুমুখী। এর স্বরূপ বর্ণনা করা স্বল্প পরিসরে সম্ভবপর নয়। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি, তার থেকে বিষয়টা অনেকটা স্পষ্ট হবে। আমরা জানি যে, প্রদর্শনী (exhibition) হচ্ছে প্রচারের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীতীরস্থ The South Bank Exhibition হচ্ছে এই উৎসবের কেন্দ্রস্থল। সাড়ে ২৭ একরংজমির উপর উদ্যান, ফোয়ারা ও গাছপালার মধ্যে স্থান পেয়েছে এই বিরাট প্রদর্শনী। দূর থেকে দেখলে বোঝা যায় যে টেম্‌স্ কি ভাবে প্রাণবন্ত করেছে প্রদর্শনীটিকে। জমির আয়তন শুনে মনে হয় না প্রকাণ্ড, কিন্তু কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, ঐচ্ছিক বিষয় এত অধিক যে সম্পূর্ণ এক দিনের কমে কেউই ভাল ভাবে দেখে শেষ করতে পারবে না এটিকে। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বিজ্ঞান, আবিষ্কার ও technologyতে ব্রুটেন কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং সে জগতকে এ সব ক্ষেত্রে কি দান করেছে তা দেখানো, আর দেখানো ব্রিটিশ জাতির ইতিহাস ও তাদের স্বরূপ। প্রদর্শনীটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছে—ব্রুটেন দেশটি, ব্রুটেনের অধিবাসী ও আবিষ্কার। প্রথম হুঁটি বিভাগ আবার অনেকগুলি Pavillonএ

বিভক্ত। এদের কতকগুলির নাম শুনেলেই আমরা প্রদর্শনীটির বিরাট ব্যাপকতা এবং বৈচিত্র উপলব্ধি করতে পারি—The Natural Scene Pavilion; The Country Pavilion, Minerals of Island; Power and Production; Seas and Ships; Homes and Gardens; Sports ইত্যাদি। The Lion and the Unicorn Pavilionএ প্রদর্শিত হবে ‘ব্রিটিশ চরিত্রের স্বরূপ’। ব্রিটিশ জাতির উৎপত্তি কি ভাগে হোল, তাদের পূর্বপুরুষ কে আর তারা কি ভাবে জীবনযাপন করত?—এই প্রশ্নের উত্তর দেবে The People of Britain Pavilion।

প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ কিন্তু তৃতীয় বিভাগটি, যার নাম হোল The Dome of Discovery, এটি এলুমিনিয়াম নির্মিত প্রকাণ্ড একটি গম্বুজ—পৃথিবীর সর্ববৃহৎ। এর তলায় চিত্রিত হবে জসীম, স্থলীয়, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি আবিষ্কার কাহিনী। কৃষ্ণ, লিভিঙ্গটন প্রভৃতি ভ্রমণকারী এবং নিউটন থেকে রাবারফোর্ড পর্যন্ত সকল বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের কাহিনী দেখাবে এ সকল ক্ষেত্রে ব্রুটেনের অবদান। প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অদ্ভুত জিনিষ। এটি চক্চকুতি বিশিষ্ট প্রকাণ্ড বড় একটি পদার্থ, মনে হয় যেন শূন্যে ঝাঁড়িয়ে আছে। এটি যে কি জন্ম দ্বারা প্রস্তুত তা আমি জানি না, এর নাম দেওয়া হয়েছে The Skylon। প্রদর্শনীতে পাওয়া যাবে Telecinema নামক একটি নূতন জিনিষ। Televisionকে সিনেমার রূপান্তরিত করে দর্শকদের দেখানো হচ্ছে এই সর্বপ্রথম।

লণ্ডনের Battersea Parkএ একটি প্রকাণ্ড প্রমোদ উদ্যান খোলা হবে। মে মাসের শেষের দিকে রাজকুমারী মার্গারেট এই প্রমোদ উদ্যানের উদ্বোধন করবেন। এখানে শুধু শিশুসহ আনন্দ পাবে না, সব বয়সের ব্যক্তিরাই পারবে উপভোগ করতে এর বিচিত্র আনন্দ-সম্ভার। ৩৭ একরংজমির এই উদ্যানে থাকবে বিভিন্ন Pavilion, Arcade, Tower, প্যাগোডা, নাট্যশালা, পুষ্করী, ঝর্ণা ইত্যাদি। এ ছাড়া Merry-go-round, বৈজ্ঞানিক গাড়ী জাতীয় জিনিষ তো থাকবেই। সন্ধ্যা বেলায় যখন এই উদ্যান আধুনিকতম উপায়ে বৈজ্ঞানিক আলোকে floodlit করা হবে ও সব ঝর্ণার জল রামধনু-ধারার মত বার হবে, তখন এই উদ্যানকে পরীদের দেশ বলে মনে হবে। চীনা ভাগন, পরীদের বাড়ী প্রভৃতি রূপকথা-পাঠিত দ্রব্যাদি আলোকিত করা হবে ও রাত্রি বহু রকম বাজী পোড়ান হবে। অনেক সুসজ্জিত দোকানও থাকবে এর ভিতরে। শিশুদের জন্য একটি বিশেষ বিভাগে থাকবে Peter Pan রেলওয়ে নামক ছোট একটি রেলপথ, নৌকা চালাবার ছোট পুকুর, ছোট একটি চিড়িয়াখানা, ছোটদের নাট্যশালা প্রভৃতি।

লণ্ডনের অজান্ত আকর্ষণ হচ্ছে উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ২৪০টি কনসার্ট, অসংখ্য থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে। এ সবের জন্য বহু বিখ্যাত শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে লণ্ডনে। এরূপ সমাবেশ না কি পূর্বে কোথাও হয়নি। এই সংগে চল্লিশটি কলা-প্রদর্শনী (Art Exhibition) দেখানো হবে। Poplar নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড হাঁপাত্য শিল্প-প্রদর্শনী হবে। হাঁপাত্য প্রদর্শনের উপায়টা অভিনব। একটি ছোট-খাট অসমাপ্ত সহরের বিভিন্ন

\* স্বাধীন-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ।

আকার ও প্রকারের গৃহাদি নানাপ্রকার স্থাপত্যের নিদর্শনরূপ থাকবে। সহরটি কিন্তু আসল সহর নয়, model সহর, আর এটি অসমাপ্ত রাখা হয়েছে, উৎসবকালে এটি অল্প অল্প করে সমাপ্ত করা হবে, বার কেসে দর্শকেরা এদের স্থাপত্য সবক্ষে অনেক কিছু জানতে পারবে। লণ্ডনে সরকারী প্রদর্শনী এ ছাড়া আরও দু'টো হবে; যথা—পুস্তক প্রদর্শনী ও কেমিস্ট্রির বিজ্ঞান প্রদর্শনী। পুস্তক প্রদর্শনীতে থাকবে চমার থেকে ইলিফট পর্যন্ত বিখ্যাত লেখকদের বাছাই-করা পুস্তক। বিজ্ঞান প্রদর্শনীটি চমৎকার। বিজ্ঞানের কঠিন ও স্বতন্ত্র ভাষার জন্ত জনসাধারণ তাকে এড়িয়ে চলে, এখানে না কি সে বাধা দূর করা হয়েছে।

এত প্রদর্শনীর নাম দিলাম, তবুও কেবল মাত্র লণ্ডনেরই তালিকা শেষ হোল না! সারা দেশে তাহলে যে কি বিরাট আয়োজন হয়েছে তা সহজে অনুমেয়। লণ্ডন ছাড়া আরও তিনটি প্রধান সহরে প্রদর্শনী হবে। গ্লাসগোতে হবে Exhibition of Industrial Power, এডিনবরাতে Exhibition of Scottish Architecture and Traditional Crafts, এবং বেলফাটে হবে Ulster Farm and Factory Exhibition। কলা উৎসব হবে বাথ, কেব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইয়র্ক, ক্যান্টারবেরী ইত্যাদি তেইশটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সহরে। এই সকল কলা উৎসব হবে স্থানীয়বাসীর বিভিন্ন প্রকৃতির। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ উৎসব সমূহের মধ্য দিয়ে পরিচুট হবে প্রত্যেক স্থানের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। দু'টো প্রদর্শনী হবে ভ্রাম্যমান। এর মধ্যে একটি জলপথে ঘুরে বেড়াবে বুটেনের সব প্রধান বন্দরে। এই প্রদর্শনীটি স্থান পেয়েছে Festival Ship "Campania"তে।

এই সব তো হোল সরকারী বা বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎসব পালন। এই সব বুটেনের পার্শ্ব উন্নতি দেখাবার প্রয়াস পাবে। কিন্তু শুধু এই দিকটা হোল একটা জাতির অসম্পূর্ণ ছবি। একটা জাতির স্বরূপ ও ইতিহাসকে সর্বাপেক্ষা প্রাণ দিতে পারবে স্বয়ং সেই জাতিই। তাই বুটেনের জনসাধারণ এগিয়ে এসেছে এ ভার নিতে। শত শত প্রায় ও সহরে নানা প্রকার উৎসবের মধ্যে পাওয়া যাবে ইংরাজ জাতির পরিচয়। গ্রাম্য নৃত্য-গীত, কার্ণিভাল, হাট-বাজার, পুশ-প্রদর্শনী, অসংখ্য প্রকার খেলাধুলার মধ্য দিয়ে বৃটিশ জাতি জগতকে জানাবে তার রীতি-নীতি, আদর্শ ও চরিত্র এবং তার নিজস্ব জীবনযাত্রা-প্রণালী। জগতের সামনে বুটেন খুলে ধরবে তার প্রাতিষ্ঠিত শোভা, তার ইতিহাস। জগৎ দেখতে পাবে কর্মরত ও ক্রীড়ারত বুটেনকে।

এই উৎসব উপলক্ষে বুটেনে আসছে একটি বিরাট দর্শকমণ্ডলী। ইউরোপবাসী তো আসছেই; আমেরিকা, সুদূর অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড, আমাদের ভারতবর্ষ প্রকৃতি দেশ থেকেও আসছে বহু জন। উৎসব কালে লণ্ডনে বোধ হয় সব জাতির ওৎসব দেশের লোক দেখতে পাওয়া যাবে। এরা উৎসব-যোগদানকারী, অনেকেই ছড়িয়ে যাবে অর্থ। সরকার তো লাভ করবেই, তা ছাড়া দোকানদার, হোটেলের মালিক ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা লুটেবে অর্থ হুঁহাতে।

আর একটা প্রশ্ন হরত জাগতে পারে। সেটা হচ্ছে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎসব পালন কিছুটা অশোভন দেখায়। সে জন্ত ঠিক এই সময়ে কেন এই উৎসবটা হচ্ছে? এ প্রশ্নের একটা

উত্তর হচ্ছে যে, ঠিক একশত বর্ষ পূর্বে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে এক উৎসব হয়, তারই শতবার্ষিকী হিসাবে বর্তমান উৎসব। এই হোল সময় নির্ধারণের কারণ। কিন্তু এই উৎসবের সঙ্গে শতবর্ষ পূর্বের The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nation নামক প্রদর্শনীর তুলনা করা যেতে পারে না। পূর্বের উৎসবটি কেবল মাত্র লণ্ডনে হয় এবং উপরোক্ত প্রদর্শনীটি ছিল তার প্রধান এবং প্রায় একমাত্র আকর্ষণ। বর্তমান প্রদর্শনীর ছায়া মাত্র ছিল এটি।

উৎসব পালনের কিছু আরও উদ্দেশ্য আছে। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই সময়ে সেন্ট পল গির্জা থেকে রাজা যষ্ট জর্জ এই মহোৎসবের উদ্বোধন করলেন। এই সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উৎসব সবক্ষে তাঁর নিজের ও সমস্ত বৃটিশ জাতির মতামত প্রকাশ করলেন। তিনি এই মর্মে বললেন যে বুটেনের মহোৎসব বৃটিশ জাতির অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তি ও সাহসের প্রকাশ্য চিহ্নরূপ। উৎসবে অঙ্কিত অতীতের কীর্তি সকল বুটেনকে অগ্রগামী হবার প্রেরণা দেবে। জগতের বর্তমান দুর্ভোগময় পরিস্থিতিতে আরও পরিচুট হয়ে উঠবে এই প্রচেষ্টা, যেখানে বুদ্ধ-প্রজ্ঞার সক্রিয় আবহাওয়ার মধ্যে প্রচারিত হবে শিল্প ও সৌন্দর্যের জয়গান।

## অ্যাটম বোমার দেশে

[ পূর্বসূচী ]

অমিতা দত্ত-মজুমদার

ওয়াশিংটনে

নতুন জগতে এসে পড়েছি। এই জগতকে শুধু বিস্মিত ছই চোখ মেলে দেখলেই হবে না, এর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে; এখানে সহজ ভাবে চলে-কিরে বেড়ানো অভ্যাস করতে হবে। পরের দিন শনিবার; সকাল সাড়ে চটায় ক্লাস নিতে হবে, তাই চটাতাই বেরিয়ে পড়েন উনি, দুপুরে লাঞ্চার পর আমরা বেড়াব ঠিক হোলো। প্রথমে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা Dupont Circle এ গেলার বাস চড়ে। বাস আমাদের বাড়ী থেকে একটু দূরে। পাথে বেরিয়ে দিনের আলোয় চারি দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। সহরটা পাহাড় জায়গার উপরে; কাজেই সূর্যের পীচালা প্রশস্ত রাস্তাগুলো উঁচু-নীচু হয়ে এগিয়ে চলেছে। গাছ দু'ধারে সারি সারি রয়েছে, কিন্তু সব পত্রহীন। শরতে এ সব দেশে গাছের পাতা ঝরতে শুরু করে, শরৎকে তাই এ দেশে বলে Fall. এখন সেই পাতা-ঝরার পালা সম্পূর্ণ হয়েছে। গাছের তলা, রাস্তার দু'পাশ শুক পত্রের স্তূপে পরিপূর্ণ। এ দেশের রোদ দেখেও মনটা প্রসন্ন হয় না, মনে হয় এইটুকু রোদ নিয়ে এরা বাঁচে কি করে। কোন আধুনিক বাঙালী কবি না কি "মরা চাঁদের" সন্ধে কবিতা লিখেছিলেন; আমাদেরও এ দেশের রোদকে মরা-রোদ বলতেই ইচ্ছে করছে—বৃন্দদেহের মত রান। আমার সোনার দেশের সোনার রোদের জন্ত মনটা ব্যাকুল হয়েছে।

বাসে উঠবার আগেই লক্ষ্য করলাম এ দেশের বাসগুলো খুব বড় বড়, কলকাতার বাসের বিপুল লম্বা। ডায়ুরাম ব্রেকের ভীম

শব্দে পথিককে সচকিত করে বাস-ষ্টপে এসে বাস থামল। উঠ দেখলাম, এত বড় বাসের টিকিট দেওয়া ও গাড়ী চালানো দুই কাজ একই লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মানুষ-শক্তি বা man power এদেশে মহাহায্য, তাই খুব বুকে-সুকে খরচ করা হয়। মস্ত বড় বাসে দু'টো দরজা; ওঠবার নিয়ম সামনের দরজা দিয়ে, নামবার সময়ে যে দরজাটা কাছে পড়ে সে দরজা দিয়েই নামা যায়। ড্রাইভারের আসনের বিপরীত দিকে উঠবার দরজা; উঠেই সামনে পড়ে ড্রাইভারের হাতের কাছে রক্ষিত ফুটওয়াল কাচের বাস; যাত্রীরা উঠেই তাতে নির্দিষ্ট মূল্যের মুদ্রা ফেলে দেয় বা সাপ্তাহিক পাস দেখায়। মুদ্রার পরিবর্তে ড্রাইভার টিকিট দেয় না। তবে যদি কিছু পথ এই বাসে গিয়ে আবার একই অভিযুগে অথচ ভিন্ন রাস্তার বাসে ওঠবার উদ্দেশ্য কারো থাকে তবে সে ট্রান্সফার টিকিট চেয়ে নেয়। এই টিকিটের থাক ড্রাইভারের সামনে বাসের গারে আটকানো রয়েছে; স্থানভাগ না করে, এমন কি এক হাত steering wheel থেকে না সরিয়েই সে এই টিকিট দেওয়ার কাজটি সারতে পারে। এই ট্রান্সফার টিকিট দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় বারও কাজে লাগানো যায়। শীতের দেশ—তাই বাসের জানলাগুলো ডবল কাচের কপাট দিয়ে বন্ধ, দরজাও বাস চলবার সময়ে বন্ধ থাকে এবং ভিতরে heater চলে সাধারণ। দরজাগুলো যান্ত্রিক উপায়ে খোলে ও বন্ধ হয়, তার হাতল ড্রাইভারের হাতের কাছে। বাস থামিয়ে সে দরজা খুলে দেয় এবং সকল যাত্রীর ওঠা-নামা শেষ হলে দরজা বন্ধ করে তার পর গাড়ী ছাড়ে। বাস-ষ্টপে যদি বেশী লোক-সমাগম হয়, যাত্রীরা আপনা থেকেই লাইন করে দাঁড়িয়ে যায়, ঠেলাঠেলি করে ওঠবার দ্বারা এ দেশে নেই। যদি উঠে দেখা যায় যে বসবার জায়গা নেই, তবে বস দূর সম্ভব পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় যাতে দরজার সামনে ভীড় না জমে। ড্রাইভার বসে বসেই এ সব লক্ষ্য করে তার সামনের আয়নাতে। যদি দরজা পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে যায়, অতি ভয় ভাবে ড্রাইভার তাদের পিছনে এগিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করে।

সহরটি সুবিস্তৃত। তাই North-West, South-East প্রভৃতি ভাগে মোটামুটি প্রথমে বিভাগ করা হয়েছে। তার পর বিভিন্ন পাড়ার নাম আছে। আমরা North-West ভাগে বাস করছি। এই অংশে Dupont Circle একটি দোকান-বাজার-বহুল পাড়া; সেখানে আমরা প্রথমে নামলাম। একটি রেস্তোরাঁতে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করে অন্তর্য্যবৃত্তি করে হেতে হলো। তিনটে নাগাদ উনি Universityতে নেমে গেলেন, কাজ ছিল কিছু; আমি আমাদের আন্তানার ফিরে এলাম। কথা রইল যে Dupont Circleএর কাছেই এক জায়গায় আবার হটর সময়ে আমি আসব, উনিও তখন সেখানে থাকবেন। কাছেই এক সীরীসান্ রেস্তোরাঁয় ওয়াশিংটনবাসী ভারতীয়দের এক সাক্ষা-সংগম হতে আজ; আমরাও সেখানে বাব। দেশ ছেড়ে এসে দেশের লোকের সঙ্গে মেলবার আগ্রহ খুব ছিল। সন্ধ্যা বেলা সেখানে বীদের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁদের মধ্যে জন কয়েক মহিলাও ছিলেন; এক জনের নাম উল্লেখযোগ্য,—বনামখ্যাত অর্থনীতিবিদ্যা: জ্ঞানচাঁদের পত্নী। ডা: জ্ঞানচাঁদ এখানে আন্তর্জাতিক মনিটারি ব্যাঙ্কের ভারতীয় প্রতিনিধি। উদ্বলোকদের মধ্যে দু'জন

বাঙালীও ছিলেন। এঁরাও কেউ এম্বাসিসিতে আছেন, কেউ বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার ভারতীয় প্রতিনিধি বা কর্মচারী।

পরের দিন রবিবার, ছুটির দিন। আমরা সহর দেখতে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম ক্যাপিটল দেখতে। এই বৃহৎ ও জমকালো প্রাসাদটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর অধিবেশন হয়। অনেক বড় বড় স্বপ্নের করে সাজানো রয়েছে, এ দেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নানা ব্যক্তির মূর্তি, ছবি ইত্যাদি আছে। সে সব দ্রষ্টব্য স্ফটিকরূপে দেখাবারও বন্দোবস্ত আছে। ক্যাপিটলের প্রবেশ-দুখের রোটেগাম্ বা গোল ঘরটিতে চুকেই খোঁজ-খবর নিতে নিতে জানা গেল যে, প্রতি পনেরো মিনিট পরে পরেই এখান থেকে একেকটি guided tour বণ্ডনা হয়। দশ সেট্ (প্রায় পাঁচ আনা) দিয়ে টিকিট কিনে আমরা ১০:১৫ জন এক গাইডের অধিবর্ত্তী হলাম। যুবক গাইডটি বেশ সুরসিক ও সুবক্তা ছিল। সে প্রথমেই আমাদের দুষ্টি আকর্ষণ করল রোটেগামের ছাদের গম্বুজে ও দেওয়ালে যে-সব ছবি ঝাঁক। আছে তার দিকে। সেগুলো সব চমৎকার ফ্রেস্কো শোর্টিং। গম্বুজের কাচের উপরকার ছবিগুলো রঙীন, যে ধরণের ফ্রেস্কো ছবি আমরা দেশে,—শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায়—দেখেছি তেমনি। কিন্তু দেওয়ালের গায়ের ছবিগুলো দেখে খোদাই করা বলে মনে হয়—সেও না কি ফ্রেস্কোই। বার্মিভি নামক এক বিখ্যাত শিল্পীর ঝাঁক। এই সব ছবি। ভিতরেও নানা জায়গায় তাঁর ঝাঁক। ছবি দেখলাম।

প্রথমে যে ঘরে সেনেটের বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর সভা হোতো, আজকাল সভ্য-সংখ্যা বাড়তে সেখানে আর হয় না; অন্য বড় কক্ষে হয়। পুরানো সভাগৃহগুলোও দর্শকদের জন্য সাজানো আছে। House of Representatives-এর পুরানো সভা-কক্ষটি আসবাবহীন; একে বলা হোতো Hall of Whispers. কেন বলা হোতো গাইড, তা আমাদের বুঝিয়ে দিল। হলটার এক ধারে মেঝের উপরে এক জায়গায় একটি পিতলের চাক্তী বসানো রয়েছে। এই চাক্তীটির উপরের 'জায়গাটিতে থাকতো তদানীন্তন দলনেতা কুইন্সী অ্যাডামসের ডেস্ক। এই ঘরটির গঠন-প্রণালীর মধ্যে এমন দোষ ছিল যে, ঘরের মধ্যে কোনো জায়গায় ফিস্-ফিস্ করে কথা বললেও এই জায়গাটি থেকে তার প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট শোনা যেত, এখনো যায়। আমাদের সবাইকে সেই চাক্তীর চারি পাশে গোল হয়ে দাঁড়াতে বলে সে চলে গেল খানিকটা দূরে। প্রায় ১৪:১৫ হাত দূরে গিয়ে মাথা হেঁট করে চাপা-গলার সে কথা বলতে শুরু করল। আশ্চর্য্য, সেই কথার প্রত্যেকটি শব্দ বেন বেতারে করে আমাদের কানে তেমনি স্পষ্ট হয়ে পৌঁছতে লাগলো। বিভিন্ন দলের গোপন পরামর্শ সব প্রকাশ হয়ে পড়ে বসে এই সভাগৃহ অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। নূতন সভাগৃহে যেকোনো আইন পরিষদের মতো করে আসন ও ডেস্ক সাজানো। গাইড আমাদের এক গ্যালারীতে দাঁড়াতে বলে নীচে নেমে গেল এবং সভাভলে কোথায় কে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন তা নিজে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো। যুবকটির বাচনভঙ্গী সুন্দর, উচ্চারণও স্পষ্ট। আমেরিকানদের উচ্চারণ স্বাক্ষর সাধারণ ভাবেই ভিন্ন ছিল, কিন্তু



কার্যকালে খুব বেশী মুস্থিলে কখনো পড়তে হয়নি। Senate ও House of Representatives এর বর্তমান সভাগৃহ দু'টি ধ্বংস পড়বার উপক্রম হয়েছিল বলে steel frame structure দিয়ে তৈরী দেওয়া আছে। প্রথমে কক্ষ মধ্যে চুকেই তা নজরে পড়ে এবং অত্যন্ত কুংসিত মনে হয়। জানতে পারা গেল যে, এটাকে সুরক্ষা করে মেগামতের কোনো উপায়ই নেই।

এর পর President's room বলে একটা ঘর দেখাতে নিয়ে গেল, সে ঘরে সোনা-রূপার ছড়াছড়ি। একটা বাতির খাড়া আছে, তার খাড়া এবং উপরকার কাঙ্ক্ষার্থ্য সমস্তই খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী—একেবারে ২৪ ক্যারেট সোনার। দেওয়ালে বড় বড় আয়না রয়েছে, তারও ফ্রেম সোনা দিয়ে বানানো। সোনার চোখ ঝলসে যায়। মনে হয় আগে ছিল সোনার বাংলা, সোনার ভারত, এখন সোনার ভারতের সোনা শুধু তার সোনালী রোঙটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ; আসল সোনা সব এই দেশে। আমাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ থেকে এসে এ দেশের প্রাচুর্য দেখে অবাক হতে হয়। সেট সঙ্গে বখন অপচয়ও দেখি তখন কষ্ট হয়। আমরা প্রথমে এসে বখন হোটলে খেতাম তখন খাতের সঙ্গে যে পরিমাণ rolls বা কুটি দিত তা খেয়ে শেষ করতে পারতাম না; এবং সেগুলো পরিবেষণকারিণীরা এঁটো বাসনের সঙ্গেই নিয়ে যেত। কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য প্রেসিডেন্টের মিতানী হওয়ার আদেশ প্রচারিত হওয়ার কুটির অপচয় বন্ধ হোলো। ক্যাপিটলের আরো নানা কক্ষ ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রোঙেগামের নীচের তলাকার Crypt নামক নামক গৃহ। এখানে এ দেশের নারী-আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় তিনটি মহিলার মঞ্চর মূর্তি আছে; এঁদের নাম লুক্রেসিয়া মট, সুলান বি, এ্যান্টনী ও আনা ডিভেন্সন।

ঘটা দুই ঘুরে ক্যাপিটল দেখা শেষ করে আমরা ইউনিয়ন ট্রেনে গেলাম—বড়দিনের ছুটিতে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যাব, তার জন্ত টিকিট করার উদ্দেশ্যে। সেখানে 'কিউ' এত লম্বা যে, ঘটখানেক কার্টোলা টিকিট কেনার ব্যাপারে। অথচ আশ্চর্য নীরবতা। প্রকাণ্ড ওয়েটিং রুম, কত লোক—মেয়ে এবং পুরুষ—সারি-সারি বসে রয়েছে; দেওয়ালের ধারে-ধারে কত স্থলর স্থলর দোকান নানাবিধ মনোরম দ্রব্যে সাজানো; লোকে ঘোরাঘুরি কেনা-কাটা সবই করছে অথচ গোলমাল নেই। একমাত্র উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, লাউডস্পীকারে ট্রেনের ছাড়বার সময় ও তার গন্তব্য ট্রেনগুলোর নাম ঘোষণা। ওয়েটিং রুম থেকে প্র্যাকটর্সে ঢোকবার জন্ত আরেকটি সুপ্রশস্ত কক্ষের ভিতর দিয়ে যেতে হয়, সে ঘরটির নাম Concourse; এখন এই মস্ত ঘরখানি শূন্য, ট্রেনের সময়ে লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। অনেকগুলি প্রবেশ-পথ; প্রতি দরজার মুখে ২৫১০ হাত দীর্ঘ কিউ হয়। জীপ-পুরুষ সকলে নিজের নিজের স্ট্রটেকশ হাতে করে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে থাকে কত কণে একটু-একটু করে এগিয়ে দরজার কাছে পৌঁছবে; কিন্তু এই ভীড়ের সময়েও অস্বস্তি নীরবতা বিরাজ করে। সহস্র লোক-সমাগমের মধ্যেও এই নীরবতা সর্বত্রই আমাদের মুগ্ধ করেছে।

Smithsonian Institution ওয়াশিংটনের একটি বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। ইতিহাস, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, (natural science), নৃতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব—এ সব বিজ্ঞানেরও এখানে গবেষণা হয়; কাজেই সংশ্লিষ্ট বাছুরের বিশেষ ভাবে সাধারণের দর্শনীয়। সহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে বিরাট চিড়িয়াখানা আছে সেটিও বিশ্বসোনিয়ানেরই অন্তর্ভুক্ত। এর নৃতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ উইলিয়াম ফেটনের সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো। ঐ সব সঙ্গে অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এঁদের। আমার আসার খবর পেয়ে ফেটন-দম্পতি আমাদের নিয়ে যেতে এলেন। সহরের বাইরে ভার্জিনিয়া স্টেটে এঁদের বাড়ী, প্রায় মাইল দশেক দূর। তাঁদের গাড়ীতে সেখানে গেলাম বিকাল বেলা। লম্বা-চওড়া হাসিখুসী মানুষ ডাঃ ফেটন; একটু জোরে কথা বলেন, হো-হো করে প্রাণ-খোলা হাসি হাসেন। দিলদরিয়া মেজাজের লোক। গৃহিণী রোগা ও ক্ষাকাশে চেহারার, চুল বব-করা নয়, খোঁপা-বাঁধা। চেহারায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সহনশীলতা দুই ফুটে উঠেছে। তিনটি সন্তানের জননী—অল্পকণের আলাপেই বোঝা যায় যে, তারাই তাঁর জীবনের কেন্দ্র। আমরা বাঙালী মায়েরা সন্তানকেই জীবনে সব চেয়ে বড় স্থান দিই; কাজেই তাঁর সঙ্গে বেশ একটা যোগসূত্র পেয়ে গেলাম। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হোলো। বড় দু'টি আমার মেয়েদেরই বয়সী—দশ বছরের ও আট বছরের; ছোটটি মাত্র দু'বছরের। বাড়ীতে দাস-দাসী নেই; গৃহিণীর বিধবা মা আছেন এ-সংসারে। মা ও মেয়ে দু'জনে মিলে সংসারের ব্যবসায় কাজ করেন। বড় ছেলে-মেয়ে দু'টি স্থলে যায়। স্থল আট মাইল দূরে। বাড়ীতে গাড়ী আছে, ড্রাইভার নেই। মায়েরই কাজ গাড়ী করে ছেলে-মেয়েদের স্থলে নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে আনা; সেই সঙ্গে হাট-বাজারও করে আনেন। গাড়ী পরিষ্কার করার জন্তও অল্প লোক নেই, স্বামি-স্ত্রী দু'জনের মধ্যে যে কেউ করেন। রাগ্না-ঘরের ভার প্রায় সবটাই দ্বিধিমার উপরে। মধুর ও শান্ত স্বভাবের এই বয়সীকে দেখে বেশ লাগল। ছোট নাতিটিও অনেক সময়ে তাঁর কাছে থাকে বখন তাঁর মেয়ে বাইরে বেরোন। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গৃহকর্মকে এ দেশের লোক সহজ করে নিয়েছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, গ্যাসের উত্তুন, অটোম্যাটিক ইন্ড্রী—এ সব ছাড়াও এঁদের বাড়ীতে কাপড়-কাচার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দেখলাম। এটির একটু পরিচয় দিই। ঠ্যাণ্ডের উপরে একটি বৃহৎ আকারের গাম্বা, তার মধ্যে প্রকাণ্ড একটি বোল-মউনীর মত জিনিস। তার কিনারগুলো ধারালো নয়, চ্যাপ্টা। এ দেশে সর্বত্রই নিত্য-প্রবহমান উষ্ণ জল স্থলভ। গরম জলে গাম্বাটি প্রায় পূর্ণ করে তাতে কুচো সাবান ঢেলে স্নাইচ টিপে দিলেই সেই বিরাট মছনীটি ধীরে ধীরে ঘুরতে আরম্ভ করে। এক মিনিটের মধ্যে গাম্বার জলে সাবান স্তম্ভর ভাবে মিশে ফেনার ভর্তি হয়ে যায়। তখন স্নাইচ টিপে সেটা ধামিয়ে দিয়ে প্রয়োজন মত কাপড়-চোপড় গাম্বার ফেলে দিয়ে আবার স্নাইচ টিপে দিয়ে চলে বাও আধ ঘটা বা কুড়ি মিনিটের জন্ত। আন্তে আন্তে গরম সাবান-জলের মধ্যে কাপড়-চোপড়গুলিকে নেড়ে-চেড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৈজ্ঞানিক শক্তি বা করবে তা খোঁপার পাটে আঁছড়ানোর চেয়ে অনেক ভালো। তার পর এসে গাম্বা-সলার নিড়াবার যন্ত্র চালিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একেকটি কাপড়ের

একেক প্রান্ত ধরিয়ে দিলে কাপড়গুলো নিংড়ানো হয়ে গামলার বাইরে অল্প পার্শ্বে ধীরে ধীরে গিয়ে পড়ে। তার পর জল বেরোবার মুখ খুলে ময়লা জলটা গামলার বাইরে ফেলে দিয়ে আবার পরিষ্কার জল ভরে কাপড়গুলো ধরকার মত দ্বিতীয় বার তৃতীয় বার ধোয়া চলে। বৈদ্যাতিক শক্তি এ দেশে খুবই সম্ভা, আমাদের দেশের এক-চতুর্থাংশ। অথচ এ দেশের লোকের ক্রয়শক্তি আমাদের দেশের চেয়ে চতুর্গুণ। সুতরাং আত্মপাতিক হিসাবে এত সম্ভা যে, সর্বসাধারণে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে পারে। গৃহিণীদের গ্রহকর্মেও তাই দিন-দিনই সহজ হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া এ দেশে বাড়ীর পুরুষেরা গৃহকর্মে সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত। ডাঃ ফেটন বিকেলে কাজ থেকে ফিরে যখন স্নান করেন ছোট ছেলের নিত্য-স্নানও তখন বাশের সঙ্গেই হয়। ছোট বাচ্চার খাবার বক্কাট মাকে পোরাতে হয় না। এ রকম ভাবে যদি বিজ্ঞানের সাহায্য ও বাড়ীর পুরুষের সজাগ দৃষ্টি থাকে, তবে আমাদের মেয়েরাও খি-চাকরের সঙ্গে খালাপালা না হয়ে বচ্ছলে ও স্তচার রূপে গৃহকর্ম করতে পারেন।

ফেটন-পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অল্পকণেই ভাব হয়ে গেল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা বলস্বলভ প্রশ্নে তারা আমায় ব্যস্ত করে তুলল। আন্তে আন্তে তাদের সব কৌতূহল নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তাদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে তাদের মায়েদের সঙ্গে কথোপকথনে এসে পড়লাম। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁকে মোটামুটি বললাম। এ দেশের মত পাব্লিক এডুকেশনের ব্যবস্থা বৃটিশের আমলে আমাদের দেশে ছিল না; এখন স্বাধীন ভারতে লোকশিক্ষার বৃহৎ আয়োজনের উদ্যোগ-পর্ব আরম্ভ হয়েছে জেনে এই আমেরিকান মহিলা খুব আগ্রহান্বিত হলেন। অশ্রম-বিভাগের উদ্যোগের কথাই বিশেষ ভাবে বললাম। আমেরিকা যাবার আগে আমি নিজেও এই রকম একটি অশ্রম-বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম শুনে ফেটন-গৃহিণী প্রস্তুত করলেন যে, এ দেশের প্রাথমিক বিভাগের স্বরূপ দেখাবার জন্য তিনি এক দিন আমাকে নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েদের স্কুলে যাবেন। আমি সানন্দে সম্মত হলাম। কথা হোলো, স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে আমাকে জানাবেন। কথা-বার্তা ও গল্প-সঙ্গের মধ্যে ক্রমে আহারও সমাপ্ত হোলো। তার পর রাত্রি দশটার পরে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্য এঁরা স্বামিন্দ্রী হ'লেনই আবার চলে গেল গাড়ী নিয়ে। বাইরে বেরিয়ে দেখি খুব ঠাণ্ডা। সেদিন সাধা দিন টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়েছিল। রাত্রে পথে বেরিয়ে দেখি,

বৃষ্টির জল পথে ও পাশের জমিতে জমে বরফ হয়ে গেছে ও তাতে মশণ ও পাতলা একটি আবরণ হয়েছে। এই আবরণ বড়ই পিচ্ছিল, তাই খুব সাবধানে গাড়ী চালাতে হচ্ছিল।

সপ্তাহ খানেক পরে আবার নিমন্ত্রিত হলার ফেটনদের গৃহে। এবার সেখানে আমরা ছাড়া আরো তিন দম্পতি নিমন্ত্রিত ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের পরে আমার পাশে উপবিষ্টা Mrs. Oser নারী মহিলার সঙ্গে বিশেষ করে কথা-বার্তা হোলো। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য খুব ও নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। এক সময়ে কথোপকথনের মাঝখানে হঠাৎ বলে উঠলেন যে, আমি যেন তাঁকে Mrs. Oser না ডেকে তাঁর নাম ধরে ডাকি। আমেরিকানদের ধরণই এমনি, ভ্রমতার লৌকিকতাকে তারা অল্পকণের মধ্যেই পরিহার করে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে অভ্যস্ত। কিন্তু বয়সে অনেকটা বড় এক জনকে নাম ধরে ডাকতে আমাদের ভারতীয় সংস্কারে বাধে। আমি শীঘ্রই অলিভ (Mrs. Fenton) এর সঙ্গে বিভাগের দেখতে যাব শুনে গ্রেস্ আমাকে এ দেশের স্কুলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি বুঝিয়ে দিলেন। এ দেশের পাব্লিক স্কুলে মোটামুটি চারটে বিভাগ আছে। প্রথমে নার্সারী স্কুল; এখানে লেখা-পড়া শেখানো হয় না, কেবল শিশুকে কতগুলো অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া ও সম্বৎসর হয়ে চলা-ফেরা ও খাওয়া অভ্যাস করানো হয়। তার পর প্রামার স্কুল; এখানে ছয়টা শ্রেণী, সাধারণতঃ ছয় বৎসর থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত এখানে কাটে। তার পর হাই স্কুল,—লেখা-পড়া দু'টো ভাগ—জুনিয়র ও সিনিয়র। এতে আরো ছয় বৎসর কাটে। সাধারণতঃ আঠার বৎসরে স্কুলের পড়া শেষ হয়। স্কুলের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। অবশ্য স্কুলও দুই রকম আছে—Public School ও Private School। পাব্লিক স্কুলের ব্যয় সরকার বহন করেন এবং সেটাই ছাত্রী ও ছাত্রদের পক্ষে অবৈতনিক। প্রাইভেট স্কুলগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয় এবং বেশ উঁচু হাবেই নেওয়া হয়। স্কুলের শেষ পরীক্ষা পাশ করাকেও এখানে Graduation বলে। স্কুল থেকে গ্র্যাডুয়েট হয়ে বেরোবার পরে তিন বৎসরে বি-এ পাশ করা যায়। এম্-এ-র জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নিয়ম। কোথাও এক বছর, কোথাও দেড় বছর, কোথাও বা দু'বছর লাগে। তার পরে রিসার্চ বা গবেষণার জন্য দু'-তিন বৎসর তো লাগেই। এই হোলো মোটামুটি এ দেশে স্কুল-কলেজের বিভাগ-ব্যবস্থা।

[ ক্রমশঃ।

### প্রতিবিশ্বের ব্যঙ্গরূপ

“এক দিন আমি আমার এক বন্ধুর গৃহে বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলাম আমারই এক ব্যঙ্গরূপ। আমার সঙ্গে জড়ুত তার সাহুগ। একান্ত নিষ্ঠুর হ'লেও, কাকে ব্যঙ্গরূপ বলে তার অভিনব নমুনা দেখলাম। আবার দেখলাম সেই ব্যঙ্গরূপ নড়াচড়া করছে। অবশেষে দেখলাম, সেটি কোন মানুষ নয়, একটি আয়না। আর তাতে আমারই প্রতিবিম্ব।”

—জর্জ বার্নার্ড শ

# স্বাধীন ভারতে ইংরেজি শিক্ষার স্থান—৬

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

সম্বন্ধ, অগত্যা  
করিবার ব্যবস্থা  
করিয়াছিলেন, ভার-  
তীয় ভাষাকে কোন  
প্রশংসমান দৃষ্টিতে

সেদিন এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। ইনি বুদ্ধিমান, কৃতবিদ্য, কালাপানি পার হইয়া বিদেশ হইতে বিশেষ বিত্তা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে দেখা, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পরও হাসি-হাসি মুখ। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিতেই শুনিলাম, “আজ একটা মস্ত জিনিস লাভ হয়েছে। চিরদিন তো বাইরে বাইরে কাটালাম, আজ আমাদের এক বড় সাহেব অন্য এক জন বড় সাহেবকে অফিসের কাগজপত্র বা লিখেছেন, তাতে বুঝলাম আমরা ইংরেজি কত কম জানি। একটা নতুন শব্দ শিখলাম, কলকাতার বাইরে কখনই এ শব্দটা শেখার সুবিধা হোত না।” ভাবটা এট, জীবন সার্থক, একটা ইংরেজি শব্দ নতুন শিখিয়াছি।

বলিয়া রাগা ভাল, এই স্বীকারোক্তিতে মানসিক একটা ধাক্কা খাইলাম। ইংরেজি তো আমরাও পড়ি—এবং পড়াই; ইংরেজি সাহিত্য আমাদের নিত্য-পূজার বস্তু। তবু এতটা ভক্তি বরদাস্ত হইতে চাহিল না। মনে মনে গর্ভ-গর্ভ করিতে লাগিলাম।

অতীতের স্মৃতি; ছেলেবেলায় কি না করিয়াছি ইংরেজির জন্য। এখনও তো শৈশবের স্মৃতি One morn I met a lame man close to my farm—কামীরামদাসের অন্ততঃসমান কথার মত মন-প্রাণ জুড়িয়া আছে। বি-এল-এ রে কতবারই না জানি মুখ কুঁচিয়াছি। ‘জপ’ করিয়াছি বলিলেও অতুক্তি হইবে না।

এখনকার মায়েরা আসিয়া বলেন, ‘জানেন, বাংলা বাংলা করে কি হবে? আমার ছেলেমেয়েরা বাংলার চেয়ে ইংরেজি সহজে ধরে। আপনারা বাংলাটা একটু ছাড়ুন তো!’

চটগ্রামবাসী চাকর আসিয়া বলে, ‘বাবু, একটু পড়াননা শিখবো।’ বাংলার কথা বলিলে সে সবগে মাথা-নাড়িয়া জবাব দেয়—‘না বাবু, ইংরেজি শিখবো! তাহলে পরে কত কি হতে পারবো!’

চুপ করিয়া থাকি; নিজের মনেরও যে ছবি দেখি, তাহাতে আতকাইয়া উঠিবার কথা। নিজেও যে বাংলার চেয়ে ইংরেজি বই তাড়াতাড়ি পড়ি, ইংরেজি লেখা তাড়াতাড়ি বুঝি। বিষ কত দূর গড়াইয়াছে!

সভ-সমিতিতে বাই, মাতৃভাষার কথা বলি—তর্ক করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহারা কোহিনুর, তাঁহারা বলেন, ইংরেজি না শিখিলে জীবনে কোনও কালচার থাকিবে না, জ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিব না। রুবাব অবশ্য তখনকার মত দিই, ‘এখনকার মত চাবি তো পাইয়াছেন, চাকুরির প্রয়োজন ভিন্ন জ্ঞানের মন্দিরে পূজা করিবার জন্য যান কি?’ কিন্তু জবাব দেওয়া যথেষ্ট নয়, দেশের নেতৃবৃন্দের কৃতি ও বুদ্ধির ছবি সম্মুখে প্রসারিত—বুঝি, ‘আমরা মরিলে হবে দেশের কল্যাণ।’ এ যুগের লোকেরা (অন্ত অহিসাস ভাবে) লোকান্তরে গত না হইলে নব্যযুগ আসিবে না।

২

মনে পড়ে শ্রম আন্তোভেবের কথা। মাতৃমন্দিরে তিনি মঙ্গল-শব্দ বাজাইয়াছিলেন। কত আশা করিয়া তিনি মাতৃভাষাকে

দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত সংগঠনকর্ম করিরা গিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা আমরা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। প্রতি বৎসর নিয়মিত দিনে তাঁহার মর্ম-মূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহার মহত্ত্বের অমুখাবন করিতে বুধাই চেষ্টা করি। মাতৃভাষাকে তিনি তো কত স্নেহের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন, অবশ্যপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং মাতৃভাষার সম্যক বিকাশের জন্য সর্বজনীন আয়োজনও করিয়াছিলেন। দুঃখ রহিয়া গেল, ইউলিসিসের যুদ্ধ আর কেহ চালাইতে পারিল না। দুঃখই বা কিসের? এমনি না হইলে ইউলিসিস হইবেনই বা কেন? তাঁহার ‘জাতীয় সাহিত্যে’ মাতৃভাষার যে বন্দনা গভীর সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, বুঝি পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি ছাত্রসমাজের স্বাভাবিক ঔদাসীন্দ্বে তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হইতে পারিল না! প্রমুখপত্র বাংলায় করিতেই কত ব্যথা, কত বেদনা; এখনও আপত্তি, স্বাধীন ভারতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমুখপত্র বাংলায় হয় না।

তাঁহারও পূর্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে মাতৃভাষার আহ্বান শোনা গিয়াছিল। সেদিনকার স্বদেশী, বাংলার ভাষার উপর জোর দিয়াছিল; বাংলা ভাষার মনের কথা কবি গাতিতে পারিয়াছিলেন; মনসী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির তো কথাই নাই, শুনিয়াছিলাম স্বদেশী সাধনার উদ্যোগায় তখনকার তরুণ বিনয়কুমার মাতৃভাষার গৌরব অর্জনে প্রাণপাত করিবেন বলিয়া সভায় ছুটিয়াছিলেন। তখনকার প্রথম জোয়ারে বাঁহারা গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, হয়তো আপাতদৃষ্টিতে বৈষয়িক দিক দিয়া তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কি চেষ্টা করিয়াও সে জোয়ারের পথ রুদ্ধ করিতে পারিতেন? আমি বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথার কথা মনে করিয়া এ কথা বলিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের হল কাঁপাইয়া ‘ব্রতকথার’ বক্তৃতা শেষ করিয়া যখন রামেন্দ্রসুন্দর ‘বন্দনোত্তরম্’ বলিয়া উঠিলেন, সেদিনের কথা স্মরণ করিতেছি। গুরুদাস, আন্তোভেব, রামেন্দ্রসুন্দর—ইহাদের পৃথক করিয়া দেখিতেছি না, একই কালপ্রবাহের বিভিন্ন প্রকাশরূপে দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। সেদিন, আর এই দিন! কেন এমন হয়।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বাহার প্রেরণা দিয়াছিলেন, আন্তোভেব বাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মর্মার্থ উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার দূর-প্রসারিত দৃষ্টি বাঙ্গালীর শিক্ষার বাংলা ভাষার স্থান সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা কি আমরা মনে রাখিব না?

‘আমাদের এই ভীষণতা’ (বাংলা ভাষার উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে) “কি চিরদিনই থাকিয়া বাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোন দিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে বা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাধাই করিতে পারিয়াছে।

“অথচ জাপানী ভাষার ধারণা-শক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশী নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষার অপবিসীম। তা ছাড়া যুগোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার-প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে, এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উভোগী গুরু-সিংহ কেবল মাত্র লক্ষ্যকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। আপান জেব করিয়া বলিল, যুগোপের বিভাকে নিজের বাণী-মান্দবে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি হার ফসলাতি। আমরা ভরসা করিয়া এ-পর্বস্ত বলিতেই পাবিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিভার কসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।”

ইহা ১৩২২ সালের লেখা; আজ হইতে ৩৬ বৎসর পূর্বে। কিন্তু ‘শিক্ষার বাহন’ প্রবন্ধটি পড়া আজকার শিক্ষাসংকটের দিনে যতটা প্রয়োজনীয়, পূর্বে কখনও হয়তো ততটা হয় নাই।

### ৩

দীর্ঘ চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথও আপোষের কথাই ভাবিতেছিলেন, শিশুবিদ্যালয়ের বাহিরে যদি একটু জায়গা করিয়া লইয়া লোক-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা যায়; কিন্তু এমন সময়ে আসিল অদৃষ্টযোগ আন্দোলন এবং মহাস্বাক্ষীর ব্যাপক কর্মভাবনা। শুধু ঐক্যনৈতিক অধিকার নয়, স্বরাজের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও শিক্ষা-নিয়মক লক্ষ্য ও পাথের সকলই ভাবিয়া তিনি সমুখে অগ্ন্যস্তর হেঁতেছিলেন। পূর্ববর্তী কালে তাঁহার ‘বেসিক’ বা বুনিয়াদি শিক্ষার মূল সূত্র হইল, মাতৃভাষার শিক্ষা। হাতের কাজ হইবে হাতের মাধ্যম, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ভাব প্রকাশের ভাষা। সেই ভাষার বাহন দিয়া হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিশু—শুধু শিশু কেন, বয়স্কেরাও—শিক্ষা গ্রহণ করিবে। জাকির হোসেন চমটির রিপোর্টে মাতৃভাষার সাত বৎসরে শিশু কতখানি শিখিবে, হাতের নমুনা দক্ষতার উল্লেখ আছে; আর সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি হইল মাতৃভাষা, ইহা সেখানে প্রথমেই স্বীকার করা হইয়াছে। গান্ধীজী ঐশ্বর্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, পুস্তক-বিখ্যাপন যেন সে প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকিবে, তাহা হাতের ভাবনার মধ্যে ছিল না। আজ বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার বুনিয়াদি গান্ধীজীর পরিকল্পনায় সড়া দিয়াছে, হয়তো সে সড়া কোথাও ক্ষণ, কোথাও জোরালো; তবে সর্বত্রই বুনিয়াকে প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। আদর্শকে খর্ব করা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সর্বত্রই কেহ তো করে নাই। কিন্তু সর্বত্রই ঐ একই ভাষা—তাহা হইলে ইংরেজি ভাষায় কি হইবে! বেসিকে তো ইংরেজির স্থান নাই! চৌদ্দ বৎসর পূর্বস্ত বিদ্যার্থী ইংরেজি না শিখিয়া মায়ায় হইবে! সে রকম মায়ায় হওয়া কি চলে। আমাদের চিরান্তর পথে এ আবার কি বাধার সৃষ্টি হইল! গান্ধীজী ইহার দৃষ্টান্তে এতটুকু নড়চড় করিবার জো রাখেন নাই। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি হয়তো একটু-আধটু আলগা দিতে চাহিয়াছেন—বুনিয়াদি শিক্ষায় ইংরেজিকে সিনিয়র বেসিকে একটু বৈকল্পিক স্থান দেওয়ার বিধান দিয়াছিলেন, কিন্তু জুনিয়র-সিনিয়র, বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার এই পার্থক্যই যে বুনিয়াদীর

# ব হ ম ত্র সাতদিনেই আরোগ্য হয়।

যত জটিল বা দীর্ঘ দিনের হউক না কেন অধুনাতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভেনাস চার্ম ব্যবহার করিলে বহুমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। এই রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গসমূহ : যথা—অস্বাভাবিক তৃষ্ণা, ক্ষুধা, প্রস্রাবে অতিরিক্ত চিনি এবং চুলকানি প্রভৃতি। এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিলে কার্বাইক্ল, ফৌড়া, ছানি এবং অন্যান্য জটিলতা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক “ভেনাস চার্ম” ব্যবহার ক’রে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছে। ব্যবহারের পরের দিন থেকেই প্রস্রাব হইতে চিনি দূরীভূত হয় ও প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। মাত্র ২১৩ দিনের মধ্যেই আপনি যে অর্ধেকের বেশী নিরাময় হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খাদ্য-দ্রব্য সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ঔষধের বিবরণাদি সমাস্থিত বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তিকার জন্য লিখুন :—প্রতি ৫০টি ট্যাবলেটের শিশির মূল্য ৬৫০, ডাকমাশুল ফ্রি।

ভেনাস রিসার্চ ল্যাবরেটরী  
হইতে প্রাপ্তব্য।

পোষ্ট বক্স ৫৮৭, কলিকাতা (M.B.)

অস্থিতকর, সুতরাং ইংরেজি শিক্ষার এই বিকল্প-বিধান কাজে লাগানো ঠিক সুবিধার বলিয়া মনে হয় নাট।

এখন কথা হউল, ইংরেজি পড়ানো কি একেবারে তবে বাতিল করিয়া দিতে হইবে? ম্যাট্রিক পর্যন্ত, অর্থাৎ ইন্সুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত কি ইংরেজি না পড়িলেও চলিবে? আমাদের এখনও বহু দিন দরিদ্রা যে বাহিরের বিদ্যা-সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে?

ইংরেজি শিক্ষা আমরা বাহা পাইয়াছি তাহাতে লাভ যে কিছু হয় নাট এমন নহে; তবে লাভের চেয়ে ক্ষতি হইয়াছে বিস্তার বেশি। মালয়ের শিক্ষা কমিশনের স্যর জর্জ এণ্ডার্সন বহু দিনের অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াছিলেন—যে সব ডাক্তার কম্পাউণ্ডার ইংরেজি-পড়া, তাহারা নূতন অবস্থার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, আর বাহারা ‘হাতুড়ে’ অর্থাৎ ইংরেজি-পড়া নয় তাহাদের উপস্থিত বুদ্ধি থাকে, নূতন কিছু ঘটিলে দেখিলে তাহারা অস্থির হয় না। কথাটা আমাদেরও ভাবিয়া দেখিবার মত। বাহা হউক, স্বাধীনতার পর তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে, এখনো ইংরেজি রাজভাষার আদর পায় কেন? এখনো ইন্সুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় ইংরেজীতে ২৫০ নম্বর ও মাতৃভাষায় ২০০ নম্বর, এই বৈষম্য কেন? আই. এ., আই. এস. সি. পরীক্ষায় ইংরেজিতে ৩০০ ও বাংলায় ১০০ পূর্ণসংখ্যা,—কেন এমন হয়? বি. এ-তেও ঐ একই অবস্থা। জানি, আজ হউক কাল হউক ইংরেজির এই রাজবেশ খসিয়া পড়িবেই; কিন্তু দেশের লোককে তো সে জন্ত ব্যগ্র হইতেও দেখি না। শুনিতেছি, ব্যবস্থা হইতেছে—ইংরেজি ও বাংলার পূর্ণসংখ্যার মান বাহাতে সমান হয় তাহা করিবার; কিন্তু কল বড় ধীরে ধীরে নড়িতেছে।

বাংলার মাধ্যমে পড়াইতে গেলে বই কোথায় পাইব—এরূপ আপত্তিও কেহ কেহ করিয়া থাকেন; যদি আমরা এ বিষয়ে আগ্রহশীল হই, তাহা হইলে বই লেখানো ও ছাপানো মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। সামূহিক চোঁড়া চাই, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের সহযোগিতা চাই। না হইলে এ সব কাজ সম্ভব হইবে না। কবিত্ত্বের কথা শ্রবণ করিয়া বলি, জাপানে বাহা সম্ভব হইয়াছে, বাংলা দেশে তাহা আরও সহজ হইবে। সেই উৎসাহ চাই, বাহা মাতৃভাষার জন্ত মনে-প্রাণে দরদ্র অল্পভব করিবে। আমরা এখন ভাবি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বাংলায় কেমন করিয়া চলিবে? রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের উত্তর বহু পূর্বেই তাহার শিক্ষার বাহন প্রেরণে দিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজির স্থান তবে কোথায় থাকিবে? আমাদের পক্ষে

বিদেশের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিতে হইলে (এবং তাহা ব্যক্তি ও দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া রাখিতেই হইবে) কোন না কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে, ইংরেজিই যে সকলকে শিখিতে হইবে তাহা নয়, ফরাসি, জার্মান, বা অন্য কোনও প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় ভাষা শিখিতে হইবে; আর তাহা হওয়া উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ বিষয়। এ দেশের সঙ্গে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্কের কথা মনে করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইংরেজি শেখাই বেকীর ভাগ লোক পছন্দ করিবে। বাহারা বিশেষ করিয়া ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবেন, তাহাদের জ্ঞান ঐচ্ছিক পাঠ্যের ব্যবস্থা থাকিবে। এ জন্ত যদি পূর্ণমান ১০০ সংখ্যার বিষয় হিসাবে ইংরেজি অবশ্য-পাঠ্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ ও বি. এ, পরীক্ষার নির্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। সাহিত্যাত্মবর্গী ছাত্রের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ পাঠ্য থাকিবেই। এম. এ-র সম্বন্ধে তো নূতন ব্যবস্থা, কারণ সেখানে ছাত্র ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়িতেই আসিয়াছে। পূর্বকার প্রকৃতি একটু-আধটু কম হইলেও বুদ্ধিমান ও আগ্রহশীল ছাত্রের পক্ষে তাহাতে বিশেষ অন্ত্রবিধা হইবে না।

এ ছাড়া সাধারণ লোকের জন্ত Language School বা ভাষা বিদ্যালয় থাকিবে; সেখানে এক বৎসরে বা দুই বৎসরে ইংরেজি শিখাইবার ব্যবস্থা থাকিবে। এখনও ফরাসি, জার্মান, ইতালীয়ান প্রভৃতি শেখার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে ব্যবস্থা আছে। এবং বিদেশের লোকেরা এখানে আসিয়া বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা অল্প কালের মধ্যে শিখিয়া থাকে। হয়তো ইহাতে সাধারণ ইংরেজি আমরা এখন বাহা বলি বা শিখি, তাহার চেয়ে ভুল হইবে; কিন্তু এখনও বাহা বলি তাহা তো খুব নির্ভুল নয়; তবে তাহাতে এমন কি আর আসে-বায়? I cockroach on your time বলিলেও সময় ও শক্তির হিসাবে তাহাতে কাজ চলিয়া বাইবে, এবং ইংরেজি না শিখিলেও জ্ঞান-মন্দিরের দরজা সর্বসাধারণের পক্ষে বন্ধ থাকিবে না।

কিন্তু এ সব কথা কাহাকে বলি! মনে পড়িল, সেদিনও ভোলা কুলিকে গুমা ঠেগনে মাল বহিতে বহিতে চাঁৎকার করিতে শুনিয়াছি—‘অংগ্রেজী নেহি পড়না!’ লোকে শুনিয়া হাসিয়াছে, পাগল বলিয়াছে। স্বাধীনতা লাভ আমাদের পক্ষে ঠিক হয় নাট, এ কথা যদি কেহ বলেন তবে এখন আর প্রবল ভাবে আপত্তি করিব না, আপত্তি করিবার যুগ নাট।

### কোনান ডয়েলের পরিচয়

স্বর্গত শ্রম আর্থার কোনান ডয়েল একবার একটি ট্যান্সিতে চেপে প্যারিসের এক হোটেলে পৌছলেন। ট্যান্সির চালককে গাড়ীর ভাড়া মিটিয়ে দিতেই চালকটি বলিল,—‘আপনার দয়া ডয়েল।’

—‘তুমি আমার নাম কোথা থেকে জানিলে?’ জিজ্ঞেস করলেন ঐ খ্যাতিমান লেখক।

—‘আমি কাগজে দেখলাম যে, আপনি অন্য ফ্রান্সের দক্ষিণ থেকে এখানে আসছেন।’ বিবৃত করলে চালকটি,—‘আপনার সাধারণ

আকৃতি দেখলেই মনে হয় আপনি এক জন ইংরেজ। আপনি বোধ হয় গত হপ্তায় আপনার চুল ছেঁটেছেন। আর, বোধ হয়, যে নাপিতের কাছে ছেঁটেছেন সে ঐ ফ্রান্সের দক্ষিণের কেউ?’

—‘আশ্চর্য!’ শালক হোমসএর স্রষ্টা বললেন,—‘আর কিছু প্রমাণ আছে তোমার জানা?’

—‘কিছু নেই’, উত্তর করলে চালক—‘শুধু আপনার মালপটে লেখা আপনার নাম ছাড়া।’

বাংলা সাময়িক-পত্রের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত  
বারে ছয় বৎসরের (ইং ১৮৬৮—৭৩) মধ্যে যতগুলি  
সাময়িক-পত্রিকা জন্ম লাভ করে, দেখা যাইবে পরবর্তী পাঁচ বৎসরে  
শতাব্দী-মধ্যস্থল হইতে তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক সাময়িক-পত্রের উদ্ভব  
হইয়াছিল।

ইং ১৮৭৪

১১৮। হাবড়া হিতকরী (সাপ্তাহিক) : জামুয়ারি (?)

১৮৭৪।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ইহাতে মাঝে মাঝে লিখিতেন। এক বার  
তিনি 'হাবড়া হিতকরী'তে হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিনী' সমালোচনা  
করিয়া দেখাইয়া দেন যে, "হেমবাবুর 'কেন বা হইবে জানি, পুরুষের  
শত টান' ইত্যাদি বায়রণের 'Man's love of man's life  
is a thing apart' (Don Juan, canto I) ইত্যাদির  
অনুবাদ।"

১১৯। হরবোলা ভাঁড় (মাসিক) : জামুয়ারি  
১৮৭৪।

বিল্যভী Punchএর অনুকরণে ব্যঙ্গচিত্র সম্বলিত মাসিকপত্র।  
"বঙ্গভাষায় এটি একটি নূতন পদ্ধতির কাগজ।" পরিচালক—  
পূর্ণাঙ্গাস ধর।

১২০। বসন্তক (মাসিক) : ৩১ জামুয়ারি ১৮৭৪।

'হরবোলা ভাঁড়'ের স্থায় এখানিও একখানি শ্রেয়স্বক মাসিক  
পত্রিকা। প্রতি সংখ্যায় 'পাণ্ডের' অনুকরণে তিন-চারখানি ব্যঙ্গ  
চিত্রোচিত্র থাকিত; চিত্রগুলি বোধ হয় নিমন্তলা-নিবাসী গিরীন্দ্র-  
কুমার দত্ত-অঙ্কিত। প্রাণনাথ দত্ত 'বসন্তক' সম্পাদন করিতেন  
বলিয়া মনে হয়।

১২১। ভ্রমর (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮১।

সম্পাদক—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদর  
দ্বন্দ্বের দিখিয়াছেন, "পত্রখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; ...এখন আবার  
ইহার তেজবিনী প্রতিভা পুনরুদ্ধার হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি  
একটি ভ্রমরের সমস্ত শব্দ লিখিতেন।" ইহা ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা  
(আষাঢ় ১২৮২) পর্যন্ত চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়। অনেকে  
জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমর'র "নূতন পর্যায় ১ম  
দণ্ড ১ম সংখ্যা" ও পরবর্তী আশ্বিন মাসে ২য় সংখ্যা প্রকাশিত  
হইয়াছিল।

১২২। আর্য্যদর্শন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮১।

সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ বিজাভূষণ। "জ্ঞান ও নীতির চর্চা  
এ প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।" এই সুপরিচালিত উচ্চ শ্রেণীর  
মাসিকপত্রখানি এগার বৎসর (১২১২ সাল) চলিয়া তিরোহিত  
হয়। ইহার ৫ম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ সালে  
প্রতির হইয়াছিল।

১২৩। ভারত শ্রমজীবী (মাসিক) : বৈশাখ  
১২৮১।

বর্তমানগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।  
পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ :—"সামাজ্য লোকদিগের জ্ঞান  
বিস্তারের বেশে কোন সচিত্র পত্রিকা নাই। এই অভাব দূর  
করিবার জন্য আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই

## বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-(২)

ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাখানি বাহির করিতে আশ্রয় করিলাম। কাহিকর,  
দোকানদার ও কৃষক প্রভৃতি সামাজ্য লোকদিগের চরিত্র ভাল  
করিবার জন্য বাহা আমাদের আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে  
প্রকাশিত হইবে।"

১২৪। গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী (পাক্ষিক...) :  
বৈশাখ ১২৮১।

গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত। আসামের রাজনীতি রাজকার্য্য  
প্রভৃতির আলোচনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। নানা কারণে  
দিনকতক বন্ধ থাকিবার পর ১২৮২ সালের শেষার্ধ্বে সাপ্তাহিক  
আকারে ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়।

১২৫। আজীজন নেহার (মাসিক) : বৈশাখ  
১২৮১।

ভগলী কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবকের চেষ্টায় চুঁচুড়া হইতে  
ইহার প্রচার আরম্ভ হয়। সম্পাদক—মীর মশাবুদ্দফ হোসেন।

১২৬। সাহিত্য কুসুম (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮১।

ভগলী বুধোদয় যন্ত্র হইতে বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক  
প্রকাশিত।

১২৭। ভারত দর্পণ প্রকাশিকা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮১।

সাধারণের হিতার্থে বিনামূল্যে বিতরিত।

১২৮। পরিদর্শক (সাপ্তাহিক) : ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ৮টি জ্যৈষ্ঠ হইতে  
প্রকাশিত হইবে—এইরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল।

১২৯। বাঙ্কব (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮১।

ঢাকা হইতে 'বঙ্গদর্শন'ের আদেশে মূল্য মূল্যের এই পত্রখানি  
প্রচারিত হয়। ইহা একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্র। সম্পাদক—  
কালীপ্রসন্ন ঘোষ। রমেনচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' প্রথমে ইহাতেই  
স্থান লাভ করে। 'বাঙ্কব' অনিয়মিতভাবে দীর্ঘকাল চলিয়াছিল।  
ইহার বিভিন্ন খণ্ডগুলি এইভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম বর্ষ ১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র

২য় বর্ষ ১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র

৩য় বর্ষ ১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র

৪র্থ বর্ষ ১২৮৫

৫-৬-৭ম বর্ষ ১২৮৭, ১২৮৮, ১২৮৯

৮ম বর্ষ ১২৯১

৯ম বর্ষ ১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)-১২৯৩

(কার্তিক-চৈত্র)

১০ম বর্ষ ১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা

১১ম বর্ষ ১২৯৫, ১ম-২য় (?)

(নব পর্যায়) ১ম বর্ষ ১৩০৮, ফাল্গুন-১৩০৯, মাঘ

২য় বর্ষ ১৩১০, বৈশাখ-চৈত্র

৩য়-৪র্থ বর্ষ ১৩১১, ১৩১২

৫ম বর্ষ ১৩১৩, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

১৩০। বাঙ্গালী পুষ্টিয়ান (মাসিক) : জুন ১৮৭৪।

পরিচালক—রজনীকান্ত বিশ্বাস।

১৩১। হিন্দুবিজ্ঞানী (মাসিক) : ৪ শ্রাবণ ১২৮১।

কাঁটালপাড়া হটতে প্রকাশিত। সাহিত্য রচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি স্থান পাইত। সম্পাদক চুঁচুড়া মিশন বিজ্ঞানপত্রের সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রকাশক—প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৩২। প্রজ্ঞা (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮১।

বিনামূল্যে বিক্রিত। ১২ নং বউবাজার স্ট্রীট হটতে ইহা প্রকাশিত হইত।

১৩৩। হিন্দুজ্ঞান (মাসিক) : শ্রাবণ (?) ১২৮১।

“দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্কার, শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।” এই উপকারী পত্রখানি শিক্ষাবিদগণ, হিন্দু বিজ্ঞানপত্র হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দু ব্যায়াম বিজ্ঞানপত্রের অধীন হিন্দুসভার সম্পাদক।

১৩৪। কুমুদিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮১।

চুঁচুড়া হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৫। সহোদর (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮১।

যুক্তিয়ান, মুর্শিদাবাদ হটতে প্রকাশিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারকে পরিহাস করিবার জন্য ইহার আবির্ভাব। সম্পাদক—অম্বুজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা।

১৩৬। সরোজিনী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮১।

শান্তিপুর গোলামীপাড়া হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিহারিলাল গোলামী।

১৩৭। উচিত বক্তা (পাক্ষিক) : ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।

মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রালয় হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—গঙ্গাচরণ বেন্দ্যোপাধ্যায়।

১৩৮। প্রতিধ্বনি (সাপ্তাহিক) : ৭ই আশ্বিন ১২৮১।

কলিকাতা ১১ নং কলেজ স্ট্রীট হটতে প্রকাশিত। প্রধান প্রধান সাংবাদিকের সহিত সম্মিলিত কয়েক জন মূললেখক দ্বারা পরিচালিত।

১৩৯। বাঙ্গালি (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮১।

ময়মনসিংহ হটতে প্রকাশিত। স্বাধিকারী ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষক, ‘তেলেনা’ কাব্য-রচয়িতা অনন্মচন্দ্র মিত্র। জীনাথ চন্দ্র ‘বাঙ্গালি’ সম্পাদন করিতেন বলিয়া জানা যায়।

১৪০। চিকিৎসা-সংবাদ (মাসিক) : আশ্বিন ১৭১৬ শক।

“চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বিষয়পূর্ণ মাসিকপত্র।” চিকিৎসক-সম্প্রদায়ের মুখপত্রও বটে।

১৪১। হিতবোধ (মাসিক) : ৩১ আশ্বিন ১২৮১।

ভাঙ্গামোড়া হটতে প্রতি সাত্তাহিক দিন প্রকাশিত। সম্পাদক অক্ষিপাণ্ডে গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া স্কুলের হেডমাস্টার।

১৪২। সমদর্শী or The Liberal (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক ত্রিভাষিক পত্র। রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ মনীষিবর্গের গুরুপত্র রচনা ইহাতে স্থান পাইত।

১৪৩। দর্শক (সাপ্তাহিক) : ৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১।

সাহিত্য-বিষয়ক পত্র ও সমালোচন।

১৪৪। দর্শক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

সাহিত্য-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন, কলিকাতা জগদীশচন্দ্র গুপ্ত দ্বারা হটতে অবিনাশচন্দ্র নিরুপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪৫। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

চুঁচুড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হটতে প্রকাশিত। ইহা বিভাগিত, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্যধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইত। প্রত্যেক কবির সংগ্রহ জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার ইত্যাদিও সম্মিলিত হইত। সম্পাদক—সারদাচরণ মিত্র, অক্ষপাণ্ডে সরকার, বন্দ্যোপাধ্যায় মিত্র।

১৪৬। হিন্দু দর্পণ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮১।

বোড়াল হটতে সম্পাদক নারায়ণদাস তপস্বী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৪৭। কুমুদ বাসু (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮১।

১৪৮। ভাবত হিতৈষিনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮১।

কলিকাতা স্বপ্নাবধি যন্ত্রে মুদ্রিত ও বিনামূল্যে বিক্রিত।

১৪৯। সত্যপ্রকাশ (পাক্ষিক) : পৌষ ১২৮১।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হটতে প্রকাশিত।

১৫০। পারিল বাক্যবহ (পাক্ষিক) : পৌষ (?) ১২৮১।

ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত পারিল হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অনিচ্ছদীন আহম্মদ।

## ইং ১৮৭৫

১৫১। সুদর্শন (মাসিক) : পৌষ ১২৮১।

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ধর্মনীতি-বিষয়ক মাসিকপত্র। পরিচালক—গোপালচরণ মিত্র।

১৫২। প্রভাত সমীর (দৈনিক) : ১৫ মাঘ ১২৮১।

সম্পাদক—খ্যাতনামা সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত। শ্রীমন্তাগবতের অনুবাদক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকালে একবারি উৎকৃষ্ট সাংবাদিক; অর্থাভাবে মাস-চারেক পরেই প্রকাশিত হয়।

১৫৩। বঙ্গহিতৈষিনী (পাক্ষিক) : মাঘ ১২৮১।

কলিকাতা কালীবাট হটতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্কবিহারী সায়্যাল।

১৫৪। বিচারক (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮১।

‘ভালিশহব পত্রিকা’র লেখকগণ কর্তৃক কলিকাতা ভিক্টোরিয়া যন্ত্র হটতে এই ইংরেজী-বাংলা ত্রিভাষিক পত্র প্রকাশিত হয়। পর বৎসর বৈশাখ মাসে ইহা ‘সমাজ-দর্পণ’ের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

১৫৫। দুর্লভ—অনাথবন্ধু (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮১।

অনাথবন্ধু ঠাকুরের নামে পত্রিকাখানির নামকরণ হইয়াছিল।

১৫৬। হিন্দু দর্পণ (পাক্ষিক) : ১৫ চৈত্র ১২৮১।

‘পত্রের নাম ‘হিন্দু দর্পণ’ রহিল। ইহাতে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশিত রহিয়াছে। আমরা হিন্দু সন্তানদিগের সমুদয় ছবি

এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব।" সম্পাদক—বোড়ীচরণ মিত্র (২৭ গ্রে স্ট্রীট)।

১৫৭। বিবীয়া পত্র (মাসিক) : ৪ এপ্রিল ১৮৭৫।

'বিবীয়া পত্র' বা Berean Leaves কলিকাতা ট্রাস্ট সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্মমূলক পত্রিকা। সম্পাদক—ডঃ এস. সি. ঘোষ।

১৫৮। সুস্বপ্ন (সাপ্তাহিক) : ১ বৈশাখ ১২৮২।

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা হইতে প্রকাশিত।

১৫৯। রাজসাহী সমাচার (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮২।

করচমারিয়া বাজসাহী হইতে বেগীমাধব নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত। পদ্মায় এক বৎসর।

১৬০। ভূতম। (সাপ্তাহিক) : ১২ বৈশাখ ১২৮২।

"ভূতমের নিবেদনে" প্রকাশ :— "সামাজিক লোবালোম উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম্ম।...সমাজ সংস্কার এবং ভারতভূমির উন্নতি সাধনই আমার একমাত্র সম্বন্ধ। প্রেলোভন ও ভয় আমার অভিদ্ভানে নাই।" সম্পাদক—'এই কলিকাল' (ব্যঙ্গকাব্য)-রচয়িতা রাধামাধব হালদার, আতিরিটোলা।

১৬১। সাম্বালনী (সাপ্তাহিক) : ২৮ বৈশাখ ১২৮২।

কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত। সাত-আট মাস পরে 'প্রতিধ্বনি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৬২। প্রতিবিন্দু (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

সম্পাদক—বামসরস্বত বিজ্ঞানদ্রষ্টা, ভূতপূর্ব 'বঙ্গলতিকা'-সম্পাদক, মোট্রাপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক। 'প্রতিবিন্দু' একতানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা ও ২য় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র' প্রকাশিত হইয়াছিল। পরবর্তী অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাবানি 'জ্ঞানস্বরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'জ্ঞানস্বর ও প্রতিবিন্দু' নাম ধারণ করে।

১৬৩। বিনোদিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

"ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত" এই নামে বৃটার গ্রাম-নিবাসী 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীপূরে অবস্থানকাল বহু জগন্নাথপ্রসাদ গুপ্তার (ছোট তরুণের দ্বারা অন্তর্গত) পোষ্যপুত্র) আত্মকৃত্যে 'বিনোদিনী' প্রকাশ করেন। অনেকে ইহাকে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকারূপে উল্লেখ করিয়া ভুল করিয়াছেন।

১৬৪। বঙ্গমহিলা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

"বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগর্ভ ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সকল উপভার দেওয়াই" ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদক—ডাঃ ভুবনমোহন সরকার, প্যারীচরণ সরকারের জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৬৫। ত্রিভৈবিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দীননাথ সেন।

১৬৬। প্রিয়দর্শন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

পরিচালক—গোদাপল্লী-নিবাসী ভদ্রনাথপ্রসাদ পাল।

১৬৭। শুভাকাঙ্ক্ষী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

পরিচালক—বেগীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৮। ভারতবর্ষীয় আর্থ পত্রিকা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮২।

হরিনাভিহ ভারতবর্ষীয় আর্থসভার দুমপত্র। "আর্থবন্ধু বন্ধু, প্রচার ও কার্যস্থ জাতির কৃত্রিম প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—গোপাললাল বসু বর্মা।

১৬৯। মধুমক্ষিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮১।

গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।

১৭০। রাজসাহী বাসী (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ (১) ১২৮২।

রাজসাহী, করচমারিয়া-নিবাসী রত্নকুমার সরকার ইহা প্রকাশের আয়োজন করিয়াছেন—ইহাতে প্রধানতঃ ইতিহাস, রাজনীতি-সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রস্তাবের অনুবাদ, সমালোচনা প্রভৃতি থাকিবে—সংবাদপত্রে এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

১৭১। রত্নাকর (সাপ্তাহিক) : আষাঢ় ১২৮২।

সম্পাদক—নিবারণচন্দ্র গুপ্ত।

১৭২। মধুকর (সাপ্তাহিক) : শ্রাবণ ১২৮২।

সম্পাদক—উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

১৭৩। ঢাকা দর্শক (সাপ্তাহিক) : ২১ শ্রাবণ ১২৮২।

ঢাকা হইতে ১ পরমা মূল্যে প্রচারিত।

১৭৪। ঠাঁর অব, ইশ্টিয়া বা ভারত নন্দন (সাপ্তাহিক) : শ্রাবণ (১) ১২৮২।

বিভাষিক—ইংরেজী-বাংলা পত্রিকা।

১৭৫। অনাধিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮২।

আজিমগঞ্জ বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া মুলিয়ান হইতে প্রকাশিত। 'অনাধিনী'ই প্রকৃত পক্ষে মহিলা-পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্পাদিকা—খাকমণি দেবী, সম্ভবতঃ 'সহোদর'-সম্পাদক অক্ষুণ্ণচন্দ্র চাট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধা।

১৭৬। অরূপ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮২।

"বাহ্যরূপ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—ডাঃ হরিশ্চন্দ্র শর্মা, বউবাজার।

১৭৭। মানসমোহিনী (মাসিক) : ভাদ্র (১) ১২৮২।

সম্পাদক—সীতানাথ ঘোষ।

১৭৮। ভিখারিণী (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮২।

কলিকাতার কাঁসারিপাড়া কেন হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭৯। প্রমোদী (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮২।

ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা হইতে প্রকাশিত।

১৮০। সুধাকর (মাসিক) : কার্তিক ১২৮২।

সম্পাদক—বহরমপুর-নিবাসী ব্রজবনচন্দ্র সরকার।

১৮১। সুব্রাহ্মণ্য ভ্রমণ বিবরণ (সাপ্তাহিক) : ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২।

"প্রিয় অব ওয়েলসের ভারতবর্ষ ভ্রমণের ইতিহাস পুনর্বার পর্য্যন্ত সাহিত্যিক বিবরণ" সচিত্র আকারে প্রকাশ করিয়া ভ্রমণ-ঘটনাটি চিরস্মরণীয় করণ ও রাজভক্তি প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। সম্পাদক—রাধামাধব হালদার, আতিরিটোলা।

১৮২। জীবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ (সাপ্তাহিক) : ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫।



“প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-ভ্রমণ-সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিবরণযুক্ত সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। ‘The Native Edition of the Royal Tourist.’ সম্পাদক—‘যৌবনে যোগিনী’-রচয়িতা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৩। ভারতমিহির (সাপ্তাহিক) : ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অনাথবন্ধু গুহ।

১৮৪। জ্ঞানদীপিকা পত্রিকা (সাপ্তাহিক ?) : ১৭১৭ শক।

সম্পাদক—কালীচন্দ্র জাতিড়ী। ১৮৮২ সনে ইহা ‘শিবদায়িকা পত্রিকা’ নাম ধারণ করে।

### ইং ১৮৭৬

১৮৫। একাকিনী (মাসিক) : মাঘ ১২৮২।

সম্পাদক—যশোদানন্দন সরকার।

১৮৬। বঙ্গীয় ভাণ্ড (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২৮২।

সম্পাদক—উপেন্দ্রলাল মিত্র।

১৮৭। হিন্দু তিত্তাকাল্পী (মাসিক) ফাল্গুন (?) ১২৮২।

সম্পাদক—নিতোন্দ্রনাথ সাকাল।

১৮৮। তোমিওপেথি (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮২।

সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

১৮৯। বীদরামী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮২।

১৮৮০ সনের আগষ্ট মাসে ইহা ‘বঙ্গরহস্য The Bengal Punch’ নাম ধারণ করে।

১৯০। বিহার দূত (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮২।

বাকিপুর হইতে প্রকাশিত।

১৯১। মূর্শিদাবাদ প্রতিনিধি (সাপ্তাহিক) : চৈত্র ১২৮২।

মূর্শিদাবাদ হইতে প্রচারিত।

১৯২। প্রতিকার (সাপ্তাহিক) : চৈত্র ১২৮২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। ‘মূর্শিদাবাদ প্রতিনিধি’র প্রতিদ্বন্দ্বীকরণে ইহার আবির্ভাব।

১৯৩। চুখক নজীর (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৩।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। “হাইকোর্টে নিম্ন মৌকদমার চুখক নজীর ইত্যাদি সংগৃহীত” হইত।

১৯৪। ভারত-সুন্দর (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৩।

ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। “রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর—জামাশ্রয় বায়চৌধুরী ও বিধুভূষণ গুহ।

১৯৫। বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেট (সাপ্তাহিক) : ১১ আষাঢ় ১২৮৩।

“গবর্ণমেন্ট ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিপোর্ট নামক রাজকীয় পত্রের বাঙ্গালাভাষ্য এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় উক্তি-সারসঙ্কলন ও নতুন নতুন সমাচার” ইহাতে স্থান পাইত। প্রকাশক—রাধামাধব হালদার, আহিরিটোলা।

১৯৬। ধর্মপ্রকাশ (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৩।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

১৯৭। মেদিনীপুর সমাচার (মাসিক...) : শ্রাবণ ১২৮৩।

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। ছয় মাস পরে ইহা পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়।

১৯৮। আদর্শ (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৩।

সম্পাদক—মদনমোহন মিত্র।

১৯৯। ব্যবসায়ী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৩।

“কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।” সম্পাদক—শ্রীনাথ দত্ত, আগার ঝাড়ুয়েট, লণ্ডন। ১২৯১ সালে ‘ব্যবসায়ী’র ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়।

২০০। বিজ্ঞান দর্পণ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৩।

“বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র।”

২০১। ভারত-ভাতি (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৩।

বর্ধমান হইতে প্রকাশিত।

২০২। ত্রিহট্ট প্রকাশ (পাক্ষিক) : আশ্বিন ১২৮৩।

সম্পাদক—প্যারীচরণ দাস।

২০৩। মিত্রোদয় (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৩।

সম্পাদক—হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়। পটলডাঙ্গার প্রাকৃত বঙ্গ হইতে প্রকাশিত।

২০৪। চিত্রকর (মাসিক) : কার্তিক ১২৮৩।

ফরিদপুরের অধীনস্থ উলপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রতাপচন্দ্র রায়চৌধুরী।

২০৫। মনোহরা (পাক্ষিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

ইহাতে কেবল কবিতাই স্থান পাইত। পরিচালক—গগনচন্দ্র দে।

২০৬। বিশ্বব্রহ্ম (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৭৬।

২০৭। দিবাকর (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৩।

বর্ধমান হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাজেন্দ্রলাল সিংহ।

২০৮। ত্রিপুরা পত্রিকা (পাক্ষিক) : পৌষ ১২৮৩।

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত।

২০৮ক। সঞ্জীবনী (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৭৬ (?)।

সম্ভবতঃ এই বৎসরেই শ্রীঅমলচন্দ্র হোমের পিতা গগনচন্দ্র পঞ্চদশ (জন্ম : ১-৪-১৮৫৬) ময়মনসিংহ হইতে ‘সঞ্জীবনী’ নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিনি ‘জীবন-মুখতি’তে বলিয়াছেন :—‘ভারতমিহির’-সম্পাদক অনাথবন্ধু গুহ-মহাশয়ের নিকট আমার সংবাদপত্রে লেখার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। বখন ময়মনসিংহ জেলা স্থলে পড়ি, তখন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ্র মহাশয়ের সাহায্যে, ‘সঞ্জীবনী’ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করি; আমিই তাহার প্রধান লেখক ছিলাম। ময়মনসিংহের ‘সঞ্জীবনী’কে কলিকাতার ‘সঞ্জীবনী’র অগ্রজ-বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—।

### ইং ১৮৭৭

২০৯। দুর্বাশা (মাসিক) : মাঘ ১২৮৩।

সম্পাদক—তুলসীদাস দে।

২১০। জ্ঞানদীপিকা (মাসিক) : মাঘ ১২৮৩।

বর্ধমান জেলার সোনাঝুড় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাখালদাস হাজরা।

২১১। কুসুম (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৩।

নসীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মৈত্র।

২১২। বঙ্গহিতৈষী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (৭) ১২৮৪।

২১৩। কুশাহ পাক্ষিক পত্রিকা : বৈশাখ ১২৮৪।

২১৪। আধ্যাত্মিকতা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৪।

সম্পাদক—রায়না-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

২১৫। সর্বার্থদায়িনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৪।

“প্রাচীন-শাস্ত্র-প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচিকা।”

সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র কর।

২১৬। সমাজবন্ধন (সাপ্তাহিক) : ৩ আষাঢ় ১২৮৪।

“সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাপ্তাহিক পত্র ও সমালোচন।” সম্পাদক—ফকিরচাঁদ বসু, অ্যান্টিস্টিক সার্জন।

২১৭। আধ্যাত্মিকতা (মাসিক) : আষাঢ় (৭) ১২৮৪।

২১৮। নববার্ষিকী : ১২৮৪ সাল (জুলাই ১৮৭৭)।

“বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদ্বিগের সংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত” বার্ষিক পুস্তক। সম্পাদক—হারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২১৯। বঙ্গমিত্র (মাসিক) : আষাঢ় (৭) ১২৮৪।

২২০। ভারতী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৪।

“ভারতী উদ্বেগ যে কি, তাহা তাঁহার নামেই সপ্রকাশ।

ভারতীয় এক অর্ধ বাণী, আর এক অর্ধ বিজ্ঞা, আর অর্ধ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাবার আলোচনাই

আমাদের উদ্বেগ। বিজ্ঞাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং ভাবসুধী। উভয়েরই সাধ্যাহুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্বেগ। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব।”—সম্পাদকের ভূমিকা।

দ্বিজেননাথ ঠাকুর প্রথম সাত বৎসর স্তম্ভভাবে ‘ভারতী’ সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্মানে ‘ভারতী’র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইত। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্পাদকগণের নাম ও কাৰ্য্যকাল এইরূপ :—

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ১২৮৪, শ্রাবণ—১২৯০                    | ... দ্বিজেননাথ ঠাকুর           |
| ১২৯১—১৩০১                            | ... স্বর্ণকুমারী দেবী          |
| ১৩০২—১৩০৪                            | ... হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী, |
| ১৩০৫                                 | ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর          |
| ১৩০৬—১৩১৪                            | ... সরলা দেবী                  |
| ১৩১৫—১৩২১                            | ... স্বর্ণকুমারী দেবী          |
| ১৩২২—১৩৩০                            | ... মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও     |
|                                      | সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়     |
| ১৩৩১—১৩৩৩ আশ্বিন                     | ... সরলা দেবী                  |
| ২২১। জ্ঞানভেদ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৪। |                                |

সুন্দর ডিজাইন ও  
নিখুঁত শ্রব

এ দুয়ের সমন্বয়

—গোঁড়ে



বেঙ্গল ফটো টাইপ কোঃ

সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত

৪৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা - ৯ ফোন ১৭০২ বি.বি

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—চন্দ্রমোহন সেন।

২২২। সুধাকর (পাক্ষিক) : ভাদ্র ১২৮৪।

সম্পাদক—হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২২৩। কোচবিহার মাসিক পত্রিকা : আশ্বিন ১২৮৪।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রঞ্জিনারায়ণ কুমার।

২২৪। ধর্মপ্রচারক (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৪।

মুন্সের আধ্যাত্মপ্রচারিণী সভার উৎসাহে প্রতি পূর্ণিমায় এই বাংলা-ভিত্তি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। “আধ্যাত্মের প্রতিষ্ঠা রক্ষা ও প্রচার” ধর্মপ্রচারকের উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (পরে, কৃষ্ণানন্দ স্বামী)।

২২৫। ভারত-চিকিৎসক (মাসিক) : কার্তিক ১২৮৪।

চৌমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র দত্ত।

২২৬। পথিক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৪।

সম্পাদক—রাজনারায়ণ চক্রবর্তী।

### ইং ১৮৭৮

২২৭। হিতৈষী (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৮।

“হিতৈষীর আদর্শ স্বর্ণ হইতে অবতীর্ণ ঐশিক পুরুষ খ্রীষ্ট।

সেই আদর্শকে সন্মুখ রাখিয়া হিতৈষীর তাৎপর্য বক্তব্য প্রকাশিত হইবে।” সম্পাদক—গ্যারীমোহন রুয়।

২২৮। হিন্দুললনা (পাক্ষিক) : মাঘ ১২৮৪।

বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত, মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় পাক্ষিক পত্রিকা।

২২৯। কালনা প্রকাশ (সাপ্তাহিক) : মাঘ (?) ১২৮৮।

২৩০। কমলিনী (মাসিক) : মাঘ ১২৮৪।

সম্পাদক—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী।

২৩১। বিবদর্শন (দৈনিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪।

সম্পাদক—সাকুটিগড়-নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সোম। ইহা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হইত।

২৩২। সমালোচক (সাপ্তাহিক) : ৬ ফাল্গুন ১২৮৪।

“পত্রিকাখানির দু’টি উদ্দেশ্য আছে, একটি মুখ্য ও অপরটি গৌণ। মুখ্য উদ্দেশ্যটি কেশব বাবুর কস্তুর বিবাহ লইয়া আলোচন করা ; গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তব্রজন করা।” সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী (প্রথম দুই-তিন সংখ্যা), পরে স্বরকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

### দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন :

১৮৭৮ সনের ১৪ই মার্চ ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। “দেশভাষার সংবাদপত্রসমূহের নিরক্ষরতা নিবারণ করা এই আইনের উদ্দেশ্য।”

এই আইনের ফলে কোন কোন বাংলা সাময়িক-পত্রের (বধা, ‘সোমপ্রকাশ’) প্রচার সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গীয় সরকার ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’র (তৎকালে বাংলা-ইংরেজী সাপ্তাহিক) প্রতিও প্রসন্ন ছিলেন না। রাজরোধ হইতে আশ্রয়কার

জন্ম পত্রিকা-সম্পাদক এক কৌশল অবলম্বন করিলেন ; তিনি পরবর্তী ২১এ মার্চ হইতে ‘অমৃত বাজার পত্রিকা’কে পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী সাপ্তাহিক পাত্রে পরিণত এবং এপ্রিল মাস হইতে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ প্রকাশ করেন।

২৩৩। আনন্দবাজার পত্রিকা (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

“অমৃত বাজার পত্রিকা ইংরাজি হওয়ার, তাহার স্থলে উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষদিগের প্রতিজ্ঞামতে এইখানি প্রবর্তিত হইয়াছে।... এখানি নামান্তরিত ভূতপূর্ব বাঙ্গলা অমৃত বাজার পত্রিকা মাত্র।” ইহাই প্রকৃত পক্ষে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র ১ম পর্যায় ; এই নামে বর্তমানে যে পত্রিকাখানি সগৌরবে চলিতেছে তাহা “নব পর্যায়”।

২৩৪। বীণা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

“নানাবিষয়িনী কবিতাপ্রসবিনী” পত্রিকা। ইহাতে বাংলা গানের স্বরলিপি, গ্রন্থসমালোচন ও গল্পাদিও মাঝে মাঝে স্থান পাইত। বহু খ্যাতনামা লেখক ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সম্পাদক—রাজকুমার রায়। ‘বীণা’র বিভিন্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম খণ্ড ... ১২৮৫, বৈশাখ-চৈত্র ... আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত

২য় খণ্ড ... ১২৮৬, বৈশাখ-চৈত্র ... এ

৩য় খণ্ড ... ১২৮৮, বৈশাখ ... বীণা যন্ত্রে মুদ্রিত

৪র্থ খণ্ড ... ১২৯৩, কার্তিক—১২৯৪, আশ্বিন ... এ

২৩৫। বালকবন্ধু (পাক্ষিক...) : ২০ বৈশাখ ১৮৭০ শক।

বালক-পাঠ্য সচিত্র পাক্ষিক পত্র, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কেশবচন্দ্র সেন।

এই উৎকৃষ্ট পত্রখানি কিছু দিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৮১, ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইহা মাসিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও কিছু দিন পরে তিরোধান ঘটে এবং ১২৯৩ সালে ১ম ভাগ পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের বৈশাখ মাসে ‘বালকবন্ধু’র “নতুন প্রকরণ” মাসিক আকারে আবির্ভূত হইয়াছিল।

২৩৬। প্রকৃতি-রঞ্জন (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

“সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক মাসিকপত্র প্রকাশসাধারণের পাঠ্য।” সম্পাদক—শারদাচরণ মিত্র, এম-এ, বি-এল।

২৩৭। কোমুদী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

রঙ্গ চূর্ণাপুর (ময়মনসিংহ) হইতে মহারাজ শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের আশ্রয়প্রাপ্ত প্রকাশিত “বিবিধ সঙ্গীত ও নানাবিষয়িনী কবিতাবিকাশিনী মাসিক পত্রিকা।” সম্পাদক—রঞ্জিতকান্ত ঠাকুর।

২৩৮। উৎকল-সমুখ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৫।

২৩৯। বর্দ্ধমান সঙ্গীতবীণী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৮৫।

বর্দ্ধমান প্রেস হইতে প্রকাশিত।

২৪০। পরিচাটিকাক (মাসিক) : ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত একখানি উচ্চাঙ্গের দ্ব্যপাঠ্য মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—ভাই প্রতাপচন্দ্র মল্লিকদার।

কয়েক বৎসর পরে 'পরিচাটিকাক' পরিচালনের ভার পড়ে—আর্য্য নারীসমাজের উপর। সমাজের পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ মোহিনী দেবী ১২১৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে পত্রিকাখানির সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৩০২ সালের বৈশাখ হইতে ময়ূভক্তের মহারানী সুরচাক দেবী কিছু দিন এবং তাঁহার সহোদর্য মণিকা দেবী শেষ এক কি দুই বৎসর পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ভাবে ২৮ বৎসর চলিয়া 'পরিচাটিকাক'র প্রচার রহিত হয়।

১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কুটবিহারের রাণী নিকম্মা দেবী সচিত্র আকারে নব পথায় 'পরিচাটিকাক' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২৪১। তত্ত্ব-কৌমুদী (পাক্ষিক) : ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮০০ শক।

কেশবচন্দ্রের দল ভাঙ্গিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'র সৃষ্টি হইলে সমাজের মুখপত্রস্বরূপ এই পত্রিকাখানির উদ্ভব হয়। সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী। 'তত্ত্ব-কৌমুদী' এখনও জীবিত আছে।

২৪২। সূহন (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৫।

দিনাকপুর ভাটপাড়া উন্নতি-সাধিনী সভা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারণবন্ধু শর্মা।

২৪৩। কল্পক্ৰম (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৫।

উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' ইহাতেই প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরমাণু ৫ বৎসর। সম্পাদক—দ্বারকানাথ বিদ্যাকরণ।

২৪৪। পঞ্চা-নন্দ (মাসিক...) : ভাদ্র ১২৮৫।

স্বনামধন্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চুঁচুড়ার সাধারণী যন্ত্র হইতে 'পঞ্চা-নন্দ' নামে "একটি সরল রেখা কর্তৃক সম্পাদিত রস-প্রধান পত্র ও সমালোচন" প্রকাশ করেন। ১ম সংখ্যা প্রকাশের পর পৃথকেকুর মত ইহা সাহিত্যাকাশ হইতে সহসা অদৃশ্য হয়।

১৮৭১ সনে ইন্দ্রনাথ কিছু দিনের জন্ত ভবানীপুরে বাসা করেন। এষ্ট সময়ে স্থানীয় যুবকবৃন্দ—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ভূধর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি 'পঞ্চা-নন্দ' পুনঃপ্রকাশের জন্ত তাঁহাকে

ধরিয়া বলিলেন। পুনর্জীবিত 'পঞ্চা-নন্দ' এবার দেড় বৎসর এই ভাবে চলিয়াছিল :—

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| ১ম কাণ্ড : ১ম সংখ্যা (পাক্ষিক), ভবানীপুর | ১৬ মাঘ ১২৮৬ |
|                                          | (১১-১৮০)    |
| ১১শ সংখ্যা (মাসিক), বর্দ্ধমান            | ১২৮৭ সাল    |
|                                          | (১১-১৮১)    |
| ১২শ সংখ্যা " " "                         | "           |
|                                          | (৮-২-৮১)    |
| ২য় কাণ্ড : ১ম সংখ্যা " " "              | "           |
| ৩য় সংখ্যা " " "                         | ১২৮৮ সাল    |
| ৪র্থ সংখ্যা " " "                        | " (৩-৮-৮১)  |
| ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা " " "                     | " (২-৬-৮২)  |

'পঞ্চা-নন্দ' সত্য-সত্যই "জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরস ব্যঙ্গ, তীব্র বিদ্রূপ এবং পবিত্র আমোদের খনি" ছিল। ইহাতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গচিত্রও থাকিত।

২৪৫। চন্দ্রশেখর (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৫।

চট্টগ্রাম হইতে কালীকুমার তর্কভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত।

২৪৬। আধ্য-প্রদীপ (মাসিক) : কার্তিক ১২৮৫।

সুন্দর দুর্গাপুর হইতে প্রকাশিত। "সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনার্থ" সম্পাদক, কলিকাতা ঠাকুর।

২৪৭। বঙ্গদর্পণ (মাসিক) : কার্তিক ১২৮৫।

ত্রিপুরা, পোষ্ট টাউন হইতে কার্তিক মাসে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

২৪৮। আধ্য বিদ্যা সুরানিধি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৫।

বাংলা সংস্কৃত পত্রিকা। সম্পাদক—ব্রজনাথ দ্বিভারত ও ব্রজব্রত সামাধ্যায়ী।

২৪৯। দিবাকর (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৭৮।

বীরভূম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দক্ষিণাঞ্জন মুখোপাধ্যায়। পর-বৎসর রাজবোম্বে ইংগর মৃত্যু হয়। 'সোমপ্রকাশ' (৩-৫-১৮৮০) লিখিয়াছিলেন :—"দিবাকর নামে আমাদের সহযোগী একখানি সমাচারপত্র ছিল। [১৮৭১ সনে] সোমপ্রকাশের মৃত্যু হইলে তিনি আমাদের সশক্ততা কব্রাতে গবর্ণমেন্ট তাঁহারও প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।"

### সাক্ষী সাক্ষী

সাক্ষীকে জেরা করছেন জজ। সাক্ষী তাঁর পাশে ঝাঁড়িয়ে আছে। জজ ভিজেন্স করলেন,—তুমি তোমার পবিত্র শপথ করে বলছো যে, এই হস্তাক্ষর তোমার নয় ?

জজের হাতে একখানি কাগজ। তাতে হস্তাক্ষর। সাক্ষী হস্তাক্ষর লক্ষ্য করে খানিক ভেবে বললে,—হ্যাঁ হজুর।

জজ আবার বললেন,—এটা তোমার হাতের লেখা নয় ?

—না। সাক্ষী উত্তর দেয়।

জজ বললেন,—এই হাতের লেখার সঙ্গে কি তোমার হাতের লেখার কোন মিল দেখতে পাচ্ছে ?

—না। সাক্ষী বলে।

জজের সন্দেহ যায় না। তিনি বললেন,—তুমি তোমার পবিত্র শপথ করে বলছো যে, এই লেখার সঙ্গে তোমার হাতের লেখার কোন মিলই নেই ?

—হ্যাঁ, হজুর। সাক্ষী উত্তর দেয়।

জজ বিরক্ত হয়ে বললেন, এ লেখার সঙ্গে তোমার লেখার কোন ধরনের একটা মিলও দেখছে না ?

—না, হজুর। সাক্ষী উত্তর করে। নিশ্চয় নয়।

জজ তখন বললেন, তুমি নিশ্চয় করে বলছো কি থেকে ?

সাক্ষী তখন বললে, আমি যে লিখতেই জানি না হজুর।

# রক্তপ্রয়াগের নরখাদক চিতা

(সারাংশ)

জিম করবেট

এক আতঙ্কের কাহিনী—ভিমালায়ের পাদদেশে অবস্থিত গাডোয়ালের অধিবাসীদের দীর্ঘ আট বছর এই আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। পাঁচ শত বর্গমাইল স্থান জুড়ে চলেছিল এক নরখাদক চিতার অভিযান আর এই অভিযানে প্রাণ দিয়েছিল একশ' পঁচিশ জন হতভাগ্য। অতিশয় সম্ভরণে সে চাকাত তার কুটিল আক্রমণ, বাড়ীর নিরাশয় আশ্রয় থেকে সে তুলে নিয়ে যেত তার শিকারকে। তাকে মারবার সকল প্রচেষ্টা সে ব্যর্থ করে দিয়েছিল—বুলেট, কঁচা বা বিষ কিছু দিয়েই তাকে কাৎ করতে পারা যায়নি। শেষে গাডোয়ালের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার সার উইলিয়াম ইবটসন “দি মানি ইটার্স অফ কুমায়ুন” এর বিখ্যাত শিকারী মেজর করবেটকে আহ্বান করেন। মেজর করবেট দু'বছর ধরে রক্তপ্রয়াগের এই নরখাদকের অনুসরণ করেন এবং শেষে দশ সপ্তাহব্যাপী অবিরাম চেষ্টার পর তাকে বধ করেন।

নরমাংসের প্রতি এই চিতা বাঘটির লালসা কি করে জন্মাল? তার কারণ এই—১১১৮ সালে ভারতে ইংল্যান্ডের ভীষণ প্রকোপ হয় এবং তাতে দশ লক্ষের অধিক লোক মারা যায়। গাডোয়ালীরা হিন্দু। মৃত ব্যক্তিকে তারা নদীতীরে দাফ করে। কিন্তু লোক যখন দলে দলে মরতে আরম্ভ করে, তখন আর দাফ করা সম্ভব হয় না। তখন তারা মৃতের মুখে একপাশ অঙ্গস্ত অঙ্গার দিয়ে মৃতদেহটি পাহাড়ের উপর থেকে নীচে উপত্যকায় নিক্ষেপ করে। এই ভাবে নিক্ষেপ মৃতদেহ থেকেই রক্তপ্রয়াগের চিতা বাঘটি প্রথম নরমাংসের

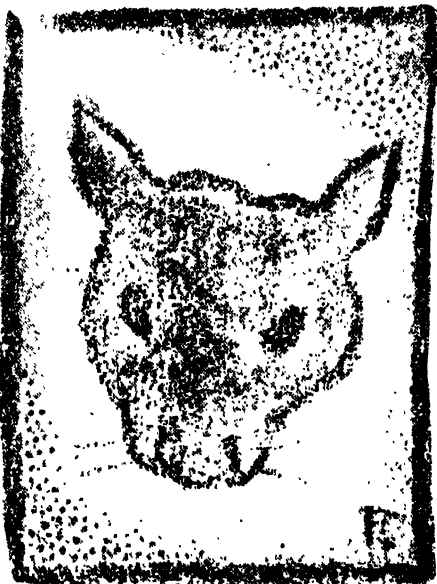
খাদ পায়। তার পর সে মাংস মারার কৌশলটি বেশ ভাল ভাবেই আয়ত্ত করে। কয়েক জন নিশ্চিত ব্যক্তির মধ্য থেকে সে এক জনকে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যেতে আরম্ভ করে। রাজে চাবীরা দরজা তার খাবার আচড়ের শব্দ শুনে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এইরূপে চলে পুরো আটটি বছর। এই আট বছর সন্ধ্যার পর কেউ বাড়ি থেকে বেরতে পারতো না, ভয়ে রাজে কেউ জানলা পর্যন্ত খুলতো না। কেউ কেউ সাধুদের দোষ দিত। হাজার হাজার লোকের বিশ্বাস ছিল, আক্রমণকারী চিতা বাঘ নয়, আসতে শয়তান—উপদেবতা। শেষে জিম করবেট প্রমাণ করেন, এই শয়তান আর কেউ নয়, অমিত শক্তিশালী এবং অতিশয় দুষ্ট আঁকুট লম্বা এক চিতা বাঘ।

করবেট সাহেব লিখছেন—“নিহত রমণীর স্বামীর মুখে সব স্তন্যলাভ। রাজির আচারের পর তার স্ত্রী বাসনগুলি পরিষ্কার করা জন্ত দরজার কাছে যায়। সেখানটা একটু অন্ধকার ছিল। কিছুক্ষণ সাড়া-শব্দ না পেয়ে স্বামী দরজার কাছে গিয়ে দেখে কেউ কোথা নেই। চীৎকার করে ডেকেও কোন উত্তর না পেয়ে সে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে বললে, ‘অন্ধকারের মধ্যে মৃতদেহ সন্ধান করতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে কি লাভই বা হত!’ কথাটা স্বদয়ই হলো মুক্তি অকাট্য। আমি অবশ্য তার দুঃখের আসল কারণ পা জানতে পারলাম। তার স্ত্রী ছিল আসন্নপ্রসবী। চিতা বাঘে আক্রমণের পর তার গর্ভস্থ পুত্র-সন্তানকে দেখতে পাওয়া যায় স্ত্রীর জন্ত যত না হোক, সন্তানের জন্ত তার দুঃখ হয়েছিল সচেষ্টে বেশী।

একটি ক্ষেতের এক ধারে একটি খাদের মধ্যে মৃতদেহটি পড় ছিল। ক্ষেতের অপর প্রান্তে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে একটি পত্রহী বাদাম গাছ। এই গাছের শাখাগুলির উপর ছিল একটি খণ্ডে গান। এটা ছিল মাটি থেকে চার ফুট উঁচুতে আর খড়ের গাদাটি উচ্চতা ছিল প্রায় দু'ফুট। আমি এই খড়ের গাদার উপর অবস্থানে সন্ধান করলাম।

মৃতদেহের কাছ থেকে একটা সূক্ষ্ম পথ খাদের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে। এই পথের উপর রয়েছে চিতা বাঘের খাবার চিহ্ন। আর যে চিতাটি দুই রাত্রি আমার পিছু নিয়েছিল, ঠিক তার খাবার চিহ্নের অমূর্তরূপ। চিহ্নগুলি থেকে বোঝা গেল যে, বাঘটির আঁক খুবই বড় এবং সে পুরুষ। তার পিছন দিকের বাঁ পায়ের খাবার চিহ্ন বিকৃত—চার বছর আগে তার এই পায়ের গুলী লেগেছিল।

আমি গ্রাম থেকে দু'টো আঁকুট লম্বা মোটা বাঁশ ও মৃতদেহের কাছে সেই খাদের পথের উপর পুঁতে দিলাম। বাঁশের সঙ্গে আমার একটি রাইফেল ও একটি শট গান বেশ ঠাণ্ডা রাখলাম। ট্রিগারের সঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতো দিয়ে বেঁধে সূতো ও একটু দূরে দু'টি খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য



বাঘটা এই পথে আবার নিশ্চয়ই আসবে এবং যদি কোন ক্রমে স্ত্রীর টান পড়ে তাহলে রাইফেল ও শট গানের স্বতঃস্ফূর্ত গুলীতে সে নিহত হবে। আর যদি সে অল্প পথে আসে আর মৃতদেহ ভক্ষণের সময় আমি যদি তার উপর গুলী চালাই, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে খাদের পথ দিয়ে পালাতে হবে। আর খাদের পথে গেলেই তাকে ফাঁদে পড়তে হবে। বাত্রের অন্ধকারে বাঘ বা মৃতদেহ কিছুই দেখা যাবে না। এ ক্ষণ গুলী করার দিক ঠিক করার জন্য একখণ্ড সাদা পাখর এনে মৃতদেহ থেকে এক ফুট দূরে রেখে দিলাম।

সূর্য তখন অস্তায়মান। এক দিকে গঙ্গার উপত্যকা, অল্প দিকে ভূবারমণ্ডিত হিমালয় এবং তার উপর অস্তায়মান সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ণ শ্রী ধারণ করেছে। চোখ যেন আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এ দৃশ্য ভাল করে উপলব্ধি করার আগেই অন্ধকার নেমে এল। নৈশ অন্ধকারে পাহাড় উপত্যকা সব ঢুবে গেল।

রাত্রির অন্ধকারের কোন নির্দিষ্ট সজ্জা নেই। কারো কাছে সামান্য অন্ধকারকে ঘন অন্ধকার বলে মনে হয়। আমার কাছে রাত্রির অন্ধকারকে অন্ধকার বলে মনে হয় না। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে রাত্রিতে আমি বেশ দেখতে পাই। দিনের মত স্পষ্ট দেখতে না পেলেও জঙ্গলের মধ্য দিয়েও চলতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

বাঘটিকে লক্ষ্য করার সুবিধা হবে বলে আমি মৃতদেহটির কাছে সাদা পাখর রেখেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম! সন্ধ্যা হতে না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল। খাদের মধ্যে একটা পাথর পড়ান শব্দ পেলাম আর তার এক মিনিট পরেই আমি যেখানে বসেছিলাম তার নীচের খড়ের উপর খস-খস শব্দ হল। বুঝলাম বাঘ এসেছে। আমি খড়ের গাদার উপর বসে জলে ভিজতে লাগলাম আর সে অর্থাৎ চিত্তা বাঘটা নীচে শুকুনো খড়ের মধ্যে আরামে সময় কাটাতে লাগলো।

এত প্রবল ঝড় আর কখনো দেখিনি। দেখলাম, সেই ঝড়ের মধ্যে কে এক জন একটা ঠাঠন নিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। লোকটার সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে জানতে পারলাম যে, সরকার আমাকে রাত্রিতে শিকারের জন্য যে বৈজ্ঞানিক টর্চ দেবার প্রতিক্ষিত দিয়েছিলেন, লোকটি পাউরি থেকে তিরিশ মাইল হেঁটে সেই টর্চ নিয়ে আসছিল। তিন ঘণ্টা আগে যদি এই টর্চটা পেতাম তাহলে.....কিন্তু দুঃখ করে লাভ নেই। এর পর যে চোদ্দ জন লোক চিত্তা বাঘটার হাতে প্রাণ দিল তারা বাঘের মুখে না পড়লেও যে আরও অধিক দিন বাঁচতো, সে কথা কে বলতে পারে? আর বৈজ্ঞানিক টর্চ যদি ঠিক সময়ে পেতাম, তাহলেও যে বাঘটাকে মারতে পারতাম, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

বাই হোক, বৃষ্টি তখনই থেমে গেল কিন্তু আমি শীতের কাপতে লাগলাম। আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে সাদা পাখরটা নজরে পড়ল। কিন্তু চঠাৎ সামনে কিছু পড়ায় পাখরটা আর দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরেই স্তন্যতে পেলাম চিত্তা বাঘটা আহায়ে যন দিয়েছে। দশ মিনিট পরে সাদা পাখরটা আবার দেখা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাচার নিচে একটা শব্দ হল। দেখলাম

কিন্তু হৃদয়ে রংএর একটা বস্তু খড়ের গাদার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার চলার শব্দটা একটু অদ্ভুত ধরনের—ঠিক যেন কোন মহিলার বেশমী পোষাকের খসখস শব্দের মত।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিলাম। ঠিক করলাম, যে মহুর্ন্তে সাদা পাখরটা আঁড়াল পড়বে ঠিক সেই মহুর্ন্তেই গুলী করবো। কিন্তু একটা ভারি রাইফেল আর বতরুণ কাঁধে রাখা যায়। সেই রাইফেলটা কাঁধ থেকে নামিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পাখরটা আবার আঁড়াল হল। দু'ঘণ্টার মধ্যে এই-রকম আরও তিন বার হল। চতুর্থ বার যখন বস্তুটা আমার মাচার নীচে এল তখন আর আমি থাকতে না পেরে গুলী করলাম। পরদিন সকালে দেখলাম, যেখানে গুলী করেছিলাম, সেখানে চিত্তা বাঘের ঘাড়ের কয়েক গাছা রোঁয়া পড়ে আছে।

রাত্রির ব্যর্থতার পর পাহাড় থেকে নেমে রক্তপ্রয়াগে বাবার সময় আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ব্যায়াম, গরম জল আর খাত দুর্ভাবনা অনেকটা দূর করে দেয়। গরম জলে স্নান করে এবং প্রাতঃরাশের পর ভাবনা অনেকটা কেটে গিয়ে মাথাটা সাক্ষ হয়ে গেল। ভেবে দেখলাম, বাঘটাকে মারার সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে, কারণ এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিক টর্চ আমার হস্তগত। কিন্তু কথা হচ্ছে, বাঘটা অলকনন্দা অতিক্রম করেছে কি না। আমার ধারণা হল যদি সে অলকনন্দা অতিক্রমণ করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে বোলান সেতুর উপর দিয়েই গেছে। এই খবরটা সংগ্রহ করার জন্য প্রাতঃরাশের পর বেরিয়ে পড়লাম।

রক্তপ্রয়াগ সেতুতে পৌছবার পথ তিনটে। একটা উত্তর দিক থেকে, একটা দক্ষিণ থেকে আর একটা বাজার থেকে পারে-চলা পথ। পথগুলি পরীক্ষার পর সেতু পার হইলাম। কেদারনাথ যাবার পথ দিয়ে আধ মাইল পথ্যন্ত এগিয়ে গেলাম। ভাল ভাবে পরীক্ষার পর বুঝতে পারলাম যে, বাঘটা নদী অতিক্রম করেনি। তখন আমি সেতু দুইটি রাস্তা বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা কাণ্ডাকরী করতে মনস্থ করলাম। সেতু-রক্ষকরা সহযোগিতা করলে আমার পরিকল্পনা সফল হতে বাধ্য। নদী পারাপারের একমাত্র অবলম্বন সেতু বন্ধ করে দেওয়া অন্তায় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অন্তায় হয়নি। কারণ আমাদের মহামান্য চিত্তার সাক্ষ্য আদেশ আরীর যলে কেউ স্বেচ্ছা থেকে স্বেচ্ছায়নের মধ্যে সেতু ব্যবহার করে না।

কাঁটার কোপ দিয়ে সেতু দু'টি বন্ধ করে দেওয়া হল। সেতুর বাম তীরে একটা টাওয়ার ছিল। কুড়ি ফুট উঁচু টাওয়ার আর তার শীর্ষদেশে একটি বেলার মত ছিল। বাঁশের মই দিয়ে তার উপর উঠতে হল। এই টাওয়ারের উপর আমাকে কুড়িট রাত কাটাতে হয় সেতু পাহারা দেবার জন্য। এক-এক সময় এমন ঝড় দিত, যে, মনে হত বৃষ্টি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে ৬০ ফুট নীচে অলকনন্দার বরফ-জলে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, কুড়িট রাতের মধ্যে একটা শেরাল ছাড়া আর কাউকে সেতু অতিক্রম করতে দেখা যায়নি।

সেতু পাহারা দেবার সময় ইবটন ও তাঁর স্ত্রী জীন পাউরি থেকে এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁদের বাংলা ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের উপর তাঁবু খাটলাম। আশ্চর্য্যের জন্য তাঁবুর চার দিকে

কাঁটার বেড়া দেওয়া হল। তাঁবুর ঠিক উপরে একটা মস্ত বড় গাছের কয়েকটা ডাল এসে পড়েছে। তাঁবুর মধ্যে আমরা আট জন ছিলাম। রাত্রির আহার শেষ হলে কাঁটার বেড়ার যে কীক দিয়ে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, তা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, গাছের ডালের সাহায্যে চিত্তা বাঘটা অনায়াসে আমাদের তাঁবুর মধ্যে আসতে পারে। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। যদি চিত্তা বাঘের হাত থেকে একটা রাত রক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে পরের দিন গাছটা কেটে ফেলা যাবে এই ঠিক হল।

আমার বিছানা থেকে ঠিক এক গজ দূরে আমার পাচক আর তার পাশে নৈনিতাল থেকে নিয়ে আসা ছ'জন গাড়েয়ালী তাল পাকিয়ে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ পরেই আমার পাচকটি নাক ডাকাতে শুরু করলো। পাঁচ থেকেই ছিল আমাদের বিপদের আশঙ্কা আর সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চন্দ্রালোকিত রাত্রি। হঠাৎ মার্স রাডে চিত্তা বাঘের গাছে উঠার শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ততক্ষণ রাইফেলটা হাতে নিয়ে চটিটা পারে দিতে না দিতেই গাছের উপর চড়াং করে একটা শব্দ হল আর বাবুর্জিটা চিংকার করে উঠলো—“সাহেব, বাঘ—বাঘ!”

আমি এক লাফে বাইরে এলাম, কিন্তু নিমেষের মধ্যে বাঘটা ছুটে পালালো এবং মাঠের উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেলো—তখন আর বুঝা চেষ্টা। বাবুর্জিটা পরে আমার বললে যে, সে চিং হয়ে ঘুঘুজিলা, হঠাৎ শব্দ শুনে যেই না চোখ খোলা অমনি দেখে কি ছ'টো অলস্তু আগুনের ভাঁটা—বাঘটা তখন তার উপর লাফ দেবার উপক্রম করছে—এই অবস্থায় সে চিংকার করে উঠে।

পরের দিন গাছটা কেটে ফেলা হল আর বেড়াও শক্ত করে বাঁধা হলো। কিন্তু এর পর কয়েক সপ্তাহ সেই তাঁবুতে অবস্থান করা সত্ত্বেও বাঘের কোন পাতা পাওয়া গেল না।

কিন্তু নিকটবর্তী গ্রাম থেকে বাঘের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যেতে লাগলো। ইবটসনরা আবার কয়েক দিন পরে খবর পাঠালেন যে, ক্রমপ্রয়াগ থেকে দু'মাইল দূরবর্তী একটা গ্রামে একটা গরু মারা পড়েছে।

গ্রামে পৌঁছে আমরা দেখলাম যে, একটা চিত্তা বাঘ একটা ঘরের দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুক গরুটাকে মারে এবং তাকে টেনে দরজার কাছ পর্যন্ত নিয়ে আসে। কিন্তু দরজাটা ছোট বলে তাকে নিয়ে যেতে পারেনি, তবে পানিকটা উল্লসং করে গেছে। দু'-এক দিন পরে অল্প একটা গ্রামে ঠিক এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। এই গ্রামে নিহত গরুটার কাছে আমরা একটা মাচান বেঁধে শিকারের অপেক্ষার রইলাম। রাত তখন ঠিক দশটা। ব্যাঙ্গ্রাঙ্গ এলেন ঠিক একেবারে আমাদের মাচানের তলায়। মাচার উপর আমি আর ইবটসন আর তার তলায় বাঘ। এমন সন্বেশ আর হয় না। আমি একবারে রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে রইলাম—যেই বেরুবে অমনি গুলী করবো। এমন সময় মাচার উপর ক্যাচ করে একটা শব্দ হলো। অনেকক্ষণ এক ভাবে বসে থাকার ইবটসনের পা ধরে গিয়েছিল বলে তিনি একটু নড়ে বসলেন। কিন্তু সেই শব্দে চিত্তা বাঘটা তার আহার ফেলে পালাল।

দু'রাত্রি পরে ক্রমপ্রয়াগ বাজারের কাছে আর একটা গরু মারা পড়লো। যেখানে গরুটাকে মারা হয়েছিল, তার ঐশ্বর্য কুড়ি গজ দূরে পাহাড়ের ঠিক ধারে একটা বড় গাছের উপর একটা মাচা বাঁধা ছিল। ইবটসন আর আমি এই মাচার উপর থেকে শিকার করতে মনস্থ করলাম।

নরখাদক চিত্তা শিকারে সাহায্যের জন্য সরকার কয়েক দিন আগে একটা কীদ পাঠিয়েছিলেন। কীদটা পাঁচ ফুট লম্বা আর তার ওজন এক মণ। এতদূর ভয়ানক কীদ আমি কখনো দেখিনি। এর চব্বিশ ইঞ্চি লম্বা দু'পাটি ধারাল দাঁত আর এক-একটা দাঁত তিন ইঞ্চি করে লম্বা। দু'টো শক্তিশালী শ্রিঃ ধার এই কীদ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটা প্রয়োগ করতে দু'জন লোক লাগে।

নিহত গরুটাকে ফেলে বাঘটা যখন দু'টো মাঠ পার হয়ে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তখন আমরা তার বাতায়াতের পথের উপর দু'টো মাঠের ঠিক সংযোগস্থলে কীদ পাতলাম। কীদের দু'দিকে কিছু গাছ-পালা দিয়ে কীদটাকে একটু খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো। আর আমরা পুরোস্ত মাচার উপর বসে ব্যাঙ্গ্রপুঞ্জবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। রাত্রি ১টার আগে চাঁদ উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই আমাদের বৈদ্যুতিক টর্চের সাহায্য নিতে হলো। ইবটসনেঃ কথামত আমার বন্দুকের সঙ্গেই টর্চটা বেঁধে রাখলাম।

সন্ধ্যা হওয়ার এক ঘণ্টা পরে বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে চার দিক কেঁপে উঠলো। বুঝলাম বাঘটা কীদে পড়েছে। বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বলে দেখি বাঘটা কীদে পড়েছে আর যুক্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে গুলী করলাম। ফলে যে শেকল দিয়ে কীদটা খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেটা গেল ছিঁড়ে। বাঘটা তখন সেই কীদ শুদ্ধ নিয়ে পালাতে লাগলো। আমি আবার গুলী করলাম ইবটসনও দু'টো গুলী ছুঁড়লেন, কিন্তু কোনোটাই বাঘের গায়ে লাগলো না। এই সময় রাইফেলে গুলী ভরতে গিয়ে বৈদ্যুতিক টর্চটা গেল খারাপ হয়ে।

চিত্তা বাঘের গর্জনে এবং আমাদের গুলীর শব্দে ক্রমপ্রয়াগ বাজারের লোকরা ও নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীরা আলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো। আমরা তাদের সঙ্গে যেতে বললাম, কিন্তু তারা এত গোলমাল করছিল যে, আমাদের কথা তারা শুনতে পো না। তখন আমি আর ইবটসন বন্দুক নিয়ে গাছ থেকে নেমে বাঘটা যে দিকে গেছে সেই অঙ্গুর হলাম। আমরা মাচার উপর একটা গ্যাসের আলো নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু দূর এগিয়েই বাঘটার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। বাঘটা তখনো কীদে জড়িয়ে গর্জনে করছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার রাইফেলের গুলী তার মাথার গুলি ফুটো করে দিল। ততক্ষণে এক উত্তেজিত জনতা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের বহু দিনের শত্রুর পতনে তাদের আনন্দ দেখে কে!

নিহত বাঘটা একটা বেশ বড় আকারের পুঙ্খ চিত্তা। এই বাঘটার কবলে বহু লোক প্রাণ দিয়েছিল। সকলেই ঠিক করলো যে, এই সেই বিখ্যাত নরখাদক চিত্তা, যে ক্রমপ্রয়াগের অধিবাসীদের

মধ্যে বহু দিন ধরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না। পূর্বের বর্ণিত নিহত রমণীর মৃতদেহের উপর মাচা বেঁধে অবস্থানের সময় আমি যে চিত্তা বাঘটাকে দেখেছিলাম, এ কিন্তু সে নয়, আমার মনে হলো।

বাই হোক, বাঘটাকে নিয়ে উৎফুল্ল জনতা শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হল। সকলের আনন্দের সীমা নেই। এই প্রথম রাত্রিতে বাজারের প্রত্যেক বাড়ীতে আলো জ্বললো। নারী ও শিশুরা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বাঘটাকে দেখতে লাগলো। সকলে যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। সকলের দেখা শেষ হলে আমাদের লোক-জন বাঘটাকে বাংলোর নিয়ে এসে। এই বাঘটা নিয়ে ইবটসনের সঙ্গে আমার তর্ক হলো। ইবটসনের ধারণা, আসল বাঘটাকেই মারা হয়েছে। শেষে স্থির হলো, আগামী পরশ রাত্রি প্রয়াগ ছেড়ে আমরা পাউরি বাজা করবো।

সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। পরদিন প্রত্যুষে উঠে 'ছোট হাজারি' খাছি এমন সময় পথে গোলমাল সুনতে পেলাম! কি ব্যাপার! চার জন লোক এসে আমাকে জানাল যে, ছোট পিপল সেতু থেকে এক মাইল দূরে নরখাদক বাঘের আক্রমণে এক যুবতী নিহত হয়েছে। তাদের সঙ্গে দটিনা হুগে গেলাম। দেখি, যুবতীটির বয়স হবে আঠারো থেকে কুড়ির মধ্যে। একটা পাখরের তৈরী ঘরের মধ্যে যুবতীটি তার স্বামী ও ছ'মাসের শিশুপুত্র নিয়ে থাকতো। ঘটনার রাত্রে স্বামী বাড়ী ছিল না, কি একটা মামলায় সাক্ষী দেবার জন্ত পাউরি গিয়েছিল, দ্বী-পুত্রের ভায় দিয়ে গিয়েছিল পিতার উপর। রাত্রে শব্দের খাওয়া হলে শিশুপুত্রকে তার কোলে দিয়ে যুবতীটি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বসে, এমন সময় বাঘটা পিছন দিক থেকে অকস্মৎ আক্রমণ করে। বাঘটা যুবতীটিকে মুখে নিয়ে ছ'টো মাঠ পার হয়। মাঠে সেখানে শেব হয়েছে, সেখানে থেকে বারো ফুট নীচে একটা পুখ। শিকার মুখে নিয়ে সে উপর থেকে পথের উপর লাফ দেয়। যুবতীর গুজন হবে প্রায় এক মণ পর্যন্তই সেব। এত ভারি দেহ মুখে করে সে বারো ফুট নীচে লাফ দিয়েছে, অথচ মৃতদেহটি মাটিতে পড়েনি। তাকে সম্পূর্ণ শূন্য রেখেই সে লাফ দিয়ে পড়ে। প্রায় দু'মণ গুজনের একটা মৃতদেহকে যে বিড়ালছানার মত মুখে করে নিয়ে যেতে পারে, তার ক্ষমতা যে কি অসাধারণ তা কতকটা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

অপরাত্ন ৪টার সময় আমরা বাঘ শিকারের জন্ত প্রস্তুত হয়ে মৃতদেহের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়ে মাচার বসবার উত্তোপ-অয়োজন করার আগেই বাঘের সাড়া পাওয়া গেল। বাঘটা তখন পাগড় থেকে নেমে আসছে। তখন আমরা তার দিকে বসুক নিয়ে অগ্রসর হলাম। ইবটসন আলো ধরলেন। কিন্তু পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে বাঘের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। রাত্রে পাহাড়ের উপর উঠে আমরা একটা বাড়ী পেলাম এবং সেই বাড়ীতেই রাত কাটালাম। বাঘটা আমাদের পিছু নিয়ে সেই বাড়ী পর্যন্ত এসেছিল, সেটা পরে টের পাওয়া যায়। পরদিন প্রাতে সেই যুবতীর মৃতদেহের কাছে গিয়ে দেখি বাঘ রাত্রে তার কাছে আসেনি। ইবটসন প্রাণত্যাগের পর রক্তপ্রয়াগ বাজা করলেন, আমিও নৈনিতাল বাবার জন্ত প্রস্তুত হতে লাগলাম। এমন সময় কয়েক জন লোক এসে খবর দিলে, চার মাইল দূরে এক গ্রামে চিত্তা বাঘ কর্তৃক

একটা গরু নিহত হয়েছে। সেই গ্রামে গিয়ে মরা গরুর কাছের আমার সেই সরকারের দেওরা কাদ পাতলাম আর কিছু দূরে একটা গাছের উপর বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই হল না। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসায় গ্রামে ফিরলাম। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে গ্রামের মোড়ল আনায় জানালো, রাত্রে সে দরজায় চিত্তার আঁচড়ের শব্দ শুনেছে। তার কথা মিথ্যা নয়। পথের দিন সকালে দেখা গেল, দরজায় চিত্তার আঁচড়ের আর চার পাশে তার খাবার চিহ্ন। বুঝতে পারলাম, বাঘ আমার পিছু নিয়েছে। তখন ১১২৫ সালের শবৎ কাল। ব্যর্থতা ও ক্লান্তি নিয়ে আমি গাড়োয়াল ছেড়ে বাবার স্থির করলাম। গাড়োয়ালীদের নরখাদক চিত্তার হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া নিষ্ঠুরতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু পরিশ্রমের একটা সীমা আছে। অনির্দিষ্ট কাল ধরে অত্যধিক পরিশ্রম করা যায় না। তার পর রাত্রে চিত্তা বাঘের হানা। নরখাদক বাঘ যদি কারও পিছু নেয়, তাহলে চাদের আলো যতই সুন্দর হোক না কেন, মোটেই তৃপ্তিদায়ক হয় না। আমার এই চলে যাওয়ায় সংবাদপত্রগুলি পর্যন্ত আমাকে খোঁচা দিতে ছাড়েনি।

বাই হোক, ১১২৬ সালের বসন্ত কালে আমি আবার ফিরে এলাম—নতুন উদ্যমে স্রুজ হল শিকারের অভিযান। আমার তিন মাসের অস্থপস্থিতির সুযোগে বাঘটা আরও দশ জনকে মেরেছে সুনলাম। মার্চ মাসের শেষ তারিখে ইবটসন পাউরি থেকে ফিরে এলেন। পরদিন সকালে প্রাণত্যাগের সময় সংবাদ পাওয়া গেল, রক্তপ্রয়াগের উত্তর-পশ্চিমে একটা গ্রামের নিকট চিত্তার আবির্ভাব হয়েছে। গ্রামে গিয়ে আমরা একটা ছাগল কিনলাম। গ্রামের আশ মাইল উত্তরে একটা পাহাড়ের উপর ছোট ছোট ঝোপ আর অনেক গুহা। সেখানে বাঘের অবস্থিতি খুবই সম্ভব। আমরা ছাগলটাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলাম আর কিছু দূরে বড় বড় পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। ছাগলটা ভীষণ চাঁৎকার স্রুজ করে দিল, কিছুক্ষণ পরে আর ছাগলের চাঁৎকার শোনা গেল না। বুঝলাম বাঘ এসেছে। দেখলাম, ছাগলটা সামনের জঙ্গলের দিকে ছিঁদৃষ্টিতে তাকিয়ে কান খাড়া করে আছে। আমি আব ইবটসন কিন্তু অনেক চেষ্টা করলেও কিছু দেখতে পেলাম না। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসায় আমাদের ছাগল নিয়ে ফিরে আসতে হল। ভেরবার সময় আমরা ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছাড়া পাবা মাত্র সে এমন ছুট দিলে যে, তার আর টিকি দেখতে পাওয়া গেল না। সে যে পথে গিয়েছিল, সেই পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমরা শুধু তার মৃতদেহটা পেলাম। চিত্তা তার টুটি কেটে পথের উপর ফেলে দিয়ে গেছে সম্ভবতঃ আমাদের ব্যঙ্গ করার জন্ত।

পরদিন রক্তপ্রয়াগ থেকে খবর এল, আমাকে সেখানে যেতে হবে, কারণ পূর্ব-রাত্রে একটা লোক চিত্তা বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে।

বাংলোর গিরে দেখি, ইবটসন নন্দরাম বলে একটা লোকের সঙ্গে কথা কইছেন। নন্দরামের গ্রাম আমাদের গন্ত রাত্রে শিকারের জায়গা থেকে চার মাইল দূরে। সেই গ্রাম থেকে আশ মাইল দূরে গাইয়া নামে এক তপস্বী খানিকটা জঙ্গল সাফ করে একটা বাড়ী তৈরী করেছিল। সেখানে সে তার মা, দ্বী ও তিনটি সন্তানকে



নিয়ে বাস করতো। সকালে গাউয়ার বাড়ীর মেয়েদের কান্না শুনে নন্দরাম তার কারখা ছিড়ানো করে জানতে পারে যে, গাউয়াকে বাবে নিয়ে গেছে। নন্দরাম সেই সংবাদটাই বটসনকে দিচ্ছিল।

আমরা গিয়ে দেখি, বাঘটা গাউয়াকে নারার পর পাঁচশ' গজ দূরে টেনে নিয়ে গেছে। মৃতদেহটা ঝোপে-ঘেরা একটা গর্স্তের মধ্যে পড়ে আছে। কাহে কোন গাছ না থাকায় আমাদের মাচা বেঁধে শিকার করার সুবিধা হল না। বাঘটা মৃতদেহের তিন জায়গা থেকে মাংস ছিঁড়ে খেয়েছিল, আমরা সেই খাওয়া জায়গাগুলিতে সায়ানাইড বিষ মিশিয়ে দিলাম। পরদিন সকালে দেখা গেল, যেখানে বিষ মেশান হয়েছিল, সেই জায়গাগুলি বাদ দিয়ে বাঘ শবীরের অঙ্গ অংশ থেকে মাংস খেয়েছে, আর মৃতদেহটা আর একটু জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

এবার বেশী ক'রে সায়ানাইড দেওয়া হল এবং পরের দিন দেখা গেল, বাঘটা মৃতদেহের অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারা গেল, অনেকখানি বিষ তার শরীরে প্রবেশ করেছে। যে বিষ দেওয়া হয়েছিল, তা একটা বাঘের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট। তখন বাঘটাকে খোঁজ করার আয়োজন করা হল। গ্রামের পাটোয়ারি দুপুর নাগাদ দু'শ' লোক যোগাড় করে আনলেন। এই সব লোক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বন ভ্রমণে লাগল। এখান থেকে আধ মাইল দূরে পাহাড়ে একটা গুহা ছিল। এই গুহায় মধ্যে একটা চিত্তা বাঘ অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। আমরা দেখলাম গুহার মুখে চিত্তার পায়ের আঁচড়ের দাগ। আমরা ঠিক করলাম বাঘটা নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে ঢুকেছে। তখন আমরা পাথর এনে গুহার মুখটা বেশ ভাল ভাবে বন্ধ করে দিয়ে ফিৎ এলাম। পরের দিন তাবের জাগ দিয়ে গুহার মুখ এঁটে দেওয়া হল। তার পর দশ দিন আর বাঘের কোন পাতা নেই, আশ-পাশ কোথাও থেকে আর চিত্তার হানার সংবাদ নেই। তখন আমরা এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে, বাঘটা গুহার মধ্যে নিশ্চয় মরে গেছে।

এ কথা চার দিকে প্রচার হতে দেয়া হল না। সকলে একটু নিশ্চিন্ত হল এবং অসতর্ক ভাবে বাইরে বেরতে আরম্ভ করল। আসলে বাঘটা কিছু মরেনি। তাকে যে সায়ানাইড দেওয়া হয়েছিল তার শক্তি সত্ত্বে আমার সন্দেহ হল। বাঘটা সম্ভবতঃ বিবাক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে কোন বকমে অল্প পথে গুহা থেকে বার হয় এবং যারা অসতর্ক ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করেছিল তাদের এক জনকে শেষ করে। তার এবারের শিকার ৭০ বছর বয়সের এক বুড়ী। বাঘটা তাকে ঘর থেকে মুখে করে তুলে নিয়ে যায়। বুড়ী প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকলেও গ্রামবাসীদের এমন সাহস হয়নি যে, তাকে রক্ষা করতে অগ্রসর হয়। কিছু দূর নিয়ে গিয়ে বাগটা বুড়ীটাকে মেরে ফেলে।

বুড়ীর মৃতদেহের কাছে মাচা বাঁধবার উপায় ছিল না। এবার আমরা এমন আয়োজন করলাম যাতে বাঘটা নিশ্চয়ই মারা পড়বে। এবার বুড়ীটার দেহে প্রচুর পরিমাণ সায়ানাইড মিশিয়ে দেওয়া হল। বুড়ীর কাছে যাবার পথের উপর গর্স্ত খুঁড়ে তার উপর আমার সেই সাজাতিক ফাঁদ পাতা হল। ফাঁদের উপর গাছপালা এমন ভাবে দেওয়া হলো, যাতে উপর উপর কিছু বুঝতে না পারা যায়। এর পর মৃতদেহ থেকে

কিছু দূরে দু'টো রাইফেল বসান হল। রাইফেলের মুখ বটল বুড়ীটার দিকে। ট্রিগার রেশম দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই দড়িটা মৃতদেহের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। বাঘটা মাংস খাবার জন্ত বুড়ীর শরীরে মুখ দিলেই দড়িতে টান পড়ে গুলী ছুটে যাবে এমন ব্যবস্থা করে রাখলাম। অবশ্য রাইফেল দু'টো ঢাকা দিয়ে রাখা হল। এইবার আমরা অনেকটা দূরে একটা গাছে মাচা বেঁধে অবস্থান করতে লাগলাম—উদ্দেশ্য, বাঘটা যদি ফাঁদে পড়ে চোঁচায় তখন আমরা গিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলবো।

রাত্রি তখন পৌনে আটটা। হঠাৎ ক্রমাগত চিত্তার ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যেতে লাগল। শব্দটা আসছিল ঠিক মৃতদেহটার দিক থেকে। আমরা বুঝলাম, এত দিনে রক্তপ্রস্রাগের নবাবাদক চিত্তা ফাঁদে পড়েছে। আমরা আনন্দে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, এত উঁচু থেকে লাফ দিয়ে আমাদের অঙ্গহানি হয়নি। পেট্রোম্যাক্স ছেলে নিয়ে আমরা মৃতদেহের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি পাপী উড়ে গেছে। কোথায় বাঘ আর কোথায় কে! চিত্তা যথাবিধি আরও খানিকটা মাংস খেয়ে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু তাহলে সে গর্জ্জন করলো কেন? বাঘটা অতি সন্তর্পণে এসে মৃতদেহের যে সব অংশে বিষ দেওয়া হয়েছিল তা বাদ দিয়ে অনেকখানি মাংস খেয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যাবার সময় তার পিছনের একটা পা ফাঁদে আটকে যায়। তখন সে ফাঁদটাকে কিছু দূর টেনে নিয়ে যায় আর ফাঁদের একটা দাঁত ভাঙা থাকায় টানাটানি করে পাটা বার করে নেয়। বন্ধুরের গুলীও ছোট্টনি আর সে গর্স্তের মধ্যেও পড়েনি। তার এবারকার পলায়ন অত্যন্ত বিস্ময়জনক। এ রকম একটা ঘটনার পর বাঘটার পক্ষে সম্ভবতঃ দু'এক দিন চূপচাপ থাকাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে তা করেনি। সন্ধ্যায় সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় মাটা নরম হয়ে যাওয়ায় আমরা তার গতিবিধি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। ফাঁদ থেকে মুক্তলাভ করে সে আমরা যে গাছে মাচা বেঁধে অবস্থান করছিলাম সেই গাছের তলায় আসে। তখন আমরা নিশ্চিত। আমরা ভেবেছিলাম এক্ষণ ঘটনার পর আর বাঘের আশা করা বুধা। এই জন্ত আমরা একটু নিশ্চিন্ত উপভোগ করছিলাম। ভাগ্যে ইবটসন গাছের গোড়ার চার দিকে তারের জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, নইলে সেই রাত্রিই আমাদের শেষ রাত্রি হত। গাছের তলা থেকে সে সোজা রক্তপ্রস্রাগে যায় এবং বাজারের প্রধান সড়ক দিয়ে আমাদের বাংলোর ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখান থেকে সে প্রত্যাবর্তন করে এবং যাবার পথে দু'টো ছাগলকে মেরে রেখে যায়।

পরের দিন আমি যখন রক্তপ্রস্রাগের পূর্ব দিকের গ্রামগুলি পরিদর্শন করছিলাম, তখন দেখলাম, চিত্তা বাঘের পায়ের দাগ একটা গ্রাম থেকে বেবিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। সেই পথ অহুসরণ করে আমি পাহাড়ের উপর এসে হাজির হলাম। তখন সবে ভোর হয়েছে। যদি চিত্তাটার দেখা পাওয়া যায়, এই আশায় আমি একখানা পাথরের উপর বসে পড়লাম। আগের দিন বৃষ্টি হওয়ায় আবহাওয়া একেবারে নিষ্কল ছিল। চতুর্দিকের অপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। আমি যেখানে বসেছিলাম, ঠিক তার নীচে অলকনন্দার

সৌন্দর্যমণ্ডিত উপত্যকা, আর তার মধ্য দিয়ে রূপালি ফিতার মত অলকানন্দা নদী এঁকে-বঁেকে চলে গিয়েছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রাম। বাড়ীগুলি বেশীর ভাগই খড়ের এবং তাও আবার খবচ বাঁচাবার জন্য একটির গায়ে আর একটি। গাড়াগালে সমতল ভূমি বেশী নেই। যেটুকু সমতল ক্ষেত্র পাওয়া যায়, সেখানে চাষ করতে হয়, কাজেই পাহাড়ের গায়ে বাড়ী করা ছাড়া উপায় নেই।

পাহাড়ের ওপারে শ্রুউজ পর্বতের চূড়া। শীতকালে ও বসন্তের প্রথম দিকে এই সব পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে আসে ঝলিত তুষার-স্তূপ। তারও ওপারে দেখা যায়, অনন্ত তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দিগন্ত স্পর্শ করেছে। এমন শ্রী-মণ্ডিত দৃশ্যের মাঝে যখন সূর্য্য অস্ত যায়, চারি দিকে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার, তখন স্তম্ভি হয় আতঙ্কের। এ আতঙ্ক কল্পনা করা যায় না, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া এই আতঙ্কের স্বরূপ বোঝা যাবে না। রক্তপ্রয়াগ এলাকার লোক এই আতঙ্ক শিউরে উঠতো সূর্য্যোদয় আট বছর ধরে।

ষট্টি খানেক বসে থাকার পর মাইল খানেক দূর থেকে দু'জন লোক এসে খবর দিলে যে, সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে তারা এই দিকে চিতা বাঘের ডাক শুনেছে। চার দিকে চেয়ে দেখলাম—কেবল মাত্র একটি দেবদারু গাছ ছাড়া কাছাকাছি আর কোন শিকারের জায়গা নেই। আমি সেই গাছ থেকেই শিকার করার মনস্থ করলাম। চিতা বাঘ যাতে ছাগলের ডাক শুনে গাছের তলায় আসে, সে জন্য একটি ছাগল আনা হল। সন্ধ্যার একটু আগেই আমি গাছে উঠে পড়লাম। গাছে উঠতে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হল, কারণ গাছের গোড়া থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত কোন শাখা ছিল না। আমি রাইফেলটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা উপর দিকে ছুঁড়ে দিলাম। রাইফেলটা যখন একটা ডালে আটকে গেল, তখন আমি দড়ি ধরে উপরে উঠে গেলাম। নেচে ছাগলটা বাঁধা রইল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ছাগলটা একবারও চিৎকার করল না, নির্ঝঞ্জে ঘাস ছিঁড়ে খেতে লাগল। তখন আমি নিজেই চিতা বাঘের ডাকের অনুকরণে ডাক দেবার সিদ্ধান্ত করলাম।

পুরুষ চিতা বাঘের স্বভাব এই যে, তারা তাদের এলাকায় অল্প কোন চিতার অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে পারে না। বর্তমান নববাদক চিতাটির কক্ষক্ষেত্রের এলাকা ছিল পাঁচ শত বর্গ মাইল জুড়ে। অবশ্য এই বিস্তৃত এলাকায় যে অল্প কোন পুরুষ চিতা ছিল না, একথা জোর করে বলা যায় না। যাই হোক, রাত্রির আধার ঘনিষে এলে আমি চিতা বাঘের স্বরের অনুকরণে ডাক দিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, সঙ্গে সঙ্গে 'আন্দাজ চারশ' গজ দূর থেকে চিতা বাঘের ডাক শোনা গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমার ডাক অনুসরণ করে বাঘটা বাট গজের মধ্যে এসে পড়লো। আমি ঠিক করলাম, বাঘটা যখন ছাগলটাকে খেতে আরম্ভ করবে, আমি সেই সময় গুলী করবো। আমার রাইফেলের সঙ্গে টার্জ লাগান ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি শিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় কিছু দূরে পাহাড়ের উপর থেকে অল্প একটা চিতার ডাক শোনা গেল আর যে-চিতাটা আমার গাছের কাছে এসেছিল, সে ডাকতে ডাকতে সেই দিকে চলে যেতে লাগল। তার পর সব নিস্তক হয়ে গেল। এই ভাবে

ক্রমশঃ দিন যায়, কিন্তু কিছুতেই আর বাঘটাকে বাহাদার মধ্যে পাওয়া যায় না।

১৯২৬ সালের ১৪ই এপ্রিল। গাড়াগালের একটি শ্রবণীয় দিন—রক্তপ্রয়াগের নববাদক চিতার শেষ শিকারের দিন। এই দিন সন্ধ্যার ভাঁইসোয়ারা গ্রামে এক বিধবার একটি ছোট ছেলেকে তাদের বাড়ী থেকে বাঘে নিয়ে যায়। এত সন্তর্পণে সে কাজ সারে যে, প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেনি যে, তাকে বাঘে নিয়ে গেছে। পরদিন সকালে বাড়ী থেকে কিছু দূরে একটা পথের উপর বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

রক্তপ্রয়াগ থেকে আমি যখন বালকটির মৃতদেহের কাছে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। জায়গাটার কাছে শিকারের উপযোগী স্থান না থাকায় আমি মৃতদেহটাকে বিধবার বাড়ীতে নিয়ে এলাম এবং উঠানে খুঁটো পুঁতে শিকল দিয়ে তাকে খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে দিলাম। আব আমি ঘরের বারান্দায় খড়ের গাদার আড়ালে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। আমি ভাবলাম, বাঘ যথাস্থানে তার শিকার না পেয়ে নিশ্চয়ই বিধবার বাড়ীতে আবার শিকারের আশায় আসবে।

সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড বড়-বৃষ্টি শুরু হল এবং বড়-বৃষ্টি যখন থামল তখন রাত্রি আটটা। বাঘ এতক্ষণে নিশ্চয়ই তার আশ্রয়-স্থল থেকে বেরিয়েছে তার শিকারের সন্ধানে। বিধবার বাড়ী পর্য্যন্ত আসতে মাত্র কয়েক মিনিট সময়ের ব্যবধান। কিছুক্ষণ পরেই খড়ের গাদার পাশে খসখস শব্দ—বাঘ এসে গেছে। কোন্ দিক দিয়ে তার উদয় হবে ঠিক করতে না পেয়ে বেই আন্দাজে গুলী করতে যাব, এমন সময় কি একটা আমার কোলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। বাঘ নয়—একটা বেড়াল—বৃষ্টিতে একবারে ভিজে গেছে! কোথাও আশ্রয় না পেয়ে আমার কোলে আশ্রয় খুঁজতে এসেছে। যাক্ তবু ভাল। খুবই ভয় পেয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভয় কাটতে না কাটতেই কিছু দূর থেকে চাপা গর্জ্জন শুনেতে পেলাম। ক্রমশঃ গর্জ্জন উচ্চতর হতে লাগল। নিশ্চয়ই হুঁটো বাঘে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। বাঘ হয় নববাদক চিতাটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে তার শিকার না পেয়ে বিরক্ত চিত্তে অবস্থান করছিল, তখন অপর একটি চিতা হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাকে আক্রমণ করে, ফলে লড়াই শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের বাঘের লড়াই বড় একটা দেখা যায় না। কারণ সাধারণতঃ একটি বাঘের রাজ্যে অপর বাঘ অনধিকার প্রবেশ করে না এবং যদিও বা দৈবতঃ উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, তারা সাক্ষাৎ মাত্রই উভয়ের শক্তির পরিমাণ বুঝতে পারে। যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল সে লড়াইয়ের আগেই রণে ভঙ্গ দেয়।

আমাদের যিনি লক্ষ্য, তিনি প্রাচীন হলেও শক্তিতে ছিলেন অধিতীয়। তার পাঁচশ বর্গ-মাইল এলাকায় তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বাঘ ছিল না। কিন্তু ভাঁইসোয়ারা গ্রামে অনধিকার প্রবেশ করায় এই বিপত্তি ঘটে। ভাঁইসোয়ারার অধিপতি তার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ সহ্য করতে না পেয়ে হানাদারকে আক্রমণ করে।

প্রথম রাউণ্ডে পাঁচ মিনিট ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল। কোন

নিষ্পত্তি হল না। ১০.১৫ মিনিট পরে আবার বৃদ্ধ-আরম্ভ হল এবং এবার মনে হল, বেন কল্পপ্রয়াগের চিত্রা ঘেরা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট ধরে লড়াইয়ের পর চূপচাপ, তার পর আবার লড়াই। এই ভাবে ক্রমশঃ তারা লড়াই করতে করতে দূরে সরে গেল এবং শেষে আর তাদের গজ্ঞন শোনা গেল না।

কলে আমার এবারকার চেষ্টাও ব্যর্থ হল।

কল্পপ্রয়াগে এক পশুভৈরব সঙ্গে আমার আলোপ হয়েছিল। বজ্রনাথ যাত্রার পথে গোলাবরায়ে তার একটা চটি ছিল। তীর্থযাত্রীরা এট চটিতে রাত্রির জল আশ্রয় নিত।

কল্পপ্রয়াগের নবখাদক কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও রক্ষা পেয়েছিল যাত্রা হুঁশ। তার মধ্যে এক জন এই পশুভৈরব, অপর জন একটা রমণী।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১১২১ সালে। গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় মাজুলি থেকে আগত দশ জন তীর্থযাত্রী ক্রান্ত হয়ে রাত্রির মত গোলাবরায়ের চটিতে আশ্রয় নেয়। পশুভৈরব বাড়ীটা দোতলা। নীচে তলার মালপত্র থাকে আর উপর তলার তীর্থযাত্রীদের থাকতে দেওয়া হয়। উপরের ঘরের সামনে সরু এক ফালি বারান্দা আর পাথরের সিঁড়ি।

তীর্থযাত্রীরা ভাড়াভাড়া আগার সমাধা করে দরজায় খিল এঁটে দেয়। ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম বোধ হওয়ায় পশুভৈরব এক সময় দরজা খুলে বাইরে আসে। বাইরে এসে দাঁড়াতেই অতর্কিতে চিত্রা বাঘের আক্রমণ। বাঘটা এসে একবারে তার দু'টি কানড়ে ধরে, কিন্তু পশুভৈরব প্রাণপণ শক্তিতে লাঞ্চারে বাঘটাকে ছিটকে ফেল দেয়। কিন্তু ততক্ষণে তার গলা ফুটো হয়ে গেছে। বাঘটা দ্বিতীয় বার আক্রমণ করার পূর্বস্বে চিত্রিকার শুনে তীর্থযাত্রীরা বাইরে আসে এবং কোন রকমে পাণ্ডুতাকে টেনে ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দেয়। পশুভৈরব তখন মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু বাঘটা ছাড়বার পাত্র নয়। সে সারা রাত ধরে সেই বন্ধ দরজার উপর ধাবা মারে আর গজ্ঞন করতে থাকে—আর ঘরের ভেতর থেকে শোনা যায় তীর্থযাত্রীদের কল্পন আর্তনাদ।

সকাল হলে তীর্থযাত্রীরা সংজ্ঞাতীন পশুভৈরব কল্পপ্রয়াগে কালী কমলী হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আমি গোলাবরায়ে গিয়ে পশুভৈরব এই অকলে চিত্রার

আগমনের সংবাদ দিয়ে সতর্ক থাকতে বললাম। পশুভৈরব বাড়ী থেকে কিছু দূরে পাথের ধারে একটা আম গাছের উপর মাচান বাঁধা হল আর নীচের বাঁধা হল ছাগশিশু। কিন্তু দশ রাত্রি অপেক্ষা করেও বাঘের দেখা পাওয়া গেল না, যদিও আশে-পাশে তার আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যেতে পাগল।

আর এখানে দেবী করা চলে না। আফ্রিকায় আমার কাজ পড়ে রয়েছে অথচ গাড়োয়ালের অধিবাসীদের বাঘের মুখে ফেলে রেখে যেতেও মন সবছে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, আর একটা রাত দেখা থাক, পরদিন সকালে যা হয় করা যাবে।

রাত্রে মাচানের উপর বসে নানা রকম চিন্তা মনে আসতে লাগল। সূচীভেদে অন্ধকার, চার দিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ গাছের তলায় খসখস শব্দ হল আর সঙ্গে সঙ্গে নীচের বাঁধা ছাগলের গলার ঘণ্টাটা জোরে জোরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাইফেল-সংলগ্ন টর্চ জ্বাললাম। জ্বলেই দেখি আমার বন্ধুকের নলের সামনেই মূর্তিমান নবখাদক। কালবিলম্ব না করে বন্ধুকের ঘোড়া টিপে দিলাম। বন্ধুকের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর পশুভৈরব তার ঘরের দরজা খুলে চোঁচিয়ে জিজ্ঞাস করলো কোন সাহায্যের দরকার আছে কি না। আমি তখন চিত্রা বাঘটার কি হল, তা জানবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছি, কাজেই তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর না পেয়ে পশুভৈরব বন্ধ করে দিল।

আমি গুলী ছুঁড়েছিলাম ঠিক রাত্রি দশটায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চাঁদ উঠবার সম্ভাবনা ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও নীচে কিছু দেখতে পেলাম না, কিন্তু ছাগলের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনে বুঝলাম সে বেঁচে আছে। কয়েক ঘণ্টা পরে কিছুক্ষণের জন্ত চাঁদ উঠলেও তাতে কোন সুবিধা হল না। ভোর হলে গাছ থেকে নামতেই ছাগলটি আমায় অভ্যর্থনা জানাল। গুলী করার জায়গা থেকে একটা মোটা রক্তের দাগ পাথর বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে। রক্তের দাগ ধরে পক্ষাণ গজ অতিক্রম করার পর একটা খাদের মধ্যে বাঘটাকে পাওয়া গেল—সে তখন চিরনিঃস্রায় নিমিত্ত।

একটা কথা আমার মনে হল, এই বাঘটা প্রকৃতির কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেনি যদিও মানুষের আইন সে ভঙ্গ করেছিল। কল্পপ্রয়াগ এলাকায় সম্রাটের রাজ্য সৃষ্টিও তার উদ্দেশ্য ছিল না। তার একমাত্র অপরাধ—সে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল।

অনুবাদক—হরকিশ্বর ভট্টাচার্য

## সম্মোহন

[ সংক্ষিপ্ত চিত্রকাহিনী ]

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

হৃদয়কেশ হালদার

রাঁতের অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ভোরের আলো। গাছে গাছে সত্য ঘুম-ভাঙা পাখীর কাকলি। পথ ভরনো জনহীন। সামনের চারের দোকানটা সবে কাঁপ খুলছে। ঝড়ের মত বেগে একখানা বাস চলে গেলো—

স্মারক থেকে নিষ্কামনের পর তার ভাগ্যে এখনো একটিও বাড়ী জোটেনি।...

ভোরের এই শান্ত সমাহিত মাধুর্যের সঙ্গে মিল রেখে ভোরাই সুরে এক জন বৈষ্ণব যখন বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেলো।

ডাক্তার সেনের বাড়ী থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ইন্সপেক্টর আর তাঁর সহকারী। তাঁদের পিছনে মলয়া, বিভাস আর দেবব্রত। সকলের মুখেই বিবাদের কান্ধা, সকলেই নির্বীক।...

ইন্সপেক্টর এই নীরবতা ভাঙলেন প্রথমে। বিভাসের দিকে চেয়ে তিনি বললেন : তাহলে আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে বিভাস বাবু। চিরঞ্জীবের বাড়ীটা আমাদের দেখিয়ে দিতে হবে। অবশ্য এই সব খুন-স্বপ্নের ব্যাপারে তাকে আইনের জগতায় আনা খুব সম্ভব ব্যাপার হবে না। কারণ ডাক্তার সেনের মৃত্যুকালীন ভবানন্দী বা চৌধুরী মশাইয়ের কথা যত সত্যিই হোক না কেন, আদালত মেসমেরিজম, মস্ত-তত্ত্ব বা ভূত-প্রত্যের কথা গ্রহণ করবে না নিশ্চয়ই। তবে তার বাড়ীর যে বর্ণনা পেয়েছি আপনারদের কাছে তাতে সেটা একটা ছোট-খাটো অস্বাভাবিক বলতেই হয়, অথচ সে ক্ষেত্রে তার যথোচিত লাইসেন্স নেই। সুতরাং বাড়ীটা একবার খানাতল্লাস করা দরকার। দেবী হলে পাখী উড়ে যেতে পারে।

বিভাস ইন্সপেক্টরের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। ম্যাজিস্ট্রেট একা প্রস্থান করলেন। দেবব্রত, মলয়া আর চৌধুরী মশাই একসঙ্গে চলে গেলেন। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে তাঁর জীপে ফার বিভাস চললো চিরঞ্জীবের বাড়ী দিকে। ইন্সপেক্টরকে অনুসরণ করলো আরো দু'খানা পুলিশ 'কার'।

ঠক ঠক ঠক...

ইন্সপেক্টর চিরঞ্জীবের বাড়ীর বন্ধ দরজায় কড়াঘাত করলেন। কিছু ভিতর থেকে কোন সাড়া এলো না। বিরক্ত হয়ে এবার শনি সন্ধ্যারে কড়া নাড়তে শুরু করলেন।

ঠাং দরজাটা উন্মুক্ত হয়ে গেলো। চিরঞ্জীবের বোবা কাল চাকরটা দরজা খুল দিয়ে সামনে পুলিশ দেখে আঁৎকে উঠলো। তার ভাবগতীন কণ্ঠ থেকে এফটা অব্যক্ত ভয় আর বিষম প্রকাশিত 'আউ' শুধু একটা বিকৃত শব্দ—আউ, আউ, আউ।

ইন্সপেক্টর ধমক দিয়ে বললেন : তাঁর মনিব কোথায় ? এঁরা ? —আউ, আউ, আউ...। ইঙ্গিতে চাকরটা বোঝাতে চেষ্টা করলো। সে কোন কাল, কথার বলতে পারে না।

একটা বোবা আর কাল চাকরের পেছনে অবধা সময় নষ্ট। ইন্সপেক্টর ক্ষুব্ধ মনে করলেন না। তাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। পুলিশ বহিনীও তাঁকে অনুসরণ করলো। পুলিশ যখন দরজা দিয়ে চিরঞ্জীবের বাড়ীতে প্রবেশ করল, তখন এক মুহূর্তের জন্তে দেখা গেলো চিরঞ্জীবের মুখ দোতলার বারান্দায়। উঁকি দিয়ে তার দাঁতে প্রবেশোদ্ধত পুলিশ বাহিনীকে দেখেই সে সরে পড়লো। অশঙ্ক থেকে। চিরঞ্জীবের বাড়ী যেন কম্পিত হতে লাগলো পুলিশ বাহিনীর শব্দ পাদক্ষেপে।

সিঁড়িটা ঘুরে এসে মিলেছে দোতলার একফালি সড় বারান্দায়, তার দু'ধারে দু'সারি ঘর। ইন্সপেক্টর এক এক লাফে দু'তিনটে ঘর পাঁচ হয়ে ওপরে উঠছিলেন। হঠাৎ গুড়ুম করে একটা শব্দ। চমকে উঠলো পুলিশ বাহিনী। ইন্সপেক্টর বসে পড়লেন।

চিরঞ্জীব পুলিশ বাহিনীকে বাধা দেবার জন্তে রিভলভার থেকে গুলীবর্ষণ করছে। প্রথম গুলীটার জবাবে ইন্সপেক্টর সিঁড়ির ওপর বসে বসেই তাঁর রিভলভার থেকে গুলীবর্ষণ করলেন। কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া নেই চিরঞ্জীবের তরফ থেকে। ইন্সপেক্টর আবার উঠে সতর্ক ভাবে অগ্রসর হতে লাগলেন। সিঁড়িটার শেষ ধাপে এসে পৌঁছেতেই আবার একবার গুলী বর্ষিত হলো। ইন্সপেক্টরের পাশ দিয়ে গুলীটা এসে এবার দেওয়ালে বিদ্ধ হলো। তার পর এক মুহূর্তের মধ্যেই পর-পর আরো দু'বার গুলী ছুড়লো চিরঞ্জীব। যে দিক থেকে চিরঞ্জীব গুলীবর্ষণ করছিলো, সেদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ততক্ষণে বেশ নিরাপদ অবস্থান বেছে নিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর কাছ থেকে বেশ কয়েক ধাপ নীচে নিরাপদ দূরত্বে এসে ধমক-পাড়িয়েছিলো বিভাস আর পুলিশ বাহিনী—তারার ওপরে উঠতে সাহস পাচ্ছিলো না। প্রাণের মায়া কার না আছে ?

ইন্সপেক্টর প্রত্যেক বারই চিরঞ্জীবের গুলীর প্রত্যুত্তর দিলেও চিরঞ্জীবের পক্ষে অক্ষত থাকার অসম্ভব হয়নি। কারণ ইন্সপেক্টর প্রত্যেক বারই আশ্রয় হাত বাড়িয়ে গুলী করছিলেন—জীবন বিপন্ন না করে মাথা বাড়িয়ে চিরঞ্জীবকে দেখবার কোন উপায়ই ছিলো না তাঁর। আরো দু'-চার বার দু'দিক থেকেই গুলীবর্ষণের পর হঠাৎ চিরঞ্জীবের দিক থেকে কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। চিন্তিত হলেন ইন্সপেক্টর। চিরঞ্জীবের ভাণ্ডারে বুলেটের অভাব হলো না কি ? কিংবা সে মিছে শক্তিকর না করে অপেক্ষা করছে সুযোগের ?

এ ভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যায় !... জীবন বিপন্ন হয় হোক, এত বড় একটা অপরাধকে এ ভাবে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। চিরঞ্জীব কি করছে দেখবার জন্তে ইন্সপেক্টর দেওয়ালের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে গেলেন।

কি আশ্চর্য। চিরঞ্জীবটা মনে করেছে কি ? এক মুহূর্তের জন্তে ইন্সপেক্টরের চোখে পড়লো বাড়ীর পিছন দিকের বারান্দার রেলিং-এর ওপর সোজা পিড়িয়ে আছে চিরঞ্জীব। হতভাগাটা নীচে বাঁশ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চায় না কি ? তিনি ক্ষণগতিতে ছুটলেন চিরঞ্জীবের দিকে। কিন্তু ইন্সপেক্টরের পারের শব্দ পাবা মাত্র চিরঞ্জীব লাফিয়ে পড়লো নীচে। ইন্সপেক্টরও ছুটে গেলেন বারান্দার দিকে। রেলিং-এ ভর দিয়ে নীচের দিকে ঝুঁকে তিনি দেখলেন, চিরঞ্জীব বহাল তবিরতেই সেখানে পিড়িয়ে আছে। তার মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে। ইন্সপেক্টরকে দেখতে পেয়েই সে চক্ষু স্থির করে তাঁর দিকে আবার গুলী ছুড়লো। ইন্সপেক্টরও সঙ্গে সঙ্গে বারান্দা থেকে সরে এসে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করলেন। চিরঞ্জীব তখন বাড়ীর পিছন দিকের গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে টাট দিয়েছে।

—আশ্চর্য। লোকটার রক্তে যেন অপরাধের বীজ বাসা বেঁধে আছে। ইন্সপেক্টর চিরঞ্জীবের গাড়ী টাট নেবার শব্দ শুনে বললেন : শীগুগির সকলে নীচে নেমে ওর গাড়ীটাকে অনুসরণ করো। একটু দেরী হলে আসামী হাতছাড়া হবে।

পথের ওপর দিয়ে যেন হাওয়ার উড়ে চলেছে চিরঞ্জীবের গাড়ী দু'পাশের লোকের বিষ্মিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা কাঁপছে ধর-ধর করে—পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর.....লোক-জন

ভয়ে সরে যাচ্ছে পথের দু'পাশে। ট্রাফিক পুলিশ মিছেট তাকে গাড়ী থামাতে বলে খেবে ক্রোধ-রক্তিম চোখে গাড়ীর নম্বর লিখে নিচ্ছে।

পিছনে পিছনে পুলিশ 'কার' তিনখানাও 'ভাঙে' অমুসরণ করে আসছে সমান বেগে। কিন্তু মার্কের মাইল খানেক ব্যবধান আর কিছুতেই কমবে না। একখানা হঠাৎ দু'খানা—জনবরত টেলিফোন করে বিভিন্ন খাঁটির পুলিশ এট উন্মাদ গতিবিশিষ্ট গাড়ীগুলোর কথা জানাচ্ছে। কয়েকটা খানা থেকে মোটর সাইকেল আর পুলিশ 'কার' বেরিয়ে পড়েছে ওদের ধরবার জন্যে। সকলেই উত্তেজিত.....ওরা কারা? কারা পথচারীর জীবন তুচ্ছ করে, আইন অমান্য করে সহরতলীর বুক দিয়ে অমন করে গাড়ী চালাচ্ছে?

অবশেষে ইন্সপেক্টরের গাড়ীর সঙ্গে চিরঞ্জীবের গাড়ীর ব্যবধান কমে আসতে লাগলো। চিরঞ্জীব গাড়ী চালাতে চালাতে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে ইন্সপেক্টরের গাড়ী লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। বন্দুকের সামনের কাচখানা ভেঙ্গে গেল। ইন্সপেক্টরও গুলী ছুড়লেন চিরঞ্জীবের গাড়ীর টায়ার লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

তোমাধার মোড়। হঠাৎ অজ্ঞ খানার একখানা গাড়ী সামনে থেকে ছুটে গেলো। ইন্সপেক্টরের গাড়ীখানা পিছন থেকে তাড়া করে আসছে। চিরঞ্জীব এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে ব্রেক করলো—তার পর ডান দিকে গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সবগে চালাতে শুরু করে দিলে। ততক্ষণে ইন্সপেক্টরের গাড়ীখানার সঙ্গে তার ব্যবধান অনেকখানিই কমে এসেছে।

পুলিশের গাড়ী দেখে অপর দিক থেকে আগত গাড়ীখানা আর কোন প্ররম্ভই করলো না। ইন্সপেক্টরের গাড়ীর পেছনে সেও তার অমুসরণ করলো।

চিরঞ্জীবের সামনের পথ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে, দু'পাশে ঘোপ-জঙ্গল, দু'একখানা পোড়ো বাড়ী, বাঁশ-ঝাড়, উঁচু-নীচু অসমান বাঁশ। এ পথে জোবে গাড়ী চালানো সম্ভব নয়। পুলিশের গাড়ীগুলো গতি হারি করতে বাধ্য হলো। চিরঞ্জীব কিন্তু তখন প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা দেওয়ার চেয়ে দুঃখটনায় যদি জীবন যায় থাকে। আর পালানো যদি সম্ভব হয়, তবে তো কথাই নেই। চিরঞ্জীবের গাড়ী লাফিয়ে লাফিয়ে কাঁকানি দিয়ে সমান বেগে চললো। অবশেষে এ পথেরও শেষ হলো—দু'পাশে নীচু প্রান্তর, মাঝে সঙ্কীর্ণ মাটির আল, কোন রকমে হুঁজুন লোক পাশাপাশি হাঁটতে পারে। আলটা নীচের জমি থেকে পনের-কুড়ি হাত উঁচু। বোপ হয় কোন কারণে দু'পাশের মাটি ভুলে কান্ধে লাগানোর এই নীচু জমিগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। চিরঞ্জীবের গাড়ী এসে সবগে আলের ওপর উঠেই মাটি ধরে গড়িয়ে পড়লো নীচে।

পুলিশ 'কার'গুলো পথের প্রান্তে গসে দাঁড়ালো। পেট্রলের কটু গন্ধ বাতাসকে যেন বিধিয়ে তুলেছে। চিরঞ্জীবের গাড়ীখানা বেকে-চুরে বিকৃত আকার ধারণ করে পড়ে আছে নীচু প্রান্তরের ওপর।

চার পাশে তার ধসে-পড়া মাটির স্তূপ। পুলিশ দল ইন্সপেক্টরের অধিনায়কত্বে সতর্ক ভাবে নেমে এলো।

চিরঞ্জীব কোথায়—চিরঞ্জীব? ইন্সপেক্টর স্তম্ভিত ভাবে দেখলেন, চিরঞ্জীবের দেহের আখানা গাড়ীর তলা থেকে বেরিয়ে আছে বাইরে। মুখখানা খেঁৎলে এমন বিস্ত্রী আকার ধারণ করেছে যে, তাকে আর চেনবার উপায় নেই। ইন্সপেক্টরের মনে পড়লো চৌধুরী মশাইয়ের বাগান-বাড়ীর হত্যাকাণ্ডের কথা। তাঁর ভৃত্য হনুজ্ঞনকে হত্যার পরও আততায়ী তার মুখ এমনি ভাবে খেঁৎলে রেখে গিয়েছিলো। পৃথিবীতে কোন আঘাতই বার্থ যায় না। প্রত্যাঘাত বৃষ্টি ফিরে আসে এমনি ভাবেই।

ইন্সপেক্টর ঝুঁকে পড়ে চিরঞ্জীবের দেহ পরীক্ষা করলেন, তার পর উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর পাশে দণ্ডায়মান বিভাসকে বললেন : সব শেষ! এমনি শোচনীয় ভাবে মরে চিরঞ্জীব শেষ পর্যন্ত আইনকে কঁাকি দিলে।

কথা হচ্ছিলো চৌধুরী মশায়ের বাগান-বাড়ীর বৈঠকখানায় বসে। মলয়া কেংলী থেকে কাপে চা চালাতে চালাতে বললো : ওঃ, এমন মামুষও হয়!...

—হয় বৈ কি! চৌধুরী মশাই খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন : অন্ধকার না থাকলে কি কেউ আলোর আদর করতো?...

—হতভাগাটা মরেছে না বাঁচা গেছে! দেবব্রত বললো : এত দিনে তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো!...

—নিশ্চিন্ত আর কই হওয়া গেলো বলো। চৌধুরী মশাই সহাস্তে বললেন : বঃ একটা বিষয় সমস্তায় পড়ে গেছি.....

—আবার সমস্তা! সবিস্ময়ে দেবব্রত প্রশ্ন করলো।

—সমস্তা বৈ কি! চৌধুরী মশাই হাসি চেপে গভীর হবার চেষ্টা করেন : মলয়া মাকে আমার একটা শুভদিন দেখে ষত দিন না তোমার হাতে তুলে দিতে পারছি, তত দিন নিশ্চিন্ত হতে পারছি কই! আবার মলয়া মা চলে গেলে আমাকে এই বুড়ো বয়সে দেখবে কে তাই ভাবছি। সমস্তা নয়?

—খ্যৎ.....! মলয়া ঠক করে কেংলীটা ঠুকে বসিয়ে দিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে : মামা যেন কী!...

সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রতও ঘর থেকে সলজ্জ ভাবে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে : সত্যি! চৌধুরী মশাই ভারী ইয়ে....

ঘর থেকে বেরিয়েই দেবব্রতর সঙ্গে মলয়ার মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। মলয়া মাথা নীচু করে আঙুলে আঁচলটা ঘড়িতে আর ধুলতে থাকে। লজ্জায় মুখ তুলে দেবব্রতর দিকে চাইতেই পারে না।

দেবব্রত কিছু অসঙ্কোচে এসে দাঁড়ায় মলয়ার পাশে। তার হাতে হাত রেখে বলে : এইবার? শুনলে তো চৌধুরী মশাই কি বললেন! কেমন জঙ্ক.....!

মলয়া ফিক করে একটু গেসে দেবব্রতকে বুজাবুজি দেখিয়ে ছুটে পালায়। দেবব্রত পিছনে ছুটে ছুটে ডাকে : আরে কনে বাবু. শুনে যাও.....

বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও বীরভূম অঞ্চলে যখন ইংরাজ বহিক দল নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত কবিরাম সৈন্যী করিতেছিল তখন উত্তর ও পূর্বদিকে সশস্ত্র সন্ন্যাসী ও ফকির দলের বিদ্রোহ উদ্ভব আকার ধারণ করে। ইহারা কখনও সশস্ত্র যুদ্ধে কখনও বা গরিলা যুদ্ধে নবাব ও ইংরাজের সিপাহীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ইংরাজ ও নবাবের অর্থ যে কোন সুরোধে ইহারা লুণ্ঠন করিত।

সন্ন্যাসী ও ফকিরের ইতিহাস অমূল্যমান করিলে জানা যায় যে, সদ্যপ্রথম সম্রাট আকবরের আমলে সশস্ত্র সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হয়। হেভার্ড ডাঃ দাবকুতাবের এক বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, মোঘল শতাব্দীতে সহস্র সহস্র মুসলমান ফকির যখন নিজেরা মোঘল যুদ্ধে সিস্ত খাতিজ না, তখন তাহারা ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে কাণ্ড করিত; তাহা ছাড়া সং মুসলমানের কাণ্ড হিসাবে নিয়ন্ত্র হিন্দু সন্ন্যাসীদের হত্যা করাও তাহাদের অজ্ঞাতম কাজ ছিল। মুসলমান রাষ্ট্রে এই সকল ফকির বিশেষ প্রতিপত্তিপালী ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন হিন্দু সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচার প্রবল ভাবে দেখা দেয়, তখন কান্দীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী পণ্ডিত মধুসূদন সরস্বতী আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে বলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎকালে রাজা বীরবল উপস্থিত ছিলেন, অবশেষে অনেক আলোচনার পর ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের রক্ষা করার জন্য সশস্ত্র 'স্বাক্ষণ-সন্ন্যাসী' নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সম্রাট এই সকল সন্ন্যাসীদের সরকারী বিদিনিষেধের হাত হইতে অব্যাহতি দেন। অগ্রে প্রথমে এই সন্ন্যাসী দল ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের একা-কাণ্ডেই নিযুক্ত ছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে ইহারা নিজেদের মধ্যে ক্রমিক্রমের ব্যাপারে প্রায়ই দারদারি করিত। কেহ বা আশ্রম মঠ প্রভৃতি স্থাপিত করিয়া সন্ন্যাসী-জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু কেহ কেহ বিবাহ করিয়া সাংসারিক জীবন যাপন করিতে লাগিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর একবার গিরি ও পূর্বী সম্প্রদায়ের প্রবেশের যুদ্ধ পরিদর্শন করেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ যুদ্ধের কারণ বিবৃত করিয়া বলেন যে, গ্রহণ-জ্ঞান উপলক্ষে কাহারা অগ্রে বান করিয়া এই লইয়া যে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহাই ঘোর যুদ্ধের আকার ধারণ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে একবার সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের মধ্যে এক যুদ্ধে বহু বৈরাগী হতাহত হয়। একবার নাগাদের সহিত মাদারী ও জেলালী সম্প্রদায়ের মুসলমান ফকিরদের প্রবল যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায়। জেমস্ গ্রাণ্টের ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, একবার সশস্ত্র সন্ন্যাসী দল একটি বৃদ্ধার নেতৃত্বে গাংবলকেশবের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া সম্রাট-সৈন্যকে পরাজিত করে এবং উক্ত দল সম্রাটের বিশেষ ভীতির কারণ হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী দলের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যুক্তপ্রদেশের অধর্ষক গগরা নদী হইতে শূদ্র ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ইহাদের গতি ছিল অগাদ সন্ন্যাসীদের স্বদীন স্বাধীন গুপ্তচর বিভাগ ছিল। ইহারা ইংরাজ ও মুসলমান দানী ও নবাবদের অপ্রতিদ্বন্দ্বিত কর্তব্যে সক্ষম এবং ইহাদের একাধিকভাবে সিপাহী-সংখ্যা ক্রমশঃ আচ্ছন্ন তাহাদের বিশেষ বিবরণ সন্ন্যাসী দলগতদের নিকট সরবরাহ করিত।

সশস্ত্র মুসলমান ফকির দলের স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে।

# বিস্মী বাকী

শ্রীতারিণী শঙ্কর চক্রবর্তী

ইহারা নিজে নিজেদের নামের পরে শাহ, অখাং বাজা উপাধি গ্রহণ করে। ইহারা গোড়া মুসলমান ছিল না। দ্বিগুণ গ্রন্থকাবের মতে ইহারা প্রকৃত পক্ষে অসহী মতাবলম্বী হিন্দু ছিল। মাদারী ফকির দল অসহী সন্ন্যাসীদের দ্বারা জটা রাখিত এবং সর্কাঙ্গে ভগ্না মাখিত। মাদারীদের মধ্যে বদিত্তেদিন মাদারী বিখ্যাত বোগী পুরুষ ছিলেন। হিন্দুগণ ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ইহার বড় শিষ্য ছিল এবং তিনি কানপুরের নিকটবর্তী মাখনপুরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। ফকির দলের মধ্যে মজুম শাহ, বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ইংরাজ সৈন্যদের সহিত ইহাদের বড়ো সংঘর্ষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর উপন্যাসের বিখ্যাত ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী মজুম শাহেরই দলভুক্ত ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চলে যে ফকির দল বাস করিত তাহাদের সহিত জামামান ফকির দলের যোগাযোগ ছিল বসিয়া জানা যায়।

ক্যাপ্টেন মার্টিন হোয়াইটের ১৭৬১ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বরের এক পত্রে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসীদের বাংলায় আবির্ভাবের কথা জানা যায়। বর্ধমান দখলের সময় ইংরাজের সহিত বর্ধমানের রাজা মিল্লী খান, দুধার সিং, সশস্ত্র ফকির দল এবং বীরভূম হইতে আগত এক সেনা-দলের বর্ধমান ও সাংতাগোলাব মধ্যবর্তী স্থানে এক প্রবল যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালে সিংহাসনচ্যুত নবাব মীরকাশিম সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টায় সন্ন্যাসী দলের সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বাবরগঞ্জ অঞ্চলে এক দল সন্ন্যাসী ও ফকির দলের আবির্ভাব হয়। এই দলকে বাধা দিতে গিয়া স্থানীয় কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ কেলীর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। এই বৎসরেই সন্ন্যাসী দল কোম্পানীর ঢাকার কারখানা দখল করে। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ গিসেস্টার সদলবলে কারখানা হইতে পলায়ন সমর্থন করিয়া কোম্পানীর নিকট এক বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, কারখানা হইতে মজুম দল পূর্বের পলায়ন করায় সিপাহীদের মজুমের কাণ্ডে নিয়োগ করা হয়। নদীর উপর অগ্নি যে কারখানি নৌকা ছিল তাহাতে প্রথমে অসহী ব্যক্তিদের, পরে অর্থ প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়। ইহার পর ছাউনীর সৈন্য সমেত পলায়ন করা স্থির হয়। কিন্তু পূর্ব বাবরগঞ্জবাসী কাণ্ড না হওয়ায় ঘোর বিশৃঙ্খলার মধ্যে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ইহার কিছু দিন পরে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের অধীনে এক সিপাহী দল পুনরায় উক্ত কারখানা অধিকার করে।

লক্ষ্যবস্তুর তদানীন্তন কালেক্টরের এক পত্রে জানা যায় যে, ১৭৬৩ সালে বামপুর বোয়ালিয়ায় কারখানা সন্ন্যাসী দল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। কারখানার প্রধান সচিব মিঃ বোনট বন্দী হইয়া পাটনায় নীত হন। ১৭৬৩ সালের অক্টোবর মাসে পাটনায় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

১৭৬৬ সালে কুচবিহার রাজ্যে আভ্যন্তরিক গোলযোগ দেখা দেয়। কুচবিহারের নাবালক রাজা দুটিহাদের বক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন, কিন্তু বাহানন্দ গোঁসাইয়ের প্ররোচনায় নাবালক রাজাকে হত্যা করা হয়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর বিষয়ে দুটিহাদের সহিত রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কন্দনারায়ণের সংঘর্ষ বাড়িয়া উঠে। সংঘর্ষে কন্দনারায়ণ পরাজিত হন এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কন্দনারায়ণের বিপক্ষে সম্রাসী দল ভাঙাটী। সৈন্য হিসাবে কাণ্ডা করে। লেঃ মরিসন এক দল সিপাহী লইয়া সম্রাসী দলের পিছনে তাড়া করিয়া মোঙ্গলঘাট (বর্তমানে মোগলহাট) নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় এক যুদ্ধে সম্রাসী দল পরাজিত হয়। সম্রাসী দলের পিছু ধাওয়া করিয়া লেঃ মরিসন দীনহাটায় আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে এক দল সম্রাসী পূর্বে হুইতেই অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাৎ ইংরাজের সিপাহী আসিয়া পড়ায় তাহাদের সহিত এক সংঘর্ষ হয়। মিঃ মরিসন অল্পকাল অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু বিচার্ড ও ক্যাপ্টেন বেনেস সাহায্যিতঃ ভাবে আঁতত হন এবং এক জন আশ্বিনীয় সৈন্য নিহত হয়।

এই সময় দলে দলে সম্রাসী আসিয়া উত্তর-বঙ্গ ভরিয়া ফেলে। ১৭৬১ সালে ক্যাপ্টেন ডি ম্যাককিজ সম্রাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান আরম্ভ করেন। লেঃ কীথের অধীনে কয়েক দল পথগণা সিপাহী রংপুর অভিমুখে যাত্রা করে। এক সংঘর্ষের ফলে ইংরাজ সিপাহী দল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং লেঃ কীথ যুদ্ধে নিহত হন।

লেঃ কীথের মৃত্যুর ফলে সম্রাসী দল আরও উৎসাহিত হইতে পারে। এই আশঙ্কায় ১৭৬১-৭০ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিভিন্ন স্থানে কোম্পানীর পরিদর্শক নিযুক্ত হয়। রাজসাহী তৎকালীন পরিদর্শক Mr. Boughton Rous ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট এক পত্রে জানান যে, “সংকট কালে সম্রাসীদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট সিপাহী সৈন্য আছে। শিবগঞ্জ পর্যন্ত যে সম্রাসী দল আসিয়াছিল তাহারা আমাদের অবস্থানের বিষয় জানিতে পারিয়া অস্ত্র চাליয়া গিয়াছে। সম্রাসীদের উপর কোম্পানীর বর্ধপক্ষের মনোভাব পত্রে ব্যক্ত হওয়া হইতেই জানা যায়। এক স্থানে Mr. Rous সম্রাসীদের “pernicious tribe” বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলেন যে, “ইহাদের অবস্থান সম্পর্কে আমরা কড়া নজর রাখিয়াছি।”

রংপুরের পরিদর্শক মিঃ জন গ্রোস ১৭৭০ খৃঃ ২০শে এপ্রিল বর্ধপক্ষের নিকট আরও অতিরিক্ত সিপাহী সৈন্য চাহিয়া পাঠান। তিনি উক্ত পত্রে লেখেন যে, “আমরা সকল সময়ের জন্য সম্রাসী অথবা ভববৃক্ক লুণ্ঠক বল যে কেহ আশ্রয় না কেন তাহাদের অভ্যর্থনায় প্রস্তুত আছি। তাহারা গত বৎসর যে সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহারা ফলে হয়তো আরও উৎসাহিত হইয়া এই বৎসরেও আসিতে পারে।” ইহাদের ধারণা সত্য পরিণত হয় এবং সম্রাসী দল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এই পথে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না।

এই বৎসরে নভেম্বর মাসে দিনাজপুরে কোম্পানীর পরিদর্শক এক দল ফকিরের আবির্ভাবের বিষয় বর্ধপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। দিনাজপুরের রাজা ফকিরদের বিরুদ্ধে দশ জন সিপাহী ও এক শত বরকন্দাজ প্রথমে প্রেরণ করেন কিন্তু পথে তিনি

জানিতে পারেন যে, ফকিরদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার হইবে। এই সংখ্যাধিকার কথা জানিতে পারিয়া তিনি বরকন্দাজ ও সিপাহীদের ফিরাইয়া আনেন। দিনাজপুর, রংপুর ও পূর্ণিয়ার কোম্পানীর পরিদর্শকদের নিবট কাউন্সিলর বর্ধপক্ষ অতিরিক্ত দুই-এক দল সিপাহীর জন্য রাজমহলের ক্যাপ্টেন হুডসনের নিকট আবেদন করার নির্দেশ পাঠান।

১৭৭১ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকার অধ্যক্ষ Mr. Kelsall এর এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, “সম্রাসী দল বিভিন্ন স্থানে ছানা দিয়া কর আদায় করিতেছে। সর্বশেষ তাহাদের ময়মনসিংহের নিবটবর্তী বাইগুণবাড়ীর নিকট দেখা গিয়াছে।” এই বৎসরে ২৫শে মার্চ ঘোড়াঘাট (দিনাজপুর) ও গোবিন্দগঞ্জ অঞ্চলে লেঃ টেইলর এক দল সম্রাসী ও ফকিরকে পরাজিত করেন। দলপতি মন্তু শাহ্ মহাস্থানগড়ে পলায়ন করেন। কোম্পানী-সৈন্য মন্তু শাহ্কে বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়।

১৭৭২ সালের প্রথম দিকে মন্তু শাহ্ দলপতি হইয়া রাজসাহী ও বগুড়া অঞ্চলে দেখা দেন। গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি তুলিয়া বাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কোম্পানীর লোক-জন তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করে তাহার উল্লেখ করিয়া মহারাণী ভবানীর নিকট এক পত্রে তিনি তাঁহার সহানুভূতি ভিক্ষা করেন। তিনি বলেন যে, “বাংলা দেশে তাঁহারা সদলবলে প্রতি বৎসর মন্দির ও তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন এবং বাংলার জনগণের নিকট ভাল ব্যবহার, ভিক্ষা ও অশ্রান্ত সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে সবেল পরিভ্রমণ করিলেও তাহাদের উপর কোন অত্যাচার ঘটে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত বৎসর ১৫ জন ফকিরকে নিহত ভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের ভিক্ষাকর প্রবাসমুহ লুণ্ঠন করা হইয়াছে। পূর্বে ফকিরগণ বিচ্ছিন্ন ভাবে চলা-ফেরা করিত, কিন্তু তাহাদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তাহারা বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে চলা-ফেরা করিতেছে। ইহাতে ইংরাজগণ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাদের চলা-ফেরা ও দেবমন্দির দর্শনে অশ্রায় ভাবে বাধা দিতেছে। আপনিই এই দেশের কর্তা। আমরা ফকিরগণ সর্কদাই আপনাদের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি।”

এই সময়কার নথিপত্রে দেখা যায়, মন্তু শাহ্ তাঁহার দলীয় লোক-জনকে গ্রামবাসীদের উপর কোন রকম খারাপ ব্যবহার বা জুলুম না হয় সেই প্রকার নির্দেশ দেন। নির্দেশে আরও বলা হয় যে, গ্রামবাসীগণ স্বচ্ছন্দে বাসা দান করিবে তাহাই যেন গ্রহণ করা হয়।

১৭৭২ খৃঃ ২৭শে ডিসেম্বর পূর্ণিয়ার কাজেক্টর, রংপুর সারকিট কমিটির সভ্য মিঃ গ্রেহামকে জানান যে, কয়েক দল সম্রাসী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে পুনরায় দেখা দিয়াছে। ইহারা গ্রামবাসীদের উপর কর দাখ্য করিয়া অর্থ আদায় করিতেছে। আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে, উক্ত সম্রাসী দল রংপুরের অন্তর্গত ভবানীগঞ্জ কাছারী লুণ্ঠন করিয়াছে। কোম্পানীর বর্ধপক্ষ রংপুরের কালেক্টরের উপর নির্দেশ দেন যে, অবিলম্বে দিনাজপুরের অবস্থিত সিপাহী দল লইয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের পথে সম্রাসী দলকে অহুমরণ করা হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের অধীনে এক দল সিপাহী ২১শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে জাকরগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করে। ৩০শে ডিসেম্বর ভোর বেলায় কোম্পানীর সৈন্য রংপুর সহরের পশ্চিম

দিকে হামগঞ্জের সমতল ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী দলকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত সন্ন্যাসী দল প্রায় পনের মত ছিল। প্রথমে সন্ন্যাসী দল পশাদপসরণ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কোম্পানীর সিপাহী দল সন্ন্যাসীদের তাড়া করিয়া তাহাদের যুদ্ধের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করে। ইহার পরে সন্ন্যাসীদের পাণ্টা আক্রমণ আরম্ভ হয়। কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসী দল দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় ক্যাপ্টেন টমাস সিপাহীদের শেষ চেষ্টা হিসাবে বেয়নেট চার্জ করিবার আদেশ দেন। সিপাহীগণ এই আদেশ সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করে। ক্যাপ্টেন টমাস যুদ্ধে নিহত হন। দেশীয় লোকেরা কোম্পানীর লোক-জনকে সাহায্য করা দূরের কথা বরং লাঠি লইয়া সন্ন্যাসী দলের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে যোগদান করে। কোম্পানীর যে-সকল লোক প্রাণভয়ে জঙ্গলে ও বড়-বড় ঘাসের মধ্যে আশ্রয়গোপনের চেষ্টা করে, গ্রামবাসীগণ তাহাদের সন্ন্যাসীদের হাতে ধরাইয়া দেয়। সিপাহীগণ গ্রামের অভিমুখে ঘাইবার চেষ্টা করিলে গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসীদের ডাকিয়া সিপাহীদের ধরাইয়া দেয় এবং জঙ্গল-শব্দ কাড়িয়া লয়।

সন্ন্যাসী দল কোম্পানী-সৈন্যকে পরাজিত করিবার পর ব্রহ্মপুত্র-দ্বানে সদলবলে যাত্রা করে। সারকিট কমিটি হিন্দুস্তান করে যে, সন্ন্যাসী দল পুনরায় এই প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বেই যেন বাধা দেওয়া হয় এবং বিহারে বসিত সেনাদলের যেন সাহায্য গ্রহণ করা হয়। ওয়াশেন হেষ্টিংস সেই ভাবেই কাজ করিবার জন্য সচেষ্ট হন। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরেই পরগণা-সিপাহী দল পুনরায় সন্ন্যাসীদের নিকট পরাজিত হয়।

ক্যাপ্টেন টমাসের মৃত্যুর পর ১৭৭২ সালের শেষ ভাগে এক দল সন্ন্যাসী কুচবিহার অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় গিয়া দর্পদেবের সন্ন্যাসী দলের শক্তি বৃদ্ধি করে। কুচবিহার রাজ্যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লইয়া দর্পদেব ও নাজিরদেবের পুরাতন কলহ তখনও চলিতেছিল। দর্পদেবের অধীনস্থ পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী-সৈন্য সন্তোষগঞ্জের দুর্গ দখল করিয়া লইল। নাজিরদেব তাহার পুরাতন বন্ধু ইংরাজের শরণাপন্ন হইল। রংপুরের কালেক্টর Mr. Purling কুচবিহারে গিয়া নাজিরদেব ও নাবালক রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নাজিরদেবের অধীনেও এক দল বেতনভুক সন্ন্যাসী ছিল ;

অপরোধের অঙ্কুরে Mr. Purling সন্ন্যাসী দলকে বিবায় দিবার পরামর্শ দেন। সন্ন্যাসী দল পূর্বে ইহাতে চলিয়া ঘাইবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, এই বিদায় দিবার অন্তর্বে তাহারা বংস্বত হইল।

সন্ন্যাসীদের দমন করিবার জন্য ওয়াশেন হেষ্টিংস তাঁহার সৈন্যদল পুনর্গঠিত করিলেন। সশস্ত্র সন্ন্যাসী দলকে যে কোন প্রকারে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য জেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠাইলেন। রংপুরের কালেক্টরের নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট রাজমহল হইতে ১১ সংখ্যক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য লইয়া জলপাইগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাপ্টেন জোন্স রংপুর হইতে আর এক দল সৈন্য লইয়া কুচবিহার অভিমুখে রওনা হন। হেষ্টিংসের নির্দেশক্রমে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্টকে সাহায্য করিবার জন্য বহরমপুর হইতে আর এক দল সৈন্য প্রেরিত হইল। দানাপুর হইতে আর এক দল সৈন্য পূর্বদ্বার উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের যাতায়াতের পথে প্রেরিত হয়। সুযোগ-সুবিধা হইলে কুচবিহারে ক্যাপ্টেন জোন্সের সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইবার নির্দেশও তাহাদের দেওয়া হয়। ক্যাপ্টেন জোন্স ২৭শে জামুয়ারী পাটগাঁ পৌছাইবার পর সংবাদ আসে যে, সন্ন্যাসী দল মাত্র আট মাইল দূরে আছে এবং তিন মাইলের মধ্যে আরও দুইটি দল আছে। দর্পদেব তখন ভূটান ও হিমমগঞ্জের মধ্যবর্তী লক্ষ্মীপুর নামক গিরিপথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই গিরিপথের যুদ্ধে দর্পদেব পরাজিত হন।

২৮শে জামুয়ারী শিবগঞ্জ হইতে ক্যাপ্টেন জোন্স সন্ন্যাসীদের পরাজয়ের সংবাদ প্রেরণ করেন। যুদ্ধে কোম্পানীর পক্ষে এক জন নিহত ও ৪ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়। সন্ন্যাসী দল বিজিন্ন ভাবে পলায়ন করে। নৌকাযোগে তিস্তা নদী পার হইয়া তাহারা সমস্ত নৌকা ছাড়িয়া দেয়। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ষ্টুয়ার্ট রাজমহলে গঙ্গা পার হইয়া দিনাজপুর হইতে ৩৬ মাইল দূরে শ্রীরামপুরে পৌছাইবার পর সোজা জলপাইগুড়ি ঘাইবার নির্দেশ পান। জলপাইগুড়ির যুদ্ধেও দর্পদেব ও তাঁহার সন্ন্যাসী দল পরাজিত হয়। ওরা ফেরারী অপরাহ্ন জলপাইগুড়ি ইংরাজদের দখলে আসে।

[ ক্রমশঃ।

## আগামী মানুষ

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

এখানে চলার পথে বনিকা নয়  
কপিক বিরতি লাগি কিছু অবকাশ  
এখানে মাটির বুক উতলা স্বপ্ন  
মাথার উপর শুধু অথই আকাশ।

এখানে অনেক দূরে রাতের আঁধার  
হুঁচোখে জড়ানো শুধু চাঁদের জোয়ার  
অনাদি অসীম মাঝে ডানার বিধার  
আমরা যাত্রী দল নোতুন সোওয়ার।

স্বপ্ন চলার পথে রাতের কুয়াশা  
এখানে আমরা শুধু প্রহর গুণি  
বুকের তলায় জমা কিছু ভালবাসা  
দুর্গম মক্ষর পথে তবু গান শুনি।

এখানে আমরা শুধু আগামী মানুষ  
স্বপনে নগর গড়ি যরণ কাহ্নস।



# বঙ্ক-পাট

প্রদান রায়

## আমাদের ক্রমশঃ অচল চলচ্চিত্র

কথায় বলে, ত্রিশ বৎসর পার হ'লেই মানুষ যৌবন-সীমাও পার হয়ে যায়। যদিও আমরা মনে মনে এ কথা মানি না। তা যদি মানি হুম, তাহলে আমাদের অনেকটাই শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে পঞ্চাশোক্তেও অগ্রণে গমন না ক'রে আবার টোপের প'রে নতুন ক'রে ঘর বাঁধতে বসত না।

তা প্রচলিত মতানুসারে বাংলা চলচ্চিত্রও ত্রিশ বৎসরকে পিছনে ফেলে যৌবনেরও সীমা পার হয়ে গিয়েছে। দুই যুগ আগে কেউ তার দোষত্রুটি দাঙে উঠত হ'লেই মুকব্বিরা হা-হা ক'রে বলে উঠতেন—‘আমাদের চলচ্চিত্র শিল্প আজও নাবালক, এখনো তার বিকশে গ্লানি প্রচার করা উচিত নয়’ প্রভৃতি।

বিশ্রুতি চলচ্চিত্র পদার্থ উপরে ভালো ক'রে গল্প ফুটিয়ে তুলতে শিখেছে জন্মের পর এক যুগের মধ্যেই। সে কথার মত কথা কইতে শিখেছে বিশ বৎসর আগেই। তার বেশী দিন পরে বাংলা ছবি মুখব হগ্ননি। তবু আমরা তাকে সাবালক ব'লে মনে করব না কেন?

এ প্রশ্নের সহস্রের খঁজে পাওয়া যায় না। আমরা কৌতুকভুলে বলি, কোন জাতের মানুষদের বুদ্ধি থাকে না আশী বছরের আগে। বাংলা ছবি বোঝাতেও কি ঐ যুক্তি প্রযোজ্য?

এদেশী চিত্ররাজ্যে গল্পের কাহাবয় শুরু করেন ম্যাডানদের, অরোরা সিনেমা, ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম ও তাঞ্জমহল ফিল্ম সম্প্রদায়।

সে-সময়ে দর্শকরা ছিল শ্রবণ বালক গোপালের মত। তারা যা শোত তাটোতেই বুনিট কেবল হ'ত না, সেট সজে মনে করত যা পাচ্ছে তা যথেষ্টরও বেশী। বাংলা ছবি ছিল তখন ‘নভেলটি’ বা আজব জিনিষের মত, সাত খুনের অপরাধীর মত মাফ করা হ'ত তার সব দোষ।

তার পর গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল বৎসরের পর বৎসর। তখনকার যুগ দর্শকরা আজ হয়েছে বৃদ্ধ। তখনকার অধিকাংশ বাংলা ছবিকার ভালো ক'রে গল্প বলতে পারতেন না। আজকের অধিকাংশ ছবিকারও ভালো ক'রে গল্প বলতে শেখেননি।

আজকের ছবিকাররা কতকগুলি বিষয়ে অগ্রসর হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করি না। তাঁরা আলোকচিত্রকে অধিকতর উন্নত ও বিচিত্র করে তুলেছেন। এবং তাঁরা হরেক বৎসর পাঁচ কয়েক ও কলা-কৌশল দেখাশোনা শিখেছেন।

এখনকার ছবিদ্রাব্যের কাব্যিক এবং খাদিকতর বিস্তার এবং কর্তব্যও অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে। আগে একটি মাত্র ক্যামেরা, গুটিকয় আসবাব ও মুষ্টিমেয় কন্ঠীদের নিয়ে ছবি

পর ছবি তোলা হয়েছে। দশ হাজার টাকা ফেসলে আগে তোলা যেত একখানা ছবি। সে জায়গায় আজ এক লক্ষ টাকাও যথেষ্ট নয়। এট দরিদ্র ভারতবর্ষেই আজ একখানি মাত্র ছবি তৈরি করতেই অনেকে বড় লক্ষ টাকা অস্বাভাবিক ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। এখন এক এক জন নট নটী বৎসবে যত টাকা বোজগার করেন, আগে তারই সাফাঘো তোলা যেত কয়েকখানি ছবি। কথা কইতে শিখে পর্যন্ত ছবির কাঁচ এত বেড়ে গিয়েছে যে, এখন একখানি মাত্র ছবির জন্তে একটি মাত্র ষ্টাডিয়ার ভিতরে যত লোক কাজ করে, পূর্বেকার চারটি চিত্র-সম্প্রদায়ের জন্তেও তত লোকের দরকার হ'ত না।

কাজ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে চিত্রনিখাতাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও। ছবির সাফাঘো তাঁদের কেউ প্রচার করতে চান আদর্শবাদ; কেউ করতে চান সামাজিক সমস্যার সমাধান; কেউ চান মূহ মগাঙ্কা বা মহাজনদের জীবন্ত ক'রে দেখাতে; কেউ চান অমীমাংসিত কাণ্ড বা চিপ্তোত্তেজক ঘটনা দেখিয়ে আমাদের চমকে দিয়ে দেহ বোমাকিত করতে; এবং কেউ বা চান নাচ-গান ও হাস্যকৌতুকে মুগ্ধ করতে দর্শকের মন।

তালে বাজারে বিস্তার চাক-চোল বাজিয়ে একখানি ছবি বেরিয়েছে। ছবিখানি যে অভিজাত তা প্রচার করার জন্তে বিজ্ঞাপনে বাক্য-বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে যথেষ্ট। এবং তা যে কীকা আওয়াজ নয় তা প্রমাণ করার জন্তে তোমরা-তোমরা ব্যক্তিদের কাছে পরনা দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে লোভনীয় প্রশংসাপত্র। প্রথম লোকে যে প্রলুব্ধ হয়নি, এমন কথাও বলতে পারি না। অসাধারণ ব্যক্তির মনে মনে না হোক মূখে স্বীকার করলেন,—হ্যাঁ, ছবিখানি অভিজাত না হয়ে যায় না, কেন না এর মধ্যে আছে ভালো ভালো ভাব, বড় বড় বুলি এবং উচ্চশ্রেণীর আদর্শবাদ। কিন্তু সাধারণ দর্শকরা ছবি দিকে ফ্যান্টাসম ক'রে তাকিয়ে রইল এবং পাড়ায় ফিরে এসে ছবির যে সমালোচনা করল, তা শ্রবণ ক'রে তাদের বন্ধুরা সে-ছবির নামও আর মুখে আনতে চাইলে না। মুক্তি বিজ্ঞাপনের চেয়ে মৌখিক বিজ্ঞাপনের মূল্য অনেক বেশী।

এটা তো গেল অভিজাত ছবির কথা। আর এক শ্রেণীর ছবি বাজারে বেরিয়েছে, যার নিখাতারা অভিজাত্যের দার পাবেন না—না মনে, না বিজ্ঞাপনে। তাঁরা তৈরি করেন ভয়াবহ ছবি। তাঁরা জানেন এক শ্রেণীর লোক ভয় পেতে ভালোবাসে, তাই তাঁরাও ভয় দেখিয়ে বেশ হুঁ-পরসা কামিয়ে নিতে চান। লোকে ছবি দেখে ভয় পায়, চমকে ওঠে, দেহকে বোমাকিত ক'রে তোলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রায় দেয়, ছবিখানা হচ্ছে নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

কেন এমন হয়? একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

উনিশ-বিশ বৎসর আগে কবি নজরুল ইসলামের ‘আলোয়’ নামে একখানি নাটক ‘নাট্য-নিকটতম’ অভিনীত হয়েছিল। ভালো কবিতা শিখে, ভালো গান শিখে এবং গান ভালো শ্রব দিয়ে নজরুল খ্যাত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর নাটকেও ছিল ভালো ভালো গান অনেকগুলি এবং সে সব গানের শ্রব দিয়েছিলেন তিনি নিজে। গড়েও নজরুলের হাতবশ ছিল। স্মরণ্য নাটকের মধ্যে যে ভালো ভালো কথা থাকবে সেটা আর বলাই বাহুল্য।

উচ্চ শ্রেণীর ভাবেরও অভাব হয়নি। তার উপরে ছিল অনেকগুলি চমৎকার নাট। কোন কোন নাট দেখে বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চো আর্ট থিয়েটারের অত্যন্ত কণ্ঠস্বর স্বরাবদী সাহেব প্রভূত প্রশংসা না করে পারেননি। তখনবার এক জন লোকপ্রিয় নৃত্যশিল্পীর (শ্যামসুন্দর) নৃত্যও দর্শকদের কাছ থেকে যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করত। অপূর্ণ দৃশ্যও পরিবর্তন করেছিলেন সুরিখ্যাত শ্রীমতু সেন। মঞ্চের বড় বড় নট-নটীগা নেমেছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায় এবং তার উপরে সিনেমার প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য সেই প্রথম দেখা দেন মঞ্চের উপরে নাটকের ভূমিকায়। মোট কথা, আয়োজন হয়েছিল প্রথম শ্রেণীর।

কিন্তু সকলের চোঁটই ব্যর্থ হ'ল, নাটকখানি একেবারেই জমল না। নজরুলের অতুলনীয় জনপ্রিয়তাও নাটকখানিকে অকাল-মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করতে পারলে না।

কেন? নজরুল উচ্চশ্রেণীর কবি বটে, কিন্তু নাটকের গল্পটিকে তিনি ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারেননি।

চিত্রকল্পগতও গল্প বলানিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা। এই ক্ষেত্রেই হলিউডের পৃথিবী-বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ জ্যাক উইন সাহেব প্রযোজক, পরিচালক ও নট-নটীর উপরেও লেখকের আসন নির্দেশ করেছেন। গল্প যদি ভালো হয় তবেই ছবি চলবে। গল্প যদি ভালো না হয়, যদি ভালো করে গুছিয়ে না বলা হয়, তবে শ্রেষ্ঠ প্রযোজক, শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নট-নটীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাও কোন ছবিকে কিছুতেই বাচিয়ে রাখতে পারবে না।

মাঝে মাঝে সমালোচনায় ও বিজ্ঞাপনে দেখি, ছবিতে ক্যামেরার কাণ্ডাবিক অত্যন্ত প্রাধান্য দিয়ে দর্শকদের আহ্বান করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে হাশ্বাকর। আমরা ক্যামেরার সাহায্যে নতুন কায়দায় ছবি তোলা দেখলে খুসি হ'তে পারি, কিন্তু নিত্যন্ত গোণ ভাবেই। যে ছবি বলে বাজে গল্প, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আলোকচিত্রকরের কোন কস-কৌশলই তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

বাংলা ছবি গোড়ার দিকে ভালো গল্পের প্রতি যেটুকু দৃষ্টি দিত, এখন তাও আর দেয় না। "মেজদিদি", "ককাল" ও "রত্নদীপ" প্রভৃতি ছবি আজকের দিনেও সমস্ত দর্শকের হৃদয় জয় করেছে একমাত্র কাহিনীর জগেই। কিন্তু এটা দেখেও ক্ষতাবলি ছবিকাররা এই সহজ সত্যটা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।

গত বাংলার "মাসিক বসুমতা"তে বাংলা ছবির যে সালতামামি

প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায়, ১৩৫৭ সালের যৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত বাংলা ছবি তোলা হয়েছে মোট পঁয়তাল্লিশখানা। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে মাত্র পাঁচখানা ছবি— "ককাল", "মাইকেল মধুসূদন", "বিজ্ঞানাগর" "মেজদিদি" ও "রত্নদীপ"। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে স্থানলাভ করেছে যথাক্রমে চারখানা ও সাতখানা ছবি। বাকি সমস্ত ছবিই ছবিই হয় "নিকট", নয় "নিকটতম"।

এই সব রাবিস বা রাবিসেরও চেয়ে খারাপ ছবি উচ্চতর শ্রেণীতে উঠতে পারেনি কেবল গল্প বলার দোষেই। এই সব ছবিতে খারাপ গল্প বলার ভার নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পনেরো আনা লোকের নাম গল্পলেখক বলে কেউ জানে না। অনেকেই পেটের দায়েই বা হোক একটা কিছু খাড়া করে দিয়েছেন। কেউ বা বিদেশী গল্প চুরি করে বাংলার মাটিতে খাপ খাওয়াতে পারেননি এবং কেউ কেউ বা মনে করেছেন তাঁরা যখন কথঞ্চিৎ পড়েছেন এবং অনায়াসেই চিঠি লিখতে পারেন তখন গল্পই বা লিখতে পারবেন না কেন?

কিন্তু নিছক পণ্ডিত্যের জেজে নিখাদাতের এই যে বিপুল অর্থব্যয় ও মন্দভাগ্য দর্শকদের এত যে বিপুল অর্থদণ্ড, এটা নিয়ে চিন্তা করলেও মন হয় ভারগ্রস্ত। আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমাদের চিত্র-কল্পগত অবাধে বিচরণ করেছে যত সব নির্দোষ প্রযোজক, অনভিজ্ঞ পরিচালক ও অক্ষম লেখক। যেখানে চেক সহ করতে পারলেই প্রযোজক, কাস্তুর বধ করতে পারলেই পরিচালক এবং কলম ধরতে পারলেই লেখক হওয়া যায়, সেখানে চলচ্চিত্র শিল্পের অধোগতি গোপন করার ক্ষমতা কাকুর আছে বলে মনে করা না। বাংলা ছবি হয়েছে আনাড়ীদের হস্তগত, তার চাহিদা ক'মে যাচ্ছে দিনে দিনে, বাঙালী দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে তিন্দী ছবির বাজারে—সেখানেও মস্তিষ্কের খেলা পাওয়া না গেলেও ধুমধাক্কা দেখে অর্থব্যয় কতকটা সার্থক হ'ল ভেবে মনকে খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া যায়। এই ভাবে আরো কিছু দিন চললে বাংলা ছবি যে কত নোচে গিয়ে দাঁড়াবে, তা কল্পনা করলেও মনের ভিতরে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস।

এই অচল অবস্থা কতকটা দূর করতে পারেন আমাদের বিভিন্ন ষ্টুডিয়ার মালিকরা। যে সব নতুন বা হঠাৎ-গরিব-গঠা চিত্র-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নামগোত্রহীন প্রযোজক, পরিচালক ও লেখকরা, দ্বিগুণ ভাড়া দিলেও তাদের হাতে ষ্টুডিয়ো ছেড়ে না দেওয়া উচিত। এ ছাড়া বাসবিলাদের উপজব বন্ধ করাবা উপায়ান্তর নেই।

### বিজ্ঞাপনের ফল

ঈশ আর মুব্বীর পার্থক্য কি বলতে পারেন? ঈশ নিরীহ আর গভীর; ময়লায় শুপে চুপসাড়ে বসবাস করে। ডিম পাড়লে কা'কেও কিছু জানায় না, চোঁচোমেচি করে না। কিন্তু মুব্বী যখন ডিম পাড়ে, তখন তার কণ্ঠস্বর যখন-তখন শোনা যায়। মুব্বী যেন সারা দুনিয়াকে ডিম পাড়ার কথা জানাতে চায়। মুব্বী যেন বিজ্ঞাপন করে চিঁচিয়ে, তারস্বরে চীংকার করে।

কলে এই হয় যে, সারা দুনিয়ার লোক মুব্বীর ডিমই বেশী পরিমাণে খায়। আর ঈশের ডিমের এক রকম সন্ধানই পাওয়া যায় না।



যাঁদের দেখেছি—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। নিউ এজ পাবলিশিং লিমিটেড। ২২নং ক্যানিং স্ট্রিট, কলিকাতা—১, মূল্য তিন টাকা। কল্লোল-যুগ—শ্রীঅশিতাকুমার সেনগুপ্ত। ডি, এম, লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট, কলিকাতা—৬, মূল্য পাঁচ টাকা। বঙ্কিমচন্দ্রের উপজ্ঞাস—শ্রীশিবানন্দ। চক্রবর্তী, ৫১টাঙ্গী এণ্ড কোং লিঃ। ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য ৫১০ টাকা। রোগটা যখন টি, বি—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। নর-নারী পাবলিশিং কনসার্ন, ২৬-১, শশীভূষণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা—১২, মূল্য সাড়ে তিন টাকা। টি, বি, থেকে সারবার পর—অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায়। নর-নারী পাবলিশিং কনসার্ন। ২৬-১, শশীভূষণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা—১২, মূল্য দুই টাকা। কুমারী অ্যারন্ডার-এর দিনপঞ্জী—তরু দত্ত। অনুবাদক—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়। এন, এস, রায় চৌধুরী প্রকাশিত। ৭২, হারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

গত কয়েক বছরের বাঙালী সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মূল-সাহিত্যের বত না উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ গল্প, উপজ্ঞাস এবং

‘সাহিত্যে বত না মৌলিক স্বল্পের সন্ধান’ সাহিত্যে দেখে ভা। চেয়ে অনেক অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কয়েক জন সমালোচনা-সাহিত্যে। বিগত কয়েক বছরে মূল-সাহিত্যে পূর্ণোৎসাহ উন্নত ধরনের গল্প, উপজ্ঞাস এবং কবিতার সাক্ষ্য এক রকম সেই বললেই ভাল হয়। পঞ্চাশের মধ্যস্তর ও যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের বাঙালী সাহিত্যে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন কয়েক জন পুথানো এবং নূতন সাহিত্য-সেবক। কিন্তু অধুন! আমাদের গল্প, উপজ্ঞাস এবং কাব্য-সাহিত্যে কেন যে সহসা এমন ভীষণ পড়লো তার কারণ আমাদের কাছে একেবারে অজ্ঞাত। পুথানো লেখকদের কয়েক জনের লেখনীতে যেন মরচে ধরে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ এখনও যারা সমান তালে লিখতে সচেষ্ট আছেন, বলতে বাধা নেই, তাঁদের নূতনতর সৃষ্টি হচ্ছে যেন চর্কিতচর্কণ। পূর্বে তাঁরা যা লিখেছেন তারই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের আধুনিকতম লেখায়। লেখায় পুনরাবৃত্তি ঘটলে যে লেখা ধামাতে হয়, সে-কথা তাঁদের বুঝিয়ে পাড়া যায় না। বাজারের টাকা এবং বস্ত্রের মোহ কি তাঁরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি? সর্বদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকরাই stock হুরিয়ে গেলে কোন রকম লোভের বশীভূত না হয়ে লেখার বিষয় হন, যাতে তাঁদের পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু বাঙালী সাহিত্যের কয়েক জন লেখককে দেখা যাচ্ছে তাঁরা তাঁদের সঞ্চিত বশবোধকে খেচ্ছার দান করছেন। অথচ লেখার ধারা কিছু মাত্র পরিবর্তন করছেন না। অজ্ঞাত দেশে দেখা যায়, কোন সাহিত্যিক প্রচুর লেখার পর যখন ক্লান্ত হন তখন লেখার রীতি বদল করেন। তার মানে গল্প লিখতে লিখতে হালকা রচনার দিকে মনঃসংযোগ করেন হয়তো, উপজ্ঞাস লেখায় ইতি দিয়ে গল্প লেখার রত হন, কবিতা-লক্ষ্যকে ত্যাগ করে কাব্যালোচনায় লেখনী নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে ঠিক তার উলটো হতে দেখা যাচ্ছে। গল্প রচনায় যার নৈপুণ্য কিংবা উপজ্ঞাস লেখায় যিনি পারদর্শী, শেষ বয়স পর্যন্ত যে গল্প এবং উপজ্ঞাস লিখলেই তাঁদের রচনা সব সময়ে উৎকৃষ্ট হবে তার কোন দার্শনিক ভিত্তি নেই। বরং তার কৃষ্ণ-স্বরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটবার আশঙ্কা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ঘটছেও তাই। তাঁদের লেখায় আর কোন আকর্ষণ থাকছে না, যদিও তাঁদের আপন আপন খ্যাতি দান হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা তাঁদের গুরুদেব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমূল্য পন্থাকে অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ রেখেছিলেন, যে-সমস্ত যুগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যে-সব রচনা তিনি দেশবাসীকে উপহার দিয়ে গেছেন তাদের একটিও অপার্ট তো নয়ই, বরং প্রত্যেকটি সুখপাঠ্য। প্রথম চৌধুরী মণ্ডিও ঐ পথের পথিক। এমন কি আধুনিক সাহিত্যের অন্নদাশঙ্কর রায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উক্ত ধারা রক্ষা করে চলেছেন। যে-সমস্ত তাঁদের একটিও লেখায় ধার এবং ভাবের অভাব হচ্ছে না। অল্পদাশঙ্করের সাম্প্রতিক ছড়া আর অচিন্ত্যকুমারের সত্তপ্রকাশিত কল্লোল-যুগই আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট পরিচয়। আধুনিক বাঙালী সাহিত্যে হয়তো সর্বোৎসাহ বয়োজ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রকুমার রায়, তিনিও তাঁর রচনার রীতি পরিবর্তন করেছেন। কিছু ভাল পূর্বে একটি অধ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে দেখা যায় হেমেন্দ্রকুমারের ব্যক্তিগত সাহিত্য-সৃষ্টি-কথা—‘জীবনের স্বপ্নপাতা’ নামে। কিন্তু বাঙালীর নূতন পত্রিকাগুলির

বার্ষিক অকাল-মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হয় এই পত্রিকাখানি। তৎপরে 'জীবনের স্বরপাঠ্য'র 'বাদের দেখেছি' নামান্তর হয় কোন এক দৈনিক পত্রিকার এবং প্রতি সপ্তাহে একেক বিভী আশ্ব-প্রকাশ করতে থাকে এবং সামান্য দিনের মধ্যেই দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। 'বাদের দেখেছি'র প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, হেমেন্দ্রকুমার আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে হঠাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি সেই 'ভারতী' গুণের অন্ততম এক জন, যিনি নিজ সাহিত্য-ধারা ও নিজ শ্রব্যবহারের ক্ষমতাসকলের শ্রিয় ছিলেন এবং এখনও আছেন। স্বর্ণকুমারী দেবী, বইন্দ্রনাথ, মণিলাল (বন্দোপাধ্যায়), গগনেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির সমসাময়িক 'ভারতী' পত্রিকার যুগ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা এমন সময়, যখন সকলের নিষ্ঠা, ঐতিহ্য ও সাহিত্য-প্রীতি ছিল গভীর ও সুনিবিড়। তখন দত্তরমত সংসাহিত্য রচনার আত্মদান করেছিলেন একাধিক প্রতিভা—যার ফলে তখনকার বাঙলা সাহিত্যে এখনকার সাহিত্যের মত মেকী ও ভুগো বাস্তবীতির কোন রকম 'ism'এর স্থান হয়নি। যদিও তখন কংগ্রেস ও অস্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যথেষ্ট স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কোন এক জন সাহিত্যিকও গড়ে তুলতে সচেষ্ট হননি এখনকার মত কোন একটাও কংগ্রেস সাহিত্য-সম্মেলন—যার ভেতর কংগ্রেস, সাহিত্য এবং সমাজের কোন বালাই নেই বলেই হয়। 'ভারতী' গুণে এবং যুগে খাঁটি সাহিত্য এবং সাহিত্যিক তৈরী হয়েছিল একাধিক প্রতিভার সমবেত চেষ্টায়। সেই যুগের এক-এক যুগধরদের সম্বন্ধে স্মৃতিকথা (ইংরেজীতে যাকে বলে Reminiscence) অঙ্কিত করেছেন হেমেন্দ্রকুমার, যাকে যেমন দেখেছেন, যাকে যতটুকু জেনেছেন। বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের একখানি গ্রন্থের অত্যধিক প্রয়োজন ছিল এবং আশা করি, এখন হেমেন্দ্রকুমার ব্যতীত অপর কেউ আর নেই যিনি বার্ষিকীভিত্তি ধারায় এই ধরনের sketch আঁকতে সক্ষম হবেন। 'বাদের দেখেছি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্রিশ জন সাহিত্যিক এবং সাহিত্য রস পিপাসুর ব্যক্তিগত জীবন-স্মৃতিতে। হেমেন্দ্রকুমারের দৃষ্টিকোণ কোন প্রকার রাজনীতির ভেজালে পরিপূর্ণ নয় বলেই প্রত্যেকটি চরিত্র এমন জীবন্ত হয়ে পাঠকদের সম্মুখে হাজির হয়েছে। 'বাদের দেখেছি' প্রত্যেক দেশবাসী পড়বেন এমন আশা করতে পারি। 'বাদের দেখেছি' বাঙলার এক সুমহান অতীত ইতিহাসের স্বাক্ষর হয়ে রইলো। নিউ এক্সপারিমেন্টাল নুতনতম রচিবান প্রকাশক, বইখানির ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদের উৎকৃষ্টতায় বেশ বড় নিয়েছেন দেখে আমরা খুশী হলাম। কিন্তু বর্ণিত চরিত্রগুলির একেকখানি ছায়চিত্র কিংবা ছোট্ট এক সঙ্কেত উপহার দিলে 'রেকর্ড' হিসাবে গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর এ্যালবাম 'বাদের দেখেছি' আরও অধিক আকর্ষণীয় হ'ত বলে মনে করি।

ঠিক এই ধরনের আর একখানি গ্রন্থ অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল-যুগ'। কল্লোল-যুগ সবচেয়ে কিছু বলবার আগে অচিন্ত্যকুমার সবচেয়ে কিছুটা পরিচয় দেওয়ার দরকার। 'কল্লোল-যুগ'র এক জন বহুবী প্রতিভা অচিন্ত্যকুমার—যাঁর লেখনী গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও অমর-সাহিত্যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে। সাহিত্যিকের লেখনী তখনই যেমে যায়, যখন

লেখকের ভাবার ভাণ্ডার হয় পূর্ণ। বাঙলা দেশের কয়েক জন খ্যাতিমান সাহিত্যিকের লেখার দেখা যায় ভাবার কোন আদর নেই, শুধু ভাবেরই ভাষণ। আবার শুধু ভাবের ভাষণ বেশী দিন টিকতে পারে না, তা সে বত উচ্চ স্তরের ভাবই হোক না। ছবি আঁকতে হ'লে শুধু যেমন এ্যানাটমি জানলে ছবি উৎসাহ না, রঙের জ্ঞান থাকার বিশেষ প্রয়োজন; তেমনি সাহিত্য রচনার জমাট Plot ও Type চরিত্র নথ-দর্পণে থাকলেই চলে না, যদি না লিপি-কুশলতার ভাষা-দখলের পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙলা ভাষা দখল করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার সামান্য জ্ঞান সক্ষম করতে হবে, কিন্তু তৎপরের বিষয়, আমাদের স্বনামধন্য কয়েক জন সাহিত্যিক সংস্কৃতের প্রথম ভাগের পাতা কখনও যে উন্টেছেন বলে মনে হয় না, যে জন্ত তাঁদের লেখা বিরস ভাষার স্বস্তি আর পড়তে চাইছে না দেশবাসী। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার একেবারে তাঁদের ব্যতিক্রম। অচিন্ত্যকুমারের শব্দ-প্রয়োগ ও ভাষা-জ্ঞান কল্পনাভীত, অভিনব ও অনবদ্য। তাঁর এই ভাষার প্রতি সঙ্গ-দৃষ্টির জন্ত তিনি যাই কেন লিখুন না, প্রত্যেক লেখাই হয় অসম্ভব সুখপাঠ্য ও সুমধুর। ভাষা-জ্ঞান বুদ্ধির পরিচায়ক। অচিন্ত্যকুমারের ভাষা বুদ্ধির দীপ্তিতে প্রখর ও সুখর।

'কল্লোল-যুগ' এমন একটা যুগ, যখন নব নব প্রতিভার সাক্ষাৎ পেয়েছে বাঙলা সাহিত্য,—যদিও সে-যুগের পূর্ণগামীরা এই নবায়নের দেখে মিথ্যা সংস্কারের ভিত্তিহীন শিখরে ব'সে ব'সে যুগায় যুগ ফিরিয়ে নিয়েছেন দিনের পর দিন। সমাজ ও সাহিত্যের পত্র-ভোজনে আমাদের দুর্ভাগ্য দেশের চূড়ামণিরা এঁদের ক'রেছে অকথা অপমান। অবশ্য এই নবীন যাত্রীরা নিঃশঙ্কে সব কিছু সহ ক'রে এগিয়ে চলেছিল প্রগতির পাথে তাদের কালি আর কলমকে মাত্র সঞ্চাল ক'রে। উক্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন বাধা আর বিপত্তি ক্ষমতে পারেনি নব যুগের এই কল্লোলকে। এক দল তীক্ষ্ণধার লেখনী ভেঙ্গে চূড়ামার ক'রে দিয়েছিল সংস্কারবাদীদের তাদের দেশকে, আর সেই ক্ষয়সত্ত্বপের 'পরেই গ'ড়ে তুলেছিল নতুন এক সুদৃঢ় ইমারত—যার ভিত্তি বিজ্ঞা, জ্ঞান ও বুদ্ধির মিশ্রণে স্প্রতিষ্ঠিত। গোকুল নাগ আর দীনেশ দাসের রক্তে গঠিত 'কল্লোল' পত্রিকা, যাকে বহু পরিশ্রমে গঠন করতে গিয়ে উক্ত বহুবর্ষ অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সেই কল্লোল-যুগের চিত্র একেছেন অচিন্ত্যকুমার, রসিয়ে রসিয়ে; অন্তরের অকুণ্ণ সহানুভূতির সঙ্গে; কোন রকম রাজনীতির আওতা থেকে দূরে থেকে থেকে। একটা বিপ্লবী যুগের ইতিহাস, কিন্তু যেন প্রথম শ্রেণীর টেকনিকের উপন্যাসের আঙ্গিকে লিখেছেন লেখক। অগ্নি ফুল্লিঙ্গ নওজোহান নজফল ইসলাম, ক্ষুব্ধতার ভাষাবিৎ প্রবোধকুমার সাত্তাল, সত্যের উপাসক শৈলজানক মুখোপাধ্যায়, অসামান্য প্রতিভা প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরম বিপ্লবী বুদ্ধদেব বসু, মিষ্টভাবী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এক-এক রক্তের একত্র মিলনের ইতিহাস—যেন এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের উজ্জল ও উপভোগ্য কাহিনী—পড়তে পড়তে নিভেয়ে হারিয়ে চলে যেতে হয় সেই যুগের কল্লোলে। বুকখানা যেন গর্বে দশ হাত হয়ে ওঠে এই জন্ত যে, মাত্র হুঁশো বছরের আবু বে-সাহিত্যের, সেই দেশের সাহিত্যে কেমন সম্ভব হ'ল হঠাৎ আলোর বলকানির মত হঠাৎ এতগুলি প্রতিভার একত্র আবির্ভাব।

স্বপ্নের কথা, এই নবরত্নদের প্রতি তদানীন্তন অনেকানেক গ্রহ ও উপগ্রহ অকথা গালিবর্ষণ করলেও কবিত্ব রবীন্দ্রনাথ, কথামিত্রী শব্দচন্দ্র ও চিরস্বপ্ন প্রমথ চৌধুরীর আন্তরিক আশীর্বাদ বহিত হয়েছিল। অচিন্ত্যকুমারের লেখনীতে প্রস্তুত কল্লাল-যুগ টিক যেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্রাচিত্রের মত চোপের সামনে দেখা যায়। কতকগুলি চিঠি গ্রন্থখানির অনুল্য দলিল হিসাবে ধরে দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার। গ্রন্থখানির প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, নিষ্ঠা ও নিঃসার্থপরতার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় লেখকের; ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম। ‘কল্লাল-যুগ’ বাঙালির প্রতি ঘরে স্থান লাভ করুক আমাদের এই প্রার্থনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা অনেকটাই করেছেন। এমন কি নাম লুকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র স্বঃ সমালোচনা করেছেন নিজের লেখার, অনেকটাই হয়তো লেখক জানেন না। লেখক লিখে যান এক মনে, অতঃপর সমালোচকদ্বন্দ্ব সেট লেখার নানান দিক আবিষ্কার করেন আপন আপন ধারায়। সর্বদেশের সাহিত্যেই এই রীতি দৃষ্টগোচর হয়। বঙ্কিম-সাহিত্য সযত্নে বিস্তারিত আলোচনা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে মাত্র কয়েক জনের। তন্মধ্যে রামেন্দ্রচন্দ্র বিবেকী, মোহিতলাল মজুমদার, ঐশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐশ্বর্যোপাধ্যায় সেনগুপ্ত ও ঐশ্বর্যদাস রায় প্রভৃতি বিখ্যাত সমালোচকদের আলোচনাই প্রধানতম। সূত্র বিশ্লেষণ, সূত্র মতবাদ এবং দার্শনিক ভিত্তিতে গঠিত সেই সব আলোচনাই গ্রন্থ করেচে বঙ্গদেশবাসী। ঐশ্বর্যদাস রচিত আলোচ্য ‘বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস’ গ্রন্থখানি বঙ্কিম-সাহিত্য সযত্নে কিছুটা নূতন আলোকপাত করেছে। হর্শনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, সুগামিনী, বিশ্ববৃক্ষ, যুগ্মশাস্ত্রীয়, চন্দ্রশেখর, বঙ্গনী, রাধাবাসী, কৃষ্ণকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম, ইন্দিরা ও রাজসিংহ সযত্নে পৃথক পৃথক আলোচনা করেছেন লেখক। উপন্যাসগুলির স্তর-বিস্তার করা হয়েছে। নায়ক-নায়িকাদের পৃথিবীর সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্থানে স্থানে মূল উপন্যাসের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। বঙ্কিম-সাহিত্য বিষয়ে ষাঁদের কৌতূহল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এই আলোচ্য গ্রন্থখানি সর্বিশেষ কাজে লাগবে, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সমালোচকের বিস্তারিত জ্ঞান ও লেখার ভাষা সকলকে আকর্ষণ করবে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সত্যিই নয়নাভিরাম।

অমিয়জীবন মুখোপাধ্যায় যক্ষা এবং যক্ষা-রোগীদের সম্বন্ধে বহু দিন ধরে অস্তান্ত গবেষণা করেছেন। যক্ষা রোগ বাঙলা দেশের যেন এক ছবপনের কলঙ্ক, যার কবাল গ্রাসে পতিত হয়ে প্রতি বছরে শত শত দেশবাসীর পরলোকস্থ প্রাপ্তি হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণ, দারিদ্র্য ও বংশগত দোষে যক্ষা রোগের বিস্তার বাঙলা দেশে। যক্ষা-রোগকে এড়িয়ে চলেব বহু লোক। লেখক অস্তান্ত সহানুভূতির সঙ্গে এই রোগ এবং রোগীদের বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। যক্ষার ইতিহাস; রোগের প্রকৃতি; ব্যঙ্গের গঠন ও ক্রিয়া, জীবগু-সংক্রমণ ও দেহের প্রতিরোধ শক্তি; জীবগু-পরিচয়; সংক্রমণের সূত্র; যক্ষার ব্যাধিক্রমিকতা; গতি ও লক্ষণ; রোগ-নির্ণয়; চিকিৎসা-পদ্ধতি; উপসর্গ; পালনীয় নিয়ম; খুঁ ও অস্তান্ত নিঃস্রাব; রোগীর পরিচর্যা; অস্ত্র-চিকিৎসা; ঔষধ; চিকিৎসার

ফলাফল; রোগীর ভবিষ্যৎ জীবন; রোগের পুনরাবির্ভাব; রোগীর সামাজিক জীবন, কাজ-কর্ম ও বায়ু-পরিবর্তন; যক্ষা রোগীর বিবাহ ও বিবাহিত জীবন প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে লেখকের এই গ্রন্থে। ভারতবর্ষের এবং পাকিস্তানের যক্ষা-নিবাসের পরিচয়, বাঙলা তথা ভারতবর্ষে যক্ষা-নিবাসী আলোচনা সযত্নে ও বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান। বাঙালির ছাত্র-সমাজ ও যক্ষা ব্যাধি এক মহান সমস্যা, এই বিষয়েও লেখক কিছু কিছু কথা বলেছেন। সর্বশেষে জনসাধারণের যক্ষা রোগের সম্বন্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যক্ত করেছেন। অপর গ্রন্থটিতে যক্ষা রোগী সূত্র হওয়ার পরে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় সেই সেট সমস্যার বিভিন্ন দিকের আলোচনা করা হয়েছে। যক্ষা রোগী সূত্র হওয়ার পরে হাদপাতালে, পরিবারে, সমাজে, যৌন-জীবনে, কথুক্ষেত্রে ও সাধারণ ভাবে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয় সেট সেট বিষয়গুলি অনেকেরই অজ্ঞাত। লেখকের লেখার কানেই পরিচয় মিলবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। প্রথম গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ বিদ্যানন্দ রায়; অপর গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ পি, কে, সেন। বাঙলা দেশে যক্ষার কবলে পতিত হয়ে কোস মাত্র অজ্ঞাত বশতঃ কত শত লোক মৃত্যু বরণ করেছে। গ্রন্থ দু’খানি প্রত্যেকের অবশ্যপাঠ্য হিসাবে আমরা নিশ্চিত করছি। অনেকগুলি আলোকচিত্র বই দু’খানির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করেছে। ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদপট লাভনীয়।

তরু দত্ত ও অরু দত্তের নাম শিক্ষিত বঙ্গদেশবাসী মাঝেই জানেন। তরু অসামান্য কাব্য-প্রতিভার কথাও হয়তো অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু এই বাঙালী মেয়েটির হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়া জীবনের বা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি—ফরাসী ভাষায় লেখা তার উপন্যাস, Le Journal de Mlle d'Arvers প্রায় অজানা রয়ে গেছে বাঙালীর কাছে। তরু কবি-প্রতিভার বিকাশ হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে, ইংলেণ্ডে যখন সে ছাত্রী—ইং ১৮৭০ সালে। ইংরেজী ভাষায় তরুর কবিতাগুলি তখন এত অধিক আদৃত হয় যে, তদানীন্তন ‘রাহু’ ইংরেজ ও ফরাসী সমালোচকেরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। উক্ত উপন্যাসের বাংলা নামান্তর করেছেন অম্বাবদক “কুমারী অ্যারভার’এর দিনপঞ্জী”। নামকরণ যথার্থই হয়েছে। ১৮ বছর বয়সে তরু উপন্যাসখানি রচনা করে। তিন বছর ফ্রান্স এবং ইংলেণ্ডে অতিবাহিত করে এসে এই উপন্যাস রচনায় সে হস্তক্ষেপ করে। ফরাসী সাহিত্যে তখন জর্জ স্ত্রাণ্ড, ষ্টেণ্ডাল, মৌপাসার যুগ। ফরাসী সাহিত্যের এই নব যুগে, মাত্র কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়ে এসে একটি বাঙালী মেয়ের পক্ষে উপন্যাস লেখা অপূর্ণ শক্তি ও সাহসের পরিচায়ক। এই উপন্যাসে লেখিকা যে অসামান্য মনোবার পরিচয় দেয় তাও তখনকার ফরাসী সমালোচকরা অকণ্ঠচিন্তে স্বীকার করেন। James Darmesteter লিখেছিলেন, “একটি ১১ বছরের হিন্দু বালিকা, যে কেবল কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়েছে, মাত্র কয়েক বছর যে ফরাসী ভাষা শিখা করেছিল, তার পক্ষে ফরাসী ভাষায় এরূপ একখানি উপন্যাস লেখা অদ্বুত সাহিত্য-শক্তির পরিচায়ক।” Edmond Gosse বলেছিলেন, “তরু দত্ত যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধিশক্তি সম্পন্ন মেয়েদের এক জন, তাতে সন্দেহ নেই। জর্জ স্ত্রাণ্ড ও জর্জ ইলিয়ট যদি তরু দত্তের মত বয়সে মারা যেতেন তা হ’লে

কীরা তরু দন্তের চেয়ে বেশী কিছু রেখে যেতে পারতেন বলে মনে হয় না।”

তরু দন্ত যখন এই উপজ্ঞাস লিখতে শুরু করেন তখন বাঙলা উপজ্ঞাসের আদিপর্ক। বঙ্কিমচন্দ্রের করেকথানি উপজ্ঞাস তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র ২১ বছর বয়সে যক্ষ্মা রোগে সহসা মৃত্যুস্থে পতিত হওয়ার তরু দন্ত একাধিক উপজ্ঞাস লিখে যেতে না পারলেও এই একখানি উপজ্ঞাস রচনা করেই সে তদানীন্তন খ্যাতিমান উপজ্ঞাসিকদের পর্যায়ে আসন পেয়েছে। উপজ্ঞাসখানি একটি রূপবতী তরুণীর জীবনের ব্যর্থতার মর্মস্পর্শী কাহিনী। যৌবনের আশায় রঙীন দিনগুলি তার ব্যর্থতার ঝরে গেল। ভবিষ্যৎ তার সন্ত-প্রসূতি জীবনে নিয়ে এল অপমৃত্যু। কুমারী আয়রভারের প্রথম যৌবনের প্রেম বাক্যে ঘিরে ফুটে উঠল শতদলে, সে তারই ছোট ভাইয়ের প্রেমিকাকে পাওয়ার লোভে ছোট ভাইকে হত্যা করল এবং শেষ পর্যন্ত সেও জেলে আত্মহত্যা করল। প্রথম প্রেমে এই মর্মান্তিক আঘাত কুমারী আয়রভার সহ্য করতে পারল না। মারাত্মক অস্থির পড়ল সে। আর তার কাছে গভীর সহ্যভূতি নিয়ে এগিয়ে এল ক্যান্টেন লুই, যে এক দিন প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে চোখের জল ফেলে ফিরে গিয়েছিল। সে দিল উজাড় করে তার অকৃত্রিম ও অজস্র ভালবাসা। মাদাম আয়রভার-এর ভাগ্যে সইল না এই সুখ, স্বামী লুইকে একটি সম্ভান উপহার দেওয়ার পরেই পৃথিবী থেকে মৃত্যু তাকে কেড়ে নিয়ে গেল। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লেখার দ্বারা এমন সরল ও মর্মস্পর্শী যে, অদ্ভুত এক আকর্ষণ জন্মভূত হয়। সারা ক্ষণ ধরে যেন এক ট্রাজেডির সুর কানে বাজতে থাকে। কারণ পরিস্থিতিগুলি বিশেষ বিশেষ করে আয়রভারের দিনের পর দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা এক অনবদ্য সৃষ্টি—যা লেখিকার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। যক্ষ্মা রোগে বোন অক্ষর মৃত্যুর পর লেখিকা এই উপজ্ঞাস রচনা আরম্ভ করেন এবং এর তিন বছর পরে তিনিও এই রোগে মারা যান। কুমারী আয়রভারের জীবনীতে কি লেখিকার আত্মজীবনীর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না? উপজ্ঞাসখানি বিদেশী ভাষাতে রচিত

হ’লেও কেমন যেন বাঙলা উপজ্ঞাস বলেও অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায়। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় তরু দন্তের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির বাঙলা তর্জমা করে বাঙালীর কাছে যে লেখিকার নূতন পরিচয় দিয়েছেন, সে-কথা বঙ্গদেশবাসী কোন দিন ভুলতে পারবে না। বইখানিতে ছাপার ভুল অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। প্রচ্ছদপট অভিনব।

প্রসঙ্গতঃ যে কথায় এই আলোচনার পত্তন করেছিলাম আবার সে কথায় ফিরে বাছি। অধুনা বাঙলার মূল-সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর গল্প, উপজ্ঞাস ও কবিতার যেন আর সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে না, যেমনটি গত কয়েক বছর পূর্বেও আমরা পেয়েছি। মাত্র হুঁশো বছরের সাহিত্যে এত অল্প সময়ে এত অধিক দূর অগ্রসর হয়ে সহসা মধ্যপথে কেন যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তার কারণ সন্ধান করলে এটোটে জানা যায় যে, পৃথিবীর সর্বদেশের সাহিত্য জাতে উঠেও মাঝে-মাঝে জাত ভারতে দেখা যায় মূল-সাহিত্যের বাজারে, যখন উৎকৃষ্ট গল্প, উপজ্ঞাস আর কবিতা জন্মলাভ করে না, যখন সমালোচনা, ইতিহাস, শ্রুতিকথা আর জন্মবাদ জাতীয় সাহিত্যে জন্মগ্রহণ করে। তাই বোধ হয় এখনকার বাঙলা সাহিত্যে “বাদের দেখেছি”; “কল্লাল-যুগ”; “বঙ্কিমচন্দ্রের উপজ্ঞাস”; “রোগটা যখন টি, বি”; “টি, বি থেকে সাববার পর” ও “কুমারী আয়রভারের দিনপঞ্জী” জাতীয় মূল্যবান গ্রন্থের আবির্ভাব হল, আর সাময়িক তিরোভাব হল জাত-গল্প, উপজ্ঞাস ও কবিতা।

পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে হামেশাই দেখা যায়, একেক সময়ে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকরা মূল-সাহিত্যে সৃষ্টি না করে সৃষ্টি করেন ঐ ধরণের গল্প, আর তৃতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা (!) তখন নোংরামি, ছ্যাঁচড়ামি ও ছাবলমির দ্বারা সাহিত্যের অঙ্গ কলকলেপন করে বাজার সচল রাখতে সচেষ্ট হয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। একেক যুগ আসে যখন সাহিত্যের কথামালায় অ, আ, ক, খ প্রভৃতির গভীর জাতীয় সুরে জাতীয়-সাহিত্য রচনা করেন আর বিনু ও বিসর্গা তখন কীক পেয়ে সফরীর মতই কিছুটা ফর-ফর করে। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, গান্ধীজীর সঙ্গে চাকল্যের পার্থক্য দাঁড়ীপায়ায় ওজন হওয়ার নয়। সময়ের কষ্টি-পাতির তার মূল্য বাচাই হবে।

### সেক্সপীয়রের প্রিয়তম অভিনেত্রী কে ছিলেন ?

উইলিয়াম সেক্সপীয়র নাট্যকার হিসাবেই সকল দেশে পরিচিত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু অনেকটাই জানেন না। ইংলণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পবিত্র একবার একটি প্রশ্ন দেওয়া হয়। প্রশ্নটি হ’ল, ‘সেক্সপীয়রের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম অভিনেত্রী কে ছিলেন?’ প্রশ্নটির সঠিক উত্তর এক জনও লিখতে পারেনি। অবিকার্য ছাত্র প্রশ্নটি বাদ দিয়েছিল। কেবল মাত্র একটি ছাত্রী যথাযথ উত্তর লিখেছিল। উত্তর হচ্ছে, সেক্সপীয়রের সময়ে কেন, তাঁর মৃত্যুরও বহু দিন পরে পর্যন্ত তদানীন্তন নাটকে নারীর অভিনয় করতো পুরুষ কিংবা অল্পবয়স্ক স্রদর্শন বালক। নারী অভিনেত্রী তখনও পর্যন্ত পাদ-প্রদীপের সম্মুখে আবির্ভূত হয়নি।



## ত্রিগোপালেন্দ্র নিরোধী

### এশিয়ার-ভবিষ্যৎ—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিজমের প্রসার নিরোধ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সকল আয়োজন করিতেছে এশিয়ার ভবিষ্যৎকে উহা কোন পথে পরিচালিত করিবে, এশিয়ার জনসাধারণ এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করিতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে-পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি এবং উহার পরিণামে এশিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ কি আকার ধারণ করিবার সম্ভাবনা, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে কম্যুনিজম নিরোধে জ্ঞাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি কি পদা গ্রহণ করিতে উত্তত হইয়াছে সে-সম্পর্কেই প্রথম উল্লেখ করা প্রয়োজন। কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত জাপানকেই এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবার আয়োজন চলিয়াছিল, যদিও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অস্ত্রাশ্রয় দেশের কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপেক্ষা করে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ ফিলিপ সি. জেন্সন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতগুলি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিবার প্রত্যাহারে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার সভাপতিত্বে ব্যাংককে এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ১৭ জন উচ্চপদস্থ মার্কিন কূটনীতিবিদ এবং আমেরিকার এশিয়া মিশনের প্রধান কর্তৃপক্ষগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলনে কম্যুনিজম নিরোধের জন্য কি কি উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় এইরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, যদি অস্ত্র সাহায্য দেওয়া না হয়, তাহা হইলে ব্যাংকক সম্মেলনের সুপারিশ অবহীন হইয়া পড়াইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, সুবিশাল চীন দেশ কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া বাইবার পর ব্যাংকক সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পূর্বেই কম্যুনিজম চৈকাইয়া রাখিবার জন্য স্পেন্ডার-পরিকল্পনা রচিত হয়। এশিয়ার যে-সকল দেশ রাশিয়ার প্রভাবের বাহিরে সেই দেশগুলিকে খাভ, কাঁচা মাল এবং টেকনিক্যাল সাহায্য প্রদান করিয়াই কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করা সম্ভব, এই ধারণাই স্পেন্ডার-পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সম্প্রতি উহাই কলম্বো পরিকল্পনা নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধের জন্য এই পরিকল্পনার উপর নির্ভর করিয়া নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহিত সামরিক চুক্তি করিবার অভিপ্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে, ডাঃ জেন্সন তৎকালে তাহা অব্যাকার

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও জানাইয়াছিলেন যে, এশিয়ার দেশগুলি যদি কোন আঞ্চলিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে চায়, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সহায়ত্বের সহিত তাহা বিবেচনা করিবে। ইহার পূর্বেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির কথা উঠিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে। ১৯৪১ সালের ১১ই জুলাই বাণ্ডাইয়েতে ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মিঃ কুইরিনো এবং চিয়াং কাইশেকের মধ্যে এক আলোচনার ফলে কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁহারা একমত হন। অতঃপর আগষ্ট মাসের (১৯৪১) প্রথম ভাগে চিয়াং কাইশেক দক্ষিণ-কোরিয়ায় বাইয়া প্রেসিডেন্ট সৌজন্যমান রীর সঙ্গে এ-সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং একটি যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা পৃথক ভাবে এবং সম্মিলিত ভাবে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার আবেদন জানান। তখনও সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যায় নাই এবং তখনও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইউনিয়ন গঠনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনিচ্ছার কথাই আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু বাণ্ডাইয়ে সম্মেলনের পর মিঃ কুইরিনো প্রকাশ্যেই এক কথা বোকার করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বাপন্ন দেশগুলি হইতেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রেরণা আসিয়াছে। সমগ্র চীন কম্যুনিষ্টদের দখলে চলিয়া যাওয়ার পর এশিয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ার বলশেভিক্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সহিতই শুধু তাহার তুলনা করা চলে। ইউরোপে বলশেভিক রাশিয়াকে আঁতুড় ঘরেই হত্যা করিবার ('to strangle Bolshevism at the moment of its birth') জন্য যে চেষ্টা হইয়াছিল, এশিয়ায় কম্যুনিজম নিরোধের আয়োজনের সহিত তাহার সাদৃশ্য বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

জাপানকে কম্যুনিজম নিরোধের প্রধান ঝাঁটিতে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত জাপান চুক্তির খসড়া পৃথক ভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে জাপানে আবার সামরিক শক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মনে যে আশঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই আশঙ্কা জাপান শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পথে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের মধ্যেই যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সেই জন্যই জাপান শান্তি চুক্তি রচনার কাজ চলিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য মিঃ ডুলসকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তার ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের সহিত একটি চুক্তি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই বিবৃতিতে তিনি উক্ত চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসের কমিটি সমূহের সহিত আলোচনা চালাইবার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা চালাইবার জন্য মিঃ ডুলসকে তিনি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। মার্কিন রাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসন এবং দেশরক্ষা সচিব মিঃ মার্শালও এই চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার যোগদান করিবেন বলিয়াও তিনি জানাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই

বিস্তৃতিতে আরও বলিয়াছেন, “The U S A is moving steadily forward in concert with other countries of the Pacific in its determination to make ever stronger the position of the free world in the Pacific Ocean area.” অর্থাৎ ‘প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের স্বাধীন দেশগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অসংখ্য দেশের সহিত একযোগে কাজ করিবার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।’ এই উক্তির একমাত্র সহজ অর্থ কি ইহাই নহে যে, এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শক্তি-বর্গের সহিত ভবিষ্যৎ যুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অ-কম্যুনিষ্ট দেশগুলির জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বাহ্যতে নিয়োজিত হয়, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সেই চেষ্টাই করিতেছেন? এই চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যেই কি কম্যুনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা-ব্যবস্থার (Defence against Communist aggression) ধনি তোলা হয় নাই? কম্যুনিষ্ট আক্রমণ নিরোধ করার প্রকৃত অর্থ কি তাহা যেমন এশিয়াবাসীর উপলক্ষি করা প্রয়োজন, তেমনি কি ভাবে এবং কি কি পন্থায় তথাকথিত কম্যুনিষ্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করার আয়োজন করা হইতেছে তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

হিটলার বলশেভিজমের কবল হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার ধনি তুলিয়াছিলেন। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কম্যুনিজমের আক্রমণ

হইতে স্বাধীন বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার ধনি তুলিয়াছে। এশিয়ায় এই সকল স্বাধীন দেশের বর্ষাধ্বরূপ কি এবং তাহাদের স্বাধীনতা কি ভাবে বিপন্ন হইতে চলিয়াছে, ইহাই আসল প্রশ্ন। প্রথম মহা-যুদ্ধের মধ্যে সংযুক্ত সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের মধ্য হইতে এই সংযুক্ত সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট রিপাবলিক পৃথিবীর অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে বাহির হইয়াছে। ইহাভেই এশিয়া ও আফ্রিকার শক্তি-ভারসাম্যের (balance of power) বশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। ইহার উপর দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম শেষ হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যে সমগ্র চীন চীনা কম্যুনিষ্টদের দখলেই গুহু চলিয়া যায় নাই, জে: ম্যাকআর্থারের ভাষায় বলিতে পারা যায়, কম্যুনিষ্ট চীন একটি উৎকৃষ্ট সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। মাও সে তুংয়ের চীন যদি লাল চীন নাও হইত, তাহা হইলেও এশিয়ায় একটি নূতন শক্তিশালী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইত, ইহা স্বীকার করা সত্যি খুব কঠিন। মার্কিন কংগ্রেসের নিকট জে: ম্যাকআর্থার যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহা বুঝিতে পাওয়া যায়। এশিয়ায় নব অভ্যুদিত শক্তিশালী চীন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করাই কম্যুনিজম নিবোধের ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি না, কম্যুনিজম নিবোধের আয়োজন হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

উত্তর আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চশক্তির এক প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পাদনের আয়োজন করিতেছে। এই পঞ্চশক্তির নাম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কিলিপাইন

বিস্ময়জনক জরুরিস্থিতি :- ‘বি. বি. সরকারের’ সৌত্র, নারায়ণ সরকারের \*  
পরিচালনার

আধুনিকতর আলোকের শিল্প প্রতিষ্ঠান

**বি. বি. সরকার**

কোম্পানি লিমিটেড

১৬০-১. বহুবাজার স্ট্রিট

ফোন:- বি. বি. ১২৫৩.



এবং ইন্দোনেশিয়া। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তাহাকেও হস্ত এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে চিয়াং কাইশেকের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে একটি গোপন চুক্তি হইয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে অশিধানযোগ্য। গত মার্চ মাসে (১৯৫১) এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বুটেনের মনোভাবকে আঘাত না করিবার উদ্দেশ্যেই হস্ত চিয়াং কাইশেককে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তিতে গ্রহণ করা হইবে না, কিন্তু উল্লিখিত গোপন চুক্তি অমুযায়ী ফরমোসায় স্থায়ীভাবে মার্কিন সামরিক মিশন রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষাদান এবং পুনঃ অঙ্গসজ্জিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কমানিষ্ট চীন এই চুক্তিকে চীনের মূল ভূখণ্ড আক্রমণের জন্য ফরমোসাকে বাঁচি করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়াস বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। রাশিয়া উত্থাকে প্রাচ্যদেশে আনৈরিকতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণের আর একটি প্রমাণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরে মার্কিন, ব্রিটিশ এবং ফরাসী সামরিক প্রধান কর্তৃক চারি দিনব্যাপী যে গোপন অধিবেশন গত ১৮ই মে (১৯৫১) শেষ হইয়াছে তাহার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

### সিঙ্গাপুর বৈঠক

গত ১৫ই মে (১৯৫১) বুটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর প্রধান কর্তৃগণ এবং তাঁহাদের উপদেষ্টাদের যে বৈঠক আরম্ভ হয় তাহা শেষ হইয়াছে ১৮ই মে। এই সম্মেলনে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ সংগঠিত গবর্ণমেন্ট সমূহের নিকট প্রেরিত হইবে। তাঁহাদের এই আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ গোপনীয় এক সামরিক ব্যাপার। তাঁহাদের আলোচনার স্বরূপ এবং সুপারিশের বিষয় জানিতে পারা না গেলেও তাহা ভানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল তাঁহাদের আলোচ্য বিষয়। এই রক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনার নিম্নলিখিত সমস্তাগুলিও তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন : (১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যদি চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করে, তাহা হইলে মিত্রশক্তিবর্গের বাহিনী কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে, (২) সমগ্র সামরিক ব্যবস্থায় হংকং এর স্থান কি, (৩) চীনা কমানিষ্টরা যদি ইন্দোচীনের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সৈন্যবাহিনীর কি নতুন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, (৪) ইন্দোচীনের জন্য ক্ষুদ্র একটি আর-এফ-এ লস এবং রয়ল অস্ট্রেলিয়ান বাহিনী প্রদানের সম্ভাব্যতা এবং (৫) ভিয়েটনামের বিরুদ্ধে টংক অঞ্চলের যুদ্ধ জে: De Tassignyকে অধিকতর সাহায্য দানের বিষয়।

এই বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সামরিক গোপনীয় বিষয় হইলেও এই বৈঠক সম্পর্কে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থা আলোচনা করিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বুটেন এবং ফ্রান্সের সামরিক প্রধান কর্তারা এবং অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডও এই বৈঠকে পর্যবেক্ষক প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনার ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন

তো কেহ নহেই, যে বাও দাই গবর্ণমেন্টকে বাঁচাইবার জন্য এই সম্মেলনে আলোচনা করা হইয়াছে সেই বাও দাই গবর্ণমেন্টও এই সম্মেলনে স্থান পায় নাই। ফ্রান্স ইচ্ছাতে মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কারণ, বাও দাই গবর্ণমেন্টের যে কোন পৃথক স্বাধীন সভা নাই, এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীর কাছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বাও দাই গবর্ণমেন্ট যদি সত্যই স্বাধীন গবর্ণমেন্ট হইবে, তবে তাহার রক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনার তাহার কোন স্থান হইল না কেন? কমানিষ্টমকে ঠেকাইয়া রাখাই যদি এই সম্মেলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ভারত, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের কি এই আলোচনার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবার কথা ছিল না?

### ব্রহ্মদেশের অশান্ত অবস্থা

সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের অশান্ত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট সম্মেলনে পেশ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছু মাত্র উন্নতি হয় নাই এবং বাহির হইতে আক্রান্ত হইলে ব্রহ্মদেশের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু চীনা কমানিষ্টদের আক্রমণ বিজোহীদিগকে সাহায্য করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সম্মেলনে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু 'টাইমস্' পত্রিকার সিঙ্গাপুরস্থিত সংবাদদাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সম্মেলনে কমানিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। 'টাইমস্' পত্রিকার উক্ত সংবাদদাতা মনে করেন যে, এশিয়ার অধিক সংখ্যক নরনারী কমানিষ্টমকে শত্রু বলিয়া মনে না করার কমানিষ্টম ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ফলে অশান্তগোপন করিয়া কাজ করিবার পক্ষে কমানিষ্টদের কোন অসুবিধা হয় না। ব্রহ্মদেশের পূর্ব অঞ্চল এবং থাইল্যান্ডের সূদূর পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে কমানিষ্টরা তাহাদের হেড কোয়ার্টার্স বা সদর কার্যালয় স্থাপন করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণযুক্তি বাহিনীর (People's Liberation Armies) কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য-নির্বাহক সমিতি মন লেন গ্রামে অবস্থিত। এই গ্রামটি থাইল্যান্ডের সীমান্তের নিকটবর্তী এবং ব্রহ্মদেশের পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। এই কমিটিতে দুই জন চীনা, দুই জন মালয়ী চীনা, দুই জন শ্রীলঙ্কেশ্বর অধিবাসী, দুই জন ভিয়েটনামী, দুই জন বর্মী, দুই জন ইন্দোনেশীয়, দুই জন লাওটিয় এবং এক জন কাবোডিয় আছেন।

ব্রহ্মদেশের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আমরা বতই তুলিতে পাই না কেন, ব্রহ্ম গবর্ণমেন্ট তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। সমগ্র বিজোহীরা আবার সঙ্কট হইয়াছে। বিজোহীদের কার্যকলাপ আবার বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার সময় ব্রহ্মদেশের সাধারণ নির্বাচন হয়ত শেষ হইয়া বাইবে। কিন্তু নির্বাচন-কেন্দ্রের সংখ্যা আরও পাঁচটি হ্রাস করা হইয়াছে। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ১১২টি নির্বাচন-কেন্দ্রে নির্বাচন হইবে। কিন্তু তদাধিক ৩৬টি নির্বাচন-কেন্দ্রে বিজোহী দ্বারা পরিপূর্ণ বলিয়া ঐগুলিতে নির্বাচন হইবে না বলিয়া স্থির করা হয়। সম্প্রতি আরও পাঁচটি

নির্বাচন-কেন্দ্র হ্রাস করা হইল। এই পাঁচটি কেন্দ্রে বিদ্রোহীদের কর্তৃত্বপন্থাই ইহার কারণ। ইহাতেই ব্রহ্মদেশের অবস্থা বৃদ্ধিতে পারা যায়।

### শ্রামের অবস্থা

কমুনিজম নিষেধের জন্য শ্রাম বা খাইল্যাও প্রত্যক্ষ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিয়াছে। অবস্থাপন্ন শ্রায়ামীরা কমুনিজম পছন্দ করে না, এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু শ্রামে বহু সংখ্যক চীনা আছে। তাহাদের অনেকেই কমুনিষ্ট-ভাবাপন্ন। শ্রামের প্রধান মন্ত্রী মার্শাল কিবুন সঙ্গরায় কর্তার দমন নীতি চাপাইয়া আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিতেছেন। তথাপি শ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তবর্তী কমুনিষ্টরা শ্রামদেশের মধ্য দিয়াই তাহাদের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহীরা শ্রামদেশের ভিতর দিয়াই গোপনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিতেছে। ব্রহ্ম গবর্নমেন্ট শ্রাম গবর্নমেন্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করেন যে, নতুন অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ পাইয়া ব্রহ্মের বিদ্রোহীরা আবার কল্পতরুণ হইয়া উঠিয়াছে।

### ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ

ইন্দোচীনের সামরিক অবস্থা ফ্রান্সের অনুরূপ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা কঠিন। সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ফ্রান্সের দিক হইতে না কি বলা হইয়াছে যে, চীন যদি হো চী মিনকে সাহায্য না করিত, তাহা হইলে টাঙ্কিন দখলে রাখা কিছুই কঠিন হইত না। কিন্তু ফ্রান্সও যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেছে, ইহাও মনে রাখা আবশ্যক। হো চী মিনের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সকে প্রার্থ্যন ১৪০টি বিমান দিয়াছে। ফ্রান্স হইতে নতুন সৈন্যও আমদানি করা হইয়াছে প্রায় ১৫ হাজার। সিঙ্গাপুর সম্মেলনে ডে: Tassigny না কি বলিয়াছেন যে, ফরাসী সৈন্যরা ভিয়েটনামীদের পূর্ব স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। এশিয়ার জনসাধারণের পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। ভিয়েটনামীরাও বাও দাই গবর্নমেন্টকে স্বাধীন এবং জাতীয়তাবাদী গবর্নমেন্ট বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছে না। বাও দাই গবর্নমেন্টকে সত্যকার গবর্নমেন্ট বলিয়াও স্বীকার করা কঠিন। তিনি স্বয়ং দালাতের শৈল-নিবাসে বাস করেন। তাঁহার খেয়াল-খুশী মত তিনি মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং বরখাস্তও করেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা এখনও ফ্রান্সের হাতে। কমুনিজম নিষেধের নামে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ফ্রান্স ইন্দোচীনে যে ক্ষেত্র-কার্য চালাইতেছে তাহাতে ইন্দোচীনে ফ্রান্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য বৃদ্ধিতে এশিয়া-বাসীরা কোন কষ্ট হয় না। সম্প্রতি এক জন ফরাসী নিরাপত্তা ইন্সপেক্টরের হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স ২০ জন ভিয়েটনামী বন্দীকে হত্যা করিয়াছে। দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী সংগ্রামের ফলে ইন্দোচীনে ব্যাপক ক্ষেত্র-কার্য সাধিত হইয়াছে। অল্প কত দিন এই সংগ্রাম চলিবে তাহা বলা কঠিন। এইটুকু বলা যায় যে, এত সংগ্রামের শেষ পরিণতিতে হয় ইন্দোচীন পূর্ব স্বাধীনতা লাভ করিবে, না হয় আবার ফ্রান্সের উপনিবেশে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ দ্বারাই ইন্দোচীনের

ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। ইতিমধ্যে ভিয়েটমিনের রাজনৈতিক গঠনের যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

হো চী মিনের ইন্দোচীনে লাও ডঙ্গ বা শ্রমিক দল নামে নতুন একটি দল গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) গঠিত হইয়াছে। রাজনৈতিক এবং সামরিক সর্বময় বর্ষে এই দলের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। অতঃপর গত মার্চ মাসে (১৯৫১) ভিয়েটমিন লীগ এবং লিয়েন ভিয়েট লীগকে সম্মিলিত করিয়া লিয়েন ভিট ফ্রন্ট গঠিত হয়। লাও ডঙ্গের যে ইচ্ছাভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই দলকে কুবক, শ্রমিক এবং বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী দল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নতুন রাষ্ট্র শ্রমিক নেতৃত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফরাসী ঔপনিবেশিক এবং মার্কিন হস্তক্ষেপকারীদিগকে পরাভিত করিবার জন্য সংগ্রামে সমস্ত ভিয়েটনামীকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করাট এই দলের প্রধান কাজ। ফরাসী সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাও ডঙ্গ কম্বোডিয়া এবং লাওসের সহিত সহযোগিতা করিবে এবং ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওস এই তিনটি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক রাষ্ট্র-জাতিতে পরিণত করিবে। ফ্রান্সের সহিত সংগ্রামকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) আত্মরক্ষা, (২) সংঘর্ষ এবং (৩) প্রতি-অক্রমণ। এই নতুন দল গঠন যে ব্যাপক সংগ্রামের প্রাথমিক প্রস্তুতি তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি টাঙ্কিন তৎকালে ফ্রান্সের সহিত ভিয়েটমিনদের সংঘর্ষ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে।

### মালয়ের সমস্যা

সিঙ্গাপুর সম্মেলনে বুটেনের পক্ষ হইতে না কি এইরূপ আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত কমুনিষ্টদের প্রভাব যদি বৃদ্ধিত না হয়, তাহা হইলে বর্তমান ১৯৫১ সালের শেষ পর্য্যন্ত মালয়ের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে। ১৯৪৮ সালের মধ্য ভাগ হইতে কমুনিষ্টদের কল্পতরুণতর কলে মালয়ে গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। কমুনিষ্ট দমনের জন্য প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া চেষ্টাতেও যখন কোন ফল হইল না, তখন জেনারেল ব্রিগসের হাতে কমুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার ভাব দেওয়া হইল। ১৯৫০ সালের ১লা জুন হইতে ব্রিগস-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেও ব্রিগস-পরিকল্পনা অবস্থার কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। কমুনিষ্টদের সংখ্যা কোন সময়েই পাঁচ হাজারের বেশী বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। বহু কমুনিষ্ট নিহত এবং বৃহৎ হওয়ার কথা বহু বার ঘোষণা করা হইলেও, কমুনিষ্টদের সংখ্যা কিছুতেই পাঁচ হাজারের নীচে নাহিমেছে না। বিদেশ হইতে কোন সাহায্যও তাহারা পাইতেছে না। অথচ এক দক্ষ সৈন্যের কমুনিষ্ট ধ্বংসের প্রচেষ্টাকে তাহারা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান সাফল্য লাভ না করার প্রধান কারণ, এই ব্যাপারে জনসাধারণের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে না। তাহারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। সংবাদদাতার পরিচয় প্রকাশ না করিয়াও কমুনিষ্টদের সংবাদ দিবার স্বব্যবস্থা করা সম্ভবও পুলিশের কাছে তেমন সংবাদ পৌছিতেছে না। জনসাধারণের

সহযোগিতা পাওয়া সহজ করিবার জন্য হোম গার্ড পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। এখানেও বড় কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। হোম গার্ডকে যে-সকল অস্ত্র-শস্ত্র দেওয়া হইবে সেগুলি পাছে অনভিশ্রুত লোকের হাতে পড়ে এই আশঙ্কায় হোম গার্ড গঠনের কাজও অগ্রসর হইতেছে না।

স্কোয়াটার-অধুষিত অঞ্চলগুলি হইতেই কম্যুনিষ্টদের জনবল এবং অর্থ ও খাদ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই ভ্রম ব্রিগস্-পরিকল্পনায় স্কোয়াটারদের পুনর্বাসতির ব্যবস্থাও স্থান পাইয়াছে। যে সকল জমিতে নিজেদের কোন স্বত্ব নাই, অথবা স্বত্ব দাবী করিলেও দাবীর মূল অত্যন্ত দুর্বল, সেই সকল জমিতে যে-সকল চীনা বাস করে এবং ঐ সকল জমি আবাদ করে তাহাদিগকেই স্কোয়াটার বলিয়া অভিহিত করা হয়। স্কোয়াটার-সমস্তা মালয়ে অবশ্য একেবারে নূতন নয়। জাপি আক্রমণের পূর্বেও কিছু না কিছু স্কোয়াটার মালয়ে সব সময়ই ছিল। জাপানের অধিকারের সময় স্কোয়াটারের সংখ্যা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পায়। কম করিয়া ধরিয়াও স্কোয়াটারের সংখ্যা পাঁচ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই সকল স্কোয়াটারের মধ্যে বহুসংখ্যক শ্রমিক আছে যাহারা জাপি আক্রমণ সময় কাজ চালাইয়াছে। ব্রিগস্-পরিকল্পনার পূর্বে মালয়ের বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই সকল স্কোয়াটার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ব্রিগস্-পরিকল্পনার পুনর্বাসতির অংশ যে-ভাবে কার্যকরী করা হইতেছে তাহাতেও উপনিবেশিক শাসনের অমায়িকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্কোয়াটারদিগকে তাহাদের বাসস্থান হইতে ধরিয়া আনিয়া ক্যাম্পে রাখা হইতেছে। ক্যাম্পের চারি দিক বার্ড তার দিয়া ঘেরা এবং পুলিশ-প্রহরী দ্বারা পরিবেষ্টিত। দিনের বেলায় পুরুষেরা নিজেদের জমিতে কাজ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে পারে। নিজের খাওয়ার জন্য ছোট্ট খাদ্য প্রয়োজন শুধু সেটুকুই তাহারা সঙ্গে নিতে পারে। এই সকল পুনর্বাসিত ক্যাম্প নাৎসী কন্সট্রাকশন ক্যাম্পের অনুরূপ বলিয়াই কি মনে হয় না? স্কোয়াটারদের পুনর্বাসতির ব্যবস্থা সবেও কম্যুনিষ্টদের কথ্যতৎপরতা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পুনর্বাসিত ক্যাম্পের পরেই ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা বলা প্রয়োজন। ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে বর্তমানে কত জন বিনা বিচারে আটক রহিয়াছে সে-সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯৫০ সালের শেষ ভাগে বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ টম ডিয়ার্গ বহন মালয় পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, সেই সময় মালয়ের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলিতে ১১ হাজার বন্দী আছে বলিয়া তিনি জানিতে পারেন। শুধু সন্দেহ করিয়া বিনা বিচারে ইচ্ছাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। বর্তমানে বিনা বিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? মালয়ে শ্রমিকদের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় এবং রবর বাগানের বৃটিশ মালিকরা মনোবৃত্তিতে যে কতখানি বুর্জো রাজাদের মত, তাহার পরিচয় বাহির-বিশে কিছুই পৌঁছিতে পারে না। মিঃ টম ডিয়ার্গকে জাহার বলিয়াছিলেন, "Tell us about That Man Bevan. We do not like him. He is a Bad Egg. I mean he's all for the communist, isn't he? I mean

Bevan not Mr. Bevin, he is a good chap.' অর্থাৎ 'বিভিন্ন লোকটার কথা আমাদের কিছু বলুন তো। আমরা তাহাকে পছন্দ করি না। লোকটা একেবারে নাজার। অর্থাৎ আমি বলিতে চাই যে লোকটা একেবারে কম্যুনিষ্ট, তাই নয় কি? আমি বিভ্রান্তের কথাই বলিতেছি, মিঃ বেভিনের কথা নয়। মিঃ বেভিন বড় ভাল লোক।' এই উক্তি হইতেই মালয়ের রবর বাগানের বৃটিশ মালিকদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে মালয়ের অবস্থার আভাস পরিস্ফুট রহিয়াছে।

যেমন ইন্দোচীনে তেমনি মালয়ে প্রকৃত সমস্তা কম্যুনিষ্ট সমস্তা নহে, প্রকৃত সমস্তা স্বাধীনতার সমস্তা। স্বাধীনতা বাহাতে না দিতে হয় তাহারই জন্য কম্যুনিষ্ট দমনের ধনি উঠিয়াছে। রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এশিয়ার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও কম্যুনিজম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিয়া কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানবের মনকে উত্তেজিত করিয়া তোলা যে সম্ভব নয়, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ যে তাহা জানে না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নিজের স্বার্থে ক্ষতিকর কোন সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ভ্রমই সিঙ্গাপুর সম্মেলনে কম্যুনিজম নিরোধের জন্য সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ ইহাও জানে যে, শক্তিশালী নয় চীনও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তীব্র প্রয়াস সৃষ্টি না করিয়া পারে না। কাজেই কম্যুনিজম নিরোধের প্রয়াস যদি নয়া চীন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া চিয়াং কাইশেককে চীনে প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন ছাড়া আর কিছু না হয়, তাহা হইলে বিশ্বের বিষয় হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে এবং নেতৃত্বে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ এশিয়া ও আফ্রিকায় আবার তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু যত দিন শক্তিশালী সোভিয়েট রাশিয়া এবং নয়া চীনের অস্তিত্ব থাকিবে তত দিন তাহা সম্ভব নয়। এই ভ্রমই এই দুইটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিবার জন্য কম্যুনিজম নিরোধের ধনি উঠিয়াছে। এশিয়ার প্রত্যেক দেশের কার্যেই স্বাধীনতা প্রেরণী সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত বোণ রিয়াছে। আমেরিকার অস্ত্র-শস্ত্র এবং সামরিক নেতৃত্ব যদি এশিয়ার জনবল দ্বারা নয়া চীন এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করিতে পারে, তাহা হইলে এশিয়ার আবার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য আরও এক শতাব্দীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কোরিয়ার যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী নীতি সেই পথেই পরিচালিত হইতেছে।

### চীন বনাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ—

চীনে এবং উত্তর-কোরিয়ায় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্দ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া গত ১৭ই মে (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে তাহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই বিবেচনা করা আবশ্যিক। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, আলোচ্য প্রস্তাব

তাহারই অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্য-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাবের অল্পকূল ৩৭টি ভোট হইয়াছিল। বিপক্ষে ভোট একটিও হয় নাই, ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু নিম্নলিখিত ১টি রাষ্ট্র ভোট গ্রহণের সময় নিরপেক্ষ ছিল : (১) ভারত, আফগানিস্তান, বঙ্গদেশ, ইকুয়েডর, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সুইডেন ও সিরিয়া। লুয়েমবুর্গ ছিল অল্পপন্থিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন, বায়েলো রাশিয়া, চেকো-স্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড এবং ইউক্রেন ভোট দেওয়ার ব্যাপার বয়কট করিয়াছিল। চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত করার প্রস্তাবে যুগোস্লাভিয়া বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য প্রস্তাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গের পক্ষেই ভোট দিয়াছে। সুইডেন ও সিরিয়া নিরপেক্ষ থাকিলেও তাহারা জানাইয়া দিয়াছে যে, এই প্রস্তাব তাহারা মানিয়া চলিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চীনকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করার প্রস্তাবের অল্পকূলে ৪৪ ভোট হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়া, সৌদী আরব এবং ইয়েমেন পক্ষে ভোট দেওয়ার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্য প্রেরণ নিষিদ্ধ করার অল্পকূলে আরও তিনটি ভোট বেশী হইয়াছে। ভোট সঞ্চকে আলোচনা করিলে আরও দেখা যায়, সিংহল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। সামরিক উপকরণ প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার পর বাকী রহিল শুধু মাঞ্চুরিয়ায় বাসাবস্বর্ণ এবং চীনের উপকূল ভাগ অবরোধ করিবার প্রস্তাব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রাচ্য নীতির যে উদ্দেশ্য, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ক্রমশঃ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথেই পরিচালিত হইতেছে। চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্যসম্ভার প্রেরণ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত প্রথমে মার্কিন সিনেটে গৃহীত হয় : একান্ত বশবৎ ব্যক্তির ভায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মার্কিন সিনেটের সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারেও ঠিক অমুরূপ ঘটনাই ঘটিয়াছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে। পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তাহাই অমুমোদন করে মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধের খারা বিশ্লেষণ করিলে ইহা বৃষ্টিতে কষ্ট হয় না যে, নয়া চীনকে ধ্বংস করিবার কালের উহা ভূমিকা মাত্র। নূতন চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইতে হইলে কতগুলি প্রাথমিক অবস্থা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নয়া চীনকে আসন প্রদানের ব্যাপারে বাধা দান হইতে উহার প্ররূপ হইয়াছে। কোরিয়ার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৈরিত্ব প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উজোগে কোরিয়াকে আক্রমণকারী সাব্যস্ত করা হয়। অতঃপর কাল-বাহিনী না করিয়া কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হইল। তার পর বাসিল অষ্ট্রিংগ অক্ষরেকা অতিক্রম করার প্ররূপ। অষ্ট্রিংগ অক্ষরেকা অতিক্রম করিলে কোরিয়া যুদ্ধে চীনের হস্তক্ষেপ করার আশা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে-প্রস্তাব গ্রহণ করিল তাহা দ্ব্যর্থতঃ অষ্ট্রিংগ অক্ষরেকা অতিক্রম করিবার নির্দেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণামরূপে কোরিয়ার যুদ্ধে কোরিয়ার পক্ষে চীনও যোগদান করিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তখন চীনকেও আক্রমণকারী সাব্যস্ত করিলেন। চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্যসম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা ইহারই প্রারম্ভত পরিণতি। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের সুদূর প্রাচ্য-নীতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। কোরিয়ার যুদ্ধ না বাধিলে ইহা সম্ভব হইত না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কোরিয়া যুদ্ধ একটি ঈশ্বর-নির্ধিষ্ট ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহদভিপ্রায় সত্ত্বেও আজ বুঝা যাউতেছে যে, কোরিয়া যুদ্ধটা একটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষ সৃষ্টি করিবার জন্য দক্ষিণ-কোরিয়াকে উত্তর-কোরিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল, এইরূপ মনে করাই কি স্বাভাবিক নয়? এই উদ্দেশ্যে একটি আশা যে কম্যুনিষ্ট চীনকে ধ্বংস করিয়া চীনে আবার চিয়াং কাইশেককে প্রতিষ্ঠিত করা, তাহা মনে করিলেও ভুল হইবে না।

চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্যসম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কোরিয়ায় যুদ্ধরত ১৬টি দেশ না কি কোরিয়া যুদ্ধের মীমাংসা করিবার জন্য পাঁচ দফা উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন বলিয়া ৭ই জুনের (১৯৫১) এক সংবাদে প্রকাশ। এই উদ্দেশ্য ও নীতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। কোরিয়ার যুদ্ধটাই এখন অপ্রধান বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইতে মাত্র কয়েক দিন বাকী। এই এক বৎসরের যুদ্ধে কোরিয়ার যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইলেও এই শান্তি উপভোগ করিবার জন্য কয় জন কোরিয়াবাসী বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাও ভাবিবার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জব্যসম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ হওয়ার সংগ্রামের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই সম্ভাবনার সম্মুখে এশিয়ার দেশগুলি কি করিবে, ইহাই প্রশ্ন। আমেরিকার পক্ষ হইয়া লড়াই করিবার স্বাধীনতাই তাহাদের আছে। আমেরিকার নির্দেশ অগ্রাহ্য করিবার স্বাধীনতা তাহাদের আছে কি?

### জাপান শান্তি-চুক্তি—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান শান্তি-চুক্তির যে খসড়া রচনা করিয়াছে তাহাতে তাহার সুদূর প্রাচ্য-নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইবে, ইহা আশা করা যাই খুব স্বাভাবিক। তাহা সুদূর প্রাচ্য নীতির পরিপন্থী বলিয়াই জাপান শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে ক্রম-পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করিয়াছে। জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির জন্য রাশিয়া যে সকল প্রস্তাব করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, জাপান শান্তি-চুক্তির খসড়া তৈয়ার করিবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের এক সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে এবং এই বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীন হইবে অগ্রাহ্য। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া প্রস্তাব করিয়াছে, বৈদেশিক দখলের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপান হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, কারাগার ঘোষণা অনুযায়ী ফরমোসা এবং পেঙ্কগাডোয়েস দ্বীপ চীনকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই তিনটি প্রস্তাব হইতেই বৃষ্টিতে পারা যায় যে, এইগুলি স্বীকার করিয়া লইলে সুদূর প্রাচ্য মার্কিন-নীতি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, এশিয়ার আধিপত্য বঙ্গার জন্য জাপানে মার্কিন বাটী থাকা

একান্ত প্রয়োজন। রাশিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করিয়াছে যে, কোরিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কাজে জাপানকে ঘাঁটি-বন্ধন ব্যবহার করা হইতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে বাদ দিয়াই জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতে চায়। এই অভিযোগ দুইটিকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাপানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলকার সৈন্য ছিল বলিয়াই কোরিয়ায় যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা সহজ হইয়াছে এবং জাপানে মার্কিন ঘাঁটি আছে বলিয়া কোরিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে। রাশিয়াকে বাদ দিয়াই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই এবং রাশিয়াকে বাদ দিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তি করিবেও।

আপ শান্তি-চুক্তির মার্কিন খসড়ার সহিত বুটেনের প্রস্তাবেরও কিছু পার্থক্য আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায়, চীনের পক্ষে চিয়াং কাইশেকের গবর্নমেন্ট এই শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে। কিন্তু বুটেন চায়, স্ত্রুং প্রাচ্য-সমস্তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চীনের স্বাক্ষর স্থগিত রাখিতে হইবে। ফরমোসা দ্বীপটি কুয়োমিটাং গবর্নমেন্ট পায়, ইহাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। বুটেন ফরমোসা সমস্তাকেও ভবিষ্যতের জন্য মুক্তদ্বীপ রাখিতে চায়। জাপানের পণ্য উৎপাদনের উপর কোন বাধা আরোপ করা হইবে না, এ বিষয়ে বুটেন আমেরিকার মতেই মত দিয়াছে। চীনের পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে এবং ফরমোসা কুয়োমিটাং গবর্নমেন্ট পাইবেন কি না, এই দুইটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য মিঃ জুগেন্স বিলাতে গিয়াছেন। বুটেন যে এই দুইটি বিষয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতেই মত দিবে, তাহা অসম্ভব বলিলে ভুল হইবে না। চীনকে আক্রমণ-কারী সাব্যস্ত করিতে এবং চীনে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ জয়-সম্ভার প্রেরণ নিষিদ্ধ করিতে বুটেন প্রথমে আপত্তি করিয়া পরে রাজী হইয়াছে। মার্কিন নীতির প্রতিবাদে মিঃ বিভান এবং মিঃ উইলসন পরত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মিঃ এটলী, মিঃ মহিসন এবং মিঃ শিনওয়েল ইহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, এশিয়ায় বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিদেশ মানিয়া না চলিলে চলিবে না। মার্কিন নিদেশ প্রতিপালনের পুঙ্খানুপুঙ্খ—এশিয়ায় বুটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা।

### কেপটাউনে হাঙ্গামা—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধি বিলের প্রতিবাদে খেতকার এবং বর্ণসঙ্কর প্রাক্তন সৈনিকেরা—গত ২৮শে মে (১৯৫১) এক মশাল শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কেপটাউনের পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং ইহাকে উপলক্ষ করিয়া পুলিশের সহিত এক হাঙ্গামাও সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে ৫১ জন লোক আহত হয়। কেপ প্রদেশের বর্ণসঙ্কর প্রেরণী লোকেরা (coloured people) সাধারণ ধমকটও করিয়াছিল। আফ্রিকার কৃষকার অধিগামী এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে মালান গবর্নমেন্ট যে বর্ণ-বৈষম্য নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, অংশেই তাহা কেপ প্রদেশের বর্ণসঙ্করদের প্রতিও প্রয়োগ করিবার জন্য অ-ইউরোপীয় প্রতিনিধি বিল উত্থাপন করা হইয়াছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন যখন গঠিত হয় সেই সময় কোন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে কোন বর্ণ-বৈষম্য ছিল না। খেতকার, বর্ণসঙ্কর কৃষকার সকল ভোটারদের নাম এই তালিকাভুক্ত ছিল। বর্ণসঙ্কর এবং কৃষকারদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। এই বৈষম্যহীন নির্বাচন ব্যবস্থা রক্ষা করা হইবে এবং উহার পরিবর্তন করিতে হইলে পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট দ্বারা পরিবর্তন করা বাইবে, দক্ষিণ-আফ্রিকার শাসনতন্ত্রে এই বিভাগ অস্পষ্ট ভাবে উল্লিখ করা হইয়াছে। এই বিধানই entrenched clauses নামে পরিচিত। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গঠিত হইবার ২৬ বৎসর পরে বর্ণসঙ্কর সদস্যদের ভোটের জোরে সর্বপ্রথম বর্ণসঙ্করদের জন্য পৃথক নির্বাচনের বিধান করা হয়। বর্ণসঙ্কর সদস্যগণ এই বিলের অল্পকুলে ভোট দিয়াছিলেন বলিয়াই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। আজ বর্ণসঙ্করদিগকে পৃথক করিবার বিধান করা হইয়াছে। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া ইউনিয়ন এসেম্বলীর স্পীকার এই মর্মে কলিঃ দিয়াছেন যে, ট্রেডিং অব ওয়েস্ট মিনিষ্টার আইন পাশ হওয়ার পর দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন নাই। শুধু সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইলেই চলিবে।

এই বিলের দ্বারা বর্ণসঙ্করদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারাই এসেম্বলীতে ৪ জন এবং সিনেটে ১ জন মাত্র খেতকার প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে ইউনাইটেড পার্টিও দুর্বল হইয়া পড়িবে। কারণ এই দলের ভোটারদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর লোক বহু আছে।

### প্যারী সম্মেলন—

গত ৩১শে মে (১৯৫১) বুটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অ-গামী ২৩শে জুলাই ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র-সচিবদের এক বৈঠক অস্থগতের প্রস্তাব করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট একই ধরণের লিপি প্রেরণ করিয়াছে। বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের কণ্ঠস্বী নির্ধারণের জন্য গত ৫ই মার্চ প্যারী নগরীতে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে, তের সপ্তাহ ধরিয়া ৬৪টি অধিবেশনে আলোচনা সম্বন্ধে কোন সর্বসম্মত কণ্ঠস্বী নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসানের জন্য সরাসরি সোভিয়েট গবর্নমেন্টের নিকট উল্লিখিত লিপি প্রেরণ করা হইয়াছে। সম্বোধিত উল্লিখিত তিনটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ সোভিয়েট গবর্নমেন্টের নিকট উক্তি লিপি পেশ করিয়াছেন। সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রমিকোর নিকটেও উক্ত লিপির প্রতিলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত লিপিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২রা মে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রমিকোর নিকট যে-তিনটি বিবল কণ্ঠস্বী পেশ করিয়াছেন ঐ তিনটি কণ্ঠস্বীর মধ্যে দ্বিতীয়টিতে সর্বসম্মত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত আছে এবং তিনটি পশ্চিমী গবর্নমেন্ট মনে করেন যে, উহাই পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের আলোচনার ভিত্তি হইতে পারে। এই কণ্ঠস্বীতে পাঁচটি বিষয় আছে। পশ্চিমী শক্তিরূপের মতে এই কণ্ঠস্বী সম্পর্কে সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবচতুষ্টয় একমত হইয়াছেন। মঃ গ্রমিকো ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছেন যে, যদিও মোটামুটি একটা

মতৈক্য হইয়াছে, তথাপি উক্ত কর্তৃপক্ষীয় পাঁচ দফা বিষয় কি পারস্পর্য্যে আলোচিত হইবে, সে-সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু চরম মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে আটলান্টিক চুক্তি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল সামরিক বাঁটি আছে সেগুলিও যে গ্রমিকো কর্তৃপক্ষীতে সন্নিবেশিত করিবার দাবী করিবার ফলে।

জাতিগতিকে নিরস্ত্র করা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের এখন আর কোন আগন্তি নাই। কারণ পশ্চিম-জাতিগতিকে অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে তাহারা নিজেরাই এখন চিন দিয়াছে। অস্ত্র-সজ্জা ক্রাসের প্রস্তাব আলোচনা করিতেও তাহারা রাজী। কিন্তু উক্ত-আটলান্টিক চুক্তি এবং পৃথিবীব্যাপী মার্কিন সামরিক বাঁটি সম্বন্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় আলোচনা করিতে রাজী নয়। মঃ গ্রমিকো জানাইয়াছেন, এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে যদি আলোচনা করা না হয়, তাহা হইলে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের কোন অর্থই হয় না। পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় ক্রশ গবর্ণমেন্টের নিকট যে লিপি প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে আটলান্টিক চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিবার ক্রশ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কথাই শুধু আছে, মার্কিন সামরিক বাঁটি সংক্রান্ত ক্রশ-প্রস্তাবের কোন উল্লেখ নাই। উহা উল্লেখ করিতে হঠাৎ ভুল হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। আটলান্টিক চুক্তি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা অবশ্যই বাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মার্কিন সামরিক বাঁটিগুলিকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বলিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। স্মরণ্য ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না যে, মার্কিন সামরিক বাঁটিগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয়ের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।

ক্রশ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত উক্ত লিপি যে চরমপত্র নয় অথবা প্যারী সম্মেলন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার হুমকীও নয় তাহা ভ্রাম্যমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ জেসাপ অবশ্য স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু প্যারী সম্মেলন এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত চলিতে পারে না, তাহা জানাইয়া দেওয়াও উল্লিখিত লিপি প্রদানের উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন অস্বীকৃত হওয়া সম্পর্কে ভরসা করিবার কিছু দেখা যায় না। আর সম্মেলন হইলেও কোন ফল হওয়ার আশা নাই বলিয়াই মনে হয়।

### নেপাল সমস্তার মীমাংসা—

নেপালের নূতন গবর্ণমেন্টকে ধ্বংস করিবার বড়বস্ত্র বার্ষ হইবার পর প্রধান মন্ত্রী মোহন সমশের এবং পররাষ্ট্র-সচিব জীযুত কৈরলা ভাট গবর্ণমেন্টের মধ্যস্থতায় মীমাংসার জন্ত দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। সাত দিন আলোচনার পর যে মীমাংসা হইয়াছে, গত ১৬ই মে (১৯৫১) তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভারত গবর্ণমেন্টের পররাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে মীমাংসার ব্যবস্থা আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হইতেছে। নেপালের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্ত সহযোগিতার মনোভাব এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নেপাল মন্ত্রিসভার কাজ করা কর্তব্য, এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য হইয়াছে।

নেপাল মন্ত্রিসভার পরিবর্তন সাধন এবং দপ্তরের পুনর্কর্তন সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করিবার জন্ত ৪০ জন সদস্য লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইবে। এই উপদেষ্টা পরিষদই বর্তমানে আইন সভার কাজ করিবে।

মন্ত্রিসভার পরিবর্তন কি ভাবে করা হইবে তাহা কিছুই স্থির হয় নাই। মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব ও কর্তৃকূশলতার জন্ত কি কি পরিবর্তন আবশ্যক তাহা মন্ত্রিবর্গ সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। উপদেষ্টা পরিষদ কি ভাবে গঠিত হইবে, মন্ত্রিসভার সহিত উহার সম্পর্কই বা কি হইবে তাহাও নির্ধারণ করা হয় নাই। অথচ ঐগুলির উপরই গবর্ণমেন্টের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ভর করিবে মনে করিলে ভুল হইবে না। কাজেই মূল বিষয়গুলিই অমীমাংসিত রাখিয়া যে মীমাংসা করা হইল তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ভরসা করিবার কিছু দেখিতে পাইতেছি না। একটি বড়বস্ত্র বার্ষ হইয়াছে। নূতন মীমাংসার ফলে ভবিষ্যৎ বড়বস্ত্র সম্বল হওয়ার পথ পরিষ্কার হইল কি না তাহা অস্বাভাবিক করিবার সময় এখনও আসে নাই।

### তিক্ষত সমস্তার সমাধান—

কম্যানিষ্ট চীনের গবর্ণমেন্ট এবং দলাই লামার প্রতিনিধি দলের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর একটা মীমাংসা হওয়া সম্ভব হইয়াছে। পিকিং বেডিয়োর সংবাদে জানা যাইতেছে যে, এই মীমাংসার ফলে গত ২৩শে মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিব্বতের মুক্তিসাধন এই চুক্তির উদ্দেশ্য। এই চুক্তিতে মোট ১৭ দফা সর্ভ আছে। এই সর্ভগুলি তিব্বতের মুক্তিসাধন, আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন, দলাই লামা ও পাকেন লামার ক্ষমতা নির্দেশ, ভবিষ্যৎ সংস্কার সাধন এবং পররাষ্ট্র ব্যাপার এই পাঁচটি অংশে বিভক্ত। সমস্ত সর্ভ এখানে উল্লেখ করিবার স্থান আমরা পাইব না। সংক্ষেপে কয়েকটি সর্ভ এখানে উল্লেখ করা হইল।

তিব্বতের জনগণ তিব্বত হইতে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক শক্তিগুলিকে বহিষ্কৃত করিবার জন্ত ঐক্যবদ্ধ হইবে এবং তিব্বতের স্থানীয় গবর্ণমেন্ট গণমুক্তি ফৌজকে তিব্বতে প্রবেশে সাহায্য করিবে। তিব্বতের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনস্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং দলাই লামা এবং উচ্চপদস্থ কাম্চাংরিগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। বগ্গুফুর পদ গ্রহণের জন্ত পাকেন লামা তিব্বত যাইবেন। ধর্মবিধাস এবং শ্রম সমূহ রক্ষা করা হইবে এবং সৈন্যবাহিনীকে চীনা গণমুক্তি বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে পুনর্গঠন করা হইবে। চীনা সামরিক ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্ত তিব্বতে একটি কমিশন ও সামরিক হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হইবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারও সর্ভ আছে। চীন গবর্ণমেন্ট তিব্বতের পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং তিব্বত চীনের পিপলস্ রিপাবলিক গোষ্ঠীতে যোগদান করিবে।

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে এই চুক্তি যে পছন্দ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিব্বতে বৃটিশ প্রাধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে এবং মার্কিন প্রাধিকার প্রতিষ্ঠার পথও আর রহিল না। অবশেষে শান্তিপূর্ণ উপায়েই তিব্বতের সমস্তার সমাধান হইল।

# ভিন্ জাতের দিদি

ঐতিহ্যবাহীন দেব (শান্তিনিকেতন)

১

সুদূর থেকে উঠে চোখ কচলাচ্ছি—কান্নার সুর বেববে বেববে, এমন সময় মা একটা ছোট টুকরিতে করে নিয়ে এলেন ফুলের মতো সাদা ধবধবে রঙের চিড়ে। আমি চিড়েতে হাত বুলিয়ে দেখলাম, ঠ্যা এক ঢাকা গুড়ও আছে। কান্না থেমে গেল। মা আমাকে চোখ-মুখ ধোয়াতে নিয়ে গেলেন।

বড় ভালো লাগছিল খেতে। মাকে বললাম, ‘মা, কোপেকে পেলে এই চিড়ে, মা?’

মা বলেন, ‘তোমার ন’দিদির বাড়ি থেকে এসেছে।’

আমাদের ন’দিদি আছে জানি, কিন্তু তাকে কখনও দেখিনি। মাকে বললাম, ‘মা, ন’দিদি কেন আসে না মা এক দিনও?’

মা বলেন, ‘সে-যে পূরের ঘরের বউ হয়ে গেছে। যখন খুশি কি আসতে পারে?’

আমি বলি, ‘আমি যদি তাকে আনতে বাই, তাহলে কি আসবে না?’

মা বলেন, ‘কেন আসবে না? নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু... এটুকু বলেই মা হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বললাম, ‘বল মা, কেন আসবে না ন’দিদি?’

মা ছুটে গেলেন রান্না-ঘরে। ভাত উধালাচ্ছে। সকাল-সকাল আমাদের ভাত হয় কি না! আমরা ত চাই খাই না। সকাল বেলায় আমাদের ভাই-বোনদের চাই গরম ভাত এক মুঠো আর একটু-খি বা ভেসে, শেষে একটু দই। বেলা একটা পৰ্ব্বস্ত চূপচাপ চলে যায়।

চিড়ে খাচ্ছি। প্রতিটি চিড়ের বেন ন’দিদির মুখ ঝাঁকা। ন’দিদি কত ভালোবেসে না-জানি দিয়েছে এই সুন্দর খাবার তার ভাইদের জন্য। আমার এমন ন’দিদিকে আমি দেখব না? বড়দি, মেজদি, সেহরি সবাই আসতে পার আর ন’দিদি আসতে পার না কেন, তার খণ্ডর কি ভালো লোক নয়?

মাকে বললাম, ‘ন’দিদির বাড়ি বাব মা?’

মা বলেন, ‘বাব ত বাবে। অত ব্যস্ত হচ্ছে কেন? বর্ষা কাল আসুক। নৌকো চলুক। তবে ত।’

আমি বর্ষা কালের অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বাঘের মুখ ঝাঁকা আমার বাঁশের সুন্দর লাঠিটা চুরি করে নিয়ে গেছে পাশের বাড়ির হাবুল। আমি ত কেঁদে আঁতুল। মা ছুটে এসে বলেন, ‘আবার হল কি?’

বললাম, ‘ঐ যে হাবলা আমার লাঠিটা নিয়ে গেছে, অ্যা, অ্যা, অ্যা...’

মা হাবুলকে ডেকে বলেন, ‘বাবা, তোমাকে আমি একটি সুন্দর বাঁশ দিচ্ছি, ঐ লাঠিটা সম্বন্ধ দিয়ে দাও বাপ। ওটা ওর ন’দিদি দিয়েছে। বড় আশ্রয়ের লাঠি ওর। দেখছ না, একটা বাঘের মুখ ঝাঁকা আছে লাঠিটার মাথায়। দিয়ে দাও বাপ।’

হাবুল বললে, ‘জ্যোতিষ’, আগে আমাকে বাঁশ দেবেন তবে আমি লাঠি দেব।’

লাঠিটা পেয়ে আমি কেবলি বাঘের মুখটাকে এদিক-ওদিক

করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। হাবুলকে বলতে লাগলাম, ‘আমার ন’দিদি আমাকে দিয়েছে। তোমার ন’দিদি আছে?’

হাবলা আমাকে মুখ ভেঙে দিলে।

আমি কান্দতে কান্দতে উঠে চলে গেলাম মায়ের কাছে।

মাকে বললাম, ‘মা, আমি ন’দিদির কাছে বাব, মা আমি...’

মায়ের কপাল থেকে ঘাম বরছিল। হৃপ্পর বোদে উল্লসের উপর বুঁকে বুঁকে রান্না করছিলেন। কড়াইএ ভাজা চড়চড় করছে। গন্ধ বেবছে। আমার জিবে জল আসছে। কতক্ষণে খেতে বসব।

২

পূরের দিন মাকে বললাম, ‘মা আমি কালকে গিয়েছিলাম ন’দিদির বাড়ি। তুমি বললে বর্ষা না এলে যাওয়া যায় না? আমি ত দিবা নৌকায় করে গেলাম। হাওর ভরতি জল ঝৈ-ঝৈ করছে। কেন আমাকে মিছে কথা বলেছিলে তুমি মা?’

মা বলেন, ‘কেমন দেখলে ন’দিদিকে?’

‘মনে নেই মা। আমাদের মতোই তার গায়ের রং। মাথায় অনেক চুল। কি-রকম শাড়ি-বেন-পরেছিল ঠিক মনে নেই। বাঘের গায়ের মতো রং সেই শাড়ির বুঝি। আরেক বার বাব মা, অ্যা?’

মা বলেন, ‘স্বপ্ন দেখেছিস বুঝি কাল রাতে?’

আমি বললাম, ‘স্বপ্ন? স্বপ্ন কি রকম?’

সে-রাজেই আবার ন’দিদির সঙ্গে দেখা হল আমার। কিন্তু মা’র কাছে যখন বলতে গেলাম, তখন আর কিছুই মনে আসছিল না। ভুলে গেলাম এর মধ্যেই। মা বলেন, ‘বা দেখা যায় অথচ মনে থাকে না তাই স্বপ্ন।’

‘দেখা যায় অথচ মনে থাকে না কেন?’

মাকে বললাম, ‘মা, কবে বাব ন’দিদির বাড়ি মা?’

মা বলেন, ‘তুই যে বললি তুই গিয়েছিলি?’

আমি বললাম, ‘গিয়েছিলাম যদি তাহলে তাকে মনে থাকে না কেন?’

মা হাসেন শুধু। পাড়া-পড়ক্সী এলে তাদের কাছে গল্প করেন আমার কথা ন’দিদির কথা। আমি বুঝতে পারি। আমি ছুটে গিয়ে মার মুখ চেপে ধরি। মা হাত দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন।

সেদিন কে একটা লোক কি নিয়ে এসেছে পোটলার বেঁধে। মাকে এসে বলছে, ‘ঐ যে মাঠান, আপনার ন’মেয়ে ঐই সব দিয়েছেন।’

মা এগোবার আগেই আমি এগিয়ে এসে লোকটার হাত থেকে নিলাম সেই পোটলা, খুলে দেখলাম—মিহি চাল আছে, সাঙলানার মতো মিহি।

দাদা-দিদিরা ছুটে এল সকলে দেখতে।

মা সেজন্যকে ডেকে বলল, ‘মহু, সন্তকে নিয়ে এরই মধ্যে এক দিন গিয়ে বেড়িয়ে আর তোমার ন’দিদির বাড়ি থেকে। কেমন?’

৩

সেদিন আমার স্বপ্ন সার্থক হচ্ছে। কত খুশি আমি। ন’দিদির বাড়ি যাচ্ছি। বড় হাওর পাড়ি দিচ্ছি নৌকায় করে। সবুজ রঙের ধান গাছ সারা হাওর জুড়ে আছে দাম বেঁধে। মাঝি লাগি দিয়ে ঠেলে নৌকো সরতে পারছে না।

মারো-মারে কাঁকা জলা। শাপলা শালুক ফুল, ফুলের কলি। নিচে থেকে জলের ভিতর দিয়ে বেন সাপের মতো গলা বাড়িয়ে আছে জলের উপর। বড়-বড় পাতা দেখে ইচ্ছে হয় তাতে ভাত রেখে থাই।

নৌকোর তলা থেকে ছুটে আসছে পোকা-মাকড়ের দল। বসছে গিয়ে শাপলা পাতার উপর। 'পি-পি' ডাকতে ডাকতে একটা ছোট পাখিও উড়ে পাখিয়ে গেল নৌকোর তলা থেকে। বস-বস কবে নৌকো এগিয়ে চলেছে। ধানের গাছগুলো ঘুরে পড়ছে। নৌকো সব যেতেই আবার সোজা হয়ে উঠেছে। আমার মনে হয়, তারা বুঝি কষ্ট পায় না? আমরা তাদের উপর দিয়ে চলে যাই—তবু তারা সস্থ করে?

গলুই এ বসেছিলাম আমি। হঠাৎ দেখি, একটা ছোট বাসা ভেসে যাচ্ছে তরতর করে কাঁকা জলের উপর দিয়ে। ধান-গাছের পাতা আরও কত কি দিয়ে তৈরি একটা ছোট বাসা। কয়েকটা শাদা শাদা স্তম্ভর ডিম উপরে। আমি লাফিয়ে উঠলাম। নৌকো একটা পাক খেল। মাঝি বললে, 'কি যে কর খোকা? একুশি আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিলাম আর কি? ঠিক হয়ে বসো। নড়ে-চড়ে না।'

সেজদাকে বললাম, 'সেজদা, ওগুলো কিদের ডিম?'

সেজদা বললে, 'ম্যাওকুচির।'

আমি বললাম, 'ম্যাওকুচি কি?'

দাদা বললে, 'এক রকমের পাখি।'

ম্যাওকুচিটা কি-রকম হতে পারে মনে মনে আন্দাজ করতে লাগলাম। এরই মধ্যে একটা পাখি আমার চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে হঠাৎ ঝপাসু করে জলে পড়ল। দাদা বললে হঠাৎ, 'ঐ দেখ, ঐ দেখ, ম্যাওকুচি গেল।'

দাদা ত বলল, কিন্তু আরেকটু আগে বললেই আমি ম্যাওকুচি দেখতে পেতাম। ম্যাওকুচি পাখির ডিমগুলো ভেসে যাচ্ছে। ঐ পাখিটা বোধ হয় হাতিয়ে ফেলেছে তার ডিম। তাই এমন উড়ছে পড়ছে। দূর থেকে কানে বেজে উঠল—

'ম্যাওকুচি' 'ম্যাওকুচি' 'ম্যাওকুচি!'

দাদাকে বললাম, 'সেজদা, ঐ শোনো, ম্যাওকুচি ডাকছে, না?'

দাদা বললে, 'না, না, এ অজ্ঞ পাখির ডাক। ম্যাওকুচির ডাক আরও মিষ্টি।'

মনে মনে হতে লাগল আরও মিষ্টি ম্যাওকুচির ডাক।

৪

মাঝি বললে, 'খোক', জামা গায়ে দাও। জুতো হাতে নাও। এবার নামতে হবে।'

আমি বললাম, 'জুতো হাতে বেন নেব?'

মাঝি বললে, 'পথে-ঘাটে কাপা-মালা আছে কি না! বাড়ির কাছে গিয়ে পা ধুয়ে তার পর জুতো পরবে।'

একটা জমির পাশে নৌকো থামল। চাষীরা ঘরে কিছই এক হুঁটু কাটা নিয়ে। ছপুর হয়ে গেছে ততক্ষণে। এক হাতে হুঁকো টানছে আর হাতে পাটনবাড়ি। কাঁধে লাঙ্গল-জোয়াল। গরুগুলি বেন এক ছুপু খাটুনির পর আর চলেতে পারছে না। চাষীদেরও একই অবস্থা। আমরা চললাম তাদের পিছু-পিছু।

উঁচু-উঁচু যেতের আল। মারো-মারে পা হড়কে যায়। ওড়াতাড়ি ইটতে পারছি না। সামনে চাষীরা রয়েছে যে। তারা পথ ছেড়ে দেয় না। আমি চাই শীগগির গিয়ে পৌছতে ন'দিমির বাড়ি। কিদে পেরে গেছে।

গরুগুলি জল খেতে লাগল। ছোট নদীর মতো বিস্ত্র নদী নয়। পাগাড়ী ছড়া। ঝিগঝির করে বয়ে যায় জল। ধুব পরিষ্কার। চাষীরা মুখ-হাত ধুয়ে নেয়। আমিও হাত-পা মুখ ধুলাম। খানিকটা জল চলে গেল শেটের ভিতর। দাদা বললে, 'ও-জল খাস নে।'

এমন জল খাব না, ত খাব কি! আমাদের পুকুরের জল ত এত পরিষ্কার কোনো কালেই হয় না। পাগাড়ী বরষা।

৫

এখান থেকে জমি উঁচু হতে-হতে পাগাড়ি গিয়ে মিশেছে। এ বেন আরেক নতুন দেশ। এখানকার মাটি লাল। পথ বালিতে বাঁধানো। কাঁদা নেই একেবারে। পথের দু'পাশে নানা রকমের নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। পাখিগুলি উড়ে যায় এ গাছ থেকে ও-গাছে। এমন সব পাখি আমি দেখিনি এর আগে। গাছ-গাছালির মারো-মারে হঠাৎ এক একেকটা বাড়ির টিনের ঘরের মাথায় দেখা যায় হুম্মান বসে আছে একটা। মনে হল, স্বপ্ন দেখছি না ত? মা যে বলেছিলেন,—'দেখা যায় কিন্তু মনে থাকে না, তাই স্বপ্ন।' কিন্তু এ বা দেখছি একি কোনো দিন ভুলবো?

## উকুনোর নতুন ঔষধ

### আশ্চর্য্যাকর ক্ষমতা

"মহাশয়: হুই আনার ডাকটিকিটের ঔষধে আমার মাসীমার নিকৃতি হয়েছে—উকুনোর হাত হতে। সামান্য হুই আনার যে এত স্তম্ভর কাজ হয়—তাহা আশ্চর্য্য।"—শ্রীমনিকুন্ডলা দেবী; C/o. A. S. M. Sajnipara Stn. Murshidabad.

"নিউট্রল-লাইসাইড পাউডার ব্যবহার করে উপশান্ত মস্তব্য করেছেন। চুল ও মাথার চামড়ার কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

অমুগ্রহ করে হুই আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন। এক জনের উপযুক্ত একমাত্রা তাম্পল পাঠাবো।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় এই "লাইসাইড" পবিত্রবশক প্রয়োজন। উচ্চ হারে কমিশন দেবো।

# নিউট্রল

Dept. M.B.; ১১, বণ্ডেল রোড; কলিকাতা—১১



কানে এস মোরগের ডাক। সেজন্যকে বললাম, 'সেজন্য, এখানে কি মুসলমান থাকে?'

সেজন্য বললে, 'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। ও-সব বলিসু নে।'

বলব না কি হয়েছে। এতে দোষ কি? মুসলমান থাকে মুত থাকে। হিন্দুবা ত মুসলী গোষে না। মুসলমানেরা সকালে চাষ করতে যায় ক্ষেতে। তাই ওরা মুসলী গোষে। মুসলী না কি খুব ভোরে সাত সন্ধ্যাে তাদের ডেকে উঠিয়ে দেয়: 'শেখ রে শেখ, রাইত পোরাইছে, দেখ, রে—দেখ—দেখ,।' 'কুকু কু; কু-কু-কু!'

হু'দিকে টা' বাড়ি। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নিচু পথ। আমরা সেই পথ ধরে চলছি। কোনো বাড়ি বাঁশের টা' টি দিয়ে ঘেরাও করা, কোনো বাড়িতে শোচার ঘেরা। কোনোটা বা টা' টি পরদা ছাড়া জাটো। খোকার মতো ঠা'ড়িয়ে।

আমরা চলি। টা' টির ভিতর থেকে কাঁরা যেন আমাদের দেখছে লুকিয়ে লুকিয়ে। পায়ের শব্দ শাওয়া যায়। আর কিস্কিসানি। কথা সবই শোনা যায়, কিন্তু বোঝা যায় না কিছুই। ফুফু করে বেরিয়ে এসেছে হু'-তিনটে ছোট ছেলে। পিছন-পিছন ঘোমটা দেওয়া একটি বউ। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলাবলি কয়েক—'এরা যে কমলাবাহুর ভাই। কমলাবাহুর বাড়িতে যাবে বুঝি?'

আমি সেজন্যর দিকে তাকালাম। সেজন্য মাথা নিচু করে পথ চলছে। যেন ওদের কাউকেই দেখতে পায়নি।

হাঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম আমি। কেঁদে ফেললাম। পথের বাসিতে চোখ-মুখ বুজে গেছে যেন।

৬

ঝকঝক-তক্তকে ঘরে আঁরি কার কোলে বসে আছি? এই কি আমার ন'দিদি? সেজন্য ত বলেও দিল না যে, এই তোর ন'দিদি!

আমি ভালো করে চোখ মেলে চাইতে পারছিলাম না। আমার চোখের কোণ থেকে বালি বের করছেন তিনি তাঁর শাড়ির আঁচলের কোণ দিয়ে। এমন স্নান্য মুখ আমি বুঝি এর আগে দেখিনি। এ যে আমার 'বড়দি'র 'সেজন্য'র চাইতেও দেখতে স্নান্য! আমার ন'দিদি না কি?

তিনি বলে উঠলেন, 'কিঁদে পেরেছে ভাই? কিছু খাবে না কি?'

আমি তাঁর দিকে তাকালাম, আবার চোখ নামিয়ে নিলাম। লজ্জা করছিল। তিনি আমাকে কোলের ভিতর হু'হাতে এমন জাপটে ধরলেন যে, আমার নড়বার জো রইল না। চুমোর পর চুমো খেয়ে আমাকে অস্থির করে তুললেন। আমি শ্বাস ফেসতে পারছিলাম না। কঁকিয়ে উঠলাম। আমাকে ছেড়ে দিলেন নাটিতে। আমি তাঁর দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বাধান্যর গেলাম। সেজন্যকে খুঁজতে লাগলাম।

ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে বের করলেন কয়েকটা সোনালী রঙের স্ট্রট-পুট কলা, এনে আমার হাতে দিলেন। বাইরে উঠোনের কোণে একটা শেয়ারা গাছ থেকে হাত বাড়িয়ে পেড়ে আনলেন

ক'টা ডাঁসা পেয়ারা। দিলেন আমার হাতে। সবগুলি আমার হাতে ধরল না। আমি হু'হাত ভরে নিয়ে ঠা'ড়িয়ে রইলাম। খাই কি করে!

সেজন্য' গেল কোথায়? ন'দিদি এতক্ষণ বুঝি কুমড়ো কাটছিল। বঁটির মুখে আধ-কাটা হয়ে লাগানো রয়েছে এক ফালি এখনও। কুমড়ো-কুমড়ো, কাল-কর্ম সব ভুলে গেছে বুঝি আমাকে দেখে? আমার ভালো লাগল; কিন্তু তাঁকে কি করে বলব যে, 'ন'দিদি আমি তোমাকে ভালোবাসি।' দিদি কি মনে করবে? লজ্জা করতে লাগল।

আমাকে আবার কাছে টেনে নিলেন ন'দিদি। জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, 'মা কেমন; বাবার জ্বর হয়েছিল; সেবেরে? তোমার না কি একটা আঙ্গুল মচকে গিয়েছিল কামিনী ফুলের গাছ থেকে পড়ে? কই দেখি?'

বলতে বলতে ন'দিদি আমার সবগুলি আঙ্গুল একটা-একটা করে টিপে-টিপে দেখতে লাগলেন। আমার কত সংকোচ, কত লজ্জা। তিনি ত বলতে লাগলেন, 'আমি তোমার ন'দিদি, পর নই ভাই, পর নই। কথা বলছ না কেন?'

ছুটে ছুটে একটা মুসলী কঁ-কঁ করতে করতে এসে চুকল ঘরে। একেবারে ন'দিদির পায়ের কাছে এসে লুকোল। আমার মুখ থেকে বেকস, 'মুসলীটা কার ন'দিদি?'

ন'দিদি বললে, 'তুমি নেবে একটা মুসলী?'

মনে মনে বললাম, 'সর্বনাশ! বলে কি, মুসলী নেব আমি?' মা আমাকে খেয়ে ফেলবে তাহলে যে!

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকান্ছি চার দিকে। কেবলই মনে হচ্ছে—বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তবু এত হিন্দুর বাড়ি নয়! আমার ন'দিদির পরনেও ত মুসলমানী কাপড়। এরা কি মুসলমান হয়ে গেছে?'

ন'দিদিকে যে-সব খাবার তৈরি করে মা পাঠিয়েছিলেন আমাদের হাত দিয়ে, তার থেকে কিছু-কিছু দিয়ে এক বাটি সাজিয়েছেন দিদি। আমাকে এনে দিলেন খেতে। মনে হচ্ছিল আমার ও সব আর এখন ভালো লাগছে না। আমাকে যদি শুধু ভাল দিয়ে ভাত খেতে দিত ন'দিদি!

একটা ফেজওয়াল লাল টুপী মাথায়, একটা ডোরাকাটা লুজি পরনে, একটা লোক চুকলে বাড়িতে। কাঁধ থেকে লাঙ্গল-জোয়াল সে নামাল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গা শিউরে উঠল। মুসলমানের মতো ঠা'ড়ি-গোঁফ তার যে!

ও মা, সে লোকটাই এসে চুকল ঘরে! ন'দিদিকে জিজ্ঞেস করলো সে, 'ভাত অইছে?'

ন'দিদি বললে, 'ছোট ভাই অইছে কি না, তাই একটু বিলম্ব অইতেছে।'

লোকটা বেগে আগুন হয়ে বলে উঠল, 'হারামজাদী মাগী, হগল দিন থইরা করত!চন্ কি?'

লোকটার চোখ দিয়ে আগুন বেরতে লাগল। আমার প্রাণ তখন খাঁচা-ছাড়া। কোন পথ দিয়ে পালাব বুঝতে পারছি না।

ছুটে আরম্ভ করছি বেদম। পথের মুখে এসে দেখি দাদাও ছুটেছে। দাদা বললে, 'ছোট ছোট। পাগলা ক্ষেপেছে। বন্ধ নেই!'

পেছন পেছন ছুটেছে ন'দিদিও। আর ডাকছে, 'ছোট ভাই, ছোট ভাই, ও সন্ত, ও সন্ত !'

আমি শুনতে পাই, কিন্তু ঘুরে তাকালেই যেন দেখতে পাই, সেই কেপে-বাওয়া লোকটার আগুন হুঁটো চোখ। আরও যায় ওখানে! ওই লোকটা কে? মনে মনে কেবলি হচ্ছিল, ও-লোকটা হবে কে?

মাঠে এসে পড়েছি। আর ছুঁতে পারছি নে। জলতেটা পেয়েছে। খেমে গেলাম। তখনও ন'দিদির ডাক কানে আসছে, 'ছোট ভাই, ছোট ভাই, সন্ত, সন্ত, কিরে আর ভাই !'

ভয় আছে, তবু তাকালাম। দেখি কি, মাঠের গায়ে যে বাড়িটা, ন'দিদি সে-বাড়ির আম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে আমাদের ডাকছে। মাথায় তার ঘোমটা নেই। আলগা খোঁপা বুলে পড়েছে পিঠে। হুঁচোখে জলের ধারা। পাগলিনী সাজেছে সে। আমার চোখে জল এল। বুকের ভিতর কেমন করতে থাকল। দশকে বললাম, 'সেজ্ঞা, ন'দিদি ডাকছেন, এসো না আবার বাই?' পিছন থেকে টানছে ন'দিদি, সামনে থেকে ছুটেছে সেজ্ঞা। আমি মাঝখানে। কোন্ দিকে বাই? হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। একবার এদিক একবার ওদিক তাকাই। চোখে ভেসে ওঠে সেই গোঁয়ার লোকটার আগুন হুঁটো চোখ। শিউরে উঠি।

৭

নৌকোর এসে উঠলাম। মাঝি বললে, 'কই, কিছু নিয়ে এলে না যে দিদির বাড়ি থেকে?'

আমি বললাম, 'বা বিপদে...'

সেজ্ঞা আমার মুখ চেপে ধরলে।

আমি কিছুই বললাম না। সেজ্ঞা তখন বানিয়ে-বানিয়ে নান কথার বলতে লাগল।

ফেরবার পথে মনে পড়ল না। ম্যাওকুটিকে, চেয়ে দেখলাম না খান ক্ষেতের দিকে, ম্যাওকুটির ডিমও চোখে পড়ল না, শাপলা-শালুক কোথায় কি যে হয়ে গেল। মন ভরে উঠল ন'দিদির ছবিতে। চোখে কেবলি ভাসতে লাগল, আমি গাছের তলায় খোলা চুলে পাগলিনীর মতো দাঁড়িয়ে আছে ন'দিদি। হুঁহাত নেড়ে ডাকছে, 'আর ভাই, আর সন্ত !' কিন্তু আমরা!

সজ্যে হয়-হয়। বাড়ি শৌছলাম। মা ছুটে এলেন। বাবা কাজ করছিলেন কাছারি-ঘরে, ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ন'দিদির ভালো-মন্দ। আমার গলা দিয়ে বেরুল কান্নার স্বর। কোনো কথা বলবার আগেই হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। বাবা কিছুই বললেন না। মা বললেন, 'কি হয়েছে সোনাল, কি হল?'

সেজ্ঞা বলতে লাগল, 'ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন। ন'দিদির বরটা বা আশি পাগল। কি বড়-বড় তার আগুনের মতো চোখ...'

এতটুকু বলতেই বাবা চোখ ইশারা করলেন। সেজ্ঞা বন্ধ করল কথা বলা।

বাবা বুঝি সব জানেন। ন'দিদির জামাইটার কথা। তাই ত উনি চুপ করে থাকেন। আমরা ন'দিদির বাড়ি যেতে চাইলে এই জগুই বারণ করতেন। মাকে বলি, 'কেন মা, এমন একটা



Phone  
3468-B.B.



আর্টিজ্যানের  
জৈষ্ঠকর্ষ!

**আর,সি,দেও সন্ন**

• জুয়েলার্স •

১১১-বহুভাঙ্গার স্ট্রীট-কলিকাতা

পাগলার সঙ্গে ন'দিদিকে বিয়ে দিলে তোমরা ? ন'দিদি কত সুন্দর দেখতে। কত ভালো সে। বড়দি-সেজদির চাইতেও !'

সেজদা বললে, 'বাটা বে খাজা মুছলা কি না ?'

আমি বলি, 'বলো কি, ন'দিদিও কি তাহলে মুছলমান হয়ে গেছে ?'

মা বললেন, 'হয়ে যায়নি রে। আগে থেকেই।'

আমি বলি, 'তাহলে ন'দিদি তোমার পেটের নয় ?'

মা বলেন, 'পেটের না-ই বা হল। তবু ত তাদের সকলকে মায়ের পেটের ভাই-বোনের মতই দেখে।'

আমি অর্ধেক হাসে বলি, 'মা, ন'দিদিকে ওখান থেকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা কর না মা, বাবাকে বলে না মা ?'

মা বলেন, 'বলবো, বলবো।'

বাবা বাড়ি ঢুকেই উৎসাহ হয়ে উঠি তার পিছু পিছু ন'দিদিও আসে কি না। কিছু কই, বাবা ত তাকে নিয়ে এস না এখনও ! মা কি তাহলে বলেননি বাবাকে ?

৮

সাত দিনও পেরয়নি। কাছাকাছি থেকে আম বাগানের দিকে যুগ করে বসে আছেন বাবা যুগ কালো করে। কাগজ-পত্র এলোমেলো। কাজ আছে, কাজ করছেন না। তামাক পুড়ে যায়, ছ'কোয় টান বেন না। আমরা ডাকি, 'বাবা, বাবা !' বাবা সাড়া দেন না।

মাকে গিয়ে বলি, 'মা, দেখ এসে, বাবার যেন কি হয়েছে। কথা বলছেন না। চোখ টগমল করছে যেন। কি হয়েছে মা ?'

মা ছুটে গেলেন, বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই, আরে ওনহ ?'

বাবা তাকালেন মার দিকে। মা বললেন, 'এ কি হল তোমার ?'

বাবা বলেন, 'কমলাকে আনতে গিয়েছিলাম।'

মা বললেন, 'তার পর ?'

বাবা বলেন, 'তার পর আবার কি ! সব শেষ হয়ে গেছে।'

সকল ভাই-বোন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার বুঝি মাথা ঘুরে গেল।

৯

আমার অশ্রুত করেছে। কবিরাজ কাকা বলে আছেন শিয়রে। মা মাথায় জলপটি দিচ্ছেন। মাঝে-মাঝে বুকের কাছে আমাকে কোলে তুলে কানে-কানে বলছেন, 'তোমার ন'দিদি আবার আসবে রে। সে কি আমাদের ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারবে ? তোমার ন'দিদি আবার আসবে।'

একটি দিনের একটি ক্ষণের কথা বললাম। গল্প নয়। যে দেশে জন্মেছিলাম আমি, সে-দেশেই জন্মেছিল ন'দিদি। আমি হিন্দুর ঘরে। ন'দিদি মুসলমানের ঘরে। ন'দিদির ঘরে ভাত আমরা খেতাম না। ন'দিদি আমাদের বাড়িতে আসত না। তবু ত সে আমাদের আপন হয়েছিল। কেমন করে হয়েছিল ?

'কেমন করে হয়েছিল মুসলমানের মেয়ে হিন্দুর ছেলের ন'দিদি ?' এই কথার স্রাব দিতে পারবে কোন্ পাকিস্তান ? কোন্ হিন্দুস্থান ?

আজকের এরা কেউ পারবে না। পারত সে দিনের ভারতবর্ষ, সেদিনের বাংলা। সেই সোনার ভারত, সেই সোনার বাংলা আবার ফিরে আসবে।

স্বপ্নের ন'দিদিও ফিরে আসবে সেদিন। গল্প নয়। বহননাও নয়। সত্যি সত্যি।

## কলাবর্তীর উপাখ্যান

ত্রিভোজ্যতির্য্য যোষ ( ভাষ্য )

১

বঙ্গদেশের কপিকাতা নগরীতে লোক প্রেম নামক রাজপথ পাঁচের গদাধর সামন্ত বাস করিতেন। গদাধর বাবু ধনী বণিক। বিবিধ প্রকার ব্যবসায়ে সিপ্ত থাকিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। গদাধর বাবুর একটি প্রাণন গুণ ছিল এই যে, তিনি অতীব কলা-রসিক ছিলেন। শুধু অবসরবিনোদনের জন্য নানাপ্রকার নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা করিয়াই যে তিনি তৃপ্ত থাকিতেন তাহা নহে, সঙ্গীত, যন্ত্র-নক্স, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি, স্টেশনি, বিবিধ প্রকার কাক কাগ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত ভ্রূগাগ ছিল। এই সকল বিষয়ের অহুঙ্কলন এবং প্রচারের চেষ্টা তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। এই কলা প্রিয়তার জন্য গদাধর বাবুর নাম সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিল।

গদাধর বাবুর তিন পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র তিন-টিই কৃতী, সকলেই পিতার ব্যবসায়ের অংশ ভোগাবদানে নিযুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথেই চলিয়াছিল। কন্যাটি কনিতা সন্তান। গদাধর বাবু

আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন কলাবর্তী। নিজের কৃতি এবং আদর্শাঘ্যায়ী উহাকে সাধারণ বিজ্ঞানিকার সহিত বিবিধ প্রকার শিল্পকলায় পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। বিশেষ করিয়া নৃত্য ও গীতে তাহার পারদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং ক্রমশঃ বহু স্থানে বহু প্রশংসা অর্জন করিল। কলাবর্তীকনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবিধ শাখার সহিত কলাবর্তীর পরিচয় হইল। দুই জন নিষ্ঠাবান সুপণ্ডিত শিক্ষকের নিবর্ত ভারতের এবং পাশ্চাত্য দেশের দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষত্ব সমস্তে শিক্ষা করিল। এইরূপে লালিত ও বর্ষিত হইয়া কলাবর্তী এক দিকে যেমন অসামান্য রূপলাবণ্য ও নৃত্যগীতকুশলতা লাভ করিল, তেমনি বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার মন-পঙ্কজ অপূর্ণ শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল।

বাংলার সমাজে যুবতী কলাবর্তী অতীব পরিচিতা হইয়া উঠিল। সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে তাহার নিয়ন্ত্রণ এক প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়াইল।

কলাবতী ব্যতীত কোন শিল্পীই যেন তাহার স্থান পূরণ করিতে পারে না। কোন অঙ্কণে কলাবতী উপস্থিত হইলেই সেখানে একটা নূতন উদ্ভাবনা, একটা অভিনব আন্দলের চিহ্নোল বহিয়া যায়। কলার কৃতিত্বে ও রশের সৌরভে পিতা গদাধর আনন্দে ও গায়বে আত্মহারা হন।

কলাবতীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণায় গড়িয়া উঠিল বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী সভা, সমিতি, সভা ও সম্মিলন। বহু শিল্প-বিদ্যালয় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিবিধ প্রকারে কলাবতীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া গিয়াছে। প্রায় প্রত্যহই নানা স্থান হইতে কলাবতীর গদর নিমন্ত্রণ, সাহসনয় আহ্বান, আন্তরিক আপ্যায়ন এবং অধাচিত বন্দন ও প্রশংসা আসে। সাধারণতঃ অল্পবোধ রক্ষিত হয়, আবার মাঝে মাঝে সবিনয় প্রত্যাখ্যানও করিতে হয়। তরুণ ও তরুণী সমাজে কলাবতীর নাম একটি মোহন মন্ত্রের মত হইয়া উঠিল।

কলাবতীর বয়স যখন আঠার, তখন তাহার মাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করেন। কলাবতী যে শুধু একটি স্নেহময়ী জননীকেই হারাইল তাহা নহে, তাহার শিল্পী-জীবনের প্রধান সহায় ও অভিভাবকেও হারাইল। কলাবতীর প্রতি প্রচেষ্টায়, প্রতি সাধনায় তাহার মমতাময়ী মাতা ঠাকুরাণী অকুণ্ঠ ভাবে সহায়তা করিতেন। তাহার বেশ-ভূষা, তাহার আহারাদি, তাহার সমরোপযোগী আনন্দবিধান, তাহার স্বভাব ও চরিত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি প্রথর চুষ্টি রাখিতেন। ইহার মৃত্যুর পর কলাবতী সহসা যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিতে লাগিল। পিতা সর্বদাই বহু কাণ্ডে বিরত থাকিতেন। এখন হইতে কলাবতীকে নিজেকে নিজের সমস্ত ভার লইতে হইল। তাহার ভাতারা বড় হইয়াছে। তাহাদের নিজেদের সংসার হইয়াছে। কলাবতীর প্রতি সাধারণ কতব্য পালন ব্যতীত তাহারা আর কিছুই করিতে চাহে না। কলাবতীর জীবনের সহিত তাহাদের জীবনের কোথাও যেন ঐক্য নাই।

কলাবতীর বয়স যখন কুড়ি, তখন গদাধর বাবু উত্তার বিবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সঙ্গতসম্পন্ন রাশী কলার উপযুক্ত পাত্র সহজে পাওয়া যায় না। গদাধর বাবু প্রাণ দিয়া কলাবতীকে মানুষ্য করিয়াছেন, নিজের উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছেন। অল্পযুক্ত পাত্রে কল্যাদান করিতে তাঁহার মন অগ্রসর হয় না। তাঁহার এবং তাঁহার কলার কল্লনা, আদর্শবাদ, শিল্প প্রীতি প্রভৃতিকে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করিবে, বিবাহিত হইলেও তাঁহার গলাকে তাহার স্বকীয় জীবন বিকশিত করিতে সহায়তা করিবে, এমন ঘর এমন পাত্র পাওয়া অতীব কঠিন। গদাধর বাবু বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মনের মত পাত্র পাইলেন না।

এদিকে মাতৃহীনা এবং বয়ঃপ্রাপ্তা কলাবতী অনেকখানি বাস্তবের অধিকারিণী হইয়া স্বভাবতই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতামাতার স্নেহ ও কঠিন শাসনে যে চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ আটু থাকিলেও বাহিরের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ অস্থিরতা দক্ষণ ক্রমশঃ পরিস্কৃত হইল। গদাধর বাবু ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং একটি স্পঞ্জের গুচ্ছ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি বোধ করিবে কে? এক দিন সহসা স্বপ্নের ক্রিয়া

বন্ধ হইয়া গদাধর বাবুর জীবননীপ নির্ধারিত হইল এবং এই মুহূর্ত্ত হইতেই কলাবতীর জীবনেও হতাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

কলাবতী বুদ্ধিমতী। নূতন পরিস্থিতিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল না। ভাতাদের সংসারেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে বাস করিতে লাগিল। ভাতারা তাহাকে নানা ভাবে সাহায্য করিলেও তাহার শিল্প-জীবনকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিতে কোন দিনই পারে নাই, এখনও পারিল না। ক্রমশঃ কলাবতী সম্পূর্ণ একাকিনী হইয়া পড়িল।

বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার স্বাভাবিক পরিচয় ঘটয়াছিল। সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া কলাবতী কিছু-কিছু উপার্জনও করিতে লাগিল। তাহার অসামান্য শিল্প-প্রতিভা বাংলার বাহিরেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাংলার বাহিরের কোন কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে তাহার ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিচয় ও খ্যাতি লাভের ফলে বহু পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল। কেহ কেহ কার্যব্যপদেশে বা ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে কলাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কোথাও কলাবতীর নৃত্য-গীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে সংবাদ পাইলে তথায় গিয়া তাহার অপূর্ণ শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। বাংলার এই রকমটির সহিত পরিচিত হইয়া বহু দেশের বহু ব্যক্তি নিজেকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

## ২

এক দিন দ্বিত্বহর কলাবতী বিশ্রাম করিতেছিল তাহার নিজের ঘরে। দরজার পর্দার কাঁক দিয়া বাহিরে বৌদিদিদের সাড়া পাইয়া কলাবতী উঠিয়া আসিয়া বলিল, এই যে, আপনারা, আসুন, আসুন! ঘরের মধ্যে দুইখানি সোফা ছিল, তাহাতে দুই বৌদিদি বসিলেন, ছোট বৌদিদি বসিলেন পাটের উপর, এবং কলাবতী একটি মোড়া টানিয়া লইয়া তাহাতেই বসিয়া জিজ্ঞাস্য নেত্রে বৌদিদিদের দিকে চাহিল। তাহাদের মুখ দেখিয়া কলাবতী একটা ঘনায়মান দুর্ধোগের আভাস পাইয়া অন্তরে অন্তরে ভীত হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিলেন। পরে তিন জনের প্রতিনিধিরূপে বড় বৌদি কথার আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, এখন আবার কেউ এখানে এসে পড়বে না তো? দিবারাত্রই তো লোক আসা-যাওয়া করছে।

কলাবতী বলিল, না, কারো আসবার কথা নেই তো! তাহাড়া কেই বা আসে? কখনো কখনো কোন সভা-সমিতি থেকে নিমন্ত্রণ করতে আসে। তা এমন ছপুং বেলায় কে আসবে?

কি জানি বাপু! তোমার দাদারা হো অত্যন্ত ভীত আর উদ্ভয় হয়ে পড়েছেন।

কেন?

কেন, সেটা বোঝবার বয়স তোমান হয়েছে। বাই হোক, এ নিয়ে আর বেশি কথা বাড়তে চাই নে।

আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি নে-

মানে, তোমার দাদারা বলছেন, তোমার এ ভাবে এ-বাড়ীতে থাকাটা—

দাদারা এটা কথা বলছেন ?

বড় বৌদি অল্প দুই বৌদির দিকে একবার চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ঠাৱাঠি তো বলছেন। আমরা কেন বলতে বাব ?

দাদারা কি বলছেন ?

বলছেন, তোমার চাল-চলন ক্রমেই অশোভনীয় হয়ে উঠছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের সামনে এ সব উদাহরণ—  
কি সব উদাহরণ ?

এই সব, নাচ, গান, সভা, সমিতি, দেশ-বিদেশ বেড়ান, এই সব। তাছাড়া নানা রকম লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়।

বৌদি, এত দিন একত্র বাস করেও, আমাকে এত দিন ধরে এত ভালবেসেও, আপনারা এইটুকু সহিতে পারছেন না ? আমি যে আপনাদেরই ছোট বোন, বৌদি !

কিন্তু, উপায় নেই। আমরা নিরুপায় হয়েই তোমার কাছে এ সব কথা বলতে এসেছি। আমাদের একত্র থাকা সম্ভব নয়।

আমি তো দূরে সরেই রয়েছি। শুধু একসঙ্গে বসে খাই, তাছাড়া আর কোন সম্পর্ক তো! তোমারা রাখনি। বাবা মা কেউ নেই বলেই, এটুকু সান্নিধ্যও তোমাদের একবারেই অসহ্য হয়ে উঠেছে ?

আমরা জানি, তুমি খুব আঘাত পাবে, কিন্তু উপায় নেই। এখানে থাকা তোমার হবে না।

যেজ্ঞদারও কি এই মত ?

যেহ বৌদি মাথা একটু নীচু করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবাব মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

ছোটদারও এই মত ?

ছোট বৌদি হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা সবার মত নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।

কিছুক্ষণ সকলেই নীরব। পরে বড় বৌদি বলিলেন, দেখ, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই।

না, কথা আমি আর বাড়িতে চাই নে। আমি কোথায় যাবো সে-সম্বন্ধে দাদারা কিছু বলছেন ?

না, তা তো বলেননি ?

তবে ?

বড় বৌদি অপর দুই বৌদির মুখের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, তোমার তো বন্ধু-বান্ধব অনেক আছেন ?

ছোট বোন, কুমারী মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবের কাছে গিয়ে থাকবে, এইটাই কি দাদাদের মত ?

ঠিক তেমন কিছু বলেননি। তবে আমরা বলছি।

কলাবতীর মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে। এই দাদারা তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। কথার আছে ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহই সর্বাপেক্ষা নির্মল, নিঃস্বার্থ স্নেহ। অথচ কলাবতীর ললাটের লিখন এমনই যে, তিনটি ভ্রাতা থাকিতেও সে শুধু অসহায় নয়, নিশ্চিত বিপদের করাল গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে এই ভ্রাতাদের নিকরূপ মনে কোন ঝিখা নাই। আর এই তিনটি নারী। ইহাদেরও কি এতটুকু প্রাণ, এতটুকু মমতা নাই ?

সকলেই আবার নীরব হইলেন। কলাবতীর চোখের কোণে

কয়েক ফোঁটা অশ্রু জমিয়া উঠিল। এই অশ্রুই কি তাহার জীবনের চিরসঙ্গী হইবে ? একটু পরে কলাবতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কেহই কোন কথা বলিলেন না। কোন বৌদির নিকট হইতেই কোন সাহসনার বাণী আসিল না। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটি ঘড়ির টিক-টিক শব্দ কলাবতীর অসহ বেদনায় সত্যমুড়তি জানাইল। কিছুক্ষণ পরে বড় বৌদি বলিলেন, আমরা এখন আসি। শীগগিরই মানে, দুই-এক দিনের মধ্যেই যা হোক একটা ব্যবস্থা করো।

কলাবতী দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া শুক হইয়া বসিয়া রহিল। বৌদিদিরা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

৩

কলাবতী উঠিয়া বসিল। চোখ মুছিয়া কটিন হইয়া তাহার বিছানার 'পরে একটু শুইয়া লইল। তার পর উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া আয়নার সামনে গিয়া চুলটা সাড়ীটা একটু ঠিক করিয়া লইল। মনে মনে বলিল, দুই-এক দিনের মধ্যে নয়, আজই, এখনই। এখনই যাবো এ-বাড়ী ছেড়ে। তাহার আলমারিতে ও বাসে কাপড়-জামা ও গহনা বাহা কিছু ছিল, সব মেঝের উপর ছড়াইয়া ফেলিল এবং তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি একটি বড় স্টুকেশে ভর্তি করিল। একটি ছোট বাসে গহনাগুলি রাখিয়া সেটাকে সমস্ত স্টুকেশের এক পাশে রাখিল। সামান্য বস্ত্রবখানি বাসনও তাহাতে পুরিয়া লইয়া আর সব ছড়ানো জিনিষগুলি পু-দিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া স্টুকেসটির উপর বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিল। চিন্তার আর অভাব কি ? এখান হইতে বাহির হইয়া কোথায় যাইবে সে ? কিন্তু সে কথা পরে। এ স্থান এখনই ছাড়িতে হইবে এইটাই এখনকার বড় কথা।

কলাবতী উঠিয়া গিয়া আনলার কাছে ঝাঁড়াইল। একটা কাঁকামুটে বেধিতে পাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, ঘরের এই সব ছড়ানো জিনিষগুলো তোর কাঁকায় তোল।

মুটে আঙা পালন করিল। কলাবতী বলিল, এগুলো আমি তোকে দিলাম। যা, নিয়ে তোর বাসায় বেধে আর, তার পর বাবি আমার সঙ্গে।

এ সব নিয়ে বাসায় বেরুলেই লোকে আমাকে ধরে ধানার নিয়ে যাবে।

কোন ভয় নেই। এই নে, এই স্ত্রজনীটা ঢাকা দিয়ে নিয়ে যা। কেউ কিছু বললে তাকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসিস।

বিস্মিত মুটে অপ্রত্যাশিত দান লইয়া চলিয়া গেল। পাছে কোন গোলমালে পড়ে এই ভয়ে সে আর কিরিয়া আসিল না।

কলাবতী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আর একটু মুটের মাথার স্টুকেশটি চাপাইয়া ব্যাগ আর ছাতা হাতে করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল।

লেক গ্লেন হইতে বাহির হইয়া সোজা সাদান' এভেনিউতে গিয়া পড়িল এবং মাঝবানের ঘাসের উপর দিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কলাবতীর সহসা মনে পড়িল, সাদান' এভেনিউএর বিখ্যাত জমিদার মহোদয় চক্রবর্তীর কথা। বহু দিন পূর্বে সে একবার গিয়াছিল

দাঁড়ার বাড়ীতে একটি বড় গানের জলসায়। সে শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র বাবু যেমন ধনী, তেমন উদার-প্রকৃতি। তিনি নিয়মিত ভাবে অনেকগুলি বিজ্ঞানসভা, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মহেন্দ্র বাবুর কাছে গেলে এই বিপদে হয়তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে, এই আশা লইয়া কলাবতী মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

কলাবতী যখন গাড়ী-বারান্দার নীচে সামনের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াছিল, তখন মহেন্দ্র বাবু নীচেই বসিবার ঘরে ছিলেন। কলাবতীকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া আসিলেন এবং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি, এ সময়ে কি মনে করে? আশ্রয়, আশ্রয়! এই কথা বলিতে বলিতে কলাবতীকে লইয়া পাশের একটি ঘরে বসাইলেন। যুটে স্ট্রোকেশ রাখিয়া কলাবতীর নিকট হঠাৎ পরস্যা লইয়া চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, তার পর, কেমন আছেন, ভাল আছেন তো?

কলাবতী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল একটু বিশেষ বিপদে পড়েই এখানে এসেছি। সবই বলছি। একটু জল আনিয়া দেবেন? গলাটা শুকিয়ে গেছে।

মহেন্দ্র বাবু চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, শীগগির এক কাপ চা করে নিয়ে আয় আর সঙ্গে কিছু খাবার। কলাবতীকে বলিলেন, আপনি চা খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি একটু পরে আসছি।

চা-পানের পর মহেন্দ্র বাবু আসিলেন। বলিলেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

কলাবতী সমস্ত ব্যাপাটটি মহেন্দ্র বাবুকে জানাইল। কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ কঁদু হইয়া আসিল। সব শুনিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, স্থায়ী ভাবে এখানে থাকা অবশ্য সম্ভব নয়, সেটা আপনিও বোঝেন। তবে আপাতত এখানেই থাকুন। আর আপনিও চেষ্টা করুন, আমিও চেষ্টা করি, একটা ভাল ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আপনি অস্থির হবেন না।

কলাবতী বলিল, আপনাকে কি বলে যজ্ঞবাদ দেবো, জানি নে। এমন একটা বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করলেন, এ জন্য আপনার কাছে আমি চিরঋণী থাকবো।

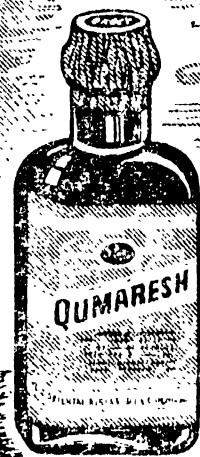
কলাবতী আপাতত মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে রহিল। নীচের তলায় একখানি ঘর। অল্প অল্প ক্রটিসম্মত আসবাব। সঙ্গীত-বিষয়ক যে যন্ত্রগুলি সে দাদাদেব বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিল, সেগুলি লোক পাঠাইয়া আনাইয়া লইল। কলাবতী অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিল। নিয়মিতরূপে সে তাহার শিল্প ও সঙ্গীতের সাধনা করে। মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে নিমন্ত্রিত হইয়া তাহার অপূর্ণ গীত, নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা সকলকে মোহিত করে। কখনও কিছু উপার্জন হয়, কখনও শুধু প্রশংসা ও ফুলের মালা লইয়াই তৃপ্ত হয়। নিউ এম্পায়ারে, ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে, থিয়েটারের ট্রেজ এবং বড় বড় মজলিসে সবদাই তাহার নিমন্ত্রণ হয়। কলাচর্চার কীকে কীকে কলাবতী ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি

## অদ্বিতীয় লিভার টনিক

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু বস্তুকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটি অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

## কুমারেশ

৭ লিভারকে সুস্থ ও সতেজ রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ  
সালকিয়া - হাওড়া

বিষয়ের বই পড়ে। পিতার নিকট যে শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহা তাহার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।

৪

কলাবতীর এই স্বচ্ছন্দ জীবন বেশি দিন বিধাতা সহিতে পারিলেন না। ঋতু আসিল মহেন্দ্র বাবুর অস্তঃপুর হইতে। এক দিন মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী স্বামীকে স্পষ্টই বলিলেন, কলাবতীর এ বাড়ীতে আর থাকা হবে না।

কেন?

ভাল দেখায় না।

কোথায় যাবে ও?

সে জ্ঞাতোমার মাথাবাখা কেন?

মাথাবাখা ঠিক নয়, কিন্তু অসহায় একটা লোকের প্রতি কতব্য কি নেই?

কতব্য তো করেছ। আর নয়।

কিন্তু কোথায় যাবে ও? ওর আয় এমন নয়, যাতে স্বাংলয়ী হয়ে একটা বাসা ভাড়া করে থাকতে পারে। অথচ এমন একটা শিল্পী, এমন একটা প্রতিভা, এমন একটা সংস্কৃতিবান প্রাণ, একে তো পথে বের করে দেওয়া যায় না?

তুমিই একটা ব্যবস্থা করে নাও, কিন্তু অজ্ঞাত।

সে তো অনেক খরচ। একটা মাত্র মানুষের জ্ঞাত একটা ছোট বাড়ী, লোক-জন—সে তো অনেক খরচ।

কি আর এমন খরচ। কত খুলে, কত কলোজ, কত হাসপাতালে, অনেক টাকা তো দিচ্ছ। এটাও তেমনি—

তুমি একটা লোকের জ্ঞাত এত খরচ?

তুমিই তো বললে, এমন প্রতিভা, এমন অসামান্য শিল্পজ্ঞান, এর জ্ঞাত না হয় হ'লই বা কিছু খরচ। ও তো শুধু একটা মেয়ে নয়, ও যে বাংলার একটা রক্ত, একটা অসামান্য গৌরব।

সে তো জানি। আমার বাড়ীতে আমার তত্ত্বাবধানে থাকলে আমি ওর জ্ঞাত খরচপত্র করতে কুণ্ঠিত নই। কিন্তু ওর জ্ঞাত স্বাধীন ভাবে থাকার ব্যবস্থা করলে ও হয়তো কয় দিন পরে আর আমাকে গ্রাহ্যই করবে না।

তোমাকে গ্রাহ্য করা বা না-করাটা তো বড় কথা নয়? ওর একটা ব্যক্তিগত আছে, স্বকীয়তা আছে, ঐশ্বর্য আছে, যার মূল্য তোমার তত্ত্বাবধানের চেয়ে ঢের বেশি। বাংলার দেবীমূর্তি ও। বাংলার জল, বাংলার মাটি, বাংলার বাতাস ওর প্রতি অপরূপমাণু গড়ে তুলেছে। ওর ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা একান্ত ভাবে জড়িয়ে আছে বাংলার সঙ্গে। ও স্বাধীন ভাবে যেখানেই থাকুক বাংলার বাণীমূর্তিরূপে সবত্র আলো ছড়াবে।

এত যদি তোমার আগ্রহ, তবে এখানে থাকতে এত আপত্তি কেন?

এখানে থাকা হতে পারে না।

দেখা যাক, কি করতে পারি।

এদিকে কলাবতীর স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে অবস্থান ব্যাপারটা তাহার পরিচিত, অপরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং সভা, সমিতি ও মজলিসে আলোচিত হইতেছে। অনেকই

উহার জ্ঞাত একটা উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু কার্যত উহার কেহই কিছু করিতেছেন না।

কিছু দিন পরে যখন মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া বাইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন এই সকল আলোচনা আরও ব্যাপক ভাবে চলিতে লাগিল। বিশেষত তরুণ ও তরুণী সমাজে একটা বিধম আলোড়ন উপস্থিত হইল। কিন্তু আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ব্যতীত আর কিছুই হইল না। কয়েক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি একবার মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎও করিলেন এবং তাঁহার বদান্ততার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলাবতীর জ্ঞাত একটি শ্রবণোত্তর করিয়া দিবার জ্ঞাত ওম্মরোপ জানাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। মহেন্দ্র বাবু তাঁহার স্ত্রীর সহিত আলোচনায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাওই পুনরাবৃত্তি করিলেন।

কলাবতীর এই অসহায় অবস্থার কথা ক্রমশঃ একটা সাধারণ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র বাবু এক দিন নিজেই কলাবতীকে বিপদের কথাটা জানাইয়া দিলেন। কিছু দিন পূর্বে সে নৌদিদিদের কাছে যে আঘাত পাইয়াছিল, এটা যেন তাহা অপেক্ষাও গুরুতর মনে হইল। কলাবতী মনেও করিতে পারে নাই, মহেন্দ্র বাবুর মত এক জন ধনী, স্ত্রী এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তাহাকে পথে বসাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন। এ আঘাত তাহার কাছে অসহনীয় মনে হইল। মহেন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাতের পর প্রায় পনের দিন সে বাড়ীর বাহির হইল না বা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না।

প্রতিবেশীরা এবং গুণামুগ্ধগীরা নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। কলাবতীর একটা সম্ভাব্যজনক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেকগুলি ছোট ছোট সভাও অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু কোন ব্যবস্থা হইল না। আগ্রহ অনেকেরই আছে, কিন্তু কাহারও সংকল্পের গভীরতা নাই। বুদ্ধেরা বলিতে লাগিলেন, মেয়েটার একটা হিল্লো হওয়া দরকার। এমন ভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। যুবকেরা বলিল, এর একটা বিহিত করিতেই হইবে। কিন্তু বিহিত করিবার মূল উপাদান কাহারও কাছে নাই। তরুণীরা সমবেদনায় ব্যাকুল, আলোচনার মুখর, কিন্তু প্রতিকারে অক্ষম।

নিজের অসহায় অবস্থা ও অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে করিতে এবং ক্রমশঃ নানা দিক হইতে নানা প্রকার হিতোপদেশ ও আলোচনা শুনিতে শুনিতে কলাবতীর মন ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এক-এক সময়ে তাহার মনে হইত, সে বৃষ্টি পাগল হইয়া যাউবে। কি অপরাধ সে করিয়াছে? সে প্রাণপণে বাংলাকে, বাংলার আকাশ-বাতাসকে ভালবাসিয়াছে, বাংলার প্রতিভাকে নিজের জীবনে বিকশিত করিয়াছে, বাংলার শিল্পকে, বাংলার কলাকে অদ্ভুত প্রাণবান রূপ দিয়াছে, মানুষের মনে আনন্দের ধারা বর্ষণ করিয়াছে। তবু বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটাও সে পাইবে না? কলাবতীর মন যেন মরিয়া হইয়া উঠিল। যে সকল প্রতিষ্ঠান, সমিতি প্রভৃতি হইতে সে নিমন্ত্রণ পাইত, লজ্জা ও সম্মানের মাথা খাইয়া সে প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবেই তাহাদিগকে তাহার অসহায়তার কথা জানাইল। কিন্তু মৌখিক সহানুভূতি ব্যতীত আর কিছুই তাহার ভাগ্যে জুটিল না। এক দিন সন্ধ্যার পরে মহেন্দ্র বাবু তাহাকে

জানাইয়া দিলেন যে, তাহার এ বাড়ী ভাগ করিয়া বাইবার ভ্রম প্রস্তুত হওয়া দরকার। কলাবতী অনেক ভাবিল, কিন্তু ভাবনার শেষ হইল না। সকালে ভাবিল, দুপুরে ভাবিল, সন্ধ্যায় ভাবিল, রাত্রে ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও যেন লোপ পাইল। অবশেষে স্থির করিল, সে নিজেকে পৃথিবীর বুক হইতে নিষ্কিন্তু করিয়া ফেলিবে। ইহাই একমাত্র পথ। সে মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, আমি স্থির করেছি, তিন দিনের মধ্যেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

কোথায় যাবে ?

তা কেনে আপনার কি লাভ ? আপনি আমার বিপদের সময়ে যে উপকার করেছেন, সে ভ্রম ধন্যবাদ। আচ্ছা, নমস্কার।

কলাবতী আজ খুব সকালে উঠিয়াছে। ঘরের জিনিষপত্র সব গুছাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার সংকল্প দৃঢ় হইয়াছে। আজ সে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইবে। বাইবার পূর্বে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্তই যেন সে নামিয়া আসিল সাদান' এভেনিংয়ে। কত লোক বাইতেছে, সকলেই তাহার চেয়ে সুখী। বেশ তো! কত গাড়ী বাইতেছে, গাড়ীতে কত নর-নারী, কত যুবক-যুবতী, কত শিশু, হাসিতেছে, খেলিতেছে। ইহারা সকলেই থাকিবে, শুধু সে চলিয়া যাইবে। পৃথিবী ছাড়িয়া বাইতে তো তাহার কোন কষ্ট নাই ? কিন্তু এই বাংলা দেশকেও যে ছাড়িতে হইবে ! তাহার প্রাণটা যে ওখানেই টন-টন করিয়া ওঠে। সাদান' এভেনিংএর মাঝখানে দিয়া কলাবতী পাদচারণা করিতে লাগিল, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, পশ্চিম হইতে পূর্বে, কিন্তু বেশি দূরে সে গেল না, বেশি হাঁটবার উৎসাহ তাহার নাই। এই তাহার শেষ ভ্রমণ। এই দিন আর ফিরিয়া আসিবে না তাহার জীবনে।

অনেকক্ষণ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া কলাবতী বাড়ীতে ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, তাহার বিছানার উপরে একখানি চিঠি পড়িয়া আছে। একটু ব্যস্ততার সঙ্গেই চিঠিখানি খুলিয়া এক নিখাসে পড়িয়া ফেলিল। চিঠি আসিয়াছে দিল্লী হইতে। লেখকের নাম ভকতরাম। চিঠির মর্মার্থ এই : আমার এক বাঙালী বন্ধুর নিকট জানিতে পারিলাম, আপনি বাসস্থানের অভাবে বিশদে পড়িয়াছেন। আপনার নাম ও গুণাবলী এ-অঞ্চলেও সুপরিচিত। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার আশ্রয়ে বাস করিতে পারেন। আমি আপনাকে বৎসরে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা দিতে সম্মত আছি। পত্র পড়িয়া কলাবতী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। বিবাতার এ কি পরিহাস ! কলাবতী দিল্লী-ওয়ারার বন্ধিতা হইবে ? মনে করিয়াই মনে-মনে যেন হাসিয়া ফেলিল। কি আশ্চর্য ! বাংলা দেশের কেহ তো তাহাকে এমন পত্র লিখিল না ? কিন্তু এ হয় না। কলাবতী দিল্লীওয়ালী হইতে পারে না। সে যে সংকল্প করিয়াছে, তাহাই ঠিক। বাংলা দেশ পরিত্যাগ করা আর পৃথিবী পরিত্যাগ করা একই কথা।

আহা!দির পর দুপুরে শুইয়া শুইয়া পত্রখানি হাতে লইয়া-বার বার পড়িল। চিন্তার পর চিন্তা। অনেকক্ষণ পরে একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িল। দিল্লীর স্বপ্ন দেখিল। একবার নৃত্যপ্রদর্শনী উপলক্ষে দিল্লী গিয়া যে-সব দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছিল, সেইগুলি মনশ্চক্ষে

ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। শরীরটা যেন কাঁপিতেছে। একটু স্থির হইয়া আবার চিঠিখানা হাতে লইয়া পড়িল। তার পরে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া একটি চেয়ারে শরীর এলাইয়া দিয়া আবার যেন কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু হাসিয়া আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বৈকালের দিকে একবার বাহির হইয়া নিকটবর্তী পোষ্ট অফিসে গিয়া ভকতরামের নামে টেলিগ্রাম করিল, আমি সম্মত। আজই রওয়ানা হইতেছি। বাড়ী ফিরিয়া গুছানো জিনিষপত্রগুলি আবার ভাল করিয়া গুছাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র বাবু একবার খোঁজ লইতে আসিয়া দেখিলেন, কলাবতী প্রফুল্ল মনে জিনিষপত্র নাড়া-চাড়া করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু স্থির হ'ল ?

আপনাকে তো বলেছি, আজই সন্ধ্যার পরে এ বাড়ী ছেড়ে যাব।

কোথায় যাওয়া স্থির হ'ল ?

পরে জানতে পারবেন। সাড়ে সাতটার সময়ে দয়া করে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন।

৬

ট্রেন ছুটিয়াছে। কলাবতীর মন দ্বিধায়, সন্দেহে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হুলিতেছে। গুন-গুন করিয়া বিবাদ-ভরা সুরে একবার গাহিল—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

কিন্তু এ বাঁশী তো আর বাজিবে না ? কলাবতীর প্রাণের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। তার গানের উৎসও বৃষ্টি শুকাইয়া যাইবে। ভকতরাম কি বুঝিবে তার প্রাণের ব্যথা ? বোঝা কি সম্ভব ? এ সব ভাবিয়া এখন কোন লাভ নাই। যে ব্যাড়া শুক হইয়াছে, তাহার শেষ পর্য্যন্ত তো তাহাকে বাইতেই হইবে।

দিল্লীতে পৌছিয়া অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা লাভ করিল। স্বয়ং ভকতরাম ট্রেনে আসিয়া কলাবতীকে মহা সমাদরে গৃহে লইয়া গেল। উহার সর্বপ্রকার স্বখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল।

এখানে আসিবার পর হইতেই নানা মজলিসে উহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। চারি দিকে কলাবতীর খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বাংলা দেশেও তাহার খ্যাতি পৌছিতে বিলম্ব হইল না।

বালীগঞ্জের প্রধানেরা মন্তব্য করিলেন, যাক, এত দিন পরে মেয়েটার একটা ছিলে হ'ল।

বরীয়া মহিলারা বলিলেন, মরণ আর কি ! বাংলা দেশ ছেড়ে, ছি, ছি !

তরুণ-তরুণীরা বলিলেন, এমন একটা প্রতিভাকে অনাদরে বাংলা দেশ ছেড়ে যেতে হ'লো ? অহো, কি হুভাগ্য ! যাই হোক, ওখানে গিয়ে একটা বৃহত্তর সমাজে কলাবতী প্রতিষ্ঠা লাভ করলে, এইটাই আমাদের গৌরব।

একটি ছোকরা বলিল, আর বলিস নে। বাংলার এমন একটা বড়কে একটু ঠাঁই কেউ দিলে না। এখন বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার বুলি কপটান হচ্ছে।



বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যে সংস্ক-সংস্ক কলা কৃষ্টি-সম্পর্কিত সভা, সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন হয়, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে কলাবতীর বিবিধ গুণের বিবিধ প্রশংসা করা হইল।

কয়েকটি সমিতি মিলিয়া কলাবতীকে একটি বিরাট অভিনয়ন দেখায় সঙ্গত করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিল। পত্রপাঠ উত্তর আসিল, দুঃখিত। দারুণ অভিমানে কলাবতীর মন ভরিয়া রহিয়াছে। যে বাংলাকে সে অকপট ভাবে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে, সেখানে আর সে কখনও ফিরবে না। সে তো মরিতেই চাহিয়াছিল। বাংলা দেশ মনে করুক, কলাবতী মরিয়া গিয়াছে।

৭

একটি কার্যোপলক্ষে মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মহেন্দ্র বাবুকে একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন, অবশ্য যাবেন। একটা খুব উঁচু মনের মজলিস।

মহেন্দ্র বাবু যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি গান ধরিলেন, তিনি কলাবতী। উঠাকে দেখিয়া মহেন্দ্র বাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এটি কি সেই কলাবতী! বসনে-ভূষণে বাঙালীরা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখের সেই অপরূপ রমণীয়তা এখনও তাকে একান্ত ভাবেই বাঙালী করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রথমেই গাহিল—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস

আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

## জ্যোতিষ-বাক্য

শ্রীচরিত্রন মুখোপাধ্যায়

জানা উদ্দেশ্যে বচন করিয়া হুক-হুক বন্ধে গল্পটি পাঠাইয়া দিলাম।

ব্যাপারটি খুলিয়া বলা দরকার। আমি এক জন আধুনিক কবি। ধনী পিতার অর্ধ শ্বাস করিয়া দিন কাটাই। আমার বন্ধুবর্গের ধারণা, আমি হঠাৎ এক দিন মহাকাব্য রচনা করিয়া ফেলিব। কিন্তু আমার তর্ভাগ্যের বিষয় ও পাঠকগণের সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এখনও সেরূপ কিছু করি নাই। বাস্তব করিয়াছি তাহা বিবাহ—একটি সুন্দরী ধনি-কন্যাকে।

কিন্তু পত্নী আমার সহধর্মিণী হইতে পারেন নাই। তাহার ধারণা, কবিতা রচনা অতি বাজে কাজ। সুতরাং আমার সভা-প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি (যেটির ২৫ টাকা প্রেসের বিল এখনও বাকী আছে) তাহার চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য, তাহা বেশী বিক্রয় হয় নাই। পাঠকের পরিবর্তে তাহা অসংখ্য বন্ধীকে লুপ্ত করিয়া তুলিয়াছে মাত্র।

গৃহিনীর ভয়ে কোন মাসিক পত্রের গ্রাহক হইতে পারি না। স্থানীয় ষ্টল দাঁড়াইয়া পড়িয়া আসিতাম। সহসা বসুমতীতে একটি ঘোষণা চোখে পড়িল। দেখিলাম, একটি গল্প-প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কোন প্রবেশ-মূল্য নাই। কেবল গল্প

মহেন্দ্র বাবু জানিতে পারিলেন, কোন আসরে গেলেই কলাবতী না কি এই গানটি আগে গাহিয়া নেয়। দুই-এক বার বাস্তব করাও হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। আসর জমিয়া উঠিল। সমবেত দুবে, চৌবে, আয়ার, নাখন, কেলকার, পান্নিকর, জীবনমায়, গণেশলাল, রহমান খান প্রভৃতি বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা করিতে লাগিলেন। ইহারাই এখন কলাবতীর ভাগ্যান্বিতা। ভক্ততরামের আশ্রয়ে এবং ইগাদেয় কাঞ্চ্যে ও পোষকতায় কলাবতীর বৃহত্তর প্রতিষ্ঠা একটা বৃহত্তর, ব্যাপকতর এবং মিশ্রিততর খিচুড়ী-কুটির ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়াছে। কলাবতীর অন্তরে বাঙালী সমাজটি শাসক হইয়া পক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আরো কিছু কাল পরে। মহেন্দ্র বাবু দিল্লী গিয়াছেন, কতকটা ভ্রমণও বটে, আবার কতকটা কাজও ছিল। এক দিন কুতুব মিনারের পাশে গিয়া দেখিলেন, একটি পাগলী বসিয়া আছে। একটু কাছে বাইতেই চিনিতে পারিলেন, এ তো সেই কলাবতী! কি আশ্চর্য! কোথায় সে রূপ, সে বসন-ভূষণ, সে ঐশ্বর্য? মহেন্দ্র বাবু কি ভূত দেখিলেন? কি ভয়ানক পরিণাম! পাগলী মহেন্দ্র বাবুকে বলিল, কি দেখছেন? বেশ হয়েছে, না? আমি আপনাকে চিনেছি। আপনি আমাকে বিপদে আশ্রয় দিযেছিলেন, ধন্যবাদ। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি—

মহেন্দ্র বাবুর চোখে জল আসিল। বলিলেন, ফিরে যাবে আমাদের কাছে? আর কখনো বলব না বাড়ী ছেড়ে যেতে।

কলাবতী হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সে আর হয় না। টু লেট। কলাবতী মরে গেছে। বাংলাদেশ কলাবতীকে আর বাঁচাতে পারবে না।

লিখিতে পারিলেই হইল। ভারিলাম, কবিতাকে যদি বাগাইতে পারিয়া থাকি, গল্পও লিখিতে পারিব। গল্প লেখা কি আর এমন শক্ত।

ক্রতপণে গৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। আশ্চর্য গল্পটি লিখিয়া ফেলিতে হইবে। গতিবেগে শব্দকেও পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। রাস্তায় একটি নূতন sign-board দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। তাহাতে লেখা আছে!

“পাকা জ্যোতিষী

আসুন! হাত দেখান!

ভবিষ্যৎকে করায়ত্ত করুন।”

আমি করকোপী প্রভৃতিতে অধিষ্ঠানী। তথাপি ভাবিলাম, দেখি লোকটা আমার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে কি না।

অনতিবিলম্বে জ্যোতিষীর কবলে পড়িলাম। জ্যোতিষী মহাশয় সাদৃশ্যের হাতখানি টানিয়া লইলেন। বহু কিছু বলিলেন। আমার নিকট কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল তাহার একটি কথা। তিনি বলিলেন, “সাহিত্য হইতে অভাবনীয় ভাবে আপনার শ্রীষ্মই কিছু অর্থলাভ হইবে।” উৎফুল্ল হৃদয়ে

জ্যোতিষী মহাশয়কে নগদ দুই টাকা দক্ষিণা দিয়া বাহির হইলাম। এইবার নিশ্চয় পুরস্কার-প্রাপ্তি। গৃহিণীকে দেখাইয়া দিব সাহিত্য-চর্চা একেবারে বাজে কাজ নহে। একটি গল্প অবিলম্বে লিখিয়া ফেলিলাম। একটি সরস বাস্তববাদী প্রেমের গল্প। অবশ্য গৃহিণীকে লুকাইয়া। রেজিষ্টার্ড পোষ্টে অবিলম্বে সেটি পাঠাইয়া দিলাম।

এইবার পথ চেয়ে আর কাল গুণে অপেক্ষা করিবার পালা। প্রায় তই একবার করিয়া ষ্টলটি ঘুরিয়া আসি—কবে পরের সংখ্যা বহুমতী বাহির হইবে। এক দিন সহসা দেখিলাম কয়েক খণ্ড নতুন বহুমতী আসিয়াছে। প্রতিযোগিতার ফলও বাহির হইয়াছে। কিন্তু একি! আমার নাম ত নাই। কত লেখক-লেখিকার নাম বাহির হইয়াছে। আমার নাম ও গল্প কিছুই বাহির হয় নাই। জ্যোতিষী ব্যাটা কি তবে বাজে ভুলুং দিয়া টাকাটা লইল? হতাশ মনে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলাম। বাড়ীতে গিয়া দেখি একটি অপরিচিত লোক বাড়ী হইতে বাহির

হইতেছে। তাহার পিছনে একটি কুলী ও তাহার মস্তকে বিরাট একটি বোঝা। বাড়ী চুকিয়াই গৃহিণীর কল্যাণ শুনিতে পাইলাম, “বৃন্দে, তোমার বইগুলো উইয়ে কাটছিল—আজ সে-বই বেচে দিলাম। কি হবে অতগুলো বই রেখে। খালি জায়গা জোড়া করে ছিল। বিক্রী করে তবু তো কিছু টাকা পাওয়া গেল।” আবদার-তরল কণ্ঠে তিনি পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, “এ-টাকা কিন্তু আমি তোমাকে দিচ্ছি না। বাঙ্গালোর সিং নতুন উঠেছে, আমি একটা কিনবো।”

বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলাম। জ্যোতিষীর কথা মনে পড়িল, “সাহিত্য থেকে অভাবনীয়ভাবে আপনার কিছু অর্থ লাভ হবে।”

উপরোক্ত ঘটনাটি দুই বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। ঘটনাটির নায়ক এখন জুতার ব্যবসারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কলেজ-দ্বীপের একটি স্তব্ধ দোকানের তিনিই স্বাধিকারী:

## আন্দামান

প্রভাত বসু

বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে বামাচরণ বড় পরিতৃপ্তির হাসি হাসছিল। আয়নাটা নতুন এসেছে—লুটের মাল। এঁলো-পড়া বস্তির এই ঘরে দামী আয়না একেবারেই বেমানান। অবশ্য হাসি সে ভক্ত নয়; তার আঁট বছরের ছেলে শ্রামাচরণ আজ বাপের নাম রেখেছে বটে। বিকেল বেলা পার্কে যখন ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল, শায়ু একটি মেয়ের গলা থেকে হার ছিনিয়ে এনেছে। হ্যাঁচকা টানে পড়ে গিয়ে মেয়েটির মাথা ফেটে গেছে, শায়ু স্বচক্ষে দেখে এসেছে। বাহাদুর ছেলে—রাষ্ট্রের কেউ ধরতে পারেনি তাকে। তা ছাড়া তার আরও কীর্তির কথা মনে পড়ে বামাচরণের। গলির ভেতর থেকে পুলিশের গাড়ীতে হাতবোমা ফুড়ে করব করে পাঁচটি টাকা নিয়ে এসেছিল শ্রামাচরণ। যাক—ছেলে মানুষ হয়ে গেছে। নিশ্চিন্তে সে চোখ বুজতে পারবে। মা-মরা ছেলেটিকে নিজের হাতে তৈরী করেছে সে। এখন থেকে খে-রকম ছুরি ঘোরায় তাতে বড় হয়ে নাম-করা গুণ্ডার সর্দার বামাচরণের বশকেও হয়ত সে জান করে দেবে। বামাচরণের বুক গর্বে ভরে উঠল। আয়নাটার মধ্যে আর একবার সে নিজের হাসি দেখে নিল। এটাও লক্ষ্য করল যে, কপালে বড়-বড় রেখা পড়েছে। এগারো বার জেলবাসের স্মৃতি সেই রেখাগুলির সঙ্গে জড়ানো। মেয়াদ বৃদ্ধি এবার ফুরিয়ে এল। যাক, ছেলেটার জন্তে তার ভাবনা নেই। গালের পাল্লের কাটা দাগটার ওপর বামাচরণ একবার হাত বুলিয়ে নিল। নাঃ, পুরোনো কথা ভাবলেই মন খাঁপা হয়ে যায়। একবার হরি ওস্তাদের আঁখড়া থেকে ঘুরে আসা যাক। বামাচরণ ফতুয়াটা পরে রাষ্ট্রায় বেরিয়ে পড়ল।

বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। বয়স অল্প বলে শাস্তির পরিমাণ এত কম। তার চরিত্র সংশোধনের জন্তও জেল-কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছেন। নানা বকম উপদেশ-অমূল্যাসন চলেছে, একিকে নিয়ম মার্কিন পাখর ভাঙ্গা, যানি ঘোরানোরও বিরাম নেই। ছুঁটোর প্রতিই শ্রামাচরণের নির্বিকার মনোভাব। শাস্ত হয়ে যখন সে উপদেশ শোনে—মনে হয়, এবার ছাড়া গেলে আর কোনো অপরাধ সে করবে না। আর যখন যানি ঘোরাতে ঘোরাতে তার সবল মাংসপেশী ফুলে ওঠে, হুঁজুরান বদনে ঠিক সময়ের মধ্যে দিনের পাঁচল' পাক শেষ করে কেলে—তখন শ্রামাচরণের গল্গল্যম চোখার দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছে করে—হ্যাঁ, বামা সর্দারের ছেলেই বটে! ইংরাজীতে বাক বলে—born criminal.

পাল্লের ব্লকের রহিমের সঙ্গে শ্রামাচরণের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ডাক্তারি কেসে রহিমের সাত বছর জেল হয়েছে। সে শ্রামাচরণের চেয়ে বছর দশেকের বড়। তবু হুঁজুরান মধ্যে মনের বেশ মিল হয়েছে। হুঁচার বছরের চুঁবি-বাঁটপাড়ির আসামী বাবা তাদের সঙ্গে শায়ু কথাই বলে না। খুনী বলে তার নাম-ডাক হয়েছে; এই কৌলীজ সে সবড়ে রক্ষা করে চলেবে। রহিম এখনও মানুষ খুন করার গোরব দাবী করতে পারে না বটে, তবে তার বাপের কাঁসি হয়েছিল খুনের দ্বারে। রহিমের মাকে মাংস দাঁথতে বলে গণি শেষ কোথায় বেন ঘুততে যায়। ফিরে এসে দেখে এখনও রাগা তৈরী হয়নি। ব্যস্, মেজাজ-গরম হয়ে উঠল; একটা দা এনে সজোরে বসিয়ে দিল রহিমের মা'র গলায়। এই গল্প শুনে শ্রামাচরণ তার নিজের মা'র কথা একবার মনে করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মা'র মুখ তার মনেও পড়ে না। তা ছাড়া মায়া-মমতা তার নেই বললেই হয়। বাপ মরবার সময় শায়ুর হাত ধরে বলে গিয়েছিল—‘দেখিসু, আমার নাম রাখিসু।’ সে কথা তার

সাত বছর পরের কথা। রেল-কাম্বারয় এক মেয়েছেলেকে খুন করে তার গয়না-পত্র কেড়ে নেওয়ার অপরাধে শ্রামাচরণের চার

মনে আছে, কিন্তু বাপের জন্ত হুং সে কোন দিন করে না। মৃত্যুর কোন বেদনা বা বিভীষিকাই তার কাছে নেই।

রহিমের সঙ্গে ভাব হবার আরও একটা কারণ আছে। রহিম টাকা জাল করবার ফিকির জানে। শামুকে শিখিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। তা ছাড়া চোরাই সিকি-আখুলি গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার কাগদা ইতিমধ্যেই রহিমের কাছ থেকে সে আয়ত্ত করে ফেলেছে।

তখন বর্ষা কাল। এক দিন সন্ধ্যা বেলা আসামী 'গিন্‌তি' করবার সময় ওয়ার্ডাররা দেখল—হু'জন কম পড়ছে। সর্দানাশ—কয়েকটা পালিয়েছে! মূলধারের বৃষ্টি পড়ছিল। সেদিন শামু আর রহিমের কাজ পড়েছিল বিলিতি বেগুনের ক্ষেতে। পরামর্শ আগেই করা ছিল। এক জন আরেক জনের কাঁধে উঠে কাপড় পাকিয়ে সেই দড়ির সাহায্যে জেলের পাঁচিল টপকে যে বার লক্ষ্য অভিযুগে বড়না দিল। কবে কোথায় সাক্ষাৎ হবে তারও ব্যবস্থা করা রইল। জেল থেকে পালানোর গোঁরবে হু'জনের কৌলীজ আর এক দাপ বেড়ে গেল।

শ্রামাচরণের নাম-ধাম বার বার বদল হচ্ছে, চেহারারও রকমের ঘটছে—কিন্তু পেশা বদলায়নি বলে আমরা তার পুরোনো নামটাই ব্যবহার করব। কয়েকটি লোমহর্ষণ ইত্যাকারের সঙ্গে জড়িত হওয়া সত্ত্বেও শ্রামাচরণ কেঁরার হয়ে আছে। আগে শুধু তার বাজবল ছিল, এখন তার অর্থবল এবং দল-বলও এসেছে। শামু সর্দারকে দরতে পারলে পুলিশ পুরস্কার পাবে; কিন্তু এই দুর্দর্শ ডাকাতকে আরন্তে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

তবে ধরা এক দিন পড়ল শ্রামাচরণ। পুলিশের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষের পর। শামুর পায়ে গুলী লেগেছিল। হু'তিন জন সশস্ত্র পুলিশ ঘায়েল ক'বে সে বিষয়-গর্বে লোহার হাতকড়া হাতে পরল। হ্যাঁ, এবার কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে। চির বিশ্রামের ব্যবস্থা হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে শ্রামাচরণের যাবজ্জীবন ঘোপান্তরের ব্যবস্থা হ'ল। পিছনের কোনো টান ছিল না তার। সংসারের স্বপ্নকে সে কোন-দিনই মনে স্থান দেয়নি। তাই কালাপানি পায়ে যাবার সময় তার অন্তরে কোন ব্যথার আভাষ মাত্র রইল না। বরং নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আগ্রহে শামু চকল হয়ে উঠল।

\* \* \*

আশ্বামান। কত বার এই বীণের নাম শুনেছে শ্রামাচরণ। কালাপানি-ফেরৎ হু'এক জন আসামীর কাছে অনেক গল্পও সে শুনেছে। বহুত ঘেরা আশ্বামান। শত শত বন্দীর বেদনা, অপরাধীর বিকৃত চিন্তাশ্রোত, শাসকের কঠোর নিষেধন, পাশবিকতার বিচিত্র রূপ, বদেগপ্রেমিকের আশ্বাসন—সব মিলে আশ্বামান অনন্ত, অতুলনীয়। যেন কৃষ্ণ সাগরজলে ঘেরা সবুজ নারিকেলশ্রেণী-মণ্ডিত গামল এই বীণটি যেন নিরন্তর মৃত্যু দ্বারা আকীর্ণ নব জীবনের প্রতীক। জঘন্ততম পাপ—তার পাশেই মুক্তিকামীর আশ্ববিসম্বন্ধন। অপূর্ণ সমন্বয়।

শামু কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের ভাল চোখে দেখে না। লেখাপড়া-জানা বাবুদের কেন জানি তার ভাল লাগে না।

ইংরেজকে ভাড়াবি কি বাবু? ওদের কত শক্তি—তোরা পারবি কেন? শ্রামাচরণের ধারণা, ইংরেজ বাহাদুর তাদের ভাল খাওয়া-পয়সার জন্ত এই জেলখানা বানিয়ে দিয়েছেন—ওদের শাস্তি দেয়, বেশি খাটায় বা খারাপ খাওয়ায় এই দিশি স্থপারিস্টেণ্টেট বা ওয়ার্ডারগুলো। একবার বাগে পেলো ঘাড় থেকে ক'টার মাথা নামিয়ে দেয় শ্রামাচরণ।

হঠাৎ একটি ঘটনায় তার মত কিছুটা পরিবর্তিত হ'ল। রাজ-বন্দীরা কিসের যেন প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছে। দু'দিন নয় চার দিন নয় আঠারো দিন কেটে গেছে। জলপান করিনি কেউ। তিন-চার জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তার ওপর জেল-পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে; 'ট্র্যাণ্ডিং হাওকাক,' (ভাণ্ডা বেড়ী), 'চট কাপড়—অনেক রকম শাস্তিরও ব্যবস্থা হয়েছে। এই ঘটনায় আশ্বামানের সর্বত্র একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। শ্রামাচরণের মেজাজও গরম হয়ে উঠল। কথায়-কথায় তর্ক বাধিয়ে বসূল সে চীফ ওয়ার্ডার সম্পদ সিংএর সঙ্গে। বেমারি আশ্বমির ওপর লাঠি চার্জ? শামুর রক্ত টপ্পা-বগ্ করে ফুটেছে। বেশরোয়া হয়ে সে একটা এসেচু চড় বসিয়ে দিল সম্পদ সিংএর গালে। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল জ্ঞাত প্রহরীরা। বেটনের আঘাতে শামুর ঠোঁট ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ইতিমধ্যে তার হাত হু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তিন মাস অন্ধকার কুঠরীতে বসে পাথর ভাঙার কাজ হ'ল তার—আর এক বেলা খাওয়া। পাথর ভাঙাকে শামু ভয় করে না। কিন্তু তাহার লোহার মত দেহ কি এক বেলা লপ্সী থেয়ে টেকে? ক্ষিপের অলায় তার মনে পড়ল রাজবন্দীদের অনশনের কথা। বাবুরা না থেয়ে যে কি করে থাকে, সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারল না।

কয়েক দিন পরের কথা। শামুকে যে মেটে খাবার দিতে আসে সে তার কানে কানে বলল—“বদেগী ডাকাতদের কর্তা অমর বাবু তোরা খুব স্তন্যাম করেছে শামু। বলেছে, তোকে তাদের দলে ভর্তি করে নেবে।” কথাটা শ্রামাচরণের ভালই লাগল। সত্যিই ত—বাবুদের চেয়ে সে কম কিসে? সন্তেবোটা খুন করেছে সে। লেখাপড়া নয় না-ই শিখেছে, কিন্তু ভর-ডব সে কাউকে করে না। একটু ইতস্ততঃ করে মেটকে সে বলেই ফেলল—“বাবুদের বলিসু আমি তেঁনাদের দলে ভর্তি হব। দরকার হলে আমি সাহেব মারতেও পারি।”

রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে শ্রামাচরণের যোগাযোগ ক্রমে বেড়েই চলে। কিছু-কিছু লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থাও সে করে নিয়েছে। বীরে-বীরে একটা যেন বিরাট পরিবর্তন এসে পড়ছে তার চরিত্রে। অনেক সংঘত হয়েছে সে। সম্পদ সিংকে ডেকে শামু এক দিন বলল—“আমার কসুর মাপ করো ভাই, তোমাকে চড় মারা আমার অজ্ঞায় হয়েছিল।” সম্পদ সিং গোঁফে চাড়া দিয়ে শুধু একবার মুহু হাসল। মনে-মনে ভাবল, তিন মাস পাথর ভেঙেই বাছাদন কাং—ইয়ে হ্যায় আশ্বামানকা খেল! শ্রামাচরণের সহ-কয়েদী বাবুলাল, ছোটো থাঁ, গুলু সর্দার এরা ঠিক করল, শামুর জাত খোঁরা গেছে। ওর বড় অহঙ্কার। চোরের ছেলে—তিনি আজ বাবু সেরেছেন। কয়েদীদের মনে একটা ঈর্ষার ভাব। কেউ চেপে রাখে, কেউ বলে। শ্রামাচরণ সম্পূর্ণ নির্ভীকার। সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। নিজের দেশকে সে

চিন্তা না, এখন যেন একটু-একটু চিনতে পারছে। স্পষ্ট কিছু সে দেখতে পার না, কিন্তু ভাসা-ভাসা ভাবে অনেক কথাই তাঁর মনে উঁকি মারে। এষ্ট দেশে আর সায়েব থাকবে না, আমরাই রাজা হব, সকলে পেট পূরে খেতে পারতে পারে—এমনি আরো কত কি !

পুরানো দিনের কথাও যে তাঁর একেবারে মনে পড়ে না তা নয়। নারীর সম্পর্কে সে কয়েক বার এসেছিল। মত্ত অবস্থায় নিম্নশ্রেণীর বারবিলাসিনীদের সঙ্গে সে করেছে; কিন্তু গ্রামাচরণ কোন দিন মোহগ্রস্ত হয়নি। সংসার ? না, সংসার সে করবে না। যদি ছাড়া পেয়ে দেশে ফেরার দিন আসে—তখন ? বাবুবা বলেছেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। সেই দেশে কি সে কোন দিন ফিরতে পারবে ? নানা চিন্তা ভিড় করে আসে তার মনে।

আশা-আশঙ্কে শায়ুর দিন কেটে বাচ্ছিল। ইংরিজিতে সে নিজের নাম সই করতে শিখেছে। স্বদেশী বাবুদের সুপারিশে সে তিসাব সেবার কাজ করেছে। বাবুদের কেউ হাসপাতালে গেলে গ্রামাচরণ সেখানে গিয়ে সেবার ভার নেয়। একটা বিচিত্র অনুভূতি এসেছে তাঁর জীবনে। পুরানো দিনের সঙ্গে আজকের তুলনা করলে তাঁর নিজেরই আশ্চর্য লাগে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে শায়ু, ছাড়া পাবার পব সে লুটপাট করে যে টাকাকড়ি আনবে সব ঐ স্বদেশী বাবুদের হাতে তুলে দেবে। আর এবার যদি খুন করতে হয়, একেবারে গোরা সেপাইএর মুণ্ডু সে ছাঁকাক করে দেবে।

কয়েক বছর পরে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে গবর্ণমেন্টের কি একটা চুক্তি অনুসারে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি আসন্ন হয়ে এল। বাবুবা সব ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরে যাবে। তাদের মধ্যে আনন্দের গাড়া পড়ে গেছে। বাদের তরুণ জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি রুদ্ধ-কারার অন্তরালে কেটেছে তারা যে আবার স্বাভাবিক জীবনে

ফিরে যেতে পারবে, এ ছিল স্রূব কল্পনারও অতীত। ধবরটা গ্রামাচরণ পেয়েছে। একবার ভাবল—অমর বাবুকে ভিগ্গেস করে, তারও ছাড়া পাবার সম্ভাবনা আছে কি না। কিন্তু পাছে অন্য রকম কিছু সন্ততে হয় সেই ভয়ঙ্কর সে মুখ কুটে আর কিছু বলতে পারল না। এত দিন তার দেশের কথা মনে পড়ত না—কিন্তু আজ তার বুকের ভেতর একটা জায়গায় কেমন যেন খচ-খচ-কবতে লাগল। তার ভ্রমরনয়ন ভাব দেখে ‘গ্যাং কেসের আসামী খোদাবক্স ঠাঁটী করে বলল—“কি যে শায়ু, কোটী পাত্তাবী পরে বাবুদের সঙ্গে জাহাজ চড়ে বাড়ী যাবি না কি ?” আর একটু হলোই গ্রামাচরণের মুখ দিয়ে একটা অশ্রীল গালাগালি বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু সে একেবারেই চূপ করে রইল।

রাজবন্দীদের মুক্তির দিন এল। চীফ, ওয়ার্ডার সম্পদ সিং-এর কাছ থেকে শায়ু জানাচ্ছে, স্বদেশী বাবুদের সুপারিশে সে জাহাজ-ঘাট পর্যন্ত গিয়ে তাঁদের তুলে দেবার অনুমতি পেয়েছে। মনকে ইতিমধ্যে সে ঠিক করে নিয়েছে। না-ই বা ছাড়া পেল—অন্য কয়েকদলের চেয়ে ত তার সম্মান বেশি। বন্দীদের আর ৭ বছর বাকি; দেখতে দেখতে কেটে যাবে। বামাচরণ সর্দারের ছেলে না সে ? এতটুকু কাতর হলে চলবে কেন ?

‘এস, এস, মহারাজা’ ঝাঁড়িয়ে রয়েছে জাহাজ-ঘাটে। বাবুবা একে-একে উঠেছেন। শায়ুর হাত ধরে “আসি তাই” বলতে গিয়ে অমর বাবুর চোখ দিয়ে কয়েক কঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কালো বং-এর ‘মহারাজা’ জাহাজ বাঁশি বাজিয়ে কালো জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। শায়ু একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সেমিকে। ভাবছিল, তবো বছর আগে এই জাহাজেই সে আন্দামানে এসেছিল।...ঠাং তার কি মনে হ’ল; গ্রামাচরণ সম্মুখে জলে বাঁশ দিয়ে পড়ল। পাহাগাদাররা হী-হী করে ছুটে এল। সুপারিটেণ্ডেন্ট রিভলভারটা বেব করে বাগিয়ে ধরলেন। গ্রামাচরণ তখন দুব-সাঁতার দিয়ে চলেছে—কোথায় গিয়ে উঠবে কে জানে ! আন্দামান জেলে ঢং-ঢং করে বিকট শব্দে ‘পাগলা ঘন্টা’ বেজে উঠল !

## আকাশ পাতাল

[ ১৫২ পৃষ্ঠার পর ]

ভূতর্কমেন্টের কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দেবেন। পাঠিয়ে, জানিয়ে দেবেন তার বিচ্ছেদ গুপ্ত আন্দোলনের সূত্র ?

নায়েবদার এক জন এসে বলেন,—গিন্নীমা’র মাসিক খোর-পোষের টাকাটা—যেন পিনীমা’র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি জানিয়ে গেছেন।

ম্যানেজার বাবু বলেন,—নিশ্চয়ই। আগামী প্রান্তেই পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

কুহুদিনী তখন ননদিনীকে নিয়ে বসেছেন বর্ধ করাতে। ছেলের শব্দের বর্ধ। কুহুদিনী বলছেন আর লিখছেন হেমলিনী।

তাদের তালিকা প্রস্তুত করছেন তাঁরা। হেমলিনীর লিখিত বাঙলা অক্ষর যেন ঠিক স্তম্ভের মত। হেমলিনী যে শিক্ষা পেয়েছিলেন কিশোরী-বেলায়। ভাইদের চেষ্টায় শোভাবাজার রাজবাটীতে রাজা রাধাকান্তর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছিলেন বেশ কয়েক বছর। অনেক বই শেষ করেছিলেন। পরীক্ষার পুরস্কার পর্যন্ত পেয়েছিলেন।

কুহুদিনী বলছেন আর লিখে চলেছেন হেমলিনী। লিখছেন তাদের উপকরণ। কনের আত্মীয়-বন্ধনের নাম। গহনা, বাসন-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদের কিরিতি।

আর ছেলে তখন একেবারে বেহঁস হয়ে বিবি গহনজানের কাছে—

[ ক্রমশঃ।

# 

রামকৃষ্ণ মিশন ও বেলুড মঠের সভাপতি স্বামী বিবেকানন্দ  
মহাপ্রাণ ৭৮ বৎসর বয়সে বেলুড মঠে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার

মহাপ্রাণ কবিরাজেন।

প্রায় ১ বৎসর ধাবৎ স্বামীজী যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতার  
ভুগিতেছিলেন। প্রায় দুই মাস তাঁহার রোগ সঙ্গীন আকার ধারণ  
করে। মাঝে তিনি অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ  
তাঁহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গড় কয়েক দিন হইতে তাঁহার  
অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়। মঙ্গলবার রাতি প্রায় ১২ ঘটিকা পর্যান্ত  
স্বামীজীর জ্ঞান ছিল না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাতি  
প্রায় ৩ ঘটিকার সময় স্বামীজীর অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটে।  
স্বামীজীর মহাপ্রাণের সময় মঠের সাধু-সন্ন্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

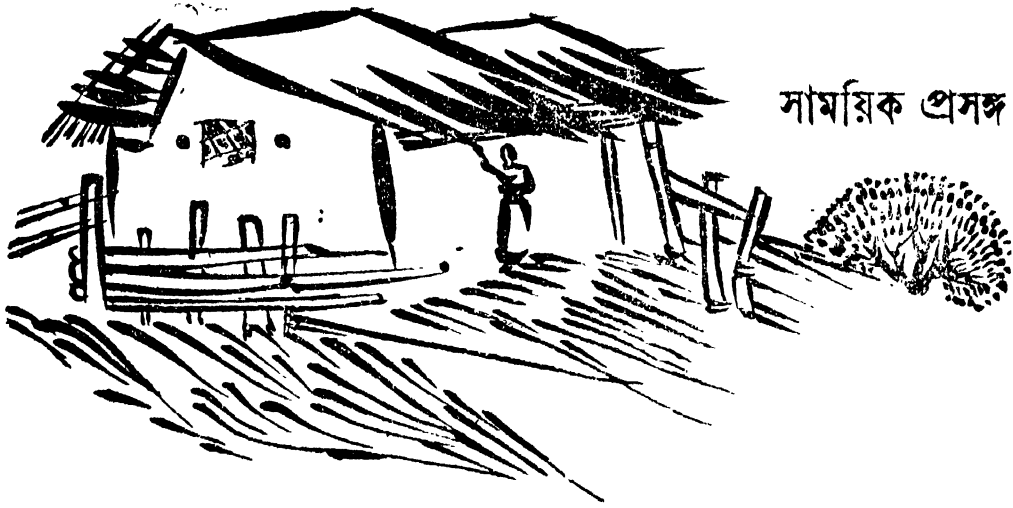
বেলা প্রায় সাড়ে ১১ ঘটিকার সময় স্বামীজীর নশ্বরদেহ  
মঠ-প্রাঙ্গণস্থিত আশ্রমের নিম্নে একখানি খাটে শায়িত করা হয়।  
স্বামীজীর নশ্বরদেহ যে খাটে শায়িত করা হয় সেই খাটখানি গেক্সো  
বস্ত্র ও পুণ্ড্র সজ্জিত করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বের নাম ছিল কালীকৃষ্ণ বসু। ১৮৭৩  
খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন দ্বানি পূর্ণিমার দিন কলিকাতার এক সংস্কৃত  
কাষস্থ বংশে তিনি জন্মগত করেন। তাঁহার পিতা ব্রৈলোক্যনাথ  
বসু তখনকার সময়ে পূর্ণ-কলিকাতার এক জন সুপ্রতিষ্ঠা চিকিৎসক  
ছিলেন। ট্রেণিং একাডেমি এবং পরে বিপণ কলেজে কালীকৃষ্ণ বসু  
পড়াশুনা করেন। কিশোর জন্মেরই তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মবোধের ভাগবণ  
দেখা গিয়াছিল। সমভাবে ভাবুক কয়েক জন সভাপাতীর সতি  
একত্রিত হইয়া তিনি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, সংস্কৃত, সংকীর্ণিত প্রভৃতিতে  
অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কালীকৃষ্ণের  
মত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিয়া সন্তোষ বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ও সেরক  
বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সুবকবুদ লুপ্তে রামকৃষ্ণ-  
দেবের গুণীশিষ্য মহাপ্রাণ রামকৃষ্ণ নম্বের বনিষ্ট সম্প্রদায়ে আসেন  
এবং ঈশ্বরোপ জীবন ও শিক্ষা বিষয় অবগত হন। কালীকৃষ্ণের  
কসঙ্গে তখন শ্রীমহেশনাথ গুপ্ত (পরে বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত  
গ্রন্থের রচয়িতা) ইংরেজী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার কাছ



স্বামী বিবেকানন্দ মহাপ্রাণ

ইহার রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যগণের এবং বরাহনগর মঠের কথা  
সুনিতে পাইয়া তথায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। শ্রীমঠ  
কালীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত বৈরাগ্য ভাব প্রবল ভাবে উদ্ভূত  
হইয়া উঠিল এবং তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সন্তোষ বসু সংসার  
ভাগ করিয়া বরাহনগর মঠে যোগ লিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ  
তখন পরিব্রজ্য্য বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সতি কালী-  
কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল অনেক পক্ষে—১৮৯৭ সালে স্বামীজী  
আমেরিকা হইতে দেশে ফিিয়া আসিলে বরাহনগর মঠে শ্রীমঠকৃষ্ণের  
সন্ন্যাসী পার্শ্বগণের অন্তরঙ্গ সাহচর্য্যে কালীকৃষ্ণের তরুণ জ্ঞান, মন  
আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাপস-জীবনের  
বহুল কঠোরতা তাঁহার বিন্দুমাত্র বোধ হইত না। অনতিকাল পরে  
তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র জননী সারদা দেবীর নিকট মন্ত্র লীলা লাভ  
করেন এবং বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণের অন্ততম পার্শ্ব স্বামী প্রেমানন্দ বা  
বাবুগাম মহাপ্রাণের নিকট থাকিয়া ধ্যান-ভজনে কিছু কাল অতি-  
বাহিত করেন। ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ  
হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে কালীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস  
গ্রহণ করিয়া গুরুদত্ত বিরজানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। স্বামীজীর  
আদেশে তিনি দেওঘরে চুক্তিকে সেবা এবং ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের  
অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রচারকর্মা অতি কৃতিত্বের সতি সম্পাদন  
করিয়াছিলেন। কিছু কাল তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিগত সেবক  
ছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবায় স্বামীজী বিশেষ প্রসন্ন হইয়া-  
ছিলেন। ১৮৯১ সালের মাঘমাঘি স্বামীজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য  
দেশে চলিয়া গেলে বিরজানন্দ তাঁহার নির্দেশ অনুসারে হিমালয়ে  
নবপ্রতিষ্ঠিত মাহারাজী অর্ধমত আশ্রমের কর্ম্ম হইয়া গমন করেন।  
১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন।  
শেষ সময় প্রায়তম গুরু সতি সাক্ষাৎ না হওয়াতে বিরজানন্দ খুবই  
ভাল্লভ হইয়া পড়েন এবং কংকীভবন হইতে সাময়িক অবসর হইয়া  
প্রায় তিন বৎসর তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী  
জুয়ানিন্দার সেবা ও সঙ্গে অতিবাহিত করেন। ১৯০৬ সালে  
মাহারাজী আশ্রমের অধ্যক্ষ গুরুদত্ত স্বামী স্বরূপানন্দ তাঁৎ দেহত্যাগ  
করিলে বিরজানন্দের উপর ঐ আশ্রমের বর্ধভার বস্তু হয়। প্রায়  
আট বৎসর তিনি ঐ গুরু দায়িত্ব চর্চা ভাবে পালন করেন। ঐ  
সময়ে আশ্রমের ইংরাজী মুখপত্র 'প্রবু ভাবত' পত্রিকার সম্পাদনাও  
তাঁহারে করিত হইত। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিং জীবনী এবং রচনা  
ও বক্তৃতাবলী ও প্রকাশনী তাঁহার ঐ সময়কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য  
প্রচেষ্টা। তৎপরে এক বৎসর মাহারাজীতে বিশ্রামান্তে বিরজানন্দ ১৯১৫  
সালে হিমালয়ের গভীর অরণ্য প্রদেশে একটি নির্জন আশ্রম প্রতিষ্ঠা  
করিয়া ১৯২৬ সাল পর্যন্ত প্রাণত: তপস্যাধিত্তে অতিবাহিত করেন।  
১৯২৬ সাল হইতে পুনরায় তাঁহার কংকীভবন শুরু হয়।  
১৯৩৪ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের সেক্রেটারী, ১৯৩৮ সালের  
মে মাসে ডাইস-প্রেসিডেন্ট এবং ঐ বৎসরের শেখাশেখি গুরুভাণ  
স্বামী ব্রহ্মানন্দের শরীর ত্যাগের পর সভাপতি নির্বাচিত হন।  
বিরজানন্দের সর্বাধ্যক্ষতাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহুতর  
প্রসাধ ও গৌরব বর্ধমাশে বৃদ্ধি হইয়াছে। বিরজানন্দের কতি  
ধংগপ্রদেশগুলি সংগৃহীত হইয়া 'পদমার্গ প্রসঙ্গ' নাম দিয়া বাংলা,  
ইংরাজী ও হিন্দী তিন সংস্করণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।  
বৎসর নিউ ইয়র্কের হার্ণার গ্র্যাণ্ড ব্রান্স বইখানির একটি মনে  
বৈদেশিক সংস্করণও বাহির করিয়াছেন।



## সাময়িক প্রসঙ্গ

### নামেই গুণ বামপন্থী ?

“হাওড়া নির্বাচনে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক জয়লাভ করিতে জনসাধারণ খুব আশঙ্ক হইয়া ভাবিয়াছিল যে, দেশে নূতন নেতৃত্বের সূচনা হাওড়া হইতেই হইবে। কংগ্রেস-নেতৃত্ব লোকে একেবারে আঁখা হারাইয়াছে এবং জনসাধারণ এমন একটি নূতন দল খুঁজিতেছে—যাহার উপর তাহারা বিশ্বাস রাখিতে পারে। বামপন্থী দলগুলি একক ভাবে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই জগৎ সর্বদা দলের মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনসাধারণ আশঙ্ক হইয়া ভাবিয়াছিল যে, বামপন্থী দলেরা সজ্ঞাভ ভাবে কংগ্রেসের বিরোধী সম্মিলিত দলরূপে গড়িয়া উঠিয়া একটি নূতন শক্তির সৃষ্টি করিবে এবং দেশকে সুপথে পরিচালিত করিবে। এই সত্যবাদী ছিল বলিয়াই হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দক্ষিণ-কলিকাতা উপ-নির্বাচনের জয় গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল এবং আমেরিকায় পর্যন্ত সাড়া জাগাইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, নির্বাচনের পর বামপন্থী দলেরা এই সজ্ঞাশক্তিকে সফল করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। এই নির্বাচনে মন্ত্রীরা অদৃষ্ট হইয়াছেন, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ দল যাগতে নানারূপ বাধা পান, তাঁহারা সে চেষ্টার একটি করিবেন না। কিন্তু নির্বাচনের পর নূতন দলের যে তৎপরতা ও নেতৃত্ব লোকে আশা করিয়াছিল, তাহা পাঠিতেছে না বলিয়া জনসাধারণের মনে হতাশা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সম্মিলিত দল এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত না হইলে তাঁহাদেরও অনিষ্ট হইবে, দেশেরও ক্ষতি হইবে।”

—দৈনিক বসুমতী।

### আচার্যের কংগ্রেস ত্যাগ

“আচার্য কৃপালনী অবশেষে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বাধ্য হইয়াছেন বলিয়া এই জ্ঞত যে, শেষ মুহূর্ত্ত পর্যন্ত তিনি কংগ্রেসে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ও মৌলানা আজাদের মত বুদ্ধদায়ী বরিয়ণ হালে পানি পান নাই। কংগ্রেস সভাপতি পুরুষোত্তরদাস ট্যাগোর কিছুতেই কৃপালনীর কোন আবদার রক্ষা করিতে সম্মত হন নাই, এ-আই-সি-সির সভায় ব্যঙ্গভরে তিনি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস-মহোত্সবের দুই-একটি শাখা-প্রশাখা যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে বিচলিত হইবার কিছু নাই, বৃক্ষের

কাণ্ডদেশ এত প্রকাণ্ড যে, তাহাতেই উগা জীবনীশক্তি অটুট থাকিবে।

কৃপালনী কংগ্রেস-বৃক্ষের শাখা নাকি ছিলেন না। বাপুজীর অগ্রতম বিশ্বস্ত ভক্তরূপে তিনি কংগ্রেসের শাস্ত্রারীদের এক জন ছিলেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদটি তাঁহার একচেটয়া ছিল এবং গান্ধীজীর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি হাই-কমান্ডের এক জন হইয়া কংগ্রেসের যাবতীয় কথ্য এবং অপকথ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। সেই সময়ে মতভেদের প্রস্র উঠে নাই, কারণ কংগ্রেসে তখন ভলের বিয় ছিল, মধু ছিল না। সমুদ্র মধুনে শুধাও উৎপিত হইলে লোভাভ্রমের। কলহ ও ঘৃণা যেমন স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি প্রাজের মধুভাণ্ড হস্তগত হইতেই কংগ্রেস-সেবকদের, এমন কি গান্ধীজীর নিষ্ঠাবান ভক্তদের, লোভ ও ঘোহ হই বিপুল ক্ষতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া এক দিকে দেশকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তাঁহাদের নিজের মধ্যে আত্মঘাতী কলহের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশসেবার বখরা লইয়া বিবাদে কৃপালনী হারিয়া গিয়া এবাদবিদায় হইতে বাধ্য হইলেন।

কৃপালনী বলিতেছেন, কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কে বর্তমান হাই-কমান্ডের সহিত তাঁহার কোন বিরোধ নাই। তাঁহার প্রধান অভিযোগ দুইটি: (১) বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুর্নীতি ঘটয়াছে, এ জগৎ তিনি পরাজিত হইয়াছেন, এবং (২) কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দলীয় মনোভাব হইতে মুক্ত নহেন, এ জগৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ দল ভায়বিত্য পাঠিতেছে না। কংগ্রেসের নির্বাচনে দুর্নীতি এই প্রথম বাব হয় নাই। কংগ্রেসের উপর নিজের দলের কত শক্ত প্রাণবীর উদ্বেগে অলু-ইতিয়া হইতে প্রায়ের কংগ্রেসে করুণ দুর্নীতি পূর্বাপর অদ্বিষ্ট হইয়া আসিয়াছে ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য কৃপালনী তার ইতিহাস যতখানি জানেন আর কেহ তেমন জানে না। বোম্বাইয়ে নরিমান, মধ্যপ্রদেশে ডাঃ খারে ও বাঙ্গলার সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত করিতে কংগ্রেসের উদ্বুদ্ধ বর্জ্যশক্তি কৃপালনীর দল করুণ দুর্নীতি ও শঠতার আশ্রয় লইয়াছিলেন, দেশের লোক তাহা ভুলে নাই। ভগ্নস্বদয় নরিমানের অকালমৃত্যু, খারের হিন্দু মহাসভায় যোগদান, সুভাষচন্দ্রের বেশত্যাগ সেই চক্রান্তের পরিণাম! তখন

ত কৃপালনী লক্ষ্য অধিবদন হন নাট, ব্যঙ্গভরা বক্তৃতাতে তাঁহার বদন সেদিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জেনারেল সেক্রেটারী-রূপে সেই সব দুঃস্থ কৃপালনীর নিজের হাত কতখানি ছিল, তাহা আশ্চর্য করা কঠিন নহে।

ভোটশাঠ্য এবং দুর্নীতি সম্বন্ধে পটভূমি সীতারানিরাকে পরাজিত করিয়া সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরেও সত্যনিষ্ঠ ও অহিংসার অবতার যে সব গান্ধীভক্ত তাঁহাকে ত্রিপুরীতে অপর্যায় করিয়াছিলেন এবং অবশেষে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, কৃপালনী তাঁহাদের অন্ততম। কষ্ট, তখনও কৃপালনী ক্ষোভোদ্ভাসিত হৃদয়ে এমন অঝোরে তপস্বীকরণ করেন নাই? এখন বাহারা কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে তাড়াইল সেদিন তিনি এই দুর্নীতিপরায়ণ প্যাটেল দলের সহিত হরিহর-আশ্রা ছিলেন। সুভাষচন্দ্র জয়ী হইয়াও গান্ধীশিষ্যদের তাঁহার গুণাধিকার কমিটিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃপালনীর দল তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। বিবৃতি দিয়া তাঁহারা সেদিন বলিয়াছিলেন, একমতাবলম্বী না হইলে একযোগে তাঁহাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নহে। আজ কৃপালনী যখন বলেন যে, কংগ্রেস কেন্দ্রীয় দপ্তরের কর্তৃক দলীয় মনোভাব-যুক্ত নহেন এই কারণে তিনি কংগ্রেসে থাকিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার অসত্য অবস্থা দেখিয়া যেমন হৃৎক্লেশ হয়, তেমনি মনে হয় বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া পাপের কি কঠোর শাস্তি দিলেন। কংগ্রেসের বহু দুর্দ্বার্য ও দুর্নীতির পাণ্ডা কৃপালনিকে অবতোলা ও অপমানের ধূলার লুপ্তি হইয়া কংগ্রেস হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল, ইহা প্রকৃতির চরম প্রতিশোধ।

কংগ্রেসে বর্তমানে নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থপরায়ণ লোকের থাকিবার উপায় নাই, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। কিন্তু বাহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন তাঁহারা নিজেদের সত্যতা ও চরিত্রবলের প্রমাণ না দিলে দেশের লোকের আস্থা পাইবেন না। কংগ্রেসের বর্তমান নীতি বেশের পক্ষে কল্যাণকর নহে, বাহারা উহার কর্তৃত্বভিত্তিতে বিশ্বাস করেন শুধু ঘরোয়া মনোমালিন্যের জন্য বিবাদ করিলে তাঁহারাও দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দল গঠন করিতে হইলে দলের জন্য এমন বলিষ্ঠ কর্তৃপ্রণালী গ্রহণ করা প্রয়োজন, বাহাতে দেশের লোক বুঝিতে পারে দুই দলের বিভিন্নতা কোথায়। আমি বেশী কংগ্রেসী এবং আমি বেশী সাধু ও গান্ধীভক্ত এই সব কাঁকা বুলিতে লোককে ধান্দা দিবার দিন আর নাই। কংগ্রেসের ইকনমিক ব্রাজ আর কংগ্রেস-ত্যাগীদের শ্রমিক-প্রজা-রাজ উভয়েই সমান অর্থহীন হয়, যদি এক দল বিড়লা এবং অপর দল শ্রীধর ও রাজা-মহারাজাদের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষমতার রাজনীতি করেন। বিড়লার বিরুদ্ধে কথা বলিতে লক্ষ্যে বাহাদের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায়, রাজা মহারাজাদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য ওকালতি করিতে বাহাদের লজ্জা হয় না, তাঁহারা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করিলে লোক বিশ্বাস করিবে কেন? রাজনীতিকের দাম্পত্য কলহের পর্যায়ে টানিয়া আনিলে পরিণামে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। কৃপালনী এখনও কংগ্রেসে আবার চুকিবার বাস্তা খোলা রাখিয়াছেন, বিভিন্ন প্রদেশে বাহাদের লইয়া তিনি দল করিতেছেন তাঁহাদের অনেকেরই নিষ্ঠা বা সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, ইহাও তিনি নিজে জানেন।

আবার তিনি বলিতেছেন যে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে দাঁড়াইবে তাহাকেই নির্বিচারে তিনি দলে লুকিয়া লইবেন। ইহা নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় নহে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, চালাকী বাংলা কোন মহৎ কাণ্ড হয় না। পলিটিক্সেও ইহা ভুলা আমাদের উচিত নয়।

—বৃগবাণী।

### পরীক্ষা আসন্ন

“বর্ধমান জেলার অধিবাসীদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। মাত্র এক মাস পরে বর্ধমান জেলাবোর্ড নির্বাচন হইবে। জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়া কংগ্রেস আজ দেশের শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে। কংগ্রেসের হাতে শাসন-ক্ষমতা আসায় জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আশা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে কংগ্রেস দুর্নীতি-পরায়ণ ধনী, শিল্পপতিদের কুক্ষিগত হওয়ার জনসাধারণ আজ কংগ্রেসের প্রতি আস্থা হারাষ্টয়াছে। যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে অত্যাচারিত হৃৎক্লেশ জনগণ একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে করিত আজ তাহাকে শত্রু বলিয়া মনে করে। কংগ্রেস আজ আর ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক নয় এবং বর্তমান কংগ্রেসের নিকট হইতে আজ দেশের উপযোগী কোন প্রগতিশীল পরিবর্তন আশা করা নিরর্থক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস সরকার কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন নাই, উপরন্তু দল-পোষণ, আত্মীয়-পোষণ ও বে-পরোয়া দুর্নীতি পন্থা অবলম্বনে দেশের সকল সমস্যাকেই জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত কংগ্রেসকে সংশোধনের জন্য বহু কংগ্রেসসেবী আশ্রয় চেষ্টা করিয়াও যখন কোন আশা পাইলেন না, তখন তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই কংগ্রেস ছাড়িতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ভারতের বিশিষ্ট ও একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবীদের বৃহৎ অংশই আজ কংগ্রেসের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। তাই বর্তমান কংগ্রেসের হাতে দেশ ও জাতি নিরাপদ নয়। এক্ষণে সমস্ত প্রগতিশীল ও জনসেবী প্রতিষ্ঠান ও করিগণ অগ্রসর হইয়া সমবেত ভাবে যদি দেশের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই একমাত্র দেশ রক্ষা পাইতে পারে এবং দেশের উন্নয়নও সম্ভবপর। আমরা তাই বার বার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্মীদের প্রতি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। একান্ত সুখের বিষয়, আমাদের আবেদন বাধ্য হয় নাই। আমাদের বর্ধমানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলি একত্রিত হইয়া আগামী জেলাবোর্ড নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতেছেন। বর্তমান জনবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রাণী পাড় করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতেছেন। কংগ্রেস শাসন যে দেশবাসীর জীবনকে দুর্ভিক্ষ করিয়া তুলিয়াছে, কংগ্রেস-সমর্থিত দুর্নীতিপূর্ণ নিরস্ত্র প্রথা যে দেশের নৈনন্দিন জীবনকে বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং খাদ্য থাকিতেও খাদ্য-সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়া জাতিকে অধঃপাতের পথে আগাইয়া দিয়াছে। ক্ষুধার জনগণের উপর আজ কংগ্রেসী সরকার কথায়-কথায় বে-পরোয়া গুলী চালাইয়া হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়াছে। চাবীর দ্বারা অন্ন মাটির দরে কাড়িয়া লইয়া পরী অঞ্চলে অন্নভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কংগ্রেসী শাসনের তীব্র

প্রতিবাদ ও উপযুক্ত জবাব দিবার সুযোগ আসিয়াছে। জেলাবোর্ড নির্বাচনে সেই কংগ্রেস পুনরায় নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাইতে লক্ষিত হয় নাই। চিরকালের প্রতিক্রিয়াশীলপণ আজ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হইয়াছেন। প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী কংগ্রেস আজ কোন যুগ লইয়া জাবাব জনগণের ভোট হরণ করিতে বাইবেন তাহাই ভাবিতেছি। আজ 'সাধু-বেশে পাকা চোরের' দলকে কি সচেতন জেলাবাসী শিক্ষা দিবেন না? আজ তাঁহাদের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জেলাবাসী এই পরীক্ষায় সাফল্যজনক ভাবে উত্তীর্ণ হইবেন। জেলাবোর্ড নির্বাচনে প্রতিটি কেন্দ্রেই কংগ্রেসপ্রার্থী বাহাতে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয় তাহার সমরস্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আজিকার বিষময় কংগ্রেসকে বর্ধমান হইতে নিম্নুল করিতে হইবে। —দামোদর।

### অন্ন দাও! বস্ত্র দাও!

কাহারও অবস্থা স্বচ্ছল বৃত্তিতে হইলে আমরা বলিয়া থাকি, তাহার 'মোটো ভাত, মোটো কাপড়ের অভাব নাই।' জীবন-যাত্রার মাপ নিরূপণে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই প্রথম ও প্রধান। সারা ভারতে আজ এই দুইটিরই অভাব। আমাদের জীবন ধারণের মাপ পাক্ষে যে পথচারে নামিয়া গিয়াছে—মস্ত্রীদিগের ভাষণে বা বিবৃতিতে আশ্বাসের বিবিধ ব্যাখ্যানের দ্বারা তাহার কোনও উন্নয়ন হইবে না। রোগের প্রতিকার করিতে হইলে উহার নিদান নির্ণয় করিতে হইবে। বালার আজিকার এই দুর্ভিক্ষাবস্থা (famine condition) কি সত্যই খাদ্য-শস্ত্রের অভাব-জনিত? গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়—এই বৎসর ১ কোটি ৭১ লক্ষ মণ আমন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে; আউস ও বোরোর পরিমাণ ১ কোটি ৮৫ লক্ষ মণের কম হইবে না। অর্থাৎ মোট চাউলের পরিমাণ ১১ কোটি ৩৬ লক্ষ মণ। অজ্ঞাত বৎসর অপেক্ষা গমের উৎপাদন এবার অনেক বেশী হইয়াছে। প্রদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ২ কোটি ৪৮ লক্ষ। প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ১১ কোটি ১৬ লক্ষ মণ। সুতরাং এই বেশব্যাপী অন্নভাব কেন? ইহার কারণ কে নির্ণয় করিবে? গভর্ণমেণ্টের সংভরণ নীতিই ইহার জন্ত অনেকাংশে দায়ী। যেখানে বাজারে অনিয়মিত ২০/১২২/১ দরে চাউল বিক্রয় করিতে পারা যায়, directive দিয়া ১২৮/০ আনা দরে চাউল সংগ্রহ করিতে গেল জোতদার বলাবতঃই উৎপন্ন ফসল সরাইয়া রাখিবে ও মজুতদার পুষ্কিপতি বাধাই করিয়া অধিক লাভের জন্ত কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিবে। সংরক্ষণের দর ও বাজার-দরে ততকটা সমতা থাকিলে ও প্রদেশের মধ্যে ধান চাউল চলাচলের পথে বাধা দূর করিলে চাউলের দর একটা স্বাভাবিক অবস্থায় আশনিই আসিবে। বাহিরে ঐশানি ও বাধাই গভর্ণমেণ্টকে অতি কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সকলকে এক বেলা উপবাস করিয়া সঞ্চিত চাউল দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অকলে পাঠাইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। আমাদের এই গোড়া দেশে ২৭/১০/১৪/১০ টাকা দরে চাউল কিনিয়া কয় জন লোক হই বেলা খাইতে পাইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? আমাদের খাজ-মন্ত্রী শ্রীসেন বলিয়াছেন (Statesman, 4th May '51), চাউলের দ্ব্যুৎপাতায়

খুব অল্প সংখ্যক লোকেই কষ্ট পাইতেছেন। ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ কোটি লোক ১৬/ হইতে ১৮/ টাকার মধ্যে চাউল কিনিতে পাইতেছেন। এই অল্পত সংবাদটি শ্রীসেন কোথা হইতে পাইলেন? শ্রীনেহরুর উক্তি ও শ্রীসেনের বিবৃতিতে মনে হয়, ক্ষমতার অধিকার মানুষের দুষ্টিভঙ্গীকে কি ভাবে বিকৃত করিতে পারে! এই সকল জন-নেতার কি জনসাধারণের সহিত আর কোন সুযোগ রাখেন না?

এখন কাপড়ের কথা বলি। যেখানে ডিসেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত গড়ে মাসে ৫৮৪৩৬ বেল কাপড় নিয়ন্ত্রণাধীনে বটনের জন্ত দেওয়া হয়, সেখানে এপ্রিল মাসে ১০১৭৭৬ বেল দেওয়া হইয়াছে। জুলা ফেব্রুয়ারী মাসে ৪২৫৩২ বেল, মার্চ ৫১০০০ বেল ও এপ্রিলে ৫৪০০০ বেল। উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও কাপড় তবে দুস্তাশ্য কেন? গভর্ণমেণ্টের বটন-ব্যবহার কোথায়ও বিশেষ ক্রটি রহিয়াছে।

নির্দিষ্ট পরিমাণ গজের অতিরিক্ত কাপড় উৎপাদন করিলে সেই কাপড় মিল-মালিকদিগকে বিক্রয় বা বাহিরে রপ্তানী করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ফলে মিল-মালিকেরা ৫/৭ হাত দ্রুতি কাপড় দ্বারা সংখ্যা পূরণ করিয়া দিতেছে। কাজেই দ্রুতি, সাড়ী বাজার হইতে উড়িয়া গিয়াছে। মিল-মালিকদের প্রমাণ দ্রুতি, সাড়ী উৎপাদনে বাধ্য করিতে হইবে। আর তুলার মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত কয়েক জন ব্যবসায়ীকে তুলা ক্রয়-বিক্রয়ের যে একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সে-ব্যবস্থারও পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন।

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

### চাউলের মূল্য

"পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এপ্রিল মাসে চাউলের দর কিরূপ ছিল, নিয়ে কয়েকটি স্থানের দর প্রদত্ত হইল।

| স্থান—           | ২৫শে এপ্রিল | ১৮ই এপ্রিল |
|------------------|-------------|------------|
| বর্ধমান সদর      | ১৮/         | ১৮/        |
| আগানসোল          | ১৬/         | ১৭/        |
| কাটোয়া          | ২১/         | ২০/১       |
| কালনা            | ২৩/১        | ২৩/১       |
| বীরভূম           | ১৬/         | ১৫/        |
| বাঁকুড়া         | ১৫/         | ১৫/        |
| মেদিনীপুর দক্ষিণ | ১৮৮/০       | ১৬৮/০      |
| মেদিনীপুর উত্তর  | ১৫৮/০       | ১৫৮/০      |
| কাঁথি            | ১৪/         | ১৩/১       |
| তমলুক            | ২০/         | ২০/        |
| নকোরা            | ৩৫/১        | ৩২/        |
| কুচবিহার         | ৪২/১        | ৪৭/১       |
| হুগলী            | ২৮/         | ২৬/১       |
| আরামবাগ          | ১৬/         | ১৫/১       |
| ২৪ পরগণা         | ৩২/১        | ২৮/১       |

—পল্লীবাসী।



## আয়-ব্যয়

“দেশীয় সরকার গত সপ্তাহ ১৯৮৮ সালের জাতীয় আয়ের একটা হিসাব বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেক লোক-শিছু গড়ে ২৫৫ টাকা আয় হইয়াছে। ইহাতে আনন্দিত হইবার কিছুই নাই। বর্তমান ভারতে ৩৪ কোটি ১০ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের বাস। তার মধ্যে ১৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৩১ হাজার লোক উপার্জনশীল।

গড়ে মাথাপিছু ২৫৫ টাকা আয় হইলেও সমগ্র লোক-সংখ্যার মধ্যে বহু লোক বেকার, বহু লোক বৎসরে ১০।২০ হাজার টাকা উপার্জন করে। তাহারা বেশী উপার্জন করে তাহারা গড়ে আয়ের তুলনায় বেশ ব্যয় করে না। তাই সাধারণ বেকার তাহারা সারা দিন খাটিয়াও পেট ভরিয়া আহার করিতে পায় নাই তাহারা তেমনিই বহিয়া বাইবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তিই ন্যূনপক্ষে ২৫৫ টাকা আয় হইত তাহা হইলে সত্যিকারের আনন্দ হইত। এখন তজ্জ্বের দল বেশী ভোগ করিবে, মজুরের দলে যেমন কম পড়ে তেমনিই পড়িবে।”

—গ্রাম-সেবা।

## উদ্বাস্ত পুনর্বাসন না, অর্থের হিনিমিনি ?

“ভারত ও বিশেষ করিয়া বঙ্গ ও পঞ্জাব বিভাগের ফলে যে লক্ষ লক্ষ লোক নিজের পৈত্রিক বাসভিটা ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে তাহাদের জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন রাজ্য সরকার মারকং কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আনি না এটা বিরাট অর্থ ব্যয় হবে শেষ হইবে! অল্প ভবিষ্যতে ইহা হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বিভাগের পরে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া গেলেও এই দীর্ঘ সময়ে এবং এই বিপুল অর্থ উদ্বাস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের কিছু হইয়াছে বলিয়া বলা নাই। একমাত্র নিলোখেরী পদ্ধতিতে দিল্লীতে ও পাশ্চিমবঙ্গের ফুলবাড়ীতে দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জনপদ গড়িয়া উঠিতেছে কিন্তু তাহা ভিন্ন আর স্থায়ী কাজ কিছুই হয় নাই। অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা হয় অর্থহীন দান আর না হয় ঋণ শানে ব্যয় হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও উদ্বাস্ত জনপদ নিরাপত্তা বাহা ব্যয় হইয়াছে সে-সমস্ত জনপদ বাসোপযোগী হয় নাই এবং এই সমস্ত জনপদ চিরদিনের মত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। তাহা যে কোন প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া অর্থ হাট্টে একরূপ ছুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলা চলে। রাজ্য সরকার সমুদ্র যদি পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতেন, দশটি নিলোখেরী পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত হইতে পারিত, ২০টি চিনির কারখানা, কাগড়ের কল, বহু ছোটখাট শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিত এবং তাহাতে উদ্বাস্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হইত। টাকার যে বিরাট অঙ্ক খরচ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহাতে ঐকম জনপদ ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা বিহীন ভাবে চলার ফলে অর্থ গঠিয়া হিনিমিনিই খেলা হইয়াছে।”

—সংগঠনী।

## শিক্ষক প্রতিনিধি

“আমর নির্বাচনের তরফী পাব হইবার জন্য আজ অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষক দরজী সাজিতেছেন। অথচ প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃসময়ে (স্বসময় অবশ্য এখনও নহে) তাঁহারা কনিষ্ঠ অঙ্গুলিও তেমন করেন নাই। প্রাথমিক শিক্ষকগণ কোনরূপ রাজনৈতিক যত্নবলে বিভাস্ত না হইয়া নির্বাচনে বাহাতে তাঁহাদের নিজদের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন তাহাও জ্ঞাত সচেষ্ট হউন। মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষকদের ৪ জন প্রতিনিধি পরিষদে পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া হইতেছে। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যদি ১৫০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিষদে ৪ জন প্রতিনিধি দেওয়া সম্ভবত বিবেচিত হইয়া থাকে তবে ৩৬০০০ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অন্ততঃ ৮ জন প্রতিনিধিকে পরিষদে স্থান দেওয়া হইবে না কেন? শিক্ষার মূল ভিত্তিই যখন প্রাথমিক শিক্ষা তখন পরিষদে সেই মূল ভিত্তিকে কাটার ব্যবস্থা কেন হইবে? যদি সরকারের সত্যই দেশে শিক্ষার উন্নতি করার চেষ্টা থাকে তবে সরকারে প্রাথমিক শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধির আসন পরিষদে বরাদ্দ করিতে হইবে। নতুবা গোড়া কাটিয়া আগায় জল দেওয়ার নীতিতে কোনো ফল হইবে না। প্রাথমিক শিক্ষকরা নিজস্ব প্রতিনিধি নিজেরা পরিষদে পাঠাইতে পারিলে তাহাদের পক্ষে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভাওতায় পড়িবার সম্ভাবনা নাই এবং সে ক্ষেত্রে তাহারা নিজস্ব প্রতিনিধির কাছে নিজস্ব স্বধ-সুবিধার দাবী উপযুক্ত ভাবে করিতে পারেন এবং পরিষদেও তাহা উপাধিত করিতে পারেন।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরকার এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন এই আশাই আমরা করি। এবং বাহাতে সরকার সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হন তজ্জ্ব প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিদের ‘তথ’ প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে উপযুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হইবে—এবং সে জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।”

—শিক্ষা ও কৃষি।

## হিন্দু-মুসলমান মহাসভা ?

“হিন্দুমহাসভা এক মজার কাণ্ড বাপাইয়া বসিয়াছেন। ভারতের মুসলমানরাও সভা হইতে পারিবেন বলিয়া ক্ষত্যায়া জারি করার ফলও হাতে-গাতে ফলিতে শুরু হইয়াছে। লক্ষ্যে ইহাতে সংবাদ আসিয়াছে, ৩৬ জন মুসলমান নেতা হিন্দু মহাসভার সভা হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। ভারতে হিন্দুদের আত্মা অজ্ঞান করিবার জন্য শিক্ষিত মুসলমানগণ অতি সম্মত অধিক সংখ্যায় মহাসভায় যোগ দিবেন বলিয়া নূতন মুসলমান সভাগণ আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সহিত মহাসভার এখন তবে পার্থক্য বহিল কান্ধানে, তাহা কে বলিয়া দিবে?”

—পঞ্জাবীসী।

## বজ্রায় চালান ?

“কৃত্যাত বজ্রা বন্দিত্বর্গের নির্বাসনে সম্প্রতি আবার রাজবন্দীদের পাঠান হুছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জেল থেকে বলে দলে ডেটিনিউকে প্রথম দমদম সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে আসা হুছে, সেখান থেকে নিঃশব্দে

বন্দীদের বজা দুর্গে চালান দেওয়া চলেছে। ইতিমধ্যে দময়ন্ত থেকে প্রায় সত্তর জন ডেটনিউকে বজাতে পাঠান হয়েছে, গত কয়েক দিনে আরও অধিক সংখ্যক বন্দী বজা দুর্গে পাঠানোর পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে বলে জানা গেছে।”

—জনসাধারণ।

### পর্দানসীনতার পুনঃপ্রচলন

“কয়েক দিন পূর্বে ঢাকার একখানি ইংরেজী দৈনিক পড়িলাম যে, উক্ত সহরে কয়েকটি মহিলায় বেওয়ালের গায়ে শোটার লাগাইয়া মৃগসমান মেয়েদের অন্তঃপুত্র বাহিরে আসাকে বে-শরীয়তী বলিয়া নিন্দা করা হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর শেবার্ধে পৌছিয়া এরূপ কথা শুনিতে হইবে তাহা কল্পনা করি নাই। আমরা যখন ফুলের ছাত্র ছিলাম তখন ‘প্রাশিকার প্রয়োজনীয়তা’ সম্বন্ধে কোন কোন শিক্ষক রচনা লিখিতে দিতেন। আজ কোন ছাত্রকে এরূপ রচনা লিখিতে কোন শিক্ষকই বলেন না, কারণ এরূপ রচনা লিখিবার প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়াছে এবং প্রাশিকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কাহারও মনে আর জাগে না। যুগের পরিবর্তন ঘটয়াছে। সব দেশে সব যুগে এমন এক দল লোকের সাক্ষাৎ পাই, যাঁহারা যুগ পরিবর্তন ও যুগ-ধর্মের লক্ষণ ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। তিস্তার জড়তা তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মৃগসমান মেয়েদের ঘরের বাইরে আসা কি বে-শরীয়তী? অবরোধ-প্রথা কি শরিয়ত-সম্মত? ইতিহাস এ প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছে তাহা আমরা বাহা জানি তাহা বলিতেছি।

মুসলমানগণ ভারত আশা সময় অবরোধ-প্রথাটী লইয়া আসে নাই, কারণ, তাহাদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না। অনাবৃত দেহ সাধারণ পুরুষের চোখে না পড়ে, সে ক্ষত মুসলমান নারী বোরখা পবিত্র। আরব, ইরান, মিশর, তুর্কী, কাবুল ইত্যাদি দেশের কসতামিনীরা বোরখা পরিয়া প্রকাণ্ড স্থানে বাইতে পারিত, প্রয়োজন বস্তু সঙ্কলের সহিত কথা বলিত, মসজিদে পুরুষ ও নারী একত্রে নারাজ আদায় করিত, এ সব কথা ইতিহাসে লিখিত। • • •

—বৃন্দার কথা।

### সজ্ঞা মানেই সাজবাতিক ?

“প্রকৃত কাজ—জনহিতসাধনের জন্য দেশে কত প্রকার কমিটি, ক্লাব, সমিতি ও সন্থা আদি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি ঐগুলি শ্রাণগত উচ্ছ্রা লইয়া জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইতার দ্বারা অনেক প্রকৃত কাজ হইতে পারে। সম্প্রতি তমলুক সহরে চোরের উৎপাত প্রশমনকল্পে পুলিশ ও সহরবাসী একযোগে কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় এবং রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাবের প্রায় ৪০ জন সভ্য অগ্রসর হইয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত সহরে রাতে পাহারাদি দেওয়ায় চোরের উৎপাত অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে, অধিকন্তু ঐ প্রকার তৎপরতার জন্য হু-একটি চোগাই মালের উদ্ধার হইয়াছে। রবীন্দ্র স্পোর্টিং ক্লাব এ ক্ষত সহরবাসীর প্রগতিশীল হইয়াছেন। আমাদের কাঁধি সহরেও ঐ প্রকার কত ক্লাব, সমিতি ও কমিটি আদি বর্তমান রহিয়াছে। ঐগুলি যদি কেবল বাক্যের দ্বারা কর্তব্য শেষ না করিয়া ঐ প্রকার কার্যে

উদ্যোগী হইতে পারে, তাহা হইলে ইতার সার্থকতার সঙ্গে সঙ্গে একটা জনকল্যাণও সাধন হইতে পারে। আজ কালের যুগ উপস্থিত, এ সময় কোন কাজে অগ্রসর না হইয়া কেবল খান্সাবাজীর দ্বারা নাম জাহির করিতে চাহিলে আর সাধারণের অসুখাগ আকর্ষণ করা হইবে না। এটি সব সময় সকলের শ্রবণ রাখা উচিত।”

—নীহার।

### গুপ্তচর বৃত্তি ?

“বর্তমানের পুলিশ সুপার পুলিশ বিভাগের তুনীতি দ্বীকরণের যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। পুলিশ বিভাগের তুনীতির বিষয় সর্বজনবিদিত। এই বিভাগটিকে তুনীতি-মুক্ত করিতে না পারিলে বিভাগটির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। রক্ষক হইয়া ভক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করায় এটি অতি প্রয়োজনীয় সরকারী বিভাগটির উপর জনসাধারণ দৃষ্টি ঘৃণা পোষণ করিয়া থাকে। সরকারী আরও কয়েকটি বিভাগ যুবের ক্ষত জনসাধারণের নিন্দার বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণ সরকারী কণ্ঠচারিগণ বর্তমানের পুলিশ সুপার প্রশ্রয়িত গুপ্তচর দ্বারা নিজ নিজ বিভাগ-গুলিকে তুনীতিমুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিলে সরকার ও সরকারী কণ্ঠচারিগণের উপর জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি হইবে। আমরা বর্তমানের পুলিশ সুপার যতদূরকৈ আন্তরিক ধর্মবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার পরিচালনায় বর্তমানের পুলিশ বিভাগ তুনীতিমুক্ত হইয়া দেশের প্রকৃত রক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হউক বলিয়া কামনা করিতেছি।”

—বর্তমান।

### দল ও শত দল

সাধারণ নির্বাচন বসন্ত আগাইয়া আনিতেছে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ততট বৃদ্ধি পাইতেছে। অবশ্য দলগুলি রাজনীতির অতি গোড়ার কথা, কিন্তু তাই বলিয়া দেশ অপেক্ষা দল বাড় নাহ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বোধানে সংশ্লিষ্ট স্থানে দল বা ব্যক্তির প্রশ্ন নিতান্ত তুচ্ছ। তাই মনে হয়, এই ভাবে অসংখ্য দলের সৃষ্টি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। দেশের বৃহত্তর স্বার্থটি কি তাহাটি আজ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। দেশের অনেকে মনে করেন যে, দেশ ভূমিতে বসিয়াছে আবার অনেকের ধারণা, দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি লিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সঙ্কটে দেশবাসী একমত বেন নহেন তাহাতে কোন ভুল নাই। বাহারা দেশে বর্তমান সমস্ত অবস্থা গিবেচনা করিয়া বলেন যে, দেশ স্বাধীনভাবে সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে চলিয়াছে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সম্মত বর্তমানের প্রভাবে আজ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যে ভাবে বিপর্যাস্ত হইতেছে তাহাতে দেশ ভেদে পাবে চলিয়াছে তাহাও বাহারা দেখিতে পায় না তাহারা ক্ষত। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সম্মতের প্রভাব হইতে মানুষের জীবনযাত্রাকে বৃদ্ধ করিয়া তাহার বৃদ্ধি গতি কিরাইয়া আনিতে হইলে আজ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মানুষের সম্পর্কে আসা এবং সত্যিকার অর্থহীন লইয়া মানুষের ক্ষত কাজ করা।

—জিহাদ।

## শোক-সংবাদ

মাসিক বসুমতীর জ্যেষ্ঠ সংহারী ছাপার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় স্বর্গত বটবুজ পালের সুযোগ্য পুত্র শ্রী হরিশঙ্কর পাল মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইলাম। হরিশঙ্কর (বটবুজ পালের তৃতীয় পুত্র) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এন্টাল পদীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার পিতার বিখ্যাত ঔষধ ব্যবসারে আত্ম-নিয়োগ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি ব্যবসার উন্নতির উদ্দেশ্যে ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। ব্যবসায়ী মহলে কোটিপতি হিসাবে সুনাম অর্জন করিবার পর তিনি স্নাতকতর কাগজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ সালে বেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনর আহ্বানে কলিকাতা কর্পোরেশনে যোগদান করেন এবং কলিকাতার দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত ওয়ার্ডের কাউন্সিলর থাকেন। ১৯৩০ সালে তিনি শ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৬-৩৭ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে তিনি অবিভক্ত বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। বেঙ্গল ভাষাশালার চেম্বার অব কমার্স, কমিটি এণ্ড ডায়াগনিস্ট এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ইমিউনিটি ফোর্স এবং অন্যান্য অনেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সদস্য হিসাবে হরিশঙ্কর বীর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কলিকাতার বহু ক্লাব ও সমিতির সভাপতি হিসাবেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হরিশঙ্করের জায় বাৎসিক, মিষ্ট-ভাতী, সদালাপী, সংল-ও সচরিত্র ব্যক্তি



অধুনা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশের শিক্ষা প্রসারের জগাও তিনি মুক্তহস্তে প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার যোগ্য সহধর্মিণী, দুই পুত্র, একমাত্র কন্যা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী হরিমোহন পাল এবং বহু আত্মীয়-স্বজনকে রাখিয়া গিয়াছেন। হরিশঙ্করের পুত্রস্বয় কমলকৃষ্ণ ও অমলকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্য ব্যবসার এবং সরল চিত্তের জগা অনেকের নিকট সুপরিচিত। আমরা হরিশঙ্করকে হারাইয়া আমাদের স্বজন-বিরোগ-বাথা অমূল্য করিতেছি। হরিশঙ্করের কীর্ষিই তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার আত্মা শান্তিলাভ করুক, এই প্রার্থনা।

বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কলিকাতার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মি: এস ওয়াজেদ আলী গত ১০ই জুন ৪৮ নং খাউতলা রোডে বাস-ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। মি: ওয়াজেদ আলী ১৮১০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার বড়তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি দেশে প্রত্যাভর্তন করেন এবং



কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। মি: ওয়াজেদ আলী বাঙ্গলা ও ইংলিশ ভাষায় এক জন সত্য লেখক। তাঁহার লিখিত কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ বাঙ্গলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ

করিয়াছে। তাঁহার “ভবিষ্যতের বাঙ্গালী” পুস্তকখানি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে বর্ধেই সমাদর লাভ করিয়াছে। মি: ওয়াজেদ আলীর মৃত্যুতে বাঙ্গলার এক জন সত্যিকারের সাহিত্যিকের অভাব হইল।

বিগত ২৫শে জ্যেষ্ঠ মাসনীর ত্রীচাক্ষুঃ বিশ্বাসের সহধর্মিণী শ্রীমতী স্ত্রীমতী দেবী ৫৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আকাশপোষ গ্রামের সুবিখ্যাত বস্তু-মল্লিক-পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ত্রীচাক্ষুঃ বিশ্বাসের সহিত স্ত্রীমতী দেবী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

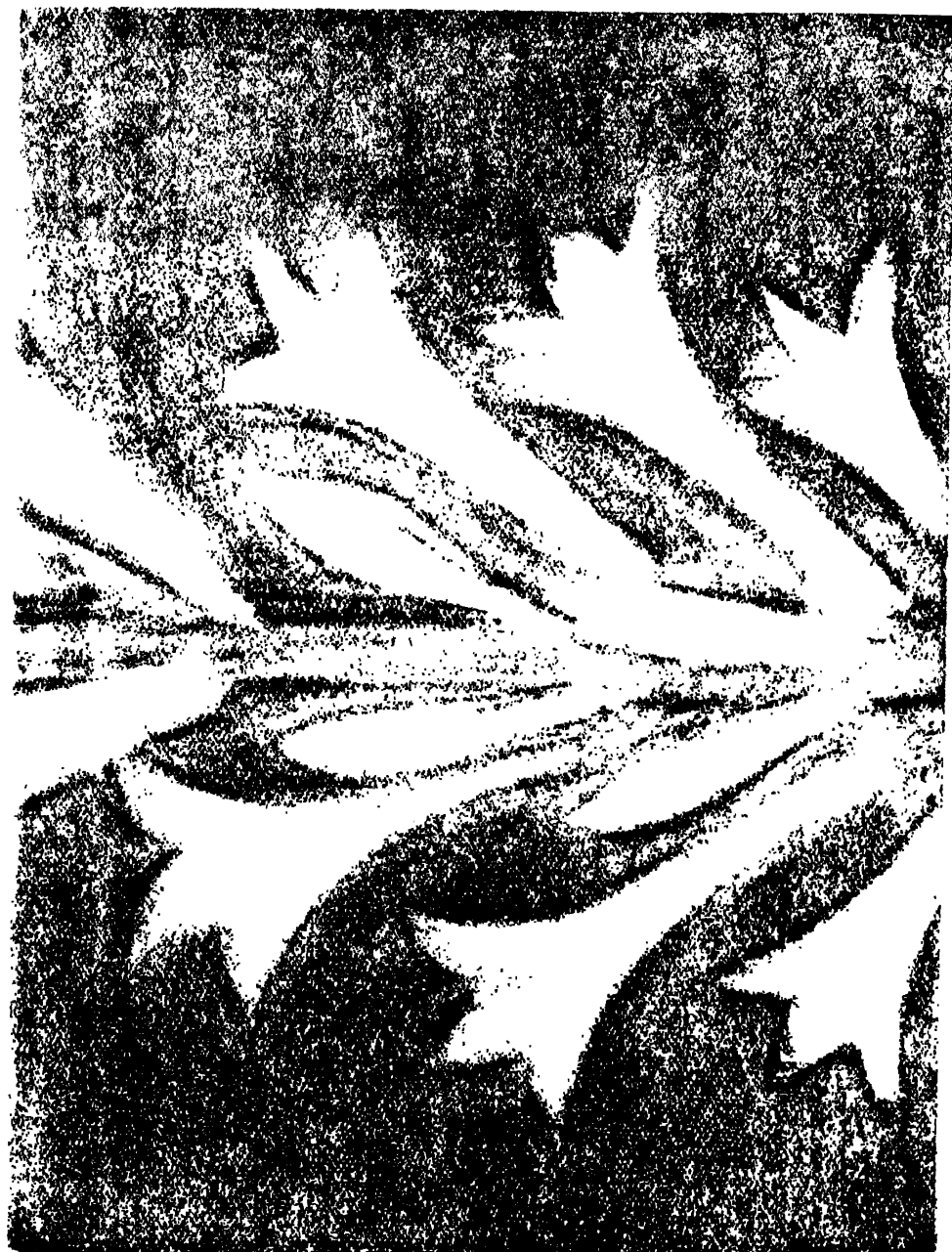
স্বামীর উচ্চ পদমর্যাদা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে কখনও গর্বিতা বলিয়া মনে করেন নাই। ধর্মকেই তিনি জীবনের একমাত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রীমতী দেবীর সংস্পর্শে যিনি আসেননি, তাঁর পক্ষে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য, সরলতা ও মহত্ব উপলব্ধি করা সম্ভবপর নহে। সাধুসঙ্গ তাঁহার প্রিয় ছিল।



এইরূপ আদর্শ হিন্দুনীরী অধুনা বিরল, এক কথা বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুকালে তিনি স্বর্গীকৃত্যবী, স্বামী, ছয় কন্যা ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে জীবদ্দশায় তাঁহার অপর একটি কন্যা গত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি ও তাঁহার আত্মার কলাশ কাশনা করিতেছি।

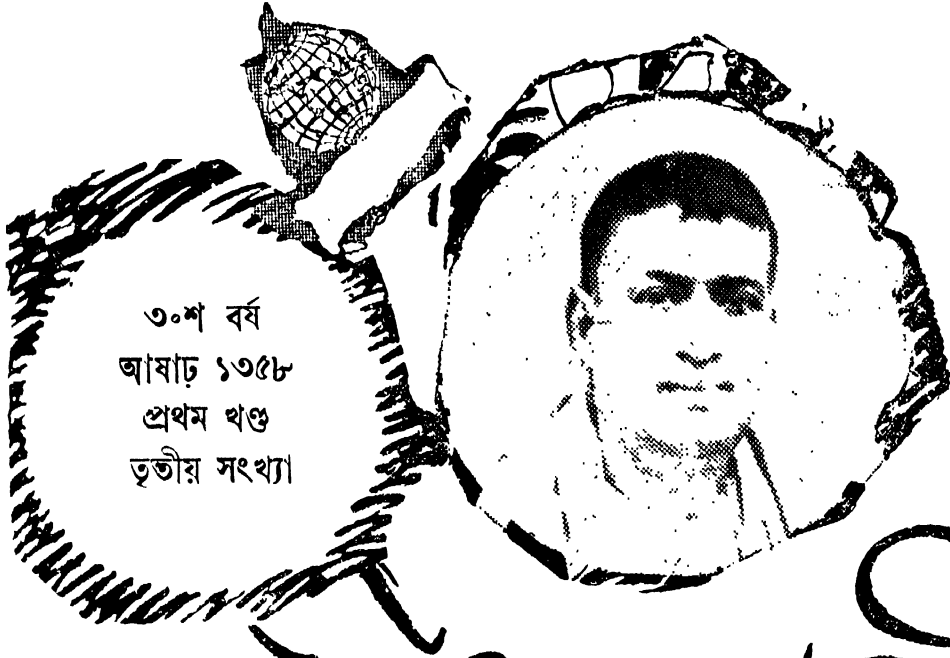
## সম্পাদক—শ্রী প্রাগতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, “বসুমতী মোটরী মেশিন” শ্রীশশিভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত





সতীশচন্দ্র যুথোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



# বাসক পুঁকিত

যুগবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ। “সে দিন তোমায় (গিরীশকে) যা বল্লুম ভক্তির মানে কি—না কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণকীর্তন, এই সব করা।

কলিতে নারদীয় ভক্তি—সর্বদা তাঁর নাম গুণকীর্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল-হরিবোল ব’লে তাঁর ভজনা করে।

ভক্তির আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ‘ঈশ্বর লাভ করে দেয়।’ এ আমি আমার মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়; অগ্নি শাকে অস্থখ হয়; কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উল্টে উপকার হয়; মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়; অগ্নি মিষ্ট খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অস্থখ নাশ করে।

নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হ’লে মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম।

প্রেম রজ্জুর স্বরূপ। প্রেম হ’লে ভক্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্য্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ’লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়েছিল।”

# পবন পুরুষ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চরিত্র

‘মন রে, চেয়ে দাখ । দেখছিস ?’

বড় তক্তপোশটিতে বসে আছে রামকৃষ্ণ । এক-সঙ্গে লাগানো ছোট খাটটিতে শুয়ে আছে সারদা । শুয়ে আছে লজ্জায় জড়সড় হয়ে । আগাগোড়া গা ঢেকে । শুধু পদতল দুটি অনাবৃত । পদ্মদলের মত পদতল । তাতে পদ্মরাগের আভা ।

ঘরে দুজন ছাড়া আর কেউ নেই । দরজায় খিল দেওয়া ।

থমথম করছে নিশুতি মধ্যরাত । এটা বসন্ত কাল না ? “ঋতুগাং কুসুমাকরঃ”—সেই মধু-ঋতু না এখন ? দক্ষিণেশ্বরের বাগানে গদগদ-গন্ধ ফুল ফুটেছে অনেক । গজার উপরে বাতাস মস্কর হয়ে এসেছে ।

‘দাখ চোখ ভরে । দেখছিস ?’

ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলছে না একটা ? জানলা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েনি ? দেখতে পাচ্ছিস না তোর অনুভূতির অন্তর্গত অন্ধকারে ।

‘পাচ্ছি ।’

‘কী দেখছিস ?’

‘একটি অমল ও অল্পম সৌন্দর্য । একটি অনাব্রাত কুসুম । একটি সর্বতোমুখী স্ত্রী ।’

‘চোখে কাব্যের অঞ্জন লাগিয়ে দেখতে হবে না । চেয়ে দাখ চর্মচক্ষু । কী দেখছিস ?’

‘একটি উদ্ভিন্নযৌবনা নারী । লাবণ্য-উমিলা শ্রোতস্বতী ।’

‘শুধু তাই ?’

‘স্বাস্থ্য সারল্য আর পবিত্রতার সমাবেশ । অম্পষ্ট, অল্পভুক্ত । বিরজ-বিশুদ্ধ বিশদ-বিশোক ।’

‘কে হয় বল দেখি তোর ?’

‘স্ত্রী হয় । যার সম্বন্ধে কোনো নিষেধ নেই, নিবারণ নেই । বরং যার পক্ষে শাস্ত্র, যার পক্ষে সংসারসৃষ্টি ।’

‘সেই স্ত্রী আজ তোর নিভৃত শয্যায় এসে শুয়েছে । যে বেঠন করে দীপ্তি পায় সে-ই স্ত্রী । যাতে নতুন করে নিজেকে জন্মগ্রহণ করানো যায় সে-ই জায়া । চেয়ে দাখ । সন্ত-প্রাণকরা স্ত্রী । এ সম্পূর্ণ তোর । তোর আয়ত্তের মধ্যে ।’

‘দেখছি । অনিন্দ্যকান্তি । অপক্লপ-সুন্দর ।’

‘হ্যাঁ, একেই বলে স্ত্রী-শরীর ।’ রামকৃষ্ণ মনের কাছে আরো উন্মুক্ত হল । বললে, ‘এরই নাম নারীমাংস । লোকে বলে এর চেয়ে ভোগ্য এর চেয়ে উপাদেয় কিছু আর নেই পৃথিবীতে । কি, আশ্বাস করবি ?’

‘কিন্তু—’ উন্মনা মন বিমনা হয়ে রইল ।

‘হ্যাঁ, তবে ঐ দেহেই যদি আবদ্ধ হয়ে থাকিস তবে আর সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে পাবি না । তখন বিবেচনা করে । নারী চাস না নারায়ণী চাস ?’

মন খুঁতখুঁত করে । তৃষ্ণার কুয়াশা সঞ্চিত হতে-না-হতেই জেগে ওঠে বৈরাগ্যের ত্রিষম্পতি । বললে, ‘কিন্তু কাম ভোগ করে কি কামের নিবৃত্তি হবে ?’

‘তা হবে না । সেই জানিস না যযাতি কী বলেছিল ? পুত্রের যৌবন চেয়ে নিয়েও তার কাম উপশম হল না । ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগে শাম্যতি । যতই আত্মতা ততই আকৃতি ।’

‘আর ঈশ্বরানন্দ ?’

‘ঈশ্বরানন্দ । এখানেও যত পান তত পিপাসা তফাৎ এই, ওখানে ক্ষয়, গ্রানি, ক্লান্তি, খেদ, অ এখানে নিরংশ, নিরস্তর, নিরতিশয় আনন্দ । যা বলেছিল বিরজ-বিশোক, বিশদ-বিশুদ্ধ—’

‘আমি ঈশ্বরানন্দ চাই ।’ মন মুখ ফেরাল ।

‘দেখিস, ভাবের ঘরে চুরি করিস নে । পেয়ে মুখে এক হ । মুখে বাহাহুরি মারবি আর পেয়ে খিদে থাকবে তা হতে পারবে না । যদি চ

জাহাজ টেনে নে স্বচ্ছন্দে। তোর হাতের  
গালের মধ্যেই তো আছে। আছে তোর  
মহিকারের গণ্ডিতে। লুকোচুরির দরকার নেই।’

রম্য-কচিরা শোভনা পুষ্পলতা। মন উসখুস  
হরে উঠল। সারদার অঙ্গ স্পর্শ করবার জন্তে হাত  
ঢাল রামকৃষ্ণ।

সেই উত্ততিতেই মন বেঁকে বসল। ধীরে-ধীরে  
কাথায় ডুব দিল অতলে। লীন হয়ে গেল আত্ম-  
রূপে। দেহমনোহীন অনাত্ম সচ্চিদানন্দে।

যে হৃদয়োৎসবরূপা সমানমনোরমা, সে কি এতই  
স্নেহ, এতই লঘু, এতই সহজলভ্য? তাকে আমি কী  
মূল্য দিলাম, তার পরীক্ষা হবে কিসে? তাকে আমি  
কাথায় এনে প্রতিষ্ঠিত করলাম—তাতে। তার  
মূল্যেই আমি মূল্যবান। তার মহত্বই আমি মহনীয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। কে যেন তাকে  
তলে দিলে জোর করে।

এ কি। তিনি এখনো শোননি? বিছানার  
পিরে ঠায় বসে আছেন? বসে আছেন নিশ্চল,  
নিঃসঙ্গ হয়ে। রাত এখন কটা হল না-জানি।  
কতক্ষণ এমনি বসে থাকবেন! ভোর হতে  
কি কত?

এমন ভাবাক্রান্ত কূটস্থ মূর্তি আর দেখেনি  
সারদা। তার ভয় করতে লাগল। জ্যোতিঃপুঞ্জময়  
দিব্যমূর্তি স্পর্শ করতে তার সাহস হয় না। কিন্তু  
কি করে এই ভাব ভাঙাবে রামকৃষ্ণের। কি করে  
নিয়ে আসবে তাকে তার স্বচ্ছ স্বাভাবিকতায়?  
এমনি বসে থেকে-থেকেই চলে যাবেন নাকি  
শেষকালে?

ব্যস্ত হয়ে ঘরের বার হল সারদা। বি কালীর  
মুখে কাছেই পাওয়া গেল। আকুল হয়ে বললে,  
শিগগির ভাগ্নেকে ডেকে আনো। উনি যেন  
কেমন হয়ে গিয়েছেন।’

কালীর মা গিয়ে ডাকাডাকি করে তুললে  
স্বয়ংকে।

কেমন আর হবেন! ভাবের ঘরে বাস করেন,  
পরের ঘোরে ভব হয়ে গিয়েছেন। নিজে ভবানী  
হয়ে এত ভাবিনী হবার কি দরকার।

হৃদয় গিয়ে রামকৃষ্ণকে নাম শোনাতে বসল।

যে নামে টান, সেই নামে জ্ঞান। আবার সেই  
নামেই পরিত্রাণ।

‘আমার প্রাণ-পিঞ্জরের পাখি, গাও না রে,  
ব্রহ্মকল্লতরুশাখে বসে রে পাখি, বিজু গুণগান  
গাও দেখি,

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সুপক ফল খাও না রে।’

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভক্ত।  
কিন্তু পাণ্ডিত্যভিমানই সব পণ্ড করেছে। ভক্তির  
চেয়ে শাস্ত্রের প্রতি বেশি পক্ষপাত। খুব পড়া-  
শোনা করেছে এমনি একটা ভাব দেখাতে সদা-ব্যস্ত।  
ইংরিজি আর সংস্কৃত বুকনি সর্বদা তার মুখে ফুটেছে।  
শব্দাঙ্কুরের প্রতি তার মুগ্ধ দৃষ্টি। সে এক ইচ্ছল  
করেছে, তার নাম প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষা-কাণ্ড-পরিবৎ।  
তার ছেলের নাম রেখেছে যুগাক্ষমৌলি পতিভূক্তি।  
হরিশ্চের নাম রেখেছে কপিঞ্জল। আর তার গুরুর  
নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে আসতে ঠাকুর বলে  
উঠলেন: ‘এ কি। এখানে জাহাজ এসে উপস্থিত।  
এখানে ছোটখাটো ডিঙি-টিঙি আসতে পারে।  
এ যে একেবারে জাহাজ!’

এ শুধু তার পণ্ডিতম্মন্যতার প্রতি কটাক্ষ।  
সকলে হেসে উঠলেও মহিমাচরণ হয়তো খুশিই হল।  
সে নৌকো নয়, সে জাহাজ।

এ জাহাজকে সহজ করে দিতে চাইলেন ঠাকুর।  
বললেন, নাম করো। নাম করলে অহঙ্কার দূরে  
যাবে। পাণ্ডিত্যের বাইরে সুখাভাওটিকে দেখতে  
পাবে তখন।

গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষ পরে একেক দিন চলে  
আসে মহিমাচরণ। বাঘের ছাল পেতে বসে  
পঞ্চবটীতে। রুদ্রাক্ষের মালা ফিরিয়ে জপ করে।  
কখনো একটা তানপুরা নিয়ে গান গায়। যেন কত  
বড় এক জন তন্ময় সাধক।

বাড়ি যাবার আগে বাঘের ছালটি ঠাকুরের ঘরের  
দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে।

‘এ কেন রাখে জানিস? দেখলেই লোকে  
জিগগেস করবে এ বাঘের ছাল আবার কার। তখন  
আমি বলব, মহিমাচরণের, আর তাতেই ওর মান  
বাড়বে।’

কেবল নিজের নাম, নিজের মান। ওরে, তাঁর  
নাম কর। তাঁর মান রাখ।

তাঁর নামেই বন্ধন মোচন হবে। বটের বীজ  
দেখেছিস? লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট।



তা, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? হয় একটি অক্ষর নয় দুটি অক্ষর। তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম—কত কি।

সেই নামের মন্ত্রই দিলেন মহিমাচরণকে। সহজ হবার সহজ নিয়ম। মুক্ত হবার সরল সূত্র।

‘শুধু এগিয়ে পড়ো। আরো এগোও। পাবে চন্দন কাঠ, কিন্তু ওখানে থামলে চলবে না, আরো এগোও। পাবে রূপোর খনি, থামলে চলবে না, আরো এগোও। তার পরে, সোনার খনি, পাবে হীরে-মানিকের খনি—তবু থামা নেই। এগিয়ে পড়ো। এহ বাহু, আগে কহ আর—’

মহিমাচরণ কাতর স্বরে বললে, ‘আজ্ঞে, টেনে রাখা য়ে। এগুতে দেয় না।’

‘কেন, লাগাম কাটো। বোড়া ছুটিয়ে দাও।’

‘কি ভাবে কাটব?’

‘শুধু তাঁর নামের গুণে কাটো। কালীর নামে যে কালপাশ কাটো।’

আর কিছু নয়, শুধু তাঁর নাম করো। একটু স্থির হয়ে বসে তাঁকে স্মরণ করো, আহ্বান করো।

যে নাম-দাতা সেই আবার নাম-প্রোতা। হৃদয় নাম শোনাতে লাগল।

ভাবভূমি থেকে সারা রাত আর নামন না রামকৃষ্ণ। নামধ্বনিতে সমাধি ভাঙল শেষকালে। প্রভাতের সৌম্যনয় এসে।

সারদাকে কাছে ডেকে নিল রামকৃষ্ণ।

‘একা-একা ঘরে আমাকে অমনি কাঠ হয়ে বসে থাকতে দেখে তোমার খুব ভয় করছিল, না?’

তা আর বিচিত্র কি। কোথায় শান্তিতে একটু ঘুমুবে, তা নয়, তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আসলে ভয় নয়, আসলে আনন্দ।

‘শোনো, আরো অনেক রকম হয়তো ভাব হবে রাত্রে। ভয় পাবে না। কোন ভাবে কোন মন্ত্র গুনিয়ে আমার জ্ঞান আনতে হবে তোমাকে সব শিখিয়ে দিচ্ছি।’

সারদা যেন ভরসা পেল।

কিন্তু, জানানো, ভাব ছাড়া লাভ নেই। ‘সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে? হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুষকে ধরে।’

আমি লোহা, তিনি চুষক। তিনিই আমাকে

ধরেছেন। মর্ত্যশয়ন থেকে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অনন্তশয়নে। যেখানে অনন্তনাগের উপরে বিষ্ণু শয়ান।

পর্যায়শি

শুধু প্রথম রাত্রি নয়, প্রতি রাত্রি।

ঘোমটাতে মুখখানি ঢেকে সর্বাঙ্গে কুণ্ঠিত হয়ে নিঃশব্দে শুয়ে থাকে সারদা। শুয়ে থাকে তরলিত সরলতায়। সমর্পিত প্রশান্তিতে। স্পৃহা নেই প্রতিবাদ নেই, প্রতীক্ষা করে আছে ধৈর্যের মত, তিতিক্ষার মত। তপস্যার মত।

নিদ্রাহীন নিশীথ বাঁ-বাঁ করছে। শোনা যাচ্ছে গজার কলস্বর।

হাত বাড়িয়ে ধরলেই হয়। টেনে নিলেই হয় আলিঙ্গনে। রক্ত থেকে কুসুমচয়নে এতটুকু কণ্টক নেই। স্নানাবতরণে নেই এতটুকু পদস্বলন।

কিন্তু আমি তো জৈব প্রয়োজনে নয়, আমি দৈব প্রয়োজনে। আমি যোল আনা করলে মানুষে যদি এক পয়সা করে।

তাঁই বলে গোঁ ধরে কিছু করে না। করে না কোনো অন্ধ একরোকোমি। সদস্য বিবেচনা করে করে। সারাক্ষণ মনের সঙ্গে চলে কঠিন বোঝা-পড়া। চলে জটিল বাদামুবাদ, সূক্ষ্ম বিচারমীমাংসা। মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দেয়, মিঠুর হাতে তার টুঁটি টিপে ধরে না। বল না কি বলবি, যা না কোথায় যাবি, নে না যা তুই চাস। কিন্তু তার আগে আমার পাশে বোস একটু শান্ত হয়ে। আমার সঙ্গে দুটো কথা ক। গোঁয়ারের মতন অমন গোঁজ হয়ে থাকিস নে। ক্ষুতি করে তর্ক কর আমার সঙ্গে। মামলায় যদি তুই জিতিস আমাকে তুই বেঁধে নিয়ে যাস জেলখানায়।

জানি, তুই কি বলবি। কিন্তু কত দিন ধরে করতে পারবি এই দেহস্তব, তাই শুধু আমাকে বল। লতাপাতাঘেরা শান্তশীতল মাটির কুটিরের যে যেতে চাস তার মাধুর্য কি আমি জানি না? কিন্তু তার চেয়ে—তাকিয়ে ছাখ দেখি এই রাত্রির আকাশের দিকে, এই অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারের দিকে,—এই মহা-মৌনের মধ্যে ঈশ্বরের মন্দিরটি কি বেশি রমণীয়, বেশি মোহনীয় নয়? আর কী তুই চাস এই শ্মশান-নাট্যের রঙ্গশালায়? যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাস্প?

যোগবাশিষ্ঠ পড়িসনি? রামচন্দ্র কী বলছেন? বলছেন, যুবতীর চর্ম-মাংস-রক্ত-বাস্প যদি আলাদা-আলাদা করে রেখে সৌন্দর্য দেখতে পাও, তবে দেখ তাই এক দৃষ্টে। নইলে মিছে আর কেন মুগ্ধ হওয়া?

জোয়ারের জলের মতন এই যৌবন। অল্লোচ্ছসিত, অচিরস্থায়ী। কিন্তু ভুবনব্যাপী এই ঈশ্বরসিদ্ধি। এ চিরকাল সমানশ্রোত, অচ্ছিন্নপ্রবাহ। বল, স্নানের জন্তে কোন ঘাটে তুই অবতরণ করবি?

তোর উপরে আমি জোর খাটাতে চাই না। তুই জাগ্রত, বুদ্ধিমান, কুশাগ্রতীক্ষ্ণ। তুই নিজেই হিসেব করে ছাখ। ক্ষয়দ্বারে যাবি, না, কি যাবি অক্ষয় মন্দিরে?

বুদ্ধদেবের সংসারত্যাগের আগে কতগুলি সুন্দরী যুবতী এসেছিল তাঁকে প্রলুব্ধ করতে, প্রতিনিবৃত্ত করতে। দীর্ঘ রাত প্রমোদোৎসবে মাতামাতি করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। তাদের দিকে তাকালেন বুদ্ধদেব। নন্দ্রার বিকৃতিতে কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মেয়েগুলোকে। বুদ্ধদেব দেখলেন এ তো শ্মশান, এখানে আবার প্রমোদলীলা কোথায়!

মন, তাই বলি, তুই কি এক বেলার কাঙালী-ভোজনে যাবি, না, যাবি চিরন্তন অমৃতের নিমন্ত্রণে?

ভিক্ষু মহাতিস্ পর্বতচূড়ায় বসে তপস্তা করেন। পাহাড় থেকে নেমে সেদিন চলেছেন অনুরাধাপুর গ্রামের দিকে। সেই গ্রামের এক সুন্দরী যুবতী স্বামীত্যাগ করে সেদিন পথে বেরিয়েছে। সহসা দেখা হল সেই সৌম্যদর্শন ভিক্ষুর সঙ্গে। যুবতী বিলোল কটাক্ষ করে মন্দির অধরে হেসে উঠল। ভিক্ষু তাকালেন তাঁর দিকে। দেখলেন বিকশিত মল্লিকার মত সুন্দর দন্তপঙ্ক্তি। কিন্তু মনে হল যেন কঙ্কালের হাসি। এক অস্থিসার কঙ্কাল তাঁর দিকে চেয়ে বিকটবদনে হাসছে।

কিছুক্ষণ পরে সেই যুবতীর স্বামীর সঙ্গে দেখা। স্বামী জিগগেস করলে, 'এই পথে কোনো নারীকে আপনি দেখেছেন?'

'নারী?' ভিক্ষু উদাসীনের মত বললেন, 'নারী না পুরুষ বলতে পারব না। দেখলাম একটা কঙ্কাল হেঁটে যাচ্ছে।'

মন, বল, নারীকে কঙ্কালে নিয়ে যাবি, না, তাকে মনোময়ী প্রতিমা করে বসাবি হৃদয়ের পদ্মাসনে?

যুবতীর মাথার খুলিটি একবার কল্পনা কর। সেই তো তোর মহামোহের কাঁদ। কিন্তু সেই যে মুখারবিন্দ সে এখন কোথায়? কোথায় সেই অধরমধু? কোথায় সেই আয়ত কুটিল কটাক্ষ? কোথায় সেই দন্তরুচিকৌমুদী? কোথায় বা সেই মঞ্জুগুঞ্জ আলাপন? কোথায় বা সেই মদনধনুর মত ভঙ্গুর ক্রবিলাস? এই করোটির বাটিতে তুই আর কী মদিরা পান করবি?

মন, শোন, একটু অমৃত-মদ খাবি? পাত্র খুঁজহিস? খুরি-খুলি লাগবে না। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই সেই অমৃতের ভাণ্ড।

রামকৃষ্ণ আবার সমাধিতে বিলীন হল।

নিশ্চক্ৰতারও বুঝি ডাক আছে। সেই মৌনের ডাকে জেগে উঠল সারদা।

দেখল যেন কপূরগৌর মহাদেব বসে আছেন। পর্বতের মধ্যে মহামেক্ষ, সরোবরের মধ্যে মহাসাগর। তুমি সর্বধাত্রী ধরিত্রী। আমি ঋত, সত্য, ধৈর্য, শ্রেয়, শৌচ, সন্তোষ। তুমি দয়া ক্ষমা নীতি কান্তি লজ্জা সহিষ্ণুতা। আমি বিগত-বিষয়-রস-রাগ। তুমি সর্বরাগস্বরূপিণী।

তুমি দিব্যাস্বর, আর আমি দিগম্বর।

ঠিক-ঠিক নামটি মনে আছে সারদার। এই ভাবে কোন মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে স্মৃতিতে উজ্জল হয়ে আছে। তাই সে নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করতে লাগল। সেই উচ্চারণে মিশল এসে তার ধৈর্যের মাধুর্য, তার সম্মতির স্নিগ্ধতা।

তুমি স্মৃতি তুমি মেধা তুমি বাক্য।

আমি উপলব্ধি আর তুমি উচ্চারণ।

সমাপি ভাঙল রামকৃষ্ণের। ঘোমটা সরিয়ে পরিপূর্ণ চোখে দেখছিল বুঝি সারদা। রামকৃষ্ণের ধ্যান ভাঙতেই ত্রস্ত হাতে মুখের উপর আবার ঘোমটা টেনে দিলে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'এবার তুমি একটু শোও। রাত পোহাতে এখনো খানিক দেরি আছে।'

কিন্তু এমন করেই কি কাটবে রাতের পর রাত? কে একজন জ্বীলোক ধরে বসল সারদাকে। তুই কি শ্রাকা না বোকা?

'কেন, কী হয়েছে?' সারদা অবাক হয়ে রইল।

'তুই কি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানিস না?' জ্বীলোকটি আবার বিক্রপ করে উঠল : 'গাঁয়ের মেয়ে

বলে কি তুই এমনি আত্মসম্মতি হবি ? গাঁয়ের মেয়ে কি আর বিয়ে করে না ? স্বামী নিয়ে ঘরসংসার করে না ? তাদের ছেলেপুলে হয় না ?

‘তা, আমি কী করলাম।’

‘তুমি হাঁদী, তুমি আবার কী করবে ? বলি, তোর স্বামীকে কি তুই ভেসে যেতে দিবি ? সংসারে তার মন নেই, সে মন তুই জাগিয়ে দিবি নে ? ভোগের দিকে তাকে টেনে আনবি নে ? তোর কপাল তুই চিবিয়ে খাবি ? ধর্মপত্নী হয়ে এমন অধর্ম ঘটাবি তুই ?’

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল সারদা। অধর্ম। তার ঠাকুর তাকে দিয়ে অধর্মের অভিনয় করিয়ে নিচ্ছেন ?

‘তা ছাড়া আবার কি ? তাকে বিয়ে করেছে অথচ তাকে তোর সংসারধর্ম কবতে দিচ্ছে না, এ তো ঘোরতর অধর্ম। তুই স্বীকার করেছিস, তুই এবার মা হবি নে ? তুই তোর পাওনা-গণ্ডা ছাড়বি কেন ? স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নিবি যোল আনা। বলবি গিয়ে সোজাশুদ্ধি—আমি সন্তান চাই। আমি মা হব।’

সরলতার প্রতিমূর্তি সারদা।

রামকৃষ্ণকে সেই রাত্রে বললে তাই সে স্পষ্ট করে। ধোঁমটা-ঢাকা মুখের মধ্য থেকে কেমন অদ্ভুত শোণাল কথাগুলি।

‘সবাই বলছে, আমার একটাও ছেলেপুলে হবে নি ? বিয়ে হয়েছে আমার, তা নইলে সংসারধর্ম বজায় থাকবে কিসে ?’

কথা শুনে চমকে উঠল রামকৃষ্ণ। সারদার মুখে এ কী কথা !

সারদা উপযাচিকা হয়ে পা টিপতে লাগল রামকৃষ্ণের। ছোট খাটটিতে তার শোবার কথা, বড় তক্তাপোশটিতে এসে বসল।

মহামায়ার চাতুরী বুঝতে পেরেছে রামকৃষ্ণ। সে হাসল মনে-মনে। মন্দিরের ভবতারিণীকে উদ্দেশ্য করে বললে, ‘তোর চালাকি ধরতে পেরেছি। তুই এত দিন নিজের মূর্তিতে এখানে ছিলি, আজ তোর কী খেয়াল হল, জীবন মূর্তি ধরে এলি আমার কাছে। তুই যদি তাই আসতে পারিস আর আমার কাছে। তুই আসতে পারলে আমার ভয় কী।’

সারদা আড়ষ্ট হয়ে রইল। চকিতে কেমন যেন হয়ে গেল আরেক রকম।

রামকৃষ্ণ বললে, ‘তুমি মা হতে চাও ? তা মোটে একটি ছেলে খুঁজছ কি গো ? দেশ-দেশান্তর থেকে তোমার কত ছেলে আসবে, সব মাতৃমন্ত্রে মাতোয়ারা। তুমি যে তখন মা-ডাকে তিষ্ঠোতে পারবে না।’

সারদার মুখে আর কথা নেই। দেহে আর দেহবোধ নেই।

ঠিকই হয়েছে। মহামায়া ঠিক ভাবটিই এনে দিয়েছেন তোমার মধ্য। তুমি জীবের জননী হবে। যে বিশ্বজনের জননী হবে তার মধ্য এই সন্তান-কামনাটি না এলে চলবে কেন ? তোমার তো এ শুধু দেহস্থলের চলনা নয়, তোমার এ শুধু মাতৃ-ভাতি। ঈশ্বরের এই সংসারে, এই পরমানন্দের মন্দিরে, তুমি লীলালাবণ্যকলাগী শ্রীমতী মাতা।

সারদা সরে গেল নিজের খাটে। আত্মানন্দে ঘুমিয়ে পড়ল।

রাতের পর রাত চলতে লাগল এই রক্তিহীন বিরতির পরীক্ষা। এই বিরতি দিয়ে ঈশ্বরের আরতি।

একই বলে সহজ-অটুট অবস্থা। সহজ, কেননা স্বস্থানে নিয়তস্থিত ; আর অটুট, কেননা ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুতি নেই এই এক বিন্দু।

এ হচ্ছে সেই অবস্থা—‘রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।’

ঈশ্বর দর্শন হলে রমণ-স্থলের কোটি গুণ আনন্দ হয়। গৌরীচরণ বলত, মহাভাব হলে শরীরের রোমকূপ পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। একেকটি রোমকূপে আত্মার সহিত মহারমণ হয়।

পতঞ্জলি বলেছে, ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাতেই বীর্য লাভ। যার বীর্য আছে তারই ভক্তি আছে। যার বীর্য আছে তারই আছে বজ্রবন্ধন। তারই আছে অনন্ত-চিন্ততা।

রামকৃষ্ণ উত্তীর্ণ হল সেই বীর্যের পরীক্ষায়। সেই স্ত্রীস্থের পরীক্ষায়।

‘রাধুনি হইবি ব্যঞ্জন রাধিবি হাঁড়ি না ছুঁইবি ভায়, সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি সাপ না গিলিবে

তায়।

অমিয় সাগরে সিনান করিবি কেশ না ভিজিবে তায় ॥”

উত্তীর্ণ হলেন সেই নির্বিকল্পের সাধনায়।

তুমি বীর্যবতী বিদ্যা। তুমি বলবতী মেধা।

তুমি ধারণাবতী স্মৃতি।

সারদাকে ডেকে তুলল রামকৃষ্ণ। বললে, 'তোমাকে আবার সেই কথা জিগগেস করছি, সারদা! তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে চাও?'

'না।' সারদা বললে, 'তোমাকে তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে চাই।'

'বেশ।' তৃপ্তির প্রসাদে বুক ভরে গেল রামকৃষ্ণের। বললে, 'এবার তবে ঘুমোও নিশ্চিন্ত হয়ে।'

কতক্ষণ পরে আবার ডেকে তুলল সারদাকে। বললে, 'সত্যি করে বলো তো, তোমার কী মনে হয়, আমি কি তোমাকে ত্যাগ করেছি?'

'বা, তা কেন মনে হবে? আমাকে তুমি গ্রহণ করেছ।' শাস্ত্র সমর্পণে ঘুমুল সারদা। এ অর্পণ কে বলে? এ অর্চনা।

রামকৃষ্ণ বললে, তুমি বাণী। তুমি করুণা। তুমি আমার নামস্বাদময়ী ভিক্ষা।

যোগেন-মা বড়লোকের ঘরের বউ, কিন্তু সংসারের জ্বালায় বড় জ্বলছে। তাপহরণের খবর পেয়ে সটান চলে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ তাকে স্থান দিলে। বললে, সারদার কাছে যাও। শাস্তির স্পর্শটি ওর কাছে।

ছুদিনেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল যোগেন-মা। যেখানে একনিষ্ঠ সেখানেই ঘনিষ্ঠ।

তার কাছে সারদা আক্ষেপ করল, 'ওঁর কেমন ভাব হয় দেখলে!'

'দেখলুম।'

'আমার ইচ্ছে হয় আমারো এমনি ভাব হোক। তুমি ওঁকে গিয়ে একটু বলবে?'

'কি বলব? যোগেন-মা তো অবাক।

'যাতে আমাকে একটু ভাব-টাব দেন। আমার নিজের বলতে বড় লজ্জা করে।'

একা তক্তপোশে বসে আছে রামকৃষ্ণ, যোগেন-মা প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। সারদা কি বলেছে বললে সরলের মত।

রামকৃষ্ণ কথা বলল না। গভীর হয়ে রইল।

নহবতে ফিরে এল যোগেন-মা। দেখল সারদা

পুজায় বসেছে। সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক করল।

দেখল আপন মনে হাসছে সারদা। কতক্ষণ পরেই আবার দরবিগলিতধারে কান্না! কতক্ষণ পরে একেবারে সমাধিস্থা।

'তবে না তোমার নাকি ভাব হয় না?' সমাধি-শেষে সানন্দ কণ্ঠে প্রশ্ন করল যোগেন-মা।

সলজ্জ মুখে হাসল একটু সারদা। বললে, 'কি জানি যোগেন, কেমনতর হয়ে গেল। একটা মহানন্দের মধ্যে গিয়ে পড়লুম। তাঁর ভাবের ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তিনি আমার চর্মস্পর্শ করেননি বটে, কিন্তু তিনি যে আমার মর্মস্পর্শ করেছেন।'

তুমিই নিতে পারবে আমার ভাব। 'তুমিই ভবভয়শমনী সর্বসিদ্ধিপ্রদাতী।

ছেচন্নিশ

আর আমাকে ছলনা করিস নে মা। আমি তো কামজয় করেছি, কিন্তু ওর মধ্যে কামভাব আনিস নে।

আকুল হয়ে প্রার্থনা করে রামকৃষ্ণ। ও যদি কামময়ী কামিনী হয়ে ওঠে, তা হলে, কে জানে আমার এই তেজ-বীর্য ধুয়ে যাবে কি না। কে জানে, সংযমের বাঁধ ভেঙে জাগবে কি না দেহবুদ্ধি।

তাই মা, আমি তোর দুয়ার ধরে পড়ে আছি, আমাকে কৃপা কর। সারদাকে তুই সারভূতা করে দে। আমি যদি মা প্রেম, সারদা পবিত্রতা।

সংসাররঙ্গমঞ্চে এ কী অদ্ভুত প্রার্থনা। নবীন-র্যোবনা জ্বীকে সামনে রেখে এক জন সমর্থ-সুস্থ বীর্যবান যুবকের অসাধারণ আরাধনা। আমার জ্বীকে কামমোহিনী করিস নে, কালমোহিনী করে দে।

আমি আর কিছু চিনি না। আমি শুধু তোকে চিনি। 'আমার মা আছেন আর আমি আছি।' আমাকে কে টলায়? 'ঝড়ে গাছ নড়ে যত, তরু বক্রমূল তত।'

মা কৃপা করলেন। ধরা দিলেন সেই ঘরে এসে। ধরা দিলেন সারদার মধ্যে।

লবকুশ হনুমানকে খুব কষে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। ছোটটি হয়ে হনুমান বাঁধন নিলে সর্বাঙ্গে। দেখে লবকুশের মহাখুশি। মহাবীর ধরা পড়েছে।

তখন হনুমান বললে :

'ওরে কুশীলব করিস কি গৌরব

ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে?'

কৃপা করে মা-ই ধরা দিয়েছেন। করালেনও তিনি, পাণ্ড্যালেনও তিনি। তিনিই সারদার মধ্যে দেখালেন জগদীশ্বরীকে।

আট মাস এক শয্যায় রাত কাটাল ছুজনে। সে এক বিচিত্র সাধনা। শবসাধনার চেয়ে ভীষণ-তরো কঠিনতরো সাধনা—এই সজীব সাধনা। আগুন যত জ্বলে যি তত জমাট হয়। সূর্য যত জ্বলে তত সংহত হয় তুষার। চন্দ্র যত পূর্ণ হয় তত শাস্ত হয় সমুদ্র। এ এক অভিনব সাধনা। শব-সাধনা নয়, নব সাধনা।

‘আমার অন্তরে আনন্দময়ী  
সদা করিতেছেন কেলি,  
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি  
নামটি কভু নাহি ভুলি।  
আবার হুঁ আখি মুদিলে দোখ  
অন্তরেতে মুগ্ধালী ॥’

সাধন শেষে রামকৃষ্ণ ঠিক করল সমারোহে একবার কালীপূজা করব। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্তা—১২৮০ সাল—ফলাহারিণী কালীপূজার দিন। সেই দিনটিই প্রশস্ত।

কিন্তু কালীপূজা মন্দিরে হবে না। কালীর যে ‘গুপ্ত ভাবে আগুলীলা।’ তাই তার পূজাও হবে গুপ্ত ভাবে। রামকৃষ্ণের নিজের ঘরে।

পূজা হবে স্ত্রীর। ষোড়ালীকৃপিনী সারদার।

‘মা বিরাজে ঘরে ঘরে

জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।’

মন্দিরে জাঁকজমক করে মামুলি পূজা হচ্ছে। সে পূজার পূজারি হৃদয়। তাই নিয়ে সে শশবাস্ত। রামকৃষ্ণ বললে, ‘এ দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস।’

ঠিক আছে। সব জোগাড়যন্ত্র করে দিয়েছে হৃদয়। দীঘল বলে একটি ছেলে, জ্ঞাতিসম্পর্কে ভাই-পো হয়, রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজা করে, ফুল-বেলপাতা জোগাড় করে আনলে। জিগগেস করলে, এ কেমনতরো পূজা?

রামকৃষ্ণ বললে, ‘এ রহস্যপূজা।’

রাত নটা। কালীবাড়িতে নানা গান-বাজনা হচ্ছে, সর্বত্র হৈ-রৈ। রামকৃষ্ণের ঘর বন্ধ। রামকৃষ্ণ অমুপস্থিত।

তার খোঁজ আর কে নেয়।

সারদাকে বলা ছিল আগের থেকে। যেমন-কে-তেমন সাধারণ বেশে মুখে ঘোমটা টেনে রাত নটার সময় ঠিক এসে ভেজানো দরজায় ঘা দিলে। রামকৃষ্ণ তাকে এনে বসাল পিঁড়ির উপর।

পিঁড়ির উপরে আলপনা-আঁকা। সামনে-পাশে পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো।

রামকৃষ্ণ বললে, ‘বোসো। পশ্চিমমুখে হয়ে বোসো।’ বলতে-বলতেই বন্ধ করে দিলে দরজা।

রামকৃষ্ণের তত্ত্বপোশের উত্তর পাশে গজাজলের যে জালা ছিল তার দিকে মুখ করে বসল সারদা। রামকৃষ্ণ বসল পূবমুখে হয়ে। যেখানে পশ্চিম দিকের দরজা তার কাছে।

প্রথমে সারদার পায়ে আলতা পরিয়ে দিল রামকৃষ্ণ। কপালে-মাথায় সিঁচুর মাখিয়ে দিলে।

স্পর্শনেই সারদার অর্ধবাহুদশা হয়ে গেল।

তার পর পরনের শাড়ি ছাড়িয়ে নিয়ে পরিয়ে দিল নববস্ত্র। খালায় করে মিষ্টি দিল খেতে। বললে, খাও। খাবার পরে পান দিল মুখে।

যোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে ‘ষোড়শীর’। পূজার উপকরণগুলি সংশোধিত হল। মন্ত্রপুত জল দিল সামনের কলসে, যথাবিধানে অভিষিক্ত করল সারদাকে। ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ—প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল রামকৃষ্ণ :

‘হে কালিকা, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী জননী, হে ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদার উন্মুক্ত করো। এর দেহমন পবিত্র করে এতে আবিস্কৃত হও, এতে বিরাজিত থাকো। জগৎসংসারের সর্বকল্যাণকরণ সম্পূর্ণ করো।’

হে কপালিনী, আমাকে ভার্য্য দাও মনোরমা। শুধু মনোরমা নয়, মনোবৃত্তি-অনুসারিণী। আমি যদি ভাবাতীত হই, ও-ও হোক তদভাবভাবিত। আমাদের দৈহিক বিবাহ নয়, আত্মিক বিবাহ। আমাদের আত্মানন্দ।

পূজার চরম উপচার প্রণাম। জপ ধ্যান প্রার্থনা উপাসনা—সমস্ত কিছুই এই শেষ প্রণামটির অঙ্কে। এ প্রণিপাতটিই শেষ অর্থ্য। রামকৃষ্ণ বিশ্বপত্রে নাম লিখল। আগে-আগে যত সাধন-ভজ্ঞন করেছে তার সব বেশবাস তোলা ছিল সযত্নে—তাই নামিয়ে একসঙ্গে করলে। রুদ্রাঙ্কর মালা, কবচ, যা কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল, তাও বাদ দিলে না। সকল

আবরণ-আভরণ, সকল সাধনসিদ্ধির ধন একত্র করে সারদার পায়ে অঞ্জলি দিলে। বললে, 'যত জপ-তপ সাধন-ভজন যত আচার-বিচার, যত কর্মকাণ্ডের মালা—সব তোমার ছুটি পায়ে অর্পণ করলাম। এ পূজাতেই আমার সমস্ত পূজার ইতি হল।'

বলে সারদাকে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।

সারদা দেখছে সব চোখ মেলে। কিন্তু সাড় নেই, মুখে কথা ফুটেছে না।

মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করেছিল এক দিন। আজ আবার অপ্রমেয়াকে প্রতিমায় নিয়ে এল।

সারদা শঙ্খকঙ্কণধারিণী লোকমাতা।

'হে সর্বমঙ্গলস্বরূপা সর্বার্থসাধিকা, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নী, সনাতনী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।'

আত্মনিবেদন করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় তিন প্রহর, ধ্যান ভাঙল রামকৃষ্ণের। সারদা তখনো নিশ্চল হয়ে বসে আছে পিঁড়িতে। তদগত তন্ময় হয়ে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'পূজা শেষ হয়েছে। এবার যেতে পারো নবতে।'

সারদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পিঁড়ি ছেড়ে। উঠেই নবতের দিকে ছুট দিলে। একটা প্রণাম করে আসা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারল না। ছি, ছি, নিশ্চয়ই ঠিক ছিল। মনে মনে তাই এখন প্রণাম করলে রামকৃষ্ণকে। পূজা-পূজকে ভেদ নেই সেই ভাবাতীতের রাজ্যে।

লক্ষ্মী বললে, 'তোমার এত লজ্জা, তুমি কাপড় পরাতে দিলে কি গো।'

'কি জানি, আমি তখন যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম।'

'তার পর উনি তোমাকে মিষ্টি খাওয়ালেন, পায়ে স্নান দিলেন, হাত দিলেন, তুমি ঠায়ে বসে রইলে?'

'কি জানি বাপু, বসে রইলুম। সব দেখছি বটে, কিন্তু কথা বলতে পারছি না, নড়তে-চড়তে পারছি না।'

'আর কেউ টের পেল না?'

'কি করে পাবে। দরজা বন্ধ যে।'

তুমি মহাশক্তি। মহাশক্তি না হলে এ পূজা গৃহণ করে এমন শক্তি কার?'

সেই থেকেই ভাব হয় সারদার।

নবতের ঘরটিতে শুয়ে আছে সারদা, তারই

বিছানার এক পাশে যোগেন-মা ঘুমুচ্ছে। রাত্রে কোথাও হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠল।

বাঁশির স্বরে ভাব হল সারদার। যেন সে বেণু-বিনোদিনী রাধিকা হয়ে গেছে। থেকে-থেকে হাসতে লাগল আপন-মনে। দেখতে লাগল বুঝি বা সেই বংশীবটবিহারীকে।

বিছানার এক কোণে তাড়াতাড়ি সরে বসল যোগেন-মা। বসেই রইল যতক্ষণ না ভাব ভাঙে। ভক্তিমতী হলে কি হয়, সংসারের মধ্যে তো আছে, যোগেন-মা ভাবল, যদি তার ছোঁয়া লেগে সারদার ভাব কেটে যায়।

সেই ভাবের চরম হল নীলাধর বাবুর বাড়িতে। ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন শ্রীমা, পাশে গোলাপ-মা, যোগেন-মা বসে। খ্যানের পর আর সমাধি ভাঙে না শ্রীমার। অনেক নাম শোনাবার পর হুঁস যদি বা এল, শ্রীমা উদ্ভ্রান্তের মত বলতে লাগলেন, 'ও যোগেন, আমার হাত কই, আমার পা কই? আমি কি করে ঢুকবো এই শরীরের মধ্যে?'

শ্রী-ভক্তেরা শ্রীমার হাত পা টিপে দিতে লাগল—এই যে পা, এই যে হাত। তবু, দেহটা যে কোথায় পড়ে রয়েছে, চট করে খুঁজে পাচ্ছেন না।

সারদা চলে গেল নবতে। রামকৃষ্ণ বললে, এবার শান্তিতে ঘুমোও গা মেলে। আমার কাছে থাকতে, আর সারা রাত বসে থাকতে জেগে, কখন কী ভাব হয় আমার আর কখন কী নাম-মন্ত্র বলে আমাকে সচেতন করো। এতে কি কারু সুখ থাকে না শরীর থাকে? তুমি মার কাছে নবতে গিয়ে ঘুমোও।

তাই যাব। তুমি যেমন নাচাও তেমনি নাচি। যাব বিরহের মন্দিরে, সেখানেই বিশ্বনাথের আরতি করব। আমার বসন নিয়েছ, তুমি নাও আমার সমস্ত বাসনা।

বিহ্বলের শ্রী স্নান করছে, ঘরের বাইরে কৃষ্ণের ডাক শোনা গেল : বিহ্বর। বিহ্বর। কৃষ্ণকণ্ঠের স্বর শুনে বিহ্বল-বাকুল হয়ে বিহ্বর-পত্নী ছুটে এল গৃহদ্বারে। কিন্তু, কি লজ্জা, ব্যাকুলতায় বসনখানিই ফেলে এসেছে ভুল করে। তখন আর পিছু সরবার পথ নেই, কৃষ্ণের কাছে সে সম্পূর্ণ উন্মোচিত। কৃষ্ণ তক্ষুনি তার নিজের উত্তরীয় বিহ্বর-পত্নীর গায়ে ছুঁড়ে দিল। তবু হাতে তাই দিলাম কোন রকমে গা

ঢাকবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে লজ্জা তার বেশি নয়। কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এল। কিন্তু কী যে খেতে দেবে ভেবে পেল না। দেখল বাড়িতে শুধু পাকা কলা ছাড়া কিছু নেই। তাই একটা ছিঁড়ে খেতে দিল কৃষ্ণকে। কিন্তু ভাবে-ভক্তিতে এমনি বিবশ হয়ে গিয়েছে যে, কলা না দিয়ে খোসা দিয়ে ফেলেছে। আর তাই কৃষ্ণ খাচ্ছে তৃপ্তি করে। ভক্তের কলা আর খোসা দুই-ই সমান ভগবানের কাছে।

আমারও তেমনি ভক্তি, তেমনি শ্রীতি, তেমনি ব্যাকুলতা। হয়তো তোমাকে খোসা দিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তুমি সর্বস্বাদগ্রাহী, তুমি দেখ তা ভাবের রসে স্বাচ্ছন্দ্য কি না।

প্রভু, তুমি যদি নাও, তবেই আমি পূর্ণ হব। তুমি যদি খাও তবেই আমার খিদে মিটবে।

গোলাপ-মার ভালো নাম অন্নপূর্ণা। মাঝবয়সী বিধবা। একটি মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর দক্ষিণেশ্বরে এসে ঠাকুরের পায়ের কাছে কৈঁদে পড়ল।

ঠাকুরের ভাব হল। বললেন, 'তুমি তো মহা ভাগ্যবতী।'

গোলাপ-মা থমকে রইল।

'সংসারে যাদের কেউ নেই কিছু নেই ঈশ্বর তো তাদেরই সহায়।'

অশরণের আশ্রয়স্থল তুমি। গোলাপ মা বসে পড়ল পদচ্ছায়ে।

ঠাকুরের তখন অশুখ, গোলাপ-মা বললে, কলকাতায় তার এক জানাশোনা ডাক্তার আছে, সে নির্ধাৎ সারিয়ে দিতে পারবে। ছোট ছেলের মত লাফিয়ে উঠলেন ঠাকুর, বললেন, কালই চলে। পর দিন ভোরেই রওনা হলেন নোকো করে, সঙ্গে গোলাপ, লাটু আর কালী। সারা দুপুর কেটে গেল এই ডাক্তারির খান্দায়। ফেরবার পথে বেজায় খিদে পেল সবাইকার। সেই কোন সকালে বেরিয়েছে সকলে। এখন দুপুর প্রায় গড়িয়ে গেছে। ঠাকুর

জিগগেস করলেন, কারু কাছে পয়সা আছে কি না। কেবল গোলাপের কাছে আছে। তাও, চারটি মোটে পয়সা।

তাই সই। ঠাকুর কালীকে বললেন, বরানগরের বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

ঠোড়ায় করে তাই নিয়ে এল কালী।

কিন্তু, কি আশ্চর্য, কাউকে কিছু না দিয়ে সমস্ত মিষ্টিটা ঠাকুর একাই খেয়ে ফেললেন। তার পরে গঙ্গার জল খেলেন অঞ্জলি ভরে। বললেন, 'আঃ, খিদে মিটল।'

অবাক কাণ্ড। আর তিন জনেরও খিদে মিটে গেল সেই সঙ্গে। কিছু নিল না, খেল না, অথচ কারু খিদে নেই এক কোঁটা। সেই বস্তু ক্ষুধা মুহূর্তে তৃপ্ত হল কি করে?

তুমি কি সেই মহাভারতের কৃষ্ণ?

তুমি তৃষাহর। তুমি তৃপ্তিকর।

নবতের সরু বারান্দায় চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে সারদা। অতৃপ্ত চোখে চেয়ে থাকে যদি কখনো কোনো ফাঁকে দেখা যায় সেই তৃপ্তিকরকে।

রামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি দেখে সারদাকে ঠাট্টা করে হৃদয়। বলে, 'সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও তবে বাবা বলে ডাকো না।'

এতটুকু রুষ্ট বা অপ্রতিভ হল না সারদা। নিবিড় ভক্তির সঙ্গে গভীর শ্রীতি মিশিয়ে বললে, 'উনি বাবা কী বলছেন! উনি বাবা মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, সমস্ত। যেখানে, যে সম্পর্কে যতটুকু আনন্দ আছে, সমস্তই উনি। উনি আনন্দময়।'

সেই গাঙ্কারীর কথা মনে করো :

'হমেব মাতা চ পিতা হমেব

হমেব বন্ধুশচ সখা হমেব।

হমেব বিদ্যা জ্ঞবিৎ হমেব

হমেব সর্বং মম দেবদেব ॥'

তুমি আমাকে দূরে সরিয়ে রেখেছ, কিন্তু জেনো, আমি তোমার দ্বারাই পড়ে আছি। [ ক্রমশঃ ]

—আগামী সংখ্যায়—

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

# কোচম্যান-পাণ্ডা

৭, ৮, ৯

চিৎপুরের মসজিদের মিনার দেখা যায় চকিতে।

অন্ধকার। তমসাবৃত দিক্‌চক্রে সহসা দেখা দেয় ভড়িংশিখার  
চীৎস আলো। মসজিদের পেছনে ঘন-ঘন বিহ্বল চমকায় কয়েক বার।  
মিনারের কবুতরেরা সজ্জাসে কাঁপতে থাকে আসন্ন বজ্রার আশঙ্কায়।  
বাতাসের বেগও কেমন দুঃস্থ। শোঁ-শোঁ শব্দ। বিপ্লব ঘোষণা  
করে যেন প্রকৃতি, এই সৌখীন নগরীর ঠিক মাথার ওপর। চক্রাকারে  
পাখির ধূলা উড়তে থাকে। বাতাসের দাপটে নিবে যায় অনেক  
কোকিলের ঝুলন্ত লঠন। মালিকরা কাঁপ ফেলে দেয় দোকানের।  
রূপটি বন্ধ হয়ে যায় নিশাচরীদের জ্ঞানলার। তবুও বাতাসের গতি  
এখন হাসি পায় কখনও কখনও, শোনা যায় সারেস্বীর করুণ স্বর।  
কোথা থেকে ভেসে আসে কে জানে, তবলার মুহ-মুহ শব্দ। আর  
মৃগুরের কণ্ঠসুধ। রাত্রির আধার তার বীর-মহুর পদক্ষেপে কতটা  
অঙ্গসর হয়েছে ঠিক বোঝা যায় না। আকাশের মেঘে ঘন কালকের  
পর্ণা, হাওয়ার ঝড়ের দোলা। রাত্রির বিতীর প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে  
গেছে। পথ প্রায় জনহীন। শুধু গলির মোড়ে-মোড়ে গাঁটকাটার বসে  
রাছে ওং পেতে। অসাবধানী মাতাল দেখলে হয় একবার। জুর,  
মিথ্যক দুই তাদের চোখে। রোজগারের আশা আর পুলিশের  
রে তাকাচ্ছে এধার-ওধার। অমীল ভাবায় কথা কছে  
সাম্পর। শিব দিচ্ছে থেকে-থেকে কর্কশ স্বরে, মুখে আঙুল  
গেরে।

রাস্তিরটা মাঠে মারা গেল বুঝি। বড়-বুড়ির বাত, নিশাচরীদের  
কদিন। খন্দের আসে না, আসনের দাঁড়ানো যায় না, রোজগার  
এমন না,—শুধু সাজাগোজাই সার হয়। বারা রোজ আনে রোজ  
গার, তাদের আর হুঃখের পরিসীমা থাকে না। মওকা পেয়ে  
মিনা-মনারা আসে, নামমাত্র মূল্য দিয়ে রাত কাটিয়ে যায়। তাই  
এর বর্ধার ইঙ্গিত পেলেই মুখের হাসি মিলিয়ে যায় তাদের।  
মিথিটে মেজাজ হয়ে যায়। দেবতাদের দোষে।

ঘন-ঘন বিহ্বল চমকায় আর হুড়-বাড় দরজা-জানলা পড়তে  
পড়ে। কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হয় কোথায়। হঠাৎ নাম ধরে  
ডাকে শুনে আবহুল ইতি-উত্তি তাকায়। বসিকদ্দিন গাড়ীর  
মোফাকিহি এসে বলে,—কোচম্যান সাহেব, হজুর আর ফিরবেন না  
এই বাদলার রাতে। তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নে যাও। ভোর নাগাদ  
বিসিকদ্দিন, হুকুম করলেন হজুর।

কথাগুলো শোনে আবহুল। শোনে স্তব্ধ-বিস্ময়ে। উত্তর করে  
না কিছু। কেমন হতাশার হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। হুঃখের  
হাসি। সাধারণ এই কদিনে এত বেশী উরতি আশা করতে পারে  
না যেন। বেড়াতে এসে রাত্রি অতিবাহিত করে যাবেন হজুর,  
বিশের এত এলোভন? ক্রেধ আর উত্তেজনার বেশী কিছু বলে না  
আবহুল, শুধু বলে,—যো হুকুম।

বসিকদ্দিন বললে,—হ্যাঁ, কোচম্যান সাহেব, হজুর এই হুকুম

করেছেন। চটপট হাঁকিয়ে বেরিয়ে যাও, আসমানে যা বিজ্ঞানীর  
খলক মারছে!

বসিকদ্দিন যে এসে কথাগুলো বলতে পেরেছে তাই যথেষ্ট।  
মদির নেশার তার লড়িত কঠোর, টলটলায়মান মূর্তি। তবুও নেশার  
উগ্র আনন্দে নেশাকে তুচ্ছ করেই সিঁড়ি বেয়ে প্রায়াক্কার রাস্তায়  
এসে হজুরের প্রতীক্ষারত গাড়ীখানাকে খুঁজে বের করেছে। বলেছে  
ঠিক, বা-বা বলতে হবে। তার পর এলোমেলো দমকা বাতাসে  
খুশীমনেই ফিরে যায় যথাস্থানে। নেশার ঘোর বোঝে লাগে তার এই  
উড়া বাতাস। তখন থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র এক গেলাসেই  
বসিকদ্দিন তুষ্ট থাকেনি, মাসীকে হজুরের সম্বন্ধে অনেক আশার বাণী  
শুনিয়ে আদায় করেছে আরও হুঁ-তিন পাঁজ। হজুর গহরজানের  
কাঁকুতি-মিনতিতে নেশার ঝোঁকে রাত্রি কাটাতে সম্মত হওয়ায়  
মাসীও খুশীতে উপচে পড়েছে। আনন্দাতিশয্যে মুখ ফুটে ক'বার  
আশীর্বাদও করেছে বসিকদ্দিনকে। বলেছে,—বিসর, তোকে  
কি বলে আর আশীর্বাদ করব, বাবা শাশানেধর তোরা  
মঙ্গল করুন।

গহরজানের গতি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বসিকদ্দিনের এত যে  
ব্যস্ততা কেন, তার ভেতর কিছু রহস্য না থাকলেও সহজ কথায়  
বলতে হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল হুঁপক থেকেই কিছু-কিছু আয়  
করা। নগদনারায়ণের যোগাড় দেখা। বসিকদ্দিনের গানের গলা  
আছে, হুঁ-টার রকম বাজনার দখলও আছে, কিন্তু থাকলে কি  
হবে, গান-বাজনার কদর ক'টা লোক করে? বসিকদ্দিন  
ক'বার চেষ্টাও করেছিল যাতে কোন করদ রাজ্যের বাঁধা  
গাইয়ে হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বসিকদ্দিনের চেয়ে আরও অনেক  
খ্যাতিমানরা আছে। তাদের ফেলে কে ডাকবে তাকে? তবে,  
মাবে-মিশেলে ডাক পড়ে তার কোথাও কোথাও থেকে। কিছু-  
কিছু আয়ও হয়। তবুও বসিকদ্দিন সেই সব আহ্বান একেবারে  
ধর্ডবোর মধ্যেই ধরে না, ছ'মাসে-ন'মাসে হুঃতো এক-আধ বার।  
মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, জলপাইগুড়ি আর সেরাইকেলার রাজকীয় গানের  
আসরে হয়তো গাইতে যায়। বাওয়া আসার পাথের আর কিছু  
উপরি টাকা। তাতে দিন গেলেও বছর গড়ায় না। বসিকদ্দিন  
তাই এই পল্লীর আশ্রয় নিয়েছে। রূপে আর গুণে সত্যিই বাদ্যের  
বর্তমান আর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, শুধু তাদের ঘরেই তার গমনাগমন।  
যৌবন বাদ্যের বিলীয়মান, কঠোর বাদ্যের নেই আর তেমন আকর্ষণ,  
নৃত্যকলায় যারা পারদর্শিতা হারিয়েছে তাদের জন্তে মুগ নষ্ট করে  
কি হবে? সময় নষ্ট করে? বাদ্যের দেখলে চরিত্র বন্ধা  
করা কঠিন তাদের জন্তে বসিকদ্দিন। বাদ্যের দেখলে চরিত্র  
ভাল হয়ে যায় তাদের জন্তে নয়। আর খন্দেরও চুনা-  
পুঁটিদের বসিকদ্দিন করে না, কই-কাংলাদের ধরে। বাদ্যের  
নাম করলে উত্তরে হাঁড়ি চাপে না তাদের চেনে না বসিকদ্দিন,



যাদের নাম করলে হুঁশটা লোক চিনতে পারে তাদের সঙ্গে তার বন্ধ দোস্তি।

কোঁটা-কোঁটা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। বসিরুদ্দিন তারকার আকাশের দিকে। আকাশটা যেন লাল মনে হয়। গজার খোলা জলের মত রঙ মেঘের। ঘন-ঘন বিজ্যং খেলে আকাশের তীরে। অন্ধকার সহসা হাসতে থাকে যেন। রাস্তা থেকে ভেতরে যায় বসিরুদ্দিন। সিঁড়ি বেয়ে ওঠে গহরজানের ঘরের দিকে। নেশার কাঁশর হয়ে বসিরুদ্দিন টলছে; সিঁড়িটা আরও যেন টলতে থাকে বাস্তবির কণার মত।

সিঁড়ির মুখে, অন্ধকারে কে যেন ঝাঁড়িয়ে। খুব কাছাকাছি আসতে আস্তে আস্তে বসিরুদ্দিন। নাকে তার ভেসে আসে মিষ্টি এক স্মৃতি। ছিল গহরজান, অপেক্ষা করছিল বসিরুদ্দিনের। জামার বুকে মেখেছিল সে জেসমিনের এসেন্স। অতি উগ্র গন্ধ তার পেয়েছে বসিরুদ্দিন। একেবারে কাছে আসতেই ফিসফিস কথা বললে গহরজান,—বসির, একটা কাজ করতে হবে তোমায়।

—কুম কর' বিবিজান। কারও শির তোমার পায়ে হাজির করতে হবে? বসিরুদ্দিন বললে চাপা কণ্ঠে। গহরজানের চিবুক ধরে।

—না না। সহাত্রে আবার ফিসফিস করলে গহরজান।—এই নাও একটা টাকা। গোটা হুই বুইয়ের গোড়ে এনে দিতে হবে এখনি।

—আলবৎ এনে দেবো বিবিজান। তবে পানি পড়ছে বাইরে। দাঁও, ঝপেয়া দাঁও। কথার শেষে টাকাটা নিয়ে নেমে যায় বসিরুদ্দিন। কয়েক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলে,—মালাবদল হবে বুঝি বিবিজান?

গহরজান হাসে ক্ষণেক। বলে,—হ্যাঁ, মালাবদল হবে, তবে সাধি হবে না।

গহরজানের কথাগুলিতে কেন কি জানি হৃৎকের সুর বেজে উঠলো। হাসলো যেন হতাশার হাসি। গহরজানের মনের গহনের স্তম্ভ আকাশ। কি কথা হয়ে ফুটে উঠলো! বিয়ে যার সত্যিই হ'তে পারতো এই ভাগা-বিপণ্য না হ'লে, তার মনে সাধির স্বাদ জাগবে না? বিয়ে আর যার কখনও হ'তে পারে না, সে খেলতে চাইবে না মালাবদলের খেলা! বসিরুদ্দিন চলে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ চূপচাপ ঝাঁড়িয়ে থাকে গহরজান। অবিকল্প পোষাক ঠিকঠাক করে। বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাস লাগে চোখে-মুখে, বেশ লাগে যেন। অন্ধকারে ঝাঁড়িয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা ভীত আর্ন্তনাদ। চমকে ওঠে যেন গহরজান। শিউরে ওঠে ভয়ে। কার ঘরের মাছ মাতলামি করছে। পশুর মত চিৎকার করছে। কাছাকাছি কোন্ ঘরের। গহরজানের হুঁখানি ঘর আর এক ফালি বারান্দা, আর আর ঘরে আছে আর আর কত কে।

—গহর গেলি কমনে?

দরজার ফাঁক থেকে গহরজানকে দেখতে না পেয়ে সিঁড়ির মুখে খুঁজতে আসে মাসী। বরষের প্রাচুর্য্য দিনের বেলাতেই দূরের কিছু ঠাঁহব করতে পারে না, রাত্রে তো বটেই। তাই অতি সাবধানে ধীরে ধীরে এসেছে মাসী। সিঁড়ির কাছ বরাবর এসে কথা বলেছে,—গহর গেলি কমনে?

—এই যে মাসী এখানে। জানান দেয় গহরজান। বলে,—দেখো, সাবধানে এসো।

মাসী আর এগোয় না। সেখান থেকেই বলে,—তুই হেথা এমন নিরিবিলিতে কেন?

কি উত্তর দেবে ভাবছিল গহরজান। ঋনিক পরেই বললে,—বসিরকে পাঠিয়েছি যুইয়ের গোড়ে কিনতে। এখনি এলো ব'লে।

হ্যাঁ, এখনি আসবে বসিরুদ্দিন। এ তল্লাটে ফুলের দোকান অনেক আছে। ফুলের কদর করে এ পল্লীর প্রতিবেশী। যোপাশ ফুল গোঁজে, ফুলের মালা পরে, ফুলদানিতে ফুল ভরে। এখানে ফুলের ছড়াছড়ি।

—তা বেশ করেছিস। বললে মাসী,—রাতে থাকবে তো খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা করবি? ভাতের থালা তো আর ধ'রে দেওয়া যাবে না। আমি না হয় যাই একবার, দেখি যদি ডিম, মাংস কিছু পাই। দেয়াল খুলে ক'টা টাকা বের ক'রে দে দেখি।

—তুমি যাবে কেন এই রাত্তিরে আবার। রাস্তায় নেমেই তো খাবারের দোকান। বসির না হয় ব'লে আসবে। দোকানের লোকই দিয়ে যাবে খন। গহরজান কথাগুলো ব'লে ব্যাপারটা অনেক হালকা ক'রে দেয়।

মাসীও নিশ্চিন্ত হয়। বলে,—তা বেশ কথা। বসির কিরলে তবে তুই টাকা দিয়ে কি আনবে না আনবে ব'লে দিল। আমি ততক্ষণ গড়াছি ও-ঘরে। কোমরের বেদনাটা চাপা দিয়েছে আবার।

মাসীর কোমরে পুরানো বাত। মাঝে-মাঝে ব্যাধির ওঠে। শুয়ে-শুয়ে কাতরায়। মাসী আর মুহূর্ত না ঝাঁড়িয়ে শয্যা নিতে যায়। গহরজান অন্ধকারে অপেক্ষা করে চূপচাপ। আশা নিরাশার অনেক স্বপ্নই দেখতে থাকে গহরজান। কেমন যেন মন থেকে বিজ্ঞাপন আসে এই দিনযাপনের ঘূর্ণ্য ধারার প্রতি! টাকা রোজগারের অহিলার কত জঘন্ত লোকের মুখে হাফি কোটাতে হয়, কত হীন আর কদর্য্য অবস্থার মানিয়ে নিতে হয় নিজেকে। বেশ মনে পড়ে গহরজানের, সেই প্রথম দিনের কথা। যেদিন মাসীর কঠোর শাসনের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গহরজান অজানা অচেনা কোন লোকের সঙ্গে রাত্রি বাপন করেছিল। কান্নার বেগ সামলে হাসি ফুটিয়েছিল মুখে। পরিবর্তে কি সে পেয়েছিল তা সে নিজেই জানে না। তাক্সি বাধ্যবাণের বললে মাসীর ক'টা মিষ্টি কথা ছাড়া আর কি পেয়েছিল? তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত চলছে সেই মন নয়, দেহ দেওয়া-নেওয়ার অফুরন্ত লীলাখেলা। বিজ্ঞান ভরে যায় গহরজানের অন্তর, তাই সে পূর্ণচ্ছেদ টানতে চায় এ হীনতম কাজে। হাজারো জনের সঙ্গস্বত্ব লাভের চেয়ে খোঁজে মনের মত এক জনকে যদি পাওয়া যায়।

কড়-কড় শব্দে বজ্রপাত হচ্ছে কোথায়। অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে এতক্ষণে। বাতাসে জলের কথা। শৌ-শৌ হাওয়া বইছে। ছাদের নালা ব'রে জলের তোড় নেমেছে নীচের উঠানে গেছে আর এসেছে বসিরুদ্দিন। জলে-ভেজা বুইয়ের গন্ধে বর্ষার বাতাসও যেন উন্মনা হয়ে উঠলো। বসিরুদ্দিনও ভিজে গেছে জলের ধারায়। গহরজান মালাগুলো নিয়ে সহাস্রভূতির সুরে

বললে,—ইস্! তোমাকে জলে ভেজালাম তো? এখন কি হবে?

বসিরুদ্দিন হাসতে-হাসতে বলে,—কি আর হবে, কিছু হবে না। হু' পাত্তর চাপালেই পানি-কানি এখনি শুকিয়ে যাবে। তুমি এখন একটা বোতল বের করে দাও দিকিন। মাসীর কাছে চাইলেই তো থ্যাক করে উঠবে এখনি।

অনেক সাধের ফুল হাতে পেয়েছে গহরজান। খুশীর হাসি হেসে বললে,—এখনি মিছি। তুমি এইখানে থাকো, ও-ঘরে মাসী আবার বাস্তব বেদনার শুয়ে পড়েছে এককণ্ঠে। দিশী না বিলিতি থাকে? শুধু ফুল নয়, আরও কি যেন এক সুগন্ধির তীব্র গন্ধ পায় বসিরুদ্দিন গহরজানের গা থেকে। জেসমিন এসেজের। বসিরুদ্দিন বলে,—দিশী দিশীই সুই। যেও না, একটা কথা বলি শোন।

চ'লেই বসিছিল গহরজান। বসিরুদ্দিনের কথা শুনে ফিরে ঝাঁড়ালো। বসিরুদ্দিন এগিয়ে গিয়ে প্রায় কানে-কানে বললে,—এমন রাত আর আসবে না। যেমন করে পারো বশ মানিয়ে নিতে হবে। ফসকালে এমনটি আর আমি জোগাড় করতে পারবো না। তোমার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হ'লে আমিও এ কাজে ইস্তিফা দিয়ে চ'লে যাবো লাহোরে। এক বাঈ আমার সাক্ষর হ'বে ব'লে পত্তর দিয়েছে সেখান থেকে। মাসে দেড়শো টাকা, কেলোয়াতী লিখবে শুধু। বুঝলে বিবিজান?

গহরজানের মনটা যেন ছাঁৎ করে ওঠে। বসিরুদ্দিন না থাকলে,—সে যেন আর ভাবতেই পারে না। সময় অপব্যয় হচ্ছে দেখে গহরজান কেবল বলে,—হ্যাঁ। বলতে বলতেই তাগ করে সেই স্থান। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ফিরে আসে আবার। শাড়ীর ঝাঁচলের ভেতর থেকে বের করে দেয় একটা বোতল। দিয়েই চ'লে যায় তৎক্ষণাৎ। যেতে-যেতে বলে,—তুমি ও-ঘরে আছো তো? আমি আসছি খানিক পরেই।

বসিরুদ্দিন সে-কথার কোন উত্তর দেয় না। বোতল পাওয়া মাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঝাঁতে ছিপি খুলে ঢকঢকিয়ে খেতে থাকে বোতলের জলীয় পদার্থ। মুখটা শুধু বিকৃত করে।

ঘরে ঢুকে দেখলো গহরজান—ঘরের লোক তখন গহরজানেরই ওড়নাখানা নাড়াচাড়া করছে। ফিরোজা রত্নের ওড়না। চুমকি-শলমার কাজ দেখছে হয়তো। হুইয়ের রাশি ফরাসের মাথখানে নামিয়ে রেখে গহরজান যেন গরমে অসহ্য হয়েই খুলে ফেললে গায়ের জামাটা। বতটুকু দেহাংশ ঢাকা ছিল জামাতে, এককণ্ঠে যেন মুক্ত হ'ল। তবুও এখনও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়নি, এখনও রয়েছে গোলাপী ভয়েলের কাঁচুলী। জামাটা এক পাশে ফেলে দিয়ে অন্ত্যস্ত কাছে বসে বসলো গহরজান।

কৃষ্ণকিশোরের নেশাজ্বর চোখ ঘুমে ঢুলঢুল। বললে,—এত ফুল এলো কোথা থেকে? কি হবে?

গহরজান হাসলে, গান হাসি। বললে,—বাগান থেকে। কথা বলতে-বলতে একটা মালা জড়িয়ে-জড়িয়ে পরলে নিজের

খোঁপায়। আর একটা মালা সহসা পরিচয়ে দিলে তার কণ্ঠে। বললে,—আমি খুলে না নিলে খুলতে পাবে না।

আগের দিন ঘর ছিল অন্ধকার। গহরজানের যে এত রূপ তা যেন চোখে পড়েনি। এত রঙ দেখতে পায়নি। এমন নিটোল গড়ন পল্লবিনী লতার মত! ঘরের আবহাওয়া যেন বদলে গেল হুইয়ের গন্ধে। গহরজান চোখে কল্প দৃষ্টি ফুটিয়ে কথা বলে কাতর সুরে। বলে,—মালাটা এবার পরিচয়ে দাও আমার গলায়। মালা-বদল হোক। আর মালা-বদল হ'লে—

কথামত মালা খুলে সত্যিই কৃষ্ণকিশোর পরিচয়ে দেয় গহরজানকে। বলে,—কি বলছিলে? আর মালা-বদল হ'লে?

খুশীর বস্ত্রায় যেন উৎসে ওঠে গহরজানের দেহ-মন। মালা প'রে তৃপ্তির আতিশয্যে দু'বাহু মেলে বক্ষে টেনে নেয় তাকে। বলে,—মালা-বদল হ'য়ে গেলে বিয়ে হ'য়ে যায়। কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না চিরদিনের মত।

কৃষ্ণকিশোর দেখে গহরজানের অনিন্দ্য রূপ। দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গহরজানের কথাগুলো শুনে চিন্তাকুল হ'য়ে ভাবতে থাকে কি যেন। গহরজানের বাহির অলঙ্কারটা লক্ষ্য করে। চুপী আর পাল্লার তারিঙ্গ। গহরজানের গায়ের রঙের সঙ্গে যেন মিলিয়ে গেছে। গহরজান আবদারের সুরে শুধায়,—রাতিরাটা থাকবে আমার কাছে, খেতে হ'বে তো কিছু? কি থাকে বল?

এখন যেন অনেক বেশী ভাল লাগে গহরজানকে, আগের দিনের চেয়ে। মনে হয়, কত যেন নিকট-সম্পর্কের। কত দিনের পরিচয়ে কত যেন আপন। কৃষ্ণকিশোর বললে,—হ্যাঁ, খাব। কথার শেষে চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেয় গহরজানের গুঠাঘর।

গহরজান ইশারার ইঙ্গিত দেখে হেসে ফেললে খিলখিল করে। হাসি ধামিয়ে বললে,—খেলে যদি ক্ষিধে মিটতো তা হ'লে ভাবনা ছিল। ধামো, আমি খাবারের কথা ব'লে আসি। যাবো আর আসবো। বলতে-বলতে সে নিজের মুখখানাকে এগিয়ে ধরে।

কৃষ্ণকিশোর যা খেতে চাইছিল তাই পায়। খায় অনেককণ্ঠ ধরে। যেন স্রুধা পান করে। গহরজান কিছুক্ষণের জ্ঞান নিজেকে মুক্ত করে উঠে যায় খাবারের জোগাড়। পাশের ঘরে গিয়ে দেখে বস্ত্র মাসীকে। আর দেখে বসিরুদ্দিনকে। বোতল পাশে নিয়ে ব'সে আছে মাদুরের 'পরে! গহরজানকে দেখে বিস্মিত হয় যেন প্রায় নিরাবরণ গহরজান।

গহরজান বললে কাকুতির স্বরে,—বসির, দোকানে গিয়ে বলে এসো না। খাবার দিয়ে যাবে। মাংস, ডিমের ডানলা আর কুটি দিতে বলবে। এই নাও টাকা। মাসীর নাম করবে। নয় তো কার ঘরে আবার দিয়ে যাবে তার ঠিক নেই।

—যো হুকুম বিবিজান। বলতে-বলতে উঠে পড়লো বসিরুদ্দিন। গহরজান দেহাজ খুলে টাকা দিতেই চ'লে গেল তুকুনি। টলতে-টলতে।

ঘরে যেতেই বললে কৃষ্ণকিশোর,—বেড়ালটাকে বুঝি তুমি পুখেছো?

ডালিম কখন এসে কণাসের 'পরে আরাম করে বসেছে এককণ্ঠ দেখতেই পায়নি। ঘুমের ভাণ করে ব'সে আছে ডালিম, চোখ

দুটোকে বন্ধ ক'রে। যেন কত ঘুমোচ্ছে। গহরজান বললে,—  
ও মা, তুমি এশে হাজির হয়েছো? হ্যাঁ, ওকে আমি পুবেছি।  
আমাকে না দেখলেও থাকতে পারে না। তোমার কাছে একটা  
আজি আছে আমার। বলবো?

এবার গহরজানকে বৃকে টেনে নিয়ে বললে কৃষ্ণকিশোর,—হ্যাঁ,  
বল না।

—কথা রাখবে বল?

—হ্যাঁ।

তবুও যেন বিখাস হয় না গহরজানের। বলে,—কিছুতেই  
কথার খেলাপ হবে না তো?

—না। বল না তুমি আজিটা।

খানিক নীরবে থাকিয়ে থাকে গহরজান, মদালস দৃষ্টি মেলে।  
তার পর বলে,—ঐ ডালিমের বিয়ে দিয়ে দিতে হবে তোমাকে।  
আমি ওর বিয়ে দেওয়াবো। অনেক টাকা খরচ করতে হবে কিন্তু।

কৃষ্ণকিশোর বলে,—বেশ তো। কিন্তু বিয়েটা হবে কার সঙ্গে?  
গহরজান সম্মতি পেয়ে উৎসাহে উপছে পড়ে যেন। বৃকে তার মুখ  
রেখে বলে ধীরে ধীরে,—এ পাড়াতে গঙ্গামণি নামে আমার এক জন  
বন্ধু আছে। যার কাছে আছে, কি যে নাম তার! হ্যাঁ, ঠনঠনের  
মল্লিকদের বিষ্ট, বাবু। কোটি টাকার মালিক। ঐ গঙ্গামণির পোষা  
বতনের সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা হয়ে আছে আমার ডালিমের।  
এখন তুমি রাজী হ'লেই হয়।

গহরজানের রূপে মুগ্ধ হয়ে গেছে। কখনও বা দেখেনি, দেখতে  
পেয়েছে সামনা-সামনি।

এখন বা বলবে তাই। কৃষ্ণকিশোর নেশার যৌকেই বলে,—  
বেশ তো। দাও না তুমি বিয়ে। এ আর এমন কি কথা!

তৃপ্তির হাসি দেখা যায় গহরজানের চোখে-মুখে। নিশ্চিন্ততার  
পরিভূত হাসি। আহ্লাদে আঁটখানা হ'য়ে কি করবে যেন ভেবে  
পায় না। সাপের মত আরও নিবিড় করে বাহুবন্ধন। আরও  
কাছে টেনে নেয়। মূর্খের মত সাত-পাঁচ না ভেবে যে সম্মতি জানায়,  
তারও মুখে যেন গর্জের ছায়া ফুটে ওঠে। ব্যাপারটা যেন কিছুই  
নয়, এমনি তাচ্ছিল্যের চাউনি তার চোখে।

ফরাসের 'পরে রূপার রেকানীতে ছিল এলাচদানা আর মশলা।  
দারুচিনি, ধৌরী আর লাল-সুপারী। গহরজান ক'টা এলাচদানা  
পূরে নেয় তার মুখে, পরম আদরে। নিজের কঠোর মালাটা খুলে  
পরিষে দেয়। কৃষ্ণকিশোরও পরিষে দেয় গহরজানকে। এমনি  
মালা-বিনিময়ের খেলা চলতে থাকে কতক্ষণ। হাসতে-হাসতে।

রাত্রি আর বর্ষা তখন বাইরে যেন পালা দেয় পরস্পরে। ঘোর  
অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন ক'রে বড়কড়িয়ে মেঘ ডাকে। বর্ষণ হয়  
হৃদয় বেগে।

আর তখন ঠিক আরেক জন কিশোরী ঘুমের মাঝে দেখে কত  
বিচিৎর স্বপ্ন। কত রঙীন পটভূমিকায়। রাজার রাণী হবে সে।  
দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তাকে দেখে পছন্দ হয়েছে বাদেয়, তাহেই  
গৃহেব বধূ হবে। আর তাও যেমন-তেমন ঘর নয়, ঐশ্বর্য-লক্ষী  
বাদেয় ঘরে বাঁধা। একমাত্র পুত্র; বিশাল সম্পত্তির একমাত্র

উত্তরাধিকারী। কল্পনাতেও বা কেউ ভাবতে পারে না, স্বপ্ন দেখে  
শুধু। ঘুমের ঘোরে সেই স্বপ্নই দেখছিল রাজেশ্বরী। নিজাতুর  
মুখে তার মাঝে-মাঝে হাসির রেখা মিলিয়ে যায়। রাজেশ্বরী স্বপ্ন  
দেখে রাজেশ্বরী হওয়ার।

—ও রাজো, আর কত ঘুমোবি?

—কৈ না তো, আমি তো জেগে রয়েছি।

—তোমার বে বে লা। আয়, যোলা নিম্ননীর খোঁপা বেঁধে দিই।  
কনে-চন্দন পরিষে দিই। পায়ে আলতা দিয়ে দিই।

রাজেশ্বরী উঠে বসে ষড়মড়িয়ে। বস্ত্রপাতের শব্দে তার নিজা  
টুটে যায়। কৈ, ঠাগমা কৈ? কেউ তো নেই, শুধু বৃষ্টির ঝরঝর  
শব্দ। রাজেশ্বরী আবার শুয়ে পড়লো ক্ষুণ্ণ মনে। কত দেবী আর  
সেই শুভদিনের। সেই শুভলগ্নের। সেই শুভদৃষ্টির।

রাত্রির পর দিন। অন্ধকারের পরেই আলো। বর্ষার পর  
যেমন দেখা দেয় শুভ পরিচ্ছন্ন আকাশ। কুল-ছাপানো জোয়ারের  
পর যেমন ভাটা। তেমনি ঠিক ঘনঘোর বর্ষার রাত্রি স্তিমিত হয়ে  
আসে অস্তি ধীরে। ভিজ্ঞ আকাশের পূর্ণাচলে সূর্য যেন নেই, তবু  
সূর্যের ঘোলাটে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয় শহরাঞ্চল। কাক  
আর চড়াই আলো দেখে ডাকাডাকি করে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়।  
বৃষ্টি থেমে গেছে কখন কে জানে, কিন্তু বাতাসে যেন জলের রেণু।  
শহরের পথ পিচ্ছিল।

আদেশ মত ভোরে উঠেই গাড়ী নিয়ে গিয়ে হাজির করে  
যথাস্থানে কোচম্যান আবহুল। ঘণ্টাটা বাজায় কয়েক বার।  
জানান দেয় তার উপস্থিতি। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ছজুর আসেন,  
এসে গাড়ীতে বসেন উড়ু-উড়ু চেহারায়ে।

বর্ষায় দেওয়ার সময় গহরজান শুধু কাকুতির সুরে ব'লে দেয়,—  
আর যেন বসিরকে না আনতে হয়। এখন তো চেনা-জানা হয়ে  
গেছে, নিজে-নিজেই চ'লে আসবে যখন খুশী। আর, না এলে  
আমিই গিয়ে হাজির হবো।

কথাটা শুনে কৃষ্ণকিশোর বলে,—না, না, তুমি যেন যেও না।  
আমিই আসব। লোক কি মনে করবে?

ঝিল-ঝিল শব্দে হেসেছে গহরজান লোকভীতি দেখে। হাসতে-  
হাসতেই বিদায় দিয়েছে। বসিরুদ্দিন কখন চ'লে গেছে জানতে  
পারেনি গহরজান। হয়তো লোকানো খাবারের কৈবা ব'লে দিয়ে চলে  
গেছে বসিরুদ্দিন নিজের বাসায় ঐ বড়-বৃষ্টির মধ্যেই। বসিরুদ্দিনের  
বাসা, এখান থেকে অনেক দূর। বিদায়পুর্বে, মেট্রাবুককে।

মাসী ভোরে উঠেই গেছে গঙ্গামণি। স্নান সেরে, বাবা  
ঋণানেশ্বরের পূজা দিয়ে ফিরতে মাসীর অনেক দেবী। গহরজান  
গিয়ে ফরাসে এলিয়ে পড়ে ঘুম-কাতর চোখে। প্রায় বিনিম্ন রাত  
কাটিয়েছে গহরজান। চোখে এখনও যেন ঘুম লেগে রয়েছে  
পূরোপূরি।

ঘরের ভেতর বাসি হুইয়ের মিষ্টি গন্ধ। ফরাসে গেলাস আর  
বোতল। উজ্জিষ্ট খাওয়ার পাত্র। মশলার রেকানী। তাকিরাগুলো  
হেথায়-সেথায় ছড়িয়ে আছে। বেশ বোকা যায়, রাজে যেন  
তাঁওবলী হয়ে গেছে ঘরে। তাহেই চিহ্ন বিতর্মান রয়েছে।

বাড়ীতে ফিরতে যেন মন চায় না।

নেহাৎ ফিরতে হয় তাই যেন ফিরেছে। গহরজান একটা রাতের মধ্যে কি এমন আকর্ষণের মায়ার জড়ালে যে, আজন্ম বেথানে লালিত-পালিত হয়েছে সেই বলত-বাড়ীতে আর মন উঠছে না। কেউ যেন নেই কোথাও। বন্ধগুরুর মত শূন্য গৃহ। লোক-জন গেল কোথায় সব। পাইক, বরকন্দাজ, তাঁবেদার, ভৃত্যের দল ছুটি নিয়েছে না কি? কটকে শুধু দ্বারপালকে দেখা যায়, পেতলের লোটার ছাই বসছে। জুড়ী আসতেই সসন্মমে উঠে পাড়ায়। গাড়ীর মধ্যস্থিত মনিবের উদ্দেশ্যে সেলাম ঠোকে।

মনিবকে আসতে দেখে সাহসভরে কথা বলে শুধু এক জন। অন্যদের কোথা থেকে কথা বলে কে জানে। পদক্ষেপের শব্দে খিলানের পায়রাগুলো উঠান থেকে উড়ে পালায় কাঁক-কাঁকে। বিনোদা কথা বলে। বলে,—কোথায় কাটলো গুনি রাতটা? এ-ও দেখতে হ'ল এই পোড়াকপালে! একেবারে উচ্ছন্নয় গেলে? বিবেকে বাথলো না? ওমা কি হবে গো! কোথায় বাবো গো! এমন নছার ছেলেও পেটে ধরে মাছ? হায়, হায়, হায়!

কোন অদৃশ্য উত্তরণভার উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি বলে বিনোদা, ব্যতীত পারে না গৃহের মালিক। অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে শুধু, যেদিক থেকে কথা ভেসে আসে সেদিকে। বলে,—যাত্রা দেখতে গিচ্ছলাম।

কথাটা কি সত্যি?

তাই যদি গিয়ে থাকে, তাতে আর দোষের এমন কি আছে। নিজের মনে ভাবে বিনোদা। আর যাত্রা দেখতে না গিয়ে যদি গিয়ে থাকে অজ্ঞ কোথাও। অস্থানে-কুস্থানে? এও মনে হয় বিনোদার, সারা রাত্রি জেগে ব'সে ব'সে যাত্রা দেখবার ছেলেও নয়। মন থেকে যেন কেমন সায় দেয় না কথাটা। স্বগত করে চাপা-গলায়। বলে,—যাত্রা দেখতে গিচ্ছলো না আরও কিছু। জাহাঙ্গিরে গিয়েছিলে তা আর আমি জানি না? হায়, হায়, হায়, হায়! কি হবে গো! কোথায় বাবো গো! কোথা থেকে এসে জুটলো এই কলসার?

—মা আসেননি বিনো? ওপরে উঠতে-উঠতে জিজ্ঞেস করলো কুককিশোর।

—মায়ের সাত পুরুষের কি ভাগ্যি যে খোঁজ পড়লো! মুখ খিঁচিয়ে-খিঁচিয়ে বললে বিনোদা। বলে,—কোন মুখে আর আসবেন বল, তোমার মতন রক্ত ছেলে ধীর? নাঃ, আসেননি। আসবেনও না আর।

কয়েক মুহূর্তের জন্ত মনটা যেন আঁকুপাঁকু করে। কুমুদিনীর কুপিত মুখ নয়, হাসি-ভরা মুখ স্নেহময়ী কুমুদিনীর, চোখের সামনে জেসে ওঠে। বৈধব্যের দুঃখ-কাতর কথা যেন ভাসতে থাকে কানে। ছেলের শয়ন-ঘরে কুমুদিনীর ছবি আছে একখানা। সম্ভব অবস্থায় বধুবোনের কুমুদিনী। গারে জড়োয়া গরনা, মাথায় হীরার মুকুট আর বেগারসীর গোলাপী ডেল। ওঠে পবিত্র হাসির মুহূর্ত আভাষ। চোখে সরল দৃষ্টি। রঙীন আবক্ষ তৈলচিত্র কুমুদিনীর। ঘরে লুবেই দেখতে পায় ছবিখানা। ছবির তলায় পাঁড়িয়ে বেখে, দেখে তাঁর মাকে—মায়ের বেকর খুব বেশী দিন দেখবার সৌভাগ্য তার হয়নি।

মা কি কাঁদছে। ছবিতে কুমুদিনীর চোখ দু'টো কি অঙ্গ-সজল। না, ছবিখানাই ঐ রকম। মনে হয়, মুখ তাঁর হাসির বেধা আর চোখে জলের। দক্ষ শিল্পীর তুলির পরশে যেন জীবন্ত হয়ে আছে।

—ম্যানেজার বাবু দেখা করতে চাইছেন। অনন্তরাম এসে বললে পেছন থেকে।—খুব জরুরী ধরকার, এখনি দেখা করতে চান।

—চল, যাচ্ছি। কিন্তু অনন্তরাম, মাকে আনাবার কি ব্যবস্থা হবে? কুককিশোর কথা বলে কেমন যেন বাপকন্ড হয়ে।

খানিক চুপ করে থাকে অনন্তরাম। কুমুদিনীর ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছবির দিকে চোখ রেখেই বললে,—তেনাকে আনতে পারে—সাধ্য কার! তিনি আর আসবেন না। আসবার রাস্তা রাখলে কৈ? কথা বলতে-বলতে অনন্তরামের স্বরও যেন কাঁপতে থাকে। চোখ দু'টো যেন চিক-চিক ক'রে ওঠে। বলে,—আমাকেও ছুটি দিয়ে দাও।

ভৃত্যের কথার কোন উত্তর দেয় না মনিব।

ম্যানেজার বাবু জরুরী প্রয়োজনে ডাকছেন শুনে সদরের দিকে এগোয়। অনেকক্ষণ দেখা পায়নি প্রভুর, টম ছুটে-ছুটে আসে কোথা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চলে। গলার বন্ধনীতে পেতলের ঘটি, কম খুম শব্দ হয় টমের চাকল্যে।

কাছারীর দালানে অপেক্ষা করছিলেন ম্যানেজার বাবু। মুখখানা যেন তাঁর বিষণ্ণ। চোখের দৃষ্টিতে হতাশা। হৃদিতার চিহ্ন কুটেছে তাঁর মুখে। রাজে চরতো ধূম হয়নি, তাই চোখের তলায় মলিন বেধা। ম্যানেজার বাবু বিজ্ঞ জন, বুকে নিয়েছেন সকল কিছু। জীবনে তাঁর দেখবার ভাগ্য হয়েছে অনেক কিছু, অভিজ্ঞতার সীমাও তাঁর নেহাৎ তল্ল নয়। ইচ্ছা করলে, হজুরকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার পন্থাও তাঁর জানা আছে, কিন্তু সাবালক প্রাপ্তির পর বোধায় থাকবেন তিনি। মাত্র এই ক'দিনের জন্ত বাধার সৃষ্টি করে কি ফল হবে! প্রাক্কণের গাছপালা থেকে তখনও বৃষ্টির জল পড়ছিল টুপ-টাপ। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। গাছ আর লতাপাতার সবুজতা বর্ষার জলে ঝোঁত হয়ে আরও যেন অধিক পরিমাণে স্পষ্ট হয়েছে। ফুঁসে ফুলের রঙ যেন চোখে পড়ছে অজ্ঞ দিনের চেয়ে।

ম্যানেজার বাবু একা নন। আরও কে এক জন বসেছিল কাছারীর দালানের কেদারায়। হজুরের সাক্ষাৎ পেয়েই বললেন ম্যানেজার বাবু,—গত সন্ধ্যায় আপনার ফিরিঙ্গী বকুটি এসে এই লেক্ষাপাখানা দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন তাঁদেরই এক জন worker এসে নিয়ে বাবে এটি। Workerটিও এসেছেন। ঐ যে ব'সে আছেন।

ম্যানেজার বাবু কথার শেষে হস্তান্তরিত করেন, লেক্ষাপাখানা। কুককিশোর লক্ষ্য ক'রে দেখে workerকে। দেখে যেন চেনা-চেনা মনে হয়। মনে হয় কোথায় যেন দেখেছে। মনে পড়ে নর্দান অকশেনদের জইং-কুমের বকু-সামলনের একটা সন্ধ্যা।

প্রতীক্ষারত workerটি এগিয়ে আসে কেদারা থেকে উঠে। বলে,—আমার নাম নর্দান অকশেন। আলাপ হয়েছিল, মনে নেই তোমার। নর্দান অকশেনের দেওয়া টীপারটিতে।

যৌবনের প্রতিমূর্তি যেন। কথার ধরে তেজস্বিতা। বলিষ্ঠ দেহ, তবুও যেন কত কমনীয়। আকর্ষণ চক্ষুদ্বয়ে উগ্র দৃষ্টি। গ্রীসীর ধরণের তীক্ষ্ণ নাসিকা। মাথায় এলবাট চুল। খাঁকির সার্ট আর পাংলুন পরনে। পায়ে ক্যাম্পের বুট।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—ঠ্যা, মনে আছে। নর্থান অক্সফোর্ড কোথায়? এই নাও তার দেওয়া লেফাফা। কি আছে এতে?

অনেকগুলি প্রশ্ন। ম্যানেজার বাবু চলে যাচ্ছিলেন নিজের কামরায়। কামরার কাছাকাছি গিয়ে বললেন,—Secretly বলে গেছেন ফিরিস্তীট, লুথিয়ানায় গেছেন গত রাত্রেই ট্রেনে।

হেসে কেসলে নর্থান অক্সফোর্ড। ফিস-ফিস শব্দে বললে,—না, সেখানে যায়নি। যেখানে গেছে, কেউ জানে না সন্ধান। আমি শুধু জানি। গেছে, ট্রেনে চেপে বসে, সেখান থেকে জাহাজের থালাসী সঙ্গে চলে যাবে জার্মানী। Arms and ammunition জোগাড় করতে গেছে। বিরতে বছর খানেক। কিন্তু don't disclose it. কেউ যেন না জানতে পারে। তোমার সঙ্গে তার friendship, তুমি তার সঙ্গে anxious হবে, only for that reason আমি বললাম। আর এখন জানলেও তাকে ধরা যাবে না। নর্থান অক্সফোর্ড এখন out of danger zone. আর এই লেফাফাতে আছে কয়েকটা map আর কিছু code. পরে কাজে লাগবে।

## কাচ

এই যুগটা প্রাকৃতিকের যুগ বললে হয়তো অতুক্তি হবে না। অস্বাভাবিক যুগের পর থেকে মানুষের সভ্যতার অনেকগুলি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। প্রস্তর-যুগ, লৌহ-যুগ, তাম্র-যুগ যেমন ছিল তেমনি কাচেরও একটা যুগ যদি নির্দিষ্ট করা যায় তা হ'লে এমন কিছু অন্তায় হবে না। কাচ ভঙ্গুর হলেও সভ্য মানুষের জীবন যাপনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাচ অপরিহার্য। কাচের গেলাস, বাটি, পেরালা, বেকারী না হ'লে আমাদের চলে না। সব চেয়ে প্রয়োজন যে বস্তু, যার অভাবে আপনি আপনাকে কষ্টাচিন্দ দেখতেই পাবেন না, সেই আয়না কাচ বিনা কখনও সৃষ্টি হতেই পারতো না। জলেও মানুষের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু আয়নার যেমনটি দেখা যায় তেমনটি আর কিছুতেই নয়। ভেবে দেখলে অস্বাভাবিক কয়তে পারবেন না, কাচ না থাকলে কত অসুবিধায় পড়তে হয়। কাচের শিশিতে ছুগুপান শৈশবে প্রায় সকলেই করেন। আবার জীবনের শেষ সময়ে, মৃত্যুকণের পূর্বে কাচের শিশিরই ওষুধ খেতে হয়। তা হ'লে এখন বলা যেতে পারে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাচ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে মানুষের সঙ্গে। কাচ অঙ্গেরও সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের, চশমার কথা স্বরণ করুন। কাচের গয়না তো নারীর অঙ্গের ভূষণ।

কাচের সঙ্গে মানুষের পরিচয় যে কত দিনের তার ঐতিহাসিক সন্ধান-নিরূপণ হয়নি এখনও। তবে ইজিপ্টে, পিরামিড তৈয়ারীরও পূর্বে কাচ তৈয়ারী করতে শিখেছিল ইজিপ্টের অধিবাসী। সিন্ধের মত নরম এক রকমের পদার্থ থেকে কাচ তৈয়ারী হয়, যার নাম সিলিকা বা Silika. সিলিকা বালি থেকে প্রস্তুত হয়। বালি, যা এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় এবং যার মূল্য এতই কম, যে জন্ম কাচেরও মূল্য খুব বেশী হয় না। সর্বসমেত ১,০০০ ধরণের কাচ আছে। বিজ্ঞান কাচের রকম-ফেরে এত আধিক্য কি

কথাগুলি শুনে শুনে কৃষ্ণকিশোর বিষয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। কথার শেষে নর্থান অক্সফোর্ড কয়েক মুহূর্ত আরও অপেক্ষা করে। কৃষ্ণকিশোর আর কিছু বলছে না দেখে বলে,—If opportunity comes, আবার দেখা হবে। But don't disclose anything. কেউ যেন না কিছু জানতে পারে ঘৃণাকরে।

যড়ি-ঘরের ঘণ্টা বাজতে থাকে ঢং-ঢং। ক'টা বাজে কে জানে। নর্থান অক্সফোর্ড হাসতে-হাসতে চলে যায় লেফাফা পকেটস্থ ক'রে। কৃষ্ণকিশোর শুধু বিষয়ের দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। নর্থান অক্সফোর্ডকে দেখে মনে পড়ে যায় লিলিয়ানকে। অনেক দিন পরে মনে পড়ে। লিলিয়ানের কথা, আর তার মুখাকৃতি। লিলিয়ান আর নেই, এই কথাটিই বাজতে থাকে তার বুকে।

বর্ষা ঋতু। গঙ্গাজলের মত ঘোলাটে রঙ আকাশের। বাদল পোকা উড়ছে।

চাতকের বাঁক উড়ছে আকাশে, অনেক উঁচুতে, এখানে সেখানে। হিমেল হাওয়া বইছে এলামেলো। গাছ আর লতাপাতা জড়াজড়ি করছে পদস্পর্শে। হাওয়ার বেগে হেলাছ তুলছে। বর্ষণের অবশিষ্ট চিহ্ন—গাছের পাতা থেকে জল পড়ছে টুপ-টুপ। আর ফুটন্ত ফুলের কত যে রঙীন পাণ্ডি খসে পড়ছে! বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে প্রজাপতির মত। [ ক্রমশঃ ]

থেকে করতে পারে? কিন্তু প্রকিয়া অত্যন্ত সহজ। সিলিকা, সোডা আর চুণই হ'ল কাচ তৈয়ারীর মূল প্রকরণ। তার পর কাচের রঙ হওয়ার কাজ হয়। বিজ্ঞান ভবিষ্যৎবাণী করেছে, ভবিষ্যতে ব্যবসা হিসাবে ব্যবহারের জন্ম দে ১০,০০০ রকমের কাচ তৈয়ারী করতে পারবে। কাচ সাধারণতঃ ভঙ্গুর, কিন্তু এমন কাচও তৈয়ারী হচ্ছে যা ভাঙ্গে না।

ল্যাবরেটরীর কাজে কাচ অপরিহার্য। এ্যাসিড এবং উত্তাপ, যাতে অন্ত্যস্ত ধাতু সহজেই গলে যায়, কাচ তাদের পরাস্ত করেছে। কাচ শুধু চশমা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, লেন্স, মাইক্রোস্কোপও কাচের সৃষ্টি। আলোকচিত্র, সর্বাক চিত্র, টেলিভিশনও আমরা কাচ না থাকলে দেখতে পেতাম না। টেলিস্কোপ না থাকলে ভূমণ্ডল মানুষের চোখে কখনও ধরা পড়তো? আর এদের সবাই কাচেরই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য। চিকিৎসা পদ্ধতিতেও কাচের ব্যবহার অতুলনীয়। অস্ত্রোপচারের ব্যবহার্য বস্তুগুলির অনেক কিছুই কাচের। এখন ইউরোপে গানের রেকর্ড কাচ থেকে হ'তে পারে কি না তাই নিয়ে গবেষণা চলেছে। সাময়িক প্রয়োজনেও কাচ কাজে লেগেছে। কাচের এক রকম জামা তৈয়ারী হয়েছে, যে জামাতে বুলেটও মাথা গলাতে পারবে না। আর এক রকমের জামা হয়েছে, যা প'রে ০ ডিগ্রী স্কেলের দেশেও থাকা যায় এবং ৪০ ডিগ্রী উত্তাপ লাভ করা যায়। ঋতুজ্ঞান, যা অস্ত্র পায়ে রাখলে নষ্ট হয়ে বাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কাচের বাজে সেখাবার সহজে নষ্ট হয় না। কাচ থেকে এক ধরণের সার তৈয়ারী হচ্ছে, যার সাহায্যে কৃষিকার্যে তত্বত ফল পাওয়া গেছে। বৈজ্ঞানিকগণ কাচের ভবিষ্যৎ খুবই আশাবাদ দেখছেন। ভবিষ্যতে কাচ মানুষের আয়াম, আয়স এবং সুরবিধায় যে আরও কত কাজে লাগবে তার ইয়ত্তা নেই।

ধড়—শরীর, কায়, দেহ, গাত্র।  
 ধড়া—জীর্ণবস্ত্র, নেকড়া, কপড়ী।  
 ধন—অর্থ, টাকা, বিত্ত, বিভব।  
 ধনপতি—সুবেদ, ধনাধিপতি, ধনী, অর্থবিশিষ্ট, ধনাঢ্য।  
 ধনাধ্যক্ষ—অর্থরক্ষক, কোষরক্ষক।  
 ধনার্জন—অর্থোপার্জন, অর্থোপায়চেষ্টা।  
 ধনিষ্ঠা—ঋষোবিংশতি নক্ষত্র।  
 ধনুঃ—চাপ, নবম রাশি, ধনুক, কাম্বুক, শরনিক্ষেপ যন্ত্র।  
 ধনুগুণ—জ্যা, হিলা, মোকী।  
 ধনুর্ধর—ধনুর্ধারী, ধনুকী, ধনী।  
 ধনুষ্ঠাকার—বায়ুরোগবিশেষ, ধনুস্তম্ভ, জ্যাশব্দ।  
 ধন্দ—ভ্রম, ভ্রান্তি, অস্বভাব, ধাঁধা।  
 ধন্য—প্রশংসা, শ্লাঘা, ভাগ্যবান।  
 ধন্যবাদ—প্রশংসা, শ্লাঘা, শুভামুবাণ।  
 ধনুত্তর—দেবচিকিৎসক, শিবের নাম।  
 ধবল—শুক্ল, শুভ্র, শ্বিত্ররোগ।  
 ধবলী—শ্বেত গাভী।  
 ধমক—ভয়প্রদর্শক বাক্য, ভাড়া।  
 ধমনী—নাড়ী, শির।  
 ধরণ—গ্রহণ, আকর্ষণ, অবলম্বন।  
 ধরণীধর—পর্যন্ত, রাজা, ভূপাল।  
 ধর্ষব্য—গ্রাহ্য, মাত্র, দণ্ডনীয়, প্রেমের।  
 ধর্ম—শুণ্য, ভ্রাম্য, জাতি ব্যবহার।  
 ধর্মশালা—দানগৃহ, অতিথিশালা।  
 ধর্মশাস্ত্র—স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণাদি শাস্ত্র।  
 ধর্মশীল—শুণ্যবান, ধার্মিক, ধর্মিষ্ঠ, ধর্মাত্মা, পুণ্যাশ্রয়, সাধু, পুণ্যশীল।  
 ধর্মাদিকরণ—ব্যবস্থান, বিচারালয়।  
 ধর্মাদ্যক্ষ—দণ্ডকর্ত্তা, বিচারক।  
 ধর্ম্য—ভ্রাম্য, উচিত, বধার্থ।  
 ধর্মক—বিক্রয়ী, সাহসিক, দুর্বল, গর্জিত।  
 ধাই—ধাত্রী, উপমাতা, প্রসবকারিণী।  
 ধাড়িয়া—জলমার্জ্জার, উদ্ভিড়াল, খেড়িয়া।  
 ধাত্রী—বিধাতা, প্রতিপালক, ব্রহ্মা।  
 ধাতু—তাত্ত্ব-পিত্তলাদি, শুক্র, শ্লেষ্মাদি।  
 ধাতুপ—অন্নরস, ধাতুপোষক, সারভাগ।  
 ধাত্য—ধান, ত্রীহি, শস্যবিশেষ।  
 ধাত্যশালী—ধানবপনযোগ্য ভূমি।  
 ধাপ—সোপানের শ্রেণী, বাস্প।  
 ধায়—শরীর, গৃহ, বসতিস্থান।  
 ধার—ঋণ, অশ্রা, তীক্ষ্ণতা, নদীর কূল।  
 ধারক—ধনী, ভেদনিবারক ঔষধ।  
 ধারণ—প্রাপ্ত হওন, গ্রহণ, অবলম্বন।  
 ধারণা—অধ্যবসায়, মনঃস্থিরতা, বুদ্ধি।  
 ধারযুক্ত—সুশাণিত, তীক্ষ্ণ, ধারাল।  
 ধারা—প্রবাহ, ব্যবহার, প্রবাহ, প্রকার।

# বহুমালা

শ্রী প্রাণতোষ ঘটক

ধারাদধর—মেঘ, জলদ, বজ্র।  
 ধারাবাহিক—ধারাবাহী, গতানুগতিক।  
 ধার্য—নিশ্চয়, অবধারিত, আক্রমণীয়।  
 ধিক—ধিকার, অবজ্ঞা-বোধক শব্দ, নিন্দা, তুচ্ছ করা।  
 ধিমা—ধীর, সাবধান, শাস্ত, অলস।  
 ধী—বুদ্ধি, মতি, ধীরজ্ঞ জ্ঞান।  
 ধীবর—মৎস্য-ব্যবসায়ী, কৈবর্ত্ত।  
 ধীর—স্থির, অচঞ্চল, পণ্ডিত, শাস্ত।  
 ধীরে—আন্তে, মনঃস্থৈর্য পূর্বক।  
 ধীসচিব—মন্ত্রী, অমাত্য, মন্ত্রশাস্তা।  
 ধুওন—বস্ত্রাদি প্রক্ষালন, ধোতকরণ।  
 ধুকন—হাপান, ঝাং হওন।  
 ধুতী—ধুতি, পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র।  
 ধুম—ব্যগ্রতা, আড়ম্বরী, সমারোহ।  
 ধুমধাম—ধুমধুমি, গুণগোল, উপদ্রব।  
 ধুয়া—গীতের ধ্রুবপদ।  
 ধুরন্ধর—ভাব-বাহক, রথাদির বাহক, যোগ্য, পট্টম।  
 ধুনক—ধূনা, বৃক্ষনির্ধ্যাস, যক্ষধূপ।  
 ধুনাচি—ধূপদানপাত্র, অম্ভট।  
 ধুপ—সঙ্করস, গন্ধপাত্রিকা, রোজ।  
 ধুপিত—সুগন্ধ, বাসিত।  
 ধুম—ধূয়া, বাস্প, ভাপ।  
 ধুমকেতু—শিখাবৎ নক্ষত্র-বিশেষ।  
 ধুজ—কৃষ্ণরক্তমিশ্রিত বর্ণ, বেগুনিয়া।  
 ধূর্ত—শঠ, খল, পাশাক্রীড়ক।  
 ধূলা—ধূলী, শুষ্কস্বল্পমুত্তিকা, রেণু।  
 ধূসর—দেবৎ পাণ্ডুবর্ণ, গৃধ।  
 ধৃতি—ঐর্ধ্য, সন্তোষ, মনঃস্থৈর্য।  
 ধোওন—মার্জন, ধোতকরণ, প্রক্ষালন।  
 ধোকা—ভ্রম, সন্দেহ, মায়, শঙ্কা।  
 ধোপা—ধোবা, বস্ত্রক্ষালনকারী, রজক।  
 ধোত—পরিষ্কৃত, শুচীকৃত, প্রক্ষালিত।  
 ধ্যান—চিন্তা, ভাবনা, যোগ, সমাধি।  
 ধ্যেয়—ধ্যানযোগ্য, বিবেচনীয়।  
 ধ্রুব—নিশ্চিত, তারা, বিতর্ক, স্থায়িত্ব।  
 ধ্রুংস—ভ্রংশ, হানি, চ্যুতি, নাশ।  
 ধ্রুজা—ধ্রুজী, পতাকা, চিহ্ন, নিদর্শন।  
 ধ্রুজিনা—সৈন্ত, উন্নতচিহ্ন, বৃক্ষাদি।  
 ধ্রুনি—শব্দ, রব, স্বর, নাদ, নিনাদ।  
 ধ্রুস্ত—অধঃপতিত, হত, নষ্ট।  
 ধ্রুস্ত—অন্ধকার, তিমির, তমস, আঁধার।



## সম্রাট নেপোলিয়ানের চিঠি

[লোকচরিত্র বিশ্লেষণ ও পারিপার্শ্বিকের স্বাক্ষর বিচার-নৈপুণ্যই নেপোলিয়ানের জীবনের অদ্বৈতপূর্ণ সাক্ষ্যের মূল বস্তু। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দ থেকে এই অতুলনীয় প্রতিভা তাঁর হাস পেতে থাকে। নেপোলিয়ান রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তাঁর বিচক্ষণতম উপদেষ্টাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এবং এই অভিযানে এমন কতকগুলি যারাজক ভুল করেছিলেন, যার পরিণাম-ফল হয়েছিল অতি ভয়াবহ। ইতিহাসের পাঠক মাজেই এ সব কথা অবগত আছেন। নেপোলিয়ানের জীবন একটি অপূর্ণ মায়ুষের সাক্ষ্যের ইতিহাস কিন্তু প্রাক-যুগের সে দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ক্রমশঃ স্পর্শিস্থিট হয়ে উঠতে লাগল জীবনের শেষ অঙ্কে। তবে শেষ শত দিনে আগেকার নেপোলিয়ানের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে—হয়ত এই সময়ই হয়েছে তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ। ওয়াটারলু যুদ্ধ-পরিকল্পনা অনন্বকরণীয়। কিন্তু তথাপি ওয়াটারলুর যুদ্ধেই পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে তাঁকে। ২২শে জুন দ্বিতীয় বার সিংহাসন ত্যাগের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন নেপোলিয়ান। এই জুন তিনি নির্বাসিত হন ক্রাঙ্গ থেকে। এর ঠিক চার দিন পরে নীচের এই চিঠিখানি লেখেন ইংলণ্ডের প্রিন্স রিজেন্টকে। প্রিন্স রিজেন্ট ইচ্ছা করলেই নেপোলিয়ানকে রক্ষা করতে পারতেন না। নেপোলিয়ানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে লর্ড লিভারপুলের মন্ত্রণা-সংসদে। তাঁরা এমন এক জারপায় তাঁকে শ্রেয়ণের পরিকল্পনা করেছিলেন যেখান থেকে পলায়ন অসম্ভব। কেপটাউন থেকে সন্তোষো মাইল দূরে দক্ষিণ আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা নামক দ্বীপটিই সর্ব দিক থেকে ঘেরে মনোনীত হোল। নেপোলিয়ানের শেষ দিনগুলি এই নির্জন দ্বীপে স্বদেশ-বদেশ-পরিভ্রমণ অবস্থার অশেষ অপমান ও দুর্গতির মধ্যে চির অবসান হয়েছে।]

১৩ই জুলাই, ১৮১৫

মহামাত্র সম্রাট,

আমি দলদলি-বিচ্ছিন্ন স্বদেশ আর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি-সমূহের শত্রুতার কোণে পতিত, আমি আমার রাজনৈতিক জীবনের স্বনিকাপাত করেছি—খেমিস টোকলসের মত আজ আমিও ব্রিটিশ জনগণের বদান্ততার কৃপাপ্রাপ্ত। হে মহামাত্র সম্রাট! আমার শত্রুদের মধ্যে আপনিই সর্বশক্তিমান, অটল ও মহামুত্তব—আমি আপনার ভায়নিষ্ঠ আইনের ছায়াতলে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

নেপোলিয়ান।

## বৈজ্ঞানিকের চিঠি

[মেরী স্ক্রভোভস্কাকে লেখা পিরারে কুরীর চিঠি]

১৪ই আগস্ট, ১৮১৪

তোমার সঙ্গে দেখা করা নিয়ে আর কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না। একটি দিন গেল শুধু ভাবনায়। যাব

নাই—সাবাস্ত্য বরেন্ধিলাম। কেন জান, তোমার চিঠি পড়ে প্রথম আমার যে অনুভূতি হয়েছিল সে হচ্ছে আমার না বাওয়াই যেন তুমি পছন্দ কর। কিন্তু দ্বিতীয় পাঠে তোমার স্নেহসিক্ত মনের স্পর্শ পেলাম—তোমার সাহচর্যে আমাকে তিনটি দিন কাটাতে দেবে এমন ইংগিতও যেন আছে চিঠিতে। আমি প্রায় চলেই বাছিলাম। কিন্তু তক্ষুণি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে ছাড়ার মত অনুসরণ করার স্বজ্ঞাজনক চেতনা অভিভূত করে ফেলল আমাকে। আমার উপস্থিতি হয়ত তোমার বাবার অস্বস্তির কারণ ঘটতে পারে এবং তোমাদের মিলনের অনন্দ পরিচয় বরে দিতে পারে, এই নিশ্চিত সম্ভাবনায় শেষ পর্যন্ত আমাকে থেকে যেতে বাধ্য করল।

কিন্তু এখন বড় দেরী হয়ে গেছে। ভারী দুঃখিত—যাওয়া আর হোল না আমার। যদি তিনটি দিন একসঙ্গে কাটাতে পারতাম আমাদের বন্ধু কি তাতে আরো নিবিড়তর হোত না? যে দীর্ঘ দুই মাস আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব তাঁর মধ্যে আমরা পরস্পরকে হাতে না ভুলে যাই, তাঁর নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি কি থাকবে না সেই তিনটি দিনের ঘনিষ্ঠতায়।

তুমি কি ভাগ্য মান? 'Micare me'র (কারনিভ্যাল) দিনটির কথা মনে পড়ে কি? ভিড়ে হঠাৎ তোমায় হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি। ভাবছি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রীতি-মধুর স্পর্শের হঠাৎ হয়ত এই ভাবে ছেদ ঘটবে এক দিন। আমি অদৃষ্ট মানি না। হয়ত এ আমাদের চরিত্রেই একটা দিক। ঠিক মুহূর্তে ঠিক মতো কাজ করতে কোন দিনই আমি শিখলাম না।

কাজেই তোমাকে তোমার দেশ, তোমার পরিজন-পরিবারকে থেকে নির্বাসিত করে ফ্রান্সে ধরে রাখাই মঙ্গল হবে তোমার পক্ষে। কেন যে এ চিন্তা আমার মাথার চুকেছে জানি না, যদিও এ ত্যাগ উপযুক্ত মূল্য দেবার কিছুই নেই আমার।

তুমি বল, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন কি? এ কি আশ্চর্যজনক নয়? অন্ততঃ স্বদেশের স্নেহ-প্রীতির দাস নই কি আমরা? বাইরে ভালবাসি তাদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার দাস আমরা। আর জীবিত অজ্ঞানের জন্ত দাসত্ব করতে হবে না কি? আর সেই ভাবে দানবের সেবক হয়ে পড়ব না?

সব চেয়ে বেদনাদায়ক—আমরা যে সমাজের বেড়াভাঙে বোঝিত তাঁর নানা দাবীর কাছে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে আমাদের। অবশ্য বার-বার ক্ষমতা বা দুর্বলতা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আর এ যদি না করি আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব—যদি বাড়ার বাড়ি করি বুঝতে হবে আমরা নীচ এবং দুর্ভাগ্যে উঠবে জীবন। দশ বছর আগে যে নীতির পূজারী ছিলাম আমি, তা থেকে আজ বহু দূরে সরে এসেছি। তখন ভাবতুম, সত্যিভাবে অতিরিক্তই বুঝি ভাল এবং পারিপার্শ্বিকের নিকট কিছু

সব মানব না এই ছিল প্রতিজ্ঞা। তখন ভাবতুম, নিজের গুণপনা মনে তেমনি ক্রটি-বিচ্যুতি নিয়েও বাড়াবাড়ি করতে হবে। আগে দা শুধু শ্রমিকদের মত নীল শাট পরতাম। ইত্যাদি।

কাজেই দেখতে পাচ্ছ, বেশ বুড়ো হয়ে পড়েছি। নিজের মনে বৌ দুর্গলতা বোধ করি আজ-কাল। আশা করি, খুব আনন্দে দিন কাটাবে। ইতি—

তোমার ভদ্রবন্ধু বন্ধু  
গীয়ারে কুরী।

ডি, এইচ, লরেন্সের চিঠি

প্রেক্সের ওয়েবার  
ইকিং, মিউনিকের সন্নিকট  
২রা জুন, ১৯১২

প্রিয় মিসেস্ হপকিন,

যদিও তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি তবুও আমি তোমাকে চিঠি দিচ্ছি। কারণ তোমার মত জনকে আমি সব সময় স্মরণের দিকে চাই। জার্মানিতে যখন এলাম আমার সঙ্গে ছিল মিসেস... তার সঙ্গে যেৎসে গিয়েছিলাম। তার স্বামী সবই জানেন, কিন্তু তিনি যে ডাইভোসে রাজী হবেন তা মনে হয় না। বিচ্ছেদ হতে পারে। আমাকে যদি তিনি ডাইভোসেই করেন, তাহলে আমাদের বিয়ে হতে পারে। বাই হোক অবস্থা এখন এই।

গত শুক্রবারে আমি রাইনল্যান্ড থেকে মিউনিকে এসেছি। ফ্রিয়েডলা মিউনিকে আমার সঙ্গে মিলেছে। সে ইজার উপত্যকার প্রান্তে আমাদের গ্রামের ঠিক পনের গ্রামেই তার বোনের সঙ্গে ছিল। আমরা এক রাত্রি মিউনিকে কাটিয়ে আট দিনের জঙ্গ ভ্রমণেরবর্ণে গিয়েছিলাম। ব্যাঘ্রবর্ণে ইজারের উজানে শরৎসর কাছাকাছি—মিউনিক থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে। এইটাই ব্যাভারিয়ান টাইরল। আমরা গেষ্ট-হাউসে উঠেছিলাম। একালে ঘন হর্সচেষ্টনাট গাছের নীচে আমরা প্রান্তরাল খেতাম—শাল আর সাদা ফুল গায়ে টুপটাপ করে পড়ত। বাগানটি ঠিক নদীর উপরেই—নদী দিয়ে কাঠের ভেলা ভেসে যায়। নদীটার নাম লয়সাক্। জলের রং কিকে সবুজ। গ্রেসিয়ার গলা জল কিনা। কিন্তু জল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি তার ভীষণ তোড়। পানকার বাসিন্দারা ব্যাভেরিয়ান। ভারী অন্ধুত। সরাইখানা, হর্সচেষ্টনাট-ঘেরা বাগান ছাড়িয়ে—গীর্জা আর মঠ। আরগাটি খুব নিরিবিলা। একমাত্র গীর্জার গম্বুজের কালো টুপি ছাড়া সারা গাড়া ধবধবে শাদা রং করা। প্রতিদিন আমরা অনেক—অনেকক্ষণ এতের থাকি। আশে-পাশে এত ফুল যে, দেখে আনন্দে চোখে জল এসে বাবে। সবই আলপাইন ফুল। নদীর ধারেও গ্লোব ফুলের বজা। এক-একটি বেন কিকে সোনার বৃন্দবু। এদের আমরা নাম দিয়েছি আইবুডোদের বোতাম। তাছাড়া প্রিয়ুলাস, ফাইনসলিপ, ডার্বোলেট অর্কিড, হাজার-হাজার ঘটা ফুল, লিলি, পার্কম্পার—খালি ফুল আর ফুল—বেন ফুলের অজস্র উপচানি চারি দিকে। এক দিন এখানকার চাষীদের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। এক দিন পাহাড়ের উপরে উঠেছিলাম এবং ফ্রিয়েডলার

আংটি আমার পায়ের পাতার উপর রেখে পা হুঁটো হুঁকের ফাঁকিতে সবুজ জলে ডুবিয়ে বসেছিলাম। কেমন দেখায় দেখতে। তার পর এক দিন বোলফ্রাং ট্রেনেও লেনেও গিয়েছিলাম। সেখানে শাদা গ্রাম ছাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে ফ্রিয়েডলার বোনের বাড়ী আছে। অনেকটা রাখালদের কুঁড়ের মত।

এখন আমি আর ফ্রিয়েডলা দু'জনে অধ্যাপক ওয়েবারের স্ন্যাটে একা থাকি। সর্বোচ্চ তলায় আমরা আছি। রাগা-ঘর ছাড়া চারখানি ঘর—বেশ ছোট-ছোট। সামনে একটু ঘেরা বারান্দাও আছে। এখানে আমরা বসি, খাই—লিখি। নীচেই রাস্তা—রাস্তায় বলদে-টানা গাড়ীগুলি মাল নিয়ে মস্তর গতিতে চলে। রাস্তা পেরিয়ে গমের ক্ষেতে মেয়েরা কাজ করে। তার পরই বন আর প্রান্তরের মাঝ দিয়ে দুধ-সবুজ নদীর ধারা। আরো দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। তাদের চূড়ায় তুষারের ঝলমলানি।

এইমাত্র রাগা-ঘরে গিয়েছিলাম। বেশ চমৎকার ছোট নিরিবিলা স্থান। ভাবলুম, ফ্রিয়েডলা কি করছে দেখে আসি। তার মাথাটা তক্ষুনি তাকেই হুঁক গিয়েছে। আমরা দু'জনে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পাহাড়ের মাথায় কালো মেঘের ওড়না। নিকটতম পর্বতশ্রেণী গাঢ় নীলে আশাশ্রম মস্তক লেপা। এ দুয়ের কঁক-কঁকে একটি অপূর্ণ সোনালী ছেদ, আবছা অপূর্ণ পাহাড়ের জটলা, চড়ার তুষারে ফিক সোনার স্বপ্ন—আরো আরো দূরে নিস্তরক তুষারে দৃষ্ট বলন্ত এলোমেলোর রাজ্য। এইবার বজ্রপাত শুরু হয়েছে সেখানে—এখানে নেমেছে বৃষ্টির ধারা।

ফ্রিয়েডলাকে আমি খুব ভালবাসি—এসমুখে আমি কোন কথা বলতে চাই না, আগে কখনো জানতুম না-ভালবাসা কি। সে আমাকে তোমায় চিঠি লিখতে বলেছে। চিরদিন তোমাদের হুঁটিতে মিতালি থাকে এই আমি চাই। কোন দিন হয়ত তার—হয়ত আমাদের—প্রয়োজন হবে তোমাকে। সেদিন তুমি আমাদের বুকে তুলে নেবে ত—নেবে না?

অপূর্ণ, স্নেহের আর মাহুনের কল্পনার অতীত ভাল এ পৃথিবী। প্রেম কি, আগে থেকে ধারণা করা যায় না—না—না! জীবনও মহৎ হতে পারে—দেবতুল্য। হ্যাঁ, হতে পারে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, আমি তা প্রমাণ করেছি।

এখানে আমাদের চিঠি লিখতে পার। আমাদের মধুসামিনীর সপ্তাহ শেষ হয়ে গেছে। ভগবান সাক্ষী—সে অপূর্ণ। কেমন লেগেছে? খুব ভাল। কাউকে বলো না। একেবল ভালদের জানবার। চিঠি লিখো।

ডি. এইচ. লরেন্স।

স্রীকে লেখা ওয়ারেন হেষ্টিংসের চিঠি

[মেরিয়ান ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বিতীয় স্রী। জাতিতে তিনি জার্মান ছিলেন এবং তাঁর পূর্ব-স্বামীর নাম ব্যাভন ইম্পহপ। একই জাহাজে ভারতে আসার সময় ওয়ারেন হেষ্টিংসের সহিত হয় হয়র দেওয়া-নেওয়া এবং ভারতে পৌঁছেই পূর্ব বিবাহ বাতিল করে মেরিয়ান হেষ্টিংসের গলায় মাল্য অর্পণ করেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।



এক জন ঐতিহাসিক লিখেছেন—“মেরিয়ান দেখতে ছিলেন যেমন অপরূপ সুলভী তেমন তার দেহ-সৌষ্ঠবও ছিল অমূল্যম।”

মেরিয়ান প্রেমিক হেলিংসের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিলেন, তিনি তাঁর অক্ষয় বাক্যের রেখে গেছেন মেরিয়ানকে লেখা তাঁর অসংখ্য অনবদ্য পত্রগুলোতে।]

কুলপী, রবিবার সন্ধ্যা,  
১১ই জানুয়ারী, ১৭৮৪

প্রিয়তমাসু

অন্তরীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে মিসেস্ স্যাণ্ডস চিঠিখানা ঠিকমত তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারবেন, এই ভরসায় লিখতে বসেছি। কিন্তু কী-ই বা লেখার আছে। শুধু মনের আবেগ মেটানোর এ চেষ্টা। গত কাল সকালে তোমায় বিদায় জানিয়ে এসেছি। শ্রীমাদের জাহাজ যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে—চেয়েছিলাম জাহাজের দিকে। তার পর দুঃখভারাক্রান্ত একটি দুর্বিঃ দিন অতিক্রান্ত হোল। একটা অসহ্য বেদনা হাতুড়ি পিটেছে মাথার মধ্যে।

বজ্রায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হোল নতুন করে দুঃখ-নহনের পালা। কামরা এবং কামরার ভিতরের প্রত্যেকটি জিনিস মুহূর্তে আমার প্রিয়তমা মেরিয়ানের কথা স্মৃতিপথে জাগরিত করে তুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ভীষণতম বাস্তবতায় মন সচেতন হয়ে উঠল যে, আমার মেরিয়ান এখন আমার কাছ থেকে হুঁশো মাইল দূরে এবং ক্রমশঃ এমন দূরে যাচ্ছে—অপর ও অনীম যার বিস্তৃতি। এই বেদনাতুর বিরতির অবসরে নিজের করুণ অবস্থার কথাটা ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছি এবং এখন (ক্ষমা করো প্রিয়তমে, না বলে পারছি না) তোমায় চলে যেতে সম্মতি দিয়ে অশ্রুশোচনাই হচ্ছে। চরমতম হঠকারিতার কাজ করেছি আমি। এবার কিসেরই বা আশায় পথ চেয়ে বসে থাকব—এ যে যুগ-যুগান্তরের বিরহ। যদি আবার কখনো দেখা হয় কি অর্থ্য দেব তোমায়? স্ববিরহের বোঝা আর দীর্ঘ দিনের বিরক্তি-কটু মন। কেবল নিজের কথাই আমি ভাবছি না, যদিও নিজের দুঃখের চিন্তা ও অদ্ভুতি অল্পচিত্ত ভাবে মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। তুমিও দুঃখ পাচ্ছ সত্যি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মুহূর্তে আমার চেয়ে ঢের বেশী বড় পাচ্ছ তুমি। ভয় হয়, এ না শেষ পর্যন্ত তোমার স্বাস্থ্যের উপর আঘাত হানে। মিঃ ডবটনের মৃত্যুকে ভয় করছি। হে ঈশ্বর, সে যেন সুখের খবর আনে। হৃদয় বা আমাদের বিচারে ভুল হচ্ছে। প্রায়ই মনে হয়েছে হৃদয় আমাদেরই ভুল। তোমায় কিরে আসতে বলব না এই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার জন্ত সব কিছু প্রয়াস করছি। এই বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগে গর্ভ ও অল্পভব করছি মনে...

মিসেস্ স্যাণ্ডস্ যাতে চিঠিখানা অন্তরীপের মুখে তোমার হাতে পৌঁছে দিতে পারে সেই সন্ধানবীর কথা বার বার আবৃত্তি করছি। স্যাণ্ডস্ এখন দিনেমার জাহাজে। জাহাজখানা এখানে নোঙর করে আছে—আগামী বৃহস্পতিবার নদী ছেড়ে যাবে আশা করছি। সম্ভবতঃ দেবীও হতে পারে। সহর থেকে আর একখানা চিঠি পাঠাব। রাতের জোয়ারের সঙ্গে আবার যাত্রা শুরু করব। যদি একবার কলিকাতার কাছাকাছি

পৌঁছতে পারি তাহলে আগামী কাল কীলছোরায় যাত্রার পরিসমাপ্তি করব মনস্থ করেছি। এই বিরক্তিকর পারিপার্শ্বিক ছেড়ে এলে আমার আশংকা হৃদয় তত বিবাদময় নাও হতে পারে। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে, সময় বা স্বভাব কোন কিছুই তোমার মৃত্যুখানি আমার হৃদয়-পট থেকে মুছে ফেলতে পারবে না, আর আমি মুহূর্তেও দেব না যদিও চিরকালের জন্ত এক বেদনাময় স্মৃতি হয়ে থাকবে।

গত কাল যখন অর্ধ-নিশ্চিত অবস্থায় গুয়েছিলাম হঠাৎ যেমন যেন মনে হোল, তোমার চম্পক জাজুল আমার মুখে-খাড়ে বুলিয়ে দিচ্ছে—তোমার গলার স্বরও শুনেছি হৃদয় করে বলতে পারি। হায়! যখন শোব এই মায়া-মরীচিকা যদি সত্য্য হোত! আর বাস্তবিকই আমার কাছে মায়া-মরীচিকার মত। কাল সকালে আমার প্রিয় মানুষটিকে বন্ধে জড়িয়ে ধরেছিলাম আর এখন যে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন—যেন তার অস্তিত্বই ছিল না কোন দিন। হায় মেরিয়ান, আমার মত এত বড় হৃদয়ভাগ্য আর কে আছে! তুমি যখন এই চিঠি পড়বে তোমারও আমার মত অবস্থা হবে। তবুও কেন জানি না, চিঠিখানা পাঠাতেই হবে—যা লিখেছি তাকে লঘু করার ক্ষমতা আমার নেই। আমার নিজের জীবনের অধিক ভালবাসি তোমায়। তোমার সঙ্গে আবার মিলনের সম্ভাবনায় প্রাণ ধরে রাখব। হে ডর্গবান! পূর্ণ কর আমার এ কামনা। এই বিচ্ছেদ আমার মেরিয়ান যেন বহন করতে পারে—তাকে নিরাপদে সুস্থ দেহে গন্তব্যে পৌঁছে দিও—আবার যেন ফিরে পাই তাকে—ফিরে পাই সব কিছুকে যা আমাদের সুখ-মিলনকে সম্পূর্ণ করে তুলবে। শান্তি! শান্তি! শান্তি! ইতি—

তোমার চিরায়ত্ত  
ও, হেলিংস।

পুনঃ—মিস্ টিটার (টাউচেট) সঙ্গে দেখা হয়েছে। ভাল আছে সে। তোমার প্রিয় বন্ধুকে আমার ভালবাসা দিও। বিদায়। [ইণ্ডিয়া গেজেটের সংবাদ মতে ২রা জানুয়ারী গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেলিংস তাঁর জীকে জাহাজে তুলে দেওয়ার জন্ত বেডগেরী পর্যন্ত জীব অমুগমন করেছিলেন। সেখান থেকে মিসেস্ হেলিংস “এ্যাটলাস” নামক জাহাজে স্বদেশে প্রত্যগমন করেন। হেলিংস-দম্পতীর প্রেম ও ভালবাসা তদানীন্তন কালের গল্প-কথায় বিষয়-বস্তু ছিল।

কুলপী—সেখান থেকে চিঠিখানা লেখা হয়েছে কলিকাতা থেকে ৪৮ মাইল ভাটিতে। এখান থেকে ডায়মণ্ড হারবার সাত মাইল দূরে। ডায়মণ্ড হারবার থেকে কলিকাতাগামী লোকের বজ্রায় উঠত এবং স্বদেশগামী যাত্রীরা জাহাজ ধরত। ডায়মণ্ড হারবার থেকে কুড়ি মাইল ভাটিতে বিপরীত ভায়ে এ্যাটলাস জাহাজটি নোঙর করেছিল।

মিঃ ডবটন সব্বন্ধে বত দূর জানা যায় তিনি হেলিংসের পার্শ্ববর্তী হতে পারেন আবার ডঃ বাস্টার্ডের মতে ডাকের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হতে পারেন।

মিসেস্ স্যাণ্ডস্—হেলিংসের পার্শ্ববর্তী ক্যাপ্টেন স্যাণ্ডসের জী মহিলাটি মিসেস্ হেলিংসের প্রতি গভীর অমুরক্তা ছিলেন।]

## ডক্টর জনসনের

[জেমস বসওয়েল ছিলেন ডক্টর জনসনের প্রধান সহচর জনসনের যে জীবনী বসওয়েল রচনা করে গেছেন তা জীবনী রচনা ইতিহাসে বিস্ময়কর দৃষ্টি। বসওয়েল টাকা ধার করে একবার জনসনে সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। ফলে জনসন দারিদ্র্য এবং অর্থহীনতা সম্পর্কে এই পত্র রচনা করে পাঠান, তারিখ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ।]

মিঃ জেমস বসওয়েল সমীপে :

প্রীতিভাজনেষু,

আপনি এখানে আসায় আমরা যতো আনন্দই পেয়ে থাকি না কেন, ধার করে পাথের সংগ্রহের ব্যাপারটা কী করে সমর্থন করা ভেবে পাচ্ছি না। স্বপ্নগ্রহণ শুধু যে একটি অসুবিধাজনক অভ্যাস তাই নয়, বিপজ্জনকও বটে। ভালো কাজ করার ক্ষমতা দারিদ্র্য কেড়ে নেয়, মনকে প্রতিরোধ করার নৈতিক এবং স্বাভাবিক প্রবণতারও এমন হানি ঘটায় যে, সাধ্য মতো দারিদ্র্য এড়িয়ে চলা উচিত। হীনবিত্ত একটি লোকের কথা ভেবে দেখুন, বংশমর্যাদা সে যতোই অভিজাত হোক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে তা যতোই সুনাম থাকি না কেন, কী করতে পারে সে? কোন মতে প্রতিরোধ করতে পারে? সে যে সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করতে পারে না—এ তো জানা কথাই; কারণ তার সামর্থ্য নেই। সম্ভবত তা উপদেশ কিম্বা সতর্কবাণী কার্যকরী হতে পারে; কিন্তু দারিদ্র্যই তা প্রতিপত্তি নষ্ট করে দেবে। সে যে বিজ্ঞ, এ কথা যত জন জানবে তাতে চেয়ে অনেক বেশি লোক জানবে সে বিস্তুহীন। যে বুদ্ধি সে নিজে মঙ্গলেই নিয়োজিত করতে পারল না, ক'জন তার মধ্যদা দেবে? স্বামী শোচনীয় আত্ম-মত্ততার কথা বারই দিলাম, এ তো প্রবাদ বাক্যই পরিণত হয়েছে। অর্থের গুণ ব্যাখ্যানা করার দরকার করে না। এই কথাটা শুধু মনে রাখবেন যে, ব্যয় করার মতো অর্থ ধীরে আসছে অস্ত্রের উপকার করা তাঁরই সাধ্যায়ত্ত, আর যে কোনো সং ব্যক্তি তো পরোপকারের জন্ত উৎসুক হবেন।

ভবদীয়

জামুয়েল জনসন

## ডক্টর জনসনের চিঠি : লর্ড চেষ্টারফিল্ডকে

[ডক্টর জনসনের বিখ্যাত অভিধান প্রকাশিত হবার কিছু আগে চেষ্টারফিল্ড 'দি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে প্রশংসামূলক মন্তব্য করেন। চেষ্টারফিল্ডের ইচ্ছা ছিল, জনসন বইটি তাঁর নামেই উৎসর্গ করেন। তখনকার কালে বলাভ ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি প্রকাশিত হত এবং তাঁদেরই সেই সব গ্রন্থ উৎসর্গ করা হত। জনসনও প্রথমে চেষ্টারফিল্ডের ক্ষুদ্রগ্রন্থপ্রত্যাশী হয়েছিলেন। কিন্তু দশ পাউণ্ড মাত্র সাহায্য করা ছাড়া চেষ্টারফিল্ড আর কোনো উৎসাহ প্রকাশ করেননি। অসীম দুঃখ-কষ্ট বরণ করে জনসনকে কাজ চালাতে হয়েছে, দ্বীপ মৃত্যুর ফলে পৃথিবীতে তিনি আরো একা হয়ে পড়েছেন; কেউ সাহায্য করেনি, কোনো উৎসাহ কারো কাছে পাননি। চেষ্টারফিল্ডকে লেখা এই চিঠিতে জনসনের ক্ষোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে, দ্রুপের কশাঘাতে তদানীন্তন অবিবেচক অভিজাত কুলের প্রতিনিধি চেষ্টারফিল্ডকে তিনি সচেতন করে দিয়েছেন যে, লেখকদেরও মর্যাদা এবং সম্মান আছে, তাঁরা বিস্তারিত ক্রীড়নক নন। সাহিত্যের ইতিহাসে চিঠিখানি অমূল্য।]

একবার এদিকে একটু দেখুন তো মিসেস সেন,—  
হার্শেলের কর্তা তাঁর সমস্তা বিবৃত করে জিজ্ঞাসা  
করছেন, “এখন কী করা যায় বলো তো মলী  
হাসি”—মেয়েদের সাজ-পোষাকের ভার যে মহিলার  
তিনি অকপটে স্বীকার করছেন, “মলী ভাই, তুই  
বখিয়ে না দিলে আর চলছে না।”

বিস্ময়কর মলী সেনের তৎপরতা। পার্ট মুখস্ত  
করছেন, গানের সুর শিখছেন, নিজ ভূমিকা  
রহার্সেল দিচ্ছেন। এসবের মধ্যেই আবার  
হাইভারকে ডেকে নির্দেশ দিচ্ছেন,

“মুখদেও, রিজেন্ট পার্কমে দত্ত সাবকে কোঠামে  
গাড়ি লে যাও, বড়ী মিসিবাবা আয়েঙ্গী। উসকে  
পিছে লেক প্লেস—যাঁহা পরশু গয়ে থে, মালুম  
হায়? হাঁ, পীলা মকান। বঁহাসে দো মেমসাব  
মানেশয়ালী হায়। বড়ে গাড়িঠো লে জানা।”  
গাড়ির বৃকের কাছে ক্লিপ গাঁটা ফাউন্টেন পেন  
খুলে নিয়ে চিঠি সই করছেন, কোনোটা ইলেকট্রিক  
কম্পানীতে অভিনয়ের রাত্রে অধিক বিজ্ঞানী  
বরবরাহের জন্ত, কোনোটা কর্পোরেশনে প্রমোদকর  
বিভাগে, কোনোটা বা লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের  
কাছে—অভিনয়ের আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রার্থনা।  
কখনও বা আর্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে দৃশ্য-সজ্জার  
পরামর্শ করছেন, টেলীফোনে মার্কেটে ফুলের অর্ডার  
দিচ্ছেন, পরিচিত পদস্থ ব্যক্তিদের ফর্দ করে দিচ্ছেন  
টিকেট বিক্রেতাদের সুবিধার্থে। তাঁর উদ্যম ও  
কণ্ঠশক্তি বহু পুরুষের পক্ষেও অনুকরণীয়।

ক্লাব, এসোসিয়েশন প্রভৃতি বহুজনের ব্যাপারে  
মাঝে মাঝে মতবৈধ ঘটে সে কথা সুবিদিত। কোন  
কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মতানৈক্যের বীজ পরিণামে বৃহৎ  
কলহের বিরাট মহীর্কহে পরিণত হয়। বন্ধু-বিচ্ছেদ  
ও আত্মীয়বিরোধ ঘটে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।  
মলী সেন এ ধরনের অশ্রীতিকর পরিস্থিতি নিবারণের  
কৌশল জানেন। বিবদমান দুই পক্ষের মাঝখানে  
কেমন করে তিনি স্নিগ্ধ হাসি ও সরল কথোপকথনের  
যাচ বস্তার করেন তা রীতিমতো গবেষণার ব্যাপার।  
বাড়ির রাতে পাকা মাঝি যেমন টেউএর আঘাত  
বাঁচিয়ে অনায়াসে তরণী তীরে নিয়ে আসে তিনিও  
তেমনই পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে অপ্রিয় আলোচনার  
শঙ্কাজনক ঘূর্ণাবর্ত থেকে বহুজনের পারস্পরিক  
শ্রীতির সম্পর্কে উদ্ধার ও রক্ষা করেন। মলী  
সেনের যারা সুহৃদ, আর কিছু না হোক, অন্ততঃ  
এই একটি কারণেই তাঁর কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকে।

উচিত। কে না জানে যে, জগতে বন্ধু লাভ করা কঠিন, রক্ষা করা কঠিনতর।

আপাত-বিরোধী মতবাদের সমন্বয় সাধনেও মল্লী সেনের কৃতিত্ব বহুবার বহু লোককে চমৎকৃত করেছে। মল্লী সেনের চিন্তা ও ভাষণে গভীর জ্ঞানের পরিচয় নেই। কেউ প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি,—ইংরেজীতে যাকে বলে কমন সেন্স—তার প্রমাণ আছে। সেইটেই যথেষ্ট।

অবশ্য অভিনয়ের পূর্বে প্রেক্ষাগৃহে একটি আনুষ্ঠানিক সভার আয়োজনের প্রস্তাবটা মল্লী সেনের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। কিন্তু সেটাকে কী করে যথোচিত গুরুত্ব দান করা যায় তার সমুদয় পরবর্তী পরিকল্পনা তাঁরই। দেশনেতা সত্যসিদ্ধ বাবুকে সভাপতি করার বুদ্ধি যেমন তাঁর, বহু জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় সদাব্যস্ত জননেতাকে একটা সাধারণ সাহায্য রজনীর আসরে দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল উপস্থিত থাকা ও বক্তৃতাদানে সম্মত করার সাফল্যও তাঁরই। ঐকান্তিক দেশসেবা ত্যাগ ও দুঃখবরণের দ্বারা সত্যসিদ্ধ দেশের জনগণের মনে এমন একটি শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত যে-কোন অমুষ্ঠান সর্বদাই সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ, এই একটি মাত্র ব্যবস্থা দ্বারা মল্লী সেনদের অভিনয় অগ্ন্যাশ্রয় সমশ্রেণীর উত্তোক্তাদের ঈর্ষাযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

ঐখানেই শেষ নয়, দৈনিক বিশ্ববন্ধু পত্রিকার সম্পাদককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে অমুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। প্রতি সপ্তাহেই তিনি শহর ও শহরতলীর একাধিক সভা সমিতির হয় সভাপতিত্ব নয় তো উদ্বোধন করে থাকেন। সে সকল সভার আলোচ্য বিষয় যেমন বিভিন্ন, উত্তোক্তা এবং শ্রোতারও তেমনি নানা শ্রেণীর। ছাত্রদের রবীন্দ্র জয়ন্তী, বুদ্ধদের বৈষ্ণব সম্মেলন, তরুণদের সাহিত্য সভা, ছানিমান স্মৃতি বার্ষিকী, পঞ্জিকা সংস্কার বা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সমিতির অধিবেশন প্রভৃতি সর্বত্র তাঁর সমান গতিবিধি, প্রত্যেকটিতে তাঁর সমান ওজস্বিনী বক্তৃতা। সভার উত্তোক্তারা খুবই খুশি হয়। সারগর্ভ ভাষণের জন্ম নয়, প্রচারসাফল্যের জন্ম। পরদিন সম্পাদকের নিজ কাগজে ডবল কলাম হেডিংএ বক্তৃতার সঙ্গে সভার যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয়, সেটা যথাস্থানে ছাপা হলে কলাম

ইঞ্চি দরে স্থূল অঙ্কের বিল মেটাতে হতো। তাতে উত্তোক্তাগণের হৃদরোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মুশ্লিল এই যে, সংবাদপত্র জগতে বিশ্ববন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী আছে এবং তার সম্পাদকেরও অমুরাগী লোকের অভাব নেই। ফলে সভাপতির আসন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বিরোধী দলের মুখপাত্র বলল, “বিশ্ববন্ধু সম্পাদককে ডাকা ভুল হয়েছে।”

অপর পক্ষ তা মানতে রাজী নয়। তাদের জবাব,—“ভুল যে নয় তা বুঝতে পারবে অভিনয়ের পরদিন সকালের বিশ্ববন্ধু দেখলে।”

“সে সঙ্গে ‘নবীন ভারতটা’ও দেখবো তো ? বিশ্ববন্ধু যেমন ফলাও করে বিবরণ ছাপবে, নবীন ভারত তেমনি তার নামটুকুও উল্লেখ করবে না।”

“কেন ? তাদের রিপোর্টারকে কম্প্লিমেন্টারী টিকিট দিই নি ?”

“ওঃ, তা হলে আর কি ? একেবারে নবীন ভারতের মাথা কিনে বসে আছি ! রিপোর্টারদের ডেকে কী হয় ? তাদের রিপোর্ট তো হবে চার পঁচ লাইন। কাগজের এক কোণে স্থানীয় সংবাদ বা আবহাওয়া খবরের নীচে ছাপা হবে। কারও চোখেও পড়বে না।”

“তা হলে আর কি করা যাবে ? নবীন ভারতে না হয় নাই বেরুবে।”

“না-ই বেরুবে ? নবীন ভারতের সাকুলেশান কত জানো ?”

বিশ্ববন্ধুর বন্ধু ব্যঙ্গস্বরে বলল, “সাকুলেশান যাই হোক, পাঠক কারা ? নবীন ভারত তো বেশী কেনে শুনেছি দোকানীরা। পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশী, পরের দিন প্যাকেট বাঁধার কাজে লাগে।”

“আর তোমার বিশ্ববন্ধুর বিক্রী বুঝি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ?”

“নবীন ভারতের সম্পাদককেই আমাদের অমুষ্ঠানে ডাকা উচিত ছিল এ কথা আমি হাজার বার বলবো, তাতে মিসেস সেন খুশি হোন আর নাই হোন।”— বলে নবীন ভারত-সেবক মল্লী সেনের পানে তাকালো।

মল্লী সেন বললেন, “আমি একটুও অখুশি হইনি, সতীশ বাবু। আমাদের এ সব ব্যাপারে যত বেশী পত্রিকার সহায়তা পাওয়া যায় ততোই

ভালো। পাবলিকের কাছে পাবলিকের সহায়কুতি না পোলে চলবে কেন? আর প্রেস পাবলিসিটি না হলে কি আজকাল লোকের সমর্থন মেলে? বিশ্ববন্ধুর সম্পাদককে ডাকা হয়েছে, হয়েছে। 'নবীন ভারতের' সম্পাদককেও ডাকলে ক্ষতি কি?"

ক্ষতি নেই। কিন্তু অসুবিধা আছে। সম্পাদকেরা তো একজন সাধারণ শ্রোতা বা দর্শক হিসাবে সভা সমিতিতে আসতে পারেন না। বিশেষতঃ এক সম্পাদক যে সভায় বিশেষ একটি অমুষ্ঠান সম্পাদনের মর্যাদা নিয়ে আসছেন তাতে অপর সম্পাদকের নিক্রিয় উপস্থিতি কল্পনা করাও অসম্ভব। অথচ একই সভার ছ'জন উদ্বোধনকর্তাও সম্ভব নয়। গৌরবে বহুবচন ব্যাকরণে আছে বটে, জীবিত ব্যক্তির বেলায় তো তা হওয়ার উপায় নেই।

মলী সেনই মৌমাংসা করলেন সমস্ত 'র। পূর্ব নির্দ্ধারিত ব্যবস্থায় যাত্রী বিশ্ববন্ধুর সম্পাদক করবেন উদ্বোধন। নবীন ভারতের সম্পাদককেও আমন্ত্রণ করা হলো। তিনি হবেন প্রধান অতিথি—গেষ্ঠ ইন চীফ। চমৎকার।

আজকের দিনে অবশ্য এতে কিছুমাত্র মৌলিকতা নেই। হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু সেদিন এটাকে অনায়াসেই ব্রেক-ওয়েভ বলা যেতে পারতো। আশা করি, বাংলা দেশের সভা সমিতির উপরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ খিনিস্ লিখে ভাবী কালে যিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টরেট লাভ করবেন তিনি প্রধান অতিথির প্রথম উদ্ভাদক হিসাবে মলী সেনকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

মলী সেন পুনরায় হাতের ঘড়ির পানে তাকালেন। আর বিলম্ব করা অমুচিত। উঠে শয্যার পার্শ্ববর্তী সাইড টেবিল থেকে হাণ্ডব্যাগটি নিলেন। জীপ্ ফাসনারটা টেনে খুলে ব্যাগের ভিতর থেকে চাবির রিটা বের করলেন।

ঘরের একপাশে সারিবন্দী গোটা চারেক আলমারী। একটার দরজায় বৃহদাকার আয়না বসানো যাতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করা চলে। বাকীগুলি কাঠের। তাদের চাকটিকে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে কিছুদিন 'মাত্র আগে কেনা হয়েছে। কাছে গেলে প্রায় মুখ দেখা যায়, গালা পালিশের গন্ধ আসে।

মলী সেন আলমারীর দরজা খুলে ভিতরে

একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। পর-পর চারটে তাক। প্রত্যেকটাতে একটির উপরে একটি করে ভাঁজ করা শাড়ির স্তূপ। লাল, নীল, হলদে, সবুজ, পিঙ্ক, মেরুণ, হাঙ্কা, গাঢ় নানা রঙ্গ। ইন্দ্রধনুতেও এত বর্ণ আছে কি?

মলী সেন প্রথম একটা শাড়ি টেনে বার করলেন। না, এটা বড় বেশী জমকালো। মনে হবে যেন বৌভাতের নিমন্ত্রণে যাচ্ছি। রেখে দিলেন। আর একটা নিলেন। মনে পড়লো গত সপ্তাহে এটা পরে দোসানীদের পার্টিতে গিয়েছিলেন। দোসানীর জুই আজ আসবে। ভাববে, শাড়ি তো নয় ইউনিয়ন জ্যাক। আলমারী বন্ধ করলেন।

পাশেরটা খুললেন। এটাতে বেশীর ভাগ টিসু শাড়ি। ভাঁজ করে রাখলে পাছে পাট নষ্ট হয়, তাই দীর্ঘ কাঠের সরু রোলারে জড়ানো শাড়ি একটির পর একটি আলমারীর দু'পাশে খাঁজ কাটা ব্রাকেটে রক্ষিত। না, এর একটাও আজকের অমুষ্ঠানে পরিধানযোগ্য নয়। প্রায় খুলতে খুলতেই বন্ধ করলেন আলমারীর কপাট।

তৃতীয় আলমারীতে স্তূপীকৃত বিভিন্ন বর্ণের মহার্ঘ বসনের মধ্যে যে বস্ত্রটির প্রতি মলী সেনের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হলো, সেটি মহীশূর সিঙ্কের একখানা ছাপা শাড়ি। আসমানী রং-এর জমি, তাতে গাঢ় নীল রঙ্গের পদ্ম ছাপ। বছর দুই পূর্বে এগজিবিশানে সখ করে কিনেছিলেন। পরদিন সেটা পরিধান করে এক চা-এর মজলিশে গেলেন। হায়, সেখানে ব্যারিষ্টার পি, সি, চৌধুরীর জুই বাস্কবী সুরটিকে দেখলেন প্রায় ছবছ ঐ রকম শাড়িতে। এক রং, এক ছাপ, একই ডিজাইন।

বিরক্তির আর অবধি রইল না। অপদার্থ মেয়ে কোথাকার। একটা শাড়ি নির্বাচনের ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। পরের রুচি ধার না করলে চলে না যাদের তাদের আবার সাজ করার সখ কেন? মলী সেন যা কিনবেন, যা পরবেন, তাই নকল করা চাই। আর কী বুদ্ধি। সবাইকে যে সব জিনিষ মানায় না সেটুকু বুঝবার মতো কাণ্ডজ্ঞান পর্যন্ত নেই। ঐ তো কালো চেহারা, তাতে নীল শাড়ি, দেখাচ্ছে যেন মোটর গাড়ির ব্লু-বুক।

শাড়ি বিক্রেতার প্রতিও ক্রুদ্ধ হলেন। এদের কি সামান্য ব্যবসায় জ্ঞানও নেই। একই রকমের

পঞ্চাশখানা সিল্কের শাড়ি তৈরী করলে সে শাড়ি কিমবে কে? এ কি খাটাউ বা ক্যালিকো মিলের দৃষ্টি যে গাঁট হিসাবে আমদানী আর ছোড়া হিসাবে বিক্রী?

মলী সেনের কাছে সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা একেবারে ব্যর্থ মনে হলো, চা এবং পেয়ালার বিশ্বাদ লাগলো। শাড়ি ফিরে এসে সেই যে আলমারীতে তুলেছেন শাড়িটা আর কখনও পরেননি।

সবগুলি তাকের উপর থেকে নীচু পর্য্যাস্ত একবার দৃষ্টি চালনা করলেন মলী সেন, তারপর একখানা বেছে নিয়ে রাখলেন আলনায। ব্রাউজের ওয়ার ড্রাব থেকে বের কবলেন শাড়ির সঙ্গে সজ্জিতযুক্ত জামা, দেওয়াল থেকে পেটিকোট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছদ।

হাতেব ঘড়িটা টিপাইর উপরে রাখলেন। চেউ-খেলানো কালো সেলুলয়েডের কাঁটাগুলি খোঁপা থেকে একে একে খুলে রাখলেন ড্রেসিং টেবিলে। চলেব রঙীন ফিতাটা ফেলে দিলেন ময়লা জামা-কাপড়ের বাস্পেটে।

স্নানাগারে প্রবেশোত্তোগ করছেন এমন সময় যে মেয়েটি এসে ঘরে ঢুকলো তার নাম সুধীরা, যদিও বেশীর ভাগ লোকই সংক্ষেপে ডাকে ধীরা। সম্পর্কে মলী সেনের ভাগিনেয়ী। শিবতোষের এক মামাতো বোনব মেয়ে। গত বৎসর ম্যাট্রিক পাশ করে বেথুনে ভর্তি হয়েছে। তাকে ফর্সা বলা কঠিন, দেহ-সৌষ্ঠবেও নিখুঁত নয়। কিন্তু মুখে বুদ্ধিদীপ্ত গমন একটি স্নিগ্ধ লাভণ্যের আভাষ আছে যা সহজেই কলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রূপ না থেকেও রমণী। রমণীয়া হতে পারে ধীরা তারই দৃষ্টান্ত।

মেয়েটি মলী সেনের প্রতি অত্যন্ত অনুবক্ত। সে নীচের ক্লাসের ছাত্রদের প্রায় প্রত্যেকেরই প্রজন আদর্শ হিরো থাকে। কারো বিদ্যাসাগর, রো নেতাজী, কারো বা ফুটবলার কিংবা সিনেমা তার। ধীরার আছে মলী সেন। তার কলেজের পাঠিনী থেকে শুক করে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে মলী মামিমার রূপ, গুণ, গা ও বুদ্ধির সবিস্তারিত বিবরণ অন্ততঃ বার চক শোনেনি। অনুরাগ ও অনুসরণের বিচারে। প্রায় তক্তের পর্য্যায় পড়ে। বৃহৎ বিষয়ের ক্ষুদ্রের তুলনা যদি ক্ষমার হয় তবে বলা যেতে

পাবে,—বুদ্ধদেবের যেমন আনন্দ, মহাত্মা গান্ধীর যেমন বিনোবা ভাবে, মলী সেনের তেমনি ধীরা। মলী সেনের সাজসজ্জা, কচি, মতামত, এমন কি কথা বলা থেকে শুক করে চলার ভঙ্গিটি পর্য্যাস্ত ধীরা অনুকরণ কবে থাকে। কোনো কাজে গভীর মনোনিবেশকালে গলার সূক্ষ্ম স্বর্ণহারটি দুই ওষ্ঠাধরের মধ্যে চেপে ধরার অভ্যাস আছে মলী সেনের। মাতুলানীর এই মুদ্রাদোষটি পর্য্যাস্ত ভাগিনেয়ীর চরিত্রে সযত্ন চেষ্টা দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রীতিটা উভয়তঃ। মলী সেনও ধীরাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। শনিবারে কলেজের শেষে প্রায়ই নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখেন। সোমবারে গাড়ী দিয়ে আবার কলেজে পৌঁছে দেন। দু' একটা পাটি, পিকনিকেও মাঝে মাঝে নিয়ে যান। পুঙ্খ বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ কোনো ব্যক্তি সঙ্গে না থাকলে দু' একবার সিনেমাও নিয়ে গেছেন। জামা, জুতা, সেট প্রভৃতি উপহার দেন যখন তখন।

কতবার শাড়ি কিনতে গেছেন মার্কেটে। নিজের জুতা। সঙ্গে ছিল ধীরা। সে বলেছে “এই শাড়িটা চমৎকার, এটা কেন মামিমা।”

মলী সেন জিজ্ঞাসা করেছেন, “এটা তোর কাছে ভালো লাগছে? আচ্ছা বেশ তোর জুতো নিচ্ছি।”

ধীরা অপ্রতিভ হয়ে বলেছে, “না, না, আমার জুতা নয়; তোমার জুতা কিনতে বলছি।”

“আচ্ছা আপাততঃ তোর জুতোই কিনছি, আমাকে না হয় দু' একদিন ধার দিস পরতে।”

ধীরা মনের চাঞ্চল্য যথাসাধ্য দমন করে বলেছে “বা রে, তোমাকে যে-শাড়িতে মানায়, আমার গায়ে তা কেমন দেখাবে?”

“খুব খাশা দেখাবে। নে বাড়ি গিয়ে আবার মাকে যেন দেখানেন। সে আমাকে কবে বকুনি দেবে।”

সেটা মোটেই সত্য নয়। বকুনি ধীরার মা দেন না। ধীরাব বাবা দু' একবার মৃদু স্বরে আপত্তি করেছেন ধীরার কাছে। বোঁঠান বড় মানুষ, টাকার ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের কি এতটা নেভা ঠিক? পূজা-পার্বণে ভালোবেসে দু' একটা উপহার দেন সে এক কথা আর ফি মাসেই শাড়ি দিচ্ছেন, জামা দিচ্ছেন সে অশ্রু ব্যাপার। শিবুদা'ই বা কী ভাবছেন কে জানে?”

মেয়ের মা সে কথায় কান দেননি, তিনি মেয়েমানুষ, সংসারিক বৃদ্ধি স্বভাবতঃই প্রথর। ধীরাকে মলা সেন দ্রুত কবে, সে তো লাভেরই কথা। এই তো আরো কত মেয়েরা কলেজে পড়ে। তাদের মায়েরা তখন করে বলে, খরচের আর পার নেই, মেয়ের জামা-কাপড়ের নিত্য নতুন ফ্যাশানের দায়ে তখন যান্ত্রিক দাখিল। আর ধীরার জন্য আরও পরিশ্রম তাকে কখনও ভাবতে হয়েছে? নতুন উপহারের কথা এতটাই দাঙ্গ। মলী সেনের নিজের ব্যবসায় জড়িত কি ধীরাকে তিনি কম দিয়েছেন? কি মাসের নতুন শাড়ি কেনা মলা সেনের একটা কাশানে যেমন ফি মপ্তাহে সিনেমায় যাওয়া অব্যাহতি পূর্বক। অথচ একটা শাড়ি কয়েকবার পরিধানের পরই আর আকর্ষণ থাকে না তার প্রতি। বাক্যকে দিয়ে দেন। ধীরে না নিলে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে দিতেন। আলমারা বোকাই কবে আর কতদিন রাখতে পারতেন? তা'ছাড়া ধীরার বিয়ের কথাটাও তো একবার ভাবতে হবে। টাকা লাগবে না তখন? মামার করণা অক্ষুণ্ণ থাকলে সে সময়েও অনেক সুরাহার সম্ভাবনা।

অর্থহীন যুক্তি। ধীরার বাবাও শারে ধারে মত পরিবর্তন করেন।

“কী চাই রে ধীরা?” মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন।

কিছু চায় না। এসেছে মলী মামাকে নিয়ে যাবে ডেসিং রুমটা একবার দেখাতে।

এ বাড়াতে কক্ষের অভাব নেই। ঠাকুর দালানে যেখানে ষ্টেজ তৈরী হয়েছে তার পিছনে ও ছ'পাশে একটা করে মান্যারি পরণের কুঠরি। সেগুলি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সজ্জাক্ষরূপে ব্যবহারের জন্য নিৰ্দিষ্ট হয়েছে। বাঁ দিকের দরজা অল্পতনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। মহিলাদের প্রসাধন ও সজ্জাপর্ক অধিকতর ব্যাপক এবং সময়সাপেক্ষ। উপহার উপকরণও অনেক। সুতরাং সেটি তাঁরা দখল করবেন। বিপরীত দিকের কক্ষটি পুরুষ অভিনেতাদের পোষাক পরিবর্তনের স্থান।

পিছনের দিকের ছোট ঘরটি আগের আমলে ষ্টোর ছিল। এটি মলী সেন বেখেছেন তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যবহারে। পদ্মালী অঙ্গীকার অভিনেতার

দ্বারা তিনি জানেন, এসব সৌখীন অভিনয়ে ষ্টেজ অনাবশ্যকরূপে ভীড় জমে। রজ্জাবতরণকারিণীদের চাইতে নেপথ্যাচারিণীর সংখ্যা বেশী হয়। অভিনেত্রীদের আত্মীয়া, সখা এবং বক্তৃস্থানীয়দের শাসন কঠোর এবং দৃষ্টি প্রথর না হলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ বন্ধুদেরও উপস্থিতিতে মহিলাদের বেশ পরিবর্তনের স্থানগুলি জনাকীর্ণ থাকে। ফলে সবসময় পক্ষে নিশ্চিত ভাবে আপন অঙ্গুরাগে মন দেওয়া কঠিন হয়। ছত্রহ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে যে একটা উদ্বেজনাহীন শান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ আত্মস্থ হওয়া প্রয়োজন আছে, তারও আর কিছুমাত্র সুযোগ মেলে না। তাই মলী সেন এবার নিজের জন্য পৃথক এক কক্ষ নির্দিষ্ট রেখেছেন। বিনা অন্তর্যমিত্তে সেখানে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

পৃথক সজ্জাগৃহের আরও একটা বিশেষ সুবিধা আছে। অভিজাত নরনারীর এই অভিনয়গুলিতে অভিনেত্রীরা বেশভূষায় যে সকল অলঙ্কার ব্যবহার করেন সেগুলি সাধারণ বঙ্গালয়ের কৃত্রিম গহনা নয় প্রকৃত মণিযুক্তায় খচিত। যথেষ্ট মূল্যবান। হ অভিনেত্রীগণের নিজস্ব নয় তো তাঁদেরই পরিচি পরিবার থেকে সংগৃহীত। বিভিন্ন দৃশ্যোপযোগী রূপসজ্জা পরিবর্তনকালে অতি বাস্তবায় অনেক সময় পরিত্যক্ত অলঙ্কার যথোচিত সাবধানতায় নিৰ্দিষ্ট স্থানস্থিত হয় না। ফলে অভিনয় শেষে বহু অগ্নেয়শ্রেণী কারো দামী কানের তুল, কারো জড়োয়া কঙ্কন, কারো হীরাবসানো ব্রোচের আর সন্ধান মেলে না ইতিপূর্বে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মলী সেনের এক মুক্তার বর্গ হারিয়েছে; একজোড়া তাবিজের জোড় ভেঙ্গে আছে। তা ছাড়া, চুলের ক্লিপ পাউডারের কোটা, কম্প্যাক্ট কেস ইত্যাদি ছেঁ খাটো জিনিসও নেহাৎ কম যায়নি। নিজের ড্রো রুম আলোদা থাকলে এসব ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। তা'না এঁটে তা বন্ধ রাখা যায়, নয় তো নির্ভরযোগ্য কোনো একজনের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করা চলে।

ধীরাকেই দিয়েছেন মলী সেন তাঁর সাজ-বা-ভার। বলা বাহুল্য ধীরার কাছে সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত গুরুভার মনে হয়নি। সে ষ্টেজ তৈরী হওয়ার ঠিক দিন আগে থাকতেই ছোট ঘরটিকে নিজ উপস্থিতি জ্ঞানায়ুক্ত করিয়েছে নিজ তত্তাবধানে প্রয়োজন

সম্ভাবপত্রে সজ্জিত করেছে। নাট্যকার কোন দৃশ্যে মলী সেনের বিরূপ অঙ্গসজ্জা ও বেশভূষার প্রয়োজন তার বিবরণ খাতায় লিখে রেখে তার যথাযোগ্য পাদান সংগ্রহ করেছে, সামান্যতম জিনিষের অভাব রূপের জন্ত পুনঃ পুনঃ সবাইকে তাগিদ দিয়েছে। তার হিসাহের আতিশয্যে উদ্যোক্তারা, মায় মলী সেন বর্ষাস্ত, বাতিবাস্ত। এক্ষণে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে একবার তাঁকে দেখিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা যার জন্ত এই আয়োজন, এত উজ্জম, এত পরিশ্রম।

মলী সেন বললেন, “ও আর এখন দেখতে চলে না। ঠিক আছে। একেবারে সেই গৌণরূপে একেই দেখবো। আর কতক্ষণই বা বাকী? আমি চুপ করে গাটা ধুয়ে নিচ্ছি।”

মলী সেনের কথায় ধীরার কন্দম্বকতার প্রতি আশ্রয় পরিচয় ছিল। সে মনে মনে যথেষ্ট প্রশংসা করলো। কিন্তু মুখে কিছুটা উদ্বেগের ভাব ব্যক্ত করে বললো, “না বাপু, আগে ভাগে তুমি একবার দেখে নাও। কোথায় কী চাপ। শেষকালে হাতের কাছে দরকারী জিনিষটি সময় মতো না পেলে কষ্ট হবে তো? তখন আমিই বা জোঁপাড় করবো কোথেকে?”

মলী সেন জানেন পূর্বচিন্তা ও অনুমানের দ্বারা কীটী মন্তব্য, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সাধনে ধীরার মনই ক্রটি রাখেনি। তবুও তিনি একবার সন্দেহ দেখে বিষয় প্রকাশ করুন, ধীরার বিচক্ষণতা, চিন্তা ও কর্মনৈপুণ্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করুন, এইটাই আগমনীয় অভিলাষ তা বুঝতেও বুদ্ধিমতী মল্লিকানীর কষ্ট হয়নি। কিন্তু আপাততঃ সময়ভাব। তার কীটীটা মনে হয় যেন ধাবমান অশ্বের গতিতে শব্দঃ সম্মুখাভিমুখী হচ্ছে।

সন্দেহে ধীরার গণ্ডদ্বয়ে মূঢ় অধলি-আঘাত করে মলী সেন বললেন, “হয়েছে, হয়েছে, তোকে তার মনো ভাবতে হবে না। আমি জানি ধীরার মিসির কাছে কখনও কোন খুঁৎ থাকে না। আমার চাই, না চাই, তা আমার চাইতেও তুই ভালো বস। এখন বরং এইখানে একটু বোস, অনেক গছিস, আমি চট করে চানটা সেয়ে নিচ্ছি।”

এর চাইতে বেশী প্রশংসা ধীরার নিজেও প্রত্যাশা করেনি। পরম আত্মপ্রসাদের সঙ্গে সে মলী সেনের গন্ত সোকাটায় বসে পড়ল।

মলী সেন বানানাগারের দিকে যেতে যেতেই আবার ফিরে এলেন। ধীরার জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, ফিরে এলুম একটা দরকারে!—শচীনকে মানে, বানাজীকে দেখেছিস এখানে?”

সংশোধনের প্রয়োজন ছিল না। বানাজীকে মলী সেন যে একান্তে নাম ধরেই ডাকেন তা ধীরার কাছে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে সে উত্তর করলো, “কৈ, না তো!”

“ষ্টেজের উপরে নেই?”

“না, আমি তো ষ্টেজের দরজা দিয়েই মিঁড়ি-কোঠায় এসেছি, সেখানে অনেকই আছেন, মিষ্টার দত্ত, নায়ার, মিসেস লাহিড়ী, টুনিদি, আরও অন্যান্য সব। কিন্তু মিষ্টার বানাজী সেখানে নেই।”

মলী সেনের মুখে যেন ক্ষণেকের জন্ত অনিশ্চয়তার ছায়া সঞ্চারিত হলো।

অনুপস্থিত এই ব্যক্তির সঙ্গে মলী সেনের সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ রহস্যের স্পর্শ আছে, তা ধীরার অনুমান করতে পারে। সে তো এখন আর বালিকা নয়। তার নিজের জীবনেও যে সম্প্রতি এক অভিনব অভিজ্ঞতা ঘটছে। অতীত নরনারীর হৃদয়ঘটিত আনন্দ বেদনার অনুভূতি সে যেন এখন অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। সে মলী সেনের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, “খোজ করে দেখবো, কোথায় আছেন?” যথেষ্ট অনুমনন না থাকলে ধীরার অদরের কোণে চপল হাসির ক্ষীণ রেখাটি নিশ্চয়ই মলী সেনের দৃষ্টির অগোচর হইতুনা।

“না, তার দরকার নেই।” বলে মলী সেন প্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটালেন। ক্ষণেক নীরবতার পরে হঠাৎ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, “বানাজীর মাকে তুই কখনও দেখেছিস?”

“না। কেন, বলো তো?”

“ভাবছিলাম তাঁকে আজকের অভিনয় দেখতে নিমন্ত্রণ করলে কেমন হয়।”

“বেশ হয়, মিষ্টার বানাজীকে বলে দাও না তাঁর মাকে নিয়ে আসতে।”

“না, সেটা ভালো দেখাবে না। প্রথম দিন আমাদেরই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাবছি তুই গেলে কেমন হয়।”



“আমি তো মিষ্টার ব্যানার্জীর বাড়ি চিনি নে।”

“ড্রাইভার কিষণ চেনে। ছোট গাড়িটা নিয়ে যাবি। বলবি যে তিনি না এসে আমরা খুব দুঃখিত হবো। তিনি চান তো পাঁচটা নাগাদ গাড়ি পাঠাবো।”

ধীরার উৎসাহ অদূরস্থ। সে মুহূর্তেই যাবার জন্ত প্রস্তুত।

মলী সেন ড্রাইভারকে ডেকে যথোচিত নির্দেশ দিয়ে ধীরাকে বললেন, “ব্যানার্জীর সঙ্গে দেখা হলে যেন বলবিনে, আমিই তোকে পাঠিয়েছি।”

ধীরা বললো, “তা বলতে হবে কেন? আনাকে দেখলেই তো বুঝতে পারবেন।”

“তা যাতে না পারে সেজ্ঞা তুই আগেই অ্যা কারো কথা বলিস। দত্ত সাহেব কিম্বা বিভাদ্রি—না, তার চাইতে ভালো হবে ক্লাবের সভাপতির নাম করা। বলবি, তিনি সদস্যদের সবারই বাড়িতে বিশেষ নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।”

ধীরা প্রস্থান করল।

শৃঙ্খল গৃহে মলী সেন কয়েক মুহূর্ত মনে মনে বিষয়টির পর্যালোচনা করে দেখলেন। শচীর মাকে সব বলা কি ঠিক হবে? তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোন্ কথার কী অর্থ গ্রহণ করবেন কে জানে? হয়তো মনে করবেন,—কি মনে করবেন?—তা অনিশ্চিত। কাজ নেই, তাঁকে কিছু বলে। হঠাৎ তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ না করলেই বোধ হয় ভালো হতো। যাক, নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, তাতে আর ক্ষতি কী? অ্যা আর দশজনের মতো তিনিও আসবেন, অভিনয় দেখে যাবেন। না, তাঁকে বলাই বোধ হয় ভালো। হাঁ, নিশ্চয়ই বলার প্রয়োজন আছে। শুনে এমন কী আর মনে করবেন? যাতে কিছু মনে না করেন ভেমন করে বললেই হবে। আপন বাচনদক্ষতার উপরে মলী সেনের যথেষ্ট আস্থা আছে। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ করে মলী সেন মন স্থির করলেন। তারপর ধীরে ধীরে স্নানাগারের দিকে পুনরায় পদচালনা করলেন। [ ক্রমশঃ। ]

### রেডিওর জ্ঞান-বিস্তার

বোন রেডিও শুনেই দিনরাত বাস্তব। অবশ্য দিন-রাত রেডিওতে অধিবেশন হচ্ছে না। দিন আবে রাতের মধ্যে যতক্ষণ অধিবেশন হয়—গানই হোক আর ভাবনাই হোক; কথকতাই হোক আর গল্পপাঠই হোক; মজতুর মণ্ডলীর আসরই হোক আর অরুণোদয়ের আসরই হোক, ‘টক’ই হোক আর নাটকই হোক; বোন কিছু রেডিও খুলে সর্বক্ষণ বসে আছে। কিছু ভাই রেডিওর তত পক্ষপাতী নয়। তবুও বোনকে রেডিও শুনে দেখে ভাই বললে,—রেডিও আমাকে জ্ঞান-সঞ্চয় করতে বিশেষ সাহায্য করে।

বোন ভাইয়ের কথা শুনে বিম্বিত হয়। বলে,—বাজে কথা। তুমি তো রেডিও খুললেই বিরক্ত হও। জ্ঞান আবার কখন সঞ্চয় কর?

ভাই হাসতে হাসতে বলে,—তাই তো বলছি। দেখিস্ না, তুই রেডিও খুললেই আমি পাশের ঘরে গিয়ে বই খুলে পড়তে বসি।

ছবি পাঠাবার সময় ছবির পেছনে আলোকচিত্রীর নাম, ঠিকানা এবং ছবির বিষয়বস্তু স্পষ্টাক্ষরে লিখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**ফটোগ্রাফ**

ছবি ফেরৎ নেওয়ার জন্য যথাযোগ্য ডাক-ব্যয় দিতে হবে। ছবির আকার পোষ্ট-কার্ডের বা তদুর্দ্ধ হ'লে সুবিধা হয়। নেগেটিভ পাঠাবার প্রয়োজন নেই।



কণিক মূর্তি (কলিকাতা বাহুবধ) — দেবপ্রসাদ সরকার  
(প্রথম পুরস্কার)



—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

**বিবরণ**

কলকাতার শ্রষ্টব্য

প্রথম পুরস্কার—১৫০

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০

তৃতীয় পুরস্কার—৫০

শান্তিনিকেতনে অবস্থিত রামকৃষ্ণর বেইজ নির্মিত মূর্তি

—মনো মিত্র

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

কানন-বাল।  
—সুধীরকুমার ১৬শ (হাজারীবাগ)



যগ্নিকী মূর্তি  
—শাস্তিনাথ মুখোপাধ্যায়  
(তৃতীয় পুংস্বায়)



বন্থের রাজাবাই টাওয়ার —অজিতকুমার মিশ্র (বাঁকুড়া)

[ উপরের এবং নীচের এই ছবি দু'খানি সম্প্রতি  
অনুষ্ঠিত বাঁকুড়া আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় যথা-  
ক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রেছে ।  
বিচারক ছিলেন মাসিক বসুমতীর সম্পাদক । ]



ঘরামি

—শান্তিপ্রসাদ দাস ( ব্যাংকপুৰ )



টুচু-নীচু

—সত্যনাথগণ গোয়েকা ( বাঁকুড়া )



সত্যিকার প্রজাপতি

—দেবানীষ গুহ (খড়্গপুর)



[ এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পৃথিবীবিখ্যাত ভাস্কর জ্যাকব  
এপুস্তিন নিশ্চিত রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির ছায়াচিত্র  
মুদ্রিত হ'ল। চিত্রখানি শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়  
মহাশয়ের সৌজন্মে প্রাপ্ত। ]

ভানানুসঙ্গী

—লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী (কলিকাতা)

জীবনের বাজাপথ বন্ধন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,

পরগারের জন্ত পাথের সংগ্রহ তহবিল অল্পসন্ধানে  
যখন দেখি তাহা রিক্ত, তখনই মনে হয় বার্ষ জীবনে তবে  
পাটলাম কি। বাঙা পাইয়াছি তাহা অমূল্য, কিন্তু তাহার  
সদ্যবতার করিবার আমার আর সময়ও অধিক নাই। ইহা  
যদি তরুণ বা ভবিষ্যৎবংশীরদের কোন কাজে লাগে তাহা  
হইলেও সার্থক মনে করিব। জীবনের দীর্ঘ পথে যে সকল  
অঙ্কলে বিচরণ করিয়াছি তাহা ব্যবসায়, সাহিত্য, রাজনীতি  
প্রভৃতি। এই সকল ক্ষেত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অল্প-  
সন্ধানে যে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহার যতটা মনে পড়িয়াছে  
পিথিয়াছি। কণ্ঠজীবনের শিক্ষার কথাও সবিস্তারে  
লিখিয়াছি, কিন্তু শিক্ষার সর্বাংশে বড় কেন্দ্র যে সংসার  
সমাজ, তাহার কথা বস্ত্র ভাবে লেখা হয় নাই। তাহাটী  
আজি পারিবারিক জীবনের শিক্ষা নাম দিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছি। পূর্বোক্ত কেন্দ্র সমূহ যেমন দেখিবার স্তনিবার বিষয়  
বহু দিকে বহু ভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পারিবারিক বিষয়  
তদপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হইলেও নিজ সংসার ভিন্ন অজ্ঞাত  
দেখিবার স্বযোগ তুলনায় কম। স্মরণ্য এই প্রবন্ধে নিজ  
পরিবারে লব্ধ শিক্ষার কথাই অপেক্ষাকৃত অধিক, সে লব্ধ এখানে  
আমার ও আমাদের পারিবারিক কথা সংক্ষেপে একটু লেখা সঙ্গত  
বলিয়া মনে করি।

আমাব এই জীবনে বৈশিষ্ট্য বলিতে এমন কিছুই নাই,  
‘স্মরণ্য’ অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদের কতটুকু তৃপ্তি দিতে  
পারিব তাহা আমি না। তবে শিক্ষা যে বর্ধেষ্ঠ হইয়াছে  
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার ‘শ্রোতের ঢেউ’ নামক পুস্তকে  
সেই সকল শিক্ষার সার কথা বাহা দিয়াছি, তাহার মধ্যে  
বার আনা বোধ হয় এই পারিবারিক বা সাংসারিক জীবনেই  
একটি হইয়াছে।

ই বাস্তবে যে একটা কথা আছে—*with a silver spoon*  
*in the mouth*, আমাব পিতা-পিতামহ বড় ধনী না হইলেও  
তাঁহারা সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাদের সমাজে মান সম্মান ছিল  
ও ধনী বলিয়া একটু খ্যাতি ছিল। তাহার উপর পিতা-পিতৃব্যের  
সন্তানদিগের মধ্যে আমিই প্রথম। স্মরণ্য আমার সখকে উঠা বলা  
চলিতে পারে। আমার পর আমার দ্বিতীয় সহোদরের জন্ম প্রায়  
পাঁচ বৎসর পর, কাজেই বৃদ্ধ পিতামহের ও বাটীর সকলেরই আমি  
বড় আদরের ছিলাম। তখনকার দিনে সহর অঞ্চলে ধনীগৃহে  
সন্তানদিগের যত্ন-আহার বলিতে দাস-দাসী অলঙ্কার-পোষাকের  
যে আড়ম্বর দেখা যাইত, আমার যত দূর মনে আছে আমার জন্ম  
সে আড়ম্বর তেমন অধিক কিছু ছিল না। এমন কি একখানা  
পায়রাবুলেটের পর্য্যন্ত কোন দিন আইসে নাই, তাহা হইলেও যত্ন-  
আদরের জট কিছুমাত্র ছিল না। তবে সত্যকার একটা রূপার  
বস্ক-বাটি আমার শৈশব-স্মৃতির নিদর্শনরূপে আজিও পুরাতন  
কিনিস-পত্রের সঙ্গে একটা আলমারিতে পড়িয়া আছে দেখিতে  
গাই। অবশ্য এ কথাও বলা দরকার, তখনকার দিনে আমরা যে  
শ্রেণীর অর্থবানই হই, সমগ্রশ্রেণীর ধনবানদের তুলনায় আমাদের  
কর্তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ গাড়ী-জুড়ির বাবুয়ানা বা বিলাসিতা  
কিছুই ছিল না। পবিত্রতা ও স্নেহগোপ্য তাঁহারা ভালবাসিতেন,  
কিন্তু তাহার মধ্যে আড়ম্বরের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁহাদের

স্মরণ-স্মৃতি

শ্রীহরির শেঠ

সখের মধ্যে ছিল পূজা-পার্কণ ও ক্রিয়াকলাপ। মধ্যে মধ্যে  
পরিভ্রমণে লোকজনকে খাওয়ানতে তাঁহাদের বড় আনন্দ ছিল।  
আমার মধ্যেও যদি এ সবের কিছুমাত্র থাকে তবে তাহা মনে হয়  
উত্তরাধিকার-সূত্রেই বর্ধিত।

যাক সে কথা, আমার যখন বয়স পাঁচ বৎসর, সর্বাংশে  
বাহার আমি আদরের পাত্র ছিলাম সেই পিতামহকে হারাইলাম।  
অবশ্য তাহাতে তখন আমি কি পরিমাণে সন্তপ্ত বা  
দুঃস্থ হইয়াছিলাম তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে সে  
বয়সে আমি যে তেমন কিছু অভাব বোধ করিয়াছিলাম  
তাহা মনে হয় না। যা সময় সময় আমাকে তিরস্কার  
করিতেন, এমন কি আমার দোষের জন্য কখন কখন মুহু  
প্রহারও করিতেন, আর সে জন্য আমার পিতৃদেবের এক  
বিধবা পিতৃষসা বিনি আমাদের বাটীতেই থাকিতেন, তিনি  
মাতা ঠাকুরাণীকে ভৎসনা করিতেন, ইহা আমার মনে  
আছে।

যথাকালে আমার বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা হয়। হাতেখড়ি,  
বর্ষবোধ এ সব যথানিয়মেই হইয়াছিল, সে সব আমার মনে নাই।  
বাটী হইতে অনতিদূরে মধু মহাশয় নামে এক বৃদ্ধ গুরু মহাশয়ের  
পাঠশালায় একটু ভৃত্যের সহিত বাইতাম এবং তাঁহার বেতদণ্ডের  
প্রভাব, পাকগণী আনিবার হুকুম ও প্লেট মুচিবার জন্য হুর্গক্ষম  
জলপূর্ণ একটি ছোট মুৎকলসী থাকিত, ইহা আমার বেশ মনে  
আছে। স্নিহাছিলাম, আমার পিতা-পিতৃব্যও তাঁহার কাছে  
এই পাঠশালায় ত্রিভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছু দিন  
মাঠ চন্দননগরের সেন্ট মেরিস্ ইনষ্টিটিউশনে—যাহার পরে ফুল্লজ  
কলেজ নাম হয় এবং বর্তমানে কনিাইলাল বিদ্যামন্দির নামে  
খ্যাত—পড়িয়া ছগলী কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে এক-এ  
পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল পড়ি। এখন এই কলেজের নাম হইয়াছে  
ছগলী মহম্মদ কলেজ। অল্প দিন কলিকাতার রিপন কলেজেও  
পড়িয়াছিলাম।

পিতৃদেব আমার লেখা-পড়া শিক্ষার জন্য চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের  
জট করেন নাই, কিন্তু আমি তদনুরূপ যত্ন লইয়া কখন পড়াশুনা  
করি নাই। পাঠে কখনও মনোযোগ দিয়াছি মনে হয় না,  
সর্বদাই কীকি দিয়াছি। স্মরণ্য যত্নেও কোন প্রকারে এন্ট্রান্স  
পাশ পর্য্যন্ত, এক-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। কোন  
কোন গ্রন্থ ও পারিবারিক ইতিহাসাদিতে আমাদের বংশ-পরিচয়ে  
লিখিত হইয়াছে—যেন পিতার বার্ষিক হেতু ব্যবসায় কাঁধ্য দেখিবার  
জন্যই বাধ্য হইয়া লেখা-পড়া ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা

ঠিক নহে। আমার অমনোযোগিতাতেই লেখা-পড়ার সাফল্যলাভ হয় নাই। শিক্ষা ব্যাপারে অমনোযোগিতা ছেলে-মেয়েদের একটা ব্যাধিরূপ। আমার ধারণা, এ ব্যাধি এক প্রকার দুর্যোগ্য, অন্ততঃ পক্ষে আরোগ্য হওয়া কষ্টসাধ্য।

লেখা-পড়া শিক্ষা বাহা হইবার তাহা হইয়াছে; সে জন্ত সময়ে বুঝি নাট, এখন আর অনুশোচনায় লাভ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট বা বড় ডিগ্রীলাভ অদৃষ্টে ঘটে নাই বলিয়াই দুঃখ নয়, শিক্ষায় মানুষের পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইবার যে সুবিধা হয়, সে সুবিধা লাভ ঘটে নাই বলিয়াই আমার অনুশোচনা। লেখা-পড়া শিক্ষা হইতে যেটুকু পাইয়াছি, সেটুকু শিক্ষার অভাব মানুষের কত বড় অভাব, তাহা বুঝা ছাড়া আর বড় কিছু নহে।

খেলা-ধুলা, মাছ-ধরা, পাখী-পোষা প্রভৃতিতে মাতিয়াই যে পড়াশুনায় আমার অমনোযোগ ছিল তাহা নহে। বেড়ান, গল্প করা এ সব আমার বেশি ছিল না। আজি পর্যন্ত কুটবল, ক্রিকেট, তাস, পাশা এ সব খেলা কখন শিখিলাম না। অভিভাবকেরা নিষেধ না করিলেও তাঁহাদের ভয়ে বাড়ির বাহিরে এখানে-ওখানে তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে কোথাও যাইতাম না। এ সব সম্বন্ধে আমার পাঠ্যজীবন কোনরূপ অস্বপ্নের ছিল না। কি বিদ্যালয়ে, কি পল্লীতে তখনকার আমার সমবয়স্ক বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই আমাকে ভালবাসিত; আমিও তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম।

ছোট বেলা হইতেই আমাদের বাগানের মধ্যে একটু জায়গা লইয়া তথায় আমার ফুলবাগান রচনার একটু সখ ছিল। আর সখ ছিল বৈজ্ঞানিক খেলা, যেমন রবারের নল লইয়া ফোয়ারা, সামান্য সামান্য আভসবাজি প্রস্তুত, উড়াইবার ফানুস তৈয়ারী, কেরোসিন তৈল হইতে আলোইবার গ্যাস প্রস্তুত। ভালরূপ পারি আর না পারি, ছবি আঁকা, চন্দন-কাঠের উপর খোদাই করিয়া নামের স্ট্যাম্প তৈয়ারী করা, ফটো তোলা, এ সবও আমার সখ ছিল। আর একটি বাতিক জুটিয়াছিল কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা। সত্য বলিতে কি, লেখা-পড়া শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়ার পথে যদি বাধা বলিতে হয় ইহাই একটি প্রকৃত বাধা ছিল। অবশ্য সে বাধা আমারই সৃষ্ট। আমার দশ বৎসর বয়সে যখন আমি এখনকার ক্লাশ ফোর-এ পড়ি, তখন হইতেই এই লেখার সখ হয়। সাময়িক পত্রিকাদিতে রচনাগুলি প্রকাশ হওয়ার মোহেই পর পর এ সখ বাড়িয়া যায় এবং ‘অভিলাপ’ নামক আমার প্রথম পুস্তক একখানি উপাচার্য্য ঢাকার ‘বান্ধব’ নামক মাসিকে ১৩১০ সালে প্রকাশ হয়। পরে উহা পুস্তকাকারেও প্রকাশ হয়। আমার এই লেখার সখের জন্তই যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অকৃতকার্য হই, ইহাই আমার বিশ্বাস। একান্ত মনে সাধনা ভিন্ন কোন কার্যেই সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে এই সাহিত্যসেবা হইতে মুখ্যত আমার ব্যক্তিগত কিছু প্রতিষ্ঠালাভ হইলেও গৌণতঃ উহা আমার সামান্য কথ-প্রচেষ্টার সহায়তা আনিয়া দিয়া আমার জন্মভূমির সেবার কার্যে অবলম্বন-স্বরূপ হইয়াছে।

পঠদশাতেই সন্তের বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়। এখনকার দিনে ইহা বতটা অর্থোক্তিক ও অশোভন দেখায় তখনকার দিনে ততটা ছিল না, বিশেষ আমাদের জাতিতে। নবগমিতা পত্নী আমার অনন্যোচিত হয় নাই, কোন দিন মুখে প্রকাশ না পাইলেও

আমার বিশ্বাস, আমার জ্বরও আমাকে কিছু মন্দ লাগে নাই। আমাদের তদানীন্তন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহের পর বৎসরেক কাল আমার জ্বর দ্বিরাগমন হয় নাই বা আমিও শব্দবাল্যে বাই নাই। বিবাহের পরও বধাপূর্ব পড়াশুনা চলিতে লাগিল। এ বিষয় মনঃসংযোগ কখনই ছিল না, স্ত্রীর বিবাহিত জীবনের নূতন মোহে অধিক কতি কিছুই হয় নাই। নবঙ্গিনী লাভে নূতন জীবনে আমার ভিতরটার মধ্যে যে এমন একটা কিছু বিপর্যয় আনিয়াছিল, তাহাও নহে। বরং এইটুকু মনে আছে, এফ-এ ফেল করার পর কলেজ ছাড়িয়া যখন বাড়ীতেই বসিয়া-ছিলাম, তখন জন্ম দিনের মধ্যেই পিতার ভগ্নশরীরে ব্যবসায়-কার্য পরিচালনার জন্ত নিত্য কলিকাতায় বাতায়াত ও পরিশ্রম দেখিয়া আমার বাটাতে বসিয়া থাকাকাটা একটু কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। কেমন একটা লজ্জা লজ্জা নিজের প্রতি ঘৃণার ভাব মনে হইত। আর তদপেকা দুঃখের বিষয় হইয়াছিল, পিতৃদেব আমাকে ব্যবসায়-কার্যের উপযুক্ত মনে করিতেন না। সত্যই আমার এদিকে ক্রটি ছিল, তাহা হইলেও আমাকে যে গড়িয়া লওয়া চলিতে পারিত না, এ কথা আমি মনে করিতে পারিতাম না। পরিশেষে বোধ হয় আমাদের কোন কোন আত্মীয়-বন্ধুদের পরামর্শেই বাবা আমায় কলিকাতায় বন্ধুত্বলা পাঠাইলেন।

কলিকাতায় আমার থাকিবার ব্যবস্থা হইল। কংগ্রেসারীরা ২ নম্বর রতন সরকার গার্ডেন লেনের একটি বাটার জিতলে যে বাসায় সকলে বাস ও খাতিপত্র লেখার কার্য করিতেন, আমিও তথায় থাকিতাম। পিতা ঠাকুর বহু কাল কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায়-কার্য দেখিয়াছেন, তিনি ইদানিং নিত্য বাতায়াত করিলেও আমার প্রায় সন্তোষাস্তর কখন বা এক পক্ষ পরে বাটা আমার ব্যবস্থা ছিল। পিতা-ঠাকুরের আদেশ মতেরেক তাঁহার জীবনাবসানের কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত আমি একবারও নিজ ইচ্ছায় বাটা আসি নাই।

দিনের বেলা বাসায় বা কংগ্রেসস্থানে একরকম মন্দ কাটিত না। রাত্রে খাতা লেখা ও ভাগাদাপত্র সারা আমাদের কার্যের পদ্ধতি ছিল, তাহাতে কি শীত কি গ্রীষ্ম রাত্রি ১২।১২।১০টার পূর্বে কেহ কোন দিন শয্যা গ্রহণ করিতে পারিত না। আমিও ততক্ষ পর্যন্ত প্রত্যহই বিনিদ্রাবস্থায় থাকিতাম, তাহাতে আমার কোঁ কষ্ট ছিল না। দোকান হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় কোন কার্যে নিযুক্ত হইবার পূর্বে যতক্ষণ একাকী জানালার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া কাটাইতাম, তখন বাড়ীর জন্ত মনটা ব্যাকুল হইঃ উঠিত। বিবাহিত জীবনের মাদকতা তখনই আমায় এক উদ্ভাস্ত করিয়া তুলিত। যে শনিবারে আমি বাড়ী আসিতাম ন আমাদের কর্ণচারীদের মধ্যে অনেকে বাটা আসিতেন, বিঃ করিয়া আমার পিতৃদেহ-পুত্র আমার প্রায় সমবয়স্ক আবাল্য ব ও হিতৈষী “ভূষণ দাদা” যিনি তখন ব্যবসায় ক্ষেত্রে কতক আমাদের কর্ণকর্তা ছিলেন—যেদিন তিনিও বাটা আসিতেন সেটি অবর্ণনীয় মনঃকষ্টে কাটিত। সত্য বলিতে কি, মনে হইত পিতৃদেহে ইহা আমার প্রতি অধিচার। এ জন্ত অন্তকার এই লেখার পূঃ কোন দিন কোন ক্ষেত্রে আমার এ মনোভাবের কথা প্রকাশ নাই। আমার জ্ঞী যে স্বাভাবিকই স্বভাবী এবং বাটা

তাহার সম্বন্ধ কেহ না থাকায় লোকাজবে কতকটা নিঃসঙ্গ, তাহার মনোভাব যে কিরূপ থাকিত তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতাম। আমার তখনকার শিশু কন্যাটিকে দেখিবার জন্য প্রাণ ছটফট করিত। আর আমার পথম স্নেহময়ী জননী, তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম না বলিয়া যত না কষ্ট হইত, তিনি আমার জন্য আমায় না দেখিয়া যে ব্যথা পাইতেন তাহা ভাবিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। মনে হয়, পিতৃদেব এ বিষয়টা ভাবিতেন না। পিতৃ-ইচ্ছা পালনরূপ কর্তব্য ভাবিয়া নীরবেই সে সব যাতনা সহ্য করিতাম। বাটীতে চিঠিপত্র আমার মধ্যম সহোদর শিবরামকে ভিন্ন আর কাহাকেও কোন দরকারে লিখিতাম না। সেই আমাকে বাটার বা পল্লীর বা অল্প কিছু জাতব্য বিষয়ের খুটিনাটি খবর লিখিত। মনে হয়, সে আমার অবস্থাটা চিন্তা করিয়া বক্তৃত্ব তাহার ক্ষমতায় হয় আমাকে নিশ্চিন্ত করিতে বা শান্তি দিতে চেষ্টা করিত। তাহার সঙ্গে সময় সময় আমার মতানৈক্যের ছল মনেরও গোলমাল হইত, কিন্তু তার চিরদমী ও দয়াদ্রব্দয়খানির কথা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমার ছোট ভাই হুগাঁদাস তখন বালক, তাহার অন্তর তখন বিশেষ ভাবে আমার সুখ-দুঃখের গুণীর মধ্যে আইসে নাই।

এখন একটা কথা বলি। কলিকাতায় থাকি, তখন টকি ছিল না বায়স্কোপের সবে আরম্ভ কিন্তু থিয়েটারের অভাব ছিল না, সার্কাস, গডের মাঠ, ইন্ডেন গার্ডেন এ সব ত ছিলই। যে শনি-রবিবার কলিকাতায় থাকিতাম আমি বড় কোথাও যাইতাম না, বাসাতেই থাকিতাম। কারণ কতকটা পাছে বাবা অসন্তুষ্ট হন, কতকটা আমার তেমন ও-সব ভালও লাগিত না। কলিকাতায় থাকিতে দীর্ঘ বিশ-বাইশ বৎসরের মধ্যে বড় বেশি হয়ত আট-দশ বারের অধিক বার থিয়েটার দেখি নাই। দুই-এক বার ভিন্ন কোন নাটক সম্পূর্ণ কখন দেখি নাই। হয়ত একটি মাত্র দৃষ্ট দেখিতে—যেমন ‘হর্গেশনন্দিনী’তে কাগাগার, ‘বলিদানে’ ঘোবি পাগলির গান—‘গা টিপিয়ে মাথা খুঁটে মন পাবি না কি’—অথবা ‘মাধবীকঙ্কনে’—‘মাধ না মিটল আশা না পুরিল’...গানটি শুনিতে গিয়াছি।

কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃদেব প্রবৃত্ত কর্তৃত্বের স্বাভাবিক পালন করিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পর অল্প কয়েক বৎসর মাত্র পিতৃদেব কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া-ছিলেন। তিনি আদেশ না করিলে বাটা আসিতাম না। ক্রমে যখন তিনি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রমে ক্রমে বিষয়টা শিথিল হইতে লাগিল এবং পরিশেষে তাহার জীবনের শেষ অবস্থায় আমি নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলাম। বিষয়-কাণ্ডের পরিচালনায় তাঁহাকে যে বেশ আনন্দ দিতে পারিয়াছিলাম, এমনটা ঠিক কোন দিন বুঝিতে পারি নাই।

বাবার ডায়াবিটিস পূর্বে হইতেই ছিল, ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ব্রাইটস্ ডিজিজে পরিণত হইল। সাধ্যমত সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসাদি হইতে লাগিল। কিছুতেই কিছু হইল না, পরিশেষে কাল পূর্ণ হইলে তিনি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার গাধেনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার শেষ সময় বুঝিয়া তিনি বিশেষ তীক্ষ্ণের আদেশ করেন এবং শেষ কথা তাঁহার মুখে বাহা উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়াছিল তাহা ‘নারায়ণ’।

বাবা চলিয়া গেলেন, আমার সাংসারিক জীবনের এক নব পর্যায় আরম্ভ হইল। পিতৃশোকের অপেক্ষা তাঁহার মত সাধুশোকের শেষ জীবনে, অন্তিম সময়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কোন অতি নিকট-জনের আচরণে তীব্র মনোবেদনার কথা এবং সারা জীবন পাবিবাবিক মঙ্গল ও বিষয়-কার্যের জন্ত পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার সহোদরদের মুখ চাহিয়া তাঁহার কোন কোন সাধু মনোভিলাষ অপূর্ণ রহিয়া যাওয়ায় কথা মনে উদয় হইয়া প্রায় সর্বক্ষণ আমার মনকে অধিক পীড়া দিতে লাগিল।

বাবা কোন দিন একটি কান মলিয়া দেওয়া এমন কি জোরে তিরস্কার পর্যন্ত করেন নাই। কিন্তু তথাপি কখন তাঁহাকে মুখ তুলিয়া কিছু বলিতে পারি নাই। তাঁহার শেষ অবস্থায় যখন দৃষ্টশক্তি ক্ষীণপ্রায় হইয়া প্রায় শয্যাশ্রেয়েই ছিলেন, সেই সময়েই মাত্র গোপনে কৌশলে তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার ফটো লইতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, কোন জনহিতকর কার্যের জন্ত কিছু টাকা ব্যয়ের অমুমতি দান প্রার্থনা প্রসঙ্গে—খুল্লতাতদের সহিত বিষয়-সম্পত্তি নিষ্পত্তির পর নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভাল বুঝিলে তখন তাঁহার আদিত্ত অর্থ ব্যয় করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

এই বিষয়-সম্পত্তি নিষ্পত্তির কথায় আমায় খুবই চিন্তাশ্রিত করিল। জীবনের নব পথ্যায়ে ইতাই আমার সর্কাপেক্ষা ভাবনার বিষয় হইল। ভাবনা অল্প কিছু নহে। বিষয় বলিতে আমাদের বাহা কিছু, তাহার প্রধান নগদ টাকা, গভর্ণমেন্ট শেপার, একটি লব্ধপ্রাপ্তি বড় কারবার ও কলিকাতায় কিছু সম্পত্তি আর চন্দননগরের বাড়ী বাগানই প্রধান। কিন্তু অস্থাবর সবই এখন আমার হস্তে। আমাদের অংশীদার আমার বিধবা সোজা খুড়ীমাতা ও ছোট খুড়া মহাশয়। তাঁহারা আমাদের কতটা বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন সে বিষয় সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। খুড়া মহাশয়ের কখন বিষয়-আশয় দেখেন নাই, স্ত্রুতরা অবিশ্বাস যদি মান থাকে, সন্তোষজনক ভাবে তাঁহারা কি করিয়া বুঝিবেন ইতাই আমায় চিন্তাশ্রিত করিল, তদুপরি আমার সহোদরদ্বয়ের অজ্ঞাতের সহিত বৈষয়িক দায়িত্বও আমার উপর লুপ্ত ছিল।

ব্যাংকে টাকা রাখা কখন আমাদের ব্যবস্থা ছিল না। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক দিন, তখন আমাদের বাহা কিছু নগদ ও গভর্ণমেন্ট প্রেমিসারি নোট ছিল সমস্ত লইয়া আমাদের এক জন আত্মীয় ও প্রাচীন কণ্ঠসারী এবং আমার এক পিতৃদ্বন্দ্ব-পুত্র সমভিব্যাহারে ছোট খুড়া মহাশয়ের কলিকাতার বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাহা রাখিবার জন্ত বলিলাম। তিনি স্বীকৃত হইলেন না, সমস্ত ফিরাইয়া আনিলাম। এই সকল রাখার দায়িত্ব গ্রহণ না করাই গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ নহে। বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা হেতু আমার এই কার্যে তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

যথাকালে বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সে শ্রাদ্ধ আমাদের পক্ষে খুবই সমারোহে অথচ বেশ সুশৃঙ্খলেই সম্পন্ন হইল। কি করিয়া যে সে-কার্য্য সহজে এবং সুখ্যাতির সহিত সমাধা হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিমিত্ত হই।



আমি ব্যবসায়-কাৰ্য্য পূৰ্ব্বৰূপে দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু উৎসাহ আর আদৌ ছিল না, কাগজ বৈষয়িক মীমাংসার জন্য চোট খুঁড়া ও সেজ খুঁড়ীমাতা উভয়েই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন এবং আমিও তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া নিজ দায়িত্ব ততৈতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হইতে একান্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। কি করিয়া এ কাৰ্য্য সমাধা হইবে সে চিন্তায় আমার নিতান্ত ব্যাকুল করিল। ক্রমে সালিশীর দ্বারা নিষ্পত্তির কথা উঠিল। তাহাতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, অল্প সালিশীর আবশ্যক নাই, আমাদের পক্ষে আমরা তিন সত্ৰদলের একত্রানি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া দি। চোট খুঁড়া মহাশয় বেরূপ বিভাগ বটন করিয়া লিখিয়া দিবেন, তাহাই আমরা মানিয়া লইব। ইহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। শেষে সালিশী দ্বারা মীমাংসাই স্থির হইল। আমরা সালিশী মনোনয়নে ভাণ্ড গ্রহণ না করার অগত্যা চোট কাঁকা মহাশয়ের অভিপ্রায় মতই তিন সত্ৰ স্থির হইল। তন্মধ্যে এক সত্ৰের সহিত আমার সামান্য পরিচয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম জ্ঞানিয়াছিলাম মাত্র এবং তৃতীয় ব্যক্তির কথা পূৰ্বে কখন জ্ঞান নাই। আমরা স্বেচ্ছায় কোন কথা বলি নাই, অপর অংশীদারদ্বয় স্বীকারে মনোনীত করিলেন তাহাই মানিয়া লইলাম। তাঁহারা সকলেই ভ্রষ্টাচারে তত্ৰাপি আমার মনে একজন কোন সংশয় বা দ্বিধাও ছিল না, কিন্তু ভয়ের কি সত্বে বিষয় জ্ঞানি না, আমাদের সালিশী মীমাংসা শেষ হইতে দুই বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছিল। প্রায় পঞ্চাশটি বৈঠক বসিয়াছিল, আমি মাত্র দুইটি বৈঠকে উপস্থিত থাকিয়া সালিশী মহাশয়ের কাৰ্য্যপ্রণালী ঠিক সমীচীন বিবেচিত না হওয়ায় তাঁহাদের বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া উভ্যদের বিচার মানিয়া লইয়া যোগদানে বিবৃত ছিলাম। আমরা এই কাৰ্য্য, আমি জানি, আমার হিতৈষী আত্মীয়-বন্ধুগণ সম্মত করেন নাই, তাহা হইলেও আমার বিবেক-বুদ্ধিতে ইহাই যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল।

সময় সালিশীর কাৰ্য্য শেষ হইল। বিভাগ বটনের সুবিধার জন্য কারবার বন্ধ করিবার কোন নির্দেশ না থাকিলেও, প্রথম মহাশয়ের দরুন আমাদের বাজারের সুরোগ লইয়া আমি ইতিমধ্যে আমাদের কারবারের সমস্ত মজুত মাল বিক্রয় করিয়া খোঁসিয়া হইয়াছিলাম। এই সময়ে আমি স্বতন্ত্র ভাবে বিলাতে মেসার্স জন্ ব্যাচি কোং লিমিটেড নামক এক নূতন এজেন্টের সহিত ও আমাদের পুরাতন এজেন্ট মেসার্স ডটন ম্যাসে কোম্পানির সহিত কাৰ্য্য আরম্ভ করি। এই নূতন কাৰ্য্যে অতি অল্প দিনের মধ্যে ভগবানের কৃপায় যথেষ্ট সাফল্য লাভ হয়।

বিভাগের ফল যদি পৈত্রিক বাসভবন ত্যাগ করিতে হয় এই আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই নিজ অজ্ঞিত অৰ্ধে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে একটি শ্রুতং বাটী খরিদ করিয়াছিলাম। সালিশীদের ব্যবস্থায় শিতামতের প্রতিষ্ঠিত দেবসবাদি এবং প্রকারান্তরে তাঁহার সুনাম রক্ষার সমস্ত ভার আমাদের উপর অর্পিত হইলেও যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম—পৈত্রিক বাসভবন হইতে বঞ্চিত হইলাম, কিন্তু মাতৃদেবীর ও প্রতিবেশীবর্গের ইচ্ছা নয় বুঝিয়া পূৰ্ব্বপুরুষদের বসবাসের স্থান ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

আমি বরাবরই বাস্তবগী। মহাশয়ের জন্য তখন গৃহনিৰ্মাণের সকল আবশ্যকীয় জবাদির অগ্রিমূল্য, ইটের দর ৪০ টাকা,

ষ্ট্রলের দর ৩০/১৩২ টাকা, তাহা হইলেও কালবিলম্ব না করি এই স্থানেই বাটী নিৰ্মাণ করিয়া বাসের ব্যবস্থা করিলাম। আমার ব্যবসায়-জীবনের শিক্ষার কাৰ্য্য বলিয়াছি, আমি যে বহু কারবার আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা অবলম্বন করিয়া একরূপ বিনা পরিশ্রমে, বিনা মূলধনে, সহুসায় সহজেই অল্প সময়ের মধ্যে ভগবান আনাকে আশার অতিরিক্ত দিলেন। \* নূতন কাজ আরম্ভ করিবার সময় আমার মধ্যম সহোদরের অভিব্যক্ত জিজ্ঞাসা করায়, সে ইহাতে যোগ দিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে—আমাদের সহিত অনেক বিষয় তাহার স্বতন্ত্র মনোভাব বুঝিয়া এ বিষয় আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

আমাদের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি বিভাগের পর আমরা আমাদের প্রাপ্ত সম্পত্তি স্বাক্ষরে আলাচিনার সময়, যখন আমার স্বতন্ত্র কারবারের দায়িত্বের কথা আর কিছু নাই, তাই হইয়াছে আমার সম্পূর্ণ ঘোষণা করিত হইলেও তখন কর্তব্য বিবেচনায় ইহার অংশ গ্রহণের জন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট মাতৃদেবীর সমক্ষে প্রস্তাব করি। তাহাতে তাহারা উহা গ্রহণে অসম্মত জ্ঞানায়, এমন কি পিতৃদেবের নিকট প্রার্থিত অমুমতি মত পঞ্চাশ হাজার টাকাও আমার বিবেচনা মত যে কোন সংকাৰ্য্যে ব্যয় করিবাব জন্য আমায় উপহীত ভাৰ্পণ করে। আর তাহাদের নগদ সম্পত্তির কতক অংশ লইয়া একটা নির্দিষ্ট অংশ আমার কাছেই রাখিল। উদ্দেশ্য যদি পুনরায় ব্যবসায়-কাৰ্য্য কিছু করি তাহাতে উহা নিয়োজিত করা কিছু ভগবানের অভিপ্রায় অনুরূপ। আমার পুনরায় কারবারে মনোনিবেশ করিলাম। ইচ্ছা ছিল, শিতামত-প্রতিষ্ঠিত আমাদের কারবার যাহার মাত্র ৬৬৫ইল ১০০০১, মূল্য সালিশী মহাশয়ের আমাদের দিয়াছিলেন, সেই নামে পুনরায় ভাণ্ড করিয়া বাজার বন্ধ করি কিছু বিবর্তন পাইয়াছিল। ভাল করিয়া কাজ দূরে থাকুক সমস্ত ব্যবসাই বন্ধ করিলাম। যে কারণে করিয়াছিলাম তাহ প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি। আর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এক দিন কথা প্রসঙ্গে ব্যবসায় বন্ধ করা বিষয় তিনি বলিয়াছিলেন এ সময় কাজ বন্ধ করায় কিছু মন্দ হয় নাই, কিন্তু পরে ছেলেপুলে করিবে কি। প্রবীণ ব্যবসায়-পুঙ্খের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা তখন ভাল করিয়া না বুঝিলেও এখন বুঝিতেছি। আ বুঝিতেছি, জীবনে যে সব ভুল করিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই সৰ্বাপেক্ষ বড় ভুল।

যদিও এখানে তখন একটু বাড়িবাড়ি হইবে, তথাপি একা কথা না বলিয়া পারি না। আমাদের মেসার্স শতুজ্ঞে শেঠ এ সত্ৰের কারবারের আরম্ভে ইহার স্থান খুব উচ্চে থাকার জন্যই ইহার খ্যাতি নয়। ইহার সত্যতা, সত্যবাদিতা, কাৰ্য্য ঠিক প্রভৃতি গুণাবলী যেমন এক দিকে বৈদেশিক কারবারি ও কারখানাওয়ালদিগের, তেমন অল্প দিকে খরিদার ব্যাপারি-মহলেও আকর্ষণে কারণ হইয়াছিল। আর শুধু কলিকাতায় নয়, দিল্লী কানপুর হইতে পূৰ্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানের লোহ, ঈল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের অনেকে

\* “আমার ব্যবসায়-জীবনের শিক্ষা” প্রবন্ধে এ বিষয় বিশ ভাবে লিখিত হইয়াছে। বঙ্গীয় তিল-সমাজ পত্রিকা; কার্তিক-১৩৫০ খ্রষ্টাব্দ।

ইহা সাহায্যকল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা গৌরবান্বিত ছিল। এ প্রতিষ্ঠান ধার পাইয়া বড় নয়, অল্পকৈ ধারে পণ্য যোগাইয়া খ্যাতিমান ছিল। স্ত্রতরা শুভউইলের এরূপ অবস্থা মূল্য হিসাবে আমাদের অংশ হইতে এই টাকাটা বাওয়ায় আমাদের একটু লাগিয়াছিল, কিন্তু প্রথম দিনের ব্যাপার হইতে কথ্য কিছু কহিব না ঠিক করিয়াছিলাম, স্ত্রতরা তাঁহাদের নির্দেশ মাথা পাতিয়াই লইলাম। শতুচ্চ শেঠ এণ্ড সন্দের নামে একটি দিনের জন্তও কাজ করিতে পারিলাম না বা করিবার সৌভাগ্য হইল না। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার নিজ নামে কাজ করিয়া বঙ্গ সময়ের মধ্যে আমি বেশ কিছু লাভবান হইয়াছিলাম। আমি পূর্বে যে মানুষ ছিলাম তখনও সেই মানুষ; কিন্তু বলিতে কোঁতুল বোধ করি, ভগবানের এই দান হইতেই আমি দাভা। শুধু তাইই নহে, এই মত অনেক কিছু আমার হেতুমূলক বা অতুত্বকী প্রশংসা-খ্যাতিরও ইহাই মূল। তখন হইতেই বুঝি, যেমন বত কিছু উৎকৃষ্ট উপাদান সম্বৃত ব্যক্তিদ্বিই হউক একটু লবণ সংযুক্ত না হইলে তৃপ্তিকর হইতে পারে না। প্রায় সর্বত্রোগহর মকরম্বজ একটু মধু সংযুক্ত না হইলে যেমন তাহার গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয় না, সেই মত অর্থের সংযোগ ব্যতিরেকে সময় সময় অনেক কিছুই বনিগর্ভে মণির স্তায় চিরদিন লোকচক্ষুর অগোচরে থাকিয়া যায়। “দারিদ্র্যমকং গুণরাশিনাশি” এই সংস্কৃত শ্লোকোং পূর্বে হইতেই শুনিয়া আসিতেছি, এই সময় হইতেই ইহার সাধকতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি। অর্থের কথা প্রসঙ্গে উত্তার আবশ্যকতা, উত্তার উপকারিতার কথা উল্লেখ বাহ্যিক মাত্র। আবার ইহাও বুঝিয়াছি, এই অর্থ হইতে বহু অনর্থের উৎপত্তি, এ কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহার দ্বারা অনেককে বিলাসিতার দাস করিয়া অলক্ষ্যে জীবনকে বিত্বনাময় করিয়া তোলে। তৃণভোজী গাভী নিঃশব্দচিত্তে স্বচ্ছন্দে মাঠ চরিয়া বেড়ায়, কিন্তু রক্তমাংসালুপ শৃগাল ব্যাঘ্র এমন কি বিড়ালটিকেও যেমন রক্তমাংসের সন্ধানে সমস্ত জীবন ছুটাছুটি করিতে হয়, সেইরূপ বিলাসে বাঁহারা মগ্ন থাকেন, তাঁহাদের সেই বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত বহু ভোগাভোগ সহিতে হয়।

ব্যবসায়-কাধ্য বদ্ধ হইল, আমার আশৈশব সাধের সাহিত্যসেবা পুনরায় গ্রহণ করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধুদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইতিপূর্বেই যে সকল সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সতিত সংলিপ্ত হইয়াছিলাম তাহাতে এবং অস্ত্রান্ত অমরূপ কার্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। এদিক দিয়া বরাবরই এমন কি এখন পর্যন্ত লোকচক্ষে কিছু মন্দ চলে নাই। বাহিরে সুবিধা-অসুবিধা আশা-নৈরাশের মধ্য দিয়া চন্দননগরের কতিপয় প্রতিষ্ঠানকে লইয়া কাটাইতে লাগিলাম। আমার ব্যবসায়-কার্যের সাক্ষ্য যেমন কখন মুকসিমানা করিয়া কেহ বলিয়াছেন—এ টাটের বা গদির গুণে; আবার কেহ বলিয়াছেন—সুন্দর ছেলে। তেমনই এ ক্ষেত্রেও সরকারী বেসরকারী বহু উপাধি ও বিশেষণে বিশেষিত হইলেও কোথাও কোথাও নেপথ্য হইতে শুধু গুজনের অক্ষুট ধ্বনি শ্রুত হইয়াছে—এই সবই নাম প্রতিপত্তির জ্ঞা। সময় ও সুযোগ মনে করিলেই মিলে না। আজ এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানাইয়া কাহারও কাহারও অন্তর্ভবন নিরসন করিতে চাহি যে, বাঁহারা আমার প্রসঙ্গে দেশপ্রী, সাহিত্যাচাধ্য, ঐতিহাসিক, ধানবীর প্রভৃতি অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন, ইহার মধ্যে সত্য যদি

কিছু থাকে তবে তাহা আর কিছু নহে, আমি আমার চন্দননগরকে ভালবাসি। বাহা কিছু করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি তাহা ইহারই জ্ঞা। আর উক্ত সব বিশেষণের মধ্যে যদি কোনটির একটুও সাধকতা থাকে, তবে একটু মন দিয়া অঙ্গসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, তাহার মূল এই ভালবাসাতেই নিহিত আছে। তবে নাম বশ যে চাহি না, প্রশংসার কথা যে কর্ণশীড়া দেয়, এ কথা যদি বলি তাহা মিথ্যা বলাই হইবে। জীবনে কি যত্রে কি সাধারণের কাজে কর্তৃত্বের অবকাশ বহু বার আসিয়াছে, কিন্তু পরম সৌভাগ্য সে জন্ত যুগ্য অহমিকা কোন দিন মনে স্থান পায় নাই, তবে নিজেকে যে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেওয়া, তাহা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হয় নাই।

আমার পারিবারিক জীবন বাহা বহু দিন হইল পদ্ধতিত পূর্ণপূত হইয়া কলপ্রস্থ হইয়া আসিল, আজি এই জীবন-সারাহু দেখিতেছি সকল দিকেই নৈরাশ। আমি ঠিক আমার আত্মজীবনী ত্রিখিতে বসি নাই। আমার জীবন-পথে চলিতে চলিতে যে সব শিক্ষালাভ হইয়াছে তাহা একটু সাবত্তারে বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা করিতে যদি শেষে জীবনই ঈড়িয়া যায় এই মনে করিয়াই আমার ইচ্ছা সত্ত্বও বহু দিন এ কাজে নিরত ছিলাম। এখন দেখিতেছি, এ অধ্যায়টিতে আমার জীবনী বা বৃত্তকথাটির পূর্ণ ইতিহাস না থাকিলেও মোটামুটি আমার জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সহিত আমার আভ্যন্তরীণ পরিচয়ই পূর্ণ হইতেছে। যে কল্পনাভীত উপলব্ধি এখন হইতে পাইয়াছি তাহা হয়ত অভিনব না হইতে পারে, কিন্তু সাংসারিক লোকের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। অবশ্য যার কন্দের ক্ষেত্র, দৃষ্টির পরিধি, জ্ঞানের পরিমাণ নিত্যান্তই সীমাবদ্ধ; যে বঙ্গ কতিপয়কেই কল্পসাহসকল্পে পাইয়া বা স্বপ্ন গভীর মধ্যে দেখিয়া-তুনিয়া বাহা কিছু অভিজ্ঞতা পাইয়াছে; তাহারও একটা মন্তব্য গড়িয়া উঠা অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু সাধারণ্যে প্রকাশ করা ধুটতার নামান্তর কি না, জানি না।

সবই যে অদৃষ্ট কক্ষল প্রারব্ধ বা ঐক্য আর কিছু, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময় ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যে সাফল্যের মূলে আমার বলিতে যেমন কিছুই ছিল না, তেমনই পারিবারিক জীবনে অসাকল্যের জ্ঞা আমার হাত কিছুই নাই। এ ক্ষেত্রে জী-পুত্র-কস্তাদি পরিজনবর্গের এমন কি দাস-দাসী প্রভৃতির সুখ-শান্তি বিধানের জ্ঞা মন, শরীর ও অর্থব্যয় দ্বারা আমার সাধ্যমত কর্তব্য পালনে ত্রুটি কিছুমাত্র করিয়াছি বলিয়া মনে করি না, কিন্তু আমার সবই ব্যর্থ হইয়াছে। এই দারুণ নিশ্ফলতা ইহার অর্থ কি? অদৃষ্টের মত কোন কিছু ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। এক দিন দৈবক্রমে মনীষিপ্ৰবর অধিনীকুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে তাঁহার মুখে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথা শুনিয়াছিলাম, “Youth is a folly, manhood is struggle and old age is a regret.” জানি না, সত্যই বৃদ্ধ বয়সটা অহুতাপ অহুশোচনার কাল কি না। যখন ইহা শুনি তখন এই অর্থই ধরিয়া লইয়াছিলাম—জীবন-সারাহু পরপারের চিন্তা যখন মানুষকে উৎবেচিত করে অথচ আর সংশোধন বা প্রতিকারের দিন থাকে না, তখন যৌবনের বৃত্ত নিজ ত্রুষ্কৃতি বা ভুল-ভ্রান্তির জ্ঞাই অহুশোচনা আটসে। কিন্তু আমার ত সে কথা নয়। আমার ত্রুষ্কৃতি বা ভুল-ভ্রান্তি যে কিছু নাই সে কথা

বলিতেছি না। সে থাক আর নাট থাক, সে জন্তও মনে কখন কিছু আসে না, বৎস দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, যে সব কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল বা অসমাপ্ত কাজ শেষ করিতে পারিলাম না, সেই জন্তই অনুশোচনা। আমি বলিলাম, সংসারে সকলের সুখ-সুবিধার জন্ত যাহা কিছু করিবার হেঁ-মন পাত করিয়া তাহা করিয়াছি। নিজের স্বত্বকে এমত অভিমত প্রকাশ করা, হয়ত বা মনে মনে পোষণ করার মধ্যে ভুল থাকা অসম্ভব নহে। সে বিষয় আমার কিছু বলিবার নাই, আমি যাহা মনে করি তাহাই লিখিলাম।

ভগবানের কৃপায় আমার জন্মস্থান সংসার। আমার শরীর স্কিষ্ট হইলেও এ বয়সে অনেকের অপেক্ষা ভাল, এখনও দেহ পুরাণী হইয়া পড়ে নাই। আত্মীয়-স্বজন এবং দেশবাসী প্রায় সকলেই আমায় প্রেম-ভালবাসির চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যদিও আমার দেশহিতৈষণাকে লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞপের ছলে budding patriot, local patriotism এ সব কথাও বেশ জ্ঞানসম্পন্ন খাতনামা ব্যক্তিদের কাছ হইতে শুনিতে হইয়াছে, তাহা হইলেও খশ মান বতটা আমার প্রাপ্য নহে তাহার অনেক বেশি আমি পাইয়াছি এবং পাঠিতেছি, এ কথা বলিবই। আর্থিক শক্তি অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় অনেক সময় ইচ্ছামুত্থাপন ব্যয় ধারা তৃপ্ত হইতে না পারিলেও এখন পর্যন্ত নীতি-প্রয়োজনীয় সাংসারিক ব্যয়ের জন্ত বিশেষ অভাব হয় নাই। তথাপি অনেক দীন-ভ্রাতৃ যেমন বলিয়া থাকেন তাহার চেয়ে দুঃখী কেহ নাই, আমারও মনে হয়, ভগবান আমায় এত দিয়াও সংসার-ক্ষেত্রে বুঝি আমার অপেক্ষা দুঃখী কেহ নাই। আমার দুঃখের প্রধান কারণ সংসারে পরিজনবর্গের মুখে প্রাণ-খোলা হাসি দেখার সৌভাগ্য খুব কমই পাইয়াছি। আমার জ্ঞাত-ভগিনীদের মনের মধ্যে হীনতা কাহারও আছে বলিয়া জানি না। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ইহাদের মধ্যে বেশ মিল মত মনের পরিচয় পাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। আমার মধ্যম ভ্রাতার পরোপকারিতা, ধৈর্য বিশ্বাস, নিষ্ঠা, জীবনে আড়খরহীনতা প্রভৃতি এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেশপ্রেম পরোপকারিতা, মনের চুড়তা প্রভৃতি সঙ্গুণ্যবসীর জন্ত আমার মনে একটা গর্বের ভাব জাসিলেও, তাঁহাদের লইয়া সংসার-পালনের সুখ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। এ জন্ত হয়ত দায়ী আমি, আমারই কৃতিত্বের অভাব বা চারিত্রিক ত্রুটিই হয়ত ইহার কারণ। যদি তাহাই হয়, যে ত্রুটি এত দিনে ধরিতে পারিলাম তাহা আর ধরিবার সময় নাই।

সংসার একাবিচিত্র স্থান, এখানে একাধারে যেমন মর্ত্যে অমরার সৌন্দর্য, তেমনই অজ্ঞা দিকে নরকের বীভৎস দৃশ্য। এক দিকে উৎসবের মাসলিক শাখাধ্বনি, অজ্ঞ দিকে ক্লান-রোল। এমন আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-নিরাশের স্বল্প আর কোথাও নাই। যে স্থান সর্বাপেক্ষা আনন্দের হওয়া উচিত, হয়ত সেখানে চুকে ভয় হয়। যাকার সাংসারে সর্বাপেক্ষা আপন জন, হয়ত তাঁহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পারা যায় না। সারা দিন কথাক্ষেত্রে পরিভ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সন্ধ্যার সময় বাটতে চুকে ভয় পায়, এমন গৃহস্থও দেখা যায়। সর্বত্রই যে এই কথা তাহা নহে, বৎস সংসারই এই অশান্তির অনলে জলিতেছে। এজন্য সংসারই অধিক যেখানে অবিরতই সংগ্রাম সংগঠনের কথা

নাই। এই সংগঠন সমাজ জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়, আর ইহার পশ্চাতে একটা জীবন্ত আদর্শ থাকা আবশ্যিক, যাহার লক্ষ্য হইবে সর্বসঙ্গী মানব-কল্যাণ। সমাজ বোধ জীবনের সমষ্টি মাত্র। সামাজিক বা সাংসৃতিক জীবন বাপন কেবল মাত্র আহা-নিজাতিতেই পরিসমাপ্তি হয় না। স্বল্পনী-শক্তির আবশ্যিকতা সকলেরই। আমরা জীবন ধারণের জন্ত যাহা আপন বা পুত্র-কলত্রাদির জন্ত পৃথিবী হইতে গ্রহণ করি, তৎপরিবর্তে আমরা কিছু দিতে বাধ্য বলিয়াই মনে করি।

পারিবারিক নীতিহীনতার ফলে কতই যে গ্লানি উদ্ভূত হইয়া থাকে, কে তাহার নির্ণয় করে? এ জন্ত সমাজ-বিজ্ঞানের পরিবর্তন ও তদনুযায়ী মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন প্রয়োজন। কৃশিক্ষা-অশিক্ষা ভুল-ভ্রান্তি হইতেও সময় সময় কি সংসার, কি রাষ্ট্র সর্বত্রই অতি তুচ্ছ বিষয় লইয়া মহাপ্রলয় ঘটতে দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষ যখন এক নয়, সংসারে ভুল-ভ্রান্তির কথা না ধরিলেও মতভেদ মতানৈক্য এ সব থাকিবেই। আমি এই বুঝিয়াছি, সংসারী লোকের পক্ষে সর্বদা সব ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করা আবশ্যিক। চূর্ণকাম সর্বদা দরকার, যখনই যেখানে বাল দাগ দেখা বাইবে তাহাকে আর একটুও বাড়িতে না দিয়া তৎক্ষণাত্ তথায় চূর্ণকাম করা দরকার। ইহা সংসারীর পক্ষে সর্বত্র নীতি। ইহা করিতে যিনি অক্ষম তাঁহার পক্ষে সংসারে শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বহু ক্ষেত্রেই অশান্তির মূলে কোথাও না কোথাও আছে মূর্খতা অথবা ভ্রান্তি। সংসারের মধ্যে জন্তপূর প্রধান বিভাগ। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী হইতেছেন নারী। তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব হেতু বহু অনর্থই হইয়া থাকে। এই যে বহু সংসারেই শান্তি-বধুর মধ্যে অতি বিরূপ সম্পর্ক পাড়াইতে গিয়া যায়, বহু ক্ষেত্রেই বধূকে দেখিবার, তাহার লইয়া কথা কহিবার কেহ থাকেন না, ইহার মূল কারণও মনে হয় অশিক্ষা হইতেই উদ্ভূত। একটুকু কল্পনা হইলে পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না, তবে বধূ প্রতিই এত নিখাতন হয় কেন? মনে হয়, কতক দান করিবার সময় তাহার পিতা-মাতা জামাতার জামু স্পর্শ করিয়া কত দান করেন, অলক্ষ্যে সেই গর্বি বা অঙ্কার মাথার থাকার অশিক্ষিতা গৃহিণীর এত দৃষ্টির কারণ হয়। জামাতা বা জামাতার পিতা-মাতার কাছে কত পিতার বিজ্ঞা-বুদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা, এমন কি ধন-গরিমা সবই নিশ্চয় হইয়া যায়। আমাদের সমাজে বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যেও কোন কোন বিষয় সংস্কার প্রয়োজন। পূর্বে যাহা চলিত কাল-প্রভাবে তাহা যে ঠিক মতই চলিবে, তাহা না হইতে পারে। এই সবার জন্ত অনেক স্থলেই দায়ী পুরুষ। তাঁহারা অনেকেই বাটীর মহিলাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন না। পুংমহিলাদিগকে তাঁহাদের প্রাণ্য সম্মান বা মর্যাদা দিতে নারাজ। মেয়েদের যেন কথা কহিতেই নাই এই তাঁহাদের ধারণা। এখনও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে তাঁহারা পুরুষের সম্পত্তির মতই বিবেচিত হইয়া থাকেন। এখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয় অনেকেই অবহিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমাদের মেয়েদের বৈরূপ শিক্ষা প্রয়োজন, সে দিকে লক্ষ্য বড় একটা দেখা যায় না। ঠিক ছেলেদের মত মেয়েদের শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ করানোর

অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাংসারিক জীবন অশান্তিময়ই হইতে দেখা যায়। সংসারে শিক্ষাহীন প্রবীণ ও আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তা নবীনাদের সহিত সংঘর্ষ সময় সময় অধিকই হইয়া থাকে।

সমাজে এমনও স্বভাববিশিষ্ট মানুষ পরিলক্ষিত হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য নহে অর্থাৎ বাহ্য অমুভূতির বিষয় তাহা তাঁহাদের নিকট ধর্মবোধের মধ্যেই থাকে না। পরিজননিগের মন যেখানে অবহেলিত বা মনের দিকে যেখানে দৃষ্টি নাই, ত্রায় ও সত্য অবমানিত হয়, যেখানে জ্ঞানী, মানী, বিদ্বান্, ব্রহ্মী প্রভৃতির জ্ঞান, মান, বিত্তা, কর্তব্য স্বীকৃত না হয়, সে সংসার সুখের হইতে পারে না। পারিবারিক সুখ-শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে গৃহস্থানী ও গৃহিণীর ব্যবহারে। তাঁহাদের দায়িত্ব সর্কাপেক্ষা অধিক। মনে রাখা দরকার, দোষ-পুত্র সংলোকও সময় সময় দুঃখ নির্ধ্যাতন হইতে অব্যাহতি পান না। সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাহারা সকল দিকে নজর রাখিয়া ক্ষমা ও ধৈর্য সহ হাসিমুখে সংসারের সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিয়া সংসার পালন করিতে পারেন, তাঁহারা ইহা সুকর্ত্তা ও সুগৃহিণী। সংগৃহস্থের ত্যাগের সীমা নাই। এই জন্তই শাস্ত্রকারগণ সংসার আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসিগণের অর্থ, সম্পদ, সংসার, ভোগ-বিলাস ত্যাগ খুবই কঠিন কাজ হইলেও, সে সব অপরের জন্ত যত না হউক নিজের স্বস্তি, পরমার্থ সন্ধান। আর সংসারী মানুষের কর্তব্য শুধু পুত্র-পরিজন পালনেই নহে, অতিথি অভ্যাগত প্রতিবেশী এমন কি জীব-জন্তু বৃক্ষ-লতার প্রতিও তাহার কর্তব্য আছে। সন্ন্যাসীকে দেখাও তাহাই কর্তব্যবাস্তব। গৃহস্থের ধর্ম, অপরের কল্যাণের জন্ত নিজ জীবনকে বলি দিতে প্রস্তুত থাকা। আদর্শ সন্ন্যাসী অপেক্ষা আদর্শ গৃহী হওয়া যে সহজ তাহা নহে।

সংসারে স্বাভাবিক অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে বাহাতে পরিজনবর্গের স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ না হইতে পারে, সেদিকে যত্নবান থাকা এবং যাহার বাহ্য অর্থাৎ যে স্নেহ, সম্মান, প্রশংসা বা শ্রদ্ধা প্রাপ্য, তাহা তাঁহাকে দেওয়া একান্ত দরকার। কথা যতটা পারা যায়, সোজা ভাবে প্রয়োগ ও গ্রহণ করাই উচিত ও অপ্রিয় উচিত কথা শুনাইয়া বাহাদুরি লগুয়ার প্রবৃত্তি সংবরণ করা আবশ্যিক; আর সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, বিত্তা বীখ্য জ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটিতেও যিনি সমৃদ্ধবান, তাঁহার যদি কোন বিষয় ছোট দোষ থাকে তাহা উপেক্ষা করাই শ্রেষ্ঠ। পরকে সহজে হীন মনে করা বা একের আদর্শের দ্বারা অপরকে বিচার করা সম্ভব নহে। নিজ নিজ আদর্শে কেহই কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে। স্বার্থপর সংকীর্ণমনা ব্যক্তি কখন নিজেও সুখী হইতে পারে না, সংসারকেও সুখী করিতে পারে না। নিজের মনকে ভাল করা, উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য শুধু একের চেষ্টায়ই শান্তি আসিতে পারে না, তবে একের মন যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে তাঁহার চেষ্টায় সংসারকে অনেকটা সুন্দর করিতে পারেন।

মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা সত্যকেও কখন অমর্যাদা করা উচিত নহে। সত্যজ্ঞান কখন বিনষ্ট হয় না। তাহার মধ্যে এমন এক প্রাণশক্তি আছে বাহা অজয়ের। ভুল বা দোষ জানিতে পারিলেই তাহা স্বীকার করিবার সংসাহস থাকে। সকলের পক্ষেই

উচিত। গৃহস্থানী যিচ্ছ হইয়া সর্বত্র ঘিলেও সংসার হইতে তাঁহার ছাড়ান নাই, এ কথা মনে রাখিয়া দুর্কলতা পরিহারের চেষ্টা করা উচিত। উৎসাহ সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন। যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে উৎসাহ লাভ সংসারী লোকের পক্ষে মূল্যবান সামগ্রী, ইহাতে অক্ষম সক্ষম হয়, দুর্কল বলীহীন হয়। সংসারী ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে সার্থক করিতে হইলে সংসারকে সর্কাপেক্ষে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতে হইবে। তাহার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক রিপু সকলের প্রাবল্য, তদ্বোধে ক্রোধ সর্কাপেক্ষা ক্ষতি করে। দেশের কাজে বিশেষতঃ অধিকার বাহাদের হাতে স্বস্তি, তাঁহাদের সমৃদ্ধিসম্পন্ন নিঃস্বার্থ কর্ম্ম হওয়া যেমন আবশ্যিক, তেমনই সংসার-ক্ষেত্রে ক্ষমতা বাহাদের হাতে থাকে তাঁহাদের ক্রোধবিবর্জিত বীরবুদ্ধিসম্পন্ন সমদর্শী এবং মিষ্টভাবী হওয়া একান্ত দরকার। পারিবারিক গণ্ডিতে হাসিমুখ ও মিষ্টভাবণ যে কত দামী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। নিজের মন কোন কারণে খারাপ থাকিলেও অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কোন ক্রটি না ঘটে সেদিকেও সংসারী লোকের দৃষ্টি রাখিতে হয়।

জ্ঞান ও ভ্রাতৃবিরোধ, দাম্পত্য কলহ প্রভৃতির উৎপত্তি রাখিবার ভুল, হিংসা, ক্রোধ, মান, অভিমান, স্বার্থ ইহেই প্রায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। সে সময় কি করিয়া বৃত্তি চরিতার্থ হইবে তাহা না ভাবিয়া শুভ ইচ্ছা প্ররোচিত ধৈর্য সহ মীমাংসার অন্বেষণেই কতকটা প্রতিকার সম্ভব। যদি সে স্রবোগ না থাকে, তাহা হইলে বরং তর্কবিতর্কের পরিবর্তে নির্দোষ হইয়া স্থান ত্যাগ করাও ভাল। এমন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, মতবৈধ হইলে মীমাংসার কোন পথ গ্রহণ না করিয়াই উত্তেজনা বেশে অনেকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পায়ত পক্ষে তাহা না করাই উচিত, মীমাংসার দ্বারা যদি কিছু ক্ষতি বা লাভ কম হয় সেও ভাল, আদালতে জয়লাভও শেষ পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ নয়। অতি তুচ্ছ সামান্য বিষয় হইতে কত বড় অনিষ্ট সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। অশনিপাত বা উরগ-বংশন প্রভৃতির কথা বলিতেছি না, ছোট একটি বটক বিচ্ছ হইতে সেপটিক হইয়া প্রাণান্ত হইতে পারে, তাহার কথাই বলিতেছি। একটি আমড়া গাছ বা একটি পরিচারিকা হইতে উদ্ভূত একটি সমৃদ্ধ সংসারের পতন, ইহা অসম্ভব ব্যাপার নহে।

পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা ভাই-ভগিনী প্রভৃতিতে লইয়া যে সংসার, সেই সংসারে পালিত হইয়া, পালন করিয়া, সেই সংসারের এক জন হইয়া যে যৌব জীবন, মূলতঃ সেই জীবনের অভিজ্ঞতার কথা এই অধ্যায়ে লিখিত হইলেও অজ্ঞাত ক্ষেত্র হইতে যে জ্ঞান ও দায়ণ্য হইয়াছে, তাহাও সংযোজিত হইয়াছে। সংসার বলিতে প্রাত্যেক সংসার ঠিক এক নহে। বিভিন্ন সংসারে পরিবারবর্গের সংখ্যা, স্থান, সুখ, সুবিধা, দুঃখের কারণ প্রভৃতি সব যদি ঠিক একও হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন সংসারের পরিজনবর্গ যে ঠিক এক ভাবেই দিনাতিপাত করিতে পারিবেন, এমন কথা নাই। দৈহিক গঠনের জ্ঞান বিভিন্ন মানবের মনের ভাবও যে কত বিভিন্ন প্রকারের আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মন জিনিষটা এক রকম ছুট রকম বা তিন রকম নহে, যেমন বহু বহু প্রকারের, তেমনই হিংসা, ক্রোধ, জিদ, সহণ্ড প্রভৃতিও সকলের সমান নহে। সুতরাং এই জীবনে জ্ঞানের সঙ্গে যে সব ঠিক মিলিবে, এমন সম্ভাবনা না থাকা বাদে

বিচিত্র নহে। একের সংসারের কথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়ত অপরে একটা অল্পমান বা ধারণা করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু তাহার ঠিক পরিমাণ করা সম্ভব নহে।

সংসারকে করি বিষবৃক্ষের সঠিক জ্বলনা করিয়াছেন, হুঃখ সংসারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বর্গের সুবিস্মৃতিত পরিবার যে নাই তাহা নহে। আনি আমার হৃৎগাণ্ড্যবশতঃ অন্ধকার দিকটাই বেশি করিয়া দেখিয়াছি। হুঃখকে সরাইয়া সুখের বাসনা এবং তাহা পাঠবার জন্য চেষ্টা ইহাই দরকার। কিন্তু কি নারী কি পুরুষ এমন এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাঁহারা এমনই ভাবে থাকেন, যেন সুখ তাঁহাদের জন্য নহে, হুঃখ-দুঃখ ভোগই যেন তাঁহাদের জন্য বিধি-নির্দিষ্ট ব্যবস্থা। ইহা একটা অভিমানের মত ভাব কি না জানি না। যে হুঃখকে অতিক্রম করার চেষ্টাই আবশ্যিক, সেই হুঃখকে যেন আকড়াইয়া ধরিয়া থাকাই তাঁহাদের ভাল লাগে। অনেকে আমার এই মন্তব্য ঠিক গ্রহণ করিতে পারিবেন কি না জানি না। অধুনা কোন কোন পরিবারে এরূপ দেখা যায় যে, বধুর প্রতি তিরস্কার, অজ্ঞার আচরণ বা অন্য কোন তাহার ব্যক্তিগত অপ্রীতি হইতে উদ্ভূত মনোভাবে তিনি তাঁহার

স্নেহের দুলালী ছোট ছেলেমেয়ের উপর বিনা কারণে বা অস্তি সামান্য কারণে অত্যাচার করিয়া থাকেন, যেন তাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। অকারণে নিজের প্রতি অবহেলা করা ইহাও সময় সময় পরিদৃষ্ট হয়। মনে হয়, এ সবই অশিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষার ফল।

বিখ্যাত বীরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—“মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে”—সত্যিই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান মানবতা লইয়া মানব-ভোগ্য সহস্র উপচার-পূরিত এই সুন্দর পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুন্দর ভাবে জীবন বাণে যেচ্ছার অবহেলা করিবেন এমনই এই প্রসঙ্গে এখনও লক্ষ শিক্ষার বহু কথাই বলা বাইতে পারে। শিক্ষার এখানে শেষ নাই, যতক্ষণ জ্ঞান থাকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে ততক্ষণই শিক্ষা পাইতে পারা যায়। আর এই সব শিক্ষাই মানব-জীবনের পরম সম্পদ, জীবনের পূর্ণতা সাধনের প্রধান সহায়। আমার পারিবারিক জীবনে সাক্ষ্য না পাইলেও, দেবী সমীপে যদি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রার্থনাই করিতে ইচ্ছা হয়—মা, এত দিনে বাহা দিয়াছ তাহা যেন কাড়িয়া লইও না।

## কফি, বিষ না অমৃত ?

কফি আধুনিক যুগে সব চেয়ে জনপ্রিয় পানীয় হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যদি আপনি নিয়ম মত কফিপানে আসক্ত থাকেন, তা হ'লে আপনি এক দিনে ২৫ থেকে ৬৫ গ্রেয়ালা কফি নিশ্চয়ই পান করেন। কফি আপনার পক্ষে ভাল না মন্দ, চিকিৎসকগণ সে-সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশ করেন।

কফি আপনাকে জাগিয়ে রাখে। আবার নিশ্চিন্ততায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। আপনার রক্তসঞ্চালন অব্যাহত করে। ক্ষুধা জাগ্রত করে। ক্ষুধা বন্ধিত করে। হজমশক্তির সহায়তা করে, যকৃতের অতিরিক্ত 'গ্রাসিড' দূর করে। না, এদের কোনটাই করে না, এদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ফলায় ?

সাধারণ আকৃতির কফি বস্ত্রটি এত জটিল যে, রসায়নবিদেরা তাঁদের পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রায় স্বীকার করেন। কফিতে সব চেয়ে বিশেষ যে ভাগটি কাঙ্ক্ষনময় তার নাম 'ক্যাফিন' বা Caffeine.

আসল 'ক্যাফিন' হ'ল এক রকমের শুভ্র গুঁড়ো পদার্থ। এক পেয়ালা কফিতে থাকে সিকি তোলাও কম 'ক্যাফিন'। 'ক্যাফিন' মস্তিষ্কে পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। অবশ্য অতিরিক্ত ব্যবহারে 'ক্যাফিনের' কুফল অনেক।

শতকরা সাতানব্বই জনের কাছে কফি ক্ষতিকর নয়। শতকরা তিন জন কফিপানে কুফল পায়। অতিরিক্ত কফি পান করলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। রাসায়নিকের গবেষণায় জানা গেছে যে, কফিপানী ব্যক্তির যদি মনে করেন, কফিই তাঁদের জাগিয়ে রাখে, তা হ'লে সামান্য পরিমাণ কফি খেয়েই তাঁরা ভ্রমে থাকতে পারেন। অপর পক্ষে কয়েক পেয়ালা গাঢ় কফি খেলেও তাঁরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হতে পারেন। তবে খালি পেটে কফি খাওয়া উচিত নয়। রক্তের চাপে বাঁরা ভোগেন কফি তাঁদের বিষত্ব। বয়স্ক লোকেরা অনায়াসে কফি পান করতে পারেন। অল্পবয়স্কদের কফি না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

কফি টাটকা খাওয়াই নিয়ম। পুরানো কফিতে অনেক ক্ষতিকারক বস্তুর উদ্ভব হয়। আবার কফি প্রস্তুতের নিয়মাবলী বখাষ পালিত না হ'লে কফি পানীয় হিসাবে গ্রহণ করা বিপদজনক। ইংরেজীতে একটি কথা আছে “Coffee boiled is coffee spoiled.” সুতরাং কফি তৈয়ারীর নিয়ম জানার প্রয়োজন সর্বোচ্চ। কফির উপকারিতা সম্বন্ধে মতবৈধতা থাকলেও কারও কারও পক্ষে অপরিস্রব পানীয় এই কফি—যার কার্যকারিতা অজ্ঞাত পানীয়কে পেছনে ফেলে রেখেছে। পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী কফি ব্যবহৃত হয় কানাডাতে। সেখানে প্রতি বছরে ১৮ লক্ষ পাউণ্ড কফি ব্যবহৃত হয়। গত দশ বছরে ভারতবর্ষেও কফি ব্যবহারের বেগবান হয়েছে। অজ্ঞাত প্রদেশ অপেক্ষা মাদ্রাজেই কফির অধিক ব্যবহার বলা যায়। এখন চা-ব্যবসায়ী আর কফি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলছে পৃথিবীর সর্বত্র।

পাশাশির হৃদে জয়লাভ করিয়া ক্লাইভ শুধু যে ইংরেজের সাম্রাজ্য ও ইংরেজের বাণিজ্যই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজি সাহিত্যের জন্মও এক নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শেখোক্ত সাম্রাজ্য সর্বাঙ্গের অপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হইতেছে। কালীহিল একবার সোচ্ছাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বরং তাহার ভারতীয় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু শেকস্পীরকে ছাড়িয়া দিতে চাহিবে না। কালীহিল একটি সম্ভাব্যতার কথা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিলেও সেই ইংরেজ-শাসনযুক্ত ভারতবর্ষ শেকস্পীরের প্রভু অটুট থাকিতে পারে।

আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার একটা ইতিহাস আছে। প্রথমে আমরা অল্প-স্বল্প ইংরেজি শিখিতেছিলাম রাজপুরুষদের সঙ্গে ও বিদেশী বণিকদের সঙ্গে কাজ-কারবারি চালাইবার জন্য। ইংরেজ রাজপুরুষের পক্ষেও ইংরেজি-জানা কেরানীর প্রয়োজন হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন বাস্তবীয় হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া নতুন শিক্ষা প্রবর্তনের পশ্চাতে আর একটি প্রেরণাও ছিল। ইংরেজ বহন আমাদের দেশে আসে তখন নানা দিক দিয়া আমরা জয়াজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলাম। শ্রায়াচাঞ্চ্যের টোলে শ্রায় ও দর্শনের আলোচনা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের জন্য যে পাঠশালা ছিল তাহার পাঠ্য-তালিকায় পাঠ্যবস্তু খুব কমই ছিল। ইংরেজির সাহায্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে বিচিত্র জগতের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিল। তার পর চলিল অবিরাম ইংরেজি চর্চা। ইংরেজি পড়া, ইংরেজিতে কথা বলা, ইংরেজিতে ভাব প্রকাশ করা, ইংরেজিতে চিন্তা করা, এমন কি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা—ইহাই হইল শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলি চিন্তাধারা প্রবাহিত হইল যাহা ইংরেজির পরিপন্থী। প্রথম হইল স্বাদেশিকতা। ইংরেজি শিক্ষা এই ধারাকে পরিপুষ্টই করিল, কারণ ইংরেজি সাহিত্য বিশেষ ভাবে জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাহারার মিল্টন, বার্ক প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা পরাধীনতার বিরুদ্ধে সজাগ হইবেন ইহা স্বাভাবিক, এবং যে পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রামশীল হইলেন, সেই পরাধীনতা শুধু রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতা নহে সাংস্কৃতিক পরাধীনতাও বটে। এই আন্দোলনকে জোরাল অভিযুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; তিনি বলিলেন, ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মধ্যে দাস-মনোবৃত্তি জাগ্রত করিয়াছে। সুতরাং ইংরেজিতে চিন্তা করা এবং ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখা শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইল না, ইহা দাসত্বের কলঙ্ক-রেখা বলিয়া বিদ্রোহিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে আর একটি ধারাও মিশ্রিত হইল। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের ঐক্য সাধিত হয়। বাহাদের নিজের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে তাহারা পরমুখাপেক্ষী হইবে কেন? উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে জনৈক ইংরেজ পরিদর্শক দেশীয় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, সেখানে পড়িবার মত কোন বস্তু তিনি দেখিতে পান নাই। কিন্তু এখন আর সেইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এক শত বৎসরের চর্চার ফলে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে; শুধু তাহাই নয়, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের লুপ্ত রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

## আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-৪

ঐশ্বর্যবোধেন সেনগুপ্ত (অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ)

সুতরাং সাহিত্যের—বিশেষ করিয়া আধুনিক সাহিত্যের—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য এখন আর ইংরেজির মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বরং আমাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে জাতীয় সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে দেশীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই করিতে হইবে। ইংরেজিকে বর্জন না করিলে আমাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হইবে না।

২

আমার মনে হয়, ইংরেজির বিরুদ্ধে এই অভিযান কল্যাণকর হইবে না। এক দিন ইংরেজির প্রাধান্য পরাধীনতার পরিচয় বহন করিত বলিয়া তাহা আমাদের চিন্তাধারের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এক দিন আমরা বিলাতী কাপড় বর্জন করিয়াছিলাম একান্ত রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু আজ দেশের অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। যদি সেই দিক দিয়া বিলাতী কাপড় কেনা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে প্রাচীন রাজনৈতির দোহাই দিয়া বিলাতী কাপড় বর্জন করা আত্মপ্রতারণার পর্য্যবসিত হইবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই যুক্তি আরও বেশী প্রযোজ্য। ভারতবর্ষ বহু জাতির বাসভূমি এবং প্রত্যেক প্রদেশেই একটি বিশিষ্ট বা একাধিক ভাষা প্রচলিত। ইহাদের কোন একটি ভাষাকে প্রাধান্য দিতে গেলে প্রাদেশিকতার বিঘ্ন কেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে তাহার দৃষ্টান্ত পঞ্জাব এবং দক্ষিণ-ভারতের পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ ভারতের একজাতীয়তাকে কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অভিযোগ মিথ্যা হইলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে-সকল শক্তির প্রেক্ষিতায় আধুনিক ভারত একজাতীয়ত বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে তদ্ব্যতীত ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব অন্ততম। অনেকে বলেন, মেকলে যেমন এক দিন জোর করিয়া ইংরেজি চালাইয়াছিলেন তেমনি আইন করিয়া হিন্দীকে চালাইয়া দিলে তাহাই ইংরেজির স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু যে সাহিত্য ও যে ভাষা জনগণের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হইবে তাহা যদি সমৃদ্ধমান না হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সংস্কৃতিকে কলঙ্ক করিবে না? পরিপুষ্ট করিবে? ইহা কি অগ্রগতি না পশ্চাদ্ধাবন? ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদের দিক দিয়া হিন্দী ও ইংরেজীর তুলনা করিলে এই প্রশ্নের মাত্র একটি উত্তরই সম্ভব। বলা যাউতে পারে যে, কালক্রমে হিন্দী বশেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্যতার উপরে নির্ভর করিয়া কি আমরা সমৃদ্ধিমানকে পরিত্যাগ করিব? হিন্দী ভারতবর্ষীয় ভাষা, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী, আসামী, মারাঠী (মারাজীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম) মাতৃভাষা নহে; তাহাকে অন্ততর ভাষা হিসাবে কসং করিয়াই ইহা শিখিতে হইবে। যদি পরিভ্রম করিয়াই শিখিতে হয় তাহা হইলে কোন ভাষা শিখিব—শেকস্পীরের না প্রেমচন্দ্রের?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে বিশ্বস্তি ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাহা বিশেষ ভাবে ইংরেজি শেখার ফল। আমরা সচরাচর

কৰ্মক্ষেত্রে বিধিমা কৰা উচিত। কৰ্মের উপর সংসার চলে। যে বকম মানুষ কাজ করছে সেই বকম ফল পাচ্ছে। সাধন-রাষ্ট্রোৎপত্তি তেমনি। বুদ্ধদেব কৰ্মের উপর ধর্ম স্থাপন করে গিয়েছেন।

### সংস্কার

মানুষ মাত্রই সংস্কারের পুটলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। সংস্কারের বশেই মানুষ ভাল-মন্দ সব বকম কাজ করে থাকে। সংস্কার সং-এবং অসং দুই-ই আছে। সংস্কারবিহীন মন হওয়া বড় কঠিন। জীবের সংস্কার কি সহজে যায়? একবার সাধুসঙ্গ বা তীর্থ-যাত্রা করলেই কি জন্ম-জন্মান্তর-ব নৃচর সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়? এ সম্বন্ধ বড় খড়কাঠি পোড়াতে হয়।

যিনি সেট, আনন্দময় ভগবানকে লাভ করে সর্বদাই আনন্দে ভগ্নপূর হয়ে রয়েছেন, এমন সাধু সঙ্গ করতে করতে তবে মনে সত্যের প্রভাব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসং সংস্কারগুলো ক্ষীণ হতে থাকে। এই ভাবে সংস্কার প্রবল হলে অসং সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নাশ হয়ে যায়। তখন মন সংস্কার-বিহীন হয়।

সংস্কার যাওয়া বড়ই কঠিন। ভগবানের কৃপা ভিন্ন হয় না। অনেক বড়লোকের ছেলে, কোনো অভাব নেই—তবুও চুরি করে। এ সব পূর্বজন্মের সংস্কার। সেই জন্তেই তো জন্মান্তর মানতে হয়। জন্ম নিয়ে ভাল কাজ করলে শুভ সংস্কার হয়। তখন অন্তঃ সংস্কারগুলো ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে।

### মন

মন সর্বদা সাবধান। মনের মধ্যে কামনা-বাসনা কলিবিদ্ধ করছে। কখন যে কোন দিকে অধঃপাতে নেয় তার ঠিক নেই। সাধন-ভজন করে মন পবিত্র হলে অসং কামনা আর মনে উঠতে পারে না। তাই বলি,—সাধন কর; কোনটা সং, কোনটা অসং তখন মনই তোমাকে বলে দেবে। মন তোমার গুরু হয়ে যাবে।

মন বেশী ভাগই বিষয়-সুখ চায়। তাই মানুষ এত দুঃখ-কষ্ট পায়। বিষয়ের চিন্তা ও বিষয়ের ধ্যান করছে বলে এত দুঃখ। বিষয়-তৃপ্তি মন স্ত্রী, পুত্র, ধন এই সবোত্তম মন্ত হয়ে থাকে। সর্বদা বিষয়-চিন্তা করে করে এমন একটা সংস্কার অম্মায় যে, মন তখন আর উঠু যাপে উঠতে পারে না। যদি বা দৈবাৎ ওঠে তো আবার পড়ে যায়। ঠাকুর যেমন বলতেন,—বেজীর ল্যাজে আধেলা ইট দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে সে যতই লাফ দিয়ে দেয়ালের গর্তে উঠতে চেষ্টা করে ঐ ইটের ভারে ধুপ করে নীচে পড়ে যায়। সংসারীর মন ঠিক তেমনি বিষয়ের টানে ঐ বেজীর মত নীচে পড়ে যায়—উঠতে পারে না। কিন্তু সেট বিষয়-টানের মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিলেই প্রশ্ন হয়ে যায়। কিন্তু জীব তা না করে তার মনকে কাশ-কাফের আঁটা কুড়ে কেঁসে রেখেছে। এমনি তাঁর মায়ী।

মনটা মায়ী-খারে আচ্ছন্ন হয়ে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এইজন্য সে বার বার এত চোটে খায়। কিন্তু তবুও ঐ বিষয়েরই ধ্যান করে। ঠাকুর বলতেন—‘মন বেচারার কি দোষ আছে?

তামা মা তাকে আঁধি দিয়েছেন। তামা মা তাকে দয়া করে ছেড়ে না দিলে তার আর উপায় নাই।’

ঠাকুর তো অনেককেই বলতেন—‘মনের মোড় ফিরিয়ে দাও, কাম-ক্রোধের মোড় ফিরিয়ে ভগবন্তুখী করে দাও।’ কিন্তু জীবের সাধ্য কি যে, বিষয়-সুখী মনকে তুলেও ভগবানে দেয়। সে সাধ্য জীবের নেই, কারণ মন গভীর সংসার-কুপে পড়ে রয়েছে। কেউ এসে তাদের টেনে তুলতে চাইলেও উঠতে চায় না। কি মন্তঃ দেখ, কাম-কাঞ্চনের মোহ তাদের এমনি পেয়ে বসেছে যে, টেনে তুললেও উঠতে চায় না। তারা দুঃখ ভোগ করছে তবুও তাদের কোন বোধ নেই—একবারে বেহীশ।

ভোগ-বাসনা আর কু-ভাব থেকে খুব সাবধান। তুলেও এদের মনে স্থান দেবে না। মনের বন্ধন নিয়গতি ক্রমশঃ হতে থাকে। তখন মানুষ বুদ্ধও বুদ্ধতে পারে না। কিন্তু যখন ভাল ভাবে বুদ্ধতে পারে তখন আর ওঁঠবার শক্তি থাকে না। সাধককে ভোগ-বাসনা অজ্ঞে অধোদিকে নিয়ে যায়। কামনা-বাসনার একটু কঁকড়ি পর্যন্ত মনে থাকলে সে মন ঈশ্বরের দিকে গতি করে না। ঠাকুর তো বলতেন যে, সত্যের আগে একটু কঁসো থাকলে সূচ ঢোকে না। বৈরাগ্য ও অস্থগাণ দ্বারা মনকে সব সময় পবিত্র রাখবে। কথায় বলে—‘মন চান্দা তো কুটুরী মে গদা।’

### সংসার

সংসারে একটি লোকের উপর অনেক লোক নির্ভর করে। তার বিষম দাঁড়। তার শরীরের প্রতি বাড়ীর সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। যদি গোলমাল হয় তবে সংসারটি ছাড়াই হয়ে যায়। অবস্থান্তর হলে বড়ই বিপদ। শ্রবে থাকতে যারা আরামে কাটিয়েছে অবস্থান্তর হলে তাদের বড়ই কষ্ট হয়। এজন্য যখন অবস্থায় ঈশ্বর রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা ভাল। ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করতে হয়—যাতে সব সহ করতে পারি, সব অবস্থায় যেন সন্তুষ্ট থাকতে পারি। ঠাকুরের মহাবাক্য ‘শ’ ‘ব’ ‘স’ অর্থাৎ সহ কর—সহ কর—সহ কর—প্রত্যেকেরই শ্রবণ রাখা উচিত।

বেশী রাগ-অভিমান করতে নেই। সংসারে থাকতে হলে একটা না একটা লেগেই থাকে। সে সব ভাবতে গেলে মন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভগবানকেও অনেকখানি সময় ভুলে যেতে হয়।

যৌবনের বেগ ও অর্থের লালসা যে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে, সংসারে থেকেও সে অনায়াসে ভব-সাগর পার হয়ে যায়।

সংসারে সব আশা-আশার আশি-আশি করে। অহং-বোধই মুখতা। মানুষ একবার ভাল করে ভেবে এবং বিচার করে দেখলে বুঝতে পারবে, এ সংসারে কে কার? সাধন-ভজন করলে তবে নিত্য ও অনিত্যের জ্ঞান হয়।

সংসারের আবহাওয়া বড়ই খাপস। সদাই জীবকে প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করে রাখছে। জীবই যে শিব, মায়ী এ কথা সকলকে ডুলিয়ে দিচ্ছে। মায়ী রহিত মহাপুরুষদের শ্রবণ করলে এ মায়ীর হাত থেকে এক দিন বেঁচে যাবে। কিন্তু সংসারে থেকে যদি গির্শি বাবুর (নাট্যচর্চা গির্শিচন্দ্র ঘোষ) অশ্রবণ কর,

ভাব যে, তিনিও ত শেষে ভক্ত হয়েছিলেন—আমরাই বা মত হব না কেন—” তাহলে কিছ সবই বিগড়িয়ে ফেলবে। অক্ষয় কর্তে যেতো না, ওতে মারা পড়বে। ঠাকুর-সন্ন্যাসীর জীবন দেখে ও তাঁদের উপদেশ মেনে চললে তোমাদের নিশ্চিত কল্যাণ হবে। জীব-দুঃখে কাতর হয়ে জগতের কল্যাণের হুই তাঁরা দেহ ধারণ করে এসেছিলেন।

সংসারে মানুষ এত স্বার্থপর হয়ে পড়েছে বলেই ওদের এত দুঃখ-দুর্দশা। মানুষ এখন নিজের ছাড়া অন্য কারুর কথা ভাবার ভেবেও দেখে না। পরের মজল না চাইলে আর নিজের মজল হবে কোথেকে? যে দেশের জন্ত ভাবে তাকে নিজের জন্ত অস্বাদ্য করে আর ভাবতে হয় না, দেশের সঙ্গে তার নিজেরও ভাগ হয়ে যায়। সে তো আর দশকে বাদ দিয়ে নয়?

সংসারে থাকলে বিয়ে করতে দোষ নেই। কিন্তু বুকে শুখে নয়বে। সস্তাবে জীবন বাপন করার মত শক্তি আগে সঞ্চয় করে নিতে হয়। যেন কোনও অবস্থাতে তাঁকে ভুল না হয়।

সুখী লোক সংসারে নেই এ কথা কেউ বলতে পারে না। ভগবানকে যে পেয়েছে সে নিশ্চয়ই সুখী। রোগ শোক জরা মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আবার বুকেরে বসেছেন যে, বাসনা-মুক্ত হলেই সুখী হওয়া যায়।

সংসারে লোককে ভালবাসলে খুব সুখী আর মন্দ বললে মনে মনে মহা অসন্তুষ্ট। সাধারণ সংসারী লোকের ভক্তি তো নীচের কাচের মত, যা (আঘাত) দিলেই ভস্মনি ভেঙ্গে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ভালই বলুন আর মন্দই বলুন তাতে যে কতখানি কল্যাণ হয় সে আর সকলে বুঝবে কি করে?

আজ-কাল সংসারে সমস্ত দিন খেটেও ভাল খাওয়া-পরাই অবস্থা করতে লোকের যায় যায় হয়েছে। তাঁর উপর বিয়ে করলে তো আরো কত ফাসাদ এসে জুটে। বিয়ের যে কত ফাসাদ! যদি স্ত্রী হেসে ভায়ে বা ভায়ের সঙ্গে কথা কয়েছে, তা হলেই সন্দেহের ভাবে বুক ভারী হয়ে যায়। বুকের যন্ত্রণায় শ্রম আইচাই করতে থাকে।

সংসারে ভায়ে-ভায়ে মিল থাকা খুব দরকার। সকলে সমান মেহগার করতে পারে না। হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়। সংসার কদিনের জন্ত? বেশী ভাববে না। কোন রকমে সংসার চলে যাবেই, তিনি চালিয়ে নেবেন। নিজেকে শুধু নিমিত্ত করে রাখো! তিনিই তো সব করছেন। জীবের সাধ্য কি যে, ভগবদ্বিচার কিছু কোন কাজ করে। তাঁর ইচ্ছায় সব হচ্ছে জানবে। তা বলে কি কিছু না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? এ সব তুম: উপদেশ লক্ষণ। নিজেকে খাটতে হবে। না খেটে কিছুই লাভ হওয়ার যো নাই। তবে তাঁকে ধরে থেকে কাজ করলে সংসারের প্রসংগ গায়ে লাগে না।

স্বাধীনতা না হলে ছেলের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিয়ে মতন ছেলের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কোন কোন বাপ-মা ছেল-মেয়েদের মতের বিচ্ছেদ বিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ ছেলের বলেন—“তোমাদের সামান্য আর, বুকে সংসার করবে। হাঙ্গামা সংসারে থেকে অনেক দুঃখ পেয়েছি।”

ছেলে-মেয়েদের নিকট বাপ-মা'র খুব সাবধান থাকা উচিত।

ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের নকল করে। বাপ-মা মানুষ না হলে ছেলে-মেয়েদের মানুষ হওয়া কঠিন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সময় দেখাবে যেন শত্রু কিন্তু অন্য সময় তাদের স্নেহ করবে।

সংসারে থেকে ভগবানকে ডাকা সোজা। কারণ বোগান দেওয়ার অনেক লোক থাকে। আর অন্য সাধন ভজন করলেই ধর্মবুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি হয়। সংসারীর প্রতি ভগবানের কত দয়া। আগে এদেশে ঘরে ঘরে সাধক ও ভক্ত ছিলেন। এখন আর সে দিন-কাল নেই। বিলিতি শিক্ষা পেয়ে লোক বোগ ভুলে গিয়ে ভোগের দিকে ছুটেছে। ধর্মের উপর সে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কোথায়? তাই তো এত দুর্দশা!

তোমরা খুব উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে সংসার-পথে চলবে, তবে নিশ্চয়ই কল্যাণ হবে। প্রকৃত ত্যাগী মহাপুরুষদের জীবন দেখে নিজ নিজ জীবন পথে ঠিক চলতে শেখো। আদর্শ ছেড়ে দিলেই ঈশ্বর থেকে ঠিকরে পড়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, পতনের রাস্তা বড়ই ঢালু। একবার পতন হলে কোমর সোজা করে ওঠা খুবই কষ্টকর। তবে মহাপুরুষেরা সংসারী জীবকে তুলবার জন্তই দেহ ধারণ করে আসেন। সাংসারীর প্রতি তাঁর কি কম কৃপা?

## মায়া

ভগবানের দয়া তো সর্বদাই সব জীবের ওপরে রয়েছে! কিন্তু জীষ মায়া-মুগ্ধ, তাঁর দয়া চায় না। ভগবান বিশ্বাসী। সকলের মনই তিনি জানেন। যে তাঁকে চায় সে তাঁকে পায়। তিনি ধরা দিয়েও ধরা দিতে চান না। এই তো হয়েছে জীবের পক্ষে মুক্তি। সব ব্যাপারই হচ্ছে তাঁর লীলা। তাঁর লীলার রহস্য সামান্য জীব কি বুঝবে! এক মাত্র মহাপুরুষেরাই তা' বখাষখ বুঝতে পারেন। আর কারো মুরোদ নেই।

মায়া এই বিশ্ব-ত্রাণের সব জীবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ভগবানের দয়া না হলে সেই মায়া'র হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোনও উপায় নেই। মহামায়া জীবের মায়া-বন্ধন কেটে না দিলে মুক্ত হওয়ার কোন উপায় নেই।

এ জগতে সবই মায়া। মায়া'র শিকল আট পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। সাধন-ভজন ও অভ্যাসের দ্বারা একটু একটু করে মায়া ত্যাগ করতে হয়। নিত্য-অনিত্য, সং-অসং বিচার করে অনিত্য অসংকে তুলতে হয়! প্রথমে পারিপার্শ্বিক আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এদের মোহ ত্যাগ করতে হয়। বাইরে বেশ লোকদের দেখাবে যাতে তারা তোমার মনের ভাব দেখে কিছু বুঝতে না পারে। কর্তব্য বোধে সবই করে যাবে কিন্তু মনে মনে জানবে যে, তারা তোমার কেউ নয়। বড়লোকের কি মনবের ছেলের নিজের ছেলে-মেয়েদের চাইতেও বেশী যত্ন করে মানুষ করে কিন্তু সে মনে জানে যে, তারা তার কেউ নয়।

পারিপার্শ্বিক বা আত্মীয়-স্বজনে মায়া ত্যাগ সোজা। সং-অসং বিচার আর তীব্র বিবেক থাকলেই ক্রমে ক্রমে হয়ে যায়। কিন্তু বাপু শরীরের মায়া ত্যাগ করা সোজা নয়। দেহ-জ্ঞান রহিত হওয়া কি'চারটি কথা? বার বার বিচার করতে হয়, মনে মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হয় যে, শরীরটাও আমার নয়, মনটাও আমার নয়, ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই আমার নয়। আমার স্বরূপ



এরও উর্দ্ধ। এমনি করে সৃষ্টির ধ্যান করতে করতে দেহের মায়া যায়, এ সব সময় শু সাধনদাপেক্ষ। এক দিনে দু'দিনে যায় না। বছরের পর বছর ধৈর্য ধরে বিচার ও বিবেক সহাবে মায়া ত্যাগ করতে হয়। লক্ষ্যমান না হলে মায়াভীত হওয়া যায় না। একটু না এফটু দাগ থেকে যায়। তবে তার দ্বারা কাজ হয় না।

এই জগৎকেট কেউ “ধোঁকার টাটি” “কেহ মজার কুটা” দেখছে। আবার কেউ দেখছে এই জগৎটা তাঁর বিরাট দেহ। আমরা সবই তাঁর কোলে রয়েছি, যেমন মায়ের কোলে সন্তান থাকে। আমরা যে তাঁরই সন্তান এইটে ভুল হয়ে যায় বলে যত গুণগোল বাধে। আমরা সকলেই যে মহামায়ার রাজত্বের গণ্ডীর ভিতরে। এইটে ভুল হয় কেন? এ যে মহামায়ার এলাকা। তিনি যে কি এক খেলা লাগিয়ে দিয়েছেন—খেলাতেই তাঁর আনন্দ, কত অবটন ঘটছেন!

জীব যতক্ষণ অবিদ্যা, অজ্ঞানের এলাকাতে রয়েছে ততক্ষণ তাঁর কাছে এগুতে পথ যায় না, কিন্তু প্রাণের ব্যাঙুলতায় তাঁকে কেঁদে কেঁদে ডাকলে পরেই তাঁর দয়া হলে তিনি কাছে টেনে নেন। জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের খেলাতে মেতে থাকে, তাঁকে কাজের ভাবে ডাকবার প্রবৃত্তি হয় না। এই গুণকর্য্য মায়ার বিচিত্র লীলা!

### প্রচারক

আগে নিজের সাধন-সন্ধান খুব বাড়াতো। ক্রমে যখন আশ্রিত হয়ে বাবে, তখন তা থেকে লোকের কল্যাণের জন্য যত দান করবে, তেঁমার ভাগ্য ফুরবে না। কারণ তিনি তখন খুব সাপ্লাই (যোগান) দিতে থাকেন। তা না হলে নিজের কিছু

জমতে না। জমতে পাত্র-অপাত্র, অধিকারী, অনধিকারী বিচার না করে কেবল বাজে খরচ করতে থাকলে কি কোন কাজ হয়? নিজের কোন কালে পুঁজি বাড়তে পারলে না, চিরকাল ভিখারী মত সাধন-সন্ধান শূন্য হয়ে বেড়াচ্ছে যে, সে আবার ধর্মশিক্ষা দিবে কি?

যে নিজেই মুক্ত হতে পারেনি সে আবার লোকের নিয়ে অপথের বন্ধন মোচন করে মুক্তি দিতে চায়। এ কি বিড়ম্বনা! নিজে কোথায় পথ্যি করবে তার যোগাড় নেই যে নিজেই কদোসী সে আবার সেই পরম ধন, পরম জ্ঞান, পরম আনন্দ ও পরম শান্তি অন্তর্ভুক্ত দিতে চায়! এ কি পাগলামী নয়? যার যা আছে সেই জিনিষ সে দান করতে পারে। কিন্তু যা নেই সেই জিনিষ কি করে দান করবে?

আজ-কাল জ্ঞান-শিক্ষাদাতা পনের মুক্তির জন্য ব্যস্ত বাণীশ অনেকই হয়েছেন। তাই কোনও কল হচ্ছে না। যারা লোকশিক্ষা দেবেন তাঁদের সময়, ত্যাগ ও তপস্কার পুঁজি থাকা চাই। নইলে নিজের কিছুই হল না, কেবল পনের মুক্তি জন্য ভাবছে। সকলের কি নিত্যানন্দের মত ক্রোধশূন্য, নিরোপ ও পরমানন্দ অবস্থা লাভ হয়েছে যে, ঘরে ঘরে বাক-তাকে অভিমানে শূন্য হয়ে হরিনাম বিলোবে? সেই অবস্থা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কোন কাজ হবে না—নকল করতে গেলে মারা যাবে!\*

\* গত চৈত্র মাসের বাণীগুলিও শ্রীশ্রীস্ট্রী মহারাজের দেব স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ সংগৃহীত তথ্যাবলী অবলম্বনে শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ চক্রাভ্যুর্দ্ধ সঙ্কলিত ও লিখিত।

### তোৎলামি কি সারে না?

আ-আ-আ-আ-আপনি কি কথা বলতে বলতে কথা জড়িয়ে ফেলেন? তার মানে আপনি কি তোৎলা? তা যদি না হন, তা হ'লে আপনি রাজা যষ্ট জন্মের চেয়ে অনেক বেশী ভাগ্যবান। লিওনার্দো দা ভিকির চেয়ে অনেক বেশী সুখী। চার্লস ডার্বাইনের চেয়ে বহু পরিমাণে ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত। আর চার্লস ল্যাথের চেয়ে অধিক আনন্দমুখর। কেন না এই সব পৃথিবীখাত ব্যক্তির সকলেই তোৎলা। বাকশক্তি পেয়েও তাঁরা কষ্টবাক্য। খ্যাতিমানদের বাদ দিলে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকের আছে এই রোগ, অর্থাৎ তোৎলামি। এই রোগের কারণ অহুসন্ধানে জানা যায়, বংশগত তোৎলামির জন্তে অনেক তোৎলা হয়। কষ্টের বা গলদেশের অসুখে জন্তে কেউ-কেউ এই রোগে ভোগে। আবার একটা কথা কিংবা একটা অক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণের বদ অভ্যাস থাকে কারো কারো। দাঁতেব দোষেও অনেকে তোৎলা হয়।

তোৎলা যারা তাদের বোকা, মূর্খ এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মনে করে তামাসা পুষাত্ত করতে শোনা যায় অনেককে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আদর্শেই তা নয়। বহু তোৎলা লোককে দেখা যায় তারা অপরিণীত প্রতিভার অধিকারী। তোৎলামি অনেকের কাছে হাতাকর

মনে হ'লেও সভ্য দেশে এই রোগীদের হাসির বস্তু কেউ মনে করে না। তোৎলামি সারিয়ে তুলতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কত সজাতি। তোৎলামি সেরে যার বৈজ্ঞানিক এবং মনোজাতিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে। রাজা যষ্ট জন্মের সিংহাসন লাভের পূর্বে এক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্তে বেশ কিছু দিনের জন্তে রাজপ্রাসাদে ছিলেন। রাজার তোৎলামি সারিয়ে একটা রাজকীয় উপাধি পান তিনি লাভ করেছিলেন। ডিমহেনিস্ মুখে পাথরের হুড়ি পুরে যে নিজের তোৎলামি সারিয়েছিলেন।

তোৎলামি শৈশবে ও কৈশোরে যতটা বেশী থাকে, বয়স হলে আবার অনেকের ক্রমে ক্রমে সেরেও যায়। একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, তোৎলামি মূর্খামি নয়, এক রকমের ব্যাধি তোৎলাকে দেখে হাসতে নেই, বরং সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে সভ্যতা। দা ভিকি ও ডার্বাইনের মত প্রতিভাবান যেহেতু ভুগছেন সে-রোগ যত্নের চিকিৎসায় উপশম হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন অর্থ আর ধৈর্য কত জনের আছে। যার অভাবে তোৎলা আমাদের কাছে এক হুরারোগ্য ব্যাধি হিসাবেই ধার্য্য হয়ে আছে। অথচ যার আরোগ্যের বহুবিধ পন্থা বিজ্ঞমান রয়েছে আবার চিকিৎসা পদ্ধতিতে।

## উড়িষ্যার গড়জাত রাজাদের অত্যাচার

এই সেদিনকার কথা। বড়লাট লর্ড উইলিংডন, লর্ড লিনলিথগো লৌহহস্তে ভারত শাসন করছিলেন। উড়িষ্যা এখন সাতাশ ভাগে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে ছাব্বিশটি দেশীয় রাজ্য। রাজারা ছিলেন খেচ্ছাচারী। ময়ূরভঞ্জ, পাটনা, কালাহাতি, চন্দপুর আর কেশুপুর—এই পাঁচটি বড় রাজ্যকে বাদ দিলে বাকী পঁচাত্তরটিতে শাসন-প্রণালী বলে কিছু ছিল না। রাজাদের সাধনা ছিল পলিটিক্যাল এজেন্টকে খুশী করা। এজেন্ট সাহেবকে হাতে ধরে রাজারা বীর-বিক্রমে নিরীহ প্রজাদের উপর অত্যাচার করে যেতেন। প্রজাদের তাঁরা মায়ূষ বলে ভাবতেন না। তাঁদের কাছে প্রজাদের জীবন বা সম্পত্তির কোনও মূল্য ছিল না।

রাজার ফার্সী বিজ্ঞানসহ ইতিহাস পড়েছেন—তাঁরা জানেন পোপ ফ্রেন্সিস হুইটলি। কু-শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ফার্সী রাজারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসে তাদের কাহিনী এখন হয়ে রয়েছে। অথচ তালচের প্রজা-আন্দোলন কাহিনী কেউ জানেন না। এরাপ্পেন থেকে বোমা আর মেশিন গান থেকে গোলা বর্ষণের সামনে যে সব অশিক্ষিত গ্রামবাসী বুক পেতে দাঁড়িয়েছিল—কোনোও বইএর পাতায় তাদের নাম পাওয়া যায় না। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা কাপুরুষের মত পালিয়ে যায়নি। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহের স্তূপ ব্রাহ্মণী নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া গেল। পৃথিবীর বুক থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তালচের রাজ্য আয়তনে খুব ছোট ছিল। মাত্র ৪০০ বর্গ-মাইল। লোকসংখ্যা মাত্র ৮৫,০০০। রাজ্যের রাজব ছিল এক গাংবো নোটে। অথচ রাজার আয় ছিল কলিয়ারী থেকে আয় ধার দিলেও প্রায় তিন লাখ টাকা। এ টাকা তিনি আদায় করতেন প্রজাদের শোষণ করে। যে টাকা দিতে অস্বীকার করত—রাজ্যে তার স্থান ছিল না। রাজার বিষ-নজরে কেউ পড়লে তাকে সবংশে ঠেট ছেড়ে পালাতে হতো। রাজা যে শুধু শোষণ করতেন, তা নয়। রাজ্যের মধ্যে তিনি লোকদের মাইনে দেওয়া ছাড়া টাকা খরচ করতেন না। প্রজাদের জন্তে তো নয়ই—নিজের জন্তেও নয়। অর্থাৎ রাজা আর রাজ-পরিবারের সমস্ত ব্যয় প্রজারা বোগাতো। শুধু তালচের নয়, ঢেকানাল, নীলগিরি প্রভৃতি রাজ্যেও প্রজাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। ঢেকানালে প্রজাদের উপর আরও বেশী নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হতো। এখানে ছিল রাজার একচ্ছত্র আধিপত্য। অত্যাচারের বিরুদ্ধে আরও প্রতিবাদ করবার সাহস ছিল না। করলেই জরিমানা দেয়া হতো। জেলে পাঠিয়ে রাজা অব্যাহত প্রজাদের শাসন করতেন। এ তো গেল রাজাদের কথা। তাঁদের ছেলে, ভাই বা আত্মীয়েরা কোনও অংশে কম যেতেন না। রাজার অফিসাররা ছিলেন এক একটি মূর্তিমান বম্বুত। রাজা ধরে আনতে বললে তারা বেঁধে আনতেন। রাজার তহবিল বাড়াতে পারলে রাজার প্রিয়পাত্র হতেন। তাঁদের সাত খন মাপ হতো।

গ্রামি আগাই বলেছি, রাজারা ঠেটের মধ্যে টাকা খরচ করতে চাইতেন না। রাজা, রাজ-পরিবারের সব কাজ প্রজারা 'বেঠি'তে অর্থাৎ বিনা মজুরীতে করে দিতে বাধ্য ছিল। রাজ্যের সাতাশটি প্রজারা তৈরী করত। চূণ পুড়িয়ে ইট করে বাড়ী-ঘর তৈরী করে দিত। রাজা একটি পয়সাও মজুরী দিতেন না। রাজা

## মুক্তিপথে

পবিত্রমোহন প্রদান

(উড়িষ্যার প্রচার ও প্রমতিভাগের মন্ত্রী)

আর রাজ-পরিবারের ক্ষেত-খামারে প্রজারা বিনা মজুরীতে কাজ করে দিয়ে আসত। নিজেদের ক্ষেতের কাজে গেলে যেনে তাঁদের ক্ষেতে ধান কাটা থেকে ধান বোনার কাজ করত। দশহরা আর অনিয়ার (ভাতের শুক্লা-খাদশী) সময় প্রত্যেক গ্রাম থেকে প্রজারা তালচের গড়ে যেত 'বেঠি' খাটবার জন্তে।

রাজা আর তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা প্রায়ই শিকারে যেতেন। কোনো ইংরেজ অফিসার (লিট সাহেব, রেসিডেন্ট বা পলিটিক্যাল এজেন্ট এসে ত কথাই নেই) এসে শিকারের ধুম পড়ে যেত। আগে থেকে রাজার তহবীলদারেরা শিকারের আয়োজন করতে ছুটতেন। জঙ্গলের রাস্তা বেঠিতে মেরামত করা হতো। ছোট ছোট নদী-নালায় উপর পোল করা হতো না—খরচ কমাবার জন্তে। 'সুতরাং' এক দল প্রজাকে ধরে আনা হতো—তারা শিকার পাঠির ট্রাক্, মোটর গাড়ী রৈলে-রৈলে পার করে দেবে। জঙ্গলের কাছাকাছি গ্রামগুলির লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম ফেলে দিনের পর দিন beat দিত। পলিটিক্যাল এজেন্ট বাহাদুর মাচা থেকে বাঘ হরিণ মেরে রাজার প্রশাসন সবুন্ধে রেসিডেন্ট সাহেবকে রিপোর্ট দিতেন; পাছে বাঘ মারলে পলিটিক্যাল এজেন্টের জন্তে বাঘ মজুর না থাকে, বা বুনো হাতী মারলে রাজার আয় কমে যায়—তাই প্রজাদের বাঘ, বুনো হাতী মারবার অধিকার ছিল না। বাঘ গ্রামের মধ্যে চুক প্রজাদের গাই-বলদ খেয়ে যেত। বুনো হাতী, হরিণ প্রজাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করত। কিন্তু প্রজাদের বিনা পারমিটে রিচার্জ জঙ্গলে যাবার অধিকার ছিল না। পাছে তারা কাঠ বেটে নেয় তাই এই ব্যবস্থা ছিল। রাজারা শীতকালে হাতী ধরে বিক্রী করতেন। তাই 'হাতীখেদা' বেঠি কাজে এক দল প্রজাকে শীতকালে জঙ্গলে পাড় খাকতে হতো।

ধরুন, রাজা বা বড় অফিসারেরা গন্তে যাবেন। আপনারা ভাবছেন—কি কত ব্যাপরায়ণ শাসক এরা। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে প্রজাদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। রাজা বা অফিসারেরা গ্রামে পৌঁছবার আগে গ্রামের সরবরাকারেরা (মোড়ুরা) চাল, ডাল, ঘি, দুধ, মাংস প্রজাদের কাছ থেকে ভোগাড় করে রাখত। একে বলা হতো রসদ। এক গ্রাম থেকে অল্প গ্রামে প্রজারা তাঁদের পালকীতে বসিয়ে নিয়ে যেত। তাঁদের জিনিসপত্র কাঁধে করে নিয়ে যেত। বলা বাহুল্য, এ জন্ত তাদের একটি পয়সা দেওয়া হতো না। এ কাজের নাম ছিল 'বেগারি'।

রাজার বত কাজ প্রজারা বিনা মজুরীতে করত—শুধু যে এই নিয়ম ছিল তা নয়। তাঁর সংসারের সব খরচ প্রজাদের বোগাতে হতো। প্রজারা রাজার গরু, মহিষ, হাতী, ঘোড়ার দানা বোগাবে। রাজবাড়ীর রান্নার জন্তে ছালানী কাঠ এনে দেবে। দশহরা আর অনিয়ার সময় দরবার হতো। গ্রামের সরবরাকারেরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে টাকা, পয়সা, চাল, ডাল, দুধ, দই সংগ্রহ করে রাজাকে 'ভেটি' (দর্শনী) দিয়ে আসত।

অল্প সময়ে বাজার-দরের প্রায় অর্ধেক নামে প্রজাদের রাজ্যকে ধান, চাল, ঘি, তেল, বিক্রী করতে হতো। একে বলা হতো কর-সামগ্রী। বাজারে কোন ভিনিষের নাম এক টাকা সেস হলে রাজা পাবেন দু' সেস হিসাবে। এই কর-সামগ্রী প্রত্যেক বর্ষিষ্ণু প্রজাকে দিতে হতো। প্রজার বাড়ী রাজ্যের এক প্রান্তে হলেও তার রেহাই ছিল না।

রাজার কোনও আত্মীয় মারা গেলে বা পৈতা, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মের সময় প্রজাদের 'মগন' বা ভিক্ষা-দ্রব্য দিতে হতো। ধান, তালচের গাছকুমারীর বিবাহ হবে। এক টাকা খাজনার উপর নিয়ন্ত্রিত হিসাবে 'মগন' আদায় করা হতো—খাট আনা পয়সা, দু' সেস সফ চাল, তিন সেস মোটা চাল, এক পোঁ ঘি ইত্যাদি। একশ' টাকা খাজনা হলে এর অতিরিক্ত একটা পাঁঠা দিতে হতো।

এ ত গেল 'বেঠি', 'বেগার', 'মগনের' কথা; এবার taxation' সম্বন্ধে লিখব। জমির খাজনা ছাড়া প্রজারা টাকায় এক এক আনা হিসাবে জঙ্গল-কর আর শিক্ষা-কর দিত। সংসারের নিত্য-ব্যবস্থায় জয়—যথা হুণ, কেরোসিন, পান, সুপুরি বিক্রী জঙ্কে লাইসেন্স দেওয়া হতো। আর লাইসেন্স—সেই শুণ ব্যবসার করতে পারবে। ব্যবসায়ীরা আবার ভিনিষের নাম বাড়িয়ে লোকদের কাছ থেকে লাইসেন্সের টাকা আদায় করে নিত। এ ছাড়া profession tax ছিল। ছুতোর, কুমোর, ধোবা, তেলিদের বার্ষিক কর দিতে হতো।

প্রজাদের জমির উপর কোন স্বত্ব ছিল না। তাদের জমির উপর গাজ কাটেতে গেলে ষ্টেটকে টাকা দিতে হতো। রাজা বা তাঁর পোষ্যবর্গের দরকার হলে প্রজাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। জমি বিক্রীর সময় ষ্টেটকে শতকরা পঁচিশ টাকা ফী দিতে হতো। খাজনা নিয়মিত না দিলে পেশাদারী মার-ধর করে আদায় করত।

অধিকাংশ রাজ্যে বিচারের নামে ব্যভিচার হতো। রাজার ছেলে ভাই আত্মীয়েরা ষ্টেটের অফিসার হতেন। বাগা অত্যাচার করতেন—তাঁরাই অত্যাচারের বিচার করতেন। আমলাদের মাইনে খুইই কম ছিল। তারা ঘুষ নেবে—এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল। ঘুষ না দিলে মকদ্দমায় জেতা সহজ ছিল না। এ ছাড়া অনেক ষ্টেট 'ধর্ম-আদালত' ছিল। এই আদালত লোকদের সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করত। বিবাহ, পৈতা প্রভৃতি সামাজিক তত্ত্বাধানে ষ্টেটকে ফী দিতে হতো।

এই রকম অত্যাচার, অত্যাচার আর শোষণের ফলে প্রজারা জলে-পুড়ে মরত। এ কেবল তালচেরে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রায় সকল ষ্টেটেই তল্লা-বিস্তার প্রজাদের উপর অত্যাচার করা হতো।

তালচের রাজ্যের এক ক্ষুদ্র গ্রামে আমার ওন্দ। আমার বাবা-জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছে। অতি কষ্টে লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলাম। প্রজাদের উপর রাজার অত্যাচার দেখে দেখে ধারণা হয়ে গিয়েছিল—এই বুঝি নিঃসম। এক শাসক আর তার মুষ্টিয়ে পোষ্যবর্গ হাজার হাজার প্রজাদের শোষণ করবে—তাদের বঞ্চিত করে নিজেদের ভোগ-বিলাসের উপাদান সংগ্রহ করবে। মনে হতো, প্রজাদের স্বাধীনতা বলে কিছু নেই—কিছু থাকতে পারে না।

কলেজে পড়বার জন্তে কটকে গেলাম। তখন আইন অমাত্ম আন্দোলন চলেছে পূর্ণবেগে। সেই উদ্বোধন দেখে উপলব্ধি করলাম—অত্যাচার করা যেমন অত্যাচার, অত্যাচার হুখ বুজ হুহু করে যাওয়াও তেমনিই অত্যাচার। বি-এ পাশ করে ষ্টেট ফিরে গিয়ে তালচের জ্বলের শিক্ষক হলাম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তালচের রাজার স্বৈরাচার উচ্ছেদের জন্তে এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করলাম। মুক্তিপথে আমার যাত্রা শুরু হলো।

## হাতীর দাঁতের দর ও কদর

কথায় বলে, মরা হাতী লাখ টাকা! মৃত হাতী যত না কাজে লাগে, মৃত্যুর পর তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ দেয় হাতী। হাতী লোকান্তরে যাত্রা করলেই তাকে মাটির তলায় পুতে ফেলা হয়। তার মানে হাতীকে কবর দেওয়া হয় না, বেশ কিছু দিন পরে মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয় হাতীকে। অর্থাৎ হাতীর কঙ্কালকে আর এই কঙ্কালের মূল্য জ্যাস্ত হাতীর চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী। সেই জন্তই 'মরা হাতী লাখ টাকা' কথাটির চলন আমাদের দেশে। হাতীর দাঁত এবং হাড়ের ভাস্কর্য সভ্য দেশের পরম আদরের বস্তু। একান্ত মহার্ঘ্য হলেও এই ভাস্কর্য দেশে এবং বিদেশে সবচেয়ে রক্ষিত হয় গৃহসজ্জার অঙ্গতম সম্পদ হিসাবে।

প্রস্তর, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তুলনায় হাতীর দাঁতই হ'ল ভাস্কর্যের সঠিক মাধ্যম। হাতীর দাঁতের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনস্বীকার্য। এর পরমায়ু হাজার হাজার বছরেরও অধিক। প্রস্তর কিংবা ব্রোঞ্জের কাজ সময়েই প্রভাবে বিনষ্ট হয়, কিন্তু হাতীর দাঁতের কাজ এক রকম অবিনশ্বর বলতে পারা যায়। হাতীর দাঁতের মুখাগ্র কঁপা এবং একেক জোড়া দাঁত পাঁচ থেকে

ছয় হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। হাতীর দাঁতের শিল্প সাধারণত ক্ষুদ্রাকারের হয়ে থাকে। এই শিল্পকার্যের প্রারম্ভ নয় থেকে একাদশ খৃষ্টাব্দে। ইউরোপে তেরো এবং চৌদ্দ শতাব্দীর হাতীর দাঁতের মূর্তি, বই এবং ছবি তৈরীর দেওয়াজ হয় যদিও এই শিল্পটি বিদেশীরাই হারাই কেবল মাত্র আদৃত হয়, কিংবা সে সব শিল্পী এই শিল্পটি প্রথম চালু করেন তাঁদের কারও না ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভারতবর্ষে দিল্লী, আগ্রা, নেপাল, এবং জয়পুরের হাতীর দাঁতে ভাস্কর্য্য পৃথিবীবিশ্বব্যাপ্ত। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাদের রাজপ্রাসাদে এই শিল্পটির কদর দেখলে চক্ষু সার্থক হয়ে যায়। বাঙলা দেশে অনেকের গৃহে হাতীর দাঁতের বহুবিধ সরঞ্জাম দৃষ্টিগোচর হয় বর্ধমান ও ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদেও হাতীর দাঁতের অনেকানেক মূল্যবান শিল্প সজ্জিত আছে।

হাতীর হাড় অনেক সময়ে দাঁত হিসাবে ব্যবসায়ীরা বিক্রয় করি থাকেন। অপাতদৃষ্টিতে হাড় এবং দাঁতের কাজ এক মনে হ'লে আসল দাঁতের কাজই অধিক মূল্যবান। ভারতবর্ষ থেকে এখ এই শিল্পকার্য্য বিদেশে রপ্তানী হয়।

উদয়নাথ ভট্টাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১২শ

শতাব্দী, বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিসিন্দা গ্রামে। মৃত্যু—  
কালীধামে। পিতা—বৃহস্পতি আচার্য। গ্রন্থ—কুসুমাজলি (ভ্রায়),  
কিরণাবলী, আশ্ববিবেক, কণাদসূত্রের টীকা, তাৎপৰ্যপরিণতি।

উদয়ননাথ ত্রিবেদী (কবীন্দ্র)—হিন্দী কবি। গ্রন্থ—রাম-  
কবিতা।

উদয়প্রভ সুরি—জৈন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুকৃত-কীৰ্ত্তি-কল্পোলিনী।

উদয়বীর গড়িন্—জৈন গ্রন্থকার। ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান।

গ্রন্থ—পদ্মসুন্দর।

উদয়র মহাদেব—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্যোতিষতত্ত্ব।

উজ্জ্বলকর ভারদ্বাজ—গ্রন্থকার। জন্ম—খানেশ্বর ৬ষ্ঠ শতাব্দী।  
গ্রন্থ—অজ্ঞানকর বর্জনের সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—আয়বাস্তিক।

উজ্জ্বলন—কবি। গ্রন্থ—কুবলয়মালা (প্রাকৃত ভাষায়—  
১১১ খৃঃ রচিত)।

উজ্জ্বলদাস—পদকর্তা। প্রকৃত নাম—কৃষ্ণকান্ত মজুমদার।  
নিবাস—মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দী মহকুমার টেঙ্গা গ্রামে। ইংরাজ  
রচিত বহু পদ প্রচলিত আছে।

উপতিয়া—বৌদ্ধভিক্ষু। গ্রন্থ—অনাগতবংস, বিমুক্তিমার্গ  
(পালি ভাষায়)।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার ও শিশুসাহিত্যিক।  
জন্ম—১২৭০ বঙ্গ ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে। মৃত্যু—১৩২২  
বঙ্গ। পিতা—কালীনাথ রায়। গ্রন্থ—ছেলেদেব রামায়ণ,  
ছেলেদেব মহাভারত, মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই। সম্পাদক—  
সন্দেশ (মাসিক, ১৩২১—১৩২৭)।

উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—সম্মার বিবাহ, দিগ্ভ্রষ্ট,  
সামোদয়ের বিশিষ্ট, সাংগঠিক নিধান।

উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রন্থকার। ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক।  
গ্রন্থ—চরিত্রাভিধান (১৮৩৩ খৃঃ)।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—  
ভাগলপুর। পিতা—মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। মাতা—মনো-  
মোহিনী। বি. এস। গ্রন্থ—শশিনাথ, অমূলতরু, নবগ্রন্থ,  
যমলা, রাজপথ, গিরিচাঁ, অন্তঃসং, দিক্শূল, অভিজ্ঞান, যৌতুক,  
দোনালী রং, নাস্তিক, বিদ্যুৎ ভাষা, আশাবরী, ছদ্মবেশী, স্মৃতিকথা।  
সম্পাদিত মাসিক পত্র—বিচিত্রা (১৩৩৪—১৩৪৭)।

উপেন্দ্রনাথ দাস—নাট্যকার। জন্ম—১২৫৫ বঙ্গ কলিকাতা।  
মৃত্যু—১৩০২ বঙ্গ শ্রাবণ। পিতা—শ্রীনাথ দাস। নাট্যগ্রন্থ—  
শব্দ-সরোজিনী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, দাসা ও আমি।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজনীতিবিদ ও গ্রন্থকার। জন্ম—  
চন্দননগর। বি. এ. পর্বত পাঠ, শিক্ষকতা, তৎপরে বোমার  
মামলায় বন্দী। গ্রন্থ—উনশকাশী, নির্বাসিতের আত্মকথা, পথের  
সন্ধান, স্বাধীন যামুয়া, সিনধিন, ধর্ম ও কর্ম (১৩২১), বর্তমান  
সমস্যা (১৩২৮), জাতের বিড়ম্বনা (১৩২৮), অনন্তানন্দের পত্র,  
বর্তমান জগৎ। সম্পাদক—আত্মশক্তি (সাপ্তাহিক—১৩২৮)।  
সম্পাদক—দৈনিক বঙ্গমতী (ইং ১৯৪৫—১৯৫০)।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—The law of  
limitation (ঢাকা, ১৮৩৪), মধুকর (১৮৭৫)।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাময়িকপত্র পরিচালক ও গ্রন্থকার।  
মৃত্যু ১৩২৫ বঙ্গ চৈত্র। পিতা—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্গমতী নামক

মা হি তা

সবিতা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশ্রীশ্রীকুমার ঘোষ

প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গমতীসাহিত্য  
মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সম্পাদিত গ্রন্থ—হিন্দু সমাজের ইতিহাস,  
১ম-২য় (১৯৩৩, পৃঃ ৬৩১), রাজভাষা, পাতঞ্জলদর্শন, কালিদাসের  
গ্রন্থাবলী (১৩০৮, পৃঃ ৬৪০), কথাসরিংগার (কমলকুমার  
মুখার্জী সহ), নাদবিন্দুপনিষৎ, ত্রৈলোক্যপনিষৎ, গর্ভোপ-  
নিষৎ, ত্রিযাগাশুবারিধি, ১ম-৩য় (১৩১৭), শঙ্করাচার্যের  
গ্রন্থমালা, তত্ত্বদার, মহানির্বাণতত্ত্ব, রামমোহন গ্রন্থমালা,  
প্রাণতোষবীতত্ত্ব, প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী, ১ম, ২য় (১৩০৪)  
প্রভৃতি।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চিকিৎসক ও গ্রন্থকার। শিক্ষা—  
এম. ডি। লে. কর্ণেল, আই. এম. এস। গ্রন্থ—A Dying Race,  
হিন্দুসমাজ।

উপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, রাজা—কবি। কাব্যগ্রন্থ—  
শ্রীরামবনবাস-কাব্য (বহরমপুর, ১৮৭০), বীরবলীকাব্য (কলি,  
১৮৭৩)।

উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—কাব্য-  
বৃত্তাকণ (ব্যঙ্গপত্রিকা, অর্ধসাপ্তাহিক—১৮৪৭ খৃঃ)।

উমাকান্ত ষ্টাটার—সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা—  
সমাচার জ্ঞানদর্পণ (সাপ্তাহিক—১৮৪৬), চন্দ্রোদয় (বারাণসী,  
সাপ্তাহিক ১৮৪১—১৮৫০), ভৈরবদণ্ড (সাপ্তাহিক—১৮৪১)।

উমাচরণ দে—গ্রন্থকার। নিবাস—বরাহনগর। গ্রন্থ—  
Domestic Medicine & Treatment of Diseases  
(১৮৭১)।

উমাচরণ ভট্ট—সাহিত্যিক। সম্পাদিত পত্রিকা—‘হিন্দুবন্ধু’  
(মাসিক—১৮৪৭ খৃঃ)।

উমাচরণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চাঁদার দরবেশ (১৮৫৪)  
গোলেবকাঙলী (১৮৫৪)। (ইনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের  
লেখক)।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, সদার—অধ্যাপক ও গ্রন্থকার। জন্ম—  
১৮৪১ খৃঃ, যশোহর। মৃত্যু—১৯০০ খৃঃ। অধ্যাপক, আগ্রা  
কলেজ, ঢোলপুরের রাণার আইডেট সেক্রেটারী, সদার উপাধি লাভ  
(১৮৯৮)। গ্রন্থ—কোমতের দর্শন, হিন্দী-ইংরেজি ব্যাকরণ।

উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—প্রচার  
(মাসিক ১২১১—১৩ বঙ্গাব্দ)।

উমা দেবী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—স্বাধীন, বাঙ্গালী জীবন,  
বাঙ্গালী জীবন, সনাতন পাকপ্রণালী, নীতিগল্পিকা। কাব্যগ্রন্থ  
—বাতায়ন, কাকলী।

উমানাথ গুপ্ত—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। জন্ম—১৮৩১ খৃঃ।  
মৃত্যু—১৯১৮ খৃঃ। সম্পাদক—সুভদ্রা সমাচার (পত্রিকা)।

উমাপতি—জ্যোতিষবিদ। গ্রন্থ—জ্যোতিষ রহস্যমালা (ত্রিংশতি ভটকৃত)-র টীকা।

উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বিজ্ঞান-পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—খুলনা জেলার সেনগতি গ্রামে। আইন ব্যবসায়—মৈমনসিংহ। গ্রন্থ—মানবের আদি জন্মভূমি, জাতিতত্ত্ববিধি, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ (বর্ধমান, ১৮৭৫), সম্পাদক—জারতি (১৩১৭-১৮)।

উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাংবাদিক। সম্পাদক—মনোহর (সাপ্তাহিক—১৮৬০ খৃঃ)।

উমেশচন্দ্র দত্ত—শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ, ২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিরপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৪ বঙ্গাব্দ ১১ই আষাঢ়, কলিকাতা। পিতা—হরমোহন দত্ত। শিক্ষা—প্রবেশিকা (ভবানীপুর লগুন মিশনারী), এফ. এ. বি. এ (১৮৬৭)। কর্মক্ষেত্র—প্রধান শিক্ষক, হরিনাভী স্কুল। ত্রাণার্থ গ্রন্থ। গ্রন্থ—বামনোত্তরবলী (কলিঃ ১৮৭২), জ্বলোক-দিগের বিজ্ঞান আবেশকতা (কলিঃ ১৮৭২)। সম্পাদক ও পরিচালক—বামনোত্তরবলী পত্রিকা (১২৭০—১৩১০ বঙ্গাব্দ)।

উমেশচন্দ্র বট্টাচার্য—সাহিত্যিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক। জন্ম—১৮৫২ খৃঃ ৬গঙ্গী জেলার রামনগর গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—দুর্গাচরণ বট্টাচার্য। এম. এ. পি. আর. এস (১৮৭৬)। কর্ম—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৭৭ খৃঃ), বিজ্ঞানসঙ্গার উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সাংখ্য-দর্শন, বেদ-প্রবেশিকা।

উমেশচন্দ্র বহু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নবীন দল্ল্যাসী, ১ম, ২য় (১৮৭৩)।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি (১৩৫১), ভারতদর্শনসার (১৩৫৬)।

উমেশচন্দ্র মিত্র—নাট্যকার। গ্রন্থ—বিধবা-বিবাহ (১৮৫৬ খৃঃ)।

উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষিচন্দ্রিকা ১ম (১৮৭১), গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৭৪)।

উল্লাসকর দত্ত—রাজনীতিবিদ। গ্রন্থ—কারাজীবনী, আমার কারাজীবনী।

উবট্টাচার্য—ভাষ্যকার। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দীতে কাম্বীরের আনন্দপুরে। পিতা—বজ্রট। গ্রন্থ—ষড়্বর্গ ও ঋকপ্রতিসাত্যের টীকা।

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থকার। জন্ম—কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী। গ্রন্থ—সপ্তস্বর (ক), পদ্মবাগ (ক), জয়ন্তী (প্র), হৃদীর দোকান (প্র), Homage to Lord Ganes, সম্পাদক—চতুর্দশ (১৩৩৪—৩৬), সারদা (১৩৩১)।

ঋষি দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শেক্সপীয়ার, বার্নার্ড শ, গাফী-চরিত, আবুল কালাম আজাদ, হু'য়ে হু'য়ে চায় (নাটক); অনূদিত গ্রন্থ—মহাত্মা গান্ধী (রোম)। রামকৃষ্ণের জীবন (রোম), জীবন প্রভাত (গর্কি) টেলিগ্রের স্মৃতি (গর্কি)।

একান্তনাথ অবধান সরস্বতী—আয়ুর্বেদবিদ। গ্রন্থ—আয়ুর্বেদসুধানিধি।

একনাথ বামী—গাধু ও ধর্মগ্রন্থ-অনুবাদক। জন্ম—১৬শ শতাব্দী মহারাজপুত্রে। অনুবাদ গ্রন্থ—রামায়ণ, ত্রিমস্তাগবত, ভগবদ্গীতা।

একরাম উদ্দীন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৃষ্ণকান্ত উইলে বস্কিমচন্দ্র নতুন মা, অনধিকার প্রবেশ, রবীন্দ্রপ্রতিভা।

এনায়েৎ হক—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম. এ., পি. এ. এ. ডি. অধ্যাপক। গ্রন্থ—আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সহ), বঙ্গ-লুফী প্রভাব (১৯১৫ খৃঃ ২৬০)।

এনায়েৎ উল্লাহ—গ্রন্থকার। জন্ম—রাণুর জেলার শ্রীতলাবাড়ী গ্রন্থ—ফকিরবিলাস।

এমদাদ আলি, সৈয়দ—গ্রন্থকার। জন্ম—মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা গ্রন্থ—ডালি (১৯১২), মাধবী বাবেয়া, পরগণার মহম্মদ সম্পাদক—নবম্বর (১৩১০—১২)।

ওহ্যাজেদ আলী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৯০ খৃঃ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৬গঙ্গী জেলার তালুকপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৯৫১। শিক্ষা—বি. এ. (আগিগড়), বি. এ. অনার্স (কেমব্রিজ), বারগ্যাটুল কর্ম—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৩ খৃঃ)। গ্রন্থ—মহামাহু মহম্মদ, গুলদস্তা, মাহিকের দরবার, দরবেশের দোয়া, ভাঙ্গা বাদি ভবিষ্যতের বাঙ্গালী।

ওয়ার্ড, উইলিয়াম—শ্রীরামপুরের মিশনারী। জন্ম—১৭৬৯ খৃঃ মৃত্যু—১৮২৭ খৃঃ। ১৭৯৯ খৃঃ-এ শ্রীরামপুরে আগমন। কেন্দ্রী মণ্ডিত মিসিভ হইয়া মিশন স্থাপন। গ্রন্থ—ইংরেজি ভাষা হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ক গ্রন্থ (১৮১১ খৃঃ কৃষ্ণদাস পালেন দোঃনী (১৮২৩)।

ওয়েলার, থোমাস, জে—মিশনারী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সর্গজি পুরাবৃত্তসার (১৮১৭ খৃঃ)।

ওয়েলার, থিওডর (Aufrecht, Theoder)—সংস্কৃত-শিক্ষাবিদ। জন্ম—১৮২২ খৃঃ সাইলেসিয়া (Silesia)। শিক্ষা—লিপিন এবং ইউরোপে, সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা। এডিনবর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৮৬২ খৃঃ)। গ্রন্থ—De accent compositorum Sanscriticorum (১৮৪৭), Halayudhi Abhidhanratnamala (১৮৬১), Die Hymnen de Rigweda (১৮৭৭), Blüten aus Hindostan (১৮৭৩), Das Aitareya Brahmana (১৮৭১), Catalogue c Sans. Mss. (Bodleian Library—১৮৫১-৬৪), Catalogue catalogorum (১৮১১-১৩)।

কটন, হেনরী (Sir Henry Cotton)—ভারত-হিঁতে সরকারী কর্মচারী। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ চী কমিশনার, আসাম (১৮৯৬—১৯০২)। জাতীয় মহাসভা সভাপতি (১৯০৪ খৃঃ)। গ্রন্থ—New India or India in Transition.

কণাদ—দার্শনিক পণ্ডিত। ১২শ শতাব্দীতে বর্তমান। প্রকৃত নাম—উলুক। গ্রন্থ—বৈশেষিক দর্শন। ইহা উলুক্যদর্শন না খ্যাত।

কণাদ তর্কবাগীশ—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান ববদীপে। গ্রন্থ—ভাষ্যরহস্য, আপনকবচনম্, মণিবাখ্যা (টীকা)। কনকলতা ঘোষ—মহিলা গ্রন্থকর্তা। গ্রন্থ—নূতন পঞ্চপাঞ্চজন্ত, পত্রলেখা।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। পিতা—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।  
গ্রন্থ—আবৃত্তি-মঞ্জুধা; মনোবোধের জীবন-স্মৃতি, মহামানব মহাত্মা  
গান্ধী।

কপিল—দার্শনিক মুনি। খৃঃপূঃ ৬৫০-৫৭৫ বর্তমান।  
গ্রন্থ—সংখ্যাদর্শন।

কমলকৃষ্ণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্তরঙ্গ-  
প্রদত্ত; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রদ্ধা সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি।

কমলকৃষ্ণ সিংহ, রাজা—শিকারী, সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম  
—১৮৩১ খৃঃ মৈমনসিংহের অন্তর্গত সুনন্দে। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ।  
পিতা—রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর (সুনন্দ)। গ্রন্থ—সঙ্গীত-  
শতক, তুর্ধতরঙ্গিনী (সেতার শিক্ষা), অমৃতত্ব, গোপালন, আশ্রয়।

কমলগোচর, দ্বিজ—প্রসিদ্ধ কবি। জন্ম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দীর  
শেষভাগে রাঙ্গপুর জেলায়। পিতা—সুহনাথ। গ্রন্থ—চণ্ডিকা-বিজয়।

কমলাকর—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে।  
গ্রন্থ—শিখাস্ততত্ত্ববিবেক, অপূর্ণভাবনোপপত্তি।

কমলাকর ভট্ট—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—খৃঃ ১৭শ শতাব্দীতে  
আরসাবাদের নিকটবর্তী পৈঠানপুরে (প্রতিষ্ঠাপুরে)। গ্রন্থ—  
নির্ণয়সিদ্ধি (স্মৃতিগ্রন্থ—১৬৯৪ খৃঃ)।

কমলাকর ভট্ট—স্মার্তপণ্ডিত। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বর্তমান।  
পিতা—রামকৃষ্ণ ভট্ট। গ্রন্থ—তত্ত্বকমলাকর, পূর্ত্ত কমলাকর।

কমলাকান্ত সার্বভৌম—ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দ্বিগঙ্গা  
রাজবংশম্।

করেঞ্জয়েসা চৌধুরাণী, নবাব—বঙ্গীয় মুসলমান কাব্য-রচয়িত্রী।  
ইনি ত্রিপুরার অমিদার। গ্রন্থ—রূপজালাল।

করিমুল্লা—গ্রন্থকার। জন্ম—সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী কোন  
গ্রামে। গ্রন্থ—হামিনোবাহাল।

করণাকান্ত ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শিল্পী ও বাণিজ্যসংস্থা,  
ডাকিনীমন্ত্র, দেববালা।

করণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গাব্দ।  
শান্তিপুর (নদীয়া)। কর্ম—প্রথম জীবনে সরকারী জুগে শিক্ষকতা।  
পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ছাত্রাবাসের  
পরিদর্শক। গ্রন্থ—প্রসাদী, স্বপ্নাঙ্গ, শান্তিঙ্গল, ধানহরী,  
বঙ্গমঙ্গল, শতনরী, (কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক); রবীন্দ্র আরাতি।  
সম্পাদক—শান্তিপুর (১৩৩৬—অমরনাথ প্রামাণিক সহ)।

কল্যাণরঞ্চিত—বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—৮২১ খৃষ্টাব্দে  
ইনি বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থ—সর্বত্র সিদ্ধিকারিকা, বাহ্যার্থ-  
নিষিদ্ধিকারিকা, স্তুতিপরীক্ষা, অগ্রাপোহবিচারকারিকা, ঈশ্বরভক্ত-  
কারিকা।

কবিচন্দ্র—প্রাচীন গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রত্নাবলী (১৬৩১ খৃঃ)।  
কবিচন্দ্র মিশ্র—কবি। ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরায়ের অগ্রজ।  
গ্রন্থ—দাতাকর্ণ, কলকলজ্ঞান।

কবিরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে  
বংগ জেলায় কয়তোয়া নদীতীরস্থ মহাধানের নিকট আরোড়া  
গ্রামে গ্রামে। পিতা—রাজবরুণ। গ্রন্থ—রসকনক (১৫২০ শকাব্দ),  
আবিষদ।

কবিকর্ণপুর—কবি ও পদকর্তা। জন্ম—১৫২৫ খৃঃ নদীয়া

জেলায় কাঁচড়াপাড়া। প্রকৃত নাম—পরমানন্দ দাস। শ্রীচৈতন্যদেব  
ইহাকে কর্ণপুর আখ্যা দেন। গ্রন্থ—চৈতন্যচরিত, অঙ্গদারকৌস্তভ,  
আর্যশতক, আনন্দব্রহ্মাবিনচম্পু, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, চৈতন্য-  
চন্দ্রোদয়।

কবিরাজ চক্রবর্তী—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। নিবাস কামরূপ,  
আসাম। গ্রন্থ—ভাষ্যতী।

কবিরাজ পণ্ডিত—অসমীয়া কবি। জন্ম—খৃঃ ১১শ  
শতাব্দীতে আসামে। অয়ন্তিরাজ কামদেবের সভাপণ্ডিত।  
কাব্যগ্রন্থ—রাঘবপাণ্ডবীয়।

কবিশেখর—বৈষ্ণব পদকর্তা। কাব্যগ্রন্থ—গোপালবিজয়।  
কবীন্দ্র—কবি। গ্রন্থ—গৌরকবিজয়, মীনকেনন।

কস্তুরীন্দ্র আয়ঙ্গার, এস—দেশকর্মী। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ  
দাক্ষিণাত্যের মিলাপুরে। মৃত্যু—১৯২৩ খৃঃ। পিতা শেষ  
আয়ঙ্গার। শিক্ষা—বি, এল। আইনজীবী। সম্পাদক—  
হিন্দু (মাসিক)।

কল্লণ—ঐতিহাসিক পণ্ডিত। জন্ম—খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে  
কাম্মীর। পিতা—চম্পক মিশ্র। গ্রন্থ—রাজতরঙ্গিনী (১১৪১ খৃঃ)।

কাউএল, ই, বি, (Edward Byles Cowell)—ইংরেজ  
গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২৬ খৃঃ। মৃত্যু—১৯০৩। অধ্যাপক,  
প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৬); অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ (১৮৫৮);  
অধ্যাপক, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৬৭)। এল, এল, ডি  
ও ডি সি এল উপাধি লাভ। সম্পাদিত গ্রন্থ—The Buddha-  
karita of Asvaghosh (১৮৯৩)।

কাকনমালা দেবী—গ্রন্থ-রচয়িত্রী। গ্রন্থ—গুহু, স্তবক,  
রসির ডায়েরী, শনির দশা।

কানাইলাল দে—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কিমিত্তি নিগুঞ্জি  
(chemistry—১৮৭১)।

কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মল্লোদরীর  
কর্ত্তব্য, রাজার জামাই, বক্ষ-প্রিয়া, নববোধের বৈষ্ণবী, বজ্রের  
গৃহিণী, দুর্গমের সঙ্গিনী, শিশির ও সুরেন্দ্রনাথ, দেওয়ানা রাণী,  
রতনে রতন (প্রহসন)।

কানিংহাম, অর, আলেকজান্ডার (Sir Alexander  
Cunningham)—জন্ম—১৮১৪ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ।  
ভারতে দৈনিক নিবাসের ইঞ্জিনিয়ার। গ্রন্থ—The Ancient  
Geography of India. The Buddhist Period,  
Corpus Inscriptionum Indicarum, The Stupa of  
Bharhat, The Book of Indian Eras, Mahabodhi.

কামাক্ষ্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আর্যগৃহ  
চিকিৎসা, মাতার প্রতি উপদেশ, প্রকৃতির কর্তব্য ও ধাত্রীশিক্ষা,  
শিশুপালন ও চিকিৎসা, স্ত্রীশিক্ষা, স্নানস্তান লাভের উপায়।

কামিনী রায়—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৬৪ খৃঃ। মৃত্যু—  
১৯৩৩ খৃঃ। পিতা—চণ্ডীচরণ সেন। স্বামী—সিবিলাসন  
কেন্দ্রনাথ রায়। বি-এ-এ (১৮৮৬ খৃঃ), শিক্ষয়িত্রী, বিটন  
কলেজ। 'জগদ্রাবীণী স্বর্ণপদক' লাভ। কাব্যগ্রন্থ—আলো ও ছায়া  
(১৮৭১ খৃঃ), দীপ ও বৃণ, পৌরাণিকী, অশোক সঙ্গীত (১৯১৪  
খৃঃ), জীবন-পথে, অথবা, ধর্মপুত্র (টলষ্টয়ের জীবনী), ডাঃ কুমারী

যামিনী সেনের জীবনী, গুণন, মালা ও নির্মালা, শ্রান্তিকী, সিতীমা, ঠাকুরমার চিঠি।

কায়কোবাদ সাহেব—মুসলমান কবি। জন্ম—১৮৬৩ খৃঃ, ঢাকা জেলা আগলা পূর্বপাড়া গ্রামে। গ্রন্থ—বিরহবিলাপ, কুসুম-কানন, অক্ষমালা, মহাশ্মশান।

কার্তিকচন্দ্র বসু, ভাষ্কর—চিকিৎসক। নিবাস—আমহাট্ট স্ট্রীট। শিক্ষা—এম. বি। সম্পাদক—Health & Happiness, বাহ্য-সমাচার (বাঙ্গালা ও হিন্দী)।

কার্তিকচন্দ্র রায়, দেওয়ান (চক্রবর্তী)—গ্রন্থকার। জন্ম—১২২৭ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগর দেওয়ান বংশে। মৃত্যু—১৮৮৫ খৃঃ। পিতা—উমাকান্ত রায়। কৃষ্ণনগরের মহারাজ ভৈরবচন্দ্রের দেওয়ান—(১২৮১ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থ—কিশোরবংশাবলী চরিত (১৮৭৫ খৃঃ), আত্মজীবন-চরিত, গীতমঞ্জরী।

কার্পেন্টার, মেরী (Miss Mary Carpenter)—ভারত হিতৈষিণী। জন্ম—১৮০৭ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। ভারতে চারি বার আগমন করেন। গ্রন্থ—Last days of Rammohun Ray (১৮৬৬ খৃঃ), Six months in India (১৮৬৮ খৃঃ)।

কালাচাঁদ দত্ত—সংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ সৌদামিনী (সাপ্তাহিক—১৮৩৮ খৃঃ)।

কালাচাঁদ পাল—পালা-রচয়িতা। নিবাস—বিরামপুর। যাত্রার পালা—কালিয় দমন।

কালিদাস—মহাকবি। পশ্চিম মালবের অধিবাসী। খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মালবধিপতি যশোধর্মদেবের সভার নবরত্নের প্রধান রত্ন। সম্ভবতঃ যশোধর্মদেবের উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। গ্রন্থ—অভি-জ্ঞান শকুন্তলম্, বিক্রমোর্ধ্বী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, পুষ্পাধিবিলাসম্, অশ্বতথোৎসব, শৃঙ্গাররসার্টিকম্।

কালিদাস—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—মনসামঙ্গল, শনির পাঁচালী (১১০৪ বঙ্গাব্দ)।

কালিদাস গণক—জ্যোতির্বিদ। জন্ম—১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—জ্যোতির্বিদ্যাকল্প।

কালিদাস গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি (কবিতায়—১৮৫৮)।

কালিদাস, বিজ্ঞ—পাঁচালীকার। গ্রন্থ—মুর্খব্রত।

কালিদাস নাথ—সাহিত্যিক। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গাব্দ। সম্পাদিত গ্রন্থ—নরোত্তমবিলাস, মহানন্দ পদাবলী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মহাভারত (কালীদাস), চৈতন্যসঙ্গম (জয়ানন্দ)।

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ বর্ধমান (সাপ্তাহিক—১৮৫০ খৃঃ)।

কালিদাস মালিক—হিন্দী গ্রন্থকার। ক্রীড়া পরিদর্শক সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ, বেনারস। হিন্দী গ্রন্থ—ভারত কী প্রাচীন বল্ক, একেসর রামমূর্তি ওর উৎকা ব্যায়াম, সরল ব্যায়াম।

কালিদাস মিত্র মুন্ডকী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিচারভরসিণী (১৮৬৮)।

কালিদাস মুখোপাধ্যায়—সঙ্গীত-রচয়িতা। গুরুকে কালি মিত্র। জন্ম—হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়া। মৃত্যু—১৮২০ খৃঃ। গ্রন্থ—গীতলহরী।

কালিদাস মৈত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—খগোল বিবরণ (১৮৬৮) সম্পাদক—সংবাদ-শশধর (সাপ্তাহিক—১৮৫২), অন্ততম সম্পাদক—জ্ঞানাক্ষোভ (মাসিক—১৮৫২ খৃঃ)।

কালিদাস রায়, কবিশেখর—কবি, সমালোচক ও গ্রন্থকার জন্ম—১২১৬ বঙ্গাব্দ বর্ধমান জেলার কড়ই গ্রামে। শিক্ষা—বি, এ গ্রন্থ—পূর্ণপুট, ১ম, ২য়, বঙ্গরী, গীতালহরী, ঋতুমঙ্গল, অকরো-কৃষ্ণকুঁড়া, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, কিশলয়, গীতিমঞ্জল, কুল-সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ১ম, ২য়, রসচক্র, অষ্টরত্না, কাব্যে শকুন্তলা, ব্র-বাংশরী, চৈতন্য, আহরণী, বৈকালী, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (সমালোচনা) প্রাচীন সাহিত্য (সমালোচনা), রামায়ণ (সম্পাদিত)।

কালীকমল চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—উপদেশাঙ্ক (১৮৬০)।

কালীকান্ত ভট্টাচার্য—সংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ-মুক্তাব (সাপ্তাহিক—১৮৪৮ খৃঃ)।

কালীকিশোর চক্রবর্তী—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—অপূর্ব কারাবা (Lady of the lake এর ছায়া অবলম্বনে), অপূর্ব সহবা-চিহ্নমালা।

কালীকিশোর চৌধুরী—গ্রন্থকার। নিবাস—বরিশাল। গ্রন্থ—বামরঞ্জন (১৮৭৫)।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্ম—হুগলীর হরিনা গ্রামে। অধ্যাপক, বিজ্ঞানাগর কলেজ। গ্রন্থ—বঙ্গের রত্নমাল বঙ্গের উপজ্ঞানসরত্ব।

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। নিবাস—শান্তিপুর। এ এ, বি এল। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—শান্তিপুর পরিচয়।

কালীকৃষ্ণ দেব, মহারাজা—অমুবাদক। অমুবাদ গ্রন্থ—রাসেল (জনসন-কৃত Rasselus গ্রন্থ—১৮৩৩ খৃঃ), গল্পমালা (Gay fables—১৮৩৬ খৃঃ—এই গ্রন্থ অমুবাদের জন্ম হুগলীর রাজ নিকট হইতে সর্বপদক প্রাপ্ত হন)।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২২ খৃঃ। সিমুলি কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৯১ খৃঃ বারাসাত। পিতা—শিবনারায়ণ মিত্র। শিক্ষা—হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজ। অতঃপর চিকিৎসা বিভাগ, অভ্যাসকৃতবিভাগ প্রভৃতি চর্চা করেন। গ্রন্থ—বিষবা-বিবা কুবিবিভা, শ্রোশিকা, মাদক-নিবারণ, গাহন্য ব্যবস্থা ও শিশু-চিকিৎসা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা (১৮৭২)।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী—ঐতিহাসিক। গ্রন্থ—রশিনারা (১২ বঙ্গাব্দ)।

কালীকুমার সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনের প্রতি উপ- (১৮৭২ খৃঃ)।

কালীচরণ অরিকারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কবিতাকলাপ (ঐরা পূর্ব, ১৮৭১)।

কালীচরণ চৌধুরী—সঙ্গীত-রচয়িতা। ইনি রংপুরের জমিদার গ্রন্থ—গীতমালা (১৮৪০ খৃঃ)।

কালীচরণ ভট্টাচার্য—কবি। গ্রন্থ—ঐরামচরিত (ইহা ভাটসি-জন্ম রচিত)।

কালীচরণ মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অন্নবধূর, বৃথিকা।

কালীচরণ সেন—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্ব

দ্বন্দ্ব, বিধবা-বিবাহ, দম্পতি-সংঘম, নিবেদন, বৈত, বিধবা-বিবাহ পরিশিষ্ট।

কালীনাথ ঘোষ—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক। নিবাস—চন্দ্রনগর (হুগলী)। গ্রন্থ—আত্মদান (নাটক), নামসুধা, অমৃতান-সঙ্গীত।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—পালা-রচয়িতা। পালা-গ্রন্থ—প্রহ্লাদ চরিত্র।

কালীপদ মুখোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ। গ্রন্থ—বাহুলীন-তত্ত্ব (Treatise on Violin—১৮৭৪)।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গাব্দ ভবানীপুর, কলিকাতা। মৃত্যু—১১০৭ খৃঃ। পিতা—রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদক—তিতবানী (পত্রিকা—১৩০১), Indian Union (এলাহাবাদ), Anti Christian Cosmopolitan, বঙ্গনিবাসী, হিন্দী তিতবানী, সাহিত্য-সংগীতা (১৩১১)। সহ-সম্পাদক—Hindu Patriot, Amrita Bazar Patrika. সম্পাদিত গ্রন্থ—বিভাগশক্তি (টীকা সমেত)।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিভাগসাগর—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১২৫০ বঙ্গাব্দ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের ভাঙ্গার গ্রামে। ইনি রায় বাহাদুর, সি, আই, ই এবং বিভাগসাগর উপাধি লাভ করেন। কণ্ঠ—ম্যানেজার, ভাণ্ডার এন্ট্রিট। গ্রন্থ—প্রভাতচিন্তা, নিশীথচিন্তা, নিভৃতচিন্তা, নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, ভক্তির জয়, ভাস্তিবিদ্যোদ, ছায়া-দর্শন, মা না মর্শাক্তি, প্রেমোদলহরী। সম্পাদক—‘বাহুব’ পত্রিকা (১২৮১—১৩১২)।

কালীপ্রসন্ন দত্ত—গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৬ বঙ্গাব্দ ২০এ আবাদ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চাঁওচা গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৮ বঙ্গাব্দ। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত। শিক্ষা—এন্ট্রান্স (বরিশাল স্কুল—১২৮১), এফ-এ, (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১২৮৩)। কর্ম—বিজ্ঞানী এন্ট্রিটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট (১২১৩-১৩০৮)। গ্রন্থ—দলিত কুসুম, বৃষ বৃদ্ধ। সম্পাদক—ভারত-সুহৃদ, ভারতবন্ধিক।

কালীপ্রসন্ন দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চুক্তির দাবী, হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞান, মহামুহূর্তে, ঘরের বউ।

কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ। গ্রন্থ—পুণ্য, রাজপুত-কাহিনী, রামায়ণের কথা, ভারত-নারী, লহর, হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞান, সরল চণ্ডী। সম্পাদক—মালক।

কালীপ্রসন্ন বিহারী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৃহৎসংকলনমালা ১—৪র্থ খণ্ড, অধ্যাপক রামায়ণ (১৮৭২), চন্দ্রহংস।

কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ঘণ্টামলের তাঁবেদারী।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬০ খৃঃ। বি. এ.। অধ্যাপক, হুগলী কলেজ। গ্রন্থ—নবাবী আমলে বাঙ্গালার ইতিহাস, সেকালের চিত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিশুবোধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, শিশুবোধ বাঙ্গালার ইতিহাস।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মধ্যযুগে বাঙ্গালা। ইংরাজি ব্রহ্মলিপি পদ্ধতি (১৮৬৭), জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭১)।

কালীপ্রসন্ন সরকার বর্মী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আর্ষ-কায়স্থ প্রতিভা (ত্রৈমাসিক—১৩১৫—১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—অনুবাদক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪১

খৃঃ কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ কর্মীদার বংশে। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। পিতা—নন্দলাল সিংহ। সাহিত্য-প্রচারের জন্য ইনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। গ্রন্থ—ভ্রমোদ প্যাচার নম্রা (১৮৬১ খৃঃ), নাটক—বিক্রমোৎসবী নাটক (১৮৫৭ খৃঃ), বাবু (নাটক ১৮৫৩), মালতী মাধব (১৮৫১), সাবিত্রী-সত্যবান্ নাটক (১৮৫৮)। অনূদিত গ্রন্থ—মহাভারত (১৭৮০—১৭৮৮ শক)। সম্পাদক—পরিদর্শক (দৈনিক—১৮৬২ খৃঃ), বিবিধার্থসংগ্রহ (১২৬৮ বঙ্গ)। পরিচালনা—হিন্দু পোর্ট ট্রাস্ট, বিজ্ঞান-সাহিত্য পত্রিকা (১৮৫৫ খৃঃ), সর্বতত্ত্বপ্রকাশিকা (মাসিক—১৮৫৬)।

কালীময় ঘটক—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৭ বঙ্গাব্দ রাণাঘাট, নদীয়া। মৃত্যু—১৩০৭ বঙ্গাব্দ। পিতা—চন্দ্রকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত। শিক্ষা—নর্মাল বিদ্যালয়। কর্ম—নানা বঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা। গ্রন্থ—চরিত্রাঙ্ক ১ম, ২য়, (১৮৭৪), ছিন্নমস্তা (উ), কৃষিবিদ্যা, কৃষি-প্রবেশ, শ্রবোজ্ঞ-জীবনী, মিত্রবিলাপ, পদ্মময় (১৮৭০), মেলা।

কালীময় বেদান্তবীরশ—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—গুরুশাস্ত্র, পাতিগুরুদর্শন, বেদান্তদর্শন, (১—৪ খণ্ড) সাংখ্যদর্শন, সাংখ্যানুক্রম, পরলোকবহন, জ্ঞানদর্শন, বেদান্তসার, আত্মব্রাহ্মণ। সম্পাদক—অঙ্কুর (১৩১৩-১৪)।

কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রাণী দুর্গাবতী, রাজার কথা।

কালীমোহন বসু—সাংবাদিক। জন্ম—১২৮৪ বঙ্গাব্দ ফরিদপুর জেলার রামনগর গ্রামে। মৃত্যু—১৩৪২ বঙ্গাব্দ। ইনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী। সম্পাদক—ফরিদপুর-তৈতরী, সম্মিলনী (পাক্ষিক—১৩২০)।

কালীমোহন বিদ্যাবাস—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—ডায়েরী-তত্ত্ব, বশীকরণ-তত্ত্ব।

কালীশঙ্কর দত্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—স্বাধীন-সুধাসিদ্ধ (সাপ্তাহিক—১৮৩৭ খৃঃ)।

কালীদাস মিত্র—সাংবাদিক। সম্পাদক—কাশীবার্তাপ্রকাশিকা (পাক্ষিক—১৮৫১ খৃঃ)।

কালীদাস মিত্র মুন্সুকী—গ্রন্থকার। জন্ম—সুখডিয়া (হুগলী)। মৃত্যু—কাশীধামে। পিতামহ—দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র মিত্র। কর্ম—এলাহাবাদ। গ্রন্থ—অজ্ঞানশলাকা, আত্মানুভূতি, কাশিকা, শক্তি-তত্ত্বসার, গুণ্ডলীলা, প্রায়গম্যহাস্য, বিবেকরত্নাবলী, বিচার দীপিকা, জ্ঞানবসায়ন, তত্ত্বপ্রকাশ, বিচারতরঙ্গিনী (১৮৬৮), প্রেমানন্দলহরী, সজ্জন-রঞ্জন, শঙ্করবিজয়ছয়ন্তী (১৮৭১)।

কালীনাথ তর্কপঞ্চানন—তাত্ত্বিক গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দক্ষিণাচার, তত্ত্বরাজ, ক্রমাসক্তোষ।

কালীনাথ তর্কপঞ্চানন—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্ঞানদর্শন, পুরুষপরীক্ষা, হিতোপদেশ, জ্ঞানচন্দ্রিকা, প্রবোধচন্দ্রিকা।

কালীনাথ তর্কপঞ্চানন—পণ্ডিত। মৃত্যু—১৮৫২ খৃঃ। সহকারী পণ্ডিত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। গ্রন্থ—পাণ্ডুলিপি (১৮২৩), বিধায়ক নিবেদকের সংবাদ (১৮১১), আত্মতত্ত্বকৌমুদী (১২২১ বঙ্গাব্দ)।

কালীনাথ দাসগুপ্ত, মুন্সী—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮০৮ খৃঃ



ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত বিদগ্রামে। মৃত্যু—১৮৮৬ খৃঃ।  
গ্রন্থ—শব্দদীপিকা, পঞ্চবটীতত্ত্ব, অবলাজ্ঞানদীপিকা, কঙ্কাপণ-  
বিনাশিকা।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—সঙ্গীত এবং ইংরেজি কবিতা-রচয়িতা।  
জন্ম—১২১৬ বঙ্গ খ্রিদিপুত্র, কলিকাতা। মৃত্যু—১২৮০ বঙ্গ  
ক্রমবাজার। পিতা—শিবপ্রসাদ ঘোষ। শিক্ষা—হিন্দু কলেজ।  
ইংরেজি রচনা—The Shair (সুজ্ঞ কাব্য); The Hindu  
Festival, The Poems, Memoirs of Indian Dynas-  
ties, Sketches of Ranjit Shing, Sketches of  
King Oudh, On Bengalee Poetry, On Bengalee  
works and writers, The Vision—a tale. সম্পাদক—  
The Hindu Intelligencer (সাপ্তাহিক পত্র—১৮৪৫—  
১৮৫৮ খৃঃ)।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—সংবাদপত্রসেবী। অন্ততম সম্পাদক—  
বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক—১৮৩২ খৃঃ)।

কাশীরাম দাস, দেব—কবি। জন্ম—১৬৫ বঙ্গাব্দ বর্ধমান  
জেলার কাটোয়ার নিকট সিঙ্গগ্রামে। পিতা—কমলাকান্ত দাস।  
গ্রন্থ—মহাভারত (পঞ্চাঙ্গবাদ—১০০০—১০১১ বঙ্গাব্দ), স্বপ্নপর্ব,  
জনপর্ব, নলোপাখ্যান।

কিরণচাঁদ দরবেশ—কবি। জন্ম—১৮৭৪ খৃঃ ফরিদপুর  
জেলার খালিয়া গ্রামে। ১৩১১ বঙ্গাব্দ সম্মাস-গ্রহণ এবং কাশীধামে  
বাস। গ্রন্থ—মন্দির (১১১৫), গানের খাতা (১১১৪),  
কাবেরী, জপজী (১১১৫), নামদ্রক্ষপুঞ্জশক্তি (১১০৪),  
সঙ্গীতমুখা (১১১৫), প্রথম শতক, দ্বিতীয় শতক, সাম-সঙ্ক্যাগাথা,  
বুদ্ধাবন-শতক, স্রসোমা, কুলসঙ্গীত।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—১৮৮৭ খৃঃ উত্তরপাড়া,  
হুগলী। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। শিক্ষা—এম, এ। অধ্যাপক।  
কাব্যগ্রন্থ—নতুন খাতা।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—সাহিত্যিক। জন্ম—১৮২২ খৃঃ মে  
মাসে। মৃত্যু—১৮৭৩ খৃঃ। পিতা—রামনারায়ণ মিত্র।  
শিক্ষা—হেয়ার সাহেবের স্কুল, হিন্দু কলেজ। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট  
ও ম্যাজিস্ট্রেট। গ্রন্থ—ধারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত।  
সম্পাদক—Indian Field.

কিথ—ইংরেজ গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮২০ খৃঃ),  
Keith's Bengali Grammar (১৮৫৪ খৃঃ)।

কুমারজীব—বৌদ্ধ ভিক্ষু। পিতা—কুমারায়ণ! মাতা—  
কুচারণকন্ডা জীবা। ইনি চীন সম্রাটের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন।  
মৃত্যু—৪০১ খৃঃ। চীনা ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—মহাপ্রজ্ঞা-  
পারমিতাসূত্র দশদশস্রিকা, বজ্রহৃদিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র,  
প্রজ্ঞাপারমিতাসম্বলসূত্র, বিমলকীর্তি, নির্দেশ, ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র,  
নৃসঙ্গমসূত্র, সূত্রালঙ্কার।

কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। নিবাস—বর্ধমান।  
গ্রন্থ—ঐক্যগবদগীতা (পঞ্চাঙ্গবাদ), বোগের বৈজ্ঞানিক আভাস,  
স্বধাকর গ্রন্থাবলী, বঙ্গাঙ্গনাগীতা, পৌরাজ গীতা।

কুমারস্বামী—টীকাকার। পিতা—প্রসিদ্ধ টীকাকার মন্নিষাণ।

জম্ম—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবীপুরে সম্ভবতঃ ১৫শ শতাব্দীতে।  
টীকাগ্রন্থ—রত্নাপণ (বিজ্ঞানার্থ প্রবীত প্রতাপ-বংশোদ্ভূত গ্রন্থের  
টীকা)।

কুমারস্বামী, এ, কে,—শিল্পবিশারদ ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—  
Message of the East (১৯০১), Mediaeval  
Sinhalese Art (১৯০১), Arts & Crafts of India &  
Ceylon (১৯১০), Selected Examples of Indian  
Art (১৯১০), Art & Swadeshi (১৯১২), Catalogue  
of Indian collections in museum of Fine Arts  
(বোম্বে, ১৯২৩), Dance of Siva (১৯২৪), Biblio-  
graphies of Indian Arts (১৯২৫), Viswakarma  
(১৯১২), History of Indian & Indonesian Art  
(১৯২৭), Rajput Paintings etc. (১৯১৬), The  
Indian craftman (১৯০১), Indian Drawings, 2 vols.  
(১৯১০—১২)।

কুমারিল ভট্ট—দার্শনিক আচার্য। জন্ম—৭ম শতাব্দীতে  
প্রাগজ্যোতিষপুরে (বর্তমান গোহাটীতে)। গ্রন্থ—তত্ত্ববর্তিক,  
শ্লোকবর্তিক, লঘুবর্তিক।

কুমুদনাথ চৌধুরী—ব্যবহারজীবী ও শিকারী। মৃত্যু—১৩৪০,  
চৈত্র। গ্রন্থ—কিলে জঙ্গলে শিকার।

কুমুদনাথ মল্লিক—গ্রন্থকার। জন্ম—রাণাঘাট। গ্রন্থ—  
নদীয়া-কাহিনী, খ্রীষ্টতত্ত্ব, হজরৎ মহম্মদ।

কুমুদবন্ধু সেন—সমালোচক ও গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গিরিশচন্দ্র ও  
নাট্যপ্রতিভা, রাজা রামমোহন রায় ও স্বাধীন ভারত।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—কবি। জন্ম—১৮৮২ খৃঃ বর্ধমান জেলার  
অন্তর্গত কোগ্রামের সন্নিকট বিখ্যাত বৈতরণ্যে। শিক্ষা—বি. এ.,  
কর্ম—প্রধান শিক্ষক, মাধবপুর হাই স্কুল। কাব্যগ্রন্থ—উজানী, বোধি,  
একতার, বনমল্লিকা, অজয়, নৃপ, শতদল, বজ্রনগদা, দ্বারাবতী,  
বনতুলসী।

কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। শিক্ষা—বি. এ., গ্রন্থ—  
ইষ্ট লীন, সিদ্ধিতত্ত্ব, সিদ্ধগৌরব।

কুমুদিনী বসু—গ্রন্থ রচয়িত্রী। পিতা—কৃষ্ণকুমার মিত্র।  
স্বামী—শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। শিক্ষা—বি. এ., গ্রন্থ—শিখের  
বলিদান, পঞ্চপুংগ, অমরেন্দ্র, জাহাজীরের আত্মজীবনী, মেরী  
কার্পেটর। সম্পাদিকা—সুপ্রভাত (১৩১৪—১৩২১), বঙ্গলক্ষ্মী  
(১৩৩২—৩৪)।

কুলদ্রাশাদ মল্লিক—গ্রন্থকার। ইনি কাশীধামে বাস  
করিতেন। শিক্ষা—বি. এ., ভাগবত উপাখ্যান। গ্রন্থ—নব্য যুগের  
সাধনা, ত্রীশ্লোকচরণে, ত্রীশ্লোকচরণে প্রসঙ্গ (১৯১৫)।

কুলদ্রাশঙ্কর রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেতালপঞ্চবিংশতি, কথা-  
সরিংসাগর, ওডিসিউস, অজ্ঞাতজগৎ, আশ্চর্য দ্বীপ।

কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বৈজ্ঞানিক জল-  
চিকিৎসা, দৈনন্দিন রোগের জলচিকিৎসা, কক্ষহারা, স্বামীর স্বপ্ন,  
পল্লীর আলো।

[ ক্রমশঃ ]

# রডোডেনড্রন

নির্মলকান্তি চক্রবর্তী

ফুল না কি প্রিয় হয় কবিদের কাছে  
এমনি কী সব কথা বইয়ে লেখা আছে ।  
আমি তো কবি-ই নই, অকবির সেরা,  
তবুও আমার কাছে প্রিয় পুষ্পেরা,  
সব চেয়ে প্রিয়তম একখানি হাতে  
নিশিগন্ধার দল তারাক্ষরা রাতে,  
হৃদয়ের প্রণয়ের শেষ সঞ্চয়  
আনন্দে সাঁপে দিয়ে গাহে জয় জয় ।

আধুনিক কৃষ্টির দৃষ্টির তলে  
জানি তারা লজ্জিত প্রীতি পলে পলে ।  
আমার তো মনে হয় কীকি ওইখানে ;  
তবে যারা দিতে জানে তারা শুধু জানে  
বাইরের সম্ভ্রাণী সবটুকু নয় ;  
তারও গভীরে থাকে শেষ পরিচয় ।  
নীলিম আকাশ সেখা হু'-একটি তারা  
অন্তরু জাগে কভু বুঝি দিশাহারা ।

অজ্ঞকের যা আমার বলবার কথা,  
ফুলেদের বটানীর নয় তবু তা ।  
শিল্পের মাধ্যমে পুষ্পের ভাষা  
কতটা প্রকাশ পায় তার-ই জিজ্ঞাসা ।

তুলি আর কাগজের মধ্যস্থতা  
কিছুটা করেই রুচ নকলের কথা ।  
তবু তার রঙ-টুকু শিল্পী মনের  
সেখানে পরশ থাকে আপন জনের ।

নকলের স্বকলে তো জগতের হাটে  
অনেকে কিনেছে নাম, তাতে দিন কাটে ।

আমিও যদ্যপানে চেয়ে চেয়ে দেখি  
অন্ধিক ফাঁকি তার, খানিকটা মেকী ।  
শক্তের ভক্তের মটল আসন,  
পাওয়ারের-টাওয়ারের শাসন-দ্রাসন,  
বিকল শিকল আর কুপাণের জয়  
চক্ষে মূঢ়তা হানে, হানে বিষয় ।

তবু তার পাশে দেখি বিদেহী এ ফুলে  
শাখায় শাখায় প্রাণ ওঠে হুলে হুলে,  
চিস্তের-বিস্তের কী আন্দোলন,—  
উদ্ধত রডোডেনড্রন ।

\* \* \*

তোমারও প্রাণের কিছু পেছ পরিচয়  
গভীর যেটুকু সে স্রগভীর নয় ।  
বিশাল কালজলধন হু'টি আঁখিতলে  
খঞ্জন-চঞ্চল হুইমী বলে,  
গুটপুটে হু'টি টোটে কলকল ধ্বনি  
কারণে ও অকারণে ওঠে গুল্লনৌ ।

ছাড়া পেলে হু'শো গজ লম্বাটে যেসে  
তোমারে জ্বিনিতে পায়ে হেন বীর কে সে !  
আত্মশাখারা বোঝে জ্যোতীর চৈলা  
কলি যুগে অবতার জীরামের চৈলা ।

হেন বীর অঙ্গনা কলকাতা এসে  
ভ্রম বনিয়া গেছ ভ্রমের দেশে ।  
তখী স্রগোল ছোট কোমরটি ঘিরে  
সর্পিলা শাড়ীখানি ওঠে বীরে বীরে ।  
বক্ষে লুটিয়ে পড়ে পৃষ্ঠে ও কাঁধে  
এলায়িত চুলগুলি বাধা পেয়ে কাঁধে,  
হাসি-ভরা কথাগুলি গীত-হৃদয়—  
তুমিই ফুলের দেশে রডোডেনড্রন ।

কাব্যের ছলে করি প্রেম নিবেদন,  
এমন ভ্রান্তি হলে হবে অকারণ,  
“ভালবাসি” হেন কথা কবিতার স্তরে  
বলতো অজীত কালে অবস্খীপুর্বে ।  
সেকালের বিকালের পড়ন্ত বোদে,  
লোভের রেণু যুগ্মে মাখিত অবোধে ।  
তোমরা যে আধুনিকা বিশ শতকের,  
তোমাদের প্রণয়ের বত হেরফের  
এটিসের চা-রসের স্রাকারিণে মিশে  
কটুতায় পটুতায় হারাহেছে দিশে ।

তবুও তোমার কাছে যেটুকু পেলেম  
তাই মণি-কাঞ্চন শতপল হেম ।  
চক্ষের চাহিনী ও স্রজের স্রুধা  
তাতেই মিটেছে মোর প্রণয়ের ক্ষুধা ।  
তার বেশী যদি থাকে ভাগ্যের দায়  
সে ধান নেব না কভু কুপা ভিক্ষায় ।  
আমিও যুবক জেনো বিশ শতকের  
আমার প্রণয় তাই স্বদেশী ফুলের  
কটক-কুচিত নম্রতা নয়,  
লজ্জার সম্ভ্রাণী ব্রত বিনয় ।

বলিষ্ঠ বক্ষের রক্তের শিরে  
ঝটিকার গতিবেগে যে হুঁরাশা ফিরে,  
মূঢ়তম চিন্তের দৃঢ়তম দাবী,  
যদি বা হারাই তার হুঁয়ারের চাবী  
তবু সেই তুচ্ছের সব শেষ গুচ্ছের  
প্রতীক যে জন,  
ফুটেছে সে বিশ্বের দূরতম পাহাড়ে—  
উদ্ধত রডোডেনড্রন ।

# হিন্দুদিগের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবী

ঐননীমাধব চৌধুরী

এ দেশের এক শ্রেণীর গবেষকের মতে হিন্দুদের লৌকিক দেব-দেবী দেশের অনার্য অধিবাসীদের ধর্ম হইতে গৃহীত। তাঁহাদের মতে হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম আর্য ও অনার্য কৃষ্টির সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহারা বলেন, অনার্য অধিবাসীদের নিকটে প্রাপ্ত দেব-দেবীকে কর্তৃত্ব গোত্র, কুল-শীলের সাহায্যে অপাঙ্কজের তরিতে পাণ্ডক্তের করিয়া বিত্তহীন হিন্দুকুলোদ্ভব বসিয়া হিন্দুরা দাবী করিয়াছে, এট দাবী ভিত্তিহীন।

হিন্দুদের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবী সম্বন্ধে এট সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবসর আছে কি না, এ প্রশ্ন কেহ হোলেন নাট। এখানে এট প্রশ্ন তোলা হইয়াছে। এট প্রশ্নে প্রথম বক্তব্য এট যে, এই সিদ্ধান্ত আমাদের গবেষকগণের স্বাধীন গবেষণা-প্রসূত সিদ্ধান্ত নহে, তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিয়াছেন এক শ্রেণীর যুরোপীয় পণ্ডিতের কাছে। দ্বিতীয় বক্তব্য এট যে, যে পক্ষে এ-সম্পর্কে তাঁহাদের গবেষণা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার মূল রচিয়াছে যুরোপীয় মতবাদের প্রেরণা ও প্রভাব।

এ দেশের বাসিন্দা যাহারা দুই-চারি দিনের জন্য পা দিয়াছেন কিংবা বাঙালদের সে অবকাশ হয় নাট, এমন যে সকল যুরোপীয় ও আমেরিকান ইণ্ডোলজিষ্ট আমাদের ধর্ম ও দেব-দেবী সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মোটামুটি মত এট যে, বর্তমান কালের হিন্দুধর্ম অনার্য জাতির ধর্মের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। বহু কাল এ দেশে বাস করিয়া সরকারী কায়েব কীকে যে সকল ইংরেজ পণ্ডিত ভারতবাসীর দেব-দেবী, ধর্মীয় ও সামাজিক অমুষ্ঠান, আচার, প্রথা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন তাঁহাদের মত এই যে, পৌরাণিক দেব-দেবী বাহাই হউন হিন্দুদের লৌকিক দেব-দেবী প্রাক-আর্যযুগের অনাধিদের ধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম কথার উপযুক্ত জিনিস যে কোন জাতির নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, তাহাতে অগৌরবের কিছু নাট। কিন্তু তাঁহাদের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হয়, গবেষণার নামে হিন্দুদের আর্ষত্বের দাবীকে যে দিক দিয়া হউক যতখানি পাওয়া যায় খোঁচা দিতে পারিলে তাঁহারা প্রজন্ম আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতেন। আরও দেখা যায়, যে সকল মত তাঁহারা প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন নাট, শুধু তাঁহাদের যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা অনাধিত সিদ্ধান্তটুকু প্রকাশ করিয়া আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। কৃতজ্ঞতাপাশে আমরাও কয়েক পুরুষ ধরিয়া মানিয়া আসিতেছি, শিব এক জন অনাধি দেবতা, দুর্গা ও কালী "bloodthirsty aboriginal goddess"-এর সভ্য-কৃত সংস্করণ, বৈদিক কবিরা গন্ধ খাইতেন সুতরাং "Cow-worship is foreign to the Rigvedic Aryans" ইত্যাদি।

আমাদের সুপীকৃত কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিয়া অবস্থার পরিবর্তন সাধনের সময় আসিয়াছে। কঠোর প্রমাণ ও স্বাধীন অমুদ্বাদনের দ্বারা এই পরিবর্তন আনিতে হইবে। আর্যদের ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তাঁহাদের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এই দলিল-পত্রের যুরোপীয় ভাষ্যকারদিগের নিকটে লজ্জা দায়ণীয় সমস্ত থাকিলে চলিবে না।

বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের লৌকিক ধর্ম ও দেব-দেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যুরোপীয় মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষা করা হইবে।

## লৌকিক ধর্ম কি

শাস্ত্রীয় আচার হইতে লোকচারের যে পার্থক্য, শাস্ত্রীয় বা পৌরাণিক ধর্ম হইতে লৌকিক ধর্মের সেই পার্থক্য সর্বদা রক্ষিত না হইলেও লৌকিক ধর্ম কি, বুদ্ধিতে অন্তর্বিধা হয় না। লৌকিক ধর্মের অমুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের দ্বারা শাসিত নহে, ইহা আমাদের একেবারে স্বায়ত্তা ব্যাপার। পুরাতন অভ্যাসক্রমে লৌকিক ধর্মের অমুষ্ঠানকে আয়ত্তা পুণ্ডিতদর্পণের গাথীর মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিয়াছি, সম্ভবতঃ মন্ত্ৰ, তাস, মুদ্রা আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এ সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে লৌকিক দেব-দেবীকে চিনিয়া লইতে কষ্ট হয় না। লৌকিক ধর্ম আমাদের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ধর্ম নহে, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনের ধর্ম।

ব্যক্তিগত, সমাজগত ও জাতিগত অনাচার সম্বন্ধে মানুষ যে কতখানি ব্যর্থিক জীব, লৌকিক ধর্মের আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। শুধু দেব-দেবী মতে, পশু-পক্ষী, সর্প-স্বপ, বৃক্ষ, জড়বস্তুকে মানুষ নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য পূজা দিতে প্রস্তুত। লৌকিক ধর্মের অব্যবহিত দ্বার মন্দিরে বাজ-দেবতা কালু রায়, দক্ষিণ রায় আসিয়াছেন, সর্প-দেবতা মনসা আসিয়াছেন, গন্ধ-বাহিনী শীতলা আসিয়াছেন, ওলাবিবি, ঘেঁটু, ভিটাকুমা, বনহুগী আসিয়াছেন, নানা সম্ভার ও নামে বস্ত্রী আসিয়াছেন, সমুদ্রের মঙ্গলদায়িনী বৃক্ষবাসিনী রূপেশ্বরী আসিয়াছেন, প্রস্তরখণ্ডে অধিষ্ঠিতা মঙ্গলচণ্ডী আসিয়াছেন। কৃষিপ্রাণ পল্লী-কেন্দ্রিক অনাধিদের জীবনকে উৎসব-মুগ্ধ করিতে আসিয়াছে কত ব্রত-পার্বণ। এই সকল ব্রত-পার্বণও দেবতার নাম লইয়া করা হয়। তাঁহাদের কেহ ক্ষেত্রদেবতা, কেহ জলদেবতা, কেহ বনদেবতা, কেহ মৌজাগায়ায়িনী, মঙ্গলবিধায়িনী দেবতা।

দেবতার মত অপদেবতার পূজাও লৌকিক ধর্মের অঙ্গ। অপদেবতাদের সংখ্যা যেমন তাঁহাদের অনিষ্ট করিবার শক্তিও তেমন। সংসারের সুখ, বাহ্য, নিরাপত্তার জন্য তাঁহাদের তুষ্ট করা অবশ্য প্রয়োজন।

দেবতা ও অপদেবতা, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ ও জড়বস্তুর উপাসনা লইয়া, ব্রত-পার্বণ লইয়া আমাদের লৌকিক ধর্ম চলিতেছে—যেমন চলিতেছে আমাদের শাস্ত্রীয় ধর্ম ও বৈদিক সংস্কার পালন।

## লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি

লৌকিক দেব-দেবী বলিতে প্রাচীন দেবতাদের সহিত অপাঙ্কজের গোত্র, কুল-শীলহীন যে সকল স্বায়ত্তা দেব-দেবীর উপাসনা করা হয় তাঁহাদের বুঝায়। ইহাদের অনেকের অবস্থা উষ্মদের দ্বারা পথে, ঘাটে, মাঠে, বৃক্ষতলে ব্রত-তন্ত্র একটু দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থান মাত্র পাইয়াছেন। কাহারও মাথার উপরে

সামগ্র্য আচ্ছাদন আছে, কাহারও তাড়াও ভোটে নাই। কাহারও প্রতিমা আছে কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডে মৃত্তিকা-পিণ্ডে, মাটির ঘটে, বৃক্ষপত্রবে অধিষ্ঠিত, কেহ বা আল্পিনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন। পূজার উপকরণের, সময়ের, পুরোহিতের সম্বন্ধে কোন কড়াকড়ি নিয়ম নাই, অভিজ্ঞাত দেব-দেবীর উপেক্ষিত এই সকল লৌকিক দেব-দেবীরা কিন্তু ভক্ত সমাজের আপন জন। তাঁহাদের পূজার আড়ম্বর না থাকিলেও প্রাণের স্পর্শ আছে।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিরোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-বেদনা জানাইবার জ্ঞান হাতের কাছে দেবতাকে পাইবার ইচ্ছা হইতে লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত মানুষের দৈনন্দিন কর্মে দেবতার সহায়তা ও বিপদে আশ্রয় পাইবার ইচ্ছা হইতে নতুন নতুন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে।

সংসারে মানুষের ভয়ের, ভাবনার বস্তু কত। আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয়, সর্পের ভয়, হিংস্র পশুর ভয়, ব্যাধির আক্রমণের ভয়, ঈর্ষণপরায়ণ, কুচক্রী শত্রুর ভয়, ব্যর্থ পরিশ্রমের হতাশার ভয় সাংসারিক মানুষকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখে। কৃষক ভাতার কৃষিকার্ষে ও ব্যবসায়ী ব্যবসারে সফলতা প্রত্যাশা করে, গৃহস্থ গৃহের মঙ্গল, পুত্র-বক্সা লাভ, কর্মে সফলতা, সংসারের সুখি প্রত্যাশা করে। সকলেই বরাভয়দাতা, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন দেবতাকে হাতের কাছে পাইতে চাহে। তাহাকে সাহায্য করিবার জ্ঞান আছে দেবতাকে পাইবার আগ্রহ হইতে নতুন নতুন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষের প্রাণের স্বতন্ত্র আনন্দ জানাইবার প্রয়োজনে, গ্রাম্য সরল মানুষের অলৌকিক অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণতার ফলে, কখনও বা শুধু খেয়াল হইতে অথবা কোন কোন লোকের ব্যবসায়-বুদ্ধি হইতেও লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়। খেয়াল হইতে লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

উত্তর-বিহারের কোন কোন অঞ্চলে চেলওয়া গোঁসাই নামে এক দেবতার উপাসনা প্রচলিত আছে। রাস্তার ধারে এক চাকড় মাটির স্তূপ হইতেছেন এই দেবতা। ভক্তমান পথচারী যাইবার সময়ে অর্ঘ্যস্বরূপ এক চাকড় মাটি দেবতাকে নিবেদন করিয়া প্রণাম জানাইয়া চলিয়া যায়। দেবতা ভুট্ট হইয়া পথিককে পথের আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করেন। মুরশিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে এক দেবীকে দেখা যায়। তাঁহাকে চেলওয়া গোঁসাইজির নিকট-আত্মীয় বলা যায়। দেবীর নাম চেলাই চণ্ডী। বৃক্ষমূলে সুপীড়িত মাটির ঢোলা হইতেছেন এই দেবী। পথচারী ভক্ত সেই পথে যাইবার সময়ে নতুন একটা মাটির ঢোলা দেবীকে নিবেদন করিয়া চলিয়া যান। উত্তর প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে চেলওয়া গোঁসাই হইয়াছেন চেলওয়া পীর। উড়িষ্যার জাজপুর অঞ্চলে ইহাকে দেখা যায় চেলাই সাধুরূপে।

### দেব-দেবীর সৃষ্টি-প্রকরণ ; বৃক্ষ, পশু ও জড়বস্তুর উপাসনা-তত্ত্ব

আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর সৃষ্টির ব্যাপারে যে প্রাণালী অনুসৃত হইয়াছে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টির ব্যাপারেও অনেক জায়গায় সেই প্রাণালী অনুসরণ করা হইয়াছে। এই প্রাণালীর ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

আমাদের দেব-দেবীর ইতিহাস সম্বন্ধে বৈদিক যুগের আগের কথা জানা নাই। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে কতের মধ্যে দশা মার্ক। পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদে কতের কল্পনার একশ পদ্যসংখ্যায় অথবা বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশ দেখা যায় যে, যথেষ্ট পৃথক দেবতার মিলনে ঋগ্বেদীয় কতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত বলা অপরিহার্য হইয়া উঠে। এই ব্যাপারটিকে তাঁহারি বলেন সিনক্রিটিজম (Syncretism)। কতের সঙ্গে মিলিত এই সকল পৃথক দেবতাদের নাম ও গুণ কত্রে আরোপিত হইয়াছে। কখন এই দেবতারি আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব লইয়া বর্তমান জিনে এবং কি কারণে তাঁহারি কতের মধ্যে বিলুপ্ত হইলেন তাহা জানবার উপায় নাই। এই সিনক্রিটিজম প্রণালীর কাছ যে ঋগ্বেদের পরেও কিছু কাল চলিয়াছিল বজ্রবর্ষের শতকৃত্যর স্তোত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের বজ্রবর্ষী, কোপনবর্ষাব, সংহাবকারী কত শতকৃত্যর স্তোত্রে হইয়াছেন স্বর্ণানচারী, বঙ্গলধারী ভিক্ষুক, তন্ত্রদিগের দেবতা। কতের চরিত্রে পরবর্তী কালে আরও নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য আসিয়াছে।

সে যাহা হউক, সিনক্রিটিজমের অধ্যায় বৈদিক যুগেই এক রকম শেষ হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যায় যে, সিনক্রিটিক দেবতা হইতে আবার নতুন নতুন দেবতার উৎপত্তি হইতেছে। অর্থাৎ এক জন প্রধান দেবতার চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্যের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করিয়া পৃথক দেবতার সৃষ্টি হইতেছে। অবতারবাদ গৃহীত হইবার পর হইতে এই ভাবে নতুন নতুন দেবতার উৎপত্তি সহজ হইয়া আসিল। দেব-দেবীর সৃষ্টির ইতিহাসে সিনক্রিটিজমের পরের অধ্যায় বিশ্লেষণ এবং তার পরের অব্যয় অবতারবাদ। অবতারবাদের কল্যাণে ক্রম-কুসংলগ্ন নবাবগত দেবতারাও প্রধান দেবতা-দেব অংশ-অবতাররূপে প্রাচীন দেবসমাজে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

দেবসৃষ্টি প্রকরণের একটি অধ্যায় জড়বস্তুকে অলৌকিক শক্তির আধার জ্ঞানে পূজা করা। এই জিনিসটিকে আমরা ঘুরাইয়া অজ্ঞ ভাষায় বলি দেবতার প্রতীক বা অধিষ্ঠান-স্বত্ব জ্ঞানে পূজা। ইহা আসলে ফেটিসিজম। এই জড়বস্তু উপাসনা মানুষের অসভ্য বা অর্ধসভ্য অবস্থার পরিচায়ক নহে; সকল দেশের সভ্য, অসভ্য মানুষের মধ্যে কোন না কোনরূপে এই জিনিষ রহিয়াছে। জড়বস্তুকে পৌরাণিক দেব-দেবীর আশ্রয় জ্ঞানে উপাসনা করিবার রীতি আমাদের ধর্মে রহিয়াছে। ইহা ফেটিসিজম হইলেও অনাধারের নিকটে গৃহীত নহে, তাহা পথে দেখা বাইবে। জড়বস্তুকে অলৌকিক শক্তি আরোপ করিবার প্রবৃত্তি হইতে নতুন নতুন লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হইয়াছে।

দেব-সৃষ্টি প্রকরণের অজ্ঞ দুইটি অধ্যায় পশু ও বৃক্ষ উপাসনা। পশু কখনও দেবতার বাহনরূপে, কখনও দেবতা পশুর মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করেন বলিয়া পূজা পায়। ভয় হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য হিংস্র পশুর ও সর্পের মত সরীসৃপের তুষ্টি সাধন করা হয়। বৃক্ষ ও ওষধি মানুষের প্রথম উপকারী। কখনও দেবতার অধিষ্ঠান-স্থানরূপে, কখনও অলৌকিক শক্তির অধিকারী-রূপে বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়।

দেব-সৃষ্টি প্রকরণের শেষ অধ্যায় মানুষে দেবত্ব আরোপ (deification of human beings)। দেবতা উপাস্ত, মানুষ উপাসক, কিন্তু মানুষেরও দেবত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্বে

তপস্যা বা অসাধারণ পুণ্য কর্মের ফলে মানুষের দেবত্ব-প্রাপ্তি ঘটিত। অবতারবান প্রচারিত হইবার পরে মানুষের দেবত্ব অর্জন অনেকপাশি সহজ ব্যাপার হইয়া আসিল।

### লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি প্রকরণ

মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে নচে, তাহার দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হয়। তাহা হইলেও উপরে নূতন দেবতার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে প্রণালীর কথা বলা হইল, লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টিও ব্যাপারে সেই প্রণালী মোটামুটি অল্পস্বত হয় এবং লৌকিক ধর্মে বৃক্ষ, পশু ও জড়বস্তুর উপাসনায় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই প্রণালীর মধ্যে অবতারবাদের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হইতেছে।

পৌরাণিক যুগে নূতন দেবতা সৃষ্টির অধ্যায় এক বকম শেষ হইয়া গেলেও যেমন অবতাররূপে মানুষের মধ্যে দেবতার আবির্ভাব এখনও আমাদের সমাজে বহু হয় নাই, তেমনি আমাদের প্রয়োজনে সৃষ্ট নূতন লৌকিক দেব-দেবীকে প্রাচীন দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত করিবার আগ্রহের অভাব নাই। সমাজে বৈদ্যিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে নিম্নস্তরের মানুষের যেমন উচ্চতর স্তরের মধ্যমালা লাভ হইয়া থাকে, প্রাচীন দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে অপাঙ্কতের লৌকিক দেব-দেবীকে তেমনি অবতারবাদের সাহায্যে নূতন মর্যাদা দিয়া তাঁহাদিগকে পাঙ্কতের করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহারূপে অনাধি দেবতাকে হিন্দু বানাইবার প্রসঙ্গ নাই, ইহা সাধারণ ব্যাপার। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

বহু লৌকিক দেবীকে দুর্গার বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এই নাম দিবার তাৎপর্য এই যে, লোকে স্বীকার করুক, ঈশ্বরী স্রীদুর্গার বংশ বটেন। বাংলায় দেবীর চণ্ডী এবং বিহারে ও উত্তর প্রদেশে দেবীর ভবানী নাম সমাধিক প্রচলিত। বাংলার মঙ্গলচণ্ডী ও ওলাইচণ্ডীর নাম পরিচিত। এক জন গ্রামাধিপতি দেবী, অল্প জন ওলাউটা-মারীভয়নিবারনী দেবী। চণ্ডী উপাধি-ধারিণী আরও অনেকগুলি লৌকিক দেবীর পূজা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কয়েকটি নামকরা হইতেছে—বসনচণ্ডী, পাতাল চণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, ধরচণ্ডী, খলচণ্ডী, ককাই চণ্ডী, বেতাই চণ্ডী, অবাচ চণ্ডী, কলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী ইত্যাদি। ইহাদের কেহ বিশেষ বিশেষ রোগ দূর করেন, কেহ ক্ষতের ফল বৃদ্ধি করেন, কেহ পশুপাল রক্ষা করেন, কেহ শিশুদের গ্রন্থ শাস্তি করেন, কেহ শত্রুকে জয় করেন; কাহারও বৈশিষ্ট্য—তাঁহার আবাস-স্থান বেত্রকুণ্ডের মধ্যে।

বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই শ্রেণীর দেবীদিগকে ভবানী উপাধি-দ্বিয়া জাতিতে উঠাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তাঁহাদের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইতেছে—আমিনা ভবানী, জটিয়া ভবানী, বেতী ভবানী, ভুঁইয়া ভবানী, বর্ণ ভবানী, বন্দী ভবানী, ফুলমতী ভবানী, অঙ্গারমতী ভবানী ইত্যাদি। দুর্গা উপাধিধারিণী অনেকগুলি লৌকিক দেবীর সাক্ষ্য পাওয়া যায়; বধা—আধদুর্গা, বনদুর্গা, পানদুর্গা, গুপ্তদুর্গা, কাব্যদুর্গা, আলদুর্গা ইত্যাদি। এই উপাধিগুলি ছাড়া ঠাকুরানী, মাতা বা মায়ী, রানী, ঈশ্বরী বা দেবী উপাধি-ধারিণী লৌকিক দেবীদিগকেও দেবীর সঙ্গে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। দক্ষিণ-ভারতের লৌকিক দেবীগণের সাধারণ উপাধি আম্মা; বধা—পূজাআম্মা, মারীআম্মা, দুর্গাআম্মা, এল্লাআম্মা।

ইত্যাদি। বাবা, গোসাই, ঠাকুর উপাধিধারী লৌকিক দেবতাদিগের অনেকে মহাদেবের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়।

### লৌকিক দেব-দেবীর বিবরণ সংগ্রহ

পল্লীকেন্দ্রিক ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মজীবনের বড় একটি চিত্তাকর্ষক বৈশিষ্ট্য লৌকিক দেব-দেবীর পূজা। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য লৌকিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। অনেক পূজা আবার অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

এক সময়ে এ দেশের অধিবাসীদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, লৌকিক দেব-দেবী ও ব্রত-পার্বণের বিবরণ সংগ্রহ করিবার দিকে ঈশ্বরাজের কোঁক গিয়েছিল। ডালটন, রিজলে, ক্রুফ, বাসেল, থার্সটন, বিশপ হোয়াইটহেড বিভিন্ন প্রদেশের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই চেষ্টা হাট্টার করিয়াছেন, গেজেটরিয়ারের লেখকগণ বিভিন্ন জেলার বিবরণ কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন।

এই সকল বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ফল একত্র মিলাইয়া নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলন করা সম্ভব। ভারত-বর্ষের অধিবাসীদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মসাধনা ও কৃষ্টির পরিচয় জানিবার পক্ষে, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের দৃষ্টিভঙ্গীর ও কৃষ্টিগত মৌলিক ঐক্যের পরিচয় পাইবার পক্ষে এইরূপ গ্রন্থ একখানি মূল্যবান দলিল হইবে। উত্তমশীল, পরিশ্রমী, বিচক্ষণ গবেষকগণকে বিভিন্ন রাজ্য-সরকার অর্থ সাহায্য করিয়া এই কাৰ্যে নিযুক্ত করিতে পারেন।

এইবার আমাদের লৌকিক দেব-দেবী অনাথদের নিকট গ্রহীত—এই যুগোপায় মতবাদের আলোচনা করা হইতেছে।

প্রবন্ধের প্রথমে বলা হইয়াছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে অলৌকিক শক্তির সাহায্য পাইবার ইচ্ছা হইতে লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রয়োজনের মধ্যে আর্থ-অনার্থ ভেদ নাই। লৌকিক দেব-দেবীর উপাসনা বৈদিক ও জ্যোতিষিক যুগে ছিল, এখনও আছে এবং নূতন লৌকিক দেব-দেবীর সৃষ্টি হইতেছে। বৈদিক যুগে প্রস্তরযুগে দেবত্ব আরোপ করিতেন 'সোম' দেবত্বের সহায়ক হিসাবে, মৃত্তিকার যজ্ঞ বেদীতে দেবত্ব আরোপ করিতেন পবিত্র যজ্ঞায়ির আধাররূপে ভক্তিমান হিন্দু বিশেষ আকৃতির প্রস্তরযুগে দেবত্ব আরোপ করেন শি বা নারায়ণের প্রতীকরূপে, অনাধি আদিবাসী ভূশ্রোষিত কাঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ডকে পূজা করে মহাদেব, ঠাকুরানী মায়ী বা সুরজনারায় জ্ঞানে। এই তিন প্রকারের উপাসনায় পূজার উপচারের পার্থক্য থাকিলেও উপাসকের মনোবৃত্তির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

এখানে বৈদিক যুগের লৌকিক ধর্ম ও লৌকিক দেব-দেবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনা হইতে জানিতে পারা যাইবে, লৌকিক দেব-দেবীর পূজা আর্থ জাতির অপরিচিত ছিল না। দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজনে বৈদিক যুগে নূতন নূতন লৌকিক দেব-দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আরও জানা যাইবে, যে পশু, সপ বৃক্ষ ও জড় উপাসনা অনাধি কৃষ্টির সংমিশ্রণে উচ্চতর হিন্দুদে লৌকিক ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হয়, তাহা বৈদিক যুগে বিশেষ পদ্ধিচিত ছিল। আরও জানা যাইবে যে, হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের ধারা বৈদিক যুগ হইতে অব্যাহত রহিয়াছে।

# রসায়ন-শিল্পের ক্রমোন্নতি

বিংশ শতাব্দীর মাঝ-পথে এসে, '৪৭ সালের ১৫ই আগস্টকে

প্রায় চার বছর পিছুনে রেখে এসেও আজ এ কথা বলা চলে যে, ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ! Poverty in the midst of plenty এই dictumটা যেন একটা শাশ্বত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। কোন দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য যাকিছু প্রয়োজন, যাকিছু অপরিহার্য সবই রয়েছে আমাদের দেশে, নেই শুধু উন্নতিটা। দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায়, তা হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রাকৃতিক সম্পদে আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ নয়, প্রকৃতি দেবী দেখাননি আমাদের প্রতি খুব বেশী কর্পণ্য। আর জনশক্তির কথা উল্লেখ নাট বা করগাম। তবে আমাদের দেশের শিল্পবৃদ্ধি বা শিল্পপুঞ্জির অবস্থা শুধু যে শোচনীয় তাই নয়, ভয়াবহও বটে। পুঁজি ও সক্রিয় সাহায্য দিয়ে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে চালু রাখার জন্যে ক'টা আর টাটা-বিড়লা খুঁজে পাওয়া যায়! সরকারের অর্থনৈতিক ও অজ্ঞাত সাহায্যে শিল্প-বাণিজ্যকে গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে কিছু কিছু, ভাবিকালে এর সফল আশা করা যায়। অতীতের কোনো বনিকাবানা তুলে দেখলে দেখা যায় যে, বহু বিফল অবস্থার মধ্য দিয়েও কিছু কিছু শিল্প-প্রচেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছিল ও হচ্ছে আর নবনব উদ্যমে শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টাও চলছে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, উপযুক্ত পুঁজি, শ্রম ও বুদ্ধির সক্রিয় সাহায্য পেলে আমাদের ভারতবর্ষ বিশ্বের অগ্রতম শিল্প-প্রধান দেশে পরিণত হতে পারে।

আজকেব দিনের সন্ধ্যাবেলা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হলে দ্রুত শিল্পোন্নতি ছাড়া আর কোন পথই নেই। শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে যাতে ক'রে অধিক মাত্রায় জিনিষপত্র প্রস্তুত হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে তবে আর সেট সম্ভব যাতে আরও নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান শুরু করা যায় সেই দিকে সচেষ্ট হ'তে হবে দেশের সরকারকে ও পুঁজিপতিদের। আমাদের বর্তমান অবস্থায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ক'রে আমাদের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ঠিক মত সদ্যবহার হয় আর সেই সঙ্গে আমাদের কার্যকারিতা ঠিক পথে চালনার দিকেও সচেষ্ট হতে হবে। এই রকম সূনিয়ন্ত্রিত পথে চলতে পারলে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়তার আশা নিকট থেকে নিকটতর হয়ে আসবে দিন-দিন।

আজকের পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশের সাধারণ শিল্পপ্রসার খুবই কম হয়েছে, আর রাসায়নিক শিল্পের কথা চিন্তা করলে আমাদের অবস্থা সাগরের কাছে গোপ্পদের পর্যায়েরও পড়েনা। বেশীর ভাগ শিল্পের প্রচার ও প্রসার নির্ভর করে রাসায়নিক দ্রব্য-সামগ্রীর উপর, তাই রাসায়নিক শিল্পকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা আজকের দিনের Talk of the day হয়ে ঠাঁড়িয়েছে। অথের কথা, আশার কথা এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার আজ করবে বড়ব হল রাসায়নিক শিল্পকে গড়ে তোলা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন ও উঠছেন। সরকারের পক্ষ থেকে অনেকগুলো 'প্ল্যান' ও 'স্কীম' করা হয়েছে ও হচ্ছে, এইগুলোকে কার্যকরী ক'রে তুলতে পারলে দেশের বহু প্রয়োজন মিটেবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই প্ল্যানগুলোর একটা খসড়া দেওয়া গেল :

ঔষধপত্র—একটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তি ক'রে



## শ্রী অমলকুমার বসু-দ্বারা

বোম্বাইএর সন্নিহিত পেনিসিলিন তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। এই কারখানাতে সাধারণতঃ ১২০০ বিজিৎ ইউনিট ক'রেই তৈরী হবে, তবে প্রয়োজনের সময় ৩৬০০ বিলিয়ন ইউনিট সরবরাহ করারও সুবন্দোবস্ত থাকবে। শুধু তাই নয়, এই কারখানায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক ঔষধাদি ও সালফা-ড্রাগ প্রস্তুতিও চলবে। বঙ্গার নবায়িত প্রতিরোধক প্যাঙ্গা গ্রামাটিনো অ্যান্টিসেপ্টিক গ্র্যানিড প্রস্তুতির জন্যেও একটা বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। গ্র্যানিটিক গ্র্যানিড ও গ্র্যানিটিক গ্র্যানাইডাইড প্রস্তুতির জন্যে তিনটে প্রতিষ্ঠানকে অগ্রমতি দেওয়া হয়েছে এবং কাজ শুরু হবে অচিরেই। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩০০০ টন ক'রে সরবরাহ করা হবে, ভারতের বর্তমান প্রয়োজনের কিছু বেশী।

শিল্প সাক্ষাৎ বিদ্যোদয়—একটা বিলাতী প্রতিষ্ঠান এ-সম্বন্ধে সুবিধা-অসুবিধাগুলো ভাল ভাবে গবেষণা ক'রে দেখেছেন এবং এঁদের দেওয়া 'স্কীম'টা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

কৃত্রিম জ্বালানী তৈল—ভারতীয় কয়লা থেকে কৃত্রিম তৈল তৈরী সম্ভব কি না, এই নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটা মার্কিন প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ১৯৪৮-এর মে মাসে। তারা একটা সূচিস্থিত ও সূনিয়ন্ত্রিত খসড়া দিয়ে গেছেন। ইত্যাবসরে এই কৃত্রিম তৈল নিয়ে কতকগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চলছে এবং ফলাফল খুবই আশাবহিত। বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রতি বছরে প্রয়োজন হয় ১৮০০ লক্ষ গ্যালন বান-বাহন চালানার পেট্রল; ৬৬,০০০ টন কেরোসিন; ৩০,০০০ টন বিভিন্ন রকম ডিসেল তৈল; ৫৩,০০০ টন চুল্লীর তৈল আর আমাদের এখানে প্রস্তুত হয় ১৫০ লক্ষ গ্যালন বানবাহন পেট্রল; ৪,০০০ টন কেরোসিন আর প্রায় ৪,০০০ টন বিভিন্ন প্রকারের ডিসেল তৈল। অর্থাৎ "শিল্পী দূরন্ত!"

রজন-শিল্প—দামোদরের আশে পাশে রজন-শিল্প-প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্যে কিছু জার্মান বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

কিনোল—আজকের প্রাক্টিক্স যুগে কিনোল একটা অপরিহার্য সামগ্রী। বর্তমানে কেবল মাত্র একটা কারখানাতেই কিনোল-ফরমালডিহাইড রেসিন তৈরী হচ্ছে। একটা মার্কিন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে আর একটা খোলার চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশ এখন প্রায় ৪২টা প্রাক্টিক্স কারখানা চলছে—যাতে প্রয়োজন হয় প্রায় ৩,০০০ টন প্রাইসিউরিন এবং আরও নানান রকম ছাঁচের পাউডার।

প্রাইউড—এই শিল্পের চাহিদা মিটতে পারে প্রাক্টিক্স শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে। বর্তমানে প্রায় ১৪টা প্রতিষ্ঠান এই প্রাইউড তৈরী করছে, বার মধ্যে চা-সরবরাহের জন্যে প্রায় ৮০০ লক্ষ বর্গ ফুট লাগে আর অজ্ঞাত কাজের জন্যে ২০০ লক্ষ বর্গ ফুট।

কাঁচা ফিল্ম—সিনেমা প্রচারের দিক থেকে ভারতবর্ষের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। অর্থাৎ কাঁচা ফিল্মের প্রয়োজনীয়তা আমাদের কত বেশী সেটা আর স্পষ্ট ক'বে বলার দরকার নেই। এই বিষয়ে ৭৮টা মণ্ডলু প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সাহায্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব না বরং আশা করা যাচ্ছে।

এ্যামোনিয়াম সালফেট—আজকের “ফসল বাড়িও” এ্যামোনিয়াম সালফেটের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী আর এ হিসেবে এ্যামোনিয়াম সালফেটের চাহিদা দিন-দিন বেড়েই চলেছে বই কমবে না। মতীশ্বর ও দিবাকর সারের চুটো চালু কারখানা রয়েছে। মতীশ্বর থেকে বছরে ৬,০০০ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যায় আর দিবাকর থেকে ৫০,০০০ টন। সিনস্রিতে একটা বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এটা শুধু প্রাচ্য নয়, পৃথিবীর সব কোণে বড় সারের কারখানা হবে সম্পূর্ণ চলে পর। এখান থেকে বছরে প্রায় ৩৬০,০০০ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যাবে; এর কাজ কিছু কিছু সুরক হ'য়েছে এবং যত ক্ষীণ পূর্বোক্তনে সুরক হতে পারে ততটী ভাল। এ ছাড়া কোক-স্টোন গ্যাস থেকে বছরে প্রায় ১০,০০০ টন ক'বে এ্যামোনিয়াম সালফেট পাওয়া যেতে পারে।

ইস্পাত—যে কোন শিল্পের পক্ষে ইস্পাত একটা অপরিহার্য সামগ্রী। যুদ্ধোৎসাহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৫-এর হিসেবে আমাদের ইস্পাতের প্রয়োজনীয়তা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টন; কিন্তু তখন আমাদের উৎপাদন ছিল ১২ লক্ষ টন। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ানোর জল্পনা চেষ্টা চলছে।

সিমেন্ট—আমাদের বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ টন সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। মনে হচ্ছে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আরও ২০ লক্ষ টনের চাহিদা বেড়ে যাবে। চলতি বছরের মধ্যে অন্ততঃ ৩৫ লক্ষ টন সিমেন্ট তৈরী ক'রতে হবে।

কাগজ—৫৬৫০০ টন ক'বে কাগজের প্রয়োজন হয় আমাদের বিভিন্ন কাগজে আর চলতি বছরের মধ্যেই সেটা তৈরী চেষ্টা চলছে।

সাবান—প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের দেশে সাবান শিল্পের সুরক হয়। সেট সময় বছরে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ হস্তর সাবান বিদেশ থেকে আসত। দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বেই এই হিসেবে নেমে আসে প্রায় ৪২০০ হস্তর। ঐ সময় আমাদের দেশে প্রায় ৬০,০০০ টন সাবান তৈরী হয়েছিল। এখন বছরে প্রায় ১২,০০০ টন ক'বে ‘গায়ে-মাথা’ সাবান এবং ৪০,০০০ টন ক'বে ‘কাপড়-কাচা’ সাবান তৈরী হচ্ছে। বাক্যের বিনোদী সাবান একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে বই শিল্পের আরও উন্নতির চেষ্টা চলছে।

বেরন—গ্যাসিটেট বেরন শিল্পের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানের কাজ সুরক হয়ে গেছে এবং আরও দু'টো কাজ খুব তাড়াতাড়ি সুরক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

রবার—প্রাকৃতিক রবার আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় প্রায় ১৮,০০০ টন, কিন্তু রবারের কারখানাগুলোতে প্রয়োজন হয় প্রায় ২২,০০০ টন। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যসত্তার প্রায় তিন কোটি টাকার আমদানী হয় প্রতি বছরে। তবে এগুলো আমাদের দেশে তৈরী করার খুবই চেষ্টা চলছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরই কিছু কিছু রাসায়নিক শিল্প সুরক হয়েছিল আমাদের দেশের বুকে। ১৯২১ সালে প্রায় ১৪০টা কারখানা ছিল, আর তাতে লোক খাতিত প্রায় ২৫০০ জন। ১৯৩১ সালে কারখানার সংখ্যা কাঁড়ায় ৩৮ আর শ্রমিকের সংখ্যা ৮০০০। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০০টা কারখানা চলছে আর তাতে লোক কাজ করছে প্রায় ২৫,০০০ জন।

বর্তমানে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন নিম্নোক্ত ভাবেই চলছে:—সালফিউরিক এ্যাসিড—১৫০,০০০ টন; সূপার ফসফেট—১০,০০০ টন; এ্যামোনিয়াম সালফেট—৫৬,০০০ টন; বাইক্লোমেট—৩০০০ টন; সোডিয়াম কার্বোনেট—৫৪,০০০ টন; কৃত্রিক সোডা—১৮,৫০০ টন; স্লিচি পাউডার—৫.১৬০ টন আর ব্রোমাইড—২০০ টন। ১৯১০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বিদেশকে প্রায় ৪০০ লক্ষ টন উচ্চাঙ্গের ম্যাগনিজ সরবরাহ করেছি। আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের অভাব, ফোমাইট, সিলিম্যানাইট, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং সেগুলোকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল থেকে উজ্জলতর হবে ক্রমশঃই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ আজকের অবস্থায় আমাদের সৃষ্টিস্থিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলাই একমাত্র পথ।

এই তো গেল আমাদের ‘প্ল্যান’ ও ‘স্কীম’। তবে সব সময়েই আমাদের কারখানাগুলোতে বেশী উৎপাদন করার দিকেই নজর রাখতে হবে, অল্প শ্রমিকদের চোখের জলের বিনিময়ে নয়। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া চাই গভীর, গাণ্ডীজীর আদর্শ মত। মহাস্বাভাবী পুঁজিপতিদের প্রতি নির্দেশ আজ আকাশ-কুসুম। আজকে এখানে ভূখা মিছিলের চোখের জলের আড়ালে পাকিয়ে উঠতে থাকে “বিড়লা বাড়ীর রহস্য”। How long, Lord! How long!

## যন্ত্র-বিজ্ঞানী মানুষ

শ্রীমদকুমার সেন

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নত বিকাশোন্মুখ। এই উদ্ভূততাই মানুষকে প্রেরণা দেয় অজানাকে জানিবার, অনধিকৃতকে অধিকৃত করিবার, অনাবিকৃতকে আবিষ্কৃত করিবার পথে। বস্তুতঃ ইহাই ইহাতেছে জ্ঞানানুশীলন বা সভ্যতা। এই সভ্যতার গতিপথে মানুষ নিজেকে বৃহত্তর পরিধিতে প্রসারিত করিয়াছে, বৃহত্তর মানব-সমাজের সঙ্গে তাহার যে নিগূঢ় ঐক্য-সম্বন্ধ তাহাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পাইরাছে। মানুষের এই জ্ঞানানুশীলন বা গতিশীল সভ্যতার অতীত মানব-সমাজে শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিধান, বিশ্বজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা। চর্চাযুগ বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব ও দ্রুতগামী বাস্তবিক জীবন মানব-সভ্যতা ও মানুষের কর্ম প্রচেষ্টার মূলগত আদর্শকে কেবলই দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। সভ্যতার নামে অসভ্যতার একটা নিদারুণ ভাস্কি আজ মানব-সমাজে শাস্তির পরিবর্তে অশান্তি, সমাজের পরিবর্তে অসমাজ এবং বিকাশের পরিবর্তে বিনাশকেই কার্যে করিতে চলিয়াছে। স্ট্রীট পরিবর্তে অনাস্থাই ইহাছে আজিকার এই নূতন বাস্তবিক সভ্যতার উপজীব্য।

তাই দেখা যায়, একটা সর্বপ্রসারী পাণচক্রের আবর্তে সমগ্র পৃথিবী ঘূর্ণপাক পাইতেছে এবং শ্রেণীগত ও জাতিগত বিশ্বেষের মুখে দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সভ্যতার নামে একটা পোষাকী বর্বরতা আজ মানব-সমাজকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। ইহার শেষ কোথায়? ইহা হইতে বাঁচিবার পথই বা কোথায়?

এক অনির্দেশ্য ও দুজ্জের্য শক্তির প্রেরণায় বিশ্বপ্রকৃতি কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকৃতির ধনসম্পদ ও জ্ঞানসম্ভারকে আহরণ করা, অধিগত করা, মানুষের জীবনের উপযোগিকরূপে রূপান্তরিত করিয়া তোলা মূলতঃ ইহাই সভ্যতার স্বভাব-ধর্ম। সুতরাং যে পরিমাণে মানুষের এই সভ্যতা বা জ্ঞানামূলীন প্রকৃতিসম্মত, ঠিক সেই পরিমাণেই উহা বিজ্ঞানসম্মত ও খাঁটি। এই সহজ স্বাভাবিক পথকে অগ্রাহ্য করিয়া অনাস্থ্যের মস্তভায় আজ মানুষ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া অপ্রাকৃত কর্ত্তের অন্ধ আবেগে ছুটিয়া চলার মধ্যে যে মাদকতা আছে আজ তাহাই মানুষকে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ ও আদর্শহীন করিয়া ফেলিয়াছে, আর পরিণামে আনিয়াছে অজ্ঞানতা, দুঃসহ শোষণ, শ্রেণী-সংঘাত, ধ্বংস-বিধ্বং ও ভীতিবিহ্বলতা। ইহাদের কোনটিই যে সভ্যতা বা শাস্তি-সমৃদ্ধির অমূল নহে তাহা বলা বাজল্য মাত্র। আশু প্রয়োজন ও দৈনন্দিন অভাব পূরণই মানুষের কর্ত্তপ্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য নয়। আসল ও অন্তিম লক্ষ্য হইতেছে কর্ত্তের দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করা, ব্যক্তিগত ও মনুষ্যত্বকে সূর্য্য করা এবং এই ভাবে ব্যক্তিসম্পন্ন ও সুখী মানুষের সাহায্যে বর্ধাৎ সমৃদ্ধিশালী ও গতিশীল জগৎ গড়িয়া তোলা। সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ত্তনীতিতে কি আজ এই আদর্শের কোন হৃদয় আমরা পাইতেছি? ব্যক্তির যোগানে মানুষের মত বাঁচিবার সুযোগ নাই, সেখানে রাষ্ট্র ও সমাজের সমৃদ্ধি তথা বিশ্বের শান্তিপ্ৰয়াস কি নিছক প্রহসন বলিয়াই বোধ হয় না?

আমরা আতর্ষ্য গ্রহণ করি—ক্ষুদ্রবৃত্তি বা বসনা-বোঁচন উহার আশু লক্ষ্য হইলেও অন্তিম লক্ষ্য হইতেছে দেহের শক্তি ও স্বাস্থ্যের সমৃদ্ধি। অন্তিমের এই অভ্যুত্থানে অগ্রাহ্য করিলে উদর-পূরণ একটি নিরর্থক কর্ত্তে পর্য্যবসিত হয়। গৃহীত খাদ্য দেহের অভাব পূরণ করে, উহাকে মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী করে। আর্থিক জগৎও মানুষের যাবতীয় কর্ত্তদায়ক সম্বন্ধে এক কথা সত্য ও সমান ভাবে প্রযোজ্য। বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থায় বহুল পরিমাণে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদন হইলেই সেই ব্যবস্থাকে সার্থক ও সভ্যতাসম্মত বলা যায় না—যদি উহা ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজ এবং রাষ্ট্রের সমতা বিধানে সহায়ক না হয়। শিল্পবিপ্লবগত ‘বৃগাস্তকারী’ উৎপাদন-প্রণালী ও যন্ত্র-যন্ত্র ব্যক্তি ও সমাজের এই মৌলিক আদর্শকে অতলে তলাইয়া দিয়া মুষ্টিমের ব্যক্তির স্বার্থকে উচাইয়া ধরিয়াছে। মানুষ কী চাহিয়াছিল, কী সে পাইয়াছে?

হুই-একটি উদাহরণ দিয়া আরও স্পষ্ট ভাবে অবস্থাটা বুঝানো যাইতেছে : মানুষের আহার্য খাদ্যশস্ত্র, ডিম, দুধ ও ফল-মূল প্রভৃতিতে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রচুর খাদ্যপ্রাণ সঞ্চিত আছে। চাউলের কথাই ধরা যাক্—খোসা বা ‘তুবে’র মধ্যে চাউল আবৃত থাকে। এই আবরণ ছাড়াইয়া চাউল বাহির করিয়া লইয়া উহা অন্নরূপে ভোজন করাই প্রাকৃতিক বিধি। এই চাউল এমন সব পুষ্টিকর উপাদান

আছে যাহা সহজেই পোকা-মাকড়ের জ্ঞানশক্তিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং যখন যেমন প্রয়োজন চাউল ভানিয়া লইয়া অবশিষ্টটা ধানরূপে রক্ষা করাই স্বাভাবিক নিয়ম। একমাত্র এই নিয়ম অমূল্যবর্ণ করিলেই চাউলের প্রকৃত উপকারিতা আমরা পাই, উহার বর্ধাৎ সম্ভাবনার হয়। কিন্তু আজ কি হইতেছে? যন্ত্র-বিজ্ঞানের কল্যাণে দ্রুত ঢেঁকির পাট উঠিয়া যাইয়া চাউলের কল দেশের সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। ব্যবসায়িক স্বার্থে চাউল-কলের মালিক একসঙ্গে সহস্র সহস্র মণ চাউল ভানে এবং উহাকে গোলায় পোকা মাকড়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহার বহিরস্তর পুষ্টিকর উপাদান সমূহ ছাঁটিয়া ফেলে। ইহা কেউ বলা হয় পালিশ পদ্ধতি। এইরূপে পালিশ-করা ‘শুদ্ধ’ চাউল আমরা পাইতুণ্ডি সহকারে গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু ভ্রমগ্রহণের যে অন্তিম লক্ষ্য, যান্ত্রিক উৎপাদন ও ব্যবসায়িক স্বার্থে তাহাকে পূর্নকৈই বলি দেওয়া হইয়াছে! এমনতরোয়, চাউলের কল কি বৈজ্ঞানিক? ধান-ভানাইয়ের এই আধুনিক পদ্ধতি মানুষের মঙ্গল করিতেছে, না অমঙ্গল করিতেছে? চাউল মানুষের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির উচ্চ, না মুষ্টিমের কলওয়ালার তুষ্টিবিধানের লক্ষ্য? শুধু স্বাস্থ্যনাশই নয়, ঢেঁকি বস্ত্রের ফলে কত সহস্র-সহস্র লোক বেকার হইয়াছে, জীবিকাক্ষণের সঙ্গত পথ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি? বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞানের অন্ধ, না মানুষের কল্যাণবিধানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য? চাউল-কলের বিজ্ঞান মানুষের কোন কল্যাণে লাগিতেছে?

এবার চিনি-প্রসঙ্গে আসা যাক্। ইক্ষুরসের দ্বারা পূর্বে গ্রামে-গ্রামে প্রধানতঃ গুড়ই প্রস্তুত হইত। তাহাতে রসের পুষ্টিকর রাসায়নিক উপাদানাদিও বঞ্চিত হইত, আবার শত-সহস্র পুরুষ, নারী ও ছেলে মেয়ে গুড়শিল্প নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা উপার্জন করিত। চিনির কলের কল্যাণে যুগ-যুগাগত এই ধারাতী সম্পূর্ণরূপে উৎপাত হইতে চলিয়াছে। আজ রস হইতে উহার প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ উপাদানগুলি বিসর্জন দিয়া উহাকে কলের প্রাক্রিয়ায় চিনিতে পরিণত করা হয়। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা একান্তরূপেই মুষ্টিমের পুষ্টিবিধানী করায়ত্ত। অপর দিকে, চিনি যখন আমরা পাই, উহার নিজস্ব ক্যালসিয়ামের অভাবে উহা স্বাভাবিক নিয়মেই আমাদের দেহের রক্ত হইতে প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম টানিয়া লয়, রক্ত তাহার ক্ষতিপূরণ করে দস্ত হইতে। পরিণামে দস্তরোগের অন্ত নাই। কলের কল্যাণে আমরা গুড়ের পরিবর্তে চিনি খাইয়া ‘সভ্যতা ও ভ্রমতা’র মুখোশ রক্ষা করিতেছি, দস্তের গোড়ায় দিতেছি ঘা, আর পাঠ্য পুস্তকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মধ্যাঙ্গা বুঝিবার জন্ত অন্তহীন উপদেশ!

দেশের ঘানি লোপ পাইয়াছে, তেলীয় জীবিকাক্ষণের পথ বন্ধ হইয়াছে। উৎপন্ন তৈলবীজ আজ ঘানির পরিবর্তে তৈল-কল-ওয়ালার কবলে কিম্বা বৈদেশিক রপ্তানীর বহরে স্থান লাভ করিতেছে, আর দেশের জনসাধারণ ভোজ্য ও নানাবিধ ক্ষমতি তৈল নামীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া অকালে গঙ্গাধাত্রী করিতেছে। তুলা চালানী বাইতেছে কাপড়ের কলে, আবার এক শ্রেণীর তুলা রপ্তানীও হইতেছে। গ্রামের লক্ষ লক্ষ তাঁত শিল্পী আজ হুতার অভাবে হাহাকার করিতেছে, নিজেদের গ্রামে তুলা উৎপাদন করিয়াও





পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁস এক বিশ্বকর যুগ।

তার বীজ শুধু এক মহাদেশের সীমায় আবদ্ধ থাকেনি, গত চারশ বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র কম-বেশী ছড়িয়ে পড়েছে। এই চারশ বছরের “আধুনিক” সভ্যতা-সংস্কৃতি তারি ভালোয়-মন্দায় যেখানে বিচিত্র ফল। সম্প্রতি সে ফলের যুগ সমাপ্ত। দু’টো মহাযুদ্ধের মাঝখানেই বিশ বছরে রেনেসাঁসের সভ্যতার ঐতিহাসিক অবশান ঘটে। যুগশুদ্ধির ‘স্মৃতি’ চেনার আঘাতে আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। ছেদের প্রত্যন্তে কি আরেক অন্ধকার যুগের সূচনা? অথবা মহত্তর নব জাগরণের? তা জানি না। কিন্তু জানি, রেনেসাঁসের যুগ আজ গত। তার ঐতিহ্য হতে আমরা আজ বিচ্ছিন্ন। আমাদের হাঠানো কৌমার্যের স্মৃতির মতই তার দিকে আমরা নিখুঁত আঁতিতে বড় জোর কখনো বা ফিরে তাকাতে পারি, কিন্তু সেখানে আর ফিরে যেতে পারি না।

এবং তাঁর অধিকাংশ পরিণত সৃষ্টি এই আন্তঃসাময়িক দু’দশকের মধ্যে কণ নেওয়া সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ আসলে আমাদের সেই অপূর্ণত কৌমার্য চাপের কবি। রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের তিনি শেষ মহাশিল্পী। আর ঐ ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করবেন, গত চারশ বছরের সাধনায় খুব অল্প শিল্পীর সৃষ্টিতেই তাঁর সমান সার্বিক প্রকাশ লাভ করেছে। গয়েটের মত তাঁর ক্ষেত্রও বার্ষিক কল্পনায় সমৃদ্ধি এনেছে, অমুভূতিকে স্পন্দিত করেছে, চিন্তায় এনেছে আরো ঔদার্য আর দৃঢ়তা, প্রকাশে গভীরতর বাজনা, প্রত্যয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাণময় বৈচিত্র্য। সুতরাং পূর্ণ পর্যায়ের তাঁর নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় আমাদের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। বরং তাঁর শেষ দশকের রচনায় রেনেসাঁসী ঐতিহ্যের আত্মা যেন তার সব বাহ্য সাময়িক আবরণ খসিয়ে ফেলে হুঃসহ অকম্প নগ্নতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে গেলেন এই ত সেদিন, পুরো দশ বছরও হয়নি। অথচ এর ভিতরেই তাঁর জগৎ আমাদের জীবন হতে কত দূরে না সরে গেছে! আমরা বারা এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে বড় হোয়েছি তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ গয়েটের মতই দূর-লোকের অনাস্থায় নক্ষত্র। বলতে কি, গয়েটের চাইতেও তিনি অনাস্থায়। কাব্য, আউক্লারুং (Aufklärung) ঐ মহাকবির কল্পনায় আমাদের আঁতের কিছুটা অন্তত অভাস দেখা দিয়েছিল। বাদলেয়র কি ডট্টরেভল্ডি হতে স্রু করে হাজলি-সাত’র প্রমুখ সমকালীনদের রচনায় রেনেসাঁসী সংস্কৃতির যে আত্মক্ষয়ী চেতনা ক্রমে প্রথর হোয়ে উঠেছে, ফাউষ্ট, মহাকাব্যে তার কিছু ইঙ্গিত চোখে পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গয়েটের মেফিষ্টোফেলস তব্বে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর শেষ বয়সের কোন কোন সমসাময়িকের প্রতি তিনি সর্কোভুক স্নেহে স্বাগত জানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের অন্তর্মুখী সাধনার স্বরূপটি তিনি অস্বপ্নমান করতে পারেননি। আসলে আন্তঃসাময়িক আধুনিকদের সঙ্গে তার শুধু বয়সের নয়, মেজাজের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। এঁদের মধ্যে যারা শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাও এ ব্যবধান পেরিয়ে তাঁর ঐতিহ্যের অংশভাগী হতে পারেননি। আধুনিকদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তাই মহাকাব্যের নায়কের মতই অনাস্থায়, প্রায় গোঁরাশঙ্কর চড়ার

## রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিকতা

শিবনারায়ণ রায়

মতই অনারোহ, শ্রদ্ধার-বিশ্বরে মাথা নত হয়, কিন্তু মন সঙ্গ পায় না।

অন্য একটা জায়গায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সে হোল চিত্রকলার মাধ্যমে ঐ শেষ বয়সের পরীক্ষা-নিরীক্ষার। সত্তার অস্বীকৃত অন্ধকার-লোকে এ ছবিগুলির জন্ম। কিন্তু এদের জগতের সঙ্গে আধুনিক মেজাজের যে আত্মীয়তা আছে, রবীন্দ্রনাথের অন্ত কোন রচনার সঙ্গেই সে আত্মীয়তা নেই। এখানেই মহাকবি অজ্ঞাতে স্বধর্মজ্যোহিতা করেছেন। ফলে এখানে শুধু যে তাঁর শিল্পের হাতই অগুণ্ঠ তা নয়, তাঁর কল্পনায় ধ্যানের ঐকান্তিকতাও অবর্তমান। অথচ এদের মধ্যে এমন একটা বিকৃত প্রাণশক্তি আছে যে, এদের কিছুতেই অবহেলা করা যায় না। কিন্তু কবি তাঁর এই বিকৃতভক্ত ভাষার আত্মচেতন স্তরে পরিণতি পেতে দিলেন না। যদি দিতেন, অন্ততঃ যদি চেষ্টাও করতেন তবে হয়তো তাঁর পরিপূর্ণতা আর আমাদের আঁতের মাঝখানে মন-জানাজানির এক সেতুবন্ধ গড়ে উঠতো। মধ্যযুগ আর রেনেসাঁসের মাঝখানে সেই সেতুবন্ধ গড়েছিলেন দান্তে, রেনেসাঁস আর আমাদের কালের মাঝখানে সেতুর কিছুটা গড়ে গেছেন গয়েটে। তাঁরা শুধু আপন-কালের কবি নন, এমন কি শুধু নিত্যকালেক কবি নন,— তাঁরা যুগান্তরের কবি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর সব থেকে প্রতিভাবান কবি হোয়েও ডিভাইন কমেডি বা ফাউষ্টের মত কোন মহাকাব্য রচনা করেননি। সব মহাকাব্যের মত তাঁর কাব্যেও নিত্যকালের আবেদন আছে, কিন্তু আমাদের এই বিশেষ কালেক রূপটি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়ল না।

আর ঠিক এই কারণেই এমন অতুল ঐশ্বর্য, অমিত উদ্ভাবনা-শক্তি, দুর্লভ চিত্রশ্রদ্ধা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অগম দেশের বার্তাবহ আগন্তুক ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর সৃষ্টিকে তো আমরা জানি, কিন্তু শ্রদ্ধা যে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলেন আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জীবনের যে সব অন্ধকার রাতে আত্মদ্ব্যতনের আতঙ্কিত নীল বিহ্বলে মুগ্ধতার অন্তরালের সদ্ব্য-আচ্ছাদিত আত্মা আঁত’ বিক্ষোবণে প্রকাশিত হয়, তাঁর জীবনে তেমনতরো রাত কি কখনো আসেনি? নিটোল, আশ্রয় অক্ষত তাঁর কল্পনার কৌমার্য, হাইনেন ভাষার বলতে হয়—So hold und schon und rein। হয়তো সব সময়ে মধুর নয়, কিন্তু সব সময়েই স্নেহর, সব সময়েই নিঃশঙ্ক। অঙ্গদাশঙ্কর তাঁকে জীবন-শিল্পী বলেছেন। আমরাও সে কথা মানি। ঋপদী, প্রায় নৈব্যক্তিক সে শিল্প, কোথাও স্নানতির সীমা লঙ্ঘন করে না। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাকে ব্রহ্মাখ্যদ বলেছে এ শতাব্দীর কোন কবির সৃষ্টিতে যদি তার সন্ধান করতে হয়, তবে সে কবি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আমরা, যাদের মন দুই যুদ্ধের মাঝখানে গড়ে উঠেছে, আমাদের জীবনে ব্রহ্মের কি আর কোন অর্থ আছে? আমি শুধু ধর্মে অবিবাদের কথা বলছি না—এ নাস্তিক্য সংগ্রামী। এ যুগের পরিণত মনে ব্রহ্মপ্রত্যয় নিতান্তই আকস্মিক স্মৃতি। আমরা যে শুধু বর্গ-শাসন হতেই বঞ্চিত

তা' নয়, কোন মূল্য-বিচারের ক্ষেত্রে শাখত, চিরন্তন, সর্বমানবীয় এ সব বিশেষণ প্রয়োগে পর্যন্ত আমাদের অনিচ্ছা আত্যন্তিক। এক কথায় আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখন আপেক্ষিকতা-নির্ভর। আর অভ্যাসাশ্রয়ী মনের পক্ষে এই অনতিক্রমা আপেক্ষিকতা-বোধ যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরি জানেন। যে সব নৈতিক নির্দেশকে বিনা বিতর্কে শ্রেয়ঃ বলে জেনে মানুষের বিবেক এত কাল অশ্রয় পেয়ে এসেছে, আজ নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক সমাজ-তত্ত্ব এবং সব থেকে বেশী মনবিকলন তত্ত্বের আঘাতে শিক্ষিত-জীবেরে তা'রা শিথিলমূল! ফলে এ যুগের চিন্তায়, ব্যবহারে, শিল্প-কলনায় যে ব্যাপক শুভনাস্তিক্য দেখা দিয়েছে, তাতে দুঃখ পোলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে কার্তেসীয় (cartesian) আত্মপ্রত্যয়ের ক্ষমিতে বেনেসাঁসের ময়ূর সাস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আজ সেখানে পর্যন্ত ভাঙন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা স্নাতকে নিজেদের প্রেম করছি, আত্মবা একথাও কি শুধু ব্রহ্মকল্লনার মত একটা বাবতাতিক অভ্যাস ছাড়া আর কিছু নয়? তবে নবলব্ধ জ্ঞানের আশ্রমে পড়ে আমাদের আর কি অবশিষ্ট বইস? একরাশ প্রাবর্তী যন্ত্রের স্তূপ, নিকেরাধদের জল্প মিথ্যা সংস্কার আর অভ্যাস, সকলের জঙ্কে কতগুলো আনিম পঙ্ক বৃত্তি—আর প্রাজ্ঞ মনের জল্প নিশ্চিতির বর্গ হতে নির্বাসনের নির্ভর চেষ্টা?

এই যে বিশিষ্ট ভাবে আত্মসাময়িক মেজাজ, এতট প্রতিনিধি হোল এলিয়টের স্মরণি আর টাইগেসিয়াম, হাক্সলির থিয়োডোর গম্ব্রিল, আর সার্ত'র এর অধ্যাপক ম্যাথিউ। এবি পূর্বাভাস ব্যালেশ্বরের কাব্যে, ডব্লিওভঙ্কার উপন্যাসে। রিকের পুতুলেরা এবি অঙ্ককার গার্ভের জগৎ, প্রকৃতি এবং জয়েসের উপন্যাসে বিভিন্ন দিক হতে এই মেজাজেরই কাহিনী। বেনেসাঁস কি আউৎক্রাস্কেসের ঐতিহ্যে একে বোঝা যাবে না। এখানে এক আশ্চর্য যুগের সমাপ্তি। হয়ত (তার বেশী কি বলতে পারি) আশ্চর্যতর কোন ভবিষ্যৎ যুগে ভূমিকা।

এই রূপান্তরের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আলোড়িত করেনি। তাঁর মানে অবগত এ নয় যে, তাঁর মনে কখনো সন্দেহ আসিনি অথবা অনিশ্চিতি কখনো তাঁর চেতনায় ছায়া ফেলেনি। কিন্তু তাঁর মনের প্রত্যয়ী সমগ্রতাকে তিনি সব সংশয়-শঙ্কা উর্দ্ধে রাখতে পেরেছিলেন। স্রীমতী বোভোয়া যাকে বলেছেন “অস্তিত্বের মৌলিক অস্পষ্টতা”, যার ফলে না কি আমাদের কোন জ্ঞান, বিচার, সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক স্বার্থার্থ্যের বেষ্টী কিছু দাবী করতে পাবে না, তার খবর তিনি রাখতেন না। ব্রহ্ম সত্য এবং বিশ্বমানবিকতায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল। সং-অসং, সত্য-মিথ্যা, স্মরণ-কুংসিহের অস্পষ্ট পার্থক্য তিনি বিশ্বাস করতেন। এ পার্থক্যবোধ তাঁর

কাব্যের আলো-ঈশ্বরিতেও এতটুকু শিথিলমূল হয়নি। এই নিঃসঙ্কেচ আত্মপ্রত্যয় ছিল বলেই তাঁর প্রকাশ প্রচারের মাত্রাচ্যুতি-মুক্ত; তাঁর লিরিক-প্রেরণা বিতর্কে বিভবিত নয়। যে অসমাধের বিকল্প সমস্রাতকে কর্কটগার্ভ সব দর্শনের মূল উপজীব্য বলে উপস্থিত করেছিলেন, যার স্রুষ্টিচৈতন্যের গীড়াতে আধুনিক মনের বয়ঃসন্ধি ঘটেছে, যার ছাপ বিশিষ্ট ভাবে এ-যুগের সমস্ত চিন্তায় শিল্পে সমাজ-জীবনে—রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের সব রচনায় ঈশ্বরি-পাতি করে ধুঁজলেও তার আভাস মিসবে না। রিকের জনার্লের পাতায় পাতায় যে গ্রানির স্বাক্ষর, সার্ত'রের উপন্যাসে যে স্রুষ্টির গীড়ার কাহিনী, জয়েস-হাক্সলীর নায়কদের যে অনতিক্রমা নৈঃসঙ্গ—আশ্চর্য, এদের সমসাময়িক মহাকাব্যের কল্পনাতে তার সামান্ততম ছায়াটুকুও পড়ল না।

এ রূপান্তর ইউরোপের সাহিত্যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরই অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে এর সূচনা ঘটেছে আরো বছর দশেক পরে—স্বধীন দস্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির কবিতায়; ধৃষ্টি মুখজ্যো, মানিক বান্দুজ্যের উপন্যাসে। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় এঁদের শিল্প-প্রতিভা অনেক বেশী সীমাবদ্ধ, তবু নিত্যন্ত নির্দোষ ছাড়া সবাই স্বীকার করবে এঁদের জগৎ তাঁর জগৎ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আধুনিকদের মধ্যে অনেকেই প্রেরণা এখন অবসিত। হয়তো বা যুগান্তরের মনকে শিল্পে প্রকাশ দেবার সামর্থ্য তাঁদের ছিল না বলেই এত দ্রুত তাঁরা ফুরিয়ে গেলেন। কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির ফল আমরা খেয়েছি, প্রাক্তন স্বর্গের নিষ্পাপ নিশ্চিতিতে আর আমাদের ফেরার উপায় নেই। বীর বুদ্ধিমান স্বধীন দস্তের মত তাঁরা চূপ করে গেছেন। কেউ-কেউ বা মার্ক্সবাদের আন্তিক্য আঁকড়ে সাহুনা পাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে আন্তিক্য শুধু আফালনই আছে, প্রত্যয়ের স্মৃতি এবং লাবণ্য তাতে অবর্জমান।

হয়তো তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথও এই রূপান্তরকে অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর এই যুগের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটা নিরাভরণ কাঠি অগ্রত্যাগিত ভাবে মনে ঘা মারে কখনো কখনো কোন কোন গল্প-প্রবন্ধেও একটা অনভ্যস্ত সংশয়ের ছায়া পড়েছে। আমরা বিশ্বাস, এই অস্পষ্ট অনুভূতি হতেই তাঁর কিছুকিমাকার স্বেচ ও ছবিগুলি উদ্ভূত। কিন্তু কবি তাঁর এই অনুভূতিকে কখনো অস্পষ্ট চেতনার স্তরে তুলে তার মুখোমুখি করেনি না। হয়ত সেটা তাঁর প্রাজ্ঞতারই পরিচয়। অনভ্যস্ত অনুভূতির অম্লসরণ করে সাধ্যের সীমানা তিনি লঙ্ঘন করেননি। আমাদের দুঃসহ আত্মপ্রাণির হাত হতে তিনি বাঁচলেন। আর-নিজের সামর্থ্যের স্মৃতি মেনে যে চলতে পারে, সেই তো প্রাজ্ঞ।

### টোয়েনের রসিকতা

মার্ক টোয়েন, পৃথিবীবিখ্যাত হাস্যরসিক। তাঁর গৃহের সর্বত্র বই আর বই। টেবিলের টানা, জানলার তাক—যেদিকে তাকাও সেদিকে বিক্ষিপ্ত বইয়ের রাশি। এক জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু টোয়েনকে জিজ্ঞেস করেন,—“আপনার বই রাখার বুক-কেস নেই কেন?”

তদুত্তরে রসিকপ্রবর টোয়েন বলেন,—“ভাল, তুমি কি জান না যে, বই ধার করা কত সহজ আর বুক-কেস ধার করা কত শক্ত?”

মাসির বাড়িতে নিমন্ত্রণ বাওয়ার আপত্তি উঠল না কোনই।

কয়েক দিনের জন্ত এসে একটি সন্ধ্যাও এদের সংসারের বাইরে কাটাতে বাজী ছিল না কলিঙ্গ। কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য হোল না। সুতরাং পাঁচ বোনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ী করে মেহীটনে এসে উপস্থিত হোল কলিঙ্গ। মেহেরা ড্রিং-রুমে পা দিয়েই শুনে আনন্দ পেলে যে, উইকহ্যাম নিমন্ত্রণ নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত।

এ সংবাদ পরিবেশনাতে প্রত্যেকে আসন নেবার পর কলিঙ্গ ঘরের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এ ঘরের বিশাল আকার আর আসবাব-পত্র দেখে তার মনে হোল, বললে সে, বুঝি বা লেডী ক্যাথারিনের বসার ঘরেই বসে আছে সে। এই তুলনা প্রথমটা কলিঙ্গ মনে ধরল না কিন্তু মাসি যখন লেডী ক্যাথারিনের একটি ড্রিং-রুমের বর্ণনা শুনলেন এবং যখন জানলেন যে, তার একটি চুল্লীর দামই আটশ পাউণ্ড তখন তিনি এই প্রশংসা-বাক্যের গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হলেন। তখন আর ফুর্তার কারণ রইল না তাঁর।

মাসির মত এমন মনোযোগী শ্রোতাও মেলা ভার। যা তিনি শুনলেন তাতেই কলিঙ্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি সহজে তাঁর ধারণা খুব বেড়ে গেল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই পড়শীদের কাছে গল্প করার জন্ত মুখ নিসপিস করতে লাগল। মেহেরা কলিঙ্গের কথায় কেউই কর্ণপাত করছিল না—তাদের কাছে এই প্রতীকা অসহ্য বোধ হচ্ছিল। অবশেষে প্রতীকার পালা শেষ হোল। অতিথিরা দেখা দিলেন। উইকহ্যাম যখন ঘরে এল তখন তাকে দেখার পর সংশয় রইল না এলিজাবেথের যে, এ মানুষটিকে প্রথম দেখার পর যে-রুগ্নতা তার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তা অপাত্রে নেয়নি সে। অতিথিরা প্রত্যেকেই সজ্জন, এখানকার সমাজের সেরা কিছু চেহারায চাল-চলনে আভিজাত্যে উইকহ্যাম সকলকে ছাপিয়ে।

এই দলে উইকহ্যামই প্রথম সৌভাগ্যবান যার উপর প্রত্যেক মেহের দৃষ্টি আর এলিজাবেথই ভাগ্যবতী মেহের যার পাশে এসে বসল সে। ফুর্তে সে এমন ভরাটী আগাপ ভ্রমিয়ে তুলল যে, বাইরের আঁর্ বাতাসে যদিও রাত যেন কেমন ভিজে সপসপে, তবুও এলিজাবেথের এই প্রথম অভিজ্ঞতা হোল কখন কবে অতি সাধারণ নীরস পান্‌সে ব্যাপারও বক্তার নৈপুণ্যে সরস স্বরগ্রাহী হয়ে উঠতে পারে।

স্বদর্শন উইকহ্যাম ও অফিসারগণের মাঝখানে পড়ে কলিঙ্গ একবারে নিশ্চভ হয়ে গেল—তরুণীদের কাছে তার আর কোন মূল্যই রইল না। তবুও মাসি মাঝে-মাঝে হতাশার সহিত শুনছিল তার কথা এবং তারই সতর্ক গৃহিণীপনায় কফি ও মাকিন পর্যাপ্ত পরিবেশিত হচ্ছিল তার পাতে।

তাসের পাট বসলে সে মাসির সঙ্গেই গ্রাবু ফেলতে বসল।—‘এ খেলা আমি খুব ভাল জানি না’—বললে সে—‘তবে শিখে নিতে বাজী আছে। তা ছাড়া আমার কাজের পক্ষে—’

কলিঙ্গ খেলতে বাজী হওয়ার মাসি কৃতজ্ঞতার গদগদ হয়ে উঠলেন কিন্তু তার কৈফিয়তে কান দিলেন না।

উইকহ্যাম কিন্তু গ্রাবু খেলায় যোগ দিল না—এলিজাবেথ ও লিডিয়া যে টেবিলে বসেছিল সেখানে সে সাধারণ গৃহীত হোল। প্রথমটা মনে হয়েছিল লিডিয়াই বুঝি তাকে গ্রাস করে ফেলবে—এমন শঙ্কাত বকতে পারে সে। কিন্তু তেমনি লটারী খেলায় বৌক বেশী



থাকায় তাস নিয়ে মেতে উঠল লিডিয়া। বাজী ধরে বাজী জিতে হৈ-ঠে দরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও প্রচণ্ড উৎসাহ তার। উইকহ্যাম এলিজাবেথের সঙ্গে গল্প ভ্রমিয়ে তুললে—এলিজাবেথও তার মুখের কথা শুনতে উৎসুক। কিন্তু যে কথা সে শুনতে চায় সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না। ডার্সির সঙ্গে উইকহ্যামের কি সম্পর্ক? অথচ ডার্সির নাম পর্যন্ত উল্লেখ করতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবেই নিরসিত হোল সমস্ত উদ্গীর কৌতুহল। উইকহ্যাম নিজেরই সূচনা করলে তার কাহিনী। নেদারল্যান্ড থেকে মেহীটনের দূরত্ব কত জানতে চাইলে সে। এলিজাবেথের উত্তর শুনে ইতস্ততঃ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, ‘ডার্সি এখানে কত দিন আছে?’

—‘প্রায় মাস খানেক’—কিন্তু এলিজাবেথ কথাটা এতখানেকই শেষ করে দিতে চায় না বলে আর একটু জুড়ে দিল সেই সঙ্গে—‘শুনছি, ডার্সিমায়ে না কি তার বিবাহট সম্পত্তি আছে?’

—‘হ্যাঁ, সম্পত্তি ওদের বিবাহট বটে। বছরে আর দশ হাজার। ওদের সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল জানা লোক পাবেন না। ওদের পরিবারের সঙ্গে আবার আমার পরিচয়।’

এলিজাবেথ বিষয়-বিস্তৃত হয়ে যায়।

—‘আজকে এ রকম জোড়ের সঙ্গে কথা বলার খুবই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন নিশ্চয়। বিশেষ করে কালেক্স নিকতাপ মিলনের পর এ রকম ভাবা খুবই স্বাভাবিক। আপনাদের সঙ্গে ডার্সির কি খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে?’

—‘ঐ খানিকটা। চার দিন মাএ দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। ভাল লাগনি তাকে আমার।’

—‘ভাল লাগা না লাগা স্বন্ধে মতামত দেওয়ার অধিকার নেই আমার। মতামত রাখারও অধিকার নেই। তাকে এত দিন থেকে এত গভীর ভাবে জানি যে, এ দিক থেকে ভাল বিচারক হওয়ার ক্ষমতা নেই আমার। নিরপেক্ষ থাকারও অসম্ভব আমার পক্ষে। কিন্তু আপনার অভিমত সকলকে আশ্চর্য করবে—আশা করি অস্ত্র আর জোর-গলার জাহির করবেন না নিশ্চয়। এখানে আপনি নিজের বাড়ীতে আছেন!’

—‘নেদারল্যান্ড ছাড়া অস্ত্র বা বলতে পারি, তার বেশী তো কিছু বলিনি আমি। হার্টফোর্ডশায়ারে তাকে কেউ পছন্দ করে না। তার অধমিকার সবাই বিরুদ্ধ। কেউই তার স্বন্ধে ভাল কথা বলে না।’

উইকহাম বাধা দিয়ে বলল—‘হুঃ করে লাভ নেই। ওকে কেন, কাউকেই যোগ্যতার অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু ওর স্বন্ধে সচরাচর এ রকম ঘটার অবকাশ হয় না। ওর সম্পত্তির জাঁক-জমকটাই লোকের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে—ওর অভিজাত-গভীর আচরণে ভয় পায় লোক—যেমন চায় তেমনি ভাবেই সবাই দেখতে পায় ওকে।’

—‘মুহূর্তের পরিচয়েই তাকে আমি বসমেজাজী বলব’—

এ কথায় উইকহাম শুধু মাথা নাড়ল।

—‘ও হয়ত আর খুব বেশী দিন দেশে থাকবে না’—

—‘তা অবিগত জানি না আমি—নেদারল্যান্ডে থাকার সময় এ রকম কথা শুনি। সে এখানে থাকলে আশা করি আপনাব পরিবর্তনের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।’

—‘না না। ডার্সি আমার তাড়াতে পারবে না। আমাকে এড়াতে চাইলে তাকেই যেতে হবে এখান থেকে। আমার সঙ্গে তার সম্ভাব নেই—তাকে দেখলেই আমি বাধা পাই মনে। তাকে অবশ্য এড়িয়ে চলার কোন কারণ নেই আমার। কিন্তু সে যে কি—জগতের সামনে তা বলা আমার পক্ষে বেদনানায়ক। তার স্বর্গগত বাবা এক জন অতি সজ্জন ব্যক্তি ও আমার অকৃত্রিম শুভাকাংখী ছিলেন। ডার্সির সঙ্গে দেখা হলেই তাঁর হাজার রকম স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। অথচ ডার্সি আমার প্রতি অতি জঘন্য আচরণ করেছে। তাঁর সব অপরাধই আমি ক্ষমা করতে পারতাম যদি সে তার বাবার স্মৃতির অবমাননা না করত—তাঁর সকল আশার মূলে না কুঠারগাত করত।’

এলিজাবেথের কৌতূহল শান্তিত হয়ে ওঠে এবং উগ্ৰুহ হয়ে গিলতে থাকে সব কথা। কিন্তু এ এমন ঘরোয়া ব্যাপার যে, বেশী কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না এ স্বন্ধে।

উইকহাম অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে অর্ধাৎ মেরীটন তার পারিপার্শ্বিক তার সমাজ প্রভৃতি নিয়ে কথা বলতে লাগল। বা কিছু দেখেছে অত্যন্ত প্রীত করছে তাকে।

—‘রমণীয় সামাজিক পরিবেশের লোভেই আসা এখানে’—বললে সে—‘অতি ভ্রম, সুখের পরিবেশ এখানকার। তাছাড়া ডেনী এ বাড়ীর বর্ণনার ভারাই আরো এলুক করে তুলেছিল আমার। মেরীটনে মনোজ সাহচর্য ও দ্বিধা পরিবেশের অভাব নেই। সামাজিক

পরিবেশ প্রয়োজনীয় আমার পক্ষে। হতাশায় লালিত আমার জীবন—নিজ’নতা বরদাস্ত করতে পারি না আমি। কাজ চাই—চাই সামাজিক সাহচর্য। সৈনিক-জীবন আমার পক্ষে লোভনীয় নয়, কিন্তু প্রহ-বৈগুণ্যে সেই জীবনই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। পাদরী-বৃত্তিই হওয়া উচিত ছিল আমার—সেই ভাবেই লালিত আমি। এত দিনে হয়ত আমি সীমিত জীবনের অধিকারী হতাম যদি না এই ব্যক্তিটি—যার কথা বললাম এই মাত্র—অস্ত্রধার হয়ে দাঁড়াত।’

—‘তাই না কি?’

—‘হ্যাঁ। স্বর্গগত ডার্সি আমার প্রচুর সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার ধর্মপিতা ছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহ করতেন আমার। তাঁর মহানুভবতার স্বর্ণ জীবনে পরিশোধ করতে পারব না কখনো। আমার ভবিষ্যতের বিশেষ ব্যবস্থা করে যাওয়াই ইচ্ছা ছিল তাঁর এবং করেছে ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে-সাথে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।’

‘কী সর্বনাশ? তা কি করে সম্ভব? উইলকে অধিকার করা কি করে সম্ভব হোল? আপনি আইনের শরণাপন্ন হননি কেন?’

—‘উইলের সত্তে’ এমন গোলামাল আছে যে, আইনের কাছ থেকে আমি কোনই আশা করতে পারি না। কোন মত্যাশ্রয়ী লোক উইলের উদ্দেশ্য স্বন্ধে সন্দেহ করবে না সত্য কিন্তু ডার্সি সন্দেহ করেছে। তার মতে উইলের সম্পত্তি সত’সাপেক্ষ এবং উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণামদর্শী হয়ে সম্পত্তির উপর সমস্ত অধিকার হারিয়েছি আমি। বরু এ কথা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, এমন কোন কুকাঁজ করিনি আমি যে, সম্পত্তির দাবী-দাওয়া হারাতে পারি। আমার মেজাজ হয়ত একটু তপ্ত, অসন্তর্ক—হয়ত তার স্বন্ধে আমার মতামত একটু খোলাখুলি ভাবেই জাহির করেছি তার কাছে। এ ছাড়া খাড়াপ আর কিছু তো মনে করতে পারছি না। আসল কথা হোল, আমরা দু’জনে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ আর আমাদের ও ঘৃণা করে।’

—‘এ অত্যন্ত জঘন্য। সকলের সামনে ওর মুখোঁস খুলে দেওয়া উচিত।’

—‘এক দিন না এক দিন স্ব-মূর্তি বেরিয়ে পড়বেই। তবে আমি নিজে কিছু করতে চাই নে। যত দিন ওর বাবার কথা মনে থাকবে তত দিন ওর বিকৃত্যতা করতে বা ওকে অপদস্থ করতে পারব না আমি।’

এ কথা বলায় উইকহামের প্রতি এলিজাবেথের মন সশঙ্ক হয়ে উঠল—আগের চেয়ে তাকে যেন আরো সন্দেহের বোধ হোল। একটু কি ভেবে এলিজাবেথ বললে—‘ওর এমন হৃদয়হীন আচরণের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?’

—‘আমাকে সে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে—বাকে ঈর্ষারই নামান্তর বলা যেতে পারে। ওর বাবা যদি আমার একটু কম ভালবাসতেন তাহলে হয়ত ও আমার একটু প্রীতির চোখে দেখত, কিন্তু আমার প্রতি তার বাবার অনন্তসাধারণ ভালবাসাই ছোট বেল থেকে আমার প্রতি তার এত ক্রোধের কারণ বলে আমার বিশ্বাস। আমার প্রতি তার বাবার স্নেহ, তার সম্পত্তির ভাগ্যদার হওয়া বরদাস্ত করার মত মনোবৃত্তি নেই ডার্সির।’

—‘ভাসিক এত ধারণা মনে হয়নি যদিও ওকে আমি একটুও পছন্দ করি না। ভাবতুম, সাধারণ ভাবে সকলকেই ঘৃণা করা লোকটার স্বভাব। কিন্তু এই প্রকার বিবেচনাপরায়ণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি, অসাধুতা বা অমানুষিকতার বশ হতে পারলে আমার ধারণা ছিল না।’

কয়েক মুহূর্ত ভেবে আবার বললে এলিজাবেথ—‘মনে পড়েছে এবার নেদারল্যান্ডেও এক দিন ওর অনমনীয় ক্ষমাহীন মেজাজ নিয়ে খুব বড়াই করছিল বটে। এ রকম প্রকৃতি নিশ্চয়ই ভয়ংকর।’

—‘এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই নে’—উত্তর দেয় উইকহাম—‘তার প্রতি আমার আচরণ অসম্ভব আমার পক্ষে।’

—‘বাপের প্রিয়পাত্র, বন্ধু, ধর্মপুত্রের প্রতি এ রকম আচরণ?’

—‘একই পল্লীতে, একই উত্তানের ছায়ায় জন্মেছি আমরা। যৌবনের বেশী ভাগ সময়ই একসঙ্গে কেটেছে। একই বাড়িতে থেকেছি—একই পিতা-মাতার স্নেহাঙ্কুরে হেসে-খেলো বড় হয়েছি। আপনার মতো মশায় যা করেন আমার বাবাও সেই কাজ করতেন। পরে স্বর্গীয় ডার্লির জন্ত সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে পেমবালি জমিদারী পরিচালনায় নিযুক্ত হন। ডার্লি বাবাকে খুব সম্মান করতেন—তার পরামর্শ মত চলতেন। বাবা অতি ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন তাঁর। বাবার মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর পুত্রের একটা ব্যবস্থা করবেন তিনি। আমার প্রব বিশ্বাস, শুধু কৃতজ্ঞতার স্বাভাবিক পরিণামের জন্তই নয়, আমার প্রতি স্নেহ বশতঃই তা করতে চেয়েছিলেন তিনি।’

—‘ভারী অদ্ভুত তো! আচ্ছা, এই গর্ববোধ ডার্লিকে আপনার প্রতি আমার আচরণ করতে শেখাতেও পারত তো। এ রকম অসাধু ওয়্যার মত গর্ববোধ থাকা তো উচিত নয়—অসাধুতাই আমি বলব একে।’

—‘ও যা-কিছু করে দস্তখ্ত বশেই। গর্বই ওর নিত্য সহচর—এ প্রায় ওর ধর্মের সামিল। আমাদের কাকুরই আচরণে সামঞ্জস্য নেই—আমার প্রতি ওর আচরণ কি যে অদ্ভুত ভেবে পাই না।’

—‘এই জঘন্য অহমিকা বোধে কি ভাল হয়েছো তার?’

—‘হয়েছে বই কি। এই অহমিকা-বোধ থেকেই সে হয়ে ওঠে উদার, মহানুভব—হয়ে ওঠে মুক্তহস্ত, আতিথ্যপরায়ণ। এই বোধ থেকেই সে বন্ধুকে দেয় অর্থ—প্রজাদের করে সাহায্য—মোচন করে গরীবের দুঃখ। বংশগরিমা-বোধ অর্থাৎ বাপ যা করে গেছেন তার তত্ত্ব ও গর্ব-বোধ করে। বংশের মুখ হেঁট করতে, লোকপ্রিয় ওপারলীর অপহৃত্যু ঘটাতে বা পেমবালি-পরিবারের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করতে কিছুতেই রাজী নয় সে। তার মধ্যে ভাতৃগর্ব-বোধও আছে—এই বোধ থেকেই সে বোনের প্রতি স্নেহশীল, তার সতর্ক অভিভাবক। এমন কথাও হয়ত শুনে পাবেন যে, ভাই-বোনের মধ্যে সেই সব চেয়ে স্নেহশীল।’

—‘মিস ডার্লি কেমন মেয়ে?’

—‘ওকে অমানুষিক বলতে পারলেই খুশী হতাম। ডার্লি-পরিবারের কাকুর সম্বন্ধে নিশ্চয় করতে আমার কষ্ট হয়। সেও তার শাস্ত্র মতই অতি দান্তিক। ছেলেবেলায় কিছু বেশ স্নেহময়ী মনোরমা ছিল—আমাকে ভালবাসত খুব—ঘটনার পর ঘটা আমি

ওর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি। কিন্তু আজ আর আমি তার কেউ না। দেখতে বেশ সুন্দরী—বয়স হবে পনের কি ষোলো। খুব গুণবতী। বাপের মৃত্যুর পর লণ্ডনেই ও ঘরবাড়ী করে নিয়েছে। সেখানেই থাকে এক জন মহিলার কাছে—যিনি তার লেখাপড়ার তদারক করেন।’

অনেক বিবৃতি, অনেক রকম আলোচনা-আলোচনার পর আবার এলিজাবেথ ফিরে আনে পূর্ব প্রশ্নে।

—‘আশ্চর্য, মিঃ বিংলার সঙ্গে ওর এত ঘনিষ্ঠতা কিসের! বিংলার মত এমন সাদা মন, সদালাপী লোক কেমন করে যে ওর বন্ধু হোল! মিশ খায় কেমন করে? আপনি চেনেন মিঃ বিংলেকে?’

—‘না তো—’

—‘খুব ঠাণ্ডা মেজাজী, ভদ্র, স্নিগ্ধ স্বভাবের মানুষ। ডার্লি যে কি প্রকৃতির লোক তিনি জানতেই পাবেন না।’

—‘হয়ত জানেন না। ডার্লি যেখানে যেমনটা দরকার মন ছুগিয়ে চলতে জানে। ওর তো গুণের অভাব নেই। যদি দরকার বোধ করে ওর মত অসাধু লোক একটাও পাওয়া বাবে না। সমস্পৃষ্টদের দলে সে স্বেরকম, কম বিত্তশালীদের মধ্যে ঠিক তার বিপরীত। দান্তিকতা কোন সময়েই তাকে পরিত্যাগ করে না। ঘনিষ্ঠদের মহলে সে মুক্তহস্ত, জ্ঞানপরায়ণ, অকপট, বিচার-বুদ্ধিমান—বিচুটা প্রীতিময়ও বটে। অর্থও চেহারাও অতি সজ্ঞান দৃষ্টি থাকে।’

তাদের আড্ডার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়রা এসে অল্প টেবিলে সমবেত হোল। কলিঙ্গ এসে কাঁড়াল এলিজাবেথ আর মাসির মাঝখানে।

কলিঙ্গের পর-পর লেডী ক্যাথারিনের উল্লেখ সচকিত হয়ে কলিঙ্গকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে উইকহাম নীচু গলার এলিজাবেথকে প্রশ্ন করল, তার এই আত্মীয়টি ব্যর্থ পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ কি না।

—‘লেডী ক্যাথারিন সম্প্রতি ওর গ্রামাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কি সূত্রে লেডী ক্যাথারিনের সঙ্গে পরিচয়, জানি না—তবে পরিচয়টা খুব বেশী দিনের নয়, নিশ্চয়।’

—‘জানেন তো লেডী ক্যাথারিন তা ব্যর্থ জার লেডী এ্যানি ডার্লি ছ’বোন। অর্থাৎ তিনি ডার্লির মাসিমা।’

—‘এ কথা জানতাম না তো! লেডী ক্যাথারিনের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনি নি কখনো। কালকের আগেও তার অভিজ্ঞের কথা জানতাম না।’

—‘ডার্লি আর মিস ম্য বার্গের বিষয়ে দুই সম্প্রতি এক হবে।’

এ কথা শুনে বিংলার বোনের কথা ভেবে হাসি পেলে এলিজাবেথের। ডার্লির প্রতি তার এত মনোযোগ, তার বোনের প্রতি এত স্নেহ-মমতা সব ব্যর্থ হবে—সত্যিই যদি ডার্লির স্বপ্ন অজ্ঞান বাধা পড়ে গিয়ে থেকে থাকে।

—‘কলিঙ্গ তো লেডী ক্যাথারিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তিনি লেডী ক্যাথারিন সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন তাতে আমার ধারণা, অতি কৃতজ্ঞতা-বোধই তার বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে আছে। তার আশ্রয়দাতা হলেও লেডী ক্যাথারিন অতি দান্তিক মহিলা বলেই আমার বিশ্বাস।’

—‘আমারও তাই ধারণা। বহু দিন তাঁকে দেখিনি কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, তাঁকে আমি কোন দিনই পছন্দ করতুম না। তাঁর চাল-চলন ছিল অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও প্রভুত্ব-প্রয়োগী। স্মৃত্তরা ও নৃশূন্য বুদ্ধিমত্তা বলও নাম আছে তাঁর। আমার মতে তাঁর এই গুণাবলী কিছুটা তাঁর পদস্থানাও সৌভাগ্য এবং কিছুটা তাঁর প্রভুত্বপ্রিয় আচরণ-সঙ্গাত। আর বাকিটা তিনি পেয়েছেন তাঁর ভাগ্যের অসম্বিক-বোধ থেকে, যার ধারণা তাদের সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের প্রথম শ্রেণীর বিচার-বুদ্ধি থাকা দরকারে।’

এলিজাবেথের নিকট উইকহ্যামের প্রতিটি কথাই বুদ্ধিসঙ্গত মনে হোল। খাওয়ার আগে পূর্বস্ত্র এই ধরণের ঘনিষ্ঠ আলোচনা চলল দু’জনের মধ্যে। তার পর পাওয়ার টেবিলে বসে নানা কোলাহলের মধ্যে আর কোন কথা হোল না বটে, কিন্তু এলিজাবেথের মন-প্রাণ উইকহ্যামের চিন্তাক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। উইকহ্যামের কথা ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতে পারছিল না সে। উইকহ্যাম যা-যা বলেছে সে কথাই ভাবতে ভাবতে চলল সারা পথ। লিডিয়া, কলিন্সও এক যুহুত নীরব ছিল না। লিডিয়া নিববচ্ছিন্ন বকে চলেছে তার লটারীর টিকিট সম্বন্ধে—কিস খেলার কত হয়েছে, কত ভিতেছে। কলিন্সের কলিপ্স দম্পত্যের সৌজস্যের প্রশংসা, খেতে বসে ক’ প্রেট উড়িয়েছে, সের আড্ডায় যা হেরেছে তার জন্ত মোটেই দুঃখিত নয়—প্রভৃতি সম্বন্ধে এত কথা বলার ছিল যে, সব শেষ করার আগেই গাড়ী পৌঁছে গেল লংবর্থে।

### সতেরে।

উইকহ্যামের সঙ্গে তার যেটুকু পরিচয় ঘটেছিল তার বৃত্তান্ত বললে এলিজাবেথ তার দিদির কাছে। সব শুনে জের বিমিত হোল যেমন উদ্ভিগ্ন হোল তেমনি। ডাসি বিংলার স্বামীর যে এমন ধারা অপমান করবে; এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করবে সে। অথচ উইকহ্যামের মত এমন অমায়িক ছেলের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করার মত স্বভাবও নয় তার। সহজ ভাবে যার কারণ নির্ণয় করা যায় না, তাকে ‘ভুল বোঝা’ বা ‘দৈব দুর্ঘটনা’ বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলে সে। বললে—‘ওরা দু’জনেই একটা কোথাও ভুল করেছে বা আমরা কেউ জানি না। স্বার্থান্বেষীরা এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম লাগিয়েছে। উভয় দিক থেকেই হস্ত সত্যিকার দোষের কারণ না থাকা সত্ত্বেও ঘটনা-পরম্পরার ওদের মন ভেঙ্গেছে। কিন্তু কিসে, তা আমাদের পক্ষে জানা অসম্ভব।’

—‘তা নয় সত্যি হোল, কিন্তু স্বার্থপর লোকদের হাদের এতে হাত আছে বলছ, তাদের স্বপক্ষেও কি কিছু বলার নেই? হয় একদম সব বাজে বলে উড়িয়ে দিতে হবে, নয় ত কাকুর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করতে হতেই।’

—‘যত খুশী হামতে পারি, কিন্তু হেসে আমার মত পালটাতে পারবে না। বাবার প্রিয়পাত্র যে—যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবা ব্যবস্থা করে গেছেন, তার প্রতি এ রকম আচরণের দ্বারা ডাসি’ কি নিজেই অত্যন্ত অপমানকর অবস্থায় টেনে নামাবে না? যার সামগ্রিকতম মনুষ্যত্ব বোধ আছে, যার চরিত্র বলে কিছু আছে—সে কখনই এ রকম কাজ করতে পারে না। তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা তার সম্বন্ধে কি এমন নৈরাশ্রজনক ভাবে প্রভাবিত হতে পারে? না, না—তা কখনই হতে পারে না।’

—‘মিঃ বিংলেকে সহজে প্রভাবিত করা যায় বিশ্বাস করতে রাজী আছি, কিন্তু উইকহ্যাম কাল রাতে নিজের সম্বন্ধে অকপট বা বলেছে তা যে সর্বৈব মিথ্যা এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই আমি। সত্যি না হলে প্রতিবাদ করক ডাসি।’ তা ছাড়া তার মুখে সততার স্পষ্ট ছাপ ছিল।’

—‘সত্যি, ভারী বিস্ত্রী এটা। কী যে ভাবা যায়!’

—‘মাপ করতে হোল, কি ভাবতে হবে সবাই জানে।’

—‘তবে একটা বিষয় স্পষ্ট ভাবতে পার যে, বিংলেকে যদি সত্যি প্রভাবিত করা হয়েছে থাকে সব জানাজানি হয়ে গেলে সত্যিই তা অশ্রুি দুঃখের হবে তার পক্ষে।’

তারা দু’জনে বনন কুঞ্জ মধ্যে বসে এষ্ট ধরণের কথা-বলাবলি করছিল তাদের ডাক পড়ল—কারণ হাদের সম্বন্ধে তারা আলোচনা করছিল তাদেরই এক জন এসে উপস্থিত হয়েছে দেখানে। বিংলে আর তার বোন এসেছে বহু-প্রত্যাশিত বস-নাচের নিমন্ত্রণ জানাতে। আগামী মঙ্গলবার দিন স্থির হয়েছে। পূর্বোক্ত বন্ধুর সাথে আবার দেখা হওয়ার দুই বোন খুশী হোল, বললে—শেষ দেখা-সাক্ষাৎের পর প্রায় এক বৃগ কেটে গেছে। তারা চলে আসার পর কি করেছে সে এত দিন, বারে বারে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। পরিবারের অন্তঃস্বদের প্রতি কোন মনোযোগই দেখাল না তারা। মিসেস্ বেনেটকে যত দূর সম্ভব এড়িয়ে গেল—এলিজাবেথের সঙ্গে মাত্র দু’-একটি কথা-বিনিময় করলে, আর বাকি সকলের সঙ্গে কোন কথাই বললে না। তার পর আসন ছেড়ে উঠে এমন তাড়াতাড়ি চল গেল ভাই-বোনে যে, এরা সবাই বিষয়ে অবাক হোল। ভাবখানা যেন মিসেস্ বেনেটের আদর-অপায়ন এড়াতেই সরে গেল তারা।

নেদারফিল্ডে বস-নাচের সংবাদ শুনে মেডেরা প্রত্যেকেই খুব খুশী হোল। মিসেস্ বেনেট তো এটাকে তার বড় মেয়ের সৌজস্যই ঘটেছে বলে মনে করলেন। নিমন্ত্রণ-চিঠির বদলে বিংলে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে নিমন্ত্রণ করায় নিজেই তিনি হুগ মনে করলেন। দুই বন্ধুর সাহচর্যে ও তাদের ডায়েরী দেখাও মনোযোগে সন্ধ্যা কাটানোর মধুর স্বপ্ন আচ্ছন্ন করল জেনকে—এলিজাবেথ উইকহ্যামের সাথে যত খুশী নাচতে পারবে আর যা-যা শুনেছে ডাসির মুখে-চোখে—আচরণে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ভেবে হর্ষাংফুল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্যাথারিন আর লিডিয়ার আনন্দ কোন ব্যক্তিবিশেষকে বা কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়—যদিও এলিজাবেথের মত উইকহ্যামের সঙ্গেই বৈশিষ্ট্য নাচবে তারা, তবুও উইকহ্যামই একমাত্র নাচিয়ে নয় যে, তাদের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ করতে পারবে! আর বস-নাচ, বস-নাচই। এমন কি মেরী পর্যন্ত আনন্দে মেতে উঠল—তারও যে আগ্রহের অভাব নেই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করল সবাইকে। —‘সকাল বেলাটা নিজের কাজ করতে পারব এই যথেষ্ট—মাঝে মাঝে বিকেল বেলা কাকুর সঙ্গে দেখা-তলা করা মন্দ কি! সমাজেরও তো দাবী আছে প্রত্যেকের উপর। মাঝে মাঝে কাজের কীকে আমোদ-প্রমোদের দরকার, সে আমি বিশ্বাস করি।’

এলিজাবেথ এতই উত্তেজিত হয়ে পাড়িছিল যে, যদিও সে অনাবশ্যক কথা বলে না—কলিন্সের সঙ্গে তবুও আজকে সে জিজ্ঞাসা না করে পারলে না যে, সেও বিংলের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে কি না। হণ করলেও বিকেলের নাচে যোগ দেবে তো? কিন্তু এলিজাবেথকে

বিব্রিত করে জানাল কলিল, নাচে যোগদানে তার কোনই আপত্তি নেই—নাচে যোগ দিলে আর্চ' বিশপ বা লেডী ক্যাথারিন কেউই তাকে নিন্দা করবেন না। বললে সে— 'সুখী জনের উদ্দেশ্যে সন্তোষের চরিত্রবান যুবক কতৃৎ প্রযোজিত নাচের মজলিসে খারাপ কিছু থাকতে পারে না। নাচে আমার আপত্তি নেই—তাঁছাড়া সেদিন সন্ধ্যায় আমার সব ক'টি স্ত্রী বোনের সঙ্গে নাচের সৌভাগ্য হবে। এই স্ত্রী-যোগে প্রথম দু'টি নাচ তোমার সঙ্গে নাচার অমুমতি চাইছি এলিজাবেথ। আশা করি, জেন এর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করবে—এর দ্বারা যে তার প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ করা হয়নি বুঝতে পারবে নিশ্চয়ই।'

এ প্রস্তাব এলিজাবেথকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে দিল। উইকহামের সঙ্গে নাচের প্রস্তাব করেছে সে, আবার এখন তার বদলে কলিল! এমন কঠোর পরীক্ষার তাকে আর পড়তে হয়নি কখনো। তাদের স্নেহের দিনগুলিকে জোর করে আরো কিছু কালের জন্য দূরে ঠেলে সরিয়ে রাখতে হবে। অতি ভক্ততার সাথেই সে গ্রহণ করল কলিলের প্রস্তাব। কলিলের গ্যালাটি যে তাকে খুশী করেছে তা নয়। এই তার প্রথম মনে জাগল তার বোনের মধ্যে তাৎক্ষণিক হ্যাঙ্গার্ড পারসনেরের কত্রী নির্গাচিত করা হয়েছে। এই ধারণা ক্রমশঃ চূড়মূল হতে লাগল যতই, তার প্রতি কলিলের সৌজন্য, মনোযোগ প্রকাশও বাড়তে লাগল। প্রায়ই সে এলিজাবেথের বুদ্ধি ও সঙ্গীতাত্মক অল্পশ্রু প্রশংসা করতে লাগল। মাও জানালেন, শীগগিরই তাদের চ'জনের তাত এক হলে খুব খুশী হবেন তিনি। এলিজাবেথ এ ইংগিত গ্রাহ্যের মধ্যেই নিলে না। কিন্তু এখন প্রতিবাদ করতে গেলেই ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি হবে। কলিলের পক্ষে এ প্রস্তাব করা আত্মপরা—তবুও করেছে সে। কাঙ্ক্ষেই এখন বিবাদ বাপান বুধা।

নেদারকিল্ডে বল-নাচের ব্যবস্থা যদি না হোত, কনিষ্ঠ তনয়াদের অবস্থা হয়ে উঠত অতি করুণ—কারণ আত্মজ্ঞানের দিন থেকে বল-নাচের দিন পর্যন্ত সেই যে অস্বাস্থ্য বারিবর্ষণ শুরু হয়েছে তার আর বিরাম নেই। মেবীটনে হেঁটে যাওয়াও অসম্ভব। না মাসিমা, না অফিসাররা, না কোন মুখরোচক সংবাদ-সন্দেশ। এলিজাবেথের দৈর্ঘ্যবও অগ্নি-পরীক্ষা হোত। উইকহামের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর করে তোলার আর স্ত্রী-যোগ ঘটেনি। মজলবাসের নাচের আয়োজন ছাড়া অন্য আর কিছুই শনিবার, রবিবার, সোমবারকে কিটি বা লিডিয়ার কাছে এমন প্রীতিদায়ক করে তুলতে পারত না।

### আঠারো

নেদারকিল্ডের ডব্লিং-ক্রমে সমবেত সৈনিকদের লাগ পোষাকের ভিড়ের মধ্যে উইকহামকে খুঁজে বের করার মধ্যে চেষ্টা করার আগের যুহুত' অবধি একবার সন্দেহ হয়নি এলিজাবেথের যে, সে হয়ত নাও আসতে পারে। যে সব কারণে উইকহামের পক্ষে এ আলসের আসা দুঃস্থ হয়ে উঠতে পারে, সেগুলি একবারও মনে পড়েনি তার। আজ সে পরিপাটি করে সেজেছে। উইকহামের চিত্তের যে ক'টি নিতৃত লোক অজ্ঞেয় আছে আজ-সন্ধ্যা বেলার অবসরে সেগুলির কতৃৎ নেবার অভিসন্ধি নিয়েই এসেছিল এলিজাবেথ।

ডার্সির নিরুদ্দেশ আনন্দের জন্য বিলে যে ইচ্ছা করে উইকহামকে নিমন্ত্রণ-তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এই জঘন্য সংশয় তার মনকে পলকের জন্য বিধ্বস্ত করে তুলল। বন্ধু ডেনির কাছে লিডিয়ার মারফৎ সে খবর পেল যে, বিশেষ জরুরী কারণে সমবে গিয়ে উইকহাম গত কাল। আজও ফেরেনি।

ডেনি তাকে স্মৃতিত হেসে জানাল—'ইচ্ছা থাকলে সে সহরে যাওয়া পিছিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এই আসর থেকে সে যেচ্ছায় নির্ধারন নিয়েছে।'

যতটুকুই হোক ডার্সি'ই মূল কারণ আজকের সন্ধ্যায় উইকহামের অনুপস্থিতির। এই বিস্তীর্ণ চিন্তা এলিজাবেথের সমস্ত সন্ধ্যা ততো করে দিল। কোন অভ্যুত্থানেই আজ সে ডার্সির সঙ্গে ব্যাক্যালাপ করবে না প্রতিজ্ঞা করলে মনে-মনে। তার ফলে সপাহাত্ম্যর বিংলার সঙ্গে আলাপও সে মনের মাদুরীভ্রষ্ট হোল।

কিন্তু এলিজাবেথের মত মেয়ের গোমরা মূখ থাকে স্বভাব-বিকল। বান্ধবী লুকাসের কাছে সে নিজের দুঃখকে বিবৃত করে অনেকখানি হাল্কা বোধ করলে। মনের মধ্যে আনন্দ প্রোত কল-মুখের কবচ ভেঙে অবিরাম ধারার বইতে লাগল আবার। কিন্তু প্রথম দু'টি নাচ হোল যখন, তখন তার মন দ্বিতীয় বার ভেঙে পড়ল। কলিলের কাছে প্রতিজ্ঞা দিওয়া ছিল আগেই। স্তব্ধতার তারই নৃত্যসঙ্গিনী হতে হোল অনিচ্ছায়। কলিল এমন অসভ্যের মত নাচে যে, রাগে-দুঃখে এলিজাবেথের কাঁদতে ইচ্ছা হোল। যে যুহুত' সে ছাড়া পেল মুক্তির নিখাস কেলে বাঁচল যেন।

তৃতীয় নাচে সে সঙ্গী পেল এক জন অফিসারকে। তার কাছে উইকহামের তদন্ত তুলে সে জানতে পারলে যে, মাদুরটিকে সৈনিক সমাজে সবাই খুব প্রশংসা করে। নাচ শেষ করে বান্ধবী লুকাসের কাছে বসে গল্প করছিল এলিজাবেথ—এমন সময় ডার্সি তাকে চকিত করে দিয়ে সহাত্ম্য আমন্ত্রণ করলে তার সঙ্গে নৃত্যসঙ্গিনী হতে। এই ঘটনার আকস্মিকতায় এলিজাবেথ কেমন যেন বিহ্বল হয়েই ডার্সির আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। ডার্সি সানন্দে বিদায় নেবার পর এলিজাবেথ রেগে উঠল নিজের অবিস্ময়াকারিতায়। কিন্তু লুকাস তাকে সাহসনা দিল—'দুঃখ করিস না ভাই, মাদুরটিকে তোর খারাপ লাগবে না দেখিস।'

—'ওকে আমি ঘুণা করি। ভাল লাগা আমার পাপ।'

যখন ডার্সি এসে আবার পাঁড়াল নাচ আরম্ভের পূর্ব যুহুত', কানেকানে লুকাস তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, রাগের বেশ এলিজাবেথ ফেন এমন কিছু না করে যাতে সে ডার্সির চোখ ছোট হয়ে যায়। উইকহামের চেয়ে ডার্সি' অন্ততঃ দশ গুণ স্তম্ভ্র তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু ডার্সির সঙ্গে নাচের আসর নামার সঙ্গে সঙ্গে এলিজাবেথ যেন নতুন বিশ্বর বোধ করল। প্রত্যেকটি নর-নারী তাকে ভাগ্যবতী মনে করে অপর্যায় দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে তাকে। হুঁজনে নীরবে নাচ শুরু করল। এলিজাবেথ ভেবেছিল দু'টি নাচ সে এমন নিঃশব্দেই কাটিয়ে দেবে নৃত্য-ছন্দে। কিন্তু মনে তার করুণা হোল। এত বড় শাস্তি কি করে দেব সে সঙ্গীকে! তাই অনেকটা কুপাভ্যেই সে নাচ সবুকে ছোট একটু মস্তব্য করলে। ডার্সিও ছোট উত্তর দিয়ে ক্ষান্ত হোল। বাধ্য হয়ে এলিজাবেথ বললে—'আমি নাচ দিয়ে শুরু করেছিলাম



প্রথম। এবার আপনার পালা কথা বলার। যা হোক কিছু বলুন।’

—‘নাচের তালের সঙ্গে মিলিয়ে কি কথা বলেন আপনি?’

—‘না বলে থাকায় কি? পুরো আধ ঘণ্টা নীরবে কাটান কি করে হয় আমিও ভেবে পাছি না।’

—‘নিজে চাইছেন আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন করছেন বুঝলাম না।’

—‘সে কথা নিজ মুখে কি বলব বলুন?’

কতক্ষণ আবার চুপচাপ চসল নাচ। তার পর ডার্সি জিজ্ঞাসা করল যে ওরা প্রায়ই মেরোটনে আসে কি না। জবাবে এলিজাবেথ সাই দিল। বললে—‘সেদিন যখন পথে আপনার সঙ্গে দেখা হোল, তখন আমার একটি নতুন বন্ধু পেয়েছিলাম।’

ডার্সির সারা মুখে একটা গর্বিত ভাব নেমে এল। কিন্তু কোন সাড়া দিল না সে। আর নিজের দুর্বলতার প্রকাশে এলিজাবেথ মনে মনে কুঠা বোধ করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ডার্সি কথা কটিলে।

—‘উইকহ্যামের মধুর ব্যবহার অনেককেই তার বন্ধু করে তোলে। কিন্তু বন্ধুর রাখার ক্ষমতা তার কতখানি সে বিষয়েই আমার সন্দেহ।’

—‘তার নেহাৎটু দুর্ভাগ্য যে, আপনার বন্ধু তিন হারিয়েছেন—’বললে এলিজাবেথ জোর দিয়ে—‘আমার মনে হয়, সারা জীবন তার জন্য তাকে দুঃখ পেতে হবে।’

এই সময় তার লুকাস ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাওয়ার জন্য এসে উপস্থিত হলেন। ডার্সিকে দেখে সাগ্রহে সম্ভাষণ করে বললেন—‘আশ্চর্য সন্দের আপনার নৃত্যভঙ্গি মিঃ ডার্সি! আর যে মনোহর সঙ্গিনীটি পেয়েছেন তার জন্যও আপনাকে প্রভুত দীর্ঘা করি আমি। এমন সুগল মিশন কণাটিং চোখে পড়ে। যাক, বিরক্ত করতে চাই না আর আমি। সানন্দে পান করুন রমণীর আখি-সুধা যা দেখে আমার নিজেরই পিপাসা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।’

ডার্সি নাচের মধ্যেই তাঁকে প্রতি-অভিবাহন জানালে। তার পর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বললে—‘কি বিষয়ে কথা হচ্ছিল ভুলে গেলাম। স্মৃতিটা ধরিয়ে দিলে বাধিত হবে।’

একথা সেকথার পর এলিজাবেথ বললে—‘কি আশ্চর্য আপনার চরিত্র! আমার তো মনে হয় নিজের মতামত আপনি দৃঢ় হাতে আঁকড়ে থাকেন চিরকাল, তাই না?’

—‘সত্যিই তাই।’

—‘কিন্তু কেন? এতে নিজের ক্ষতিই হয় না? যদি আপনার বিচার ভ্রান্ত হয়?’

—‘আপনি কি বলতে চাইছেন আমি ঠিক ঠাঠর করতে পারছি না মনে হয়?’

—‘আপনার মানসিক গঠনটা বুঝে নেবার চেষ্টা করছি; এই মাত্র।’

—‘কিন্তু কেন?’

মাথা নাড়াল এলিজাবেথ। ‘আপনার সম্বন্ধে এত বিরুদ্ধ মতামত শুনি যে, তার মধ্যে সত্য আবিষ্কার করতে পারিনি আজও।’

—‘সে কথা সত্যি। লোকে আমার সম্বন্ধে কত বিভিন্ন ধারণাই না পোষণ করে। কিন্তু মিস্ বেনেট, আপনি অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন না।’

—‘কিন্তু এখন যদি আপনার চরিত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা না সঞ্চারিত হয়, আর হয়ত কোন দিন তার সুযোগ হবে না।’

—‘আপনাকে আমি কোন দিন বঞ্চিত করব না’—বলে ডার্সি বিদায় নিল তার কাছে।

কিন্তু এই মেরোটির প্রতি মনের কোণে একটা মোত ছিল, যার ফলে এর উপর কোন বিভ্রান্তির ভাব সে পোষণ করতে পারলে না। কখন অজ্ঞাতে তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল তৃতীয় ব্যক্তির উপর যে আজকের আসরে অনুপস্থিত ছিল।

এলিজাবেথ গিয়ে আসন নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বিংলার বোন এসে তার পাশে বসল। বিনা ডুমিকার সে বললে—‘এই মাত্র জেনের কাছে শুনছিলাম যে তুমি না কি উইকহ্যামের প্রতি একান্ত মনোযোগী হয়েছ। এ অবস্থা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। উইকহ্যাম ছেলেটি ভালই। সে বোধ হয় আত্ম পরিচয় দেবার সময় তোমায় বলতে ভুলেছে যে, ডার্সির পিতার এক কর্মচারীর ছেলে সে। তোমার বাকবী হিসেবেই তোমায় একটু সহকর্মে দিচ্ছি তাই যে, তার কথার অবধা মূল্য দান করো না। ডার্সি যে তাকে বঞ্চিত করেছে এ একেবারে মিথ্যে। ডার্সিকে আমার চেয়ে কেউ ভাল করে জানে না। বরং উইকহ্যামই ডার্সির সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আজকের জনসায় তাকে নিমন্ত্রণ করতে হতই, কিন্তু ভালই হয়েছে যে, এমন সামাজিক উৎসবে সে নিজেই সরে পাড়িয়েছে। আমার কাছে তার এখানে আসাটাই কেমন ঔদ্ভত্য বলে মনে হয়। অবশ্য তার দোষও দিই না আমি। যেমন বংশে জন্ম তেমন তো আচরণ হবে মানুষের।’

এলিজাবেথের মুখ রাগে আগুন হয়ে উঠল—‘তোমার আক্রোশ হোল যে, সে মিঃ ডার্সির পিতার কর্মচারীর ছেলে, এই ত। তার বংশ আর তার অপরাধ দুইই এক পর্যায়ে পড়ে তোমার মতে। সে কথা সে আমার কাছে একবারও গোপন করেনি।’

ঘৃণার ভাব দেখিয়ে বিংলার বোন উঠে গেল। যাবার সময় বলে গেল—‘আমায় মাপ করো তাই। আমি তোমার ভালোর জন্যই বলতে এসেছিলাম। আর কিছু নয়।’

খুঁজে বের করল জেনকে ভিড়ের মধ্যে এলিজাবেথ। আজ সন্ধ্যায় যে অচিন্ত্য আনন্দ পেয়েছে, তারই বিকশিত প্রভা জেনের মুখে। এলিজাবেথ দেখে পরম পরিতৃপ্ত হোল। একবার ভাবলে, আজকের এই সুখের স্মরণে তৃতীয় ব্যক্তিদের রেযারেষির ব্যাপার নিয়ে সে কেটে দেবে না। কিন্তু না বলেও থাকতে পারলে না। হাসিমুখে সে দিদিকে বললে—‘কি গো মেয়ে! উইকহ্যাম সম্বন্ধে কিছু খবর পেলে না কি! নিজের মায়াটিকে নিয়ে সব ভুলে আছ?’

—‘না ভুলিনি’, বললে জেন—‘ভুলি নি গো। তবে তেমন কিছু খবরও পাইনি। যা-কিছু শুনলাম ওর মুখে, ওর বোনেরও মুখে। তাতে মনে হয় উইকহ্যাম ছেলেটি খুব ভাল নয়। ডার্সির সঙ্গে বধোচিত ব্যবহার করেনি। ডার্সির ভালবাসা সে নিজের দোষেই খুঁচিয়েছে।’

—‘মিঃ বিংলে কি তাকে চেনে?’

—‘সে দিনের আগে তার কখনো দেখেও নি।’

—‘তা ত বুঝলাম। কিন্তু সম্পত্তির ব্যাপার কি শুনলে?’

—‘সে, ও মানুষটি জানে না। তবে ডার্সির কাছে শুনেছে যে উইকহামের টাকা পাওয়া সত্যসাপেক্ষ ছিল।’

এলিজাবেথ তবু যেন নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। বললে—  
‘যাই হোক, ব্যাপারটা খোলসা হোল না মোটেই। কার কথা কতখানি সত্যি বোঝা গেল না। দেখা যাক।’

তার পর দুই বোন আজকের সন্ধ্যার মধুর অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। বিংলে যে স্নিগ্ধ অহুত্ব জাগিয়েছে তার মনে, সে কথা সবিস্তারে বলল জেন বোনকে। গভীর তৃপ্তির ভাব তার মুখে দেখে এলিজাবেথেরও সংশয় বইল না যে এই দু’টি প্রাণী বীরে বীরে একান্ত হয়ে উঠেছে।

এমন সময় কলিন্স এসে তাদের আলাপে বিঘ্ন ঘটালে। সে এসেই সদর্পে জানাল যে, এই ভ্রম জনসমাবেশে সে তার এক পরম প্রিয়জনের সাক্ষাৎ পেয়েছে। জেডী ক্যাথারিনের ভায়ে যে এখানে এসেছে তা আগে জানলে কখন গিয়ে সে তার সঙ্গে আলাপ করে তার আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে ফেলত।

এলিজাবেথ তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে। ডার্সি হয়ত এই অনাহুত আত্মীয়তার ভঙ্গীকে শুদ্ধিভূত দেখবে না, এ সন্দেহ প্রকাশও করলে সে, কিন্তু কলিন্স তার স্বভাব-স্বত্ব উল্লাসিক চালে বললে—‘তোমার বিচ্ছিন্নতা ও বিচারক্ষমতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই জানাচ্ছি যে, আমার বিবেকের নির্ধারিত পথেই আমার চলতে হয়, কেন না আমার ধর্মপথের যাত্রী। যে শিক্ষা ও ধর্মশাসন আমাদের চরিত্রের অঙ্গ তার নিদেশেই তোমাকে জানাচ্ছি যে, তোমার মত অনভিজ্ঞ রমণীর বুদ্ধিচালিত হওয়া আমার পক্ষে গভীর লজ্জাকর।’

কলিন্স গভীর ভাবে এগিয়ে গিয়ে ডার্সিকে অভিধান করল। এলিজাবেথ দূর থেকে তাদের দু’জনের ভঙ্গী নিরীক্ষণ করে মনে মনে কৌতুক অহুত্ব করতে লাগল। ডার্সির প্রথম বিশ্বাস কাটাবার পর কলিন্স যখন দ্বিতীয় বার বক্তৃতা শুরু করেছে তখন কি এক অহিলায় ডার্সি তাকে ছোট একটু অভিধান জানিয়ে বিদায় নিয়ে অস্ত্র দিকে চলে গেল। কলিন্স প্রথমটা হতবুদ্ধি হলেও তার অহমিকা সে ছাড়ল না। তেমনি মর্পের সঙ্গেই এসে জানাল যে, লোকটি অতি চমৎকার। এমন মিষ্ট সঙ্গায়ণ ও আদব-কায়দা যে, অত বড় মহীয়সী মহিলায় যোগ্যই বটে।

আহারের টেবিলে বসল সবাই। প্রিবেন্সী লুকাস-গিন্নীর সঙ্গে জেনের ভবিষ্যৎ সংসার সংক্ষেপে গল্প জমিয়েছেন মা সরবে। এই মেয়েটিকে যদি বিংলের মত অভিজ্ঞতার ঘরে গৃহিণী করে পাঠাতে পারেন, তবে তাঁর অস্ত্র মেয়েগুলিরও ভবিষ্যৎ সমুজ্জল। কেন না, এত বড় ঘরে জামাই করতে পারলে দেশের অস্ত্রাস্ত্র বড় ঘরেও তিনি একে একে অস্ত্র মেয়েগুলিকে প্রেরিত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস তার হোল জানা। লুকাস-গিন্নীকেও তিনি শুভেচ্ছা জানালেন যে, তার মেয়েও যেন অমনি বড় ঘর-বর লাভ করে। যদিও মনে মনে তিনি ছিন্ন জানেন, সে-সম্ভাবনা তাঁর প্রতিবেশিনীর কপালে নেই।

বুধাই এলিজাবেথ তাকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। অন্ততঃ নিয়কর্ত্তে তাঁর আলাপ চালিয়ে যাবার জন্ত বার বার মিনতি করল। তাদের বিপরীত দিকেই ডার্সি বসে যে মায়ের বাক্য-বিচারের অধিকাংশ শুনছে, এ তার কাছে বীজমিত বিরক্তিকর বোধ হতে লাগল। মা তাকে উল্টে ভৎসনা করলেন—‘ডার্সির কানে যাচ্ছে, তাতে দোষ হয়েছে কি? ডার্সির কাছে আমাদের এমন কিছু বাধ্য বাধকতা নেই যে, তার কানে বিষ ঠেকতে পারে এমন কথা বলা আমাদের অস্ত্রায়। তুমি চূপ কর বাছা।’

—‘চূপ কর মা। ডার্সিকে ক্ষুব্ধ করে আমাদের লাভই বা কি? তার কাছে ছোট হলে যে তার বন্ধুত্ব বিরাগের কারণ হবে আমরা।’

কিন্তু মায়ের উচ্ছৃঙ্খিত বাক্য-প্রবাহকে রোধ করার ক্ষমতা ছিল না তার। যতক্ষণ না তাঁর নিজের ক্লাস্তি এল ততক্ষণ তিনি একবারও থামলেন না। এলিজাবেথ বসে বসে লক্ষ্য করলে, লুকাস-গিন্নী এক সময় ক্লাস্ত হয়ে উঠলেন। অপরের সৌভাগ্য উদয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে এক সময় তিনি হাই তুলে আহায়ে পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করলেন। তার পর মাও চূপ করে গেলেন।

কিন্তু এলিজাবেথের আজ মানসিক স্বস্তি বার বার খণ্ডিত হতে লাগল। মেরী উঠল গান করতে। তার গলা গান কিছুই এত বড় আসরের উপযুক্ত নয়। তবু সে অক্ষম সামর্থ্য নিয়ে এতগুলি লোকের আনন্দবর্ধনের দায়িত্ব নিলে। এলিজাবেথের এত হজ্জা করছিল যে, দ্বিতীয় গানটির পথেই সে বাবার দিকে তাবাল মিনতির চেষ্টা। মিঃ বেনেট এই বুদ্ধিমতী কস্তাটির অভিলাস বুঝলেন—‘চমৎকার হয়েছে মা মেরী। এবার অস্ত্র সব সমাগতা মেরেনের গাইতে দাও। তোমার পালা এখন শেষ।’

পিতার এই বক্তৃতায় মেরী হতচকিত হয়ে গেল প্রথমটা। তার পর গানের টেবিল থেকে সরে গেল। মেরীর জন্ত এমন দুঃখ লাগল এলিজাবেথের।

কিন্তু বেনেট-পরিবারের সুনামকে বিনষ্ট করার যড়যন্ত্র করেছিল যেন আজ সবাই। হঠাৎ কলিন্স উঠে পাড়িয়ে অনাহুত ভাবে উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করে দিল—‘আমি যদি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হতাম, এমন সুরাঙ্ক একটি সামাজিক সম্মেলনে সমবেত নরনারীকে আনন্দ পরিবেশন করার জন্ত গান করতাম নিশ্চয়ই। সঙ্গীত এক নিষ্পাপ আনন্দ। এ কথা অবশ্য বলি না যে, গান বাজনার অধিক কালক্ষেপ করা শোভন, কেন না মানুষকে নানা কতব্যে ব্যাপৃত থাকতে হবেই। বিশেষ করে এক জন ধর্মযাজকের পক্ষে এ কথা আরো বেশী বাস্তব, বেশী সত্য।’ বেশ দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে ডার্সিকে অভিধান জানিয়ে কলিন্স ক্ষান্ত হোল।

সেদিনের সন্ধ্যা এলিজাবেথের কাছে কোন কারণেই রমণীর হয়ে উঠল না। বিদায় নেবার কালে ডার্সি নিশ্চয়ই তাদের লক্ষ্য করল মাত্র। জেন ও বিংলে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে পাড়িয়ে গল্প করছিল। আজকের সন্ধ্যাটিতে তারা পূর্ণস্বপ্নের স্বপ্নের কাছাকাছি আসতে পেরেছিল, মনে হোল এলিজাবেথের।

যাবার সময় মা বিংলেকে বিশেষ ভাবে অহুত্ব করলেন যে, সামাজিকতার বালাই মা রেখে সে যেন অতি অবশ্য এক দিন

তাদের বাড়ীতে এসে আহার করে। বিংশ শতাব্দীর চিত্রে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। বিশেষ কাজে তাকে ধুওনে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে ফিরেই সে সানন্দে এক দিন উপস্থিত হবে বেনেট-পরিবারের ভোজন-পর্বে অংশ গ্রহণ করতে।

মায়ের আর ভূক্তির শেষ রইল না। অন্ততঃ তিন-চার মাসের মধ্যেই তিনি নেদারফিল্ডের এই বাড়ীতে তার মেয়েকে স্ত্রীপ্ৰতিষ্ঠিত দেখতে পাবেন। তাঁর আর একটি কন্যাও যে কলিঙ্গের সঙ্গে বিবাহিত হবে এও তাঁর পরম আশঙ্ক্যের কথা। তাঁর সব মেয়েদের মধ্যে এলিজাবেথের প্রতি তার স্নেহ কম? তবু সে যে কলিঙ্গের মত পাত্রের হাতে পড়বে এও তাঁর কাছে ভালই মনে হোল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রইল যে, আর সব তাঁর কাছে পরিগণ্য হয়ে গেল।

### উনিশ

পরের দিন বেনেট-সংসারে এক নতুন দৃশ্যের অবতারণা হোল। কলিঙ্গ অবশেষে তার প্রস্তাব পেশ করল। মাত্র আগামী শনিবার পর্বন্ত ছুটি থাকায় আর কাল হরণ না করে বিয়ের কথাটা পাকা করে ফেলার জন্য সে উদ্যমী হয়ে উঠেছিল। প্রাতিরাশের পর মিসেস বেনেট, এলিজাবেথ ও একটি ছোট বোনকে একত্র দেখে সে সাহসী হয়ে মাকে বলল—‘আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখন এলিজাবেথের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে পারি কি?’

বিশ্বয়ে এলিজাবেথ রাজা হয়ে উঠল এবং কোন কিছু করার আগেই মিসেস বেনেট তাড়াতাড়ি বলে বসলেন—‘নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। আমার স্বির বিশ্বাস, লিজি এতে খুশীই হবে। ওর কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। কেটি, চল আমরা ওপরে যাই।’

—‘তুমি যেয়ো না মা—থাক। মিঃ কলিঙ্গ ক্ষমা করবেন আমার। আমাকে বলার এমন কিছু গোপনীয় থাকতে পারে না; আপনাদের, বা মায়ের শোনো চলে না। আরিও চলি।’

—‘না, না, অবুধ হয়ো না লিজি। তুমি থাক এই আমি চাই।’ এলিজাবেথ স্পষ্টত বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করছিল এবং কোন অহিলায় পালাবার পথ খুঁজছিল।

—‘লিজি, আমি চাই তুমি কলিঙ্গের কথা শোন।’

এ রকম নির্দেশ সংঘন করার সাধ্য নেই এলিজাবেথের। মুহূর্তের স্থিত চিন্তায় তার বিচার-বুদ্ধি ক্ষিয়ে এসে। তাড়াতাড়ি এবং ঠাণ্ডা মাথায় এর একটা হেজ-নেস্ত করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সে জোর করে বসে রইল এবং এটা-ওটার নিজেকে ব্যস্ত রেখে মানসিক নিপীড়ন গোপন করতে চেষ্টা করল। মিসেস বেনেট ও কেটি চলে গেল ঘর থেকে।

তার চলে যেতেই শুরু করল কলিঙ্গ—‘আমার বিশ্বাস করো এলিজাবেথ, তোমার এই লজ্জাশীলতা তোমার ক্ষতি করা তো দূরে থাক তোমার আরো গণাধিত করে ফুলেছে। এই একটু অনিচ্ছা প্রকাশ না করতে যদি, তোমাকে আমার তত মনোরমা ঠেকত না। বিশ্বাস করো, তোমাকে আজ এসব কথা বলার সম্পূর্ণ মত নিয়েছি তোমার মার’। স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা বতাই তোমার সত্য-গোপনে লুক্কর করুক, ঘৃণাকরেও তোমার সন্দেহ জাগতে পারে না আমার উদ্দেশ্যের। এত খোলাখুলি ভাবেই আমি অমুরাগ দেখিয়েছি

যে, তুল বোঝার উপায় নেই। এ বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনী করে নিয়েছি। বিশ্ব ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার আগে বিয়ে করার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত আমার।’

গাভীর্থ সংঘেও ভাব-গদগদ কলিঙ্গের কথাবার্তা এলিজাবেথের এতই হাসির উল্লেখ করল যে সন্মোগ পেয়েও তাকে ধামিয়ে দিতে পারলে না। আবার শুরু করে কলিঙ্গ—‘আমার বিয়ে করার প্রথম কারণ হোল, আমার মত স্বচ্ছল অবস্থার যে কোন ধর্ম-বাক্যকেই বিয়ে করে গ্রামেতে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ স্থাপন করা উচিত। দ্বিতীয়, আমার স্থিরবিশ্বাস, এতে আমার স্ত্রণ আরো বহু গুণ বর্ধিত হবে। তৃতীয় কারণ—অবশ্য কারণটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল—অর্থাৎ যে মহীয়সী মহিলাকে আমার হিতাকাঙ্ক্ষিনী বলি, এ তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ও নির্দেশ। হুঁয়ার তিনি যেহেতু এ বিষয়ে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। হাল্ফোর্ডে আসার আগের দিন রাজ্যেও তিনি বলেছেন—কলিঙ্গ, তোমার বিয়ে করা উচিত। তোমাদের মত ধর্ম-বাক্যকদের অবিবাহিত থাকে সম্ভব নয়। এমন একটি বৌ হওয়া চাই তোমার, যে পরিশ্রমী গৃহকর্ম-নিপুণা হবে—বড়লোকের আদুরে দুলালী নয়, যে সামান্য আয়ে সন্তুষ্ট ভাবে মানিয়ে চলতে জানে। এই রকম একটি মেয়ে যত শীগ্গির পার ঘরে আন—আমি নিজে গিয়ে তাকে দেখিয়ে-তুলিয়ে দিয়ে আসব। ক্যাথারিন দ্য বার্গের উপদেশ আমার পক্ষে অবহেলা করা অসম্ভব। আমি একটুও অতিরিক্ত করছি না এলিজাবেথ, নিজে দিয়েই তুমি দেখতে পাবে তিনি কত ভাল। তোমার বুদ্ধি ও সজীবতায় তিনি খুব খুশী হবেন। এই হোল মোটামুটি কারণ। এখন বাকি রইল বলা, কেন নিজের গ্রামে থাকা না করে এত দূর আমি কত্ভার সন্ধান এসেছি—বলিও আমাদের ওখানে ভাল মেয়ের অভাব নেই। দাসল কারণ তাহলে সম্পূর্ণ খুশীই বলি। তোমার বাবার মৃত্যুর পর আমিই এই সম্পত্তির মালিক হব (ভগবান বরুন তিনি দীর্ঘায়ু হোন), কাজেই তাঁর কত্ভাদের এক জনকে বিয়ে করাই আমার উদ্দেশ্য—যাতে বাবার অবতর্মানের তাদের বিশেষ কোন ক্ষতি না হয়। আশা করি টাকার কথা পাড়লাম বলে তাতে তোমার অস্বাচ্ছন্দ্য হারাব না। এ ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার। ধন-সম্পত্তির প্রতি আমার কোনই লালসা নেই। সে রকম কিছু দাবী করব না তোমার বাবার কাছে—জানি, সে দাবী পূরণের ক্ষমতা নেই তাঁর। শতকরা চার পাসেন্টের যে হাজার পাউণ্ড তোমাদের ভাগে পড়বে তাও মাসের মৃত্যুর আগে পাছ না। কাজেই এ বিষয়ে আমি নীরব থাকব এবং কথা দিচ্ছি তোমার, বিয়ের পর একটি কথাও এ সম্বন্ধে উচ্চারিত হবে না আমার মুখ থেকে।’

কলিঙ্গকে এবার ধামান দরকার বুঝলে এলিজাবেথ।

—‘আপনি বড় তাড়াতাড়ি রার দিয়ে ফেলছেন। তুলে গেছেন আমার উত্তর এখনও জানান হয়নি। সেই উত্তরটাই দেব এবার। আমার সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্বন্ধেও সচেতন আমি কিন্তু আপনাকে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর আমার উপায় নেই।’

কলিঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে উত্তর দিল—‘আমাকে আর নতুন করে শেখাতে হবে না। অন্তর থেকে মেয়েরা বাকি চাই

তাকেই প্রত্যাখ্যান করে প্রথমে। দু'বার তিন বারও এ প্রত্যাখ্যান হতে পারে। এই সুহৃৎ বা বললে তাকে হত্যা হবার কারণ দেখছি না। আশা করি, অচিরেই মত বদলাবে তোমার।’

—‘আমার শেষ কথা শোনার পরও আপনার আশা করাটা পরমার্শব। সেদলের মেয়ে আমি নই বারা দ্বিতীয় বার প্রস্তাবের অপেক্ষায় নিজের সুখ অবধি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আপনি আমাকে সুখী করতে পারবেন না এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত মেয়েরও ক্ষমতা নেই আপনাকে সুখী করার। আপনার শুভার্থিনী আমার দেখলে অযোগ্যাই মনে করবেন।’

—‘যে নিলাম তাই সত্যি, কিন্তু তোমায় কেন তিনি অপছন্দ করবেন আমার ধারণায় আসছে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে আমি তোমার মিতব্যয়িতা, বিনয়নম্রতা ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করব তাঁর কাছে।’

—‘কিন্তু সে প্রশংসা অনাবশ্যক। আমার সম্বন্ধে বিবেচনার ভার আমার উপরেই ছেড়ে দিন—যা বললাম তাই বিশ্বাস করুন। সুখী হোন, আরো ধন লাভ হোক—কামনা করি। আপনাকে প্রত্যাখ্যান দ্বারা এর অত্যাধিকার প্রত্যাখ্যান করব সকল শক্তি দিয়ে। এই প্রস্তাবের দ্বারা আপনি আমাদের পরিবারের প্রতি আপনার মনোগত ভাব প্রকাশে যে কিছু বোধ করছিলেন তা তো মিটেই গেছে। সুযোগ এলেই লংবোর্ণের সম্পত্তির দখল নিতে পারেন আত্মনির্ভরতার ভাব মনে না এনেই। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল এ ব্যাপারে ধরে নিতে পারেন—বলেই চলে যাওয়ার একা উঠে দাঁড়াল এলিজাবেথ। কিন্তু কলিজা বাধা দিল তাকে।

—‘পরে এ সম্বন্ধে আবার যখন কথা হবে, আশা করি তোমার সম্মতিসূচক উত্তর পাব। এখনকার এই নিঃস্বপ্নতার জগৎ তোমায় নিশ্চিন্ত করছি না আমি। মেয়েদের স্বভাবই হোল প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। হয়ত আমার অভিলাষকে আরো উদগ্র করে তোলার জন্যই বিমুগ্ধ করেছ আমার। এই লজ্জাশীলতা মেয়েদের ভূষণ।’

—‘আপনি আমার সত্যিই বিমুগ্ধ করেছেন মিঃ কলিজা—এলিজাবেথের গলায় স্বর গাঢ় হয়ে উঠল—‘এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি তা যদি আপনি উৎসাহসূচক বলে মনে করে থাকেন তাহলে আপনাকে বিমুগ্ধ করার ভাষা আমার জানা নেই।’

—‘তোমার এ প্রত্যাখ্যান তো কথার কথা। এ বিশ্বাসের কারণ, আমি তোমার অযোগ্য নই—তা ছাড়া আমার আর্থিক সঙ্গতিও একান্ত কম। জীবনে আমার প্রতীক্ষা, সেটী ত বূর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তোমাদের সঙ্গে রক্তের টান—সব কিছুই আমার স্বপ্নকে। এ কথাটাও তোমার ভেবে দেখা উচিত যে, মনোহাঙ্গিনী গুণাবলী সত্ত্বেও বিয়ের প্রস্তাব আর দ্বিতীয় বার না-ও আসতে পারে তোমার জীবনে। সম্পত্তিতে তোমার অধিকার এতই স্বল্প যে, তোমার সৌন্দর্য, গুণাবলী, সব কিছুই তার তুলনায় নগণ্য হয়ে যাবে। কাজেই তুমি যে সত্য সত্যই বিমুগ্ধ করছ না আমার, ধরে নিতে পারি। বিয়ের প্রসঙ্গকে সংশয়ান্বিত করে প্রেমকে আরো গাঢ়তর হবার সুযোগ দিতে সব সময়েই রাজী আমি। এই রকমই তো প্রকৃতি সৃষ্টিলা মেয়েদের।’

—‘এক জন প্রচণ্ড লোককে অবধা পীড়ন করার মত শালীনতা-বোধ আমার নেই। আমার উক্তি অকপট বলে গৃহীত হলে বাধিত হবে। এই প্রকারের প্রস্তাব দ্বারা আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন সে জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আমার মনোভাব সব দিক থেকে এর বিরুদ্ধে। এর চেয়েও বৃদ্ধ করে বলার আর প্রয়োজন আছে কি? আপনি কি এখনও আমার সৃষ্টিলা মেয়ে ভাববেন যে আপনাকে পীড়ন করতে চায়, না ভাববেন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে যে ছদ্মস্ব থেকে সত্যি কথা বলেছে?’

—‘কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি, এলিজাবেথ—বললে কলিজা বিসম্বস্ত সাহসের ভাব দেখিয়ে—‘কিন্তু তোমার বাবা-মা রাজী হলে তুমি তো আর আমাকে নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ করতে পারবে না।’

এই আত্মপ্রত্যাহার আর কোন উত্তর দিল না এলিজাবেথ। নিঃশব্দে সে চলে গেল সেখান থেকে। যদি তার এই প্রত্যাখ্যানকে উৎসাহসূচক বলেই গ্রাহ্য হয়, শেষ পর্যন্ত সে তার বাবার শরণাপন্ন হবে—যিনি এমন সন্দেহ-নিরসক ভাষায় তাঁর বক্তব্য বলবেন যে আর ভিন্নার্ধ করার সুযোগ হবে না—অন্ততঃ তার আচরণকে সৃষ্টিলা মেয়ের প্রেম বা ছলনা বলে ভুল বোঝার অবসর ঘটবে না।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার তাহুড়ী

## বেঁচে থাকলে

কারখানার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন জানালে এক জন নাতিবুদ্ধ কর্মপ্রার্থী, গুভারসিয়ারের পদের জন্য। কারখানার কর্মসচিব আবেদনকারীর আবেদন-পত্রে যে জায়গায় পিতা এবং মাতা থাকাল তাঁদের কত বয়স উল্লেখ করতে হয়, সে জায়গায় বথাক্রমে ১২৮ এবং ১২২ সংখ্যা দেখে হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

আবেদনকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’তেই জিজ্ঞেস করলেন কর্ম-সচিব,—তোমার পিতা-মাতার বয়স এত ?

—না। উত্তর শেষ আবেদনকারী।—তাঁরা বেঁচে থাকলে ঠিক এই বয়স হ’ত।



## নারীর রূপসজ্জা

শ্রীপরীরাণী সেন

নারীর রূপসজ্জা বলিতে কি বুঝিব? দামী দামী শাড়ী-গয়না

পরিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টাকেই রূপসজ্জা বলা হইবে, না সচরাচর সর্বসাধারণ যেমন পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে, বেশ-বিক্রাসে তাহা হইতে কিছু বেশী পরিপাটি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে? এর সঙ্গে অবশ্য আর একটি দিকের রূপসজ্জা-স্বার্থক প্রথাও যোগ করিয়া বুঝিতে হইবে—এক কথায় যেটিকে বলা যায় 'প্রসাধন'। রূপসজ্জার বাঁধা কোন মান নির্ণয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয়, তাই সম্ভব নয়; কারণ বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক ক্ষমতার উপর ইহা অনেকখানি নির্ভরশীল।

রূপসজ্জা কে না করে। ইহা পুরুষও করে, নারীও করে। তবে নারী-পুরুষ সবাই প্রাচীন কাল হইতেই মানিয়া লইয়াছে যে, রূপসজ্জা নারীর পক্ষে যেমন প্রয়োজন পুরুষের পক্ষে ঠিক ততখানি নয়। ঐরূপ মানিয়া লইয়াছে বলিয়াই যুগ-যুগব্যাপী কবিগণ নারীর রূপ ও রূপসজ্জার প্রশংসা গাহিয়া গিয়াছেন। যে-কোন যুগের যে-কোন কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশে নারীর রূপ-বোঁদন-সাজ-সজ্জার মহিমা কীৰ্তন করিয়াই যেন কাব্যের মধুরা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।

বাহিরে কোমলতা, কমলীয়তা, শেলবতা এক অন্তরে মেহ, প্রেম, স্নেহ... প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব দিয়া ভগবান বৈচিত্র্যময়ী নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি-কল্পনার বর্ণনা-মাধুর্যে নারীর রূপ-বোঁদন যেন আরও সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। নারী-হৃদয় প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টির ও পরিপূষ্টির স্বভাবতঃই উর্বর ক্ষেত্র। পুরুষের মনে যে প্রেমের জন্ম, তা বহিঃপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু নারীর মনে তা স্বচ্ছ কল্পনার দ্বারা অলঙ্কৃত প্রবাহিত হইতে থাকে—বাহ্যিক প্রকাশের জন্য তাহা কখনও উগ্র ভাবে লালসিত হয় না। তাই সব দিকে কল্যাণময়ী ও প্রেমময়ী নারীর রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সাজসজ্জা ও প্রসাধনের উপযোগিতা সবাই চিন্তা-বিশ্লেষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা বোধ হয় সর্বজনগ্রাহ্য

সত্য যে, নারী যে রূপচর্চা করিয়া শারীরিক সৌন্দর্যকে কমলীয় ও বরণীয় করিয়া থাকে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া কবি তাঁহার লেখনীর মুখে, শিল্পী তাঁহার তুলির আল্পনায় তাহাকে যেন আরও অপরূপ ও অপার্থিব করিয়া তোলেন।

বাগানে ফুল কোটে, সবাই দেখিয়া বলে সুন্দর; কারণ চোখে তাহারা সেই রূপটি দেখিল। কিন্তু যে-ফুলের সৌন্দর্যের সঙ্গে স্নেহস্বাদও রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া শুধু সুন্দর বলিয়াই লোক ক্ষান্ত হয় না, স্নেহের অন্তর্ভুক্তিতে অন্তর আকুল হয় বলিয়া সে মুগ্ধও হয়, ফুলটিকে অন্তর দিয়া ভালবাসিতেও চায়। কিন্তু নারী প্রাণহীন ফুল মাত্র নয়, তাহা হইতে সে অনেক বেশী। তার প্রাণ আছে, রূপ আছে, গুণ আছে, সঙ্গে সঙ্গে তার রূপসজ্জার প্রকৃত প্রয়োজন আছে; তাই সে সজ্জা নানা ব্যবস্থা-সম্মতও রহিয়াছে।

পুরুষ জাতি নারীর শুধু রূপের পূজারী, গুণের নয়—ঠিক এরূপ কথা কেহ নিশ্চয় বলিবে না। তবে তাহাদের প্রেম ও পূজা যে প্রাণহীনতঃ ও প্রথমতঃ রূপ-সাপেক্ষ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ফুলের বেলার মাহুৰ তাহার প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্যের ও স্নেহের বাহিরে কিছু না চাহিলেও নারীর বেলার পুরুষ তাহা চায়; জীব কাছে স্বামী তাহা অন্তরের অন্তঃকল হইতে দাবী করে। তাই তাহার রূপসজ্জার প্রয়োজন অবিসংবাদী ও অপরিহার্য।

নারীর রূপচর্চা প্রভৃতির বহু অমূল্য বর্ণনা প্রাচীন স্মৃতি কবিদের বর্ণনায় পাওয়া যায়; কালিদাসের বর্ণনায় তাহা পাওয়া যায় সব চেয়ে বেশী। অতীতে নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধনের ধারা ও উপকরণ ছিল সহজ ও স্বতন্ত্র। কালিদাসীয় ও প্রাক-কালিদাসীয় যুগের নারী সম্বন্ধে কবিগুরু লিখিয়াছেন :

“কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,  
লীলাকমল হইত হাতে কি জানি কোন্ কাছে।  
অসক সাজত কুম ফুলে, শিরীষ পরত কর্ণমূলে,  
যেথলাতে ঢুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।  
ধারা-বস্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া মিত কেশে,  
লোমফুলের শুভ রেণু মাখত মুখে বালা।  
কালান্তর গুণ গন্ধ লেগে থাকত সাজে,  
কুরুবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে।”

আবার—

“কুরুমেরি পল্লবলথায় বন্ধ রইত ঢাকা,  
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংস-মিথুন আঁকা।”

কিন্তু যুগের বিপ্লবময় পরিবর্তনে ও আধুনিক সভ্যতার বিস্তারে সাবেক কালের ধূপের ধোঁয়া, লোম-রেণু, শিরীষ, নীপের মালা প্রভৃতি অচল হইয়া গিয়াছে, আর সে-সবের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে আধুনিক নানা প্রসাধন-সামগ্রী। তাই বর্তমান যুগে এগুলি প্রয়োজন আজকাল আর কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু এখন প্রশ্ন পাঁড়িঠেছে এই যে, নারীর রূপসজ্জা কোন্‌খানে কতটুকু প্রয়োজন এবং কোন্‌খানে ও কিরূপে তাহা অপয়োজন?

সদ্য অতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত নারীর রূপসজ্জার সর্বপ্রাণন সহায় হইতেছে শাড়ী ও গয়না; তবে এ দুটির উত্তরকমারিতে ক্রমেই নূতনত্ব আমদানী হইতেছে। তার মানে, যুগের পরিবর্তিত রুচি অনুযায়ী সব-কিছু যেন নব জন্ম লাভ করিয়া চলিয়াছে। মাহুৰের মন চলে, তাই পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের পানে ছুটিতে চায়। সভ্যতা প্রগতির পথে চলে, তাই রুচির রূপান্তর

ঘটে। অতএব শাড়ী-গয়নার এ সব নতুন নতুন রূপকে নিন্দা করা চলে না। আবার আধুনিক কালের প্রসাধনের দ্রব্য-সম্ভারও বহু-রূপ-গন্ধে বিশেষবৃক্ষপূর্ণ হইয়াই চলিয়াছে, প্রতি সভ্য-সমাজে সেগুলি সমাদর লাভও করিতেছে।

অবিবাহিতা ও বিবাহিতা তরুণীদের রূপসজ্জার ক্রাফিসমূহ দাবী ও প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। বয়সের সঙ্গে রূপচর্চার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে ইহাদের ক্ষেত্রেও শাড়ী-গয়না-প্রসাধনের একটা শোভন সীমা থাকা চাই। এই সীমাবোধটি বুঝিয়া চলিবার উপর রূপসজ্জার সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে।

আর্থিক অবস্থা, রং, রূপ, শারীরিক স্বাস্থ্য—এ সবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেশীর ভাগ স্থানে সাজসজ্জা ও প্রসাধন করা হয় না বলিয়াই তা সমালোচনার বস্তু হইয়া পড়ায়। যে-মেয়েটি কলেজে পড়িতেছে, মধ্যমিত পরিবারের সাংসারিক দুরবস্থার উপর আরও আঘাত হানিয়া তাহার শাড়ীর বা প্রসাধনের প্রতি অত্যধিক আত্মরক্তি শুধু নিন্দনীয় নয়, উহা অপরাধও। খাজের উপরে যদি ক্যাসানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তেমন মূঢ়তা আর কি হইতে পারে! কিন্তু আজ-কাল ছুগ-কলেজের মেয়েদের অনেকের মধ্যেই তাহাই তো দেখা যায়। ইহারা সুখাত্মীন তাই সুস্বাস্থ্যহীন; কিন্তু বান্ধবীদের অনুরোধে নতুন নতুন চণ্ডের শাড়ী আর নানা প্রসাধন দ্রব্যের দ্বারা রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধির অবিবাহিত কৃত্রিম চেষ্টা একান্ত শোচনীয়। যদি তাহারা নিজ নিজ অবস্থাকে ডিঙাইয়া ক্রমাগত রুচি-বিকারই দেখাইতে থাকে, তাহা হইলে তা চ্যম নিন্দনীয় হইতে বাধ্য। স্নেহপুস্তলীদের ঐকান্তিক অনুরোধে আর সময়বিশেষে তাহাদের চোখের জলে বিচলিত হইয়া বহু বাপ-মা যে অমাজনীয় ভুল করিয়া বসেন, তাহার জন্ত ভবিষ্যৎ জীবনে ভুক্তভোগী হয় ঐ মেয়েরাই। যে তরুণী বয়সের উদ্ধাম সময়ে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হারাইয়া বসিল, তাহার মত কাঙাল আর কে আছে! এখানে অভিতারকেরা যদি একটু শক্ত হইতে পারেন, রূপচর্চার জন্ত আর্থিক ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন না করিয়া যদি মেয়েদের অপেক্ষাকৃত একটু সুখাত্মের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এ সব তরুণীদের স্বাস্থ্যের বিনিয়াদ অকালে ভাঙিয়া পড়ার সম্ভাবনা বোধ করা বাইতে পারে। বর্তমানকার পুরুষদের জন্ত গড়া শিক্ষা-বস্ত্রের মধ্যে পড়িয়া মেয়েরা অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক শ্রমে এমনটী তো অতিমাত্রায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তার উপর রুচি-বিকারের ছোঁয়াচ লাগিয়া তাহারা যদি ঐরূপ ভুল পথে পরিতালিতা হয়, তাহা হইলে তাহা আশংকার কথা বটে। তাই আর্থিক ক্ষমতার সঙ্গে বতটা সম্ভব সামঞ্জস্যবিধান করিয়া রূপসজ্জার জন্ত ব্যয় করা তরুণীদের পক্ষে অতীব প্রয়োজন,— তাহারা কুমারীই হোক বা বিবাহিতাই হোক।

প্রসাধন দ্রব্যগুলি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু উল্লেখ করা বাইতে পারে। সব রংয়ে, সব স্বাস্থ্যে এবং সব রূপে সকল বয়স প্রসাধনের দ্রব্য যে মানানসই হইতে পারে না, ইহা নারীমাত্রেই (আবার উল্লেখযোগ্য ভাবে তরুণীদের) বুঝিয়া চলা কর্তব্য। যে-মেয়েটির রং ময়লা, তাহার সঙ্গে যে-রঙের যে-শাড়ীখানি মানাইবে তাহার তাই ব্যবহার করা সুরচিসম্মত; ঠিক তেমনি, রঙের সঙ্গে

প্রসাধনের দ্রব্যগুলিও সামঞ্জস্যবিধান করিয়া ব্যবহার করা সুরচির পরিচায়ক। ঐরূপ সব স্থলে বান্ধবীদের মাথুলী ভয়ুগ্রন করিয়া চলা সাধারণতঃ ভ্রান্ত্যর হইয়া পড়ায়, যদিও সজ্জাকাবিনীরা নিজেরা অনেকেই তাহা বুঝিয়া টুটিতে পারেন না। ঠিক ঐরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গেও শাড়ী-জামা-অঙ্গরাগের দ্রব্যাদি যথাসম্ভব খাপ খাওয়াইয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার এগুলির সঙ্গে বয়সের তারতম্যও অবশ্য বিচার। যে-শাড়ী বা যে-প্রসাধন দ্রব্য তরুণীদের শোভাবধক, বয়স্ক গৃহিনীদের পক্ষে তাহা হইতে পারে না। অথচ বড়লোকের গৃহিনীদের মধ্যে এ শ্রেণীর রুচিবিকার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। হয়ত তাঁহারা মনে করেন, আমার টাকা আছে, নিজ নিজ অভিকৃতি অনুযায়ী সাজসজ্জা করিলেই গোল চুকিয়া গেল।

কলিকাতার মত সহরে রাস্তা-ঘাটে শাড়ী-গয়না ও প্রসাধন সম্পর্কীয় নানা অশোভন রুচির অনেক বিষয়কর নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিনেমা ও থিয়েটার-হলে, কলেজ ও স্কুলে কচিহীন রূপসজ্জার ও বেমানান চাকচিক্যের যে অদ্ভুত অদ্ভুত বৈচিত্র্য সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যেমন বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক, তেমনই উপভোগ্য!

ঠোঁট, গাল ও নখ রঙা করিবার দ্রব্য সখ আমাদের বত কম হয়, ততই মঙ্গল। প্রথমতঃ, রঙের সঙ্গে মানাইয়া তাহা ব্যবহার করিবার রুচি বা বুদ্ধি অবিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায় না; আবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত রং মাখিয়াও অনেকে সং সাজিতে কুস্তিতা হয় না। গায়ের রং বাহাদের ফর্সা, একমাত্র তাহাদেরই ঠোঁট-গালে রংয়ের বৃদ্ধ প্রলেপ গোলাপী রঙের একটা অপরূপ আনিয়া সৌন্দর্যবৃদ্ধির কিছুটা সহায়ক হইতে পারে। যে-পরিমাণ পাউডার মাখাইয়া মুখখানিকে যে সুস্বাস্থ্যমণ্ডিত করা যায় না, বৎ কৌতুকাবহ কুরূপই ধারণ করে, আবার যামে ভিজিয়া কখন কখন তাহা আরও বিকৃত হইয়া ওঠে, এ সচজ সত্যটি প্রসাধন-প্রিয়াদের বোঝা উচিত। উগ্র গন্ধের 'সেন্ট' (এবং তাহাও আবাব অনেকেই যেমনটি করিয়া থাকে, অর্থাৎ বেশী করিয়া) ব্যবহার করাও সুরচির পরিচায়ক বলা চলে না; কারণ বেশী পাউডারে যেমন রূপসজ্জাটি উৎকট হয় মাত্র, উগ্র গন্ধও তেমনি যেন মাহুঘটির হইয়া ডাকিয়া বলে, 'ওগো, তোমরা জেনে নাও, আমি যে 'সেন্ট' মেখেছি'! তার মানে, ইহারা যেন মনে করে, গন্ধে চতুষ্পার্শ্বের লোকের নাক জ্বালাইয়া দিতে না পারিলে আর উহা ব্যবহারের সার্থকতা কি হইল!

এখানে গৃহিনীদের অকাল-বাধক্যের বিষয় একটু আলোচনা করা হয়তো অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। দরিদ্র সব বাঙালী পরিবারগুলিতে গৃহিণীরা ছু'-তিনটি সন্তানের জননী হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু শরীরেই আধা-বাধক্যের ছাপ মারিয়া বসেন না, সখ সাধ-রূপচর্চায় দিকেও তাঁদের মনের মূঢ়া ঘটিয়া থাকে বিষয়কর ভাবে। হাঁ, এ কথা খুবই সত্য যে, পনের আনা বাঙালী-পরিবারের পক্ষে আজকালিকার কঠিন বাজারের পেটের দানা সংগ্রহ করাই সুরকঠিন ব্যাপার। কিন্তু তবু যেখানে যখন ও বহুটুকু সম্ভব দ্রব্য সঞ্চ-সাধকে জীবিত রাখিয়া চলা নানা দিকে বৃদ্ধির পরিচায়ক হইবে সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন অভাবের নির্মম কশাঘাত যখন নিত্যকার

তাড়নায় আমাদের বিব্রত করিয়াই চলিয়াছে, তখন মনটাকে সস্তবক্ষে একটু সজীব রাখিবার প্রয়োজন গভীর ও অনস্বীকার্য। ক্রিষ্ট মনকে উৎকৃষ্ট রাখিবার সহায়ক তো হইল আনন্দের প্রচলিত বাহনগুলিই, অর্থাৎ বাতিরে সিনেমা, থিয়েটার ও অজ্ঞাত আনন্দ-প্রমোদ এবং ঘরে কিছু কিছু তৃপ্তিদায়ক রূপসজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতি। নারীর মনের উপর আনন্দের আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে শেখোক্ত দু'টির কার্যকারিতা প্রায় বাছুমাত্রব্যব। অভাব ও অশান্তিতে অজর্জিত মনাবিস্ত বাঙালী-পরিবারগুলির গৃহলক্ষ্মী ঝাঁহারা, গৃহ-পরিবেশে তাঁহাদের মত অভাগিনী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন; কারণ নিজ নিজ সাংসারিক চমকের বড়-বান্ধলের দৃষ্টিতে প্রদানতঃ তাঁহাদের উপর দিয়াই নিষ্ঠুর ভাবে বহিয়া যায়! এমন সব স্থলে স্বল্প বায় ও বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা যদি চিন্তাবিনোদনের উল্লিখিত বাহনগুলির সহায়তায় অশান্তি-কলুষিত আবহাওয়াটি কখন কখন বদল করিয়া অন্তরকে একটু জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, সেটা তাঁহাদের পক্ষে মোটেই বিলাস নয়, সবটুকুই বাহ্যুতরী।

তা' ছাড়া আরও একটি দিক বহিয়াছে। সম্ভাবনাতী গৃহিণীর পর্ষায়ে উদ্রোত হইলেই স্বামীর মনের চাওয়া-পাওয়ার দিকটি তুলিয়া গেলে চলবে না। সাক্ষসজ্ঞায় অত্যধিক আগ্রহবশি ও অতি মাত্রায় প্রসাধন-প্রিয়া হইতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে না; কিন্তু ঐগুলির প্রতি মুক্তিহীন গিরোধিতা বা বিতৃষ্ণা ভাবও কখনই অনুমোদন করা যাউতে পারে না। কর্মজ্ঞান স্বামী ঘরে ফিরিয়া বাঙালী গৃহলক্ষ্মীদের মুখে 'এটা নাই, ওটা নাই, ছেলের জ্বর, মুদীর তাগাদা'... ইত্যাদি অমধুর বুলি তো নিয়মিত ভাবে শুনিয়াই থাকেন, কারণ সেটা হইল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের অক্ষয় কবচ-স্বরূপ! আবার তারই সঙ্গে যদি সতর্কমিণির কক্ষ, অপরিচ্ছন্ন ও ঘর্ষসিক্ত অপরাধ মূর্তি দেখিতেও তিনি অভ্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তো তাঁহারা প্রতি মোটেই স্ববিচার করা হইল না। টেবিলের উপর ফুলদানিতে সুগন্ধ ও সুন্দর ফুল না রাখিয়া আবর্জনা শ্রেণীর দ্রব্যাদি গুজিয়া রাখিলে তাহা কাহারও পক্ষে কচিকর হইতে পারে না। প্রেমভাসবাসার মনোদায় স্বামীর চিন্ত বশ থাকিবে এটি খাঁটি কথা, তাহাই আদর্শ মতবাদ; কিন্তু প্রীত দৈনন্দিন নানা কচিহীন চাল চলনে ও অশোভন পরিবেশে সে পবিত্র প্রেমের মর্ম ভুলের কালিমা যোগ হইতে থাকে কি না, তাহাও বিচার্য। উল্লিখিতরূপ শোভন ও সজ্জ উপায়ে স্বামীর মনের আনন্দ বর্ধন বৃদ্ধিমতী ও প্রেমময়ী সহধর্মিণীর একটি পবিত্র কর্তব্য। দেখা যায়, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্বামীর ইহাতে খুশী হন, তাই মুগ্ধ ও হন।

প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব অর্থ সম্ভবির দিকে তাকাইয়া এ-মুখে প্রত্যেক তরুণী ও গৃহিণীর রুচিসম্মত উপায়ে সাক্ষসজ্ঞা ও অজ্ঞব্রাগ প্রভৃতিতে পরিমিত আয়বস্তি থাকা কোন মতেই সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না, বরং তাহা সর্বতোভাবে শোভন ও সুন্দর। নারী প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী; তার মনের এ সব অভিনব গুণাবলির সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য ও সৌকুমার্যের জন্ত কিছুটা রূপচর্চার সমভাস যোগ হইয়া তাহার বাহিরটিও পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে থাকিলে তাহার প্রেমরূপ, স্নেহরূপ ও কল্যাণরূপ সাংসারিক জীবন মধুরতর ও অনির্ঘটনীয় হইয়া উঠিবে।

## সত্যিকার গল্প

মীরা চট্টোপাধ্যায়

উখুখ আগ্রহে অপেক্ষা করছেন চিকিৎসকগণ অধিনায়কের আগমন আশায়। কিয়ৎক্ষণ পরেই চিকিৎসকগণের বহু-প্রত্যাশিত মুহূর্ত এল ঘনিষে, দ্ব্যপ্রান্তে দেখা দিল তাঁর গাড়ী। গাড়ী হতে অবতরণ করতই অগ্রসর হয়ে আগ্রহাশ্রিত চিকিৎসকবৃন্দ জানান তাঁকে সংবর্দ্ধনা।

চিকিৎসকগণ সমভিব্যাহারে অধিনায়ক প্রবিষ্ট হন চিকিৎসালয়ে। চিকিৎসালয়ের প্রতিটি কক্ষ তিনি পরিদর্শন করেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। চিকিৎসকবৃন্দের মধুরালাপ এবং চিকিৎসালয়ের সুবন্দোবস্ত তাঁকে প্রীত করে।

চিকিৎসকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি আরোতপ করেন অপেক্ষারত গাড়ীতে। গাড়ীর অভ্যন্তর হতে চীৎকার তীব্রপাত হয় পার্শ্ববর্তী কোন এক গৃহস্থানে দণ্ডায়মান শুশ্রূষাকারিণীর প্রতি। চিকিৎসকের নিকট হতে জ্ঞাত হন, রোগীর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষ ছ'জন রোগীকে ঐ গৃহে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছেন। গাড়ী হতে অবতরণ করে ঐ গৃহস্থান অভিমুখে অগ্রসর হতে হতে চিকিৎসকগণকে সন্ধানন করে বলেন, "একাকী যেতেই আমি বেশী পছন্দ করব, কাজেই আপনারা অনুমতি দিন আমি একাকীই যাবি।"

এক জন চিকিৎসক তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন ঐ গৃহাভিমুখে। পশ্চাৎ ফিরে সে দৃশ্য দেখে কঠিন স্বরে তিনি বলেন, "নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন করুন, আমি একাকী যাব স্থির করেছি অতএব একাকীই যাব, আমি প্রতিজ্ঞাভিষ্ট হই না।" বিমূঢ় এবং ভ্রান্ত চিকিৎসক করেন নিজ স্থানে প্রত্যাবর্তন আর অধিনায়ক প্রবেশ করেন ঐ গৃহে একাকী।

জল! জল! জল!

কোন পিপাসার্তের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঐ তিনটি কথা বেরিয়ে এসে চিকিৎসালয়ের নিস্তব্ধতা করছিল ভঙ্গ আর সঙ্কল্প করছিল আকাশ আর বাতাসকে। এই আর্দ্র কণ্ঠ শ্রবণ করে দ্বিগত পদে তিনি কক্ষ হতে কক্ষে ছুটতে লাগলেন। সর্বশেষ কক্ষে তিনি এসে দাঁড়ান ধমকে, এক মুহূর্ত সৈনিক এক কোঁটা জলের জন্ত আকুল কণ্ঠে চীৎকার করছে কিন্তু কোন ব্যক্তি সেখানে নেই উপস্থিত হতভাগ্য সৈনিকের মুখে ঢেলে দিতে এক কোঁটা জল। স্তম্ভিত এবং বিমূঢ় অবস্থায় তিনি সেই স্থানে থাকেন দাঁড়িয়ে নিশ্চল হয়ে। সৈনিকের আহ্বানে ফিরে আসে তার সখিৎ, পার্শ্বের কক্ষ হতে এক গ্রাস জল এনে রোগীটির মুখে দেন ঢেলে।

\* \* \* \*

বাহির-দ্বারে অপেক্ষারত চিকিৎসক অধিনায়কের বিলম্ব হেতু প্রবেশ করেন ঐ কক্ষে আর তাঁর নয়নগোচর হয়, অধিনায়ক এক সৈনিকের মুখে দিচ্ছেন ঢেলে জল।

পর-পর তিন গ্রাস জল পান করে পরিতৃপ্ত সৈনিক থাকিয়ে থাকে তার ত্রাণকর্তার মুখের দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে। ধীরে ধীরে তার হুই নয়ন পূর্ণ হয়ে ওঠে কৃতজ্ঞাশ্রুতে, বর-বর করে বরে পড়ে অজ্ঞ আর অধিনায়কের নিকট মনে হোল এই অজ্ঞ আশীর্বাদের

দ্রোতক আর সেই আশীর্বাদে পুণ্য ধারায় অভিযুক্ত হয়েছে তাঁর সর্বস্ব।

“কম্যাগার” কৃতজ্ঞতা করে পড়ে তার এই কথা।

“কি ভাই? একটু সুস্থ বোধ করছ কি?”

“সুস্থ? সুস্থ হয়ে কি হবে কম্যাগার? এবার যাওয়াই ভালো। আমার তো সবই পূর্ণ হয়েছে, যা-কিছু বার্থ হয়েছে তাবি, তাও বার্থ হয়নি, পূর্ণের পশ-পরশ তাদের ‘পরে রয়েছেই’—বহু কণ নিমন্তর থাকবার পরে আবার বলতে থাকে বীরে বীরে—“যা সুখী আমি ভগবান, সত্যি আমার জায় সুখী সারা পৃথিবীতে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং যাবে না। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজকের দিনের এ স্মরণশক্তি সমস্তে লালন করব। উঃ কম্যাগার.....”

“না না ভাই, এ সব কথা নয়, এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করো.....”

সেইক্ষেণে পার্থে দণ্ডায়মান চিকিৎসক যেন কী বলতে বাচ্ছিলেন কিছু তাঁকে বাধা দিয়ে অধিনায়ক বলে ওঠেন—“বাধা দেবেন না, বাধা দেবেন না। এদের সাথে আমি কথা বলতে চাই, চাই এদের সেবা করতে—বলতে বলতে দু’কোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ে সৈনিকের অঙ্গে।

“কম্যাগার, মরণে এখন আমার দুঃখ নেই! আপনি স্বহস্তে আমার জল দিয়েছেন, এ যে আমার স্বর্গ-সুখ! আর কিছু চাই না। না, না, আর কিছু চাই না!” উত্তেজনার প্রাবল্যে শব্দ্যর উপর ঊঠে বসে সৈনিক।

“এ কি ভাই, সৈনিক তুমি, তুমি তো এ কথা বলতে পার না, তুমি হতে পার না আত্মকেন্দ্রিক, দেশের প্রতি তোমার যে কর্তব্য রয়েছে সে তো তোমার শেষ হয়নি.....”

“ই্যা কম্যাগার, আপনি সত্য কথা বলেছেন, আমি সৈনিক, আমার হতে হবে সুস্থ, করতে হবে দেশের কাজ—” দীক্ষণ উত্তেজনায় বলে বাচ্ছিল সৈনিক কিছু পরক্ষণেই গভীর নৈরাশ্য এসে তাকে পরিব্যাপ্ত করে—“আমারও ইচ্ছে করে কম্যাগার কিছু আর সে সময় নেই। স্বাধীন দেশের সূর্য আর তার আলোর আমার জ্ঞান করিয়ে দেবে না, তার পূর্বেই দেশে যাব ধরণীর ধূলায়। তাই কি সত্য?”

“না ভাই, এ তো সত্য হতে পারে না, স্বাধীন দেশ তুমি দেখবে আমি নিশ্চয় করে জানি, তোমার মত দেশপ্রেমিক ক’জন হয়! তোমরা চলে গেলে দেশ কাকে নিয়ে থাকবে নাই? চলে যাওয়া তো তোমার হবে না”—বলতে বলতে অধিনায়কের কণ্ঠ কঁদে হয়ে আসে আর সৈনিক স্বপ্ন দেখে স্বাধীন দেশের \* \* \*

কিরংকাল পরে অধিনায়ক গৃহ হতে নিষ্কান্ত হন এবং এসে দাঁড়ান চিকিৎসকদের দ্বাৰা। গাড়ীতে আরোহণ করে চিকিৎসকবৃন্দকে সন্মোদন করে বলেন—“ওদের একটু স্বস্তি নেবেন—” অশ্রু লুকোবার জন্য মুখ ফিরিয়ে নেন অধিনায়ক, সেই মুহূর্তেই গাড়ী চুটে অদৃশ্য হয়ে যায় লাল ধূলি উড়িয়ে।

অপরায়ু ঘনিষে আসে। অধিনায়কের মন-বিহ্বল পাড়ি দেয়

সেই হানে—যে হানে শায়িত রয়েছে সেই সৈনিক। কাজকক্ষে মন দিতে পারেন না তিনি। তিনি তাঁর দেহরক্ষীকে পাঠান সৈনিকের খোঁজে।

সন্ধ্যার আঁধার আসে ঘনিষে। দেহরক্ষী করে প্রত্যাবর্তন।

—“কেমন আছে সেই সৈনিক?” তাঁর কণ্ঠস্বরের আকুলতায় চমকে ওঠে দেহরক্ষী।

—“সে আর এই পৃথিবীতে নেই।”

—“বঁচে নেই?”

—“না।”

—“কখন মারা গেছে?”

—“ভোর বেলায়।”

—“আমারি দোষ হয়েছে, আমারই দোষ, আমি যদি ভোরের যেতাম।”

উদ্গস্তের জায় তিনি স্বয়ং ঘরে বেড়াতে থাকেন। হঠাৎ গবাক্ষের নিকট দাঁড়িয়ে বালন, “সূর্য ওঠবার সঙ্গেই গেছে, সূর্য দেখেছে কিছু স্বাধীন দেশের সূর্য নয়।—তুমি কী জান, ওকে কোথায় সমাধি দিবে? খোঁজ নিয়ে এসো। আমি যাব, আমি ওর সমাধির...” শিশুর মত অঝোরে কেঁদে ফেলেন অধিনায়ক।

কেউ জানে কে এই অধিনায়ক? আমাদের বাঙ্গালীর ছেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের শ্রী নেতাজী সত্যেন্দ্র বসু।

## অ্যাটম বোমার দেশে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অমিতা দত্ত-মজুমদার

এর পরে এক দিন অলিভ টেলিফোন জ্ঞানালেন যে, পনের দিন আমাদের নিয়ে স্কুল দেখতে যাবেন। সকাল বেলা ১টার একটু আগেই অলিভ গাড়ী নিয়ে এলেন। স্কুলটির নাম Kay School. সহরের যে অঞ্চলে এই বিদ্যালয়টি অবস্থিত সেই পাড়ার কোনো গণ্যমান্য ও স্রবণীয় ব্যক্তির নামে স্কুলটির নাম হয়েছে। এটি পাব্লিক গ্রামার স্কুল। কেটনদের ছেলে-মেয়েরা এখানে পড়ে। প্রাইভেট স্কুল অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বলে অনেকের পক্ষে সন্তানদের সেখানে পড়ানো সম্ভব হয় না। তাইড়া সস্তা সন্তো অনেক ছেলেমেয়ের সেখানে পাঠান না, কারণ পাব্লিক স্কুল ডিমক্র্যাটিক ভাবটা যতটা অধিগত ও মজাগত হয় প্রাইভেট স্কুলে তা হয় না! অ্যামেরিকা ঘনিকের দেশ হলেও এখানকার শিক্ষিত সাধারণ কেউই পাড়া-প্রতিবেশী বা পরিচিত জনের মধ্যে আভিজাত্যের ভাবটা বিশেষ পছন্দ করতে পারেন না। এদের সামাজিক সাম্যের ভাব কাগজপত্রে বা আইন সভায় যতটা, বাইরে চলা-ফেরা ক্ষেত্রেও তেমনি। অতি সহজ ভাবে সকলে মেলা-মেশা করতে অভ্যস্ত। কেবল নিগ্রোদের বেলায় ব্যাহত হয় এদের এই সাম্য ভাব; তাদের জন্য এই গণতন্ত্রের দেশেও সব বিষয়েই আলাপা বন্দোবস্ত। সাড়ে ১টার একটু পরেই আমরা Kay School এ পৌছলাম। প্রথমেই এক শিক্ষয়িত্রীর সাথে দেখা হতে তিনি আমাদের জ্ঞানালেন যে, মিনিট পাঁচেক পরেই স্কুলে Fire Parade হবে, সেটা হয়ে



গেসেট আমাদের ক্লাস দেখানো হবে। Fire Parade এ বেশেয় বিজ্ঞানীয় সমুদ্রে প্রতি সপ্তাহে একবার করানো হয়; এ দেশের শৈত্য নিবারণের জন্য প্রতি বাড়ীকে উত্তাপ যন্ত্র দিবাশক্তি কাজ করে, তার থেকে সময়ে সময়ে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার আশঙ্কা—হয়ও মাঝে-মাঝে! কিন্তু আগুনে মানুষ পুড়ে মরার ঘটনা বিরল। Fire brigade এর ব্যবস্থা খুব ভাল, আর মানুষের অভ্যাগণ খুব চমৎকার। এই তৎপরতায় শিক্ষা স্থল থেকেই দেওয়া হয়। এই ব্যাপারটি সেদিন প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটল। আমরা ছাঁজন বারান্দার দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছি এমন সময়ে জোরে-জোরে একটা ঘটনা বেজে উঠল; এইটেই বিপদের সঙ্কেত-স্বনি। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাসের সব থেকে ছেলে-মেয়েরা লাইন করে বেরিয়ে যেতে লাগল। মাত্র আড়াই মিনিট সময়ের মধ্যে দোতলা বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর থেকে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে উঠানে জড়ো হলো। এই সব ছেলে-মেয়েদের বয়স পাঁচ থেকে বারো পর্য্যন্ত। এরা যে বকম শিশুস্বল ভাবে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল দেখে আশ্চর্য হইলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই আবার সকলে নিঃশব্দে ক্লাসের ঘরে-ঘরে ফিরে এল। তখন সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের (৬ষ্ঠ শ্রেণীর) শিক্ষয়িত্রী আমাদের ডেকে নিয়ে তাঁর ক্লাসে গেলেন। সেখানে ছেলে-মেয়েদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে তাদের জানালেন যে, আমি বিমানযোগে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকায় পৌঁছেছি। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার একটা পথ পেলাম—দেয়ালে টাঙানো ম্যাপের সাহায্যে তাদের বোঝালাম, কোথা থেকে কোন্ কোন্ দেশের উপর দিয়ে আমি এসেছি। তারা আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলো আমাদের দেশের সম্বন্ধে। এখন ঠিক খুঁটুপাসের আগে ছেলে-মেয়েদের মনে খুঁটুপাসের কথাই জাগছে; তারা আমার জিজ্ঞাসা করল, ভারতের ছেলে-মেয়েরা খুঁটুপাসের সময় কি করে? অনেক বড়বাও এ প্রশ্ন করেছেন। আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অখুঁটান, অতএব সেদেশে খুঁটুপাস বড় পর্ব নয়। অতি অল্পসংখ্যক লোক খুঁটান এবং তারাই খুঁটুপাস উৎসব উদ্‌যাপন করে। আমাদের হিন্দুদের অল্প পর্বকাল আছে এবং তখন খুব সমারোহ হয়, যেমন এখানে ক্রীসমাসে হচ্ছে। বড়দিনের সময়ে এখানে যেমন উপহার-বিনিময় হয়, ছুগাপুজার সময়ে আমাদের দেশেও তেমনি হয়। এই কথাতে এরা খুবই আশ্চর্য হয়েছে। পৃথিবীতে খুঁটান ছাড়া অল্প ধর্মাবলম্বী বহু লোক থাকতে পারে এ ধারণা তাদের কাছে নূতন। আরো নানা প্রশ্ন তারা করল এবং আমায়ও উত্তর দিতে হলো। মোটের উপর আমার ধারণা হলো যে, আমাদের দেশের এই বয়সের শিশুদের চেয়ে এদের মন বেশী জাগ্রত; এদের মনে প্রশ্ন জাগে বেশী এবং অপরিচিত আগতকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে এদের সঙ্কেত হয় না। তবে এদের বুদ্ধি বেশী এ কথা বলা চলে না। এদের বহু প্রশ্নই শিশুস্বল এবং অনেক প্রশ্ন অর্থহীনও ছিল। প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ হলে আমি খানিকক্ষণ ক্লাসে পড়ানো দেখলাম। খুব কড়াকড়ি ভাবে ঘটা ভাগ করে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হয় না এখানে। অনেকটা শিক্ষয়িত্রী ও ছেলে-মেয়েদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞি অনুসারে দৈনিক কার্যক্রম চল। সেদিন

তখন ঐ ক্লাসে সাহিত্য পড়া হচ্ছিল। সময়টা ঠিক খুঁটুপাসের আগে, তাই খুঁটুপাস বা nativity সবক্ষে "বালকবালিকার" রচনা লিখে এনেছিল শিক্ষয়িত্রীর নির্দেশক্রমে। কয়েক জনের রচনা শুনলাম। নৃত্য এদেশীয় সমাজে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু; শিশুকাল থেকেই এদের দৃষ্টি-কুর্ন্ত ভাবে নাচের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শেখানো হয়। অপেক্ষাকৃত ছোটদের একটা ক্লাসে শিক্ষয়িত্রী গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগিয়ে সেটা বাজাতে আরম্ভ করলেন। শিশুরা আপন আপন ইচ্ছামত তার সঙ্গে নাচতে আরম্ভ করল। যদিও তাদের ভঙ্গি বিভিন্ন, স্বাভাবিক চন্দ্রবোধ কিছু সকলেরই জাগ্রত; এবং কারো কারো ভঙ্গিমাৎ বেশ লীলায়িত ও সুন্দর।

প্রধান শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে পরিচয় হলো। এই দক্ষ ও কণ্ঠকুশল রমণী দুইটি বিজ্ঞালয়ের পরিচালনা করেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, দুইটি বিজ্ঞালয়ের সমস্ত শিশুর নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাঁর নখদর্পণে আছে। বহু পরিচিত জনের নাম মনে রাখবার ক্ষমতা এ দেশের লোকের আশ্চর্য, কিন্তু এই মতিহার শ্রুতিশক্তি আমাকে আশ্চর্য করে দিল। এ দেশের স্কুলের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা বললাম। কলেজের সঙ্গে পরিচয় আরো আগেই শুরু হয়েছে অধ্যাপকের পত্নী হিসাবে। এখানে পৌঁছবার তিন দিন পরেই ছাত্র-ছাত্রীরা আমার সঙ্গে পরিচয় করতে চায় বলে উনি আমাকে ওর ক্লাসে নিয়ে গেলেন। এই ক্লাসে সেদিন ফিল্ম দেখানোর কথা ছিল। স্কুলের ক্লাসে গ্রামোফোন শোনানো হচ্ছে, কলেজের ক্লাসে film দেখানো হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এই ক্লাসের পাঠ্য-বিষয় "ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি"। আমেরিকানদের সব কিছুই সরস, মধুর ও হালকা করে তোলার দিকে ঝোঁক, আর তা না হলে তাদের মন পাওয়া যায় না; আমাদের ভারতীয় অধ্যাপক সে কথা বুঝে চলচ্চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাসকে সুখরোচক করে তোলবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় দৃতবাসের দপ্তর থেকে কয়েকখানা ছোট-ছোট মনোরম চিত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ভারতীয় নৃত্য, শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত প্রভৃতির কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এতে। ছবিগুলি উপভোগ্য। আমেরিকায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই সাক্ষ্য ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলো এবং অনেক Undergraduate ক্লাসও সাক্ষ্য হয়; কারণ তাতে দিনের বেলায় বাদে জীবিকার অল্প কাজ করতে হয় তাঁরা উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পান। বেশি বয়সে স্কুল-কলেজে যাওয়ারকে আমরা অনেক সময়েই সময়ের ও শক্তির অপব্যয় মনে করি—এ দেশে তা নয়। তার কারণ বোধ হয় অর্থোপার্জনের প্রয়োজন ছাড়াও শুধু জ্ঞানচর্চার উৎসাহ এদের আছে। কাজেই সাক্ষ্য ক্লাসে নানা বয়সের লোক সমবেত হন। সাধারণতঃ সহরের কর্ণকেন্দ্রে কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অংশ থাকে, তাকে Downtown Campus বলে এবং সেখানে বয়স্কদের ক্লাস হয়। প্রতি সাক্ষ্য তিন ঘণ্টা ক্লাস হয়, তাতে তিনটি credit hour হয়। এমনি যদি সপ্তাহে চার দিন করা যায় তাহলে বারোটি credit hour হয় এবং দু'বৎসর ধরে নিয়মিত সপ্তাহ বারো ঘণ্টা ক্লাস করলে এম-এ পরীক্ষা দেবার উপযুক্ত বিবেচিত

# ত্রুদৈক ব্রনজী...

রূপচর্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে...নূতন এসে করে  
পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরস্বামী নারী—  
সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে  
জেগে রয়েছে চিরদিন.....কেনই যে তার অদ্বৈক  
রূপ। দে-রূপ সাধনায় এ-যুগের সর্বগুণাবিত আদিক  
জ্বাকুস্ম।



সি,°কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জ্বাকুস্ম হাউস, কলিকাতা।

CKJ-BI/CPS

হন। তবে সংসারী বা চাকুরে লোকের পক্ষে সস্তাহে বাবোটা ক্লাস করা প্রায় অসম্ভব। অনেকেই ছয়টা ছয়টা করে করেন, তাতে চার বৎসরে তাঁদের এম্-এ, দেবার যোগ্যতা হয়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের দুই বিভাগেই (দিনে ও রাত্রে) খুব ভীড়। যে সব ছাত্রদের যুদ্ধে টেনে নেওয়া হয়েছিল তাদের যুদ্ধান্তে আবার কলেজের পড়া সাক্ষর করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পড়বার সময়ে এদের খাবারীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করছেন,—এই বিধানের নাম G. I. bill; মূল ক্যাম্পাসে ও Downtown Campus-এ ছাত্র সমাগমের শেষ নেই, এদের বিভাগস্বরূপ দেখলে কি আনন্দই না হয়। তবে ধারা ভিতরের খবর রাখেন তাঁরা বলেন যে, যেমন অল্পতর তেমনি এখানেও অধিকাংশই আসে ডিগ্রীর জন্য; নিচক বিভাগস্বরূপের জন্য আসে ত-চার জন মাত্র। আমি নিজে যে দু'টি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম তার একটিতে যে সব মহিলারা আসতেন তাঁরা সবাই গৃহিণী শ্রেণীর—কেউ মধ্যবয়সী কেউ বা প্রৌঢ়া। এই বয়সের গৃহিণীরা আমাদের দেশে হলে সংসার-বন্দনের বাঁধের আর কিছুতে মনোযোগ দেবার কোনো সুযোগ পান কি? অথচ সংসার-বন্ধ এ দেশের এঁরাও কম করেন না। এক জনের কথা বলি। বয়স বড়র চল্লিশ হবে; স্বামী ভাল চাকরী করেন। তিনিটি সন্তান; বড়টি মেয়ে, সে ছোটবেলায় শৈশব-পক্ষাবাত বা Infantile paralysis হয়ে অবসন্ন হয়ে গেছে। স্বামী ভালো চাকরী করেন বলে তাঁর যে বাড়ীতে বি-চাকর আছে তা নয়। রান্না-খবের কাজ, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার করা এ সব তো নিজে করেনই—উপরন্তু বাগানের কাজও নিজে হাতে করেন। অবস্থার সচ্ছলতা বোঝা যায় তাঁর গাড়ী দেখে। তাও নিজে চালিয়ে আসেন। ড্রাইভার নেই। সস্তাহে দু'টি সন্ধ্যার তিনি সারা দিনের পরিশ্রমের পরও পড়তে আসেন স্বামী ও সন্তানদের খাইয়ে রেখে। দাসী-চাকর এ দেশে সহজে মেলে না; কিন্তু অল্পকণের জন্য সাহায্যকারী পাওয়া যায়। সন্ধ্যার পর ছোট শিশু রেখে যদি মায়েরা বেরোতে চান তবে যতক্ষণ তাঁরা না ফেরেন ততক্ষণ পাড়ার কোনো ছুলের বা কলেজের ছেলে-মেয়ে সেই শিশুটিকে ভুলিয়ে-রাখা ঘুমপাড়ানো প্রভৃতি করে। অবশ্য এ কাজ তারা করে বিনামূল্যে নয়, পারিশ্রমিক নিজেই। অনেকে হয়তো এ ভাবে অর্ধোপার্জন করে নিজের বই-খাতার খরচটা সবটাই জোগাড় করে নেয়। এই কাজ তারা করে তাদের বলে baby-seater.

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র ও নগর-মধ্যস্থ কেন্দ্র সবক্ষেত্র বা বলয় এ তো কেবল "আমেরিকান ইউনিভার্সিটি" সম্বন্ধে। তাহাড়া ওয়াশিংটনে আবার চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—"জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়", "জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়", "মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়" ও "হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়"। এর মধ্যে প্রথম তিনটি এবং "আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়" সাদা মানুষের জন্য। অতি নির্দিষ্ট সংখ্যক নিগ্রো ছাত্র এখানে ভর্তি হতে পারে। "হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়" কেবল মাত্র "রঙীন" অর্থাৎ নিগ্রো বা নিগ্রোসকরের জন্য।

আমরা যাকে বলি ভাইস্ চ্যান্সেলার এ দেশে তাকে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট। এ দেশে পৌছবার পরে এক দিন "আমেরিকান ইউনিভার্সিটি" প্রেসিডেন্ট ডাঃ ডগলাসের

সঙ্গে আমরা দেখা করতে গেলাম। এ দেশে আসে থেকে কথাবার্তা ঠিক না করে কেউ কারো বাড়ী যায় না। আমরাও দেখা করবার নির্দিষ্ট সময় জানিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ডগলাস দিন-রাত কাজে ব্যস্ত, তাই নির্দিষ্ট সময়ও তিনি বাড়ী পৌছননি। শুনেছিলাম তিনি অবিবাহিত; এবং তাঁর শূন্য সংসারে তাঁর এক বিবাহিতা ভগিনী সন্তানসহ থাকেন গৃহিণীর মর্যাদায়। প্রেসিডেন্টের বুদ্ধা মা জীবিতা আছেন, কিন্তু তিনি সচরাচর বাস করেন এক পার্কতে কৃষিক্ষেত্রে। সেখানে এখন শীত বেশী তাই সহরে চলে এসেছেন। তিনিই আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন এবং আমরা যেন কত দিনের পরিচিত ও স্নেহভাজন এই ভাবে গল্প করতে লাগলেন। আমার ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই ভগ্নমহিলার পূর্বে পরিচয় ছিল, কিন্তু পরে জানলাম যে, উনিও একে এই প্রথম দেখলেন। অপরিচিত মানুষের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার সুরে ভগ্নমহিলা আধ ঘণ্টার অধিক আলোচনা করলেন, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। গল্প করাটাকে সত্যিই এরা আটের মত চর্চা করে। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন যে, American University থেকে Howard University-র choir দলকে ষ্টুডেন্টসের প্রজ্ঞাপিত সঙ্গীত পাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, আজ তারা ইউনিভার্সিটির মন্দিরে গান গাইবে। আমরা তাঁর সঙ্গে গেলে তিনি খুসী হবেন। আমরা সাগ্রহে সম্মতি জানিলাম। নিগ্রোর এ দেশে গাইয়ে হিসেবে নাম করেছে; এই গানের দলের গানও আমাদের খুবই ভাল লাগলো। নিগ্রো বলতে আমরা যা বুঝি এ দেশের নিগ্রো ঠিক তা নয়। সাদা মানুষের সঙ্গে নিগ্রোদের প্রচুর সম্মিশ্রণ হয়েছে এবং তার ফলে এদের গায়ের রংয়ে আকস্মিক নিগ্রোর মত কৃষ্ণবর্ণ থেকে আরম্ভ করে শ্বেতচন্দ্রের মত রং এবং মাঝের সব রকম শ্রামবর্ণ ও গৌরবর্ণের বৈচিত্র্য পুষ্ট হয়। বাঙালীর মত রং অনেকেই থাকে। তবুও এদের চুলে এবং ঠোঁটে নিগ্রো জাতির বৈশিষ্ট্য প্রায়ই থেকে যায়। সেই লজ্জা এদের colored বলে পৃথক করা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রে, বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে সাদা-কালোর বিভেদ বড় কড়া। গাছীজী না কি লুই ফিশারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে কয়টা লিফিং হয়;—কথাটা আজকালও খাটে। ওয়াশিংটন ডি, সিন্স ঠিক দক্ষিণে, পটোম্যাক নদীর পরপারে ভার্জিনিয়া স্টেট দক্ষিণের অন্তর্গত। সেখানে সাধারণের গম্য স্থানে সর্বত্রই এই বিভেদ দেখেছি; সে কথা পরে বলব। আজ গানের দলে নানা রঙের মানুষের মেলা দেখলাম। গাইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্দ্ধে, কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা তার চেয়ে কমই ছিল। পরে শুনিলাম, ইউনিভার্সিটিতে সেদিন আরেকটি খেলাধুলার অনুষ্ঠান ছিল, ছেলে-মেয়ের দল সেখানেই গেছে। গান শোনার পর আমরা আবার প্রেসিডেন্টের বাড়ীতে ফিরে গেলাম। ইত্যবসরে প্রেসিডেন্ট ফিরেছেন; তাঁর সঙ্গে পরিচয় হোলো। চওড়া মুখ, বড় কপাল ও উজ্জল চেহারার হাসিখুসী মানুষটি। এর বিশেষত্ব এই যে, ইনি অসাধারণ খাটেতে পারেন। আমাদের সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ গল্প গল্প করলেন। আজকের গল্প-সম্মেলনের প্রধান বিষয় ছিল আমার আকাশ-বাতা। অবশেষে কবি ও মিষ্ট খেয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

২১শে ডিসেম্বর ইউনিভার্সিটিতে খুষ্টমাস ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যা বেলা সেখানে গেলাম। ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই বথারীতি সাক্ষ্য-পোষাকে সঙ্গে এসেছেন। পাশ্চাত্য পুরুষের সব বকম পোষাকেই দেহ অতি স্ফটিকরূপে আবৃত হয়, সাক্ষ্য-পোষাকে সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা ও রুচিবোধেরও পরিচয় মেলে। কিন্তু পাশ্চাত্য নারীর দিনের পোষাক বা কাজের পোষাক হৃদয়তার দিক দিয়ে বিসদৃশ; আর সাক্ষ্য-পোষাক নারীর স্বাভাবিক স্ত্রীর পরিপন্থী। পুরুষের চক্ষে নিজের যৌবনকে লোভনীয় করে তোলাবার এমন প্রকট প্রচেষ্টা সমগ্র প্রাচ্য দেশে কোথাও দেখা যায় না। “মেরী অ্যাভিনি হন্” এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাস। আজকের নিমন্ত্রণ ব্যাপার এখানেই হবে। এখান দেখলাম, দলে দলে মেয়েরা অর্দ্ধাবৃত হয়ে প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ছেলেরা মধুলোভী ভূঙ্গের মত আশে-পাশে গুঞ্জন করছে। মেয়েরা সবাই ছাত্রীর দল; স্ত্রাবকদের মধ্যে ছাত্রও আছেন, নবীন অধ্যাপকও আছেন। কয়েক জন অধ্যাপক ও অধ্যাপক-পত্নীর সঙ্গে পরিচয় হলো। জন দুই অধ্যাপিকার সঙ্গেও। আলাপ-পরিচয় করতে করতে এগোতে লাগলাম দোতলার সিঁড়ির দিকে—খাবার ব্যবস্থা সেখানে। একটা ঘরে খুব জোরে অ্যামেরিকান জাঁজ বাজছে ও নাচ হচ্ছে। ক্রমে ভীড়ের টানে-টানে খাবার-ঘরে পৌঁছান। প্রবেশ-পথের মুখে দেখি ডাঃ ডগলাস্ পাড়িয়ে সকলকে সম্বর্ধনা করছেন। কয়েক দিন আগেই সহকারী ডিন্ ডাঃ পোজনাবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আজ এখানে তাঁর পত্নীর সঙ্গেও আলাপ হলো। আমরা তাঁদের নিয়ে এক টেবিলেই খেতে বসলাম। প্রথমে ডিন্ প্রার্থনা করলেন, তার পর সকলে মিলে একটি ধর্মসঙ্গীত (খুষ্টমাসের উপযোগী) গাওয়া হলো। তার পর আমরা খেতে বসলাম। মিসেস পোজনাব আমার পাশে বসেছিলেন। মধ্যবয়স্ক মহিলা, জগ্ৰাবী তাঁর দেশ; মাত্র বছর দশেক আগে স্বামীর সঙ্গে এ দেশে এসেছেন, এ দেশটা এখনো তাঁর ধাতস্থ হয়নি। এ দেশের ছেলে-মেয়েরা বাল্যকাল থেকেই নিজের স্বাধীন ইচ্ছা দ্বারা যে ভাবে পরিচালিত হয় সেটা মোটেই তিনি পছন্দ করেন না দেখলাম। এ সম্বন্ধে আমার কি দায়িত্ব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, “দেখুন, আমরা প্রাচ্য দেশের লোক; বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান দেখানোর রীতি আমাদের দেশে যতখানি বেশী তার তুলনায় ইউরোপীয় রীতিও অনেকখানি হালকা; আর এ দেশের রীতির তো কথাই নাই। তবে আমি এ দেশে নতুন এসেছি এবং ইউরোপে বাই-ই নি; মতব্যা আমার এই মন্তব্য পুঁথিগত বিভ্রান্ত; অভিজ্ঞতা-স্বক নয়। ক্রমে যখন এ দেশের হালচাল আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখব তখন বলতে পারব। তবে যে বকম শুনেছি বাস্তবিকই যদি তাই হয় তবে আমার যে আপনাদের চেয়েও খারাপ লাগবে তা আগে থেকেই বলে দিচ্ছি।” শুনে তিনি খুব হাসলেন। যাক্, আমরা যে টেবিলে খেতে বসেছিলাম তা খুব সুলভ করে সাজানো ছিল। বাস্তবিক প্রত্যেকটি টেবিলই ছাত্রছাত্রীরা সাজিয়েছিলেন আর খুব সুলভ করেই সাজিয়েছিলেন। আহারাঙ্কে বথারীতি ঈশ্বরকে যজ্ঞবাদ জ্ঞাপন করার পর সব চেয়ে সুলভ করে সাজানো টেবিলটির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো, এবং সেটা

ধারা সাজিয়েছেন তাঁদের অভিনন্দন জানানো হলো। তার পর ছেলে-মেয়ের দল চলল নাচ-ঘরের দিকে; আমরা বিদায় নিলাম।

[ক্রমশঃ।]

## ভাগ্যালিপি

ঐশাধনা মিত্র

### তুহিন শীতল রাত।

পৃথিবীর আকাশ হতে শাদা জ্যোৎস্নার আভা আর শাদা স্বরফের কুচি এক তালে একসঙ্গে ক্রমাগত ঝরে চলেছে যেন গলা মোমের স্রোত। বঠিন পৃথিবীর দেহের সম্পর্কে এসেই জন্মে যাচ্ছে ওগুলো একান্ত হয়ে।

স্টেট্‌ কীথের একাংশ।

শহরতলী! মমর ধ্বনির চাপা কান্নাতে মুগ্ধরিত হয়ে উঠেছে পথের দু'পাশের ত্রস্ত বিবর্ণ পপলার গাছগুলো—হিমবাহী ঝোড়ো ঝাপটার নিরবচ্ছিন্ন আঘাত সহ করার শক্তি হারিয়েই হুহুতো। মোড়ের মাথায় মাথারি গোছের সরাইখানাটার হটগোলও কেমন নিঃশ্বাস হয়ে এসেছে দুর্দান্ত শীতের চাপে। মিটমিটে হলদে আলোতে রংচটা টেবিলগুলোর অস্বাভাবিক চেহারা, শরীর গরম করার অজুহাতে আকর্ষণ মদ গিলে লুটিয়ে-পড়া বস্ত্রিষ্ট-দেহী শ্রমিকদের কৌটকানো মুখের ভাব—চার দিকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা মাংসের টুকরো, সাহুসিক চিংড়ির পা, কীকড়ার দাঁড়া, ক্যাবিনস আর রেজিনের পসে-বাওয়া অংশ—সব খণ্ড-খণ্ড বিস্তৃততা মিলিয়ে কেমন একটা ভীতের ভাবই মনে জাগিয়ে তোলে।

ম্যানেজার নিজের চেয়ারে বসে বসে চুপে। মোটা-সোটা ইতদী পরিচরিকাটি সম্বর্ণণে তার পাশ কাটিয়ে আসবার সময়ে একবার ম্যানেজারের দিকে তাইলো! নাঃ, এখন বটা থানেকের মধ্যে আর ও জাগছে না নিশ্চয়ই। লম্বা বেকটার একধারে পুরোনো কোটটাকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে গুটিয়ে গুটিয়ে ইতদী পরিচরিকাটিও কাৎ হলো। একটু পরেই তার নাক গজল করতে আরম্ভ করলো।

এই তন্দ্রা-পূরীর অশ্রুত আবহাওয়া থেকে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টাতেই যেন ওধারের অন্ধকার কোণে নির্দিষ্ট স্টিট ছেড়ে একটি তরুণী সজোরে দাঁড়িয়ে পড়লো। আলোর শেডেতে ওর মুখটি সম্পূর্ণ আড়াল করা। কত দিন—আর কত দিন এ ভাবে এই নারকীয় পরিবেশের মধ্যে কাটাতে হবে? দৃষ্টি-কন্ডা সে, এই তো উপজীবিকা। কিন্তু কেন তার মনে কেবলি উঁকি মারে বড়ো হবার, এ সব ছাড়িয়ে উল্কে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা—অন্তরের গহন কোণে যে আসন রয়েছে দুর্লভ বশোলিঙ্গা সেখানে তো এই নগণ্য, অপরিচ্ছন্ন হোটেলের ম্যানেজার উলসনের চোখ-রাঙ্গানী পৌছায় না। কিন্তু তুচ্ছ এক পরিবেশনকাহিনীর এত স্বপ্নবিলাস কেন—নিজের অবস্থাতে সন্তুষ্ট না হওয়ার প্রয়াস?

টক্ টক্ টক্।

বাইরের দরজাতে টোকা পড়লো। থুপ করে মেয়েটি বহানে আত্মগোপন করবার চেষ্টা করে—বড়ো-বড়ো বলনীর রজিন জাল

বোনা ছেড়ে। এত রাতে এই সরাইখানার কি ধরনের লোক আসে জানা আছে ওর—পাঁড় মাতাল নিশ্চয়ই কোনো—এসেই পা ছড়িয়ে বসে মদের জর্ডার দেবে আর ঐ পানীয়ের অল্পপান স্বরূপ লোকটার লোলুপ দৃষ্টি তার নিটোল যৌবন-ভরা সর্বাঙ্গ লেহন করে ফিরবে অথবা সরাসরি কোনো ঘৃণ্য প্রস্তাব করেই বসবে। কেন খালি এই শ্রেণীর লোক এসে ভিড় করে এখানে? কেন আসে না কোনো সুচরিত্র গুণগ্রাহী রাজার ছেলে অথবা সেনাধ্যক্ষ—যে তাকে চিনতে পারবে—স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করবে তার অন্তর, তার পর এই পাঁকের থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে বসিয়ে দেবে বশের সিঁহাসনে?

টুক টুক টুক টুক। আবার টোকা পড়তে থাকে দরজাতে। মেয়েটি আরো ঘন হয়ে বসে তার জায়গাটিতে। টুক টুক টুক টুক। সাড়া না পেয়ে আগ্রহক এবার বুটের ঠোঙের দিতে থাকে বন্ধ দরজার 'শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চীৎকারও শোনা যায়—ওহে কাল! ম্যানজার, হোটেল বন্ধ রেখেই ব্যবসা চালাবে না কি?

মেয়েটি এতক্ষণে উৎকর্ষ হয়ে ওঠে। গলার স্বর, ভাষা, কথা বলার ভঙ্গী ছোট্টলোকের মতো তো নয়—যথেষ্ট ভঙ্গ আর শব্দ। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সমুপশ্চৈ মেয়েটি দরজা খুলে দেয়—তিন জন সুরেশ ভঙ্গলোক ঘরে ঢুকে পড়েন। আশে-পাশে একবার তাকিয়ে নিয়ে তাঁরা মেয়েটির দিকে চোখ ফেরান—সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে ওঠে তাঁদের চোখে-মুখে—এমন এক পারিপার্শ্বিক এমন একটি উদ্ভিন্ন-যৌবনা পুত্রী কিশোরীকে কেমন যেন মানাচ্ছে না—তাঁরা কল্পনা করেননি তো! দরজা কেন এতক্ষণ খোলা হয়নি সে কৈফিয়ৎ আর তাঁদের চাওয়া হোলো না—ওরই মধ্যে অসংস্কৃত খানিকটা জায়গা বেছে নিয়ে ওরা বসে পড়ে কফির কংক্রাস করলেন। গরম জল চড়িয়ে মেয়েটি ইহুদী পরিচারিকা বেসিংসকে ডেকে তুললো। উলসন্ ইতিমধ্যে উঠে পড়েছে; তার ঘরে এমন অসময়ে এতগুলি মহাসত্ত্ব অতিথিকে দেখে ঠাঁক-ডাকের চোটে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। অতিথিরা তাকে বাস্তব হতে বারণ করে এক পাশে ডেকে নিয়ে কি একটা পরামর্শ করতে লাগলেন যেন মনে হোল। কফি আর বিস্কুট ছাড়া তাঁরা কেউই আর বিশেষ কিছু নিলেন না। দ্বিতীয় বার কফি পরিবেশন করতে গিয়ে খানিকটা গরম কফি পরিবেশনকারিণী—ওঁদের মধ্যে বিনি প্রধান তাঁরি কোলেতে ঝেলে দিলে—এত তার হাত কাঁপছিলো। ভঙ্গলোক লাক্ষিয়ে উঠে পড়লেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওপরের ৯ কোটা খুলে ফেললেন, সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। উলসন্ চোখ কটমট করে তাকিয়ে একটা বেরাড়া গালাগাল দিয়ে উঠলো।

মেয়েটি লজ্জায় ও ভয়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলো—বহুদূর দীর্ঘা-বিভক্তা হলে বোধ হয় তখন সুরিখা হোতো তার। হি হি, অমন দামী পোষাকটা অসাংবধানতা বশতঃ নষ্ট করে দিলে সে?

ভঙ্গলোকটিই কিছু বাচিয়ে দিলেন তাকে। তিনি এগিয়ে এসে ওর কম্পিত হাত হতে 'ট্রে'টি নিলেন আর অস্ত্র হুঁজুনকে পরিবেশন করে মিষ্টি ভাবে ওকে বুঝিয়ে দিলেন কি ভাবে পরিবেশন করতে হয়। উলসন্ প্রভৃতি সকলে ঠাঁ করে রইলো—এমন ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেনি—গালাগালির বদলে এ কি? সবাইকে আশাতীত রকম বখশিশ্ব করে তার পর তাঁরা চলে গেলেন। উলসন্ও গেল সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিতে। ফিরে এসে উলসন্ সালস্কারে ভঙ্গলোকত্রয়ের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে। ওঁরা না কি কাছাকাছি কোনো এক গ্রামে ফিল্ম তুলতে এসেছিলেন সকাল থেকেই—খুব বড়ো এক কোম্পানী। ছবি তোলা হয়ে বাওয়ার পর সব ট্রাকগুলি রওনা করে দিয়ে আসতে আসতে এঁদের এত রাত হয়ে যায়। পথের মাঝে গাড়ী খারাপ হয়ে গিয়ে আরও দেবী হয়ে গেল। ঠাঁওয়ার জমে গিয়ে এক কাপ কফির জন্তেই থুঁজে-থুঁজে ওঁরা এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। কথার শেষে উলসন্ গভীর ভাবে তরুণী পরিচারিকাকে বললে, পরের দিন বিকেলে তৈরী হয়ে থাকার জন্ত। আর কিছু জানা গেল না ওর কাছ থেকে।

পরদিন ঐ ভঙ্গলোকেরা আবার এলেন। মেয়েটির বুক টিপ টিপ করছে—ভাগ্য তাকে নিয়ে আবার এ কি নতুন খেলা আরম্ভ করলে—কতখানি উপহাসাস্পদ হবে সে জন-সমাজে।

উলসন্ও গাড়ীতে চেপে বসলো সাহস দেওয়ার প্রয়োজনে। সামান্য ছোটো একটু ভূমিকা—প্রথম দিন তো ক্যামেরা আর ফ্লাড লাইটের সামনে একটা কথাও বেরোলো না মুখ দিয়ে। বিস্কু ওর অঙ্গ-সৌষ্ঠব আর ভঙ্গিমা যথেষ্ট মুগ্ধ করলো পরিচালককে। ভাগ্যচক্র ঘুরতে আরম্ভ করলো বীরে-বীরে শুভ লক্ষ্যের নির্দেশে।

ট্রুডিঙতে 'একট্রা' হতে ছোট-ছোট ভূমিকার মেয়েটি দক্ষতা দেখাতে লাগলো ক্রমশঃ। সেই কফি-মাখানো পোষাকটি একবার ও উপহার পেলো ডিরেক্টরের কাছ হতে ভালো অভিনয়ে পুরস্কার-স্বরূপ। প্রথম বৈদ্যন ওর অভিনীত ছবি মুক্তিলাভ করলো সেদিন ওর কি আনন্দ—তা সে বত ছোট পাটাই হোক না কেন।

সেদিনের সেই ব্লটন্ কীথের এক নগণ্য হোটেলের পরিবেশনকারিণী এই ভাবে সুরোণ শেষে বীরে বীরে হলিউডের তারকা জগতে পরিচিত হল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই—সেই পৃথিবী বিখ্যাত অভিনেত্রী প্রেটা গারো।

### জীবন-দর্পণ

“জীবনটা হ'ল একটা আয়না। তুমি যদি তাকে দেখে ভ্রু কুঞ্চিত কর, সেও তাই করবে। তুমি যদি সহ্যন্তে তার প্রতি তাকাও, সেও হাসতে হাসতে তোমাকে অভিনন্দন জানাবে।”

—খ্যাকারে।

২৫০। রজনী-রহস্য (মাসিক) : ১ জানুয়ারি ১৮৭৯।  
ইহাতে কেবল মাত্র উপজ্ঞান স্থান পাইত। আমাচারণ কুণ্ড কৰ্ণক  
প্রকাশিত।

২৫১। কৃষিতত্ত্ব (মাসিক) : মাঘ ১২৮৫।

পাইকপাড়া নার্সারি হইতে নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক  
কৃষি-বিষয়ক এ... প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—বিশ্রাম  
মুখোপাধ্যায়।

২৫২। ভারত-সুন্দর (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

ঢাকা, নান্দার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অম্বিকাচরণ রায়।

২৫৩। সাহিত্য ভাণ্ডার (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

“এই পত্রিকা স্থলবিশেষে চেষ্টা ও স্থলে স্থলে পেনি  
এনসাইক্লোপেডিয়ায় অনুরূপে লিখিত হইবে। কোথাও বা  
অবিকল অনুবাদ করা হইবে, কোথাও বা অমাত্র গ্রন্থকারের  
শ্রুত হইতে বিষয়বিশেষ সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধার করা হইবে।”  
কলিকাতা বড়বাজার ১৪৭ নং কটন স্ট্রীট হইতে মদনমোহন ভট্ট  
কর্তৃক প্রকাশিত।

২৫৪। সমাচার সার (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।  
গলাহাট হইতে প্রকাশিত।

২৫৫। রজনী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৫।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।

২৫৬। নব বিভাকর (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

সম্পাদক—গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ভবানীপুর এল-  
এম-এস-কলেজ। ইহা সেকালের একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদ-  
পত্র। ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে ‘নব বিভাকর’ অন্তর্য্যস্ত  
সংস্কার-সম্পাদিত ‘সাধারণী’র সহিত সম্মিলিত হয়। অন্তর্য্যস্ত  
‘নব বিভাকর—সাধারণী’ সম্পাদন করিতেন; ৪র্থ ভাগ, ২১শ  
সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার বিলুপ্তি  
ঘটে।

২৫৭। খেয়াল (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে কবিতা, গল্প, উপজ্ঞান  
বঙ্গ-রচনা স্থান পাইত। সম্পাদক—নন্দলাল রায়। ১২৮৯  
সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকাখানি ‘মাসিক সমালোচক’র সহিত  
সম্মিলিত হইয়া যায়।

২৫৮। মাসিক সমালোচক : বৈশাখ ১২৮৬।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উদ্ভাস্ত্র প্রেম-  
চন্দ্র চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

২৫৯। পূর্ব প্রতিক্ষনি (পাক্ষিক) : বৈশাখ  
১২৮৬।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

২৬০। খুদীর বাত্ব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৬।

পৃষ্ঠপুর্ষ সঙ্কীর্ণ সচিব মাদিকপত্র। সম্পাদক—জি. এইচ.  
রুস (Rouse)।

২৬১। প্রভাত-পঞ্চ (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৬।

বহরমপুর কলেজের জন-কয়েক ছাত্রের বৃত্ত প্রকাশিত।  
সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

২৬২। দুঃখিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ত্রিভুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, কবিতাময়ী পত্রিকা। সম্পাদক—  
ভগবতীচরণ চক্রবর্তী।

২৬৩। প্রভাতী (দৈনিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

স্বসম্পাদিত পত্রিকা, শিয়ালদহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—  
ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত।

২৬৪। নিরামিষভোজী বালক (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ইহাতে খাদ্য-বিষয়ক—বিশেষতঃ নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে  
আলোচনা থাকিত। পরিচালক—বলরাম লাহিড়ী।

২৬৫। বিশ্ববন্ধু (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

বগুড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কিশোরীলাল রায়।

২৬৬। কল্পনা-লতিকা (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৬।

ভবানীপুর হইতে ভূদয় গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও  
গোপালচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ৭ম সংখ্যা (মাঘ ১২৮৬) হইতে  
পত্রিকাখানির নামকরণ হয় ‘কল্পলতা’ এবং ‘স্বর্ণলতা’-রচয়িতা  
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

২৬৭। শারদ কোমলী (সাপ্তাহিক ?) : ভাদ্র ১২৮৬।

ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রিকা।

২৬৮। মেদিনী (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২৮৬।

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—স্বয়ম্ভাব দাস।  
ইহাতেই বোধ হয় কবি কামিনী রায়ের রচনা সর্বপ্রথম প্রকাশিত  
হয়। তিনি লিখিয়াছেন—“মেদিনী নামে মেদিনীপুরে একখানা  
সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা [চণ্ডীচরণ সেন] তাহার জন্য  
আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তৎকালে ‘প্রার্থনা’ ও  
‘উদাসিনী’ শীর্ষক দুইটি কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও  
‘আলো ও ছায়া’র স্থান পায় নাই।”

২৬৯। সংশোধনী (সাপ্তাহিক : আশ্বিন (?) ১২৮৬।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

২৭০। চিন্তা (সাপ্তাহিক) : কার্তিক ১২৮৬।

সম্পাদক—ভূদয় চট্টোপাধ্যায়।

২৭১। ভারতদর্পণ (মাসিক...) : অগ্রহায়ণ ১২৮৬।

কলিকাতা পটুয়াটোলা বাস্তব সভা হইতে প্রকাশিত। চারি মাস  
পরে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়;  
সম্পাদক—তারকনাথ বিষ্ণু।

২৭২। ভারত ভিহারিনী (মাসিক) : পৌষ ১২৮৬।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—হরকুমার মুখোপাধ্যায়।

ইং ১৮৮০

২৭৩। নক্ষত্র (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৬।

শান্তিপুর, খাঁ-পাড়া হইতে প্রকাশিত।

২৭৪। আভাস (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৬।

“ইদানীন্তন বিকপতা-প্রাপ্ত আচার-ব্যবহারাদির প্রতি লক্ষ্য  
করা এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। সম্পাদক—ভুবনমোহন  
বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৭৫। বিষ-বৈরী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৭।

১৫ নং কলেজ স্কয়ার হইতে ব্যাণ্ড অব হোপ দ্বারা প্রকাশিত  
ও বিনামূল্যে বিতরিত। সম্পাদক—নন্দলাল সেন।

২৭৬। প্রকৃতি (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৭।

ডুবানীপুর হইতে প্রকাশিত “বিজ্ঞান ও কবিতাময়ী মাসিক  
পত্রিকা।” সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। ১২৯০ সাল  
হইতে ইহা তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত ‘কল্পলতা’র সহিত  
সম্মিলিত হইয়া যায়।

২৭৭। কৃতজ্ঞতা-কাব্য-কুসুমোপহার (ত্রৈমাসিক) :

ইহাতে কবিতাই—বিশেষতঃ মহারানী স্বর্ণময়ীর গুণগরিমানুচক  
কবিতাই স্থান পাইত। সম্পাদক—অঘোরনাথ ঘোষ।

২৭৮। নলিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৭।

দে-বুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। ইহার প্রথম তিন  
পর্বে ‘মহিমা’র কবি স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনেকগুলি অপ্রকাশিত  
গল্প-পত্র রচনা স্থান পাইত কথিত। সম্পাদক—নরেন্দ্রনাথ বসু।

২৭৯। ত্রিপুরা বার্তাবহ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৮৭।

ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত।

২৮০। আখ্যপ্রভা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৭।

ময়মনসিংহ, দুর্গাপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কম্বীকান্ত  
ঠাকুর। ইহা প্রকৃতপক্ষে পূর্বপ্রকাশিত ‘আখ্যপ্রদীপ’ পত্রেরই  
নামান্তর মাত্র।

২৮১। উপহার (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

শোভাবাজার কলিকাতা হইতে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ইহা প্রকাশ  
করিতেন।

২৮২। সমীরণ (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

পল্লীগাম জুগুড়া হইতে প্রকাশিত। পরিচালক ও  
স্বত্বাধিকারী—কদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইহার ২য় খণ্ড মাখনলাল  
দত্তের সম্পাদনায় ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হয়।

২৮৩। কুসুম (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

সম্পাদক—রাধামাধব হালদার।

২৮৪। বঙ্গবহু (সাপ্তাহিক) : ২২ আগষ্ট ১৮৮০।

ইহা পূর্বে ‘বীদরানী’ নামে প্রকাশিত হইত। পরিচালক—  
স্বরকনাথ মুখোপাধ্যায়।

২৮৫। অপূর্ণ রহস্য (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, হাত-প্রধান পত্র। পরিচালক—  
হরিহর নন্দী।

২৮৬। লাক্ষ্মীময়ী (সাপ্তাহিক) : ২৬ আগষ্ট ১৮৮০।

সম্পাদক—দেবকান্ত বাগচী।

২৮৭। হিন্দুদর্শন (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৭।

স্বদেশ মুন্সীর একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র। সম্পাদক—  
বিধুভূষণ মিত্র।

২৮৮। নব ভারতী (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৭।

সম্পাদক—বরদীন্দ্র সরকার।

২৮৯। জ্ঞানপ্রভা (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৭।

সংস্কৃত-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। সম্পাদক—কুমার উমেশচন্দ্র  
রায় ও শ্যামলাল চক্রবর্তী।

২৯০। রহস্য-মঞ্জরী (মাসিক) : ভাদ্র (?) ১৮৮৭।

পরিচালক—জগদীশ-নিবাসী কদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৯১। কল্পনা (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৭।

দে-বুগের একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। সুলভে সাধারণের মধ্যে  
জ্ঞানপ্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। চতুর্থ বর্ষের (মার্চ ১৮৮৬)  
পত্রিকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বরদীন্দ্রনাথ, বিহারিলাল চক্রবর্তী প্রমুখ  
খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের রচনায় অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সম্পাদক—  
হরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯২। ধর্মবিষয়ক প্রতিবাদ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৭।

কালীঘাটস্থ হিন্দু মিশনারী সোসাইটির মুখপত্র। খৃষ্টধর্মের  
সহিত তুলনায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য  
ছিল।

২৯৩। মাধবী (পাক্ষিক) : কার্তিক ১২৮৭।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৯৪। পরিদর্শক (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৮০।

ঈহট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি  
ঈহার Memories of my Life and Times পুস্তকে  
লিখিয়াছেন —“a new Bengalee weekly was started  
in Sylhet about the middle of 1880, and I was  
invited to be its editor...The name of our new  
Bengalee weekly was ‘Paridarshak’...Like the  
‘Bharat Mihir’ of Mymensingh, the ‘Paridarshak’  
of Sylhet also almost from its birth commen-  
ded public attention and soon became one of the  
most powerful exponents of educated public opi-  
nion not only of the district of Sylhet but more  
or less of the whole province of Bengal...It was  
my first independent charge in journalism, and  
my subsequent career in this line has been very  
largely indebted to this first opportunity that  
my Sylhet friends found me.”

২৯৫। আদর্শিনী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৭।

সুলভ মূল্য, নিয়মিত প্রকাশ ও সাধারণের মনোব্রঞ্জন—এই  
তিনটি গুণের অতি লক্ষ্য রাখিয়া এই মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনীয়  
আবির্ভাব হয়। সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

ইং ১৮৮১

২৯৬। ভিষক (মাসিক) : আশ্বিন ১৮৮১।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র।  
পরিচালক—হর্গদাস রায়।

২৯৭। খৃষ্টীয় মহিলা (মাসিক) : মাঘ ১২৮৭।

ইহা কেবল মাত্র মহিলাদের দ্বারাই পরিচালিত হইত।  
সম্পাদিকা—কুমারী কামিনী শীল।

২৯৮। বিক্রমপুর প্রকাশ (মাসিক) : মাঘ ১২৮৭।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী।

২৯৯। ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৮১।

৩০০। চাক্ষুবর্তী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৮

শেরপুর হইতে প্রকাশিত। পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক নীলেশচরণ বসু কিছু দিন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

৩০১। **সজ্জনভোষণী** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৮।  
বৈষ্ণব পত্রিকা। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হইবার প্রায় দুই বৎসর পরে (মাঘ ১২৯১) ইহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—কেশবনাথ দত্ত।

৩০২। **সদানন্দ** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৮।  
ঢাকা হইতে প্রকাশিত। “বস-প্রধান বিজ্ঞপ পত্র ও সমালোচন”। প্রকাশক—হরিহর নন্দী।

৩০৩। **পাটনা ধর্মসভা মাসিক পত্রিকা** : বৈশাখ ১২৮৮।  
বাঁকীপুর হইতে প্রকাশিত, বাংলা-ইংরেজী-হিন্দী পত্র।  
পরিচালক—অম্বিকচরণ ঘোষ।

৩০৪। **রসিকরাজ** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।

হাত্ৰোদীপক, বিজ্ঞাপনক সচিত্র মাসিকপত্র।

৩০৫। **সাতস** (সাপ্তাহিক) : জুন ১৮৮১।  
এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। কয়েক মাস পরে ইংরেজী-বাংলা  
দ্বিভাষিক পত্রে পরিণত হয়।

৩০৬। **বেঙ্গল মিসুলেনি** (মাসিক) : জুন ১৮৮১।  
চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র।  
সম্পাদক—জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩০৭। **তত্ত্বকল্পতরু** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৮।  
সম্পাদক—প্রসন্নকুমার কর চৌধুরী।

৩০৮। **হালিশহর প্রকাশিকা** (সাপ্তাহিক) : আষাঢ় (?) ১২৮৮।

কলিকাতা হইতে নবীনচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে  
রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত।

৩০৯। **বিধানী** (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৮।  
“খাছারী নববিধানের গভীর তত্ত্ব ও উচ্চ ভাব সহজে বুঝিতে চান,  
এবং ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ ও গল্প পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চান,  
ঐহাদিগের জ্ঞাত।” পরিচালক—নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

৩১০। **চন্দ্রিকা** (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৮।  
উদয়পুর হইতে প্রকাশিত, সম্ভবতঃ বাংলা সাময়িক-পত্র।

৩১১। **ধর্মবন্ধু** (পাক্ষিক...) : ১ আশ্বিন ১২৮৮।  
“ইহাতে সাধারণের পাঠোপযোগী ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় প্রস্তাব,  
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত ও সুন্দর সুন্দর আখ্যানিকা”  
স্থান পাইত। সম্পাদক—শশিভূষণ বসু। চারি বৎসর পরে—  
১৮৭৭ শকের বৈশাখ (ইং ১৮৮৫) হইতে ‘ধর্মবন্ধু’ মাসিক আকার  
ধারণ করে। ১৮৯০ সনে ইহার সম্পাদক হন—রামানন্দ  
চট্টোপাধ্যায়।

৩১২। **সরস্বতী** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৮।

পরিচালক—নন্দলাল ঘোষ।

৩১৩। **হোমিওপ্যাথিক প্রচারক** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৮।

বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৩১৪। **শ্রীক্ষেত্র চিত্র** (মাসিক) : আশ্বিন (?) ১২৮৮।

ঢাকা হইতে ক্ষেত্রচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

৩১৫। **উদাসিনী রাজকম্বার গুপ্তকথা** (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৮।

ইহাতে উপক্ৰান্ত স্থান পাইত। প্রকাশক—গোপেন্দ্রনাথ দাস  
ঘোষ, টালা।

৩১৬। **সাহিত্য-দর্শন** (মাসিক) : ১২৮৮ সাল।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

৩১৭। **আচার্য্য** (মাসিক) : কা্তিক ১২৮৮।

নড়াইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩১৮। **বালক-হিতৈষী** (মাসিক) : কা্তিক ১২৮৮।

বালকপাঠ্য। পরিচালক—জানকীপ্রসাদ দে।

৩১৯। **বঙ্গ-সুহৃদ** (মাসিক) : কা্তিক ১২৮৮।

শেরপুর, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অঘোরনাথ  
চট্টোপাধ্যায়।

৩২০। **আধ্যাত্মহিনী** (সাপ্তাহিক) : ৮ নবেম্বর ১৮৮১।

বালক-বালিকা-পাঠ্য। সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

৩২১। **নিরপেক্ষ ধর্মতত্ত্ব** (মাসিক) : কা্তিক ১২৮৮।

নিরপেক্ষ ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র।

৩২২। **বঙ্গবাসী** (সাপ্তাহিক...) : ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৮৮  
( ১০-১২-১৮৮১ )।

“বঙ্গবাসীর উদ্দেশ্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার।  
রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, জীবনচরিত, বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ-  
পত্র,” এই অতিপরিচিত পত্রিকাখানি যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তদীয়  
বন্ধু উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়েব সহযোগে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম  
সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল।

## ইং ১৮৮২

৩২৩। **চিন্তরঞ্জিনী** (দ্বৈমাসিক) : হেমন্ত, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১২৮৮।

শ্রীবাটী সাহিত্য সভা হইতে প্রকাশিত। “সংক্ষেপতঃ সামাজিক  
বিষয়ে সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনাই এই চিন্তরঞ্জিনী বা সচিত্র বক্তৃ-  
পত্রিকার অন্ততম উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—রাজরাজেন্দ্র চন্দ্র।

৩২৪। **হরিভক্তিতরঙ্গিনী** (মাসিক) : পৌষ ১২৮৮।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। “পত্রিকাখানির দ্বারা নববিধান  
প্রচার করাই উদ্দেশ্য।”

৩২৫। **দি ইণ্ডিয়ান হোমিওপ্যাথিক রিভিউ** (মাসিক) :  
জ্যৈষ্ঠ ১৮৮২।

ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্র। সম্পাদক—বিহারিলাল  
ভাট্টা, এল-এম-এস-এ।

৩২৬। **অতিথি** (মাসিক) : মাঘ ১২৮৮।

বঙ্গের সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে আলোচনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।  
বেহালাব রায় এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ ইহা প্রকাশ করিতেন।

৩২৭। **অবকাশ** (মাসিক) : মাঘ ১২৮৮।

‘কল্পনা’-কাৰ্য্যালয় হইতে প্রকাশিত “নবজ্ঞানপূর্ণ মাসিকপত্র”।  
সম্পাদক—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৩২৮। **বঙ্গবিলাপ** (মাসিক) : মাঘ (?) ১২৮৮।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—কালীনাথ চৌধুরী।



৩২৯। পারিজাত (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২৮৮।

পরিচালক—হরচন্দ্র দাস।

৩৩০। শিবদায়িকা পত্রিকা (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২৮৮।

কালীচন্দ্র লাহিড়ী-সম্পাদিত 'জ্ঞানদীপিকার' নামাঙ্কর।

৩৩১। কল্লতরু (মাসিক) : ১২৮৮ সাল।

সম্পাদক—অপূর্ণকৃষ্ণ দত্ত।

৩৩২। প্রবাহ (মাসিক) : ১ বৈশাখ ১২৮৯।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। সম্পাদক—বামোদর মুখোপাধ্যায়।  
 ইতিকাল হুই বৎসর। ১৩১১ সালের মাঘ মাস হইতে 'প্রবাহ' পুনঃপ্রচারিত হয়; এবারও হুই বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই।

৩৩৩। সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৯।

"ইহাতে স্বাভাবিক ও বিজ্ঞাতীয় ভাষায় প্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সরল বাঙ্গলায় অনুবাদ মাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে।"  
 সম্পাদক—প্রাণানন্দ কবিভূষণ; তৃতীয় বর্ষ হইতে বীরেশ্বর পাণ্ডে ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন।

৩৩৪। গোপাল ভাঁড় (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৯।

"রহস্যজনক মাসিকপত্র।" সামাজিক কুনীতি প্রীকৃত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পাদক—কিবললাল বর্ষণ।

৩৩৫। বার্তাবহ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৮৯।

পাবনা হইতে প্রকাশিত।

৩৩৬। ঋষিতত্ত্ব (মাসিক) : বৈশাখ ১২৮৯।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আত্মব্রহ্মের মাসিকপত্র ও সমালোচনা।"  
 সম্পাদক—অন্নদাচরণ সংস্কৃতি।

৩৩৭। দর্পণ (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯।

কুমিল্লা মুহূর্ত্ত সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত।

৩৩৮। ভারতভিত্তিক (পাক্ষিক) : জ্যৈষ্ঠ (?) ১২৮৯।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত।

৩৩৯। রামধনু (সাপ্তাহিক) : জুন ১৮৮২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত শিল্প বিজ্ঞানাদি বিষয়ক সচিত্র পত্রিকা।  
 সম্পাদক—দুর্ধ্বনাথায়ণ ঘোষ, ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরি অ্যাসিষ্ট্যান্ট।

৩৪০। নবীন (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৯।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রসন্নকুমার গুহ।

৩৪১। স্বদেশ সংস্কারক (মাসিক) : আষাঢ় ১২৮৯।

সম্পাদক—হরিমোহন রায়।

৩৪২। প্রতিভা (সাপ্তাহিক) : আষাঢ় (?) ১২৮৯।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

৩৪৩। প্রতিবাদ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৯।

সম্পাদক—অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩৪৪। মালা (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৮৯।

সম্পাদক—মাধনলাল দত্ত।

৩৪৫। উষা (মাসিক) : শ্রাবণ (?) ১২৮৯।

পাবনা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তারকনাথ অধিকারী।

৩৪৬। ভারতবাসী (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৮৯।

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।

৩৪৭। বিক্রম (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৮৯।

বঙ্গ-বিক্রপাত্মক পত্র। সম্পাদক—কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৩৪৮। দিল্লীকা লাড্ড (মাসিক) : ভাদ্র ১২৮৯।

সম্পাদক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

৩৪৯। সুরভি (সাপ্তাহিক) : ১ আশ্বিন ১২৮৯।

"এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আলোচনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা 'সুরভি'র উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—যোগীন্দ্রনাথ বসু। ইহা রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইত। বছর-চারেক পরে পত্রিকাখানি 'পতাকা'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুরভি ও পতাকা' নাম ধারণ করে।

৩৫০। বঙ্গবন্ধু (মাসিক) : অক্টোবর ১৮৮২।

খুঁটতবুন্দুলক পত্র। সম্পাদক—রে: বরদাচরণ ঘোষ।

৩৫১। প্রজাবন্ধু (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২৮৯।

গোন্দলপাড়া (ফরাসী চন্দননগর) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৫২। ইন্দ্রজাল বা উদাসিনী রাজকন্ডার পুঁথি (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৯।

ইহাতে বঙ্গীকরণ ও দ্রব্যগুণ দ্বারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ক্রিয়া-প্রদর্শনের প্রক্রিয়াসকল স্থান পাইত। প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৩৫৩। আর্ধ্যরঞ্জন (মাসিক) : আশ্বিন ১২৮৯।

বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

৩৫৪। জাতীয় সুস্বাদু (পাক্ষিক) : আশ্বিন (?) ১২৮৯।

৩৫৫। জ্ঞানবিকাশিনী (সাপ্তাহিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯।

ঢাকা হইতে 'সুসঙ্গত সমাচার'ের আদর্শে প্রকাশিত।

৩৫৬। প্রেমপ্রচারিণী (পাক্ষিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। পরিচালক—কিশোরীমোহন পাল।

৩৫৭। সুখসংরক্ষ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৮৯।

সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি সম্বলিত মাসিকপত্র। পরিচালক—সরোজনাথ মুখোপাধ্যায়।

৩৫৮। আর্ধ্যপ্রতিভা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২৮৯।

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা। প্রকাশক—কালীচরণ পাল।

৩৫৯। বঙ্গবন্ধু (মাসিক) : পৌষ ১২৮৯।

শ্রীরামপুর হইতে রামচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত।

জুগপাইগুড়িতে ভাগ্যবিপর্যয়ের পর  
সন্ন্যাসী দল নিরুৎসাহ না হইয়া শক্তি  
সঞ্চয় করিতে লাগিল। ১৭৭৩ সালের জাহ্নুয়ারী  
মাস হইতে ইহাদের পুনরাবির্ভাবের সন্ধান  
পাওয়া যায় এবং এই বৎসরেই বিদ্রোহ চরম  
আকার ধারণা করে। বগুড়ার কালেক্টার মি:  
হাচ, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট এক সংবাদ  
পাঠান যে, চৌগাঁ অঞ্চলে জমিদারের নামেবকে  
সন্ন্যাসী দল বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। উপযুক্ত মুক্তিপণ ব্যতীত  
তাহার উদ্ধারের আশা নাই। সেই সময় তিন সহস্র সন্ন্যাসী  
বগুড়া হইতে ১২ মাইল দূরে সেরপুরে অবস্থান করিতেছিল।

৮ই জাহ্নুয়ারী মি: হাচের আর এক পত্রে প্রকাশ যে, বগুড়ায়  
অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ ৮০টি গরুর গাড়ী, এক শত ঘোড়া সমেত দুই সহস্র  
সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত এলাকায় সমস্ত সন্ন্যাসী  
দলের আবির্ভাবে তিনি প্রমাদ গনিলেন। সন্ন্যাসীদের সহিত  
কোন প্রকার সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য জমিদারদের পক্ষ হইতে  
দুই জন নামের ও কোম্পানীর উকিল সমেত সন্ন্যাসী দলপতির  
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের অভিপক্ষি জ্ঞাত হন। বারো শত  
টাকার বিনিময়ে সন্ন্যাসী দল স্থানত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়।  
জমিদারগণ অর্থ প্রদানে স্বীকৃত হইলে কোম্পানীর কোবাগার  
হইতে উক্ত অর্থ জমিদারগণকে অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হয়।  
অর্থপ্রাপ্তির পর সন্ন্যাসী দল বগুড়া হইতে শিবগঞ্জ গিয়া আরও  
চারি সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সহিত মিলিত হয়।

এই সংবাদ অবগত হইয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন  
এডওয়ার্ডকে অবিলম্বে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ঢিলমারী অভিযুখে  
যাত্রা করিবার আদেশ দেন। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড তিন কোম্পানী  
সিপাহী সৈন্য লইয়া ১৭ই জাহ্নুয়ারী রংপুর জেলার অন্তর্গত  
উলিপুর হইয়া পর-বিবস ঢিলমারীতে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত  
হইয়া জানিতে পারেন যে, ১২ই তারিখে সন্ন্যাসীদের একটি ক্ষুদ্র দল  
তথায় পৌছাইয়া স্থানীয় জমিদার ও দুই জন বিশিষ্ট অধিবাসীকে  
ধরিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের নিকট হইতে ১৩০০০ টাকা আদায়  
করে। অল্পমন্ধানে আরও জানা যায় যে, সন্ন্যাসী দল দেওয়ানগঞ্জ,  
এমনাপুর হইয়া ময়মনসিংএর মধুপুর জঙ্গলে আশ্রয়গোপন করিয়াছে।  
উক্ত জঙ্গলে সন্ন্যাসী দলপতির হাশিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও  
পরিলক্ষিত হয়। জঙ্গলে আশ্রয়গোপন করার পর সন্ন্যাসীদের  
গতিবিধি ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই।

২৬শে জাহ্নুয়ারীর এক পত্রে ঢাকার কালেক্টার বলেন, “আমি  
অন্ত ময়মনসিংএর পরগণা-জমিদার কিংবদন্তী রায়ের নিকট হইতে  
২০শে জাহ্নুয়ারী তারিখের এক পত্র পাইয়াছি। উক্ত পত্রে জানা  
যায় যে, দরিয়ান গিরির নেতৃত্বে ৫ হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল  
জামালপুরের অন্তর্গত জাকরণাহী পরগণায় প্রবেশ করিয়াছে।  
স্থানীয় জমিদারের নামেবকে আটক রাখিয়া ইহারা ১৬ শত টাকা  
আদায় করে। ইহার পর সন্ন্যাসিগণ মধুপুর, মুক্তাগাছা জমিদারের  
খালাপসি পরগণা হইয়া ময়মনসিং অভিযুখে বাগরার সংবাদ  
পাইয়াছি।”

উক্ত পত্রে আরও জানা যায় যে, মতি গিরির অধীনে ছয় হাজার  
সন্ন্যাসীর আর একটি দল দরিয়ান গিরির দলের সহিত মিলিত হইবার

# বিপ্লবী বাংলা

শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী

জন্ত ময়মনসিংএর দিকে যাত্রা করিয়াছে। দলের সামরিক শক্তির  
এক বর্ণনা করিয়া পত্রলেখক বলেন যে, ইহাদের সহিত প্রচুর গাদা  
বন্দুক, বর্ম ও অস্ত্রাশ্রয় সামরিক অস্ত্রশস্ত্র রহিয়াছে।

২১শে জাহ্নুয়ারী কালেক্টারের নিকট প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা  
যায় যে, প্রায় ৩৫০০ শত সন্ন্যাসীর একটি দল আলাপসি পরগণায়  
প্রবেশ করিয়া জমিদারদের গোমস্তা কিংবদন্তী রায়ের ও রমাপ্রসাদ  
রায়ের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি জমিদার  
৩৫০০ টাকা খেদারত দিয়া আশ্রয়লাভ করে। কোম্পানীর গুপ্তচর  
বিভাগের এক সংবাদে জানা যায় যে, জরওয়াল গিরির অধীনে  
একটি দল ১৫টি নৌকা-যোগে ঢিলমারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত  
হইয়াছে।

কোম্পানীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ঢাকার কালেক্টার  
৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক পত্রে জানান যে, ৫ হাজার সন্ন্যাসীর একটি  
দল ঢাকার নিকটবর্তী কাগমারী অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।  
ইহাদের প্রতিরোধের জন্য তিনি নোয়াখালী ও বশোহর হইতে  
কয়েকটি সিপাহী দল চাহিয়া পাঠান। ৬ই ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে  
প্রকাশ যে, সন্ন্যাসীরা পাথরঘাটা হইয়া বাংলা নদী অতিক্রম করিয়া



গোসাঁই বিদ্রোহী দল

মধুপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। গতিবিধি দেখিয়া কোম্পানীর লোকেরা সন্ন্যাসী দলের গন্তব্য স্থল ঢাকা বলিয়া মনে করেন। সেই জঙ্গ ঢাকাকে উপযুক্ত ভাবে সুরক্ষিত করা হয়। কিন্তু এক দল সন্ন্যাসী ঢাকা অভিমুখে আসিয়া প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায়। উক্ত ঘটনার পর মনে হয়, সন্ন্যাসীদের কর্মসূচীর পরিবর্তন ঘটে।

৭ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, সন্ন্যাসিগণ পুনরায় বাঙ্গী নদী পার হইয়া আতিয়া পরগণা অভিমুখে গিয়াছে। সন্ন্যাসীরা যখন মধুপুরের জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল তখন ঢাকার কালেক্টার হরকরা মারফৎ সাবাদ পান যে, কোম্পানী সৈন্য বাইগুনবাড়ী পর্যন্ত আসিয়াছে।

সন্ন্যাসী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবাদ জানিতে পারিয়া দিনাজপুরের কালেক্টার ও সার্কিট কমিটি জলপাইগুড়িতে ক্যাপ্টেন ষ্টয়ার্টকে অবিলম্বে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের সহিত যোগদান করিতে নির্দেশ পাঠান। ইহা ছাড়া ক্যাপ্টেন জোসেফকে অবিলম্বে পাঠাইবার জন্ত রংপুরের কালেক্টারকে আদেশ পাঠান হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে জানা যায় যে, হুমুসন্ত গিরির অধিনায়কত্বে এক দল সন্ন্যাসী ৬ই ফেব্রুয়ারী আতিয়া হইতে পাখুয়া পৌছিয়াছে। মিরজাপুরের নিকটবর্তী গ্রামের জমিদার জমিদারের গোমস্তা রামলোচন বসুর নিকট হইতে ৪২০০ শত টাকা আদায় করিয়া জমিদারের উকিলকে টাকা বাইবার পথ জোর করিয়া দেখাইতে বাধ্য করে। উক্ত দল সেই দিনই বিহাট আসিয়া পৌছায়। তথায় কোম্পানীর সিপাহী সৈন্তের অবস্থানের সংবাদ পাইয়া তাহারা টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাকনপুর, পাখরঘাটা হইয়া মধুপুর জঙ্গল অভিমুখে চলিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের আক্রমণের ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানের বনী জমিদার ও তালুকদারগণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হন।

এনিকে সন্ন্যাসীদের ঢাকা অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ফলে তাহাদের পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন হয় এবং তাহারা পশ্চিম দিকে ফিরিয়া যায়। সন্ন্যাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয় অবগত হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডকে সন্ন্যাসীদের অগ্রসরণে নিবৃত্ত হইবার জন্ত নির্দেশ পাঠান। কারণ, তাঁহার মতে দেশী সিপাহীদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা বিপজ্জনক। কিন্তু তিন সহস্র সন্ন্যাসীর এক দলের সম্মুখীন হওয়ার ফলে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই।

সন্ন্যাসীদের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেই কোম্পানীর মূল সিপাহী সৈন্য হইতে ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড ও সার্জেন্ট মেজর ডগলাস এবং ১২ জন সিপাহী সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কোম্পানীর সিপাহী সৈন্তরা সন্ন্যাসীদের অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিহ্বল হইয়া যায় ও চতুর্দিকে পলায়ন করে। কিন্তু কোম্পানী সৈন্তের নায়ক ডগলাস ও এডওয়ার্ডের পক্ষে পলায়ন সম্ভবপর হয় নাই। তরবারি ও বল্লমের আঘাতে সার্জেন্ট মেজর ডগলাস যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু ক্যাপ্টেন টিমোথি এডওয়ার্ডের বৃত্তদেহের কোন অঙ্গহানি পাওয়া যায় নাই। কেবল মাত্র তাঁহার টুপি সিরাজগঞ্জের নিকটবর্তী বারিপুরের খালে পাওয়া যায়।

সন্ন্যাসীদের সহিত যুদ্ধে কোম্পানী সৈন্তের শোচনীয় পরাজয়ের

সংবাদ ওয়ারেন হেস্টিংস জ্ঞাত হইলে তাঁহার সমস্ত ক্রোধ দেশী সিপাহী সৈন্তের নায়ক জয়রাম সুবেদারের উপর গিয়া পড়িল। তিনি মেদিনীপুরের কালেক্টারকে নির্দেশ পাঠাইলেন যে, “ক্যাপ্টেন ফরবেস, চতুর্দশ ব্যাটেলিয়নের অধ্যক্ষ জয়রাম সুবেদারকে—বিনি সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন—যেন অবিলম্বে আটক করিয়া সামরিক পাহারায় সিপাহী জেনারেলের সম্মুখে বিচারার্থ হাজির করে।” বিচারের প্রহসনের পর জয়রাম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কামানের তোপের মুখে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডের পরাজয়ের পর দেড় হাজার সন্ন্যাসীর একটি দল কুমারখালি কারখানার আট মাইল দূরে ১১ই মার্চ তাঁর স্থাপনা করে। কোম্পানীর গুপ্তচর বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, পরে উক্ত দল মামুদশাহী বংশোদ্ভূত অভিমুখে চলিয়া যায়।

জয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আরও কয়েকটি সন্ন্যাসী দল প্রধান দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীহট পর্যন্ত যায়। তথায় গিয়া জীহট আক্রমণের জন্ত জয়সিংহা পূর্বতের রাণার সাহায্য প্রার্থনা করে। ১০ই মের সংবাদে জানা যায় যে, স্থানীয় কালেক্টার মিঃ থ্যাকারে কয়েকটি কামান মাটির দুর্গে প্রোথিত করিয়া সন্ন্যাসীদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

এই বৎসর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যখন সন্ন্যাসী দল কোম্পানীর অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইংরাজের সিপাহী সৈন্তের সহিত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। সন্ন্যাসী দলের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহারা তাহাদের রীতি অনুযায়ী গ্রামের জমিদারদের নিকট হইতে কেবল মাত্র কর আদায় করিয়া চলিয়া বাইত।

৩রা ফেব্রুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ষাটালের নিকটবর্তী কীরপাইএর নিকট প্রায় সাত হাজার পদাতিক ও পাঁচ শত অশ্বারোহী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গভর্ণরের আদেশে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা হইতে পাঁচ কোম্পানী সৈন্য ও বর্ধমান হইতে তিন কোম্পানী সৈন্য ঘটনাস্থলে গিয়া পৌছে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা এই সময় কোম্পানী সৈন্তের সহিত সংঘর্ষ না করিয়া তীর্থ-পরিক্রমায় পুরীর পথে যাত্রা করিয়াছিল। পরে বিয়ুপুর, বাঁছুড়া হইয়া তাহারা মেদিনীপুর জঙ্গলে প্রবেশ করে।

কটকের কালেক্টার ২০শে অক্টোবর তারিখের এক পত্রে পুরী হইতে সন্ন্যাসীদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিয়া বলেন, “সন্ন্যাসিগণ বাংলা দেশ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। ইহারা সংখ্যায় প্রায় তিন সহস্র, তাহাদের সঙ্গে তিনটি কামান, গালা বন্দুক, বর্শা ও তরবারি আছে।”

সন্ন্যাসী দল রাজসাহী অঞ্চলে পৌছিলে স্থানীয় কালেক্টার কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট এক পত্রে জানান যে, সন্ন্যাসীরা কোথাও কোন অত্যাচার না করিয়া জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে মাত্র আবশ্যকীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া চলিয়া বাইতেছে।

সন্ন্যাসীদের সহিত ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষের ফলে কোম্পানীর অস্তিত্ব বাংলা দেশে বিপন্ন হইয়া পড়ে। দেশী সিপাহীদের প্রত্যক্ষ সহায়ত্ব অধীনকালে সন্ন্যাসীদের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার কর্ম-পরিষদ সন্ন্যাসীদের হস্তে বিভিন্ন স্থানে কোম্পানী সৈন্তের পরাজয়ের ফলে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং কঠোর হস্তে ইহা

দমন করার জন্য এক সর্বাঙ্গিক পরিকল্পনা করেন। সন্ন্যাসী দমনকল্পে বাংলার বিভিন্ন জেলার জমিদার কংগ্রেসদার হইতে গ্রামেব চৌকিদার পর্যন্ত প্রত্যেকের নিকট সন্ন্যাসীদের সম্পর্ক সতর্ক করিয়া এক নির্দেশনামা পাঠান হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে সরকারী কার্যে সশস্ত্র ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা ব্যতীত সমস্ত সন্ন্যাসীদের নিরস্ত্র ও বিতাড়িত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ১৭৭৩ সালে আত্মরায়ী মাসে কোম্পানীর পক্ষ হইতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, “যে সকল বৈরাগী, সন্ন্যাসী, পন্থিক ও বিদেশীয় দল এ দেশে উপস্থিত আছে তাহারা যেন অবিলম্বে এই বিজ্ঞপ্তি বাস্তব হইবার সাত দিনের মধ্যে বাংলা ও বিহার এসাকা হইতে চলিয়া যায়। কিন্তু যে সকল ঠামানন্দী ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের বাংলায় মঠ-আখড়া প্রভৃতি আছে অথবা জমিদারের বৃষ্টিভোগী হইয়া স্বার্থী ভাবে বসবাস করিতেছে তাহারা এই আদেশের আশ্রয়ে পড়িলে না।

কিন্তু এই আদেশনামা বাস্তব হইবার পূর্বেও যদি সন্ন্যাসীদের বিজ্ঞাপিত স্বাক্ষর সমূহ দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া সাধা জীবন বাস্তা নির্ধারণের কাজে মিলেগণ করা হইবে। ইহা ছাড়া তাহাদের বাসভূমি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কোম্পানী-সরকারি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিবে।”

এই বিজ্ঞপ্তির দুই মাস পূর্বে কালেক্টরগণ জমিদার ও কৃষকগণের প্রতি এক নির্দিষ্ট আদেশ জারী করিয়া বলেন যে, সন্ন্যাসীদের গতিবিধি জানিয়া যাহা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের লক্ষ্যমণ্ডিতে হইবে। যার জমিদারগণ এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোন সংবাদ পাঠাইতে

অবতলা করেন তাহা হইলে তাহারা কোম্পানীর বিচাগজাতন হইবেন। কৃষকগণ এই আদেশ অমান্য করিলে কর্তৃপক্ষ শাস্তি পাইবে। ইহা ব্যতীত সন্ন্যাসীদের দমনকল্পে ভূটানের রাজ্যের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চুক্তি সাধিত হয়। এই চুক্তির বলে কোম্পানী-সৈন্য সন্ন্যাসীদের পশ্চাৎদ্বার করিয়া ভূটান রাজ্যেও প্রবেশ করিতে পারিবে এবং ভূটানের রাজ্য ও তাহার রাজ্যে সন্ন্যাসী প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া যিবেন।

বিভিন্ন নির্দেশনামা জারি করার পর কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সিপাহী সৈন্যকে নতুন ভাবে গঠিত করার জন্য মাননিকেশ করেন। নতুন ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক সিপাহী সৈন্যের প্রধান সেনাপতি হিসাবে ইংরাজ সেনা নিযুক্ত হয় এবং পরগণা সিপাহী দল জাতিয়া দেওয়া হয়। পরগণা-সিপাহীদের সম্পর্ক তেহীস “a rascally corps” বলিয়া অভিহিত করিতেন।

কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সহর্ক তৃষ্টি এবং ফকির ও সন্ন্যাসী দলের আত্মকসত্তার ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিরুদ্ধে কাণ্ডক্রম স্ফূর্তিত হইতে থাকে। সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আত্মঘাতী কলহ ক্রমশঃ এক তীব্র রূপ ধারণ করে। বগুড়া ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানের সংঘর্ষের ফলে এক ফকির ও সন্ন্যাসী হতাহত হয়।

কয়েক বৎসর পূর্বে পুনরায় মজলুম শাহের দলকে বাংলা দেশে দেখা যায়। ১৭৭৬ সালের মার্চ মাসে কোম্পানী সৈন্যের সহিত কয়েকটি স্থানে সংঘর্ষ হয়। কিন্তু কোন স্থানেই মজলুম শাহের দল বিশেষ সুরক্ষা কবিত্তে পারে নাই। ১৭৭৬ সাল হইতে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানী সৈন্য ও সন্ন্যাসীদের

দুইজনেও গুরুদেবী :- 'বি.বি. প্রসন্নকায়ের' সৌত্র, নারায়ণ গুরুদেবের \*

কলিকাতা

আধুনিক ও নতুন প্রণালীতে

**বি.বি. প্রসন্নকায়**

কোম্পানী লিমিটেড

১৬০-১.৬২৬০০০০০ টীট

কলিকাতা

ফোন :- বি.বি. ১২৫৩.

সহিত ক্রমান্বয়ে সংঘর্ষ হওয়ার ফলে মজুম শাহ অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন।

অবশেষে ১৭৮৬ সালে ৮ই আগষ্ট Lt. Ainslie এক দল সিপাহী লইয়া বগুড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। বগুড়া হইতে ১০ ক্রোশ পূরে প্রায় আড়াই নটা হাফাতিয়া সংগ্রামের ফলে মজুম শাহের দল সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়। পরাজিত হইয়া মজুম শাহ বগুড়া, রাজশাহী ইইরা মালধর অভিমুখে তুলসীগঙ্গা অতিক্রম করার সময় ৭ অক্টোবর হইতে পড়িয়া গিয়া বিশেষ ভাবে আহত হন। মজুম শাহ ইটাই শেষ অভিযান, কারণ পর-বৎসর মাখনপুরে তিনি মারা যান।

মজুম শাহের মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্য মাদার বঙ্গ ও মুসা শাহের নাম একমাত্র উল্লেখযোগ্য : ১৭৮৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দিনাঙ্গপুরের নিকটে মুসা শাহের সহিত কোম্পানী সেনার এক বগুড়ার ফলে ইংরাজ সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মুসা শাহের মৃত্যু কোম্পানী সেনার উর্ধ্ব-পরিচিতি অনেক সৈনিক ছিল।

মজুম শাহের দলভুক্ত অগ্রতম শিষ্য ভবানী পাঠকের নাম ১৭৮৭ সালের বিভিন্ন সরকারী কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। রংপুর ও ঢাকা অঞ্চলের হাফাতির ব্যবসায়ী হল ঢাকার কাছিমের প্রধান অধ্যক্ষ মিঃ উটলিয়ামসের নিকটে অভিযোগ করে যে, ভবানী পাঠক ও তাহার দল তাহারদের নৌকা লুণ্ঠন করিয়া বধাসর্ব্ব্ব লইয়া গিয়াছে। মিঃ উটলিয়ামস বণিক দলের সহিত কয়েক জন সিপাহী ও তাহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য এক পরোয়ানা বাহির করিলেন। কিন্তু পাঠক কোম্পানীর সিপাহী ও পরোয়ানা উৎসর্গকর্ত্ত উপেক্ষা করিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যে তিনি বগুড়ার নিকটবর্ত্তী ত্রীকান্তিতে আর একটি নৌকা লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর বস্তু অধিকার করেন। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে লেঃ ব্রেনান জানিতে পারেন

যে, পাঠক রংপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের ১০ ক্রোশের মধ্যে অবস্থান করিতেছে। তিনি ২৪ জন সিপাহী সমেত এক জন হাফিলদারকে পাঠকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তাহার অধিকৃত পাঠকে আক্রমণ করেন। সেই সময়ে তিনি ৬০ জন বরকন্দাজ সমেত নৌকাতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ সংঘর্ষের পর ভবানী পাঠক তাহার সহকারী প্রধান নায়ক এক জন পাঠান সহ আরও দুই জন নিহত ও আট জন আহত হন। অবশিষ্ট ৪২ জন বরকন্দাজকে বন্দী করা হয়। ইহা ছাড়া সাওতাল বড় নৌকা বোঝাই অস্ত্র শস্ত্র ও কোম্পানী সেনা দখল করে।

ঠিক এই সময়েই লেঃ ব্রেনানের রিপোর্টে দেবী চৌধুরাণীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে, ভবানী পাঠকের সহিত দেবী চৌধুরাণীর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণীর অনীনে অনেক বেতনভুক্ত বরকন্দাজ ছিল। তিনি নিজে ডাকাতি করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন তাহা বাদে ভবানী পাঠকের লুণ্ঠিত অর্থেরও তিনি অংশীদারী ছিলেন। রংপুরের জেলা কালেক্টার ব্রেনানের নিকট দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী আদালতে হাজির করিবার জন্য নির্দেশ চাহিয়া পাঠান। ইহার উত্তরে ব্রেনান লিখিয়া পাঠান যে, “তোমার প্রেরিত বাংলা কাগজ-পত্র পড়িয়া যদি গ্রেপ্তারের কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই নারীদম্পত্যকে গ্রেপ্তার করার আদেশ পরে পাঠাইব।” ইহার পর দেবী চৌধুরাণীর বিষয়ের উল্লেখ আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৭৯৪ সালে সপরিবার গভর্নর জেনারেল এক লিখিত গোপনায় বলেন যে, ফকির ও সন্ন্যাসী দল কর্ত্তক আক্রান্ত হইলে যেসকল ভূমিদার ও তালুকদার তাহাদের হত্যা করিতে পারে—সেই জন্য হত্যাপরোধ তাহাদের কোন বিচার হইবে না।

## মধুসূদন

শ্রীহর্গাদাগ সরকার

আদেশ নহে ক’ এ তো ! তুমি যেন আকুল প্রার্থনা :  
‘দীড়াও পৃথিবীর’।

প্রদানিত হয়ে আসে মন।

কাহার সমাধি পার্শ্বে জাগে চিত্তে অপরূপ স্পন্দন,  
আশ্রয় অবাঞ্ছিত হয়ে ভেসে আসে স্বপ্ন-বেশনা !  
স্বাঙ্গিক জীবনে ক’র বয়ে গেছে অপরূপ যশা !

স্বপ্ন বিজ্ঞমে যদি কোনো দিন ঘটে বিশ্বরণ,  
এ বঙ্গবাসীরা! যদি ভুলে নাম—শ্রীমধুসূদন,  
মর’র-স্বপ্নকে তাই লিখিত কি কার্য অজস্রম ?

শাশ্বত হে কবি তুমি মহী-পরে মহাসিঁত্রাবৃত ?  
বিপ্লবী বাংলার কুমি সভ্যতায় ছিলে অঙ্গভূত,  
তুমিই বাংলায় এই—এনেছিলে নব আগরণ,  
তোমার আশ্রয় পাছ আশ্রয়ের স্বপ্নে বিধ্বস্ত,  
সেখানে তোমার যুক্তি, তব নাম অঙ্কিত অদ্বুত ;  
স্বপ্নে জীবিত চির—

মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

# 'ডেটল'

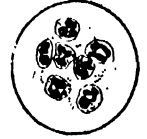
## কি কি কাজে লাগে ডাক্তারবাবু?

তরুণী বধূর এই প্রশ্ন শুনে ...

### ডাক্তার তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন

#### জীবাণু-সংক্রমণের খুঁটিনাটি :

রোগবাহী জীবাণুরা শরীরে সংক্রমণের বিষ ছড়িয়ে দেয়। প্রথম থেকেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এষ্ট সব জীবাণু অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংক্রমণের বিবে সারা শরীরে বিস্তারিত করে তুলতে পারে। এগুলি এত ক্ষতিকারক যে কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েই দেখা যায়। স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজার গুণ বড়ো করে এক জীবাণু জীবাণুর চোখেরা এখানে দেওয়া হল, দেখুন।



কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন :  
ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণুর প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আব্রবক্ষণ সর্বপ্রথম উপায়।

চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়, 'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে :  
সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সময় সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্রাম কলে কর্তৃক কেঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কলকড়া করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলায় ঘায়ে বহুলা উপদ্রব হয় ও দাঁ গুটিয়ে যায়।



মাথার চুলকামিতে :  
মাথার চুলকামি ভয়ানক ঝাঁপাচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথা জড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথা ঠিক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — মাথার নিম্ন শিশির গায়ে বোখা থাকে।

#### মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় :

'ডেটল'-এর বিশা মৃত অর্থ অর্থ — এতক মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং তুলনা নেই। বিনামূল্যে "মডার্ন হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষা) নামক পুস্তিকার দ্রষ্টা লিখুন।



# 'DETTOL'

## A black and white illustration of a dog, possibly a Weimaraner, lying down and looking towards the right. The dog has a sleek, short coat and is resting on a textured surface. Its head is turned slightly to the right, and its tail is visible on the left side of the frame. The illustration is simple and appears to be a woodcut or a similar print style.

श्रीहरिनाम सङ्गमसारं

জাহ্নব উপঃ মাথা রাখিয়া বৃন্দিত চক্ষু যুবকটি যখন অবসন্নতা-  
 ঘোর একটু কাটায়া উঠিল তখন দেখা গেল গৃহে ভাটার আগমন-  
 পথের দিকে চাহিয়া অশেফারত অমতায়, উপবাসী মাতা ও ভ্রাতা-  
 ভগিনীদের কথা খাণ্ড করিয়া তাহার সমস্ত দুঃখমণ্ডল বিবাদাক্ষর  
 ও বেদনাক্রুর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গেট বেরলা-করণ বিবাদার্ত  
 ভাব মুহুর্তেই কাটয়া গিয়া সহগা একটা ভীষণ উগ্র ও কঠিন রূপ  
 পরিগ্রহ করিল। যুবকের তেজোদীপ্ত বিস্তৃত নয়নদ্বয়ে ধ্বংস-  
 করিয়া যেন হুট বৎ অগ্নি ছড়িয়া উঠিল। মনে হইল যেন সেই  
 অপরিমের রোষাফি একটা বিশ্বধাসী দানবদের স্রষ্টা করিবে।  
 বর রোষের আগুনে দরওয়ান বিশাল নগরীর নিকে চাহিয়া  
 যুবকটি আপনায় অজ্ঞাতেই চোৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—  
 জীবন নাই, ইবর মিথ্যা, এক সোরাটা একটা স্বপ্নহীন দানবের  
 কারখানা, এখানে বার্ষিক্য দয়া, মায়া, প্রেহ, প্রেম, সহানুভূতি  
 কিছুই নাই। দরিদ্র হৃদয় অসহায়ের এখানে কোন স্থান নাই।  
 আপনায় হৃৎ-হৃদঙ্গার কথা বিস্মৃত হইয়া মুহুর্তেই যুবকটি সমগ্র  
 বিশ্বের প্রৌড়িত মানব-সমাজের সতি একান্ততা স্থাপন করিয়া  
 ফেলিল। আপনায় অনাহাংকিষ্ট ভ্রাতা-ভগিনীর স্থানে তাহার  
 চক্ষের সমুখে ভাসিয়া উঠিল সমগ্র পৃথিবীর হতভাগ্য দরিদ্র, অনাথ,  
 আতুর, অসহায়, হৃৎ-হৃদঙ্গা-ভয়াক্রান্ত মানব-সমাজের সকল  
 ছবি। তাহার মানস-চক্ষে দেখা গিল তাহার অঙ্গণিত মূৰ্খ দরিদ্র

‘কে ও?’—সন্ধ্যার আবহাওয়া অন্ধকারে অদূরে বুকের অন্তরায়  
হঠাৎ তাহার উদ্দেশে কে বেন কহিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বর হইতেই  
যুবকটি তাহাকে চিনিতে পারিল। নবাগত ব্যক্তিটি নিকটে  
আসিয়া যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিল—‘দেখ, তোমার  
সাংসারিক অবস্থার কথা আমি জানি, তোর লত চেষ্টা সত্ত্বেও  
তোর অপরিণামি চুঃখ-দৈন্তের কথা আমার নিকট হতে লুকাতে  
পারিবে না; এক্ষণ বাইতুসের মত আর কত কাল চাকরি-চাকরি  
করে অথবা চুঃখ-কষ্ট ভোগ করবি? তায় চেয়ে সাধা লক্ষ্যে  
বরণ করে চিরতরে নিজের ও আত্মীয়-পরিজনদের চুঃখ-দুঃখের  
পরিদেয়ান্টি কর। আর সেও তো তাব ধ্যান-জ্ঞান, তো এই  
চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করে দীর্ঘ দিন ধরে অপেক্ষা করছে।’—এই বলিয়া  
লোকটি তাহার ফতুয়ার পকেট হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির  
করিয়া যুবককে পড়িতে দিল। কিংকর্ষব্যবিন্দুর হৃদয়  
নীরবে যুবকটি এককণ তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া বাইতেছিল।  
পরিশেষে কাগজখণ্ড হাতে লইয়া ঔৎসুক্যে চরিতার্থ করিবার  
জ্ঞান গ্যাসের আলোতে পড়িতে লাগিল—‘স্বদেশের, তোমার

আশা-পথ চাহিয়া কত দিন তো কাটিয়া গেল। আর যে নিজেকে কিছুতেই সত্যনা দিতে পারিতেছি না। আমার অক্ষুব্ধ ধন-সম্পত্তি থাকিতেও তোমার সেবার কিছুই লাগাইতে পারিলাম না। তোমার হৃৎ-দর্শনার কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করি। এই দাসীকে তাহার অগাধ ধন-সম্পত্তির সহিত ত্রিচরণে স্থান দিয়া তোমার নারিক্স-হৃৎ-পের অবসান কর।”

অপরিচিতার নিকট হইতে এইরূপ নিঃশব্দ প্রেমপত্র পাইয়া ক্রোধ বিষয়ে তাহার গুণ্ডাধর কাঁপিয়া উঠিল, বিদম অবজ্ঞার সহিত কাগজখানি সেই ব্যক্তিটির হাতে ফিরাইয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল—“তুই যদি আমার বাল্যবন্ধু না হতিস্ তাহ’লে এক যুট্টাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করে বন্ধুর প্রতি এই উপকারের যোগ্য পুরস্কার দিতুম। তাই আজ রেহাই দিলুম, যা, চলে যা, আর কখনও যেন তোর মুখদর্শন না করি। আর তোর সেই প্রেমার্থিনী মহিলাকে বলবি যে, তার দৃশ্য প্রস্তাব এই হতভাগ্য দরিদ্রের পদাঘাতেরও যোগ্য নয়।” এই বসিয়া আর কখনো বিদম না কবিয়া যুবকটি হন-হন করিয়া বিদ্যাতালোক-শোভিত রাজপথ দিয়া গৃহভিমুখে চলিয়া গেল।

অতি সপ্তর্পণে জরাগ্রস্তের দ্বায় প্রথপদে গৃহের নিকটবর্তী হইয়া কক্ষদ্বার নাখা ঠেকাইয়া ঠাঁড়াইয়া যুবকটি অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনাহারে, বুখা-পূর্ণাটনের পরিশ্রমে, ও দৃষ্টিস্তায় যুবকটির শরীর ক্রিমক্রিম গুরাইতেছিল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে আর স্থির রাখিতে করিতেছিল না।

‘মা গো!’—পুত্রের কষ্টের শুনিয়া কল্যাণময়ী মেগা-তুয়া জননী প্রতপদে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। পুত্রের শুক, বিনোদ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মেহময়ী মাতা যেন দুঃকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—“আজ সারা দিনে পেটে বুঝি কিছু পড়েনি?” মাতার প্রশ্নকে এড়াইয়া গিয়া যুবকটিও তাঁহাকে পাণ্টা প্রশ্ন করিল—“তোমরাও বুঝি এ হু’দিন না খেয়ে আছ?”

মা বলিলেন—“না, আমরা কেন না খেয়ে থাকব। তোর কোন এক বন্ধু বোধ হয় বেনামী চিঠির ভিতর কয়েকটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা না হলে তো আর কোন উপায়ই ছিল না।”

সেই পত্রলেখক দরদী অকৃত্রিম বন্ধুর কথা শ্রবণ করিয়া যুবকটির কোমল চিত্ত কৃতজ্ঞতার আগ্রুত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে একখানা বেকারীতে থান কয়েক রুটা ও এক গ্রাস জল লইয়া আসিয়া পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া মাতা কহিলেন—“নে, এখন চট করে মুখটা-হাতটা ধুয়ে খেয়ে নে, পোড়া ভগবান না-খাইয়ে না-খাইয়ে চিন্তায়-ভাবনায় আমার সোনার বাছাকে মেয়ে কেসবার জোগাড় করেছে। আমারও পোড়া ভাগি, না হলে এই দুধের ছেলেকে আর সংসারের ভার নিতে হবে কেন?”—এই বলিয়া পরলোকগত স্বামী ও অতীতের স্মরণ জীবনের কথা শ্রবণ করিয়া মাতা বস্ত্রাঙ্কলে অশ্রুস্রাবণ করিলেন।

অন্তান্ত পরিজন সবাই রাত্রিকালীন আহার গ্রহণ করিয়া ঘাইয়া পড়িয়াছে। মাতা হয়তো নিজের আহােরের জন্য কিছুই অবশিষ্ট না রাখিয়া সমস্ত খাবারই পুত্রের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া যুবকটি মাকে বলিয়া উঠিল—“কই, কোথায় তোমার খাবার রেখেছ, আমি দেখব।”

মাতা বলিলেন—“এই শেষ বেলা আমি খেয়ে উঠছি; একপ্রতি

ক্ষিপেও আজ আমার নেই, এক বিন্দু জলকেও তল করার সাধি আমার আর নেই।”

যুবকটির প্রেমালিত জঠরানলের কাছে যদিও সম্মুখের খাবারের চতুর্দশ খাবারও পর্যাপ্ত ছিল না, তথাপি মাতার শত নিবেদন ও মাথার দিবি সম্মুখে থান তিনেক রুটা হাতে লইয়া অবশিষ্ট খাবার সহ প্লেটটিকে এক দিকে সরাইয়া দিয়া এক গ্রাস জল একেবারে সে নিঃশেষে পান করিয়া উঠিয়া শয়ন করিতে গেল।

যুবকটির মৃত্যুশোচ কাটিয়া গেল, তাহার পর আরও কয়েক মাস অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাহার দৃশ্যের আর অবসান হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে একটি কর্মের সংস্থান করিতে সমর্থ হইল না। যে অদৃষ্ট বিধাতা এই নিখিল বিশ্বের নিয়ামক, দ্রব্যাগোর কঠিন নিষ্পেষণে তাহার প্রতি একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ও প্রচণ্ড অভিমান যদিও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি আশ্চর্য্য বৃদ্ধি যুবকটির সমস্ত সত্তার সহিত এমন ভাবে বিজড়িত ছিল যে, অজ্ঞাতেই তাহার চিন্তা আসিয়া তাহার সমস্ত মন অধিকার করিয়া ফেলিল। তাই প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে ঈশ্বরকে শ্রবণ-মনন পূর্ব্বক নব আশায় বুক বাঁধিয়া তাঁহার নাম করিতে-করিতে সে শয্যা ত্যাগ করিত। এক দিন পার্থক্যের ঘর হইতে তাহার জননী উহা শুনিতে পাইয়া আপনাদের অবর্ণনীয় দুঃখস্বপ্নের কথা শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—“চুপ কর ছোঁড়া, ছেলে বেলা থেকে কেবল ভগবান, ভগবান! ভগবান! ত সব করলেন!”

মেহময়ী জননীর এইরূপ কথায় বিষম আঘাত পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যুবক ভারিতে লাগিল—ভগবান কি বাস্তবিকই আছেন এবং থাকিলেও কি আমাদের সন্মুখ প্রার্থনা কি তিনি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রাণের আকৃতি-মিনতি, তাহাতে তিনি সাড়া দেন না কেন? শিবের সঙ্গারে এত অশিষ কোথা হইতে আসিল—মঙ্গল-ময়ের রাজ্যে এত প্রকার অমঙ্গল কেন? কোন মহামান্য বলিয়াছিলেন—ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময় তবে দুঃখ ও দৈব দুর্বিপাকের করাল কবলে পতিত হইয়া লাখ-লাখ লোক মরিতেছে কেন? তাহার কঠোর ব্যঙ্গ স্বর যুবকটির কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রতি একটা কঠিন সন্দেহ আসিয়া ক্রমশঃ তাহার হৃদয় অধিকার করিল।

যুবকটি তাহার কোন ভাবই অপরের নিকট হইতে স্বপ্নে লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। স্মরণ্য ভবন হইতেই সর্বত্র সে ঈশ্বর-ভাকিয়া সশ্রমণ করিতে অগ্রসর হইল যে—ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সার্থকতা এবং প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বিষম দুর্দলতা—এ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে প্রয়োজন হইলে পাশ্চাত্য দার্শনিক হিউম, বেন, মিল, কীতে প্রভৃতিদের মত উদ্ভূত করিয়া প্রচণ্ড তর্ক জুড়িয়া দিত। স্রবোগ ও সময় বুঝিয়া যুবকের পাড়া-প্রতিবাদীরা তাহার নিদলক চিহ্নে কালিমা আরোপ করিতে লাগিল। কলে স্বপ্ন দিনেই চতুর্দিকে হব উঠিল যে, সে নাস্তিক এবং দৃষ্টিব্রজ লোকদের সহিত মিলিত হইয়া মজ্ঞপানে ও বেতালয়ে পর্যাপ্ত গমনে কুণ্ঠিত নহে। সঙ্গে সঙ্গে যুবকেরও আবার তেজস্বী মন অথবা নিশ্চয় অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল এবং



কেহ জিজ্ঞাসা না করিলেও সে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—“এই দুঃখ-কষ্টের সংসারে নিজ দরদৃষ্টির কথা কিছুক্ষণ ভুলিয়া থাকিবার ক্ষমতা যদি কেহ মতপান করে, অথবা বেড়াগৃহে গমন করিয়া আপনাকে সুখী জ্ঞান করে, তাহাতে আমার যে কিছুমাত্র আপত্তি নাট তাহাই নহে, পরন্তু ঐরূপ মন করিয়া আমিও তাহাঙ্গিণের দ্বারা ক্ষণিক সুখভোগী হইতে পারি—এ কথা যেদিন নিঃসংশয়ের বৃত্তিতে পারিব সেদিন আমিও ঐরূপ করিব, কাহারও ভয়ে পশ্চাৎপদ হইব না।” সকলেই মনে করিল, যুবক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছে।

প্রায়ের পর বর্ষা আসিয়াছে। এক দিন গৃহে পর্যাণ্ড আহার্যের সংস্থান নাই তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়া মাতাকে ‘আমার নিমন্ত্রণ আছে’ বলিয়া যুবকটি কর্মের অনুসন্ধান বাহিব হইয়া গেল। গৃহে বাতির হইবা মাত্রই এক দল ঘনী বন্ধ যুবকটিকে এক বকম জোর করিয়া টানিয়া তাহাদের কাহারও বাটতে লইয়া গেল। যুবকটি স্তব্ধ থাকিল। তাই তাহাদের অনুগোপনপূর্ব্বক এড়াইতে না পারিয়া অপরাহ্ন পর্য্যন্ত সঙ্গীতাদি দ্বারা তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিল। বেলা শেষে যখন সে স্থান হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিল, তখন তাহার কৃষ্ণাঙ্গি, বিবর্ণ মুখ দেখিয়াও বন্ধুদের কেহই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনুসন্ধান করিল না যে—যে ব্যক্তি এতক্ষণ পরিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন ব্যাপ্ত ছিল তাহার অন্তরের কথা কি!

বন্ধুগৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইয়া কৃষ্ণা-ভুজায় হ্রাস দেহে যুবক কিছুক্ষণ অদূরে এক উজান-মধ্যে কালযাপন করিল। সহসা চারি দিক অন্ধকার ও আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে দ্রুত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু পথিমধ্যে প্রবল বারিবার্ষিক আরম্ভ হওয়ার যুবক নিকট এক পাতী-বারাণসী অপেক্ষা করিতে লাগিল। যুবকের আগমন লক্ষ্য করিয়া সমুখস্থ গৃহ হইতে এক নারীমুখী তাহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য সহসা তাহার সমুখের আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবকটি তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—“বাছা, এই ছাই-ভয় শরীরটার চূড়ির জন্য এত দিন কত কি করিলে, মৃত্যু সমুখের—তখনকার সখল কিছু করিয়াছ কি? হীনবৃদ্ধি ছাড়িয়া সংপূর্ণ অবলম্বন করা।” চরিত্রহীন নাস্তিক, অধঃপতিত যুবকের নিকট হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া রমণী বিস্ময় লব্ধিত ও স্তম্ভিত হইয়া চলিয়া গেল। যুবকও আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া সেই প্রবল বর্ষার মধ্যে দ্রুতপদে তথা হইতে বাতির হইয়া গেল।

সমস্ত দিন উপবাসে ও রাতে বৃত্তিতে ভিজিয়া অবসর পদে ও ততোধিক অবসর মনে যুবকটি যখন বাটতে ফিরিতে লাগিল তখন সর্বাঙ্গ ছুড়িয়া সে এমন একটা স্নানস্থান অনুভব করিল যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পাখি বাটার ‘রকে’ জড় পদার্থের দ্বারা পড়িয়া রহিল। অর্দ্ধচৈতন্য নেত্রাঙ্গের দ্বারা যুবক মেহে ও মনে সঙ্গ্রহকার সামর্থ্য-বিরহিত হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল। স্বপ্নবৎ চিত্তবাসিকের নিয়ন্ত্রিত করিবারও তাহার সামর্থ্য ছিল না। কোন এক অদৃষ্ট শক্তির প্রভাবে আপনা-আপনি তাহার মনে নানা বর্ণের চিত্রা ও ছবি পর-পর উদয় ও লয় হইতেছিল। সহসা তাহার উপলব্ধি হইল, কোন এক

দৈব শক্তির প্রভাবে একের পর এক করিয়া ভিত্তির অনেকগুলি পর্দা যেন উঠিয়া বাইতে লাগিল। শিবের সংসারে অশিব কেন, ইশ্বরের কঠোর বিধান ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে সকল বিষয় নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার মন এত দিন নানা সম্মেহে আবৃত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরেব নির্বিড়িত প্রদেশে দেখিতে পাইয়া যুবক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার শারীরিক ক্লান্তি মুহূর্ত্তে বিপ্লবিত হইয়া মনে অমিত বল ও বিমল শক্তির উৎপত্তি হইল। যুবক চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার দুঃখ-রজনীর অবসান হইবার আর যতট বিলম্ব আছে। এই যুবকটিই হইলেন আমাদের বিশ্ববিখ্যাত বোদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দ।

## সাহসী যুবকের কীভ

শ্রীরত্নতরুনার রায়

আজ হইতে প্রায় বাট বৎসর আগেকার কথা। কাহিনীটি ঘটেছিল পৃথিবী-বিখ্যাত লণ্ডন সহরের বৃক। জেমস্ ম্যাকলিন তখন ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট সভাগৃহের এক জন সদস্য। সেই সময় এক জন কীর্তিমান যুবক লণ্ডনে আইন শিক্ষার জন্য অবস্থিতি করিতেছিলেন। পার্লামেন্ট সভাগৃহ বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছিল, বক্তৃতা করিতে উঠিলেন জেমস্ ম্যাকলিন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানকে চুক্তিবদ্ধ ‘দাস’ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কথাটি শ্রবের কাছে খুব সামান্য, কিন্তু যুবকটি ইহাকে সামান্য বলিয়া মনে করেন না। ইহার অন্তরালে ভারতীয়দের প্রতি একটা উপহাস ও তাচ্ছিল্য ভাব নিহিত ছিল। তাহার কর্ণগোচর হইল হিন্দু-মুসলমানের এই নিনাক্রম অপমান। তিনিও এক জন ভারতবাসী হিন্দু, ভারতবাসী হিন্দু হইয়া তিনি স্থির থাকিলেন পানেন নাই। হিন্দু-মুসলমানের এই নিনাক্রম অপমান মনে বড় বাধা পাইলেন। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে তাহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরাধীন জাতির এত লাঞ্ছনা, এত বড় অপমান,—এ যেন বিবাক্ত তীব্রের মত অন্তরেব অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিতে লাগিল। জাগ্রত হইল দেশাত্মবোধ। ভুলিয়া গেলেন যে, এটা বিদেশ, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে। তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না ভারতবাসীর এই অপমান। মনস্থ করিলেন ইহার প্রতিবাদ করিবার—প্রতিজ্ঞা করিলেন উক্ত বক্তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার।

অধ্যয়ন সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিয়া লণ্ডনস্থিত প্রবাসী ভারতবাসীকে একত্রিত ভাবে সংগঠিত করিয়া লণ্ডনের বিখ্যাত একটা হল একটি মহতী সভা আহ্বান করিলেন। ভারতবাসী নিদাক্রম অপমানের বিরুদ্ধে ওজ্ঞাহীন ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। লণ্ডনে একটি চাক্ষু্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হইল। প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রিকাগুলিতে এই সাহসী যুবকের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তুমুল আন্দোলন চলিল। উদারনৈতিক দলগুলি সমর্থন করিল এই যুবককে। কিন্তু ইহার পর আর কিছু সাড়া পাওয়া গেল না সরকারের পক্ষ হইতে। বলিষ্ঠ যুবক কিন্তু নিশ্চেষ্ট হইলেন না। অল্প দিন পরেই লণ্ডনের উদারনৈতিক দলগুলির সহায়তায় পুনরায় একটি সভা আহ্বান করিলেন—আবেদন করিলেন প্রতিকারের

জ্ঞান। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন মহামতি গ্রাউটোন্। সেই সভায় যুবকটি গুজবিনী ভাষায় তীব্র সমালোচনা করিলেন। টেনক নড়িল পার্লামেন্ট সভাগৃহের, নতি স্বীকার করিতে হইল জেমস্ ম্যাক্লিনকে স্বীয় অপরাধের জ্ঞাত। বলিয়া বাধা প্রয়োজন যে, পার্লামেন্ট সভাগৃহের সদস্য পদ হইতে জেমস্ ম্যাক্লিনকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

সেমিনের সেই যুবকটি কে জানেন?—বাংলার ইতিহাস-বিখ্যাত বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশের পরম জ্যোতিষ, 'স্বরাজ্য দলের' প্রতিষ্ঠাতা বাংলা মায়ের সুযোগ্য সন্তান বনামগঞ্জ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

## গল্প হলেও সত্যি

### শ্রীকিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৮৭ সাল। তিন মাসের ছুটি লইয়া ২রা অগ্রহায়ণ শিষ্য গীর্ষদাতার বাড়ির হইলেন। নানা তীর্থ পথ্যটন করিয়া মাঘ মাসে কান্দিধামে উপস্থিত হইলেন।.....

এই মাঘ প্রাতঃকালে প্রথমে আশ্রমে বাইয়া স্বামিজীকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া উভয়ে পদগঙ্গায় স্নান করিতে গমন করিলেন। দুই ঘণ্টা ধরিয়া স্নান করিয়া গুরুদেব জল হইতে উঠিলে শিষ্য তাঁহার দিক্ত অঙ্গ মুছাইয়া দিয়া উভয়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। আশ্রমে লোকচলাচল বন্ধ হইলে গুরু এবং শিষ্য একত্র হইয়া বসিলেন। নানাবিধ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

গুরু—.....এই পৃথিবীর নিশ্চয়ই এক জন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি বহুল সময় সকল স্থানে বিজ্ঞমান রহিয়াছেন, তিনি 'ঈশ্বর'। তিনি সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, কেবল জ্ঞান ও বিচার-বলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাতির করা চাই। ব্যাকুল হইয়া ভক্তি ভাবে যিনি তাঁহাকে ডাকিবেন তিনিই তাঁহাকে পাইবেন।

শিষ্য—সত্য সভ্যই কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়?

গুরু—সাধনা করিলে ও গুরুর কৃপা হইলেই দর্শন পাওয়া যায়। তুমি কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও?

শিষ্য—প্রভো! তাহা হইলে জীবন সার্থক হয়। আমার আশ পূর্য্য সৌভাগ্য যে, স্বয়ং ভগবানকে গুরুপদে বরণ করিতে পারিয়াছি। ভগবান না হইলে কেহ ভগবান দেখাইতে পারেন না।

গুরু—জ্ঞান যাত্রা তোমার সে আশা পূর্ণ করিব। এক্ষণে বেলা হইয়াছে, বাসায় বাও।

সন্ধ্যার সময় শিষ্য আশ্রমে বাইয়া দেবভাগশকে ও স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্বামিজী শিষ্যকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন। ঐ ঘরে কেবল মাত্র একখানি আসন পাতা ছিল ও একটি দীপ জলিতেছিল।

স্বামিজী বলিলেন—“আমার বেনীর নিকট ছোট ঘরে যে কালী মূর্তি আছে তাহাকে দেখিয়া আইস।” শিষ্য বাইয়া আসিলেন যে, পাবাণময়ী মা অচলা বিবাহমানা। ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে তাহাই বলিলেন। গুরু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,

“মাকে কি এখানে দেখিতে চাও?” শিষ্য বলিলেন, “গুরুদেব! এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি যে, তাঁহাকে এখানে দেখিব। মাকে দেখা আর জগৎমাতাকে দেখা সমান কথা। আপনি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দেখাইলে কৃতার্থ হই।”

শিষ্যকে স্থির ভাবে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিয়া গুরু ধ্যানস্থ হইলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ধ্যান ভঙ্গ হইল, এবং মাকে ডাকিলেন। শিষ্য প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, একটি কুমারী বলিকার জায় সেই পাবাণময়ী মা দীর পদ-বিক্ষেপে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অম্পট দীপালোকে চৈতন্যময়ীর আবির্ভাব এবং রূপের চুটা দেখিয়া শিষ্য অতিশয় ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। মনে সাধ হইল, প্রণাম করিয়া একবার ‘মা’ বলিয়া ডাকিলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন যে, নিকটে গুরুদেব এবং সম্মুখে জগৎমাতা, এই সময় যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে তবে সশরীরে স্বর্গলাভ হয়। আনন্দ ও ভয়ে মুগ্ধের কথা ফুটিল না, শিষ্য জড়বৎ হইয়া রহিলেন। অচেতন পাবাণ সচেতন হইল বিজ্ঞ শিষ্য সচেতন হইয়াও অচেতন হইলেন। স্বামিজী শিষ্যকে প্রবুদ্ধ করিয়া বলিলেন, “তুমি পুনর্বার বাইয়া সেই স্থানে মায়ের মূর্তি আছে কি না দেখিয়া আইস।” কম্পিত পদে ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে শিষ্য দেখিতে গেলেন বটে কিন্তু মায়ের মূর্তি আর সেখানে দেখিতে পাইলেন না। আরও ভীত হইয়া দ্রুত পদে স্বামিজীর নিকট আসিলেন। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। শিষ্য গুরু নিকট বসিয়া মাকে একাগ্র মনে দর্শন করিলেন—দেখিলেন, পূর্বের মত সবটাই আছে কেবল জিহ্বা বাহিরে নাই এবং পদতলে মহাদেব নাই।

গুরুর অন্তমতি ক্রমে মাকে প্রণাম ও তাঁহার পদমূলি মস্তকে লইয়া শিষ্য রিজেকে পবিত্র ও সার্থক জ্ঞান করিলেন। মায়ের পা দু'খানি মনুষ্য-পদের মত নরম অল্পভূত হইল। স্বামিজী বলিলেন—“বেশ করিয়া দেখিয়া লাভ, যেন পরে আর কোন প্রকার আক্ষেপ করিতে না হয়।” শিষ্য স্থির ভাবে দেখিতে লাগিলেন। কিচৎক্ষণ পরে গুরুদেব মাকে নিজ আসনে মাইতে ইঙ্গিত করিলেন। ছোট মেয়ের মত মা দীর পদে গমন করিয়া আবার নিজ আসনে পাবাণময়ী হইয়া বিবাহমানা রহিলেন।

শিষ্যের কৌতুহল অদম্য হইয়া উঠিল, “গুরুদেব, পাবাণ কি প্রকারে চলিতে পারে? বাহা দেখিলাম তা অতীব অসম্ভব!” গুরুদেব কহিলেন—“তোমার জন্মদেহ কেমন করিয়া চলি?” শিষ্য বলিলেন—“মায়ের দেহে আত্মা ও চৈতন্য আছে, সেই জন্ম চলিতে ও বলিতে পারে।” তাহাতে গুরুদেব উত্তর করিলেন—“নিছ সাধকের গুণে বধন বৃত্তিকা, পাবাণ বা শাযুতে আত্মা ও চৈতন্যের সকল হয় তখন সেই মূর্তিও চলিতে, বলিতে, গুণিতে ও কাণ্য করিতে পারে।”

রাত্রি অধিক হইল। গুরুদেব ঘোড়িতে আসিয়া শয়ন করিলেন, শিষ্য বাসায় গমন করিলেন।—

এই স্বামিজীকে কে না চেনেন! আত্মির ইতিহাসে ইনি দেবতার স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইনি জীবমুক্ত মাহাত্ম্য ত্রৈলোক্য স্বামী। আর শিষ্য হইতেছেন শ্রীউমচরণ মুখোপাধ্যায়।

## বাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

পৃথকী কঙ্কার মাথায় সমুদ্রে হাতপানি রেখে আদর করে বললেন : ভাগ্যেই তু মা ! শিবাজী মহারাজাই প্রথমে নিয়ম করেন—ভেলেদের মতন মারাঠা মেয়েবাও তলোয়ার খেলবে, ঘোড়ায় চড়বে, লড়াই শিখবে। এইটুকুই সুখেব কথা মা, পেশোয়া রাজপাট ছেড়ে বিঠুর এসেও সাবেক চালগুলি বজায় রেখেছেন।

শিতার এই কথা থেকেই মধু তার মনের কতকগুলো চাপা কথা এই সময় বলে ফেলল। এখানে এসে ঘরটি কতকগুলি ব্যাপারে তার মনে বড় ধোঁকা লেগেছিল। পুণ্যর বহানু পেশোয়াদের বিপুল প্রতিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতি ও দলদলার কথা গল্পের মতন তিনি কানেই শুনেছেন কাশীতে বাণুজীর কাছে। তিনি ভেবেছিলেন, সেই পেশোয়ার বংশধর রাজ্য তারিমে বিঠুর এসে খুব সাধারণ ভাবেই, গরীবানি ভাবেই আছেন। কিন্তু বিঠুর এসে তাঁর রাজ্যের মতন জাঁক-জমক, রাজবাড়ীর বাহার, আদর কায়দা, চার দিকের আড়ম্বর দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি ভেবে পাননি যে, রাজ্য হারিয়ে রাজা না হয়েও এই পেশোয়া এ রকম করে রাজ্যের মতন জাঁক-জমকে কি করে আছেন? এত প্রশ্নই এখানে এলো কি করে? আজ কথায় শুনে স্বযোগ পেয়ে পৃথকীকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : ঠ্যা বাবা, তবে যে শুনেছিলাম আমাদের পেশোয়া রাজ্য হারিয়ে ইংরেজের হাততোলা বৃত্তি উপর ভরসা করে বিঠুরে থাকেন। কিন্তু এখানে এসে যে সব কাণ্ড দেখছি—কে বলবে ইনি রাজা নন? এর কারণ কি বাবা?

কঙ্কার কথা শুনে একটু হেসে পৃথকী বললেন : এর কারণ হচ্ছে মা, আগেকার মহানু পেশোয়াদের বিরাট প্রতিপত্তি প্রলাব্ধ। গোড়া থেকে সে সব কথা না শুনে তুমি মা বুঝতে পারবে না। মহারাজা শিবাজীর গল্প তুমি বাণুজীর কাছে শুনেছ। তিনি যেমন আবারের পর আবার ফেনে যোগল-শক্তিকে চূর্ণ করেছিলেন, তেমনি মারাঠা জাতটাকেও শক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন। তাই শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে শত্বজী শক্তির অহঙ্কার আর নিজের গোবে জতলে মগ্নঘাতে মরলও জাতটা বেঁচেছিল। শত্বজীর ছেলে শাজী ছিলেন ভীতু প্রকৃতির লোক। শিতার অসমুদ্র দেখে তিনি যুদ্ধভাঙ্গামায় লিপ্ত হতে চাইতেন না—অথচ রাজ্যের চার দিকের তখন বুদ্ধের তিক্তিক লেগেছে। এই সময় তাঁর ধুলভাত শিবাজীর ছোট ছেলে রাজারামের বিধবা স্ত্রী তারাবাই তাঁকে ভ্রমকী দিয়ে বললেন—‘তুমি কোছে দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, রাজা চালানো তোমার কাজ নয়—ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি বসব ছত্রপতির সিংহাসনে।’ শাহজী ত ভেবেই অস্থির! এমন সময় তাঁর সেবেস্তার এক ব্রাহ্মণ সেরাধী—নাম তাঁর বালাজী বিশ্বনাথ, তিনি বললেন—‘বিশ্বাস করে মহারাজ আমায় হাতে-রাজ্যরক্ষার সব ভার ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করব।’ শাহজী তাঁর কথা শুনে রাজি হয়ে গেলেন—তাঁরই হাতে তুলে দিলেন ছত্রপতি শিবাজীর তরবারি, আর সেই সঙ্গে মহারাজের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব। সত্যই তিনি করলেন এক অসাধ্য সাধন—সব শত্রুদের দাবিয়ে মহারাজ শাহজীকে করলেন নিরুটক। কুন্তল মহারাজও

তখন করলেন কি, ‘পেশোয়া’ নামে এক স্বায়ত্তশাসন পদ স্থাপিত করে বালাজীকে সেই পদের বিশিষ্ট আসনে অভিষিক্ত করে রাজ্যরক্ষা ও শাসন সম্পর্কে ব্যবহার্য ভার তাঁর উপরে ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে শাহ ও তাঁর বংশধরেরা হলেন ঠাঁটো জগন্নাথ আর বালাজী ও তাঁর বংশধরেরা হলেন রাজ্যের শাসক। এঁরা গইলেন নামে মাত্র রাজা হয়ে, আর পেশোয়ারা তাঁদের সেই পেশোয়া পদকে বাদশাহী পদের মতন বিপুল প্রতিষ্ঠা ও শক্তিসম্পন্ন করে প্রকৃত পক্ষে রাজত্ব করতে লাগলেন। আগে সেতারা ছিল মহারাজী রাজ্যের রাজধানী, প্রথম পেশোয়া সেখান থেকেই রাজ্য চালাতেন। কিন্তু দ্বিতীয় পেশোয়া মহাবীর বাজীরাম পেশোয়ার গদী সেতারা থেকে পুণায় তুলে নিয়ে গেলেন; তখন থেকে পুণাই হলো রাজধানী। দোর্দণ্ড প্রতাপে বংশপরম্পরায় পেশোয়াদের রাজত্ব চলতে লাগল। তাঁদের কত কীর্তি—কত ইতিহাস! সে সব পরে এক দিন বলব তোমাকে। শেষে এল এই পেশোয়ার আমল—আজ আমরা বিঠুরে বীর আশ্রয়ে এসেছি। নানা রকমের অনাচার আর গৃহবিবাদে পেশোয়ার প্রতাপেও তখন ভাঙন ধরেছে। ওদিকে বিদেশী ইংরেজরা এ দেশ থেকে বেছে বেছে লক্ষ লক্ষ সাতসী বতিষ্ঠ বীরপুরুষ সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেককে নতুন প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে ওদেশের ভীষণ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিয়ে এমন এক দুর্দ্বন্দ্ব সিপাহীবাহিনী গড়ে তোলেন—যুদ্ধে বারো কিছুতেই হার মানতে চায় না। ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল—প্রবল প্রতিপত্তিশালী পেশোয়া-শক্তির পতন না হলে ভারতবর্ষের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই শেষ পেশোয়ার আমলে তাঁর শত্রুদের সঙ্গে মিত্রাণী করে একযোগে পেশোয়াকে আক্রমণ করে ইংরেজ তার কাজ গুছিয়ে নিল। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পেশোয়া বিজয়ী ইংরেজের হাতে তাঁর সমস্ত সাম্রাজ্য তুঙ্গে দিয়ে নিজের ও পরিবারদের ভরণপোষণের জন্তে বারিষ আট লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে ইহা বিঠুরে বাস করবার অধিকার পেলেন। এ ছাড়া একটি জায়গীরও তাঁকে দেওয়া হলো। এই সঙ্গে আরো সাব্যস্ত হলো যে, বিঠুর ও পেশোয়ার জাহাঙ্গীরের বাসীন্দারা পেশোয়ার শাসনাধীনেই থাকবেন—ইংরেজ সরকারের আদালতে তাঁদের মামলা-মকদ্দমার জন্ত যতে হবে না। একে সন্ধির পরেই পেশোয়া পুণায় প্রাসাদের পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, যান-বাহন, সজ্জিত ধনসম্পদ ও অসংখ্য সেনা-সামন্তদের সঙ্গে নিয়ে বিঠুরে চলে এলেন। অজ্ঞ প্রাণ বায়ে এখানে বিশাল রাজত্ববন তৈরী করে এর নাম রাখলেন—ব্রহ্মাবর্ত প্রাসাদ। পেশোয়া বধন পুণা ছেড়ে এখানে আসেন, পুণার বহু পরিবার সেখান থেকে বাস তুলে পেশোয়ার সঙ্গে এখানে এসে বাস করতে থাকেন। সেই জন্তেই বিঠুর এমন জনপূর্ণ নগরী হয়ে উঠেছে।

পৃথকীর মুখে অতীতের এই সব কাহিনী শুনে মধুবাই বুঝতে পারলেন, যুদ্ধে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়েও কেন পেশোয়া এখানে এখনো রাজ্যের মতন জাঁক-জমকে বসবাস করছেন।

কথায় কথায় পৃথকী আরো বললেন : মৌবনে বরাবর যুদ্ধ-বিগ্রহ করে, প্রচৌ বয়সে এই ভাবে বিঠুরে এসে আগেকার সেই পেশোয়া খুবই বিলাসী আর আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন। পাছে এই সুখ-সজ্জাগে কোন বিষ ঘটবে—সেই ভয়ে এ-পর্ধ্যন্ত ইনি

বরাবরই ইংরেজের সঙ্গে সত্যি আর সন্তোষিত বজায় রেখেছেন—সন্ধিস্ত লজ্জন করে এমন কোন কাজ করেন না, যাতে ইংরেজের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। বরং পরম মিত্রের মতন ইংরেজের আপদে-বিপদে নিজেই উপযাচক হয়ে অনেক সাহায্য করেছেন। আফগানিস্থানের আমীরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজের টাকার টানটানি পড়লে পেশোয়ার তাঁর সঞ্চিত টাকা থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ইংরেজকে ধার দেন। এর পর পাঞ্জাবে শিখদের সঙ্গে ইংরেজের লড়াই বাধলে ইংরেজ যখন বিপন্ন হয়ে পড়ে, সেই সময় পেশোয়ার নিজের খরচে এই বিটুর থেকে এক হাজার পদাতিক আর এক হাজার অশারোহী সেনা পাঞ্জাবে পাঠিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেন। এতে ইংরেজ সরকার খুব খুশি হন বটে, কিন্তু মারাঠা জাতি মনে মনে পেশোয়ার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হন। পেশোয়ার ভাই—আমাদের বাপুজী তখন কানীতে, তিনি সেখান থেকে পাঞ্জাবে ফৌজ পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন পেশোয়ারকে—কিন্তু ইনি সে আপত্তি গ্রাহ্য করেননি। এই ক্ষত্রেই মা আমরা পেশোয়ার কাছ থেকে দূরে থাকতুম। এখন ঘটনাচক্রে এঁরই আশ্রয়ে আমাদের থাকতে হবে মা! তবে এ কথাও বলি, ইংরেজের এখন একাদেশে বৃহস্পতি—এদের সঙ্গে শত্রুতা করে এ দেশে সুখে-শান্তিতে বাস করা অসম্ভব। পেশোয়ার দেশের অবস্থা আর নিজের সামর্থ্যের কথা ভেবেই ইংরেজের মন যুগিয়ে চলেছেন। পেশোয়ার যখন প্রথমে বিটুরে আসেন, আর সেই সঙ্গে হাজার হাজার মারাঠা পুণা ছেড়ে তাঁর অন্তঃগমন করেন, ইংরেজ তখন ভয় পেয়েছিল; ভেবেছিল, তাঁর রাজ্যের সেরা সেরা লোক যখন বিটুরে এসে তাঁর কাছেই থাকছেন, পরে যদি শক্তি সঞ্চয় করে এঁদের নিয়ে পেশোয়ার আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন—তাহলে ত বড়ই বিপদের কথা হবে! কিন্তু তার পরেই তাঁদের সঙ্গে পেশোয়ার ব্যবহার দেখে ইংরেজের মন থেকে সে সন্দেহ মুছে যায়। এখন ওঁরা পেশোয়ারকে ওঁদের পরম বন্ধু ও গুণগ্রাহ্যী বলেই জানেন।

অতীতের কথা ও কাহিনী গল্পের মত শুনতে খুব শৈশব থেকেই মন্থরাই অভ্যস্ত হয়েছিলেন। কানীতে চৌষটি মন্দিরে পুরোহিত ও কথকদের মুখে পুরাণের কাহিনী শুনে তিনি যেমন আনন্দ পেতেন, বাড়িতে বাপুজীও দেশের বড় বড় বোদ্ধাদের গল্প বলে তাঁর মনে মতন প্রেরণার সঞ্চার করতেন। নৈলে, এই বয়সের কোন্ মেয়ে এ ছেলে ইতিহাসের কথা এমন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনতে ভালবাসে? কিন্তু জগতে যারা অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের কথাই আলাদা।

তবে মন্থর মত মেয়ে পেশোয়ার সম্বন্ধে এই সব কথা শুনেই কি মনের কোঁতুল মিটিয়েছিলেন মনে কর? সেই বয়সেই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে বেন আঁচড় দিতে থাকে। রাজ্য ছেড়েও রাজ্যের বাইরে এসে পেশোয়ার রাজ্যের মতন দশদশপায় আর ভাঁক-জয়কে সন্তোষিত, এ খুব ভালো কথা; কিন্তু ইংরেজ যখন দেশের আর সব রাজ্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্যে লড়াই করতে কোমর বেঁধে পড়লো, পেশোয়ার সেখানে ইংরেজকে কোঁজ পাঠাতে গেলেন কেন? পেশোয়ার এই কাজটি বেন কাঁটার মত মন্থর মনে বিধতে লাগলো। এক দিন তিনি কথায় কথায় পেশোয়ার মুখের উপরেই কথাটা বলে ফেললেন। সেদিন পেশোয়ার সভায় কথা হচ্ছিল যে, ইংরেজরা

কৌশলে পাঞ্জাব জয় করে পাঞ্জাবের সিংহ বণজিং সিংহের বিধবা মহিষীকে বন্দিনী করে খুবই অজ্ঞায় করেছেন। এটো কথার গীট্টাই বালিকা মন্থ হঠাৎ বলে উঠলেন: বাপুজী, এর জন্যে আপনিও কম দায়ী নন—এই ইংরেজকে কোঁজ দিয়ে আপনি সাহায্য করেছিলেন।

বালিকার মুখে এ কথা শুনে সবাই বিষয়ে হতবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন। পেশোয়ার কিন্তু তৎক্ষণাৎ মন্থকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে বললেন: আমার চোখে আঙুল দিয়ে এমন করে এর আগে আর কেউ আমার অজ্ঞায় দেখিয়ে দেয়নি মা! সত্যিই আমি অজ্ঞায় করেছিলাম।

সেদিন খেলার মাঠে যেতে যেতে নানা মন্থকে উৎসাহ দিয়ে বললেন: তুমিও দেখছি আমার মতনই তলিয়ে ভাব। সত্যি বোন, বাবার কতকগুলো কাজ আমাকেও খুব ব্যথা দেয়। কিন্তু আমি বলতে সাহস করিনি। আচ্ছ যে আমার কি আনন্দ হোচ্ছে তা বলবার নয়।

মন্থ বললেন: আমি যে কথা চোখে রাখতে পারি না ভাই!

দেখতে দেখতে বালিকা মন্থ অস্ত্র-চালনায় নানারও প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠলেন। নানার ছোট ভাই রাও সাহেব কিছু পেছিয়ে পড়লেন—অসি খেলার প্রতিযোগিতায় ছবেলী তাঁকে হারিয়ে দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিলেন। এক দিন নানা গভীর হয়ে বললেন: ছবেলী, তোমাকে বোন বলে আমি নিজেই বড় হয়েছি। তোমার কব্জির যে বকম জোর, হতত এর পর আমাকেও হারিয়ে দেবে তুমি।

মন্থ যুহ হেঁটে উত্তর করলেন: বোন কি কখনো দাদার চেয়ে বড় হতে পারে? আমি যে তোমার তলোয়ারের মান রাখতে পেরেছি, তাতেই আমার আনন্দ।

শেষে নানার সঙ্গে মন্থর তলোয়ার খেলা বিটুরে যেন একটা দর্শনীয় ব্যাপার হয়ে উঠল। খেলার মাঠে আর লোক ধরে না—সবাই অবাক-বিষ্ময়ে দেখে হুই অদ্ভুত প্রতিযোগীর অস্ত্র-চালনা। এক দিকে প্রিয়দর্শন কমনীয় কান্তি ঘোড়শবায়ী কিশোর নানা, অন্য দিকে অনিন্দসুন্দরী সুকুমারী দশমবর্ষীয়া বালিকা ছবেলী। এক-এক দিন পারিষদবর্গের সঙ্গে পেশোয়ার স্বয়ং এঁদের অসি-খেলা দেখেন মুগ্ধ-বিষ্ময়ে উজ্জ্বলিত কণ্ঠে প্রশংসা করেন: সাবাসু—ছবেলী, চমৎকার!

ছবেলীর এই বাহাদুরী চরমে উঠল—যেদিন তিনি তেজস্বী এক টাট, ঘোড়ায় চড়ে সমস্ত বিটুর পরিক্রমণ করে এলেন। নানা প্রথমে ভেবেছিলেন, তলোয়ার চালাতে পারলেও ঘোড়ায় পিঠে চড়ে টহল দিতে কিছুতেই পারবেন না ছবেলী। কিন্তু প্রথম দিনেই তিনি নানার সে ভুল ভেঙে দিলেন। সুসজ্জিত ঘোড়াকে দেখেই বালিকার সঙ্গে সঙ্গে বেন অদ্ভুত এক উত্তেজনা জেগে উঠল; তিনি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার মুখোসে হাত দিয়ে আদর করে বললেন: আমি তোমার পিঠে উঠব—আমাকে তুলবে না। বালিকার কথার সঙ্গে ঘোড়াটিও বাড় নেড়ে তার কোমল হাতে মুখখানি বসতে লাগল। মন্থ অমনি সভাস্তে বললেন: ঘোড়া রাজি হয়েছে, আমি এর পিঠে উঠব। বলতে বলতেই মন্থ রেকাবে পা রেখেই ঝাঁ করে

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন এমন কাহিনী করে—যেন ঘোড়ার পিঠে চড়া তাঁর একটা সাধা বিজ্ঞা, তিনি যেন কত সব ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েছেন। ঘোড়াটাও যেন এই অদ্ভুত বালিকাকে চিনে ফেলেছিল, বুঝতে পেরেছিল যে, সহজাত সাস্থ্যের মতই এটিও তাঁর একটা সাধা বিজ্ঞা, আর এমনি বেপবোয়া সওয়ারকে পিঠে তুলতেই তাঁর আনন্দ। তাই, যেমনি মনু তাঁর পিঠের উপর পাতা মখমলের জিনের উপর বসে পড়লেন, ঘোড়াও অমনি একটা ঝাঁকুনি দিয়েই তেজস্বিনী আরোহিণীকে নিয়ে ছুটল সামনের মুক্ত পথে। নানা সাহেব, রাও সাহেব নিজের নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে চেয়েছিলেন ছবেলী দিকে; তাঁর কাণ্ড দেখে তাঁরাও সলস্ফে ঘোড়ার পিঠে উঠে তাঁরই পিছু-পিছু ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। পিছন থেকে তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন, তেজস্বী জন্তুর লাগাম টেনে বাধা করেই ছবেলী তাকে চালাচ্ছে। এ খেলাতেও মনু আশ্চর্য্য বকমের সাক্ষ্য অর্জন করলেন।

এখন থেকে ঘোড়ায় চড়ে পাল্লা দিয়ে বেড়ানোই হলো মনুর শ্রেষ্ঠ খেলা ও কসরৎ। এই খেলার মধ্যে মনু ঘোড়া চেনবার আর তাকে বশীভূত করবার কৌশলও খুঁজে বার করে ফেললেন। এমনি করে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়াবাজী করতে করতে দেশের আর একটা ভাইয়ের সঙ্গেও মনুর পরিচয় হয়ে গেলো; তাঁর নাম—তাস্তিয়া তোপি। ইনি এমন এক দেশভক্ত তেজস্বী মারাঠা ব্রাহ্মণের পুত্র—যিনি মারাঠা জাতির পতনের জন্তু মর্মান্বিত হয়ে পুনরুত্থানের কামনায়া তপতায় দেহপাত করেন—মৃত্যুকালে তিনি পুত্র তাস্তিয়াকেও দেশাত্মবোধের বীজা দিয়ে আদেশ করে যান, দেশের মুক্তির জন্তে সেও যেন তার জীবন উৎসর্গ করে। এই তাস্তিয়ার সঙ্গে কিশোর বয়সেই নানা সাহেব সৌখ্যমুখে আবদ্ধ হন; সেই মূর্ত্তে নানা সাহেবের পঞ্চ-ভগিনী ছবেলীও নানার বন্ধু তাস্তিয়া তোপিকে ভাই বলে গ্রহণ করলেন।

দেখতে দেখতে এলো ভ্রাতৃ-ধিতীয়ার উৎসব। মনু পশুজীর কাছে আবেদন করলেন: ভাইকৈটার দিন আমি নানা ভাইদের চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দেব বাবা! আমার জিনিস-পত্র সব চাই। পশুজী প্রসন্ন মনেই কস্তার নির্দেশ মত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব এনে দিলেন। খুব ঘটা করে মনুবাঈ ভাইকৈটা দিলেন। ভাইয়ের বিশেষ ফোঁটা যদিও নানার অদ্ভুতই ছুটল, কিন্তু রাও সাহেব, এবং তাস্তিয়াকেও তিনি আমন্ত্রণ করতে ডোলেননি—প্রত্যেককেই নূতন বস্ত্র উপহার দিয়ে ভবি ভোজে পরিভূক্ত করে ভ্রাতৃ-ধিতীয়া উৎসব পালন করলেন মনুবাঈ।

এই ভাবে খেলায়-খুলায়, বিজ্ঞা ও অস্ত্রশিক্ষায় এবং নানারূপ

ব্যায়ামের ভিতর দিয়ে আরো দু'টি বৎসর কেটে গেল; এর পর এলো মনুর ভাগ্যোদয়ের বছর—১৮৪২ খ্রিঃ। এই সময় এক দিন হঠাৎ কানীরা সেই জ্যোতিষী ঝিঁরুয়ে এসে উপস্থিত। পশুজী তাঁকে চিনতে পেরে সাধবে অভ্যর্থনা করলেন। জ্যোতিষী বললেন: মনে আছে পশুজী, আমার গণনার কথা বলেছিলুম, আপনার কস্তা হবেন রাজরাণী? তারই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গারাত ও যশোবন্ত বাবা সাহেবের জ্ঞাত সর্কগুণাবিতা সুলক্ষণা পাত্রীর প্রয়োজন হয়েছে। আমি আপনার কস্তার কথা বলেছি। মহারাজের পক্ষ থেকে তাঁর অমাত্যরা আজই পাত্রী দেখতে আসছেন। এ কস্তা যে তাঁরা পছন্দ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আপনার কথা মনুবাঈ রাজরাণী হবেন পশুজী!

পশুজী কস্তার জ্ঞাত ভিতরে ভিতরে পাত্রের আবেষণ করছিলেন; এ সংবাদে আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। কথাটা পেশোয়ারও শুনলেন, তিনি সর্হর্ষে বললেন: আমি জানতুম, ছবেলী যেমন অসাধারণ মেয়ে, তেমনি কোন অসাধারণ ঘরেই হবে ওর বিয়ে।

ঝাঁসীর অমাত্যরা পাত্রী দেখে সন্তুষ্ট হয়ে জানিয়ে গেলেন, এমনি কস্তারই অমুসন্ধান তাঁরা করছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। ইনিই হবেন ঝাঁসীর মহারানী।

এর পর শুভলগ্নে মনুর বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হলো। বিবাহের সময় ঘটল এক কৌতুকাবহ ঘটনা। পুরোহিত বধন বরবেশে মহারাজ গঙ্গারাত রাওএর অঙ্গবস্ত্রের সঙ্গে বধু মনুবাঈএর অঙ্গাস গাঁটছড়া বাঁধতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছেন, সেই সময় মনু সহাস্তে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন: পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গি'ট দিন যেন খুলে না যায়।

কস্তার কথায় বিবাহ-স্থলে হাসির রোল উঠল। স্বয়ং মহারাজও আড়োঁখে কস্তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। পেশোয়ার সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সহাস্তে বললেন: এরকম কথা ছবেলীই বলতে পারে—পুরুত ঠাকুরকেও হার মানিয়ে দিলে।

সত্যি, বিবাহ-বাসরেও সবার সামনে এমন কথা সহজ ভাবে বলতে পেরেছিলেন বলেই—আর এক দিন পরম সঙ্কট কালে ইংরেজ রেসিডেন্টের মুখের উপরে সেই বক্তৃতা থেকেই অকুণ্ঠ স্বর নির্গত হয়েছিল—মেরী ঝাঁসী দেবী নেহী!

বিবাহের পর ঝাঁসীর প্রাসাদে কুলবধূরূপে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের কুলপ্রথা অনুসারে বধু মনুবাঈয়ের নূতন নামকরণ হলো—লক্ষ্মীবাঈ।

[ক্রমশঃ]

### অনস্বীকার্য

যখন এক জন কেউ কংগ্রেসের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তখন আপনি তাঁর বন্ধু। যখন তিনি নির্বাচিত হন তখন আপনি তাঁর নির্বাচক। আর যখন তিনি আইন বিধিবদ্ধ করেন তখন আপনি এক জন করদাতা ব্যতীত আর কেউ নয়।

## “এক শতাব্দীতে একবার।”

সম্প্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে পুরে পুরে ছুটি সংবাদ।  
বার্লিনে মধ্য-ওজনের (middle-weight) ছুটি বিশ্বাস্য  
যুষ্টিযোদ্ধার প্রতিযোগিতা হয়, তাঁদের এক জন জার্মান, আর এক  
জন নিগ্রো। কালো যোদ্ধার খুঁসি খেয়ে খেতাজ যোদ্ধা নিতান্ত কাবু  
হয়ে পড়ে। অমনি কালার বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে ওঠে থলা  
দশকরা। বেগতিক দেখে মধ্যস্থ লড়াই থামিয়ে দেয়।

এর কিছু দিন পরে সেখানে এক জন ভারি-ওজনের (heavy-weight) জার্মান যুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে বিশ্ববিজয়ী নিগ্রো যুষ্টিযোদ্ধা  
জে লুইসের লড়াই হবার কথা ছিল। কিন্তু উপরোক্ত খবরটা  
তনে লুইস আমেরিকা থেকে তার পাঠিয়ে বলেছেন, আমি  
জার্মানিতে গিয়ে যুদ্ধ করতে নারাজ।

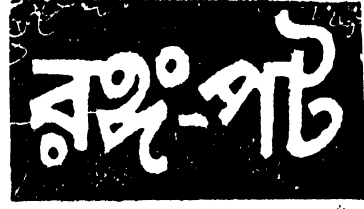
যুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে এই বর্ণবিষেব ব্যাপারটা নতুন নয়। চল্লিশ  
বৎসর আগে আমেরিকার অপরাধিত খেত যোদ্ধা স্ক্রেক্সিসকে  
কুপোকাং ক’রে নিগ্রোদের মধ্যে সর্বপ্রথমে বিশ্ববিজয়ী উপাধি  
অর্জন করেছিলেন জ্যাক জনসন। তার ফলে সমগ্র খেতাজ  
সমাজ কেঁপে ওঠে। নিগ্রো পল্লী আক্রান্ত হয় এবং বিশর হয়  
জনসনের জীবন। তিনি যুরোপে পালিয়ে যান প্রাণভয়ে।  
কিন্তু সেখানেও নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারলেন না।  
বাগা হয়ে শেষটা তিনি তাঁর চেয়ে ঢের নীচু দরের যুষ্টিযোদ্ধা জেম্  
উইলার্ডের কাছে এক কৃত্রিম যুদ্ধে (mock-fight) যেতে হার মেনে  
(১৯১৫ খৃঃ) খেতাজদের মান ও নিজের প্রাণ রক্ষা করেন।

লুইসের বিজয়-গৌরবও যে ইয়াক্সিদের খুঁসি করে, এমন মনে  
করবার কারণ নেই। নিরুপায় হয়ে তারা তাঁকে কোন ক্রমে সহ্য  
করে, এই মাত্র।

এ তো গেল ভঁতোর ভঁতি, হাতাতাতির ব্যাপার। এখানে  
সাধারণতঃ কাজ করে প্রাকৃতিকজনদের নিরুপস্থি মনোবৃত্তি, স্তবরাং  
গালে হাত দিয়ে অবাক হবার দরকার নেই। যুষ্টি বা মল্লযুদ্ধের  
প্রেক্ষাগৃহে বা ফুটবল খেলার মাঠে ধীমানতা কোন দিনই দলে ভারি  
হ’তে পারবেন না। দক্ষিণ-আমেরিকার একটি দেশে ফুটবলের  
মাঠে দর্শকদের ও খেলোয়াড়দের মাঝখানে জলপূর্ণ গভীর খাল  
কেটে রাখা হয়। কারণ? বাধা না থাকলে দর্শকদের কাছ  
থেকে মধ্যস্থ ও খেলোয়াড়দের উত্তম-মধ্যম লাভের প্রভূত সম্ভাবনা  
থাকে।

কিন্তু কলাকলির আসর প্রাকৃতিকজনদের জন্মে নয়।  
বঙ্গালয়ের গ্যালারির দেবতারা কুবিখ্যাত হ’লেও প্রধানতঃ তা  
এমন সব বসিকজনদেরই উপভোগের ঠাই, চিত্ত বীদের যুক্ত ও  
উদার এবং জাত বিচার ক’রে বারা শিল্পীদের উত্তম বা অধ্যমের  
কোঠায় ফেলেন না। উচ্চশ্রেণীর শিল্পী মাত্রই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,  
হাদের মধ্যে কেউ নেই হরিজন।

কিন্তু সেখানেও যদি গায়ের রং দেখে কাককে প্রশস্তি  
দেওয়া এবং কাককে লাঞ্ছনা করার প্রথা প্রচলিত হয়, তবে  
হেমন কুপ্রথাকে থিকার দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অল্প দিন  
আগে আমেরিকাতে এই বকম একটি লজ্জাকর দৃশ্যই দেখা  
গিয়েছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা হচ্ছে, এটাও প্রমাণিত হয়ে  
গেছে যে, খেলার মাঠের দর্শকদের মনোবৃত্তি নিয়ে বারা গর্ভভের মত  
কলা-কমলার কুজবনে প্রবেশ করে, তারা নয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আজও



প্রসাদ রায়

তারা অধিকাংশই করতে পারেনি বসিকজনদের। বাসন্তী  
পূর্ণিমাতেও পেচকরা ককশ চাঁকায় করে বটে, কিন্তু তারা থামিয়ে  
দিতে পারে না বসন্ত-বৃত্ত কোকিলদের কলসন্মিত।

সলোমন হিউরক সাহেব হচ্ছেন আমেরিকার অন্ততম শ্রেষ্ঠ  
প্রমোদ-পরিবেশক। উদয়শব্দ, আনা পাবলোভা, ইজাভোরা  
ডান্‌ফান, মেরি উইগ্‌মান, শালিয়াপিন ও রুবিন্‌স্টন প্রভৃতি  
প্রথম শ্রেণীর নর্তক, গায়ক ও বাদকরা তাঁর আশ্রয়ণেই আমেরিকায়  
গিয়ে দেখা দিয়েছেন। তাঁর বারা আবৃত্তত হয়ে যথেষ্ট নাম  
কিনেছেন একাধিক অনামা শিল্পী।

শিল্পীদের সঙ্গানে একবার হিউরক গিয়াছেন ফ্রান্সের প্যারিস  
সহরে। এক সন্ধ্যায় রাত্রিপথে বেড়াতে বেড়াতে তিনি একটি  
বিজ্ঞাপন দেখলেন, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে—অযুক্ত বঙ্গালয়ে  
আজ এক জন আমেরিকান “কন্ট্র্যাণ্টো”র (মিহি সুরের গায়িকা)  
গানের আসর বসবে।

তিনি টিকিট কিনে প্রমোদগৃহে প্রবেশ করলেন। শ্রোতাদের  
আসনগুলি পরিপূর্ণ। যথাসময়ে বঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন একটি  
দীর্ঘাঙ্গী নিগ্রো সুবতী। চোখ মুদে তিনি গান ধরলেন এবং  
হিউরকের সর্বদা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল একটা বৈজ্ঞাতিক  
শিহরণ। বীর কণ্ঠস্বরে এমন ইন্দ্রজাল, তাঁর নাম পর্যন্ত  
আমেরিকায় অপরিচিত, অথচ তিনি ঐ দেশেই মেয়ে।

তরুণী গায়িকার নাম মেরিহান একারসন। স্বদেশেও এখানে—  
ওখানে তিনি গান গেয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে আমল দেয়নি।  
তাই তিনি যুরোপে এসেছেন ছুটি উদ্দেশ্য নিয়ে : আরো ভালো  
ক’রে গান শিখতে এবং ইতিমধ্যে যেটুকু শিখেছেন তার সাহায্যেই  
জীবিকা নির্বাহ করতে।

সামান্য পুঁজি নিয়েই তিনি যুরোপে এসেছিলেন, অল্প দিনেই  
তা প্রায় ফুরিয়ে গেল। কিন্তু মেরিহানকে দায়ে ঠেকতে হ’ল না।  
বড় বড় ওস্তাদদের কাছে কণ্ঠসাধনা করতে করতে তিনি যুরোপের  
দেশে দেশে গান গেয়ে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং সর্বত্রই লাভ  
করলেন উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। ভারতের মত ওদেশের শ্রোতারা  
হাত গুটিয়ে কেবল মৌখিক অভিনন্দন দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, দরাজ  
হাত বাড়িয়ে শিল্পীর হাতেও অর্পণ করে কাঞ্চনমূল্য। মেরিহানের  
পথ হয়েছে কুসুমাস্তত; সঙ্গীত অমূল্যলনের সঙ্গে চলছে তাঁর যশ,  
মান ও অর্থ উপার্জন।

ইতালীর অমর সঙ্গীতশিল্পী আর্দুরো তোস্কানিনি তাঁর গান  
তনে তাঁকে বলেছেন, “তোমার মত কণ্ঠস্বর শোনবার সুযোগ পাওয়া  
যায় এক শত বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র।”

প্রতিভার অবতার ও নাট্যাচার্য্য ঠানিস্‌পাভ্‌স্কি তাঁর হাতে  
রানীকৃত খেত লাইল্যাক্‌ দুস উপহার দিয়ে বলেছেন, “আপনি

কসিয়াজেটে থাকুন। মস্কো আর্ট থিয়েটারের “কারমেন” গীতিনাট্যে আপনাকে দেওয়া হবে নামভূমিকাটি।”

ফিনল্যান্ডের অতুলনীয় সুরকার জ্যান সিবিলিয়াসের বাড়িতে বসেছে মেরিয়ানের গানের আসর। তিনি গান শুনে গভীর স্বরে বলেছেন, “আমার ঘরে তোমার কণ্ঠস্বর ধরবার জায়গা নেই।”

হিউরকের শিক্ষিত শ্রবণ সত্য উপলব্ধি করতে ভুল করলেন না। মেরিয়ানকে বন্দী করে আবার তিনি ফিরিয়ে আনলেন আমেরিকায়।

এবারে মেরিয়ানের ভার পড়েছিল যোগ্য হস্তে। জনতার পরিপূর্ণ প্রমোদ-গৃহে তাঁর অপূর্ণ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করলে অভিভাবিত বিম্বর, উদ্গাদনা ও প্রশংসা-কোলাহল। পত্রিকায় পত্রিকায় সঙ্গীত-সমালোচকরা তাঁর জন্তে অক্লান্ত ভাষায় প্রশংসা রচনা করতে লাগলেন। কেউ বললেন, “এ সঙ্গীত প্রথম শ্রেণীর ও পরমোত্তম।” কেউ বললেন, “এ সঙ্গীত ভাষায় বর্ণনাতীত।” কেউ বললেন, “মেরিয়ান এগারসন তাঁর স্বদেশে ফিরে এসেছেন পৃথিবীর অকৃত্রিম শ্রেষ্ঠ গায়িকারূপে। এখন আমাদের উচিত তাঁকে যোগ্য গৌরব দান করা।” কে তাঁকে বেশী প্রশংসা করবে, তাই নিয়ে আরম্ভ হ’ল যেন প্রতিযোগিতা।

গানের আসর—আসরের পর আসর! প্রত্যেক আসরে থাকে না তিল ধারণের ঠাই। যে সহরে মেরিয়ানের আবির্ভাব হয়, সেখানেই রাজপথ হয়ে যায় লোকে লোকারণ্য—সকলে ছুটে আসে কেবল তাঁকে একবার চোখে দেখবার জন্তে। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’ বললে, “মেরিয়ানের কণ্ঠস্বর হচ্ছে একটা সমগ্র জাতির কণ্ঠস্বর।”

মেরিয়ানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোনটি তাঁর জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত?

তিনি জবাব দেন, “যেদিন আমি বাড়ী ফিরে এসে মাকে বলতে পেরেছিলুম—মা, আর তোমাকে খেতে খেতে হবে না।”

বালিকা বয়সে মেরিয়ানকে দাসীস্বত্বের দ্বারা টাকা রোজগার করতে হ’ত। দয়ালু প্রতিবেশীরা চান তুলে সঙ্গীতশিক্ষার ব্যয় সংকুলান করত। সেই মেরিয়ান আজ হয়েছেন বিপুল বিত্তের অধিকারিণী—বাড়ী, গাড়ী, দাস-দাসী, তাঁর কিছুই অভাব নেই। যুরোপ-আমেরিকার দেশে দেশে তাঁর নামে গুঞ্জন উঠেছে। বাংলা দেশে নিছক আর্টের সেবা করলে ধনী হন নিঃস্ব, আর খেতাজদের দেশে আর্ট নৌনের অঞ্চলেও নিক্ষেপ করতে পারে বহু লক্ষ মুদ্রা। লক্ষ্যের সঙ্গে সরস্বতীর বিবাহ হয় লক্ষী-সরস্বতীর পূজারীদের দেশেই।

টেম্পল য়ুনিভার্সিটি, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি ও স্মিথ কলেজ থেকে মেরিয়ান “Doctorates of Music” উপাধি লাভ করেছেন এবং আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট-পত্নী মিসেস রুজভেল্ট তাঁর কণ্ঠে স্বহস্তে ঝুলিয়ে দিয়েছেন স্পিনগার্ল পদক। তাঁর জন্মস্থান ফিনাডেলফিয়ায় সম্মান বাড়িয়েছেন বলে তাঁকে দেওয়া হয়েছে দশ হাজার ডলারের “বক” পুরস্কার।

স্বর্গত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁকে নিজের ভবনে সাদরে আমন্ত্রণ করেন—এমন অসাধারণ সম্মানলাভ ঘটে খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’লে তাঁকে কি বলে সম্বোধন করবেন তা ভেবে-চিন্তে মেরিয়ান একটী ছোট বক্তৃতা মহলা দিয়ে তৈরি করে রাখলেন। মিঃ রুজভেল্ট এসে আসর করে তাঁর কক্ষ হ’লে হাসতে হাসতে বললেন, “ওগো বাছা, তোমাকে

দেখছি ঠিক তোমার ছবির মতই দেখতে—কেমন, তাই নয় কি?” মেরিয়ান উত্তর দেননি কি, ভাষাচাঞ্চা। শেষে নিজের ছোট বক্তৃতাটি পর্যন্ত একেবারে ভুলে গেলেন।

ইংলণ্ডের মহামান্য রাজা ও রাণী বেড়াতে গিয়েছেন আমেরিকায়। তাঁরা মেরিয়ানকে দেখবার জন্তে কৌতুহল প্রকাশ করলেন। মিসেস রুজভেল্ট তাঁকে রাজা ও রাণীর সামনে নিয়ে গেলেন। ভয়-তরাসে মেরিয়ান রাজার সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না তো বটেই, তাঁকে প্রণত-জাহ্নু হয়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে ভুলে গেলেন।

এ সব তো হচ্ছে ঢালের এক পিঠের লিখন। এবারে ঢাল উল্টে দেখা যাক তার অল্প পিঠে কি আছে।

মেরিয়ানকে সহ্য করতে হয় অনেক অপমান, অনেক গালি-গালাজ, অনেক টিটকারি। কিন্তু তিনি ধীর, স্থির, শান্ত মেয়ে। কোন প্রতিবাদই করেন না। এ সব বিরুদ্ধতা কেবল তাঁর গায়ের কালো রংয়ের জন্তে।

অনেক ট্যান্ডিওরলা তাঁকে তাদের গাড়ীতে চড়ে দেয় না। তিনি যুথ বুঁজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন এমন কোন ট্যান্ডির জন্তে, যার চালকের মন অপেক্ষাকৃত উদার।

অনেক হোটেলের খেতাজ মালিক তাঁকে দরজা থেকেই খেদিয়ে দেয়। তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় দূরবর্তী কোন নিগ্রো পল্লীতে গিয়ে। তিনি কোন রকম ভিত্তিতা সৃষ্টি করতে চান না। একবার খালি দুঃখ করে বলেছিলেন, “ভগবান যখন নিগ্রোকেও গুণী করেন, তখন নিশ্চরই তাঁর কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।”

মেরিয়ানের সঙ্গতবাদক হচ্ছেন এক জন খেতাজ, গানের সঙ্গে তিনি পিয়ানো বাজান। তাই নিয়ে বারংবার প্রতিবাদ গুঠে। তাঁর ম্যানেজার হিউরককে সাবধান করে দেওয়া হয়—“একটা নিগ্রোর সঙ্গে সঙ্গত করবে খেতাজ? দেখো, ছুঁড়ীটাকে সবাই ঢিল ছুঁড়ে মারবে, বিষম গোলমাল হবে!” আজ পর্যন্ত কেউ ইটকাদি নিক্ষেপ করেনি, কিন্তু গোলমাল হয়েছে বারংবার—তবে সে গোলমাল হচ্ছে স্বাভাবিক এবং প্রশংসাস্বপ্নের।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের “ইষ্টার” রবিবারে ব্যাপারটা একেবারে চরমে গুঠে। ওয়াশিংটন সহরের হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মেরিয়ানের সেখানে গান গাইবার কথা। সহরের সব চেয়ে বড় প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে কন্সট্রিউশন হল। কিন্তু সেখানকার কর্তারা বেকে বসলেন, বললেন, নিগ্রো শিল্পীদের শুভে আসর ছেড়ে দেওয়া আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

‘দি ওয়াশিংটন হেরাল্ড’র সম্পাদকীয় কলামে এই নিবেদন প্রকাশিত হয় মন্তব্য প্রকাশিত হ’ল: “এ রকম বর্ণবিশেষ আমাদের জাতিকে তাবৎ সংস্কৃতিশীল পুরুষদের চোখে উপহাসভাজন করে তুলবে এবং উল্লসিত করবে হিটলার ও তার নাজীদের।” কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ মন্তব্য গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলেন না।

তার পর সেনট্রাল হাই স্কুলের প্রেক্ষাগৃহের জন্তে আবেদন করা হ’ল। কিন্তু সেখানেও নিগ্রো শিল্পীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এখন উপায়? হিউরক লিন্‌কলন মেমোরিয়ালের সরকারি জমির জন্তে আবেদন করে সকল হ’লেন। তিনি তখন সানসে ঘোষণা করলেন—“আগামী ইষ্টার রবিবারে লিন্‌কলন

মেরিয়ালের খোলা মাঠে মেরিয়ান এণ্ডারসন তাঁর গানের জলসা বসাবেন।

চারি দিকে সৃষ্টি হ'ল বিবম উত্তেজনা! শত্রু-মিত্র নানা জনের মুখে নানা গুজব। মেরিয়ান নিজেও ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "দরকার নেই এত হাঙ্গামায়।" কিন্তু ডিউরক অটল।

নির্দিষ্ট দিনে পুলিশ-বাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত হয়ে মেরিয়ান যখন আসতে গিয়ে হাজির হ'লেন, তখন সামনে দেখলেন এক অভাবিত দৃশ্য। বিস্তীর্ণ ময়দানে বিরাট জনতা! অমন সুরহুৎ জনতার সামনে তিনি আর কখনো গান গাইবার সুযোগ পাননি। টিকিট কিনে তাঁর গান শুনতে এসেছে পাঁচাত্তর হাজার শ্রোতা!

গান শেষ হ'লে উঠল আকাশভেদী প্রশংসাধ্বনি!

মেরিয়ান বললেন, "আজ আমি গান শোনালুম সমগ্র জাতিকে।"

সুতরাং যে গণ্ডী কাটে, তা লুপ্ত ক'রে দেয় বৃহত্তর লোকসাধারণের উচ্চতর মনোবৃত্তি।

## রাশিয়ার চলচ্চিত্র

সুখেন্দু দত্ত

মুখ্যের চিত্র-প্রদর্শনী সম্বন্ধে রোম'। রোল'। একদা বলেছিলেন :

—“সোবিয়তের চলচ্চিত্র শিল্প জনগণের শিল্প হিসাবে অধিতীয়। এই শিল্প সকলের হয়ে কথা বলে, সকলের আওয়াজকে ধ্বনিত করে তোলে এবং সকলের চোখ খুলে দেয়। সোবিয়ৎ শিল্পীদের কীর্ষি ইতিমধ্যেই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, নতুন সোবিয়ৎ জগতের বৈশিষ্ট্যকে তারা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধ ‘ট্রাজিডি’গুলির মত। সোবিয়তের চলচ্চিত্র শিল্প নিজের নতুন পথ সৃষ্টি করে নিয়েছে। প্রগতির প্রতিটি ধাপকে সোবিয়ৎ চলচ্চিত্র শিল্প চিরস্মরণীয় ভাবে চিহ্নিত করে রেখে গিয়েছে।”

সোবিয়ৎ চলচ্চিত্রের জন্ম আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে। তার আগে রুশিয়ায় কোন ভাল ছবি তোলা হত না। পনের বছরের মধ্যেই সোবিয়তের ছবি নিজের দেশে তো বটেই, বিদেশেও এই যে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল এর পেছনে রয়েছে সোবিয়ৎ ছবির আদর্শগত উপকরণ। সোবিয়তের নতুন জীবনের, নতুন মানুষের, ভাবী পৃথিবীর প্রতিনিধির নতুন জগৎ সৃষ্টির বীরত্বময় জীবন-সংগ্রামকে পর্দায় প্রতিফলিত করে সোবিয়তের চিত্র-প্রযোজকেরা ভগতে সৃষ্টি করলেন এক নতুন ধরনের ছবি। চলচ্চিত্র শিল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে সোবিয়ৎ ছবি এক যুগান্তর এনে দিল। তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষ সোবিয়তের ছবি অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ও আগ্রহ নিয়ে দেখেন। সোবিয়ৎ ছবির আদর্শগত সত্যনিষ্ঠ উপকরণ তাদের মনকে আকৃষ্ট না করে পারে না।

সোবিয়ৎ চলচ্চিত্রের জন্ম নভেম্বর বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধের অগ্নিগর্ভে। বিপ্লবের সাক্ষ্যের পরই রুশিয়ার সিনেমা-জগতের প্রগতিশীলরা সেই সময়কার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে রেকর্ড করতে আরম্ভ করলেন। লেনিন নিজে এই ধরনের ছবিকে অত্যন্ত জরুরী বলে

মনে করতেন। সোবিয়ৎ সিনেমার ইতিহাসে লেনিন ও স্তালিন বরাবর স্বদেশের জরুরী ঘটনাগুলোর ছবি তোলার দিকে নজর রেখে এসেছেন দেখা যায়। কলে খুব জল্প সময়ের মধ্যেই সোবিয়তের ঘটনামূলক ছবির বিশেষ উন্নতি হয়। তার পর যতই দিন বাড়ে, সোবিয়তের এই ধরনের ছবি আদর্শ ও উদ্দেশ্যে নিখুঁত হয়ে উঠছে। ঘটনামূলক ছবিকে রসপূর্ণ, তথ্যবহুল এবং দর্শকজনচিত্তজয়ী করতে সোবিয়ৎ দেশের মত আর কোন দেশই পারেনি। কয়েক মাস আগে কলকাতার দেখান ‘ফেটিভ্যাল অফ ইউএ’ ছবিখানাই তার সর্বোৎকৃষ্ট পরিচয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষার মহান সংগ্রামের সময় রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইতিহাসের পাতার মতই রেকর্ড হয়ে গিয়েছে সোবিয়তের ঘটনামূলক ছবির বল্যাণে। এই সব ছবি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। শুধু ঘটনামূলক বলে নয়, চিত্রকলায় দিক থেকেও ছবিগুলো অনবদ্য। এই সব ছবির জন্ম প্রত্যেক রণাঙ্গনে, শত্রুর পিছনে, গেরিলা দলে সর্বত্র আলোকচিত্রকারেরা ক্যামেরা নিয়ে তৈরী থাকতেন। অনেক সময় তাঁদের ক্যামেরা রেখে অন্য হাতে নিয়ে লেগে পড়তে হয়েছে। কত শিল্পীই না এই ভাবে প্রাণ দিয়েছেন!

কিন্তু শুধু ঘটনামূলক ছবিই নয়, বর্তমান যুগে চলচ্চিত্র শিল্প-জগতেও নায়কের স্থান দখল করেছে সোবিয়ৎ ইউনিয়ন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে সোবিয়ৎ চলচ্চিত্র বরাবরই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আসছে। চিন্তার বস্তিত্বতা এবং ছবিতে গল্প বলার কলা-কৌশলের জ্ঞানও সোবিয়ৎ ছবি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

দেশ ও জনগণের সেবারত গ্রহণ করে, সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শকে প্রতিফলিত করে সোবিয়তের চলচ্চিত্র শিল্প গোড়ার দিক থেকেই চমৎকার সব ছবি তুলে আসছে। এগুলোর মধ্যে বহু ছবি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে, সোবিয়ৎ ছবির সৃষ্টিশক্তি যে কতখানি বেশি, বিশ্ববাসী তা দেখেছে। দেখেছে যে, সোবিয়ৎ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও কর্মাদল কি ভাবে জীবনের ও সমাজের উন্নতির জ্ঞান বিজ্ঞানের এই মহান অবদানকে ব্যবহার করেছেন।

সোবিয়তের ছবিগুলো ওদেশের শত্রু, সবল ও গঠনমূলক সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে, জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্কিশেয়ে জীবনের ক্ষেত্রে মানবতার জ্ঞান গভীর প্রেম ও সৌহার্দ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। শ্রমের মর্যাদা, স্বদেশপ্রেম, যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস এবং ব্যক্তিগত জীবনে সত্যতা প্রভৃতির আদর্শকে ফুটিয়ে তোলে অগ্রগামী জীবনের সুখর প্রতিচ্ছবি সোবিয়ৎ চলচ্চিত্র। ভারতে সোবিয়ৎ রাষ্ট্রদূত মঃ নভিকভ-এর ভাষায় “সোবিয়ৎ ছবিগুলো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলোকে আরও নতুন ও উচ্চতর জীবনের জ্ঞান ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। পুর্বা জীবন-যাত্রার চেয়ে উন্নততর জীবনযাত্রার জ্ঞান প্রয়োজন বোধে জীবনের বা কিছু জ্ঞান বা কুৎসিত ভাব থাকে, তাকে সমালোচনা দ্বারা দূর করারও চেষ্টা হয়।”

সোবিয়ৎ মানুষের জীবন-সংগ্রামকে দেখানর সংগে সংগে সোবিয়ৎ ছবি এই জিনিষটো ফুটিয়ে তোলে যে, সোবিয়তের মানুষ



কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জীবন-সংগ্রামে নেমেছে। সোবিয়তের ছবি তাই স্বাভাবিক দেশের জনগণকেও মুক্তি-সংগ্রামে সাহায্য করে, অনুপ্রেরণা দেয়। পনের বছর আগে সোবিয়েৎ ছবি স্পেনের জনগণকে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রেরণা দিত। সে সময় প্রতিটি বিপাবলিকান বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার সময়ে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র “চাপায়েফ” দেখতে চাইত। ছবি দেখে চাপায়েফের সৈনিকদের মতই বীরত্বের সংগে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা নিত বিপাবলিকান স্পেনের গণতন্ত্রী বাহিনীর সৈনিকেরা। চীনের দেশভুক্তরাও জাপানী আক্রমণকারী আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ঠাঁবেদার কুওমিনতাং-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সোবিয়েৎ ছবি থেকে পেয়েছে প্রচুর অনুপ্রেরণা।

শিক্ষা ও তথ্যমূলক ছবিই সোবিয়তের চলচ্চিত্রের অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া শিল্প-উৎকর্ষের দিক থেকেও সোবিয়েৎ ছবি আশ্চর্য উন্নতি লাভ করেছে। সোবিয়েৎ চলচ্চিত্রের উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য চিত্তাকর্ষক ভাবেই পরিচুত। রঙীন চিত্ররচনার উৎকর্ষে সোবিয়েৎ চিত্রনিখাতারা আশ্চর্য্য পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছু দিন আগে কলকাতায় সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসবের সময় দেখান ‘টেল অফ দি উড্‌স্’ ছবিখানাই তার একটা পরিচয়। অতি নিখুঁত বাস্তব রঙের পরিষ্কৃষ্ট ছবিখানা। সমৃদ্ধ। বক্তব্যের বর্ণনা এবং চিত্র গ্রহণের দিক থেকে ছবিতে যেমন নিপুণ তথ্য

সংগ্রহ ও পরিবেশনের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বড় যোজনার সমারোহ ও বৈশিষ্ট্য চোখ ও মনকে তৃপ্তি দেয়। সোবিয়েৎ চিত্রনিখাতাদের উদ্ভাবনী কৌশল যে কতখানি, তারই পরিচয় দেয় ছবিখানা। কলকাতায় দর্শক-সমাজের কাছ থেকে এটা সম্পূর্ণ স্ফায়সঙ্গত ভাবেই প্রচুর প্রশংসা ও অভিনন্দন পেয়েছে, তাদের বিশ্বাসের উল্লেখ করেছে।

আমাদের দেশে সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র আসে খুব কমই। কম আসে নানা কারণে। প্রথমত, সোবিয়েৎ ছবি প্রদর্শন করার জন্য সরকারী অনুমতি লাভ করতে অনেক চেষ্টা বিধা ভোগ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, সরকারের অপ্রিয়ভাজন হওয়ার ভয়ে চিত্রগৃহের মালিকেরা সোবিয়েতের চলচ্চিত্র দেখাতে চান না। তার ওপর রক্ত ভাষায় তোলা ছবি আমাদের দেশের দর্শকদের বোধগম্য নয়। কিন্তু ভাষাগত বাধা ও ব্যবধান থাকে সত্যেও সার্বজনীন আবেগসম্পন্ন সার্থক ও রসোত্তীর্ণ ছবির মর্ম ও প্রসঙ্গলব্ধিতে অসুবিধার কারণ ঘটে না। তাই যাদের উত্তোগ, আয়োজন এবং পরিবহনায় কিছু দিন আগে কলকাতায় সোবিয়েৎ চলচ্চিত্র উৎসব সম্ভব হয়, তাঁরা সিনেমারস-পিপাসু দর্শকদের বিশেষ একটা প্রয়োজন মেটাবার জন্য ধন্যবাদভাজন হয়েছেন নিশ্চয়ই। যে সব ছবি সচরাচর দেখার সুযোগ-সুবিধা নেই, সেই সব ছবি দর্শকসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার চলচ্চিত্রের অনুগ্রহী মাঝেই তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন।

## ঋষি বন্ধিমচন্দ্র

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

ভারতের প্রাচীন ঋষির হে তবু বংশধর,  
হে ঋষি মহামানব, ঋষি বন্ধিমচন্দ্র!  
এই বিমখিতা দেশজননীর ধূলিকণা থেকে  
কি বিরাট অদৃশ—আশ্রম তুমি গড়ে তুলেছো।  
জনতার প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে  
তুমিই সেই প্রশান্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলে,  
তুমিই শুধু মুহূর্তের স্বপ্নে এসে গভীর কেন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিলে—  
যে কেন্দ্র থেকে সেই এক প্রশ্ন, সূর্য-চন্দ্র-তারার,  
পশু-পাখী, ধূলিকণা এমন কি পাথরেও প্রসারিত—  
যেখানে এখনো একটি বিনিমিত আত্মা নিজ ক্রোড়ে  
এক অদৃশ সঙ্গীতে সমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বস্তুকে লোলা দিচ্ছে,  
সমস্তই চলছে কিংবা মনে হচ্ছে সমস্তই রয়েছে স্তব্ধ হয়ে!

বধন আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মৃত সন্ধান বিস্মৃত  
হয়ে মাতাল হয়েছিলাম, বিদেশী সাহিত্য, সভ্যতা, পোষাক,

বিদেশী ভাষা, বিদেশী কাঁচা কাঁচা আমরা অন্ধকে নকল কবছিলাম,  
অন্ধকার কূপের মধ্যে ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে  
অভব্য ভাবে পরস্পরকে গালাগালি দিছিলাম—  
তখন তুমি আমাদের থেকে দূরে গিয়ে  
কত দূরে, কত মহীরান্ ধ্যানের মধ্যে নিদ্রেকে সমাহিত করেছিলে  
তুমি, তোমার মনই সেই নিস্তব্ধ গান্ধীধের মধ্যে, গভীর  
প্রশান্তির মধ্যে, অদৃশ আত্মার মধ্যে ডুব দিয়েছিলো।  
এই দৃশ পৃথিবীর পরপারে—যেখানে প্রাচীন ঋষির আছেন,  
ধারা এই বিরাট সীমানা অতিক্রম করে গেছেন—সেইখানেও  
তোমার মহীরান্ কীর্তি বিনম্র ভাবে বিরাট পুরুষের পাদমূলে প্রসারিত।  
হে ঋষি, তুমিও সেই প্রাচীন ঋষিদের মতই উদাস কঠোর বলেছিলে :  
—“ওঠা, জাগো।”

তোমার সেই উদাস আহ্বান ক্ষুদ্র দার্শনিক শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের  
কাছে এনেছিলো বিরাট বিষয়।

কিন্তু সমস্ত মানুষের কাছে এনেছিলো একতার অগ্নিবর্ণী।

তোমার ধ্যানের ভারত, এই প্রাচীন ভারত, আবার কিরে আশ্রক,

তার নিজের আত্মার কাছে, কিরে আশ্রক তার নিজের ধ্যানে।

নিজের কতব্যে, ভক্তিতে তার বিহ্বল বিরাটবে।

তাকে আবার বসতে হবে সমগ্র পৃথিবীর ঋষিকের পদে।

লোভ থেকে দূরে, সংগ্রাম থেকে দূরে, অসত্য থেকে দূরে,

তাকে আবার উঠতে হবে, জাগতে হবে, অধিকার করে নিতে হবে

এই মহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আসন।

বন্দী স্থলতান অমরাবতী কয়েদখানার কালো প্রাচীরের দিকে অকুলি নির্দেশ করে গজিয়ে ব'লে উঠল—“আজ বিশ বছর ধরে পেট ভরে খাবার জন্তে বুখাই চেষ্টা করে আসছি। হয় আমাকে পেট ভরে খেতে হবে নতুবা কয়েদখানার দেওয়ালে মাথা ঠুক মরতে হবে। এর জন্তে আমার মরতে হয় তাও স্বীকার।” চৈত্রেয় মধ্যাহ্ন-সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় কয়েদখানার প্রাচীর যেন জ্বলছিল। সারা কয়েদখানার বন্দীদের এই গরমে দম বন্ধ হ'য়ে বাবার উপক্রম হয়েছিল। ঠিক এমন সময়ে স্থলতান ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠে।

স্থলতানের সাথে আমার দেখা অমরাবতী কয়েদখানায়। বন্দীরা তাকে বোকা ব'লেই ডাকত। দ্বিতীয় রিপূর বাহক হিসাবে স্থলতানের দুর্গাম কেউ দিতে পারত না। সময়ে সময়ে স্থলতান যোগে ফেটে পড়ত কিন্তু পর মুহূর্তেই স্থলতান আবার ঠাণ্ডা বরফ হয়ে যেত। এই জন্তেই বন্দীরা তাকে “বোকা স্থলতান” বলত।

স্থলতান সত্যিই বোকা ছিল। অবশ্য অস্ত্র ধারণের বোকা। তার বিঘাট দেহে কিছু শক্তিশালী শারীরিক গঠন, গোল মুখ, বসানাক, রুক্ষ চুল ও কোঠের নিমজ্জিত আঁখি দেখলেই মনে হ'বে যে, স্থলতান সারা জীবন দুঃখের চিন্তা করতেনই এসেছে। কয়েদীর পোষাকে তাকে বেশ মানাত। স্বল্পভাষী কিন্তু বীরে বীরে কথা বলত।

“খালি” ও “তাসলা” হাতে না থাকলেই স্থলতান বা হাতের চেটোতে চূপ-তামাক রেখে ডান হাতের বুছাসুষ্ঠ দিয়ে চাপ দিয়ে খটনি তৈরী করত। এই কাজটায় এমনি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, হাতে চূপ-তামাক না থাকলেও বা হাতের চেটোতে ডান হাতের বুছাসুষ্ঠ মর্দন করে যেত।

বাওয়া, খাকা, পরা সকল মানুষেই চায় আর এর জন্তে মানুষ মৃত আশাই না পোষণ করে! স্থলতানও আর দশ জনের মতই এমনি আশা করে। তার জীবনের বিশ বৎসর ধরে সে এই আশা করে এসেছে কিন্তু কোনটাই সে পায় নেই। তার বাপ-মা আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলেন স্থলতান। কিন্তু ছেলের জন্তে আশ্রয়, খাবারের সংস্থান—এর কোনটাই তাঁর ক'রে যেতে পারেন না। স্থলতানের শৈশবেই তাঁর মারা যান। স্থলতান অকুল পাথারে পড়ল। দুনিয়ার নিজের আত্মীয় বলতে কেউ ছিল না আর নিজের স্নিগ্ধ বলতেও কিছু ছিল না। কেউ তাকে মাহুশ করতেও নিল না। মনে হয়েছিল সে যেন আকাশ থেকে নীচে পড়েছে।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে স্থলতানের প্রতিবেশীদের গুরু-মহিষের প্রতি একটা ভালবাসা জন্মাল। গুরু-মহিষের সাথে সে ভোরে ঘুম থেকে ওঠে, তাদের সাথেই মাঠে যায় আর তাদের সাথেই ফিরে আসে। এর-তার বাড়ীতে চেয়ে-চিন্তে বা পায় তাই সে খায় আর গুরু-মহিষের সাথে গোয়ালেই ঘুমেয়। কেউ তাকে কোন দিনই পেট ভরে পুষতে দিত না। কাক পেলেই ফটি মেগে বেড়াতে। এই হ'য়ে কোন রকমে পেটের আলা মেটাতে।

গ্রামে আর ভাল লাগে না। স্থলতান চলে যায় শহরে চাকুরীর খোঁজ। অবশেষে সে আসে অমরাবতী শহরে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। কাজ আর পায় না। কেউ যদি তাকে পরসা দেয় তা হ'লে সে পিঠে গাধা পর্যন্ত চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এমনি তার অবস্থা। কে তাকে কাজ দেবে? কাজ পায় না ব'লে ত ক্রিড়ে খামবে না।

## স্থলতান

আম্রাতো শার্চে

সে তার কাজ ঠিকই করে যায়। পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার দোকানে কত খাবারই না সাজান রয়েছে। স্থলতান বা খেতে চায় তাই-ই দোকানে সাজান রয়েছে, কিন্তু খাবার উপায় কোথায়? চলতে চলতে একটি মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বলতে থাকে: “আম্রার দয়ায় যদি একবার এ দোকানে কাজ পাই! লুকিয়ে মুখে পুরি একখানা জেলাপী, জিবের তলায় রাখি একখানা পেড়া, আর সত্ত গিলে ফেলি একখানা বরফী। কিন্তু এখানে কাজ পাই কি করে? আমি যে মুসলমান। দোকানের মালিক হ'লে নাহুল-মুহস হিন্দু বেণে।” দোকানের সাজান জিনিসগুলোর উপরে তাঁর দৃষ্টি হেনে স্থলতান আগিয়ে চ'লে যায়।

বহু চেষ্টার পর অবশেষে একটা চাকুরী স্থলতানের ভুঁটে গেল। একটা পানের দোকানে। দৈনিক চার আনা বেতনের চাকুরী। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দোকানে কাজ করতে হবে অথচ মজুরী দৈনিক চার আনা। কিছু দিন পরেই স্থলতান বুঝতে পারল যে, দৈনিক চার আনার তার চলে না। কাজেও মন বসে না। এক দিন মালিকের কাছে গিয়ে বলে ফেলল: “মালিক! আমার একটা কথা আছে।”

“কি কথা? বলে যাও।”

“আজ্ঞে—আমার এ মজুরীতে আর পোষাচ্ছে না।”

“মজুরী কম বলে মনে হচ্ছে না কি? কত চাও হে?—কি বলছ?”

“এ মজুরীতে আমার নিজেরই দিন চলেছে না।”

“আমি বি করতে পারি বল?”

“আপনি কিছুই করতে পারেন না?” বিস্মিত হ'য়ে স্থলতান প্রশ্ন করে।

মালিক বেশ ভারীকী চালে উত্তর দিলেন: “দেখ, তোমার পেট অভর। কোথাও তোমার পেট ভরবে না।”

“এ কথা আপনি কি ক'রে বলেন? আমার পেট কি অস্ত্র লোকের পেটের চেয়ে আলাদা?”

মালিক ক্রুর হাসির রেখা টেনে বললেন: “নিশ্চয়ই। তোমার পেটের মত অভর পেট দুনিয়ায় নেই।”

“ওঃ, আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করছেন বৃষ্টি, শেঠী।”

“তা' ছাড়া আর কি?”

“আমাকে আর কিছু খেতে দিন।”

“ও, তাই না কি? এখন আমার কাছে খেতে দূর হ'য়ে যাও। তোমাকে দরকার করে না।” মালিক কাঁসরের কঙ্কালদিক্বে গজ্ঞে উঠলেন। এই কথা ব'লেই তিনি এক গোছা পান নিয়ে কাঁচি দিয়ে বোটা কাটতে লাগলেন।

হারান চাকুরী! ফিরে পাবার জন্তে স্থলতান এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার পর নিঃশব্দে সে বের হ'য়ে গেল। “আমি মুসলমান—মালিক হিন্দু। আমার মজুরী সে কি করে বাড়াতে পারে?” নিজেকে সে এই প্রশ্ন করে আর মনকে সামুনা দেয় এই ব'লে যে, সে এর পর থেকে মুসলমান ছাড়া আর কারো দোকানে কাজ করবে না। বা হাতের চেটোতে ডান

হাতের বুড়ামুঠ দিয়ে চাপ দিতে দিতে সে বের হ'লো মুসলমান মালিকের খোঁজে।

\* \* \* \*

এক রেষ্টোরাঁর সিঁড়িতে উঠে দাড়িওয়ালা মুসলমান মালিকের কাছে গিয়ে সুলতান জিজ্ঞেস করল : “শেঠজী! এখানে কাজ পেতে পারি কি?”

মালিক গক কেনার মত সুলতানের অপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে সোজা উত্তর দিলেন! “ঐ, পাওয়া যাবে। বেতন কত চাও?”

সুলতান উত্তর দিল : “মালিকের হাতে বিচাবের ভার দিলাম।”

দাড়িতে আব্বুস চালিয়ে মালিকের চালে উত্তর দিলেন : “দিন-মজুরী চার আনা। দু' বেলা খোরাক আর চা। এতে হবে ত?”

সুলতানের বড় আনন্দ হ'লো। “একটা লোকের আর কি দরকার? দু'বেলা খোরাক, চা আর তামাকের জন্তে চার আনা। ...ভালই হ'লো” এই ব'লে ভিতরে ঢুকে গেল। খিমার গন্ধে জিবে জল আসে সুলতানের। ভয়ে ভয়ে মালিকের দিকে তাকিয়ে সুলতান চুরি ক'রে একখানা থিমা মুখে পুরে দিল। টেবিলের চারি ধারে চায়ের কাপ। কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। বিরাগাণী সাজান ডিস। বেরিকে সুলতান তাকায় সেদিকেই খাবার আর খাবার। আনন্দে চোখ হলে উঠ সুলতানের।

এক পক্ষ অতীত হ'য়ে গেল। এক দিন মালিক গভর্ন ক'রে উঠলেন : “এই জোচ্চোর! প্রত্যেক দিনই এক থালা বিরাগাণী, এক থালা থিমা আর এক থালা ভাত গিলছ। আমার দোকান ত ডকে উঠতে আর দেয়ী নেই।”

করুণ স্বরে সুলতান উত্তর দিল : “মালিক, যা দরকার হয় তার বেশী ত খাই না।”

“ওঃ, এই বৃষ্টি তোমার খোরাক? তুমি যা গিলছ একটা রাকসেও তা খেতে পারে না।”

মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সুলতান বলল : “এ ত চাই।”

মুখ লাল ক'রে মালিক চাঁৎকার ক'রে বলে উঠলেন : “এই বৃষ্টি চাকুরী! আগামী কাল তুমি আমাকে গিলবে আর বলবে, এ-ও তোমার খোরাক।”

সুলতান জিজ্ঞাসা করল : “তাহ'লে আমি কি করব?”

মালিক বস্তুর মত গভর্ন ক'রে উঠলেন : “কি করবে? কিছুই করতে হবে না। দূর হ'য়ে যাও।”

“মালিক, আর বেশী খাবো না,”—কাঁদ-কাঁদ স্বরে সুলতান উত্তর দিল।

“না, না, না! দূর হ'য়ে যাও। গরুর চেয়ে বাছুর বড় চাই না।”

গোটা দোকানখানা হাসিতে কেটে পড়ল। সুলতান অপমানিত হ'য়ে দোকান থেকে বের হ'য়ে গেল। “পরের চাকুরী করার সাধ আমার মিটে গিয়েছে। এইবার কুলি হবো”—এই ব'লে সে ট্রেনের দিকে হাঁটা শুরু করল।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুলতান ট্রেনে অপেক্ষা করতে

লাগল। কিন্তু কেউ-ই তাকে মোট ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্তে ডাক দিল না। দ্বিদের জালায় চোখ দিয়ে জল বের হ'য়ে আসে—চোখের সামনে তার জীবনটা ফুটে ওঠে। বিড়-বিড় ক'রে বলে, “আমি অনাথ, ভিক্ষে করেছি, মাঠে গোবর কুড়িয়েছি, পরের কাছে কাপড় চেয়ে পরেছি। কিন্তু কিসের জন্তে? সব কিছুই করতে পারি—সব কিছুই করতে প্রস্তুত কিন্তু আমার কিছুই করার নেই! আমার কুড়ি বছর বয়স হ'লো কিন্তু খাত নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই।”

\* \* \* \*

সর্বাস্থে যত্না অমৃতব করল সুলতান। আরে সর্বাস্থ আশ্রনের মত গরম হ'য়ে ওঠে। দু'দিন অচেতন অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়ে থাকল সুলতান। তৃতীয় দিনে সারা রাজ্যে বখন জ্ঞান কিরে এল তখন দ্বিদের পেটে আশ্রন ছিল। চারি দিক নিশ্চল। সারা দুনিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটা মানব-সমাজ ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন কি, দুনিয়ার যাবতীয় থালা-বাটি-গ্রাস পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ-ই আর জেগে নেই। শুধু জেগে আছে ঘর-বাড়ীর দেওয়াল। তার আগ্রত প্রহরীর মত কাঁড়িয়ে আছে। সবাই বেন পালিয়ে গেছে দেশ ছেড়ে। সবই শূন্য বোধ হ'লো সুলতানের।

কিন্তু সুলতান ত ঘুমোরনি। সে ত জেগে আছে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায়? কেন? সে নিজেও তা জানত না। একটা মানুষকেও সে দেখতে পেলে না। রাস্তার মোড়ে কাঁড়িয়েছিল শুধু এক জন পুলিশ। সে জানিয়ে দিচ্ছিল—মানব জাতির অস্তিত্বের কথা—মানুষ এখনও আছে—লুপ্ত হ'য়ে যায়নি। অধর্নিজিত অবস্থায় সেও রুগ্ন সুবগী-ছানার মত মাথা নাড়তে নাড়তে পাহারা দিচ্ছিল।

রাস্তার অপর দিকে কাঁড়িয়ে আছে একটি সিনেমা-ঘর। তার কপালের উপরে বোলানো ছিল “ভি শান্তরামের অমর সৃষ্টি রাম-বোশী” বুকে এঁটে নিয়ে একখানা সাইনবোর্ড। এর নীচে বসে আছে সৃষ্টিগুপ্ত রামবোশী আর পাশে নৃত্য-ভঙ্গিমায় হাত তুলে আছেন নারীকা বারাবাই।

সুলতান থেমে যায়। তার ছেঁড়া প্যাণ্টের পকেটের ভিতর দু'হাত চালিয়ে দিয়ে খাড়া নীচু ক'রে যা দেখে তাতে তার সর্বাস্থ রাগে ফুলে ওঠে। অজানার উদ্বেগে চাঁৎকার ক'রে ব'লে ওঠে : “চোপ, রও!”

পুলিশের ঘুম ছুটে যায়। সেও চাঁৎকার ক'রে উঠে : “আবে, শালা কা বে।”

সুলতানের মাথা ঘুরে যায়। সামলিয়ে নিয়ে বিধাশ্রম পা বাড়ায় সামনের দিকে। উত্তর দেয় : “আমি সুলতান।”

পুলিশ বেটনটি হাতে ক'বে ধরে। টোঁটের কোণে গ্লোবের রেখা টেনে সুলতানকে প্রঙ্গ করে : “সুলতান! কোন্ সুলতান—সুলতান মহম্মদ, সুলতান তোগলক—আকবার সুলতান, না, টিপু সুলতান? কোন্ সুলতান?”

সুলতান এদের নাম কোন দিন শোনেও নাই। শোনার সুযোগও তার মেলেনি। নির্বিকার চিত্তে উত্তর দিল সুলতান : “না, না, না—আমি এদের কেউ নই।”

পুলিশটি আর একটু আগিয়ে আসে। একেবারে সুলতানের ঘরের কাছে। ব্যঙ্গের স্বরে প্রশ্ন করে: “তবে কিসের সুলতান? :. রাতের সুলতান।”

নম্র ভাবে সুলতান উত্তর দিল: “আমি কুলী সুলতান। গত তিন দিন ধরে কোন কাজই পাইনি।”

“নাগহোল বইলা কাবাতু। কোন্ নরক থেকে আগমন হচ্ছে?”

পুলিশ বেটনটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে আবার ঘুমোতে যায়। সুলতান তাকে নিরাশ করেছে।

সুলতান ইজিতে জানিয়ে দিল: “আমার ভীষণ অর। বড় ক্রিদে পেয়েছে—”

“সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তার পর খেতে পাবে”—এই বলে পুলিশ উত্তর দেয়।

“আমার একটি পরসাদও নেই।”

দার্শনিকের মত গভীর চালে পুলিশ জীবন-দর্শনের উপদেশ দিগ্ন করে বলে: “কাজ করলেই পরসাদ পাবে।”

“কিন্তু পুলিশ সাহেব, আমি যে কাজ পাই না।”

সঠিক পথ বাতলিয়ে পুলিশ বলে: “কয়েদখানায় চলে। সমানে আরামেই থাকবে।”

কাতর অশ্রুস্রব করে সুলতান বলে: “মেহেরবান, দয়া করে আমাকে নিয়ে চল।”

“ভেবেছ, কয়েদখানা বুঝি দাতব্যখানা? চুরি কর। নিজেই নিয়ে যাব।”

সুলতান তীব্র গলায় প্রতিবাদ জানায়: “কখনই না। কখনই চুরি করব না।”

অবজ্ঞার স্বরে পুলিশ বলে: “শালা, চুরি করতে পারবে না। কয়েদখানায় বাবার সখ দেখ!”

বা হাতের চোটোতে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ টিপতে টিপতে সুলতান বলে: “মরব তবু চুরি করব না।”

পুলিশ রাগে ফেটে পড়ে বলে: “উল্লুক! তাই মর,।”

\* \* \* \*

খালি পকেটে হুঁহাত চুকিয়ে দিয়ে সুলতান চলে যায়। খালি পেটে। মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল। নিজে থেকে প্রশ্ন করে: “বোঁচ থাকে সহজ, না মরা সহজ?” নিজেই উত্তর দেয়: “না, বোঁচ নয় মৃত্যুই সহজ। শ্রুতি উঠবে। দোকান খুলবে। লোকগুলো কাপ-কাপ, চা গিলবে। কেউ টানবে সিগারেট—কেউ গিলবে মিষ্টি—কেউ পান্ চিবিয়ে পিচ্ ফেলবে। তার পর সন্ধ্যা বের হয়ে যাবে দোকান থেকে। আর আমি? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের মুখের পানে চেয়ে থাকব পেটে কিদে নিয়ে! তার পর লোক-জন নিজের নিজের কাজে ছুটবে। টোংগাওয়ালা টোংগায় ঘোড়া জুড়ে দেবে। তাদের ঘোড়াগুলোও আমার চেয়েও সুখে আছে। পেট ভরে তারা খেতে পায়—নির্মল বাগানে ঘুরে বেড়ায়। জজ ও উকিলেরা মন্ত্রগতিতে আদালতে হুঁকবে। আর আমি? ঘুরে বেড়াচ্ছি। কাজ নেই। কেউ কাজও দেয় না। কিসের খালাস মরছি। আমি একটা অপদার্থ। যথেষ্ট হয়েছে! এ হতভাগ্য জীবনের আবার মূল্য কি? বেদার হয়েছে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।”

বেকারী তার কাছে হ’য়ে দাঁড়িয়েছে কুঠব্যাপি। সুলতানের মনে হ’তে লাগল এই দুরারোগ্য ব্যাপি শৈশব থেকেই তার সর্গালে যেন আক্রমণ চালায়েছে। আর সে আক্রমণের বেগ সহ করতে পারছে না। জীবন অসহ হ’য়ে উঠেছে। অরে কাঁপুনী আরম্ভ হয়েছে। কচ্ছপের মত ঘাড়টা বাড়িয়ে চলছে সুলতান। আবার নিজেকে শিকার দিয়ে বলে চলে: “এ দুনিয়া আমার জন্তে নয়। দুনিয়া আমার চায় না। শুধু আমার মরণই দুনিয়া চায়।” এমন কত টুকরো-টাকরা দার্শনিক তত্ত্ব তার মাথায় আজ চুকেছে।

গত রাত্রির শেষের দিকে এমন কত কথাই না সুলতান চিন্তা ক’বেছে। অবশেষে এক সিদ্ধান্তে সে উপনীত হ’য়েছে। আর ধীর পরীক্ষণ নয়। দ্রুতগতিতে সুলতান হাঁটা দেয়। অমরাবতী-বন্দরা মেইন গোরের দিকে সুলতান চলে। পূর্ব দিক ফর্সা হ’য়েছে। রক্তিমভা আলো ঠিকরে বের হ’য়ে আসে। নিমল মুহু মুহু বাতাস আপন বেগে ব’য়ে চলেছে অজানার পথে। সুলতানের গায়ে লাগে। সুলতানের হাড় পর্য্যন্ত শিউরে উঠে। তার ক্রোধের মাজাই বেড়ে যায়।

ঝাঁকে ঝাঁকে পার্বীর মল গাছ ছেড়ে দূর দূরান্তে চ’লে যায় খাতের সন্ধানে—কাঠবিড়ালীগুলো উঁকি মারে কোঠার থেকে—মাঠে বের হ’য়ে আসে গরু-মোষ-ছাগল। সকলেই বের হ’য়েছে খাতের সন্ধানে। তারা জানে কোথায় খাত আছে। সকলেরই মুখে আনন্দ। সকলেরই স্বাধীন জীবন।

কিন্তু সুলতান? সে পাগলের মত এগিয়ে চলেছে। চোখ দিয়ে বের হচ্ছে জল।

\* \* \* \*

দূরে দেখা যাচ্ছিল একখানা বিরাট ইঞ্জিন। তার কপালে জলছে এক তীব্র আলো। বীর গতিতে বের হ’য়ে আসছে তার গহ্বর থেকে এক শব্দ। চারি দিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে আসছে। একটানা শব্দ।

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনখানা থেমে যায়। চাকাগুলো এক বিকট শব্দ ক’রে উঠল। যাত্রীরা ভলোট-পালোট হ’য়ে এ-ওর ঘাড়ে পড়ে যায়। কেউ কেউ জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যাপার বুঝবার চেষ্টা করে।

“ব্যাপার কি? গরুর গাড়ী, না ট্রেন?” এক জন যাত্রী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক’রে মন্তব্য করেন।

“ট্রেনের আর দেখ কি! এক উল্লুক লাইনের উপর শুয়ে রয়েছে।”

অপর এক জন জিজ্ঞাসা করেন: “লোকটা ওখানে পড়ে র’য়েছে কেন?”

অজ্ঞ এক জন চটপট ক’রে উত্তর দিল: “আবার কেন? মরবার জন্তে! আপনি কি মনে করেন আমাদের প্রশ্রাম করবার জন্তে না কি?”

“শয়তানটা কে?”

“সুলতান বলে মনে হ’চ্ছে। সে-ই ত আত্মহত্যা করবে বলে।”

এক জন ষোভাস্ব দার্শনিকের মত মন্তব্য করেন: “হতভাগ্য ভারতীয়রাই ত আত্মহত্যা করতে চায়।”

রেল-লাইন থেকে সুলতানকে টেনে তুলে নিয়ে যাবার জন্তে লোক জন চেষ্টা করতে লাগল। সে কিছুতেই নড়তে চাইল না। গায়ের জোরে রেল-লাইন চেপে ধরে থাকে। চীৎকার করে বলতে লাগল: “সাহেব, গাড়ী চালিয়ে দাও—গাড়ী চালাও। মরতে চাই। মরণের ভয় আমার নেই। আমি মরতে চাই। বেঁচে থেকে আমার লাভ নেই। আমার মরতে দাও। চালাও গাড়ী—”

খদ্বেব টুপি-পরিহিত এক জন যাত্রী বোমা ফাটার মত শব্দ ক’রে বললেন: “শালা, তুমি গাড়ী আটকালে! নইলে এতক্ষণ বাদ্‌নেয়া পৌছে যেতাম।”

আরও অনেকে এফসঙ্গে অভিযোগ জানাল: “মেল ধরতে বোধ হয় পারবনা—”

“সময় মত পৌছতে না পারলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লোকসান হ’য়ে যাবে।...”

“বোম্বাইয়ে আজ আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা।...”

“হতভাগাকে টেনে ফেলে দেয় না কেন?”

“অপেক্ষা করুন মশায়—পুলিশ এসে গিয়েছে। সব ঠিক হ’য়ে যাবে।”

গোলমাল চূকে গেল। সব শান্ত।

আগের রাতের পুলিশটিই এসে গিয়েছে। সুলতানের ঘাড় ধ’রে পুলিশটি বলে: “আরে?—এ যে সুলতান। ঠিক হ্যাঁ। কয়েদখানায় যাবার পথ ঠিক হ’য়ে গিয়েছে। চল এইবার।” সুলতান তাকে আঘাত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

• • •

অমরাবতী কয়েদখানায় সুলতান এসে গেল। এখানেও সেই একই বিপদ। কয়েদখানায় পেট ভরে খেতে পায় না। মাত্র দু’খানা পাওলা কুটি, একটু ডাল, তরকারী নামধারী কয়েদখানা অসিদ্ধ শাকপাতা। এর উপরে আছে ওয়ার্ডারদের হস্তিভা—“গেট আপ, সিট ডাউন, লব্বর”—সুলতানের সর্বাঙ্গ জলে বায়।

সুলতান ভাবে বন্দীরা এদের চোখে ভেড়া না কি। অসহ্য হ’য়ে ওঠে এই অপমান।

আজ সুলতান গোটা কয়েদখানা কাঁপিয়ে তুলেছে। জেলারের সামনে সে একটা ধামের উপরে কাঁপিয়ে পড়ে। তাসুলা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাঁ পায়ের আঙ্গুলের ওপরে ভর দিয়ে ধামের উপরে কাঁপিয়ে উঠতে তৈরী হয় সুলতান। ক্ষুঃ রক্তবর্ণ ক’রে চীৎকার ক’রে জানিয়ে দেয়: “পেট ভ’রে খাবার জন্তে সব কিছুই চেষ্টা ক’রে আসছি। তুলে যেও না—আমি এর জন্তে মরতে গিয়েছিলাম। এখানেও যদি পেট ভ’রে খেতে না পাই তাহ’লে আমার পথ দেখাতে হবে। যা’ ইচ্ছে তাই করব। এখন কাপুকদের মত আত্মহত্যা করব না। ভেবে দেখ আমি কি করি।”

কয়েদখানার কার্ডখানা সে ছুড়ে ফেলে দেয়। গোটা কয়েদখানা ভীত হ’য়ে ওঠে। বন্দীরা বের হ’য়ে আসে। সকলেই চোখ জাগ্রত। পাগলা ঘটি বেজে উঠল। সর্বত্রই চাকল্য ভাব।

জেলার কাঁকা বুলি আউড়ে চীৎকার ক’রে ওঠেন: “নেমে এস। যা’ চেয়েছ তাই পাবে।”

কামিজটা তুলে শূত্র পেট চাপড়ে সুলতান প্রত্যুত্তর দেয়: “এই পেটের জন্তেই আমি লড়াই ক’রে প্রাণ দেব।”

আঘাত খেয়ে মানুষ যেমন পিছনে হটে, জেলারের অবস্থা তাই হয়। বিড়-বিড় ক’রে বলেন: “আহাম্মক! মুর্খেরাই মরতে চায়।” জেলার অবাক হ’য়ে যান। তাড়াতাড়ি কয়েদখানার কার্ডখানা তুলে নিয়ে লিখে দিলেন: “আরও দু’খানা কুটি।” তার পর তিনি বের হ’য়ে যান কয়েদখানার প্রাঙ্গণ থেকে।

সুলতান যখন শুনে শেল তার জন্তে আরও দু’খানা কুটি দেবার আদেশ হ’য়েছে তখন সে হাসতে থাকে। মেজাজও শান্ত হ’য়ে গেল।

সুলতান এইবার লড়াই করছে।

কিসের লড়াই? কুটির লড়াই।

অমুবাদক—ললিত হাজরা।

## ভূতের গল্প

বিষ্ণুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অরুণা অনেকক্ষণ থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিল। শেষে মরিয়া হয়ে মুখ ফুটেই বলল—‘চল, আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে বসি। আমার মোটেই ভাল লাগছে না।’

‘—কি ভাল লাগছে না?’

—‘ওই লোকটার হাব-ভাব। তখন থেকে কেমন ভাবে আমাদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে, দেখছ না? কেন, এত কি দেখবার আছে আমাদের মধ্যে? আর এতখানি জায়গা থাকতে এত কাছ ঘেঁষেই বা এসে বসার মানো কি বাপু?’

লোকটার বিসদৃশ আচরণ যে মনুষ্যের চোখেও পড়েনি তা নয়। কিন্তু নারীচিত্তের ভীতিপ্রবণতাকে প্রায়শ দিতে নেই এমন একটা মনোবৃত্তির বশেই বলল, ‘তোমার মত সব...’

অরুণা নাছোড়বান্দা—‘না বাপু, ওঠ। আগ্রায় বেড়াতে এসে

লোদি হোটেলে বসে বসে কিমানো কোন কাজের কথা নয়। আমাদের তো সব তোজমল আর আগ্রা কোর্ট সারা হয়েছে। সেকেন্ডা, ইতমংউকোলা, দয়ালবাগ, মথুরা বুদ্ধাবন, যতপুর সবই তো বাকি।’

তবু মনুষ্য খুঁত খুঁত করে—

—‘তুমিই তো বললে, আজ আর অল্প কাজ নয়, শুধু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা শোন। আর যদি সময় থাকে বাজারে একটা শেতপাখরের বুদ্ধমূর্তি...’

বেচারী শেষ করারও অবকাশ পেলো না। অরুণা তখন আসন ছেড়ে চসন্তে সুরু করে দিয়েছে—‘কাজেই অনুসরণ করা ছাড়া অল্প কোন উপায় রইলো না।’

লোকটি কিছু এবার বেয়াদবির চূড়ান্ত করলে। এক হাত বাড়িয়ে দুই জনেরই পথ রোধ করে বললে,—‘এক মিনিট—’

মহুজ বিমিত, অরুণা বিরক্ত।

—‘আচ্ছা, আমি এক ভদ্রলোককে জানিতাম ঠিক আপনার মত দেখতে। তার নাম মহুজ—মহুজ ওহ—বাণের নাম বিজয় ওহ, পিতামহ শিবদাস ওহ, প্রপিতামহ—’

—‘বাস, বাস, হয়েছে। আর বেশী দূর এগুবেন না, এগুলো আমি আর পেয়ে উঠবো না। কিন্তু, কেয়া তাজ্জব! আপনি আমার তিন পুরুষের নাম বলে উদ্ভূতন চতুর্দশ পুরুষের নাম এলার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন আর আমি আপনার বাপ-ঠাকুরদাদা দূরে থাক, আপনার নামই মনে করতে পারছি না। নাঃ, অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ও কি, তুমি এমন করে পালাচ্ছ কেন?’

শেষের কথাটি অরুণাকে লক্ষ্য করে। মাথা-ধরার সাক্ষিপ্ত হুতার অরুণা সরে পড়লো।

২

‘আফগারমুন টি’ টেবিলে আবার দেখা। অরুণা সরে পড়ার আদার ধরেছিল কিন্তু সে আদার টেকেনি। মহুজের সব্যস্ত শব্দটিকে ঢাকবার জন্যে আগছক বললে, ‘আপনার জন্ত ডেলিকেসি ফিল করার কোন কারণ নেই, মিঃ ওহ! মিসেস্ ওহের মাথা-ধরাটাকে আমি মোটেই সন্দেহ করিনি। আর সন্দেহজনক হলেও লজ্জার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের আদর্শ মহিলাদের অপরিচিত পুরুষ সম্পর্কে—চাচাছোলা ভাবায় পরপুরুষ সম্পর্কে একটা প্রেজুডিস থেকেই যায়। ওটা ওদের সুখমারই একটা অঙ্গ। তা’ ছাড়া আমার প্রায়ে-পড়া ভাবটাও অত্যন্ত বিসদৃশ হয়েছিল। পরে ভেবে দেখে নিজেই মনে-মনে বড় লজ্জা পেয়েছিল’।

অরুণা আরক্ত মুখে বললো,—‘আমার কারুর সম্পর্কে কোন প্রেজুডিস নেই।’

—‘না, না, আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। সংস্কার বাদ দিলে মানুষের জীবনের কিছুই থাকে না। আর সেই সংস্কারের ভাল-মন্দ সবই থাকতে পারে, থাকা স্বাভাবিক।’

বৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে অরুণা বললে,—‘আমার কোন কুসংস্কার নেই।’

—‘কিন্তু আমার আছে। বহু কুসংস্কার আছে। যেমন ধরুন এই ক্যামেরাটা। যদি বলি, এই ক্যামেরায় আপনাদের কর্তা-গির্দার যুগল ফটো তুললে আপনার অচিরে বৈধব্য অবস্থাধারী, তবে হয়তো আপনি তাকে কুসংস্কার বলে বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি। এ পর্য্যন্ত এই ক্যামেরায় বিশটা যুগলের ফটো তুলেছি—সর্বত্রই এক ফল। শুধু বৈধব্য নয়, বেগবোর পর পুনর্বিবাহ। এতটা হয়তো আপনার ভাল লাগবে না, বাড়াবাড়ি মনে হবে।’

—‘ইয়া আল্লা!’ মহুজ লাকিয়ে ওঠে,—‘তবে ত আপনার ক্যামেরায় আমাদের একটা ফটো তুলতেই হচ্ছে। বৈধব্যের আইডিয়াটা ভাল না লাগলেও অরুণার পুনর্বিবাহ? Nice!’

সময়ে সময়ে ভারী ছেলেমানুষি করে মহুজ। অরুণার আর বলে থাকা সম্ভব হলো না। ঢাকা বাগান্দা ছেড়ে লোদি হোটেলের বাগানের দিকে বেরিয়ে পড়ে। সাদা পাখরের কৃত্রিম সঙ্গীর কাছে গিয়ে বসে।

সাদা পাখরের জন্ত আত্মা বিখ্যাত। তাঁজমহলের বিখ্যাত শিল্পীদের বংশধরেরা আজও সম্মিলিত তাঁজগঞ্জ গ্রামে বাস করে। কিন্তু রাত্জা উচ্ছেদ আর জমিদারী বিশেষের ফলে তাদের ব্যবসাসে ভাটা পড়ে গেছে। টাটা-বিড়লার জ্ঞানিত-অজ্ঞানায় করার বিজ্ঞতা আট হিসেবে আয়ত্ত করলেও বায় করার বিজ্ঞতা বড় কাঁচা! তা’চাড়া তাঁদের ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের সঙ্গে বয় ও কাগজে কলমে দেখানো উদ্ভবের একটা সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়, কাজেই কথায় কথায় লাখ-লাখ টাকার গৌর্যকৃষ্ণি তাঁদের সংহত করে চলতে হয়। কাজেই পাখর শিল্পের প্রোলিটারিয়েট রূপ পেনি তাঁজমহল, ছোট ছোট ঠাকুর-দেবতার মূর্তি ইত্যাদি আজ হতভাগ্য তাঁজগঞ্জ শিল্পীদের জীবিকার প্রধান নির্ভর। তবু পাখরের কর্ণাটা দেখলে চোখ জুড়ায়।

মহুজ কখন যে এসে অরুণার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপে হাত রেখেছে, সে মোটেই টের পায়নি।

—‘লোকটা চলে গেছে তাহ’লে?’

—‘না, শুই যে, ক্যামেরার তাক করছেন।’

অরুণার হুই চোখে হঠাৎ যেন আগুন খেল যায়। লাকিয়ে ওঠে—‘আপনার মন্তব্য কি? কেন আপনি এই সর্বনাশা ক্যামেরা নিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছেন? কেন? বেন?’

তার পর হঠাৎ তার হাত থেকে ক্যামেরাটি কেড়ে নিয়ে সজোর আহ্বাড়ে সান-বঁধানো রাস্তায় চুপকার করে ফেলে।

৩

আগছক এমন একটা ভাব দেখান যেন অরুণাটি ওকে বাঁচিয়েছে। শ্রিয়জনের উপহাররূপে পাওয়া এই সর্বনাশা ক্যামেরার বোঝা সে অনিচ্ছায় বয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আজ সে মুক্ত। কোন ক্ষতিপূরণ দূরে থাক বরং তারই উচিত এ জন্ত অরুণাকে পুরস্কৃত করা। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।

প্রথমটা যেন পরিবর্তন করার জন্ত বললো,—‘তাহ’লে এই পূর্ণ পূর্ণিমায় আপনারা জ্যোৎস্না-স্নাত তাঁজমহল দেখতে যাচ্ছেন? একটু রাত করেই বেরুবেন।’

মহুজ বললে—‘রাত করে বেরিয়ে আর কি হবে? রাত এগারোটায় তো তাঁজমহলের সদর বন্ধ হয়ে যায়।’

—‘নিয়ম যেমন আছে, ব্যতিক্রমও তো তেমনি আছে। আচার যেমন আছে, ব্যাভিচারও তেমনি আছে। জানেন তো এই তাঁজমহলের দ্বারদ্বারেরা সাজানোর শাসন থেকে বংশাশ্রমে দ্বারদ্বার করে আসছে। ওদের কুলাচায়ে দাঁড়িয়ে গেছে, কাজেই মা’ ভৈঃ।’

মহুজ হালে।

—‘কিন্তু ভয় আছে জ্ঞানায়গায়। সেটাও বলে রাখা ভাল। কিছু দিন আগে এক মাজানী-যুগল প্রায়ে তাঁজমহলের জ্যোৎস্না পান করে কিরছিলেন। বেরসিক টাকাদালা সর্বস্বের সঙ্গে তাঁদের প্রাণটিও অপহরণ করে।’

মহুজ হো-হো করে হেসে উঠে—‘আপনি দেখছি শুধু ক্যামেরার কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন, ও, নয়। চোর-ডাকাত কোন কিছুতেই শঙ্কার অভাব নেই। ভুতে বিশ্বাস করেন,—ভূত?’

—‘নিশ্চয়—’

তার উত্তরের সুরে মম্বজ ও অরুণা দু’জনেই একটু অবাক হলো, পরে হেসে উঠলো।

—‘না, না, হাসির কথা নয়। আমি সত্যি ভুতে বিশ্বাস করি।’

—‘কারণ?’

—‘কারণ, আমি নিজেই যে একটা ভূত।’

মম্বজ-অরুণা আবার হেসে উঠলো। এবার খুব জোরে।

—‘বিশ্বাস হলো না? আচ্ছা দেখুন—’ লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪

মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে লোদি হোটেলে এসলো মম্বজ। আগ্রা শহরে নিত্যকার আকর্ষণ কিছু নেই। যা আছে, এক সপ্তাহেই যথেষ্ট। অথচ অরুণার হাটের যা’ প্রবৃত্তি তাতে এখনও মাস খানেকের আগে আগ্রা ত্যাগের কোন সম্ভাবনাই নেই।

দিনটা অমাবস্তার কাছাকাছি। লোদি হোটেলটা এই সময়ে

বেশ কাঁকা। বাজালী এডিশনাল ম্যানেজার জ্যোতিষ ব্যানার্জি ফুসং পেয়ে মম্বজের কাছাকাছি এসে বসলো। কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের পর একটু ইতস্ততঃ করে বললো—‘দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি এত দিন, কিন্তু এখন বলতে কেন বাধা নেই। বছর চার-পাঁচ আগের কথা। আমি তখন সত্য এখানে চাকরিতে চুকছি। নিরঞ্জন বলে আমার এক পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বন্ধু হঠাৎ এখানে এসে ওঠে। যে ঘরে আপনারা আছেন, সেখানেই তাকে থাকতে দেওয়া হয়। তখন তার বিরহ দশা চলছিল। শৈশব থেকে বি. এ. অবধি সে ছিল শান্তিনিকেতনের ছাত্র। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে তার ভাল হয়। মেয়েটি যুক্তাহাটার জমিদার নিকুঞ্জ বাবুর মেয়ে, নাম সম্ভবতঃ অরুণা বা ওই ধরনের কিছু হবে। খুব বিনীততা হয় ওদের কিন্তু বিয়ে হয়নি। কেন হয়নি সে কথা বাক। নিরঞ্জন ওই ঘরেই আত্মহত্যা করে। কিন্তু মৃত্যুর পর কাকুর সঙ্গে অসম্ভাব্য ব্যবহার করেনি। এ কি, আপনি ওরকম হয়ে গেলেন কেন—কি হলো—?’ এবার মম্বজের পালা। ভূত দেখলো না কি ও?

## বিশেষী গল্প

শ্রীশ্রীরামকুমার নন্দী

মাগেড প্যাসেজের তিন নম্বর বাড়ীর সামনের ছোট বসবার ঘরে বসে আছেন জ্যাকসন পিপার। এক কালে তিনি ছিলেন বৈমানিক। এখনও সেই প্রাক্তনীর পরিচয়েই গর্ববোধ করেন। চোখে-মুখে অন্তরীণ ফোভ আর হতাশা নিয়ে বসে আছেন তিনি। কিছুক্ষণ আগে ঘরের মধ্যে টর্পেডো বয়ে গেছে। কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই এক তাঁবু চোখে-মুখে ছাড়া। পিপার ভাবছিলেন টর্পেডোর গতি-প্রকৃতির কথা। তিনি শুনেছিলেন কারো কাণ্ডে কাছ থেকে যে, এই ধরনের ঝড় সামনে যা পায় তাকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়, আঘাত করে চূরমার করে দেয় আর আশে-পাশে যারা থাকে তাদের ক্ষয়-ক্ষতি হয় না বললেই চলে। একটু আগে ঝড় এসেছিল; পিপারকে বিধ্বস্ত করে টর্পেডো সামনের সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় চলে গেছে। এখনো ঝড়ের দূরগত গর্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ঝড় যেন আবার আসবে। উৎসেগ আর আশঙ্কায় প্রায় অধিমরা জ্যাকসনকে সচকিত করে ঝড় নেমে এল আবার সিঁড়ি বেয়ে।

‘তোমার জন্ম আবার আমার অন্তর করল; আশা করি এবার খুব খুশি হয়েছ। তুমি আমাকে মারবে, মারবে, মারবে।’—হতভম্ব পিপারের দিকে কথাগুলো ছুঁড়ে মারল তাঁর স্ত্রী। পিপার একটু নড়ে বসলেন। বলবার কিছুই নেই, আর তা ছাড়া চূপ করে থাকাই ভালো। জানী লোকেরা বলেন না কি বোবার শত্রু নেই।

‘তোমার বিয়ে করার যোগ্যতাটুকুও নেই। অজ্ঞ যে-কোন মেয়ে হ’লে অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে চ’লে যেতো—’ আবার গর্জন করে ওঠে পিপার-গৃহিণী।

পিপার সবিস্ময়ে জানান—‘আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।’

‘তুমি আর নাক নেড়ে নেড়ে কথা বলো না’—ধমক দেন গৃহিণী।—‘আমার ত মনে হয়, সারা জীবনটাই চলছে তোমাকে বিয়ে করে।’

‘আমারও তাই মনে হয়’—একটু সাহস করে বলেন বৈমানিক।

‘আচ্ছা’,—শাসিয়ে ওঠে গৃহিণী আর সঙ্গে সঙ্গে বর্তা চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়—‘আচ্ছা বেশ, তুমি তা হ’লে হাঁপাতে উঠেছ আমাকে বিয়ে করে। এখন ভাবছ বিয়েটা না করলেই হ’ত। কপুরুষ কোথাকার, তোমার মুখ দেখতেও আমার খেয়াল করে। আহা!—সুর পাটে যায় পিপার-গৃহিণীর। গলায় তরঙ্গ কারুণ্যের আমেজ লাগে—‘আহা, আজ যদি আমার প্রথম স্বামী বেঁচে থাকত আর যদি তোমার জায়গায় ঐ চেয়ারে সে ব’সে থাকত, তা হ’লে আমি যে কী সুখী হ’তাম!’

‘যদি সে আসে আমি তাকে একুনি চেয়ার ছেড়ে দেব’ আর স্বাগত জানিয়ে সানন্দে বনবাসী হব এ কথা তোমা আমি হলক করে বলতে পারি’—বলে ওঠেন পিপার বেশ খুশি হয়ে। তাঁর কথা ধামে না—‘যদিও চেয়ারখানা এখন আমার আর আমার আগে এটা ছিল আমার বাবার সম্পত্তি, তবুও আমি এটা সানন্দে তোমার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দিতে রাজী আছি এ কথা আমি মাতা মেরীর নামে শপথ করে বলছি। আজ লোকটি বড় বুদ্ধিমান ছিল। যখন ডলফিন জাহাজ ডুবল তখন সে ভালো মতলবই ঠাউরেছিল। অবশ্য এর জন্য তাকে আদি কোন দোষ দিতে পারি না।’—পিপার সওয়াল শেষ করলেন।

‘তার মানে?’ কথের ওঠে পিপার-গৃহিণী।

‘আমার ধারণা, সে জাহাজের সঙ্গে ডুবে মরেনি।’—সহজ ভাষা বলে পিপার।

‘ভবে মরেনি?’—গৃহিণীর স্বরে বাঙ্গ ফুটে ওঠে—‘তা’ হ’লে তার কী হ’ল? এই তিরিশ বছর সে আছে কোথায়?’

‘লুকিয়ে আছে’—বলেই উঠ পড়েন পিপার; আর কিছু ঘটবার আগেই সামনের সিঁড়ি বেয়ে ত্বরিত ক’রে উপরে উঠে যান।

উপরের ঘবখানি পিপার-গৃহিণীর প্রথম স্বামীর নানান জিনিষে ভরা, মরা মিউজিয়াম। তার ছবি নানা ধরণের আর নানা আকৃতির—ছড়িয়ে আছে ঘরের দেওয়ালগুলোয়। নাবিকের সবুহুং বুট দু’টিও রক্ষিত হয়েছে এক কোণে। পিপার বিছানার এক পাশে ব’সে ভারতে লাগলেন, যদি সে ক্রিয়ে আসে ত বড় ভালো হয়। এমন ব্যাপারও ত ঘটে। আর একবার না হয় ঘটল। তাঁর চিন্তায় ছেদ পড়ল গৃহিণীর চীৎকারে।

‘জ্যাকসন, আমি বাইরে যাচ্ছি।’—নীচের তলা থেকে হাঁক দিলেন শ্রীমতী—‘যদি তুমি রাগে যেতে চাও ত নিয়ে থেয়ো আর না ক্ষিদে থাকে ত থেয়ো না।’ নীচের সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হ’য়ে গেল।

পিপার জানালা দিয়ে উঁকি মেবে দেখলেন যে, তাঁর অর্ধাঙ্গিনী পাল-তোলা নৌকার মত হেলে-দুলে চলেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তিনি এসে বসলেন স্বখানে। নিশ্চিন্ত মনে পাইপে আগুন ধরালেন। দেখতে দেখতে ঘরের কোণে-কোণে জ্বমে উঠল ঘোঁষার মেঘ আর মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল চিন্তার আলো।

পরের দিন সকাল বেলা। লগুনগামী ট্রেনের যাত্রী পিপার। ট্রেনের চাকার সঙ্গে সময়ের চাকার ঘুরে চলেছে। ঠিক সময়ে ট্রেন লগুন পৌঁছল। পিপার বাসে চেপে চলেন তাঁর বন্ধুর বাড়ী—তাঁর বন্ধু ক্যাপ্টেন ক্রিপেন। পিপারকে দেখে ক্যাপ্টেনের আনন্দ আর ধরে না। পিপারকে জড়িয়ে ধ’রে প্রোট ক্যাপ্টেন একটা হৈ-টৈ বাধিয়ে দিল। ছোঁড়া চাকরটাকে রাস্তানিষ্কৃত করে ভুকুম করল পাশের বাড়ীর বাচ্ছা ছেলেটার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে—‘ওরে, ষ্টাউট আর জীন মদ নিয়ে আয়, আর গোটা দুই পাইপও আনিসু।’ বাচ্ছা চাকরটা ভুকুম তামিল করতে এসে বাবু পেরায়ের বন্ধুটিকে একবার আড়চোখে দেখে নিল।

ক্রিপেন কথার মোড় ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে—‘আচ্ছা, তোমাকে একটু বিব্রত দেখছি কেন বল ত? হয়েছে কী? তোমার স্ত্রী ভালো ত?’

‘হ্যাঁ ভালো, তবে আমার পক্ষে মারাত্মক।’

‘মানে, অসুখ-বিসুখ করেছে না কী?’

‘আরে না, না, অসুখ করেনি, মাথা খারাপ হয়েছে। আর আমার মাথাটাও ক্রমেই শ্রীমতীর মাথার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করছে। উত্তরাঙ্গী আমাকে যা প্যাচে ফেলে দিয়েছে, এখন তা থেকে আমাকে স্বয়ং ভগবান এলেও রক্ষা করতে পারেন কি না সন্দেহ।’

‘তুমিও তাকে পাণ্টা প্যাচে ফেলে দাও, বাসু, ল্যাঠা চুকে যাবে!’ বলে ক্রিপেন মুকবির ভক্তিতে।

‘আরে ভাই, সেই ভক্তই ত তোমার কাছে আসা। মেয়েদের সবচেয়ে তোমার জ্ঞান যে কত গভীর তা ত আমার অজানা নেই। এখন তুমি একটু সাহায্য করলেই বেঁচে যাই।’

‘ব্যাপারটা কী? গিন্নীর মেজাজ খারাপের কারণ সবচেয়ে কি বুঝতে পেরেছ? সে সম্পর্কে বখাৎখ বিবরণ দিতে পারলে, বাঃ আর তোমার ভাবনা নেই। এই শর্মা সব ঠিক ক’রে ধেবে’—বলে ক্রিপেন বুকে তাল ঠোকে খেলোয়াড়ী ভক্তিতে। পিপার বোলে ওষুধ ধরেছে।

‘আবে ভাই, সে কথা জানি বলেই না এত দূর আসা তোমাকে বলব না ত আর কাকে বলব? এ পৃথিবীতে তুঁি ছাড়া আর কে আমার এমন হিতৈষী আছে? আমার গিন্নী হচ্ছে একটি আন্তর শয়তান। ওঃ, ঐ নাদাপেটা গুণানীটাকে বি ক’রে যে কী ভুলই করেছি, তা আর বলবার নয়। আমার বাবা দেওয়া নামী-দামী আসবাব-পত্রগুলো গিন্নী তার এক ভাগ্নীকে বেটে ভাই দিয়ে দিচ্ছে, তা’তে ক’রে মনে হয় মাস দুয়েকের মধ্যে আমার বাড়ী-ঘর মূনি-ধবির আশ্রমে পবিত্র হ’য়ে যাবে। ভাগ্নীটা তোফা শয়তানী শিখেছে। সকাল বেলা আমার বাড়ীতে আসে আর যাবে সেই সন্ধ্যা বেলায়। যাবার সময় খড়িটা-আমটা নিয়ে সে যাবে না। সেদিন একটা সোফা নিয়ে গেল তার না কি সোফা না হ’লে চলে না। তাই আমার ওপ দয়া করলেন। কত আর বলব বল? এই দেখ, আমার স্ত্র্যদিকে দেওয়া তোমার সেই রূপো-বাঁধানো পাইপটা আর নেই। ভাঙা ভগিনীপতি বোধ হয় এত দিনে কোন বেণের দোকানে সেটা বাঁ দিয়েছেন। দুঃখের কী আর শেষ আছে ভাই? বড়ো বয়সে বিয়ে-বোগে ধ’রে আমাকে এক দম নাৎসহাস করে দিয়েছে, এখন তুমি যা হয় একটা বন্দোবস্ত কর। পিপার বিষ ভজিতে বসেন।

‘তাচ্ছা, তুমি ত ভাগ্নীটাকে বেশ একটু কড়াপাকে দমক দিয়ে পায়। তুমিও তার সম্পর্কে মামা। সেটা কর না কেন?’—সুখা ক্রিপেন।

‘আবে ভাই ভক্ত ভাবে যেটুকু করবার সেটুকু করেছি ভাবলাম ভাগ্নীটাকে বহুশ্রদ্ধা বেশ একটু ঠুকে দেবো। এই ন মনে কবে গত বৃহস্পতিবারে ভাগ্নীটাকে বেখান্না রকমে প্রেম করে বসলাম—কি গো, আর কিছু নেবে না কি? আর কিছু পছন্দ হচ্ছে না কি? বেহায়া মেয়েটা অপমানটা মোটেই গায়ে না মেমে আমার বসবার ঘরের বড় খড়িটা চেয়ে বসল। গিন্নী অগ্নি এগাল হেসে বললেন—তা বেশ ত, নিয়ে যা না; ছোট খড়িটা দিয়েই আমাদের কাজ চ’লে যাবে। সন্ধ্যা বেলায় ভাগ্নী গেলেন, খড়ি সঙ্গে গেল। আর আমিও প্রায় জাহান্নমে যেতে বসেছি। মামী ভাগ্নীর ‘আত্মীত’ আমার আঁতে যা দিয়েছে।’

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল ক্যাপ্টেন। তার পর বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল পাত্রে। ক্যাপ্টেনের কপালের খাঁজটা ক্রমেই স্পষ্ট হ’য়ে উঠেছে। ভাবছে ক্যাপ্টেন কী করা যায়? বন্ধু হুখে তার সহানুভূতি আছে বটে কিন্তু পিপারের অমিত প্রশংসা ক্যাপ্টেনকে সজাগ ক’রে তুলেছে, স্ত্র্যামটা রাখতে হবে ত!

একটু পরে পিপার আবার শুরু করলেন: ‘আমার বাঁচবার একটি পথ আছে। সেটি হচ্ছে আমার স্ত্রীর প্রথম স্বামী ক্যাপ্টেন বুডকে খুঁজে বার করা।’



‘দূর বোকা, সে করে মরে ভুত হয়ে গেছে। মিছামিছি বাজে কাজে সময় নষ্ট করো না।’—বলল ক্রিপেন।

‘আরে না, না, আমি ভাকে খুঁজতে যাচ্ছি না। এই দেখ তার ছবি। সে ঠিক তোমার মতই লম্বা-চওড়া ছিল। তার চোখ এবং নাক ঠিক তোমার মতই সুন্দর ছিল। আজ যদি সে বেঁচে থাকত তা’ হলে তার বয়সও তোমার মত হ’ত। আর তা ছাড়া, সে ত তোমার মতই এক জন সুন্দর নাবিক ছিল।’—বললেন পিপার খুব নিরীহ গলায়।

ক্রিপেন হঠাৎ এই ধরণের বাক্য—বিজ্ঞাসের মর্মটা ঠিক কৃষ্ণতে না পেয়ে পিপারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখের ভাবে অকথিত প্রশ্ন জেগে রইল—‘কি বলতে চাও?’

পিপার আবার বলে চললেন—‘মেয়েদের বশ করার তার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, আর সেটা তোমার আছে আরো বেশী মাত্রায়। এদিক দিয়ে তোমার তুলনা মেলা ভার। আর তা’ ছাড়া তুমি এক জন সুন্দর অভিনেতা। তোমার মত অভিনয়-ক্ষমতা আমি খুব কম পেশাদার অভিনেতার মধ্যেই লক্ষ্য করেছি। তবে কি জান, ঢাক পেটানোর অভাব। তোমার জন্ত সেটা ত কেউ করল না। তা’হলে আজ আর তোমায় পায় কে? বেশ-বিদেশে লোকে তোমার ছবি টাঙ্গিয়ে রাখত ঘরে-ঘরে। আহা, তোমার সেই বন-বিড়ালের ডাক—অমন ডাক হেনরী আরভিংও ডাকতে পারে না, এ কথা আমি হৃদয় করে বলতে পারি।’

অল্প প্রশংসা-ধারানিক্ত ক্রিপেন বিনয়ে-ভেজা গলায় বলল—‘তুমি ত ভাই সঠিক জান। কলি-রোগজ্বরের জন্ত সারা জীবনটা ত জলে-জলেই গেল। অভিনয় করার সুযোগটা আর পেলাম কোথায়?’

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পিপার বললেন—‘তোমার ক্ষমতা আছে ভাই, যে ক্ষমতা ভগবান সবাইকে দেন না। এ দক্ষতা তোমার সহজাত এবং তোমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ ক্ষমতা থাকবে।’

ক্রিপেন একটু হাসল। হাসিতে তার বিচলিত হৃদয়ের লক্ষণ। সেটা পিপারের চোখ এড়ালো না। তিনি দেখলেন এই সুযোগ। মাতেঙ্গ লগ্ন বুঝি বয়ে যায়। তিনি আবার শুরু করলেন—‘ভাই, আমাকে বাঁচাবার জন্ত তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তোমাকে ক্যাপ্টেন বৃদ্ধ সাজতে হবে। এ কঠিন কাজ সারা হইলেও এক তুমি ডাড়া আর কেউ করতে পারবে না, এ কথা আমি জানি এবং মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। আর সেই জন্তই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।’

চোখ বড়-বড় করে ক্রিপেন বলল—‘এ তুমি কী বলছ? ক্যাপ্টেন বৃদ্ধ সাজতে হবে!’

‘আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আর শক্ত কী? এই নাও, এই নোট-বইটাতে তোমার জ্ঞাতব্য সমস্ত কথাই লেখা আছে। সে কী করত, কী ভাসোবাসত না বাসত, তার কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, তার বংশ-ইতিহাস, তার জাহাজের কথা, সব তুমি এই বইখানিতে পাবে। তোমার বিশেষ কোন অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না। আমার জীবন কাছে হাজার-বারোশো বার শুনে-শুনে এ সব আমার মুখস্থ হ’য়ে গেছে। আমি সব খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি তোমার জন্ত। এটা প’ড়ে দেখ।’

হাত বাড়িয়ে বইটা নিয়ে ক্রিপেন পাতা ওলটতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরে বইটা আন্তে আন্তে নেড়ে বলল—‘এ আমার খারাপ হবে না ভাই। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না বলে আমি আন্তরিক ক্ষুণ্ণ।’

‘তুমি ইচ্ছা করলেই করতে পার ভাই। আর তা ছাড়া ভাবো ত, কী মজাটাই না হবে? সব ব্যাপারটা আগে বুঝে নাও, নোট-বইটা পড়। মনে মনে সমঝে নাও যে, তুমিই ক্যাপ্টেন বৃদ্ধ। তার পর এসে আমার কাছ থেকে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দাবী কর। হ্যাঁ, তোমায় ওর ডাক-নামটা বলে দিই—মার্শা।’

ক্রিপেন একটু ভেবে বলল—‘আচ্ছা ধর আমি যদি ক্যাপ্টেন বৃদ্ধ সেজে যাই, তা হলে তোমার সুবিধাটা কী হচ্ছে?’

‘আহা, বুঝতে পাচ্ছ না? তুমি এসে দাবী করলেই আমি মার্শাকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে, কায়মনোবাক্যে তোমাদের ওভেজা জানিয়ে খসে পড়ব, অবশ্য পাড়ার পাঁচ জনকে জানিয়ে। তার পর তুমি এক সময় সুবিধা বুঝে পালিয়ে যাবে। দেও আর তোমায় ধরতে পারবে না।’ বললেন পিপার আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে।

‘আচ্ছা, ভেবে দেখি, তোমাকে পরে লিখে জানাব।’ চিন্তিত ভাবে বলে ক্রিপেন।

‘আরে ভাই, এতে আর ভাববার কী আছে? মন স্থির করে ফেলো। তুমি যদি এটুকু করবার প্রতিশ্রুতি দাও, আমি ধরে নেবো যে, ব্যাপারটা ঘটে গেছে। আমি ত তোমাকে চিনি। তোমার কথা নড়চড় কখনো হয়নি, হবেও না।’ প্রশংসার আর একটা বড় ঢেউ ভেঙে পড়ল ক্রিপেনের মাথায়। এবার সে বেশ খানিকটা বেশামাল হ’য়ে পড়ল।

‘আচ্ছা, তোমার বউকে দেখতে কেমন?’ প্রশ্ন করে ক্রিপেন। ‘বেশ ভালো দেখতে, খাসা দেখতে। আর বেশ নাড়িস-হুড়স নোট-সোটা। এ বয়সে আমরা যেমনটি চাই, ঠিক তেমনটি।’ বললেন পিপার চটুল ভঙ্গীতে।

ক্রিপেন চুপ করে রইল। তার পর আবার নেতিবাচক ঘাড় নাড়া। অস্বুট কণ্ঠে সে বলল—‘না ভাই, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। তোমার স্ত্রীর প্রতি এত বড় একটা অবিচার করবার আমি অন্ততঃ পক্ষপাতী নই। এ অস্ত্র—এ ঘোরতর অস্ত্রায়।’ শেষের দিকে গলায় স্বরে দুটো ফুটে উঠল। পিপার তখন মনে মনে প্রমাদ গুণেছেন।

‘আহা, অস্ত্রায় ত আমারই হয়েছে। মার্শার প্রথম স্বামী জীবিত আছে কি না সঠিক ভাবে না জেনে মার্শাকে বিয়ে করা ত উচিত হয়নি আমার! নীতিশাস্ত্র ত আমাকে রেহাই দেবে না আমার এই অহুচিত কাজের জন্ত। আমি এখন সেই অস্ত্রায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাচ্ছি। তুমি শুধু আমাকে পাপমুক্ত হ’তে সাহায্য কর, ভাই!’—পিপারের গলায় আন্তরিকতার স্বর গভীর হ’য়ে উঠল।

ঘরে শান্ত নিস্তব্ধতা। শুধু ঘোঁরার মেঘ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে ঘরের আকাশে। ‘তুমি যদি এদিক থেকে বিচার করতে বল, তাহ’লে অবশ্য অনেক কিছু ভেবে দেখবার আছে,—আন্তে আন্তে বলল ক্রিপেন ভাবনা-অড়ানো কণ্ঠে।

স্বচরু বৈমানিক ব্যালেন যে, আর বেশী দেরী নেই সিদ্ধিলাভের। পিপার অকুণ্ণ হাতে নাবিকের গ্রাসে জীন ঢেলে দিল। তার পর কথার ঝড় উঠল—সওয়ার আর জবাব। কত সত্য বিকৃত হ'ল। নীতিশাস্ত্রের মাথা মুড়িয়ে হু'জনেই বোল ঢেলে দিল—হু'জনেই সে শাস্ত্রে সমান পণ্ডিত ত! অবশেষে স্থির হ'ল যে, মার্খার মত মেয়েকে ত্যাগ করার মধ্যে কোন পাপ নেই, বরং পুণ্য আছে। এক স্বয়ং বীতশ্রুটি এই ধরণের মেয়েদের ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। স্বরামন্ত দুই সৈনিকের হাতে সেদিন নীতিধর্মের শ্রাবশাস্তি চুকে গেল।

সেদিন বৃহস্পতিবার—ক্যাপ্টেন বুডের আসবার দিন। প্রত্যাশা-চকস পিপারের মন তাঁকে স্মৃতির হ'য়ে হৃদয় কোথাও বসবার অবকাশ দেয় না। তিনি কেবল এ-ঘব ও-ঘর ক'রে বেড়ান। বোলা বুঝি আর কাটতে চায় না। দুপুরটা জিমেতালে বৈকালের দিকে যদিও বা গেল, বৈকালটা আর সন্ধ্যা হ'তে চায় না কিছুতে। পিপারের বৈধব্য বুঝি আর থাকে না। তিনি বাইরের ঘরে পায়চারী করছেন আর পথের দিকে তাকাচ্ছেন বাবে-বাবে। পিপার-গৃহিণী ঘরে বসে উল বুনছে আর একমনে লক্ষ্য করছে পিপারকে। পিপারের সেদিকে খেয়াল নেই। কত'কে চমকে দিয়ে গৃহিণী গর্জন তুলে বললে—‘এক দণ্ড কী চূপ ক'রে বসে থাকতে পার না! খালি ছুটোছুটি আর হৈ-চৈ! বলি, তোমার জ্বালায় বাড়ীতে কী আর লোক বাস করবে না?’

পিপার আজ আর কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। যে কয়েদীর ছাড়া পাবার সময় হয়ে এসেছে সে শেষ বারের মত মুখ বুজে জেলারের ঢাবুক খাচ্ছে। দিকে জানলার বাইরে জিরানিয়াম গাছের ফাঁকে জেগে উঠল ফ্রিপেনের জন্ত চোখ হু'টো। পিপারের সন্ধানী দৃষ্টি তাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। পিপারের ইচ্ছে হ'ল একবার ‘ভরবে’ ব'লে চীৎকার ক'রে ওঠ। পর মুহূর্তেই শ্রীমতীর ভাঁটার মত চোখ হু'টোর কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর কথা কান দিয়ে গিয়ে একেবারে মর্মে প্রবেশ করল: ‘কী, কথা কানে গেল না। অমন খড়োছড়ি করা হচ্ছে কেন জানতে পারি কী?’

পিপার খুব নিরীহ ভাবে বলল, ‘দেখ দেখি, কে যেন জানলা দিয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে।’

গৃহিণী নিজের কথার উত্তর না পেয়ে আরো চটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাক্যস্রোত উৎসারিত হ'ল—‘সামিধ্যেতা দেখ একবার। কোথাকার কোন ভবঘুরে এসে জানলা দিয়ে উঁকি মারবে, আর আমি তাকে দেখতে যাব। বটে। দরকার থাকে তুমি দেখ গে।’ ব'লে শ্রীমতী আবার উল বোনায় মন দিলেন।

ক্যাপ্টেনের নাটকীয় প্রবেশের জন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পিপার। হুঃসহ উত্তেজনা আর হুঃসহ প্রত্যাশা বুঝি তাকে পাগল ক'রে দেবে। বাইরের প্রশান্তিটা বজায় রাখবার জন্ত কাঁপা হাতে পিপার পাইপটা ধরিয়ে নিল। জানলার বাইরে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে ফ্রিপেনের চলমান মূর্তিটা মাঝে-মাঝে দেখা যাচ্ছে। বাইরে ফ্রিপেন পায়চারী করছে সমরকে পারো-পারে মাড়িয়ে। এদিকে পিপার একাগ্র হ'য়ে তার বুকের ওঠা-নামার শব্দ শুনেছে। ফ্রিপেন কিছু আসছে না। প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেল। পিপার

অধৈর্য হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। জানলার কাছে গিয়ে বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল—‘যাটা, নিশ্চয় একটা ভবঘুরে।’—কথাগুলো কেমন যেন একটু বেশরো শোনালো পিপারের।

শ্রীমতী এবার একটু মনোযোগ দিল এদিকে। উলের বাড়িগটা পাশের মোড়ার ওপর নামিয়ে রেখে প্রশ্ন করল—‘তুমি কার কথা বলছ? এর মধ্যে আবার ভবঘুরের আবির্ভাব হ'ল কোথায়? তখন থেকে সেই এক কথা নিয়ে ভাঙ-ভাঙ কোরো না ব'লে দিচ্ছি। মাথা ধরে আমার।’

পিপার আজ কিছুতেই দমবে না। সে মরিয়া হয়ে ব'লে ওঠে—‘আরে, ওই যে লোকটা তখন থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মারছে গাছগুলোর ওপাশ থেকে। চোখে চোখ পড়তেই স'রে পড়ছে। লোকটাকে দেখতে ঠিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত।’

‘জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত’—কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল শ্রীমতী। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্ধানী চোখের দৃষ্টি বাতায়নপথে পথচারী হ'ল। পথচারী পথিক ধরা পড়ল সে দৃষ্টির আলোয়। ফ্রিপেন ঠিক সেই লগ্নে মাথাটা তুলেছিল জিরানিয়াম ঝোপের ওপর। শ্রীমতীর সাথে শুভদৃষ্টি হ'ল। ক্যাপ্টেন আবার ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বিড়ালাকীর ধরদৃষ্টি বুঝি বা ক্যাপ্টেনের সত্য পরিচয় জেনে ফেলল। মার্খার মনে অনেক দিন আগেকার জানা-চেনা একটা মুখের স্মৃতি জেগে ওঠে। এ যেন সেই মুখ। কালের কারিগরীতে সে মুখের রদবদল হ'য়েছে, তবু যেন ঠিক সেই মুখ। মার্খা একবার আড়চোখে পিপারের দিকে তাকায়। পিপার তখন পাইপে তামাক ভরছে। মুখে-চোখে তার বজায় খুশীর ভাব। খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। এবার তার ও শুধু দর্শকের ভূমিকা। মার্খা কিছুক্ষণ চূপ ক'রে বসে রইল। তার পর উঠে গেল বাইরের দরজাটা খুলে দিতে। দরজাটা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের হাওয়ায় ঘর ভরে গেল। পথে লোক-জন নেই। সেই পথিকেরও দেখা নেই।

‘কাউকে দেখলে?’—জিজ্ঞাসা করলেন পিপার।

পিপার-গৃহিণী ঘাড় নাড়ে। মার্খা তার জায়গায় ফিরে এসে বসল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। উলের বলটা হাতে তুলে নিয়ে আর একবার বাইরে তাকাল মুক্ত বাতায়ন-পথে। কেউ কোথাও নেই। সে আবার বুনতে লাগল তবে মাঝে-মাঝে তার প্রত্যাশী দৃষ্টি জানলার ওপাশে কাকে যেন খুঁজছিল বাবে-বাবে। এদিকে পিপার সময়ের পরধানি গুণে। ছোট বড়িটা টিক-টিক করছে কানের কাছে। কয়েকটা সেকেন্ড, তার পর কয়েকটা মিনিটও কেটে গেল। উৎস্রক হ'য়ে আছে হু'জনেই—তবে হু'জনের ভাবনা-ভঙ্গি ও মনন-শৈলী ভিন্ন রকমের। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল টক্ টক্ টক্। পিপার চমকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল—‘ভিতরে এসো।’

আজ্ঞে-আজ্ঞে দরজা খুলে গেল। ক্যাপ্টেন ফ্রিপেনের দীর্ঘ দেহ দীর্ঘতর ছায়া রচনা করল ঘরের কার্পেটের ওপর। অভিনেতার চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। যেন তার কথা হারিয়ে গেছে। সে শুধু শ্রীমতীর দিকে চেয়ে অতি পরিচয়ের স্মৃতিবিজ্ঞ আগ্রহে বলে ফেলল—‘মার্খা, আমার মার্খা, আমাকে চিনতে পার?’

মার্খা প্রতারিত হ'ল—তার প্রথম বোঁবনের ভালোবাসার স্মৃতি তার বিচার-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিল আবেগের বজায়।

সে শুধু বিমিত্র কণ্ঠে একবার বলল, 'জেম, তুমি।' তার পর জঙ্ঘুকতার অনাবর্তে ভেসে গেল ইন্দ্রের ঐরাবত। সমাজ, সংসার সব ভেসে গেল। মার্খা ছুটে গিয়ে জেমকে জড়িয়ে ধরল পরম আগ্রহে, তার পর চুম্বন-চুম্বন ভরে দিল প্রোচের সারাটা মুখ। পিপার গভীর শান্তিতে উপভোগ করতে লাগলেন এই মিলনদুগ্ধের প্রহসন। প্রয়োজনবাদী পুরুষ ভাবছে আপন কার্যসিদ্ধির কথা। মার্খা জেমকে টেনে বসায় একটা সোফায়।—'জেম, জেম, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে?' উপচে-পড়া খুণী চাপতে পারে না মার্খা। বার বার ঐ এক প্রশ্নই করে।

'সে অনেক—অনেক দেশে ঘুরেছি'—বিস্তৃত প্রত্যেক সময়ে নেয়—'কিন্তু যেখানেই থাকি আমার প্রিয়তমা পত্নীর চবি আমার চোখের নামনে সব সময়েই ভাসছিল। আমি কি তোমায় কখনো ভুলতে পারি গো?' কথাগুলো যতটা সস্তর আত্ম করে বলে ক্যাপ্টেন।

'আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি।'—তার মাথার চুলগুলো যেদবলস আঙ্গুল দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল মার্খা—'আচ্ছা আমি কি খুব বদলে গেছি?' প্রশ্ন করে স্রীমতী আশ্চর্য-জড়ানো কণ্ঠে।

'না না, কিছুই বদলাওনি'—বলে ক্যাপ্টেন, স্রীমতীর সুনীবিড় সান্নিধ্য থেকে নিজেকে কিছুটা মুক্ত করে। মার্খা ছাড়বার পাত্রী নয়। সে আবার বেসে বসে ক্যাপ্টেনের কাঁধে মাথা রেখে বলে: 'এত দিন ছিলে কোথায়? আমাকে ভুলে ছিলে কি ক'রে?'

এবার ক্যাপ্টেন গল্প শুরু করে: 'ডলফিন জুবে বাওয়ার পরে আমি ত পড়লাম অকুল সমুদ্রে। তার পর চলল অবিরাম সংগ্রাম—আমার সাথে সাগরের অগণিত উর্মিমালার। সে বৃহৎ স্রী হলাম আমি।'—এই বলে ক্যাপ্টেন একবার আড়চোখে পিপারের দিকে চায়। পিপার পায়েব ওপর পা তুলে দিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঝলন্ত পাইপ থেকে নীলাভ ধোঁয়ার রেখা অঙ্গু গতিতে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। তাঁর মুখ দেখে কিছু বোকা যায় না। তিনি সারধান হ'য়ে গেছেন। ভেতরের কথা বাইরে যেন প্রকাশ না পায় তাই তাঁর এই সাবধানতা।

বলে চলে ক্যাপ্টেন—'এসে উইলসাম এক জনহীন ধোঁপে। এক গাছপালা আর জীবজন্তু ছাড়া সেখানে আমাকে সঙ্গ দেবার জ্ঞান কেউ ছিল না। জান মাথা, সে কী নির্জনতা। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কঠোর ক'রে ধরেছে। কি ক'রে যে সেখানে পুরো তিনটি বৎসর ছিলাম তা' এক ভগবানই জানেন। তার পর ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। নিউ সাউথওয়েলসগামী এক জাহাজে আশ্রয় পেলাম। সেখানে একটি লোকের সাথে পরিচয় হ'ল—তার বাড়ী পূলে। সে আমাকে বলল যে, তুমি মারা গেছ। তোমার বিহনে আমি বিধ-ব্রহ্ম অন্ধকার দেখি, এ কথা তুমি জান মাথা।'।

মার্খা বাড়ি নেড়ে সম্মতি জানায়। দু'টি জল-ভরা বড় বড় চোখ তুলে ধবে ক্যাপ্টেনের চোখের একান্ত কাছে। ক্যাপ্টেন একটু বিচলিত হয়। আবার শুরু করে ক্যাপ্টেন—'তাই তাইলাম আর দেশে কিংব কাব জ্ঞান? কে আছে আমার সেখানে?

কি হবে গিয়ে সেই দেশে যে দেশের বাতাস আমার প্রিয়র কবরের চার পাশে দীর্ঘবাস ফেলে? এতদূর কত চিন্তা মাথায় এল। তাই দেশে আর না ফিরে অষ্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে কাটিয়ে দিলাম আরো কয়েকটা বছর। এই মাত্র সেদিন জানতে পারলাম যে, তুমি বেঁচে আছ, তাই না ছুটে চলে এসাম। এসে দেখি আমার ছোট্ট ফুলটি ঠিক তেমনি আছে।'

তিরিশ বছরের বিচ্ছেদ-বিধুর মার্খা আর মাথা তুলতে চায় না ক্যাপ্টেনের কাঁধ থেকে। ক্যাপ্টেনের মাংসল কোমরটাকে মার্খা হুঁহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। এই কাঁকে অভিনয়-লক্ষ ক্রিপেন তাকায় পিপারের দিকে। পিপার মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিনয় দেখছিলেন তাঁর বন্ধুর। হ'জনার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। পিপার তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন।

'তুমি যদি আর কয়েকটা দিন আগে আসতে জেম'—অশ্রুজ্বল কণ্ঠে বলে মার্খা—'মাত্র তিন মাস আগে আমি ঐ লোকটাকে বিয়ে করেছি।'

'বিয়ে করেছ! তবে আর কী হ'বে? তুমি আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে পারলে না, মার্খা?' বলে ক্যাপ্টেন একটু স'রে বসবার চেষ্টা করে। সূচতর অভিনেতার কণ্ঠে তিরস্কারের স্বভাব।

সে যাক্ গে, আমি তোমার স্ত্রী আর তুমিই আমার স্বামী। তোমাকে যাতে আর না হারাই সেদিকে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আমি না মরা পর্যন্ত আর তুমি আমার চোখের আড়াল হতে পারবে না।—ধরা-গলায় বলে মার্খা।

পিপারের সাথে ক্যাপ্টেনের আবার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। ক্যাপ্টেনের চোখে ভয়ের আভাষ। 'ও-সব বাজে কথা থাক'—বলে ও'স ক্যাপ্টেন।

'ওটা মোটেই বাজে কথা নয়'—বলে মার্খা আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁহাতে ক্যাপ্টেনের গলা জড়িয়ে ধরে। 'তুমি বা বললে তা ত সত্যি নাও হ'তে পারে। তুমিও ত অল্প মেয়েকে বিয়ে ক'রে থাকতে পার। আমি ত আর সে সব কথা ভুলছি না বা জানতে চাচ্ছি না। এখন আমি যখন তোমাকে একবার পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না।'—স্রীমতীর গলায় দৃঢ়তার আভাষ ফুটে ওঠে। ক্যাপ্টেন ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে।

পিপারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মার্খা আবার শুরু করে—'আর যদি ঐ পুকে লোকটার কথা বল ত বলব যে, ও আমাকে এমন বিরক্ত ক'রে তুলেছিল যে, বিয়ে না ক'রে উপায় ছিল না। ওকে আমি কখনো ভালোবাসিনি। খালি খালি আমার পিছনে ও ঘুরে বেড়াত আর যেখানে-সেখানে বিয়ের প্রস্তাব করত। পিপার, তুমি আমার কাছে কবার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে—বারো না তেরো বার?'

পিপার বিরল মুখে বললেন—'ভুলে গেছি।'

মার্খা ক্যাপ্টেনের গালে নিজের গালটা প্রায় ঠেকিয়ে আবার বলতে শুরু করল—'আমি তোমায় সত্যি ক'রে বলছি জেম, ওকে আমি কোন দিনই ভালোবাসিনি। পিপার, তোমাকে কী আমি ভালোবেসেছি কোন দিন?'—পিপারের দিকে চেয়ে মার্খা প্রশ্ন করে।

শিপার ঘাড় নেড়ে বলেন—‘না, কোন দিনও না। জানি না, কিন্তু কোন লোকের তোমার মত অকণ্ঠ জী ছিল কি না। তবে আমার প্রতি তোমার যে বিন্দুমাত্র দরজা ছিল না, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব।’

শিপারের কথা শেষ হ'বার আগেই দরজার টোকা পড়ল। শিপার উঠে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দিলেন। পাড়ার পাজীর মেয়ে এসেছে কোন কাজে। সে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। ক্রীমতী শিপারকে এক জন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এভাবে ব'লে থাকতে দেখে সে বেশ খানিকটা হতভম্ব হ'য়ে গেল। কি ব'লে কথা আরম্ভ করবে সেটা সে কিছুকই খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ চলে যাওয়াও খারাপ দেখায়। মাথা তাকে মুক্তি দিল এই ক্রিশঙ্কর অবস্থা থেকে। খুশীভরা গলায় বলল মেয়েটির উদ্দেশ্যে—‘ইনি আমার প্রথম স্বামী জেম বুড।’

জেম ততক্ষণে নিজেকে মাথার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। এই বয়সে আদি রসের এই বীভৎস প্রকাশ, বিশেষতঃ এতগুলি অপরিচিত প্রাণীর সামনে মোটেই কটিকর ঠেকছিল না ক্যাপ্টেনের। মাথা কিন্তু ছাড়বে না জেমকে। থাক না বাইরের লোক। সে যদি একটু ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসে তার শুদীর্ঘ দিনের হারিয়ে যাওয়া স্বামীর সঙ্গে, তাতে কার কী বলবার আছে? সে জোর ক'রে জেমের মাথাটা তার স্ত্রিগুল স্বন্ধে চেপে পরল বাঘের খাবার মত হাতখানা দিয়ে। ক্যাপ্টেন বুল, কলে

পড়েছে। সে বিনা প্রতিবাদে তার কাঁধে মাথা বেখে চোখ দু'টি বুলল, বোধ হয় লজ্জায়।

পাজীর মেয়ের নাম মিস্ উইনথ্রুপ। সে এতক্ষণ পরে কথা বলল বেজার উৎসাহিত হ'য়ে,—‘জেরে, তাই না কি? তাই না কি? এ যে একেবারে রক্ত-মাংসে গড়া এনক'আর্ডেন দেখছি।’


‘কে, কি নাম বললেন?’ প্রশ্ন করেন শিপার।

‘এনক'আর্ডেন’—বলল মিস্ উইনথ্রুপ। ‘আমাদের দেশের এক জন বিখ্যাত কবি একটি সুন্দর কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির কাহিনী হচ্ছে যে, এক জন নাবিক সাত সাগরে পাড়ি দিয়ে ফিরছিল বছরের পর বছর ধ'রে। কয়েক বছর এই ভাবে কাটিয়ে দেওয়ার পরে সে ঘরে ফিরল। ইতিমধ্যে স্বামীর দীর্ঘ দিনের অস্থপস্থিতিতে তার স্ত্রী আর এক জনের জীবনসঙ্গিনী হ'য়েছে। নাবিক তখন মনের দুঃখে বনে চলে গেল। কেউ জানল না তার কথা। ভগ্ন-হৃদয়ে সেখানে তার যুহু-হ'ল এক বিষয় সন্ধ্যায়।—কথা শেষ ক'রে সে ক্রিপেনের দিকে ‘তাকাল অর্ধপূর্ণ দৃষ্টিতে। ক্যাপ্টেন যেন ঐ নাবিকের মত বনে চলে না গিয়ে অপরাধ করেছে।

তৈরী-করা বিষয় ভঙ্গীতে শিপার বললেন আস্তে আস্তে—‘আমার এখন স্বপ্ন ভাঙ্গবার পালা। আমি বিধাতার সে অভিশাপকে মাথা পেতে নিছি।’

মিস্ উইনথ্রুপ কথার মাঝে ব'লে উঠল—‘ব্যাপারটার মধ্যে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সন্ধাননা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা,

**সুন্দর ডিজাইন ও**  
**নিখুঁত রক**  
**এ দুয়ের সমন্বয়**  
*—উল্লেখ—*



**বেঙ্গল ফটো টাইপ কোঃ**  
**সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত**  
**৪৬/১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯ ফোন-১৭০২ বি/বি**

আপনারা একটু এই ভাবে বসুন, আমি আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। একটা ছবি নেবো আমি আপনাদের হুঁজুনের।—সে শেষের কথাগুলো বলল মার্শা আর ক্রিপেনকে লক্ষ্য করে।

মার্শা খুসি হ'য়ে বলল—‘বেশ, বেশ, তোমার ক্যামেরাটা দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এসো।’

ক্যাপ্টেন প্রায় রুপে উঠল—‘সে হবে না। আমার ছবি তোলা হবে না।’ প্রত্যেক সাবধানে হচ্ছে। চোখে-মুখে তার তীক্ষ্ণ সতর্কতা।

মার্শা আদ্যের ভঙ্গিতে বলল—‘হ্যাঁ গা, আমি অনুরোধ করলেও তুলতে দেবে না?’

বিরক্ত ক্যাপ্টেন মার্শার কাঁধ থেকে মাথাটা তোলবার জন্য আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। শ্রীমতী সজাগ। সে আবার জোর ক’রে মাথাটা চেপে ধরল তার সুবিস্তৃত কাঁধে। ক্যাপ্টেন ঝাঁঝিয়ে উঠল—‘তুমি সারা জীবন ধ’রে অনুরোধ করলেও না।’

উইনথুপ পিপারের দিকে তাকিয়ে বলল—‘আচ্ছা, আপনি কি বলেন? ভঁরের একটা ছবি তোলা কী উচিত নয়?’

‘আমি ত কোন আপত্তির কারণ দেখি না’—অজ্ঞ কথা ভাবতে ভাবতে বলেন পিপার।

মেয়েটি তখন ক্রিপেনের দিকে ফিরে বলল ‘শুনুন, মিস পিপার কী বলছেন। উনি মোটেই কিছু মনে করবেন না আপনারা ছবি তুললে। কাজেই আপনারাও কিছু মনে না করাই উচিত।’

ক্যাপ্টেন ভারী গলায় বলল—‘আচ্ছা, পরে ভঁর সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কথা বলব।’

ক্যাপ্টেনের গলার স্বর শুনে পিপারের সম্বন্ধে ফিরে আসছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, অনমনস্ক ভাবে ছবি তোলায় মত দিয়ে তিনি ভালো করেননি। তাই তাড়াহাড়ি ব’লে উঠলেন—‘আচ্ছা মিস উইনথুপ, ব্যাপারটা এখন আমাদের মধ্যেই থাক। বাইরের পাঁচ জনকে জানিয়ে কাজ নেই।’

মেয়েটি বলল—‘বেশ, সেই ভালো। আচ্ছা, আর আপনাদের বিরক্ত করব না। আরে, লোকগুলো কী অসভ্য!’

সবাই উইনথুপের কথায় রাস্তার দিকের জানলাটার দিকে তাকালো। সেখানে একগাল মাথার ভীড়। ওরা তাকাতাই মাথাগুলো ডুব দিল জানলার নিচে। ক্যাপ্টেন ক্রিপেনের মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। বজুর উপকার করতে এসে সে এতক্ষণ ধ’রে নাজেহাল হচ্ছে। আর নয়। সে উঠছিল তার জায়গা ছেড়ে এই অসভ্য লোকগুলোকে হুঁকথা শুনিতে দেবার জন্য। মার্শা তার হাত চেপে ধ’রে ধমকে উঠল—‘জ্বম!’ ক্রিপেন আর বলল না। মার্শার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। মনের বড় হুশিয়ার মেঘগুলোকে উড়িয়ে এনেছে। তারা জমেছে ক্যাপ্টেনের মুখের ওপর। ক্ষুব্ধ ক্যাপ্টেন বৈমানিকের দিকে জুঁজু কটাক হানে। পিপার বীতিমত ঘাবড়ে বান ক্রিপেনের রকম-সকম দেখে। এক কঁকে তিনি আন্তে-আন্তে ক্যাপ্টেনকে বলেন—‘জ্ব কী, তুমি একটু সহজ হও, সব ঠিক ক’রে নেবো আমি।’ কিন্তু ক্যাপ্টেন আর সহজ হ’তে পারে কৈ?

পাজীর মেয়েটি চলে যেতেই ক্রিপেন বলে—‘আমি একটু বাইরে

বুকে আসব। মাথাটা বেজার ধরেছে।’ মার্শা তখনি এ প্রস্তাবে রাজী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরবার পোষাক প’রে আসে। ক্যাপ্টেন কাঁপা-গলায় বলে—‘আমি একা যাব। আমাকে একা ভাবতে দাও।’

শ্রীমতী দৃঢ় স্বরে বলে—‘সে হবে না, তোমাকে আর একা ছাড়ছি না। আমি এখন সব সময় তোমার পাশে-পাশে থাকতে চাই। লোকে আমাদের একসঙ্গে দেখলে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই। আর আমার পক্ষে ত এ পরম গর্বের কথা যে, তোমার পাশে আবার দাঁড়াতে পেরেছি। চল আমরা এক-সঙ্গে বাইরে যাই। তুমি পাঁচ জনকে বল যে, তুমি আমার কে? লোককে জানতে দাও আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। যত দিন বাঁচব তোমাকে আর চোখের আড়াল করব না—চিরকালটা চোখে চোখে রাখব।’ শ্রীমতী দরদ দিয়ে বলল কথাগুলো। কথায় শেষে তার গাল বেয়ে কয়েকটা ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ক্রিপেন এবং পিপার হুঁজুনেই বুঝতে পারলেন যে, ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হ’য়ে উঠছে।

ক্যাপ্টেন মরিয়া হ’য়ে হতভম্ব বৈমানিকের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল—‘কি করা যায় বলুন ত? আপনি কি পরামর্শ দেন?’

শ্রীমতী তীক্ষ্ণ স্বরে বলল—‘ও বলবার কে? ওকে আবার আমাদের মধ্যে টানছ কেন?’

ক্যাপ্টেন আয়ত-আয়ত ক’রে বলল—‘ভঁর সঙ্গে পরামর্শ কর দরকার ব’লে মনে হয়।’ তার পর কয়েকটা মিনিটের নিম্ভকতা। পিপার কোন কথাই বলল না। ওরা হুঁজুনেও নির্বাক। আবার শুরু করল ক্যাপ্টেন একটু দম নিয়ে—‘মিস উইনথুপ যে কবিতার কথা বলল, সেখানে মেয়েটির প্রথম স্বামীই ত ভয়ঙ্কর প্রাণত্যাগ করেছিল। তারই মত আমারও পঞ্চপ্রাণিই প্রাণ্য। সেটাই হত আমার স্বাভাবিক পরিণতি।’ শ্রীমতী আরো কয়েকটা ফোঁটা চোখের জল দিয়ে ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলোকে পূরাপূরি অস্বীকার করল। ক্যাপ্টেন ছাড়বার পাত্র নয়। সে আবার শুরু করল—‘আমাকে যেতে দাও মার্শা, আমার মরাই ভালো। আমার মরতে দাও।’

শ্রীমতীর চোখে বর্ষার ধারা নামল। সে ধারা-সম্পাতের অন্তরে রয়েছে তীক্ষ্ণ ক্ষোধের বিদ্যুৎ-সূচনা। শ্রীমতী আরো একটু নিবিড় হ’য়ে বলল, হাত দু’টো দিয়ে জড়িয়ে ধরল ক্যাপ্টেনের গলা। শ্রীমতীর চোখের জলে ক্যাপ্টেনের বুক ভেসে যেতে লাগল নিরুপায় ক্যাপ্টেন চোখের ইসারায় পিপারকে জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ ক’রে দিতে বলল। পিপার নীরবে সে আদেশ পালন ক’রে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণের নীরবতা। পিপার এবার কথা শুরু করলেন—‘বাইরে একগাদা লোক জমেছে। ব্যাপারটা জানাজানি হ’য়ে গেছে ব’লে মনে হচ্ছে।’

শ্রীমতী ঝাঁঝিয়ে উঠল—‘তা হোক গে। আমি একটুও গ্রাহ্য করি না। শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে, ও আমার কে?’

‘তা ত পারবেই—তা ত পারবেই’—বলেন পিপার স্বার্থবোধক স্বরে।

শ্রীমতী পিপারকে আর কোন আমল দিল না। ক্যাপ্টেনের গল

ছেড়ে সে এবার একটা হাত নিয়ে আদর করতে লাগল ক্যাপ্টেনকে। এখন ভাবের মাত্রা একটু বেশী হয় অগ্নি শ্রীমতী ক্যাপ্টেনের দৃষ্টমান ওয়েষ্টকোটের ওপর সম্মুখে তার চ্যাঙাড়ির মত মাথাটা ঘষতে থাকে। ক্যাপ্টেন রীতিমত ঘাবড়ে যায়। প্রথম-নিবেদনের এই ধরনের উদ্ভট রীতির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। সে অলস দৃষ্টিতে পিপারের দিকে তাকায়। পিপার-বোথেন যে, ক্রিপেনকে তিনি জাঁতিকলে ফেলে দিয়েছেন। তিনি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবতে থাকেন এই পরিস্থিতির সমাধান কোন্ পথে ?

মিনাস্তের স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়ল আকাশ-প্রান্তরে আর ছড়িয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের প্রত্যাগমন সংবাদ দূরান্ত পথে-ঘাটেও। মিস্ উইনথপের প্রচারবিমুখতার কল্যাণে কেউ জানতে বাকী রইল না যে, শ্রীমতী পিপার তার হারানিধি ফিরে পেয়েছে। নানান লোক আসতে লাগল। স্থানীয় এক জন রিপোর্টারও খবর পেয়ে এসে হাজির। সে ত নাছোড়বান্দা। তাকে অনেক কষ্টে ঠেঁকিয়ে রাখা হল আগামী কাল ব্যাপারটার পূর্ণ বিবরণী দেওয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে। ক্যাপ্টেন কারো সঙ্গে দেখা করতে নারাজ। শ্রীমতী সবাইকে দেখাতে চায় কিন্তু ক্যাপ্টেন কারো সামনেই বের হতে চায় না। ঘরে একটা খমখমে ভাব। পরের ঘটনা কি যে ঘটবে কেউ জানে না। পিপার অমরোখ-ভরা কণ্ঠে শ্রীমতীকে বললেন—‘মাধা, একটু চা করলে হয় না?’ শ্রীমতী কিছু বলবার আগেই ক্যাপ্টেনও এই প্রস্তাবের অমুমোদন করল। কাজেই শ্রীমতীকে উঠতে হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাবার সময় অবশ্য সে ক্যাপ্টেনের টুপিটা হাতে করে নিয়ে যেতে ভুলল না। ক্যাপ্টেন পাশ-গলায় পিপারকে বলল—‘এখন কী হবে? এই অবস্থায় মানুষ বেশীক্ষণ মাথার ঠিক রাখতে পারে না। যা হয় একটা কিছু কর।’

‘এই ভাবেই কিছুক্ষণ চলুক না’—কিস্কিস ক’রে বললেন পিপার।

ঘাড় নেড়ে ক্রিপেন বলল—‘দেখ, তা হয় না। আমি রান্না-ঘরে গিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলছি। আর এ ধরনের ব্যাপার চলতে দেওয়া উচিত নয়। তোমার জন্য যেটুকু পেরেছি করেছি, আর নয়। এসো আমার সঙ্গে।’ ক্রিপেন রান্না-ঘরের দিকে চলল।

পিপার মরিয়া হয়ে ক্যাপ্টেনের জামার হাতা টেনে ধরল। কিস্কিস ক’রে বলল—‘দোহাই ভাই, ও আমায় মেরে ফেলবে।’

‘তার আমি কি করব?’—বলে ক্রিপেন জামার হাতাটা ছাড়িয়ে নেয়।—‘তোমার মার খাওয়াই উচিত?’

‘তোমাকেও ওরা ছাড়বে না, মনে রেখো। বাইরে বারী পাড়িয়ে আছে ওরা জানতে পারলে তোমাকেও মোটা মাথা নিয়ে ফিরে যেতে হবে না, এ কথা আমি হালক করে বলতে পারি।’—বললেন পিপার ভয় দেখিয়ে।

এবার ক্যাপ্টেন রীতিমত ঘাবড়ে গেল। রান্না-ঘরে বাবার সমস্ত সোহা তার উবে গেল কপূরের মত। সে বসে পড়ল। পাণ্ডু মুখে পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—‘তা হলে ভাই, এখন কী করা যায়?’

পিপার একটু ভেবে বললেন—‘দেখ’ এক কাজ কর। শেষ ট্রেনটা ছাড়েরাত আটটার। তুমি ওকে নিয়ে ট্রেনের ধারে বেড়াতে যাও। আর এক মাইল দূর থেকে ট্রেনটা দেখা যায়। ট্রেনটা ছাড়বো- ছাড়বো হলে তুমি দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বে আর ট্রেন ছেড়ে যাবে। ও দৌড়তে পারে না। কাজেই তোমাকে ধরতে পারবে না।’

‘কানাই লাল মিত্রের  
সোমরাজ  
কবিরাজী কেশতৈল  
দ্বাখার বোণের দ্বাখোষধ  
সুগন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ’

খবরমূল্য :-

\* তিল তৈল \* কদম্ব বজায়েল  
\* কদম্ব বাইউন

\* সোমরাজ বীজ  
\* দ্বাখোষধ

\* বজ ও শ্বেত চন্দন  
\* ব্রাহ্মী \* আমলা

\* দ্বাখ (কদম্বী) \* চন্দন তৈল  
\* বেলা তৈল \* চামেলী তৈল  
\* বার গুণ্ডো \* লগাভেগুর  
\* ইত্যাদি বিখ্যাত সের্ত

উপকারীতা :-

\* দ্বাখার বোণে  
\* চুল ওঠা বন্ধ করিতে  
\* চুল বাড়াইতে  
\* অনিদ্রায় নিতদ্রমানে  
‘সোমরাজ কেশতৈল’  
\* সর্বোৎকৃষ্ট \*

কথাগুলো মন্দ লাগল না ক্রিপেনের। সে ভাবতে লাগল সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে।

যে চুকলেন শ্রীমতী। তাতেই ট্রেতে ধূমায়িত চায়ের পাত্র। পরিবেশিত হল চা আর সামান্য আনুষঙ্গিক। তিন জনে বেশ সময় নিয়ে চা খেতে লাগল। তাড়াতাড়ি নেই কোন। হুঁ-চারটে অবান্তর আলোচনাও হল। ক্যাপ্টেন পানিকটা চাঞ্চা হয়ে উঠেছে। তার মুখে-চোখে একটু খুশীর ভাব। মার্খাও ক্যাপ্টেনের ভাষান্তর লক্ষ্য করে খুশী হয়েছে। ক্যাপ্টেন চা শেষ করে গল্প শুরু করল—তার ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি কথা। মাঝে-মাঝে তাদের পুরানো দাম্পত্য-জীবনের কথাও এসে পড়ছে। পিপার ভয়ে কাঁটা হয়ে উঠেছে পাছে ক্যাপ্টেন কিছু বেকাঁস বলে ফেলে। গল্প গড়িয়ে চলল। এমে খাবার সময় হয়ে এসে। তিন জনে খাবার-ঘরে এসে। মার্খা পিপার কোথায় যাবে, থাকবে কোথায়, আগার বিষয়ে করবে কি না এ সব প্রশ্নও তুলল খাবার টেবিলে। পিপার কোন প্রয়োজি ঠিক মত জবাব দিলেন না।—‘এখনো ও সবকিছু কিছু ভাবিনি’—এই বলে পিপার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে গেলেন।

ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে এসে পড়ল এদিকে। ক্যাপ্টেন চকস হয়ে উঠেছে। খাওয়া শেষ করে সে মার্খাকে বলল—‘চল মার্খা, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।’

মার্খাও বেজায় খুশী। সে আবেগ-উজ্জ্বল কণ্ঠে বলল—‘আমি কিন্তু আগেকার মত আর জোরে-জোরে গটতে পারি না জেম, সে কথাটা মনে রেখো। তোমাকে কিন্তু আস্তে-আস্তে হাঁটতে হবে আমাকে সঙ্গে নিলে।’

ক্যাপ্টেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে—‘বশ, তাই হবে।’

বেরোবার সময় পিপার মার্খাকে বললেন—‘দেখ, এখানে পিছনের দরজা দিয়ে যাও। সামনের রাস্তায় এখনো লোক জমে আছে বলে মনে হয়।’

মার্খার হ’য়ে ক্রিপেন দগ্ধবার জানাল পিপারকে তার এই উপদেশের জ্ঞান, তার পর তারা দু’জনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল।

পিপার খানিকক্ষণ বসে বসে পাইপ টানলেন। তাঁর চোখ দু’টো আটকে আছে ম্যাটেলপিনের দড়িটার ওপর। কাঁটাটা বেজায় আস্তে ঘুরছে। আটটার দর থেকে অত দূরে কেন ছোট কাঁটাটা? বড় কাঁটাটা সব তিনের ঘর পার হ’ল। পিপার আর বৈধ ধরে বসে থাকতে পারেন না। তিনিও পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সোজা রাস্তা ধরে তিনি চললেন ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশনে পৌঁছে দেখেন যে, ট্রেন আসতে তখনো অনেক দেরী আছে। তিনি সাইডিংএ রাখা কয়লা-ভর্তি একটা মালগাড়ীর আড়ালে আশ্রয়গোচন করলেন। নাটকীয় পরিণতিটা তাঁর স্বচক্ষে দেখা চাই।

আটটা বাজতে আর মিনিট পাঁচেক বাকী। ক্যাপ্টেনের দেখা নেই। পিপার ক্রমেই বৈধ হারিয়ে ফেলছেন। যে পথে ক্যাপ্টেন আসবে, সেদিকে চেয়ে আছেন পিপার অনেকক্ষণ। তাঁর চোখ দু’টো ব্যাথা করছে। ক্যাপ্টেনের তবু আসবার সময় হয় না। পিপার যে কী ভীষণ বেগে উঠছেন ক্যাপ্টেনের ওপর সেটা একমাত্র তিনি জানেন আর জানেন ভগবান। এদিকে প্র্যাটফর্মটা ক্রমেই জর্জি হ’য়ে

উঠতে লাগল। জনতার তরঙ্গ। বিরাম নেই তাদের পায়ের-পায়ে এগিয়ে আসার। গাড়ী আসবার ঘণ্টা বাজল। দূরে সাদা ধোঁয়ার নিশান তুলে ট্রেন আসছে। কোথায় ক্রিপেন? তার দেখা নেই। পিপার চার দিকটা ভালো করে তাকিয়ে দেখে নেন। অন্ধকারে ভালো করে দেখাও যায় না। মহা মুশকিল। ঐ ট্রেন এসে পড়ল। যাত্রীদের কোলাহল বাড়ছে। ট্রেনটা প্র্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল। উত্তেজনায় পিপার উঠে দাঁড়ান। গলা বাড়িয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেনকে। দ্রুতগতি ক্যাপ্টেন আসছে ট্রেনের দিকে। অনেক দূরে ধপ-ধপ করে আসছে মার্খা আর হাত তুলে ডাকছে জেমকে। জেম উৎসাহে পালাচ্ছে। জেম প্র্যাটফর্মে উঠে পড়েছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পিপার। ট্রেনে উঠল ক্রিপেন এক লাফে। গাড়ী ছাড়বার সময় হ’য়ে এসেছে। ষ্টেশন-মাষ্টার ক্রিপেনের গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বলল—‘খুব একটু জরুরি গাড়ীটা পেয়ে গেলেন আর।’ ক্রিপেন তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সে কিছু না বলে শুধু একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল শ্রীমতী কত দূরে। ষ্টেশন-মাষ্টার ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে শ্রীমতীকে দেখতে পেলো। মার্খা তখন হুঁহাত তুলে ডাকছে জেমকে আর তার সাধ্যাতীত জোরে দৌড়ে আসছে। এই বুঝি পড়ে যার! ষ্টেশন-মাষ্টার ক্যাপ্টেনকে আশ্বাস দিয়ে বলে—‘আপনি আর কিছু ভাববেন না। আপনার স্ত্রী না আর পুত্রস্বত আমরা গাড়ী ছাড়ব না।’ ক্যাপ্টেনের মাথায় বজ্রাঘাৎ হ’ল। কামরার সবাই মুখ বাড়িয়ে শ্রীমতীর আগমন-পথের দিকে চেয়ে রইল। ক্যাপ্টেন শুধু অন্ধ দিকে তাকিয়ে রইল। ভাবতেও আর পারছে না এর পরে কী ঘটবে! মার্খা এসে পড়ল ষ্টেশন-মাষ্টার মহা সমারোহে কামরার দরজাটা খুলে ধরে তার গাড়ীতে উঠিয়ে দিল। গাড়ী ছেড়ে দিল হুঁ-হুঁ করে।

ষ্টেশনের জনতা আর নেই। প্র্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আর জাকসন পিপার। এখনো অনেক দূরে ট্রেনটার পিছনের আলো দেখা যাচ্ছে। পিপার অন্তরমনক ভাবে ভাবছেন ওদের দু’জনের কথাবার্তা হচ্ছে এখন। ক্রিপেন কী বলছে মার্খাকে আর মার্খা বা কী বলছে? একটা কুলি লক্ষ্য করল পিপারকে এই ভাঙা দাঁড়িয়ে থাকতে। সে শুনেছে ক্রিপেনের আবির্ভাবের কথা পিপারের কোন দিকে খেয়াল নেই। তিনি লক্ষ্যও করলেন কুলিটাকে। কুলিটা আস্তে-আস্তে পিপারের পাশে এসে মিঃ হুয়েক চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর সাহস করে পিপার কাছে একটা হাত রেখে বলল—‘আপনি আর ভেঁকে দেখতে পা না মিঃ পিপার। ওঁর জরুরি আর মিছে মন খারাপ কর না।’—তার গলার স্বর সমবেদনায় করুণ। পিপার চোখ তাকান। কুলির চোখ দু’টো চকচক করছে। বোকা সমবেদনার অঙ্গ। ভীষণ বিরক্ত হলেন পিপার। কণ্ঠের তাকে বললেন—‘তুমি একটি আস্ত গাধা!’—তার পর ক’রে প্র্যাটফর্মে ছেড়ে চলে গেলেন মোটা পথ ধরে।\*

\* W. W. Jacobsএর ‘Benefit Performance’

অনুবাদ।

শৌ...ও...! হুম...হুম...হুম...! কই কই কই  
কই.....!

কাশ্মীর রণাঙ্গন। যুদ্ধস্থল উরি। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা দশ হাজার ফুটের ওপর। বজ্র পর্বতসারাজি। এক-ইটু বরফ ঢাকা। আপাদমস্তক পশমী সামরিক বস্ত্রে আবৃত যুধমান সেনানী।

আকাশে বোমারু। পুষ্পবৃষ্টির মত অবিরাম বর্ষণ করছে বোমা। দূর-পাল্লার কামান থেকে উড়ে আসছে হলন্ত অগ্নিপিশু। প্রচণ্ড শব্দ, এক ঝলক আগুন। মুহূর্তপূর্বে যারা ছিল, পরমুহূর্তে তারা নেই। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু তারই মধ্যে সবাই ঝাঁড়িয়ে আছে, হাসিমুখে। পায়ে হিম, মাথায় আগুন। বিপদকে, মৃত্যুকে অবহেলা করে অটুট ভাবে কর্তব্য পালন এদের ধর্ম। উদ্ভূতন নেতার আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করাই এদের জীবনের লক্ষ্য।

হেড কোয়ার্টারে বসে কমান্ডিং অফিসার। অপেক্ষা করছেন একটি বেতার সংবাদের। বিপত কয় দিন ধরে একই ব্যাটালিয়ন লড়ে চলেছে, এক-ইটু বরফের মধ্যে। তিন জনের পায়ে গ্যাংরীন হয়েছে। দু'জনের পা কাটতে হয়েছে। আর এক জনেরও বোধ হয় হবে। ডাক্তার কোন ভরসা দিতে পারছেন না। দিনের পর দিন যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত বিকশে ঝাঁড়িয়ে মামুষের বিকশে। দু'জন পাগল হয়ে গেছে। ব্যাটালিয়নকে এখনই সরিয়ে আনা প্রয়োজন। এদের পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভব নয়। কিন্তু উপায় নেই। আর এক দল না আসা পর্যন্ত থাকতেই হবে এদের।

সিগন্যাল অফিসার ঘরে ঢুকলেন ভড়িত বেগে। হাসি উপচে পড়ছে মুখে। মিলিটারী কায়দা ঘরে ঢোকবার আগে ভকুম নেওয়া। আনন্দের আতিশয্যে তুলে গিয়েছেন আদব-কায়দা।

“ওরা এসে পড়েছে স্যার; জীনগরে আছে, কাল এখানে পৌছে যাবে”—বলতে বলতে সংবাদের ফর্মটো এগিয়ে দিলেন কমান্ডিং অফিসারের হাতে। একবার না, দু'বার তিন বার তিনি পড়লেন। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের চোখকে। তার পর লাফিয়ে এসে শেক-হাণ্ড করলেন সিগন্যাল অফিসারের সঙ্গে।

“খ্যাক গড়! আর দু'দিন দেবী হলে আমি পাগল হয়ে যেতুম। ব্যাটালিয়নও হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।”

নূতন দল এসে পড়েছে, ফ্রন্টে ঝাঁড়িয়ে গেছে। পুরানো দল ছুটি পেয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যাবার জ্ঞাত প্রস্তুত। সৈনিকদের সঙ্গে অনেক অফিসাররাও চলে যাবেন। কয়েক জনকে থাকতে হবে কাজ বৃদ্ধির দাবীর জ্ঞাত। ধনক্ষেত্রে যারা যুদ্ধ করে, তারা ছাড়া যুদ্ধ-সংক্রান্তীয় কাজে আরও অনেককে থাকতে হয়। অ্যাগুলাস বাহিনী, রসদ বাহিনী, পরিবহন বাহিনী ইত্যাদি। আর থাকে এক দল লোক—যারা এসব কিছুই মধ্যেই নেই। প্রেম। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারের দল। জনসাধারণকে জানায় এরা রণাঙ্গনের বাবতা। জীবন তুচ্ছ করে এরা যোগাড় করে খবর, তুলে নেয় ছবি। দু'আনার কাগজের এক পাতার একটি কলামের অর্ধেকটা সংবাদ, কি-একটা ছবি—মাত্র এইটুকুর পিছনে কি অমাহুয়িক সাহস এবং কঠোর পরিশ্রম, তা কেউ বলনা করতে পারে না। সব চেয়ে বিপদসঙ্কুল স্থানে তাদের যেতে হয় সব চেয়ে আগে—সুপ নিউজ চাই যে! বৃত্ত্য উদ্ভূত কণার সামনে তারা হেসে সিগারেট ধরায়।

## রণাঙ্গনে

ত্রিযামিনীমোহন কর

সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে এ-কে-রে বিখ্যাত। পুরা নাম অনিলকুমার রায়, কিন্তু এ নামে খুব কম লোকেই তাকে চেনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও গিছিল সে সামরিক সংবাদদাতা হিসাবে। বাফা, অষ্ট্রেলিয়া, সিরিয়া, জার্মানী বহু স্থানেই ঘুরেছে সে। তখনই নাম করেছিল প্রচুর, আর নাম হারিয়েছিলও তখনই। খেতাজরা গুর নাম দিয়েছিল এ-কে-রে। সেই নামই তার চলে গেছে লেখার মধ্যে দিয়ে।

কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল দত্ত বললেন,—“বে, অনেক দিন তো এই মারণ-বজ্রের দর্শক হয়ে রইলে। বস্তুও বড় কম করনি। দিন সাতেক রেষ্ঠ ক্যাম্প ঘরে এস।”

“কিন্তু এখানকার কাজ?” প্রশ্ন করলে সে।

কমান্ডিং অফিসার উত্তর দিলেন—“থাকবে তো জীনগরে। এখান থেকে সংবাদ সব সমগ্রই পাবে। আর সব সাংবাদিকরা তো রইলেন। খবর পাবেই। ভাববার কিছু নেই।”

“বেশ। তবে গুরে আসি।”

“হ্যাঁ। মধ্যে-মধ্যে একটু রিলাক্স করা দরকার। আমিও চাচ্ছি ছাণ্ডভার করে দু'-এক দিনের মধ্যে জীনগর যাব। আজ সব অফিসাররা যাচ্ছে। তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও।”

জীনগর রেষ্ঠ ক্যাম্প। ফোভী দিলখুস' বন্দোবস্ত করে রণাঙ্গন সৈনিকদের দিল খুস করবার। সামরিক এসটাব্লিশমেন্টের এ একটা প্রয়োজনীয় বিভাগ। মন চাক্রা না রাখতে পারলে খুস করা অসম্ভব।

বিখ্যাত নিডোজ হোটেলের হলঘরটা হয়েছে অভিটোরিয়াম। এক প্রান্তে ষ্টেজ। সামনে দু'সারি সোফা অফিসারদের জন্য রিজার্ভ। বাকী সব চেয়ার অগ্নাজ্ঞ সৈনিকদের জ্ঞাত। প্রচুর আয়োজন, নাচ, গান, বিস্কিটার। রোজই লেগে আছে। সপ্তাহে দু'দিন সিনেমা। সৈনিকদের কাছে সিনেমার চেয়ে নাচ-গানে আদর বেশী। রক্ত-মাংসের সজীব দেহের আকর্ষণ।

গান সকল ভাষাতেই করতে হয়। সকল সৈনিকের ভাষা এ নয়। বেশীর ভাগই প্রেমের গান। অবিকারণ করণপূর্ণ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ চাহিদা নেই, তাই পরিবেশনও নেই। আর নাচ সে যে কি আর কি নয় বলা শক্ত। লক্ষ-খাম্প আর যৌ আবেদনই তার মূল। বাকিটা অর্থাৎ সুর, তাল, হৃদয়, ল আহুসঙ্গিক মাত্র। ইঙ্গিত যত স্পষ্ট, সৈনিকদের উল্লাস তত উচ্ছৃঙ্খল।

কিন্তু এসবের ব্যতিক্রম ঘটল শেষ নাচে। হলশুদ্ধ দর্শক ত্ত বিম্বিত। ষ্টেজে যে নর্তকী এল, সে কি মানবী! অপ্সরা-অর্ধ রশ্মিও যেন লজ্জা পায় তার বৌবন-উচ্ছল দেহ-লাবণ্যে। আর ি অপূর্ণ নৃত্য! দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়ও বোধ করি এ নৃত্য দুর্লভ অমৃতান শেষ হয়ে গেল। পদা পড়ে গেল। তবুও সবাই বো রইল নির্বাক হয়ে। মোহিত চিত্ত সকল ইন্দ্রিয়কে যেন বিব করে কেলেছে।



অমুষ্ঠানের পর রে জিগেস করলে ওয়েলফেয়ার অফিসার ক্যাপ্টেন প্রকাশকে।

“অপূর্ব! মেয়েটি কে হে?”

“মেয়েছেলে তো অনেক ছিল। কার কথা বলছ?”

“শেষ নৃত্য যে করল। তা ছাড়া আর সবই তো বীভৎস।”

“তোমারই দেশের মেয়ে। নাম রিণি গুপ্তা। কেমন সুন্দরী দেখলে তো। কেবল নাচ নয়, সব বিষয়েই অসামান্য। তার আর জি গুপ্তার নাতনী। বিলেতে মানুষ। অপূর্ব ইংরেজী বলে। আর সব চেয়ে বড় কথা—অগাধ পরম।”

“আলাপ হয় না?”

“হয়, তবে—”

“তবে কি?” প্রশ্ন করলে রে।

“ভয়ানক গির্জা। অসম্ভব একমের স্রাটি। রেসের মাঠের চেয়েও তাড়াতাড়ি ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স শূন্য হয়ে যাবে ওর সঙ্গে মিশলে।”

“আমি আর ক’দিন এখানে থাকব। খুব জোর দিন তিনেক। তাতে আর কি কতি করতে পারবে? আর আমি তো ঠিক ওর সঙ্গে মিশতে বাচ্ছি না—”

“দেগো বন্ধু, প্রেমে পড়ে যেও না যেন? সাবধান করে দিচ্ছি আগে থেকে। সকলের ওয়েলফেয়ার দেখা আমার কর্তব্য। প্রেমকে সে ঘৃণা করে, গ্যাকামো বলে।”

“তবে তো আলাপ করতই হয়।”

পরিচয় হ’ল মেলা-মেসার সুরিগা হ’ল না। পরদিনই রিণি গুপ্তাকে স্ট্রীটের থেকে প্লেনে চলে যেতে হ’ল নতুন দিল্লী। এক বিশেষ উৎসবে তার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। জঙ্গলটি আগা-সরকারী। উদ্ভেদ কূটনৈতিক। ইতিহাস স্মৃতি হয় রাজ্যে, ডিনারের পর—নাচ-গানের আসরে পানীয়ের হল্লোড়ে। মন ভেজাতে হলে মন মজান দরকার।

সাংবাদিকরা এক বিচিত্র শ্রেণী। আড়চো, আলাপ অথবা সামাজিক অমুষ্ঠান সব থেকেই তারা খুঁজে-পেতে বের করে নেয় জনসাধারণকে পরিবেশন করার মত সংবাদ। এরা ঠিক রিপোর্টার নয়। পটনার পিছনে যা থাকে অজ্ঞাত, তারই সন্ধান দেয় এরা। একেই বলে স্পুন নিউজ।

রিণি গুপ্তাকে ঠেজে দেখে, তার সন্ধে গুজব শুনে এবং পাঁচ জনের কাছ থেকে যৌক্তিক-স্বব নিয়মে রে লিখে ফেললে রিণির সন্ধে একটা রাইট-আপ। সেতার পাশ করে দিলে। সামরিক গোপন কথা কিছুই নেই যখন। রে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে নিজের কাগজের সম্পাদকের কাছে। স্মৃতি করে প্রথম পাতার ছাপা হ’ল, রিণি গুপ্তার ছবি সহ।

সম্পাদক সেন বেক লিখল,—“ভূমি শুধু প্রথম শ্রেণীর সামরিক সংবাদদাতা নয়, প্রথম শ্রেণীর গসিপ-রাইটারও বটে।”

রিণি গুপ্তা কাগজ পড়ে নিজের টেট কামড়ে মনে মনে বললে,—“কোন হতাশ প্রেমিক নিশ্চয়ই। স্বাউগেল! স্মৃ করব।”

কিন্তু মামলা করা চলে না। সাংবাদিকরা আইন বাঁচিয়ে দেখে, খায়াপ-ভাল, সত্য-বিখ্যা, সবই।

সাক্ষ্যের মুখে খামিরে দেওয়া ফ্রাঞ্চেপনের নিকটতম উদাহরণ। রণক্ষেত্রে যুদ্ধবিবর্তির হুকুম তখনই দেওয়া হয় যখন বিশক মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে বিশক পেছু হটেছে আর যত্নক সাক্ষ্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, সেখানে যুদ্ধবিবর্তির হুকুম কি মনস্তত্ত্ব, কি রণতত্ত্ব কোন দিক দিয়েই অমুহোমন করা চলে না। কিন্তু রাজনৈতিক কূট চাল বোঝা স্রদ্ধারও অসাধ্য।

যুদ্ধবিবর্তির পর রে ফিরে এল কলকাতায়। অনর্থক কান্দীরে থাকার কোন মানে হয় না। কি রিপোর্ট সে লিখবে? যুদ্ধ বন্ধ, কোন খবর নেই। কিন্তু তার শিচ্ছনের যে সব কথা তা লেখা চলেবে না। কান্দীরবাসীদের হলে অবিশ্বাস, সৈন্যদের ভেতর অসন্তোষ, এ সব থাকবে সৌচ-স্ববনিকার অন্তরালে। সরকার এর প্রকাশ কিছুতেই সহ্য করবে না।

সম্পাদক সেন বললে,—“মাইনে কিছুটা কমবে। কিন্তু আমায়ের ঠাফেই তুমি থাকবে। তোমার কাজ হবে ‘গসিপ’ লেখা।”

‘ওয়ার কনসপুওন্ট’ থেকে ‘গসিপ-রাইটার’। অনেকটা পতন। অর্থের দিক দিয়েও এবং সম্মানের দিক দিয়েও। তবে বেকার হয়ে পড়ার চেয়ে ভাল। থাকে কি? যা পাবে তাতে মেসে থাকা আর গাওয়া দিবা চলে যাবে। এমন কি কিছু হাতেও থেকে যাবে। রে সম্মত হ’ল।

হয়ত এ কাজটাও সে পেত না। কিন্তু সেনের সঙ্গে বের পরিচয় বড় দিনের। কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল। কিছুটা বন্ধু ছিল বলা চলে। সেট সুরবাডেট চাকরীটা। সেই সঙ্গে আরও একটা কাজের জোগাড় করে দিল সেন।

রে বরাবরই ইংরেজীতে ভাল। লেখাতে এবং বলাতে। সেনের বোন অলকাকে পড়াতে হবে হুণ্ডায় তিন দিন। মাইনে খুব একটা না হলেও খায়াপ নয়।

উভয় কাজেই লেগে পড়ল রে।

রিণি গুপ্তা কলকাতায়। ক্যামাক স্ট্রীটে প্রাসাদোপম ভটালিকা, তিনখানা গাড়ী। অভিজাত সম্প্রদায় এবং সকল সরকারী, বেসরকারী উচ্চ দরের অমুষ্ঠানে সে হ’ল প্রাণ। সোসাইটি চক্রের কেন্দ্রস্থল। বিরাট বিরাট ঘনীদের গাড়ী সব সময়েই তার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে। তাকে বাক দিয়ে ‘গসিপ’ লেখা চলে না।

রে’র কলম যেন হল বনে গেছে। যেমন বেঁধে, তেমনই ছালা দেয়। সংবাদপত্রের পাঠকরা চায় এই সব মুখরোচক কাহিনী পড়তে। কাগজের কাটতি বেড়ে গেছে ছ-ছ করে। রে উন্নতি লাভ করেছে ক’মাসের মধ্যেই। সহকারী সম্পাদকের পদে। কিছুটা লেখার জোরে আর কিছুটা বোধ হয় অলকার সুপারিশে।

অলকা অবাক হয়ে যায়। বুঝতে পারে না বেকের। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রিণির বিরুদ্ধে যে এমন ভিত্ত, তার প্রতি সে এমন শাস্ত কি করে হয়। বোঝে না সে, যে বোজগারের জন্ত সাংবাদিকদের এমন অনেক কিছুই লিখতে হয় যা সে বিশ্বাস পর্দায় করে না। অলকা মনে করে বোধ হয় তার প্রতি রে’র দুর্বলতা আছে। সেই ধারণায় বেশ একটু কষ্টও চালায়। রে যেনে নেয় নীরবে। অর্থ

তার প্রয়োজন। বস্তুতঃ সম্মানে আঘাত না লাগছে, কথা শুনেও  
দেখ কি? অলংকার ধারণা হয়ে ওঠে আরও বহুত্ব।

প্রিন্স বামদেবের সঙ্গে ইদানীং রিণির মেলা-মেশাটা খুব বেড়ে  
গেছে। যেখানে রিণি, সেখানেই প্রিন্স। অনেক কথা, অনেক  
জল্পনা-কল্পনা চলছে ওদের নিয়ে অভিজাত সোসাইটির মধ্যে। অগাধ  
টাকা প্রিন্সের, বিলতে ফেরত। আর চেহারাও নেহাৎ মন্দ নয়।

সম্প্রতি ওরা গেছে দার্জিলিং। প্রিন্সেরই এক বাড়ীতে উঠেছে।  
প্রিন্স উঠেছেন অল্প এক বাড়ীতে। রিণির সঙ্গে আছেন রিণির  
পিসী। শ্যোনদুর্গি মহিলাটির। আর বিষয়-বুদ্ধিও খুব প্রখর।  
প্রিন্স তাঁকে তোয়াজ করছেন খুবই। যদি রিণি-বড় লাভ হয়।

সেন পাঠিয়েছে রে'কে দার্জিলিং। 'গসিপ' লেখবার এমন  
সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। ঢালাও হুকুম, বস ইচ্ছে খরচ  
কর। ওদের সোসাইটিতে মিশে হাঁড়ির খবর জানতে হবে। তার পর  
হাটে হাঁড়ি-ভাঙ্গা।

দার্জিলিং প্রিন্সের বাড়ীর কাছাকাছি এক হোটেলে গিয়ে  
উঠল রে। খোঁজ করে যত ক্লাবে আর আড্ডায় প্রিন্স আর রিণির  
যাওয়াত, সবতেই সেও পড়ল ঢুকে। এখানে রে স্বনামে পরিচিত।  
অনিলকুমার রায় কিছু দিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে বেমালাম গেল  
মিশে। টাকার জোরে আর পালাশ-করা ব্যবহারে সেও উঠল  
এক উচ্চল জ্যোতিষ্ক হয়ে। অনেক কিছু দেখল, জানল, শুনল।  
ফলে কাগজে রে'র নামীয় যে লেখা বেরোল রিণি ও প্রিন্সকে নিয়ে  
তা যেমন তীব্র তেমনই তিক্ত।

চারের টেবিলে রিণি বললে প্রিন্সকে,—“ছোটলোকের কাণ্ডটা  
দেখেছেন”—কাগজটা দিলে এগিয়ে প্রিন্সের দিকে।

লেখাটা পড়ে প্রিন্স উঠলেন বলে। টেবিলে ঘূসি মেয়ে  
বললেন,—“কেস করব—”

রিণি বিজ্ঞপের হাসি হেসে বলল—“তাতে কেলেঙ্কারি বাড়বে  
বই কমবে না। ইগনোর করাই একমাত্র উপায়। তবে এক কাজ  
করা যায়।”

আগ্রহ-কণ্ঠে প্রিন্স প্রশ্ন করলেন,—“কি?”

“অনিল বাবুকে বলে একটা কাউন্টার আর্টিকেল লেখাব।  
যে লোকটা যে স্বাউনডেল তাই প্রমাণ করাব—”

“ঐ অনিল বাবু না কে, ওর সঙ্গে তোমার বেশী মেলা-মেশাটা  
আমি বিশেষ পছন্দ করি না।”—রাগ আর অভিমান-মিশ্রিত স্বরে  
বললেন প্রিন্স। ঋণে চোটে চাপলে রিণি। মুখ হয়ে উঠল  
কঠোর। ধারাল কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—“আমি কার সঙ্গে মিশব, তা  
কি আপনি ঠিক করে দেবেন?”

কথাটা বলা যে ঠিক হয়নি, বলে কেলেই প্রিন্স বুঝতে  
পেরেছিলেন। তাই ভাড়াভাড়া নিজেকে সামলে নিয়ে অমৃত্যুপ  
প্রকাশ করলেন বিনীত ভাবে।

“না, না, আমি তা মীন করিনি। বড়ই হুঃখিত। আমার  
ভুল বুঝো না।”

জলা পাঁহাড়ের ওপর এক বেঞ্চে বসে রিণি আর অনিল। রে  
নয়, এখন সে অনিলকুমার রায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আবহাওয়া,  
সিনেমা ইত্যাদির কথা বলতে বলতে রিণি অবতারণা করলে আসল  
কথার।

“আচ্ছা অনিল বাবু, আমাকে আপনার কি বকম মনে হয়?”

মাথা চুলকে অনিল বললে,—“আপনার সঙ্গে আমার বেশী  
দিনের পরিচয় নয়। বিলম্বিত করে বলবার মত জ্ঞান আমার নেই।  
তবে যতটুকু দেখছি তাতে যা মনে হয়, তাই বলতে পারি।”

“বেশ, তাই বলুন।”

“আপনি স্কন্দরী এবং শিক্ষিত। লোকের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতা  
আপনার প্রচুর। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া যে-কোন ব্যক্তির  
পক্ষে পরম সৌভাগ্য।”

“ধন্যবাদ”—হেসে উত্তর দিলে রিণি,—“এইবার আপনাকে এই  
খবরের কাগজটা পড়তে অনুরোধ করছি। আমার সন্দেহ কি  
লিখেছে, দেখুন।”

অনিলের হাতে ধিয়ে দিলে রিণি, তার সন্দেহ রে'র লেখা  
প্রবন্ধটি।

ভীষণ অশ্রুতে পড়ে গেল রে। তার লেখা তাকেই দেখান হচ্ছে  
সমালোচনার জন্ত। অথচ রহস্য বজায় রাখতেই হবে। সুরতরাং  
কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। আঁমতা-আমতা করে বললে,—  
“বোধ হয় লেখক আপনাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। দূর থেকে দেখে  
এবং পাঁচ জনের কথা শুনে লিখেছে। ভাল করে মিশে দেখলে  
এ রকম কথা লিখতেই পারত না।

“আচ্ছা, আপনি কাগজে লেখেন কি?” হঠাৎ প্রশ্ন করে বলল  
রিণি। চমকে উঠল অনিল। তবে কি তাই গোপন কথা ফাঁস  
হয়ে গেছে। মুছ কণ্ঠে বললে,—“কই না তো। বিশেষ কিছু,  
মানে—”

রিণি নিজের থেকেই বলল,—“একটু সাহায্য করতে পারেন  
আমায়?”

“কি রকম বলুন। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করব।”

“আপনি আমার সন্দেহ যদি কিছু লেখেন এই স্বাউনডেলের  
লেখার প্রতিবাদ করে?”

এতক্ষণে যেন ধড়ে প্রাণ এল অনিলের। যাক, রহস্য ফাঁস  
হয়নি। কি উৎকর্ষার মধ্যেই কাটছিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে  
উত্তর দিলে,—বেশ তো। চেষ্টা করব। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে  
লিখব। তবে লেখাটা পাঠাবার আগে আপনাকে একবার দেখে  
দিতে হবে।”

“নিশ্চয়ই।”

লেখাটা রিণির খুবই পছন্দ হ'ল। ঐযং ঘণ্টা-মধ্যে পাঠিয়ে  
দেওয়া হল কাগজে। এই সূত্রে রিণির সঙ্গে অনিলের পরিচয়টা  
হয়ে গেল বেশ ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতা তাদের আনন্দ দিলেও পীড়িত  
করে ভুলল প্রিন্স বামদেবকে। তিনি খরচ করে চলেছেন অজে  
পয়সা রিণির জন্ত আর রিণি—রাগে রিণি করে ওঠে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ,  
কিন্তু কিছু করতে অথবা বলতে তাঁর সাহস হয় না। রিণির যা  
মেজাজ, সেয়ে—

প্রিন্স বন্দোবস্ত করলেন রিণিকে টাইগার হিল থেকে সূর্য্যোদয় দেখাবার। তাঁর গাড়ী হঠাৎ খারাপ হয়ে বাওয়াতে গ্যারেজ থেকে একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করলেন। রিণি প্রোপোজ করলে সঙ্গে অনিল বারুকে নিলে কেমন হয়? প্রিন্স গম্ভীর হয়ে বললেন, এখন আর তা সম্ভব নয়। গাড়ী ভাড়া করা হয়ে গেছে। খুব ছোট গাড়ী না হ'লে শেষ অবধি উঠতে পারবে না। রিণি, তার পিসী, তিনি নিজে আর ডাইভারের বেশী গাড়ীতে জায়গা হবে না। রিণি আর কি করে অগত্যা।

তবে রিণি অনিলকে জানালে সে কথা। অনিল হেসে বললে, “দেখে নেবেন,—শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই আপনাকে টাইগার হিলে যেতে হবে সূর্য্যোদয় দেখতে।”

রিণি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—“তার মানে?”

অনিল রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বললে,—“পুরুষকারজনিত বরাত।”

সেই দিনই গ্যারেজে গিয়ে হাজির হ'ল অনিল। প্রিন্সের ভাড়া-করা গাড়ী ও ডাইভার বুঁজে পেতে বেশী বিলম্ব হ'ল না। অনিলের পকেটের কিছু টাকা ডাইভারের পকেটে স্থান পেল। ঠিক হ'ল, টাইগার হিলের পথে হঠাৎ গাড়ী খারাপ হয়ে বাবে, আর অনিলের গাড়ী চলে বাবার পর আবার গাড়ী চলতে সক্ষম হয়ে উঠবে। নিজের জন্ত অনিল ভাড়া করলে একটি টু-সীটার। ডাইভার আর সে। অতি কষ্টে আর এক জনের স্থান হতে পারে।

রাত তিনটে। প্রিন্সের গাড়ী ছুটে চলেছে টাইগার হিলের পথে। সামনে ডাইভার আর প্রিন্স, পিছনে রিণি আর তার পিসী। উজ্জ্বলিত ভাবে প্রিন্স পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে গল্প করছেন রিণির সঙ্গে। হঠাৎ ক্যাচ করে শব্দ। ডাইভার শ্রেক করেছে। গাড়ীতে গোলমাল। নেমে দেখতে হবে।

ডাইভার গাড়ীর বনেট খুলে নিবিষ্ট মনে সারাবার চেষ্টা করছে খুঁতটা, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার পকেটে স্থান পেয়েছে গাড়ীর ভাল প্রাগণ্ডা আর পকেটের ভাস্কর প্রাগ লাগিয়ে দিয়েছে গাড়ীতে। তাই যত বার চেষ্টা করে গাড়ী আর ঠাঁট নেয় না। প্রিন্স অগ্নিশর্মা হয়ে হিন্দী-ইংরেজী মিশিয়ে প্রচণ্ড ভাবে গালমন্দ করছেন ডাইভারকে। সে মুখ কাঁচুমাঁচু করে নীরবে গাড়ী সারাবার ভাগ করে চলেছে। আর রিণি মধ্যে মধ্যে বলছে প্রিন্সকে,—“আহা, বেচারাকে অমন করে বকবেন না।”

প্রিন্স হুকার দিয়ে উঠলেন—“বকবেন না! আলবৎ বকবে। ভাড়াভাড়ি না পৌছতে পারলে সূর্য্যোদয় আর দেখা হবে না।”

পিসী বললেন, “উপায় কি! সবই বরাত। কিন্তু ডাইভারকে বকলে তো আর কোন সুরাহা হবে না।”

কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রিন্স চীৎকার করছেন ক্রমাগত,—“ডায়মন্ড আদায় করব, কেস করব—”

ভোঁক, ভোঁক, ক্যাচ—প্রিন্সের গাড়ীর পিছনে এসে একটা টু-সীটার ঝাঁড়াল। আরোহী নেমে এসে প্রশ্ন করলে—“কি হয়েছে?”

রিণি অবাক হয়ে গেল। তার সামনে ঝাঁড়িয়ে অনিল।

প্রিন্স গর্জ্জ উঠলেন,—“আর বলেন কেন? গাড়ী মাঝ-রাষ্টায় অচল হয়ে পড়েছে। বাচ্ছিলুম সূর্য্যোদয় দেখতে, তা আর হ'ল না দেখছি—”

রিণি বললে,—“প্রিন্স বড়ই হুঃখিত হয়েছেন আমার সূর্য্যোদয় দেখা হবে না বলে—”

অনিল হুঃখিত ভাবে জানালে,—“তাই ত! আপনারা ভারী বিপদে পড়ে গেছেন দেখছি। আমার গাড়ীটা আবার ভয়ানক ছোট। মেরে-কেটে এক জনের স্থান হতে পারে। আপনারা তিন জন—”

পিসী বলে উঠলেন,—“আমরা নয় পরে বাব বাবা! তুমি রিণিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। ও বেচারী এতটা এসে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যাবে—”

রিণি আপত্তি করলে,—“না না, তোমরা সবাই পড়ে থাকবে—”

পিসী বাধা দিলেন,—“আপত্তি করিসনি। উঠে পড়। দেয়ী হয়ে যাবে—”

রিণি প্রিন্সের দিকে চাইলে। প্রিন্সের আপত্তি করবার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও ভয়ভীর খাতিরে করা চলল না। কণ্ঠহাসি হেসে বললে,—“হ্যাঁ, তুমি চলে যাও রিণি। অন্ততঃ এক জনের তো দেখা হবে।”

রিণি উঠে পড়ল গাড়ীতে, অনিলের পাশে। গাড়ী চলে গেল এগিয়ে। প্রিন্সের হৃৎপিণ্ড যেন মথিত করে।

রাগে ফেটে পড়লেন প্রিন্স। কাল ঝড়লেন বেচারী ডাইভারের ওপর।

দূর—বহু দূর তুষার-মণ্ডিত পাহাড়ের পিছন থেকে উঠছে নতুন দিনের অগ্রদূত। বিচিত্র রাগে রঞ্জিত দিগন্ত। রূপোর পাহাড়ে যেন আগুন ধরে গেছে। রক্তের মেলা বসেছে পূর্বে। উজ্জল, প্রাণের সে রঙ, চাওয়া যায় না বেশীক্ষণ। টাইগার হিলে ঝাঁড়িয়ে দেখছে নবাক্ষণ-ছটা অনিল আর রিণি। পাশাপাশি। মুখে এসে পড়েছে তীব্র জ্যোতি। যেন নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছে ওরা নতুন দিনের সাথে-সাথে। অনিল হেসে বললে,—“দেখলেন পুরুষকার আর বরাতের যোগাযোগ—”

রিণি সগজ্জ ভাবে বললে,—“ধন্য আপনি! কিন্তু এ জন্ত অনেক কাঁঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে তো। কেন?”

অনিল উত্তর দিলে,—“সব কেন'র কি উত্তর দেওয়া যায়? সব বলতে পারেন।”

“ওধু সখ? আর কিছু না?”

“জীবনে নতুন দিনের সন্ধানে মাহুয কি না করে?”

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাঁফাতে-হাঁফাতে পাহাড়ে উঠা এলেন প্রিন্স আর রিণির পিসী। রিণি আর অনিলকে পাশাপাশি ঝাঁড়িয়ে হাসাহাসি করতে দেখে প্রিন্সের মেজাজ গেল ভীষণ তিরিকি হয়ে। কি-একটা বলতে বাচ্ছিলেন এমন সময় রিণি বলে উঠল,—“আমাদের একটা ছবি তুলুন না। পিছনে নবাক্ষণরাগ-রঞ্জিত আকাশ, ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে ভারী স্নন্দর হবে।”

প্রিন্স আপত্তি করতে বাচ্ছিলেন। রিণি মধুর স্বরে কাকুতি মিশিয়ে বলল,—“প্লাজ।”

প্রিন্সের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ক্যামেরা করে উঠল 'ক্লিক'।

সম্পাদক নিশীথ সেন হস্তদস্ত হয়ে আপিস থেকে বাড়ী কিয়ে ডাক দিলে অলকাকে। অলকা এসে ঘরে ঢুকতেই নিশীথ একটা রচনা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, —“ফুল! গর্জিত একটা। কি সব ট্র্যাশ লিখে পাঠিয়েছে।”

অলকা ভ্রাতার চঠাৎ বিস্ফোরণের কারণ বুঝতে না পেয়ে বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলে,—কি হ'ল? গাল-মন্দ করছ কাকে?”

নিশীথ শ্লেষপূর্ণ স্বরে উত্তর দিলে,—“কাকে আবার? তোমার মাষ্টারকে। ঐ অনিলটাকে।”

অলকা তখনও কিছু বুঝতে পারলে না। পুনরায় প্রশ্ন করলে,—“কেন? কি হয়েছে?”

নিশীথ বেগে জবাব দিলে,—“বাজে প্রশ্ন না করে ঐ ছাই-পাশ লেখাটা পড়ে দেখ। তা হলেই সব বুঝতে পারবে।”

অলকা পড়তে লাগল আর নিশীথ মত হস্তীর মত ঘরময় হুপনাপ করে বেড়াতে লাগল।

তার পড়া শেষ হতেই নিশীথ বললে,—“দেখলে লোকটার কাণ্ড! তোমার কথ্যতেই ওকে কাগজে বেখেছিলুম, ছাড়িয়ে দিইনি। ওর যাতে সুবিধা হয় সেই জন্ম তোমার প্রাইভেট টিউটরও করে দিয়েছিলুম। এখন দেখছ তো, লোকটা একেবারে অপদার্থ।”

অলকা কৌশল করে উঠল,—“আমার কথ্যতে বেখেছিলে? মোটেই না। নিজের কাগজের সুবিধার জন্মই ওর চাকরী পাওনি। ওর সুবিধার কথা ভেবে তো তোমার ঘুম হচ্ছে না। আর প্রাইভেট টিউটর যে বেখেছিলে তার কারণ এত কমে আর কোন টিউটর পাওয়া যায় না।”

নিশীথ অলকার স্পষ্ট বাক্যে একটু দমে গেল। বললে,—“তা বাই হোক, অনিল নিজের কর্তব্য কর্তে অবহেলা করেছে। রিপির সম্বন্ধে এ লেখা পাঠান ঠিক হয়নি। এটাকে ‘গসিপ রাইটিং’ বলে না।”

“কেন বলে না শুনি?” ‘গসিপ রাইটিং’ মানে কি কেবল নিন্দা পাণ্ডুয়া? ঘরের হাঁড়ির খবর টেনে বার করা আর হাটে হাঁড়ি ভাঙা?”

একেবারে চুপসে গেল নিশীথ। এর কি উত্তর দেবে? অকাত্য খুঁজি। আমতা-আমতা করে বললে,—“তা নয়। মানে, লেখার দোষ আমি দিচ্ছি না, তবে কাগজে এ সব বিশেষ সুবিধা হবে না। লোকে চায় একটু খুশোরচক, কি বলে—মানে, একটু খেউড়।”

অলকা এইবার হেসে ফেললে। বললে,—“এই সত্যি কথাটা আগে বললেই হ'ত। লেখার কোন দোষ নেই। ভাবা সন্দর। তবে বাজারে কাটবে না। লোকে যা চায় এতে তা নেই। কি বল দাশা?”

“হ্যাঁ, এই কথাই তো আমি বলছি।”

“তোমার এই অভিযোগ আমি মেনে নিচ্ছি। এ লেখার কোন দোষ নেই। প্যানপানে। এ-কে-রে'র কলম দিয়ে এ লেখা বার হওয়া ঠিক হয়নি। পড়ে মনে হয় বেন লেখকের রিপির প্রতি একটু দৌরল্য আছে। পক্ষপাতবোধের গন্ধ রয়েছে।”

“রাইস ইট। এ-কে-রে'র নামে এ লেখা বার হতে পারে না। এ লেখা আমি ছাপব না। আর একটা লেখা পাঠাতে লিখে দিচ্ছি।”

“তা না হয় ছাপলে না। চিঠিও না হয় মিলে। কিন্তু এর পরের লেখায়ও যদি এই দোষ থাকে? তোমার এক চিঠিতেই কি দৌরল্য উৎপন্ন হবে?”

“তা বটে। এটা আমি ভাবিনি। কিন্তু যদি বাবে বাবে এই ধরনের লেখা পাঠাতে থাকে, তবে ওকে রেখে আমার লাভ কি? চাকরী ছাড়িয়ে দেব।”

“চাকরী ছাড়ান তো খুব সোজা। কলমের একটা খোঁচার হয়ে বাবে। কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে লেখা দরকার। লোকটা ইচ্ছে করলে অদ্ভুত ভাল লিখতে পারে; নয় কি?”

“নিশ্চয়ই। সেই জন্মই তো ওকে রেখেছি। কিন্তু হঠাৎ এ কি?”

“স্বদয়ের দৌরল্য। এইটা কাটাতে পারলেই আবার সব ঠিক হয়ে বাবে।”

“তা তো বুলুহ। কিন্তু কি করে?”

“রিপি অনিলকুমারকে জানে, এ-কে-রে তার অপরিচিত। দুই নাম একই ব্যক্তির জানলে ওর ছায়া মড়াত না। তুমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এ-কে-রে সম্বন্ধে কাগজে একটা লেখা বার করে দাও। সেই সঙ্গে ছবিও দিয়ে দিও। রিপি তখনই বুঝতে পারবে এই অনিলকুমারই এ-কে-রে। এই ব্যক্তিই এত দিন ধরে ওর কুৎসা করে এসেছে। তার পর স্রেফ মারতে বাকী রাখবে। দৌরল্য কোথায় মিলিয়ে বাবে। কলে পূর্বের চেয়ে আরও ধারাল লেখা বার হবে এ-কে-রে'র কলম থেকে।”

নিশীথ আনন্দে লাফিয়ে উঠল। “অদ্ভুত বুদ্ধি! সেই জন্ম বাবা তোকে কাগজের অর্ধেক স্বধ দিয়ে গেছেন। এ বুদ্ধি আমার সাধারণ কোন দিন আসত না। আমি চলুম আফিসে। কালই এ-কে-রে'র জীবনী কাগজে বার করে দেব।”

“খেয়ে বাবে না?”—প্রশ্ন করলে অলকা।

“ফিরে এসে”—সিঁড়ি থেকে উত্তর দিলে নিশীথ।

নিশীথ চলে গেল। অলকা দাঁতে দাঁত চেপে বললে,—“অনিল একটা স্বাউনডেল। আমার সঙ্গে ট্রেচারী! এর কল ভীষণ হবে।”

প্রিন্স উত্তরোত্তর চটেই চলেছেন। খুবই স্বাভাবিক। রিপিকে তিনিই এনেছেন দার্জিলিঙে, তাঁর নিজের বাড়ী দিয়েছেন থাকতে। আর তার পিছনে টাকা খরচ করেই চলেছেন ক্রমাগত। কিন্তু কি রিটার্ন পেয়েছেন? সবই জন্ম ঘা ঢালা, কোথাকার কে অনিলকুমার—তাঁর পায়ের ন'খের যোগ্য নয়—সেই কি মা বসল আসর জাঁকিয়ে। এক পরসাত খরচ না করে। আর তিনি হয়ে গেলেন কোণঠাসা। মেজাজ গরম এবং মন খারাপ হবারই কথা। তিনি খালি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে অনিলকুমারকে অপদহ করা যায়। হ'—এক বার চেষ্টা করে নিজেই অপদহ হয়েছেন, তার কারণ রিপি যে অনিলের স্বপক্ষে। নইলে এত দিনে.....

না; ওকে দার্জিলিঙ থেকে তাকাতাই হবে, যেমন করে হোক।

ক'দিন ভ'ল রিগি কাসি'রাং গেছে। কোন এক আত্মীয়দের বাড়ী। দু'-চার দিন পরে ফিরবে। অনিলের বিশেষ কোন কাজ নেই হাতে। তাই সার্কলের দু'-একটা খুখরোচক নিউজ মধ্যে মধ্যে লিখে পাঠায় নিশীথের কাগজে। বাকী সময়টা পথে পথে টো-টো করে কাটায়।

সেদিন ষ্টেশনে বেড়াচ্ছে উদ্বেগবিহীন ভাবে। এমন সময় দার্জিলিং মেল এসে হাজির। সেদিনকার কাগজ নামল ট্রেন থেকে। অনিল একটা কাগজ কিনলে। তার নিজের কাগজ অর্থাৎ যে কাগজে সে লেখে। বিশেষ আগ্রহ ছিল রিগির সম্পর্কে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখাটা ছাপার অঙ্করে দেখবার জন্য। কিন্তু অবাক হয়ে গেল। কাগজে তার প্রবন্ধ নেই, আছে তার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। সচিৎ জীবনী।

প্রথমটা খুব খুশী ভ'ল অনিল রায়। নিশীথ যে তাকে এ ধরনের পাব্লিসিটি দেবে, এটা সে আশা করেনি। ভেরি কাইণ্ড অব ডিম। কিন্তু তা ক্ষণিকের জ্ঞান। পরেই রহস্য ভেদ করে ফেললে। এ-কে-রে আর অনিলকুমার রায় যে অভিন্ন, তারই প্রমাণ রয়েছে কাগজের ছবিতে। এর পর সে আর রিগিকে মুখ দেখাবে কি করে? ভাগ্যে আজ রিগি দার্জিলিঙে নেই। কাল আসবে। সূত্রাং আজ রাতেই তাকে দার্জিলিঙ ত্যাগ করতে হবে। সে যে সত্যই মত বদলে রিগির সম্বন্ধে লিখেছে, এ কথা কিছুতেই রিগিকে বোঝান যাবে না। রিগি ভাববে, এও একটা কৌশল মাত্র। কোন যুক্তিই চলেবে না। তার ওপর প্রিন্স...

সেই বিকেলেই কাউকে কিছু না বলে, হোটেলের প্রাণ্য মিটিয়ে অনিল দার্জিলিং ত্যাগ করল।

কথা ছিল লাঞ্চ থেয়ে রিগি কাসি'রাং থেকে বেরোবে। তিনটা নাগাদ ঘুমে পৌছবে। প্রিন্স আর অনিল ঘুমে ওর জল অপেক্ষা করবে। তার পর সবাই বৌদ্ধ মন্দির দেখে দার্জিলিঙে ফিরবে।

সওয়া তিনটে নাগাদ ঘুমে এসে রিগি দেখলে মোড়ের মাথায় প্রিন্স একা দাঁড়িয়ে। তুষিত দৃষ্টিতে এমিক-ওমিক চাইলে কিন্তু সে নেই। আসিনি? বিশ্বাস করতে পারলে না রিগি নিজের চোখকে। প্রিন্সকে জিজ্ঞেস করলে,—“অনিল বাবু এলেন না?” প্রিন্স হেসে উত্তর দিলেন,—“না, সে দার্জিলিঙে নেই।”

বিস্মিত হ'ল রিগি। “দার্জিলিঙে নেই মানে?”

“মানে খুব সরল। দার্জিলিঙ, ত্যাগ করে পাগিয়েছে।”

“কিন্তু আমার সঙ্গে একবার দেখা পর্যন্ত না করে—”

বাধা দিয়ে বললেন প্রিন্স,—“দেখা করার উপায় ছিল না।”

ঈষৎ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে রিগি বললে,—“হেয়ালী ছেড়ে একটু স্পষ্ট করে বলুন। আমি আপনায় কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। এ ভাবে হঠাৎ পালাবার কারণ? আপনি কি বলতে চান?”

প্রিন্স গভীর হয়ে উত্তর দিলেন,—“আমি কিছুই বলতে চাই না। তুমি এই খবরের কাগজটা দেখ। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।”

রিগি এ-কে-রে'র জীবনী ও ছবির পাতাটার চোখ বুন্ডিয়ে কাগজটাকে দলা পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেল দিলে।

মুখ দিয়ে কেবল একটি কথা বার হ'ল—“বিশ্বাসঘাতক!” ঐ একটা কথাতেই তার মনের সকল ভাব প্রকাশ পেল।

প্রিন্স নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন।

অনিল কলকাতার ফিরেই সম্পাদক নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা করলে। নিশীথের ব্যবহারে, আড়-ছাড় ভাব দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—“কি ব্যাপার বল তো?”

নিশীথ গভীর হয়ে উত্তর দিলে,—“কিছু না।”

“কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। কথাবার্তায় সেই রকমই মনে হচ্ছে। আমার রচনা না ছেপে হঠাৎ আমার লাইক স্কেচ কাগজে বার হ'ল কেন?”

“সম্পাদক সে জ্ঞান জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। তবু বলছি। রচনা আমাদের কাগজের পলিসির সঙ্গে খাপ খায় না। আর তোমার জীবনী ছাপা হ'ল এ-কে-রে'র সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।”

“ধন্যবাদ। কিন্তু তার কলে আমি দার্জিলিঙে ছাড়তে বাধ্য হলুম। অনিলকুমার আর এ-কে-রে একই লোক জানতে পারবার পর আমার পক্ষে আর রিগির সম্বন্ধে “ছুপ” নিউজ জোগাড় করা সম্ভব হবে না।”

“অমনিতেও সম্ভব হ'ত না। এত টাকা খরচ করে তোমায় দার্জিলিঙে পাঠিয়ে আমাদের কি লাভ হ'ল? য়া লিখে পাঠালে তা স্রেফ রাবিশ। আমাদের কোন কাজেই লাগল না। অনর্থক পরয়া নষ্ট হ'ল। সূত্রাং তোমার কাছ থেকে রিগি সম্পর্কে কোন রচনাট আশা করি না।”

“তবে এখন আমার কাজ কি?”

“কিছু নয়।”

“কিছু কাজ না থাকলে তো চাকরী থাকে না।”

“চাকরী যে থাকবেই এমন তো কোন কথা নেই। বাই হোক, তুমি আজ সন্ধ্যার সময় একবার আমাদের বাড়ী যেও। তখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রাণ ঠিক করা যাবে। অলকাও এই কাগজের অংশীদার। তাকে না জিজ্ঞেস করে কিছু করা সম্ভব নয়।”

সন্ধ্যার সময় অনিল ছুফ-ছুফ বকে নিশীথের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। অলকা বাইরের ঘরেই বসেছিল। অনিল চুকতেই ছোট একটি নমস্কার করে কৃত্রিম বিষয় সহ বললে,—“এই যে অনিল বাবু, দার্জিলিঙ থেকে কবে ফিরলেন?”

প্রতিনমস্কার করে অনিল উত্তর দিলে,—“আজই। সকালে।”

শ্রিতহাস্য সহ অলকা বললে,—“এসেই দেখা করতে এসেছেন। ভেরি কাইণ্ড অব ইউ!”

অনিল একটু গৌতো-হাসি হাসলে। উত্তর আর কি দেবে?

অলকাই পুনরায় বললে,—“বাদায় সঙ্গে দেখা হয়েছে?”

“হ্যাঁ, এসেই অফিসে গিছলুম দেখা করতে। সে বাড়ীতে দেখা করতে বসেছে।”

“আই সী। আর নতুন কি লিখলেন? অনেক দিন আপনায় কোন লেখা দেখিনি।”

“আর দেখবেনও না বোধ হয়। নিশীথ বলছিল ‘গসিপ’ লেখবার আর প্রয়োজন হবে না।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। রিণির সন্ধানে কি একটা লেখা নিয়ে দানা খুব রাগাণুগি করছিল। কি লিখেছিলেন?”

“আমি একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার চরিত্র আলোচনা করেছিলুম।”

“ওঃ! দানা যদি তার কাগজে ঐ ধরনের লেখা ছাপতে রাজী না হয়, তবে যেমন চায় সেই রকম লিখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর অজ্ঞ তো কলম বন্ধ রাখা চলবে না।”

“তা তো চলবেই না। তাহলে যে পেট চলবে না। এখন ঠিক বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন বুঝছি যে, লেখকের নিজের মতামত বিলাস মাত্র। যাদের পরমা আছে, তাদেরই ঐ ধরনের বিলাস-ব্যসন শোভা পায়। যাদের করে খেতে হবে তাদের পক্ষে মালিকের ইচ্ছাই শিরোধার্য করে নিতে হবে।”

“বেটার লেট জান নেভার। এখন যে জান লাভ করে ফেলেছেন সেই ভাবেই চালিয়ে যান। আমি না হয় আপনার সঙ্গে দাদাকে বলব।”

“বক্তাবাদ!”

“আর দেখুন, আমার পড়াশুনা আবার আগের মতই চালাতে চাই। আপনার কোন আপত্তি নেই তো?”

“না, না। বেশ, কাল থেকেই—”

“কাল কেন? আজ থেকেই। চলুন, আমার ঘরে—”

অনিলের চলে যাওয়াতে প্রিন্স খুব খুশী। যাক, একটা

আপদ গেছে। কিন্তু প্রিন্স খুশী হলে কি হবে, রিণির মেজাজ বিশেষ সুবিধাজনক নয়। সব সময়ই কি রকম যেন মন-মরা। তাকে আনন্দ দেবার ব্যত রকম চেষ্টাই প্রিন্স করেন, কোনটোতেই সে যেন প্রাণ খুলে সাড়া দিতে পারে না। প্রিন্স কিন্তু দমবার পাত্র নন। চেষ্টা অবিরত চলতে থাকে। শেষ রিণিই এক দিন হাঁফিয়ে উঠে বলে,—“কলকাতায় ফেরা যাক। আর এখানে ভাল লাগছে না। ছোট জায়গা, কিছু দিনের মধ্যেই বোরিং হয়ে পড়ে।”

দার্জিলিং থেকে কলকাতাগামী ট্রেনের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসে আছেন প্রিন্স বামদেব, রিণি গুপ্তা ও তার পিসী। শিয়ালদহ পৌঁছবার কিছু পূর্বে রিণি বামদেবের চুকল টয়েলেট, মেকআপ ইত্যাদিতে ফিনিশিং টাচ দিতে। বার হ’ল ঠিক যখন ট্রেন ষ্টেশনে চুকছে। রিণিকে দেখে প্রিন্স এবং পিসী হু’জনেই থ! রিণির মাথায় অল্প একটু ঘোমটা, কপালের মাঝে সিন্দূরের টিপ। নী খিতে সিন্দূর, হাতে নোয়া।

প্রিন্স বিস্মিত হয়ে বললেন—“এ কি!”

রিণি মুচকি হেসে উত্তর দিলে—“যুদ্ধবোম্বা।”

আর কিছু বলবার সময় হ’ল না। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে তখন ঝাড়িয়ে গেছে।

রিণিরা কলকাতায় হঠাৎ এলেও সে খবর সাংবাদিক মহলে চাপা ছিল না। সব কাগজ-ওয়ারিরাই উৎসুক প্রিন্স-রিণির রোম্যান্স পরিবেশন করতে। ভদ্র অথবা অভদ্র যে ভাবেই



Phone  
3468-B.B



**আর, সি, দেও সন্ন্য**  
**ডুয়েলার্স**  
**১১১ - বহুবাড়ার স্ট্রীট - কলিকাতা**

পরদিন সকালেই নিশীথের কাগজে রিণির বিরুদ্ধে অনিলের মানহানির মোকদ্দমার কথা বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হ'ল। চারি দিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

কেসে অনিলের হার হ'ল। রিণির কোন উক্তির ত্রুটি ধরা গেল না। তার বক্তব্য—সে আর অনিল এক দিন লেবঙ্গে গিছিল। সঙ্গে আর কেউ ছিল না। সেখানে নীলকণ্ঠ নামক এক ব্রাহ্মণ তার সঙ্গে অনিলের বিবাহ ঘের।

বৌজ নিয়ে জানা গেল তার প্রত্যেক কথাটা সত্য।

অনিলের উকীল প্রতিবাদ করেছিল,—“কিন্তু এ সব কথায় বিয়ে হয়েছে তা তো প্রমাণ হচ্ছে না।”

প্রত্যুত্তরে রিণির উকীল জানিয়েছিল,—“হয়নি তাও তো প্রমাণ হচ্ছে না। নীলকণ্ঠ বাবু কিছু দিন পূর্বে মারা গেছেন, নইলে তাকেই আমরা হাজির করতে পারতুম।”

তার পর জজ, জুরী ও জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল,—“ধন্যবতার ও জুরী মহোদয়গণ, কোন হিন্দু-মহিলা কাউকে মিথ্যা ভাবে স্বামী বলতে পারে না। অবশ্য অনেক সময় অর্থ বা সম্পত্তির লোভে এমনটা যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়, কারণ অনিল বাবুর এমন অর্থ বা সম্পত্তি নেই। তা ছাড়া আমার ক্লায়েন্ট প্রচুর বিতশালিনী। তবে পুরুষদের দ্বীকে অস্বীকার করার কথা প্রায়ই শোনা যায়। হয়ত বৌকের মাধ্যমে মোহের বলে বিবাহ করে বলল কিন্তু পরে তা স্বীকার করল না—এ ঘটনা বিরল নয়। আমার ক্লায়েন্ট স্বামীর সম্পত্তি চায় না, একসঙ্গে থাকবার জগত সে জোর করছে না—কেবল তার পোজিশন যাতে এ ভাবে নষ্ট না করা হয় সেই জন্ত সুবিচার চিন্তা করছে।”

রিণির করুণ স্মরণ মুখ, তার পক্ষের উকীলের আবেগপূর্ণ বক্তৃতা, জুরীদের স্টিমেন্ট, আর জনমত—সব মিলিয়ে রায় রিণির পক্ষেই হ'ল। রিণির পক্ষের অমুরোধে অনিলকে শ্রেয় বকাবকি করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। প্রসিকিউট করা হ'ল না।

কেস হারার সঙ্গে সঙ্গে অনিলকে সব হারাতে হ'ল। নিশীথের বাড়ী যেতে অলকা দেখা পায়ত্ত করলে না। নিশীথ তাকে জানিয়ে দিল ভবিষ্যতে এই বাড়ীর এবং নিশীথের অফিসের দরজা দুই-ই তার জন্ত বন্ধ। তার জন্ত অনেক ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করতে হয়েছে। আর নয়।

এদিকে কাগজে এবং বাজারে অনিলকে নিয়ে চি-চি পড়ে গেল। ভ্রমসমাজে মুখ দেখান মুশ্কিল। মেস সে আগেই ছেড়ে এক ছোট গোটোলে উঠেছিল। সেখানকার ম্যানেজারও সাত দিনের মধ্যে উঠে যাবার জন্ত নোটিশ দিলে। হাতে বৎসামাত্র যা ছিল, তা আর কত দিন চলেবে। মরিয়া হয়ে অনিল ছোট্টাছুটি আরম্ভ করলে একটা কাজ জোটবার জগ।

কিন্তু কোথায় কাজ? কি কাজই বা সে করতে পারে? যত কাগজ ছিল, প্রত্যেক অফিসেই গেল আর প্রত্যেক জায়গা থেকেই সে বিতাড়িত হ'ল। একে কাজ নেই, তার ওপর অনিলকে কাজ দিতে কেউ রাজী নয়। এই ক্যাণ্ডালের পর আবার—

অনিল হোটেল ত্যাগ করে টালিগঞ্জের এক বস্তীতে একটা টিনের ঘর ভাড়া নিয়েছে। বাসিন্দারা অশিক্ষিত। অনিলের সম্বন্ধে কিছু জানে না। জানবার আশ্রয়ও নেই। সে হিসেবে অনিল যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছে।

কিন্তু অবিলম্বে একটা কাজ জোগাড় না করলেই নয়। দু'একটা লেখা বিভিন্ন কাগজে পাঠিয়েছিল। ফেরৎ এসেছে। সম্পাদক দুঃখের সহিত জানিয়েছেন—এখন তার লেখা ছাপা সম্ভব নয়। পরে হয়ত হতে পারে।

রিণিকে প্রিন্স প্রণ করলেন,—“অনিলের ব্যাপারটা কি সত্য?”

হেসে রিণি উত্তর দিলে,—“সত্যও আর মিথ্যাও।”

প্রিন্স চটে উঠলেন,—“হয়ালী রাব। আজ একটা হেন্ডনেস্ত করতে চাই। বিয়ের ব্যাপারটা কি সত্য? স্পষ্ট উত্তর দাও।”

রিণি গভীর হয়ে পাণ্টা প্রণ করলে,—“কিন্তু আপনাকে এই ভাবে প্রশ্ন করার অধিকার কে দিল? আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আপনাকে কিছু জানাতে আমি বাধ্য নই।”

প্রিন্স নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি স্রব বদলে ফেললেন : “রিণি, আমি তোমাকে ভালবাসি, সেই জগ্গই—”

বাধা দিয়ে রিণি বললে,—“আমি আপনাকে বন্ধু মনে করি। সেই সম্বন্ধই থাকতে দিন। আর বেশী কিছু চাইতে যাবেন না। উভয়ের পক্ষেই তা দুঃখের হবে।”

প্রিন্স একেবারে চুপসে গেলেন। এই প্রথম তিনি স্পষ্ট ভাষায় রিণিকে প্রেম-নিবেদন করলেন, আর এই তার উত্তর। যাক, ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। একেবারে ছিঁড়ে ফেলে কোন লাভ নেই। তাই মনের ভাব দমন করে শাস্ত ভাবে বললেন,—“আচ্ছা, এখন তাহ'লে উঠি। আজ সন্ধ্যার এনগেজমেন্টের কথা মনে আছে তো?”

যেন কিছু হয়নি এমন ভাবে হেসে রিণি উত্তর দিল,—“নিশ্চয়ই।”

একটা হেন্ডনেস্ত না করলে যে আর চলেবে না অনিল সেটা বুঝতে পেরেছিল। এ অবস্থায় ব্যাপারটা পড়ে থাকলে তার পক্ষে কাজকর্ম যোগাড় করা অসম্ভব। তাই সে সাহস করে সোজা গিয়ে হাজির হ'ল রিণির বাড়ী।

বেয়ারা তাকে দেখেই কঁকে সেলাম করল। তার ছবি সে মেম-সাহেবের টেবিলে দেখেছে। অতি বিনয়ের সহিত ডুইং-ক্রমে বসিয়ে সে গেল মেম-সাহেবকে খবর দিতে।

একলা বসে অনিল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। দুঃসাহসের বশবর্তী হয়ে সে এসে পড়েছে, কিন্তু বলবে কি? হঠাৎ পালিয়ে যাওয়াও ভাল দেখায় না। এমন সময় রিণি এসে ঘরে ঢুকল।

হেসে রিণি বললে,—“এই যে আপন। এত দিন আসেননি কেন? আমি তো রোজই পথ চেয়ে বসে থাকি।” রিণির ঠাট্টায় অনিল যেন লুপ্ত সাহস এবং কোথ থুঁজে পেল। কাঠোর ভাবে প্রশ্ন করলে,—“এই সব মিথ্যার সাহায্যে আমার সর্বনাশ করার কারণ কি?”

কৃত্রিম বিষয় সহ রিণি বললে,—“সর্বনাশ মানে। আমি তো কোথায় আপনার ভাল করতে গেলুম—”

রাগত ভাবে অনিল বাধা দিলে,—“আর ভালর কাজ নেই। আপনার এই নির্দয় খেলার জন্য আমার চাকরী গেছে, বাসস্থান গেছে, ভক্তসমাজে মাথা তোলবার উপায় নেই। কেউ চাকরী দিতে রাজী নয়।”

শ্রম-ভরা কঠে রিপি উত্তর দিলে,—“এইটুকুতেই বাবড়ে গেছেন। কিন্তু আপনার সর্বনাশ করার সময় তো আপনার পে খেয়াল হয়নি? তুচ্ছ কয়েকটা টাকার জন্য মিথ্যার সাহায্যে আপনি আমায় লোক-সমাজে হেয় করেছিলেন। আমি তো আপনার মত কোর্টে যায়নি, ভেঙ্গেও পড়িনি। অথচ আমি জীলোক আর আপনি পুরুষ। থাক, আর কিছু বলবার না থাকে তো আপনি এখন যেতে পারেন। আমাকে এখনই বেরোতে হবে। আমাকে আকিউজ করার মুখ আপনার নেই। যদি কখনও অমৃতপুত্র হন তবে আসবেন। নয়স্কার।”

ঘর থেকে রিপি বেরিয়ে চলে গেল। কশাহত, লজ্জিত অনিল পথে নামল। সত্যই তো। দোষ তারই।

খ্রিস্ট রিপির বাড়ী থেকে বেরোবার পরেই অনিল চুকেছিল। অনিল খ্রিস্টকে দেখেনি কিন্তু খ্রিস্ট অনিলকে দেখেছিলেন। কোতূহল বশতঃ তিনি অনিলকে ধলো করে ডুইং রুমের বাইরে বাগানে ঝাঁড়িয়ে রইলেন। রিপি এবং অনিলের সমস্ত কথাই তিনি শুনলেন। তার পর নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে সোজা চলে গেলেন নিশীথের কাছে।

সব শুনে নিশীথ বললে,—“এইবার ঠিক হয়েছে। রিপিকে বন্দ করা যাবে। আপনাকে কিছু সাক্ষী হতে হবে।”

খ্রিস্ট হেসে বললেন,—“নিশ্চয়ই। সব রকম ভাবে আপনারের সাহায্য করব। আহা বেচারা অনিল।”

“কিন্তু অনিলের জন্য আপনার এতটা করার কারণ কি? তার সঙ্গে আপনার এমন কিছু বন্ধুত্ব নেই—”

“তা নেই বটে।”

“তবে? এতে আপনার লাভ?”

“সত্য প্রকাশ হলে আমার পক্ষে রিপিকে লাভ করা সম্ভব হতে পারে।”

অনেক ধুঁজে-পেতে অনিলকে বার করে নিশীথ একেবারে নিজের বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেল। অনিলের কোন ওজর-আপত্তি শুনলেন না।

অলকা পূর্বেই নিশীথের কাছে সব কথা শুনেছিল। অত্যন্ত মধুর অভ্যর্থনা করে চা খেতে দিল।

বিনয় সহ বললে,—“কিছু মনে করবেন না অনিল বাবু, আপনার ওপর আমরা অবিচার করেছিলুম।”

নিশীথ সায় দিলে,—“বটেই তো। আমাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব বলেই তো আজ তোমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলাম। হ্যাঁ দেখ, তোমার কাজটা খালিই আছে। কাল থেকে পক্ষি সেও।”

আবদারের সুবে অলকা বললে,—“আর কাল থেকে আমার পড়াশুনাও দেখে দিতে হবে।”

# ব হ ম ত্র

## সাতদিনেই

### আরোগ্য হয়।

যত জটিল বা দীর্ঘ দিনের হউক না কেন অধুনাতম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ভেনাস চার্ম ব্যবহার করিলে বহুমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হয়। এই রোগের প্রধান প্রধান উপসর্গসমূহঃ যথা—অস্বাভাবিক তৃষ্ণা, ক্ষুধা, প্রস্রাবে অতিরিক্ত চিনি এবং চুলকানি প্রভৃতি। এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিলে কার্বিকুল, ফৌড়া, ছানি এবং অত্যন্ত জটিলতা দেখা দেয়। হাজার হাজার লোক “ভেনাস চার্ম” ব্যবহার ক’রে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাইয়াছে। ব্যবহারের পরের দিন থেকেই প্রস্রাব হইতে চিনি দূরীভূত হয় ও প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। মাত্র ২৩ দিনের মধ্যেই আপনি যে অর্ধেকের বেশী নিরাময় হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। খাদ্য-দ্রব্য সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ নাই। ঔষধের বিবরণাদি সমন্বিত বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য পুস্তিকার জন্য লিখুনঃ—প্রতি ৫০টি ট্যাবলেটের শিশির মূল্য ৬৮০, ডাকমাশুল ফ্রি।

ভেনাস রিসার্চ ল্যাবরেটরী  
হইতে প্রাপ্তব্য।

পোস্ট বক্স ৫৮৭, কলিকাতা (M.B.)



অনিল এতক্ষণ বিষয়ে নির্ভীক হয়ে বসেছিল। সব কিছুই তার কাছে হেয়ালীর মত ঠেকছিল।

প্রশ্ন করলে,—“হঠাৎ কি হ’ল যে—”

অলকা বাধা দিলে,—“সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে।”

অনিল তবুও কিছুই বুঝতে পারলে না। পুনরায় প্রশ্ন করলে,—“কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।”

নিশীথ উত্তর দিলে,—“তুমি কাল রিণির বাড়ী গিছলে। তোমাদের সমস্ত কথা প্রিন্স আড়ালে থেকে লুকিয়ে শুনেছেন।”

বিস্ময় হয়ে অনিল বললে,—“ভেরী মৌন অব্ হিম্।”

নিশীথ তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—“মৌন একটু হয়ত হয়েছে কিন্তু তাতে আমাদের কতটা সুরিখা হ’ল ভাব। প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে পারলুম। মেয়েটা তোমাকে কি ভাবে ডাউন করেছে বল তো?”

অলকা বললে,—“আপনি এই অপমানের জন্ত ওর নামে আবার কেস করুন। প্রিন্স নিজে আমাদের দিকে সাক্ষ্য দেবেন।”

“প্রিন্সের এত তৎপরতার কারণ কি? আমাদের উনি দু’চক্ষে দেখতে পারেন না। বহু বকমে অপদম্ভ করবার চেষ্টা করেছেন। আজ হঠাৎ এত দরদ কেন?”—প্রশ্ন করলে অনিল।

উত্তর দিলে নিশীথ। “এই ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে গেলে তাঁর পক্ষে রিণিকে পাবার সুরিখা হবে।”

হাসল অনিল। বিদ্রূপের হাসি। বললে,—“আই সী। কিন্তু আমি তো আর কেস করব না।”

ধেন আকাশ থেকে পড়ল অলকা।

“কি বলছেন আপনি? এই অপমান নীরবে হস্তম কববেন?”

“করব। কারণ এর জন্ত দায়ী আমি নিজেই।”

নিশীথ প্রশ্ন করলে,—“মানে?”

অনিল শাস্ত ভাবে উত্তর দিলে,—“প্রোভোক্‌ড হয়ে রিণি আমায় ক্ষতি করেছে স্বীকার করি, কিন্তু বিনা কারণে তুচ্ছ কয়েকটা টাকার জন্ত আমি যা ওর ক্ষতি করেছে তার তুলনায় ওটা যৎসামান্য। আমি পূর্ববৎ হয়ে ধৈর্য ধরতে পারিনি, ওর বিরুদ্ধে কেস করেছি। আর সে নারী হয়ও নীরবে তা সহ করেছে। দোষী আমিই, সে নয়।”

“এখনও ভেবে দেখ। মনে রেখ আমাদের কথা মত কাজ না করলে আমাদের অক্ষর উইথড করতে বাধ্য হব।” নিশীথ বললে।

দৃঢ় স্বরে অনিল উত্তর দিলে,—“বেশ করে ভেবেই বলছি। না খেতে পেয়ে মরে গেলেও আর অপরাধ বাড়তে রাজী নই।”

অন্ত কোন কথাই অপেক্ষা না রেখে অনিল বেরিয়ে গেল। নিশীথ আর অলকা শুক হয়ে বসে রইল।

সেখান থেকে অনিল সোজা রিণির বাড়ী গেল।

রিণিকে বললে,—“আমার ভুল এবং দোষ আমি বুঝতে পেরেছি। কৃতকর্মের জন্ত আমি অশ্রুতপ্ত।”

রিণি অশ্রু-কোমল কণ্ঠে উত্তর দিলে,—“আমি জানতুম, এক দিন আপনার ভুল আপনি বুঝতে পারবেন। এবং সেই দিন আমিও আমার ভুলের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করব। আমার অপরাধ বড় কম নয়।”

“আমি মিথ্যার উপর ভিত্তি করে লিখেছিলুম আপনার সম্বন্ধে অনেক কুখ্যাতি। কিন্তু দার্জিলিঙে ভাল ভাবে আলাপ হবার পর আমার শেষ লেখাটাই ছিল সত্য। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা ছাপা হয়নি।”

“তা না হলেও আমি দেখেছিলুম। তখনই বুঝেছিলুম এক-রে-মরে গেছেন। অনিলকুমার রাই এ সব লিখবেন না।”

হঠাৎ রিণির পিসীমা ঘরে ঢুকলেন। এক গাল হেসে বললেন,—“বাক্, এত দিনে সব ঠিক হয়ে গেল। মেয়েটা তো কেঁদে-কেঁদে সারা।”

সলজ্জ ভাবে রিণি বললে,—“যাও, কি যে বল পিসীমা।”

পিসীমা বলে যেতে লাগলেন,—“একমাত্র আমিই সব ব্যাপারটা আর রিণির মনের খবর জানতুম। যাক, তাহ’লে কালই গেনে দার্জিলিঙ চলে। এবার সত্য করে গোপনে তোমাদের চার হাত এক করে দিই। তুমি এখন যেও না বাবা, এইখানেই থাকে।”— পিসীমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ হুঁজুনেই চূপচাপ।

অনিল বললে,—“দার্জিলিঙে যখন তোমায় ভাল করে জানবার সুযোগ হ’ল, তখনই আমার ভুল বুঝতে পারলুম। সেই থেকেই—”

সলজ্জ হেসে রিণি বললে,—“আমি জানি তা—”

“কি করে জানলে?”

“টাইগার হিলে যাবার কাণ্ড দেখে। আর এ সব জিনিষ মেয়েদের চোখ এড়ায় না।”

“কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে সাহস হয়নি। কোথায় তুমি, আর কোথায় আমি! আকাশ-পাতাল পার্থক্য!”

“বারা কলমে সাহস দেখাতে পারে প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা খুব লাজুক আর মুখচোরা।”

“কিন্তু তুমি—সত্যি কি দেখলে—”

“দেখলুম, তুমি সত্যকারের পুরুষ। আমার অর্থ আর রূপ তোমাকে লক্ষ করতে পারেনি। তুমি গালমন্দ করে, উপেক্ষা করে আমাকে জয় করেছিল। ওয়েলকাম চেঞ্জ।”

“তবে এ বকম বৃদ্ধঘোষণা করেছিল কেন?”

“তা ছাড়া তোমায় পাবার পথ ছিল না। পিসীমারই পরামর্শ। তোমার বিয়ের পথটা মেয়ে রেখে দেওয়া। আর যুদ্ধের জবাব যুদ্ধ, এ তো স্বীকার কর?”

“তা করি। কিন্তু সর্বক্ষণই কি যুদ্ধের অন্তরালে আমার জন্ত তোমার—”

বাধা দিয়ে রিণি বললে,—“যাও, সব কথাই কি মুখ ফুটে বলতে হয় না কি—”

এমন সময় পিসীমা ডেকে পাঠালেন, খাবার দেওয়া হয়েছে। সত্যিই রণাঙ্গনে অঙ্গনাদেরই জয় হয়।

পরদিনই রিণি, তার পিসীমা আর অনিল গেনে করে দার্জিলিঙে চলে গেল। হুঁ-এক জন রিপোর্টার খবর পেয়েছিল। বোধ হয় রিণিই দিয়েছিল। গেনে ওঠবার কালের ফটো তুলে নিল। কাগজে প্রকাশিত হ’ল—

“রিণি ও অনিলের মনোমালিন্য চূকে গেছে। সুখী দম্পতি মনুচন্দ্রিকা বাপনের জন্ত দার্জিলিঙে বাড়া করেছেন।”

সঙ্গে ছবি। তলার ক্যাপশান।

স্বাভাব—বদরুস। বেঙ্গল পাবলিশিং ১৪নং বক্স  
চাট্‌জেট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য সাড়ে সাত টাকা।  
আহরণ—কালিদাস রায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০নং শ্রামাচরণ  
বে ট্রীট, কলিকাতা—১০, মূল্য সাড়ে চার টাকা।  
শ্রীমন্তনবদগীতা—স্বামী উত্তমানন্দ। প্রবাসী কার্যা-  
লয়, ১২০১২ আপার গারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য  
পাঁচ টাকা।

জাত সাহিত্যিক কথাটা শুধু কথার কথা না, কথাটার কোন  
তথ্যপার্থ্য আছে সাহিত্যের দরবারে? কথাটি খতিয়ে বিচার  
কালে শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে, কথাটি কথাই। শব্দ দুটির  
কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হ'তে পারে না এই জ্ঞত যে, জন্মগত  
প্রতিভাকে শুধু প্রতিভা হিসাবে ধরে রাখলে প্রতিভার ধার নষ্ট হওয়া  
বিচিত্র নয়। প্রতিভা জন্ম থেকে যিনি অর্জন করেন, অর্থাৎ জন্মাবধি  
ধার অন্তরে সাহিত্যিক-সুশীল বৃত্তি বর্তমান, তাঁর প্রতিভার মাঝে  
মাঝে শাপ না পড়লে প্রতিভা যে তাঁকে বর্জন করে যাবেই  
তাতে আর কোন কথা উঠতে পারে না। এখানে শাপ দেওয়া  
অর্থে এই কথাই বোঝায়, শুধু প্রতিভার দ্বারা অধিক দিন লেখনী  
চালনা সম্ভব নয়, যদি না সেই সঙ্গে চলতে থাকে বিত্ত বা জ্ঞান  
সঞ্চয়ের সৌমিত্র চেষ্টা। দুঃখের বিষয়, বাঙলা দেশের প্রতিভাবানদের  
অনেকেই শুধু প্রতিভার জোরে বাজার সরগরম রাখতে চেষ্টা করেন,  
স্বচ্ছ চেষ্টা করেন না সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নিজের প্রতিভাকে  
পরিণত করতে। সুখাত যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর এবং ধার  
অভাব হ'লে মানুষ্যের অসময়ে মৃত্যু অনিবার্য, তেমনি ঠিক প্রতিভাকে  
জীয়ে রাখতে হ'লে সূচ্যক বিত্তাসঞ্চয়ও অপরিহার্য—যার অভাবে  
যে-কোন প্রতিভার অপব্যয় অসম্ভব নয়।

সম্প্রতি একটা কথা অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, সাম্প্রতিক  
বাঙলা সাহিত্যে না কি জোরার শেষ হ'য়ে ভাটার দিন প'ড়েছে।  
প্রায় মানে, যে সব লেখা আশ্চর্যকণি করছে তাতে সাহিত্যের  
কোন ছাপ থাকছে না, যদিও ধারা এই সব লেখা লিখছেন তাঁদের  
অধিকাংশ না হ'লেও কেউ কেউ ছাপ-মারা সাহিত্যিক।  
এ হ'লে এই কথাই প্রমাণ হয়, ছাপাখানায় লেখা ছাপালেই সেই  
লেখা সাহিত্যের পথচ্যে ওঠে না। কিন্তু বাজার চালু রাখতে হ'লে  
এই ছাপাখানা বজায় রাখতে হ'লে ছাপার কাজ ধারিয়ে রাখলে  
চলে না। আর সেই ছাপার কাজ চালাতে হ'লে বিত্তালয়ের  
নোট-বুক ছাপালে যদিও বা চলে, নোট-বুকের বাজার ছাড়া আর  
আর যে বাজার আছে, অর্থাৎ সাহিত্যের বে-বাজার আছে সে-বাজার  
চলে না। তাই এই ভাটার দিনেও কারক্রেমে সাহিত্য করতে হচ্ছে  
সাপার অক্ষরে। আর এ কথা কে না জানে, গায়ের জোরের তরু  
যেমন ভিত্তিহীন, কারক্রেমের সাহিত্যেও তেমনি নেই কোন ভিত্তি?

কিন্তু প্রতিভাবানদের অভাবে সাহিত্যে ভাটা পড়লে কারও  
কিছু বলবার থাকতো না। বাঙলা সাহিত্যে এত অধিক প্রতিভা  
বসিত থাকা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যকে যদি না জীয়ে রাখতে  
পাওয়া যায় তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হ'তে পারে না।  
বাঙলার একাধিক মনীষী যখন ব'লে গেছেন, বাঙালী জাতি বিলুপ্ত  
হ'লে গেলেও বাঙলা সাহিত্যে বাঙলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর  
পাওয়া যাবে অথবা ভবিষ্যতেও, তখন যেন তেন প্রকারেণ যে  
ধাঁড়িয়ে রাখতে হয় বাঙলা সাহিত্যকে। আর এ কাজে অগ্রসর



হ'তে পারেন তাঁরাই, ধাঁড়ের উদর শূন্য হ'লেও ধারা সত্যিকার  
প্রতিভাবান। এবং বলতে বাধ্য নেই, আমাদের সাহিত্যের গভীতে  
সর্বজন-স্বীকৃত Genius এখনও অনেকে রয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এত অধিক Genius থাকা সত্ত্বেও  
সাহিত্যের জাত কেন বিনষ্ট হচ্ছে ক্রমে ক্রমে? সংসাহিত্যের  
অভাব হচ্ছে কেন? একটা ক্ষোভের কথা এখানে বলে রাখা  
প্রয়োজন, কয়েক জন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক ইতিমধ্যে সাহিত্যের  
দরবার থেকে মালা গলায় প'রেও সেলাম ঠুকে বিদায় গ্রহণ  
ক'রেছেন। সাহিত্যের সঙ্গে তাঁদের কোন আর direct  
connection নেই। তাঁরা এখন ভূতপূর্ব সাহিত্যিক। আর  
কয়েক জন দক্ষ সাহিত্যিক আছেন, ধারা এক সময়ে দস্তরমত  
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে।  
তাঁরা বেমালুম রাতারাতি সাহিত্যের আসর থেকে সোজা রাজনীতির  
আসরে গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং মাঝে-মিশেলে বা লিখছেন তাতে  
সাহিত্যিক বৃত্তি অপেক্ষা রাজনৈতিক বৃত্তির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে  
ডের বেশী। সাহিত্যে বিশেষ আগ্রহের স্ততি গাইতে শোনা গেছে  
অনেকানেক বিদেশী সাহিত্যিককে এবং সাহিত্যের পথচ্যেও উঠেছে  
সেই সব সাহিত্য। কিন্তু সাহিত্য-সভায় নেচে নেচেও চিৎকার  
ক'রে 'গান্ধীজি কি জর' গাইলে যে মহাশয় ও সাহিত্যের কারও

জরাজরকার হয় না সে-কথাটি এরা স্বীকার পেতে চাইছেন না। বস্তুতঃ এ কথা তো আর অস্বীকারের উপায় নেই যে, policyর দিক দিয়ে গান্ধীজির পরামর্শই হয়েছিল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে। যে-ব্রত পালনের স্থান হিমালয়ের পাদদেশে সে-ব্রত যদি রাজনীতির সীমানায় কেউ পালন করতে চায়, তাতে ব্রত পালন হ'লেও রাজনীতি রক্ষা হয় না এবং ব্রতধারীর জীবন রক্ষা হওয়াও সম্ভব নয়। তাই-ই হয়েছিল গান্ধীজির অদৃষ্ট। এবং গান্ধীজির এই ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্ত যে তাঁর স্বাবিকারী লরী তা বোধ করি স্বাবিকারী অস্বীকার করলেও স্বার্থাভীত ভ্রম্যক্রিয়া কেউ অস্বীকার করবেন না। তবুও এই রাজনৈতিক সাহিত্যিকদের লেখনী চালনা বার বার ব্যর্থ হয়েছে যে কি কারণে খামচে না, তার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

এঁদের বাদ দিয়েও আরও অনেক প্রতিভাবানদের উপস্থিতি বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অতীত দিনের বাঙলা সাহিত্য তার ভবিষ্যি প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে বর্তমান সাহিত্যকে নিয়ে। অতীত গৌরব গাইলে যদি বর্তমান সাহিত্যের লুপ্ত-গৌরব কিংবা পাওয়া যেতো তা হ'লে গত শ' বছরে সমগ্র মানব অতীত অন্ধি গাওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অতীতে ব্রত সহযোগে অন্ধ ভঙ্গন করেছিলাম বলে বর্তমানেও যে সেই ব্রতের জয়গান শুনেও কেউ রাজী থাকবেন, তা তো মনে হয় না। কিন্তু যে Geniusরা অতীতে বাঙলা সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং রক্ষা করেছিলেন তাঁরা বর্তমান সাহিত্যের দুর্দিনে সাহিত্যের মানবক্ষা করতে কেন সচেষ্ট হবেন না? তাই বলছিলাম, এত অধিক প্রতিভা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের এই দুর্দশা হবে কেন?

কথাটি যতটা এক কথায় সেবে দেওয়া যায়, কথাটি ততটা এক কথার বিষয় নয়। প্রতিভা থাকলেই দিনের পর দিন সেই প্রতিভা কি প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যাবেন? এ কথার উত্তরে বলতে হয়, ঠা। প্রতিভা গার আছে তাঁকে সন্ততঃ সাহিত্যের আসরে শেষ পর্যন্ত আপন দক্ষতা দেখিয়ে যেতে হ'বে, নয় তো জীবিতাবস্থাতেই তাঁর সাংস্কৃতিক মৃত্যু অবধারিত। ভ্রাতোম, টেকচাঁদ, দীনবন্ধু, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমথ চৌধুরী মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত সমতালে সাহিত্য সেবা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র তো 'শেষের পরিচয়' শেষ করতেই পারলেন না। কিন্তু বর্তমান বাঙলার সাহিত্যিকদের কেউ কেউ যেমন লেখায় ইতি দিয়ে বসে আছেন, তেমনি আবার কেউ কেউ যা লিখছেন তাতে প্রতিভার চেয়ে পুনরাবৃত্তির অভ্যাস-দোষ প্রতিকলিত হচ্ছে। এর আসল কারণ কি?

কারণ আর কিছুই নয়, প্রথমে যে কথা বলছিলাম, সেই কথাই আবার বলছি। প্রতিভা থাকলেই শুধু প্রতিভার খাতিয়ে বৌ দিন লেখনী, চালানো যায় না যদি না প্রতিভাকে শাণ দেওয়ার কাজও সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত চলতে থাকে। কারণ কারণ আধুনিকতম লেখায় যে ধার এবং ভাবের অভাব লক্ষ্য করা হচ্ছে, তার একমাত্র কারণই হল এই লেখানোর দিকে নজর না দেওয়া। অর্থাৎ জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয়ের অভ্যাস আরম্ভ না করা। আর এই অভ্যাস না থাকলে জ্ঞান-সাহিত্যিককেও যে মধ্যপথে ধাঁচট

থেতে হয় তা তো অনেকে দেখতেই পাচ্ছেন স্বচক্ষে। তাই বলছিলাম, শুধু প্রতিভা থাকলে যদি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যেতো তা হ'লে নিউটনের মত জ্ঞানীকেও শেষ বয়সে বলতে শোনা যেতো না, তিনি না কি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে ছুড়ি আহরণ করছেন। বিজ্ঞা বিতরণ ধারা করবেন তাঁরা যদি বিজ্ঞা আহরণের প্রতি সজাগ না থাকেন, তাতে দেশেরও যেমন ক্ষতি তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি বিজ্ঞান ব্যক্তিদের। তবে এই জ্ঞান সঞ্চয়ের রীতিটা যে কেমন ধারার হবে তার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়াটা সমালোচকের কাজ নয়, বিনি আহরণ করবেন তাঁর কাজ। আর এই কাজ বর্থাৎ পালিত হ'লে দেখা যাবে সাহিত্যের জোয়ার; সাহিত্যে তখন ভাঁটা পড়ার আর অবকাশ থাকবে না। বিজ্ঞানসে শিক্ষা না পেয়েও সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে কেউ, এ কথাটি আমি বিশ্বাস করি না। দেশ-বিদেশের গ্রাম্য-গাথা ও চারণের গান তা হ'লে তো জ্ঞান-সাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে পারতো।

'বনফুল' জ্ঞানী এবং বিদ্বান। এই জ্ঞান-বিতার পরিচয় মিলবে তাঁর পুর্বানো এবং সাম্প্রতিক রচনায়। ছোট গল্প, রস-রচনা, উপন্যাস, নাটক এবং কাব্যে বনফুলের সাহিত্য উজ্জ্বল। তাঁর প্রত্যেক লেখার ভাবের দক্ষতা যেমন বিজ্ঞান তেমনি আছে বুদ্ধির প্রবর্তনা—জ্ঞান এবং বিজ্ঞা না থাকলে যেগুলি আরপেই থাকে না। বনফুলের পুর্বানো রচনা 'কিছুক্ষণ' ধারা পড়েছেন, আধুনিকতম গ্রন্থ 'স্বাবর' পড়েও তাঁরা বিম্বিত হবেন এই জন্ত যে, লেখকের জ্ঞানের পরিধি কত দূর বিস্তৃত। 'স্বাবর'এ মত উপন্যাস, যাতে সেই আদিম অন্ধকার যুগের লোক পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছায়াছবি, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে যে-ছবি একেবারে বিরল বললেও অত্যন্ত হয় না। পাশ্চাত্য দেশে আলফ্রেড হার্ডি যে ধরনের পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা করে যেখান থেকে অর্থনৈতিক করেছেন বাঙলা সাহিত্যে বনফুল সেই খ্যাতিরই অধিকারী। মানুষ—যে-মানুষ অন্ধকার হিমশীতল অতীত সময়ে ভরাবহ প্রকৃতির সহচর ছিল, জন্ম-বিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সে স্রষ্টা। তার অগ-গমন এখনও খামেনি। পশ্চিম কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী মানুষ আধুনিকতম যুগের প্রবর্তক—এই মানুষের ক্রমিক রূপ অঙ্কিত করেছেন বনফুল। পুরুষ ও স্ত্রী, পরস্পরকে অবলম্বন করে ও পরস্পরকে ধ্বংস করে যে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করেছে, 'স্বাবর' সেই রূপেরই প্রতিকৃতি। সামাজিক জ্ঞান ও মাত্র জন্মগত-প্রতিভা স্বাবরের জায় উপন্যাস রচনা সম্ভব হয় না, কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ই স্বাবরের মূল প্রেরণা। 'বনফুল' ইতিহাস ও ভূগোলকে সাহিত্যের সীমানায় জলের মত তরল করে হাজির করেছেন, অথ পাণ্ডিত্য মূল আখ্যানের গতি কোথাও রান করেনি। 'বনফুল' জায় সর্বতোমুখী প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর 'স্বাবর' ইতিহাসের জায় বাঙলার স্বাধীনতার পটভূমি হোক, তাতে দেশবাসী জ্ঞান বৃদ্ধি হ'বে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট লোভনীয়।

কবিশেখর ঞ্জিকালিদাস দ্বার বাঙলা সাহিত্যে সুপরিচিত স্বনীশ্রোতার যুগে যে ক'জন কবি দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখছেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর অন্যতম। ৮৭তীজ্রমোহন বাগচী, ক্রীকুমদ বরন মল্লিক প্রভৃতির সমসাময়িক কালিদাস দ্বারও আন্তর্জাতিক

কবি-ধর্মের প্রেমাচার কাব্যলক্ষ্যের বেধায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্ববস্তুর নিকট চিন্তন করেন বাঙলা দেশের প্রকৃতি, যার সবুজ রূপের প্রতি আছে কবিশেষের সংখ্যাতীত কবিতার। বিদেশী সাহিত্যে কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেমন প্রকৃতির কবি, প্রকৃতির শীতল ছায়ায় তাঁর কাব্য যেমন রূপায়িত হয়েছে, বাঙলা দেশের 'কবিশেষের'ও তেমনি প্রকৃতির কোড়েই লালিত-গালিত। প্রকৃতি-বর্ণনায় তাঁর প্রতিভার ছন্দগুলি পরিপূর্ণ। আর প্রকৃতি শুধু নয়, বাঙলা দেশের নদ, যার দ্বারা দীন ও দরিদ্র, অনাহারের আগায় যারা ক্লিষ্ট ও পিষ্ট, তাদের আসল রূপটিও খুঁজে পাওয়া যায় কবিশেষের কাব্যে। আর এই রূপ অন্ধনে পাওয়া যায় স্বাধীনতা নিষ্ঠার পরিচয়। প্রেমের বিষয়, বাঙলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি মূল দৃষ্টান্তের সেবারতন থেকে নিজেই সরিয়ে নিয়ে গেছেন প্রাচীনতার প্রাচ্যকর্মে—তাদের কবিতায় তাই কাব্যের সুর নেই, আছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের জয়গান। কিন্তু কবিশেষের প্রেমেরী এখনও রাজনীতির মোহে মুগ্ধ হয়ে সর্কার গভীতে পতিতালিত। তিনি—যে জন্ত কোন কোন আধুনিক সমালোচক সাহিত্যের দরবারে কবিশেষকে স্বীকার করতেই পরাধীন। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকখানা কবিতার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর—যাদের মধ্যে 'ব্রজবংশ' 'পর্ণপুট' 'টোকালা' ও 'ঋতুমঞ্জল' সর্বজনপ্রিয় হয়েছে। আলোচ্য 'আহরণ' সঙ্কলন-গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন কাব্য-গ্রন্থ থেকে অনেকগুলি কবিতা আহরণ করা হয়েছে। এবং বলতে দিখা নেই, সঙ্কলন হয়েছে বথার্থ ও বখাযোগ্য। সঙ্কলনটি বিভক্ত হয়েছে, বথাক্রমে প্রাচীন বঙ্গ, ব্রজের বধে, প্রেমের স্বপ্ন, পল্লীপথে, গার্হস্থ্য-জীবনে পুষ্পকুঞ্জে, প্রবাসপথে, প্রাচীন ভারতে, গান, ঋতুরঙ্গে ও বেলা শেষে প্রভৃতি ক'টি বিভাগে।

কবিশেষের কালিদাস রায় প্রকৃতিকে যদি রবীন্দ্র-ছায়ায় গুঁঠে পা বায় তা হ'লে, হয়তো কথাটি আপত্তিকর হবে না। তাঁর প্রাণ, কবিশেষের অধিকাংশ কবিতায় পাওয়া যায় কবিগুরুর স্পষ্ট-নিশ্চয় প্রভাব। তবুও তাঁর 'কাব্যে প্রাচীন বাঙলার কাব্য-ধারার যেন মূর্তন রূপ পরিষ্কৃত হ'তে দেখা যায়। সংস্কৃতের অনুরূপ অলঙ্কার-প্রীতিও তাঁর কাব্যে Classic-ভঙ্গীর আভাষ দেয়। কবিগুরু কবির প্রভাবও যেন মেলে। তবুও বাঙলা ও বাঙালীর প্রেমের রূপ কবিশেষের কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুরী—যা অস্তুর কাব্যে সচরাচর খুঁজে পাওয়া যায় না। 'আহরণ'এর ভায় কবির একখানি কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশের যেন অতি প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনায় প্রকাশক ধন্যবাদার্থ। 'আহরণ' গ্রন্থে বাঙলা কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বাক্ষর রয়েছে। 'আহরণ' সমাহৃত হবে বাঙলার প্রতি ঘরে।

গত সংখ্যায় সাহিত্য-পরিচয় আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথাই বলতে চেয়েছিলাম যে, সম্প্রতি বাঙলা ভাষার মূল-সাহিত্য অপেক্ষা, প্রাচীন প্রথম শ্রেণীর গল্প ও উপন্যাসের চেয়ে জীবনী, স্মৃতি-কথা সঙ্কলন ও অনুবাদ-গ্রন্থ অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রমাণ অনুবাদ সাহিত্যে স্রীমৎ উত্তমানন্দ দ্বারী ব্যাখ্যাত আলোচ্য 'ভগবদগীতা'ও এই দিক দিয়ে আরেক প্রমাণ। 'ভগবদগীতা' মহাভারতেরই একটি অংশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হ'ল তাঁর পটভূমি। কিশোরী অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে নিজের আত্মীয়, জাতি-গোষ্ঠী ও পুষ্যপাদ গুরুদের বিক্ষেপে যুদ্ধ করতে হবে, তাঁদের হত্যা করতে

হবে, এই কথা ভেবেই মুহূর্তমান হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারথি, পুরাধর্ম-দাতা ও বন্ধু। অর্জুনের হতাশা লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে উৎসাহিত করতে রত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের দ্বারা বোঝালেন, মৃত বা জীবিত কারও জন্তেই পণ্ডিতেরা শোক করেন না, কারণ দেহ অবিনশ্বর, আত্মা অবিনশী। সুতরাং তথাকথিত আত্মীয় ও জাতি-গোষ্ঠীকে হত্যার জন্তে কাতর হবার কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ আরও বোঝালেন : নিকাম কর্ম থেকে কোন পাপ হয় না। নিজের কুলধর্ম রক্ষা করাই হ'ল মায়ুষের শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য, যে কুলধর্মচ্যুত, সে মহাপাপী। কৃষ্ণজয়ের কুলধর্মই হ'ল যুদ্ধ করা। অতএব অর্জুন যুদ্ধ যদি না করেন তা হ'লে তিনি হ'বেন ধর্মচ্যুত। 'ভগবদগীতা'র এইটিই হ'ল মর্মকথা।

প্রথমে 'মহাভারত' বীরগাথা ছিল এবং বীরত্ব-শৌধ্য-বীর্য ইত্যাদি মহাকাব্যের গুণগুলিই তাঁর প্রধান বিশেষত্ব ছিল। পরে ব্রাহ্মণ ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা মহাভারতের রূপান্তর করেন তখন 'গীতা' যুক্ত করা হয়। যুদ্ধের নৈতিক ব্যাখ্যা না হ'লে পাণ্ডবদের অনেক ক্রিয়াকলাপই সমর্থিত হয় না। তা ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের অবনতির যুগে বর্ণাশ্রমধর্মের গুণগান করাও প্রয়োজন, তাই 'বধর্মের' শ্রেষ্ঠত্ব গীতার মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব গীতার সারমর্ম যে "বধর্মপালন" তা সহজেই বোঝা যায়। এই আখ্যানের ভিত্তিতেই 'ভগবদগীতা' রচিত। উত্তমানন্দের ব্যাখ্যায় উক্ত আখ্যান অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় রূপ পেয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে অল্প কোন ভাষ্যকারের ভাষ্য ও টীকা স্থান পায়নি, কেবল মাত্র সহজবোধ্য ভাষায় ভগবদগীতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নানা মূর্খের নানা মত। বিভিন্ন ভাষ্যকারের কটকিত ভাষ্য পড়তে পড়তে মূল গ্রন্থের আমল রসটি আমরা হারিয়ে ফেলি। সেই দিক দিয়ে এই অনুবাদটি গ্রহণযোগ্য। যদিও মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুদিত জিগিরীক্সলেখক বন্বর 'ভগবদগীতা' আমরা পূর্বেই পেয়েছি এবং বইটি বাঙলা ভাষায় সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট একেবারে প্রথম শ্রেণীর।

প্রথমে যে-কথায় এ আলোচনার মুখবন্ধ করেছিলাম, সেই প্রতিভার কথায় আবার ফিরে আসছি। আসল কথাটি হ'ল এই প্রতিভা কেবল মাত্র প্রতিভার দ্বারায় বিকশিত হ'তে পারে না, যদি না দিনের পর দিন প্রতিভার মাঙ্কন-কাণ্ড চালাতে হয়। শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রতিভার কোন মূল্য নেই। শিক্ষা না পেয়ে শিক্ষকতা যেমন মূল্যহীন। জ্ঞান ও শিক্ষার লেশ মাত্র নেই অথচ প্রতিভাশালী, এই প্রতিভা যে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু প্রতিভাকে এমন কিছু সৃষ্টি করতে হবে যার আয়ু অল্প নয়, যা চিরায়।

শিক্ষা-দীক্ষাহীন প্রতিভাশালীদের ক্ষণস্থায়ী রচনার সাহিত্যের দরবারে সাময়িক হলোড় তোলার চেয়ে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের দীর্ঘায়ু সাহিত্য-সৃষ্টি ভাষা এবং সাহিত্যের পক্ষে অনেক অনেক বেশী লাভের—যাদের লাভ করলে স্রীষ হারাণোর ভয় নেই, অথচ লাভ করে পূরাপুরি আনন্দ উপভোগের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। যাদের প্রতিভা আছে তাঁরা আশা করি, স্বীকার করবেন না এই সহজ কথাটি—দীর্ঘ না মাজলে অসময়ে দীর্ঘের মধ্যাদা যেমন হারিতে হয়, তেমনি প্রতিভা শাবিত না হ'লে প্রতিভার বিনাশও অবশ্যজন্য।

# ঐতিহাসিক পরিচিতি

## ত্রিগোপালচন্দ্র নিরসী

### ফরাসী নির্বাচনের ভেতরী—

গত দু' মাসে (১৯৫১) ফ্রান্সে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল তাহার ফলাফল যেমন কোঁতুলপ্রদ, তেমনি উহার আন্তর্জাতিক এবং গণতান্ত্রিক তাৎপর্যও গভীর অর্থপূর্ণ। নিয়মিত সময়ে এই নির্বাচন হইলে যে-সময়ে হইত তাহার কয়েক মাস আগেই নির্বাচন হওয়ার গুরুত্ব হয়ত খুব বেশী নয়, কিন্তু কম্যুনিষ্ট-দিগকে এই নির্বাচনে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে নির্বাচন-আইনের এমন অদ্ভুত এবং গণতন্ত্রবিরোধী পরিবর্তন করা হইয়াছে যে, ফরাসী পত্রিকা L'Humanite এই নির্বাচন আইনকে 'a machine for stealing votes' (ভোট চুরি করিবার যন্ত্র) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই নির্বাচন আইন যে কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ ভাবে রচিত হইয়াছে তাহা বিলাতের উদারনৈতিক পত্রিকা 'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' স্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই নির্বাচন আইন অমুসায়ে একটি মাত্র ভোটের কম-বেশীতে কয়েকটি আসনের তারতম্য ঘটতে পারে। Le monde পত্রিকা বলিয়াছেন যে, "Theoretically a candidate getting no votes could be returned." অর্থাৎ 'যিওরেটিকেলি কোন প্রার্থী যদি একটি মাত্র ভোটও না পান তাহা হইলেও তিনি নির্বাচিত হইতে পারেন।' যে উদ্দেশ্যে এই জটিল ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ নির্বাচন আইন রচিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যে যে সিদ্ধ হয় নাই, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় না। নূতন জাশনাল এসেমবলীতে কম্যুনিষ্ট সদস্যের সংখ্যা ৮১ জন হ্রাস পাইয়া ১০১ জন হইয়াছে সত্য; কিন্তু ফ্রান্সের ৫০ লক্ষেরও অধিক ভোটার কম্যুনিষ্ট-প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়াছেন, ইহার গুরুত্বও উপেক্ষার বিষয় নহে। ত গলের পার্টির সাপ্তাহিক পত্রিকা 'Carrefour' হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান (proportional representation system) বহাল থাকিত, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট-সদস্যের সংখ্যা ষাঁড়াত্ত ১৫০ জন। ফ্রান্সের নূতন নির্বাচন আইনের ভাষ্যমতীর ভেতরী সবচেয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে নির্বাচনের ফলাফলের কথাই প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের সময় ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদ বা জাশনাল এসেমবলীতে আসন-সংখ্যা ছিল ৬১৭টি। বর্তমান নির্বাচনের সময় উহা বৃদ্ধি করিয়া ৬২৫টি করা হইয়াছে। কোন দল কত সংখ্যক আসন দখল করিতে পারিয়াছে এবং মোট কত ভোট পাইয়াছে তাহার বিবরণ এবং ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলের সহিত তাহার তুলনামূলক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :

সামাজিক দল—আসন লাভ করিয়াছে ১০১টি এবং মোট

৫০,৬৮,৫১৩ ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁহারা ১৮২টি আসন এবং ৫৪,৭০,১৪৬টি ভোট পাইয়াছিলেন।

ত গল-পক্ষী—১১৭টি আসন এবং ৪১,৩৪,৮৫১টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের ত গল-পক্ষীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

সামাজতন্ত্রী দল—আসন লাভ করিয়াছে ১০৪টি এবং ২৭,৬৪,২১৫টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তাঁহারা ১০১টি আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং মোট ভোট পাইয়াছিলেন ৩৩,৮৪,৭৭৫টি।

পপুলার রিপাবলিকান দল (এম-আর-পি)—মোট ২৩,৫৩,৪৭৫ ভোট পাইয়া ৮৬টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ৪৮,৬৭,০৬৭ ভোট পাইয়া আসন লাভ করিয়াছিলেন ১৬৪টি।

রেডিক্যাল দল—আসন লাভ করিয়াছে ১৫টি এবং মোট ২১,১৪,২১৩টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ২২,২৮,৩২৬ ভোট পাইয়া ৬১টি আসন লাভ করিয়াছিলেন।

উদারনৈতিক রক্ষণশীল দল—মোট ২৪,১৬,৬১০ ভোট পাইয়া ১১টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ৭৪টি আসন এবং ২১,৩১,২১৭ ভোট পাইয়াছিলেন।

অজ্ঞাত দল—মোট ৩০,৩১৬ ভোট পাইয়া ২৩টি আসন লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ২৭টি আসন এবং ১১,৫৮১ ভোট পাইয়াছিলেন।

বর্তমান নির্বাচন ১,১২,৮৫,১৬১ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ১,৮১,১০,০০০ জন ভোটার ভোট দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের তুলনায় ৪,৩১,৩৫৩ হ্রাস পাওয়ার তাহার ৮১টি আসন হারা হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট পার্টি ১৯৪৬ সালে প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় ৪,২০,৫৬০ ভোট কম পাইয়াও ৬টি আসন হারা পাইয়াছে। পপুলার রিপাবলিকান দল (এম-আর-পি) ১৯৪৬ সালে প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা ২৫,১৩,৫১২ ভোট কম পাইয়াছে কিন্তু ৭৮টি আসন হারাইয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪,৩১,৩৫৩ ভোট কম পাইয়া ৮১টি আসন হারাইয়াছে, আর এম-আর-পি ২৫,১৩,৫১২ ভোট কম পাইয়া হারাইয়াছে ৭৮টি আসন। এম-আর-পি দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হ্রাস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন নির্বাচন আইনের জন্ত এম-আর-পি দলই বিশেষ ভাবে দায়ী। তাহাদের বাধাদানের জন্তই দ্বিতীয় খ্যালাট-প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। নূতন নির্বাচন আইন প্রবর্তিত না হইলে এই দলের অবস্থা যে আরও কাঁচ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। ফরাসী ধর্মযাজকগণ একান্ত ভাবে এম-আর-পি দলকে ভোট দিতে বলিয়াছেন। তথাপি তাঁহার ২৫ লক্ষ ভোট কম পাইয়াছেন। আলোচ্য নির্বাচনের প্রথম একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ফল ত গল-পক্ষী সদস্য-সংখ্যা। তাঁহার ৪১ লক্ষের কিছু অধিক ভোট পাইয়া ১১৭টি আসন পাইয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা ৫০ লক্ষের অধিক ভোট পাইয়া পাইয়া ১০১টি আসন। এম-আর-পি দল যে-সকল ভোট হারাইয়াছে সেগুলি যে ত গল-পক্ষীরা পাইয়াছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

দল হিসাবে অস্তিত্ব দলের সদস্য-সংখ্যা অপেক্ষা তু গল-পন্থী সদস্যের সংখ্যাই সর্বাধিক। বেশী। কিন্তু বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোটের দিক হইতে বিবেচনা করিলে কম্যুনিষ্ট পার্টিই পৃথক-পৃথক ভাবে বিভিন্ন দলের প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট পার্টি চারি লক্ষ ভোট কম পাইল কেন, তাহাও অবশ্য বিবেচনার বিষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকের সংখ্যা হ্রাসই ইহার কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু লোক যে বেসতী-মনোভাবসম্পন্ন, এ কথা বিবেচনা করিলে এই অসুমান সঠিক বলিয়াই মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম বিরোধের উদ্দেশ্যে মার্শাল পরিকল্পনার অস্ত্র কোটি কোটি ডলার ব্যয় করিয়াছে। ফরাসী শ্রমিকদের উপর কম্যুনিষ্টদের প্রভাব বাহাতে ক্ষুব্ধ হয় তাহার জন্যও অর্থব্যয় বড় কম করে নাই। তথাপি কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা শতকরা ২.৭ ভাগের বেশী কমে নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিবার জন্য যে নতুন নির্বাচন আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে—তাহাকে ফরাসী বন্ধুশীল পত্রিকা Le Monde “most dishonest in French history”, (ফরাসী ইতিহাসে সর্বাধিক অসাদৃশ্য আইন) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ‘ভোট চুরি করার’ এই অসাদৃশ্য আইন সত্ত্বেও নতুন নির্বাচনে ফরাসী জাতীয় পরিষদে কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি শক্তিশালী দল হইয়া রহিয়াছে।

কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিয়া গণতন্ত্রকে বিজয়ী করিবার জন্য যে নতুন নির্বাচন আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে ইহার মত গণতন্ত্রবিরোধী আইন আর কিছুই হইতে পারে না। এই আইন দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনকে যে ভাবে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহা সত্যই এক অদ্ভুতপূর্ণ ব্যাপার! আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বহাল থাকিলে যে-সকল নির্বাচন-ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা, সেই সকল নির্বাচন-ক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বাতিল করা হইয়াছে। আবার যে সকল নির্বাচন-ক্ষেত্রে নতুন আইন কম্যুনিষ্টদের পক্ষে অসুবিধা, সেই সকল নির্বাচন-ক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনই বহাল রাখা হইয়াছে। অতি চমৎকার ব্যবস্থা নয় কি? ফ্রান্সের ১০টি বিভাগীয় নির্বাচন-ক্ষেত্রের অধিকাংশ নির্বাচন-ক্ষেত্রেই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইন বাতিল করিয়া *apparentement* প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই প্রথার মূল কথা হইল এই যে, কয়েকটি দল মিলিয়া যদি শতকরা ৫১ ভোট পায় তাহা হইলে সবগুলি আসনই ঐ দলগুলি নিজেরদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইতে পারিবে। এই ব্যবস্থার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, ২৭টি বিভাগীয় নির্বাচন-ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টি ১১ লক্ষ ভোট পাইলেও এক জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীও নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। কারণ, বিভাগীয় নির্বাচন-ক্ষেত্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট পার্টি একক এমন শক্তিশালী নয় যে, শতকরা ৫০টি ভোটের বেশী পাইতে পারে। আবার অন্য দলের সহিত মিলিত হইবারও কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন সুবিধা নাই। নির্বাচনের পূর্বে যে কয়েকটি পার্টির হাতে আসন-কমতা ছিল তাহাদের জয়লাভের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নতুন আইনে নির্বাচনের জন্য

*apparentement* বা *party alliance* এর ব্যবস্থা ই প্রথান বিষয়। যে-সকল নির্বাচন-অঞ্চলে এই নতুন আইন প্রযোজ্য, সেখানেই দুই বা ততোধিক দলের প্রার্থীদের মিলিত তালিকা ভোটারদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। ভোটারদিগকে বলা হইয়াছে যে, নির্বাচনের জন্য সোশালিষ্টরা পপুলার রিপাবলিকান দল বা র্যাডিক্যাল দল কিম্বা উভয় দলের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যে দলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন নাই তাঁহাদের ভোটে সেই দলের সুবিধা হইলে তাঁহারা সোশালিষ্টদিগকে ভোট দিবেন কি না তাহা তাঁহাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে। কোন নির্বাচন-অঞ্চলে মিলিত দলগুলির প্রার্থীদের তালিকা অথবা সংযুক্ত তালিকা-গুলি যদি শতকরা ৫১ ভোট পায়, তাহা হইলে ঐ তালিকা বা সংযুক্ত তালিকাই ঐ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য নির্ধারিত সমস্ত আসন লাভ করিয়া থাকে। অতঃপর প্রায় দাঁড়ায়, শুধু ঐ বিজয়ী তালিকার বা সংযুক্ত তালিকার প্রার্থীদের মধ্যে আসন বন্টন করা। এই বিজয়ী তালিকার প্রার্থীদের মধ্যে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান অনুযায়ী আসন বন্টন করা হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যে-সকল অঞ্চলে এই নতুন আইন কম্যুনিষ্টদের অসুবিধা হইতে পারে, সেখানে ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন আইন অনুসারে নির্বাচন হইয়াছিল, সেই নির্বাচন আইন অর্থাৎ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনই বলবৎ রাখা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্যারী নগরী এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি এই সকল নির্বাচকমণ্ডলীর। এখানেও ভোট গণনার পদ্ধতি এমন করা হইয়াছে বাহাতে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরোধী দলগুলিরই সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সোশালিষ্টরা তু গল-পন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজী হয় নাই। অন্যত্র কেন্দ্রীয় দল তু গল-পন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিল। কিন্তু তু গল-পন্থীরাই রাজী হয় নাই। অনেকে মনে করেন যে, তু গল-পন্থীরা যদি সহযোগিতা করিতে রাজী হইতেন, তাহা হইলে প্যারী এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি ব্যতীত আর কোন স্থান হইতে এক জন কম্যুনিষ্ট প্রার্থীও নির্বাচিত হইতে পারিতেন না।

বর্তমান নির্বাচনে কেন্দ্রীয় দলগুলিই জয়লাভ করিয়াছে এবং কম্যুনিষ্টরা বৃহৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত এই নির্বাচনের ফলাফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্তর্গত পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমস্ত হইবার কিছুই নাই। ফ্রান্সে কম্যুনিষ্টবিরোধীদের শক্তিশালী সূত্র গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়াই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য। কারণ, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য ফ্রান্সে কম্যুনিষ্ট বিরোধী স্থায়ী গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়া স্থায়ী গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা কঠিন। কম্যুনিষ্টরা বাহাতে শক্তিশালী না হইতে পারে, সেই জন্য সোশালিষ্টরা দক্ষিণপন্থীদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। আবার সোশালিষ্ট এবং তু গল-পন্থীদের মধ্যে মিলে ভাল হিসাবেই পপুলার রিপাবলিকান দল এবং র্যাডিক্যাল দল সোশালিষ্টদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। বিরোধী দল হিসাবে কম্যুনিষ্টরা এবং তু গল-পন্থীরা একাবস্থ হইয়া গবর্নমেন্টে বিরোধিতা করিবে, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তু গল-পন্থীরা শুধু মন্ত্রিসভার বসিবার আনন্দেই গবর্নমেন্ট গঠনে সহযোগিতা

করিতে রাজী। পপুলার রিপাবলিকান দল এবং র্যাডিক্যাল দল ছাড়া গল-পন্থীদেরই সমগোত্রীয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয় দল তিনটি অর্থাৎ তথাকথিত তৃতীয় শক্তি যদি গবর্নমেন্ট গঠন করেও, তাহা হইলেও উহার স্থিতিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। কমুনিষ্টদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য সোভ্যালিষ্টরা তাঁহাদের দাবীপূরণের অনেক কিছুই বর্জন করিয়াছেন। কমুনিষ্ট পার্টির নীতি যদি স্ফুটন্তিত ভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সোভ্যালিষ্টরা উভয় সঙ্কেটে পড়িবেন। তাঁহাদের হয় শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করিতে হইবে, না হয় উহার বিরোধিতা করিতে হইবে। সমর্থন করিলে র্যাডিক্যাল, ছাড়া গল-পন্থী এবং দক্ষিণপন্থীরা মিলিয়া সোভ্যালিষ্টদিগকে গবর্নমেন্ট হইতে বিতাড়িত করিবে এবং ক্রমে গবর্নমেন্টে প্রাধান্য হইবে তাহা গল-পন্থীদের। সোভ্যালিষ্টরা ফ্রান্সকে সেই পথেই লইয়া যাউতেছেন বলিয়া মনে হয়। তবে জাৰ্মানীর হিটলারের সঙ্গে ফরাসী হিটলারের পার্থক্য হইবে এই যে, ফরাসী হিটলার মার্কিন ঐক্যবাদের দ্বারা হিটলারী করিবেন।

### কমুনিজমনিরোধের আয়োজন—

প্রত্যেক দেশে কমুনিজমনিরোধের যে-ব্যবস্থা চলিতেছে ফ্রান্সের নিক্সাচেন আইন তাহার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কমুনিজমনিরোধের এই ধরনের প্রচেষ্টার আর একটি দৃষ্টান্ত ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নিক্সাচেন। ইটালীতেও কমুনিষ্টরা বাহাতে জয়লাভ না করিতে পারে সেই ভাবেই নূতন নিক্সাচেন আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইটালীতেও মার্কিন পরিকল্পনার মারফৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কমুনিষ্টবিরোধী প্রচারকাণ্ডের জ্ঞাতও যথেষ্ট অর্থ দিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জট করে নাই। ফলে ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নিক্সাচেনে কমুনিষ্টরা বিপুল ভাবে পরাজিত হইয়াছে। বহু সংখ্যক মিউনিসিপ্যালিটির নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কমুনিষ্টদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ইটালীতে কমুনিষ্টদের এই বিপুল পরাজয় সত্ত্বেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কমুনিষ্ট পার্টি এবং কমুনিষ্ট পার্টির সহিত সহায়ত্বসম্পন্ন জার্মান সোভ্যালিষ্ট পার্টি মিলিত ভাবে ১৯৪৮ সালের নিক্সাচেনের তুলনায় বেশী ভোট পাইয়াছে। ১৯৪৮ সালে তাহার মোট ভোটের শতকরা ৩০.৩ ভাগ ভোট পাইয়াছিল। এবার তাহার পাইয়াছে মোট ভোটের শতকরা ৩৭.২ ভাগ। নিক্সাচেন আইনের ভেতর জট বৈশী ভোট পাইয়াও তাহার পরাজিত হইয়াছে। এরিকে আবার নয়া ফ্যাসিষ্ট পার্টির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী গ্যাসপারির ডেমোক্রেটিক খ্রিস্টিয়ান দলের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা কমিয়াছে। ফ্রান্সের সাধারণ নিক্সাচেন এবং ইটালীর মিউনিসিপ্যাল নিক্সাচেনের ফলাফল হইতে ইহা বেশ বৃষ্টিতে পায়া যাইতেছে যে, কমুনিজমনিরোধের চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। অধিকন্তু এই চেষ্টা গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথই প্রশস্ত করিয়াছে।

### মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমুনিষ্ট দমন

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমুনিজমনিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে-সকল আয়োজন করিতেছে সেগুলি সম্পর্কে নূতন করিয়া

এখানে আলোচনা করা নিম্নরোজন। উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি, পশ্চিম-ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি ও জাপানের সহিত শান্তি-চুক্তির আয়োজন এবং সামরিক শক্তিবৃদ্ধি সমস্তই কমুনিজম-নিরোধের ব্যাপক প্রচেষ্টারই অঙ্গ। গত জুন মাসে (১৯৫১) মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে সিনেটর কেম যে-সকল দেশ রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখিয়াছে তাহাদিগকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য যে-সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহাও কমুনিজম নিরোধের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক ভাবে কার্যকরী করিবার জন্তই। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া অনেক সিনেটরই বিপক্ষজনক মনে করিবেন। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ এই প্রস্তাবের বিবেচনা তিন মাসের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করায় সিনেটর কেইন বলিয়াছেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কার্য দ্বারা কোরিয়ায় ১,৪১,০০০ জন নিহত এবং আহত আমেরিকাবাসীর প্রতি অবিখ্যাতরূপে বিধাসম্মতকতা করা হইয়াছে। কেম-প্রস্তাবের অমুকুল কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে বিশ্বয়ের বিষয় হইবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে কমুনিষ্ট দমনের যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহা তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হয় নাই। কিন্তু বলপূর্বক মার্কিন গবর্নমেন্টকে উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও প্রবোচনা দানের চক্রান্ত করিবার অভিযোগে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক ফেডারেল গ্র্যাণ্ড জুরীর সম্মুখে ১২ জন কমুনিষ্ট নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়। এক জন ব্যতীত অপর ১১ জনের বিচার হয়। দীর্ঘ শুনানীর পর ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই ১১ জনের প্রতি যে দণ্ডদেশ প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে সুলীম কোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া গ্র্যাণ্ড জুরী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। দণ্ডিত কমুনিষ্ট নেতৃগণ সুলীম কোর্টে আপীলের যে কারণ প্রদর্শন করেন তাহাতে বলা হয় যে, ১৯৪০ সালের শ্রিথ আইন অনুসারে তাহাদিগকে দণ্ডিত করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ আইন শাসনতন্ত্রবিরোধী এবং মার্কিন শাসনতন্ত্রের প্রথম সংশোধনে যে বাক-স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, শ্রিথ আইন দ্বারা তাহার ব্যত্যয় করা হইয়াছে। গত ৪ঠা জুন (১৯৫১) সুলীম কোর্টের আট জন বিচারপতির মধ্যে ছয় জন একমত হইয়া কমুনিষ্ট নেতাদের আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ডদেশ বহাল রাখিয়াছেন। এই ছয় জন বিচারপতির পক্ষে প্রধান বিচারপতি মিঃ ভিনসন রায় প্রদান করেন। শ্রিথ আইন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন গবর্নমেন্টকে বলপূর্বক বা হিংসাত্মক কার্য দ্বারা ধ্বংস করা কর্তব্য, প্রয়োজন, অভিপ্রের্ত বা সঙ্গত—এইরূপ শিক্ষা দান, কিম্বা উহার সহিত সহযোগিতা করা বা সমর্থন করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন দ্বারা বাক-স্বাধীনতা ধ্বংস হইয়াছে কি না, সুলীম কোর্টের বিচারে ইতিপূর্বে তাহা নির্ধারিত হয় নাই। কিন্তু ১৯১৮ সালে বিচারপতি অলিভার ওয়েন্সেল হোমস্ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “The question of every case whether the words used are used in such circumstances and are of such nature as to create a clear and present danger that they will bring about the

substantive evils that congress has a right to prevent." অর্থাৎ 'সুস্পষ্ট ভাবে এবং বর্তমানে বিপদাশঙ্কা দেখা দিলেই উহা প্রতিরোধ করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে।' এগার জন কমানিষ্ট নেতার আপীল অগ্রাহ্য করিয়া সুলীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের মুখপাত্র হিসাবে প্রধান বিচারপতি মিঃ ভিনসন রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন, বিবাদিগণ যে অবস্থা অসুখ্যায়ী দ্রুত গবর্ণমেন্টকে প্রেরণ করিতে চান তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সুতরাং যে সুস্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদ (a clear and present danger) দেখা দিলে স্থিতি আইনে কল্পিত ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র অসুখ্যায়ী গ্রহণ করা যাউতে পারে উহা সেইরূপ সুস্পষ্ট এবং বর্তমান বিপদ। সুলীম কোর্টের এই রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমানিষ্ট পার্টির সকল সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ এই রায় প্রকাশিত হওয়ার পর মার্কিন স্কেডারেল গোয়েন্দা বিভাগ (F.B.I) ১৭ জন কমানিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করিয়াছে। মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

বোধ হয়, গ্রিগ বংসর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমানিষ্ট পার্টি গঠিত হইয়াছে। উহার সদস্য-সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশী হইবে না। শ্রমিক ইউনিয়নগুলির উপর কমানিষ্ট পার্টির কোন প্রভাব নাই। সুলীম কোর্টের এই রায় প্রকাশিত হওয়ার, নামে না হইলেও কার্যতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমানিষ্ট পার্টি বে-আইনী হইয়া পড়িল। কিন্তু উল্লিখিত আপীলের বিচারে যে দুই জন বিচারপতি অধিকাংশ বিচারপতির সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের মন্তব্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা বিশেষ ভাবে বিবেচনা না করিয়া পারিবেন না। এই বিচারপতিদ্বয়ের মধ্যে এক জন বিচারপতি মিঃ ব্র্যাক এবং আর এক বিচারপতি মিঃ ডগলাস।

বিচারপতি মিঃ ডগলাস তথ্যের উপরেই বেশী জোর দিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কমানিষ্ট নেতারা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসুভবোধ্য কোন কাজ করেন নাই, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যৎযত করার অভিযোগও উপস্থাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে গতিবোধ উপস্থিত করা হইয়াছে এবং বাহা কিছু তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা এই যে, তাঁহারা মার্কিন-লেবিন মতবাদের চারিখানি ক্লাসিক্যাল পুস্তক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলির পঠন-পাঠন বন্ধ করা উচিত, এমন কথা কেহই বলেন না। তাই যদি হয়, তবে ঐ বইগুলি পড়াইবার ব্যবস্থা বাহা করা কেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিরূপে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়? তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "The crime then depends not on what is taught but on who the teacher is." অর্থাৎ 'তাহা হইলে কি পড়ান হইতেছে তাহা দ্বারা নয়, কে পড়ান তাহা দ্বারা ই অপরাধ গণ্য হয়।' বিচারপতি মিঃ ব্র্যাকও অনেকটা অনুরূপ যুক্তিই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি স্থিতি আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়াই মনে করেন এবং বিচার্য বিষয় সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের উদ্ভেদের জন্ত কমানিষ্ট নেতারা কিছু বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এই অভিযোগ তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করা হয় নাই। ভবিষ্যতে গণপূর্বক গবর্ণমেন্ট অপসারণের জন্ত পথে কোন এক সময়ে সমবেত

হইতে, আলোচনা করিতে এবং ভাবধারা প্রচার করিতে তাঁহারা একমত হইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

সুলীম কোর্টের এই রায়ের পরে আমেরিকাবাসী ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা লইয়া যে উভয় সঙ্কেতে পতিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিলোপ না করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। কমানিষ্টরা মানুষের চিন্তাধারাকেও নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়া থাকে। অবশেষে গণতন্ত্রও কি চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করিবে?

#### অষ্ট্রেলিয়ায় কমানিষ্টমনিরোধ

কমানিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার জন্ত অষ্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট শাস্তির সময়ে এই আইন শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কাজেই ঐ আইন বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার রক্ষণশীল প্রধান মন্ত্রী মিঃ রবার্ট মেজিস আবার নতুন করিয়া কমানিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার জন্ত উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে গত ১৮ই জুন অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেজিস বলিয়াছেন যে, কমানিষ্ট পার্টির উচ্ছেদের জন্ত বর্তমান মাসের মধ্যে যদি তাঁহাকে ক্ষমতা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্ত তিনি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার এই উক্তিকে কঁাকা আগুয়ান মনে করিয়া বোধ হয় কোন কারণ নাই। নির্বাচন আইন পরিবর্তন করিয়া কমানিষ্টমনিরোধের ব্যবস্থা ক্রাঙ্গে ও ইটালীতে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। মিঃ মেজিস কমানিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে ডাইবেক্ট অ্যাকশন গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

#### আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও কমানিষ্টম

৩০শে জুন (১৯৫১) স্নাকফোর্টে পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীদের এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। এই সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হওয়ার পরই গত ৩রা জুলাই উক্ত প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ-নিরোধের জন্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে অগ্ররোধ করিয়া এক ঘোষণা-বাণী অগ্রমোদন করিয়াছে। এই ঘোষণা-বাণীতে তিন হাজার শব্দ আছে। উহাতে কমানিষ্টমকে নতুন সাম্রাজ্যবাদের অন্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং কমানিষ্টম ও ক্যাপিটালিজমের নিপীড়ন—উভয়কেই নিলম্বা করা হইয়াছে। যুদ্ধ-নিরোধের জন্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির অন্তঃসম্মতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে শান্তি অঙ্গতম। কোরিয়া যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কমিনফর্ম তাহার ক্ষমতার সম্প্রসারণের জন্ত সমস্ত আক্রমণ করিতেও যে কুচিত নয়, কোরিয়া যুদ্ধ তাহা প্রমাণ করিয়াছে এবং কোরিয়া যুদ্ধে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দ্বারা আক্রমণ নিবোধ করা এবং যুদ্ধ নিবারণ করা সম্ভব। ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, স্বাধীন বিশ্ব যদি আক্রমণ, সামরিক-নৈতিক অগ্রপ্রবেশ এবং অর্থনৈতিক পতন



নিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম এড়ানো সম্ভব হইবে।

পৃথিবীর এক কোটি সমাজতন্ত্রীদের ৩০টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একমাত্র জাপানের প্রতিনিধিরাই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, যে কোন অবস্থাতেই সমাজ-তন্ত্রের কর্তব্য যুদ্ধাঘোষনের বিরোধিতা করা। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল এই নূতন প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করিলেও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই ঘোষণা-বাকীর কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বর্তমান ঐকাত্মিক নিরাপত্তার ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি প্রশ্ন করেন, কোন পৃথিবীকে সমাজতন্ত্র রক্ষা করিবে? ডাঃ লোহিয়া পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজম উভয়েরই দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন যে, একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদই পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিতে সমর্থ। কিন্তু কিরূপে সমর্থ, ইহাই মূল প্রশ্ন। ১৯৪৮ সাল হইতে পশ্চিম-ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা নিজদিগকে তৃতীয় শক্তি (Third force) বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। গত তিন বৎসরে উহার পরিণাম কি হইয়াছে?

বর্তমানে এই তৃতীয় শক্তির নীতিগত মূল ভিত্তি হইয়াছে নিজেদের দেশে জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতিবস্থা বজায় রাখা। এই তৃতীয় শক্তি এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। দরিদ্র জনগণের প্রতি তাহাদের দরদই অত্যন্ত অস্পষ্ট। মার্কিন ডলার-সাহায্যের শক্তি সম্পর্কেও প্রথমে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। মার্কিন ডলার-সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার ফলে পশ্চিম-ইউরোপের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। অল্পসম্ভার ফলে জনকল্যাণ রাষ্ট্রের স্বপ্নও তাহাদের তালিয়া গিয়াছে। কম্যুনিজম দমনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া শুধু প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিরই শক্তিবৃদ্ধি তাঁহারা করেন নাই, নিজেদের আত্মবিলুপ্তির পথও প্রশস্ত করিয়াছেন।

#### কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন

সম্প্রতি মিলানে ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ, উত্তর-আমেরিকা এবং এশিয়ার ৬৬টি দেশের ২ কোটি ২৫ লক্ষ সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের তিন শত প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৪১ সালের নবেম্বর মাসে লণ্ডনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ-কম্যুনিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে এই স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন গঠিত হয়। ইহাতে বিশ্বশ্রমিক বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মিলানের অধিবেশনে গত ৫ই জুলাই (১৯৫১) স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন পৃথিবীর অমুন্নত অঞ্চল-গুলিতে সূদূর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়ন কন্ট গঠনের জন্য প্রতিক্রিয়াবদ্ধ হইয়াছেন।

#### মিসেস্ ফেন্টনের অপরাধ

গত জুন মাসে মিসেস্ মশিকা ফেন্টন নামক বুটেনের জর্নিক সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার কারণটি শুধু প্রােহেলিকা। হইয়াই রহে নাই, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনিবার দাবীও করিয়াছিলেন। কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে পরিকল্পনা-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ হিউগ ডান্টন অবশ্য বলিয়াছেন যে, কম্যুনিষ্টদের প্রতি মিসেস্ ফেন্টনের সহানুভূতি আছে, ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, “যদি আমি তাহা মনেও করি তথাপি আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে (মিসেস্ ফেন্টনকে বরখাস্ত করা) ইহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।” মিসেস্ ফেন্টন বিনা ছুটিতে উত্তর-কোরিয়া ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং গত ৭ই জুন পাবলিক একাউন্টস কমিটি বখন তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান তখন তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই কি তাঁহাকে বরখাস্ত করার আসল কারণ?

আঠারটি দেশের ২০ জন মহিলা লইয়া গঠিত তথ্য-সন্ধানী (fact finding) মিশনের সহিত তিনি উত্তর-কোরিয়ার গিয়াছিলেন এবং ভ্রমাবহ হত্যাকাণ্ডের বিবৃত্ত বিবরণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা এতই ভয়ানক যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।” তাঁহার বৈবক্ষ্যতা রেকর্ড করিয়া ১০ই জুন (১৯৫১) মঞ্চ হইতে বেতারযোগে প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে মিসেস্ ফেন্টন বলিয়াছেন যে, উত্তর-কোরিয়া বখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে গিয়াছিল তখন উত্তর-কোরিয়ার অধিবাসীদের উপর বিশেষ করিয়া নারী ও শিশুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিয়াছিল। কুবক নারীরা মার্কিন সৈন্যদের বেসকল অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাকে জানাইয়াছে তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “I think, I shall hear their accusation as long as I live, but the real accusation must be levelled not simply against men who committed these deeds but against all of us who allow these to be done in our names.” অর্থাৎ “যত দিন বাঁচিয়া থাকিব তত দিন এই সকল অভিযোগ আমার কানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। যাহারা এই সকল কাজ করিয়াছে প্রকৃত অভিযোগ শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করিলেই চলিবে না, আমরা যাহারা আমাদের নামে এই সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইতে দিয়াছি তাহাদের সকলের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ উপস্থাপন করিতে হইবে।” কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের উৎকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

#### প্যারী সম্মেলনের ব্যর্থতা—

গত ৩১শে মে (১৯৫১) পশ্চিমী রাষ্ট্রত্রয় রাশিয়ার নিকট যে পত্র দেন, তাহার উত্তর গত ২১শে জুন মঃ গ্রোমিকো পশ্চিমী সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের হাতে অর্পণ করেন। রুশ গবর্নমেন্ট ১৫ই জুন উক্ত পত্রের উত্তর প্রদান করেন। উক্ত উত্তর পাওয়ার পর ২২শে জুন চতুঃশক্তির সহকারী পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের সহকারী পররাষ্ট্র সচিবগণ মঃ গ্রোমিকোকে জানাইয়াছেন

যে, আলোচনা চালাইয়া বাওয়ার আর কোন সার্থকতা নাই। গত এই মার্চ যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছিল, ২২শে জুন তাহার সমাপ্তি হইল বার্ষিকতার মধ্যে। এই বার্ষিকতার জন্ত দায়ী কে তাহার উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। পশ্চিমী শক্তিক্রয় রাশিয়ার ঘাড়েই লোণ চাশাইয়াছে। আবার রাশিয়া এই বার্ষিকতার জন্ত দায়ী করিয়াছে পশ্চিমী শক্তিক্রয়কেই। কিন্তু রাশিয়ার উত্তর বিল্লেখণ করিলে সঠিক উত্তর পাওয়া বোধ হয় কঠিন হয় না।

রাশিয়ার উত্তর সম্পর্কে ইহাই বলা হইয়া থাকে যে, পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন সম্পর্কে পশ্চিমী শক্তিক্রয়ের প্রস্তাব রাশিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছে। আটলান্টিক চুক্তি এবং বিদেশস্থ মার্কিন ষাঁটিসমূহ সম্পর্কে আলোচনাই রাশিয়ার প্রধান দাবী। রাশিয়ার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, শুধু কোঁতুল বশতঃ এই দাবী করা হয় নাই, আন্তর্জাতিক বৈদেশিক ক্রাস করা এবং বিশ্বশান্তি অক্ষুর রাখা আগ্রহেই এই প্রস্তাব করা হইয়াছে। রাশিয়ার উত্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমী শক্তিক্রয় আটলান্টিক চুক্তি এবং বিদেশস্থ মার্কিন ষাঁটিসমূহ অসম্মত বিষয়রূপে (as a disagreed item) কণ্ঠস্থচিহ্নিত করিতে রাজী হইলেই রাশিয়া পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে যোগদান করিবে। চীন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুম্যানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স ও বৃটেনের সহিত রাশিয়া যে-সকল পরস্পর সাহায্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, পশ্চিমী শক্তিবর্গ পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে এই সকল চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইলে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট তাহাতে কোন বাধা সৃষ্টি করিবেন না। রাশিয়া অজ্ঞাত দেশের সহিত তাহার পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তিগুলির আলোচনা কণ্ঠস্থচিহ্নিত করিতে রাজী হওয়ার পর আটলান্টিক চুক্তি ও বিদেশস্থ মার্কিন ষাঁটিসমূহ অসম্মত বিষয় (disagreed item) হিসাবে কণ্ঠস্থচিহ্নিত করিতে পশ্চিমী শক্তিক্রয়ের রাজী না হওয়া কি অত্যন্ত অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় না?

### শ্রীমতী ব্যর্থ বিজ্রোহ—

বিজ্রোহের দেশ গ্রামে সম্প্রতি হঠাৎ যেমন বিজ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল, তেমনি আকস্মিক ভাবেই বার্ষিকতার মধ্যে এই বিজ্রোহের অবসান হইয়াছে। গত ২১শে জুন (১৯৫১) একটি মার্কিন জাহাজ গ্রাম গবর্নমেন্টের হাতে অর্পণের অনুরোধে যোগদানের সময় প্রধান নৌ মার্শাল পিবুল সংগ্রামকে নৌবাহিনীর এক দল সৈন্য অপহরণ করে। ইহাতেই এই বিজ্রোহের আরম্ভ। অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার সময় এই ঘটনা ঘটে। অতঃপর নৌবাহিনী একটি নূতন গবর্নমেন্ট গঠন করে। গ্রাম দেশের স্থল-সৈন্যবাহিনী মার্শাল পিবুল সংগ্রামের পক্ষে ছিল এবং বিমান বাহিনী তাহাদিগকে সাহায্য করে। ৩০শে জুনও স্থল-বাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকে। এলা জুলাই তারিখে প্রাতে ম্যানিলা হইতে প্রচারিত ব্যাঙ্ক সরকারের ঘোষণায় বলা হয় যে, সংগ্রাম-গবর্নমেন্টের উচ্ছেদের জন্ত যে নৌ-বিজ্রোহ হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে এবং প্রধান মন্ত্রী মার্শাল পিবুল সংগ্রাম অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সংগ্রাম-গবর্নমেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৩ কোটি ১ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য এবং ১ কোটি ডলার মূল্যের সামগ্রিক প্রদান সাহায্য পাইয়াছেন। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গ্রামই

সর্বপ্রথম বাও দাই-গবর্নমেন্টকে স্বীকার করিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে গ্রামই সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে সর্বপ্রথম। গ্রামের পূর্ব-সীমায় ইন্দোচীনে ছোট চীনের সহিত ফরাসীদের সংগ্রাম চলিতেছে। দক্ষিণ-সীমায় মালয়ে চলিতেছে কমুনিষ্ট বিজ্রোহ। পশ্চিম-সীমায় বিজ্রোহে ক্ষতবিক্ষত ব্রহ্মদেশ। উত্তরে অবশ্য কমুনিষ্ট চীন, কিন্তু মধ্যে দুর্লভ্য পরকতমালায় ব্যবধান।

### ইরাণী তৈল-সঙ্কটের ভবিষ্যৎ—

ইরাণের তৈল-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসায় সাহায্য করিবার জন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে সর্বশেষ নয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, ইরাণ গবর্নমেন্ট উহা গ্রহণ করায় মীমাংসায় স্তব্ধতা কতখানি আশাশ্রয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। তৈল-বিরোধ সম্পর্কে বৃটেনের আবেদন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালত গত ৫ই জুলাই (১৯৫১) রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হইয়াছে যে, মূল সমস্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পূর্বে যে সকল ব্যবস্থা ছিল সেইগুলিই বহাল রাখা এবং এই বিরোধে উভয় পক্ষের স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্তরীকী কালের জন্ত পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি তত্ত্বাবধায়ক বোর্ড গঠন করা উচিত। ১ই জুলাই রাতে ইরাণ রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, ইরাণ গবর্নমেন্ট আন্তর্জাতিক আদালতের রায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহার দুই দিন পরে ১ই জুলাই তেহরানস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডাঃ হেনরী গ্রোভি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পত্র ইরাণের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদেকের হস্তে প্রদান করেন। গত ৩০শে জুন (১৯৫১) ডাঃ মোসাদেক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহাই উত্তরে এই পত্র দেওয়া হইলেও ইহাতে তৈল-বিরোধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার জন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার বিশেষ পরামর্শদাতা মিঃ হারিম্যানকে প্রেরণের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্বেই হয়ত মিঃ হারিম্যানের প্রচেষ্টার ফলাফল জানা যাইতেও পারে। কিন্তু তৈল-বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে ইরাণ গবর্নমেন্টের দাবী ও বৃটিশ গবর্নমেন্টের দাবীর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক।

ইরাণ গবর্নমেন্ট তৈল-শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিতে চান এবং যে-সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে তৈল-শিল্প সভ্যই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হয় সেই সকল ব্যবস্থাই গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। ইরাণ গবর্নমেন্ট তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার আইন পাশ করিয়াছেন। দেশজাত ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানী নামক একটি প্রতিষ্ঠান এবং উহার কার্য পরিচালনার জন্ত একটি বোর্ডও গঠন করা হইয়াছে। এই বোর্ড ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিবেন। ইহা ব্যতীত তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা অর্থহীন হইয়া পড়ায়। তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবার আইনের ২নং দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তৈল বিক্রয় হইতে যে আয় হইবে, খরচ বাদে তাহার সমস্তই ইরাণ গবর্নমেন্টের ট্রেজারীতে গিতে হইবে এবং ইরাণ গবর্নমেন্ট উহার শতকরা পঁচিশ ভাগ ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীকে কতিপয় দিবসের জন্ত পৃথক করিয়া রাখিবেন। তৈলবাহী জাহাজগুলিতে যে তৈল সরবরাহ করা হইবে, তাহার রসিদও জাতীয় ইরাণী তৈল কোম্পানীর নামে দাবী করা হয়। কিন্তু বৃটেন চায়, ইরাণের

তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্বকরণের নীতি নামে মাত্র স্বীকার করা হইবে, কিন্তু কার্যতঃ ইঙ্গ-ইরাণীয় তৈল কোম্পানীই পূর্বের ভায় বহাল থাকিবে। ইহার লক্ষ্য ইরাণে সৈন্ত অবতরণ করা ব্যতীত আর বত ভাবে চাপ দেওয়া সম্ভব, বুটেন তাহা দিতে ক্রটি করিতেছে না।

আগোষ্ঠী-সম্মেলনের ১৪ই জুন (১৯৫১) বে আলোচনা আরম্ভ হয়, ১১শে জুন তাহা ব্যর্থ হওয়ার পরই মধ্যপ্রাচ্যস্থিত সমস্ত বুটিশ ঘাঁটিগুলিকে প্রত্যন্ত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বুটিশ কূটনৈতিক মরিসাসকে আবাদান বন্দরের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ করিয়া দিবার হুমকি দিতেও ক্রটি করা হয় নাই। ২৮শে জুন বুটিশ কর্মচারী ইরাণ গবর্ণমেন্টের অধীনে কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছে। ইরাণের তৈলখনি হইতে বুটিশ কর্মচারীদিগকে বুটেন অবশ্যই সরাইয়া আনিবে না। কারণ, উহা তৈলখনিগুলি ছাড়িয়া দেওয়ারই ন্যায়সম্বল হইবে। কিন্তু রসিদ সম্পর্কে গণগোল সৃষ্টি করিয়া আবাদান বন্দর হইতে তৈলবাহী জাহাজগুলি ফেরৎ পাঠান হইয়াছে। বুটেনের এই অনমনীয় দৃঢ়তার কারণ অসুস্থমান করা কঠিন নয়।

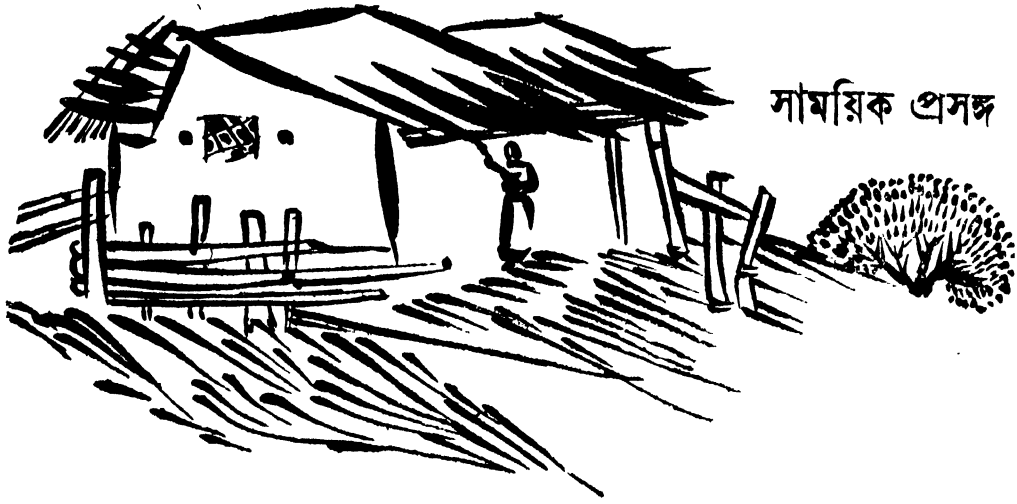
ডাঃ মোসাদেক ভয়ানক ক্রশ-বিরোধী। রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ করিতে তিনি রাজী হইবেন না। ইরাণের এমন আর্থিক সঙ্কতি নাই যে, তৈল খনিগুলির কাজ চালাইতে পারে। ইরাণী টেক্‌নেশিয়ান আছে মাত্র ৪০ জন। তাহা পর ইরাণ তাহার তৈল বিক্রয় করিবে কিরূপে এবং কাহার নিকটে, ইহাও বড় সহজ সমস্যা নয়। ইরাণ যদি তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিতে পারে তাহা হইলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এই লক্ষ্যই বুটেন অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। উহার পরিণাম অসুস্থমান করা সহজ নয়।  
কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা—

কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পর ১০ই জুলাই (১৯৫১) কায়সং এ যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গত ৮ই জুলাই লক্ষ্যতাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে প্রারম্ভিক আলোচনা সমাপ্ত হইলেও এবং ১০ই জুলাই সম্ভাব্যজনক পরিস্থিতির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আরম্ভ হইলেও, আকস্মিক ভাবে ১২ই জুলাই যুদ্ধবিরতি আলোচনায় এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং তিন দিন আলোচনা বন্ধ থাকার পর অবশেষে ১৫ই জুলাই পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও এইরূপ সাময়িক অচল অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে কোন অসুস্থমান আশ্রয় করিতে চাই না। কিন্তু যে কারণে উল্লিখিত অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যিক। কম্যুনিষ্ট বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২৩ জন সাংবাদিককে কায়সং এ প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত হওয়ারতাই এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টদের পক্ষে দাবী ছিল এই যে, সত্যিকার যুদ্ধবিরতি আলোচনার লক্ষ্য প্রাথমিক আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইলেই সাংবাদিকদিগকে আলোচনায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু জেঃ রিজওয়ে মনে করেন যে, ইহাতে কে উপস্থিত থাকিবে কি থাকিবে না তাহা নির্ধারণ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গত ১৫ই জুলাই জেঃ রিজওয়েও এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, আন্তর্জাতিক

গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধবিরতি সম্মেলন গোপনে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, সাংবাদিকদের ভ্রমুপস্থিতি সম্বন্ধে প্রারম্ভিক আলোচনা যদি ব্যর্থ না হইয়া থাকে, তবে পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও তাঁহাদের ভ্রমুপস্থিতির লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার কোন কারণ নাই। তবে এই আপত্তি ও প্রতি-আপত্তির মূলে অল্প কোন সাময়িক বা রাজনৈতিক কারণ থাকাই সম্ভব। বাহা ইউক, শেষ পর্যন্ত যে অচল অবস্থার অবদান হইয়াছে ইহাও শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি হইলেও সুদূর প্রাচ্যের মূল সমস্যা এবং তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামের আশঙ্কা বর্তমানের মতই থাকিবে।

কোরিয়া যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ণ হইবার দুই দিন পূর্বে গত ২৩শে জুন (১৯৫১) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে রাশিয়ার প্রতিনিধি দলের নেতা মঃ মালিক বেতার-যোগে এক বক্তৃতায় অষ্ট্রেলিয়ার অক্ষরোথার সাময়িক শক্তি ও যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আলোচনার লক্ষ্য যুগ্মদান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন। অতঃপর ক্রশ-প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া ক্রশ পররাষ্ট্র-সচিব মঃ গ্রিমকো মন্তব্যস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিকট বলেন যে, উভয় পক্ষের সেনা-নায়কগণই আলোচনা ব্যর্থ যুদ্ধবিরতির সঠিক নির্ধারণ করিবেন এবং সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কোন আলোচনা হইবে না। এই লক্ষ্যই যুদ্ধবিরতি আলোচনা আরম্ভ হওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধবিরতি যদিও হয়, তাহা হইলেও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা একটুকুও হ্রাস পাইবে না। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষা-ব্যবস্থা দৃঢ় করিবার প্রয়াস শিথিল হইলে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইবে। গত ৫ই জুলাই পিকিং রেডিও হইতে চীনের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির ফলে সুদূর প্রাচ্যের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না।

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার কল বাহাই ইউক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ও থাকিবে স্বাধীন-বিশ্বের সমরসজ্জার আরোহণ চলিতেই থাকিবে—যে পর্যন্ত না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, ইল-মার্কিন ব্লকের সাময়িক শক্তি সোভিয়েট ব্লকের সাময়িক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছে। গত ১২ জুলাই বুটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক যুক্তভাবে রচিত জাপ শান্তি-চুক্তির যে খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং মিঃ জন ফষ্টার ডুলেস এ-সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাশিয়া ও চীনকে বাদ দিয়াই এই শান্তি-চুক্তি করা হইবে। জাপান ফরমোসার দাবী পরিত্যাগ করিবে বটে, কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। শান্তি-চুক্তির পরে যে দ্বৈত রক্ষা-ব্যবস্থার চুক্তির বিধান করা হইয়াছে তাহাতে জাপান সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইয়া থাকিবে। জাপ গবর্ণমেন্ট ইচ্ছামুসারে চিয়াং কাইশেক অথবা মাও সে তুংয়ে সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, এই সর্বও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তির কথাও স্মরণ করা আবশ্যিক। এশিয়া-বৈরাট্যশক্তি পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহকর্ম হইয়া উঠিয়াছিল, সে জাপান আজ সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শক্তি মার্কিনের অধীন। যুদ্ধের পরে এশিয়ার নতুন শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে নয়টান। কম্যুনিষ্ট নিয়োগে অজুহাতে এই নয়টানকে বিধ্বস্ত করাই পশ্চিমী শক্তিবর্গের সুদূর প্রাচ্য-নীতি।



## সাময়িক প্রসঙ্গ

### বাঙ্গালোরের অধিবেশন

“কংগ্রেসকে ভাঙ্গনের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্য্য করি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে এই আশা লইয়া যে সকল কংগ্রেসসেবী বাঙ্গালোরে গিয়াছিলেন তাঁহারা যদি নিরাশ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কংগ্রেসের ভাঙ্গন ঘোষণা করিবার জন্য গত মে মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ২১ জন সদস্য যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছিলেন বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে উহার যে দুইটি সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয় যে, শ্রীযুক্ত নেহরু ট্যাগুনজীর সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি এবং সাধারণ ভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করিবেন। উক্ত সংশোধন প্রস্তাবের পাঁচটি প্রস্তাব হিসাবে ট্যাগুনজীর প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু মূল প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারীদের দুই জন উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় নেহরুজী ও ট্যাগুনজীর মধ্যে শক্তি পরীক্ষা আর সম্ভব হইল না। দলত্যাগী সদস্যদ্বয়কে কংগ্রেসের মহান কাজে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়া যে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে মিঃ কিদোয়াইয়ের মনোবাসনা ঘোষণা হয় অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে দুইটি সদস্য পদ খালি রহিয়াছে, তাহাতে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু উপদলের দুই জনকে গ্রহণ করা হইলেও মিঃ কিদোয়াইয়ের সম্মতি হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ, এই প্রস্তাব দুই মাস পূর্বেই করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ কংগ্রেসের ভাঙ্গন ঘোষণা করা অপেক্ষা ক্ষমতা হাতে রাখিবার চেষ্টা করাই কংগ্রেসের বৃহৎ নৈতৃত্বের উদ্দেশ্য। ইহার জন্য যে পদ্য তাঁহারা গ্রহণ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে নিজেদের প্রতিই কংগ্রেসসেবীদের আস্থা প্রকাশ পাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি না কি এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, বাঁহারা কংগ্রেসের সমস্ত নহেন এইরূপ ব্যক্তির যদি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইচ্ছাহারের প্রতি আশ্রয় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মনোনীত করা হইবে। নির্বাচন কমিটি এইরূপ স্থির করিয়া থাকিলে আশঙ্ক্য হইবার কিছুই নাই।

কংগ্রেসী শাসনের চারি বৎসরে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসসেবীদের সম্পর্কে জনসাধারণের যে ধারণা জন্মিয়াছে আমাদের শাসকবর্গের তাহা অজানা নাই। শাসন-ক্ষমতা হাতে থাকিলে দেশবাসীর উপর দমন-নীতি চালাইতে পারা যায়, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাচারে এবং অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, কিন্তু পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করিয়া ভোট আদায় করিতে পারা যায় না। শাসনকর্তার আসনে বসিয়া দেশবাসীর অন্ন-বস্ত্রের দাবীকে চোখ রাঙাইয়া ঠাণ্ডা করা যায়, দেশবাসী সম্পর্কে তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যও করা সহজ হয়। কিন্তু নির্বাচনের সময় চোখ রাঙাইয়া কিবা তীব্র শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য করিয়া ভোট পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইচ্ছাহারে দেশবাসীকে অন্ন-বস্ত্র যোগাইবার আশাস অবশ্যই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গত চারি বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসী শাসকবর্গ যে ভাবে দেশবাসীকে অর্দ্ধাচারে এবং অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আশাসে দেশবাসী আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। কাজেই কংগ্রেস-সেবীদের পক্ষে দেশবাসীর কাছে ভোট ভিক্ষা করিয়া বিশেষ সুবিধা হইবে না। বাঁহারা কংগ্রেসসেবী নহেন, অথচ প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে ভোট যোগাড় করিতে পারিবেন, এইরূপ লোককে বাগাইতে পারিলে অনেক সুবিধা আছে। কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা থাকিলে আখেরে সুবিধা হইতে পারে তাবির্য অনেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কংগ্রেসের মনোনয়ন পাইবার জন্য কংগ্রেস ক্রীড়ে একটা দস্তখত করিতে রাজী অবশ্যই হইবেন। কিন্তু আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে পাইলে কংগ্রেসী শাসকবর্গ যে নির্বাচনী ইচ্ছাহারকে এক টুকরা ছেঁড়া কাগজের মত ফেলিয়া দিবেন, তাহাতে দেশবাসীরও কোন সন্দেহ নাই।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

### চন্দননগরের শিক্ষা

“চন্দননগরের নির্বাচন দেখাইয়া দিল যে, কংগ্রেসী দুঃশাসনের কবলমুক্ত হইবার জন্য আমাদের সাধারণ মানুষ—প্রত্যেক সং ও দেশভক্ত নাগরিক কতখানি আগ্রহশীল।

চন্দননগর নির্বাচনে দেশভক্ত ও গণহতী রাজনীতিক দল এবং প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই পরিহার করা হইয়া দিল যে, বাঁহারা দেশবাসীর ভাল করিতে চান বলিয়া গর্ব করেন, এবং তাঁহাদের জন্য কাজকর্মও

করেন, তাঁহাদের সকলের দেশপ্রেমিক ও প্রগতিশীল একতাকেই শুধু জনসাধারণ বিশ্বাস করেন। কোন একটি দল বা প্রতিষ্ঠান যদি জেদ করিয়া একক ভাবে জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা গড়া দাবি করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে।

চন্দননগর নির্বাচন ইহাও প্রমাণ করিল যে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে যদি শাসন-কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ থাকেন এবং কংগ্রেসী গুণান্বী ও গোলযোগ সৃষ্টির চক্রান্তে সহায়ক না হন, তাহা হইলে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীকে সরকারী গণী হইতে অপসারণ করা সম্ভব।

—স্বাধীনতা।

### এ যুগের সাংবাদিকতা

“শুধু সংবাদপত্রের মালিকদিগকে দোষী করিয়া লাভ নাই। সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সিনেমা সমালোচক প্রভৃতি অনেকই প্রলোভনের উর্দ্ধে নহেন; আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতন নহেন। সরাঞ্জ হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারী বিতরণের দ্বারা স্বল্পায়ু সিনেমা-পরিচালক কি ভাবে ‘যুগান্তকারী’ বলিয়া সম্পাদকীয় স্তরে সার্টিফিকেট আদায় করিতে পারেন, ফুলের মালা ও সভাপতিত্ব দান করিয়া কি ভাবে অধ্যাত পাঠ্যগানের বার্ষিক উৎসবের বিবরণী ডবল কলাম হেভি-এ ছাপানো যায়, তাহার সম্বন্ধে এক্ষণে কাহাবও অবদিত নাই। কেন যে বীমা কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসারগণের কবিতা, বিস্কুট কোম্পানীর প্রচার-সচিবের গল্প ও টি সেস আপিসের বিজ্ঞাপনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীগণের প্রবন্ধ বা বসরচনা বাংলা দেশের প্রত্যেকটি পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলিতে ছাপা হয় তাহার রহস্য অন্বেষণ করা কঠিন নয়।

বর্তমানে ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের এই দুর্বলতা শুধু আমাদের গবর্ণমেন্টের নিকটই নহে, ভারতে স্থিত বিদেশী দূতাবাস-গুলির কর্তাদের নিকট পর্য্যন্ত দিনের আলোর দ্বারা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিতেছি। কয়েক জন সম্পাদককে রাশিয়া ভ্রমণে আমন্ত্রণ করা হইবে এই সংবাদ প্রচারের ফলে এখানকার দুইখানি সংবাদপত্রে ক্রুরপ নীর্যময়ানী সাভিয়েট ও ষ্টালিন-প্রশংসিত সুরু হইয়াছিল তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশেষে উহাদের মধ্য হইতে এক জন সম্পাদক আমন্ত্রিত হওয়ার অপর সম্পাদক হাল ছাড়িয়া থামিয়াছেন। দুই বৎসর ধাবৎ ব্রিটিশ কাউন্সিল ছয় সপ্তাহের জন্য জন কয়েক দেশীয় ভাষার সাংবাদিককে ব্রিটেনে লইয়া যাইতেছেন। ইহার জন্য কলিকাতার সাংবাদিক-মহলে আকুলি-বিকুলি ও তৎপরতা কর্পোরেশনের ভোটবন্দকে পর্য্যন্ত হার মানাইয়াছে। তথ্যের তাড়নার কাউন্সিলের কলিকাতা আপিসের কর্মকর্তাগণ উদ্যম ও উত্সাহ। প্রার্থীদের মধ্যে এক জন একটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের মাথা, অত্যন্ত বক্ষণশীল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক জন সাংবাদিক কাউন্সিলে বলিয়া আসিলেন, পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিলে এখানেই করিয়া তিন কলসী গঙ্গাজল লগুনে লইয়া যাইতে হইবে। ইহার সম্পর্কে এই অভিযোগ তিনি এ কথা জানিতে পারিয়া পরদিন ঈপাইতে ঈপাইতে ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন—যমিন্ দেশে বলাচাঁর, বিলাতে গেলে তিনি কিছু দর্ভাঙ্গন আর কাঠ-পাছকা

লইয়া যাইবেন না। যোমে যাইয়া রোমানদের দ্বারা আচরণ করিবেন। স্তম্ভরাং সাহেব যেন কুলোকেব কথায় কাণ না দিয়া অল্পহৃৎপূর্বক তাহাকেই ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউনাইটেড স্টেটস ইনকরমেশন সার্ভিস ফুলব্রাইট বৃত্তি দিয়া আমেরিকা ভ্রমণের সুযোগ দেয়। কলিকাতার কোন এক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক প্রায় বছর খানেক ধাবৎ নিয়মিত ভাবে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত সমুদয় সংবাদের কাটিং অর্থাৎ ভাবে এসপ্লেনেডের আমেরিকান কনসালের আপিসে সশরীরে হাজির হইয়া পৌছাইয়া দিতেছেন। তদন্তেছি, এ বৎসর বৃত্তির জন্য তাঁহার নাম সুপারিশ হয় নাই, আগামী বৎসর হইবে আশা আছে।

বিগত দশ-পনের বছরে ভারতীয় সংবাদপত্রের উন্নতি ঘটয়াছে ইহা অস্বীকার করি না। মুদ্রণ, সংবাদ সংগ্রহ, প্রচার, রোটারী মেশিন, টেলিগ্রাফার ইত্যাদি বহু ব্যাপারে আজকালকার খবরের কাগজ তাহাদের পূর্ববর্তীদের বহু পক্ষান্তে ফেলিয়া আসিয়াছে। সংবাদপত্রে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে বহু গুণ, তাহাদের পারিশ্রমিকও আগের তুলনায় বহুলাংশে উন্নত পরিমাণের। সংবাদপত্রের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু প্রভাব বাড়ে নাই। সাংবাদিকের শক্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু সন্ত্রম বাড়ে নাই। সেকালে ট্রামে বা পদব্রজে চলাফেরা করিয়া অতি পরিমিত প্রচার-সংখ্যার পত্রিকা সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবাকব, যোগেন্দ্র বিজাভরণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জনগণের মনে যে প্রভাব উল্লেখ করিতেন, আজকালকার আশী বা নব্বই হাজার দৈনিকের মোটরবিহারী সম্পাদকগণের পক্ষে তাহা কল্পনার অতীত। প্রাচীন সম্পাদকেরা কণিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু কণিষ্ঠ ছিলেন না। ‘সেদিনের সম্পাদক’ অভাবে কষ্ট পাইতেন, কিন্তু স্বভাবে নষ্ট হইতেন না।

আধুনিক সাংবাদিকের চরিত্রের এই স্বলন আমাদের পূর্বগামীদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কালে বিলাতীরা প্রভাব প্রথম গৃহীত হয়। তৎকালীন একটি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া একটি নাম-করা বিলাতী কোম্পানীর ছাত্রের বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছিল। ‘বঙ্গদেশী’ গ্রন্থের সংকলন গৃহীত হইলে উক্ত পত্রিকার বৃদ্ধ সম্পাদক কোম্পানীকে লিখিয়া জানাইলেন যে, যেহেতু তিনি তাঁহার পত্রিকায় বিলাতী বর্জনের স্বপক্ষে লিখিবেন, সেহেতু অন্তঃপর ঐ কোম্পানীর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা আর সম্ভব হইবে না। বেশী দিনের কথা নহে, ফরোয়ার্ড পত্রিকার পি, চক্রবর্তী মহাশয়কে একটি বিশিষ্ট ধনী মাড়োয়ারী গৃহে বিবাহের নিমন্ত্রণ এই কারণে প্রত্যাখ্যান করিতে দেখিয়াছি যে, উক্ত মাড়োয়ারীর কারখানার তৎকালীন ধর্ম্মমন্ড সম্পর্কে শ্রীমন্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের প্রয়োজন হইতে পারে।

এ যুগে ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকগণের সন্ত্রম দুইই মালিক, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক ও রিপোর্টারেরা আপন কুকার্ণের দ্বারা নষ্ট করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে সিদ্ধান্ত বা ত্রাণুইচের প্লটের উপরে রিপোর্টারেরা যদি হুমড়ি খাইয়া পড়েন, মাসে একটা ‘টক’ দেওয়ার আকর্ষণে সম্পাদকেরা যদি নিজের কাগজে বেতারের বিক্রেতা চিঠি প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন, সরকারী খরচে বিমান ভ্রমণের মোহে যদি সাংবাদিকেরা সরকারী প্রচার বিভাগের লজ্জাজনক দর্শন দিতে থাকেন, তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সাংবাদিকগণের

ঐতিহ্য ইত্যাদি বড় বড় কথা বলিয়া তাঁহারা যতই আফালন করুন না কেন, একমাত্র করণ বা হস্তারসের উল্লেখ ব্যতীত তাহাতে আর কিছুই হইবে না।” — যুগবাণী।

### কৃষকের উন্নতি কোন্ পথে ?

“আজও আমাদের সমাজে কৃষকের শোষণ-ব্যবস্থা ঠিক সাবেকী কায়দায় চলিতেছে। ১১৩৭ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি-ক্ষেত্রের পরিমাণ আঠার শত কোটি টাকা সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১৯৩১ সালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির হিসাব অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল নয় শত কোটি টাকা। অতএব আমাদের দেশের কৃষক ক্ষেত্রের মধ্যে জন্মায়, বাঁচে ও মরে। এই কৃষি-ক্ষেত্রের দায় হইতে কৃষককে মুক্ত করার জন্য কয়েকটি ঋণ-সালিশী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কৃষকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে না। কারণ কৃষি ও কৃষি-ক্ষেত্র অস্বাভাবিক জড়িত। কৃষির উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কৃষি-ক্ষেত্র দূর করার চেষ্টা করা নেহাৎ বোকামি।

অজ্ঞাত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের উৎপাদন-শক্তি কমিয়া আসিতেছে। এই সত্য সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। খাজের অভাবে, জমির অভাবে মানুষ চোখে অন্ধকার দেখিয়া আমাদের দেশে অস্বস্থতা করিতেছে। কোটি কোটি লোকের জীবন ধারণের মান দ্রুতগতিতে নামিয়া যাইতেছে। খাজের অভাবে, বজ্রের অভাবে, অর্ধের অভাবে, শিক্ষার অভাবে কৃষকের কর্মশক্তি কমিয়া আসিতেছে এবং কৃষিজাত শস্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইতেছে।

কৃষিজাত উৎপন্ন শস্য কেন কমিয়া যাইতেছে তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় :—

(ক) ভূমির খণ্ডীকরণ ও বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন, (খ) সেচ ব্যবস্থার অনুবিধা (গ) সাবেকি কৃষিকার্য পদ্ধতি ও কৃষকের বিসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাব। ইহার সহিত জড়িত হইয়াছে কৃষিজ পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের অসংখ্য ত্রুটি, যাহার ফলে কৃষক ক্রমশঃই মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িতেছে। একে ত দৈনিক দুর্বল, তাহার উপর সরকার হইতে ফড়িয়া দালালের যদি অনবরত তাহাকে শোষণ করিতে থাকে, তবে কৃষকের বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

“অধিক খাজ ফসল” আন্দোলন আমাদের দেশে ফলসায়ক হয় নাই, কারণ অধিক খাজ ফলাইবার প্রণালী আমরা গ্রহণ করি নাই। এশিয়া ও চীনে চাষের অব্যোধ্য জমিও বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে আবাদী জমিতে পরিণত হইতেছে। অথচ আমাদের দেশে সহস্র সহস্র একর কর্ণোপযুক্ত জমি অনাবাদী পতিত রহিয়াছে। সহস্র সহস্র একর আবাদী জমির ফসল বানের জলে, সমুদ্রের লোণা জলে, প্রাণে, জলাভাবে প্রতি বৎসর নষ্ট হইতেছে। হতদরিদ্র কৃষক অসহায়, এই দুর্বস্থা দূর করিতে পারে না; কারণ আমাদের ভূমি-ব্যবস্থার নিক শ্রেণীর লোক জমির কর্তৃক করে। সেই ভূমি-ব্যবস্থার মূলে গহিয়াছে মুনাকা প্রবৃত্তি। ভূমির উপর কৃষকের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত না হইলে সাধারণ কৃষক উৎপাদনে উৎসাহী হইতে পারে না। ভূমির উপর কর্তৃত্ব পাইলে আমাদের দেশেও কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিবিশেষ বাধা গঠিত বোধ থামার স্থাপিত হইতে

পারিবে এবং জমির উন্নতির প্রচেষ্টা আবদ্ব্য হইবে। আজিকার কৃষিজ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের অসংখ্য ত্রুটি দূর হইবে। কৃষক তখন নিজের স্বার্থ, স্ব-শ্রেণীর স্বার্থ, রাষ্ট্রের স্বার্থ ব্যাঘাত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখনই কেবল সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের পবিত্র সত্ত্ব হইবে এবং স্বাধীন হইবে।” — বগুড়ার কথা

### বামপন্থী ঐক্যের প্রয়োজন কেন ?

“স্বাধীনতার চারি বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। এই চারি বৎসরে জনগণ কংগ্রেসী অপশাসনের আঁহাদ হাড়ে-হাড়ে পাইয়াছে। তাই আজ জনমন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে—সে যে কোর উপরে ইহার পরিবর্তন চাহিতেছে—মুক্তির সন্ধান করিতেছে। জনমন আজ আর প্রকাজে কংগ্রেসীর বিবোধিতা করিতে দ্বিধা করিতেছে না—সে আগামী নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

জনমনের এই বিক্ষোভের প্রকাশ আমরা দেখিলাম হাওড়ার পৌর-সভার সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে এবং মালদহের আইন সভার উপনির্বাচনে। যদিও পৌরসভায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাদিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তবুও সেখানে প্রায় সকল কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি একত্রিত হওয়ায় কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীদের পরাজিত করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ইহা কম কথা নহে! যে-কংগ্রেস ল্যাম্প-পোষ্টকে টিকিট দিয়া ঠাঁড় করাইয়া দিলে ল্যাম্প-পোষ্ট ভোটে জয়লাভ করিত সেই কংগ্রেস যখন আজ ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত তখন তাহার অপশাসনের উপযুক্ত শিক্ষা জনগণ

## উকুনের নতুন ঔষধ

### আশ্চর্য্যকর ক্ষমতা

“মহাশয় : দুই আনার ডাকটিকিটের ঔষধে আমার মাসীমার নিকৃতি হোয়েছে—উকুনের হাত হতে। সামান্য দুই আনায় যে এত সুন্দর কাজ হয়—তাহা আশ্চর্য্য।”—শ্রীমনিরুদ্ভলা দেবী ; C/o. A. S. M. Sajnipara Stn. Murshidabad.

“নিউট্রল-লাইসাইড পাউডার ব্যবহার করে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। চুল ও মাথার চামড়াই কোন প্রকার ক্ষতি করে না।

বুগুহত করে দুই আনার ডাকটিকিট পাঠাবেন। এক জনের উপযুক্ত একমাত্রা স্যাম্পল পাঠাবো।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলায় এই “লাইসাইড” পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চ হারে কমিশন দেবো।

# নিউট্রল

Dept. M.B. ; ১৯, বগুলা রোড ; কলিকাতা—১৯

দিয়াছে ইহা আশার কথা—অন্যের কথা ইহাই যে, অগতিশীল শক্তি একত্র কংগ্রেসী অপকোশল বার্ষ করিতে মিলিত হইয়াছিল। মালদহের উপনির্বাচনে অগ্র কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিচ্ছি, এই উপনির্বাচনে বামপন্থীরা সম্মিলিত হইতে পারে নাই—এখানে কৃষক-প্রজা-মজদুর দল ও কমুনিষ্ট দল পৃথক পৃথক প্রার্থী দাঁড় করাটাবার ফলে ভোট বিভক্ত হইয়াছিল এবং সে মজদুর কংগ্রেসপ্রার্থীর জয় হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসপ্রার্থীর জয় হইলেও অগ্র দুই দল প্রার্থীর ভোটসখার যোগকল কংগ্রেস-প্রার্থী হইতে অনেক বেশী ছিল। এই পরাজয় হইতে বামপন্থীদের চৈতন্য হইবে আশা করি। কারণ ইহা আজ দিবালোকের জায় সত্য যে, কংগ্রেসী অপশাসনের পরিবর্তন জনগণ মনে-প্রাণে চায়। কংগ্রেসের অপসারণ করিতে শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন। বামপন্থী দল দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। কিন্তু তাহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে দলদলির ফলে কংগ্রেসীদের সুবিধা হইতেছে। নির্বাচনের বিশেষ দেরী নাই। বৃহত্তর স্বার্থ—অর্থাৎ জনগণের স্বার্থক্ষার্থে তাই ক্ষুদ্র দলগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়া বামপন্থীদের একত্রিত হইতে হইবে এবং তবেই হইবে কংগ্রেসের পরাজয়।

অগ্র ইহা সত্য কথা যে, কংগ্রেসবিরোধিতা মানেই বামপন্থী নয়। হিন্দু মহাসভার জার সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানও কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছে এবং বহু চোরাকারবারী ও মুনাক্ষাখোর জোট বাধিতেছে। ইহাও কোন দিন অগতিশীল বামপন্থী শক্তি হইতে পারে না। তাই ইহাদের সঙ্গে ঐচ্ছা স্থাপনার কথা উঠিতে পারে না। আমরা আশা করি, ভারতের সোশালিষ্ট দল, কৃষালনীর দল, ডঃ বোসের কৃষক-মজদুর-প্রজা দল, ফার্বার্ড ব্রুচ, আর, এস, পি, আর, সি, পি, টিউ ইউনিয়ন, কমুনিষ্ট এবং যে সমস্ত সমাজসেবী কর্মী কোন দলের সতিত যুক্ত না হইয়াও বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামের দোয়ার নিযুক্ত শাভন, নির্বাচনের সময় তাহাদের মধ্যে একটি কার্যকরী ঐচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হইবে। চুলচেরা ঐচ্ছা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলেও একটি কার্যকরী মঠৈচ্ছা প্রতিষ্ঠা থুইই সম্ভব এবং মনে হয়, এই ঐচ্ছা ফল স্বরূপদারীও হইতে পারে। এ বিষয়ে নেতৃত্বকে উত্তোঙ্গী দেখিলে আমরা সুশীল হইব।”—সংগঠনী।

### বাঁচিবার অধিকার

“কালের বখচক্রে পেষণে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ নিশ্চেষ্ট। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতিষ্ঠার পথ নাই। আত্ম থাকা সত্ত্বেও তাহারা মুহূর্ণপথবাহী। সমাজে বাহারা উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, তাহারা হয় বেকার নয় এমন আয়ের চাকুরী করেন, বাহারা বারা ভজোচিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা চলে না। অনেক অধ্বশিক্ষিত ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের চেয়ে অনেক বেশী বেজগার করেন। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক কর্মহীন, বেকার, ছত্রছাড়া জীবনধারণ করিতেছে। ভ্রম্যধিকারিগণ ভ্রমিহীন, অধ্বজালে জর্জরিত, ব্যক্তি ফেইল হওয়া এবং দেশ-বিভাগের দুর্বিপাকে সর্বহারা বাবাবর হইয়া আজ এখানে কাল দেখানে আশ্রয়প্রার্থী বা ‘ভগনীর’ জীবনযাত্রার বাতাবিক গতিপথ রুহ। ধরনের

শেষ সীমায় আসিয়া আজ তাহারা উদ্ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় আজ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিনাশেই কি আমাদের কল্যাণ হইবে? তাহা কি আমাদের সমাজ-জীবনের পক্ষে কাম্য? আজ দিকে দিকে যে উচ্ছ্বাসতা ও উদ্যোগগামিতা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ দেশের এই ভয়াবহ সমস্যা-ই হল। এই বিষয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টি নাই। নেতৃত্বশূন্য মৌন। অপর দিকে এক দল দলগত রাজনীতির প্রয়োজনে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যেন-তেন-প্রকারে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠকে অগ্রহ লভের আশার উদ্বাস ও একে অগ্রকে অতিক্রম করিয়া বাইবার প্রতিযোগিতার মাত্রাজ্ঞানশূন্য। এই অবস্থার উদ্বেগমূলক ভাবে তরুণ-মনকে বিভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলা এবং বিশ্বাসলা সৃষ্টি করা কঠিন কিছু নহে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্র-শাসনে, সামাজিক জীবনে স্বেচ্ছাচারিতার বিসমৃদ আচরণকে মূলধন করিয়া যে রাজনীতির খেলা চলিতেছে, তাহাতে আমাদের সমাজ-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত না হইয়া পারা যায় না।”—যুগশক্তি।

### সহর ব্যবস্থা করুন

“বর্ধা আরম্ভ হইতে না হইতেই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে চাউলের মূল্যবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া বাইতেছে। বর্ধমান সহরেই মোটা চাউল ২০.১২২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। বাটতি অঞ্চল-গুলিতে ইতিমধ্যে চাউলের মূল্য ৩০ টাকা দর উঠিয়াছে। তদুপরি ‘করিডর’ প্রথার প্রবর্তনের ফলে চাউল সরবরাহের উদ্ভুক্ত পথটিও অবরুদ্ধ হইয়াছে। সহর বিভিন্ন বাটতি অঞ্চল চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা না হইলে বর্ধার দিনে চাউলের অভাবে এই সকল অঞ্চলে হাহাকার উঠিবে। আমরা খাদ্য-বিভাগের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।”—বর্ধমান।

### সৈনিকের বদায়ত

“খাত-সমগ্রা সমাধানে ভারতীয় বাহিনী—ভারতীয় স্থল-বাহিনী— ১৯৫০-৫১ সালে যে “অধিক ফল ফলাও” প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য লক্ষ্যেই আর্মি মেডিক্যাল কোর সেক্টরকে ভারত গবর্নমেন্টের খাত ও কুনি মন্ত্রণালয় হইতে ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিযোগিতার ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে আখলাহ শিখ রেজিমেন্ট সেক্টর ও বেলগাঁওস্থ মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রি রেজিমেন্ট সেক্টর। স্থল-বাহিনীর ৩টি কম্যাণ্ডে মোট ৬৪৪৪ একর জমিতে চাষাবাদ হইতেছে এবং ২,৩২১ একর জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা হইবে। ভারতীয় স্থল-বাহিনীর সৈন্যগণ মোট ১,২১৭১১ মণ কল ফসাইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে তত্ত্ব জাতীয় খাদ্যশস্য, ফল ও শাকসব্জীই প্রদান। খাদ্য অপচয় নিবারণ পরিকল্পনাটিও ভারতীয় স্থল-বাহিনী বিশেষ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। ১৯৪৯ সনের জুলাই মাস হইতে এ পর্যন্ত ভারতের বীর সৈনিকগণ নিজেদের বরাদ্দ হইতে স্বেচ্ছায় ৬৮,৬১৭ মণ খাদ্যশস্য প্রত্যর্পণ করিয়াছে।”—নীহার।

## কলেজ ছাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়

“এ বৎসর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল সত্যই প্রশংসনীয় নহে। প্রায় আটশু বিভাগে এক-চতুর্থাংশ এবং বিজ্ঞান বিভাগে (সায়েন্সে) এক-তৃতীয়াংশ পাশ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে ঐশ্বর্য্য ছাত্র-সংখ্যা বাহা ছিল আজ বাংলার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাবে তাহা বদলাইয়া গিয়াছে। ইহার সম্যক কারণ নির্ধারণ করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়, কেহ বা ছাত্র, কেহ বা কলেজ, আবার কেহ বা সমাজ-জীবনের গ্রন্থিকর পরিস্থিতি, আবার কেহ কেহ আংশিক ভাবে প্রত্যেককেই দায়ী বলিয়া থাকেন।

আংশিক ভাবে যদি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ছাত্র, তত্ত্বপরি সমাজ দায়ী—তবে কলেজ এবং ছাত্ররাও এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত পাইতেছেন না। ছাত্ররা সত্যই পড়াশুনা করেন না বা করিতে পারেন না। অনেক বলেন যে, ছাত্ররা বাড়ীর নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বা অসুস্থ পরিস্থিতি না থাকায় পড়াশুনা করিতে পারেন না। কিন্তু বাংলার প্রবাদ আছে যে, “যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?” কলেজকেও দোষী করা যাইতে পারে কারণ যে সমস্ত ছেলেকে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠান, তাহার কেন পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে না? যে সমস্ত ছেলে কলেজে পাশ করে তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পাশ করিবে না? তাহার কারণ কলেজের পরীক্ষার ফলাফল বিশেষ সুবিধাজনক না হইলেও প্রথম

বর্ষ হইতে দ্বিতীয় বর্ষে, তৃতীয় বর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করা যায় এবং টেষ্ট পরীক্ষায়ও পাশ না করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্মোদিত পরীক্ষা দেওয়া যায়, একথা ছাত্ররা জানেন। সুতরাং কলেজের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে যে ছাত্রদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিবে একথা আর আশ্চর্য্যের কি আছে?

কলেজের কর্তৃপক্ষ এখন হইতে যদি দৃঢ়তার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে ছাত্ররাও এই গন্তী পার হইবার জন্য তৎপর হইবেন এবং তাহা হইলেই এইরূপ অনিবার্য্য অস্বাভাবিক অকৃতকার্য্য ছাত্রের সংখ্যা হ্রাস পাইবে বলিয়াই মনে হয়।” —আসানসোল হিঠৈবী।

## বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ধারণা

“বুনিয়াদী শিক্ষার মর্ম্মকথা অধুনা আবিষ্কৃত কোন তথ্য নয়, বহু দিন পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রীশ্রীকেন্দ্রনে এই ধর্ম্মের শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই শিক্ষার পরিপূর্ণ একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং কি ভাবে এই পরিচালনা বাস্তবে কার্য্যকরী করা যায় তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর চেয়েও বড় কথা সত্যিকার এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি জনমনকে আগ্রহান্বিত করে তুলেছেন তিনি।” সম্প্রতি বাণীপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের বার্ষিক পুনর্মিলন সভায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী উপরোক্ত মন্তব্যটি করেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ্র এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত



আমেরিকার সরকার দ্বারা প্রাপ্ত ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা—২৮শে জুন বকে থেকে জাহাজযোগে আমেরিকা যাত্রা করেছেন এঁদের পাঠ ও বসবাসের সকল প্রকার অর্থ জোগাবেন আমেরিকা সরকার



ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ-বর্জিত, আমাদের সামাজিক জীবনধারণের প্রতিফলন যে-শিক্ষায় নেই, এই উপলব্ধিই আমাদেরকে এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী স্বাভাবিক সত্ত্ব গ্রহণ করতে ও তাকে বিশিষ্টতা দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে, তা কৃত্রিম এবং মহাস্বাক্ষরী পরিকল্পিত শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে এর মূলত বৈসাদৃশ্য রয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন, কিন্তু এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোন শিক্ষাব্রতীই এইরূপ অভিযোগ করেন নাই। বুনিয়াদী বিজ্ঞান-শুল্লির সঙ্গে এই অভিযোগের কোন সম্পর্ক নাই। একমাত্র সরকারবিরোধী রাজনীতিক দলগুলিই এই ধরনের অভিযোগ করে থাকেন। সরকার আন্তরিকতার সঙ্গেই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছেন। বুনিয়াদী বিজ্ঞানে এসে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সেটাপল অ্যাডভাইসরী বোর্ডের অনুমোদিত নুতন অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে কি না দেখে বাবার মত তিনি সকলকে আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এই কার্যে ব্রতী হয়েছে। বঙ্গ ৪, মাত্র বাবীনতা লাভের পর এখানকার কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিহারে আট বৎসর ধাবৎ পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই বিহার ও অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির তুলনা করে লাভ নেই।

—শিক্ষা ও কৃষি।

### ধান দাও—কাপড় দিব, পাকা রাস্তা দিব

এবার চাষীর ঘরে কসল উঠতে না উঠতেই কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক পরিবারের ৩২ মাথা-পিছু মাত্র সাত মণ হিসাবে ধান বাদ দিয়ে বাকী সমস্ত ধান মণ-প্রতি সাড়ে ৭ টাকা দরেই সরকার জোর পূর্বক সীজ করে নেবেন। বর্ধমান উদ্বৃত্ত জেলা। স্তত্রাং বর্ধমানের ক্ষেত্রে এ নীতি সর্বোদ্রে প্রয়োগ করা হইবে। অথচ চাষীর ধানের উপর এমন একটা নিষেধ খবরদারী জারী করার সময় কংগ্রেস সরকার মোটেই ভেবে দেখেন না যে, (১) চাষীর কাছ থেকে সরকার যে দরে জোর করে ধান নিয়ে যেতে চান, সে দরে কৃষক ধান দিতে পারে না; (২) সরকার বাগাহর যে মূল্য-হারে ধানটি নিয়ে যেতে চাইছেন, তাঁর আনুপাতিক মূল্য-ভাবে চাষীর নিত্য-ব্যবহার্য তেল, খইল, কাপড়, তামাক প্রভৃতি দ্রব্যগুলি চাষীকে সরবরাহ করার কোন তাগিদ বা কল্পতপ্তরতা সরকারের নাই, এবং (৩) সরকারের স্বযোগিতা ও দুর্বল নীতির ফলেই গত ৪ বৎসর ধরে কালোবাজারী, চোরবাজারী, আমলাতান্ত্রিক, ধ্বংসকারী এবং একচেটিয়া পুঁজি-পুঁজির অসীম লোভ আজ দেশময় এই নিদারুণ খাদ্য ও বস্ত্রশঙ্কট সৃষ্টি করেছে। ৪ বছরের কংগ্রেসী শাসন একমাত্র বিদেশী ও বৈদেশী পুঁজি এবং বড়লোকদের স্বার্থেই সরকারের নীতি পরিচালিত হয়ে এসেছে,—সাধারণ চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের স্বার্থে নয়। চাষী ও মজুরের স্বার্থে এ সরকার কি করেছে, কি করে নাই, এবং কি করা যেত, তার হিসাব-নিকাশ করলেই এ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল রূপ সহজেই ধরা যায়। এখানে শুধু ধান-চালের

কথাই বলব। ধান, চাল আর সাধারণ চাষীর জীবন নিয়ে গোটা ৪ বছর কাল জাতীয় কংগ্রেস সরকার নিছক বেইমানী করেছে বলে বৈদেশী বলা হবে না। এক দিকে পুঁজিবাদী শোষণ-ব্যবস্থা সমস্ত প্রকারের বস্ত্রগুলোকে সাধারণ চাষীর ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্য দিকে “যেবে নে রে রামধন” নীতির একনি পুঁজারী কংগ্রেসী নেতারা চারি দিকে লুণ্ঠের ব্যবসায় ঝেঁদেছে তাই সরকারের মন্ত্রীরা চিনি আমলানি নাম করে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা চুরি করলেও তার বিচার হয় না। সরকার সাপ্লাই বিভাগ কম দরে ৩২ লক্ষ টাকার চাল কিনে সেই চাল চড়া দরে বন্ধন মাত্র ২১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকায় বেচে, তখন এই লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসানের জন্য তার কোন কৈফিয়ত লং করা হয় না; স্বাভাবিক চীন ও দোভিয়েট দেশ হতে খাদ্য-শস্য আমদানী না করে যে কংগ্রেসমন্ত্রীরা বিহার ও অন্যান্য-খাবার না দিয়ে বহু লোককে হত্যা করল, সেই শয়তানদের সর্বনাশ কাজের কোন তদন্ত পর্যন্ত হয় না, অথচ কুড়মুন ও নাসিগ্রামের চাষীরা ধানের শস্য দখল চাইলে তাদের উপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হ’ল, হাট-গোবিন্দপুরের কৃষকসম্মিলী সভা করে বাজারের ধন নিয়ন্ত্রণের দাবী করলে তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হ’ল, এবং কুচবিহারে দুখা জনতা কোন মতে বাঁচার মত খাদ্য দাবী করলে তাদের গুলী করে হত্যা করা হ’ল।

—বর্ধমানের ডাক

### শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা

“যদি শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তবে মহাস্বাক্ষরী চিন্তাধারায় অনাড়ম্বর কোন দল না করিয়া সমাজ সেবার গঠনমূলক কার্যেই আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। একই আদর্শে চলিতে হইবে তাঁহার সভা, অহিংসা ও তাহার প্রতীক চরখাকে আন্তরিক বিশ্বাস করিতে হইবে ও সেই মত কার্য করিতে হইবে। নচেৎ শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার বুলি ছাড়িয়া দেওয়া ভাল।”

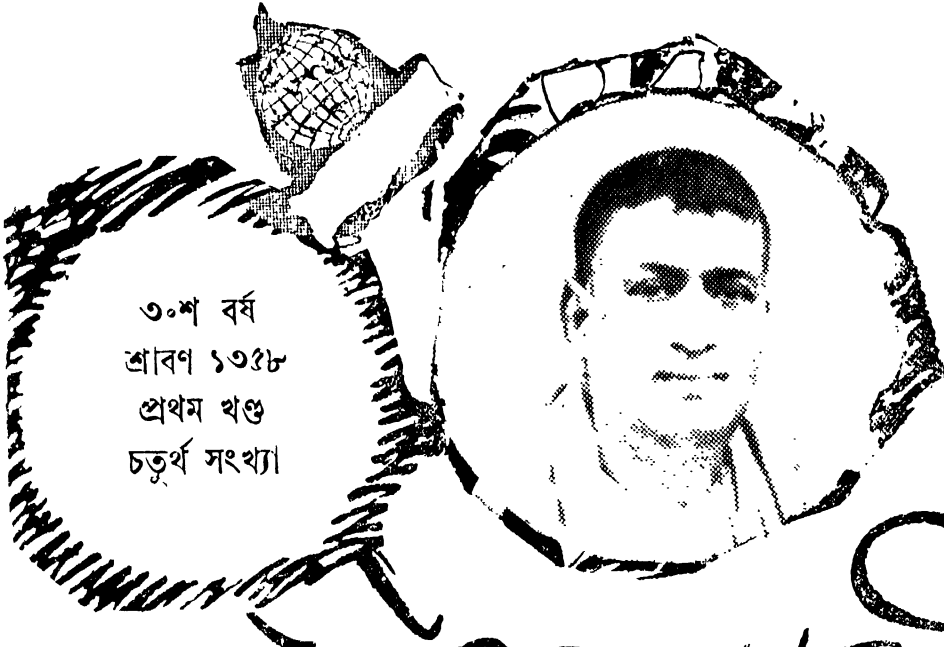
—গ্রামসেবা

### স্বর্গত মৃণালিনী সরকার

হিন্দুর জাতীয় উত্তরাধিকার ভক্ত বিহারীলালের দ্বী ভগবন্ত-পরায়াণা মৃণালিনী দেবী ৬৭শ্রানপূর্ণিমা তিথিতে ৪ঠা আষাঢ় পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন ভূতপূর্ব ডিষ্ট্রিক্ট ও সেন্স জজ ৬৭বাবাহাদুর বিহারীলাল সরকারের সহিত চন্দননগরনিবাসী ৬৭জাতভোষ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা মৃণালিনীর বিবাহ হয়। স্বামীর ধর্ম ও কর্মজীবনের সহিত তাঁহার ঐকান্তিক সহযোগিতা ছিল। ঐরামস্বয়ংদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ মৃণালিনী দেবীকে নিলোভ জীলোক বলিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর ১৪ বৎসর ভাগবতপাঠ শ্রবণ এবং দেবালয়ে গমন তাঁহার নিত্যব্রত ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।







# বাসক পুঁইতী

## যুগবাণী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। শাস্ত্রের দুই রকম অর্থ—অর্থার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থটুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা, ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মা'র মুখের কথা'র সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। সত্ত্বগুণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, রজঃ তমোগুণে ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। সত্ত্বগুণকে সাদা রংএর সঙ্গে উপমা দিয়েছে; রজোগুণকে লাল রংএর সঙ্গে; আর তমোগুণকে কাল রংএর সঙ্গে। আমি এক দিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের ঘোল আনা; আর আমার এক টোকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মা'রছে,—তোমার বার আনা। (সকলের হাস্য)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। জানি না বাপু। অত হিসাবে কেন? আম খাও; কত আম গাছ; কত লক্ষ ডাল; কত কোটি পাতা; এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতন্যিতা; যেমন করাও তেমনি করি; যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

# পারম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

প্রচেষ্টাকৃত্যাদি পৌনঃপুন্য

২১.৩.১৯১৯

সমস্ত সাধনার ইতি করে দিলে রামকৃষ্ণ।

আর পাখা চালিয়ে কী হবে? দক্ষিণ থেকে চলে এসেছে মলয় হাওয়া। আর কী হবে দাঁড় টেনে? ব্যাক কাটিয়ে অল্পকূল বাসতে পাল তুলে দে নৌকোর।

সাধনের প্রথম অবস্থাতেই খাটনি। তার পরে পেনসন। প্রথমে সিঁড়ি ভাঙা, পরে পাহাড়ের চড়ায় পরেশনাথের মন্দির।

সিদ্ধি সিদ্ধি বললে কি হয়? সিদ্ধি গায়ে মাখলেও নেশা হয় না। খেতে হয় একটু। দুধে মাখন আছে বললেই কি মাখন হবে? দুধকে দই পেতে মন্থন করো নির্জনে।

‘হরিসে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বন্য বনি যাই।’

হরিতে লেগে থাকো। লেগে থাকতে থাকতেই হরি হয়ে যাবে। বলতে বলতেই হরি ব’নে যাবে।

রামকৃষ্ণ হরি হয়ে গেছে। যে আছে সেই হয়েছে। এটি হওয়া অর্থ থাকটিকেই প্রকাশিত করা।

এর পর আবার সাধন কি?

বাউল বৈষ্ণৱা বলে, সাঁই। ‘সাঁইয়ের পর আর কিছু নাই।’

রামকৃষ্ণেরও আর কিছু নেই। রামকৃষ্ণের পরেও আর কিছু নেই।

বৈষ্ণব বাউলরা একেই বলে সহজ অবস্থা। সহজ অবস্থার দুটি লক্ষণ। প্রথম, কৃষ্ণগন্ধ গায়ে নেই। তার মানে ঈশ্বরের ভাব অন্তরে ওতপ্রোত, বাইরে কোন চিহ্ন নেই, মুখে হরিনাম পর্যন্ত বলছে না। আর দ্বিতীয়, পদ্মের উপরে অলি বসবে অথচ মধু খাবে না। তার মানে, জ্বিতেন্দ্রিয়, কাম-কাঞ্চনে স্পৃহা নেই। রামকৃষ্ণের এখন সেই সহজ অবস্থা।

অনেক পিত্ত জমলে ছাঁবা লাগে, তখন চার দিক হলদে দেখায়। অনেক ভক্তির জমলে মধু লাগে তখন চার দিক হরি দেখায়। শ্রমতী যখন শ্রামকে ভাবলে, সমস্ত শ্রামময় দেখলে। আর নিজেকে শ্রাম বোধ হল। রামকৃষ্ণ সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরময় দেখল, দেখল সেও ঈশ্বর। পারার হৃদে শিশে অনেক দিন থাকলে শিশেও পারা হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ ভগবানের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে থেকে ভগবান হয়ে গেল। কুমুরে পোকা ভাবতে-ভাবতে আরম্ভ নাশচল হয়ে যায়, নড়ে না, শেষে তাকে আন্তে-আন্তে কুমুরে পোকাই হতে হয়। রামকৃষ্ণ ব্রহ্ম ভাবতে-ভাবতে ব্রহ্ম হয়ে গেল। যে নিরাকার ছিল সে হয়ে দাঁড়াল নরাকার।

তার আবার সাধন ভজন কি। হরি আবার কবে হরিনাম করে।

যার খোলা নেমেছে তার আবার আল কিসের? কিন্তু খোলা নামবে কখন? এক জন বাউল এসেছে রামকৃষ্ণের কাছে। রামকৃষ্ণ তাকে শুধোল: ‘তোমার খোলা নেমেছে?’

বাউল তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

‘বলি রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে? হাত আল দেবে তত “রেফাইন” হবে রস। প্রথম আকের রস, পরে গুড়, পরে দোলো, পরে চিনি তার পর মিছরি—। কিন্তু, জিগগেস কাঁচ খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন কবে শেষ হবে?’

বাউল শুনতে লাগল মত্তমুগ্ধের মত।

‘যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে। তার আগে না। যেমন জোঁকের উপর চুন দিলে জোঁক আপনি পড়ে যায় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়। তার আগে নয়।’

আল নিভিয়ে খোলা নামিয়ে বলে আছে

রামকৃষ্ণ। সে এখন আকাশের মৌন। সমুদ্রের শান্তি। ধরিত্রীর সমর্পণ।

ওঁকার ধ্বন, আত্মা শর আর ব্রহ্ম লক্ষ্য। নিভুল ভাষে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে, তার পর তীরের মুখে প্রক্ষার সঙ্গে তন্ময় হতে হবে। ব্রহ্মতত্ত্বলক্ষ্যমুচ্যতে।

‘কিন্তু জানিস, তাঁকে যখন লাভ হয়, তখন আর উচ্চারণ করবারও জো নেই। সমাধি থেকে অনেক নিচে নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।’

শাস্ত্রে যেমন বলা আছে তেমনি দর্শন হয় রামকৃষ্ণের। কখনো দেখে জগৎময় আগুনের ফুলঙ্গ। কখনো দেখে চার দিকে যেন পারার হৃদ ঝকঝক করছে। কখনো বা গলিত রূপের স্রোত। কখনো বা গ্রহতারায় রংমশালের ফুলবারি। নীলমাত্রমের প্রধ্বং কখনো বা অন্তঃসীন অন্তরীক্ষের শুভ্রতা।

রামকৃষ্ণ এখন একটি অথও প্রাপ্তি, একটি অথও প্রত্যুত্তর।

একটি আকাশবিস্তীর্ণ প্রশান্ত স্তব্ধতা।

কিন্তু ব্রহ্ম নিয়ে আমি কতক্ষণ থাকব? ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। কখনো লীলায় কখনো নিত্য—যেন ঢেঁকির পাটে ওঠা-নামা করছি। এক দিক নীচু হয় তো আরেক দিক লাফিয়ে ওঠে। এদিকে তাকাই সেদিকে তিনি। অন্তর্মুখে সমাধিস্থ হয়ে আছি তখনো তিনি, বহির্মুখে জীবজগৎ নিয়ে মাছি, তখনো তিনি। যখন আরশির এ পিঠ দেখছি তখনো তিনি, আবার যখন উলটো পিঠ দেখছি তখনো তিনি।

শিব হয়ে আছি, তিনি। জীব হয়ে আছি, তিনি।

তুঘের দ্বারা আবৃত থাকলেই ধাতু, তুঘ থেকে বৃত্ত হলেই তুঙুল। জীবে-শিবে ভেদ নেই। ভেদ হচ্ছে ভ্রান্তির ফল। কোরকে যেমন পুষ্পভাব, স্ফুটিত পুষ্পেও তেমনি কোরকত্ব। ঈশ্বরে যেমন শিবভাব, জীবে তেমনি ঈশ্বরভাব।

কিন্তু যাই বলো বাপু, নিবিকল্প ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকতে পারব না। বালকের মতন থেকেছি, থেকেছি উম্মাদের মত। কখনো জড় হয়েছি, কখনো শিথিল। তারপর আবার নিত্য থেকে চলে এসেছি লীলায়। রামলালকে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, নইয়েছি-খাইয়েছি। হনুমান সেজে গাছে উঠে বসছি, আন্ত-আন্ত ফস খেয়েছি। তারপর শ্রীমতী হয়ে কৃষ্ণময় হয়ে গেলাম। আবার লীলা ছেড়ে

নিত্যে মন উঠে গেল। ত্যাক্য-গ্রাহ্য রইল না। সজনে তুলসী সব এক হয়ে গেল। বত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললাম। হয়ে গেলাম সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষ। সেই আদি যার আর অন্ত নেই।

সব রকম সাধনই করেছি। তামসিক, রাজসিক আর সাত্ত্বিক। জয় মা কালী, দেখা দিবিনে? দেখা যদি না দিবি তো গলায় ছুরি দেব। এই হল তামসিক সাধন। রাজসিক সাধনে নানারকম ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের সমারোহ। এত তীর্থ করতে হবে, এত পুরস্চরণ এত পঞ্চতপা। আর সাত্ত্বিক সাধনা শাস্তশীলের সাধন। ফলাকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু নামটি নিয়ে নিনিমেষ হয়ে পড়ে থাকো। নাম দিয়ে দিয়ে কাম ধুয়ে ফেল।

আর কাম বুঢ়লেই মনস্কাম।

আমারই মতন রূপ কে একজন প্রবেশ করলে আমার মধ্যে। দেহের ঘটপদ্ম ফুটে উঠল তার আবির্ভাবে। নিয়মুখ ছিল, উর্ধ্বমুখ হয়ে উঠল।

আমি জীবের জগ্গে এসেছি জীবের মধ্যেই থাকব। থাকব “ডাইলিউট” হয়ে। আমার আপন জন কত আসবে আমার কাছে, কত আফ্লাদের দিন আছে, কত ভাবের আশ্বাদের দিন। গাঁজাখোরকে দেখলে গাঁজাখোরই আফ্লাদ করে। গায়ে পড়ে বোলাকুলি করে। অল্প লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপন জনকে দেখলে গা চাটে, অল্প লোক দেখলে চুঁ মারে।

আমার আপন জন সব যখন আসবে তখন আমাকে আপন ভাষায় কথা বলতে হবে। ব্রহ্ম হয়ে বোবা হুঁহুয়ে থাকলে আমার চলবে কেন?

পাকা ঘির কোনো শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন আবার পাকা ঘিয়ে কাঁচা লুচি পড়ে, তখন একবার কলকল করে ওঠে। কাঁচা লুচিকে পাকা করে আবার সে চুপ হয়ে যায়।

এই ঘিয়ে পড়বে অনেক কাঁচা লুচি। তাই একটু কলকল না করে উপায় নেই।

মৌমাছি যতক্ষণ ফুলে না বসে ভনভন করে। ফুলে বসে মধু খেতে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধু খেয়ে যখন মাতাল হয় তখন আবার আনন্দে গুনগুন করে।

যাচ্ছে ড্রেনের দিকে। এ কি, এ কোন পথে চলেছি? পথ কই গৃহে ফেরবার? পথ সব মুছে গেল নাকি? অথচ পিছন ফিরে শব্দ বাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে পথ তো দেখতে পারছি দিবা। তবে এ কী পথভ্রম!

রামকৃষ্ণ ফের শব্দ বাবুর বাড়ির ফটকের কাছে ফিরে এল। এইবার ঠিক হৃদয় হবে পথের। সামনে গিয়ে ডাইনে। পথঘাট তো মুখস্ত। তবে কেন বেচালে পা পড়বে? আফিঙের পুঁটলি টাটকে ঠুঁড়ে রামকৃষ্ণ আবার রওনা হল। আস্তে আস্তে এক পা দু পা করে, মুখস্তের জের টেনে-টেনে। কিন্তু যথাপূর্ব তথাপরং। আবার দিকভ্রম আবার পথলুপ্তি। আবার কে পা ধরে টানতে লাগল পিছন দিকে। কি, কোথায় কী ভুল হল আমার!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রামকৃষ্ণের। শব্দ বলেছিল, আমার থেকে নিয়ে যেও, তাকে না বলে আমি তার কম্পাউণ্ডারের থেকে চেয়ে নিয়ে গেছি। তাই মা আমাকে যেতে দিচ্ছেন না। ঘুরিয়ে মারছেন। আমার যে সত্যচ্যুতি হয়েছে। এ ভাবে নেওয়া তো চুরি করার সামিল।

অমনি ফিরে গেল রামকৃষ্ণ। ডিসপেনসারিতে গিয়ে দেখে সেই কম্পাউণ্ডারও নেই। দরজা বন্ধ নাকি? কে জানে। জানলা একটা খোলা আছে। সেই জানলা দিয়ে আফিঙের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভিতরে। বললে, ‘ওগো, এই তোমাদের আফিং রইল।’

বলে ফের মন্দিরের দিকে পা বাড়াল রামকৃষ্ণ। সমস্ত পথ এখন সড়গড়। আর কেউ টানছে না পা ধরে, ঠেলছে না এদিক-ওদিক। চোখের দৃষ্টি ফর্মা হয়ে গিয়েছে।

আমার মা আছে আর আমি আছি। আমি তো মার হাত ধরিনি, মা-ই আমার হাত ধরেছেন। নিজে না ধরে তাঁকে দিয়েই ধরিয়েছি আমাকে। তাই পা এতটুকু পড়তে দেন না বেচালে।

আমি তোমাকে ছেড়ে থাকি, কিন্তু মা, তুমি আমাকে ছেড়ে থাকো না। “মুখে তুমি মং ছোড়ো।”

ওরে শোন, পাদরের বাচ্চা হবি না, বেড়ালের বাচ্চা হবি। পাদরের বাচ্চা তার মাকে ধরে, মা যখন এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফায়, কখনো

তার মা ঘাড়ে কামড়ে ধরে, বেড়ালের বাচ্চার আর ভয় নেই। মা-ই তাকে ঝাঁকড়ে ধরে নিয়ে যাবে যেখানে খুশি। কভু আখার ধারে, কভু বা ছাইয়ের গাদায়, কভু বা বাবুদের বিছানায়।

তুমি কোথায়, তোমাকে ধরতে পারছি না। এই হাত বাড়িয়ে দিলাম, তুমি আমাকে ধরো।

মাঠের মাঝে আলপথ, এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ। বাপ তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে সেই আলপথ দিয়ে, গ্রামান্তরে। ছোট ছেলেটিকে বাপ কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে। বড়টি সেয়ানা, সে নিজেই বাপের হাত ধরে চলেছে। সব পথ, পড়ে যাবার ভয়, তাই দু ছেলেই বাপের আশ্রয় নিয়েছে। যাচ্ছে-যাচ্ছে, হঠাৎ একটা শব্দচিল উড়ে যেতে দেখল, একেবারে ঠিক মাথার উপর দিয়ে। দেখেই দু ছেলের মহা আতঙ্ক। দু জনেই আপনা ভুলে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোট ছেলেটা জানে, বাপ আমাকে ধরে আছে, আমার ভয় কি, আমি আনন্দে হাততালি দিই। কিন্তু বড় ছেলেটি যেই বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেল, অমনি পড়ে গেল নিচে, ঘা খেয়ে কেঁদে উঠল।

মাকে অমনি কোলে নিতে বল। মার কোলে বসে হাত ছেড়ে দে।

সারদার বাবা রামচন্দ্র রামনবমী তিথিতে মারা গেলেন। সারদার মন ভেঙে পড়ল। ভাবল আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাই।

বৈশাখ মাস, ১২৮১ সাল, সারদা আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এল।

কিন্তু থাকে কোথায়?

আর কোথায়। সেই সংকীর্ণ নবত ঘরে। চন্দ্রমণির সঙ্গে।

একরতি ঘর। একটুখানি দরজা। ঢুকতে-বেরতে মাথা ঠুঁকে যায়। একজনে থাকবার মতও তাতে জায়গা হয় না—তা দুজনে, শাওড়ি-বোয়ে। এটুকু ঘরের মধ্যেই হাঁড়ি-কুঁড়ি, পোঁটলা-পুঁটলি। যত হাবজা-গোবজা। ছিকের ঝুলছে যত কড়া-ডেকচি। রামকৃষ্ণের জগে জিয়ানো মাহ পর্যন্ত। এখানে থাকতে বোর যে বেরায় কষ্ট হবে।

কথাটা শব্দ মল্লিকের কানে উঠল। মথু হলে হয়তো অটালিকায় রাখতেন, শব্দ মল্লিক

তুলে দিলেন। তার জন্যে জমি নিতে হল মৌরসী স্বহে। আড়াই শো টাকা সেলামী দিলেন শঙ্কু।

জমি তো হল কিন্তু কাঠ কই ?

কাঠ জোগাল কাণ্ডেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। বিশ্বনাথ নেপালরাজের কর্মচারী। কলকাতায় ও মফস্বলে নেপালের শাল কাঠের সে জোগানদার। বেগুড়ে তার কাঠের গদি। বললে, ‘যত লাগে পাঠিয়ে দেব শালের চকোর।’

লড়াইয়ে বামুনের ঘরের ছেলে। বাপ ভারতীয় ফৌজের সুবাদার। এরা লড়াইও করে আবার পূজোও করে। যুদ্ধক্ষেত্রে শিব নিয়ে যায়। এক হাতে শিব অস্ত্র হাতে তরবার।

বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবত সব কঠিন। তারপর ভক্তি কত! যখন পূজো করে কর্পূরের আরতি করে। পূজো করতে-করতে স্তব করে আসনে বসে। সে আরেক মানুষ। পূজো করার সময় চোখের ভাব ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে।

কী ভক্তি! নিজের মার কাছে নিচে বসে। মা যে আসনে বসে তার চেয়ে নিচু আসন। কিংবা যে আসনে সে বসবে তার চেয়ে উঁচু আসনে মাকে বসাবে।

কী ভক্তি! রামকৃষ্ণ বরানগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, ছুটে এসে মাথার উপরে ছাতা ধরে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে নানা তরকারি রেখে খাওয়ায়। যেখানে খাওয়ায় সেখানেই আঁচাবার ব্যবস্থা করে, উঠতে দেয় না। বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ওদের বাড়িতে গিয়ে পাইখানায় বেহুঁস হয়ে পড়েছে রামকৃষ্ণ—এত আচারী, তবু পাইখানায় গিয়ে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এল। যদি কখনো সমাধি হয় রামকৃষ্ণের, কাণ্ডেন মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সে এককালে হঠাৎযোগ করত। তাই গুণ আছে তার হাতে।

শালের চকোর পাঠিয়ে দিল বিশ্বনাথ। একখানা আবার গঙ্গার জোয়ারে ভেসে গেল একদিন। হৃদয় ছুঁখ করে বললে সারদাকে, ‘তোমারে যেমন অদেষ্ট, একটা শালকাঠও ঠিকমত জোটে না।’

সারদা শুধু একটু হাসল উদাসীনের মত।

গেছে-গেছে ও শালকাঠ। বিশ্বনাথ আবার নতুন পাঠিয়ে দিলে। ঘর উঠল সারদার। চালাঘর।

শালকাঠ নিয়ে বিশ্বনাথেরও বিপদ কম নয়। গঙ্গার জোয়ারে অনেকগুলি কাঠ তার ভেসে গেছে। রাজসরকারের দারুণ ক্ষতি। এখন কী কৈফিয়ৎ দেয়া যাবে এর জন্তে, কে বলবে? কাঠের হিসেব পাঠালে না এবার বিশ্বনাথ। ঠিক করলে পরের বছরের লাভে এ লোকসানের পূরণ করবে। কিন্তু হঠাৎ কাটামুণ্ড থেকে তার তলব এল। বিকৃত কি রিপোর্ট গেছে রাজধানীতে, বিশ্বনাথের চাকরি নিয়ে টানাটানি। সংসারী লোক, ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। নেপালে যাবার আগে এল সে দক্ষিণেশ্বরে। সেই সরল সত্যশরণের কাছে।

বললে, ‘এখন উপায় বলুন।’

‘উপায় খুব সোজা।’ বললে রামকৃষ্ণ। ‘এর চেয়ে সোজা আর হতে পারে না।’

‘কি?’

‘সত্য কথা বলবে। কাঠ তো আর তুমি নাওনি, গঙ্গায় নিয়েছে। তাই বলবে গিয়ে দরবারে। তোমার কিচ্ছ হবে না। মা তোমাকে, তোমার সত্যকে রক্ষা করবেন। সত্যের মত সহজ আর কিছু নেই।’

বুদ্ধের ভার নেমে গেল বিশ্বনাথের। সোজা সত্য কথা বলব এ সব চেয়ে বড় আশ্বাস। অতলস্পর্শ শাস্তি।

হলও তাই। সত্য কথা বলায় তার দৌষফালন তো হলই, তার প্রমোশন হল। কাণ্ডেন ছিল কর্ণেল হল। ফিরে এল কলকাতায় নেপালের রাষ্ট্রদূত হয়ে।

বাঙালীদের নিন্দা করে বিশ্বনাথ। নিন্দা করে ইংরিজি-পড়ুয়াদের। ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে বলে, ‘এমন মাণিককে ওরা চিনল না।’

সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আট চাই। আর এই সত্যই ভগবান। সত্য কথাই কলির তপস্বী। কায়মনোবাক্যে বারো বছর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্কল্প হয়ে যায়।

‘আমি মাকে সব দিয়েছিলুম। জ্ঞান অজ্ঞান, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, শুচি-অশুচি, সব। কিন্তু সত্য মাকে দিতে পারলুম না। বলতে পারলুম না, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর অসত্য। ঐ সত্য যদি ত্যাগ করি তবে মাকে যে সর্বস্ব অর্পণ করলুম সেই সত্য রাখি কিসে? সত্য ভগবানকেও



দেয়া যায় না। সতাই তো ভগবান। তা আবার দেব কাকে ?

সেই শালকাঠের ঘরে বাস করতে লাগল সারদা। একটি মেয়ে এইল তার তত্ত্ব করতে।

সেই ঘরেই রাঁধে সারদা—রামকৃষ্ণের সেই ছিনাথ হাতুড়ে। খাঙ্গা-বাটি সাজিয়ে নিয়ে যায় মন্দিরে। কাছে বসিয়ে রামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসে। মাথা থেকে ঘোমটাটি সরে না হাওয়ায়।

দিনে-ছপুয়ে রামকৃষ্ণ মাঝে-মাঝে যায় সেই চালাঘরে। খোঁজ-খবর নিয়ে আসে। ঘোমটার ভিতর থেকে কথা কয় সারদা।

একদিন হল কি, বিকেলের দিকে গিয়েছে রামকৃষ্ণ। আর যেমনি যাওয়া অমনি মুঘলধারে বর্ণণ। সে বর্ণণ আর থাকে না। মন্দিরে এখন ফিরে যাই কি করে ?

না, যাব না মন্দিরে। তোমার চালাঘরটিতেই থাকব আজ। কি খাওয়াবে আজ বলে ?

ঝোল-ভাত তোমার পথ্য, ঝোল-ভাতই খাবে। সারদা রেঁধে দিল ঝোল-ভাত।

খেতে-খেতে রামকৃষ্ণ বললে, ‘এ কেমনতরো হল ? কালীঘরের বামুনরা যেমন রাত্রে বাড়ি আসে এ যেন আমি তেমনি এসেছি।’

চালাঘরেই রাত কাটাল রামকৃষ্ণ। চালাঘর নয়, কালীঘর।

#### উদ্দেশ্য

চালাঘরে থেকে সারদার কঠিন আশা হল। শম্ভু বাবু প্রসাদ ডাক্তারকে নিয়ে এলেন। খাওয়ালেন অনেক ঔষুধপত্র। কিন্তু রোগের কিছুতেই আরাম হয় না। সবাই বলে, দেশে ফিরে যাক। সেখানকার খোলা হাওয়া আর মিঠে জল ছাড়া সারবে না অসুখ।

জয়রামবাটিতে ফিরে গেল সারদা। আশ্বিন মাস, ১২৮২ সাল। শ্যামাসুন্দরী তাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

অসুখ বেড়েই চলল। কোথায় মুক্ত হাওয়া, কোথায় মিষ্টি জল। সারদা মিশে গেল বিছানার সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরী চোখে আঁধার দেখলেন। দেশের হাতুড়ে-রোজাদের ডাকেন এমনও বুঝি তাঁর সংস্কার নেই। আছেন শুধু দয়াময়।

সারদার দেহ বুঝি আর থাকে না। শবর পৌঁছল রামকৃষ্ণের কাছে।

‘তাই তো রে শম্ভু, সারদা কেবল আসবে আর যাবে।’ শান্ত স্বরে বললেন রামকৃষ্ণ, ‘মম্বুযাজ্ঞের কিছুই তার করা হবে না।’

বিছানার থেকে আশ্তে-আশ্তে উঠে বসল সারদা। কাছেই গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির। ঠিক করল সিংহবাহিনীর মাড়ে গিয়ে হত্যা দেবে। হয় রোগ নাও, নয় আমাকে নাও।

গ্রাম্যদেবীর কোনো নাম-ডাক নেই। কিন্তু আমার ডাকেই তার নাম হবে।

মা-ভাইরা যেন জানতে না পারে। চুপি-চুপি যেতে হবে মন্দিরে। কিন্তু যেতে পারব তো একা-একা ? নিজের পায়ে ভর করে ?

কে যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ধীরে-ধীরে। মা-ভাইরা জানতেও পেল না।

সিংহবাহিনীর মাড়ে হত্যা দিয়ে পড়ল সারদা।

খানিকক্ষণ পড়ে থাকবার পরেই সিংহবাহিনী নেমে এল সিংহাসন থেকে। বললে, ‘তুমি কেন পড়ে আছ গো ?’ বলে হাত ধরে তাকে তুলে দিল। ‘ওলতলার মাটি একটু খাও গে, আধি-ব্যাধি সেরে যাবে।’

মাটি খেয়ে অসুখ সেরে গেল সারদার। জীর্ণ দেহ সবল হয়ে উঠল।

গ্রামে-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল সিংহবাহিনীর মাহাত্ম্য। দূর-দূরান্তর থেকে আসতে লাগল আর্ত-আতুর। কেউ আমরা আগে জানিনি, আগে বুঝিনি, খোঁজ করিনি আমাদের গ্রাম্যদেবীকে। সাপের বিষ পর্যন্ত নাশ হয় ঐ মাটির ছোঁয়ায়। চল চল যাই সিংহবাহিনীর দ্বারায়।

লোকমাতা লোকের কল্যাণের জন্তে ঘুমন্ত দেবীকে জাগিয়ে দিলেন। যেমন জগতের প্রভু ভুবনের কল্যাণের জন্তে জাগিয়ে দিয়েছিলেন ভবতারিণীকে।

এ দিকে শম্ভু মল্লিকের অবস্থা সতিন হয়ে উঠেছে ঘোর বিকার। সর্বাধিকারী এসে দেখে বললে, ‘ঔষুধের গরম।’

দেখতে গেল রামকৃষ্ণ। শম্ভুর বিকারাচ্ছন্ন মুখে ভেসে উঠল তৃপ্তির প্রশান্তি।

‘শম্ভুর প্রদীপে আর তেল নেই।’

অশুখের গোড়ার দিকে শব্দ বলেছিল একদিন হৃদয়কে : ‘হৃদ, পৌঁটলা বেঁধে বসে আছি। কাণ্ডারী এলে তার হাতে তুলে দেব পৌঁটলা। বলব ফেলে দাও ভবনদীতে। ভার হালকা করো।’

ঐশ্বর্য ছিল, আসক্তি ছিল না। সংসারে টাকার দরকার বটে, কিন্তু ওগুলোর জন্তে ভাববে কে বসে-বসে? যখন আসে আসবে যখন যাবার যাবে। যদৃচ্ছা লাভ। ঈশ্বরের যারা ভক্ত, ঈশ্বরের যারা শরণাগত, তারা কিছু ভাবে না, তাদের যদৃচ্ছা লাভ। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এক দিক থেকে আসে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বৈরাগ্য মানে তো শুধু সংসারে বিরাগ নয়, বৈরাগ্য মানে ঈশ্বরে অনুরাগ। যার ঈশ্বরে অনুরাগ আছে তার অশ্রু অঙ্গরাগে দরকার নেই।

জানিস যারা ভক্ত, তারা হচ্ছে ঈশ্বরের আত্মীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ। ঈশ্বরই তাদের টেনে নেন। দুর্ঘোষনেরা যখন গন্ধর্বের কাছে বন্দী-হুল যুধিষ্ঠিরই তাদের উদ্ধার করলেন। বললেন, আত্মীয়দের ঐ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক।

ভক্তের আবার ভয় কি। অভাবের ভয় না, গাঘাতের ভয়? না, মরণের ভয়?

ওরে ভক্তের নাশ নেই। ‘ন মে ভক্তঃ প্রণশতি।

শব্দ চলে গেল। এখন কে হবে রসদদার?

ঝি কালীর মা সেবা করে চন্দ্রমণিকে। নববুয়ের উপর বয়স হয়েছে চন্দ্রমণির। বুদ্ধির জড়তা এসে গিয়েছে। হৃদয়কে দেখতে পারে না হৃ চক্ষু। কি করে তাঁর ধারণা হয়েছে অক্ষয়কে ওই মেরে ফেলেছে। এখন বলছে রামকৃষ্ণ আর সারদাকেও সে মেরে ফেলবে। মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণকে বলে গলা নামিয়ে, হৃদয়ের কথা কখনো শুনবি না। ও শব্দুর।

রাসমণির বাগানের কাছেই আলমবাজারের পাটের কল। ছপুরে কলে সিটি বাজে। সেই সিটিকে চন্দ্রমণি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলে। ঐ সিটি না শোনা পর্যন্ত খেতে বসে না। কেউ অমুরোধ করলে বলে, ‘এখন কী খাব গো? লক্ষ্মীনারাণের ভোগ হয়নি, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজেনি, এখন কি খাওয়া যায়?’ যেদিন কলের ছুটি থাকে সেদিন আর বাঁশি বাজে না। সেদিন চন্দ্রমণিকে খাওয়ানো শক্ত হয়ে পড়ে। বৈকুণ্ঠের শঙ্খ নেই আমারও খাওয়া নেই।

রামকৃষ্ণ তখন নানারকম কৌশল করে। ছোট মেয়েকে যেমন করে ভোলায় তেমনি করে পাশে বসিয়ে খাওয়ায় মাকে।

রোজ ভোরে উঠে মাকে দর্শন চাই রামকৃষ্ণের। কিছুক্ষণের জন্তে তাঁর কাছে থেকে তাঁকে সেবা করা চাই স্বহস্তে। আর কত দিন মার পাদপদ্ম স্পর্শ করা যাবে মা-ই জানেন।

হৃদয় দেশে যাবার জন্তে তোড়জোড় করছে। বাঁধছে বোঁচকা-বুঁচকি। হাটের থেকে নানা দ্রব্য কিনে এনেছে। না গেলেই নয়। শুনতে পেয়েছে দেশে কি-এক বেধেছে মোকদমা।

রামকৃষ্ণের কাছে গেল অমুমতি চাইতে।

‘মামা, যাব?’

‘না।’ রামকৃষ্ণ বারণ করল।

‘কেন বারণ করছ?’

রামকৃষ্ণ কারণ বললে না।

হৃদয় যত জিদ করে, রামকৃষ্ণ তত স্তব্ধ হয়।

শেষকালে হৃদয় গেল খাজাঞ্চির কাছে। মামা না বললে কি হয় খাজাঞ্চি যদি ছুটি দেয়, তবেই হল। খাজাঞ্চি ছুটি মঞ্জুর করল। আর হৃদয়কে পায় কে? সন্দের সময় রামকৃষ্ণ নবতে এল। এল মার কাছটিতে।

শুরু করল যত সব পুরোনো কথা, গাঁ-ঘরের কথা, পাড়া-পড়শীর কথা। পুরোনো কথার মত এমন আর কী ভালো লাগে মায়েদের। ছেলেদের ছেলেবেলার কথায় এলে মায়েদের আর খামায় কে।

রাত রাড়ছে, তবু কথায় মত্ত মায়ে-পোয়ে।

মন্দির থেকে হৃদয় ডাকাডাকি শুরু করল। কি গো মামা, খাবে না? খেতে এস।

মাকে ছেড়ে তবু উঠে যেতে মন ওঠে না রামকৃষ্ণের। মার কাছটিই যেন কাশীধাম।

হৃদয়ের চীৎকার তীব্রতর হল।

‘আমারটা রেখে তোরা দু জনে খা গো।’ বললে রামকৃষ্ণ।

তোরা দু জনে মানে হৃদয় আর রামলাল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রামলাল এসে পূজারী হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে।

আমি আরো একটু বসি মার কোল ঘেঁসে। আরো একটু কথা শুনি।

রাত প্রায় ছপু, মাকে খুম পাড়িয়ে রামকৃষ্ণ

ফিরে এল নিজের ঘরে। খেয়ে-দেয়ে শুলো নিজের বিছানায়।

কিন্তু হৃদয়ের চোখে ঘুম নেই। কেবল এ পাশ ও পাশ করছে। রাত যত বাড়ছে তত বাড়ছে হৃদয়ের ছটফটানি। কে যেন আঠেপৃষ্ঠে তাকে বেঁধে ধরেছে বিছানায়, ছাড়া পাবার জগ্গে হাত-পা ছুঁড়ে ফণে-ফণে।

রামকৃষ্ণের পাশের বিছানা হৃদয়ের। রামকৃষ্ণ দেখেও দেখছে না।

এক ঝটকায় উঠে পড়ল হৃদয়। ঘরের কোণে গাঁঠির বাঁধা, কাল ভোরেই সে রওনা হবে ঠিকঠাক। সহসা সে ক্ষিপ্ত হাতে গাঁঠির বাঁধনগুলি খুলে ফেলতে লাগল। আর বাঁধনও কি একটা ছটো! যেমন যত রাজ্যের জিনিস পেয়েছে পুরেছে তেমনি এঁটেছে দড়িদড়ার গোরপ্যাঁচ।

টেনে থিঁচে ছিঁড়ে খুলতে লাগল দড়ির জট।

রামকৃষ্ণ জিগগেস করল, 'কি হল?'

'কী হল। বিছানায় শুতে পাচ্ছি না। যতক্ষণ এ বাঁধনগুলো না যাচ্ছে ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। গাঁঠির মতই দড়ি দিয়ে কে আমাকে বেঁধেছে নাগপাশে—'

'বাড়ি যাবি না?'

'আর গেছি! মনে একটা ইচ্ছে হলেই যদি কেউ বাগড়া দেয়, তাহলে বাঁচি কি করে?'

বন্ধন মুক্ত হয়ে হৃদয় ফের ফিরে এল বিছানায়। বললে, 'কিন্তু কেন যে বাড়ি যেতে দিলে না বুঝতে পারলুম না।'

'পারবি। ভোর হোক।'

নিজে আগে ভোরে উঠে কালীর মাকে জাগিয়ে দেয় চন্দ্রমণি। সেদিন কালীর মা-ই আগে উঠল। বেলা এক-গা হতে চলল তবু চন্দ্রমণির সাড়া নেই। ডাকাডাকি করতে লাগল কালীর মা। তবু দরজা খোলে না।

দরজায় কান পেতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল কালীর মা। শুনতে পেল গলার একটা ঘড়ঘড় শব্দ। ছুটে গেল হৃদয়কে খবর দিতে।

বার থেকে কী কৌশলে হৃদয় খুলে ফেলল জড়কো দেখল চন্দ্রমণির শেষ অবস্থা।

ওষুধ আর গঙ্গাজল দিতে লাগল ফোঁটা-ফোঁটা করে।

তিন দিন কাটল এমনি অবস্থায়। হৃদয় অমুরের মত যুঝতে লাগল যমের সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললে, এবার অন্তর্জলি করা হোক। চন্দ্রমণিকে নিয়ে চলল গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল চন্দন আর তুলসী দিয়ে মার পায়ে অঞ্জলি দিলে রামকৃষ্ণ।

পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

রামলাল ফুল নিয়ে এল, হৃদয় নিয়ে এল শ্বেত চন্দন। মার পা দুখানি গঙ্গাজলে ধুয়ে তাতে রামকৃষ্ণ ঘন করে চন্দন মাখিয়ে ছিল। এ জল চোখের জল আর এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

'যে দেহ থেকে আমার দেহের প্রকাশ সেই দেহ আজ মিশে গেল পঞ্চভূতে।'

এঁড়েনার শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল চন্দ্রমণিকে। রামলাল মুখাণ্ডি করলে, সংকার করলে। রামকৃষ্ণ যে সম্মাসী।

রামলালই শ্রাদ্ধ করল বৃষোৎসর্গ।

রামকৃষ্ণ অশৌচ পর্যন্ত পালন করেনি। প্রেতপিণ্ড দেওয়া তো দূরের কথা।

পুত্রোচিত কোনো কার্যই করলাম না মার জগ্গে। মনের ভিতরটা খচখচ করছে রামকৃষ্ণের। অন্তত একটু তর্পণ করি মাকে।

গঙ্গায় নামল রামকৃষ্ণ। পিছনে অগণন লোক। রামকৃষ্ণের মাতৃতর্পণ দেখবে।

জলের অঞ্জলি নেবার জগ্গে গঙ্গায় হাত ডোবাল রামকৃষ্ণ। কিন্তু যেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত উপরে তুললে অমনি হাতের আঙুলগুলি অসাড়, শিথিল হয়ে গেল। একে বেকৈ ফাঁক হয়ে গেল। সব জল পড়ে গেল ফাঁক দিয়ে। যতক্ষণ জলের মধ্যে থাকে হাত ঠিক বদ্ধাঞ্জলি থাকে, যেই জল নিয়ে উপরে ওঠে আঙুলগুলি অমনি কাঠির মতন শক্ত হয়ে প্রসারিত হয়ে পড়ে। এক বিন্দু জল বন্দী হয় না। বারবার চেষ্টা করেও পারছে না কিছুতেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল রামকৃষ্ণ। 'মা গো, তোর জগ্গে কি কিছুই করতে পারব না?'

কোনো দোষ স্পর্শেনি তোমাকে। তুমি গলিত-হস্ত। বললে এসে পণ্ডিতেরা। তুমি অধ্যাত্মসাধনার চূড়ায় এসে উঠেছ।

তুমিই 'শ্রদ্ধাণ্ডি সমিধাতে।' তুমিই 'শ্রদ্ধা হুয়তে হবিঃ'।

[ ক্রমশঃ ]

# বসুভাষ্য

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

নকুল—বেজী, নেউল, চতুর্থ পাণ্ডব ।  
 নকুল—রাত্রি, নিশি, বজ্রনী, যামিনী ।  
 নকুল—কুস্তীর, কুমীর, ঘাড়িয়াল, জলহস্তী ।  
 নথ—নথর, অঙ্গুলিব অগ্রভাগ ।  
 নথরঞ্জনী—নরুণ, নথচ্ছেদনাস্ত্র ।  
 নথশূল—আঙ্গুল-হাড়া, কুণী ।  
 নথায়ুধ—বৃহন্নথবিশিষ্ট জন্তু, নথী ।  
 নগ—বৃক্ষ-পর্শিতাদি, অচল ।  
 নগণ্য—অবজ্ঞেয়, তুচ্ছ, হেয়, অগণ্য ।  
 নগর—নগরী, পুরী, গ্রামাদি ।  
 নগ্নিকা—যজ্ঞাতপ্তকৃৎ কণা, উলঙ্গিনী ।  
 নচেৎ—নতুবা, অন্যথা, যদি নহে ।  
 নট—নর্তক, নৃত্যকারী, অভিনেতা ।  
 নটী—নর্তকী, অভিনেত্রী, বারদী, বেথুনী ।  
 নট্যালয়—গণিকা-গৃহ, বেথুনালয় ।  
 নত—নয়, ভূমিষ্ঠ, বক্র, বিনত, বিনয়ী ।  
 নথ—নারীর নাসিকাভরণ-বিশেষ ।  
 নদ—নদী, গাং, স্রোতস্বতী, নিমগ্না ।  
 নদ—নদী, নদীনা, পতির ভগিনী ।  
 নদী—নদীনা, নদনীত, নগ্নন ।  
 নন্দ—হর্ষ, কুশল, আনন্দ, আনন্দ ।  
 নন্দী—আহ্লাদিত, শিবের অগ্রতন অমুচর ।  
 নপ্তা—নপ্ত, নাতী, পৌত্র, দৌহিত্রাদি ।  
 নব—নূতন, আধুনিক, নবীন, নবন ।  
 নবান্ন—নূতন অন্নের উৎসর্গ পার্শ্ব ।  
 নভঃ—অন্তরীক্ষ, আকাশ, গগন ।  
 নভঃ—গভ, বন্দনা, দণ্ডবৎ, নমস্কার ।  
 নান—চক্ষু, লোচন, নেত্র, ঔপি, আনয়ন ।  
 নরক—পাপভোগের স্থান, নিরয় ।  
 নাপতি—রাজা, ভূপতি, নরাধিপ, নরেন্দ্র ।  
 নগম—বৃহ, শিষ্ট, নয়, কোমল ।  
 নর্জমা—পর্যনামা, নাপা ।  
 নর্জ—কোতুক, লোলা, পরিহাস ।  
 নর্জ—নাশ, অস্থায়ী, অচির ।  
 নর্জ—তাসকটচূর্ণ, নাস ।  
 নাপুন—স্নান করণ, অবগাহন ।  
 নর্জ—সর্প, ভূজঙ্গ, মাপ ।  
 নর্জ—নৃত্য, নাট, অঙ্গভঙ্গি ।  
 নর্জ—নৃত্য, নৃত্যরূতি ।

নাট্যমন্দির—নাট্যালয়, নাট্যশালা, নৃত্যালয় ।  
 নাড়ী—উদরস্থ শিরা, হস্তের প্রধান শিরা ।  
 নাতি—অপত্যের পুত্র, পৌত্র ।  
 নাথ—স্বামী, ভর্তা, প্রভু, বর্তা ।  
 নাদ—শব্দ, গজ্জন, গৌময় ।  
 নানা—অনেক, বিবিধ, বহু, ভিন্ন ভিন্ন ।  
 নান্দী—প্রভাবনা, নাট্যাদির মঙ্গলাচরণ ।  
 নান্দীমুখ—আনন্দমুখক শব্দ ।  
 নাবিক—কর্ণধার, কাণ্ডারী, নাবী ।  
 নাতি—উদরের মধ্যস্থান, চক্রমধ্য ।  
 নাম—আখ্যা, কীৰ্ত্তি, যজ্ঞা, পদবা ।  
 নামকরণ—অন্নপ্রাশন, নাম দেওন ।  
 নামন—অপোগমন, অবরোধ, নাবন ।  
 নামক—অধ্যক্ষ, কর্ত্তা, স্বামী, প্রবন্ধ ।  
 নামিকা—মণী, স্ত্রী, ভাষা, পাত্র, নারী ।  
 নারীদর্শ—স্বীয়দর্শ, পাত, বহু ।  
 নাশ—বিনাশ, ধ্বংস, হানি, মরণ, ক্ষতি ।  
 নাসিকা—স্রোতস্বতী, নাক ।  
 নাস্তিক—অনাথবর্গী, শাস্ত্রান্ধক ।  
 নিঃ—বহির্গমন, বাহিত্যবোধক শব্দ ।  
 নিশদ—নাগর, অবাক, নৌমি, তুচ্ছ ।  
 নিঃশেষ—সম্পূর্ণ, শেষবাহিত ।  
 নিকট—অদূর, অন্তর্গত, কাছ ।  
 নিকার—অনকার, নিষেধ ।  
 নিকৃত—শঠ, ধূর্ত, দুষ্ট, অধম ।  
 নিকৃষ্ট—অদজ্ঞাত, অধম ।  
 নিক্তি—পরিমাণ-যন্ত, তুলনাকাটি ।  
 নিক্ষেপ—ফেলা, আঁধ, নিক্ষেপ করণ ।  
 নিখুঁত—নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ।  
 নিগূঢ়—গুপ্ত, দুজ্ঞেয় ।  
 নিগ্রহ—দণ্ড, দমন, ক্রেশ ।  
 নিচয়—সমুহ, নিবহ, সকল, দাঁশি ।  
 নিঠুর—নিঠুর, কঠিন, নিদারুণ, নিদয়, কুপাত্তান ।  
 নিত্য—অনন্তর, অমৃত্যুরাহিত ।  
 নিদর্শন—আদর্শ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ ।  
 নিদাঘ—গ্রীষ্ম, গুপ্ত, দর্ম্য ।  
 নির্দিষ্ট—আজ্ঞাপিত, কাণ্ডিত, নিরূপিত ।  
 নির্দেশ—আজ্ঞা, কথা, উল্লেখ, নির্দেশ ।  
 নিজা—দুঃ, তজ্জ, নিদ ।  
 নির্মাদ—এব, শব্দ, গজ্জন, দর্শন, নাদ ।  
 নির্মাদ—অপবাদ, দোষ কথন ।  
 নিপুণ—পটু, দক্ষ, পারদর্শী ।  
 নিবর্ত—বিরত, নিষেধ, ক্ষান্ত, দমন, শাস্ত ।

# ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও হিন্দী ভাষা

শ্রীপ্রিয়ব্রজ সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যের শক্তিবৃদ্ধি চেষ্টা আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের কয়েকটি আধুনিক বিশিষ্ট ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা ও তাহা প্রকাশের কাজে লোকে প্রেরণা পায়। তাহাতে স্বার্থান লোকে শাসক ও শাসিত—উভয়কেই শোষণ করিতে না পারে, সেজ্জা ও দেশের শাসন-ব্যবস্থার উন্নতির নিমিত্ত কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকদিগকে দেশের লোকের ভাষা ও প্রথা সহিত পরিচিত করা আবশ্যিক হয়। সেজ্জা ১৭৯৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর সরকারী বিভাগ হইতে নষ্ট মধ্যে এক বিজ্ঞাপন বাহির করা হয় :—“দেশীয় ভাষার নিয়ম-কানুন সংক্রান্ত পরীক্ষা পাশ না করিলে ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কোন কথ্যচর্চাও তাহাব পদের (কোন কোন বিভাগে, সে কথা পরে জানান হইবে) যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সকল দেশীয় ভাষার জ্ঞান অপরিহার্যরূপে আবশ্যিক হইবে।” আদালতের কাজের জন্ত হিন্দুস্থানী ও পারস্য ভাষার জ্ঞান আবশ্যিক বলিয়া জানান হয়। কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত কথ্যচর্চাবাদ (রাইটারগণ) ইহার পূর্বে তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিশেষ ভাবে অনুমোদিত শিক্ষক ও মুন্সীদের নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু হার্ড ওয়েলসলির সময়ে এই শিক্ষা নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক করিবার চেষ্টা করা হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময় অল্পতরু কয়েক জন শিক্ষককে তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যাটবার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও যোগ্য দেখা যায়। সে সময় শিক্ষক ও ছাত্রদের সাহায্যার্থে কোন পাঠ্যপুস্তক ও সাহায্যকারী কোন পুস্তকও ছিল না। এই সকল শিক্ষকদের মধ্যে জন বি গিলক্রাইস্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিলক্রাইস্ট ১৭৮৩ সালের পরবর্তী কোন সময়ে বোম্বে ডিট্যাচমেন্টে অধীনে এগিষ্টাণ্ড সার্কেল নিযুক্ত হন। ১৭৮৫ সালে তিনি হিন্দী ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। তিনি তাহাতে হিন্দী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা কাজ শেষ করিতে পারেন, সেজ্জা তাঁহাকে ১২ মাসের ছুটি দেওয়া হয়। ১৭৮৬ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি তাঁহার কাগজে অনেক দুই অধ্যায় হইতে পারেন। গভর্নর জেনারেলকে তাঁহার লিখিত একখান চিঠি হইতে তাহা জানা যায়। ১৭৮৭ সালের জুন মাসে তিনি গভর্নর জেনারেলকে লিখেন, ৩ বৎসর অনবরত পাঠশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার পুস্তকের প্রথম খণ্ড শেষ করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার কাগজে স্তবিধা পাঠবার আশায় বাবাণসী জমিদারীতে কোন স্থানে বাস করিবার এবং তিনি যে কাগজে নিযুক্ত আছেন, তাহাতে অর্থ উপায়ে বা আর্থিক সুবিধা লাভের কোন সম্ভাবনা না থাকায় নীল চাষে লগ্নমতি প্রার্থনা করেন। উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করা হয়। বোর্ড তাঁহাকে বাবাণসীতে বাস করিয়া

চাষ করিবার অনুমতি দেন। নীল চাষ এদেশে তখন নূতন। গিলক্রাইস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কয়েক বৎসর বাস করায় ফলে নীল চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইহার পর গিলক্রাইস্টকে গাজীপুর হইতে পত্র লিখিতে দেখা যায়। তিনি সে পত্রে অনুবোধ করেন যে, কাগেন কার্পাসট্রিকের পরিকল্পিত পুস্তকের ২ শত খণ্ড লইবার জন্ত কোম্পানী দে ১২ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, সেই টাকাতা গেল তাঁহাকে দেওয়া হয়। কারণ, কাগেন ইতিমধ্যেই বোর্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ত্যাগ করিবার সম্মত করিয়াছেন। কাগেন সমস্ত ও অতিবিক্রম পবিত্র করিবার শক্তির অভাবে তাঁহার সাহিত্য-সাধনায় ক্ষান্ত হন। গিলক্রাইস্ট আবও জানান, স্থানীয় লোকে অধিক সাহায্যের ও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা না পাওয়ায় তিনি তাঁহার নিজের কাজ চালাইতে পারিতেছেন না।

১৭৯১ সালের পূর্বেই তিনি তাঁহার অভিধান রচনার কাজ শেষ করেন। কিন্তু সেজ্জা তাঁহাকে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়। এজ্জা তিনি তাঁহার অভিধানের গ্রাহকদিগকে প্রতি খণ্ডের জন্ত আবও ১০ টাকা করিয়া দিবার জন্ত অনুরোধ জানান। প্রথমে মূল্য ধরা হইয়াছিল সমগ্র অভিধানের জন্ত ৪০০ টাকা। গ্রাহকরা সে অনুবোধ অনুসারে কাজ করেন গিলক্রাইস্ট ইহার পর অনতিবিলম্বে ব্যাকরণ ও পাবিশিষ্ট রচনা করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে ভারত সরকারের কাগজ-পত্রে আবার গিলক্রাইস্টের নাম দেখা যায়। সরকারের নূতন কথ্যচর্চাবাদ (জুনিয়র রাইটারগণ) হিন্দুস্থানী ও পারস্য ভাষার কিছু ব্যাপ্তি লাভ করি মুন্সীর নিকট এই দুই ভাষা অধ্যয়নের উপযুক্ত হইবার পক্ষে তাহাদিগকে প্রত্যহ এই দুই ভাষা শিক্ষা দিবার এক প্রস্তাব দিরা করেন। এই সকল কথ্যচর্চাবাদে মুন্সীর নিকট হইতে ভাষা শিক্ষা জন্ত যে ভাতা দেওয়া হইত, গিলক্রাইস্টকে তাঁহার পাবিশ্রমিকের এই ভাতার টাকা লইতে দেওয়া হয়। ১৭৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী ঐকপ ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। বৎসরের শেষে পরীক্ষা লওয়া হয়। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংএর এক কক্ষ গিলক্রাইস্ট ব্যবহাবে জন্ত নির্দিষ্ট করা হয়; তিনি সেখানে বাস করিলেন। জুনিয়র রাইটারদিগকে সপ্তাহে ৬ দিন ভাষা শিক্ষা দিবেন, তাহা হয়। এই কথ্যচর্চাবাদ শিক্ষা গ্রহণের সময় তাহাদের নিজ নিজ অর্থ নির্দিষ্ট কাগজ করিয়া যাইত। গিলক্রাইস্টকে তাঁহার ক্লাসে ছাত্র উপস্থিতির হিসাব হাজিরা-বহিতে রাখিতে হইত। গভর্নর জেনারেল মাসে একবার করিয়া ছাত্রদের অধ্যয়নের উন্নতির অবস্থা পরিদর্শন করিতে যাইতেন।

গিলক্রাইস্টের ঐ ক্লাসই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্তর্গত অবস্থা। ১৭৯৯ সালের শেষ পর্যন্ত কোন নাম স্থির হয় নাই। গভর্নর জেনারেল ১৮০০ সালের প্রথম দিকে বোর্ডকে লিখেন যে, তিনি ১৮০০ সালের ১লা জুন গিলক্রাইস্টের ছাত্র

কোম্পানীর জুনিয়র সিভিল মার্জ্যান্টদের হিন্দুস্থানী ভাষার পবীক্ষার দিন স্থির করিয়াছেন। পবীক্ষায় যাত্রাব্যবস্থাপন পবিচয় দিতে পাবিবে, তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮০০ সালের ৪ঠা মে কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮০০ সালের ১৮ই আগষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক-পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। উহা পর গিলক্রাইস্টেব ও মুন্সীদেব ভাতা প্রভৃতির ও অজ্ঞাত ব্যয় কলেজের হিসাবে ধরা হইতে থাকে। ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা যায়, প্রধান প্রতিষ্ঠানটিতে ছিলেন—হিন্দুস্থানী মুন্সীবা—৩৩ জন মুন্সী, ৩ জন অম্বাবাদক ও ১ জন নাগবী লেখক। কেবী তখনও বিশিষ্ট স্থান পান নাই এবং গিলক্রাইস্টেব ও কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন না। গিলক্রাইস্টেব ১৮০৩ সালের নভেম্বর মাসের জন্ম হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে ১৫০০ টাকা, তাঁহার প্রথম সহকারী কান্তনু মাওরাট ও তাঁহার দ্বিতীয় সহকারী এনসাইন ম্যাক ডাউগ্যাল যথাক্রমে ১০০০ ও ৮০০ টাকা, উইলিয়াম কেবী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার শিক্ষকরূপে ৫০০ টাকা মাত্র পান। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে মাহিনা যদি পদ-মর্যাদা সূচিত কবে, তাহা হইলে উক্ত হিসাব হইতে কর্তৃপক্ষের নিকট অধ্যাপকদের পদের আবেদনিক গুরুত্বের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। ১৮০৭ সালের মধ্যে মাহিনার তাহেব অনেক উন্নতি করা হয় এবং কোলকাতা পদত্যাগ করিলে কেবীকে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক করা হয়।

গিলক্রাইস্টেব জুনিয়র রাইটারদের নিয়মিত অধ্যাপনার সময় কয়খানি পুস্তকও প্রকাশ করেন। সাদী বৈনিতিক উপদেশের কবিতা-পুস্তকখানি তিনি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাহার নাম দেন “হিন্দী নব্যাল প্রিসেপ্টর” বা হিন্দী নৈতিক উপদেশক। বড় প্রাচ্য ভাষার শব্দাবলীর সঠিক উচ্চারণ শীঘ্র শিখিবার নির্দিষ্ট ও কার্যকরী নীতিসম্মত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রথাব পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়া তিনি আব একখানি বই লিখেন। তাহার নাম দেন “হিন্দী-বোম্যান অর্থো-এপিগ্রাফিক্যাল অ্যান্টিমেটাম” অর্থাৎ হিন্দী-বোম্যান শব্দের শুদ্ধোচ্চারণ সম্বন্ধে শেষ কথা।

“হিন্দু ষ্টোরি টেলার” পুস্তকে তিনি জনপ্রিয় এক শত প্রাচীন কাহিনী, উপাখ্যান, বহুশ্রুতি, নীতি-বাক্য ও বহুল-প্রচলিত প্রবাদ বোম্যান, নাগবী ও পারসী—তিন বকম বর্ণমালায় পব পব প্রদান করেন। হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ ও অভিধান প্রভৃতির গ্রন্থকাব “ষ্ট্রেজার্স ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাইড টু হিন্দুস্থানী” বা হিন্দুস্থানী ভাষার পথি-প্রদর্শক নামে আর একখানি বইও লিখেন। পুস্তকখানি ১৮০২ সালের জুলাই মাসে হিন্দুস্থানী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি সাব জর্জ বারলোর নামে উৎসর্গ করা হয়। হিন্দুস্থানী ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে সাব জর্জের বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করা হয়। সাব জর্জের এই প্রশংসা হইতে বুঝা যায়, বিশিষ্ট সহকারী কর্মচারীবী সে সময় এই ভাষা শিখিবার বিষয়ে কিরূপ আগ্রহী ছিলেন। গিলক্রাইস্টেব তখনও হিন্দুস্থানী ও হিন্দী পার্থক্য প্রদর্শনে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার পুস্তকে সম্রাটের বাবগুলিব নাম তিন বকম ভাষায়—হিন্দুস্থানী, হিন্দী ও ইংরেজীতে ছিল। দৃষ্টান্তরূপে এতায়াব—রবিবার—মাণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮০২, ১৮০৮ ও ১৮২০ সালে বইখানির ৩টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তাঁহার কাজের জন্ম তাঁহাকে যে শক্তিকর্য করিতে হইত, তাহার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য চমৎ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৮০৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি কলেজ-কাউন্সিলের সেক্রেটারী নিকট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করেন। কলেজ-কাউন্সিল তাঁহার পদত্যাগ-পত্র কলেজের পবিদর্শক গভর্নর মেনোবেলের নিকট পাঠাইবার সময় গিলক্রাইস্টেব উৎসাহ, কার্যদক্ষতা ও কলেজের কার্যে বরাবর তাঁহার মনোযোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে স্বাস্থ্যতানিব জন্ম ইংলণ্ড যাত্রার অনুমতি দেন। ইংলণ্ড অবস্থান কালেও তিনি হিন্দী ভাষা চর্চার আগ্রহ একেবারে ত্যাগ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার কতকগুলি পুথ্যতন পুস্তকেব সমাধাণন করিয়া সেগুলি প্রকাশ করেন। তাহা ছাড়া, তিনি কোম্পানীর এজিষ্ট্যান্ট মার্জেন ও অজ্ঞাত কর্মচারীদের বিনা পাবিশমিকে ভাষা শিখাইতেন। শীত ও গ্রীষ্ম কালের ৬ মাসের মধ্যে ২ মাসে তিনি ১৪ দিন করিয়া শিক্ষা দিতেন।

ভাবতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থের এলফিনস্টোন গিলক্রাইস্টেবের হিন্দী ফাইলোলজিব (শব্দবিজ্ঞান), প্রতিষ্ঠাতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ-বচয়িতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাইলোলজিব নীতি অনুসারে হিন্দুস্থানী ভাষার অনুশীলনে তিনি বিশেষ আগ্রহাশিত ছিলেন। বর্ণমালা সম্বন্ধে তাঁহার একটি নিয়মিত পবিকল্পনা ছিল। সে-সমক্ষে পাঠকগণকে “হিন্দুস্থানী ফাইলোলজী”র উপকর্মবিকা পাঠ করিতে অনুবোধ করি। তাহার মধ্যে ইংরেজী-হিন্দুস্থানী অভিধান ও ব্যাকরণের কথা প্রভৃতি আছে। মাদ্রাজের লেফটেন্যান্ট টিমাস শেবাক ও বাঙ্গালাব সিভিল মার্জিনেব জে বি ইলিগট তাঁহার বন্ধু ছিলেন। তাহাণা তাঁহার এই গল্প বচনায় সাহায্য করেন। ইংলণ্ড পূর্বে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। গিলক্রাইস্টেব এই পুস্তকে লিখেন, “পারসী-আববী ও নাগবী—উভয়েই নানা দিকে এত কটিপূর্ণ যে, কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় কলেজে আমি যে সকল সমাধাণন ও পার্থক্য-বোধক চিত্রেব প্রবর্তন করি, সে সকল তাহাতে আবলক। এই পুস্তকে সে সকল চিত্র প্রভৃতি আছে। এই সময় হইতে বাঙ্গালায় হিন্দুস্থানী প্রেস হইতে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করা হয়, সে সকলেও এই সকল চিত্র প্রভৃতি আছে।”

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনায় গিলক্রাইস্টেব ব্যস্ত হইত আরও অনেক ইউরোপীয় বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। তাঁহার অনেক সাহায্যকারীর মধ্যে ইউরোপীয়গণ ছিলেন। তাঁহাণাও হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য তাঁহার সহিত একযোগে কাজ করেন। গিলক্রাইস্টেব তাঁহার পদত্যাগ-পত্রে লিখেন, কলেজের ছাপাখানা ও হিন্দুস্থানী প্রেসের দায়িত্ব অজ্ঞাতদের সহিত ডাঃ হাটারেরও উপব ছিল। ডাঃ হাটার কলেজের সহিত সশ্লিষ্ট ছিলেন ও ছাপাখানা হইতে কতিপয় পুস্তক প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি বাণেন। ১৮০৫ মালে নিঃ ব্যাকডাউগ্যালের স্বাস্থ্যতানি-জনিত অনুপস্থিতির সময় তিনি অস্থায়ী ভাবে হিন্দুস্থানী ভাষার সহকারী অধ্যাপক ছিলেন।

গভর্নমেন্ট ও ডাঃ উইলিয়াম হাটারের মধ্যে কিছু পত্র-বিনিময় হয়। পত্রে ডাঃ হাটার হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধান বচনার প্রস্তাব

কবেন। নাগরীক পরিবর্তে তিনি পাবসী বর্ণমালায় বিন্যাস পছন্দ করেন। অক্ষরাবৃত্তকরণ সম্বন্ধে তিনি সাব উইলিয়াম জোন্সের প্রথায স্থানে গিলক্রাইষ্টের প্রথা ভাল বলেন। ফোট উইলিয়াম কলেজে হিন্দুস্থানী বিভাগে গিলক্রাইষ্টের প্রথাটি প্রচলিত ছিল। কলেজ-ক্যাডিন্সিল শীতাব প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যয়-বহুল বিবেচিত হওয়ায় সে করেন পবিত্যক্ত হয়।

তখন বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রাদেশিক ভাষার বাৎসরিক বাদ-প্রতিবাদ হইত। হিন্দুস্থানী ভাষায় এইরূপ বাদ-প্রতিবাদের একাদিক আলোচনার বিবরণ এখনও বর্তমান। সতী-প্রথা সম্বন্ধে মাদাজের মিঃ ডবলিউ চ্যাপলিন ১৮০৩ সালের ১৯শে মার্চ শীতাব অভিমত প্রকাশ করেন। উহার কয়েক ছন্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল—

“আগে মেঘা কহনা বুধা ইস মিসে মৈ জামতা ভঁ তুমহাবে জীর্মে বোতা মান কৈ জো মেঘে তিবলে সমায়া তৈ ইস কাবণ মৈ স্তমানে কো লোভা গসে ভঁ হে মহাবাজে মৈ দেবু তো হুম কৈসী কৈসী পকড কবহে তো যিহ মৈ বিন লগাব কহতা ভঁ জো কোঙ্গি মেঘে বাদকো কুহুভী হুগাবে বোতা বদা জ্ঞানী তৈ।”

লালুজী “বাকীতি” সম্বন্ধে একটি স্থান নিয়ে উদ্বৃত্ত কবিতা দিহেছি। কহা হইতে উল্লিখিত উদ্বৃত্তাংশের ভাষার অপরূপতা স্পষ্ট প্রাণমান হইবে। নীচের শেষ ভাষার ভঙ্গী স্পষ্ট। ইহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ভ্রান্ত ও গড়িতও আবামপ্রদ।

“কবর দ্বাপকে মাঁচি” পদ্যকেন্দ্র নাম এক সর্বোত্তম তৈ। কাত সমে কহাকে সব পছিন মিলি এক হিববাগু নাম হুম কো বাজা কি গো। সো ভাঁ বাজকবন লাগো। কহো কৈ জা বাজা ন হোয় ভাঁ কী প্রজা স্তমানে ন বৈ। জৈসে সমদমে বিনা কেবট নাব না চলে তৈসে সমাবমে ভঁ বাজা বিন ধয় ন নিহে। বাজা প্রজা কী নিহ নিহ অধিকাবে চাই নিষ পুদকী সমান জন। আক জো রাজ প্রজা কৌ পালিন কবি ন বজাবে সো জগৎ মে প্রতিষ্ঠা ভ ন পাবে।”

প্রধানতঃ ফোট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া যে সকল পুস্তক প্রকাশ করা হয়, তাহার কতকগুলি নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল :—

হিন্দী মাধ্যমাল না ভাবতব বহুপেটিকা; হিন্দুস্থানী গ্রন্থকবদের গুণ হইতে উদ্বৃত্ত কতিপয় অংশ; ১৮০২ সালে কলিকাতায় জন গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে সম্বলিত।

হিন্দী প্রৌদি বোলাব; গ্রন্থকাব জন গিলক্রাইষ্ট, ২ খণ্ড সমাপ্ত, কলিকাতা, ১৮০২ সাল। হিন্দুস্থানী ভাষায় বোম্যান, পাবসী ও নাগরী বর্ণমালায় ব্যবহৃত।

ওবিয়েটাল ফেলিট; জন গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে সম্বলিত; বোম্যান ৩খণ্ড, পৃঃ ৩৭, ৩১৬; কলিকাতা ১৮০৩।

উর্দু বিসালী অথবা কাইদ-ই-জবান-ই-উর্দু; গিলক্রাইষ্ট রচিত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের নিয়মাবলী; পৃঃ ১৮১, কলিকাতা, ১৮২০।

হিন্দী বোম্যান অথোগ্রাফিক্যাল আন্টিমেটাম অথবা হিন্দী-বোম্যান শব্দের শুদ্ধাকার সম্বন্ধে শেষ কথা। গিলক্রাইষ্ট রচিত, পৃঃ ৮৪, কলিকাতা ১৮০৪।

আখতাগ-ই-হিন্দী—মিব বাহাভব আলি কর্তৃক সংস্কৃত

হিতোপদেশের পারসী সংস্করণের অনুবাদ। পারসী সংস্করণটির নাম মিফতা-অল-কুতব। পৃঃ ২১৭১, কলিকাতা ১৮০৩।

আবা-ইশ মাফিল—দিল্লীর হিন্দু রাজস্ববর্গের ইতিহাস; শেব আলি কর্তৃক পাবসী গ্রন্থ হইতে সম্বলিত; পৃঃ ৩১২১, কলিকাতা ১৮০৮।

বাব ও বহাব—লুই ফার্দিন্যান্ড স্মিথ অনূদিত, পৃঃ ২৪৮, কলিকাতা ১৮১৩।

বোতাশ পটিশ—ত্রুজ ভাষা হইতে অনূদিত; অনুবাদক মজহর আলি খাঁ ও লালু লাল। পৃঃ ১৭১, কলিকাতা ১৮০৫।

গঞ্জ-ই-গোয়াবি—মিব আম্মান কর্তৃক পারসী অথলাখ-ই মুহসিনিব অনুবাদ, কলিকাতা, ১৮০৫।

গুল-ই-বকাওরালি—অজ নাম মকহব-ই-ইসক; নিতালচাঁদ লাহোবী কর্তৃক পাবসী ইজ্জত-আলাব অনুবাদ; পৃঃ ৭২২, কলিকাতা ১৮০৪।

ইথোয়ান-আল-মাফা—মৌলভী ইকবাম আলি কর্তৃক আববী হইতে অনূদিত; পৃঃ ২৯৯, কলিকাতা ১৮১১।

ল-ই-ইফ-ই-হিন্দা—হাশিমাবাদক গল্প-সংগ্রহ, পাবসী ও নাগরী অক্ষরে; গ্রন্থকাব—লালু লাল; পৃঃ ১২৪, ১৫৮, ৮৬; কলিকাতা ১৮১০।

নসব-ই-বেনজব—মিতব গুল-বয়ানব গল্প সংস্করণ; লেখক মিব বাহাভব আলি। গিলক্রাইষ্ট কর্তৃক ইংরেজী ভূমিকা সহ সম্পাদিত; পৃঃ ৬১৬৯, কলিকাতা ১৮০৩।

তোতা-কহান্নি—তোতা উপাখ্যান; হায়দাব বজ কর্তৃক পাবসী ভূতী-নামা হইতে অনূদিত; পৃঃ ১৬৮, কলিকাতা ১৮০৪।

সবফ-ই-উর্দু—আমানত আল্লা, পৃঃ ১০১, কলিকাতা ১৮১০।

সুস্তাখাবাং—হিন্দী; আক্ষরিক অনুবাদ, কোন কোন অংশে ব্যাকরণ-সম্মত বিশ্লেষণ সহ; গ্রন্থকাব—জন সেক্সপীয়াব, ২ খণ্ড, লণ্ডন ১৮১৭-১৮।

ফোট উইলিয়াম কলেজ ভাবতব অজ্ঞাত প্রধান প্রাদেশিক ভাষায় মত হিন্দী ভাষার অনুশীলনে উৎসাহ দেয়, ভাষাটির শব্দ-বিজ্ঞা সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি কবে, উহার ব্যাকরণ ও অভিধানের ব্যবস্থা কবে এবং পাঠক-সমাজও গড়িয়া তুলে। হিন্দী গল্প-সাহিত্যে কলেজের দান সন্দাপোষা গুরুত্বপূর্ণ। গ্রিয়ারসন তাঁহার “মডার্ন ভার্ণাকুলাব লিটারেচার অফ হিন্দুস্তান” গ্রন্থে ১৩০০-১৮৫৭ সালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“ইউরোপীয়দের নিকট হিন্দী নামে পরিচিত আশ্চর্যজনক মিশ্র ভাষাটির সৃষ্টি হয় ঐ সময়; তাঁহারাই উহা আবিষ্কার করেন।”

১৮০৩ সালে গিলক্রাইষ্টের তত্ত্বাবধানে লালুজী লাল আকবরের সভাসদগণের মধ্যে প্রচলিত মিশ্র উর্দুভাষার প্রেমসাগর নামক পুস্তকখানি লেখেন। তাঁহার পুস্তকের বিশেষত্ব, তিনি আববী ও পাবসী ভাষা হইতে উৎপন্ন বিশেষ্য পদের পরিবর্তে কেবল ভাবভীষ শব্দ ব্যবহার করেন। হিন্দী ভাষা উত্তর-ভাবতের সর্বত্র গল্প-সাহিত্যের মাধ্যম হইয়া উঠে, কিন্তু উহা কোথাও চলিত ভাষা না থাকায় গল্প-সাহিত্যে সাফল্যের সতিত ব্যবহৃত হয় নাই।

লালুজী লাল গুজরাটের অধিবাসী। তাঁহার পরিবারবর্গ আগ্রা

এস কবেন। তিনি জীবিকার্জনের জন্ত মুর্শিদাবাদে আসেন। তিনি সেখানে নবাবের দরবারে ৭ বৎসর ছিলেন। তিনি কিছু দিন মহাবাজ রামকৃষ্ণের নিকটও ছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে গিলক্রাইষ্টের দৃষ্টিতে পড়েন। ফোট উইলিয়াম কলেজে ২৪ বৎসর চাকরীর পর ১৮৮১ সন্থতে তিনি অবসর লন। তিনি প্রায় এক ডজন পুস্তক লিখেন:—সিংহাসন বৃত্তিসি, শকুন্তলা, প্রেমসংগর, ভাব কায়দা (বাকবণ), সভা-বিলাস, বাঙ্গলাতি (ব্রজভাষার), বেতাল পচিশি (উর্দু), মাধব বিলাস (গজ ও পংখ) প্রভৃতি। তিনি বিজাবীলালের সং-সাইএব একখানি ভাষ্যও লিখেন। তাহার নাম লাল-চন্দ্রিকা। বাণবঙ্গীর বাবু শ্যামসুন্দর দাস তাঁহাকে আধুনিক হিন্দী গজ-সাহিত্যিকগণের অগ্রদূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সদল মিশ্র ও সৈয়দ ইনসাউল্লা খাঁও তাঁহার ছাত্র এই সম্মানেব অধিকারী। এই শ্রেণীকৃত ব্যক্তিরও ফোট কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন।

লালুজী তাঁহার প্রেমসংগরের ভূমিকার গিলক্রাইষ্ট ও ডাঃ উইলিয়াম হাণ্টারের প্রশংসা করেন। হাণ্টার তাঁহাকে কাঁচাব কাছে সাহায্য করেন। সদল মিশ্র আবার অদিবাসী; তিনি কাঁচাব চন্দ্রাবতী বা নটিকেতোপাখানের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি বাম-চরিত-মানস সম্পাদন করেন। ২৪২৫ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন ও ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ফোট উইলিয়াম কলেজটি সমরোপযোগী না থাকায় যথাসময়ে হুলিয়া দেওয়া হয়। কলেজটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কংগ্রেসীদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইলেও উহা ভাবহেব আধুনিক ভাষাগুলির উন্নতিতে ব্যবহৃত ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করে। অন্যান্য অনেক ভাবহীস ভাষার মত হিন্দী কলেজটিব নিকট বিশেষ ভাবে স্থা। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসে গিলক্রাইষ্ট, হাণ্টার, লালুজী লাল প্রভৃতির নাম কৃতজ্ঞতার সহিত নিষ্পিদ্ধ থাকিবে।

## উলকী

উলকী সময় বিশেষে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ও অজাবদি ধর্মিক দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে সভ্যতা পরিবর্তিত হইয়াছে তৎসমনস্তে প্রধান নগরীতে উলকীর প্রথা পায় উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু এই সকল দেশেও গ্রাম্য পরিষদজীয়া লোক সকলের মধ্যে এখনও তাহা চলিত আছে। এই উলকীর উৎপত্তির কাব্য সম্ভবিত কি হইতে পারে তাহা গ্রাম্যায় নিম্নে লিখিত হইছে।

মধ্য যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল তৎকালে শিল্পবিজ্ঞা ও মানি কালের মত পরিবর্তিত প্রাপ্ত হয় নাট। তখন লোক জীবন গ্রাহ্য করিত; লগা, পর, শাখাদি দ্বারা নিষ্পিত কুটিব এস করিত, বন্ধু পুত্রপুত্র প্রভৃতিতেই বসনের কার্য সম্পন্ন করিত এবং তাহাদিগের অন্যান্য প্রসোজন সমস্তও ইত্যাদি প্রকারে লব্ধ হইত। এই অবস্থা লোক যতক্ষণ গ্রাহ্যাদির দ্বারা যত্নে নিযুক্ত থাকিত ততক্ষণ তাহাদিগের মনও তৎকালে লিপ্ত থাকিত ও তৎকালে সময় অতিবাহিত করাও তাহাদিগের পক্ষে কষ্টকর হইত না। কিন্তু অপর বসনাদির অভাব পূরণ হইলে পর পরিশিষ্ট সময় তাহাদিগের স্বল্পে ভাব স্বরূপ হইত সুতরাং সেই সময়ে কোনকপ না কোনকপ কায়ে নিযুক্ত থাকিব জন্য লোক চিন্তিত: ভ্রমণ, নানা বস্ত্র দর্শন ও কৌড়াদি করিতে বাধ্য হইত। এইকালে নানা লোক—নানা কায়েব দ্বারা চিত্তবিনোদন ও সময়োতিপাত করিত এবং সেই কৌড়াইহেই শিল্পবিজ্ঞার উদ্ভব হইত। অবকাশ কালে চিত্তবিনোদ্য কেহ কেহ পুষ্পচয়ন করিয়া দ্বারা অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিত এবং তদর্শনে অপবেও একপ দ্বারা নিম্মাণ ও পবিমান করিলে ক্রমশ: সকলেই তাহা শোভা সম্পাদক বোধে ব্যবহায়াবস্ত্র করিয়াছিল। এইরূপে যে পুষ্প, ফল, গা, পক্ষীর পালক প্রভৃতি দ্রব্যব ভূষণাদির নিম্মাণ ও চন্দন ও মৌরিক পত্র-রচনাদির আবস্ত হয় তাহার সম্বন্ধ নাই। অজাবদি দ্রব্যও অসভ্য জাতীয়েরা উক্ত রূপ ভূষণাদি বহু আদরে পবে তাহাবই শোভার মোহিত হয়। পরে পুষ্পমণ্ডনাদি অল্প কালে নষ্ট হয় দেখিয়াই অন্যরূপ মণ্ডন নির্মাণের উপায় উদ্ভাবনে

লোকেব যত্ন হইল এবং সেই বস্ত্রেই উলকীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সভ্যতার উন্নতির সহিত উলকীর ক্রমশ: লোপ ও তাহার স্থানে মণিবস্ত্রাদি নিষ্পিত অলঙ্কারাদির ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তদনুসারে অসভ্য দেশ সকলেই উহা প্রাচুর্য দেখা যায়।

আমাদিগের দেশে উলকী প্রচলিত এবং যদিও এক্ষণে বাঙ্গলাট কলিকাতার নবায় কামিনীগণের দৃষ্টিতে তাহা দেখা যায় না তথাপি পল্লিগ্রামের অনেক উলকী পাবেন। এইরূপ ইন্দো ফান্স ইটালী প্রভৃতি সকল দেশেই প্রধান নগরাদিতে ইহা ব্যবহার নাই কিন্তু এখনও গ্রাম্য লোকেরা সর্দার ও যথেষ্ট পরিমাণে পাবেন। কোন ইউরোপীয় পোতাশ্রয় সামান্য মৈনিকের হস্তাদি দেখিলেই একখান যথার্থতা বুঝা যায়। আমাদিগের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদের (বিশেষত: সামান্যাবস্থার) কামিনীগণের বাহ, বক্ষস্থল, ললাট, চিবুকাদি স্থলে নানাকর উলকীর পত্র-লেখা দেখা যায়। এই সকল পত্র-লেখা করবারি বাল্যকালে দেহেই ইচ্ছিত স্থানে ও ইচ্ছিতরূপে ক্ষেত্রবর্গের বসেব সহিত অগাধ বস্ত্র মলাইয়া একপ্রকার চক্ষুর্গণ বস প্রস্তুত করিয়া তাহা সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রবেশ করান হয়। প্রথমত কিছু বেদনা ও যন্ত্রণা হয়, পরে যখন দেহ পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হয় তখন এই সকল বিদ্ধ স্থানে ক্রমশ: পত্র-লেখা সকল উত্তমরূপে প্রস্ফুট দেখা যায়। দক্ষিণ মাগধস্থ দ্বীপাবলিতে উলকীর প্রথা বহু প্রচলিত ও তথায় অধি নিষ্পিত সূচিকা দ্বারা দেহে ছিদ্র করিয়া একপ্রকার বদান্ননির্জারগেব মধি তত্ত্বরণে প্রবিষ্ট করা হয়। পূর্ণোক্ত দ্বীপ সকলে উলকী গ্রন্থ অধিক প্রচলিত যে তথায় উলকী পাবেন একটি ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের উলকী পবিত্রে ইচ্ছা হয় তাহাব তৎকাল্যেব ব্যবসায়কে ডাকিয়া অতিপ্রায় মত তাহা পরে। কিন্তু গ্রন্থিক পত্রলেখা করা সকলের ঘটে না, যেহেতু উলকীদাতাগণ শ্রমালুবাঈক পুঙ্খাব লগ স্তবায় যথেষ্ট বৈভব না থাকিলে সর্দারে পত্রলেখা অসম্ভব। এই জন্ত প্রধান বা দলপতিগণ সর্দারবাবে উলকী করিয়া তৎকালকে উত্তম মাহুর ও অগাধ জব্য পুঙ্খাব দেন।



# হোবান-পাণ্ডা

অ, আ, ই

উত্তর হয়ে গেছে আবও কয়েকটা দিন।

ফুলের পাণ্ডি ডাওয়া উড়ছে প্রজাপতির মত।

উত্তরে বাতাসে শাখা থেকে ঝবেছে বর্ষার ভেজা ফুল। কত অজস্র ফুল। বড়বেশ বিবাহের গেয়াল-খুশীর ফুটি, কত বিচিত্র বও! কখন কুঁড়ি ছিল, কখন আবার কেউ জানলে না হ'ল ফুটন্ত, ছড়ালো স্বপ্নক, বিকিরে দিলে মধু। দেখতে না দেখতে কখন ফুরালো যে আবু, পাখাত পমিয়ে বাবে বাবে মিশে গেল ধূলায়। মাছের আঁচা আঁচায় যেন পুন ভেঙ্গে জাগলো; ভেঙ্গে বইলো হাওয়ায় ছলতে ছলতে। বাতের কত কুঁড়ি ভোবের ফুল হয়ে হাসলো পদস্পর্শে; কণ আঁচ বড়ের ঢালি দিলে উগ্রাচ ক'বে দিনের পব দিন। তাব পর হলো কাজে হাওয়াব অশুভ সময়। কনুকে ঠাণ্ডা হাওয়া? হলো অবিশাস্ত বর্ষণ?

প্রজাপতির মত বাতাসে উড়লো বটান ফুলের ছিন্ন দল।

শীত যখন বিবাহের নেয়, বসন্ত যখন আসে—সঙ্গে আনে পুষ্প-শোভা, দাবিগ্রাক বাঁড়িয়ে দেয় ফুলের বও। বাসন্তিক ফুল—যেন প্রেমের মত। ফুলের মত প্রেম? অনেক ফুলে আছে যেমন মধু, কত ফুলে আছে বিব। যেন মিলন আর বিবহ। ঋতু আর তপের মত। আসে আর চলে যায়; যায় আর আসে।

একটি একটি পাণ্ডি যেন একেকটি দিন।

পাখার কুঞ্জেব সঙ্গে, ফুল প্রফুটিত হয়, দিন চক্ষু মেলে। পাখার কুঞ্জেব সঙ্গেই আবার মূর্তিত করে চক্ষু। ফুলও বারে যায়। প্রেমের মিষ্টি স্বপ্নবাণী মধুময় দিন। ছুঁয়েব মেঘাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর, বিস্ময় দিন। হুঁদিন। যেমন মিলন আর বিবহ।

ফুলের উড়ন্ত ছিন্ন দলেব মত দিনের পরিক্রমা।

উত্তর হয়ে গেছে আবও কয়েকটা দিন। অলস-জনের বৈচিত্র্য-হীন দিন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মত বধ্য পূর্ণা তথা পর একেকটি দিন। তবে, হুজুবেব উন্নতি হয়েছে কয়েক বিষয়ে। নাবাসকতের টাইম ওভার হয়ে বাওয়াতে সবকার হুজুবেক জমিদারী মালিকানা হাওঁভাবে ক'বেছেন। হুজুব স্বয়ং এখন মনার্ক। বাজর করবেন, অস্ত্র-চালনা না শিখলে চলে না। হুজুব আগমাবীতে সম্ভ্রিত বন্ধু আর বিভলভাব বেব কবিয়ে লাগতে শিখেছেন। ক'দিন এ উপলক্ষে শব্দের আনাচে-কানাচে সেয়ে জলা আর বাদায় উদ্ভস্ত বক মেয়ে এসেছেন। কাদাখোঁচা হত্যা ক'বে এসেছেন। আব কাপ্তেনীয যত বকম কায়রা-কাহন থাকে তাদের রশ্ত ক'বে ফেলেছেন। আক্রামদ্দিন নামে বাপ-পিতামোব আমলের পরিচিত দাঈকে ডাকতে পাঠিয়ে কয়েক হাজার টাকার পোষাক

হুজুব আব দিকৃষ্টি না ক'বে ঐ ঐ পোষাকেব মাপ এবং অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন। বলতে লক্ষ্য হয়, বিবি গজবজানকেও কয়েকটা দামী-দামী পোষাক লুকিয়ে কবিয়ে দিয়েছেন। বেনাবমী আব কিংগাবের জামা পেয়ে গজবজান যেন বর্তে গেছে।

অভাগা জননী দিনেব পর দিন ছেলেব কীর্তিকাহিনী শুনে কেঁদেছেন আর দিন গুণেছেন। ছেলেব গেয়াল নেই। দিন গুণেছেন তিনি—বিয়েব দাব্য দিন। বিয়ে দিয়েই কুমুদিনী চলে যাবেন—কোথায় যাবেন কেউ জানে না। মুখ ফুটে বলেননি। মায়ে ছেলেতে বাতে আবার পুনর্মিলন হয় তেমনলিনী তার চেষ্টার ক্রটি করেননি, কিন্তু কুমুদিনী যেন পাষাণ, কিছুতেই ঠাকুরঝি কথায় সাব পেননি। গৃহ-দেবতাব অপমানে ছুঁখে মিয়মাণ হয়ে জপ-আফ্রিক নিয়ে থাকেন। সময়ে-অসময়ে কাঁদেন। কিছু মুখে তোলেন না। আহাব-নিম্না ত্যাগ ক'বেছেন বললে হয়।

দেখতে দেখতে চ'লে গেল আবও কয়েকটা দিন।

ক্রমে বিবাহের দিন ঘনিষে এলো। বাজেরখরীব স্বপ্ন সার্থক হওয়াব শুভক্ষণ। তৈ-তৈ বৈ-বৈ শব্দে মুখব হয়ে উঠলো বিয়ে-বাড়ী। খাদ্ধীয়-স্বজনবা এলো; মহল থেকে হলো আমলা আর গমস্তা; গুড়শিবা এলো, যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হোগলার ঢালা উঠলো; এগানে-সেগানে ঝুললো হরেক রঙের লঠন; উঠানগুলো শামিয়ানাব আববণে প্রায়ক্ষকাং হয়ে গেল। গোলাপী কাপড়ের তকমাধবা ও উর্দীপবা ঠাবেদাব, ভূত্যা, পাইক, বককনাজ আর সিপাইবা যে যাব এলাকায় মোতায়েন হ'ল। বিয়ে-বাড়ী যেন গমগম করতে লাগলো। মানাই বাজলো।

সিন্দুক থেকে নিজের গয়না বেব করতে করতে তেমনলিনী বললেন,—তোমাব ছেলেব বে, তুমি থাকবে না? ভাঁড়ার আগলায়ে কে? লোকে কি বলবে? বৌকে আশীর্বাদ করবে না?

কুমুদিনী কাতব কর্ণধব। চোখে জলের বেখা। বিবব মুখাকৃতি। বললেন,—তুমি দেখবে ঠাকুরঝি। তুমি বৌ বণ কবব। তুমি যজ্ঞ তুলবে। লোকজন আছে, তুমি যেমন বলবে তেমন হবে। বৌকে আমি প্রথম সেদিন দেখছি সেদিনই আশীর্বাদ ক'বেছি। আমাকে এসে বলবে যে বৌ যবে এসেছে, শুনে আমি তীর্থে বেরিয়ে পড়বো। তাব পর ছেলে যা খুশী করুক।

কথাব শেষে কুমুদিনী ছ'চোপ বেয়ে অঝোরে জলের পা নামলো। অসহ্য কষ্টেব ব্যথাতুব অশ্রুপাত। কুমুদিনী চক্ষু মুন্নি ক'বে বসে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে আবার বললেন,—দেখো ঠাকুরঝি, দেখা-শুনাব যেন ক্রটি না হয়। কেউ যেন অধু

বস। বস! সে বৌঠান কাশীতে বয়েছে। ভালস-ভালস  
কান্দো মিটেয়ে দিয়ে এসে ভাট। বড় বাড়িতে গাড়া পাঠাবে,  
কেউ আসে।

হেমলিনী মিন্দুক থেকে গয়না বেব কবড়িলেন। বিসে-বাড়ীতে  
ছেন, গা মেলানো গয়না পবড়েন তাই। বিছে, ছাব, মপচেন,  
বু, বাউটি, গিনি-গাথা। বললেন,—জানি না বৌঠান, কেমন  
কি করব!

কুন্দিনী বললেন,—কাশীবৌকে আসতে বলে পাঠাবে। সে  
খালে তোমার অনেক সুবিধে হবে। তদিনেব যজ্ঞ, ঠিক মিটে  
লাব ঠাকুরেব দয়ায়।

তদিনেব অসুখ। প্রথম দিনে গাভ হবিল, ববভগমন।  
বদিনে বৌ-ববণ ও লৌহিভোজন। বাত্রি থাকতে হেমলিনী  
বসে খাড়া কবলেন বৌঠানের আসেব ধুলো মাখায় নিয়ে।  
ন এসে পৌছলেন তখন সানাইয়ের বাজনায ভোবেব বাসিণী  
বিলে। লোকচেনেব অতাব নেই, ব্যবস্থা ও বন্দবস্ত হয়েই  
বড় সব কিছুব। সবুও কোথায় যেন কাব অতাব বোব  
বহ। গাব গুহ, সেই গুহকবী। গাব উপস্থিতি শতক  
নাব সমতুল্য, বহুেব মত কটিন সেই কুন্দিনীকে দেখতে  
বহা যাচ্ছে না? হত আনন্দেব মারেও যেন কোথায়  
বাব বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু কাবও সাঠস হচ্ছে না যে,  
বৌঠানকে নিয়ে আসে, হাজিব কবে এখানে।

গোমাগা গোমাকের বেতনভকবা মেদিকে তাকাও মেদিকে।  
গাথাও অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য ও দলভূদেব মধ্যে বৌটি পাকিয়ে  
বিলে—কপোব ঢাকা, ছত্র, উত্তরীষ ও বহু বিতরণ করা হচ্ছে।  
ব কবেবা জানলা খাব দবজায় ভেলভেটের পর্দা পাওয়াছে।  
ব কবোলেট বৌঠানেব যজ্ঞ, ভিয়েনে খাজ, গজা, পাঙ্কয়া  
ব জিলাগীবা ভোসেব হচ্ছে। তাদের গঞ্জে মাতোয়ারা হয়ে  
বিলে হাওয়া। মলবেব ঘবে-ঘবে ফবাসে কপোব প্রতিবদান,  
বোপপাশ, পানের ডিবে মাজানো হয়েছে। অন্ধবে পড়শিবা  
বিলে বসেছেন—কুটনো কোঁচি হচ্ছে।

কমণঃ বেনা অতিক্রান্ত হচ্ছে। উত্তরোত্তর ব্যস্ততাও বদ্ধিত  
হবে যেন। গারে হলুদেব ব্যবস্থা হচ্ছে। ববণডাল মাজানো  
হবে, কোথাও ঢাল খাব ডাল বাচা হচ্ছে। কুলোব শব্দ হচ্ছে  
ব মপাং। বাগ্নাববে নাড়ু, তৈবীব ছোপাড় কবছেন হেমলিনী।  
বিশী ও অজাণ এতাবা বোপান দিচ্ছে। পড়শি মহিলাদেব  
বাব ফিসফিস গুঞ্জন চলেছে, কুন্দিনীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে  
ব কেন? তাঁদেব সকলেব চোখ-মুখে জিজ্ঞাস্ব ঐশ্বর্য্য।  
ব নলিনী এসে বড়-বাড়ীতে গুড়ী পাঠিয়েছিলেন বৌঠানেব কথা মত  
ব বৌদেব আনতে। লোক ফিবে এসে বললে,—কেউ আসে  
ব যেন না।

বিশ্বয়ে পানিক চূপচাপ চেয়ে থাকেন হেমলিনী। বশিকী  
ব বহা, শুভকাজে না আসা এমন কিছু বিশ্বয়কর নয়। সবুও  
বলেন,—কেন? বৌঠান তো তাঁদেব কাছে দোষ কবেনি কিছু!

লোক তখন বললে,—না না, দোষেব কিছু কথা হচ্ছে না।  
ব শড়ীতে অসুখ। এখন যায় তখন যায় অবস্থা।

এতখণে সত্বিকাব বিখিত হ'লেন হেমলিনী। বললেন,—  
কাব আবার অসুখ হ'ল!

লোক তখন বললে,—বহুবাব অসুখ। গ্যাস দেওয়া  
হচ্ছে। লোক কথা বলাত বসতে দেখলে কেউ শুনেছে কি  
না। বললে,—অত্যাচারে অত্যাচারে বহুবাব শবীবাব কিছু  
কি আবে বেগেছেন! মত গেয়ে গেয়ে গ্যাঙ্কিনে তাব ফল  
ভোগ কবছেন। আগে কেউ যাওয়াব উপকন হয়ছে। পেটের  
ভেতর যা মগ গেছে। তদিনে চ'বাবির জানহাব হয়ে আছেন।  
গ্যাস চলেছে।

কথায়লো অনে হেমলিনীাব দুখানা দেখায় যেন ভয়াব্র।  
কেন উত্তর দেন না। চন্দ্রাব কাছ প্রার্থনা কবেন, যেন  
শুভকাজে স্থির না হয়। পার্শ্ববন্দ, দ্বিত্ব পটে ভেসে ওঠে  
পর্বেন্দায়েব অসমুখাবিতাব পরিচয়। মত এত মেয়েমানুষেব  
কাজে কত মাবা যে উল্লেখ দিচ্ছেন। সব থেকে গয়না বেব  
কবে নিসেছেন, ক'বা তামুক পয়স্ব বিবী কবে ফেলছেন।  
নোমাসেব, মত ও মেয়েমানুষ ব্যবীত কথা কিছুকে জানলেন না।  
যমন কি পবম কপত্রা আ থাকতেও ফিবে তাকালেন না।  
হুগেব খাস ফেললেন হেমলিনী।

—হেম! হেম গেলে কোথায়?

নাম ধ'বে ডাক অনে হেমলিনী বাগ্নাব-থকে বেগিয়ে গলেন।  
দেখলেন যিনি ডাকছেন, নাম ধ'বে ডাকবাব অবিকাব তাব আছে।  
বললেন,—ডাকছেন?

—গ্যা, এ কি বকম কথা?

—কেন, কি হবেছে? ভয়ে ভয়ে শুবোলেম হেমলিনী।

—ভেদেখবেব ক'বর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁদেব প্রাপ্য কেন পাবেন  
না? মুড়াপোড়া বামনবা পাচ্ছে, কাঁবা কি দোষ কবলেন?

বস্তাব প্রশ্ন জটিল। হেমলিনী কি উত্তর দেবেন ভেবে  
স্থির কবতে পারেন না। বললেন,—আমি কি বলব? যা ব'বলেন  
তাই হ'বে।

প্রশ্নকতা লালমোহন। সমাসী-মালু। যেন কিঞ্চিৎ কুপিত  
হয়েছেন। বললেন,—তোমানেব মাত পুত্র থেকে কাঁবা পাচ্ছেন।  
আব এখন গমস্তাদের আমল হয়ে কাঁবা—

কথা শেষ হওয়াব আগেই কথা বলেন হেমলিনী।—  
আমাব নাম নিয়ে বলুন কাজ্যবতে। গমস্তাব হওয়া জানেন না।

লালমোহন বললেন,—পত্নেব বিলিণ কাজ পর্বেছিল মা আমাব  
ওপব। মকসমেক সাথে তিনশো পত্নেব বিলি ক'বেছি কদিনে।  
তোমার বেহালা থেকে বেলেগেছে পয়স্ব।

লালমোহন ব্রাহ্মণদেব ক্রিয়াক্ষেপে নায়েব কাট ববেন।  
আমন্ত্রণ-লিপি বিতরণ কবেন। হেমলিনীাব সম্মতি পেয়ে গুণী  
হলেন কি না ব'বলেন না হেমলিনী।

লালমোহন বাক্যব্যয় না কবে সদবেব লিকে অগ্রসর হ'লেন।  
অন্ধবেব শেষ ববাব গিয়ে বললেন,—গায়ে হলুদেব সময় যেন  
উত্তীর্ণ হ'য়ে না যায়। আঁচী ক' মিনিট পয়স্ব তোমার টাইম।  
এখন বেজেছে প্রায় সাঁটটা।

বাজেশ্বরী তখন জেগেছে ঘন থেকে অনেকদূর। কাক ডাকাব শব্দে।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে তার স্বপ্ন সার্থক হওয়াই শুভদিনের। নৃকেব ভৈরবী ভ্রমবে উঠছে থেকে-থেকে। এত সুখের মাঝেও অসহ্য কষ্ট হচ্ছে যেন। তত কবছে বুকটা। ঠাণ্ডা'র জ্বালা আর বাড়ান আর আর সকলের জ্বালা চকল হয়ে উঠছে অগ্নে-অগ্নে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বাদেব কাছে লালিত-পালিত হয়েছে গরম আদেব, তা'দেব হেঁচ হেঁচ হতে হবে—বাহা'র পোয়ালি'র আর তা'দেব দেখতে পাওয়া যাবে না! দেখানে যাচ্ছে, হোক না সেখানে'র স্বপ্ন, হোক না অশেষ সুখের সীমা-অগ্নি, তবুও জন্মাবি বাদেব অকৃত্রিম স্নেহছায়ায় এতগুলো দেন কাটিয়েছে, কয়েক দফার মধ্যে তা'দেব সঙ্গে যখন সম্পর্ক ছুঁতে ফেলতে হবে, তা'দেবও যেন হাঁট হাঁট করে আসে বাজেস্বরী'র। অতীতে কখন চোখে'র মেয়ে'র মন'র সঙ্গে তা'দেব বিদ্যুৎ পড়ে বেঁটে নেবে ফেনে তা'র আঁচলে চোখ মুড়ে নেয়। নৃকেব ভৈরবী ভাত করে বিসেক-দাঁড় বন জোলা'র হা'র সানাইয়ের শব্দে। কেমন গেন ভয় ভয় করে। চিপ-চিপ করে বন'র। এ শব্দ হয়ে আসে শবীরা'। শুনে পড়ে বাজেস্বরী।

—বাসো, ওলো বাসো!

কেথা থেকে এসে আসেন ঠাণ্ডা। বাকের'র ঘর'কেব কাঁপতে কাঁপতে। দরজা দাঁবে নিজে'র নেত্রে'র চান সামলে ডাকেন,— ওলো বাসো, উঁপি না মনে ক'বেছিল। গায়ে হুঁদেব • হু' এসে পড়লো ব'লে। এখনও শুনে খান'বি বেজাকেরী।

কথা বলতে বলতে গায়ে যান ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা এসে বাজেস্বরী। ঠাণ্ডা তার হাত ধ'বে হোসেন। হুঁতে জা'র ধ'বে কেন কি জানি মুখখানা তার দেখেন কতক্ষণ। দেখতে দেখতে অর্ধ যান যেন। প্রব'বল চোখ বাজেস্বরী'র, স্বপ্নে মাখানো। ব'সি ডাবেব মত মুখ। চন্দনের মত ব'হু। কুঞ্চিত কেশের রাশি'র চেঁচি'র নেমেছে পিঠে। মোমের মত গঠন। দেখতে দেখতে বৃদ্ধা হ'য়ে ব'লে ফেললেন শিশুর মত। ঠোঁট হুঁতো তাঁব কাঁপতে লাগলো। হুঁজ দেখা'রো কাঁপছে সদাঞ্চল। বাজেস্বরীও জড়িয়ে ধরলে পিতামহীকে। তা'বও চোখে বৃষ্টি বা নামলো অশ্রুব'গা। বিচ্ছেদের অন্তর্দীপে ব'দিলে হুঁজনে—এক জন ফুটন্ত ও অনাশ্রাত ফুলের মত ভব'র কুমা'রী, আর অগ্ন জন মৃত্যুর আশ্রান'ব জ্বালা প্রস্তুত লোচ'র বৃদ্ধা!

—বাসো!

—ঠাণ্ডা!

—হুঁ আমাকে ফেল চ'লে যাবি?

—না, তোমাকেও নিয়ে যাবো। তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। হেসে ফেললেন ঠাণ্ডা নাভীর কথা শুনে। কাঁদতে কাঁদতে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন,—বে হচ্ছে তোব, আমি যেতে যাবো কেন?

চুপচাপ চেয়ে থাকে বাজেস্বরী। ঘুমন্তা'র চোখে। এ কথা'র উত্তর খুঁজে পায় না। তবুও বলে,—ঠা, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে। থাকবে আমার কাছে। থু—ব যত্ন কব'বো তোমাকে।

—আর এ ঘর-দোর কে দেখবে তোব? বাজো, যদি'ন মা

মরি, এ ভিটের থাকতে দিবি তো? কথা বলতে বলতে বা'র কাঁপে ওঠে বৃদ্ধার। বলেন,—এ ঘর-দোর যে তোব। তোব'র দে বে গেছে তোকে।

বাজেশ্বরী বলে,—এবার আমি বাগ কব'বো ঠাণ্ডা। যা তু' আসছে বলছো?

আবার তেমে ফেললেন ঠাণ্ডা। দম্ভহীন মাড়ি বেব ক'র হামসেন হুং-কা'র হাসি। বললেন,—আব ভাই দেবী কব'বো না মুখ-হাত মুখে যা। তবু এসে পড়লো বলে। যা ভাই বি' আমাব।

স্বপ্ন আর দুঃখের মিশ্রিত অনুভূতিতে বুকটা আবার চিপ-চিপ করে উঠলো। বাজেস্বরী খব থেকে বেবি'য়ে গেল অশ্রু পদক্ষেপে'র গেল মুখে-হাতে তল দিতে। পবিব বসনে নিজে'র পবিত্র কব'তে। লাল-পাড কোবা শাড়ী পব'তে। কপাব কাজল-সত্তা গোঁপা'র হুঁততে।

ঠাণ্ডা পাখাব মুঠ'ব মত দাঁড়িয়ে থাকেন সেখানে। দর'র বেগে অশ্রুপাত হয় তাঁব। আসন্ন বিয়োগ-ব্যথা'র হুংখে।

শহরে যেন তি-চি প'ড়ে গেছে। বাসুদেব ছেলের নিয়ে।

এ যুগে টাকা না থাকলে কেউ দাবেও টিনকে চায় না। বাদেব টাকা আছে তা'দের কাছে আর'ক লোক বিনয়'বনত ঠা'। তা'দের নাম কবে, তা'দের যশেব কাঁটন গায়, তা'দের সাক্ষাৎ ঈশ'র মনে ক'বে ইষ্টেব চায় পূজা করে। তুর্গীংসদেব ও ছেলের বিয়ে'র প্রতিযোগিতা চলে কে কত টাকা খবচ করতে পারে। বাসুদেব ছেলের বিয়েতেও জী ধব'বের টাকা'র ঠাট'ব ব্যবস্থা হয়েছে। সূত'র'র সূর্য্য পূর্ণিকাশে চলতে না চলতে বাস্তায় ভয়ানক লোক'র হ'তে লাগলো। ঢোল, ভেড়' ও ভেঁপু শব্দে তিষ্ঠানো দা'স হ'য়ে উঠলো। চুনোগলি'র ঈশ'রজী বাজনার পাড়া বেঁপে উঠলো। চুলী'র পেনো সুবা পেয়েছে, জ্ঞানগমি'র হানিয়ে বেতানো নাচ'ে লাগলো। ব'গ'সিসেব লোভে যে যত বকম ঢঙ ও কা'য়দা জা'র নেচে নেচে দেখাতে লাগলো।

ক্রমে দেখতে দেখতে শুভ মুহূর্ত্ত এলো।

জুড়িতে চেপে ভজু'র যাত্রা কবলেন। আত্মীয়-অন্ত'ব'র ও পুরোহিত চললেন। অল'বের হাতকাড়, পাঞ্জা ও সিঁড়ি বাস্তা'র হুঁপাশে চললো। পেছনে পেছনে গ্যাস-বাতি'র গেন। তক্তানি'র ওপ'ব মগে'ব নাচ ও ফি'বিস্টি'ব নাচ। লাল বনা'র খাস-গেলাশ ও কপো'র ডাঙিতে বেশ'মের পতাকা-ধরা ত'কমা'র মুটেরা চললো। সাজা সায়েব-তুক-সওয়াবেব পেছনে ঝাড় লঠনপা'রী'র। ব্যাণ্ড, ঢোল ও নাগ'বাব শব্দে, লোক'র হুলা'র অধ্যক্ষ'দের মিচিলেব চিৎকা'বে কলকাতা কাঁপতে লাগলো। বাস্ত'র হুঁবা'বি বাড়'ব জানলা ও বাবা'র লোকে প'বে গেল।

মা কুমুদিনী তখন হেমলিনী'র স্বস্তবালয়ে, তাঁদেব পূজাব ঘরে মুগ্ধিত চোখে বিড়-বিড় ক'বে প্রার্থনা করছেন। শুভকাজ গা'র ভালয় ভালয় মিটে যায়, কায়মনোবাক্যে ডাকছে—বলছেন কত কথা, আর হুঁচোখ থেকে অশ্রুপাত হচ্ছে তাঁ'র পুত্র এবং পুত্রবধূ'র মঙ্গল কামনা করছেন।

এত আনন্দ আর হাসির মাঝেও যেন দুঃখের ছায়া। যেন  
এই অভাব। মা চলে গেছেন ব'লে ছেলের পাবে আক্রোশ হচ্ছে  
কানও। কিন্তু হাসিমুখে বিয়ে মত দিয়েছে, বিয়ে হওয়াতে  
এত পবিত্রতন হয়ে যাবে, এটী কথা ভেবে কেউ আর মুগ ফুটে  
ক'বলছে না।

শাঁখ আর উলু-উলু। ছাননা-তলা আলোয় আলো।

—তাপ বাজো, ভাল ক'বে তাপ।

—তাকাও, চোখ তুলে তাকাও। লজ্জা ক'বে না। ছিঃ!  
পূর্বতল চোখ বাজেধবী। ভয়ে আর লজ্জায় জড়মড়। কত লোক  
এক আছে তাকে। এ অবস্থায় তাকাত পাবে কেউ, যাব বিয়ে  
হচ্ছে। বাজেধবী তবুও চোখ তোলে, কাজলপরা চোখ। তাকায়  
এক মুহূর্ত। কত ভয়ে আর লজ্জায়। শরীষটা কাঁপছে, ধড়াস-  
ধড়াসে কবছে বুকটা। ঠাট্টা আর তামাসা করছে কত কে।  
এক কাটিছে। হাসাসি হচ্ছে। লজ্জা কবে বাজেধবী। লাল  
চোখ পড়েছে। গয়না পড়েছে কত। মাথা থেকে পা পঙ্খস্থ।  
এই ভাবে যাচ্ছে দেহটা। স্বা-আচাৰ চলছে। এখনও আছে  
একটুকু বাত।

সেখানও যেমন এখানেও তেমন। এত উজোগ-আয়োজনের  
এত হাসির পবিত্রতন কৈ। যাবা এসেছে তাদের মুখে হাসিতে  
এত হাসি ককত। কানও মুখে হাসি, কাঁও চোখে কটাক্ষ।  
এখন বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কত মেয়ে স্বয়ংছে ঈশায়। এই ঠাগুমা  
এই ক্ষেত্রে নাচে বাজেধবী, যে কান্ডের তাব ফুলে। শৈশবে  
যাচ্ছে পিতামহী হাসি—লালি-পালিত হয়েছিল এই ঠাগুমা'র শৈশ-  
বে। আনন্দে কটী ছিল না, বিজ্ঞ পিতামহী'র বুকজবা  
এইসে পেলো বৈ? শুধু মুখে ভালবাসার মন্য আছে? তবুও  
এই সম্পত্তির অধিকারী বাজেধবী, তাবের মেয়ে ত'লেও কথা  
ক'বে।

পাতিবর্তা সেম কোথা দিয়ে।

পাপড়ি খসে গেল আবেকন। মেয়ে শব্দবালয়ে যাবে, হেঁচক  
এইসে পাতিবর্তা হয়ে যাবে বাগিচা বাজলো। বাজেধবী কান্ডে কান্ডে  
এইসে। সঙ্গে চললো বাজ-পাতিবর্তা। ঠাগুমা কান্ডে বুক  
ক'ছে, বাজোকে বুক জড়িয়ে। পবিত্রতন বুক বাজকববা  
এইসে দেখে বাজলো বাথা-ভবা বাগিচা। বাজেধবী চললো  
এইসে বাগিচা বাগিচা।

—সামাকে ফেল যাবি বাজো? কান্ডে কান্ডে বললেন  
ঠাগুমা। বললেন,—বকে ক'বে মাহুগ কবেছি, ছেড়ে থাকবো  
ক'বে? ঠাগুমা বললেন আব কান্ডে।

বাজেধবী উত্তর দেবে কোথা থেকে। ঠাগুমা বকে দুগ বেগে  
ক'ছে কুপিয়ে কুপিয়ে।

বাজেধবীর সঙ্গে চলে বাজ-পাতিবর্তা। এলোকেশী, পুবাণা কি, সে  
এইসে দেখেছে-ভনেছে শৈশব থেকে। তেসেছে থেলেছে হাসি  
ক'বে।

বধূকে যবে তুললেন হেমলিনী। কাঁকালে ক'বে। এতাব  
তুকতাক কবলে কত বকম। ভয়ে আর লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে  
বাজেধবী।

—তোব ভাগ্যি বটে বাজো।

কাছাকাছি এসে ফিস্ ফিস্ কবলে এলোকেশী। ফুর্তিতে গদগদ  
হয়ে। বললে,—যব-দৌব দেখে এলেম যবে-ফিবে। ঐশাখি  
ছড়ানো বয়েছে। কিন্তু, ছেলের মাকে দেখলেম না তো! তোব  
শাস্ত্রীকে তো দেখতে পাছি না!

ফালফাল তাকিয়ে থাকে বাজেধবী। জানলে তবে তো  
বলবে। এলোকেশী বললে,—শুধোলেম নোকজনদেব। বললে না  
কেউ। চুপ মেবে গেল।

বাজেধবী উত্তর কবে না। জানলে তবে তো বলবে, তাকে  
জানলে তবে তো।

—থামো তুমি এলোকেশী। কে কোথেকে ভনেবে! আছেন,  
যাবেন আবার কোথাগ!

বিবকুত বাজেধবী। কথাগুলো বলে চুপিচুপি। বলে,—  
পাথা ক'বে দেখি, গবম সাগছে।

আমিমানায় ঢাকা উড়োনগুলো। জমোন হয়ে আছে।  
হাওয়া লেশ নেই।

যবেব দেওয়ালে ছিল তাপ-পাথা। এলোকেশী তাওড়া কবে।  
বাজেধবী হাফ ছেড়ে বাঁচে। বলে,—তুমি গদা'র মত বা-তা কথা  
বল'না যাব-তাব সঙ্গে।

—না, না, আমাকে তুই বলবি বাজো! শেখাবি আদব-  
কায়দা? এলোকেশী'র কথায় বিজ্ঞতাব স্বর। বলে,—কিন্তু,  
ভাগ্যি বটে তোব!

—কতসঙ্গে মিলিবে বন'তো। বাজেধবী কথা বলে 'অসহিষ্ণু'  
হয়ে। বলে,—এত গয়না, খুলে দে এলো। ক'ব্ব হচ্ছে যে।  
বি'দছে গায়ে।

—তা ববলে হয়। বনে এলোকেশী।—মিটক 'হাথে কুস্তম-  
টিয়ে। কিলো না হুই। দেখেছে-দেখতে হয়ে যাবে। আমি পাথা  
ক'বছি।

কমদোয় আর লোভনের শাস্তবায় গনগন ক'বছে বাতী।  
মাঝে মাঝে ক'বিত্তেছন। কত অতিথি আসবে। কত মাত-গব্য  
পুণ্য হবে মহিমা। স্বাধীন-স্বজন, বাত কে কামবে। যজ্ঞিব  
কোথাও হচ্ছে। কনের বাতী থেকে ক'ব্ব এসে পড়লো বলে।  
কলশযাব তব্ব। কত সামগ্ৰী দেবে বাজেধবী ঠাগুমা। যব খালি  
ক'বে দেবে।

প্রজাপতি ধবি—

পুণোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। পুনককুত হয়। হেমকুণ্ডেব দেওয়ান  
জলে বাজেধবী চোখ। মি'দবেব পাশিতে কপাল পবিত্রতন হয়ে  
যায়। নাটমন্দিব পুণোহিতের মন্ত্রের শব্দে দুগর হয়ে ওঠে।  
বৈবাতিক কার্গা শেষ হ'তে বেলা হ'য়ে যায় কত।

এ আদাব কাব যব। কাককক ক'ব্বতক ক'বছে। পবিত্রপাটি  
মজ্জিত। পিশশাস্ত্রীর সঙ্গে চলে বাজেধবী। হেমলিনী বলেন,—

সহযোগিতা করতে তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই সম্পূর্ণরূপে তাঁদের হস্তে হস্ত করার মতো নির্ভরতা নেই বীরেশ্বরের। তিনি কখনও বা মিনতির হাত থেকে তুলি কেড়ে নিয়ে আঁকতে বসেন ফুলের মঞ্জরী, কখনও বা ডঙ্গীকে সরিয়ে দিয়ে উঠসে লাগতে শুরু করেন সবুজ রং এর ওয়াস্। ফলে পরিশ্রমের পরিমাপ বিভ্রান্ত হয়ে লঘু হওয়ার অবকাশ পায় না, পুঞ্জীভূত হয়ে কেবলি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ষ্টেজের বহির্দিশে যবনিকার দুই পার্শ্বে ঘন কৃষ্ণ মঞ্চমলের উপরে কোনারকের সুখ মন্দিরের রথচক্রের অনুকরণে রূপাশী জাঁরির ছুটি চক্রাচনার পরিকল্পনা বীরেশ্বরের। চক্র দুটির কেন্দ্র থেকে ছলিয়ে দেওয়া হবে তুয়ারশুল একজোড়া টাঁদমালা। নীচে থাকবে ছুটি আতপল্লববাহী পূর্ণকুম্ভ। শুভকর্মের চির-পরিচিত শাস্ত্রমন্ত্র ও মন্ত্রলিপি। সেই মঞ্চলবট দুটি আলিম্পনের ভঙ্গিতে সমগ্র সূচিত্রিত করাছিলো ডঙ্গী।

বীরেশ্বর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

“মিস দত্ত, আপনার হাতে কী? মঞ্চলবট? না, না, এ লাইনটা অত্যন্ত নয়। শাচ্ছা, দিন আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি।” বলে নিজের তুলি নিয়ে বসে পড়েছেন। দেখিয়ে দিতে বসলেও সেটা একেবারে শেষ না করে যে উঠবেন না সে কথা সবারই জানা আছে।

“ঘরমে টেলিফোন।” অর্থাৎ সুবালা। বীরেশ্বরের জ্ঞী।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হলেন। শঙ্কা অহেতুক নয়। কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন বেলা সাড়ে চারটায়। বলে এসেছিলেন, ফিরতে একটু রাত হতে পারে। আজ সন্ধ্যা ষট্টা বাজে প্রায় চব্বিশ ঘটটারও উপরে। এখনও বাড়ি যাওয়া হয়নি। নিজের অপরাধের গুরুত্ব বীরেশ্বর নিজের কাছেই সন্দেহ বোধ করলেন।

এটা অভূতপূর্ব নয়। ইতিপূর্বে আরও একাধিকবার অনুরূপ ঘটনার ইতিহাস আছে। বীরেশ্বরের শিল্পচাতুর্যে যতখানি মাত্রাবোধ অল্প কিছুতে ততখানি নয়। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবেরা অনুরোধ করে,

“খিয়েটারের নামে তোমার কী আর দিগ বিদিক

জ্ঞান থাকে না? এরকম নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ষ্টেজ সাজানো তো দেখিনি কখনও।”

বীরেশ্বর প্রতিবাদ করেন,

“না, না, নাওয়া-খাওয়া ছাড়বো কেন? এট তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এই উপবনের দৃশ্যটা হলোই, বাস্।”

তারপর কিছুটা যেন অপরাধের স্বরে যুহু করে বলেন,

“ভাই, দিনের পর দিন সর্বস্বরনাশিনীর লেবেল আর বনস্পতির ক্যালেন্ডার একে একে আদ্রুলে বাত হওয়ার দাখিল। সিনেমা, খিয়েটারের সেট ডিজাইন করার মধ্যে তবুও একটুখানি যেন হাঁফ ছাড়ার অবকাশ পাই। কিন্তু সিনেমায় তো নিজের ইচ্ছে মতো দৃশ্য পরিকল্পনার যো নেই। বেশির ভাগ মাড়োয়ারী মালিক, তাদের লক্ষ্য হলো কী করে সম্ভব ছবি তুলে বেশী পয়সা পাওয়া যায়। বলে, ‘বাবু, একঠো বাগিচা, একঠো রেল-টিশান্ ওর একঠো জমিদারের মর্যাদা হোগে খুব আচ্ছা ছবি চাইয়ে যায় পান্ডর, যেল হলো রান্। বেশী সেটে কুছ্ দরকার নাই।’ ছবি আঁকা একটু আধটু যা শিখেছিলাম, তার কিছুটা সদ্যবহার করার সন্ধ্যা পাই শুধু এই প্রতিজ্ঞা সম্ভাদায়ের মৌশল অভিনয়ে। নিজের কল্পনাকে তবুও খানিকটা সার্থক করতে পারি।”

টেলিফোনের দিকে যেতে যেতে আপন মনে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আপন বিবেক গ্রানিমুক্ত করার প্রয়াসী হলেন বীরেশ্বর। কাল বাড়ি থেকে বেরবার সময় তিনি কিছু ভাবেননি যে, রাত্রিতে বাড়ি ফিরতেই পারবেন না। কী করে ভাববেন? প্রথম অঙ্ক সমুদ্র-সৈকতের দৃশ্যপটটি যে হঠাৎ কর্মকর্তাদের অনবধানতায় ছিঁড়ে নষ্ট হবে তা কি কেউ আগে কল্পনা করেছিলো? সেখানা যে পুনরায় নতুন করে আঁকতে হবে তা কি তিনি জানতে পেরেছিলেন? হাত গুণতে তো আপন জানেন না। হুঃ, কাল রাত্রিতে তগুনি আঁকা শুরু না করলে আজ অভিনয়ের আগে তা শেষ হতো কি না। মিনতি, ডলী হাজার হোক ছেলেমানুষ, তাদের ভরসায় কি সেটা ফেলে রাখা চলে? তা ছাড়া, মলী সেন বার বার করে অনুরোধ

করলেন। আহা, যেকোন মুখে পড়েছিলো বোঁচরা, দেখলে কার না মায়া হয়? তখন কাজ ফলে বাড়ী চলে যেতে পারে কোন ভদ্রলোক?

হ্যাঁ, সুবালাকে একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কাল রাত্তিতে বাস্তবতার মধ্যে সেটা ভুল হয়ে গেছে। অছায়াই হয়েছে। কিন্তু আজ সকালে কী একবার চেষ্টা করেন নি? এমিনিটের চেষ্টায় টেলিফোনের যে রং নাথায় পায়েছেন সে কি তাঁর দোষ? কে না জানে যে, কলকাতার টেলিফোনে পনের মিনিটের আগে একটা নাথারই পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও ভুল নাথার। রিসিভার তুলেই একেবারে যে ঠিক ফাইনটি পায় সে তো নিশ্চিত মনে সেটলেজারের ঠিকিট কিনলেও পারে।

“হালো, কে, সুবাল? হ্যাঁ, আমি কথা বলছি। দেখ, কাল রাত্তিরে এখানে”.....বীরেশ্বর মহে প্রত্যাগমনের বিদ্বৎ সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়েছিলেন।

সুবাল বাধা দিয়ে বললেন, “প্রিমিয়র কোম্পানী থেকে লোক এসেছিল। বললে, তাদের ডিজাইনটা কাল চাই ই।”

“কাল? জাচ্ছা, ওটা তো প্রায় হয়েই আছে। আর একটু শুধু ফিনিশ দিয়ে দেওয়া বাকী। দশ মিনিটের কাজ। আমি তোমাকে কাল রাত্তিরে খবর.....”

“আর নিউ বুক কোম্পানী ফোন করেছিল। তাদের ওখানে আজ কিম্বা কালের মধ্যে যেতে বলেছে, খুব জরুরী।”

“কাল যাবো’ধন। আজ সকালে তোমাকে একবার টেলিফোন.....”

“নীরেনবাবু এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। তোমাকে একবার তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন করতে বলে গেছেন।”

“তা এখনি করছি। এখানে সাড়ে পাঁচটায় অভিনয় শুরু হবে। তুমি খোকনকে নিয়ে..... হালো, হালো,”.....ঐ যাঃ, বোধ হয় লাইন কেটে দিয়েছে। না, এই টেলিফোনের মেয়েগুলিকে নিয়ে আর পারা যায় না।

“হালো মিস্, হালো, হালো”.....বীরেশ্বর টেলিফোনটা ফ্রাশ করতে শুরু করলেন। ঠক্

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। বৃথা চেষ্টা। আজকাল কি আর টেলিফোনে কথা বলার জো আছে কারো সঙ্গে? গভীর বিরক্তির সঙ্গে বীরেশ্বর রিসিভারটা রেখে দিলেন।

কিন্তু সুবালাকে তো অভিনয় দেখতে আসার কথাটা বলা হলো না। সে নিজে উত্থোগী হয়ে আসবে কি? সম্ভাবনা খুবই কম। কম কেন, একেবারে নেইই বলা যেতে পারে। বীরেশ্বরের সম্পর্কিত কোনো অভিনয়, প্রদর্শনী বা শিল্পাভিযানে আজ পর্যন্ত কোন দিন সুবালাকে যোগ দিতে দেখা যায়নি। বড়দিনের সময়ে বীরেশ্বরের চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে পরিচিত অপরিচিত নরনারীর ভীড় হয়েছে মিউজিয়মে। দৈনিক সংবাদপত্রে উদ্ধৃষিত প্রশংসায় সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছেন চিত্র-সমালোচকেরা। প্রসিদ্ধ রসজ্ঞের দল সুখ্যাতি করেছেন প্রকাশ্য সভায়। একমাত্র নিষ্পৃহ, নিরাসক্ত, নিরুৎসুক রয়েছেন সুবাল। শিল্পীর নিজের স্ত্রী। বন্ধু-বান্ধবের দল অগ্রহ ভরে নিয়ে যেতে চেয়েছে সঙ্গে করে। অসুস্থতা বা অস্থায়ী কোন অপরিহার্য গৃহকর্মের অজুহাতে সুবাল। বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁদের নিমন্ত্রণ।

সেবার ফাইন আর্টস সোসাইটির এগজিভিশনে প্রদর্শনীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপালের স্বর্ণপদক পেলেন বীরেশ্বর। বিশেষভাবে অতীত সভায় সহরের শ্রেষ্ঠ গুণী, জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতি ও সঘন করতালির মধ্যে সে পদক গলয় পরিয়ে দিলেন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী মহোদয়। স্বামীর এই সম্মান-সভায় সুবালাকে অনেক করে নিমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন সভার উদ্যোক্তাগণ। এমন কি, সোসাইটির সভানেত্রী লেডী সুধা ব্যানার্জী স্বয়ং পত্র দ্বারা বীরেশ্বরকে অমুরোধ করেছিলেন শিল্পীকে সঙ্গীক উপস্থিত হতে। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সভাস্থলে বীরেশ্বরকে আসতে হলো একক। সেদিন সকাল বেলায়ই কী এক অপরিহার্য কারণে সুবালার শ্রীরামপুরে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটলো। ছোট ভাইএর বাড়ীতে। সেখান থেকে ফিরতে ট্রেন ফেল করলেন।

অভিনয়-মঞ্চের দিকে ফিরে চললেন বীরেশ্বর। যেতে যেতে মনে কিছুটা অস্থিতি বোধ করলেন। কাল রাত্রি থেকে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত গৃহে

জিনিস কলকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কব বসিয়ে দেখ—কাজেই আসেন হয়ে দাঁড়াই! আর এরা বড় একটা কাপড় টোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আভ্যায় আব গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ারি করে—এই সম্ভাব্য বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্যাপ্ত আজকাল। ভবপতি খাঁড়, সব শুভন। কব অনেক—কলা, লেবু, পেঁয়াজ, আপেল, বাদাম, কিসমিস, এত সব বেটে, আরও অনেক কব কালিচেমিষিয়া হতে আসে। আনাবস চেষ্টা—ওবে অমন, নিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে, spinach—এ বাক্সে ঠিক আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর বৈজ্ঞানিক এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গের ডাল, ওবে গোপালের মার চুড়চুড় নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাটকটী আছে, সব বাজের নানা বকমের নাছুর মা আছে। এদের পানি কাগসের মত। ছব আছে, দুই কনাচ, ঘোল অপর্যাপ্ত। মাটা (cream) সবদাই ব্যবহার। চায়ে, কফিতে, সকল বাতাই এই মাটা—cream—সব না, ছুবে মাটা! গরম মাটাও আছে, গরম বকফজল—শীত এক গরম, শীত এক বাত। গরম মাটা কি না হতেও বকফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) আভ্যায়, মর্দিত বকফজল খেতে বাড়ে কমনে আসে। গরু খাড়ে সব ভান। আর কলপি এত সব নানা আকাবের।

নাগাগারা falls (জল প্রপাত)। হাব ইচ্ছা, গাভ বাব ত দেখলুম। গরু grand (মহান ও উচ্চনারোদক) নটে, তবে যত শুনেছ তা নয়। একদিন শীতকাল aurora borealis\* হয়েছিল।

মা ঠাকুরাবাবীও খবড়পত্র কেমন চলাই, তোমরা যা ত কিছুই লখ নাই। খালি childish prattle (শিশুর মত সবকথা) আমায় এ জন্মে বড় একটা সময় নাগ, next time, দেখা যাবে।

যোগেন বোর গুণতিন দেবে গেছে। সবদায় সবদায় বোগ এখনও শাস্তি হয় নাই। একটা power of organisation (সংগঠনশক্তি) চাই—বুকেই ? তোমাদের মিতব কাকব মাথায় ততটুকু বি আছে কি ? যদি থাকে ত বুদ্ধি খেলাও দিকি—হাবক দাদা, শবৎ, হবি—এরা পাবের।—ব originality (মৌলিকতা) ভাবি কম, তবে গরু good workman, persevering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই সবকাব, আর শকী খুব executive (কাজের লোক), বানবাকি এরা যা বলে তাই শুনে চলে। কহকহলো ঢো চাই—fiery youngmen (আগ্নিমন্ত্রে দক্ষিত যুবক), বকতে পাবলে ?—intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), বমের মুখে যেতে পাবে, সাঁতাব লসে সাগর পাবে যেতে প্রস্তুত, বকলে ?

\*Aurora Borealis (সন্ধ্যাক জ্যোতি) পৃথিবীর উত্তরভাগে ব্যতিক্রম (তথ্য) হব মসি কমনোত্ত বাব। কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈজ্ঞাতক অলো দেখা গিয়া থাকে। উহা নানা আকাবের এবং নানা বর্ণের। ইহাকেই অবোবা বোরিয়ালিস্ বলে।

hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মন্দ both (দুই) প্রাণপণে তারই চেষ্টা কব—চেলো বনাও আব আমাদের purify drilling (পবিত্রতাব সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

তোমাদের আক্সেল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirrorকে পরমহংস মশার নবনেকে হেন বলতেন হেন বলতেন, কেন বলতে গেলে—আব আজগুবি কাজগুবি যত—পরমহংস মশারের বুদ্ধি আব কিছুই ছিল না ? খালি thought reading আব nonsense (পবচিত্তবিজ্ঞান আব বাজে) আজগুবি হু পয়সাব brainগুলো। ঘুবা হয়ে দায়। হোদেব নিজের বড় বড় একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাজলা বাসে যা দিকি বাবুবামের লম্বা পত্র পড়লাম। বড়ো বেচে আছে—এ কথা। তোমাদের আড্ডাটা নাজিক বড় malarious বাথার আব হবি লিখছেন। বাজাকে আব হবিকে আমায় বকব ভক্ত মণ্ডবং লাটিচব ইষ্টিকবং চতবাবং দিবে। বাবুবাম অনেক delirium বকেছে। সাম্রাজ্য আনাগোনা বকেছে, বেশ বেশ গুণ্ডকে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমায় ভালবাসা জানাও ও সব কবো। সব ঠিক আসবে দীবে দীবে। আমার পত্র চিঠি লেখার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেকচার ত ঠিকই লিখো—না, একটা লিখে দিয়েছলুম যা ছাপিয়েছ। ব্যাক হব দ্যাটকি—না মুখে আসে গুণ্ডেব যুটিয়ে দেন। কাগজ পাবে সঙ্গে কোনও মঞ্চ নাই। একবার ট্রিগুয়েটে তিন খটা বাড়া বুলি কেড়েছলুম আমি নিজে অবাক হয়ে বাই সময় সময় 'মদো তোর পেটে এত ছিল'। এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এতিবাব লিখতে ফকফ হব দেখছি। ঐ ত মুঞ্চিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গল করে বাবা!

কোনও চিঠি বাজাব হুজব কবিসু মি, খববদাব! জেডডা নাজিক ? যা করতে বলছি পাবত কব, না পাবত মিছে কেচাং কব না। তোমাদের বাড়ীতে কটা ঘব আছে—কেমন কবে চলছে রাঁধুনী কাঁধুনী আছে কি না সব লিখবে। মা ঠাকুরাবাবীকে আমায় বক্ত বক্ত সাষ্টাঙ্গ দিবে। তারকদাদা আর শরতের বুদ্ধি নিয়ে কাজটা কন্তে বলেছি—কববাব চেষ্টা করিবে—দেখিব কেমন বাহাতব এইটুকু যদি না কবিতে পার তা হলে তোমাদের ওপর হতে আমায় সব বিশ্বাস আর ভবসা চলে যাবে। মিছামিছি কন্তাভজাব বাহতে আমায় ইচ্ছা নাই—I will wash my hands of you for ever (তোমাদের কোন দায়িত্বই আমি রাখব না)।

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈজ্ঞাতিক শক্তিসংকাবি কবিত হইবে। বসে বসে গল্পবাক্সির আর ঘণ্টা নাড়ার কা ঘণ্টা নাড়া গুহস্থের কন্ড, ম—রা—ককন গে, তোমাদের distribution and propagation of thought current (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। \* \* \*

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তাব আমি আসচি, বকলে ? ত হাজাব, দণ হাজাব, বিশ হাজাব সা চাই, মেয়ে মন্দ বকলে ? গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা, কবছেন ? চেলো চাই at any risk (যে কোন বকমে হোক তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো।

এ কবি নয়, ভাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ নাথা মুড়িয়ে  
 young educated men—not fools (শিক্ষিত  
 ক—আত্মশয়ক নয়), তবে বলি বাতায়ন। ভলম্বল বাধাতে হবে,  
 ফাঁকি ফাঁকি ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তাবকদাদা,  
 কলিকাতাব মাঝে বিভ্রান্তের মত চক্ৰ মাঝ দিকি, বাব কতক।  
 গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, গালি চেলা কর, মায়  
 ময়মদ যে আসে সে নাথা মুড়িয়ে, তাবপব আমি আশুচি।  
 spiritual tidal wave (অধ্যাত্মিক বলা) আসছে—নৌচ  
 চায় যাবে, মূর্খ মহাপ্রাণ্ডেব শুক হয়ে যাবে তাঁব রূপায়—  
 অস্তিত্ত জাগ্রত প্রাপ্য বরান (goal) নিবোধত।”

Life is ever expanding, contraction is death  
 (জীবন হচ্ছে সম্প্রসাধন, অব সংকোচনই মৃত্যু)। সে আশুচরিত্র  
 আপনাব আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তাঁব নবকেও জায়গা  
 নেই। সে আপন নবকে পয়ত্ত গিয়ে জীবের জগা কাঁচব হয়,  
 কটা কবে, সেই বামকুণ্ডেব পল্ল—ইতবে রূপণা: (অপবে জীববুদ্ধি)।

এই মহা সন্ধিপূজাব সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে  
 গিয়ে ঘবে ঘবে তাঁব সম্প্রসারিতবর্ণ কবিরে, সেই আমাব ভাই,  
 সেই তাঁব ছেলে, বাকি যে তা না পাব তফাৎ হয়ে যাও এই  
 বেল ভালয় ভালয়। এই চিঠি তোমরা পড়বে—মোগেন মা,  
 প্রাণ মা সকলকে জ্ঞানাবে। এই test (পরীক্ষা), যে বামকুণ্ডেব  
 ফলে, সে আপনাব ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েইপি পরকলাণ-  
 চিত্তিবঃ। প্রাণত্যাগ হইলেও পবেব কলাণাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা।  
 বাবা আপনাব আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, বাবা আপনাব জিহেব  
 সম্মন সকলেব মাথা বলি দিতে বাজি, তাঁবা আমাদের কেউ নয়,  
 তাঁবা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেল ভালয় ভালয়। তাঁব চরিত্র, তাঁব  
 শিলা, ধর্ম চাবিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন,  
 এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতবঙ্গ আসুছে, onward, onward  
 (গিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমন্ডে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁব  
 কাঁড়—onward, onward, নামেব সময় নাই, যশেব সময় নাই,  
 মকব সময় নাই, ভক্তিব সময় নাই, দেখা যাবে পবে। এখন এ  
 সময় অনন্ত বিস্তার, তাঁব মহান্ চবিরেব, তাঁব মহান্ জীবনেব,  
 তাঁব অস্তিত্ত আশ্রাব। এই কাণা—আব কিছু নাই। যেখানে তাঁব  
 নাম যাবে কৌটপতঙ্গ পয়ত্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, দেখও  
 দেখ না? একি ছেলেবেলা, একি জ্যাঠামি, একি চেন্নচামি—  
 “বস্ত্রিত্ত ক গত্ত”—হবে হবে। তিনি পিছে আছেন। আমি  
 আশু লিখতে পারছি না—onward, এই কথাটা গালি বলছি, যে  
 এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমাব spirit (শক্তি)  
 ফলেব, বিশ্বাস কর। Onward, হবে হবে। চিঠি বাজাব  
 ব না। আমাব হাত ধবে কে লেখাচ্ছে। Onward, হবে হবে।  
 মনে যাবে—হুঁসিয়াব—তিনি আসুছেন। যে যে তাঁব সেবাব  
 পাবে তাঁব সেবা নয়—তাঁব ছেলেদেব—গবীব গুবো, পাণী ভাগী,  
 তাঁব পয়ত্ত তাদের সেবাব জ্ঞা যে যে তৈয়াব হবে, তাদের  
 তিনি আসবেন—তাদের মুখে সবস্বতী বসবেন, তাদের  
 মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী,  
 বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা  
 চলে যাক।

আমি আব লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন গে।

ইতি—বিবেকানন্দ

পুঃ—একটা বড় খাশা বাগবে এবং তাহাতে যখন সে স্থান  
 হইতে কোন পত্র আসে তাহাব একটা চুম্বক লিখিয়া রাখিবে। তাহা  
 হইলে উক্ত দিবাব বেলায় ডুলচক হইবে না। Organisation  
 শব্দেব অর্থ division of labour (কর্মের বিভাগ)।  
 প্রত্যেকে আপনাব শা-নামে কাজ করাব এবং সকল কাজ  
 মিলে একটা ফল প্রাপ্য হবে।

তোমাব পত্রাব জগা হু হু কবিতা পাঠাইলাম।

গাঠি গীত এমতে তোমাস.....\*

এখন এই পয়ত্ত, পবে যদি কল ক আশ্রাব পাঠাব। বিশেষ  
 অনুধাবন কবে যা বা লিপ্লাম তা কবিরে। আমাব কবিতা  
 কপি কবে বেণা—পবে আশ্রাব পাঠাব। ইতি—বি।

## উৎসর্গ পত্র।

[ উৎসর্গ-পত্র রায়বাহাদুর শ্রীদত্ত হাবাগচন্দ্র বর্ধমাতের

“পতিভাসুন্দরী” হইতে গৃহীত। ]

প্রাণপুত্তা, জ্ঞান ও সংস্কারের মৌরবে

যিনি দেশ বিদেশে পূজিত,

বাহার তেজস্বিতা ও মনস্বিতা ও নিব্বার্থ পরোপকারিতায়

অতিবড় অধ্যাত্মাকেও অবনত হইতে হয়;

বাহার সদয় মধুর প্রমায়িক ব্যবহারে ও

উচ্চবংশোচিত সামাজিক শীল্যচায়ে,

ধর্ম নিদান সকলেই চমৎকৃত,

বঙ্গের সেই সুসন্তান—

বাণীচরণাশ্রিত বিদ্যাবিনয়-অলঙ্কৃত,

ভাবতের সর্গপ্রদান ধর্ম্মাদিকবণের

মাননীয় বিচারপতি

পদম পূজাম্পদ—“ডাক্তার সরকার”

শ্রীযুক্ত প্রান্তোষ মুখোপাধ্যায়,—

M. A., D. L., D. Sc., F. R. A. S., F. R. S. E.

মহোদয় শ্রীচরণে,

তদীয় ভক্তিব পুঞ্জ-পুষ্পাজলিকূপে

প্রতিভাসুন্দরী

উৎসর্গ হইল।





উঁচু থেকে

( উল্টে দেখুন )

—মনো মিত্র



কলিকাতার ট্যাক্সি

—গণেশ দাশ

( দ্বিতীয় পর্যায় )

—আগামী সংখ্যার প্রতিযোগিতা—

বিষয়

প্রচ্ছদপট

সাঁকে

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আগ্রায় আকবরের সমাধি  
সে কেন্দ্রার আলোকচিত্র মুদ্রিত হ'ল। চিত্রটি  
শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায় গৃহীত।

প্রথম পুরস্কার—১৫৯

দ্বিতীয় পুরস্কার—১০৯

তৃতীয় পুরস্কার—৫৯

ছবি পাঠানোর শেষ দিন

তারিখ



কলিকাতার হোটেল

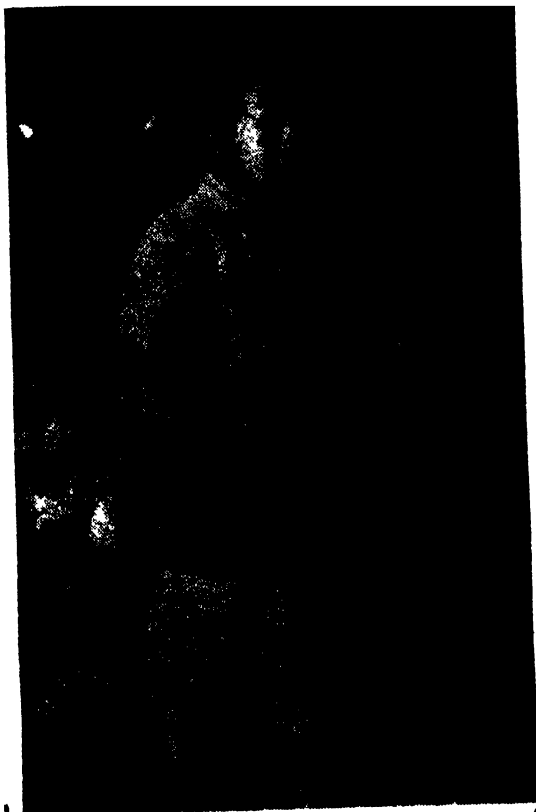
(তৃতীয় পুরস্কার)

—বণজিৎ রায়চৌধুরী—



শিশু

শিশুদের জন্য



## বন্ধুর কথা

যতীন আমার সমবয়স্ক, অন্তরঙ্গ ও অভেদাঙ্গা বাল্যবন্ধু।

এত কাল পরে সেদিন তার ইচ্ছা হয়েছে নিজের জন্মদিন নিয়ে একটা কবিতা লেখে। কিন্তু জন্মদিনটা মনে নেই, কারণ সেটার প্রয়োজন জীবনে হয়নি। আফিসের পাঠ্য কোন একটা খুঁটাধের ১লা জানুয়ারী লেখা ছিল, তাই দিয়ে এত দিন কাজ চলে আসছিল। কিন্তু তা নিয়ে কবিতা লেখা চলে না। আমার জিজ্ঞাসা কবলে, 'তাই, তোর ত সবই মনে থাকে, আমার জন্ম-তারিখটা বলে দে।' আমি এসে বললাম, 'মনে হচ্ছে, তোর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল আষাঢ় শুক্লা দশমী দিবসে।' কোষ্ঠী খুলে দেখা গেল সে জায়গাটা ছিল, কীটদষ্ট। প্রায় ৬৪ বৎসরের পুর্বানো কাগজ, দেখে দেওয়া যায় না। যাই হোক, আমার কথায় বিশ্বাস কোরেই যতীন জন্মদিন শীর্ষক কবিতা লিখে এনে আমার শোনাল :—

মেঘের আড়ালে তেবই আষাঢ় চুপি চুপি চলে যায় ;  
অপরিচিতের মতন এবাবও বিদায় দিবি কি তার ?  
বাঁধ বাঁধ বাঁধ তেবই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি',  
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।  
এবার সাধিয়া শুধাও তাহাবে কি চাহে সে বলিবাবে,  
জীবনে যাহারে করিনি স্বরণ, বরণ কবই তাবে।  
তারি বক্ষেব সজল স্বাসে ভরি' লহ তব বুক,  
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।  
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলংকিত,  
কাল সাগরের কৃষ্ণ কমল পূর্ণ প্রস্তুত !  
ঢল ঢল তাব নির্মম শোভা সনিবন্ধ ডাকে,  
তারি গন্ধের মেঘেব ছন্দে সকল গগন ঢাকে,  
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল ওজনহীন,  
মর্মে'র কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।  
চিব কলংকী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল  
এই দিনটির মুণালে ফুটল হেন সহস্রদল।

পেরেছিসু কি রে চিন্তে ?

মরণ-কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।

চেয়ে থাক চেয়ে থাক

বন্দনহীন অর্থাবিহীন নিশ্চল নির্বাক।

কুড়ি ছত্দের কবিতাটি ১৩ই আষাঢ়ে আরম্ভ কোরে ১৫ই আষাঢ় শেষ হ'য়েছে ; আর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুকে টেনে এনে আলাদা কোরেছে। যতীনের এই রকমই হয়। কবিতা শুনে বাহবা দিলাম ; কারণ, বললাম, বন্ধু তাই চায়।

বাল্যে বা কৈশোরে যতীনের কবিতা-রোগ দেখিনি। ৮ বছর বয়সেই যে ম্যালেরিয়ায় ধরল, স্বরূপে বা বহুরূপী হ'য়ে আজ পড়াশোনা তাকে আর রেহাই দেয়নি। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রামে পড়াশোনা, আর বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া যার মাতৃভূমি এবং পড়াশোনা, সে যে এখনও বেঁচে আছে এই আশ্চর্য্য ! তার পাঁচ-ছয় বছর বয়সে কেউ শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি। ১২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ কোরে সে কলকাতায় গেল কাকার বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে। বছর দেড়েক স্কুলে অধ্যয়ন করার পর হ'ল

# অস্ব-স্বাতি

বন্ধু—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

তার বিউরনিক প্লেগ। আমাদের পল্লীগ্রামের দেহ তখনকার দিনে ম্যালেরিয়ায় কাছে বন্ধক দেওয়া, সহ্যেব প্লেগ আমল পেল না, যতীন সেবে উঠল। মাস ছয়েক পরে আবার তাকে ধরল তখনকার বাতৈরিক বিকার, এখনকার টায়ফয়েড। নাড়ী-টাড়ি ছেড়ে গেল, কিন্তু প্রাণ রইল। আমরা বললাম, 'যতীন, আব কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই, পাশেব গ্রামে তাই স্থল হয়েছে, সেইখানে পড়ি চল।' তাই হ'ল। মাস কয়েক সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর যতীন আরও শীর্ণ হ'য়ে পড়ল। তার পিতা তখন বালেশ্বরে সামান্ত চাকরি করেন। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্থলে ভর্তি কোরে দিলেন। জল-হাওয়ার গুণে যতীন কয়েক মাসে মোটা হ'য়ে উঠল ; কিন্তু বাপের গেল চাকরি। কলকাতায় ফিরে এসে ওবিয়োটাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৯০৩ খৃঃ এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তরণ। বেনেটোলাব মেসে যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন এক এক দিন বলতাম—যতীন, তোব স্বর এলে লেপ চাপা দিয়ে স্থলে যাই, ফিরে এসে কোন দিন দেখব মরে প'ড়ে আছিসু। সে কিছুট খায়, বীজগণিত কয়ে, আর হাসে।

সেদিনের জেনেবাল এ্যাসেম্বলি (এখনকার স্কটিশ চার্চ) কলেজ থেকে ১৮ বছর বয়সে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোন্ লাইনে যাওয়া যায় এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এক বন্ধু এসে বললেন, 'শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোষ্টেলে থাকতে গেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে। অভিভাবকের কোন বালাই নেই, তার উপর হোস্টেল-প্রিন্সিপেলের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা তুলনাহীন।' পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হতে গেল। এই ব্যাপারে তাব কবির সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কি বস্ত, সে বিষয়ে যতীন বা তার অভিভাবকদের কোনই ধারণা ছিল না। পদ্মপুকুরের সন্নিগটে বসেই প্রাবেশিক পরীক্ষা করলেন সেখানকার ডাক্তার। বুকোব মাপ, দেহের ওজন, সবই কম কম হ'ল। তখন ডাক্তার বাবু আব একটা পরীক্ষা করলেন। সেই তৃতীয় প্রহরের নিদ্রা-বোধে দুব্বের একটা অশ্বখ গাছ দেখিয়ে বললেন—এ পদ্মাস্ত্র জোরে ছুটে গিয়েই ছুটে ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও যতীন সেটা ভালোই পাবল। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে যখন 'ষ্টেটসম্যান' কাগজ উন্টে কোরে পড়তে দেওয়া হ'ল তখন আর পাশ-ফেল বোকা গেল না। ডাক্তার বললেন তুমি বি-এ পড়গে যাও। সে যখন বাবালা ছেড়ে নেমে বাচ্ছে, তখন ডাক্তার বাবু করুণাপ্রবণ হয়ে পাশ কোরে দিলেন ; অর্থাৎ বুকোব মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন কোমর বাঁধলাম।

লেখাপড়া যা হয় হ'তে লাগল; কিন্তু মুন্সিলে পড়া গেল ওয়ার্ষিকপ নিয়ে। প্রথম বৎসর ছুতারখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের শ্রিপারের মত এক-একটা কাঠ দিয়ে হাতকরাতের সাহায্যে সেটাকে ফালা-ফালা কোরে চিরতে বলা হ'ল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করাব পব আসল কাজ শেখানো হবে। দু'-তিন দিনের মধ্যে হ'তে ফোঁসা প'ড়ে, গ'লে, যা হ'য়ে গেল, কিন্তু কাঠ বিদারি হ'ল না। হু'-চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট কোরে। মনে হচ্ছে, বর্তমানের এক জন রাজ্যমন্ত্রী তাঁদেরই অন্তরম। ব্যাডমিণ্টন খেলার মাঠে তিনি ঝাঁ হাতের কর্কে কিছুতেই ডান হাতের ব্যাট ঠেকাতে পারতেন না; সেও বোধ হয় কলেজ ছাড়াই আর একটা কারণ। তালাই কোরেছিলেন; আজ তিনি ত্যাগপত্র ও দেশমাত্র।

যাই হোক, আমবা গবীরের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চালিয়ে যেতে লগ্নগলাম। যতীনের মনো-নাথের অবস্থ, কিন্তু ডাক্তারখানায় কুইনাইনের দাম লাগে না, এবং কুইনাইন মিস্ত্রিচার খেয়েও যতীনের আর মূণ দোবার বিশেষ দরকার হয় না। ডাক্তার পথ্য পাঠান—পাউকিটী আব মাসের মেন। সে ডাক্তারটির বিশ্বাস ছিল পুষ্টির খাদ্যে অভাবের বান্ধালীও ছেলের অত ম্যালেরিয়া হয়, বিশেষতঃ শিবপূব কলেজের ঐ খাটনিব পব, মাত্র ডাল-ভাত খেয়ে। যারা স্বস্থ তাদের কোন সাহায্য তিনি করতে পারতেন না, কিন্তু বোগী হ'লে তিনি ঐ প্রকার পথ্যে ব্যবস্থা করতেন।

বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তর হ'য়ে জানায়, নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র যে প'ড়েছে সে ও-বখা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমবা কুরুক্ষেত্র পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সবম' অংশ, তেমন্দের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসিমার কাশীগ্রাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে-লুকিয়ে কয়েক বার শেষ কোরেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ার বাবোয়ানি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু ববি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি, গান হু'-দশটা শুনিছি। মিহির মুহু হেসে বললে—নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথের কি তফাৎ সেটা বোঝাবার জন্য রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে প'ড়ে দেখ, তার পরে তর্ক কোবো। মিহির-প্রদত্ত, আড়োদীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমবা ত অবাক! হায় নবীন সেন! এই বিজ্ঞে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে খরিত্রী দ্বিধা হও।

যাক, ছুতারখানাল,—কামারখানাল-কটকিত বিজ্ঞাব পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কষ্টে-স্বপ্নে পাশ কোবে যতীন ট্রেনিং নিতে ঢাকায় গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতৃভূমি নদীয়ার জেলা-বোর্ডে চাকরি জুটল ১১১৩ খৃঃএ। এই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তখনকার জেলা-বোর্ডের প্রবীণ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী কুশনগরেই। প্রথম বয়সে কিছু দিন P. W. D.তে চাকরি কোরে তিনি অনেকটা ওড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বংশেরও ধনখ্যাতি ছিল।

দাদার উপর তাঁর পরিবারবর্গ বলতে তিনি ও তাঁর পরিবার। স্মৃতরাং

অর্ধের প্রয়োজন তেমন নয়। তাঁরই মেহছায়ে ও সহকারী হিসাবে চাকরি আরম্ভ কোরে যতীনের আর উপরি-পাওনা নেবার অবকাশ বা অভ্যাস হ'ল না। আমি বলেছিলাম, 'শুকনো মাহিনায় তোমার চলবে না, যতীন! সংঘম থাকলে মদ খেলেও মাতাল হয় না, চুপি করলেও চোর হয় না; আর শতকরা হিসাবে ঠিকাদারদের লাভের অংশমাত্র গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেটা চুরি নয়।' যতীনের সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ক্রমে দেখলাম, এ বিষয়ে তার একটা অহমিকাও জন্মে গেল।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটি প্রধান দোষ ছিল, তিনি সে সময় বিশেষ কিছু দেখতে পেতেন না। জেলা-বোর্ডের চাকরিতেই একটা এ্যাকসিডেন্ট হ'য়ে একটি চোখ পূর্বেই নষ্ট হ'য়ে যায় এবং বাকিটিতে বেশ ঝাপসা দেখতেন। অতিশয় অমায়িক, সদাশয় পুরুষ; বোর্ডের সদস্যদের বিশেষ প্রিয়। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান বান্দালী এবং তাঁর কৈশোরের বন্ধু। কাণ্ডে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। স্মৃতরাং সেই ঝাপসা-দেখা একটি চোখই জেলা-বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল। কাণ্ডপরিদর্শনে গিয়ে পল্লীপথে সাদা গরুকে ভদ্রমহিলা মনে কোরে তিনি পথের এক পাশে ঈড়াতেন, আবার ভদ্রমহিলাকে গরু মনে কোরে লাঠি উঠিয়ে পূর্বের ভ্রম সংশোধন কোরে নিতেন, এমন রটনাও ওভার শিয়ারবা কবত। কিন্তু সে সব অবিদ্যাক্ত কথা কোন দিন বোর্ডের মিটিংএ উঠেনি। এমন সময় এক জন বঙ্গবিশ্রুত দুঃপ্রকৃতি আধখাপা ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন সম্ভাবনায় ইঞ্জিনিয়ার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ঐ সাহেবের এমন বদনাম ছিল যে, পূর্বে তিনি আর এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার দিয়েছিলেন। তিনি সত্য সত্যই এলেন এবং প্রথমেই বোর্ডের তাইস-চেয়ারম্যানকে ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন—'এই অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার কত দিন হইতে বোর্ডকে প্রতারিত করিতেছে এবং বোর্ড তাহার নিকট কি পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করিতে পারে, আমায় জানানো হউক।' বিষয়টি বোর্ডের অধিবেশনে পেশ করিতে হইল এবং সদস্যদের নির্বন্ধাতিশয়ে সাহেব-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ারকে ১ বৎসরের ছুটি দিলেন, আর যতীনের উপর ভার পড়ল অস্থায়ী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার। সাহেবের ইচ্ছা, ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে নেবেন।

এ-সাহেব যে-কোন সময় হু'-চার যা বসিয়ে দিতে পারে; স্মৃতরাং যতীনের প্রাণপণে চাকরি করতে হ'ল। সাহেব খুশি হলেন এবং অল্প ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নদীয়া জেলার আবহাওয়ায় অতিপরিশ্রমে যতীনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল। সেটা হ'তে অবশ্য বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। তার মধ্যে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার দু'টি চান, ছুটি পান, আর যতীন কাজ চালিয়ে যায়। এই অবস্থা। যতীনের চাকরি যখন পাকা হওয়ার কোন বাধা দেখা যাচ্ছে না, তখন খুঁটি কেঁচে গেল। সাহেব বদলি হ'য়ে গিয়েছেন, ওই ইঞ্জিনিয়ার অত্রোপচারের ফলে আবার ঝাপসা দেখছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যানের আমল পরিবর্তিত হওয়ায় বেসরকারী চেয়ারম্যান খেয়ে বোর্ড পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত কোরেছে। স্ববোগ বৃদ্ধ ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেবার প্রার্থনা জাতি দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তার একটা অন্তরায় উপস্থিত হ'ল।

বোর্ডের কাগজপত্রে দেখা গেল, তাঁর বয়স্ক্রম তখন চাকরির সীমারেখা অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ অটিনামুসারে তাঁর আর চাকরি করা যাবে না। তিনি আব এফটা সরকারী নথি থেকে নজর দেখালেন, বয়স এখনও সীমারেখার মধ্যেই আছে। দু'টি বয়সের মধ্যে মাত্র ৬ বৎসর তফাত। আসলে, ছাপাব দোষে ইংরাজি অর্ট এক স্থানে ভুল তৈরি হয়েছে; আর অর্টটাই যে ঠিক সে বিষয়ে তাঁর বা অপার দাবও কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, দু'টি বয়সের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাঁকে এফিডেবিট করতে বলা হ'ল। তিনি এফিডেবিট না দোবে তাঁর বয়স কত, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ভার বোর্ডের পাব দিলেন। বোর্ডের অধিবেশনে ভোটের তাঁর বয়স ধার্য্য করা হ'ল এবং তাঁকে ৬ মাসের জন্ম কাজে যোগ দেওয়ার অহুমতি দেওয়া হ'ল। যতীন পেল ঐ ছ' মাসের ছুটি।

ঢাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। ভগ্নস্বাস্থ্য যতীন নেয় ছুটি, আর আপনা-দুটি ইঞ্জিনিয়ার পান extension। স্বগ্রামে ব'সে যতীন একটা চালায়, খন্দর বোনায়, কিন্তু জেল খাটে না। একটা দেশলাইএর শতকল কিনে গ্রামস্থ বালক-শ্রমিকেব সাহায্য নিয়ে ভাবে এই হে কুটীবাশিলের দোঁলতে গ্রামের উপকার এবং তাবও জীবিকার সম্ভাবন হবে। স্বাস্থ্যেব যে প্রকার অবস্থা তাতে রাস্তায়-রাস্তায় দাব বোর্ডেব চাকরি করবাব আশা বা ইচ্ছা তাব আর নেই। খন্দরে পাব সেদিনকার দেশী দেশলাইএ যে পেট ভরবে না, সে কথা সবাই জানে, যতীন বুঝে না। এমন সময়, প্রায় তিন বৎসর পরে তার ঘরে গেল কাশিমবাজারবাধিপতি প্রান্তঃসরগীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের প্লেটে ইঞ্জিনিয়ারেব চাকরি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, আত্মীয়-স্বজনেব সংগ্রহে দেশলাই ফেলে এবং চরকা নিয়ে যতীন যোগ দিলে সেই রাতে ১৯২৩ সালে, যখন তার বয়স ৩৬ বৎসর। সেই বৎসর তার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। এর কবিতা-গুলি কৃষ্ণনগরে চাকরি করবাব সময় ও তৎপূর্বে রচিত। স্বাস্থ্যভঙ্গের ৬ বৎসর যতীন কোন কবিতা লেখেনি।

কাশিমবাজারেব চাকরিতে যোগ দিয়েই যতীনের ঘাড়ের আবাস মাহেবই চাপল। স্বর্ণগ্রন্থ মহারাজা স্থির কোবেছেন নিজের একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে এক ছুঁদে ও অবসরপ্রাপ্ত সিলিলিয়ান সাহেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কোবে নিজে বানপ্রস্থ দলপলন করবেন। তাই হ'ল এবং সাহেব এলেন। কৃষ্ণনগরেব মাহেবটিব মত এ'রও সুনাম আছে, প্রয়োজন হ'লে চাবুক চালাতে প্রস্তুত করেন না। কাশিমবাজারের যৌবরাজ্যে সাহেবি আমল পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কর্মচারীদের প্রায় সকলেরই চাকরি গেল, যতীন নূতন ব'লেই বোধ হয় চাকরিটা থাকল।

মহারাজা যে সাহেবটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তিনি অপ্রতিভত প্রভাবে ৬ বৎসর রাজদণ্ড চালনা করেছিলেন। সাহেব প্রথমেই পুরাতন কর্মচারী ও পদ্ধতি পরিবর্তন কোরে নূতন নূতন আর্থিক নিযুক্ত করবতে লাগলেন। জমিদারী সেরেস্তার পুরানো পদবী পাতিল হ'য়ে এ্যাকাউন্টেন্ট, সুপারিনটেন্ডেন্ট, অডিটার ইত্যাদি নূতন পদে নিত্য নব লোকের আগমন শুরু হ'ল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গবর্ণমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মচারী। বেতন পূর্ণপেঙ্কা অনেক বেশী, যোগ্যতাও বোধ হয় বেশী। প্রত্যহ নূতন নূতন বৃদ্ধের আগমন দেখে মহারাজারই এক বৃদ্ধ স্মরসিক কর্মচারী

এক দিন বললেন, এমনি ঘটনা এ রাজ্যে আর এবকাব ঘটেছিল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি গল্প শুরু করলেন :—

"তখনকার রাজা বর্তমান মহারাজার ছায় এমন গাটি বৈষ্ণব ছিলেন না, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু শাস্ত্রপথেও চলতেন। পূজাব সময় রাজবাটাব স্তূপ্রশস্ত নাটমন্দিরে যাত্রাগান চলছে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একমনে শুনছে। রাজা চলেছেন সদব থেকে অক্ষবমহলে। মাঝে নাটমন্দির পার হবার সময় দেখলেন, যাত্রাব আসবে কে এক জন লম্বিতশুভ্র বৃদ্ধ চমৎকাব বস্তুতা করছে। রাজা পার্শ্বস্থ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন—'ও কোন্ হায়?' পারিষদ করযোড়ে নিবেদন করলে—'ভজুর, ও নাবদ মুনি হায়।' রাজা বললেন—'ও ত বহুৎ আছা বোলতা হায়, অউব মুনি হায়?' চারি দিকে সাড়া প'ড়ে গেল, যাত্রাব অধিকারী বাজ-ইচ্ছা বুঝে তৎক্ষণাত্ বশিষ্ঠ মুনিকে আসরে নামালেন, যদিও বশিষ্ঠ মুনিব সে সময় আসবার কোন কারণ ছিল না। রাজা বশিষ্ঠকে দেখে আবও মুগ্ধ হলেন, এবং হুকুম করলেন 'অউব মুনি লে আও।' তখনি আর এক জনকে পাকা দাড়ি পবিয়ে মুনি সাজিয়ে আনা হ'ল। রাজা তখন আসরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন এবং হুকুম দিচ্ছেন—'অউব মুনি লে আও।' যাত্রাদলে যে কয়টা পাকা, ডাঁসা দাড়ি ছিল ফুবিয়ে গেল, তখনও রাজা মুগ্ধ রসে বলছেন—'অউব মুনি লে আও।' শেষে রাজবাড়ীর গুদাম থেকে শণ পাট বার কবে তারি সাহায্যে মুনি সাজানো আরম্ভ হ'ল, এবং ডজন কয়েক মুনি যখন সাববন্দী হ'য়ে আসরে পাঁড়াল, তখন অধিকারী শাল বংশিস পেলেন।

মশায়, সেই ইতিহাসই চোখের উপর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।"

ইতিহাসেব পুনরাবৃত্তির কথায় আব একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে। শোনা যায়, দিল্লীর খোয়ালি সম্রাট মুহম্মদ বিন তোগলক্ তিন বার দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত কোরেছিলেন এবং প্রতিবারই হুকুমজারি হয়েছিল সমস্ত নাগরিকদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। কাশিমবাজারেব সাহেবটিও প্রথমে তাঁর রাজধানী কাশিমবাজার থেকে বহরমপুরে নিয়ে আসেন এবং সেপান থেকে ৩ বার তাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যান। তিনিও প্রত্যেক বার হুকুম দিয়েছিলেন, চেয়ার টেবিল ভাঙ্গারী কাগজ-পত্র এবং ভাঙ্গারবার্গ সকলে তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হবে। তাবাব ওমন ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে স্থানান্তর-করণের সময় আমলাদের একটি দিনও আফিস কামাই না হয়, অর্থাৎ শনিবারের দিন যে টেবিল-চেয়ারে ব'সে সাহেব ও আমলাবর্গ বহরমপুরে চাকরি করবেন, সোমবারে ঠিক সেই-সেই চেয়ার-টেবিলে তাঁরা কলকাতায় যথারীতি আফিস করবেন। এর ভার প্রধানতঃ ইঞ্জিনিয়ারেব উপর। কাশিমবাজার মহারাজার সদব-আফিস এক বিরাট ব্যাপাব; স্তূপ্রশস্ত বানওতা মহারাজা প্রত্যেক বারই নিবেদ কোরেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। চেয়ার-টেবিল-কাগজের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ, সপবিবাব আমলাদের ঠোঁটোঁলি, ভিড়, বর্ষাব অবিশ্রাম বাবিবর্ষণ ইত্যাদিতে মিলে সে এক অদ্ভুতপূর্ণ দৃশ্য। কিন্তু জবরদস্ত সাহেবেব এমনই প্রতাপ ও দমতা যে প্রকৃতই শনিবারের আফিস বহরমপুরে সেবে সোমবারের আফিস কলকাতায় বসেছিল। দেশ থেকে সাহেব তাড়িয়ে ভাল কাজ হয়নি।

ক্রমে মহারাজা বিরক্ত হয়ে এই প্রচণ্ড সাহেবটিকে সবাবার চোঁটা করতে লাগলেন। কটক তুলতে কটক চাই, সাহেব তাড়াতে

সাহেবেবই প্রয়োজন। নানা কৌশলে মহারাজা এণ্টেট দিলেন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এব তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এবারও যে সাহেবটি কর্ণধার হয়ে এলেন তিনি হাল হাতে কোরেই বললেন, ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে আফিস অল্পস্থানান্তরিত করতে হবে। নিজেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক বাড়ী ভাড়া করলেন—বার উপরিতলে থাকবেন স্বয়ং সপরিবারে, আর নিম্নতলে বসবে আফিস। নিজের স্ত্রিধা অমুখ্যায়ী, সাহেব কারও সঙ্গে পরামর্শ না কোরেই বাড়ী নির্মাচন কোবে দেখেছেন, এখন তাঁব ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হবে তারই মধ্যে সকলের স্থান-সংকুলান। অনেক মাথা-জোপী হিসাব কোরে যতীন বললে—কোন উপায়েই এ-বাড়ী নিম্নতলে সমস্ত আমলার বসবাব স্থান করা যাচ্ছে না, উপরতলের কিছুটা না নিলে অন্ততঃ কুড়িটি লোকের স্থানান্তার ঘনিচ্ছ। সাহেব অত্যন্ত সঙ্কোচে জবাব দিলেন—ঐ কুড়ি জন আমলাকে বহুখাস্ত কোবে দিলেই হবে। যতীন বললে—সাহেব, আর একবার মেপে দেখি। তাব পর তন্নপ্রায় আস্তাবল মেবামত করিয়ে, বাথরুমগুলির কমাডু, ইউরিম্যাল সরিয়ে, বারান্দায় পর্দা টাঙিয়ে, কোন রকমে ঐ কুড়ি জনের জায়গাও হ'ল। এ সাহেব রাজস্ব কবলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। ঐরই রাজস্ব কালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেহবন্ধা করেন।

তার পব থেকে বাঙ্গালী সাহেবেব পালা। মহারাজার ঋণ শোধ না হ'য়ে ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী সাহেবদের বেতন খাঁটি সাহেবদের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এই রকম নামতে লাগল। এ'বা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত পাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহেব হ'লেও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। যিনি যখন এসেছেন তিনিই বলেছেন, পূর্বসূরীগণের দোষেই এণ্টেট ঋণাক্ত হয়নি, আমাব আমলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই সব বৈটিক হ'তে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪২ খৃঃ জাপানীরা ভারতীয় কলকাতায় বোমা ফেলব কি না। বোমা তখনও পড়েনি, কিন্তু কলকাতা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে গেল। সেই সময় রাজধানী আবার কলকাতা থেকে বহরমপুর ফিরে এল। আবার সেই আমলাদের সাথে সাথে ঢেয়াব টেবিল আলমারী কাগজের বস্তা সচল হ'য়ে উঠল। সেট ছড়োভড়ি, বিশৃঙ্খলা, অর্ধেব শ্রাদ্ধ। দীর্ঘ ১৩ বৎসব কলকাতায় কাটিয়ে যতীনও ফিরে এল বহরমপুরে।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌ ঋণমুক্তিব কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। ষাঁড়ি-মারি মিলে যতই মাবে টান হেঁটো, ঋণভারে ভাবী তবণী ততই যেন ভাবাচুবির দিকে এগিয়ে যায়। শেষে, ১৯৪৪ খৃঃ মহাবাণ শ্রীচন্দ্র তাঁব বহুমূল্য কয়লা খনিব অংশবিশেষ বিক্রয় কোবে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন, এবং জমিদারীভাব ভাব স্বতন্ত্রে গ্রহণ করলেন। এখনও সেই ব্যবস্থা চলছে।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০; এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিমবাজার এণ্টেটেই চাকরি কোরেছে। সেই সূত্রে তাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হ'য়েছে। তার কর্মজীবনে যে-সব চট্টগ্রামের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক, তাব কেউ মারক হয়নি; যতীনও তাদের ভুক্তি-কুটিলকটাক্ষ এ'দিয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে। “মরীচিকা”র পুরব সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা। সে খবর মহারাজা শ্রীশঙ্কর ব্যতীত বড়পুত্রসেব তপস বেতই বড় এ'বা রাখতেন না। কাজ থেকে অবসর নেওয়াব পবই যতীন ভা'য় তার নূতন কবিতা শুনিয়ে দিল :—

ইট কাঠ চূণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী  
সাবাটা জীবন শুধু গাঁথিছু পরের বাড়ী।  
কত হুশিচ্ছাই ঘটাতে বাসের সূখ,  
আলো হাওয়া জল ড্রেন,—পাছে কোন হয় চুপ।  
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,  
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাই।

ছন্দ অর্থ আর ষড়ি ষড়ি কথা বাড়ি,  
সকলই পরের তব, কবিতা যা গাঁথিয়াছি।  
অশ্রুসাগর সেচি' অচেতুক কৌতুকে  
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা ছলায়েছি বৃকে বৃকে।  
হায় রে, আমার বল সে-বুক সে-মালা কোথা,  
যার পরশনে মোব জুড়াবে বৃকেব ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবাব,  
মিথ্যে হইছু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।

এই ইঞ্জিনিয়ার-কবির, বা লোহাব ফুলদানির, কর্মজীবনে কিছু পরিচয় দিলাম; কাব্যপরিচয় দেবে তার কবিতা। তার আমি জানি, এই পরিচয়ও খাঁটি সত্য হবে না। তার অধিকাংশ কবিতার পিছনে একটি ছোট্ট সূত্রে ইতিহাস আছে; সেই সূত্রেই আসল সত্য; সঙ্গে সঙ্গে যে সব সূতো বোরাফেরা কোরেছে তা'ই যতীনের মিথ্যা কবিত্যতি দিতে বসেছে। এদিক দিয়ে তাব বলা ভাল। আমার এমনও মনে হয়, যতীনের ‘বাল্যের ম্যালেরিয়া’ই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হ'য়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ কোরেছে। এদিক থেকে দেখলে তার কবিতার প্রধান উৎসটি হ'ল ধবা পড়তে পারে।—বিপ্রতীপ গুপ্ত।

### স্নেহের ক্যাসাদ

স্বামী আব স্ত্রী তাঁদের বছর খানেকের পুত্র-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে তাব দাছ আর দিদিমা'র কাছে গেছেন। কয়েক সপ্তাহ অতি-বাহিত হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের কর্ণস্থলে ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে আসে। এমন সময় এক দিন দাছ স্নেহে বলেন,—বাচ্ছাটাকে

তাই আমরা দেবো। খুব আনন্দে থাকবে। বাচ্ছাটির পিতা বলেন,—ও আমাদের কাছে থাকলেই ভাল থাকে। তবুও এ'না একটা সত্যিকার হাল-ফ্যাশনের গাড়ীর প্রতি খুব ঝোক হয়েছে।

দাছ আর নাতিকে নিজের কাছে রাখবার কথা আদৌ উচ্চ

## রাজনৈতিক মতবাদের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-রাষ্ট্রবাদ

বিচার করা অসুচিত। কারণ, প্রাচীন কালে সুনির্দিষ্ট মতবাদ কোথাও জন্মলাভ করে নাই। যে সকল মতবাদ যুগ যুগ ধরিয়া বর্তমানে নির্দিষ্ট পরিষ্কার সংজ্ঞা ও রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা প্রাচীন সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সেগুলি একত্রিত হইয়া বিভিন্ন মতবাদরূপে দানা বাঁধিতে পাবে নাই। হিন্দু-রাষ্ট্রবাদ বিচার করিবাব সময় আর এক দিকের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে Secular State বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন কালে তাহা কোথাও বিদ্যমান ছিল না,—প্রাচীন ভারতেও ছিল না। তখন ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি স্বাভাবিকভাবে যুক্ত ছিল। কোথাও ধর্মের প্রাধান্য বেশী, কোথাও নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যদিও নরপতিগণ আপন আপন ধর্ম-পালনে বিবত ছিলেন না, তবু তাঁহাদের ধর্মের চেয়ে রাষ্ট্রনীতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন বেশী। এখানে ধর্মের অর্থ religion বলিতে যাহা বুঝি, তাহাই। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহাদের ধর্ম সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী ছিলেন। বহু হিন্দুরাজ্যই বৌদ্ধ মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিল; বৌদ্ধ রাজ্যই হিন্দু মন্ত্রী ও সেনাপতি ছিল। এই সকল হিন্দুরাজ্যই রাজত্বের বহু শত বৎসর পরেও ইউরোপে ধর্ম লইয়া মারামারি হইয়াছে। পোপ ও মহান্ন রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতির মধ্যে যথেষ্ট বিবাদ-বিসংবাদ হইয়াছে। প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী বক্তব্যের সংগ্রাম হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম লইয়া কোন দিন বিরোধ ঘটে নাই। ইউরোপীয় রাজগণ তাঁহাদের অসুস্থ ধর্ম জীব কবিতা প্রজ্ঞাদিগের উপর চাপাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতে হিন্দুরাজগণ এখনো তাঁহাদের ধর্ম প্রজ্ঞাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন যে, প্রজ্ঞাগণ যেন স্বীয় ধর্ম পালন করে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবাদের উপর ইহা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শাস্ত্রঃ মনে হয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতীয় রাজগণের কলাহর ইতিহাস। ভারতবর্ষে রাশিয়া ব্যতীত ইউরোপের সমান। ইউরোপেও বিভিন্ন রাজগণের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। ইংল্যান্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দেশেও ‘চেস্টারব’ জন্ম নৃপতিগণ উন্মুখ থাকিতেন। সেইরূপ সার্বভৌমত্ব লাভের আশা প্রত্যেক ভারতীয় রাজার মনে জাগরুক ছিল। অসম্মেধ, রাজত্ব প্রভৃতি সমস্ত সার্বভৌমত্ব স্থাপনের জন্মই সৃষ্ট হইয়াছিল। বর্তমানে World State মতবাদ প্রাচীন ভারতের সার্বভৌমত্ব মতবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ। বিজিগীষু রাজা এই সকল মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া সার্বভৌমত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইতেন। রোম নগরকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপে একটি বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবাব যে স্বপ্ন ইউরোপীয় রাজনীতিবিদরা দেখিয়াছিলেন, সেই স্বপ্ন ভারতবর্ষে বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল বহু পূর্বেই। ভারতের রোম পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করিয়া মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত ও পাল-বংশীয় নৃপতিগণ সমগ্র ভারতকে একত্রিত করিয়াছিলেন।

### রাষ্ট্রের উৎপত্তি

রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি, এই মতবাদ প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। এই মতবাদ অনুসারে বিধাতার নির্দেশ

## হিন্দুর রাষ্ট্রবাদ

শ্রী অজিতকুমার নন্দী

অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। মানব-সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিবার জন্য বিধাতা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজা বিধাতার প্রতিনিধি-স্বরূপ; সুতরাং রাজ-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। “নরপতি মানব-রূপধারী দেবতা-স্বরূপ; অতএব উহাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করা নিতান্ত অকর্তব্য। নরপতি সমগ্রাণুসারে হস্তাশন, আদিত্য, মূহূ, কুবের ও যম এই পাঁচটি মূর্তি ধারণ করেন।” রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি—এই মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দু নরপতিগণ নিজদিগকে সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া অভিহিত করিতেন। এই মতবাদ শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঈজিপ্টের পৌরাণিক আখ্যায় আছে যে, সূর্যদেব ‘রা’ মর্ত্যলোক শাসন করিবাব জন্য তাঁহার পার্শ্ব পুত্র রাজাকে সৃষ্টি করেন।

“মহুসংহিতায়” সংক্ষিপ্ত ভাবে এই মতবাদের আলোচনা করা হইয়াছে। মহুসংহিতায় বলা হইয়াছে,—

“অরাজকে হি লোকেহমিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াং।

রক্ষাধমন্ত সর্বন্ত রাজানমসুজং প্রভুঃ।৩।

ইন্দ্রানিলযমার্কানামশ্লেষ বরুণশ্চ।৪।

চন্দ্রবিশ্বেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিহত্য শাশ্বতীঃ।৫।

যমাদেব্যাঃ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নিশ্চিতো নৃপঃ।

তন্মাদভিভবত্যস সর্বভূতানি তেজসা।৬।

তপত্যাদিভাব্যক্লেষ চক্ষুশ্চি চ মনাসি চ।

ন চৈনং ভুবি শক্লোতি কশিচদপ্যাভিবীক্ষিতুং।৭।

সোহগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোহর্কঃ সোমঃ স ধম্ববাট।

স কুবেরঃ স বরুণঃ স মতেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ।৮।

—মহুসংহিতা, সপ্তমোঃধ্যায়ঃ।

“যেহেতু জগৎ অরাজক হইলে প্রবলেব ভয়ে সকলেই ব্যাকুল হইবে, এই জন্য ভগবান্ সমস্ত চরাচর রক্ষা করিবাব জন্য রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, বায়ু, যম সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের এই আট দেবতাব সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর বাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশে বাজা নির্মিত হইয়াছেন; এই জন্য শৌর্য-বীর্যের আতিশয্য দ্বারা সকলকে অভিভব করিতে পারেন। বাজা সূর্যের ত্রায় দশক লোকদিগের চক্ষু ও মন দাহ করেন, ফলতঃ পৃথিবীতে কোন লোক বাজাকে আভিমুখে অবলোকন করিতে পাবে না। রাজা প্রত্যাপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্রের তুল্য হন। বাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সামান্য মনুষ্যবোধে অবজ্ঞা করিবে না, যেহেতু, তিনি অনির্ঘটনীয় মহান্ দেবতা, মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন।”

রাজা দেবতাব অংশ; তাঁহার আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়। ইহাতে রাজার দেবদত্ত অধিকারের কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মহা-ভারতের শাস্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে ‘রাজন’ শব্দের উৎপত্তির কথা ভীষ্মদেব বলিয়াছেন। কৃতযুগে কোন রাজা ছিল না। ধর্মহুসারে প্রত্যেক প্রত্যেককে রক্ষা করিত। দোষী ছিল না; সুতরাং শাস্তির প্রদান নাই। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা মোহ, লোভ, ক্রোধ এবং রাগের দ্বারা অভিভূত হইল। বিশ্বশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল



সামাজিক জীবনে। বেদ ও ধর্ম লোপ পাইল। মল্লয়া-সমাজে শুল্লা আনিবার জন্ত রাজার প্রয়োজন। তখন ভগবান নারায়ণ ঈশ্বরীয় নিজেব তেজ দ্বারা বিরজকে সৃষ্টি করিলেন মানুষকে শাসন করিবার জন্ত। কিন্তু বিরজ তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্ততবাং বিশ্ব অশান্তন সপ্তম পুরুষ পৃথু বৈশ্যকে রাজা করা হইল। ভগবান বিষ্ণু পৃথুর শরীরে প্রবেশ করিলেন, এবং সে জন্ত পৃথু সমস্ত বিশ্বের পূজা প্রাপ্ত হইলেন। তখন হইতে দেব ও নরদেবের পার্থক্য বহিল না; অর্থাৎ রাজা এবং দেবতা অভিন্ন। যেহেতু রাজা দেব দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, স্ততবাং কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যদিও তিনি সাধারণ মনুষ্যের মত একই সংসারে বাস করেন এবং এক প্রকার অজ-প্রত্যঙ্গ ধারণ করেন, তবু সমস্ত অনুসাধারণ তাঁহার আদেশ পালন করিবে।

শাস্তিপূর্বক ৬১ অধ্যায়ে পুনরায় বাস্তব উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধিষ্ঠির রাজ্যের কর্তব্যতম কার্য সম্বন্ধে ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিম্নলিখিত কাহিনী বলিলেন। “বলবানের নিকট নত হওয়া লোকের কর্তব্য; কাণ, বলবানের নিকট নত হওয়া অর্থ ইন্দ্রের নিকট নত হওয়া। স্ততবাং রাজা-বিহীন প্রজাগণের আশ্রয়-মঙ্গলের জন্তই রাজাকে বন্দা করা কর্তব্য; ধন অথবা দাণাদি নিমিত্ত নহে। অস্বাজক হইলে চুই জনে একের বিস্ত এবং অপব বহু লোকে চুই জনের বিস্ত হরণ করে, দাস্তবৃত্তির অনুহুদগিকে বসপূর্বক দাস করিয়া থাকে এবং বসপূর্বক পুরুষগণকে হরণ করে, এই জন্তই দেবগণ পূজাপালক রাজার নিয়ম করিয়াছেন। ভীষ্মদেব বলিলেন, “আমরা শুনিয়াছি, যেকপ জল-মধ্যে বৃহৎশায় মন্তাগণ কৃশায়তন মন্তাগণকে ভঙ্গন করে, সেইরূপ অস্বাজক রাজার প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপ পবম্পব সকলেরই কলঙ্ক হইতে থাকিলে, তাহারা সমবেত হইয়া শপথপূর্বক এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিল যে, ‘আমাদের মধ্যে যে কেহ নির্ভু-ভাবী, কর্তার-দণ্ড, পবদ্বীপামী এবং পবদ্বীপহাবী হইবে, তাহারা আমাদের ত্যাজ্য হইবে’। তাহারা নির্গীর্ণসে সকল বর্ষে বিশ্বাসের নিমিত্ত পবম্পব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্বিবাদে অবস্থান করিতে লাগিল। তদনন্তর তাহারা সকলে মিলিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল;—‘ত ভগবন্! আমাদের কোন ঈশ্বর না থাকায় আমাদের অস্ত্র বৃদ্ধি হইতেছে এবং আমরা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছি; অতএব আপনি আমাদের নিমিত্ত একজন ঈশ্বর নিয়োগ করুন, যিনি আমাদের সকলকে প্রতিপালন করিবেন এবং বাঁচাকে আমরা সকলে মিলিত হইয়া পূজা করিব’। তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মকে তাহাদের রাজা হইবার জন্ত আদেশ করিলে মনু তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিলেন না। মনু কহিলেন, ‘পাপপূর্ণ কর্ম আচরণ করিতে আমার অতিশয় ভয় হয়, বিশেষতঃ মিথ্যাবৃত্ত মনুষ্যগণের মধ্যে রাজ্য জয় করা নিরতিশয় দুষ্কর’। প্রজাগণ মনু এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল, ‘আপনি ভীত হইবেন না, পাপ হইতে আপনাব কোন ভয় নাই, বাহা বা পাপকর্ম করিবে, তাহাবাই তাহার ফল ভোগ করিবে। আমরা আপনাব কোষ-বুদ্ধির নিমিত্ত আমাদের লক্ষ্য পক্ষ ও ত্রিবর্ষের পক্ষাংশ ভাগের এক ভাগ ও দ্বাদশের দশ

এই তিনটি মতবাদে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজা-হীন রাজ্যে বিশ্বশুল্লা উপস্থিত হইয়াছিল। বিশ্বশুল্লা উপস্থিত হইবার পূর্বে প্রজাগণ স্থখ-শান্তিতে বাস করিত। তার পর নানা রকম বিদ্র ও জটিলতার প্রাদুর্ভাব হইল। এই অশান্তি উপশম করিবার জন্ত ভগবান রাজার সৃষ্টি করিলেন এবং নিজের প্রতিনিধিরূপে মানব-সমাজ শাসন করিবার জন্ত পৃথিবীতে পাঠাইলেন। যেহেতু রাজা ভগবানের অংশ, সেই জন্ত তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয়। যদিও প্রাচীন হিন্দুগণ রাষ্ট্র-বিধাতার সৃষ্টি এই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তবু তাঁহারা রাজ্যের স্বেচ্ছাচারিতা কখনো সমর্থন করেন নাই। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ পার্লামেন্টকে বলিয়াছিলেন, “A King can never be monstrously vicious. Even if a King is wicked, it means God has sent him as a punishment for people's sins and it is unlawful to shake off the burden which God has laid upon them. Patience, earnest prayer and amendment of their lives are the only lawful means to move God to relieve them of that heavy curse.” রাজার এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বদাই নিশ্চিত হইয়াছে। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

রাষ্ট্র-বিধাতার সৃষ্টি মতবাদ ব্যতীত সামাজিক চুক্তিবাদের বিবরণ পাওয়া যায় কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের আবির্ভাব নূতন নহে। হব, সু, লক্ষ, ক্রমশো প্রভৃতি দার্শনিকদিগের লেখায় এই মতবাদের বিকাশ হইলেও, অতি প্রাচীন কালেই ইহা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। ইহার প্রাচীনতম আভাস পাওয়া যায় প্লোর (৪২৮—৩৪৭ খৃঃ পূঃ) Crito নামক গ্রন্থে। সামাজিক চুক্তিবাদের মূল কথা হইল, আদিম কালে মানুষের কোন রকম শাসনতন্ত্র ছিল না। তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইত। একমাত্র প্রকৃতির রীতিনীতিগুলি তাহারা মানিয়া চলিত। তখন রাষ্ট্র ছিল না, সমাজের বন্ধন ছিল না। প্রত্যেকে নিজের নিজে ইচ্ছামত জীবন যাপন করিত। সে অবস্থাকে ‘প্রাকৃতিক পরিবেশ’ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিতে নানা প্রকার জটিলতা দেখা দিল তাহাদের জীবনে। নানা প্রকার বিদ্র আসিল। অস্ত্রায় করিলে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ নাই। এই সকল অনবিধা দূর করিবার জন্ত তাহারা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। সেই চুক্তিই ‘সামাজিক চুক্তি’ এবং এই চুক্তির ফলস্বরূপ রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

এই সামাজিক চুক্তির কথা কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ উল্লিখিত হইয়াছে। “মাংসভক্ষ্যের দ্বারা অভিভূত প্রজারা বৈবস্বত মনুর রাজ্য (নির্বান) করিল এবং দ্বাদশের ষষ্ঠ ভাগ, পণ্যের দশম ভাগ ও স্বর্ণের অংশ তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া স্থির করিয়া দিল। সেই কারণে দ্বারা ভূত (বর্ষিত) হইয়া রাজারা প্রজাদের কল্যাণ সাধনের জন্য হন। তাঁহাদের প্রদত্ত দণ্ড এবং গৃহীত কর পাপ দূর করে এবং

আনা শস্ত্রের বর্ষ ভাগ রাজকররূপে দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—‘যিনি আমাদের রক্ষক—এই অংশ তাঁহার। প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহারা নিগ্রহ ও অমুগ্রহ করিতে সমর্থ; অতএব তাঁহারা ইন্দ্র এবং যমের তুল্য। তাঁহাদের অবমাননাকারীদিগকে দেবদণ্ড স্পর্শ করে।’ (খবিসয়ে কৃত্যাকৃত্যপক্ষরক্ষণম্, অর্থশাস্ত্র)। অত্যাচারে প্রসীড়িত হইয়া প্রজাগণ বৈবস্বত মমুকে নির্বাচিত করিল এবং তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্ত কর প্রদান করিল। সূতরাং রাজা প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের ভূত্ব হইলেন।

অনুরূপ সামাজিক চুক্তির বিবরণ পাওয়া যায় বৌদ্ধশাস্ত্রে; যথা—দানবিকায় ও মহাবস্তু অবদানম্। বুদ্ধদেব রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। প্রথমে ছিল সুর্য্যময় যুগ। কোথাও দুঃখ-কষ্ট ছিল না, পাপ ছিল না। সকলেই সুখ-শান্তিতে বাস করিত। মানুষের বন্ধু-মাংস-গঠিত দেহ ছিল না; তাহারা ছিল মনোময় স্বয়ংপ্রভ। বায়ুর ভিতর দিয়া তাহারা চলাফেরা করিতে পারিত। দিনে দিনে আদিম পবিত্রতা-শ্রবণের সঙ্গে তাহাদের অবনতি হইতে লাগিল। ক্রমে বর্ণভেদ ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদোভেদজ্ঞান জাগিল। পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, সম্পত্তির উদ্ভব হইল। সেই সঙ্গে দেখা দিল নানা রকম পাপ। পরদ্রব্য-হরণের ভাব দেখা দিল সমাজে। তখন সকলে মিলিয়া এক জন রাজা নির্বাচন করিতে রাজী হইল। সে রাজা যথার্থ দোষীকে শাস্তি দিবেন এবং তাঁহার কার্যের বিনিময়ে উৎপন্ন ধাত্তের এক অংশ পাইবেন। তখন তাহারা, তাহাদের মধ্যে যিনি সর্বাঙ্গ-রক্ষক ও শক্তিশালী, তাঁহার সহিত উপরি-উক্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। সেই নির্বাচিত রাজা হইলেন ‘মহাজনসম্বত’। যেহেতু তিনি ক্ষেত্রের পতি (সন্তানাম্ পতি), সে জন্ত তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলা হইত। আইনামু-সারে প্রজাদিগকে রজনু (রঞ্জতি) করিতেন বলিয়া তিনি রাজনু। ‘মহাবস্তু অবদানমে’ উল্লিখিত হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তিকে পীড়ন ও দৈশ্বরকে আনন্দ দানের বিনিময়ে তাঁহাকে ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধাত্তের এক অংশ দেওয়া হইত।

সূতরাং মানুষেরা নিজেদের রক্ষা করিবার জন্ত যে সামাজিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইল, তাহার ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সামাজিক বিশেষ একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিল এই সামাজিক চুক্তিতে। হব্-সু-পতিত রাষ্ট্রের জয়বাদের সহিত হিন্দুদিগের মতবাদের আশ্চর্য-বলক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটা বৈষাদৃশ্য লক্ষিত হয়। হব্-সু-সের মতে সার্বভৌমিক ক্ষমতা শাসকের দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণীত মতবাদে, এই সামাজিক চুক্তির রাজা জনসাধারণের ভৃত্য হইয়া গেলেন। কারণ, উৎপন্ন শস্ত্রের বর্ষ ভাগ এবং পণ্যের প্রথম ভাগ তাঁহার বেতন-স্বরূপ। শাস্তিপূর্বক বলা হইয়াছে যে, এই-স্বরূপ ও অজ্ঞাত ভাবে রাজার যে আয় হইয়া থাকে, তাহা তাহার বেতন। এই জন্ত রাজা স্বৈরাচারী হইতে পারেন না।

আধুনিক লেখকগণ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরো কয়েকটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে একটি হইল ‘প্যাট্রিয়ার্কাল’ মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, প্রাচীন কালে কতিপয় পরিবারের লোকদিগের উপর অপ্রতিহত ভাবে একাধিপত্য প্রদর্শিত হইত। পরিবারের কর্তার ক্ষমতা ছিল অসীম।

তিনি পরিবারের কোন লোকের অঙ্গচ্ছেদ করিতে, এমন কি, তাহার প্রাণ লইতে পারিতেন। তাহাকে বিক্রয় করিবার অধিকারও কর্তার ছিল। এইরূপ বৃহৎ একাধিপত্য পরিবারের উল্লেখ হোমারের গ্রন্থে পাওয়া যায়। রোমান-পরিবারের কর্তার এইরূপ অধিকার ছিল। এই পরিবারের কর্তাই পরবর্তী কালে রাজার আসন গ্রহণ করিয়া রাজ্যস্থিতি করিয়াছিলেন। যদিও এই মতবাদ ভারতীয় সাহিত্যে পবিস্মৃত হইয়া উঠে নাই, তবু তাহার আভাস বৈদিক উপকথায় বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আছে; ঋজুখকে তাঁহার পিতা অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়, অনশ-শেষের পিতা তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিলেন উপবাস হইতে পরিবারকে রক্ষা করিবার জন্ত। ইহা হইতে বুঝা যায়, পরিবারের লোকের উপর কর্তার ক্ষমতা ছিল। প্রাচীন আর্য-সমাজ কতগুলি পরিবারে বিভক্ত ছিল; যথা—জন্মন, বিশ ও জন (ঋগ্বেদ, ২, ২৬, ৩)। খুব সম্ভবতঃ, জন্মন ছিল সেই গ্রাম, যেখানে অধিবাসিগণ এক জন পূর্ব-পুরুষকে স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ কতগুলি জন্মন মিলিত হইয়া একটি ‘বিশের’ স্থিতি হইল। বিশের কর্তাকে বলা হইত ‘বিশ-পতি’। আবার কতগুলি ‘বিশ’ একত্র হইয়া ‘জন’ স্থিতি করিল। ‘জনে’ অধিপতিকে ‘জন-পতি’ (বাজার তুল্য) আখ্যায় ভূষিত করা হইল। এইরূপ বৈদিক যুগের সমাজ সংগঠনের সহিত প্রাচীন রোমান সমাজ গঠনের মিল আছে। কতগুলি রোমান-পরিবার মিলিত হইয়া একটা gens হইল। কতগুলি gens একত্রে curia নামে অভিহিত হইল; আবার দশটি curia মিলিত হইয়া একটি tribe বা গোষ্ঠী হইল। সূতরাং এই সকল প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এইরূপ কতটি-প্রভাবান্বিত একাধিপত্য পরিবার হইতে।

### রাষ্ট্রের স্বরূপ

(১) স্বামী, (২) অমাত্য, (৩) মিত্র, (৪) জনপদ, (৫) দুর্গ, (৬) কোষ ও (৭) দণ্ড—এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইগুলি সপ্তাঙ্গ-মতবাদ নামে প্রচারিত। রামায়ণ ও মহাভারতে, রাজগণ বাহাতে এই সপ্তাঙ্গ বস্ত্র-সহকারে রক্ষা করেন, এই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সপ্তাঙ্গগুলি পরস্পর নির্ভরশীল এবং রাজ্যের ভ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ। স্বামী অর্থাৎ রাজা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ এবং অজ্ঞাত অঙ্গগুলিও ভিত্তি-স্বরূপ। রাজধর্মামুসারে প্রজার হিতসাধন করাই হইল রাজার কর্তব্য। মহাভারতে অনেক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা তাঁহার স্বীয় কর্মের দ্বারা রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি অথবা অশান্তির স্থিতি করেন। “ভূপালগণের ব্যবহা-বদশতই সত্য, দ্রোতা, ধাপর ও কলি এই চারি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তন্নিবন্ধনই রাজা যুগ-স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।” স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিবার জন্ত রাজাকে কার্যকরী নীতি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। “অন্তের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সূতরাং অন্তের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কার্যমুঠানে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। বাহ্যিক কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ভাগ হইলেও শত্রুরা

তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর, যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও শক্ররা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না।" (১৬৮ সং, শাস্তিপদ)। যাহারা মনে করেন যে, ভাবতবর্ষে অধ্যাত্মবিজ্ঞার আলোচনাই শুধু হইত, এইরূপ কূটনীতি তাহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবে। প্রাচীন ভারতে বহু মেকিরাতেলিও আকির্ভাব হইয়াছিল।

রাজ্যের অন্ততম অঙ্গ হইল অমাত্য। ভারতের নীতিশাস্ত্র-কারগণ বলিয়াছেন যে, রাজ্যশাসনে অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীন কাল হইতেই রাজ্যশাসন ব্যাপারে অমাত্য ও মন্ত্রীগণের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা এবং মহাভারতে কুরুপ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অমাত্য ও মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করা হইবে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। "কুলীন, সচরিত্র, ইঙ্গিতজ্ঞ, দয়ালু, দেশ-কালজ্ঞ ও প্রভুহিতৈষী ব্যক্তিগণকেই অমাত্যপদ প্রদান করা ভূপতির কর্তব্য।" এই সকল অমাত্য ও মন্ত্রী গুণচরিত্র দ্বারা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইতেন। শাস্তিপর্বের ৮৫ অধ্যায়ে ভীষ্মদেব অমাত্যদেব সন্ধক্ষে বলিয়াছেন, "চারি জন সুপবিত্র বেদবিজ্ঞাবিশারদ স্বাতক ব্রাহ্মণ, আট জন অস্ত্রধারী মহাবলশালী ক্ষত্রিয়, অতুল ঐশ্বর্যশালী একবিংশতি বৈশ্য, বিনীত-স্বভাব অতি পবিত্র তিন জন শূদ্র এবং এক জন গুপ্তচরাদি অষ্টগুণ-বিশিষ্ট পুণ্যগণেরা সূতকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা তোমার কর্তব্য। অমাত্যগণ সকলেই যেন পঞ্চাশং বয়সবয়স্ক, বিনীত, বুদ্ধিমান, অপক্ষপাতী, বিচারক্ষম, লোভবিহীন ও মুগয়াদি সপ্ত প্রকার দোষশূন্য হন।"

মিত্রকে সপ্তাঙ্গের একটি অঙ্গ বলা হইয়াছে। মিত্র চারি প্রকার, —এককায়, সংসাদনোজ্ঞত, অমুগত, সহজ ও কৃত্রিম। ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তিও নৃপতির মিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও তাহারা মিত্র, তবু রাজা তাহাদিগের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া লইতেন। উপরিউক্ত চারি প্রকার মিত্রের মধ্যে অমুগত ও সহজ মিত্রই উৎকৃষ্ট। অপর দুই প্রকার মিত্রকে বাজা ভয় করিয়া চলিতেন।

জনপদ (territory) রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি-স্বরূপ। ইহা বিচার করা হইত তিনটি গুণ দ্বারা—আয়তন, জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতি। চাণক্য জনপদের গুণগুলি পূর্ণ ভাবে বিচার করিয়াছেন। তাহার মতে আদর্শ জনপদ হইবে বিস্তৃত; আত্মনির্ভরশীল; দুঃসময়ে বহিরাগতদিগের রক্ষণে সমর্থ; আত্মরক্ষায় ও শত্রু-প্রতিবোধে সমর্থ; পার্শ্ববর্তী রাজ্যগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় শক্তিসম্পন্ন; শিলা-বিহীন; জলাভূমি, মরুভূমি ও অসমতল ভূমি হইতে মুক্ত; তক্ষর-শাপদ-জঙ্গলশূন্য; উর্বর ক্ষেত্র, আকর, মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য, হস্তা-অধ্যুষিত জঙ্গল এবং পণ্ডিতগণ-ভূমিযুক্ত; শক্তিশালী; গুপ্তপথ-যুক্ত; গবাদি পশুপূর্ণ; প্রাকৃতিক বারিবর্ষণে নির্ভবশীল নহে; স্থলপথ ও জলপথ-যুক্ত; বাণিজ্যিক দ্রব্যে পরিপূর্ণ; করভার বহনে সমর্থ; পরিশ্রমী কৃষিজীবীর আবাসস্থল; শিশু ও ইনজাতিপূর্ণ; সং ও রাজতন্ত্র প্রজাপূর্ণ।

কোষের প্রাধান্য অত্যাঙ্গ অঙ্গ হইতে কম নহে। আবার কোষ ও রাজ্যরক্ষা করিতে হইলে বলের প্রয়োজন। "স্বীয় ও পরকীয় রাজ্য

সংগ্রহ করিয়া বিবেচনা পূর্বক ব্যয় করাই ভূপতিদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।" বল না থাকিলে কোষ রক্ষা হয় না; কোষরক্ষা না হইলে বল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কোষ, বল ও মিত্র পরিবর্তিত করা রাজাদিগের নিত্যন্ত আবশ্যক।" রাজ্যরক্ষার জগ্ন্য দুর্গের প্রয়োজন। মহাভারত, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার দুর্গের নাম ও গঠন বর্ণিত হইয়াছে।

এই ত গেল সপ্তাঙ্গ মতবাদের কথা। তৎকালীন বহু-প্রচারিত শাসনতন্ত্রগুলির মধ্যে রাজতন্ত্র নীতিশাস্ত্রকারগণ কর্তৃক অধিক সমর্থিত হইয়াছে। মহাভারত, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ রাজ্যশাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীকবর্ণন পক্ষে মত দিয়াছে। তাহার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক। শাস্তিপর্বের ৮-৭ অধ্যায়ে ভীষ্ম রাজ্য-পালন সন্ধক্ষে বলিতেছেন, "নরপতি কাহাকে এক গ্রামেব, কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের, কাহাকে শত গ্রামেব ও কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য প্রদান করিবেন। এই সমুদায় গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া যথাবিধানে প্রজাপালন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এক গ্রামাধিপতি দশ গ্রামের অধিপতিব সমীপে, দশ-গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির সমীপে এবং বিংশতি গ্রামেব অধিপতি শত গ্রামেব অধিপতির সমীপে নিজ নিজ অধিকারস্থিত মনুষ্যদিগের দোষ নির্দেশ করিবে।.....এ সমুদায় গ্রাম-রক্ষকের সংগ্রাম ও গ্রাম-সম্পর্কীয় অত্যাঙ্গ কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জগ্ন্য এক জন আলমুহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে এবং প্রতি নগরের কার্য-সন্দর্শনার্থ এক-এক জন সর্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা ভূপতির কর্তব্য। গ্রহণ যে প্রকার নক্ষত্রদিগের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে, সেইরূপ সর্বাধ্যক্ষবর্গ সমস্ত সভাসদের উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া চর দ্বারা তাহাদিগের ব্যবহাব পরীক্ষা করিবেন।" অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদ অধিকতর সমর্থিত হইয়াছে।

রাজতন্ত্র ব্যতীত অত্যাঙ্গ প্রকাবের শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সাধারণতন্ত্র কর্তৃকগুলি রাজ্যে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সাধারণ প্রজাদের অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল সাধারণতান্ত্রিক রাজ্যগুলির গঠন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের ছিল। স্ব-রাজ্যের শাসনকর্তা স্ব-রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইতেন। সাধারণের মধ্য হইতেই গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বরাজ্যের সভাপতিরূপে নির্বাচন করা হইত। রাজাবিহীন শাসনতন্ত্র বৈরাজ্য নামে অভিহিত হইত। উত্তর-ভারতের কতকগুলি গোষ্ঠীর শাসনতন্ত্র বৈরাজ্য বলিয়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে। বৈরাজ্য ছিল পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার গণতন্ত্র ছিল,—'অরাজক'।

কিন্তু এই সকল সাধারণতান্ত্রিক রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ, আলেকজান্ডারের আক্রমণে এই রাজ্য-গুলির দুর্বলতা ও ত্রুটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জগ্ন্য প্রজাগণ চন্দ্রগুপ্তের স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্রের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিল। ইহার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়াছিল যথেষ্ট। Justin সে জগ্ন্য বলিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্ত

servitude the very people he had rescued from foreign dominion.” প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের যাবতীয়

কর্তৃত্ব রাজার হস্তে জ্ঞাত হইয়াছিল। রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল সভা ও সমিতির জ্ঞান। সভা ও সমিতির মতামত রাজা মানিয়া চলিতেন, মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাহা ছাড়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন না করিলে নরকবাস হয়, এই ভয়ও ছিল। অত্যাচারী রাজার নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ মহাভারতে আছে,—

“অরক্ষিতাঃ স্ত্রীয়াং বিলোপ্তারমনায়কম্।

তাৎ বৈ রাজকলিং হন্যাঃ প্রজাঃ সন্নহনির্ণয়ম্।”—অমু, ৬১, ৩২-৩৩ অর্থাৎ, যে রাজা রক্ষা করে না, শুধু অর্থ হরণ করে, বিলোপকারী এবং নায়কশূন্য সেই অধম রাজাকে প্রজারা মিলিত হইয়া নিদয় ভাবে হত্যা করিবে।

### রাষ্ট্রের লক্ষ্য

হিন্দুর মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল ‘ধর্ম’ রক্ষা করা। এই ধর্মের প্রকৃত অর্থ অতিশয় ব্যাপক। ইংরেজীতে যে অর্থে religion শব্দ ব্যবহৃত হয়, এখানে ইহা শুধু তাহাই নহে। ইহার অর্থ আরও বিস্তৃত। প্রাচীন হিন্দুগণ দেখিয়াছেন যে, এক চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মে সমস্ত বিশ্ব-চরাচর পরিচালিত হইতেছে। চন্দ্র, সূর্য ও ঋতুগুলি একই নিয়মে আবর্তিত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মই হইল ‘রীতি’। মানুষের কার্যকলাপ এই ‘রীতির’ দ্বারা নিয়মিত করা উচিত। বৈদিক যুগে ‘রীতি’ শব্দটির প্রচলন ছিল। পরে উপনিষদের যুগে ‘ধর্ম’ ‘রীতি’র স্থান গ্রহণ করিল। জ্ঞান, দণ্ড, কর্তব্য প্রভৃতিকে ‘ধর্ম’ নির্দেশ করে। রাষ্ট্রের সৃষ্টি এই ধর্মের জ্ঞান। ধর্ম না থাকিলে ‘মাংসভ্রাতৃত্ব’ প্রাণ্ডুর্ভাব হয়। তখন জ্ঞান, শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু থাকে না; কারণ, রাষ্ট্রই এইগুলির স্রষ্টা। এক কথায় ধর্ম বিনা রাষ্ট্র নাই। বশিষ্ঠ ও বৌদ্যন্যের মতে, ধর্ম হইল শিষ্ট অর্থাৎ স্ববিধগণের আচরিত কর্ম। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সদাচারই ধর্ম।

আইন অর্থে ধর্মের আদর্শ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’—‘রাজ্যম্ আজ্ঞা’। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নারদ, শুক্ল ও জৈমিনির শাস্ত্রে। নারদ-মুখ্যিতে আছে, কর্তব্য পালনের অভাব লক্ষিত হওয়াতে ‘ব্যবহার’ প্রচলিত হইয়াছে। দণ্ড দ্বারা (শাসনের ক্ষমতা) রাজা আইন রক্ষা করেন বলিয়া লোককে দণ্ডের বলা হইয়া থাকে। Coercive power বলিতে আমরা বাহা বুঝি, দণ্ডের অর্থ তাহাই। শুক্লার্চ্য উপদেশ দিয়াছেন যে, চক্ৰ-নিবাদ করিয়া শাসন-পত্র প্রবর্তিত করিতে হইবে।

‘মাংসভ্রাতৃত্ব’ কালে ‘মমত্ব’ অর্থাৎ ‘স্বত্ব’ বলিয়া কিছু ছিল না। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর হইতে ‘মমত্ব’ অর্থাৎ ‘স্বত্বের’ সৃষ্টি হইল। দণ্ডের প্রয়োজন এই ‘মমত্ব’ রক্ষা করিবার জ্ঞান। রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য সূচকরূপে পালিত না হইলে, তাহাকে নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত।

“যৌ গ্রাম-দেশ-সজ্ঞান্য কৃথা সত্যেন সবিদম্।

বিসংসেদমরো লোভাতঃ রাষ্ট্রাধিবাসয়েৎ।”

—মহুসাহিত্য ৮, ২১১।

গ্রাম-দেশ-সজ্ঞের স্বার্থ রক্ষা করিবে বলিয়া শপথ পূর্বক প্রতিজ্ঞা করার পর যদি সে ব্যক্তিগত লোভের বশবর্তী হইয়া পূর্ণোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তবে তাহাকে রাষ্ট্র হইতে বাহিন্য করিয়া দিবে। রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃতির (প্রজাব) কর্তব্য বহুবিধ। শুক্লার্চ্য বলিয়াছেন যে, শুধু কর্তব্যগুলি অজ্ঞায় কার্য হইতে বিরত হওয়াই প্রকৃতির কর্তব্য নহে, তাহার আবাহনীয় ব্যক্তিগণকে ধরাইয়া দিবে অথবা প্রকাশ করিবে। দুর্জন, চোর, দুশ্চরিত্রকে আবৃত্ত করিয়া রাখিবে না। কোটিল্যও নাগরিকদিগকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইবার জ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ‘স্ব-ধর্ম’ রক্ষা করা। কাহারো স্ব-ধর্ম নিৰ্মীত হইত, কোন বর্ণে তাহার জন্ম তাহাব দ্বারা। প্রাচীন কালে বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি হয় শ্রম-বিভাগের জ্ঞান। তখন গুল্য অনুযায়ী কেহ তাহার বৃত্তি গ্রহণ করিত। কিন্তু কালক্রমে এই সঙ্করণশীলতা নিষিদ্ধ হইল। তাহার ফলে যে সামাজিক অচলায়তনের সৃষ্টি হইল, তাহাতে সমাজের হানি হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রের যাবতীয় সুবিধা ভোগ করিত, আর বৈশ্য ও শূদ্র শুধু উচ্চবর্ণের সেবা করিয়া যাইত। যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, কোটিল্য, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি শাস্ত্র চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম কি, তাহার এক বিবরণ দিয়াছেন। মানুসের ধর্ম হইল অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, সংযম, পবিত্রতা, চুরি না করা, দয়া, ক্ষমা, ক্রোধ-বর্জন ইত্যাদি। এই সকল ব্যতীত উপরি-উক্ত শাস্ত্রগুলিতে প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম হইল ইন্দ্রিয়দমন, বেদাধ্যয়ন, দান-গ্রহণ। ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। বৈশ্যগণ দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সহপায় দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং পশু-পালন করিবে। ইহা ব্যতীত অজ্ঞ কোন কর্ম তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ধর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রিপূর্বক ৬০ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, ‘ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের দাস হইবে বলিয়া শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বর্ণত্রয়ের পরিচর্যা করাই শূদ্রের উৎকৃষ্ট ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিপালন করিলেই শূদ্র পরম সুখী হইতে পারে। শূদ্র অর্থ সঞ্চয় করিলে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতি তাহার বশবর্তী হইতে পারেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে পাণী হইতে হয়; অতএব ভোগ-বিলাসী হইয়া তাহার ধন সঞ্চয় করা কদাচ কর্তব্য নহে।’ কোটিল্য বলিয়াছেন যে, স্বধর্ম-পালন করিলেই ‘স্বর্গ’ ও ‘আনন্ত্য’ লাভ করা যায়। ইহা লক্ষ্যন করিলে, বর্ণগুলিও তাহাদের ধর্মের বিশৃঙ্খলার জ্ঞান পৃথিবীর অন্তিম কাল উপস্থিত হয়। কাজেই রাজা কখনো তাহাদিগকে স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতে দিবে না। কারণ, আর্থব্যবহার অবলম্বন ও বর্ণ-ধর্ম অনুসরণ করিয়া যে স্বধর্ম পালন করে, ইহালোকে ও পরলোকে সে সুখী হয়। কারণ, এই তিন বেদের বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইলে, এই দুনিয়ার অবশুজ্ঞাবী উন্নতি হইবে, কখন ধ্বংস হইবে না।

ঐতিহাসিক বেণীপ্রসাদ ‘ধর্মের’ প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা এক দিকে সুবিধাভোগী দ্বিজগণ এবং অপব দিকে অধীন সর্বহারাদের দ্বারা গঠিত (Government in Ancient India p, 26)। প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের লোকেরা তাহাদের প্রাধান্য বজায় রাখিতে সর্বদা সচেষ্ট ছিল। Richard Fick বলিয়াছেন, “The more Brahmanical

culture spread in the course of centuries, the more did the priestly classes succeed in stamping their desired physiognomy upon the Indian society through their religions and social influence." হিন্দু আদর্শ, ধর্ম সমাজের মহান কল্যাণ সাধন করে। বর্তমানে আমরা Social good বলিতে যাচা বুরি, তাহা তৎকালীন সামাজিক কল্যাণ হইতে পৃথক্। সেই সময়ে সমাজের মহান কল্যাণ নির্ভর করিত, প্রত্যেকে আপন আপন স্ব-ধর্ম পালন করিতেছে কি না তাহাৰ উপর। এই সকল কারণে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের লোকেরাই শুধু সমাজের কল্যাণ উপভোগ করিত পাবিত। স্তন্যবর্ণের লোকেরা লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া উচ্চবর্ণকে সেবা করিয়া যাউত। রাজ্যের ব্যবসায় স্থবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল।

বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হইল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের কুফলের প্রতিবাদ-স্বরূপ। বর্ণ-বর্ণে, শ্রেণীতে-শ্রেণীতে যে প্রভেদ ছিল, তাহা অস্বীকৃত হইল এই ধর্মে। জাতি-ধর্ম-নির্দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনা আসিল। বৌদ্ধ-রাজগণের মতে রাষ্ট্রের আদর্শ হইল, সকল ধর্মের সার কতকগুলি নীতি প্রজারা মানিয়া চলিতেছে কি না তাহা লক্ষ্য করা। কারণ, এইগুলি মানিয়া চলিলে প্রজাগণ ঐতিক ও পারলৌকিক সুখলাভ করিবে। প্রিয়দর্শী অশোক যদিও বৌদ্ধ ছিলেন, তবু তিনি জোর করিয়া প্রজাদের উপর তাঁহার ধর্ম চাপাইয়া দেন নাই। তাঁহার মতে, বৌদ্ধধর্মের 'অষ্ট-পন্থা'—যাহা সর্বকালেব সর্বধর্মাবলম্বী লোকের অবশ্য পালনীয়—রক্ষা করাই রাষ্ট্রের আদর্শ। তাই তিনি তাঁহার মতামতগুলি পর্বত-গাত্রে ও শিলাখণ্ডের উপর উৎকর্ষ করিয়া প্রজাগণকে জানাইয়া দিয়াছেন—তিনি ইহা চাচেন, আর অজ্ঞায় কার্যগুলি অপছন্দ করেন।

## লটারী খেলা

ভাগ্য মানে ন' কে? ভাগ্য যদি কেউ না মানতো, ভাগ্য কথাটি কেন সৃষ্টি হ'ল? ভাগ্য কথাটি থাকবে কেন অভিশ্রুতি? এই মুহূর্তে যে রাজা, পব-মুহূর্তে তাকে হর্যোতা ফকির হতে হল ভাগ্যের খেলায়। ভাগ্যের জোবে কেউ হচ্ছে বাজা আবার ভাগ্যের ফেবে কেউ হচ্ছে প্রজা। ভাগ্যই মানুষের স্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ কবছে। ভাগ্যই যত কিছু জয়-পরাজয়েব নিয়ন্ত্রণ। প্রগতিপন্থী জাতির আবার ভাগ্যকে কেয়াব করে না। তাদের মতে, মানুষই মানুষের ভাগ্যকর্তা। কৃতকর্মের ফলে মানুষ নিজেব ভাগ্যকে ভাল এবং মন্দ দিকে পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু নিবন্ধ এবং অশিক্ষিত জাতি এ কথায় সায় দেয় না। ভাগ্যের পদেই তাদের নির্ভর। বাঙলা দেশেও কথায় কথায় ভাগ্যের দোহাই পাড়ে লোকে। বাঙলা দেশেই দেখা যায়, কলকাতার মত শহরে মাঠ-ময়দানে আব দীর্ঘব দৌবে মুখ্যতম ব্যক্তিবাহু ছক কেটে আর ভাঁওতা মেবে হ'পয়সা কামাচ্ছে নিবন্ধর আর অশিক্ষিতদের ভাগ্যকল বলে দিয়ে। তাদের কাছে উপরীত আব তুলসীব কঠী, কপালে সিঁদুর-চন্দনের কোঁটা, মুখে তুবড়ী আর পেটে কি আছে তা আর না বলাই ভাল। তবুও হ'পয়সা হচ্ছে তাদের। এত কথাব কি দরকার, মশ্রুতি কলকাতাব কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রকে পর্যন্ত মানুষের রাশি মিলিয়ে ভাগ্যফল ঘোষণা কবতে দেখেছেন অনেকই। কারণটা আর কিছুই নয়, অন্ধ দেশবাসীকে ঠিকিয়ে কাগজের চাতিদা বাড়িয়ে হ'পয়সা কামানো। যাতে ভাগ্যানিয়ন্ত্রাকে কেউ চিনে ফেলে সেজন্ত আবার ভাগ্যকর্তার নামটা থাকে ভাঁড়ানো। আগামী হস্তার ফলাফল জানিয়ে দেশবাসী ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন ভবিষ্যৎকল্প।

এই ভাগ্য-খেলাব অজ্ঞতম খেলা হল লটারী। লটারীর বন্ধ্য কি বলতে পারেন? একটি অর্থ আছে, কথাটি একেবারেই অজ্ঞাত। লটারী অর্থে সৃষ্টি খেলা। লটারীতে মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা হলেও, তথাকথিত জ্যোতির্বিদের মত ঠকবাজীর খেলা খেলে না লটারী। লটারী ঠিক জুয়া নয়। লটারীতে অনেক জাতীয় কৌশল হওয়ার স্বাক্ষর আছে ইতিহাসে।

লটারীর প্রথম প্রচলন হয় ইংলণ্ডে, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠানের সেবার নিমিত্তে সর্বসমেত ৪,০০,০০০ টিকিট বিক্রয় হয়। তার কিছু পরেই ব্রিটিশ মিউজিয়াম তৈয়ারী হয় লটারীর টাকায়। গ্রীনউইচ হাসপাতালও তৈয়ারী হয় লটারী খেলার অর্থে। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান লণ্ডন কোম্পানী আমেরিকায় বিলেতী উপনিবেশ স্থাপনের অর্থ সংগ্রহ কবে লটারী মারফৎ। ব্যবসা আব সাধারণের সেবার জন্তে ইংরেজ এবং আমেরিকান খ্যাতিমান ব্যক্তির লটারীর আশ্রয় গ্রহণ করেন 'ন্যূয়াপুর্বি' ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। প্রায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন হাসপাতালের জন্তে জাতীয় লটারী খেলার সূত্রপাত হয়—যার সাম্প্রতিক নাম সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত, সেই 'আইরিস স্ট্রীপ টেক্স'।

আমেরিকায় লটারীর প্রচলন হয় ১৩০৮—১৪২৫ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে উপনিবেশ স্থাপন ষ্টেট কিংবা কংগ্রেসের সামরিক প্রয়োজনে অর্থের দরকার হলেই লটারী খেলা হত। আমেরিকায় বিখ্যাত ফ্যানিউইল হল, বর্টন, ষ্টেট হাউস, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি অগ্নিকাণ্ডের পর আবার তৈয়ারী হয় লটারীর টাকায়। রাস্তা-ঘাট আর শহর নির্মিত হয় আমেরিকায় এই লটারীর টাকায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মাউন্টেন রোড লটারীর অজ্ঞতম পরিচালক ছিলেন জর্জ ওয়াসিংটন। ইয়েল, হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, উইলিয়াম ম্যারী ও কলম্বিয়া কলেজ এবং পেন্সিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় লটারীর অর্থে গঠিত হয়। তা ছাড়া ইউরোপে অনেক গির্জা লটারীর টাকায় গঠিত হয়েছে।

প্রায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে লটারীকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছে ইউরোপ। লটারীর দ্বারা দেশ আর দেশবাসীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেখানে। ভাগ্য এখানে যেমন ঠকবাজীর খেলার সামগ্রী, সেখানে ভাগ্যের খেলায় দেশসেবার কার্য হয়।

বাণী ভেসে আগছে—শুনতে পাচ্ছি। “জয় হইবে, ভারত-বর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্ধাক, তাহারই জয় হইবে।” আমরা যাহারা ইংরাজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আশ্বাসন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

মিলি মিলি গাওব সাগর-লহরী সমান।

‘তাহাতে নিস্তরঙ্গ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভ্রাম্যচ্ছন্ন মৌন ভারত চতুঃপাশে যুগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে—আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকঙ্কাগণকে কোট-ক্লক পণাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্ত চিত্তে আমাদের পৌত্রদের জ্ঞাত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, এতারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে আসিয়া করজোড়ে কহিবে, ‘পিতামহ, আমাদের মস্ত দাঁও।’

তিনি কহিবেন, ‘ও ইতি ব্রহ্ম’;

তিনি কহিবেন, ‘ভূমৈব স্ত্রথম, নাম্নে স্ত্রথমস্তি’;

তিনি কহিবেন, ‘আনন্দঃ ব্রহ্মণো বিধান ন বিভেতি কদাচ ন’।

এ মস্ত ভারতাস্থার মস্ত—ধ্বনিত হয়েছে বাণীসাদক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে আমাদের এই যুগে। এ বাণী বহু যুগের। এ বাণী চিব-পুণাতন। এ বাণী তবু নূতন। এ বাণী ভারতাস্থার আগমনী। এ বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। আজ তাঁর আবির্ভাব-তিথি। ভারতাস্থার বাণীতেই তাঁর আগমনী গীত হোক।

মাধুসূদনের মন আত্মপ্রকাশ করে আসছে স্বরণাতীত কাল থেকে বিভিন্ন সমাজ ও জাতিকে আশ্রয় করে চিন্তা-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে। সভ্যতার উপান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিও উঠছে পড়ছে। ইতিহাস শুধু এই উপান-পতনের সংবাদ পরিবেশন করেই চুপ হয়ে যায়নি, একটি মহৎ শিক্ষাও দিয়েছে যে, যে-জাতির ভিত্তিমূলে সত্য বস্তু, সে-যাতি কালপ্রবাহের ঘূর্ণিপাকে পড়েও তার সভা একেবারে হারিয়ে ফেলে না। পৃথিবীর ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে যদি দেখা যায়, এখানে পুরনো দিনের গ্রীক ও আজকের যুরোপীয় জাতির কথায় দণ্ডবাক্য শিউরে উঠে। তাই ভারত-পথিক স্বামীজী বলেছিলেন : “সাধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর গঠিত না হলে সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসবিধগু হয়ে যাবে।”

কেন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, সে-প্রশ্নের জবাব আজকের দিনের প্রগতিশীলদের মনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তবু স্বরণ করি ভারতাস্থার বাণী—নচিকেরা বলছেন যমকে, “মানবচিত্ত কেবল ঐক্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। আমি যখন সর্বৈক্যধাপতি (মম) তোমার দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি তখন বিস্তাদি দত্তই আসিয়া উপস্থিত হইবে—তুমি যত দিন প্রভু হইয়া রাজত্ব করিবে তত দিন জীবিতও থাকিবে, স্ত্রতরাং এ ক্ষণস্থায়ী বস্তু আমার কাম্য নহে। আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বস্তুই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়।”

ভারতাস্থার প্রথম ও প্রধান কথা সমগ্র মানবের প্রথম ও প্রধান কথা। সে কথা তার আত্মাকে নিয়েই। কী উপায়ে পরম ধন্যতাকে পাওয়া যেতে পারে—এর চেয়ে গুরুতর প্রশ্ন মানব-মনে নেই। এই প্রশ্নের সমাধান-চেষ্টাই সে নিরন্তর করে আসছে এবং ‘নন্ত কাল ধরে করেই চলবে।’ উপনিষদে দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাত্মম-প্রাণ করে যাবার কালে হুই পত্নীর মধ্যে ধনাদি বস্তুন করে দেবার স্তব হুইজনকেই ডাকলেন। কিন্তু বিধবী মৈত্রেয়ী বাইরের বিত্তবিভবে সন্তোষলাভ না করে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন :

# ভা র তা স্না শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীচিন্তরঞ্জন দেব (শাস্তিনিকেতন)

‘যেনাহং নামৃত্যাম্ কিমহং হেনে কৃধ্যাম্’

যদি এট সমস্ত পৃথিবী বিস্তে পূর্ণ হয়, আমি কি তাহাতে অমৃত হইতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরে ‘না’ এই কথাট মৈত্রেয়ী শুনতে পেয়েছিলেন এবং শুনেছিলেন, “ওগো, আত্মারই দর্শন করা উচিত, আত্মারই শ্রবণ, মনন, ও ধ্যান করা উচিত।”

এই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ দেখতে পাই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ পবনমংস-দেবের মধ্যে। তাই তাঁকে বলতে চাই যে তিনি ভারতাস্থা।

অনেক যুগের অনেক কথা রয়েছে। সকল কথা কেউই জানে না। যা জানা আছে তা-ও বলা হয়ে ওঠে না। তবু যেটুকু না বললে অপরাধ হয় সেটুকুই বলার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কথা নয়, যিনি ভারতাস্থার মর্মবাণী শুনবাব জন্তে সারা জীবন কান পেতেছিলেন—আর গেয়ে উঠেছিলেন :

‘কথা কও, কথা কও,

অনাদি অতীত অনন্ত রাতে কেন বসে চেয়ে রও—

হে অতীত?’

সেই বাণীমূর্ত্তি রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে ভাবতবর্ষের মর্মোদ্ঘাটন যেমন সার্থক ভাবে হয়েছে, তেমনটি আব কোথাও দেখা যায় না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন প্রাণ পেয়ে তাঁব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কথা কয়ে উঠছে—সে কথা ভারতাস্থার। আজ আমরা শুনি :

“ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কি, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে—ভারতবর্ষের ইতিহাস সে উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়-রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা। বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।”

ভারতাস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথামূর্ত্তে মধুবর্ণ করেছেন :

“কি জান, সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়। সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘুটি সব ঘর পার না হলে কি চিকে ওঠে? ঘুটি যখন চিকে ওঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

“আমাব সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে।

“দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলে আসছে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।”

“সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।

ন হিনস্ত্যাস্তান্যাস্তানং ততো যাতি পরাং গতিম্।”

সর্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আব নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি) তখনই পরমাগতি-প্রাপ্ত হন।

“ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ”

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বা-কিছু আছে, সব-কিছুতেই পরমেশ্বর ওতপ্রোত হয়ে আছেন।

ফরাসী দেশের অধিবাসী পৃথিবীখ্যাত বোঁমা বোঁলা তাঁর বিবেকানন্দ-জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—“No other religion has possessed it to this degree and with Vivekananda it was part of the very essence religion.”

এত দূর থেকেও তিনি জানতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের বাণী দৈবযোগে তাঁকে জাগ্রত করেছিল—তাই তিনি উৎসুকচিত্তে বিশ্ববন্দ্য বরীন্দ্রনাথকে লিখে পাঠিয়েছিলেন এ-সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সাহায্য করতে। বরীন্দ্রনাথ উত্তরে শুধু এই বলেছিলেন, “ভারতবর্ষকে যদি জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে চেষ্টা করুন।”

বোঁমা বোঁলা বিবেকানন্দকে জেনেছিলেন, তাঁকে জানতে গিয়ে জেনেছিলেন তাঁর গুরুমহারাজকে—ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে। মনীষী বোঁলা যুরোপীয় জাতিসমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ব্রাহ্ম-বিবেকানন্দের জীবনালোকের আদর্শ তাঁদের জীবনে স্থাপন করে গেছেন, এবং এই আশা নিয়ে গেছেন যে, এক দিন তাতে উপকারই হবে।

বরীন্দ্র-কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—“পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা তাহাই পোলিটিকাল উন্নতির ভিত্তি, এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা ইহাই ধর্ম নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি। যুরোপীয় সভ্যতা যে-একাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিবোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-একাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক।”

তাই ত জাতিব জনক গান্ধীর মুখে শুনি—“ভারতের প্রয়াস যদি বিফল হয়, এশিয়া মরিয়া যাইবে। ভারতবর্ষ বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালন-ভূমি। ভারতকে এষ্ট আখ্যা সংগত ভাবেই দেওয়া যায়। ভারতবর্ষ এশিয়া, আফ্রিকা অথবা সকল স্থানের শোষিত জাতিগুলির আশ্রয়স্থল হইয়া থাকুক।”

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার জওহরলালেরও প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে একই বাণীতে—“আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, যেখানে বাকি পৃথিবীর দেশসমূহ বিফল হয়েছে প্রাচ্য জগৎ সেখানে অক্ষুত সাফল্য লাভ করিবে। ইতিহাসে এ ব্যাপার বহু বার ঘটেছে এবং দেখা গেছে যে পূর্ব দিক থেকেই আলো আসে।”

সত্যি সত্যিই আলো পূর্ব দিক থেকেই আসে। সে আলো প্রজ্ঞার আলো। আমরা তা দেখি গৌতমবুদ্ধে, দেখি শ্রীচৈতন্যে; এরাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণে। এঁরা সবাই ভারতের আত্মা।

শ্রীরামকৃষ্ণের এক ভক্ত এক দিন বলছিলেন, “আমার বোধ হয় তিন জনেই এক বস্তু : যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব আর আপনি : এই তিনে এক।”

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, “এক এক, এক বই কি! তিনি যেন এর উপর এমন করে বসেছেন।” বলতে বলতে ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

Sir Humphrey Devy বলেছেন, “ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না। আবার

উপমা দিয়েছেন, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু সূর্যের আলো যেখানে পড়ে সেদিকে চাওয়া যায়।”

পরমাত্মার আলোতেই মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্ময় হয়েছেন। এই জ্যোতিতেই প্রকাশিত হচ্ছেন মানবাত্মা খুঁট, চৈতন্য। যত মত তত পথ।

আবার শুনি বরীন্দ্র-কণ্ঠে,—“বিধাতাই ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় অর্থ বৈশক্তি পাইয়াছে সেই শক্তি চর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব-জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনর্থ বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে—সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।”

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখি একটি ছবি : “আমি এক দিন দেখলাম, এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে—তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুন্সেফদার, কুকুর, আবার এক জন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শানকী—তাতে ভাত রয়েছে। সেই শানকীর ভাত সবাইএব মুখে একটু একটু দিয়ে গেল। আমিও একটু আশ্বাদ করলুম।

“আর এক দিন দেখালে বিষ্ঠা-মূত্র, অন্ন-ব্যঞ্জন, সব রকম খাবার জিনিস—সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাশ্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মতো সব আশ্বাদ করলে, যেন জিহ্বা লক্-লক্ করতে করতে সব জিনিস একবার আশ্বাদ করলে। দেখালে যে সব এক—অভেদ।”

বরীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টিতে দেখি : “বিদেশী বাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেবীতা ভীত হয় নাই। নাসা কুক্ষিত করে নাই। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে ব্যক্ত করিয়াছে।”

কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতা নিয়েই যত মুন্সিল। এই কথাটার না কি অর্থই বোঝা যায় না। কি করেই বা যাবে? যে বা আচরণ করেনি সে কি করে তার খবর জানবে? বরীন্দ্রনাথ কিন্তু বলছেন, “আমরা অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। এই জগতের কেন্দ্রস্থলে কি রহস্য লুপ্তায়িত তাহা আজও আমাদের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু কায়িক অস্তিত্বের প্রাচীরের মধ্য দিয়া আমরা যে স্তিমিত আলো দেখিতে পাইতেছি তাহাতে কায়িক জীবন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনেই আমাদের বিশ্বাস গভীরতর বলিয়া মনে হয়। কারণ, যে অব্যক্ত সত্যকে আমরা প্রকাশ করিতে অক্ষম তাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া থাকি। বাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের আচরণেও প্রকাশ পায় যেন তাঁহারাও ইহাতে আত্মবান, অন্ততঃ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জগৎকে অধিকতর সত্য বলিয়া মনে করেন। স্মৃতির বাঁহারাও সত্য-শিব-সুন্দরের জগৎ বৃত্তকে এই কায়িক জীবনের অবসানে বরণ করিতে প্রস্তুত। ইহাতে মানুষের আন্তরিক মুক্তিকামনা যে অসীম জগতের সত্যের সহিত

নিজের নিবিড় অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক উপলব্ধি করে সেই অসীম জগতে তাঁহার প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, “অনন্ত সমুদ্র। জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে অন্তরে বাইরে সেই পরমাঙ্গা। তবে ঘটটি কি? ঘট আছে বলে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে। ‘আমি’ ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ ‘আমি’টি যদি যায় তাহলে বা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।”

বলেন তিনিই, “চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাচ্ছিল, শংকরাচার্য নেয়ে ফিরছিলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেললে। শংকর প্রিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি?’

সে বললে, ‘ঠাকুর, আমাকেও তুমি ছোঁওনি, আমিও তোমাকে ছুঁইনি। তুমি বিচার করেই দেখ। তুমি কি দেহ; তুমি কি মন; তুমি কি বুদ্ধি?’

“শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণ—কোনো গুণেই লিপ্ত নয়।

“ব্রহ্ম কিরূপ জানিস? যেমন বায়ু। দুর্গন্ধ, ভালো গন্ধ সব বায়ুতে ভেসে আসছে—কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত।”

এমনি একটি মানুষ তিনি—যিনি সত্যের সহিত নিজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এক ভক্ত এক দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?”

তিনি বললেন, “তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়—আবার প্রেমের লিঙ্গযানি হয়।”

এ কথা শুনে ত ভক্তটি হো-হো করে হেসে উঠলেন। ঠাকুর কিন্তু শিশুর মতো সহজ মন নিয়ে আবার বললেন, “এমন একটি প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।”

ভক্তটি আবার গম্ভীর হলে ঠাকুর বললেন, “ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালোবাসা না এলে হয় না। খুব চাষা হলে তবেই ত চার দিক হৃদয়ে দেখা যায়। তখন আবার ‘তিনিই আমি’ এই বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হলে বলে ‘আমিই কালী’, গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বলতে থাকে ‘আমিই কৃষ্ণ’। তাঁকে রাত-দিন চিন্তা করলে তাঁকে চার দিকে দেখা যায়।” যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক তবে খানিকক্ষণ পরে চার দিক শিখাময় দেখা যায়।

ভক্তের মনে প্রশ্ন জাগে—ঠাকুর তা বুঝতে পারেন : বলেন, “তাঁর কৃপা না-হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার না-হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

“ছেলে অনেক দৌড়োদৌড়ি করছে দেখে মা’র দয়া হয়। না গুকিয়ে ছিলেন এসে দেখা দেন।”

ভক্ত ভাবছেন, কেন তিনি দৌড়োদৌড়ি করান। ঠাকুর অমনি বলছেন, “তাঁর ইচ্ছা যে, খানিক দৌড়োদৌড়ি হয়, তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরই নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তিরূপিণী মা’র শরণাগত হতে হয়। মায়াপাশে বেঁধে ফেলেছে। এই পাশ ছেদন করতে পারলে তবেই ঈশ্বরদর্শন হতে পারে।”

মায়াপাশের কথা শুনে ভক্ত শিউরে উঠেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে বলেন, “তাঁর কৃপা পেতে হলে আত্মশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে স্থিতি প্রসন্ন করছেন। তিনি অন্ত্রান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়। সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে চিনতে পারা যায় না।

“শক্তিই জগতের মূলধার। সেই আত্মশক্তির ভিতরে বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা দুই-ই আছে। অবিজ্ঞা মুগ্ধ করে—কামিনী কাঞ্চন; বিজ্ঞা ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়—ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেমের উদয় হয়। অবিজ্ঞাকে প্রসন্ন করতে হলে দরকার শক্তিসাধনা।”

ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, “সংসার ত্যাগ করতে হবেই?”

ঠাকুর বলেন, একটা জিনিসের ‘পর যদি আরেকটা জিনিস থাকে প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে অপর জিনিসটাকে সরাতে হবে না? একটাকে না-সরালে আবেকটা কি পাওয়া যায়? তাঁকে দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়? ধন, মান, বশ এক দিকে—আর তিনি আরেক দিকে। এক দিক ভুলে যাও, আরেক দিক খুলে যাবে।”

১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “পবমহঃসদেবকে আমি ভক্তি করি। ধর্ম নৈতিক ধর্মসবাদের যুগে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ উপলব্ধি কবিরূপে উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রশস্ত মন পবম্পরবিরোধী সাধন-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করিয়াছিল। সরলতা দ্বারা তিনি ঐশ্বর্য ও পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরকে শিক্ষার দিয়াছেন।”

এই পবমহঃসদেবই আমাদের ভারতাত্মা, একথা তাঁর জীবন থেকে ও বাণী থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। সকল ধর্মের সমন্বয় সাধন তাঁর জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি কি ভাবে এই সমন্বয়ের উপলব্ধি করতেন তাঁর কথায়ই শুনি, —“আমার ধর্ম ঠিক আব অপরের ধর্ম ভুল, এ মত ভাল নয়। ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে, এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি, আরেক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার। কিন্তু বস্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের এক একটি পথ ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়। বেদ পূবাণ তন্ত্রে প্রতিপাত্ত একই সচ্চিদানন্দ। বেদে সচ্চিদানন্দ—ব্রহ্ম; পুরাণে সচ্চিদানন্দ—কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি। তন্ত্রে সচ্চিদানন্দ—শিব। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব।”

নরেন্দ্র জিজ্ঞেস করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুরকে— “মা’ মা’ বে কর, মাকে কি দেখতে পাও তুমি?” জিজ্ঞাসার মধ্যে অবিখ্যাসের ভাব প্রচ্ছন্ন।

সহজ সুরে ঠাকুর বলেন, “দেখতে পাই কি রে, মার সঙ্গে বসে কথা কই, খাই, পাশটিতে শুয়ে ঘুমুই।”

বিজ্ঞপের সুরে নরেন্দ্র শুধায়, “মাথা-খারাপ, ঈশ্বরকে দেখা যায় কখনও—কোথায় থাকে সে?”



ঠাকুরের সজ্জ ভাষা, “নিচে, উপরে, সামনে, দক্ষিণে, উত্তরে—সেবেদ্য সর্বমিতি। ভিতরে বাইরে—বহিরন্তস্ত ভূতানাম্। আত্মকৃত্ত্ব, পর্যন্ত তিনি। অশবীর্য শবীরেণ অনবন্তেণ অবস্থিতম্। দেখবি বৈ কি, নিশ্চয়ই দেখবি। তোব এমন চোখ, তুই দেখবি নে?”

ঠাকুর ফরমাসে কবলেন, “গা ত সেই গানটা—‘যো কুছ হায়, সো কুছ হায়’।”

নবেন গান ধল। ঠাকুরের কী আনন্দ!

“সর্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম। যা কিছু তুই দেখছিস তোর চোখের সামনে সব তিনি। গাছ পাখি মানুষ সব। আকাশ মাটি বাতাস আগুন জড় চেতন—সমস্ত। নিত্যানিত্যানি চেতনচেতনানাম্। তিনি সর্বব্যাপী। সর্বাঙ্গীত স্বয়ং প্রকাশ।”

“কে—ঈশ্বর?”

অল্পতার শেষ সীমা পবমানু, আব বৃত্তের শেষ সীমা আকাশ। তেমনি জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-ব অল্পতার পবাকাষ্ঠা ক্ষুদ্র জীব, আর তাব আতিশয্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বর।

নবেন বললে, “সহজ করে বলুন।”

ঠাকুর বলেন, “কি বলছিস বে নবেন?” হাসতে হাসতে কাছে এসে নবেনকে ছুঁয়ে দিলেন ঠাকুর। ছুঁতেই সমাপ্তি হয়ে গেলেন তিনি। বাহুজ্ঞান নেই।

পবমপুরুষের ছোঁয়া লেগে নবেনেরও কি যে হল!

কি যে হল কে বলবে? চোখের স্রুগ থেকে একটা পদা উঠে গেল যেন। যেন চেতনান্তর হল। জনিস্ত্ব দুই চোখ বুজে গিয়ে জেগে উঠল কপালের শীর্ষে তৃতীয় নয়ন। চেয়ে দেখল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু নেই। ধূলিকণা থেকে আকাশ বিকাশ সূর্য পর্যন্ত সব কিছু ঈশ্বর। এ কি, চোখে ঘোর লাগল না? চোখ বুজলে নবেন। অন্ধকারেও সেই জ্যোতি, সেই ঈশ্বর।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিবেল নবেন। ইট কাঠ দবজা সব প্রাণময়। খেতে বসল—মনে হল খালা, বাটি, ভাত, ডাল সব-কিছুর মধ্যে ঈশ্বর বিরাজ করছেন। বিনি পরিবেশন কবছেন আর যে খাচ্ছে দুই-ই তিনি—সচ্চিদানন্দ।

ভাতের খালা সামনে নিশ্চন্দ্রের মতো বসে আছে নবেন।

মা এসে মনে করিয়ে দিলেন, ‘বসে আছিস যে রে, পা!’

খেতে স্রু কবল নবেন। কিন্তু কে খাচ্ছে, কি খাচ্ছে, যে খাচ্ছে সে কে এবং যাকে খাচ্ছে সেই বা কি।

ভোর হল তবুও ঘোব গেল না। কলেজে যাবার পথে গাড়ি এসে উঠছে গায়ের উপর। মনে হয় গাড়িও যা, সেও তাই। সব ঈশ্বরময়।

বিকলে হেদোব ধাবে বেড়াতে বেবিয়ে লোটার বেলিং মাথা ঠুকছে নরেন—‘বলু তুই কে? তুই কি ঈশ্বর?’ কোথাও কি অস্ত নেই? জাগরণে যে আছে স্বপ্নেও কি সেই? স্রুগুণ্ডিও কি ঠাতেই, সব-কিছুর অন্তরালেও কি সেই অখণ্ডস্বরূপ!

‘শুধু ঈশ্বর দেখছি এ হলোই চলবে না। আরও চাই। তাঁকে ঘরে আনতে হবে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে। রাজাকে ত পথ থেকে ঠাঁড়িয়ে দেখে অনেকেরই। কিন্তু আমি যে তাঁকে ঘবে আনতে চাই? আমি কি পারব না?’

তিনি পেরেছিলেন। ঈশ্বরকে ঘরে আনতে পেরেছিলেন স্বামী

বিবেকানন্দ। তাঁর সঙ্গে কথাও বলতে পেরেছিলেন। আমরা কি করে জানি? আমরা জানি তাঁরই মর্মবাণী থেকে:

‘বহু রূপে সমুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর

জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

বলছেন, ‘আমি সত্য দর্শন করেছি, তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে পার। আমি যে সাধন অবলম্বন করেছি তুমিও সেই সাধন কর, তাহলে তুমিও আমার মতো সত্য দর্শন করবে। ঈশ্বর সকলের কাছেই আসবেন সেই সমস্ত ভাব সকলেরই আয়ত্তের ভিতর রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি মানবধর্মের সারস্বরূপ, তাঁর নিজের স্রষ্টা নূতন বস্তু নয়।.....’

‘যেমন কোনো শরীরবিশেষের সমুদয় কোষগুলি মিলে একটি মানুষ হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জীবাত্মা যেন এক-একটি কোষস্বরূপ, এবং তাদের সমষ্টি ঈশ্বর—আর সেই অনন্ত পূর্ণ তত্ত্ব ব্রহ্ম তারও অতীত। সমুদ্র যখন স্থির থাকে, তখন তাকে বলা যায় ব্রহ্ম, আর সেই সমুদ্রে যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন তাকেই আমরা শক্তি বা মা বলি। সেই শক্তি বা মহামায়াই দেশকালনিমিত্তস্বরূপ। সেই ব্রহ্মই মা। তাঁর দুই রূপ—একটি সর্বিশেষ বা সত্ত্ব, এবং অপরটি নির্বিশেষ বা নিমিত্ত। প্রথমোক্ত রূপে তিনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ; দ্বিতীয় রূপে তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সেই নিরূপাধিক সত্তা থেকেই ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এই ত্রিভূত ভাব এসেছে। সমস্ত সত্ত্বা যা কিছু আমরা জানতে পারি, সবই এই ত্রিকোণাত্মক, এইটিই বিশিষ্টাষ্টৈত ভাব।.....’

‘সেই জগদম্বার এক কণা, এক বিন্দু হচ্ছেন কৃষ্ণ, আর এক কণা বুদ্ধ, আর এক কণা খুঁট। আমাদের পার্থিব জননীতে সেই জগদম্বার যে এক কণা প্রকাশ রয়েছে তারই উপাসনাতে মহত্ব লাভ হয়। যদি পরম জ্ঞান ও আনন্দ চাও, তবে সেই জগজ্জননীর উপাসনা কর।.....’

‘জীবের মধ্যে মানুষই সর্বোচ্চ জীব, আর পৃথিবীই সর্বোচ্চ লোক। আমরা ঈশ্বরকে মানুষের চেয়ে বড় বলে ধারণা করতে পারি না, সুতরাং আমাদের ঈশ্বর মনোভাবাপন্ন—আবার মানবও ঈশ্বরস্বরূপ। যখন আমরা মনুষ্যভাবের উপরে উঠে তার অতীত কোন উচ্চ বস্তুর সাক্ষাৎকার করি, তখন আমাদের এ জগৎ ছেড়ে, দেহ মন কল্পনা—এ সবেরই বাইরে লাফ দিতে হয়। আমরা যখন উচ্চাবস্থা লাভ করে সেই অনন্তস্বরূপ হই, তখন আর আমরা এ জগতে থাকি না। আমাদের এই জগৎ ছাড়া অল্প কোনো জগৎ জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মানুষই এই জগতের সর্বোচ্চ সীমা। পশুদের সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পারি, তা কেবল সাদৃশ্যমূলক জ্ঞান। আমরা নিজেরা যা কিছু করে থাকি অথবা অনুভব করি, তাই দিয়ে আমরা তাদের বিচার করে থাকি। সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি সর্বদাই সমান—কেবল সোটা কখন বেশি, কখন কম অভিযুক্ত হয় এই মাত্র। এই জ্ঞানের একমাত্র প্রস্রবণ আমাদের ভিতরে এবং কেবল সেইখানেই ঐ জ্ঞান লাভ করা যায়।.....’

‘আশির উপর যে ময়লা আছে, তা পরিষ্কার করে ফেল। নিজের মনটাকে পবিত্র কর, তাহলেই দপ, করে তোমার এই জ্ঞানের উদয় হবে যে, তুমি ব্রহ্ম।.....’

‘ভগবানকে আমাদের বাইরে পাওয়া অসম্ভব। বাইরে যা

ঈশ্বরতত্ত্বের উপলব্ধি হয়, তা আমাদের আত্মারই প্রকাশ মাত্র। আমরাই হচ্ছে ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। বাইরে যা দেখা যায় তা আমাদের ভিতরের জিনিসেরই অতি সামান্য অভ্যুত্থান মাত্র।.....”

শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ কথায় বলি,—“ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে পাও এবং নিতে চাও তাহলে পরিশ্রম করে ঢাবি এনে দরজার তাল খুলতে হয়। তার পথ রত্ন বাব করে আনতে হয়। তা না হলে দালা-দেওয়া ঘব, দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দূকের তাল ভাঙলুম, ঐ রত্ন বার করলুম। শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে ত হয় না—সাধনা করা চাই।”

এই সাধনার জগ্গই বিবেকানন্দ ডাক দিলেন,—“ঘুমন্ত ভারতবর্ষ জাগো।”

ভারতবর্ষ কি ঘুমিয়েছিল? হ্যাঁ ঘুমিয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহিরের জৌলুসে ভারতবাসীরা নিজের অধ্যাত্ম সম্পদ সম্বন্ধে হয়ে উঠেছিল বীতশ্রদ্ধ ও অজ্ঞ, যার দরুণ পৃথিবীর অসংখ্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে কুসংস্কারপন্ন অসভ্য মনে করবার সুবিধা পেয়ে উঠেছিল। দরকার হয়ে পড়েছিল তখন ভারতাত্মার বাণী প্রচারের। নিনেথল সম্মানসূী বিবেকানন্দ নিয়েছিলেন এই গুরুভার। তিনি যে সাধারণের সতিত ভারতাত্মার বিজয়-নিশান পাশ্চাত্য দেশে উড়িয়ে এসেছিলেন—সে কথা আজ কাব অজানা আছে?

আজও বাজে তাঁর সেই উদাত্ত কণ্ঠ,—“হে ভারত, তুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়েব জন্ম বলি প্রদত্ত। তুলিও না তোমাব সমাজ যে বিঘাট মহামায়ার ছায়া মাত্র, তুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মজ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।.....”

“হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী আমার ভাই, দক্ষিণ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। হুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, আমার প্রাণ। ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বাদ্যকোর বারানসী। বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন-রাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদগুরু, আমায় মনুষ্য দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।”

এই ডাক রেখে গিয়েছিলেন ভারতাত্মার শক্তিবিশিষ্ট বিবেকানন্দ। আমরা দেখি এর সার্থক রূপ মহাত্মা গান্ধীর জীবনে। গান্ধীজীকে এই মহতী বাণীর জীবন্ত বিশিষ্ট বলব তাই। বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর প্রণামী তুলে ধরি :—

“স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাময়ী মহতী বাণী হইতেই আমি দেশসেবার যাত্রা কিছু অভ্যুত্থেরণা লাভ করিয়াছি, এ জন্ম আমি এবং দেশসেবক মাত্রই স্বামীজীর নিকট অপরিণীমরূপে স্বগী।”

আরও একটি কথা গান্ধীজী বলে যাননি। সে হচ্ছে তাঁর জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের ‘যত মত তত পথ’ অভ্যুত্থেরণের কথা। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে মৈত্রী ও সান্ন্য প্রতিষ্ঠার জন্ম তিনি তাঁর জীবনকে প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরূপ দিয়ে। এই মহাসাধনার পরীক্ষা কালেই তাঁর জীবনলীলা সংবৃত হল, এ কথা নাহুয মাঝেই জানে, অন্তত জানা থাকলে নাহুযেরই উপকার হয়।

কারণ, মহাত্মাজী তাঁর জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন ভারতাত্মার সেই বাণী,—

“ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানন্তঃ।”

ছড়িয়ে গেছেন মস্তের বীজ,—

“প্রেমেরই জয় হইবে, ঘৃণাব নহে ;

“ত্যাগের জয় হইবে, ভোগের নহে ;

“চৈতন্য জয়ী হইবে, জড় নহে।”

ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাঠ নেতাজী স্বভাষচন্দ্রের জীবনে। তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—“মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমার জীবনে বিবেকানন্দের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিবেকানন্দকে ভব করে আমি তাঁর গুরুমহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হই।”

নেতাজী নিজেকে বামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক উত্তরপুরুষ বলে জেনে নিয়েছিলেন। নেতাং বাল্যকালেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁকে হতে হবে ‘An Embodiment of the past, a product of the present and prophet of the future.’

মাত্র আঠাশো বৎসর বয়সের এই আত্মদর্শন কতখানি সার্থক হয়েছে সে বিচারের ভার রয়েছে ভারতের ইতিহাস-বিধাতার উপর। বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন কবেছেন নেতাজী নিম্নোক্ত ভাষায় : “তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে এক জন যোদ্ধা, শক্তি-সাধনায় সিদ্ধ সাধক। তাঁহার ঐশ্বর্যশালী, উন্নত, গম্ভীর ও দুজ্জের্য ব্যক্তিত্ব সমস্ত ভারতবর্ষের অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেই পৌরুষের আদর্শ বাংলার যুবকদের যেমন আকৃষ্ট কবেছে তেমন আর কাহারোও করে নাই। স্বামী বিবেকানন্দকে আমি গুরু বলিয়া মানি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি শিষ্যরূপে তাঁর পায়েব তলায় থাকতুম। আমি বলতে চাই যে, তাঁহার বাণী ও আদর্শই আমার জীবনকে গঠিত করিয়াছে।”

কোনো বন্ধুকে লেখা স্বভাষচন্দ্রের একখানি পত্রের কয়েক ছত্র তুলে দিই :

“মনে পড়ে একটি চিত্র। কালীমন্দির দক্ষিণেশ্বরে। সম্মুখে খড়গস্তম্ভ মা কালী আনন্দময়ী—শিবের আসনেব উপব অসিধিতা—শতদলবাসিনী—তাঁর সম্মুখে একটি বালক—বালক হইতেও বালক প্রকৃতি—আধ-আধ স্বরে কীদিতেছে এবং কাঁকে যেন ডেকে-ডেকে বলিতেছে, ‘মা, এই নাও তোমাব ভালো, এই নাও তোমার মন্দ। এই নাও তোমাব পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য।’

“করালমুখী ভীষণদণ্ডী মা অল্পতে সন্তুষ্ট নয়, সব গ্রাস করতে চায়—তাই ভালোও চাই, মন্দও চাই। পাপও চাই, পুণ্যও চাই। বালক সব দিতে বসেছে। না দিলে শাস্তি নাই—মা যে ছাড়িবেন না।

“বড় কষ্ট! মাকে সবই দিতে হইবে। মা কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। তাই কীদিতেছে ও বলিতেছে, ‘এই নাও, এই নাও।’

“দেখিতে দেখিতে অক্ষর্য্য বন্ধ হইল, গণ্ডস্থল ও বক্ষ শুকাইল, হৃদয় জুড়াইল। হৃদয়ে আর কিছু নাই। যেখানে ভীষণ কটক যন্ত্রণা দিতেছিল, তার চিহ্নও নাই, সবই শান্তিময়। হৃদয় মধুতে ভরিয়া গেল, বালক উঠিল। আপনাব বলিয়া তার আর কিছু নাই—সব দিয়ে ফেলেছে। এই বালকটি রামকৃষ্ণ।”

এই ‘সব-দিয়ে-ফেলবার’ সাধনাই ভারতাত্মার সাধনা। প্রাচীন ভারতের নচিকেতা যে জীবনের ছবি নিয়ে এলেন আমাদের মনে, যে-ছবি নিয়ে এলেন মৈত্রেয়ী, যে-ছবি দেখি গৌতমবুদ্ধের জীবনে, তাই ধরা দিল শ্রীরামকৃষ্ণে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলি ভারতাত্মা। বিবেকানন্দ এরই জীবনের প্রতিধ্বনি। সে-প্রতিধ্বনির প্রতিমূর্তি গান্ধীজী; স্বভাষচন্দ্র সে-প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি।

“এই ঘটনা সত্য যে, আলিপুর জেলের নির্জন কক্ষে ধ্যানে অবস্থান কালে আমি অনবরত এক পক্ষ কাল স্বামী বিবেকানন্দকে আমার নিকট কথা বলিতেছেন শুনিতে পাইয়াছি এবং তাঁহার দিব্য উপস্থিতি অনুভব করিয়াছি। স্বামীজীর সুস্পষ্ট বাণী কেবল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে শুনিতে পাইয়াছিলাম, সেই বিষয়ে বাহ্য কিছু বলিবার বলিয়াই তিনি দ্ব্যস্ত হইলেন।”

এ-দিব্যদর্শন শ্রীঅরবিন্দের। তিনি বলেছিলেন,—‘ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে।’

ভগবৎপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ধর্মই ভারতের আত্মা। ভারতীয় সাধনার মূলসূত্র ধর্ম। আধ্যাত্মিকতা ভারতের সহজাত। ভারতবাসীর বিশ্বাস জগতের মূল রহস্য জগতকে ছাড়িয়ে, জীবনের মূল সত্য জীবনের পারে।

সাধারণের বর্তমান তবু দেখাতে চায়, মান্নস বুঝি ভাবতেই পারে না যে, ধর্ম ও দর্শনই মানব-জীবনের সর্বপ্রধান উপজীব্য। যা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এত সব দুঃখ-কষ্টের উৎপত্তি, তাতে ফিরে যেতেই যত ভয়। যা থেকে মুক্তি আসবে, সে যে বাইবের কিছু নয়, এ কথাটা বুঝি বোঝাবার প্রয়োজন। তাই কবি-কণ্ঠে আহ্বান ওঠে :

“যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে মর্ত্যমান কবে তুলবেন অন্ধকারের মধ্যে ঠাড়াইয়া সেই ঐতিহাসিককে আমরা আহ্বান করছি। তিনি তাঁহার শ্রদ্ধা দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদের আত্ম-উপহাস আত্ম-অবিশ্বাস অনায়াসে তিবদ্ধ করিবেন, আমাদের মধ্যে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে পূর্বের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবাব আব প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন এ কথা আমরা বুঝিব যে, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে, আমাদের

মধ্যে মহৎ আশার কারণ আছে। আমরা কেবল গ্রহণ করিব না, অনুকরণ করিব না, দান করিব, প্রবর্তন করিব, এমন সম্ভাবনা আছে। পলিটিক্স, এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নহে। প্রাচীন ব্রহ্মচর্যের পথে বৈরাগ্যকঠিন দারিদ্র্যগৌরব শিরোধার্য করিয়া দুর্গম নির্মল মাহাত্ম্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিবার জন্য আমাদের স্বর্ষি পিতামহদের সুগম্ভীর নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।

“হে ঐতিহাসিক, আমাদের সেই দিব্য সংগতি কোন্ প্রাচীন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া আছে দেখাইয়া দাও, তাহার দ্বার উন্মোচন কর।”

কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ আহ্বান করছি তোমাকেই, ওগো আমাদের আত্মার আত্মীয়, তুমি আবার আবির্ভূত হও দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরের জ্ঞান নিয়ে, কারণ তোমার উদ্দেশ্যে ধর্ম-রাজ্যের বাণী আমাদের মর্মে মর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে :

“নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্তেনৈব সুজ্ঞানায় শ্রেষ্ঠ।”

“তুমি যে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই মহাবস্তু তুমি আমাদের দান করবে, তাই তুমি এসো। তুমি অবতীর্ণ হও।”

এক হাতে মাটি আরেক হাতে টাকা নিয়ে এসো গঙ্গাতীরে। বিচার করো কোনটা বেশি ভারী। কোনটার বেশি দাম। টাকা না মাটি, মাটি না টাকা। বিচার করতে করতে পেয়ে যাও, দুই-ই তুল্যমূল্য—দুই-ই সমান অসার। মাটি আর টাকা দুই-ই একসঙ্গে ছুঁড়ে ফেলে দাও গঙ্গায়। নিঃশেষে নিমুক্ত হও।

তখন আমরা তোমার মস্ত্র নিই, আমরাও ঘুম থেকে জেগে উঠি আর তোমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করি অমর কবীন্দ্রের তানে তান মিলিয়ে—

“বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা  
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা ;  
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে  
নূতন তীর্থ রূপ দিল এ জগতে ;  
দেশ-বিদেশের প্রশ্রাম আনিল টানি  
সেথায় মোদের প্রণতি দিগাম আনি।”

## স্বপ্ন ও সাহিত্য

লেখক রবার্ট লুই ষ্টিভেনসনের ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের অত্যন্তব্য ঘটনার উৎস হল স্বপ্ন। লেখকের স্ত্রী মিসেস ষ্টিভেনসন বলেছিলেন : আমি এক দিন প্রাতে লুইএর চাঁৎকারে জেগে উঠি ঘুম থেকে। তিনি স্বপ্ন দেখছেন ভেবে আমি যখন তাঁকে ঘুম থেকে জাগাই তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন,—‘কেন তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গালে ? আমি বেশ চমৎকার একটি গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম।’ আমি না কি তাঁকে এক চরম মুহূর্তে জাগিয়েছিলাম।

স্বপ্ন-জীবন ষ্টিভেনসনের সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। কাহিনী যুগিয়েছে, দৃশ্য ও চরিত্রের সন্ধান দিয়েছে, কথোপকথন জানিয়েছে এক গল্পের গতিপথের পর্য্যন্ত পরিচালনা করেছে।

# বিদ্যা সুন্দর কাব্যের মূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন-শাস্ত্রী

কাব্যরসিকের নিকট বিভাসুন্দর-কাহিনী অতি পরিচিত। বিভাসুন্দরের প্রতিপত্তি কেবল বাংলা দেশে নহে, সমগ্র প্রাচ্যে। বিভাসুন্দরের অথবা অম্লরূপ কাহিনী লইয়া সংস্কৃতে কয়েকখানা কাব্য আছে, এই কাব্যগুলি নিখিল ভারতের সম্পদ। বাংলা দেশে যে কবি বিভাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছেন। গমপ্রসাদ সেন ও ভারতচন্দ্র উভয়ে সমসাময়িক, এবং উভয়েই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত, ইহার উভয়েই বিভাসুন্দরের কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। মনে হয়, একে অস্তুর রচনায় তুষ্টি হইতে পারেন নাই, তাই সকলেই স্ব স্ব প্রতিভা ও কবিত্ব-সম্পদ দ্বারা এই জনপ্রিয় কাহিনীটিকে নূতন নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভাসুন্দর আদিরসাত্মক ও স্থানে স্থানে ইহার আদিরস অতিশয় উগ্র। সে স্রোতের আদিরস পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিতে হইত, পাত্র ফেনায় পূর্ণ হইয়া উঠিত এবং বাহারা তাহা পান করিতেন তাঁহাদের সকলে তাহা সামলাইতে পারিতেন না। আধুনিক সাহিত্যের আদিরস অধিকার মত, সুস্বাদু সৃষ্টি দ্বারা তাহা শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, ইহার কার্যও সুস্বাদু, অব্যর্থ ও কখন কখন প্রাণঘাতক। পাগাই ইউক, আধুনিক বিদগ্ধেরা এই জগুই বিদ্বৎপরিষদে প্রকাণ্ড বিভাসুন্দরের গুণ কীর্তন করিতে প্রস্তুত নহেন, ইহার মূল হস্ত তাহাদের সুস্বাদু অমৃতের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, কিন্তু বহু কাল ধরিয়া রসিক-সমাজে ইহার প্রতিপত্তি এতই মহতী ছিল যে, ইহার মহত্ত্বই সেই দিক বিবেচনা করিয়া ইহাকে মহাকাব্য বলিলেও সোধ হইত না। যাহার প্রতিপত্তি মহতী তাহাকেও এক শ্রেণীর মহাকাব্য বলিতে লোভ কি?

অধিকাংশ বিভাসুন্দর কাব্যের নায়ক তাহাদের দুষ্কৃতের জগু দণ্ডিত হইয়া শ্রাশানে নীত হইয়াছেন এবং ঘাতকের উত্তম শত্রু হওয়ার মধ্যে না আনিয়া প্রিয়ার সম্ভোগ বৃত্তান্ত কতকগুলি শ্লোকে সজ্জিত করিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের মতে ইহা চোর নামক কবিত্বের রচিত, শ্লোকের সংখ্যা পঞ্চাশ বলিয়া এই শ্লোকগুলি পঞ্চাশপঞ্চাশিকা নামে পরিচিত। কোথাও বা শ্লোকগুলির নাম 'চোরীস্বরূপ-পঞ্চাশিকা', অর্থাৎ যে পঞ্চাশিকায় সমাজবিধি অগ্রাহ্য করিয়া নায়ক ও নায়িকার গুপ্ত বিহার বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোকগুলি কাহার রচনা তাহা বলা দুষ্কর। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কবি বরকৃষ্ণ প্রথম বিভাসুন্দর রচনা করেন, শ্লোকগুলি তাহারও হইতে পারে। কাহারও মতে ইহা চোর নামক প্রসিদ্ধ কবির রচনা; কেহ মনে করেন যে, কাশ্মীর কবি বিলহন ও চোর নামক ব্যক্তি। আদিরসাত্মক কাব্যের মধ্যে এই শ্লোকগুলি পৌরুষ হয় অমর-শতকের পরেই স্থান পাইবার যোগ্য; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত চোরপঞ্চাশিকার যতগুলি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠভেদে ও অন্তর্ভুক্ত পাঠে পূর্ণ। যখন কোনটি মৌলিক পাঠ তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই, তখন বিভিন্ন পাঠগুলির মধ্যে যেগুলি সুন্দর ও সঙ্গত তাহা বাছিয়া লইয়া ইহাদের সংস্কার করা যায়। কোনও শ্লোকে বিভাসুন্দর বর্ণনায় আছে "খাসোত্তরং বনিতং মুখঃ শশাক্ষী" আবার পুস্তকান্তরে ইহার পাঠ আছে,

"খাসোত্তরং চ নিভৃতং চ মুহূর্মলতীম্"। বলা বাহুল্য, প্রথম পুস্তকের পাঠটি কেবল অন্তর্ভুক্ত নহে অর্থশূন্য; দ্বিতীয় পুস্তকের পাঠটি শুদ্ধ ও সুন্দর। এ স্থলে প্রথম পুস্তকের পাঠটি ত্যাগ ও দ্বিতীয় পুস্তকের পাঠটি গ্রহণ করিয়া শ্লোকটির সংস্কার করা বাঞ্ছনীয়। শ্লোকগুলির প্রত্যেকটিতেই আছে "অতাপি...তাং শ্রামি" অর্থাৎ আজও তাহাকে সেই অবস্থায় মনে করি। বিভাসুন্দরের নায়ক শ্রাশানে উত্তমশত্রু ঘাতকের সম্মুখে তাহার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়াছেন, প্রিয়াকে স্মরণ করিবার অম্লরূপ অবস্থা সকলের হয় না ও ইহাবারও প্রয়োজন নাই; কিন্তু অশীতিপব-বয়স্ক স্ববির ও পূজার ফুল তুলিতে তুলিতে মনে মনে আবৃত্তি করিতে পারেন 'অতাপি তাং শ্রামি', তাহাব জীবনেও সেই এক দিন গিয়াছে এবং তাহা যে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে তাহাতে সন্দেহ কি? যাহারা রসসিদ্ধ মন্বন করিয়া অমৃত আহরণ করিতেছেন সেই মন্বননিপুণদের 'অতাপি তাং' বলিয়া স্মরণ করিবার প্রয়োজন না হইতে পারে, প্রাচীন মন্বনে অপারগ হইলেও তাহার বোম্বুনের অধিকার আর কে হরণ করিতে পারে? এই বোম্বুনেই তো তাহার একমাত্র অবলম্বন। এই শ্লোকগুলি যাহাদের প্রিয়সমাগম অপ্রাপ্ত অথচ প্রত্যাশিত তাহাদের ধ্যানের, যাহাদের ধ্যানের, যাহাদের প্রিয়া কণ্ঠলগ্না তাহাদের অমৃতবের ও যাহারা গলিত-যৌবন বৃদ্ধ তাহাদের স্মরণের, স্মরণে ইহাদের জনপ্রিয়তার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বিভাসুন্দর কাব্যের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ইহা আগাগোড়াই কাল্পনিক না ইহার সহিত কোনও প্রকৃত ঘটনার কোনও সংশ্রব আছে তাহা বলাও কঠিন। যে বিভাসুন্দর কাব্যকে কেহ কেহ বরকৃষ্ণের রচনা মনে করেন তাহার ভাষা আধুনিক বলিয়া মনে হয়, কাব্যংশেও তাহা সমৃদ্ধ নহে। আমার মনে হয়, ইহার মূল বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যানে। পিতামাতার অজ্ঞাতে যুবক ও যুবতীর প্রেমলীলাই বিভাসুন্দর জাতীয় কাব্যের মুখ্য উপাদান, বৎসরাজের উপাখ্যানেই ইহার প্রথম বীজ দেখিতে পাই। বৎসরাজের কাহিনীরও দুইটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম, অশ্বঘোষ-কৃত অর্থকথায়; দ্বিতীয়, বৃহৎকথায়। এই সকল উপাখ্যানের সাবাংশ এইরূপ—(১) অর্থকথায় বলা হইয়াছে যে, অবন্তিরাজ প্রজ্ঞাত মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, বৎসরাজ উদয়নের সহিত কন্যা বাসবদত্তার বিবাহ দিবেন, কারণ, কুলে শীলে ও গুণে তাহার অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত পাত্র আর কেহ ছিল না। প্রজ্ঞাত কিন্তু প্রার্থনা-ভঙ্গের ভয়ে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিলেন না, উদয়নের মৃগয়া ব্যসন আছে বলিয়া তিনি একটি কাঠময় ও যন্ত্রযুক্ত কৃত্রিম হস্তীর গর্ভে কতকগুলি সশস্ত্র যোদ্ধা স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে মৃগয়ারত উদয়নকে বন্দী করিয়া আনিলেন। প্রজ্ঞাত বাসবদত্তার নিকট উদয়নের পরিচয় দিলেন যে লোকটি গীত-বাক্তে অতিশয় নিপুণ, তবে খর্বাকৃতি ও কুংসিত এবং উদয়নের নিকট বলিলেন যে, তাহার কন্যাটি অতিশয় বুদ্ধিমতী, তবে কুজা। পরম্পরের নিকট পরম্পরের এই পরিচয় দিয়া তিনি উদয়নকে বাসবদত্তার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন। উভয়ের মধ্যে একটি পর্বা

থাকিত, পদারি আড়াল হইতে উদয়ন বাসবদত্তাকে বীণাবাদন শিক্ষা দিতেন। কিন্তু পদারি আড়াল আর বেশী দিন রহিল না, এক দিন গুরু ও শিষ্যের কলহে পদারি সবিয়া গেল, উভয়ে উভয়কে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। বিনি যুবক ও যুবতীর আরাধ্য—সেই দেবতা তাহাদের গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলেন, উদয়ন স্বীয় মন্ত্রীর সাহায্যে কৌশলে বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিয়া স্বীয় রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও তাহাকে বিবাহ করিলেন।

(২) গুণাঢ্যের বৃহৎ কথা অবলম্বন করিয়া সোমদেব কথা-সরিংসাগর রচনা করিয়াছেন। ইহার কথামুখবলম্বকে উদয়ন ও বাসবদত্তার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অর্থকথা হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, এ স্থলে বাসবদত্তার পিতা উজ্জয়িনীপতি চণ্ডমহাসেন, চণ্ডমহাসেন উদয়নের সহিত বিবাহের প্রস্তাব না করিয়া বাহাতে তিনি তাহার রাজধানীতে আসিয়া বাসবদত্তাকে শিক্ষা দেন সেইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উদয়ন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উদয়ন পূর্বে হইতেই বাসবদত্তার রূপ-গুণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উদয়নকে বন্দী করিবার বৃত্তান্ত উভয় গ্রন্থেই এক প্রকার। কথাসরিংসাগরে—উদয়ন ও বাসবদত্তার নিকট পরস্পরের মিথ্যা পরিচয় দেওয়া ও পদারি পাটাইবার কথা নাই। মন্ত্রী যোগেশ্বরায়ণ ও বিদূষক বাসবদত্তার সাহায্যে উদয়ন বাসবদত্তাকে অপহরণ করেন।

উদয়নের উপাখ্যান কালিদাসের কালে অতিশয় প্রচলিত ছিল, কবি মেঘদূতে অবস্থির বৃদ্ধদেব 'উদয়নকথাকোবিদ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন মেঘদূতে "প্রজোত্তম প্রিয়হৃতিতং বসবাজোহত্র জহে" ইত্যাদি অতিরিক্ত শ্লোকও দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, কালিদাস অর্থকথায় বর্ণিত উপাখ্যানের সহিত পরিচিত ছিলেন। কালিদাসের পূর্ববর্তী ভাস প্রতিজ্ঞা যোগেশ্বরায়ণ ও স্বল্পবাসবদ ও নাটকে কিন্তু কথাসরিংসাগর, অর্থাৎ বৃহৎকথার উপাখ্যানই গ্রহণ করিয়াছেন। পিতা-মাতার চক্ষে ধূলি দিয়া যুবক ও যুবতীর প্রেম-লীলার এবং প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মধ্যে একটা বিভ্রাস্তম্বক বা গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের প্রথম পরিচয় উদয়ন ও বাসবদত্তার আখ্যানেই পাওয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যে এই জাতীয় আরও দুইটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে এবং অনেকের বিশ্বাস, এই কাহিনী দুইটি কেবল কল্পনা নহে, বাস্তব ঘটনামূলক। রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সাধুরা কিরূপে সাধনমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন তাহা দেখাইবার জন্ত বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু সাহিত্যে বহু উপাখ্যান আছে। জৈন কবি রাজশেখর নৃসিং তাঁহার প্রবন্ধকোষে এইরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। রাজশেখর সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। প্রবন্ধকোষের কাহিনীটি এই : (৩) বিশালকীর্তি এক জন দিগম্বর সন্ন্যাসী ও মহাপণ্ডিত, মদনকীর্তি তাঁহারই ছাত্র। মদনকীর্তি সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া নানা স্থানে গমন পূর্বক পণ্ডিতদের জয় করিয়া জয়-পতাকা লইয়া আসিলেন ও অবশেষে গুরু নিবেদন করিলেও তাহা অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। দক্ষিণ দেশে তিনি কর্ণাট রাজ্যে রাজা কুন্তীভোজের নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজাও তাঁহার কবিশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় বংশের প্রশস্তি রচনা পূর্বক একখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। মদনকীর্তি বলিলেন যে তিনি মুখে শ্লোক বলিয়া যাইবেন, যদি কেহ

তাহা লিখিয়া লইতে পারেন তাহা হইলে তিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। রাজকন্ঠা মদনমঞ্জরী অতিশয় বিদূষী, রাজা তাহাকেই এই কার্যে নিয়োগ করিলেন। উভয়ে এক বাড়ীতেই বাস করেন, তবে সাক্ষাৎ হয় না। কবিতা বলিবার সময়ে উভয়ের মধ্যে একটা পদারি আড়াল থাকে। উভয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেন, বিভ্রাৎ ও বুদ্ধির পরিচয় পান, কিন্তু চারি চক্ষের মিলন আর হয় না। উভয়কে দেখিবার জন্ত উভয়ের আগ্রহ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে এক দিন রাজকন্ঠা ইচ্ছা করিয়া মদনকীর্তিকে ব্যঞ্জনে অধিক লবণ দিলেন, কবি খাইতে বসিয়া ব্যঞ্জন মুখে দিয়াই বলিয়া উঠিলেন "অহো লবণিমা", মদনমঞ্জরীও পদারি আড়াল হইতে বলিলেন "অহো নিষ্ঠুরতা"। পদারি আড়াল সরিয়া গেল, রাজকন্ঠাকে দেখিয়া কবি বলিয়া উঠিলেন—

নিরর্থকং জন্ম গত্য নলিন্ধা

যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংবিবম্।

রাজকন্ঠাও তাহার উত্তরে বলিলেন—

উৎপত্তিবিন্দোরপি নিফলৈব

দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন।

বলা বাহুল্য, নলিনীর জন্ম সার্থক ও ইন্দুৰ উৎপত্তি সফল হইতে বিলম্ব হইল না। কবির কাব্য রচনার কার্যে শৈথিল্য আসিল। কবি দিনেব পর দিন নানা কৌশলে শৈথিল্যের জন্ত কৈফিয়ৎ দিয়াও রাজাকে তুষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে কবির সমস্ত কীর্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা কবিকে বধ করিবার আদেশ দিলেন, তখন রাজকন্ঠা ও তাহার সখীরা ছুরিকা লইয়া আসিয়া বলিলেন যে, কবিকে বধ করিলে তাঁহার আত্মহত্যা করিবেন। রাজা আর কি করেন, অগত্যা বহু সম্পত্তির সহিত তিনি কবির হস্তে কথা মদনমঞ্জরীকে দান করিলেন। কবি নিশ্চিন্ত চিত্তে সংসার-সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় গুরু বিশালকীর্তি শিষ্যের এই অধঃপতনের সংবাদ পাইয়া বৈরাগ্যের প্রশংসা, রমণীর নিন্দা ও তাহার আচরণের জন্ত ভৎসনা করিয়া এক পত্র লিখিয়া জনৈক ছাত্রকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ছাত্র মদনকীর্তি তাহার উত্তরে অজ্ঞাত কথার মধ্যে গুরুদেবকে জানাইয়া দিলেন—

সন্দষ্টাধরপল্লবা সচকিতং হস্তাগ্রমাধুষতী

মা মা মুঞ্চ শঠতি কোপবটনৈরানন্তিতক্ললতা।

সীংকারাঙ্কিতলোচনা সরভঙ্গ বৈশ্ণবিতা মানিনী

প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমাৎ মথিতো মুদৈঃ স্তরৈঃ সাগরঃ।

অর্থাৎ ষাঁড়ার প্রিয়াকে চুষন করিয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত অমৃতের সন্ধান পাইরাছেন, দেবতার তাহার সন্ধানে বুথাই সমুদ্র মন্ধান করিয়াছে। এই উত্তরে গুরুর জ্ঞানোদয় কতখানি হইয়াছিল জানি না, তবে মদনকীর্তি শব্দ বা মীননাথের মত কাব্যশাস্ত্রে হত্যা করেন নাই, রসিকেরা অবশ্যই ইহার জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

বিভ্রাস্তম্বরের সহিত সন্নিষ্ট অপর উপাখ্যান বিল্হনেব। বিল্হন রাজশেখর অপেক্ষা অনেক পূর্ববর্তী। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান কুন্তল ও কর্ণাটরাজ চালুক্য নরপতি বিক্রমার্জুন বিক্রমাস্বদেবকে অবলম্বন করিয়া তিনি 'বিক্রমাস্বদেবচরিতম্' নামক বৃহৎ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য রচনায় সম্ভষ্ট হইয়া

বিক্রমস্বর্গের তাঁহাকে 'বিভাপতি' উপাধিও দিয়াছিলেন। বিক্রমস্বর্গদেব-বিভাপতি ব্যতীত বিলহন-রচিত কণ্ঠসুন্দরী নাটিকা ও চৌরপঞ্চাশিকা পাওয়া যায়। অনেকের বিশ্বাস, চৌরপঞ্চাশিকা বিলহন কবিরই রচনা, পরবর্তী কালে অনেকে ইহার অম্লকরণ করিয়াছেন, এবং বিলহন, কাব্যের নায়ক ও চৌর কবি অভিন্ন ব্যক্তি। বিলহন-চরিত দুইটি পাওয়া যায়, একটি ফরাসী পণ্ডিত মিসিয়ে এরিয়েল কর্তৃক প্রকাশিত, অষ্টটি কাশ্মীরি হইতে আহৃত ও মুম্বই নগরের নির্ঘয়সাগর মুদ্রায়ন্ত্রের অধিকারী কর্তৃক কাব্যমালার ত্রয়োদশ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। এই দুইটি উপাখ্যানের মধ্যেও পার্থক্য আছে। মিসিয়ে এরিয়েল-প্রকাশিত বিলহন-চরিত কাহার রচিত বলা যায় না, কাব্যমালায় প্রকাশিত বিলহনকাব্য কবির স্বরচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি।

(৪) এরিয়েল-প্রকাশিত বিলহন-চরিতের সারাংশ এই—মহাপঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষ্মী-মন্দির, রাজা মদনভিরাণ, বাণী মন্দারমালা ও রাজকন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা যামিনীপূর্ণতিলকা। রাজকন্যা সঙ্গীতাদি শাস্ত্রে নিপুণা হইলেও সাহিত্যশাস্ত্রে পাবদর্শিনী নহেন। রাজা তাহার অম্লগত পণ্ডিতদিগকে রাজকন্যাকে পড়াইতে বলিলে তাঁহারা বলিলেন যে, বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাদের দক্ষতা থাকিলেও সাহিত্যে তাঁহাদের অধিকার নাই। অবশেষে কাশ্মীরদেশীয় সাহিত্যাদি সর্লশাস্ত্রে নিপুণ বিলহন কবি রাজসভায় আগমন করিলেন, রাজাও তাঁহার পাণ্ডিত্যে তুষ্ট হইয়া তাঁহার উপর কন্যার অধ্যাপনার ভার দিলেন। রাজকন্যা অতি সুন্দরী ও যুবতী, অধ্যাপক বিলহনও পবন রূপবান্ যুবক, সুতরাং রাজা একটু শঙ্কিত হইলেন। রাজকন্যা স্বপ্নের মুখ দেখিতেন না, এবং কবি কুঠরোগীদের পরিহার করিয়া চলিতেন, উভয়ের এই পরিচয় পাইয়া রাজা কবির নিকট স্বীয় কন্যাকে কুঠিনী ও কন্যার নিকট কবিকে স্বপ্ন বলিয়া পরিচয় দিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রী একই বাড়ীতে মহাসুখে থাকিতেন; তবে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে পদার আড়াল ছিল। এক দিন রাত্রে চন্দ্রোদয় হইয়াছে, জ্যোৎস্নার সমগ্র জগৎ পূর্ণ হইয়াছে, কবি চন্দ্রোদয়ের মনোহর শোভায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় শয্যায় শয়ন করিয়া শ্লোকের পর শ্লোকে সেই শোভা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পদার আড়াল হইলে রাজকন্যা সেই বর্ণনা শুনিয়া মনে করিলেন, স্বপ্ন ব্যক্তির পক্ষে এই শোভা অসম্ভব করা অসম্ভব, আর অসম্ভব না হইলে এমন বর্ণনা হয় না। তাহার সন্দেহ হইল, ঐশ্বর্য্য বাড়াইল, তিনি পদার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া কবিকে দেখিতে লাগিলেন। তখন চারি চক্ষের মিলন হইল, কবিও দেখিলেন রাজকন্যা কুঠিনী তো নহেই, পবন পরমা সুন্দরী। গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের অবসান হইল, তখনই নিভৃত বিহারে মত্ত হইলেন। ক্রমে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া কবিকে বন্দী করিলেন ও তাহার শিরচ্ছেদ করিবার জন্ত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। স্থানে যাইয়াও কবির কোনও হুচিন্তা নাই, আনন্দ তাহাকে পরিহার করিতেছে না। যাতকগণ ইহার কাণে জিজ্ঞাসা করিলে কবি বলিলেন—“আমাব তো ভয়ের কোন কারণ নাই, কেন না আনন্দের দেবতা আমার মধ্যে বাস করিতেছেন।” ইহা পর কবি কতকগুলি শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন, শ্লোকগুলির নায়ক-নায়িকার সঙ্গেগমূলক ব্যাখ্যা স্পষ্ট, কিন্তু চোঁটা করিলে তাহাদের সম্বন্ধ শক্তিমুগ্ধির নানাবিধ প্রকারমূলক ব্যাখ্যাও করা যায়।

রাজা এই সকল শুনিয়া কবিকে মাঝ্জনা করিলেন ও তাহার হস্তেই কন্যা যামিনীপূর্ণতিলকাকে দান করিলেন।

(৫) বিলহন-রচিত বিলহন কাব্যের বর্ণনা অল্প প্রকার। গুজর দেশে মহিলপত্তনের রাজা বীৰসিংহ, তাঁহার ভাৰ্যা অবন্তিরাজের কন্যা সুতারা ও ইহাদের কন্যা শশিলেখা বা চন্দ্রলেখা। রাজা কাশ্মীর হইতে আগত কবি বিলহনের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার উপরে রাজকন্যাকে সাহিত্য ও কামশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার দিলেন। উভয় শাস্ত্রেই রাজকন্যা পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। কিন্তু কামশাস্ত্রের চর্চা করিতে যাইয়া আর গুরু ও শিষ্যাব ব্যবধান রহিল না। কবি গাঙ্ধর্ব-বিধি অনুসারে শশিলেখার পাণিগ্রহণ করিলেন। কবি বলিয়াছেন—  
‘কামী যুতা মরকলাকুশলা চ বান্ধা’

অতএব

‘দেবাস্ত্রোয়ারঘটিতং ঘটং বভূব।’

ক্রমে রাজা জানিতে পারিলেন যে, কবি তাহার কন্যাকে উপভোগ করিতেছেন। কবি বন্দী হইলেন, কিন্তু তাহার কোন দুর্ভাবনা নাই, নির্বাসনঃ স্বনগরঃ প্রপৃষ্ঠমানঃ  
নাশং করতা বধবন্ধনকং সমস্তম্।’

নগর হইতে নির্বাসন, গর্দভের পৃষ্ঠে আবোপণ, করচ্ছেদ, বন্ধন বা বধ সমস্তই তিনি প্রিয়ার জন্ত সহিতে পাবেন।

ভবংকৃতে চাঙ্গনমঞ্জলাক্ষি

শিরো মদীয় যদি যতি জাতু।

নীতানি নাশং জনকাজ্ঞায়ৈ

দশাননেনাপি দশাননানি।

অর্থঃ—সীতার জন্ত যখন রাবণ দশ-দশটা মাথা দিয়াছেন তখন প্রিয়ার জন্ত এ-টা মাথা না হয় গেলই। শব্দানে যাতকেরা কবিকে ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে বলিলে কবি শ্লোকের পব শ্লোকে রাজকন্যার উপভোগের স্মৃতি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে শশিলেখা শিরচ্ছেদের জন্ত কবিকে স্থানে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া সমুদ্রতল প্রাঙ্গণের উপর আরোহণ করিয়া সেই স্থান হইতে ভূপতিত হইয়া প্রাঙ্গণ্যগের চোঁটা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যাব সখীবা মহিষী সুতারাকে এই সংবাদ দিলে মহিষীও যাতাতে কন্যাকে বাঁচান যায় সেই চোঁটা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী ও অজ্ঞান বন্ধুরাও রাজাকে বুঝাইলেন যে কবিকে হত্যা করিলে ব্রাহ্মণবধ ও নারীবধ উভয় পাতকই হইবে, রাজকন্যার জন্ত কবি অপেক্ষা গুণবান্ পাত্রও পাওয়া যাইবে না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে কবির হস্তে শশিলেখাকে প্রদান করাই ভাল। মহিষী, মন্ত্রী ও বন্ধুদের উপদেশে অবশেষে বহু সম্পদের সহিত রাজা শশিকলাকে বিলহনের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সমস্ত উপাখ্যান হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বিভা-সুন্দর কাব্যের দুইটি ধারা। যেগুলি অর্থকথায় বর্ণিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার উপাখ্যানের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, সেইগুলিতে মিলনের পূর্বে নায়ক ও নায়িকাব মধ্যে একটা যবনিকা ও উভয়ের সম্বন্ধে উভয়ের ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাই, যেগুলি বৃহৎকথায় বর্ণিত বৎসরাজ ও বাসবদত্তার উপাখ্যান অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে সে স্থানে কোন যবনিকা বা ভ্রান্ত ধারণা নাই। রাজশেখর স্বরূপ প্রবন্ধ-কোষে মদনকীর্তি ও মদনমঞ্জরী উপাখ্যানের উপর এরিয়েল

প্রকাশিত বিলহন-চরিতের ও বিলহন-বচিত বিলহন কাব্যের স্পষ্ট প্রভাব আছে। বিলহন-বচিত কাব্যের উপরও অমরুতশতকের প্রভাব স্পষ্ট। এই সকল উপাখ্যানের মধ্যে যদি কোনটিতে প্রকৃত ঘটনার সচিত কোন সম্বন্ধ থাকে তবে বিলহন-বচিত বিলহন কাব্য সম্বন্ধেই তাঁর বক্তব্য, লোকপ্রসিদ্ধিও সেইরূপ। বিলহন বিক্রমাদেববচিতের রচয়িতা, এবং একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কবি। তাঁহার উপাধিও বিজ্ঞাপিত। বিলহনের সময়ে মহিলপতন বা অমহিলপতনের রাজা ছিলেন কর্ণবাজ, বীরসিংহ নতেন। বাম্মীরে - বিলহনকৃত যে চৌরীস্বতপঞ্চাশিকা পাওয়া গিয়াছে,—তাহার প্রথম শ্লোকে আছে,—

সর্বস্ব গৃহবর্জি কুন্তলপতিঃ গৃহাতু তস্মৈ পুনঃ  
ভাণ্ডাগারমগুপ্তময় হৃদয়ে জগতি সাদৃশ্যতম্।

অর্থাৎ কুন্তলপতি, অপমানের ইচ্ছা হয়তো আমার সর্বস্ব গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার স্বয়ম্বিহীন সারস্বত নিদি আপনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে মনে হয়, কর্ণটি ও কুন্তল উভয় স্থানের অধীশ্বর চালুক্যরাজের কোপদৃষ্টিই কবির উপর পতিত হইয়াছিল। বিক্রমাদেবচরিতে কবি গুজরদের যেরূপ নিন্দা করিয়াছেন তাহাতে গুজরদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা ও স্প্রকটীত হইয়াছে। মনে হয়, কবির প্রিয়া গুজরদেশীয়া ছিলেন না। কবিপ্রিয়া স্বয়ং বিহ্বী ছিলেন, তিনি কবিকৃত গুজর-নিন্দা সহ কবিতেন না, অথবা প্রিয়াব অম্বোধে কবি স্বয়ংই সে কাণ্ড করিতেন না। বীরসিংহ নাম ও কবিপ্রিয়াব নামও বোধ হয় কল্পিত, ইচ্ছা কবিরাজ কবি হয়তো তাহা গোপন করিয়াছেন। কবিপত্নী হয়তো কর্ণটি-বাজেব অথবা কর্ণটিব কোনও সামন্ত বাজাব কন্যা ছিলেন। এক সময়ে কবি রাজ্যব কোপে পড়িলেও বিবাহের পর কবি যে রাজ-পরিবাবেব বিশেষ প্রিয় হইয়াছিলেন ও বাজ্যে তাহার বিলক্ষণ প্রতীক্ষা হইয়াছিল তাহা বৃত্তিতে পারা যায়। এমনও হইতে পারে যে, বিক্রমাদেবের পিতা বৈলোক্যমল্ল বা আহবমল্লই কবিপ্রিয়াব জনক ছিলেন। কবি পরবর্তী কালে স্বীয় শালক রাজাধিরাজ বিক্রমাদেবের চরিত অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় যতগুলি বিজ্ঞানসম্মত বচিত হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলির উপরেই সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মত কাব্যগুলির অসাধারণ প্রভাব; তবে বাংলা বিজ্ঞানসম্মতের একটা বৈশিষ্ট্য এই—ইহা প্রায়ই দেবীমাতাশাস্ত্রকে কোনও গানের অন্তর্গত। বাংলায় বিশেষ প্রচলিত চৌরপঞ্চাশিকার সচিত বিলহন কাব্যের ও অজ্ঞাত চৌরপঞ্চাশিকার সাদৃশ্য অল্পই, কাব্যংশেও বিলহনের চৌরপঞ্চাশিকা উৎকৃষ্ট। তবে বাংলা বিজ্ঞানসম্মতের একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় কাব্যে নায়ক-নায়িকার মিলনের জন্ম কোথাও দূতী বা কুটনীজাতীয় কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই, বাংলা কাব্যে সর্বত্রই ইহার প্রয়োজন হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্যে নায়ক-নায়িকা এক বাড়ীতেই বাস করেন, তাহাদের মধ্যে যবনিকার ব্যবধান মাত্র, কোথাও আবার সে ব্যবধানও নাই, বাংলা কাব্যে স্তম্ভপথ অবশ্যই চাই। সংস্কৃত কাব্যে কোনও দেবতা নায়ককে বক্ষা করিবার জন্ম পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নাই, বাংলা কাব্যে সর্বত্রই দেবতার প্রভাব। সংস্কৃত কাব্যে নায়ক বেপদোয়া, তাহাকে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ

করিতে বলিলে প্রিয়ার মূর্তি ধ্যান করে, শিবজ্ঞেদের ভয় দেখাইলে বলে 'রাবণ সীতার জন্ম দশটি মাথা দিয়াছেন, আমি না হয় প্রিয়াব জন্ম একটি মাত্র মস্তক দানই করিলাম।' বাংলা কাব্যে যত বিপদ ঘনাইয়া আসুক না কেন, নায়কের ভরসা আছে যে দেবতা তাহাকে বক্ষা করিবেন। বাংলা কাব্যে নায়ক-নায়িকার পরেই দূতী বা কুটনীজাতীয় স্থান। ভারতচন্দ্রের হীরা বাংলার রসিকদের অনেক ফুল যোগাইয়াছে, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রভাবমুক্ত হইতে প্রাণপাণ্ট চেষ্টা করিয়াও কয়েক স্থানে ভারতচন্দ্রের উপর একটু ঝাল ঝাড়িয়াছেন, এ যেন মনে মনে ভূতের ভয় থাকিলে জোর করিয়া "ভূত নাই, ভূত নাই" বলার মত; তাহার বিপরীতে যুগোপযোগী পরিবেশের মধ্যে হীরা আসিয়া দেখা দিয়াছে; বিমলা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমার জননী হইলেও কবি তাহাকে দিয়াও খানিকটা হীরার কাজ করাইয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞানসম্মত নামটি কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন। বাংলা দেশে "বিজ্ঞানসম্মতচরিতম্" অথবা "সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মতম্" নামে পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে অবশ্য নায়ক-নায়িকার নাম বিজ্ঞা ও স্মন্দর, কিন্তু "সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মতম্" নাম শুনিলেই মনে হয় সংস্কৃত ভিন্ন অল্প ভাষায়ও যে বিজ্ঞানসম্মত আছে কবি তাহা জানিতেন, তিনি সংস্কৃতের বিশেষ ভক্ত বলিয়াই সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মত কাব্য রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মত কাব্যংশেও উৎকৃষ্ট নহে। মনে হয়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কোনও পণ্ডিত এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত বিজ্ঞানসম্মতের কবি সম্ভবতঃ বাঙ্গালী বৈষ্ণব। বিজ্ঞানসম্মত কাব্যের নায়ক-সম্মত দেবীভক্ত শাস্ত্র হইলেও কবি—

"কালিন্দীতটসন্নিধাবুবনে গোপান্দনালিন্দন-  
কৌড়াকর্ণচূষনাদিরসিতঃ সমুচ্ছিতো বেণুনা।"

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। বিলহনকে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা 'বিজ্ঞাপতি' উপাধি দিয়াছিলেন। বিলহন-চরিত বিজ্ঞানসম্মতের মূল হইলে পরবর্তী কবিরাজ কাব্যের নায়িকার নাম বিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন। অবশ্য ইহা অসম্ভব মাত্র, কেন না এই ভাবে বিজ্ঞাপতি হইতে বিজ্ঞা নামটি বাছিয়া লইলেও স্মন্দর নামের অল্পরূপ কোন কারণ পাওয়া যায় না। কেহ মনে করেন, কাব্যের নায়ক মহাশাস্ত্র ও পরম ভক্ত, তাহার প্রিয়া বিজ্ঞা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত পরাবিজ্ঞা। এ কল্পনাও কষ্টকল্পনা, কেন না, সংস্কৃত কোন কাব্যে আধ্যাত্মিকতাব গন্ধও নাই। তত্ত্বসাধনার ক্ষেত্র বঙ্গদেশেই বিদ্য, দেবীর ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদ তো তাহাকে দিয়া শত সাধনাও করাইয়া গিয়াছেন। স্মন্দর শ্রমানে গিয়া যে শ্লোকগুলি বলিয়াছে, তাহা চৌরপঞ্চাশিকা বা বাহাই হউক, একমাত্র বঙ্গদেশেই তাহার নায়িকাপক্ষে ও দেবীপক্ষে ব্যাখ্যা অভিশয় কষ্টকল্পিত। সংস্কৃত কাব্যে দেবতার প্রসঙ্গও নাই, দেবীপক্ষে ব্যাখ্যার প্রয়োজনও হয় নাই। কবিরাজ স্মন্দর নামটির এত প্রিয় কেন, তাহার এরূপ কারণ অসম্ভব করা যাইতে পারে, অবশ্য ইহাও অসম্ভব মাত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রচলিত ইহাও রচনা প্রাচীন নহে, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ভাষা দেখিয়া এইরূপ অসম্ভব করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। সম্ভোগের রসাল বর্ণনা

ত্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশে ত্রক্ষবৈবর্ত পুরাণের বিলক্ষণ প্রচলনও ছিল। এই পুরাণে—

বিদগ্ধেন বিদগ্ধ্যাঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,  
বিশিষ্টেন বিশিষ্টায়াঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,  
সুন্দরেন তু সুন্দর্যাঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ,

এই পংক্তিগুলি বহু স্থানে আছে। বিজ্ঞানসন্দের কবিবা সন্তোষ বর্ণনায় ত্রক্ষবৈবর্ত পুরাণের কবির নিকট শিশু। জানি না, বাঙ্গালায় প্রথম যিনি বিজ্ঞানসন্দের রচনা করিয়াছেন তাহার উপর উক্ত পংক্তি-গুলির কোন প্রভাব ছিল কি না। বিজ্ঞা—সুন্দরী, নায়ক সুন্দব হইবে না কেন?

বঙ্গদেশে বিলহন-চরিতের বিলক্ষণ প্রচলন ছিল। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তিবাদের জায় গ্রহে পর্যন্ত

বিলহন-চরিতের শ্লোক উদ্ভূত করিয়াছেন। “ভবংকৃতে চাঙ্গন-মঞ্জলাক্ষি”—ইত্যাদি যে শ্লোকটি পূর্বে উদ্ভূত হইয়াছে, মুক্তিবাদের কোন কোন গ্রন্থে তাহার পাঠ এইরূপ—

যুয়ংকৃতে খঞ্জনমঞ্জলাক্ষি  
শিরো মদীয় যদি যতি জাহু।  
লুনানি নুনা জনকাত্মজার্থে  
দশাননেনাপি দশাননানি।

বাঙ্গালা বিজ্ঞানসন্দের কাব্যের উপর বিলহন-চরিত প্রভুতির যথেষ্ট প্রভাব। সম্প্রতি বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা বিজ্ঞানসন্দের কাব্যগুলির একটি সম্বলন প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

## শিশুশিক্ষায় হস্তলিপি

শ্রীশিবনাথ বাগচী

হস্তলিপি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া একটি বিশেষ গুণ। বন্ধন উত্তম হইলে যেমন সাধারণ শাক-তরকারিই রুচিকর হয়, হস্তাক্ষরও সুন্দর হইলে তেমনি লিখিত বিষয় প্রথমেই আকর্ষণের সৃষ্টি করে। এই আকর্ষণের কারণ যে মুখ্য ভাবেই হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য তাহা নহে। উহার প্রধানতম কারণ, ঐক্য হস্তাক্ষর অভ্যাস কবিতা যে বস্ত্র, যে অধ্যবসায়, যে স্থিতি ও নিবিষ্টচিত্ততার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা। কুংসিত হস্তলিপি যে লেখকের অল্প, ব্যস্ত ও অস্থির-চিত্তের পরিচায়ক, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি?

অনেকে বলিবেন—হস্তলিপি কদর্য্য এরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি বিদ্বান হইতে পারিয়াছেন। শিক্ষার ইতিহাসে উহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার সুদৃশ্য হস্তাক্ষরবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান নহেন, এরূপ উদাহরণও বিরল নহে। আমরা বলি, তাহা দিয়া আমাদের কাঙ্ক্ষ কি? হস্তলিপি সুন্দর না হওয়া শিক্ষায়—বিশেষরূপে প্রাথমিক শিক্ষায়—ক্রটি বুঝায়। কুংসিত দূর্বোধ হস্তলিপি ছাত্র-ছাত্রীর ধর্মের পরিচায়ক নহে, উহাতে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক অসুপযুক্ততার ইতিহাসই পাওয়া যায়। হস্তলিপি শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং ঐ অঙ্গের যত্ন না করিলে, অতি সামান্য হইলেও, শিক্ষায় যে ক্রটি রহিয়া যায়, উহা ক্রটিই। উহাকে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না, করিলেও সেই যুক্তির সহিত শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শের কোন সামঞ্জস্য নাই।

এখানে এই ক্রটির উৎস কোথায় এবং কি প্রকারেই বা উহার সংশোধন সম্ভব—এই প্রশ্ন সকল চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীই করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা এবং অবহেলা করিতে করিতে যে সকল অভিব্যক্তি ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারা অবশ্য আমাদের কথায় রাগান্বিত হইতে পারেন; কিন্তু সেই ভয়ে শিক্ষা দ্বন্দ্বই আদর্শচ্যুত হইতে পারে কি?

প্রত্যেক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীর হস্তাক্ষর অল্প অভ্যাসের পরিচয় বহন করে। শতকরা

৪০ জনের হস্তলিপি ত একেবারেই দুর্য্যোগ। ইহার উপরে অপরিস্ফুটতা, বর্ণাঙ্ক প্রভৃতিতে লিখিত বিষয় যেন কিছুত-কিমাচার মুষ্টি পরিগ্রহ করে। উহার প্রতি চাহিলেই ঘৃণা বা ক্রোধের উদ্বেগ হয় ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক অল্প এবং অবহেলার কথা চিন্তা করিয়া। অবশ্য ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীরা হস্তলিপির অভ্যাস বেশি করিয়া থাকে এবং যে সকল ছাত্রীর হস্তাক্ষর কুংসিত তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তবু এই সংখ্যাও আরো অবহেলা করিবার মত নহে।

হস্তাক্ষর বিকৃতির কয়েকটি হেতু দীর্ঘ অভিজ্ঞতাব ফলে আবিষ্কার করা গিয়াছে। উহাই এখানে নিবেদন করিব এবং আশা করি, উহার অজ্ঞাত কারণ থাকিলেও, প্রধানরূপে ঐগুলির সংশোধনের চেষ্টা করিলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর বিশেষ উপকার হইবে এবং শিক্ষার একটি অতি-অবহেলিত অঙ্গ পরিপুষ্ট লাভ করিবে।

এই মন্তব্য পাঠে অনেক অভিব্যক্তি বলিবেন—আমাদের ধর্ম-ঐশ্বর্য্য আছে, আমাদের পুত্র-কন্যা-আমিসের ‘কলম-পেশা কেবাণী’ বা হিসাব-রক্ষকের পদে কাজ করিবে না। তাহাদের মহাজনী খাতা লিখিতে হইবে না যে, তাহাদের হস্তাক্ষর-শিক্ষা বিষয়ে এত চেষ্টা-যত্ন করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে হইবে। কিন্তু এই কথায় শিক্ষক তাঁহার আদর্শচ্যুত হইলে বা নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। তাঁহাকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, অসম্পূর্ণ শিক্ষাকে প্রশংসা দেওয়া, আর শিক্ষা বিষয়ে অজ্ঞানী ব্রতমতে পরিচালিত হওয়া বা ঐ অবৈজ্ঞানিক ব্রতমতের উপর শিক্ষার বিনিয়োগ গড়িতে যাওয়া একইরূপে মারাত্মক। ইহার ফল অজ্ঞাপিক সকলকেই ভুগিতে হয়। একটি সামান্য উদাহরণই এখানে দিই:

হস্তাক্ষর বুঝিতে না পারিলে পরীক্ষক ধনী বা পুত্র-কন্যাকে খাতির করেন বলিয়া জানা যায় নাই, দরিদ্রেরও এই কারণে রেহাই হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় না। শিক্ষার ধনি-দরিদ্র ভেদাভেদ নাই, শিক্ষার আদর্শ ধনী এবং দরিদ্রের জন্য ঐহারা পৃথক করিতে গিয়াছেন, তাহারা শিক্ষাকে অবনত করিয়াছেন।



প্রকৃত শিক্ষক এই মনের সমর্থক নহেন। তিনি মনে করেন না যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে জাতি-কূলেব কোন পার্থক্য আছে।

দুর্য্যোধন হস্তাক্ষরের জ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের, তথা জীবনের পরীক্ষায় প্রতি বৎসর যে কত ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হইতেছে, তাহার হিসাব আমরা কত জন রাখি? হস্তাক্ষর দুর্য্যোধন হওয়ার জীবনক্ষেত্রে যে কত অপব্যয়, কত অকৃতকার্যতা আসে, তাহার শতকরা হিসাব আমরা কত জন রাখিয়া থাকি? পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাষ্ট বা খোঁজ করিয়া আমরা কয় জন পাঠ করি?

হস্তাক্ষরের ক্রটিকে আমরা 'প্রাথমিক বিভাগ্যাস ক্রটি' আখ্যা দিতে পারি। প্রাথমিক বিভাগ্যয়েই শিশুগণ প্রথম হস্তলিপির অভ্যাস করিয়া থাকে, সুতরাং এই বিষয়ে শিশুর প্রাথমিক কু-অভ্যাসের জন্ম প্রাথমিক শিক্ষাষ্ট দায়ী। অনেক অভিভাবক হয়ত মনে কবিরেন, প্রাথমিক বিভাগ্যয় এই জন্ম দায়ী হইলে তাঁহার নিকৃতি পাঠলেন। কিন্তু নিকৃতি পাইবার কথা এখানে নাই। প্রাথমিক শিক্ষালয় বলিতে শিশুর গৃহকেই প্রথম বুঝায় এবং প্রাথমিক শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী বলিতেও মাতা-পিতা প্রভৃতি অভিভাবকদিগকেই প্রধানরূপে নির্দেশ করা যায়। প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি বড়ো শিশুর গৃহশিক্ষাকেই মুখ্যরূপে গণ্য করিতে হইবে। সর্ববিষয়ে শিশুর 'হাতে খড়ি' গৃহেই হইয়া থাকে, উহার যাবতীয় 'দোষ-গুণের ভিত্তিও গৃহেই স্থাপিত হয়। সর্বপ্রথম হস্তলিপির অভ্যাসও শিশু গৃহেই করিয়া থাকে।

একণে অল্পবয়স্ক শিশু গৃহে যাহাদেব হস্তলিপি দেখিয়া লিপির অভ্যাস করিবে, তাহাদেব হস্তলিপিতেই শিশুর আদর্শ। এই আদর্শ নিকৃষ্ট হইলে শিশু উহাও অমূল্যমূল্যে ফগনই উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর লাভ কবিত্তে পাবে না, এবং নিকৃষ্টেব অভ্যাস একবার শৈশবে আবস্ত হইলে সারা জীবনেও উহার সংশোধন দুঃসাধ্য।

সুতরাং প্রায়শ্ছেই শিশুকে সুন্দর আদর্শ হস্তলিপির অমূল্যমূল্য করিবার সুযোগ দিতে হইবে। এই অল্পবয়স্ক-কার্যে প্রাথমিক অবস্থায় তাড়াহুড়ায় সুফল লাভের আশা আদৌ থাকে না। আদর্শমুদ্রাবে ধীরে ধীরে শিশুকে হস্তাক্ষর লিখিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। হস্তলিপির দোষ-ক্রটি সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে 'এতগুলি লিখা প্রত্যহ প্রস্তুত করিতেই হইবে'—এই নীতি একেবারেই তাৎপর্যহীন। বিশেষ করিয়া অপরিপক্ক অবস্থায় শিক্ষকের প্রহারের ভয়ে শিশু তাড়াহুড়ায় তাঁহার আঙ্গা পালন করিলেও, তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যাইবে। গুণামুদ্রারেই লিখার বিচার করিতে হইবে, সংখ্যামুদ্রারে নহে।

প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে হস্তলিখন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে বলাও বিপজ্জনক, পুস্তক বা হস্তলিপি দেখিয়া নিজে নিজে লিখিতে বলাও মারাত্মক। ইহাতে সে স্বকপোল কল্পিত প্রণালীতে লিখিয়া যাইবে, এবং ক্রমে ভুল শিখিয়া অভ্যাস করিবে, যাহা হইতে তাহাকে নিকৃতি পাওয়ার দুই-চারি বৎসর এইরূপ চলিবার পথে সুকঠিন।

হয়ত অনেকে বলিবেন—আপনার থিসিস অনুসারে শিশুকে হস্তাক্ষর শিখাইতে হইলে সে সারা জীবন ধরিয়া উহাই করিবে, অল্প কিছু শিখিবে না। এইখানে বক্তব্য এই যে, 'যে-কোন প্রকারে আঁচড় কাটিতে পারিলেই হইল'—এইরূপ মনোভাব লইয়া শিশুকে হস্তাক্ষর শিখাইতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইলে, আমরা ঘাট স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু শিক্ষার প্রতি পদে যাহারা শিল্পী ও সাহিত্যিকের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া চলিতে চাহেন, আমাদের বক্তব্য তাঁহাদেরই জ্ঞান—অপবেব জ্ঞান নহে। অবহেলায় কোন কিছুই উত্তমরূপেই শিক্ষা করা যায় না, আর শৈশবে অভ্যাসের ক্রটি থাকিলে উহা সারা জীবনই পীড়াদায়ক হইয়া থাকে।

## ভারত রাষ্ট্রের উদারতা

শ্রীমুদ্ররঞ্জন মল্লিক

হেন বাষ্ট্রেব মিলিবে তুলনা কি ?

আরাজীবের কবর হইল জাতির সম্পত্তি !

সম্রাট তবু ক্ষুদ্র ধাতার মন

শুধু তিন্দুব করেছে নির্ঘাতন

ভাঙ্গি মন্দির করিয়াছে কুংসিত ।

ধ্বংস করেছে সাম্রাজ্যেব ভিত ।

তাঁহাব কবর তাহাবো কবর আজ

বক্ষা করাই হল ভারতের কাজ ।

যত সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি

উদার বলিয়া নাতিক তেমন খ্যাতি ।

'ক্রমওয়েল'র কঙ্কাল বা'ব করি

কাঁসিতে টাঙালো শুনিয়া হাসিয়া মরি ।

দেখুক তাহারা মোদের আদর্শ

পুণ্য ধন্য এ ভারতবর্ষ ।

# পেট্রোলিয়াম

খনিজ সম্পদের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনের তাগিদে এবং তাদের বিভিন্ন ব্যবসায়ের বাঁচা মাল সরবরাহের প্রয়োজনে ইংরেজের প্রচেষ্টায় গত ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী এ দেশে ভূতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হয়। সেই অবধি এই বিভাগের বহুমুখী প্রচেষ্টা অল্প-বিস্তর চলে আসছে। প্রায় ত্রিশবর্ষের মত বিরাট দেশের পক্ষে সেটা সত্যই নাম মাত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারত সরকার অবশ্য এদিকে যথেষ্ট নজর দিয়েছেন, তাই এদিকে কাজও বেশ কিছু হচ্ছে। অজ্ঞাত খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ভাগ্যবান হলেও পেট্রোলিয়ামের দিক থেকে আমরা অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী।

গত ১৯৪৪ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর এ দেশে মোট ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশিত হয়েছে। ঐ সময়ে ভারতের পূর্ব প্রান্তে, আসামের ডিগবয় খনি অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম নিষ্কাশনের কাজ চলছিল “আসাম অয়েল কোম্পানী”র দ্বারা। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের আটক পুলের নিকটে জয়ামীর, খাউড় এবং ধুলিয়ানু নামক ছোট তিনটি খনির কাজ চলছিল “আটক অয়েল কোম্পানী”র দ্বারা। ভারত বিভাগের ফলে ঐ ছোট তিনটি খনি পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে।

অবিভক্ত ভারতের মোট পেট্রোল উৎপাদন ছিল সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের ১.০০ ভাগের এক ভাগের চেয়েও অনেক কম। আর বর্তমান ভারতের ডিগবয় খনি অঞ্চল থেকে যে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দেশের প্রয়োজনের ১.০০ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র। বাকি ৯৫ ভাগ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। তাব মধ্যে একমাত্র ইরান থেকেই আসে ৭৪ ভাগ; বাকি ২৪ ভাগ অজ্ঞাত দেশ থেকে আসে। এই আমদানীর হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে গত ১৯৪৯ সালে এসেছে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ গ্যালন

১৯৫০ " " " ১১ " ৩৫ " "

১৯৫১ সালে আনার চেষ্টা চলছে ২৩ " ৭০ " "

তার মধ্যে এসেছে জানুয়ারী মাসে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ গ্যালন।

ফেব্রুয়ারী " ৭৫ " "

গত গেল উচ্চ শ্রেণীর পেট্রোল (যা হাওয়াই জাহাজে ব্যবহার করা হয়) এবং সাধারণ পেট্রোল (যা মটর গাড়ী এবং পেট্রোল-ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়, এর অল্প নাম “মটর স্পিরিট” বা “গ্যাসোলিন”) তার হিসাব। এ ছাড়াও পেট্রোলিয়াম জাত অনেক জিনিস, যেমন—কেরোসিন, প্যারাফিন (যা দিয়ে মোমবাতি তৈরী হয়), বিভিন্ন জাতীয় লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ, ক্রুড, অয়েল, বিটুমেন, আসফাল্ট, নেপথলিন, ঠাইরিন প্রভৃতি বহু জিনিস পেট্রোলিয়ামকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রণালীতে পরিমল্ক করে পাওয়া যায়। এই পরিমল্ককরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। সামান্য আভাষ দিতে গেলে বলতে হয় যে, বিভিন্ন পরিমাণের উত্তাপে এবং বিভিন্ন চাপে এর কিছুটা অংশ গ্যাসে পরিণত করা হয়। সেই গ্যাসকে তরল, কঠিন অথবা জেলীর মত অবস্থায় পরিণত করে কোন কোন জিনিস তৈরী হয়; আবার কোন কোন জিনিস অবশিষ্টাংশ থেকে তৈরী হয়। এ সবের জ্ঞানও কম টাকা বিদেশে চলে যায় না।

যে অবস্থায় আমরা খনিজ পেট্রোলিয়ামকে নল-কূপের মধ্যে দিয়ে উপরে তুলে এনে থাকি সেটা হচ্ছে কতকগুলি কঠিন, তরল



শ্রীশিশিরকুমার কর

এবং বায়বীয় অবস্থায় বিবিধ হাইড্রো-কার্বন জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ মাত্র। বৈজ্ঞানিক শ্রেণী-বিভাগে এগুলিকে বলা হয় “প্যারাফিন” জাতীয় ( $cn H_{2n+2}$ )। তা ছাড়াও এতে অজ্ঞাত বহু রকমের খনিজ রাসায়নিক পদার্থ অজ্ঞাদিক পরিমাণে মিশে থাকে। তাই বিভিন্ন তৈল-উৎপাদন কেন্দ্রে ব্রুড, অয়েলের মধ্যে পদার্থের, গুণের এবং দোষের বিভিন্নতা দেখা যায়।

গাঁজ-পালা, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যে সমস্ত জৈব পদার্থ কোন কারণে মাটি চাপা পড়ে কালক্রমে ভূগর্ভস্থ উত্তাপ এবং ভূপৃষ্ঠের চাপের ফলে পাখুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়, তাদের কিছুটা অংশ কয়লার মধ্যে প্রস্তুতীভূত অবস্থায় (ফসীল) পাওয়া যায়। তা থেকে বেশ জালুতে পাওয়া যায়, কোন জিনিষটা কয়লায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু পেট্রোলিয়ামের মধ্যে তেমন কোন চিহ্ন পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া তরল পদার্থ মাত্রই যেমন স্বভাবত: আপন যায়গা থেকে সরে যেয়ে নিম্নতম যায়গায় সঞ্চিত হয়, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে যেখানে পেট্রোলিয়াম জমাচ্ছে সেখান থেকে অজ্ঞাত সরে যেয়ে সঞ্চিত মত যায়গায় সঞ্চিত হয়। তাই কোথায়, কোন জিনিষ থেকে, কি অবস্থায় পেট্রোলিয়াম জমাচ্ছে, সেটা অজ্ঞানের ভগতই রয়ে গেছে।

গত শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অজৈব মতবাদ প্রচলিত ছিল। তখন বৈজ্ঞানিকগণ মনে করতেন—ভূগর্ভস্থ জল পাথরের ফাটলের মধ্য দিয়ে চুইয়ে নিচে যাওয়ার সময় ভূগর্ভস্থ অত্যধিক গরমে বাষ্পে পরিণত হয়। সেই উত্তপ্ত বাষ্প কার্বাইড, অব আয়বণ এবং ঐ জাতীয় অজ্ঞাত ধাতব পদার্থের সহিত রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে পেট্রোলিয়ামের অর্থাৎ প্যারাফিন জাতীয় হাইড্রো-কার্বনের সৃষ্টি হয়। আজ-কালকার দিনে অবশ্য এই মতবাদের উপরে বৈজ্ঞানিকগণের আদৌ কোন আস্থা দেখা যায় না।

আজ-কাল বৈজ্ঞানিকগণ পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জৈব মতবাদে আস্থাবান। এখনও অবশ্য ঠিক কোন জীব বা কোন উদ্ভিদ থেকে খনিজ পেট্রোলিয়াম জমাচ্ছে তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়নি। ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট জীব—যাঃ অমজান ছাড়াও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে, আব তেমন ক্ষুদ্রতম এককোষ-বিশিষ্ট উদ্ভিদই হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের স্রষ্টা। অবশ্য এদের কাউকে অণুবীক্ষণ ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। হুঁ-এক জন বিশেষজ্ঞ রাসায়নিক মাছেব পরিত্যক্ত অংশ থেকে তাঁদের পরীক্ষাগারে বসে পেট্রোলিয়াম তৈরী করতে পেরেছেন। তা থেকে কেহ কেহ অজ্ঞমান করেন যে, সামুদ্রিক বড় বড় জীব এবং বড় বড় মাছ থেকেও পেট্রোলিয়াম তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তা সম্বন্ধে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের ধারণা যে, পূর্বোক্ত ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট জীব ও

উদ্ভিদ থেকেই এ কাজ হচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশে এই সব জৈব পদার্থের বিরাট সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তারা পচে গলে যাওয়ার আগে মাটি চাপা পড়লে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে তারা পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। পাহাড়, পর্বত, এবং উঁচু যায়গা যেখানে সমুদ্র-তলের অবস্থা বর্তমান, অর্থাৎ যে সব যায়গা এক দিন সমুদ্রের নিচে ছিল, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কালক্রমে উঁচু হয়ে উঠেছে—সেইরূপ বহু যায়গার মাটিই নমুনা পরীক্ষা করে তার মধ্যে হাইড্রো-কার্বন পাওয়া গেছে।

পূর্বোক্ত জীবাণুগুলিকে এলবুমেন্ এবং সেলুলোজ থেকে অম্লজান্ এবং যক্ষারজান্কে সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত করে তাদের তৈলাক্ত এসিডে পরিণত করতে দেখা গেছে। তা থেকে কালক্রমে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে অজৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হওয়াই স্বাভাবিক।

পেট্রোলিয়ামেব পনি অম্লসন্ধান কবে বের করা অত্যন্ত জটিল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ধারা এই ব্যাপারের ভিতরে অন্ততঃ কিছুটা প্রবেশ না কবেছেন তাঁদের এর সমগ্র জটিলতা হৃদয়ঙ্গম কবা কষ্টসাধ্য। পেট্রোলিয়ামের খনি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অম্লসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারও বটে। এই অম্লসন্ধান নানা ভাবে করা হয়ে থাকে। তার প্রথম পর্যায় হচ্ছে ভূতাত্ত্বিক অম্লসন্ধান।

প্রথমে ভূতত্ত্ববিদগণ ভূপৃষ্ঠের নানা জাতীয় পাথর, মাটি, যেমন—বিটুমিনাস্ শেল্ বা অয়েল শেল পেট্রোলিয়ামের নিকট-আত্মীয় অজ্ঞাত খনিজ পদার্থ প্রভৃতির উপস্থিতি, তাদের অবস্থান, গঠনভঙ্গী প্রভৃতি থেকে পেট্রোলিয়ামেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক অম্লমান করেন। আগে বলেছি—সমুদ্র-তলের আণবিক জীব এবং উদ্ভিদ থেকে পেট্রোলিয়ামের সৃষ্টি হয়। তাই যেখানে ভূপৃষ্ঠে সেই সমুদ্র-তলের অবস্থা বর্তমান অথবা তার কিছুটা নিদর্শন পাওয়া যায়, তেমনি যায়গাতেই তাদের প্রাথমিক অম্লসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। তাই আশে-পাশে আসফাল্ট্ ডিপজিট্, প্রস্তরীভূত লবণের অস্তিত্ব, বিটুমেন্ ডিপজিট্, নিউম্লেটিক্ চুন-পাথর ইত্যাদির অস্তিত্ব এবং সামুদ্রিক জীবের প্রস্তরীভূত অস্থি (ফসীল) ভূনিম্নে পেট্রোলিয়াম থাকার চিহ্ন বলে ধবে নেওয়া হয়। এমনও দেখা গেছে, কোন যায়গায় এমন বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে, অথচ হুঁ-একটি নিদর্শনের অভাব ঘটেছে তেমন যায়গায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। আবার এমনও দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠে যেখানে প্রায় সমস্ত নিদর্শনই বর্তমান, তবুও সেখানে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। আবার যেখানে কোন নিদর্শনই নাই, সেখানে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে। এর কারণ হচ্ছে—নানাবিধ কারণে পেট্রোলিয়াম তার উৎপত্তি-স্থান থেকে বহু দূরে সরে যায়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে পেট্রোলিয়ামের “মাইগ্রেশন্” বলে। পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি-স্থানের উপরে প্রাকৃতিক কারণে ভূপৃষ্ঠের চাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে নিচের পাথর ক্রমশঃ জমাট বাঁধতে থাকে এবং ক্রমে ভিতরকার শূন্যস্থানগুলি (pore spaces) এবং বালুসমষ্টির অভ্যন্তর ভাগ থেকে পেট্রোলিয়াম্ এবং জল নিষ্কাশিত হয়ে পড়ে। তার পর প্রাকৃতিক যে সমস্ত কারণে তরল পদার্থ এক যায়গায় থেকে অন্য যায়গায় সরে যায়; যেমন তরল পদার্থের তলটান (surface tension) মাধ্যাকর্ষণ (gravity) এবং আশে-পাশে গ্যাসের চাপ ইত্যাদি

বালির ভিতর দিয়ে যেমন করে জল বয়ে যায় তেমনি করে পেট্রোলিয়াম্ তার উৎপত্তি-স্থান থেকে বেলে-পাথরের ভিতরকার শূন্যস্থান আর চূর্ণ-পাথর বা ডোলোমাইট হলে তার ফাটলের মধ্যে দিয়ে অন্য যায়গায় সরে চলে যায়।

স্থানে স্থানে এই গ্যাসের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেলে যে কি অবস্থা দাঁড়ায় তার একটা উদাহরণ, আশা করি, পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হবে না। আসামের লখিমপুর জেলায় মার্ঘেরিটা এবং লেডোপ মাঝামাঝি “বড় গোলাই” নামে একটা যায়গা আছে। “আসাম রেলওয়ে এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী”র রেল-লাইন মার্ঘেরিটা ছেড়ে কিছু দূর যেয়ে ভয়ানক ভাবে বেকে গিয়ে লেডোতে যেয়ে শেষ হয়েছে। তার থেকেই যায়গাটার নাম হয়েছে “বড় গোলাই”। পেট্রোলিয়ামেব সন্ধান পেয়ে “আসাম অয়েল কোম্পানী” এই যায়গায় হুইটা নল-কুপ বসান (১৯২৬-২৭)। তখন লেখকের সেখানে থাকবার সুযোগ হয়েছিল। যত দূর মনে আছে, প্রথমটা ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার ফুট গলে পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। কিন্তু এই যায়গায় পারিপার্শ্বিক গ্যাসের চাপ (static pressure) এত বেশী ছিল যে, তার ফলে পাইপের ভিতর দিয়ে ক্রুড পেট্রোলিয়াম এত বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে যে, প্রথম কিছু দিন পর্যন্ত পাম্প বসানই সম্ভব হয়নি। এই কুপটার নিচেকার পেট্রোলিয়াম কয়েক মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় কুপটা সাত-আট হাজার ফুট মেয়েও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় নাই। ফলে এই যায়গায় কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকা নষ্ট হয়।

আবার অনেক যায়গায় এমনও দেখা যায় যে, উপবেব পাথরের ভিতরকার অতি সামান্য ফাটলের মধ্যে দিয়ে তেল উপরে উঠে আসছে। সেই সব যায়গা পেট্রোলিয়াম্-বিশেষজ্ঞ ভূতত্ত্ববিদগণকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া কোন কোন যায়গায় এমন অতি ক্ষুদ্র ফাটলের মধ্য দিয়ে মিথেন্ বা মার্শ্ গ্যাস্ অথবা কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস্ অথবা হাইড্রোজেন-সালফাইড্ গ্যাস্ বেরিয়ে আসার চিহ্ন পাওয়া যায়। পূর্ব-পাঞ্জাবের কাংড়া জেলার জ্বালামুখী তেমনি একটি যায়গা। ভূতত্ত্ববিদগণের মনকে এই যায়গা বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে।

পূর্বোক্ত নিদর্শন অম্লযায়ী যে সমস্ত যায়গায় পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যেতে পারে বলে ভূতত্ত্ববিদগণের ধারণা হয়, সেই সব যায়গায় খুঁটিনাটি বিবরণ সহ বিস্তৃত মানচিত্র তৈরী করা হয়। তাহাতে জমির উচ্চতা (contour) ত দেখান হয়ই, তা ছাড়া বহু খুঁটিনাটি তথ্যের সঙ্গে তাহাতে বিভিন্ন স্থানের পাথর, কোন দিক থেকে কোন দিকে তাদের ফাটলগুলো চলেছে, কি ভাবে তারা নিচের দিকে নেমে গেছে (dip), সেই কোণ সমূহের মাপ (the angle it forms to the horizontal), ডিগ্রী, মিনিট, সেকেন্ড—এমন কি সেকেন্ডের শতাংশের একাংশ পর্যন্ত অত্যন্ত নিভুল ভাবে সেই মানচিত্রে দেখান হয়ে থাকে। কারণ, এই সমস্ত সামান্য মাত্র ভুল হলে ১৯১২° হাজার ফুট যেতে যেতে সেই পার্শ্বক এত বেশী বেড়ে যায় যে, শেবটা সমস্ত পরিভ্রম এবং অর্থব্যয় ব্যথা হয়।

এ জন্ত বিশেষজ্ঞ পেলিওলজিষ্টগণেরও সাহায্য নেওয়া হয় থাকে। পূর্বে যে ক্ষুদ্রতম এককোষবিশিষ্ট জীব এবং উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে তারা এত ক্ষুদ্র যে, এক ঘন-ইঞ্চি যায়গায়

তাদের বহু লক্ষ একসঙ্গে দানা বেঁধে থাকতে পারে। তাদের প্রস্তুতীকৃত দেহ এই যায়গার মাটি বা পাথরের মধ্যে আছে কি না তাঁরা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন।

এই অমুসন্ধানের কাজে জিওফিজিসিষ্টগণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম আছে কি নাই, সে সম্বন্ধে অমুসন্ধান করে বলে দেওয়া এঁদের গভীর বাইরে। তাঁরা শুধু ভূপৃষ্ঠ পরীক্ষা করে বিভিন্ন পাথর এবং মাটির স্তরগুলির উঠা-নামা, ভাঙ্গা-চূরা, তাদের সংযোগ-বিয়োগ বন্ধন এবং অবস্থান সঠিক নির্ধারণ করে—দিতে পারেন। তা থেকে ভূপৃষ্ঠের বহু নিচে সেই সব মাটির এবং পাথরের স্তরগুলি কোথায় আছে এবং কি ভাবে আছে তাও সঠিক বলে দিতে পারেন। অনেক যায়গায় এমনও দেখা গেছে যে, নিচে পেট্রোলিয়াম জমা আছে, কিন্তু তাব উপরে মাটি বা পাথরের একটা বা কয়েকটা নূতন স্তর এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যাতে করে নিচেকার পেট্রোলিয়ামের অবস্থিতির কোন চিহ্নই উপর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জিওফিজিসিষ্টগণের অমুসন্ধানের ফলে সেই সব ভূগর্ভস্থ নূতন এবং পুরাতন স্তরের অস্তিত্ব এবং অবস্থান জানা যায়। ফলে, ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়ামের খবরও জানা সম্ভব হয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে নূতন নূতন উপায় সমূহ উদ্ভাবিত হচ্ছে। এ জন্ত নল-কূপ বনানির কথা পরে বলা হবে। এই সব নল-কূপ কিছু দূর বনানির পর তার মধ্যে বিদ্যুৎস্রোত বইয়ে দিয়ে—নিম্নস্থ বিভিন্ন পদার্থের বিদ্যুৎস্রোত নিরোধক ক্ষমতা বিশেষ যন্ত্র সাহায্যে পরিমাপ এবং নির্ধারণ করে তাব রেকর্ড করা হয়। তা থেকে নিচে এক কত নিচে মাটি, বালি বা পাথর—কি রকম পাথর এবং অজ্ঞাত যা কিছু আছে নিশ্চিতরূপে জানতে পারা যায়।

ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব নির্ধারণের জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রচলিত বহুবিধ উপায়ে যেখানে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব জানতে পারা সম্ভব হয়নি, সে উপায়ে তা জানা গেছে। প্রথমে সামান্য ২১শ' ফুট গভীর নলকূপ বসিয়ে তার ভিতর জেলিগনাইট, ডিনামাইট অথবা টি, এন, টি নামক বিস্ফোরকের সাহায্যে বিস্ফোরণ করা হয়। সেইসমোগ্রাফ দ্বারা ছোট এবং অত্যন্ত স্পর্শকাতর যন্ত্র সেই নলকূপের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে তাহাতে বিস্ফোরণজাত কম্পনের (shock-wave) দ্বারা রেকর্ড করে নেওয়া হয়। তা থেকে বিশেষজ্ঞ জিওফিজিসিষ্টগণ বহু নিচে ভূগর্ভে কোন শ্রেণীর মাটি, বালি এবং পাথর ইত্যাদি আছে কি না সঠিক ভাবে নির্ধারণ করে তা থেকে নির্ভুল ভূচিত্র আঁকতে পেরেছেন। তা থেকে জানতে পারা গেছে যে, নিচে বিটুমিনাস শেল বা অয়েল শেল আছে কি না; অথবা টুপির আকারের একটা মাটির পর্দা আছে কি না—বার নিচে পেট্রোলিয়াম এসে সঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে। এই ভাবে সম্প্রতি আমেরিকার টেক্সাস প্রদেশে পেট্রোলিয়ামের খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইরূপ বহু জটিল প্রণালী ও প্রক্রিয়ায়, বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র এবং বিবিধ সূক্ষ্মতম এবং জটিলতম যন্ত্রাদির সাহায্যে ভূগর্ভে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করা হয়।

আগে বলেছি, পেট্রোলিয়াম যেখানে জন্মে সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে অল্প যায়গায় সরে যায়। এই ভাবে যেখানে যেখানে সঞ্চিত

হতে থাকে কার্যকরী হিসাবে সেইটাই হচ্ছে পেট্রোলিয়ামের খনি; এবং তারই উপরিভাগটাই হচ্ছে “অয়েল-ফিল্ড”। উপর থেকে তেমন যায়গা নির্বাচন করাই হচ্ছে আসল অমুসন্ধান (Exploration)।

ভূগর্ভের গভীরতম স্তরে কোথায় পেট্রোলিয়াম এসে জমা হয় বিশেষজ্ঞগণ সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে অমুসন্ধান করেছেন। ভূগর্ভের অত্যধিক উত্তাপে তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়; এবং গ্যাসও আরও বেশী সম্প্রসারিত হতে থাকে, অর্থাৎ তার আকার (volume) বাড়তে থাকে। এইরূপে যখন চাপের পরিমাণ ভয়ানক ভাবে বেড়ে ওঠে তখন স্থানবিশেষে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎসার হয়। আবার স্থান বিশেষে উপরিস্থ মাটি এবং পাথর ইত্যাদিকে উপরেব দিকে কতটা ঠেলে তুলে রেখে দেয়। ভূগর্ভে যেখানে এইরূপ গ্যাস সঞ্চিত হতে থাকে তার উপরে সংকোচনশীল পদার্থ যেমন নরম মাটি বা শেলের পুরু স্তর থাকলে সেটা ক্রমে ক্রমে এবং সংকুচিত হয়ে উপরটা পাতলা হয়ে ক্রমে একটা টুপির অথবা কোণের আকার ধারণ করে। তার উপরে বালির স্তর থাকলে সেই বালি ক্রমে ক্রমে স্থানচ্যুত হয়ে টুপির আকারে মাটির ছাদকে আরও উপরে উঠতে সক্ষম হয়। তাব উপরে একটা শক্ত পাথরের স্তর থাকলে সেই ডোমের বেশ শক্ত একটা ছাদ হয়ে পড়ায়। উপরের এই ছাদের প্রতিরোধ শক্তি গ্যাসের শক্তির চেয়ে বেশী হলে অগ্ন্যুৎসার বা ভূপৃষ্ঠের আকারের কোন পরিবর্তন হয় না; তাই উপর থেকে সহজে এটা ধরাও পড়ে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে “ম্যাড-ভল্কানো” বা মাটির আগ্নেয় গিরি বলে। বাসিয়াতে পেট্রোলিয়ামের জন্য অমুসন্ধান করতে যেয়ে এমন ম্যাড-ভল্কানোর খবর পাওয়া গেছে যার মাঝখানটা গ্যাসের চাপে ২৫০ ফুট উপরে উঠে গেছে।

এই ম্যাড-ভল্কানো অনেক যায়গায় সমুদ্রের নিচে থেকে জলের উপর পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে দেখা যায়। এ জিনিষটা মাটির বলে হুঁদিনেই মাটিটা জলে গলে যেয়ে ভিতরের গ্যাসটা বেরিয়ে যায়; ফলে সত্যোজাত দ্বীপটাও অদৃশ্য হয়ে যায়। তাই মাঝে-মাঝে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ জন্মে উঠতে, আবার হুঁচাব দিন পরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। আমাদের দেশের কাছে আরাকানের নিকটে সমুদ্রের মধ্যে মাঝে-মাঝে এ দৃশ্য দেখা যায়।

যে সমস্ত গ্যাসের চাপে এই ম্যাড-ভল্কানোর সৃষ্টি হয় তারা সাধারণতঃ পেট্রোলিয়ামধর্মী। তাদের নাম আগে করেছি। তাই এই ম্যাড-ভল্কানোর নিচে পেট্রোলিয়াম এসে জমে থাকতে দেখা যায়। বাস্তবতে, আসামে, আটকে, বাকুতে, মেসোপোটামিয়ায়, ত্রিনিদাদে অয়েল-ফিল্ডের নিচে ঠিক এই অবস্থা। ভূতত্ত্ববিদ মিঃ এস, কে, রায় মনে করেন, পূর্ব-পাঞ্জাবের কাংড়া জেলা এবং তার পার্শ্ববর্তী মণ্ডি টেটের নিচেও ঠিক এই অবস্থা বিদ্যমান। পারিপার্শ্বিক অবস্থার এবং গ্যাসের চাপের ব্যতিক্রম অনুসারে এই ম্যাডভল্কানো বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে।

এত জায়গা থাকতে টুপির বা কোণের আকারবিশিষ্ট ম্যাড-ভল্কানোর নিচে এসে পেট্রোলিয়াম জমা হয় কেন? তার কারণ কতকটা এর জন্মস্থান থেকে সরে যাওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জলের চেয়ে পেট্রোলিয়াম হালকা বলে এবং লবণাক্ত জলের

চেয়ে আরও বেশী হাল্কা বলে জলের উপর ভেসে-ভেসে দূরে চলে যায়। আবার পারিপার্শ্বিক গ্যাসের চাপে কঁক পোলে পাথরের রক্ত এবং ফাটলের ভিতর দিয়ে উপরে উঠে এসে নষ্ট হয়ে যায়। মাটির কণা আকারে অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১,৫০০ ভাগের এক ভাগ অথবা ০.০০১৬ এবং ০.০০১৭ মিলিমিটারের মাকানারি আকারের বলে গ্যাসের চাপে অত্যধিক জমাট বাঁধা টুপি আকারের ছাদ ভেদ করে পেট্রোলিয়াম ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসতে পারে না বলে ওখানেই আটকে থাকে।

নলকূপ বসানর প্রণালী বা পদ্ধতি অথবা টেকনিক আলোচনার স্থান এখানে নয়। পেট্রোলিয়ামের অনুসন্ধানের দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব। যা হোক, এই ভাবে ভূতত্ত্ববিদগণ পেট্রোলিয়াম সম্বন্ধে যখন কতকটা নিশ্চিত পূর্বাভাস দেন, তখন সেই সব জায়গায় গভীর নলকূপ বসিয়ে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হয়। এটা ঠিক জলের জন্ত ১০০ বা ২০০ ফুট গভীর নলকূপ বসানর মত সহজ বা সুলভ ব্যাপার নয়। পেট্রোলিয়ামের জন্ত যে সমস্ত নলকূপ বসান হয়ে থাকে তার গভীরতা ২৫০০।৩০০০ ফুট থেকে আবিস্কার করে কয়েক মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৯৪৮ সালে আমেরিকার উয়েমিং প্রদেশে ১৭,৮০২ ফুট গভীর নলকূপ বসিয়েও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে এই যায়গায় পেট্রোলিয়াম পেতে হলে ২০,০০০ ফুটের নিচে যেতে হবে। এরই ঠিক পরের বছর ক্যালিফোর্নিয়াতে ১৮,৭৩৪ ফুট গভীর নলকূপ বসিয়েও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। আমেরিকার কন্সটিগন (Drillers) এই সব নিফল নলকূপের নাম দিয়েছে “বন-বিড়াল” (Wild Cat)। হয়ত স্মৃচতুর বন-বিড়ালগুলিকে ধরতে চেষ্টা করলে যেমন তাদের পেছন পেছন ছুটে হয়রাণ হতে হয়, এটা বোধ হয় ঠিক তেমনি ব্যাপার বলে “বন-বিড়াল” নাম দেওয়া হয়েছে। এই বছর জুলাই-আগষ্ট মাসে উয়েমিং-এর সাবলেট অঞ্চলে ২০,৫২১ ফুট গভীর নলকূপ বসিয়ে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে।

আগে বলেছি, জলের জন্য নলকূপ বসানর মত অত সহজ ব্যাপার এ নয়। বাংলার মত মাটির দেশে একটা ১০০ ফুট গভীর নলকূপ বসাতে ফুট-প্রতি গড়ে ৩ থেকে সাড়ে ৩ টাকা মত খরচ পড়ে। আবার পাহাড়ের দেশে একটা ৫০০।৬০০ ফুট গভীর নলকূপ বসাতে সেই যায়গায় খরচ পড়ে গড়ে ৩০ টাকা ফুট। এটা যত গভীর হতে থাকে ততই প্রতি-ফুটে খরচ বোমানান ভাবে বেড়েই চলে।

এত বিভিন্ন বকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর এবং এত বেশী অর্থব্যয় করে পেট্রোলিয়ামের জন্য যে সমস্ত নলকূপ বসান হয়ে থাকে, হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, তাদের প্রতি ১০০টির মধ্যে ৮৮ থেকে ৯০টা এই “বন-বিড়ালের” দলে চলে যায়। তা সত্ত্বেও ১০টার মধ্যে যে একটাতে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় সে সমস্ত খরচ-খরচা পুষিয়ে দিয়েও অতি অল্প দিনের মধ্যে কোম্পানীকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তা ছাড়াও এক বিন্দু তেল পাওয়ার আগেই আফিস, স্টোর, রিফাইনারি, ওয়ার্কশপ ছাড়াও বাড়ী, ঘর, হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তা-ঘাট, বাজার, পোষ্ট আফিস, আমোদ-প্রমোদের যায়গা, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা মিলিয়ে একটা মাঝারি ধরনের আধুনিক

সহর গড়ে তুলতে হয়। এই সমগ্র ব্যাপারটাকে আর্থিক দিক থেকে লক্ষ্য করলে বেশ বুঝা যাবে যে, একটা পেট্রোলিয়ামের খনি অনুসন্ধান করে বের করে তাকে তৈল-প্রসূ করে তুলতে হলে বেশ কয়েক কোটি টাকা মূলধন এবং যথেষ্ট ঝুঁকি নেওয়ার মত আর্থিক সামর্থ্য, মনোবৃত্তি এবং মনোবল থাকা প্রয়োজন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ বিষয়ে কত দূর কি কথা হয়েছে তার সাক্ষিত্ত বিবরণ দেওয়ার আগে মণ্ডিষ্টেই এবং কাংড়া জেলার জালামুখীতে পেট্রোলিয়াম পাওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ছ’-টা কথা বলা আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মণ্ডিষ্টে, যোগীন্দ্রনগরের বিখ্যাত জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র থেকে পূর্ব দিকে মাত্র ৩৪ মাইল দূরে লবণ-পাথরের খনি আছে। স্থানীয় লোকেরা শতাধিক বছর ধরে সেই খনি থেকে লবণ তুলে নিচ্ছে। এই যায়গা থেকে ৫০।৬০ মাইল দূরে উত্তর-পূর্ব দিকে মোনালীতে “ওয়ারশিষ্ট রিখিকা আশ্রম” অর্থাৎ বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমের নীচে উচ্চ জলের প্রস্রবণ আছে। এই যোগীন্দ্রনগর থেকে ৫০ মাইল দূরে পশ্চিম দিকে জালামুখী। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের কোন কোন যায়গায় আস্ফাল্ট ডিপজিট আছে, কোথায়ও বা বিটুমেন পাওয়া যায়। কোথায়ও ল্যুয়ুলিটিক চূর্ণ পাথরও আছে। এই জালামুখী আমাদের পরম পবিত্র পীঠস্থান। কথিত আছে, নারায়ণ যখন শিবের স্বকৃষ্টি সতীর মৃতদেহ স্মদশন চক্রে কেটে ৫১ খণ্ড করে ফেলেন তখন দেবীর জিহ্বা এখানে এসে পড়ে। এই যায়গায় অধিকা দেবীর মন্দির ধারা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে ভূতত্ত্ববিদ কেই থাকলে তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এই যায়গায় ভূমিতে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব বিচলমান। এই মন্দিরের মাঝখানের চতুষ্কোণ কুণ্ডটির ৪।৫ যায়গা থেকে এবং উত্তর-পশ্চিম কুণ্ড থেকে অনবরত যে দাছ গ্যাস সবগে বেরিয়ে আসছে, তা যে ভূগর্ভস্থ পেট্রোলিয়াম থেকে উদ্ভূত এবং উপবিষ্ট পাথরের ভিতরকার অতি সামান্য ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে তা’তে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

পূর্বে আভাস দিয়েছি, একটা পেট্রোলিয়ামের খনির অনুসন্ধানের কাজ স্মৃচতুরে পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বর্তমানে ভারত সরকারের যা আর্থিক অবস্থা, তার উপরে বিদেশ থেকে ঋণগ্রস্ত সংগ্রহে বেরূপ অপব্যয় অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহাতে এমন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হাতে নেওয়া সমীচীন হবে কি না সেটা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। তবে টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদ, ভালমিলা জৈন সমবেত ভাবে চেষ্টা করলে দেশের এই মূল্যবান সম্পদ আহরণ সম্ভব হতে পারে এবং দেশের পরমুখ্যপেক্ষিতা হতে পারে। এদিক দিয়ে পাঞ্জাবের ধনপতি লাল শ্রীবান, করমচাঁদ খাপর, লাধাসিং বৌদীরও একটা কর্তব্য আছে মনে হয়।

যা হোক, এ বিষয়ে ভারত সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ১৯৪১ সাল থেকে একটা কথা শুনা যাচ্ছিল যে, বোম্বাইয়ে বেলগাম জেলায় সাউন্সি নামক যায়গায় জামদগ্নীওড়ি মন্দির কাছে একটা কুয়ার জলে তেল ভাসতে দেখা গেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরের বছরই ভূতত্ত্ব বিভাগ এটা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন যে, কুয়াটা কোয়ার্টজাইট পাথরের মধ্যে খোঁদা হয়েছে সেখানে পেট্রোলিয়ামের কোন চিহ্ন বা নিদর্শনই নাই। কু

পোড়ার জন্ত মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছিল। তা'তে যে তেল দেওয়া হয়, তা থেকেই হয়ত একথাটার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৪৯ সালে এ বিষয়ে বিশেষ কোন অনুসন্ধান চালান না হলেও ১৯৫০ সালে অনেক কিছু করা হয়েছে। ঐ বছর আসামের বালিপাড়া এবং আবার পাহাড়ে অনুসন্ধান চালান হয়; কিন্তু আশালুফ ফল পাওয়া যায়নি। গোয়ালপাড়া জেলায় বিজনী-রাজের জমিদারীর মধ্যে এক জায়গায় জলের উপর তেল ভাসুছে বলে খবর আসে। ভূতত্ত্ববিদগণ সেখানে যেয়ে দেখতে পান যে, জলের উপরে যে জিনিষটা ভাসছে সেটা আয়রণ-হাইড্রো-অক্সাইড মাত্র। পেট্রোলিয়াম নয়।

কলিকাতার “গাশনাল অয়েল মাইনিং এণ্ড রিফাইনিং সিণ্ডিকেট” আসামের খাসি ষ্টেটের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে কিছুটা জায়গা লীজ নিয়েছেন। সেখানে ১৯১০ সালে একটা নলকূপ বসান হয়েছিল। এরা অনুসন্ধানের জন্ত ভারত সরকারের সাহায্য চাইলে, দুই জন ভূতত্ত্ববিদ সেখানে যেয়ে পাথরের ফটিল দিয়ে চুইয়ে-আসা পেট্রোলিয়াম এবং গ্যাসের সন্ধান পান। সেখানে উপরিস্থ পাথরের যেমন অবস্থা তা'তে বহুসংখ্যক এবং প্রত্যেকটা কয়েক হাজার ফুট গভীর নলকূপ বসানর প্রয়োজন অনুভূত হয়। আর্থিক দিক থেকে এটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং মস্ত-বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া বলে তাঁরা মত দেন।

বধে পোর্ট ট্রাষ্টের জমিতে একটা বাড়ীর জন্ত ৭৮ ফুট গভীর ভিত খুঁড়তে যেয়ে তেল পাওয়া যায়। কয়েক বার ঐ জায়গা থেকে মোট এক লক্ষ গ্যালন মত তেল পাওয়া গেছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, ঐ জায়গা থেকে ৪০ ফুট দূরে মাটির নিচে কয়েকটা পাইপ আছে। তাদের ভিতর দিয়ে তেল স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। বধে ডক বিস্ফোরণের সময় ঐ পাইপগুলি ফেটে পাওয়ার ফলে ঐ ভাবে তেল জমা হচ্ছে।

কচ্ছ প্রদেশে দুইটা কুয়ার মধ্যে পেট্রোলিয়াম আছে বলে স্থানীয় লোকের ধারণা জন্মে। ভূতত্ত্ব বিভাগের পেট্রোলিয়াম-বিশেষজ্ঞ সেখানে অনুসন্ধান করে দেখতে পান—যে জিনিষটাকে পেট্রোলিয়াম বলে লোকের ধারণা হয়েছে সেটা হচ্ছে আয়রণ-অক্সাইড।

এমনি পূর্ব-পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জেলার শ্রামচুরাশি গ্রামে পেট্রোল আছে বলে লোকের ধারণা জন্মে। ভূতত্ত্ব বিভাগ ঐ গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী ৪৫টি গ্রামে অনুসন্ধান-কার্য চালিয়ে দেখেন যে, জলের উপরে তেলের মত যা ভাসুছে গাছ-পালা ও শাক-সব্জীর পচন থেকে তার উৎপত্তি।

উত্তর প্রদেশের লখিমপুর থেরীতেও এমনি অনুসন্ধান চালান হয়েছে; কিন্তু কোন সম্ভাবজনক ফল পাওয়া যায়নি।

১৯৫১ তারিখের প্রেস ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া খবরে প্রকাশ যে, নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে ৬০ মাইল দূরে ওখালডোঙ্গা পাহাড়ের কাছে পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে। নেপালের চারিটি সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবসায়ী সমবেত হয়ে তেল নিষ্কাশনের জন্ত নেপাল সরকারের কাছ থেকে ঐ জায়গাটা ১০০ বছরের জন্ত লীজ নিয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠান যখন তেল নিষ্কাশন আরম্ভ করবেন তখন থেকে নেপাল সরকার শতকরা ৩ টাকা হারে রাজস্বের পাবেন। আপাততঃ কাজ যত দূর এগিয়েছে তা থেকে মনে হচ্ছে, ঐ জায়গা থেকে রোজ ৫০০ গ্যালন তেল পাওয়া যাবে।

ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ গত ২৬/৫/৫১ তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদগণ নাগা পাহাড়ে নিম্ন শ্রেণীর পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি একথাও বলেছেন যে, সেখানে নল-কূপ না বসান পর্যন্ত এর চেয়ে অধিক তথ্য জানা সম্ভব নয়।

আসাম এবং পূর্ব-পাকিস্থানের সীমান্তে পাথুরিয়া পাহাড় অঞ্চলে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানে এখনও পাকিস্থানের সঙ্গে সীমানা নিয়ে গোলমাল চলছে। এই জায়গায় পাকিস্থানের অংশেও পেট্রোলিয়াম আছে। তাই আসাম অয়েল কোম্পানী আসাম থেকে কতকগুলো মেসিনারী পাকিস্থান অঞ্চলে সবিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সংবাদ পাওয়া গেছে।



—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত

—এটা একটা অল-সিজন জামা ক'রে দিলুম।  
শীতের সময় পরলেন, গরমের সময় খুলে রাখলেন।



## শ্রীমধুসূদনের কবি-কল্পনায় নারী

দীনা গিত্তে

ঊনবিংশ শতকে বঙ্গভাষায় প্রথম নাট্য-সাহিত্যের জন্ম হয়।

কিন্তু সেই প্রথম যুগে বাঙ্গালা নাটক তেমন সুরচিসিক্ত বা হৃদয়গ্রাহী ছিল না; সুতরাং তাহা তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের মাজ্জিতক্কটি বা রসপিপাসুর মনকে পরিভূক্ত করিতে পারে নাই। এই সময়ে রামনারায়ণ তর্কবন্ধ মহাশয় শ্রীহর্ষ-প্রণীত সংস্কৃত 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি মনোজ্ঞ নাটক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি সর্বজননের আদৃত হইয়া আশাতীত প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও ধনী সমাজের বিশিষ্ট অঙ্গস্বরূপ ইংরেজ, পারসী, ইত্যাদি ও সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী—বাহার্য কলিকাতার নাট্য-জগতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহারাই এই বাঙ্গালা নাটক-খানির সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। সুতরাং ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ কবি মধুসূদনের উপর এই পুস্তকখানি ইংরেজীতে তজ্জমা করিয়া দিবার ভার দেওয়া হইল। এই রত্নাবলী নাটকখানি তজ্জমা করিয়া দিবার পর হইতেই মধুসূদনের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের পথ সূচিষ্ট হইয়া গেল। ইহার পূর্বেও তিনি ইংরেজীতে কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন, কিন্তু কবিশযশঃপ্রার্থীর আকাঙ্ক্ষা সফল হয় নাই। কারণ, তাহার রচিত **Captive Lady** এবং **Visions of the Past** কাব্য দুইখানি প্রশংসা অপেক্ষা উপেক্ষা ও তীব্র সমালোচনাই লাভ করিয়াছিল বেশী। রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের পর হইতে মধুসূদন বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য রচনায় বিশেষ আগ্রহশীল ও অম্লবাসী হইয়া উঠিলেন এবং হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও প্রেরণায় বঙ্গভাষায় প্রায় অনভিজ্ঞ কবি স্বল্পদিনের মধ্যেই মাতৃভাষাও আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একটা বিরাট ও বিশ্বব্যাপী প্রতিভা লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য-গগনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেদিন তাহার যে ভাষার জ্যোতির্লোকে বঙ্গদেশের চক্ৰ ঘলসিয়া

গিয়াছিল আজও সেই রশ্মিজাল বাঙ্গালার সাহিত্য-জগতের একাংশ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

মধুসূদন ছিলেন বিশ্বশ্রী—চিরবিদ্রোহী, তবুও বাঙ্গালা মায়েরই এক হৃদয় অশান্ত সন্তান। বঙ্গজননীর এই বিদ্রোহী সন্তান বিদেশী সাহিত্য হইতে মূল ঘটনা, ভাব, কল্পনা, বর্ণনাভঙ্গী, ছন্দ, আদর্শ ইত্যাদি আহরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকেই নূতন রূপসজ্জায় ভূষিত করিয়াছিলেন এবং আপন সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও মহিমায় শিশুর জায় উন্নীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন এক জন প্রকৃত দরদী কবি ও নিপুণ শিল্পী, সত্য ও সূন্দর এবং ঐশ্বর্যের পূজারী—সঙ্গীতের অম্লবাসী। তাই স্বদেশের বাহা কিছু সূন্দর বস্তু তাহার কবিমনে প্রবল ভাবে সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা লইয়াই আত্মহারা কবি স্বদেশী ও বিদেশীয় সুরে কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনা গাহিয়াছেন। কোথায় গেল ভারতের কাব্য-জগতের চিত্রাচারিত বিধিনিষেধের শাসন, পদে পদে কত না বাধা;—সর্ব-সংস্কারমুক্ত শক্তিমান কবি আপনার প্রাণ-প্রাচুর্যের দুর্দম আবেগে, নব উদ্বোধিত প্রতিভায়, নব নব সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার অমূল্য রত্ন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

কল্প রসের প্রতি কবির একটি সহজাত আকর্ষণ ছিল। সঙ্গীতপ্রিয় কবিস্বদয় বিবাদের সুরেই অপূর্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠিত। এই বিবাদের সুর গাহিতে গিয়া কবির বিশ্বকর সৃষ্টি যেন প্রস্টাবেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ মাৎপূজক, তাই ভারতের কবি চিরদিনই নারীর প্রশস্তি গাহিয়াছেন বিচিত্র সুরে। মধুসূদনের নৈপুণ্য ও কৃতিত্বও নারীর বিচিত্র রূপের মহিমা কীর্তন করিতেই সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে। তাই করুণ ও বিবাদের সুরে চারণ কবি বাঙ্গালার পুণ্য প্রেমের নির্বরধারা, আনন্দ ও শক্তিরূপীণী, চির ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ত্রুণসী নারীর জীবনগাথা অমর ছন্দে গাহিয়াছেন। নারীকে তিনি কত বিচিত্র রূপেই না তাহার ধ্যান-কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন!

এক দিকে নূতন সৃষ্ট ছন্দসঙ্গীতে নূতন কাব্যসৃষ্টির উদ্ভেজনা, প্রচণ্ড বলিষ্ঠ শক্তির ঐশ্বর্য ও ভাবের সমারোহ; অপর দিকে বাঙ্গালার চির নির্ধ্যাতিতা বেদনাময়ী নারীর মেঘাচ্ছন্ন শারদশশীর জায় রূপের মহিমা, একাগ্র পতিপ্রেম, তেজস্বিতা ও পবিত্রতা—এই সব কিছুই তাহার কবি-প্রতিভাকে দুর্বীর বেগে নব নব সৃষ্টির পথে উৎসাহিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের যেখানে নারীর যা-কিছু বৈশিষ্ট্য বা সৌন্দর্য তাহার কবি-মনকে মুগ্ধ, বিম্বিত ও ব্যাধিত করিয়াছে তাহা তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া রূপকার ভাস্কর শিল্পী কবি তাহার মানসী কল্পাদিগকে নানা বিচিত্র রূপে রূপায়িত করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছেন।

জীবনে স্বীয় জননীর অমূল্য প্রভাব তিনি আমরণ বিশ্বৃত হইতে পারেন নাই। জননীর হৃদয়ে অনিচ্ছাকৃত বেদনা দিয়া তিনি জীবনে সুখীও হয়ত হইতে পারেন নাই। মাতাকে ভালবাসিয়া, শ্রদ্ধা করিয়া বাঙ্গালার মেয়েদের তিনি ভালবাসিয়াছিলেন। তাই নারী-চরিত্র অঙ্কন করিবার জন্য যে আদর্শ তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালার একান্ত নিজস্ব, বাঙ্গালী নারীর বৈশিষ্ট্য। খুঁটখুঁটি বাঙ্গালার কবি স্বদেশের অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য রেহ ও শ্রদ্ধার সুরে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তাই বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীকরূপে বাহারা চিরকাল আদর্শ হইয়া বিরাজ করিতেছেন তাহারাই ছিলেন মধুসূদনের কবি-কল্পনার আদর্শ। তাহার সৃষ্টি নারীচরিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শগত ও চরিত্রগত অল্প-বিস্তর

পার্বক থাকিলেও সামঞ্জস্যও আছে এবং তাহা শিল্পী কবির স্বহস্তের  
রূপচর্চায় ও নিজস্ব ভাবান্ধে অভিনব হইয়াছে।

‘রত্নাবলী’ নাটকের নায়িকা সর্বাপেক্ষে একটি বাঙ্গালী নারী। এই  
নারী মধুসূদনের নব উদ্বেষিত কাব্যপ্রতিভা, অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী ও  
আদর্শকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল কম নয়। ‘রত্নাবলী’ অতুলনীয়  
রূপসী, সিংহলেশ্বরের একমাত্র দ্বিহিতা কিন্তু নিয়তির নির্গম পরিহাসে  
ভাগ্যবশিত। এই সহনশীলা, নিরতিমানিনী মেয়েটি তার অতুলনীয়  
রূপ, সরল প্রেমমুগ্ধ অন্তরের ঐশ্বর্য লইয়া কবির হৃদয়ে এক সুগভীর  
বেদনাময় মমতা ও সহানুভূতির স্থান অধিকার করিয়াছিল।  
তাই দেখিতে পাই যে, তাঁহার প্রথম নাটক ‘শর্মিষ্ঠা’ রচনা কালে  
পাশ্চাত্য প্রভাব সত্ত্বেও তিনি রত্নাবলীকেই আদর্শ করিয়াছিলেন।  
শর্মিষ্ঠার চরিত্রও বড় করুণ, বড় বেদনাময়, অথচ মধুর। উভয়ের  
চরিত্রেই একটি অনাবিল স্নিগ্ধ ভাবরসে হৃদয় আগ্রস্ত করিয়া দেয়।  
উভয়েই রাজহুলারী সৌভাগ্য-গর্ভে গর্ভিতা, কিন্তু যে  
রাজ-অন্তঃপুরে সর্বপ্রধানা মহিষীর গৌরব ও সম্মান লাভ  
করিবার যোগ্য, সেখানে তাঁহার প্রথম জীবনে ভাবী সপত্নীর  
দাসী—তাহার হস্তে নিগৃহীত। তবুও উভয়েই অতি প্রশান্ত  
মনে আপনাদের ছবদৃষ্টিকে মানিয়া লইয়াছেন। রত্নাবলীকে  
মহিষী বাসবদত্তার আদেশে সম্রাট উদয়নের দৃষ্টির অন্তরালে সামান্য  
পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে; পরিশেষে রাজ-  
অন্তঃপুরের এক দুর্গম স্থানে নিগড়বদ্ধ অবস্থায় বন্দি হইয়াও থাকিতে  
হইয়াছে। এই গভীর দুঃখেও তিনি মনের স্বৈর্য্য, আশা ও বিশ্বাস  
হারান নাই, বাসবদত্তার শত অত্যাচারেও তাঁহার মনে কোন অভিযোগ  
নাই। বরং সম্রাট উদয়নকে একাগ্র অন্তরে ভালবাসিয়া তাঁহার প্রাসাদেই  
আশ্রয় লাভ করিতে পাইয়া জীবনকে দগ্ধ মনে করিতেছেন।

রাজহুহিতা শর্মিষ্ঠারও আপনার মলভাগ্যের জগৎ কাহারও প্রতি  
কোন বিরূপ বা বিদ্বেষ নাই। মহিষী  
দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করিয়াও কখনো  
অদৃষ্টকে অপরাধী করেন নাই। উপরন্তু  
সম্রাট অসহিষ্ণুতায় তাহাকে তিরস্কার  
করিয়া বলিতেছেন—‘সখি, তুমি বিধা-  
তাকে অকারণ দোষী করিতেছ কেন?  
কৃষ্ণকঙ্কা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ-  
বিসম্বাদ না হইলে ত আমার আজ এ  
হৃদশা হইত না।’

বাসবদত্তার মত দেবযানীও কোপন-  
শতাবা, নিষ্ঠুরা, অতিমানিনী। কিন্তু  
মধুসূদনের দয়ালু দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-কৌশলে  
দেবযানীও প্রগাঢ় প্রেমময়ী, সাদরী—  
স্বামী হৃদয় হইতে সামান্য বিচ্যুতির  
আশঙ্কায় ব্যাকুলা।

শর্মিষ্ঠা নাটকের পর মধুসূদন পদ্মা-  
বতী নাটক রচনা করেন। পদ্মাবতীর  
মূল উপাখ্যানটি গ্রীক পুরাণের আদর্শ  
রচিত হইলেও পদ্মাবতীর চরিত্রটিও বড়  
মধুর ও কোমল। পদ্মাবতী সৌন্দর্য্য

ও সরলতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু রাজকঙ্কা, রাজমহিষী হইয়াও নিয়তির  
পরিহাসে যুথদ্রষ্টা কুরঙ্গিনীর স্তায় তাহাকেও আশ্রয়হীনা হইয়া বনে  
বনে ছুটিতে হইয়াছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে পদ্মাবতীকে  
স্বামীর পার্শ্বে রাজরাজেশ্বরীরূপে দেখিতে পাইয়াও তাহার কেশখমানা,  
ছিন্নবস্ত্র কমল-কলিকার স্তায় বিপর্য্যস্ত রূপটি কিছুতেই মন হইতে  
মুছিয়া যায় না।

নারীর ভাগ্যানিয়ন্তা ‘অদৃষ্ট’ নামক বিরাট শক্তিমান পুরুষের  
হস্তে লালিতা অসহায় নারীর অক্ষধারাসিক্ত রূপরাশিই ছিল  
মধুসূদনের ধ্যান-কল্পনায় সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের কৃষ্ণকুমারী ইহাদেরই সহোদরা। একই  
উপাদানে গঠিত। ভাগ্যবিভক্ত কৃষ্ণা শুনিলেন যে, পিতার  
ইচ্ছায় তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, কিন্তু বালিকা  
কৃষ্ণা—যাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের বিপুল সুখ সম্ভাবনা—অকালে মৃত্যুর  
সংবাদেও তাহার মনে কোন দ্বিধা বা সংশয় নাই। পুত্রতাতকে  
কাতর দেখিয়া বলিতেছেন—‘তা এ নিমিত্তে আপনি এত কাতর  
হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে একবার ডেকে আনুন গে। আমি  
তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মত বিদায় হই...।’

ঈশ্বরে এমন অলস্ত বিশ্বাস, এমন অপার দৈর্ঘ্যনিষ্ঠতা, অদৃষ্টকে  
নির্বীচাবে মানিয়া লইবার এমন হৃদয় তপস্যা, গুরুজনে অটল ভক্তি,  
সুগভীর পাত্তিত্ব, প্রেম ও নির্ভরতা—এ বৃষ্টি ভারতের হিন্দু  
মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ‘তিলোত্তমা’ কবির প্রতিভার এক  
বিষয়কর নিদর্শন। সৌন্দর্য্যের পূজারী কবি তিলোত্তমাকে আপন  
হৃদয়ের রঙে এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের পুত্রলী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।  
বিপন্ন দেবতার শত্রু নিপাত করিবার জন্য বিশ্বের সৌন্দর্য্য  
ছানিয়া সে বরতন্ত্র গঠিত। সরসীর জলে আপন রূপের প্রতিবিম্ব



ফেটভাল অব ডিটেনে পোষাকের ‘ফ্যাশন’ও প্রদর্শিত হয়। এই ক’জন মহিলা  
কতকগুলি পোষাক পরেছেন—যেগুলি লগনের সব চেয়ে খ্যাতিমান দর্জির তৈরী।



দেখিয়া সে আপনিই মুগ্ধ ও বিম্বিত। যে দুৰূহ কার্যসাধনের জন্য তাঁহার উদ্ভব সে বিষয়ে সে সেন সম্পূর্ণ সচেতন নয়। ক্ষণিকের জন্যে সৌন্দর্যের মোহভাল বিস্তার করিয়া দেবকার্য সাধন করিয়া সৌন্দর্যের প্রতিমা, স্বর্গ্যালোকের প্রথর দীপ্তির মাঝে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু সে সৌন্দর্যের মায়াজাল নয়ন-মন হইতে আর অপসৃত হইল না।

‘তিলোত্তমা’ সৌন্দর্যের বরপুত্র কবির সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ। কবির সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ বচনা ‘মেঘনাদবধ কাব্যের’ প্রত্যেকটি নারীচরিত্র স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ও অনবদ্য সৌন্দর্যের গরিমায় অনবদ্য—অতুলনীয়। মেঘনাদবধ কাব্যের ‘সীতা’ বহুবলবৎ প্রেম ও পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু চির হৃৎগগিনী; অশোকবনে নিদ্রায় রাক্ষসের হস্তে বন্দিনী। লোকললামভূতা সীতা অদৃষ্টের হস্তে নিম্মম ভাবে লাক্ষিতা—কিন্তু মুখে নাই কোন অভিযোগ, কোন বাহ্যিক ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস! স্বামী, আশ্রয়-পবিজন, স্বপ্ন-সম্পদ হইতে বিচ্যুতা—তবুও অসীম ধৈর্য্যবলে নৌবে প্রিয়তম স্বামী বীৰশ্রেষ্ঠ বৎসলিতলক রামচন্দ্রের আশায় আশায় ‘হরন্তু চেড়ী’-বেষ্টিতা হইয়া দিন গণিতেছেন। ললাটে আয়ুযুগল সিন্দূরবিন্দু, পবিধানে কাষায় বসন, মস্তকে রক্ত কেশ-সম্ভার এক বেণীতে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠদেশে অন্ধে বিলম্বিত, অসীম ক্লমসাধনায় সীতা তপস্বিনী—তবুও মহতী জ্যোতির্ধরী সে দেবীমূর্তি। শত্রু-মিত্রভেদে অন্তরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত করুণার প্রস্রবণ—কত না সুগভীর মমতা! শত্রুপুত্র মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদে সীতার চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এই আদর্শ নারীই আজিও বাঙ্গালার তথা ভারতের অন্ধকাবাহর গগন-ললাটে শুকতারাব মত দেদীপ্যমানা হইয়া নারী-জীবনের চলাব পথ নির্দেশ করে।

রাক্ষসবাজ্ঞমতিধা মেঘনাদজননী মন্দোদরী—শ্রেষ্ঠাঙ্গী মাতা ও শত্রু এবং স্বামি-পুত্রের গৌরবে মহিমাশ্রিত সাম্রাজ্ঞীর আদর্শস্থানীয়া। মন্দোদরী ত্রিভুবনবিজয়ী লঙ্কেশ্বর বাবণের উপযুক্ত পত্নী। অটল মর্যাদাজ্ঞান তাঁহাকে মুহূর্তের জগৎ স্বামীর বিরুদ্ধে ধৈর্য্যহার্য হইতে দেয় নাই। সীতার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনিবার মধ্যে স্বামীর মনোবৃত্তি যে হীনতম ইঙ্গিত সুস্পষ্ট, তিনি কখনও সে দিক দিয়াও খান নাই। স্বামীর কৃতকাৰ্য্যের অথবা আলোচনা বা স্বামী-নিন্দার কথা তাঁহার মনের কোণেও ঠাই পায় নাই। এই গাভীধা ও আত্মসম্মান জ্ঞান, সংযম, স্বামি-ভক্তি ও বিশ্বাস সাম্রাজ্ঞীই উপযুক্ত। সাম্রাজ্ঞী মন্দোদরী মাতৃভক্ত, পৌরুষবীৰ্য্যের প্রতীক। পুত্র ইন্দ্রজিতের মাতা এবং সুলক্ষী, আদর্শ কুলবধ, দানববাজনিনী প্রমীলার শত্রু। কিন্তু পুত্রস্নেহে তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় মায়েব মন দুর্বল হইয়া আসে, সাধারণ রমণীর জায় মুখমণ্ডল বিবর্ণ—ভীতি-ভাবনায় উদ্বেল হইয়া ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে বীর পুত্রকে বিদায় দিতে পুত্রবৎসলা জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। হায়! রাম-লঙ্ঘন, এমন কি বিশ্বাসঘাতক বিভীষণ—সকলকেই যা তাঁর বড় ভয়! সেই পুত্রের অজ্ঞায় যুদ্ধে নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদে মায়েব হৃদয়ে যে প্রলয়ের ঝড় উঠিয়াছিল তাহার তবঙ্গে সেদিন রাক্ষস-সভায় কি প্রচণ্ড বিক্ষোভই না জাগিয়াছিল? শোকবিবশা রাণী মন্দোদরী সভায় আসিয়াই স্বামীর পদতলে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সাম্রাজ্ঞী মন্দোদরী বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা নন, তাই সেদিন পত্নীকে সাধনা

দিবার উপযুক্ত ভাষা রাক্ষসরাজের ছিল না। প্রতিহিংসা-উদ্ভাত শোকদগ্ধ স্বামীর চরণে মর্দনবেদনা জানাইয়া রাণী অন্তরালে চলিয়া গেলেন। পুত্রবধূর সহমরণের কালেও আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদা কবির মৌলিক সৃষ্টি—তাঁহার মানসী কল্পা। চিত্রাঙ্গদা শোকাকুলা জননী, অভিমানিনী, বহুপত্নীক স্বামীর অবহেলিতা স্ত্রী। চিত্রাঙ্গদার একটি মাত্র পুত্রই ছিল সখল। সেই পুত্রই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের উপযুক্ত মৃত্যু বরণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মাতৃহৃদয়ে সাধনা কোথায়? চিত্রাঙ্গদা উন্মাদিনীর জায় রাক্ষসরাজের সভায় প্রবেশ করিয়া পুত্রের জন্ত গগনভেদী বিলাপ করিয়া উঠিলেন। রাজা রাবণ অল্পতপ্ত, বেদনা ও অশুশোচনায় অভিভূত। কিন্তু শত শত পুত্র-পৌত্র ও পরিজনব মধ্যে একটি মাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক পিতার হৃদয়ে তত গভীর নয়। এই জগুই চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমানের অবধি নাই। কিন্তু এই যে নারী সম্মান, পদমর্যাদা ও স্বামীর সম্পূর্ণ আদরে বক্ষিতা হইয়া ভীক কপোতীর জায় বিশাল রাজ-অন্তঃপুরে এক কোণে পড়িয়া আছেন, প্রবল পরাক্রম রাজ্যেশ্বর স্বামীর সম্মুখে যে স্বল্পভাবিণী পত্নীর মৃদু কণ্ঠস্বর হয়ত স্বামি-সোহাগের ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের কলরবে মুখবিত হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইত না—সেই কণ্ঠস্বরে আজ কোথা হইতে আসিল বজ্রনিদাদ—ভাষায় আসিল তরল গৈরিক নিঃশ্রাবের অগ্নিঝালা! নিদারুণ মর্দনপীড়ায় একমাত্র পুত্রশোকের দহনে চিত্রাঙ্গদা বিদ্রোহিনীর জায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে বলিতেছেন—এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র-বাস্তিত দেবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত; মহাবাহু দাশবধি রামচন্দ্র কি তোমার সিংহাসনের আশায় এত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন? কে এই কাল-অনল সোনার লঙ্কাপুর্বাতে প্রজ্বলিত করিয়াছে? স্বামীর নিন্দনীয় কাণ্ডের প্রতি তীব্র ইঙ্গিত করিয়া তীব্রস্বরে তাঁহাকে ধিকার দিয়া শোকাকুলা উন্মাদিনী জননী একটি বিদ্রোহের জায় অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। আর স্বামীর বিরাগভাজন হইবার ভয় নাই—দুঃখ-স্বপ্ন আচ্ছ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। তাই অন্তরের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া অজ্ঞায়কারী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অভিমান জানাইয়া চিরদিনের জগুই কাব্যের পটভূমিক হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু তবুও তাহাকে ভোলা গেল না। কাব্যের প্রথম দৃষ্টেই রাক্ষসরাজের বিশাল সভা যে দিক্কারে পূর্ণ কবিয়া দিয়া গেলেন—অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া হাহাকারের ঝড় বহাইয়া দিয়া অন্তরে অসীম দুঃখের অগ্নিশিখা লইয়া অন্তরালে চলিয়া গেলেন—সেই অগ্নিশিখাই বৃষ্টি রাবণের বক্ষে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতায়া প্রজ্বলিত করিয়াছিল—জীবনেও আর সে অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই!

মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা কবির কল্পনা-সমৃদ্ধির অনবদ্য বিকাশ—অশ্রুভাষা-ভাব-বিলাস। প্রমীলার চরিত্রে কুলবধু কোমলতা ও সৌন্দর্যের সহিত বীরাজনার তেজ সন্মিলিত হইয়া অভিনব হইয়াছে। ভবিষ্যতের অগ্রদূত শ্রুতি মধুসূদন তাঁহার মানসী কল্পাদের শুধু মে—কোমলা, পরনির্ভরশীল গৃহের কল্যাণী বধূরূপে অন্তঃপুরের গণ্ডিতে আবদ্ধ দেখিয়াই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত হন নাই। তাহাদের চরিত্রে বীরাজনা নারীর বীর্যবত্তা আরোপ করিয়া দৃষ্টতকারীর দণ্ডবিধান করিবার জগু তাহাদের শক্তিরূপিণী কল্পনা করিয়া অসীম আনন্দে উজ্জ্বলিত হইয়াছেন।

সেই আনন্দের উচ্ছ্বাস 'প্রমীলা'-চরিত্রকে অম্লরস্বিত করিয়াছে। যুদ্ধসম্ভার্য সম্ভিতা বণরঙ্গিণী প্রমীলার পরাক্রমে রাঘববীর রামচন্দ্র তীর কাপুরুষের স্থায় যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। প্রমীলার চরিত্র নিজস্ব ভাবাদর্শে চিত্রিত করিতে গিয়া কবি রামচন্দ্রকেও হয়ে প্রতিপন্ন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

কিন্তু অসুখ্যম্পশ্যা স্নকুমারী নারীকে শক্তিরূপিণী বা বীরঙ্গনা-রূপে রূপায়িত করিয়াই কবি ক্ষান্ত হন নাই। শত নির্ঘাতনেও তাহাদের যে কঠ ছিল নীরব, সেই চির-শাস্ত মোন কঠে দিয়াছেন বিদ্রোহের ভাষা। বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদার কঠে প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে যে তাঁর তিরস্কারের স্বর ধ্বনিত হইল, বীরঙ্গনা কাব্যে জনার কঠে সেই তিরস্কারের সহিত বিদ্রোহিনীর অগ্নিঝালাময়ী ভাষা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বীরঙ্গনা কাব্যখানিও স্বতন্ত্র আদর্শবাদী কবির বাঙ্গালা সাহিত্যে নূর মৌলিক অবদান। এই কাব্যখানি বিদেশীয় আদর্শে রচিত হইলেও ইহা কবির বিরাট প্রতিভার কোমল ও গভীর ভাবের নিদর্শন—বৈচিত্র্যময় কল্পনার অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা। নারীকে জীবনে বিভিন্ন অবস্থায় যে-যে রূপে দেখা সম্ভব, কবি আপনার ধ্যান-কল্পনায় তাহা যেন প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক একখানি পত্রিকায় তাহাদের এক একখানি আলোচ্য ঘটনা করিয়াছেন। প্রত্যেকখানি আলোচ্য শিল্পকৌশল ও চমৎকারিত্বে অতুলনীয়।

বীরঙ্গনা কাব্যে বীণ্যবত্তা বা অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগের বাণী শুনা যায় শুধু কৈকেয়ী ও জনার পত্রিকায়। আর অজ্ঞাত পত্রিকায় আছে শাস্ত্রপুত্রী জাহ্নবী দেবীর স্বামীকে প্রত্যাখ্যান-পত্র, শকুন্তলা ইত্যাদির স্বরণার্থ পত্র, তারা উর্ধ্বশী ইত্যাদির প্রেমপত্র। তবে সকলকেই বীরঙ্গনা আখ্যা দিবার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, ইহারা সকলেই কেহ বা বিদ্রোহিনী, কেহ বা স্বামীর অজ্ঞায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদের সাহসে তেজস্বিনী—কেহ বা প্রেমাকুলা—অন্তরের কামনা ও গোপন প্রেমকে খুঁজালোকে প্রকাশিত করিয়া প্রেমোন্মাদের নিকট প্রেমের বার্তা প্রেরণ করিয়াছে নিঃসঙ্কোচে, 'বাকুল প্রেম-নিবেদন করিয়াছে নিঃসংশয় হইয়া—ইহারা সকলেই প্রকাশের সাহসে বীণ্যবত্তী। কোন দ্বিধা নাই, নিন্দা বা কলঙ্কের ভয় নাই, লজ্জাও নাই। ইহাতে ভারতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিন্তু কোথাও এতটুকু সৌন্দর্য ব্যাহত হয় নাই।

উনবিংশ শতকের বাঙ্গালা সাহিত্যে ও সমাজে 'বীরঙ্গনা' কাব্যের স্থায় একখানি পত্রিকা-কাব্য রচনা নিদারুণ দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সেই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মনে হয়, বিদ্রোহী মধুসূদন যেন সমস্ত কিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সর্বক্ষেত্রে এক জন সংস্কারকের বেশে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। তবুও এ কথা সত্য যে, আজ হইতে প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে নারী-প্রগতির যে আভাস শক্তিমান কবি মধুসূদন হৃদয়ের অদম্য সাহসের সহিত দিয়া গিয়াছেন—শত বৎসর পরে বাঙ্গালা সমাজে ও সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই প্রগতি সর্বক্ষেত্রেই হয়ত প্রাণাণকর হয় নাই, তবুও শুভ যে আনিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি প্রেমিক কবির অলৌকিক প্রেম-রসে সিক্ত

হইয়া অল্পম—হৃদয়ের অগ্নান, নিরুল্লস প্রেমের সঙ্গীত। এই কাব্যখানিতে যেন দুঃখ, হতাশা ও বার্থতাময় কঠোর বাস্তব সংসার-ক্ষেত্র হইতে বহু দূরে একান্ত নিঃস্বপ্নে গিয়া কবি প্রেম ও বিরহের পুতলী জীবাধিকার বিলাপের সহিত মিলাইয়া আপনার বাঁশীতে কল্প রাগিণীর মুচ্ছনা তুলিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনার রাধা ভারতেরই একটি প্রেমিকা, অশ্রুসিক্ত-নয়না, বিরহ-ব্যাকুলা। কিন্তু মানবী রাধা কখন ধীরে ধীরে ধরণীর কামনা-কলুষ ধূলি-মাটি হইতে 'আরাধিকায়' রূপান্তরিত হইয়া অন্তরের প্রেমকে উল্লোকেই উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন! তাই মধু-বসন্তে প্রিয়তমের সহিত মিলনের আশায় ব্যাকুলা রাধিকা সখীকে বলিতেছেন—

সখি রে—পাত্তরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে

তুই কব-কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে

ধাসে ধূপ, লো প্রমদে

ভাবিয়া মনে।

'রত্নাবলী' নাটকের রত্নাবলী হইতে আবৃত্ত করিয়া বাঙ্গালার নারীর অপরূপ স্নিগ্ধ সৌন্দর্য মুগ্ধ-কবির অন্তরে বসতৃষ্ণাকে জাগরিত করিয়াছিল এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নব নব সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাই আমরা পাটয়াছি ভক্ত কবির এক একখানি অমূল্য কাব্য—যাহা নারীর নানা রূপের একান্ত স্ততি-গানে মুগ্ধ।

## অ্যাটম বোমার দেশে

অমিতা দত্ত-মজুমদার

৩

### দক্ষিণ-পশ্চিমে

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিভিন্ন। বৃষ্টিদিনের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়ে এই বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হলাম। এক অঞ্চলে যখন বৌদ্রের ঝং জ্যোতির্মান বিবর্ণ, অজ্ঞা অঞ্চলে সেই সময়েই উজ্জ্বল বৌদ্রবিবর্তিত স্থানল প্রান্তর চোখে পড়ল।

Washington D. C. অ্যালিগ্যানি পর্বতমালার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বন্ধুবর্ত্য অবশেষ এখানে হয়েও হয়নি। কতকগুলো ছোট-বড় টিলার উপরে এই সহবটি গড়ে উঠেছে। অতি সুন্দর ঝকঝক তক্তকে সহর; চড়া কাঁকীটের রাস্তা; রাস্তার দু'ধারে পত্রহীন (শীতকালে) গাছের সারি। রাস্তাগুলো সরল বটে কিন্তু সমতল নয়। এমন সুন্দর সোজা অথচ উঁচু-নীচ রাস্তা আর দেখিনি। রাস্তাতে যখন এর দু'ধারে আলোর মালা জ্বলে ওঠে তখন এই বন্ধুরতার রূপ আবে অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে। অবিশ্রান্ত চলমান মোটর গাড়ীগুলোর পিছনকার লাল বাতিব সাবিত্তে আরো মনোহর বোধ হয়। সহরের ধাব দিয়ে পোটোম্যাক্ নদী বয়ে গেছে। পাহাড়ে নদী, দু'ধারে উঁচু পাথুরে পাড়ের মাঝখান দিয়ে সফ্র খাতে কতক পথ অতিক্রম করে তার পরে নদী এই সহরের উত্তরাংশেই চওড়া হয়ে গেছে, তুই অঞ্চলে নদীর দুই রূপ। ঔপনিবেশিক যুগে বহু যুদ্ধ ঘটেছে এর আশেপাশে, এর বুকে; তাই ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে এই

এগিয়ে চলতে লাগলো। ভারতীয় বন্ধু দু'টি প্রান্তরালের পর নেমে গেলেন; আমরা সারা দিন ট্রেনের কামরায় বসে থেকে বিকালে নামলাম। ট্রেনের কামরা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। চকিষ ঘটনা বন্ধ বায়ুতে বসে কাটানোর পর খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা হলো; আর পায়ের তলায় স্থিরা ধরিত্রীকে অনুভব করে স্নায়ুগুলী শান্ত হলো, কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি পেল কোথ—আকাশের উজ্জ্বল নীল রং আর বৈকালী রৌদ্রের স্বর্ণআভা দেখে। করাটার সেই সন্ধ্যাটির পর এমনি আকাশ আর এমনি রোদ দেখিইনি এ পর্যন্ত। আরাম ও তৃপ্তিটিকে বেশ তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করছিলাম, এমন সময়ে ডাক শুনে সচেতন হলাম। দেখলাম, দলের সবাই এগিয়ে গেছেন, আমিই পিছনে। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম।

নৃতাত্ত্বিক অধিবেশনে ধারা এসেছেন তাঁরা সবাই **New Mexico University**র অতিথি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত বাসু নিয়ে এক জন এসেছেন আমাদের নিতে। তাঁকে আমি সাধারণ ডাইভার বলেই মনে করেছিলাম। আমার ভুল ভাঙলো পরের দিন যখন অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে একে সভ্যের ব্যাজ নিতে দেখলাম। যাক, আমাদের জিনিসপত্র বাসে তোলা হলে পরে তিনি বললেন যে, আধ ঘণ্টা পরে আরেকটা ট্রেন আসবে, তাতে আরো ডেলিগেটদের আসবার কথা। আমরা যদি বিশেষ কষ্টবোধ না করি তবে তিনি সেই ট্রেনটাও দেখে যেতে চান, কারণ ক্যাম্পাস অনেক দূর। আমরা সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সময়টা কাটাবার জন্য ষ্টেশন-সংলগ্ন কফির দোকানে গিয়ে বসলাম।

এখানে আমাদের নজরে পড়লো ত্রিযুক্ত-কোথ ও গাল-মুখে ঈষৎ-চ্যাপ্টা-নাকওয়ালা মানুষ। বুঝলাম, এরাই তারা—যাদের আমবা রেড ইণ্ডিয়ান নামে অভিহিত করে থাকি। নানা বকম পুঁতির মালা, বিশেষতঃ রূপার উপর টর্কোয়েজ বসানো আঁটি ও মালা বিক্রীর জন্ত নিয়ে এরা ঘূষছিল। ক্যাফিটেরিয়াতে দেখলাম ষাড-লঠনের মত করে শুকনো লক্ষা গাঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে—এবা খুব ঝাল খায়। ট্রেনেরই একটা ঘরে এদের হাতের কাজের জিনিসের একটা মিউজিয়াম আছে। আমরা সেটা দেখতে যাবার পবামর্শ কবছিলাম, এমন সময়ে সেই ডাইভার এসে আমাদের ডাকলেন। আমবা বাসে উঠে ক্যাম্পাসে অভিমুখে চললাম।

আমাদের দেশে যেমন পূজোর ছুটিতে সবাই প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্ত বাড়ী যায়, এ দেশে তেমনি বড়দিনের সময়ে যায়। সকলেরই বাড়ীতে বড়দিনের সময়ে বিশেষ উৎসব হয়, পল্লপরের সঙ্গে মিলিত হবার ও উপহারের আদান-প্রদানের ধুম লেগে যায়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা সবাই বেরিয়ে পড়ে; কেউ বাড়ী যায়, অনেকে আবার দল বেঁধে এদিক-ওদিক বেড়াতেও চলে যায়। কেউ-ই ছুটিটা বসে থেকে মাটি করে না। নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য ছোট-বড় বাড়ী এখন বড়দিনের ছুটিতে খালি রয়েছে। এই সব বাড়ীতেই **A. A. A. (American Anthropological Association)** এর গেলিগেটদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। আমরা একটা বড় দোতলা বাড়ীর একতলার একখানি ঘর পেলাম। এই বাড়ীটা মেয়েদের হোষ্টেল—এ দেশে বলে **Girls' Dormitory**। আমাদের ঘবখানিতে দু'জনের জায়গা। যে মেয়ে

দু'টি থাকে তারা তাদের জিনিসপত্র সবই রেখে বাড়ী গেছে। শেলফে সারি-সারি বই সাজানো। ড্রেসিং-টেবিলের ড্রয়ারে দেখলান পোষাকও রয়েছে—সবই খোলা; তালা বন্ধ করে যাবার আবশ্যকতা কেউ বোধ করেনি। এ দেশের ধারাই এই। আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে নিজের জিনিসপত্র রেখে আমরা স্নান করে তৈরী হয়ে বসবার ঘরে এসে বসলাম। সেখানে অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, আমরা কয়েক জন বসে গল্প-সল্প করছি। ওয়াশিংটনের মত এখানেও **Central heating system**এর কাজ চলছে; তবুও যে বড় বড় কাঠের কুঁদো অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানো হচ্ছে সেটা বৈঠকী আরামের একটা অঙ্গ। মেয়েদের **dormitory**র যিনি তত্ত্বাবধায়িকা (**House Mother**) তাঁরই উপর ভার ছিল এই অতিথি দলের সুখ-স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করবার। তিনি এসে আলাপ-পরিচয় করে সকলের খোঁজ-খবর নিয়ে গেলেন। তার পর আমরা বেবিসে গিয়ে মেক্সিকান হোটেলে গরম গরম ও ঝাল-নানা সুস্বাদু বার্না খেয়ে রসনাব তৃপ্তিসাধন করলাম।

[ ক্রমশঃ ]

## স্মৃতিসভা

রাণী ঘটক-চৌধুরী

খ্যাতির আকর্ষণ বড় প্রবল। আমাদের বৃদ্ধিপ্রধান মনটার কোথায় যেন দুর্বলতার অনাবিক্ত বিরটি ছিঁড় আছে। প্রতিভার খ্যাতি যাদের লাগে ছুটেছে তাদের জন্যে অকুপণ ভক্তি সেখানে সঞ্চিত। কোন বিখ্যাত মানুষের নাম শুনেই আমাদের সে ভক্তি বিনা স্বাধায় উজ্জ্বলিত হয়ে কণ্ঠে নেমে আসে, জিহ্বা সহজেই গুলকীর্তনের ভাষা পায়, চমকপ্রদ শব্দাবলীরও অভাব ঘটে না। হয়ত সে অতিমানুষটির ভাবধারার সঙ্গে কদাচও পরিচয় হয়নি। তাঁকে মহৎ বলব কোন সুদ্রে, সাধারণ মানুষের চাইতে তাঁর কাছ থেকে কতটুকু বেশি পেলাম—এসব প্রশ্নের সমাধান করে নেওয়াও যেন নিতান্তই অবাস্তব। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বিধি দিয়ে গেলেন :

অহল্যা দ্রোণী কুন্তী তাবা মন্দোদরীসুখা।

পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং সর্বপাপবিনাশনম্।

আমরা সহজেই সে বিধি মেনে নিলাম। পঞ্চকন্যাদের বধাসম্ভব স্বপ্ন করে পাপ বিনাশে সচেষ্ট হলুম। এও এত সহজে সম্ভব হ'ল মনের সেই প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণেই। সেখানকাব নাম কোণে আঁচড় কাটবার পক্ষে একটি শ্লোকের বিধানই যথেষ্ট। পঞ্চকন্যাদের জেনে নিলাম পাঁচটি পুণ্যস্মার অধিকারিণী বটে; মনটা অহুসঙ্কানী হয়ে প্রশ্ন করবারও সাহস পেল না—এদের স্মরণ করবার বিধি কেন? প্রকৃতই এঁরা স্মরণীয় কি না এসমস্যা তুলে এখানে মীমাংসা করতে চাই নে। আমাদের মন যে খ্যাতিমান অথবা খ্যাতিমতীদের প্রতি দুর্বলতা পোষণে চির বিভ্রান্ত—এই উদাহরণ দিতে গিয়ে পঞ্চকন্যাদের গাঁড় করালুম। পঞ্চকন্যাদের মহলে যদি কোন স্মরণে এই নির্বিচার উদার দৃষ্টির সংবাদ পৌঁছত তা হলে তাঁরা বিদ্রোহ প্রকাশ করতে স্বিধা করতেন না বরংই আমার বিশ্বাস। অহল্যার কষ্টস্বর নিশ্চয়ই মর্ত্য পর্যন্ত ছুটে আসত "রামের পাদস্পর্শে যে পাপাণ রূপান্তরিত হয়ে আমি পৃথিবীতে মৃত

হয়ে উঠেছিলুম, তোমাদের অন্ধ-ভক্তি আমাকে আবাব যে পাষণেই পরিণত করেছে !”

আমার এই সবটুকু উক্তির মূল কথা এই যে, প্রতিভার খ্যাতিতে অন্ধ হয়ে আমরা নিজেরাই যে কেবল বিড়ম্বিত হই তাই নয়, প্রতিভাবান্দেরও অথবা বিড়ম্বিত করি। মধুরকে ছলের জন্তে স্তুতিবাদ জানালে সেই স্তুতিতে ভক্তির পরিমাণ যত বেশিই থাক না কেন, তাতে তার খুশি হবার কোন কারণ নেই। প্রতিভাবান্দের প্রতি ভক্তিপ্রকাশের এই ব্যভিচারের কারণ হচ্ছে পরের মুখ থেকে বালের স্বাদ পাবার অপচেষ্টা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা প্রতিভাবান্দের জানতে চাই অস্ত্রের দৃষ্টি দিয়ে—অস্ত্রের উক্তির স্তুতিমালা ঘেঁটে। কারো বিধি থেকে এই যে কাউকে জানা, এ নিতান্তই অবৈধ জানা। অন্ধ যেমন করে ক্ষুধান্দের মুখের উক্তি শুনে ছুস্তর বর্ণ সম্বন্ধে ধারণা করতে চায়, জানার এ পন্থাও তার চাইতে এক চুল এদিক-ওদিক নয়।

## ২

বিশেষ বিশেষ তিথিতে ব্রত-পার্বণ আচার-অমুষ্ঠান পালন করিতে আমাদের দেশের মেয়েরা যেমন অভ্যস্ত, দেশের শিক্ষিত-সাধারণও অধুনা তেমনি বিশেষ বিশেষ তিথিতে খ্যাতিমান্দের স্মৃতি-অমুষ্ঠান পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছে। রীতিটা বিদেশীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার নীতিটা যে প্রায় ক্ষেত্রেই এখনো পুরোপুরি বিদেশীয়, তাতেই বা সন্দেহের অবকাশ কোথায়? কোন প্রতিভার উদ্দেশ্যে বুঝে-সুজে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করা এক কথা, আর অন্ধ সংস্কারবশে পাষণ-প্রতিমার পায়ে পাত্ত-অর্ঘ্য নিবেদন করা অল্প কথা। আমরা এখনো যেন শেষোক্ত পথ ধরেই চলেছি। সুতরাং কোন প্রতিভাবানের স্মৃতি অমুষ্ঠানে পুরোহিত বসিয়ে আমরা মন্ত্রের মত তাঁর বাণী উদ্ভূত করি, জীবনীর সন-তারিখ উপস্থিত করি এবং প্রসাদ বিতরণের পর যার যার ঘরে ধোয়া-মোছা মন নিয়ে ফিরে যাই। এই যান্ত্রিক রীতি প্রতিভাকে সম্মানিত করে না, আমরাও লাভের খাতায় শূন্য অঙ্ক নিয়েই সম্বষ্ট থাকি।

কোন বিরুদ্ধ সমালোচক আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, “তা হলে তুমি কি স্মৃতি-সভার বিরোধী?” এ প্রশ্নের আমার একটি মাত্র উত্তর, “আমি স্মৃতি-সভার বিরোধী নই, কিন্তু প্রীতি-সভার বিরোধী।” বিয়ে উপলক্ষে গীতিসভার আয়োজন হোক, প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হোক, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ হোক তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কোন প্রতিভাবানের স্মৃতিসভা কেবল মাত্র ওটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে যোরতর আপত্তির কারণ আছে বৈ কি। এতে আমরা মন্ত্রদেব বঞ্চিত করি, প্রতিভাবান্দের লাঞ্চিত করি এবং সর্বোপরি দেশের জনগণের কাছে তাঁদের অবাস্থিত করে রাখি।

কোন কবি অথবা সাহিত্যিকের জন্ম অথবা মৃত্যু-তিথি পালনের কথাই ধরা যাক। একশ’ বার এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও হাজার বার বলব যে, উত্তোক্তারা যেন এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকেন। সে উদ্দেশ্য কী? তা হচ্ছে অমুষ্ঠানগুলোকে এমন ভাবে পালন করা যাতে করে উপস্থিত জনগণ দেশের কবি-সাহিত্যিকদের প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে পারে। এক দিনের কয়েক ঘণ্টার সভার মধ্য দিয়ে নিশ্চয়ই তা সম্ভব নয়,

কিন্তু এ সমস্ত সভা যদি জনগণের মধ্যে দেশের কবি-সাহিত্যিকদের জানবার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে, জানার ইংগিত দিতে পারে, তবেই তার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে। আজকালকার বিভ্রান্তির অধিকাংশ ছাত্রের যেমন ভাষা পড়ে সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হয়, নিজেদের সংস্কৃতিসেবী বলে ধারা গর্ব অনুভব করেন তাঁরাও তেমনি স্মৃতিসভার বস্তুত্বা শুনে কবি-সাহিত্যিকদের জানতে প্রয়াসী হন। এতে প্রকৃত জানা হয় না, অন্ধ-ভক্তির চরিতার্থতা হয় মাত্র। এই অন্ধ-ভক্তির আতিশয্যেই আমরা যুগে যুগে অতিমাত্রায় ভগবানের অবতাররূপে মাটি থেকে বহু উদ্ভব তুলে দেখতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের প্রত্যেক মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাই প্রচলিত অলৌকিক গল্পের অভাব নেই। কবি-সাহিত্যিকেরাও এমনি থেকে বাদ পড়েননি। তাই আমরা কবির কাব্য-বিচারের চেষ্টা না করে ভক্তি-বিচারে অগ্রসর হয়েছি। জয়দেব-বিজ্ঞাপতি প্রভৃতি কবিদের ভক্তিরসের অবতার জেনে প্রণাম করেই খুশি হয়েছি, অথচ তাঁদের কাব্যরসের ধারা যেখানে সহজ গতিতে প্রবাহমান, সেদিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতেও আমরা কুঠা বোধ করিনি। এই কারণেই মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী এবং তাঁদের সম্বন্ধে ভাষা-জীবন-সমুদ্রে ভেসে-আসা কাষ্টখণ্ডের মতো আঁকড়ে ধরে অবলম্বন করে নিতে চাই; আর তাঁদের চিন্তার তরণী, কর্মজীবনের সম্পদ অলঙ্কার ভাসতে থাকে।

## ৩

ইংরেজ কবি W. S. Lander Robert Browningকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

There is delight

In praising 'tho' the praiser sit alone

And see the praised far off him far above.

গভীর একান্ততাবোধসম্পন্ন আনন্দের উপলব্ধি থেকে এই স্তুতিবাদের জন্ম; সুতরাং কবি এখানে উভয়ের মধ্যে যে-ব্যবধানের কথা বলেছেন আসলে তা ব্যবধান নয়। তাই এখানে কবি ব্রাউনিংকে যে কথা বলেছেন তা নির্বিচারে স্তুতিবাদের কথা নয়। কোন মহামানবকে অনুভূতিতে সত্য পরিচয়ে জেনে যে-স্তুতি স্বভাবতই কণ্ঠে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে—কবি বলেছেন তাতেই আনন্দ আছে, কারো নামকে কণ্ঠ-কবচ করে নয়। এতে যথার্থ জানার ইংগিত আছে।

মহাকবি কালিদাস প্রকৃত বিবেচক এবং মূঢ়দের ব্যবধানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : “সন্তঃ পরীক্ষ্যন্ততরঙ্গজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেনবুদ্ধিঃ”—অর্থাৎ বিবেচকেরা নতুন পুরাতন যাই হোক, তাকে বিচার করে গ্রহণ করেন আর মূঢ় ব্যক্তির পরের প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে তার অনুসরণাদিক্রমে বিনজ নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে থাকে, কোনটি ভাল কোনটি মন্দ এ বিচার করবার ক্ষমতা তাদের নেই। সুতরাং এদের স্তুতিবাদের অমূল্য শব্দাবলীর কোনই মূল্য নেই। ধারা প্রকৃত কাব্যরস একান্ত ভাবে অন্তরে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরাই প্রকৃত কবিদের বাঁচিয়ে রাখছেন। সে বাঁচানো বুলির মতসঞ্জীবনীতে ক্ষণিকের জল নয়, সেই হচ্ছে কবিকে চিরদিন দেশের আকাশ-আলোর নিচে বাঁচিয়ে রাখবার মহৎ উপায়। কবির প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনও সেখানেই। সভা-সমিতির কাঁকা

# ছোটদের আসর



## একটি সত্য ঘটনামূলক গোয়েন্দা কাহিনী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

[এখানে যে ডিটেকটিভ কাহিনীটি দেওয়া হ'ল, এটি গল্প নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। ঘটনা-ক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।]

রাত সাড়ে তিনটে। রাস্তার এক পাশে একখানা মোটর গাড়ী।

সামনের আসনের মূর্তির মত স্থির হয়ে ব'সে আছে একটা লোক। কনষ্টেবল লুইস শিলি নিজের খাঁটিতে পাড়িয়ে-পাড়িয়ে নজর রাখছিল গাড়ীখানার উপরে। এই ভাবে কেটে গেল ঘণ্টা খানেক। তার পব শিলি এগিয়ে এসে গাড়ীর ভিতরে ফেললে নিজের টর্চের আলো। ড্রাইভারের আসনে ব'সে ব'সেই ঘুমোচ্ছে একটা ছোকরা। ছুই চোখ মোটা। মাথাটি এলিয়ে পড়েছে কাঁধের উপরে। শিলির প্রথম দৃষ্টিতে ছোকরা নড়ে-চড়ে উঠল বটে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। দ্বিতীয় দৃষ্টি দিয়ে শিলি ঠাকলে, “এই! কে তুমি? উঠে পড়!”

ধড়মড় ক'রে ছোকরা জেগে উঠল। তার চোখে-মুখে আতঙ্ক! তার পব ভালো ক'বে চেয়ে দেখে একটা আশস্তিব নিশ্বাস ফেলে সে বললে, “তবু ভালো, পুলিশ! আমি ভেবেছিলুম ডাকাত! যা ভয় পেয়েছিলুম!”

শিলি স্বধোলে, “কে তুমি বাপু? এখানে কি করছিলে?”

—“ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।”

—“নাম কি?”

—“ডেভিড টিকো।”

—“বয়স?”

—“সতেরো।”

—“বাড়ী কোথায়?”

—“ক্যামডেনে।”

—“এত রাতে বাড়ীতে না গিয়ে রাস্তায় গাড়ীতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে কেন?”

—“সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরছিলুম। হঠাৎ চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এল।”

ছোকরা জবাবগুলো দিচ্ছিল বেশ সপ্রতিভ মুখেই। তার ডাব-ডলিও সন্দেহজনক নয়। কিন্তু শিলি ভাবলে, তবু বলা তো যায় না, দিন-কাল যা খারাপ! চারি দিকেই চুরির পর চুরি হচ্ছে, ছোকরাকে আর একটু বাজিয়ে দেখা যাক।

—“টিকো, তোমার বাড়ীর লাইসেন্স দেখি।”

—“একটা চামড়ার ব্যাগে পুরে লাইসেন্সখানা পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। আজ হু'দিন হ'ল ব্যাগটা হারিয়ে গিয়েছে।”

—“বটে, বটে! তাহ'লে আমার সঙ্গে একবার থানায় চল তো বাপু!”

টিকো কোন রকম ইতস্তত না ক'রেই শিলির অনুসরণ করলে।

থানায় এসে টিকো বললে, “মা-বাবা আমার জন্যে ভাবছেন। একবার বাড়ীতে ফোন করতে পারি?”

—“নিশ্চয়। ঐ ঘরে ফোন আছে।”

টিকো চ'লে গেল। শিলি থানার ‘ফাইল’ খেঁটে দেখতে লাগল, ডেভিড টিকো নামে কোন ছোকরা আসামীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় কি না? খোজা-খুঁজি বার্থ হ'ল, টিকোর নাম নেই।

টিকো বলেছে তার বাসা ক্যামডেনে। শিলি অস্ত্র একটা কোনেব সাহায্যে সেই এলাকার থানার কর্তারীকে ডাকলে। ডিটেকটিভ মর্গ্যান শিলির কাহিনী শুনে ক্যামডেন থানার ‘ফাইল’ খুঁজে বললেন, “ডেভিড টিকো নামে কোন ছোকরা কোন দিন এ এলাকায় ধরা পড়েনি।” তখন শিলির বিশ্বাস হ'ল যে টিকো তাহ'লে ছুঁই ছোকরা নয়।

সে টিকোর কাছে গিয়ে বললে, “তোমার গাড়ী আপাতত থানাতেই থাক। প্রায় ভোর হয়েছে। তুমি বাসে চড়ে বাড়ী যেতে পারবে?”

—“অনায়াসেই।”

—“বেশ। বাড়ীতে গিয়ে তোমার বাবাকে একবার এখানে ডেকে আনো।”

টিকো চমকে উঠল। প্রস্তাবটা তার পছন্দ হ'ল না। বললে, “বাবাকে কেন? মাকে ডেকে আনলে চলে না?”

—“বাবাব নাম শুনেই তুমি চমকে উঠলে কেন?”

টিকো বললে, “এত ভোরে বাবাকে ডাকাডাকি করলে তিনি চটে যেতে পারেন।”

—“বেশ, তাহ'লে যে কেউ এলেই চলেবে। তোমার বাবা কি মা এসে যদি লাইসেন্সের কথা স্বীকার করেন, তবে গাড়ী ছেড়ে দিতে আমি কোন আপত্তি করব না।”

টিকোর প্রস্থান। শিলি ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, সাবধানের মায় নেই ব'লেই এত হাল্কা করলুম। ছোকরা অপরাধী নয়। দেখা যাক ওর মা এসে কি বলে।

আধ ঘণ্টা পরে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘণ্টা। শিলি বিসিভারটা তুলে নিয়ে বললে—“হ্যালো!”

—“আমি ক্যামডেন থানার ডিটেকটিভ মর্গ্যান। একটু আগেই তুমি না বলছিলে, ডেভিড টিকো নামে কে এক ছোকরা তার চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে?”

—“হ্যাঁ, তাই।”

—“উত্তম। সেই ব্যাগটা আমরা পেয়েছি। ছোকরা এখন কোথায়?”

—“বাড়ী থেকে মাকে ডেকে আনতে গিয়েছে।”

—“সে ফিরে এসে থানায় বসিয়ে রেখ। আমরা এখনি যাচ্ছি।”

—“মর্গ্যানের কণ্ঠস্বর উত্তেজিত।

শিলি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, এ আবার কি ব্যাপার? টিকোর ব্যাগ ক্যামডেন থানায় হাজির হ'ল কেমন ক'রে? আর ওটা যে টিকোর ব্যাগ, তাই বা মর্গ্যান জানতে পারলে কেমন ক'রে?

এমন সময়ে টিক্কোর পুনরাবির্ভাব—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন মর্গ্যান ও কেবলি দুই ডিটেকটিভ।

শিলি জিজ্ঞাসা করলে, “টিক্কো, তোমার মা কই?”

—“এত সকালে মাকে টানাটানি করতে ভালো লাগল না। তাঁকে আর আনবারও দরকার নেই।”

—“কেন?”

—“আমি ভুল করেছিলুম। ব্যাগে নয়, লাইসেন্সখানা ছিল আমার বাড়ীর ভিতরেই। এই নিন।”

লাইসেন্সের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শিলি বললেন, “দেখছি সব ঠিকঠাক আছে। ভালো কথা। টিক্কো, ক্যামডেন খানা থেকে এই দু’জন ডিটেকটিভ এসেছেন তোমার সন্ধানে।”

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্যামডেনেই তার বাসা, সেখানকার দু’দু’জন ডিটেকটিভ তাকে খুঁজতে এসেছে শুনে টিক্কোর মুখ কেমন শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, “কেন? ব্যাপার কি?”

মর্গ্যান বললেন, “ব্যাপার কিছুই নয় বাপু। তবে তোমার কাছ থেকে হয়তো আমরা কিছু সাহায্য পেতে পারি। দেখ তো, এই চামড়ার ব্যাগটা তোমার কি না?” তিনি টেবিলের উপরে একটি ছোট ব্যাগ স্থাপন করলেন।

ব্যাগটা নকল চামড়ায় তৈরি। তার উপরে মুদ্রিত আছে এক অশ্বারোহী ‘কাউ-বয়ে’র ছবি। বালকরাই এরকম ব্যাগ ব্যবহার করতে ভালোবাসে।

টিক্কো একগাল হাসি হেসে বললে, “বাঃ, এ তো আমারই ব্যাগ! আপনারা এটা কোথায় পেয়েছেন?”

তীক্ষ্ণ চোখে তার আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে মর্গ্যান বললেন, “টিক্কো, তুমি ঐ চেয়ারে বোসো।”

টিক্কো বসল। চেয়ার টেনে তাকে ঘিরে বসলেন গোল্ডেনবার্গ ও।

মর্গ্যান বললেন, “শোনো টিক্কো। আজই রাশি-রাশি চোরাই মাল আমাদের হস্তগত হয়েছে। কেমন ক’রে তা বলতে চাই না, কারণ সে হচ্ছে অনেক কথা। এইটুকু পালি জেনে রাখো, সেই সব চোরাই মালের ভিতরে ছিল তোমার এই ব্যাগটাও। ফাউন্টেন পেন, বন্সক, রিডুলভার, জডোয়া গয়না প্রভৃতি আরো অনেক কিছু দামী-দামী জিনিষের সঙ্গে এই তুচ্ছ ব্যাগটা ছিল কেন, আমরা তা বুঝতে পারছি না। এখন তুমি যদি বলতে পারো ব্যাগটা কোথায়, কেমন ক’রে হারিয়ে ফেলেছিলে, তা’হলে হয়তো চোরের সন্ধান পেতে দেবী হবে না।”

ডেভিড টিক্কোর মুখ দেখে মনে হ’ল, সে বেন দস্তরমত হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। তার পর সে মাথা নেড়ে বললে, “ব্যাগটা আমার কাছ থেকে চুরি যারনি, ওটা আমি নিজেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছিলুম। তবু চোরাই মালের সঙ্গে পাওয়া গেল আমার ব্যাগ, ভারি আজব ব্যাপার তো!”

মর্গ্যান বললেন, “ব্যাগটাও হয়তো তোমার কাছ থেকেই চুরি গিয়েছে।”

—“অথচ আমি টের পাইনি।”

—“আশ্চর্য্য কি, হয়তো চোর তোমার পকেট ঘেরে স’রে পড়েছিল।”

টিক্কো আবাব মাথা নেড়ে জানালে, না।

মর্গ্যান স্মধোলেন, “তোমার ব্যাগটা কবে হারিয়ে গিয়েছে?”

—“দিন তিনেক আগে।”

—“তোমার ঠিক মনে আছে?”

—“অন্তত গেল দু’দিন থেকে ব্যাগটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।”

মর্গ্যান পকেট থেকে একখানা ‘ট্রিলি’-চস্তান্তরপত্র বাব ক’রে বললেন, “এখানা কি তোমার?”

—“নিশ্চয়! যদিও ও কাগজখানা এখনো আমি ব্যবহার করিনি।”

মর্গ্যান বললেন, “কাগজখানা তোমার ঐ ব্যাগেব ভিতরেই ছিল।”

আচম্বিতে টিক্কোর মুখ হয়ে গেল রক্তশূন্য। সে ব’লে উঠল, “না, না, ও কাগজখানা আমার নয়! আমি কি বলতে কি ব’লে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।”

—“হ্যাঁ, তাই দিয়েছি বটে।”

—“ও কাগজ আমার হ’তে পারে না। আমি বলছি, ও কাগজ আমার নয়।”

মর্গ্যান গাত্রোপান ক’রে বললেন, “টিক্কো, তোমাকে এখন আমাদের সঙ্গেই যেতে হবে। দেখছি, আমবা কোন সাধারণ চুরির মামলা হাতে পাইনি, এর ভিতরে আছে গভীর রহস্য।”

মর্গ্যানের কথাই পরে সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ডেভিড টিক্কো বালক মাত্র, কৈশোর অতিক্রম ক’রে সবে যৌবনে পা দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তার মুখের উপরে আছে বালকতার স্পষ্ট ছাপ। অথচ তারই চারি দিক ঘিরে রচিত হয়েছিল যে জটিল ও অদ্ভুত রহস্যের জাল, তা যেমন অসাধারণ, তেমনি অভাবিত ও অতুলনীয়। আপাতত আমরাও টিক্কোকে পুলিশের জিম্মায় রেখে গোল্ডেনবার্গের সঙ্গে রহস্য-জালের খেঁই খোঁজবাব চেষ্টা করব।

\* \* \* \*

চুরির হিড়িক সুরু হয় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে। চোরেরা হানা দেয় কলিংস্ রোডেব মি: ওটো টপাবকাবের বাড়ীতে। তারা একটা জানলা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল। চুরিব আগে ভারি-ভারি আসবাবগুলো টেনে এনে এমন ভাবে সদর দরজার উপরে চাপিয়ে রেখেছিল যে, বাড়ীর মালিক ভিতরে আসবার জন্যে ঠোকাঠেলি করলেই তারা স’রে পড়বার সুযোগ পাবে। চুরির পর তারা বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কীর দরজা দিয়ে।

তার পর থেকে সুরু হ’ল চুরির পর চুরি—ক্যামডেন, কলিংস্‌উড, গ্লস্টোর, পেনসকেন, ওকলী, অডুন ও হাউন হাইটস্ প্রভৃতি সাউথ ডারসির সহরে-সহরে। সর্বত্রই তাদের একই পদ্ধতি। তারা জানলা ভেঙে ভিতরে ঢোকে, সদর দরজার উপরে আসবাবগুলো চাপিয়ে রাখে এবং খিড়কীর দরজা দিয়ে পলায়ন করে।

এক প্রত্যেক বারেই তাদের আবির্ভাব হয় রাত আটটার কাছাকাছি কোন একটা সময়ে। সেই জন্তে তাদের নাম রাখা হ’ল “রাত আটটার চোরের দল”। তারা যে সন্ধানী চোব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ প্রত্যেক বারেই চুরির সময়ে বাড়ীর লোক থেকেছে অস্থগস্থিত।

অনেক দিন পর্যন্ত জনপ্রাণী চোরেরের মুখদর্শন করবার সুযোগ

পায়নি। একবার মাত্র জনৈক ব্যক্তি একটি ঘটনা-ক্ষেত্রে দুই জন লোককে চলে যেতে দেখেছিল, কিন্তু সেও তাদের পিছন দিক ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি।

অবশেষে মিঃ জ্যাফাটি'ব বাড়ীতে তাদের এক জনের খানিকটা বর্ণনা পাওয়া গেল।

ডিটেকটিভ মর্গ্যান ও কনলির কাছে জ্যাফাটি বললেন : “বাড়ী'ব অস্ত্রাস্ত্র লোকবা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আমি সব আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাত যখন আটটা পনেরো, তখন একতলায় কি একটা শব্দ হয়, আমাবও ঘুম ভেঙে যায়। আমি বিছানা থেকে নেমে পা টিপে-টিপে গিয়ে সিঁড়ির আলো জ্বলে দিয়ে দেখি, নীচেয় একটা লোক ঝাঁড়িয়ে উল্লম্বে থাকিয়ে আছে আমার পানে। সে আমাকে শাসিয়ে বললে, ‘খবদার, টু’ শব্দটি কোরো না!’ পরমুহুর্তে সে মাংস ক’রে নিজের পকেটে হাত চালিয়ে দিলে— আমি ভাবলুম, এই বে. এইবারে বাব করে বুঝি রিভলভার! তার পর সে রিভলভার বাব করলে না বটে, কিন্তু পকেট থেকে নিজের হাত বার ক’রে আমার দিকে একটা অঙ্গুলিনির্দেশ ক’রে তালুতে জিত লাগিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করলে। তার পরেই খিলখিল ক’রে হেসে উঠে এক ছুটে বাড়ীর বাইরে পালিয়ে গেল। আমি নীচেয় নেমে গিয়ে দেখি, আমার আসবাবগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু চোর সেগুলো সদর দরজা পৃথাস্ত্র নিয়ে যাবার সময় পায়নি। একটা জান্নাও ভাঙা।”

গোয়েন্দারা চোরের চেহারা'ব বর্ণনা জানতে চাইলেন।

জ্যাফাটি বললেন, “তার বয়স উনিশ-বিশের মধ্যেই। মাথার উচ্চতা হবে আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, দেহের ওজন দুই মণের বেশী হবে না। তার মাথায় লম্বা-লম্বা চুল, সুরুসে নাক, দুই গাণে'ব হাড় উঁচু-উঁচু। তার চোখ দুটো ছোট ছোট।”

সব থানাতেই জেল-খাটা বিখ্যাত বা অবিখ্যাত আসামীদের অসংখ্য ফোটা সংগ্রহ ক’বে রাখা হয়।

গোয়েন্দারা বললেন, “লোকটা'ব ছবি দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?”

—“পাবব।”

জ্যাফাটিকে ছবি'ব বইগুলোর সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ’ল—গাদা-গাদা বই। কয়েক ঘণ্টা পরে ছবি দেখা শেষ ক’রে তিনি উঠে ঝাঁড়িয়ে বললেন, “আমার বাড়ীতে যে অনাহৃত অতিথি এসেছিল, এর মধ্যে তার ছবি নেই।”

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গেল পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরের দিনের কথা। গ্লসেটারের একখানা বাড়ীতে গিয়ে হানা দিলে রাত আটটার চোরের দল। তার পরের দিনেই কলিংস্‌উডে হ’ল আবার তাদের আবির্ভাব। এ পর্যন্ত তারা যে-সব নগদ টাকা, জড়োয়া গয়না, রেডিয়ে ও ঘড়ী প্রভৃতি সবিয়ে ফেলতে পেরেছে তার মোট দাম হবে পঁইত্রিশ হাজার টাকার চেয়েও বেশী।

পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত অসহায়। তারা উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছে, প্রাপণ চেষ্টা'ব ও তদন্তের কিছুই বাকি রাখছে না, তবু নিয়মিত ভাবেই চুরি হচ্ছে আজ এখানে, কাল ওখানে—

যেখানে-সেখানে। পুলিশ অতঃপর কি করবে যেন তা জানতে পেয়েই চোরের দল পুলিশের আগে-আগেই গিয়ে আবির্ভূত হয় যে কোন ঘটনা ক্ষেত্রে।

পুলিশের খাতায় ছাড়া-পাওয়া যত দাগী চোরের নাম আছে, তাদের ভিতর থেকে প্রত্যেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আবার ধ’রে এনে খোঁজ-খবর নেওয়া হ’ল—ফল কিন্তু অষ্টরঙ্গ! রাড্রে পথে-পথে চৌকীদার'ব সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হ’ল। যে-সব দোকানে লোকে জিনিষপত্র'ব বাঁধা রাখে বা বিক্রি করে, সেখানে খানাতল্লাস ক’বেও একটিমাত্র চোরাই মাল পাওয়া গেল না।

কনলি এক দিন মর্গ্যানকে ডেকে বললেন, “চোর'বা যদি না চুরির পদ্ধতি বদলায় আর রাত আটটার চুরি করার অভ্যাস না ছাড়ে, তবে এক দিন না এক দিন আমাদের হাতের মুঠোর ভিতরে তাদের আসতে হবেই।”

তার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের দোসরা জানুয়ারি তারিখে সাতঘণ্টা বসন্তের বৃষ্টি জর্জর ব্রাউন রাজপথ দিয়ে যেতে-যেতে আক্রান্ত হ’লেন দুই জন গুপ্তার দ্বারা।

একটা গুপ্তা রিভলভার দেখিয়ে টাকার দাবি করে। ব্রাউন প্রতিবাদ করাতে সে রিভলভারের বাড়ি মেরে তাঁর মাথা ও মুখ ক্ষত-বিক্ষত ক’রে দেয় এবং তিনি মাটির উপরে পড়ে যান প্রায়-অচেতনের মত।

পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে ব্রাউনের কাছ থেকে আততায়ীর যে বর্ণনা সংগ্রহ করলে, তার সঙ্গে ছব্ব মিলে গেল গত পরিচ্ছেদে জ্যাফাটি'ব দ্বারা বর্ণিত চোরের চেহারা।

অধিকতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ঘটনাটা ঘটেছিল প্রায় রাত আটটার সময়েই।

মর্গ্যান বললেন, “একই লোকের কীর্তি ব’লে সন্দেহ হচ্ছে।”

“কনলি মাথা নেড়ে বললেন, “কিন্তু আচমকা এই নূতন পদ্ধতিটা আমার ভালো লাগছে না। কোথায় বাড়ীতে-বাড়ীতে চুরি, আর কোথায় রাজপথে রাহাজানি! চোরেরা সাধারণতঃ নিজেদের এক-এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব’লে মনে করে, সহসা তারা নিজেদের পদ্ধতি বদলায় না। তবু বর্তমান ক্ষেত্রে সময় আর চোরা'র যে মিল দেখছি, তাও উপেক্ষা করা চলে না।”

চুরির পর চুরি চলতে লাগল, একটানা চলতে লাগল চুরির পর চুরি। চোরদের হাত বেন দম-দেওয়া ঘড়ীর কাঁটা, নির্দিষ্ট সময়ে করে নির্দিষ্ট কর্তব্যপালন!

ছাডন হাইটের একখানা বাড়ী থেকে রাত আটটার চোরেরা নিয়ে গেল সাত লুক টাকার জড়োয়া গহনা!

মর্গ্যান ও কনলি থানায় ব’সে চোরদের নবনব কীর্তি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, হঠাৎ এল টেলিফোনের আহ্বান।

দ্বীলোকের কণ্ঠস্বর। সে মার্কেট স্ট্রীটের এক রেস্টোরাঁ'র পরিবেশিকা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, “শীগ,গির আনুন, শীগ,গির! এখানে একটা লোক এসেছে—”

—“কে লোক? কি বলছ তুমি?”

—“এখানে একটা লোক কোথায় রাহাজানি ক’রে এসে বস্তু'ব কাছে সেই গল্প বলছে। শীগ,গির আনুন, নইলে সে চ’লে যাবে।”

তখনই ছুই গোয়েন্দা মোটর ছুটিয়ে দিলেন সেই রেস্টোরাঁর দিকে।

পরিবেশিকা রেস্টোরাঁর দরজাতেই দাঁড়িয়ে পুলিশের জন্তে অপেক্ষা করছিল। এক ব্যক্তিকে সে দেখিয়ে দিলে অঙ্গুলিনির্দেশে। সে তখন বাইরে বেরিয়ে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পথরোধ করলেন গোয়েন্দারা।

সচমকে সে বললে, “কি চান আপনারা?”

—“আমরা পুলিশ।”

সে ভয়ে ভয়ে বললে, “তাই না কি?”

মর্গ্যান বললেন, “তুমি কোথায় গিয়ে রাহাজানি করেছ, এতক্ষণ সেই গল্প বলছিলে। আমরাও গল্পটা শুনতে চাই।”

—“রাহাজানি!”

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাহাজানি। এতক্ষণ তাই নিয়ে যে খুব মুখসাবাসি করছিলে!”

—“মুখসাবাসি? হ্যাঁ মশাই, ঠিক তাই। বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনেকই মুখের কথায় রাজা-উজীর মারতে চায়, তা কি আপনারা জানেন না? আমি যা বলছিলুম সব বাজে বানানো কথা!”

—“তোমার নাম?”

—“অ্যাণ্ডি ক্লিং।”

—“আমাদের সঙ্গে থানায় চল।”

ব্যাণ্ডেজ-বঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ জর্জ ব্রাউনকেও থানায় ডেকে আনা হ’ল।

ক্লিংকে আরো কয়েক জন লোকের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, “মি: ব্রাউন, দোসুরা জামুয়ারিতে যে লোকটা আপনাকে রিভলভার দিয়ে মেরে আহত করেছিল, সে কি এই দলের মধ্যে আছে?”

ব্রাউন মিনিট কয়েক ভালো ক’রে লক্ষ্য ক’রে দেখিয়ে দিলেন অ্যাণ্ডি ক্লিংকে!

ক্লিং যেন একেবারেই শুভিত! তার পর সে আর্ড কণ্ঠে ব’লে উঠল, “না, না, এ সত্য নয়! উনি ভুল করেছেন!”

ব্রাউন বললেন, “অসম্ভব! আমি যদি আরো দশ লক্ষ বৎসর বাঁচি, তাহ’লেও তোমার মুখ এ জীবনে ভুলতে পারব না!”

কন্‌লির জামার হাতা ঢেপে ধ’রে ক্লিং বললে, “আমার কথায় বিশ্বাস করুন। এ ভদ্রলোক কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

কন্‌লি বললেন, “উনি তোমাকে সনাক্ত করেছেন। তবু তুমি শেষ স্বীকার করছ না কেন?”

ক্লিং বললে, “যে দোষ করিনি তাই আমাকে স্বীকার করতে হবে?”

—“সেদিন তোমার সঙ্গে আর এক জন লোক ছিল। কে সে?”

—“কেউ নয়! আমিই যখন ঘটনাস্থলে হাজির ছিলাম না, তখন আমার সঙ্গে আবার থাকবে কে?”

—“এই যে সব রাত আটটার চুরি, এর সম্বন্ধে তুমি কি জানো?”

—“আপনি কি বলতে চান? আমার বিরুদ্ধে আরো সব চুরির মামলা আছে না কি?”

গোয়েন্দারা এমনি সব প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু ক্লিংয়ের কাছ থেকে কোন স্বীকার-উক্তিই আদায় করতে

পারলেন না। তার এক কথা—সে ব্রাউনকে আক্রমণ করেনি, রাত আটটার চুরি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানে না।

গোয়েন্দারা বুঝলেন, ব্রাউনের মামলায় ক্লিংকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে বটে, কিন্তু রাত আটটার চুরির মামলায় তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তখন জ্যাফাটিকে ডেকে আনা হ’ল, সর্বপ্রথমে ধীর সঙ্গে রাত আটটার চোবেদের এক জনের মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল।

তিনিও কয়েক জন লোকের ভিতর থেকে ক্লিংকে বেছে নিয়ে বললেন, “এই লোকটিকে সেই চোবটার মতন দেখতে বটে, কিন্তু এ ভিন্ন লোকও হ’তে পারে।”

—“তাহ’লে আপনি ঠিক সনাক্ত ক’রতে পারছেন না?”

—“প্রায় তাই-ই বটে। চোবের চোয়ার সঙ্গে এর অনেকটা মিল আছে, এর বেশী আর কিছু আমি বলতে পারব না।”

ক্লিংকে রাহাজানির মামলায় বিনা জামিনে ধ’রে রাখা হ’ল।

মর্গ্যান বললেন, “ক্লিং বন্দী, এখন দেখা যাক এব পরেরও রাত আটটার চুরি বন্ধ হয় কি না! তা যদি হয়, তবে বরতে হবে, ক্লিং সত্য সত্যই ঐ চুরিগুলোর সঙ্গে জড়িত আছে।”

[ক্রমশঃ।

## গল্প হলেও সত্যি

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত

১৯১১ সালের কথা। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ শেষ হলে গান্ধীজী ভারতে ফিরবার সংকল্প করলেন। তাঁর মনে হল, ভারতেই তখন তিনি জনসেবার বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাবেন। অতি কষ্টে ভারতীয় বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি দেশে ফিরবার অমুমতি আদায় করলেন।

গান্ধীজীকে বিদায়-অভিনন্দন জানবার জন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকায় নানা স্থানে সভা হল ও তাঁকে বহু মূল্যবান নানা উপহার দেওয়া হল। উপহারের মধ্যে সোনারূপার জিনিস ত ছিলই, দামী হীরার অলঙ্কারাদিও ছিল।

গান্ধীজীর মনে এক প্রশ্ন জাগল—তিনি কেমন করে এই সব মূল্যবান উপহার গ্রহণ করবেন? উপহারগুলি দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁর জনসেবার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল; এগুলি গ্রহণ করলে তাঁর জনসেবার মূল্য গ্রহণ করা হবে; তিনি আর নিজেকে নিঃস্বার্থ লোকসেবক বলে মনে করতে পারবেন না।

উপহারগুলির মধ্যে পঞ্চাশ গিনি দামের একটি সোনার নেকলেস ছিল। নেকলেসটি কস্তুরবাঁটকে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তাও ত গান্ধীজীর জনসেবার পুরস্কার!

যেদিন সন্ধ্যায় এই সব উপহার গান্ধীজীর বাড়ীতে জড় করা হল, সে রাতে তাঁর ঘুম হল না। বিজ্ঞান মনে তিনি সারা রাত তাঁর ঘরে পায়চারি করে কাটালেন; কিন্তু সনস্তার কোন সমাধান করতে পারলেন না। বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রদত্ত উপহার ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন, কিন্তু সেগুলো আত্মসাৎ করা আরও কঠিন। দ্বী ও পুত্রদের তিনি সর্বদা নিঃস্বার্থ জনসেবার শিক্ষাই দিয়েছেন



জনসেবার মূল্য গ্রহণ করতে নেই, এই-ই তাদের বুদ্ধিয়েছেন। আজ কেমন করে তিনি এই সব উপহার গ্রহণ করবেন ?

গান্ধীজীর গৃহের জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর ছিল। ঘরে কোন মূল্যবান অলঙ্কারের বালাই ছিল না। সকলেই সাদাসিধে জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আজ সোনার ঘড়ি কে ব্যবহার করবে ? সোনার ঢেন, হীরার আংটি কে পরবে ? তিনি অপরকে অলঙ্কারের মোহ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন ; আজ এই সব অলঙ্কার নিয়ে তিনি কি করবেন ?

অবশেষে গান্ধীজী মন স্থির করে ফেললেন। এই সব উপহারের কিছুই তিনি নেবেন না ; সবই জনসেবার কাজে দান করবেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর মনের কথা দ্বী ও ছেলেদের বললেন। ছেলেরা সহজেই বাপুজীর প্রস্তাবে সায় দিল ; কিন্তু কস্তুরবাই বোঁকে বললেন। তিনি বললেন যে, গান্ধীজী বা তাঁর ছেলেদের এ-সব জিনিসের কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে, তাঁর নিজেরও অলঙ্কারের প্রতি কোন লোভ নেই ; কিন্তু ছেলেদের বিয়ের পরে বৌমাথা আসবেন, তাঁদের জন্ম অলঙ্কারগুলো রাখতে হবে। তা'ছাড়া এত ভালবেসে যারা উপহার দিয়েছে, ফিরিয়ে দিলে তারা মনে ব্যথা পাবে।

কিন্তু ছেলেবা দূট, গান্ধীজী নিজেও টললেন না। তিনি বললেন যে, ছেলেবা ত এখনই বিয়ে করছে না, বড় হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে তাবা বিয়ে করবে ; প্রয়োজন হলে তারাই তাদের বৌদের অলঙ্কার দিতে পারবে, তা'ছাড়া অলঙ্কারের মোহ আছে, এমন বৌ ত তাঁরা ঘরে আনতে চান না।

কস্তুরবাই কিছুতেই অলঙ্কারগুলি ফিরিয়ে দিতে রাজী হলেন না। যখন স্বামীর সঙ্গে তর্কে কিছুতেই পারলেন না, তখন বললেন, তাঁকে যে নেকলেস উপহার দেওয়া হয়েছে তা' ফিরিয়ে দেবার অধিকার গান্ধীজীর নেই। কিন্তু গান্ধীজী ছাড়বার পাত্র নন ; তিনি বললেন, সে নেকলেস ত তাঁরই লোকসেবার পুরস্কারস্বরূপে তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে—কস্তুরবাইয়ের নিজস্ব কোন জন্মসেবার জন্ত নয়।

কস্তুরবাই এ কথা মানলেন বটে ; কিন্তু বললেন যে, গান্ধীজীর জন্মসেবা তাঁরও অংশ আছে। তিনি কি দিন-রাত গান্ধীজীর জন্ম খাটেননি ? যত লোক তাঁদের বাড়ীতে এসেছে, দাসীর মত কি তিনি তাদের সেবা করেননি ?

দ্বীরা এই কথাগুলি গান্ধীজীর মন্থ বিদ্ধ করল, কিন্তু তবু উপায় নেই ; উপহাৰগুলি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। তিনি কোন রকমে কস্তুরবাইয়ের সম্মতি আদায় করে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় সমাজের সেবার জন্ম উপহারগুলি সব ফিরিয়ে দিলেন। একটি শ্রাসপত্র (Trust Deed) লিখে শ্রাসীদের হাতে সব অর্পণ করলেন। কালক্রমে উদারহৃদয়া কস্তুরবাইও বুঝলেন যে, গান্ধীজী ঠিক কাজই করছেন।

জনসেবাই জনসেবার পুরস্কার—গান্ধীজীর এই আদর্শ লোকসেবক কর্ম্মীমাত্রেরই গ্রহণ করা কর্তব্য। নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের সাধনায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এখন ভারতকে মহানু করে তুলতে হলে গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত শত-শত নিঃস্বার্থ লোকসেবক কর্ম্মীর

## বাসীর রাণী লক্ষ্মী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম্পত্য-জীবন

৪

বিবাহের পর বিদায়ের পালা এল। বিবাহিতা মম্ম মহারাজা স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাবেন—চললো তার আয়োজন। মম্ম সবিনয়ে পরিচিতদের কাছ থেকে বিদায় নিতে লাগলেন ; শাশুলোচনে বললেন : আমাকে মনে রাখবেন—যেন ভুলে যাবেন না। খেলার সাথী নানা সাহেব ও রাও সাহেবকে বললেন : খেলা কিন্তু আমি ভুলবো না, সেখানে গিয়েও খেলব।

নানা সাহেব বললেন : আমাদের কিন্তু ভুলে যাবে ছবলি—রাজরাণী হয়ে !

মম্ম মুখখানি ভার করে উত্তর দিলেন : তবে খেলার কথা বললাম কেন ? খেলতে গেলেই তোমাদের কথা মনে পড়বে ; খেলার সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছ যে !

রাও সাহেব বললেন : খেলা আর আমাদের জমবে না—তুমি যে ছিলে আমাদের খেলার প্রাণ !

মম্মর মনটি অমনি হুলে উঠল ; বললেন : ভাইকোটার দিনে আমি কিন্তু কোঁটা পাঠাব—সেদিনটিতে তোমরাও আমাকে মনে কর।

নানা বললেন : তুমি যে একটি স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে চলেছ, এতেই আমাদের আনন্দ। রাণী হয়ে তুমি দেশের কত উপকার করবে।

আয়ত ছুঁটি চোখ বড় করে নানার মুখের উপরে তার স্বচ্ছ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মম্ম বললেন : রাণী হলেও আমি তোমাদের ভুলবো না, এই বিটুরের ছবি আমি মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে চলেছি জেনে।

এর পর বাবাকে বললেন : তোমার জন্তে আমার বেড়ো মন কেমন করবে ; তুমি আমাকে দেখতে যেয়ো বাবা—ওঁরা হয়ত ওঁদের রাণীকে ঘন ঘন আসতে দেখেন না।

পঙ্কজী একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন : এ কথা কেন বলছ মা ?

মম্ম বললেন : ওখান থেকে ধারা এসেছেন, এই কথা যে তাঁরাই বলছিলেন বাবা ! রাণী হলে না কি আর আসবার নিয়ম নেই। তা ব'লে ওঁরা কি আমাকে ওঁদের বাড়ীতে কয়েদ করে রাখবেন ? তাহলে কিসের রাণী হতে চলেছি আমি ? আগে ত বাই, তার পর বোঝাপড়া করব ওঁদের সঙ্গে। আমি কিন্তু তোমাকে ওখানে নিয়ে রাখব বাবা, এর পর।

পঙ্কজী হাসতে হাসতে বলেন : তোমাকে দেখতে আমি যখন তখন যাবো বই কি মা, কিন্তু তা ব'লে জামাইয়ের বাড়ীতে বরাবর থাকতে পারি না, সে চেষ্টা তুমি কর না মা—তাতে নিশ্চয় হবে।

শুনল মম্ম বলে ওঠেন : বা-রে, তা কেন ? আমি বিয়ের পর রাণী হতে চলেছি, আর তুমি এখানে চাকরী করবে বাবা ! সে কি কখনো হয় ? তুমি দেখো, এর পর আমি কি করি ! রাণী হই রাণীর মতন রাণী হবো আমি।

সবার শেষে পেশোয়া ও তাঁর মহিষীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন মনু। পেশোয়া হাসতে হাসতে বললেন : আমার মনে হচ্ছে পার্বতী যেন শিবের ঘর করতে চলেছেন।

মনু অমনি খপ করে বলে উঠলেন : আপনার কথা আমি বুঝিছি। শিবের অনেক গুণ ছিল বলে পার্বতী বরের বয়েসের জন্তে দুঃখ করেননি। শিবের মতন আমার বরেরও বেশী বয়েস হয়েছে, কিন্তু আমার তাতে দুঃখ নেই এই ভেবে—তিনি একটা রাজ্যের রাজা, কত লোককে প্রতিপালন করেন, লোকের ভালো করবার উপকার করবার তাঁর কত ক্ষমতা আছে—এতেই আমার আনন্দ। আপনি আশীর্বাদ করুন পেশোয়া, আমি যেন পার্বতীর মত সুখী হই, আর উনি শিবের মত লোকের মঙ্গল করেন।

বালিকার মুখের কথা মহিষীদের সঙ্গে পেশোয়া স্তব্ধ হয়ে শোনেন। তাঁর পর গম্ভীর মুখে বলেন : দেবতার আশীর্বাদ আর দৈবী শক্তি না থাকলে এই বয়েসে কোনো মেয়ের মুখ দিয়ে এ ধরণের কথা বাব হতে পারে না।

মহা সমারোহে বিশাল মিছিল কবে নববধূ স্বামীর সঙ্গে ঝাঁসীর প্রাসাদে এলেন। বধূরূপ দেখে সকলেই সুখ্যাতি করতে লাগলেন। হর্ষ-পরিবেষ্টিত ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদ দেখে বধুও বিস্মিতা হলেন। প্রাসাদের মধ্যেই মনোরম উদ্যান। অন্তঃপুরে রাণীর স্বতন্ত্র মহল, যাদেপ বহনের জগ্গ কত পরিচাটিকা, মনোরঞ্জনব জগ্গ নৃত্য-গীত-পটায়সী রূপসী কিশোরীর দল, দ্বাবে দ্বাবে শত্ৰুপাণি প্রতিহাবিনী—একটি বালিকা বধুর পরিচর্যার জগ্গ কি বিপুল আয়োজনের ঘটা! পেশোয়াব বিধুব প্রাসাদের জাঁক-জমকের কথা মনুর মনে পড়ে।

শুণবারে এসে মনুর পিতৃদত্ত নামের পরিবর্তন হলো—লক্ষ্মীবাই নামেই তিনি পরিচিতা হলেন। মারাঠাদের এটি প্রচলিত প্রথা—বিবাহের পরে শ্বশুর-শাশুড়ীরা নিজেদের ইচ্ছামত নামকরণ করেন নববধুর। এব পর পূর্বাতন নাম পবিত্যক্ত হয়—শ্বশুরবাড়ীর দেওয়া নতুন নামেই অতঃপর বধু অভিহিতা হন। কাজেই পুণ্ড্রীর অলংকরণী মনু ঝাঁসীতে এসে পূর্ণনাম ত্যাগ করে স্বামিদত্ত লক্ষ্মীবাই নাম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

এর পর লক্ষ্মীবাইএর দাম্পত্য-জীবনের কথা বলতে হলে তার আগে ঝাঁসী রাজ্যটির কথা বলতে হয়। কারণ, ঝাঁসীকে ভালো বোনা জানলে ঝাঁসীর এই হেজরিনী রাণীকে জানতে অসুবিধা হবে।

ঝাঁসী হচ্ছে মধ্য-ভারতের বৃন্দেলখণ্ড বিভাগের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। অতীত কাল থেকেই ছোট-ছোট কতকগুলি রাজ্য নিয়ে বৃন্দেলখণ্ড গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক রাজ্যই এক-এক রাজবংশ দ্বারা ক্ষমতাক্রমে শাসন করে আসছিলেন। মোগল আমলে ঔরঙ্গজীর দশাশ নজর পড়ল প্রথমে এই রাজ্যগুলির উপরে। তিনি এসেন তাদের স্বাধীনতা হরণ করে করদ রাজ্যে পরিণত করত। বৃন্দেলারাজ্যের তরুণ রাজা ছত্রশাল হলেন প্রতিবাদী; তিনি বৃন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে সম্মেলন করে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরলেন স্বয়ং তাদের নেতাক্রমে। মহাবীর শিবাজীর আদর্শে প্রাণিত হয়ে এই মারাঠা ব্রাহ্মণবীর বাদশাহের প্রবল প্রতিরোধ কর্তে বৃন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন। তখন অত্যন্ত

রাজ্যগুলির রাজারা বৃন্দেলারাজ ছত্রশালকে মহারাজা বলে স্বীকার করে তাঁর মিত্ররূপে স্বাধীন ভাবে নিজের নিজের রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কালক্রমে হায়দ্রাবাদের নিজাম চিন কিলিচ আসফসা প্রবল হয়ে মালবরাজ গিরিধর রাও এবং গুজরাটের নবাব সরবুলন্দ খাঁর সহযোগিতায় একযোগে বৃন্দেলখণ্ড আক্রমণ করলেন। মহারাজ ছত্রশাল তখন বৃদ্ধ ও রুগ্ন। তাঁর ইতিহাস-বিশ্রুতা কন্যা মন্তানীর রূপ-গুণের খ্যাতি সারা ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে। ত্রিশস্তির এই অভিনানের মূলেও ছিলেন এই মন্তানী। বৃদ্ধ রাজা ছত্রশাল তখন নিরুপায় হয়ে মহাবাহু-চক্রের নেতা মহাবীর পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের সহায়তা প্রার্থনা করলেন। বিপন্ন ব্রাহ্মণ রাজার আমন্ত্রণ ব্রাহ্মণবীর বাজীরাও সাদরে গ্রহণ করে তাঁর দিগ্বিজয়ী সেনাপতি রণজী সিন্ধিয়া ও মলহররাও হোলকারের নেতৃত্বে সেনাবল পাঠালেন সম্মিলিত ত্রিশস্তির বিরুদ্ধে। ফলে, নিজাম, মালব ও গুজরাতের বিপুল বাহিনী শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হলো। তখন কৃতজ্ঞ রাজা ছত্রশাল রাজকন্যা মন্তানীকে বিজয়ী বীর বাজীরাওয়ের হাতে সমর্পণ করে বৃন্দেলখণ্ডের রাজত্ববর্গের সঙ্গে একযোগে এই মর্মে এক সন্ধিসন্ধিতে আবদ্ধ হলেন যে, অতঃপর পেশোয়ার আশ্রিত মিত্ররাজ্য-রূপে তাঁরা নির্ভয়ে স্ব স্ব রাজ্যশাসন করতে থাকবেন এবং কেউ আক্রান্ত হলে পেশোয়া তখন তাঁকে রক্ষা করবেন। যে সব রাজ্যেব সঙ্গে পেশোয়া এই ভাবে সন্ধি করলেন, তাদের মধ্যে ঝাঁসীও এক বিশিষ্ট রাজ্য। এই রাজবংশ মহারাজ ছত্রশালের সমসাময়িক এবং আত্মীয়গোষ্ঠী-সম্মত। কেন না, বৃন্দেলার মতন ঝাঁসীর রাজারাও ব্রাহ্মণবংশীয়।

দিন যায়। ক্রমে পেশোয়াদের অমিত পরাক্রমেও ভাঙ্গন ধরে এলো; ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন ইংরেজশক্তির অধিকূলে। ফলে, ভারতীয় রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে ইংরেজের সার্বভৌম শক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এই সূত্রে বৃন্দেলখণ্ডের পেশোয়া-আশ্রিত রাজ্যগুলিকেও এক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হলো। ১৮১৭ সালে বৃন্দেলখণ্ড পেশোয়াদের হস্তচ্যুত হয়ে ইংরেজের হস্তগত হলো। ইংরেজ তখন পেশোয়াদের মতই বক্ষকস্বরূপ হয়ে বৃন্দেলখণ্ডের প্রত্যেক রাজার সঙ্গে নতুন করে সন্ধি করলেন। এই সন্ধি সম্পর্কেই ঝাঁসীর তৎকালীন রাজা রামচন্দ্ররাও এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা পুরুষানুক্রমে ঝাঁসীরাজ্যের অধিপতি ও স্বাধিকারী বলে ইংরেজ কর্তৃক স্বীকৃত হলেন। এই সন্ধিতে কোন রাজ্যের রাজা বাজ-মর্ধ্যাদাচ্যুত হননি, ইংরেজের সঙ্গে রাজা-প্রজা-স্বচক কোন সম্বন্ধও স্থাপিত হয়নি—উভয় পক্ষই পদব্রজে মিত্ররূপেই অতিষ্ঠ হন। এই মিত্রতাব পরিচয় খেলেন ইংরেজ ১৮২৫ সালের ভবতপূব সংগ্রামের সঙ্কটকালে। ইংরেজকে সে সময় বিপন্ন দেখে বোতিলারা ঝাঁসীর সন্ধিহিত কালী নামক ইংরেজদের এক নগরী অবরোধ করে। ঝাঁসী-রাজ রামচন্দ্র রাও সে সময় চার শত অশ্বাবোহী, এক হাজার পদাতি ও দু'টি কামান পাঠিয়ে কালী রক্ষায় ইংরেজকে সাহায্য করেন—তাঁর সাহায্যের জন্তই তখন কালী বক্ষা পায়।

এর পর এলো ১৮৩২ সালের স্ববলীয় ১১শে ডিসেম্বর। মহামতি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তখন ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল। তিনি রাজ্যের পরম সঙ্কটে ঝাঁসীর মিত্র-রাজা রামচন্দ্র রাওয়ের আচরণের



আপন প্রেমমুগ্ধতা নিয়ে অধিকক্ষণ একাকী কাল কাটাতে

হোল না কলিঙ্গকে। বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন ভাবী শান্তি। তিনি যখন দেখলেন, কলিঙ্গের সঙ্গে আলাপ করে দ্রুত-হাতে দবজার হাতল ঘুরিয়ে ততোধিক দ্রুত-পায়ে এলিজাবেথ তার পাশ দিয়ে সবেগে চলে গেল সিঁড়ির দিকে, আর অপেক্ষা না করে তিনিও যবে প্রবেশ করে ভাবী জামাতাকে পরম মেহের সঙ্গে অভিনন্দন জানালেন। সে অভিনন্দন সানন্দে গ্রহণ করে কলিঙ্গ অতঃপর বিরত কবল তার সঙ্গে এলিজাবেথের কথাবাতা। এলিজাবেথ যে স্বাভাবিক ব্রীড়া ও চরিত্রের অল্পপম স্নিগ্ধতার জগুই তাকে আন্তরিক 'না' 'না' কবেছে সে-কথাও বেনেট-গিল্লীকে সে জানাতে ভুলল না।

এলিজাবেথের এই প্রত্যাখ্যানের কথা শুনে মায়ের হৃদয় স্থিতি পেল না। 'তা হোক' বললেন তিনি—'ওকে আমরা বাজী করাব। ঐ মেয়েটি আমার বড়ো জেদী আর বোকা। নিজের মঙ্গল কিসে হা পোখে না। যাক, সে আমি ওকে বুঝিয়ে দেব।'

—'মাপ করবেন'—বললে কলিঙ্গ—'সত্যি যদি আপনার মেয়ে জেদী হয় তাকে বোঁ হিসেবে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার পাদবী-জীবনে সুখী বিবাহিত জীবনই প্রধান কাম্য। সে ক্ষেত্রে আপনার মেয়ের প্রত্যাখ্যান আমার পক্ষে শুভ। তাকে আর মিছিমিছি আপনি জোব করবেন না।'

—'সে কি কথা বলছে বাবা।' বেনেট-গিল্লী উত্তর আগ্রহে বললেন—'নিজের বিয়ের ব্যাপারেই ওর যত জেদ। নইলে এমন ঠাণ্ডা নরম মেয়ে তুমি কদাচিৎ দেখতে পাবে। কিছু ভাবনার নেই, ওর বাবাব সঙ্গে বসে আমি সব ঠিক করে ফেলব।'

আর কোন জবাব কানে না নিয়ে তিনি সোজা গিয়ে ঢুকলেন স্বামীর ঘরে। 'হ্যা গো, শুনছ। এলিজাবেথ তো কলিঙ্গকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না। তুমি বাপু মাঝে না দাঁড়ালে তো এমন সুপাত্র আমাদের ঘরে আসে না।'

দ্বীপ কথা শুনে তিনি বললেন—'কিসেব কথা বলছ, বুঝতে পারলে ভারী খুসী হব। একটু ভেবে বলা দবকার মনে হচ্ছে।'

—'নিজে বল মেয়েকে। বলো, তোমার ইচ্ছা যে এলিজাবেথ তাকে বিয়ে করুক।'

—'ডাক তবে তাকে।'

এলিজাবেথ ঘরে উপস্থিত হওয়া মাত্র বাপ তাকে সম্বোধন করে বললেন—'শোন মা। তোমার সঙ্গে একটা জরুরী আলোচনা করতে চাই। আমি গুনলাম, কলিঙ্গ তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। এ কথা কি সত্যি?'

—'হ্যা, বাবা—'

—'তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ?'

—'হ্যা বাবা—'

—'কিন্তু তোমার মা'র ইচ্ছা যে তুমি কলিঙ্গকে গ্রহণ কর।'

বেনেট-গিল্লী কপট ক্রোধে বললেন—'নিশ্চয়ই। নইলে ও-মেয়ের মুখ আর জন্মে আমি দেখতে চাই নে।'

—'তাহলেই দেখ', বললেন বাপ—'যদি তুমি তাকে বিয়ে না কর তোমার মা আর কখনো তোমার মুখ দেখবেন না। আর যদি তুমি ওকে বিয়ে করো তবে আমি আর কখনো তোমার মুখ দেখব না।'



বেনেট-গিল্লী স্বামীর এই লঘুচিত্ততার রাগ করে চলে গেলেন। এলিজাবেথ নীরবে হাসতে লাগল।

কলিঙ্গও একলা ঘরে সব বিষয়টি রোমন্থন করছিল মনে-মনে। এলিজাবেথ তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পাবে কিসের জন্তে তা তার মাথায় আসে না। পাত্র হিসেবে তাব চেয়ে ভাল আর কে হতে পারে? তবু ঐ মুখের মেয়েটির উপর কোন ক্ষোভ তার মনে জমা হোল না। সে যে তার মায়ের কাছে এর জন্তে লাঞ্ছনা ও ভৎসনা লাভ করেছে, সেই কথা চিন্তা করে আর কলিঙ্গের মনে কোন দুঃখ রইল না।

সে বেনেট-গিল্লীকে বললে এক সময়—'আমার ভুল হয়েছে যে, আপনাদের কাছে প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যান না হয়ে আপনার মেয়ের কাছে প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যান হলো। কিন্তু মাহুয় মাজেই ভুল করে। তবু সব জিনিষটাই শোভন ভাবে করতে চেয়েছিলাম আমি। আমার অভিলাষ ছিল, আপনাদের পারিবারিক স্তম্ভ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখে আপনাদের ঘর থেকেই একটি মনোরমা পত্নী নির্বাচন করা। কিন্তু আমার আচরণ যদি কোন ভাবে আপনাদের মনে দুঃখ দিয়ে থাকে, তবে তার জন্তে আমি অকুচিত্ত চিন্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

একুশ

কলিঙ্গের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় ধামা-চাপা পড়ে গেছে। এলিজাবেথ শুধু মাঝে-মাঝে এক অস্বস্তিকর চিন্তায় পীড়িত হয় আর মা এই প্রসঙ্গ তুলে মাঝে মাঝে তাকে খোঁচা দেন। কলিঙ্গের

তার প্রতি তুই তোব কর্তব্য করেছিস—এ নিয়ে আর খুঁতখুঁত করিস্ নে।’

—‘কিন্তু সবই ভাল ধরে নিয়েও আমি কি সুখী হতে পারব এমন এক জন লোককে পেয়ে যার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব তাকে অত্যন্ত বিয়ে দিতে চায়?’

—‘সে বিচারের ভার তোমার। যদি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে স্থির কবো যে, তুই বোনকে অসন্তুষ্ট করাব হুংতাব বোঁ হওয়াব সুখে তুলনায় ঢেব বেশী, সে ক্ষেত্রে আমাব উপদেশ হোল তাকে সবাসি প্রত্যাখ্যান করা।’

—‘কী যে বলিস’—স্বপ্ন হাসি দেখা দিল জেনেব মুখে—‘জানিস তো, তাদের অন্তে দুঃখিত হব খুবই কিন্তু ওকে প্রত্যাখ্যান কবতে পারব না।’

—‘পারবে তা আমিও ভাবি না। আব সে জন্তাই তোব অবস্থায় আমার কল্পনা হয়নি।’

—‘কিন্তু শীতে যদি সে না ফেরে আমার বিচার-অবিচারের হয়ত আর প্রশ্নই উঠবে না। ছ’মাসে হাজারো রকম কিছু ঘটতে পারে।’

বিংলেব আর ফিরে না আসাটা এলিজাবেথের কাছে অতি ঘৃণ্য মনে হোল। ক্যারোলিনের স্বার্থেব গন্ধই পেলে সে এর মধ্যে। মুহূর্তের জন্তও ভাবতে পারে না সে, কেমন করে এক জন স্বাধীন-চিত্ত যুবক বোনের ইচ্ছায় পরিচালিত হতে পারে! এ বিষয়ে তার মতামত বিশেষ জোবেব সঙ্গেই জাহির কবলে এলিজাবেথ এবং শীগ্গিরই এর স্তম্ভন পরিণতি দেখতে পাবে জানালে। হতাশায় মুসড়ে-পড়া জেনেব প্রকৃতি নয় কোন দিনই। আশার সঞ্চার হতে লাগল ক্রমশঃ কিন্তু তবুও মাকে-মাকে ভালবাসায় সন্দেহ আশাকেও পরাভূত কবতে লাগল। কে জানে, হয়ত বিংলে আর ফিরবে না নেদারল্যান্ডে।

স্থির হোল, মাকে শুধু জানান হবে যে ওবা সবাই লগুনে চলে গেছে—বিংলের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন ইংগিতই করা হবে না। কিন্তু তিনি অর্ধেকটা শুনেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঠিক যে মুহূর্তে তারা পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছিল, সেই মুহূর্তে ও-বাড়ীল লোকদেব চলে যাওয়ায় অত্যন্ত মর্মাহত হলেন তিনি। কিছুক্ষণ বিলাপেব পর তিনি মনকে এই বলে প্রবোধ দিলেন যে, বিংলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে লংবোর্শে। সব শেষে ঘোষণা কবলেন, এর আগে ডীনাভেরই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল শুধু—এবার ছ’বেলাই খাওয়াবেন তাকে।

### বাইশ

পরদিন বেনেটরা লুকাস-পরিবারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। মিসু লুকাস দিন-ভোর কলিকের সঙ্গে গল্পে-গল্পে কাটালে। “কী খোশ-মেজাজেই না রেখেছ ওকে ভাই তুমি। কি বলে যে ধর্মবাদ দেব তোমায়”—বললে এলিজাবেথ বাধবীকে। শালটি জ্বাবে বললে যে, সখীকে সে হতাশ করবে না। কিন্তু শালটি যে অভিসন্ধি নিয়ে ফিরছিল তার ধারণাও ছিল না এলিজাবেথের। কলিককে লাভ করার সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ হতে চায়। সে রাতে যখন তারা বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে তখন তার মনে আর কোন

সন্দেহের অবকাশ রইল না যে, কলিককে সে জয় করতে পেরেছে যদিও লোকটি অন্নিহই এ দেশ থেকে চলে যাবে মনস্থ করেছে কিন্তু শালটি স্বপ্নেও যা ভাবেনি তাই হোল। পরদিন ভোর না হতেই চোরের মত এ-বাড়ী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সবার অলক্ষ্যে কলিক লুকাসদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। বোনেদের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘাবার উদ্দেশ্য যে, তার এই নূতন অভিযান নিয়ে তারা নানা অর্থ কবে বসবে। তা ভিন্ন কিছুটা সাক্ষ্যের নিদর্শন না পেলে সে ব্যাপারটা জানাজানি করতেও চায় না। শালটির স্তম্ভ সদয়তায় যথেষ্ট সাহসী হয়ে উঠলেও বুধবারের প্রত্যাখ্যানের আশঙ্ক তখনো নেবেনি তার হৃদয়ে। কিন্তু যে ভাবে কলিক এখানে সমাদৃত হলে তাতে তার আশাতিরিক্ত পুরস্কার লাভ ঘটল। মিসু লুকাস তাকে উপরের বাতায়ন থেকে লক্ষ্য করেই নৌচে নেমে এল এবং যেন হঠাৎই দেখা হোল এই ভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল পথে। সে-ও ভাবতে পারেনি যে, এক দিনের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পুরুষটির হৃদয়ের এতখানি প্রেম তারই জন্ত উন্মুল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

পথের ঐটুকু নিভৃত বিশ্রামাল্যাপের মধ্যেই অনেক কিছু পাকা হয়ে গেল তাদের মধ্যে। দু’টিতে যখন বাড়ীতে প্রবেশোন্মুখ তখনই কলিক তাকে মিনতি করে বললে সেই পবিত্র দিনটির কথা উচ্চারণ করতে বেদিন সে নিজেকে পৃথিবীর সর্বাঙ্গের স্তম্ভী মানুষ বলে মনে করতে পারবে। এই মানুষটিকে গ্রহণ করার মূল কারণ বিষয়-বুদ্ধি সজ্ঞাত হওয়ায় শালটিও সে বিষয়ে কোন নিকৃৎসাহ করলে না তাকে।

বাগ-মা এ কথা শুনে দু’জনকে সম্মুখে আশীর্বাদ করলেন। নিজেকে অবস্থা-বৈগুণ্যে তারা মেয়েকে অধিক কিছু যৌতুক দিতে পারতেন না। সে অবস্থায় কলিকের মত জামাতা লাভ পরম আনন্দের সন্দেহ নেই। তাছাড়া ছেলেটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিও সমৃদ্ধ। মা তক্ষুনি মনে-মনে হিসেব করলেন, আর কত দিন যিঃ বেনেট বাঁচতে পারেন অর্থাৎ আর কত দিনের মধ্যে তাঁর মেয়ে স্বামীকে নিয়ে ঐ বাড়ী ও সম্পত্তি দখল করতে পারবে। সমস্ত পরিবারটি এই সুখবরে মুহূর্তে আনন্দ-মুগ্ধ হয়ে উঠল। আপ সকলে যা-ই ভাবুক, শালটি নিজের মনের সঙ্গে অনেকখানি বোঝাপড়া কবে নিলে। মনোমত নাই হোক তবু ত সে তার স্বামী হবে। চিরকুমারী না থেকে সে ত ঘর-ঘর পাবে। বিয়ে হওয়া তার সাধনা ছিল, এতদিনে তা সফল হতে যাচ্ছে। লেখাপড়া-জানা গরীব মেয়েদের পক্ষে বিয়েই একমাত্র সংজীবিকার উপায়। সুখের দিক থেকে বিয়ে যতই অনিশ্চিত হোক না কেন, অভাব থেকে বাঁচা পথ নিশ্চয়ই। সাতাশ বছর অপেক্ষা করার পর অবশেষে সুদিন এলো তার। তার এই সৌভাগ্য এলিজাবেথ কতখানি আশ্চর্য হবে তাই ভাবলে শালটি। এলিজাবেথের চেয়ে প্রিয়জন আর তার কেউ ছিল না পৃথিবীতে। হয়ত বা সখী তাকে দেখে দেবে। তার চেয়ে বরং নিজেরই সখী-সন্দর্শনে গিয়ে তাকে সব কথা খুলে বলবে। কলিককে সে অল্পরোধ করলে যেন এ সম্বন্ধে কোন কথা সে বেনেট-পরিবারে না ব্যক্ত করে। কলিক সে প্রতিজ্ঞা দিয়ে বিদায় নিলে।

পরদিন ভোরেই বিদায় মেবে কলিক জানাল বাদ্রে আহাের সময়। বোনেদের কাছে সে সহান্ত বিদায় নিলে। বেনেট-গিন্নি

সৌজন্তের সঙ্গে তাকে অসুযোগ করলেন যে, যখনই সুযোগ-সুবিধা ঘটবে কলিঙ্গ যেন এ বাড়ীতে আতিথ্য নেয়।

—‘আপনার এই আমন্ত্রণ আমি পরম আগ্রহে গ্রহণ করলাম। কেন না, অতি নিকট-ভবিষ্যতেই এখানে আবার ফেরার বাসনা নিয়েই এবার বিদায় নিচ্ছি।’

এ কথায় সবাই বিস্মিত হলেন। মিঃ বেনেট তার এই আশ্চর্য প্রত্যাবর্তনের মানসে বিচলিত হয়ে বললেন—‘কিন্তু তাতে লেডী ক্যাথারিন হয়ত বা অসন্তোষ বোধ করবেন। আমার ত মনে হয়, কাজের খাতিরে আত্মীয়-স্বজনকেও পরিহার করা উচিত।’

—‘আপনাকে ধন্যবাদ স্মার।’ বললে কলিঙ্গ—‘কিন্তু তাঁর চিরস্নেহের সম্মতি না নিয়ে কোন কিছুই আমি করব না সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।’

কিন্তু সে রাত্রের কথাবার্তায় এটুকু সবাই আভ্যন্তরীণ বুলে, যে কোন কারণেই হোক, কলিঙ্গ সত্ত্ব প্রত্যাবর্তনের অভিনায় নিয়েই এবার বিদায় নিচ্ছে; কিন্তু তার এই বাসনার পিছনে কি প্রেরণা তা কেউই উপলব্ধি করতে পারলে না।

পরদিন সকালে মিস্ লুকাস প্রিয়সখীর কাছে এসে বসল নিভৃত। গত দু’দিন এলিজাবেথের মনে এ মুহূর্ত সস্তাবনা উঁকি মাঝছিল যে, কলিঙ্গ ভাবছে যে শাল’টি তাকে প্রেমের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু শাল’টি যে সত্যিই তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে এই বাস্তব সত্যে তাব মনে এমন বিশ্বাসের ধাক্কা লাগল যে, সব ভুলে গিয়ে সে চেঁচিয়ে বললে—‘ঐ লোকটির সঙ্গে বাগ্দস্তা হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি না। এ সম্ভব?’

বান্ধবী এই হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও শাল’টি এ ভ্রমনার জন্ত প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। নিজের শাস্ত ভঙ্গীটুকু পছন্দ রেখে সে সগৌরবে বললে—‘এতে অবাধ হচ্ছিস কেন ভাই! তোর কাছ থেকে সাজ পায়নি বলে কোন মেয়ের কাছেই সে প্রীতি পাবে না, এমন অবিশ্বাস্য কথা কেন তুই ভাবতে পারলি!’

এলিজাবেথও নিজেকে সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। সে নিজের মূল স্বীকার করে বান্ধবীর পরম মুখ কামনা করলে।

—‘তুই কি ভাবছিস আমি জানি’—বলে শাল’টি—‘তোর হৃদয় হবার কারণও বুঝি আমি। কিন্তু তুই জানিস, আমি ভালো মেয়ে নই। কখনও ছিলামও না। আমি শুধু চাই একটি ভালো ঘর। আর এই লোকটির সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পত্তির কথা ভেবে দেখলে আমার ত মনে হয় যে, বিবাহোত্তর জীবনে মেয়েরা যে সুখ-স্বচ্ছন্দ্য কামনা করে তার কোনটারই আমার অভাব ঘটবে না।’

শাল’টি বিদায় নিলে নিজের ঘরে বসে এলিজাবেথ কত কি ভাবলে মনে-মনে। তিন দিনে দু’বার প্রেম-নিবেদন করে যে লোক, তার সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ঐ মেয়েটি কতখানি সুখী হবে তাই ভাবতে লাগল সে। যদিও সে জানে বিয়ে সম্বন্ধে তার ধারণা, শাল’টির তা নয়। তবু।

### তেইশ

মা ও বোনের সঙ্গে বসেছিল এলিজাবেথ। যে কথা সে শুনেছে সে কি তা বলা ঠিক হবে? এমন সময় তার লুকাস স্বয়ং এসে

উপস্থিত হলেন সেখানে। মেয়ে পাঠিয়েছে তাঁকে বিয়ের কথাটা জানাতে এদের। লংবোর্ণ-পরিবারের অপরিমিত প্রশংসা করে দুই পরিবারের মধ্যে আশ্চর্য্যাত্মক সন্তাবনায় খুশী-চিন্ত স্মার লুকাস বিবৃত করলেন তাঁর শুভ সন্দেশ। শ্রোত্রীমণ্ডলী সব শুনে কেবল মাত্র বিস্মিতই হোল না, উড়িয়ে দিতে চাইলে কথাটা। মিসেস বেনেট বললেন—‘আপনার নিশ্চয়ই ভুল ঘটেছে কোথাও।’ লিডিয়ার অন্ত সৌজন্তের বালাই নেই—সে ফস করে বলে বসল—‘কি যে বলেন? কলিঙ্গ তো লিঙ্গিকেই বিয়ে করতে চায়।’

কিন্তু এত প্রতিবাদেও স্মার লুকাস নিশ্চিন্ত হলেন না। তাঁর সংবাদ যে স্থির, জোর-গলায় সে কথা বললেন তিনি এবং ক্ষমাশীল হৃদয়ের সঙ্গে এদের নিলজ্জতা হজম করতে লাগলেন।

এই অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা কর্তব্য মনে করে এলিজাবেথ এগিয়ে এল তাঁর সাহায্যে এবং জ্ঞানাল, কথাটা সত্যি—বান্ধবীর কাছ থেকে পূর্বাভূত শুনেছে সে। মা ও বোনের বিশ্বাসকে খামিয়ে দেবার জন্ত সে সাগ্রহে অভিনন্দন করল ভাগ্যবতীর পিতাকে—জেনও যোগ দিল তার সাথে।

স্মার লুকাস যতক্ষণ রইলেন এদের মা আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না, এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্মার লুকাস চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি বর্ণ-মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। প্রথমতঃ, সমস্ত ব্যাপারটাকেই তিনি অবিশ্বাস করলেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর স্থির বিশ্বাস জন্মাল যে, কলিঙ্গকে তারা বাধ্য করেছে কোন কৌশলে। তৃতীয়তঃ, তাঁর ধারণা এ বিয়ে সুখের হবে না। চতুর্থতঃ, তিনি বিশ্বাস করেন এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবে। আর সমস্ত কিছু থেকে সিদ্ধান্ত করলেন তিনি যে, এলিজাবেথই হোল যত অনর্থের মূল। তা ছাড়া এ-বাড়ীর সবাই মিলে অমন ভাল ছেলের সঙ্গে বরোচিত ব্যবহার করেছে। কোন মতেই আর তাঁকে সামান্য দেওয়া গেল না—কিন্তুতেই প্রশমিত হবেন না তিনি। পুরো এক দিনেও তাঁর রাগ পড়ল না। না বকে এক সপ্তাহের আগ্রহ তিনি কথাই বলতে পারলেন না এলিজাবেথের সঙ্গে। এক মাসের আগে রুচ না হয়ে স্মার লুকাস বা লেডী লুকাসের সঙ্গে ভাল করে বাক্যলাপ করলেন না তিনি আর মেয়েকে ক্ষমা করতে অনেক, অনেক মাস কেটে গেল।

এ বিয়ের সংবাদে জেনও সত্যি একটু বিস্মিত হোল। কিন্তু মনের ভাব সে গোপন রাখলে। এ বিয়ে যে অসম্ভব নয় এ কথা কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলে না এলিজাবেথ। কিটি বা লিডিয়া মিস্ লুকাসের ভাগ্যে একটুও ঈর্ষান্বিত হোল না, কেন না কলিঙ্গ তো সামান্য এক জন পাদরী ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের কাছে এ বিয়েটা মেরীটনে গল্প করার মত ঘটনা ছাড়া আর বেশী কিছু মনে হোল না।

তাঁর মেয়ের যে ভাল বিয়ে হোল বেনেট-গির্লকে এ কথাটা শোনাতে ছাড়লেন না লুকাস-গির্ল। মিসেস বেনেটের গোমরা মুখ আর কটু মন্তব্য সত্ত্বেও আগের চেয়ে ঢের বেশী হাস্যোক্তি লংবোর্ণে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন শুধু বলতে যে, খুব খুশী হয়েছেন তিনি এ বিয়েতে।

এলিজাবেথ আর শাল’টির মধ্যেও কেমন একটা সংকোচের পর্দা নেমে এল যার ফলে দু’জনেই এ সম্বন্ধে দীর্ঘ রইল।

কিছু না হলে বোন কেন দাদার স্বাধীনতায় বাধা দেবে? বিংশে যদি আমার প্রতি অনুরাগীই হয় তার নিশ্চয়ই বিচ্ছেদ ঘটতে চেষ্টা করবে না। করলেও সফল হবে না। এই রকম একটা সম্পর্কের কথা কল্পনা করেই তুই সবার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করছিস আর আমাকেও অত্যন্ত অসুখী করে তুলেছিস। এই রকম ভাবে আমাকে দুঃখ দিস নে। ভুল হয়েছে আমার, স্বীকার করতে একটুও লজ্জিত নই আমি। বরং তার সম্বন্ধে, তার বোনদের সম্বন্ধে খাবাপ ধারণা পোষণ করার তুলনায় এ অতি তুচ্ছ। প্রসন্ন চিত্তেই এটাকে গ্রহণ করতে চাই আমি—ঠিক যে ভাবে বোঝা যায়।’

এ ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করতে পারলে না এলিজাবেথ। এর পর থেকে বিংশের নাম কদাচিৎ উচ্চারিত হোত হ’জনের মধ্যে।

মিসেস্ বেনেটের এখনও বিশ্বাসের ঘোর কাটেনি। বিংশের ফিরে না আসার জন্য এখনও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। এমন এক দিনও যায় না যেদিন না এলিজাবেথকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হয়। মেয়ে নিজের যা বিশ্বাস করে না, তাই বিশ্বাস করাতে চায় মাকে অর্থাৎ জেনের প্রতি বিংশের অসুযোগ সাময়িক এবং অসম্মতের সঙ্গে-সঙ্গে তা স্থিমিত হয়ে এসেছে। এ সম্ভাবনার কথা মেনে নিলেও বারে বারে এ কথা বোঝাতে হয় তাকে। মিসেস্ বেনেটের একমাত্র আশা, বিংশে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে গ্রীষ্মে।

মিঃ বেনেট কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে বিচার করেছেন সমগ্র ব্যাপারটাকে। এক দিন এলিজাবেথকে ডেকে বললেন তিনি—‘দিদিটি তোমার দেখছি ভীষণ প্রেমে পড়েছে। আমার অভিনন্দন তাকে। বিংশের আগে মেয়েরা প্রেমে পড়তে চায়—এতে বাস্তবী-মহলে খাতির বাড়ে এবং তা নিয়ে চিন্তার জাবর কাটা যায়। তোমার পালা কবে? জেন তোমাকে টেকা দিয়ে যাবে বেশী দিন এ হতেই পারে না। এবার তোমার পালা। মেরীটনে অনেক অফিসার আছে যারা এখানকার সব মেয়েদের হতাশ করতে পারে। উইকহাম তোমার পছন্দ হোক। বেশ ছেলে—তোমার সঙ্গে ভাল রেখে চলতে পারবে।’

—‘জেনের মত বড় আশা সবার করলে চলবে কেন? উইকহামের চেয়ে খারাপেও চলতে পারে আমার।’

—‘তা সত্যি। তবে এটা সুখের কথা যে, তোমাদের এমন স্নেহময়ী মা আছেন যিনি তাই নিয়েই চূড়ান্ত করে ছাড়বেন।’

যে বিষয় আবহাওয়া লংবোর্ণ-পরিবারের আকাশ গুমোট করেছিল উইকহামের উপস্থিতিতে তার অনেকখানি অপস্থত হোল। প্রায়ই দেখা হয় তার সঙ্গে। তার সম্বন্ধে এলিজাবেথ যা শুনেছিল, ডার্সিদের সম্পত্তিতে অধিকার এবং ডার্সির নিকট হতে যে অজ্ঞায় ব্যবহার পেয়েছে সে—এখন তা সকলেই জেনে ফেলেছে। সকলের মধ্যেই তা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। প্রত্যেকেই খুশী হয়েছে—কারণ এ সব জানার আগে থেকেই লোকটাকে কেউ পছন্দ করত না।

একমাত্র জেনের ধারণা, সব কিছুই অন্তরালে এমন একটা অপরাধ-মূলক কিছু আছে যা অজ্ঞাত হার্টফোর্ডশায়ারের সমাজে। জেনের এমন নবম শ্রদ্ধা স্বভাব যে, সব সময়ই তার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। কিন্তু অন্য সকলের চোখে ডার্সি জঘন্য চরিত্রের লোক বলে নিশ্চিত হতে লাগল।

## পঁচিশ

আর এক সপ্তাহ প্রেম-নিবেদন ও সুখ-সৌধ রচনার পর কলিন্সকে ছেড়ে যেতে হোল প্রিয় শালটির স্নেহপাশ ছিন্ন করে। শনিবার আগত। এই বিচ্ছেদ-বেদনার লাঘব হোল যা হোক নববধূকে অভ্যর্থনা-আয়োজনের প্রস্তুতিতে। এ আশা সে নিঃসন্দেহ করতে পারে যে, কয়েক দিন পরে হার্টফোর্ডশায়ারে ফিরে এলেই সেই শুভ-দিন নির্ধারিত হবে যা তার জীবনকে সুখময় করে তুলবে। আগেব মতই ভদ্রতার সহিত বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিলে কলিন্স—স্বন্দরী বোনদের সুখ ও স্বাস্থ্য কামনা করলে এবং কাকাকে পর লেখার প্রতিশ্রুতি দিলে।

পরদিন সোমবারে মিসেস্ বেনেটের ভাই ও ভাজ ক্রিষ্টমাস কাটাতে এসে উপস্থিত হলেন লংবোর্ণে।

মিসেস্ গার্ডিনার এসে প্রথমেই উপহারগুলি বন্টন করলেন এবং সহরের হাল-ফ্যাশানের ফিরিস্তি দিলেন। তাঁর বলার পালা শেষ হলে শোনার পালা পড়ল। বেনেট-গিল্লী ভাজের কাছে অনেক দুঃখের কাহিনী বিবৃত করলেন—অসুযোগ কবলেন অনেক। শেষ দেখা-শুনার পর কত দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে তাঁর উপর দিয়ে। দু’মেয়ের বিয়ে হতে-হতে ভেঙ্গে গেছে। তিনি বললেন—‘জেনকে আমি পোষ দিই না। হলে সে বিংশকে বিয়ে করতই। কিন্তু লিজির কথা আর কি বলব? এত দিনে সে কলিন্সের বৌ হতে পারত—নিজের একগুয়েমিপনার জন্য সব মাটি করলে। এই ঘরে বসেই কলিন্স বিয়ের প্রস্তাব কবেছিল কিন্তু সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তার ফল হোল এই যে, মিসেস্ লুকাস আমার আগে তার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। আর লংবোর্ণের সম্পত্তি আগের মতই অনিশ্চিত হয়ে রইল। লুকাসরা খুব শেয়ানা। সব সময় গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। এ সব কথা বলা ঠিক নয় জানি। সংসারে প্রতিপদে যা গেয়ে-খেয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি নিজের উপর আর চারি ধারে এমন সব প্রতিবেশীরা জুটেছে যারা নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। যাক, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়ায় মনে একটু ভরসা পাচ্ছি।’

জেন আর এলিজাবেথের সঙ্গে পত্র মারফৎ মিসেস্ গার্ডিনার জেনেছেন সব কথা। ননদের কথার তিনি জবাব দিলেন খুব কমই। ভাগ্নীদের প্রতি মমতা বশতঃ তিনি কথাবাতার মোড় ঘোরাগেই ভিন্ন দিকে।

পরে এলিজাবেথকে একলা পেয়ে এ-সম্বন্ধে আলোচনা করলেন থুঁটনাটি। ‘জেনের পক্ষে বিয়েটা খুবই বাস্তবীয় ছিল’—বললেন তিনি—‘দুঃখের কথা, ভেঙ্গে গেল শেষ পর্যন্ত। অবশ্য এমনটা হামেশাই। তোমার বর্ণনা মতে বিংশের মত ছেলেরা চট করে স্বন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে, কয়েক সপ্তাহ চলে মন-দেওয়া-নেওয়া তার পর ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদ ঘটলেই সহজেই বিখ্যত হয় প্রেমিকের কথা। এমন অবিস্মৃয়কারিতা আকচাঁর ঘটছে।’

—‘সামান্য পাওয়ার পক্ষে চমৎকার যুক্তি। কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হব না। কয়েক দিন আগে প্রেমে ভয়ংকর মজেছিল যে স্বামী আত্মনির্ভরশীল যুবক, সে বন্ধুদের প্ররোচনায় আর ঘৃণাকরও কথা মনে স্থান দেবে না এ রকম ঘটে না।’

—‘ভয়ংকর ভালবাসা এমন একঘেয়ে, সংশয়পূর্ণ, অনিশ্চিত ব্যাপার যে, এর থেকে কোন ধারণাই করা যায় না। আধ ঘণ্টার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি প্রকৃত দুর্নিবার আকর্ষণের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। বলি, তুমি বিংলের ভালবাসা কেমনতর ভীষণ ভালবাসা?’

—‘এ রকম অমুরাগ আমি কখনো দেখিনি। জেনের প্রতি ভালবাসায় যেমন আত্মনিমগ্ন, অস্ত্র মেয়েদের প্রতি তেমনি মমতাহীন ঔদাসীন্ধ্য।’

—‘হৃভাগ্য জেনের। ওর মত সহজ মনের মেয়ে—ওর জন্য দুঃখ হয়। চট করে ও মন থেকে এ মুছে ফেলতে পারবে না। বরং, ওকে কি বুঝিয়ে আমাদের সঙ্গে লগুনে আনা যায় না? স্থান পরিবর্তনে মনের ভার লাঘব হতে পারে। তাছাড়া বাড়ীর বাইরে যাওয়া এমনতেই মনের পক্ষে উপকারী।’

এ প্রস্তাবে এলিজাবেথ অত্যন্ত প্লীত হোল। জেনও এ প্রস্তাবে যে সহজে রাজী হবে সে-সম্বন্ধে তার একটুও সন্দেহ নেই।

—‘তবে বিংলে ওখানে আছে বলে অস্বীকার করবে না তো? আমরা সহরের আর এক প্রান্তে থাকি—আমাদের সম্বন্ধ সম্পর্কের সহিত মিল নেই। আর জান তো, আমরা এত কম বাড়ী থেকে বের হই যে, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াই অসম্ভব। অবশ্য বিংলে যদি আসেন তো সে আলাদা কথা।’

—‘কিন্তু তা একেবারে অসম্ভব। সে এখন তার বন্ধুদের হোফাজতে। ডার্সি তো কিছুতেই তাকে ঐ রকম জায়গায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে দেবে না। এ রকম কথা ভাবেন কি করে? ডার্সি হয়ত গ্রেসচার্চ স্ট্রীটের নাম শুনে থাকতে পারে, কিন্তু এ রকম স্থানে পদার্পণ করলে এক মাস তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এর ময়লা থেকে নিজেকে পরিষ্কার করতে। বিংলে তো তাকে ছেড়ে এক পাও নড়ে না।’

—‘তাহলে তো আরো ভাল কথা। ওদের সঙ্গে দেখাই হবে না। কিন্তু জেন কি তার বোনকে চিঠি লেখে না? সে হয়ত দেখা করতে আসতে পারে।’

—‘সে তো সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করতে পারলেই বাঁচে।’ এ-সম্বন্ধে এলিজাবেথের সুসংবদ্ধ ধারণা সত্ত্বেও এবং জেনের সঙ্গে বিংলেকে

যে দেখা করতে দেওয়া হবে না মেনে নিলেও এলিজাবেথের মনের উপাস্ত্রে কেমন একটা ক্ষীণ আশা উঁকি মারতে লাগল যে, দেখা হওয়াটা একেবারে অসম্ভব না-ও হতে পারে। হয়ত সম্ভবই—এক-এক সময় তাই মনে হতে লাগল। হয়ত ভালবাসা আবার নতুন করে উদ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে—জেনের প্রতি স্বাভাবিক অমুরাগ হয়ত পরাভূত করতে সক্ষম হবে বন্ধুদের অভাবকে।

মিসেস্ বেনেট সানন্দে গ্রহণ করলেন ভাজের আমন্ত্রণ।

গার্ডিনার এক সপ্তাহ লংবোর্থে ছিলেন এবং এমন এক দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন না তাঁরা হয় লুকাস, নয় ত ফিলিপস, নয় ত বা অফিসারদের সঙ্গে খানা খেয়েছেন। বাড়ীতে যখনই ভোজের ব্যবস্থা হোত হুঁ-চার জন অফিসার আসতই আর উইকহাম নিশ্চিত উপস্থিত থাকত সে ভোজ-সভায়। উইকহামের সঙ্গে এলিজাবেথের গভীর ঘনিষ্ঠতা মিসেস্ গার্ডিনারের মনে কেমন একটা সন্দেহের রেখাপাত করল। তিনি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেন হুঁজনকে। তাদের মধ্যে গভীর ভালবাসা দানা বেঁধে উঠছে মনে লা করলেও তাদের পরস্পরের প্রতি আত্মরক্ষা এতই স্পষ্ট যে, তিনি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হার্টফোর্ডশায়ার ত্যাগ করার আগে এ-সম্বন্ধে এলিজাবেথের সঙ্গে কথা বলতেই হবে এবং এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত সতর্ক করে দেবেন তাকে।

দশ বছর আগে—তখন তাঁর বিয়ে হয়নি—মিসেস্ গার্ডিনার কিছু কাল ডার্বিশায়ারে যে অংশে ছিলেন সেখানে উইকহামরাও থাকত। কাজেই হুঁজনের পরিচিত এমন অনেক লোক আছেন সেখানে। পাঁচ বছর আগে ডার্সির বাবার মৃত্যুর পর যদিও উইকহাম কমই গেছে সেখানে, তাহলেও তারা হুঁজনেই প্রায় সকলকে চেনে।

মিসেস্ গার্ডিনার পেয়ার্লিতে ছিলেন—স্বর্গত ডার্সিকেও চিনতেন ভাল ভাবেই। কাজেই এক দক্ষা আলোচনা হোল তাঁকে ঘিরে। উইকহাম য-যা বলল নিজের জানার সঙ্গে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিতে লাগলেন তিনি। বর্তমান ডার্সির ব্যবহারের কথা জানান হোল তাকে। তাঁর মনে পড়ল যে, ছেলেবেলায় অহংকারী রুক্ষ ছেলে বলে ডার্সির বদনাম ছিল।

[ক্রমশঃ।

অমুবাদক—শিশির সেনগুপ্ত ও জয়সুকুমার ভাদুড়ী।

## চোর ধরার ফন্দী

(সত্য ঘটনা)

সৈনিকদের তাঁবু। ব্রিটিশ অফিসার আর ভারতীয় সৈনিক, সর্বসমেত আট জন আছে তাঁবুতে। এক রাতে এক সৈনিকের একটি সোঁখীন ঝুলি চুরি হয়ে গেল বোমালুম। অনেক খোঁজা-খুঁজির পরেও পাওয়া যায় না। এমন সময় ব্রিটিশ অফিসার অনন্তোপায় হয়ে অধিকা দাস নামে কোজাটোলির বিখ্যাত চোর-ধরাকে ডাকতে পাঠালেন।

অধিকা সাত জন সৈনিককেই কতকগুলি গতানুগতিক প্রশ্ন ক’রে অবশেষে বললে,—‘আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি একটি লাঠি দিচ্ছি, যেগুলির প্রত্যেকটি সাত ইঞ্চি লম্বা। লাঠিগুলোকে তোমরা এক রাত্রি বালিসের তলায় রেখে দেবে। সকালে এসে

আমি দেখবো লাঠিগুলোকে। আর, তোমাদের মধ্যে যে চুরি ক’রেছে দেখতে পাবে, তার লাঠি হুঁইঞ্চি বেড়ে গেছে।

অফিসার এই কৌশলে তত আত্মবান নয়। হেসেই প্রায় উড়িয়ে দিলেন অধিকার কথা শুনে। কিন্তু অধিকা বললে,—‘দেখোই না সাহেব, কি হয়।’

পরদিন সকালে অধিকা দেখলো, হুঁজনের লাঠি সাত ইঞ্চিই আছে। তাদের মধ্যে যে সত্যিকার চোর তার লাঠি হুঁ ইঞ্চি কম গেছে। ধরা পড়ার ভয়ে চোরটি রাত্রি বেলায় লাঠিটি ভেঙ্গে হুঁইঞ্চি কমিয়ে রেখেছিল। অধিকা চোরকে ধবে ফেললে তৎক্ষণাৎ অফিসার তো তখন হতবাক।



# আমাদের পল্লীকাব্যে বর্ষা

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আমাদের পল্লীকাব্যে বর্ষা-বর্ণনা সম্পর্কে কিছু বলিবার আগে

পল্লীকবিদের প্রকৃতি-বর্ণনা বিষয়ে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বাংলার পল্লীগাথা বা কাব্যগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পল্লীকবিগণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতি বর্ণনা না করিয়া অধিকাংশ স্থলেই প্রসঙ্গক্রমে উহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কারণ এই নয় যে, প্রকৃতিকে তাঁহারা জড় পদার্থ মনে করিতেন এবং মানব-চিন্তের উপর উহার কোনই প্রভাব অনুভব করিতেন না। প্রকৃতি যে তাঁহাদের নিকট কোন স্বাতন্ত্র্য দাবী করে নাই, তাহার মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের নিবিড় যোগ, সামাজিকতা ও আত্মীয়তা-বোধ। আমরা পল্লীগাথাগুলিতে এক বৃহত্তর পল্লীসমাজের সম্মুখীন হই। এই সমাজ গুপ্ত স্বজাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে লইয়া নয়, মানুষের চতুর্পার্শ্ব বিশাল প্রকৃতি-জগৎ—সমস্ত জল-স্থল, আকাশ, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুল, পশুপক্ষী ও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এখানে পল্লীকবিদের সৃষ্টি, স্বচ্ছ ও আন্তরিক দৃষ্টির কাছে প্রকৃতির ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন পদার্থই জড় বা নিরর্থক ঠেকে নাই; সকলই গভীর অর্থপূর্ণ হইয়া মানুষের চিন্তা, চেষ্টা ও আনন্দ-বেদনার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে এবং গ্রামের উৎসব-ব্যসনে, সামাজিক আচার-বিচারে নিজেদের স্থান করিয়া লইয়াছে। তাই স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতির বর্ণনা পল্লীকবিরা আবশ্যক মনে করেন নাই; পক্ষান্তরে সংসার-সমাজের স্বপ্নই কোন কথা-কাহিনী তাঁহারা বিবৃত করিয়াছেন, তখনই আপনা হইতেই সে কথা-কাহিনীর মধ্যে উহাদের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই প্রকৃতি-রাজ্যের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ, প্রকৃতিতে ও মানুষে যে যথার্থ জাতিভেদ নাই, উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী-চলাচলের যোগ আছে, একে যে অস্ত্রের উপর নিগূঢ় প্রভাব বিস্তার করে, তাহা পল্লীকবিদের অনেক কাব্যেরই একটি বিশিষ্ট ও স্থলপট স্বর।\*

ইহাদের বর্ষা-বর্ণনার মধ্যেও আমরা প্রায়ই ইহার পরিচয় পাই। বাংলার মাটিতে বর্ষার আগমন-নির্গমন ও স্থিতিকাল সম্পর্কে শুল্কর একটি লোকবচন প্রচলিত আছে :—

“আগাড়ে উৎপত্তি  
শ্রাবণে যুবতী  
ভাদ্রে পোয়াতি,  
আশ্বিনে বুড়া  
কার্তিকে দেয় উড়া।”

এই বচনটিতে আমরা মোটামুটি বরষে বর্ষার জীবনের আদ্যন্ত স্তরগুলি দেখিতে পাই; পল্লীবাসীদের বহু বৎসরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কোনও কবি যে ইহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণতঃ ছয় ঋতুতে বৎসর ধরিয়া আষাঢ়-শ্রাবণ এই দুই মাসকে বর্ষাকাল বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা কি দেখিতে পাই? বাংলা দেশে বর্ষা প্রায় পুরা চারটি মাস স্থায়ী হয়, তবে এক-এক মাসে উহা এক-এক মূর্তিতে দেখা দেয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে দুই-এক পসলা ভারি বৃষ্টি হইলেও প্রকৃত বর্ষা আরম্ভ হয়

আষাঢ় হইতেই। আমরা শহরবাসীরা আষাঢ়ের প্রথম দিবসেই নব বর্ষাকে অভিনন্দন জানাই, ‘বর্ষামঙ্গল’ উৎসব করি। বহু শত বৎসর পূর্বেও বাংলা হইতে বহু দূরে রামগিরি পর্বতে এক যক্ষ ‘আষাঢ় প্রথম দিবসে’ নূতন বর্ষার আগমনে প্রিয়া-বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রাবণে বর্ষার এক চর্যার গতিবেগ ও যৌবন-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় :—‘পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা।’ ভাদ্রে আবার এই উন্নততা থাকে না, উহা এক শান্ত-সৌম্য মূর্তিতে দেখা দেয়, সর্বক্ষে তাহার পরিপূর্ণতার মন্থরতা। আশ্বিনে নদীনালায় ভাঁটা পড়িতে থাকে, প্রবল বারিপাত কদাচিৎ দেখা যায়। কার্তিকে দুই-এক দিন বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাহাকে আর কেহ বাদল-ধারা বলে না। পল্লীকবি পূর্বোক্ত বচনটির ভিতর দিয়া নারী-জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া কত সহজে কত অল্প কথায় বর্ষার সমগ্র জীবন-আলেখ্যটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন!

অতঃপর আমরা মৈমনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গ-গীতিকা প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী-গীতিকা অনুসরণ করিয়া পল্লীকবিদের বর্ষা-বর্ণনা সম্পর্কে আলোচনা করিব। প্রথমে বলিব বর্ষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কথা।

উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি বর্ষাকে ধরাতলে রাজার বেশে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছেন; জলকণবর্ষা জলধর ইহার (বর্ষারূপী রাজার) মন্তমাতঙ্গ, তড়িলাতা বিজয়-পতাকা এবং গুরুগম্ভীর বজ্রনাদ মাদল (রাজার আগমন-ঘোষী বাজয়ন্ত)।

“স-শীকরাশোভাধরমন্তকুঞ্জরন্তড়িৎপতাকাশনিশব্দমদর্শঃ।

সমাগতো রাজবহুত্বতদ্যুতির্থনাগমঃ কামিজনিপ্রিয়ঃ প্রিয়ে।”

পল্লীকবিরাও মানুষের নানা মূর্তিতে বর্ষাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কখনো সে আসিয়াছে সোনার ঝারি হাতে সজীবনী মূর্তিতে, কখনো বা আসিয়াছে পসারিধীরূপে জলের পসরা মাথাতে, কখনো বা আসিয়াছে রাজার বেশে,—সঙ্গে রাণী তাহার কলসী কাঁখে। এক জন কবি লিখিয়াছেন :—

হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নামি আসে।  
নবীন রয়সা জলে বসুমাতা ভাসে।  
সজীবন সুখাশি কে দিল ঢালিয়া।  
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া।  
শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।  
বাগিচা করিতে ছুটে সাধুর তরণী।

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, অবিরাম বৃষ্টি পড়িতেছে। কবির মনে হইল,—নিবিড়কুমুদা বর্ষা যেন সোনার ঝারি হস্তে চতুর্দিকে জলসিক্কন করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছে। সে জলের অদ্ভুত সজীবনী শক্তি! এত দিনের মৃতপ্রায় তরুলতা মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিয়াছে। নদী-নালা কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে জলের উপর দিয়া পণ্যভরা সাধুর নৌকা উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

আর এক জন কবি বর্ষা-সমাগমে আনন্দ-বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া বলিতেছেন :—

হায় তারিয়া নাইবারে ভাই দেখ জ্যৈষ্ঠ মাস গেল।  
জলের বৈবন লইয়া আষাঢ় মাস আইল।  
কাঁখে কলসী মেঘের রাণী ফিরন পাড়াপাড়া।  
আশমানে ঝাড়ইয়া জমিনে ঢালে ধারা।

\* বর্তমান লেখকের ‘পালাগানে মানুষ ও প্রকৃতি’—বিচিত্রা,

সায়র হায়র নদীয়ে করে কল কল ।  
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের জল ।  
ডোবা ডেঙ্গরা বাহিয়া মুলুক হইল তল ।  
আখাটিয়া নয় পানি হইয়াছে পাগল ।  
কোথা হইতে আইসেবে ঢেউ ফেনা মুখে লইয়া ।  
সাধুর তরণী যায় পাল উড়াইয়া ।

যৌবন-মদে মত্ত বর্ষা তাহার মেঘ-রাণীকে সঙ্গে করিয়া লোকালয়ে নামিয়া আসিয়াছে । সেই রাণী যেন কাঁখে কলসী লইয়া পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আকাশে পাড়াইয়া উচ্চ হইতে নিম্নে সর্বত্র জল ঢালিয়া দিতেছে । সে-জলের ধারায় সাগর-হাওর, নদী-নালা, খানা-ডোবা একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । কবি ভাবিয়া কুল পাঠিতেছেন না,—এত জল কোথায় ছিল,—সহসা কোথা হইতে আসিয়া এমন পাগলের মতো সব একাকার করিয়া দিল !

আর এক জন কবি বর্ষাকে জল-পসারিণীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন :—

“শ্রাবণ আসিল মাখে জলের পসরা ।  
পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা ।  
জলেতে কমল ফুটে আর নদীকুল ।  
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ।  
দিন রাত্তি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি ।  
কুল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি ।  
খাউরি বিউনি করে যত ডুমের নারী  
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ।”

শ্রাবণ যেন জলের পসরা মাখায় করিয়া মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে এবং সেই পসরা হইতে সর্বত্র জল ছড়াইয়া চলিয়াছে । এই জল-ধাবার কি দুর্বার শক্তি ! \* \* \* এই সময়টায় যেমন বড় বড় সওদাগরেরা বাণিজ্যে বাহির হয়, তেমনি ভূম, বেদে প্রভৃতি সম্প্রদায়ও নিজেরদের তৈয়ারী খাউরি বিউনি লইয়া নদী-পথে দেশ-বিদেশে যায় । কবির দৃষ্টি কিছুই এড়ায় নাই ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তো একেবারে বর্ষার কবিই বলা যাইতে পারে ! কত রূপে কত ভাবে যে তিনি বর্ষাকে দেখিয়াছেন, চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার অস্ত্র নাই । পল্লীকবিদের উপরি-উক্ত বর্ষা-মূর্তিগুলির সঙ্গে বিশ্বকবির দুই-একটি মূর্তির তুলনা করিলে হয়তো ধুঁটতা হইবে না । তিনি বর্ষাকে কখনো প্রাসাদের শিখরে নীলবাস-পরিহিতা এলোকেশী মূর্তিতে দেখিয়াছেন :

“ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে  
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে  
কবরী এলায়ে ?  
ওগো নববন—নীলবাসখানি  
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?”

কখনো বা বলিয়াছেন :—

“আজি আসিয়াছে ভুবন ভরিয়া,  
গগনে ছড়িয়ে এলোচুল ;  
চরণে জড়াবে বনকুল ।”

কখনো বা দেখিয়াছেন :

“ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব চরণে  
জলসিক্ত ক্ষিতি দৌরভ-বভসে  
ঘনগোঁরবে নবযৌবনা বরষা,  
শ্রামগন্তীর সরসা ।”

কবিগুরুর অনন্ত অনবজ দানের কণিকা মাত্রই এখানে যথেষ্ট । এইবার আমরা ময়মনসিংহের ৮৮৮কুমার দে সংগৃহীত এবং সৌরভের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবি নয়ানচাঁদের বর্ষা-বর্ণনার (ভাজ বর্ণনার) আর একটি চিত্র এখানে পরিবেশন করিব । ইহা গ্রাম্যভাষায় রচিত হইলেও ভাব-সমৃদ্ধ এবং ভাস্কর্য্যের বর্ষার একটা পরিপূর্ণ রূপ হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

“আধলা গাধলা দিন করেছে ভাস্কর্য্যের রাতি ।  
ঘরের কোণে কুলেব বউ জালিয়া দিছে বাতি ।  
বেঙ ডাকিছে ঘন ঘন কচুবনের মাঝে ।  
ভরা গাঙে ঢেউ ছুটেছে আকাশ ভরা সাজে ।  
নদী-নালায় জল ধরে না পান্দী ভাসে স্নাতে ।  
গাঙের তলায় মাণিক জালায় ভাস্কর্য্যের চান্নি রাতে ।  
ভোর গিয়াছে কমলবনে আনতে ফুলের মধু ।  
ফুলের কানে গুণগুণিয়ে গাইছে ভ্রমর-বঁধু ।  
সোনা-রূপার মেঘের পাহাড় কাঁদিয়ে থাকে ছল ।  
বন-বাদরে ফুটেছে হাসি ধরকে জিয়ার ফুল ।”

ভাস্কর্য্যের বাদল রাত্রি, পথ-ঘাট জনহীন । কুলবধূর কুটারে-কুটারে সন্ধ্যাদীপ জ্বলাইয়া দিয়াছে, কচুবন হইতে ভেকের উল্লাস-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, নদী-নালায় জল ধরে না, তাহাদের বৃকে ঢেউয়ের লাফালাফি, উপরে আকাশে মেঘের ছুটাছুটি, ভরা নদীতে স্রবমা পানসীর অগ্রগতি,—সকলে মিলিয়া এক অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে । এখানেই শেষ নয়, ভাস্কর্য্যের জ্যোৎস্না-রাত্রিতে নদীতল পর্য্যন্ত দেখা যায়, তারায় ভরা আকাশ তাহার বৃকে প্রতিফলিত হয়, যেন লক্ষ মাণিক জালিয়া উঠে । রাত্রিশেষে ভোর আসে, সঙ্গে আসে কমল, কমলের মধু ; কমল-বনে উঠে অলির গুঞ্জন, কমলে অলিতে হয় প্রেমালাপন । অরুণের কিরণ পড়ে মেঘের গায়, সৃষ্টি হয়—সোনা-রূপার পাহাড়, অরুণের কিরণ পড়ে বনে-উপবনে, হাসে তরুলতা, হাসে জিয়ার ফুল ।

প্রথমেই বলিয়াছি, পল্লীকবির স্বতন্ত্র ভাবে প্রকৃতি-বর্ণনা না করিয়া অল্প কথা-কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপেই উহার বর্ণনা করিয়াছেন । বর্ষার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-বিশয়ক পূর্বোদ্ধৃতিগুলিও তাহাই । বর্ষা শুধু-শুধু আসে না,—মানব-চিত্তে নানা আবেদন লইয়া সে উপস্থিত হয় । আমরা এইবার সেইগুলিরই আলোচনা করিব ।

বাদল-ধারা অনেক সময় মানুষকে অজ্ঞানতা করিয়া দেয়, বিরহীর বিরহ-বেদনা তীব্রতর করিয়া তোলে । তখন মানুষের মনে কেমন যেন একটা উদাস ভাব বিরাজ করে, কোন কার্য্যে তাহার মন বসে না । কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এক বর্ষা-দিনের তাহার মনের অবস্থা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :

“চেয়ে আছি শৃঙ্গপানে, কোন কান্ধ হাতে নাই  
কোন কান্ধে নাহি বসে মন ;  
তন্ত্রা আছে, নিজা নাই ; দেহ আছে, মন নাই  
ধরা যেন অক্ষুট স্বপন !”

ছেলে-ভুলানো ছড়ায়ও আমবা একটি পল্লী-বালিকার এই  
উদাস ভাবটি লক্ষ্য করি :—

“ও পারেতে কালো রং  
বুড়ি পড়ে রম্ রম্,  
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে।  
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে।”

বাসল-দিনে যখন চারি দিক কালো হইয়া আসে, রম্-রম্ বুড়ি  
পড়িতে থাকে, আকাশে গায় থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ চমকায়,  
গুরু-গুরু মেঘ ডাকে, বনে-উপবনে এলোমেলো বাতাস বয়, তখন  
চিন্তা স্বভাবতই কেমন যেন হইয়া উঠে, কি যেন সে চায়। প্রিয়-  
পরিজন কাছে থাকিলে অনেক সময় সে গল্প করে ; যুক্তিহীন সে-  
গল্প। কবিশুদ্ধ বলিয়াছেন :—

“এমন দিনে তারে বলা যায়,  
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।”

মহাকবি কালিদাস এই বর্ষাকালকে ‘কামিজ্ঞপ্রিয়’, ‘কামিনী  
চিন্তাহারী’ বলিয়াছেন। এই সময়ে পুরুষ-নারী উভয়েই চায়  
তাহাদের প্রিয়তম-প্রিয়তমার সান্নিধ্য। তখন অতি মানিনীর মানও  
অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় ; সাজ-সজ্জায় তাহার প্রিয়তমকে  
ভুলাইতে চায়। রাজসভাব কবির দৃষ্টি যেমন এই দৃশ্য এড়ায়  
নাই, পল্লীকবির দৃষ্টিতেও তাহা ধরা পড়িয়াছে :—

“আইল আইল শাওন মাসের ঘন বরিষণ।  
দেওয়ার গজ্জন শুষ্ঠা কাঁপে নারীর মন।  
উলকিয়া ফিনকি ঠাড়া আশমান ভাইরা পড়ে  
চমকাইয়া বেসুরা নারী আপন স্বামী ধরে।  
গলায় সাফলাব মালা আর শীতল পাটি।  
ভালত বিছাইয়া শয্যা করি পরিপাটি।  
বিভোলা বন্ধেরে লইয়া ঘুমে অচেতন।  
এই কালে মলয়ার দুঃখ নিবারণ।”

অভিमानে যে নারী স্বামী হইতে মুগ্ধ ফিরাইয়া আছে (বেসুরা),  
আকাশভঙ্গী বজ্রনাদে ভীত হইয়া সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরে ;  
যথাসাধ্য সাজসজ্জা করিয়া প্রাণপ্রিয়র সঙ্গে রজনী অতিবাহিত করে।  
কিন্তু প্রিয়তম বাহার ঘরে নাই, কিংবা প্রবাসে আছে যে, বর্ষাকালে  
তাহার বিরহ-বেদনার শেষ কোথায় ?

“কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।  
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আশমানে ভাসে।  
গুরু গুরু দেওয়ার ডাকে জিকি ঠাড়া পড়ে।  
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়া মরে।”

বর্ষারস্ত্রে কুড়াপাখীর (ডাঙ্ক-ডাঙ্কী ?) ডাকে পল্লীর মাঠ-ঘাট,  
‘বিল-বিল, কোপ-ঝড় মুখরিত হইয়া উঠে, আকাশে কাল মেঘ ভাসিয়া

বেড়ায়, জমির উপর তাহার ছায়া পড়ে, মেঘের গুরু-গুরু শব্দে  
চারি দিক প্রকম্পিত হইতে থাকে, বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র পড়ে, বুড়ি  
বরে। বর্ষার সুন্দর একটি দৃশ্য। কিন্তু এই দৃশ্য যে-মানের পূত্র  
বিদেশে—তাহার মনে কি ভাব জাগাইয়া তোলে ? তিনি একটা  
দারুণ অন্তর্ধাতনায় অস্থির হইয়া পড়েন।

প্রিয়-বিরহিণীর অবস্থাটাও দেখুন :—

“আশমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছে তুমি কারে।  
এ না আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে।  
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।  
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি।”

ওগো মেঘ ! তুমি আকাশে থাকিয়া কাহাকে ডাকিতেছ ?  
তুমি কি আমার সেই নয়ন-ভুলানো জনের সন্ধান জান ? এই যে  
শত দিকে শত ধারায় আষাঢ়ের জল গড়াইয়া চলিয়াছে, পথ-প্রান্তর  
নদী-নালা প্রাবৃত হইয়া গিয়াছে। এমন রাত্রিতে সে কোথায় গেল ?  
পল্লীকবির অনাড়ম্বর ভাষায় বর্ষার আর একটি চিত্র। এ চিত্রও  
কাব্য-নায়িকা নীলার চিত্তে প্রিয়-বিরহ-বেদনা তীব্রতর করিয়া  
তুলিয়াছে।

“কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।

ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম।

কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।

লতায় পাতায় শোভে হীরামন হার।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।

ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা।”

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, গুরু-গুরু শব্দে মেদিনী কম্পিত হইতেছে,  
ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, ময়ূর-ময়ূরী উজ্জাসে নৃত্য করিতেছে,  
কদম্বের ডালে, লতায়-পাতায় কত রংএর ফুল ফুটিয়া আছে। কিন্তু  
এমন দিনে সেই প্রাণপ্রিয় কোথায়, তাহার বিরহে যে আমার  
সমস্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ! মনের এই আগুন তো প্রকাশ করা  
যায় না, তাই বিরহিণী ঘরের কোণে লুকাইয়া চোখের জল  
ফেলিতেছে !

বর্ষা-সমাগমে আর এক জন কাব্য-নায়িকার বিরহ-যন্ত্রণা কি  
করণ ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করিয়াছে !

“আষাঢ় মাসে ত গান্ধারে বহিছে উজানী।

শুকনা নদীতে আইল জোয়ারের পানি।

দেয়ার ডাকে ঘন ঘন মেঘে শীতল পানি।

পিয়াসে তাতিয়া মরি অবলা হুঙ্মিনী।

এই মেঘে নাইরে পানি আমার লাগিয়া।

অখ, খির পাতা ঢইল্যা পড়ে আসমান চাহিয়া।”

প্রিয় বাহার দূরে,—প্রবাসে, আষাঢ়ের জোয়ারের জলে তাহার কি  
হইবে ? সে জলে তো তাহার পিপাসা মিটে না ! আষাঢ়ের  
মেঘ তো তাহার জন্ত বারিবর্ষণ করে নাই ? তাহা হইলে যে  
প্রিয়তম তাহার কাছে আসিত ! আকাশের দিকে বুধাই চাহিয়া  
থাক। বিরহিণী শেষে মেঘকে ডাকিয়া শেষ কথা বলে :—

“শুন শুন বিঘোর দেওয়ারে ডাকে কাঁপে মাটি।

দিনে দিনে বৈবন-গঙ্গা ধরিলেক ভাটি।

কইও কইও মনের কথা প্রাণবদ্ধ করবে।

মরিল ছদ্মিণী কল্পা মরিল পরাণে।”

ওগো মেঘ, ওগো ভয়ঙ্করনাদী মেঘ! তোমার ডাকে তো মেদিনী কাঁপিতেছে! শোন! আমার যৌবন যে দিন-দিন নিঃশেষিত হইতে চলিল! তুমি বলিও, প্রাণবদ্ধকে কানে-কানে বলিও,—এ ছুঃখিনীর মরিতে আর বৈধী দিন বাকী নাই।

মহাকবি কালিদাসের যক্ষও এমনি এক আঘাটের দিনে তাহার বিরহ-ব্যথার কথা শ্রিয়াকে জানাইতে মেঘকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিল। পল্লী-নায়িকার ভাষা অমার্জিত হইলেও তাহারও বার্তাবহ আঘাটের মেঘ।

বাদল-ধারা যে শুধু মানুষকেই অশ্রুমনা করিয়া দেয়, তাহার বিরহ-বেদনা ভীততর করিয়া তোলে, তাহা নহে। প্রকৃতির আপন ঘরেও তখন যে একটা বিরহ-ব্যথার করুণ রাগিণী বন্ধুত হইয়া উঠে, পল্লীকবির দৃষ্টি তাহাও এড়ায় নাই। এই যে—

“শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসবা।

পাথর ভাসাইয়া বহে শাওনিয়া ধারা।”

তাহাতে চাতকের কি? পৃথিবী জলে জলময়, যেদিকে চোখ যায়—শুধু জল আর জল! কিন্তু চাতকের তাহাতে পিপাসা মিটে কই? আকর্ষণ পূর্ণ করিয়া তাহার জল পান হয় কই? তাই সে চারি দিকের পূর্ণতার মধ্যে চিত্তের অপূর্ণতা লইয়া থাকিয়া-থাকিয়া গাহিয়া উঠে :—

“রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।

না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর।”

এই বাদলের দিনেই আর একটা পাখী শ্রিয়া-বিরহ-বেদনার কাতর হইয়া “বউ কথা কও”, “বউ কথা কও” বলিয়া পথে-পথে কাঁদিয়া ফিরিতেছে। শ্রাবণের জল অবিশ্রান্ত ঝরিতেছে, মুহূর্ত্তে বাজ পড়িতেছে; কিন্তু পাখীটার সেদিকে লক্ষ্য নাই; দিন-রাত্রি একই ভাবে সে প্রাণপ্রিয়াকে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে! তবু ত তাহার মান ভাঙ্গে না, সে আসিয়া ধরা দেয় না! পাখীটার এই বিচ্ছেদ-যাতনা পল্লী-কাব্যের এক নায়িকা লীলা আপনার অন্তর্বেদনা দিয়া একান্ত ভাবে অনুভব করিতেছে,—নিজের দুঃখের সহিত পাখীর দুঃখের রূপটিকে এক করিয়া দেখিতেছে! পল্লীকবি রঘুব্রত ইহার এক অপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন :

“কোন বা বিরহী নারী হায় অভাগিনী।

অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী।

শাউনিয়া ধারা শিরে বস্ত্র ধরি মাথে

‘বউ কথা কও’ বলি কান্দি ফিরে পথে।

কাহারে স্নহও রে পাখী আমি নাহি জানি

আমিও তোমার মত চির বিরহিণী।”

আমরা দেখিলাম, বর্ষাকাল প্রবাসী এবং প্রোথিতভর্তৃক। উভয়েই সমান পীড়া দেয়। প্রাচীন এবং আধুনিক, পল্লীর এবং বাঙ্গালীর সকল কবিই এই বিষয়ে বলিয়াছেন বা ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু যে-সঙ্গে প্রবাসী বা প্রোথিতভর্তৃক প্রাণ নাই, স্বামি-স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে সংবৎসর একত্র থাকে, বর্ষাকাল যে তাহাদের সকলের পক্ষেই আনন্দদায়ক এবং পূর্ণ ভোগের কাল, তাহা তো

বলা যায় না। বিস্তারিত বাহারা, অষ্টপ্রহর তাহারা শ্রিয়-পরিজনের সঙ্গে একত্রে বাস করিয়াও কষ্ট ভোগ করে এবং তাহাদের সেকষ্টের মাত্রা চরমে উঠে এই বর্ষাকালে। পল্লীকবির দৃষ্টি শুধু বর্ষার সৌন্দর্য এবং মানুষের বিরহ-বেদনার প্রতিই আবদ্ধ থাকে নাই, পল্লীবাসী দরিদ্র দম্পতির অশেষ কষ্টের কথাও তাঁহারা ভাবিয়াছেন। লিখিয়াছেন :

“নাকের নথ বেচা মলুয়া আঘাট মাস খাইল।

গলায় যে মতির মালা তাও বেচা খাইল।

শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।

এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।”

বর্ষায় এই তো দরিদ্র-গৃহেব চিত্র। এ স্বলে মনে পড়ে দুঃখের কবি মুকুন্দরামের ফুল্লরার সেই বর্ষা-গীতি। মুকুন্দরাম একেবারে পল্লীকবি না হইলেও প্রথম জীবনে তিনি পল্লীর সুখ-দুঃখের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কালকেতুর উপাখ্যান পল্লীর দরিদ্র ঘরেরই ছবি।

“আঘাটে পূরিল মহী নব মেঘে জল।

বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সঞ্চল।

মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।

কিছু ক্ষুদ্র কুঁড়া মিলে উজর না পূবে।

\* \* \*

দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।

লব্ধ বৃষ্টি হইলে কুড়ায় (কুটারে) আইসে বান।”

বাংলার বৃকে বর্ষায় প্রায় প্রতি বৎসরই কোন না কোন অঞ্চলে বজ্রা হয়, লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি থাকে না। পল্লীকাব্যে তাহারও অসংখ্য বর্ণনা আছে।

“আইল আইশনানে পানি উত্তে করল তল।

ক্ষেত কিম্বা ডুবাইয়া দিল না রইল সঞ্চল।

দেশে আইল দুর্গাপূজা জগতজননী।

কোলের ছাল্যা বান্ধা দিয়া পুজে দুর্গারানী।

\* \* \*

মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে শিরে দিয়া হাত।

মারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।

টাকায় দেড় আড়া ধান পইড়াছে আকাল।

কি দিয়া পালিব মায়ে কোলের ছাওয়াল।”

দেশে জলপ্লাবন হওয়ায় তিন শত বৎসর পূর্বে টাকায় বখন একবার ছয় মণ ধান বিকাইতে লাগিল, লোক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—কি করিয়া ছেলপিলেকে বাঁচাইবে। আর আজ আমরা কোথায় আছি? দুঃখ-কষ্টের কথা আর নয়। বর্ষার আবও একটি দিক আছে।

বর্ষাকাল আর বাহার পক্ষে যাহাই হউক না কেন, সাধারণ বাঙ্গালীর ইহা অতি কাম্য কাল। বাঙ্গালীর ঘরে বর্ষা আসে নূতন আশার বাণী লইয়া; অনেক সঞ্চিত আশাও তাহার এই সময়ে পূর্ণ হয়। কিসের এ আশা? আশা অনেক কিছুই। বাংলা দেশ কৃষিপ্ৰধান দেশ, তত্‌পরি ইহা দেবমাতৃক। দেবতার অনুগ্রহে এখানে বর্ষাসময়ে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে

তাহার কৃষি-সম্পদ। বাংলাব প্রধান তিনটি ফসল—আউশ, পাট ও আমন। বর্ষাকালে পাট কাটা হয়, আউশ ঘবে উঠে এবং আমন বা বোবোব চাষা বোপণ করা হয়। তিনটিই নির্ভর করে বৎসর জলেব উপর। স্তম্ভটি হইবে,—এই আশাতেই বাংলাব কৃষক আশাচর প্রতীক্ষা করে, যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে তাহাব দেখ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, পাখালব মতো বলিয়া উঠে :—

“কানা মেঘাবে তুইন আমাব ভাট।

এক কৌটা পানি দে শাটলেব ভাট পাট।”

বাঙ্গালী কৃষকেব এটি সময় গৃহকোণে-মুখোমুখি বসিয়া আলাপ করিবাব নয়। মাঠে এক-এটি এক-বৃক জলে তখন তাহাব কণ্ঠক্ষেত্র। মা সম্বন্ধকে ঘন হইতে ডাকিয়া তালিন, জল-ঝড়ে ক্ষেত্রেব কাজেশ্বরেব বাহিব কবিয়া দেন :—

“মেঘ ডাকে বৃক গুরু ডাক্য তুলে পানি।

সকাল কটবা ক্ষেতে যাও আমাব বাত্মণি।

আশমান ছাইল কালা মেঘে দেওয়ায় ডাকে বইয়া।

আর কতকাল থাকবে বাহু ঘবেব মাঝে শুইয়া।”

বাংলা দেশ শুধু দেবমাতৃক নহে, উহা নদীমাতৃকও বটে। বর্ষাব জলে বাংলাব অসংখ্য নদী-নালা কানায়-কানায় ভরিয়া উঠে। সেই ভরা নদীব উপর দিয়া পাল খাটাইয়া চলে পণ্যভরা সাধুব তরণী। এক সময়ে এই নদী-পথেই বাংলাব তিন-চতুর্থাংশ ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইত। বাংলা দেশ ধনপতিব দেশ, চাঁদ সওদাগবেব চৌদ্ধ ডিগ্রাব দেশ। বর্ষাব আশায় বণিকেবা সর্বস্ব অপেক্ষা কবিত, বর্ষাব জলে তাহাদেব নৌকা ভাসাইত, দেশ-লিঙ্গদেশ বাণিজ্য কবিয়া লাভবান হইয়া ফিবিয়া আসিত। এখনো এ নদী-পথেব প্রয়োজন শেষ হয় নাই। পল্লী-কাব্যেব এখানে-ওখানে ব ও না এই বাণিজ্য-বাত্রাব বর্ণনা আছে।

“আটল আষাঢ় মাস লইয়া মেঘেব বাণী

নদী-নালা বাইয়া আটসে আষাঢ়িয়া পানি।

শুকনা নদীতে চেউয়ে তোলাপাড় কবে।

বাণিজ্য কবিতে সাধু যত বাহে দেশান্তবে।

পাল উড়ে পাল পড়ে বে উজান ভাসে নাইয়া।

কোনু বা দেশে যায় সাধু উজান নদী বাইয়া।”

শুধু বাণিজ্য নয়, বাঙ্গালীত তখন দেশে-বিদেশে যাতায়াতও ছিল জলপথে। কবে বর্ষাব জলে জলপথ স্তম্ভ হইবে, দূর্বল আত্মীয়-বান্ধবেব দেখা মিলিবে, প্রবাসী প্রিয়জন বাড়ী ফিবিবে, এই আশায় বাঙ্গালী দিন গণি ও।

“ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘবে বাপ আব ভাই।

আশায় বাঙ্কিয়া বৃক বজ্রনী গুয়াই।”

প্রবাসীবা অনেকেই তখন সাধু-সদাগবেব তরণী বাহিয়া দেশে

ফিবিত। প্রিয়া আশায় বৃক বাধিয়া থাকিত,—‘সাধুব তরণী বাহি বঁধু আটব দেশে।’ ভরা নদীতে ‘লিলুয়াবী বাতাসে’ পাল উড়াইয়া সোনার পানসী চলিত যাত্রী লইয়া।

কুড়াপাখী শিকার ছিল তখন বাঙ্গালীত একটা মস্ত আকর্ষণ। ভরা বর্ষায় যখন বিলে-ঝিলে, ঝোপে-ঝাড়ে কুড়াপাখী ডাকিয়া উঠিত, জল-বজ্র মাথায লইয়া বাঙ্গালী হইত ঘবেব বাহিব; পল্লী-কাব্যে কত না ইহাব বিবরণ ছড়াইয়া আছে। কুড়া শিকাব যে শুণ্ড একটা খেয়াল বা বিলাস ছিল তাহা নহে, অনেকে কুড়া শিকাব কবিয়া তাহাদেব অবস্থাবও পরিবর্তন সাধন কবিত।

“কুড়া শীগাব কবিয়া বিনোদ পাটল জমোন বাড়ী।

ইনাম বকশিস্ পাটল কত কইতে নাহি পাবি।

বাজ্যেব বাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে।

কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখা দিল তাবে।”

এত সব কাব্যেই পল্লীকবি লিখিয়াছেন,—“আটল আষাঢ় মাস লইয়া নব আশা।” কৃষক, বণিক, গৃহী, প্রবাসী, শিকারী কত জনেব কত আশা বর্ষাব অনুগ্রহে পূর্ণ হইবাব স্রবোগ উপস্থিত হয়!

বর্ষাব সরপ্রধান অন্তর্ধান মনসা পূজা। ধনি-দরিদ্রনির্নির্দেশে এক সময়ে বাঙ্গালীত ঘবে-ঘবে মহা সমারোহে এই পূজা সম্পন্ন হইত। এই পূজাব সহিত যে ককণ কাহিনী স্বভিত আছে, বাদল-ধাবস চোখের ধাবা মিশাইয়া বাঙ্গালী আজও তাহা শুনে। শতাব্দিক কবি এই কাহিনীতে বং ফবাইয়া বাঙ্গালীত ভাষা-সাহিত্য সমৃদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। মনসাব ভাসান, ভাটিয়ালী গান, নৌ-শিল্প, নৌকা-বাইচ বর্ষাবই দান।

মনসাব ভাসান পল্লী-বাংলাব বর্ষাব সৌন্দর্যে একটা ককণ মাধুর্য্য শিলাইয়া দিয়াছে।

“কিসেব ঢাক কিসেব ঢোল কিসেব বাজ বাজে

শায়াস্তা সংক্রান্তে রাজ মনসাবে পুজে।”

\* \* \*

“শাওন বাওনা মাস আখাল পাখাল পানি

মনসা পূজিতে কল্যা হইল উগোণিনী।”

বর্ষা-বর্ণনাব অবিচ্ছেত অংশকপেট এইকপ কত কথা আমাদের পল্লী-কাব্যে ছড়ানো বহিয়াছে। আমরা আব অধিক দূর অগ্রসর হইব না। বাংলাব বৃকে খাজ ‘বিষম নদীত চেউ বে অলছ তলছ পানি।’ তাই ভাবতেব সেই গৌববময় যুগেব মহাকবিব ভাষা বাঙ্গালীত জন্ম প্রার্থনা কবিব :—

“বহুগুণবমণীয়ঃ কামিনীচিন্তাবী তকবিটপিলতানাঃ

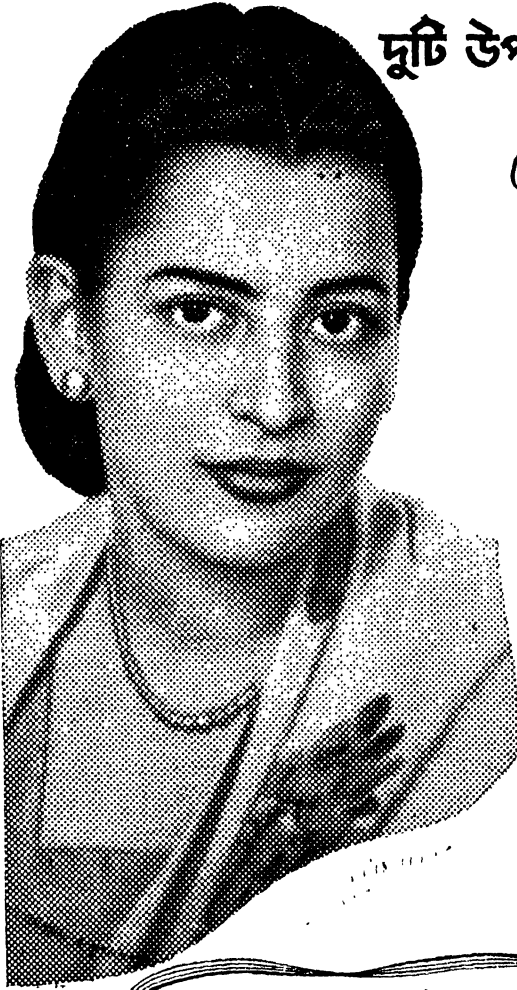
বান্ধবে নির্নিবাবঃ।

জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণভূতো দিশতু তব হিতানি

প্রায়শো বাঙ্কিতানি।”

## পোষাকী হাসি

“আপনাব পোষাক-পবিচ্ছদ কখনও সম্পূর্ণ হতে পাবে না যতক্ষণ  
না আপনাব গুণাধবে ফুটে উঠে হাসিব মুহু বেথা।” —অজ্ঞাত।



দুটি উপায়ে পাবেন

## আরো মসৃণ ও সুন্দর মুখশ্রী

মুখশ্রী আপনার আরো কমনীয় ও সুন্দর হবে, যদি দুটি পণ্ডস ক্রীমের সাহায্যে সৌন্দর্য-সাধনার বিখ্যাত দুটি নিয়ম মেনে চলেন।

প্রত্যেকের জন্যই দুটি ক্রীমের দরকার— কারণ একটিতে ময়লা কাটে, অপরটি মুখশ্রী রক্ষা করে। রাত্রিতে চাই, সারাদিনের ধূলি ও ময়লা দূর করার জন্য উচ্চাঙ্গের একটি তৈলাক্ত ক্রীম — পণ্ডস কোল্ড ক্রীম। আর ভোরবেলা চাই, রঙ-কালো-করা রোদের তাত থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্য হাল্কা, অদৃশ্য একটি ক্রীম—পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম।

### সৌন্দর্য-সাধনার দুটি উপায় :

রোজ রাত্রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মেখে আস্তে আস্তে মালিশ করে বসিয়ে দিন। এর সুমিশ্রিত তেল লোমকূপের ভেতর থেকে সমস্ত ময়লা বার করে আনবে। তারপর মুছে ফেলেই দেখবেন, মুখখানি কেমন লাবণ্যে উজ্জ্বল!

রোজ ভোরে খুব পাতলা করে পণ্ডস ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। এ হাল্কা, অথচ চট্‌চটে নয়। মাথার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যান এবং অদৃশ্য একটি সুন্দর সারাদিন মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ ও কমনীয় রাখে।



একমাত্র কনসেশানেয়াস :

জিওফ্রে ম্যানাস এণ্ড কোং লিঃ

বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

# পণ্ডস

## সাহিত্য

সংস্কৃত-অনুশ্রুতি

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৈরীজ্ঞানকুমার ঘোষ

**কুষ্ক ভট্ট**—টাকাকার। ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজশাহী জেলার নন্দনপুৰ (নন্দনা) ইং'হার নিবাসভূমি। পিতা—দিবাকর ভট্ট। শিক্ষা—কালীধামে। গ্রন্থ—মহাভারতাবলী (মহা-সাহিত্যের টাকা)।

কুসুমকুমারী রায়—মহিলা কবি। কাব্যগ্রন্থ—মর্মোচ্ছ্বাস।

কুসুম দেব—কবি। উজ্জয়িনীর রাজা ভট্ট'হরির সভাপণ্ডিত। গ্রন্থ—দৃষ্টান্তশতক।

কুন্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—কবি। জন্ম—১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে মুখোপাধ্যায় বংশে। পিতা—বনমালী। মাতা—মালিনী। গৌড়েশ্বর ইং'হাব গুণের পরিচয় পাইয়া ইং'হাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। গ্রন্থ—বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, বৃহৎ লঙ্কাকাণ্ড।

কুপারাম মিশ্র—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত এবং টাকাকার। গ্রন্থ—পঞ্চপক্ষীপ্রকাশ (১৭৯২ খৃঃ), মুহূর্ত্ততত্ত্বের টাকা, বহুচিন্তামণি উদাহরণ, লীলাবতী-কৌতুক (টাকা), সর্বার্থচিন্তামণির টাকা।

কুপাশঙ্কর—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—জ্যোতিষকেদার।

কুষ্কমল গোস্বামী—পদকর্তা, যাত্রা-পালা রচয়িতা। নামান্তর—মড গোসাই। জন্ম—১৮১০ খৃঃ ভজনঘাট, নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৮৮৮ খৃঃ, চুঁচুড়া, হুগলী। পিতা—সুরলীধর গোস্বামী। ইনি বহু দিন ঢাকাবাসী ছিলেন। গ্রন্থ—নিমাই-সন্ন্যাস, স্বপ্নবিলাস (ঢাকা), রাই-উম্মাদিনী (ঢাকা), বিচিত্রবিলাস (ঢাকা), সুরল-সংবাদ (ঢাকা), নন্দহরণ (ঢাকা), ভরত-মিলন।

কুষ্কমল ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী। জন্ম—১৮৪০ খৃঃ (আহু)। মৃত্যু—১৯০২ খৃঃ। নিবাস—মালদহ। পিতা—রামজয় তর্কালঙ্কার। এণ্ট্রান্স (সংস্কৃত-কলেজ—১৮৫৭), বি-এ (১৮৬০)। শিক্ষকতা, অধ্যাপনা (প্রেসিডেন্সী কলেজ—১৮৬২), ওকালতী, পরে অধ্যক্ষ রিপণ কলেজ (১৮৯১)। গ্রন্থ—হুরাকাডেক্সর বুধা ভ্রমণ (১৮৫৮), বিচিত্রবীর্ষ, নাগানন্দম্ (১৮৬৪)। সম্পাদক—বিচারক (সাপ্তাহিক—১৮৫৮ খৃঃ), হিতবাদী (সাপ্তাহিক—১৮৯১)।

কুষ্কান্ত বিজ্ঞানাগীশ—স্মার্ত পণ্ডিত। পিতা—কালীচরণ জ্ঞায়ালঙ্কার। ইনি নদীয়ার মহারাজা গিরিশচন্দ্রের (১৮০২—১৮৪১ খৃঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—শব্দশক্তিপ্রকাশিকা (জ্ঞায়), গোপাল-লীলামৃত উপমান-চিন্তামণির টাকা, চৈতন্যচিন্তামৃত (কাব্য), কামিনী-কাম-কৌতুক (কাব্য), দায়ভাগের (জীমূতবাহন-কৃত) টাকা। পদার্থতত্ত্বের (শিরোমণি-কৃত) টাকা, গৌতমমন্ত্রের টাকা, কাব্য-প্রকাশিকার টাকা, জ্ঞায়রত্নাবলী, তত্ত্বরত্নাবলী, জয়সিংহ

কুষ্কান্ত মালবীয়া—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৯৩৬ সংবত, এলাহাবাদ। হিন্দী গ্রন্থ—প্রিয়তমা, কর্মবীর। সম্পাদক—অভ্যুদয়

কুষ্কান্ত শিরোমণি—কবি ও পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। মৃত্যু—১৮৮২ খৃঃ। নবদ্বীপ মিশনারী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। গ্রন্থ—সংকাব্যকল্পক্রম (সংকলন কাব্য)।

কুষ্কামিনী দাসী—মহিলা কবি। গ্রন্থ—চিন্তাবিলাসিনী (কাব্য—১৮৫৮ খৃঃ)।

কুষ্ককিশোর রায়—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—হুর্গালীলা-তরঙ্গিনী (কাব্য) ১ম (১৩১২), ২য় (১৩১৬)।

কুষ্ককুমার মিত্র—সংবাদিক ও ধর্মপ্রচারক। জন্ম—১৮৫৯ মৈমনসিং-টাকাইয়েলের বাঘিলগ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৬ খৃঃ। পিতা—গুরুচরণ মিত্র। ইনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক, দেশসেবী এবং বহুবিধ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৭০ খৃঃ), বি, এ। শিক্ষকতা (সিটি স্কুল ও কলেজ—১৮৭৯—১৯০৮)। কারাবাস (১৯০৮—১৯১০)। গ্রন্থ—একাকাহিনী, বুদ্ধদেবচরিত, রাজা, রাণী, ভিক্টোরিয়া-চরিত, মহম্মদ-চরিত। সম্পাদক—সঞ্জীবনী (১২৮৯)।

কুষ্ককুমারী—গ্রন্থরচয়িত্রী। পিতা—পূর্ণানন্দ ঘোষ-রায় (পাচখুণী)। গ্রন্থ—হুহিতার বিলাপ।

কুষ্কচন্দ্র চৌধুরী—হিন্দী গ্রন্থকার। হিন্দী গ্রন্থ—আমীচাঁদ, উত্তররামচরিত, মালতীমাধব, মহাবীচরিত, বাম্বীকি রামায়ণ।

কুষ্কচন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিলাপ-বিবৃতি-মালা, (রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত 'বিলাপকুসুমাজলি'র অনুবাদ—১৭১৩ খৃঃ)।

কুষ্কচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদিক। জন্ম—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার শিবনিবাস। মৃত্যু—১৯১১ খৃঃ। সহ-সম্পাদক—সাধারণী, সম্পাদক—বঙ্গবাসী পত্রিকা, দৈনিক চন্দ্রিকা।

কুষ্কচন্দ্র মজুমদার—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—১২৪৪ বঙ্গাব্দ খুলনার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গাব্দ সেনহাটি। হেড পণ্ডিত—বশোহর জেলা স্কুল (১৩০০ বঙ্গ পঞ্চম)। গ্রন্থ—সম্ভাবনতক (১৭৮২ শক), রাসের ইতিবৃত্ত, মোহনভোগ, কৈবল্যতত্ত্ব। সম্পাদক—ঢাকা-প্রকাশ, বিজ্ঞাপনী, দ্বৈতাবিকী (১২৯৩-৯৪)।

কুষ্কচন্দ্র রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অপরাধতত্ত্ব (১৮৬৭)।

কুষ্কচন্দ্র শ্রুতিতীর্থ—স্মার্ত পণ্ডিত। গ্রন্থ—শ্রীমন্তাগবত, শ্রীমন্তগবদগীতা।

কুষ্কচরণ দাস—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—শ্রীমানন্দ-প্রকাশ।

কুষ্কজীবন—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—রঙ্গপুর জেলার বাহির বন্দর পরগণার বজরাগ্রামে। কাব্য-গ্রন্থ—অভয়ামঙ্গল।

কুষ্কজীবন সাহা—সঙ্গীতজ্ঞ। নিবাস—রাজশাহী। গ্রন্থ—সঙ্গীতাবলী (১৮৭৪ খৃঃ)।

কুষ্কতীর্থ, ভারতী—গ্রন্থকার। অধ্যক্ষ, দাক্ষিণাত্যের শৃঙ্গেরি মঠ (১৩৩৩—১৩৮০ খৃঃ)। পূর্বনাম—সোমনাথ। গ্রন্থ—বৈয়্যাসিক জ্ঞায়-মালা।

কুষ্কদয়াল বসু—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। শিক্ষক, মিত্র ইনস্টিটিউশন। গ্রন্থ—ভার্জিন সয়েল (অনুবাদ), ডেভিড লিভিংস্টোন (ঐ), মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ)। পড়ার পরেও ভাবতে হয়।

কুষ্কদাস বা শ্রীকুষ্ককিশোর—কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট সিঙ্গিগ্রামে। ইনি কালীদাস দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র। পিতা—বসন্তকাকাজ দাস। গ্রন্থ—শ্রীকুষ্ক-বিলাস।

কৃষ্ণদাস—কবি। সম্ভবতঃ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে গুজরাতে বর্তমান।  
গ্রন্থ—প্রেমবাস।

কৃষ্ণদাস—অনুবাদক। গ্রন্থ—চমৎকারচন্দ্রিকা।

কৃষ্ণদাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাপ্তিবর্ণদীপিকা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোস্বামী—গ্রন্থ ও পদাবলী রচয়িতা। জন্ম—  
আনুমানিক ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় মধ্যে অজয়নদের  
উপর খামটপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন ধামে। পিতা  
—ভগীরথ দাস। শৈশবে সংস্কৃত ও ফার্সি শিক্ষা, নানা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ  
করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ,  
জীবগোস্বামী প্রভৃতির পুণ্যশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন। ইনি পরম  
বৈষ্ণব ছিলেন। গ্রন্থ—গোবিন্দলীলামৃত (কাব্যগ্রন্থ)। কৃষ্ণকর্ণামৃত  
গ্রন্থের টীকা, ভাগবতশাস্ত্র গুটরহস্ত, অষ্টোত্তমসূত্রের কড়চা, স্বরূপবর্ণন,  
বৃন্দাবন-ধ্যান, ছয়গোস্বামীর সংস্কৃত-সূচক, জ্যোতির্দণ্ডনির্ণয়, প্রেম-  
রত্নাবলী, বৈষ্ণবচর্চা, রায়মালা রাগময়করণ, পাণ্ডুললন, বৃন্দাবন-  
পরিক্রম, রাগ-রত্নাবলী, শ্রামানন্দপ্রকাশ, সার-সংগ্রহ, ত্রিঐচৈতন্য-  
চরিতামৃত, (১৬১৫ খৃঃ), রসভক্তিলহরী।

কৃষ্ণদাস, দীন—বৈষ্ণব পদকর্তা। জন্ম—শান্তিপুরের সন্নিকট  
অধিকা নামক গ্রামে। পিতা—কংসারি মিত্র। মাতা—কমলা  
দেবী। গ্রন্থ—ভক্তিরসাস্বাদিকা।

কৃষ্ণদাস, দুঃখী—পদকর্তা। গ্রন্থ—অষ্টোত্তমসূত্র, উপাসনা-  
সার-সংগ্রহ, বৃন্দাবন পরিক্রম।

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—বঙ্গীয় কবি। নামান্তর—রামকৃষ্ণ। জন্ম—  
বর্ধমানের অধিকানগরে। পরে কলিকাতা বহুবাজারে বাস। পিতা—  
তারারাম। কাব্যগ্রন্থ—নারদ পূরণ বা নারদ-সংবাদ (১০১১ বঙ্গ)

কৃষ্ণদাস পাল—সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ।  
মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ। পিতা—ঈশ্বরচন্দ্র পাল। শিক্ষা—ওরিয়েন্টাল  
সেমিনারী, মেট্রোপলিটান কলেজ। রায় বাহাদুর (১৮৭৭) এবং  
সি, আই ই, (১৮৭৮) উপাধি লাভ। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়ে-  
শনের সম্পাদক (১৮৭১ খৃঃ)। সম্পাদক—Hindu Patriot  
(ইহা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র)।

কৃষ্ণদাস বাবাজী—অনুবাদক। অনুবাদ-গ্রন্থ—ভক্তমাল (নাভাজী  
কৃত হিন্দী হইতে)।

কৃষ্ণদাস, লাউড়িয়া—ভক্ত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৫শ শতাব্দীতে  
শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের অন্তর্গত লাউড় পরগণার রাজা। ইহার প্রকৃত  
নাম দিব্যসিংহ। বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ইনি কৃষ্ণচন্দ্র নাম গ্রহণ  
করেন। গ্রন্থ—বিকৃতভক্তিরত্নাবলী (সংস্কৃত পড়ামুদ্রা), বাল্যসুত্রম্।  
কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য—পাঁচালীকার। জন্ম—শ্রীহট্টের মান্দারকান্দি।  
পিতা—দেববাচস্পতি। পাঁচালী গ্রন্থ—নিয়তমঙ্গলচণ্ডী।

কৃষ্ণ দৈবজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—নবাহুর্ (টীকা),  
শ্রীমদ্ভাগবত (টীকা), জাতকপদ্ধতি (টীকা), ছাদকনির্ণয়।

কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—পদ্মা (১৩০৫—  
১৩১৫)।

কৃষ্ণধ্বজ দীক্ষিত—গ্রন্থকার। জন্ম—১৭শ শতাব্দী কোয়ংপুর  
গ্রামে। পিতা—বেকটেশ্বর দীক্ষিত। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—তীর চিঠি, চলার সাখী,  
নানা প্রসঙ্গে, মনের পথে।

কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ধর্মপ্রচারক  
(১৮০১—১৮০৮ শক)।

কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ—কবি। জন্ম—১৭১৪ খৃঃ (আহু)  
মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীর নিকট পাতেঙা নামক গ্রামে।  
মৃত্যু—১৮৫৫ খৃঃ (আহু)। পিতা—কমলাকান্ত ঘোষ। গ্রন্থ—  
বৈষ্ণব-পদাবলী, সত্যনারায়ণের পাঁচালী।

কৃষ্ণ ভট্ট বা কৃষ্ণ ভট্ট আর্ডে—টীকাকার। জন্ম—১৭১৮  
শতাব্দী কান্দীধামে। পিতা—রঘুনাথ। গ্রন্থ—মধুবা বা জাগদীশী  
টীকা, দীপিকা।

কৃষ্ণ মিশ্র. কবি চূড়ামণি—পণ্ডিত ও নাট্যকার। জন্ম—১১শ  
শতাব্দীতে। গ্রন্থ—প্রবোধচন্দ্রোদয় (সংস্কৃত নাটক)।

কৃষ্ণমোহন দাস—সাংবাদিক। পরিচালক—সম্বাদতিমির-  
নাশক (১২০০—১২৩৭ বঙ্গ)।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড, ডাক্তার—বঙ্গালী খৃষ্টীয়  
ধর্মযাজক ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৩১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্রামপুকুরে।  
মৃত্যু—১২৯২ বঙ্গাব্দ। পিতা—জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—  
হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ। ইনি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ডি এল,  
(১৮৭৬) খৃষ্টাব্দে গ্রহণ (১৮৩২ খৃঃ)। শিক্ষকতা, হেয়ার স্কুল  
(১৮২৯), অধ্যাপক, বিসপস কলেজ (১৮৫২—৬০), সম্পাদক—  
Inquirer, সর্বাধর্মসংগ্রহ (দ্বিভাষিক পত্রিকা—১৮৪৫ খৃঃ), সুধাংশু  
(সংবাদপত্র)।

কৃষ্ণলাল সাধু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আকাশ-কাহিনী।

কৃষ্ণরাম দত্ত—কবি। গ্রন্থ—রাধিকামঙ্গল।

কৃষ্ণরাম দাস—গ্রন্থকার। প্রকৃত নাম—কৃষ্ণরাম বসু।  
জন্ম—১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা নিমতা গ্রামে। পিতা—ভগবতী  
দাস। গ্রন্থ—দক্ষিণ রায়ের উপাখ্যান বা রায়মঙ্গল (১৬৮৬ খৃঃ),  
বিজ্ঞানন্দর (কালিকামঙ্গল), অশ্বমেধপর্ব, ভজনমালিকা।

কৃষ্ণবিহারী সেন—শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে  
৩০এ নবেম্বর কলুটোলা (কলিকাতা), মৃত্যু—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ ২৯এ মে।  
পিতা—প্যারীমোহন সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (১৮৬৪ খৃঃ),  
এফ এ, (প্রেসিডেন্সী—১৮৬৬ খৃঃ), বি, এ (১৮৬৮ খৃঃ),  
এম, এ (১৮৬৯ খৃঃ)। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ। প্রধান শিক্ষক—কলিকাতা  
স্কুল (১৮৭২), অধ্যক্ষ—জয়পুররাজ কলেজ, ও জয়পুর রাজ্যের  
Director of Public Instruction. গ্রন্থ—অশোকচরিত,  
বুদ্ধচরিত (১৮৯০), নববিধান কি? (১৮৯৬), কবিতামালা,  
গল্পমালা, অশোকচরিত নাটক। সম্পাদক—Sunday Mirror,  
The Liberal & the New Dispensation,

কৃষ্ণানন্দ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কঙ্কনিবাস-বাদ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তাত্ত্বিক ও পণ্ডিত। নামান্তর—  
আগমবাগীশ ভট্টাচার্য। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবাবীপে।  
পিতা—মহেশ্বর গৌড়াচার্য। কৃষ্ণানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের সমাময়িক।  
শিক্ষা—বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন, শক্তিমন্ত্র গ্রহণ  
ও পরে ঘোরতর তাত্ত্বিক। গ্রন্থ—তত্ত্বসাব (সংকলন গ্রন্থ),  
শ্রীতত্ত্ব-বোধিনী।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাস, রাগসাগর—সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-গ্রন্থ রচয়িতা।  
গ্রন্থ—রাগকল্লক্রম, ১ম—৬ষ্ঠ পণ্ড (১৮৩৩—১৮৪৩ খৃঃ)।



কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—তন্ত্র-গ্রন্থকাব। নিবাস—কাশীধাম।  
গ্রন্থ—কাকটেশ্বরী তন্ত্র ( ১২৩৬ বঙ্গ )।

কৈতক। দাস—কবি। নিবাস—ভুগলী জেলা। গ্রন্থ—  
মনসার ভাষান বা গীতি।

কেন্দারনাথ দত্ত, ভক্তিবিনোদ—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৪৫  
বঙ্গাব্দে নদীয়া জেলায় উলা গ্রামে। মৃত্যু—১৯১৪ খৃঃ। পিতা—  
আনন্দচন্দ্র দত্ত। কর্ম—ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ( ১৮৬৬—৯৪ খৃঃ )।  
গ্রন্থ—শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত, জীবনম, প্রেমপ্রদীপ, বিজন গ্রাম,  
সন্ন্যাসী ; সংস্কৃত ভাষায়—শ্রীকৃষ্ণসাহিত্য, শ্রীগোবিন্দ-শ্রবণমঙ্গল স্তোত্র,  
দণ্ডকোন্ডভ, আশ্বায়ন্যুহ ; উর্দুতে—বালিদে বেজিন্দী ; ইংরেজিতে—  
Pourade, The Muts of Orissa, Our wants, The  
Bhagavata Speech, Gautama Speech. সম্পাদক—  
সজ্জনতোষিণী ( মাসিক, ১৯৮৮ )।

কেন্দারনাথ দাস—গ্রন্থকার। নিবাস—বহরমপুর। গ্রন্থ—  
ভারতবর্ষের প্রাচীন দিগ বিহার ( ১৮৭২ খৃঃ )।

কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রস-সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। জন্ম—  
১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে।  
মৃত্যু—১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নভেম্বর পূর্ণিয়ার। সবকারী ঢাকুরী এবং  
সবকারী কাজে চীনদেশে গমন। ঢাকুরী হাতে অবসর গ্রহণ করিয়া  
কাশীধাম এবং পূর্ণিয়ার বাস করেন। ইনি জগদ্বিরণী পদক লাভ  
করেন। গ্রন্থ—পাণ্ডনা, মা ফলেসু, কোষ্টিব ফলাফল, কবুলতা, আমরা  
কি ও কে, দুঃখেব দেওয়ানী, ভাড়াই মশাই, চীনবাত্রী,  
আই হাজ, পাথের, শেষ খেয়া।

কেন্দারনাথ মজুমদার—সাম্পাদক ও গ্রন্থকাব। জন্ম—১২৭৭  
বঙ্গ মৈমনসিংহেব কিশোরগঞ্জে। মৃত্যু—১৩৩৩ বঙ্গ মৈমনসিংহে।  
গ্রন্থ—মৈমনসিংহেব ইতিহাস, মৈমনসিংহেব বিবরণ, ঢাকার বিবরণ,  
সারস্বতকুঞ্জ, বাল্য সাময়িক সাহিত্য, বামায়ণের সমাজ ; উপন্যাস  
—ভক্তদুষ্টি, স্রোতের ফল, সমস্তা, চিত্র। সম্পাদক—কুমাণ ( পত্রিকা ),  
বাসনা ( ১৩০৬ ), আবর্ত ( ১৩০৭ ), সৌভ ( ১৩১৯ )।

কেন্দারনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—মাসিক  
প্রকাশিকা ( ১৮৭৪ )।

কেবলকৃষ্ণ বসু—পাটালীকাব। জন্ম—১১৫২ বঙ্গ মৈমনসিংহেব  
কেন্দারপুর গ্রামে। পিতা—বিজয়রাম বসু। গ্রন্থ—কাশীখণ্ড  
( ১২২২ বঙ্গ ), সত্যনাবায়ণেব পাটালী।

কেবলবাম আচাৰ্য—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—নবদ্বীপ। গ্রন্থ—  
পেটিকা ( ১৬৯৯ খৃঃ )।

কেবলবাম পঞ্চানন—গণিতজ্ঞ। গ্রন্থ—গণিতবাজ ( ১৭৬২ খৃঃ ),  
বেথাপ্রদীপ।

কেরী, উইলিয়াম (William Carey, D. D.)—বিখ্যাত ধর্ম-  
যাজক ও শিক্ষাবর্তী। জন্ম—১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড নদাম্পটনশায়াবে।  
মৃত্যু—১৮৩৪ খৃঃ। পিতা—এডমণ্ড কেবী। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে  
আগমন। শ্রীধামপুর কলেজ স্থাপন ( ১৮১৮, ১৫ই জুলাই ),  
শ্রীধামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রাশ্রম স্থাপন। বাংলা অধ্যাপক,  
ফোট উইলিয়াম কলেজ ( ১৮০১ ), বাঙ্গালা ব্যাকরণ ( ১৮০১ খৃঃ ),  
বাঙ্গালা-ইংবেজি অভিধান ( ১৮১৫—১৮২৫ ), সংস্কৃত রামায়ণের  
ইংবেজি অনুবাদ, তেলেগু ও পাঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ, বাইবেলের বাংলা

অনুবাদ, ইংলণ্ডেব ইতিহাস ( অনুবাদ, গোল্ড স্মিথ কৃত—১৮১৩ খৃঃ )।

কেশবচন্দ্র গুপ্ত—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। এম, এ, বি, এল,  
আইনজীবী। গ্রন্থ—মাদাম হালিদা নদিবের জীবনমুতি, অতি  
বোগাস, সখের শ্রমিক, বিদ্রোহী তরুণ, আসমানের ফুল।  
সম্পাদক—অর্চনা ( মাসিকপত্র—১৩১৫ )।

কেশবচন্দ্র বায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—শবাবলী ( অভিধান,  
১৮৬৭ খৃঃ )।

কেশবচন্দ্র সেন—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ও গ্রন্থকাব। জন্ম—১৮৩৮  
খৃষ্টাব্দে ১৯এ নভেম্বর কলিকাতা। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই জানুয়ারী,  
কলিকাতা। পিতা—পারীমোহন সেন। নিবাস, ভুগলী জেলায়  
গৌরীভা নামক গ্রামে। শিক্ষা—হিন্দু স্কুল, মেট্রোপলিটান কলেজ।  
ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ ( ১৮৫৭ খৃঃ ), সভা স্থাপন—Goodwill Frater-  
nity ( ১৮৫৭ ), সঙ্গতসভা ( ১৮৬৯ ), ব্রাহ্ম ধর্ম-প্রচারে ব্রতী।  
ব্রহ্মানন্দ উপাধিলাভ ( ১৮৬২ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল ), আদি ব্রাহ্মসমাজেব  
আচাৰ্য। ব্রাহ্মবন্ধুসভা, ব্রাহ্মিকা সমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ  
( ১৮৬৯ )। প্রচার-উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন ( ১৮৭০, ফেব্রুয়ারী  
১৮ই সেপ্টেম্বর )। ভারত-সংস্কার সভা স্থাপন ( ১৮৭০, ১লা  
নভেম্বর ), নববিধান ( ১৮৭৮ )। গ্রন্থ—Young Bengal, this  
is for you ( ১৮৬০ ), যুগধর্ম মাহাত্ম্য প্রতিপাদক হবিলীলা বা  
বিধানভারত ( ১৮৮০ ), জীবন-বেদ, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম, প্রেমের  
ধর্ম, প্রার্থনালীল হও ( পুস্তিকা ), Native Female Improve-  
ment ( ১৮৭২ ), True Faith, The New Samhita,  
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, সাধু-সমাগম, শ্লোক-সংগ্রহ, Yoga—Subjective  
& Objective, দৈনিক উপাসনা, আচাৰ্যেব উপদেশ ( ১০ খণ্ড ),  
সেবকের নিবেদন ( ৫ খণ্ড ), দৈনিক প্রার্থনা, প্রতিমা,  
Lectures in India ( ২ খণ্ড ), Lectures in England,  
Essays : Theological & Ethical, Discourses &  
Writings. Social Reformation in India,  
The New Dispensation ( 2 Vols ), সম্পাদক—  
Indian Mirror ( ১৮৬০ ), ধর্মতত্ত্ব ( ১৮৬৪ ), স্কুলভ  
সমাচাৰ্য, Sunday Mirror, নববিধান ( পত্রিকা—১৮৭৭ )।

কেশবদাস—হিন্দী কবি। গ্রন্থ—বিজ্ঞান গীতা, স্মৃতিবিলাস,  
স্বপ্নপান্থসন্ধান, স্বাভাবিকপ্রকাশ, সন্তোষসুহৃৎ, রত্নপ্রভাব।

কেশবদাস মিত্র—হিন্দী কবি। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান।  
কাব্যগ্রন্থ—রসিক প্রিয়া, কবি প্রিয়া ( ১৬০২ খৃঃ ), রামচন্দ্র।

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী—সন্ন্যাসী ও গ্রন্থকার। জন্ম—  
১২০৩ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলায়। মৃত্যু—১৩২২ বঙ্গ। পূর্ণনাম—  
বাবিকাগ্রসাদ বায়-চৌধুরী। পিতা—রামনাবায়ণ বায়-চৌধুরী।  
গ্রন্থ—হানন্দগীতা।

কৈয়ট—টীকাকাব। জন্ম—১০-১১শ শতাব্দী কাশ্মীর।  
নিবাস—অবন্তিনগর। পিতা—উবটাকাব। গ্রন্থ—প্রদীপ ( কাব্য )।

কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। জন্ম—বর্ধমান জেলায় রায়ন।  
গ্রামে। গ্রন্থ—বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা ( ১৮৭৯ খৃঃ )।

কৈলাসচন্দ্র নন্দী—সাহিত্যিক। জন্ম—১২২৫ বঙ্গ ত্রিপুর।  
ব্রাহ্মধর্মবিদ্যার কালীগঞ্জ গ্রামে। মৃত্যু—১৮৮৪ খৃঃ। পিতা—  
নন্দদুলাল নন্দী। শিক্ষা—প্রবেশিকা ( ১২৭২ বঙ্গ ), ব্রাহ্মধর্ম

দীক্ষিত (১৮৬৯)। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু পত্রিকা (১৮৭০ খৃঃ),  
ইষ্ট (East)—পত্রিকা (১৮৭৫), Pilgrim Journal  
(১৮৮০)।

কৈলাসচন্দ্র বিজ্ঞানভূষণ—সাহিত্যিক। জন্ম—১২৬৬, ২৫এ  
অগ্রহায়ণ। মৃত্যু—১৩০৯, ২৭এ ফাল্গুন। শিক্ষা—এম, এ, (সংস্কৃত  
কলেজ)। অধ্যাপক, ডফ কলেজ। সম্পাদক—সোমপ্রকাশ  
(সাপ্তাহিক)।

কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কবি। জন্ম—নদীয়া জেলার  
হরিপুর। গ্রন্থ—চপলা, কবিতাপ্রস্থান।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ, বিজ্ঞানভূষণ—ঐতিহাসিক ও গ্রন্থকার।  
জন্ম—১২৭৮ বঙ্গ ত্রিপুরা জেলার কালীগঞ্জ গ্রামে। মৃত্যু—  
১৩২১ বঙ্গ। পিতা—গোপালচন্দ্র সিংহ। গ্রন্থ—ত্রিপুর  
ইতিবৃত্ত, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, সেনরাজগণ, ফরাসী  
বীজ্ঞান জোয়ানের জীবন-চরিত, শব্দব, শ্রীধব স্বামীর টীকা  
(বঙ্গানুবাদ সহ), শ্রীদাকব্রহ্ম, হস্তামলক, সাধক-সঙ্গীত, ১ম, ২য়,  
মোহনগর, শ্রীমন্তগবদগীতা, কান্দালের গীত, কান্দাল গীতা।

কৈলাস জ্যোতিষার্ঘ্য—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—তাবদিয়া।  
গ্রন্থ—জ্যোতিষ-প্রভাকর, জ্যোতিষ-প্রদীপ।

কৌণ্ড—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীতে।  
গ্রন্থ—তর্কপ্রদীপ, জ্ঞানপদার্থদীপিকা।

ক্রমদীপ—বৈয়াকরণিক। জন্ম—১১-১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—  
সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।

কমানন্দ দাস—গ্রন্থকার। জন্ম—১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার  
ধুটকা গ্রামে। পিতা—বঘনন্দন দাস। গ্রন্থ—জ্ঞানবন্ধাকর, তত্ত্ব-  
সমাস, মনসার ভাসান।

ক্ষিতীন্দ্র দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেবীর চোঁতিশ।

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—অধ্যাপক ও পণ্ডিত। অধ্যাপক,  
শান্তিনিকেতন। গ্রন্থ—প্রাচীন ভারতের নারী, দাদু (১৩৪২),  
কবীর, জাতিভেদ, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা (১৩৫১),  
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ (১৩৫৪), বাংলার সাধনা (১৩৫২), ভারতের  
সংস্কৃতি (১৩৫১), ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনাব ধারা (১৯৩০),  
Mediaeval Mysticism of India (লণ্ডন, ১৯৩০)।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য।  
জন্ম—১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী। মৃত্যু—১৯৩৭ খৃঃ।  
পিতা—হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা—বি-এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ—  
১৮৮০ খৃঃ)। তত্ত্বনিধি উপাধি লাভ। আদি ব্রাহ্ম সমাজের  
আচার্য। গ্রন্থ—অভিযুক্তিবাদ (১৩০৯), কলিকাতায় চলাফেরা, বাজা  
বিশুদ্ধ (১৩০০), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, আর্থ-রমণীর শিক্ষা ও স্বাধী-  
নতা (১৯০১), আদিশূর, ভট্টনারায়ণ, আলাপ, শিক্ষা সমগ্রা ও কুষ্টি,  
ব্রাহ্মধর্মের বিবৃতি (১৩১৬)। অধ্যাত্মধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ (১৩০২),  
শাখি জল (১৩১৭), শ্রীভগবৎকথা (১৩১৯), ও পিতা নোহসি  
(১৩২১), প্রাণের কথা (১৩২২), বঙ্গসেনা-সংগঠনে দেশের  
ঐতি (১৩২৩), শিক্ষা সমগ্রা ও কৃষি শিক্ষা (১৩২৩), মা  
(১৩২৪), মারে-পোয়ে (১৩২৫), তোমরা ও আমরা (১৩২৬),  
যুক্তিকা (১৩২৬), জর্মণীর বর্তমান রাষ্ট্রনীতির অভিব্যক্তি  
(১৩২৭), ওপারে (১৩২৮), আদি ব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলী সংগঠনের

প্রস্তাবনা (১৩২২)। সম্পাদক—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৩৭  
শক—১৮৫৩ শক)।

ক্ষীরোদচন্দ্র রায়—কবি। গ্রন্থ—প্রেমহাব (১২৯৩)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞানবিনোদ—সাহিত্যিক ও নাট্যকার। জন্ম—  
১২৭০ বঙ্গ ২৪ পরগণার খড়দহ গ্রামে। মৃত্যু—১৩৩৪ বঙ্গ বাঁকুড়া  
শতবে। বি-এ (মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন), এম-এ। অধ্যাপক,  
জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ (১৮৯৩—১৯০২ খৃঃ)। পরে অধ্যাপকের  
পদ ত্যাগ করিয়া নাট্যলয়ে যোগদান। গ্রন্থ—ফুলশয্যা (কাব্য—  
১৮৯৪), নাট্যগ্রন্থ—প্রেমাজলি (১৮৯৬), আলিবা (১৩০৪),  
প্রমোদরঞ্জন (১৩০৫), সাবিত্রী (১৩০৯), সপ্তম প্রীতিমা  
(১৩০৯), বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য (১৩১০), রঘুবীর (১৩১০),  
রঞ্জাবতী (১৩১১), উলুপী (১৩১৩), পদ্মিনী (১৩১৩), পলাশীর  
প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৩), চাঁদবিবি (১৯০৭), নন্দকুমার (১৩১৪),  
দাদা ও দিদি (১৩১৪), অশোক (১৯০৮), নিয়তি  
(১৩২০), ভূতের বেগার (১৯০৮), দৌলতে ঢনিয়া  
(১৩১৫), বক্ষ: ও রমণী (১৩১৩), বাঙ্গালার মনন (১৩১৭),  
মিডিয়া (১৩১৯), খাজাহান (১৩১৯), ভোম্ব (১৩২০), রূপের  
ডালি (১৯১৩), নিয়তি (১৩২০), আলোচ্য (১৩২১),  
বাদশাহজাদী (১৩২২), রামানুজ (১৩২৩), বঙ্গে বাটোর (১৯১৭),  
কিন্নরী (১৯১৮), মন্দাকিনী (১৩২৮), আলমগীর (১৩২৮),  
রক্তেশ্বরের মন্দিরে (১৯২২), বিদ্রুথ (১৩২৯), গোলকুণ্ডা (১৯২৫)  
জয়ন্তী (১৯২৬), রাধাকৃষ্ণ (১৯২৬), নব-নাট্যায়ণ (১৩৩০)।  
উপন্যাস—নিবেদিতা (১৯১৯), গুহামুখে (১৩২৬), গুহামণ্ডে  
(১৩৩০), পতিতার সিদ্ধি (১৩৩০), চাঁদের আলো (১৯২৪)।  
গীতিনাট্য—কবি কাননিকা (১৩০৩), কুমারী (১৩০৫), জুলিয়া  
(১৩০৬), নারায়ণী (১৩১১) পুনর্বাগমন (১৩১৯), বজ্রবাহন  
(১৩০৬), বেদোবা (১৯০৩), বৃন্দাবনবিলাস (১৯০৪), বাসন্তী  
(১৩১৫), বরুণা (১৩১৫), পলিন (১৩১৭), দুর্গা (১৩১৬)।

ক্ষুদিবাম দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কপিলামঙ্গল।

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে  
২৪ পরগণা টাকুর নিকট দণ্ডীরহাটা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৮০ খৃঃ।  
শিক্ষা—জুনিয়ার স্কলারশিপ (১৮৫৪ খৃঃ), ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা  
(১৮৫৯ খৃঃ)। অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৬০ খৃঃ)।  
গ্রন্থ—জবিপ ও পবিমিত্তি (১৮৭৩), লঘু পরিমিত্তি (১৮৭৮),  
শুভঙ্করী (১৮৭৯),। সহ-সম্পাদক—এডুকেশন গেজেট।

ক্ষেত্রকালী রায়, কবিরত্ন—গ্রন্থকার। জন্ম—ভুগলী জেলার  
সাহাগঞ্জে। গ্রন্থ—অর্ধেততত্ত্ব (১৯০৮)।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। মৃত্যু—১৯০৩ খৃঃ। Bengal  
Academy of Literatureএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৩০০  
বঙ্গ)। গ্রন্থ—চন্দ্রনাথ, হিন্দু, মথুরা, ব্রহ্মা।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, সঙ্গীত-নায়ক—সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার।  
জন্ম—মেদিনীপুর ১৮১৩ খৃঃ। মৃত্যু—১৮৯৩ খৃঃ। পিতা—  
রাধাকান্ত গোস্বামী। গ্রন্থ—ঐক্যমিত্ত স্বরলিপি (১৮৬৮),  
মুদ্রঙ্গমঞ্জরী (১৮৭৪), কণ্ঠকৌমুদী (১৮৭৫), An essay on  
the six modes of music on the six Ragas (১৮৭০)  
সঙ্গীতসার।

প্রাকৃতিক বস্তুকে দেব বা দেবীৰূপে কল্পনা কবিবাব দৃষ্টান্ত স্বকণ জল, নদী, বায়ু প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। শুধু দেবীৰূপে কল্পনা করা নয়, ইগাদিগকে মাহু সম্বোধন করা হইয়াছে। বিশ্বদেবগণের সঙ্গে বা পৃথক ভাবে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে, যজ্ঞে উপস্থিত হইবাব জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে।

যজ্ঞসম্পর্কিত প্রায় সকল বস্তুকে,—যজ্ঞের বেনী, সোমপেয়ণের প্রস্তর, যজ্ঞে যুতীভূত দিব্যর জুহু বা কাঠের হাতা, অবণি বা যজ্ঞ-কাঠ, যজ্ঞশালাব দ্বারকে দেবীৰূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যজ্ঞের কৃশকে দেবতারূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। যজ্ঞদেবী ইলার সঙ্গে মতা ও ভাবতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অগ্নি স্তোত্রে ইলা, সবস্বতী, মতা ও ভাবতীর একত্র উল্লেখ দেখা যায়। ইলা যুতপদী তরুণী দেবী, মনুবা শিক্ষয়িত্রী (ঋ ৭।৩।১১; ১।৭।৩৮)। কোন কোন ঋকে বাক্যেব মেনা সবস্বতীর সঙ্গে বাকু, গোবী ও সমর্পণী নামে কয়েক জন নূতন দেবীকে দেখা যায়। সাগনাচার্যের মতে বাকু, গোবী, ইলা, ভাবতা, সমর্পণী বাক্যেব সঙ্গে সম্পর্কিত।

বৃক্ষ উপাসনা সম্পর্কে অবগাম্যনী ও ওমদিব স্তোত্রগুলির উল্লেখ করা যায়। অশ্বপ বৃক্ষ দেবতার অধিষ্ঠান-স্থান। দশম মণ্ডলের ৫৮ সূক্তে মৃত অশ্বদ্বয় মনের বিভিন্ন গন্তব্য স্থানের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—অশ্বেশবীমনো অগাম—যে মন ওমদিব মধ্যে গিয়াছে। এই ঋকেব অ্যাপ্যায় Plant soulএর কথা বলা হইয়াছে। কৃশকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন কবিবাব কথা বলা হইয়াছে। অবণিকে অর্চিত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

দেবতাদিগের পশুরূপ ধারণের কথা পাওয়া যায়। ইন্দ্রকে বুধ ও বাজেব সঙ্গে, কন্দকে ববাজেব সঙ্গে, ঘোটককে অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। অনেক দেবতার পশুদান ছিল, পুণ্য ছাগ, অশ্বিরয়ের গর্ভ, ইন্দ্রের ঘোটক ইত্যাদি। বুধ ও গাণী, বখ ও অশ্বকে দেবতারূপে কল্পনা কবিয়া স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। গাণী স্থান এত উচ্চ যে, দেবতাদিগকে “গোজাতঃ” বলা হইয়াছে। গাণীকে অদিতিকূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গাণী “অগ্না” অর্থাৎ অগ্নি। “মতা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধাবস্তু”—দেবগণ তাঁহাব ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া সকল ব্রত ধারণ করেন (ঋ ৮।৯৭২)। বলা হইয়াছে—না “গামনাগমদিতি”, গাণীদ্বিগা অদিতিকে হিসা কবিও না (ঋ ৮।১০।১১৫)। ৪র্থ মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে দেখা যায়, “যে বেহুঃ বিশ্বজুবঃ বিশ্বকপাঃ”, বেহু বিশ্বের প্রেরয়িত্রী, বিশ্বকপা। দেবতারূপী অশ্ব দক্ষিণ ও এতদ্বাং দেবতারূপী পক্ষী তাক্য, সূর্য ও জেনের উল্লেখ কয়েকটি ঋকে পাওয়া যায়। জেন ও সূর্য সোম আনয়নকারী দেবতারূপে স্তূত হইয়াছেন। পূণ্য বাহন ছাগ অজ একপাদ নামে দেবতারূপে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন (ঋ ১।৩৪।৮, ৬৬।১১)। অতিবৃদ্ধ নামে সর্পকপী দেবতাকে স্তোত্র দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে (ঋ ১।৭।১৩।১২)।

ঋগ্বেদে অবতারবাদ তেমন স্পষ্ট ভাবে নাই। স্পষ্ট ভাবে নাই বলিবাব অর্থ—একটি মাত্র সূক্তে দেখা যায় ইন্দ্র বুধগণ বজ্রের কথা মেনা হইয়াছিলেন (ঋ ১।৫১।১০)। দেবতাদিগের বিভিন্ন রূপ ধারণের, পশু ও পক্ষীর রূপ ধারণের কথা অনেক বাব পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন ঋগ্বেদে সোজা স্তূতি দেবতা বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

তাঁহাদের মধ্যে দধ্যাক, মনু, কুংস, উশনা কাব্য, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা ও অথর্বন ঋগ্বেদের নাম করা যাইতে পারে।

বাড়-ফুঁকের মত লোকসমাজে প্রচলিত মন্ত্র-তন্ত্রেরও স্থান হইয়াছে ঋগ্বেদে। সপত্নীকে ক্রেশ দিব্যর ও স্বামীব প্রণয় লাভের জন্ত তীব্র শক্তিযুক্ত লতা ও মন্ত্রেব ব্যবহারের কথা আছে। মন্ত্রপূত লতা স্বামীর উপাধানে বাথিয়া সপত্নীপীড়িতা স্ত্রী বলিতেছে—

মা মনু প্র তে মনো বংসং গৌরিব ধাবতু পথা বাবিব ধাবতু, অর্থাৎ যেমন গাভী বংসেব প্রতি পাবিত হয়। যেমন কণা নিম্নপথে পাবিত হয় (ঋ ১।১১৪৫।৬) তেমনি যেন তোমাব মন আমার প্রতি পাবিত হয়।

অলম্বী নাশেব প্রক্রিয়া ও মন্ত্র আছে। জলে ভাসমান কাষ্ঠগুণ দেখাইয়া ঋগ্বেদেব বলিতেছেন,—এই কাষ্ঠগুণের স্বত্বাবিকার কেহ নাই। হে বিকপাকৃতি লম্বী, উহার উপর আবোহণ কবিয়া তুমি সমুদ্রপারে চলিয়া যাও। (ঋ ১।১১৫৫।৩)। দুইটি সূক্তে গভ-বক্ষাব মন্ত্র আছে। যম্মা নাশেব মন্ত্র দুইটি সূক্তে পাওয়া যায়। একটি সূক্তে ঋগ্বেদ বলিতেছেন,—আমি এই যে আর্জতি দিলাম তাহার ফলে হে বোগী, তুমি এক শত বংসব জীবিত থাকিবে—শতং জাবো শবদো ববমানঃ, শতং হেমন্তাঙ্কতমু বসন্তানি (ঋ ১।১১৬১)। হে বোগী, সূত্রে এক শত শবৎকাল জীবিত থাক, সূত্রে এক শত বসন্ত জীবিত থাক। ছংশম্মনাশেব মন্ত্র, শকবিনাশেব মন্ত্র দুইটি সূক্তে আছে। শকনাশে সকল ঋগ্বেদ ব্যঙ্গ কবিয়া বলিতেছেন,—অবশ্রদাম উরনত মতুকা ইবোদিকা মতুকা উরকাদিব (ঋ ১।১১৬৩)। আমি তোমাদের মস্তকে উঠিয়াছি। যেমন জনমধ্য হইতে ভেদেব চিৎকার করিতে থাকে তদ্রূপ তোমাব আমার চবৎতল হইতে চিৎকার কবিতে থাক।

## বৈদিক যুগের লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টির

### দ্বিতীয় পর্য্যায়

ঋগ্বেদেব দেব-সৃষ্টি প্রকরণে প্রথম লক্ষ্য কবিবার বিষয় নূতন দেবীর সংখ্যা। দ্বিতীয় লক্ষ্য কবিবার বিষয় দেবত্ব প্রদানে ঋগ্বেদের উদারতা। বৃক্ষ উপাসনা, সর্প উপাসনা, প্রস্তবোপাসনা, পশু উপাসনা পণ্ডিতগণের মতে প্রিমিটিভ ট্রাইব্যাল ধর্মের অর্থাৎ অনাথ জাতির ধর্মের লক্ষণ। বৌদ্ধ ধর্মের এই সকল অঙ্গকে তাঁহাব অনাথ জাতির ধর্ম হইতে গৃহীত বলিয়া মত প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু যে ঋগ্বেদকে যুরোপীয় পণ্ডিতগণ আথ জাতির সর্বপ্রাচীন দলিল বলেন, তাহাতে আথ জাতির ধর্ম এই সকল জিনিস পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতেছে। তৃতীয় লক্ষ্য কবিবার বিষয়, অবতারবাদ স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত না হইলেও প্রধান প্রধান দেবতার পার্শ্বচরূপে নূতন নূতন দেবতার (স্বী-দেবতার সম্বন্ধে একথা বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য) আবির্ভাব। চতুর্থ লক্ষ্য কবিবার বিষয়, প্রথমে প্রাচীন দেব-দেবী কাছে যে সকল লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত আবেদন করা হইত, ক্রমে নূতন সৃষ্ট দেব-দেবীর কাছে সেট সকল প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত আবেদন করা আরম্ভ হইল। ইহারাই ঋগ্বেদের লৌকিক দেব-দেবী।

বৈদিক যুগের দ্বিতীয় পর্য্যয়ে দেখা যায়, প্রাচীন দেবতাদিগের চরিত্র ও অবস্থাব পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং এক দিকে যেমন অভিজাত

শেখাব দেব-দেবীর বিশেষতঃ দেবীর সখা বাডিয়া চলিয়াছে, অতীতকৈ ফেরপ লৌকিক দেবদেবীর সখাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রথমে দ্বিতীয় পর্ধ্যায়ের লৌকিক দেব-দেবীর কথা বলা হইতেছে। লৌকিক দেব-দেবীর শাসন প্রধানতঃ কৃষিকার্য, সম্ভ্রানের জন্ম, ব্যাধি-নাশোপায়া এবং দুঃস্থ ও কুদৃষ্টি হইতে বক্ষা। এই কয়েকটি ব্যাপ্যাবের মধ্যে আবদ্ধ হইলেও তাঁহাদের জন্ম আরও নূতন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে দেখা যায়।

ঋগ্বেদে কৃষিকর্ম-সম্পর্কিত লৌকিক দেব-দেবী ক্ষেত্রপতি, সীতা-শন ও সীতের কথা বলা হইয়াছে। গৃহস্থস্বস্ত্যুজ্ঞিতে আবও কয়েক জন নূতন দেবতাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। গোতিল গৃহস্থবে দেখা যায়, সীতাকে কেন্দ্র করিয়া তাশা, ভবদা ও অনথা নামে তিন জন দেবী আবির্ভূত হইয়াছেন! ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্ত-বর্জন, শস্তমাত্রাই ও শস্ত গোলায় তুলিবার সময়ে ইহাদের পূজাব ব্যবস্থা আছে (৪।৪।২৭)। পাবস্বর গৃহস্থস্বস্ত্যে আবও তিন জন নূতন দেব-দেবতাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবপন, শস্ত-বর্জন প্রভৃতি কার্যের সময়ে যজা, শসা ও তত্ত্বিব পূজাব নির্দিষ্ট আছে (২।১৭।১৩)। ক্ষেত্রে লাদল চালনা করিবার সময়ে সীতা ও গল্পমতির পূজাব বিধানও আছে। ক্ষেত্রে লাদল সংযোজনা করিবার মধ্যে উদ্দা, পজ্জা ও অশ্বিনের সঙ্গে উদ্দা কাণ্ড ও হাতীকাবি নাম দুই জন নূতন দেবতার নিকট বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ঋগ্বেদে প্রাচীন দেবতা পৃথিবীর সঙ্গে ভূমি নামে এক জন নূতন দেবতা উদ্দেশ্য বলিদানের বিধান পাওয়া যায়।

শাংখ্যায়ন গৃহস্থস্বস্ত্যে ঘোদিগী নামে এক জন পশুচারণ ক্ষেত্রাদিষ্টারী দেবীর পূজাব বিধান আছে (৩।১।১)। পাবস্বর, তিব্যাকেশিন ও শাপস্বস্ত্য গৃহস্থস্বস্ত্যে গোপনের মঙ্গলের জন্ম পশুচারণের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি পূজাব বিবরণ পাওয়া যায়।

শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রীব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শাংখ্যায়ন গৃহস্থস্বস্ত্যে ঋগ্বেদে দুই জন নূতন দেবী ভদ্রকালী ও সর্বাঙ্গভূতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

তিব্যাকেশিন গৃহস্থস্বস্ত্যে গুরুব হস্তে শিবাকে অর্পণ করিবার মধ্যে বাচিনী ও অঘোরা নামে দুই জন নূতন দেবীর পূজাব বিধান আছে (৩।৩।৫)।

অথর্ববেদে দেবপত্নীদের সঙ্গে বাচি নামে এক জন নূতন দেবীর আবহন করা হইতেছে দেখা যায়। ইহাব কাণ্ড ও গুণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। অথর্ববেদে বসি নামে এক জন নূতন দেবীর সমাধ ও পাওয়া যায় (৭।১।৭৪)।

ঋগ্বেদে প্রায় সকল প্রধান দেবতাব নিকট ব্যাধি-নাশোপায়া প্রার্থনা করা হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে রুদ্র ও অশ্বিনের কীর্তি-কাহিনীর দীর্ঘ তালিকা অনেক বাব দেওয়া হইয়াছে ঋগ্বেদে। পববর্তী কালে দেব-চিকিৎসকের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন দেবতারা। শাংখ্যায়ন ও আশ্বলায়ন গৃহস্থস্বস্ত্যে পশুস্ত্যাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে তকমন একটি ব্যাধির নাম। তবমনকে দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদে সিনীবালীর চরিত্র অথর্ববেদে আবও বিকশিত হইয়াছে। সিনীবালী ও ভগ দেবতার নিকটে প্রার্থনা করা হইতেছে নব বিবাহিত দম্পতিকে সম্ভান দান করিবার জন্ম (অ, বে, ১৪।২।১৫, ২১)।

অহমতিব চরিত্রও অবিকশিত হইয়াছে। স্ত্রীলোক প্রণয়কে বশ করিবার জন্য তাঁহাব নিকট মাতাম প্রার্থনা বহিরাছে দেখা যায় (অ, বে, ৩।১৩।১১)। সিনীবালী, অহমতি, বাকা ও অহুস্ব সঙ্গে কৃত নামে এক জন দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শবিকালে তাঁহাকে তাম্রপাত্র হইতে চাটল ও যব প্রদান করিবার বিধান আছে (অ, বে, ২।৩৬; ৫।১।৪)।

ঋগ্বেদে নিশ্চি পববর্তী কালে এক জন মহা শক্তিশালিনী কৃষ্ণত্রেব অবিষ্টারী দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। তাঁহাব পাদগণের সখা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। মহাবাস্যেব যুগেব যবদা দুঃস্থ গ্রহ, অনিষ্টকারী অপদেবতাব বৃদ্ধা প্রাতিতামহী হইতেছেন এই নিশ্চি। বাড়-কুক, মন্ত্র-হস্ত, কবচ-তাবিজ, শাস্তি-স্বস্ত্যানেব সৃষ্টি নিশ্চিতির অল্পতব ও অল্পচৌদিগেব প্রভাব হইতে নিশ্চিতি পাইবার ইচ্ছা হইতে।

ঋগ্বেদে তিন নিশ্চিতির উল্লেখ আছে কিন্তু তাহাদের পৃথক কাণ্ড-কলাপেব পরিচয় নাই। (ঋ ১।১।১৪।২)। অথর্ববেদে নিশ্চিতিকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহী, দ্রহ, মংলি, অবাগী, অশতি নামে নূতন স্ত্রী-অপদেবতাব উদ্ভব হইয়াছে। দ্রহকে একবাব ঋগ্বেদে দেখা যায় (ঋ ৭।৫।১৮)। সম্ভ্রানের জন্মসম্প্রদায়ের সময় গ্রহীর নিকটে প্রার্থনা করা হয় (অ, বে, ২।১৪।৬)। মংলি ও তাঁহাব বহু কল্পা গোশালীয় উপদ্রব সৃষ্টি করে। (অ, বে, ২।১৪।১)। অবাতি নিলাময় শক্রগণেব নিকট স্বপ্নে নগ্নাকলাপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বুদ্ধি-ভ্রংশ করে (অ, বে, ৫।৭।৮, ১০)। গ্রহীর উপদ্রব হইতে বক্ষা পাইবার জন্ম দশবৃক্ষেব নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে দেখা যায় (অ, বে, ২।১।১)। নিশ্চিতির অল্পচৌ দলেব মধ্যে তবুদি ও মাব দিব নাম পাওয়া যায়। নিশ্চিতির সহচর দলেব মধ্যে কণ্ণনামধারী একটি দলেব উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা গর্ভস্থ জ্ঞান খইয়া ফেলে (অ, বে, ১।১।১২)। কৌশিকস্বস্ত্যে উদ্দা, অঘোরা ও শক্রজয় নামে তিন জন অল্পচবেব ও অল্পচৌব নাম পাওয়া যায় (অ, বে, ৬।১৩)। মানব গৃহস্থস্বস্ত্যে বিনায়কগণেব পূজাব বিধান আছে। বিনায়ক ও মহাসেন পবে সাক্ষেব নাম হইয়াছে। ভাবরাজ গৃহস্থস্বস্ত্যে মহাসেন ব্যাধির নাম (৩।১)। মহাকাব্যেব যুগে সাক্ষ হইতে স্ত্রী ও পুরুষ দুঃস্থ গ্রহগণের সৃষ্টি উপাখ্যান পাওয়া যায়।

বাস্কস, পিশাচ, দুঃস্থ গ্রহেব প্রভাব ও অনিষ্টকারী শক্রব কুজিয়ার প্রভাব হইতে নিশ্চিতি পবে মন্ত্রশক্তি ও বিশেষ প্রক্রিয়াব দ্বারা তদন্ত লাভেব উপায়েব বর্ণনায় কৌশিকস্বস্ত্যে পূর্ণ।

ঋগ্বেদের সর্প-উপাসনা পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে তে পল্লিত হইয়া উঠিয়াছে। অতিব্রূ নাম আবেপিত হইয়াছে। অকন্দেববেদে সর্পদেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে (১।১।১)। ঐন্দবেব ব্রাহ্মণে সর্পবাজীব স্তোত্র আছে। এই স্তোত্রে সর্পবাজীব পৃথিবীর মতিত অভিন্নকর্মে আহ্বান করা হইয়াছে (৫।২।৩)। শতপথ ব্রাহ্মণেও এইরূপ স্তোত্র বহিয়াছে (৪।৬।১।১৭)। সর্পের উদ্দেশ্যে শ্রাবণ মাসে বলিদানেব বিধান সবগুলি স্বস্ত্যে আছে। স্বব-সাহিত্যে সর্পকে প্রথমে নাগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কাহল, প্রসাদন দ্রব্য, মালা এবং তাহার্য নিবেদন করিবার ব্যবস্থা আছে। আশ্বলায়ন গৃহস্থস্বস্ত্যে কল্পদেবতাব মতিত সর্পদেবতাকে করিব দানেব কথা পাওয়া যায় (৮।২৭)। তিব্যাকেশিন গৃহস্থস্বস্ত্যে রুদ্রেব আবহন প্রসঙ্গে বলা হইতেছে, তিনি সর্পগণের সঙ্গে বাস করেন (১।৫।১১)।

# বিলম্বী বাংলা

শ্রী গঙ্গাধর চক্রবর্তী

৪

সূর্যাস্ত বিদেশের দাবাঙ্গি নিরূপিত হইতে না হইতেই মেদিনীপুর অঞ্চলে জঙ্গল মহালের চূয়াড়গণ পুনর্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মৌবকাশিম কর্তৃক মেদিনীপুর ইংরেজের হস্তে সমর্পণ এবং স্থানীয় অধিবাসিগণ ইংরেজের অধিকাংশ কিছুতেই মানিয়া লয় নাই।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জঙ্গল মহালের চূয়াড়গণ মেদিনীপুরের পশ্চিমে শিলদা পর্বতগণের অন্তর্গত দুইটি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া ইংরেজ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মে মাসে তাহারা বায়পুর্বে বরফের উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়িয়া পড়ে। জুলাই মাসে গোবর্দ্ধন দিকপতি নামক এক বাগ্‌দী সর্দারের অনীশে চাবিশত বিদ্রোহী চন্দ্রকোণা থানার এলাকায় উপস্থিত হয়; পবে তাহারা কাশীজোড়া, তমপুক, জলেশ্বর, ময়না, নাবায়ণগড় প্রভৃতি পর্বতগণ প্রবেশ করিয়া ইংরেজ-কর্তৃক বিপন্ন করিয়া তোলে। ক্রমশঃ সাফল্য লাভ করায় তাহাদের সাহস বাড়িয়া উঠে এবং ঐ বৎসরে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সাঁথালি পুত্র গ্রাম সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া লয়। মেদিনীপুরের নিকটবর্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়ে চূয়াড়দিগের দুইটি প্রধান আড্ডা ছিল। এই দুইটি কেন্দ্র হইতে তাহারা অভিযানে বাহির হইত।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠস্থিত কংকটী গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া ও জ্বালাইয়া দিয়া চূয়াড়গণ প্রচণ্ড কবিত্ত লাগিল যে, কৃষকগণ অন্ধকার বজনীতে তাহারা মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিবে। ইংরেজ কালেক্টরের আশঙ্কা হইল যে, তাহারা ভোম্বাপানী লুণ্ঠন কবিত্ত পাবে। কারণ ভোম্বাপানীর তখন মাত্র ২৭ জন প্রহরী ছিল, আর অক্ষাণ্ড হইলে তাহারা পলায়ন না করিয়া যে যুদ্ধ করিবে তাহা সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। তদানন্তর কালেক্টর Julius Mihoff ৭৬ মাঠ বোর্ডের নিকট এক পত্রে লিখিলেন—“চূয়াড়দিগকে দমনের কোন চেষ্টাই হইল না, যদিও তাহারা প্রতিদিন প্রজাদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার কবিত্তেছে, তাহাদের অত্যাচারে নিবীচ প্রজাবৃন্দ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহর আসিয়া আশ্রয় লইতেছে।”

১৬ই মার্চ চূয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণের ফলে দুই জন কোম্পানী-সিপাহী ও কয়েক জন স্থানীয় অধিবাসী নিহত হয়। অবশিষ্ট সিপাহী সকল মেদিনীপুরে পলাইয়া আসে। কিন্তু মেদিনীপুরে নিরাপক ছিল না। ১৭ই মার্চ তারিখে মেদিনীপুরের কালেক্টর কর্ণেল ডনকে এক পত্রে জানান যে, ঐদিন বাত্রিকালে মেদিনীপুর সহর লুণ্ঠনের সম্ভাবনা আছে এবং সেই জন্ত তিনি ভোম্বাপানীর টাকা বৃক্জগাণায় রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ইহার পবে ২১শে মার্চ তারিখের পত্র হইতে জানা যায় যে,

পূর্বোক্ত বাত্রিতে চূয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর দখল করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল এবং সেই সংবাদ পাঠিয়া মহরবাদী অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল; কিন্তু কোম্পানীর দেওয়ানের চতুর্ভাষী তাহা আব কাথো পবিত্র হইতে পাবে নাই। তিনি প্রচণ্ড করিলেন যে, চূয়াড়দিগের সহর আক্রমণের সংবাদ পাঠিয়া কর্তৃপক্ষ দুই দল দেশীয় সিপাহী ও পঞ্চাশ জন ইংরাজ সৈন্য সহবে আনিয়া

বাখিয়াছেন। সেই সংবাদ পাঠিয়া চূয়াড়গণ মেদিনীপুর সহর আক্রমণ করিতে আব অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সহরবাসীরা আতঙ্ক বায় নাই; তাহাদের অনেকেই বাত্রিকালে পবিবাববর্গ ও অর্থাদি সঙ্গে লইয়া কালেক্টরের গৃহপ্রাঙ্গণে রাতি রাখিয়া কবিত। দিবাভাগেও সহরের বাহিরে যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মেদিনীপুরের তদানন্তর কালেক্টর বোর্ডকে এই বিষয়ে প্রতিকারের জন্ত পত্র লিখেন।

কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ চূয়াড়দিগকে দমনের জন্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া কর্ণগড় ও আবাসগড় আক্রমণ করেন। চূয়াড়দিগের সহিত মহযোগিতার সন্দেহ হেতু কর্ণগড়ের জমিদার বাবী শিবোমণিকে বন্দী করিয়া ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুরে আনা হইল। ২০শে মে তারিখে আবও পাঁচ দল সিপাহী মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ৭ই জুলাইর অন্তর্গত আনন্দপুর প্রভৃতি দুইটি কেন্দ্রে সুরেদার, জমািদার, হাবিদার প্রভৃতি ৩০ জন সৈনিক কয়দারী বন্ধিত হয়। কয়েক বারবার ফলে চূয়াড়গণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া এক পর্বতগণ হইতে অপর পর্বতগণে বিতাড়িত হইতে লাগিল। জুন মাসের মধ্যে চূয়াড়গণের দ্বারা অধিকৃত সমস্ত গ্রাম কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ তাহাদের দখলে আনেন। ইহার পবে তাহারা দলবদ্ধ পাবে আর কোন আক্রমণ করে নাই। চূয়াড়-বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব কালেক্টর করায় ও সের্গেন্ট অফিসার জে. সি. প্রাইস বলেন যে, জায়গীর বাজেরাশু হওয়ায় সবদার ও পাটকগণ উন্নয় প্রায় হইয়া সবকারের বিরুদ্ধাচরণ কবিত্ত থাকে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের এই অভিযানের ফলে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ ভীত হইয়া তাহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিবেন। জঙ্গল অঞ্চলের সকল হুদাঙ্গ জাতিই ঐ সকল জায়গীরদারদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটদের আক্রমণ কবিত। মেদিনীপুরের স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্যগণ তাহাদিগকে শাসন করিতে পাবে নাই— বাহির হইতে প্রতিবন্ধ সৈন্য আমদানি করিয়া তাহাদিগকে দমন কবিত্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৭শে মে তারিখে বোর্ডের নিকট লিখিত জেলা-কালেক্টরের পত্রে জানা যায় যে, পাটকান জমি বাজেরাশু করাতেই গোলমাল বাড়িয়া উঠিয়াছিল। চূয়াড়দিগকে অসভ্য ও অশিক্ষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, চূয়াড়গণ ইংরেজ শাসন প্রণালীর সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তাহারা যখন দেখিল যে, সহসা তাহাদের পুরুষানুক্রমে অধিকৃত জমি পুলিশের দ্বারা বাজেরাশু হইতেছে তখন তাহারা মনে করিল, তাহাদের দ্বারা এই কাজ হইতেছে তাহাদের নিকট ইহার প্রতিকারের আশা বলা বৃথা; সেই জন্ত তাহারা অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির স্বাভাবিক নিয়মে বিদ্রোহী হইয়া দেশ মধ্যে লুণ্ঠন ও অত্যাচারে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, রাজস্ব আদায় এক প্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।”

এই কারণে কাউন্সিলের সহকারী সভাপতিও পাইকান জমিদারস্বা সম্পর্কে বোর্ডকে তিরস্কার করেন। রাজস্ব হ্রাস ও আদায়ের বিশৃঙ্খলা বিষয়ে অমনোযোগের জন্যও বোর্ড নিন্দিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য বোর্ড স্থির করেন, চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারণিত না হওয়া পর্যন্ত পাইকান জমিদার বন্দোবস্ত স্থগিত থাকিবে। পুলিশের দাবোগাণে চুয়াড়দিগের আক্রমণ নিবারণে অক্ষম হওয়ায় জঙ্গল মহালের জমিদারদিগের হস্তে এই সময় পুলিশের ক্ষমতাও প্রদত্ত হইয়াছিল। যে সকল জমিদারের প্রজাণা চুয়াড়দিগের লুণ্ঠনে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সকল মহালের রাজস্ব আদায় সম্পর্কেও কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ শৈথিল্য প্রদর্শন করেন।

জঙ্গল-খণ্ডে কোম্পানীর সম্পূর্ণ দখলে আসিবার পূর্ব ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ, বর্ম্মান, মানভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে কয়েকটি করিয়া জঙ্গল-মহাল নামে একটি নূতন জেলা গঠন করা হয়। তৎকালে এই জেলার তেইশটি মহাল ছিল এবং এক জন ইংলাজ ম্যাজিস্ট্রেট তথায় সর্বোচ্চ অবস্থান করিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই জেলাটির অস্তিত্ব ছিল। পরে উহা উঠাইয়া দিয়া উত্তর অন্তর্গত মহালগুলি পার্শ্ববর্তী জেলা কয়েকটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

জঙ্গল-খণ্ডে চুয়াড়দিগের বিদ্রোহ নিবারণিত হইতে না হইতে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের উত্তরাংশের বনজাতিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মেদিনীপুরের এই বিদ্রোহ “বগড়ী

নাএক হাঙ্গামা” নামে পরিচিত। নাএকগণ প্রায় চুয়াড়দিগেরই সমশ্রেণীভুক্ত। তাহারা কুন্সুট-নামে আত্মকবিলেও হিন্দুধর্মে আস্থাবান ও গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান ছিল। বগড়ী রাজবংশ কর্তৃক উত্থাপিত জায়গীর নিদ্বিষ্ট ছিল। উত্তরা গৌড় জায়গীর ভোগ করিত এবং আবঙ্গক হইলে রাজ-সরকারে পাঠক-সৈন্যের দ্বারা কবিত। কোম্পানীর আমলে বগড়ী পাঁচ ছয়মাসে রাজ্যচ্যুত হইলে বগড়ী জমিদারী ভিন্ন ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা হয় এবং নাএকদিগের জায়গীরও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ছয়মাসের পরে বহুসংখ্যক নাএক আপন বৃত্তি ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অচলসিঁহ নামক জনৈক ছদ্ম সৈনিক পুন্সের নেতৃত্বে ইংলাজ-শক্তির বিরোধে যথেষ্ট বন্ধপবিকর হয়।

নাএকগণ গড়বেতার নিকটবর্তী নিবিড় বনজমিন-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বগড়ী কেন্দ্র হইতে প্রান্তস্থল পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জলিয়া উঠিল। নাএকগণ ইংলাজ-অধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্তী যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্বজাতীয় নব-নাবীর আতঙ্কের কারণ হইয়া উঠে। এই আক্রমণের ফলে কোম্পানীর শক্তির মূলকেন্দ্র বিশেষ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়ে।

গড়ব জেলাবলের আদেশে ওকেলী নামক জনৈক ইংলাজ এক দল বুটিশ সৈন্য লইয়া বগড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গণগণিত অবশ্যে বনজাতীয় অশিক্ষিত নাএকগণের সহিত অশিক্ষিত ইংলাজ সৈন্যের সংঘর্ষ অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। নাএকগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বৃদ্ধ করিত না, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে



**আর্থনিক**  
**গিনি সোনার**  
**অলঙ্কার বৈচিত্রে**

RCD

Phone  
3468-B.B

SA-A  
KARTICK

**আর্টিজ্যানের**  
**জোঁক**

**আর, সি, দে ও সন্ন**

**ডুয়েলার্স**

**১১১-বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা**

মুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ ভাবে ইংরাজ সৈন্যের উপর পতিত হইয়া তাহাদের ভাষণ ভাবে আক্রমণ করিত। এইরূপে ইংরাজ সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে পর ইংরাজ সৈন্যদ্ব্যক্ষ এক দিন দ্বাদ্দে কয়েকটি কামান একত্রিত করিয়া ক্রমাগত গোলাবর্ষণে সমস্ত বৈদ্যুতিক বিদ্যুত করিয়া ফেলিল। নাকগণ এই আক্রমণের ফলে প্রমাদ গণিল। অনেকেই প্রাণ হারাইল। তাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারা গোলাব সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। ইংরাজ সৈন্য সেট বাদে নাকদিগের সমস্ত আবাস-স্থল ধ্বংস করিয়া দেয়।

পবদিন বুধশাখা, বনান্তরালে ও নদীর নিকটবর্তী স্থান সমূহ হইতে বহুসংখ্যক নাক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল, কিন্তু অচলসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। ইংরাজ সৈন্যদ্ব্যক্ষ তাঁহাকে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক জন সৈন্য বগড়াতে বাগিয়া অবশিষ্ট সৈন্য জগলী ও মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

অচলসিংহ গণগণিব বন হইতে পলাইয়া গিয়া জঙ্গলময় বগড়াব পশ্চিম প্রান্তস্থ প্রদেশে যে আব একটি বন দেখিতে পাওয়া যায় সেই বনে আড্ডা স্থাপন করেন। যে সকল নাক ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে চাৰি দিকে পলায়ন করিয়া জীবন বাঁচাইতে পারিয়াছিল, তাহারা আবার একে একে আসিয়া অচলসিংহের নূতন শিবিরে সমাগত হইল। ইহা ছাড়া রাজপুত ও মহাবাহাদ্রীগণও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া অচলসিংহের দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। তাহারা ইংরাজ অধিকৃত পল্লীসমূহে আপতিত হইয়া পল্লীবাসী বধ্যসর্ধ লুণ্ঠন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যে সকল ইংরাজ সৈন্য অচলসিংহকে বন্দী করিবার জ্ঞা বগড়াব জঙ্গলে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইল। এই স্বযোগে বগড়াব রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহ বিশ্বাসবাতকতা পূর্বক অচলসিংহকে ইংরাজ সৈন্যদ্ব্যক্ষের হস্তে ধবাইয়া দিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নাক বীর অচলসিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিশপ্ত সম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

অচলসিংহের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিলে নাকগণ তাহাদের দলস্থ অন্যান্য সৈনিক পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন দলের দলপতি পদে বরণ করিয়া আরও কিছু দিন ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য নাকগণকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত করে। তাহাদের আবাস-স্থল ধ্বংস করিয়া ১৭ জন দলপতিকে ধৃত করিয়া প্রকাশ্য স্থানে কাঁসী দেওয়া হয়। ঐ বৎসরে প্রায় ২০০ বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।

বগড়ার রাজা যাদবচন্দ্রের রাজত্বকালে মেদিনীপুরে মোগল-শাসন বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে ইংরাজ কণ্ঠ্যবী বগড়া রাজ্যে বার্ষিক কর নিদ্বারণের জন্য রাজপ্রাসাদে সমাগত হন। জনশ্রুতি, তাহারা কোন

চুষ্ট লোকের বডবস্ত্রে নিহত হওয়ায় কোম্পানী রাজা যাদবচন্দ্রকে বিদ্রোহী স্থিৎ করিয়া রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং রাজাকে কারাবদ্ধ করিয়া কলিকাতায় লইয়া যান। যাদবচন্দ্র সে অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ১৭১০ সালে আত্মহত্যা করেন।

যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হইলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় তাঁহার পুত্র ছত্রসিংহ নির্দিষ্ট বাজস্ব ইংরাজ কোম্পানীকে দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় বাজ্যধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিরুপিত সময়ে উহা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজ বণিক দল সমস্ত বগড়া রাজ্য গ্রাস করিয়া লয়। মাত্র বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার আয়েব “তবফ বেতলা” নামক জমিদারীর স্বত্ব রাজাকে প্রদান করেন। রাজা গডবাড়ী পবিত্যাপ করিয়া পিতামহ গুমসেবের প্রতিষ্ঠিত মঙ্গলাপোতা গ্রামেব বাগান-বাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় অচলসিংহের নেতৃত্বে নাক-বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ইহভাগ্য রাজা ছত্রসিংহ সেই স্বযোগে ইংরাজ-কোম্পানীর রূপাদৃষ্টি লাভেব আশায় এর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জ্ঞা বিশ্বাসবাতকতা করিয়া অচলসিংহকে ইংরাজ সেনাপতিব হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু ছত্রসিংহ যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাট। ইংরাজ বণিক দল তাঁহাকেও সেই হান্সারাব অগ্নতন নেতা স্থিৎ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে দশ বৎসরের জ্ঞা কারাবদ্ধ করিলেন। পরে তিনি মুক্তিলাভ কবিলে তাঁহাকে বার্ষিক ছয় সহস্র টাকার একটি বৃত্তি দেওয়া হয়। ছত্রসিংহের কোন পুত্র না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র উত্তরাধিকারী মায়াস্ব হন এবং আজীবন কাল বার্ষিক তিন সহস্র টাকার একটি বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

নাকের স্বভাবতঃই উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল, তাহার উপর ধৃত হইলে তাহাদের প্রাণদণ্ড যে অনিবার্য, ইহা জানিত বলিয়াই তাহারা শেষ রক্তবিন্দু দিয়া কোম্পানীর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিত। এই কারণে নাক-বিদ্রোহ মেদিনীপুর জেলায় কিরূপ ভাষণ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত মিঃ হ্যামিলটনের বিবরণ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছিলেন,— “বঙ্গলার অগ্নাত প্রদেশে ব্রিটিশ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইলেও ব্রিটিশ রাজধানী কলিকাতা হইতে মাত্র ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানেব প্রজারা নিরাপদ নহে। সে দেশে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কাহাবও সাক্ষী দিবার সাহস নাই, তাহা হইলে অত্যাচারিগণ সাক্ষ্যকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিবে না।”\*

[ ক্রমশঃ ।

\* T. C. Price—The Chuar Rebellion of 1799. District Gazetteer—Midnapore. মেদিনীপুরের ইতিহাস।

“চিন্তা না ক’বে কথা বলা যানে লক্ষ্য না ক’রে বন্ধু  
ছোঁড়া।”

—স্পেনীয় প্রবাদ।

# অন্ধৈক বসুমতী..

রূপচর্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে... নূতন এসে করে  
পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—  
সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষায় নিজের মধ্যে  
জোগে রয়েছে চিরদিন.....কেনই যে তার অন্ধৈক  
রূপ! দে-রূপ সাধনার এ-যুগের লক্ষণগাথিত আদিক  
অবাকুস্ম।



সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ অরাকুস্ম হাউস, কলিকাতা।  
GKJ-81/CPS



# বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-৪

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৮৮৩

৩৬০। **সখা** (মাসিক) : জামুয়ারি ১৮৮৩।

বালক-বালিকা-পাঠ্য সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক—প্রমদাচরণ সেন। ১৮৮৫ সনের ২১এ জুন প্রমদাচরণের মৃত্যু হইলে পরবর্তী জুলাই মাসে প্রকাশিত ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা হইতে ৪র্থ বর্ষ (ইং ১৮৮৬) পর্যন্ত ‘সখা’ সম্পাদন করেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। তাহার পর অন্নদাচরণ সেন পত্রিকা-পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। শেষ তিন-চার বর্ষের—বিশেষ করিয়া ১১শ-১২শ বর্ষের (১৮৯৩-৯৪) ‘সখা’ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩৬১। **যশোহর প্রবাহ** (মাসিক) : ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

এই নামের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি মাসিক পত্রিকা—যশোহর বরগুণি গ্রাম হইতে শশিভূষণ মোদকের সম্পাদনায় ফেব্রুয়ারি মাস হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৩৬২। **ভারত-দর্পণ** (সাপ্তাহিক) : ১ ফাল্গুন ১২৮৯।

৪৬ নং পটুয়াটোলা লেন হইতে এক পয়সা মূল্যে প্রতি সোমবার প্রচারিত হইত। সম্পাদক—ভাবকনাথ বিষ্ণু।

৩৬৩। **উত্তরবাসিনী** (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

সম্পাদক—দ্বাবকানাথ মজুমদার।

৩৬৪। **মুকুলমালা** (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

কাশীকুণ্ডব ঘাট, ফরাসী চন্দ্রনগর হইতে প্রকাশিত।

৩৬৫। **বসন্ত সমীরণ** (সাপ্তাহিক) : ফাল্গুন ১২৮৯।

শালকিয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—এম. এন. বর্মণ।

৩৬৬। **সঞ্জীবনী** (সাপ্তাহিক) : ৩ বৈশাখ ১২৯০।

এই সুপরিচিত সংবাদপত্রখানির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন—দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর স্কুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন। প্রথম দিকে দ্বাবকানাথই প্রধানতঃ পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। গগনচন্দ্র হোমের ‘জীবন-স্মৃতি’তে প্রকাশ :—“স্বত্বাধিকারি ছাড়িয়া দিলেও ১১০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক ও প্রধান প্রবন্ধ-লেখকরূপে এই সংবাদপত্রের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম।”

৩৬৭। **সময়** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২৯০।

রাজনীতি, সাহিত্য, সংবাদ এবং বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র ; ‘সঞ্জীবনী’র স্থায় ইহাবও নগদ মূল্য ছিল দুই পয়সা। সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস, এম-এ, বি-এল।

৩৬৮। **সারস্বত পত্র** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২৯০।

ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে প্রকাশিত। প্রথম সম্পাদক—রাজবাহারী দাস ; পরে উমেশচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষের জামাতা।

৩৬৯। **বঙ্গমহিলা** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

“জ্ঞানের অধিকার বর্ধন ও গৌরব স্থাপন ইহার উদ্দেশ্য।... বাঙ্গালির অন্তঃপুরে যেখানে অজ্ঞানতিমির চিরবিরাজমান, যেখানে ঐক্যের পণ্ডিতগণের বিতর্কিত জ্ঞানালোক লঙ্ঘপ্রবেশ হয় না, সেই

স্থানে থাকিয়া স্বার্থ সাধন করিবে।” সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

৩৭০। **কিরণ** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

নান্নার ভারত-সুস্থ যাত্রা হইতে এই পত্নময়ী পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইত। পরিচালক—কালীশঙ্কর দে।

৩৭১। **হানিমান** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

“সদৃশ-চিকিৎসা বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।” সম্পাদক—বসন্তকুমার দত্ত।

৩৭২। **হোমিওপ্যাথিক প্রচারক** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—পূর্ণচন্দ্র সেন।

৩৭৩। **বৈষয়িক তত্ত্ব** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

তাহিরপুর দাতব্য-কৃষিকার্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বঙ্কবিহারী খাঁ। ১ম ভাগ মাসিক আকারে অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষে ‘বৈষয়িক তত্ত্ব’ ত্রৈমাসিক পত্রিকা-পরিণত হয়।

৩৭৪। **তরঙ্গিনী** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

মজঃফরপুর হইতে প্রচারিত। বিহাবে ইহাষ্ট প্রথম বাংলা মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামসত্য মুখোপাধ্যায়।

৩৭৫। **দ্রব্যগুণতত্ত্ব** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৩৭৬। **মুকুলমালা** (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯০।

সম্পাদক—কেদারনাথ ঘোষাল।

৩৭৭। **নব্যভারত** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। সম্পাদক—দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী। ১৩২৭ সালের ১৮ই আশ্বিন দেবীপ্রসন্ন পরলোকগমন করিলে প্রভাত-কুসুম রায় চৌধুরী পিতাব প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাখানির পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। সম্বৎসরমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপত্নী ফুল্লনলিনী ১৩২৮ সালের আশ্বিন-কার্তিক যুগ-সংখ্যা হইতে ‘নব্যভারত’-এ সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানি ৪৩শ বর্ষ (বঙ্গাব্দ ১৩৩২) পর্যন্ত চলিয়া লুপ্ত হয়।

৩৭৮। **কৌমুদী** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

সম্পাদক—হারাণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৩৭৯। **যোগিনী** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

পরিচালক—উমাশঙ্কর বাগচী।

৩৮০। **লগনা সুন্দরী** (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯০।

পরিচালক—মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৮১। **সহচরী** (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯০।

সম্পাদক—বীরেশ্বর পাণ্ডে।

৩৮২। **কলির নূতন অবতার** (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২৯০।

পরিচালক—লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।

৩৮৩। **সচিত্র বঙ্গীয় রহস্য** (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২৯০।

আদরিণী প্রেস হইতে কৃষ্ণেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কেবল কথা-সাহিত্যই স্থান পাইত। স্বত্বাধিকারী—তারকনাথ বিশ্বাস।

৩৮৪। **পাক-প্রণালী** (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২৯০।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৩৮৫। **শক্তি** (সাপ্তাহিক) : ৪ আষাঢ় ১২৯০।

শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার কলিকাতা

হইতে প্রকাশিত হইত।

৩৮৬। ভারতভূমি (সাপ্তাহিক) : ১১ শ্রাবণ ১২১০।

শান্তিপুত্র হইতে প্রকাশিত।

৩৮৭। হীরাপ্রভা (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১০।

প্রকাশক—অন্নদাপ্রসাদ দাস।

৩৮৮। দৈনিক বার্তা (দৈনিক) : ১ আগষ্ট ১৮৮৩।

প্রকাশক—গিরীন্দ্রলাল চৌধুরী, হুগলী।

৩৮৯। উদ্বোধন (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২১০।

৩৯০। নন্দিকেশ্বর (মাসিক) : ভাদ্র ১২১০।

সচিত্র রহস্যাক্ষর মাসিকপত্র। সম্পাদক—সত্যচরণ গুপ্ত।

৩৯১। আলোক (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২১০।

শ্রুত সংবাদপত্র, নগদ মূল্য আশ পয়সা।

৩৯২। ব্রাহ্মণ (মাসিক) : ভাদ্র ১২১০।

আর্য্যধর্ম-প্রচারিকা মাসিকপত্র। সম্পাদক—তেজশচন্দ্র বিদ্যানন্দ।

১৩০১ সালে 'বেদব্যাসের' সহিত সম্মিলিত হইয়া 'বেদব্যাস ও ব্রাহ্মণ' নাম ধারণ করে।

৩৯৩। বালিকা (মাসিক) : ভাদ্র ১২১০।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, বালিকা-পাঠ্য পত্রিকা। সম্পাদক—দক্ষকুমার গুপ্ত।

৩৯৪। আন্দোলন (মাসিক) : ভাদ্র ১২১০।

সম্পাদক—নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

৩৯৫। কলিকাতার নিগূত তত্ত্ব (মাসিক) : আশ্বিন ১২১০।

পরিচালক—নন্দলাল সবকার।

৩৯৬। নন্দব চাঁদ (মাসিক) : আশ্বিন ১২১০।

হাস্যপ্রধান পত্র। পরিচালক—দুর্জয় গুপ্ত।

৩৯৭। ভারতবর্ষিক (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২১০।

ইহাতে বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদাদি স্থান পাইত।

৩৯৮। সংসার (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন (?) ১২১০।

কলিকাতা, কানীপুর হইতে প্রকাশিত।

৩৯৯। স্বপ্নবাসিনী (সাপ্তাহিক) : কার্তিক ১২১০।

বঙ্গমহিলা-পরিচালিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। কলিকাতার ঠাণ্ডা অঞ্চল হইতে প্রকাশিত।

৪০০। ষ্টিম পত্রিকা (পাক্ষিক) : কার্তিক ১২১০।

৪০১। বাল্যবন্ধু (মাসিক) : কার্তিক ১২১০।

বালকপাঠ্য ষষ্ঠতত্ত্ব বিষয়ক পত্র। সম্পাদক—জে-ই-পেন।

৪০২। কৃষিপদ্ধতি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১০।

ববাহনগর নাসারি হইতে প্রকাশিত কৃষি বিষয়ক পত্র।

সম্পাদক—উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪০৩। পঞ্চপ্রদীপ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১০।

১৭ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে অগ্রহায়ণ মাসাবধি প্রকাশিত হইবে বলিঙ্গা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৪০৪। চণ্ডমা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১০।

৪০৫। বস্তুবিজ্ঞা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১০।

নরগ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিপদ চক্রবর্তী।

৪০৬। নীহার (মাসিক) : পৌষ ১২১০।

ইং ১৮৮৪

৪০৭। মুসলমান (সাপ্তাহিক) : জানুয়ারি ১৮৮৪।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসাবে এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র জানুয়ারি মাস হইতে প্রকাশিত হইবে বলিয়া অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

৪০৮। পাক্ষিক সমালোচক (পাক্ষিক) : ১ম পক্ষ, ফাল্গুন ১২১০।

বিবিধ-বিষয়ক পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন। স্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। 'পাক্ষিক সমালোচক' সম্বন্ধে ঠাকুরদাস লিখিয়া গিয়াছেন :—“আট মাস কাল সতঃ ও সম্মানের সহিত চলিয়া, সাহিত্যের সু-আহার্য্য অভাবে উহা এক বৎসর পরে এ দেশীয় অনেকানেক পত্রিকারই মত পিছুলাকে বিনোদন হয়।...প্রথম আট মাসের অধিক কাল উহার সঙ্গে আমার লেখনীর ও সম্পাদকীয় কর্তব্যের সংশ্রব ছিল না।...পাক্ষিকেই বোধ হয়, আমার প্রবন্ধ লেখার প্রথম হাতে-ঝড়ি।”

৪০৯। অদ্বুত ইন্দ্রজাল (মাসিক) : ফাল্গুন ১২১০।

ইহাতে ইন্দ্রজাল বা ম্যাজিকের কথাই স্থান পাইত। পরিচালক—গিরীন্দ্রলাল ঘোষ, টালা।

৪১০। সচিত্র পারত কুসুম (মাসিক) : ফাল্গুন ১২১০।

ইহাতে পারত-উপাখ্যান প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৪১১। রত্নসিংহ (মাসিক) : ফাল্গুন ১২১০।

প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৪১২। রহস্য সংগ্রহ (মাসিক) : চৈত্র ১২১০।

প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

৪১৩। সোহাগিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

সম্পাদিকা—কুম্বরঞ্জিনী বসু ও শ্যামসিনী দে।

৪১৪। তপস্বিনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

প্রকাশক—জীবনচন্দ্র ভক্ত।

৪১৫। কুমুমমালা (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

৪১৬। চিকিৎসা-সম্মিলনী (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগির ও কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন।

৪১৭। ব্রাহ্মজীবন (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

“যাহাতে ব্রাহ্মগণ উপাসনালীল হন এবং পারিবারিক সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্ম ধর্মামুসারে সম্পন্ন করেন, ইহাই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।” ‘ধর্মবন্ধু’ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

৪১৮। সংসঙ্গ (মাসিক) : বৈশাখ ১২১১।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে।

৪১৯। ভূবণ্ডী কাকের নকশা (মাসিক) : আষাঢ় (?) ১২১১।

বিজ্ঞপাদক পত্র। প্রকাশক—অধিকাচরণ মোদক।

৪২০। রত্নাকর (পাক্ষিক) : আষাঢ় ১২১১।

ঢাকা শীতল প্রেস হইতে বংশীনাথ বসাক কর্তৃক হিন্দুধর্মপ্রচারক এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।

৪২১। ভূত (মাসিক) : আশাঢ় (?) ১২১১।

ব্যঙ্গরচনামূলক সচিত্র পত্র।

৪২২। জাহ্নবী (মাসিক) : আশাঢ় ১২১১।

“সর্বথা আজি মানব পশুনাংপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জগাই জাহ্নবীর অবতারণা।” সম্পাদক—বীবেশ্বর পাণ্ডে

৪২৩। নবজীবন (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১১।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র। সম্পাদক—‘সাধারণী’-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সবকার। প্রথম ৫ বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহাব পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্দ্র-শুল্কর ত্রিবেদীর হাতেরপিড়ি হয় এই ‘নবজীবনে’; তাঁহার প্রথম রচনা—‘মহাশক্তি’ ১ম বর্ষেব পৌষ-সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

৪২৪। প্রচার (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১১।

ভামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্বাভাগে বাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্রটি প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—“নবজীবনের পনব দিন পরে, প্রচারের ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়।” ‘প্রচার’ ৪ বৎসর (১২১৫ সাল পর্য্যন্ত) চলিয়া লুপ্ত হয়।

৪২৫। কালভৈরব (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১১।

বিজ্ঞপাত্তক পত্র। সম্পাদক—মাখনলাল চক্রবর্তী।

৪২৬। গৃহস্থালী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১১।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

৪২৭। আলোচনা (মাসিক) : ১৫ই তাদ্র ১৮০৬ শক।

ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের পত্র। সম্পাদক—গগনচন্দ্র হোম। প্রথম ২ বৎসর। গগনচন্দ্র ‘জীবন-স্মৃতি’তে বলিয়াছেন :—“বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও ‘আলোচনা’ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাতার ছিল আমার উপর।”

৪২৮। আয়বন্ধু (মাসিক) : আশ্বিন ১২১১।

শাস্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। হিন্দুধর্মের প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত কালনা সভার মুখপত্র।

৪২৯। বয়স (মাসিক) : আশ্বিন (?) ১২১১।

চুঁচুড়া অল্প প্রেস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিপিন-বিহারী দত্ত।

৪৩০। পতাকা (সাপ্তাহিক) : কার্তিক (?) ১২১১।

সম্পাদক—জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম-এ, বি-এল। বছর-দুই পরে ইহা ‘সুরভি’র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সুরভি ও পতাকা’ নাম ধারণ করে।

৪৩১। সমাজ সংস্কার (মাসিক) : কার্তিক ১২১১ (?)।

সম্পাদক—বিহারীলাল দাসগুপ্ত।

৪৩২। আয়র্কেন্দ-সমীকরণ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২১১।

আয়র্কেন্দীয়-চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অনুমতি অনুসারে কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন এবং কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনের তত্ত্বাবধানে ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও কবিরাজ হরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্তৃক সম্পাদিত।

ইং ১৮৮৫

৪৩৩। ভোক্তবাজী (মাসিক) : মাঘ ১২১১।

ইন্দ্রজাল, বসায়ন ও ম্যাজিক সম্বন্ধীয় বালক-পাঠ্য পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু।

৪৩৪। ভারত (মাসিক) : মাঘ ১২১১।

বাগবাজার বালক-পাঠ্য-সমাজ হইতে রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৩৫। রাজ চিকিৎসক (মাসিক) : ফাল্গুন (?) ১২১১।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামচন্দ্র মল্লিক।

৪৩৬। পবিত্রাম (মাসিক) : ফাল্গুন ১২১১।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ইহা ক্ষুদ্র গ্রাম জয়রামপুর হইতে যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইত বটে, কিন্তু নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত না।

৪৩৭। প্রস্তুতিশিক্ষা নাটক (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২১২।

নাটকীয় সংলাপের দ্বারা লিখিত। সম্পাদক—প্রমথনাথ দাস, এম-বি।

৪৩৮। বালক (মাসিক) : বৈশাখ ১২১২।

সম্পাদক—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’তে লিখিয়াছেন :—“বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, স্বধীন্দ্র, বালেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাদেরও রচনার ভাব গ্রহণ করিতে বলেন।” এক বৎসর সর্বোত্তম চলিবার পর ‘বালক’ ‘ভারতী’র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

৪৩৯। ভারতবাসী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১২।

কলিকাতার পি, এম, সুর কোম্পানির যত্নে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিন্দ্রদাস গড়গড়ী।

৪৪০। দৈনিক (প্রাত্যহিক) : বৈশাখ ১২১২।

বঙ্গবাসী-কার্যালয় হইতে এক পয়সা মূল্যে এই সুলভ পত্রিকাখানি কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই স্বেচ্ছামোহন সেনগুপ্ত বিতারক সম্পাদক হইয়া প্রায় ১৪ বৎসর ‘দৈনিক’ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৪৪১। কৃষি গেজেট (মাসিক) : বৈশাখ ১২১২।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক—গিরিশচন্দ্র বসু, বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

৪৪২। সীতা (মাসিক) : বৈশাখ ১২১২।

সম্পাদক—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

৪৪৩। শিল্প কৃষি পত্রিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২১২।

তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। পরিচালক—কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়।

৪৪৪। কুশদহ (সাপ্তাহিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

ইহা কিছু দিন পরে 'ভেরি' পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। 'কুশদহ ও ভেরি' আবার ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে 'স্বলভ সমাচার'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'স্বলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে।

৪৪৫। সমাজ-দীপিকা (মাসিক) : ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

হিন্দু সমাজের পুনঃসংস্কার ও হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিকবর্ণনের প্রতিই পত্রিকাখানির বিশেষ লক্ষ্য ছিল। সম্পাদক—অক্ষয়কুমার বিজ্ঞাবিনোদ।

৪৪৬। দিনাজপুর পত্রিকা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রধানতঃ কৃষিতত্ত্বই আলোচিত হইত। সম্পাদক—ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরী, বি-এ, বি-এল।

৪৪৭। শিল্পপুষ্পাঞ্জলি (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৪৮। ভারতে হরিদ্বার (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবচন্দ্র বসু ও কালীকুমার ঘোষ।

৪৪৯। বিজলী (মাসিক) : আষাঢ় ১২৯২।

বেরা, ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীমাচরণ মজুমদার।

৪৫০। তত্ত্ব-মঞ্জরী (মাসিক) : ১ শ্রাবণ ১৮০৭ শক।

"নীতি, ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কৃত মাসিক পত্রিক।" সম্পাদক—রামচন্দ্র দত্ত।

৪৫১। নব-নলিনী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯২।

আন্দুলবাড়িয়া (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

৪৫২। নিবন্ধ (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিকিশোর রায়।

৪৫৩। পল্লীগ্ৰাম (মাসিক) : ভাদ্র (?) ১২৯২।

রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ যতুনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪৫৪। ত্রৈমাসিক হোমিওপ্যাথিক বাতাবত : ভাদ্র (?) ১২৯২।

সম্পাদক—অক্ষয়প্রসাদ দত্ত। প্রকাশক—কে, দত্ত এণ্ড কোম্পানী।

৪৫৫। বৈষ্ণব (মাসিক) : আশ্বিন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০।

বৈষ্ণব জগতের হিতসাধনার্থ ইহাব আবির্ভাব। সম্পাদক—কালিদাস নাথ।

৪৫৬। শ্রীমন্ত সওদাগর (পাক্ষিক) : কা্তিক (?)

১২৯২।



**পিসি জাত**

**ডুয়েলার**

১২৫-বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকতা-১২

৩ নং আর্গিবিটোলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—  
ক্রিশোর রায়।

৪৫৭। হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক (মাসিক) : কার্তিক  
১২১২।

ঢাকা গির্জা বঙ্গ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী  
ভট্টাচার্য।

৪৫৮। বঙ্গবাসী (মাসিক) : কার্তিক ১২১২।

সম্পাদক—কালীচরণ বসু।

৪৫৯। বিবিধ তত্ত্ব (মাসিক) : কার্তিক ১২১২।

চিকিৎসা, শিল্প পাকবিজ্ঞা ও ইঞ্জিনারাদি বিষয়ক পত্র। ৩৭ নং  
হরীতকী বাগান লেন হইতে রামকুমার নাথ সরকার কর্তৃক সঙ্কলিত  
ও প্রকাশিত।

৪৬০। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১২।

লাতিটী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত। সম্পাদক—জগদীশচন্দ্র  
লাহিড়ী ও বিপিনবিহারী মৈত্র, এম. বি।

৪৬১। ভারত শ্রমজীবী (মাসিক) : অগ্রহায়ণ  
১২১২।

পূর্বতন 'ভারত শ্রমজীবী'র দ্বিতীয় কল্প। প্রধানতঃ কৃষি,  
শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।  
সম্পাদক—শশিভূষণ বিশ্বাস।

৪৬২। মহাবিজ্ঞা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১২।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। তত্ত্ববিজ্ঞা, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক-  
প্রচারক পত্রিকা। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য, এফ. টি. এস।  
ইহা ১২১৪ সালে ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র 'গরীবের'  
সহিত মিলিত হইয়া 'গরীব ও মহাবিজ্ঞা' নামধারণ করে।

... ...

১৮৮৫ সনে (১১১২ সালে) আবও কয়েকখানি সাময়িক-  
পত্রের অন্তিমের প্রমাণ পাইতেছি; এগুলি সম্ভবতঃ পূর্ব-বঙ্গের—  
ইং ১৮৮৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। পত্রিকাগুলি—

১। 'স্বপ্নাপান', ২। 'কুমারী পত্রিকা', ৩। 'ভারত মিহির'  
(মাসিক, ৪৬ পৃষ্ঠাননুসারে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত),  
৪। 'পূর্ববঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক)।

### ইং ১৮৮৬

৪৬৩। ঢাকা গেজেট (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৮৬ (৭)

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "আংলো ভার্টিকুলার" সাপ্তাহিক পত্র।  
সম্পাদক—শশিভূষণ বায়, 'ঈষ্ট' পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

৪৬৪। বিবৃষক (মাসিক) : মাঘ ১২১২।

সম্পাদক—কালীকিঙ্কর আশ্রয়বত্ত।

৪৬৫। ধুমকেতু (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১৩।

চন্দ্রনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবকৃষ্ণ মিত্র।

৪৬৬। বেদব্যাস (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৩।

"হিন্দুধর্মের প্রকৃত মহিমা কর্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য।"  
সম্পাদক—ভূধর চট্টোপাধ্যায়।

৪৬৭। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৩।

"যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বাস্তব, রন্ধন,

কাঞ্চকাব্য, চিত্র, মুষ্টিযোগ, ম্যাজিক, ইঞ্জিনার, প্রভৃতি মানবের  
আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে" সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক—  
অমৃতলাল বসু, নদীয়ার অন্তর্গত নকাসিগাড়া থানার পুলিশ  
সব-ইনস্পেক্টর।

৪৬৮। গ্রামবাসী (পাক্ষিক...)। বৈশাখ ১২১৩ (৭)

উলুবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত; ঐ অঞ্চলের গ্রামবাসীকে  
রাজনীতি বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল।  
১২১৬ সালের বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত  
হয়।

৪৬৯। আর্ধ্যপ্রতিভা (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১৩ (৭)

হালিশহর হইতে প্রকাশিত।

৪৭০। বঙ্গববি (মাসিক) : আষাঢ় ১২১৩।

বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র।

৪৭১। বাণিজ্য-ভাণ্ডার (মাসিক) : শ্রাবণ (৭) ১২১৩।

৪৭২। আহমদী (পাক্ষিক) : শ্রাবণ ১২১৩।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে করিমুল্লাহ খানম চৌধুরাণীর  
আশুকুল্যে প্রকাশিত। সম্পাদক—আবদুল হামিদ খান আহমদী  
ইউনুফজ্জয়। "মুসলমানদিগের কয়েকখানি সংবাদপত্র কলিকাতায়  
কিছু দিন পূর্বে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু 'আখব্বারে এসলামিয়া'  
ভিন্ন আব সবগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। 'আহমদী'র অসাম্প্রদায়িকতা  
ও জায়েনিষ্ঠা সুপরিচিত ছিল।" ১২১৬ সালে ইহার নাম 'আহমদী  
ও নবরঙ্গ' পাইতেছি। সম্ভবতঃ 'নবরঙ্গ' নামে স্থানীয় কোন পত্র  
ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে।

৪৭৩। কাবিগর-দর্পণ (মাসিক) : আশ্বিন ১২১৩।

"মেশিন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে প্রচার  
করিবার জন্য প্রত্যেক মেশিন প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ" ইহা  
প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

৪৭৪। বিশ্বকর্মা বা বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)

আশ্বিন ১২১৩।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষাপ্রদায়ী প্রবন্ধমালা বিবিধ  
ভাষার সংবাদপত্র এবং পুস্তক হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া  
এই সচিত্র মাসিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। সম্পাদক—  
বিহারীলাল ঘোষ।

৪৭৫। ভিষ্ক-বন্ধু (মাসিক) : আশ্বিন ১২১৩।

সম্পাদক—ভোলানাথ চক্রবর্তী।

৪৭৬। উপন্যাসলহরী (মাসিক) : কার্তিক ১২১৩।

সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

৪৭৭। সুনীতি ও সংবাদ (পাক্ষিক) : কার্তিক (৭)  
১২১৩।

'বিশ্বকর্মা' পত্রের মাঘ ১২১৩-সংখ্যায় সমালোচিত। ইহা  
বারাণসী ধর্মামৃত যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক  
মূল্য দেড় টাকা। পত্রিকাখানি শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (কৃষ্ণানন্দ  
স্বামী) ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মপ্রচারিণী সভার (তৎকালে কাশীতে  
স্থানান্তরিত) উত্তোগে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে 'সুনীতি'  
নামে ১২১০ সালের ১লা কার্তিক প্রকাশিত হইয়া এক বৎসর  
জীবিত ছিল।

পরশর বাবুরা আমাদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া এসেছেন খাত  
ছ'মাস। কিন্তু এবই মধ্যে 'মা' বা 'মাঠাকুরুণ'র মহিমা

শুনতে শুনতে প্রায় কান ঝলপালা হয়ে গেল। যদি ভাড়াটে বাড়ী  
পাওয়া ঈশ্বর দর্শনের মতই অবিখ্যাত ঘটনা না হ'ত, তাহ'লে

হয়ত এত দিনে আর একটা বাড়ী দেখে উঠে যেতুম।  
অবশ্য ঠিক গুরুমা বলতে যা বোঝায়, ইনি না কি তা নন।  
অর্থাৎ গুরুর স্ত্রী নন—ইনি নিজেই গুরু! নেহাৎ সাদা-সিঁদে ধরণেরও  
নন—রীতিমত গেরুয়াধারিণী সন্ন্যাসিনী।

বিরক্ত-বোধও যেমন করতুম, কোঁতুলও একটু হ'ত বৈ কি!  
কথায় কথায় মা।

ফুটফুটে মেয়েটি পরাশর বাবুর, বছর বোল-সতেরো বয়স, এদিকেও  
খুব ঠাণ্ডা, ঘর-কন্নায় মন আছে, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে। মানে ক্লাস  
টেন আজকালকার। বিনা মাষ্টারেই প'ড়ে গত বছর ক্লাসে ফার্স্ট  
হয়েছে। এক কথায় বেশ মেয়েটি। শালার জন্য অমনিই একটি  
মেয়ে খুঁজছিলুম, কিছু দিন দেখে-দেখে এক দিন প্রস্তাব করেই  
বসলুম। শালাও এম-এ পাস, সরকারী চাকরী করছে, পাত্র হিসাবে  
খুবই সোভানীয়, যে কোন পাত্রীর পিতারই শুনলে চমকে ওঠবার  
কথা।

কিন্তু পরাশর বাবু বিনীত অথচ উদাসীন ভাবে বললেন, 'এ ত  
আমার সৌভাগ্য রমেন বাবু, কিন্তু মা না এলে ত কিছু হবার জো  
নেই!'

'কথাবার্তা না হয় তিনি এলে হবে। আগে আপনারা ছেলে  
দেখুন, বিয়ে দেবেন কি না সেটা ভাবুন—দেনা-পাওনা।'

'কিছুই হ'তে পারবে না। যা করবেন তিনিই করবেন।  
ছেলে দেখতে হয় তিনি দেখবেন, বিয়ে দেবেন কি না এখন তাও  
তিনি জানেন। আমি কিছুই বলতে পারব না।' সহাস্ত্রে উজ্জল  
চোখ দু'টি মেলে চাইলেন পরাশর বাবু, পরিপূর্ণ প্রসন্নতা মুখে-চোখে।

হঠাৎ মুখে এসে গেল, 'দৈনিক খাওয়া-দাওয়াটা কি তাঁর নির্দেশে  
করেন পরাশর বাবু? আর ছেলে-মেয়ের অসুখ হ'লে কি হয়?  
অমুমতি নিয়ে ডাক্তার দেখান?'

পরশর বাবু কিন্তু একটুও ক্ষুব্ধ হলেন না। হেসে বললেন,  
'প্রায় তাই। তবে মোটামুটি এ সব ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ নেওয়াই  
আছে। আর ভারি অসুখ করলে ত তাঁকে জানাতেও হয় না—  
তিনি নিজেই এসে পড়েন। তার পর যা করবার তিনিই—'

'নিজেই এসে পড়েন? যোগবলে না কি?' কণ্ঠস্বরে বিজ্ঞপের  
স্বরটা চাপতে পারলুম না।

'তা জানি নে। কখনও জিজ্ঞেসও করিনি। তবে এসেও  
পড়েন ঠিক। সেবার বকুলের টাইফয়েডের সময় তিন দিনের দিনই  
এসে পড়লেন। তখন আমরা জানি সামান্য অর। উনি এসেই  
বললেন, করছ কি, এ যে টাইফয়েড—দুধ বন্ধ করো। আট দিনের  
দিন রক্ত পরীক্ষা করে ডাক্তারও বললে, তাই। টাইফয়েড।...  
তার পর পুতুলের যেবার রক্ত-আমশা হ'ল—আমরা জানিও না মা  
কোথা—উনি নিজেই এলেন, কী সব ওষুধ দিলেন, মেয়ে দিবা  
সেরে উঠল।...কাজেই অসুখ-বিসুখ নিয়েও আর মাথা ঝামাই না  
আমরা।'

কথাটা যে ঠিক বিশ্বাস হ'ল না তা বলাই বাহুল্য। তবুও মুখে  
ভক্তি ও বিশ্বাসের ভাব টেনে আনতে হ'ল। তাঁর বলা শেষ হ'লে  
বন্দ বোধ গর্ভিত-মিত মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তখন

গুরুমা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

বললুম, 'তাহ'লে অবিশ্রি কথাই নেই। কিন্তু মাঠাকুরুণ যদি না  
থাকতেন কি তিনিই আপনার ওপর বিচারের ভার দিতেন তাহ'লে  
এ পাত্র পছন্দ হ'ত ত?'

'ও রকম ভাবে কখনই ভাবিনি রমেন বাবু। মা না এলে  
আমি কিছু বোধ হয় ভাবতেও পারব না। এই দেখুন না, আর  
একটি সম্বন্ধ এসেছে বর্ধমান থেকে, তাঁদের খুব ইচ্ছা, পাত্রের বাবা  
আমার অফিসেই কাজ করেন, সে ছেলেও এম-এ পাস, কী একটা  
খুব বড় চাকরী করে, এখনই বুঝি ছ'শ' টাকা মাইনে—না কি অমনি  
বললেন, শুনিওনি ভাল ক'রে—মা না এলে ত শুনে লাভ নেই।  
বুঝলেন না?'

খুবই বুঝলুম। বুঝলুম যে এ পাত্রী আমার শালার অর্ধট্টে  
ছুটেবে না। যাক—তবু মা'র সম্বন্ধে কোঁতুলটা যেন বেড়েই যাচ্ছে  
ক্রমশঃ। বললুম, 'তা মা কবে আসবেন কিছু জানেন? কিছু  
লিখেছেন তাঁকে?'

নিশ্চিন্ত পরাশর বাবু বললেন, 'কী করে লিখব! কোথায়  
আছেন তিনি তা ত জানি না। কোথাও ত বাঁধা ঠিকানা নেই।  
আজ এখানে কাল-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। শেষ শুনেছিলুম  
ভাগলপুরে গিছিলেন—সে-ও ত মাস খানেকের কথা।'

'তবে? তিনি আসবেন কি না কি করে জানবেন?'

'দরকার মনে করলেই তিনি আসবেন। যদি না আসেন ত  
বুঝব—এখন দরকার নেই।'

এমন মাধুর্ষকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে যাওয়া বুঝা।  
সুতরাং সে চেষ্টা করলুমও না। তবে 'মা'কে দেখবার বাসনা বোল  
আনার ওপর আঁঠুরো আনা চেপে রইল।

কিন্তু তিনি ইচ্ছে না করলে ত হবার যো নেই।

দিন সাতেক পরে সকালে বসে চা খাচ্ছি, গৃহিণী এলেন প্রায়  
লাফাতে লাফাতে। এমন গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন যে, খানিকটা  
চা চলকে আমার লুপ্তিতে পড়ে গেল। কিন্তু এ সব তুচ্ছ ব্যাপারে  
কোন দিনই তাঁব লক্ষ্য নেই, এইটুকু আসবার উত্তেজনায় হাঁফাতে  
বললেন, 'ওগো শুনেছ, ওদের সেই মা-ঠাকুরুণ এসেছেন!'

কড়া রকম একটা ধমক দেব বলে মুখ তুলেছিলুম কিন্তু সে কথা  
আব মনে রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'কবে? কখন?  
কে বললে তোমাকে? কী করে জানলে?'

'এইমাত্র দেখে এলুম—দেখবে এসো না—।'

চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রেই দৌড়লুম। আমাদের শোবার ঘর  
থেকে ওদের বাড়ীর ভেতরের উঠানটা পরিষ্কার দেখা যায়। দেখি  
মা-ঠাকুরুণ বাইরের রকেই বসে আছেন একটা আসনের ওপর—আর  
পরশর বাবুরা সপরিবারে ঘিরে ছেঁকে ধবেছেন। যে রকম ভাব-  
ভঙ্গী এদের, ইনিই যে সেই অস্থিতীয় মা সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ  
রইল না।

ভাল করে তাকিয়ে দেখলুম। এদের মাথা বাঁচিয়ে দেখা শক্ত  
তবু একটু অপেক্ষা করতে সবটাই দেখা গেল। নিতান্ত বেঁটে খাটো  
একরকম মাছবটি, পায়ের বর্ণ শ্যাম, চোখাখা মध्ये কোন অসাদাশয়ই

নেই। শুধু চোখ দু'টি আয়ত এবং তার দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর। মর্পের মধ্যে পর্য্যন্ত সে চাহনি পৌঁছয়। কেমন যেন ভয়-ভয় করে সেদিকে চাইলে।

‘হামি-স্ত্রী’ অর্থাৎ হয়ে থাকিয়ে আছি, মা নিজেই একবার মুখ তুলে চাইলেন, সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে পরাশর বাবুও আমাকে দেখে হৈ-চৈক’রে উঠলেন, ‘এই যে রমেন বাবু...আমুন, আমুন, মা এসে গেছেন।’

অগত্যা চায়েব কাপ নামিয়ে বেগে তখনি সেতে হ’ল। অফিসেব তখনও ঢের দেবী—সে অজুহাত চলবে না। তাড়াছাড়া এমনিতে ওঁরা এত ভদ্র—আবাত দিতেও কষ্ট হয়।

গিয়ে প্রণামও করতে হ’ল। লাল কাপড পাবনে—ঠিক লাল নয়, তন্নত, রক্তাভ-গেঞ্জিয়া বলা চলে। কারণ ওদই মধ্যে আরও গাঢ় লাল পাড়টা নজরে পড়ল। হাতে কল্লার বালি এবং তাগা। সীঁথিতে সিঁদুর নেই, কপালে অহল্যাবাহি-ধরণে চওড়া রক্তচন্দনেব টিকা, তারই ওপর একটু ভাষ বা বিভ্রতিব চিহ্ন। কোন্ সম্প্রদায়, কেমন সম্মান, তান্ত্রিক না অস্ত্র কিছু—কিছুই বোঝবার উপায় নেই।



—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত

এই ত দেখিয়ে পাঁচশ হাজার টাকা invest কোরে দিলুম চিন্তে, তার পর কি তোল,...দেড় লাখ টাকা income tax এর দেনা ভি শোধ হয়ে গেল তাই থেকে আউর এক লাখ কাপড়ে বেরিয়ে এল। সুনতে কি রকম.....আচ্ছা লাগছে না?

সধবা কি বিধবা—কিংবা কুমারী তাই বা কে জানে! পরাশর বাবুকে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি, করলেও সহুত্তর পেতুম কি না সন্দেহ, হয়ত শুনতুম, ‘তা’ত জানি না। জিজ্ঞাসা ত করিনি—’

এসে সত্ত চাপান শেষ করেছেন। সামনে খালি পাথরের কাপ। তার পাশে রেকাবীতে গোলাপ-জল-ভিজ্জ-শ্রাকড়ায় ঢাকা পান।

আমি প্রণাম করতে কোন আশীর্বাদও করলেন না—অন্তত টোট নড়ল না, সাধুদের ধরণে চোখ বুজে প্রতি-নমস্কারও করলেন না। বরং সেই মর্পভেদী দৃষ্টি তুলে একবার আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক’রে রেকাবী থেকে একটা পান তুলে মুখে দিলেন।

পরাশর বাবুর একেবারে আছাদে গদগদ অবস্থা। বললেন, ‘মা, ইনিই সেই রমেন বাবু, এঁর কথাই আপনাকে বলছিলুম। বলুন না, সেই বা বলছিলেন—’

মা এবার কথা বললেন। মুহু ধমক দিয়ে বললেন, ‘ছি পরাশর! ওঁরা হলেন পাত্রপক্ষ। ওঁরা বার বার কথা পাড়বেন কি! একবার দয়া করে বলেছেন—এই ঢের। আমি দুপুর বেলা ওঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে কথা পাড়ব এখন।’

ওঁর এই বিবেচনায় খুশি না হয়ে পারলুম না। এতক্ষণ যে একটা বিদ্রোহের ভাব পোষণ করছিলুম, সেটা খানিকটা কাটল। বললুম, ‘না না—তাতে কি হয়েছে। এ ত আপনা-আপনিই মাথোই। বকুল মেয়েটিকে আমার বেশ লাগে। তাই বলেছিলুম আমার শালা প্রদোষের কথা। তা সে ত শুনলুম উনি ঢের ভাল সখন্ধ পেয়েছেন অস্ত্র জায়গা থেকে।’

‘উভ’, ‘উভ’—মা সে নাকচ কবে দিয়েছেন যে!’ সহজ ভাবেই বলেন পরাশর বাবু।

‘কেন!’ বিস্মিত না হয়ে পারি না, ‘সে ত যা শুনেছিলুম খুব ভাল পাত্র! তবে কি সে সব মিছে কথা?’

‘না বাবা।’ মা-ঠাকরুণ শাস্ত কণ্ঠে বললেন, ‘মিছে কেন হবে। তাদের আমি জানি। ভাল পাত্র ঠিকই—তবে কি জান বাবা—বড্ড ভাল পাত্র। বৈবাহিক সম্পর্কটা অসমান অবস্থায় করতে নেই, তাতে কোন পক্ষই স্বগী হয় না। সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে পরাশরের প্রাণান্ত হবে অথচ ওঁর তত্ত্ব-তাবাস তাদের পছন্দ হবে না। তাবা নাক তুলবে। আমাব ইচ্ছা সমান-সমান ঘরেই করি। অবিশি আমি জানি না আপনার স্বত্তরবাড়ীর অবস্থা কেমন—’

‘আমাকে আর আপনি কেন বলছেন মা!’...বিনয় করেই বলি, ‘আমার স্বত্তরবাড়ীর অবস্থা চলন-সই। এখানে কালিঘাটে একটু মাথা গোঁজার জায়গা আছে—ছোট দোতারা বাড়ী—তাছাড়া দেশেও কিছু বিষয়-আশয় আছে, গিয়ে বসলে একটা ছোট সংসার চলে যায়। এম-এ পাস, সরকারী অফিসে ঢুকেছে, শ’ আড়াই টাকা মাইনে পায়। ওঁর ছোট ভাইটি নেভিতে ঢুকেছে—তারও প্রসপেক্ট ভাল—’

‘এ ত বেশ ভাল সখন্ধ বাবা! তোমাদের পক্ষ থেকে মেয়ে পছন্দ করবেন কে?’

‘ধরুন, আমি আর আমার স্ত্রী। তা হুঁজনেরই আমাদের পছন্দ, কাজেই সে কথা আর উঠবে না। এখন আপনি পছন্দ করলেই কথা এগোতে পারে।’

‘তাহ’লে চলো না পরাশর, এক দিন ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে ওঁর স্বত্তরবাড়ী যাই—’

‘বেশ ত, যে দিন বলবেন সেদিনই নিয়ে যাবো। আপনি তাহ’লে মন ঠিক করুন—। আমি আবার আসব এখন। আজ তাহ’লে আসি—আবার অফিস আছে ত?’

‘হাও বাবা!...নিশ্চয়—ভাতভিক্ষে আগে।’ এবার প্রণাম করতে সময়ে তিনি দাড়িতে হাত দিয়ে গুরুজনের মতই সে হাত মুখে তুলে চুমু খেলেন।

পাত্র মা পছন্দ করলেন। পরাশর বাবু ত নির্বিকার, না কি ঠ্যা—ভাঁড় পছন্দ হয়েছে কি না—কিছুই বোঝা গেল না। আমি বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন করলুম, ভাঁড় সেই এক ভাব, ‘ও আমি ভেবেও দেখিনি রমেন বাবু, আমি ত পছন্দ করতে আইনি—সঙ্গে গিয়েছিলুম মাত্র। ভাল-মন্দ আমি বুঝি না, সব ঠিক ছেড়ে দিয়েছি, উনি যদি ভাল বুঝে থাকেন ত নিশ্চয়ই ভাল।’

‘তবু আপনার মেয়ে ত?’

‘কিছু না। সব ঠর। আমি আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়ে সবই ঐব সম্ভান। আমার কাছে মা আর জগন্মাতা এক হয়ে গেছে রমেন বাবু, সে বিশ্বাস না থাকলে দীক্ষা নিয়ে লাভ নেই।’

যাক—মা’র যখন পছন্দ হয়েছেই, তখন ঠেকে আর উদ্ভক্ত ক’রে লাভ কি! প্রশ্ন করলুম, ‘তাহ’লে সেনা-পাওনা?’

‘সে-ও উনি। কী চান ঠেকাই বলুন।’

‘কিন্তু আপনি কি দিতে পারবেন সে-ও কি উনি জানেন?’

‘নিশ্চয়ই। এটুকুও জানবেন না?’

তা বটে।

তবে মাকে কিছু বলতে হ’ল না, মা নিজেই কথা পাড়লেন, ‘বাবা, বকুলকে যখন তোমরা দয়া করেছই, তখন আর দেরি ক’রে লাভ কি? তোমাদের ঘরে যাতে ও চলে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাটাই ঠাড়াভাড়ি করে ফ্যালো—’

অর্থাৎ সেনা-পাওনার কথাটা। যথেষ্ট সঙ্কোচের সঙ্গেই কথাটা পাড়তে হ’ল। কিন্তু এইবার দেখলাম, মা সংসার-ভাগিনী সন্ন্যাসিনী বটে তবে উদাসিনী নন। দর-দস্তুর বেশ ভালই করতে পারেন—প্রতিটি ব্যাপারে এমন কথাকবি করলেন যে, আমাদের খামি-জীকে ক্রমেই তালিকা সঙ্কচন করতে হ’ল। এমন লোকের ওপর সত্যিই সব ছেড়ে দিয়ে লাভ আছে—এত সাংসারিক বুদ্ধি পরাশর বাবুর নেই, তিনি হ’লে অনেক বেশি দিতে রাজী হয়ে যেতেন। মাঠাকরুণের দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়—বহুদূরপ্রসারীও বটে।

এক দিন আর থাকতে পারলুম না, বলেই ফেললুম। বিশ্বের তখন দিন স্থির হয়ে গেছে, সেনা-পাওনা মোটামুটি সব মিটে গেছে, তবু মাঠাকরুণ প্যাচ কবছেন দেখে একটু রাগও হয়েছিল বোধ হয়; ঘর থেকে সবাই চলে যেতে বললুম, ‘মা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি ত আপনার কান্নুর চেয়ে কম নয়?’

‘কম হবে কেন বাবা—সংসার চিনে দেখে তবে ত ছেড়েছি।’

‘কিন্তু এখন ত ছেড়েছেন তবে এ সব কচকচিতে থাকেন কেন?’

‘এদের ত ছাড়তে পারিনি বাবা, এদের কল্যাণের জন্তই এই সব থাকতে হয়। এরা যে সম্পূর্ণ আমার ওপরই নির্ভর করেছে।’

‘কানাই লাল মিত্রের  
সোমরাজ  
কবিরাজী কেশ তৈল  
দ্রাঘ্যরোগের দ্রাব্য  
সুগন্ধে অর্ষশ্রেষ্ঠ’

২৮ মূল্য :-

\* তিল তৈল \* কদম্ব তৈল  
\* কদম্বারাইডিন

\* সোমরাজ বীজ  
\* দ্রাঘ্যরোগের  
\* বস্ত্র ও শ্বেত চন্দন  
\* ব্রাহ্মী \* গ্রামলী

\* দ্রাঘ্য (কদম্বী) \* চন্দন তৈল  
\* বেলা তৈল \* দ্রাঘ্যলী তৈল  
\* বস্ত্র ও শ্বেত চন্দন  
\* ইত্যাদি বিখ্যাত সেন্ট

উপকারীতা :-

\* দ্রাঘ্যরোগের  
\* চুল ওঠা বন্ধ করিতে  
\* চুল বাড়াইতে  
\* অনিদ্রা, নিতদ্রুত  
‘সোমরাজ কেশ তৈল’  
\* সর্বোৎকৃষ্ট \*



‘তবু—কি রকম লাগে না !’

‘কেন লাগবে বাবা ! আমি যদি এদের ছেড়ে হিমালয়ে গিয়ে থাকতুম তাহলে কি রকম লাগতে পারত ১০০ তুমি ত লেখাপড়া জানা ছেলে বাবা, পূরণ নিশ্চয় পড়েছ—সেকালে রাজা-রাজড়ারা যেখানে থাকতেন সঙ্গে পুরোহিত থাকত। পাণ্ডবরা বনে গিয়েছিলেন তাও পুরোহিত সঙ্গে ছিল। তাঁরা অনেকেই গৃহী ছিলেন না বাবা—কিন্তু গৃহীদের চেয়ে ভাল বুঝতেন বলেই গৃহীরা তাঁদের ওপর নির্ভর করত, তাঁরাও গৃহীদের ছাড়তে পারতেন না।’

কথাটা ভাল রকম সহজর দিতে পাবি না, তবু কোঁতুল বেড়েই যায়। খোঁচা দেবার লোভটাও থাকে না।

প্রশ্ন করলুম, ‘এমন ত আপনার অনেক শিষ্য আছে। তাদের সকলকেই ত দেখতে হয়, তবে সাধন-ভজন কবেন কখন ?’

‘সবাই ত পরাশরের মত নির্ভর করে না বাবা। দেখতে হবে কেন ? আর সাধন-ভজন ?’

এই বলে হঠাৎ থেমে গিয়ে মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

তখন আমরা ঐ ছ’টি মাত্র প্রাণী ঘরের মধ্যে। আমার স্ত্রী অন্যত্র বাস্তু, ছেলে-মেয়েবা খেলতে গেছে। মা আমাদের বাড়ীতেই বসে আছেন। স্ত্রীর খুবই নিঃস্রন চারি দিক। সেই নিঃস্রনতার মধ্যে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন কবি, ‘খামলেন কেন মা ?’

‘সাধন-ভজন কিছু নেই বাবা। এটা শুধু ভেঙ্ক।’

‘কী যে বলেন !’ আমিও পালটা বিনয় কবি। যদিও মনে মনে ঐ বিশ্বাসটাই বন্ধমূল।

‘না বাবা। অকাবণ মিছে বলব না। এটা ভেঙ্কই। এ ভেঙ্ক না নিয়ে কী-ই বা উপায় ছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছি। নিকট-আশ্রয় বলতে কেউ নেই—যার বাড়ী যেতুম গলগ্রহ হয়ে থাকতে হ’ত। বিয়ের মত খাটতে হ’ত অথচ বিয়ের মাইনেটা পেতুম না। পাছে ঐ ছেড়ে যায় বলে বিকেও সমীহ ক’বে চলে আজ-কাল—সে ভয়ও থাকত না আমার স্বপক্ষে। সেই অবস্থায় দিশাহাবা হয়েই গিয়েছিলাম গুরুব কাছে। তিনি এই কাপড় হাতে দিয়ে বললেন, এই তোরা রক্ষা-কবচ দিলাম মা, নিরাপদে এবং সুখে থাকতে পারবি। শিউরে উঠে বললুম তাঁকে—কিন্তু বাবা, এ যে লোক-ঠকানো ! তিনি বললেন—লোক-ঠকানো কেন হবে মা, তুমি রীতিমত দীক্ষা দিও, আমি তোমার সব শিখিয়ে দিচ্ছি। আর যাদের অল্প খাবে প্রাণপণে তাদের উপকারের চেষ্টা ক’রো, তাহলেই আর কোন ঋণ থাকবে না। ...তবু সন্ধাচের সঙ্গেই বললুম—কিন্তু বাবা, এ ত ছদ্মবেশ ? তিনি বললেন—সে ত অল্প-বিস্তর সকলেরই বটে। ভগবানের খিয়েটারে সবাই আমরা এক-একটা মুখোশ পরে নেমেছি। এক-একটা পাটে সজ্জা বই ত নয়।—এই আমার সত্য পরিচয় বাবা।’

মা খামলেন। আমি ত অভিভূত। বললাম, ‘এ সব কথা কি শিষ্যদের বলেছেন ?’

‘সবাই ত চিনতে চায় না। শুনলেও বিশ্বাস করে না। পরাশরকে বলেছি কিন্তু ও বিশ্বাস করেনি। জেবেচে এই সত্যটাই আমার মনোবল—সত্যকে বিশ্বাস করা।’

আশ্চর্য্য ! যত দিন একে সন্ন্যাসিনী বলে জানতুম তত দিন এর ভেঙ্ক, ছদ্মবেশ, লোক-ঠকানো ব্যবসা, এই কথাই ভেবেছি, বা আকারে-ইঙ্গিতে সেই খোঁচা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন ইনি সেইটে স্বীকার করতে আর বিশ্বাস হ’ল না। এখন মনে হ’ল এটাই ঠিক বিনয়, ঠিক যথার্থ সন্ন্যাসিনী রূপটিকে আমাদের চোখে আড়ালে রাখতে চান—আমাদের এড়িয়ে বা পিছলে বেবিয়ে যেতে চান।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলি, ‘আপনি আমাকে হয়ত পরীক্ষা করছেন। কিন্তু আমি অত বোকা নই ১০০ পরাশর বাবু যে বলেন বিপদের সময় বা প্রয়োজনের সময় ঠিক আপনি এসে হাজির হন, সেটা ত মিছে নয় !’

মা হাসলেন। মধুর হাসি। বললেন, ‘ওটা নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ বাবা। এসে পড়েছি ছ’বার এই মাত্র। অনেক দেখেছি, তাই হ’ল চারটে রোগের চেহারা দেখলেই চিনতে পারি। ছ’-একটা টোটকা ওষুধও জানি—’

‘কিন্তু এই যে বকুলের বিয়ের ব্যাপার ? পরাশর বাবু বলেছিলেন, সময় হলেই আসবেন। তাই ত এলেন।’

‘দূর বোকা ছেলে ! ...ওর আবার সময় কি ? বকুলের কী-ই বা বয়স। ছ’ বছর পরে বিয়ে দিলেও তোমরা বলতে ঠিক সময় !’

‘যখন ছ’টো জায়গা থেকে স্বপ্ন হচ্ছে তখনই বা আপনি এলেন কী ক’রে ?’

‘বকুল যা মেয়ে—বহু জায়গা থেকেই স্বপ্ন আসত।’

এই বলে আর একটু হেসে তিনি উঠে পড়লেন।

অর্থাৎ মা’র স্বপ্নে রীতিমত দ্বিধা পড়লুম। কোন্টা মিছে আর কোন্টা সত্যি—কিছুতেই ঠিক করতে পারলুম না। সেদিন থেকে শ্রদ্ধার ভাবটাই বেড়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু যখন দেগলুম পরাশর বাবুর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে বিয়ের বাজার করলেন, বিয়ের দিন সমানে হালুইকরদের পিছনে লেগে রইলেন, শেষ পর্যন্ত নিপুণ গৃহিণীর মত ফুলশয্যার তত্ত্ব গুছিয়ে পাঠিয়ে নিজের পরাশর বাবুদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলেন, তখন সে ভাবটা রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়ল। হিসাব-নিকাশ, টাকা-কড়ি সব তাঁর হাতে। মায় বিয়ে চুকলে ম্যারাপওয়ারা ডেকরেটার সকলকাব বিল কেটে দাম ঠিক করে দিয়ে তবে তিনি গেলেন। ঘোর বিষয়ী এবং সংসারী। একটু কুপণও।

আমাদের জানলা থেকে ও-বাড়ীর ঘর দেখা যেত, দেখে দেখে গৃহিণী বিরক্ত হয়ে বলতেন, ‘বঙ্ক করো, সন্ন্যাসীতে অক্লি ! ওর চেয়ে আমরা ঢের বেশি বৈরিণী।’

কথাটার আমার মনেও তখন সায় জাগত।

হয়ত উনি নিজের স্বপ্নে সত্যি কথাই বলেছেন। সেইটেই একটা কৌশল। জানেন যে নিজের দোষ আগে থাকতে নিজের স্বীকার করলে লোকে বিনয় ভাবে।

বকুলের বিয়ের মাস-কতক পরে হঠাৎ একটা প্যাচে পড়ে গেলাম। কেল-মারা ব্যাকের ব্যাপার—আমারই টাকা, অথচ

আমি নানা চক্রান্তে চোরের পর্যায়ে পড়ে গিছি। মান-সম্মত সব বৃদ্ধি যায়, সেই সঙ্গে গৃহিণীর সবগুলি গহনাও। তাতেও পারাব কি না সম্ভব।

কোথাও যখন কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না, গৃহিণী আহা-নিন্দা ত্যাগ করেছেন, আমারও প্রায় সেই অবস্থা—হঠাৎ শুনলুম—বাড়ীতে মা এসেছেন।

পরশব বাবু আমার এই বিপদের খবরটা জানতেন কিন্তু গরীব কেরাণী, যেয়ে বিয়ে দিয়ে প্রায় সর্বস্বাস্ত, কোন সাহায্য করবার উপায় ছিল না। এখন মা আসতে তিনি যেন অকস্মাৎ বল পেলেন, বাড়ী থেকে চোঁচামেচি ক'রে ডাকলেন, 'রমেন বাবু রমেন বাবু—শীগুগি আশ্রন—মা এসে গেছেন, আর ভয় নেই।'

মা এসেছেন, ঠুঁদের মা—আমার কী-ই বা করবেন? তবু যেতে হ'ল—বিরক্তি সহকারেই গেলাম। আমি মরছি নিজের জ্বালায় এমন সময় এই সব পাগলামি কি ভাল লাগে!

যেতেই পরাশর বাবু বললেন, 'কেমন বলিনি মা ঠিক সময় আসেন। বলুন ত কী আপনার ব্যাপারটা? খুলে বলুন—কিছু সঙ্কোচ করবেন না।'

আচ্ছা মুন্সিল ত! এ সব ব্যাপারে মেয়েছেলেকে বোঝাই কী ক'রে? আব বুঝেই বা উনি করবে কি? তবু বলতেই হ'ল। এ বকম কোণঠাসা করলে না বলে উপায় নেই।

যথাসাধ্য সংক্ষেপেই সব বললাম। মা স্থির ভাবে বসে শুনলেন। নামনে সেই প্রথম দিনকান মত খালি পাথরের কাপ আর পানের রেকাবি।

সব শুনে বললেন, 'ঠেঁরের ব্যাক্ত? আচ্ছা, থিয়েটার রোডের সতীশ সেনকে ধরলে কিছু হয়?'

সে কি! চমকে উঠলাম। পুতুল আমাকেও এক কাপ চা দিয়ে গিয়েছিল—সেটা ধাক্কা লেগে পড়ে গেল।

'সতীশ সেনই ত সব মা। ও হচ্ছে করলে এখনই মিটে যায় ব্যাপারটা।'

'চলো দিকি এখনই একবার যাই। কিছু হয়ত একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে।'

এ জ্বীলোকটি বলে কি! সতীশ সেন মহা কড়া লোক। কড়া এবং বদমাইস। সে না কি নিজের বাপকে খাতির করে না। এ সেই হাটে যাবে ছুঁচ বেচতে?

তবু তখন আর আমার অত বিচারের সময় নেই। এক পা জেলে। তখনই একটা ট্যান্ডি ডেকে আনলুম। মা সেই ধুলো-পায়েই চললেন। বকুলেব মা স্থান করে যেতে বলতে উত্তর দিলেন, 'না, সতীশ বাবু শুনেছি সকাল ক'রে বেরিয়ে যায়। ঘুরে আসি আগে—'

আমার মনে তখনও কোন আশা নেই, বরং মনে হচ্ছে যে, এই হুদ্দিনে ট্যান্ডি ভাড়াটাই বাজে খরচ। কিন্তু যখন দেখলুম মা গাইরে থেকে কোন এস্তেলা না দিয়েই আমাকে সঙ্গে ক'রে দোতলায় উঠে গেলেন তখন একটু বিস্মিতই হলুম। বোধ হয় সামান্য একটু 'বসাও হ'ল।

সতীশ বাবু তাঁর দোতলায় অফিস-ঘরে বসে কাজ করছিলেন। মাকে দেখে বেন লাফিয়ে উঠলেন, 'এ কী ব্যাপার, মা কতক্ষণ!' উঠে এসেই একেবারে সাঁঠাঙ্গে প্রশ্নাম।

মা জাঁকিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন, আমাকেও ইঙ্গিত করলেন পাশে বসতে কিন্তু সতীশ বাবু আর চেয়ারে বসলেন না, কার্পেটের ওপর মা'র পায়ের কাছটিতে বৈসে বসলেন।

'এবার কত দিন পরে তোমার দয়া হ'ল বল ত মা।' সতীশ বাবুর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'বড্ড ব্যস্ত ছিলাম বাবা। যাক—সে কথা, তোমার অফিসের সময় আর আটকাব না বেশিক্ষণ। এই ভক্তলোকের একটা কাজ উদ্ধার, করতে পাবো কি না জাখো দিকি একবার। বিনা দোষে বড ঠেকে পড়েছেন।'

'বিনা দোষে না ঠেকলে তুমি স্থপাশি করতে না মা, তা আমি জানি। কিন্তু তা না হ'লে ত তুমি আসতে না। আপনার কী ব্যাপার বলুন ত?'

সংক্ষেপে সব কথা বলতে সতীশ বাবু বললেন, 'এই ব্যাপার? আচ্ছা সে হয়ে যাবে।'

কী উপায়ে আমি উদ্ধাব পেতে পারি তাও বলে দিলেন এবং একটা দরখাস্ত লিখে আজই অফিসে নিয়ে গেলে তিনি তখনই আমাকে দায়-মুক্ত কবে দেবেন তাও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সকুতজ্ঞ চিত্তে নমস্কার ক'বে উঠে ঠাঁড়াতেই মা-ও উঠলেন।



—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত

ম্যাজি :—কোর্টের বাইরে মিটিয়ে নিতে পারলে না হে?

আসামী :—তাই ত চেষ্টায় ছিলাম, আপনার পুলিশই বত বাগুড়া করলে।

সতীশ বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ভেতরে যাবে না মা, তোমার বৌ যে কান্নাকাটি করবে।'

'সে পাগলীকে তুই বুঝিয়ে বলিস বাবা। বর্ধমানের রসময় চাটুজের মেয়ের খুব অসুখ, আজই একবার যেতে হবে। খবর পেলাম আমার ভবসায় একটা ডাক্তার পর্যন্ত দেখায়নি। কী পাগলের পাল্লায় যে পড়েছি সব।...এই এগারটার গাড়ীতে আমাকে যেতেই হবে।'

সতীশ বাবু একটু ঈর্ষিত ভাবেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি ত ভাগ্যবান, আপনার জন্তে মা এত কাজের মধ্যেও কলকাতাতে ছুটে এসেছেন—'

'আবার ঐ সব পাগলামী সতীশ!' মা সন্তোষে তর্জ্ঞন করলেন।

গাড়ীতে যেতে যেতে আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। হেঁট হয়ে ঠিক পায়ে হাত দিয়ে বললুম, 'মা, কেন যে অ'ত ছলনা করেন। কত কৌতুহলি আপনার সব্বন্ধে—ছি ছি, সে কথা মনে হলে গলায় দড়ি দিতে চ'চ্ছে করে।...কিন্তু আপনি কি দেখে আমায় এত অনুগ্রহ করলেন?'

'আবার তুমি ঐ সব পাগলামী শুরু করলে বাবা? জ্ঞানবান ছেলে দেখে তোমাকে সতীয়া কথাই বলেছি! বাঁকুড়া থেকে আসছি, বর্ধমান যাবো, নেহাৎ জানাহারের জন্তেই পথশ্রমে বাঁড়ী এসেছিলুম, তুমি বিশ্বাস করো, এ'ব ভেতর আমার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নেই।'

তার কঠম্বরে এমন একটি সত্যের আভাস ছিল যে, আবার সংশয়ে পড়লুম। 'তবু বললুম, 'কিন্তু এই ত সতীশ বাবু ঐ কথা বললেন, এ'বা সবাই বিশ্বাস করেন যে, প্রয়োজন হলেই আপনি আসেন। সবাই কি বোকা?'

'স্নেহ যোগাযোগ বাবা। আমারই ভাগ্য হয়ত এখনও বলবান, নইলে এমনি যোগাযোগ আমার অদৃষ্টে বার বার ঘটবে কেন? কিন্তু এ মিথ্যা সম্মানের বোকা আমি যে আর বইতে পারছি না! ক্রমশঃই মিথ্যার বোকা ভারি হয়ে উঠছে।'

মা একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। মনে হ'ল যেন সে চোখে জল ভরে এসেছে—

কিন্তু আর কথা'র সময় ছিল না। গাড়ী ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। মা তখনই ন্নান ক'রে নিলেন। হয়ত তখনও কৌতুহল প্রবল, তাই ঠাঁড়িয়েই রইলুম। কী খান পেটা দেখে তবে যাবো—মনে'র অগোচরে এই চিন্তাই ছিল খুব সম্ভব। বিশেষ করে যখন শুনেছিলাম যে, উনি ব্রাহ্মণের মেয়ে তবু পরাশর বাবুদের হাতে ভাত পর্যন্ত খান—তখন ভাল-মন্দ খাবার লোভেই এই সহজ ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছেন এই ছিল অনুমান।

কিন্তু খেলেন দেখলাম পাখীর মত একগাল ভাত আর একটি কাঁচকলা সিদ্ধ। একটু ঘি ও একটু ছুধ। তার সঙ্গে কোন রকম মিষ্ট পর্যন্ত নয়।

'এ কি, হয়ে গেল?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

শ্রিত প্রসন্ন মুখে পরাশর বাবু বললেন, 'বারো মাসই উনি এ'খান। আর এই একবার।'

মা হেসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তপস্কার জন্ত নয় বাবা, শরীর ভাল থাকে বলে এমনি কম খাই। বেশি খেয়েই ব'ত অসুখ।'

মা তখনই চলে গেলেন। কিন্তু আমার দ্বিধা আজও কাটল না। কোন্টা বিশ্বাস করব—মা'র কথা, না মা'র কাজ? অথচ গাড়ীতে সেদিন নিঃসংশয় সত্যের স্বরটিই তাঁর কণ্ঠে বেজেছিল! সেই সঙ্গে একটা চাপা বেদনা; পারিপার্শ্বিকের বাঁধা মার গেয়ে নিরুপায়ের কণ্ঠে যে বেদনা বাজে।

আমার স্ত্রী কিন্তু এবার তাঁর পায়ে আছড়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। কবে যে তিনি আসবেন তা জানি না—তিন বছর গেছে সেই দিনটির পর। জানবার উপায়ও ত নেই। কাউকে কোন দিনই তিনি ঠিকানা দেন না, কোথায় কখন থাকেন তাও কেউ জানে না।

## বিশেষ

(চীনা গল্প অবলম্বনে)

হু'জেন লিউ উপত্যকায় বাস করতেন, আশ-পাশের গাঁয়ের

লোকেরা তাঁদের প্রেততাত্ত্বিক তুক-তাকের কথা জানত। 'এক জন পুরুষ; ডাক-নাম তাঁর দ্বিতীয় কুং মিং।\* অপর জন স্ত্রীলোক; ডাক-নাম তৃতীয় পরী-কন্যা। দ্বিতীয় কুং মিং-এর আসল নাম ছিল লিউ সিউ তে। ব্যবসা করবার সময় তিনি তখন এ নাম ব্যবহার করতেন। তুক-তাক প্রেততত্ত্বে তিনি এখন আত্মনিয়োগ করেছেন। দৈব-নির্দেশ না পেলে কোন শুভ কাজে তিনি হাত দিতে সাহস পান না। আর তৃতীয় পরী-কন্যা তো প্রতি মাসের পরলা ও ১৫ই তারিখে মাখার লাল রঙের এক পট্টা এঁটে নিজেকে

জাহির করতে থাকেন 'দেবী' বলে। 'শস্ত্র-বপনের পক্ষে শুভ নয়' কথাটা ভুলেও মুখে আনেন না দ্বিতীয় কুং মিং। আর তৃতীয় পরী-কন্যা ভুলেও উচ্চারণ করেন না: 'ভাতটা গলে গেল' কথাটা। বিশেষ এই ছুটি সাংকেতিক উক্তির পিছনে ছুটি কাহিনী যুক্ত রয়েছে:

একবার হোল কি, সারাটা বসন্ত কাল কেটে গেল তবু যদি এক কৌটা বৃষ্টি হোত। পঞ্চম শুক্লপক্ষের তিন দিনের দিন সামান্য একটু জল হোল শু'ড়িও'ড়ি। চতুর্থ দিন তাই যখন সবাই বীজ বপনের জন্ত মাঠে ছুটছিল, দ্বিতীয় কুং মিং করলেন কি, তিনি তাঁর পাঞ্জি-পত্ৰের বিশ্বর ষাঁটাষাঁটি করে আর কর-পণনা করে জানিয়ে দিলেন যে, 'শস্ত্র-বপনের পক্ষে দিনটা আজ শুভ নয়।' পঞ্চম দিন ছিল আবার 'জাগন বাচ, উৎসব'। সাধারণতঃ তিনি সেদিন বিশ্রাম নিয়ে থাকেন। বৃষ্ট দিনটি তাঁর মতে শুভ দিন। কিন্তু হু'জা

\* কুং মিং (১-২৩৪)—প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। সঠিক ভাবে তিনি ভবিষ্যৎ গণনা করতে পারতেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

বশতঃ মাঠগুলি ইতিমধ্যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সেদিন তিনি অবশ্য তাঁর চার একর জমিতে বীজ ফেললেন। কিন্তু অর্ধেকও বীজ তাতে ফলল না। আর সবাই যখন নতুন চারা নিড়ান নিয়ে বাস্তু, দ্বিতীয় কুং মিং আর তাঁর দুই ছেলে তখন প্রথম বারের বীজ সব মাঠে মারা গেল বলে আবার রোপণ করতে গেল। ‘রোপণের পক্ষে দিনটা শুভ নয়’, তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণীই তাঁর সর্বনাশের মূল। সারা গায়ে এ জন্ত তাঁকে হাতে হোল হাত্মান্দ।

তৃতীয় পরী-কস্তার বছর নয়কের একটি মেয়ে ছিল। নাম সিয়াও চীন। প্রতিবেশী চীন ওয়াং-এর পিতার অনুরূপ করেছিল। তিনি তাই এক দিন তৃতীয় পরী-কস্তার দ্বারায় এসে ধর্মা দিলেন। তিনি এসে বসলেন তৃতীয় পরী-কস্তার ধূপ-ধূনাপূর্ণ বেদীটির সামনে জাহ্নু পেতে এবং “দেবী”র মুখ থেকে আদিষ্ট দাওয়াই-এর জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। “দেবী” তখন বিড়-বিড় করে কি সব মন্ত্র আউড়ে চলেছেন তো চলেছেন। সিয়াও চীন ছিল রাগাঘরে। ঠাঁড়িতে ভাত চাড়িয়েছিল দুপুরেব, মাকে ঘটা করে অমন মন্ত্র পাঠের ভড়ং করতে দেখে উনানে চাপান ঠাঁড়ির কথা সে ভুলে গেল একেবারে। মন্ত্র শুনতে সে ঈর্ষা ভরসা। কিছুক্ষণ পর চীন ওয়াং-এর বুড়ো বাপ যখন প্রস্তাব কবতে বাইরে গেলেন, তৃতীয় পরী-কস্তা করলেন কি, মাধামেব আনুষ্ঠানিক আসনে বসে লোক-জন কারুর সঙ্গে তাঁর যে কথা-বাতী কওয়া নিষেধ সেটা ভুলে গিয়ে তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিয়াও চীনকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন : ‘যা যা, নিজের কাজ কর গে তুই। ভাতটা ওদিকে গলে গেল একেবারে!’

কথাটা অপ্রত্যাশিত ভাবে কানে গিয়ে পৌঁছল বুড়োর। এবং গায়ের সকলের কানে তিনি তা পৌঁছে দিতে একটুও কনুও করলেন না। এর পর থেকে কোঁচুকপ্রিয় গ্রামবাসীরা তৃতীয় পরী-কস্তার সামনেই ‘ভাতটা গো গলে গেল’ বলে টিপ্পনী কাটতে প্রায় ছাড়ত না।

২

পুরো ত্রিশ বছর ধরে তৃতীয় পরী-কস্তা দেবতা নামানোর পেশা চালিয়ে আসছেন। পনেরো বছর যখন তাঁর বয়েস, যুফুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। গায়ের মধ্যে তিনি তখন সেরা সুন্দরী। যুফুও খাঁটি লোক। কম’ঠ যুবক; বাজে কথা বড় একটা বলে না।

যুফুর মা পূর্বে মারা গিয়েছিলেন। তাই পিতা-পুত্র যখন ক্ষেতের কাজে মাঠে চলে যেতেন, ঘরে একমাত্র নব-পরিণীতা বধূ ছাড়া আর কেউ থাকত না। বধূর এই একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে গায়ের ছোকরা সব আনন্দে ছুটে আসত তাকে সঙ্গ দেবার জন্ত। দিন কয়েকের মধ্যে নববধূ সে সব ছোকরাদের মস্ত একটা দল জুটিয়ে ফেললে। ওরা এসে তাকে হাসি-ঠাট্টা-মস্তারায় সিঁকিত করে রাখত সব সময়। যুফুর পিতা বধূর এ সব চাল-চলন বরদাস্ত করতে পারতেন না। দৈর্ঘ্যের সীমা তিনি এক দিন হারিয়ে ফেললেন। বেগে আগুন হয়ে ছোঁড়াদের সব ডেকে এমন প্রচণ্ড গালাগালি করলেন, যার ফলে ওরা এ-বাড়ী আসা নিশ্চয় ছেড়ে দিত, যদি নববধূ সারা দিন-রাত্রি ধরে হলুদুল একটা কাণ্ড করে না বসত। চক্কিশ ঘণ্টার মধ্যে মাথায় দিল না সে চিক্কী ; করলে না জলস্পর্শ ;

তৃণটি পর্যন্ত কাটলে না দাঁতে ; সারাটা দিন বিছানায় শুয়েই কাটিয়ে দিল। বিস্তর সাধাসাধিতেও যদি মাথা তুলত একটি বার। স্বামী আর শ্বশুর বেকুব বনে গেল একেবারে। ব্যর্থ উঠতে পারলে না কি করবে। প্রতিবেশী এক ঠান্ডি কোপে এক ডাইনী বুড়ী এনে হাজির করল এমন সময়। সে তো বিস্তর মন্ত্র-টন্ত্র আউড়ে এক সময় বলে উঠল : ‘তৃতীয় পরী-কস্তা নববধূর স্বজ্ঞে ভর করেছে। নববধূও অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বিড়বিড় করে উঠল :

‘হ্যা-হ্যা ; না-না !’

সত্যি সে যেন কারো মিডিয়াম। এর পর থেকে তিনি নিজেকে তৃতীয় পরী-কস্তা বলে জাহির কবতে থাকেন। এবং প্রতি মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে নিয়মিত দেবতার উপাসনা করেন। মাসের এই দুই দিন গ্রামবাসীরা তাই ধূপকাঠি আর মোমবাতি নিয়ে ধর্মা দেয় তাঁর দরজায়। তিনি তখন যোগিনীর চণ্ড ওদের ভাগ্য আর স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় নানান প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন।

যে সব ছোঁড়া তৃতীয় পরী-কস্তার নিকট ছুটে আসত ওরা তাঁর মুখে ধর্ম-কথা শুনবার চাইতে তাঁর শ্রীমুখের কথামৃত শুনবার প্রতি সবিশেষ নজর দিত। তৃতীয় পরী-কস্তাও তা জানতেন। জানতেন তাঁর শক্তি নিহিত কোথায়। তাই তিনি পরিপাটি করে বেশভূষা করে থাকতেন ; চুল আঁচড়াতে পরিপাটি করে। মুখে একগাল পাউডার মেখে ঐ সব ছোঁড়াদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্ত উন্মুখ হয়ে উঠতেন।

এ হোল ত্রিশ বছর আগেকার কাহিনী। অধিকাংশ তাঁর ভক্তের এখন গৌর গিয়েছে পেকে। শ্বশুর হয়ে পড়েছে ছেলে-মেয়ের। গুটি কয়েক বাহু আইবুড়ে ছাড়া কেউ আর তৃতীয় পরী-কস্তার কাছে আসবার বড় একটা সময় করে উঠতে পারেন না। কিন্তু তিনি তা খুব একটা গায়ে মাখে না। বয়েস পঁয়তাল্লিশের কোটা ছাড়িয়ে গেছে। তবু তিনি পরিপাটি করে সাজ-গোজ করতে ভালবাসেন। জরির কাজ-করা জুতো পরেন। পায়জামা পরেন ফুল তোলা। হুঁড়োগ্যের কথা, মাথার এখানে-ওখানে চুল উঠে গিয়ে তাঁর চাক দেখা দিয়েছে। তিনি তাই চাকবার জন্ত ক্রমাল বাঁধেন মাথায়। অত পাউডার মেখেও তিনি যদি মুখে বান্ধিকোব খাঁজ ক’টা চাকতে পারতেন ! বরং পুরু করে পাউডার মাথার মুখখানাকে তাঁর অনেকটা এক স্তর তুষারাবৃত ডিম্বাকার গাণার নাদের মত দেখাত।

তাঁর আগেকার ভক্তবৃন্দের দল বড় একটা এদিক পানে মাড়ায় না। জন কয়েক যে আইবুড়ে মাঝে-মাঝে আসে তারাও হয়ে উঠেছে ফিকে-পানসে। তাই তিনি করলেন কি, নতুন করে আর এক দল ছোঁড়া নিলেন জুটিয়ে। ওরা তাঁর আমলের ছোঁড়াদের চাইতে সংখ্যায় ঢের বেশী ; দেখতেও বেশ সুন্দর। কিন্তু ওদের মূল আকর্ষণ হোল তাঁর কুমারী মেয়ে সিয়াও চীন।

৩

সব শুদ্ধ ছ’টি কস্তা জন্মেছিল তৃতীয় পরী-কস্তার। পাঁচ জনেরই শৈশবে মৃত্যু হয়, সিয়াও চীনই তাঁর একমাত্র মেয়ে যে এখন বেঁচে

আছে। সে যে বুদ্ধিমতী হু-তিন বছর বয়সেই তার প্রমাণ মিলল। মার ডবলবুল এসে ওকে লুক্কোলে তুলে নিত। বলত : “এ আমার মেয়ে!” অমনি অপর আব এক জন হয়ত ওকে কোলে নিয়ে বলে উঠত : ‘না, না, ওটি আমার মেয়ে! তার যখন বছর পাঁচ-ছয় বয়স, সিয়াও চীন তখন বুঝতে পারলে, এ সব মন্তব্য তার বেলায় মোটেই শোভন নয়। তার মা-ও তাকে শিখিয়ে দিলেন, ফের যদি কেউ অমন কথা মুখে আনে সে যেন তাকে শুনিয়ে দেয় : ‘না মশাই, আমি তোমার মাসী হই।’

সকলে বলতো, সিয়াও চীন আঠারো বছর বয়সে তার মার চাইতে বেশী সুন্দরী। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা কাজের কঁাকতালে একটু স্বেচ্ছা পেলেই তার সাথে হু’টি মিষ্টি কথা না বলে ছাড়ত না। সিয়াও চীন কাশড় কাচতে নদীতে গেলে দল বেঁধে ওরা পিছু নিত। আগাছা বাছবার জন্ত বাড়ী থেকে বেরলেই ওরা তার সঙ্গ নিত। হুপুর বেলা পাড়া-পড়ার তৃতীয় পরী-কন্ডার বাড়ীতে ছুটে আসত নিজ নিজ ভাতের বাটি নিয়ে। গল্প-গুজব করে যেত কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে। ত্রিশ বছরেরও বেশী এই রীতি চলে আসছে এ বাড়ীতে। কিন্তু ছেলে-ছোকরাদের এই উৎসাহ-আতিশয্যের ইতিহাস মাত্র দুই কি তিন বৎসরের। প্রথম প্রথম তৃতীয় পরী-কন্ডা ভাবতেন, তিনি বৃষ্টি এখনও গাঁয়ের ছোকরাদের আকর্ষণ করবার শক্তি রাখেন। পরে কিন্তু তাঁর এই ভুল ভাঙে। বুঝতে পারেন, ওরা ছুটে আসে তাঁর মেয়ের টানেই।

সিয়াও চীন মাকে আস্তে পছন্দ করে না। যা তার পক্ষে করা উচিত না এমন কিছু একটা সে করতো না, যদিও সে সকলের সঙ্গে হেসে-মেতে কথা কইত। গত হু-তিন বছর থেকে সিয়াও-এর হিআইয়ের সঙ্গে তার আলাপটা বেশ জমে উঠেছিল। গ্রীষ্মে এক সকালে বাবা তার মাঠে গেছেন ক্ষেতের কাজে। মা-ও বেরিয়েছে পাড়ায় গল্পের মজলিশে। পাড়ার বকাটে ছোঁড়া চীন ওয়াঃ এমন সময় চুকল তাদের বাড়ীতে। হু’পাটা দাঁত দেখিয়ে এক-গাল হেসে সিয়াও চীনের কাছে সে এগিয়ে এল। বলল : ‘বাঁচা গেল বাবা, ঘরে কেউ নেই! আমরা যা কিছুই করি না কেন, জানতে পারবে না কেউ।’

‘চীন ওয়াঃ-দা, কি যে বলো তুমি ঠিক নেই।’ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল সিয়াও চীন—‘আমরা কি এখনও ছেলেমানুষ?’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঢের হয়েছে, ছোনালী রাখে। আর ভালো মানুষ সাজতে হবে না।’ বলে চলল চীন ওয়াঃ—‘সিয়াও-এর হিআই এলে তো চলে পড়তে এতক্ষণে। ওর মধ্যে এমন কি পেলে শুনি যা আমার নেই? ওর উপর মন উঠতে পারে আর আমার বেলায় বৃষ্টি ওঠে না?’

সিয়াও চীনের হাত হু’খানা সে হু-হাতে আঁকড়ে ধরল। ওকে বুকে টেনে নিয়ে কানে কানে বলে উঠল : ‘যাও, ঢের হয়েছে, আর নেকামী করতে হবে না।’

এমন একটা ঘটনা ঘটবে চীন ওয়াঃ স্বপ্নেও ভাবেনি। সবাই যাতে শুনতে পায় সিয়াও চীন চিৎকার করে উঠল সে জন্ত। চীন ওয়াঃ আর করে কি? বাধ্য হয়ে ছেড়ে দিতে হোল ওকে। তার পর ঘর থেকে ছুটে পাগিয়ে গেল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল : দেখে নেবে সে।

চীন ওয়াঃকে গাঁয়ের কেউ দেখতে পারত না হু’চক্ষে। সম্পর্কিত ভাই সীন ওয়াঃই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। বাপ তার গ্রামের ক্ষেত-মালিক। প্রতাপে তিনি বাঘের মত। এক-পুরুষ ধরে বুড়ো মোড়লগিরি করে আসছে সারা গাঁয়ে। হুঃ গ্রামবাসীদের ধরে মারধর করা, আটক রাখা ইত্যাদির কলা-কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে বেশ। চীন ওয়াঃ সত্তরো-আঠারো বছর থেকে বাপের অপকর্মে নাক গলায়। ধর-পাকড় করতে হোলে বাপকে আর ছুটে হয় না নিজে। বাপের মুখের কথা বেরতে না বেরতেই ছেলে অমনি ছুটে যায়। ধরে আনতে বললে নিয়ে আসে বেঁধে। প্রতিটি দুষ্কর্ম নিজেই হাসিল করে আসে।

প্রতিরোধ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে বিশ্বাসঘাতক আর শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, ছাড়িয়ে-দেয়া সৈন্ত আর ডাকাতেরা দল বেঁধে ঘরে বেড়াত দেশের মধ্যে। উৎপাত করে বেড়াত পল্লী অঞ্চলে। চীন ওয়াঃ-এব বাপ তখন মারা গেছে। হু-ভাইকে তখন আর পায় কে? সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতার কাজে ওরা পেয়ে গেল স্বাধীনতা। পরাজিত এক দল সৈন্ত জুটিয়ে গাঁয়ের লোকদের অপহরণ করতে ওরা সহায়তা কোরত। তাদের ঘৃণ্য কাণ্ডবন্দীর এই কেবল একটা নমুনা। কমিউনিষ্ট আট-নব্বর ঝুট আর্মি এসে ডাকাতদেব অত্যাচার যখন দূর করল, হু’ভাই তখন লিউ উপত্যকায় এসে ফিরে।

লিউ উপত্যকার লোক-জন সব জন্মভীক। চারি দিকেব ডামা-ডোলের বাজাবে অনেকেই যখন বেঘোরে প্রাণ হারাজে, ওরা তখন ঘর থেকে এক পা বাড়তে কি আব সাহস পায়? আশ-পাশের বড় বড় গ্রামগুলিতে এদিকে পর-পর শাসনতান্ত্রিক দপ্তর, দেশপ্রেমিক সামন্তি, সামরিক কমিটি প্রভৃতি গড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু লিউ উপত্যকায় একমাত্র গাঁয়ের মোড়লের পদ ছাড়া—তাও আবাব শাসন-কর্তা এসে নিয়োগ করে গিয়েছিলেন—কেউ আব অমন ধারা সরকারী কোন পদে অধিষ্ঠিত হ’তে সাহস করল না। গ্রাম্য প্রতিনিধি নির্বাচনেব জন্ত যখনই কোন আমলাকে সরকারী দপ্তর থেকে পাঠান হোত লিউ উপত্যকায়, গ্রামবাসীরা তখন একে অপরকে দেখিয়ে দিত। পদ-প্রার্থী হ’তে নিজেরা কিছুতেই চাইত না। ‘জনগণকে সেবা করা’র এই স্বেচ্ছা হারাল না চীন ওয়াঃ আর সীন ওয়াঃ। সীন ওয়াঃ গ্রাম-রক্ষী দলের আর চীন ওয়াঃ বেসামরিক কমিসার দপ্তরের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হোল। এমন কি, চীন ওয়াঃ-এর স্ত্রীও বাদ গেল না। জাপবিরোধী নারী সমিতির সে সভানেত্রী নির্বাচিত হোল! বাদবাকী পদগুলি ভর্তি করা হোল যত সব বুড়ো আর অর্থবন্দে দিয়ে। কিন্তু জাপবিরোধী যুব বাহিনীর অধিনায়কত্ব তো আব কোন-বুদ্ধকে দিয়ে চলে না। চীন ওয়াঃ-এর তখন মনে পড়ল সিয়াও-এর হিআই-এর সুন্দর মুখখানা। ওকে সে ও-পদে বসিয়ে দিল। সিয়াও-এর হিআই-এর বাবা দ্বিতীয় কুং নিং এটা পছন্দ করেন না। তবে চীন ওয়াঃ-এর বিরাগভাজন হতেও তিনি চান না, ফল নির্বাচন কালে সিয়াও-এর হিআই সহজে নির্বাচিত হয়ে গেল।

গাঁয়ের মোড়ল এই উপত্যকার বাসিন্দে। অনেক কিছু তাঁকে শিখে না নিলে চলে না। যতই দিন যেতে লাগল চীন ওয়াঃ আর আর সীন ওয়াঃ-এর প্রতিপত্তি বেড়ে উঠল। পূর্বের চাইতে ওরা

আরও উগ্রতর হয়ে উঠতে লাগল। ছোটখাট আমলাদের চোখে বত দিন ধূলা দেয়া যায়, গ্রামবাসীদের তখন গ্রাছ করে কে? ওর। তো কেবল তাদের কুপার পাত্র। গ্রাম্য-প্রতিনিধিদের যখন-তখন বদ-বদল হ'তে লাগল। হু'ভাই কিন্তু নিজ নিজ পদে কায়েমী হয়ে দইল। সকলে ওদের বিষবৎ বর্জন করত। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত অমন দুই শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পাবত না অর্ধেকটাও।

৫

সিয়াও-এর হিআই দ্বিতীয় কুং মিং-এর দ্বিতীয় পুত্র। একবার যখন শত্রুদেব বিরুদ্ধে ধড়-পাকড় যুদ্ধ চলছিল, হু'জন শত্রুসৈন্যকে সে তখন ঘায়েল করে। দক্ষ নিশানাদার হিসেবে সে লাভ করেছিল পুরস্কার। চাঁদপানা তার মুখ আর সুগঠিত তার দেহাবয়ব ছিল উপত্যকাব সকলের গর্বের বস্তু। প্রতি বছরের প্রথম মাসে সে যখন গ্রামে-গ্রামে খেলতে যেত, মেয়েরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত তার দিকে।

সিয়াও-এর হিআই ইচ্ছলে কখনও পড়েনি। তার বয়স যখন ছয়, বাবা তাকে গুটি কয়েক অক্ষর শিখিয়ে দেন। সে খুব চালাকচতুর ছেলে। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বড় শ্লোক শীঘ্র সে কণ্ঠস্থ করে নিল। কোন আগন্তুক এলে ওর বাবা ছেলেকে তাদের নিকট এনে হাজির কবত। ওবাও তার শাস্ত্র স্বভাবের সুযোগ নিয়ে তাকে জ্বালাতন না করে ছাড়ত না। কিন্তু “শত্রু-বপনের পক্ষে অন্তত দিনের” দুর্ঘটনার পর দ্বিতীয় কুং মিংকে দেখলে গ্রামবাসীরা অমনি হাসি-ঠাটা শুরু করে দিত। তাঁর স্ত্রী আর বড় ছেলেটিও বাপের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। বোচারী সিয়াও-এর হিআইকেও বাপের নিন্দার অর্ধেক ভাব মাথা পেতে নিতে হোল। ছেলেমাছুষ পেয়ে তাকে নিয়ে সবাই এ জন্ম ঠাটা-তামাসা করত। তার বয়স তখন তেরো বছর। কিন্তু বড়োরা তাকে নিতান্ত ছেলেমাছুষ বলেই গণ্য করত। আর তার সমবয়সীরা আচ্ছা করে তাকে জদ করার জন্ম ফলি আঁটত। ওরা তাব পিছু নিতো। চাঁৎকার কবে বলে উঠত : “বীজ-বপনের পক্ষে শুভ নয় দিনটা গো, শুভ নয় দিনটা!” এমন ধারা প্রায় মাসখানেক ধরে চলল। মার উপদেশ মত সিয়াও-এর হিআই ভবিষ্যতে বাপের কোন ব্যাপারে আব থাকবে না ঠিক করলে।

আজ হু'বছরেরও বেশী সিয়াও চীনের সঙ্গে সিয়াও-এর হিআইয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তার বয়স তখন সতেরো। পাড়ার বকাটে ছোঁড়াদের সঙ্গে মিশে শীতের এক দীর্ঘ রাত্রি সে আড্ডা দিতে এসেছিল তৃতীয় পরী-কস্তাদের বাড়ীতে। সিয়াও চীনের সঙ্গে তখন হয় তার প্রথম আলাপ। আজ তা এমন নিবিড় হয়ে উঠেছে যে, প্রত্যহ একবার সিয়াও চীনকে না দেখলে প্রাণ তার আই-চাই করতে থাকে। প্রেমিক-প্রেমিকা হু'জনকে পরিণয়-সূত্রে বেঁধে দেবার জন্ম গাঁয়ে অবশ্য ঘটকের অভাব ছিল না। কিন্তু এ বিয়েতে দ্বিতীয় কুং মিং-এর আপত্তি তিন কারণে : প্রথম দক্ষ, সিয়াও-এর হিআইয়ের রাশি হোল “ধাতু” আর সিয়াও চীনের “অগ্নি”। এখন অগ্নি ধাতুকে কোলেই যে গিলে খায়! দ্বিতীয়তঃ, সিয়াও চীনের জন্ম বছরের দশম মাসে। ও-মাসটা নিফলা। আর তিন কারণ—তৃতীয় পরী-কস্তার বিরুদ্ধে প্রচলিত বদনাম।

চ্যাংতে অঞ্চল থেকে তখন এক দল বাস্তহারা এসেছিল। ঐ দলে লি নামে ছিল এক বৃদ্ধ, তার ছিল আট-নয় বছরের একটি ছোট মেয়ে। অনাহারের কবল থেকে বাঁচবার জন্ত মেয়েটাকে কারও কাছে গছাতে পারলেই বৃদ্ধা যেন বর্তে যায়। দ্বিতীয় কুং মিং ভাবলেন, দাঁও-এ বৃদ্ধি পাওয়া গেল মেয়েটাকে, তিনি ওর জন্ম-তারিখ আর ঠিকুজাটা চেয়ে নিলেন। তার পর বিস্তার গণনা করে ঘোষণা করলেন : ‘হাজার হাজার মাইল দূরদেশে জাতক-জাতকীর জন্ম বটে, কিন্তু ওদেব হু'জনের বিবাহ হ'তেই হবে—বিধাতার লিখন!’ সিয়াও-এর হিআইয়ের ভাবী বধুরূপে তিনি মেয়েটাকে বাড়ীতে রেখে দিলেন।

বাপ মেয়েটাকে আদর্শ পুত্রবধুরূপে নিলেও তাঁর ছোট ছেলে কিন্তু ওকে দ্বীপে গ্রহণ করতে সম্মত হোল না। এ নিয়ে পিতা-পুত্র মনোমালিন্য চলল দিনের পর দিন। দ্বিতীয় কুং মিং কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না। নিজের জিদ বজায় রাখলেন। সিয়াও-এর হিআই তখন বলল : ‘বেশ, তুমি যদি ওকে বাড়ীতে রাখতে চাও রাখো। আমি’ কিন্তু এর মধ্যে নেই।’

মেয়েটা শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল। তবে বাড়ির অপর লোক-জনদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কি, সঠিক বোঝা গেল না।

৬

সিয়াও চীনের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে চীন ওয়াং মনে-মনে তার উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করলে। যতই দিন যেতে লাগল

## উকুনের নতুন ওষুধ নিউট্রল-লাইসাইড

“আমি ‘লাইসাইড’ পাইয়াছি ও ব্যবহার করাই-য়াছি। আপনার প্রেরিত উকুনের ওষুধ বিশেষভাবে কার্যকরী। লোকে জানিতে পারিলে ইহার বহুল বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।...আপনাদের ওষুধের ও ব্যবসায়ের উন্নতি কামনা করি।”

শ্রী কে, কে, দাস ; Rajapalayam, S.I. Rly.

প্রতি প্যাকেটের জন্ম দুই আনার ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা কয়েকটি জেলায় এই “লাইসাইড” পরিবেশক প্রয়োজন। উক্তগারে কমিশন দেবো।

# নিউট্রল

Dept. M. B.

১৯, বগুলা রোড ; কলিকাতা-১৯

সকল তার বাড়িতে লাগল। সিয়াও-এর হিআই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। তাই সামরিক সদর দপ্তরের জ্ঞাত গ্রাম্য-প্রতিনিধিদের শিক্ষার এক সভায় সে পারল না উপস্থিত থাকতে। সভার পর চীন ওয়াং সিন ওয়াংকে বলল : ‘সিয়াও-এর হিআইয়ের অর না হাতি! আসলে ও গিয়ে প্রেম করছে সিয়াও চীনের সঙ্গে। ওর বিরুদ্ধে আমাদের এবার লড়াই হবে।’

সিন ওয়াং ছিল গ্রামবন্দী দলের কর্তা। সিয়াও চীনের উপর তার ও রাগ। সহজেই সে রাজী হোল। চীন ওয়াংকে বললে, সে যেন তার স্ত্রীকে বলে জাপবিরোধী নারী সমিতিতে সিয়াও চীনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালায় এ নিয়ে। চীন ওয়াংয়ের স্ত্রী ঐ সমিতির সভানেত্রী। সিয়াও চীনের বাড়ীতে স্বামী তার ঘন ঘন যাতায়াত করত বলে ওকে সে ঘৃণা করত। কুমতলবটা শুনে সে বরং খুশীই হোল; ভাবলে, এত দিনে বুঝি গায়ের ঝাল সে মেটাতে পারবে। হাতের সেলাইএর কাজ ফেলে সে অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল শব্দকে জব্দ করতে। পবদিন গ্রামে দু’টি সভার আয়োজন হোল। সিয়াও-এর হিআইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জ্ঞাত সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক আহূত হোল একটা সভা। আর অপরটা ডাকা হোল সিয়াও চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জ্ঞাত জাপবিরোধী নারী সমিতি কর্তৃক।

যে অপরাধ সে করেনি তার কাছে নতি স্বীকার করতে সিয়াও এর হিআই কিছুতেই পারলে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে সে অটুট রইল। ওকে বেঁধে আনবার জ্ঞাত সিন ওয়াং আদেশ দিল তার লোক-জনদের। বিচারের জ্ঞাত চালান দিল তাকে গ্রামের কর্তৃপক্ষের নিকট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গায়ের মোড়লটি জায়বান আর ঠাণ্ডা মেজাজী। সিন ওয়াংকে তিনি জানালেন : সিয়াও-এর-হিআই সত্যিই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। আর ও যদি প্রেমও করে থাকে তা আপনার বে-আইনী কেন হবে? এ জ্ঞাত আপনি খামকা ওকে বেঁধে আনতে পারেন না।’

সিন ওয়াং কিন্তু নাছোড়বান্দা। বার বার সে বলতে লাগল : ‘ওর যে এক স্ত্রী বর্তমান আছে!’

‘সে কি কথা! ছোট সে মেয়েটাকে ওর বাপ ছেলের বউ হিসেবে পছন্দ করেছিল, ওকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি। এ কথা যে গায়ের সকলেই জানে!’ জবাব দিলেন মোড়ল। বললেন,—‘ঐ বিয়েতে ওর আপত্তিও কাণ আছে বই কি! ছেলের ঘোল বছর আর মেয়েদের পনেরো বছর না হ’লে যে বাগদত্তা করা চলে না। ছোট ওই মেয়েটা তো এখনো তেরো বছরে পা দেয়নি। সে যখন বড়ো হবে সেও তখন আপন পছন্দ মত নিজ স্বামী বেছে নিতে চাইবে। অতএব, সিয়াও-এর হিআই নিজ পছন্দ মত কোন মেয়েকে ভালবাসতে পারে বই কি! কেউ তাতে বাধা দিতে পারে না।’

সিন ওয়াং-এর মুখে কোন উত্তর জুটল না। সিয়াও-এর হিআইও পান্টা অভিযোগ আনল। বলল : ‘বিনা কারণে কাউকে বেঁধে আনা কি আপনার আইন মাসিক কাজ হচ্ছে?’

দুই জনকে শাস্ত করবার জন্য মোড়ল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পল্লী-শাসন দপ্তর থেকে সিঙন ওয়াং বিদায় নেয়নি তখনও। তার পুঁহিই সিয়াও চীনকে রণ-রঙ্গিনী বেশে ওসিকে আসতে দেখা গেল জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রীকে হেঁচড়িয়ে টেনে আনতে।

কাছারীতে চুকবার পুঁহিই সে মোড়লকে উদ্দেশ্য করে চৈচিয়ে বলে উঠল : ‘আপনারাই বলুন তো, কারো নামে কোন অভিযোগ আনলে তার প্রমাণ চাই না? জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রী বলে উনি কি মাথা কিনে নিয়েছেন? মজি-মাসিক বা-খুশী তাই করে যাবেন?’

সিন ওয়াং চীন ওয়াং-এর স্ত্রী দশা দেখে ভয় পেয়ে গেল মনে-মনে। আশংকা হোল, কি জানি আড়াগোড়া সব ঘটনাটাই বুঝি বেকাঁস হয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ে সে নিজেও। তাই সে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল ওখান থেকে। গায়ের মোড়ল ব্যাপারটা সব শুনলেন। কিছু অমুসন্ধানও করলেন। তাব পর থানিকক্ষণ ভেবে-চিন্তে মামলাটা মিটিয়ে দিলেন অবশেষে।

৭

এদিকে তৃতীয় পরী-কস্তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যুবকদের সঙ্গ তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়েটাই যে পথের কাঁটা! ওরা কেউ আর তাঁকে পৌছে না। সিয়াও চীনের সঙ্গ চায় সবাই। এটা তিনি টের পেলেন সম্প্রতি। সিয়াও-এর হিআই ছোঁড়াটা একটি তাজা ফল—ভাবেন তৃতীয় পরী-কস্তা। কিন্তু মেয়েটাব জ্ঞাত একবার চোখে দেগবার কি উপায় আছে? সিয়াও চীনের জ্ঞাত তিনি বহু দিন থেকে একটা পাত্রের সন্ধান করছিলেন। মেয়েটাকে পান করতে পারলে তিনি যেন নিষ্কৃতি পান। কিন্তু তাঁর অপবাদের জ্ঞাত কোন পরিবারই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে রাজী হয় না। পল্লী-শাসন অফিসের সেদিনকার ঘটনাবলি পর অনেকেই তো কানাক্ষুণ্য করতে লাগল, এব-হিআই সিয়াও চীনকে বাপ-মায়ের বিনা অনুমতিতে বিয়ে করতে যাচ্ছে। তৃতীয় পরী-কস্তা তখন ভাবলেন, সিয়াও-এর হিআই-এর সঙ্গে তাহ’লে আব তাঁর চলামি করা চলে না।

কথায় বলে কি, “সৈন্ত-সংগ্রহের নিশানাটা একবার তুলে ধরো, দেখবে, দলে-দলে ক্ষুধার্তা সৈন্তদলে ভর্তি হ’তে ছুটে আসছে!” তাই হোল। উ শানসির সমরকর্তা ইয়েন সি-সানের অধীনস্থ জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মেজর। ভদ্রলোক বিপত্নীক। গ্রামের মন্দিরের নিকট ভিড়ের মধ্যে সিয়াও চীনকে দেখে ওকে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবেন, স্থির করলেন। তৃতীয় পরী-কস্তাও এটাকে ঈশ্বর-প্রদত্ত সুযোগ বলে ভাবলেন। ঘটক মশাইয়ের প্রথম আগমনের দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি মেজর উর কাছ থেকে পাকা-দেখার উপহার গ্রহণ করে বসলেন।

এদিকে সিয়াও চীন ভাবছিল, সিয়াও-এর হিআইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা সব যখন একরূপ ঠিক-ঠাক হয়ে রয়েছে, সে এখন মা’র প্রস্তাবে কান দেয় কি করে? তাই যেদিন পাকা-দেখার উপহার সব বাড়ীতে এল, মা’র সঙ্গে তার একপ্রস্থ ঝগড়া হয়ে গেল। অলংকার আর সিন ও সাতিনের জামা-কাপড়গুলি মেঝের উপর সে দিলে ছুঁড়ে। ঘটক মশাই চলে যেতেই মাকে সে জানিয়ে দিলে : ‘এ সব উপহারে তার প্রয়োজন নেই। বার প্রয়োজন সেই যেন বিয়ে করে তার পরিবর্তে।’

তৃতীয় পরী-কস্তা এবার সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়লেন, তিনি একটা লম্বা ঘুম দিলেন। তার পর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে বার-দুই হাই তুললেন। তার পর মন্ত্র আউড়িতে লাগলেন বিড়বিড় করে।

বলতে লাগলেন, দেবতা আবার তাঁর উপর ভর করেছে। প্রথমেই তিনি স্বামীর উপর এক হাত নিলেন। বললেন, তিনি অমন দুর্বল বলেই তো আজ এই দুর্দশা সংসারের। তার পর তিনি জানালেন, সিয়াও চীন আর মেজর উর বিবাহ পূর্বজন্ম থেকে ঠিক হয়ে আছে। আরও বললেন : ‘বিয়ে-সাদি সব ভগবানের হাত। এক চুল নড়চড় হবার জো নেই! যদি কেউ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, সে তার সর্বনাশ ডেকে আনে; কুড়ুল হানে আপন পায়ে!...’

স্বামী সব শুনে খর-খর করে কাঁপতে লাগলেন। মেঝেতে ধাঁটু গেড়ে বসে দেবীর কাছে করজোড়ে মিনতি করতে লাগলেন কমা করতে। ‘দেবী’ আদেশ দিলেন যেন সিয়াও চীনকে আছা করে ঠেঙিয়ে দেয়। আদেশটা মেয়ের কানেও গেল। ‘দেবী’র ভাণ করা তার মাকে সে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না, জানত। তাই সে এটী থেকে বেরিয়ে গেল। এবার বাজে যত খুশী বকুক গে।

সিয়াও-এর হিআইকে খুঁজতে সিয়াও চীন গ্রামের ড-মাথার দিকে ছুটে চলল। মাঝপথে এসেই সে দেখা পেল এর-হিআইয়ের। সেও বেরিয়েছিল তাকে খুঁজতে। ওরা দু’জন হাত-ধরাধরি করে প্রকাণ্ড একটা গুহার দিকে চলল। হু’জনে সেখানে বসে তৃতীয় পর্ব-কথা সম্বন্ধে কি করা যায় ভাবতে লাগল।

৮

সিয়াও চীন এর-হিআইকে সব কথা খুলে বলল। মেজর উকে বিয়ে করার জন্ত মায়ের পীড়াপীড়ি, মার ‘দেবীর’ ভাণ-করা কথা, আর সে অবস্থায় তিনি যা-যা বলেছেন—সবই সে সিয়াও-এর হিআইকে জানালে।

‘ওঁকে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।’ সিয়াও-এর হিআই উত্তর দিলে—‘শহরের অফিসে গিয়ে আমি খোঁজ করে এসেছি। ওঁরা বললেন, যে-কোন যুবক-যুবতী বিবাহ-সার্টিফিকেটের জন্ত আবেদন করতে পারে। তাদের পরস্পরের সম্মতি থাকলেই হোল। কেউ আর আটকাতে পারবে না।...’

এমন সময় বাইরে ওরা কাদের পদধ্বনি শুনতে পেল। সিয়াও-এর হিআই উঁকি মেয়ে দেখল, চার-পাঁচ জন লোক এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। এক জন চাঁৎকার করে বলছে : ‘গ্রেপ্তার করবি, হু’জনেকেই অমনি গ্রেপ্তার করবি।’

চীন ওয়াং-এর গলা। এর-হিআই আর সিয়াও চীন হু’জনেই হতস্রাৎ চিনতে পারলে। এর-হিআই নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলে না। হেঁকে বলে উঠল : ‘কে কাকে গ্রেপ্তার করছে শুনি! আমাদের কথা যদি বোলো, আমরা যে-আইনী কি দাবী?’

বলা বাছল্য, সিন ওয়াংও সঙ্গে ছিল। সে আদেশ দিল : ‘ছেড়ে দিয়ো না, ছেড়ে দিয়ো না ওকে। যে-আইনী কিছু করেছে দি না সে পরে দেখা যাবে, এখন ছেড়ে দিয়ো না। বাপস্, কি মাথা-বাখাটাই না গেছে ওর জন্য গেল কিছু দিন থেকে।’

‘বেশ, যেখানে যেতে বলবে যাবো’—জবাব দিলে এর-হিআই—‘চল, জিলা-সরকারের কাছে যদি যেতে বোলো যাচ্ছি। সেখানে গিয়েও আমি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করবো।’

‘অতো সহজে নিস্তার পাবে ভেবো না যাহু!—সিন ওয়াং বলে চলল—‘বাঁধ ওকে আছা করে!’

সিয়াও-এর হিআই সহজে হার মানল না। বিস্তর সে খস্তা-খস্তি করল ওদের সঙ্গে। একা সে, পেরে উঠবে কেন? ওরা তাকে বাঁধল অবশেষে। ‘হু’—এক ঘা দিলও বেশ।

‘বাঁধ, মেয়েটাকেও বাঁধ!’ সিন ওয়াং হাঁকলে।—‘বাঁধ ওকেও। সেবার খুব যে বলছিল, অভিযোগের প্রমাণ কই? কেমন এবার? হু’জনেকেই এখন হাতে-নাতে ধরা গেছে।’

বেচারী সিয়াও চীনকেও ওরা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বাঁধলে দড়ি দিয়ে। পল্লীবাসীরা তখনও ঘুমতে যায়নি। গোলমাল শুনে অনেকে ছুটে এল। মশালের অস্পষ্ট আলোয় ওরা হু’জন যুবক-যুবতীকে দেখলে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। এ অবস্থায় ওদের দেখে ব্যাপারখানা কেউ বলে না দিলেও সবাই আন্দাজ বসে নিলে। দ্বিতীয় কুং মিংও ছুটে এসেছিলেন। ছেলেকে অমন দশায় দেখে তিনি তো সিন ওয়াংয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

করজোড়ে বলতে লাগলেন : ‘সিন ওয়াং, তোমাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের কোন প্রকার শত্রুতা নেই, বাবা! আমি বুড়ো মানুষ, আমার মুখ দেখে বাবা, ওর প্রতি তুমি সদয়...’

‘ওর সম্পর্কে আমাদের এখন আর কিছু করবার নেই।’—জবাব দিলে সিন ওয়াং—‘ওকে দায়রা সোপর্দ করতে হবে।’

‘বাবা, তুমি ব্যস্ত হয়ে না। সিয়াও-এর হিআই বলে উঠল।—

‘ওরা যেখানে খুশী আমায় পাঠাক না কেন, আমি তো কোন দোষ করিনি। অতো ভয় কিসের?’

‘খুব যে হে ছোকরা! শেষ পর্যন্ত তোমার মুরোদ টিকলে হয়!’—সিন ওয়াং টিপ্পনী কাটলে।—‘ওদের নিয়ে চল’—বলে সে হুকুম দিলে তিন জন গ্রামরক্ষীকে।

গ্রামের শাসন-দপ্তরে নিয়ে যাবো ওদের?’—রক্ষীদের এক জন বলে উঠল।

‘না, ওখানে নিয়ে গিয়ে কি হবে? গ্রামের প্রধান তো সেবার ওকে অমনিই ছেড়ে দিলে।’—জবাব দিলে সিন ওয়াং। বললে—‘জিলা ফৌজী সদর দপ্তরে নিয়ে যা ওদের। বিচার হবে সামরিক আদালতে।’

ওরা তাই যুবক-যুবতী হু’জনেকে ফৌজী সদর দপ্তরের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

৯

তরুণ-তরুণীর এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে গ্রামদাসীদের কারো টু’ শব্দটি করবার সাহস হোল না। ওরা সবাই দ্বিতীয় কুং মিংকে বাড়ী ফিরবার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

মাধু পুরুষটি খালি মাথা নেড়ে চললেন সমানে : ‘হার এমন ধারা বিপদ যে ঘটবে আমি আগেই জানতাম। কাল সকালে মাঠে বাছিলাম, পথে দেখলাম, এক যুবতী পাছাড়ে চড়ছে। পরনে তার শোকের পোষাক। সে চলেছে এক গাধার পিঠে চড়ে। এটা যে অলক্ষণের চিহ্ন ঠিক জানতাম। এ বছরটা আমার বাছ-দশা। কোষ্ঠীতে লেখা আছে, সকাল বেলা শোকাতুরা কারো মুখ দর্শন করলে একটা মা একটা বিপদ



ঘটবেই। তাই তো আমি কোথাও বড় যাই-টাই না। কিন্তু ভাগ্যলিপি খণ্ডাবে কে? গতকাল রাত্রে এর-হিআই-এর জননীও স্বপ্ন দেখেছেন যে, মন্দিরে খুব গান-বাজনা হচ্ছে। শুধু তাই না, আজ ভোরে একটা কাকও ঘরের চালায় বসে দশ-দশ বার ডেকে গেল কা-কা করে। হায়, কপালের লেখা কে মুছতে পারে গো!

যাদের মাথার উপর অমন বিপদ, তাদের চোখে কি নিজ্রা আসে? একমাত্র দত্তক পুত্রবধু ছাড়া দ্বিতীয় কুং মিংদের বাড়িতে সে রাত্রে শয্যা পাতা হোল না। দ্বিতীয় কুং মিং হাত-মুখ ধুয়ে। তার পর তিনটে পয়সা বার করে টেবিলের উপর তা ছুঁড়ে দিয়ে বসলেন ধ্যানে। পয়সা কয়টাতে যা দেখলেন তাতে তাঁর নিজেরও ভয় হোল রীতিমত। মুখখানা তাঁর ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। তিনি গৌড়িয়ে উঠলেন: ‘ঈশ্বর, হা ঈশ্বর, বীভৎস ওই সব প্রেতাত্মা দেখলাম কেন? আমার চার দিকেই দেখছি বিপদ—খালি বিপদ। হায়, সে-বার এর-হিআই যখন গ্রাম্য যুব-বাহিনীর ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হোল, তখনই আমি ওকে পই-পই করে নিষেধ করলাম, বললাম: ‘নিস নে চাকরীটা! তা বেজম্মা কি আমার কথা কানে তুলবে? এখন যে কোঁজী আদালতে বিচার হতে চলল। ক্যাপ্টেন না হ’লে কি অমন ঘটতো?’

গিন্নী এসেও নাকি-কান্না জুড়ে দিলে: ‘হা ঈশ্বর, আমার এর-হিআই বাছাটাকে অমন সাজা দিলে কেন?’

বড় ছেলে তা-হিআই বাপ-মাকে শাস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। বললে: ‘আপনারা কিছু ভাববেন না। ও তো আর কাউকে খুন-জখম করেনি যে, সাংঘাতিক কোন অপরাধে অপরাধী সে। জিলা কতৃপক্ষের কাছে ওকে তো নিয়ে গেছে, আমিও যাচ্ছি। দেখি মামলা কদর গড়াল। আপনারা এখন গিয়ে শুয়ে পড়ুন গে।’

একটা লঠন খেলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে।

তা-হিআই চলে গেল। দ্বিতীয় কুং মিং তখনও তার ছক-কাটা ভাগ্য-চক্রের উপর খুঁকে পড়ে কি-সব অনুধাবন করতে লাগলেন। এমন সময় এক মহিলার কান্না তাঁর কানে এল। পর-দুহুতেই মহিলাটি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লো এবং ওকে চিনে উঠবার পূর্বে সে তাঁকে আঁকড়ে ধরে কেঁদে উঠল: ‘আমার মেয়ে কই, লি শিউ-তে! বলো, আমার মেয়েকে কোথায় চুরি কবে লুকিয়ে রাখলে তোমার ছেলে? আমি……’

দ্বিতীয় কুং মিং-র স্ত্রী তখন গায়ের ঝাল মিটাবার জন্য এক জন কাউকে খুঁজছিল। যখন সে দেখলে আগন্তুকটি তৃতীয় পরী-কন্যা, তখন সে “ক্যাং” থেকে ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। চীৎকার করে বলে উঠল: ‘কপাল ভাল, হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম। নইলে আমার আবার খুঁজে বেড়াতে হোত। বজ্জাত মা-বেটি মিলে আমার ছেলের মাথাটি খেলে—বাছাকে অমন কাজটা করতে উকানি দিলে; এখন আবার পোড়া-মুখ দেখাতে এসেছে! চল মাগী, গ্রামের কতৃপক্ষের কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে এর বিহিত করতে হবে’

মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে ওরা তার পর এমন চুলোচুলি শুক করলে বা কেবল মেয়েদের পকেই সম্ভব। দ্বিতীয় কুং মিং তাঁর ধ্যান

ধারণার কথা সব ভুলে গিয়ে দু’জনকে ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তৃতীয় পরী-কন্যা নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বুঝলেন, টের পেলেন, চুলোচুলিতে প্রতিবন্ধিনীই তাঁর অধিকতর পটু। তিনি নিজেকে কোন-রকমে মুক্ত করে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ও-বাড়ি ছেড়ে। দ্বিতীয় কুং মিং-গিন্নীও তাঁর পিছু নিচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামী এসে তাকে থামালেন। তৃতীয় পরী-কন্যা চলে গেলেও কুং মিং-গিন্নী অনেকক্ষণ ধরে অভিসম্পাত করতে ছাড়ল না।

১৬

দ্বিতীয় কুং মিং সারা রাত্রি জেগে কাটালেন। পরদিন ভোব হবার পূর্বেই তিনি জিলা শাসন-দপ্তরের দিকে রওনা হলেন। মাঝামাঝি যখন এলেন দেখলেন, তা-হিআই আর গ্রামরক্ষী তিন জন ফিবে আসছে। ওদের সঙ্গে এক জন সহকারী আমলাও রয়েছেন, আর আছে এক জন শাসন-দপ্তরের পাইক। দূর থেকে ছেলেকে দেখে দ্বিতীয় কুং মিং উচ্চস্বরে বলে উঠলেন: ‘তা-হিআই, কি হোল রে? সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি তো?’

‘না না, তেমন কিছু না। ব্যস্ত হবেন না আপনি’—জবাব দিলে তা-হিআই।

ওরা এবার সামনা-সামনি এসে পড়ল। সহকারী আমলাটি আব গ্রাম-রক্ষী তিন জন দ্বিতীয় কুং মিং-এর পাশ কেটে চলে গেল। তা-হিআই পাইকের সঙ্গে বাবার পরিচয় করিয়ে দিল। বলল: ‘জিলা কতৃপক্ষের আপনাকে আর ‘বুফু-গিন্নীকে জিলা শাসন-দপ্তরে ডেকে পাঠিয়েছেন। আপনি বরং এখনই যান। কিছু ভয় করবেন না। এর-হিআই আর সিয়াও চীনকে শাসন-দপ্তর কাছারীতে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সিন্ ওয়াং আর চীন ওয়াং-এর অপকারের কথা কতৃপক্ষের কানে বহু দিন থেকে যাচ্ছিল। ওদের দু’জনকেই এখন গারদে রাখা হয়েছে, সহকারী যে আমলাটিকে আপনি এইমাত্র যেতে দেখলেন, তিনি এখন আমাদের গ্রামে যাচ্ছেন সিন ওয়াং আর চীন ওয়াং ভাইদের দুষ্কৃতি আর অবৈধ কাৰ্যবলীর সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে। কাল রাত্রে আমি যখন জিলা শাসন-দপ্তরে গিয়ে পৌঁছলাম, দেখলাম, আগেই মামলা এক রকম শেষ হয়ে গেছে। জিলা-কতৃপক্ষ সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের বিয়েটা সমর্থন করেছেন।’

‘যাক বাবা, শুনে সুখী হলাম ওরা অবৈধ কিছু করেনি।’—দ্বিতীয় কুং মিং বলে উঠলেন—‘কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হ’তে পারে না। ওদের কোণ্ঠীর যে মিল নেই! আচ্ছা, আমার তলব করেছে কেন বলতে পারিস?’

‘না।’ তা-হিআই জবাব দিলে।—‘তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি বরং একটু শীতাই যান। আমি বাড়ী গিয়ে মাকে সব বলছি।’

পাইকটা এবার প্রথম কথা কইলে। বললে: ‘শুনলে তো জ্যাঠা, আপনাকে তলব করা হয়েছে। আপনি এক্ষুণি যান। আমি গিয়ে অপর জনের উপর শমনজারি করে আসি।’

তা-হিআইকে নিয়ে সে চলে গেল।

জিলা শাসন-দপ্তরে গিয়ে কুং মিং দেখলেন, এর-হিআই আব সিয়াও চীন পাশাপাশি এক বেঞ্চিতে বসে আছে। ওদের দেখে

দাঁধ পিঠে ঝলে উঠল রাগে। সিয়াও-এর হিআইকে লক্ষ্য করে তিনি পার্শ্ব উঠলেন : 'সব নষ্টের মূল হলি বেটা তুই! খালাস পেয়ে গেছিস কখন, এখনো বাড়ি যাসনি কেন? বেহায়া কোথাকার? ভেবে-ভেবে তোর জন্ত আর একটু হ'লে আমি প্রাণ হারাভুম, আর তুই কি না—'

'কি হোল আপনার?'—মেয়ের হৈকে উঠলেন—'এটা অফিস না বাজার?'

এ ক্ষেত্রে যে চূপ করতে হয় এ হ'স দ্বিতীয় কুং মিং-এর ছিল। মেয়ের আবার হাঁকলেন : 'আপনিই বুঝি লিউ সি-তে?'

'আজ্ঞে!' সাধু দ্বিতীয় কুং মিং জবাব দিলেন।

'আপনি কি আপনার পুত্র সিয়াও-এর হিআইয়ের জন্ত একটা শিশু-কঙ্কাকে পুত্রবধূ হিসেবে দস্তক নিয়েছেন?'

'আজ্ঞে!'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'আজ্ঞে, 'মক্টি' মাসে ওর জন্ম—এই বছর বারো হোল।'

'পনেরো বছর না হ'লে কোন মেয়েকে বাগ্‌দস্ত করা চলে না। গান, ওকে আপনি ওর নিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন গে। সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীন এখন থেকে বাগ্‌দস্ত হয়ে রইল।'

'মেয়েটার যে কেউ নেই হুজুর। খালি আছে এক বাপ, সে-ও খাবার বাস্তহারা।'—দ্বিতীয় কুং মিং জবাব দিলেন—'কোথায় সে এখন ঘ'বে বেড়াচ্ছে, কে জানে? এমন একটা স্থান নেই যে মেয়েটাকে পাঠাই। মেয়েদের পনেরো বছর না হ'লে বাগ্‌দস্ত করা চলে না, তা সরকারের আইন আছে বটে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে যে ৭৮ বছর বয়সেই মেয়েদের সব বিয়ের জবাব হয়ে যায়। আমার প্রতি একটু সদয় হোন হুজুর, সদয় হোন! ...'

'অবৈধ এই বাগ্‌দস্তদের এক জনই যদি বিয়ে নাকচ করতে চায়, তাই হ'বে কিন্তু।'—জিলা মেয়র বললেন।

'না হুজুর, ওরা হু'জনেই এ বিয়েতে সম্মত আছে।'—দ্বিতীয় কুং মিং বলে উঠলেন।

'এর-হিআই, তুমি কি তোমার পিতার সঙ্গে একমত?—মেয়র প্রশ্ন করলেন।

'না।' সিয়াও-এর হিআই জবাব দিল।

জবাব শুনে দ্বিতীয় কুং মিং চটে উঠলেন। চোখ রাড়িয়ে এর-হিআইকে ধমকিয়ে উঠলেন। বললেন : 'জানিস, এখন সব-কিছু নির্ভর করছে তোর উপরই!'

'আচ্ছা, বাগ্‌দস্ত কে আপনার ছেলে না আপনি?'—মেয়র টিপ্তন্বী কাটলেন।—'আজকাল ছেলেরা বুড়ো বাপ-মায়ের মত নিয়ে গা না-নিয়ে বৌ পছন্দ করছে। আপনি যে মেয়েটাকে দস্তক নিয়েছেন তার যদি যাবার কোন স্থান না থাকে আপনিই তাকে আপনার মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করে নেন না কেন?'

'আমার অবস্থা কোন আপত্তি নেই।'—দ্বিতীয় কুং মিং বললেন—'কিন্তু হুজুর, দয়া করুন, সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের এ বিয়ে কিছুতেই ঘটতে দেবেন না!'

'কিন্তু আমি যে বললাম, আপনি এ-বিয়েতে বাধ সাধতে পারেন না!'

'দয়া করুন হুজুর, দয়া করুন! ওদের কোঠীর যে মিল নেই

হুজুর! এ বিয়ে যদি হয়, ওরা কিছুতেই জীবনে সুখী হ'তে পারবে না।' দ্বিতীয় কুং মিং এবার হা-হা করে উঠলেন মহা ব্যস্ত হয়ে। ছেলের দিকে ফিরে বলে উঠলেন : 'শুয়োরা মী করিস নে এর-হিআই, তোর জীবনের সুখ-শান্তি সব আজ বিপন্ন!'

'আপনি আপনার শুয়োরা মীটা এবার ছাড়ুন তো।'—মেয়র বলে চললেন।—'আপনি যদি আপনার উনিশ বছরের ছেলের সঙ্গে বারো বছরের এক মেয়েকে বিয়ে দিতে চান জোর করে, আপনাকে তা হোলে আজীবন অমুতাপ করতে হবে। আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার ভালোর জন্তই এ সব বলছি। আপনার ছেলে আ সিয়াও চীন যদি দু'জনে দু'জনকে বিয়ে করতে চায় আপনি তা পছন্দ করুন আর না করুন—খুব কিছু একটা যায়-আসে না। যান, বাড়ি যান এখন। গিয়ে আপনার নতুন মেয়েটির যত্ন-আশির্ ককুন গে!'

দ্বিতীয় কুং মিং নতুন করে আরেক দফা অমুনর-বিনয় বুঝি করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এক পেয়াদা এসে ধাক্কা দিয়ে তাঁকে বার করে দিল।

## ১১

হুই কারণে তৃতীয় পরী-কক্কা দ্বিতীয় কুং মিং-এর বাড়ি এসেছিলেন। প্রথমতঃ, বাইরের লোজ-জন তাঁকে কেমন ভয় করে তা পরখ করতে। আর দ্বিতীয়তঃ, অপরের স্বন্ধে সব দোষটা চাপাতে। সিয়াও চীনের গ্রেপ্তাবে তিনি তেমন অশুশী বড় একটা হননি। তাই দ্বিতীয় কুং মিং-গিল্লীর সঙ্গে একপ্রস্থ চুলোচুলির পর বাড়ি ফিরে তিনি দ্রিবি একটা ঘুম দিলেন। পরদিন বেশ শানিকটা বেলা না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিছানা ছাড়লেন না। যুহু এদিকে মেয়ের জন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তবে গিল্লীর সঙ্গে প্রথমে পরামর্শ না করে তিনি যে কিছু করতে পারেন না। গিল্লীকে এদিকে জাগাতেও তাঁর সাহসে কুলাল না। তাই করেন কি, প্রাতরাশ প্রস্তুত করার দিকে তিনি মন দিলেন। খাবারটা যখন প্রায় হয়ে এল, তৃতীয় পরী-কক্কা ধীরে-স্বস্থে তখন গা তুললেন। মুখ-হাত ধুতে-ধুতে আর চুলে চিরুণী দিতে-দিতেই খাবার তৈয়ারীর বাকী সময়টা কেটে গেল। যুহু তখন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন :

'সিয়াও চীনের কি হোল একবার খোঁজ নিতে গেলে না?'

'কোথা যাবো শুনি? তোমার মেয়ে কি কারো ধার ধারে?'

যুহু'র আর কিছু বলতে সাহসে কুলাল না। খাবারটা না হওয়া পর্যন্ত উনানের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জ্বর প্রসাধন-পর্ষ সমাপ্ত হোল যখন তখন কেবল খেতে সুরু করলেন।

তৃতীয় পরী-কক্কা প্রাতরাশ শেষ করে নেবার পূর্বেই জিলা শাসন-দপ্তরের পাইক এল শমন জারী করতে। গলা-খাঁকিবি দিয়ে গলাটা তিনি পরিষ্কার করে নিলেন, তার পর ধীরে-স্বস্থে বললেন : 'মেয়ে এখন বড়ো হয়েছে, সে কি আমার কথা কানে তোলে যে, চাল-চালন আমি শেখাবো ওকে? মেয়ের কাছে আমার ছুটে যাবার কি দরকার শুনি?'

তিনি প্রাতরাশ সেবে নিলেন। তার পর সাজ-গোজ করতে বসলেন। মাথার বাঁধলেন নতুন রুমাল; পায়ে দিলেন ফুল-তোলা জুতো; কান-করা একটা ইজেরও পরলেন। মুখে

এক গালা পাউডার ঘরে চলে শুভ্রলেন আর একপ্রস্থ নতুন অলংকার। তিনি তখন যুদ্ধকে হুকুম করলেন আস্তাবল থেকে খচরটা বার করতে। খচরটার পিঠে চড়ে তিনি চললেন আর স্বামী হেঁটে চললেন পিছু-পিছু তাঁর পাচন হাতে। জিলা শাসন-দপ্তরের দিকে ওবা রওনা হলেন।

গন্তব্য-স্থলে ঠরা এসে পৌঁছলে মেয়ের ঘরের তৃতীয় পরী-কন্ডাকে নিয়ে যাওয়া হোল। মেয়রকে দেখে তিনি জাম্ব পেতে গড় করলেন। উচ্চস্বরে বলে উঠলেন : 'আমি ঠিক জানি আমার প্রাণ জিলা-মেয়র যা করবেন তা আমার পক্ষে যাবে !'

মেয়র টেবিলের উপর ছুঁকে পড়ে খস-খস করে লিখছিলেন কি সব। মাথায় একরাশ রূপোর অলংকার-পরা এক মহিলাকে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখে তিনি ভাবলেন, দু'-তিন দিন পূর্বে শাস্ত্রীর সঙ্গে যুগড়া করে যে বধুটি তাঁর কাছে ছুটে এসেছিল, এ বৃন্নি সে। তাই বললেন : 'তোমার শাস্ত্রীর জামিনদাতা রয়েছে না ? ওর কাছে গেলে না কেনো ?'

ব্যাপারটা বুঝে উঠতে না পেরে তৃতীয় পরী-কন্ডা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো মেয়ের দিকে। মেয়র এবার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। চেয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে যিনি বসে আছেন তিনি কারো বধু নন—বয়সে প্রৌঢ়, মুখে এক গালা পাউডার মাখা।

পেয়াদা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে। বললে :

'আপনি যার কথা বলছেন ইনি সে নয়। ইনি হলেন সিয়াও চীনের মা।'

মেয়র তাঁর সামনের মহিলাটির দিকে এবার তাকালেন। বললেন : 'ও, তুমিই তাহোলে ! ওঠো ওঠো, এখানে আর ঢং দেখাতে হবে না। সব জানি আমি তোমার সম্বন্ধে। উঠে বসো !'

তৃতীয় পরী-কন্ডা উঠে পঁড়ালেন।

'তোমার বয়স কতো ?'

'পর্যতাল্লিশ।' দেবী জবাব দিলেন।

'আয়নাটার দিকে একবার চেয়ে দেখো তো, পর্যতাল্লিশ বছরের ভদ্রঘরের মেয়েদের মত তুমি পোষাক পরেছো কি না ?'

বছর দশেকের একটি মেয়ে দরজার পাশে পঁড়িয়েছিল। মেয়রের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল। অফিসের পেয়াদাকে বলতে হোল ওকে বাইরে গিয়ে খেলতে।

'আচ্ছা, তুমি দেব-দেবতা নামাতে পারো এ কথা সত্যি না কি ;—মেয়র আবার প্রশ্ন করলেন।

তৃতীয় পরী-কন্ডার মুখে কোন জবাব কুলাল না। মেয়র তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন : 'তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য এক জন প্রেমাস্পদ ঠিক করেছো ?'

'হ্যাঁ।'

'এ জন্য কত টাকা তুমি দালালি পোলে ?'

'সাত্তিন হাজার ডলার।'

'আর কি ?'

'কিছু অলংকার আর কয়েকটা জামা-কাপড়।'

'এ সব ব্যাপারে তুমি তোমার মেয়ের মতামত নিয়েছিলে ?'

'না।'

'এ সব ওর মত আছে কি না তুমি জানো ?'

'জানি না।'

'আমি ওকে এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। তুমি নিজের জিজ্ঞেস করে দেখো।'

সিয়াও চীনকে ডাকবার জন্ত মেয়র হুকুম দিলেন পেয়াদাকে।

দশ বছরের যে মেয়েটাকে বাইরে গিয়ে খেলতে বলা হয়েছিল, সে অমনি এ খবর রটিয়ে দিল যে, জিলা শাসন-দপ্তর অফিসে একটি আধ-বয়েসী স্ত্রীলোক এসেছে, ওর বয়স পর্যতাল্লিশ বছরের কম নয়। সে কিছু মুখে পাউডার মাখে পূক করে, আর রঙ-চঙে তাৎক্ষণিক পুরার ছিঁরি কি ? এ শুনে আশ-পাশে যত সব স্ত্রীলোক ছিল সবাই ছুটে এল। চটকদার প্রৌঢ়াকে দেখবার জন্য। অফিস-প্রাঙ্গণ দেখতে-দেখতে মেয়েতে ভর্তি হয়ে গেল। ফিস-ফাস করে ওরা পরস্পর কানাকানি করতে লাগল : 'বয়সটা পর্যতাল্লিশের এক চুলও কম না ভাই, বুঝি ?'

'পায়জামাটা একবার চেয়ে দেখেছিস্ লা ?'

'পায়ের ফুল-তোলা ছুতো-জোড়াটা দেখেছিস্ ?'

তৃতীয় পরী-কন্ডা ইতিপূর্বে জীবনে এমন ধারা অপ্রস্তুত হননি কখনো। তাঁর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল ; কঁোটা-কঁোটা ঘাম দেখা দিল। এমন সময় পেয়াদা এনে হাজির করল সিয়াও চীনকে। পেয়াদা সবাইকে শুনিতে শুনিতে ইচ্ছে করে বলে উঠল : 'ঈ করে তোমরা সব দেখেছো কি ? উনি কি আকাশ থেকে পড়লেন ? অমন মেয়েমানুষ জীবনে কখনো দেখোনি বুঝি ? যাও, ভাগো ভাগো !'

শুনে সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। মেয়র তখন তৃতীয় পরী-কন্ডাকে শুধোলেন : 'তোমার মেয়েকে যে লোকটার সঙ্গে বিয়ে দেবার ঠিক করেছো তাকে বিয়ে করতে রাজী কি না, তুমি তোমার মেয়েকে এমন জিজ্ঞেস করতে পারো।'

তৃতীয় পরী-কন্ডার কানে কোন কথাই গেল না মেয়রের। উঠানে মেয়েদের টিপ্পনীগুলি ওর কানে কেবল অম্লরসিত হ'তে লাগল : 'পর্যতাল্লিশ...ফুল-তোলা ছুতো...!' লজ্জায় তাঁর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হোল। ঘন-ঘন তিনি মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন। তবু নিস্তার পেলেন না। মুখ দিয়ে তাঁর টুঁ শব্দটি পরিস্রব বার হোল না। এদিকে ভীড়ের মধ্যে উঠানের মেয়েগণ অল্প প্রসঙ্গ নিলে : 'ওটি ঠর মেয়ে বুঝি ?...ও মা, মেয়ে জাহুক আর না জাহুক মা তো বেশ চটক করে সাজতে জানে !...হ্যাঁ গা, উনি আবার অপদেবতা নামাতে পারেন শুনছিলাম না ?'

তৃতীয় পরী-কন্ডা সম্বন্ধে প্রচলিত 'ভাতটা গলে গেল' কাহিনীটা ভীড়ের মধ্যে কে যেন জানত। সে এক সময় কাহিনীটা সবাইকে জানিয়ে দিলে। দেখালে মাথা ঠুকে মরতে পারলেই যেন নিষ্কৃতি পান তৃতীয় পরী-কন্ডা। তবু যদি মেয়রের আক্রমণ থেকে রেহাই পেতেন। তিনি বলে চললেন :

'তুমি যদি তোমার মেয়েকে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করতে না চাও, আমি করছি।'

সিয়াও চীনের দিকে তিনি এবার মুখ ফেরালেন।

'সিয়াও চীন, তোমার মা যে লোকটিকে ঠিক করেছে তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও ?'

‘না, মোটেই না। সে যে কে, তাও আমি জানি না।’

মেয়র এবার তৃতীয় পরী-কল্পার দিকে মুখ করলেন। বললেন :  
‘শুনলে তো?’

তিনি তখন তৃতীয় পরী-কল্পাকে বললেন—নিজেদের পছন্দ মত বিয়ে-করা তরুণ-তরুণীদের রক্ষার জন্ত এখন আইন হয়েছে। এ-ও জানালেন, সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের বিয়ে আইনে কোথাও আটকায় না। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন, মেজর উর কাছ থেকে তিনি যে ট্রাকা ও উপহার গ্রহণ করেছেন, সব কিছুই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তাঁর। শুধু তাই না, সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের এই বিয়েতে তাকে দিতে হ’বে সম্মতি।’

লক্ষ্যায় তৃতীয় পরী-কল্পা কোন কথাই বলতে পারলেন না। তবু তিনি মেয়রের কাছে শপথ করে এলেন যে, যা-যা তাঁকে করতে বলা হোল তা তিনি পালন করবেন।

## ১২

সিন ওয়াং আর চীন ওয়াং-এর গ্রেপ্তার-কাহিনী গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। গ্রামবাসীদের আজ আনন্দ দেখে কে? বিকেলে মন্দির-প্রাঙ্গণে গ্রামের সবাই এসে জড় হোল। গ্রামের প্রধান জন-সভায় প্রথম বক্তৃতা শুরু করলেন। তিনি বিপুল জনতাকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন : অপরাধ প্রমাণের জন্ত তারা যেন দু’ভাইয়ের অপকারী সম্পর্কে যা-যা জানে সব বলে ফেলে। সবাই প্রথমে ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে, অপরাধ প্রমাণ না হ’লে দু’ভাই অভিযোগকারীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ছাড়বে না কিছুতেই। তাই অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোন কথাটি বললে না এবং ওদের মধ্যে যারা ভীতু তারা এমনও কানাকানি করতে লাগল : ‘শান্তিতে থাকতে হোলে পিঠি সহিতে হয়!’

কিছু চীন ওয়াং-ভাইদের অত্যাচারে জর্জরিত এক যুবক সহসা উঠে পাড়াল। বলল : ‘আমি দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে আসছি। দেখলাম, যতই চোখ বুজে সহ্য করি ততই অধিক বিপদে পড়তে হয়। আপনারা যদি কেউ কিছু নাও বলেন, আমিই বলবো।’

সে তখন বলতে শুরু করলে চীন ওয়াং কেমন করে ডাকাতি করতে দস্যবাদের নিয়ে এসেছিল তাদের ঘরে। এ ছাড়াও দু’ভাইয়ের আরও চার-পাঁচটি অপকারের কাহিনী সে শুনাল সকলকে। অবশেষে বলল : ‘আমি এবার থামছি। আপনারা আর কেউ বলতে থাকুন।’

এক জন একবার শুরু করলেই হোল, অপর নির্ধাতিতদের তখন পায় কে? একে একে ওরা বলতে লাগল, দু’ভাই কেমন করে ঘৃষ নিত; কেমন করে ওরা লোকদের আত্মহত্যা করতে বাধ্য করত, কি করে ওরা বিধবা যুবতীদের সতীত্ব নষ্ট করত; গ্রামবাসীদের দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত আলানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করত; চাষীদের কি করে বেগার খাটিয়ে নিত নিজেদের জমিতে; নিজেদের ট্যাকের জন্ত কেমন করে ট্যাক্স আদায় করত; গ্রামবাসীদের দিয়ে কি করে নিরীহ লোকদের বৈধ আনতে বাধ্য

করত...সুখান্ত পৃথক একে একে সবাই দিয়ে চল তার দীর্ঘ ফিরিস্তি।

এই সব অভিযোগের দায়ে জিলা বর্তৃপক্ষ দু’ভাইকে প্রাদেশিক সরকারের নিকট সোপান করলেন। অভিযোগগুলি যখন সত্য বলে প্রমাণ হোল, প্রাদেশিক সরকার দু’জনের তখন দীর্ঘ পনেরো বছর সেল দিলেন ঠুকে। আদেশ দিলেন—ওরা যা-কিছু চুরি করেছে যাদের কাছ থেকে, সব কিছু যেন ফিরিয়েও দেয়।

নব-শাদুল দু’জন বিদায় নিলে গাঁয়ের ধমনীতে আবার স্বাভাবিক রক্তধারা ফিরে এল। শীঘ্র আবার নির্বাচন হোল এবং গাঁয়ের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হোল পুনরায়। বিগত অভিজ্ঞতার পর গ্রামবাসীরা এবার নির্বাচনে পুরোপুরি লোগ দিলে। কাজেই চীন ওয়াং-এর দ্বী জাপবিরোধী নারী সমিতির সভানেত্রী পদে পুনরায় নির্বাচিত হ’তে পারলে না। নির্বাচিত হ’তে না পারলেও দৃষ্ট-কোণ তার গেল বদলে। এখন থেকে সে প্রগতিশীল হবার চেষ্টা করবে জানিয়ে দিলে।

তাত্ত্বিক আর সাধু দু’জনেরও পরিবর্তন ঘটেছে কিছু-বিছু।

সেবার জিলা শাসন-দপ্তরের প্রাঙ্গণে সমবেত মেয়েদের ঠাট্টা-মন্তব্যের সামনে তৃতীয় পরী-কল্পা খুব বিব্রত বোধ করেছিলেন। বাড়ি ফিরেই মেয়রের কথা মত আহার সামনে গিয়ে ঠাঁজলেন। উপলব্ধি করলেন—আর না, মেয়র এখন বিয়ে হ’তে চলল। নিজে আর ঢং দেখিয়ে কাজ নেই! তাই সাজ-ভূষা ফেলে তিনি আপন বয়সোচিত পোষাক পাবে চলবেন ঠিক করলেন। চুপি-চুপি তিনি তাঁর ধূপ-ধূনা দেওয়ার বৈদীটি সরিয়ে ফেললেন। ত্রিশ বছরের তাঁর পুরোন বৈদী। ওঁটার সামনে বসেই তিনি তাঁর কল্পিত অপদেবতা নামানোর চেষ্টা করতেন।

এদিকে দ্বিতীয় কুং মিং জিলা শাসন-দপ্তর থেকে বাড়ি ফিরে দ্বীরা কাছে হস্তি-তথ্য শুরু করে দিলেন যে, সিয়াও-এর হিআই আর সিয়াও চীনের কোষ্ঠীর মিল নেই। শুনে-শুনে গিরী পিস্তি ছলে উঠল এক সময়। বেগে বলে উঠল : ‘হয়েছে—হয়েছে, তুমি তোমার ওই কর-কোষ্ঠীর বুজরুকী রাখো তো দেখ! ও-সব দিয়ে তো সারা জীবন নিজের আর অপর লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করলে। এখন আর কেন? এর-হিআইয়ের কপাল ভালো যে, সিয়াও চীনের মত অমন লক্ষী মেয়ে পেয়েছে সে। বাছার জীবনটাকে ছাই-পাশ ও-সব শয়তানী তুক-তাক দিয়ে নষ্ট করতে তোমার লজ্জা করে না? “শস্ত্র-বপনৈব পক্ষ শুভ নয়” বলে লোকে যে ঠাট্টা করে! তা ভুলে গেলে না কি?’

গিরীও যখন তাঁর যাহুবিজ্ঞা নিয়ে অমন ধারা ঠাট্টা করতে শুরু করেছে, তিনি আর তাঁর যাহুবিজ্ঞা অপর লোকের সামনে প্রয়োগ করেন কোন মুখে?

সিয়াও-এর হিআই ও সিয়াও চীন বাড়ি এসে দেখে, ওদের বাপ-মায়ের জীবনের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন ঘটেছে অনেকটা। পাড়া-পড়শিদের সাহায্যে তাদের এই বিয়েতে বাপ-মায়ের মত করিয়ে নিতে তেমন বেগ পেতে হোল না।

যথাসময়ে এ বিয়ে হয়ে গেল।

অচুবাদক—নিখিল সেন।

## স্বা জ নী তি

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

হানিফ চাচা তার বলদ নিয়ে সকালে মাঠে যেতো এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে যা খোলছানি দিতো তাই তারা মনের আনন্দে খেতো। এট ভাবে দিন যেতে থাকলে হঠাৎ এক দিন বলদেরা খোলছানি পেতে আপত্তি জানালো। খোলছানি পাভনায় দিলে তা যেমন ভাবে দেওয়া হতো তেমনিই পড়ে থাকতো। তা ছাড়া লাঙল ও গাড়ী বওয়ার কাজেও তারা শিং-নাড়া দিতে সুরু করলো যখন-তখন! হানিফ চাচার মত মানুষেরও বিপদ হয়েছে পড়লো। চিরকাল গাড়ী বয়ে আর লাঙল চষে হঠাৎ কি এমন স্বরাজ এলো যে বলদেরা আগের মত কাজ করতে চাইলো না, এ কথা হানিফ বুঝতে চেষ্টা কোরেও বুঝতে পাবলো না। বিপদ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে হানিফ পাড়ার এক মুকুন্দের কাছে গিয়ে কঁদে পড়লো।

—হেই ঠাকুর! আমায় আপনি বাঁচান, নইলে মারা যাব!

—সে কি! তোমার আবাব কি হলো সেখের পো? তোমার মোকুসীপাট্টার আবাব কি বিপদ হলো?

—আজ্ঞে, আমার দক্ষিণ হাত বন্ধ হয়েছে গেল ঠাকুর!

—দক্ষিণ হাত? চাষ-আবাদ বন্ধ হয়েছে গেল!

—তাই, বলদেরা আর মাঠে যেতে চাইছে না, মাঠে গেলেও চাষ-আবাদ করতে তারা বাজী নয়।

—কি বলে তারা?

—বলে স্বাধীন হয়েছি—লাঙল বইবো কেন? এত দিন দেশের অনেক জমি চাষ করেছি, অনেক ঘানি ঘুরিয়ে তেল বার করেছি, অনেক পাঁচন খেয়ে আর খোঁয়াড়ে আটক থেকে দেহ মাটি করেছি, আর তার বদলে পেয়েছি কেবল ক্ষুদ্রের ঘণ্টের সঙ্গে লাউ সেক। এখন আব ও-সব অখাত খেতে আর খাটতে রাজী নই।

—বুঝেছি, এ ব্যারাম বাপু খুবই শক্ত ব্যারাম। ভাল হবে, তবে কিছু খবচ করতে হবে হয়ত।

—তা হয় হবে, কিছু যাবে বোলে তো আর এত বড় জমির মালিকানা ছাড়তে পারি না? বলুন কি করতে হবে।

—তুমি বরং বলদের নেতাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

—যে আজ্ঞা!

এর পর ক্রমেই হানিফ চাচার দিন খারাপ হোতে লাগলো। এ-খামার সে-খামার থেকে খবর আসে—সব জায়গাতেই বলদেরা বিদ্রোহ করছে। আইন-কানুন কিছুই মানছে না। কেবল তাদের কথা—নিজদের ভার নিজেরা নেব। কাউকেই আমাদের দায়িত্ব নিতে হবে না। আমাদের খাবার আমরা দেখে নেব। মালিক এখন আমবাই।

হানিফ চাচা বাধ্য হোয়ে একবার মাঠ আর বাড়ী যাতায়াত সুরু করলো। মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয়দের পার্টী আর ডিনারে খরচ করতে লাগলো। বহু দিনের চলতি ব্যবস্থা। চিরকাল যেখান থেকে মধু ব স্বাদ পাওয়া গিয়েছে সেখান থেকে সরে যাওয়া

যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই জানে! তারা সরে গেলে এ দায়িত্ব পালন করবে কে? এমন কোন দল বা বলদদের মধ্যে এমন কোন সংগঠন নেই যারা হানিফ চাচার অধর্তমানে দেশের কাজ চালাবে! অতএব হানিফ চাচার চল গেল সমস্ত বলদ না খেয়ে আর রোগে মারা পড়বে—এ কথাই তারা তারস্বরে ঘোষণা করলো।

কিন্তু এতেও বলদেরা থামে না বরং আরো জোরে আন্দোলন চালাতে লাগলো। বলদেরা চতুর্দিকে সভা-সমিতি কোরে লোক ক্লেপিয়ে বেড়াতে লাগলো। বলে—নিজের দায়িত্ব নিজেরাই নেব, খাটবে যে জমি তার। তাছাড়া হুঁ-চারটে বন্দুক-পিস্তলও বলদেরা পরীক্ষা করতে লাগলো। কোন রকমেই বলদেরা যখন ভয় পেল না তখন হানিফ চাচা বাধ্য হোয়েই বলদদের নেতা জুহকে ডেকে পাঠালো।

—কি হবে দা'ঠাকুর!

—কিছু ভাবতে হবে না, তুমি আড়ালে থাক, তোমার ওপব ওরা একটু চটে গিয়েছে। তুমি বরং বিলতে থেকে মাওন ভাইকে আনাও। সে অনেক দিন মিলিটারীতে থেকে হাত চালাতে শিখেছে ভাল। এ ব্যাটাদের ওপর কিছু মিষ্টি ছুতো মারুক।

—কিন্তু তাতে কি হবে?

—হবে, সে-সব ঠিক কোরে দেবে সে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন দিন বেশী কিছু না করে তার জন্ত নতুন পলিগী ঠিক করতে হবে। বেটাদের ভাগ কোরে এক জনের বিরুদ্ধে আব জনকে লাগিয়ে দিলেই ওরা নিজদের মধ্যে মারামারি করতেই ব্যস্ত থাকবে বুঝলে?

—যা বলেছেন! ওঃ, কি বুদ্ধি যে আপনার! যদিও আপনি ওদেরই আত্মীয় তবু আমাদের যে উপকার করছেন তার তুলনা মেলে না। আপনার মাসোহারাটা বাড়িয়ে দেব মনে করছি!

ইতিমধ্যে মাওন ভাই এসে গেলেন। বলদদের নেতাদের ডাক পড়লো মাওন ভাইএর বিরাট প্রাসাদে। অবশ্য বলদদের পয়সায় ও পরিশ্রমে তৈরী প্রাসাদে মাওন ভাইএর জাতি-কুটুম্বরাই বাস কোরে আসছেন। ভয়ে-ভয়ে চোরের মত ছাড়া এ প্রাসাদে কোন দিন বলদদের ওঠার সুযোগ হয়নি বেশী। হঠাৎ বলদদেব নেতাদের ডাক পড়তেই হস্তদস্ত হোয়ে নেতারা ছুটে এলো। কেবল তারা অপেক্ষায় ছিলো কতক্ষণ ডাক পড়বে। বলদকে মানুষে ডাকে কথা বলতে, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

—আমুন, আমুন! বলদদের নেতা জুহকে অভ্যর্থনা জানালেন মাওন সাহেব।

—আপনার সাথে দেখা করতে পেরে বড়ই কৃতার্থ হোলাম। আপনার মত পণ্ডিত, সুশাসক আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। জুহ প্রত্যুত্তর দিয়ে দিলো হাসিমুখে।

—কি যে বলেন! আপনার পাণ্ডিত্যের কাছে আমি? আপনি একটা দেশের সমস্ত বলদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক! আপনার তুলনা কেবল আপনিই!

—জাজ্ঞা দেবেন না, আপনি নিজে মহৎ তাই সকলকেই মহৎ বোলে মনে করেন। আপনি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ দেশের

এক জন শাসনকর্তা! স্বর্ঘ্য অস্ত্র-না-বাওয়া দেশের এক জন ভক্তধরুণ।

—তাই কি, বিলেতে থাকতে আপনার বুদ্ধির প্রখরতা আমাদের চমক লাগাতো। আপনার কর্মকুশলতা, আপনার অমায়িক ব্যবহার, পরকে আপন করার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় জানি বলেই আপনার ব্যাপারে আমার আসতে হয়েছে। জানি, আপনি শুধু এই বলদদের মধ্যে জগৎগ্রহণের পাণ ছাড়া আর অস্ত্র এমন কোন পাণ করেননি যার জন্ত আপনার মাল্লবের পধ্যায়ে উন্নীত হোতে কোন বাধা আছে।

—যাই হোক এখন কাজের কথায় আসা যাক, কি বলেন?

—বেশ তো! চলুন আমার পেশাল চেয়ারে, আপনার সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেয়ে নিই।

ভেতরে মাওন আর জুহু হুই নেতা মুখোমুখি সোফায় বসলেন। বাইরে বলদদের অজ্ঞান ক্ষুদে নেতারা বসে থাকলেন। সরবৎ আর নানাবিধ স্মৃষ্টি ও স্মৃগন্ধি পানীয় বলদ-নেতার পেটে পড়তেই সমস্ত ভ্রগতকে তাঁর আপনার মনে হতে লাগলো। মাওনের কণ্ঠ আর মিসেস মাওন তাঁদের স্মৃষ্টি ও সরস ব্যবহারে আর সেবার দ্বারা অতিথির আপ্যায়নে কোন ত্রুটি রাখলেন না। বাইরে নিঃশব্দে অন্যান্য বলদ-নেতারা অধীর ভাবে চেয়ে রইলেন জুহুর ধাশা-পথ চেয়ে। ওদিকে মাওন ও জুহুর মধ্যে কথা আরম্ভ হোলো।

—আপনার মত লোক তো বুঝতেই পারেন যে, এত বড় দেশ কি একত্রে শাসন করা যায়? হুঁভাগে ভাগ করার প্রয়োজনকে কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? তাছাড়া আপনারদের সংখ্যালঘু নেতা জেনো তো ভাগ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থাতে কিছুতেই রাজী নয়।

—কিন্তু জানেন তো, অনেক বিদেশী ঝড়-ঝাপটা সহ্য কোরে এই দেশ কোন দিন বিভক্ত হয়নি। তাছাড়া আমাদের সংস্কৃতি, এক-জাতিত্ববোধ সব নষ্ট হবে না কি?

—এক-জাতিত্ববোধ! এ তো জেনো স্বীকারই করেন না। বিজাতি-ত্বই তাঁর মূলনীতি! তাছাড়া আপনার ব্যায় বলদ জাতির সঙ্গে জেনোদের তুলনা করতে সত্যিই আমাদের কষ্ট হয়। মনে হয় যেন স্বর্ঘ্যের পাশে দাঁপশিখা। সারা পৃথিবীব্যাপী যার খ্যাতি, যে হচ্ছে গণিশ্যার ভাবী শ্রেষ্ঠ বলদ-নেতা তার সঙ্গে কার তুলনা!

—কিন্তু বুড়ো বড় অমত করবেন।

—বুড়ো ধর্মকর্ম নিয়ে থাকুন, সন্ধ্যা-উপাসনা, চরকা, পল্লী-উন্নয়ন, হরিজন এই সবই ঠাঁর পক্ষে ভাল। ঠাঁকে আবার রাজনীতির মধ্যে আনা কেন?

—তা ছাড়া আমার নিজেরও বেশ মন সরছে না।

—কেন আপনি মিথ্যা ভাবছেন? এ আপনারদের পক্ষে খুবই ভাল। ওরা আপনারদের মানতে চাইবে না আর আপনারদেরই বা দরকার কি এত বড় দেশের বিক্ষুব্ধ বলদকুল নিয়ে রাজ্য শাসন করা! ভাগ করলে শাসনেরও সুবিধা অথচ বেশী দায়িত্ব নিতে হবে না।

—আচ্ছা, পরামর্শ করি গে অন্য নেতাদের সঙ্গে।

—আনুন। আপনার আবার পরামর্শ! আপনিই তো সব।

তাছাড়া (কানে কানে) আপনার মত নেতাদের কোন ভয় নেই, একটুকু ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি হবে না।

বলদের দল চলে গেল আপন-আপন ডেরায়। বুড়োর কাছে জানালো সব কথা। বললে, যা আসছে তা নিয়ে নেওয়া ভাল। না হোলে এত দিন মার খেয়ে কোনই লাভ হয়নি। কেবল নির্ধ্যাতন আর জেল ভোগ করাই সার হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে কীসিতে বোলা। কোন দিন স্বাধীনতা একেবারে আসে না, অল্প-অল্প করে সইয়ে নিতে হয়। তাছাড়া যদি চিরকাল জেল খাটতেই কেটে যায় তবে ভোগ হবে কবে? ভোগের জন্য কিছু ছেড়ে দিতেই হবে, আপোষ যদি করতেই হয় তবু এখনই করা ভাল। আপোষ ছাড়া পৃথিবীতে কোন কাজ হয়? মাল্লবের কাছে বলদের গায়ের জোর খাটে না। অতএব যা আসছে তা নিয়ে নেওয়াই ভাল।

ওদিকে জেনোকে ডেকে আনলেন মাওন। সব কথা বললেন। বললেন, আপনারা ভাগ ছাড়বেন না। তাঁরাও জানে একসঙ্গে থাকলে জেনোকে জুহুরা প্রভুত্ব করতে দেবে না। তাছাড়া মাওনের কথার তুবড়ি জেনোকেও নোহাবিষ্ট করে ফেলে। বলে, আপনার প্রতিভার কাছে জুহুর প্রতিভা! চাঁদের আলোর কাছে জেনোবিকির টিপিটপুনি! দেশ ভাগ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। দেশ ভাগ করার কথা যেন তিনি কিছুতেই না ছাড়েন। সারা জীবন ধরে জুহুরা কি নির্ধ্যাতন চালিয়ে এসেছে তাঁদের ওপর, তা যেন তাঁরা ভুলে না যান। আর সেই প্ল্যানটার কথা যেন জেনো ভুলে না যান। শেষ অস্ত্র তোলা আছে। দেশ ভাগ মানতেই হবে। শেষ পর্যন্ত টাফ আর লোক।

বখারীতি দাঁঠাকুরের পরামর্শে হানিফ চাচা একটা দারুণ সমস্তা থেকে উদ্ধার পেল। অবশ্য জাতি-ভাইরা প্রথমটায় রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার কথায় বেজায় চটে গিয়েছিল। শেষে যখন সমস্ত ব্যাপারটা তারা বুঝলো তখন মাওন ভাইয়ের বুদ্ধির তারিফ করলো। বলদদের স্বাধীনতা দিলেও তারা হানিফ বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের সম্পূর্ণ স্বার্থ দেখে চলবে। এ জমির স্বত্ব ফেলে যাওয়া নয়, এ যেন নিজের জমিদারীতে ম্যানেজার রেখে যাওয়া। ম্যানেজার সবই করবে প্রভুর মঙ্গলের জন্ত, কাজ কেবল বলদ-কুলকে ভাঁওতা দেওয়া। ম্যানেজার বলবে, (জুহুর মতই কোন ঘরের লোক) ওহে বলদকুল! তোমরা জমি চাষ কর, ফলের দিকে তাকিও না; আমাতে তোমাদের সমস্ত বিশ্বাস অর্পণ কর।

সবই হোল, তবু শেষ পর্যন্ত কাজ এগোলো না। বুড়ো এই ভাগাভাগিতে একেবারেই চটে আনন্দ। কিছুতেই সে মানতে রাজী নয়। এতখানি এগিয়ে শেষে পিছিয়ে আসাও সহ্য নয়। মাওনের সঙ্গে জুহু দেখা করতে পারে না। মাওনও নিজে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়েছে। সকলকে আশ্বাস দিয়ে শেষে কাজ পণ্ড হবে। হানিফ চাচাদের এত সাতের লাভের রাজ্য একটা অমীমাংসিত অবস্থার থাকবে! মাওন তার শেষ অস্ত্র ছাড়লেন। স্বক হোল “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”। সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়লো এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে। নদীর

এ-পার থেকে সে-পারে। ওরা শ্রামলা বলদ কেটে কচু-কাটা করলো আর এরা ধলা বলদ কেটে কুমড়োর মত ফালা করতে লাগলো। বলদের চাঁৎকারে আর হাঙ্গা ডাকে সমস্ত দেশ কঁপে উঠলো। রক্তের নদী বয়ে যেতে লাগলো। অলক্ষ্য থেকে মাওন ও জেনো প্রাণ খুলে হেসে নিলো। অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। এ কাঁদে জুহুকে পা দিতেই হবে। কোথায় যাবে তারা? জুহুকে আসতেই হবে আবার।

—এ কি হোলো মাওন সাহেব?

—কি খবর বলদ-শ্রেষ্ঠ?

—এই রক্তপাত, খুন!

—বলেছিলাম তো দেশ ভাগ না করলে মঙ্গল নেই। আপনার জায় বিজের পক্ষে এটা কি অজানা ছিল?

—তাই তো দেখছি!

—এ কি দেখছেন, ভাগ না করলে হয়ত এর চেয়েও কিছু বেশী হবে মনে হয়। হু' সম্প্রদায় কখনও মিলে থাকেনি, আর থাকতেও পারে না। এরা আর ওরা সম্পূর্ণ আলাদা। ওদিক দিয়ে জেনোর স্বিজাতি-খিয়োরী নিভুল। আমি এ রকম হবে পূর্ব থেকেই আশঙ্কা করছিলাম। আপনাকে যে ভাগের কথা বলেছিলাম তা অনেক ভেবেই বলেছিলাম। আপনি তো পণ্ডিত-বলদ। আপনার কোন অসুবিধাই নেই। আপনি হবেন প্রধান বলদ-মন্ত্রী, আপনার আত্মীয়-স্বজন কোন দিন টের পাবে না বেকার কাকে বলে? তাছাড়া আপনি হবেন বলদ-তন্ত্রের ধারক ও বাহক। আপনিই হবেন রাষ্ট্র এবং দল।

—রাষ্ট্রচালনায় এই জটিলতার মধ্যে আমাকে আবার টানা কেন?

—সে কি! আপনি হচ্ছেন নেতা! আর এর মধ্যে জটিলতা তো কোথাও নেই। আপনার দেশের নীতি পরিচালনা করব আমরাই। আপনি শুধু লক্ষ্য রাখবেন আমাদের স্বার্থ যেন কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না হয়। আমাদের এবং আপনার নিজের জন্ত যত বেশী আপনি বলদকুলের স্বার্থ বিপন্ন করবেন ততই আপনার গদী শক্ত হবে।

—আপনার পরামর্শের জন্ত ধন্যবাদ মিঃ মাওন! চিরকাল ঘুরে-ঘুরে লাক্সল ঠেলে বেড়িয়েছি, রাজনীতির কিছুই ভাল শেখা হয়নি—বিশেষ রাষ্ট্রচালনার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। এ সময় আপনার উপদেশ বিশেষ উপকারে আসবে মনে হয়।

—মনে রাখবেন, আমি বা আমরা সব সময়েই আপনার তত্বাক্ষী। রাষ্ট্র হাতে পাবার আগে আদর্শের কথা বা বড়-বড় বক্তৃতা যা আপনি দিয়েছেন তাতে খুব ভালই হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র-

পরিচালনার ব্যাপারে কূটনীতির প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আমরা যে বিভেদ সৃষ্টি কোরে শাসন চালিয়েছি সেই নীতিই হবে আপনার নীতি। বলদ-সাধারণকে সব সময় বক্তৃতা দিয়ে বিভ্রান্ত রাখতে হবে, কিন্তু কাজ করার সময় অস্ত্র বুদ্ধির প্রয়োজন। বলদেরা যাতে শিক্ষা না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে আপনার একটা মস্ত কাজ। পুলিশই হবে আপনার প্রধান সহায় এবং তাদের জন্ত বাজেটের বেশীর ভাগ ব্যয় করা হবে আপনার কাজ। সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে আপনার ধনী বলদদের সব সময় হাতে রাখা, তাদের আবদার মত কাজ করা এবং কোন সময়েও যেন আমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ থাকলো তা ছিন্ন না হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা, লাল জুহুর কাছ থেকে দূরে থাকবেন সব সময়! এটা যেন ভুল না হয়।

—আচ্ছা, মনে থাকবে! ধন্যবাদ আপনাকে! অসুবিধা হলেই আমি যাব আপনার ওখানে। আপনার ও মিসেস মাওনের কথা আমি কোন দিন ভুলবো না। গুড বাই!

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মাওন সাহেব পাড়ারগাঁয়ের দিকে ছোট কুটারে বাস করছেন শান্তিতে। দেশ তাঁর দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ তাকে কিছু দিন বিশ্রাম করতে সময় দিয়েছে। হানিফ চাচারও সবাই এখন বিলেতে। এখান থেকে মাসোহারা যায় এখন। তাছাড়া বেহুলকে তাঁরা রেখে গিয়েছেন খবরদারী করতে আর আছে বিভিন্ন ইওরোপীয় ফার্মের সাহেবেরা। এক দিন মাওন, হানিফ চাচা সব এক যায়গায় বসে। এমন সময় খবর গেল, জুহুর দেশেতে দুর্ভিক্ষ লেগেছে আবার। কোথায় না কি খাবারের দাম ভীষণ চড়েছে তাই খাবার চাইতে যাওয়ায় গুলী চালিয়ে কয়েকটা শিশু ও মেয়ে-বলদকে তারা খতম করেছে।

—কি খবর হানিফ চাচা?

—আজ্ঞে, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি। বেটারা আপনার পরামর্শ মত দেশ শাসন করছে। জানেন, ১৭১° বার এই ক'বছরে গুলী চালিয়েছে। বলদ মেরেছে তার ডবল। আর দুর্ভিক্ষ তো লেগেই আছে। তার ওপর ওখানকার স্ত্রীবলদেরাও না কি আজকাল কাপড়ের অভাবে হাফ-প্যান্ট পরছে।

—সে কি বলছো চাচা?

—তাই তো বাবাজি, তবে আমাদের মুনাকার টাকায় জুহু হাত দেয়নি। হাত দিয়েছে যত ব্যাটা গরীব বলদের পেটে! যা বুদ্ধি দিয়ে এসেছো বাবাজি! জালিয়ানাভাগ তো ছেলেমানুষ, ওরা এরই মধ্যে ২।৩টে জালিয়ানাভাগ চালিয়েছে।

—তাই না কি! মাওনের পেট থেকে হাসি যেন ফেনিয়ে-ফেনিয়ে উঠতে থাকে!

“কথা বলা এক কিছুই মীমাংসা করতে যাওয়ার চেয়ে নীরব থাকা এবং বোকা সাজা ঢের ভাল।”

—আব্রাহাম লিঙ্কন।

# রূপ চর্চার আধুনিক প্রণালী

দকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে  
নিজেদের দেহত্ৰী ও লাভণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন।  
সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে  
সৌন্দর্যচর্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি  
হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন  
সামগ্রী আজ রূপচর্চার অগ্রতম আধুনিক  
প্রণালী বলিয়া সর্বত্র  
সমাদৃত।



মলয় চন্দন সাবান  
রেণুকা পাউডার  
লাবণি স্নো ও ক্রীম  
ভূহিনা সৌন্দর্য কীর  
ক্যাষ্টারল স্বাসিত ক্যাষ্টর তৈল



কিনিকার সমগ্র  
আঙ্গন ক্রীম  
মেখিলা নইনে

দি কাল কাটা কেছি ক্যাল কোং, লি: কলিকাতা-২২



# বন্ধু-পট

## অনুকূল সমালোচনা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ছবি মূল্যবোধে ভরিত কবিতাকল্পিত আলোকচিত্র সমালোচকদের নিয়ে কঠোর সমালোচনা কবেছেন। সমালোচকরা না কি নিন্দক। তাঁদের অনুকূল সমালোচনা না কি বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নতিতে অজ্ঞাতম কারণ। সেই পুণ্যতন অভিযোগ! এর মধ্যে আছে মুকদ্দিসানা, নেই কিন্তু মুসিয়ানা।

আমরিকেশা নিজেই পাণ্ডিত্য মিষ্টতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকে; কিন্তু আত্মতৃপ্তির বসনা যদি তা হুসেহ অমরবাদে ভুজ্জ্বলিত করে তোলে, তবে তাই প্রতিবাদও কি পবিত্র বলে গণ্য হবে?

কাগজওয়ালাদের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ছবিওয়ালাদের চেষ্টাও ক্রটি নেই। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞাপন, মানবের আত্মজ্ঞান, বিনামূল্যে প্রবেশপত্র বিতরণ, জলপানবোর আয়োজন এবং সময়ে-সময়ে ভবিনোজন।

কল্যানসংস্করণও মেয়ে দেখাবার জন্যে বরণক্ষকে ঢেকে আনে পবন সমাদরে। লোকে মেয়ে দেখে চোখ দিয়ে, বসনা দিয়ে নয়। তাহাপি সে ক্ষেত্রেও “দীপ্ততাম্ ভুজ্জ্বলতাম্” এর আশা হয় না। এটা উৎসাহের মত বলা চলে অসম্ভব।

কিন্তু মেয়ের চোখ-মুখ যদি কিছুতরিকমাকার এবং তাই গানের বং যদি হয় “গদাধরের পিসি”র চেয়ে কালো, তবে কোন বকম মিষ্ট বাক্য ও খাতা দিয়ে কেউ কি বরণক্ষকে স্বপক্ষে টানতে পারে?

টক আমাদের মিষ্ট বলে মানতেই হবে—যে তেতু আমওয়ালার জিগির দিয়ে বলেছে, তাই হাম টক নয়। কুলীকে স্বামী বলে স্বীকার করতেই হবে—যে তেতু কলিদেশে নিখিল হুয়েছে কতিপয় মণ্ডা-মিঠাই। “ইবাণ-দেশের কাজী”দের যুক্তি হয়তো এই বকম, কিন্তু বাংলা দেশের সমালোচকদের তাঁদের এজলাসে টেনে নিয়ে যাবার ক্ষমতা কারো কাছে বলে মানি না।

এমন সব ছবিওয়ালার আছে যারা সত্যিকার ছবিবান নয়। মা লক্ষ্মী যখন অগ্নমনস্ক থাকেন তখন তাঁর অলক্ষ্যে তাঁর কাঁপির ভিত্তরে হাত ঢাকিয়ে কাঞ্চনমূল্য আদায় করবার লোভেই তারা ধারণ করে চিত্রনিখাতার ছদ্মবেশ।

এমন সব “সমালোচক” আছে যাদের বিজ্ঞান দৌড় সমালোচনার প্রথম পাঠ পধ্যস্ত নয়। তবে তাদের সমালোচকের ভেক নিতে হয় নিতান্তই “পেটকা ওয়াস্তে”। তাদের পেটে অল্প-বিস্তর তরল কি নিবেট কিছু পড়লেই আনন্দে দৌল-কলেববে হয়ে ওঠে তারা প্রশংসার পক্ষমুখ।

এই শ্রেণীর ছবিবান এবং এই শ্রেণীর লিপিকারই বাংলা চলচ্চিত্রের অধোগতির অজ্ঞাতম কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের

সেবক নয়, এটা হচ্ছে ব্যক্ত গুণকথা। তারা ছবিব চোবাবাজারে আসে নকল মালকে আসল বলে চালাবার ফিকিরে এবং যে কোন উপায়ে রূপচাঁদপক্ষীকে বন্দী করবার জুই সিন্দুক-পিঞ্জরে। তাদের উদ্দেশ্য উচ্চশ্রেণীর নয় বটে, কিন্তু তারা বুদ্ধিমান—হয়তো অতি-বুদ্ধিমান জীব। উপরচালকদের ঘটেই থাকে অতিবুদ্ধি, তাই প্রায়ই তারা শেষ পর্যন্ত শেষবন্দ্য করতে পারে না। তবে বলতে হবে উচ্চশ্রেণীর মানুষ না হলেও তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত নয়।

কিন্তু শেখোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের—অর্থাৎ লিপিকারদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের নেই কোন বকম উচ্চাকাঙ্ক্ষার বালাই। গুটিকয় মৌখিক মিঠা বাণী, কতিপয় দয়াদত্ত মিষ্টান্ন বা আর কিছু এবং খানকয় “ফি-পাস”—বাস্, এইটুকুর বিনিময়েই এরা আত্মাকে বিক্রয় করতে প্রস্তুত!

এবার হচ্ছে কবি ঈশ্বরদত্ত বর্নিত সেই জাতীয় জীব, যারা কল্লতরুর কাছে গিয়েও বলে—

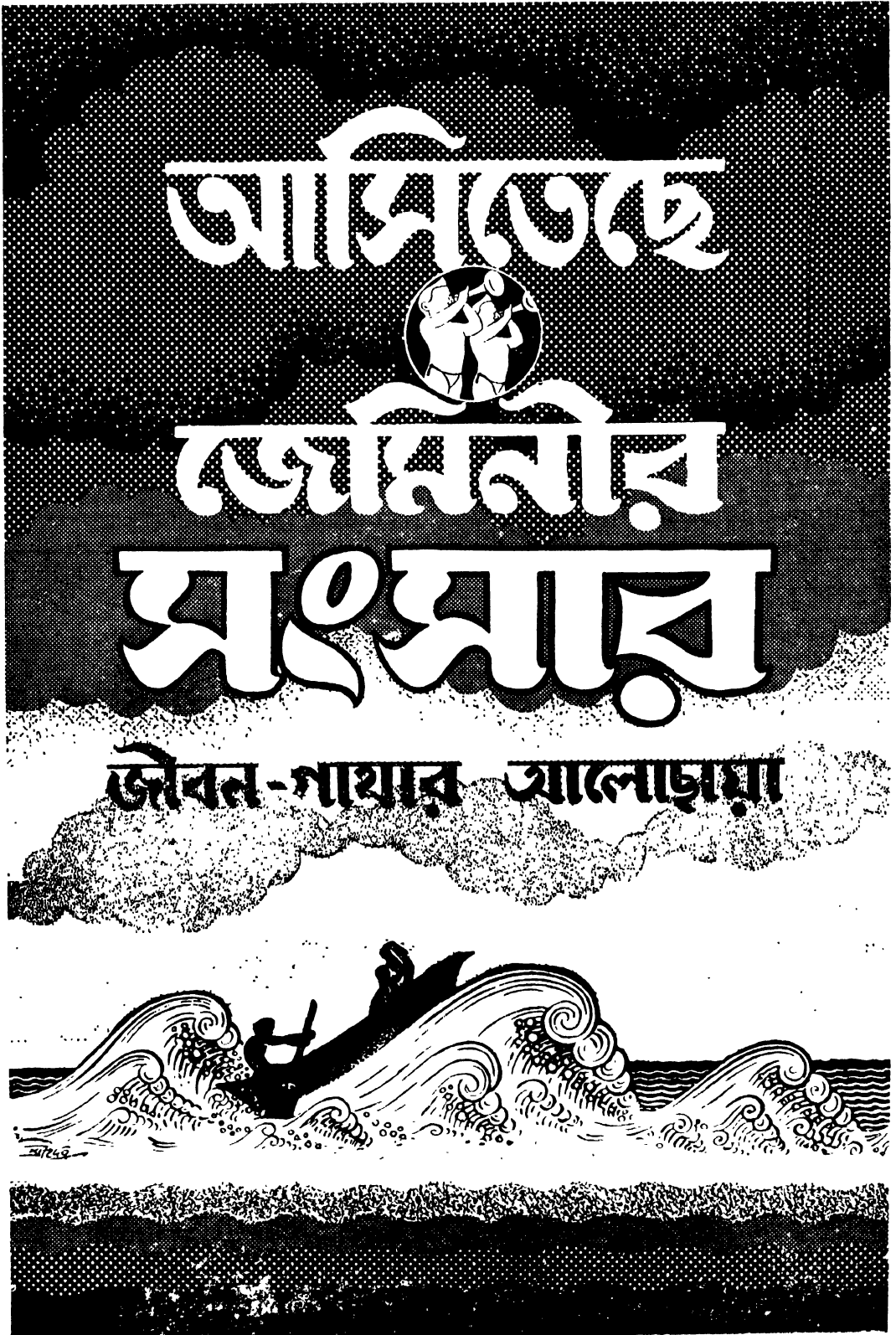
“আমরা ভূমি পেলেই খুশি ছব,  
খুশি খেলে বাঁচব না!”

এ দেশে চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে যাঁরা ছবিব কথা নিয়ে আলোচনা করতেন, তাঁরা ছিলেন দরদী সমালোচক। বাংলা দেশে ছবি নিয়ে নিয়মিত ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হয় শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ও শ্রীপ্রেমাক্ষর আতর্ষী সম্পাদিত “নাট্যব” পত্রিকায়। সে দিন স্বার্থহীন আলোচনা। কারণ, ছবিওয়ালারা তখন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন না। তাঁদের কাছ থেকে কাগজওয়ালারা কোন বকম মানব-আপায়ন বা জলযোগের প্রত্যাশাও করতেন না। কাগজওয়ালারা যে ছবিকে অধিকতর লোকপ্রিয় করে তুলতে পাবেন, ছবিওয়ালারা তখনও পধ্যস্ত সেটা আশঙ্ক করে উঠতে পাবেননি। বিধ কোন বকম স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও সেদিনকার সমালোচকরা বাংলা ছবিগুলিকে প্রশংসা ছাড়া নিন্দা করবার কথা মনেও আনতেন না। ক্রটি-বিচ্যুতি দেখলেও তাই উল্লেখ করতেন না। খুব কঠিন ফুলের চারা বোদের কাঁজে মাথা পড়ে। সেই জন্যেই শিশু বাংলা ছবিকে তখন বিক্রম সমালোচনার উত্তাপ সহ্য করতে হয়নি।

তাব পব বাংলার বাংলা ছবিব হানাদি দেওয়ার দিন গণ্য হ’ল। সে নিজেই পাণ্ডিত্য দিয়ে দাঁড়াতে শিখলে। স্বাধীন ভার চলতে শুরু করলে। ক্রমে সে সাবালক হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সমালোচকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকে আদর ও সহানুভূতি পেয়ে তাই মাথা খাবাপ হয়ে গেল। খেড়ে হয়েও সে দাবি করতে লাগল, সবাই যেন সব সময়েই তাকে চুমো খায়, গাল টিপে দেয়, আদর করে কোলে তুলে নাচায়। বাণ সত্যিকার সমালোচক, তাঁদের সে ক্রটি হয় না। তাঁরা বলেন,— সাবালক হয়েছে, ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে, এখন অন্তায় কবলে ধমক খেতে হবে বৈ কি!

ছবিবানরা উপলব্ধি করলেন “তে তি নো দিবসা গতাঃ!” এত দিনেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁদের ব্যবসায়-বুদ্ধি পাকা হ’ল। উঠেছে, স্তব্ধতা এটুকু বুঝতে তাঁদের বিলম্ব হ’ল না যে, ছবিব উচিত মত চালু করতে হ’লে সমালোচকদের দলে না টানতে চলবে না। কারণ জনসাধারণ যথেষ্ট পরিমাণে সমালোচকে মুখাপেক্ষী, বিজ্ঞাপনের চেয়ে অনুকূল সমালোচনা অধিকত



বিক্রাপনের টোপ ফেলা শুরু হ'ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছবির বাজ্যে দেখা যেতে লাগল নানা বকম অনাচার ও উপসর্গ।

প্রকৃত সমালোচকরা স্তব্ধ নাহেব মত টোপ খেয়েও বঁড়ীতে অটিক পড়লেন না, অবিরলিত ভাবে ভালোকে ভালো এবং মন্দকে মন্দ বলতেই লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা বেশী নয়। সংগঠনের পথিকরা কোন দিনই দলে ভাবি হয় না।

কিন্তু মিঠা বলি, খাবার ও বিক্রাপনের টোপ খেতে গিয়ে তাগতি দলে-দলে দবা পড়ে, বাদেব গায়ে আছে সমালোচকের চম্বাবেশ এবং মনে আছে প'ড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা লাভেব প্রবল লোভ। তুচ্ছ উৎকোচ পেলেই তাবা তৃতীয় শ্রেণীর ছবিকেও প্রথম শ্রেণীর প্রথম ব'লে কতারা দেবার জগ্গে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

জনসাপাষণ গট চম্বাবেশী সমালোচকদের প্রথম-প্রথম চিনতে পারেনি। তাদের কথা শুনে 'তাবা প্রেক্ষাগৃহকে পবিত্র' ক'বে তুলত। কিন্তু আলো দেখতে গিয়ে তাবা ফিবে আসতে লাগল অন্ধকার নিয়ে। আলো তো কেউ দেখতেই পেলে না, মাঝখান থেকে টাঁকেরে কড়িখলি গেল মাঠে মাথা। ক্রমে তাদের চোখ ফুটল। জাল সমালোচকদের চিনতে পাবলে তাবা। এবং দীর্ঘ-দীর্ঘে গটো তাবা বুঝতে পাবলে, কোন্ কোন্ সমালোচক কবেন না মিথ্যাব পক্ষে ওকালতি। তাঁরা বিজ্ঞাপন পেলেও সত্য কথা বলেন, বিজ্ঞাপন না পেলেও বলেন। তাঁরা বন্ধুর ছবিও মন্দ হ'লে সখ্যাত্তি কবেন না, শব্দ ছবিও ভালো হ'লে নিন্দা কবেন না। তাঁরা খানেন, ছবি হচ্ছে 'আট' এবং একমাত্র সেট হিসাবেই তাব বিচার। এক পাতা বিজ্ঞাপন বা এক খালা মিষ্টানের সঙ্গে আটের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

গাঁট হসেছেন খাজ চিত্রনিম্মাতাদের চক্ষুশূল। তাদের মত 'এবাই' আধুনিক বাংলা ছবির অসংপত্তনের অজ্ঞাতম কারণ। কিন্তু ব্যাপারটা কি উন্টোই নয়? বাংলা ছবি আবার যদি উদ্ধপথেব যাত্রী হয়, তাহ'লে কি তাব মূলে থাকবেন না সত্যিকার সমালোচকরাই? তাঁরা মেকাকে ধবিয়ে দিচ্ছেন, বাবিসকে চিনিয়ে দিচ্ছেন, কাচ ফেলা কাকনকে বেছে দিচ্ছেন। বাবিসের স্তূপ যত উঁচু হবে, বাংলা ছবি কি তত নীচুতে নেমে পড়বে না? বাবিস দিয়ে কেউ কোন দিন গ'ড়ে তুলতে পাবে তাজমহল?

থু হালে কলকাতার এক জন বিখ্যাত চিত্রনিম্মাতা ও চিত্রশানার অধিকাংশ সঙ্গে বাংলা ছবি নিয়ে আমাব কিছু-কিছু আলোচনা হয়েছিল। সেট প্রসঙ্গেই শুনলুম, তাঁব একখানি ছবি বাজাবে একেবাবেই চলেনি, ফলে তাঁব পক্ষাশ হাফাব তাঁবা লোকমান হয়েছে। ছবির ভদ্রশাব জগ্গ তিনি কিন্তু সমালোচকদের দোষ দিলেন না, দায়ী করলেন দর্শকদের। তাবা না কি সে ছবি দেখতে চায় না। প্রথম প্রথম কিছু-কিছু দর্শক-সমাগম হয়েছিল, কিন্তু অল্প দিনেব মধ্যেই দর্শকের দল এত হালকা হয়ে পড়ে যে ছবিখানা বাজাব থেকে তুলে নিতে হয়।

ব্যাপার যে কি হয়েছিল অনারাসেই অনুমান করা যায়। নতুন ছবি দেখতে প্রথম যাবা এসেছিল, পকেটের পয়সা ফেলে বাবিস দেখে তাবা হতাশ হয়ে ফিবে যায়। তাব পর বন্ধুদের কাছে বর্ণনা কবে নিজেদের তিস্ত অভিজ্ঞতার কথা। বন্ধুরা তাই শুনে

সাবধান হয়ে যায়। এট ভাবে মুখে-মুখে ছবিখানার অপকীর্তি কথ্য ছড়িয়ে পড়ে দর্শকমহলে।

পূর্বোক্ত চিত্রনিম্মাতা সমালোচকদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা কবেননি। তিনি বুঝতে পেরেছেন, দর্শকদের ভালো লাগেনি ব'লেই ছবিখানা হয়েছে স্বল্পায়ু। কিন্তু অধিকাংশ চিত্রনিম্মাতাব ঘটে এটুকু বৃদ্ধি নেই। স্তাবক সমালোচকরা প্রশস্তি রচনা করলেও কোন কদর্য ছবিকে দীর্ঘজীবী কবতে পারে না। বরং তাদেরই "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হয়, অর্থাৎ জাতও যায় পেটও ভরে না। এক দিকে যে সব দর্শক মিথ্যা সখ্যাত্তি কথ্য পাঠ ক'রে বাবিস ছবি দেখতে যায়, তাদের কাছে তাবা মার্কী-মারা হয়ে থাকে, দর্শকরা তাদের আর বিশ্বাস কবে না। অজ্ঞা দিকে বিজ্ঞাপনের গুটিকর টাকা এবং এক দিন খেয়ে কুবিয়ে যাওয়া গুটিকর মণ্ডা-মিঠাইয়েব স্মৃতি নিয়ে চিবদিন জীবনধারণ করা চলে না।

অধিকাংশ চিত্রনিম্মাতার দাবণা, সংকীর্ণ প্রাপ্তির আশায় সমালোচকরা থাকবেন তাদের হাতের মুঠোব ভিতবে। পুতলোবাজী পুতুলেব মত তাঁদের পুসি মত বোবাতে-ফেবতে ওঠাতে-বসাতে পারা যাবে। এট দাবণাব বশবর্তী হয়ে তাঁরা ছবি নিয়ে বেলেখেলা গেলেতে ভয় পান না। আট হিসাবে ছবিকে হিলোস্তম ক'বে তোলাব দিকে দৃষ্টি বাধা তাঁবা দবকাব মনে কবেন না। ইদেক বকম সস্তা, ভেজাল বস্ত্র যাচায়ে ছোঁচাচড়া দিয়ে একটা-কিছু গ'ড়ে তুলতে পাবলেই তাঁবা নিশ্চিত হন। মনে কবেন, দর্শকরা হচ্ছে শিশুব মত, মাকাল ফলেব মত বাইবেব রঙেব বাহার দেখলেই আছাদে তাবা আটখানা হয়ে পড়বে। তাব উপবে পোষমানা কাগজওয়ালারা যখন 'সাবাস সাবাস' ব'ব তুলে আকাশ বিন্দী ক'বে ফেলবে, তখন সে গো হবে সোনার সোচাগা—ছবিখানা বিকিয়ে যাবে একেবাবে "উত্তপ্ত পিষ্টকে"র মত। এট লাভ দাবণাই হচ্ছে বাংলা দেশেব অধিকাংশ ছবিব ব্যর্থতাব মদপ্রধান কারণ। দুই বা শিষ্ট সমালোচকের প্রগই এখানে ওঠে না, চিত্রনিম্মাতারা নিজেবাই করেন নিজেদের পায়ের কুঁচাবাঘাত।

পূর্বে যে বিখ্যাত চিত্রনিম্মাতাব একখানি ছবির ব্যর্থতার কথা উল্লেখ কবেছি, উদাহরণস্বরূপ তাঁর ছবিকেই গ্রহণ করা যাক। জর্নেক প্রবীণ লেখকের একটি চিত্রকাহিনী মাকামানি জনপ্রিয়তা অর্জন কবে। তখন উক্ত চিত্রনিম্মাতাব দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁকে বলা হয়, একটি নতুন গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা কবতে। ভদ্রলোক কথামত গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা তো করলেনই, তাব উপবে চাইলেন পবিচালকের কর্তব্যও পালন করতে। ভদ্রলোক লেখকপে প্রবীণ বটে, কিন্তু চিত্রজগতে নবগত। পরিচালক-রূপে তাঁব হাতে-পড়ি পয্যস্ত হয়নি। কিন্তু চিত্রনিম্মাতা সেদিকে নজর না দিয়ে কাজ কবলেন "penny-wise and pound-foolish" এর মত। নামজাদা পবিচালক নিজেব নাম হিসাবে বেশী দাম হাঁকবে, আর এট নামহীন পবিচালক বিকিয়ে যাবেন যথেষ্ট সস্তায়। অতএব চিত্র-নাট্যকারই হলেন চিত্রপরিচালক।

তার পর? তার পব আব কি, শিক্ষার্থীকে গুরুর আসনে বসালে যে বিড়ম্বনাব সৃষ্টি হয়, এখানেও হ'ল তাবই পুনবত্নয়। ছবিখানা মার খেলে। লোকে তার দিকে ফিরেও তাকালে না। নয়।

পরিচালক ভাঙলেন পরের মাথায় কাঁটাল। চিত্রনিষ্ঠা তাব হ'ল অঙ্ক লক্ষ টাকা লোকসান।

যাঁরা সত্যিকার সমালোচকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেরদের কটি মস্তক অঙ্ক হয়ে থাকতে চান, তাঁরা একটা মন্ত কথ্য ভুলে যান। লেখনীয় সমালোচনার কথনীয় সমালোচনার মূল্য ঢের বেশী। লেখক যে সমালোচনা কাগজে লেখেন, তার চেয়ে ফলপ্রসূ হয় দর্শকবা যে সমালোচনা করেন মুখে-মুখে। ছবিকাবরা বিবিধ উপায়ে হয়তো লেখকদের মুখ বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু দর্শকদের মুখ বন্ধ কবাবেন কেমন ক'বে? তাদের একমাত্র যুক্তি হচ্ছে—মাথব তেল, ফেলব কড়ি। এখানে কড়ি যাব জোর তাব। সমালোচকদের cape goat বা মুক্তিছাগে পরিণত করতে পারলেই বাংলা ছবি লক্ষ্মীলাভ কবাবে না। ছবিকে রাখতে পারে বা মাবতে পারে কেবল দর্শকরাই।

সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ছুটি বড় দৃষ্টান্ত আছে।

“কিন্নরী” হচ্ছে ক্ষীবাদপ্রসাদের একখানি নাটিকা। সেখানি যে দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর বচনা, সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু ওখানি ভালো কি মন্দ নাটক, তা নিয়ে দর্শকরা একটুও মাথা ঘামায় না। পালাটি তারা অত্যন্ত উপভোগ কবে। অতএব তাব জনপ্রিয়তা হয়েছে অসাধারণ।

“গৃহপ্রবেশ” ও “তপস্বী” খোদ রবীন্দ্রনাথের রচনা। সমালোচকরা একবাক্যে তাদের নাটককে ও অভিনয়কে দিয়েছেন অভিনন্দন। কিন্তু দর্শকবা তাদের সহ্য কবতে বাজী হয়নি। সাধারণ রঙ্গালয়ে পালা ছুটি হয়েছে একেবাবই ব্যর্থ।

সমালোচকের লিখিত নিন্দা-প্রশংসাব উপবে নয়, দর্শকদের মৌখিক নিন্দা-প্রশংসাব উপবেই নির্ভব কবে নাটক বা ছবির ভবিষ্যৎ।

## —সাহিত্য পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

### শান্তিনিকেতন—

(প্রথম ও দ্বিতীয়)—ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রতি খণ্ডে মূল্য চাব টাকা।

### ধর্ম—

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য সাত সিকা।

### সংস্কৃত—

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য দেড় টাকা।

### মাল্লখের ধর্ম—

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—বিশ্বভাবতী গুহালয়, ২ নং বঙ্কিম চট্টোজো ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

### স্বাধীনতা দিনের উপহার—

কাঙ্গী আবহুল ওহদ। প্রকাশক—কাঙ্গী খুবশীদ বখ্ত, ৮ বি নং, তাবক দস্ত বোড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

### অনাগত—

প্রফুল্লকুমার সবকার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

### আধুনিক আলোক চিত্রণ—

পরিমল গোস্বামী। ফটোগ্রাফিক স্টোর্স এণ্ড এজেন্সি লিঃ, ১৫৪ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

### কাজল রেখা—

মলি বাগচী। কমলা বুক ডিপো, ১৫ নং বঙ্কিম-চট্টোজো ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

### গোপন কথা—

টিফেন জুইগ। অজ্ঞাবাদক—শান্তিবজ্ঞন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বাচল প্রকাশক, ৬নং কলেজ বো, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

### বিদ্যাপতি—

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। জেনাবেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ, ১১৯ নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

### প্রসাদ—

শ্রীশ্রীমুপেন্দ্রনাথ। প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২১১ নং কালিদাস পতিভূতি লেন, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

### রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ১২। মূল্য দুই টাকা।

### বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল, এম-এ সম্পাদিত। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### মুকুন্দ দাসের গ্রন্থাবলী—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

### শ্রীচীচণ্ডী—

(মূল ও বঙ্গানুবাদ) বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য এক টাকা।

### শ্রীমন্তাগবত—

(প্রাচীন ভক্তদের বঙ্গানুবাদ)—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

### আমার বাঙলা—

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ঈগল পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

### অশরীরী—

প্রমথনাথ বিনী। পি, কে, বসুমতী এণ্ড কোং, কলিকাতা—৩১, মূল্য দেড় টাকা।

### নতুন চাঁদ—

নজরুল ইসলাম। নূব লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

### বিপ্লবের ডাক—

সুনীল জানা। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

# প্রান্তিক পাবলিকিটি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাজা আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড ও মধ্য-প্রাচ্যের ভবিষ্যৎ—

গত ২০শে জুলাই (১৯৫১) জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ মধ্য-প্রাচ্যে পশ্চিম জর্ডান জেরুজালেম সহর এবং-আকুসা মসজিদে প্রবেশ কবিরার সময় মুস্তাফা শাবিব নামক জনৈক আবদেব গুলিতে নিহত হইয়াছেন। আততায়ীও রাজা আবদুল্লাহর দেহাবশিষ্ট গুলিতে নিহত হইয়াছে। ইহাও কয়েক দিন পূর্বে ১৬ই জুলাই, শাবিবে লেবাননের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রিয়াদ এল মোলহ জর্ডানের রাজধানী আশ্মান সহর জর্ডান আততায়ী গুলিতে নিহত হন। তাঁহার আততায়ী না কি সিবিরার জর্ডানক জাতীয়তাবাদী। এই হত্যাকাণ্ডে তীব্র নিন্দা কবিতা গত ১৯শে জুলাই রাজা আবদুল্লাহ এক ঘোষণায় বলিয়াছিলেন,—“এই সকল ছুর্ত্বকে আমরা কিছুতেই সহ্য কবিত না অথবা যে সকল প্রতিষ্ঠান নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি জ্ঞানবহুত্ব কবে তাহাদিগকে কিছুতেই প্রশংসা দেওয়া হইবে না।” অদৃষ্টে এমন নিদারুণ পরিতাপ যে, ইহাও পবদিন তাঁহাকেই আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। রাজা আবদুল্লাহ নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, মধ্য-প্রাচ্যে, ইজ্রাইল রাষ্ট্রের সহিত আবদেব রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে নব্যে কিছু ভাবে দেখা দিবে তাহা অনুমান করা যেমন কঠিন, তেমনি তাঁহাকে হত্যা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝা উঠাও সম্ভব নয়।

তিনি কোন হুঁপী দাবা নিহত হন নাই অথবা আবদেব দাপেব কোন শক দাবা তিনি নিহত হইয়াছেন এমন কথাও বলা হয় নাই। জেরুজালেমে প্রাক্তন মুক্তি এবং প্যালেষ্টাইন আরব উচ্চতর কমিটি প্রধান কর্তা হজ আমীন এল হোসেনার নিযুক্ত লোক দাবা তিনি নিহত হইয়াছেন, এই মন্তব্যে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার আততায়ী মুস্তাফা শাবিব জেহাদ-বাহিনীর এক জন সদস্য বলিয়া প্রকাশ। জেরুজালেমের প্রাক্তন মুক্তিতে এই জেহাদ-বাহিনী গঠন কবিতাছেন। প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের হাত হইতে রক্ষা করাই এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বলিয়া প্রকাশ। ইহাও একটি অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য আছে বলিয়াও শোনা যায়। প্রাক্তন মুক্তি দাবী কবিতা থাকেন যে, তিনিই প্যালেষ্টাইনের আবদেবের একমাত্র এবং অকৃত্রিম নেতা। যিনিই তাঁহার এই নেতৃত্বের দাবীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন তাঁহাকেই অপসারিত করা জেহাদ-বাহিনী গঠনের অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও তাঁহার নেতৃত্বে অল্পকাল একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। বর্তমান জেহাদ-বাহিনীকে ইহাও বংশধর বলিয়া অভিহিত করা যায়। রাজা আবদুল্লাহ পূর্বে-প্যালেষ্টাইন তাঁহার রাজ্যের অঙ্গীভূত কবিতা প্রাক্তন মুক্তির মূল্যবান মন্ত্রণার আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা

আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ডে প্রাক্তন মুক্তির হাত আছে, এইরূপ প্রমাণ-কার্যেব তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ কবিতা গত ২১শে জুলাই কবিতা হইতে তিনি এক বিবৃতি দিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, রাজা আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড যদি জেহাদ-বাহিনীর সদস্য হইত তাহা হইলেও এই হত্যাকাণ্ডের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। উল্লিখিত প্রচা-কাণ্ডের বিষয় পাবদেব এবং উচ্চতর প্রতিক্রিয়া প্যালেষ্টাইন আবদেব এবং প্যালেষ্টাইন সহবগুলি উপর যে সাংবাদিক সম্মেলক কাগ্যকলাপ সংঘটিত হইতে পারে সে-সম্বন্ধেও তিনি সতর্ক কবিতা দেন।

রাজা আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ডের মূল বস্তু প্রকাশিত হইবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে এইরূপ হত্যাকাণ্ড এই নূতন নয়। ১৯৪৮ সাল হইতে এ পর্যন্ত মধ্য-প্রাচ্যে দুই জন রাজা, এক জন প্রেসিডেন্ট এবং চারি জন প্রধান মন্ত্রী নিহত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত এক জন মন্ত্রী, এক জন প্রধান সেনাপতি, পুলিশের এক জন প্রধান কর্তা, এবং ফৌজদারী বিচার বিভাগের এক জন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হস্তে জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। যে দুই জন রাজা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লাহ দ্বিতীয়। ইহাও পূর্বে ১৯৪৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইয়েমেনের রাজা ইমাম ইয়াযায়া, তাঁহার দুই পুত্র এবং প্রধান মন্ত্রী নিহত হন। ১৯৪৯ সালের ১৪ই আগষ্ট সিবিরার প্রেসিডেন্ট হোসেনী জাইম এবং প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ ববাজী নিহত হন। মিশরের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ নোকবোশী পাশা ১৯৪৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর, ইরানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আবদুল হোসেন ১৯৪৯ সালের ৪ঠা নবেম্বর, ইরানের প্রধান মন্ত্রী ফেনাবেল আলী বাজমা ১৯৫১ সালের ৭ই মার্চ আততায়ীর হস্তে জীবন দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিযুক্ত প্যালেষ্টাইন-মধ্যস্থ কাউন্সিল বার্নাডোট ১৯৪৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর নিহত হইয়াছেন। সমস্ত হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। হত্যাকাণ্ডের ব্যর্থ হইয়াছে এইরূপ ঘটনাও বড় কম নয়। ইরানের শাসকে হত্যাকাণ্ডের তন্মধ্যে অন্যতম। মধ্য-প্রাচ্যে হত্যাকাণ্ডের শেষ এখানেই কি না তাহাই বা কে বলিবে?

রাজা আবদুল্লাহর হত্যাকাণ্ড সহ মধ্য-প্রাচ্যে যে-সকল হত্যাকাণ্ড এ-পর্যন্ত ঘটয়াছে সেগুলিও জ্ঞান শুধু উপর আবদেব জাতীয়তাবাদী-দিগকেই দায়ী কবিলে চলিবে না। মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই ইহা প্রতিক্রিয়া। আবদেব-জগতে রাজা আবদুল্লাহ ছিলেন বুটেনের বিশ্বস্ত বন্ধু। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মক্কা সহরে তাঁহার জন্ম হয়। তৎকালে আবদেব প্রায় সমগ্র অংশই ছিল ‘তুবস্কেব’ অধীন। জেজাজেব বাজা হোসেনেব তিনি দ্বিতীয় পুত্র। কনষ্টান্টিনোপলে তিনি শিক্ষাগ্রাপ্ত হন। তুবস্কেব পার্লামেন্টে তিনি হেজাজের প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা মক্কাব শেরিফ এবং আমীর নিযুক্ত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে আবদুল্লাহ প্রথাত টি, ই, লবেস্কেব প্রেরণায় তুবস্কেব বিরুদ্ধে আবদেব-অভ্যুত্থানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কবিতাছিলেন। লবেস্কেব কৌশলে আবদেব স্বাধীনতা লাভেব আশায় তুরস্কেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল। তুবস্কেব বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে বাহারা অংশ গ্রহণ কবিতাছিলেন, তন্মধ্যে আবদুল আজিজ ইবন সৌদ, মক্কাব শেরিফ হোসেন এবং তাঁহার দুই পুত্র

ফৈজাল এবং আবদুল্লাব কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের শেষে জীববরা স্বাধীনতা লাভ করিলে, মক্কাব শেখিফ হোসেন দামাস্কাসে আববের বাজা হইবেন এইকপ অনেক কিছুই আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধে মিশ্রশক্তি জয়লাভ করায় আববরা তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদেব স্বাধীন হওয়ার আশা পূর্ণ হইল না। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট শেরিফ হোসেনকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ হইলে কবিলেনট, জেডা হইতে রণতরীও সরাইয়া লইলেন। এই সুযোগে ইবন সৌদ হোসেনের চেজাজ রাজ্যও দখল করিয়া লইল। তুরস্কের সাম্রাজ্য সিরিয়া, ইবাক এবং প্যালেষ্টাইন এই তিন অংশে বিভক্ত করা হইল। প্যালেষ্টাইন এবং ইবাক আসির বৃটিশের ম্যাণ্ডেটের অধীনে এবং সিরিয়া ও লেবানন বহিল ফ্রান্সের ম্যাণ্ডেটের রাজ্যরূপে। পিতাব অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাব মোহ দুঃ হইতে বিলম্ব হয় নাই। ১৯২১ সালে তিনি সিরিয়া দখলের জন্য এক সৈন্যদল গঠন করিয়া আশ্বানে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই প্রদক্ষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বেলফোর্ড বোম্বার প্যালেষ্টাইনকে ইতালীর জাতীয় বাসভূমিতে পরিণত করিবার আশ্বাস দেওয়ার পূর্ব জর্ডান নদীর পূর্বতীরস্থ আজলুন, বন্কা এবং কাবাক এই তিনটি জেলা নষ্টা স্বতন্ত্র একটি অঞ্চল গঠন করা হয় এই সত্ত্বে যে, উহা প্যালেষ্টাইন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিলে, কিন্তু উহা পরিচালিত হইবে প্যালেষ্টাইনস্থিত বৃটিশ প্রতিনিধি দ্বারা। আবদুল্লাব যখন মসৈগো আশ্বানে উপনীত হইলেন, তখন বৃটিশ তাহাকে ট্রান্সজর্ডানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইল। আবদুল্লাও বৃদ্ধিমানের মত বৃটিশের অধানে ট্রান্সজর্ডানের আমীর হইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই হইতে রাজা আবদুল্লাব বিশ্বস্ততা সহিত সমস্ত বিষয়ে বৃটিশকে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। নিজেব স্বাধীনস্বাধীনতা জন্য ট্রান্সজর্ডানবাসীরা ক্ষতি করিয়াও তিনি বৃটিশের আত্মগত্যা করিয়াছেন, এই অভিযোগও একাধিক বার তাহাব বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছে।

আবদুল্লা ট্রান্সজর্ডানের আমীর হওয়ার পূর্ব উহার শাসন-কায়দা উপর প্যালেষ্টাইনস্থিত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সূচুট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯২৭ সালের নবেম্বর মাসে আমীর আবদুল্লাব সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এক নূতন চুক্তি হয়! এই চুক্তিব সর্তাহুসাবে ট্রান্সজর্ডানের শাসন-ব্যবস্থাব উপর বৃটিশের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চুক্তিতে একটি নির্বাকচেনমূলক আইন সভা গঠনের এবং আবদুল্লা এই আইন সভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবেন এইকপ সর্বত্র অবগত ছিল। কিন্তু বৃটিশের ম্যাণ্ডেটের ক্ষমতাব সমুখ্যে এইকপ আইন সভা থাকিব কোন অর্থই হয় না। বৃটিশের প্রেরণায় যে আবব লীগ গঠিত হয় তাহাব সনদে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে আবদুল্লা স্বাক্ষর দান করেন। ১৯৪৬ সালে বৃটেনের সহিত তাহাব আব একটি সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ট্রান্সজর্ডানের উপর হইতে বৃটিশের ম্যাণ্ডেটের অবসান হয় এবং আমীর ট্রান্সজর্ডানের রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে প্যালেষ্টাইন বৃটিশ ম্যাণ্ডেট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজবাইল রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং আরব রাষ্ট্রগুলি একযোগে এই নবজাত রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে। আবব-ইজবাইল যুদ্ধে রাজা আবদুল্লাব আবব লিজিয়ন সাফল্যের সহিত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন জেরুজালেম সহর প্যালেষ্টাইনের পূর্বাঞ্চলের

কতক অংশ রাজা আবদুল্লাব আবব লিজিয়ন দখল করিয়া লয়। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে প্যালেষ্টাইনের এই আববী অংশে ট্রান্সজর্ডান পার্লামেন্টের জন্য এক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এপ্রিল মাসে জর্ডান ভূমির পূর্ব ও পশ্চিম এলাকা মিলিত করিয়া রাজা আবদুল্লাব অধীনে এক অগুণ্ড হাশিমাইট জর্ডান রাজ্য গঠনের এক সিদ্ধান্ত ট্রান্সজর্ডান পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্ব-প্যালেষ্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডানে মিলিত হইয়া যে নূতন রাষ্ট্র গঠিত হইল তাহাব নাম হইল জর্ডান রাজ্য। ট্রান্সজর্ডান রাজ্য বৃটিশের সৃষ্ট। রাজা আবদুল্লা উহাব সহিত পূর্ব-প্যালেষ্টাইন যুক্ত করিয়া উহাকে জর্ডান-রাজ্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু রাজা আবদুল্লা যেমন দাবী করেন যে, তিনি হজবত মহম্মদের পিতামহ হোসেনের বংশধর এবং এই জন্য নাম হইয়াছে হাশিমাইট বংশ, তেমনি জর্ডান নামটি বাইবেলের পুরাতন পথ্যার বা ওল্ড টেষ্টামেন্টেও পাওয়া যায়। ইজবাইলগণ মুসা (Moses) নেতৃত্বে মিশর হইতে আসিয়া জর্ডান নদীর পূর্বতীরস্থ মোয়াব রাজ্যের উচ্চ অধিকার্য কিছু দিন বাস করিয়াছিল। এইখানেই মুসা মৃত্যু হয়। তাহাকে কবর দেওয়া হয় দক্ষিণ-জর্ডানে।

আবব জাতীয়তাবাদীদের সহিত যে-সকল কারণে রাজা আবদুল্লাব বিরোধ ঘটিয়াছিল সেখনি উল্লেখ না করিলে মধ্য-প্রাচ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া উঠা কঠিন। রাজা আবদুল্লা বৃটিশের জীবদাব ছিলেন বলিয়া জাতীয়তাবাদী আববরা তাহাব যৌব বিরোধী ছিলেন। তাহাব আব একটি মতলব ছিল—জর্ডান, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ও লেবাননকে একত্র করিয়া হাশিমাইট বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সিরিয়া ও লেবাননের প্রজাতন্ত্রী আববরা চায় এই কয়েকটি রাজ্যকে একত্র করিয়া প্রজাতন্ত্রী আবব-রাষ্ট্র স্থাপন করিতে। প্যালেষ্টাইনের অনেক আবব মনে করেন যে, তিনি যে ১৯৪৮ সালে ইজবাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাব আসল উদ্দেশ্য ছিল প্যালেষ্টাইনের কতক অংশ গ্রাস করা। মৌদী আববের রাজা আবদুল্লা আজিজ ইবন সৌদের সঙ্গে তাহাব শত্রুতা প্রসিদ্ধ। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ইবন সৌদ রাজা আবদুল্লাব পিতা হোসেনের চেজাজ রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। রাজা আবদুল্লা আবব উহা দখল করিতে চেষ্টা করিতে পাবেন, রাজা ইবন সৌদের মনে এই আশঙ্কা আছে। বস্তুতঃ রাজা আবদুল্লাও চেজাজ দখলের অভিপ্রায় গোপন বাখেন নাই। বৃটিশের প্রতি একনিষ্ঠ আত্মগত্যা প্রকাশ করিতে রাজা আবদুল্লা কখনই লজ্জা অনুভব করেন নাই। আরব রাষ্ট্রগুলি দৃষ্টিতে উহা ভাল লাগে নাই। মিশর এবং ইবাকের সঙ্গে বৃটেন যে বন্ধা-ব্যবস্থা মূলক চুক্তিব প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা রাজা আবদুল্লাব সহিত চুক্তিবই অমূলক। কি মিশর, কি ইবাক কেহই এইকপ চুক্তি স্বীকার করিতে রাজী হয় নাই। রাজা আবদুল্লাব বিরুদ্ধে আর একটা বড় অভিযোগ—তিনি ইজবাইল রাষ্ট্রের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আবব-স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এ কথা বলিলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না যে, ইজবাইল রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাব নীতির মধ্যেই রাজা আবদুল্লাব বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইজবাইল রাষ্ট্রের অন্তিম স্বীকার করিলেই

আব-ইজ্জাইল সম্পর্কে সমাধান যে হঠাৎ পাবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্যালেস্টাইন-আবদেব স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসবাক্যকর্তার জ্ঞান নয়; অতীত কালে বাজা আবদুল্লাহ প্রতি সমগ্র আবদেব দেশগুলিতে বিবোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রজাতন্ত্রী আবদেব আশঙ্কা, বাজা আবদুল্লাহ এশিয়াব আবদেব ভাষাভাষী বার্ষিকিক শাসনাইট বংশের শাসনাধীনে একাধিক কবিত্তে চেষ্টা কবিবহুচেন। তাঁহাব এট প্রচেষ্টা সফল্য লাভ কবিলেও আবদেব জনসাধারণের আয়নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইবে এবং বাজা আবদুল্লাহ বৃটেনেব অস্থগত বলিয়া এশিয়াব আবদেব ভাষাভাষী বার্ষিকিক উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে বৃটেনেব একাধিপত্য। বাজা আবদুল্লাহ বৃহত্তর মিসিয়া গঠনের প্রয়াসকে মিশর দেশে আছে ঈশাব চক্ষে। মিশরব আশঙ্কা ছিল, বাজা আবদুল্লাহ এই প্রচেষ্টা সফল হইলে মধ্য-প্রাচ্যে মিশরব প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে।

আবদেব-প্যালেস্টাইনকে বাজা আবদুল্লাহ প্রাস কবায় মিশর এবং ফেজজালেমেব প্রাক্তন মুক্তি অশান্ত বুদ্ধ হইয়াছেন। ইহাতে এক দিকে তাঁহাব বাজা সম্প্রদায় এবং ফেজজালেমেব পবিত্র স্থানগুলিব উপর তাঁহাব আধিপত্য যেমন প্রসারিত হইয়াছে, তেমনি মিশর ও প্রাক্তন মুক্তি পশ্চিম নিখিল প্যালেস্টাইন গবর্নমেণ্টকে অস্বীকার করা হইয়াছে। ১৯৭৮ সালে প্যালেস্টাইনে মিশরব পরাজয়েব দায়িত্বও বাজা আবদুল্লাহ উপর চাপানো হইয়াছে। মিশর মনে করে, বাজা আবদুল্লাহ যদি নিশ্চেষ্ট না থাকিলেন তাহা হইলে মিশরব পরাজয় হইত না। এই নিশ্চেষ্টতাকে মিশরব সৈন্যবাহিনী ধ্বংস কবিবাব বুদ্ধ ইজ-জর্ডানীয়ান চক্রান্ত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। এই প্রচার-কায় এখনও চলিতেছে। বাজা আবদুল্লাহ নিহত হওয়াব পবদিন কায়বোব এক পত্রিকায় একরূপ ৩৬ লাইন প্রকাশিত হইয়াছিল, "The End of the Traitor Abdullah, Enemy No 1 of Peace." আবদেব লীগেব একত্রিক নিবাপন চুক্তিব (Collective Security Pact) প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাজা আবদুল্লাহ বাজী না হওয়াতে তাঁহাব প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিশরব সাবাদপত্রে এইরূপ মন্তব্যও করা হইয়াছিল যে, জর্ডানেব সৈন্যবাহিনী আবদেব লিজিয়নেব বৃটিশ সেনাপতি গ্রব পাশা শুধু বৃটিশই নহেন, তিনি এক জন ইহুদী গুপ্তচর এবং আবদেব সমস্ত সামরিক গুপ্ত তথ্য তিনি ফাঁস কবিয়া দিবেন।

বাজা আবদুল্লাহ নিহত হওয়াব মধ্য-প্রাচ্যে খুব গুরুত্ব পবিবর্তন কিছু ঘটবে, ইহা মনে কবিবাব কোন কারণ দেখা যায় না। তবে মধ্য-প্রাচ্যে বৃটেনেব প্রভাব আরও প্রাস পাওয়াব আশঙ্কা উপেক্ষাব বিষয়নয়। জর্ডান বাণেব ভবিষ্যৎ কি, তাহাও অসুখান করা কঠিন। মিসিয়া অতঃপব জর্ডান বার্ষিকে তাহাব অঙ্গীভূত কবিবাব চেষ্টা যে কবিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এদিকে আবদুল্লাহ উত্তরাধিকারিণ লইয়াও বিবোধ বাদিবাব আশঙ্কা আছে। বাজা আবদুল্লাহ মৃত্যব মাঘ দশ মিনিট পবেই জর্ডান মন্ত্রিসভা তাঁহাব দ্বিতীয় পুত্র নায়েফকে বিজেট নিযুক্ত কবিয়াছেন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ তালাল বর্তমানে চিকিৎসাব জ্ঞান সূত্রবল্যাণে অবস্থান কবিতেছেন। কিন্তু আসলে ইহা তাঁহাব নির্বাসন ছাড়

আব কিছুই নয়। বাজা আবদুল্লাহ যখন তুবস্কে গিয়াছিলেন সেই সময় জর্ডানেব প্রধান মন্ত্রী এবং আবদেব লিজিয়নেব বৃটিশ সেনাপতি সচিব যুবরাজ তালালেব বগড়া হইয়াছিল। অতঃপব স্নায়িক তুল্লতাব অজ্ঞাতে প্রথমে তিনি বৈকট হাসপাতালে চিকিৎসিত হন এবং পরে স্বাস্থ্য লাভের জ্ঞান চিকিৎসকদেব পরামর্শে সূত্রবল্যাণে গমন করেন। বাজা আবদুল্লাহ তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত কবিবাব জ্ঞান শাসনতন্ত্র সংশোধন কবিতে চাতিয়াছিলেন। তিনি যদি সত্যি যুবরাজ তালালকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত কবিয়া গিয়াও থাকেন, তাহা হইলেও সিংহাসনেব উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা তিনি স্থির কবিয়া যান নাই। সিংহাসনেব অধিকার লইয়া গোলযোগ কিকপ আকাব ধারণ কবিবে তাহা অসুখান করা সম্ভব নয়। মিশর যুবরাজ তালালেব সমর্থক। ইবাক সমর্থন করে আবদুল্লাহ দ্বিতীয় পুত্র নায়েফকে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এই ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন তাহা মনে কবিবাব কোন কারণ নাই। তবে তাঁহাবা পর্দাব আড়াল হইতে কল টিপিবেন।

### ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় স্পেন—

ফ্রান্সেব স্পেনেব সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি দৈপক্ষিক চুক্তি কবিবাব জগাই শুধু উল্লেখীয় হয় নাই, স্পেনকে ইউরোপেব রক্ষা-ব্যবস্থাব অঙ্গীভূত কবিবাব পবিত্রনাও তাহাব আছে। এই দৈপক্ষিক চুক্তি এবং ইউরোপ বক্ষা-ব্যবস্থায় স্পেন কি ভূমিকা গ্রহণ কবিতে পারে, সেসম্পর্কে আলোচনা কবিবাব জ্ঞান মার্কিন নেভেল অপারেশনেব প্রধান কর্মী এডমিরাল শেবমান ১৬ই জুলাই (১৯৭১) স্পেনে গিয়াছিলেন। জেনারেল ফ্রান্সেব সচিব আলোচনা শেষ কবিয়া ফিবিবাব পাখে নেপথ্যে আকস্মিক ভাবে তাঁহাব মৃত্যু হয়। আলোচনাব ফলাফল হয়ত মথানময়ে জানা যাইবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন স্পেনেব সচিব দৈপক্ষিক চুক্তি কবিতে চায়, স্পেনকে ইউরোপেব বক্ষা-ব্যবস্থাব অঙ্গীভূত বা কেন কবিতে চায়, তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব এই প্রয়াসে বৃটেন ও ফ্রান্স অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছে, হয়ত স্পেনকে ইউরোপেব বক্ষা-ব্যবস্থাব অঙ্গীভূত কবিবাব প্রয়াস বাধাও দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত কি কবিবে, তাহাও উপেক্ষাব বিষয় নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেব এই প্রয়াস কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বস্তুতঃ ফ্রান্সকে দলে টানিবাব চেষ্টাব ইতিহাস এবং উত্তর-আটলান্টিক চুক্তি সম্পাদনেব কাহিনী সমসাময়িক মনে কবিলেও ভুল হইবে না। গত তিন বৎসবে জন কয়েক মার্কিন সিনেটাব স্পেনে বাইয়া ফ্রান্সেব আতিথ্য গ্রহণ কবিয়াছেন এবং দেশে ফিবিয়া ফ্রান্সেব ফালাজিষ্ট বাহিনীব ভয়সী প্রশংসা কবিতো ক্রটি কবেন নাই। শুধু মার্কিন সিনেটবরাই নয়, মার্কিন দেশবক্ষা বিভাগেবও কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি স্পেনে গিয়াছিলেন, শুধু ফ্রান্সেব আতিথ্য গ্রহণেব জগাই নয়, আবও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁহাদেব ছিল। তাঁহাবা পিবাবিত্ত পর্দাতমালাকে কিকপে বক্ষা-ব্যবস্থাব পবিত্ত করা যায় তাহা যেমন পবিত্রন কবিয়া আসিয়াছেন তেমনি স্পেনেব বাটিসমূহ হইতে আক্রমণেব কিকপ সুযোগ আছে তাহাও দেখিয়াছেন।

জেনারেল ফ্রান্সেব সৌভাগ্য এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মনে নিবপেক্ষ ছিলেন, যদিও মোভিয়েট রাশিয়াকে ধ্বংস কবিবাব

উদ্দেশ্যে তাঁহাব রু ডিভিশনকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে ক্রটি করেন না। নিবপেক্ষ না থাকিয়া যদি তিনি ছিলোবে পক্ষে যোগদান করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাব অদৃষ্টে হিটলাব ও মুসোলিনীবা দশাট ঘটিত কি না, তাহা লইয়া আলোচনা কবিসা লাভ নাট। কিন্তু তাঁহাব নিবপেক্ষ থাকাব ফল যে এত দিনে ফলিতে আবশ্য কবিসাছে, সন্দেহাও অনস্বীকাষা। সম্প্রতি সে কয়েক জন মার্কিন সিনেটব স্পেনকে উত্তব-আটলান্টিক চুক্তিতে গ্রহণ কবিসাব সুপারিশ কবিসাছেন, তাঁহাদেব দূত পাবসা, ফার্সেব সৈন্যবাহিনী ঘোবতব কমান্ডিবিবোধী। কাঙ্চেট মিত্র-সৈন্যবাহিনীবা পাশে ফার্সেব সৈন্যবাহিনীকে দাঁড় কবাইবাব তাঁহাবা পক্ষপাতী। ফার্সেব তাঁহাবা পড়ন্দ কবেন কি কবেন না, এই প্রশ্নটাই তাঁহাদেব কাঙ্চে প্রাপ্তব। কাবণ, ১৯৭১ সালে বাশিরা যখন আক্রান্ত হইয়াছিল তখন বাশিবাব সতিত মৈত্রী স্থাপনেব সময় ষ্টালিনকে তিনি পড়ন্দ কবেন কি না ইহা চিন্তা কবিসা মিঃ চার্লিস কাজ কবেন নাট। কিন্তু ফার্সেব সৈন্যবাহিনী শুধু কমান্ডিবিবোধী হওয়াট মথেষ্ট নব, তাঁহাদেব যুদ্ধ-সামর্থ্য, সনবনিপুণতা এবা অস্ত্রসজ্জা প্রভৃতিব কথাও বিবেচনা কবা আবশ্যক। যুদ্ধক্ষেত্রে কমান্ডিবিবোধিতা আঘাত পানিবাব খবাব অল্প বলিবা গবা হইতে পাবে না। ফার্সেব পাসন-বাবস্থাব অগতাব প্রবান ভিত্তি সে তাঁহাব সৈন্যবাহিনী, য কথা অবশ্য অস্বীকাব কবিসাব উপায় নাট। কিন্তু পাশ্চব সময় আভ্যন্তবাব নাতিবক্ষাব যোগ্যতা দ্বাবা সৈন্য-বাহিনীবা যুদ্ধ-নিপুণতা প্রমাণিত হব না। ফার্সেব সৈন্য-বাহিনীতে মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজাব সৈনিক আছে। তন্মধ্যে

অফিসাবেব সংখ্যাট ৩০ হাজাব। একপ মাথা-ভারী (top-heavy) সামরিক বিভাগ ঘোব হয় আব কোন দেশেই নাট। গার্ডিয়া সিভিল অর্থব সিভিল গার্ট বা অসামরিক বক্ষা-বাহিনীবা সৈন্যসংখ্যা ৬০ হাজাব। কিন্তু এই গার্ডিয়া সিভিল আগলে সামরিক পুলিশ ছাড়া আব কিছুই নয়। তথাকথিত সোশিয়াল ত্রিগেড প্রকৃত পক্ষে স্পেনেব গোষ্ঠাপো। ইহাব সদস্য-সংখ্যা ১৫ হাজাব। স্তত্রাব স্পেনেব সামরিক বাহিনীবা সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াইতেছে ৩ লক্ষ ২০ হাজাব। এই বাহিনী মোট ২২টি ডিভিশনে বিভক্ত। তন্মধ্যে ৬ ডিভিশন সৈন্য স্পেনিশ মবোঙ্কোতে অবস্থিত এবা তবশিষ্ট ১৬টি ডিভিশন রতিয়াছে স্পেনে। স্পেনেব বিমান বাহিনীতে আছে ৪০ হাজাব সৈন্য এবা বিমান আছে ১৫০টি। কিন্তু বোম্বাক বিমান এবা আধুনিক জঙ্গী বিমান একটিও নাট। স্পেনেব নৌবাহিনীতে লক্ষব আছে ২৫ হাজাব। যুদ্ধ-জাহাজ বহিতে একটাও নাট। ৬টি জুগাব এবা ৩৬টি ডেব্রুয়াব এবা ৭টা সাবমেরিন আছে। ফার্সেব সৈন্যবাহিনীবা অর্ধেক কলক্ৰিপট (conscripts) এবা অর্ধেক নিয়মিত সৈন্য। ইহাদেব অধিকাংশই দবিদ্ব শ্রেণীবা লোক এবা স্পেনেব সাবাবণ লোকদেব দারিদ্র্য এমনট ভাবব যে, তাহাবা ছুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, নূতন কাপড়-চোপড় কিনিবাব সামর্থ্যেবও তাহাদেব অভাব। শতকবা ৮০ জন স্পেনিয়ার্টেব চামড়াব জুতা কিনিবাব সামর্থ্য নাট। কিন্তু সৈন্য হইতে পাবিলে খাওয়া-পবা তো জুটিয়া যায়ই, তাছাড়া মাহিনাও পাওয়া যায় বংসবে ৫ ডলাব। অফিসাবেদেব মাহিনা অবশ্য ইহাদেব তুলনায় খুবই ভাল। কর্বেলদেব মাসিক বেতন ৮০ ডলাব

বিজ্ঞাত জীবনিলীয়া :- 'বি.বি.সরকারের' সৌত্র, নারায়ণ সরকারের \* পরিচালনায়

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

**বি.বি.সরকার**

কোম্পানি লিমিটেড

১৬০-১.বহুবাজার স্ট্রীট,  
কলিকাতা

ফোন:-বি.বি. ১২৫৩.



এবং জুনিয়র অফিসাররা মাসে ৭০ ডলার বেতন পাওয়া থাকেন। অফিসারগণকে অনেক সম্ভার খাজ বিক্রয় করা হয়। সেই সম্ভার খাজ চৌবাজারে বিক্রয় করিয়াও তাঁহারা মোটা লাভ করিয়া থাকেন। অফিসারগণ ব্যবসা-বাণিজ্যও করিয়া থাকেন এবং শিল্পপতিবাও তাঁহাদিগকে ব্যবসারে গ্রহণ করিতে আগ্রহী। সামরিক অফিসারগণ ভাঙে থাকিলে শ্রমিকদিগকে শোষণ করা সহজ হয়।

ফ্রান্সেব সৈন্তবাহিনীর অবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেশরক্ষা বিভাগ জানে না ইহা মনে করিবাব কোন কারণ নাই। স্তলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া ফ্রান্সেব ঘোষণা করিয়াছেন। সৈন্তবাহিনীকে শক্তিশালী করিবাব জ্ঞান তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিন ডলারও পাঠবেন সন্দেহ নাই। দুর্নীতিপূর্ণ বায়ণ ফ্যাসিষ্ট এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ডলার সাহায্যে গতি কি হইতে পারে, চিয়াং কাইসেকের চীন এবং সিং মানরীর দক্ষিণ-কোরিয়ায় তাহা প্রমাণ। তথাপি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনেব সহিত দ্বৈপাক্ষিক চুক্তি করিতে এবং স্পেনকে উত্তর-আটলান্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করিতে কেন চায়, তাহা কি খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় না?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্পেনেব সঙ্গে যে দ্বৈপাক্ষিক সামরিক চুক্তি করিতে চায় তাহা সম্পাদিত হইলে মার্কিনেব আর্থিক ও সামরিক সাহায্যেব পরিবর্তে স্পেন তাহা বিমান ও নৌ-বাঁটিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করিতে দিবে। আটলান্টিকে আমেরিকার যে সক্ষম নৌ-বাঁটি আছে সেগুলি অপেক্ষা স্পেনেব নৌ-বাঁটিগুলি ভাল, ইহা মনে করিবাব কোন কারণ নাই। ফ্রান্সেব এবং বুটেনে তাহা যে-সকল বিমান-বাঁটি আছে সেগুলি অপেক্ষা স্পেনেব বিমান-বাঁটিগুলি অধিকতর নিরাপদ তাহাও সত্য নয়। রাশিয়াব সঙ্গে সত্য যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে পিবানিজ পর্বতমালা রুশ-বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে, ইহাও কেহ মনে করেন না। কিন্তু ইউরোপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুধু আটলান্টিক চুক্তিব উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে চায় না। আটলান্টিক চুক্তি যদি কোন কারণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসাবে স্পেনের সহিত চুক্তি কাজে লাগিবে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তিব বিশেষ পার্থক্য অনস্বীকার্য। বিশেষতঃ জেঃ ফ্রান্সেব স্পেনের ডিক্টেটর। জনমতেব কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া বিনা ওজর-আপত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ পালন করা তাহার পক্ষে যত সহজ, বুটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে তত সহজ নয়। বুটেন ও ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টও বিনা আপত্তিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য পালন করিতে চায় বটে, কিন্তু জনমতকে ঝাঁকি দিয়া ভুলাইয়া রাখিবাব চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া আমেরিকার নির্দেশ পালন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটে। পশ্চিম-জাৰ্মানীকে অল্পসজ্জিত করার ব্যাপারে তাহার খুব ভাল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম-জাৰ্মানীর সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জাৰ্মানীকে অল্পসজ্জিত করার ব্যবস্থা এখনও সম্পন্ন হয় নাই। নিরাপত্তার বিধান বা Safety Clause-এর ব্যবস্থা হইলেই জাৰ্মানীকে অল্পসজ্জিত করা সম্ভব হইবে। স্পেনকে আটলান্টিক চুক্তিতে গ্রহণ করার ব্যাপারেও বুটেন ও ফ্রান্সের তরফ হইতে আপত্তি উঠিয়াছে। কালক্রমে টেন এবং ফ্রান্স উভয়েই যে ইহাতে রাজী

হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু স্পেনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে বুটেন ও ফ্রান্সের বিরোধী জনমতকে ভুলাইয়া শাস্ত করিতে হইবে সর্বপ্রথম। স্পেনকে গ্রহণ করার পরিণাম কি হইবে বলা কঠিন। ফ্রান্সের সিংহাসন যে খুব স্তব্ধ তাহা বলা যায় না। কয়েক মাস পূর্বে স্পেনে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট হইয়া গিয়াছে। কঠোর দমন-নীতি এই ধর্মঘটকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। স্পেনেব জনসাধারণেব আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং ফ্রান্সেব বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যাপক ভাবেই প্রধুমায়িত হইয়া উঠিতেছে। ফ্রান্সেব সৈন্তবাহিনী তাহা নিঃসন্দেহে যে যুদ্ধ করিবেই সে-সময়কেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। স্পেনে মার্কিন প্রভাব বৃদ্ধি ফলে ফ্রান্সেব পতন আসন্ন হইয়াও উঠিতে পারে।

### মিঃ মরিসন বনাম ‘প্রাভদা’—

গত ১লা আগষ্ট (১৯৫১) সেভিয়েট কমানিষ্ট পার্টিব পত্রিকা ‘প্রাভদা’য় একই সঙ্গে বৃটিশ পবরাষ্ট্র-সচিব মিঃ হার্বার্ট মরিসনেব বিরুদ্ধে এবং ঐ সম্পর্কে প্রাভদার উত্তর প্রকাশিত হওয়ায় স্তব্ধ ঠাণ্ডা-যুদ্ধেব একঘেষেয়ী মধ্যে একটা পরিবর্তন সৃষ্টি হইতেছে মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। কিছু দিন পূর্বে এক জলযোগে বৈঠকে মিঃ মরিসন তাহা বক্তৃতাব পূর্ব বিবরণ প্রকাশ সম্পর্কে ‘প্রাভদা’কে চ্যালেঞ্জ করিয়া এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ চ্যালেঞ্জের সমালোচনা করিয়া ‘প্রাভদা’ সে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাতে ‘প্রাভদা’ উক্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবার স্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। তদনুসাবেই ‘প্রাভদা’ পত্রিকায় মিঃ মরিসনেব দেড় হাজার শব্দ-সম্বলিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে আড়াই হাজার শব্দ-সম্বলিত ‘প্রাভদা’র উত্তর।

মিঃ মরিসনেব বিবৃতি এবং ‘প্রাভদা’র উত্তরকে স্বাধীনতা সম্পর্কে বিতর্ক বলিয়া অভিহিত করা যায়। অবশ্য মিঃ মরিসন তাহার বিবৃতিতে বুটেনের অল্পসজ্জা এবং আটলান্টিক চুক্তিব পক্ষেও যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘প্রাভদা’র উত্তরে এই যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বিতর্কই এই বিবৃতি এবং উত্তরেব সর্বাঙ্গীক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তু। মিঃ মরিসন তাহার বিবৃতিতে স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশের ধারণা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ‘প্রাভদা’ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন স্বাধীনতা সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়াব ধারণা। স্বাধীনতা সম্পর্কে এই দুইটি ধারণাব মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য বহিয়াছে তাহা বুঝিলে এই বিতর্কের তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। এই পার্থক্য বুঝিবার জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড তাহা জানা। এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ডের দ্বারাই বৃটিশ-স্বাধীনতা এবং সোভিয়েট-স্বাধীনতা সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা হইতে কতখানি বিচূর্ণ হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিশেষতঃ, যে সামাজিক শক্তি দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সেই সামাজিক শক্তি স্বাধীনতাব মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা না জানিলে স্বাধীনতা লইয়া বিতর্কেব কোন অর্থ হয় না। মিঃ মরিসন বৃটিশ স্বাধীনতাব যে স্বরূপ এবং প্রকৃতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া তাহা আসলে সংবাদ ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া

কিছুই নয়। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, প্রাক-যুদ্ধযুগে টোরী এবং উদারনৈতিকদের শাসনের সময়ে শ্রমিক দল যে স্বাধীনতাকে 'freedom to starve' বা অন্যভাবে থাকিবার স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিতেন মি: মরিসন তাহাকেই বৃটিশ-স্বাধীনতা বলিয়া রাশিয়ার জনগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহার উত্তরে 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা ছাড়াও যে আরও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে-সবল স্বাধীনতা আছে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব সেগুলির কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই। 'প্রাভদা' মি: মরিসনকে এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, বৃটিশ শ্রমিক দলের শাসন সময়েও বৃটিশ পুঁজিপতিদের লাভ বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুত-বৃদ্ধি রোধ করা হইয়াছে। এইখানেই যে-সামাজিক শক্তি রাষ্ট্র পরিচালন করে তাহার সহিত স্বাধীনতার স্বয়ংক্রিয় পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রমিক গবর্ণমেন্ট নিজকে সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেন্ট বলিয়া দাবী করিলেও কাথ্যত: তাহার বৃটিশ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছেন। 'প্রাভদা' মনে করেন যে, বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্টকে সমাজতন্ত্রী গবর্ণমেন্ট বলিয়া অভিহিত করা চল না।

মতামত প্রকাশ এবং সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার কোন মূল্যই নাই, এমন কথা 'প্রাভদা' বলেন নাই। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের জীবনে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্থান কোথায় এবং কতটুকু তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যিক। অল্পবস্ত্রের অভাবে স্কিষ্ট সাধারণ মানুষের অল্পবস্ত্রের দাবী করিবার স্বাধীনতা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত হইলেও অল্পবস্ত্র পাওয়া স্বাধীনতা স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইলেও উহা প্রকাশ করিবার কোন সুযোগ-সুবিধা সাধারণ মানুষের নাই। সংবাদ-পত্রগুলি প্রধানত: শিল্পপতিদের দ্বারা পবিচালিত বলিয়া সাধারণ মানুষের দাবীদায়ী ঐগুলিতে স্থান পায় না। বস্তুত: , মানুষের স্বাধীনতা এবং নিশ্চিন্ত মনে বাঁচিয়া থাকাই যদি স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই যে স্বাধীনতার বৃহত্তম অংশ, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সাধারণ মানুষের দিক হইতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই জীবন-ধারণের সমস্ত এ কথা অল্পবস্ত্রের অভাবে স্কিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ বুঝিবে না। এই দিক দিয়া রাশিয়ার জনসাধারণ যে বৃহত্তম স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার জনসাধারণ দীর্ঘ দিন ধরিয়াই শোষণ হইতে, অর্থনৈতিক সংকট হইতে, বেকার-সমস্যা হইতে, দারিদ্র্য হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বস্তুত: , সমাজতন্ত্রের প্রেরণা সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। রাশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান যে উন্নত হইয়াছে তাহা বুটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জীবনযাত্রার মানের সহিত তুলনা করিবার বিষয় নহে। জার-শাসিত রাশিয়ায় জনগণের জীবন-যাত্রার সহিত শুধু তাহার তুলনা করা সম্ভব। কারণ, শতাব্দীরও অধিক কালব্যাপী সাম্রাজ্য শোষণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির জনগণের জীবনযাত্রার মান কিছু উন্নত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রী রাশিয়া নিজের সম্পদ দ্বারা ২৫১০ বৎসরের মধ্যে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিয়াছে, এ কথাও মনে রাখা আবশ্যিক।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রাশিয়ায় আছে কি না, তাহা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। ধনতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই রাশিয়াতে নাই। কিন্তু জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সোভিয়েটগুলিতে পোলাখুলি ভাবেই মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। রাশিয়ায় মতবাদকে দমন করা হয়, এ কথা না বলিয়া বলিতে হয় মতামতকে সমাজ-তন্ত্রের আদর্শ অনুযায়ী গড়িয়া তোলা হয়। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও স্কুল-কলেজে শিক্ষা-ব্যবস্থা কি ধনতন্ত্র বজায় রাখিবার উপযোগী করিয়াই ছেলে-মেয়েদিগকে গড়িয়া তোলে না? পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে সাম্যটা শুধু মতবাদের প্রশ্ন, কিন্তু সাধারণ মানুষের দিক হইতে উহা কার্যে পরিণত করিবার বিষয়। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকিতে সাম্য কখনই সম্ভব হইতে পারে না। আবার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর হইলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বও আর থাকে না। 'প্রাভদা' বলিয়াছেন, রাশিয়ায় জনগণ সমস্ত বুজ্জিয়া দলগুলিকে অপসারিত করিয়া একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, এই পার্টিই একমাত্র ভূম্যধিকারী-বিবোধী এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী। স্বাধীনতা যদি অর্থনৈতিক সাম্য এবং নিরাপদ জীবিকার মূল ভিত্তি হয়, তাহা হইলে এই সাম্য এবং নিরাপদ জীবিকার বাহারা শত্রু তাহাদের স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা গড়িবার স্বাধীনতা তাহাদিগকে দিলে কল-বিপ্লবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। এই জন্যই 'প্রাভদা' বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় জনগণের শত্রুদের স্বাধীনতা নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতেও উহার শত্রুদের স্বাধীনতা নাই, এ কথাও অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতার স্বরূপ এবং প্রকৃতি লইয়া 'প্রাভদা'-মরিসন বিতর্ক এইখানে শেষ হইল কি না তাহা আমরা জানি না। এই ধরণের বিতর্ক শুধু একাডেমিক হওয়া সম্ভব নয়। স্বাধীনতার মান নির্দেশ করিতে হইলে উহার মূল উৎসের সন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্য এইরূপ বিতর্কের কোন সাধকতা নাই, এ কথা কিছুতেই বলা চলে না।

### পশ্চিম-জাতিগণের অল্পসম্পন্ন সমস্যা—

গত সাত-আট দশক ধরিয় আলোচনার পরেও ইউরোপের দক্ষিণ-ব্যবস্থায় পশ্চিম-জাতিগণের ভূমিকা সম্পর্কে কোন মীমাংসা এখনও সম্ভব হয় নাই। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) ওয়াশিংটনে বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিবদের সম্মেলনে এসম্পর্কে আরও আলোচনা হইবে। পশ্চিম-জাতিগণকে অল্পসম্পন্ন করিবার পরিকল্পনা বন্-সম্মেলনে এবং প্যারী-সম্মেলনের আলোচনায় যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে ওয়াশিংটন-সম্মেলনে উহার চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। পশ্চিম-জাতিগণকে অল্পসম্পন্ন করা সম্পর্কে বর্তমানে দুইটি প্রধান পরিকল্পনা আছে। একটি প্লেভন পরিকল্পনা (The Plevan Plan) আর একটি পিটার্সবার্গ (Petersburg) পরিকল্পনা। ওয়াশিংটন-সম্মেলনে এই দুইটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

পশ্চিম-জাতিগণকে অল্পসম্পন্ন করা সম্পর্কে ফ্রান্সের আশঙ্কা

গ্রন্থ সম্পৃষ্ট। কমান্ডার জেনারেল অপেক্ষা সামরিক শক্তিসম্পন্ন জাঙ্গাণীকেই ফ্রান্স বেশী ভয় করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। এই জঙ্গ ফ্রান্স প্রথম প্রস্তাব করিয়াছিল, ছোট-ছোট কয়েকটি জাঙ্গাণ ইউনিট গঠনের। এই ইউনিটগুলি মিত্রপক্ষীয় সেনাপতির অধীনস্থ বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর সহিত সংযুক্ত থাকিবে, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ইহার পর প্রতি দলে ৬ হাজার সৈন্য লইয়া ত্রিগেড গুপ বা কম্ব্যাট টিম (combat team) গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু উহাও গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার জাঙ্গাণ সৈন্য লইয়া ১০ ডিভিশন সৈন্য গঠন করা। এই দশটি ডিভিশন গঠনের কাজ সম্পন্ন হইতে দেড় বৎসর লাগিবে। জাঙ্গাণীর প্রাক্তন সেনাপতিরাও একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা একটি আরকলিপির আকারে বচনা করা হইয়াছে। ইহাতে মিত্রশক্তি-বর্গের নিকট দাবী করা হইয়াছে যে, পশ্চিম-জাঙ্গাণীর সৈন্য-সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার করা হইবে। প্রত্যেক কর্পে (corp) দুইটি ডিভিশন থাকিবে এবং প্রত্যেক ডিভিশনে থাকিবে ১২ হাজার সৈন্য, মোট ছয়টি আর্মি কর্পস্ (corps) গঠন করিতে হইবে। কঙ্গক্রিপশন দ্বারা সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে এবং দুই বৎসর সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে এবং জাঙ্গাণ হাই কম্যান্ড ও যুদ্ধ-মন্ত্রিসভার গঠন করিতে হইবে।

প্রভা-পরিকল্পনার মূল কথা এই যে, ইউরোপীয় কাউন্সিলের রক্ষা-মন্ত্রিসভার গঠন করিয়া উহার নিয়ন্ত্রণাধীনে ইউরোপীয় বাহিনীকে রাখিতে হইবে। বৃটেন এইরূপ ব্যবস্থা পছন্দ কবে না। পশ্চিম-জাঙ্গাণীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ফ্রান্সের সহিত পশ্চিম-জাঙ্গাণীর মতভেদটা না কি অনেকটা সর্বাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পশ্চিম-জাঙ্গাণীর অন্তঃসজ্জা সম্পর্কে আব অধিক বিলম্ব করিতে রাজী নয়। অবশেষে মার্কিন অভিজ্ঞদের নিকট বৃটেন এবং ফ্রান্সকে নতি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, কমান্ডার জেনারেল নিরোধের নামে ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

### পরলোকে মার্শাল পঁত্যা—

মার্শাল পঁত্যা গত ২৩শে জুলাই (১৯৫১) ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ববর্তী তিন দিন যাবৎ তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। এক দিন ফরাসী জাতির দৃষ্টিতে বিনি দেবতুল্য ছিলেন, শেষ-জীবনে তাঁহাকে সকলের ঘৃণা ও অবজ্ঞাজনন হইতে হইয়াছিল। ১৮৫৬ সালে ফ্রান্সের এক অভিজাত, ধনী এবং ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পুরা নাম Henri Philippe Benoni Omer Joseph Petain. প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি কর্ণেলের পদ হইতে একেবারে মার্শালের পদে উন্নীত হন। অসীম বীরত্বের সহিত তিনি ভার্জ'ন দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্ত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার জীবন বলি দিতে হইয়াছিল। ১৯১৭ সালে তিনি প্রধান সেনাপতি হন। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ফ্রান্সের লেশরক্ষা-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান পরিচালক ছিলেন। ফ্রান্সের কোন মন্ত্রিসভাই তাঁহার পরামর্শ

ব্যতীত কোন গুরুতর সিদ্ধান্ত করিতেন না। একমাত্র দুর্মর্গ মন্ত্রিসভাতেই তিনি কিছু দিন সময়-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এঞ্জিস শক্তিবর্গের আক্রমণ আশঙ্কায় সম্মুখে স্পেনের নিরপেক্ষতা ফ্রান্সের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। ঐ সময় তিনি ফ্রান্সের স্পেনে ফরাসী রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ঐ সময় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে জে: ফ্রান্সের সহিত তাঁহার কোনরূপ চুক্তি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার বিচারের সময় যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে বুঝা যায় যে, ফ্রান্সের পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া তিনি ডিক্টেটরের আসনের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

১৯৪০ সালে মে মাসে ম: পল রেনে তাঁহাকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬ই জুনের মধ্যে অবস্থা আয়তনের বাহিরে চলিয়া যায় এবং বেনে মন্ত্রিসভা মার্শাল পঁত্যার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেন। ফরাসী পার্লামেন্টও তাঁহাকে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি নাৎসী জাঙ্গাণীর সহিত যুদ্ধবিরতি-পত্রে স্বাক্ষর করেন।

যুদ্ধের পূর্ব ১৯৪৫ সালে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডদেশ প্রদত্ত হইলেও বার্ডিকোর কথা বিবেচনা করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় প্রেসিডেন্ট আরিয়ল তাঁহার দণ্ড মকুব করেন। যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে ফরাসী জাতির কাছে তিনি দেবতার আসনেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সুদীর্ঘ জীবন লাভ করার জন্তই হয়ত যশ, খ্যাতি সমস্ত হারািয়া তাঁহাকে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

### তৈল-বিরোধ মীমাংসার আলোচনা—

তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণ সম্পর্কে ইরাণ ও বৃটেনের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসা করিতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিশেষ দূত মি: এভিরেল হ্যারিম্যানের প্রচেষ্টা যে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৫ই জুলাই (১৯৫১) তিনি তেহরানে পৌছেন। তাঁহার কয়েক দিনের চেষ্টার ফলে তৈলসমস্যা সমাধানের জন্ত গত ২৩শে জুলাই ইরাণ গবর্নমেন্ট বৃটিশ প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনা করিতে রাজী হন। এইরূপ আলোচনায় বৃটিশ গবর্নমেন্টকে সন্তুষ্ট করাইতে মি: হ্যারিম্যান লওনেও গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে গত ৩১শে জুলাই আবাবাদানের তৈল-শোধনাগার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং চারিখানি বৃটিশ ডেপুটার আমদানি করিয়া পারশ্ব উপসাগরে বৃটিশ নৌশক্তি বৃদ্ধিও করা হয়। অবশেষে মি: হ্যারিম্যানের চেষ্টায় বৃটিশ গবর্নমেন্টও আলোচনার জন্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে রাজী হন এবং অবশেষে তিন মাসব্যাপী তৈল-সঙ্কটের অবসানকল্পে ১০ই আগষ্ট বৃটিশ মন্ত্রিসভার লর্ড প্রিন্সিপাল মি: রিচার্ড ষ্টোক্সের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিনিধি দলের সহিত ইরাণের প্রতিনিধিদের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত আলোচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞান করিবার মত কিছুই পাই নাই। ১২ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ইরাণের তৈল চালান

দেওয়া ও বাজারজাত করিবার জন্ত একটি যুক্ত ইঙ্গ-পারসিক তৈল কোম্পানী গঠনের জন্ত বৃটিশ প্রতিনিধি দল প্রস্তাব করিবেন।

মিঃ হ্যারিয়ামান কি ভিত্তিতে আলোচনা চালাইবার জন্য উভয় পক্ষকে আলোচনায় রাজী করাইয়াছেন, সে-সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই। তবে তাঁহার আলোচনা চালাইবার দরমুলাটা না কি এই যে, ইরানের তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার নীতি স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হইবে এবং তৈল চালান দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইবে ইঙ্গ-ইরানীয় তৈল কোম্পানীকে। তৈল-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার নীতি স্বীকৃত হইলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠিবে। ইরান শেয়ারের মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিতে চায়। বৃটেন শেয়ারের বাজার-দর অনুসারে ক্ষতিপূরণ চাহিবে।

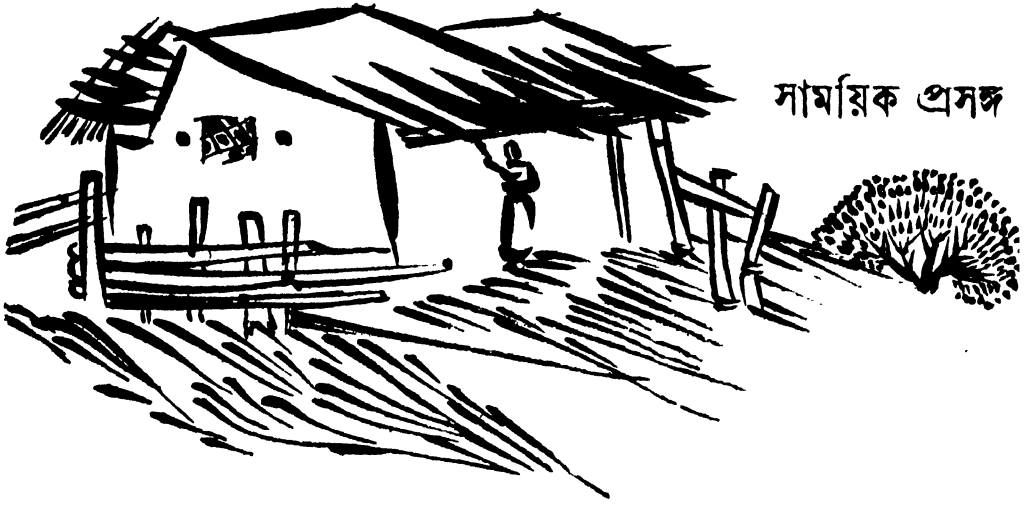
### যুদ্ধ-বিরতি আলোচনার ভবিষ্যৎ—

কায়েসাংএ যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা আবস্ত হওয়ার পর এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই এক মাসের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা অনেক সঙ্কট কটাইয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহাতীতরূপে কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। আলোচনা আবস্ত হয় ১০ই জুলাই (১৯৫১) এবং কাগাসুচী নির্ধারণ করাই ছিল আলোচনার প্রথম কর্তব্য। কিন্তু প্রথমেই বিরোধ সৃষ্টি হয় ১২ই জুলাই কম্যুনিষ্টরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ২০ জন সাংবাদিককে কায়েসাংএ যাইতে বাধা দেওয়ায়। কম্যুনিষ্টদের যুক্তি ছিল এই যে, যে-সকল বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু এডমিরাল জয় দাবী করিয়া বসিলেন, সাংবাদিকদের প্রবেশের বাধা তুলিয়া না নইলে কোন আলোচনাই আর হইবে না। শেষে ১৪ই জুলাই কম্যুনিষ্টরা কায়েসাংএ নিরপেক্ষ এলাকা গঠনের জন্ত জেঃ রিজগনের প্রস্তাব এবং সংবাদদাতাদের প্রবেশের দাবী মানিয়া লইলে ১৫ই জুলাই পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। অতঃপর কনসুচী নির্ধারণের কাজ অগ্রসর হইতে থাকিলেও ১৯শে জুলাই পুনরায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কম্যুনিষ্টগণ দরুৎ কোরিয়া হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের বিষয়টি কনসুচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে চাওয়াই এই অচল অবস্থার কারণ। অবশ্য দুঃখ্যোগের জন্ত ২০শে জুলাই তারিখে আলোচনা-বৈঠকের অধিবেশন হইতে পারে নাই। ২১শে জুলাই কম্যুনিষ্টদের প্রস্তাব অনুযায়ী ২৫শে জুলাই পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত থাকে। ঐ তারিখে কম্যুনিষ্টরা বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং উহার স্থলে উভয় পক্ষ সম্মিলিত গবর্ণমেন্ট সমূহকে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে সুপারিশ করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব কনসুচী-ভুক্ত করা সম্পর্কে মতৈক্য হয়। ইহার পরেই আর এক নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় ‘বাফার’ অঞ্চল বা অসামরিক অঞ্চল গঠনের প্রশ্ন লইয়া। কম্যুনিষ্টরা অষ্ট্রিংশ অক্ষরেখাতেই বাফার অঞ্চল গঠন করিতে চায়, আর তথাকথিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চায় উহাকে অষ্ট্রিংশ অক্ষরেখার আরও উত্তরে প্রসারিত করিতে। কিন্তু, এই ব্যাপার লইয়া যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহা লইয়া ১০ই আগষ্ট পর্যন্ত আলোচনায় অচল অবস্থা চলিতে থাকে, এমন কি আলোচনা ফাঁসিয়া যাইবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছিল। ইতিমধ্যে আবার কম্যুনিষ্টরা কায়েসাং-এর নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়াছে এই অভিযোগে আলোচনাই স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে কায়েসাংএ ভুলক্রমে

চীনা সৈন্যের উপস্থিতির জন্ত কম্যুনিষ্টরা ক্ষমা প্রার্থনা করায় ১০ই আগষ্ট দুই ঘণ্টারও অধিক কালব্যাপী আলোচনা-বৈঠকের এক নীরব অধিবেশন হয়। ১২ই আগষ্টের আলোচনায় কিছু আশার দৃশ্য দেখা গেলেও আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত প্রশান্ত সংবাদে দেখা যায়, আলোচনায় ন যথো ন ততোই অবস্থা চলিতেছে।

আলোচনার ধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয়, কম্যুনিষ্টরা হাবিয়া গিয়াছে এইরূপ একটা ভাব লইয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতির পরাজিত শত্রুর উপর বিজয়তা পক্ষের মত সর্ব চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টরা পরাজিত হয় নাই, কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতিদের কম্যুনিষ্টদের প্রতি বিজিত শত্রুর মত আচরণ তাহারা মানিয়া লইবে না, ইহা তাঁহার বুঝে না এ কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে তাঁহাদের আচরণের অর্থ কি? কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি হয়, ইহা কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় না?

রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েট সভাপতি-মণ্ডলীর প্রেসিডেন্ট মঃ সেভার্নিক গত ৬ই আগষ্ট (১৯৫১) শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টাকে সুদূর কবিবাব উদ্দেশ্যে পক্ষ-শক্তির চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সমর্থনের জন্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। যদিও পক্ষ-শক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নাই, তথাপি পক্ষ-শক্তি বলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স এবং কম্যুনিষ্ট চীনকে বুঝান হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তি প্রতিষ্ঠাব জন্ত রাশিয়ার দিক হইতে এই ধরনের প্রস্তাব এই নূতন নয়। অতীতে এই সকল প্রস্তাবের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে এই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে তাহাই ঘটবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শান্তির রক্ত প্রকৃত পক্ষে কে চেষ্টা করিতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না সোভিয়েট রাশিয়া, এই প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচনাব যোগ্য। রাশিয়ার শান্তি-প্রচেষ্টাকে কম্যুনিষ্ট প্রচার-কৌশল বলিয়া অভিহিত করা হয়। আবার রাশিয়া চূপ করিয়া থাকিলেও মনে করা হয়, না জানি রাশিয়া গোপনে-গোপনে কি করিতেছে! গত ৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ব-বার্লিনে যে বিশ্বযুব উৎসব আরম্ভ হইয়াছে, উহার মধ্যে অনেকে রাশিয়ার কূটনৈতিক চাল দেখিতে পান। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে শান্তিরক্ষায় উজ্জত হইয়াছে? মার্কিন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন, “কোরিয়ায় যদি মািমাংসা হয়-ও তাহা হইলেও বিশ্বশান্তি বিপন্ন হওয়ার বৃহত্তম আশঙ্কা—সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপুল শস্ত্র শক্তি থাকিবে। সুতরাং দ্রুত অন্তঃসম্বন্ধিত হইতে এবং অস্ত্রাস্ত্র স্বাধীন দেশগুলিকে রক্ষা-ব্যবস্থা গঠনের জন্ত সাহায্য করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রস্তুত হইতে হইবে।” রাশিয়া যদিও বলিতেছে যে, কম্যুনিজম এবং ধনতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে, তথাপি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। ধনতন্ত্র জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিতে অসমর্থ। নিপীড়িত জনগণ কম্যুনিজমের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কাও সাম্রাজ্যবাদীরা উপেক্ষা করিতে পারে না। কাজেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা নয়, কম্যুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করাই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা কম্যুনিজম নিরোধের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করেন। এই অবস্থায় কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি হইলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।



## সাময়িক প্রসঙ্গ

### স্বাধীনতা দিবস

কংগ্রেসী নেতা, ভূতপূর্ব সিভিলিয়ান, পুলিশ ও কন্স্টাবলের

স্বাধীনতা পাঠিয়েছে, ইহা যেমন নিঃসন্দেহ, জনসাধারণ স্বাধীনতা বোধমাত্র স্বাদ পায় নাট, ইহাও তেমনি নিঃসন্দেহ সত্য। ভারতের স্বাধীনতা আসিয়াছে আপোষের পথে, জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া তাহার মূল্য দিতে হইয়াছে। দিল্লীর গদী দখলের অত্যাচার আশ্রয়ে যাহারা ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহারা সেদিন জোর-গলায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্ত সমাধানের ইহাই একমাত্র পথ। পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করিয়া লইলেও পাকিস্তান টিকিবে না, মুসলমানেরা শীঘ্রই বৃষ্টিতে পারিবে এবং আবার ভারতের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইবে—ভাবত বিভাগের দিন যাহা স্বপ্নে ভাষায় এই আশ্বাস দিয়া ভারত বিভাগে দেশবাসীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের নীরব-সম্মতি আদায় করিয়াছিলেন, আজ তাহারা বসিতেছেন, ভারত বিভাগ রহিত করিবার দাবী তোলা মহাপাপ। যে বস্তুর পাত বোধ করিবার জন্য ভারত বিভাগ হইয়াছে, বিভাগের পরেও সে বস্তু শোস্ত খামে নাই। অচিন্তনীয় অবিশ্বাস্য ভাবে দেশে রক্তনদী বহিয়াছে। কোটি-কোটি লোক সর্বস্বান্ত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এক কোটি ভারতবাসী পরম অনিশ্চিত ও দূষিত আবহাওয়ায় মৃত্যুর অধিক ক্লেশ ও অপমান-জালা ভোগ করিতেছে। বৎসরের পর বৎসর পাকিস্তান একটি দাবী তুলিতেছে, তাহাই স্বীকার করিয়া ভারত সরকার ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। আপোষলব্ধ স্বাধীনতা যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা আজ দিশাহারা।

—দৈনিক বসুমতী।

আমাদের জাতীয় অস্বীকার অক্ষণে-অক্ষণে পালিত হইয়াছে একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে, বরঞ্চ তাহার নিত্য প্রাথমিক সত্যগুলিই অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতিপালিত। তথাপি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, জটিল জাতীয় সমস্যাগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য দিকে দিকে তাহার ব্যগ্র-বাহ প্রসারণ; স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়, দুর্বল বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিবার জ্ঞান দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপের দ্রব ধ্বনি। আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে আজ আর এক নূতন সঙ্কট মালা

তুলিয়া দাঁড়াইতে চাতিতেছে : বন্ধুত্বাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রবর্গে যে পাকিস্তান নব জাগ্রত এশিয়ার জয়যাত্রাপথে ভারতের সাথী ও সহযাত্রী হইতে পারিত—দুঃস্বপ্নীয় এক দুর্ভাগ্যবশত বশে সে যে শুধু এশিয়ার অগ্রগামী জাতিসমূহের শোভাযাত্রা হইতে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইতেই মনস্থ করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়া শোভাযাত্রী দলের সম্মিলিত গতিছন্দে ছেদ ও পতন ঘটাইতে চাতিতেছে। তাহার পশ্চাৎ হইতে বাহা সে কাণ্ডে প্রেরণা ও প্ররোচনা যোগাইতেছে, এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অদ্বৈত ইতিহাস তাহাদিগকে স্মরণ করিতে বলি : স্বাধীনতা অর্জনের জ্ঞান যে জাতি একদা সর্বস্বপণ করিয়াছিল, আজ তজ্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত সাহস ও সামর্থ্য, জাতীয় ঐক্য ও ঐকান্তিকতার তাহা অর্জন হইবে না। 'বন্দে মাতরম্!'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

গান্ধীবাদী অহিংসা মন্ত্র এই বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের আশ্বগোপনের আবরণ মাত্র। আশ্ব-প্রবন্ধনার আদর্শগত ভিত্তি। সে আবরণ ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে জনতার ক্রমবর্ধমান আন্দোলনে, আর সঙ্কটের তীব্রতায়। তাই মরিয়া হইয়া সে শেষে আশ্রয় লইয়াছে চরম অস্ত্রে—ভাড়াঘাতী দাঙ্গা ও যুদ্ধের উদ্দানিতে। আজ ১৫ই আগস্টে শপথ লইতে হইবে আমাদের যে,—ছিনাইয়া আনিতে হইবে তাহার অনিচ্ছুক হাত হইতে এই দূষিত বিবাক্ত বাণ। চল্লিশ কোটি মানুষের বস্ত্র-দুট একতার আওরাজে বাজুক এই কণ্ঠ দাবী—কান্দীর সমস্ত শান্তিপূর্ণ মৌমাংসা চাই, পাক-ভারত মৈত্রী-চুক্তি চাই, কমনওয়েলথ চুক্তির অবসান চাই।

এই আওরাজ আজ অপ্রতিরোধ্য আওরাজ হইয়া ১৫ই আগস্টের বিশ্বাসঘাতক দাস-চুক্তিকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলার পথকে প্রশস্ততর করুক।

—স্বাধীনতা।

### সোশ্যালিস্ট দলের নির্বাচনী কর্মসূচী

“সোশ্যালিস্ট দলের নির্বাচনী কর্মসূচীর মূল বিষয় এইরূপ :

বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী উচ্ছেদ। প্রতি কৃষক-পরিবার মো. ৩০ একর জমি রাখিতে পারিবে। তদ্বক্ষ সমস্ত জমি অল্প চাষ এবং ভূমিহীন মজুরদের দেওয়া হইবে। ক্ষুদ্র জমিদারদের পুনর্বাসিত

জন্ম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে এবং ৩০ একরের অধিক জমির মালিকদের ১০০ একর পর্যন্ত দশ বৎসরের জন্ম গ্রুইট দেওয়া হইবে।


সরসাদাধাণের ভেটে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং মালি-পাৰপাস সমবায় সমিতি কৃষি পুনর্গঠনের ভিত্তি হইবে। সরকারী এবং বিভাগগুলিকে একত্র করিয়া একটি ভূমি-কমিশনের অবদান করা হইবে। জমির উন্নতির জন্ম ভূমি-স্বত্বসেবক দল গঠিত হইবে। তাহা কৃষি খনন, কম্পোষ্টের গর্ত খনন, জল নিষ্কাশণ প্রভৃতিতে সাহায্য করিবে। নতুন ও পতিত জমি উদ্ধারের জন্ম গবর্ণমেন্ট পাঞ্জ-সেনাদল তৈরি করিবে। সরসাদাধাণ সমবায় প্রচেষ্টায় উৎসাহ দেওয়া হইবে। কালেকটিভ কার্ফ গঠিত হইবে। ইহাতে ভূমিহীন মজুরেরা কাজ পাইবে। দেশের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্ম কতকগুলি শিল্প বাণ্টায়ত হইবে। ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানী বাণ্টায়ত হইলে মূলধনের পরিমাণ বাড়িবে। লোহা, বিদ্যুৎ, খনি, কেমিক্যাল সাব-এবং চা ও কফিক্ষেত প্রভৃতি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া অর্থনৈতিক উন্নতির জন্ম একান্ত প্রয়োজন। অপর সমস্ত শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে। সরকারী কন্ট্রোল এমন করা হইবে যাহাতে সকল প্রকার উৎপাদনের উপর হইতে সকল প্রকার বাধা উঠিয়া যায়। মূলধন বৃদ্ধি অপেক্ষা শ্রমিকের উপর বেশী শ্রম দিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেকনিসিয়ানদের ডাকিয়া আনিতে হইবে। অটোমাস পাবলিক কর্পোরেশনগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা যাহাতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের দোষমুক্ত হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। এই সমস্ত কর্পোরেশন ওয়ার্কস কমিটিব মাধ্যমে শ্রমিক-প্রতিনিধি লগতে হইবে। যৌথ ব্যবসায়ের এমিফ-প্রতিনিধি গ্রহণ বাধ্যতামূলক হইবে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে দল অভিটের সাহায্যে শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে। বোম-বোমা, প্রসূতি-মঙ্গল এবং বুদ্ধ বয়সের পেনসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক শ্রমিককে ইউনিয়নের সদস্য হইতে হইবে। পরিকল্পনা ব্যবস্থা গোড়া হইতে গঠন করিতে হইবে। কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের সমবায় পদ্ধতিতে জমি দিতে হইবে। মধ্যবিত্ত ও কারিগরদের পুনর্গঠন গবর্ণমেন্ট করাইবে। সমাজের উন্নতিতে মুষ্টিমেয় সম্পত্তির মালিক বাধা হইলে তাহা দ্রব করিতে এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতে রাষ্ট্রবিধি বদলাইতে হইবে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলিকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। শাসনব্যবস্থা সংশোধনের দ্বারা দুর্নীতি, উৎকোচ গ্রহণ, অযোগ্যতা এবং দীর্ঘস্থূলতা দূর করিতে হইবে। বিচার সহজলভ্য করিতে হইবে। শাসনব্যবস্থার সহিত জনসাধারণের সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। আটলান্টিক ও সোভিয়েট দলের বিবোধ হইতে দ্রবে থাকিতে হইবে! ইন্মোনেশিয়া হইতে মিশর পর্যন্ত কালেকটিভ সিকিউরিটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইউ-এন-ওর যে সমস্ত সজ্জা যুদ্ধ ও বুদ্ধি দূর করিতে চাহিবে তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। ধনী ও শক্তিশালী জাতি এবং দরিদ্র ও দুর্বল জাতির মধ্যে ভেদ সৃষ্টিতে বাধা দিতে হইবে। আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পৃথিবীর সর্বত্র সোশালিষ্ট আন্দোলনে ভারতবর্ষ সাহায্য করিবে। ইহাই হইবে সোশালিষ্ট দলের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। —প্রবাসী।

### আবার কেন ?

“১৯৪৬ সনের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের’ তিত্ত অভিজ্ঞতায় ভারতের সাধারণ মানুষ জানিতে পারে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি কি ভীষণ! এই দুঃস্থবুদ্ধির প্রবোচনায় মত্ত হইয়া এক দল লোক সাধারণ মানুষের বিপর্যায় সৃষ্টি কবে। এই অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব বিপর্যায় নেতৃহকেও বিভ্রান্ত করে। বৃটিশের ম্যাজিকে দেশের নেতৃহ মোহ-গ্রস্ত হইলেন। এই উগ্র সমস্যার সমাধান আশায় এই দেশ বিভাগ হইল। বৃটিশ তাহা বিবেচন নীতির সাফল্যে আনন্দিত হয় ও দেশের শাসন-ভারও হস্তান্তরিত হয়। ক্রমে বিদ্রোহের উগ্রতা হ্রাস পাইয়া দুই নব-সৃষ্ট রাষ্ট্রের ভিতর সৌহার্দ স্থাপিত হইল। ব্যবসা-বাণিজ্যও স্বাভাবিক গতিতে চলিতে সুরু করিল। বৃটিশ-শক্তি বাহুতঃ দেশ ছাড়িয়া গেলেও তার লুক্ক দৃষ্টি এই দেশের উপর আছে। দুই রাষ্ট্রে সৌহার্দই যদি চলিতেই থাকে তবে বৃটিশের স্বার্থে আঘাত জানিবেই এবং দেশ ভাগ করার অর্থই অনর্থ হইয়া যাইবে। তাই যখন উলারের চাপে বৃটিশের অর্থনৈতিক বিনিয়াদ ধ্বংসের মুখে পৌছিল তখন সাময়িক সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার প্রচেষ্টায় সে তাহার ‘মুদ্রাব মান’ পরিবর্তন ঘটাইল ও ভারতকে তাব লেজুড়ে জুড়িয়া লইল। কিন্তু পাকিস্থানকে মুদ্রাব মূল্যমান হ্রাস না করার বুদ্ধি ‘দার’ দিয়া এই দুই রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন ভাবে আঘাত হানে। ফলে সেই

**টোল ও কোম্পানীর**






**বরানগর, কলিকাতা**

**দাদ ও কাউন্সের**  
অর্থ মলম

**কিউটা-টোন**  
মোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

**নিম্ন মলম**  
থোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য

পুণ্যতন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আবার জ্বলিয়া উঠিল। পূর্ব-পাকিস্থানের অতি নিবীহ সাধারণ যেহেতু হিন্দু-জ্ঞানতাব জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। ইহা বা নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আজ উদ্বাস্ত নামে একে একে নিঃশেষ হইয়া যাউতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে যে সব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ চলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা পাকিস্থানে গিয়া স্বর্গস্থ ভোগ কবিত্তেছেন কি না জানা যায় নাই, তবে চাষী মুসলমান চলিয়া যাওয়ার ফলে আজ উর্বৃত্ত কৃচবিহাব শুধু ঘাটতি অঞ্চলে পরিণত হইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, নূতন জালিয়ানওয়ালাবাগ নাম ধারণ করিয়াছে। নিবীহ বালক-বালিকা প্রাণ হারাইয়াছে। তাই আজ যখন দুই রাষ্ট্রের সীমান্তে সৈন্ত-সমাবেশ ও নেতৃদ্বয়ের মুখে অসংলগ্ন ভূমিকির কথা সংবাদপত্রের কলেবর বুদ্ধি কবিত্তেছে তখন মনে এত প্রশ্নই আসে—‘আবার কেন?’ হুই রাষ্ট্রেই কর্ণধারগণ সাধারণের জীবনযাত্রাব মান উন্নত করিতে পাবেন নাই বরং দিনের পব দিন নানা সমস্তাব আবার ফেলিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতা সহবেই গত ছয় মাস প্রাপ্তি তিন দিনে একটি আত্মহত্যা সংঘটিত হইয়াছে। তাই যখন দুই রাষ্ট্রের প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র-কর্ণধারগণের কার্য সমালোচনা দ্বারা জনতাকে জাগ্রত করিয়া দেশের শাসন, ব্যবস্থাব পরিবর্তন আনিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন, তখন ‘গ্রাহাম’ সাহেবের কাশ্মীরে পদার্পণ ও দুই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের তথাই সেই বিদ্যে বস্তুতায় পুনঃ আবির্ভাবে স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠিতেছে—‘আবার কেন?’ গ্রাহাম সাহেব মারফৎ বৃটিশের অকল্যাণ তন্তু দুই রাষ্ট্রের জনতার জীবনে যে বিপর্যয় আনিতে সচেষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ব্যাহত করার জন্য দুই রাষ্ট্রেরই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক সক্রিয় চেষ্টা দ্বারা এই কাঙ্গ-মেঘ বিদূষিত কবিবেন তাহাই কামনা করি। জনতা আজ আর চায় না এই আত্মঘাতী সংগ্রাম, তাই এই অপচেষ্টা বার্থ হইবেই। তবু নিশ্চিন্তে নিশ্চিন্ত থাকি উচিত হইবে না। ‘সমাজ-দোহা’ বা যাহাতে তাহাদের কষ্ট-প্রচেষ্টায় অগ্রসর না হইতে পারে তাহা দিকেও নজর কবিত্তে হইবে। একবার বন্ধ ছিলিয়া গেলে দুই রাষ্ট্রের সহস্র সহস্র জীবন বিপন্ন হইবে, লাভ ঘটিবে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সমাজদোহা।’

—বীরভূম বার্তা।

### উদ্বাস্ত

“আমরা ইতিপূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, উদ্বাস্তদের পুনর্ন্যস্তি কেবল সমস্তা নহে, ইহা একটি মহাসমস্তা। সমাজ জীবন ও আজন্ম কালের পরিবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন লক্ষ লক্ষ নবনারী ও শিশুদের জীবনকে স্তম্ভস্থলতাব সতি স্তম্ভপ্রতিষ্ঠিত কবা একপ্রকার অসম্ভব। একমাত্র নিজ-নিজ আবাসে ও নিজ-নিজ পরিবেশের মধ্যে ইহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমস্তা সমাধানের কোন পথ নাই। তাহা কি করিয়া এবং কবে সম্ভব—প্রশ্ন ইহাই? তাহা করিতে হইলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাপাড়া প্রয়োজন। দুই রাষ্ট্রের দুই জন সংখ্যালঘু মজ্জী নিয়োগ অথবা সংখ্যালঘু বোর্ড গঠনই যদি এই সমস্তা সমাধানের উপায় হইত তবে এত দিনে আমরা সমস্তা সমাধানের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতে পারিতাম। দেশ ভাগ-বাটোয়ারা বাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া এক সম্প্রদায়কে কেবল নিজ শত্বে অস্ত গৃহছাড়া হইতে হইবে ইহা সত্যই অমানুষিক।

এই অমানুষিক মনোবৃত্তির ফলেই আজ লক্ষ লক্ষ নবনারী ও শিশু গৃহছাড়া ও ভিক্ষাপাত্র সঞ্চল কবিত্তেছে। ভিক্ষা দ্বারা এই মহাসমস্তা সমাধানের কিছু মাত্র উপায় দেখা যায় না। ইহাতে সমস্তা আবণ্ড জটিল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এই যে দুর্গত মনুষ্য-সমাজ ইহাদেরও রাজনৈতিক প্রয়োজন সিদ্ধি কল্পে লাগাইতে কেহই পশ্চাৎপদ হন না। গৃহছাড়া এই সকল বাঙ্গালীদের দেশ-দেশান্তরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস এ পর্যন্ত কত দূর সফল হইল তাহা হিসাব-নিকাশ লইবার দিন আসিয়াছে। রাজনৈতিক প্রয়োজনবশত তাগিদে দেশকে বিভেদের ভিত্তি উপর স্তম্ভপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভাগ-বাটোয়ারা কবা হইয়াছে এবং গোটা বাঙ্গলা দেশটা ও বাঙ্গালী জাতি হইয়াছে ইহা বলি-স্বকপ। আজ বাঙ্গলার কথা বাঙ্গালীরও ভাবিবাব অবসর নাই। যাহা ভাবিতেছেন তাহা অত্যন্ত করুণা করিয়া কেবল মাত্র “আহা” “আহা” কবিত্তেছেন। ইহা ফলে উদ্বাস্ত সমস্তা মহাসমস্তায় রূপ পরিগ্রহ করিতে প্রয়াস পাউতেছে। অবস্থা দেখিয়া ক্রমশঃই এই কথা আমাদের মনে হইতেছে যে, পুনর্ন্যস্তি প্রশ্ন অবাস্তব ও অসম্ভব। স্থায়ী ভাবে ইহাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আজ বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের কথা বাঙ্গালীদের চিন্তা কবিত্তে আমবা বিশেষ ভাবে অনুরোধ কবি। দেশ ভাগ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য কবা হইবে কোন অধিকারে? দেশটা কাহার? বাঙ্গালী যদি তাহা আজও উপলব্ধি না কবিত্তে পারে তবে এমন এক দিন আসিবে যে, গোটা বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর কোন স্থান হইবে না। স্থান-মাহাত্ম্য লইয়া দুই-দশ বৎসর বেশ কাটিবে, কিন্তু পরিণাম অতি ভয়াবহ। সেই ভয়াবহ ও ভয়াল দৃশ্যের যৎসামান্য দেখিয়াই আজ আমরা বিচলিত হইতেছি। যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাদের নিজ-নিজ গৃহে কি স্তম্ভপ্রতিষ্ঠিত কবা যায় না? এক দিকে যদি তাহা সম্ভব হয় অপব দিকে তাহা কেন অসম্ভব হইবে? গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য কবা হইবে এমন কোন প্রকারণ চুক্তি তো সাম্প্রদায়িক বাটোয়াবায় ছিল না? তবে দিনেব পব দিন উদ্বাস্তদের ভীড় বাড়িতেছে কেন? চিন্তানায়কদের ইহা চিন্তা করিয়া দেখিবাবও আজ অবসর নাই।”

—ত্রিশোতা।

### রাজনীতিতে নামের মোহ

“অনেক কিছু অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বাংলা দেশের অধুনালুপ্ত যুগান্তব দল বলিয়া কথিত দলটি এত দিনে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিলেন। গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উক্ত দলের সদস্যগণ মিলিত হইয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁহাদের নবগঠিত ক্ষুদ্র দলের নামকরণ করিতে পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। আচার্য কৃপালনী কর্তৃক গঠিত কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে ইহারা প্রথমে যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া আচার্য কৃপালনী প্রমুখ যখন কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলেন তখনও ইহারা কংগ্রেস ত্যাগ না করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া গেলেন। এদিকে আবার আচার্য কৃপালনী-আহুত পাটনা সম্মেলনে ইহারা যোগদান করিলেন, কিন্তু উক্ত সম্মেলনে গৃহীত দলের নামকরণ লইয়াই ইহাদের মতভেদ

হওয়ার তাঁহারা শেষ পর্যন্ত সম্মেলন ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসীর স্মরণ আছে, সর্বভারতীয় কৃষক-মজদুর-প্রজা পাটি গঠিত হইবার বহু পূর্বে পশ্চিম-বাংলার কংগ্রেসভাগী বিশিষ্ট কর্মিগণ দ্বারা কৃষক-প্রজা-মজদুর পাটি গঠিত হইয়াছিল। এবং সে বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইহাই একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠনে প্রেরণা জাগাইয়াছে। পাটনা সম্মেলন এই নামকরণের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়া সামান্য রদ-বদল করিয়া কৃষক-মজদুর-প্রজা পাটি বা সংক্ষেপে প্রজা-পাটি নামে নতুন সংস্থার নামকরণ করিয়াছেন। যেহেতু, কৃষক-প্রজা-মজদুর পাটির নেতা হইয়াছেন ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, সেই হেতু উক্ত দলের সহিত মিশিয়া যাইলে তাঁহাদের স্বতন্ত্র আন্তর্য কোথায় থাকে ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া যুগান্তর দল নবগঠিত প্রজা-পাটিতে যোগদান না করিয়া বাংলা দেশের মধ্যে আবার একটি দলের সৃষ্টি করিলেন। উক্ত দলের সহিত তাঁহাদের আদর্শের কোন পার্থক্য আছে বলিয়া তাঁহারা কোন ঘোষণা করেন নাই, কেবল মাত্র নামের জন্যই তাঁহারা পৃথক দল করিতে উত্তত, ইহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যাইতেছে। বিশ্বস্ত মহলের সংবাদে প্রকাশ, এই নবগঠিত শিত দলটির নাম সর্বোদয় দল রাখা হইবে। মহাত্মা গান্ধীই সর্বোদয় সমাজ পরিকল্পনার জনক। যুগান্তর নামক দলটি কোন দিনই গান্ধী মতবাদে বিশ্বাসী নহেন, পক্ষান্তরে আচার্য কৃপালনী প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর ও গান্ধীবাদের উত্তরসাধক। যদি প্রকৃত সর্বোদয় সমাজ প্রতিষ্ঠাই এই দলটির কাম্য হয় তাহা হইলে আচার্য কৃপালনী পরিচালিত সর্বভারতীয় এবং ইতিমধ্যেই শক্তিশালী প্রজা-পাটির মধ্যে মিশিয়া না যাওয়ার পিছনে কি যুক্তি আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পশ্চিম-বাংলার প্রজা-পাটি শুধু তাঁহাদের কাল্পনিক পূর্বের অভয় আশ্রম দলের একটোটা অধিকারে নাই। বাঁহারা কোন কালে অভয় আশ্রম দলে ছিলেন না এবং এখনো নাই তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক বিশিষ্ট কর্মী পশ্চিম-বাংলার প্রজা-পাটিতে যোগদান করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ত্রিপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের কর্মীদের মধ্যে নেতাজীর অনুগামী এক বিশিষ্ট অংশ আসিয়া প্রজা-পাটিতে যোগদান করিয়াছেন। সে জন্ত উক্ত দলের নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের কাতর অনুরোধ, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রেতি চাহিয়া সর্বশক্তিতে সর্বভারতীয় প্রজা-পাটিকে পৃষ্ঠ করিয়া তুলুন। নচেৎ শক্তি বিভক্ত হইলে বর্তমান কংগ্রেস-বিরোধী কাহারো অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। প্রজা-পাটির দ্বার তাঁহাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইবার জন্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। ক্লাসে হইলেও বর্তমান জনবিরোধী প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সহিত বাঁহারা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া জনগণের মধ্যে আসিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।”

—দামোদর।

### বর্ষীয় গ্রাম্য স্বাস্থ্য

“প্রতি বৎসর বর্ষীয় সময় গ্রাম্য স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায় তাহা সমস্ত লোক স্বীকার করেন। উহার কারণও স্পষ্ট এই যে, গ্রামের রাস্তা-ঘাট-পুকুর প্রভৃতি কর্ণমাস্ত হইয়া যায়। ঐ সময় রাস্তা-ঘাটের আবহাওয়া পচিয়া উঠে। তাহার দ্বারা দূষিত গ্যাস

বাহির হয় এবং সেই পচা আবহাওয়ার মাছি-মশা প্রভৃতি ডিম পাড়ে। ইহার দ্বারা ম্যালেরিয়া, কলেরা, ডাইরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া গ্রামবাসী বেশ কষ্ট পায়, এমন কি জীবনান্ত ঘটয়া থাকে। গ্রামবাসিগণ এই সময় যদি একটু সচেতন হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষার জন্ত কিছু কার্য করেন তাহা হইলে এই দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। যে সব পুকুরের জল যাতায়াত করে নাই, জল কালো হইয়া আছে ও তাহাতে পানো প্রভৃতি হইয়া থাকে— তাহার পানো পরিষ্কার করিতে হইবে ও সেই জলে বাহাতে মশা ডিম না পাড়ে বা ডিম পাড়িয়া থাকিলে কিছুটা কেরোসিন তৈল ঢালিয়া জলটি বিশেষ করিয়া গুলাইয়া দিলে মশার ডিম নষ্ট হইয়া যায় ও ম্যালেরিয়া রোগ হইতে পারে না। এই বর্ষীয় সময়েই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কারণ। তার পর জল মাঠে ঢুঁি হইয়া যাওয়ার জন্ত লোক রাস্তা-ঘাটে পায়খানা করে, সেই পায়খানাতে বৃষ্টি পড়িয়া পচিয়া উঠে এবং সেই সব পচা মলের উপর মাছি ডিম পাড়ে। প্রচুর মাছি জন্মায় এবং মল দ্বারা যে সব রোগ সৃষ্টি হয় তাহা ঐ মাছির দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। তাহাতে কলেরা, ডাইরিয়া প্রভৃতি হয়। সেই জন্ত প্রত্যেক বাড়ীতে বড় রকমের কোন পায়খানা না করিতে পারিলেও নালা-পায়খানা করিয়া তাহাতে মলত্যাগ করিয়া মাটির দ্বারা ঢাকিয়া দিলে এই সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি পাত্তা যায়। ইহাতে কোন খরচ নাই। তবে একটু পরিশ্রম করিয়া নালা চারি পাশে সামান্য আড়াল করিবার জন্ত আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে। শুধু যে রোগ দূর হইবে তাহা নয় ইহার দ্বারা উত্তম কৃষি উৎপাদনের সার প্রস্তুত হইবে। বিভিন্ন জায়গায় সরাইয়া সরাইয়া ঐ নালা-পায়খানা করিলে কৃষির সমস্ত ক্ষেত্রটি উর্বর করা যাইবে। এই সব বিষয়ে গ্রামবাসীদের এইবার দৃষ্টি দিতে হইবে। নিজে করিতে হইবে ও অপরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্ত পরামর্শ দিতে হইবে। সমস্ত গ্রামে নলকূপ নাই। পুকুরের জল খাইতে হয়। বর্ষীয় জলে পুকুরের চারি ধারের আবহাওয়া ও মতা-পাতা ইত্যাদি জলে পচিয়া বহু রোগের বীজাণু জন্মায়। সে জন্ত প্রত্যেক ঘরে-ঘরে জল উত্তমরূপে গরম করিয়া খুব ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহার করিতে হইবে—এই বিষয়ে অবহেলা করিলে রোগ-শোকে আক্রান্ত হইয়া গরীব পল্লীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বহু দৃষ্ট করিয়া আমরা স্বাধীন হইয়াছি। এবার আমাদেরকে গ্রামবাসীদের ও সমগ্র গ্রামের সুখ-স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, নচেৎ স্বাধীন হইয়া সুখভোগ করা সম্ভব হইবে না। যে দেশে রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যত বেশী সেই দেশ তত সভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আমাদেরকেও রাস্তা-ঘাট পুকুর-পুষ্করিণী ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিয়া সভ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। এই সভ্যতার মধ্যে অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাণবন্ত গ্রাম সুখ-স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য উন্নত হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে।” —গ্রামসেবা।

### প্রাদেশিক সম্মেলন

“গত ২২শে জুলাই, কলিকাতার ৬২নং বৌবাজার স্ট্রীটে, ভারত সভা হলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন সাফল্যের সহিত স্তম্ভ ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়



সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই সভার উদ্বোধন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কৃতাৰ্থ করেন। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুইটি হইতেছে যে, যদি মেদিনীপুর জেলা স্কুলবোর্ড তাহাদের অধীনস্থ শিক্ষকদের প্রাপ্য মে মাস পর্য্যন্ত বেতনাদি আগামী আগষ্ট মাস মধ্যে মিউনিসিপালিটি দেন তবে তাহাৰ প্রতিবাদ এবং জনগণের সহায়ত্বসম্পন্ন দৃষ্টি এই অবিচারের প্রতি আকর্ষণের জন্ত প্রাদেশিক সমিতির নির্ধারিত সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিনে সমগ্র প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রতীক ধর্মঘট করিবেন। এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের দ্বারা দাবীকৃত বেতন বা ভাতা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাস মধ্যে সহায়ত্বভূতিসূচক কোনো ব্যবস্থা না করিলে, একটি বিশেষ প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট করার প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইবে। এই প্রস্তাব ২টিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষকদের জীবন-মরণ সমস্যা। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দেশনেতাগণ এবং জনসাধারণ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং দেশ বা সমাজ প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যাহাতে কোনো বিপদের সম্মুখে পতিত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।”

—শিক্ষা ও কৃষি।

### পাকিস্তানী আমন্ত্রণ

“পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব (tension) দূর করিবার জন্ত জনাব লিয়াকত আলি জীনেহরকে কবচিতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। অবশ্য এ আমন্ত্রণ সর্ভাধীন। পাক সীমান্তের নিকট আত্মরক্ষার জন্ত ভাবত যে সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছে, সাক্ষাৎকারের পূর্বে তাহা অপসারণ করিতে হইবে। পাকিস্তানী প্রেসে ভাবতের বিরুদ্ধে বিবেচ্য প্রচারণা, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-সচিব, পশ্চিম-পাঞ্জাবের শাসনকর্তা, পূর্ব-বাংলার প্রধান মন্ত্রী জেহাদেব ইঞ্জিত, মাসাদিক কাল হইতে পশ্চিম-বাংলা ও আসাম সীমান্তে পাকিস্তানের ব্যাপক সৈন্য-স্থাপন—এ সবার কোনও উল্লেখ এই আমন্ত্রণপত্রে নাই। জনাব লিয়াকত আলির মতে এ সকলই অলৌকিক, বাস্তব-ভিত্তিহীন, সকলই মায়া। ব্রিটিশ ফিল্ড-মার্শাল অকিনলেস স্বাস্থ্য লাভের আশায় পূর্ববঙ্গের ও ভারতের সীমান্ত পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। কান্দীয়ে যুদ্ধ-বিরতির পর কান্দীয়ে ভারত-সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস ও পাকিস্তানের সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধিতে একমাত্র ভারতেরই দূরভিসন্ধি সূচিত হইতেছে, ভাবতের আক্রমণাত্মক নীতিরই প্রমাণ দিতেছে। পাকিস্তানের এই লজ্জা (logic)এব সহিত আমরা বহু দিন হইতে পরিচিত। আব পাকিস্তানের ধূম ধরিয়া পাক-বন্ধু ইংল্যান্ড ও যে ভারতকেই দোষী প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইবে তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কান্দীর আক্রমণ করিয়া উত্তার অর্দ্ধাংশ পাকিস্তান এখন দখল করিয়া রাখিয়াছে। তবুও জাতিসংঘ পাকিস্তানের পক্ষে বরাবর ওকালতি করিয়া আসিতেছেন। আগুয়েন ডিভান একবার ভ্রমক্রমে অসতর্ক মুহূর্তে পাকিস্তানকে

আক্রমণকারী (aggressor) বলিয়া কেলিয়াছেন। পাকিস্তানের ইংল্যান্ড ও আমেরিকান বন্ধু এই উক্তি আমল দিতে চায় না। দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রান্ত হইলে যে ইউনাইটেড নেশন্সের যুদ্ধ অবতীর্ণ হইতে ৪৮ ঘণ্টাও লাগে নাই, সে ইউনাইটেড নেশন্স পাকিস্তানের কান্দীর আক্রমণের বেলায় নেসনের জায় কানো চক্ষুতে টেলিস্কোপ লাগাইতেছেন। জনাব লিয়াকত আলি আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে সেই আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের প্রভাবান্বিত জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কান্দীর সমস্তার সমাধানে আহ্বান করিয়াছেন। লিয়াকত আলি ও তাহার সমর্থক ইঙ্গ-আমেরিকা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট জাতিসংঘের পাকিস্তান ও ভারত কমিশনের ১৯৪৮-এর আগষ্ট ও ১৯৪৯-এর জানুয়ারী প্রস্তাব সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছে! সৈন্য অপসারণ সম্বন্ধে কমিশনের আরকলিপিতে প্রদত্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা ভারত সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত। পাকিস্তান সৈন্যপ্রসারণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ার কান্দীর সমস্তার সমাধানে বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। জাতিসংঘ কিন্তু পাকিস্তানের দোষ-ত্রুটি দেখিতে পান না। আমেরিকার সারা বিশ্বে সামরিক বাহিনী স্থাপনের পরিকল্পনায় পাকিস্তান ও কান্দীর প্রয়োজন। ভারত কোনও শক্তিসংঘে (Power Block)এ যোগ দিতে নারাজ। সেখানে ইঙ্গ-আমেরিকার স্বার্থের হানিকর কোন ব্যবস্থা যতই জায়গত ও বিধিসম্মত হউক না কেন, তাহা জাতিসংঘ মানিয়া লইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মাধ্যমে কান্দীর সমস্তার সমাধান সূত্রপরাহত। জানি না, জীনেহর জনাব লিয়াকত আলির আমন্ত্রণের কি উত্তর দিবেন। দেশবাসী তাহার নিকট হইতে দৃঢ়তা বা আশা করে। ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করিবে না এই প্রতিশ্রুতিও পূর্বেই দিয়াছে কিন্তু জনাব ত ব্ল্যাক-আউট প্রভৃতি যুদ্ধের মহড়াতেই ব্যস্ত। তাহার মুখে বলপ্রয়োগের দ্বারা সমস্তা সমাধানের নীতি পরিহারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আহ্বান আন্তরিকতাহীনই দেখাইতেছে। আশা করি, আমাদের গবর্ণমেন্ট পাকিস্তানের “হেঁদো” কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া দেশরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা অচিরে সম্পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন। আমরা কাহাকেও আক্রমণ করিতে চাই না। কিন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ও যথোপযুক্ত শাস্তি দিতে যেন আমরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকি।”

—মুর্শিদাবাদ সমাচার।

### জেহাদী জিগির

“কান্দীর-বিরোধ মীমাংসার জন্ত ‘উনো’-সালিশের দিল্লী-করাচী আনাপোনা ও আলোচনাদি করার প্রাক্কালে পাকিস্তানের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী মহল হইতে যুগপৎ লড়াই ও জেহাদের জিগির ক্রমাগত ধনিত ও প্রতিধনিত হইতেছে। পাকিস্তানের সহিত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করার অভিপ্রায় নাই, ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই কথা প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতে জনসভায় বা পত্রিকাদিতে যুদ্ধের কোন প্রকার প্ররোচনা বা আন্দোলনও নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও বণহস্তার কান্ড হয় নাই। আমাদের প্রতিবেশী জীহট জেলার এক শ্রেণীর পাকিস্তানী সর্দারও (তন্মধ্যে দারিদ্রশীল এম, এল, এ-রা পর্য্যন্ত আছেন) জীহটের গোবিন্দপার্ক সভায় সমবেত হইয়া জেহাদী জিগির ছাড়িতেছেন। এই জিগিরের

সারবস্ত ভারত সরকার ও পাকিস্তানী হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিবোধকার। কিন্তু ইহার ফলে উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের মধ্যেই আতঙ্ক ও অসোয়াসক্তি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ইহার পরিণতি কি হয় তাহা দেখিয়া এবং ঠেকিয়া শিখিয়া সেই শিক্ষা অল্প সময়ে তুলিয়া বসা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। পাকিস্তানের এই শ্রেণীর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের উত্তেজনামূলক প্রচারে, বুদ্ধি-পরামর্শে ও হীন কার্যকলাপে মাত্র একটি বৎসর পূর্বে লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক সর্বস্বান্ত হইয়া আতঙ্কে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়া বাঙ্গলাগী হইয়াছিল। সেই লজ্জাকর অধ্যায়ের কুখ্যাত নায়কেরা আবার কর্মতৎপর হইয়া উঠিতেছে। ইহার ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। ইহাদের এই প্রকাব উগ্র প্রচারের ফলে আবার সেই পুরাতন খেলা আরম্ভ হইলে এ যাত্রা তাহার শেষ কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা উভয় রাষ্ট্রের কর্তৃদ্বারা এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না কি? ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইয়াছে এবং স্থানান্ত্রাগণ ও আরম্ভ হইয়াছে। ক্রীষ্ট গোবিন্দপার্কের সভার একান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে সভাপতির ভাষণে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জগদ্রুত সমস্ত মুসলমানকে ছাড়িয়া দেওয়ার দাবীর ভিতর দিয়া প্রতি স্পষ্ট ভাবে পাকিস্তানী সর্দারদের যে জঘন্য মনোবৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক কোন গবর্ণমেন্ট তাহা বরদাস্ত কবিত্তে পারেন এ কথা আমরা ভাবিতে পারি না। সভা সমাজেব শিক্ষিত নাগরিকের মুখ হইতে এই শ্রেণীর কথা বাহির হইতে পারে তাহা সভ্যই বিশ্বাসেব বিষয়। ইহার দ্বারা কেবল পাকিস্তানী সংখ্যালঘুদের আতঙ্কিত কবিত্তা তোলা হইবে এমন নহে, ভারতীয় মুসলমানরাও উদ্বেগ বোধ করিবেন। নিজ রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিতাড়ন করিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া দিবার অপকৌশল এবং তাহার প্রতিক্রিয়া হইতে কোন শিক্ষাই ইহার গ্রহণ করিতে পারেন নাই—ইহাই আশ্চর্যের বিষয়! নিবীহ লোকের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত, লাঠিবাজী, নারী-নির্ধাতন, প্রকাশ্য রাজপথে নারীকে উলঙ্গ করিয়া কোড়াক অমুভব করা, ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়িয়া ধর্মাস্ত্রিত করিয়া স্বধর্মের গোঁড়ব (৭) বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান লাভ, আর এই আণবিক যুগে বোমা-এরোপ্লেন লইয়া যান্ত্রিক যুদ্ধ যে এক জিনিষ নহে—তাহা পাকিস্তানের নেতারা মোটেই বুঝিতে পারেন না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কান্দীর জয়ের আফলান তাই আপাততঃ স্বগিত রাখিলে পাকিস্তানের লাভ বই লোকসান হইবে না। কারণ পূর্বে অশ্রুস্রব্দ অপকৌশলাদি এবার আর কার্যকরী হইবে না। দ্বিতীয় দিল্লী-চুক্তির মাধ্যমে এবার শান্তির সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা রহিবে না : অস্ত্র পন্থার ভিতর দিয়াই সব সমস্তার চূড়ান্ত সমাধানের চেষ্টা করা হইবে—এই কথাই আমরা মনে করি। পাকিস্তানের নেতারা কি সভ্য সভ্যই তাহা চাহিতেছেন?

—যুগশক্তি।

### মাদক-বর্জন

“মাদক-বর্জন সম্পর্কে ‘বরেন্দ্র-ভূমি’তে কিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়ার পর স্থানীয় আবগারী কর্তৃপক্ষ হইতে আরো কতকগুলি

জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে। পূর্বে-নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী ১লা জুলাই হইতে এতদঞ্চলে মাদক-বর্জন আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। নিয়ম-কানুন পরিবর্তনরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে যে সময়ের আবশ্যক হইবে, তাহাতে আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্বে উক্ত আদেশ অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ২৭শে জুন তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ—আগামী স্বাধীনতা দিবস হইতে মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরে মাদক-বর্জন আইন চালু করা হইতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে তাহার পূর্বেই জেলা নিবারণ সংস্থা (District Prohibition Board) কার্য আরম্ভ হইবে। এই সংস্থার কার্য হইবে মাদক-বর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচারকার্য, জনশিক্ষা, আবগারী দোকানের বেকাব কল্যাচারীদের জীবিকার উপায় করা, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, পল্লী-উন্নয়ন কার্য এবং বে-আইনী মাদক দ্রব্য আমদানী ও তাহার ব্যবহার প্রতিরোধ। এ পর্যন্ত যে সমস্ত নির্দেশাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট (সম্ভবতঃ সিভিল সার্জনের নিকট হইতে) প্রদান করিতে পারিলে মদপায়িগণ বিলাতী মত্ত ক্রয় করিতে পারিবে। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী প্রকৃত রোগীদের নিকট সুরাসাধ্যযুক্ত (alcohol) ঔষধাদি বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু এই সমুদয় ঔষধ যাহাতে নেশা করার জন্য ব্যবহৃত না হয় তাহার জন্য ইহার বিক্রয়-ব্যবস্থা লাইসেন্স দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। বিলাতী মদের দোকান সম্পূর্ণ তুলিয়া দেওয়া হইবে কি না, এ সম্পর্কে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মহলে এ পর্যন্ত কোন নির্দেশ আসে নাই। আদিবাসীদের মদ চোলাই করিতে কোন পারমিট দেওয়া হইবে না। তবে তাহাদের বিশেষ ক্রিয়া-কথো—যেমন জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহের সময় সংযত ভাবে কিছু পচুই (প্রকৃত মদ নহে) প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। মাদক-বর্জন কার্য যথারীতি সূত্র হওয়ার পর কাহারো নিকট গাঁজা ও ভাং পাওয়া গেলে অথবা কেহ উহা বিক্রয় করিতেছে দেখা গেলে তাহাকে আইনতঃ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদিও আয়ুর্কৌদীয় ‘মোদক’ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নাই তবুও ইহা বিক্রয় ও ব্যবহার সুরাযুক্ত ঔষধাদির ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়াই মনে হয়। আয়ুর্কৌদৌক্ত “মৃতসঞ্জীবনী” সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইবে না। কিন্তু ইহার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করা হইবে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক উপযুক্ত ডাক্তারী সার্টিফিকেট প্রদান করিলে মাত্র এক পাউন্ট পর্যন্ত ইহা ক্রয় ও মজুতের অনুমতি পাওয়া যাইবে। আফিমের ব্যবহার এখনই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হইবে না। ইহা বিক্রয়ের জন্য মাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি দোকান অথবা সরকারী এজেন্সী থাকিবে। আফিম-ব্যবহারকারীদের গণনা করিয়া পুণীভূক্ত করা হইবে এবং প্রত্যেককে উহা ক্রয় করিবার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া একখানা করিয়া রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসরই উক্ত পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। এই ভাবে আফিমের ব্যবহার ক্রমে ক্রমে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।” —বরেন্দ্রভূমি।

### ট্রাম কোম্পানীর সহিত চুক্তি

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর সহিত ২০ বৎসরের একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। কলিকাতা

ট্রাম কোম্পানীকে জাতীয়করণ করিবার একটি প্রস্তাব পরিষদের আগামী সভার উপস্থাপিত হইবার কথা ছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ কি করিয়া ২০ বৎসরের চুক্তি সকলের অজ্ঞাতসারে সম্পাদিত হইল—তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। প্রথমত, এই সব বিলাতি কোম্পানী যে টাকা মুনাফা করিয়াছে—তাহার পরিমাণ তাহাদের মূলধন অপেক্ষা এত গুণ অধিক যে, ক্ষতিপূরণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। আমাদের সরকার কিন্তু শুধু ক্ষতিপূরণ দিবার আশ্বাস দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই আরও ২০ বৎসর অবাধে লাভ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কলিকাতা ও ২৪ পরগণার যানবাহন সমস্তার সমাধানের জন্ত ট্রাম ও বাসকে জনসাধারণের একটি সমবার প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, যত দিন না গ্রামাঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা মত ব্যবস্থা হইতেছে, তত দিন সহরের জনসমষ্টির বিকেন্দ্রিকরণ সম্ভব হইবে না। গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রভৃতির সুব্যবস্থা হইবে না। এবং গ্রামাঞ্চল হইতেও সহরের উপর লোকসংখ্যার চাপ আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের উন্নতির জন্য এবং সহরের উপর হইতে লোকসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য যান-বাহনের প্রসার বিশেষ প্রয়োজন; এবং ট্রাম, বাস, রেলপথের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনার দ্বারা ইহা সম্ভব। বিভিন্ন কোম্পানী, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং কিছুটা সরকারের হাতে যদি পৃথক পৃথক ভাবে যান-বাহনের ভার থাকে তাহা হইলে কোন সুশরিকল্পিত ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন মত যান-বাহনের ব্যবস্থা করিতে হইলে জনসাধারণের প্রত্যেক বোগাবোগ থাকিবে প্রয়োজন এবং জনগণের সমবার প্রতিষ্ঠান মারফতই তাহা সম্ভব। কলিকাতা ও ২৪ পরগণার সমস্ত অঞ্চলের সাধারণের যাবতীয় যান-বাহনের স্বত্ব ও পরিচালনার ভার জনসাধারণের উপর অর্পণ করিলে আরও অর্থের যে প্রয়োজন হইবে তাহা প্রত্যেক নাগরিককে একটি করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিলেই উঠিয়া যাইবে। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া বস্তুত তাহাদের যে কোন মত থাকিতে পারে—তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই সব চুক্তি করার অধিকার সরকারের নাই। আজ যে পঞ্চায়েতের কথা তুলিয়াছি এবং দাবী করিতেছি যে, সরকার তাঁহার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে পঞ্চায়েত মারফৎ জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন—তাহার প্রয়োজনীয়তা ট্রাম কোম্পানীর সহিত এই চুক্তিতে আরও বেশী প্রতিপন্ন হইতেছে। —চব্বিশ-পরগণার ডাক।

### ভারত বিভাগের কুফল

“পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিভাডন করে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাকে আরও বাহিরে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টা চলছে সূচক পরিকল্পনা অনুসারে আর ৫ খনিরপক ভারতে সুরে-খাচ্ছো বাস করছে মুসলমান সম্প্রদায়। আজ পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুকে যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়প্রার্থীরূপে এসে পত্তর স্বাধীন বাপন করছে তার পাশে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান অধিবাসীদের ছবি মিলিয়ে দেখলে পাকিস্তানের পরিস্থিতির জয়ই পরিলক্ষিত হয়। খণ্ডিত

ভারতের স্বাধীনতা গ্রহণ করে কয়েকসে যে ভুলের বীজ রোপণ করেছিল আজ তা বিবর্তকরণে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ভারতকে বিপর্যস্ত করতে বসেছে। সে বিবর্তককে সম্মুখে উৎপাটিত করবার জন্য আজ ভারতকে হত্রে হবে কর্তৃত্বপন, সবল নীতির দিতে হবে পরিচয়, তোষণ নীতিকে বর্জন করে বহু মুষ্টির বিপক্ষে ভুলতে হবে বহু মুষ্টি; কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হবার পূর্বে ভেবে দেখতে হবে ভারতের লাভ-অলাভের কথা। পাকিস্তান যতই জেহাদ তুলুক না কেন, তার এমন শক্তি ও সাহস নাই যে, ভারত আক্রমণ করে—এ কথা আজ প্রতি ভারতবাসীকে ভাবতে হবে। আর তাদের প্রস্তত হতে হবে স্বদেশের মানসম্মত ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে আত্মবলিদান দেবার জন্য। মিথ্যা ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কাবু হয়ে পড়বার কোন সম্ভব কারণ নাই। ভারত-সীমান্ত যদি আক্রান্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের নিরাপত্তা যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে তার প্রতিবিধান করবার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসী যে প্রস্তত আছে আজ সেই কথা পাকিস্তানকে সমঝিয়ে দিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন সর্বদলগত বিভেদ ভুলে সকল ভারতবাসীর একযোগে কর্তৃত্বপ্রচেষ্টা। ভারত সরকার যদি সবল নীতির আশ্রয়ে ভারতের মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী নিজের রক্তদানে সে মর্যাদা রক্ষার্থে যে অগ্রসর হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীনেহের দৃষ্টি যেন সেদিকে পড়ে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তরের কামনাকে পদদলিত করে তিনি যেন পুনরায় অমরীদার কোন নূতন চুক্তিতে পাকিস্তানের সঙ্গে আবদ্ধ না হন, এই আমাদের প্রার্থনা।” —জনসম্মত।

### শেঠ ইন্দ্রকুমার কর্ণানী

রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল চন্দনমল কর্ণানী ট্রাষ্টের প্রতিষ্ঠাতা, কলিকাতার তরুণ ব্যবসায়ী শেঠ ইন্দ্রকুমার কর্ণানী পশ্চিমবঙ্গ



সরকারকে সশ্রুতি ১৭ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। দানের উদ্দেশ্য—কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের উন্নয়ন; যথা—স্বচ্ছ চিকিৎসায়, শিশুদিগের পক্ষাঘাত চিকিৎসায় এবং পোষ্ট ও গ্রুয়েট ট্রেণিং সেন্টার উন্মুক্ত করা। বর্তমানে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে মাত্র ২৩৭টি বেড আছে, তৎস্থলে ৫০০ বেড করা হইবে এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত করিয়া তৎস্থলে দাতার পিতামহের নাম অনুসারে “রায় বাহাদুর সুখলাল কর্ণানী স্মৃতি-হাসপাতাল” নামকরণ হইবে।







# জীবনকাল

## যুগবাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে তুষ্টি কর, সকলেই তুষ্টি হবে।  
তস্মিন্ তুষ্টি জগৎ তুষ্টিম্।—ঠাকুর যখন দ্রৌপদীর হাঁড়ির শাক  
খেয়ে বলেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎশুদ্ধ জীব তৃপ্ত—  
হেউ চেউ হয়েছিল। কই মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্টি  
হয়েছিল—হেউ চেউ হয়েছিল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। শোনো ! আলো জ্বালো বাতুলে পোকার  
অভাব হয় না ! তাঁকে লাভ কল্লে তিনি সব জোগাড় করে  
দেন—কোন অভাব রাখেন না। তিনি হৃদয়মধ্যে এলে সেবা  
করবার লোক অনেক এসে জোটে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেউ কেউ জ্ঞানচর্চা করে বলে মনে করে,  
আমি কি হইছি ! হয় ত একটু বেদান্ত পড়েছে। কিন্তু ঠিক  
জ্ঞান হলে অহঙ্কার হয় না ; অর্থাৎ যদি সমাধি হয়, আর  
মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়, তা হ'লে আর অহঙ্কার থাকে  
না। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। সমাধি হলে  
তাঁর সঙ্গে এক হওয়া যায়। আর অহং থাকে না।

# পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পঞ্চাশ

মথুর বাবু তখন বেঁচে, রামকৃষ্ণ তাঁকে এক দিন ধরে বসল : 'দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব।'

মথুর বাবু অভিমাত্রী লোক, আগু-পিছু করতে লাগলেন। আমরা কেন সেধে তার বাড়ি যাই? সে নিজে আসতে পারে না?

'ওগো, দেবেশ্র যে ঈশ্বরের নাম করে।'

নাম তো তুমিও করো। সে আসতে পারে না তোমার এখানে?

আমি নাম করলে কি হয়, আমার নিজের কি কোনো নাম আছে? তাঁর নাম দিয়ে নিজের নামটাকে মুছে ফেলেছি। তাঁর নামেই নিজের নামের নাশ হয়েছে। দেবেশ্রের কত বিত্তে, কত ঐশ্বর্য। সে তো কলির জনক। সে এ দিক-ও দিক ছ দিক রেখে দুখের বাটি খায়। সে ভোগেও আছে যোগেও আছে। রাজত্বও করছে দাসত্বও করছে। সে একটা মহাতীর্থ। তাকে এখানে আসতে না দিয়ে আমার ওখানে যাওয়াই তো আমার লাভ। আমি অমন একটা তীর্থ করব না?

যেখানে ঈশ্বরের নাম সেখানেই আমি আছি। তাঁকে যে ডাকে সে যে আমাকেও ডাকে।

দেবেশ্র আর মথুর একসঙ্গে পড়তেন হিন্দু কলেজে। সেই সুবাদে যাওয়া সহজ হয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেলেন রামকৃষ্ণকে।

দেবেশ্রনাথের তখন দেশজোড়া নাম। খৃষ্টানি থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্তে তিনি ব্রাহ্মধর্ম আর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা রামমোহন এসে বোঝালেন বেদান্ত-প্রতিপাদিত ধর্মই সত্যধর্ম আর তাই প্রচার করবার জন্তে স্থাপন করলেন ব্রাহ্মসভা। দেবেশ্রনাথের সাধনায় সেই ধর্মই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মধর্ম, আর সেই সভাই হয়ে দাঁড়াল ব্রাহ্মসমাজ।

বিদেশের গুরুর কাছে গোটা দেশ যখন ধর্মে দীক্ষা নিতে যাচ্ছিল তখন রাজা রামমোহন দেখালেন তাকে তার আপন সত্যসম্পদ। সেই দেখানোর কাজে দেবেশ্রনাথ একটি দিব্য শিক্ষা। ব্রহ্মকে তিনি শুধু অমুঠানে রাখেননি নিয়ে এসেছেন জীবনের অধিষ্ঠানে। তিনি প্রত্যগাত্মা। তিনি ঈশ্বরদর্শী।

দিব্য ভূঁড়ি হয়েছে মথুর বাবুর, তবু তাঁকে চিনতে পারলেন দেবেশ্রনাথ। বিনয় বচনে জিগগেস করলেন, 'সঙ্গে ইনি কে?'

কথার সুরে একটি প্রসন্ন বিন্ময়। চোখের সম্মুখে হঠাৎ যেন দেখতে পেয়েছেন সুন্দরের মহামহিম প্রকাশ। একটি বিভাষিত বিভূতি।

'এই এক জন আত্মভোলা মানুষ। ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।' মথুর বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যেন শুধু এইটুকুই পরিচয় নয়। পাগল নয়, পারঙ্গম; অনন্তগুণগভীর। মানুষ নয়, লীলা-মানুষবিগ্রহ। তাকিয়ে রইলেন দেবেশ্রনাথ।

'সংসারে থেকে তুমি ঈশ্বরে মন রেখেছ, তাই তোমাকে দেখতে এসেছি।' বললে রামকৃষ্ণ। 'তুমি জনক রাজার মত দুখানা তরোয়াল ঘোরাও, একখানা জ্ঞানের একখানা কর্মের। তুমি পাকা খেলোয়াড়।'

স্মিতশাস্ত নেত্রে হাসলেন দেবেশ্রনাথ।

'কিন্তু এ দেখায় চলবে না। দেখি তোমার গা দেখি।'

সহজ-সুন্দর মানুষটির এ অনুরোধ যেন গৃহাহিত প্রত্যগাত্মার আদেশ। এ আবরণমুক্ত হওয়া মানাই ভারমুক্ত হওয়া, মালিন্যমুক্ত হওয়া। আবরণ খুলে ফেলতে পারলেই রইল না আর অহঙ্কার, রইল না আর অসন্তোষ।

গায়ের জামা খুলে ফেললেন দেবেশ্রনাথ।

রামকৃষ্ণ দেখল সেই “পুলহবাহুঃ পৃথুতুঙ্গবক্ষঃ”কে।  
দেখল তাঁর গৌরবর্ণের উপর কে সিঁছর ছড়িয়ে  
দিয়েছে। বুঝল ঈশ্বর স্পর্শ করেছে দেবেন্দ্রনাথকে।  
তাঁর মর্ত ওহু ভাগবতী ওহু হয়ে উঠেছে।

দেখে খুশি আর ধরে না রামকৃষ্ণের। তুমি  
তো তবে আমার দেশের লোক, আমার স্বজন-  
বান্ধব। রামকৃষ্ণ চেপে ধরল দেবেন্দ্রনাথকে।  
‘তবে আমাকে কিছু ঈশ্বরীয় কথা শোনাও।’

বেদ থেকে কিছু-কিছু শোনালেন দেবেন্দ্রনাথ।  
এই বিশ্বজগৎ প্রকাণ্ড একটা ঝাড়-লঠনের  
মতো। প্রত্যেকটি জীব ঝাড়-লঠনের বাতি এক-  
একটি। শুধু নিজেরা জ্বলছে না, সমস্ত কিছুকে  
উজ্জ্বল করে রেখেছে।

কী সর্বনাশ! আমি যে অমনি দেখেছিলুম  
এক দিন পঞ্চবটীতে। তোমার সঙ্গে আমার যে  
তা হলে মিল গো! কিন্তু বিষয়টার ব্যাখ্যা কি?

‘ঝাড়-লঠন না হলে কে জানত কে দেখত এই  
জগৎসংসারকে?’ দেবেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করতে  
লাগলেন। ‘ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন শুধু নিজেদের  
দেখাতে নয়, ঈশ্বরকে দেখাতে। শুধু নিজেদের  
গৌরব প্রচার করতে নয়, ঈশ্বরের গৌরব প্রচার  
করতে। মানুষ ছাড়া ঈশ্বরকে বোঝেই বা কে,  
বোঝায়ই বা কাকে। ঝাড়ের আলো না থাকলে  
সব-কিছু অন্ধকার, স্বয়ং ঝাড় পর্যন্ত দেখা  
যায় না।’

বড় সুন্দর করে বললে তো। একই বহুধা  
হয়েছেন। গণনাহীন অনৈক্য দিয়ে দেখাচ্ছেন সেই  
এককে। সেই সমগ্রকে। সেই অখণ্ডকে। তিনি  
যে অখণ্ডেকরস।

‘আমি’-র মধ্যে কিছু নেই। আমার মধ্যেই  
সমস্ত রয়েছে।

আলাপ করে উল্লাস হল দেবেন্দ্রনাথের।  
বললেন, ‘আমাদের উৎসবে কিন্তু আসতে হবে।’

‘সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।’ উদাসীন রামকৃষ্ণ।

‘না, আপনি আসবেন।’

কিন্তু দেখছ তো আমার অবস্থা। আমার  
কাপড়-চোপড়ের আঁট নেই। কখন কি ভাবে তিনি  
রাখবেন তিনিই জানেন।’

‘না, আসতে হবে।’ দেবেন্দ্রনাথ পিড়াপিড়ি  
করতে লাগলেন। ‘শুধু একটা ধুতি আর উজুনি

পরে আসবেন। আপনাকে এলোমেলো দেখে কেউ  
যদি কিছু বলে আমার কষ্ট হবে।’

‘না বাপু, আমি তা পারব না। বাবু হতে  
পারব না আমি।’

দেবেন্দ্রনাথ শুধু অর্ধবস্ত্র উন্মোচন করেছিলেন,  
কিন্তু রামকৃষ্ণ মুক্তসমস্তসজ্জ। রামকৃষ্ণ সর্ববিকার-  
বর্জিত। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। তার কাপড়  
থাকলেই বা কি, না-থাকলেই বা কি। নয় বলেই  
তো সে পূর্ণ। চরম বলেই তো সে পরম।

কিন্তু শালীনতায় বাধল দেবেন্দ্রনাথের। পর দিন  
মথুর বাবুকে চিঠি লিখে পাঠালেন। একেবারে খালি-  
গায়ে এলে ভালো দেখাবে না। গায়ে অন্তত  
একখানা উজুনি—

ওরে, ওরা এখনো বস্ত্রকে দেখে, সত্যকে দেখে  
না। আমাকে দেখে না, আমার কাপড় দেখে।  
ওরে, এ যেন হরির শরীর। হরির শরীরের জন্মে  
ক হাত কাপড় কিনবি, কোন বাজারে? হরিই  
জগৎ, জগৎই হরি—এর বাইরে আর শরীর কই?  
হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো ন হি  
ভিন্ন তমুঃ।

‘দেবেন্দ্র এখনো ভোগে আছে। তাই সে  
ভাগেও আছে।’

আমার ভোগও নেই তাই ভাগও নেই। আমার  
ইয়ত্তাও নেই, পরিচ্ছেদও নেই। আমি সর্বোপাধি-  
শূন্য।

‘কিন্তু গৃহস্থেরা কি একেবারে ডুবে যেতে পারে  
না?’ জিগগেস করল কেশব সেন।

‘তোমরা ডুবে যাবে কি গো? তোমরা একবার  
ডুব দেবে আবাব উঠবে।’ হাসল রামকৃষ্ণ।

তোমরা ঈশ্বরকোটি নও, তোমরা পানকোটি।

‘কিন্তু, কেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর?’

মহর্ষি বলতে পারো, কিন্তু আসলে রাজর্ষি।  
রাজর্ষি জনক। সংসারে থেকেও থাকতেন অরণ্যে।  
অরণ্যের নির্জনতায়।

‘দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর? দেবেন্দ্র? দেবেন্দ্র?  
দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম করল রামকৃষ্ণ।  
বললে, ‘তবে কি জানো, পর্যাণ্ডকাম হতে হয়।  
এক জনের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় উদয়াস্ত পাঠা-  
বলি হত। এখন আর বলির সে ধুমধাম নেই।  
এক জন জিগগেস করলে, মশাই আপনার বাড়িতে



আর বলির সে ধুমধাম কই? বাবু বললে, 'আরে, এখন যে দাঁত পড়ে গিয়েছে।' খেমে আবার বললে রামকৃষ্ণ, 'দেবেন্দ্রনাথ খুব মানুষ। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙছে। হাতে তেল মেখে নিয়ে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আর আঠা লাগে না।'

ওরে একবার পরশমানিককে ছুঁয়ে সোনা হ। তার পর হাজার বছর ধরে মাটিতে পোঁতা থাক, যে-সোনা সে-সোনাই থেকে যাবি।

মথুর বাবুকে আবার ডাকল রামকৃষ্ণ। বললে, 'চলো এবার আরেক তীর্থে।'

সে আবার কোথায়?

দীননাথ মুখুজ্জের বাড়ি। বাগবাজারের পোলের কাছে থাকে। লোকটি বড় ভালো।

ভাল লোক হলেই তার বাড়ীতে যেতে হবে? মথুর বাবু ঝাড়া দিয়ে উঠলেন।

শুধু ভালো নয়, ভক্ত। সব সময়ে তাঁতে আছে, মন-প্রাণ সব তাঁতে গত হয়েছে। এমন লোককে আমি দেখতে যাব না? ভক্তকে দেখা তো তাঁকেই দেখা।

ছনিয়ার অলিতে-গলিতে কত এমন ভক্ত আছে। তাই বলে সবাইকার বাড়ি-বাড়ি খাওয়া করতে হবে না কি?

আমাকে সে সব অলি-গলির ঠিকানা এনে দাও। আমি জনে-জনে গিয়ে প্রণাম করে আসব। ভক্ত হচ্ছে ভগবানের বৈঠকখানা। সেখানেই তিনি বিশেষরূপে প্রকাশিত। বিশেষরূপে তরঙ্গায়িত, তরলীকৃত। বৈঠকখানাতেই তো বাবু আছেন খুশমেজাজে, দিলদরিয়া হয়ে। মজা ওড়াবার মজলিশ চালাচ্ছেন চব্বিশ ঘণ্টা। আমাকে সেই আখড়ার আড্ডাধারী করে দাও।

ভক্ত ছাড়া তীর্থ নেই মহীতলে। যোল টাকার পয়সা এক কাঁড়ি, কিন্তু যোলটি টাকা যখন একত্র করো তখন আর কাঁড়ি দেখায় না। যোল টাকার বদলে যদি একটি মোহর করো তখন আরো কত ছোট হয়ে গেল। আবার সেটির বদলে যদি এক কণা হীরে করো, তা হলে লোকে টেরই পায় না।

ভক্ত ছোটটি হয়ে আছে। শুধু ঈশ্বরের নামটি ধরে বসে আছে। তীর্থ ভ্রমণ, গলার মালা ভেক-আচার কিছু নেয় না, শুধু ভক্তি নিয়ে পড়ে থাকে।

ভার নেয় না সার নেয়। জীবনে শুধু একখানি দলিল লিখে চুকিয়ে দেয় লেখা-পড়া। সে দলিল উইল বা দানপত্র নয়, নয় কোনো বন্ধক-তমসুক, শুধু একখানি আমমোক্তারি। ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দিয়ে নির্বঙ্কাট হয়ে বসে থাকে। সে আমমোক্তারি বিশ্বাসের খাতায় রেজেষ্টারি করা। রদ-রহিত নেই কোনো কালে।

তার নাম আর তিনি তো অভেদ। যা রাম তাই নাম। তেমনি যা ভগবান তাই ভক্ত।

মথুর বাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তীর্থ দর্শনে বেরুল রামকৃষ্ণ।

সেদিন দীননাথের বাড়িতে দীননাথের এক ছেলের পৈতে হচ্ছে। বাড়িটি ছোট, কিন্তু হৈ-চৈ প্রচণ্ড। তার উপর কে এক জন বড়লোক এসেছে ল্যাণ্ডো করে, তাকে নিয়ে দীননাথের ঘরগুপ্তি ভীষণ ব্যস্ত। এমন সময় এদের দেখে ওদের অগ্রস্তুত অবস্থা। কোথায় বসায় এই অনাহুতকে? নিমন্ত্রণ না করলেও যে চলে আসে পথ চিনে, প্রার্থনার অপেক্ষা না করে? কোথায় বসাই? ঘরে যে অনেক জিনিস, অনেক আসবাব, সেখানে জায়গা কোথায়?

পাশের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন মথুর বাবু, ওপাশ থেকে কে বাঁজিয়ে উঠল: 'ও-ঘরে হবে না, ও-ঘরে সব মেয়েরা আছেন।'

মহা অগ্রস্তুত। জায়গা হল না রামকৃষ্ণের। তাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন মথুর বাবু।

'কেমন? দেখলে?' চটে গিয়েছেন মথুর বাবু। রামকৃষ্ণ হাসতে লাগল। বললে, 'কেন, দীননাথকেই দেখলাম। তিনি দীননাথ তিনি কি আমাকে কীকি দিতে পারেন।'

'আর বোলো না। বসতে জায়গা দিল ঘরে?' 'ঘরে জায়গা না দিক, হৃদয়ে দিয়েছে।'

'তোমার কথা আর শুনব না। তোমার সঙ্গে যাব না আর কোথাও।' তবু রাগ যায় না মথুর বাবুর। 'তোমাকে যারা স্থান না দেয়—'

'আমাকে স্থান না দিলে স্থান কোথায় আর সংসারে?' দীননাথের মতই হাসতে লাগল রামকৃষ্ণ।

তুমি, মথুর বাবু, তুমি আর নেই। তবে আমাকে এখন বেলঘরের বাগানে কেশব সেনের কাছে কে নিয়ে যাবে?

আমি আছি—এগিয়ে এল কাণ্ডেন। ১. জে  
বর্ষত্রয় হৃদয়।

কিন্তু গাড়ি ?

গাড়ি আমি দেব। কাণ্ডেন বললে।

কাণ্ডেনের সঙ্গে তার গাড়িতে চড়ে চলল  
রামকৃষ্ণ। চলল মাইল দুই দূরে বেলঘরে  
জয়গোপাল সেনের বাগানবাড়িতে। সেখানেই  
কেশব এসেছে। ভক্তদল নিয়ে মেতেছে সাধন-  
ভজনে। চল হরিকথা শুনে আসি। মা হাতছানি  
দিয়ে ডাকছেন সেখানে।

রামকৃষ্ণের পরনে শুধু লালপেড়ে একটি ধুতি।  
কোঁচার খুঁটটি বাঁ-কাঁধের উপর ফেলা। কালো  
বানিস-করা চটি পায়ের।

চলেছে জ্ঞানীগুণীদের মজলিশে। যেখানে  
হরিগুণগান, সেখানে গুণই বা কি, আর জ্ঞানই  
বা কি।

একাল

দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত কেশব সেন।

চমৎকার চেহারা। সৌম্য, প্রশান্ত ওজঃপূর্ণ।  
মুখশ্রীতে ঈশ্বরবিশ্বাসের লাবণ্য মাখানো। কঠিন  
যেমন ভক্তির মধুরতা তেমনি প্রতিজ্ঞার তেজ।  
দাঁড় আর দাঁড়ির সমাহার। বাগুবজ্রে বংশীধ্বনি।

চমৎকার বক্তৃতা দেয় কেশব। যেমন ইংরিজি  
তেমনি বাঙলা। প্রথম-প্রথম ইংরিজি, শেষ দিকে  
কেবল বাঙলা। সে বক্তৃতার কী বর্ণচ্ছটা। কী  
বিশ্বাসচাতুর্য। যে শোনে সেই তন্ময় হয়। সত্য  
পথের ধ্রুব জ্যোতিতি চোখের সামনে জ্বলতে দেখে।

দেশ তখন ভেসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে মদে,  
খুঁটানিতে, ইংরিজিয়ানায়। উচ্ছন্ন যাবার জন্তে  
পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে চার দিকে। ছুটতে বা  
থারছে কই, নর্দমায় টলে পড়ছে।

কাঁচা নর্দমার পাঁকের মধ্যে সার সার গুয়ে আছে  
মাতালেরা। ধাঙড়দের ঝোড়াগুলোকে মাথার  
ঘালিশ করেছে। যেন একেক জন কত বড়  
বাহাদুর। পাহারাওয়ালা এলে বলছে, 'এ বাবা'  
নর্দমায়, মিউনিসিপালিটিতে আছি, পুলিশ  
জুরিসডিকশানের বাইরে। টিকিটিও ধরতে পাবে  
না।'

“সধবার একাদশী”র নিমির্টাদ বলে, সে কালে  
হুতে পেতো, এ কালে আমাদের মদে পেয়েছে।

ত্রাণির নাম বোতলচারুহাসিনী। আমি তাকে  
ছাড়তে পারি কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে কই? যদি  
“রাইম” করতে চাও তো মদ খাও।

সে যুগে মদ না খাওয়া মানে শিক্ষিত বলে  
কল্কে না পাওয়া। যে-কলেজ থেকে বেরিয়েছে  
পাশ করে তার নাম ডোবানো। স্বনামধন্য  
রামগোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্রাজুয়েট হয়েছে কিন্তু  
মদ খায় না। ঘোষ মশায় দুঃখ করে তাকে বলছেন,  
'তুই মদ খেতে শিখলি না, তোকে আমি সমাজে  
বার করি কি করে?'

প্যারীচরণ সরকার “সুরাপাননিবারণী সভা”  
স্থাপন করলেন। মদিরার শ্রোত তবু বন্ধ হয় না।  
নিমে দত্ত বলছে, ও সভা যদি ধরায় না নিপাত হয়  
আমি নিপাত হব। বড়মানুষের ছেলে-ব্যাটারা  
এক-একটি করে সভ্য হবে আর আমি ধেনো খেয়ে  
মরব এ হতে দেব না। এক ব্যাটা বড়মানুষের  
ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন  
হয়—

গিরিশ ঘোষ মদ খায়। তা নইলে না কি তার  
নেশা হয় না।

ঠাকুর বলেন, 'খা না—কত খাবি? কত দিন  
খাবি? শেষে যখন তোকে সে-নেশা ভগবৎ-নেশায়  
পেয়ে বসবে তখন মদ কোথায় পড়ে থাকবে টেরও  
পাবি না।'

সে-নেশা মদের চেয়েও হুর্মদ। সে-নেশাই  
সর্বনাশের নেশা।

তা ছাড়া, আরেক লক্ষণ, শিক্ষিত সমাজ  
সদলবলে সাহেবিয়ানার মোসাহেবি শুরু করে  
দিয়েছে। গায়ে বিলিতি খেলাত, মুখে বিলিতি  
বুকনি। যা কিছু ইংরেজি, যেমন কিছু সাহেবি তাই  
ওঠ-বোস মস্ত করো। ইংরেজের পায়ে দেশ বিকিয়ে  
দিয়েছ, ভাব-ভাষাও বিলিয়ে দাও।

নিমে দত্ত বলছে, I read English, write  
English, talk English, speechify in  
English, think in English, dream in  
English.

সেইখানে ঠাকুর এলেন খাঁটি দিশি বাঙলার  
জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বললেন, 'চার দিকে বড় গোলমাল।  
কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোল ছেড়ে  
মালটি নেবে।'

ঠাকুর যেমন আপনি অকপট তেমনি ভাষাও অকপট।

বললেন, ‘তিনটে “স” হয়েছে কেন বলতে পারিস? শ, ষ, স—এই তিন “স” কেন? এই তিন “স”-র মানে হচ্ছে, স, স, স। মানে সহ কর, সহ কর, সহ কর। যে কোনো কাজে হাত দিস, বসিস যে কোনো সাধনায়, সহ্য করতে হবে। সহ্য না করলে সিদ্ধি নেই। এই সওয়ার বা সহ্য করার উপরে জোর দেবার জগ্গেই তিনটে “স” হয়েছে।’ বলেই একটি ছন্দ গাঁথলেন: ‘সে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।’

আগে লোকে বলত, উপমা কালিদাসস্ত, এখন দেখছে, উপমা রামকৃষ্ণ!

তার পর পোশাকটি দেখ।

এক দিকে চাঁদনির সাহেব আরেক দিকে বাগবাজারের বাবু।

বাবুর বর্ণনা দিচ্ছে নিমচাঁদ। ভোলাচাঁদকে দেখে বলছে, ‘তুমি যে বাবু সোজা বাহার দিয়ে এসেছ। মাথার মাঝখানে সিঁতে, গায় নিমুর হাফ-চাপকান, গলায় বিলাতী ঢাকাই চাদর, বিড়াসাগর-পেড়ে ধুতি পরা, গরমি কালে হোল মোজা পায়, তাতে আবার ফুল-কাটা গাটার, জুতোয় ফিতের বদলে রূপার বগলস, হাতে হাড়ের ছাণ্ডেল বেতের ছড়ি, আঙ্গুলে দুটি আংটি—’

ভোলাচাঁদ ইংরেজিতে বলছে, ‘ফাদার ইনলা গিভ সার—ইউ মাই ফাদার ইনলা সার—’

আর রামকৃষ্ণের পরনে লালপেড়ে ধুতি, গায়ে বড় জোর একটি মার্কিনের জামা, পায়ে কালো-বানিশ-করা চটি, বড় জোর কখনো কচিং হাফ-মোজা।

মণি মল্লিককে বললেন, ‘গোটা দু-এক মার্কিনের জামা দিও। সকলের জামা তো পরি না। কাপ্তেনকে বলব মনে করেছিলাম, তা তুমিই দিও।’

মণি বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল। কৃতার্থের মত বললে, ‘যে আজ্ঞে।’

কিন্তু ঠাকুর যখন ভদ্রলোক ছেড়ে ভাবলোকে আসেন তখন তিনি একেবারে দিগ্বল!

তখন তিনি মগ্নলায়তন হরি। তখন তিনি সকলেশ্বর। তাঁর ললাটফলকে কস্তুরীতিলক, বক্ষস্থলে কৌস্তভ, নাসাগ্রে নবমোক্তিক, করতলে

বেণু, সর্বদ্বন্দ্ব হরিচন্দন। তিনি অহেতুক-দয়ানিধি

তখনকার দিনের লোকেরা প্রণাম করে না প্রণাম করাকে কুসংস্কার বলে। প্রণাম না করে বলে, গুড মর্নিং। বলবার সময় তর্জনীটা একবার একটু কপালে ঠেকায়। ঘাড়টা মোটা করে রাখে। কারু কাছে মাথা নোয়ায় না। মাথা নোয়ালেই যেন মানটি খোয়া যাবে।

ওরে, মাথা নত কর। যেখানে যেটুকু গুণ দেখছিস সেখানেই তো ঈশ্বরকে দেখছিস। ঈশ্বর যে গুণগুরু। গুণাতীত হয়েও তিনি যে গুণবর্ধক। সে গুণের কাছে মাথা নোয়া। ঈশ্বরকে স্বীকার করলেই তো নিজেকে মান দিলি। যার এই মান স্বয়ং হুঁস আছে সেই তো মানুষ। যে বোঝে সে অন্তের সম্ভান নয়, অমৃতের সম্ভান, সেই তো যথার্থ মানী।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির মানে প্রণাম শেখার পাঠশালা।

বাগবাজারে বোসপাড়া গলির মোড়ে বসে আছে গিরিশ ঘোষ, ঠাকুর গাড়ি করে যাচ্ছেন সেখান দিয়ে। গিরিশকে দেখেই ঠাকুর প্রথমে প্রণাম করলেন। প্রণাম ফিরিয়ে দিল গিরিশ। ঠাকুর আবার প্রণাম করলেন তক্ষুনি। যতবার গিরিশ প্রণাম ফেরায় ততবার ঠাকুর আগ বাড়িয়ে নতুন আরেকটা প্রণাম করে বসেন। কাঁহাতক চালানো যায় এই প্রণামের প্রতিযোগিতা? ক্ষান্ত হল গিরিশ ঘোষ। কিন্তু প্রণামে ঠাকুরের নিবৃত্তি নেই। গিরিশের ধামবার পরেও আরেক বার প্রণাম করলেন ঠাকুর।

গিরিশ ঘোষ বললে, ‘দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনটার সঙ্গে প্রণামে আর টক্কর দেওয়া চলে না। ওর ঘাড় বাথা হয় না কিছুতে।’

ঠাকুর জগন্মাতাকে প্রণাম করছেন আর বলছেন, ‘ভাগবতভক্ত ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর চরণে প্রণাম, নিরাকার-বাদীর চরণে প্রণাম। সর্বতীর্থময় হরি। সর্বভূতে, সর্বজীবে প্রণাম।’

গিরিশ ঘোষ বলে, ‘রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগৎজয় হয়েছিল, কৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হয়েছিল বংশীধ্বনিতে, আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগৎজয় হবে প্রণাম-মন্ত্রে।’

নাম করো আর প্রণাম করো। প্রকৃষ্টরূপে  
সম্মতি তো প্রণাম।

আরেক হাওয়া চলছিল সে যুগে—খৃষ্টানির  
হাওয়া। যেহেতু ইংরেজের ধর্ম, সেহেতু আর কথা  
নাই, মেতে যাও। হিন্দুধর্ম মানে পুতুল পুজো,  
বেশ ছেলেখেলা। শিক্ষার আলোতে এসে ও সব  
কুসংস্কার মানতে কেউ রাজি নয়।

গীতা-উপনিষদের কেউ নাম শোনেনি। চণ্ডী ?  
সে আবার কি মাখামুণ্ডু ? চৈতন্যদেবের বাড়ি  
কোথায় তা কে জানে ? ভাগবত ? ও তো  
কথকের কথা। সে যুগে কথকের কথা মানে  
আবাটে গল্প। যদি কেউ কিছু আজগুবি কথা বলে,  
ভদ্রলোকেরা অমনি বলে বসে—এ কথকের কথা।  
ভদ্রলোকেরা শোনে না কথকতা। তার চেয়ে  
গাঁজায় দম দেওয়া ভালো।

তবে তোমরা পড় কি ?

পাদরির বাড়ি-বাড়ি বাইবেল দিয়ে গেছে,  
তাই পড়ি এক আখটু। ইংরেজিতে লেখা, বেশ  
বোঝা যায় সহজে।

দেশের কতগুলো মাখাল লোক খৃষ্টান হয়ে  
গেল। দেখাদেখি আরো অনেকে। যেন একটা  
হুজুগ পড়ে গেল। গা ভাসিয়ে দিল গডলিকায়।

বাঙালি পাদরির দল বেরুল গলির মোড়ে,  
হেদোর ধারে, কেউ বন্দ্যার গির্জের কোণে।  
কালাপাহাড় মুসলমান হয়েছিল, এরা হল শাদা-  
পাহাড়। এদের ধর্মের মধ্যে কর্ম শুধু হিন্দু  
দেবদেবীকে গাল পাড়া। সব চেয়ে ঝাল বেশি  
কালী আর কৃষ্ণের উপর। কালী ঝাংটা আর কৃষ্ণ  
ননীচোর।

শ্রোতার দল মেতে ওঠ। এক কথায় বাপ-  
পিতেমোর ধর্মকে নাকচ করে দেয়।

হিন্দুধর্ম একটা কুসংস্কার। ছত্রিশ রকম জাত  
মানে। জীলোকে আর বাসন-কোসনে তফাৎ  
হাখে না। পাঙ্কিতে বসিয়ে পাঙ্কি-শুদ্ধ জলে  
দুবিয়ে গলাস্তান করায় মেয়েদের। যিনি অনন্ত  
গকে কি না নিয়ে এসেছে ঘটে-পটে, মাটির ডেলায়।  
বার দেবতাও একটি-দুটি নয়, তেত্রিশ কোটি।

অত হিসেব সামলাতে পারব না। পাদরির  
খাই ঠিক। ঈশ্বর এক আর নিরাকার। আর  
ধর্মের অবতার যীশুখৃষ্টই একমাত্র সমুদ্রতী।

গির্জের খাতায় নাম লেখাতে লাগল দলে-দলে।  
যেহেতু খৃষ্টান হলাম সেহেতু সাহেব হয়ে গেলাম।  
তাই নিয়ে এসো মদ, নিয়ে এসো নিষিদ্ধ মাংস।

একেই বলেছে, “জাত মাংসে পাদরি এসে, প্যাট  
মাংসে নীল বাদরে।”

এখন এর উপায় কি ? সব যে যায় !

রামমোহন নিয়ে এলেন বেদান্তের বাণী, দেবেন  
ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্মধর্মে। আর কেশব  
লেগে গেল প্রচারণায়। বক্তৃতা দিয়ে ফিরতে  
লাগল। শুধু বক্তৃতা নয়, বার করল একাধিক  
পত্রিকা।

উদ্যোগগামীরা একটু ধমকে দাঁড়াল।

খৃষ্টধর্ম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে একটা আপোষ  
ঘটাল কেশব সেন। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে  
থাকো ভক্তির ভাবটি। যীশুবিহীন যীশুর ধর্ম গ্রহণ  
করো। তুলে দাও জাতিভেদ আর যদি দেশের  
মুক্তি আত্মার মুক্তি চাও, মুক্তি দাও জীজাতিকে।

বেশ ভাব। ইংরেজের ধর্ম খৃষ্টানিও আছে,  
বাপ-পিতেমোর ধর্ম হিন্দুয়ানিও আছে। চলো  
ব্রাহ্মসমাজে গিয়েই নাম লেখাই।

কেনারাম ডেপুটিকে জিগগেস করছে নিমচাঁদ :  
“তুমি তো ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দুশাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি  
দেবতার সব ত্যাগ করেছ, না, দুটি-একটি রেখেছ,  
সাত দোহাই তোমার, যথার্থ করে বলো—”

কেনারাম বললে, “আমি কেতাব না দেখে উত্তর  
দিতে পারি না। আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন  
করেছেন—”

“দূর ব্যাটা ঘটিরাম,” নিমচাঁদ ঝাঁজিয়ে উঠল :  
“তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ তা এক ঝাঁচড়ে জানা  
গিয়েছে। যখন ব্রাহ্মধর্মের সত্য হচ্ছে একমেবা-  
দ্বিতীয়ম্, তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ  
করিচিস কি না, বলতে কতক্ষণ লাগে ?”

কেনারাম চিন্তিত মুখে বললে, “একটি-আধটি  
ঠাকুর হলে খপ করে বলা যায়, তেত্রিশ কোটির  
কথা ঝাঁ করে বলা যায় না—জানি কি, যদি দুটো-  
একটা রাখবার মত হয়।”

ব্রাহ্মধর্ম বুরুক আর না বুরুক, লোক তো আগে  
ফিরুক পাদরিদের খপ্পর থেকে। হুজুগটা তো বন্ধ  
হোক।

কেশবের বাগ্মিতায় আর ধর্মসাধনায় বিশ্বাস

ফিরে এল উদ্ভাস্তদের। ঝাড়াই-বাছাই করে যদি দেশের মাঠেই পাই তবে কেন আর যাই নিদেশের মাটিতে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে নাম লিখলেই তো শুধু চলবে না, নিতে হবে নীতি আর পবিত্রতার পাঠ, সত্যনিষ্ঠা আর পরোপকারের ব্রত। “ব্যাণ্ড অফ হোপ” নামে এক দল খুলল কেশব। মদ-তামাক খাব না। ছোঁব না নিষিদ্ধ মাংস।

নিমিটাদকে শাসালো রামধন : “তুমি বসো, আমি তোমার শ্রদ্ধের আয়োজন করে আসছি।”

নিমে বললে, “ব্রাহ্মমতে কোরো বাবা। অনেক বৃষ পার করেছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভালো লাগবে না।”

এর পর আবার আরেক দল উঠল যারা ঠাকুর-দেবতাও মানে না নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, সংশয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না। হাল ছাড়া নৌকোর মতো দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেক দল উঠল, যারা প্রত্যক্ষবাদী। ধর্ম-তর্ম ধার ধারে না, ইন্দ্রিয়ের বাইরে জানে না আর কোনো অমুভূতির অস্তিত্ব।

চার দিকে বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, একটা ঝোড়ো হাওয়ার এলোমেলো ধূলো।

এমন সময় ঠাকুর এলেন। সনাতন ধর্মের শাস্ত্র জ্যোতির স্নিগ্ধতা নিয়ে, বিশ্ববিস্তীর্ণ উদার উন্মুক্তি নিয়ে। হিন্দুধর্মের উজ্জ্বল স্তম্ভ প্রতীক হয়ে নির্গলিত ভাষা হয়ে। নিয়ে এলেন শাস্তি, সামা, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সঙ্গতি, সংহতি, সমন্বয়। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে রইলেন না, এলেন একেবারে ভুবনজোড়া আসন মেলে।

নিয়ে এলেন সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্তি, ত্যাগ, সন্তোষ আর আর্জব। শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা শ্রুত আর উপরতি। নিয়ে এলেন প্রেম। প্রেমের অমোঘ মহিমা।

ভগবান ভূতভাবন হিন্দুধর্মের মন্ত্রাস্কিত পতাকা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন দক্ষিণেশ্বরে। যদা যদা হি ধর্মস্ত গ্ন-নির্ভবতি ভারত—। হতপ্রভ সূর্য উদ্দীপিত হল। ঠাকুর মৃতদেহে নিখাস সঞ্চার করলেন। ক্রমে-ক্রমে সঞ্চার করলেন আশ্বাস। তার পর সকলে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে-ভেসে চলল। ভেসে চলল সেই অমৃতের সমুদ্রে।

দক্ষিণেশ্বরের তুর্গম অরণ্যে সরল একটি ফুল ফুটেছে। কিন্তু লোকে তার গন্ধটির খবর পা: কি করে? ফুল তো ফুটলেই চলে না, চাই গন্ধবহ সমীরণ। যে বলবে, দেখ, কেমন ফুল ফুটেছে আর, শোনো, আমার সঙ্গ ধরো, দেখবে চলো কোথায় ফুটেছে এ ফুল। আমি নিয়ে এসেছি সেই কাননের ঠিকানা।

কেশব সেনই সেই গন্ধবহ সমীরণ।

বাহার

কেশব সেনকে রামকৃষ্ণ প্রথম দেখে আদি সমাজে, সে অনেক আগে। মসজিদ ঘুরে, গির্জা ঘুরে গিয়েছিল এক দিন ব্রাহ্মসভায়। গিয়ে দেখে বেদীর উপর চার পাশে অনেক লোক, মাঝখানে কেশব। ধ্যান করছে চোখ বুজে।

‘জোড়াসাঁকোর দেবেলের সমাজে গিয়ে দেখলাম, তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে। দেখলাম যেন কাষ্ঠবৎ। সেজ বাবুকে বললাম, যত জন ধ্যান করছে তার মধ্যে ঐ কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে। ও কি যে সে ছেলে? লেখাপড়া নেই, বাপের ধার মেনে নিলে এক কথায়। অণু ছেলে হলে মানত?’

কিন্তু চোখ বুজেই বা ধ্যান করতে হবে কেন? চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা কইছে তবু ধ্যান। যেমন ধরো দাঁতের ব্যথা। সব কাজ করছে কিন্তু মন রয়েছে দরদের দিকে। চোখ চেয়ে আছে, কথা কইছে, কাজ করছে, কিন্তু মন রয়েছে ভগবানে বিদ্ধ হয়ে। তিনিও আমাকে চান, আমিও তাঁকে চাই, তবু ধরতে পারছি না, মিলতে পারছি না—এ কি কম যন্ত্রণা?

এবার শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে এসে বসা, আলাপ করা, অন্তরের অঙ্গ হয়ে যাওয়া।

তার আগে কেশবকে এক দিন স্বপ্নে দেখেছিল রামকৃষ্ণ। মা-ই দেখিয়েছিলেন। কেশব যেন পেখম-মেলা ময়ূর, ময়ূরের মাথায় মুক্তো। মা-ই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পেখম হচ্ছে কেশবের শিষ্য-মণ্ডল আর মুক্তোটি হচ্ছে তার রাজসিকতার দীপ্তি।

সকাল বেলায় দিকে কেশব তার শিষ্যবৃন্দ নিয়ে পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় আস্তে-আস্তে কাছে এসে। বললে, ‘আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।’

কে আপনার মামা ?

ঐ দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। হরিকথা শুনতে বড় ভালোবাসেন। সারা দিনরাত ডুবে আছেন এই হরিকথায়। যেখানে হরিনাম পান হরিভক্ত পান সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হন। হরিগুণগান শুনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

‘কোথায় তিনি ?’

‘গাড়িতে বসে আছেন।’

‘নিয়ে আসুন নামিয়ে।’ কেশব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

হৃদয় গিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল রামকৃষ্ণকে। সবাই রামকৃষ্ণকে দেখবার জন্তে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। দেখে হতাশ হবার ভাব করল। ও! এই? এ তো এক জন সাধারণ লোক। আজ্ঞে-বাজে পাঁচ জনেরই এক জন।

রামকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছে কোন জন কেশব। বুকের ভিতরে তারে-তারে সুর বেজে উঠল।

কেশবের কাছে আসবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে পাঠিয়েছিল একবার রামকৃষ্ণ। বলেছিল, তুমি একবার যাও, গিয়ে দেখে এস তো কেমন লোক। নারায়ণ দেখে এসে বলেছিল লোকটা জপে সিদ্ধ।

রামকৃষ্ণ কেশবের কাছটিতে চলে এল। বললে, ‘বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি। তোমরা না কি দেখেছ ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?’

কেশব তন্ময়ের মত তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের দিকে। এ সে কী দেখছে? কাকে দেখছে?

বললে, ‘আপনি বলুন—’

আমি বলব? গলা ছেড়ে গান ধরল রামকৃষ্ণ।

‘কে জানে কালী কেমন,

ষড়দর্শনে না পায় দরশন,

মূলাধারে সহস্রারে

সদাযোগী করে মনন।

ঘটে ঘটে বিরাজ করেন

ইচ্ছামগ্নীর ইচ্ছা যেমন ॥

মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড

প্রকাণ্ড তা জান কেমন,

মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম,

অশ্রু কেবা জানে তেমন।

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে

সন্তরণে সিদ্ধ তরণ ॥”

গাইতে-গাইতে রামকৃষ্ণের সমাধি হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে ভাবলে এ বুঝি একটা ঢং, মস্তিষ্কের বিকার। কিংবা হয়তো লোকটার মৃগী আছে।

রামকৃষ্ণের কানে হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। হরি ওঁ! হরি ওঁ! হরি ওঁ!

ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের মুখ প্রসন্ন পবিত্র হাস্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে আশ্বাসন করে এসেছে, অবগাহন করে এসেছে এ তার মুখ। এ মুখ উপলব্ধির, সমাপতির। জ্ঞানানন্দ, বোধানন্দ আর মিলনানন্দের সংমিশ্রণ।

এ মুখের বিভা দেখে অভিভূত হয়ে গেল সকলে।

অন্ধেরা হাতী দেখে এল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে। এক জনের হাত পড়েছিল পায়ে, সে বললে, হাতী ঠিক থামের মতো। আরেক জনের হাত পড়েছিল পেটে, সে বললে, জলের জালার মতো। দূর, কুলোয় মতো—কানে হাত রেখেছিল যে তৃতীয় জন, সে বললে।

“ভাবলে ভাবের উদয় হয়।

যেমনি ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।”

গাছে এক গিরগিটি থাকে। এক জন তাকে দেখে এসে বললে, একটা সুন্দর লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। আরেক জন বললে, ভুল দেখেছিস, লাল নয় নীল। তোরা তো খুব জানিস। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি আজ সকালে, বিলকুল হলদে। বললে তৃতীয় জন। কাকে যে তোরা কী রঙ বলিস কিছু ঠিক নেই। বিজ্ঞপ করে হেসে উঠল চতুর্থ জন। শ্রেফ সবুজ, একেবারে কচু পাতার রঙ। মহাবিরোধ উপস্থিত। সবাই মিলে চলল সেই গাছের নিচে। গিয়ে দেখে এক জন লোক বসে আছে সেখানে। তাকে সবাই ধরল। আপনি তো এখানকার বাসিন্দা, বলুন জানোয়ার-টার কী রঙ? যে যেমন দেখে তেমনি। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক, ও. কখনো লাল কখনো

নীল কখনো হলদে কখনো সবুজ। ওটা বহুকালী।  
আবার কখনো-কখনো দেখা যাবে ওটার একদম  
রঙ নেই। ওটা বর্ণহীন, নিৰ্গুণ।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনে লাগল রামকৃষ্ণকে।

ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি  
ধরে দেখা দেন। এক জনের এক গামলা রঙ ছিল।  
অনেকে আসত তার কাছে কাপড় রঙ করবার  
জন্তে। যে যে-রঙ চায় তার কাপড় সেই রঙে  
ছুপিয়ে দিত। এক জন দেখছিল এই আশ্চর্য  
ব্যাপার। তাকে রঙওয়ালা জিগগেস করলে,  
তোমার কী রঙ চাই? সে বললে, 'ভাই যে রঙে  
রঙেছ আমায় সেই রঙ দাও।'

কী গভীর কথা কেমন সরস করে বলছে  
রামকৃষ্ণ। স্নানাহারের বেলা হয়ে গেল তবু কারু  
ওঠবার নাম নেই।

নিরাকার জ্ঞানের সাধন, সাকার ভক্তির।  
ভক্তির কাছে নিরাকার এনো না, কিছু দেখতে না  
পেলে ধরতে না পেলে তার ভক্তির হানি হবে।  
সাকার থেকে চলে আসবে সে নিরাকারে। আগে  
হয়তো দশভুজা নিলে—সে মূর্তিতে বেশি ঐশ্বর্য।  
তার পর চতুর্ভুজ। তার পর দ্বিভুজ। তার পর  
গোপাল—বালগোপাল। ঐশ্বর্যের বালাই নেই,  
কেবল একটি কচি ছেলের মূর্তি। তার পরে আরো  
ছোট হয়ে গেল—একটি শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম।  
তার পর? আর দরকার নেই রূপে। প্রতীক  
তখন প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন মহাব্যোমে একটি  
অখণ্ড জ্যোতি। সেই জ্যোতি দর্শন করেই লয়।

কিন্তু, তার পর? ধ্যান যখন ভাঙবে? জ্ঞানের  
পর কোথায় এসে দাঁড়াবে? দাঁড়াবে এসে  
প্রেমে। তখন আবার সাকারে চলে আসবে।  
তখন দেখবে সমস্ত জীব ঈশ্বরের প্রতিভাস।  
জীবের আকারে ব্রহ্ম বিচরণ করছেন। তখন  
ব্রহ্মোপাসনা মানে জীবোপাসনা। আর  
জীবের যা প্রেম ঈশ্বরে তাই ভক্তি। আর, ভক্তির  
প্রগাঢ় পরিপক্ব অবস্থাই প্রেম।

উপাসনার ঘণ্টা বাজল। এখন উঠতে হয় এই  
আড্ডা ছেড়ে।

কে ওঠে! কোথায় আবার উপাসনা। ভগবানের  
কাছটিতে বসাই তো উপাসনা। এ কি আমরা  
ভগবানের কাছটিতে বসে নেই?

বেদান্তের বিচারে ব্রহ্ম নিৰ্গুণ। তাঁর কী স্বরূপ  
কেউ বলতে পারে না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি সত্য  
ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানা রূপও সত্য।  
ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য।  
কবীর বলত, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার  
মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে?

নানা রকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন,  
অধিকারী ভেদে। যার যেমন পেটে সয় তেমনই  
তো পরিবেশন করবেন। বাড়িতে যদি বড় মাছ  
আসে, মা নানা রকম মাছের তরকারি রাখেন—  
যার যেটি মুখে রোচে। কারু জন্তে মাছের টক,  
কারু জন্তে মাছের চচ্চড়ি। কারু জন্তে মাছ ভাজা।  
যেটি যার ভালো লাগে, যেটি যার পেটে সয়।  
সর্বত্রই সেই মৎস্যস্বাদ।

আমাদের হলধারী দিনে সাকারে আর রাতে  
নিরাকারে থাকত। তা যে ভাবেই থাকে, ঠিক  
ঠিক বিশ্বাস হলেই হল। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস।  
গুরু বলে দিয়েছে, রামই সব হয়েছেন—'ওহি রাম  
ঘট ঘটমে লেটা।' কুকুর এসে রুটি খেয়ে যাচ্ছে।  
ভক্ত বলছে, 'রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও, রুটিতে ঘি  
মেখে দিই।' গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস।

কিন্তু যাই বলো, সাকারই বলো নিরাকারই  
বলো, তিনি রয়েছেন এই খেলের মধ্যেই। হরিণের  
নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গান্ধে হরিণগুলো  
দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথেকে গন্ধ  
আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের  
মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে  
ঘুরে-ঘুরে মরছে।

এ কি, আজ কি আর কোনো কাজ হবে না  
না কি? সবাই এমনি বসে থাকবে সারাক্ষণ?

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে আছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো  
চেয়ে আছে। চার দিকে শুধু আনন্দের ঢেউ।

'এ যেন গরুর পাশে গরু এসেছে। বাঁকের  
কই মিশেছে বাঁকে এসে। তাই এত লহর পড়েছে  
চার দিকে।'

কেশব ভক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়েছে।  
এমনটি তো সে কই গুণাবেনি। এ যে একেবারে  
'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরশ্চৈব।' ভূমার অখণ্ড অভ্যদয়।  
প্রণামের রসে আধ্বুত হল কেশব। নিজেকে

বালকের মতন মনে হল। চিনির পাহাড়ের কাছে ক্ষুদ্র এক পিপীলিকা।

নিশ্চয়ই ঈশ্বর দেখেছে, পোয়েছে, হয়েছে। নইলে এমন সব কথা কয়! কথায়-কথায় এমন একটি ভাব আনে! এমন সব সহজ করে দেয় সহজে।

ভর্কের জায়গা নেই, প্রশ্ন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্দেহ মাথা তুলতে পারছে না। চোখের সামনে বসে আছে যেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বশেষ উপলক্ষি।

উঠল রামকৃষ্ণ। যাবার আগে কেশবকে বললে, 'তোমার ল্যাজ খসেছে।'

কেশব তো অবাক।

ব্যাঙাচির যদ্দিন ল্যাজ থাকে তদ্দিন জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে পড়ে তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিস্তার ল্যাজ থাকে তদ্দিন সে সংসার-জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মস্থলে উঠতে পারে না। ল্যাজ খসে পড়লেই

সংসার ও সারাংসার দুই জায়গায়ই সে থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছ সচ্চিদানন্দেও আছ।

সংসারে থেকে যে তাঁকে ডাকে সে বীরভক্ত। যে সংসার ছেড়ে এসেছে সে তো ডাকবেই—ডাকবার জগ্গেই এসেছে, তাতে তার বাহাদুরি কি। সংসারে থেকে যে ডাকে, সে বিশ মণ পাথর ঠেলে দেখতে চায়, সেই ধন্য, সেই বাহাদুর, সেই বীরপুরুষ।

রামকৃষ্ণ চলে গেলে এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। এই সহজ সুন্দরটি কে? কে এই সদয়হৃদয়? কে এই মায়ামানুষবেশী?

চল যাই সভা করে সবাইকে বলি গে। অখিল মধুরের যিনি অধিপতি তিনি এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

তুমি কি তাঁকে চোখে দেখেছ? সবাই ঘিরে ধরে কেশবকে।

চোখে দেখেছি। দুই চোখে তাঁকে কুলায় না। চল তোরাও দেখবি চল।

[ক্রমশঃ।

## হিউম

জোসেফ হিউমের ছেলে অ্যালান হিউম, যাকে “ফাদার অব ইণ্ডিয়ান জাশানালা কংগ্রেস” বলা হয়, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জোসেফ হিউম ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য। তেরো বছর বয়স তখন অ্যালানের—তখনই তিনি আশা করেছিলেন নেভিতে গিয়ে জাহাজ-চালক হবেন এবং নিয়মদহ্ন কর্মিরূপে জাহাজে কাজ পেলেন। কিন্তু নেভি থেকে তাঁকে যেতে হল টেইলিবেবীর কলেজে। কলেজও ছেড়ে দিলেন। শিক্ষা গ্রহণ করলেন চিকিৎসা-বিভাগ। যখন কুড়ি বছর বয়স, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে ঢাকার পেলেন হিউম। তখনকার সিভিল সার্ভিস এখনকার চেয়ে পৃথক ছিল। প্রথমেই তিনি মুহুরী হয়ে পুলিশ-ক্যাড্রিতে নিয়োজিত হলেন। দু’তিন মাস যেতে না যেতেই হিউম অল্প এক খানার নগ্নব-দারোগা হলেন। দারোগা থেকে খানার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভারও পেলেন।

খানার কাজ থেকে হিউম হলেন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেট। এটোয়াতে তিনি বদলী হলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাই বিদ্রোহের সময় হিউম এটোয়াতে ম্যাজিস্ট্রেট। বয়স ছাব্বিশ বছর।

সিপাই বিদ্রোহের সময় এটোয়া হয়ে উঠেছে অজ্ঞাতম প্রয়োজনীয় গোপন—যার আয়তন প্রায় সতেরোশো মাইল এবং যার লোকসংখ্যা সাত লক্ষেরও বেশী। সমগ্র যুক্তপ্রদেশ তখন বিদ্রোহীদের কবলিত। এটাতে সৈন্যরা বিদ্রোহ কবেছে, সংবাদ পৌঁছল হিউমের কাছে। দু’দিনের মধ্যেই বিদ্রোহীরা এটোয়া আক্রমণ করলে এবং হিউমের গিলালিত যুদ্ধ সৈন্যরা মারা গেল। যাই হোক, সিপাই বিদ্রোহের

সময় হিউমের দক্ষতায় তদানীন্তন যুক্ত-বিশারদরা বিম্বিত হয়ে গেলেন। হিউম এটোয়াতে শীঘ্র শান্তি ফিরিয়ে আনলেন।

অল্প, অশিক্ষিত ও দরিদ্র এটোয়াবাসীর দুঃখে হিউম বিগলিত হয়ে পড়লেন। এটোয়াতে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করলেন। পুলিশী ব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি করলেন। আবগারী বিভাগের সংস্কার করলেন। তদানীন্তন গভর্নমেন্ট হিউম সম্বন্ধে লিখলেন: “হিউম অধীনস্থ এটোয়াবাসীর জন্য যথেষ্ট স্বার্থ ত্যাগ করেছেন এবং এটোয়াকে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত করেছেন।” ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে হিউম যুক্ত-প্রদেশে বদলী হলেন শুদ্ধ বিভাগের কমিশনারের পদ পেয়ে। যুক্ত-প্রদেশে গিয়েই হিউম স্বাধীন রাজ্যের নৃপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত করে শুদ্ধ বিভাগের বিবিধ অপ্রয়োজনীয় কাজ নিয়ম-কানুন উঠিয়ে দিলেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হিউম ভারত গভর্নমেন্টের হোম-সেক্রেটারীর পদ পেলেন। লর্ড লিটনকে সমালোচনা করার জন্য হিউমকে ঢাকারিতে ইস্তফা দিতে হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। হিউম ছিলেন যোরতর প্রাচ্যবাদী। হিউমের গ্রন্থাগার ছিল দেখাবার মত সৌন্দর্য্য। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কয়েকটি পুস্তক বিভাগ হিউমের দেওয়া গ্রন্থে সুষ্ট হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় হিউমের নাম অলঙ্কার অক্ষরে লেখা থাকবে। হিউম ভারতবর্ষকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন। হিউমের অধিকাংশ দিন কেটেছে ভারতবাসীদের উন্নতিকল্পে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই হিউম দেহত্যাগ করেন। ক্রকউড কবরস্থানে হিউম চিরনিদ্রায় মগ্ন আছেন।



# হোমন-পাণ্ডা

অ, আ, ই

বাড় বয়ে গেল হঠাৎ।

ঝড়ের বেগ তবুও থামে না। গান শেষ হ'লে গানের বেশ থাকে কানে; হাসি খেমে গিয়েও যেমন হাসি কানে বাজে; শব্দ ফুরিয়ে যায় থাকে কেবল প্রতিশব্দ; ফুল শুকোলেও পাওয়া যায় মিষ্টি সুবাস; বৃষ্টি-শেষে বয় যেমন জলো-হাওয়া—যজ্ঞি শেষ হলেও যজ্ঞির জের তবুও যায় না। কোথায় রয়েছে ঐ শুভানুষ্ঠানের চিহ্ন। কত কে দেখতে আসছে কনেকে। বিয়ে উপলক্ষে যারা এসেছিল তাদের চলে যাওয়াব পালা চলেছে। মহল থেকে আমলা-গমস্তারা এসেছিল, কয়েক জন প্রজ্ঞাও এসেছিল। দূর-দেশ থেকে এসেছিল ক'ঘর আত্মীয়। আসা-যাওয়াব পাথের নিয়ে ঘবের মানুষরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নায়েররা টাকা চুকিয়ে দিচ্ছেন বাঁর বা প্রাপ্য। হোগলার ঢালা এখনও রয়েছে। দরজা-জানলায় রয়েছে ভেলভেটের পর্দা। কার্গোপালকে যোয়ালানো লঠনগুলোও রয়েছে। যজ্ঞির অক্ষুরস্ত বাসি লুচি কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। লোকজন খেয়েও ক্ষুরোতে পাচ্ছে না। যে আসছে যাচ্ছে।

এত কিছু হ'ল, দেখলেন না শুধু কুমুদিনী।

হেমনলিনীর মুখে কাজ মিটে যাওয়ার ফিরিস্তি শুনেই বললেন,—আমি তো আর অপেক্ষা করব না ঠাকুরঝি। আমাকে যেতে হবে, আর দেৱী করা চলবে না।

—যাবে কোথায় বৌঠান! যাবো বলছ ব'লে সত্যিই যাও? তুমি? হেমনলিনীর কথায় বিশ্বাসের স্রব। বলেন,—তুমি কি জ্বেরী বৌঠান! ভুলে যাও না, ক্ষেমাঘোড়া ক'রে ভুলে যাও।

—না ঠাকুরঝি! তুমি আর বাধা দিও না। কুমুদিনীর দৃষ্টিতে কঠিন প্রতিজ্ঞা। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও, ট্রেনের খরচা পাঠিয়ে দেবে, পেয়াদা দেবে হ'জন। পৌছে দিয়ে আসবে আমাকে। যাবো আমি কাশীতে।

—কি যে বল বৌঠান! আমাকে শুনিও না, যা খুশী কর'। হেমনলিনীর কথার স্রবের হতাশা। বলেন,—ক্ষমা করতে নেই?

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কুমুদিনী। ওষ্ঠাধর কাঁপতে থাকে তাঁর। শীর্ণ মুখাকৃতি। হঠাৎ বলেন,—জানো ঠাকুরঝি, তুমি যে কিছু জানো না। ছেলে মদ খ'য়েছে, গেছে কুচ্ছিং জায়গায়। আমি শুনেছি ভালো লোকের কাছে।

—এ্যা। বিস্মিত হ'লেন হেমনলিনী।—কে বললে কে? কি বলছ' বৌঠান? কে তোমার কান ভাঙ্গলে?

হুংখের হাসি হাসলেন কুমুদিনী। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেন,—যে বলেছে তাকে আমি বিশ্বাস করি।

গালে হাত দিলেন হেমনলিনী। চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে। বললেন,—আমি ভাবি আমারই কপাল পুড়েছে। আমার স্বোয়ামী আর ছেলেরা শুধু—

—থাক্ ঠাকুরঝি, থাক্। কি হবে ব'লে? যে যাবে তাকে তুমি আমি পারবো আটকাতে? তুমি দিদি অমত কর' না। কুমুদিনীর কথায় কাকুতি। বলেন,—কাছারীতে ব'লে পাঠাও। পেরাদার হাতে টাকা পাঠিয়ে দিক।

—ক'দিন আব বাচবে বৌঠান? থাকো না আমার কাছে। কোথায় আর যাবে? অনুরোধ করেন হেমনলিনী। অজ্ঞাসিক কণ্ঠে।

—না ঠাকুরঝি। বেশ থাকবো আমি। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে পূজো ক'রবো। লক্ষ্মীটি দিদি আমার।

কোন ওজর-আপত্তি কানে তুললেন না কুমুদিনী।

ঐ দিন রাতের গাড়ীতেই চ'লে গেলেন। হেমনলিনীর পাঙ্কীতে চোপে হাওড়ায় গেলেন। হ'জন পেয়াদা পৌছে আসতে সঙ্গে গেল। মহিলাদের কামরায় গেলেন কুমুদিনী।

দুপুর বেলা। তত আর সাড়াশব্দ নেই।

লোকজন ফাঁক পেয়ে বিশ্রাম করছে। বিনোদা আব এলোকেশী খাওয়া-দাওয়া ক'রে ছুঁদণ্ড গল্প করতে বসেছে। পরস্পরের সঙ্গে ক'দিনে ভাব জমেছে বেশ। যদিও এলোকেশীকে ঠিক মনে ধরেনি বিনোদার। কুটুম-বাড়ীর লোক, নেহাৎ কথা না বললে নয়। এলোকেশীও দেখেই চিনে ফেলেছে, বুঝেছে দেমাকে মট-মট করছে মাগী। তবুও মেয়ে-স্তরফের ব'লে এলোকেশী খুসী হয়েই কথা বলছে।

বিনোদা বলছে,—আমি এয়েছি কুমুদিনীর সঙ্গে, যখন আমার বয়েস তিরিশ। তখন অল্প হাল ছিল। তখন কস্তাদের আমল। যি বলেই মনে করতো না কেউ। ঘরের মেয়ের মত ছিলুম। এখনকার মত তখন? আর বল না।

বিনোদা কথার শেষে পান খায়। দোকতা খায়।

এলোকেশী বললে,—কেন, এখনও তোমারই তো পতিপত্তি। তুমিই তো দেখাশুনো কর'। তোমাকেই তো দেখি মানে লোকজনের।

—আর ব'ল না। বলে বিনোদা।—লোকজনের মানলে কি হ'বে, ছেলে মানে? বললুম, যা মাকে ফিরে নে আয়। শুনলে? মা তো শেষ পর্যন্ত কাশীবাসীই হ'ল। আর বল' না।

—হয়েছিলটা কি? শুধায় এলোকেশী। চাপা গলায়। বলে,—কি হুংখে কাশীতে গেলো! হয়েছিলটা কি?

—পান খাবে? আপ্যায়িত করে বিনোদা। বলে,—আর ব'ল না।

—দাও খাই! দাঁত কি আর আছে যে চিবুতে পারবো!

বিনোদা বললে পা দুটোকে ছড়িয়ে,—দুঃখ ব'লে দুঃখ! বলবো না, বললে বলবে যে কান ভাঙ্গলে। ব'লে কি হবে? রূপুণী বৌ পেয়েছে, দেখি কি হয়!

কথাগুলো শুনে খতমত খেয়ে যায় এলোকেশী। সাজানো ঘর-দোর দেখে যত খুসী হয়েছিল, ক'টা কথা শুনে অল্প মেজাজ হয়ে যায়। বলে,—আমি কি আর বলতে যাবো কাউকে। বল' না দিদি, বল' না। মেয়েটাকে তো আগে থেকে ব'লে-ক'য়ে রাখতে হবে। কি হ'তে কি হয়।

বিনোদা হাসে, কৃত্রিম হাসি। হতাশা আর ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি। বলে,—তা বটে। ব'লে-ক'য়ে রাখলে তো ভালই হয়।

—শুনে যে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সিঁদোচ্ছে দিদি! এলোকেশী কথা বলে ভয়-কাতর কণ্ঠে। বলে,—কি হবে দিদি?

বিনোদার মুখে পিক। কিছু বলে না। চূপচাপ চেয়ে থাকে হতাশ-চোখে। বোঝে কাজ হয়েছে, এলোকেশী ভয় পেয়েছে। কেন কে জানে বিনোদার যেন জাতকোষ আছে। কখনও যেন সহ্য করতে পারে না কুমুদিনীর ছেলেকে। কখনও পারতো না। তবুও এখন মায়ে-ছেলেতে শত্রু-হাসানো সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। এখন তো আরও বেশী। দেখলেই সারা শরীর জ্বলতে থাকে যেন। কথা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে। বললে,—জুজুব কোথায় এখন?

এলোকেশী ক্রমশঃ অবাক হয়। বলে,—কে জানে! বল' না দিদি, তুমি যেন পেটে কথা চাপছো!

বিনোদা বলে,—বললে কি চাপা থাকবে কথা! আমিও তো বলতে চাই। তোমারও জেনে রাখা ভাল। বৌটাকে রূলে রাখলে যদি—

কথার মাঝপথে কথা থামায় বিনোদা। বিষয়টা জটিল করে তোলে এলোকেশীর কানে। এলোকেশী ভাবে এলোপাতাড়ি। গায়েব রক্ত যেন জল হয়ে যায়। কত সুখের স্বপ্ন দেখেছিল এলোকেশী রাজেশ্বরীকে জড়িয়ে। কত কল্পনা করেছিল।

—বল' না দিদি, বল' না। বললে এলোকেশী। কথায় উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে।

বিনোদা পিক গিলে ফেলে। বলে,—বলবো'খন। ব্যস্ত হও কেন?

অনন্তরাম কোথায় ছিল। হঠাৎ আসে। বলে,—বিনোদা, বৌদি ঝিকে ডাকছে। যেতে বল আগে।

—যাও দিদি, ডাকছে তোমাকে। বিনোদা যেতে বলে এলোকেশীকে। এলোকেশীর শরীর যেন কাঁপছে। অজ্ঞাত কথার প্রারম্ভ শুনেছে এলোকেশী। শুনে পর্যন্ত কেমন হয়ে গেছে যেন। উঠে যায় এলোকেশী।

—আচ্ছা মানুষ তো! তোর কি ভীমবতি ধ'রেছে? অনন্তরাম বললে এলোকেশী চলে যেতেই। বললে,—বৌটা শুনেলে রক্ষে থাকবে ভেবেছিস!

বিনোদা খিঁচিয়ে ওঠে। বলে,—কেন, লোমটা কি করেছে?

অনন্তরাম বললে,—তাখ, এতক্ষণ শুনছিলাম আমি। ঝিটাকে বিবোছিস তো? ভালটা কি হবে শুনি?

—জানি না অত-শত। বলেছি বেশ ক'রেছি। বিনোদা বলতে বলতে শুয়ে পড়ে আড় হয়ে। তেলচিটে বালিসটা টেনে নেয়।

অনন্তরাম বললে,—যা বলেছিস বলেছিস। বেশী কিছু বলিস তো কেটে দু'খানা করে ফেলবো তোকে। ব'লে রাখলাম। ভাল করতে পারবে না মন্দ করবে?

—মুখ সামলে কথা ব'ল ব'লছি। তোমার খাই না আমি। বিনোদা বলে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে।

—আমার খেলে বাঁচতে পেতিসু এতক্ষণ! যার খাচ্ছিস তাকে গাল দিবি আড়ালে? যাতে ক্ষতি হয় করবি? অনন্তরাম বললে ঘৃণার স্বরে।

—বেশ করবো। কথার শেষে পাশ ফিরে শোয় বিনোদা। কথায় যেন তাচ্ছিল্য। বলে,—কানের কাছে চেঁচামেচি ক'র না বলছি।

অনন্তরাম চূপচাপ তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। বলে না কিছু। শান করতে চলে যায় পুকুরে। আকাশের ঠিক মধ্যখানে সূর্য। পুকুরের জলে প্রতিবিম্ব পড়েছে।

শুয়েছিল রাজেশ্বরী। বাহুতে মাথা রেখে। আলুলায়িত চুলের রাশি ছড়িয়ে পড়েছিল পালঙ থেকে ভূমিতে। বোধ হয় চোখ দুটো বুজেছিল। এলোকেশী আসতেই চোখ চাইলো। বললে,—কিছু বলছো?

এলোকেশীর চোখে বিষয়। বলে,—তবে যে বললে ডাকছিস তুই?

রাজেশ্বরী বলে,—না তো। কে বললে? যা, বিশ্রাম কর গে যা। এলোকেশী বলে,—সোয়ামী কোথায়?

রাজেশ্বরী হেসে ফেলে। বললে,—বেরিয়েছে। বললে তো আসছি শীঘ্রি।

—কোথায় গেল বললে না? শুধায় এলোকেশী। রাজেশ্বরী বলে,—না। তুই ঐ বইটা দে যা দেখি আমায়। দেওয়ালের মাথায় ছিল একটা বই। পাতা-খোলা। বিয়েতে উপহার পাওয়া। বেহুলা।

এলোকেশী বই দিয়ে বিশ্রাম করতে যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে ঘরের ইদিক-সিদিক। দেওয়ালের ছবি, আসবাব-পত্র, ঝাড়-লগ্নন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলোকেশী। দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়, দেওয়ালের ছবিতে চোখ রেখে। যাদের ছবি তাদের মুখে-চোখে আভিজাত্য, দৃষ্টিতে পবিত্রতা।

—ঠাগমার কাছে যাবি কবে? এলোকেশী জিজ্ঞেস করে। কি মনে হ'তে জিজ্ঞেস করে কে জানে।

রাজেশ্বরী বলে,—বাবো শীঘ্রি। ঠাগমা ব'লেছে, ব'লে পাঠাবে। এই তো ঘুরে এলাম, ক'টা দিন বাক।

জোড়ে গেছিল রাজেশ্বরী। কাটিয়ে এসেছে ক'টা দিন। ঠাগমা বলেছেন,—খশুর-ঘরে কেই বা আছে! যা, খশুর-ঘর করণে যা। মন আঁকু-পাকু করলে আমিই যেয়ে দেখে আসবো।

এলোকেশী খানিক বাদে, কি মনে হ'তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বিনোদার কাছে যেতেও মন চায় না, কি শোনাতে কি

শোনাবে কে জানে! বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। দালানে গিয়ে অঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবে।

কাছারীতে নায়কদের মধ্যে তখন বাস্তবিতা চলছিল। সাবেকী আমলের কয়েক জন কথা কইছিলেন। হজুর বেকবর সময় টাকা নে গেছেন। বিশ-পঁচিশ হ'লে কথা ছিল না, তবিল খুলিয়ে বা পেয়েছেন তুলেছেন। কাগজের টাকা, সব সমেত হাজার দু'রেক হবে। নায়করা হতচকিত হয়ে গেছেন। কখনও এমন হয় না। এত টাকা একসঙ্গে প্রয়োজন হয় না কখনও। নায়করা বাধা দেবেন এমন সাধ্য কার হবে। হজুর স্বয়ং এখন মালিক। ম্যানেজার বাবু থাকলেও বলতে পারতেন। কেন টাকা নেওয়া হচ্ছে, পারতেন জিজ্ঞেস করতে; কিন্তু সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার বাবুও কাগজ-পত্র ব্যয় দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'রেছেন।

নায়করা বলাবলি করছিলেন টাকা কেন প্রয়োজন হ'তে পারে। বার বা মনে হচ্ছিল বলছিলেন।

ভাদ্রের প্রথম। চড়া রোদ্দুর দুপুরের। গুমোট হয়ে আছে।

কাছারীর প্রাঙ্গণে কতকগুলো কাক কা কা করছে। পাশ পাশ মুবগীর বাচ্ছা, লাফালাফি করছে হেথায়-সেথায়।

দেখতে দেখতে কতকক্ষ কেটে যায়। দুপুর গড়িয়ে যায়।

বেহুলা পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়ে রাজেশ্বরী। এলোকেশী ডাকে। ঘুম ভাঙায়। বলে,—আয়, চুল বেঁধে দি। বেলা ফুইরেছে। উঠ পড়।

ঘুম-চোখে দেখে রাজেশ্বরী। উঠ বসে। বলে,—ডাকতে হয়। কত বেলা হয়েছে বল তো!

—ডাকছি তো। মেজাজ ভাল নয় আমার। আয় চুল বেঁধে দি। এলোকেশী কথা বলে বিরক্ত হয়ে। বলে,—মা লক্ষীর কিপায় ভাল হলোই ভাল।

রাজেশ্বরী কান দেয় না এলোকেশীর কথায়। এলোকেশী সময় নেই অসময় নেই বলে এমন কত কথা। কথার শ্রোতা যে কে, কাকে উদ্দেশ্য ক'রে যে বলে এলোকেশীই জানে।

রাজেশ্বরী বললে,—শান্তড়ীর ঘর খুলিয়েছিলুম এলো। দেখলি না তো তুই!

—ডেকেছিলি আমাকে? বলে এলোকেশী।—সাজানো-গোজানো ঘর তো?

—হ্যাঁ। সাজানো ব'লে সাজানো! দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে গেলো। খন্তরের ছবি দেখলুম। রাজেশ্বরী কথা বলে বিব্বল হয়ে। বলে,—কত সাজী-জামা শান্তড়ীর। আলমারী ঠাসা।

—তুই তো পাখি। বলে এলোকেশী, কথায় লোভ ফুটিয়ে। বলে,—শান্তড়ীকে ফেরাতে হবে রাজো। যেখানেই থাক, ফেরাতে হবে। শান্তড়ী না এলে ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি।

কি বলছে সব এলোকেশী, যে-সব কথার কোনও মানে হয় না। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে ডাগর চোখ দুটোকে তুলে। বললে,—তীর্থ করতে গেছে শান্তড়ী, গেছে কানীতে। কথা বলতে বলতে

থামে রাজেশ্বরী। কয়েক মুহূর্ত। বলে,—বললে যে আসছি শ্রিত্রি! কোথায় গেছে বল তো!

বুকটা গুমরে ওঠে এলোকেশীর। কোথায় গেছে, এলোকেশী জানবে কোথেকে। এলোকেশীও তো ভাবছে, গেছে কোথায়। কতকক্ষ কেটে গেছে। সূর্য্য প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। ভাদ্রের বেলাশেষে মেঘ জমেছে ঈশানে। দলে দলে মেঘ। কোথায় যেন আছে কে কেশবতী, মুখ লুকিয়ে আছে আকাশে। বিছিয়ে দিয়েছে কৌকড়া কৌকড়া চুল আকাশের বুক। হাওয়া চলেছে মাঝে মাঝে। শিরশিরে হাওয়া।

—কোথায় গেছে বলে গেছে আমাকে? বলে এলোকেশী। কথাটা শুনে মুখটা শুকিয়ে যায়, চূপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লজ্জিত হয় কিছুটা। বলে,—ফিঁতে, কাঁটা কোথায় আছে?

এলোকেশী উত্তর দেয় না কথার। ফিঁতে-কাঁটা এনে জিজ্ঞেস করে,—এখানে বাঁধবি না ছাতে বাবি?

রাজেশ্বরী বললে,—চল' ছাতে চল'। অনন্তরামকে শুধোও দেখি, গাড়ীতে গেছে তো? আমি ছাতে আছি।

রাজেশ্বরী ছাদে যায়। ছাদে গিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে ভাল লাগে। ছাদে গিয়ে বসে রাজেশ্বরী। চুল বেঁধে দেয় এলোকেশী। একেক দিন একেক ধারার খোঁশা ক'রে দেয়।

—হ্যাঁ গাড়ীতে গেছে। শেছন থেকে বললে এলোকেশী। বললে,—কাছারী থেকে টাকা নে বাওয়া হয়েছে।

জু হুঁটো কুঁচকে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবতে থাকে কত কথা। বলে,—শিশিমার কাছে গেছে?

—জানি নে বাবা। এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। বলে,—ভাব-গতিক ভাল বুঝি না বাপু!

চূপচাপ চেয়ে থাকে রাজেশ্বরী।

অনন্তরাম কোথা থেকে আসে হঠাৎ। আসে ঝড়ের মত। বলে,—বৌদিদি, বৌদিদি! চোখে দেখবে, তুমি। তবুও—

—কি হয়েছে অনন্ত? অবাক-চোখে বলে রাজেশ্বরী। বলে,—কি হয়েছে?

অনন্তরামের চোখে জল। মুখে হতাশা, কথায় কাকুতি। বলে,—চোখে দেখেও কিছু মনে করবে তুমি বৌদিদি? হিতে বিপরীত হয়ে বাবে বৌদিদি। খৈর্য ধরতে হবে যে তোমাকে। বৌদিদি—

অনন্তরামের চোখে অশ্রুধারা। কথা শেষ না করেই চলে বাচ্ছিল। রাজেশ্বরী ডাকলে,—অনন্ত, কি হয়েছে ব'লে বাও।

এলোকেশী বলে,—হয়েছে যা, শুনে কি হবে? বুঝেছি আমি যা হয়েছে।

রাজেশ্বরী উঠে পাড়ায়। ছাদ থেকে ঘরে ফিরে আসে। এলোকেশীকে বলে,—কি হয়েছে বল' আমাকে।

এলোকেশী কিছু বলে না। বিনোদা এসে বলে,—মদে চুর হয়ে ফিরেছে যে বোয়ামী।

বজ্রাবাত হয় মাথায়। রাজেশ্বরী চোখ দুটোকে বন্ধ করে ফেলে। কম্পিত কণ্ঠে বলে,—কি হবে এলো?

এলোকেশী কথার উত্তর দেয় না। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রাজেশ্বরী পাবাণ-মূর্খির মত পাড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে

ভালপাড় হয়ে যায়। সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে ঠকঠকিয়ে। রাজেশ্বরী তাকিয়ে থাকে জানলার বাইরে। হাতের তালু দু'টো ঘেমে ওঠে। কপালের দু'শাশ কিম-কিম করে। দেয়ালে ছিল শায়না। রাজেশ্বরী দেখতে পায় রাজেশ্বরীকে। শুভ্র ধপধপে রঙ, মোমের মত গড়ন, আলুলায়িত কেশরাশি। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় রাজেশ্বরী। কি হবে দেখে রূপের ডালি? নেশা, মদ, মদ খাওয়ার নেশা! শুধু কি নেশা? মনে মনে কত প্রশ্ন জাগে। চোখ দুটোকে বিধে ফেলতে চায় আয়নায় দেখে। কত সুখ, কত হাসি, কত মিষ্টি কল্পনার জাল বুনেছিল রাজেশ্বরী। মুহূর্তের মধ্যে কি হয়ে গেল!

হঠাৎ মনে পড়েছিল গহরজানকে।

বিয়ে হওয়ার আগে থেকে কত দিন হয়ে গেছে, যেন ভুলে গিয়েছিল গহরজানকে। হঠাৎ ভেসে উঠেছে স্মৃতির পটে, গহর আর গহরজানের কথাবার্তা। কথা বলার আদব-কায়দা। দেখা হওয়ার শেষ-দিনে কত সোহাগ দেখিয়ে কথা বলেছিল গহরজান। কত হেসেছিল আর হাসিয়েছিল। আবার যাতে যায়, ভুলে যাতে না যায়, সে-জন্ত কত ক'রে বলেছিল গহরজান। ঘুম থেকে জেগেই মনে পড়েছিল গহরজানকে। কা'কেও কিছু না বলে কাছারী থেকে টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দিনমানের। আবহুল শুধু বলেছিল,—হজুর, ভুলে যাও। যেও না।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্ত হজুর দ্বিধা বোধ করেছিলেন। তবুও বলেছিলেন,—চল' চল', জরুরী কাজ আছে। আবহুল, কেউ যেন জানতে না পায়। শুধু তুমি জানো।

গহরজান দেখে প্রথমে কিছু বলেনি। বেশ কিছুক্ষণ মুখ ফিরিয়েছিল। রাগ ক'রে কথা বলেনি। গরজ গহরজানের, বেশী-ক্ষণ চুপ ক'রে থাকলে কি হয় কে জানে। কথা বলেছিল গহরজান। হাসতে হাসতেই বলেছিল। নোটের গোছা পেয়েছে গহরজান। খাওয়া-দাওয়া আর আদর-আপ্যায়িত ভুলিয়ে দিয়েছিল। লেমনেডের মিথ্যা অভ্যুহাত দেখিয়ে বাইরেছিল বেশ দামী বিলেতী। এক-আধ গেলাশ হ'লেও কথা ছিল, পুরা একটা বোতল কণেক কণেক।

আবহুল ধরাধরি ক'রে গাড়ীতে তুলেছে। নেশার রৌকে আবহুলকে কি বলতে কি বলেছে। বাড়ীতে বখন পৌঁছেছে তখন যে দেখেছে বুঝেছে নেশাচ্ছন্ন অবস্থা। দেখে শিউরে উঠেছে কেউ কেউ।

ঘরে আসতেই রাজেশ্বরী আঁচলে মুখ ঢাকে।

কৃষ্ণকিশোর ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে বিছানায়। অনন্তরাম শুইয়ে দেয়। অনন্তরাম পেছনে পেছনে এসেছিল। অনন্তরামকে বলে,—অনন্তরাম, ক্ষমা ক'র ভাই। অজ্ঞায় করেছি।

—চের হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়' দেখি। অনন্তরাম বললে ধমকের সুরে। বললে,—ভুলে যেও না, বো—

ডুগরে ডুগরে কীদে রাজেশ্বরী। হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে। আঁচলে মুখ ঢেকে। এলোেকশী দেখে-শুনে চলে যায় সেখান থেকে। বুক টাপড়তে টাপড়তে।

বিনোদা শুধু সিঁড়ির তলার ঘরে গিয়ে হাসে আপন মনে। মনের সুরে হাসে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। একেক বাঁধ খামে, আক্রোশের ভস্মীতে বলে কত কথা ফিসফিসিয়ে। কথা খামিয়ে হাসতে থাকে। বলে,—মুখে বলতে হ'ল না। চোখেই দেখতে পেরেছে।

অশান্তির ছায়া নামে বাড়ীতে। ডেকে-জানা অশান্তি।

নায়েবরা অনন্তরামকে বলেন,—পকেটে দেখ' দেখি টাকা-পয়সা কত আছে? বেরুবার সময় হাজার দুয়েক টাকা নিয়েছিলেন।

অনন্তরাম বললে আফশোষের সুরে,—বলতে হবে না আমাকে। দেখেছি আমি। একটা পয়সা নেই। হাজার দুয়েক দ্রবের কথা। কথা বলতে বলতে খানিক চুপ ক'রে থাকে অনন্তরাম। বলে,—পায়ে ঢেলে দিয়ে এসেছে। দেখতে হবে না। কি করা যায় বলুন তো?

নায়েবরা কিছু বলেন না। সকলের চোখে আশাহীন দৃষ্টি। ব্যোম্বুদ্ধ এক জন নায়েব বলেন,—আবহুলকে ডেকে ব'লে দেওয়া হোক, গাড়ী চাইলে—

অনন্তরাম বললে,—আবহুল কি করবে! তাকে বললে যদি না যায় কলকাতার শহরে গাড়ী পাওয়া যাবে না? কিন্তু যায়টা কোথায়?

নায়েবরা তৎক্ষণাৎ বলে,—হ্যাঁ, যাওয়া হয় কোথায়?

আবহুলকে ডাক পড়ে। জেরা করা হয় যেন তাকে। আবহুল ভয়ে শিউরে বলে,—হজুরকে আমি বলেছি, যেও না হজুর। ভুলে যাও। সাদি হয়েছে,—

নেশার ঝার ধীরে ধীরে কাটে।

রাজেশ্বরী বসেছিল পাশে। চোখ চাইতে রাজেশ্বরীকে দেখে মনে মনে লজ্জিত হয় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরী তখনও কীদে। চোখ দু'টো ফুলে উঠেছে। চেয়ে আছে শূন্য-দৃষ্টিতে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় ছিলাম আমি?

রাজেশ্বরী কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে,—ঘুমিয়ে পড়'।

কৃষ্ণকিশোর উঠে বসে। ঘরে আলো জ্বলে দিয়ে যায় মশালটি। শাঁখের আঁধার হয়েছে। মশা উড়ছে ভেঁ। ভেঁ। ডাকছে ঝিঁঝিঁ। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে কথা কইছে বল তো?

সত্যিই ঘরের বাইরে কে কথা বলছিল। জিজ্ঞেস করছিল,—কো কোথায়? ডাকো বৌকে।

বিনোদা ঘরের ভেতর আসে। বলে,—বট্টাকুমা এসেছে বৌকে দেখতে। ঘরে আসবে?

—বট্টাকুমা! বললে কৃষ্ণকিশোর। উঠে পড়ে বিছানা থেকে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রণাম করে বট্টাকুমাকে। বললে,—কত কষ্ট ক'রে এসেছেন? ঘরে চলুন। বট্টাকুমা। ফুলকুমারী। অশীতিপর বৃদ্ধা। ধমকের মত শরীর তাঁর বৌকে গেছে। হাসি-খুশীর মাছুর। বললেন,—ব'তে আসতে পারলাম না ভাই। কত অন্তর গেল।

বিনোদা বললে,—কেমন আছে এখন? তনলুম যে, কে সাধু ওষুধ দিয়ে ভাল ক'রে দিয়েছে?

ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে বললেন,—হ্যাঁ, স্থবিকেশ থেকে সাধুটি এসেছিলেন। কি টোটকা খাইয়ে ভাল করলে। এখন উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য্য ভাল করলে বটে!

পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ। বেঁচে উঠবেন বলে আশা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। পূর্ণেন্দ্রকৃষ্ণ এখন বলছেন,—নেশা ত্যাগ করলুম আমি। কখনও ছোঁব না।

বট্টাকুমা ঘবে আসতেই বাজেশ্বরী প্রণাম কবলে তাঁকে। ফুলকুমারী বললেন,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যে দেখছি। বোঁ করেছে বটে কুমু। কথা বলতে বলতে আঁচল থেকে খুললেন আশীর্বাদী। বললেন,—আয় তো ভাই!

বাজেশ্বরী এগিয়ে আসে। ফুলকুমারী কপালে পরিয়ে দিলেন জড়োয়া টায়রা। বলমলিয়ে উঠলো টায়রাটা লষ্ঠনের আলোয়। ফুলকুমারী বললেন,—মা কাশীবাসী হয়েছে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—হ্যাঁ। বললাম কত, শুনলে না। এখন থেকে কাশীতে থাকবে।

কুমুদিনীর চলে যাওয়ার কারণটা জানতেন ফুলকুমারী। জানতেন ছেলে যে-কীর্তি কবেছে, কুমুদিনীর কাছে অসহ্য হয়েছে। আর কিছু বলেন না ফুলকুমারী। বলেন,—এখন আমি উঠি ভাই।

—না, না, এখন যাওয়া হবে না। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কখনও তুমি আসো না। থাকো এখন।

—না ভাই। জপ-আত্মিক আছে। কথা বলতে বলতে মতিই উঠে পড়লেন ফুলকুমারী। বললেন,—পাক্কীতে পৌঁছে দিক, বল কাউকে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—চল, আমি তোমার হাত ধরে পৌঁছে দিচ্ছি।

—চলি ভাই। বাজেশ্বরীকে বললেন ফুলকুমারী।—সুবিধে পেলে যেও। কাছেই তো থাকি।

বাজেশ্বরী সায় দেয় মাথা হেলিয়ে। ফুলকুমারী কাঁপতে কাঁপতে চলেন। কৃষ্ণকিশোর হাত ধরে নিয়ে যায়।

এলোকেশী আসে। বলে,—গা ধুতে যা। রাত হয়ে গেল যে। চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বাজেশ্বরী। টায়রাটা খুলে রেখে দেয় বিছানায়। হতাশ-চোখে চেয়ে থাকে। বলে,—কি হবে এলো?

কি বলবে ভেবে পায় না এলোকেশী। বলে,—কি হবে, কি বলবো বল। তুমি যদি—

কথা শেষ হয় না। কৃষ্ণকিশোর ফিরে আসে। এলোকেশী চূপ করে যায়। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—বট্টাকুমাকে দেখলে? দেখি কি দিলে?

—এঁ যে। ইশারায় দেখিয়ে দেয় বাজেশ্বরী। টায়রাটা তুলে দেখে কৃষ্ণকিশোর। বাজেশ্বরী গা ধুতে যাচ্ছিল। কৃষ্ণকিশোর বললে,—কোথায় যাচ্ছে?

কথায় জড়তা ফুটিয়ে বাজেশ্বরী যেতে যেতে বললে,—গা ধুতে।

কৃষ্ণকিশোর দেখে বোঝে যে, বাজেশ্বরী বোধ হয় বুঝেছে কিছু কিছু। মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে। টায়রাটা দেখতে দেখতে

কি মনে হয়। লুকিয়ে ফেলে কৃষ্ণকিশোর। রাখে এমন জায়গায় যে, কেউ দেখতে পাবে না। কি উদ্দেশ্যে রাখে কে জানে!

অনন্তরাম হঠাৎ কথা বললে,—আসব আমি?

চমকে ওঠে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—কে, অনন্তরাম?

—হ্যাঁ। কাছারী থেকে বলে পাঠিয়েছে যে, টাকা দু'হাজারের খরচ লেখাবে না? কি কি খরচ হয়েছে বলবে আমাকে?

কথাগুলো শুনে মুখটা শুকিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্তে। জু হুঁটো কুঁচকে ওঠে। বলে কৃষ্ণকিশোর,—খরচা লেখাতে হবে না। বল' যে দিয়ে দিয়েছি, বিলিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেললে অনন্তরাম। বললে,—আমাকে কিছু দেওয়া হোক না। কাঁকে দেওয়াটা হ'ল?

—বাকি ইচ্ছে হয়েছে। বললে কৃষ্ণকিশোর।—কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

অনন্তরাম বললে,—ছি, ছি, কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? তুমি এখন খোদ-কর্তা হয়েছে। তবুও লেখা থাকলে কাছারীতে—

কথা শেষ করতে দেয় না অনন্তরামকে। বলে,—বলছি তো দিয়ে দিয়েছি।

হেসে ফেলে অনন্তরাম। শব্দহীন হাসি। হাসি দেখতে পায় না কৃষ্ণকিশোর। আরাম-কেন্দ্রার দেহ এলিয়ে দিয়েছে। পেছন থেকে কথা বলছিল অনন্তরাম। বললে,—তবে, হাজার হাজার টাকা যদি ঘড়িক ঘড়িক বিলিয়ে দিতে থাকো—

কথাটা শেষ করে না অনন্তরাম। খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। হাসে শব্দহীন হাসি। মনে মনে বলে,—তুমি বলবে না, আবহুল যে বলে দিয়েছে!

অনন্তরাম ফিরে তাকিয়ে দেখে বাজেশ্বরী। ফিস-ফিস করে বলে,—বৌদিদি তুমি!

—খরচা পেলে অনন্ত? শুধায় বাজেশ্বরী।

—উঁহ। বললে অনন্তরাম। বললে তবে তো! বললে যে বিলিয়ে দিয়েছি।

বাজেশ্বরী বললে,—কি হবে অনন্ত? নেশা করছে কবে থেকে?

—বললে তবে তো! বলে কিছু? মা থাকতে। বলে অনন্তরাম। বলে,—আমি যাই। শুনতে পেলে—

বাজেশ্বরী ঘরে ঢুকে বললে,—কোথায় বেরিয়েছিলে?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—বিশেষ কাজ ছিল। কাছারীর কাজে।

অনন্তরাম সোজা আস্তাবলে যায়। আবহুলকে ডাকে। বলে,—মিঞা, কে জোগাড় করে দিলে বল' তো? কে চেনালে?

আবহুল সাদাসিধা মানুষ্য। রেখে-ঢেকে কথা কয় না। বলে,—ধরতে পারলে না অনন্ত? তুমি ধরতে পারলে না? বসির জোগাড় করে দিয়েছে।

অনন্তরাম বললে,—তুমি দেখেছো জেনানাকে? উঁচু জাতের না—

—হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। আচ্ছা দেখতে আছে। বয়স ভি বেশ কমতি আছে। গরাণহাটাতে কোঠি লিয়ে আছে।

—গরাণহাটা? আড়ং যে আবহুল! বললে অনন্তরাম। বললে,—কি করা যায় বল' তো?

—আল্লা জানে। বললে আবহুল।—আমি কি বলবো? তুমি বল'না ভজ্জবকে। বুলিয়ে বল'না। আমার তো মন-মেজাজ খাবাপ হয়ে গেছে।

—বোঝালে বোঝে! বলে কি মাকেই তোয়াক্কা করলে না। ঘনস্তবাম বলে।—বোঝী কিছু বললে বলবে যে যাও হঠাৎ যাও।

—ঠিক বাত আছে। ডর তো ঐ আছে। আবহুল বলে।  
‘অনস্তবাম’ তবুও বলে,—কি করা যায় বল'তো? মেয়েটাকে গিয়ে বলবো আমি? বলবো যে—

হেসে ফেললে আবহুল। হাসতে হাসতে বললে,—কি হ'বে ব'লে? কুছ, ফায়দা হবে না। শুনে হাসবে।

গহবজ্ঞান তখন মাসীকে জড়িয়ে ধ'রে খুশীতে উপচে পড়ছে যেন। মুখে হাসিবি ঝিলিক তুলে বলছে,—মাসী, কইতে না কইতে বাকা! আমি ভাবি, ক'দিন হ'ল আসা-যাওয়া করলে, কৈ টাকা কৈ ফেলে!

নোটগুলো গুনছিল মাসী। বুড়ো আঙুলে খুঁখু মাথিয়ে গুনছিল। গুণতে গুণতে বললে,—ভাগ ঘরের ছেলে। শুধু নেবে, দেবে না, হয় কখনও! দিলে তো দিলে হু'হাজার না বলতেই দিয়ে গেল। খাও এখন কদিন খাবে!

গহবজ্ঞানের পাশে ছিল ডালিম। থেকে থেকে চুমু খায় গহবজ্ঞান ডালিমকে। বলে,—ডালিম, ডালিম, ডালিম!

মাসী বললে,—কবে আসবে কিছু বললে?

গহবজ্ঞান বলে,—বললে আসবে। সুবিধে পেলেই আসবে।

নোটগুলোকে তুলে রাখতে ওঠে মাসী। বলে,—ঠিক কথা। বসন্ত লোক হলে খুশীমত আসতো। সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে তো। যা হোক, ভুই মুখ-হাত ধুয়ে আয়। খেতে দি তোকে।

—সৌদামিনী আছে?

কে ডাকে। কান খাড়া ক'রে শোনে হু'জনে, গহবজ্ঞান যার সৌদামিনী। সৌদামিনী বলে,—কে বল'তো?

গহবজ্ঞান আলুখালু বেশে বসেছিল। শাড়ীটা জড়িয়ে নেয় ঝক-পিঠে। বলে,—মালুম হচ্ছে না তো। দেখো না তুমি।

—সৌদামিনী। সৌদামিনী আছে?

—হ্যাঁ। কে? ঘর থেকে উত্তর দেয় সৌদামিনী। বলে,—কি ডাকছে?

—আমি ঘোষাল। বলে আগজ্জ্বক।

—ঘোষাল, কি মনে ক'রে? সৌদামিনী বলে।

—কথা আছে। দেখা দাও, তবে তো। যাবো আমি? ঘোষাল বললে।

—হ্যাঁ। সৌদামিনী বলে।

মাধব ঘোষাল। ঘোষালকে দেখতে বেশ। মাথায় বাবরি। কাপানো গোক। চোখে সূক্ষ্ম। কদ'রও। ছিপছিপে চেহারা। দশ চল্লিশের কাছাকাছি। বয়স হ'তে না হ'তে ঐতগুলো পড়ে গেছে। মদ খেয়ে খেয়ে ক্ষয়ে গেছে ঐত। বাধানো ঐত। গানে আতরের তুলো। মটকার জামায় কিরোজা পাখরের

বোতাম। হাতে কৌচানো কাঁচির ধুতির কোঁচা। সৌদামিনীকে দেখেই বললে,—গহর কোথায়? খন্দের আছে। বসাবে?

—দেবে কত? সৌদামিনীর কথায় গুমরের শব্দ। বলে,—কত দেবে কত?

ঘোষাল বাবরিতে হাত বুলিয়ে বললে,—গান-বাজনা শুনে, থাকবে রাতভোর। হু'তিন জন। দেবে হয়তো টাকা বিশ-ত্রিশ।

—খ্যাংরা মারো! মুখ ঘুরিয়ে নেয় সৌদামিনী। বলে,—তোমার কত থাকবে ঘোষাল?

ঘোষাল হাসে। বাধানো ঐতগুলো দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে ঘোষাল,—সাত-আট টাকা। বসাবে তো বল', ডাকি তবে?

—ত্রিশ টাকায় কি হ'বে? সৌদামিনী বলে,—গান শুনে যাক, ত্রিশ টাকা দিক।

—চল্লিশ? ঘোষাল বলে।

সৌদামিনী ঘুরে ঐতায়। বলে,—দেখি, গহর যদি রাজী থাকে। গহরজ্ঞান উঠে গিয়েছিল পাশের ঘরে। মুখ-হাত ধুতে যাচ্ছিল গামছা হাতে ক'রে। সৌদামিনী চুপি-চুপি বললে কি যেন। গহরজ্ঞান আপত্তি জানালে মাথা হুলিয়ে। বললে,—না মাসী না। যে টাকা দিচ্ছে তাকে আমি ঠকাবো? হাটিয়ে দাও ঘোষালকে।

—চল্লিশ টাকা দেবে বলছে। সৌদামিনী হাল ছাড়ে না। বলে,—চল্লিশটা টাকা!

চ'টে যায় গহরজ্ঞান। বলে,—না।

সৌদামিনী বোঝী জোর করে না। হু'হাজার টাকা হাতে পেয়ে জোর করবার মুখ থাকে না। বলে,—হ্যাঁ, দি বিদেয় ক'রে দি।

ঘোষাল ভেবেছিল হয়তো চল্লিশে আপত্তি হবে না। সৌদামিনী বলবে,—ডাকো লোক। কিন্তু সৌদামিনী বললে,—ঘোষাল, হ'বে না। রাস্তা দেখ'।

মাধব ঘোষাল কৌচানো কৌচাটা ঝাড়ে। বাবরিতে হাত বুলিয়ে বলে,—আচ্ছা, কিন্তু ঘোষালকে ভুললে চলবে না মাসী! কলকাতায় ঘোষালকে চেনে না কে আছে?

সৌদামিনীর মেজাজ ক্লক হয়ে ওঠে। বলে,—আঁ গেল। বলছি হবে না!

কৌচানো কৌচাটা ঝাড়ে মাধব ঘোষাল। কি বল'তে গিয়ে বলে না। সিঁড়ি বেয়ে চ'লে যায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল গহরজ্ঞান, এখন থেকে অল্প কাকেও বসতে দেবে না ঘরে। কেনা হয়ে থাকবে গহরজ্ঞান। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল পেয়ে গেছে। পেয়েছে কত প্রতীক্ষায়, যোজ্জাখুজ্জি করেও যা মেলে না। বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, যার অল্প কেউ ভাগীদার নেই। যাকে তুষ্ট করলে ভাবতে হবে না কখনও। যাকে পেলে অপেক্ষায় থাকতে হবে না রোজগারের আশায়। গুন-গুন গান গায় গহরজ্ঞান। খুশী হয়েই গায়। গাইতে গাইতে যায় মুখ-হাত ধুতে।

মাসী টাকাটা গুণতে বসে। ভুল হ'ল না তো! মাধব ঘোষাল ততুল ক'রে দিয়ে গেল। হয়তো গণনায় ভুল হয়ে গেছে। মাসী টাকাটা গুণতে থাকে। আঙুলে খুঁখু মাথিয়ে।

কাছারীতে কে এমন আছে যে, খরচা চেয়ে পাঠায়।

উগ্র নেশা। ঘোর কাটলেও আমেজ থাকে। কড়া মেজাজ হয়ে ওঠে থেকে থেকে। কুক্কিশোর বললে,—কাছারী থেকে আসছি।

রাজেশ্বরী বললে,—আমি যাবো নাট-মন্দিরে। লক্ষ্মীপূজা হবে।  
কৃষ্ণকিশোর বলে,—ডেকে দেবো এলোকেশীকে ?  
রাজেশ্বরী বলে,—এলো ডাকবে বলেছে পূজা যখন হবে।  
এলোকেশী হাসে। বলে,—চল রাজো। পাকত ডাকতে পাঠিয়েছে।  
নাট-মন্দিরে যায় রাজেশ্বরী। পায়ে হোতা। শব্দ হয় ঝম-ঝম।

হঠাৎ দেখা পেয়ে কাছারী শুদ্ধ শুদ্ধ হয়ে যায় যেন।  
কৃষ্ণকিশোর বলে,—খবর কে চেয়ে পাঠিয়েছিলেন ?

বয়োবৃদ্ধ নায়েবদের এক জন বললেন,—আমি হজুর বলেছিলাম  
অনন্তকে। হজুর যদি পরচাটা—

—অনন্ত বলেছে খবর ? বলে পাঠিয়েছি ? কৃষ্ণকিশোর  
কথা বলে চড়া মেজাজে। বলে,—লিখেছেন খবর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ হজুর। লিখেছি দাতব্য খাতে।

লেখা-পড়া ভাল না। বাঙলা, সংস্কৃত, ইংরেজী—লেখা হ'ল  
মা একটা ভাষাও। শিক্ষায় জ্ঞান হয়, জ্ঞান হ'ল না কিছুতে।  
শিক্ষিত না হয়েও কত মানুষ আছে—সাবা হয় শিল্প ও ভদ্র।  
ভদ্র বাস্তি-বাস্তিও জানেনা না। গায় না শিখে শিখলো শুধু  
অগায়, নম্র না হয়ে হল দান্তিক। বিগতরা ছিলেন কত জ্ঞানী,  
কত বিচক্ষণ, কত শিল্প ও ভদ্র। বিগতদের কত কষ্টে অর্জিত  
টাকা-পয়সা, বর্তেছে ভাগ্যক্রমে। যথা ব্যবহার না করে উড়িয়ে  
দিতে হবে পোলামকুটিব মত।

—যদি অগায় হয়ে গিয়ে থাকে ক্ষমা কববেন হজুর। বৃদ্ধ  
নায়েবটি বলল কম্পিত কণ্ঠে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—টাকা আমার, খবর আমি করব। লক্ষ  
গণ্ডা কৈফিয়ত দিতে হবে ?

—ক্ষমা কববেন হজুর। অগায় হয়ে গিয়েছে।

অটহাসি। হঠাৎ বিকট শব্দে অটহাসে কে।

চমকে ওঠে যে যেখানে ছিল। কে হাসে এত উল্লাসে ? হাসি  
খামতে চায় না। অপরিচয় অটহাসি। কাছারীর দালানে কে, যে  
হাসছে ? লঠনের আয়ো। স্পষ্ট মানুষ চেনা যায় না।

—হজুর কাছারীতে কাজ-কর্ম দেখছেন ?

কথা শেষ কবে বক্তা হাসে। অটহাসি। হো-হো শব্দে।

—পিশেমশাই !

হ্যাঁ, শিবচন্দ্র। তেমনসিনীর স্বামী। কি খেয়াল হয়েছে  
হঠাৎ দেখা দিয়েছেন। আদিব বেনিয়ান, চুনোট-করা খান ধুতি।  
কোঁটা লুটোছে। তৈরি হয়ে বেবিয়েছেন শিবচন্দ্র। শিমলের  
যাচ্ছিলেন, গাড়ী থামিসে নেমে পড়েছেন দেখা করে যেতে।  
হাত ক'টুলা আঁট। লঠনের আলোর চিক চিক করছে। বোধ  
হয় নেশা কবছেন, সে জ্ঞান হাসছেন এত অধিক। হাসতে হাসতে  
বললেন,—ভাল আছে তোমরা ?

—হ্যাঁ। পিশীমা ভাল আছেন ? জহর, পায়া ?

—বিলকুল ভাল। কাজ দেখছেন কাছারীতে ? ড্যাম্ গ্লাড হয়েছে  
দেখে। বসবো গিয়ে পিশীকে। কথা বলছেন পিশেমশাই জোরে জোরে।  
'কাছারীতে কাজ দেখছেন' কথাটা শুনে নায়েবরা হাসলেন।  
বিদ্রোহী হসি। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন, চাপা গলায়,—  
কাছারীতে কাজ দেখছেন বটে।

পিশেমশাই বললেন,—মা চিঠি দিয়েছে ? কানীতে গিয়ে  
কোথায় উঠেছে ?

কৃষ্ণকিশোর বললে,—না। পেয়ালা হ'জন গিয়েছিল। ফিরে  
বললে, মা অনীতে ঘর ভাড়া করেছে। কে সাধুমা আছে, ঐ  
সাধুমা মাকে দেখবে বলেছে।

পিশেমশাই বললেন,—পিশীমা ব'লে দিয়েছে গাড়ীটা যখন  
হোক পাঠিও, আসবে। আমার গাড়ী তো কাজে খাটে।

—হ্যাঁ, পাঠাবো। কৃষ্ণকিশোর বলে।

পিশেমশাই বললেন—যাই তবে।

পিশেমশাই চলে যেতেই কাছারীতে যায় কৃষ্ণকিশোর। বলে,—  
পিশীমা গাড়ী চেয়েছেন। আবহুলকে বলে দেওয়া হোক।

—অবগুই ভাবে গাড়ী যাবে হজুর। বয়োবৃদ্ধ নায়েবটি বললেন।

নাট-মন্দির থেকে ফিরে রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসেছিল। ভূমিতে,  
ভেলভেটের গালচেয়। ভাবছিল কি করবে। কি করবো।  
ভাবছিল, বলবে স্বামীকে। বলবে, তুমি কাছে থেকে যা খুশী খাও।  
যেও না কোথাও। ভাবছিল বলবে, যা খেয়েছো খেয়েছো, ভবিষ্যতে—  
—বোঁ, ভাঁড়ার দেবে কে ? যাবে তুমি, দাঁড়াবে যেয়ে ?  
কথাগুলো বলে ব্রাহ্মণী। বলে ধীবে ধীরে।

—হ্যাঁ, চল যাচ্ছি। রাজেশ্বরী বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায়।  
বলে,—এলোকেশী কোথায় ?

—ডেকে দেবো ? ব'লে ব্রাহ্মণী।—দিচ্ছি ডেকে।

এলোকেশী আসে। বলে,—কি বলছিস ?

রাজেশ্বরী চুপি চুপি বলে,—কোথায় আছে ? কাছারীতে  
আছে তো ? আমি যাচ্ছি ভাঁড়ার দিতে।

এলোকেশী বললে,—খোজ করছি।

পিশেমশাই চ'লে যেতে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে কাছারীর  
দালানে। চড়া মেজাজে কথা বলেছে। নায়েব মশাইকে ডাকে  
কৃষ্ণকিশোর। বলে,—নায়েব মশাই !

নায়েব মশাই বলেন,—হজুর ! কাছে এসে বলেন,—হজুর !  
কৃষ্ণকিশোর বললে,—হয়তো বেয়াদপি হয়ে গেছে। ভুলে  
যাবেন, যদি—

কথার মাঝেই কথা বলেন নায়েব। কাঁচুমাচু হয়ে বলেন,—  
হ্যাঁ, হজুর। ভুলে গেছি।

খুশী হয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। ঘরে গিয়ে দেখে, এলোকেশী  
রয়েছে। বিছানা করছে। বললে,—তোমাদের মেয়ে কোথায় ?

বোমটা টানে এলোকেশী। বলে,—ভাঁড়ার দিতে গেছে।

বলতে বলতে রাজেশ্বরী এসে দাঁড়ায়। এলোকেশী বেড়িয়ে  
যায় ঘর থেকে। কৃষ্ণকিশোর বললে,—ভাঁড়ার দিতে গিয়েছিলে ?

মুখটা খম-খম করছে। চোখ দু'টো বুঝি ফুলে উঠেছে একটু।  
রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ।

কাছে এগিয়ে যায় কৃষ্ণকিশোর। রাজেশ্বরীকে টানে বুকের  
কাছে। জড়িয়ে ধরে বলে,—কত কথা আছে।

রাজেশ্বরী ফুঁপিয়ে ওঠে। চেয়ে থাকে ডায়া-ডায়া চোখ তুলে।  
যে-চোখে টাটকা কাজল। [ ক্রমশঃ ]

## আখ্যান

বীরেশ্বরের বিয়ে হয়েছে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। ফুলশয্যার পরদিন দুপুরবেলা নববধূসহ শ্বশুরালয় থেকে গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। বিদায়ের ক্ষণে মেয়ে যত কাঁদে মেয়ের বাপ তাঁর চেয়ে বেশী। নতুন জানাতাকে জড়িয়ে ধরে বার বার করে বললেন—

“সুবি আমার মা-মরা মেয়ে, বড্ড চাপা। মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলবে না। ওর মুখ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে ওর কখন কি চাই।”

বীরেশ্বর তখন থার্ড ইয়ারের ছাত্র। মনে মনে হেসে ভেবেছিলেন, নে আর এমন শক্ত কী?

বোধ হয়, শক্ত হতোও না। কিন্তু বিপর্যয় ঘটলো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার হাত ছিল বীরেশ্বরের। পাঠশালায় বিভ্রাভাসকালে শ্লেটে দিবানিদ্রারত পণ্ডিত মশায়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনের দ্বারা সহপাঠীদের কৌতুক ও অধ্যাপকের ক্রোধ উদ্বেক করেছেন অনেক দিন। বালাকালের নানাবিধ বায়ুরোগ উপগমের বহুপরীক্ষিত চিকিৎসা—প্রচুর তিরস্কার ও প্রচুরতর কর্ণমর্দন—হলো নিষ্ফল। গুরুজনের মুষ্টিযোগের মুষ্টিযোগ বার্থ করে চিত্ররোগ অনড় হয়ে রইল বীরেশ্বরের প্রকৃতিতে।

অগ্নিদাহের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত হয় বায়ুবেগ; উচ্ছৃঙ্খল ধনীনন্দনের সঙ্গে বন্ধু। বীরেশ্বরের সঙ্গে যোগ দিলেন তার এক আত্মীয়। মণি পিসিমা বয়সে নবীন, রুচিতে আধুনিক এবং স্বভাবে মধুর। কলেজের ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন তাদের বাড়ি। ভ্রাতৃপুত্রের অঙ্কনচাতুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মুখে দিলেন উৎসাহ, হাতে দিলেন উপহার,—ছবি আঁকার এক প্রস্থ রং এবং এক গুচ্ছ তুনি।

অতঃপর বীরেশ্বরকে সংযত রাখা আর কোনো মতেই সম্ভব হলো না। স্কুলের খাতা, অঙ্কের বই, মায় সংসারের ধোবার হিসাব ও দাদামশায়ের জমা-খরচের জাবেরা বিভিন্ন রেখায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল; ঘরের দেয়াল, আলমারীর কপাট, এমন কি, গৃহপালিত মার্জারশাবকগুলি পর্য্যন্ত বিচিত্র রংএর প্রলেপন থেকে রক্ষা পেল না।

ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বীরেশ্বর এলেন কলেজে। কলকাতায়। স্কুল জীবনের আবেষ্টন ও অভ্যাস অনেক কিছুই ফেলে আসতে হলো পিছনে। ছাড়লেন না শুধু একটি। ছবি আঁকার সখ।

# জেনোভিক

যাযাবর

হোষ্টেলের অত্যন্ত ভেলেরা যখন থ্রিয়ার গার্সন ও চার্লস বোয়ের এর জীবনী মুখস্ত করে কিশা ফুটবলের মাঠে রেফারীর কর্ণ কটুক্তি ও মন্তকে বিনামা বর্ষণে বাস্ত, বীরেশ্বর তখন নিজ কক্ষে আপন মনে তুলি দিয়ে ছবি আঁকেছেন নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে দিনের পর দিন। অঙ্কনশিল্পে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছবির কোনোটা গবাক্ষপথে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেছে পথে, কোনোটা পালঙ্কের নীচে ভুলশায়ী হয়ে পরদিন ভাতোর সবেগে সংমার্জনী তাড়নায় কৈবলা লাভ করেছে আবর্জনার আধারে। কিছু সংখ্যক একত্রিত করে এক সহপাঠী কলেজের এক উৎসব-সভার আয়োজন করলো এক ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর। কে জানত যে তারই মধ্যে লুক্কায়িত ছিল একটি দাম্পত্য প্রেমের ভবিষ্যৎ সমাধি? গেট্রিলো প্রিনজিপ কি কখনও কল্পনা করেছিল যে সেরাজেভোয় তারই নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলিতে অন্ধুরিত ছিল ভাঙ্কনের লোকক্ষয়, কাইজারের পতন ও ভার্সাই চুক্তি?

স্থানীয় মার্কিন কন্সাল জেনারেল এসেছিলেন উৎসবে। তিনি বীরেশ্বরের ছবি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরই চেষ্টায় এক মার্কিন সংস্কৃতি সমিতি বীরেশ্বরকে দিতে চাইলেন একটি বৃত্তি। ভারতবর্ষের যে কোনো সরকারান্ত্রনোদিত চিত্রবিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সুবিধার্থে। এখানেই বিপদের সূত্রপাত।

ছয় শত ডলার। তখনকার দিনের মুদামানে দু'হাজার টাকারও কম। তিন বৎসরের ভাতা। উল্লসিত বীরেশ্বর আত্মহারা হয়ে বললেন, তিনি অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে শুরু করবেন অনায়াসে শিল্পসাধনা। কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হবেন আট স্কনে।

শুনে বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, মাথা খারাপ!

আত্মীয়েরা ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলো, “আর দেড়টা বছর গেলে পরীক্ষা। কোনো মতে সেকেণ্ড ক্লাশ অনাস নিয়ে বি, এস, সি-টা পাশ করতে



পারলে যা হোক একটা কিছু করে খাওয়ার পথ হবে।”

অভিভাবকেরা ফ্রান্সা হয়ে গর্জন করলেন, “হতচ্ছাড়া কোথাকার; ছবি এঁকে হবে কী? তাতে পেট চলে কারো?”

কিন্তু বীরেশ্বরকে তখন পোটের নেশায় পেয়েছে, পোটের কথা ভাববার অবকাশ নেই।

বীরেশ্বরের বাবা বৃদ্ধ হয়েছেন। অনেককাল রেলের স্টেশন মাষ্টার। রেলের বর্তমান অনেক বড় সাহেবকে তিনি ছোট সাহেব-কাল থেকে জানেন। তাঁরাও অনেকে তাঁকে নাম ধরেই ডাকেন। সূত্রাং আশা ছিল, কৰ্ম থেকে অবসর গ্রহণের প্রাকালে পুত্রকে অন্ততঃ শ’দেড়েক টাকা বেতনে সিগনেলার-রূপে ভর্তি করে যেতে পারবেন। বাস্। মন দিয়ে খাটলে আস্তে আস্তে প্রমোশন পেয়ে সেও কি আর একদিন এরকম মাষ্টারবাবু হবে না? কথায় বলে, বাপকা বেটা……।

কিন্তু বাপের বুদ্ধির সঙ্গে বেটার বুদ্ধি এ যুগে খুব বেশী যে মিলে এমন প্রমাণ নেই। অন্ততঃ বীরেশ্বরের মিলল না। তিনি তখন শিল্প-জীবনের কলনায় নিভোর। পুরোপুরি স্বপ্নরাজ্যে পদচারণা করছেন। সেখানে তিনি রাকেল ও লিওনার্ড দা ভিক্সির উত্তরসাধক, বটিচেলী ও পল্ গগার সগোত্র, অবনী ঠাকুর ও নন্দলালের সতীর্থ। রূপার বোতাম-ঝাঁটা সাদা জিনের কোট গায়ে টুলে বসে দিনের পর দিন ফাইভ আপ আর সিগ্নটিন ডাউনের লাইন ক্রিয়ার দিচ্ছেন নিজের জীবনে এমন দুর্ঘটনার কথা তিনি ভাবলেও শিউরে ওঠেন। মনে মনে বলেন, হুঃ। শরৎচন্দ্র যদি রেস্‌পুণের একাউন্টস আপিসে কেরানীগিরি করে দেহপাত করতেন কিম্বা সমারসেট্‌ মম্ যদি সেন্ট টমাস হাসপাতালে রোগীর নাড়ী টিপে জীবন কাটাতেন তবে পৃথিবীতে দুর্গতির আর সীমা থাকতো কি?

সুবালা তখন পিত্রালায়ে। সত্তাপ্রসূত পুত্রের জননী। বীরেশ্বরের কলেজ পরিত্যাগ ও চিত্রবিদ্যা-ভ্যাসের সংকল্প তাঁর কানেও এসে পৌঁচেছে। জনশ্রুতিতে। তিনি বিশ্বাস করেননি। এর মূলে কিছুমাত্র সত্য থাকলে পত্রযোগে বীরেশ্বর সর্ব্বাঙ্গে জানাতেন তাঁকেই—পত্নীপ্রাণের এই সহজাত বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সুবালা পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন।

হঠাৎ একদিন সংবাদ এলো। হুঃসংবাদ বলটি ঠিক। সমস্ত শুভানুধায়িগণের সছপদেশ অগ্রাহ্য করে বীরেশ্বর নিজের কলেজের পাঠ্যপুস্তক সহপাঠীদের বিলিয়ে দিয়ে চলে গেছেন বরোদায়। সেখানকার কলাভবনে সুরু হয়েছে শিল্পের সাধনা। কিছুটা উৎসাহ ও উত্তেজনায়, কিছুটা বা প্রতিকূলতার আশঙ্কায় আত্মীয় স্বজনকে লেখেননি কিছু।

বর্ষীয়সী হিতাকাঙ্ক্ষিণীর দল সুবালাকে অনেক পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন, চিঠি লেখো। কেউ বললেন, টেলিগ্রাফ। কেউ বা উপদেশ দিলেন, একেবারে বরোদায় সশরীরে উপস্থিতির। এমন কি, তাঁর স্বশুরেরও ইচ্ছা ছিল পুত্রবধূ কণ্ঠের তিরস্কারের দ্বারা বীরেশ্বরকে এই অপরিণামদর্শিতা থেকে নিরস্ত করুন। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে সুবালা স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সকাতর অনুরোধ, সক্রোধ ভৎসনা, সখেদ অশ্রুপাত দূরে থাকুক, কখনও পত্রে বা বাঁচনিক আলোচনায় এ প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র করলেন না বীরেশ্বরের কাছে। জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে সুবালার কথা যদি বীরেশ্বরের মনে না পড়ে থাকে তবে তিনি কি উপযাচিক। হয়ে তাঁকে তা স্মরণ করাতে যাবেন? ছিঃ। যে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি আপন স্ত্রী এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন মর্মান্তিকরূপে উদাসীন হতে পারে সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তির সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হতেও তাঁর আত্মসম্মানে বাধে। হুঃসহ হুঃখের সূত্রী বৈদনায় আপনার চতুর্দিকে এক অপরিণীম উদাসীনতার দুর্লভা প্রাচীর রচনা করলেন তিনি। আপন অভিমানের যে দুর্ভেদ্য দুর্গে নিজেকে তিনি অলক্ষ্যে অপসারিত করলেন তার প্রবেশদ্বার বীরেশ্বরের কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। নিশ্চিতরূপে। চিরকালের জন্য।

শিল্পশিক্ষার মধ্যপথে বীরেশ্বরের ভগ্নহৃদয় পিতা লোকান্তরিত হলেন। সুবালার দাদারা দুজনেই কৃতী এবং সহোদরার প্রতি গভীর স্নেহপরায়ণ। তাঁদের আগ্রহ ছিল সপুত্র সুবালাকে নিজেদের সংসারে সমাদরে ও সমস্মানে গ্রহণ করা। সুবালা সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে ভর্তি হলেন ট্রেনিং কলেজে। বি. টি পাশ করে এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কৰ্ম সংগ্রহ করলেন সম্পূর্ণ আপন উছোগে।

আর্ট স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে দীর্ঘ দীন বীরেশ্বরের অর্থগণের পন্থা প্রশস্ত ছিল না। এদেশে চিত্রকরেরা সতটা নাম পায়, ততটা ইনাম পায় না। বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁদের সুখ্যাতি থাকে অজস্র। কিন্তু সে কবলি শব্দ, তার পিছনে অর্থ নেই। কচিং কদাচিং মাসিক পাত্রে ছ'একখানা ছবি মুদ্রণের দ্বারা যে উপার্জন হয় সেটা উচ্চারণ করতে বিনা রংয়েই চিত্রকরের কর্ণদ্বয় রক্তিম হয়ে ওঠে।

বীরেশ্বরের জীবনেও সে অধায় গেছে। সেই অসচ্ছলতার দিনে আপন উপার্জনের দ্বারা সংসার-বাত্রাকে সুবালাই সচল রেখেছিলেন। বীরেশ্বর কখনও জানতেও পারেননি কী ভাবে সংগৃহীত হয়েছে তার নিজের ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ, পুত্রের সেন্ট জেভিয়ার্সে অধ্যয়নের ব্যয়, কেমন করে ঘটেছে প্রাত্যহিক আহাৰ্য্যের নিয়মিত ভদ্রোচিত আয়োজন, কোথা থেকে এসেছে রোগীর পথ্য, চিকিৎসকের দক্ষিণা, এবং প্রয়োজন হলে বায়ুপরিবর্তনের সমুদয় অর্থ।

ধীরে ধীরে বীরেশ্বরের ভাগা প্রসন্ন হয়েছে। আজ তাঁর মাসিক উপার্জন অনেক বিলাত প্রত্যাগত ব্যারিষ্টারের পক্ষেও ঈর্ষার যোগ্য। অথচ সুবালার আচরণে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। আজও তিনি তেমনি নির্বাক নৈপুণ্যে সংসার পরিচালনা করেন। দশটা বাজতে না বাজতে নিয়মিত বেঁটে ছাতা ও ভ্যানিটি বাগ হাতে নিয়ে ট্রামে চেপে স্কুলে যাত্রা করেন। পাঁচটায় ক্লান্ত দেহে ফিরে এসে বাবস্থা করেন বৈকালিক চা-পার্শ্বের।

স্বচ্ছলতার দিনেও এই অনাবশ্যক কুচক্রসাধনা থেকে সুবালাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয়নি। বীরেশ্বর মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অণু প্রসঙ্গের অবতারণা দ্বারা সুবালার সে আলোচনা এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে।

বেশী পীড়াপীড়ি করার সাহস হয় না বীরেশ্বরের। সংসারের অণু আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিল নেই সুবালার, একথা বীরেশ্বর পূর্বে অভিজ্ঞতার দ্বারা জেনেছেন। নিজের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থায় সবাই খুশি হয়, এটা প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সুবালার নামাত্ম সহায়তার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছেন, শুধু বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছেন। আশ্চর্য্য!

সেবার পূজার সময় একদিন মার্কেটে বীরেশ্বরের

দেখা হয়ে গেল তাঁর এক দূর সম্পর্কিত ভগিনী ও ভগিনীপতির সঙ্গে। তাঁরা দুজনে পূজার সপ্তদা করছিলেন! ভগিনী প্রশ্ন করল, “বউদির জন্ম এবার কি শাড়ী কিনলে, বীরেশ্বর দা’?”

বীরেশ্বর জবাব দিলেন, “বউদির শাড়ি? সে আমি কিনবো কেন?”

“বাঃ, তুমি কিনবে না তো কিনবে কে?”

“কেন, তোর বউদি। আমাদের সবার জামা কাপড়ই তো সে কেনে।”

বিস্মিত কণ্ঠে বোন বলে, “তোমাদের জামা কাপড় তিনি কিনতে পারেন। তা বলে তাঁর নিজেরটাও কি তিনি কিনবেন? আর যদি বা কেনেনও তা হলে আর তোমার দিতে নেই নাকি? তুমি কি কখনও বউদিকে কিছু কিনে দাও না?”

“না তো। টাকা পয়সা তো সবই তার কাছে থাকে। তার যখন যা দরকার তা সেই কিনে নেয়। আমি তো মাসের শেষে পুরো মাইনেটা তার হাতে তুলে দিয়েই খালাস।” বলে আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসেন বীরেশ্বর।

“এই তোমার বুদ্ধি? এমন না হলে আর আটটিষ্ট!” সহাস্তে মন্তব্য করলেন ভগিনীপতি।

একখান বাঙ্গালোর সিল্কের শাড়ি নির্বাচন করে ভগিনী বীরেশ্বরের হাতে দিয়ে বললেন, “নাও, এই শাড়িটা নিয়ে যাও বউদির জন্ম। ফিকে নীলের উপরে ঘন নীল আর সোনালী জরির আঁচলা, ফর্সা রঙে বউদিকে খাশা মানাবে। তেষটি টাকা দাম আজকালকার হিসেবে খুব বেশী নয়। আচ্ছা, তোমার কাছে টাকা না থাকে তো, আমি দিচ্ছি। পরে পাঠিয়ে দিও, তা’হলেই হবে।”

কিন্তু যার জন্মে শাড়ি তাঁর আচরণ একান্ত হতবুদ্ধিকর। খুশি হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে সুবালার বলে উঠলেন,

“শাড়ি কার জন্মে?”

“তোমার।”

“আমার?” আমার জন্মে শাড়ি তোমাকে কে আনতে বলেছে?”

সত্য গোপন করে বীরেশ্বর বললেন, “কেউ বলেনি। আমি নিজেই কিনেছি। ব্লু রংটা তোমাকে খুব চমৎকার.....”

বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে সুবালার বাধা দিয়ে বললেন,

“কেন, কেন, তুমি শাড়ি কিনতে গেলে আমার জন্তে?”

অপ্রস্তুত বীরেশ্বর শাড়ির পাকেটটা জীর হাতে দিতে দিতে থেমে গেলেন।

ইতস্ততঃ করে বললেন, “কিছু অন্ডায় হয়েছে কি? আমি তো ঠিক বুঝতে পারিনি। রাণী আর ওর বর সীতেশের সঙ্গে নোকানে দেখা হয়েছিল। তারা বললে.....তোমার কি পছন্দ.....”

“অন্ডায়, খুব অন্ডায়। কোনো দিন যেন তুমি আর.....” বলতে বলতে দর দর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। সুবালার ছুই নেত্র থেকে কপোলে, গণ্ডে, বক্ষে। দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন কক্ষান্তরে।

প্রত্যাখ্যাত শাড়ির পাকেটটার পানে তাকিয়ে হতবাক বীরেশ্বর দাঁড়িয়ে রইলেন একা। ইতিপূর্বে সুবালার চক্ষে জল দেখেননি তিনি কখনও। সুতরাং তার মনোবেদনার পরিমাণ অনুমান করতে পারলেন। কিন্তু হেতু খুঁজে পেলেন না। সংমারে অন্ডা লোকের জীরা শাড়ির জন্ম বায়না ধরে, গুনেছেন। শাড়ি উপহার দিলে আহত হয়ে অশ্রুপাত করে কোন রমণী?

বীরেশ্বর ভেবে ভেবে কূল পান না।

পূর্ব-পরিত্যক্ত আসনে ফিরে এসে বীরেশ্বর অর্ধ-সমাপ্ত ঘটচিত্রণ সম্পূর্ণ করতে লাগলেন। তুলি তুলে নিলেন হাতে। রক্তাভ গৈরিক বর্ণের যুৎ-কুম্ভটির গায়ে চিক্রণ শ্বেত রেখায় ছঙ্ক-ধবল একটি শঙ্খলতা একে দিলেন ধীরে ধীরে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, বহু বর্ষ আগে তাঁকে দিয়ে সুবালা ঠিক এমনি একটি শঙ্খলতার নক্সা আঁকিয়ে নিয়েছিলেন বালিশের ওয়াড়ে। সোনালী সিল্কের সূতায় তার উপরে স্বহস্তে রচনা করেছিলেন সুশ্রী সূচীশিল্পী।

কলেজ-হোষ্টেলের অপরিপাটি শয্যায় উপাধানগাত্রে এই সীবন সৌকুমার্য বহুজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে সহপাঠীদের মধ্যে প্রচুর কৌতুক পরিহাসের কারণ হয়েছিল। বিস্মৃতির অঙ্ককার গহ্বর থেকে ক্ষীণ ধারায় বয়ে আসে স্মৃদূর অতীতের উজ্জ্বল অলোকোদ্ভাসিত দিনগুলির একটু আধটু আভা, বৈশাখের অরণ্যপ্রান্তে বিগত বসন্তের দ্রুত বিলীয়মান যুহু পুষ্পবাসের মতো।

“কী হে বীরেশ্বর, তুলি হাতে নিয়ে উর্দ্ধমুখী হয়ে

আছো যে? কার ধ্যান করছো? কলালক্ষ্মীর ন. গৃহলক্ষ্মীর?” বলে সিদ্ধনাথ সহাস্ত্রে পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর চমকে উঠে পুনরায় অঙ্কনকার্যে মনোনিবেশোত্তোগ করলেন। বাম হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ঈষৎ চাপ দিয়ে টিউব থেকে তুলীর উপরে রং মাখিয়ে নিতে নিতে সলজ্জে উত্তর দিলেন, “দাদা, এ বয়সে কি আর কোন লক্ষ্মী বর দেবেন যে, ধ্যান করবো?”

“ঠিক বলেছ ভায়। আমাদের বয়সে লক্ষ্মী সরস্বতীকে ডেকে আর কাজ নেই। তার চেয়ে বরং নন্দী মামাকে ভজনা করা ভালো। খুসী হয়ে যদি ‘ছ’চার হন্দর সিদ্ধি পাঠিয়ে দেন তো এই কন্ট্রোলার দিনে ব্ল্যাক মার্কেট করে কিছু গুছিয়ে নিতে পারি। হাঃ, হাঃ হাঃ।” সিদ্ধনাথের অট্টহাস্য প্রায় সিকি মাইল দূর থেকে শোনা যায়।

বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায় সিধুদা? মিসেস সেন কম করে হোক অন্ততঃ তিনবার তোমার খোঁজ করেছেন।”

“ওঃ, তাই নাকি? বড়ই অন্ডায় হয়েছে দেখছি! আর বল কেন ভাই, গিন্নী সেই থিয়েটারের নাম শোনা ইস্তক আজ একমাস ধরে রোজ ছবেলা শাসাচ্ছেন, তিনি অভিনয় দেখতে আসবেনই। যতো বলি, আমার ছু লাইনের পার্ট, প্রায় যত সৈনিকের ভূমিকা বললেই চলে। সে আর দেখে কী হবে? তত তাঁর জেদ বাড়ে। মনে মনে বোধ হয় ঠাউরেছেন যে, নিশ্চয়ই রাজপুত্র-টুত্র সেজে এই বৃদ্ধ বয়সে কোন সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে প্রেম করবো, তাই তাঁকে দেখতে দিতে চাইনে। হাঃ, হাঃ হাঃ” বলে আর একদফা উচ্চ হাস্য করলেন সিদ্ধনাথ।

সিদ্ধনাথ মিত্র একটা বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। দিলদরিয়া গোছের লোক। পঞ্চাশ অতিক্রম করেছেন বছর ছু তিন হবে। কিন্তু এখনও বয়সের তর্জ্জনী সঙ্কেতের দ্বারা আপনাকে তারুণ্যের অলকাপুরী থেকে বার্দাকোর রামগিরিতে নির্বাসিত করেননি। খেলাধুলা, গান-বাজনা, অভিনয়, আবৃত্তি সর্ব্ব বিষয়েই তাঁর উৎসাহ অসাধারণ। কোনটাতেই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা বিশেষ নেই, কিন্তু অন্ডা আর পাঁচজনকে একত্রিত করে একটা কিছু জাঁকিয়ে তোলার কাজে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তুলির রেখার উপরে দৃষ্টি রেখে অন্ধনরত বীরেশ্বর বললেন, “বেশ তো, আসুন না।”

“তুমি তো ভায়া বলেই খালাস। এদিকে আমাকে যে এখানকার ব্যবস্থা ফেলে রেখে ছুটে হয়েছ বাড়িতে। এত করে বললাম, পাশের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে এসো। না, আমাকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসা চাই। বলেন, অথ কোন সাধারণ সিনেমা, থিয়েটারে আর কাউকে নিয়ে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে আমার বন্ধুবান্ধবদের ব্যাপার, আমার সঙ্গে না এলে নাকি তাঁর সম্মানের হানি ঘটে। কী আর করি? ছজুরাণীর হুকুম তো না মেনে রক্ষে নেই।” বলে সিদ্ধনাথ অসহায় কাতরতার ভঙ্গি করলেন। কিন্তু এই কপট অভিযোগের অন্তরালে স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রীতির যে সুনিশ্চিত প্রমাণ তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে পরিষ্কৃত হলো সেটা বীরেশ্বরের মতো অমনোযোগী মানুষের পর্যাস্ত দৃষ্টি এড়ায় না।

“তোমার শ্রীমতী আসছেন কখন?” সিদ্ধনাথ জিজ্ঞাসা করেন।

বীরেশ্বর সংশয়ের স্বরে বললেন, “কী জানি, আসবেন কি না—”

“আসবেন কি না কী হে? বলেন নি তোমায় কিছু? অবাক করলে। দেখছি, ছবিতে যত রাজ্যের সুন্দরীর মুখ এঁকে এঁকেই গেলে, নিজের স্ত্রীর মুখের পানে তাকাবার বুদ্ধি আর সময় পেলেন না? ওহে, বুড়োমানুষের কথাটা মনে রেখো, বাড়ির গিন্নীটি সবার আগে। ওসব বান্ধবী-টান্ধবী হচ্ছে বিলাতী ডিনার সুট। ফিটফাট, ধোপ ছরসুট। সঙ্কোবেলা পরে ক্লাবে, পার্টিতে যেতে মন্দ নয়। স্ত্রী হলো আমাদের সেকলে দোলাই। কাট, ছাট, ইস্তিরির জোলুস নেই বটে, কিন্তু এমন কাজের জিনিষ আর নেই ভাই। গ্রীষ্মে কাঁধে চাপালে, শীতে গায়ে জড়ালে, রোদ রুপিতে মাথায় বাঁধলে।” বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উৎফুল্ল হয়ে আর এক প্রস্থ অট্টহাস্য করলেন সিদ্ধনাথ। তারপর বীরেশ্বরকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব গাভীর আরাপ করে উপদেশ দিলেন।

“না হে, যা বলছি শোন। একুনি বাড়ি চলে যাও, বউমাকে নিয়ে এস। বুঝেছি, একটু মনান্তর হয়েছে আর কি। সে কিছু নয়। এক সঙ্গে ঘর করতে গেলে অমন হয়েই থাকে। এই আমারই

দেখ না, গিন্নির সঙ্গে কথা কাটাকাটি তো এক রকম লেগেই আছে। তা বলে একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের চলে কি? এক দণ্ডও না। শাস্ত্রকারেরা তো বলেই গেছেন,—অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে—কী হে পুরো কথাটা?”

সিদ্ধনাথ বাস্তব মানুষ। বেশীক্ষণ একস্থানে স্থির হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবে নেই। ইতস্ততঃ ছুটোছুটি না করলে তাঁর মনে স্বস্তি থাকে না। “যাই দেখিগে এদিকে সাজ পাষাকগুলি ঠিকমতো এসে পৌঁছেছে কি না। মিসেস সেন যা উতলা মানুষ। হয় তো বা এরই মধ্যে গাড়ি নিয়ে ছুটেছেন দোকানে!” বলে দ্রুতপদে নিজাকান্ত হলেন।

বীরেশ্বরের হলো কী? তাঁর হাতের তুলি চলতে চায় না কেন? মালতীর পদশব্দে তাঁর খেয়াল হলো প্রায় মিনিট দশেক তিনি তুলি রেখে দিয়ে নিঃশব্দে নিজস্ব বসে আছেন। আত্মস্থ হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকার শ্রাবণ দিনের অপরাহ্ন বেলায় ছিন্ন মেঘের অন্তরাল থেকে অকস্মাৎ বিচ্ছুরিত এক ষলক সূর্য্যাকিরণ যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরণীর দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করে তোলে, বীরেশ্বরের মনেও তেমনি হঠাৎ যেন এক বিষয়কর উপলব্ধির আলোকে নবীন অনুভূতি দেখা দিল। তাই তো, বাড়ি গিয়ে নিজে স্ত্রীকে নিয়ে এলে হয়। কী আশ্চর্য্য, একথাটা তো এর আগে খেয়াল হয়নি।

অসমাপ্ত অন্ধনকার্য্যের ভার মালতীর হস্তে গ্রাস্ত করে তিনি চললেন মলী সেনের সন্ধানে।

বেশী দূর যেতে হলো না।

মলী সেন বুঝি বীরেশ্বরের খেঁজেই আসছিলেন। এগিয়ে গিয়ে বীরেশ্বর বললেন, “মিসেস সেন, আমাকে একবার বাড়ি যেতে.....”

বাক্য সমাপ্ত করার অবকাশ পেলেন না। মলী সেনের মুখের পানে তাকিয়ে অর্ধ পথেই থেমে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,

“ব্যাপার কী মিসেস সেন? কী হয়েছে?”

“এই দেখুন কাণ্ড” বলে মলী সেন বীরেশ্বরের দিকে একটি পুস্তিকা এগিয়ে দিলেন।

অভিনয়ের প্রোগ্রাম।

অভিজাতগণের অভিনয়োৎসবে অভিনয়ের পরিচয় পুস্তিকা—প্রোগ্রামটি—একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। অবশ্য তাতে অভিনয় সংক্রান্ত তথ্য অতি সামান্যই

থাকে। এক পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বাবসায়ীর বিজ্ঞাপন, কোনোটা জড়োয়া গহনার, কোনোটা বিলাতী প্রসাধন দ্রব্যের, কোনোটা বা সিগারেট বা চা বিক্রেতার। অপর পৃষ্ঠায় প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পনির্দেশক ইত্যাদির নাম। পৃষ্ঠান্তরে অভিনয়ের কোন বিশেষ ছ'একটি দৃশ্যের আগের ভাগে তোলা ফটোগ্রাফ এবং নায়ক-নায়িকাদের পোট্রেট।

এ ধরনের অভিনয় যাঁরা হামেশাই দেখেন, তাঁরা জানেন, প্রোগ্রামে মুদ্রিত কোন কোন মহিলার ফটোগ্রাফস্থ তথ্যদেহের সঙ্গে তাঁদের বর্তমান যৌবন বপুর মিল অতি সামান্যই আছে। সেটা আশ্চর্য্য নয়। কারণ সেগুলি অন্ততঃ সাত-আট বৎসর পূর্বে তোলা ও ফটোশিল্পী কর্তৃক সংমার্জিত—ইংরেজীতে যাকে বলে রিটাচড্—ফটোগ্রাফ। প্রোগ্রামে মুদ্রণের জন্তই সময়ে নির্বাচিত। আসলে সেগুলি—মা যাহা ছিলেন; মা যাহা হইয়াছেন নয়।

মুদ্রণ পারিপাট্য ও গঠন সৌষ্ঠবে অনেক ক্ষেত্রে অভিনয়ের চাইতে অভিনয়ের প্রোগ্রামটিই অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষক হয়; আধুনিক ইভিনিং পার্টিতে অধিকাংশ মেয়েদের রূপের চাইতে পোষাকের মতো।

এই অভিনয়েরও একটি মনোহারিণী পরিচয় পুস্তিকা রচনার জন্ত মলী সেনের ব্যগ্রতার অবধি ছিল না। বহু দিন বীরেশ্বরের সঙ্গে তার পরিকল্পনা, আকৃতি ও মুদ্রণ সম্পর্কে তিনি বহু জল্পনা কল্পনা করেছেন। উভয়ের সম্মিলিত চিন্তা, যত্ন ও নৈপুণ্যে অবশেষে এমন একটি সুচিত্রিত পুস্তিকার পরিকল্পনা চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয় যাতে রুচি এবং রূপের অতি প্রশংসনীয় সমন্বয় ঘটেছিল। মলী সেনের আশা ছিল, বহু বর্ষে চিত্রিত ক্রিস্মাস্ কার্ডের মতো এক টাকা মূল্যের এই সুদৃশ্য প্রোগ্রামটিও অভিনয়ান্তে অন্ততঃ কিছু কালের জন্ত কোনো কোনো দর্শকজনের ড্রয়িং রুমে মেটেলপীসের শোভা বর্ধন করবে। হায়, তার পরিণতি দেখে মলী সেনের প্রায় দুঃখে কান্না পাওয়ার উপক্রম। ক্রোধে বীরেশ্বরের বাক রোধ।

বহু বাবহারে ক্ষয়প্রাপ্ত অতি পুরাতন আংশিক ভগ্ন টাইপে মুদ্রিত, মফঃস্বল আদালতের নীলাম

ইস্তাহারের মতো অস্পষ্ট, অপরিচ্ছন্ন। অভিনেত্রী, অভিনেত্রীগণের ছবিগুলি বিকৃত ও মসীলিপ্ত। অতীতের কোনো কোনো বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে ছবি সম্পর্কে কিম্বদন্তী এই যে, বায় সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র ব্লকের নীচে আবশ্যকানুযায়ী কেবল মাত্র পরিচয় লিপি বদলিয়ে বিভিন্ন জননেতার প্রতিকৃতি চালানো হতো। বালগঙ্গাধর তিলক বক্তৃতা করিতেছেন এবং সি, কে, নাইডু বাট করিতেছেন—এ ছুটি ছবির ব্লক একই, তফাৎ শুধু ক্যাপশানে। এই প্রোগ্রামে ছবি দেখে সে জনবীরের কারণ অনুমান করা চলে। অতি নিকট আত্মীয়গণের পক্ষেও এই ছবি থেকে ছবির পাত্রপাত্রীদের সনাক্তকরণ দুঃসাধ্য। কাণ্ডই বটে। প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বললেই হয়।

ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, “প্রেসের ম্যানেজারকে ধরে চাবকানো দরকার। এ কি আট পেপার, এ তো সিলকেশান—আসল আট পেপারই নয়। ইমিটেশান। এই কাগজে আট শ্লেট ছাপা চলে?”

মলী সেন এসব টেকনিকাল ব্যাপার সামান্যই বোঝেন। তিনি মিনতি করে বললেন, “এ প্রোগ্রাম তো কারো হাতে দিতে পারবো না। যা হয় একটা উপায় করুন, বীরেশ্বরবাবু।”

বীরেশ্বর বললেন, “সে কথা ঠিক। কিন্তু আমাকে যে এখন একবার বাড়ি যেতে হচ্ছে মিসেস সেন।”

“বাড়ি এখন থাক, বীরেশ্বরবাবু, আপনি একবার না হয় প্রেসেই গিয়ে দেখুন, যদি কিছু করা যায়।”

“প্রেসে অল্প কাউকে পাঠালে হয় না? সুবালাকে—মানে আমার স্ত্রীকে একবার……”

বাধা দিয়ে কাতর কণ্ঠে মলী সেন বললেন, “অল্প আর কাউকে দিয়েই একাজ হবে না। দোহাই আপনার বীরেশ্বরবাবু। এক্ষুনি একবার গাড়িটা নিয়ে যান, এই প্রোগ্রাম নিয়ে কাউকে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না। আর দেবী করবেন না। প্লিজ।”

উর্দ্ধ্বাশ্রমে বীরেশ্বরকে ছুটতে হলো ছাপাখানার উদ্দেশ্যে। সুবালার রইলেন,—কোথায়? ঠিক যেখানে ছিলেন সেখানে। [ ক্রমশঃ ]

### -প্রচ্ছদপট-

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কোনারকের স্বর্ধ্য-মন্দিরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি জে, আর, সেনগুপ্ত (কলি-২২) কর্তৃক গৃহীত।



## দু'টি অভিভাষণ

বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে

স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অভিভাষণ

আজ এই ইনস্টিটিউট উৎসর্গ করিলাম। ইহা শুধু গবেষণাগার নয়—মন্দির। আমাদের ইন্দ্রিয় সাহায্যে প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা কল্পিত উপায়ে অনুভব-গ্রাহ্য এই বিরাট বিশ্বের মধ্য দিয়া যে সত্য উপলব্ধি করা যায়, সেই সকল প্রতিষ্ঠার জন্ম পদার্থ-বিজ্ঞানসম্মত শক্তি প্রয়োগ করা হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য শব্দ যখন শ্রবণশক্তির বাহিরে চলিয়া যায়, তখনও আমরা কল্পনায় অনুভব করিয়া থাকি। মানুষের দৃষ্টিশক্তি যেখানে চলে না, সেখানে অদৃশ্য জগতেও আমরা সত্য জানিবার চেষ্টা করি। আমরা যাত্রা দেখিতে পাই না, তাহাট বিরাট, তাহাও তুলনায় আমরা যাত্রা দেখিতে পাই, তাহা সামান্য, নগণ্য। মানুষের ইন্দ্রিয় পূর্ণ নয় বলিয়া সে বিরাট অজ্ঞাত সমুদ্রে হুঁসাত্তিক অভিযান চালায়। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্ম বিজ্ঞান যে সমস্ত উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও বাহিরেও অনেক সত্য থাকিয়া যায়। সে সকলের জন্ম আমাদের আবশ্যক বিধাসেব; সে বিধাসেব পরীক্ষা কয়েক বৎসরে হইবার নয়, সমগ্র জীবন ভরিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে হয়। যে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্ম বিশ্বাস আবশ্যক হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত শ্রুতিমন্দির হিসাবে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। যে ব্যক্তিগত—সাধারণও বটে—সত্য ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার শ্রুতি এই মন্দির, তাহা এই যে, কেহ কোন মহান কাণ্ডে জীবন সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিলে ঋদ্ধতার মুক্ত হয়, তাহা প্রথমে অসম্ভব মনে হয়, তাহা তখন তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।

৩২ বৎসর পূর্বে আমি বিজ্ঞানের অধ্যাপনা পেশারূপে গ্রহণ করি। এইরূপ বলা হইত যে, ভাবতবাসীদের মন অদ্বিত ভাবে ঐত বলিয়া তাহা প্রকৃতির তব পথ্যালোচনায় নিযুক্ত না হইয়া পার্থক্যিক গবেষণার দিকেই বরাবর আকৃষ্ট হইবে। অনুসন্ধান ও ঠিক লক্ষ্য করার ক্ষমতা থাকিলেও সে সকলের ব্যবহারেব সুযোগ দেয়া না। যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী অথবা দক্ষ প্রকৌশলিকও ছিল না। কিন্তু আমরা সেই জাতিব লোক, যাহারা প্রকৃতি সমস্ত উপায়েই মহান কার্য সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

গবেষণা কাণ্ডে ব্যাপৃত হইয়া আমি আমার অজ্ঞাতসারে পদার্থ-বিজ্ঞান ও শারীর-বিজ্ঞানের সীমান্ত অঞ্চলে নীত হই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখি, উভয়ের সীমারেখা লোপ পাইতেছে এবং তেঁতন ও প্রকৃতির রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইন-অর্গানিক (অ-প্রাণীয়) দ্রব্য স্থিতিশীল ছাড়া অল্প কিছু চলিয়া মনে হয়। সার্কজমী প্রতিক্রিয়া ধাতু, উদ্ভিদ ও জীবকে

যেন একই সাধারণ নিয়মের অধীন করিতেছে বলিয়া মনে হয়। সকলের মধ্যেই যেন প্রধানতঃ শ্রাণ্ডি ও অবসাদের একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। সেই সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের ও উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং মৃত্যুর সঙ্গে যে স্থায়ী সংসদনা ভাব থাকে, তাহারও লক্ষণ দেখা যায়। আমি তাহা দেখিয়া বিশ্বাসে স্তম্ভিত হই। আমি বিশেষ আশাশ্রিত সনয়ে রয়্যাল সোসাইটির সমক্ষে আমার গবেষণার ফলাফল পরীক্ষা সহকারে প্রদর্শিত করি। সেখানে আমার বক্তব্য বলিবার পর শারীর বৈজ্ঞানিকবা আমাকে পদার্থ-বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রেই আমার গবেষণা সীমাবদ্ধ রাখিবার পরামর্শ দেন।

পূর্ববর্তী ১২ বৎসর আমাকে আশাশ্রিত অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত করিতে হয়। আমরা জীবনের এই সময়টাব উল্লেখ আমি সংক্ষেপে করিলাম এই জন্ম যে, যিনি সত্যের সন্ধান আত্মনিয়োগ করিবেন, তাহাও জানিয়া রাখা উচিত, তাহাও জীবন-পথ খুব সহজ হইবে না, তাহাকে অবিদ্যমান সংগ্রাম চালাইয়াই যাঁহিতে হইবে। তাহাকে লাভ-লোকসান, ক্ষয়-পূরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া নিজ জীবন সত্যের সন্ধান উৎসর্গ করিতে হইবে। আমার ক্ষেত্রে এই দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার হঠাৎ দূরীভূত হয়। ভারত সরকার আমাকে ১৯১৪ সালে বৈজ্ঞানিকদের দরবারে পাঠান। সেখানে আমি জগতের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সোসাইটিগুলির সমক্ষে আমার আবিষ্কারগুলি উপস্থিত করিবার সুযোগ পাই। তাহার ফলে আমার নূতন মত ও গবেষণার ফল সকল স্বীকৃত হয়। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার জ্ঞান, ভারতে সত্যানুসন্ধিস্থল অন্বেষণ কত বেশী এবং সময় সময় তাহা কিরূপ নৈরাশজনক হইয়া উঠে। ইহা সত্ত্বেও আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে, যাহারা আমার পরে এ পথে আসিবে, তাহাদের কাজ যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টকর হয়, তাহাও পথ আমি করিব এবং কয়েক বৎসরেব পরিশ্রমে যাহা পাওয়া গিয়াছে, ভারতকে যাহাতে তাহা ভাগ্য করিতে না হয়, তাহাও ব্যবস্থা আমি করিব।

ভাবত কি লাভ করিবে ও বজায় রাখিবে? পাশ্চাত্য তাহাও পারিবে প্রচেষ্টায় সফল পাইয়াছে, তাহাও ক্ষমতা ও অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছে। জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানেব প্রয়োগেব জন্ম বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রেও অনেকে সচেষ্ট। কিন্তু তাহা বক্ষার জন্ম ততটা নয়, যতটা ধ্বংসের জন্ম। সংস্রমেব শক্তির অভাবে সভ্যতা ধ্বংসের মুখে কম্পমান অবস্থায় উপনীত। মানুষ যে উন্নতির মত ছুটিতেছে, তাহার পরিণাম বিধম বিপত্তি। তাহা হইতে তাহাকে বক্ষা করিবার জন্ম কোনকণ সহায়তাকারী আদর্শ থাকা আবশ্যক। মানুষ তাহার দুর্ভাগ্যের প্রেলোভন ও উত্তেজনার অনুসরণ

করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সাফল্য কিসের—কোন শেষ উদ্দেশ্যের জ্ঞান—সে-কথা চিন্তা করিবার জ্ঞান সে এক মুহূর্তও খামিতেছে না। সে ভুলিয়া গিয়াছে, জীবনের প্রতিযোগিতা অপেক্ষা পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাতেই অধিক ক্ষমতা পাওয়া যায়। এ দেশে যুগে যুগে এমন সব লোকের আবির্ভাব হইয়া গিয়াছে, যাহারা সময়োপযোগী আন্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরিবর্তে জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ লাভের জ্ঞান নিষ্ক্রিয় আত্মত্যাগে নয়, সক্রিয় জীবন-সংগ্রামে ত্রুটি হন। যাহারা সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করেন, তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সফল দিয়া জগৎকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

অন্যকে প্রদান করিবার, সমৃদ্ধ করিবার, মানব-সমাজের আহ্বানে আত্মত্যাগের এই আদর্শই মানব সভ্যতার সহায়তাকারী আদর্শ। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই আদর্শের মূলে থাকে না; সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা-ত্যাগে—যে অজ্ঞান বলে, অন্যের ক্ষতি করিয়া বাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাষ্ট লাভ—সেই অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদেই ইহা ব মূল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকগণের নিকট বিভিন্ন পেশা যোগ্য কাৰ্য্যক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে। যে সকল মুষ্টিমেয় যুবক অন্তরেব বাণী উপলব্ধি করিয়া, জ্ঞানলাভের জগত জ্ঞানলাভের ও সত্য নিজে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত দৃঢ় চরিত্র ও উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাদের সমগ্র জীবনে অক্লান্ত সংগ্রাম করিয়া যাঁইবেন, আমি আমার ছাত্র হইবার জ্ঞান সেইরূপ যুবকদিগকেই আহ্বান জানাইতেছি।

আমার ইচ্ছাও ইচ্ছা, যত দূর স্থান সম্বলান হইবে বিভিন্ন দেশের কর্ম্মীরা এই ইনষ্টিটিউটে সুবিধা পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা আমি আমার দেশের প্রতিহ অল্পমাত্রায় কবিত্তেছি। ১৫ শতাব্দী পূর্বে এ দেশ জগতের বিভিন্ন দেশে-ছাত্রদিগকে নালন্দা ও তক্ষশিলায় বিজ্ঞাপাঠে সাদব অভ্যর্থনা জানাইত।

পাশ্চাত্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানলাভের যে ব্যবস্থা আছে, তাহার ফলে মূল সত্য—জগতে যে কেবল একটি সত্য থাকিতে পারে এবং একটি বিজ্ঞানের মধ্যেই এই সকল শাখা বর্তমান, ইহা লক্ষ্যপথে না পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভাবতবাসীর মন যে ভাবে ভারিতে অভ্যস্ত, তাহাতে তাহারা এক দিন এই একতার আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিবে, তাহারা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে এক সশৃঙ্খল বিশ্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাইবে। এই ভাবে চিন্তা করিতে কবিত্তেই আমি এক দিন নিজের অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সীমাব্যবায় উপনীত হই। গত ২৩ বৎসরে আমি যে ১৫০টি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কবি, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আমি এখন তাহার মধ্যে প্রাকৃতিক অঙ্কুর দেখিতে পাইতেছি।

পার্থিব দ্রব্যের ক্ষুব্ধ, জীবনের স্পন্দন, বৃদ্ধির চাকলা, স্নায়ুর তাড়না ও তাহার ফলে অমুড়িত—এ সকল কত বিভিন্ন রকমের, কিন্তু তাহার মধ্যে কি একতা! আবাস, স্নান, উত্তেজনার কম্পন শুধু স্থানান্তরিতই করা যায় না, কপান্তবিত ও দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি ছায় তাহার প্রতিবিম্বও গ্রহণ করা যায়। ইহার মধ্যে কোনটি অধিক বাস্তব—পার্থিব বস্তু অথবা তাহার প্রতিবিম্ব? ইহার মধ্যে কোনটি অবিনশ্বর—ধ্বংসের অতীত?

বৈদিক যুগে এক জন মহিলাকে তাঁহার ইচ্ছা মত ধন লইতে কল হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কি তাঁহাকে অমর

করিবে? যদি তাহা তাঁহাকে অমর না করে, তাহা হইলে তিনি তাহা লইয়া কি করিবেন? ইহাই ভারতের আত্মার চিরন্তন বাণী। অতীতে অনেক জাতির উদ্ভব হইয়াছে। তাহারা জগৎ-সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু এখন তাঁহাদের বংশের স্মৃতি—মৃত্যিকাগর্ভে প্রোথিত মাত্র কিছু ভগ্ন জিনিষপত্র। পার্থিব সম্বন্ধে নয়, উন্নত চিন্তায়; সমৃদ্ধিতে নয়, আদর্শে অমরত্বের বীজ নিহিত। সম্পদ বৃদ্ধিতে নয়, মতবাদ ও আদর্শের উদার প্রচারে প্রকৃত মানব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অশোক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদা দান করিয়া জগৎবাসীকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার নিকট অর্দ্ধ আমলকী ব্যতীত আর দিবার কিছুই ছিল না। কেহ যেন তাঁহার এই অর্দ্ধ আমলকীটি গ্রহণ করেন—ইহাই তাঁহার শেষ অনুরোধ ছিল।

এই ইনষ্টিটিউটের কার্ণিশে অশোকের সেই অর্দ্ধ আমলকী প্রতিমূর্ত্তি আছে। দর্শনিক বিশ্বের অস্তিত্ব হইতে যাহাতে দেবতাদের শক্তিবিশেষ জগৎ বস্তু নিষ্কৃত হইতে পারে, সে জগৎ সেই পূত-চরিত্র মুনি তাঁহার জীবন দান করেন। সেই বস্তুই প্রতীক সর্বোপরি স্থান পাইয়াছে। আমরা অর্দ্ধ আমলকীই কেবল দিতে পারি। কিন্তু অতীত মহত্তর ভবিষ্যৎকে দেখা দিবে। আমরা এখানে যে কার্য্যে ত্রুটি হইতেছি, তাহার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের অবিচলিত আস্থা যেন বৃহত্তর ভারত গড়িয়া তুলে।

### কায়েদে আজম জিন্নার অভিভাষণ

[নিখিল ভারত মোসলেম লীগের নেতা মিঃ এম এ জিন্না ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের জগৎ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিয়া বক্তৃতা দেন।]

মিঃ প্রেসিডেন্ট, আপনার ভাষায় আমি আপনাকে আশ্বাস দিতেছি যে, সামান্য লাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া আমরা এখানে সহযোগিতা করিতে আসিয়াছি।

আমি প্রথমেই এক দিকে গ্রেট ব্রিটেনের নৈতিক দাবী ও অপর দিকে তাহার ঋণ-বিচ্যুতির বিষয়ে বলিব। এ কথা স্বীকার করিতে আমি দ্বিধাবোধ করিব না যে, ভারতে আপনাদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক বিপুল স্বার্থ রহিয়াছে। সে জগৎ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আপনারা বিশেষরূপে স্বার্থযুক্ত পক্ষ। কিন্তু আপনাদিগকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতে আপনাদের যে স্বার্থ আছে, আমাদের তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ও অনেক অধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। আপনাদের স্বার্থ আর্থিক ও বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক, কিন্তু আমাদের নিকট উহা সর্ববিষয়ক

এখানে প্রধানতঃ ৪টি পক্ষ আছে। আমি ক্ষুদ্রতর সংখ্যালব্ধে কথা তুলি নাই—শিখ, খৃষ্টান ও অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা আছেন। কিন্তু প্রধান পক্ষ ৪টি—বুটিশ, ভারতীয় রাজহুগণ, হিন্দু ও মুসলমানগণ।

কিছু ভুল বুঝা হইয়াছে। লর্ড পীল বলিয়াছেন, অসহযোগ আন্দোলনের জগৎ তাঁহার দল বিশেষ উত্তাক্ত হইয়াছে। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন, “আমরা যদি একমত হই ও ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আপনাদিগকে উন্নত অবস্থা প্রদান করি, তাহা হইবে যাহারা তাহা ধ্বংস করিতে ইচ্ছুক, তাহারা তাহার স্বযোগ পাইবে।

আপনাদিগকে এখন ভারতের অবস্থা বুঝিতে হইবে। হিন্দু বা মুসলমান, শিখ বা খৃষ্টান, পার্শ্ব বা অল্পমত সম্প্রদায়, এমন কি, বণিক সম্প্রদায় বা ব্যবসায়ী—ভারতে এমন কোন শ্রেণীর লোক নাই, যাহারা জোরের সহিত বলে নাই যে, ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিতে হইবে। আপনাদিগকে বলিতেছেন, ভারতের এক বিশেষ প্রভাবশালী বড় দল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ধ্বংস বা উহার অপব্যবহার করিতে চায়। আমি আপনাদিগকে একটি প্রশ্ন করিব। এই দলটি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে, তাহাদিগকে যে সকল দল দান প্রদান করিতেছে, আপনাদিগকে চান, তাহারা আপনাদের নিকট হইতে এই উত্তর লইয়া ফিরিয়া যাইবে যে, একটি শক্তিশালী দল ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ধ্বংস বা উহার অপব্যবহার করিবে কিম্বা এই সম্বন্ধে কিছুই করা যাইবে না? এখানে-সেখানে জন কয়েক ব্যতীত ভারতের ৭ কোটি মুসলমান সকলেই অসহযোগ আন্দোলন হইতে দূরে থাকে, অল্পমত সম্প্রদায়ের ৩৫ কোটি হইতে ৪ কোটি লোক অসহযোগ আন্দোলনের বিবোধী; শিখ ও খৃষ্টানরাও উহাতে যোগদান করে নাই। যে দলটিকে আপনাদিগকে বড় দল বলিতেছেন, তাহারা সকল হিন্দু সমর্থন পায় নাই। এই সকল দলের সকলে ফিরিয়া গিয়া অবশিষ্টদের সহিত যোগদান করে, ইচ্ছা কি আপনাদিগকে চান? আপনাদিগকে অবস্থা ও গুরুত্ব অনুধাবন করিবেন বলিয়া আশা করি।

ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে নিকট এই বৈঠকের কার্যকলাপে আমরা যে মূল নীতি অনুসারে চলিব, তাহা উপস্থিত করিতেছি। ভারত তাহার নিজের ঘরের কর্তৃত্ব চাহে—এই মূলনীতিই বৈঠকে বরাবর আমাদের আলোচনা পরিচালিত করিবে। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভা লইয়া গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়িত্ব প্রদান ব্যতীত অঙ্গ কোনরূপ শাসনতন্ত্রের ধারণা আমি কবিত্তে পাবি না। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কথা যিনিই বলিয়া থাকুন, তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন না পাওয়া পর্যন্ত কতকগুলি বিষয়ে বাদন-ধারণ থাকিবে। উহাই আমাদের মূল নীতি।

লর্ড পীল ও লর্ড রীডিংএর বক্তৃতার সাবমর্থ—কিরূপ তৎপত্তার সহিত স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে, তাহা লইয়া মতবৈধ। স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান—কোনরূপ কার্য্যে ব্যবস্থা। ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভার হস্তে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থবক্ষার ব্যবস্থা বিবেচ্য হইবে। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের কথা ধরা হউক। আপনাদিগকে যদি সংখ্যালঘুদের মধ্যে নির্দিষ্টতার মনোভাব বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে যেরূপ শাসনতন্ত্রই দান না করুন না, তাহা সাক্ষ্যের সহিত পরিচালনা করা যাইবে না। আপনাদিগকে ভারতীয় রাজস্বগণের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। মুসলমানেরা যেমন তাহাদের সম্প্রদায়ের জঙ্গ রক্ষা-কবচ চাহে, হিন্দুগণও সেইরূপ ভারতের শাসনতন্ত্রে তাহাদের স্বার্থবক্ষার দাবী চাহে।

লর্ড আরউইন তাহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, “কতকগুলি প্রকৃত সুবিধা আছে। তাহার মধ্যে কতক ভারতের নিজের অবস্থার জঙ্গ রক্ষার ঘরোয়া ব্যাপারে, আর কতকগুলি জগতের অবস্থার জঙ্গ।

এ সকলের সম্মুখীন হইতে হইবে। বৈঠকের উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয় নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে, কত দূর সম্ভব ভাল ও স্থানান্তরিত ভাবে ও খুব তৎপত্তার সহিত এই সকল সমস্যা অতিক্রম করা যাইতে পারে।”

ভারত কত দিনে স্বায়ত্ত-শাসন পাইতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট আপনি ১৯২৮ সালে লণ্ডনে ব্রিটিশ শ্রমিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব কালে বলিয়াছিলেন—

“আমি আশা করি, কয়েক মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ গণতন্ত্রের সহিত একটি নতুন ডোমিনিয়ন সংযুক্ত হইবে; সে ডোমিনিয়নটি অঙ্গ জাতির; গণতন্ত্রের মধ্যে সমান স্থান পাইয়া তাহা আত্মসম্মান লাভ করিবে;—আমি ভারতের কথা বলিতেছি।”

আপনার এই কথা সত্ত্বেও লর্ড পীল ও লর্ড রীডিংএর বক্তৃতার আসল কথা—ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সময় লইয়া এখনও মতভেদ আছে। ১৯২৮ সালের পর ২ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

লর্ড পীল বলিয়াছেন, সাইমন কমিশনের কতকগুলি সুপারিশ বিপ্লবমূলক। এদিকে কমিশনের চেয়াবমান বলিতেছেন, ভারতীয় রাজস্বগণকে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে কার্য্য-পদ্ধতির আমল পরিবর্তন করিয়াছেন। অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। আমার কথা, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অতীতের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে; ভারত সরকারের ডিসপ্যাচও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় রাজস্বগণের যোগদানে ব্রিটিশ ভারতের জঙ্গ যে ঔপনিবেশিক অধিকার দায়ী কবা হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত পশ্চাতে যাইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখন সমগ্র ভারতীয় ডোমিনিয়নের কথা ভাবিতেছি। কাজেই এখন আর সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অথবা ভারত সরকারের ডিসপ্যাচের কথা ভাবিয়া কোন লাভ নাই।

পাতিয়ালাব মহারাজা ও জাম সাহেব বলিয়াছেন, নিখিল ভারত ফেডারেশনের বিষয় বিবেচনা করিবার পূর্বে কোন বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনালে তাঁহাদের অধিকার স্থির করিতে হইবে। আমি সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে বলিব, ভারত সরকারের বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রদত্ত আদেশের ফলে তাঁহাদের অবস্থা যাহাই হউক না, এই শাসনতন্ত্র এখন চালিয়া সাজা হইতেছে, তখন তাঁহাদের অধিকার স্থির করিবার জঙ্গ কাহাবও সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তাহারা এখানে তাঁহাদের অধিকারের কথা বলিতে পারেন। এই বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত হইবে, সে বিষয়ে সকলে যদি একমত হন এবং পাল্লামেন্ট যদি সে অনুসারে ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বাটলাব রিপোর্টে যাহা আছে অথবা সিমলা বা দিল্লীর লর্ড-দপ্তরে যাহা স্থির হইয়াছে, তাহা জঙ্গ কিছু আসিয়া-যাইবে না।

লর্ড পীল ও লর্ড রীডিং বলিয়াছেন, এ বিষয়ে পাল্লামেন্টকে শেষ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আমরা যদি আশা না কবিতাম যে, পাল্লামেন্ট এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগকে এখানে দেখা যাইত না। মূল পরিবর্তননা স্বরণ রাখিবেন। স্থির হয়, ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ-ভারত ও ভারতীয় সামন্ত রাজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিয়া যত দূর সম্ভব মতকো আসিবেন এবং যদি ঐক্য মতকো ঘটে, তাহা হইলে তাহারা



সে সকল প্রস্তাব পার্লামেন্টে উপস্থিত করিবেন। আপনারা কি পার্লামেন্টে ৩টি দলেবই প্রতিনিধি নন? আপনারা যদি একমত হন, তাহা হইলে পার্লামেন্টে আপনারদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আপনারা কি শঙ্কিত? এ বিষয়ে লড অ'বট্টন বলেন,—

“সমগ্রা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত করিবার যে অধিকার আছে, তাহা অধীকার করিবার কোন বাধা নাই। আবাব যে সিদ্ধান্তে বাজনৈতিক ভাবেই যে স্বেচ্ছাপ্রবোধিত সম্মতি পাওয়া যাইবে, তাহাতে উপনীত হইতে চেষ্টা করাব শুকন পার্লামেন্ট

কম করিয়া দেখিলে তাহা পার্লামেন্টের দৃষ্টির অভাব ঘটন করিবে।”

গোলটেবিল বৈঠকটি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে যে ভাবেই হউন স্বেচ্ছাপ্রবোধিত সম্মতি পাওয়া সম্ভব, তাহা ন; যে বৃটিশ প্রতিনিধিরা পার্লামেন্টের ৩টি দলেব প্রতিনিধি, তাহাদের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারিবে। এই বৈঠকের যত দূর সম্ভব ভবিষ্যত সম্মতিতে বাধা স্থির হইবে, পার্লামেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করিলে তাহা তাহার পক্ষে বিশেষ ভ্রমোৎসাহকতারই কাণ্ড হইবে।

### জনপ্রিয়তা লাভ করা যায়

আপনি কি অগ্নির কাছে আকৃষ্ট হ'তে চান? মাছুয় মাত্রেই চায় জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে, পরিচিত হ'তে। জনপ্রিয় না হলে রাজনৈতিক রাজনীতি কবতে পারেন না, ব্যবসায়ী ব্যবসা চালাতে পারেন না, বিক্রীত বিক্রী কবতে পারেন না। বাস্তব জগতে জনপ্রিয়তা না থাকলে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়। জনপ্রিয়তা অর্জন কবতে হ'লে কি ভাবে করা যায়, মনস্তত্ত্ববিদরা সে কৌশল আবিষ্কার ক'বেছেন। ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জন সম্বন্ধে প্রচুর গৃহ লেখা হয়েছে। আমাদের দেশে শুধু গুরুগম্ভীর ঘটনা লেখা হয় মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে—উদ্ভূতি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত পুস্তক-তালিকায় কণ্টকিত লেখা প'ড়ে কিছুই জানা যায় না। ইউরোপে সহজবোধ্য অসংখ্য গ্রন্থ আছে, কোটি কোটি বিক্রী হয়েছে। দেশবাসী যাদের সাহায্য পেয়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক মতে জনপ্রিয় হ'তে হ'লে :

আপনি অগ্নির কাছে আপনার দেখা বা পড়া বিষয়ক ঘটনা বিবৃত কববেন—যা শুনলে কেউ খুশী হবে। আপনি অগ্নিকে তাবিক কবতে চ'লে যাবেন না। তোষামোদী ভাল নয়, কিন্তু সত্যিকার প্রশংসা কবা কৌশল জানবেন।

দেখবেন, আপনি পরিচিত লোকদের নাম যেন ভুলে না যান। নাম ভুলে গেলে যতই পরিচয় থাক, পরিচিত জন আদর্শে খুশী হবে না। নাম এবং মুখ মনে রাখতে পারে কেউ। স্মরণীয় অভ্যাস কবতে হ'বে যাতে নাম এবং মুখ মনে থাকে। হেনরী ফোর্ড ফ্যাক্টরীর অধীনস্থ কুলিটিকে পছন্দ চিনেতেন। নাম ধ'রে ডাকতেন।

অলস পরচর্চা করবেন না বখশও। হিংসাত্মক অপবাদ ছড়াবেন না।

কথায় ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার করবেন না প্রয়োজন না হ'লে। ‘তুমি’ বা ‘আপনি’ কথা দু'টিতে জোর দিতে হবে। ‘আমি’ ‘আমাকে’ ও ‘আমাব’ শব্দ ক'টি বাতিল করতে হবে।

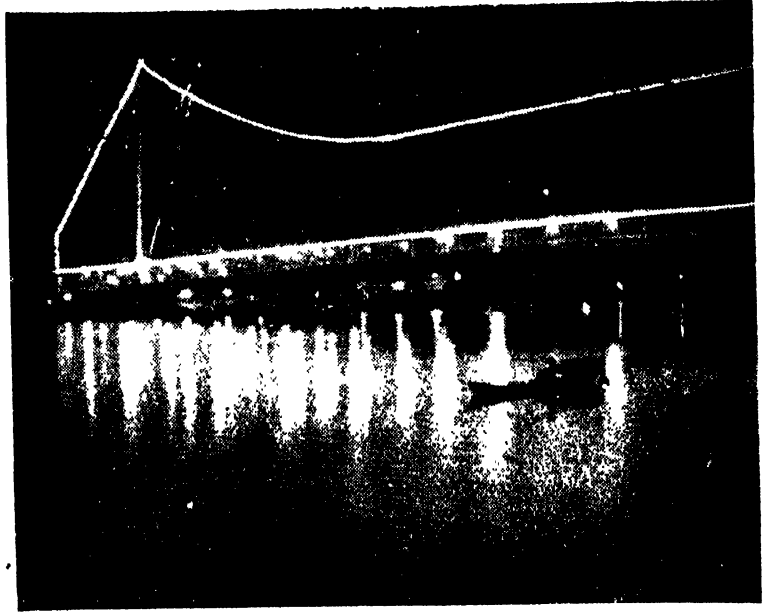
কাউকে লক্ষ্য ক'রে ঠাট্টা বা মন্তব্য করা উচিত নয়। পবিতর্কে অগ্নির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে হবে মদা-সর্দান।

ভুল কবলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার কবতে হবে। দোষ ঢাকতে চেষ্টা না ক'রে হাসতে হাসতে দোষ ক'বল কবা বুদ্ধির পরিচায়ক বেশী কথা না ব'লে বেশী কথা শুনতে হবে। চুপ ক'রে থাকতে হবে, ব'লেতে দিতে হবে অগ্নিকে। কথায় কথায় মায় দিতে হা হাসতে হাসতে। অগ্নি যখন কথা বলছে তখন কথা শুরু ক'রে ভুল করা হবে। অগ্নির মতামত অস্বীকার করলে চলবে না, নেগে নিতে না পাবলেও বলতে হবে, আপনি যা বলছেন ঠিক। আপনি যা বলছি, হয়তো ঠিক হ'লেও হ'তে পারে।

অর্থায় জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রতে হ'লে অহং ত্যাগ ক'রে হবে। মুখে হাসি রাখতে হবে। সন্তোষিতা অর্জন কবতে হবে ভাল শ্রোতা হতে হবে। গাল দেওয়ার চেয়ে গাল খাওয়ার অভ্যাস কবতে হ'বে। অজ্ঞতা প্রকাশ কবলে চলবে না। অজ্ঞতা জানিয়ে চুপ-চাপ থাকতে হবে।

একটি উক্ত উপায় কয়েক দিনে আয়ত্ত হবে না, দস্তুর মত অভ্যাস কবতে হবে। অভ্যাস হ'লে দেখা যাবে যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

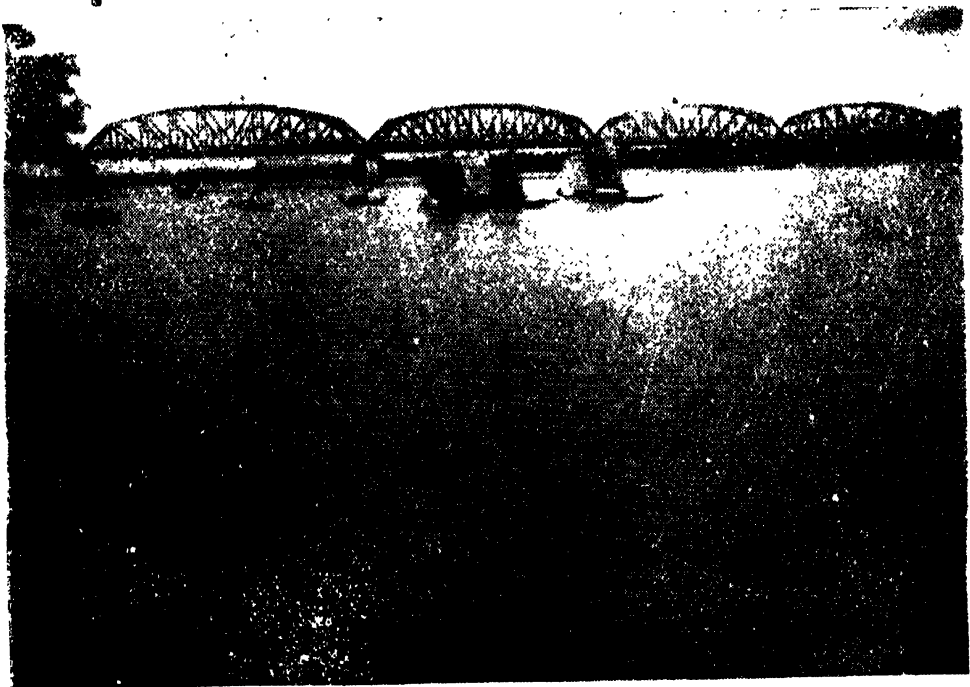
ফটো  
গ্রাফ



হাওড়া ব্রিজ

(প্রথম পুস্তক)

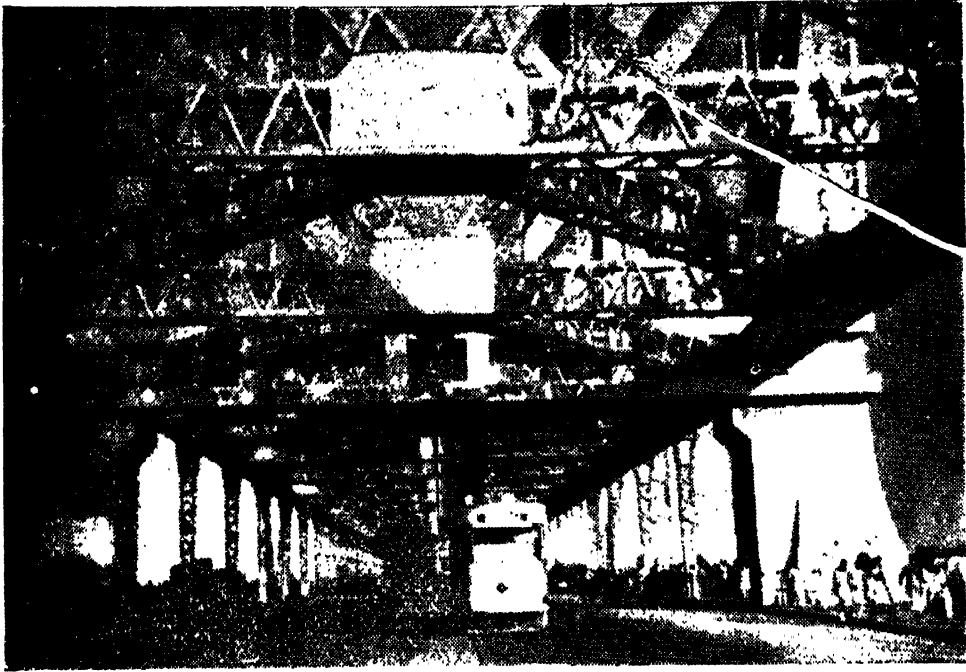
—স্বদেশ বায় (কলি-২৯)



বালি ব্রিজ

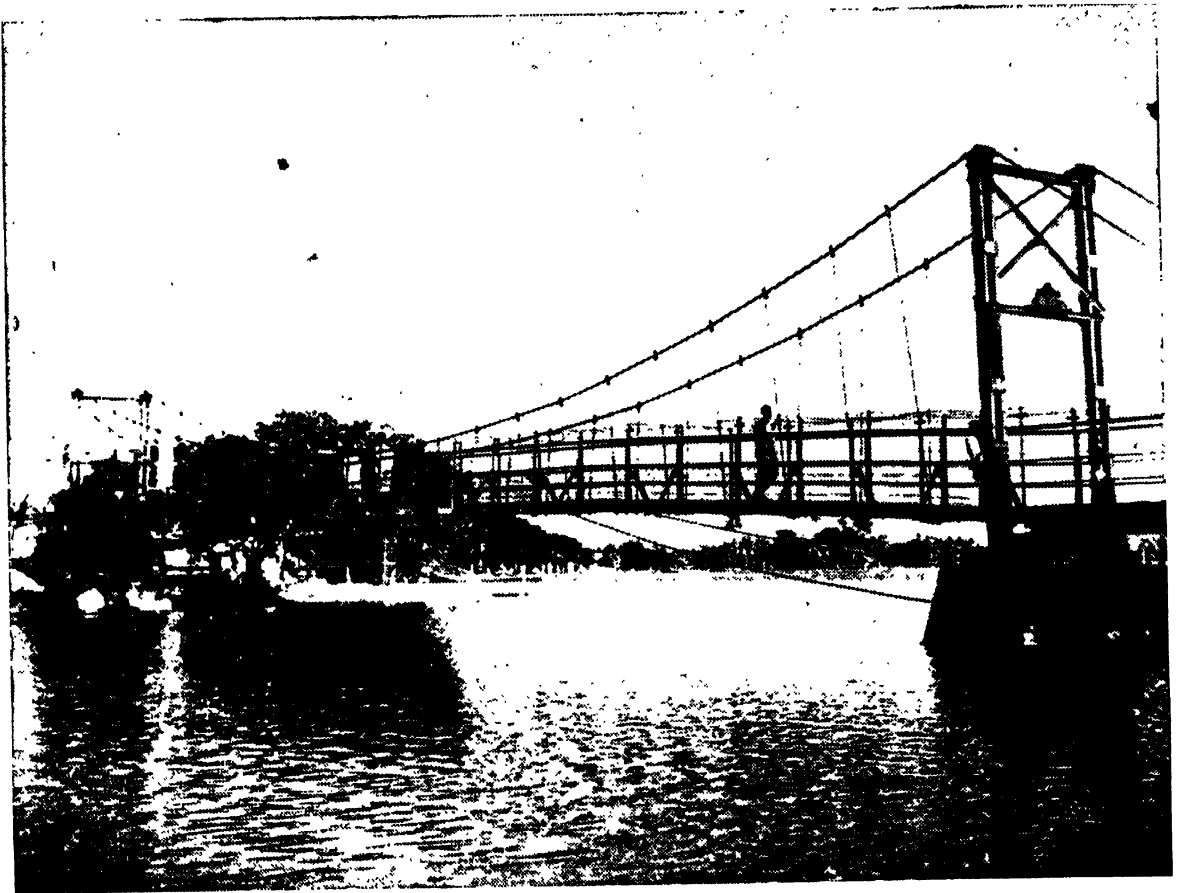
(দ্বিতীয় পুস্তক)

—কপনাবায়ণ শেঠ (কলি ৮)



হাওড়া ব্রিজ

—শান্তিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলি-৩৫)



লেক ব্রিজ (তৃতীয় পুনর্দর্শন)

—নির্মলকুমার দত্ত (কলি-৯)



—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী (কলি-২৬)

পাশ থেকে

## প্রতিযোগিতা-

বিষয়

সিলুয়েট

প্রথম পুরস্কার ১৫৯

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৯

তৃতীয় পুরস্কার ৫৯

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২৬শে আশ্বিন



—গুণেন সিং (কলি-২৬)

শিশু-বেলা



—সুব্রত রায় (কলি-২৫)

নিবର୍ভম—নিষেধ, খণ্ডন ।

নিবাড়ন—নিষ্পত্তি, সমাপ্তি, নির্বাহ ।

নিবান—নির্বাণ করান, মিটান, লোপকরণ ।

নিবারণ—নিষেধ, প্রতিষেধ, রোধ, বারণ ।

নিবিড়—ঘন, অগম্য, গুপ্ত, অবিদল ।

নিবিষ্ট—উদ্ভাস্ত, কত, তৎপর ।

নিবৃত্ত—বিরত, ক্ষান্ত, বাধিত, দগিত ।

নিবৃত্তি—বিরতি, ক্ষান্তি ।

নিবেদন—সম্মানপূর্বক জ্ঞাপন, উৎসর্গ ।

নির্ভাজ—অমিশ্রিত, খাটি, অকৃত্রিম ।

নিভৃত—গুপ্ত, নিষ্কজন, বিদল ।

নিমগ্ন—ডুবিত, মজ্জিত, অবগাহিত ।

নিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, আহ্বান, ডাকন ।

নিময়—পরিবর্ত, অমুকম, বিনিময় ।

নিমিত্ত—কারণ, জন্ম, পোষোজন, মূল ।

নিমিত্তক—হেতুক, মূলক, দ্বারা, জন্ম ।

নিমিষ—নিমেষ, চক্ষুর পলক, অল্পক্ষণ ।

নিমীলন—নেত্র মূর্ত্তিতকরণ, চক্ষুমুদন ।

নিম্ন—নীচ, অধঃস্থ, গভীর, নত ।

নিম্নগং—অধোগামী, গভীর, নদ ।

নিয়ত—নিত্য, নির্ণীত, আদিষ্ট ।

নিয়তি—আদেশ, অদৃষ্ট, কপাল ।

নিয়ন্তা—শাসনকর্তা, প্রভু, সারথি ।

নিয়ম—নির্ণয়, নিরূপণ, ব্যবস্থা ।

নিযুক্ত—আজ্ঞাপিত, নিরূপিত ।

নিযুৎ—দশ লক্ষ, দশশত সহস্র ।

নিযুদ্ধ—বাহ্যযুদ্ধ, মন্বযুদ্ধ, নিরস্ত্র যুদ্ধ ।

নিরঞ্জন—নির্মল, নিষ্কলঙ্ক, বিসর্জন ।

নিরত—অনবরত, সর্বদা, অত্যন্তরক্ত ।

নিরপরাধ—নির্দোষ, নিষ্পাপ ।

নিরপায়—নির্বিষ, অবিনাশী, নিত্য ।

নিরপেক্ষ—অনপেক্ষ, স্বাধীন ।

নিরবকাশ—বাস্ত, নিরবসর ।

নিরবচ্ছিন্ন—কেবল, নিরন্তর, শুদ্ধ ।

নিরবত—অনিদ্রা, উত্তম ।

নিরবধি—নিরন্তর, সর্বদা, নিরাধারা ।

নিরবয়ব—অবয়বহীন, নিরাকার ।

নিরর্থক—অফলক, বিফল, নিষ্প্রয়োজন ।

# বহুমালা

শ্রী প্রাণতোষ খটক

নিরহ—শাস্ত, অবিবাদী, নিবিরোধী ।

নিরাকরণ—দূরীকরণ, বহিস্করণ ।

নিরাকান্ডকী—শাস্ত, নিষ্পৃহ, মৃদু ।

নিরাকার—আকাররহিত, অমূর্ত্তিক ।

নিরাট—শব্দ, দৃঢ়, নিরেট ।

নিরাতঙ্ক—নিবিস্ময়, নিষ্কটক ।

নিরাপদ—আপদরহিত, নির্বিষয় ।

নিরাময়—রোগরহিত, আরোগী, সুস্থ ।

নিরামিষ—মৎস্যাদিরহিত ।

নিরালয়—নিরালা, বিদল, নিষ্কজন ।

নিরাল—বিদল, গুপ্ত, একাকী, নিষ্কজন ।

নিরাশ—হতাশ, ভগ্নোদ্যম, ভগ্নাশ ।

নিরাহার—উপবাস, অভোজন, লজ্জন ।

নিরীক্ষণ—দর্শন, অবলোকন, দেখন ।

নিরীহ—নিরুজোগ, অচল, স্থির ।

নিরুত্তর—প্রতিবাহ্যে অসমর্থ, অবাক ।

নিরুপম—অতুলা, অসাদৃশ্য, অমুপম ।

নিরুপায়—অগত্যা, উপায়ান্তর ।

নিরুপেক্ষা—আদর, সম্মন, মর্যাদা ।

নিরূপণ—নির্ণয়করণ, বিতর্কণ, স্থিরকরণ ।

নিরোধ—বেষ্টন, ব্যাঘাত, রোধ ।

নির্গত—বহির্গত, ক্ষরিত ।

নিগুণ—গুণাতীত, মূর্থ ।

নির্ঘণ্ট—সূচীপত্র, আলোচনা, নিশ্চয় ।

নির্ঘাত—বজ্রঘাত, মর্দনব্যথাকর ।

নির্জর—শব্দ, দৌর্ভাগ্যহীন, অজীর্ণ ।

নির্জিত—ক্ষান্ত, বশীভূত ।

নির্জীব—জ্বলন্ত, মুচ্ছাংগত ।

নির—উমুই, পরিতের বোঁরা ।

নির্ণয়—নিষ্পত্তি, নিশ্চয়, যীমাংসা ।

নির্ণীত—স্থিরীকৃত, নিশ্চিত ।

নির্দয়—নিষ্ঠুর, ক্রুর, নিদারুণ কঠিন ।

নির্দায়—মুক্ত, অনাপদ, দায়রহিত ।

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ—ସ୍ଥିରୀକୃତ, ନିରୂପିତ, ଚିହ୍ନିତ ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ—ନିରୂପଣ, ନିୟୋଜନ, ଆଜ୍ଞା ।

ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ—ଦୋଷରହିତ, ନିରପରାଧ ।

ନିର୍ଦ୍ଦିନ—ନିରାଶ, ଦିନ ।

ନିର୍ଦ୍ଦୀରଣ—ନିର୍ଗଣକରଣ, ନିସ୍ପାଦନ ।

ନିର୍ବିଂଶ—ଦଶରହିତ, ଅଷ୍ଟାନିଶିନ, ଅପୁରୁଷ ।

ନିର୍ବିକଳ—ନାଆକର୍ମ, ନିୟମ, ଆକ୍ରମ ।

ନିର୍ବିବାଣ—ନିବାଣ, ଗୋଷ୍ଠ, ଲୟ, ଅସ୍ତମାନ ।

ନିର୍ବିବାଦ—ନିସ୍ପାଦିତ, ପରିତ୍ୟାଗ, ଅପବାଦ ।

ନିର୍ବିବାହ—ବିବାହ, ବାଧାସାଧନ, କର୍ମାସିଦ୍ଧ ।

ନିର୍ବିବିକାର—ବିବାହରହିତ, ନାଶ, ଦୀନ ।

ନିର୍ବିବିଧ—ବିବିଧରହିତ, ନିରୂପଣ ।

ନିର୍ବିବିଧ—ଅଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ଅବୋଧ ।

ନିର୍ଭଂଜନ—ନିନ୍ଦା, ତିରସ୍କାର, ଅଭ୍ୟାସାପ ।

ନିର୍ଭୟ—ଭୟହୀନ, ମାତୃତା ।

ନିର୍ଭର—ଂଶ, ସମାକ୍ରମେ ଅବଲମ୍ବନ ।

ନିର୍ଭୁଜ—ଅନାୟ, ଦୟାହୀନ, ଶୁଦ୍ଧ ।

ନିର୍ମାଳ—ପରିସ୍କୃତ, ପବିତ୍ର, ସ୍ବଚ୍ଛ ।

ନିର୍ମାଣ—ଗଠନ, ଗ୍ରାହଣ, ଶିଳ୍ପକର୍ମ ।

ନିର୍ମାତା—ଗଠନା, ଶିଳ୍ପକାରୀ ।

ନିର୍ମାପଣ—ନିର୍ମାଣ କରଣ, ଗ୍ରାହଣ ।

ନିର୍ମାୟକ—ନିର୍ମାଣକାରକ, ପଟକ ।

ନିର୍ମାଳ୍ୟା—ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପୁଷ୍ପାଦି ।

ନିର୍ମିତ—ସଂଚାର, ଗଠିତ, କୃତ, କ୍ରମିତ ।

ନିର୍ମୂଳ—ଖୋଲା, ଅବକ ।

ନିର୍ମୂଳ—ବୁଦ୍ଧିହୀନ, ମୋହୀନ, ତାଳୁ ।

ନିର୍ଯ୍ୟାସ—ଆଶା, ଶ୍ବାସ, ସିମାନ୍ତା ।

ନିର୍ଲଜ୍ଜ—ନିର୍ଲାଜ, ଅନମତ୍ତମ, ଲଜ୍ଜାହୀନ ।

ନିର୍ଲୟନ—ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠ, ନିର୍ଦ୍ଦାଶ ।

ନିର୍ଲା—ରାତି, ବଜ୍ରୀ, ତାମସୀ, ସାମିନୀ ।

ନିର୍ଲିତ—ଶାନ୍ତି, ନିରାଶ୍ରୟ ।

ନିର୍ଲିଖ—ଅଜ୍ଞାନ, ରାଜେବ ମହାଭାଗ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଗତୀର ନିନ୍ଦା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦାପାତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନିର୍ଗଣ, ହିରଞ୍ଜାନ, ଅବଧାନ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଅଲଭ, ହାସ୍ୟ, ଅଚଳିଷ୍ଠ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନିର୍ଲୁପ୍ତ, ପରିଜ୍ଞାତ, ହିର ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ହିର, ନିରୁଦ୍ଦେଶ, ନିର୍ଭାବନା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଚେଷ୍ଟାରହିତ, ଅଲସ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନାସିକାର ବାୟୁ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ତୁଳ, ବାଣାଧାର, ହିର, ତୁଳୀ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଚଢ଼ାଳ, ଉଦ୍‌କର୍ଷା, ସ୍ଥାନତା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ବାରଣ, ପ୍ରତିବେଦ, ବାଧା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଓଷଧ ପାନକରଣ, ସେବା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଦୁଃଖଶୂନ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଦକ୍ଷ, ଉଦ୍ଧାର, ଶ୍ରାବ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଅଗଠିତ, ପ୍ରାକୃତ, ଅକ୍ରମିତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନିର୍ଲୁପ୍ତ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ସମାର୍ଥ, ସତ୍ୟ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନିର୍ଲୁପ୍ତ, ବିକଳ, ମିଥ୍ୟା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଦକ୍ଷ, ଉଦ୍ଧାର, ଶ୍ରାବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସ୍ଥାପିତ, ଗଠିତ, ଦନ୍ତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ତୁଳା, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ସମାନ, ଶ୍ରାବ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଅପୋଭାଗ, ଶ୍ରାବ, ଶ୍ରାବ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—କ୍ଷୁଦ୍ରମାଣ, ଅସମ, ନିର୍ଲୁପ୍ତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଓଷଧ, ବାବଧାର, ଶ୍ରାବ, ନିୟମ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଗ୍ରହୀତ, ବାପାଧାର, ଶ୍ରାବ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସବଣ, ଲୋନ, କ୍ଷାର ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସ୍ବାତି, ସୁବ, ବାକ୍ସିତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନବୀନ, ନୂତନ, ମହୋଦ୍ଧାତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ତୁଳାକୋଟି, ପାଦାଳକାରବିଶେଷ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଓଷଧ, ବିବନ୍ଧ, ଦିଗନ୍ଧର, ନୟ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନୟନ, ଚକ୍ଷୁ, ଲୋଚନ, ଅକ୍ଷି ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଲୋପ, ଜୟୀର, ଜାୟୀର ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ମହତା, ମାତର୍ଲାମ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଉପହାର, ବଳି, ନିବେଦନାହ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ନୌକା, ତରୀ, ତରୀ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସ୍ଥାପିତ, ସଂକ୍ଷିତ, ଗଠିତ, ନିର୍ଲୁପ୍ତ ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ସମାର୍ଥ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ।

ନିର୍ଲୁପ୍ତ—ଓଷଧ, ବିଚାର, ଉପବୃଦ୍ଧ ।

একটা হাসির গল্প বলে আরম্ভ করি। বছর বাইশ তেইশ আগে যখন লগুনে ছিলুম তখন সেখানে এক বোর্ডিং হাউসে কে এক জন সাত্তাল আত্মহত্যা করেন। এই নিয়ে আমরা জটলা করছি এমন সময় এলেন শ্রীনলিনাক্ষ সাত্তাল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, এত বিমর্ষ কেন? মুখে নাই হর্ষ কেন? তিনি উত্তর করলেন, কে এক জন সাত্তাল আত্মহত্যা করেছে। কালকের খবরের কাগজ পড়ে দেশের লোক ধরে নেবে আমিই সেই সাত্তাল। কাজেই গাঁটের কড়ি খরচ করে খান কয়েক তার করে দিতে হলো, আমি নই সেই সাত্তাল যে আত্মহত্যা করেছে।

আমিও তেমনি জানিয়ে রাখছি যে, আমি স্বনামধন্য কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের আত্মীয় নই, তেওতার জমিদার বংশে আমার জন্ম নয়, আমরা বৈজ্ঞ নই, এমন কি উপবীতধারীও নই। বিশ বছর আগে নওগাঁ মহকুমার ভার পেয়েছি, এক সাবরেজিষ্ট্রার এলেন সাক্ষাৎ করতে। মুখে হাসি ধরে না। বললেন, আপনিও বৈজ্ঞ, আমিও বৈজ্ঞ, অমুক অমুক অমুক অমুক অমুক বৈজ্ঞ। আমরা এখানে অনেকগুলি বৈজ্ঞ।...নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় এক বক্তা আমার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন আঠারো বছর আগে, এঁর আর পরিচয় কী দেব। কে না জানে এঁরা এই জেলার বিখ্যাত জমিদার বংশ।...সতেরো বছর আগে বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমি সোনামুখীর বিদ্যালয় দেখতে গেছি। তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে সেক্রেটারি বললেন, ইনি ব্রাহ্মণ। আর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ইনিও উপবীতধারী।... এই রকম অজস্র গল্প আছে আমার বুলিতে। কলকাতায় মাস কয়েক আগেও এরূপ ঘটেছে। আর একটা বলে বিষয় পরিবর্তন করি।

পাঁচ বছর আগে ময়মনসিংহের সাহিত্য সভায় এক ভাষালোক আমার সম্বন্ধে বললেন, হবে না কেন। যত বড় বড় সাহিত্যিক সকলেই জমিদার। জমিদার না হলে সাহিত্যিক হয় কখনো। শ্রীনলিনাক্ষ সাত্তালের মতো আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো, আমরা তেওতার রায় নই। আমাদের জমিদারি অনেক দিন গেছে।

মোগলরা যখন পাঠানদের হারিয়ে দিয়ে

# অগ্র-স্মৃতি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওড়িশার মালিক হয় তখন সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান তোডর মল্লের সহকর্মী রামচন্দ্র খান। হুগলী জেলার কোতরংনিবাসী দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ বোষ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ এঁকে একখানা তালুক দেন। সেই জাহাঙ্গীরী তালুক পেয়ে ইনি ওড়িশায় বসবাস করেন। খান থেকে কবে এঁরা রায় হলেন, চৌধুরী হলেন, মহাশয় হলেন সে সব আমার জানা নেই। বালেশ্বর ও কটক জেলার সাত-আটটি জায়গায় সাত-আট জন মহাশয় আছেন। বড় তরফের বড় কর্তাকে বলা হয় মহাশয়। আমরা হচ্ছি রামেশ্বরপুরের মহাশয় বংশ। অগ্গাণ্ড শাখার এখনো কিছু কিছু জমিদারি আছে। আমরা কিন্তু নির্ভূম মহাশয়। থাকবার মধ্যে আছে কিছু লাঞ্চারাজ সম্পত্তি। তাও শরিকদের দখলে।

আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় অত্যন্ত নিরীহ ও নিবিরোধী ছিলেন, জ্ঞাতিদের দোয়াত্মা সহ্য করতে না পেরে চিরকালের মতো রামেশ্বরপুর ত্যাগ করেন। আমার বাবা নিমাইচরণ রায় অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরি করতে বাধ্য হন। বাপ-মা, ভাই-বোন সকলের ভার তাঁর একার উপরে। সরকারী চাকরি, উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু নিকট-ভবিষ্যতে বদলির আশা ছিল না। অনুগোল তখনকার দিনে পাণ্ডববর্জিত জেলা। শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাবঞ্চিত। তার তুলনায় ঢেকানাল দেশীয় রাজ্য হলেও সব রকমে অগ্রসর। সেখানকার হাই স্কুলে পড়তে অনুগোল থেকে ও আশেপাশের দেশীয় রাজ্য থেকে বহু ছাত্র আসত। বাবা ভেবে দেখলেন ভাইগুলিকে মানুষ করতে হলে ঢেকানালে বাস করা ভালো। তিনি সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজদরবারে চাকরি নিলেন। আর্থিক সুবিধা কিছুমাত্র হলো না, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ যা পাওয়া গেল তা আশাতীত। রাজা সাহেব ছিলেন



অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির গুণগ্রাহী সজ্জন। তাঁর আস্থানে নানা প্রদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসতেন কাজ-কর্ম নিয়ে কিছু দিন থাকতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে। বাঙালীই বেশী। স্কুলের জন্তে যথেষ্ট খরচ করা হতো, অথচ ছেলেদের বেতন লাগত যৎসামান্য। লাইব্রেরীতে রাশি রাশি বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজী বই ছিল। স্থানীয় অফিসারদের কারো কারো ঘরোয়া লাইব্রেরী ছিল। রাজবাড়ীতে ছিল থিয়েটার ও চিড়িয়াখানা। রাজার ছিল হাতীশাল, ঘোড়াশাল। প্রায় প্রত্যেক বছর হাতী ধরা হয়ে আসত। বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস খেলা হতো। অনেকগুলো দৌঁঘি। সাঁতার কাটতে, নৌকায় করে বেড়াতে সুযোগ পেত সকলে। পাহাড়ী জায়গা, চারদিকে জঙ্গল। রেল লাইন নেই। সেটা হয়েছিল শাপে বর।

ঢেকানালের রাজধানী নিজগড়ে আমার জন্ম। জন্মদিন ১৫ই মার্চ, ১৯০৪। সেদিন ছিল বারুণী। বংশের বড় ছেলে। আত্মরে ছলল। যে দেখে সেই একটা করে নাম রাখে। বারুণীয়া, বৃন্দাবনচন্দ্র, গদাধর, এমনি কত নাম। আমরা শান্ত, সেই জন্তে অন্নপ্রাশনের সময় নামকরণ হলো অন্নদাশঙ্কর। আমার ঠাকুরদা যতদিন ছিলেন নামকরণের ধরণ ছিল শান্ত। এক এক করে নাম রাখা হয় চার ভাইবোনের—অন্নদাশঙ্কর, অভয়াশঙ্কর, রাজরাজেশ্বরী, অজয়াশঙ্কর। ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নেন। সেইজন্তে ছোট বোনের নাম রাখা হলো ব্রজেন্দ্রমোহিনী। রাজবাড়ীর উপর বাবার কিছু প্রভাব ছিল। বাবার কথায় রাজা সাহেব তাঁর এক ছেলের নাম রাখেন গোৱেন্দ্রপ্রভাষ। আমাদের বাড়ীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হলো শ্রীশ্রীগৌরগোপাল।

আমার মা হেমলিনী রায় কটকের প্রসিদ্ধ পালিত বংশের মেয়ে। পালিত বংশ বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় গেছেন উনিশ শতকে। তাঁদের চালচলন হাল ফ্যাশনের। একে তো তাঁরা শহুরে লোক, তার উপর তাঁরা কলকাতার সঙ্গে নিত্য সংযুক্ত। তাঁদের মুখের ভাষা চলতি বাংলা। আর আমাদের মুখের ভাষা অনেকটা মেদিনীপুরের আঞ্চলিক বাংলার মতো ওড়িয়া প্রভাবিত। আমরা কথায় কথায় বলতুম “কেরে।” অর্থাৎ “করিয়া।”

একটা নয়না দিচ্ছি। চলতি বাংলা : আমি খেয়ে এনেছি। আমাদের বাংলা : আমি খায়ে করে আসেছি। এখানে এই “কেরে” শব্দটি সম্পূর্ণ বাহুল্য। কিন্তু বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুরে, ওড়িশায় এই শব্দ বা এর অনুরূপ শব্দ লক্ষ্য করা যায়। সাধু ভাষায় দাঁড়াবে, আমি খাইয়া করিয়া আসিয়াছি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্তে আমাদের মুখের ভাষাকে পরিহাস ছলে বলা হয় কেরা বাংলা। আমাদের ঠাট্টা করে বলা হয় কেরা বাঙালী। আমরাও পান্টা হাসতে জানি। মামাদের বলি বাংলাবালা। এই অর্থে আমার মা ছিলেন বাংলাবালা।

দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ঠাকুমার কোলে মানুষ হয়েছি। ঠাকুমাকে বলতুম মা। মাকে বলতুম, খোকার মা। খোকা আর কেউ নয়, আমি নিজে। এসব আবিষ্কার করতে আমার অনেক দিন লেগেছিল। মাকে, বাবাকে, বরাবরই একটু পর পর মনে হতো। আমার ঠাকুমা হুর্গামণি রায় জাজপুরের সম্রাট সেন বংশের মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী তেমন শক্তিমতী। সেকালের পক্ষে তিনি বেশ শিক্ষিতা ছিলেন। বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার প্রাচীন আধুনিক অনেক বই তাঁর পড়া ছিল, কিস্বা জানা ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল তাঁর নখদর্পণে। দেশী বিদেশী অনেক রূপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী গুজব ও খবর ছিল তাঁর বুলিতে। তাঁর কাছে রাত্রি ও দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি যা শিখেছি পরে বই পড়ে তার চেয়ে এমন কী বেশী শিখেছি। তিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, এর চেয়ে বড় কথা তিনি আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। অল্পবয়সী রুগ্ন মায়ে প্রথম সন্তান, আমার নাকি সন্তানের মধ্যে ছিল একটি মাথা ও কয়েকখানি হাড়। মাংস লাগে ঠাকুমার অবিশ্রান্ত যত্নে। তেল-হলুদ মাখি শুইয়ে রাখতেন। খাওয়াতেন দুধ আর নর ভাত। অনেক বয়স পর্যন্ত আমার জন্তে আলাদা রান্না হতো। উঠানে একটা তোলা উলুনে ছোঁ একটা হাঁড়িতে সিদ্ধ হতো পুরোনো সরু চাল তার সঙ্গে আলু। গলা ভাত, আলু ভাতে কাগজী লেবু ও চিনি, হয়তো এক ফোঁটা ঘি এ ছিল আমার নিয়মিত পথ্য। এ ছাড়া দুধ সর নর্ন

খুব কম বয়সেই চা খরি। ঠাকুরদা চা খেতে বসলে আমাদের ডেকে খাওয়াতেন। এই ভাবে ছ'সাত বছর কাটলে পর আমি সব কিছু খেতে শুরু করি, সাধারণত ঠাকুমাকে না বলে। আমার এই অনিয়মের প্রশ্রয় দিতেন আমার মা। লুকিয়ে একটা কিছু আমার হাতে মুখে গুঁজে দিতেন। প্রতিবেশীরাও আমাকে এটা-ওটা খাইয়ে খুশি হতেন। ফলে আমি হয়ে উঠি যেমন পেটুক তেমনি পেটরোগী। গায়ে গতি লাগছে না বলে মা আমার দুঃখ করতেন। কথা নেই বার্তা নেই এক গ্রাস দুধ এনে ঢক ঢক করে গিলিয়ে দিতেন। উণ্টো ফল হতো।

দশ বছর বয়সের সময় আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগে। সব সঞ্চয় ছাই হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ঠাকুরদার মৃত্যু হয়েছিল। এর পরে একানব্বত্তী পরিবার ভেঙে যায়। ঠাকুমা চলে যান বড়াকার সঙ্গে। মাকে আর বাবাকে নতুন করে পাই। মা ছিলেন অত্যন্ত সরল, স্নেহপ্রবণ, শাসন করতে একেবারেই জানতেন না, কাঁদতেন, গৌরগোপালের কাছে প্রার্থনা করতেন। সংসারের কাজ তাঁর ভালো লাগত না, লাগত গৌরগোপালের সেবা আর পূজা আর নামকীর্তন। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ঝি-চাকর চলে যায়। মা'কেই সমস্ত কাজ করতে হতো। শাপুড়ী থাকতে কম কষ্ট পাননি, কিন্তু সেটা কায়িক নয়, মানসিক। এবার পেতে হলো কায়িক কষ্ট। বৈষ্ণব দীক্ষার পর থেকে মাছ-মাংস বারণ। নিরামিষও দুমূল্য। বাবার পদোন্নতি হয়েছিল, কিন্তু আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। এক দিন চা বন্ধ করে দিলেন। বাবা এক বার যা স্থির করতেন তার আর নড়-চড় হতো না। রাজ্যের লোক জানত তাঁর যে কথা সেই কাজ। সেই জন্তে রাজা-প্রজা সকলে তাঁকে বিশ্বাস করত। তেজস্বী লোক ছিলেন। কোনো দিন তাঁর সাহসের অভাব দেখিনি। মহাযুদ্ধের পেষণে আমরা প্রত্যেকেই গুঁড়িয়ে যেতে লাগলুম। কিন্তু সব চেয়ে ক্ষতি হলো মা'র। যুদ্ধের পর দেশে শান্তি এলো, কিন্তু আমাদের ঘর গেল ভেঙে। সামান্য কয়েক দিনের জরে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মা'র মৃত্যু হয়। তার কয়েক দিন আগে পলিটিক্যাল এজেন্টের

সঙ্গে বগড়া করে বাবা ইস্তফা দিয়েছিলেন। দেওয়ানের অনুরোধে ইস্তফা প্রত্যাহার করেন। নইলে আমরা পথে বসতুম। আমাদের সেই সদাশয় রাজা সাহেব তখন বেঁচে নেই। তিনিও সামান্য অসুখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। তাঁরও তখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

বলতে গেলে মাকে আমি ছ'সাত বছরের বেশী পাইনি। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি ছিলুম না। গেছলুম ম্যাট্রিক দিতে কটকে। তিনি আমাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে। আমি কিন্তু বরাবরই একটু উদাসীন ছিলুম। আমি বাস করতুম মনোজগতে। আমার একখানা হাতে-লেখা মাসিকপত্র ছিল। সেটা ওড়িয়া ভাষায়। কিন্তু আমার প্রধান পাঠ্য ছিল যত রাজ্যের বাংলা বই ও বাংলা মাসিকপত্র। আমার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয় আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। সেকালের এক জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতেও আমার গতিবিধি ছিল। রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ সরকার মহাশয়ের নাতিরা আমার বন্ধু। সুতরাং আমি ঢেকানালে বসেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন-আধুনিক অসংখ্য বই পড়তে পেয়েছিলুম, আর মাসে মাসে পড়তে পেতুম “প্রবাসী,” “ভারতবর্ষ,” “ভারতী,” “সবুজপত্র,” “মানসী ও মর্মবাণী,” “নারায়ণ,” “গৃহস্থ,” “শিশু,” “সন্দেশ,” “মোচাক”। এ ছাড়া ইংরেজী মাসিকের অপ্রতুল ছিল না। এমন করে আমার সাহিত্যিক রুচি গড়ে ওঠে। একবার স্কুলের পরীক্ষায় প্রাইজ পাই টেলিগ্রায়ের ছোট গল্পের ইংরেজী অনুবাদ। তার থেকে একটার বাংলা অনুবাদ করে “প্রবাসী”তে পাঠিয়ে দিই। তখনো আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স বোধ হয় ষোলো। অবিলম্বে উত্তর এলো লেখাটি “প্রবাসী”তে ছাপা হতে যাচ্ছে। উত্তরদাতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। “তিনটি প্রশ্ন” সেই গল্পটির নাম।

“তিনটি প্রশ্ন” আমার প্রথম প্রকাশিত বাংলা রচনা। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগেই আমি স্থির করে ফেলেছিলুম যে, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সাংবাদিক হব ও ভারতের স্বাধীনতার জন্তে লিখব। ঢেকানালের শারঙ্গধর দাস ছিলেন আমেরিকায়। তিনি যখন সে দেশ থেকে ফিরলেন আমি ওড়িয়াতে

একটা গান লিখলুম ও সেই গান গেয়ে তাঁকে প্রকাশে সম্বন্ধনা করা হলো। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছি শুনে মা'র মনে সন্দেহ হলো আমিও আমেরিকা যাচ্ছি। তিনি আমাকে চোখে চোখে রাখলেন। আমার কাছে কথা আদায় করে নিলেন যে, আমি পালাব না। কিন্তু ম্যাট্রিক দেবার জন্তে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কটক যাবার পর আমার প্ল্যান হলো কাউকে কিছু না বলে কলকাতায় পালানো, কলকাতা থেকে আমেরিকায়। কটকে বসে ছোট কাকাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলেছিলুম যে, সাত দিনের মধ্যে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সাত দিনের মধ্যে যা ঘটল তা আমার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা নয়, বিধাতার পরিকল্পিত আশ্চর্য ঘটনা। মাকে বেশ ভালো দেখে এসেছিলুম, খবর এলো তিনি নেই। কোথায় আমি চলে যাব আমেরিকায়, না তিনি চলে গেলেন স্বর্গে। আমার আমেরিকা যাওয়া হলো না, কিন্তু আমেরিকা এলেন আমার ঘরে আমার বধূরূপে প্রায় দশ বছর পরে।

ছোট কাকাকে বলার ফল হলো এই যে, বাবা আমাকে অনুমতি দিলেন কলকাতা গিয়ে খবরের কাগজের সম্পাদনা শিখতে। ইতিমধ্যে আমি জর্নালিজমের উপর বইপত্র পড়েছিলুম। কিন্তু আমি রিপোর্টার হতে চাইনি, প্রফরীডার হতে চাইনি, সাব এডিটর হতে চাইনি, চেয়েছিলুম ফ্রীলাস হতে। নয়তো লীডার রাইটার হতে। আমার পরমহিতৈষী দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আমাকে পরিচয়পত্র দিলেন, দেখা করলুম “বসুমতী” সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি আমাকে কিছু অনুবাদ করতে দিলেন। তার পর উপদেশ দিলেন শট্‌ছাণ্ড টাইপরাইটিং শিখতে। ঘোষ-মিত্তিরের ওখানে গ্রেগ শট্‌ছাণ্ড আরম্ভ করে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং। সপ্তদাগরি আপিসের বাবু তৈরি হচ্ছিল সেখানে। আমার ভালো লাগল না। “সার্ভ্যান্ট” সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করলুম। তিনি আমাকে বললেন প্রফরীডিং শিখতে। তাঁর দপ্তরে এক ভঙ্গলোক আমাকে শেখালেন বটে, কিন্তু এ কথাও বললেন যে আমি তাঁর দানা মারতে এসেছি। শুনে হুঃখ হলো। দেখলুম এঁরা কেউ আমাকে চিনলেন না।

সম্পাদনা শেখবার এই হয়তো সনাতন পদ্ধতি।

কিন্তু এর জন্তে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আধপেট! খেয়ে অসুস্থ হয়ে কী করব ভাবছি এমন সময় ছোট কাকা শ্রীহরিশচন্দ্র রায় লিখলেন, তুমি আমাদের বংশের বড় ছেলে, তোমার কাছে আমরা এর চেয়ে বড় কিছু আশা করেছিলুম। ফিরে এসো, কটক কলেজে আমি তোমাকে ভর্তি করে দেব। আমার কাছে থাকবে। ছোট কাকার কথামতো কাজ হলো। কিন্তু জর্নালিজমের নেশা গেল না! স্থির রইল ঐ হবে আমার পেশা।

সেটা অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। সরকারী কলেজে পড়তে হলো এই যথেষ্ট লজ্জা। সরকারী চাকরি তো অভাবনীয়। আই. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদকী ভাগ্যপরীক্ষায় নামব, এমন সময় খবর পাওয়া গেল আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছি। স্কলারশিপ পাব নিশ্চয়। মোড় ঘুরে গেল। চললুম পাটনা। স্থির হলো বি. এ. পরীক্ষার পর আবার কলকাতা গিয়ে সম্পাদনার সুযোগ খুঁজব। কিন্তু এবারেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করি। স্কলারশিপও পাই। এম. এ. পড়তে পড়তে আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় যোগ দিই। প্রথম বারে সারা ভারতে পঞ্চম হই। সেবার মাত্র তিন জন নেওয়া হয়। আমাকে আরেকবার পরীক্ষা দিতে হলো। এবার আমি সারা ভারতে প্রথম হই ও পূর্ববর্তীদের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এর পরে তো আর সম্পাদক হওয়ার কথা ওঠে না। দু'বছরের জন্তে সরকারী খরচে বিলেতে চলে যাই। মনকে বোঝালুম, আচ্ছা, ফিরে এসে চাকরিতে ইন্তফা দিয়ে সম্পাদক হওয়া যাবে। তখন আমি স্বাধীন। হায়! পুরুষের ভাগ্য দেবতারও অজানা।

ইতিমধ্যে আমার সাহিত্যচর্চা ধীরে ধীরে চলছিল। কলেজে আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে একটা ক্লাব করি। তার নাম ননসেন্স ক্লাব। তার একটা হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তাতে যে যা খুশি লিখত। যে কোনো ভাষায়। আমি লিখতুম ইংরেজী বাংলা ওড়িয়া তিন তিনটে ভাষায়। মাঝে মাঝে “প্রবাসী” প্রভৃতি মাসিকপত্রে লেখা দিতুম। “প্রবাসী”তে একবার আমার একটি বড় কবিতা গোড়ার দিকে ছাপা হয়। “ভারতী”তে ছাপা হয়

আমার সমাজধ্বংসী রচনা “পারিবারিক নারী-সমস্যা।” লেখকের বয়স মাত্র আঠারো বছর, একথা জানা থাকলে “বঙ্গনারী” তার একটা উত্তেজিত প্রতিবাদ লিখে ছাপাতেন না। কত বার তাঁকে আমি পুরীর সমুদ্রতীরে দেখেছি, ভেবেছি নিজের পরিচয় দিয়ে বলি আমিই সেই কালাপাহাড়। কিন্তু আমার সাহস যা কিছু ঐ কাগজে কলমে। মোকাবিলায় আমি একটি ভিজেবেড়াল। “ভারতী” আমার প্রতি সদয় দেখে শরৎচন্দ্রের “নারীর মূল্য”র উপর একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিই। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। “ভারতী” তার সমস্তটাই ছাপলেন। শরৎচন্দ্রের এই নির্জলা প্রশংসা তখনকার দিনে নতুন ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কি না জানিনে। দীর্ঘকাল পরে যখন তাঁর “শেষ প্রশ্ন”র বিকল্প সমালোচনা করি তিনি মনে করলেন আমি তাঁর নিন্দুক। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝাপড়ার অবসর হয়নি।

সঙ্গে সঙ্গে ওড়িয়াতেও আমার সাহিত্যের কাজ চলছিল। উৎকলের শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র “উৎকল সাহিত্য” ইবসেনের “ডল্‌স হাউস” নিয়ে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সম্পাদক-প্রবর ব্রাহ্মনেতা বিশ্বনাথ কর মহাশয় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্নেহ করতেন। আমার আরো অনেক প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁর আশুকুল্যে ছাপা হয়। সাধারণত তিনি আমাকে প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান দিতেন। আমার বন্ধুরাও তাঁর স্নেহ আকর্ষণ করেন।

আমাদের সেই ননসেন্স ক্লাবের দলটি কর মহাশয়ের মাসিকপত্রে স্থায়ী আসন পেয়ে সবুজ দল বলে সুপরিচিত হয়। অন্নদাশঙ্কর রায়, বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র মিলে “সবুজ কবিতা” নামে একখানি বই বার করেন। ননসেন্স ক্লাবের মেম্বর নন এমন কয়েক জন লেখক ও লেখিকা পরে এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে “বাসন্তী” নামে একখানি বারোয়ারি উপন্যাস সংরচন করেন। কর মহাশয় তাঁর মাসিকপত্রে এই উপন্যাসটিকেও আশ্রয় দেন। সবুজ দল বলতে এঁদের সবাইকে বোঝায়। বাংলায় যেমন “কল্লোল যুগ” ওড়িয়াতে তেমন “সবুজ যুগ।” বন্ধুরা আশা করেছিলেন যে, আমি তাঁদের সঙ্গে থেকে নব নব উত্তমের দ্বারা

সবুজ সাহিত্যের খ্যাতি বর্ধন করব। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমি চিন্তা করছিলুম যে, বাংলা ওড়িয়া দুটো ভাষার দুই নৌকায় পা রেখে আমি কাল-পারাবার পাড়ি দিতে পারব না। কেউ কোনো দিন দুই ভাষায় অমর হয়নি। আমাকে দুটোর একটা বেছে নিতে হবে, যেমন নিয়েছিলেন বঙ্কিম, যেমন নিয়েছিলেন মাইকেল। ঠিক এই রকম একটা সন্ধিক্ষণ এসেছিল কবিবর রাধানাথ রায়ের জীবনে। তিনিও লিখতেন বাংলায়, ওড়িয়ায়। দুই ভাষায়। নামও হয়েছিল বেশ। এমন সময় তিনি বাংলা ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র ওড়িয়ায় লেখেন। অক্লান্ত সাধনার ফলে আধুনিক উৎকলের শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হন।

আমি কিন্তু রাধানাথের বিপরীত সিদ্ধান্তে পৌঁছাই। আমি বেছে নিই বাংলা। এর পরে আমি যখন ওড়িয়া লেখায় ইঠাৎ ক্ষান্তি দিই আমার বন্ধুরা অবাক হন। সম্পাদক হন বিস্মিত। পাঠকেরা হন ক্ষুব্ধ। অথচ আমি নিজেও নিশ্চিত ছিলাম না যে এক দিন আমি বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হব। আমার পক্ষে ওটা কুল ছেড়ে অকুলে ভাসা। তখনো আমি “পথে প্রবাসে” লিখিনি। বাংলা দেশে কেউ আমাকে চেনে না। “কল্লোল” আপিসের সামনে দিয়ে হাঁটাটাই করেছি, সাহস হয়নি ঢুকতে। শান্তিনিকেতনে কবিসন্দর্শন করেছি, বলিনি যে আমি এক জন সাহিত্যিক। দেখতে দেবার মতো যা আমার ছিল তা “প্রবাসী”র গুটিকয়েক কবিতা, “ভারতী”র গুটি দুয়েক প্রবন্ধ। অপর পক্ষে ওড়িয়ায় তখন আমি প্রথম পৃষ্ঠার অধিকারী।

বাংলায় লিখব, এই সিদ্ধান্তের পরের ধাপ বাংলা দেশে বাস করব। বিলেতে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হয়ে আমি কোন্ প্রদেশে কাজ করতে চাই আমি উত্তর দিলাম, বাংলা দেশে। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমাকে আর কোথাও পাঠাতে পারতেন, কিন্তু দেখা গেল আমার ইচ্ছা তাঁরা মেনে নিলেন। বাংলা দেশে আমি আই. সি. এস. হয়ে আসি ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে। তার আগে মাঝে মাঝে কলকাতা ও শান্তিনিকেতন এসেছি। সতেরো বছর বয়সের আগে বাংলা দেশ দেখিনি। পঁচিশ বছর বয়সের পর থেকে বাংলা

দেশ দেখে বেড়াচ্ছি। বাবা যতদিন ছিলেন ঢেকানালের বাড়ীতে কালেভদ্রে যেতুম। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের জন্তে যাই। পরে একবার দক্ষিণ ভারত দেখে ঢেকানাল হয়ে ফিরছি এমন সময় আমার মেজ ছেলের অস্থখ করে ও চিকিৎসা-বিভাগে কটক হাসপাতালে মৃত্যু হয়। বাবো বছর আগে ঘটে এ ঘটনা। তার পর থেকে আর ও-মুখে হইনি। পুত্রশোকের মতো শোক নেই। আমার জীবনের প্রথম উনিশ বছর কেটেছে ওড়িশায়, প্রধানত ঢেকানালে, পুরাতো ও কটকে। তার পরের ছয় বছর কেটেছে বিহারে ও বিলেতে। তার পরের একুশ বাইশ বছর কাটল বাংলা দেশে। আর দু'মাস পরে আমার সরকারী কর্মজীবন শেষ হয়ে যাবে। আমি অকালে অবসর নিয়ে সাহিত্যে আত্ম-নিয়োগ করব। শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে বসব।

সাংবাদিকতার নেশা অনেক দিন ছুটে গেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে সাহিত্যের কাজই আমার আসল কাজ। এ কাজ শেষ না করে আমার ছুটি নেই। কিন্তু শেষ হবে কী, ভালো করে আরম্ভই হয়নি। যিনি আমাকে এত দূর নিয়ে এসেছেন তিনি আমাকে বাকীটুকু এগিয়ে দেবেন, এই আমার বিশ্বাস। জীবন বড় বিচিত্র ব্যাপার। কেমন করে কী যে হয় কেউ বলতে পারে না। সিভিল সাভিসের শিক্ষানবীশ হয়ে দু'বছরের জন্তে বিলেত যাচ্ছি এমন সময় “বিচিত্রা” বেরোয়। আমার

বন্ধু শ্রীকৃপানাথ মিশ্র ভাগলপুরের লোক। সেই সূত্রে “বিচিত্রা” সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কৃপানাথের কথায় “বিচিত্রা”য় ছাপতে দিই “রক্তকরবীর তিন জন।” সম্পাদক আরো লেখা চেয়ে পাঠান। তখন বলি, আচ্ছা, আমি আমার ভ্রমণকাহিনী লিখে পাঠাব মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে। “পথে প্রবাসে” শুরু হলো বয়েতে জাহাজ ধরতে গিয়ে। তিন চার বিস্তি ছাপা হবার পর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ ভালো লাগে। তেরো চোদ্দ বছর বয়সে এঁরাই ছিলেন আমার আদর্শ কবি, আদর্শ প্রবন্ধকার। চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভূমিকা লিখে দিলেন। আর যা বললেন তা এক জন তরুণ সাহিত্যিকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। আকবর বাদশাহের দরবারে এক দিন এক নবীন গুণী এলেন। তাঁর আলাপ শুনে বড় বড় ওস্তাদরা মাথা থেকে পাগড়ি খুলে ফেলে দিলেন। এখন থেকে ইনিই শোনাবেন, আমরা শুনব।

হ্যাঁ, জীবন অতি বিচিত্র ব্যাপার। তন্ময় হয়ে পড়ছি দেখলেই মা ধরে নিতেন উপজ্ঞাস পড়ছি। বলতেন, হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে! ছেলে তাঁর নভেল লিখছে দেখলে কী মনে করতেন জানিনে। হয়তো বলতেন, হুঁ! নভেল লেখা হচ্ছে!

আগে টাকা!

টাইনস্টন চার্চিল অপরাহ্নে বন্ধুদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন। ঐ দিন রাতে বেডিঙতে তিনি ভাষণ দেবেন। চার্চিল বন্ধুদেব গুচে পৌঁছতে দেরী করেছিলেন। গাড়ী থেকে নেমে তিনি ট্যাক্সি চালককে বললেন,—হুমি বি-বি-সি ষ্টুডিওর ফটকে গিয়ে অপেক্ষা ক'ব। আমি ফিব্ব তোমাব গাড়ীতে।

চালক বললে,—আপনাকে অজ্ঞ গাড়ী দেখতে হবে। আমি এখন অত দূর যেতে পারবো না।

চার্চিল বিস্মিত হ'লেন চালকের কথা শুনে। বললেন,—কেন?

—রাতে বেডিঙতে চার্চিল কথা বলবেন। যবে ফিব্ব গিয়ে আমাকে শুনতে হবে। বললে গাড়ীব চালক।

কথাগুলো শুনে অত্যন্ত খুশী হ'লেন চার্চিল। পকেট থেকে উপবি কিছু টাকা বেব ক'বে দিয়ে দিলেন তন্মুনি চালকটিকে।

চালক তখন টাকা পেয়ে বললে খুশী হয়ে,—আপনাব কথা শুনবো। আমি অপেক্ষা কববো বি-বি-সি ষ্টুডিওতে। চার্চিল তোলা থাক্ এখন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ইংরাজি শিক্ষাকে কি ভাবে সমন্বয়যোগী করে নেওয়া হবে—সেই প্রশ্নই আজকের দিনে অত্যন্ত প্রধান সমস্যা। ইংরাজির ক্লেসিকর প্রভাব থেকে ভারতীয় ছাত্রদের মনকে মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা যে অত্যন্ত জরুরী সে বিষয়ে সকলেই এখন একমত। প্রত্যেক ভাবতবাসীই মনে করেন যে, বৈদেশিক শক্তির রাজনৈতিক কড়ংহেব হাত থেকে ভাবতবাসীর মুক্তির অত্যন্ত প্রধান ফল হওয়া উচিত বিদেশী ভাষার গীড়াদায়ক শাসনের হাত থেকে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মুক্তি-সাধন। সকলেই এখন স্বীকার করেন যে ইংরাজি জ্ঞানের উপর যে কৃত্রিম মূল্য এত দিন আরোপ করা হয়েছে, তাব ফলে ভারতীয় বালক-বালিকাদের মন এবং বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ একেবারে রুদ্ধ না হলেও ব্যাহত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, এব ফলে যথোপযুক্ত ভাবে মাতৃভাষা অধ্যয়নের পথে তো বাধা সৃষ্টি হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় মনের সাধারণ বিকাশ এবং উন্নতির মূলেও কুঠাঘাত কবা হয়েছে।

এখন সকলেই বুঝতে পারেন যে, মাতৃভাষা শিক্ষা শুরু কবাব সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ ভাবে ইংরাজী শিক্ষাব যে ব্যবস্থা এত দিন চালু ছিল তাব পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকর। স্কুলে শিক্ষকদের অধিকাংশ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় হয়েছে ইংরাজি শিক্ষা দিতে। স্কুলের কটিনে ইংরাজির জ্ঞান অনাবশ্যক ভাবে এত বেশী সময় দিতে হয়েছে যে, তার ফলে মাতৃভাষা ও অজ্ঞাত বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া একেবারে শিশু বয়সে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল একটি বিদেশী ভাষাব বানানবৈজ্ঞানিকতা এবং উচ্চারণ ও বাক্যাগঠন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণেব সমস্ত ব্যাপারটাই ভারতীয় ছাত্রদের উপর চূড়ান্ত মত চোপে বসে ছাত্র-জীবনের একেবারে শুরুতেই শিক্ষার সমস্ত আনন্দ ও মাধুর্যকে খর্ব কবেছে।

ভারত যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন কবেছে তখন আশা করা যায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বহু শতাব্দীর জড়তা এবং অলসতা কেটে গিয়ে এবার তাব সর্বব্যাপী নব জাগরণ হবে। ইংরাজি যখন আজ রাষ্ট্রের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং সমর্থনে বর্ধিত হয়েছে তখন স্বাধীন দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরাজির স্থান হবে কোথায়, তা বিবেচনা করবার সময় উপস্থিত। এত দিন ইংরাজি শিক্ষার জ্ঞান যে শক্তি ও সময় মর্মান্তিক ভাবে নষ্ট হয়েছে এবং যে মানবিক সম্পদ ভয়াবহ রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আজকের ভারতে তাব অবসান করতে হবে। ইংরাজিকে আজ নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন কৃত্রিমতা চলবে না। জাতির প্রকৃত মঙ্গলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ইংরাজি শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

শিক্ষা-ক্ষেত্র থেকে ইংরাজিকে একেবারে মুছে ফেলবার প্রয়োজন নেই। ইংরাজরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও যে এখানে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, এত কাল যে উঁচু বেলীতে ইংরাজিকে স্থান দেওয়া হয়েছিল, সেখান থেকে তাকে নানিয়ে আনতে হবে। সকলেই মনে করেন যে, ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় ইংরাজি এত দিন যে গৌরবেব আসনে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে এখন মাতৃভাষাকে বসাতে হবে। এত দিন ইংরাজি ছিল লক্ষ্য, কিন্তু এখন ইংরাজিকে দেখতে হবে লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ্য হিসাবে। এখন থেকে ইংরাজির কাজ হবে সহায়তাকারী ভাষা হিসাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক

# আমাদের ইংরাজী শিক্ষা-৫

অধ্যক্ষ পি, কে গুহ

ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সাহায্য করা—আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তঃজাতিক যোগসূত্র রক্ষায় সাহায্য করা এবং যে পশ্চিমী সাহিত্য, চিন্তাধারা এবং বিজ্ঞান ইংরাজি গ্রন্থে প্রকাশিত হচ্ছে, তা ভারতবাসীর কাছে বোধগম্য করা।

এই গুরুত্ব হ্রাসেব উচিত্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং বিশেষ মান-মর্যাদা প্রাপ্ত শিক্ষণীয় প্রধান বিষয়ের স্থান থেকে ইংরাজিকে নানিয়ে সহায়তাকারী দ্বিতীয় ভাষায় কপান্তরিত করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মতভেদ নেই। ইংরাজির মূল্যবোধ ও শিক্ষা-ক্ষেত্রের অজ্ঞাত শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে এই মৌলিক পরিবর্তনের ফলে স্বভাবতই ইংরাজি শিক্ষাব ধাবাবও আমূল সঙ্কর্য করতে হবে। আমাদের শিক্ষা-পরিবর্তনায় ইংরাজিব এই নূতন ভূমিকাব ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হতে পারে সেগুলোকে নিম্নলিখিত শিরোনামায় আলোচনা কবা যেতে পারে:—

ইংরাজি শিক্ষা শুরু হবে কোন্ ক্লাস থেকে ;

ইংরাজির প্রথম কোর্স ;

ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স ;

ইন্টারমিডিয়েটে ইংরাজি কোর্স ;

ডিগ্রি কোর্সে ইংরাজি।

## ইংরাজি শিক্ষা শুরু হবে কোন্ ক্লাস থেকে

ভারতের সমস্ত শিক্ষাবিদই মনে করেন, ইংরাজি এখনকার মত স্কুলের খুব নীচু ক্লাস থেকে শুরু না কবে একটু উঁচু ক্লাস, যথা—যষ্ঠ শ্রেণী থেকে (অর্থাৎ ছাত্রের বয়স যখন ১২।১৩ বছর) শুরু কবা উচিত। এতে সব দিক দিয়েই সুবিধে। মন এবং বুদ্ধিবৃত্তি গঠনের স্বচনাতেই বিদেশী ভাষা শেখাব বিড়খনা থেকে মুক্তি পেয়ে মাতৃভাষা চর্চাব সুবিধা হবে এবং অজ্ঞাত শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগ দেবাব যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। তাতে ইংরাজি শিক্ষাও সুদৃঢ় এবং সম্ভোজনক হবে, কারণ ইংরাজি শিক্ষা শুরু হবে এমন সময় যখন ছাত্ররা নতুন ধরণেব শব্দ শেখাব ক্ষমতা এবং বাক্য গঠনের নূতন পদ্ধতি অর্জন কবেছে।

## ইংরাজির প্রথম কোর্স

ছাত্ররা ১২।১৩ বছর বয়সে ইংরাজি শিখতে শুরু করছে। কাজেই ইংরাজির প্রথম কোর্স এমন ভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তিন বছরের মধ্যে ইংরাজিব বনিয়াদ এমন সুদৃঢ় হয়ে যায় যে, ১৫।১৬ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজিকে তার উপর বেশ উপযুক্ত ভাবে দাঁড় কবানো যেতে পারে। এই ত্রিবর্ষিকী প্রাথমিক কোর্স প্রণয়নে সময় এবং পরিসরেব দিকে কড়া নজর রেখে এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ছেলেবা এখন ছয় বছরে যা শেখে, তখন যেন তিন বছরে তাই শিখতে পারে। এ না হবার কোন কারণ নেই। আজকাল ছেলেবা অপরিণত বয়সে ইংরাজির উদ্দেশ্যহীন এবং অপচয়-মূলক প্রথম কোর্স ধরে এবং স্নানার্থ ৬ বছর তাই নিয়ে কাটায়। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক অগ্রগতি কিছুই হয় না। স্মরণ্য পরিণত

বয়সে দ্বিবার্ষিকী প্রথম কোর্স অধিকতর কার্যকরী না হবার কোন কারণ নেই।

কোর্স শুরু হবে বর্ণমালা দিয়ে এবং সরল প্রকাশভঙ্গি ভিত্তিতে (যেখানে অনিদিষ্টতা এবং অস্বাভাবিকতা নেই অর্থাৎ ইংরাজি প্রকাশের অতি স্বাভাবিক পদ্ধতি) রচিত সৃষ্টিস্ফূর্ত এবং ক্রমাগত পরিবর্তনের পথ অতিক্রম করে এসে শেষ হবে সরল গল্প রচনায়।

### ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স

ত্রৈবার্ষিকী প্রাথমিক কোর্স শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে ম্যাট্রিকুলেশনের দ্বি-বার্ষিকী ইংরাজি কোর্স। ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরাজি কোর্স কি হওয়া উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, উপরে বর্ণিত প্রাথমিক কোর্স শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত। দুটো বিকল্প কোর্স থাকবে। একটা হবে প্রধানতঃ ভাষা শেখাবার বাস্তব এবং ফলপ্রসূ কোর্স। তাতে সাহিত্য হিসাবে ইংরাজি শেখাবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। অপরটি হবে সাহিত্যের কোর্স। তাতে থাকবে সাহিত্য হিসাবে ইংরাজির প্রতি ছাত্রদের আগ্রহ-সৃষ্টিকারী সরল কবিতা এবং সুন্দর পরিপাটি দরনের গল্প। বীরা ম্যাট্রিক কোর্সেই ইংরাজিকে দ্বিধা-বিভক্ত করার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেন যে, নবম শ্রেণিতে যে সমস্ত ছাত্রকে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল দেখা যাবে এবং যাদের মন সাহিত্যাত্মিনী বলে মনে হবে, একমাত্র তাদেরই ইংরাজি সাহিত্যের কোর্স গ্রহণের অনুরোধ দেওয়া হবে। আর সাহিত্যের প্রতি যাদের অনুরাগ নেই এবং যারা কবিতা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ঝুঁকবে, তাদের শেখানো হবে ইংরাজি ভাষা।

কেউ কেউ মনে করেন, ১৯১৫ বছরের মত পরিণত বয়সে এক দল ছেলেকে অ-সাহিত্য পাঠের দিকে ঠেলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। স্কুলেই ছাত্রদের পরিচয় হুঁটো শ্রেণিতে ভাগ করতে হলে তাদের মধ্যে যতটুকু জ্ঞানবাস দরকার হবে, ততটুকু জানা যাবে না। এমন কি, এই উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় যদি অষ্টম শ্রেণীর শেষে একটা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও করেন, তাহলেও সেই সিদ্ধান্ত কিছুটা স্বৈরাচারী হবে। একটা ছাত্র যখন তার প্রকৃত ক্ষমতা, অক্ষমতা, স্বাভাবিক ধীশক্তি এবং অনুরাগ-বিরাগ সম্বন্ধে নিজেই সচেতন হয়নি, তখনই তার ভবিষ্যৎ শিক্ষার ছক কেটে দেওয়া এত বড় গুরু দায়িত্বের ব্যাপার যে, স্কুলের শিক্ষকরা অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সতর্ক বাজি হবেন কি না সন্দেহ। বীরা ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজিতে দ্বিবিধ কোর্সের বিরোধী, তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে আরো জোরালো করেন এই বলে যে, ইংরাজি সাহিত্যে বালক-বালিকাদের উপযুক্ত অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর গল্প-পড়ের এত প্রাচুর্য যে, তার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির সুযোগ সব ছাত্রকেই দেওয়া উচিত। তাঁরা বলেন যে, সাহিত্য হিসাবে সাহিত্যের রস উপভোগ করার মধ্য দিয়েই একটি ভাষা সম্পর্কে প্রকৃত ভাষা-জ্ঞান অর্জন করা যেতে পারে। তাই তাঁরা বলেন যে, নতুন শিক্ষা-পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে ভাষা-জ্ঞানের সৃষ্টি করতে হলে ইংরাজির সৌন্দর্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। তাঁরা মনে করেন, ছাত্রদের সঙ্গে বিদেশী ভাষার প্রথম পরিচয় আনন্দদায়ক

হওয়া উচিত। তার জন্ত চাই ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সরল সাহিত্য উপভোগের ব্যবস্থা করা। নিছক ভাষা-শিক্ষার ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে অত্যন্ত নীরস এবং নিরানন্দময়।

দু'টি মতামতের উপরই অনেক কিছু বলবার আছে। ম্যাট্রিকুলেশনে ইংরাজিকে দ্বিধা-বিভক্ত করণের প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব নয়। আবার বীরা ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রদের জন্ত ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যের মিশ্র কোর্সের পক্ষপাতী তাঁদের কথাও উপেক্ষণীয় নয়। দু'টি মতামতের সমন্বয়-সাধন করে এমন একটি কোর্স নির্ণয় করা যেতে পারে যা হবে কিছুটা সাহিত্য-যুক্ত ভাষা-প্রধান এবং বাস্তব। যারা সাহিত্যানুরাগী নয়, তাদের কাছে এই পাঠ বোকা হয়ে দাঁড়াবে না, আবার ম্যাট্রিকের পর কে কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করবে সেই রুচি-অভিরুচিরও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে।

এবং পরেই প্রশ্ন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান হবে কোথায়?

### ইন্টারমিডিয়েট ইংরাজি কোর্স

ইন্টারমিডিয়েটে ঢাকার মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুরূপ সাধারণ ইংরাজির একটা পেপারের বিশেষ প্রয়োজন। এটা হবে আই-এ, আই-এস-সি এবং আই-কম ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য এবং এই পেপারের পাঠ্য বিষয়ে থাকবে সামান্য সাহিত্য, সরল গদ্য এবং ছোট-ছোট সরল কবিতা। সেগুলো ভাবমূলক না হয়ে বর্ণনামূলক হলেই ভাল এবং এই পেপারের প্রধান বিষয়ই থাকবে রচনা শিক্ষা। আই-এ ছাত্রদের জন্ত ইংরাজির এই সাধারণ পেপারের সঙ্গে থাকবে ইংরাজি সাহিত্যের একটি বাধ্যতামূলক কোর্স, কিন্তু এখানেও লক্ষ্যটা হবে ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজি রচনা পড়ে স্বাধীন ভাবে বোঝাবার দক্ষতা বাড়ানো।

### ডিগ্রি কোর্সে ইংরাজি

বি-এ ক্লাসে ইংরাজি সাহিত্য হবে ইচ্ছাধীন (optional) বিষয়। তবে বি-এ ক্লাসের অন্যান্য সমস্ত ছাত্রদের জন্ত থাকবে সাধারণ ইংরাজির একটি বাধ্যতামূলক কোর্স। সেটা হবে ইন্টারমিডিয়েটের সাধারণ ইংরাজি পেপারের মত, তবে উচ্চতর মানের। বি-এস-সি এবং বি-কমের ছাত্ররাও সাধারণ ইংরাজির কোর্স নিতে পারবে, কারণ তাতে তাদের লাভই হবে।

ডিগ্রী ক্লাসে সমস্ত ছাত্রের পক্ষেই ইংরাজির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রক্ষা করা বিশেষ লাভজনক হবে; কারণ, তাতে ইংরাজি পাঠ্যপুস্তক থেকে তথ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা তো হবেই, উপরন্তু এমন একটা ভাষায় নিজেদের তারা প্রকাশ করতে পারবে যা অন্তত আরও কিছু কাল আন্তঃপ্রাদেশিক আদান-প্রদানের প্রধান বাহন হয়ে থাকবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের সর্বপ্রধান যোগসূত্র হিসাবে ইংরাজি তো থাকছেই।

যারা অনার্স নেবে দেশী সাহিত্যে, ইংরাজি সাহিত্যের কোর্স হবে তাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয়। এ ছাড়া তাদের জন্য বিশেষ ভাবে প্রণীত ইংরাজি সাহিত্য-সমালোচনা এবং ইংরাজি সাহিত্যের গঠন-রীতি সম্পর্কীয় একটি পেপারও তাদের নিতে হবে।

ইংরাজি সাহিত্যের প্রতি যাদের প্রকৃত আগ্রহ গড়ে উঠবে, একমাত্র তাদেরই বি-এ ক্লাসে ইংরাজিতে অনার্স নিতে দেওয়া হবে। কোর্সে ছাত্রের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের উপর দু'টি পেপার থাকবে। তাতে সুবিধা এই যে, ছাত্রটি যে দেশী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হতে যাচ্ছে, তার সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমালোচনার তুলনামূলক অধ্যয়ন করা সম্ভব হবে।

এম-এ ক্লাসে একমাত্র তারাই ইংরাজি পড়তে পারবে, যারা ইংরাজিতে অথবা কোন দেশী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেছে। এম-এ কোর্সেও বি-এ অনার্সের মত দেশী সাহিত্যের উপর দু'টি পেপার থাকবে, তবে উচ্চতর মানের। তাতে তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এম-এ কোর্সে দেশী সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকায় ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা-পদ্ধতি এবং ইংরাজি সাহিত্যের গঠন-প্রণালীর উপর দু'টো পেপার থাকলেও বিশেষ সুবিধা হতে পারে।

ইংরাজদের বিদায় দিলেও ইংরাজিকে আমরা বেখে দেব এবং নিজেদের কাজে ব্যবহাৰ করব। ইংরাজি আব আমাদের উণীড়ক প্রভু হিসাবে থাকবে না। নিজেদের সাহিত্য অধ্যয়নে ইংরাজি হবে আমাদের সহায়ক এবং এই বিবটি উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার প্রধান সূত্র। ইংরাজিকে আর আমবা দেবতার আসনে বসাবো না। ইংরাজদের ইংরাজি উচ্চারণ এবং লেপার অক্ষ অঙ্ককরণ কবে আমরা আর সময় ও শক্তিৰ অপব্যয় করব না। আমবা ইংরাজির বাহ্যাকারের দিকে নজর না দিয়ে বিষয়-বস্তুর দিকে দৃষ্টি ফেৰাবো এবং নিজেদের ভাবাব মাধ্যমে ইংরাজি শিখব। অগ্ৰাণ্ণ বিধায়ের মত ইংরাজি শিক্ষাব বাহন হবে মাতৃভাষা—সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত।

ইংরাজদের বাজর্নৈতিক শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার পর নিজেদের মঙ্গলের জ্ঞান ভাবত যদি তার শিক্ষা-পবিকল্পনায ইংরাজিকে স্থান দেয়, তাহলে তাব জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ নেই এবং এর মধ্যে কোন দাস-মনাবৃত্তিও নেই। সকলেই স্বীকার কবেন, বিশ্বের মহান ভাষা হিসাবে আন্তঃপ্রাদেশিক এবং আন্তর্জাতিক

আদান-প্রদানের যোগসূত্র হিসাবে ইংরাজির মূল্য অসীম। সংস্কৃতির দিক দিয়েও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজিকে যদি সহায়তাকারী অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে স্থান দেওয়া হয়, এবং সেই অমুযায়ী ইংরাজি শিক্ষাদান-পদ্ধতি পুনর্গঠন করা হয়, তাহলে ইংরাজি আর আজকের মত পীড়াদায়ক বোঝা হয়ে না থেকে আমাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে। যে দেশী সাহিত্যেব উন্নয়ন এবং অধ্যয়নের জ্ঞান আমরা এত ব্যাকুল, উপরে বর্ণিত উপায়ে ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করলে তাতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাবে।

আমাদের বিশ্বস্ত হওয়া উচিত নয় যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সেই সমস্ত ভারতীয়ই মহান হয়েছেন যাদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ হয়েছে এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং সংস্কৃতির পথে আমাদের একমাত্র ছাড়পত্র হচ্ছে ইংরাজি। ভারতীয় ভাষায় শ্রেষ্ঠ লেখক হয়েছেন তাঁরাই, যারা সেন্সপীয়ার, মিল্টন, শেলী এবং কীটসের সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পবিচিত হয়ে ইংরাজি সাহিত্যের মূল সুরটি আয়ত্ত কবেছেন। ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্য, ইংরাজি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবধারা এবং ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে আমাদের কাছে বিশ্ব-সংস্কৃতির একমাত্র না হলেও মহান্ হোবণ। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক এবং মানবিক জ্ঞান-দীপ্তির মূল্যবান আধার।

যে দেশে ইংরাজির ব্যাপক প্রসারের ফলে এক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, ভারত কি তাব সুযোগ-সুবিধা হাবাতে পাবে? ভাবত ইংরাজিকে আয়ত্ত করেছে। বাজর্নৈতিক অথবা জাতীয় কুসংস্কারের খাতিবে এই বিবটি সাংস্কৃতিক বিচ্ছয়কে হাক্কা ভাবে জলাপাল দেওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসের মত ভাবত তাব বিচ্ছয়তাকে জয় কবেছে। ববীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, সর্বোজ্জিনী নাইডু, জগতবলাল নেহেরু, বাধাকৃষ্ণ সাবা বিশে প্রমাণ কপেছেন যে, মহান্ ভারতীয় মানস ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যেব সাব বস্তুকে আয়ত্ত করতে পারে, তাঁবা প্রমাণ কবেছেন যে, ইংরাজি ভাষা এবং সাহিত্যেব সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বিজাতীয় প্রভাব বৃদ্ধির পরিবর্তে ভাবতের জাতীয় সংস্কৃতি উন্নততর ও ব্যাপকতর হয়েছ।

### গল্প হলো সত্যি

তখন ভিক্টোরিয়ার আমল। বলিভিয়ার ডিক্টেটর ম্যারিয়ানো বলিভিয়াতে এক আসরে আমন্ত্রণ জানালেন অতিথি ও অভ্যাগতদের। ম্যারিয়ানোব এক পাটরাণীকে আসরে এনে অতিথিদের আদেশ করা হ'ল যাতে সকলে ঐ পাটরাণীকে সেলাম জানায়। সকলেই প্রায় সেলাম জানালে, কিন্তু বলিভিয়াস্থ ব্রিটিশ দূত সেলাম জানাতে অস্বীকার করলে। ম্যারিয়ানো তা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে আদেশ করলেন যে, ঐ দূতকে নয় ক'রে পাখার পিঠে চাপিয়ে, ঢাক বাজাতে বাজাতে রাজধানীর বাইরে বের ক'রে দেওয়া হোক। আদেশ পালিত হ'ল যথার্থ।

যখন ভিক্টোরিয়া ঐই অপমানের কথা বিস্তারিত শুনলেন, তখন তাঁর রাজত্বের মানসজ্ঞানতে ভিক্টোরিয়া ভীষণ চটে গেলেন। প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে পাঠানো হ'ল। ভিক্টোরিয়া লুকন দিলেন যে, মানচিত্র থেকে বলিভিয়াকে বাতিল করা হোক। ভিক্টোরিয়া নিজেই কাঁচি দিয়ে মানচিত্র থেকে বলিভিয়াকে কেটে ফেললেন। পবিত্রদ-গৃহে পৃথিবীর ঝুলন্ত মানচিত্রে বলিভিয়া আব বঠলো না। বিলোত্তী ভূগোলে বলিভিয়ার কোন উল্লেখ থাকবে না। ব্রিটিশের কোন কিছু থেকে বলিভিয়াকে বাদ দেওয়া হ'ল তখনকার মত।



# ঐ রঙ্গ জে বের জিজিয়া কর

শ্রীমান শর্মা

খৃষ্টীয় ১৬৭১ সালের এপ্রিল মাসে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর যে জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন, সে উপলক্ষে তিনি কিংপ নীতি অনুসারে চলেন ও কার্যক্ষেত্রে কিংপ ব্যবস্থা করেন, সরকারী কাগজপত্র হইতে সে-সম্বন্ধে পর্যালোচনার কিছু চেষ্টা করা বাইতেছে।

আবগণ কর্তৃক সিদ্ধ জয়েব পর হইতেই ভারতের মুসলমান রাজা বা তাঁহাদের হিন্দু প্রজাদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায় কবিত্তেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ফিবোজ শা হোগলক এরূপ বেহাইএব কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিতে পান নাই। আদর্শ মুসলমান রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহাব যে ধারণা ছিল, বাহাতে তাহাব সচিত্র দিল্লী বাক্যের মত দুব সম্ভব সম্ভবিত থাকে, সেই জন্য মাধ্যম নীতি অনুসারে তিনি ব্রাহ্মদেরও উপর ঐ কর স্থাপন করেন। সেই হইতে মুসলমান রাজা বা সকল শ্রেণীর হিন্দুদের নিকট হইতেই ঐ কর আদায় কবিত্তেছিলেন। আকবর তাঁহাব অ-মুসলমান প্রজাদের এই অপমানজনক কর-ভার হইতে বেহাই দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। তাঁহাব কয় জন উত্তরাধিকারীও তাঁহাব নীতি অনুসরণ করেন; তাঁহাবও মুসলমান প্রথা অনুসরণ করেন নাই।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ কবির পর অবস্থাব পরিবর্তন ঘটে। ঔরঙ্গজেব ধর্ম সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ছিলেন; তিনি পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য স্থাপনে ব্যগ ছিলেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান রাজা ছিলেন, কাজেই কোবাণের নির্দেশ ব্যতীত অন্যভাবে রাজাশাসন তিনি অস্বীকৃত মনে করেন। তাঁহাব পূর্ব-কথন যদি অ-মুসলমান পথা মানিয়া লইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাব বিবেচ্য বিষয় নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এশিয়া ও ইউরোপের সমগাময়িক রাজাদের মত তিনি তাঁহাব রাজ্য ভগবানের সেবক হিসাবে শাসন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। তাঁহাব শাসনে বাহাতে তাঁহাব ধর্মের গোঁব বৃদ্ধি পায়, সে জন্য তিনি গোঁড়া মুসলমান শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরণেব সিদ্ধান্ত করেন। তাই বাহা তিনি ইসলামী আদর্শ বলিয়া মনে কবিতেন, সেই অনুসারে তাঁহাব শাসন-ব্যবস্থা চালান। ঐ সময় ইংলেণ্ডে দ্বিতীয় চার্লসের ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা তাঁহাব খৃষ্টান প্রজাবা গর্জিত বলিয়া মনে কবিতেন। সেইরূপ আকবরের পবন্থ-সহিত্যাব নীতি ঔরঙ্গজেব ধর্মতানিকব বিপথগমন বলিয়া বিবেচনা কবিতেন। তাঁহাব ভাব-গতি বিশিষ্ট ধরণেব ছিল; সে জগৎ বেকপ কুসংস্কার ও আদর্শ হওয়ার কথা, তাঁহাব তাহাই ছিল। পবন্থ-সহিত্য তাখনও ভবিষ্যতের ব্যাপাব ছিল। অজ্ঞ মতাবলম্বী মুসলমানবাও তাঁহাব নিকট বিশেষ প্রশংসেব আশা কবিত্তে পারিতেন না। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলেণ্ডে এই বিষয়ে ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই; উনবিংশ শতাব্দীর ভূতীয় পাদেব পূর্বে আয়ারলণ্ডে রোমান ক্যাথলিকদের নাগরিক অস্ত্রবিধা দ্বীভূত হয় নাই।

আকবর সে যুগেব উপযোগী লোক ছিলেন না। ঔরঙ্গজেব যুগোপযোগী আদর্শ পালন কবিত্তা মন্তব্য লাভ করেন। আকবরের অনেক কর্তব্যবাহী তাঁহাব ঐ উদারতা খেছায় মানিয়া লয় নাই।

তাহাব তাহাতে কোন উৎসাহ পায় নাই। কাজেই কোন ধর্ম-পরায়ণ রাজা ভাবতের মুসলমান রাজাদের স্বাভাবিক নীতি পুনরায় গ্রহণ কবিলে মোগল কণ্ঠচারী মহলে বিরোধিতার কোন আশঙ্কা ছিল না। মুসলমান সমাজের ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিবাহ ভাবতের মুসলমান রাজাদের স্বৈরাচারমূলক শাসনে কার্যকরী ভাবে বাধা দিতে পারিতেন, কিন্তু যে রাজা তাঁহাদের পরামর্শ ও পরিচালনা চাহিতেন, তাঁহাব পবিকল্পনায় তাঁহাবাই বা কিরূপে বাধা দিতে পারেন? কাজেই সব দিক দিয়াই অবস্থা নীতি-পরিবর্তনের উপযোগী ছিল।

অবশ্য ঔরঙ্গজেবের প্রজাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোক হিন্দু ছিল। সে শতাব্দীতে অজান্ধরা যেমন ভুল করিতেন, ঔরঙ্গজেবও তাহাদের চছা ও স্বার্থেব প্রতি উদাসীন থাকিতা সেইরূপ ভুল করেন। কিরূপে তিনি এরূপ অভিমত পোষণ করিত্তে আবশ্য করেন, সে কথা বুঝিবার জগা সে সময়ের সরকারী কাগজ-পত্রের বিবরণ পর্যালোচনা করা আবশ্যক। যখন উত্তরাধিকারি লইয়া সংগ্রাম বাধে, তখন প্রায় সকল হিন্দু রাজগাই তাঁহাব পাশে যুদ্ধ করেন। যশোবন্ত সিং অজ্ঞ পথ গ্রহণ করিলেও কিছু পবে তিনিও তাঁর পাশে যান। এই উত্তরাধিকারিদের সংগ্রামের কূটনীতি এখনও ভাল কবিত্তা বিবেচনা কবিত্তা দেখা হয় নাই। তাহা না দেখা পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এই ধর্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামি কিরূপে ক্রমশঃ দেখা দিতে থাকে, সে সমস্তাব সমাধান হইবে না।

১৬৭১ সালের মধ্যে ঔরঙ্গজেব গোঁড়ামীর দিকে এত অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, অ-মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর স্থাপনের আদেশ দেওয়া তাঁহাব পাশে সম্ভব হয়। ভারতবর্ষ ও রাজপুত রাজ্যগুলিতে সকলকেই—সবকারী কণ্ঠচারী, বেসবকারী লোকজন, ব্রাহ্মণ, অ-ব্রাহ্মণ, কেরাণী ও সৈন্যবিভাগেব লোকদিগকেও—ইহা দিতে হইত। কখন কখন বলা হইত, সৈন্যবিভাগে কাজ করা মুসলমানদের পাশে বাধ্যতামূলক ছিল; সৈন্যবিভাগে চাকরীর পরিবর্তে হিন্দুদিগকে এই কর দিতে হইত। ভারতের মুসলমান সম্রাটবা, বিশেষতঃ নোগল সম্রাটবা এই বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণে মুসলমান প্রজাদিগকে কি ভাবে বাধা করিতেন, বেকপ কোন ব্যবস্থাব কথা কেহই বলেন না। মতবাদেব কথা বাদ দিলে কার্যক্ষেত্রে এমন একটিও নিদর্শন পাওয়া যায় না, যেখানে ভারতের কোন মুসলমান শাসক তাঁহাব রাজ্যরক্ষার জগা তাঁহাব স্বজাতীয়দিগকে তাঁহাব পরাকাতলে আহ্বান কবিত্তাছিলেন। যদিই ধবিত্তা লওয়া হয়, কোন সময় সৈনিকবৃত্তির পরিবর্তেই ঐ কর লওয়া হইত, তাহা হইলে যখন রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের রাজপুত রাজাদের উপর ঐ কর স্থাপন করা হইত, সে সময়ের সম্বন্ধে আর সে কথা বলা যায় না। মেবাবেব রাণা একবার মোগল কণ্ঠচারীদিগকে লক্ষ সুর্য্য মুদ্রা কর-স্বরূপ দিবার পর হিসাব কবিত্তা দেখা যায়, ৩ হাজাব টাকা কম হইয়াছে। ১৬৮৭ সালের ৩রা আগষ্ট সম্রাট জয়সিংহকে ঐ টাকা মাপ করেন, তাহাব কারণ, বহু দিনের শত্রুতাব অবসানে সেই সময় উভয়ের মধ্যে সন্ধি হয়। সম্রাটের দরবারেব

১৭০২ সালের ১২ই জুলাইএর বুলেটিনে দেখা যায়, সৈন্যবিভাগ হইতে জিজিয়া আদায়ের জ্ঞাপন নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, সম্রাটের সৈন্যদলে নিযুক্ত হিন্দুরা জিজিয়া দিতে দিত।

শ্রাব যদুনাথ সরকার এক সময় বলেন, হিন্দু সরকারী কৰ্মচারীরা ঐ কর দিতেন না। কিন্তু প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের আগরাব দরবারের ১৬৯৪ সালের ৮ই মে তারিখে বুলেটিনে দেখা যায়, প্রাদেশিক বজার নিজস্ব সহকারী, এক জন দেওয়ান ও এক জন আমিন—এই কয় জন হিন্দু কৰ্মচারী জিজিয়া 'কর প্রদানে বিলম্ব করিয়া' ফেলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন কৈফিয়ৎ দেন, তাঁহার উক্ত পদের মুসলমান কৰ্মচারী বিশেষ পীড়িত হইয়া পাড়ায় তিনি সরকারী কাজে ব্যস্ত ছিলেন; সে জন্ম নিজে যাইয়া জিজিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি ঐ কর তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে দিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার অসুযোগ অগ্রাহ্য করা হয়। তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয়, যথানিয়মে তাঁহাকে নিজে যাইয়াই কর প্রদান করিয়া আসিতে হইবে। ঐ সকল কৰ্মচারীকে আদেশ মত নিজেরা যাইয়া জিজিয়া দিয়া আসিতে হয়। রাজস্বদের রাজ্যেও এই কর বসান হয়। ১৬৮৮ সালের ২রা মে তারিখে জয়পুর সর্বকাবের কাগজপত্রে দেখা যায়, রাজা রাম সিংএর ডাক-পেয়াদারা বারহানপুর পৌছিলে তাহাদিগকে ঐ কর দিতে বলা হয়। তাহারা তাহার পূর্বেই জয়পুরে ঐ কর দেওয়ায় আবার তাহা দিতে অস্বীকার করে। ফলে তাহাদিগের নিকট যে সকল চিঠিপত্র ছিল, তাহা জোরপূর্বক দখল করা হয় এবং তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ব্যাপারটা সম্রাটের গোচরে আনিবার পর তবে তাহারা মুক্তি পায়। অতঃপর আদেশ দেওয়া হয়, সম্রাটের অথবা অজ্ঞ কাহারও ডাকবাহী লোকদের নিকট হইতে কেবল তাহাদের বাসস্থানেই কর আদায় করা হইবে, ডাক লইয়া যাইবার সময় তাহাদের নিকট করের দাবী করা হইবে না।

জায়গীরে জায়গীরদারদিগকে জিজিয়া আদায়ে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে দেওয়া হইত না। সম্রাটের কৰ্মচারীরা যাইয়া কর আদায় করিত। কৰ্মচারীদের কাজ প্রীতিপ্রদ ছিল না। যে করকে ব্যাপক ভাবে ঘৃণা করা হইত, তাহা আদায়ে গোলমাল সর্বদাই ঘটিত। ১৭০৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী সংবাদ পাওয়া যায় যে, মালব প্রদেশের আমিন-ই-জিজিয়া বিরাম দেব সিসোদিয়ার পুত্র দেবী সিংএর জায়গীরে জিজিয়া আদায়ের জন্য এক জন সৈন্য পাঠান। সৈনিকটি সে স্থানে পৌছিলে দেবী সিংএর লোকরা তাহাকে আক্রমণ করে, তাহার চুল ও নাড়ি ধরিয়া টানটানি করে। শেষে সে রক্তহস্তে ফিরিয়া যায়। সম্রাট দেবী সিংএর জায়গীরের অবস্থার পরিবর্তনের আদেশ দেন। ইহার পূর্বে এক আমিনকে আরও বেশী বিপদে পড়িতে হয়। সে কোন মনসবদারের জায়গীরে কৰ্মচারী না পাঠাইয়া নিজেই যায়। সে জিজিয়া আদায়ের চেষ্টা করিলে মনসবদার আমিনকে হত্যা করে। ১৬৯৪ সালের ১৮ই জুলাই ঘটনাটি সম্রাটের গোচরে আনা হইলে তিনি মনসবদারের পদাবনতির আদেশ দেন।

জিজিয়া করের পরিমাণও কম ছিল না। গুজরাটে উহা প্রাদেশিক রাজস্বের শতকরা ৪\*৪২ ভাগ ছিল। দরবারের

অজ্ঞ এক তারিখের বুলেটিনে জানা যায়, 'বেরারে মাল্লের নামক স্থান হইতে ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হইয়াছে, আদায় এখনও শেষ হয় নাই।' আইন-ই-আকবরীতে যে স্থানটিকে মানবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদি মাল্লের হয়, তাহা হইলে আকবরের সময় উহা রাজস্ব ছিল ২০ হাজার টাকা। ঔরঙ্গজেবের সময় সমগ্র বেরার প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫১৮-১৭৫০ টাকা। আকবরের সময়ও প্রায় ঐরূপ ছিল। আকবরের সময় বেরারে ১৪২টি পরগণা ছিল। সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী পরগণা ৬২৭৮৬৮ টাকা রাজস্ব দিত। আলোচ্য পরগণা হইতে যে ৩০ হাজার টাকা আদায় করা হয়, তাহা ঐ রাজস্বের তুলনায় শতকরা ৪\*৭৬ ভাগ। তখনও কিন্তু জিজিয়া আদায় শেষ হয় নাই।

জিজিয়া স্থাপন ও তাহা আদায়ের জ্ঞাপন বিপুল ব্যবস্থা করিতে হইত। কি পরিমাণ জিজিয়া আদায় করিতে হইবে, তাহা একখানি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ থাকিত। আদায় আরম্ভ হইলে পরগণার আমিন তাহার সাহায্যের জ্ঞাত স্থানীয় সরকারী কৰ্মচারী, কোতোয়াল, কামুনগো ও থানাদারদের আহ্বান করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল। সে প্রাদেশিক আমিনকে তাহার আদায়ের সংবাদ জানাইত। সম্রাট যখন সভাসদগণ সহ বাহিরে যাঠিতেন, সে সময় তাঁহার সঙ্গে এক জন জিজিয়া-আমিন থাকিত। কোন সৈন্যদলকে যখন অভিযানে পাঠান হইত, তখন আলাদা কৰ্মচারীদিগকে তাহাদের সঙ্গে পাঠান হইত। তাহারা সৈন্যদের নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করিত। এই সমস্ত কৰ্মচারী সাধারণতঃ বিশেষ উচ্চপদস্থ হইতেন না। ১৭০২ সালে সম্রাটের সঙ্গে যে আমিন যায়, সে ৩ শত অশ্বাবোহী সৈন্যের মনসবদার ছিল। ২ শত অশ্বাবোহী সৈন্যের ভারপ্রাপ্ত আমিনও ছিল। সর্বোচ্চ পদের আমিন ৬ শত অশ্বাবোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিল। এক জন আমিন দাক্ষিণাত্যেব সমস্ত প্রদেশের কার্যের তত্ত্বাবধান করিত।

৩ রকম জিজিয়া ধার্য করা হইত। যাহাদের ১ শত ডিরহাম (৫১ তোলা ১০ মাশা ও ৭১ গ্রেন কপা) মূল্যেব সম্পত্তি থাকিত, তাহারা ১২ ডিরহাম জিজিয়া দিত। অর্থাৎ মোট সম্পত্তি (আয়েব নয়) শতকরা ৬ ভাগ জিজিয়া দিতে হইত। মূলধনের উপর জিজিয়া দিতে হইত। ফলে সমগ্র মূলধন প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যেই ঐ ভাবে নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কথা। বিল অফ্-এন্ড-চেঞ্জ (হুণ্ডার) উপব বাটার সর্বনিম্ন হার ছিল টাভাবনিয়ারের মতে শতকরা ৬ টাকা। ১৭০৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত টাকা-কড়ির লেন-দেনের-ব্যাপার হইতে জানা যায়, স্বদের হার ছিল শতকরা ৪ টাকা। অর্থাৎ যে মালিকের সম্পত্তি হইতে বৎসরে ৪২ টাকা আয় হইত, সেইরূপ দরিদ্র ব্যক্তির নিকট হইতে সমগ্র আয়ই জিজিয়া-স্বরূপ লওয়া হইত।

যাহাদের আয় ৫২ টাকা হইতে মোটামুটি ২১ হাজার টাকা ছিল, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর করদাতা। তাহাদিগকে জিজিয়া-স্বরূপ ২৪ ডিরহাম (৬০ টাকা) দিতে হইত। শতকরা ৪ টাকা স্বদ হইলে ২১ হাজার টাকার স্বদ ১ শত টাকা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে জিজিয়া আয়েব শতকরা ৬ টাকা হাভে আদায় করা হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর জিজিয়া অনেক কম হইলেও বর্তমানের আয়করের হার অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। যাহাদের সম্পত্তির

মূল্য ১০ হাজার ডিরহামের অধিক ছিল, তাহাদের আয়ের পরিমাণ যাহাই হইক না, তাহারা ৪৮ ডিরহাম দিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। তাহাদিগকে মোট ১২১/০ আনা দিতে হইত। জিজিয়া বাবদ দরিদ্রদের বাৎসরিক আয়ের বেশী দিতে হইত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়ের শতকরা ৬ ভাগ লওয়া হইত। ধনীদের নিকট হইতে যাহা লওয়া হইত, তাহা তাহাদের আয়ের অল্পপাত অল্পায়াই ছিল না। ধনীরা এক সঙ্গে সমগ্র টাকাটা দিত; মধ্যবিত্তরা তাহাদের ইচ্ছামত একেবারে অথবা দুই বা ততো দিত; দরিদ্ররা ৪ কিস্তিতে দিতে পারিত।

অবশ্য কোন কোন শ্রেণীর লোককে জিজিয়া হইতে রেহাই দেওয়া হইত। অপ্রাপ্তবয়স্ক, নারী, সকল প্রকার ক্রীতদাস, অন্ধ, দুর্বল-মস্তিষ্ক, বেকার, খঞ্জ ও ভিক্ষুকদিগকে জিজিয়া দিতে হইত না। যাহারা ৬ মাসের অধিক অরুণ থাকিত, তাহাদিগকেও ঐ কর দিতে হইত না।

করদাতাদিগকে নিজেরা যাউয়া কর দিতে হইত। যে মঞ্চের উপর আদায়কাবী বসিত, তাহার নিকট যাউয়া আদায়কারীর সম্মুখে পাঁড়াটয়া নিজ হস্তে আদায়কারীর নিকট মুদ্রাগুলি ধরিতে হইত। প্রাপ্য কর যাহাতে বেহাট দেওয়া না হয়, সে সম্বন্ধে আদায়কাবীকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। সে নীতি অনুসারে করটি আদায় করা হইত, কাহাকেও ব্যক্তিগত ভাবে বেহাট দিলে তাহা বিপর্যাস্ত হইয়া যাইবে বলিয়া ঔরঙ্গজেব মনে করিতেন। ঐ বিষয়ে স্থানীয় কণ্ঠচারীদিগকে কোন ক্ষমতা দিবার কথা তিনি কানে তুলিতেন না।

তবে সময় সময় কোন কোন অঞ্চলকে বেহাট দেওয়া হইত। স্থানীয় কণ্ঠচারী বা স্থপাতি কবিলেও ঔরঙ্গজেব ২টি ক্ষেত্রে কোন বেহাট দেন নাই। পঞ্চাশতাব্দে সবকাবী কাগজপত্রে দেখা যায়, বিস্তৃত অঞ্চলে ৫টি ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেব বেহাট দেন অথবা সে সত্ত্ব প্রস্তুত ছিলেন। ১৬৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বাতাজুপুর্বে অবিবাসীদের পক্ষে জিজিয়া বেহাটএবং একখানি আবেদন পেশ করা হয়। ঔরঙ্গজেব ঐ দিনই ঐ বিষয়ে বিস্তুত বিবরণ চান। তাহাব পর সে সম্বন্ধে আব কি ব্যবস্থা হয়, সবকাবী কাগজপত্র হইতে তাহা জানা যায় না। স্থানীয় অধিবাসীদের ও সবকাবী কণ্ঠচারীদের আবেদনের ফলে তাহাদের কর দুই-এক বৎসরের জ্ঞা মাপ করা হয়। ১৭০৪ সালের ১১শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণাত্যের মোগল প্রদেশগুলির সর্বত্র ঐ কর আদায় বন্ধ করা হয়; মাথাঠাদের আক্রমণের জ্ঞা যে অনুবিধা ঘটে, সে জ্ঞা ঐরূপ বিশেষ ব্যবস্থা হয়। ১৭০৪ সালের ১২ই নভেম্বর

দেবলবার্টের জিজিয়া কর আদায় ৩ বৎসরের জ্ঞা নিষিদ্ধ করা হয়। হায়দরাবাদ জয়ের পর উহার জিজিয়া ও অম্বাজ কর মাপ করা হয়। কত দিন সে অবস্থা ছিল, জানা যায় না। তবে ব্যবস্থাটি যে অল্প দিনের জ্ঞা, তাহা বলাই বাহুল্য। এক সমসাময়িক লেখক বলেন, দক্ষিণাত্য জয়ের পূর্বে সেখানে জিজিয়া বলপূর্বক স্থাপন ও আদায় করা হয়। অবস্থা বিবেচনা করিয়া রেহাইএর সিদ্ধান্ত করা হইত। ঔরঙ্গজেব যে এই বিষয়ে অবস্থা কর্তার অথবা জেদী ছিলেন, ঐরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

ঔরঙ্গজেব ইসলামী আইন অনুসারে তাঁহার রাজ্য শাসনের নৈীতি স্থির করেন, জিজিয়া তাহারই অঙ্গ। তাঁহার অ-মুসলমান প্রজারা ঐ করের জ্ঞা কিরূপ অবস্থায় পড়িতে পাবে, সে কথা তিনি কোন দিন চিন্তা করেন নাই। যদি কেহ ঐ কর প্রদান এড়াইতে চাহিত তাহা হইলে তাহার পক্ষে সে পথও উন্মুক্ত ছিল। সে “সত্যধর্ম” গ্রহণ করিয়া ঐ করভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিত। দরবারের ঐ সময়ের বুলেটিনে প্রায়ই লোকের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা দেখা যায়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকাবীকে দরবারে উপস্থিত করা হইত। কিন্তু কত জনে যে কেবল বা প্রধানতঃ ঐ করভারের জ্ঞা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা স্থির করা কঠিন। অ-মুসলমানদের জীবন যাহাতে কষ্টকর হইয়া উঠে, সে জ্ঞা ঔরঙ্গজেব আরও অনেক উপায় অবলম্বন করেন এবং তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সম্বন্ধে অনেক প্রলোভনও দেখান। জিজিয়া ঐ সকল উপায়েব অন্যতম। কাজেই অ-মুসলমানদিগকে মুসলমান করার বিষয়ে জিজিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কিরূপ কার্যকরী হয়, তাহা বলা কঠিন।

ঐ সঙ্গে আরও একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, ঔরঙ্গজেব যে সময় জিজিয়া কর স্থাপন করেন, সে সময় পূর্বধর্মসিদ্ধতা বাহিন্যকদের নিয়ম-বহির্ভূত ছিল। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের বা তাহাদের দ্বন্দ্বের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন বলিয়া যে ঐ কর স্থাপন করেন, তাহা নয়। ইসলামী বাহিন্য সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের ধারণা বেরূপ ছিল, তাহা তাহাকে ঐ কর স্থাপনে বাধ্য করে। জিজিয়া আদায়ে তিনি সাধারণতঃ অধিক কড়াকড়ি করিতেন না। মুসলমান রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্মে অবিবাসীকে তাহাব সহনশীলতাব জন্য যে মূল্য দিতে হইতে পারে বলিয়া স্বভাবতঃ আশা করা যাইতে পারে, ঔরঙ্গজেবের নিকট জিজিয়া কর তাহার কম কিছু ছিল না।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল।

## কাগজ

কাগজ পুরাতন ‘কাগদ’ নামে কথিত। কাগজ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—কঠাস, তামিল—বরক, ডেনমার্ক—পেপির, ফরাসী ও জার্মানী—পেপয়ার, ইটালী—চার্টা বা কার্টা, পর্তুগীজ ও স্পেন—পেপেল, রাসিয়া—মাস্কনা, ইংলণ্ড—পেপার এবং বাঙলায় কাগজ।

কাগজের সৃষ্টি হয় তৃণ ও বৃক্ষের অংশ থেকে।

## আবির্ভাব

কবীরদাস ছিলেন সিদ্ধ ভক্ত, সন্তদের মধ্যে মণ্ডলেখর-স্বরূপ।

কবীরদাসের পরবর্তী উত্তর-ভারতের সকল সংস্কারমুক্ত ভক্ত-সম্প্রদায়ই কোনো না কোনো ভাবে তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। এই সব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কেউ কেউ সাক্ষাৎ ভাবে কবীরদাসের শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত।

হিন্দীভাষী জনসাধারণের উপর কবীরদাসের প্রভাব অসাধারণ। একমাত্র গোস্বামী তুলসীদাস ব্যতীত এদিক দিয়ে আর কারুর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। হিন্দীতে একটি কথা আছে—

ভক্তী ভাবিড় উপজী লায়ো রামানন্দ,  
প্রগট কিয়া কবীরনে সন্তদ্বীপ নব খণ্ড।

ভাবিড় দেশে উৎপত্তি হ'ল ভক্তির। তাকে নিয়ে এলেন রামানন্দ আব কবীরদাস, প্রকাশ করে দিলেন সন্তদ্বীপ নবখণ্ডে, (অর্থাৎ সারা দুনিয়ায়)। এর থেকেই বোঝা যায়, হিন্দীভাষী জনসাধারণের কাছে ভক্তির ক্ষেত্রে কবীরদাসের স্থান কত উচ্চে।

কবীরদাসের আবির্ভাব-কাল সঠিক জানা যায় না। কিংবদন্তী অনুসারে ইং ১৩৯৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে গুরুপক্ষে কবীরদাসের জন্ম হয়। কবীর কসৌটি গ্রামে আছে কবীরদাসের মৃত্যু হয় ১৫১৮ খৃঃ এবং তিনি ১২০ বছর বেঁচে ছিলেন। সেই হিসাবে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দেই তাঁর জন্ম হয়। কিন্তু অনেকে বিশেষ করে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এটি সত্য বলে মানেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের ইতিহাস-সম্মত জন্মকাল ইং ১৪৪০ সাল। তবে ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই নাহেরদেব এই মত স্বীকার করেন না। ১৩৯৮ খৃঃ কবীরদাসের জন্ম হয় এই মতটিই তাঁরা সত্য মনে করেন। ভাবতব্রাহ্মণে আছে, কবীরদাসের জন্ম হয় ১৩৯৮ খৃঃ ও ১৪৪৮ খৃঃ তিনি দেখদক্ষা করেন। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন ডাঃ ফ্যুরের “উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার শিলালেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভব কবে ভারতব্রাহ্মণের মতই সমর্থন করেন।

কবীরের জন্ম সম্বন্ধে একাধিক মত প্রচলিত রয়েছে। সাধারণ মত—এক গরীব মুসলমান জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম নীরু আর মায়ের নাম নীমা।

কিন্তু কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যেরা এই মত মানেন না। কবীরের মত এত বড় মহাপুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জোলায় ঘরে জন্মাবেন এ কথা তাঁরা বিশ্বাসই করেন না। তাঁদের মতে কবীরদাসের জন্ম হয় অলৌকিক উপায়ে। তিনি গুরু রামানন্দের জৈনিক ব্রাহ্মণ শিষ্যের বিধবা কন্যার সন্তান। তিনি জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন এই মাত্র। নীরু আর নীমা তাঁর আসল পিতামাতা নয়। কবীরদাস তাদের কুড়ানো ছেলে। তাঁকে তারা শুধু পালন করেছিল।

কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাহিনী।

গুরু রামানন্দের এক জন ব্রাহ্মণ শিষ্য এক দিন তাঁর বালবিধবা কন্যাকে নিয়ে স্বীয় গুরুদেবকে দর্শন করতে যান। মেয়েটি প্রণাম করলে রামানন্দ তাকে সুপ্ত্র লাভ কর বলে আশীর্বাদ করেন। মেয়েটি যে বিধবা তা তিনি জানতেন না। এখন উপায়? সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্বাদ ত ব্যর্থ হতে পারে না? বাপ ও মেয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল গুরুর পায়ে। গুরু বললেন—আমার আশীর্বাদ মিথ্যা হতে

# ভক্ত কবীর

শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস (শান্তিনিকেতন)

পারে না। তবে ভয় নেই তোমাদের। আমার বরে পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীতই এই কন্যা পুত্রলাভ করবে। জগতের পরিভ্রাণের নিমিত্ত এর গর্ভে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে। অলৌকিক হবে এর সন্তানের জন্ম। সে মায়ের হাতের তালু দিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে মেয়েটি লোকনিন্দার ভয়ে তাকে চুপি চুপি লহর তালান্ড-এ একটি পান্ডুলেব উপর রেখে দিয়ে আসে।

ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পায় জোলা নীরু আব তার স্ত্রী নীমা। এমন সুন্দর ছেলে, না জানি কোন অভাগিনী ফেলে দিয়ে গিয়েছে! ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ-সম্বন্ধে স্বামি-স্ত্রীতে মিলে অনেক পরামর্শ হ'ল। তাদের নিজেদের কোন ছেলে ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত তারা স্থির কবল ঈশ্বরই ছেলেটিকে তাদের দিয়েছেন। তারা ছেলেটিকে নিয়ে এসে নিজের সন্তান বলেই পালন করতে লাগল।

আর একটি গল্প। এক দিন গুরু রামানন্দের শিষ্য গোঁসাই অষ্টানন্দ দেখতে পেলেন স্বর্গ থেকে একটি অদ্ভুত আলো নেবে এল লহর তালান্ড-এ। সেই আলোতে চারি দিক উদ্ভাসিত হ'য়ে গেল। তিনি এই অদ্ভুত আলোর কথা স্বীয় গুরুদেবকে জানানেন। রামানন্দ বললেন—ঐ আলো সাধারণ আলো নয়। এক জন মহাপুরুষ ঐ আলোর আকারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হ'লেন। লহর তালান্ড-এ একটি পান্ডুলেব উপর শিশু হয়ে আছেন তিনি। সময়ে এই শিশুর আলোয় সারা দুনিয়া উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

গল্পের এর পরের অংশ আগের গল্পের মতই। শুধু একটু পার্থক্য আছে। নীমা আব নীরু যখন ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায় এ সম্বন্ধে পরামর্শ করছিল, তখন ছেলেটি নিজেই এ বিষয়ের মীমাংসা করে দেয়। সে নীমাকে বলে, পূর্বজন্মে তুমি বিশেষ সেবা করেছিলে তাই এবার আমি তোমাদের ঘবে ছেলে হয়ে এসেছি। আমি এবার তোমাদের মোক্ষলাভের ব্যবস্থা কবে দেব।

ক্রমে ছেলেটি বড় হ'তে লাগল। সময় এল তাব নামকরণের। নীরু তখন এক জন কাজিকে ডেকে নিয়ে এল নাম ঠিক করে দেবার জন্ত। কাজি নাম বাছবার জন্ত খুললেন কোবাণ। যে পাতা বেকুল তাতে এই ক'টি নাম পাওয়া গেল—কবীর, আকবর, কিববা, কিবরিয়। সব ক'টিরই অর্থ এক; একই মূল তাদের, যার অর্থ ‘মহৎ’। শব্দগুলি খোদার সম্পর্কে প্রযোজ্য। কাজি ত অবাক। বই বন্ধ করে আবার খুললেন, এবারও সেই নাম ক'টাই বেকুল। কাজির বিষয়ের অন্ত রইল না। তিনি বার বার চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সেই ক'টি নাম ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। ভয় পেয়ে তিনি চলে গেলেন। এই অদ্ভুত খবর চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল। শুনে অজ্ঞান কাজিরাও এলেন নীরুর বাড়ীতে। কিন্তু তাঁরাও কোরাণ থেকে সেই চারটে নাম ছাড়া আর কিছুই বের করতে পারলেন না। তখন কাজিরা নীরুকে বললেন, এ অতি অলক্ষণে ছেলে। একে মেরে ফেল; নৈলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে। তাঁদের কথায় নীরু ছেলেটির বুকে ছোরা বসিয়ে

দিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাতে শিশুর কিছুই হল না, এক কোঁটা রক্ত পধ্যস্ত বেরুল না। এই অসম্ভব কাণ্ড দেখে নীল অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। তখন শিশুটি একটি দোহা বললে। তার মানে হল—‘রক্ত-মা’সে গড়া নয় আমার দেহ, এ বিষুদ্ধ আসো।’ তখন ওরা এই অদ্ভুত শিশুর নাম রাখল কবীর।

কবীরদাসের মা বা জীবনকে নিয়েই এমনি ধরণের বহু অলৌকিক কাহিনী জন্মে উঠেছে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। এটা কিছু আশ্চর্যও নয়। সকল দেশেই অসাধারণ মানুষদের নিয়ে বিশেষ করে ধর্মগ্রন্থদের নিয়ে তাঁদের অল্পগামী বা ভক্তরা নানা অলৌকিক কাহিনী পচনা করে থাকে। এই সব কাহিনী থেকে ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভবই বলা চলে। কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

জোলা-পরিবারে কবীরদাসের জন্ম হয়েছিল কি না নিশ্চয় কবে বলা না গেলেও তিনি যে জোলা-পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন আব তাঁর নামটাও যে মুসলমানী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।

কাজেই কবীরদাসের পরিচয় পেতে হ’লে, তাঁর বাণী বুঝতে হ’লে আগে এই জোলা জাতির একটি মোটামুটি পরিচয় লওয়া আবশ্যক। কেন না, এদের ঐতিহ্য, এদের মধ্যে প্রচলিত মত, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিকই কবীরদাসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলা জোলা শব্দের মূল ফার্সী জোলাহা শব্দ। ডাঃ হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী বলেন, জোলাহা শব্দটি ফার্সী হলেও সংস্কৃত পুরাণে জোলা জাতির উৎপত্তির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মতে স্বেচ্ছ (মুসলমান) পিতা আর কুবিন্দ (শিল্পকার জাতিবিশেষ) মাতা থেকে জোলা জাতির উৎপত্তি হয়। পৌরাণিক বিবরণগুলির সঙ্গে প্রায়ই ঐতিহাসিক সত্যের মিল পাওয়া যায় না। জোলা জাতির উৎপত্তির এই পৌরাণিক বিবরণও ঐতিহাসের দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য মনে হয় না, দ্বিবেদীজীও এই পৌরাণিক মত সমর্থনযোগ্য মনে করেন না।

জোলারা মুসলমান! তাঁত বোনা এদের ব্যবসায়। এরা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর ‘কবীর’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, জোলাবা মুসলমান হ’লেও অল্প মুসলমানের সঙ্গে এদের মৌলিক ভেদ আছে। এরা যেখানে থাকে এক চাপে থাকে। পাজাব, মুক্তপ্রদেশ, বিহার আর বাঙ্গলা দেশেই জোলাদের বসতি দেখা যায়। দ্বিবেদীজী বলেন, উত্তর-পাজাব থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গলায় ঢাকা ডিভিসন পধ্যস্ত অঞ্চলভ্রমণে এক বিশিষ্ট ভূভাগে জোলাদের বাস। এই অঞ্চলে এক সময়ে নাথপন্থী যোগীদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। মধ্যযুগে এই নাথপন্থী যোগীদেরই অধিকাংশ বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। এরাই জোলা।

নাথধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র প্রাচীন ধর্ম। নাথধর্মের সাধনা যোগমার্গের সাধনা। “নাথ-সিদ্ধাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল ‘কায় সাধনের’ দ্বারা ‘জীবমুক্তি’ লাভ।” কায়-সাধনই এই ধর্মের প্রধান কথা আর কায়-সাধন করতে হ’লে শ্রয়োজন হঠযোগের। এই জন্তই নাথপন্থীরা হঠযোগ সাধন করত। আর সেই কারণে তাদের বলা হ’ত যোগী বা যুগী। হিন্দু তাত্ত্বিক সাধনার

সঙ্গে নাথপন্থীদের সাধনার যথেষ্ট মিল থাকলেও নাথপন্থী যোগীরা হিন্দু ছিল না। তারা বেদ, ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র মানত না। দীর্ঘকাল তারা প্রবল হিন্দুধর্মের সমক্ষে নিজেদের ধর্মের স্বাভাবিক রক্ষা করেছিল। তারা হিন্দুর আচার-ব্যবহার কিছুই মানত না, “বর্ণাশ্রম মানত না, স্পৃহা-স্পৃহা বিচার করত না, হিন্দুর দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব কাউকেই মানত না।” তাদের মধ্যে নিরাকার ভাবের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাদের ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের চেয়ে মুসলমান ধর্মের মিল বেশী দেখা যায়। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃতদেহের সমাধি দিত। এদিক দিয়েও তাদের সঙ্গে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের মিল বেশী লক্ষ্য করা যায়।

এই যোগী বা যুগী-সম্প্রদায়কে হিন্দুরা অত্যন্ত ভয় মনে করত। ও যুগার চক্ষে দেখত। তাব কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ডাঃ দ্বিবেদী তাঁর কবীর গ্রন্থে নানা মূল্যবান তথ্য বিচার করে বলেছেন—আশ্রমভ্রষ্ট যোগী বা যোগসাধনকারী সন্ন্যাসী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে এই যোগী জাতি গড়ে ওঠে। হিন্দুরা সন্ন্যাসীকে যেমন অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে ভক্তি সন্ন্যাসীকে তেমনি করে অত্যন্ত ঘৃণা। তাদের সন্তান-সন্ততি অস্পৃশ্য হয়ে যায়। তারা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার বাইরে থাকে। উত্তর-ভারতের গৌসাই, বৈরাগী, মাধু প্রভৃতি অনেক জাতির এই ভাবে উৎপত্তি হয়েছে।

যোগী জাতি প্রথমে নাথপন্থী হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল নাথপন্থী থাকে। তার পর মধ্যযুগে এদের অধিকাংশ মুসলমান হয়ে যায় এবং তখন এদের নাম হয় জোলা, এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

যোগীদের মধ্যে যারা মুসলমান হ’ল না, তারা ক্রমে হিন্দুধর্ম মেনে নিল এবং বিরাট হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তবে বহু কাল পধ্যস্ত তাদের মধ্যে প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বজায় ছিল।

যোগীরা একে ছিল সমাজের নিম্নস্তরে, তার উপর ছিল বড় গরীব। তাঁত বোনা ছিল তাদের জাত-ব্যবসায়। মুসলমান হওয়ার পরও তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হ’ল না; আর্থিক অবস্থাও ভাল হ’ল না; সামাজিক মর্যাদাও বাড়ল না। নতুন ধর্মও তাদের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে প্রথম প্রথম পারেনি। তারা নামে মাত্র মুসলমান ছিল। পূর্বের অনেক ঐতিহ্য, সংস্কার, বিশ্বাস এমন কি আচার-অনুষ্ঠান পধ্যস্ত তাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল।

এমনি একটি জোলা-পরিবারে কবীরদাস জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন। তখন জোলারা মনে হয় সবে মাত্র হযত এক-আধ পুরুষ ধরে মুসলমান হয়েছে। কাজেই তাদের মধ্যে পুরোনো সংস্কার, ঐতিহ্য প্রভৃতি পুরো মাত্রায়ই বজায় ছিল। এই সবের মধ্যেই কবীরদাস মানুষ হন। সেই জন্ত তাঁর জীবনের উপর এইগুলির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়।

কবীরের শৈশব বা বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি যে তখন লেখাপড়া শেখেননি এ কথা নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ, কবীরদাস নিরক্ষর ছিলেন। তিনি “মসী কাগজ ছুঁতে নই” অর্থাৎ কাগজ আর কালি ছুঁতেনি।

আমাদের দেশে গরীব শিল্পজীবী-পরিবারে যা হয় ছেলেরা অল্প

যেস থেকেই জাত-ব্যবসায় শিখে এবং পিতার কাজে সাহায্য করে। তার পর ১৩১৪ বছর বয়স থেকে বা তাঁরও আগে থেকে তারা পূর্ববয়স্ক পুরুষের মত কাজ কবতে থাকে। অনুমান করা যায়, কবীরদাসের বেলাও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তিনিও জাত-ব্যবসায় শিখেন এবং তাঁত বুনেই জীবিকা অর্জন করতেন।

কবীরদাস বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলেন কি না, এ নিয়েও কথা উঠেছে। সাধারণ লোক জানে কবীরদাস সংসারী ছিলেন। তাঁর মুসলমান শিষ্যরাও তাই বলেন। মুসলমান কিংবদন্তী অনুসারে তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল লুই। তাঁর একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও ছিল। ছেলেটির নাম কমাল, মেয়েটির নাম কমালী।

কবীরদাসের হিন্দু শিষ্যরা এ সব বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, কবীরদাস কখনও বিয়ে করেননি। লুই বলে কেউ যে ছিলেন এ কথাও তাঁরা অনেকেই স্বীকার করেন না। আর বাবা স্বীকার করেন তাঁরও বলেন, লুই ছিলেন কবীরদাসের শিষ্য। কমাল কমালীকেও তাঁরা কবীরদাসের শিষ্য বলেন। আবার কেউ কেউ বলেন ওরা ঠিক শিষ্য নয়, পাণ্ডিত্য পুত্র-কন্যা।

এ সম্বন্ধে কাদের কথা যে ঠিক বলা কঠিন। কেন না, এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। জৈন ও বৌদ্ধ প্রাধিকারের সময় থেকে বিশেষ করে শঙ্করাচার্যের সময় থেকে ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীরা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। বৈদিক ও পৌরাণিক কয়েক জন বিখ্যাত ঋষি ছাড়া ভারতবর্ষে বড় বড় ধর্মগুরুরা প্রায় সবাই সন্ন্যাসী। লোকেব একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, সন্ন্যাসী না হ'লে কেউ বড় সাধু-সন্ত হ'তেই পারে না। কাজেই কবীরদাসের মত এত বড় এক সিদ্ধ সন্ত, এত বড় এক জন ধর্মগুরু সন্ন্যাসী ছিলেন না, এ কথা তাঁর হিন্দু শিষ্যদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। এটো জগুই তাঁরা নানা ভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, কবীরদাস সংসারী ছিলেন না। এ অবস্থায় এঁদের মত সন্তা মনে নেওয়া যায় না।

কবীরদাস সংসারী ছিলেন কি না এ নিয়ে পাদ্রী কি (Keay) সাহেব বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন। কবীরদাসের পদ থেকে এ সম্পর্কে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ যা পাওয়া যায় বিশেষ করে তা বিচার করে তিনি সিদ্ধান্ত কবেছেন, কবীরদাস সংসারী ছিলেন। খাচাধ্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদেরও তাই মত।

তবে সংসারী হ'লেও কবীরদাস সাধারণ লোকে সংসার বলতে যা বোঝে সে রকম সংসার করেননি কোনো দিনই। তাঁর সংসার ছিল সন্ন্যাসীর সংসার। তিনি ছিলেন স্বভাব-উদাসী মানুষ। বিষয়-চিন্তার চেয়ে ভগবদ্-চিন্তাই তিনি বেশী করতেন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটিত ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় ও সাধুসঙ্গ করিতে।

কবীরদাস ছিলেন আমরণ দরিদ্র। ধনী হবার ইচ্ছা পর্যন্ত তাঁর হয়নি কখনো। কেন না, ধর্মেত্বকে তিনি ভগবদ্-ভক্তির বিপক্ষী মনে করতেন। জীবন ধারণের জন্ত যেটুকু না হ'লে নয় তিনি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। সেই জন্ত বিষয়-কর্মও যেটুকু করলে নয় তাই করতেন। এর থেকে কেউ বেন না মনে

করেন যে, কবীরদাস শ্রমবিমুখ ছিলেন বা সাধু হ'লে কাজকর্ম করা দরকার নেই মনে করতেন। তিনি পবিত্র করে জীবিকা অর্জনের কথাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—

কহৈ কবীর অস উত্তম কৌজ,

আপ জ্যৈয় ঔরন কো দৌজ ॥

কবীর বলছে, এমনি উত্তম করবে যাতে কবে নিজের জীবিকা চলে আর অন্তকেও কিছু দিতে পার।

কবীরদাস নিজেও যতটা সম্ভব তাই কবতেন। তবে সব বিষয়েই তাঁর ছিল ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর। পরিবার প্রতীপালনের ভারও তিনি ঈশ্বরের উপর দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি চমৎকার পদ পাওয়া গেছে—

দীন দয়াল ভরোসে তেরে

সভ পব, বাক চটাইআ বেড়ে।

হে দীনদয়াল! তোমার উপরই আমার ভরসা। আমার সব পরিবারকে তোমারই নৌকায় চড়িয়ে দিলাম।

কিন্তু পরিবারের অজ্ঞ লোকেরা তা আব কবীরদাসের মত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিল না? তারা যখন দেখত কবীরদাস কাজকর্মে অবলোকা করছেন এবং ফলে তাঁদের অন্ন-সংস্থানই ভাঙ হয়ে উঠেছে তখন তারা বিশেষ করে কবীরদাসের মা এ নিয়ে খুব দুঃখ করত এমন কি কান্নাকাটিও করত। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে—

মুসি মুসি বোঁবৈ, কবীর কী মায়,

এ বারক কৈসে জীবিত রক্ষায়।

ওননা বুননা সম তজ্যো হৈ কবীর,

হবি কা নাম লিখি লিয়ো শরায়।

দুঃখ কার করে কীদন্তে লাগল কবীরের মা! তে রক্ষায়, এবার কেমন কবে বাঁচব। কবীর শরীরের উপর লিখে নিয়েছে হরির নাম আর তানা দেওয়া কাপড় বোনা সব ছেড়ে দিয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায়, কবীরদাসের পারিবারিক জীবনে শান্তি ছিল না। পারিবারিক অশান্তির আর একটি কারণও ছিল। কবীরদাস মুসলমান-পরিবারের লোক হয়ে হিন্দু গুরু রামানন্দের শিষ্য হন। এ বিষয়ে আমরা পাবে আলোচনা করব। স্বভাবতঃই তাঁর পরিবারের সবাই এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাদের সেই ক্ষোভও পরিবারের শান্তি নষ্ট করে। এই পারিবারিক অশান্তির ফল এই হ'ল যে, মতই অশান্তি বাড়ত ততই কবীরদাস ঈশ্বর প্রসঙ্গে আরও গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন।

যদি কমালকে কবীরদাসের ছেলে বলে স্বীকার করা হয় (আর নিরপেক্ষ লোকেরা তা কবেও থাকেন), তাহ'লে কবীরদাসের পুত্রজাগ্যও ভাল ছিল মনে হয় না। অন্ততঃ ছেলেকে নিয়ে তিনি সুখী হতে পারেননি। হিন্দীতে একটি বহুল-প্রচলিত কথা আছে—“ভূবা বংশ কবীরকা জো উপজা পুত্র কমাল।”—পুত্র কমালের জন্ম হওয়ায় ভুল কবীরের বংশ।

এর থেকে মনে হয়, পিতার পথ থেকে পুত্রের পথ ভিন্ন ছিল। তিনি পিতার আধ্যাত্মিক সাধনা গ্রহণ করেননি। কারো কারো মতে কমাল বড় হ'য়ে পিতার মতের বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ অবশি এ সব কথা বিশ্বাস করেন না। উল্লিখিত দোহাটিরও তাঁরা অজ্ঞ

রকম ব্যাখ্যা করেন। আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন বলেন, “কমাল এক জন ভক্ত ও গভীর চিন্তাশীল সাধক ছিলেন। কবীরের মৃত্যুর পর যখন কমালকে সবাই বলিল, তুমি তোমার পিতার শিষ্যদের লইয়া সম্প্রদায় গড়িয়া তোলা। তখন কমাল বলিলেন, আমার পিতা চিবজীবন ছিলেন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আব আমিই যদি সম্প্রদায় স্থাপন করি তবে পিতার সত্যকে হত্যা করা হইবে। ইহা এক প্রকার পিতৃহত্যা। সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তখন অনেক বলিলেন, ভূ. বংশ কবীরকে জে উপজা পুত্র কমাল।” প্রকৃত প্রস্তাবে কি সে দটেছিল তা উপযুক্ত ভ্রামাণে অভাবে নিশ্চয় কবে বলা কঠিন।

তবে ষা-ই ঘটুক না কেন, কবীরদাসের পারিবারিক জীবন যে সুখের ছিল না এ কথা অনেকটা নিশ্চয় কবেই বলা যেতে পারে।

সারা ভগবানকে চায় তাদের ভাগ্যে বোধ হয় এমনি ঘটে! তাদের জাগতিক সখ-শান্তি ভগবানই বরি হরণ করে নেন। নৈলে, তারা যে অনন্তমনা হয়ে ভগবানকে চাইতে পারে না। আব অনন্তমনা হয়ে ভগবানকে না চাইলে তাঁকে ত পাওয়া যায় না? সাধুদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে—ভগবান বলছেন—‘যে কবে আমার আশ তার কবি সর্গনাশ, তবু যদি না ছাড়ে আশ আমি হই তার দামেব দাস।’ তাই বোধ হয় কবীরদাসও পারিবারিক জীবনে সখ-শান্তি পাননি।

তবে দুঃখ, অশান্তি কিছুই কবীরদাসকে বিচলিত করতে পাবেনি। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করছি, এ সবের দরুণ বরং তাঁর ঈশ্বরানুরাগ আবও গভীরতর হয়েছিল। কবীরদাস ছিলেন স্বভাব-উদাসী ‘মস্ত’ মানুষ। হিন্দীতে ‘মস্ত’ বলে তাকেই, যে আপন-ভোলা মানুষ সব সময়ই কোনো ভাবে বিভোর হয়ে থাকে, সংসারের ভাবনা যে একটুও ভাবে না, অতীতে কি কবেছে না কবেছে তার হিসাব রাখে না, বর্তমানে কি করছে না করছে তা নিয়েও মাথা ঘামায় না আর ভবিষ্যতেও কোনো ধারণা রাখে না।

এখন ধরণের বোমভোলা সাদানন্দ মানুষ ছিলেন কবীরদাস। কিন্তু তাই বলে তাঁর মধ্যে কোনো বকম ভাববিহীনতা বা দুর্বলতার চিহ্ন মাত্রও ছিল না। অতি স্থিৰ ছিল তাঁর বুদ্ধি। অনমনীয় ছিল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি একবার যা বিশেষ বিবেচনার পর সত্য বলে গ্রহণ করতেন, কিছুতেই কোনো কাবণেই তার থেকে বিচ্যুত হতেন না। সারা দুনিয়া বিরুদ্ধে গেলেও নয়। আর একটা কথা। কবীরদাস ছিলেন বিশেষ বিচাৰশীল মানুষ। কোনো কিছুই তিনি বিনা বিচাবে গ্রহণ করতেন না। “তিনি সত্যকে পবথ কবিয়া লইতেন।

কবীরদাস ছিলেন ভক্ত আর ভক্তজনোচিত বিনয়ও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু একটি জায়গায় সাধারণ ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ করে বৈষ্ণব ভক্তদের সঙ্গে তাঁর একটি মস্ত বড় পার্থক্য ছিল। তিনি নিজেকে কখনো হীন পতিত মনে করতেন না। কবীরদাসের আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। নিজের সম্বন্ধে বা নিজের গুরু সম্বন্ধে বা নিজের সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব জাগেনি কোনো দিন। ডাঃ হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীজী বলেন—কবীর ছিলেন বীর সাধক, তাঁর এই বীরত্বের মূল হ’ল তাঁর অটুট আত্মবিশ্বাস।

ডাঃ দ্বিবেদী বলেন, কবীরদাস ছিলেন এক জন যুগাবতার। যুগাবতারের বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর ছিল যুগ-প্রবর্তকের দৃঢ়তা, আর তিনি যুগ-প্রবর্তনও করেছিলেন।

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, মহাপুরুষেরা তাঁদের সমসাময়িক লোকদের হাতে লালিত হয়েছেন। লোকে তাঁদের কথা বুঝতে পারেনি বা ভুল বুঝেছে। এই জন্মে প্রাণপণে তাঁদের বিরুদ্ধতা করেছে, এমন কি অনেক সময় তাঁদের প্রাণ পর্যন্ত বিনাশ করবার চেষ্টা করেছে। কবীরদাসের বেলাও তাই হয়েছিল। তাঁর শত্রু ছিল অসংখ্য।

কবীরদাস হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকেই অর্থাৎ তাঁর বাহ্যলুপ্তানকে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি বেদ-কোরাণ, পুরোহিত-মোহা, মন্দির-মসজিদ, তীর্থ-হজ, ব্রতোপবাস-বোজা, সন্ধাফরিক-নমাজ কিছুই মানতেন না। এ সমস্তই নিরর্থক মনে করতেন। এই জন্মে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। তারা নানা ভাবে কবীরদাসকে জব্দ করবার চেষ্টা করতে থাকে, এমন কি তাঁর নামে অতাস্ত জগজ্জ বকমেব কলঙ্ক পর্যন্ত রটায়। কিন্তু তাতেও কবীরদাস ভয় পাননি। এদের এই হীন আক্রমণেও তাঁর চরিত্র-মহত্ব খর্ব হ’ল না। পাহাড়ের মত অটল রইলেন কবীরদাস আপন চরিত্র-মাহাত্ম্যে।

কবীরদাসকে এমনি জব্দ করতে না পেরে শেষে হিন্দু-মুসলমানে মিলে বাদশা সিকন্দর লোদীও কাছে গিয়ে নাসিহত করল। এ সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে; তার সব ক’টিরই সাব কথা এই—মুসলমান বললে—জাঁহাপনা, কবীর আমাদের ধর্ম নষ্ট করল। হিন্দুও করল সেই অভিযোগ। সব শুনে বাদশা হুকুম দিলেন, কবীরকে হাজির কর দরবারে। হুকুম তামিল হ’ল। কবীরদাস এলে বাদশার সঙ্গে তাঁর অনেক বাগবিতণ্ডা হ’ল। কবীরদাসের কড়া কড়া কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন বাদশা। কবীরদাসের হ’ল প্রাণদণ্ড। কিন্তু বাদশা তাঁকে বধ করতে পাবলেন না। জলে ডুবিয়ে আগুনে পুড়িয়ে হাতীর পায়েব তলায় ফেলে কত ভাবেই না চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ’ল না। শেষে বাদশার চোখ ফুটল। কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন বাদশা।

কবীরদাস সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলিতে পাওয়া যায়, তিনি নানা ভাবের সাধু-সন্তদের সঙ্গে মিলনের জন্ত বহু স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ‘কবীর-মন্সুর’ প্রভৃতি গ্রন্থমতে সূদর মন্সুর, বাগদাদ, সমরকন্দ, বোখারা প্রভৃতি স্থানের সাধকদের সঙ্গে পর্যন্ত তিনি দেখা করেছিলেন।

কাহিনীগুলি বলে, এই ভ্রমণের সময় এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে করে কবীরদাসের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে লোকে তাঁর শরণ নিয়েছে। এই সময়েই যোগী গোবরনাথ এবং সর্দানন্দ নামে ‘সর্গজিত’ উপাধিধারী দ্বিধজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে কবীরদাসের বিচার হয় এবং তাঁর অলৌকিক শক্তির কাছে তাঁদের পরাজয় হয়।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের সঙ্গেও কবীরদাসের সাক্ষাৎ হয় বলে কাহিনী প্রচলিত আছে।

কবীরদাসের শিষ্যকরণ সম্বন্ধেও নানা গল্প শোনা যায়, বিশেষ করে সমাজের উচ্চস্তরের যে সব ব্যক্তি কবীরদাসের শিষ্য হয়েছিলেন

তাদের সম্বন্ধে কোনো না কোনো কাহিনী অবশ্যই শোনা যায়। রাজা বীরসিংহ, কবীরদাসের অন্ততম প্রধান শিষ্য ধর্মদাস প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিষ্য। কবীরদাসের সম্বন্ধে আর একটি মজার গল্প শোনা যায়। সিদ্ধ সাধু হিসাবে যখন কবীরদাসের নাম ছড়িয়ে পড়ল তখন দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। এরা সাধুর কাছে ভগবানের কথা শুনবার জন্য আসত না, এরা আসত ঘন, পুত্র, বোগের ঔষধ এই সব চাইবার জন্য। জ্বালাতন হ'লেন কবীরদাস; তাঁর সাধন-ভজন সব মাথায় উঠল; কি করে এ সব লোকদের হাত এড়ানো যায় তাই তিনি ভাবতে লাগলেন, ভেবে ভেবে শেষে এক অদ্ভুত উপায় বের করলেন। কবীরদাস শুরু করলেন বেণ্ডাসস্ত্র মাতালের অভিনয়। মাতালের মত চলতে-চলতে একটি বেণ্ডার কণ্ঠস্থ হয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সহবে। লোকে দেখে ছি-ছি করতে লাগল, যা মুখে আসে তাই বলে কবীরদাসকে গালাগাল দিতে লাগল। কবীরদাস যে একটি এক নম্বরের ভণ্ড এ বিষয়ে আর কাকুরই কোনো সন্দেহ রইল না। কবীরদাসের কাছে লোকের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কবীরদাসের উদ্দেশ্য সফল হ'ল।

কবীরদাস দীর্ঘজীবী ছিলেন। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ১১৯ বছর ৫ মাস ২৭ দিন বা মতান্তরে ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। কবীর-দাসোটা নামক গ্রন্থ অনুসারে ১৫১৮ খৃঃ মঘর নামক স্থানে কবীরদাস দেহত্যাগ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু আচাধ্য ক্ষিত্তিমোহন সেন প্রমুখ ভাবতীয় পণ্ডিতরা এই মত প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা ১৪৯৮ খৃঃ কবীরদাস দেহত্যাগ করেন বলে 'ভাবতভ্রাক্ষণ' যে উল্লেখ আছে তাই সমর্থন করেন, এ কথাব আমবা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই মঘর বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলাব গোবরা-পুরের নিকট একটি জায়গা। কবীরদাসের জন্ম সম্বন্ধে যেমন সব অলৌকিক কাহিনী রয়েছে তেমনি তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস আছে যে, সিদ্ধ মহাপুরুষেরা কবে সংসার ছেড়ে যাবেন তা তাঁরা আগে থেকেই জানতে পারেন। কবীরদাসও জানতে পেয়েছিলেন, তাই দেহ-ত্যাগে কিছু দিন পূর্বে তিনি কাশী ছেড়ে মঘবে চলে যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। লোকের বিশ্বাস, কাশীতে যে মরে সে স্বর্গে যায় আর মঘবে যে মরে সে গাণা হয়। সেই জন্য কবীরদাসের ভক্ত অমুরাগী প্রভৃতি সবাই মিলে তাঁকে মঘবে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করবার জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি কবল। কিন্তু কবীরদাস কিছুতেই মত বদলালেন না। তিনি বললেন, স্থান-বিশেষে মরলে মানুষের বিশেষ কোনো গতি হবে এ সব কোনো কাজের কথা নয়। আসল কথা হ'ল, যার হৃদয়ে রাম রয়েছেন, যেখানেই মরুক না কেন সে-ই পাবে মুক্তি। নৈলে মুক্তি মিলবে না আর কিছুতেই। এ সম্বন্ধে কবীরদাসের একটি পদও পাওয়া গেছে। (অনুদিত পদ ৫৮)।

কবীরদাস কাশী ছেড়ে মঘবে যাচ্ছেন এ খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁকে শেষ বারের মত দর্শন করবার জন্য সহরের লোক ভেঙে পড়ল। সবার চিন্তা ব্যথাভর। কবীরদাসের প্রায়

হাজার দশক শিষ্য ও অমুরাগী কাদতে কাদতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলল মঘরে।

মঘবের উপর দিয়ে বয়ে চলেছিল অমী নদী। তার তীরে ছিল এক সাধুর ভজন-কুটীর। তখন কুটীরখানি শূন্য ছিল, কবীরদাস গিয়ে আসন বিছালেন সেই কুটীরে। শিষ্যদেব ডেকে বললেন, তোমরা আমার জন্য কিছু শাদা পদ্মফুল আর হু'খানা শাদা চাদর নিয়ে এস। একটি সময়ের মধ্যেই এক-রাশ পদ্মফুল আর চাদর হু'খানা শিষ্যেরা নিয়ে এল।

গুরু দেহরক্ষা কবনের খবর পেয়ে কবীরদাসের হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান শিষ্য মঘরে সমবেত হ'ল। সৈন্স-সামন্ত নিয়ে এলেন রাজা বীরসিংহ, এঁকে বলা যায় হিন্দু দলের নেতা। আর এলেন সৈন্সে বিজলী গা। ইনি মুসলমান দলের নেতা।

কবীরদাসের সময় হয়ে এল। তিনি এবার সবাইকে ডেকে বললেন,—তোমরা আব এখন এখানে ভিড় করো না, আমি একটু ঘুমব। দরজাটা তেজিয়ে দিয়ে তোমরা সব চলে যাও।

রাজা বীরসিংহ বুঝলেন এই গুরুজীর শেষ নিদ্রা। তিনি তখন এগিয়ে এসে প্রণাম করে বললেন, গুরুজী, রূপা ক'বে অমুমতি করুন, সত্যলোকে আপনাব প্রয়াণের পর আপনাব পবিত্র দেহ নিয়ে গিয়ে আমি বিস্তৃত তিন্দুপ্রথা অনুসারে তার সৎকাব করব। এ কথা শুনে প্রবল আপত্তি জানালেন বিজলী গা। বললেন, এ কখনো হ'তে পারে না। আমি এই পবিত্র দেহ মুসলমান মতে কবর দেব।

কবীরদাস দেখলেন, উভয় পক্ষের সৈন্স-সামন্ত প্রস্তুত, তাঁর নম্ব দেহকে নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের রক্তপাত অনিবার্য। তিনি উভয় পক্ষকে মৃদু ভৎসনা করে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ—তোমরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোনো বাগবিতণ্ডা কবতে পারবে না আর পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধবতে পারবে না। গুরুর আদেশ যে পালন করে কল্যাণ হয় তার।

দুই দলই এই আদেশ মাথা পেতে নিল। এবাব ভিড় সরে গেল। কবীরদাস তখন শেষ বারের মত ধূমিয়ে পড়লেন। শিষ্যেরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। শানিকক্ষণ পরে ঘবেব ভিতর থেকে কেমন এক বকম শব্দ শোনা গেল। শিষ্যেরা অঝোবে কাদতে লাগল আর গুরুজীব জয়ধ্বনি কবতে লাগল। গুরুজী সত্যলোকে প্রয়াণ করলেন।

এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটল। তাব পর দরজা খোলা হ'ল। ভিতরে সে এক অপূর্ণ দৃশ্য। কোথাও দেহ নেই। আছে শুধু হু'খানা চাদর আর প্রত্যেক চাদরের উপর একবাশি কবে পদ্মফুল।

এমনি কবে কবীরদাস হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেলেন। রাজা বীরসিংহ একগানা চাদর ও তাব উপবকাব ফুলগুলি কাশীতে নিয়ে গিয়ে যথাবীতি দাহ কবলেন। তাব পর চিত্তাভ্যাস নিয়ে বর্তমানে যাকে 'কবীর চৌবা' বলে সেই জায়গায় প্রার্থিত কবলেন।

এদিকে বিজলী গা তাঁব অংশ মঘবেই কবর দিলেন। শেষে অবশি হিন্দু-মুসলমান উভয় দল মিলে মঘবে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা কবন।





### ছািবশ

এলিজাবেথকে নিভুতে পাওয়া মাত্রই মামী তাকে সতর্ক করে দেওয়ার সুযোগ নিলেন। অনেক কথার পর তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন—‘মা এলিজা, তুমি এমন বোকা মেয়ে নও যে সতর্ক করে দেওয়ার পরও ভুল করে বসবে। তবু স্পষ্ট করেই তোমায় বলা ভাল। নিজেকে সামলে চলো। নিজেকে ঐ মানুষটির ভালবাসার জ্বালে জড়িয়ে ফেলো না। আমি তার সঙ্কে কটু কিছু বলছি না। ছেলেটি ভারী মিস্তকে আর চমৎকার। ওর যদি অনেক ধন-দৌলতও থাকত, যা ওর পাওয়া উচিত ছিল, তবু তার সঙ্কে আমি তোমায় সতর্ক করে দিতাম। নিজের অল্প বয়সের স্বপ্নকে যেন মাথা জাগাতে দিও না নিজের বুদ্ধির ওপর। তুমি চালক-চতুর মেয়ে, তোমার বাপ তোমার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন। বাপের দুঃখের কারণ হবে না তুমি নিশ্চয়ই।’

—‘তোমার ভয় নেই মামীমা। নিজের বিষয়ে আমি সতর্ক আছি। তার সঙ্কেও বইলাম। যদি পারি মিঃ উইকহামের প্রেম-নিগড় আমি সহজে পরব না।’

—‘তুমি বড্ড হাল্কা স্ববে কিন্তু কথা কইছ এলিজা।’

—‘সত্যি মামীমা। ভালবাসা আমার জন্মায়নি তার উপর। একটুও না। তবু এ কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার যে, তার মত অমন চমৎকার সজ্জন মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। যদি তিনি সত্যি আমায় ভালবাসেন তবে তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না আমার জীবনে। অবশ্য এ কাজের নির্বুদ্ধিতা

আমি খুব বুঝি। বুঝি যে মিঃ ডার্সিই ওজনে ভারী। আমার বাবার মতের মর্যাদা আমার কাছে খুব বড়ো। আর তাই জানি করতে। আমার বৃকে কঠিন করে বাজবে। জানি, বাবা মিঃ উইকহামের উপর এতখানি সন্মদয় নন। কিন্তু মামীমা, যেখানে ভালবাসাই বড়ো সত্য, সেখানে ধন-দৌলতের বাণ মেনে চলে ক’জন? আর আমিই কি তা পাবব? কিন্তু তোমাদের দুঃখ দেওয়ার ব্যথা আমার আরো গভীর। যতই যা-ই হোক, আমি ভাড়াহুঁড়ো করে কিছু করব না, তোমাদের জন্তে আমি বিলম্বিত করব আমার শেষ পদক্ষেপ। তোমায় কথা দিচ্ছি, আমার দিক থেকে সে কোন ইংগিত পাবে না কোন দিন।’

—‘তাকে এত ঘন-ঘন এখানে আসায় নিবৃত্ত করতে পার না—অন্ততঃ তাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য মাকে তাগিদ নাও দিতে পারো।’

—‘বেশন করেছিলাম সেদিন—’শ্রিত হেসে বললে এলিজাবেথ—‘কিন্তু না, যত ঘন-ঘন দেখেছি তুমি এসে, তত ঘন-ঘন মানুষটি আসেন না এ-বাড়ীতে। তুমি এসেছ বলেই তাকে নিমন্ত্রণ করছেন মা পারিবারিক অতিথি হিসেবে। তবে এখন থেকে আমি চালাক হবো। তুমি দেখো।’

মামীমা’র এই স্পষ্ট পবামর্শে লাভই হোল এলিজাবেথের। সে কথা অকুণ্ঠ চিন্তে সে জ্ঞাপন করলে তাকে।

অপব দিকে কলিন্সের বিবাহের দিন আসন্ন হয়ে এল। বুধবার শাল’টি এল এদের পরিবারে ঘরোয়া বিদায় নিতে। বৃহস্পতিবার তাই বিয়ে। মনে মনে বাস্তুবী ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক নাড়া-চাড়া করেছিল এলিজাবেথ। শেষে কিছু স্থির করতে না পেরে এই কথা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিল যে, তা’বা সুখী হবে।

কিন্তু যে শীতল আপ্যায়নে অভ্যর্থনা করলেন মা শাল’টিকে যে, নিতান্ত ক্ষুদ্র না হয়ে পারলে না এলিজাবেথ। অনেকটা তাঁর হয়ে যেন ক্ষমা প্রার্থনার জঙ্কই সখী বসে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তাকে এগিয়ে দিতে। দুই সখীতে নিভৃত কথা হতে লাগল।

—‘তুই আমায় ভুলে যাবি না তো এলিজা? তোর খবর দিবি তো মাঝে মাঝে?’

—‘নিশ্চয়ই দেবো। তুই দিবি তো ভাই?’

—‘আর একটা মিনিট বইল আমার তোর কাছে। আমাব ওখানে আসবি একবার।’

—‘এখানেই তো শীগগির দেখা হবে।’

—‘না, বোধ হয়। এখন বেশ কিছু দিন আমায় কেটে ওঁর বাসায় থাকতেই হবে। কথা দে, তুই যাবি?’

সেখানে যাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দের আশা দেখতে না পেলেও এলিজাবেথ এই বিদায়-ক্ষণে বাস্তুবীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না।

—‘মাচ’মাসে বাবা আর মারিয়া আসছেন আমার ওখানে। তুই যদি তাদের সঙ্গী হোস, আমার কম আনন্দ হবে না তোকে পেয়ে তাদের চেয়ে।’

বিয়ের পরই বব-কনে তাদের কেটের বাসায় যাত্রা করল। এদের বিয়ে নিয়ে যেটুকু ফেনা উঠেছিল এই নিস্তরঙ্গ সমাজে, বব-কনে বিদায় নেবার অল্পকাল মধ্যেই আবার তা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতে লাগল রীতিমত ভাবে দুই সখীর মধ্যে। শাল’টির প্রথম চিঠিখানি সঙ্কে এলিজাবেথের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল ছিল। কেমন লাগছে তার স্বামী, তার ঘর

তার নতুন সমাজ, নতুন সংসার। কিন্তু চিঠি পড়ে এলিজাবেথ নিরাশ হল। তার আশার অতিবিক্ত কিছু লিখতে পারেনি শাল'টি। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সে বর্ণনা করেছে তার সংসারের সচ্ছলতার কথা, স্বামীর জমানো আসবাব, তৈজস-পত্রাদির কথা, লেডী ক্যাথারিনের কথা। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। এলিজাবেথ ভাবলে, বাকী যা তার জ্ঞানবার রইল সে স্বামি-সন্দর্শনে যাওয়ার আগে জানা সম্ভব হবে না তার পক্ষে।

লগুন পৌঁছে জেন চিঠি দিয়েছে বোনকে। জানিয়েছে, পরের চিঠিতে সে বিংলেনের সন্ধক্ষে হয়ত কিছু খবর পাঠাতে পারবে।

চার সপ্তাহ কেটে গেল লগুনে। কিন্তু একবার মাত্র মিস্ বিংলেনের সঙ্গে দেখা হওয়া ভিন্ন আর কোন কিছু এমন ঘটেনি যা বোনকে চিঠিতে লিখতে পারত জেন।

কিন্তু অবশেষে অনেক প্রতীক্ষার অবসানে এক দিন বিংলেন বোন জেনের কাছে পালটা সাক্ষাৎ করতে এল। কিন্তু তার স্বল্পস্থায়ী পরিচয় এবং সর্গাদিক লক্ষ্যবীয় তাব আচরণের বৈসাদৃশ্য দেখে জেনের আব ভুল করবার স্তব্ধতা রইল না। এই সমস্ত ব্যাপারটি বর্ণনা করে জেন চিঠি দিল বোনকে :

—“প্রিয় বোন এলিজা! তুই-ই জিতে গেলি। বিংলেন বোন আমার প্রতি তার ব্যবহারে যে প্রকাণ্ড প্রতারণা করেছিল তা তুই আমার চেয়ে পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলি। তবু বোন এ কথা আমি বলব যে, তুই যেমন তাকে গোড়া থেকে অবিশ্বাস করেছিলি, আমি তেমনি তার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলাম। আমাদের দু'জনের বিশ্বাসের মূল্যেই কিন্তু ভিত্তি ছিল না।

গতকাল সন্ধ্যায় ক্যারোলিন আমাদের এখানে এসেছিল। তাব আগে অবশ্য এক লাইনও লিখে আমার খবর নেয়নি বা দেয়নি। কিন্তু তার সেই আসা ও কথাবার্তার মধ্যেই এটুকু বুঝেছি যে, এই আসায় তাব কোন আনন্দ ছিল না। কোন বকম ভণিতা করেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবার কোন শুভ কামনা কবে যায়নি। দেখলাম তাকে। অবাক হলাম তার পরিবর্তনে এই ক'মাসের মধ্যে। আমাকে এ ভাবে হুঃখু দেবার পিছনে কোন যুক্তি তার মনে ছিল তা আমি ভেবে পাই নে বলেই তাকে আমি অপরাধী বলে ভাবতে পারছি না।

যাই হোক, তার কাছে ষতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি সে হোল এই যে, তার দাদা আর সম্ভবতঃ কোন দিনই নেদারফিল্ডে ফিরছেন না। বাড়ী ছেড়ে দেবেন কি না জানি না কিন্তু ফিরবেন না, এ কথা নিশ্চিত। ও-কথা আর ভেবে আমাদের মন খারাপ করবার কোন প্রয়োজন নেই।

শাল'টির খবর শুনে ভারী খুশী হয়েছি ভাই! আমার ইচ্ছে যে, তার বাবা ও বোনের সঙ্গে তুইও বাস তার শ্বশুরবাড়ীতে। সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই তুই খুশী হবি।”

এলিজাবেথের হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে উঠল দিদির এই পত্র পড়ে। কিন্তু এইটুকু রইল তার স্মৃতি যে, ভবিষ্যতে অন্ততঃ এই মেয়েটির কাছে তার দিদি আর প্রতারণিত হবে না। জেনের জীবনে পুরানো অধ্যায়ের নতুন অবতারণা আর যেন না হয় এই আশা করলে এলিজাবেথ। বিংলেন চরিত্রের বিশ্লেষণ করে সে তার

অন্ধকার দিকগুলি আরো গভীর কলকলিগু করে দেখতে পেল। অন্ততঃ তার শাস্তি হিসেবে এখন বিংলেনের বিয়ে হওয়া উচিত ডার্সির বোনের সঙ্গে, যাতে সে ভাল মতেই উপলব্ধি করতে পারে কি বুটো মুক্তোব লোভে সে আসল মণি ফেলে দিলে অবহেলায়।

## সাতাশ

এই ভাবে নিরুন্নত দিন কাটে এদের পরিবারে। শুধু মাঝে মাঝে শীত-শিতাবিত দেহে অথবা ধূলি-ধূসরিত পথে মেরিটনে যাওয়া-আসা একটু বা বৈচিত্র্য আনে। জাহুয়ারী-ফেব্রুয়ারী কাটল। মার্চে' এলিজাবেথের হ্যান্সফোর্ডে যাওয়ার কথা। প্রথমে সে ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায়নি। কিন্তু শাল'টি যে তার আসার আশায় আছে এ কথা মনে কবে সে খুসী হয়ে যাওয়া স্থির করে ফেলল। দীর্ঘ দিন অদর্শনে শাল'টিকে দেখার বাসনাও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং কলিলের প্রতি বিতৃষ্ণাও প্রশমিত হয়েছে অনেক। তাছাড়া যে বাড়ীতে এ ধরনের মা ও লোনেরা আছে সে বাড়ী আরো লোভনীয় নয়। আব পরিবর্তনের জন্ত একটু হাওয়া বদল খারাপ কি? এই-কাককে জেনের সঙ্গেও দেখা হতে পারবে। শাল'টির ব্যবস্থা মতই সব ঠিক হোল। তাব উইলিয়াম ও তাঁর দ্বিতীয় মেয়েসব সঙ্গে এলিজাবেথ যাবে। লগুনেও এক রাত কাটানোর ব্যবস্থা হোল।

একমাত্র বেদনাদায়ক—বাবাকে ছেড়ে যাওয়া। তিনি তার অভাব ভারী অনুভব করবেন। আর সত্যিই যখন যাওয়ার সময় উপস্থিত হোল তিনি অখুসী ভাব দেখানেন। এলিজাবেথকে তিনি চিঠি লিখতে বললেন এবং চিঠি লিখলে চিঠিব উত্তর দেবেন প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

বেশ হঠাতার মধ্যেই উইকহামের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা সাঙ্গ হোল। এ কথা উইকহাম কখনই ভুলতে পারবে না যে, এলিজাবেথই প্রথম তার মনে দেখাপাত করেছিল—জাগিয়েছিল তাকে। সেই তার কথা প্রথম মনোযোগ দিয়ে শুনেছে—তার হৃৎথে সহানুভূতি জানিয়েছে। কাজেই বিদায়-মুহুর্তে উইকহাম তার শুভ কামনা করলে সব দিক থেকে। লেডী ক্যাথারিন ছাড়া বর্গকে কি বকম দেখবে তাও স্বরণ করিয়ে দিলে। এলিজাবেথ বিদায় নিলে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে যে, বিয়ে হোক আর অকৃতদারই থাকুক সে, উইকহামই তাব জীবনে সৌজন্যে ও স্নিগ্ধতায় আদর্শ হয়ে থাকবে চিরকাল।

মাত্র চব্বিশ মাইল পথ। খুব ভোরেই যাত্রা শুরু করেছিল তারা যাতে হুপু নাগাদ পৌঁছে যেতে পারে গ্রেসচাচ'স্ট্রীটে। গাড়ী যখন গার্ডিনারদের বাড়ীর দরজায় এসে থামল জেন তখন ড্রিং-রুমের বাতায়নে বসেছিল। তারা ঘবে চুকতেই জেন তাদের স্বাগত জানাল। এলিজাবেথের উদগ্রীব চোখ মুহুর্তে বোনের উপর গুস্ত হোল। না—আগের মতই স্বাস্থ্যবতী লাগণময়ী আছে জেন। সিঁড়িতে এক দল ছেলেমেয়ে তাদের দিদির দেখার জন্ত উসখুস করছিল—ড্রিং-রুমে অপেক্ষা করাব তব নয়নি তাদের। বার মাস না দেখার লজ্জা সেতু নীচেও নেমে আসতে পারছিল না। আনন্দ প্রকাশ আর আদরের পালা চলল। একটি উৎফুল্ল দিন কেটে গেল—সকাল বেলা তাড়াহুড়ায় কেনা-কাটিতে আর সন্ধ্যাটা থিয়েটারে।

এলিজাবেথ এর মধ্যেই এক সময় সুযোগ করে, মামীর পাশে আসন নিল। তাদের প্রথম কথাই শুরু হোল জেনকে নিয়ে। শুনে সে বিষয়ের চেয়ে দুঃখই পেল বেশী যে, নিজেকে খুশী রাখার চেষ্টা সম্বন্ধে মামো-মামে বিষাদ ও নৈরাশ্য মুশড়ে ফেলে জেনকে। অবশ্য এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী না হওয়াই উচিত। মিসু বিংলের গ্রেসচাচ'ষ্ট্রাটে আসার খুঁটি-নাটি তথা জ্ঞাপন করলেন মামীমা। তার ও জেনের মধ্যে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে, পুনরাবৃত্তি করলেন। বিংলের বোন নিজে থেকেই সঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

মামী তখন উইকহামের চলে যাওয়া নিয়ে ঠাট্টা করলেন এলিজাবেথকে এবং হাসিমুখে এ অবস্থা মেনে নেওয়ার তারিফও করলেন তাব।

—‘আচ্ছা, লেডী ক্যাথারিনের মেয়েটি কেমন-তর বল ত বাপু’—প্রশ্ন করলেন তিনি—‘তাকে অর্থসোভা বলা যায় না নিশ্চয়ই।’

—‘কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে অর্থসোলুপতা আর হিসেবী মনোবৃত্তি ব মধ্যে পার্থক্য কি? হিসেবীপনাব শেষ আর লোভের শুরুই বা কোথায়? গেল খুঁটমাসে আমার বিয়ে কবার ব্যাপার নিয়ে ভয় পেয়েছিলে তুমি, কেন না সেটা অপরিণামদর্শিতা হোত। আর এখন দশহাজারী মেয়েকে পেতে চেষ্টা করছে বলে তাকে অর্থগৃহ্য বলবে?’

—‘মেয়েটি কেমন বল আগে, তার পব সে লোকটির বিচার হবে।’

—‘খুব ভাল মেয়ে। তার সম্বন্ধে খারাপ কিছুই জানি নে।’

—‘ঠাকুরদার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তির মালিক না হওয়ার আগে পর্যন্ত সে তার প্রতি একটুও মনোযোগ দেয়নি।’

—‘কেনই বা দেবে? আমাব অর্থ নেই বলে আমার ভালবাসা লাভের চেষ্টা যদি অজ্ঞায় হয়ে থাকে, তবে কেনই বা সে তেমন মেয়েকে ভালবাসতে যাবে যার অর্থ নেই—যাকে সে পছন্দ করে না?’

—‘কিন্তু এই সম্পত্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এত তাড়াতাড়ি তার প্রতি ঝুঁকে পড়ার মধ্যে একটু অসভ্যতা ফুটে উঠেছে না কি?’

—‘বিপদে পড়লে ঐ সমস্ত ভ্রমতা-ট্রস্ততার বলাই থাকে না। মেয়েটি যদি বাপা না দেয় আমারাই বা পিছুবো কেন?’

—‘মেয়েটির বাপা না দেওয়া তার আচরণের কৈফিয়ৎ নয়। এতে এইটে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মেয়েটির মধ্যে একটা কিছু অসভ্য আছে—বুদ্ধি অথবা অহুভুতির?’

—‘যাই বলুন না কেন। সে হবে অর্থলিপ্সু আর মেয়েটি নিদোষ।’

—‘না, লিজি, না। এটাই আমি অপছন্দ করি। যে ছেলে বহু দিন ডারিশায়ারে কাটিয়েছে তার সম্বন্ধে এ রকম ধারণা করতে দুঃখ নাই।’

—‘তাই যদি হয়, ডারিশায়ারে যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা বাস করে তাদের সম্বন্ধে অতি খারাপ ধারণা করতে বাধ্য। আর এদের বন্ধুরা বাবা হাটফোর্ডশায়ারে থাকে তাবও কেউ উঁচু দরের নয়। এদের একটুও পছন্দ করি না আমি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আগামী কাল আমি এমন জায়গায় যাচ্ছি যেখানে এমন একটি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যার একটিও ভাল গুণ নেই, যার না আছে প্রশংসনীয় চাল-চলন বা বুদ্ধি। দেখছি নির্দোষবাই জানার মত লোক।’

—‘সাবধান লিজি, তোমার কথায় হতাশার সুর ফুটে উঠছে।’

এই নাটক অভিনয় শেষে বিদায় নেবার আগেই এলিজাবেথ মামা মামীর সঙ্গে গ্রীষ্ম কাটানোর নিমন্ত্রণ গেল।

—‘কত দূর যাব এখনও ঠিক হয়নি’—বললেন মামীমা—‘তবে লোক অঞ্চল অবধি যাবই।’

এর চেয়ে অল্প কোন পরিকল্পনা এলিজাবেথের নিকট এত প্রীতিদায়ক হতো না। এবং সে সাগ্রহেই এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। আনন্দাতিশয্যে সে বলল—‘মামী কী আনন্দ! কী আনন্দ হচ্ছে আমার! তুমি আমায় নতুন জীবন দিলে—নবীন উজ্জ্বল। দূর হোক বিবস্ত্রি-হতাশা! কত আনন্দময় মুহূর্ত কাটাৰ পাশাড়ে পর্বতে।’

## আটাশ

পরের দিন যাওয়ার পথে প্রতিটি জিনিষ সুন্দর আব নতুন টেক্সটাইল এলিজাবেথের নিকট। মনও আনন্দে উন্মুগ। দ্বিদিবে এত ভাল দেখে এসেছে যে, তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সমস্ত দুর্ভাবনা মন থেকে নির্বাসিত করতে পারে। উত্তরাঞ্চলে পথটনের সম্ভাবনা সতত আনন্দ-উৎস হয়ে রইল।

সদর রাস্তা থেকে যখন হ্যান্সফোর্ডের গলিতে গাড়ী ঢুকল, সবাই গীর্জাটি কোথায় খোঁজ করতে লাগল। গাড়ী যেই মোড় ঘোরে তারা আশাবিত হয়ে ওঠে এইবার ‘বুঝি দেখা যাবে। রোজিংস পার্কের বেড়া তাদের বাড়ীর এক দিককার সীমানা। গৃহ-স্বামীদের সম্বন্ধে যা-যা শুনেছে মনে পড়াতে হাসি পেল এলিজাবেথের।

অবশেষে গীর্জাটি দেখা গেল। বাস্তার দিকে ঢালু হয়ে আসা বাগানটি, বাগানের মধ্যে বাড়ী, সবুজ বেড়া, লয়েরলব বোপ—সব কিছুই তারা যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে তার প্রমাণ জ্ঞাপন করতে লাগল। কলিঙ্গ আর শালটি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করল তাদের। গাড়ী ছোট গেটের মুখে এসে থেমে গেল—সেখান থেকে কীকব-বিছান পথটুকু পায়ে হেঁটে বাড়ীতে প্রবেশ করল তারা। পর্বস্তরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রত্যেকেই খুশী হোল। শালটি গভীর আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করল এলিজাবেথকে এবং যতই দেখল যে তাকে খুব খুশী-মনে গ্রহণ করছে ততই তার আনন্দ হতে লাগল। এটাও সে লক্ষ্য করল, বিয়ের পরও কলিঙ্গের স্বভাব বদলায়নি মোটেই। তাব ভ্রমতা-বোধ আগের মতই আছে। গেটের মুখেই সে এলিজাবেথকে থামিয়ে কয়েক মিনিট ধবে বাড়ীর কথা জিজ্ঞেসা করলে তাকে। তার পর বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হোল তাদের—বৈঠকখানায় এসেও চলল আব এক প্রশস্ত অভ্যর্থনাব পালা।

এলিজাবেথ কলিঙ্গকে ঐশ্বর্য্যভূষণে দেখতে পাবে বলে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। এ কথা সে না-ভেবে পারল না যে, ঘরের বিশালতা, সৌন্দর্য, আসবাবপত্র প্রভৃতির বর্ণনা যেন তাকে উদ্বেগ করেই করা হচ্ছে—যেন কলিঙ্গকে প্রত্যাখ্যান করে সে কী যে হারিয়েছে সেইটাই সম্মুখিয়ে দিতে চায় এলিজাবেথকে। কিন্তু প্রতিটি জিনিষ পরিপাটি ও আরামদায়ক হলেও একটি দীর্ঘনিশ্বাসও উপিত হোল না বুক ভেঙ্গে, বরং তার বান্ধবী এমন সঙ্গীকে নিয়ে কি করে যে আনন্দ বজায় রেখেছে সেইটাই আশ্চর্য লাগতে লাগল তার। যখনই কলিঙ্গ

এমন কথা বলছিল যা শুনে স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই লজ্জাবোধ করতে পাবে এবং হামেশাই বলছিল সে এমন কথা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এলিজাবেথের দৃষ্টি এসে পড়ছিল শাল'টির উপর। ছ'-একবার ক্ষীণ আরক্তির আভাষ মিলিয়ে যেতে দেখেছে মুখে—তবে সাধারণতঃ শাল'টি বুদ্ধিমতীর মতই তার কোন কথায় কর্ণপাত করে না। দীক্ষণ ধবে ঘরের প্রতিটি আসবাবপত্রের বর্ণনা করে, পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও লগুনে যা-যা ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণী দিয়ে কলিঙ্গ তাদের বাগানে বেড়াতে যাওয়ার জন্ত আহ্বান জানাল। বাগানটি বেশ বড়, সুপরিকল্পিত এবং নিজ হাতে বাগানের পরিচর্যা করে কলিঙ্গ। বাগান-পরিচর্যা তার কাছে একটি সম্মানজনক আনন্দ-সকলন। এলিজাবেথ বিষ্ময়ে লক্ষ্য করলে, শাল'টিও এই স্বাস্থ্যপ্রদ শরীর-চর্চায় বেশ গর্ব অনুভব করে এবং যত দূর সম্ভব উৎসাহ দেয় কলিঙ্গকে। কিন্তু তাদের বাগান যতই সুন্দর হোক না কেন, বোজিংসের সঙ্গে তুলনা হয় না। দূরে সমুদ্রত ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত হাল ফ্যাশানের একটি সুরমা অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

শাল'টির বাড়ীটি ছোট কিন্তু সুন্দর—প্রতিটি জিনিষ পরিষ্কার-পবিত্র—যথাযথ ভাবে সাজান। এলিজাবেথ শাল'টির গৃহীপন্যাস তারিফ করল। কলিঙ্গের কথা মন থেকে মুছে ফেলা সত্যিই আরামদায়ক, শাল'টির স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা দেখে তা বুঝে নিতে ভুল হয় না এলিজাবেথের।

কথায় কথায় জানল এলিজাবেথ যে, লেডী ক্যাথারিন এখনও গ্রামে আছেন। ডানারের সময় আবার উঠল কথাটা। কলিঙ্গ বলল—‘আগামী রোববার চাচে’ লেডী ক্যাথারিন ছ বৃর্গের সঙ্গে দেখা হবে—তঁার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাবে। অমায়িকতা আর প্রসন্নতার তিনি প্রতিমূর্তি। এ কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তোমরা যত দিন এখানে থাকবে প্রতিটি নিমন্ত্রণে তোমাকে আব মেয়রকেও তিনি নিমন্ত্রণ করবেন। শাল'টির প্রতি তাঁর আচরণ খুবই মধুর। সপ্তাহে দু'বার বোজিংসে নিমন্ত্রণ থাকেই। তিনি কখনই আমাদের হেঁটে বাড়ী আসতে দেন না। নিজের একথানা গাড়ী করে বাড়ী পাঠিয়ে দেন—তঁার অনেকগুলো গাড়ী আছে।’

—‘সত্যিই লেডী ক্যাথারিন খুব শ্রেয় বুদ্ধিমতী মহিলা’—সায় দিল শাল'টি—‘প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর করেন।’

—‘ঠিক বলেছ। আমিও ঐ কথাটা বলতে চেয়েছিলাম। তিনি এমন মেয়ে যাকে সম্মান না করে পারা যায় না।’

সন্ধ্যাটা কটল প্রধানতঃ হাটফোর্ডশায়ারের খবর আদান-প্রদানে। যা আগেই লেখা হয়েছে পুনরাবৃত্তি করলে তার। এলিজাবেথ নিজের ঘরে যখন একলা হোল তখন শাল'টি কতখানি স্তব্ধ হয়েছিল, কতটা সে স্বামীকে মানিয়ে নিতে পেরেছে জীবনে তার পরিমাপ করতে চেষ্টা করলে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হোল যে, বেশ সূষ্ঠু ভাবেই চলেছে সংসারযাত্রা। কী ভাবে এখানকার দিন কাটবে তাও মনে-মনে খতিয়ে নিলে এলিজাবেথ।

পরের দিন দুপুর বেলা এলিজাবেথ বেড়াতে যাবার জন্ত প্রসাধনে ব্যস্ত—এমন সময় হঠাৎ নীচ থেকে একটা সোরগোলে সমস্ত বাড়ী তোলপাড় হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত কান পেতে শুনল, কে যেন

হস্ত-দস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে ছুটে আসছে—তাকে ডাকে গলা ফাটিয়ে। দরজা খুলতেই মেরিয়াকে দেখতে পেল—উত্তেজনার হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সে—‘তাড়াতাড়ি নীচে থাবার-ঘরে এস—একটা মজার ব্যাপার দেখতে পাবে। কী, আমি বলব না। তাড়া-তাড়ি—তাড়াতাড়ি নীচে চল।’

এলিজাবেথ বুখাই ভিজেসা করাত লাগল—মেরিয়া আর বেশী বলতে পারল না। তার ছুটে নীচে নেমে এল এই আশ্চর্য জিনিষ দেখতে। ব্যাপার আর কিছু নয় ছ'জন ভদ্রমহিলা বাগানের গেটের কাছে ছোট্ট একটি ফিটন করে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—‘ওঃ এই ব্যাপার’—বললে এলিজাবেথ—‘আমি ভেবেছিলাম বুঝি শূরারের ছানাটানা বাগানে ঢুকেছে। এ দেখছি লেডী ক্যাথারিন আব তাঁর মেয়ে।’

—‘উনি লেডী ক্যাথারিন নন। বুঝাটী হলেন মিসেস জেন-কিনসন—ওদের সঙ্গে থাকেন। অপরিচিত হলেন মিস ড বৃর্গ। চেয়ে দেখ। কত ছোটটি। কেউ এত ছোট আর রোগা হতে পারে ভাবা যায় না।’

—‘এই হাওয়ার মধ্যে শাল'টিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলাটা অত্যন্ত রূঢ় অভ্যস্ত। কেন, উনি ভিতরে আসতে পারেন না?’

—‘শাল'টি বলে, উনি কন্সটিং বাড়ীতে পায়ের ধূলা দেন। পায়ের ধূলা দেওয়ার অত্যন্ত বাগিত করার ব্যাপার।’

—‘চোরারটা মন্দ নয়’—স্বগতোক্তি করলে এলিজাবেথ—‘কিন্তু বড় রোগা আর খিটখিটে। ওর পক্ষে ভালই হবে। ওই হবে তার উপযুক্ত স্ত্রী।’

কলিঙ্গ ও শাল'টি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার উইলিয়ামও গেটের সামনে তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে এবং মিস ড বৃর্গ তার দিকে তাকানো মাত্র মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন তিনি।

কথাবার্তা শেষ হলে ভদ্রমহিলারা গাড়ী ধাক্কিয়ে চলে গেলেন আব শাল'টির ফিরে এল বাড়ীতে। কলিঙ্গের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সে তাদের সৌভাগ্যের জন্ত অভিনন্দন জানাল তাদের। শাল'টি বলল যে, আগামী কাল বাড়ী শুদ্ধ সবার বোজিংসে নেমস্তম্ভ।

### উনত্রিশ

এই আমন্ত্রণের ফলে কলিঙ্গের বুক দশ হাত ফুলে উঠল। এই বার অতিথিদের দেখাবে তার মুকুটির ঐশ্বর্য। কত স্নেহের চক্ষে তিনি দেখেন তাকে ও তার পত্নীকে এইবার চাক্ষুস করবে তার অতিথিরা। ঠিক এই কামনা করছিল সে। তবে এত তাড়াতাড়ি যে তিনি সুযোগ দিলেন তা লেডী ক্যাথারিনের পদম কুণ্ডল ভিন্ন আর কি?

—‘সত্যি বলতে কি’—বললে সে—‘আমি একটুও বিশ্রিত হতাম না যদি তিনি রবিবারে আমাদের চা খেতে এবং বিকেলটা তাঁর ওখানে কাটাতে নেমস্তম্ভ করতেন। বরং এই রকমই আশা করছিলাম আমি। কিন্তু এতখানি আমার দারবার অতীত ছিল। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে, তোমাদের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই

তিনি সমস্ত পরিবারটিকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর আতিথেয়তার উদার পরিচয় দেবেন।’

—‘আমি কিন্তু একটুও বিস্মিত হইনি’—বললেন শ্রীর উইলিয়াম—‘সত্যিকারের বড়লোকদের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা হবার সুযোগ ঘটেছে তাব থেকে বলছি।’

সেদিন এবং পরের দিন সকাল বেলা পঞ্চম লেডী ক্যাথারিনের গল্প ছাড়া আর কোন কথাই হোল না। কলিন্স ভাল ভাবে তাদের তালিম দিল সেখানে গিয়ে কি কি দেখতে পাবে—অত বড় ঘর, অত দাস-দাসী—অদ্ভুত ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তাবা যেন হকচকিয়ে না যায়। মেয়েবা যখন প্রসাধনের জগা প্রস্তুত হচ্ছিল কলিন্স এলিজাবেথকে বলল—‘সাজ-পোষাকের জগা ভেব না। লেডী ক্যাথারিন আর তাঁর মেয়ে যে সব সাজ-পোষাক পরেন তা তিনি আমাদের কাছে আশা করেন না। তোমার যে সব চেয়ে ভাল পোষাক তাই পরেই যেয়ো। সাধারণ ভাবে সেজে-গুজে গেলে লেডী ক্যাথারিন একটুও খাপসাপ ভাববেন না। লেডী ক্যাথারিন অবস্থার দৃব্ব বজায় বেখে চলা পছন্দ করেন।’

তারা যখন সাজগোজ করছিল তার মধ্যেই কলিন্স বাব তিনেক তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেবার জগা তাড়া দিল। লেডী ক্যাথারিন ডীনারের জগা অপেক্ষা করা পছন্দ করেন না। লেডী ক্যাথারিন ও তাঁর হাল-চাল সম্বন্ধে এত বকম ভগাবত বর্ণনা শুনে মেরিয়া তো রীতিমত দাবড়ে গেল, কাবণ এ বকম সমাজে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত সে।

স্বব্বরের দিনটি। তাবা পার্কেব ভিতর দিয়ে প্রায় আধ মাইল হেটে গেল। এলিজাবেথ খুশী-মনেই ঠাঁটলে চারি দিকের শ্রিত্ততার দিকে চোখ বেখে।

তারা যখন হল-বরের সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মেরিয়ার ভয় উত্তোত্তব বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আর উইলিয়ামও অবিচলিত ছিলেন না। শুধু এলিজাবেথ ভয় পায়নি। কাবণ, লেডী ক্যাথারিন সম্বন্ধে যা যা শুনেছে সে তাতে তাঁকে অনন্তসাধারণ বা বিশ্বয়কর গুণসমম্বিতা বলে মনে হয়নি। আর অর্থ ও পদমখাদার আড়ম্বর বিনা বুক-হুব-ছুরানিতেই সম্মুখীন হতে পারবে সে।

ঘবে প্রবেশের মুখেই কলিন্স বাড়ীর সৌন্দর্য, স্ত্রীসামগ্রীসম্বন্ধে আশ্চর্য্য বক্তৃতা শুরু করে দিল। ভূতাদের অনুসরণ করে তারা একটি ঘরে এল—যেখানে লেডী-ক্যাথারিন, তাঁর মেয়ে ও মিসেস জেনকিন্সন বসেছিলেন। লেডী ক্যাথারিন মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাদের। কে পরিচয় করিয়ে দেবে পূর্বাভেই শালটি স্বামীর সঙ্গে স্থিব করে বাখায় পরিচয়-পূর্ণ বেশ সূচাক্রান্ত্য সম্পন্ন হোল—অনর্থক ধন্যবাদ ও ক্ষমা প্রার্থনার বামেলা আর হোল না।

সেই ক্রমেই উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে আর উইলিয়াম চারি দিকের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দেখে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, ছোট একটি নমস্কার করে এক পাশে চুপ করে বসে বইলেন। তাঁর মেয়ে তো ভয়ে এমন হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে, চেয়ারের এক কোণে কুঁকড়ে বসে বইল—কোন দিকে তাকাতে ভেবে উঠতে পারলে না। এলিজাবেথ কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি—সে শাস্ত ভাবে সামনের মহিলা তিন জনকে লক্ষ্য করতে লাগল। লেডী ক্যাথারিন দীর্ঘাঙ্গী নির্মুণ-গড়ন মহিলা। এক কালে হয়ত সুন্দরীই ছিলেন। তাঁর আচরণে প্রসন্নতা সুস্পষ্ট নয়। অন্ততঃ এটুকু ভুলতে পারলে

না যে, এই মহিলাটি সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তাদের চেয়ে উঁচু। মৌন গাভীরের মুখোমুখি বসেছিলেন না বটে, কিন্তু আলাপে-আচরণে তাঁর অহমিকা ও কতৃৎ ভাব স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছিল। এলিজাবেথের মুহূর্তে উইকহামের কথা মনে পড়ে গেল এবং উইকহাম তাঁর সম্বন্ধে যা-বা বলেছিল তাব একটিও অত্যুক্তি মনে হোল না।

লেডী ক্যাথারিনের দিকে দেখতে দেখতে এলিজাবেথ তার মুখাবয়বে ও আচরণে ডার্সির সঙ্গে কিছুটা মিল আবিষ্কার করল। তার পর সে মেয়ের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে। সত্যি, এত চিকণ আর সরু মেয়েটি। মায়ের সঙ্গে মেয়ের কোন দিক থেকেই মিল নেই।

আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত চমৎকাব হয়েছিল। যতগুলি চাকর-বাকব ও আহাৰ্য-পদের কথা উল্লেখ করেছিল কলিন্স, তার একটিও বাদ পড়েনি। লেডী ক্যাথারিনের অভিপ্রায়ে কলিন্স টেবিলের শেষ প্রান্তে উপবেশন করল। কলিন্স প্রত্যেকটি রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল। প্রত্যেকটি ডিস অনবজ হয়েছিল বলে সে প্রথম অভিনন্দন জানাল; পরে শ্রীর উইলিয়াম ও জামাতার প্রতিধ্বনি করতে লাগলেন।

আব উইলিয়াম অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন ইতিমধ্যে এবং এমন ভাবে প্রশংসা করছিলেন যাতে লেডী ক্যাথারিন শুনতে পান। লেডী ক্যাথারিনও এদের প্রশংসা উপভোগ করছিলেন এবং স্থিত হাত্রে স্তাবকদের আপ্যায়িত করছিলেন। পাটির আর কেউ বিশেষ কোন কথা বলছিল না। এলিজাবেথ সুযোগ পেলে মুখ খুলছিল। সে বসেছিল শালটি আব মিস্ ছ বর্গের মাঝখানে। শালটি লেডী ক্যাথারিনের বাণী শ্রবণে তন্ময় আর মিস্ ছ বর্গ একটি কথাও উচ্চারণ করেনি সাবান্ধ। মিসেস জেনকিন্সন প্রধানত মিস্ ছ বর্গের খাওয়ার দিকে নজর রাখতে ব্যস্ত—এটা-ওটা খাওয়ার জগা অনুবোধ করছিল তাকে আর কখন চটে যায় এই ভয়ে তটস্থ হয়েছিল। মেরিয়ার কোন কথা বলার প্রস্নই ওঠে না। আর পুরুষদের হুঁজনের খাওয়া আর প্রশংসা করা ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না যেন।

ড্রয়িং-রুমে এসে লেডী ক্যাথারিনের কথা শোনা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না এবং কফি পরিবেশিত হওয়ার আগে পঞ্চম্ব তিনি অনর্গল বকে যেতে লাগলেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি তাঁর মতামত দিলেন এমন চূড়ান্ত ভাবে যে, তার কোন প্রতিবাদই হতে পারে না। তিনি শালটিকে তার গৃহস্থালী সম্বন্ধে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা কথা জিজ্ঞেসা করলেন এবং তার মত ছোট সংসার কি ভাবে চালাতে হয় সে-সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ বর্ণন করলেন। এলিজাবেথ ক্রমশঃ আবিষ্কার করলে, এই মহামান্ত মহিলার কোন তুচ্ছ বিষয়েই মনোযোগ এড়ায় না যে-সম্বন্ধে তিনি কোন না কোন নির্দেশ দিতে পারেন। শালটির সঙ্গে কথা বলার ক্রীকে তিনি মেরিয়া ও এলিজাবেথকেও নানা প্রশ্ন করলেন—বিশেষ করে এলিজাবেথকেই। শালটিকে বললেন, এলিজাবেথের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বিশেষ কিছুই জানেন না তিনি—তাহলেও মেয়েটি বেশ নম্র ধীর—সুন্দর চেহারা। নানা সময়ে তিনি এলিজাবেথকে জিজ্ঞেসা করলেন—ক’টি বোন তারা, বোনেরা তার ছোট না বড়, কাকুর বিয়ের কথা পাকা

যেছে কি না, তারা দেখতে সুন্দর কি না, কোথায় লেখাপড়া  
লেখা—বাবার কি গাড়ী আছে—মা'র কুমারী নাম কি ?  
এলিজাবেথ এই সব প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করছিল কিন্তু বেশ সমীহের  
সঙ্গেই উত্তর দিল প্রতিটি প্রশ্নের। সব শেষে লেডী ক্যাথারিন  
মুগ্ধ করলেন—‘তোমার বাবার সম্পত্তি ভবিষ্যতে কলিজাই  
বর্তাবে।’ শালটির দিকে ফিরে বললেন—‘এতে আমি খুশীই  
হয়েছি। আমি তো ভেবেই পাই না, কেন মেয়েদের বঞ্চিত করে  
সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে। তার লুইস ও বার্গের বংশে এ  
বংশের প্রয়োজন কখনো হয়নি। তুমি গাইতে-বাজাতে জান ?’  
—‘সামান্য—’

—‘ও, তাহলে এক সময় শোনা যাবে তোমার গান-বাজনা।  
আমাদের পিয়ানোটা মস্ত বড় আর সম্ভবতঃ অতি উঁচু দরের।  
যাই হোক, এক দিন বাজিয়ে। তোমার বোনেরা গান-বাজনা  
জানে ?’

—‘এক জন জানে।’

—‘সবাই শেখে না কেন ? সকলেরই শেখা উচিত। মিস্ ওয়েবরা  
সবাই বাজাতে জানে—তার বাবার তোমাদের মত আয় নেই।  
ছবি আঁকতে পার ?’

—‘না, কেউ পারি না।’

—‘কেউ না ?’

—‘না—’

—‘আশ্চর্য! আমার মতে তোমাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি।  
তোমার মা'র প্রতি গ্রীষ্মে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে এ সব শেখান উচিত  
তোমাদের।’

—‘মা'র হয়ত আপত্তি ছিল না কিন্তু বাবা লণ্ডনকে ঘৃণা  
করেন।’

—‘তোমাদের গভর্নিস চলে গেছেন ?’

—‘আমাদের কোন কালোই গভর্নিস ছিল না।’

—‘গভর্নিস ছিল না, বল কি ? এ কি করে সম্ভব ? পাঁচটি  
মেয়ে বাড়ীতে মানুষ হোল, অথচ এক জনও গভর্নিস ছিল না।  
এ রকম আমি শুনি কখনো। তোমাদের শিক্ষার জন্ত তোমার  
মাকে তাহলে দাসীর মত খাটতে হোত।’

এলিজাবেথ না হেসে পারল না, জানালে সে রকম অবকাশ  
ঘটেনি।

—‘তবে, কে তোমাদের পড়িয়েছে ? কে দেখেছে তোমাদের ?  
গভর্নিস নেই, নিশ্চয়ই তোমাদের লেখাপড়ায় অবহেলা হয়েছে।’

—‘কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে তুলনা করলে হয়ত সত্যিই  
আমাদের অবহেলা হয়েছে। তবে আমাদের যার শেখার ইচ্ছা  
আছে, তার উপায়ের অভাব হয়নি। লেখাপড়ায় চিরকালই  
আমরা উৎসাহ পেয়েছি এবং যখন যে রকম শিক্ষক দরকার হয়েছে  
পেয়েছি। অলস হতে কেউ চাইলে অলস হতে পারত।’

—‘কিন্তু গভর্নিস থাকলে এটাই হোত না। তোমার মা'র  
সঙ্গে পরিচয় থাকলে আমি এক জন গভর্নিস রাখতে বলতাম তাঁকে।  
আমি সব সময় বলে এসেছি, লেখাপড়া শিখতে হলে নিয়মিত  
কাকুর পরিচালনা ছাড়া সম্ভব নয় এবং একমাত্র গভর্নিস থাকলেই  
তা সম্ভব। আমি আমার এই উপদেশ দিয়ে কত পরিবারের

উপকার করেছি। তরুণ-তরুণারা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলে  
আমি খুব খুশী হই। মিসেস্ জেনকিনসনের চার ভাগনী আমার  
সহায়তায় ভাল করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে। এই তো সেদিন  
আর এক জন যুবকের জন্ত সুপারিশ করেছি—দৈবাৎই তার নাম  
উল্লেখিত হয়েছিল আমার কাছে। মিস্ বেনেট, তোমার আর  
কোন বোন সমাজে বেড়িয়েছে ?’

—‘হ্যাঁ, সকলেই।’

—‘সকলেই—পাঁচ জনই একসঙ্গে ? অত্যন্ত খারাপ। আর  
তুমি মাত্র মেজ মেয়ে। বড়োর বিয়ে হওয়ার আগেই ছোটরা সমাজে  
নিশ্চে ? তোমার ছোট বোনেরা নিশ্চয়ই খুব ছোট ?’

—‘আমার সব চেয়ে ছোট বোনের বয়স বোল হয়নি। হয়ত  
সমাজে মেশবার মত তার পূর্ণ বয়স হয়নি। কিন্তু আমার মনে হয়,  
অভিভাবকদের অর্থাভাব বা অথ কোন কারণে বিয়ে হয়নি,  
বিয়ে করার ইচ্ছা নেই বলে ছোট বোনদের সমাজে মেশবার আনন্দ  
থেকে বঞ্চিত করলে তাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে। সব চেয়ে  
ছোটরাও জ্যেষ্ঠার মত বোবনের আনন্দ উপভোগের গ্রাধ্য অধিকার  
আছে। শুধু এ রকম একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের বঞ্চিত করলে  
বোনে-বোনে ভালবাসা ব্যাহত হয়—মনের স্নিগ্ধতা ক্ষুণ্ণ হয়।’

—‘তোমার বয়সের আদ্যক্ষে তুমি একটু পাকা পাকা কথা বল।  
তোমার বয়স কত ?’

—‘তিনটি ছোট বোন বার বড় হয়ে উঠেছে’—হাসতে হাসতে  
বললে এলিজাবেথ—‘তার কাছ থেকে এ রকম উত্তর প্রত্যাশা হয়ত  
আপনার ধারণার অতীত।’

সোজাসুজি উত্তর না পেয়ে লেডী ক্যাথারিন একটু বিস্মিত  
হলেন। এলিজাবেথ বুঝতে পারলে, সেই প্রথম—যে এ রকম  
অপ্রতিহত ঔদ্ধত্যকে প্রথম অগ্রাহ করেছে।

—‘তোমার বয়স নিশ্চয়ই কুড়ির বেশী নয়—সুতরাং বয়স  
গোপন করার কোন অর্থ হয় না।’

—‘আমার বয়স একুশও হয়নি’—বললে এলিজাবেথ। লেডী  
ক্যাথারিন এট অদ্ভুত মেয়েটি'র দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে  
দেখলেন। কিন্তু আব কোন প্রশ্ন করলেন না তাকে।

অনেকক্ষণ পবে তারা সবাই গৃহাভিমুখে বড়না হোল।

### ত্রিশ

তার উইলিয়াম মেয়ের বাড়ী বইলেন এক সপ্তাহ। কিন্তু এই  
অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের কতাব স্মৃতি দেখে গেলেন ভুল  
হয়ে। দেখলেন তার স্বামীকে ও সমাজকে। খুশী হলেন এই  
ভেবে যে, সব মেয়েই বিয়ের পর এত ভাগ্যবতী হয় না তাঁর মেয়ের  
মত। জামাই তাঁকে প্রতিদিন সকালে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে গাড়ী  
করে সব দেখিয়ে-শুনিয়ে। আর শিশুর মশায় চলে যাওয়ার পর  
কলিক্লে'র সকাল বেলা কাটো কিছুটা বাগানে, কিছুটা লেখাপড়ায় বা  
পাড়ার ঘরের জানলার কাছে ঝাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পান করে।

মেয়েদের বসার ঘরটি পিছনে। এখান থেকে তারা বাইরের  
জগতের কোন খবরই পায় না। সুতরাং কলিক্লে'র প্রতীক্ষার তাদের  
থাকতে হয় সদর রাস্তার সব খবরের জন্তই। বিশেষ করে যত বাবাই  
লেডী ক্যাথারিনের মেয়ে তাব ফিটনে এই পথ দিয়ে যায়, কলিক্লে

দ্রুতপদে এসে তাদের জানিয়ে দিয়ে যায় সে শুভ সমাচার। প্রতিদিনই ঘটে এই ঘটনা। কোন কোন দিন সে হয়ত বা থামে এদের দেউড়ীতে। শাল'টির সঙ্গে দু'-একটি বাক্যলাপ ঘটে গাড়ীতে বসেই। কদাচিৎ নামে সে গাড়ী থেকে। শত অনুনয়েও তাকে সম্মত করানো যায় না।

কলিঙ্গ প্রায়ই লেডী ক্যাথারিনের বাসায় যায়। শাল'টির বাওয়াও বিরল নয়। লেডী ক্যাথারিন তাদের সর্ব বিষয়ে উপদেশ দেন। সাময়িক খুঁটিনাটি বিষয়ে, তাদের ঘরের আসবাবপত্রের বিস্তারিত সম্বন্ধে। এমন কি তাদের আত্মার্থে মাংসের টুকুরো যে বড় বড় করে কাটা হয় সে-বিষয়েও তাঁর মন্তব্য কবাবা ভুল হয় না।

এই মহিলাটি যে এই পল্লীর শুণ্ড নয়—আশে-পাশের অনেকগুলি পল্লীরই শাস্তিবন্ধা কত্রী, এ অভিজ্ঞতা হোল এলিজাবেথের ক'দিনের মধ্যেই। কলিঙ্গ তার কানে পৌঁছে দেয় কোথায় কাদের সংসারে অশান্তি ঘটেছে, কোথায় কলহ বেধেছে কোন কারণে। কারা নিতান্ত গরীব অবস্থায় দিনবাপন করছে। লেডী ক্যাথারিন তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে যান অকুস্থলে। মিটিয়ে দেন নিজে উপস্থিত থেকে এই সব বাদ-বিসংবাদ, অশান্তি। শাস্তি-শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দেন।

সম্প্রতি দু'বাব করে তাঁর বাসায় এদের আমন্ত্রণ থাকে। প্রথম ক'দিন তার উইলিয়াম উপস্থিত থাকতেন। এখন তাঁর আসনটি শূন্য থাকে। তা নইলে প্রথম দিনের আসব, কথাবার্তা ও শালীনতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। যতই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন হোক, এলিজাবেথ বেশ আরামেই কালক্ষেপণ করতে লাগল এখানে। যতক্ষণ কলিঙ্গ-দম্পতী ঐ মহিলাব সঙ্গে আলাপে অভিযান্ত্রিক কবে, এলিজাবেথ বাগানে ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। বছরের এই সময়টি অতি মনোরম। বাগানের এক নিভৃত ছায়া-দেশ বীথিপথে এলিজাবেথ একাকী ঘুরে বেড়ায়। পরম প্রিয় তার এই জায়গাটি।

এমনি শান্ত মুহূ পদক্ষেপে এলিজাবেথের প্রবাস-জীবনের পনেরো দিন কেটে যায়। ইষ্টাবের উৎসব সমাসন্ন হয়ে আসছে। শোনা গেল যে, শীঘ্রই এখানে নতুন অতিথির দল এসে পড়বে। এখানে আসার পূর্বে শুনেছিল এলিজাবেথ যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডার্সি এখানে আসাব আশা আছে। অল্প অতিথিদের বিষয়ে এলিজাবেথের কৌতূহল এত প্রবল নয় বটে, কিন্তু ডার্সি এলে এই পাটিতে নতুন বড় লাগবে নিঃসন্দেহে। আর লেডী ক্যাথারিনের মুখে সে ডার্সি সম্বন্ধে স্নেহপূর্ণ স্মৃতি নানা মন্তব্য শুনেছে ইতিমধ্যে। আব সে যে শাল'টি ও এলিজাবেথের পূর্ব পরিচিত, এ সংবাদে তিনি রীতিমত উন্মাদ প্রকাশ করেছিলেন।

আজ সকালে সদর বাস্তাব দিকে এমন সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি বেখেছিল কলিঙ্গ যে, আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাত'র রটে গেল গ্রামে। গাড়ীতে উপবিষ্ট ডার্সিকে মস্তক অভিবাদন জানিয়ে কলিঙ্গ দ্রুত-পায়ে গৃহে ফিরল সে-সম্মেলন পরিবেশন করতে। পরদিন সকালেই সে লেডী ক্যাথারিনের বাসায় গেল ডার্সিকে প্রদক্ষা জ্ঞাপন করতে। লেডী ক্যাথারিনের পবন স্নেহস্পন্দ প্রিয়জন এক জন নয় দু'জন এসেছে। ডার্সি তার কাকার ছোট ছেলে—ফিজ উইলিয়ামকেও সঙ্গী করে নিয়ে এসেছে এবাব। যখন কলিঙ্গ ফিরল বাড়ীতে, দু'টি অতিথিই তার সঙ্গে এ-বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিল। স্বামীর

পড়ার ঘর থেকে তাদের পথে আসতে দেখে শাল'টি ছুটে এসে ভিতরের মেয়ে-মহলে আগন্তুকদের আসার খবর জানিয়ে দিল।

—‘আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো ওদের সৌজন্যকে। মিঃ ডার্সি যে এত তাড়াতাড়ি এসে আমাদের আপ্যায়িত করবেন ভাবতে পারি না।’

বান্ধবীর কথাব প্রত্যুত্তর দেবার আগেই বাইরে আগন্তুকদের গৃহপ্রবেশের সাড়া পেল এলিজাবেথ। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিন জন পুরুষ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। প্রথমেই ফিজ উইলিয়াম। বছর ত্রিশ বয়স। দেখতে ততি সুদর্শন না হলেও মুখে-চোখে নিখাদ ভঙ্গলোকের পরিচয় প্রত্যক্ষ। ডার্সির সেই পরিচিত আত্মত্বও গান্ধী। মৌন মুখেই সে কলিঙ্গ-পত্নীকে অভিবাদন করলে। এলিজাবেথের প্রতিও সে রক্ষাব্যূহের অন্তরাল থেকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলে। প্রত্যুত্তরে নিঃশব্দে গ্রীবা সঞ্চালন করলে এলিজাবেথ।

সামান্য পরিচয়ের পরই ফিজ উইলিয়াম সম্মেলনের মতই এদের সঙ্গে মাধু সংলাপে ব্যাপ্ত হোল। ডার্সি নীরবে বসে রইল অনেকক্ষণ। তার পর হয়ত বা নিজের সৌজন্যের দুর্নামের ভয়েই এলিজাবেথকে উদ্দেশ করে তাদের পারিবারিক কুশলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে। সামান্য কথায় তার জবাব দিয়ে এলিজাবেথ তাকে প্রতিপ্রশ্ন করলে—‘দিদি মাস তিনেক হোল লগুনে গেছে। তাব সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল না কি ইতিমধ্যে?’

ডার্সির সঙ্গে যে তার দেখা হয়নি তা জানে সে। কিন্তু বিলো-পরিবারের সঙ্গে জেনের ইতিমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে ডার্সি কতখানি ওয়াকিবহাল তা পাটে জেনে নেবার কৌতূহলে এ কথা পাড়লে এলিজাবেথ। জেনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি এ কথা বলার সময় ডার্সি যে একটু বিবর্ণ হোল তা এলিজাবেথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াল না। কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত আব কোন আলোচনা হোল না তাদের মধ্যে। অল্পকাল পরেই অতিথি দু'জন সেদিনের মত বিদায় নিল।

## একত্রিশ

কর্ণেল ফিজ উইলিয়ামের শ্রদ্ধা আচরণে সকলেই—বিশেষ করে মহিলাবা এবারকার আনন্দ-উৎসবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহিত হলেন। কয়েক দিন কাটার পর কলিঙ্গ-পরিবার লেডী ক্যাথারিনের বাড়ীতে আমন্ত্রণ পেলে—যে ক'দিন সেখানে অতিথিরা ছিলেন এদের উপস্থিতি নিম্নয়োজন ছিল—দু'জন অতিথির আগমনের সাত দিন পরে ইষ্টাবের দিন তারা এই নিমন্ত্রণ পেল। এই ক'দিনের ভিতর ডার্সিকে মাত্র একবার গীর্জায় দেখা গিয়াছিল—যদিও কর্ণেল ইতিমধ্যে একাধিক বার এদের এখানে আনাগোনা করেছেন।

ইতিপূর্বে যে সমাদর পেত এরা লেডী ক্যাথারিনের কাছে, আজ তাতে কিছু কার্পণ্য দেখতে পেল সকলেই। তিনি অধিকাংশ সময়েই ব্যস্ত হয়ে রইলেন প্রিয় মানুষটিকে নিয়ে। বিশেষ করে ডার্সির প্রতি তার অবিমিশ্র আলাপ-আপ্যায়ন ঘরের সব ক'জনেরই ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠল।

কর্ণেল কিন্তু এদের পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বিশেষ করে কলিঙ্গ-গৃহিণীর প্রিয় বান্ধবীটি তার মন জুড়ে ছিল। তাকে

তেই সে নানা বিষয়ে আলাপ শুরু করে দিল। কোন নিমন্ত্রণে যে এত আনন্দময় মুহূর্ত ইতিপূর্বে আর কখনো অভিবাহিত করেনি এলিজাবেথ। তারা এমন অকপট সোৎসাহে গল্প করতে লাগল। ডার্সি ও লেডী ক্যাথারিনের দৃষ্টি নিশ্চিন্ত হোল অবিলম্বেই। ডার্সি বিশেষ করে তীক্ষ্ণ কৌতূহলের সঙ্গেই তাদের এই ঘনিষ্ঠতাকে লক্ষ্য করল। লেডী ক্যাথারিনও নিজের বিষয় প্রকাশ করে চললেন—‘কি নিয়ে এমন গভীর গল্প চলছে তোমাদের? কি কথা আমাদের একটু শোনাও না, ফিজ উইলিয়াম। মিস্ বেনেটকে কি লজ্জা, শুনি না?’

তিনি যে নাছোড়বান্দা এ কথা ভেবে কর্ণেল জ্বাবে বললে—‘আমরা গানের আলোচনা করছি।’

‘গানের কথা! তবে একটু জোরে আলোচনা কর ফিজ, যাতে আমরাও শুনতে পাই। ঐ একটি আলোচনা—যাতে আমার ভারী আনন্দ হয়। তোমাদের কথাবার্তায় আমাদেরও অংশ নিতে দাও। নাবা ইংল্যাণ্ডে আমার চেয়ে কোন প্রিয় লোক বেশী নেই যার গানের প্রতি এমন স্বাভাবিক প্রীতি আমার মতো প্রায়শই দেখতে পাবে না তুমি। যদি গান শিখতাম খুব বড়ো গায়িকা হতে পারতাম। মেয়েও আমার কম ছিল না কিন্তু ওর শরীরটাই ও-পথের কাটা হয়ে বইল। তা ডার্সি, বোনটির সঙ্গীত-চর্চা এগোচ্ছে কেমন?’

বোনের প্রশংসায় ডার্সি পঞ্চমুখ। লেডী বললেন—‘তুনে ভারী খুশী হলাম। তাকে বলো যে, আমি বলেছি, নিয়মিত চর্চা না রাখলে সে ওস্তাদ হতে পারবে না। আমি যে কত মেয়েকে বলেছি এ কথা। আর এ মেয়েটিও পিয়ানো বাজায় মন্দ নয়। কলিংবের বাসায় পিয়ানো নেই, তাই এলিজাবেথকে বলি, আমাদের এখানে এসে একটু সাধনা করতে। কোন অসুবিধা হবে না। ও-ঘরে তো কেউ যায় না।’

কাকীর এই নিলজ্জিতায় ডার্সি বেন লজ্জিত হয়ে পড়ল।

কফি খাওয়ার পর কর্ণেল এলিজাবেথকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আজ বাজনা শোনানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছিল তার। স্তব্ধতা এলিজাবেথও এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। লেডী ক্যাথারিন ভাইপোর সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন এই বাজনার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা দেখিয়ে। ডার্সি এক সময় উঠে পড়ল, তার পর দীর্ঘ মন্তর পায়ে এগিয়ে পিয়ানোর নিকটবর্তী এমন একটি জায়গায় ঘাঁটি নিয়ে দাঁড়াল—যেখান থেকে সুন্দরী গায়িকার মুখখানি সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এলিজাবেথ তার এই ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করলে আড়চোখে, তার পর মুখ ফিরিয়ে তার দিকে পূর্বদৃষ্টিতে চেয়ে একটু

বাঁকা হাসি তেমে বললে—‘অম্বল গভীর মুখে সামনে দাঁড়িয়ে কি আমায় অপ্রস্তুত করতে এলেন? আপনার বোন ভাল বাজালেও আমি লজ্জা পাব না আমার বাজনায়। অম্বলের মুখ চেয়ে অপ্রস্তুত না হওয়ার দৃঢ়তা আমার চরিত্রে আছে। এই সব মুহূর্তে আমি খুব সামলে নিতে পারি নিজেকে।’

—‘ঠিকই ধরেছেন’—জ্বাবে বললে ডার্সি—‘আপনি যে স্বীকারোক্তি করেছেন তা যে আপনার নিজস্ব মত নয়, তা যৌথভাবে বুদ্ধি আমার হয়েছে আপনার সঙ্গে এত দিনের পরিচয়ে।’

এলিজাবেথ ফিরল কর্ণেলের দিকে। ততোধিক সবল স্বরে বললে—‘আপনার ভাইয়ের কাছে আমার যথার্থ পরিচয় পেতে পারবেন। উনি বলে দেবেন যে আমার কথা বিশ্বাস না, করতে।’

ফিজ উইলিয়াম কৌতূহলী হয়ে বললে—‘বলুন না, ডার্সির চরিত্র সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?’

—‘তবে শুনুন বলছি। কিন্তু অবিনয়ী কিছু শোনবার জন্ত তৈরী হয়ে থাকুন। ঠাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এক বল-নাচের আসরে। সেখানে খুব কমই পুরুষ ছিলেন উপস্থিত। কিন্তু উনি চারটির বেশী নাচে যোগ দেননি। আব একটি তরুণী মেয়ে সঙ্গীতীন হয়ে বসে থাকলেও উনি সৌজন্য করে তার প্রতি ভদ্রতা দেখাননি। এ সব অসৌজন্য আপনি অস্বীকার করতে পারেন না কি মিঃ ডার্সি?’

—‘আমার পরিচিত ক’জন ভিন্ন ভিন্ন কোন মেয়েকে চেনবার সুযোগ পাইনি আমি তখনো।’

—‘কিন্তু ঐ ধরণের আসরে কে আব সব চেনা-জানা মেয়েদের সঙ্গ পায়? পরিচয় করে নেয় লোকে। শালীনতা তাই দাবী করে না কি?’

—‘নেচে আলাপ করার প্রতিভা আমাদের নেই, স্বীকার করছি।’ এমন সময় লেডী ক্যাথারিন এসে তাদের আলাপের স্ত্রু ছিন্ন করে দিলেন। বললেন—‘এ মেয়েটির হাত মিষ্টি। কিন্তু লওনের কোন সঙ্গীত-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকলে ওর আরো উন্নতি সম্ভবপর হতো। আঙ্গুল ওর চলে ভালো, তবে রুচি তত উচ্চগ্রামে ওঠেনি আমার মেয়েটির মত। আমাদের গ্যারি গান-বাজনায় মন্ত পারদর্শিনী হতে পারত যদি ওর শরীর একটু স্বস্থ থাকত।’

এলিজাবেথের কিসে ভালো হবে সে সম্বন্ধে আবে অনেক উপদেশ তিনি দিলেন। তার পর এক সময় দাঁব গাড়ী কবে এবে বাসায় ফিরে এল।

অনুবাদক—শ্রীশিব সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাট্টা।

“রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্ত এসেছিলেন।

তাকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।”

—স্বামী বিবেকানন্দ



# বাংলা সাময়িকপত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-৫

শ্রীযুক্তেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বাবে অনবধানতা বশতঃ দুইখানি সাময়িক পত্রিকার নাম  
বাদ পড়িয়াছে : উজা—

১। **ভব-প্রকাশিকা** বা **শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস-**  
**দেবের উপদেশ (মাসিক ?) :**

সম্পাদক—বামচন্দ্র দত্ত।

২। **পল্লীপ্রকাশ (মাসিক) :** আশ্বিন ১২৯৩।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনারায়ণ  
রায়।

ইং ১৮৮৭

৪৭৮। **বুদ্ধ-বন্ধু (মাসিক) :** ফাল্গুন ১২৯৩।

সম্পাদক—রুকমণী চৌধুরী।

৪৭৯। **গান ও গল্প (পাক্ষিক) :** ১ বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—মতিলাল বসু, নাট্যকার মনোমোহনব পুত্র এবং  
বোসের মার্কসেব প্রতিষ্ঠাতা। বহু বিশিষ্ট লেখকের রচনায়  
পত্রিকাখানি সমৃদ্ধ ছিল।

৪৮০। **কর্ণধার (মাসিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—চাবাণচন্দ্র রক্ষিত।

৪৮১। **বীণাপাণি (মাসিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

“প্রধানতঃ সনাতন তিন্দুর্ধ্ব সঙ্কীর্ণ আলোচনা ইহার উদ্দেশ্য।”

সম্পাদক—প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৮২। **চিকিৎসাচর্চা (মাসিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

নদীয়া, মোল্লাবেলিয়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-বিষয়ক পত্র।

সম্পাদক—বঙ্গনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

৪৮৩। **তিন্দুর্ধ্ব (সাপ্তাহিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

৪৮৪। **দীপিকা (মাসিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—পার্বীমোহন হালদার।

৪৮৫। **নব-যুগ (মাসিক) :** বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

৪৮৬। **কামনা (মাসিক) :** বৈশাখ (?) ১২৯৪।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ দত্ত।

৪৮৭। **সামাবাদী (মাসিক) :** বৈশাখ (?) ১২৯৪।

উড়িয়া হইতে প্রকাশিত এবং বিনামূল্যে বিতরিত। ইহাতে  
“অতি উদারভাবে ধর্ম, নীতি ও মিতাচার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত  
হইয়া থাকে।

৪৮৮। **কাদালের ব্রজাণ্ড-বেদ।** আত্ম ও সাধন-  
তত্ত্ব। ১২৯৪ সাল।

কুমারখাসী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কাদাল-ফিকির-  
চাঁদ ফকীর (হরিনাথ মজুমদার)। ইহার ৬ ভাগ প্রকাশিত  
হইয়াছিল; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় পূর্ণ।

৪৮৯। **হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী (মাসিক) :** আষাঢ় ১২৯৪।

সম্পাদক—মুনসী গোলাম কাদের।

৪৯০। **গুপ্ত জ্ঞানবর সংগ্ৰহ (মাসিক) :** শ্রাবণ ১২৯৪।

ডাঃ এ. সি. বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৯১। **অমুসন্ধান (পাক্ষিক...)**। ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪।

অমুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র। নানারূপ জুরাচুরি হইতে  
দেশবাসীকে সতর্ক করাই ‘অমুসন্ধান’ের উদ্দেশ্য। প্রথম সম্পাদক—  
দুর্গাদাস লাহিড়ী। অষ্টম বর্ষ (২১ বৈশাখ ১৩০১) হইতে  
পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক আকার ধারণ করে।

৪৯২। **সংসার-দর্পণ (মাসিক) :** শ্রাবণ ১২৯৪।

সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করাই ইহার  
উদ্দেশ্য ছিল। পরমায়ু—দুই বৎসর। সম্পাদক—সুপ্রসিদ্ধ কথ্য  
সাহিত্যিক কেন্দারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৯৩। **সচিত্র কৃষি শিক্ষা (মাসিক) :** ভাদ্র ১২৯৪।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কালীকুমার মুন্সী।

৪৯৪। **সারসংগ্রহ (মাসিক) :** ভাদ্র ১২৯৪।

বীরভূম জেলার মলুটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—  
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

৪৯৫। **বিভা (মাসিক) :** আশ্বিন ১২৯৪।

“ঐচ্ছারূচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।” ভাওয়ালের কবি  
গোবিন্দচন্দ্র দাস ইহার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন; ইহার  
৭ম-৮ম যুগ্ম-সংখ্যায় মুদ্রিত দাস-কবির ‘প্রেম ও ফুল’ কাব্যের  
সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য আছে : ‘প্রেম ও ফুল’ বিভা  
প্রকাশক প্রকাশ কবিরাজের। আমরাদিগের ইহার অধিক  
সমালোচনা করা ভাল দেখায় না। ‘বিভা’ একখানি উচ্চাঙ্গের  
মাসিক পত্রিকা। ইহার পৃষ্ঠায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনেকগুলি  
রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ম ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত  
“জাতিভেদ” প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাউতে পারে; প্রবন্ধটির শেষে  
লেখকের নামোল্লেখ না থাকিলেও মলাটে মুদ্রিত সূচীতে আছে।

৪৯৬। **ধর্ম-নিগম (মাসিক) :** আশ্বিন ১২৯৪।

ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা; শশিভূষণ নন্দী কর্তৃক সংকলিত।

\* \* \* \*

‘বামাবোধিনী পত্রিকা’য় (ভাদ্র ১২৯৪) ‘গৃহীয় প্রহরী’ নামে  
একখানি পত্রিকার, এবং ‘বিভা’য় (পৌষ ১২৯৪) নিম্নোক্ত  
পত্রিকাখানির প্রাপ্তিস্বীকার আছে। এগুলি সম্ভবতঃ ১২৯৩-৯৪  
সালে প্রথম প্রকাশিত হয় :—

(ক) গরীব ও মহাবিজ্ঞা (‘গরীব’ ঢাকা হইতে প্রকাশিত  
সাপ্তাহিক পত্র, ইহার সহিত স্থানীয় ‘মহাবিজ্ঞা’ সম্মিলিত হয়)।

ইং ১৮৮৮

৪৯৭। **ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র (মাসিক) :** ফাল্গুন (?)  
১২৯৪।

সম্পাদক—আন্তোব গুপ্ত।

৪৯৮। **অপূর্ব পঞ্চায়ৎ (সাপ্তাহিক) :** বৈশা  
১২৯৫।

পরমায়ু—৬ মাস। সম্পাদক—উপেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ‘বঙ্গবাসী’  
ভূতপূর্ব কার্যাব্যাহক।

৪৯৯। **ক্রীড়া ও কৌতুক (মাসিক) :** বৈশা  
১২৯৫।

তাহিরপুর হইতে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পবিচালক—  
কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়। ১৮৮৯, ১লা জাহ্নয়ারি হইতে

বাবেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদকত্বে ইহা সাপ্তাহিক আকারে নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত।

৫০০। গৌড়তরু (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২১৫।

মালদহ হইতে প্রকাশিত।

৫০১। বিবেক (পাক্ষিক) : বৈশাখ ১২১৫।

ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

৫০২। ব্রহ্মাণ্ডরাজ্য (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১৫।

ইহা পূর্বের দিনকতক চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ১২১৫, বৈশাখ হইতে পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

৫০৩। কল্লতরু (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২১৫।

“আশা ও ব্যবসা সঞ্জীৱনী বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।” সম্পাদক—পি, এন, [পরেণনাথ] বিখ্যাত। ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকার আকারে ও ধরণে বাহির হইত।

৫০৪। সমীপ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ (?) ১২১৫।

উল্বেড়িয়ার হিতকরী সভা হইতে প্রকাশিত।

৫০৫। শান্তি (সাপ্তাহিক) : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২১৫।

বিমলাচরণ চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত।

৫০৬। হরিভক্তিতত্ত্ব (মাসিক) : আষাঢ় ১২১৫।

সদ্যাবাদ, বহুবমপূর্ব হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—দাস হরিচরণ বসু।

৫০৭। স্তম্ভী পাখী (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১৫।

যশোহর হইতে প্রকাশিত, নীতিবিষয়ক বালক-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—সারদাপ্রসাদ বসু।

৫০৮। আহার-তত্ত্ব (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১৫।

নিরামিষভোজী সভার মুখপত্র। সম্পাদক—ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৫০৯। ধ্বস্তুরি (মাসিক) : ভাদ্র ১২১৫।

সম্পাদক—সতীপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

৫১০। গৃহী সখা (মাসিক) : আশ্বিন ১২১৫।

মধ্যবিস্ত-শ্রেণীর লোককে গৃহকর্মনির্বাহে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত। সম্পাদক—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

৫১১। শক্তি (সাপ্তাহিক) : আশ্বিন ১২১৫।

ঢাকা আধুনিকটোলা হইতে প্রকাশিত। “ইহার মত সকল বেশ উদার অথচ হিন্দুভাবাপন্ন।”

৫১২। সারস্বত-প্রসূনাঞ্জলি (মাসিক) : কার্তিক ১২১৫।

“সাধাবশের মোহাস্ফকার নষ্ট করাই এই ক্ষুদ্র ‘সারস্বত-প্রসূনাঞ্জলি’র প্রধান উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—অবোরনাথ ঘোষ।

৫১৩। বিরহিণী (মাসিক) : কার্তিক ১২১৫।

ইহাতে প্রধানতঃ গল্পই স্থান লাভ করিত। সম্পাদিকা—শৈলবালা দেবী।

৫১৪। শিক্ষা (মাসিক) : পৌষ ১২১৫।

বনগ্রাম (যশোহর) ছাত্রসমিতি হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্রিয়নাথ বসু।

৫১৫। শ্রীহট-সুহৃদ (মাসিক) : পৌষ ১২১৫।

“আজ-কাল স্কুল-কলেজের বালক ও যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র অতিশয় হীন হইতেছে, ঐ সকল হীনচরিত্র বালক ও

যুবকদিগকে সংপথে আনাষ্ট ‘শ্রীহট-সুহৃদ’ব ব্রত।” এই চ-পৃষ্ঠা পরিমিত মাসিক পত্রিকা (বার্ষিক মূল্য ১০) বালকদিগের যত্নে পরিচালিত হইত।

৫১৬। মালঞ্চ (মাসিক) : পৌষ ১২১৫।

ভূতপূর্ব ‘পাক্ষিক সমালোচক’-সম্পাদক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ঋনবারপূর্বে (ত্রিহুত ষ্টেট রেলওয়ে) অবস্থানকালে এই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্রখানি প্রকাশ করেন। ইহাতে রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত। পরমাণু—হুই বৎসর।

ইং ১৮৮৮ সনে আরও কতকগুলি পত্র-পত্রিকার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; পত্রিকাগুলি—

(ক) চন্দ্রবিলাস (সাপ্তাহিক)।

(খ) গৌরব।

(গ) চটল গেজেট (সাপ্তাহিক)।

(ঘ) চন্দ্রহাস (সাপ্তাহিক), বহরমপুর।

(ঙ) কাশিপুর-নিবাসী (মাসিক...), বরিশাল। সম্পাদক—প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

(চ) মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা (ত্রৈমাসিক), টাঙ্গাইল।

(ছ) জগৎবাসী (সাপ্তাহিক)।

(জ) পীরগোরাচাঁদ (বিজ্ঞাপনমূলক মাসিকপত্র)।

এই সকল পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব পূর্ব সম্ভব ১২১৫ সালেই ঘটিয়াছিল।

এই বৎসর হিন্দী ভাষায় বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাখানির নাম—‘সুগৃহিণী’; ইহা স্ত্রীলোকদিগের জন্য শিল্প হইতে ১২১৪ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৮৮৮) প্রচারিত হয়। সম্পাদিকা—হেমন্তকুমারী দেবী, রাজচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গদ্বিণী (দ্রঃ ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, বৈশাখ ১২১৫, পৃঃ ৩)।

## ইং ১৮৮৯

৫১৭। ভারত-সঞ্জীবন (মাসিক) : মাঘ ১২১৫ (জাহ্নবাবি ১৮৮৯)।

হুগলী বুদ্ধোদয় প্রেস হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ভূপতি নাথ দাস।

৫১৮। শুক-সাবি (মাসিক) : মাঘ ১২১৫।

যশোহর শুভকরী যন্ত্রে মুদ্রিত। সম্পাদক—নিবারণচন্দ্র কাক্যতীর্থ, যশোহর জেলাস্কুল।

৫১৯। ফরিদপুর-হিতৈষিণী (সাপ্তাহিক...): ফাল্গুন ১২১৫।

ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। ১২১৮ সালে মাসিকে কপান্তরিত।

৫২০। আর্থ্যপ্রতিভা (মাসিক) : চৈত্র ১২১৫।

প্রকাশক—বৈষ্ণবচরণ বসাক।

৫২১। শাস্ত্রপাঠ-সম্মিলনী (মাসিক) : চৈত্র ১২১৫।

সম্পাদক—রেঃ ডবলিউ. জি. ব্রুক্‌য়ে, ভবানীপুর।

৫২২। সাহিত্য-বহুভাণ্ডার (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৬।

সম্পাদক—কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫২৩। শিক্ষা-পরিচর (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৬।

শিক্ষা-বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, পুঠিয়া রাজসাহী। স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই পত্রের সচিব সংগঠিত ছিলেন। ১২১৭ সালের পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশ :—“পাঠকগণ সুনীয়া স্থখী হইবেন, শিক্ষা-পরিচরের পরিচালন এবং উন্নতি বিধান সম্পাদককে সাহায্য করিবার জন্য এখন হইতে কয়েক জন কৃতবিক্ত হিতৈষী বন্ধু সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচর-সমিতি নামে একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। ‘‘শিক্ষা-পরিচর’’ সমিতির অধিবেশন-স্থান বোয়ালিয়া, রাজসাহী, বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বি-এল।’’ শিক্ষা-পরিচর-সমিতি ‘‘শিক্ষা-পরিচর’’ এবং জাতীয় সাহিত্য-বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ‘‘শিক্ষা-পরিচর’’ একখানি সুপরিচালিত পত্র, ৫ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সম্পাদক—‘‘দেবীযুক্ত’’-প্রণেতা শরচ্চন্দ্র চৌধুরী (মৃত্যু : ১৩ ফাল্গুন ১৩৩৩) সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন।

৫২৪। আর্দ্রদর্শ-প্রচারক ব্রাহ্মণপণ্ডিত (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৬।

সম্পাদক—বেদাধ্যাপক ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি সবস্বতী।

৫২৫। সন্মিলনী (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১৬।

‘অমৃত নাজার পত্রিকা’র পব যশোহর হইতে প্রকাশিত ইহাট উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্র।

৫২৬। পবীক্ষা (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৬।

‘‘উইনানী হেকিমী চিকিৎসা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, আর্ধ্যদর্শ, উপন্যাস, ইতিহাস ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—সুদয়নাথ মৈত্র ও পণ্ডিত বৈজনাথ বিজানিদি।

৫২৭। সদৃশ-চিকিৎসা-দর্শণ (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৬।

‘‘নূতন শিক্ষার্থী বাহাতে সহজে গোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারেন তদ্বিষয়’’ এই নামের এক মাসিকপত্র বৈশাখ ১২১৬ হইতে প্রকাশিত হইবে—এই মর্মে কেশবনাথ চট্টোপাধ্যায় (গোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, বনগ্রাম, যশোহর) কর্তৃক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল।

৫২৮। গুরুচরণ (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১২১৬।

৬৫ নং মেছুয়াবাজার হইতে প্রকাশিত। ‘‘এই পত্রিকাখানি ব সকল বিষয়ই অদ্ভুত!—নাম ‘গুরুচরণ’, ম্যানেজার পেডুমোর সাহেব, স্বত্বাধিকারী হাকিম নাজাতালি শা কাদিবী; লেখা হয় বাঙ্গলা ভাষায় আর্ধ্যদর্শ ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ।’’

৫২৯। ভারত-ভগিনী (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২১৬।

‘‘শ্রীমতী হরদেবী নাম্নী লাহোরের একটি হিন্দু মহিলা ‘ভারত-ভগিনী’ নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতেছেন।’’—‘সুসভ সমাচার ও কুশদহ,’ ১৫ আষাঢ় ১২১৬।

৫৩০। ত্রাণোদয় (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২১৬।

‘‘মুক্তিতত্ত্বপ্রকাশক পাক্ষিক পত্র বিনামূল্যে বিতরিত। ১ নং ডিহি জীরামপুর বোড, ইটানী হইতে প্রকাশিত। এখানি খৃষ্টীয় ধর্মবিষয়ক পাক্ষিক পত্র। আধ্যদর্শ ও স্বাধীন খৃষ্টীয়ানকে এখন

আর দেখিতে পাই না কেন?’—‘সুসভ সমাচার ও কুশদহ,’ ১৫ আষাঢ় ১২১৬।

পূর্ব বৎসর বৈশাখ মাস হইতে ‘ত্রাণোদয়’ অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়েব সম্পাদনায় মাসিক আকারে প্রকাশিত হয়।

৫৩১। শিলচর (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২১৬।

শিলচর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বিধুভূষণ রায়।

৫৩২। সুকথা (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১২১৬।

কোচবিহার স্টেট প্রেসে মুদ্রিত হইয়া কোচবিহার হইতে প্রকাশিত হইত।

৫৩৩। আনন্দ (মাসিক) : আষাঢ় ১২১৬।

সম্পাদক—কেশবনাথ ঘোষ।

৫৩৪। সবিতা (মাসিক) : আষাঢ় ১২১৬।

উত্তরপাড়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগীন্দ্রনারায়ণ সিংহ।

৫৩৫। রবি (মাসিক) : আষাঢ় ১২১৬।

ছোট জাগুলিয়া ‘ছাত্র-সভা’র অনুমত্যমুসারে ২° নং হরীতকী বাগান লেন হইতে অনুকূলচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ বসু, এম-এ।

৫৩৬। শিশু-বান্ধব (মাসিক) : ঈং ১৮৮১ (?)

১৮৭১ সনে জি, এটচ, রুজ (Rouse) ‘খৃষ্টীয় বান্ধব’ প্রকাশ করেন। তাঁহারই সম্পাদনায় ‘শিশু-বান্ধব’ প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ১৮৮১ সনের জুলাই সংখ্যা ‘শিশু বান্ধবের’ উল্লেখ আছে।

৫৩৭। সাহিত্য-কল্পদ্রুম (মাসিক) : শ্রাবণ ১২১৬।

সম্পাদক—শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। ৩ নং বীডন স্কোয়ার, নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে ‘বহুমতী’র স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রকাশিত। সপ্তম সংখ্যা (মাঘ ১২১৬) হইতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদক হন এবং নবম সংখ্যায় (চৈত্র) ‘সাহিত্য-কল্পদ্রুম’ের ১ম বর্ষ শেষ হয়। অতঃপূর্ব ১২১৭ সালের বৈশাখ হইতে ‘কল্পদ্রুম’-কাটা ‘সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়। ‘সাহিত্য’ ২য় বর্ষ হইতে ‘সাহিত্য-কল্পদ্রুম’ের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র হইলে উপেন্দ্রনাথ ও ১২১৮ সালের বৈশাখ হইতে ২য় বর্ষে ‘সাহিত্য-কল্পদ্রুম’ ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদকত্বে প্রচার করেন। ইহা তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

৫৩৮। গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা : শ্রাবণ (?) ১২১৬।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন সেন।

৫৩৯। প্রজাপতি (মাসিক) : আশ্বিন ১২১৬।

সম্পাদক—বিজয়কৃষ্ণ রাহা।

৫৪০। যমুনা (মাসিক) : আশ্বিন ১২১৬।

৭৫ নং বসরাম দে’র স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে ‘যমুনা-সমিতি’ কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিশর চট্টোপাধ্যায়।

৫৪১। দরিত্র-রঞ্জন (মাসিক) : কার্তিক ১২১৬।

‘‘অনুশীলন ভিন্ন সাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি হয় না। সকলেই লিখিতে না শিখিলে মাছুভাবায় ভাল-মন্দের বিচারশক্তি জন্মে না; লেখক, অলেখক সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমাদের এই আয়োজন।’’ ইহাতে প্রতি সংখ্যায় এক এক খানি

পুস্তক—প্রধানতঃ উপন্যাস স্থান লাভ করিত। সম্পাদক—চুর্ণাল মিত্র।

৫৪২। রুচি (মাসিক) : কার্তিক ১২১৬।

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়।

৫৪৩। পুষ্পহার (মাসিক) : কার্তিক ১২১৬।

বোম্ব এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র বৈতালিক।

৫৪৪। সুধাকর (সাপ্তাহিক) : কার্তিক ১২১৬।

“কোন সুশিক্ষিত ভদ্র মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত...লেখা বেশ বিস্তৃত এবং উদারজাবাক্যক। মুসলমানদিগের আরও কয়েকখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র ছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।...টান্কাইলের ‘আহমদী’ অনিয়মিত প্রকাশের জন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেছে না।”

## ইং ১৮৯০

৫৪৫। নব যুবক (মাসিক) : পৌষ ১২১৬।

টান্কাইল, ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—উমেশচন্দ্র দে।

৫৪৬। চিকিৎসক (মাসিক) : মাঘ ১২১৬।

তালন্দ, রাজসাহী হইতে প্রকাশিত। উদ্দেশ্য—আয়ুর্কর্মেদেব পুষ্টিবর্দ্ধন। সম্পাদক—ডাঃ বিনোদবিহারী রায়।

৫৪৭। সঙ্গিনী (মাসিক) : মাঘ ১২১৬।

বিবিধ বিষয়ক সমালোচনৌ মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—রাধিকাপ্রসাদ দত্ত।

৫৪৮। সাহিত্য (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৭।

এই অতি-সুপরিচিত পত্রিকার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক। ১২১৭ সালের বৈশাখ মাসে ইহার আবির্ভাব। সম্পাদক—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। ১৩২৭, ১৭ পৌষ তারিখে সমাজপতির মৃত্যু হইলে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্বহস্তের সাধের পত্রিকাখনি সহজে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই; তিনি ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যা হইতে সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ‘সাহিত্য’ ১৩৩০ সাল পর্যন্ত চলিয়াছিল।

৫৪৯। সুবোধিনী (সাপ্তাহিক...): ১ বৈশাখ ১২১৭।

সম্পাদক—কবিরাজ শ্রীজ্ঞানবল্লভ রায়। ইহা প্রধানতঃ “খাঁটা বাঙ্গালায় পয়্যারাদি ছন্দে লিখিত।” সাপ্তাহিক আকারে আট সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর, পরবর্তী আঘাট মাস হইতে ‘সুবোধিনী’ মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। মাসিক ‘সুবোধিনী’ সম্পাদন করিতেন—কালিদাস মিত্র।

৫৫০। প্রতিমা (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৭।

সে-যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। সম্পাদক—বামদেব দত্ত। ইহার মৃত্যুতে প্রথম বর্ষের পত্রিকার শেবার্দ্ধ সম্পাদন করেন—শ্রামলাল গোস্বামী।

৫৫১। মজলিস (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৭।

বৈঠকী আলাপ, সঙ্গীত, কবিতা, খোদগল, চরিত্র সমালোচন, চুটকী, রংতামাসাপূর্ণ মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—জুর্গাদাস দে। ‘মজলিসে’ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল বসুর কিছু কিছু রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৫৫২। চিকিৎসা-লহরী (মাসিক) : বৈশাখ ১২১৭।

ইহাতে সর্বপ্রকার প্রণালীর চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রকটিত হইত।

৫৫৩। হিতকরী (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২১৭।

কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া হইতে প্রকাশিত। রাজসাহীর ‘শিক্ষা-পরিচর’ লেখেন :—“আমরা জানিয়াছি, এক জন সুপ্রসিদ্ধ দেশভিত্তিক সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া হিতকরীর পরিচালনা করিতেছেন।” আমাদের মনে হয়, পত্রিকাখানি মীর মশাররফ হোসেনের, এবং হরিনাথ মজুমদার (কান্দাল হরিনাথ) অন্তরালে থাকিয়া উহার পরিচালনায় সহায়তা করিতেন। দ্বিতীয় বর্ষে ‘হিতকরী’ টান্কাইলে স্থানান্তরিত হয়।

৫৫৪। সমালোচক (মাসিক) : বৈশাখ (?) ১২১৭।

কাশীপুর, চুয়াডাঙ্গা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

৫৫৫। আধ্যাত্মিক (মাসিক) : আঘাট ১২১৭।

কায়স্থ জাতির গৌরব বৃদ্ধিব উদ্দেশ্যে প্রচারিত। সম্পাদক—দেব কিশোরীমোহন ঘোষ বস্তু।

৫৫৬। হোমিওপ্যাথিক তত্ত্বপ্রকাশ (মাসিক) : আগাট ১২১৭।

সম্পাদক—হরিদাস চক্রবর্তী।

৫৫৭। নববিধান মৃতসঞ্জীবনী (মাসিক) : আঘাট (?) ১২১৭।

টান্কাইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ তালুকদার।

৫৫৮। আশালতা (মাসিক) : ভাদ্র ১২১৭।

পাবনা জেলার অন্তর্গত মিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী দে, বি-এল। ইহার ১ম সংখ্যায় রজনীকান্ত সেনের ‘আশা’ নামে কবিতা স্থান পাইয়াছিল; উহাই কবির প্রকাশিত প্রথম কবিতা।

৫৫৯। চিত্রদর্শন (মাসিক) : কার্তিক ১২১৭।

স্বলভ সচিত্র মাসিকপত্র। প্রকাশক—বিহারীলাল রায়, কলুটোলা আর্টিষ্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী।

৫৬০। ভারতকুসুম বা পুস্তকনামাবলী (মাসিক) : কার্তিক ১২১৭।

সম্পাদক—চন্দ্রকুমার কবিভূষণ।

৫৬১। সংসার চিন্তা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২১৭।

পরিচালক—রসিককৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৬২। নব-মিহির (পাক্ষিক) : অগ্রহায়ণ (?) ১২১৭।

ময়মনসিংহ জেলার টান্কাইলের অধীন ঘাটাইল হইতে রামগোপাল ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৬৩। জন্মভূমি (মাসিক) : পৌষ ১২১৭ (ডিসেম্বর ১৮৯০)।

৫৬৪। বঙ্গনিবাসী (সাপ্তাহিক) : ১২১৭ সাল (ইং ১৮৯০)।



বৈষ্ণব কবি

মালবিকা রায়

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বৈষ্ণব সাহিত্য প্রধানত: ভক্তিরসমূলক।

কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য যদি কেবল মাত্র ভক্তিরসমূলকই হইত, তাহা হইলে এই নাস্তিকতার যুগে, যখন ভক্তি ও ভক্তের একান্ত প্রাচুর্য্য দেখা য়ে য়েও ইহা মানুষকে এ ভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না। বৈষ্ণব সাহিত্যকে ভক্তিরসমূলক না বলিয়া বরং প্রেমরসমূলক বলা চলিতে পারে। যদিও প্রেমের কবিতা বলিতে যাহা বোঝা যায়, বৈষ্ণব কবিতা ঠিক সেই জাতীয় নহে।

প্রেমের কবিতা বলিতে আমরা বুঝি, প্রেমিক পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া যে সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল সরল উক্তি করে, যা শুধু এক জনকে শোনাইবার জন্যই, এক জনকে উদ্দেশ্য করিয়া রচনা, যাহার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণিত হইয়া এক অমূল্য উদ্দেশ্য আবেগে চিত্তকে ক্রম করিতে চায়—যাহাকে একরূপ কবির আত্মজীবনী বলা চলে, কবির মানসিক জীবনের সহিত মিলাইয়া যাহার রসাস্বাদন করা যায়।

কিন্তু লোকধর্মের ভয়েই হোক, অথবা সহজাত সংস্কারের বশেই হোক, বৈষ্ণব কবিতা ঠিক এই পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদের অন্তরে প্রেম-অর্থাৎ তাঁহারা রাধা-কৃষ্ণের রূপের মধ্য দিয়া প্রণয়নীয় পাদপদ্মতলে নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই সর্বকালের সর্বযুগের মানুষ ইহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করে নাই।

বৈষ্ণব কবিতা যে শুধু মাত্র প্রেমের বা ভক্তির পূজারী ছিলেন তাহাই নহে, ইহারা অনেকাংশে প্রেমের মধ্য দিয়া প্রকৃতিরও পূজা করিয়া গিয়াছেন। মানুষের অন্তরের সহিত প্রকৃতির যে একটি নিগূঢ় যোগাযোগ আছে, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব কবিতা বৃক্ষাচ্ছিন্ন—বর্ষাব বিরহ-সজল পথ বাহিয়া প্রকৃতি যখনই ক্ষতবাক্ত বসন্তের মিলন-দ্বারা আসিয়া করাঘাত করিয়াছে, অভিলারিণী রাধিকার অভিসার সেই দিনই শেষ হইয়া মিলনের

উঠিয়াছে, চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার প্রেমে পৃথিবী প্রাণিত হইয়াছে, বিকশিত পুষ্পের সৌরভ-বিশ্বল ভ্রমের গুঞ্জে দিগন্ত মুখরিত হইয়াছে। মিলনের রঙে সমস্ত প্রকৃতি যখন রঙীন হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের গান বৈষ্ণব কবিতা শুধু সেই দিনই গাহিয়া উঠিয়াছেন :—

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি  
কুহর কোকিল বরিহা কেলি  
কপোত নাচত আপন রঙ্গে  
রাই নাচত শ্রাম সঙ্গে।

\* \* \*

মধুরা মধুরী, দু'ছ যুগ হেরি  
রঙ্গেতে নাচিছে তায়  
শুক শারী মেলি তরুড়ালে বসি  
রাধা-কৃষ্ণ গুণ গায়  
নবীন তান নবীন গান  
নব অলিকুল বেড়িয়া  
ভ্রমরা ভ্রমরী গুন-গুন করি  
আনন্দেতে পড়ে মাতিয়া  
নবীন যমুনা নবীন জল  
নবীন তরঙ্গ তায়  
নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ  
প্রেমানন্দে ভাসি যায়।

বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের মিলন-বিরহের স্রবটর সতিত তাল মিলাইয়া যাহারা গান গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃত পূজারী না বলিলে ভুল বলা হয়।

শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির মূল রংটিকে তাঁহারা ধরিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতির গুঠন নীল, হরিৎ চিত্রিত, তাহার অঞ্চল শ্রামল। তাই রাধিকা নীলবসনা, কৃষ্ণ শ্রাম ও পীতাম্বর। প্রকৃতির সহিত মিশিয়া রাধাকৃষ্ণ একাকার হইয়া গিয়াছেন। তাই শ্রামল-তমালের শাখাকে রাধিকা কৃষ্ণ বলিয়া ভ্রম করিয়াছে। প্রকৃতির সকল সৌন্দর্যের মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকার সৌন্দর্যকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষ ও প্রকৃতি, এই দুই সত্তাকে তাঁহারা এক বলিয়া ধরিয়াছেন। তাই কৃষ্ণ কখনো রাধা সাজে সাজিয়াছেন, রাধা কখনো কৃষ্ণরূপে। রাধাকৃষ্ণের এই যুগল-মিলনের মধ্য দিয়া মানুষ ও প্রকৃতির মিলন ঘটিয়াছে। এই মিলনের রূপ কীর্তন আত্মভোলা বৈষ্ণব কবিতা প্রেমের পূজা করিতে গিয়া আপনার অজ্ঞাতসারে কতরূপে যে প্রকৃতির পূজা করিয়া চলিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেম

সুলতা কর

পাহাড়ের চূড়ায় ঝাড়িয়ে স্বর্ধাস্তের শোভা দেখছিলাম।

আকাশের বৃক্ অন্তগামী সূর্যের রাজ্য আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পাহাড়ের তলায় সবুজ ধানের ক্ষেতের উপর ছড়িয়ে পড়েছে সেই আলোর আভা। এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একটি ছোট কালির বিন্দুর মত গাঢ় কালো মেঘের টুকরো আকাশের এক কোণে লাফিয়ে উঠল, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সেই মেঘের টুকরো

ংকে নিঃশেষে মুছিয়ে দিয়ে কালো মেঘের ভয়াবহ রূপ ঘনিষে উঠল সমস্ত আকাশ জুড়ে।

ঝড়ের আগের স্তব্ধতা জেগে উঠল পৃথিবীর বুকে। সব শব্দ থেমে গেছে, ছোট পাখীদের ডানার ক্ষীণতম শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। কি ভয়াবহ স্তব্ধতা! নিদারুণ আশঙ্কায় আমি যেন ঝেঁপে উঠলাম। মনে মনে প্রার্থনা কবতে লাগলাম—“হে ঝড়ের দেবতা, এস এস। ঝড়ের নিনাদে, বিদ্যুতের কশাঘাতে দিগ্-দিগন্তকে ভরিয়ে দিয়ে ভেঙ্গে পড় পৃথিবীর বুকে। ধ্বংসের প্রলয়ের ঝঞ্জা বয়ে যাক। এখনকার এই স্তব্ধতা, এই নিদারুণ আশঙ্কায় প্রতীক্ষা করে থাকার চেয়ে সে-ও সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার প্রার্থনায় কোন ফল হল না। ঝড়ের মেঘ আগের মতই নিশ্চল হয়ে আকাশ জুড়ে পৃথিবীর বুকে বিরাট বোকার মত হয়ে ঝাঁড়িয়ে রইল। কেবল থেকে-থেকে তার আরতন বেড়ে উঠতে লাগল।

ভয়াব্রু চোখে ঝড়ের মেঘের রূপ দেখেছি, এমন সময় চোখে পড়ল একমুঠো মল্লিকা ফুলের মত কি যেন ভেসে চলেছে কালো মেঘের পাশ দিয়ে। ভাল করে তাকিয়ে দেখি, একটি ধবধবে সাদা পাখী গ্রামের দিক থেকে উড়ে এসে গভীর জঙ্গলের দিকে চলেছে। ডানার ঝটপট শব্দ করতে করতে সোজা ঢুকে গেল ঝোড়ো মেঘের গাট কালিমার ভিতরে। তাব পর সেই মেঘের ঝাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আকাশের অপর প্রান্তে। দেখতে দেখতে তার কোমল দেহ মিশে গেল গভীর অরণ্যের মাঝখানে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। ঝড়ের মেঘ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে-ফুলে উঠছে। এমন সময় দেখি, আকাশের কোলে ঝোড়ো মেঘের পাশে আবার ভেসে উঠেছে ছ’টি সাদা পাখী। প্রথম পাখীটি ঝড়ের হাত থেকে বাঁচবার জ্ঞান বনেব ভিতর থেকে তাব সঙ্গিনীকে ডেকে নিয়ে এস। এবার ছ’জনে মিলে ফিরে চলেছে গ্রামের পাথে, তাদের নিজেদের আনন্দময় নীড়ে। আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে উড়ছে তারা। ওদেব ওড়ার শাস্ত গতি দেখে বুঝি যে ওদের মনে কোন আশঙ্কা নাই, কোন ব্যগ্রতা নাই। ঐতক্ষণ বাদে ঝড় গজ্জন কবে উঠল, ঝঞ্জা প্রবল বেগে বইতে আরম্ভ করল।

পাহাড়ের উপর থেকে অতি কষ্টে নামতে লাগলাম। চার দিক অন্ধকার, চোখে কিছুই দেখছি না। ঝড়ের গজ্জনে কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। তুমুল বেগে বর্ষণ নেমেছে, থেকে থেকে বাজ পড়ার শব্দে আতঙ্কে শিউরে উঠছি, থেকে থেকে বিদ্যুতের কশাঘাতে আকাশ বলসে উঠছে।

এই ঘোর দুর্ঘযোগের মধ্যে বাড়ীর পথ ধরে চলেছি অতি কষ্টে। গ্রামে পৌঁছলাম। শতধারে বৃষ্টির জল মুখের উপর পড়ছে। মুখ মুছতে গিয়ে উপরের দিকে তাকালাম। তাকাতেই দেখি, একটি বট গাছের ডালে খড়-কুটো দিয়ে বাঁধা নিজেদের উত্তপ্ত নীড়ে বসে বয়েছে ছ’টি পাখী। দেখেই চিনতে পারলাম।

একটি হল সেই সঙ্গীহারা পাখী—ঝড়ের রুদ্ধ আক্রোশকে অগ্রাহ্য করে বনের মাঝখানে থেকে যে তার সঙ্গিনীকে ডেকে এনেছে। আর একটি হল তারই সঙ্গিনী, সঙ্গীর আহ্বানে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে গান গাইতে গাইতে যে উড়ে এসেছে নিজেদের নিভৃত নীড়ে।

চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। কী স্থখী ওরা! পরস্পরের উচ্চ দায়িত্ব পাচ্ছে। এক জনের ডানা আর এক জনের বুকে এসে

পড়েছে। প্রেমে ছ’টি প্রাণ এক হয়ে গেছে। ওদের দিকে চেয়ে ভাবছি—প্রেম এ জগতে কত সুখ, কত শান্তি বহন করে আনে। প্রেম মৃত্যুকে কি ভাবে তুচ্ছ করে।

আমার বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ জীবন আজ ওই ছ’টি পাখীর স্থখী-জীবনকে দেখে কত তৃপ্তি পাচ্ছে। বুঝছি, প্রেমই মানুষ থেকে জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ সবাইকে স্থখী করে নীড় বাঁধাব প্রবৃত্তি দেয়। জীবনের রুদ্ধ মরুভূমিতে আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়।

## আমাদের কর্তব্য

হাসিরাশি দেবী

ক’লকাতা-সহরের বস্তিবাসিনীদের নিয়ে অনেক বার মাথা ঘামানো হয়েছে; কিন্তু এই ক’লকাতারই এমন কতকগুলি গৃহস্থ ঘর-সংসার, অর্থাৎ বাদের পৈতৃক ভিটেই মাত্র আছে এই সহরে, কিন্তু আর কিছু নেই,—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কায়িক ক্রেশে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান ক’রতে হয় এবং সংসারী হ’য়ে গুটি কয়েক পুত্র-কন্যারও সকল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয় বিনা অপত্তিতে, এ রকম নাগরিকের সংখ্যা এ নগরে নেহাৎ কম নয়।

আজকের দিনে নান্না সম্বর্ধের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী যে রকম শোচনীয় ভাবে আর্থিক দুর্ববস্থার সামনাসামনি এসে পৌঁড়িয়েছে, এ রকম দুর্ববস্থায় আর কোনও দেশ—সেই দেশেরই অধিবাসী পৌঁড়িয়েছে কি না, জানা নাই; আর, জানা থাকলেও—বক্তব্য সে বিষয় নিয়ে নয়, ব’লছি আমাদেরই সম্বন্ধে, আমাদেরই ঘর এবং সংসার নিয়ে।

উপরে বাদের কথা ব’লেছি, সেই সব সংসারের মেয়েদের অধিকাংশকেই আগেকার দিনে, অর্থাৎ ১৯১২-০ বছর আগে সংসারের সংরক্ষণশীলতা এবং পারিবারিক কৌলৌণ্য ও আচার-নিষ্ঠার দোহাই দিয়ে রাখা হতো নিরক্ষর ক’রে। এতে সংসারে মায়ের হাতের কাজে সাহায্যও করা চলতো, এবং সময়ে-অসময়ে ছোট-ছোট ভাই-বোনদের তদারক-তাগাদা করারও কোনও অসুবিধা থাকতো না। কিন্তু আজকাল তার মধ্যে একটু অদল-বদল হ’য়েছে। যদিও সে অদল-বদল সামান্যই, অর্থাৎ আর সব দিকে আগেকার মত আইন-কাহুন বলবৎ থাকলেও এখন বিনা বেতনের স্কুলে ভর্তি ক’রে দেওয়া হয় কয়েকটা বৎসরের জ্ঞান। অন্ততঃ অক্ষর পরিচয় হ’তে যতটুকু সময় এবং দায়িত্ব সেটুকু শেষ হ’লেই মেয়ের বয়স সম্বন্ধে সচেতন হ’য়ে ওঠেন পিতামাতা। বিবাহের চেষ্টায় স্কুল ছাড়িয়ে এনেও ব্যবস্থা দেন ঘর-সংসারের কাজ শিখবার এবং হাঁড়ি-পেঁসেল ধরবার।

অবশ্য এ ব্যবস্থা অজ্ঞান নয়, অশোভনও নয় আমাদের জীবনে, কারণ, এর পরেই আমাদের জ্ঞান যে সংগ্রাম-ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে, সেখানে দায়িত্ব এবং দায়িত্বের মুখোমুখি পৌঁড়িয়ে বাঁচতে হ’লে অভাবের সংসারে এই রকম শিক্ষা পাওয়ার উপকারিতা আছে, এবং এই সব সংসার, সমাজ ও দেশের আংশিক দায়িত্ব চিরকাল ধরে মেয়েরা বহন করেছেন, আজও করছেন, এবং পাবেও হয়তো করবেন। কিন্তু বলবার কথা, শুধু কি দায়িত্ব বহনের এই একই পথ ছাড়া আর পরিবর্তন হবে না?

এখনকার দিনের মেয়েরা এই ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে শেখে সেলাই, বোনা বা গান

নাচ—টিক যেটুকুর দ্বারা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণই করা চলে কেবল,। অর্থকরী হিসাবে ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ কোনও কাজ দেয় না এ সব। বোগীর সেবা-শুশ্রূষার কিছুও তারা জানে না।

কিন্তু আমাদের প্রতি গবেষণা এবং আগের দরকার হয় সেবা-শুশ্রূষা, রান্না এবং শিশুপালন। এগুলোর জ্ঞান কোনও স্কুল থেকে হাতে-কলমে অর্থাৎ উদ্দেশ্যমূলক ও কার্যকরীরূপে কোথাও শিক্ষা পেতে দেখিনি মেয়েদের। বইয়ের পৃষ্ঠায় যা লেখা থাকে, সেই অল্পযায়ী এক-আধ দিন শিক্ষয়িত্রীরা বন্ধনেন যে পরীক্ষা নেন, তাও সংক্ষিপ্ত। শুশ্রূষা এবং সেবা সম্বন্ধে কেবল আমাদের জাতিই নয়—দেশও নির্দিকার। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিও যেন তাই ও-সব সংশ্রব এড়িয়ে চলেছেন সন্তপণে। কাজেই-সেবার যে আনন্দ আছে, সে কথা আমরা ভুলে গেছি।

আনন্দ বলতে আমরা এখন যেটুকু বুঝি, সেটুকু জলসা, থিয়েটার এবং সিনেমার মধ্যে হয়েছে সীমাবদ্ধ। অবসর সময়ে—হাঙ্গা সুর ও কথার সমষ্টি, প্রেমের গান, নাচ-গানে-ভরা ছায়া-ছবি, এবং গায়কদের মুখে-মুখে অতি আধুনিক গান শুনে আমরা যে আনন্দ অনুভব করে থাকি, সে আনন্দ ক্ষণিকের হলেও মনে-প্রাণে সেই দিকেই যে আকর্ষণ অনুভব করি, তাই জ্ঞান দায়ী আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়। আজকের যে কুচিরোধ আমাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টির দিকে নিয়ে যেতে চায় না, সে কচি-বিকৃতির মূলেও আছে এই সময়ের স্বল্পতা। ভাববাব যে সময়ের দরকার, এবং চারি দিক থেকে ছড়ান মনটাকে গুটিয়ে এনে যে সাধনায় নিয়োগ করলে সিদ্ধি আসে, সে সাধনা কবাব সময় আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে অর্থনৈতিক সমস্যা।

দৈনিক আমরা কত জন পেট ভরে খেতে পাই, কত জন অধ্বাভাবে এবং কত জন নামমাত্র খেয়ে সময় কাটাই, তার মোটামুটি হিসাব সংগ্রহ করলেই দেখা যাবে যে, তাদের কাছে সংস্কৃতিকে বাঁচাবাব, কৃষ্টিকে বক্ষা কবাব এবং স্রষ্টা দান করবার আশা রাখা সম্ভব কি না।

তবু উচ্চশিক্ষিত বলতে যাদের বুঝি, এই সব হতভাগাদের তুলনায় তাদের ভাগ্যে নিশ্চয় কিছু দেবতার আশীর্বাদ থাকে, তাই শিক্ষার প্রাবল্য থেকেই সংসারের সঙ্গে লড়াই করবার জ্ঞান তাঁদের কোমল বাঁধতে হয় না ; কলে উন্নতিশীল মনোর ও অপমৃত্যু ঘটে না অসময়ে। একমাত্র তাঁদের কাছেই দেশ এবং দশ যতটুকু আশা করতে পারে—ঘটনা-বিপদে এবং নানা বিভ্রাটে তা-ও সফল হবার আশা নাই।

এই অবস্থায় কেবল এই ক'লকাতা মহানগরীর নাগরিকগণই নয়, বাংলার এই সাধারণ মানুষের বিরাট সমাজকে আধুনিক যুগ ঠেলতে ঠেলতে বেদিকে নিয়ে চলেছে, সেদিকের শেষে যে কি অপেক্ষা করছে তাদের জন্তে, সে কথা ভাবতে গেলে ভয় হয়,—আশা হয় না।

## আটম বোমার দেশে

( পূর্বানুস্মৃতি )

অমিতা দত্ত-মজুমদার

পূর্বের দিন ২৭শে ডিসেম্বর কারো কোনো কাজের বরাদ্দ ছিল না। অধিবেশন আরম্ভ ২৮শে থেকে। কাজেই কথা হোলো সেদিন আমরা রেড, ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে বেড়াতে যাব।

যখন প্রথম সাদা মানুষ এ দেশে আসে তখন সমস্ত দেশ রেড ইণ্ডিয়ানদেরই ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে এরা ক্রমে পূর্বাঞ্চলের এবং দক্ষিণাঞ্চলের উর্বর সমভূমি পরিত্যাগ করে মধ্য-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে এসেছে। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লোকসংখ্যা হওয়ার দরুণ এদের সংখ্যা খুবই কমে যায়। তার পর আবার কতকংশ খেত জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণে নতুন সঙ্কর জাতি অন্তর্গত হয়ে পড়ে। বাকি যারা ছিল তারা দিন-দিন চীনবীজ হয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে। এদের জমিজমা সবই ঔপনিবেশিকরা ক্রমশঃ অধিকার করে নিচ্ছিল ; সেটা নিবারণ করা হয়েছে আইন করে কতকগুলো গ্রাম সংরক্ষণ করে। এই সব সংরক্ষিত গ্রামের জমি খেতজাতীয়রা কিনতে পাবে না আইনতঃ। এখানে তাই অবিমিশ্র আদিবাসীর জীবনযাত্রা-প্রণালী ও সমাজ-ব্যবস্থার রূপ এখনো বজায় আছে। নৃতত্ত্বের তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যবিচারের পক্ষে এ স্থান বিশেষ অমূল্য। আমাদের দেশের নৃতত্ত্ববিদদের তাই এতে উৎসাহ।

ভোবেই সারা দিনের মত তৈরি হয়ে বেবোলাম। সকালে বাইরে এসে দেখলাম যে, যদিও বেশ উজ্জল রৌদ্র উঠছে তবু শীতের প্রাণবর্তা কম নয়। বাত্মিতে বরফ পড়েছিল। যেখানে যেখানে বাড়ীর বা গাছের ছায়ার জ্ঞান রোদ লাগছে না, সে সব জায়গাতে তখনো গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ জমেই রয়েছে। দুই কারণে এ অঞ্চলে বৌদ্ধতাপ বেশী। প্রথমত, ওয়াশিংটন বা শিকাগো থেকে এই জায়গাটা অনেকটা দক্ষিণে। দ্বিতীয়ত, এখানকার বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের অংশ কম, তাই সূর্যরশ্মি ব্যাহত হয় কম, কাজেই তাপ দেয় বেশী। বাত্মিতে living roomএ central heating-এর উপরেও অগ্নিকুণ্ডের আগুন বেশ আবামদায়ক বোধ হচ্ছিল ; কিন্তু আজ দুপুর বেলায় গায়ে ওভারকোট বাগা যাচ্ছিল না। ভোবের রোদটা অবশ্য বেশ মধুর লাগল।

দিনের আলোয় এই প্রথম এ দেশের ঘর-বাড়ীগুলো দেখলাম—বেশ লক্ষ্য করার মত এদের গড়ন। প্রশস্ত ক্যাম্পাসটি বেশ সাজানো-গোছানো। বড় বড় চৌকো ব্লক রেখে চওড়া-চওড়া রাস্তা ক্যাম্পাসে অনেকগুলো রয়েছে। প্রত্যেক ব্লকেই বেশ ব্যবধান রেখে রেখে কয়েকটা করে বাড়ী। বাড়ীগুলির গঠন ভিন্ন ভিন্ন ও অভিনব। সাদা মানুষের সভ্যতা এসে পৌঁছবার আগেই আদি-অধিবাসীরা রোদে শুকানো কাঁচা ইট বাড়ী তৈরীর কাজে ব্যবহার করত। এই ইটকে “আদোবে” বলে। বাড়ী এ অঞ্চলে অনেক আছে। এ সব বাড়ীতে চূণ-বালির পরিবর্তে কাঁদা দিবে আস্তর দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান স্থাপত্যের পরে মেক্সিকান গঠনের বাড়ীগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মাটির পাঁচাল-ঘেরা উঠানে নীচু দোতলা বাড়ী। উঠান থেকে মাটির সিঁড়ি উঠে গেলে দোতলার বারান্দা অবধি। ঘরের সামনে বারান্দা, উপরে নীচেও। স্বকৃষ্ণকে পরিষ্কার উঠানে গোটা কতক ফুলগাছ। এই সব ছোট ছোট বাড়ীগুলি অধ্যাপকদের বাসা। এ ছাড়া এ ক্যাম্পাসে আছে বহু আধুনিক কংক্রিটের বাড়ী, তবে সেগুলি বেশী উঁচু নয়। বহু সামরিক অস্থায়ী ঘর আছে—যুদ্ধে সময়কার কার্টের বাড়ী। অতিরিক্ত ছাত্রবাস হিসাবে এগুলো ব্যবহার হয় ; এগুলোতেও central heating প্রভৃতি সুব্যবস্থা

আছে। ভোবের কনকনে ঠাণ্ডা অথচ শুকনো হাওয়ায় এই সব লক্ষ্য করতে করতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনাগারে পৌছলাম। যাত্রা থেকে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানে। ক্যাফিটেরিয়া প্রকৃতিতে খাবার দেওয়া হোলো, পরিবেশন করে নয়। লেখা গলি দিকে ঢুকে এক কাউন্টারে পয়সা দিয়ে এগোতে লাগলাম। চলতে চলতে আহার্য্য সব মিলল পথের পাশে-পাশে—প্রথমে ট্রে, ছাপকিন্ ও কাঁটা-চামচ দিয়ে আরম্ভ। সাধারণ ক্যাফিটেরিয়ার চেয়ে এখানে খবচ অনেক কম অথচ খাদ্য প্রচুর। পেট ভরে থেয়ে আমরা সেখান থেকে বেরোলাম।

নর্থ-ওয়েষ্টার্নের এক অধ্যাপকের গাড়ীতে আমরা গ্রামে চললাম। গাড়ীতে আমরা ছ'জন ছিলাম। আমি ছাড়া সকলেই নর্থ-ওয়েষ্টার্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই দলটির আরেকটি বিশেষত্ব ছিল—পৃথিবীর নানান দেশের লোক ছুটেছিলাম আমরা এই গাড়ীতে। গাড়ীর মালিক ডাঃ ব্যাক্সম্ আমেরিকান; হু'টি ছাত্রীর মধ্যে এক জন এসেছেন কিউবা থেকে, এক জন তুবস্ব থেকে। ছাত্র ছিলেন একটি, তাঁর দেশ দক্ষিণ-আমেরিকার চিলিতে। আর আমরা ছ'জন ভাবতীয়। বেশ একটি আন্তর্জাতিক পরিবহন।

কাছাকাছি যে গ্রামটিতে আমরা যাব বলে ঠিক করেছিলাম সেটা চল্লিশ মাইল দূরে। তার নাম "সান্তে ফেলিপে" বা সেন্ট ফিলিপ। নামটি স্পেনীয়; তার কারণ, ইংরেজরা এদিকে উপনিবেশ স্থাপন করার আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনীয়রা এ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাদের ভাষা ও তাদের ধর্ম দুই-ই এখানে প্রচলিত হয়। বোমান ক্যাথলিক সম্ভব নাম গ্রামের নাম বাখা তারই উদাহরণ। রেড্ ইণ্ডিয়ানরা অস্কাগা প্রাচীন উপজাতির (tribal people) মত ভূত-প্রেত, গাছ-পাখি প্রভৃতির পূজা করতো—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় animism. বৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পরেও এরা এদের প্রাচীন উৎসব-অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করেনি। Reservation এ ঢোকবার পথে গ্রামের নাম লেখা সাইনবোর্ড দেখলাম। কাছেই আরেকটা সাইনবোর্ড, দেখা গেল—"মাদক দ্রব্য আনা নিষিদ্ধ"। এর মদ খেতে অভ্যস্ত নয়, কাজেই মাদক দ্রব্যে এরা সহজে বশীভূত হয়। লোভী ব্যবসায়ীদের তাই লোভ হয় এদের মধ্যে মত্ত বিক্রয় করে লাভবান হবার। অনেক কুটচক্রী এদের নেশায় বশীভূত করে জমি-জমা পর্য্যন্ত লিখিয়ে নিয়েছে। তাই সরকার থেকেই জাবী করে দেওয়া হয়েছে এদের গ্রামে মদ প্রবেশ নিষেধ। গ্রামের বসতি-স্থলকে ঘিরে বিস্তৃত জমি-জমা রয়েছে, সেখানে চাষাবাস ও ঘোড়া চবাবার ব্যবস্থা। সে-সব অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী ভিতরে গিয়ে থামলো একটি আদোরের তৈরী গির্জার সামনে। আমরা নেমে তার প্রাঙ্গণে ঢুকলাম। আমাদের দেখে ছ'জন লোক এগিয়ে এল; এক জন বৃদ্ধ, অপর জন মধ্যবয়সী। শেখোস্ত জন ইংরাজী বলতে পারে, সেই কথাবার্তা বলল। জানা গেল, বৃদ্ধটি গির্জার রক্ষক। জন-প্রতি ৫০ সেন্ট করে দক্ষিণা দিলে আমাদের গির্জায় ঢুকে দেখবার অধুমতি দেবে। আমরা হাতে সম্মত হলাম। ভিতরটা স্পেনীয় ধরণে সাজানো, তবে খুবই সাদাসিধে সাধারণ। বাড়ীটি মজবুতও নয়। বিশেষতঃ গায়ক দল যে গ্যালারীতে বসে, সেখানে ওঠবার সিঁড়িটি তো একবারে নড়বড়ে; আমরা তাই বেয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠলাম।

মন্দিরের ছাদের দুই কোণে দু'টি চূড়া আছে, সেখানে দু'টি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো; তার একটি এখনো ব্যবহৃত হয়, অপরটি ফেটে গেছে, আর বাজানো হয় না। কিন্তু সেটা রূপাব তৈরী, মূল্যবান জিনিস, তাই ওটি এখনো ঝোলানোই আছে। উপর থেকে চারি দিক ভালো করে দেখে আমরা নেমে এলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি বড় তোরণ ছিল, তাতে লেখা—"ফোটা তোলা নিষেধ"। আমাদের মধ্যে এক জনের ফোটা তোলায় সন্দেহ ছিল, তাঁর ক্যামেরাটি হাতেই ছিল। তিনি ওদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ফোটা তোলায় প্রস্তাব করলেন। বিনা আপত্তিতে ওরা রাজি হলো। সেই গেটের সামনেই ওরা দাঁড়ালো ওদের রচণ্ডে কঞ্চল শুছিয়ে নিয়ে; তাদের মাথাব পিছনেই লেখা—ফোটা তোলা নিষেধ। আমরা দু'এক জন তাই নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম কিন্তু ওরা তখন ছবিতে চেহারা উঠবে এই আনন্দেই বিভোর। ছবি ছাপা হলে ওদের পাঠাতে হবে, নাম-ঠিকানা সব নিতে হোলো।

এর পূর্ব আমরা গাড়ী কবে আরেকটা গ্রামে গেলাম, তার নাম সান্তে ডোমিন্গো, ইংরাজীতে বলা যেতে পারে সেন্ট ডোমিন্গো। এ গ্রাম ঢুকে এক জায়গায় plaza লেখা দেখে গাড়ী থামানো হোলো; সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল এক অপূর্ব দৃশ্য। মস্ত বড় বকরকে পরিষ্কার উঠানে রচণ্ডে অদ্ভুত পোষাক পবে, মাথায় ও হাতে গাছের পাতা-ফুল-ইত্যাদি নিয়ে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ও শিশু নামছে। আমরা গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। শুনলাম, আজ ওদের শস্য-উৎসব; হয়তো আমাদের মবান্ন ধবনের কিছু। কিছুক্ষণ একমনে নাচ দেখার পূর্ব ক্রমে চারি দিক লক্ষ্য করলাম। রেড্ ইণ্ডিয়ান গ্রামের গঠনটি বেশ। মাঝখানে বড় একটি চহর, তাকে ঘিরে চারি পাশে সাবি সাবি বাড়ী—সব ঐ কাঁচা ইটের। গ্রাম যত বড়, মানুষের চহরটিও ততই বড় হবে। ঐ চহরের এক পাশে একটি গোলাকার বাড়ী, তার কোনো জানলা-দরজা নেই, কেবল একটি সিঁড়ি উঠেছে ছাদ অবধি, ছাদে উঠে নীচে নেমে ভিতরে ঢুকতে হয়। এটাকে এরা Kiva বলে। একে পুরুষদের সভাগৃহ বলা যেতে পারে,—মেয়েদের এখানে প্রবেশাধিকার নেই। বেড্ ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি আছে, যথা—, পুরেব্রো, হোপি, নাভাহো, ইত্যাদি। এই অঞ্চলের বাসিন্দারাও নাভাহো জাতীয়। এই সব বিভিন্ন জাতি-গুলির মধ্যে আচার-ব্যবহার ও ভাবাব পার্থক্য আছে। Kivaর পাশে এক দল লোক জড়ো হয়ে ঢাকের তালে তালে একটানা সুরে গান গেয়ে চলেছে; তাদের সামনে সমস্ত প্রাঙ্গণটি জুড়ে নাচের দল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ছোট ছোট শিশুরা অবধি সবাই নাচে বোগ দিয়েছে। এদের মেয়ে পুরুষের পোষাক এক রকমের—গোড়ালীর উপর পধ্যস্ত ঢিলে পাজামা, তার উপর এক জামা, হাঁটু অবধি তার ঝুল। আজ উৎসবের দিনে সবাই ভালো পরিষ্কার পোষাক পরেছে; তা ছাড়া পরেছে নানা রঙের পুঁতির, কড়ির ও হাড়ের মালা অনেকগুলো করে। মাথায় বড় বড় পাতা গোঁজা, হাতেও বড় বড় ঝাড়িয়ে ডাল। পুরুষদের শরীরের উল্কাংশ অনাবৃত, তাতে খয়েরেব বসের মত কি এক রকম রসের প্রসঙ্গ দিয়ে চিত্র-বিত্রিত করা হয়েছে। তার উপর পৈতার মত কবে পরেছে অসংখ্য কড়ির



ও হাড়ের মালা। কোমরে পাঞ্জামার উপর সুন্দর মত করে পরেছে এক গুণ রঙিন কাপড় হাঁটু অবধি। তার উপরে জমকালো কোমর-বন্ধ। পুরুষদের নাচ অতি-তাণ্ডব। নাচের তালে তালে তারা প্রাণপণে লাফাচ্ছে এবং লক্ষের সঙ্গে সঙ্গে কড়ির মালা বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। মেয়েবা নাচছে ধীরে ধীরে, তালে তালে পা ফেলে। শিশুদের মধ্যে যারা খুব ছোট তারা শুধুই চলে বেড়াচ্ছে। নাচের তাল খুবই সরল, কাজেই একঘেয়ে। এই নাচ দীর্ঘকাল চলতে থাকল। আমি এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। দেখলাম, দু'পাশের বাড়ীগুলির রোয়াকে ও ছাদে অনেক লোক বসে নাচ দেখছে, তাদের কারো কারো পরনে আধুনিক পাশ্চাত্য পোষাক। তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত কম বয়সের তারা ভাঙ ভাঙ ইংরাজী বলতে পারে; প্রাচীনোব নিজেদের ভাষা ছাড়া স্পেনীয় ভাষা বলতে জানে। নাচের একটি বিরতির সময়ে একটি যুবক এসে আমাদের “সেলাম আলায়কুম” বলে অভিবাদন করল। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অভিবাদন কোথায় শিখেছে সে। বলল যে, যুদ্ধে বোগ দিয়ে সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতে গিয়েছিল, সেখানে শিখেছে। আমাদের অহুরোধে সে গ্রামের বৃদ্ধ মোড়লের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল; সে বৃদ্ধ কিন্তু আমাদের ইণ্ডিয়ান বলে মানতে মোটেই রাজি নয়। বলল, “ইণ্ডিয়ান যদি তো মুখে দাঁড়ি-গোঁফের চিহ্ন কেন?” রেড, ইণ্ডিয়ান পুরুষদের মুখ মেয়েদের মতই মশ্ফ হয়; দাঁড়ি-গোঁফের চিহ্ন থাকে না। যাক্, আবার নাচ শুরু হোলো। আমরা কিন্তু তখন সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বেলা তখন দু'টো। জুঠরে অগ্নিদেবের দহনলীলা আরম্ভ হয়েছে; অখচ লোকালয় থেকে আমরা বহু দূরে। এ দেশে লোকালয়ে বা তার আশে-পাশে কখনো ক্ষুধার্ত থাকতে হয় না; দু'চার পা পরে পরেই আর কিছু না হোক Drug Store আছে, আর সেখানে মোটামুটি রকম খাওয়া যায়। কিন্তু এখানে এই জনহীন প্রান্তরে দোকান কোথায়? এদিক-ওদিক করে মাইল কতক যাবার পরে একটা গ্রামের দোকান দেখা গেল; আমরা সেখানে নামলাম। সামান্য কিছু খাওয়া ও পানীয় সেখানে মিলল,— বিস্কুট, ভূট্টার খই, আর বোতলে-করা কমলা লেবুর সরবৎ। তাই খেয়ে ক্ষুধাটা চাপা দেওয়া গেল। তখন বেলা পড়ে এসেছে। তার পর যখন আমরা নানা ছোট-ছোট পাহাড়ের আশ-পাশ দিয়ে অঁকা-বঁকা পথ ধরে অনেক মাইল গিয়ে সহরে পৌঁছলাম তখন শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

এর পর দু'দিন ধরে নৃতাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশন। অধিবেশনে বহু খ্যাতনামা নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের দেখলাম ও তাঁদের বক্তৃতা শুনলাম। কারো কারো সঙ্গে মাক্‌স্‌ পরিচয়েরও সুযোগ ঘটলো। বক্তৃতার অনেকগুলোই ছিল বৈজ্ঞানিক ধরনের, আবার অনেকগুলি বেশ সাধারণের বোধগম্য হয়েছিল। ভারতীয় অধ্যাপকের বক্তৃতার বিষয় ছিল ভারতের সমাজতাত্ত্বিক ক্রম-পরিবর্তন সম্বন্ধে। সেটা ভালই বুঝলাম। অধিবেশনের প্রথম দিনে আমরা সারা দিনই সভাতে রইলাম। কিন্তু অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে আবার আমরা গ্রামে বেড়াতে গেলাম আরেক দম্পতীর আমন্ত্রণে তাঁদের গাড়ীতে। এঁরা স্বামিন্দ্রী হ'জনেই নৃতত্ত্বের

ছাত্র, খুব অল্পবয়সী; কিন্তু খুব গভীর প্রকৃতির। সারাক্ষণই এঁরা কোনো না কোনো গভীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তুরস্কের মেয়েটি ও চিলির ছেলেটি আজও আমাদের সঙ্গেই ছিল; তাদের কাছে তাদের দেশের গল্প অনেক শুনলাম।

চিলির অধিবাসীরা স্পেনীয় বংশ-সম্মত ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। তারা অ্যামেরিকানদের মত জীবনটাকে অত লম্বা ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয়। ওদের ছেলেমেয়েদের মেলামেশাও এত অবাধ নয়, কাজেই আমাদের মত ওরাও অ্যামেরিকানদের চপল মেলামেশাটা উচ্ছৃঙ্খলতার পধ্যায়ের ফলে। তাদের দেশে ছেলে-মেয়েবা একসঙ্গে পড়ে, খেলাধুলো কবে, বেড়ায়, কিন্তু তার মধ্যে সব সময়েই এক জায়গার দাঁড়ি টানা থাকে। ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা বিবাহের বন্ধনও তাদের কাছে দৃঢ়তর। দক্ষিণ-আফ্রিকার কোন দেশেই যুক্তরাষ্ট্রের মত অতি আধুনিকতার ঢেউ লাগেনি। ব্রাজিলে না কি এখনো বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়েরা অভিবাবকহীন হয়ে বেড়াতে পারে না; ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশাও নিষিদ্ধ।

এবার একটু ভুবন্বের গল্প কবি। কামাল পাশার সমাজ-সংস্কারের ঢেউ পৌঁছায়নি এমন প্রত্যন্ত প্রদেশও এখনো কিছু-কিছু আছে শুনলাম। সে-সব অঞ্চলে মেয়েরা এখনো সালোয়ার-কামিজ-ওড়না ব্যবহার করে, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য-পোষাক-পরা সহরেব মেয়েদের যে নামে তারা অভিহিত করে তার অর্থ “বিশেষী”। আমার বিমানযাত্রার পথে ইস্তাম্বুলের হাওয়াই বন্দরে ঘণ্টা খানেক কাটিয়েছিলাম সে কথা আগে উল্লেখ করেছি। বাসে করে সহরের ভিতরকার রেষ্টোরাঁয় গিয়ে প্রাতরাশ খেয়েছিলাম। তখন সবে মাত্র প্রভাত হচ্ছে, পথে জন-মানব দেখিনি। জনশৃঙ্খ পথের দৃশ্য ভালই লেগেছিল। আর যে দু'চারটি লোক দেখেছিলাম তাদের নজর করেই দেখেছিলাম। দেহের বর্ণ ও পোষাক তাদের “সাদা” মানুষের মতই; প্রভেদ ছিল চুলের ও চোখের রঙে। এ দেশের যৌবন উগ্র, শক্তিমত্তে চপল; প্রাচ্যের যৌবন কান্তিময় স্নিগ্ধ। এ দেশের বার্কিক্য আবার সাধারণতই মলিন ও দীন হয়; প্রাচ্যের বার্কিক্যের সৌম্য-গভীর ভাব তাতে বড় থাকে না। প্রোচা নারী আমাদের দেশে মাতৃত্বের মহিমায় মগ্নিত; এ দেশে যৌবনকে ধরে রাখার চপল প্রচেষ্টায় প্রোচত্বের গাভীর হই ক্ষুণ্ণ। অবশ্য মাতৃভাবময়ী নারীও এ দেশে দেখেছি, কিন্তু তাঁরা প্রোচত্বের সীমা ছাড়িয়ে বার্কিক্যে পৌঁছে গেছেন। যাক্, দু'-তিন দিন এই দু'টি তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে ও তাদের দেখে তাদের দেশ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি একটি ধারণা করে নিলাম।

আমরা যেদিন অ্যালবুকার্কিতে পৌঁছেছিলাম সেদিন বড় সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল; আকাশ ছিল নীল, রাত্রিতে জ্যোৎস্না-ধোঁত প্রায় ৫০০০ ফুট উঁচুতে এই সহর অবস্থিত, স্তম্ভরা ঠাণ্ডাও কম ছিল না। কিন্তু সে ছিল শুকনো বরষার ঠাণ্ডা। বরফ পড়তো কিন্তু সে বরফ কেমন সাদা বাবির মত জমে থাকত ছায়া-শীতল স্থানে, সে কথার উল্লেখ আগে করেছি। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর সমতল নয়, ঢেঁউ-খেলানো। মাঝে মাঝে Maces বলে এক রকম পাহাড় আছে। বিস্ত, ধূসর এর রং, আর লম্বা প্রাচীরের মত এর গড়ন—উপরিভাগ সমান, বেন কোনো দৈত্য ঠেছে ফেলে দিয়েছে। Rio Graude বলে একটা

বড় নদী এই অঞ্চলে প্রবাহিত ; সে-ও এই Maces এর কাঁকে  
কাঁকে বয়ে গেছে ।

অধিবেশনের তৃতীয় দিনে আমাদের আরেকটা নূতন জায়গা  
দেখার সুযোগ ঘটেছিল । আলবুকার্কি থেকে ৬০ মাইল দূরে  
“সান্তা ফে” বলে একটি সহর আছে ; এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সহর  
এটি । পাহাড়ের উপরে এই সহর, উচ্চতা ৮০০০ ফুট । স্থানীয়  
এক সম্ভ্রান্ত মহিলা অধিবেশনে সমাগত সকলকে দুপুরের আহারের  
নিমন্ত্রণ করেছিলেন সেদিন । আহারের সময় ছিল বেলা ১টা ।  
প্রাতরাশের পরে আমরা গতকালের সেই অল্পবয়স্ক দম্পতীর—তাদের  
নাম Thurston—গাড়ীতে বড়না হলাম । সন্দের মন্থণ রাস্তা,  
যেন তেল-ঢালা ; অসমতল হওয়া সত্ত্বেও গাড়ীতে এতটুকু ঝাঁকুনি  
লাগে না । দিনটা ছিল একটু মেঘলা ধরণের । পথে এক  
জায়গায় নেমে আমরা চারি দিকের দৃশ্য উপভোগ করলাম—সেই  
সঙ্গে বেশ খানিকটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়াও । একটা বড় পাথরের  
সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের একটি গুপ-ফোটো তোলা হোলো ।  
সান্তা ফে-তে আমরা পৌঁছলাম বেলা ১১টায় ; তখন  
টিপ-টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । আমাদের হাতে দু’ঘণ্টা সময়  
রয়েছে তাই আমরা সহরটি ঘুরে দেখতে গেলাম । আমেরিকার  
সব চেয়ে পুরানো গীর্জা এট সহরে আছে । একটি নিম্নজন্ম জায়গায়  
এক টিলার উপরে প্রকাণ্ড এক আদোবের তৈরী গীর্জা দেখলাম ;  
সেটি না কি সব চেয়ে বড় আদোবের দালান । আমেরিকার সব  
চেয়ে পুরানো বাড়ী না কি এই সহরেরই এক পল্লীতে ;  
খুঁজে খুঁজে সেটিকেও বের করা হোলো । তার পর নিমন্ত্রণ রক্ষা  
করতে এখানকার সব চেয়ে বড় হোটেলে গেলাম । নাম তার লা-  
ফন্ডা ( La Fonda ) ; ভিতরে সব স্প্যানিশ ধরণে সাজানো—  
খাবার টেবিল পর্য্যন্ত । খাবার-ঘরের এক কোণে উঁচু মঞ্চের  
উপর বাদক দল বস্তু নিয়ে বসেছিল । খাওয়া আরম্ভ হতে তাদের  
বাজনা আরম্ভ হোলো—মাঝে মাঝে গানও হতে লাগল । কালো  
চুল-চোখওয়ালা মেয়েরা আঙুল-লব্ধিত বিস্তৃত-ঘের-ওয়ালা পোষাক  
পরে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করতে লাগল । বেশ লাগছিল, মনে  
হচ্ছিল এ যেন আরেক রাজ্য ।

খাওয়ার পরে আমরা সেখানকার মিউজিয়াম দেখতে গেলাম ।  
প্রধানতঃ এই অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত নানা রকম জিনিস  
এখানে রয়েছে । সন্ধ্যার সময়ে ফেরবার জন্তু বড়না হলাম ।  
বেরিয়েই দেখা গেল বরফ পড়া শুরু হয়েছে । বরফের ধারার মধ্যে  
দিয়ে সামনের পথ দেখা যায় না ; গাড়ীর চালকদের খুব বেগ  
পেতে হোলো । থাসটন-দম্পতী পালা করে গাড়ী চালাচ্ছিলেন ।  
যাবার সময়ে যে পথ আমরা এক ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিলাম,  
ফেরবার সময়ে সেখানে আড়াই ঘণ্টা লাগলো ।

পরদিন সকালে উঠে দেখি Nex Mexico University  
Compus বরফে সাদা হয়ে গেছে । সেদিন সকাল ১০টার  
আমাদের শিকাগো ফেরবার ট্রেন । তাই ভোবেই বাস্তু গুহিয়ে  
নিয়ে প্রাতরাশ খেতে বেরোলাম । জুতো-মোজার উপবে গলোশ  
পরা ছিল,—ঝুরো বরফের মধ্যে পায়ে পাতা সবটা এবং হাঁটুর  
মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল । খুব আমোদ হচ্ছিল হাঁটতে ।  
খাবার-ঘরে সকলের কাছ থেকে বিনায় নিয়ে টেলিফোনে টান্ধী  
ডেকে আমরা ষ্টেশনে এলাম—আগাগোড়া সবই বরফে ঢাকা ।  
দক্ষিণ-পশ্চিমে যাবার সময়ে আমরা যে পথে গিয়েছিলাম, এবার  
অন্ত পথে ফিরছি । Texas, Oklahoma, Kansas,  
Missouric এই ক’টা রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে আসতে হোলো ।  
Texas এর cowboyদের দুঃসাহসিক ও বোমাঞ্চকর গল্প পড়ে-  
ছিলাম । আমাদের সৌভাগ্যক্রমে দু’জন কাউবয় আমাদের  
কামরাতেই উঠল । এক আমেরিকান বন্ধু চিনি দিয়ে দিলেন তাদের  
কাউবয় বলে । বড়োসড়ো চেহারা, রোদে-পোড়া রং, ঢিলে পোষাক,  
মাথায় বিশেষ রকমের কাউবয় হ্যাট ; এইটুকুই তাদের চেহারার  
বিশেষত্ব ।

Texas, Oklahoma ও Kansas এট তিন রাষ্ট্রে মত্গপান  
নিষিদ্ধ । আমাদের ট্রেনে লাউজ কাবে সংশ্লিষ্ট বার আছে, সেখানে  
মত্গপদের ভীড় লেগেই থাকে । কিন্তু বতক্ষণ গাড়ী এই তিন  
রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে চলে ততক্ষণ মদ বিক্রী বন্ধ থাকে । আমরা  
বেলা দশটার ট্রেনে উঠেছিলাম ; সন্ধ্যার পর কখন যেন গাড়ী এই  
“শুক” প্রদেশে প্রবেশ করে—পরদিন সকাল ৮টা নাগাদ এর সীমা  
অতিক্রম করার কথা । কিন্তু রাত পোহাতে দেখা গেল যে,  
সারা রাত বরফের ঝড় হওয়াতে গাড়ী খুব অল্পই এগোতে পেরেছে ।  
শুক প্রদেশ পার হতে বেলা গড়িয়ে গেল । বেচারী মন্যপায়ীদের  
কি রকম কষ্ট হয়েছিল তা বুঝতে পারা যায় পরের ব্যাপার দেখে ।  
বিকালের দিকে হঠাৎ এক সময়ে বারের নিগ্রো “বয়” গানের সুরে  
“অ্যাকোহল, অ্যাকোহল” আবৃত্তি করতে করতে চলে গেল ; তার  
পরেই দেখি কামরা প্রায় খালি করে সবাই গলা ভেজাতে গেছে ।  
মজা দেখে আমরা হাসতে লাগলাম ।

ঝড়ের জন্তু আমাদের ট্রেনের গতি খুবই ব্যাহত হোলো ।  
টেলিগ্রাফের পোষ্ট তার সব ঝড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পথের খবর  
তাই পাওয়া যাচ্ছিল না । বরফের ঝড়ে সামনে মাত্র কয়েক হাত  
দেখা যায় ; কাজেই অতি মন্থর গতিতে ট্রেন চলছিল । দিনের  
বেলা এক সময়ে লক্ষ্য করলাম যে, তিন ঘণ্টায় মাত্র ত্রিশ মাইল  
এগিয়েছি । কাজেই যেখানে বিকাল সাড়ে তিনটায় শিকাগো  
পৌঁছবার কথা ছিল, সেখানে রাত দশটায় পৌঁছলাম ।

[ ক্রমশঃ ।

“যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল বুদ্ধ  
মিটলেই! অকল্যাণ মিটেবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল,  
ঘুরে-ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোস প’রে।”

—রবীন্দ্রনাথ

# ছোটদের আসর

একটি সত্য ঘটনামূলক গোয়েন্দা কাহিনী

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এভাবে ক্যাম্‌ডেন, ওপারে ফিলাডেল্‌ফিয়া এবং দুই সহরের মাঝখান দিয়ে বয়ে যায় ডেলীওয়ার নদী। নদী পার হয়ে অপরাধীরা দুই সহরে গিয়েই উৎপাত করে এবং নদী পার হয়ে গোয়েন্দাদেরও দুই সহরে গিয়েই কাজ করতে হয়।

কিন্তু ফিলাডেল্‌ফিয়ায় এ পর্যন্ত রাত আটটার চোরদের কোন উপদ্রব হয়নি। তাব বদলে ঘটতে লাগল অল্প রকম ঘটনা।

আদালতে যেদিন অ্যাণ্ডি ক্লিগের মামলা, ঠিক সেই তারিখেই ফিলাডেল্‌ফিয়ায় ডাক্তার গ্রুয়েস্‌ যখন নিজের ডিসপেন্সারিতে বসে আছেন, তখন হুঁজন লোক এসে তাঁব কাছে সর্দি-কাশির ঔষধ চাইলে।

ডাক্তার গ্রুয়েস্‌ তাঁব সঙ্গে কথা কইছেন, হঠাৎ একটা লোক রিভলভার বার করে বললে, “তোমার কাছে টাকাকাড়ি কি আছে দাও!”

ডাক্তার বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের ব্যাগটা (তাঁর ভিতরে দুই শো টাকা ছিল) বার করে দিলেন। তবু অকারণেই তারা তাঁকে রিভলভারের দ্বারা নিশ্চয় ভাবে প্রহাণ না করে অস্থূল হ’ল না।

পুলিস ভাবলে, স্থানীয় অপরাধীর কীর্তি।

আরো দুই হস্তা পরে ঠিক ঐ ভাবেই নিজের ডিসপেন্সারিতে বসেই আক্রান্ত ও প্রহৃত হলেন ডাক্তার আর্ভি রোসেনবার্গ। চোরেরা তাঁর কাছ থেকে হস্তগত করলে এক হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা।

গোয়েন্দারা বললেন, “একই দলেব কীর্তি।”

দুই হস্তা পরে স্থানান্তরে আবার সেই কাণ্ড। এবারে ঠান্ডলি বক্‌ নামে আর এক ডাক্তারের পালা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আবির্ভূত হয়েছিল হুঁজন করে লোক এবং প্রত্যেক ডাক্তারের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছিল তাদের চেহারা বর্ণনা। কিন্তু পুলিস তবু কোন অপরাধীরই নাগাল পেলে না।

এদিকে অ্যাণ্ডি ক্লিগ যখন বাস করছে ক্যাম্‌ডেনের জেলখানায়, তখনও বন্ধ হ’ল না বাত আটটার চুরিগুলো।

সত্যি কথা বলতে কি, আদালতে যেদিন উঠল অ্যাণ্ডি ক্লিগের মামলা, ঠিক সেইদিনই রাত আটটার সময়ে চোরের দল হানা দিলে কলিংস্‌উডের একখানা বাড়ীতে এবং বাবার সময়ে পিছনে রেখে

গেল নিজেদের বিখ্যাত ‘ট্রেডমার্ক’ : সেই ভাঙা জানালা, সেই সদর দরজায় চাপানো ভারি ভারি আসবাব, সেই খোলা খিড়কীর দরজা।

কনলি বললেন, “কিছুই বুঝতে পারছি না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

মর্গ্যান বললেন, “ক্লিগের রাহাজানির সঙ্গে এই রাত আটটার চুরির কোন সম্পর্ক নেই।”

কনলি বললেন, “ক্লিগ ধরা পড়বার পরও তাঁর জুড়িদার রাত আটটার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, এও হ’তে পারে তো?”

মর্গ্যান বললেন, “তাতে আর আমাদের কি সুরাহা হবে? ক্লিগ তো তাঁর জুড়িদারের নাম আমাদের কাছে কীস ক’রে দেবে না?”

এদিকে চুরির পর চুরি, ওদিকে ডাক্তারের পর ডাক্তারের উপরে আক্রমণ! দুই কাণ্ডই চলতে লাগল একসঙ্গে। এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে কোন যোগাযোগ আছে, এমন সন্দেহ পুলিসের মনে ঠাই পেলে না। কাগজওয়ালারা ক্ষাপ্তা হয়ে উঠল। কিন্তু পুলিস নাচার।

ডাক্তার হোরেসিয়ো ক্যাম্পবেল ডিসপেন্সারিতে উপবিষ্ট। বাহির থেকে দরজায় করাঘাত হ’ল। তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে দেখলেন, তিন জন লোক বাইরের বন্ধির উপরে পাশাপাশি বসে আছে।

এক জন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “বড়ই ঠাণ্ডা লেগেছে ডাক্তার! ওয়ট-টুডু দিতে পারেন?”

ডাক্তার ক্যাম্পবেলের বুকটা ধড়াস করে উঠল। ডাক্তারদের উপরে আক্রমণের কাহিনী তাঁর জানতে বাকি নেই। আততায়ীদের চেহারা বর্ণনাও তিনি খবরের কাগজে পাঠ করেছেন। তিন জনের মধ্যে দুই জনের চেহারা সেই বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যায়।

কোন রকমে বুকের কাঁপুনি থামিয়ে শান্ত ভাবেই তিনি বললেন, “একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনি সব ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছি।”

ঘরের ভিতরে ফিরে এসেই তিনি ধারণ করলেন টেলিফোন-যন্ত্র। তার পরেই থানার লোক গেলে তাঁর বিপদের খবর।

তার পর কাটল এক মিনিট...দুই মিনিট...তিন মিনিট। প্রত্যেকটা মিনিট কি স্তূর্ণ! প্রত্যেক মিনিটেই ডাক্তারের ভয় হয়, এই বৃষ্টি ডাকাতের দল হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে রিভলভার হাতে করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে! চার মিনিট..... পাঁচ মিনিট!

অবশেষে ঘরের বাইরে শোনা গেল কাদের কতৃৎপূর্ণ কণ্ঠস্বর। ডাক্তার বাইরে এসে আশস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দুই জন পুলিস-কর্ত্তব্যচারী।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তিন জন সন্দেহজনক আগন্তকের মধ্যে দুই জন হচ্ছে সহোদর—নাম ওয়াণ্টার ও ডানিয়েল ব্রেনন। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে তাদের শালক, নাম ওয়াণ্টার ট্রাম্‌সন।

গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা এখানে কি করতে এসেছ?”

—“ট্রাম্‌সনের ঠাণ্ডা লেগেছে। আমরা ওয়ুধ নিতে এসেছি।” গোয়েন্দারা বললেন, “ট্রাম্‌সনের ঠাণ্ডা লাগার কোন লক্ষণই তো দেখতে পাচ্ছি না।”

ট্রাম্‌সন বললে, “ঠাণ্ডা লেগেছে আমার বুকের ভিতরে।

আপনারা তা যদি দেখতে না পান, সে জন্যে তো আমি দায়ী নই।”

—“বেশ, থানায় চল।”

যে তিন জন ডাক্তার আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দুই জনের পাত্রা পাওয়া গেল। ডাক্তার বন্ধু কিছুক্ষণ লোক তিন জনের দিকে তাকিয়ে ওয়াণ্টার গ্লেনকে সনাক্ত করলেন। এবং ওয়াণ্টার গ্রামসন সম্বন্ধে বললেন, ওকেও দ্বিতীয় ব্যক্তির মত দেখতে বটে, কিন্তু আমি হলপ ক’রে কিছু বলতে পারব না।”

ডাক্তার রোসেনবার্গও ওয়াণ্টার গ্লেনকে সনাক্ত করলেন। এবং ডানিয়েল গ্লেন সম্বন্ধে বললেন, “ওব সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির মিল আছে বলেই মনে হচ্ছে।”

তিন জন আসামাই প্রবল প্রতিবাদ ক’রে জানালে, তারা সম্পূর্ণরূপেই নিরপরাধ এবং ঐ দুই জন ডাক্তারকে জীবনে তারা কখনো চোখেও দেখিনি।

তাদের উপরে বিনা জামিনে হাজত বাসেব হুকুম হ’ল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফিলাডেলফিয়ার ওয়াণ্টার গ্লেন ক্রমাগত প্রতিবাদ করছে—  
“আমি নিরপরাধ! ডাক্তারদের আমি আক্রমণ করিনি।”

ক্যামডেনেব অ্যাণ্ডি ক্লিংয়ের মুখেও ঐ একই কথা: “আমি নিরপরাধ! মিঃ ব্রাউনের উপরে আমি হানাদ দিইনি।”

অথচ আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের দু’জনকেই নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করতে পেরেছেন।

এদিকে সাড়ে আটটার চোরের দল নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে পরিপূর্ণ উৎসাহে!

অবশেষে!

অবশেষে ক্যামডেনের মিসেস ক্যাথারাইন অ্যাণ্টনের কাছ থেকে টেলিফোনে থানায় খবর এল, তাঁর প্রতিবেশীর এক শিশুপুত্র একটি বাস্তু ফুড়িয়ে পেয়েছে, তার মধ্যে আছে বন্দুক, জড়োয়া গয়না, ঘড়ী ও আরো হরেক রকম দামী জিনিস।

কনলি তখনই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হ’তে দেরি করলেন না। শিশুর নাম ফ্রেডি ডম্, বয়স সাত বৎসর। সে একটা নয়, পেয়েছে তিন তিনটে বাস্তু।

একটা বাস্তু খুলে দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে অনেক ঘড়ী, ফাউন্টেন পেন, রূপার বাসন, আংটি, হীরকখচিত সোনার গয়না, একটা রিভলভার ও কতকগুলো কার্তুজ—

কনলির বুকের ভিতরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল রক্তস্রোত! বিপুল আগ্রহে অল্প বাস্তু দু’টোও তিনি খুলে ফেললেন তাড়াতাড়ি। সে দু’টো বাস্তুও ঐ রকম সব দামী জিনিসে ঠাসা!

এ যে রাজার ঐশ্বর্য!

দু’একখানা গয়না পরীক্ষা ক’রেই বোঝা গেল, সেগুলো হয়েছিল রাত আটটার চোরের দলের করতলগত!

এ যে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য!

শিশুর দিকে ফিরে কনলি শুধোলেন, “খোকা বাবু, এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ?”

—“নদীর ধারে খুব ভোর বেলায় খেলা করতে গিয়েছিলুম।

সেইখানে ছুটোছুটি খেলা করতে করতে আমি আর একটু হ’লেই বাস্তুগুলোর উপরে হোট খেয়ে প’ড়ে গিয়েছিলুম আর কি!”

—“তুমি বাস্তুগুলো খুলে দেখেছিলে?”

—“তা আবার দেখিনি? আমি ভেবেছিলুম এগুলো হচ্ছে বোম্বের্দের গুপ্তধন!”

—“তার পরই তুমি সোজা বাড়ীতে ফিরে এলে বুঝি?”

—“উঁহু। আমার যে সব বন্ধু বাস্তুগুলোকে বাড়ীতে তুলে আনবার জন্তে সাহায্য করতে চাইলে, বাস্তুের কোন কোন জিনিস নিয়ে আগে তাদের কিছু কিছু উপহার দিয়েছিলুম।

—“কি কি জিনিস বাছা?”

—“অত কি ছাই আমার মনে আছে? যে যা চাইলে, তাই!”

ফ্রেডি ডসের মায়ের দিকে ফিরে কনলি বললেন, “আপনি পেয়েছেন এক আশ্চর্য্য সংপুত্র। বেশী ভাগ ছেলেই এরকম কিছু পেলে আর কারুর কাছে সে কথা প্রকাশ করত না।”

থানায় যখন বাস্তু তিনটে নিয়ে আসা হ’ল, সবাই তখন চরম বিষয়ে একেবারে হতবাক!

মর্গ্যান বললেন, “এত ঐশ্বর্য্য নদীর ধারে পরিত্যক্ত হ’ল কেন? যে এমন কাণ্ড করেছে, তাকে আমরা খুঁজে বার করব কোন উপায়ে?”

কনলি বললেন, “আমিও ও-কথা ভেবে দেখেছি। আমার কি সম্ভব হয় জানো? ক্লিং ধরা পড়াতে তার ছুড়িদার ভয় পেয়ে এই কার্য্য করেছে।”

—“জিনিসগুলো ভালো ক’বে পরীক্ষা ক’রে দেখা যাক, নতুন কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না।”

রাত আটটার চোরের দল যেখান থেকে যে-সব জিনিস চুরি ক’রেছিল, পুলিশের কাছেই ছিল তার সুদীর্ঘ তালিকা।

পরীক্ষা-কাধ্য যখন চলছে, সেই সময়ে মর্গ্যান বাস্তু হাংড়ে বার করলেন একটা নকল চামড়ার ব্যাগ। একখানা ট্রলি-হস্তান্তর-পত্র ছাড়া তার ভিতরে আর কিছুই ছিল না।

মর্গ্যান বললেন, “এই ব্যাগের উপরে সম্ভবত কারুর নামের দু’টো আদ্য অক্ষর লেখা আছে—ডি, এল। এরকম ব্যাগ তো ছোঁকরাবাই ব্যবহার করে। এর মানে কি?”

—“হ্যাঁ, এ ছোঁকরাদের উপযোগী ব্যাগই বটে।”

—“এমন এক ছোঁকরা, যাব নামের দু’টো আদ্য অক্ষর হচ্ছে ডি, এল। যদিও তা হয়তো সম্ভবপর নয়, তবু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে।”

—“কি কথা?”

—“একটু আগেই দুসেপ্টারের থানা থেকে ফোর্স এসেছিল, ডেভিড টিন্ডো নামে এক ছোঁকরার খবরাখবর নেবাব জন্তে। সেও না কি তার একটা চামড়ার ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। ডি, এল তো ডেভিড টিন্ডোরও নামের আদ্য অক্ষর হ’তে পারে।”

কনলি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হয়ে বললেন, “চল, সেখানেই যাই।”

তার আধ ঘণ্টা পরেই দুসেপ্টারের থানায় গিয়ে মর্গ্যান ও কনলির সঙ্গে ডেভিড টিন্ডোর যে-সব কথাবার্তা হ’ল, আমরা তা বর্ণনা করছি এই আখ্যায়িকার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই।

তবু এখানে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

টিঙ্গো স্বীকার করলে ব্যাগটা তারই। তিন দিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল।

গোয়েন্দারা তাকে সেই ব্যাগের ভিতরে 'ট্রলি'-হস্তান্তর-পত্রখানাও দেখালেন। প্রথমটা সেখানাও সে নিজের ব'লে মেনে নিলে। কিন্তু পর-দুহুর্ন্তেই রক্তহীন হয়ে গেল তার মুখ। সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল, "না, না, ওখানা আমার নয়! আমি কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি! আপনারা আমার মাথা গুলিয়ে দিয়েছেন।"

হস্তান্তর-পত্রের উপরে ছিল গতকল্যকার তারিখ। অথচ টিঙ্গো বলে তার ব্যাগ খোয়া গেছে তিন দিন আগে! তার মানে, গত-কল্যাও এই ব্যাগটা ছিল তার কাছেই!

কেন সে এই মিথ্যা কথাটা বললে? পুলিশের সম্মুখে হ'ল জাগ্রত। ডেভিড টিঙ্গোকে নিয়ে গোয়েন্দারা গেলেন তার বাড়ীতে। তার বাবা তখন কর্ণস্থলে গিয়েছেন। বাড়ীতে ছিলেন কেবল তার মা।

তাদের বাসা খানাতল্লাস ক'রে সম্মুখজনক বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না, কেবল একটা রিভলভার ছাড়া। সেটা বেলজিয়ামে প্রস্তুত এবং লুকানো ছিল ডেভিড টিঙ্গোর শোবার ঘরের বিছানার তলায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, রিভলভারটা কোথা থেকে সে পেয়েছে?

সে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে, "রাস্তায় একখানা আরোহীহীন মোটর গাড়ী দাঁড় করানো ছিল, ওটা প'ড়েছিল তাবই পিছনের আসনে। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে একটা রিভলভার পাবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাই লোভ সামলাতে পারলুম না। রিভলভারটা চুপি-চুপি তুলে নিয়ে স'রে পড়লুম। তার আগে জীবনে আব কোন দিন আমি চুপি করিনি।"

তার কাছ থেকে আর কোন তথ্য উদ্ধার করা গেল না।

রাত আটটার চোরের দল এ-পর্যন্ত ষাঁদের বাড়ীর উপরে হানা দিয়েছিল তাঁদের প্রত্যেকেই খানায় আহ্বান করা হ'ল, তিনটে বাজ্ঞে পাওয়া চোরাই মালগুলো সনাক্ত করবার জন্তে।

সেই বেলজিয়ামে প্রস্তুত রিভলভারটা দেখেই জর্নৈক মহিলা বললেন, "ওটা আমাদের সম্পত্তি। চোরেরা আমাদের বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রিভলভারের 'ক্লিপ'টা তাড়াতাড়িতে বা ভুল ক'রে নিয়ে যেতে পাবেনি, এখনো আমাদের বাড়ীতেই প'ড়ে আছে।"

তৎক্ষণাৎ 'ক্লিপ'টা আনিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল, রিভলভারের সঙ্গে তা খাপ্, খেয়ে যায় যথার্থ ভাবেই।

কনুলি বললেন, "টিঙ্গো, রিভলভারটা তাহ'লে তুমি কোন মোটরগাড়ী থেকে চুপি করনি। তুমি যে রাত আটটার চোরদেরই এক জন, এইবারে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। তুমি কি এখনো মিথ্যা কথা বলতে চাও?"

না, ডেভিড টিঙ্গো আর মিথ্যা কথা বলতে চায় না। কিন্তু সে যে-সব আজব কথা বললে, তা শ্রবণ ক'রে গোয়েন্দাদের চিত্ত একেবারে চমৎকৃত হয়ে গেল।

রাত আটটার চুরিতে তার জুড়িদার ছিল না অ্যাণ্ডি ক্লিং।

টিঙ্গোর একমাত্র জুড়িদার হচ্ছে তার পিতা স্বয়ং!

সে বললে, "বাবা রোজ রাত্রে চুরি করবার জন্তে আমাদের জোপ ক'রে সঙ্গে নিয়ে যেতেন, আমাদের তাঁর সঙ্গী হ'তে হ'ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। তাই রাত্রে প্রায়ই আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতুম। যেদিন আপনারা প্রথম আমাদের খানায় নিয়ে আসেন, সেদিনও আমি বাবার ভয়ে রাত্রে রাস্তায় মোটরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।"

সেই রাত্রেই ডেভিড টিঙ্গোর বাবা ধরা পড়ল। তার নাম বেঞ্জামিন টিঙ্গো। ধরা প'ড়েই সে অপরাধ স্বীকার করতে একটুও ইতস্তত করলে না। সে এক অদ্ভুত চরিত্রের লোক—সত্যিকার ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড। দিনের বেলায় ভালো চাকরি করে, মাহিনা পায় হুগুয় পাচশো টাকা। সকলেই তাকে অত্যন্ত সাধু, ভদ্র ও নম্র প্রকৃতির মানুষ ব'লে জানে। সে যাব-পর-নাই ধর্মভীরু, নিজের বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে রাখে এক-একখানা ক'রে বাইবেল!

সে নিজের বাড়ীর একটা গুপ্তস্থান থেকে আরও চল্লিশ হাজার টাকার চোরাই মাল বার ক'রে দিয়ে বললে, "পুলিশ চারি দিকে ধরপাকড় করছে ব'লে ভয় পেয়ে আমি তিন বাজ্ঞে চোরাই মাল নদীর ধারে ফেলে দিয়ে এসেছিলুম। সেই সঙ্গে ভ্রমক্রমে গিয়েছিল আমার ছেলের চামড়ার ব্যাগটাও।"

কিন্তু এখনো গোয়েন্দাদের জন্তে অপেক্ষা ক'রে আছে নূতন নূতন বিষয়!

বেঞ্জামিন টিঙ্গো নিজেই বললে, "ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তারদের উপরে হানা দিয়েছিলুম আমরাই!"

ডেভিড টিঙ্গো বললে, "অ্যাণ্ডি ক্লিংকে বিনা দোষে ধরা হয়েছে। বুড়ো জর্জ ব্রাউনকে রিভলভারের দ্বারা 'আঘাত' করেছিলুম আমিই!"

তাদের কথা যে মিথ্যা নয়, সে প্রমাণ পেতেও বিলম্ব হ'ল না। নির্দোষ ব্যক্তির মুক্তিলাভ করলে। আসামীর গেল কারাগারে।

আর সেই ছোট জর্জ ফ্রেডি ডম্—যে আবিষ্কার করেছিল চোরাই মালের বাজ্ঞ তিনটে। সে উপহার লাভ করলে একখানি বাইসিকেল।

শেষ

## অখিনীকুমার দত্ত

তারানথ রায়

অখিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের উপদেশ ছিল—"যে জায়গায় থাকবে সে জায়গাটা ঘেন গরম হয়। কলকাতা ডুবে মরবার ভয় করলে কখনও আমেরিকা আবিষ্কার করতে পারতেন না।"

মা বাংলার সেকালের বিখ্যাত বক্তা লালমোহন ঘোষের ভাগিনেরী প্রসন্নময়ীর উপদেশ ছিল—"যেঁ সয়, সে রয়।"

এই পিতা ও মাতার সম্মান অখিনীকুমার দত্ত। ব্রজমোহন তাঁকে হাতে করে মানুষ করেছিলেন। শিশু অখিনী, বাবার মুখে বেদান্ত শুনেছেন—পুরাণ, ইতিহাস শুনেছেন, বাবার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ঢোলক বাজিয়ে হরিতলায় হরিনাম করেছেন, মায়ের দেখাদেখি খট পেতে ঠাকুরপূজা করেছেন।

তখন খুব শিশু। বাবা বিষ্ণুপুরে মুনসেফী করেন, অশ্বিনীকুমার সেখানে স্কুলের ছোট ক্লাশে পড়েন। এক দিন রাতে শহরে বেরুল বাঘ। বাবার কাছে শুয়ে অশ্বিনী। বাবা ডেকে শুনালেন বাঘ কি রকম করে ডাকে। বাবা তাব পর ঘুমিয়ে পড়লেন। অশ্বিনীর আর ঘুমই হ'ল না। বাবার কাছে শুনে তার মনে বার বার এই ভাবনাই হ'ল—“বাবাই যদি বাঘ হয়!”

বাবা কিন্তু বাঘ হয়ে অশ্বিনীকুমারকে পাহারা দিতেন। সর্বদা কাছে কাছে রেখে সেকালের পাণ্ডা আবহাওয়া থেকে তাকে মাত্র ঝাঁচিয়েই রাখেননি, কি করে জাতের নতুন শিশু গড়ে উঠে নতুন ভারতের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারে তাব চেষ্টা করে গেছেন।

বয়স তখন তাঁর ১৪। রঙ্গপুরে এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্ম অশ্বিনীকুমার তৈরী হচ্ছেন। বাবা-মা কাছে নেই। যাদের বাসায় থাকতেন তারা চরিত্রহীন মাতাল। এক দিন সবাই বসে মদ খাচ্ছে, অশ্বিনীকেও বলছে একটু খেয়ে দেখতে। বালক অশ্বিনী মদের গ্লাস ধরবার জন্মে হাত বাড়িয়েছেন হঠাৎ তাঁর বাল্যবন্ধু ভুবনের কথা মনে পড়ল। ভুবনকে ভালবাসতেন। ভুবনের মুখ মনে পড়তে গ্লাস ফেলে পালিয়ে গেলেন।

তখন ১৬ বছর বয়স না হ'লে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া চলত না। কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে অভিব্যক্তি তাঁকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। পরীক্ষায় বৃত্তি নিয়ে উত্তীর্ণ হলেও এই মিথ্যা তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় এই মিথ্যা তার পক্ষে অসহ্য হয়েছিল। কিন্তু বিভ্রালয়ের রেজিষ্টার পধ্যস্ত বয়স কমিয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে যখন চাইলেন না, পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ম বাবাকে একগাণা চিঠি লিখে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্ধেশ যাত্রা কবলেন পায়ে ধেঁটে। পুঁজি, চার পয়সা! চৈত্রের দুপুর। হু' পয়সার আখ আর কলা পথ থেকে খেলেন।

আবার চলেন! সন্ধ্যায় ক্লাস্ত হয়ে বালক এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে একটু জল চাইলেন। জননীজ জল মুড়ি মুড়কি দিলেন, তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আহা, কচি বাচ্চা বিবাহী হ'ল? অশ্বিনীকুমার সেখানে দাঁড়ালেন না, কাছেব একটা হাটে গিয়ে গাছতলায় শুয়ে ঘুমলেন। রাত প্রায় এক প্রহর। এক ভদ্রলোকের নজর পড়ল। সঙ্গে করে নিয়ে একটা তন্তুপোষ দেখিয়ে বললেন, এখানে ঘুমোও।

আবার চলেন অশ্বিনীকুমার। চন্দননগরে এক বন্ধু ধরে নিয়ে গেলেন। রাতটা প্রার্থনায় কাটল। সে যুগটাই ছিল প্রার্থনার। ভোর হতে না হতে আবাব চলেন চৈত্রে ডাকতে ডাকতে—“আমার মন ভুলাল যে, কোথায় আছে সে।”

এক ধাক্কাড়ের সঙ্গে দেখা, ইচ্ছে হ'ল জড়িয়ে ধরে জিক্সেস করেন, তাঁর মন যে ভুলাল তার সন্ধান সে জানে কি না। একটা গাছের সঙ্গে দেখা—তাকেই জড়িয়ে ধরে জিক্সেস করলেন—“বল দেখি বে তরু লতা, আমার জগজীবন আছে কোথা?”

আবার চলেন। মাধবপুরে এক ধনী বৃদ্ধের ঘরে রাতের অতিথি। বৃদ্ধা বিশেষ করতেই পারলেন না অশ্বিনীকুমার যশোদের ছোট আদালতের জজের ছেলে। এক পুকুরের ঘাটে রাত কাটল।

আবার চলেন। পুঁজি হু'পয়সার মুড়ি-মুড়কী এ দিন খেয়ে আবার চলেন।

এমনি করে বালক অশ্বিনীকুমার সেদিন কলকাতা থেকে

পদব্রজে বর্ধমান গেছিলেন। আর কপর্দকহীন অবস্থায় বর্ধমান থেকে পায়ে ধেঁটে যশোরে বাবার কাছে যখন ফিরে গিয়ে তাঁর পাঠ স্থগিত রাখার কারণ জানালেন, আর পথেব কাহিনী একে একে বললেন, তখন পুত্র অশ্বিনীকুমারের গর্বে পিতা ব্রজমোহন গর্বিত হয়ে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

## ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

### রাজাস্ত:পুরে

বর-বেশে, মহারাজা গঙ্গাধর রাও বিবাহ-বাসরে স্তম্ভজিতা কন্ডার মুখে প্রাসঙ্গিক একটি কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ বড় সাধারণ মেয়ে নয়—অসামান্য কোন মনস্বিনী মেয়ে না গোলে বিবাহ-স্থলে বরের কাপড়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সময় বহু লোকের সামনে পরিহাসের সুরে কখনই বলতে পারতেন না—‘পুরুত ঠাকুর! খুব জোরে গিঁট দিন—যেন খুলে না যায়!’

বিবাহের পর বধুরূপে ঝাঁসীর বিশাল প্রাসাদে এসে এমনি অনেক বিষয়েই কন্ডা তাঁর নির্ভীক ও সপ্রতিভ ব্যবহারে প্রাসাদ-স্বত্ব সকলকেই অবাক করে দিলেন। নববধু রাজকন্ডা নন, কোনো বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরোয়ানার মেয়েও নন, তাঁব পিতা সাধারণ এক রাজ-কর্মচারী মাত্র—কিন্তু রাজরাণী ও বধুর মর্যাদা নিয়ে রাজ-প্রাসাদে আসবার পরেই তাঁর ভাবভঙ্গি কথাবার্তা আচার-ব্যবহার দেখে স্বয়ং মহারাজও স্তম্ভ হোয়ে গেলেন। তিনি ভেবে স্থির করতে পারলেন না যে, এতটুকু মেয়ে, এই বয়সে এখানে এসেই এসব শিখলে কোথা থেকে? সে যে এই বংশের রাণী—বিশাল অক্ষর-মহলের অধিনায়িকা, তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন—এ সব তথ্য নিজে থেকেই কেমন করে এই বালিকা বধু জ্ঞাত হলো?

সাধারণতঃ যে-বয়সে বালিকারা খেলাধুলা করেই আনন্দ পায়—সাংসারিক কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজে জড়িয়ে পড়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়; নব পরিণীতা কন্ডা সেই বয়সেই রাণীর গাভীরে নিজেকে আবৃত করে রাজাস্ত:পুরের কত্রীষ ভারও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন! এই জন্মই অক্ষর-মহলের দাস-দাসী থেকে আরম্ভ করে রাজ্যেশ্বর মহারাজ পর্যন্ত বিষয়ে অবাক হোয়েছেন। রাজ-সংসারের জাঁক-জমকপূর্ণ অবস্থা এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও এক বিরাট ব্যাপার! বিভিন্ন প্রকৃতির বহু পরিজন, নিকট ও দূর-সম্পর্কের নানা শ্রেণীর আশ্রিতা আত্মীয়-স্বজন, বহু পরিচারিকা ও প্রতিহারিণী, তাদের সম্ভ্রান্ত-সম্ভ্রান্তি প্রভৃতি শত শত প্রাণী বিশাল রাজাস্ত:পুরে প্রতিপালিত হয়; তাদের যথাযথ পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের জন্ম উপযুক্ত পরিদর্শিকা বা তত্ত্বাবধায়িকা থাকা সম্বন্ধে রাজপ্রাসাদের রাণীই মাথার উপরে থাকেন অধিনায়িকার মত। প্রাসাদের অক্ষর-মহলের মত বহিমহলেও বহু পুরুষ মহারাজার আশ্রিতরূপে বসবাস করেন, সেখানে দক্ষ পরিদর্শকদের উপরে অধিনায়ক থাকেন মহারাজা স্বয়ং। এত সব পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও নানা শ্রেণীর লোকজনদের নিত্য নিয়মিত ভাবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও বড় সহজ কথা নয়—রাজা-রাজড়াদের কাণ্ড-কারখানাই

আলাদা। কিন্তু বালিকা তোলেও ঝাঁসীর নতুন রাণী লক্ষ্মী নিজের কর্তব্য মনে করে নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন—অধিনায়িকার মত সব কাজেব তত্বাবধান করতে লাগলেন। বালিকার এই সাহস ও কর্তব্যজ্ঞান রাজপুত্র সৰলকেই লিখিয়ে অভিভূত করবে।

মহাবাজ্ঞা গঙ্গাধর আদব করে বাণীকে জিজ্ঞাসা করলেন : শুনলাম, তুমি না কি অন্দর-মহলের যাবতীয় কাজকর্মেব তদাবক নিজেই করছ ?

স্বামীর দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে একটি বাব চেয়েই সে দৃষ্টি নত করে লক্ষ্মী বললেন : হ্যাঁ। এখানে এসেই শুনেছিলাম, এ কাজ রাণীর ; তাই ভরসা করে আমিও এগিয়ে গেছি। ভালো করিনি ?

সাদবে বধুবাণীব হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে ধরে মহাবাজ্ঞ বললেন : নিশ্চয়ই ভালো করেছ। কিন্তু তোমার মত এত অল্প বয়সে কোন মেয়ে বাণী হয়ে ত আসেননি, তার পর বয়স অনেক বেশী না তোলে কেউ ভরসা করে তোমার মতন এগিয়ে যেতেও পারেননি ! আমি এত ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, তুমি এ-বাড়ীতে এসেই এখনব নিয়ন্ত্রিতো ?

লক্ষ্মী বললেন : আমি রাজকন্যা না তোলেও রাজবাড়ীর ভিতরকার পব সব জানি। বিব্রের পোশোয়াজীর ভাই আগ্রাজীর কাছে আমি যে অনেক কথা শুনিছি। বিয়ের পর রাণী হোয়ে এলে বাণীরা যে বসে বসে আলতো দিন কাটান না, অন্দর-মহলে তাঁদের কত কাজ, আগ্রাজীব কাছে তখন খাঁটিয়ে থুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে সবই আমি জেনেছিলাম যে। তিনি বলতেন, পোশোয়ার যেমন দরবাব করে রাজ্য শাসন করতেন, পোশোয়ার রাণীবা তেমনি অস্ত্রপুর্বে রাজত্ব করতেন—সেখানে পোশোয়াদের ক্ষমতা চলতো না, রাণীবাটই সব কিছু করতেন। বিপত্তা যখন আমায় রাণী করেছেন, রাজ্য শাসন করবাব শক্তিও নিশ্চয়ই দিয়েছেন। আমি মনে করি, এই অন্দর-মহল আমাব রাজ্য। আপনি যেমন ঝাঁসী রাজ্য শাসন করেন, আমাবও উচিত এই রাজ্যটিও তেমনি শাসন করা। অবিশি, আমি বালিকা ; যদি ভুল করি—দোষ-ত্রুটি হয়, মাথা উপরে আপনি আছেন—স্বামী, তার ওপর বাজ্ঞা, দোষ, ত্রুটি, ভুল দেখিয়ে দেবেন, আমি মাযধান হব। আব এতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তা-ও বলুন।

পত্নীব কথাগুলি মুগ্ধ হোয়েই মহাবাজ্ঞ শুনছিলেন। শেষে আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে বললেন : আমি অনেক পুণ্যের ফলেই তোমার মত কণ্ঠারত্নকে আমাব পত্নীরূপে পেয়েছি। এখানে এসে অল্প দিনেই তুমি যে রকম স্বেচ্ছা ও সাহসেব পবিচয় দিয়েছ, আব এই মাত্র যে সব কথা আমাকে বললে, তা থেকেই বুঝতে পাযছি—বাণী হবাব জনেই তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। যে জ্যোতিষী তোমাব সন্ধান দিয়েছিলেন, তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। আদর্শ নাবীর গুণবাশি তোমার মধ্যে লুপ্ত আছে। আমি তোমাব উপরে অন্দর মহলের সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিলাম ; সত্যই এ তোমার রাজ্য, আব এ রাজ্যে তুমি রাণী, তুমি সর্বময়ী। সবাই এখানে অবনত-মস্তকে তোমার শাসন স্বীকার করবে।

লক্ষ্মীও তৎক্ষণাৎ স্বামীর পদতলে অবনত-মস্তকে ভক্তি নিবেদন করে গাট স্বরে বলল : আপনি আশীর্বাদ করুন—রাজ্যস্ত্রপুর্বেব সকলকেই আমি যেন স্নেহ দিয়ে আপনার করে নিতে পারি।

স্বামীর আশীর্বাদেই হোক, বিধাতের ইচ্ছায়ই হোক, কিম্বা লক্ষ্মীর আশ্চর্য গুণের জন্যই হোক—অল্প দিনেই তার অস্ত্রপুর্বেব ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠল আশ্চর্য ভাবে। অস্ত্রপুর্বেব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে ধনা, ধন্য ধরনি উঠল রাণীর উদ্দেশে। দেখতে দেখতে বিশাল অন্দর-মহলেব সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রাণী লক্ষ্মীর এক অপূর্ব রাজ্য উঠল গড়ে। অস্ত্রপুর্বে আশ্রিতা আত্মীয়াদের কুমারী কন্যারা দলবদ্ধ হোয়ে নানাকণ থেলা ও নৃত্য-গীতে অভ্যস্ত ছিল ; লক্ষ্মী এখন তাদের মতো প্রেবণা দিয়ে মারাত্ম বীরাদ্ধনাদের আদর্শে গড়ে তুলতে উত্তোণ হলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, প্রাচীরবদ্ধ রাজ্যস্ত্রপুর্বে সুদীর্ঘ উতান, বিস্তীর্ণ প্রান্তব, কৃত্রিম অরণ্য, শুবুহং সরোবর—সবই বয়েছে অস্ত্রপুর্বিবাদেব চিত্রবিনোদনেব জন্য, হয়ত এক কালে অস্ত্রপুর্বেব মহিলাবা এই সব উতান অরণ্য প্রান্তব সরোবরসমূহ ব্যবহার করে চাপল্যের সাড়া তুলতেন ; কিন্তু এখন এগুলি শুধু অতীতের স্মৃতিই স্ববণ করিয়ে দেয়—এদিকে পুরবাসিনীদের কোন আগ্রহই নেই। বাণী লক্ষ্মীর আদেশে উতান, উপবন, সরোবর বত দিন পরে সংস্কৃত হলো ; বত দিন অব্যবহৃত থাকায় উতানগুলি দুর্গম জঙ্গলে পবিণত হয়েছিল, আর উপবনগুলির ব্রিসমায়ও কেউ ভয়ে বেসত না—মহাবনেব মত ভীষণ হোয়ে ওঠায়। কিন্তু লক্ষ্মীর চেষ্টায় আবাব তাদের পুত্মী ফিবে এলো।

এই সব সংস্কার-কার্য দেখে মেয়েদের মনে কোতুল জাগলো—বধুবাণীব মন্তব্য কি ? বত কাল ধরে যে সব জমি পড়ে থেকে বন-জঙ্গলে ভরে গিয়েছিল, সেগুলির দিকে সতনা রাণীর নজর পড়ল কেন ? বন-জঙ্গল পবিষ্কার করে কি হবে ?

এব পর বাণী এক দিন সকলকে ডেকে নিজেই বললেন : তোমাদের জন্মেই অন্দর-মহলেব পিছনের ঐ-সব বন-জঙ্গল আমি পবিষ্কার করিয়েছি। বয়ে বসে তোমরা যে সব হাঙ্গা খেলাধুলা কর, তাতে দেহ বা মন কোনটাই শক্ত হয় না। এখন থেকে আমি তোমাদের নিয়ে খেলব, আর আমাদের খেলার জায়গা হবে ঐ সব মার্গ-ময়দান-বাগান-বন—যেগুলো পবিষ্কার করানো হয়েছে !

বাণী নিজে তাদের সঙ্গে খেলা করবেন শুনে মেয়েগুলি আনন্দে ফেটে পড়বার মত হোয়ে বলে উঠল : রাণী আমাদের সঙ্গে খেলবেন ! এমন মৌভাগ্য আমাদের হবে ?

মিষ্টি হেসে লক্ষ্মী বললেন : বিয়ের আগেও আমি খেলেছি—আমাদের খেলা দেখে লোকে অবাক হোয়ে চেয়ে থাকত। বিয়ে হোলেও সে খেলা আমি তুলতে পারিনি, তোমাদের নিয়ে খেলবো স্থির করেছি। না খেললে শরীব আর মন শক্ত হবে কি করে ?

এব পর লক্ষ্মী খেলার যে ব্যবস্থা করলেন, তাঁর কাছে অপূর্ণ বা অভূত না হোলেও এখানকার মেয়েরা খেলবার আগে সে খেলাব নাম শুনেই চমকে উঠলো—সেই সঙ্গে তাদের মনে মনেও এব বিষয়কর উত্তেজনার সঞ্চার হোলো।

লক্ষ্মী করলেন কি, মহাবাজ্ঞকে তাঁর সঙ্কল্পেব কথা বলে কতকগুলো টাট্টা বোড়া আনালেন অন্দর-মহলে। কালো কালে স্তম্ভপুষ্ঠ তেজী বোড়া—গায়ের লোমগুলি এত মশ্ণ যে, পিঠে মাছি বসলেও বুঝি পিছলে পড়ে। আর, দেখতে ছোট হোলেও শক্তিতে তারা কম নয়—বড় বড় লড়াইয়ে বোড়ার সঙ্গেও টক্কর দিতে ছুটে পারে, এমন তাদের পায়ের জোর।

যতগুলি মেয়েকে নিয়ে লক্ষ্মী তাঁর দলটি বেঁধেছিলেন, ঠিক ততগুলি ঘোড়াই যোগাড় করে আনালেন দলের মেয়েদের জন্তে ; অবশিষ্ট, নিজেও একটি ঘোড়া বেছে নিয়েছিলেন তিনিও খেলবেন বলে। এক-একটি ঘোড়ার এক-একটি নাম বেধে তিনি দলেব প্রত্যেক মেয়েকে দিয়ে বললেন—এই নাম রইল তোমার ঘোড়ার, এই নাম ধরে তুমি ডাকবে, নিজের হাতে থাওয়াবে, তোয়াজ করবে, তার পর খেলা হোয়ে গেলে খোজা সহিস এসে ঘোড়াগুলোকে আন্তাবোলে নিয়ে যাবে, নিজের নিজের ঘোড়ার নাম সবাই মনে রাখবে।

এখানে বলা উচিত, রাজাস্তম্ভপুত্রের পুরুষ পরিচালকদের প্রবেশ করবার উপায় নেই। অন্দর মহলে কাজ করবার জন্তে খুব শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ মেয়েরা নিযুক্ত থাকে। আবার যে সব কাজ মেয়েদের দ্বারা সম্ভব নয়, সেখানে খোজাদেব বহাল করা হয়। লক্ষ্মী প্রথম প্রথম খোজা সহিসদেরই আনিয়া মেয়েদের ঘোড়ায় চড়া শেখাবার ব্যবস্থা করলেও, পরে ‘মাওলা’ নামে অস্ত্রাজ শ্রেণীর মারাঠা মেয়েদের আনিয়া তাদের উপরে অন্দর-মহল এবং অন্দর-মহলের মহিলাদের ঘোড়াগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ভাব দেন।

ঝাঁসীতে রাজবধূকে আসবার আগেই লক্ষ্মী বিঠুরে শুধু যে ঘোড়ার চড়া শিখেছিলেন তা নয়, এই বিজ্ঞাতে তিনি এমনি পারদর্শিনী হোয়ে ওঠেন যে, প্রতিযোগিতায় এক নানা সাহেব ভিন্ন কেউ তাঁকে হারাতে পারতেন না। যাদের ঘোড়ায় চড়ে ব্যায়াম করা অভ্যাস, এক দিন ঘোড়ায় চড়তে না পোলে তাদের মন যেন নিসৃপিসু করতে থাকে। রাণীবও হয়েছিল সেই দশা। বিয়ে পর ঝাঁসীতে এসে আর ত তাঁর ঘোড়ায় চড়া হয়নি ; অথচ, ঘোড়ায় চড়বার জন্তে তাঁর মন সর্বক্ষণ উসুখু কবতে থাকে। শেষে বুদ্ধি খেলিয়ে তিনি শুধু নিজের জন্তে নয়—রাজ-প্রাসাদের সমবয়সী মেয়েদের জন্তেও নিত্য নিয়মিত ভাবে ঘোড়ায় চড়ে খেলা করবার এই উপায় উদ্ভাবন করলেন। ফলে, ঝাঁসীতে ভারী নারীবাহিনী গঠনের এক পটভূমিকার পত্তন হলো।

লক্ষ্মী তাঁর কিশোরী সঙ্গিনীদের বললেন : এ খেলা নতুন কিছু নয় ; ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী মারাঠা মেয়েদের অন্তরে বীরঙ্গনা হবার প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি যখন মারাঠা দেশকে স্বাধীন করবার জন্তে সমস্ত জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, মারাঠা মেয়েরাও তখন চুপ কবে ঘরের কোণে বসেছিল না। বর্ম পরে অস্ত্র হাতে করে ঘোড়ায় চড়ে তাবাও পুরুষদের মত লড়াই করেছিল। সে যুগে প্রত্যেক মারাঠা মেয়ের সম্পদ গর্দ ও গৌরব বলতে ছিল—একটা ঘোড়া, একটা বর্ম আর একপানা তলোয়ার। এখন আমরা সে সব ত্যাগ কবে মাড়ী কাঁচুলি অলঙ্কার সার করছি ; তাই তার দিক দিয়ে জাতির জীবনে দুর্গতিও ঘনিয়া এসেছে। এখন আমি কি ভেবেছি জানো—তোমাদের নিয়ে এই ঝাঁসী থেকে আবার পথ খুলে দেব। আমাদের দেখাদেখি মারাঠা মেয়েরা আবার আগেকার মত বর্ম পরবে, তলোয়ার খেলবে, আর ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে।

লক্ষ্মীর কথা, লক্ষ্মীর অপূর্ণ মূর্তি, লক্ষ্মীর বিচিত্র ভঙ্গি মেয়েদের অন্তরে তখন প্রেরণা ঢেলে দিয়েছে, তরুণ মনগুলি উদ্দীপিত হোয়ে উঠেছে দারুণ এক উত্তেজনায় ; রাণীর আদর্শে তারা প্রত্যেকেই অল্পপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এলো।

এখন থেকে রাজাস্তম্ভপুত্রের প্রাচীর-বেষ্টিত বিশাল বিস্তীর্ণ স্থানটি অবলম্বন করে এই কিশোরীদের ঘোড়দৌড়ের খেলা আরম্ভ হলো। লক্ষ্মী নিজে তাদের শেখাতে লাগলেন—কেমন করে ঘোড়াকে বাধ্য করতে হয়, কি ভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে হয়, কি কৌশলে ঘোড়া চালাতে হয়। সহিসরাও ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে থেকে রাণীব নির্দেশ মত কাজ করতে লাগল।

অল্প দিনের মধ্যেই কিশোরী দলটি অস্বাভাবিক অত্যন্ত হায়ে উঠল। ক্রমে তারা স্বাধীন ভাবে নিজে থেকেই নিজের নিজের ঘোড়াকে ইচ্ছামত চালাতে সমর্থ হলো। তখন তাদের কি আনন্দ ! এত বড় একটা বিজ্ঞার আলো! এত দিন তাদের চোখে পড়েনি—তারা যেন অন্ধকারে বসেছিল ! কি শুভক্ষণেই রাণী এসেছিলেন, আর এই বিজ্ঞার কথা বলে, এই বিজ্ঞার আলো! নিজের হাতে ছেলে দিয়ে তিনি এদের জড়তা কাটিয়ে পথ খুলে দিলেন।

এর পর এই খেলাতেই মেয়েগুলি এমনি মেতে উঠল যে, প্রাচীরের মধ্যে যেন তাদের প্রমত্ত চিহ্নগুলি আর আবদ্ধ থাকতে চায় না ; নবলক এই বিজ্ঞার আলো—প্রাচীরের বাহিরের মেয়েদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলো। তাদের আগ্রহ দেখে লক্ষ্মীর মনটিও আনন্দে যেন ঝলঝল করে উঠল ; তিনি বললেন, এ বিজ্ঞার দ্বারা এই ; এর আলো চোখে পড়লে সে আলোয় শুধু নিজের চোখই ভরে যায় না—অপরেও বাতে সে আলোর আভা দেগে আনন্দ পায়—সেই সাধই মনে জেগে ওঠে। এই দেখ না—তোমরা অন্দর-মহল থেকে চুপিচুপি ঘোড়ায় চড়া বিজ্ঞাটি শিখে এত আনন্দ পেয়েছ যে, বাহিরের মেয়েগুলিকেও এই বিজ্ঞা শেখাবার জন্যে অধীর হোয়ে উঠেছে। কিন্তু এর জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, ক্রমে ক্রমে সবই হবে। জানো ত, আমি রাজবধূ—তোমাদের সঙ্গে অন্দর-মহলে খেলা করি বলে বাইরে গিয়ে ত আর ছুটোছুটি করতে পারি না ! তা ছাড়া, এখানে আমাদের আরো কাজ আছে।

শুধু ঘোড়ায় চড়া নয়—শাস্ত্র পাঠ, পূজা-অর্চনা, সেবা-পরিচর্যা—এই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাগুলিও লক্ষ্মী সঙ্গিনীদের শিখাতে লাগলেন।

মহারাজা গঙ্গাধর তলে তলে খবর নিয়ে জানলেন, কিশোরী রাণী লক্ষ্মী মহীয়সা মহিষীর মত অস্তম্ভপুত্রের সর্গ নিপুণ লক্ষ্য বেখে এমন স্মৃশ্বাশ্লে তাঁর কর্তব্য পালন করে চলেছেন যে, কোথাও কিছুমাত্র ক্রটি নেই, রাণীর আচরণে সকলেই সন্তুষ্ট ; যে প্রাচীন নিয়মে অস্তম্ভপুত্রের কাজগুলি চলে আসছিল, রাণী লক্ষ্মী তাব দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে দিয়ে অনেক পবিবর্তন করেছেন, কিন্তু তার জন্যে কেউ কোন অভিযোগ তোলেনি, বরং মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাই কবছেন।

প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে এক দিন মহারাজ গঙ্গাধর রাণীব আশ্চর্য অশ্চাচলনা দেখে স্তব্ধ হোলেন। মারাঠা বীরঙ্গনাদের মত আঁট-সাঁট করে কাপড় পড়ে ঘোড়ায় চড়ে রাণী অন্দর-মহলের বিস্তীর্ণ উজানে টহল দিচ্ছেন—অদূরে তাঁর সঙ্গিনীরা তাদের ঘোড়ার পিঠে বসে নিশ্চলক দৃষ্টিতে রাণীর অদ্ভুত অশ্চাচলনা দেখছেন ! কিছুক্ষণ পরেই রাণীর ইঙ্গিতে সঙ্গিনীরাও তাদের ঘোড়া নিয়ে রাণীর অঙ্গসরণ করল—উত্তান-পথে চলল এই অস্বাভাবিক দলের অপূর্ণ পরিচরণ !

[ক্রমশঃ।



# ফোর্ট উইলিয়ম

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

বাংলায় ইংরেজদের প্রথম কেল্লা পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ম

খুব কম লোকেই জানেন দুর্গটি দেখতে কেমন বা তার আকার কেমন ছিল, অথবা কোথায় ছিল তার অবস্থিতি। অনেকেই হয়ত শুনে বিস্মিত হবেন যে, পুরোনো কেল্লার একটি ভগ্নাবশেষ আজো জেনারেল পোষ্ট অফিসের অভ্যন্তরে অটুট আছে। অনেক পুরোনো স্মৃতিই আজ কলিকাতার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন ও বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হতে বসেছে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটিকে কোনক্রমেই ভোলা চলতে পারে না। বর্তমান কলিকাতা নগরী তো তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর সমৃদ্ধির চারি পাশে দীর্ঘ দীর্ঘ দানা বেঁধে। ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে এই দুর্গটি ছিল তাদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রতীক।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দিরে পুরোনো কেল্লা ও সেন্ট অ্যান ( St. Anne ) গীর্জার একটি মডেল রক্ষিত আছে যা দেখে আধুনিক কলিকাতাবাসিগণ বিলীয়মান অতীতের যংকিৎ পবিচয় লাভ করতে পারেন।

প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি এক দিনে বা এক বছরে একক চেষ্টায় নির্মিত হয়নি। তদানীন্তন বাংলার নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের জুলুম থেকে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ধন-সম্পদ রক্ষা ও নিরাপদ বাণ্য জঙ্গ ভগলী নদীর তীরে কোথাও একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্মাণের পবিকল্পনা সর্বপ্রথম উদয় হয় উইলিয়ম হেজ্জের মাথায়। ১৬৮২ থেকে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হেজ্জের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর এজেন্ট ও বঙ্গোপসাগর এলাকায় কম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনার সর্বময় ছিলেন। সূতাছুটি বা কলিকাতায় স্থান নির্বাচনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ জব চার্ণকের—এই সময় তিনি সরাসরি নবাবের সহিত শত্রুতা ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হন। চার্ণকের মন্ত্রণায় ও নেতৃত্বে ইংরেজরা ভগলী থেকে সরে এসে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সর্বপ্রথম সূতাছুটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন সাময়িক ভাবে। সূতাছুটিতে দ্বিতীয় বার আশ্রয় গ্রহণ করেন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট এইখানেই পাকাপাকি বসবাসের ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ জব চার্ণকের কলিকাতার ভিত্তি স্থাপিত হোল। জব চার্ণকের মৃত্যুর পর শ্রার জন গোম্বসুবার সূতাছুটিতে এসে দেখতে পেলেন সেখানে এক চূড়ান্ত বিশৃংখল অবস্থা। নবাবের নিকট হতে স্থায়ীভাবে বসবাসের কোন সনন্দ পাওয়া যায়নি—অথবা দুর্গ নির্মাণেরও কোন চিহ্নমাত্র নেই। শ্রার জন তখন একটি স্থান নির্বাচন করে স্থানটিকে ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিলেন মাটির দেয়াল দিয়ে—নবাবের সম্মতি পাওয়া মাত্র কুঠী নির্মাণ করা হবে সেখানে। কম্পানীর জঙ্গ একটি বাড়ীও খরিদ করা হোল, সেটিকে পরে দরকার মত সম্প্রসারিত করে অফিসের জঙ্গ ব্যবহার করা যাবে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রার চার্লস আয়ার যখন কম্পানীর এজেন্ট তখন নবাবের নিকট হতে বহু-প্রতীক্ষিত সম্মতি পাওয়া গেল। সূতাছুটিতে কম্পানীর অধিকার স্বীকৃত হোল—পাশাপাশি তিনি

এায়ের অর্থাৎ গোবিন্দপুর, কলিকাতা ও সূতাছুটির ইজারা নিল ইংরেজরা এই আশায় যে, এখান থেকে যে কর আদায় হবে তা থেকেই কম্পানীর কুঠীর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ও সৈন্যদল পোষণের খরচ উঠে আসবে। কিন্তু তাইলেও দুর্গ নির্মাণের বহু দুরতিক্রম্য বাধা দেখা দিল। কম্পানী ভেবেছিল, এমন একটি দুর্গ নির্মাণ করা হবে যার দ্বারা নিজেদের লোক-লব্ধর বিষয়-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা যাবে। কিন্তু তখনই আবার বিশালাকার দুর্গ নির্মাণের দ্বারা নবাবের ভীতি ও সন্দেহ উদ্ভবের সংশয়ও দেখা দিল। পরিশেষে কম্পানীর ডিরেক্টররা পাঁচ কোণ-বিশিষ্ট একটি দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা মঞ্জুর করলেন।

কিন্তু কলিকাতাস্থ ডিরেক্টররা সলা-পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, দুর্গের আকার হবে চতুষ্কোণ। কিন্তু এই পরিকল্পনাকেও বাস্তবে রূপ দেবার মত বিখাসী ও উপযোগী কর্মচারীর যথেষ্ট অভাব দেখা দিল—দুর্গ নির্মাণের কাজ নানা কারণে বিলম্বিত হতে লাগল। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে কম্পানী চূড়ান্ত চেষ্টার জঙ্গ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোলেন। বাংলা দেশকে একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সী ঘোষিত করা হোল এবং দুর্গের নামকরণ করা হোল সম্রাট তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে—ফোর্ট উইলিয়ম।

শ্রার চার্লস ইতিমধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁকে আবার নানা প্রকার নির্দেশ, অর্থ ও ব্যাপক ক্ষমতা দিয়ে পুনরায় ভারতে প্রেরণ করা হোল। শ্রার চার্লস ভারতে বেশী দিন অবস্থান করেননি—মাত্র সাত মাসের পর দুর্গ নির্মাণের ভার তাঁর উত্তরাধিকারী জন বীয়ার্ডের হস্তে অর্পণ করে দেশে ফিরে আসেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে জন বীয়ার্ডের স্থলে প্রতিষ্ঠিত হোল রোটেশান গভর্নমেন্ট। আট জন সদস্যে গঠিত এই রোটেশান গভর্নমেন্টে দু'জন সভাপতি পালা করে নেতৃত্ব করতেন হস্তায় হস্তায়। এদেবই শাসনকালে দুর্গের পশ্চিম দিককাব গম্বুজ দু'টি ও নদী-তীরের দেয়ালের অধিকাংশ নির্মিত হয়। দুর্গ নির্মাণ শেষ হতে গ্যান্টনি ওয়েন্টডেন, জন রাসেল ও রবার্ট হেজ্জের—এই তিন জন গভর্নরের শাসনকালও শেষ হয়। সর্বশেষ সংবোজন সমাপ্ত হয় ১৭১৬ অথবা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ প্রায় আঠারো বছর লেগেছে দুর্গটির চূড়ান্ত রূপ নিতে।

দুর্গের প্রথমে নির্মিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বের গম্বুজ ও তৎসংলগ্ন দেয়ালগুলি। উত্তর-পূর্বের গম্বুজ নির্মিত হয়েছে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে গভর্নর বীয়ার্ডের সময়ে। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তিনি দুর্গাভ্যন্তরের কুঠি বা গভর্নমেন্ট হাউসও নির্মাণ আরম্ভ করে দেন এবং এই নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হয় রোটেশান গভর্নমেন্টের আমলে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরই আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের গম্বুজ নির্মাণও তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা হয়। দুর্গ এলাকার বাইরে পূব দিকের দেওয়ালের সম্মুখে অবস্থিত সেন্ট অ্যান্ গীর্জাটি রোটেশান গভর্নমেন্টের শাসনকালেই নির্মিত হয়েছে। গীর্জার অভিব্যেক-উৎসব সম্পন্ন হয় ১৭০১ খৃষ্টাব্দে এই জন তারিখে 'এসেনশান্ ডে'র পরদিন রবিবারে। ১৭০১ খৃষ্টাব্দেই দুর্গের সামনের দীঘির (লালদীঘি) সংস্কার করা হয় অর্থাৎ দীঘিটিকে আকাবে আরো বড় ও গভীরতর করা হয়। দীঘির কাটা মাটি নবনির্মিত দু'টো গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থান ভরাট করার কাজে লাগান হয়েছিল। দীঘির পাড় শক্ত করা হয়েছিল ভাঙ্গা ইট-পাথর আর ব্যালাষ্ট দিয়ে। নদীর দিককার দেয়াল নির্মাণ শুরু হয় ১৭১০

খৃঃ ফের্গ্যারী মাস থেকে। দুর্গের সামনে ইটের গাঁথনি দিয়ে একটি জেটি তৈরী করা হয় এবং সেই সঙ্গে আবক্ষ প্রকার ও সারি সারি কামান বসিয়ে এই দিকটা সুরক্ষিত করার ব্যবস্থাও সম্পন্ন হয়। পশ্চিম দিককার দেওয়াল আরম্ভ করেন গভর্নর ওয়েন্স্টেডেন ১৭১০ কিংবা ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এবং নির্মাণ-কার্য শেষ হতে লাগে ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর তারিখে লেখা একটি পত্র পাঠে জানা যায়—“জেটি নির্মিত হয়েছে কিন্তু উপরের প্রকারের নির্মাণ-কাজ শেষ হতে এখনো বাকি। সুদূর অবতরণ-মঞ্চ এবং মঞ্চের শেষ প্রান্তে অবস্থিত নদীর জোয়ার-ভাটার সকল সময় সক্রিয় ক্রেন নির্মাণের কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। দুর্গাভ্যন্তর শেষ হতে আর বাকি আছে মাত্র একটি দেয়ালের ছোট টুকটাকি কাজ আর দেয়ালের উপর প্রশস্ত পথ নির্মাণ। পূর্ব দেয়াল থেকে পশ্চিম দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত লং রো (Long Row) বা কেন্দ্রের গৃহগুলির পুনঃসংস্কারও করতে হবে। গৃহগুলির অবস্থা ভগ্নদশা এবং যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে।”

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে লেখা আর একটি পত্র পাঠে জানা যায়—“রাইটাবদের জন্ত দীর্ঘ গৃহ-সারি নির্মাণ শেষ হইয়াছে—গৃহগুলি বেশ প্রশস্ত ও আবাস্যময়ক। আবক্ষ প্রকার নির্মাণও ক্রমশঃ শেষ হবে।”

বস্তুতঃ, দুর্গ নির্মাণ কার্যেব মোটামুটি পবিসমাপ্তি এইখানে। দুর্গের চারি দিকে কোন পরিণা গনন করা হয়নি—কাজেই সুরক্ষিত ব্যবস্থা হিসেবে দুর্গের গুরুত্ব ও কার্যকারিতাও সমধিক ছিল না। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অফ ডিরেক্টররা দুর্গের সমালোচনা করে যে প্রস্তাব রচনা করেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

—“Very pompous show to the water side by high turrets of lofty buildings but having no real strength or power of defence.”

এর পূর্ব থেকে দুর্গের যে সমস্ত সংযোজনা হয়েছে তার দ্বারা দুর্গকে আরো সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়নি—মালগুদামের স্থান বন্ধির চেষ্টা হয়েছে মাত্র। মাল আমদানী ও রপ্তানীর জন্ত গুদাম-ঘর দক্ষিণ দিকের গম্বুজ-সংলগ্ন দেয়াল-ভাঙ্গুরে তোরণের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গুদাম-ঘরের সামনের বারান্দা নির্মিত হয় যার ফলে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের গম্বুজ বাওয়া-আসার পথ মূলতঃ ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু এত করেও স্থান-সমস্তার সমাধান হয়নি। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে গভর্নর ব্র্যাডিলের নির্দেশে দুর্গের দক্ষিণ প্রান্তে দুর্গ-সংলগ্ন আর একটি সুবৃহৎ গুদাম-ঘর নির্মিত হয়। গুদাম-ঘরটি দক্ষিণ-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম গম্বুজ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল—এর ফলে গম্বুজ দুটির দুর্গরক্ষণের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয় বহুলাংশে। অধিকন্তু গম্বুজ-সংলগ্ন দেয়ালটি গুদাম-ঘরের দেয়ালে পরিণত হোল এবং গুদামে বাওয়া-আসা করার জন্ত এই দেয়াল ভেঙ্গে দুর্গ ও গুদাম-ঘরে যাতায়াতের একটি প্রকাণ্ড পথেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর পর থেকে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কর্তৃক দুর্গ অধিকার পর্যন্ত দুর্গের আর কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে হুগলী নদী আজকের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হোত। আজকে

যেখানে জনবহুল ষ্ট্রাণ্ড রোডটি অবস্থিত সেদিন এটির অস্তিত্বই ছিল না—বর্তমান ষ্ট্রাণ্ড রোড সেদিন গঙ্গাগর্ভে বিলীন ছিল। জেনারেল পোষ্ট অফিস, নতুন সরকারী অফিস গৃহসমূহ, কাষ্টমস্ হাউস ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বাত্মীতি যেখানে অবস্থিত এই সমগ্র এলাকা নিয়েই পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ অংশ জুড়ে যে সুবৃহৎ গুদাম-ঘরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেখান দিয়েই গেছে বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীট। ফেরালী প্রেস উত্তর দিকের সীমানা। পূর্ব দিকে নেতাজী স্মৃতি রোড ও ডালহৌসী স্কোয়ার। তখনকার দিনে এটিকে বলা হোত লাল বাগ বা কালক্রমে লালদীঘিতে রূপান্তরিত হয়েছে। দুর্গটিকে দেখাত চতুষ্কোণ। দুর্গের উত্তর দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪০ ফুট, দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ছিল ৪৮৫ ফুট এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় প্রান্তের দৈর্ঘ্য ৭১০ ফুট। দুর্গের চার কোণায় চারটে সমচতুষ্কোণ গম্বুজ চারি দিকের উপর সতর্ক নজর রাখত। গম্বুজগুলি চার ফুট পুরু এবং ১৮ ফুট উঁচু দেয়াল দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন এবং দেয়ালগুলি সিমেন্টের গাঁথুনি দিয়ে জমাট বাঁধান টাইল ইটের তৈরী। গম্বুজ চারটির প্রত্যেকটিব মাথায় দশটি করে কামান বসান থাকত। পূর্ব দিকের এবং প্রধান গেটের মুখে পাঁচটি কামান বসিত ছিল। নদীর তীর ধরেও দুর্গ-মধ্যে ভারী ভারী কামান বসান হয়েছিল। দুর্গাভ্যন্তরে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত নৌচ নীচ গৃহ-সারি দুর্গটিকে প্রায় সম-দ্বিগুণিত করেছিল। তা ছাড়া দুর্গের চারি দিকেই দেয়াল-সংলগ্ন বহু ঘর ও খিলানযুক্ত পথ দুর্গটিকে ঘিরে বেধেছিল—ঘরগুলির ছাদ র‍্যামপার্টের কাজ করত। দুর্গের দ্বিগুণিত অংশ দুটির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত একটি সরু পথ। দুর্গের উত্তরাংশে থাকত গোলা-বাক্স, রসদ, ওষুধ পাত্রের দোকান, কামারশালা প্রভৃতি। এই অংশেই নদীর দিকে একটি ছোট গেটের নিকটে দণ্ডায়মান থাকত পতাকা-দণ্ডটি। দুর্গের কেন্দ্রে ছিল অস্ত্রাগার ও ল্যাবরেটরী। যে গৃহ-সারি উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণাংশকে পৃথক করেছিল তাদের বলা হোত লং রো (Long Row)। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় দিকে এইটাই হোল রাইটাস বিল্ডিং বা কম্পানীর কর্মচারীদের বাসগৃহ। গৃহগুলি ছিল যেমন স্নাত্যসেতে তেমনি অস্বাস্থ্যকর।

দুর্গের দক্ষিণ দিকে দু'টো ফটক ছিল—একটি ফটক দিয়ে যাওয়া যেত নদীতে, পারাঘাটায় যেখানে কম্পানীর ক্রেন সবল সময় কার্যরত থাকত। আর একটি ফটক দিয়ে এসে পড়া যেত পূর্ব দিকে এক বিরাট এ্যাভিনিউতে—যার নাম পরে বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে যথাক্রমে ডালহৌসি স্কোয়ার নর্থ, লালবাজার, বহুবাজার, বৈঠক-খানা। দক্ষিণ দিকের গৃহগুলি কম্পানীর মাল গুদামজাত করে রাখার জন্ত ব্যবহৃত হোত। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ দেয়ালের বহির্ভাগে কয়লাঘাট স্ট্রীট ধরে কম্পানীর আমদানি-রপ্তানীর মাল-গুদাম নির্মিত হয়। মাল-গুদামের পশ্চিম দিকেই ছিল একটি ছুতারখানা। দক্ষিণাংশের কেন্দ্রে গভর্নরের প্রাসাদ। প্রাসাদটিকে দেখাত অনেকটা ইংরেজী ‘[’ চিহ্নের মত। এর পশ্চিম ও প্রধান অংশ দৈর্ঘ্যে ২৪৫ ফুট। এই বাহুর কেন্দ্রে ছিল এক বিরাট তোরণ এবং তোরণ থেকে নদীবক্ষে সিঁড়ি পর্যন্ত দু'পাশে সমব্রহ্মিত স্তম্ভশ্রেণী। প্রধান ফটক-পথে প্রবেশ করে বাম পাশ দিয়ে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করলেই বিরাট হলঘর ও

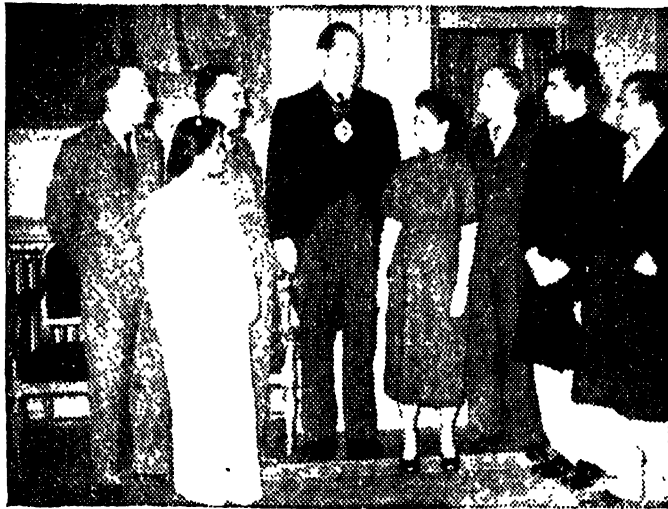
প্রধান প্রধান কক্ষগুলি। দক্ষিণ-পূর্ব অংশ গভর্ণরের বাসের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। পূর্ব দিকের ফটকের উভয় পার্শ্ব দিয়ে পূর্ব দিকের দেয়ালের সমান্তরালে দুই সারি খিলান নির্মিত হয়েছিল। প্রথম খিলান-সারিতে দেয়াল-সংলগ্ন কুঠাগুলি অবস্থিত ছিল আর দ্বিতীয় খিলানের সারি কুঠাগুলি পশ্চিমাংশের বাবান্দার কাজ করত। প্রথম খিলান-সারি ও দেয়ালেব অন্তর্গত স্থান মাঝে মাঝে দু'পাশে প্রাচীর-বেষ্টিত করে যে সমস্ত কক্ষ তৈরী হয়েছিল তারই একটিতে ঘটেছিল নিরঙ্কুস ভাবে অতিরিক্ত 'অন্ধকূপহত্যালালী'। খিলানগুলির পরিমাপ ছিল আট ফুট নয় ইঞ্চি এবং খিলান-নির্মিত কক্ষগুলি ব্যবহৃত হোত কয়েদখানা, সৈন্যদের ব্যারাক প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে।

সংক্ষেপে এই তোল গঙ্গাতীরে অবস্থিত ইংরেজদের নির্মিত প্রথম কেল্লার চেহারা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিবাজদ্দৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করেন। উপনিবেশিকরা প্রস্তুত ছিলেন না এই আক্রমণের জন্ত। সূর্য থেকেই দারুণ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। প্রথমে ইংরেজদের বাস-এলাকা রক্ষার চেষ্টা চলে কিন্তু সে-চেষ্টা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। তখন তারা বাধ্য হয়ে সরে এল দুর্গাভ্যন্তরে। সেখানেও আর এক বিশৃংখলার রাজত্ব। দুর্গ রক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয় এবং এই বিপদে কি করা যায় সে বুদ্ধি দেবার মতও লোক ছিল না। গভর্ণর ডেক ও বেনার ভাগ ইংরেজগণ 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' এই নীতি অনুসরণ কবে নদীতে অবস্থিত জাহাজে পলায়ন কবলেন আর অন্ধকূপহত্যার মিথ্যা কাহিনী রটনাকারী জন জেবানিয়া হলওয়েল প্রমুখ ১৭ জন খেতকায় ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পণ করে দুর্গেই অবস্থান করতে বাধ্য হন। পলায়নের উপায় থাকলে

এঁরাও যে পালাতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই সামান্য গোলাগুলী-ছোঁড়ার পর দুর্গ অধিকৃত হয়। ২০শে জু. নবাব উত্তর দিকেব গেট দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন।

নবাবের অধিকাংশে থাকা কালীন দুর্গের কতকগুলি গৃহ ধ্বংসা করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং কলিকাতারও নানা পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল আলিনগর। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ জাম্ময়ারী আবার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলিত হয় এবং দুর্গ আবার পূর্বকার অবস্থায় ফিরে আসে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কম্পানীর সমস্ত মালপত্রের সরিয়ে ফেলে দুর্গটিকে সম্পূর্ণ সৈনিকদের ব্যারাকে পরিণত করা হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে গোটা মাল-গুদাম ও লং রোর গৃহগুলি সামান্য সংস্কার করে কর্ণেল কুটের অফিসারদের অভ্যর্থনার জন্ত ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব দিকেব ফাটক ও অন্ধকূপ কয়েদখানার মধ্যবর্তী স্থানে একটি সাময়িক গির্জা নির্মিত হয়। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে দুর্গ হতে সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ অপসারণ করে স্থানটিকে কঠিন হাউসে রূপান্তরিত প্রস্তুতি চলে এবং এই উদ্দেশ্যে অনেক নতুন নতুন গৃহ নির্মাণ ও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ এই সময় হতেই দুর্গের দ্রুত ভাগ্যবিপর্যয়ের সূত্র। এদিকে হুগলী নদীরও দিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—নদী সবে এসেছে বহু দূরে। কাজেই জীবন-ম্রোতের দিক পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

পুরোনো কেল্লা অতীত যুগের মানুষের কর্ম-কুশলতাব এক নগণ্য নিদর্শন—ভিক্টোরিয়ান যুগের লোকের মনে আর রং ধবাত্তে সক্ষম হোল না। হেষ্টিংসের শাসনকালে দুর্গের অবশিষ্টাংশও সম্পূর্ণ অপসারিত হয়। নতুন কঠিন হাউসের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার। কলিকাতা-বাগিগণ সাদর অভিনন্দন জানাল—এই নতুন পরিবর্তনকে।



লণ্ডনে আন্তর্জাতিক যুব-সম্মেলনে লর্ড মেয়র এবং ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিদের দেখা যাচ্ছে।

গঙ্গাধর শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—  
ত্ৰায়বার্তিক তাৎপৰ্য টীকা (সম্পাদিত ১৮৯৮), ত্ৰায়মঞ্জরী  
(১৮৯৫), ত্ৰায়রত্নমালা (কালী, ১১০০), বসগঙ্গাধর (কালী, ১১০৩)।  
গঙ্গাধর সরস্বতী—পণ্ডিত। জন্ম—১৮শ শতাব্দী। গ্রন্থ—  
বেদান্তসিদ্ধান্ত মুক্তিমঞ্জরী।

গঙ্গানাথ বা, মহামহোপাধ্যায়—শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার। জন্ম—  
১৮৭২ খৃঃ ২৫এ সেপ্টেম্বর, এলাহাবাদ। এম, এ, ডি-লিট।  
অধ্যাপক মুন্সের সেন্ট্রাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—ভাব-  
বোধিনী (১৯০৫), ভক্তিকল্লোলিনী (১৮৯৬) শব্দার্থমঞ্জরী  
(১৮৯৪), কবিবহন (তিল্লী, প্রয়াগ—১৯২১), Sloka  
Varttika (১৯০০), কতিপয়দিব্যাসঙ্গমগ্রন্থ (১৮৯২),  
বেদমাহাত্ম্য (১৮৯৪), Sloka Tantra Varttika (১৯০৩),  
সম্পাদিত—A study of the Prabhakar School of  
Purba mimamsa (১৯১০), Kavyaprakasa of  
Mammata (১৮৯৪)।

গঙ্গা প্রসাদ অগ্নিত্রোহী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Princess of  
Wales, ১ম ও ২য় খণ্ড।

গঙ্গানাবায়ণ বসু—সংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ দিবাকর  
(মাস্তাহিক—১৮৩৮), সংবাদ বাজবাণী (১৮৪৪), জনসংবাদী  
(১৮৪৭)।

গঙ্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার—চিকিৎসক। জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ  
জিবাট বলাগড় (ভগলী)। মৃত্যু—১৮৮৯ খৃঃ ভবানীপুর। পিতা—  
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ—মাতৃশিক্ষা (১৮৭১ খৃঃ), চিকিৎসা  
প্রকরণ, স্ত্রীচিকিৎসা (১৮৭১), Principles and Practice  
of Medicine, ২য় খণ্ড (১৮৬৯)। অনূদিত গ্রন্থ—নির্দেশক  
এবং শাস্ত্র—শারীর বিজ্ঞা (১৮৭১)।

গঙ্গা ভাস্কর—পণ্ডিত। গ্রন্থ—শকুনাবলী।

গঙ্গাবাম—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—ভাবফল।

গঙ্গাবাম—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বুদ্ধজয়োৎসব।

গঙ্গাবাম দেব চৌধুরী—কবি। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে  
মৈমনসিংহে। পিতা—হুসৈনাবায়ণ। গ্রন্থ—মহারাত্রি পূরণ,  
শুকসংবাদ, লবকুশ চরিত্র।

গঙ্গাশরণ হরদেব সহায়—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। সম্পাদিত গ্রন্থ—  
নরপতি জয়চর্য (মীরট), ভৃগুসংহিতা ১ম, ২য় (মীরট),  
প্রত্যক্ষ মুক প্রশ্ন ক্রিয়া (ঐ মীরট)।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১১-১৩শ  
শতাব্দী মিথিলায় (গৌড়)। গ্রন্থ—তত্ত্বচিন্তামণি।

গজপতি রায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চন্দ্ররোহিণী (১৮৭৪)।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৩১৫ বঙ্গ,  
২৬ কান্তিক। গ্রন্থ—দেশ-বিদেশের ধর্ম, ইউরোপের সেবা  
সাহিত্যিক, মহাভারতের গীতি গঙ্গা, দ্বিতীয়শচবিজ্ঞম্, স্বর্ণমুকুর, পুরুষ ও  
রমণী, বহু বিচিত্র, রাজ্যের তপস্বী, বজ্রনীলম্বা, প্রেরণা, কমা ও  
সেমিকোলন।

গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায়—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও  
আয়ুর্বেদবিদ। এম, এ, এল, এম, এস। চিকিৎসক। বিজ্ঞানিধি,  
সরস্বতী উপাধিলাভ। গ্রন্থ—সিদ্ধান্ত-নিদান, আয়ুর্বেদ-সংহিতা,  
প্রত্যক্ষ-শরীরম্, ১ম, ২য়, ৩য়, Hindu Medicine Science  
of Aurved, আয়ুর্বেদ-পরিচয়।

সাহিত্য

সবক-বন্ধু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

গণপতি—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—গুজর প্রদেশ। পিতা—  
হরিশঙ্কর জ্যোতিষী। গ্রন্থ—মুহূর্ত গণপতি (১৮৮৫ খৃঃ)।

গণপতিকৃষ্ণ গুজর-হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বলভদ্রদেশকা  
রাজকুমার জয়ন্ত।

গণপতি ঠাকুর—মৈথিলী কবি। ইনি 'যোগীশ্বর' উপাধি লাভ  
করেন। পিতা—জয়দত্ত। গ্রন্থ—গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

গণপতি সরকার, বিজ্ঞানজ্ঞ—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—  
কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিগাচাটার সরকার বংশে। গ্রন্থ—কামন্দকীয়  
নীতিশাস্ত্র। জ্যোতিষযোগতত্ত্ব, রসনির্ভর, শ্রাবণপদ্ধতি, ফলদীপিকা,  
পুষ্পবাণবিলাসম্। উপনয়ন সন্ধ্যাতর্পণ, মধ্যম রহস্ত, কালিকাপুরাণীয়  
দুর্গাপূজা পদ্ধতি, যজুর্ সংস্কার পদ্ধতি। সম্পাদক—কায়স্থ-পত্রিকা  
(১৩২৭-২৮, ১৩৩১-৩২)।

গণেশনাথ ঠাকুর—সঙ্গীতকার ও অনুবাদক। জন্ম—  
জোড়াসাঁকোব বিখ্যাত ঠাকুর বংশে। পিতা—গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
গ্রন্থ—বিক্রমোৎসবী (বঙ্গানুবাদ)।

গণেশ দৈবজ্ঞ—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। জন্ম—১৫শ শতাব্দীর  
মধ্যভাগে। পিতা—কেশব দৈবজ্ঞ। গ্রন্থ—বৃহত্তথিচিন্তামণি,  
গ্রহসংবাদ, ত্রিখাদিপাত্র, বুদ্ধিবিনাসিনী (টীকা)।

গণেশচন্দ্র ডাটাচার্জ—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—যোগবাশিষ্ঠ  
রামায়ণ (১৮৭৫)। মহাভারত (রোহিণী সরকার সহ—  
১৮৭১-৭৫)।

গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবনীসংগ্রহ, ১ম,  
২য়, ভ্রমণকাহিনী, বৈজ্ঞানিক, তারকেশ্বর, সেনাপিয়ার গ্রন্থাবলী,  
স্বপ্নবৈচিত্র্য, খোকার খেলা, বাসিকা ব্রতের ছড়া, Saints of  
India, দার্জিলিং ও চট্টল, Wonders of the World, A  
Bengali Dictionary of Court Terms.

গণেশবিহারী মিশ্র—সম্পাদক। জন্ম—সফৌ। জমিদার।  
সম্পাদিত গ্রন্থ—দেবগ্রন্থাবলী (শ্রীমবিহারী মিশ্র সহ)।

গতিগোবিন্দ—বৈষ্ণব পদকর্তা। নিবাস—মালিচাটা। পিতা—  
শ্রীনিবাস আচার্য। মাতা—গৌরাঙ্গপ্রিয়া। গ্রন্থ—অমৃতপ্রকাশ খণ্ড,  
বীরাবলী।

গদাধর ত্রায়বাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—শ্রীহট। গ্রন্থ—  
চিন্তামণি আলোক, দীপ্তিটীকা।

গদাধর দাস, কালীদাসমুখ—কবি। জন্ম—বর্ধমান জেলায়  
সিদ্ধিগ্রামে ১৭শ শতাব্দীতে। পিতা—কমলাকান্ত দাস। গ্রন্থ—  
জগৎ-মঙ্গল (১৬৪২)।

গদাধর প্রসাদ শর্মা, বৈজ্ঞ—তিল্লী গ্রন্থকার। জন্ম—  
এলাহাবাদ। হিন্দী গ্রন্থ—ব্যাকরণ দর্শন, ব্রহ্মকুল পরিবর্তন।

গদাধর ভট্টাচার্য—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দী পাবনা জেলায় লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামে। পিতা জীবদেবাচার্য। শিক্ষা—মিথিলা গমন করিয়া জ্ঞানেশ্বর অধ্যয়ন ও তৎকালে অসাধারণ নৈয়ায়িক পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসিত। অতঃপর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া জ্ঞানেশ্বর অধ্যাপনা করেন। গ্রন্থ—কুস্তমাজলিবাখ্যা, মুক্তাবলীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীপ্তি, দীপ্তিবিব গদাধরীবাখ্যা, ত্রুণনির্গণ, রত্নকোষবাদবহুত্ব, আখ্যাতবাদ, শব্দবাদ, তত্ত্বচিন্তামঞ্জাবোধটীকা, প্রামাণ্যবাদ দীপ্তির টীকা, মুক্তিবাদ, শব্দপ্রামাণ্যবাদ রহস্য, স্মৃতি-সংস্কারবাদ।

গদাধর সিং—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ। হিন্দী গ্রন্থ—চীন মেতেরামসু, হমারী এডওয়ার্ড তিলক যাত্রা, ক্রশ জাপান যুদ্ধ, লীলাবতী রমণী, জাপানী রাজবাবস্থা।

গদাধর সিংহ বায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভোগেব পথে, স্বপ্ন-সুন্দরী, সমাজ-শাসন।

গয়াদত্ত ত্রিপাঠী—হিন্দী গ্রন্থকার। নিবাস—এলাহাবাদ। শিক্ষা—বি. এ.। গ্রন্থ—খাদ ওর উনকা ব্যবহার, লাখকী পেন্ডি।

গাগা ভট্ট—পণ্ডিত। নামান্তর—বিশ্বেশ্বর ভট্ট—জন্ম—১৭শ শতাব্দী। পিতা—দিনকর ভট্ট। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক গাগা ভট্ট পৌরোহিত্য করেন। (৬৭৪ খৃঃ)। গ্রন্থ—কায়স্থ ধর্ম—দীপ, বাকাগম (টীকাগ্রন্থ)।

গাঙ্গেশ্ব বিজ্ঞান—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—পঞ্চাঙ্গ বিজ্ঞান (১৬৪৩ খৃঃ)।

গান্ধী, মহাত্মা, মোহনচাঁদ করমচাঁদ—বাক্যনীতিবিদ ও দেশনেতা। জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ ২রা অক্টোবর। মৃত্যু—১৯৪৮ খৃঃ দিল্লী নগরীতে। বার-গ্যাটল, আইন ব্যবসায়, বোধাই হাইকোর্ট, এ্যাডভোকেট, নেটাল সুলীমকেট, দক্ষিণ-আফ্রিকায় এসিয়াবাসীদের বহিষ্কারের আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। বয়স যুদ্ধের সময় সেবদল গঠন (১৮৯৯), এশিয়াটিক ল অ্যামেগুমেট অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯০৬)। কাবাবাস। ভারতে প্রত্যাবর্তন (১৯১৫), কাইজার-ই-হিন্দ পদকলাভ (১৯১৫), চম্পাবণ সন্ত্যগ্রহ (১৯১৬), সরমতী আশ্রম স্থাপন, অসহযোগ আন্দোলন, খন্দর প্রচার ইত্যাদি। বেলগাঁও কংগ্রেস সভাপতি (১৯২৫), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২৯), ডাঙী লষণ আইন অমান্য অভিধান (১৯৩০), কাবাবাস ও মুক্তি। গান্ধী-আরউটন চুক্তি (১৯৩১), গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান (১৯৩১), পুনরায় গ্রেপ্তার, যারবেদা জেলে বাস। পূণাচুক্তি স্বাক্ষর যারবেদা জেলে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (Award) প্রতিবাদে অনশন ও মুক্তিলাভ। ইহারই প্রচেষ্টায় সাইমন কমিশন ও ব্র্যাকোর্ড ক্রিপস মিশন ভারতে আসেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর ইনি বিভিন্ন দেশে প্রার্থনা-সভার অমুষ্ঠান করেন। দিল্লীতে এইরূপ অমুষ্ঠানে ইনি নিহত হন। সম্পাদক—Young India, নবজীবন (হিন্দী সাম্প্রদায়িক) গ্রন্থ—Guide to Health, Autobiography.

গিরিজাকুমার বসু—কবি। সম্পাদক—বাহুবর (প্রেমাসুর আতর্ষী সহ—১৩৩৪—৩৭), রেবু (১৩১০)।

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—কবি ও সাংবাদিক। মৃত্যু—

১৩৪১ বঙ্গ। পিতা—বহুনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক—সাহিত্য সমাজ (পত্রিকা), পরিচালক—বার্তাবহ (সংবাদপত্র)।

গিরিজানাথ রায়—চিকিৎসক। গ্রন্থ—স্বাস্থ্যবিধান ও পথ-বিচার, মুষ্টিযোগ ও স্বাস্থ্যকথা, ম্যালেরিয়া ও তাহার প্রতিকার।

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার। জন্ম—১২৬৮ বঙ্গ, চৈত্র, ববিশালের অন্তর্বর্তী সিদ্ধিকাটি গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৫ ২২এ ভাদ্র। শিক্ষা—বরিশাল জেলা স্কুল, এন্ট্রান্স (সিটি কলেজিয়েট স্কুল), এফ, এ ও বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), বি, এল। আইন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—গৃহলক্ষ্মী ১ম ও ২য়, বক্ষিমচন্দ্র ১—৩ খণ্ড, হিতকথা, দম্পতীর পত্রালাপ।

গিরিজাভূষণ ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রবাসী বাঙ্গালী (১২৯৫ বঙ্গ)।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী—প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১৮০৫ খৃঃ (বহরমপুর)। পৈতৃক নিবাস—মৈমনসিংহ জেলার ন'পাড়া গ্রাম। পিতা—ভবানীকিশোর চক্রবর্তী। প্রথম জীবনে ইনি চিত্রশিল্পী ছিলেন। পরে বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি সঙ্গীত কলাভবনের প্রতিষ্ঠাতা, সঙ্গীত সম্মিলনীর অধ্যাপক। সম্পাদক—সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাসিকপত্র)।

গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী। সম্পাদক—দেবালয় (১৩১৮—২০)।

গিরিজাশঙ্কর সাত্তাল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেদ গবেষণা। গিরিশ্বর কবি—কবি। গ্রন্থ—গীতগোবিন্দ (পদ্মানুবাদ, ১৮১০ শক)।

গিরিশ্বর দাস—পণ্ডিত। ইনি সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক। মৃত্যু—১০৫০ হিঃ। গ্রন্থ—তর্জমাই রামায়ণ (পারস্ত ভাষায় অনুবাদ—১০৩৩ হিঃ)।

গিরিশ্বর দাস—কবি। গ্রন্থ—স্বর্ণমঙ্গলমূত্র (পদ্মানুবাদ)। গিরিশ্বরী মিত্র—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—দৃগগোলবর্ণন। গিরিবালা দেবী—ঔপন্যাসিক। গ্রন্থ—রূপহীনী, হিন্দুব মেয়ে, মুকুটমণি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার। জন্ম—১২৫০ বঙ্গ ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা বাগবাজারে বহুপাড়ায়। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ ২৫এ মাঘ। পিতা—নীলকমল ঘোষ। শিক্ষা—গৌরমোহন আচ্যের স্কুল ও হেয়ার স্কুল। পিতৃবিয়োগের কিছু দিন পরে গ্রেট ব্রাহ্মণাল থিয়েটারে অভিনয় ও ম্যানেজারী। ইহার পরে ষ্টার থিয়েটারে অধ্যক্ষতা ও বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয় করেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্য। গ্রন্থ—মার্ডিস (১২৭১), Charitable Dispensary (১২৭১), বীর ও দৈত্য (১২৭১), আলিবা (১২৭১), দুর্গাপুস্তক পঞ্চায়েৎ, (Circus pantomine—১২৭১), যামিনীচন্দ্রমাহীনা—গোপন চূষন (A kiss in the dark—১২৭১), 'সহস ইহলি আজি কবিচূড়ামণি' (১২৭১)। গীতিকাব্য :—আগমনী (১২৮৪), অকালবোধন, দোললীলা (ঐ), মায়াকর (১২৮৭), মোহিনী-প্রতিমা (ঐ), আলাদীন (ঐ), ত্রুণ-বিহার (ঐ), মলিনমালা (১২৮৮), হীরার ফুল (১২৯০), মলিনাবিকাশ (১২৯৬), আবুহোসেন (১২৯২), স্বপ্নের ফুল (১২৯৩), ফণীর মণি (১২৯৪), হীরক জুবিলী (১২৯৫), পারস্ত গ্রন্থন (ঐ),

নন্দদার (১২১৭), মহিহরণ (১২১৮), নন্দলীলা (ঐ), অভিশাপ (১২১৯), হর-গৌরী (১৩০২), বাসর (১৩০৩)। নাট্যগ্রন্থ :—আনন্দ (১২৮৮), রাবণ বধ (ঐ), সীতার বনবাস (ঐ), অভিমত্যা বধ (ঐ), লক্ষ্মণ বর্জন (ঐ), সীতার বিবাহ (ঐ), রামের বনবাস (১২৮৯), সীতাহরণ (ঐ), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐ), দক্ষসন্ত (১২৯০), দ্বৈতচরিত্র (ঐ) নন্দময়ন্তী (ঐ), কমলে কামিনী (ঐ), বুধকেতু (১২৯১), শ্রীবৎসচিন্তা (ঐ), চৈতন্যলীলা (ঐ), প্রহ্লাদ-চরিত্র (ঐ) নিমাই-সন্ন্যাস (ঐ), প্রভাসযজ্ঞ (১২৯২), বৃদ্ধদেব (ঐ), বিশ্বমঙ্গল (ঐ), রূপসনাতন (১২৯৩), পূর্ণচন্দ্র (ঐ), নসীরাম (১২৯৪), বিদ্যাদ (ঐ), প্রফুল্ল (১২৯৫), হারানিধি (ঐ), চণ্ড (১২৯৬), মুকুল-মঞ্জরী (১২৯৮), জনা (১২৯৯), করমেতি বাই (১৩০১), কালাপাহাড় (১৩০২), মায়াকানন (১৩০৪), পাণ্ডবগৌরব (১৩০৬), মনের মত (১৩০৮), ভাস্তি (১৩০৯), সংনাম (১৩১১), বলিদান (ঐ), সিরাজদ্দৌলা (ঐ), মৌরকাশিম (ঐ), ছত্রপতি শিবাজী (১৩১৪), শাস্তি কি শাস্তি (১৩১৫), শঙ্করাচার্য (১৩১৬), অশোক (১৩১৭), তপোবল (১৩১৮)। গ্রন্থসমূহ :—ভোটমঙ্গল (১২৮৯), বেল্লিকবাজার (১২৯৩), মহাপুজা (১২৯৭), সপ্তমীতে বিসর্জন (১৩০০), বড়দিনের বকশিস (ঐ), সভাতার পাণ্ডা (১৩০১), পাঁচ কনে (১৮৯৬), অশ্রুধারা (১৩০৯), শাস্তি (১৩০৯), আয়না (ঐ), ব্যায়সা-কা-তায়সা (১৩১২), ম্যাক্বেথ (অনুবাদ—১২৯৯), গৃহলক্ষ্মী (অসম্পূর্ণ)।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ সাংবাদিক। জন্ম—১২৩৬ বঙ্গ আষাঢ়, কলিকাতা। মৃত্যু—১২৭৬ বঙ্গ, আশ্বিন। পূর্বনিবাস—নদীয়া। শিক্ষা—ওরিয়েন্টাল সেমিনারী। The Bengal Recorder (সাপ্তাহিক পত্র) প্রতিষ্ঠা (১৮৪১ খৃঃ)। ইহা পরে হিন্দু পেট্রিয়ট নামে রূপান্তরিত হয়। তৎকালীন The Hindu Intelligencer, Library Chronicle, The Hindoo Patriot, Mukherjee's Magazine, The Calcutta Monthly প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রসমূহে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। গ্রন্থ—Life of Ram Dulal Dey (১৮৬৮ খৃঃ)। সম্পাদিত সাময়িক পত্র—The Bengalce (১৮৬২-১৮৬৯ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র চূড়ামণি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পার্বতী-পরিণয় নাটক (১৮৭১ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—জীবতত্ত্ব (১৮৬২ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র দেব—কবি। গ্রন্থ—ছন্দাবলী (১৮৫২ খৃঃ)।

গিরিশচন্দ্র বসু—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ইলিয়াদ (বঙ্গানুবাদ—১৮৩৭ খৃঃ)। সম্পাদক—স্বর্দামণ্ডকার (ঐতিহাসিক—১৮৩৭)।

গিরিশচন্দ্র বসু—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালখানা গ্রামে। মৃত্যু—১৮৯৮ খৃঃ। পিতা—শঙ্করচন্দ্র বসু। ইনি খল সাময়িক পত্রে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধ লেখেন। সিমলার কালীপ্রসাদ ঘোষের সাহায্যে The Hindu Intelligencer নামক একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। গ্রন্থ—সেকালের দারোগাব কাহিনী। সম্পাদক—শক্তি (ঢাকা হইতে প্রকাশিত), সহ-সম্পাদক—The Hindoo Patriot.

গিরিশচন্দ্র বসু—শিক্ষাবিদ। জন্ম—১২৬০ বঙ্গ বর্ষমান জেলায় বেড়গ্রামে। প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গবাসী কলেজ। গ্রন্থ—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ১ম, ২য় খণ্ড।

গিরিশচন্দ্র বাক্তী—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভিক্ষুদর্শন। (১৯০৫-১৯)।

গিরিশচন্দ্র নাগ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীক, বামমোহন ও তাঁহার মাহাত্ম্য, ডেপুটি-জীবন, মনুয়া। Appreciation of Raja Rammohan Roy.

গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অন্ধের দৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞাবিনোদ—সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। জন্ম—১২৩০ বঙ্গ আশ্বিন মাসে ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাজপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১০ বঙ্গ ১৭ই অগ্রহায়ণ। পিতা—রামধন বিজ্ঞাবিনোদ। শিক্ষা—সংস্কৃত কলেজ। পুস্তকাধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ (১৮৪৪-১৮৮২ খৃঃ)। গ্রন্থ—দশকুমারচরিতের বঙ্গানুবাদ (১৮৫৬), বিধবা-বিষম-বিপদ (১৮৫৮), শব্দসার (অভিধান ১৮৬০), উৎকট বিধান (১৮৭০), মুক্তবোধ ব্যাকরণ। (ঢাকা—১৮৭১), মুক্তবোধসার (১৮৮১), কাদম্বরী কথা (১৮৮৫)। সম্পাদিত গ্রন্থ—রঘুবংশ (সজীবনী টীকাসহ—১৮৫২)।

গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বেজাগাইড (The Prostitute's Act, ১৮৬১)। নিরিক সংক্রান্ত নজীর (১৮৭০)।

গিরিশচন্দ্র সেন, মৌলবী, ভাই—প্রচারক। জন্ম—১৮৩৬ খৃঃ ঢাকা জেলায়। মৃত্যু—১৯১২ খৃঃ। পিতা—মাধবরাম সেন রায়। বালাকালেই ইনি সংস্কৃত ও ফার্সী অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৫ খৃঃ ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন, সাধু অঘোরনাথ প্রভৃতির সাক্ষাৎ লাভে ব্রাহ্ম ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন। পরে ইনি নব বিধানের মৌলবী নামে অভিহিত হইতেন। গ্রন্থ—ধর্ম ও নীতি (১৮৭১ খৃঃ)। হিতোপাখ্যান (গোলস্তান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ), বিনিতা-বিনোদ, হাদিস, মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম (১৯২৭), এমাম হসন ও হোসয়ন (১৮৫৩ শক), কোরাণসরফি (বঙ্গানুবাদ, ১২৯৮), চারিজন ধর্মনেতা (১৩৩৭), তাপসমালা (১৯৩২)। সম্পাদক—বঙ্গবন্ধু (পত্রিকা, ঢাকা), মহিলা (১৩০৩-১৭)।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—মহিলা কবি। জন্ম—১৮৫৭ খৃঃ ১৮ই আগষ্ট। মৃত্যু—১৯২৪ খৃঃ ১৪ই আগষ্ট। স্বামী—বহুবাজার-নিবাসী অক্ষরচন্দ্র দত্ত বংশের নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। গ্রন্থ—অক্ষকণা, ভারত কুসুম, সন্ন্যাসিনী, শিখা (১৩০৩), অর্ঘ্য (১৩০১) আভাষ (১২৯৭), সিন্ধুগাথা (১৩১৪), স্বদেশিনী (১৩১২)। সম্পাদিকা—জাহ্নবী (১৩১৪-১৫)।

গিরীন্দ্রশেখর বসু—মনস্তত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক। গ্রন্থ—পূরণ প্রবেশ (১৩৪১), লালকালো, স্বপ্ন।

গিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—(নীলমণি বসাক সহ) পারস্য ইতিহাস (১২৫৫ বঙ্গ)।

গুণচন্দ্র গুণি—জৈন আচার্য। গ্রন্থ—মহাবীরচরিত।

গুণমতি—দার্শনিক পণ্ডিত। গ্রন্থ—অভিধর্ম কোষভাষ্য (৬৩০-৬৪০ খৃঃ)।

গুণরত্ন—বৌদ্ধ পণ্ডিত। ১৪ শতাব্দী। ঢাকাগ্রন্থ—বড়দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা।

গুণাকব—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—তোরামকবন্দ (১৭১৬ খৃঃ)।

গুণাচ্য—গ্রন্থকার। জন্ম—১ম, ২য় শতাব্দীতে মল্লীপুত্রনে।  
অজুর্নাজ হাল সাতবাহনেন প্রদান মন্ত্রী। গ্রন্থ—বৃহৎকথা।

গুণানন্দ বিজ্ঞাপাশীশ—টাকাকার। জন্ম—১৬শ শতাব্দীর শেষ  
ভাগে। গ্রন্থ—অল্পমানদীপিত টাকা, গুণবৃত্তিবিবেক, শ্রায়কুসুমাজলি-  
বিবেক, শ্রায় লীলাবতী প্রকাশ, দীপিত বিবেক, শব্দালোক বিবেক।

গুণানন্দ সেন—কবি। গ্রন্থ—মনসাব ভাসান।

গুণাভিরাম বড়ুয়া, রায় বাহাদুর—গ্রন্থকার। জন্ম—আসামে  
কামরূপ জেলায়। মৃত্যু—১৮৯৪ খৃঃ। গ্রন্থকার—আসাম বুরুঞ্জী  
(আসামের ইতিহাস)।

গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অনুবাদক। জন্ম—১৮০০ খৃঃ বিখ্যাত  
ঠাকুরবংশে। পিতা—মহাপ্রজ্ঞা ব্রহ্মনাথ ঠাকুর। গ্রন্থ—  
বিক্রমোবশী (বঙ্গানুবাদ)।

গুরুচরণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেমামৃত।

গুরুচরণ বায়ু—সাংবাদিক। সম্পাদক—রঙ্গপুর বার্তাবহ  
(সাপ্তাহিক—১৮৪৭ খৃঃ)। ইহা রঙ্গপুরের প্রথম সাপ্তাহিক।

গুরুদয়াল চৌধুরী—সাংবাদিক। সম্পাদক—মুর্শিদাবাদ সম্বাদ-  
পত্রী (সাপ্তাহিক—১৮৪০)।

গুরুদাস গুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—বিক্রমপুরের রাজগামে। গ্রন্থ—  
মহারাজ বাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত (কাব্য)।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রাব—শিক্ষাবিদ ও বিচারপতি। জন্ম—  
১৮৪৪ খৃঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে নাবিকেলডাকায়। মৃত্যু—১৯১৮  
খৃঃ ডিসেম্বরে। পিতা—রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এম-এ (১৮৬৫),  
বি-এল, ডি, এল, পি, এইচ, ডি। অধ্যাপক—বহুবনপুর কলেজ,  
প্রেসিডেন্সী, ফ্রেন্সেল গ্র্যাসেমন্ট্রী। আইন ব্যবসায়—কলিকাতা  
হাইকোর্ট (১৮৭২), ঠাকুর আইন অধ্যাপক (১৮৭২), বিচারপতি  
(১৮৮৮—১৯০৪), ভাইস চ্যান্সেলর (১৮৮৯—১৮৯৩)। গ্রন্থ—  
জ্ঞান ও কর্ম। 'The Elements of Arithmetic, Hindu  
Law of Marriage & Stridhan (১৮৭৯), A few  
thoughts of Education (১৯০৪), A note on the  
Debnagri Alphabets (১৮৯৩), Elementary  
Geometry (১৯০৭)।

গুরুনাথ বিদ্যানিবি—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। সম্পাদিত গ্রন্থ—  
ত্রিবেদীয় সঙ্ঘাবিধি (১৩১৮ বঙ্গঃ), ভাষা-পরিচ্ছেদ (১৩১৭),  
কুমারসম্ভব (১৩১৭), ভট্টিকাব্যম্ (১৮৩৩ শক), রঘুবংশ  
(১৮৩২ শক), কলাপ ব্যাকরণম্ (১৩১৩), শব্দরূপকল্পদ্রুম  
(১৩১৬), অমরকোষ টীকা (১৩১০), মিত্রলাভ (১৩২৪),  
কুব্জবৃত্তি, কোবসংগ্রহ, বিদ্যখোদিতবঙ্গিণী।

গুরুনাথ সেনগুপ্ত—ফবি। গ্রন্থ—বীবোত্তর কাব্য (১২১০)।

গুরুপ্রসাদ সেনগুপ্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা জেলার ভান্ডাবাড়ী  
গ্রামে। মুদ্রেক। গ্রন্থ—পদচিন্তামণিমালা (কীর্তনগ্রন্থ, ১২৮৩ বঙ্গ)।

গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য—পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। অনুবাদ গ্রন্থ—বড়াবলী,  
মুজারারুস, স্বপ্নবাসবলতা, চণ্ডকৌশিক, মালবিকাগ্নিমিত্র, প্রতিজ্ঞা  
বোগন্ধরায়ণ, উত্তরচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোবশী, মালতীমাধব,  
মহাবীরচরিত, বেণীসংহার, মুচ্ছকটিক, বালচরিত, মধ্যমাযোগ,  
চাক্রদত্ত, দূতকাব্য, দূত-বচোৎকচ, অভিনায়ক, কর্ণবধ, পঞ্চরত্ন।

গুরুসদয় দত্ত—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলায়। পিতা—  
রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। আই, সি, এম্। ব্রতচারী নৃত্যের প্রবর্তক।  
গ্রন্থ—সরোজনলিনী, পাগলামীর পুঁথি, ভজার বাঁশী, চাঁদের  
তুড়ি।

গোকুলচাঁদ শর্মা—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রাণবীৰ প্রতাপ  
(১৯১৫)।

গোকুলচন্দ্র ভবন—জ্যোতির্বিদ। নিবাস—জয়পুর। গ্রন্থ—  
ভাবতীয় জ্যোতিষ যন্ত্রালয়, ভেদপাঠ প্রদর্শক।

গোকুলচন্দ্র নাগ—সাহিত্যিক। উল্লেখ কালিদাস নাগের কনিষ্ঠ  
ভাতা। ইনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। গ্রন্থ—পথিক,  
ঝড়েব দোলা, মায়াকুসুম। সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা—কল্লোল  
(মাসিক পত্র)।

গোকুলনাথ—বৈষ্ণব ভক্ত। গ্রন্থ—চৌবাশি বার্তা, (ভক্তদেব  
জীবন কাহিনী—১৫৬৮ খৃঃ)।

গোকুলমোহন রাধনী—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—দেশভক্ত  
লাজপৎ রায়, শিব নবতি, নিত্যদর্শন, দেশ কা ধন।

গোকুলানন্দ সেন—গ্রন্থকার। নামান্তর—বৈষ্ণব দাস। জন্ম  
—১৮শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মুর্শিদাবাদ জেলাব কান্দীর অন্তর্গত  
টেংগ গ্রামে। পিতা—ব্রজকিশোর সেন। গ্রন্থ—পদবল্লভক  
(সংকলন), গুরুকুল পঞ্জিকা।

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ—বাজনৈতিক নেতা ও অর্থশাস্ত্রবিদ  
পণ্ডিত। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ বোম্বাই প্রদেশে কোলাপুর নামক  
স্থানে। মৃত্যু—১৯১৫ খৃঃ ১১এ ফেব্রুয়ারি। শিক্ষা—বি, এ  
(১৮৮৪), অধ্যাপক, ফার্স্ট সন কলেজ। সভাপতি, জাতীয়  
মহাসভা, বাবাগঙ্গী (১৯০৫)। সম্পাদক—সুধাকব (ইঙ্গ-মহাধি  
সাপ্তাহিক), সর্বজনীন সভা।

গোপবন্ধু দাস—দেশহিতব্রতী নেতা। মৃত্যু—১৯২৮ খৃঃ।  
সম্পাদিত সাময়িক পত্র—সমাজ।

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ—কবি। জন্ম—১৮৫০ (আনু) মালদহ  
শহরে। পিতা—হরচন্দ্র ঘোষ। শিক্ষা—বি, এ (প্রেসিডেন্সী  
কলেজ), বি, এল (১৮৭৬), হাইকোর্টে ওকালতী, মুদ্রেক (১৮৮২)।  
গ্রন্থ—কুসুমমালা (১৮৭৭), ব্রহ্মচারী (কাব্য)।

গোপালকৃষ্ণ মিত্র—সাংবাদিক। সম্পাদক—ভারত-সংস্কারক  
(সাপ্তাহিক—১২৮০-৮১)।

গোপাল চক্রবর্তী—কবি। গ্রন্থ—ভার্গববিজয় কাব্য (১২৮০)।

গোপালচন্দ্র ঘোষ—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোবিজ্ঞান (১৮৭৪)।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী—টাকাকার। গ্রন্থ—গৌরীচন্দ্র সংক্ষিপ্তসারের  
টাকা।

গোপালচন্দ্র দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সুলোচনা অথবা আদর্শ-  
ভাষা (১২৮৯)।

গোপালচন্দ্র দে—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ-মনোবজ্ঞন  
(সাপ্তাহিক—১৮৪৭)।

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হেমাসিনী বা  
অজুতানিনয় (১৮৯৫), শিক্ষাপ্রণালী।

গোপালচন্দ্র মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—পত্নীপুস্পহার (১৮৭২)।

[ ক্রমশঃ ]

# আ মা দে র লো ক সা হি তে না রী

শ্রীকামিনীকুমার রায়

মেয়েলী ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথা লোকসাহিত্যের অন্তর্গত।

সেকালে আমাদের নারীদের আদর্শ কি ছিল, কি আদর্শে তাহারা আপনাদিগকে গড়িয়া তুলিতেন, জীবনে কি তাঁহারা কামনা করিতেন, মেয়েলী ব্রতের অনেক ছড়াতেই তাহারা পরিচয় পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে কুমারীরা 'হরিব চরণ' ব্রত করে; ব্রতের ফল তাহারা কি চায়?—

“রাজ্যেশ্বর স্বামী চায়।

দরবার-জোড়া বেটা চায়।

সভাসুন্দর জামাই চায়।

ঘরবা গৃহিণী বউ চায়।

সর্ব-সুন্দরী কত্তা চায়।

আলনায় কাপড় দলমল করে।

ঘরের বাসন বন্ধুমকু কবে।

গোয়ালে গোরু মরায় ধান।

বছব বছব পুত্র পান।

না দেখেন স্বামি-পুত্রের মরণ।

না দেখেন বন্ধুবান্ধবের মরণ।

এক হাঁটু গঙ্গার জলে মরে।

পায় যেন হরিব চরণ।”

এই ছড়াটিতে সেকালে নারীরা কি কামনা করিতেন, কি পাইলে তাহারা জীবনে সুখী হইতেন, তাহাবই একটি সুন্দর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন নারীরা শুধু স্বামি-পুত্রের মঙ্গলই কামনা করিতেন না, বন্ধু-বান্ধবও দীর্ঘায়ু হউক, ইহা চাহিতেন।

‘দশপুতল’ ব্রতের একটি ছড়ায় সেকালে নারীরা কি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বালিকা-বয়স হইতেই আপনাদিগকে ভবিষ্যতের জ্ঞাত প্রস্তুত করিয়া লইতেন, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাটিতে দশটি পুতুল আঁকিয়া, এক-একটি পুতলে হাত রাখিয়া বালিকা বলে :—

মরিয়া মনুষ্য হব, বামের মত পতি পাব।

” ” ” সীতার মত সতী হব।

” ” ” লক্ষণের মত দেবর পাব।

” ” ” দশরথের মত খন্তর পাব।

” ” ” কৌশল্যার মত শাস্ত্রী পাব।

” ” ” কুন্তীর মত পুত্রবতী হব।

” ” ” দ্রৌপদীর মত রাধুনী হব।

” ” ” দুর্গাব মত সোহাগী হব।

” ” ” পৃথিবীর মত ভার সব।

” ” ” যমীর মত জেঁও হব।

এই কামনার বস্তুগুলিকে সেকালের বলিলাম এই জ্ঞাত যে, একালের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। খন্তর-শাস্ত্রী, দেবর-ভাস্কর পরিবৃত্ত একাম্ববর্তী পরিবাস একালের অনেক নারীই পছন্দ করেন না; দ্রৌপদীর মত রাধুনীও তাহারা হইতে চান না, ঠাকুর-চাকরদের উপর এই কাজটির ভাব চাপাইতে পারিলেই যেন তাহারা সুখী হন।

সেকালে নারী-জীবনের আর একটি কামনা ছিল,—‘সতীন যেন হয় না।’ সর্বকালেই নারীদের ইহা অন্তরে বধ্য। কারণ, “স্ত্রীলোক ভাগের প্রেম চায় না, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বেচ্ছা স্ত্রীলোকের জায়-অজায় বিচার থাকে না।” সপত্নী-কলহে কত সুখে সংসার যে গড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, সপত্নী বহুত্ব ও দুর্গবহাবে কত অভিজাত পরিবাসে কত সাক্ষীর যে নয়ন-জল ঝরিয়াছে, আমাদের লোকসাহিত্যে তাহা দৃষ্টান্তে অভাব নাই। সে যুগে এক পত্নী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও আবার বাব বাব দারপরিগ্রহ করা যেন ধনী এবং কুলীন স্বামীদের একটা নেশা ছিল। এই নেশার ঘোরে তাহারা সংসারের আবহাওয়া বিস্মৃত করিয়া তুলিতেন। রাষ্ট্র ও সমাজ তখন এই স্বেচ্ছা নীতির ছিল। তাই স্ত্রী নিজেই অনেক সময় নানী অন্তর্ধান-অভিচারণে ভিতর দিয়া স্বামীকে বশে বাগিতে চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন সাহিত্যে আমরা ডাইনীদেব ও অনেক তুচ্ছ-তাকের কথা পাই, কিন্তু নারীদের এই বৃত্তি অবলম্বনের জ্ঞাত তখন পুরুষেরাই দায়ী ছিল। তাহারাষ্ট সাক্ষীর চক্ষে নিজ হস্তে শলাকা বিদ্ধ করিয়া, দবদাব মত জিজ্ঞাসা করিত, “তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি বৈদেহী?” কোন কোন ব্রতের ছড়ায় সপত্নী প্রাতি মনোভাবটি, দেখুন, কেমন উলঙ্গ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে!

১। পাণি, পাণি, পাণি।

সতীনকে গঙ্গায় নিয়ে যায়।

আমি খাটে বসে দেখি।

২। উদ্বেড়ালি উৎ যা।

স্বামী রেখে সতীন যা।

৩। অশ্বপুতলায় বাস করি।

সতীন কেটে নিখুঁত করি।

সাত সতীনের সাত কৌটা।

তাব মাঝে আমাব এক অব্ভবের কৌটা।

অব্ভবের কৌটা নাড়িচাড়ি।

সাত সতীনকে পুড়িয়ে মাঝি।

একে একে সাতটি সতীন যিনি আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সাক্ষী কি না আবার তাহাবই দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছেন! স্বামীর বিবন্ধে এতটুকু অভিযোগও নাই। ভাবতায় নারীর পক্ষেই ইহা সম্ভব।

ব্রতকথাগুলির ভিতর আমরা নারীর এক কল্যাণময়ী মূর্তি সাক্ষ্য পাই। বালিকা-বয়স হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কত কৃষ্ণসাধনাব ভিতর দিয়া তাহারা চলিয়াছেন। কিসে স্বামি-পুত্রের মঙ্গল হইবে, কিসে গৃহ-সংসারের সকলের উন্নতি হইবে,—তাঁহাদের কেবলই এই চিন্তা। আজ শনিব উপবাস, কাল রবিব; আজ যমী, কাল মঙ্গলচণ্ডী; আজ বনদুর্গা, কাল সবচণী। ব্রতান্তর্গতের তাঁহাদের অন্ত নাই। শুদ্ধ মনে, শুদ্ধ বসনে, কত নিয়মে, কত এক উপকরণে জীবনভর তাহারা এই সকল করিয়া যান। স্বামী চৌদ্ধ ডিঙ্গা লইয়া বাগিজে যাত্রা করিয়াছেন, স্ত্রী গৃহকোণে বসিয়া একমনে মঙ্গলচণ্ডীকে



ডাকিতেছেন ! পুত্র প্রবাসে আছে, মা বাড়ী থাকিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছেন ! তবে কি ছেলে তাঁহার ভাল নাই ? তাড়া-তাড়ি মানত করিলেন, ‘মা সুবচনী, ছেলে আমার ভাল আছে জানিলে কালই তোমায় পান-সুপারি দিয়া পূজা করিব।’ জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্যসঙ্গী ব্রহ্ম, মম যষ্টীর ঘটে জলের ছিটা দিতে দিতে বলিতেছেন :—“জ্যৈষ্ঠ মাসে অবণ্য যাট। ফিরে ঘুরে এলো যাট। বার মাসে তের যাট। যাট যাট যাট। ঝি চাকর, গোব্দ-বাছুর, পশু-পক্ষী, কর্তা, ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি, নাতি-নাতনী, যাট যাট যাট।” এখানে নারীর নিজের জ্ঞান কোন প্রার্থনা নাই, অপর সকলের মঙ্গলেই তাহার মঙ্গল। লোকচক্ষুর অন্তরালে, নীরবে নিভূতে কত যুগ ধরিয়া নারীবা এইরূপে আমাদের কল্যাণ সাধনায় ব্যাপৃত আছেন ; ত্রাতামুষ্ঠান ও ব্রতকথাগুলি তাহাবই সাক্ষ্য দান করে।

শিবদুর্গা-বিষয়ক গীতিগুলিতে, বিশেষ করিয়া আগমনী ও বিজয়া গানে, অনেক ছেলেভুলানো ছড়ায় আমবা আমাদের সেকালের নারীসমাজের অন্তর্দর্শনার একটা করুণ চিত্র দেখিতে পাই। বাংলায় মুসলমান রাজত্বের পূর্ণ অধিপত্যের কালে নিতান্ত ঠেকায় পড়িয়া আমাদের সমাজে ‘অষ্টম বর্ষে গোবীন্দান’-প্রথার প্রবর্তন হইয়াছিল। সেই বয়সে স্নেহের পুস্তককে দূরে পবের গৃহে পাঠাইয়া জননীর অন্তর্জ্বালার সীমা থাকিত না। সংসাবেব প্রতি কাজে—শয়নে-ভোজনে-উপবেশনে সর্বদা তিনি একটা শৃঙ্খলা অনুভব করিতেন। তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় সুপাত্র প্রায়ই মিলিত না। কল্যাণী হয়তো সুন্দরী, সুশিক্ষিতা এবং গৃহকক্ষে নিপুণ। কিন্তু তাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে একটি দরিদ্র কি মূর্খ স্বামী ; তিনি বুদ্ধ, মৃতদার কিংবা বহুদারও হইতে পারেন। যোগ্যতাব মধ্যে তাহার হয়তো আছে বহুলালী কোলিক্তের গর, আর একাধিকই পরিবাহে কাহাবও উপব নিলজ্জ নির্ভরশীলতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইরূপ পাত্রের বিবাহ দিয়া মা অলিয়া-পুড়িয়া মরিতেন। প্রতিবেশীদের মুখে, ফকির-বৈষ্ণবদের কাছে মা মেয়েব স্মৃতি-দুঃখের কথা, তাহার শিশু-বাড়ীর অবস্থা-ব্যবস্থার কথা শুনিতে। সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে বলিলেও মাতৃহৃদয়ে দুঃখ-কষ্টের চিত্রটাই বড় হইয়া দেখা দিত। মেয়েকে একটি বার দেখিবার জ্ঞান তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত ; তিনি স্বামীকে অনেক বলিয়া-কহিয়া পাঠাইতেন, মেয়েকে আনিতে। কিন্তু আনিয়াও কি বেশি দিন বাখিতে পারিতেন ? পারিতেন না। আগমনী ও বিজয়া গানে বাঙ্গালী-গৃহের সেকালের এই করুণ চিত্রই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“যাও যাও গিরি আনিতে গোবী

উমা কেমনে বয়েছে !

আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে

মা মা বলে উমা কেঁদেছে ।

ভাস্ক্রেতে ভাস্কড় গীর্জিত বড়,

ত্রিভুবনব ভাস্ক করেছে জড়

ভাস্ক খেয়ে ভোলা হয়ে দিগম্বর

আমার উমারে কত কি বলেছে ।

উমাব বসন ভূষণ যত আভরণ

তাও বেচে ভাস্ক খেয়েছে ।”

এই সকল গানের মধ্যে শিব ও উমা দেবত্ব ও দ্রব পবিত্র করিয়া আমাদের একান্ত আপনাত মানুস—আদরের ধন জামাত ও কল্যাকপে স্থান লাভ করিয়াছেন। আর মেনকা কল্যাকপে কাতবা সমস্ত বঙ্গজননীর স্নেহ ও বাসনা-ব্যাকুলতার প্রতীক রূপে আমাদের সমুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

আট-নয় বৎসরের বালিকারাও যখন পিত্রালয়ের স্নেহ-শীত-সম্পর্শ, আশীশব পরিচিত সঙ্গি-সার্থী, পাড়া-প্রতিবেশী, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত স্বামিগৃহে যাইত,—নূতন আবেশনীর মধ্যে, বিভিন্ন-রুচি লোকদের লইয়া, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে জীবনযাত্রা আবস্ত করিত, তখন তাহাদেবও কি অন্তর্বেদনা-কম হইত ? লোকসাহিত্যে তাহাও ধরা পড়িয়াছে। নব-পরিবর্তিত অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীকে লইয়া সূর্য্যাই ঠাকুর নিজ দেশে যাত্রা করিতেছেন। গৌরী ঘুরিয়া ঘুরিয়া মায়ের আঁচল ধরিতেছে, আর কাঁদিতেছে,— সে যাইবে না। মা সাক্ষাৎ প্রবোধ দিতেছেন—

“টাকা নয় রে কাঁড় নয় বে কোচবে বাখিব।

পরের লাগ্যা হৈছে গৌরী পরেরে সে দিব ।”

যাত্রাকাল আসন্ন হইয়া আসিল, গৌরী ব্যাকুল হবে বলিতে লাগিল,—‘ওগো আমার ‘মাও ধন বাপ ধন’, তোমরা কি আমাকে বাখিতে পার না ?’ মা উত্তর দিতেছেন, ‘হায় ! সভার মধ্যে পণের টাকা গনিয়া লইয়াছি, কিরূপে তোকে বাখিব।’

সূর্য্যাই ও গৌরী নৌকায় নদীপথে ভাসিয়া চলিয়াছে ; মা বাপ ভাই বোন সকলের কান্না শুনা গৌরীর কানে আসিয়া পৌছিতেছে। সে মাঝিদের মনিত করিয়া বলিতেছে :—

“ভাস্ক নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।

ধীরে ধীরে বাও বে মাঝি-ভাই মায়ের কাঁদন শুনি।

ভাস্ক নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।

ধীরে ধীরে বাও বে মাঝি-ভাই ভাইয়ের কাঁদন শুনি।

ভাস্ক নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানি।

ধীরে ধীরে বাও বে মাঝি-ভাই বৃটনের কাঁদন শুনি ।”

সেকালের অধিকাংশ ‘গৌরী’কেই এভাবে পিত্রালয় ছাড়িয়া যাইতে হইত। স্বামিগৃহে গিয়া সে যে প্রায়ই শাস্তি-স্বস্তি পাইত না,—

“হাড হ’ল ভাস্ক ভাস্ক, মাস হ’ল দড়ি

আয় বে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ।”

এই সকল ছড়াব ভিতরই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদরের হুলালীর কপালে অনেক সময় ‘বুড়ো বব’ জুটিত, মাতাপিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারই হস্তে তাহাকে দান করিতেন। বড় আলায় বড় দুঃখেই কল্যাণ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল :—

\* \* \* \*

“চোখ খাও গো বাপ মা, চোখ খাও গো বুড়ো

এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাক খেগো বুড়ো

বুড়োব হঁকো গেল ভেসে বুড়ো মরে কেশে

নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো ম’রে রয়েছে

ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠে ।”

ছড়াব রাজ্য অতিক্রম করিয়া এইবার আমরা লোকসাহিত্যের রূপকথা ও পল্লীগাথা অধ্যায়ে প্রবেশ করিব।

রূপকথা এবং পল্লীগাথা বা 'পালাগান'—এইগুলির মধ্যে আমরা নারীর এক অত্যাশ্চর্য প্রেমময়ী মূর্তির সম্মুখীন হই। এ প্রেমের বৃক্ষ তুলনা নাই। যে একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় সীতা-সাবিত্রী ভারতীয়দের চিরপূজ্য হইয়া আছেন, রূপকথা এবং পালা-গানের নায়িকারা তাঁহাদেরই সগোত্র। কাহারো ক্ষেত্রে কখনো বা মনে হয়, তিনি বৃক্ষ সাধন-পথে সীতা-সাবিত্রীকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন! অনেক স্থলেই দেখা যায়, বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াই হউক, কিংবা হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুরাগ বশতঃই হউক, নারী একবার যাহাকে হৃদয় দান করিয়াছে, সেই দত্ত-হৃদয়ের ডালি লইয়া সে দ্বিতীয় বার আর কাহারো দ্বারে উপস্থিত হয় নাই। প্রলোভন আসিয়াছে শত বাব শত পথে। রাজা, রাষ্ট্রস্বর্গ্য তাহার পায় লুটাইয়া পড়িয়াছে; মাতা-পিতা, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ—সকলে সম্মানে তাকে আহ্বান করিয়াছে, কিন্তু সেদিকে সে ভ্রক্ষেপ মাত্রও কবে নাই। যাহাকে সে একবার হৃদয়েষ্বররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সুখে-দুঃখে, স্তব্ধ-হৃদয়ে-সর্বদা সর্বাবস্থায় তাহারই সে অন্তর্গত রহিয়াছে, তাহারই গানে জীবন ভোর করিয়া দিয়াছে। পুরুষ প্রায়ই ইহাদের ভালবাসার মধ্যাদা রক্ষা কবিতো পাবে নাই, রক্ষা করে নাই; সে সহজেই অল্পগামী হইয়াছে, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। কিন্তু নারী তাহা একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় শত প্রতিকূলতার মধ্যেও গৌবিশুদ্ধের মতই অচল রহিয়াছে। কখনো বা কাহারো জীবনে আসিয়াছে প্রবল পরাক্রান্ত লম্পটের দুর্বিসহ অত্যাচার, কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে কুচক্রী সপত্নীর অশান্ত উৎপীড়ন, কেহ বা লাভ করিয়াছে সমাজ ও আত্মীয়-বান্ধবের

নিদাকণ নিষ্ঠুরতা। কিন্তু কোন প্রতিকূল শক্তিই ইহাদের কাছকেও একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা হইতে টলাইতে পারে নাই। সে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, এমন কি স্বামীর ইষ্টেব জন্ম স্বামি-স্বত্ব পর্যন্ত সপত্নীকে চিবুতবে দান করিয়া দিয়াছে; কিন্তু ভালবাসা ত্যাগ কবে নাই, হৃদয়-মন্দিরে অতি সাবধানে, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাহা রক্ষা করিয়াছে। অসীম বিপদেও ইহা বা ধৈর্য্য হাবায় নাই, বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করিয়াছে, যেখানে সফল হয় নাই আত্মবিসম্বন্ধন দিয়াছে, তবু অবাঞ্ছিতকে আত্মদান কবে নাই। অনেক স্থলে ইহারা শুধু আত্মবক্ষাই কবে নাই, অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছে, শাস্তি দিয়াছে। অশুভ ইহাদের প্রত্যাশপন্নমতি, অশুভ ইহাদের উদ্ভাবনী শক্তি, অপূর্ণ ইহাদের নারীত্বের মধ্যাদা-বোধ!

লোকসাহিত্যের এই রূপকথা ও পল্লীগাথা-ভাণ্ডারে যাহারা শ্রদ্ধার সহিত প্রবেশ করিবেন, দেখিবেন কি অমূল্য সম্পদ ইহাতে নিহিত আছে। পৃথিবীর অল্প কোন দেশ এই সম্পদের অধিকারী হইলে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত। আমরা এক সীতা-সাবিত্রী লইয়া গর্ব করি, কিন্তু এই ভাণ্ডারে কত শত সীতা-সাবিত্রীর পদচিহ্ন পড়িয়া আছে! এখানে দুই-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব।

কাঞ্চনমালা একটি রূপকথা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকায় ইহা স্থান পাইয়াছে। রূপকথায় অতিপ্রাকৃত কিছু থাকিবেই; কিন্তু সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়াও আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা খাঁটি সোনা,—আমাদেরই ঘরের এককালের প্রতিচ্ছবি। 'কাঞ্চনমালা'য় আমরা কি দেখিতে পাই?

আধুনিক  
গিনি সোনার  
অলঙ্কার বৈচিত্রে

RCD

Phone  
3468-B.B

G.A. Kartick



আউজাতের  
জৌকর!

আর.সি.দেও সন্ন্য  
ডুয়েলার্স  
১১১ বহুচাডার স্ট্রীট কলিকাতা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এক সদাপব পাড়ে তাঁহার শতুল ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয় এই আশঙ্কায় ছয় মাসেব এক অন্ধ শিশুকে আনিয়া স্বায় কন্ডা কাকনমালাব হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—

“আজি হৈতে এই পুত্র পালন কর তুমি।

কপালে আছিল তোমাব অন্ধ ছাওয়াব স্বামী।”

কি ভীষণ কথা! পিতা হইয়া কন্ডাব প্রতি কি দারুণ নিষ্ঠুরতা! পিতাব নিকট কন্ডাব কোনট মূল্য বহিল না, কন্ডাকে বিসজ্ঞান দিয়া তিনি তাঁহাব চৌদ্দ ডিঙ্গা বন্দা করিলেন।

অশ্রুভাবাকান্ত হৃদয়ে কাকনমালা আপনাব অদৃষ্টকে স্বীকার করিয়া লইলেন, তিনি বলিলেন,—

“বাপেবে বা দোষী কেন কপাল হইল বুড়া।

মাখী হও চন্দ্রহর্য আস্মানাব তাবা।

কোলেব মধ্যে মাখী হও অন্ধ ছাওয়াব স্বামী।

যাক্সি হইতে অলগাব তুমি সে সোয়ামী।”

যুগে যুগে নবতায় নাবাবা পাত্তিত্রয়েব প্রকল্প আদর্শই দেখাইয়া আসিতেছেন। রূপকথাব নায়িকা হইলেও ‘কাকন’ কাহান্যেই সঙ্গোব। তিনি সেই বাকিতেই অন্ধ শিশু স্বামীকে লগ্না নিকর্দেশ যাবা করিলেন এবং এক নিমেষস্থান কাঠবিষাব গৃহে স্থান পাইলেন। অচিরেই এক সম্মান-প্রদত্ত ফল খাওয়াইয়া কাকনমালা তাঁহাব শিশু-স্বামীব অন্ধব ঘটাইলেন। তাঁহাব প্রতিদিনেব সেবাসহে শিশু অপূর্ব সুন্দর হইয়া বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাকন কাঠবিষাবঘৃদেব সঙ্গে বনে যান, ভাল ভাল বনফল তুলিয়া আনেন, শিশু-স্বামীকে সমস্ত খাওয়ান। কিন্তু অদৃষ্ট তাঁহাব ইহাতেও বাদ মাঝিল। এক দিন এক অশ্রাব্যী বাজা মৃগয়ায় আসিয়া ছয় বসমবেব সেই শিশুকে দাখুবায় আলয় হইতে কোব কাবয়া লইয়া গেল। কাকনমালাব চক্ষেব নদী উজান বহিতে লাগিল।

বসব যায়, বসব আসে, কিন্তু সেই শিশুব কোনট সন্ধান মিলে না। বহু কষ্টে বহু দেশ পাব হইয়া কাকনমালা শেষে ‘সুমাই নগরে’ গিয়া উপনীত হইলেন। সহসা একদিন শুনের, সেই নগবেব বাজা বিজ্ঞাপন কন্ডা কুঞ্জলগাব জন্য এক জন দাসী চাহিয়া ঢোল পিটাইতেছেন। পথে-প্রান্তরে চলাব কষ্ট কাকনেব আব সহ হইতেছিল না। তিনি অগত্যা বাজকনাব দাসী হইয়া বাজ-অন্তপেবে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

‘বাজা বিজ্ঞাপন কাকনমালাব শিশু স্বামীকে অপচরণ করিয়া আনিয়া খাষাসময়ে স্বায় কন্ডা কুঞ্জমালাকে তাঁহাব সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সপত্নী কুঞ্জমালাবই কাকন এখন দাসী। কিন্তু স্তম্ভতুবা বাসকন্যা অল্প দিনেব মনোহর বয়িয়া লইল, সে যাহাকে দাসী করিয়া ঘবে আনিয়াছে, সে তাহাব সপত্নী এবং এই সপত্নীব জন্য তাহাব স্বামীব মন অর্নিশ ধুবিতেছে! সপত্নীকে ববদান্ত কবা সহজ নহে। অশেষ হুশালিনী বমণীবাও এই পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে, ~~কুজুবনের~~ কুজমালাও পাবিল না। তাহাব মনে হইবয়ে জেলা বাস কবা, আব সাপেব সহিত বাস

আমাব উমারে ক

উমাব বসন ভূষণ

তা কটে গায়।

তাও বেচে ভাঙ্গ খেয়েদাঁতি পায়।

ঘবেতে আশ্রন লাগলে পুইড়া করে ছাই।

সতান থাকিলে ঘবে জন্মে স্ত্রণ নাই।”

সপত্নীব প্রতি এইরূপ মনোভাব আমরা মেয়েলী ত্রুতের কয়েকটি ছড়াও হৃদপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। কুঞ্জমালা শীঘ্রই মায়ের সহিত যুক্তি করিয়া কাকনমালাকে ডাকিনী প্রতিপন্ন করিল এবং রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিল। কিন্তু কুঞ্জমালাব ইহাতে মনোবাসনা পূর্ণ হইল না, স্বামীব সেহাগ হইতে সে একেবারে বঞ্চিত হইল, কাবণ নিকরানিতা কাকনমালাব তত্ত্ব বাজকুমাবও আব ঘবে থাকিতে পাবিলেন না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহাব চক্ষু গেল, আবাব তিনি অন্ধ হইলেন।

এদিকে কাকনমালা আবাব সেই সম্মানীয় শবণাপন্ন। সম্মানীয় এবাব তাঁহাকে বিবাহ প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। এই প্রাসাদেই শেষে এক দিন অন্ধ স্বামীব সহিত তাঁহাব পবিচয় হইল। কাকন প্রতীকৃ ফোভ বা অভিমান প্রকাশ করিলেন না, কায়মনোবাক্যে অন্ধ স্বামীব সেবা করিতে লাগিলেন। একপে ছয় মাস যায়, সম্মানীয় দেশ ভ্রমণ হইতে ফিবিয়া আসিয়াছেন। কাকনমালা কাঁদিয়া তাহাব পায় পড়িলেন, বলিলেন, “তুমি আমার স্বামীকে চক্ষুদান কর; বাজধেন আমি কিছুই চাই না, তবু যদি তুমি সম্ভষ্ট না হও, আমাকে অন্ধ করিয়া স্বামীকে ভাল করিয়া দাও।”

“বন বাজা নাতি চাই কবত আছান।

খামায় অন্ধ কটবা কব স্বামীব নয়ন দান।”

সম্মানীয় মাথা নাড়িলেন, যেন বাজা-ধন অতি তুচ্ছ—অনেকেই কবিতে পারে। স্বামীব সামিধ্য লাভ করিতে পাবিলে অন্ধ হইয়া থাকিও যেন কিছু নয়! সম্মানীয় দৃষ্ট কষ্টে বলিলেন, “প্রতিজ্ঞা কব, আমি যাহা বলি তাহাই করবে।” স্বামী চক্ষু পাইবেন, স্বামীব জীবন স্ত্রণেব হইবে, ইহাব জন্ম কাকনেব কি না করিবাব আছে? তাঁহাকে যাহাই কবিতে বলা হইবে, তাহাই তিনি কবিলেন।

সম্মানীয় কাকনমালাব হাতে একটি ফল দিয়া কহিলেন, “এই ফলটি লও, ইহা দ্বারা তোমাব স্বামী চক্ষু ফিবিয়া পাইবে। কিন্তু শুন, সে-স্বামীব উপব তোমাব কোন স্বত্ব থাকিবে না, এই ফলটির সহিত সর্বস্বত্ব তোমাব সতান কুঞ্জমালাকে দান করিতে হইবে। এখানেই শেষ নয়, আবও শুন, দান করিবাব সময় অন্তরে যদি বিন্ধুমাত্রও বাথা জাগে, চোখেব কোণে জল দেখা দেয়, হাত কাঁপে, বুক ছব, ছব, কপে, কিবা একটি দীর্ঘশ্বাসও পড়ে,—সে দান সিদ্ধ হইবে না, তোমাব স্বামীব অন্ধত্ব গঢ়িবে না।”

কাকনেব সম্মুখে এ কি কঠোর পরীক্ষা! কত দিনেব কত সাধনাব ভিতব দিয়া পাওয়া তাহাব জীবন-সর্বস্বদন স্বামীকে সপত্নীব হস্তে তুলিয়া দিতে হইবে, স্ত্রণের লেশমাত্রও তাঁহাব অবশিষ্ট থাকিবে না, কিন্তু ইহাব জন্ম যে তিনি একটু হুঃ কবিলেন, দুই কঁোটা চোখেব জল ফেলিয়া হৃদয়ের ভাব একটু লব্ধ করিলেন,—সে অধিকাও যে তাঁহাব কাড়িয়া লওয়া হইতেছে! কাকনমালা এই কঠোরতন পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইলেন। স্বামীব ইষ্টকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন। এই স্বামীকে তাহাব শিশুকাল হইতে কত হুঃ-কষ্টেই না তিনি লালন-পালন করিয়াছেন! মাখায় কাঠের বোকা, কাঁপে শিশু-স্বামী,

দবদর ধাবায় নাম বাহিয়া পড়িয়াছে,—এই অবস্থায় কাঠবিয়াদের সঙ্গে তিনি বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, বৌদ্ধ-বুড়ি হঠাতে আঁচল ঢাকা দিয়া শিশুকে বক্ষা করিয়াছেন, ক্ষুধার কান্নায় তাকে বনের ফল কুড়াইয়া দিয়াছেন! সেই স্বামীকে আজ তিনি পুনরায় পাইয়া “কয়েক শোধ সপত্নীকে দিয়া যাউতেছেন!” এই মহাত্যাগের তুলনা কোথায়? পত্নীকবি সে-দৃশ্য এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

হুংখ নাই স্থপ নাই অস্তব হইল খালি।  
স্বামীর লাগিয়া কন্না না হইল শোকালি।  
ফলের সহিত কন্না পুনঃ কাম কবে।  
রাজ্যসহ সোয়ামীবে সমর্পণ কবে।  
চক্ষু নাই যে জল কন্না বকে নাই হুংখ।  
স্বামী এড়ি যায় কন্না মনে নাই শোক।  
কি জানি কান্দিলে পাছে স্বামী না হয় ভাল।  
মনেব যত শোক হুংখ মুছিয়া ফেলিল।  
এ বড় কঠিন পণ নারী হইয়া জিনে।  
না জিনিব তেন পণ পুঙ্খ পবনীণে।”

পৃথিবীর অপর কোন সাহিত্যে একপা মহাত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে কি না জানি না। কবি সত্যই বলিয়াছেন, কান্দন নারী হইয়া যে পণ বক্ষা কবিত্তে পাবিলেন, অতি বড় প্রবীণ পুঙ্খও তাহা পাবিত না।

‘মল্লয়া’ ঐতিহাসিক ঘটনামূলক একটি পালাগান; ‘ময়মনসিংহ-গীতিকায়’ ইহা স্থান পাইয়াছে। মল্লয়া ছিলেন আডালিয়া গ্রামের হীবাধব দাসের কন্না। দন-দৌলত, বিদগ্ন-সম্পত্তিও তাঁহাদের সীমা ছিল না। এই মল্লয়াব সঙ্গে ভিন্ন গ্রামের চাঁদবিনোদের বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্বেই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে ছদ্মবেশ স্বাভাবিক প্রেমে বশতঃ উভয়ে উভয়কে ভালবাসিয়াছিলেন। বাংলায় তখন মুসলমান রাজত্বের পূর্ব প্রভাব। কাজিয়া ছিল পবগণার বিচাবকর্তা। ভর্তাগ্যক্রমে তাহাদেরই এক জনের লুন্ধু দুটি পড়ে মল্লয়াব উপর। দেশে তখন ‘কুটনী’ নামে এক শ্রেণীর সমাজ-শত্রুও হুঁটি হুঁটিয়াছিল। উহারা লম্পটদের অর্থ-পুষ্টি হইয়া মদল বালিকা ও কুলবধূদের নানা প্রলোভন দেখাইয়া যবের বাহিব কবিত্তে চেষ্টা করিত। হুঁটি কাজি এইরূপ এক কুটনীকে দিয়া মল্লয়াকে প্রলুন্ধু কবিত্তে ও আপন বশে আনিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সাধ্য কি সাধকে কেহ টলায়? স্বামী, শান্তিী কেহই যবে নাই, এইরূপ অবস্থায় একদিন পাণিষ্ঠা কুটনী মল্লয়াব কাছে আসিয়া কাজির কুপ্রস্তাব ফাঁদিল। ক্রোধে অপমানে মল্লয়াব সর্বস্ব জলিয়া উঠিল। তিনি কুটনীকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন :—

“আমাব সোয়ামী সে যে পূর্বতের চুড়া।  
আমাব সোয়ামী যেমন বণ-দৌড়েব ঘোড়া।  
আমাব সোয়ামী যেমন আসনানের চান।  
না হয় হুংমণ কাজি তাহাব নউখেব সমান।

হুংমণ কুকুর কাজি পাপে দিল মন।  
ঝাঁটার বাড়ি দিয়া তাবে কবতাম বিড়ম্বন।  
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমাব লক্ষ পরমাই পাইয়া।  
ধানের মোহব ভাজি কাজিব পায়ের লাথি দিয়া।”

সেমন হুঁটি প্রস্তাব, তেমনি তাহাব উত্তর। তাব পব আরম্ভ হইল কাজিব চক্রান্ত, ইহাব প্রতিশোধ গঠন কবিত্তেই হইবে। বিবাহের সময় দেওয়ানকে ‘নজব মবেচা’ দেওয়া হয় নাট বলিয়া কাজি বিনোদের বাড়ী-জমি সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিল। দুই দিন আগে তাহাব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দন-দৌলতের সীমা ছিল না, আজ তিনি কাজিব কোপে পাথব ভিগাবী। গোন্ধ-বাহুব ঘব-দুয়ার সব বেচিয়া পাইলেন, তবু চলে না; শেষে মল্লয়াব অলঙ্কার-গুলিও একে একে শেষ হইল। বিনোদ ক্রোধে অনেক বুঝাইলেন, ‘তোমার বাপের বাড়ীর বিবাহ অবস্থা, সেখানে গিয়া তুমি কিছু দিন থাক, তাঁহারা পরম যত্নে রাখিবেন।’ কিন্তু মল্লয়া প্রাণ-প্রিয়কে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া কোথাও গেলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া এক দিন বিনোদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভাগ্যক্ষেপে বাহিব হইয়া পড়িলেন।

দারুণ কষ্টের মধ্যে মল্লয়াব দিন যাউতে লাগিল। কাজি ভাবিল, এইবার যদি অন্যটি সিদ্ধ হয়! মল্লয়া এইবার নিশ্চয়ই হুংখ-কষ্টের আগাতে ভাসিয়া পড়িয়াছে। কুটনী আবার কুপ্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু একি! হুংখ-কষ্টের দাবদাহ যে সাধীকে আবও খাঁটি সোনা করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে! কুটনীর প্রলোভনের মাধ্যম তিনি পদাঘাত করিয়া বলিলেন :—

“আন্ধাইবে কাটির আমি হুংমণ দিবা বাতি।

কাজিবে কহিও তাব মুখে মাঝি লাথি।”

মল্লয়াব মাতা এবং ভ্রাতারা এসব শুনিয়া মল্লয়াকে পিত্রালয়ে নিতে আসিল। কিন্তু তিনি তখন হুংমণ প্রেমের তপস্রায় মগ্ন, হুংখ-কষ্ট তাঁহাকে কি কবাবে? তিনি পিতৃগৃহে যাউতে অস্বীকার করিলেন এবং ভ্রাতাদের হৈ বলিয়া বিদায় দিলেন :—

স্বপ্নব বাড়ী থাকবাম আমি কবিত্তি মন।

সেইত আমাব গরা কাশী সেই ত বৃন্দাবন।

বুড়া শান্তিী আমাব পুত্র নাই যবে।

কি দেখ্যা মায়েব কও এই হুংখ পাশবে।

শূতা কাটিয়া বান ভানিয়া অনশনে অদাশনে মল্লয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন বিনোদ প্রভূত উপাঞ্জন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বাজেয়াপ্ত জমি-বাড়ী উদ্ধাব করিলেন। চাঁদবিনোদ ও মল্লয়াব কয়েক দিন বেশ সুখেই কাটিল। কিন্তু ভবন্ত কাজির ইহা সহ্য হইল না। সে তাহাব উপবত্তালা দেওয়ানকে ‘সুন্দরী মল্লয়া’ব সংবাদ জানাইল এবং তাহাব হাতে মল্লয়াকে তুলিয়া দিতে বিনোদের উপর এক পবোয়ানি জাবি করিল। সাত দিন পব কাজি বিনোদকে ধরিয়া নিল, এবং বিচার করিয়া ‘জাস্ত’ কবব দিতে শুরু দিল। মল্লয়া এই অবস্থায়ও দৈব্য হারাইলেন না, কড়া পাণী মাবফত ভ্রাতাদের নিকট পত্র লিখিয়া স্বামীকে উদ্ধাব করিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বিপদ হুঁটিতে উদ্ধাব পাইলেন না। শূতা গৃহ হুঁটিতে দেওয়ানের চববা তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

মল্লয়া এখন দেওয়ান সাহেবের অস্তঃপুরে। তবু তিনি টলিলেন না। সাধী ব্রত-প্রতিষ্ঠাব ছল করিয়া তাহাকে ভাঁড়াইতেছেন এবং আত্মরক্ষা করিতেছেন। কাম-বিহবল দেওয়ানের অবস্থা দেখিয়া মল্লয়া ভাবিলেন, এইবার যদি কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা যায়। তিনি দীঃ

নিশ্চয় ভাগ্য কবিতা দেওয়ানকে বলিলেন, 'দেখুন, আপনার অধীন কাজি আমাকে বহু দুঃখ দিয়াছে ; সে আমার স্বামীকে জ্যান্ত কবর দিয়াছে। এমন কাজি বাঁচিয়া থাকিতে আপনার সহিত আমার মনের মিলন হইতে পারে না।' মলুয়ার জন্ত দেওয়ান কি না কবিত্তে পারেন ? তিনি কাজিকে শূলে চড়াইবাব জন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন। সাধবীর হৃদয়ের দ্বাঙ্গা এত দিনে কতকটা প্রশমিত হইল।

মলুয়া এইবার ভাবিলেন, মরিতেই যদি হয় আরো একটু নড়িয়া-চড়িয়া মরি। তিনি দেওয়ানকে বলিলেন, 'দেখুন, আমার স্বামী এক জন ভাল কুড়া-শিকারী ছিলেন, তাঁহার সহিত থাকিয়া আমিও কুড়া-শিকারের কৌশল শিখিয়াছি। আমার ব্রত-প্রতিষ্ঠার আর বার দিন বাকী আছে, চলুন এই অবসরে আমরা কুড়া-শিকারে যাই। তাব পূর্ব যথাসময়ে মিলন হইবে।' দেওয়ান স্বীকৃত হইলে মলুয়া কুড়ার মাংসকৃত এক পত্র দিয়া ভ্রাতাদের 'ধলাই' বিলে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

'ধলাই' বিলে 'ভাওয়ালিয়া' নৌকার মলুয়া ও দেওয়ান। হঠাৎ পান্সী বাহিনী মলুয়ার ভ্রাতারা আসিয়া তাহাদের আক্রমণ করিল।

"লাঠি বাড়াইতে ছিল যত পাঁড়ি মাঝি।

উব্বত হইয়া জলে পড়ে করে কাজি মাঝি।

পঞ্চ ভাইয়ের পানসীখানা দেখিতে সন্দব।

লক্ষ দিয়া উঠে কল্যা তাহার উপর।"

এইরূপে সেকালের এক মধ্যবিত্ত ঘরের পল্লীবাসী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি এবং চব্বিষের দৃঢ়তা-বলে প্রবল প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া হস্ত হস্তে নাবীদেব মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ সমাজ ইহাব কতটুকু মূল্য দিল ? সমাজপতিরা বিনোদের উপর ভকুম্ভাশি কবিলেন,—'যে মলুয়া দীর্ঘকাল দেওয়ানের অন্তঃপুরে বন্দী ছিল, তাহাকে ঘবে বাগিলে বিনোদকে 'একঘবে' হইতে হইবে।' বিনোদ ইতস্ততঃ কবিত্তে লাগিলেন,—এমন মলুয়াকে তিনি কি কবিতা পরিভাগ্য কবিলেন ? কিন্তু শেষে সমাজেই জয় হইল, যেমন চব্বিদিন হইয়া আসিতেছে। চাদবিনোদ প্রায়শ্চিত্ত কবিতা সমাজে স্থান পাইলেন এবং মলুয়াকে পরিভাগ্য কবিলেন। মলুয়াব ভ্রাতারা মলুয়াকে লইয়া যাইতে আসিল, ভগিনীকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ কবিতা

যাইবেন না ; বাহিরের চাকরাণী ( বাইব কামুলী ) হইয়া থাকিবেন, ট্যান আঙ্গিনা ঝাঁট দিবেন, গোবর-ছড়া দিবেন, ঘরে-দুয়ারে নাই বা গেলেন, বাগ্নাবাগ্না নাই বা করিলেন। তবু তো স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবেন। ভ্রাতারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল।

চাদবিনোদ অম্বার বিবাহ করিয়াছেন, মলুয়া বাহিরের কাজকর্ম কবিতা স্বামী ও সপত্নীকে যথাসাধ্য স্থগী রাখিতে চেষ্টা করেন। অদৃষ্ট এই অধিকারটুকু হইতেও তাঁহাকে যেন বঞ্চিত কবিত্তে ফন্দী আঁটিল ! একদিন মাঠে সর্পদৃষ্ট হইয়া চাদবিনোদ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সকলে যখন কাদিয়া অস্থির, মলুয়া গাঢ়বী ওঝার বাড়িতে মৃতপ্রায় স্বামীকে লইয়া গেলেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে বাঁচাইয়া আনিলেন। চার দিকে ধন্য ধন্য বব পড়িয়া গেল। এইবার কেহ আব তাঁহাকে ঘবে তুলিয়া লইতে আপত্তি কবিল না।

কিঞ্চ বিনোদের মামা ইহাতে প্রবল বাগ্না দিলেন, সকলকে ভয় দেখাইলেন। মলুয়াব ধৈর্যের সীমা তখন আর রহিল না, দুঃখ-জয়ের সমস্ত শক্তি তখন তাঁহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, তিনি বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী আব স্থগী হইতে পারিবেন না, সমাজ কেবলই তাঁহাকে বিব্রত কবিত্তে। ঘাটে এক 'মন পবনের নৌকা' বাধা ছিল ; মলুয়া আব কোন দিকে দৃকপাত না কবিতা সোজা গিয়া সেই নৌকার উঠিলেন, নৌকার কাছ কাটিয়া দিলেন। ঝড়ের মুখে উত্তাল তরঙ্গের বুকে ভাঙ্গা নৌকা ভুবিতে ভুবিতে ভাসিয়া চলিল। মুহূর্ত্তে এই সংবাদ চাবি দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। শশুর, শাস্ত্রী, স্বামী, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আসিয়া নদীর তীরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুই হাত বাড়াইয়া সকলে আকুল স্বরে ডাকিতে লাগিল, 'ফিবে এস, ফিবে এস।' স্বামী চাঁৎকার কবিতা বলিতেছেন :—

"চান্দ স্বরুজ ভুবক আমার সংসারে কাজ নাই।

জাতি বন্ধু জনে আমি আব ত নাই চাই।"

কিঞ্চ সাধবী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল, তিনি থাকিতে তাঁহার স্বামীর কলঙ্ক ঘটিবে না। তিনি একে একে সকলকে প্রবোধ দিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইলেন। দেখিতে দেখিতে 'মন পবনের নৌকা' সেই সতীলক্ষ্মীকে লইয়া কোন্ অতলে তলাইয়া গেল ! এ কি সেই চিরদুঃখিনী জনক-নন্দিনীরই সর্বসঙ্গ ধরিত্রীর কোলে আশ্রয় গ্রহণ ?

## আত্ম-মর্যাদাবোধ

জন ব্যাবীম্বর—বিখ্যাত অভিনেতা, গেছেন টুপীর দোকানে টুপী কিনতে—হলিউড বোম্বোডেতে। দেখতে চাইলেন টুপী। অগণিত টুপী দেখতে দেখতে একটি টুপী মনে পড়লো। বললেন,—পছন্দ হয়েছে। কত দাম ? বিল করুন।

দোকানী বললে,—কাব নামে বিল হবে ?

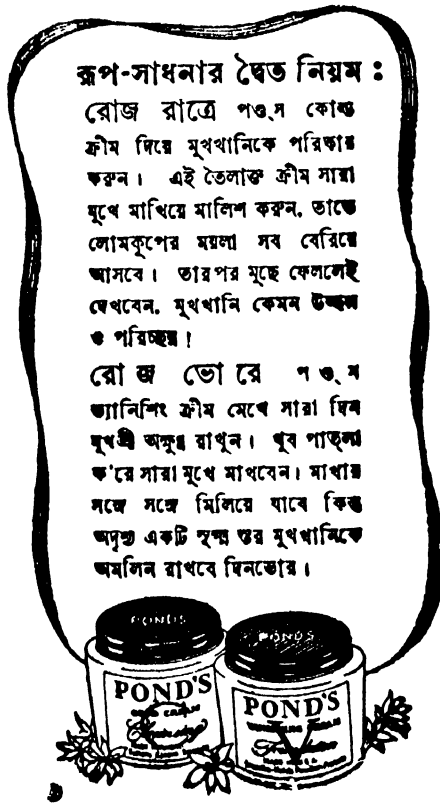
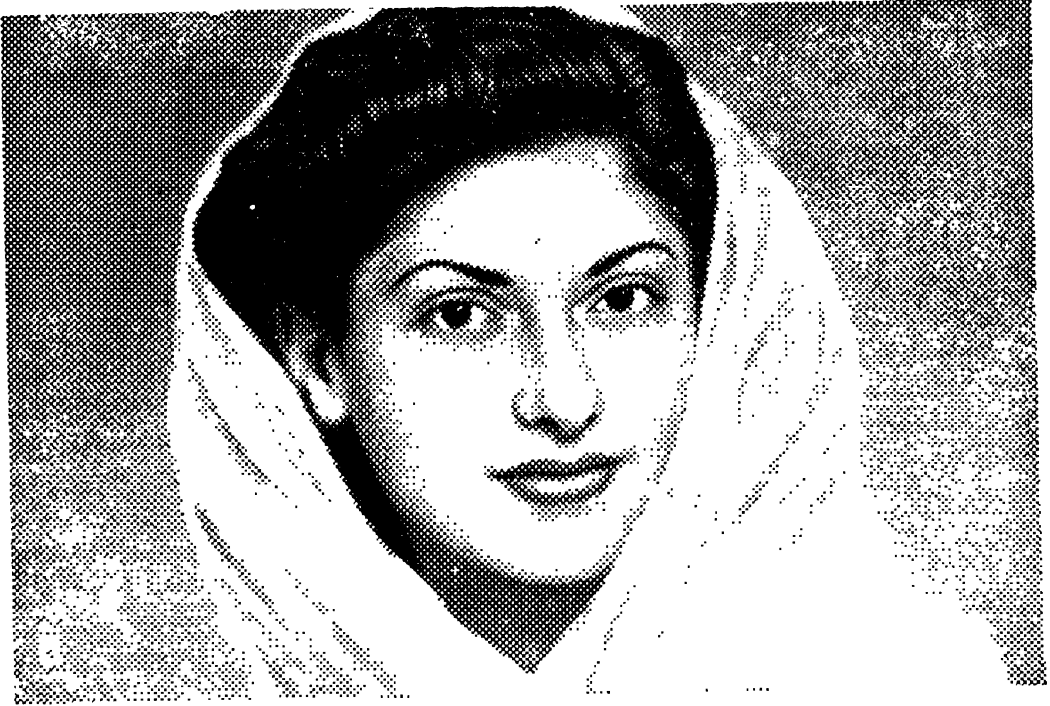
এব বলি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে

পড়লেন জন ব্যাবীম্বর।

বিখ্যাত দু'টি চোক পাকিয়ে উঠলো। সজোবে বললেন,—ব্যাবীম্বর।

দোকানী বললে,—উপাধি বললেন। প্রথম নামটি ?

অত্যধিক ঘা খেলেন যেন জন ব্যাবীম্বর। চিংকার ক'বে উঠলেন,—এখেল।



**রূপ-সাধনার দ্বৈত নিয়ম :**

রোজ রাতে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম দিয়ে মুখখানিকে পরিষ্কার করুন। এই তৈলাক্ত ক্রীম সারা মুখে মাখিয়ে মালিশ করুন, তাহলে লোমকূপের ময়লা সব বেরিয়ে আসবে। তারপর মুখে ফেললেই দেখবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন।

রোজ ভোরে পণ্ডস ত্যানিশিং ক্রীম মেখে সারা দিন মুখশ্রী অক্ষুণ্ণ রাখুন। খুব পাতলা করে সারা মুখে মাখবেন। মাথার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে কিন্তু অদৃষ্ট একটি হৃদয় স্তর মুখখানিকে অমলিন রাখবে যিনতোর।

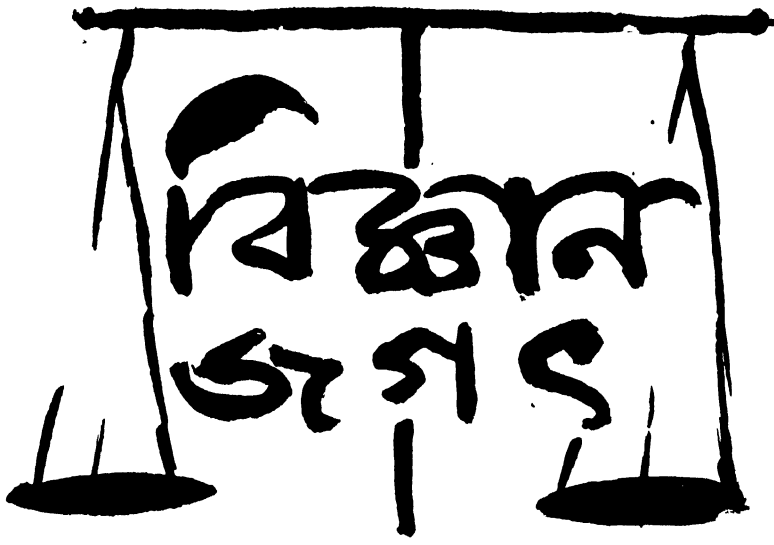
*আরো সুন্দর,  
আরো কমনীয়  
...ইরক্স পণ্ডস ক্রীমের শুণে*

মুখশ্রী মসৃণ ও মনোরম রাখতে হলে প্রাতে ও রাতে রূপ-সাধনার দ্বৈত নিয়ম মেনে চলা দরকার। রাত্রিতে চাই এমন একটি তৈলাক্ত ক্রীম যা পরের দিনের তরে মুখখানিকে পরিচ্ছন্ন ও কোমল করে রাখবে—যেমন পণ্ডস কোল্ড ক্রীম। আর ভোরবেলা চাই—চট্‌চটে নয় এমন একটি তুষারস্তর ক্রীম যা দিনভোর রং-কালো-করা হৃদ্যা-লোকের ছোঁয়াচ থেকে মুখখানিকে বাঁচাবে—যেমন পণ্ডস ত্যানিশিং ক্রীম।

**পণ্ডস**

একমাত্র কনসেশানেয়াস : জিওফ্রে ম্যানাস এণ্ড কোং লিঃ

বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।



## এ্যাটম

শ্রীযাশ্বিনীমোহন বর

সূচনা

ঋষ্ট জন্মাবাব বহু বহু পূর্বে ভারতীয় দার্শনিক কনাদ অণু-পবমাণুব কথা মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। পরে, এখন হতে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে গ্রীক মনোনীবাও সেই কথা বলেন। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ডেমোক্রিটাস পরমাণুর সংজ্ঞা হিসেবে বলেন যে, পবমাণু (atoma, atoms) জড়ের সর্বানন্ম অখণ্ড একক। অর্থাৎ জড়কে পবমাণুব চেয়ে ছোট আংশে বিভক্ত করা যায় না। এই মতবাদ বহু দিন বিশ্বস্তিত্ব অতল গর্ভে চাপা পড়েছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইতালীর গ্যালিলিও, ফ্রান্সের ডেকার্টে, ইংলণ্ডের বেকন, বয়েল, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তখনও এটা দার্শনিকের মতবাদ ছিল মাত্র।

আধুনিক আণবিক সূত্র আবিষ্কার কবলেন জন ডাল্টন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে। তাঁর হাতে মতবাদ প্রকৃত রূপ পেল। তিনিই প্রথম দেখালেন যে, বিভিন্ন বস্তুর পরমাণুর ওজনের অনুপাত নির্ণয় করা যায়। এই হ'ল বসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তি-প্রস্তাবস্বরূপ। প্রাচীন ভারতীয় মতে ত্রিধাও পাঁচটি মৌলিক পদার্থ আছে; ক্ষিতি, অপ্., তেজ, মকং, ব্যোম। গ্রীক-দর্শনও ভারতীয় ভাবধারায় পৃষ্ট হয়ে এই মতই স্বীকার করে নিয়েছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এম্পেডোক্লস বলেন যে, বস্তু মাত্রই চারটি মৌলিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট এবং তাদের নাম ক্ষিতি, অপ্., তেজ, মকং। ব্যোমটা তিনি বাদ দিলেন। দেখা যাচ্ছে, একই সময় একই দেশে দু'টো বিভিন্ন মতবাদ। একটা ডেমোক্রিটাসের আবেকটা এম্পেডোক্লসের। কিন্তু যেকোনো আবিষ্কটল প্রমুখ মনোনীবা দ্বিতীয় মতবাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা করলেন, সেই জন্তু দু'হাজার বছর ধরে ভুল মতবাদই চলল। এই মতবাদের জন্তুই বহু দিন ধরে চেষ্টা চলেছিল লোহাকে সোনা কবাব। কিন্তু কিছুতেই তা হয়ে ওঠেনি। আজ অবস্থা তা করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার মূলে আছে পূর্বের ধামা-চাপা

মেওরা প্রথম মতবাদ। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

এই চার মৌলিক পদার্থ-তথ্য প্রথম খেল ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রবার্ট বয়েলের হাতে। তিনি বললেন, মৌলিক পদার্থ মানে যা তাকে কিছুর সংমিশ্রণে তৈরী নয়। মেশালে সেটা হয়ে পড়বে যৌগিক পদার্থ। আজকের মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞার বীজ এবং লুকিয়েছিল, কিন্তু তবু একশ' বছর ধরে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাসায়নিক লাভোয়সিয়ে (যাকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়) প্রমাণ করে দিলেন যে, হাইড্রো মৌলিক পদার্থ নয়। অন্ততঃ পক্ষে দু'টো বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণে হাইড্রার সৃষ্টি। তাই প ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রীষ্টলে এবং ক্যাভেন্ডিশ প্রমাণ করলেন যে, জলও মৌলিক পদার্থ নয়।

অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংমিশ্রণ। চার মৌলিক পদার্থের মতবাদ ধুলিসাং হল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লাভোয়সিয়ে বললেন, "মৌলিক পদার্থ বলা আমবা এমন কিছু বৃষ্টি যাকে ভাগ অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা যায় না অর্থাৎ যা বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়নি। যে পদার্থ সং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী হয় তাদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ। জল যৌগিক পদার্থ কিন্তু হাইড্রো কেবল মৌলিক পদার্থ। একই পদার্থের সকল পরমাণু একই বকমেব এবং এ পদার্থের ধর্ম বজায় রাখে। কিন্তু বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পদার্থ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী। পরমাণু সমূহের প্রকাশের জন্য ডাল্টন বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করেন; যেমন, অক্সিজেনের পরমাণুর প্রতীক এর বৃত্ত, হাইড্রোজেনের পরমাণুর প্রতীক বৃত্তের সহিত কেন্দ্র-বিন্দু ইত্যাদি। কিন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত হাস্যামার। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বার্ডালি প্রতীক করলেন যে, পদার্থের লাতিন নামের গোড়ার একটা দু'টো অক্ষর দিয়ে সেই পদার্থের পরমাণু প্রকাশ করা হোক যেমন, অক্সিজেন (Oxygenium) এর প্রতীক O, হাইড্রোজেন (Hydrogenium) এর প্রতীক H, সোনা (Aurum) এর প্রতীক Au, রূপো (Argentum) এর প্রতীক Ag ইত্যাদি কেবল মৌলিক নয়, যৌগিক পদার্থ প্রকাশ করতেও প্রচ ব্যবহার করা চলে। যেমন, জলকে H<sub>2</sub>O প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা চলে; তার অর্থ দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এক পরমাণু অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মিশে জল সৃষ্টি করে। তাহা দেখা যাচ্ছে যে, প্রতীক দেখে যৌগিক পদার্থ কি কি মৌলিক পদার্থ কতটা পরিমাণে আছে জানা যায়।

এইবার এল আণবিক ওজনের কথা। পরমাণু এতই ক্ষুদ্র সোজাশুজি তার ওজন বার করা অসম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থ আণবিক ওজনের অনুপাত নির্ণয় করা যায় ডাল্টনের সূত্র সাহায্যে। তিনি সব চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেনের পরমাণু এ ধরে বিভিন্ন পরমাণুর আণুপাতিক ওজন করলেন। এই পদ্ধতিতে হলে ডাল্টনের সূত্র জানা প্রয়োজন। তিনি বললেন (ক) যে-কোন বিশুদ্ধ পদার্থের পরমাণু সমূহের আয়তন, চেহা

ন এক; (খ) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরমাণুর কোন ধর্ম যায় না, কেবল সাজানোর পরিবর্তন ঘটে; (গ) পরমাণু সমূহের ন সমজাতম অথও সংখ্যাও অল্পপাতে হয়। তাঁর সময়ে একমাত্র এক পদার্থ জলের কথাই জানা ছিল। তিনি বললেন, তুলসারে জলের প্রতীক  $HO$  হওয়া উচিত, কাবণ এর চেয়ে অল্পপাত হতে পারে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করে তিনি দেখলেন ওজন হিসেবে হাইড্রোজেন এক ভাগ এবং অক্সিজেন সাত (পরে—এইটাই ঠিক) ভাগ মিশে জল সৃষ্টি করে। তাব মানে অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেনের পরমাণুর আট গুণ। ডাণ্টন যা নির্ণয় করেছিলেন, তা প্রকৃত পক্ষে মৌলিক পদার্থের সমতুল্য ওজন, পরমাণুর ওজন নয়। এক ভাগ হাইড্রোজেনের ওজনের সঙ্গে কোন মৌলিক পদার্থের কত ভাগ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিশতে পারে, বা এক ভাগ হাইড্রোজেনকে সরাতে পারে সেই নাম সমতুল্য ওজন। যেমন জলের প্রতীক  $H_2O$ , তাহা হাইড্রোজেনের দু'টো পরমাণু অক্সিজেনের একটা পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মিশে। অতএব অক্সিজেনের আণবিক ওজন তাব সমতুল্য ওজনের দ্বিগুণ। ডাণ্টন হাইড্রোজেনকে মূল ধরে মৌলিক পদার্থ-সমূহের আণবিক ওজন নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হাইড্রোজেনের সঙ্গে খুব কম পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটে। তাই বাঞ্জিলিয়াস তুলনার জন্ত অক্সিজেনকে মূল ধরেন, কাবণ অক্সিজেন প্রায় সকলের সঙ্গেই মিশতে পারে। অক্সিজেনের আণবিক ওজন হল ১৬ এবং সমতুল্য ওজন হল ৮; সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের আণবিক ওজন দাঁড়ায় ১·০০৮০, ঠিক ঠিক হয় না।

এইবার অণু (molecule) ও পরমাণু (atom) এর মধ্যে পার্থক্য জানা প্রয়োজন। ডাণ্টন এই পার্থক্যটা ধরতে পারেননি। তিনি তাঁর বিখ্যাত সূত্রে আণবিক ওজন বলতে আসলে পরমাণবিক ওজন বোঝাতে চেয়েছিলেন। ১৮১১ সালে ইতালীয় পদার্থবিদ আভোগাড্রো এই পার্থক্য কিছুটা বুঝতে পারেন, কিন্তু তা প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে পারেননি। ১৮৩৩ সালে ফরাসী বৈজ্ঞানিক গ্যারি প্রকৃত পার্থক্যটা কোথায় তা বুঝিয়ে দেন। সে পদার্থের (মৌলিক অথবা যৌগিক) সূক্ষ্মতম অংশ, যা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, তাকে অণু বলা হয়। পরমাণু কিন্তু স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্য এক অণু থেকে পরমাণুগুলি বার হয়ে নিজ-নিজ স্থান বদল করে ভিন্ন বিচ্ছিন্ন ফলে শেষে ভিন্ন অণু সৃষ্টি করে। যৌগিক পদার্থ জলের ( $H_2O$ ) একটি অণুতে দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে। কোন মৌলিক পদার্থ—ধরুন, হাইড্রোজেন—তার একটি পরমাণু হল  $H$ ; কিন্তু প্রকৃতি একে দুই অবস্থায় থাকতে দেয় না। একে থাকতে হয় অণুরূপে  $H_2$  মনে। গ্যাসগুলির সাধারণত এক অণুতে দু'টো করে পরমাণু থাকে। তবে হিলিয়াম ইত্যাদি কয়েকটি জড় (inert) গ্যাসের অণুতে একটি মাত্র করে পরমাণু আছে।

আভোগাড্রোর সূত্রে আছে যে, তাপ এবং চাপের কোন তারতম্য না ঘটলে বিভিন্ন গ্যাসের সমান ঘনফলে সমান সংখ্যা অণু থাকে। গ্যাসের ভরাস্ত্র হ'ল এক ঘনফলের ওজন; অর্থাৎ এক ঘনফল

গ্যাসে যতগুলি অণু আছে তাদের মোট ওজন। সুতরাং কোন গ্যাসের ভরাস্ত্র তাব এক অণুর ওজনের আনুপাতিক। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে—

$$\frac{\text{কোন পদার্থের আণবিক ওজন}}{\text{নির্দিষ্ট গ্যাসের আণবিক ওজন}} = \frac{\text{পদার্থের ভরাস্ত্র}}{\text{নির্দিষ্ট গ্যাসের ভরাস্ত্র}}$$

অনেক কারণে অক্সিজেনকে নির্দিষ্ট গ্যাস ধরা হয়েছে। এর আণবিক ওজন ৩২; সুতরাং যে কোন পদার্থের আণবিক ওজন

$$= \frac{\text{পদার্থের ভরাস্ত্র}}{\text{অক্সিজেনের ভরাস্ত্র}} \times ৩২.$$

এই সূত্রে পদার্থ গ্যাস হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সকল পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় না। সে জন্য অল্প উপায় আছে।

এইবার মৌলিক পদার্থ সমূহকে তালিকাভুক্ত করবার চেষ্টা চলল। ১৮২৯ সালে দোবেরনাব লক্ষ্য করলেন যে, একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলিক পদার্থ সমূহের পরমাণবিক ওজনের মধ্যে বেশ একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। অন্য বৈজ্ঞানিকরা আগ্রহ দেখালেন বটে কিন্তু এ উপর বিশেষ আস্থা দিলেন না; কাবণ বড় পদার্থেই সঠিক পারমাণবিক ওজন জানা ছিল না। ১৮৫৮ সালে কানিজাবো অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সঠিক পরমাণবিক ওজন প্রকাশ করলেন এবং দেখা গেল, দোবেরনাবের কথার সঙ্গে বেশ খাপ খাচ্ছে। ১৮৬৫ সালে নিউল্যাণ্ড অক্টেভ সূত্র বাব করলেন, ধর্ম ও পরমাণবিক ওজনের সম্বন্ধে। অক্টেভ বলতে সঙ্গীতের সা, বে, গা, মা, পা, ধা, নি। এর পর সা, তার পর বে ইত্যাদি। যদি পরমাণবিক ওজনের উচ্চক্রম হিসেবে সা-টি মৌলিক পদার্থ সাজান হয়, তবে অষ্টমটি প্রথমটির সঙ্গে, নবমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে সমধর্মী হবে। কিন্তু সবগুলি গুছিয়ে দেখা গেল যে তা হয় না। এই সূত্রানুসারে সোনা আইয়োডিনের সঙ্গে, লোহা গন্ধকের সঙ্গে সমধর্মী হয়ে পড়ে।

১৮৭১ সালে রুশীয় বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলভ এই সম্বন্ধ নিয়ে তাঁর বিখ্যাত পর্যায়-সূত্র প্রকাশ করেন। তিনি এক নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি ভাবে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালেন। উল্লস স্তম্ভগুলির নাম দিলেন গ্রুপ, আর আড়া-আড়ি থাকগুলির নাম দিলেন পর্যায়। তিনি দেখালেন যে, নির্দিষ্ট অন্তরের পরে পবে মৌলিক পদার্থ সমূহের ধর্ম একই হয়। যেখানে যেখানে এই পর্যায় ধর্ম মিলল না, তিনি বললেন যে, সেখানে হয় পরমাণবিক ওজনে ভুল আছে, কিংবা অনাবিষ্কৃত কোন মৌলিক পদার্থ সেখানে বসবে। তিনি সেই নতুন পদার্থের আবিষ্কারের পূর্বেই ধর্ম নির্ণয় করে দিলেন। এ যেন রাম না হতেই বামায়ণ! ১৮৭৫ সালে গ্যালিয়াম, ১৮৭৯ সালে স্ক্যান্ডিয়াম, ১৮৮৬ সালে জার্মানিয়াম আবিষ্কৃত হলে সব দেখা গেল যে, পর্যায়ক্রমে ঠিক কান্ধে কান্ধে বসে গেল। মেণ্ডেলভের পর্যায়-সূত্র বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করে নিলেন। আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রের এটি গেন ভিত্তি। পরে অবশ্য এতে সামান্য অদল-বদল করতে হয়েছে। আধুনিক পর্যায়-তালিকায় পরমাণবিক ওজনের স্থান অধিকার করেছে পরমাণবিক সংখ্যা এবং সেগুলি সব অথও সংখ্যা। তালিকায় ১৬টি গ্রুপ আছে; ১(ক), ২(ক), ৩(ক), ৪(ক), ৫(ক), ৬(ক), ৭(ক), ৮; ১(খ), ২(খ), ৩(খ), ৪(খ), ৫(খ), ৬(খ), ৭(খ) এবং ০।



শেষের গুণটি হয়েছে জড় (inert) পদার্থ সমূহের জ্ঞা। আর তালিকায় পর্যায় আছে সাতটি; ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭। একই গুণের মৌলিক পদার্থ সমূহ সমবর্মী।

এতদ্ব্যতীত অণু-পবমাণুর কথা যা বলা হল সবই কল্পনা-বাজ্যে; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। যা হিসেব দেওয়া হয়েছে, সব আপেক্ষিক। অণু বা পবমাণুর প্রকৃত ওজন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি, কারণ তাদের ওজন বা আয়তন অত্যন্ত কম।

১৮১৬ সালে ইয়ং জলের অণুর আয়তন সম্পর্কে বললেন যে, অণুটি এক ইঞ্চির  $১০০০০০০০০০$ তম অংশ ব্যাসের একটি গোলক। অবশ্য এটা আন্দাজে। ১৮৫০ সালের জাখাণ বৈজ্ঞানিক ক্লসিয়াস, বলাই বয়েলের গ্যাসের গতিত্বের সাহায্যে 'অল্প কয়েক অণু আয়তন নির্ণয় করতে চেষ্টা করলেন। গতিত্ববাদের গ্যাসের অণু সকল ক্রমাগত নাড়ছে, পরস্পরের সঙ্গে এবং পাতের গায়ে দাক্ষাৎকি করেছে। এই সূত্র থেকে একটি সমীকরণ পাওয়া গেল, যাতে গ্যাসের সাক্ষ্যতা অর্থাৎ গতিত্ব বাধা, অণুর আয়তন ও এক ঘনফলে তাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কিন্তু যেহেতু অণুর আয়তন ও সংখ্যা উভয়ই অজ্ঞাত, সুতরাং সমীকরণের সমাধান করা গেল না। ১৮৬৫ সালে জাখাণ বৈজ্ঞানিক লর্শমিড সহজেই এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন, যদিও তা একেবারে নির্ভুল বলা চলে না। তিনি বললেন যে, যদি অণু সমূহকে গোলক ধরা হয় এবং যদি পদার্থ সমূহের 'বল' অপর্যাপ্ত মনে করা যায় যাতে অণুগুলি একেবারে ঠাস করে প্যাক করা থাকে, তাহলে উপবিষ্ট অণুগুলি বাকি দুইটি ও তবলের ভাঙ্গ নিয়ে 'আব' বলের সমীকরণ পাওয়া যাবে। সমীকরণ দুইটির সমাধান থেকে অণুর আয়তন এবং এক ঘনফলে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসগুলিকে ধরে এপার্যবিত করে তিনি অণুর ব্যাস নির্ণয় করলেন—এক সেণ্টিমিটারের  $১০০০০০০০$ তম অংশ 'আব' এক ঘন সেণ্টিমিটারের গ্যাসে  $2 \times 10^{18}$  অণুর সংখ্যা। অবশ্য এটা ভুল। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা বলে এটা গৌরব ভুলের জ্ঞা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আভোগাড্রোর সূত্র থেকে পাওয়া যায় যে, একটি ঘনফলে সকল গ্যাসের অণুর সংখ্যা সমান। যদি কোন পদার্থের অণুর ওজন গ্যাসে প্রকাশ করা যায়, তবে 'তাকে পদার্থের গামা' (গামা-মাসিকিউস) বা মোহা বলে। বলা হাইড্রোজেনের মোহা ২.০১৬ গ্রাম, অক্সিজেনের ৩২ গ্রাম, নাইট্রোজেনের ২৮.০২০ গ্রাম ইত্যাদি। বিভিন্ন গ্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শূণ্য ডিগ্রী তাপে এবং একক বায়বীয় চাপে যে কোন গ্যাসের এক মোলের ঘনফল  $22.414$  লিটার (এক লিটার = ১০০০ ঘন সেণ্টিমিটার)। এই ঘনফলে অণুর সংখ্যা প্রত্যেক গ্যাসের জ্ঞা এক। এই সংখ্যাকে আভোগাড্রোর সংখ্যা বা আভোগাড্রোর ধ্রুবক বলা হয়।

১৮২৮ সালে পদার্থবিদ ব্রাউন দেখালেন যে, জলের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ফুলের বেনু ফেলে দিলে, তাবা ক্রমাগত চাচি ধাবে ছুটছুটি করতে থাকে। গ্যাসের গতিত্ববাদের অণুদেরও ঠিক এই ব্যাপারট ঘটবে। তাহলে বলা যায় ব্রাউনের গতি গ্যাসের গতি একটা বিবর্তিত সংস্করণ। এই দিক দিয়ে ১৯০৮ সালে ফ্রাঙ্ক পেরিন অণুদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন। ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আয়েনষ্টাইনের সমীকরণের সাহায্যে তিনি আভোগাড্রোর সংখ্যা নির্ণয় করেন। এই সংখ্যাটির মান হ'ল  $6 \times 10^{23}$ । বিভিন্ন গ্যাসে একই ফল পাওয়া গেল। এখন এই সংখ্যায় নির্ভুল মান ধরা হয়  $6.023 \times 10^{23}$ ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, কোন পদার্থের একটি অণু বা পবমাণুর ওজন বাব করতে চলে তার আণবিক বা পয়মাণবিক ওজনকে আভোগাড্রোর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। সব চেয়ে হাল্কা হাইড্রোজেন পবমাণুর ওজন  $1.67 \times 10^{-24}$  গ্রাম আর প্রকৃতক সবচেয়ে ভারী ইউরেনিয়ামের পবমাণুর ওজন  $3.95 \times 10^{-22}$  গ্রাম। বিশেষ ভাবে তৈরী তুলাবস্তু  $10^{-8}$  গ্রাম ওজন পর্যন্ত মাপতে পারে। অণু বা পবমাণুর ওজন চাফুর ভাবে মাপা চলে না, গাণিতিক উপায় ছাড়া পথ নেই।

আভোগাড্রোর সংখ্যা জানা হলে এক ঘন সেণ্টিমিটার গ্যাসে অণুর সংখ্যাও জানা হয়ে গেল। তাহলে গ্যাসের গতিত্বের সাহায্যে অণুর আয়তনও নির্ণয় করা চলে। সব চেয়ে ছোট হাইড্রোজেন পবমাণু  $1.35 \times 10^{-8}$  সেণ্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলক। হিলিয়াম পবমাণুর ব্যাস  $2.2 \times 10^{-8}$  সে: মি: এবং অক্সিজেন নাইট্রোজেন পবমাণুর ব্যাস প্রায়  $1.8 \times 10^{-8}$  সে: মি:।

লর্শমিডের প্রকল্পের সাহায্যেও অণু-পবমাণুর আয়তন নির্ণয় করা যায়। তিনি বলেন যে, 'তবল বা ঘন পদার্থকে খুব চেপে প্যাক করা গোলককণী অণুর সমষ্টি মনে করা যায়। জলের উদাহরণ নেওয়া যাক। জলের আণবিক ওজন ১৮ গ্রাম, আর ১৮ গ্রাম জলের ঘনফল ১৮ ঘন সেণ্টিমিটার। সুতরাং ১৮ ঘন সেণ্টিমিটার জলে  $6 \times 10^{23}$  সংখ্যা অণু আছে (আভোগাড্রোর সংখ্যা)। তাহলে একটি অণুর ঘনফল হল  $3 \times 10^{-23}$  ঘন সেণ্টিমিটার। যদি অণুকে  $r$  ব্যাসার্ধের গোলক মনে করা যায়, তবে 'তাব ঘনফল হবে  $\frac{4}{3}\pi r^3$ , যেখানে  $n = 3.1415$ ; সুতরাং জলের অণুর ব্যাসার্ধ হল প্রায়  $1.7 \times 10^{-8}$  সে: মি:। এই অতি সহজ উপায়ে অণু বা পবমাণুর আয়তন নির্ণয় করা যায়।

বাগিত্ত ভাবে পবমাণুকে চাফুর দেখা সম্ভব নয়। সব চেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বাব বিবরণ লক্ষ ওণ, তা দিয়েও দেখা যাবে না। কোন দৌগিক পদার্থের বড় জটিল অণু দেখা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু 'তাব মধ্যে থাকে সহস্রাধিক পবমাণু। আধুনিকতম উপায় এক্স-রে, ইলেকট্রন এবং বর্ণালীর সাহায্যে অণুপবমাণুর আয়তন ও আভোগাড্রোর সংখ্যা নির্ণয় করা। ব্যাসে প্রতিবার  $10^{-8}$  না লিখে  $1A^\circ$  লেখা হয়; অর্থাৎ  $1A^\circ = 10^{-8}$  সেণ্টিমিটার। তাহলে হাইড্রোজেনের (নবতম নির্ণয়ের ফলে) ব্যাসার্ধ হল  $0.53A^\circ$  (আংস্ট্রম)।

এ কথা সত্য যে, অণু-পবমাণুর তথ্য নির্ণীত হয় গণিতের সাহায্যে, পরীক্ষাগারে চোখে দেখে নয়। কিন্তু এ-ও স্বীকার করতে হবে, গোড়ায় পরীক্ষা না করলে গণিত সাহায্য করতে পারত না। এ বিষয়ে এখনও অনেক কিছুই রয়েছে অনাবিস্কৃত। যতটুকু হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে খুব কম চাপের গ্যাসের মধ্যে তড়িত-প্রবাহ সঞ্চালনের ফলে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

[ ক্রমশ: ]

তখন আমি ছোট। বয়েস—আট-দশ বছর হবে। ঠিক হল

ঢাকা যাব। পিসতুতো ভায়ের বিয়ে—তিন দিন পবেই। এই

পিসে মশাই যখন মারা যান, পিসতুতো ভাই আঁতুড়ে। মা-ঠাকুরমা বাবা-কাকা—আমাদের বাড়ির সবার স্নেহ এই ভায়ের উপর—পিসিমায়ের উপর। সেই ভাইয়ের বিয়ে—যেতেই তার। চিঠি এসেছে, টেলিগ্রাম এসেছে। কিন্তু সমস্যা—কী কবে যাওয়া যায়? আমাদের নদী কীর্তিনাশ। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি নাশ করেছিল। বিধাস হয় না, শুকিয়ে হাঁটু-জল। বর্ষায় তিন মাস মাত্র আমাদের ষ্টেশন থেকে ষ্টীমার চলে, তাব বেশী নয়। সেই তারপাশা যাওয়া, ঢাকা মেল ধবা। সাবা রাত কাটবে, গহনার নৌকা চলবে, ভোবে মেল। না ধরতে পাবলে সারাটা দিন ষ্টেশনে পড়ে থাকা—বাত আটটায় আবেক পীমার। নৌকাতে যাওয়া সহজ, একেবারে সদব ঘাট। হুঁদিন লাগে। হাওয়া সুবিধে থাকলে দেড় দিন। উজিয়ে যায়। খবচ কম, লোক যেতে পাববে বেশি। অজ্ঞানের প্রথম। বাড়-বিষ্টিব শঙ্কা নেই। জোয়াংরা বাত। কিন্তু বড় কাকা বললেন—অসুবিধে হো নেই, মেলা নৌকা এই সময় যাওয়া-আসা কবে। ভাবনার কেবল চব ছুঁটো—ঢাকাকে চব, পুলিশমাবার চব; গায়ে গায়ে। দিনেব বেলো তাব কাছ বেসে যাওয়া—সে এক রকম দুঃসাহসী। নদীটা চওড়া। ওপারে কমলাঘাট, দেখা যায় না। তালতলা থেকে ফুল্লা—কম দূব নয়। তার মধ্যে এমনি ছুঁটো চব। চবের মুসলমান—কে না জানে তাদের নাম? জান-প্রাণেব জোয়াংরা বাথে না, দবা-মায়াবও ধাব ধাবে না। তাদের জীবনই যে অমনি। চরে ফসল ফলে কেবল—লক্ষা, কলা আব মিষ্টি-কুমড়া। তাই নিয়ে ওবা ওপারে যায়, বাজাবে ঢোকে, বিক্রি কবে। হুণ, তেল, কাপড়, গান্ধা আনে। আব কবে ডাকতি। ঐই ঠাংবেজ রাজস্বও কেউ ওদেব গায়েল করতে পাবলে না। বারো নদীতে যেই নৌকোব শব্দ হল, ছোটো পানসী নিয়ে। দিনমানেও সন্ধ্যাও পেলে কি আব ছাড়ে? তবে শুনবে সে গল্প?—

কাকা জুং কবে বাস গল্প শুরু করলেন—দিনে-চপুবে এমনি এক বাজাজানি শুরু হল! দাবোগাব কাছে পৌছোলো খবব। ঢাকাব বড় দাবোগা। অনেক ডাকাত ধবেছেন, ঢেব পুবস্কার পেয়ে-ছেন, দুদ্ধান্ত সাহস, ধারালো বুদ্ধি! বাতাসেব আগে তাঁব ঘোড়াব বেগ, মনেব রাগে শাব-দেওয়া। পিছনেব পুলিশ দল অনেক পিছনেই রইলো প'ড়ে, দাবোগা এগিয়ে গেলেন। চাবে ডাকাতের মজাই এই—দেখতে নেহাং ভালো মাহুষ। ছেঁড়া-ময়লা কাপড়-গামড়া, দাঁন-মলিন চোখা। চোখ পিটপিট কবছে। ডাকতি কবাব সময় না কি সে চোখে আঙুন বেবোয়। এই মুহূর্তে ডাকতি করল, পব-মুহূর্তে তার চিহ্নও মেলে না। চাবি দিকে জল আব জল, মধ্যে একটু চব। দিনে-বাত্তে ছুবিব ফলার মতো তীক্ষ্ণ হাওয়া। খাড়া পাড়ে লেগে অদ্ভুত শব্দ কবে, তাব ঝোড়ো হাওয়ায় বালি ওড়ে। চবের মাঝখানে হয়তো খান কুড়ি-পঁচিশ ঘব, কয়েকটা কলা-ঝোপ! তাব মধ্যে ওবা পুলিশ, জল-পুলিশ সবাব চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালায়। কোথায় সে লুকায়, পাল্লা পাওয়া যায় না। শুধু মেয়েরা ঘর-দোর নিকোয়, চাল ঝাড়ে, কলসী ভ'রে জল আনে, আর বুরি আড়ালে মুচকি হাসে। প্রশ্ন শুধোও, নির্বিকার মুখে বলে—মাছ ধরতে গেছে কিংবা গেছে বাজাবে। কোথাও কাউকে মেলে না! ধবা যদি বা কেউ পড়ে, জেল খাটে, শাস্তি পায়, আবার ঘরে ফিরে এসে ধে-কে সেই। সে সব অভিজ্ঞতা দাবোগাব ছিল।

## জ ন

ত্রীশাধনা কর (শান্তিনিকেতন)

তাঁই ছুটেছিলেন; সবাইকে পিছনে বেগেই ছুটেছিলেন। ওবা লুকিয়ে পড়বাব আগেই গিয়ে পড়তে হবে। হাতে তাঁব বিভলভার, কোমবে ছোবা। জানতেন পিছনে দশ-পনেবো জন পুলিশ আসছে, সাইকেলে, বন্দুক নিয়ে। কিন্তু হিসেবে কবেছিলেন ভুল। দাবোগা পৌছবাব আধ ঘণ্টাটাক পবে গিয়ে পৌছল পুলিশ দল। তখন কেউ কোথাও নেই। মেয়েবা কাজ কবছে, বাচ্চাবা খেলা কবছে। দাবোগা গেলেন কোথায়? অনেক খোঁজে হুদিশ মিলল—নদীর জলেব একখানে বস্ত্রেব বড় ঘোড়েনি। একটা কলাগাছের ডেলা, গায়ে মস্ত একখণ্ড দেহ,—টোছে কবেই যেন বেঁধে বাখা হয়েছে। চেউয়ে-চেউয়ে ভাসছে আব ভুবছে। সদবে খবব এল। দলে দলে পুলিশ দাবোগা ছুটল। চর তোলাপাড়। ওদেব বাচ্চাব দলেব যেন মহা ফুর্তি মাগল। তাবা বালি উড়িয়ে দিলে, খেলাচ্ছলে ডিগবাজি থেলে। গাড়িব মধ্যে ধূপধাপ নেবে কচ্ছপেব ডিম খুঁজতে লেগে গেল। দুষ্মণ হুঁ-এক জন দরা পড়ল। একটি কথা বাব কবা গেল না। শাস্তি সইলে, নিশ্চিন্ত মনে জেলে গেল। এ সব শোনা গল্প নয়, নিজেব চোখে দেখা। আমি তখন ঢাকায় আমিন, পুলিশ দলের সঙ্গে চাবে গিয়েছিলাম, আবো অনেকে গিয়েছিল। সেই থেকে চবের নাম পুলিশমাবাব চব।

কাকা থামতেই ঠাকুরমা বলে উঠলেন—তবে নৌকোয় গিয়ে কাজ নেই বাপু!

কিন্তু নোয়াবালি সেখ, জোয়ান বয়েস, হাত-পা শক্ত শক্ত, নৌকা বেয়ে আর কাঠ কেটে শিবা বের-কবা। তাব বাবা বায়ের হাতে মাব' গিয়েছিল, লড়াই কবেছিল দেড় ঘণ্টা। নোয়াবালি সে গল্প প্রায়ই করত। বলতে বলতে তাব বাব-কবা শিবা দবদব কবত, মুখটা টকটক কবত, কালো বগ্টা হত বেগুনি। আব চোখ হুঁটো—সে যেন উদ্ধাব টুকবো, ঠিকবে বেবিয় আসতে চাইত। স্পষ্ট মনে হত সেই বাঘটাকে, না হোক বায়েব বাশের কাউকেও যদি সে পেত, দেখে নিত। বাপেব মৃত্যুটা সে কখনো ভোলেনি। ছেলেবেলা থেকে সে আমাদের মজুবা খাটে। বাড়িব পাশেই বাড়ি। সে বলে উঠল—কর্তামা, তবে আমাব কথা শুনুন, আমাব সম্বন্ধী হুর্কদ্দিন থা। নাজিবাবাদ বাড়ি। নৌকো বাওসাই তাব কাজ, মস্ত দোমালাই নাও আছে, দিন দশ-বাবো আগেই এসেছে ঢাকা থেকে। পথ-ঘাট তার জানা। তাকে বললে সে নিশ্চয় আপনাদের নিয়ে যাবে।

সবাই মিলে পবামণ হল। কাকা বললেন—চেনা-জানা মান্নি হলে অবজ্ঞা ভয় তত থাকে না। হোমাব সম্বন্ধীকেই নিয়ে এসো গে, দেখি সে কী বলে।

নোয়াবালি বললে—আমিও যাব সঙ্গে, নৌকো এমনি বাইব, যেন পক্ষীরাজের নৌকো, এক দিনে উড়ে চলে যাব ঢাকা, সদর ঘাট। নদীতে মাছ ধবব, জাল নিয়ে ধাব, চাবে বালা-খাওয়া হবে—সে খুব মজাব। নৌকাতেই যাব, কী বল কুট্টি ভুইঞা।

নোয়াবালি কুন্তিবাজ লোক। আমাদের মাতিয়ে দিলে। বিকলেই গেল নাজিবাবাদ, আর সম্বন্ধীকেই শুধু নয়, তাব দোমালাই নাওটা শুদ্ধ আমাদের গ্রামেব বড় খালে নিয়ে এল। হুর্কদ্দিন

এসে ভরসা দিলে। এখন আর অত ভয় নেই চরে। চার পাশে জল-পুলিশ, পাঠারা দেয়। তার পবে তেমে বললে—নোয়াবালি ছাড়লে না, নৌকাস্তম্ব নিয়ে এল। কিন্তু আমি তো যেতে পারব না, আমাব যে আগেই আপেক জায়গায় বায়না হয়ে গিয়েছে। নদীর ঘাটে কত নৌকা আছে, কেয়া যাবে। সে তার অনেক চেনা মাঝির নামও বলে দিলে।

পরদিন। কাক-ভোব, মঙ্গলের উল্লাহ বৃন্দ পা। আমবা নদীর ঘাটে এলাম। কিন্তু চেনা মাঝি এক জনও মিলল না। যাদের মিলল তাদের নৌকা ভাড়া হয়ে গেছে, নয় তো নৌকা সাবাই হচ্ছে। অগত্যা অন্ত মাঝির নৌকাই ভাড়া নিতে হল। নাম তার রুস্তম। বেঁটেখাটী মানুষ, মুখে এসেছে পিঠ, পেকে গিয়েছে জ্ব। কিন্তু নৌকার কার্যের মতোই জলে ভিজে বোদে পড়ে সে পোক্ত। সে খুব কথা শুক কবলে বাবা-কাকার সঙ্গে, প্রথম থেকেই। ঢাকা যাবার পথ-ঘাটের খবর, সদর ঘাটের কথা, চরের কথা, সব তার নথের ডগায়। বাড়ি বললে দক্ষিণ পাড়েই—সামনেই, জাহ্নবাব চর। নোয়াবালি বললে—তোমার কথায় একটু উত্তর পাড়ের টান আছে মনে হচ্ছে।

রুস্তম তাড়াতাড়ি বললে—আগে যে ভুইঞা উত্তর পাড়ের বাড়ি ছিল। নদীতে ভেঙে নিলে, এপারে চলে এসেছি। আর বাড়ি-ঘর কি, স্ত্রী আর ছোটো ছেলে ক'বছর গিয়েছে, ওই একটা বাকি। গণি ওব নাম, বিয়ে দিয়েছিলাম, তা বউটাও বাঁচল না। বাপ-বেটায় নাও বেয়েই দিন কাটাচ্ছি। ওবে গণি, নাও ঠিক কর।

গণির বয়স হবে সত্তেরো-আঠারো। সুন্দর চেহারা—যেন তেল-কুচকুচে সতেজ বাঁশ। তার বড়ে এখনো বোদে-পোড়া তামাটে বঙ ধবেনি। চোখ বড় বড়, তাবায় একটু নীলচে গাল আভা। চাউনি যেন নদীবই মতো রহস্য-ভরা। সে একটা কথা বললে না। নৌকা ঠিক কবতে লাগল। রুস্তম নোয়াবালিকে হাত ধবে নৌকায় টেনে নিলে। তামাক খেতে দিলে। আমি সব থেকে ছোট, আমাকে—উঁচিয়ে তুলে নিয়ে এল। বাবা-কাকার খুবই ভাল লাগল ওকে। দটা খানেকের মধ্যেই নৌকা ছাড়ল। আমার অনিন্দ সব চেয়ে বেশি। একে তো যাচ্ছি সুন্দরদার'র বিয়েতে—যে সুন্দরদা এতটুকু বয়স থেকে আমাকে আদবে ও আবদারে আয়ত্ত কবে নিয়েছেন। চিঠিতে লিখেছেন—আমি না গেলে তার বিয়েই হবে না। তাব উপরে নৌকোতে চলেছি এতটা পথ। পাড়ে ভিড়ে উঠুন খুঁড়ে বাগা হবে, কলাপাতায় থাওয়া হবে, নোয়াবালি ধববে পদ্মাব মাছ। আব কত কী যে দেখতে দেখতে যাব, সে কি এখনই জানি! আগ্রহে ঔৎসুক্যে একেবাবে ছইয়ের বাইরে গলুইয়ের মাথায়। নোয়াবালি'ব কাছ ঘেঁসে বইলাম। সে বললে—দেগবে বুট্টি ভুইঞা নদীতে কত কুমার ভাসে, শুক্ক উন্টায়।

—সত্যি, কুমার দেখা যায়, ভাসতে?

—গ্যা, হবদম। মবা গরুর মতো, সাদা। চেউয়ে-চেউয়ে ভেসে-ভেসে যায়।

কলকাতা গিয়েছিলাম, কিছু দিন আগেই; চিড়িয়াখানায় কুমার দেখেছিলাম। হেসে বললাম—ঠাকাছ। কুমার বুঝি সাদা? কালো যে, গিরগিটির মতো, চিড়িয়াখানায় আছে।

নোয়াবালি বললে—অমনি বটে, জলে ভাসলে সাদা দেখায়।

ইলিশ মাছ ধরতে এসে কত বার দেখেছি। দূর থেকে যেই জলে মেরেছি লগির যা, টুপ করে ডুবে গেছে।

আমি ঔৎসুক্যে বলে উঠলাম—সত্যি, আর কি আছে নদীতে বল না?

আমরা বসেছিলাম যেদিকে গণি বৈঠা বাইছে। সে হঠাৎ আমার দিকে তাকালো। একটুখানি হাসলে। কী বলতে গিয়েও বললে না। আমার কেমন যেন লাগছিল ওকে। কেমন যেন হৃৎপিণ্ড চাউনি, মুচকে হাসি। ওপাশের গলুইয়ে বাবা আর বড় কাকার সঙ্গে রুস্তম মাঝি কথার জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। আমি নোয়াবালিকে ভাবলাম বলি—কেন ভালো চেনা-জানা মাঝির নৌকা নিলে না। কিন্তু ওরা যদি শুনে ফেলে। ফাঁক বুঝে বলতে হবে, গণি যে বার বারই আমার দিকে তাকাচ্ছে। ঠিক সোজা ভাবে নয়। একটু যেন আড়াল রেখে। কিন্তু প্রত্যেক বাবই প্রায় আমার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। আমার মনটা গুরুগুরু করছে। আমি ওব দিকে ঘুরে বসলাম। নোয়াবালি'ব সঙ্গেই গল্প জমে উঠল।

নৌকাটা দোমাসাই। টিনেব ছট, গায়ে ছোট জানালা-কাটা। মোটা-পাটাতন। তিন-চাবটে লগি, পাঁচ-ছ'খানা বৈঠা। মা-ঠাকুরমা ভাই-বোনেরা ভিতরে। মা আমাকে বাব বাব ডাকলেন—যে ছটফটে তুই, জলে পড়ে যাবি। বাবা বকলেন। কিন্তু আমি কি ওসব কথা শুনি? আমি যে কুমার দেখব, মাছ ধবা দেখব, নদীর আবো যত আশ্চর্য্য জিনিস! আমার ভিতরে বসে থাকা পোয়ায়? এমন কি নৌকা আমাদের ঈশাব ঠেশন ছাড়ল, একটা চব পড়ল, অমনি আমি বলে উঠলাম—এই বুঝি ডাকাতের চর?

গণি চোখে হেসে আমার দিকে তাকালে। কিছু বললে না। ওপাশ থেকে রুস্তম মাঝি বলে উঠল—এমনি বাতাস যদি থাকে, সে আজ বিকেলে পেরব। বিকেল বেলাতেই পেরিয়ে বাওয়া খুবদে। অনেক নৌকা চলে তখন—যাত্রীর, মালের, হাটুবে।

গণি বলে উঠল—আর তার সঙ্গে চরের ডাকাতদের নৌকাও ভেসে চলে।

তার গলাটা কেমন ভারী-ভারী। আমার বিশ্বয়ের সঙ্গে একটা কেমন ভয়ের আভাস মিশে গেল—ডাকাতেরা বেয়ে যায়?

—ডাকাত বলে কি চিনবাব জো আছে? তাবা দিবি সবাব সঙ্গে কথা বলে, গল্প করে, ভাটিয়ালী গায়। এই আমাদেরই মতো। দেখলেও চিনতে পারবে না।

তাব ঠোটে এবং চোখেব কোণে কি চাপা হাসি? আমি মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে বলে ফেললাম—চিনব না কেন, নিশ্চয় চিনতে পারব ডাকাত।

নোয়াবালি দৃঢ় স্বরে আমার কথায় সায দিয়ে হেসে বললে—নিশ্চয় চিনব আমরা, জলে ডাওয়া কুমার ডাকাত বাঘ যত দুমণ সবাইকে চিনব আর লড়াই করব, কী বল কুঁটি ভুইঞা। আমি খুব খুসী। গণি নৌকা বাইছে, বাক ঘুরছে একটা, তার মুখ দেখলাম না।

হেমন্তের নদী। এপার ওপার দেখা যায়। শান্ত মেয়ে, চেয়ে আছে চুপটি ক'রে। মনে কিন্তু ছটমি ভরা। সুযোগ পেলেই যেন মেতে উঠতে উদ্ভত। আভাস মেলে—এক-এক জায়গায়

একটু বাতাসেই নাচন জাগছে। হাসিব বোল উঠছে—কল-কল খল-খল। ছোট ছোট ডেউয়ে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে—কাছ দূবে এপাশে ওপাশে। রেখায় রেখায় ঠিকবে ফুটছে স্বর্ধেব আভা—লাল নীল হলদে বেগনি। এক এক জায়গায় আবার এত নিখর জল, মনে হয় পাতলা রূপোব পাতে মোড়া। পাড়ের বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে। ছোট ছোট কী পাখি। ডানা ঝাপটিয়ে বালিতে স্নান করে যাচ্ছে। কোনোটা জল খাচ্ছে, পাড়ে বসে, চোট ডুবিয়ে, পুচ্ছ উন্টুয়ে, ফুরুর করে উড়ে পালালো। গাঙ-শালিক নদী পাড়ি ধরেছে নীল আকাশ সঁতরে। কাশের বনে ফুল ফোটা শেষ হয়নি। কেশরগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, ফুলের ঝাড় মাথা লুটিয়ে লুটোপুটি। আকাশে সাধা মেঘেব টুকরা, ওরা যেন তাবই জীবন্ত রূপ। মাটিতে নেবে অটকা পড়েছে। পাল্লাতে ব্যস্ত, পারছে না। জলে হাওয়ায় মাটিতে আব ফুলে খেলা জুড়ে দিয়েছে। কোনো পাড়ে একেবারে নদীব গায়েই গ্রাম, বন্দর, হাট-বাজার। মানুষের অবিরাম স্রোত। ধাকড়াক, ঠাসঠাস। মাল বোঝাই হচ্ছে, নাবানো চলেছে। চকুচক টিনের ঘর,—লম্বা, কত বড়। পাটের গুদাম—নোয়াবালি বললে। আমি দু'চোখ মেলে চেয়ে থাকি। ভুলে যাই, কুমীর ডাকাত। কেবল প্রশ্নেব উণর্ প্রশ্ন—এটা কি, ওটা কি, কোথেকে নৌকা আসছে কোথায় যাচ্ছে। ওখানে আমাদের নৌকা কেন একটু ভিড়াও না। বন্দরটা একটু দেখাও।

নোয়াবালি হেসে বলে—এমনি ভিড়াতে ভিড়াতে গেলে যে

সময় মতো ঢাকাই পৌছোনো হবে না। বিয়েই বা দেখবে কী করে। কালকের মধ্যেই তো পৌছোনো চাই। ওই যাঃ, এদিকে যে একটা শুশুক উন্টে গেল, তুমি দেখলেই না। আর ওই, ওটা কি ডুবে গেল—কুমীরের লেজটা কি?

আমি লাফিয়ে একেবারে ঝুঁকে পড়ি, সে যদিকে তাকিয়েছে,—কোথায় কুমীর?

নোয়াবালি থপ, কবে আমাকে ধবে ফেললে—আঃ, একুনি যে পড়ে বাচ্ছিলে।

বকুনির ঝড় উঠল। মা আমাকে জোর কবে নিয়ে ছইয়ের তলায় বসিয়ে রাখলেন।

নোয়াবালি হেসে বললে—আচ্ছা, আরেক বার উঠুক, তোমাকে ঠিক দেখাবো। ওই যে ল্যাজ দেখিয়েই কুমীরটা ডুবল, সে কী অমনি ডুবল ভেবেছ? শিকার দেখে তাক করে ডুবেছে। ঠিক উঠবেই কোথাও।

অনেকক্ষণ চূপ করে বসে রইলাম। কুমীরটা আর উঠল না। কিন্তু সে না-ই উঠুক, আমার উত্তেজনা এতটুকু কমতি হল না। ছই ধবে দাঁড়িয়ে, নয় ঝাঁপিয়ে সামনে এসে কেবল এদিক ওদিক দেখি—যে প্রকাণ্ড কুমীরটা তার লেজের ডগা দেখিয়ে ডুব দিল, সে আমার সমস্ত মন আব কল্পনা জুড়ে সত্যির চেয়েও আশ্চর্য হয়ে জেগে রইল।

স্ব্থ মখন মাথার উপর, রুস্তম মাঝি বলল—এই পাড়েই নৌকা ভিড়াই, আপনাবা বাম্মা-খাওয়া সেবে নিন, আমরাও

## অদ্বিতীয় লিভার টনিক

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু বস্তকর্ণিকা গর্দন, খান্ত পবিপাক, বোগ প্রতিক্রোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ার অগ্রোষ ঔষধ মাত্র নচে—ইহা একটি অদ্বিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

## কুমারেশ

৭ লিভারকে সুস্থ ও সতেজ  
রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ  
সালকিয়া - হাওড়া

থেয়ে নি। এই বাকটা পেরুলেই আসল পদ্মা। কোণাকুণি পাড়ি ধবতে হবে। আজকে হাওয়া বেশ ভাল বইছে। সন্দের আগে ট্র্যাকের চব পেকতে পাবলে সাধা বাত বেয়ে কাল ভোরেরই সন্ধ ঘাটে পৌছানো যাবে।

বাবা বললেন—গ্যা, বত তাড়াতাড়ি যেতে পার মাঝি, ততই ভাল, তোমাকে খুসী করে দেব।

রুস্তম মাঝি বললে—সে আপনাবা দেবেন বৈ কি। সে আমি জানি। আমার নাও ভালো, আমি বাইতেও কখনো কষ্টব করি নে, বাবুগাই আমার কদব বোঝে। ফিরবার সময়ও আমার নাও কেয়াবা কদবেন ভুইএ, আমি দু’-তিন দিন সদর ঘাটেই থাকব।

নোয়াবালি বললে—তা কেন, আমবা তোমাব ভাড়া অর্ধেক দিয়ে যাব, তুমিই আবাব আমাদের নিয়ে আসবে।

গণি তার ভাবী খমখমে গলায় বলে উঠল—আগে পৌছানোই যাক, পরে ফেরাব কথা। এখানে থামানো নাও?

তার আগের কথাটা শুনে, সবাই শুনলে কি না সেও মল্লেহ। আমার মনটা কেমন ছম্ছম করে করে উঠল। বললাম—কেন, পৌছাতে পারব না না কি?

গণি হেসে বললে—বলা যায় কি? জলে চলছ, কখন কি ঘটে। এ তো আব ভাড়া নয়।

আমাকে চুপ করে যেতে দেখে নোয়াবালি হেসে বললে—ঠকলে তো কুটি ভুইএ, ও তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। এই বুঝি তোমার মাহস।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম—দু, মোটেই ভয় পাটিনি।

গণি তেমনি চাপা হাসল, বাকিয়ে তাকানো আমার দিকে। নৌকা পাড়ে ভিড়েছিল, আমি আর ওর দিকে না তাকিয়ে সাক্ষিয়ে নেবে পড়লাম।

এটা ঠিক চব নয়। ধান-ক্ষেত, বন। নদীব পাড়। একটা একটা সন্ধ্যা পায়েরলা পথ—বান-ক্ষেত বেয়ে এসে বনের ওপাশে মিলিয়ে গেছে। কাশ বাবলা মোতরার ঝড় আছে-কাছে কাছে। জলেব কিনাবে কিনাবে, ঘন ঝড়। একটি অনেক পুরোনো বট গাছ। হেসে পড়েছে জলেব ধারে। নদীব পাড় ভাঙতে ভাঙতেও কাঁ করে বয়ে গেছে, করে বা ভেঙে পড়ে। তাবই ছায়ায় সবাই গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দাঁড়াল, বসল। নোয়াবালি নাবল জাল নিয়ে, এবাবে মাছ ধববে সে। পিছন পিছন ছুটলাম আমি। নদীতে দু’চাবটে নৌকা ভাসছে। মাঝিদের অস্পষ্ট গান শোনা যাচ্ছে—

মন মাঝি তোব বৈঠা নে বে

আমি আর বাইতে পারলাম না।

আমাদের পাড়ের দিকে একটা লোক মাটির গামলায় বসে জল কেটে কেটে আসছে। ভেলা ঠেলছে দু’জন। ওপাশে ছোট ছোট কতগুলি বাচ্চা খুব স্নান করছে। তাদের ডুববার ভয় নেই, কুমীরের ভয় নেই, তাবা সব নদীব পাড়ের, প্রায় উলঙ্গ, কোমরে রূপার ঘুঙ্গী। নোয়াবালি জাল ফেলে। জল-পরীর মতো জাল আকাশে পাখা মেলে, বপাৎ গন্ধে জলে পড়ে। তলিয়ে যায়। নোয়াবালির হাতে দড়ি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে একটু; আর, আমি একাগ্রদৃষ্টি। তাকিয়েই থাকি—কাঁ মাছ উঠবে? যদি

আবাব্যাপন্যাসের দৈত্যের কলসীর মতো কিছু একটা উঠে আসে। মামা-বাড়ি গিয়ে ছোট মাসির কাছে গল্পটা যে শুনে এসেছি এট দেখিন। হঠাৎ মনে হয় যদি সেই কুমীরটাই জালে আটকা পড়ে জাল টানতে থাকে নোয়াবালি আব আমাব কৌতুহল উত্তেজিত হতে হতে একেবারে উদ্ভামতার শেষ সীমায় উপনীত হয়! থানিক এগিয়ে আসি, থানিক পিছিয়ে যাই। কাঁ যে দেখব! জাল সাদা হয়ে উঠে এল। কত মাছ—জাল সাদা হয়ে উঠে এল। কত মাছ—বান, খল্লা, ভাঙনা। ভয়টা কেটে গিয়ে আবেক বকম আনন্দে ছুটে যাই। মাছগুলি খুলে নিয়ে বলি—ইলিশ মাছ উঠবে না?

নোয়াবালি হেসে বলে—ইলিশ মাছ কি এ জালে ধরা যায়। তার জাল আসাদা, ধবাব কায়াদা আসাদা। তাবা নাবানদীতে বাক বেঁধে চলে। বাটা খল্লাও বাক বেঁধেই শ্রোতব উজানে এগোতে থাকে, তাই তো যখন ধরা পড়ে, এতগুলি করে পড়ে।

অনেক মাছ হল। ফিরবার পথে এক সময় নোয়াবালিকে বলেই ফেললাম—গণি মাঝি, কেন অমন মুচকে মুচকে হাসে? অমন ভাবে তাকায়!

নোয়াবালি অবাক হয়ে বলে—তা কি হয়েছে?

কাঁ যে হয়েছে, সে আমি তাকে কাঁ করে বোঝাবো! আমি চুপ করে গেলাম। নোয়াবালি বললে—কেন এ কথা বলছে, কাঁ ভাবছ, বলা তো?

আমি কিছুই বলতে পাবলাম না। চুপ। নোয়াবালিই চলতে চলতে বললে—ছেলেটা দেখতে কিঞ্চি ভারী সন্দেব। কাঁ আশ্চর্য চোখ দু’টো। আর বেশ গম্ভীরগোছব।

আমি শুধু বললাম—হঁ।

বটের তলায়, দিবাং সংসার। মা বাবা কবছেন, ঠাকুরমা গ্রাহিক কবছেন। গণি আর রুস্তম নৌকাতে বাঁধছে। ঘটব ঘটব মশলা-পেশার শব্দ! এত মাছ, দেখে সবাই খুসী। মা বাঁধলেন থিঁচুড়ি, মাছভাজা, মাছ-ঝাল। ওবাও বাঁধল থিঁচুড়ি আর মাছেব ছালন,—তাদের রঙ লঙ্কায় বাঙা, গন্ধে পেয়াঙ্গ-বন্ধনের ত্রীত গন্ধ। বাবা হয়ে এসেছে, আমরা নদীতে নেয়ে এসেছি। গেতে .বসব;—দু’জন লোক পাড়ের সেই পায়েরলা পথ দিয়ে আসছে। হাট নয়তো বাজার-ফিরতি। হাতে আগ, তবকাবী, মাটির হাড়িকুড়ি। কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, দাঁড়াল। বললে—কোথায় যাবেন আপনাবা? ঢাকা, না, নাঙ্গলবন্ধ?

নাঙ্গলবন্ধ পুণ্ড্রাবানের জগা বিখ্যাত। বাবা বললেন—ঢাকা যাব। এদিকে কি হাট-বাজার, গাঁ-বন্দর আছে?

ওবা বললে—বনের ওপাশেই জেলেপাড়া। ধান-ক্ষেতের দক্ষিণে ভুল্লোকের গাঁ। মাইল খানেক দূরে হাট-বাজার, নদীব পাড়েই বসে। বড় কাকা জিজ্ঞেস করলেন—এদিকে কুমীর বা চোর-ডাকাতের ভয়-টয় নেই তো?

—সে ভয় বড় নেই! তবে.....

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তা কালেন। তারা বললে—এই বন আর নদীর পাড়ের কাশ-ঝোপগুলি;—এগুলিই সব সময় নিরাপদ থাকে না। বর্ষায় বাঘ আটকা পড়ে, খুব কচিব, তবু চিতে হেড়োল এখানে লুকিয়ে থাকে। বুনো শূয়ার তো প্রতিবারই বেরায়।

চম্কে বাবা বললেন—সে কী মশাই, এখান দিয়ে হাঁটা-চলা কখনে কোন্ সাহসে?

—হাট-বাজার তো করতেই হবে। সাবধানে থাকি, এ সময়টাই তো ভয়ের, দল বেঁধে চলি। শুয়োরের প্রাণেও তো ভয় আছে। হবে এক-একটা বড় ঝোঁড়া থাকে। গতবারের কথাই ধরুন না। হাটের বাব। পথ দিয়ে লোক-জনের আসা-যাওয়া। দিন দুপুর। কথা নেই, বাতী নেই, গৌ-গৌ ডাক। তাকাতো না তাকাতো তেড়ে এলো—সে যে-সে জন্তু নয়। এক দাঁতালো শুয়োব। তার কী বিকট চেহারা—যেন হুঁমণ চলন্ত গাও গাছের গুঁড়ি। দাঁত দুটো হুঁপাশে—ছুঁচোলো হয়ে বেরিয়ে। গৌ ধরে যাকে তাড়া কবল তার আব ছাড়াই নেই। পেট চিঁপে হুঁকাক কবে দিলে। এত লোকের হৈ-হৈ, লাঠির শিটুনি, দায়ের কোপ, ট্যাটার খোঁচা—ক্রক্ষেপ নেই। লোকটাকে দাঁত দিয়ে চিরলে, তার পবে তাড়া খেয়ে বেসামাল। নদীর পাড় ভেঙে একেবারে জলে। আব কি তাকে পাড়ে উঠতে দেওয়া হয়? সাবাটা বেলা সোরগোল। আধমরা ভান জন্তু, তবু কি সে মরতে চায়? পাড় খুঁড়ে, গুঁতিয়ে, জল ধুলিয়ে একাকার। গৌ-গৌ ডাকে ত্রাস জন্মিয়ে দিয়েছিল সবার। তাই বলছিলুম—ভয়-ডব বিশেষ নেই। তবে, ওই শুয়োব-টুয়োব যা বেবোয় মাঝে মাঝে।

গল্প কবে তাবা চলে গেল। আমবা খেতে বসলাম। নোয়াবালি বললে—আমুক না, কোন্ শুয়োবেব পো আসবে। লগি বৈঠা নেই! মাথা গুঁড়িয়ে দাঁত ভেঙে দেব না!

ঠাকুরমা বললেন—ও সবে কী দরকার বাপু, থেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়ি সব নৌকোয় উঠে পড়ে।

কাকা হেসে বললেন—আর বেটা দাঁতাল শুয়োব পাড়ে দাঁড়িয়ে বাগে ফুঁসে মরুক গে।

ঠাকুরমা গম্ভীর মুখে বললেন—হাসি-ঠাট্টার কথা নয়। রাশ্তা-ঘাটে বেরুনো কি কম ঝঙ্কি!

রুস্তম মাঝি এসে দাঁড়াল—তা ঠিক কথা বলেছেন কত'মা, জলের পথে যাওয়া সে আরো বিপদ। এই কচি বয়স থেকে নৌকোয় ঘুরছি; কত বার যে কত বিপদে পড়লাম, আল্লা মরজিতে বেঁচে আছি এখনো। একবার ভবা বর্ষায় মেঘনা পাড়ি দিতে গিয়ে যে ব্যাপার, না থাক, সে গল্প এখন করব না। ও সব আবার আমরা মানি কি না। এট জিন্-টিন্ অপদেবতার কথা বলছিলাম। তবে আপনাদের কোনো ভয় নেই, ভার যখন নিয়ে এসেছি ঢাকা পৌছিয়ে দেবই।

গণি একমনে নিজেরে খিচুড়ি নাড়ছে। মুখ তুলে তাকাল না। খাবারে মন দিলাম। ঠাকুরমা খেলেন ডাব, কলা, সাবু। না আমাদের দিলেন গরম গরম খিচুড়ি, মাছভাজা। আমাদের খাওয়া শেষ; মা খেতে বসেছেন, এমনি সময় বনের দিকটা একেবারে সরগরম। কী যেন কী আওয়াজ হ'ল, তার পরেই কুকুরের ষেউ-ষেউ, মেলা লোকের চিংকার, ঝোপ পিটুনির শব্দ। লাফিয়ে সব একেবারে নৌকায়। শুধু বাবা-কাকা নোয়াবালি পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। রুস্তম মাঝল বৈঠা হাতে। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বন কাপছে, হাশঝাড় ঘন ঘন ঝুলছে। সবাই তাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি—ঐ—ঐ বুঝি কী বেকল, হুঁমণ গাও গাছের গুঁড়ি, ছুচোলো দাঁত।

কিন্তু ক্রমে আওয়াজটা পড়ে গেল। কুকুরের ডাক হল বন্ধ, লাঠির পিটুনিও মিলিয়ে গেল। সব চূপ। ব্যাপারটা যে কী, কিছুই বোকা গেল না। কোনোখানে একটি লোক নেই, কা'কে জিজ্ঞেস করা যায়। বাবা-কাকা একটু এদিকে এগিয়ে গেলেন, নোয়াবালি আর রুস্তম ওদিকে। হদিশ পেলেন না। ফিবে এলেন।

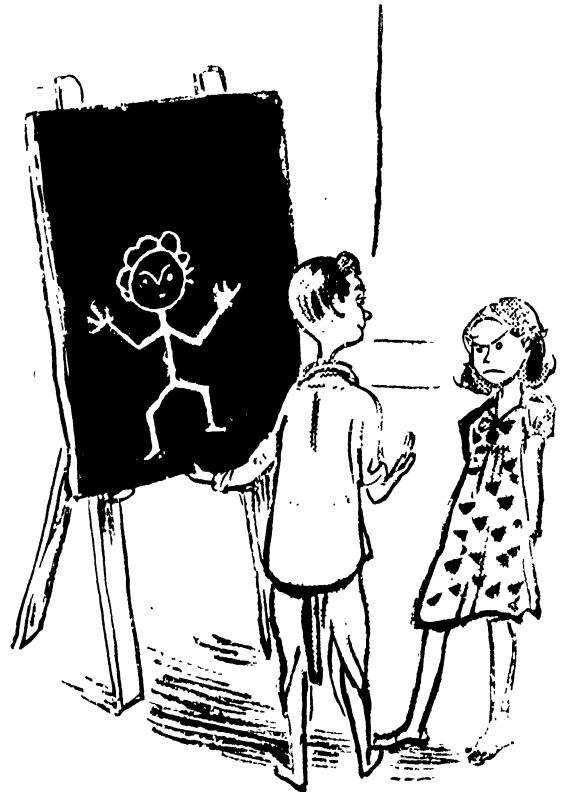
রুস্তম মাঝি বললে—হয়তো গোমাপ কিংবা ধাঁড়,—তাব পিছনেই সব অমনি ছুটেছে!

বাবা বললেন—কী জানি, নদীপাড়ের দেশ, কী বকম, কী ধবন, সবই অচেনা অজানা।

গণি হাসিটা এবাব লুকাতে পাবলে না। সূর্যের আভা পড়ে মুখ উজ্জল। নোয়াবালি বললে—কী হে গণি মিঞা, তুমি অত হাসো কেন?

গণি মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। শুধু সেই বাঁকা তির্যক চোখে তাকালে। তামাক টানতে লাগল। রুস্তম কোমবে ভাল করে গামছা বাঁধলো, হাল বৈঠা নিয়ে বলে উঠল—আল্লা আল্লা নবী, বদব বদর। অমুচ্চ গম্ভীর স্বব, সেই জনশূন্য নদীর পাড়ে জলের মধ্যে থমথম গমগম করে বাজল। বিবাট চওড়া নদী। রোদ ইস্পাতের মতো, চোখ বলসে দেয়। জায়গায় জায়গায় ঈষৎ কালো কালো লাগে। সুন্দর ডেউ। যেন অনেকগুলি কালনাগিনী চিং-উপুড় হয়ে নেচে নেচে চলেছে। কী নিশানা কবে কোন্ দিকে

—শীর্শল চক্রবর্তী অঙ্কিত।



আমার ঘাড়, হবি আঁকতে মানা করলুম না?

কূল পাবে জেনে ওবা নৌকা ছাড়ল, বুঝে পেলাম না। অফুৰন্ত অতল জল। মনটা কেমন কবে উঠল। তীবে বনের আর কাশের ঝোপের আড়ালে যে দাঁতাল শুয়োবটী রইল অদেখা, কাকার কথা মতো যে আমাদের ধরতে এসে ধরতে পারত না, তীবে দাঁড়িয়ে বাঁধে ক্ষোভে ফুঁসত, সে বেন সম্মুখে প্রচণ্ড তরল রূপ ধরে দেখা দিল। কী বহুস্ত ভবা! গণিব চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ল। ঠিক ওই চাউনিতেও বেন অমনি বহুস্ত, নদীৰ সঙ্গে বেন তার গভীর যোগ। আমি মা'র কোল বেঁসে শুয়ে পড়লাম। রুস্তম মাঝি নায়ে পাল তুলে দিলে; বাবা-কাকার সঙ্গে তার খুব গল্প চলছে। কত কী গল্পই যে বলছে, তার আর শেষ নেই। ওব অত কথাও আমার ভালো লাগলো না। কূলজাবা নিতল দরিয়ায় ওরা মাঝি, কিন্তু এট নদীর মতোই ওদেব উপব আস্থা রাখতে পারছি না। কাগজের নৌকার মতো ছোট নৌকাটা, তুলতে তুলতে নাচতে নাচতে চলেছে—চল চল ছলাং, চল চল ছলাং, চল চল। আমি মাকে আঁকড়ে ধরে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েই কেটে গেল।

নৌকা ভালতলা ঘাটে এসে থামল। হেমন্তের সূর্য জলের গায়ে। বেলা অল্পই বাকি। ওপারে ট্যাকের চব—কালো বিন্দুর মতো। রুস্তম মাঝি বললে—এখানে আব নাও ভিড়াবে না ভুইঞা, সন্ধ্যা বাতেই ওই চবটা চাড়িয়ে যাব।

বাবা বললেন—যেহে পারবে?

—খুব পারব। নয় তো সারাটা রাত এখানে থাকতে হবে, কাল বিকেলে সদরঘাট।

গণি এতক্ষণে কথা বললে—এত ভয় কবলে দরিয়ায় চলা যায় না। জোবে বেয়ে চলে গেলে ট্যাকের চব পড়ে থাকবে কোথায়।

সে তাম্বিল্য ভবে হাসল একটু। নোয়াবালি বলে উঠল—ঠা চলো, বেয়েই চলো। তিন জনে দাঁড় বৈঠা বাইব, উড়ে চলে যাব, একেবারে ডাকাতদেব ঘবে হানা দিয়ে, নাকের ডগা ঘষে দিলে, কী বল কুটি ভুইঞা?

রুস্তম মাঝি বললে—না, না, সে ভয় নেই, আমি চিরটা কাল নৌকা বাইছি, কত লোক নিয়ে এলাম গেলাম এখান দিয়ে।

তখন সন্ধ্যাব মনোরম ছায়া, নদীতে কত নৌকা, কত রঙের খেলা। অপূর্ণ! বাবা-কাকা অমত কবলেন না, নৌকা এগিয়ে চলল। শুক জল, ছোট ছোট ঢেউয়ের মালা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। দুবে দুবে মাঝিদের গান ভাসছে। তরতর করে এগোছি। তালতলা তার হাট-বাজার, নৌকা, লোকজন, কাঠের পুল—সব নিয়ে আবছা হয়ে যেতে লাগল। এপারে তালতলা আব ওপার—জলের বেথায় আকাশে বিলীন। ডাকাতের দেশে যাছি, মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। বরু কৌতূহলে বাইবে নোয়াবালিৰ কাছে বসে বইলাম,—কুমীর দেখালে না, শীতাল শুয়োবটীও কোথায় রইল কে জানে, এবার ডাকাত দেখাতে হবেই।—আমি বললাম।

নোয়াবালি হেসে ঠাটা কবে বললে—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গণি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালো, তার সেই মোটা ভাবী গলায় বললে—ডাকাত দেখবেই? তাদের কিছু একটুও নয়ামরা নেই, তারা কুমীর আর শীতাল শুয়োবটীর চেয়েও ভয়ঙ্কর। তখন আর ভয় পেয়েও বেহাই পাবে না।

কথা শেষে সে আবার কেমন হাসল। সন্ধ্যার ওই কুয়াশা-ঘন

ধূসর হাসির মতো, নদীর জলের আভায়ে যেন মিল হয়ে গেল তার আমি জু কুচকে নোয়াবালিকে বললাম—আরো জোবে বৈঠা বা না, তুমি তো বাইচে প্রথম হও।

নোয়াবালি বললে—কেন, দিব্যি তো নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে ওরাও ভাল বাইয়ে। অর্ধেকের বেশি এসে গেছে এক দিনে তোমার বুঝি ডাকাত দেখবার আর সবু সবুইছে না?

আমি বললাম—দিনের বেলাই দেখতে চাই, তাবা কেমন সবাব সঙ্গে নৌকা বেয়ে যায়। ওই তো সেই চব, নয়?

হাত কুড়িপঁচিশ দুবে ট্যাকের চর। যেন একটা বিবাক আদিম কচ্ছপ জলের মধ্যে পিঠ জাগিয়ে রয়েছে। গ্রাম এবং কলা গাছগুলিও দেখা গেল। আমার মনটা একটা কেমন উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে অস্থির। রুস্তম মাঝি এমন গল্প জুড়েছে, আর বাবা-কাকা এমন মন দিয়ে শুনছেন, তাঁদের বোধ হয় খেয়ালও নেই, কোন্ জায়গাটা পেরুচ্ছেন। এপারে এসে চব সমান্তরালে এগোনো, আগের পাড়ির বেথার সঙ্গে লম্বা-আঁকা। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবল। সঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের হিম-বাপ-ঢাকা রাত্রি এলো নেমে। নৌকার চার পাশে একটা মাদা সিঙ্কের ঘেরা-টোপ কে বেন পবিয়ে দিলে—তার বুনোট গাঢ় অথচ সূক্ষ্ম। এত যে নৌকা ভাসছিল মুহূর্তে সব অদৃশ্য হয়ে গেল। আর এদিক থেকে উত্তুবে হাওয়া কনকন সনসন করে বইতে লাগল। নদীৰ ঠাণ্ডা, হেমন্তের ঠাণ্ডা—সব মিলিয়ে একটা অজানা শব্দা মৃতিমান। হি-হি করে হাড় অবধি কাঁপিয়ে তুললে। নোয়াবালি একটু বিনম্র হয়ে বললে,—খুব কুয়াশা আজ।

রুস্তম মাঝি শুধু বললে—নদীতে কখন কী হয় বলা যায় না তো। সে নদীৰ খেয়াল। ওসব কি আর দেখলে চলে?

গণি বেশ একটু হেসে এবাব আমাকে ডেকে বললে—কী কুটি ভুইঞা, এবাব যদি দুঘণ্টা আসে, কেমন হয় তখন?

ঠাকুবমা বলে উঠলেন—থাক, ওসব কথা আর এখন বোলো না, নৌকা বেয়ে যাও। চরটা পেরুতে এখনো কত দেরী?

রুস্তম মাঝি হেসে বললে—সবে তো শুরু, দুটো চর। তা ভয় কী ঠাকুরণ, কিছু ভয় নেই। একবার মেঘনায় ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম, সেও বুট-ঝিয়ে নাও ভরা...চরের হৃদান্ত ডাকাত, হাতে গোলা তলোয়ার, চোখে ধূর্ত চাউনি.....

বাবা বাধা দিলেন—থাক মাঝি, পরে গল্প করো, নৌকো যে তোমার বেশি এগোচ্ছেই না।

নোয়াবালিও বলে উঠল—নৌকা সত্যি যে এগোচ্ছে না। জোবে বাও মাঝি।

গণি বীবে বললে—উত্তুরে হাওয়া বইছে যে, উল্টো দিক থেকে, ভাটিয়ে নৌকা পিছে টানছে দেখছ না মিঞা!

সত্যি নৌকা এগিয়ে যেতে ভয়ানক বেগ পেতে লাগল। আধ মাইল পেরুতে আধ ঘণ্টা চলে গেল। কুয়াশাটা কেটে গিয়ে চাঁদ উঠল; বাপসা কাচের লঠনের মতো, নিঃসীম শূন্যে ঝুলছে। বড় কাকার হাতে ঘড়ি ছিল, রাত প্রায় আটটা। চর দুটো এমনি ভাবে পেরুতে অস্তুত ঘণ্টা দুয়েক দেরি। বাবা-কাকা এতক্ষণে গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। একবার নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে

এলেন—নৌকা তালতলা থেকে ছাড়াটা ঠিক হল না। মাঝি ভদ্রসা দিলে বটে, কিন্তু...

মা চাণা স্বরে বিরক্তি ভরে বললেন—বাইরেটা দেগেই লোক চেনা যায় বুঝি?—আর, মাঝি যে গল্প জুড়েছে তোমরা একেবারে ভুলে গেছ। চেনা মাঝি তো নয়?

আমরা ভিতরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। মা-ঠাকুরমা'র ফোট ঘন-ঘন নড়ছে, ইষ্টমন্ত্রের স্বর অক্ষুট শোনা যাচ্ছে। বাবা-কাকাও বার বার মাঝিকে বলতে লাগলেন—কী মাঝি, তোমার কথা তো ঠিক হল না?

কম্বল মাঝি ঠিক আগের মতোই হেসে সাহস দিয়ে বলল—কী হয়েছে ভুইঞা, উত্তরবে হাওয়াটার জন্তে এগোনো যাচ্ছে না, ফুনি পেরিয়ে যাব আল্লার নামে। গণি, বৈঠার শব্দ বেশি করিসু নে বে। ভয় নেই কিছু।

কিন্তু সেই শীতল রাত্রি, জল আব চর, যেখানে চরের মুসলমানদের বাস, সেখানে এক অচেনা মুসলমান মাঝির ভদ্রসা মোটেই আশ্বাস জোগাল না। নোয়াবালি তার প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা টানছে। তার আড়ালে নায়ের মাথায় গণিকে বেশি দেখা যাচ্ছে না, তবু তার বাঁকা হাসিটা যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সে কি এখনো হাসছে? একবার এক ঝিলকি সে মুখ ফেরালো, আমারই দিকে, তেমনি হাসি স্পষ্ট। আমার পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল। ওকে যেন বুঝতে আব বাকি নেই। ঢবেব সেই ধূর্ত ডাকাতদের রূপ এক পলকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। কিন্তু তখন আব কিছু করার নেই।

আমরা কতকটা এগিয়েছি, বাতাসটা একটু কমে এসেছে, নিস্তরঙ্গ রাত্রি, কোথাকে ভেসে এলো একটা স্ববের রেশ—সে কি বীণার বজ্রার না বাঁশির তান, না চরের গায়ে-লাগা বাতাসের শব্দ! কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু অতি কোমল-স্নিগ্ধ বণন জলের গায়ে-গায়ে বেজে-বেজে সমস্ত জলটাকে যেন বাজিয়ে তুলেছে। আকাশটাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। চাঁদ যেন মত্ততায় নির্বাক। বাতাস কান পেতে আছে। ঐ অপরাণ স্বর—সে কী আনন্দ না বেদনা, না কী, জানি না, শুধু আমাদের সবার মনে কেমন অভিভূত হয়ে পড়ল। এ কোন্ অচিন্ত্য রথরাজ্য! এ কী মায়া! বাবা হৃৎস্বরে বললে—কিসের স্বর মাঝি?

কম্বল মাঝির কথা যেন সব হারিয়ে গেছে। বাইতেও যেন সে ভাল পারছে না। অনেকক্ষণ পর উত্তরটা দিলে—জানি নে। কোথায় কি বাজছে, জলে অমনি শব্দ হচ্ছে।

নোয়াবালি দ্রুত বললে—হাওয়াটা পড়ে গেছে, এবার হাত সালাও মাঝি।

কম্বল মাঝি বললে—হঁ।

জনপূর্ণ জগতের বাইরে অন্তরীণ বারিসমুদ্র। রান চন্দ্রালোকে চরটা ধূসর, মাঝখানের গ্রামটা ঘনতরো কালো। অশ্রুতপূর্ণ স্বরটা কৈপে কৈপে ডানা মেলে কোথায় উড়ে চলেছে। আমার মনে হল, মা-ঠাকুরমা'র মুখে শোনা কোন্ রূপসী বন্দিনী রাজকন্ডার দেশে এসেছিল। কবে লুপ্ত হয়েছিল সে হৃৎস্বরের হাতে, এমনি নৌকায় চলতে চলতে। আর মুক্তি পায়নি। কে উদ্ধার করবে? রাজকন্ডা নিস্তর রাস্তে বীণা হাতে বসে। ওরা যখন হিংস্রতায়

শাপ দিতে থাকে, তৈরি হতে থাকে বজ্রের লোভে, রাজকন্ডা বীণায় হোলো বজ্রাব। এই হৃৎস্বরই মায়ায়, থলতায় ভরা জল, আর এই নৌবস বালুর ঢব—এদেব জ্বাল করা স্তম্ভর করার তপস্কাই যেন তার। ব্যথায় আশ্বাসে ভয়ে আনন্দে উত্তেজনায় সমস্ত অন্তর অনির্গতনীয় ব্যাকুলতায় আকুল হয়ে উঠল। আমাদের নৌকা কখন পাড়ের দিকেই অনেকটা এগিয়ে এসেছে কেউ টেব পায়নি, এমনি স্ববের জ্বালের মোহবিস্তার। হঠাৎ বননু শব্দে বীণার সব কটি তার যেন পড়ল ছিঁড়ে, সমস্ত প্রকৃতি নীরবে হায় হায় করে উঠল, গণি মাঝি শুধু ভারী গলায় বলে উঠল—সর্বনাশ!

আব কিছু বলার দরকার ছিল না। সেই রাত্রির বুক চিবে সে মুহূর্তে আওয়াঙ্গ শোনা গেল—ভো, ভো ভো। তাবট স্বরে স্বরে দূব থেকে দূব আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে প্রতিধ্বনিত যেন হল—সর্বনাশ—সর্বনাশ!

নোয়াবালি পাগলের মতো টানের পর বৈঠার টান মাঝে লাগল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—মা, ওয়াই ডাকাত, চেনা মাঝি নিলে না কেন?

গণি তার টানা নীলচে ত'চোখ মেলে তাকালো, তার মুখে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল সেই হাসি। ভারী স্ববে বললে—এখন একটুও শব্দ কোবো না।

কম্বল মাঝি একেবারে বাঁকা পিঠা টান করে দাঁড়াল। বললে—ভুইঞা ভিতরে যান। যা বলি শুনুন।

বাবা-কাকা অক্ষুটে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি বেইমান, হৃৎস্বরণ। ওই যে ওরা নেবে পড়ল।

মা-ঠাকুরমা ডুকবে বলে উঠলেন, বক্ষে কব, বক্ষে কব। তে মা কালী, তে মা হুর্গে!

তাদের গল শুকনো, মুখ বিবর্ণ। কম্বল মাঝি যেন একেবারে গেল বদলে। সে সজোবে বাবা-কাকাকে ধমক দিয়ে বললে—ভুইঞা, অমন কবলে মাঝা পড়বেন। ওরা এখনও কুয়াশায় আমাদের নাও দেখতে পায়নি, শব্দ শুনে তাক কবে ফেলবে। নদীতে এমন কত বিপদে পড়তে হয়, ভড়কালে নিধাং প্রাণ হাবাবেন। আমি যখন কথা দিয়েছি, আপনাদের বাঁচাবোই, মিথ্যা আশ্বাস কম্বল দেখ দেয় না। গণি!

—হঁ।

—পাল তুলে দে। বেদিকে নাও যায় বাক। হাওয়ায় জোর আছে।

নোয়াবালি আর গণি মাঝি হুঁজনে পাল টাঙাতে লাগল। আব কম্বল প্রাণপণে দাঁড় টানছে তে টানছেই। তবু ওরা এসে পড়ল। পান্দা ছোট্ট যেন চুষকের টানে। সাত-আটা বৈঠার ছপ-ছপ, শব্দ শোনা যেতে লাগল। জ্যোৎস্না জল খাব কুয়াশার সাদায় আমাদের নৌকার ছইয়ের টিনের সাদা মিশিয়ে এক। ওরা প্রথমটা ঠিক ঠাণ্ডব পেলে না। পাল পেয়ে নৌকা সাঁ-সাঁ করে দক্ষিণ দিকে চলল। সামনেই পেরিয়ে গেল ডাকাতের একটা পান্দা, গা ঘেঁসে প্রায়। ওরা হুঁ-তিনটা পান্দা নিয়ে নেবেছে। ছুটে এল একটা। হাত দশেক মাত্র তফাৎ। ওদেব অস্পষ্ট অষ্ট-হাসি ছুঁচেব মতো কানে বিঁধল। আর ভাববার ছিল না। বাবা-কাকা বাড়তি বৈঠা টেনে নিয়ে ছইয়ের বাইরে এলেন।



নোয়াবালি আমাদের আজীবনের অমুগত। আমাদের সে বাড়ির লোকের চেয়েও বেশি জানত। তার অনেক দিনের সাথ ছিল বাঘের সাথে লড়াই করা। দুঃসময়ের সঙ্গে হল মুখোমুখি। সে রোঁয়া-ফোলা বাঘের মতো উঠল ফুলে, প্রত্যেকটি পেশী গোণা যায় বুঝি জ্যোৎস্নাতে। বললে—মাঝি, জানি না, তোমাদের মনে কী হুঁটু মি ছিল, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কারো সাধি নেই এদের কিছু করে।

গণি মাঝি তেমনি ফিরে তাকালো—তাব মুখে কেমন ধূসর হাসি—তেমনি ভারী গলায় কী বলতে গেল, কিন্তু আর বলা হল না। ডাকাতের পানসী এসে নৌকা ধরে-ধরো। মা-ঠাকুরমা নিদারুণ ভয়ে চিংকার করে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। ডাকাতের দল আমাদের নৌকার পাশ ধরবার চেষ্টা করলে, সঙ্গে সঙ্গে গণি ফিরেই মাঝে নৈঠার যা। নোয়াবালিও এলোপাখাড়ি যা লাগাতে লাগল। পালের টানে আমরা এগিয়ে চলেছি, ডাকাতরা নৌকায় উঠবার চেষ্টা করছে, রুস্তম মাঝির এক হাতে শস্ত্র করে হাল ধরা, অস্ত্র হাতে সে লগির যা মাঝে। ডাকাতবাবু চূপ বইল না, পাল কেটে ফেললে, তলোয়ার আর লাঠি ঢালাচ্ছে নিপুণ হাতে। নৌকা টালমাটাল করতে লাগল, আমাদের চিংকার আকাশ বিদীর্ণ করতে লাগল, একটা সীতংস কাণ্ড! আরো পানসী ছুটে আসছে। আমরা মা-ঠাকুরমাকে বাহুড়েব মতো আঁকড়ে আছি। কতক্ষণ জানি নে, দূরে হঠাৎ কুয়াশা ভেদ ক'রে একটা ক্ষীণ আলোর বেগা ফুটে উঠল। তীরের দিক থেকে একটা বাঁশি শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের দল চকিত হয়ে উঠল, বসে গেল পানসীতে, হুঁক্ষপে পানসী পাঁচ হাত তফাতে চলে গেল। রুস্তম মাঝি চিংকার করে উঠল—জলপুলিশের লঞ্চ, আল্লাহ বিসমিল্লাহ! তাই দুঃসময় পালালো।

সবাই বিহ্বল হয়ে ওই দিকে তাকালাম। ঝাঁটার কাঠির মতো আলো ফেলে জলপুলিশের লঞ্চ আসছে। তারা হয়তো আমাদের চিংকার শোনেনি, কিন্তু সন্দেহ কিছু একটা করেছে। রুস্তম মাঝি—কপাল কেটে তার রক্ত পড়ছে, এক হাতে দাঁড় টানতে টানতে অস্ত্র হাতে কপাল মুছে—আমাদেরও এর মধ্যে অনেক দূরে সরে পড়তে হবে। জলপুলিশের লঞ্চ পেরিয়ে গেলে ওরা যদি আবার ফিরে আসে! বাও, মিঞা বাও, মাঝ দরিয়ায় চলে যাই, ওপারে তালতলাতেই ফিরে যাই।

কিন্তু নোয়াবালি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—এ কী, গণি মিঞা কোথায়? গণি, গণি,—গণি মিঞা নৌকায় নেই। জলের আশেপাশেও তাকে দেখা গেল না। সবাই আবার হৈ-হৈ করে উঠলাম—ডাকাতরা কি তাকে নিয়ে গেল?

রুস্তম মাঝি হায় হায় করে উঠল—গণি, গণি!

বাবা বললেন—যা খেয়ে জলে পড়ে তো যায়নি?

কখন যে সে এই ব্যাপারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে কেউ টের পায়নি। সবাই খানিকক্ষণ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। নৌকা বাওয়া অবধি বন্ধ। কী যে করা যায় কেউ বুঝে উঠতে পারল না; রুস্তম মাঝি আতঁকঠে বলে উঠল—সে যে আমার মা-মরা ছাওয়া, ওই যে আমার শুধু একটি। আব আমার কে আছে?

নোয়াবালি বলে উঠল—ওকে না খুঁজে আমি যাব না। ওই যে ওটা কালো কী। গণি, গণি।

নৌকা সে এগিয়ে নিয়ে গেল, কিছুই নয়। হয়তো দেখেছে। যত দূর চোখ যায় বাবা-কাকা তাকিয়ে দেখলেন জল, কুয়াশা ঢাকা, তারা নেই, আলো নেই, শুধু সাদা—নিছক চার দিক! চরের থেকে আমরা তখন প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে জলপুলিশের লঞ্চ আলো ফেলে ওপাশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এদি একটা বৈঠার শব্দের মতো শব্দ হল, রুস্তম মাঝি মুহূর্তে সচনি হয়ে বসল—ওরা আবার আসছে কি? নাঃ, নৌকা বাও মিঞা, এ জনের জন্ত এতগুলির জান দিতে পারি না।

নোয়াবালি দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার পরে বৈঠা তুলে নিলে—হা আল্লা!

নৌকা নদীর গভীরে চলে গেল। প্রাণ বাঁচাতে কোথায় চলেছি তাব ঠিক নেই। নিস্তরু নিস্তবঙ্গ পাথর। কারু মুখে আর কথা নেই। বতই দ্বে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে গণি কোথায় ফেলে আসা হল। আমার চোখে ভেসে উঠতে লাগল তা সেই চাঁড়নি আর সেই হাসি। তাকে খুব লড়তে দেখেছিলা একবার, আর খেয়াল করিনি। সমস্ত মনটা এখন কেঁদে কেঁদে উঠে লাগল। মা-ঠাকুরমা চোখ মুছেছেন। বাবা-কাকা সেই জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, আর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে রুস্তম মাঝি হালে বসে। নৌকা কোথায় চলেছে কে জানে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, ভোর বেলা তাকিয়ে দাঁ নুখ উঠছে, কুয়াশা নেই। কমলাঘাট অদূরে। সারা রাত না রুস্তম আব নোয়াবালি মাঝ-দরিয়ায় নৌকা বেয়েছে। দিক পায় কুল দেখিনি। নৌকা এসে কমলাঘাট ভিড়ল। লোকাল যে কী, মাটি যে কী, সেদিন সে মুহূর্তে সবাই মাটিতে পা দি বুঝলাম। রুস্তম মাঝি যেন পাথর। বাবা থানায় খবর দি গেলেন। রুস্তম মাঝি বললে—আর ও-সব করে কী হবে ভুইএ আর কি সে আছে? চরের দুঃসময়—বে-সে দুঃসময় নয়!

পরক্ষণেই বলে উঠল—আমাকে ছেড়ে দিন এবার,—আমি এ বার তাকে খোঁজ করে আসি। সে জলেই হয়তো পড়েছিল, সা রাত হয়তো সাঁতার কেটে আমাকে খুঁজেছে। তাকে তো ভাবে মতো খুঁজেও আসিনি। সে তার মাকে খুব ভালোবাসতো। এ কুটি ভুইএর মতো তার একটি ভাই ছিল, সেও হারিয়েছে। ভাইকে হারিয়েছে বড় হুঁখ ছিল তার মনে, কিন্তু মুখের হাসি তার কথ মিলায় নাই। আমি যাবই—তাকে খুঁজতে যাব।

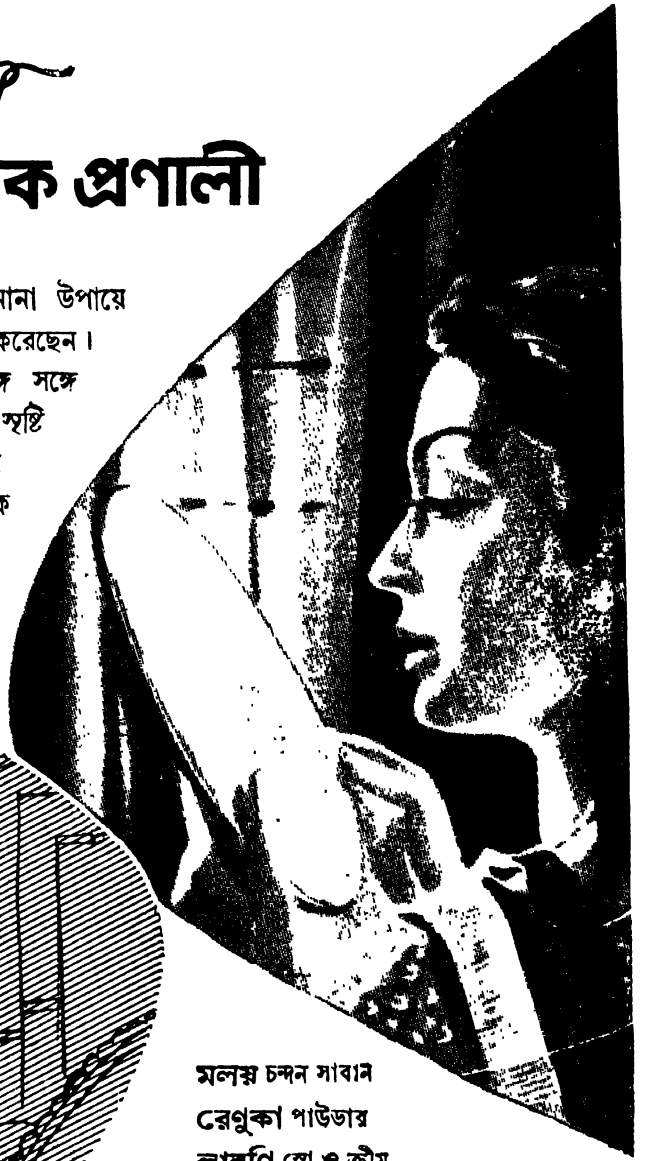
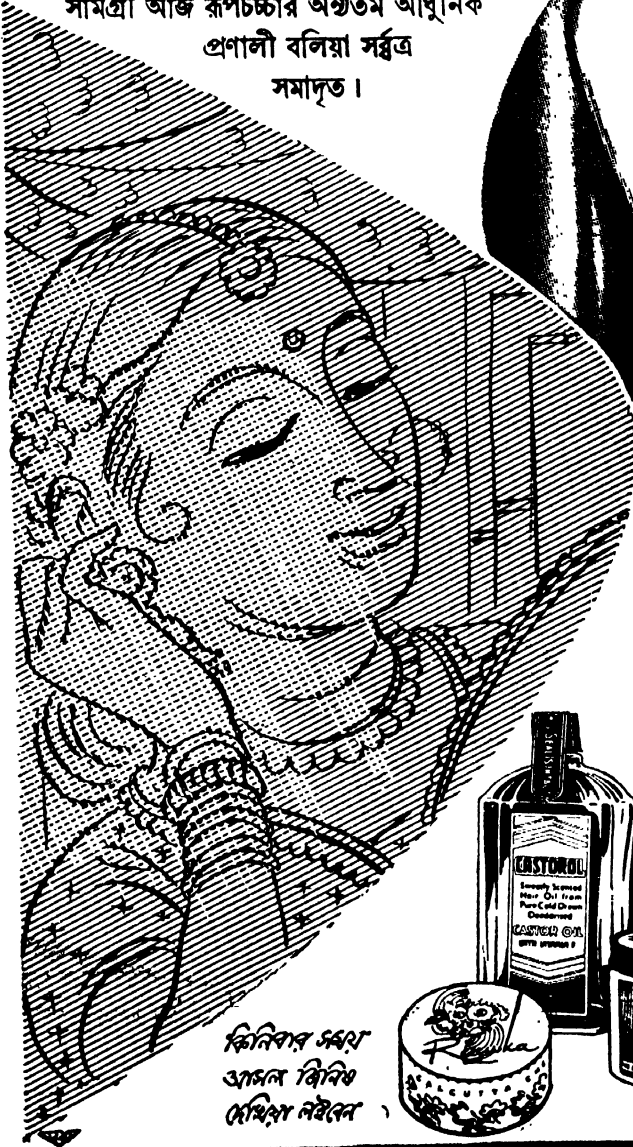
মা-ঠাকুরমা'র চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাবা-কাক পরামর্শ করে বললেন—না মাঝি, তোমাকে আমাদের সঙ্গে চা যেতে হবে, দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে।

রুস্তম ফাল-ফাল করে তাকিয়ে রইল। নোয়াবালি বললে—তোমাকে নৌকা বাইতে হবে না, শুধু হাল ধরে বসে থাক, আ বাইব।

হুপুরের কিছু পরে আমাদের নৌকা ট্যাকের চরের কাছ দিয়ে ঢাকা ফিরল। তখন সোনা-গলানো জল, অনেক নৌকা আ যাওয়া করছে, জলপুলিশ ও স্থলপুলিশে মিলে তল্লাশ করছে গণি কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। দিনের আনোতে মনেই হল এইখানেই কাল রাত্রে এমন একটা হুঁটনা ঘট গেছে। শুধু স্ব মনে হল গণি মিঞার মতোই কেমন রহস্যভরে হাসছে!

# কপচর্চার আধুনিক প্রণালী

সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে  
নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন।  
সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে  
সৌন্দর্যচর্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি  
হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন  
সামগ্রী আজ কপচর্চার অগ্রতম আধুনিক  
প্রণালী বলিয়া সর্বত্র  
সমাদৃত।



মলয় চন্দন সাবান  
রেণুকা পাউডার  
লাবণি স্নো ও জ্যৈষ  
ভূহিনা সৌন্দর্য কীর  
ক্যাষ্টরল স্বাসিত ক্যাষ্টর তৈল



কিনিকার সমগ্র  
আমল ক্রিষ্ণ  
দেখিয়া নইলেন

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং

# নি কি উজ্জি

বিজন ভট্টাচার্য

আগে ছিল বাগান-বাড়ী, মাঝখানে হলো ভূতের বাড়ী—তার পব বিকিউজি কলোনী। হুঁবছর পব এখন অবিকি কলোনীও ঠিক বলা যায় না। তিরিশ-চল্লিশ ঘর উদ্বাস্ত পরিবার, কমে কমে এখন মাত্র দশ-বারো ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। জায়গাটা ঠিক বসবাসের উপযোগী নয়। বিশেষ করে খেটে-খাওয়া অভাবী মানুষের পক্ষে তো একেবারেই নয়। ধান-কাছে কল-কারখানা নেই, দোকানপাট হাট-বাজার নেই, কাজকর্ম চলে সমাজের যে স্তরের লোকের সঙ্গে, সেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বসতিও কাছ-পিঠে খুব কম। এক আছে সম্মান ব্যবধানের ফাঁক বেগে পেয়ে তেঁ-তিন বিঘে সাজানো বাগানের মাঝখানে ছোট ছোট ধাপেব মত বাংলা পাটাতন বাড়ী। মানুষ থাকে কি থাকে না, বোঝাই যায় না। সব বড় বড় লোকের লজ ভিলা। ব্যবহারিক জীবনে সেন-সেনের কথা এখানে দৃশ্যমান। সমাজই নেই তার মানুষ থাকবে কি! তাই বেশীর ভাগ পরিবারই স্বযোগ-সুবিধে মত রুজী-বোজগানের তাগিদে সরে নড়ে গেছে আশ-পাশ শহরতলী অঞ্চলে। অবশিষ্ট রয়ে গেছে মাত্র দশ-বারো ঘর। মাথা-মুখ গুঁজে এরা এখনও ফুটো-ফাটা ক্যান্ডেন্সা টান আব হোগলা পাঁতার দোচালা ছাউনীর মধ্যে দায় ঠেকে পড়ে আছে। এরা একেবারেই ভাগ্যহীন। ত্রিভুবনে ঠাই হয়নি এদের।

সেদিন ছিল উটোরথের মেলা। পাল-পার্বণের দিন। সকাল বেলা। যে স্থল্যেব আলো আশীর্বাদেব মত ছড়িয়ে পড়েছে চবাচবে, সেই আলোই কলোনীর ছোড়া-তাড়া গুঁজিমাণা দোচালা ছাউনাগুলোর ওপর এসে পড়েছে অরুণণ ভাবে। এ-ব বেলাব হলদে আলো গায়ে মেখে ফাঁকে বসে পুতুল গড়ছে যশোদা কাদামাটি দিয়ে একমনে। সবই বেনে পুতুল,—যাগবা-পবা কাঁচুলি-অঁটা রাজপুতানীর বেশ, গোলগাল ট্যাগাটুপা। চং আছে কিন্তু ডোল নেই। অবিকি দামও আবার সেই বকম; মাত্র হুঁ-হুঁ পয়সা। আঙ্কাবাব বাজাব, বেলা পড়ে এলে হুঁটা পুতুল তিন পয়সা দরেও ছাড়তে হয় কোন কোন দিন। দিনান্তে চার গুণা পুতুল বিক্রী হলো তো খুব হলো সেদিন। টহলদার পুলিশের বাববরদারি আর রাহা খরচা বাদ দিয়ে যে ক' গুণা পয়সা হাতে থাকে, তাতে করে একটা মানুষের আধ বেলাব খোবাকিও হয় না।

মেলার বাজাব। বেলাবেলি পুতুল পাঠাতে হবে হাট-বাজারে আজ। জোরে-জোরে হাত চালায় যশোদা।

গায়েব জামাটা কাঁধে ফেলে লক্ষণও সাত-সকালে উঠে ধান্দায় বেরুছিলো রুজী-বোজগানের। পাল-পার্বণেব দিন বুয়ে পিঁড়ি আব পিসমুজের ওপর আশ্ব বাড়তি নিয়েছে খানকয়েক দোলমঞ্চ। মেলা বসবে বড় বাস্তাব এক দিক থেকে আর এক দিক। জিনিষ-গুলো আজ তাব কা সেও কাতে পাবে ভাল দরে। বেরুবার মুখে উঠানে যশোদাকে দেখে মস্তকা কবে বলে, 'তুই পয়া কি অপয়া, সে কথা বোঝাবো আজ।

যশোদা হেসে বলে, কেন রাগা বউ এসে বাজাবের পয়সা দিয়ে গেল আখলাম, কপালঘণ তো আজ তারই। আমারে তো উঠান পেরে দেখছি তুই!

—হাতে হাতে পয়সা নিলাম মুখ আখলাম কোন সময় গুপীনাথের বউ'র!

—ঐ হলো, মুখ আখানি রূপ দেখেছো।

—না, মাইরী বলছি কালীর কিরে। পেরথম মুখ আখলাম তো'র।

—তো ভালই হবে, যাঃ! আশীর্বাদ করলাম।

—দূব ধুমসী, ছোট কখনও আশীর্বাদ করে বড়োরে। ছোট যে সে করবে বড়োরে...

—কি করবে?

—দূব ছাই, দেবী হয়ে যাচ্ছে আমার, তুই মা'ব ঠাঙ্গে শুনে নিস, আমি চললাম।

—কি হলো!—কথা জানে না কথা বলে বড় বড়।...কি বলে রে!—ঐ...

এই মা-মাসী'র মত কথাব পৃষ্ঠে কথা ধবে যশোদাব মোড়লী কর' একেবারেই পছন্দ হয় না লক্ষণেব। কথাব ঠানা খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, পুতুল না ছাই হচ্ছে ওগুলো কাদামাটি দিয়ে। পুতুল,—পুতুলির নাক হবে বাশী'র মত টেকোলো, চোপ হবে টানা-টানা, হাত-পা'র ডোল আসবে পিবতিমেব মত—বংএব ওপব গর্জ্জন তেলেব ছোপ ধবালি চোখ-মুখ বেঁদে যাবে খন্দেবের—দেখবে কি কিনবে। চুনিব জলে ডুবিয়ে ডুবো কালির ছোপ ধবালি যদি পুতুল হতো!—ও পুতুল তো'ব কেও কেনবে না।

কোথায় হুঁটা ববাতজোবেব কথা শোনাবে বহুর-গুণাব দিন, তা না চোখে চোখ পড়তেই সঙ্কাল বেলা সাউকুড়ি করে কতকগুলো অকথা কুকথা শুনিবে যায় লক্ষণ যশোদাকে।

কিল খেয়ে কিল চুরি কবা প'টোর মেয়ের ধাত নেই। অপযশ তো এমনিই আছে যশোদার—মুখ না বেন নাপিতের ফুব। চেঁচিয়ে বলে, ছুতোব মিস্ত্রী'ব বেটা পট-পুতুলিব কি বুঝিস বে তুই! কে যদি মুখচোপা করবি তো তো'ব উকো দিয়ে নাক ঘ'সে তুলে দেবো। বেসরম ছেলে!

সরম-ইচ্ছতেব বালাই নেই লক্ষণেব। যশোদাব গালাগালিগুলো গায়ে তো তার লাগেই না, বরং আঙ্করা পেয়ে মস্তকা করে ফেপিয়ে তোলে যশোদাকে : এই ছুতোবের ব্যাটার মত নাক তুলতে পারবি যেদিন মাটির ঢেলাব সেদিন দেখবি তো'ব পুতুল 'মনিহারী' দোকানে বিকোবে, বুঝলি! হাজার গুণা মানষির হাটা-চলার বাস্তায় তখন আর তো'র পুতুল ফুটপাথবের ধুলোয় গড়াগড়ি খাবে না।...! দেখেছিস্ নাক!

বোঁচা নাকটা উঁচু করে তুলে ধ'রে হাসতে হাসতে চলে যায় লক্ষণ তিনখানা পিড়ি, দু'গুণা পিসমুজ আর খান চাবেক দোলমঞ্চ নিয়ে। আজকেব এই ক'টা জিনিষই আগামী কালের একান্ত ভরসা।

যশোদা আর কোন কথা কয় না। বুদ্ধির কাজে পরামর্শ সে তো সব সময়ই চায় লক্ষণের কাছে। 'তা লক্ষণই কোন আমল দেয় না। হাট-বাজারেব কথা, মেয়েমানুষ সে কতটুকু জানে! 'মনিহারী' দোকানের কাচ-ঘরে যে পুতুল থাকে লক্ষণের মুখে সে কথা এই জীবনে প্রথম শুনল। 'মনিহারী' দোকানের কাচ-ঘরে লক্ষণ যদি তার পুতুল রাখবার ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে তো সে লক্ষণের বাশী'র মত নাকটাই মাটির পুতুলে তুলে দিতে পারে। পুতুল আর কাচ-ঘরের কথা ভাবতে ভাবতে যশোদা কালো কালির

ছোপসরা আঙুলে নিজের নাকটাই চেপে ধরে। ভাবে, নতুন দেশ, আনকো জায়গা, পথে-ঘাটে চলা-ফেরাবই বা কত কায়দা,— বাচ্চা কালের সেই হাত-ধরাধরি কবে গোলা হয়ে গেলাব মত—এদিক দিয়ে যাবো, কাঁটাটা বড়ি মাঝবো...। চৌকিদারের হাতে ঠেকে বড় বড় বাস, লবি পর্যন্ত মাঝপথে থেমে যায়। পুসন মানুষই বলে হিমসিম খেয়ে যায়,—তেমাথা কি চৌবাস্তাব মাথায পড়লেই চোখ বন্ধ কবে কাছার গেবো বৈধে আব গেবো খুলে কলোনীতে ফেবে হয়বাণ হয়ে, আব সে তো সবলা অবলা মেয়েমানুষ। কাঁড়াপাটা নাড়ামাড়া হলেই কি আব পাব পাবাব সো আছে শহব-বাজাবে! বলে প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গে বাদী যশোদাব। চোপে-মুখে মানুষ টানে। কথায় বলে, মেয়েমানুষ এমনি অবলা। পথে-ঘাটে যবতি-ফিবতি যশোদা যেন আবও পলক।। লক্ষণ যথার্থই তাকে 'বলদা' বলে গালমন্দ পাড়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে পায় না যশোদা লক্ষণের। গালমন্দ যে অহত পাড়ে ভালও সে অন্ততঃ কিছুটা বাসে। সেইটাই বীতি জগতে। লক্ষণের সে সব কিছু নেই। এইটাই আশ্চর্য্য! সে সব সময়ই তার নিজের তালে বাসে। কাজের ফাঁকে আনাগোনার পথেই বা হয় ছোটো-চাবটে ফাঁকা কথা বলে ঠাট্টা-মস্করা করে; বাক্যের হালচাল বুঝে কাজের কথায় কথনও কোন পরামর্শ দেয় না—যে না, এই দিয়ে এই কর।

এতটুকুগানি সবাই করে। এমন তো না যে যশোদাব জগতে লেগে থাকতে হচ্ছে লক্ষণকে নিজের কাজকর্ম বিসর্জন দিয়ে সারা দিনমান! একটু শুধু দেখিয়ে দেবে। 'আজ না হয়, কাল

তো তাকে দাঁড়াতে হবেই নিজের পায়ে ভর কবে। সংসারে কারো গলগ্রহ হয়ে সে এক দিনেব জন্মেও বেঁচে থাকতে চায় না। মান আর অভিমান,—সকাল বেলাই মেঘ-বোদ্ধুব খেলা কবে যশোদার সারা চোপে-মুখে। গা-গাতোর ভারী ভারী লাগে। বেনে পুতুল গড়তে বসে আব হাত ঘোর না ছলবল করে। আব গড়েই বা লাভ কি পুতুল! হাটে-বাজারেই যদি না বিকোয়! হাতের কাছের মাটির পুতুলগুলো যশোদা দুপুর পর্যন্ত ঠায় বসে বসে সব ঠুকে ঠুকে ভেঙে ফেলে। তার পব বাবান্দায় গিয়ে মাটি নেয়। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো—সুয়ে সুয়ে গভায় যশোদা। ঠাণ্ডা মাটিতে গা ঢেলে দিয়েও সোযান্তি আসে না। আধ-ঘুম আধ-জাগানের মাঝখানে লক্ষণ আর 'মনিহাবী' দোকানে টিকোলো নাক বসানো বেনে পুতুলের কথাগুলো স্বপ্নের মত মনে হয় যশোদার;—মনেব পুতুলগুলো হাত-পা ছুঁড়ে খলগল করে হাসে আর দেয়লা কমে যশোদার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। ঠাণ্ডা মাটিতে বুক চেপে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যশোদা।

আজড় গা, ঠাণ্ডা মাটি, গা ঢেলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডয়রা কলা-গাছের মত ফুলে ঢোল হয়ে ওঠে যশোদা সন্ধ্যা নাগাদ। এমন ঘুম যে, কানের কাছে ঢাক বাজালেও পছন্দ কবি সে ঘুম ভাঙবে না যশোদাব।

ছ'মাস আগেও দুই চোখের পাতা এক কবতে পাবেনি যশোদা। চোপের বাত কেটে গেছে জতাশের গলা ছ'হাতে জড়িয়ে। —জগৎ জুড়ে যশোদা!—কোথায় থেকেছে আব কোথায় থাকেনি



**পিলসেন বীর**

**ডুয়েলার**

১২৫-বি, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

J. A. K. P. K.

সে! শিয়ালদহ ষ্টেশন, সাবগাছি ক্যাম্প, বর্ধমান—হরিণডাঙ্গা ; সব ঠাইে দুঃস্থপ্লেব মত। দিন-বাত সমান অন্ধকার। যশোদা তখন প্রায় শুয়েই থাকতো সব সময়, কিন্তু ঘুম ছিল না চোখে। মাঝে মাঝে সাবা শব্দবটা তাব শুবু ধর-ধর করে কঁপে কঁপে থিমিয়ে পড়তো। ঘুমেরই মতন অথচ সে ঘুম ঘুম না। কালঘুমের ছোঁয়াচ। সে সব দিনের কথা মনে করলে এখনও হাত-পা তিমি হয়ে আসে যশোদার।

সন্ধ্যা উত্তবে অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। যশোদার সাড়া নেই। ছড়া-কাঁট নেই, সন্ধ্যা-বাতি নেই, আশ দামড়া মাগী সন্ধ্যা বাতির পর্যন্ত বাবান্দার ওপর আড়াআড়ি ঘুমুচ্ছে পড়ে বাঙালীর মত গলাচুলে,—এ একেবারে অসহ্য লাগে লক্ষণের বুড়ী মা'র কাছে। কত ঠিক-ডাক, হাত ধরে টানিটানি, যশোদার ঘুম ভাঙে না। প্রতিটিবাক্ত হয়ে লক্ষণের মা শেষ পর্যন্ত কীর্তন শুনতে চলে যায় বখতলা লাঠি ঠুকে-ঠুকে পথ-বিপথ বাছন্তে-বাছন্তে। বুড়ার এ এক নেশা। কী-ই বা করে-বুড়ী! হাতে-গড়া সোনার সংসার তাব তো চোখের ওপরেই বানচাল হয়ে গেল দুর্গিপাকের দাপটে। কাবাবারী হাতের মারপ্যাচ বোঝে না বুড়ী। লক্ষণের মা জানে, সংসারে জন্মগ্রহণের পাঁচ দিন পূব ছয় যষ্টীর দিনটো বিধাতাপুরুষ প্রত্যেক মানুষের কপালেই উত্তরকালে কি হবে না হবে সব ছকে দিয়ে যায়। সেই অব্যর্থ লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না। জীবনের ঢাকা বন-বন কবে ঘোবে সেই লিখনেবই অমোঘ বিধান মত,—কেউ হয় বাজা-গজা, কেউ হয় পথেব ডিগাবী। কেন হয় কি বুস্তাস্ত সে কথা মানুষের কথা বলে নিশাসই করে না বুড়ী। ভবিষ্যতের ওপর কথা নেই,—লক্ষণের মায়ের শেষ কথা। 'তবু সংসারী মানুষ; আশা-নি-পোড়ানি আছে;—থেকে থেকেই মনে পড়ে বুড়ার কদমখালির চোদ্দপুকথের ভিটে-মাটির কথা, নিজের হাতে বোনা লাল ন'টের ক্ষেত, লাউ-মাচাটা, কস্তার আমলের সেই কালো পাথরের বাটিটা—বিধান মত অপ্রাপ্য হলোও বস্তব নাড়া ধরে টান মেবে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়, আব বুড়ী অমনি ছুটে ছুটে যায় বখতলা। কীর্তন না শুনে উপায় নেই বুড়ার।

লক্ষণের সেদিন কলোনীতে ফিরতে রাত হয়ে যায় বেশ কিছুটা। আশা ছিল খালি হাতেই পকেট ভরতি করে ফিরবে; ঘবেব মাল আব ঘবে তুলতে হবে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আব এক;—যা হলে হয় আব যা প্রকৃত হয়—হুয়ে প্রায়ই মিল খায় না। কাছেই যে-মন নিয়ে মেলায় যায় সে-মন নিয়ে ফিরে আসে না লক্ষণ। অবিধি একেবারে যে হয়নি কিছু তাও না। জিনিষের মধ্যে পিঁড়ি পিলসুজ সবই প্রায় কেটে গেছে, এক দোলমঞ্চটো তাকে কঠিন ঠেকায় ঠেকিয়েছে। একখানাও বিক্রী হয়নি। কি করবে!—হুঁটাকার জিনিষ লক্ষণের মুখেব দিকে তাকিয়ে অনায়াসে ছ' আনা আট আনা বলে বসে খরিদার; কার্দের নামেরই পড়তা থাকে না। মুঠি বিগ্রহেব আসন বলে যে কেউ একটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে দবদস্তব করবে, এমন এক জন খরিদারের সঙ্গেও পরিচয় হয় না লক্ষণের। দোলমঞ্চ বিক্রী হয় কি করে! উন্টোরথের মেলা—পাল-পাংশেব দিন,—যে দিন মানুষ বলে সখ করে হুঁচাব টাকা বেশী

করে টাকাকে নিয়ে আসে, সেই দিনই যদি বেচা-কেনার বাজাব এই বকম মন্ডা যায়, তা হলে আর সব দিনের কথা তো, ভাবতেই পাবা যায় না। লক্ষণ ভাবে, জাত-ব্যবসার ওপর সফল কবে আব হয়তো তাব দিনই বাবে না। ভবিষ্যতের দিনগুলো অন্ধকার বাতের মতই কালো কালো মনে হয় লক্ষণের।

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক বোড ছেড়ে কলোনীর পথে পা বাড়ায় লক্ষণ। আলোটা এখানে অস্পষ্ট। হোগলা পাতা আব টুকরো টিনের দোচালা ছাউনিগুলো আবছা ছবির মত দেখা যায়। পথ-ঘাট ভাল করে ঠাতর করা যায় না। লক্ষণের কিন্তু তবু পথ চলতে অসুবিধে হয় না। পায়ের নীচ থেকে পথ সরে গেলেই সে অন্ধকারে ঠিক ঠাওব করতে পারে। সুরু সুরু মেঠো ইঁটা-পথ কত অন্ধকার বাতে পাড়ি দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেছে লক্ষণের।

হঠাৎ আলো থেকে একেবারে অন্ধকারে পা বাড়ালে চোখ থাকতেও নজর চলে না মানুষের। দৃষ্টিটা সই হতে একটু সময় লাগে। তবু সামান্য একটু পবিসরের মধ্যে 'তিনশ' পয়ষাট দিন যোবাকেরা, সিদে ঘবে গিয়ে উঠতে অসুবিধা হয় না লক্ষণের। পা খাবড়ে ধুলো-কাদা ঝেড়ে বাবান্দার গিয়ে ওঠে লক্ষণ। ঘরের ভেতরটা আবও অন্ধকার। হুঁচাব বাব ডেকেও লক্ষণ সাড়া পায় না কারো। কোথায় কাব ঠাই আলো কবে বসে আছে যশোদা এখন কে জানে! নিজের মনেই বদবক ক'বতে ক'বতে অন্ধকারে পা বাড়ায় লক্ষণ। ঘুমকাতরে পোটার মেয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটির ধুলোর, লক্ষণ সেটা অনুমানই করতে পারে না। এক পা হুঁপা—তিন পা'তেই পড়বি তো পড় দোলমঞ্চ নিয়ে জড়মুড় কবে একেবারে যশোদার ঘাড়েব ওপর।

শালার কেলো কুকুর : বাগে ফেটে পড়ে লক্ষণ! জোর ববাত বাশেব খুঁটিটা বা হাতে ধরে ফেলে সামলে নেয় লক্ষণ ঝোঁকটা।

উ-হু-হু-হু : আচমকা পায়ে চোট পেয়ে ছটকে উঠে বসে যশোদা।—উ-হু-হু-হু-হু!

কুকুর না, যশোদা।—উ-হু-হু-হু-হু.....! সহানুভূতি তো আসেই না, বরং রাগ হয় লক্ষণের; বলে—এই বকম ধারা মানবি শোয়! আমি ভাবলাম বলি.....

বাধা দিয়ে যশোদা বলে, কেন কুকুর কি মানুষ নজরে পড়ে না! জলজ্যাস্ত আস্ত একটা মানুষ শুয়ে আছে আর,—উ-হু-হু-হু-হু.....

লক্ষণ বিরক্ত হয়ে হেঁকে ওঠে, ই্যা গা-গতোর দিয়ে হীরের নাগাল আলো ঠিকবে বেঞ্চছে কি না তোর যে নজরে পড়বে কেলো ধুমসী কোথাকার!

খুঁড়ো না বলছি ই্যা!—চোখের মাথা পেয়ে বসে আছে সে কথা বলে না।

ঘুম চোখে পা খাবড়ে ঘরের মেজতে গিয়ে শোয় যশোদা।

এত আধিথোতা সহ্য হয় না লক্ষণের। বলে, সন্ধ্যা রাত্তিরি শুয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছি তোর লজ্জা করে না?—সন্ধ্যা পর্যন্ত পুতুলগুলোর জন্তি হা পিত্ত্যে বসে আর এমনই নবাবের বিটি তুই যে সেই পুতুলগুলো পর্যন্ত পাঠাতি পারলি নে!

ঠেস মেরে কথা বলে যশোদা, কেন সে পুতুল না কি কেউ কেনবেই না হাটে-বাজারে পয়সা দিয়ে, তার পাঠিয়ে কি করবে।... সে পুতুল আমি ভেঙে ফেলছি।

—কি করিছি!

—ভেঙে ফেলিছি।

হতবাক হয়ে যায় লক্ষ্মণ যশোদার কথায়। কম্বে কম দশ গুণ পয়সা লোকসান! বিরক্ত হয়ে বলে, যাগ গে,..... ঝুঁক-ছাগলের সঙ্গে কথা বলারও এটা মানে হয়!

ভুল বুঝে আর ভুল করে লজ্জা হয় যশোদার; আবার হাসিও যায় বেহায়ার মত। অন্ধকারে একলা শুয়ে থিক্-থিক্ করে হাসে, শব্দ করে।

পিস্তির নাড়ী জ্বলে যায় রাগে লক্ষ্মণের। বলে, ফালতু ভাত খাস কি না, তাই বুঝে উঠতি পারিস নে যে কত ধানে কত চাল!... এক হাসে ভূত-গেস্তি আর হাসিস তুই,... মরদ কায়দা কবা হাসি;... সাথে লোকে বলে কলঙ্কিনী!

সরম-ইজ্জতের বালাই টেনে যা দিয়ে কথা বলে লক্ষ্মণ। কৌশ করে ওঠে যশোদা। তেই সামলে কথা বলিস, ছোট লোক! আমি কোন্ বৈটান মাগ না জানিস। দাসখণ্ড গিথে দেইনি চাবো কাছে।

—পুলুপুলো তুই ভাঙলি কোন্ আক্কেলে, বল!

—বলব না। হঠাৎ কেটে পড়ে যশোদা: বলবো না, খাবও না আব ভাত।

—না খাবি নে। খাটিবি নে যখন তখন ভাতও খাবি নে। প্রত সস্তা না ভাত।

—হ্যাঁ, অন্ততঃ তোব ভাতের যে খুব দাম, সেটা বোঝলাম।

—হ্যাঁ তাই বোঝ।

—আচ্ছা!

চলেব গোছা পাক দিয়ে বেঁধে বারান্দা দিয়ে হন-হন করে চ'লে যায় যশোদা। বাবার সময় বলে যায়, পুড়ী এসে যেন শোনে রাত করে আজ আমি গুপীনাথের বউ'ব কাছে গেল।

—যেখানে তোব খুসী।

—অপরের খুসী-অখুসী'ব দার'খাবি নে রে!—ধবাকে সরা জ্ঞান করে অন্ধকারে উদাও হয়ে যায় যশোদা।

লক্ষ্মণ আর কোন হাঁক-ডাক করে না। বেয়াড়া ধবনের মেজাজ মেয়েটার, সোজা কথার উল্টো মানে ধরে বুকের ওপব অবুকের মত মুখোপা করে যখন-তখন, ভাল লাগে না লক্ষ্মণের। কৌশ করে একটা নিখাস ফেলে একটা বিড়ি পরায় লক্ষ্মণ।

সত্যিই যশোদাকে নিয়ে এক ছালা হ'য়েছে লক্ষ্মণের। পদ্মাপার, চরখানাপুনের হিন্দু মেয়ে যশোদা, বছর ঘুরে গেল পূর্ণনা টেশন থেকে পাক্কেটের সেই যে কদমখালির ক' ঘর পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে চলে এসেছে, ব্যস—রয়েই গেছে সেই থেকে। ঠাই নেই, সম্বল নেই,—যশোদা একাই এক পরিবার। সবাই পায়ে ঠেলে, দূর ছাট-বলে তাড়িয়ে দেয়,—তা ছাড়া সোমপ মেয়ের দায়িত্বের ঝুঁকি সাহস করে কেউ নিতেও চায় না; শেষকালে লক্ষ্মণই অনেক বলে-কয়ে কদমখালির ছ'চাব ঘর পরিবারের মৌখিক আশ্বাসে সঙ্গে করে নিয়ে আসে যশোদাকে।

প্রথম প্রথম কোন কথা ওঠেনি। কোন দিন গুপীনাথের বাড়ী, কোন দিন চৈতন্য মাথির বাড়ী, কোন দিন বিষ্টু কামারের ঠাই, কোন দিন বা লক্ষ্মণের কাছে, সুরিধে মত পাত পেড়ে শেট চলেছে

যশোদার। কিন্তু এক বছর আগে আর পাবে, ঢাকা গেছে সব উটে-পাটে ঘুরে। সবাইই প্রায় দৈনকের ভাল। দায় এসে পড়ে লক্ষ্মণেরই বাঁধে। আছে তো আছেই,—সেই থেকে লাগা-বাঁধা রয়ে গেছে যশোদা লক্ষ্মণেরই হিচকায়। চৈতন্য মাথি ওলাওটায় মাঝা গেছে গত বছর। এ বছর তার পরিবারই ভাত পায় না। পথে-ঘাটে ভিক্ষে করে বেড়ায় চৈতন্যের বিধবা বউ বৈটানপুতের হাত ধরে। গুপীনাথ বাড়ল বৈরাগী মাহুষ, স্বর ব'সে গিয়ে এখন আর সুর আসে না গলায়, কর গুণে আব হাত দেখে নিজের পরিবারকেই খাওয়াতে পারে না তাব অজ্ঞ পরে কা কথা! কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। গুপীনাথের বউ'র কাছে হালে না কি ছ'-একটা বেটাছেলেও ভাসা-যাওয়া করে। গুপীনাথ সবই জানে সবই বোঝে অথচ কোন কথা বলে না। পথে-ঘাটে চলতি-ফবতি দেখা হতে দুখু-এবে বলে, কি কবব ভাই, সবই জন্মেই বিড়ম্বনা! এক এক সময় মনে হয়, বউ'র মাথায় মুক্তির বাড়ি মেবে নিজে গলায় দড়ি দেই।...স্বব-বসা গলাব বৃত্তান্তটা বুঝিয়ে কঁাস-কঁাস করে বলে, এই স্বব যেদিন বসে গেছে না, সেই দিনই আমি বুঝিছি আমার অপমিত্য হলো। আব বেশী কি বলবো! জ্যান্তে নবণ যে কা'কে বলে, তা গুপীনাথকে দেখলে বোকা যায়। বাড়-বাপটা সয়ে কাঁড়িয়ে আছে এখনও,—এমন আব এক জনও নেই কদমখালিব। এক লক্ষ্মণই বা পেটে-খুটে কোন মতে টিকে আছে এখনও। ছত্রভঙ্গ কদমখালিব একমাত্র সক্ষম উত্তরাধিকার। কিন্তু যশোদা যেন



—শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত

—কবি তৈরী করা যায় না ভাই, কবিতা জন্মায়।

—এটা তোমার সেই বার্ষ কন্ঠ্যালের যুক্তি নয়তো?

একটা দুঃখের মত আঁচ সেই উত্তরাধিকারকেও বানচাল করে দিতে চায়। কি আছে যশোদার মনে কে জানে! লক্ষণ ভাবে আর বিড়ি টানে একলা বসে।

সামনেই গুপীনাথের দোচালা। ঘবে আলো জ্বলছে টিম-টিম করে। গুপীনাথের বউ'র করে বিশ্বাস নেই এক মুহূর্ত। মোহিনী দিনে যোগিনী রাত্রে বাঘিনী। ইতিমধ্যে যশোদাকে আবার কি পরামর্শ দিচ্ছে কে জানে? দাওয়ায় বসে সোয়াস্তি পায় না লক্ষণ। সাত-পাঁচ ভেবে যশোদার তল্লাসে বেরিয়ে পড়ে লক্ষণ অন্ধকারে।

নিশ্চিত রাত। কোন সাড়া-শব্দ নেই। ভিজ ভিজ পায়ে ঠাটা পথ ধরে লক্ষণ গুপীনাথের ছাউনীর চাচের বেড়ার গায়ে কান পেতে ধরে। বউ'র সঙ্গে ঝগড়া করছে গুপীনাথ। বিষয়টা—আল্লামান যাওয়া না যাওয়া। গুপীনাথের বউ'র আদৌ যাবার ইচ্ছে নেই আল্লামানে। বলে, আনকো আত্মস্তরের দেশ, চেনা-জানা এট' মানসির মুখ দেখাত পায়ো না সারা দিনমানে, ডাঙার মানুষ জল-সেরা দেশে যেয়ে কি শেখকালে মরবে! মরে গেলিউ আমি আল্লামান যাবো না।

গুপীনাথের কাছে আল্লামান ও বর্তমান, যদিও দুই-ই সমান, তবু আল্লামান যাওয়াই সে বেশী পছন্দ করে। হয়তো ভাবে সমুদ্রমেখলা সেই দ্বীপের দেশে বউকে নিয়ে সে আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করতে পারবে একাকীত্বের মাঝখানে। এক রকম পালিয়েই বাঁচতে চায় গুপীনাথ। যুক্তি দেখায়, এখানে না থেয়ে শুকিয়ে মবার চাইতে তেপান্তরের সেই আল্লামান ঢের ভাল। কি আছে এখানে! আর সেখানে গেলে সবকার দেখিসু জমি দেবে, হাল-পাঙল-বলদ দেবে, টাকাও দেবে পেরখমটা কিছু-কিছু,—সসারী মানুষের আর কী চাই! আব তোর ফলন কি সেই মাটির, পলি মাটির ব্যাপার তো! লোকে কি না বুকেই সব আল্লামান যাচ্ছে তুই বলতি চাসু?

গুপীনাথের বউ কিছুতেই সায় দেয় না। বলে, যাবার হয় তুমি একা যাও আল্লামান। এটা পোট আমার, দুঃখ-কষ্ট করে আমি চালিয়ে নেব এইখানেই। বাক্সা, ভিন দেশে মানুষ যায়!

একবগা কথা শুনে রেগে ক্ষেপে ওঠে গুপীনাথ : বলি সেডা না হয় ভিন দেশ হলো কিন্তু এডা তোর কোন্ বাবার দেশ! ছিল তো পদ্মাপার!

না হয় : ঘাড় বেকিয়ে একোলেঘেড়ের মত তর্ক করে গুপীনাথের বউ।

এ ঝগড়া থামবার নয়। লক্ষণ বুঝতে পাবে, গুপীনাথ কাছেই থাক আব দুবেই থাক, ব্যবধানটা আল্লামানের মতই দূস্তর হয়ে গেছে ছ' জনের মধ্যে। বেচারী গুপীনাথ!

স্বামি-স্ত্রীর এই বচসার মাঝখানে যশোদার থাকা কখনই সম্ভব নয়। অন্ধকারে পা টিপে-টিপে লক্ষণ ভিন্ন পথ ধরে। কিন্তু গেলই বা কোথায় রাত মাথায় করে! খামখেয়ালী মেজাজের কি কিছু ঠিক আছে যশোদার! রাগ করে বেরুবার মুখে পর্যন্ত বলে গেল, গুপীনাথের বউ'র কাছে শোবে! লক্ষণ নিজের মনেই গালমন্দ পাড়ে, হাড়ফালানে হতচ্ছাড়ী কোথাকার!

এদিক-সেদিক ঘুরে রথতলা গিয়ে হাজির হয় লক্ষণ। বেশ দরদরম হ'য়ে আছে আসর তখনও। অশপতলার নীচেই

শান-বাধানো পরিষ্কার চত্বরটায় দাবা প'ড়েছে দুই প্রস্থ। এগিয়েই কীর্তনের আসব,—জীবাধিকার লীলামাহাষ্মা খেলের বোল সহ স্বতোংসাবিত হচ্ছে পদকর্তার মুখে। থাকে তো এইখানেই আছে যশোদা, ভাবতে ভাবতে এগিয়ে যায় লক্ষণ কীর্তনের আসরের দিকে। দেখে, সত্যিই যশোদা, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাতজোড় করে একেবারে পদকর্তার মুখোমুখি বসে আছে। পদকর্তা নকুলদাসও রসিক জন, আবেদন-নিবেদনগুলো আবার যশোদাকে লক্ষ্য করেই বেশ সুর দিয়ে বিতং করে গাইছে। দূরেই বসে আছে লক্ষণের বুড়ী মা; কীর্তন গান বড় ভাল লাগে বুড়ীর।

নকুলদাস গান করে আর ঘুরে-ঘুরে নাচে বেপরোয়া আনন্দে। বসের যোগান দেন শ্রীমধুসূদন, ওপর থেকে। মাটির সঙ্গে এ আনন্দ-বসের সরাসরি কোন যোগাযোগ নেই। নেই বলেই হয়তো এতটা অনাবিল, পরিমাণে এত বেশী। বেলফুলের মালা গলয় দিয়ে সেই-সেই করে নাচে নকুলদাস। দোল খেয়ে মালাটা কখন-সখন যশোদার কপালেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। ক্ষেপে লাল হয়ে ওঠে লক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে। যশোদার কিন্তু কোন দিকে ভ্রক্ষেপ নেই। কীর্তন শুনে মধু-খাওয়া মোমাছির মতই ঝিম ধরে আছে যশোদা; অদ্ভুত একটা রূপরাগ মূর্ত হয়ে উঠেছে ওর তন্ময়তা ঘিরে। মেয়েমানুষের এত রূপ দেখেনি লক্ষণ এর আগে কোন দিন। সে-ও পলক ফেলতে পারছে না; একদৃষ্টে যশোদার দিকে তাকিয়ে আছে।

রোজ এতক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় কীর্তন। ফুরানির কারবার, সন্ধ্যা বাস্তির থেকে ঘটনা-খানেক গাওয়ার পরই সাধারণতঃ পালা শেষ করে নকুলদাস। মাস গেলে মাত্র বিশ-পঁচিশটা টাকা; দোয়ারী আছে, খোলসাজ আছে, ভাগের ভাগ নিজের বলতে বিশেষ কিছুই থাকে না। তবু চোখে চোখে না থাকলে লোকে ভাববে হয়তো মরেই গেছে নকুলদাস; কীর্তন-টীর্তন আর গায়' নয় না। মানুষের মন, ভুলতে কতক্ষণ! কাজেই ব্যবসাব খাতিরেই চালিয়ে যেতে হয় সময় সংক্ষেপ করে। তবে হ্যাঁ, শ্রোতা ভাল থাকলে সত্যিই সময়ের হিসেব থাকে না নকুলদাসের। এক ঘটীর জায়গায় গোটা বাস্তিরটাই যে তখন কোন দিক দিয়ে কেটে যায়, টেরও পাওয়া যায় না। আজকের পালা-গান শেষ করতেও তেমনি দেরী হয়ে যায় নকুলদাসের। নামগান সহ সাড়ে ত্রিশকুশী মাত্রার ভাল এতক্ষণে পড়তে স্ক্র করেছো খোলে। মহাশূন্যে আঙুল তুলে হরিধ্বনি দিচ্ছে নকুলদাস। এইবার পড়বে মূর্তী-মূর্তী বাতাস। লক্ষণের কিন্তু সেদিকে ভ্রক্ষেপ নেই। সে দেখছে যশোদাকে, কৃতা-কাতর ভিজ্জ-ভিজ্জ চোখ করে কীর্তনায় নকুলদাসের দিকে তাকিয়ে আছে। ভাল লাগে না লক্ষণের নকুলদাসের রং-ডং। বুকের ভেতর থেকে একটা ছালা পাক দিয়ে মাথায় ক্ষেপে ওঠে। ইচ্ছে করে লাকিয়ে প'ড়ে যশোদার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে সে বাড়া নিয়ে যায়।

রথতলায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে উঠে দাঁড়ায় নকুলদাস। যশোদা পা ওটিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ায় ভয়ে-ভক্তিতে। নকুলদাস বলে, কিছু মনে করো না মা; ও বে-রাধিকা সে-ই তুমি; ঠেকলই বা পায়ো আমার মাথা। আমি কোন প্রভেদ দেখি নে।

যশে দা কোন কথা বলে না। আজব কথা শুনে শুধু ফ্যাল-ফ্যাল করে নকুলদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আসর

২৫ বিদায় নেবার আগে নকুলদাস বেলফুলের মালাটা যশোদার হাতে তুলে দেয়; বলে, ঘরে গৌরাক্ষ আছেন তো মা, তা এই মালাটা তাঁর পায়ে দিও তোমার মঙ্গল হবে। দেখো যেন ভুলে রে মালা ঠাকুরের গলায় দিও না।

ফুলের মালা গলায় দুলবে তার আবার এত বিধি-নিষেধ কিসের? সপ্রতিভ প্রশ্ন করে যশোদা : ক্যানো যতি গলায় দেই!

—যদি গলায় দাও!—নকুলদাস কুণ্ঠিত হেসে বলে, অবিশিষ্ট গতে করে দেবতারও পাপ নেই তোমারও অপযশ নেই, মাঝখান থেকে কীর্তনীয়া নকুলদাস মারা পড়বে আর কি, এই! মানুষের মার মালা দেবতার গলায় কি দিতে আছে মা!—তুমি পায়েই দিও।

যশোদা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী না। চোখ ঘুরিয়ে বলে, হবে যে বললেন ষে-রাখিকা সেই তুমি! মানবী কখনও দেবী হয় বাবা?

খুব সহজ অথচ কঠিন প্রশ্ন। নকুলদাস চোখ বুঁজে যেন ডুব দিয়ে ওঠে শব্দসায়র থেকে; বলে—হয়, যদি কেউ রূপারোপ করে। বুঝলে না!...মানে, তুমি তো আর তোমায় দেবী বলনি!...আমিই তোমারে স্ত্রীরাখিকা সংজ্ঞা দিইছি!...এ ক্ষেত্রে আমি রূপারোপ করলাম তোমার ওপরে, বুঝলে মা!

—মানে কথা নিজি বলি হয় না, পরে বলি হয়, এই তো!

—হ্যাঁ, তবে তার ভেতরেও কথা আছে।

—কি কথা?

—আছে মা আছে। অত উতলা হলি হয়।

—আচ্ছা তো আমি যদি বাবা আপনাবে সেই গৌরাক্ষ বলি...


—হ্যাঁ তা হলি আমিই সেই গৌরাক্ষদেব। মানে কি!...

আমাকে গৌরাক্ষদেব,—এখানে দেখছে কে!—তুমি,—তুমি আমাকে গৌরাক্ষদেব দেখছো, কেমন কি না!—তা এখানেও কি সেই রূপারোপের কথাই উঠে পড়ে না মা!...আচ্ছা বাত হলো তা আর এক দিন এসো মা-জননী, বলবো কথা।

যশোদা দূর থেকে গড ক'বে বলে, আচ্ছা তো আসবো এক দিন বাবা।

এত রঙ্গ জানে যশোদা জানা ছিল না লক্ষ্মণের। মাথায় তার খুন চেপে বসে। হৃপুর রাতে নকুলদাসের সঙ্গে রথতলা এসে ধর্মকথার মস্তুরা করার যে কি মানে, তা সে খুব বোঝে। এক মুহূর্ত আর না ঈাড়িয়ে রথতলা থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় লক্ষ্মণ। না পালিয়ে উপায় নেই। কারণ, হাতের কাছে পোলে সে হয়তো তখন গলা টিপেই মেবে ফেলে যশোদাকে। লক্ষ্মণ ভাবে, একেই বলে কালসাপ! এক বছর ধরে পুষেছে বলেই না আজ সেই যশোদা তাকে দংশাতে এসেছে। এ দংশনের জ্বালা কালনাগিনীর বিষকেও হার মানায়। বিষদস্তী খায় একবারে, যশোদা দগ্ধাবে জীবন ছুড়ে, লক্ষ্মণ যত দিন বাঁচবে তত দিন। মুখ থেকে জিবটাকে উল্টে ঠেলে বাব কবে কোঁস-কোঁস কবে নিশ্বাস টানে

**সুন্দর ডিজাইন ও**  
**নিখুঁত ব্লক**  
**এ দু'য়ের সমন্বয়**  
*—বোঁটে*



**বেঙ্গল ফটো টাইপ কোঃ**  
**সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত**

৪৬/১ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯ ফোন ১৭০২ বি,বি



সে। খাম-প্রশাসেও 'তাব' আচ্ছ আঙনব ছালা। কিন্তু সে জানে, এ আঙনব গতটুকু আঁচ আজ যশোদাব গায়ে লাগবে না; শুধু 'তাব' নিজের বুকব ভেতরটা পুড়িয়ে পুড়িয়ে থাক কবে দেবে। একবার বসে, একবার ওঠে, পাগল-পাগল লাগে নিজেকে লক্ষণেব।

জলের গতি স্বাভাবিক অবস্থায় নীচেব দিকেই। কথায় বলে বাগ না চণ্ডাল,—খুন চাপলে ভঁস থাকে না মাথায। কিন্তু সেই মাথাব সঙ্গে ভঁসেব আবার এমনই নিকট সম্বন্ধ সে, সেই চণ্ডালের গৌ নিয়েও খুন সেখানে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। নীচেব দিকে নেমে গায়ে ফাঁক পোলেই। বাগ পড়ে আসে।

আজ্ঞাকারে একলা পানিকরণ চূপচাপ বসে থাকাব পব লক্ষণেবও বাগেব উপশম হয়। কিন্তু 'তাব' পব দ্বিতীয় অধ্যায়েই আসে বুক ভেবে অস্মান। প্রতিতিসাব পবই ছঃখবাদের কালীদহ। লক্ষণ ভাবে, মাঝিটো তো!—অনাথীয় এক পটৌব মেয়ে যশোদাব সঙ্গে 'তাব' কিসেব সম্পর্ক!...চূলাচোবা বিশ্লেষণ কবে আত্মনিগতের অধ্যাসটুকু বেশ বসন কবে তোলে লক্ষণ।... যশোদাকে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষেছে বলেই না এটা 'তাব' সেই লোকসানেব ছালা!...তসত্তো হবে, এত ছোট মন নিয়ে সে আজও পৃথিবীতে বেঁচে নেই। যশোদাব মত অনাথা একটি মেয়েকে অন্ততঃ একটা বড়ব গাঠিয়ে-পাবিয়ে বাঁচিয়ে রাখাব মত জন্ম 'তাব' আছে। কিন্তু সেই জন্মের প্রস্তুতি যদি হয় 'তাব' হলে তো প্রত্যাশাব কোন কথা ওঠে না। দাম কবে প্রতিদানের প্রত্যাশা তো দামনেবই নামাশ্রব। অতিশুণু সেই দামেব নবো পূর্বোপকারেব নামগন্ধ নেই। এখন এমনও যদি হয় যে সেই প্রত্যাশা নৈবাঙ্গিক, সামান্য একটা ভালবাসা ছাড়া কিছুই আব সে নাবা কবে না যশোদাব ওপব; কিন্তু তা হলেই বা সেটা একেবারে নিঃস্বার্থ? কি সুকিরে? এতে কবে, বাব কিছু নেই, 'তাব' যেটুকু আছে সেই-টুকুই নিঃশেষে পুঃ নেবাব প্রবৃত্তি প্রকট হয়ে ওঠে না? ক্ষুদ্র স্বার্থেব মহত্ব বাগা দিলেই কি নিজেব সব দোষ ফালন হয়ে যায়? ...কঠিন আত্মসমালোচনা, নিজেকে একটুকু বেচাই দেব না লক্ষণ।

বাস্তব অন্ধকারে নিঃস্বপ্ন দাওয়াব ওপব হিনমাথা এক কবে চোখেব মত বসে থাকে লক্ষণ।

একটু পবেই লক্ষণেব বুড়ী-মা আসে যশোদাব হাত ধবে। একেই কার্না মানস, তায় বাব কবে পথ চলতে সাপে কাটে কি বিড়ের যায়, বুড়ীকে যশোদাই আগলে আগলে নিবে বেড়ায় সব সময়। পাশ ফিরলেই,—কনে গেলি কো!—ঠোত থাকে লক্ষণেব মা গলা কবে; নড়াচড়াই এক দাব হয় যশোদাব। বুড়ী মাল্লসেব হাজাব ফৈজত, শক্তক ঝামেলা, হক না হক ক্ষয়-ক্ষতিব কথা শ্রবণ কবে সময়-অসময়ে কানেব মাথা খায় প্যাচাল তুলে: যশোদা কখনো কোন অপত্তি কবে না। 'তাব' পব এটা-সেটা ফুটিফমায়ের তামিল কণা পব একটা সংশয়ের নিবশন কবতে মতিই একেবারে ভিমসিম খেয়ে যায় যশোদা,—লক্ষণকে সে হয়তো বেচাই কবে নেবে বুড়ীব কাছ থেকে। বুড়ী মানস, দেগতে পায় না চোখে, মনেব কথা অন্তরে পুষে পুষে চাঁৎ এক দিন তুচ্ছ কাণে খণ্ডপ্রসন্ন বসিবে বসে সংসারে। ছেলেকে বলে, হুই আগে ঐ বাজুসিবি ভাড়া হাবানজান, 'তাব' পব কথা বলিস! লক্ষণও কম

যায় না; বুড়ীব কথার পৃষ্ঠে কথা বলে মুখচোপা করে কাঠগোয়ারেব মত; মাঝখান থেকে যশোদাই একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে মায়-পোয়ে'ব ঝগড়ার বিষয়বস্তু হয়ে—মনে হয়, তখনই চলে যা: ছুটে যেদিকে হয়। পদ্মাপাবেব মেয়ে যশোদা, পদ্মাব মতই ফুলে-ফুলে ওঠে অভিমানে; কখনও রাগে, কান্দে, ছুটে চলে যা: পাগলেব মত দিখিদিকে। শেষ পর্যন্ত লক্ষণকেই তখন আবার ফিবেয়ে আনতে হয় যশোদাকে শত সাধ্য-সাধনায়। সহায়: সবলহীন একটা মেয়ে, আছে আছে একেবারে চলে যাবে হাবা-উঃক্ষেণ, 'তাও' আবার বিবেকে সহ হয় না লক্ষণেব মায়ের। বুড়ী বলে, জীবজন্তু পৃথলিই কষ্ট হয়, আর এ তো মানষির বাচ্চা! তাড়াতে গিয়ে জড়িয়ে পবে বুড়ী যশোদাকে; মনেব সংশয় মনেই থেকে যায় লক্ষণেব মায়ের। থাকে থাকে আবার এক দিন ফাটাকাটি লেগে যায় এটো যশোদাকে কেন্দ্র করেই সংসারে। নিবসন আব হয় না সমস্কার। কিন্তু এ তো গেল সংশয় আর ভাবান্তরেব কথা। মিলমিশও আবার কম নেই বুড়ী যশোদাব সঙ্গে। ঝগড়াই হোক আর যাই হোক, প্রাণেব কথা বুড়ী আবার সময়ে যশোদাকেই বলে। বুড়ো বয়সে ছোট ছোট শূক্ষ্ম অল্পভূতিব বড় একটা দাম পাওয়া যায় না সংসারে! সবাই প্রায় বলে, ও-সব জরদগব স্নায়ব বিকৃতি,—ভীমবতি! কিন্তু লক্ষণেব মা আশাবিত্ত হবে একটা কথা বলতে এলে যশোদা বুড়ীব সব কথাগুলো কান পেতে শোনে, তাবিকও কবে নানা ভাবে। হঃখের জীবন বুড়ীব, তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, যশোদাব মত একটা উদ্ধাম মেয়ের এই ভাল লাগালাগিব ভেতবেই বাকি 'কটা দিন বেঁচে থাকবার একটা মানে খুঁজে পায় বুড়ী। মেয়েটার অন্তরেব এই নিভৃত প্রসাদ-গুণটি ভুলতে পাবে না লক্ষণেব মা। তাই যত কথা বুড়ীব যশোদাব সঙ্গেই। বলে, কি গাওনাই কবলো লো আজ নকুলদাস যশোদা, এই রকম মাথুর গুনি নাই বহু কাল! যশোদা হেসে উত্তর কবে, সে 'তুমি যখনই রথতলা গেছ জানলাম, আমি তখনই ব্যক্তি পেরিছি বস্তু আছে কীর্তনীয়র মধ্য। তা না হলি বোজ বোজ তোমাব এই বৃকে তেটে তেটে বথতলা যাওয়া...। পদগুলো এখনও আমার কানে বাজছে।

যবে ফিবেও সেই নকুলদাসেব কথা। বিরক্ত বোধ কবে লক্ষণ। ভাবে, নকুলদাসের অন্তরেব মণিমুক্তা ইতিমধ্যেই খুঁটিয়ে দেখা হয়ে গেছে যশোদার।

বেশ ছিল একলা অন্ধকারে। যশোদার মুখে পাকা পাকা কথা শুনে আবার তন্মে হয়ে ওঠে লক্ষণ। বৃকের অন্তস্তলে ছালা ধরিয়ে সেই চণ্ডাল আবার কখে উঠছে স্নায়ুতে। শূক্ষ্ম আত্ম-বিশ্লেষণেব অভিজ্ঞান আপসা হয়ে আসে তার ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না-লাগাব চোরাগলি ধরে। আবার খেই হাবিয়ে ফেলে লক্ষণ। বুড়ী-মা ও যশোদাব বসাত্তক আলোচনার মাঝখানে বেবসিকেব মত ঠেচিয়ে ফেটে পড়ে: ভক্তিতে তো আব ভাত আসে না, শুধু কেন্তন গুনি কি হবে!...সেই তো আমারেই আবার কাঠকুঠি বেচে বাবস্থা কবে আনতে হয় পিণ্ডির। তাও যদি আবার দুপুর বাতে এসে নিজের হাতে চটকাতে হয় সেই পিণ্ডি তাহলে যবে-দোরে আসার তো কোন দরকার নেই! তোমাদের

কি!—আছে নকুলদাস, পোলের বোলের আড়ালে মরম-কথা কয়!—  
সেই হলিই তো সব হয় তোমাদের!

সেই সকাল বেলা বেরিয়েছে!—সারা দিনমান হয়তো খাওয়াই  
হয়নি। লক্ষ্মণের মা বলে, না খেয়ে ভাত ভিজিয়ে বেথিছি তো'ব  
জন্তে হাঁড়ি করে; এতক্ষণে বেড়ে-কুড়ে তো পেলিউ পাতিসু সড়ে-  
নড়ে। আর নয় তো দু'পা এগিয়ে গিয়ে এটা ডাক দিলিই হতো,  
যশোদা এসে ভাত বেড়ে দিত! য্যাও করবি নে অ-ও কববি  
নে তার ক্ষিদে'র আর দোষ কি বল?...যা যশোদা, বেড়ে-  
কুড়ে দিগে যা।

—কি যশোদা! ও ভিজো ভাত আমি খাব না। মায়ের  
সঙ্গে কথা বলার সময় ছোট ছেলে'ব মত থম্ থম্ করে লক্ষ্মণ।

—খাবি নে তো গরম ভাত এখন আসবে কনখে শুনি?  
হাঁড়ি'তি যে চাল বেশী, সে কথা তো সকাল বেলাই বলিছি।

—‘বলিছি’ তো এনেওছি, সে খবর রাখ?

মা'মুষ বুড়ো হলে অমুভতির পর্দাগুলো ভৌতা হয়ে যায়;  
কিছু চায়ও না, দেয়ও না। লক্ষ্মণের কথা'ব উত্তবে বলে,  
এনিছিস ভাল করেছিস। তো'ব চাল তুই-ই খাবি। হাত'তালি  
বাজাবে কেডা রে তা'ব জন্টি!...যা লো যশোদা, দু'টো  
চাল আল দে দেগে।...এলাম একমন নিয়ে টেচিয়ে-মেচিয়ে দিলে  
তাবে গিচড়ে!—গুরু গুরু! শুয়ে পড়ে লক্ষ্মণের মা।

যশোদার ক্লান্তি নেই। একটা ভাল জিনিষ আর পাঁচটা ভাল  
জিনিষকে জাগিয়ে তুলেছে তা'ব গহন মনে। আজ তা'ব  
খুব ভাল লাগছে। যশোদার কীর্জন মনে নেই, রাসলীলার মম  
মনে নেই, নকুলদাসও বিস্মরণ,—শুধু আজ সে একলা গহন  
বনে'ব রাত-জাগা পাগীর মত অতন্দ্র জেগে আছে। অন্ধকারে  
উদ্ভাস্ত কলো'নীটা মনে হচ্ছে যেন নিস্রপ্ত বৃন্দাবন; নিজে'কে মনে  
হচ্ছে বিলাসিনী রাইকিশোবী। ডান হাতে জড়ানো বেলফুলে'ব  
মালাটা অন্তর'ব করতেই মনে পড়ে তার নকুলদাস বাবাজী'ব কথা—  
মালাটা গৌরাস্তের পায়ে দিও মা, মঙ্গল হবে। কীর্জনীয়ার তত্ত্বকথা  
স্মরণ করে হাসি পায় যশোদার;...‘পায়ে দিও’...মালা কখনও  
পায়ে পড়ে! অভিমান করে নিজেই অক্ষুটে বলে, পায়ে না হাতী!  
—দেই তো মালা আজ গৌরাস্তের গলায়ই দেবো।

নিজের মনেই স্ববভি হয়ে উঠে আনন্দে গলে গলে পড়ে যশোদা!  
এদিকে লক্ষ্মণ যে মাথা'ব ঘাঁড়ি ক্ষেপিয়ে তুলে ঘাড় গুঁজে বসে আছে  
অন্ধকারে সে কথা থেয়ালই থাকে'না। বাবান্দায় এসে খিল-  
গিল করে হেসে ভেঙে পড়ে যশোদা। রসিকতা করে বলে : ক্ষিদে  
পেয়েছে তাই বুঝি গোসা হয়েছে বাবু!...ভাগ্যিস যাওনি বখতলা!  
তা হলি আর কেস্তন শোনা হ'তো না।

লক্ষ্মণ কোন কথা বলে না। আহত অভিমানে দাঁত চেপে  
চূপ করে বসে থাকে।

যশোদার মন আজ হংসবলাক। কথায় তা'ব বাঁধন নেই  
আজ। বলে : কথা বলা'না কেন?...মরদের রাগ হবে বাবে'ব মত;  
ধরবে চুলের মুঠি, মারবে তিন লাথি, অমনি গরম গরম ভাত এসে  
পড়বে খালায় ঝটপট। তা সে কপাল তো আর করে আসনি চাঁদ,  
রাগ করবে কার ওপর!

টেনে-টেনে কথা বলে আব কোমব বেঁকে ভেঙে ভেঙে পড়ে  
যশোদা লক্ষ্মণের সামনে গিলখিলিয়ে হেসে। নিজের আবেগেই বলে  
যায়, কেস্তন শুনে আসিবাব সময় নকুলদাল আমাকে এই বেলফুলের  
মালাটা হাতে নিয়ে বললে কি জান?...বললে, মালাটা গৌরাস্তের  
পায়ে দিও মা, মঙ্গল হবে। তা আমি মনে মনে বলি কি  
নে, গৌরাস্তদে'ব তো ঘবে নেই, এক আছে কালো কিষ্ট তাও  
রথে'ব মেলায় যবে যবে এসে চরণ দু'খানা তানার ধূলা-কাদা  
মাখা, শুনছো?...

লক্ষ্মণ কোন রা কাড়ে না। অনেক কষ্টে নিবিয়ে ফেলছিল  
সে যে আশুন, যশোদা এখন সেই আশুনেই ঘি ঢালতে শুরু  
করেছে। অন্ধকারে চোখ দু'টো তা'ব চক্চক্ করে জ্বলে  
ওঠে। যশোদার কিন্তু সে দিকে জ্ঞক্ষেপ নেই। বেলফুলের  
মালাটা লক্ষ্মণের গলায় দিয়ে বলে, তা এ মালা যদি দিতিই  
হয় তো পায়ে কেন, গলায়ই দেই।

জ্যা'তে বাণ জো'তাই ছিল, এখন টঙ্কার লেগে ছুটে গেল সেই  
বাণ। গলায় মালা দিতেই লক্ষ্মণ লাফিয়ে উঠে ঠাসু করে এ'না।  
চড় বসিয়ে দেয় যশোদার নবম গালে'ব ওপর। বেলফুলে'ব মালা  
টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে রূপে দাঁড়ায় দৈত্যের মত : বজ্জাত  
মাগী, নকুলদাস পেইছিস না?

অপ্রত্যাশিত একটা প্রাণঘাতী অপঘাত অন্ধকারের গুহা-গর্ভ  
থেকে আছড়ে এসে প'ড়ে হঠাৎ যেন অললুপ্ত করে দেয় যশোদার  
সমস্ত চৈতন্য-বুদ্ধি। টাল খেয়ে দ্বত-ব্রত সে বাবান্দা থেকে মাটিতে  
পড়ে যায় দূ'বে। কোন সাড়া নেই যশোদার শব্দে। গাড়-কুটে  
ধূলা-বালি'ব ওপর লুটিয়ে থাকে মধুবন্দাবন'ব বাইকিশোবী।

একটু জোরে হয়ে গেছে চাপড়টা। হাতের ওজনটা লক্ষ্মণ  
বাগে'ব মাথায় একেবারেই আন্দাজ কবতে পারেনি। কিন্তু হতে  
কি হবে! উপায় ছিল না লক্ষ্মণেরও। একেই নকুলদাসে'ব দেও  
মালাটা সাপে'ব মত মনে হয়েছে লক্ষ্মণে'ব যশোদার হাতে, তা  
ওপর সেই সাপ যশোদা যে আবার তারই গলায় জড়িয়ে দেবে—  
এ কথা ভাবতে পারেনি লক্ষ্মণ। সাপে'ব নিষে'ব সে কি ছা  
সে কথা যশোদা জানে না। আত্মবক্ষ্য 'ভাগিদে সামান্য চড়-চাপড়  
কিছুই না তা'ব কাছে। যশোদাকে টেনে তুলতে গিয়ে হ'  
গুটিয়ে ফিরে আসে লক্ষ্মণ;—থাক পড়ে অমনি তাবানজাদী; স্পঃ  
ওর মরণ আছে।

নিবান্ন বাত, বোবা অন্ধকার; রাহের কালো চোখে টে  
যশোদা মাটিতে বুক চেপে গুমবে গুমবে কান্দে।

লক্ষ্মণে'ব কোন কথা নেই। কান পেতে সে শুধু কান্না শে  
যশোদার। ছলনা'ময়ী'ব ছলনা;—কপকথা'ব সেই সো  
হবিণ।...হাসতে গিয়ে এক কঁোটা জল গটিয়ে পড়ে লক্ষ্মণে'ব  
দিয়ে।

আত্মবতিমন্তমতিবকালোকালিন্দী,—এ চোখে'ব জ্বলে শুধু আ'  
আছে, শাস্তি নেই।

বৈদে কৈদে শ্রাস্ত হয়ে শাস্ত হয় যশোদা। চোখের সা'  
নববন্দাবন ভা'হ করে জ্বলে যায়। নকুলদাসে'ব প্রেমলীলা গান f  
মনে হয়। এ সংসারে কোন দিন কোথাও বৃন্দাবন ছিল  
শিথিপাশাশোভাগোপীর্জনবিমোহন ক্রীকৃষ্ণ ছিল না, ছিল না ক

শীলাময়ী সেই বরনারী স্ত্রীরধিকা ; কীর্তনীয়। তাকে ঠিকিয়েছে। ভাবে আব মরমে মবে যায় যশোদা।—পদ্মাপারের প'টোর মেয়ে সে, ঘর পুড়িয়ে ছাটি খেয়ে ভিন দেশে এসে শুধু দয়াভিক্ষের ওপরে তো হা-ভাতের জীবনটা জিয়েয়ে রেখেছে। সেই তো তার সত্যিকার পবিচয়। কি ভাবতে কি ভাবলে সে, লক্ষণের গলায় সাধ করে মালা দিয়ে দারুণ অপমানে জঙ্ঘবিত করলো নিজেকে। কেন সে ভেবেছিল বেলফুলের একটি মালা স্বপ্নের করে তুলবে তার হুংখের জীবনটা! সে কি ভুলে গিয়েছিল!—খাওয়া নেই, ঘুম নেই, চোখে ওপব যে বীভৎস নিগ্রহ, ভাতে কাপড়ে মুখে তেল, হুংখের মত টু'টি টিপে ধবে তার, নাখে দাঁতে সেই প্রত্যক্ষ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবেই তো। তাকে ভিমসিম খেতে হয় দৈনন্দিন জীবনে। এ সব কথা বিশ্ববনের অবকাশ তার কতটুকু আছে! মনে পড়ে তার সেই শক্তিগড় কলোনির কথা, কদমখালির ছন্নছাড়া দলের সঙ্গে মাসটানা লবী ভবতি করে যেখানে সে প্রথম গিয়ে ওঠে,—সাত দিন যেতে না যেতেই পর্বোয়ানা এসে, উঠে যাও—জমিদারের ভাড়াটে লেঠলরা বোনা লাঠি নিয়ে এসে তামলা সুরুর কবলে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ভবতি পুলিশ এসে গাছ-লাঠি উ'চিয়ে—সঙ্গীদধারী নিলিটারী এসে তিন-চার গাভী—গুলীও চলল কয়েক বাড়িও ; হিন্দু-মুসলমান হামলাকারীদের গায়ে লেগা ছিল না, যশোদা ভাবলো বুঝি বা তিল্লান্ন সালের কয়েক শ' দুব'ন্ত আবার আক্রমণ করে বসেছে তাদের ক্ষুদ্র বসতি। কিন্তু তখন তার মনে শুধু একটা কথাই,—বাঁচতে হবে আবার বাঁচতে হবে ; চৈতন্য মান্নির কোলের ছেলটাকে হু' হাতে বৃকে জড়িয়ে ছুটেতে থাকে সামনের দিকে যশোদা। কই, সেদিনও তো প্রাণভয়ে এতটা মুসড় পড়েনি সে! এট তো সেদিনও, হাওতা ষ্টেশন থেকে থানিকটা দূরে, বেল-লাঠনের ওপর সেই শাক এল যান্ত্রিক বথচক্রগর্বে, বাফুসে একখানা ইঞ্জিন চম্ভসু শব্দে এসে যশোদার ঠিক পাঁজরব কাঁড়ায় গজ্ঞাতে লাগলো, যশোদার পাশেই ভুমডি খেয়ে পিঠি পেতে বসেছিল লক্ষণ ;—বলে, ভয় পামনি যশোদা, জ্ঞাপ কাগে গেছে ঢাকগাড়ী! কই, ভয় তো তার একটুও কবেনি সেদিনও! মুড়ার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তো পায়ের তলা থেকে তার মাটি সবে যায়নি আজকের মতন! অনাথা এক উদ্বাস্ত মেয়ের ছন্নছাড়া জীবন,—এ জীবন তো সব সময়েই বায়ে হেসে বাতাসে দোলে, এক দিন খাওয়া জুটেছে তো তিন দিন খাওয়া জোটেনি, জীবন-মুড়ার মাঝামাঝি ক্রিশকু একটা থাকা-না-থাকার মতই দিন কেটে গেছে আলো-আঁধাবিতে, কিন্তু তবু এক মুহূর্তের জ্ঞেও তো সেই বন্ধুর দিনগুলো অপমানে আজকের মত কালো হয়ে ওঠেনি। বন্ধুত্বের দিন—বন্ধুত্বের পৃথিবী—নিজেকে মনে হয়েছে যশোদার ভিন্নমস্তা—নিজের বন্ধু নিজে পান করে মতশক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে সে দানবের সাথে ময়দান নোবে বলে ; কিন্তু আজ তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ ফুটিয়ে গিয়ে যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছে নিদাকণ একটা বিস্তৃতায়। ভাল করে বাঁচতে গিয়েই কি সে আজ সাধ করে মরণ থেকে আনলো জীবন! না কি নকুলদাসের বেলফুলের মালায় পাবিজাত মালায় অভিশাপ ছিল!—সহ হলো না মায়ুসেব গলায়!

বাতের অন্ধকারেও বুঝি কলঙ্কিনী মুখ দেখা যায়। নিজের মুখখানা হু' হাতে চেপে ধবে যশোদা।

ঘুমোয়নি লক্ষণ। হাতের ওপর মাথা রেখে দাওয়ার ওপর মটকা মেরে শুয়ে আছে। ভাবে, যশোদা মত মেয়ে, চড় খেয়ে নিশ্চয়ই চুপ কবে থাকবে না। কান্নাটা কমলেই ষটকা মেরে উঠে তাকে উদ্বাস্ত করে তুলবে জবাবদিহি করে। একটা চড়ের শোধ লক্ষ কথার তুবড়ী ছুটিয়ে মুখে মুখেই সে উত্তল কবে নেবে। যশোদা কিন্তু একটা কথাও বলে না। কান্না থামার পর কতক্ষণ হয়ে গেল,—তবুও না।

নিরবচ্ছিন্ন এই নীরবতা ভাল লাগে না লক্ষণের। এর চাইতে যশোদা যদি তাকে একটা চড়ের জায়গায় পাঁচটা চড়ও মারতো, সেও যেন হ'তো ভাল। অন্তর্দাহের বেশ থানিকটা উপশম হতো হুংখ সয়ে। কিন্তু এখন যেন সেই একটা চড়ই একশ'টা হয়ে উল্টে-পাল্টে পড়ে তাকে নিশ্বাস ফেলবাবও অবকাশ দিচ্ছে না। থেকে থেকেই বৃক চেপে ধরছে কঠিন চাপে। নিজের গাল ঠিক নিজে চড়ানো যায় না। অত্যন্ত বোকা বোকা মনে হয় নিজেকে। লক্ষণ দাঁত দিয়ে ঠ'টি কামডায় জোরে জোরে।

স্বৈর্ঘ্যের বীধ একবার ভাঙলে ধৈর্য ধবে থাকা দায় হয়ে পড়ে। অমুশোচনার সঙ্গে সঙ্গে তখন আসে তার স্বীকারের মর্মান্তিক অধ্যায়। জিতে-নেওয়া প্রত্যেকটা সামনের বাঁটি ছেড়ে দিয়ে তখন পেছনে হ'টে আসতে হয়। নিজের ঠ'টি নিজের দাঁতে আর কতক্ষণ কামড়ানো যায়! আত্মপীড়নের এই সব নীরব অভিব্যক্তি প্রতিপক্ষকে সহানুভূতিশীল করে তোলবাব পক্ষে আর্দ্রা যথেষ্ট নয়। লক্ষণ তখন পায়ের আঙুল নাড়ে, দাবনার ওপর সশব্দে মশা চাপড়ে মেরে হাব-ভাবে যশোদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যশোদার কিন্তু তখনও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। লক্ষণ হাত-পা ছোড়ে, উসখুস করে সাবা শরীরে ; অগত্যা নিজের খেঁদেই আপন মনে বক-বক করে—ক্ষিদেয় শালা এদিকে পেটের নাড়ী পর্যন্ত হজম হয়ে সে সেদিকে কারো হুঁস নেই!.....সংসারে খালি এনে ছাও, চেয়ে না কোন কিছু কারো ঠেঙ্গে ; ব্যস, তা হলিই আর কি তুমি ছোটলোক,.....নেমকহারাম সংসার ;...যাঃ শালা আন্দামান তো আন্দামানই সই, চলে যাব আন্দামান...এখানেও নিজের বলতে কেউ নেই, সেখানেও কেউ থাকবে না।

ব্যবধানটা সামান্যই। আরও ছোট ছোট কবে বললেও যশোদা লক্ষণের সব কথাগুলোই শুনতে পেতো। কিন্তু জেগে ঘুমোয় যে ব্যক্তি, তার সাড়া কাড়া মানুষের সাথে নাই। তাই ঘুবিয়ে-ফিরিয়ে হাজাব গণ্ডা উত্তরেও লক্ষণ যশোদার একটা কথার জবাব পায় না। চড় মারাব পবই কিন্তু লক্ষণের মনে হয়েছিল কথাটা—জাত-প'টোর জেদী মেয়ে বলতে যদি সুরুর কণে একবার তো! কথার খই ফুটেবে মুখে, আর নয়তো দাঁতে দাঁত চেপে বৃক ফেটে মরবে সেও ভাল তবু মুখ খুলবে না কিছতেই।

মেয়েমানুষের অনেক জালা। আড়ি কবে দাঁত চেপে থাকবে বললেই চুপ করে থাকতে পারে না যশোদা, কারণ ব্যক্তিগত জীবনের ব্যর্থতার অমুশোচনাগুলো লক্ষণ এত গলা করে আঙড়াচ্ছে রাত কবে যে, এক্ষুনি হয় তো কানী বুড়ী ঘুম ভেঙ্গে উঠে যশোদাকে জবাবদিহি করে ঠেচিয়ে-মেচিয়ে একশা করবে কলোনির মাঝখানে। যশোদার নামে এক ঢোক জল তো সবাই প্রায় আগে গায়, মিথ্যাকে সত্যি করে তারও হয়তো পাঁচটা অকথা-কুকথা বলতে

সুরু করবে তক্ষুনি। স্মৃতির কথা উদ্ভবে কথা না বললেও উদ্ভব একটা দিতেই হয় যশোদাকে ন'ড়েচ'ড়েও। জীবনের দায়—সব চাইতে বড় দায়! এ দায় অস্বীকার করবার উপায় নেই যশোদার সমসারে।

এতক্ষণে উঠে দাঁড়ায় যশোদা ধূলিশয্যা থেকে। হু'হাতে মুখখানা সাপটে বিশ্রুস্ত চুলটা আঁট করে বেঁধে নেয় খোঁপা করে। তার আঁচলের মুড়োটা মুহূর্তে কোমরে পাক দিয়ে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় লক্ষণের পাশ কাটিয়ে। হাঁফ ছেড়ে উঠে বসে লক্ষণ। সেও যেন প্রাণ ফিরে পায় এতক্ষণে। গোটা জীবনটা হঠাৎ এই ভাবে নিজের মধ্যে গুটিয়ে কি চূপ করে বসে থাকতে পারে মানুষ! যশোদাকে উদ্দেশ্য ক'রে সেই প্রথম কথা পাড়ে: থাক আর রাত ক'রে কাত করতি হবে না। আমি আর কিছু খাব না আজ।

যশোদা কোন কথা বলে না। মুখ বুঁজে শুধু কর্তব্য কাজ করে যায়। ইচ্ছে ছিল, ঐ মাটির ওপরেই অবসর দেহ-মনটাকে এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু লক্ষণ তাকে সে অবকাশ দিল না। নিজের জীবনের ছুঁতোর পাঁচালী স্বার্থপরের মত ঘুলিয়ে তুলে বিবিধে তুলল আবহাওয়া; যেন লক্ষণের জীবনে যা-কিছু হয়নি আর যা-কিছু হলো না, তার জগ্রে যশোদাই একমাত্র দায়ী। স্বার্থবাদী মানুষের এই মনটার খই পায় না যশোদা। রাতের কালোর মতই এই দিকটা মানুষের বুঝি নিরঙ্কুশ অন্ধকার। নিজেরও জানে না, অপরকেও জানতে দিতে চায় না। ঠিক ব্রহ্মতে পারে না যশোদা কি রকম কি হয় ব্যাপারটা।

তাও দায়িত্ব স্বীকার করেই কি পার পাবার যো আছে! কর্তব্য, অকর্তব্য—তাও তো আবার সম্পর্কিত মানুষের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে। যেমন, মনে যাই থাক যশোদার, ক্ষিদের আলায় যার পেটের নাড়া হজম হয়ে যাচ্ছে, তাকে ফ্যান-জল দেওয়াই যশোদার প্রথম কর্তব্য। সেই দায়িত্ববোধ থেকেই হাঁড়ি নিকিয়ে ভাত তুলতে যাচ্ছে যশোদা এত আয়াস স্বীকার করে; অথচ লক্ষণই আবার তাকে ঠেস মেরে বলে, থাক আর রাত করে কাত করতে হবে না। লক্ষণ চায় ভাত রেঁধে আহুক যশোদা গরম গরম তার জগ্রে; অথচ সেই ভাত যখন হাঁড়ি করে


চড়াতে যায় যশোদা তখন লক্ষণের হয় ভীষণ রাগ। লক্ষণ যে কি চায়, সে কথা লক্ষণ নিজেরই জানে না; তার যশোদা কি বুঝবে?

হাঁড়ির ভেতর চাল ছেড়ে দিলেই ভাত তৈরী হয়ে আসে না। তার জল চাই, আগুন চাই,—একটা কাজ করতে গেলেই পাঁচটা আহুসঙ্গিক কাজ এমনতেই জড়িয়ে আসে তার সঙ্গে। তা আহুক। কাজে যশোদার ভয় নেই। জল ছিল না, ঘড়া ভরতি করে দ্বথলার 'টিউকল' থেকে জল নিয়ে এসে যশোদা। বিচ্ছেদে কামড়ায় কি সাপে কাটে তার ঠিক নেই, জল আনার পরই কাঠকুটো কুড়িয়ে নিয়ে আসে যশোদা আগান-বাগান বেঁটে। তাও উলুনটা খটখটে থাকলে হয়!—বুড়ির জল পড়ে সেই উলুনের ভেতরেও আবার এক-হাঁটু জল বেধে আছে—সে এক মহা সঙ্কট। গ্রাফা-কানি ভুবিয়ে ভুবিয়ে সেই জল তখন আবার তাকে নিড়ে ফেলতে হয় নিশ্চরী করে। ভিজ্ঞে কাঠ-পাতায় আগুন ধরে না সহজে, পোড়া উলুনের ওপর হুমড়ি খেয়ে ফুঁ পেড়ে পেড়ে বুক ফেটে ফিক-ব্যথা ধরে যায় যশোদার। তাও উলুনের পাড়ে একনাগাড়ি বেশীক্ষণ বসে থাকা যায় না। ভিজ্ঞে পাতার সাদা ঘোঁরা নাকে মুখে চুকে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেয়। উবু হয়ে তখন দশ বারোটা লম্বা লম্বা ফুঁ একনাগাড়ি দিয়ে যশোদা এক ছুটে গিয়ে কাঁকায় দাঁড়ায়। ভিজ্ঞে পাতার ভারী ঘোঁরা, দম যেন একেবারে বন্ধ হয়ে আসে যশোদার।

এই ঘোঁরার গন্ধের একটা সুবাস যশোদা আজও ভুলতে পারে না। সাঁজাল দেওয়ার মত কেমন যেন একটা বোটিকা গন্ধ স্মৃতি-স্মৃতির মতই ঘুর-ঘুর করে তার মনে। যশোদার মনে পড়ে, পদ্মার বুক জাগান দিয়ে ওঠা ছেড়ে-আসা গ্রাম সেই চরখানাপুর, ধান-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হারিয়ে যাওয়া সেই উড়াল দেওয়া আল-পথ—খেটে-খাওয়া অভাবী মানুষের প্রাণের রাজপথ; ঢেঁকিশালের ওপর লতিয়ে ওঠা কুমড়া গাছের ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে কালো ভোমরার সেই ঘুরে-ঘুরে আসা। স্মৃতি-পুঁথির পাতায় সব কথাগুলো এখনও সোনার জলে লেখা আছে যশোদার।

সাদা ঘোঁরার কুণ্ডলী অন্ধকার আকাশে রাতের আমগাছের মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে উধাও হয়ে গেছে মেঘলোকে। যশোদার মনেরও ঠিকানা নেই। সে যেন এখন সেই চরখানাপুরের গায়ের

**টোল কোম্পানীর**






**বরানগর, কলিকাতা**

**দাদ ও কাউরের**  
মোর্থ মলম

**কিউটা-টোল**  
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

**নিম্ন মলম**  
থোস পাঁচড়া ও চুলকানীর জন্য

ভিটেয় চূপ কবে একলা ঝাঁড়িয়ে বর্ষণক্ষান্ত শব্দেব আকাশে পূব-পশ্চিম আড়াআড়ি সাতরঙা এক রামধনু দেখছে।

একটা মেয়েব একলা চিন্তা ভাল লাগে না লক্ষণের। দায় যা সে তো আপনা থেকেই মনে মনে কাঁধে তুলে নিয়েছে পোটোর মেয়ের; তার আবার অত ভাবনা কিসের যশোদার!

মেয়েমানুষ গভীর হয়ে থাকলে বোধ কবি পুরুষকাব খর্ব হয় মরনের! লক্ষণ বলে, ভাবনা আর চিন্তে, চিন্তে আর ভাবনা! অত ভাবনে হলি কি আব ভাঁত বাঁধা যায়! কাব্যি চলে।

লক্ষণের কথায় সন্ধি ফিরে আসে যশোদার। এক ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েই নিবস্ত উলুনে ফুঁ দিতে থাকে জোবে জোবে। আগুনের আঁচে মুখ রাঙা করে বলে, রাঁধতি জানলে সে-ও হয় এক কাব্যি; ভাবনে হলাম গো কি হলো?

যশোদার মুখেব কথা শুনে খুশী হয়ে ওঠে লক্ষণ। এগিয়ে গিয়ে বলে, ঐ হয়, ফ্যান-ভাতের কাঁদা, তাও বাত তেঁতুলটার সময়!

--আমাবে শোনোচ্ছ?

--হ্যাঁ, তো আর কাণে!

--বুঝি নে।...অসুবিধেব সব কথাগুলোই যে আমাবে শুনতি হবে সেটাই বা কি রকম?

--বেঠিকটাট বা কি দেখাচ্ছিস তুই! সামনে থাকিস, ঘূবে ঘূবে বেড়াব কাজে-কস্মে, এখন দবকারেব সময় অসুবিধেব কথাগুলো কি আমি ও-পাড়ার মানসিব কাছে বলতি যাবে?

--সে এখন তুমি বোঝ গে।

--মানে?

--মানে, আমিই বা ও-পাড়ার না হয়ে ও-পাড়ার হলাম কবে থেকে?

--যবে থেকে আসে তোব হিসেবে।

--আমার হিসেব ভাসার হিসেব; আজও ভেসিছি কালও ভেসিছি। তার মধ্য ও-পাড়া ও-পাড়া নেই। ভেসে এসিছি আবার ভেসে চলে যাবো।

--দিলি তো!

--ও, খুব যে দবদ দেখি! এটু আগেই না তাব হাতেনাতে প্রমাণ দেখলাম!...মক্ষরা করে কথা বলতি লজ্জা করে না?

--লজ্জা সে তো মেয়েমানুষির অঙ্গের ভূষণ। বেটাছেলের কি লজ্জা মানায়?

--না, বেটাছেলের হতি হয় শেমগোব; মেয়েমানুষির গালেব ওপর ঠাস-ঠাস করে চড়াতি হয় তাবো।...আবার কথা বলে!

অভিমানে বুকের ভেতবটা থেকে থেকে মুষড়ে ওঠে; দমকা শ্বাস টেনে টেনে ফুলে ফুলে কাঁদে চূপ করে। উলুনের আঁচে তেলা-তেলা রাঙা মুখখানা বিলিক মেয়ে ওঠে ঝঙ্কারে।

লক্ষণ কি বলবে ভেবে পায় না। সমস্ত বক্তব্য যেন কঠিন হয়ে তার গলার মাঝখানে এইমাত্র আটকে গেল। ঢোক গিলতে গিয়েও দম পায় না লক্ষণ। চোখ হুঁতো কর-কর করে ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। হুঁতো চোখ জুড়ে শুধু পাঁচ-পাচটা আঙুল একটা মেয়ের মতন গালের ওপর জানোয়ারের খাবার স্বাক্ষর নিয়ে খব-খব করে কাঁপে। অন্তর্দ্বারিতে কালো হয়ে যায় তার মুখটা। সে কি মানুষ ছিল না!

যশোদা আর কোন উচ্চবাচ্য করে না। কথা তার ফুরিয়ে গেছে।

লক্ষণের কিন্তু অনেক কথা কঠিনালীতে ভিড় করে আসে হুড়মুড় করে। স্তম্ভ কামনার শপথগুলো সারি দিয়ে ঝাঁড়ায় বুকের ভেতরটায়; আর সে কোন দিন যশোদাকে মারবে না, বকবে না, শুধু ভালবেসে ভাল করে দেবে তার সমস্ত ক্ষতিচিহ্ন।

ক্রত পায়ে এগিয়ে গিয়ে লক্ষণ খপ কবে একখানা হাত চেপে ধবে যশোদাব। মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,—কি বুঝিস! আমি তোরে মেরেচি!

লক্ষণ হয়তো জানে না গনুগনে উলুনের আগুন জল ঢেলে নিবোতে নেই। পোটোর মেয়ের নরম হাতে আচমকা বিদ্যুৎএর ইন্দ্রজাল খেলে: ছেড়ে দাও! থাঙ্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে লক্ষণ। যশোদা এক নিশ্বাসে বলে যায় কথা, গালে চড় মেয়ে আবার সোহাগ কাড়তে এয়েছে! বদমাইস ছেলে!...বাত কবে হাত ধরতি তোর লজ্জা কবে না পবের মেয়ের!...

ধূলো ঝেড়ে এগিয়ে যায় লক্ষণ যশোদার দিকে। বলে, এটুও না। এটুও লজ্জা কবে না আমার পবের মেয়ের হাত ধরতি। শোন!

এবাবও ছুটে পালাতে যাচ্ছিল যশোদা। কিন্তু লক্ষণের পাঙ্কা এবাব বজ্রমুঠ। হাত কাঁপছে না, মন টলছে না; হুঁহাতে জাপটে ধরে যশোদাব মুখখানা আয়নার মত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে লক্ষণ।

পদ্মার ঢেউ বুক ভাঙে যশোদার।

--কেন!

--কেন না!

হাসতে গিয়ে বেঁদে ফেলে যশোদা। চোপের জল তো না, মুস্তাফল; গণ্ড বেয়ে পিছনে পড়ে যশোদার। অক্ষুটে বলে, কদমখালিব কারিগর তোমরা, খাট-পালংএব স্বপন দেখ, —তোমার ওখ কানী বুড়ী সেই পালংএ পাটরাগী এনে বসাবে।—মিথ্যে আমারে জড়াও কেন?

কান্না আর ঘামে-ভেজা তেলটিটে গালের ওপর লক্ষণ নিজের মুণ্ডটা চেপ ধরে বলে, ছুতোবের ঘরে পোটোর মেয়ে, সেই তো হলো রাজ্যঘাটক;...আব পালংএ শুলিই যদি পাটরাগী হয়তো একখান পালঙ্ক নয় বানিয়েই নেব দিনক্ষণ মত!

কথা তো না যেন গান শুনছে যশোদা চোখ বুঁজে। লক্ষণ বলে যায়, য্যাও দিন দিন না; আরও দিন আসবে।...তখন দেখবি এই সব দিনির কথা আর মনেও থাকবে না।...সেও দিন অবিশ্যি এমনি আসবে না, আনতি হবে হাতে হাতে—খাটতি হবে অবজ্জল...বুঝি!

লক্ষণ আর কোন উত্তর পায় না। পোটোর মেয়ে যশোদা ছুতোবের ছেলে লক্ষণের ঘরে খড়-কুটো ধূলো-মাটির পালঙ্কেই সেদিনকার মত ঘুমিয়ে পড়ে!

একটু পরেই মিষ্টি একটা স্বপ্নাগ পেয়ে চমকে জেগে ওঠে যশোদা। দেখে হাড়ি উথলে ফ্যান পড়ে নিবে যাচ্ছে উলুনে। আর ফুটন্ত ভাতের সোঁদা গন্ধে ম' ম' করছে চার দিক।

# ত্রুটিক বসন্তী..

রূপচর্চার রীতি-নীতি বদলায় যুগে যুগে... নতুন এসে করে  
পুরাতনের স্থান অধিকার। কিন্তু নারী—চিরন্তনী নারী—  
সে তার কেশসম্পদের নিরাপত্তা-রক্ষার নিজের যথো  
যোগে রয়েছে চিরদিন.....কেনই যে তার অটুট  
রূপ। দে-রূপ সাধনার এ-যুগের সর্বগুণাবিত আদিক  
অবাকুস্ম।



সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ, আবাকুস্ম হাউস, কলিকাতা।  
GKU-BI/CPS

# শাভালপুরী

প্রেমচন্দ্র অবলম্বনে

১

‘ভক্তমাল’ পড়তে পড়তে কখন চোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে।

ভক্তমালে কত মহাত্মার কাহিনী। তাঁদের কাছে ভগবৎ-প্রেমই সব কিছু, ভগবৎপ্রেমই তাঁরা ময়। এ ধরনের গভীর ভক্তি কেবল কঠোর তপস্বীতাই লাভ করা যায়। আমি কি পারি না এমন তপস্বী কোবতে? এ সংসারে আমার আব আছে কি? গয়না? লোকের ভাল লাগতে পারে কিন্তু আমার চোখে জ্বালা ধরে। ধন-দৌলত? যাব প্রিয় তাব থাক! আমার ত ধন-দৌলতের নামে গায়ে জ্বব আসে।

পাগলী স্ত্রীলা! কত উচ্ছ্বাসই না কাল আমাকে সাজিয়েছিল, কত অমুরাগেই না আমার কালো চুলের ভিতর ফুল দিয়েছিল গুঞ্জে। বারণ করলাম কত! মানা শুনল না স্ত্রীলা! যা ভয় কোরেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই তোলে। দু’জনে যত হাসি হেসেছিলাম তাব চেয়ে বেশী কোবেই কাঁদতে হোল। স্ত্রীর সাজসজ্জা দেখে স্বামী আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে, সংসারে এ ধরনের স্ত্রী বোধ হয় বেশী নেই। শুনলাম, ‘তুমি আমার পরলোকটি নষ্ট কোরবে, আর কিছু নয়। তোমার চালচলন হাবভাব সে কথাই বলছে।’ স্বামীর কাছ থেকে এ কথা শুনে কোন্ নারী না বিষ খেতে চায়? ভগবান! সংসারে এমন লোকও আছে?

অবশেষে নীচে এসে ভক্তমাল পড়তে শুরু কোবলাম। পড়তে পড়তে মনে হ’ল আব কিছু না। এবাব বুদ্ধাবনকুঞ্জপিতারীর চরণ-সেবাস্তেই বাকী দিনখলি দেব কাটিয়ে, তাঁকেই দেখাব আমার বেশ-বাস। তিনি ত আর বিরক্ত হবেন না? আমার মনের কথা ত আর তাঁর অগোচরে নেই?

২

ভগবান! নিজের মনকে বোঝাব কি কোরে? তুমি ত অন্তর্ধর্মী! আমার মনের আনাচে-কানাচের সকল খবরই তো তোমার জানা! ভাবি একবার, স্বামীকে মনে কোরব ইষ্টদেবতা, তাঁর চরণে সেবা কোরব, তাঁর কথা মতই চলা-ফেরা কোবব। তাঁর কোনও কথায়, কোনও ব্যবহারে স্বল্পমাত্র দুঃখ হবে না। তাঁর ত কোন দোষ নেই! কপালে যা ছিল তাই হয়েছে! এর জন্তে তাঁরই বা কি অপরাধ, আমার মা-বাবারই বা কি অপরাধ? অপরাধ আমার পোড়া কপালের! কিন্তু যখনই স্বামীকে আসতে দেখি আমার মনের উন্মাদ কোথায় যেন উড়ে যায়, মুখের উপর মৃত্যুকালিমা যেন বিস্তারিত হয়ে যায়, মাথা ভারী হয়ে আসে। তাঁর চেহারাও দেখতে ইচ্ছে করে না, সামান্য কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কোনও শব্দকে দেখেও বোধ হয় কান্নার এত ক্লাস্তি বোধ হয় না। স্বামীর আসাব সময় বুকে যেন হাতুড়ি পিটিতে থাকে। দু’এক দিনের জন্তেও স্বামী যদি বিদেশে যান, আমার মনের ওপরকার ভারী বোঝাটা বাহুমন্ত্রণে কোথায় যেন চলে যায়। আবার হাসতে থাকি, গল্প-গুজব করতে থাকি। জীবনে

আবার রং ধরে।...আবার তাঁর ফিরে আসার খবর পেলেই চারি দিক অন্ধকার বলে মনে হয়।

মনের অবস্থা কেন যে এমন হয় জানি না! বোধ হয় আমাদের দু’জনের মধ্যে পূর্বজন্মে শত্রুতা ছিল। সে শত্রুতার শোধ নেবাব জন্তেই তিনি আমাকে বিয়ে করেছেন, আর আমার মনেও ভ্রাতৃত্ববোধ সেই পুরোনো ভাব গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছে। নইলে, তাঁকে দেখলেই আমার শরীর রী-রী করে ওঠে কেন? আমাকে দেখলেই বা তাঁর গায়েব জ্বালা শুরু হয় কেন? বিয়ের ইচ্ছাটা না তোলেই হোত! বাপের বাড়ীতে আমি এর চাইতে অনেক সুখেই ছিলাম, এবং বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থাকতেও পারতাম। কিন্তু তা হোলো কই? বিয়ে! যে সমাজ-ব্যবস্থা অভাগিনী কন্যাকে কোনও না কোনও পুরুষের গলায় গাঁথে দেওয়া অনিবার্য মনে করে, সে সমাজ-ব্যবস্থাব সর্বনাশ হোক। এই সমাজ-প্রথার নামে কত নারীর চোখে জল আসে! কত আশায় ভরা কোমল হৃদয় এই প্রথার চরণতলে নিম্নেপিত।

স্বামী! নারীর কত কল্পনার ধন! ‘স্বামী’ কথাটি শুনলেই চোপের সামনে ভেসে আসে, পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের, পুরুষ-শ্রেষ্ঠের, সুরূপ মানুষের সজীব মূর্তি। কিন্তু আমার কাছে এই দু’টি অক্ষর কি বাণী বহন কবে আনে—হৃদয়ের শূল, দেহের কাঁটা, চোখের জ্বালা, মর্মভেদী ব্যঙ্গবাণ।

স্ত্রীলা সব সময় হাসিমুখী! দারিদ্র্যের প্রতি তার কোনও অনুরোধ নেই। তার গয়না নেই, কাপড় নেই। সামান্য একটি ভাড়ার বাড়ী। ঘরের সকল কাজ সে নিজে হাতেই করে। কিন্তু কোনও দিন তাকে কাঁদতে দেখিনি। আমার যদি হাত থাকত তাহ’লে আমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে তার দারিদ্র্য বদলে নিতাম। হাসতে হাসতে তার স্বামীকে ঘরে আসতে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলার দরিদ্র জীবনের মন্দ জ্বালা বাহুমন্ত্রণে কোথায় চলে যায়। আনন্দে তার বুক ফুলে ওঠে। সে প্রেমালিঙ্গনে কত আনন্দ! কত সুখ! ত্রিলোকের সকল ঐশ্বর্য বিলিয়ে দিতে পারি সে সুখের জন্ত।

৩

আজ নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

শুধালাম : আমাকে তুমি বিয়ে কোবেছিলে কেন?

এই প্রশ্ন দীর্ঘ দিন আমার মনে জেগেছে। এত দিন কোনও রকমে জোর কোরে চেপে এসেছি। আজকে পেয়ালা উছলে উঠল।

প্রশ্ন শুনে তিনি হতবুদ্ধির মত হোয়ে গেলেন, পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন : ঘর আগলাতে! ঘরের ভাব ছেড়ে দিতে। নয়ত কি? ভোগ-বিলাসের জন্তে। গৃহিণী না হলে ঘর হানাবাড়ী বলে মনে হয়। চাকর-বাকর ঘরের সম্পত্তি ফাঁক করে দিত। যেখানে জিনিষ পড়ে থাকত সেখানেই পড়ে থাকত, কেউ তার দেখবার লোক ছিল না।

বুঝতে পারলাম আমাকে আনা হয়েছে ঘরের চৌকি দেবার জন্তে। আমাকে সম্পত্তি রক্ষা কোরতে হবে আর ভাবতে হবে ধন আমার ভাগ্য, এ সকল আমারই। সম্পত্তিই হোলো স্বামীর কাছে মুখ্য, আমি কেবল চৌকিদারণী। এ ঘরে আজই আগুন লাগুক। এত দিন ত এ সব না জেনেই ঘরের কাজ করে এসেছি।

হয়ত স্বামী যা চাইতেন ততখানি করতে পারিনি কিন্তু আমাব বুদ্ধি অমুসারে নিশ্চয়ই করেছে।

কিন্তু আজ থেকে আর কোনও জিনিষ ছোঁব না, এই দিবি করছি। অবশ্য ঘরের চৌকি দেবার জন্তেই পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে আনে না, এ কথা আমার জানা এবং স্বামী আমার বাগ কোরেই এ কথা বলেছেন। তবু স্ত্রীলার কথাই ঠিক বলে মনে হয়। খাঁচায় পাখী না দেখলে খাঁচা যেমন কাঁকা-কাঁকা ঠেকে, সে বকম ঘরে স্ত্রী না থাকলে আমার স্বামীর কাছে ঘর কাঁকা-কাঁকা ঠেকত। সেই জন্তই তাঁর বিয়ে! স্ত্রীলোকের এই বরাত!

৪

আমাব ওপর এত সন্দেহ কেন তাঁব?

যেদিন থেকে আমাব কপাল এখানে আমাকে টেনে এনেছে সেদিন থেকে বরাবর তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখেছি। কিন্তু কেন? একটু চুল বেঁধে বসে থাকলেই বা তাঁর এত টোটো কামড়ান কেন? কোথাও যাওয়া-আসা কবি না, কাকর সাথে কথাও বলি না, 'তবু এত সন্দেহ কেন? এ অপমান অসহ্য। আমার আবহ কি আমার নিজের কাছে প্রিয় নয়? আমাকে এত ছোট কোবে ভাবেন কেন? আমার ওপর সন্দেহ কোরতে তাঁব লজ্জাও করে না? যে লোক কানা সে কাউকে হাসতে দেখলেই ভাবে তাকে নিয়েই সবাই হাসাহাসি কোরছে। বোধ হয় এঁব মনেও এই ধরনের ভুল ধারণা জোয়ে গিয়েছে যে আমি তাঁকে ব্যঙ্গ করছি। নিজের অধিকারের বাইরে কাজ কবাব ফলে বোধ হয় আমার মনেও এই ধরনের প্রবৃত্তি জেগে যায়। ভিক্ষুক বাস্তবহাসনে শাস্তিতে ঘৃণাতে পারে না। চারি দিকে সে দেখে শত্রু আব শত্রু। মনে হয় সকল বুড়ো বদেরই বৃষ্টি একই অবস্থা।

স্ত্রীলার কথায় চলেছিলাম দেবদর্শনে। সবাই জানে যে মলিন বেশে রাস্তায় বেরোন মানে নিজেকে হাসির পাত্র করা। হঠাৎ কোথা থেকে সে সময় স্বামী আবির্ভূত হোলেন। তিরস্কারপূর্ণ চোখে আমাকে দেখে তিনি বললেন, এত সজ্জা কোরে কোথায়?

বললাম : একটু ঠাকুর দেখতে চলেছি।

কথাটি শোনা হতে না হতেই রাগত ভাবে বললেন : তোমাব যাবার কোনও দরকার নেই। যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করে না, দেবদর্শনে তার পুণ্য না হয়ে পাপ হয়। আমার কাছ থেকে উড়তে চলেছে? মেয়েছেলেকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

অবর্ণনীয় ক্রোধ আমাব চিন্তকে অধিকার কোরল। তৎক্ষণাৎ কাপড় বদলে ফেললাম আমি। পণ করলাম দেবদর্শনে আর কোনও দিন যাব না। এ সন্দেহের কি কোনও কালে শেষ নেই? ও-কথার জবাব ছিল সেই মুহূর্তে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান, আর দেখা স্বামী কি কোরতে পারেন? কিন্তু কি জানি কেন চেপে গেলাম।

আমি উদাস আর বিমনা হোয়ে থাকলে তাঁর আশ্চর্য লাগে। মনে ভাবেন আমি অকৃতজ্ঞ। তাঁর বিচারে তিনি আমাকে বিয়ে কোরে বোধ হয় খুব কৃতার্থ করেছেন। এত সম্পত্তি, এত ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে আমার তাঁর প্রতি বিশ্বাস না হওয়াই উচিত ছিল, অষ্টপ্রহর তাঁর যশোগান কবাই উচিত ছিল। এসব কিছু না কোরে আমি উন্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকি। কখনও কখনও বেচারার ওপর দয়াও হয়। এ কথা তাঁর জানা নেই যে, নারী-জীবনে

এমন কিছু আছে, যা হাবালে নারীর কাছে স্বর্গও নরকতুল্য হয়ে যায়।

৫

তিন দিন হল স্বামীর অস্থগ কোরছে।

ডাক্তার বলছে জীবনের কোনও আশা নেই, নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছে। আমার কিন্তু তাতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এত নিষ্ঠুর আমি আগে ছিলাম না। কি জানি এখন আমার সে কোমলতা কোথায় চলে গিয়েছে। রোগীকে চোখা দেখে আমার মন আগে কত করুণায় ব্যাকুল হয়ে যেত। কাকুর কান্না আমি সহিতে পারতাম না। সেই আমিই আজ তিন দিন ধরে আমার পাশের কামবাত্তে আমার স্বামীর কাতবানি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু চোখের জল ফেলা ত দূর্বব কথা, একবারও দেখতে যাই না। ভাবি, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি? লোকে আমাকে পিশাচিনী বলে বলুক, বলুক কুলটা! কিন্তু এ কথা বলতে আমাব লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর অস্থগ দেখে আমার এক ধরনের ঈর্ষাময় আনন্দ বোধ হচ্ছে। আমাকে তিনি কারাবাস দিয়ে বেখেছেন। 'পবিত্র বিবাহ', এ নামে আমি একে অভিহিত করতে চাই না। কারাবাস ছাড়া এ আব কি? এতখানি উদাস আমি নই যে, যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে তাকে আমি পূজা কোবব, আমাকে যে লাখি মারে তার চরণ চুষন কোবব। মনে হল, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পাপের শাস্তি দিচ্ছেন। একথা বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কাকুর গলাতে কোনও মেয়েকে জোর করে ঝুলিয়ে দিলেই কি সে তাঁব স্ত্রী হয়ে যায়? সেই মিলনই ত সত্যিকার বিবাহ যখন অস্তিত্ব : একবারও চিন্তে প্রেম জাগে। শুনতে পাচ্ছি স্বামী তাঁর কামরায় পড়ে পড়ে আমাকে গালমন্দ কোরছেন। রোগের সমস্ত বিষ আমার ওপর ঢেলে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার তাতে ব্যেই গেল! যার খুসি সে তাঁর সম্পত্তি নিক, ঐশ্বর্য নিক, আমার এ সবের কোনও প্রয়োজন নেই।

৬

আজ তিন মাস আমি বিধবা, অস্তিত্ব লোকে তাই বলে। যাব যা খুসী তাই বলুক, আমি নিজেকে অস্ত বকম ভাবি। চূড়ি আমি খুলে ফেলিনি, কেনই বা ফেলব? মাঁথিতে সিঁদূব আগেও দিইনি, এখনও দিই না। বুড়ো বাপেব সকল কাজ তাঁর সুপুত্রেব হাতেই হোল। আমি কাছেও যাইনি। যবে আমাকে নিয়ে নানা আলোচনা চলেছে। কেউ আমার মাথাব খোঁপা দেখে নাক সেঁটকায়, কেউ আমাব গয়না দেখে চোখ মটকায়। আমাব কিন্তু কোন চিন্তাই নেই। তাদের জালিয়ে দিতে বং-বেংয়েব শাড়ী পরি, আরও সাজগোছ করি। আমার সামান্য হুংখও নেই। আমি তো কারার বাইবে এসেছি।

ক'দিন হোল স্ত্রীলার ঘরে গিয়েছিলাম। ছোট বব। কোনও ঘর সাজাবার জিনিষ নেই, চৌকি পয়ান্ত নেই। স্ত্রীলা কিন্তু কত আনন্দে রয়েছে। তার আনন্দ দেখে আমাব মনেও নানা বকম ইচ্ছা জেগে ওঠে। সে কল্পনাকে কুংসিত কেন বলব? আমার মন ত তাকে কুংসিত বলে না। জীবনে তার কত বং? চোখ দু'টি তার হাসছে, চোটেব ওপর চাপা হাসির খেলা চলেছে, মনের মধ্যে বয়ে চলেছে অমুসারের সুধাপ্রোত। এ আনন্দ কণিক হোসেও জীবনকে সফল করে দেয়। সে কথা কোনও দিন কেউ ভুলতে



পারে না। সে স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যথেষ্ট। সে মেজরাবের আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্তরে কঁপতে থাকে।

এক দিন শ্রুশীলাকে বলি : তোব স্বামী যদি বিদেশে যায়, তাহ'লে তুই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি।

গম্ভীর ভাবে শ্রুশীলা উত্তর দিল, না ভাই, মরব না। তাঁর স্মৃতি আমার মনকে আনন্দে রাখবে, যত দিন তিনি বিদেশে থাকেন না কেন?

এই প্রেমই ত আমার কাম্য। এরই জগ্গ আমার মনে এত ব্যাকুলতা। এমন স্মৃতিই আমি চাই যাব দ্বারা আমার হৃদয়ের তার বাজতে থাকবে চিরকাল, যার নেশা আমাকে আজীবন আচ্ছন্ন কোরে থাকবে।

৭

রাত কাটে কেঁদে কেঁদে। মনের মশ্যে কিসের ব্যথা? জীবনের সামনে বন্ধুর পথ। সে পথে বয়েছে অশান্তির ঘূর্ণি হাওয়া। সবুজের শ্যাম সমাপোষ কোথায়? যব আমাকে চিবিয়ে থাকছে। মন আমার বলছে, পাখীর মত কোথায় উড়ে চলে যাই। ভক্তির গ্রন্থের দিকে তাকাতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না। বেড়াতে যেতেও ভাল লাগে না। মন আমাব কি যে চায় আর কি যে চায় না নিজেই বুঝি না। আমাব যা জানা নেই আমাব প্রতি অণু-পরমাণুর কাছে কিন্তু তা জানা! নিজেব ভাবনাকে প্রকাশ কোরে চলেছি আমি। অন্তরের বেদনায় প্রতি অঙ্গের কি আর্তিনাদ! 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।'

৮

চিত্তের চঞ্চলতা আমাব সেই স্তবে এসে পৌঁছেছে, যে স্তবে মানুষের নিম্নাতে কোনও লজ্জা বা ভয় থাকে না। যে লোভী স্বার্থপর পিতামাতা আমাকে ক্রুশতে হাত-পা বেঁদে ফেলে দিয়েছে, যে পাশাণ হৃদয় আমাব সীংখিতে সিঁদূর দিয়েছে, তাদের প্রতি আমার নানা কুচিন্তা জাগতে থাকে। তাদের মুখ আমি পুড়িয়ে দেব। নিজের মুখে কালি দিয়েও তাদের মুখে কালি দেব। নিজের প্রাণ দিয়েও তাদের কাসির ব্যবস্থা কোবব। নাবীড় এখন আমাব অবলুপ্ত। জেগে উঠেছে আমার ভীষণ জ্বালা।

ঘরের সবাই গুমিয়ে। নিঃশব্দে নীচে নামলাম। দ্বার খুলে বাড়ীর বাইরে আসি। গমে ব্যাকুল হয়ে কোনও প্রাণী যেন বেরিয়ে খোলা জায়গাব দিকে চলেছে। ঘরে বন্ধ হয়ে যেন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো।

রাস্তায় নিশ্চরতা!

সারি সারি দোকান বন্ধ।

ঠাং দেখি একটি বুড়ী আসছে এদিকে। ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি। আমাব দিকে বুড়ী এগিয়ে এল। আপাদ-মস্তক দেখে বললে; কাকে খুঁজছ বাছা?

ব্যঙ্গ করে বললাম : যমকে!

: জীবনের অনেক সুখভোগই তোমার বরাতে এখনও বাকী আছে। অন্ধকার রাত শেষ হয়েছে, আকাশে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে।

হেসে বললাম : অন্ধকারেও তোমার চোখের এমন তেজ যে, আমার কপালের লেখা পড়ে ফেলচ!

: চোখ দিয়ে পড়ছি না বাছা, বুদ্ধি দিয়ে পড়ছি; পাকা মাথার বুদ্ধি। খারাপ দিন তোমার চলে গিয়েছে, আসছে ভাল দিন। হেসো না বাছা, এ কাজেই এত বছর আমার গিয়েছে। যে

এক দিন ভূরতে যাচ্ছিল সে এই বুড়ীর দৌলতেই আজ ফুলের শয্যা-ভূয়ে আছে। এক দিন যে বিষের পেয়ালার খেতে যাচ্ছিল সে আজ দুধের কুলি কবছে। আমার দ্বারা যদি কোনও অভাগিনীর উপকার হয় সেই জগ্গেই আজ এত রাত্রে বেরিয়েছি। কাকুর কাছে কিছু প্রত্যাশী নই আমি। ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা আমার ঘরেই আছে। কেবল এই আমার ইচ্ছে কি, যত দূর সম্ভব লোকের উপকার কোরব। আমি লোককে এমন মত্ত বলে দিই যার ফলে যার ধনের কামনা তাব ধন, যাব সম্ভান কামনা তার সম্ভান লাভ হয়।

আমি বলি : আমার টাকা চাই না, সম্ভান চাই না। আমার যা চাই তা তোমার দেবার ক্ষমতা নেই।

হাসল বুড়ী। বললে : বাছা, তুমি যা চাইছ তা আমার অজানা নেই। তুমি চাইছ যে জিনিষ যা সংসারের হোলেও স্বর্গীয়, যে জিনিষ দেবতার ববদানের চাইতেও আনন্দপ্রদ। চাইছ তুমি আকাশকুসুম, ভূমুখের ফুল, অমাবগার চাঁদ। কিন্তু আমার আছে সেই মন্ত্র যা অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে। প্রেমের পিয়াসী তুমি। তোমাকে আমি চড়িয়ে দিতে পারি প্রেমের-তরবারে। সেই প্রেম-তরবারী প্রেম-সাগরের প্রেম-তরঙ্গ নাচতে নাচতে তোমাকে কুলে ভিড়িয়ে দেবে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম; তোমার বাড়ী কোথায় মা?

: নিকটেই বাছা! যদি তুমি যেতে চাও তাহ'লে আদর কোরে নিয়ে যাই।

বুদ্ধাকে মনে হোলো কোনও স্বর্গের দেবী। তাঁর পিছনে পিছনে আমি চলাতে থাকলাম।

৯

হায় রে!

যে বুড়ীকে ভেবেছিলাম স্বর্গের দেবী দেখলাম সে নরকের ডাইনী। আমাব শেষ সর্কনাশ হয়ে গিয়েছে। 'অমিয় সাগবে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।' ছিলাম স্বচ্ছ প্রেমের পিপাসী, পড়েছি দুর্গন্ধ বিষাক্ত নালিতে। সে হুলভ বস্ত্র আগেও পাইনি, এখনও না। শ্রুশীলার মত আমি সুখ চেয়েছিলাম, বেগার বিকৃত বিষয়-বাসনা নয়। কিন্তু জীবন-পথে একবার ভুল করলে আর ভুল শোধরানো যায় না।

কিন্তু আমার অধঃপতন কার জগ্গ? এ দোষ আমার নয়। এ দোষ আমার মা-বাপের আর ঐ বুদ্ধের, যে আমার স্বামী হোতে চেয়েছিল। আমি এ সব লিখতাম না, কিন্তু লিখছি কেবল আমার আত্মকথা শুনে লোকের চোখ ফুটবে বলে। আবার বলি, নিজের মেয়ের জগ্গ ধন দেখো না, বিষয় দেখো না, বংশ দেখো না, দেখো কেবল সুপাত্র। উপযুক্ত পাত্রের হাতে যদি মেয়েকে তুলে দিতে না পার তাহ'লে মেয়েকে কুমারী বেখে দাও, বিব দিয়ে মার, গলা টিপে দাও, কিন্তু কোনও বুড়ো বোকলের সঙ্গে তার বিয়ে দিও না। মেয়েছেলে সব কিছু সহ্য কোরতে পারে। সহ্য করতে পারে প্রবলতম দুঃখ, গভীরতম বিপদ কিন্তু সহ্য করতে পারে না যৌবনের আনন্দমত্ততার কঠোরোধ।

'আমার কথাটি ফুরালো'।

'এবারেব মত বসন্তগত জীবনে'। আর জীবনে আমার কোনও আশা নেই। তবু যে অবস্থা থেকে আমি চলে এসেছি এই জ্বলন্ত অবস্থায়, তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আর আমি চাই না।

অনুবাদক—সুখাকর চট্টোপাধ্যায়।

যাচ্ছিলাম ট্রেণে। অনেক দূরের পথ, ভিড়ও খুব, গাড়ুর মত বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় যে বাড়িবেব মধ্যে হবে, আশা ছিল না। প্রায় সকলেই নামবে আমার সঙ্গে হাওড়া ট্রেনে। ভিড় যখন চরম হয়ে গেছে,—আর নতুন লোক আসাব উপায় নেই, দরজা আগলাবাব দরকাব নেই, কেন না দরজাব সামনে বাস্-বিছানা বেখে তার ওপব লোক বসে সেটাও আগল-বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন গাড়ীশুদ্ধ লোকে কেনম ভাব হয়ে গেল। সকলে সকলের পাশের লোকের পরিচয় নিল। খবরাখবর জিজ্ঞাসা কবল এবং গভীর ভাবে সুখ-দুঃখের কথা কইতে আরম্ভ কবল। যারা খানিক আগে স্চাগ্র জায়গা নিয়ে দুঃখোদনের মত ঝগড়া করেছিল।

মারখানের মাননের বেশি ঠাসা, আমি একটা পাশের বেক্সির কোণে বসতে পেবেছিলাম। গাড়ী পূর্বে জোবে চলেছে, একেবারে শরের বড় ট্রেনে গিয়ে থামবে।

সহসা কানে এলো ‘ছেলেপিলে?’ ‘ছেলেপিলে নেই মশাই!’ ‘কি কবা হয়?’ তাব পব কানে আসে ‘কত পান?’ এ সব সমাজে পরিচয় কবাত্তে লাগে না। এবং এই সব অভব্য, অসভ্য প্রশ্নও লোকে সবল মনেই জিজ্ঞাসা কবে—আর শ্রোতাও বিবস্ত্র হয় না—সহজ ভাবেই উত্তর দেয়। তাই এ সব জায়গায় প্রথমেই পৃথিবীর আদিম প্রশ্ন ওঠে পাঞ্জ-সংগ্রহের,—তাব পর আসে সেই খাঞ্জ কাদেব জঞ্জ। কাজেই ‘কত পান’ ‘কয়টি পুত্র’ ‘কোথায় থাকেন’ ‘কান্নরই জানতে ও জানাতে সক্ষম নেই!

শুনলাম নিঃসন্তান লোকটি বলছেন, ‘পেশ আছি মশায়। যদিও বুড়ো বয়সেব কথা ভাবি। তবে পবিবাবেব মনে সুখ নেই। তাঁর জন্মেই এই কলকাতায় যাওয়া। কে এক সাধু আছেন তিনি না কি পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ কবান, যজ্ঞ সফল হয়।’

অজ্ঞ লোকটি অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা একটু চূপ করে রইলেন। তার পব বললেন, ‘ও!’

নিঃসন্তান ভদ্রলোকেব কাছাকাছি আর এক জন ছিলেন, হঠাৎ আক্রোশের সুরে বলে উঠলেন, ‘ও কামেলা আবার লোকে সাধ কবে চায়? কি করে ভানবেন যে, ছেলেই হবে আর মেয়ে হবে না, আর মেয়েও একটাই হবে—সাত বা ন’টা মেয়ে হবে না। আর বুড়ো বয়সে? এক বেটা বেটিও দেখে না মশায়। সব নিজের নিয়ে থাকে। এই আমার ছ’টা মেয়ে, তিন ছেলে। পাঁচটা মেয়েব বিয়ে দিয়েছি, দুই ছেলেরও দিয়েছি। গত বছর থেকে স্ত্রী একেবারে ‘চৌরঙ্গি’ (চতুরঙ্গ?) বাত শয্যাগত, তা এক বেটা জামাইও মেয়ে পাঠালে না। আর বৌমায়াও তাঁদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে স্বব-সংসার নিয়ে ছেলেদের কাছে। ছোট মেয়ে ছ’বেলা রাঁধে—আমার আপিস, ভায়েদেব ইস্কুলের ভাত দেয়, কগীর সেবা করে। ধকন, ওদেরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর আমরা বুড়ো-বুড়ী হ’জনেই রোগে পড়ছি। তখন?’ তিন্ত্র ভাবে চতুর্দিকের শ্রোতাদের দিকে চেয়ে আবার বললেন, ‘তখন কি করবেন? আসল কথা থাকতো টাকা, সবাই পিপড়ের মত আসতো সারি গেথে। তা ছেলেমেয়েই বলুন আর ভাইপো-ভায়েই বলুন। কিন্তু তখন আমার আপনার লোকও লাগতো না! লোক রাখতে পারতাম! লোক রাখতাম মশাই! জানেন?’

## ছে লে

জ্যোতিষ্ময়ী দেবী

নিজের সিদ্ধান্তে পবিভূষ্ট হয়ে দিখিজয়ীর মত তিনি একবার সকলের দিকে বা গাড়ীব চার পাবে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

এক জন ক্ষীণ কণ্ঠে একটু প্রতিবাদ কবতে চাইল, ‘আপনার ছেলেমেয়ে আর লোকজন তুলনা হয়? আব লোকজন যে চুরি করে খুন করে পালাবে না তাই বা কে জানে?’

দিখিজয়ী বললেন, ‘তা কবতে পাবে চুরি, কববে হয়ত খুন, কিন্তু পাছি কোথায় আপনার ছেলেমেয়ে? বলুন?’

ওদিকের এক কোণ থেকে আব এক জন বলতে চাইলেন, ‘তা’ সব জায়গায় সমান হয় না। বেশীভাগ জায়গায় ছেলেমেয়েরা সেবা-যত্ন করেই থাকে।’

তাকে থামিয়ে দিয়ে দিখিজয়ী বললেন, ‘আব অনেক সময় বে করে না সেটা দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়?’

তর্কব আড়াল থেকে কানে এলো আগেব ‘ও’ বলে নীবব প্রশ্নকর্তা তাঁব পাশের পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ কবাব জঞ্জ ইচ্ছুক লোকটিকে পূর্বানো কথায় স্তত্র ধবে বললেন, ‘আমি একটা পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ কবাব কথা জানি।’

ভদ্রলোক আবার চূপ কবলেন। তাঁব যেন খানিকটা বলার পব আব না বলা অভ্যাস। লোকে প্রশ্ন করুক, করলে বলবেন। সবাই ভাবছিলেন তিনি বলবেন। তাঁবা উৎসুক ভাবে চূপ করে রইলেন।

ছেলেমেয়েব কর্তব্য অপালনের বচসাটা তখন থেমে গেছে।

এক জন সকেঁতুহলে জিজ্ঞাসা কবলেন, ‘পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ কবে এখনও লোকে? রানায়ণেই পড়েছি দশবধ কবেছিলেন। সে তো রাজা-রাজড়ার ব্যাপাব!’

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, ‘হ্যা, কবে বৈ কি। বাস্-রাজড়ার মতই কতকটা ব্যাপাব বটে। তবে খববেও কম-বেশী তো আছে সব জিনিসের। আমি সেই পুত্রোষ্ট্রব ছেলেটিকে দেখেছি।’ আবার চূপ কবলেন। যেন মনে কি দিবা হচ্ছিল বলা উচিত কি না। কিন্তু কোথা থেকে যেন কপকথা না কথকতার গৃহ এলো ভেসে। গাড়ীশুদ্ধ সবাই চূপ করে তাঁব দিকে চেয়ে রইলো উৎসুক ভাবে।

যিনি পুত্রোষ্ট্র যজ্ঞ কবাব জঞ্জ কলকাতায় বাছেন তিনি বললেন ‘দেখেছেন? তা হলে যজ্ঞ কবলে ছেলে হয়?’

প্রথম ভদ্রলোক বললেন, ‘হ্যা, হয়েছিলো তো।’ তাঁব এ কথা মন্ডেও যেন অর্দ্ধেক বলার মত কি ধব ছিল। প্রায় সকলেরই মা হচ্ছিল, তার পব কি? ছেলে তো হয়েছিল, আব ছেলেই তো ব’ মেয়েও নয়। তবে কি? বেটে নেই? না, কি?

আর এক জন একটু অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, ‘হয়েছিল ে মানে? আছে তো? বলুন না মশাই ব্যাপাবটা শুনি।’ এক গা শ্রোতা অবহিত ও উন্মুগ্ন হয়ে ঐ লোকটির পানে চেয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক একটু চিন্তিত ভাবে পুত্রোষ্ট্রব যজ্ঞ যিনি বাছেন ঐ দিকে একবার চাইলেন। কিন্তু আর গল্পটা না বলে উপায় ছিল : বলতে আরম্ভ কবলেন :

—“সে অনেক দিনের কথা, তখন আমারি বয়স হবে ১৭।১৮ বছর। আমার দূর-সম্পর্কের পিসেমশাই ছিলেন। কাজ করতেন বন্দার কোথায়। অনেক সময় যেমন হয়, থাকতেন বিদেশে, উপায় করতেন প্রচুর, খবরও করতেন অনেক রকমে। জ্বী থাকতেন দেশে মা-বাবা কাছে। নিজে সেখানে থাকতেন ভীষ্মদেব বা শুকদেবের মতন নয়, বেশ খুসী মতই থাকতেন। মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। দু’টি মেয়ে হয়েছিল ছেলে হয়নি।

তার পর তাঁর বাবা মারা গেলেন, মা-ও কিছু দিন বাদেই গেলেন। নিজেরও বয়স পবিত্রত হয়েছে, মেয়েদের বিবাহ হয়েছে, আর জ্বীকে একলা ফেলে বাথা চলল না। তত্কালিক দেশে এলেন। সে একটা সমাবোহ যেন। বন্দার সৌখীন জিনিসে সেট পাড়ার সেকেলে বাড়ির কাচারি-বর ভাবে উঠল। ছোট ছোট কার্চের খেলনা, চমৎকার ছোট প্যাগোড়া, বুদ্ধমূর্তি কত রকমের, মোম জমানো কাপড়, চীনদেশী পর্দা, জাপানী চিক, ফুলদানি, ‘ও মণিপল্লি হু’ জপের মালা, কার্চের হালকা চমৎকার বাসন—কি যে নয়! তার সঙ্গে এলো দু’টা কুকুব, দু’টি হরিণ, একটি ময়ূব, তিনটি খাঁচা-ভরা ছোট ছোট পাখী ও বালচে রংএর কাকাভূয়া, আর একটি ছোট বাচ্চা ভাল্লুক, তখনও বড় হয়নি। তার নাম ছিল টাপু।

আর বোধ হয় অগাধ টাকা। টাকা কি বকম ভাবে অগাধ হয় তা তো বোঝবার সে বয়স নয়। পিসিমার গায়ে সোনার বোকা, চাকর-বাকর-দাসীর ভিড়, গ্রামের সকলের ও-বাড়ীতে আসা-বসাতে এখন বৃদ্ধত পারি টাকা ছিল বেশ।

মেয়ে দু’টির বিয়ে আগেই হয়ে গিয়েছিল।

বছর থানেক কেটে গেল। মেয়েবা স্বস্তববাড়ী গেছে। বাইরে পিসেমশাইএর দাবাব ও গল্পের মজলিস আর ভেতরে পিসিমার তাসের আব তোখামোদের আসর—যেন আব জমাট ঝাঁপছিল না। বিদেশী জিনিস দেখে ও দেখিয়ে পুরোনো হয়ে গেছে। সে দেশের গল্পও অনেক বাব করে বলা হয়েছে। পিসিমার গহনার জৌলুসও বোধ হয় পুরোনো হয়ে এসেছিল। কি আব-কিছু কে জানে! যেন মনের কোনোখান একটু ঝঁকা ঠেকছিল।

তার পর দেখলাম, পিসিমার বাড়ীতে গণংকাব, জ্যোতিষী সাধু-সন্ন্যাসীবা ওয়া-আসা, ভিতরে-বাইরে কথাবার্তা-আলোচনা—এত বিষয়-সম্পত্তি কে খাবে, কার ভোগে লাগবে, মেয়ে মানে তো পাখর-বাটি, মিথ্যে সম্ভান। বাপ-পিতামহর জলপিও লোপ পাবে—এই সব!

মাছলী, কঁবচে পিসিমার হাতের সোনার তারিঙ্গ, গলার হার, কোমবেব চন্দ্রহাব আবে ভাবি হয়ে উঠল। আর পিসেমশাইএর বুকের মন্তনতাতে বেথা দেখা দিতে লাগলো।

তার পর পিসিমার এক দিন রাতে আবার একটি মেয়ে হল। পিসেমশাইএর মুখ ভারি হয়ে উঠল। পিসিমার চোখ জলে ভেসে গেল। যদিও লোকেরা সকলে নানা রকম সাধুনা দিতে লাগল। তবু তাদের মাঝ থেকেই অবশেষে কে এক জন বললে, ‘ঈদ মেয়ে-নাড়ী। ছেলে হবে না। আবার বিয়ে করুন মুখুন্ডে মশাই।’

কথটা অনেকের মনঃপূত হল। ষাঁরা পিসিমার স্তম্ভ-ঐশ্বর্যে ঈর্ষাতুর ছিল তাদের—আব যারা পিসেমশাইয়ের জন্ত সত্য বংশধর চাইত তাদেরও। আবার অনেকে হুঃখিত হল। মেয়ে-আমাইল

বেশে গেল। আর পিসিমার চোখের জলে বিয়ের কথাটাও তখনকার মত ভেসে গেল।

বছর থানেক বাদে শুনলাম, এক না কি মহা তাত্ত্বিক সাধু এসেছেন পুন্ড্রি যজ্ঞ করাবেন। ছেলে হবেই মেয়ে নয়।

যজ্ঞের ফর্দ হতে লাগল—অল্পঠানের দিন দেখা, আয়োজন, যোগাড়-যজ্ঞ সব হতে লাগল। আর মোটা-মোটা হলদে পুঁথি দেখে সন্ন্যাসী ঠাকুর মন্ত্র নির্বাচন করতে লাগলেন। সব ঠিকঠাক হলে তবে সূর্য-ঘড়িতে লগ্ন দেখে (বিলম্বী ঘড়ি নয়) যজ্ঞ হবে। হোমে আহুতি দেওয়া হবে।

সন্ন্যাসী ঠাকুর বহু পুঁথি ঘেঁটে দেখে এক দিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় এসে বললেন—‘সবই ঠিক হ’য়েছে, পুত্র আপনাব হবে। দিনও খুব ভাল পাওয়া গেছে, ঋণও মাহেন্দ্র। কিন্তু একটা জিনিস প্রয়োজন হবে।

শীতকাল। পিসেমশাই বৈঠকখানার গদীর ওপর পায়ের ওপর পশ্চিমী বালাপোষ ঢেকে কাত হয়ে শুয়ে দাবা খেলছিলেন। সাধুকে দেখে উঠে বসলেন সসন্ত্রমে। সন্ন্যাসী ঠাকুর গালিচার ওপর আর একটি গালিচার আসনে বসলেন। সকলে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইল সাধুর দিকে।

পিসেমশাই বললেন, ‘কি জিনিস?’

—‘একটি জীবিত প্রাণী চাই।’

—‘কি রকম? বলি দেবার মত পশু?’

—‘হ্যাঁ, তাই অনেকটা। কিন্তু যে পশুটি উৎসর্গ করা হবে শিশু খানিকটা তার মতই আকার পেতে পারে, সেই জন্ত চতুষ্পদ বা খেচর জলচর জাতীয় জীব উৎসর্গ করা সমীচীন হবে না। শাস্ত্রে বলেছে নরাকার জীব অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা চাই।’

পুরুত ঠাকুর ছিলেন, আমার বাবাও ছিলেন ঘরে, আমার ঝুঁদের কাছেই গল্প শোনা। তাঁরা অবাক হয়ে রইলেন, নরাকার জীব কি পাওয়া যাবে! পিসেমশাইও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

পুরুত মশাই একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, ‘নরাকার অর্থাৎ দ্বিপদ জীব বলছেন?’

সন্ন্যাসী একটু হাসলেন, বললেন, ‘হ্যাঁ, এই বানর জাতীয় জীব আর কি! ভয় পাচ্ছেন কেন?’

পিসেমশাই নড়ে-চড়ে বসলেন। তার পর বললেন; ‘সেই বা কোথায় পাই?’

এইবার পুরুত ঠাকুর বললেন, ‘তার অভাব কি আছে? একটা বান্দর বা হুম্মান কিনে আনলেই হবে।’

সন্ন্যাসী আবার একটু হাসলেন, বললেন, ‘তার দরকার নেই, সেও আমার ঠিক করা হয়েছে। এখানেই আছে। শুধু আপনার ইচ্ছা হলেই সেটি নেওয়া যাবে।’

পিসেমশাই ব্যগ্র ভাবে বললেন, ‘নিশ্চয়। কোথায় আছে সেটি?’

—‘আপনার ভল্লুক-শাবকটি গ্রহণ করব। দ্বিপদও বটে, নরাকারও বটে, অপ্রাপ্তবয়স্কও বটে। একেবারে সবই শাস্ত্রানুগত পাচ্ছি।’

ভালুক-ছানাটি পিসেমশাইএর খুবই প্রিয় বা আত্মদে ছিল। সকাল-সন্ধ্যা তাকে নিয়ে তাঁর একটু খেলা করা চাই-ই।

পিসেমশাই একটু চুপ করে রইলেন, তার পর বললেন, ‘একটা না হয় কিনে আনাই কোনো জন্ত?’

সন্ন্যাসী বললেন, 'না, সে হবে না, তত সময় নেই। শুভলগ্ন—যেটি পেয়েছি, সেটি এক বছরের মধ্যে আর নেই। তাছাড়া আমি আপনার যজ্ঞটি করে দিয়েই চলে যাব কুমারিকায়। সেখানে ৮মার কাছে আমার বিশেষ পূজা আছে। যদি সেখানে আমার থাকা হয়ে যায়, আর না আসি, তবে আপনার কার্য্যোদ্ধার হওয়া শক্ত।'

পিসিমার কানে গেল। স্বামীর আবার বিয়ের ভয় তাঁর যায়নি। পুরুষরা যে ৭০ বছরেও বিয়ে করতে পারে তা তাঁর জানা ছিল। একবার যে পুরুষ মানুষ নিমবাজী হয়েছিল, বিয়েতে, তার বিয়ে করতে কতক্ষণ? সে পুরাত্নেই হোক, আর ভাষ্যার্থেই হোক। ঠাঁর স্বামীর বয়স তো মাত্র পঞ্চাশ বছর।

তিনি স্বামীর অজ্ঞ জন্তু কিনে আনার কথা কানেই তুললেন না। সন্ন্যাসী ঠাকুরের সব প্রস্তাবেরই দৃঢ় ভাবে সমর্থন করলেন। ভাষ্যক-বাছা তো কিছুই নয়,—হতাশায়, ভয়ে তিনি একটি পুণ্যস্থানের জন্তু যে কোনো জীবহত্যা করতেই রাজী হয়ে যেতেন, এমনি হয়ে উঠেছিলেন। এই মাহেন্দ্রক্ষণ, এই তিথি, এই লগ্ন আব এ তাত্ত্বিক সাধুব ক্রিয়া একটা গৃহপালিত জন্তুর জন্তু খোয়াতে রাজী নন। তাঁর নিজেরও বয়স প্রায় চল্লিশ হয়েছে যদি সাধুর ফিরে আসতে দেবী হয়, যদি না-ই আসেন? আর স্বামী যদি আবার বিবাহে সম্মতি দেন?

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই চারি দিক ঘিরে হোগলার উঁচু চাল করে বিরাট যজ্ঞ-মণ্ডপ তৈরী হল। আশে-পাশে হাজাব ব্রাহ্মণ-ভোজনের জন্তু ঘিবে জায়গা করা হল।

তিন দিন ধরে যজ্ঞ হবে। প্রথম দিন পিতৃলোককে জলপিণ্ডদান, আভ্যাদয়িক নান্দীমুগ কৃত্য। তার পরদিন অধ্বাব্যে জীবিত পশু উৎসর্গ আর হোম। শেষ দিনে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন।

ক'দিন ধরে আমরা আর বাড়ী যেতাম না। দ্বিতীয় দিনে রাত্রি বারোটা থেকে পূজা আরম্ভ হল।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে জাগিয়ে দিল। দেখি পিসেমশাই, পিসিমা আর সন্ন্যাসী-ঠাকুর তিন জনে হোমের কুণ্ডটির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন! হোমের কুণ্ডটি সাধারণ হোমকুণ্ডের মত নয়, একটা ৩০৪ হাত গভীর গর্ত।

সেই গর্তটার মধ্যে সেই ভাষ্যক-ছানাটাকে কয়েক জনে এনে নামানো হল। সে প্রথমটা নামতে চায়নি। অবশেষে মন্ত একছড়া কলা হাতে নিয়ে পিসেমশাইএর একটা হাত ধরে নামল।

গর্তের একধারে পিসেমশাই পিসিমা পাশাপাশি দু'টি আসনে বসলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সামনে বসলেন তাদের। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে নতুন নতুন ঝুড়ি-ভরা নানা রকম ফল, নৈবেদ্য, একখানা পুষ্পপাত্র-ভরা ফুল-বেলপাতা, নতুন কাপড়, আরতির পঞ্চপ্রদীপ, পাণিধাত্র থেকে কঁাসর-ঘণ্টা, একটা শিলসুজ, একটা মঙ্গল-প্রদীপ, অর্থাৎ পূজার সব রকম যোগাড়ই ছিল। তার পর পূজা আরম্ভ হল।

সন্ন্যাসী মন্ত্র বলে একটা গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে পিসেমশাইএর হাত দিয়ে ভালুকটাকে পরিষে দিলেন। তার পর একটা একটা করে ফল মিশ্রিত গর্তের মাঝে তার হাতে দেওয়া হ'তে লাগল। নতুন কাপড়খানাও তার হাতে পিসেমশাই দিলেন। শেষ কালে

কানাইলালদ্বৈতের  
সোমরাজ

কবিরাজী কেশতৈল  
দ্বাখার যোগের দ্ব্যর্থ  
দ্রুগন্ধে অম্বশ্রেষ্ঠ

খবরমূল্য :-

\* তিল তৈল \* কদম্বার তৈল  
\* কদম্বারাইডিন

\* সোমরাজ বীজ  
\* দ্ব্যর্থদ্ব্যর্থ  
\* বস্ত্র ও শ্বেত চন্দন  
\* ব্রাহ্মী \* ব্রাহ্মী

\* দ্ব্যর্থ (কদম্বী) \* চন্দন তৈল  
\* বেল তৈল \* চন্দন তৈল  
\* বস্ত্র ও শ্বেত চন্দন  
\* ইত্যাদি বিখ্যাত সেন্ট

উপকারীতা :-

\* দ্বাখার যোগে  
\* চুল ওঠা বন্ধ করিতে  
\* চুল বাড়াইতে  
\* অনিদ্রা, নিতদ্রুমে  
'সোমরাজ কেশতৈল'  
\* অম্বশ্রেষ্ঠ \*

তার মাথায় একটি শ্রুণীপ জ্বলে দিয়ে কি একটা বলে সন্ন্যাসী ঠাকুর কাকে যেন ইসারা করলেন।

আর দেখি ঝড়ি লুই কবে মাটি নিয়ে নিয়ে প্রায় দশ-বাঁবে জন সেই গর্তায় ফেলতে লাগল। ভালুকটা এতক্ষণ কি করছিল, ফলগুলো খাচ্ছিল কি না অত লক্ষ্য করিনি। এখন সে গাঁক-গাঁক করে চিংকার করে লাফিয়ে ওঠাবাদ চেষ্টা করল, কিন্তু ঝড়ির পর ঝড়ি মাটি পড়ে সে দেখতেই না পাক, বা চাপাই পড়ুক আমরা আর দেখতে পেলাম না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গর্তটা ভরে গেল। পিসেমশাই আসনে বসে, তাঁর কপালে বিন-বিন কবে নাম ফুটে উঠেছে। যে হাতে ভালুকটির হাত ধরেছিলেন সেটা মাটিতে মাথা। এলোমেলো ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল কবে সেই গর্তটির দিকে তাকিয়ে তিনি বসেছিলেন। কোনো দিকে চাইছিলেন না।

ইতিমধ্যে ঐ জায়গাটায় হোমের জন্ম যজ্ঞভূমিরেব কাঠ সাজানো হতে লাগল। হঠাৎ আমাদের মনে হল মাটিটা নড়ে উঠল। কাঠগুলো চাবি দিকে ডুবিয়া গেল, না, কি যেন হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তখন কাঠ আবার ঠিক করে দিয়ে আগুন জ্বলে দেওয়া হল।

পিসেমশাই কি রকম ভাবে একবার চাবি দিকে চাইলেন, যেন কি বলতে চাইলেন, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

তাঁর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। লোকে বললে, সে জল হোমের কাঠের দোয়ার জন্ম।

আগুন ফালাব পবও হোমের কাঠ আবার নড়ে গেল ছ'-একবার আমাদের মনে হল।

‘ও স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য’ বলে আর মন্ত্র বলে বলে সেই স্তম্ভ-কবা বেলপাতা ফুল অর্ঘ্য মাটির মালসা-ভরা গাওয়া ঘিয়ে ডুবিয়ে হোম স্নক হয়ে গেল। কত হাজার তা’ আমি ঠিক জানি না—এক হাজার আট বোপ হয়। বারিও শেষ হল হোমও শেষ হল!

লাল চেলী-পবা সাধু লাল চেলী-পবা পিসেমশাই আর পিসীমাকে নিয়ে হোমকুণ্ড প্রদক্ষিণ কবিয়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে, শান্তিজন দিয়ে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তার পর দিন শুনলাম, পিসেমশাই-এর খুব শরীর খাবাপ,

লোক-জন খাওয়ানোতে এসে দাঁড়াতে পারবেন না। কিন্তু ব্রাহ্ম ভোজনের সময় দেখলাম এসেছেন মালা-চন্দন, দক্ষিণার ব্যবস্থা করতে। বস্ত্র চূপ করলেন।

ট্রেন-ভর্তি ঠেসাঠেসি শ্রোতার নির্বাক হয়ে গল্প শুনছিল।

কাছের এক জন বললেন, ‘তার পর?’

‘তার পর পিসে মশাইকে আর আমরা বড় একটা বাইরে দেখতে পেতাম না। জন্মের দিকেও নয়, বাগানেও নয়, যে দিকে যজ্ঞ হয়েছিল সেদিকেও নয়। লোকেবা বলাবলি করত, আঁহা, পোখা জীব, লোকটার মনে কষ্ট হয়েছে।

আমি তো তার পর পড়া-শোনার জন্ম কলকাতায় চলে গেলাম। পরে শুনেছিলাম একটি ছেলে হয়েছে।’

সমবেত ভাবে সকলে বললে, ‘ছেলে হয়েছে তা হ’লে? আছে তো?’

বস্ত্র ঘাড় নেড়ে বললেন ‘হ্যাঁ, আছে।’

পাশের পুন্ড্রিট ইচ্ছুক লোকটি বললেন ‘তবে কি?’

বস্ত্র বললেন, ‘এই এইবার গ্রামে গিয়েছিলাম এত দিন পরে প্রায় ১৬ বছর পরে। পিসিমা’র বাড়ী গেলাম দেখা করতে। পিসেমশাই নেই। পিসিমা আছেন, বৃদ্ধা হয়েছেন। বসতে বললেন, জল খেতে দিলেন। পিসেমশাই-এর কথাও বলে দুঃখ করলেন। বাড়ীতে এক বাড়ী নাতি-নাতনী মেয়ে-জামাই সব। এমন সময় একটি চোদ্দ-পনের বছরের ছেলে একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে হাতে কবে ধরে সামনে এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমার ছেলে কোথায়?’ কত বড় হ’ল?’ পিসিমা বললেন—‘এই তো ছেলে বে’। পিসিমা তাকে কাপড় পরিয়ে দিতে লাগলেন। অর্থাৎ হয়ে দেখলাম ছেলেটিকে। মাথাটি লম্বা মতন, হাতগুলো একটু বেশী লম্বা যেন, হাতে-পায়েও একটু বেশী লোম। চোখের দৃষ্টি দুর্ব্বলত্বের মত। কথা অস্পষ্ট বলে। জিভটা খালি মুখের এপাশে-ওপাশে নাড়ে। মাঝেবে মতই সব, অথচ যেন কি একটু অল্প বকম। অবশ্য তখন আমাদের ভ্রম সেটা। পিসেমশাই ওকে সাত-আট বছর দেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মেয়ে-জামাইদেরই আবার এমন বাগলেন ওঁদের দেখবার জন্ম। গায়েব লোকে কেউ কেউ বললে, তিনি না কি ছেলে হওয়ার আগে কয়েক বাব ভালুকটিকে স্বপ্ন দেখেছিলেন।’

### প্রতিভাময় আয়ারল্যান্ড

যখন দেখবেন সুসাহিত্য বচিত হয়েছে ইংরেজীতে তখন বুঝবেন যে, ঐ সাহিত্যের রচনাকার কোন আয়ারল্যান্ডবাসী। ইংবেজীতে লিখলে যে ইংরেজে লেখে না, কেউ কেউ হয়তো জানেন না। আয়ারল্যান্ডবাসী লেখে, কিন্তু নাম হয় ইংবেজী সাহিত্যের। ইংবেজীতে অল্পশ গ্রন্থ আছে, সমগ্র বিশ্বে পবিচিত যুগ যুগ থেকে,—লিখেছেন আয়ারল্যান্ডবাসী। থরন জর্জ বার্বার্ড শয়ের নাম। শকে বার দিয়ে অগ্নিগা বাঁধা ছিলেন তাঁদের মধ্যে জোনাথন সুইফট, ঠার্ন, গোল্ডস্মিথ, উইলিয়াম ব্লেক, রিচার্ড

টিল, ম্যারিয়া এগওয়ার্থ, চার্লস ট্রোফিট, আরব্য রজনীর অনুবাদক রিচার্ড বাটিন, রুবাইয়াতের অনুবাদক এডওয়ার্ড ফিটজারাল্ড, উইলিয়াম কনগ্রিভ, ফাবকুয়ার, সেবিড্যান, উইলিয়াম লেকি, ব্রাইস, টিনডল এবং অস্কাব ওয়াইল্ড। উক্ত নামধারীদের মধ্যে কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ নাট্যকার, কেউ ঐতিহাসিক, কেউ কবি। বিগত যুগ ছেড়ে আসা যাক কিছু দূর এগিয়ে। ইয়েটস, জর্জ মুর, জেমস জয়েস, ম্যাকনিশ, ও ফ্লাহার্টি, ও ক্যাসি, ট্রিফেন্স, ওয়েষ্ট। আশ্চর্য্য, প্রতিভা বিকশিত করে আয়ারল্যান্ড, পৃষ্ঠ হয় ইংরেজী সাহিত্য।

চুয়াড় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা নির্কাণিত  
হুইতে না হুইতেই কলিকাতা, ২৪

বগলা ও ফরিদপুর অঞ্চলে ওয়াহবী সম্প্রদায়ে  
প্রচলিত হওয়ার ফলে বৃটিশ  
রাজশক্তির ভিত্তিমূল কম্পিত হইয়া ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবদুল  
ওয়াহব নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়।

তিনি যে আন্দোলন প্রবর্তিত করেন তাহাট

পরে 'ওয়াহবী বিদ্রোহ' নামে খ্যাতি লাভ করে। ওয়াহব  
তাহার ধর্মীয় লোকদের অনাচারে বাধিত হইয়া তাহাব প্রতিকারে  
প্রবৃত্ত হন। তাহাব এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে  
পরিভ্রমণ করাব পর অবশেষে মহম্মদ ইবন সৌদকে তাহাব আদর্শে  
অনুপ্রাণিত করেন এবং পরে তাহাকে নিজের জামাতারূপে গ্রহণ  
করেন।

ইহার পর তিনি নেতৃত্বদেব একত্রিত করিয়া এক সংস্কারবাদী  
সেনাদলের সৃষ্টি করেন এবং নেজ্জ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জয়  
করিয়া নিজে ধর্মাত্মক স্থান অধিকার করেন। ধর্মীয় অনাচার-  
নিবারণকল্পে তিনি সাতটি নির্দেশ দান করেন। এই মতবাদট  
পরে ওয়াহবী মতবাদ বলিয়া প্রচলিত হয়। এই ওয়াহবী  
সম্প্রদায়ট সন্নী সম্প্রদায়েব অগ্রগামী দল—যাহাবা গোঁড়া ইসলাম  
ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত।

ওয়াহবেব আদর্শ ও মতবাদ আববদেব মনে গভীর বেথাপাত  
করে। বহিবাগত তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও অনেকে এই আদর্শের  
প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ওয়াহবী আদর্শে অনুপ্রাণিত  
এইরূপ এক জন তীর্থযাত্রী ছিলেন যক্ষপ্রদেশেব অন্তর্গত রায়বেবেলী  
সৈয়দ আহমেদ। তাহাব নেতৃত্বেই ভাবতে ওয়াহবী আন্দোলনেব  
সূর্যপাত হয়।

মুসলিম ধর্ম, মৌলবী ও আদালতের কথ্যচারী প্রভৃতি নিয়  
ও নিয়মধ্য শ্রেণীর বিক্ষোভট ভাষা পায় ওয়াহবী আন্দোলনে।  
কোবাণ-সম্মত সমাজবাদেব প্রেবণায় তাহার অত্যাচারী বৃটিশরাজ,  
হিন্দু ও শিপেব বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ইংরাজ, হিন্দু বা  
শিখ সকলেই তাহাদেব নিকট বিদ্রোহী, সকলেই তাহাদেব নিকট  
শেচ্ছ। ওয়াহবী নেতাগণ ধনী, ব্যবসায়ী বা উচ্চ-মধ্যবৃদ্ধি শ্রেণীর  
সমর্থনেব উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া জনসাধারণেব  
সহিত সাংযোগ বক্ষা করিয়া চলিত। এই কাণখেট বৃটিশেব আশ্রিত  
হিন্দু ও মুসলমান জমিদারগণ ও ধনীরা এই আন্দোলনে আতঙ্কিত  
হইয়া উঠে। হাট্টাব সাচেব এই বিষয়েব উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,  
“ওয়াহবী শক্তি কোন ধনী বা প্রভাবশালী শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া  
গড়িয়া উঠে নাই। তাহাদেব আবেদন ছিল জনগণেব কাছে এবং  
তাহাদেব ধর্ম বা বাজনীতিব মূল সূত্র ছিল বিক্ষুব্ধ জনগণেব আশা  
ও আতঙ্ক।”

ওয়াহবী আন্দোলনেব গুরুত্ব এই দিক দিয়া যে, তাহাদেব সংগ্রাম  
ভারতের সাধারণ মানুষেরই সংগ্রাম। ইহাব পিছনে আমীর-  
ওমরাহদের রাজনৈতিক কাণসাজী ছিল না। অত্যাচারী ইংবাজ  
সরকারেব ঘেচ্ছাচারমূলক শাসনযন্ত্রেব ধ্বংস সাধন করাট ছিল এই  
আন্দোলনেব অন্ততম উদ্দেশ্য। ব্যাপকভাবে দিক দিয়াও এই  
আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময় সমগ্র উত্তর-ভারতে—

# বিলুপ্ত বাংলা

শ্রীতাপিনীশঙ্কর চক্রবর্তী

সুদূর সীমান্তেব পার্শ্বত্যা কেন্দ্র হইতে মধ্য বাঙ্গলাব জেলাগুলি পর্য্যন্ত  
এই দুই রাজ্যেব মাইলেব মধ্যে বিভিন্ন স্থলে তাহাদেব শাখা ও  
কথ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ওয়াহবিগণ একাদিক বার বৃটিশ শক্তির  
বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রত্যেক বারই তাহারা  
হারিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদেব গুপ্ত অথচ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শাসকদের  
সর্বদা সশঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবতেই মাটিতে বিশেষ  
শাসনেব মুগ্ধ উৎপাটনেব সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ওয়াহবী  
আন্দোলনেব মধ্য দিয়া রূপ পরিগত করে বলিয়াই আন্দোলন  
পরিচালনায় প্রভূত দুরলভতা থাকে। সাংঘ ও ওয়াহবী আন্দোলন  
ভাবতেই স্বাধীনতা-সংগ্রামেব বস্তুকৃত অধ্যায়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার  
করিয়া আছে। এই আন্দোলনে দুইটি প্রধান দোষ ছিল—ধর্মের  
গোঁড়ামি প্রভাব এবং জাতীয় চেতনাব একান্ত অভাব। ধর্মের  
ভিত্তিতেই এই আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ওয়াহবীরা এই  
ভাবতবশ্যকে “দাব-উল-হার্হ” বলিয়া অভিহিত করিত। দাব-উল-হার্হ  
অর্থ শত্রুদের দেশ—অর্থাৎ মুসলিম কর্তৃত্বের অভাবে এই দেশ শত্রু-  
ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান-নির্বিশেষে সকলেই  
তাহাদেব শত্রু—সকলেই কাফের। এই দুরলভতা বলায়ল আমাদের  
জাতীয় ইতিহাসে এক শোচনীয় সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতে ওয়াহবী আন্দোলনেব নেত্রী সৈয়দ আহমেদ ১৭৮৬ সালে  
মহম্ম মাসে রায়বেবেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি  
আমীর খান পিণ্ডারী—পর্বতী কালে টঙ্কেব নবাবেব অধীন অথারোহী  
সৈনিকেব কাধ্য গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবে শিখ-বাজা তথা হিন্দু-  
প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহমেদেব জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল।  
১৮১৬ সালে দিল্লীর বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত শাহ আবদুল  
আজিজেব নিকট তিনি ইসলাম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিন  
বৎসর পর তিনি নিজে ধর্মপ্রচারকরূপে কুম্বক্ষেত্রে অবতীর্ণ  
হন। হিন্দুদের সাংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম ধর্মে যে সকল আচার-  
অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করিয়াছে তাহা দূর করিয়া  
ইহাব সংস্কার সাধন করাট তাহাব উদ্দেশ্য ছিল। ইসলামেব  
সংস্কার সাধন ব্যাপারে তিনি যেমন গোঁড়া মৌলবাদেব সমর্থন  
লাভ করিলেন তেমনই সাধারণ মুসলমানগণও তাহাব অনুবর্তী  
হইতে লাগিল। রোহিলখণ্ডেব অন্তর্গত বৈজুল্লা খানের জাগীর-  
দারীতে সৈয়দ তাহার কথ্যস্থল বাছিয়া নেন। বৈজুল্লা খানের  
বংশধরগণ ওয়ারেন হেস্টিংসেব অত্যাচারেব প্রতিশোধ গ্রহণের  
আকাঙ্ক্ষায় সৈয়দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রোহিলাদের নিখুঁত  
করাব জন্ত ওরায়েন হেস্টিংসের দানবায় অত্যাচারেব ইতিহাস ভারতে  
ইংরাজ শাসনেব মসৌলিপ্ত কাহিনীকে আবও কলঙ্কিত করিয়াছে।

১৮২০—২২ সালে সৈয়দ আহমেদ সমগ্র উত্তর-ভারত পরিভ্রমণ  
করেন। এই সময় বহু লোক তাহার শিষ্য হয় এবং সৈয়দ আহমেদ

তাহাদের মধ্য হইতে বিশ্বাসী লোক দেখিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহাদের ধর্ম-কর সংগ্রহের জ্ঞাত নিয়োগ করেন। পরে মুসলমান সম্রাটগণ যে ভাবে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিতেন ঠিক সেই অনুকরণে মৌলভী ওয়ালেয়ত আলি, মৌলভী এনায়েত আলি, মৌলভী মবত্ব আলি এবং মৌলভী কুবাৎ হোসেন প্রভৃতি চার জন শিষ্যকে প্রধান ধর্মগ্রন্থ হিসাবে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি পাটনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহার মতবাদ বাঙ্গলার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁহার জনপ্রিয়তা এত দূর বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহার পক্ষে শিষ্য গ্রহণের নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক পূর্ব অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাট। অবশেষে তিনি তাঁহার উকীলকে কাপড় বিছাইয়া দিয়া বলেন, যাহারা তাঁহার উকীলগণের যে কোন স্থানে স্পর্শ করিবে তাহারাই তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহার পর ১৮২২ সালে মক্কার তীর্থ করিতে গিয়া ওয়াহাবীদের সম্পর্শে আসেন। এইখানেই তিনি ওয়াহাবীদের দলভুক্ত হইলেন এবং পব-বৎসব অক্টোবর মাসে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮২৪ সালে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র স্থাপিত করিলেন। উত্তর-ভারতে পাঠানদের লইয়া তিনি একটি দুর্ধ্ব দল গঠন করেন। উক্ত দলের সহায়তায় শিখ-রাজত্বের উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হইলেন। ওয়াহাবীদের সংগঠন দ্রুত শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং টাংকের নবাবের নিকট হইতে অর্থ ও লোকবলের যথেষ্ট সাহায্য পায়। ১৮৩০ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়াব দখল করিয়া লয়। পেশোয়াবের পতনের পর সৈয়দ আহমেদ নিজেই খালিফ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজের নামে টাকা প্রচলন করেন।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমাজ-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। বিবাহ-সম্পর্কিত এক নির্দেশের ফলে তাহার সমর্থক দলের মধ্যে তীব্র বিবাদ দেখা যায় এবং সংঘর্ষে তাঁহার দলের অনেকে নিহত হয়। অবশেষে ১৮৩১ সালে যে মাসে বালাকোট সৈয়দ আহমেদ শিখ সৈন্যের গুলীতে নিহত হন এবং ওয়াহাবীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।

ইহার পর ওয়াহাবী আন্দোলনের অগ্ৰাণী নেতাগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, সৈয়দ আহমেদের মৃত্যু হয় নাই এবং আল্লার নির্দেশে এবং ইসলামের স্বার্থে তিনি আত্মগোপন করিয়া আছেন এবং গোপনে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই অর্থাৎ ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আরাব আত্মপ্রকাশ করিবেন। সাধারণ মুসলমানেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পূর্বাশঙ্কা অধিক অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। নিভৃত পার্বত্য অঞ্চলে সিতানায় ওয়াহাবীদের দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ওয়াহাবী আদর্শ বাংলা দেশে যে ভাবে ব্যাপকতা লাভ করে তাহা এক বিচিত্র কাহিনী। ওয়াহাবীদের সংগ্রামের ইতিহাসে “তিতু মিঞা” বা তিতু মৌবের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। সামান্য অবস্থা হইতে নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কৃষ্ণনিষ্ঠার বলে তিনি এক বিরাট ওয়াহাবী বাহিনী সংগঠিত করিতে সমর্থ হন। তিতু মিঞা বাবাসত্বে অস্তুর্ত চাঁদপুর গ্রামেই অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার

আসল নাম নিসার আলি। পেশাদার মল্লবীর হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিতু মিঞা ছিলেন চাষী-গৃহস্থের পুত্র। ছোট-খাট এক জমিদার-কন্ডার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থা কিছু উন্নতি হয়। এই সময় কিছু দিন তিনি মুষ্টিযোদ্ধা হিসাবে কলিকাতায় অর্থ উপার্জন করিতেন। কিন্তু ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল-কার্যে নিযুক্ত থাকা কালে তাঁহাকে জেলে ধাইতে হয়।

জেলে হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি মন্ডারপাথের যাত্রী হন। মন্ডাতে সৈয়দ আহমেদের সম্পর্শে আসিয়া তিতু মিঞা তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং সেই হইতে তিনি ওয়াহাবী মতবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে বহু শিষ্য সংগ্রহ করেন; ইহার গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে পেশোয়ার ওয়াহাবীদের দখলে আসায় প্রকাশ্য ভাবে তিতু মিঞা মুসলমান ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমে ইংরাজের বিরুদ্ধে না গিয়া হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরগুলির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় ইছামতী নদীর তীরের অধিবাসী কৃষক রায় নামক এক জমিদার ওয়াহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক ও প্রজাদের উপর ৩০ টাকা হিসাবে এক কব ধাধ্য করেন। ইহার ফলে মুসলমান কৃষকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। শীঘ্রই তিতু মিঞার অনুগামীগণ দলে ভাবী হইয়া উঠিল। বহু হিন্দু-গ্রাম লুণ্ঠিত হইল।

ইংরাজ সরকারের সহিতও তিতু মিঞার শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিল। নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেলা তৈয়ারী করিয়া তিতু মিঞা তাঁহার দল-বল সহ সেই স্থানে সমবেত হইলেন। কলিকাতার পূর্ব ও উত্তর দিকের গ্রামসমূহ, ২৪ পরগণা, নদীয়া, ও ফরিদপুর অঞ্চল তিন-চার হাজার বিদ্রোহীদের করতলগত ছিল। ওয়াহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত জনগণ তিতু মিঞাকে খাণ্ড ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন।

৬ই নভেম্বর প্রায় ৫০০ ওয়াহাবী সৈনিক একটি ছোট সহর আক্রমণ করিয়া ইংরাজ-শাসনের অবসান ঘোষণা করে। জেলা কর্তৃপক্ষ এই বিদ্রোহ দমনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৩১ সালের ১৪ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে এক দল শক্তিশালী কোম্পানী-সৈন্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। কোম্পানী দল ওয়াহাবী সৈন্যদের প্রথমে ভয় দেখাইবার জ্ঞান ফাঁকা বন্দুকের আগুয়াজ করে। কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হয়। বিদ্রোহী দল কোম্পানী সৈন্যের উপর প্রবল ভাবে আক্রমণ করে। ১৭ই নভেম্বর ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে আরও এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের আক্রমণ করে। ইউরোপীয় সৈন্যগণ হস্তান্তরে আবেগ করিয়া যুদ্ধ চালায়। কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে কোম্পানী-সৈন্য পশ্চাদপসরণ বাধ্য হয়। পরাজিত ব্রিটিশ সৈন্যদল নদীপথে পলায়ন কালে অধিকাংশই ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হয়।

তিতু মিঞার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দমনের জ্ঞান ইহার পর কোম্পানী কর্তৃপক্ষ অখারোহী, পদাতিক ও দেহরক্ষী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তিতু মিঞা আত্মত্যাগ সাগ্ৰাম করিলেন। কিন্তু বিপুল সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষে বেশী দিন যুদ্ধ করা সম্ভব হইল না। শিব্যের পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিতু মিঞা শত্রুর গুলীতে নিহত হন।

ইহাব পর ব্রিটিশ সৈন্য তিতুর বাঁশের কেলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।  
যুদ্ধে ৩৫° জন ওয়াহাবী সৈন্য বন্দী হয়। তন্মধ্যে ১৪° জনের  
কারাদণ্ড এবং তিতুর সহকারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

তিতু মিঞার মৃত্যুর পর বাংলা দেশে ওয়াহাবী সমাজ  
প্রত্যক্ষ ভাবে ইরাজ শক্তির সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু বাংলা দেশ  
হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাহারা অর্থ ও লোকবল দিয়া  
সাহায্য করিত। বাংলা দেশে নীল কুম্ভীরাল ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই  
তাহাদের অভিযান বিশেষ ভাবে চলে।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর তাহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওয়াহাবী  
মতবাদ বাহাতে স্তম্ভ ভাবে সর্বত্র প্রচারিত হয় তাহার সকল প্রকার  
চেষ্টা করেন। সমগ্র উত্তর-ভারতে, সুদূর সীমান্ত প্রদেশের  
পার্বত্য অঞ্চল হইতে মধ্য-বাংলার জেলাগুলি পর্যন্ত এই  
দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে তাহাদের কর্মক্ষেত্র  
স্থাপিত হয়।

ওয়াহাবীদের মধ্যে একটি যুদ্ধ-সঙ্গীতও প্রচলিত ছিল। এই  
সঙ্গীত যুদ্ধকালে তাহাদের মধ্যে বিশেষ প্রেরণা জোগাইত। নিম্নে  
সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইল।

"First I glorify God, who is beyond all praisie ;  
I land his prophet and write a song on

Holy War :

Holy war is a war carried on for religion, without  
any lust of power.

In the sacred scriptures its glories are related ;

I mention a few.

War against the Infidel is incumbent on all  
Musalmans ; make provision for it before all

things.

He who from his heart gives one farthing to the  
cause,

Shall here after receive seven hundred fold ;

And he who both gives and joins in the fight,

Shall receive seven thousand fold from God.

He who shall equip a warrior in this cause of

God shall obtain a martyr's reward ;

His children dread not the trouble of the grave ;

Not the last trump ; nor the day of judgement.

Cease to be cowards ; join the divine leader,

and smite the infidel.

I give thank to God that a great leader has been

born in the 13th century of the Hirja.

Oh friend, since you must some time die, is not

Better to offer up your life in the service of the

Lord ?

Thousands go to war and come back unhurt ;

Thousands remain at home and die.

You are filled with world-ly care, and have  
Forgotten your maker in thinking of your wives  
and children ?

How long to escape death ?

If you give up this world for the sake of God,

You enjoy the pleasures of heaven for ever.

Fill the uttermost ends of India with Islam,

So that no sounds may be heard but "Allah !

Allah !"

ওয়াহাবীরা সাময়িক আদর্শে উদ্ভূত হইয়া ১৮৫৮, ১৮৬৩ এবং  
১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।  
প্রত্যেক বারই তাহারা পরাজিত হয়। ক্রমে সরকার তাহাদের গুপ্ত  
প্রচেষ্টার কথা জানিতে পারিয়া তাহাদের গুপ্ত কর্মকে প্রকাশের  
উপর কড়া নজর রাখে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারে যে,  
সাধারণ মুসলমানদের সহানুভূতি ওয়াহাবীদের প্রতি ; তখন তাহারা  
যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়িয়া প্রলোভনের পথে তাহাদের আয়ত্তে আনিতে  
সচেষ্ট হয়।\*

[ ক্রমশঃ ।

\* Indian Mussalmans by W. W. Hunter ;  
Calcutta Review ; ভাবতবর্ষে স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস।

## উকূনের নতুন ওষুধ নিউটেল-লাইসাইড

"আমি 'লাইসাইড' পাইয়াছি ও ব্যবহার করাই-  
য়াছি। আপনাদের প্রেরিত উকূনের ঔষধ বিশেষভাবে  
কার্যকরী। লোকে জানিতে পারিলে ইহার বহুল  
বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।...আপনাদের  
ঔষধের ও ব্যবসায়ের উন্নতি কামনা করি।"

শ্রী কে, কে, দাস ; Rajapalayam, S.I. Rly.

প্রতি প্যাকেটের জগ্ন দুই আনা ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা কয়েকটি জেলায় এই  
"লাইসাইড" পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চতর কমিশন দেবো।

# নিউটেল

Dept. M. B.

১৯, বঙেল রোড ; কলিকাতা-১৯





## নাট্যকার ও দর্শক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ইংবেজবা এদেশে আসবার আগে বাঙালীরা অভিনয় দেখত যাত্রাব-গ্রামে। অনেকটা ঠিক ধরবে আসব ব্রহ্মদেশ, গাম-দেশ ও বদরপা প্রভৃতি স্থানে দেখা যাবে। প্রাচীন ভারতে উচ্চতর শ্রেণীর দর্শকরা দেখাতেন সে শ্রেণীর বঙ্গালয়, পাশ্চাত্য থিয়েটারের সঙ্গে তাব অল্প-বিস্তর মিল আছে। কিন্তু এখানকার জনসাধারণ অভিনয় দেখবার স্তরোপ পো-সাধারণ মত আসতে গিয়ে। ব্রহ্মদেশ, গামদেশ ও বদরপা প্রভৃতি স্থানে পড়েছিল প্রাচীন ভারতেরই প্রভাব। এবং খুব মজবুদ সেই প্রভাব থেকেই বাঙালীর যাত্রার উৎপত্তি। চীন দেশে থিয়েটারের পতন হয়েছে স্রবণাতীত কালে। কিন্তু কোন কালেই সেখানে সুব্যবস্থা কি প্রাচীন ভারতের এতটুকু প্রভাবও পড়েনি। সেখানেও বাবা বঙ্গমন্ডল উপরে অভিনয় হয় বটে, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে দাঁড়ালে বিদেশী দর্শকরা মনে করবে—এ যে দেখছি এক আচ্ছন্ন কাণ্ড-কাণ্ডানা। অনেক বংসর আগে কলকাতার ছুটি বঙ্গালয়ে (বিদ্যন ষ্ট্রাটে ও চীনেপাড়ায়) ছুটি চৈনিক নাট্য-সম্প্রদায় নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল এবং সে অভিনয় আমি দেখেছি। চীনা বঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের কোনটুকু বাল্যই নেই। আছে বটে মাঝ-পোষাকের যথেষ্ট জাঁকজমক, নেই কিন্তু বিলাতী থিয়েটারের অধিকাংশ উপসর্গ। নিদেনপক্ষে যা ব্যবস্থার না কবলেই চলে না, এমনি দু-চারটি ছোটখাটো আসবাব ও জিনিসপত্র দিয়েই কাজ চালানো হয়। মঞ্চে এক পাশে যখন অভিনয় করে নট-নটীরা, বাইরে লোকরা এসে মঞ্চে অগা প্রান্তটা পাবে দৃশ্যের জন্তে প্রস্তুত করে তোলে। কুশীলবরা একবার মঞ্চ পবিক্রমণ করলেই বুঝতে হবে যে, তারা এক স্থান থেকে অগা স্থানে যাচ্ছে। ক্রমাগত প্রতীকের সাহায্য নেওয়া হয়। নট যদি লঠন নিয়ে মঞ্চে আসে, বুঝতে হবে অক্ষকব বারি! মুখে পাশে হাতপাখা ধরলে বুঝতে হবে, প্রথমে বোম্বে সে নগর মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাত্র অভিনেতা পতাকা হাতে ধরে দেখা দিলে ধরে নিতে হবে, মঞ্চের উপরে হাজির আছে হাজার জন সৈনিক। এক জন বর্শাধারী ছুঁড়লে আর এক জন তা যদি হাতে ধরে ফেলি মাটির উপরে শুয়ে পড়েই আবার উঠে দৌড়ে মঞ্চ থেকে চলে যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে মাঝে পড়েছে। এমনি আধো কত কি!

জাপানে নাট্যভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হয়েছে চৈনিকদেরই দেখা-দখি। কিন্তু চীনা পদ্ধতিব সঙ্গে জাপানী পদ্ধতিব পার্থক্য আছে যথেষ্ট। বিলাতী বা ভারতীয় পদ্ধতিব সঙ্গে পার্থক্য তার আকাশ-পাতাল। জাপানের "নো" নাট্যভিনয়ের কথা পৃথিবীতে বিখ্যাত। সেখানে আরো কোন কোন শ্রেণীর অভিনয় আছে। কিন্তু সে সব কথা এখানে বোঝা ক'রে বলবার দরকার নেই, কারণ ভারতীয় থিয়েটারের গায়ে একেবারেই লাগেনি চীন বা জাপানের থিয়েটারি হাওয়া।

বাঙালী বঙ্গালয়ের গোড়া খোঁজবার জন্তে প্রাচীন ভারত কি চীন-জাপান কি প্রাচীন গ্রীসের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। বাংলা বঙ্গালয়ের গোড়ার দিকে তার উপরে যাত্রাব প্রভাব ছিল অল্প-বিস্তর,—এমন কি আমাদের বাল্যকালেও থিয়েটারি অভিনয়ের ও পালাব উপরে কিছু কিছু যাত্রাব ছাপ বিজ্ঞমান ছিল। কিন্তু আসলে বাংলা গল্প-সাহিত্যের মত বাংলা বঙ্গালয় ও দৃশ্যকাব্যও এসেছে বিলাতী কারখানা থেকে। ইংরেজী থিয়েটার ও বাংলা বঙ্গালয় একই ঢালের এপিঠ ও-পিঠ। এবং আমাদের নাট্যকাররাও নটিক বচনার সময়ে ভাস বা কালিদাস বা শ্রীহর্যের আদর্শ গ্রহণ কবতেন না; তাঁরা আগে অহুগামী হতেন সেক্সপিয়র প্রভৃতির এবং এখন কাজ কবেন আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যকারদের পবিকল্পনা অনুসারে। সকলেই জানেন, ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাংলা থিয়েটারের জন্ম দিয়েছিলেন রুসিয়া থেকে আগত হেরাসিম লেবেডেফ সাহেব।

কলকাতায় তখনও ইংবেজদের নিজস্ব বঙ্গালয় ছিল। কিন্তু বাঙালীরা তখনও থিয়েটারের স্বপ্ন পুষাত্ত দেখেনি, তারা যাত্রা ও পাণ্ডালি প্রভৃতি নিয়েই নিযুক্ত ছিল একান্ত ভাবে।

এই সময়ে তাঁরা লেবেডেফ সাহেবের খেয়াল হ'ল, বাঙালীদের বাংলা ভাষাতেই থিয়েটারের অভিনয় দেখাবেন। তিনি নিজের বাংলা শিপলেন এবং বাংলায় কোন থিয়েটারি নাটক নেই ব'লে তত্বমা কবলেন ছুপানা ইংবেজী নাটক। নিম্মাণ করলেন নতুন এক নাট্যশালা। শাব পব বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ সাংগ্রহ করে তাদের নিয়ে মতলা দিয়ে খুলে বসলেন বাংলা বঙ্গালয়। এবং সেই প্রথম ভারতীয় বাস্তবত্বের সঙ্গে সুযোগীয় বাস্তবত্ব মিলিয়ে দেশীয় স্তরে বাজানো হয় দেশীয় একতান।

কিন্তু সেখানকার অভিনয় বেশী দিন চলেনি জনসাধারণের আগ্রহের অভাবে। লেবেডেফ সাহেব এদেশ ছেড়ে চলে গেলেন, তাঁর বঙ্গালয়ের দরজা হ'ল বন্ধ। লোকে তার কথা ভুলে গেল।

দেশে ক্রমে ইংবেজী ভাষা, সাহিত্য ও রীতিনীতির প্রভাব বেড়ে উঠল। জনসাধারণ যাত্রা প্রভৃতি নিয়েই মেতে বসল বটে, কিন্তু শিক্ষিত, নব্য বাঙালীর কৃতি হাতে সায় দিতে পারলে না। তাঁরা সহবের ইংবেজী বঙ্গালয়ের দিকে ঘুরে পড়লেন। ক্রমে তাদের ঝোঁক বাড়তে লাগল, নিজেবাও সেই ভাবে অভিনয় করার জন্তে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তখনকার সংবাদপত্রাদিতেও বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত কববার জন্তে আন্দোলন চলতে লাগল। ধনী বাঙালীরা ইংবেজদের অনুকরণে আপন আপন আলয়ে অস্থায়ী বঙ্গমঞ্চ বোধে ইংবেজী নাটক অভিনয় কবতে লাগলেন। কিন্তু "নানান দেশে নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?" লেবেডেফ সাহেবের প্রস্থানের চল্লিশ বংসর পবে বাঙালীরা প্রথমে নিজেদের থিয়েটারে বাংলা ভাষায় নাটকের অভিনয় দেখান—যদিও সে নাটক মৌলিক নয়। প্রথম যুগের বাঙালী নাট্যকাররা সাধারণতঃ সংস্কৃত নাটককেই ভাষান্তরিত করতেন বটে, কিন্তু বঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হ'ত অবিকল ইংবেজদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

তার পর বাংলা বঙ্গালয়ের প্রধান নাট্যকার হয়ে দাঁড়ালেন বামনারায়ণ তর্করত্ন। তিনি কয়েকখানি মৌলিক নাটকও রচনা করলেন। কিন্তু ইংবেজী নাট্য-সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল না ব'লে পালা রচনা করতেন তিনি এদেশের পুরাতন প্রথা অনুসারেই। শিক্ষিত বাঙালীদের মন তাদের মধ্যে তেমন স্ফুর্তি লাভ করতে পারত না।

সেই অভাব দূর করবার জগো কলম ধরলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সংস্কৃত নাট্যরীতি পূর্বোপরি বর্জন করে তিনি অবলম্বন করলেন বিলাতী নাট্যরীতি। রামনাবায়ণ তাঁকেও সংস্কৃত নাটকের রীতি গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা না করে মাইকেল বলেছিলেন—সংস্কৃতের নিগড় আমি পবন না। আমার নাটকে বিদেশী ভাব থাকবে বটে, কিন্তু আমি লিখব কেবল তাঁদের জগো, আমার মত গাঁরা পাশ্চাত্য ভাবের ভাবুক। তিনি বচনা করলেন মৌলিক নাটক “শর্মিষ্ঠা”। সেটা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কথা। তার পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী নাট্যকাররা নাটক-রচনার জগো আর কোন নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পাবেননি। মাইকেলের বহু কাল পূর্বে সাধারণ বঙ্গালয়েব সর্বপ্রধান নাট্যকার গণিষাচন্দ্র নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন: “মহাকবি সেকপীরই আমার আদর্শ। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। \* \* \* আমি পাশ্চাত্য সাহিত্যেব সংস্রবেই বেশী এসেছি।” ফীরোদপ্রসাদের নাট্যকবলীতেও আছে এই পাশ্চাত্য প্রভাব এবং এ প্রভাব দ্বিচ্ছন্দ্রলালেব বচনায় আরো বেশী মাত্রায় অনুভব করা যায়। তবু গণিষাচন্দ্র বলতে পেরেছিলেন: “কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস রুতিবাস আমার ভাষাব বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও বিদ্যমান।” দ্বিচ্ছন্দ্রলাল তাও বলতে পারবেন না। তাঁর লেখাতেও আছে যথেষ্ট বিলাতী গন্ধ। আমাদের আধুনিক নাট্যকারদের কথা বলাই বাহুল্য। তাঁদের নাটক অধিকতর বিলাতী ভাবাপন্ন।

যুবোপেব এক এক দেশেব বিখ্যাত নাট্যকাররা এক এক সময়ে দেখিয়েছেন নাটক-বচনার বিশেষ পদ্ধতি ও নতন পবিকল্পনা।

সকলকার নাম কববার দরকার নেই, সেকপীর, তিউগো, ইবসেন, মোটরলিক, শেখভ ও আন্দ্রীভের নাম উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এঁদের পরম্পরের পদ্ধতি ও পবিকল্পনার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া হুঁকর। এঁদের প্রত্যেকেই আখ্যানবস্ত্র ও চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন আপন আপন বিশিষ্ট ধাবণা অনুসারে।

আজ পর্যন্ত এক জন মাত্র বাঙালী নাট্যকার এরকম কোন বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পাবেননি। তাঁরা বড় জোবে যুবোপীয় নাট্যকারদের জনতাব মধ্যে গিয়ে পড়ে দিশেতাবার মত ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন, আজ অবলম্বন করেছেন এক জনকে এবং কাল দর্পা দিয়েছেন আর এক জনেব কাছে। এমন কি কারুব কারুব রচনায় আজও পাওয়া যায় এলিজাবেথীয় নাট্যজগতেব যুগপথ। এদেশে নাটক-রচনায় নতন পদ্ধতি ও পবিকল্পনার পবিচয় দিয়েছেন কেবল রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তাঁর কথা এখানে অবাস্তব। তিনি সাধারণ বঙ্গালয়েব গণ্ডীর ভিতরে আসেননি। এবং সাধারণ বঙ্গালয় সেটে তাঁর উচ্চতর শ্রেণীর নাটকগুলি গঠন করতে গিয়ে বিপদগস্ত হয়েছেন একাদিক বার।

এ জগো দায়ী বাংলা দেশের সাধারণ দশকরা। তাবা হীরককে চিনতে না পেবে তুচ্ছ কাচের চাকচিকোব দিকে আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে সাধারণ বাংলা বঙ্গালয়েব অগতম জন্মানতা গণিষাচন্দ্রের উক্তি উল্লেখযোগ্য: “ম্যাকবেথেব অনুবাদ করে থিয়েটারে অভিনয় কবতে আমার ১৮১৭ বংসব লেগেছিল। \* \* \* মনে তো করেছিলাম যে ম্যাকবেথেব পব ওখেলো, আমলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি বই অনুবাদ করে অভিনয় কবব। কিন্তু যদিও সকলে

কিন্তু এ স্বকল্পিতা:—‘বি.বি.সরকার’ সৌ. নারায়ণ সরকারের \*  
পরিচালনা

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

**বি.বি.সরকার**

কোম্পানি লিমিটেড

১৬০-১. বহুবাজার স্ট্রিট

ফোন:—বি.বি. ১২৫৩.

কলিকাতা

ম্যাকবেথ নাটকের অভিনয় প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু দর্শকের অভাবে বঙ্গালয়ে অভিনয় সম্ভব বন্ধ হ'ল। অথচ অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের স্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আব্বাছাদ কবলাম না। বাবসায় কৃতকার্য না হ'লে আমার হাত-পা বাঁধা। \* \* \* \* বৈশী ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। বিশেষ শিক্ষিত লোক ছাড়া এই নাটক (ম্যাকবেথ) সাধারণের উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশী দেখে না।”

মস্তক এবং মনোমার দিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হবে, বাংলা রঙ্গালয়ের সাধারণ দর্শকবা এখনো বাস করছে আঁতুড়-ঘরেই। গির্জাচত্বরের দ্বারা অনুদিত “ম্যাকবেথ” অভিনীত হয়েছিল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ সাধারণ বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তেইশ বৎসর পরে। ধ'বে নিলুম বাঙালী দর্শকদের বুদ্ধি তখনও ভালো ক'রে পাকেনি। কিন্তু তাবও ছালিশ বৎসর পাবে ঠাব থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল সুলেখক দেবেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা অনুদিত “ওথেলো”। অনুবাদ হয়েছিল চমৎকার এবং তারক পালিত (ওথেলো), অপবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ট্রাগো) ও তাবাসুল্লরীর (ডেসডিমোনা) অভিনয়ও হয়েছিল সত্য সত্যই অল্পম। কিন্তু বাঙালী দর্শকদের কাঁচা বুদ্ধি তখনও গ্রহণ করতে পারেনি সেক্সপিয়ারকে।

তারও বড় বৎসর পাবে ঠাব থিয়েটারে খেলা হয় রবীন্দ্রনাথের পরম উপভোগ্য নাটক “গৃহপ্রবেশ”। প্রধান ছুটি ভূমিকায় শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীমতী নীহারবালা অভাবিত কৃতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সে পালাটিকেও একেবারেই আমল দেয়নি দর্শকরা।

রবীন্দ্রনাথের “বাজা ও রাণা” নাটক বড় কাল আগে বাংলা রঙ্গালয়ে বাঁচিমত লোকপ্রিয় হয়েছিল, কারণ তাঁর অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে রচিত এই নাটকখানি মধ্য সহজবোধ্য মেলাড্রামার উপাদান ছিল প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু তিনি যখন তাকে পরিবর্তিত করে অপর এক নাটক (‘তপতী’) দিলেন, তখন তাঁর পরিণত বয়সের পরিবর্তন ও ঘটনানুগত্য এবং শিশিবকুমারের প্রয়োগ-কৌশল ও অনবদ্য অভিনয়ও সে পালাটিকে সাধারণ দর্শকদের অনাদব থেকে বক্ষা করতে পারেনি। এ ছুটি হচ্ছে আধুনিক দৃষ্টান্ত। এগেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, অল্প শতাব্দী কাল পাব হয়েও সাধারণ বাঙালী দর্শকদের মনোবা কিছুমাত্র উন্নত ও মার্জিত হয়নি। সেদিন কোন রঙ্গালয়ে গিয়ে “সমুদ্রগুপ্ত” নামে একখানি জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় দেখলুম। সমুদ্রগুপ্ত হচ্ছেন চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু তাঁর সময়েই নাটকের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে দ্বাবীক্ষণ যন্ত্র—যার আবিষ্কার গ্যালিলিও পৃথিবীতে বিস্তারিত ছিলেন যোড়শ ও সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে! কেবল তাই নয়, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই টেনে আনা হয়েছে কবি কালিদাসকে, ঐতিহাসিকরা তাঁর কালনির্ণয় করেছেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা তাঁর পৌত্র কুমারগুপ্তের সময়ে। দর্শকরা অজ্ঞানবদনে সহ্য ক'রে যাচ্ছে এই সব ঐতিহাসিক প্রলাপ বা অপলাপ। এবং এ জন্তে আমাদের নাট্যকারগণও অল্প দোষী নন। তাঁরা স্থূলপাঠ্য ইতিহাস না পড়েও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে লজ্জিত হন না। আধুনিক কালে কোন পাশ্চাত্য বঙ্গালয়েই এমন বিসদৃশ কাণ্ড সম্ভব হ'ত না।

## —সাহিত্য-পরিচয়—

### প্রাপ্তি স্বীকার

**বিংশতি মহামানব**—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ। দিষ্টাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোং লিঃ ; ৩২-এ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

**সেকাল একাল**—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। এ, মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লিঃ ; ২, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা আট আনা।

**বাবলা রাণীর ছড়া**—শ্রীমুখা বসুজা। এ, মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ ; ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

**জনগণের উপনিষৎ**—শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত। আন্তোব্য লাইব্রেরী ; ৫, বঙ্কিম চাট্টারজী স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

**রাত্রির তপস্বী**—মন্মথ রায়। সংহিতা কাথ্যালয় ; ২০৩২ বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

**ধর্ম-প্রসঙ্গ**—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ। ৩, শত্ৰুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**পল্লবাসী**—শ্রীআদিত্যশঙ্কর। ববেন্দ্র লাইব্রেরী ; ২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব**—সন্তোষকুমার সামন্ত। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ; ৫৪১৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**সোসালিষ্ট পার্টি কি চায়!**—নবেদ্রনাথ দাস। পি ৩৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

**মগের মূলুক**—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ ; ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য তিন টাকা।

**নিত্য-সঙ্গীত-লহরী**—শ্রীমৎ স্বামী নিত্যপদানন্দ অবধূত। মহানির্বাণ মঠ, নবদ্বীপ। মূল্য দুই টাকা।

**মৃত্যুর পরে কি হয় ও কোথায় যায়**—ডাঃ শ্রীবাধারমণ বিশ্বাস। ১, সাগর ধব লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**অজানার পথে**—শ্রীনবেশনাথ মৈত্র। শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী ; ১৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা চার আনা।

**অভিশপ্ত বাঙলা**—শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ। বীণা লাইব্রেরী ; ১৫, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য এক টাকা।

**পুরাণের দশ বছরের যমেশ্বরী**—শ্রীকানাইলাল ঘোষ। দি প্রকাশনী ; ১১এ, তাবক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

United Nations Work And Progress Of TECHNICAL ASSISTANCE—U. N. Dept of Public Information. New York. N. Y. Price 15 cents.

**বঙ্কিম মানস**—অরবিন্দ পোদ্দাব, এম, এ, ডি-ফিল, ইণ্ডিয়ানা লিঃ ; ২১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

**তত্ত্ব জিজ্ঞাসা**—শ্রীসত্যীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, পি, এইচ, ডি। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ; ৫৪১৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**জনগণের রবীন্দ্রনাথ**—শ্রীস্বদীপচন্দ্র বর। সিগনেট প্রেস ; ১০২ এলগিন রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

## শান্তি-চুক্তি, না, নয়! যুদ্ধের খসড়া—

পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ে গত ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) সানফ্রান্সিস্কোয় অনুষ্ঠিত জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্মেলনে জাপান-শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এক পক্ষে ৪৮টি রাষ্ট্র এবং অপর পক্ষে জাপান এই শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করিয়াছে। ভারত এবং ব্রহ্মদেশ এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই। রাশিয়া, পোল্যান্ড এবং চেকোস্লোভাকিয়া সম্মেলনে যোগদান করিলেও শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। ফ্রান্সকে খুশী করার জন্য তাহাব সৃষ্ট ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া এবং লাওসকেও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমন্ত্রিত হইয়া দক্ষিণ-কোরিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত ছিল। অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের জাপান-শান্তি-চুক্তিতে স্বাক্ষরের মূল্যস্বরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটি দেশের সহিত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) তারিখে এক ত্রিপক্ষীয় শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়াকে খুশী করার জন্য চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া জাপানের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্বের উপর ভোর দেওয়া হইয়াছে। শুধু ইহাতেও ফিলিপাইন সন্তুষ্ট হয় নাই। ফিলিপাইনকে সন্তুষ্ট করার জন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রকে তাহাব সহিতও এক বক্ষা-চুক্তি করিতে হইয়াছে। এই বক্ষা-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে ৩০শে আগষ্ট (১৯৫১) তারিখে। ফিলিপাইনের সহিত বক্ষা-চুক্তি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সহিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তিকে জাপান-শান্তি-চুক্তির ভূমিকা বলিয়াও অভিহিত করা যায়। এই শান্তি-চুক্তিতে বুটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক জন সহযোগী উল্লেখ্য। বুটেনও শান্তি-চুক্তির একটি স্বতন্ত্র খসড়া তৈয়ার করিয়াছিল। বুটেনকে সন্তুষ্ট করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খসড়া শান্তি-চুক্তিতে চীনদেশের স্বাক্ষরের কোন ব্যবস্থা করে নাই এবং ফরমোসা দ্বীপের ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতেও জমা মূল্যবাহী রাখিয়াছে। বুটেন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। সুতরাং জাপান-শান্তি-চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বুটেনের যুক্তভাবে রচিত, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায়। পাকিস্তানের এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করার একমাত্র কারণ যে কাশ্মীর, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কাশ্মীরই হইল পাকিস্তানের পবিত্র নীতি। ‘দি নিউ স্ট্রেটসম্যান এণ্ড নেশান’ লিখিয়াছেন, “Pakistan’s accommodating attitude stems rather from her regrettable differences with India than from any real desire to see the present ‘Treaty made effective.’” অর্থাৎ পাকিস্তানের এই মানিয়া লওয়ার মনোভাব বর্তমান সন্ধিকে কার্যকরী হইতে দেখিবার প্রকৃত ইচ্ছা হইতে নয়, ভারতের সহিত শোচনীয় বিরোধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু গোটা জাপান-শান্তি-চুক্তিটাই একটা উপলক্ষ মাত্র। আসল উদ্দেশ্য জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা-চুক্তি সম্পাদন। জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরই জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত না হইলে জাপানে সমস্ত মার্কিন সৈন্য মোতায়েন রাখার জন্য জাপানের সহিত কোন চুক্তি করা সম্ভব নয়। আবার জাপান-শান্তি-চুক্তিও এমন ভাবে রচিত হওয়া আবশ্যক যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে জাপানের সহিত এইরূপ চুক্তি করা সম্ভব হয়। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যের প্রাতি লক্ষ্য রাখিয়াই

## ঐতিহাসিক পরিস্থিতি

### ত্রিগোপাশঙ্ক নিয়োগী

জাপানের সহিত শান্তির চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছে। জাপান-শান্তি-চুক্তির অন্তর্গত সর্বগুলি উদাহরণেই অন্তর্সঙ্গী এবং বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে রচিত হইয়াছে। এই জন্যই জাপান-শান্তি-চুক্তি সশব্দে রাশিয়ার প্রস্তাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বচিত খসড়া চুক্তিপত্র সম্পর্কে রাশিয়া ও ভারতের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাক্ষরিত হইয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রচিত জাপান-শান্তি-চুক্তিপত্র। এইরূপ জাপান-শান্তি-চুক্তি এবং জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, এশিয়ার অধিবাসীদেরই তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই চুক্তিকে ‘শান্তি-প্রতিষ্ঠার সক্রিয় পথ’ (it offers action for peace) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা যুদ্ধনিরোধের পবিত্রতাকে যুদ্ধ চালাইয়া যািতে চায় তাহাদের স্বরূপও এই সম্মেলন উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর বগন শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতেছিল, সেই সময়ে রাশিয়ার ডেপুটি প্রবাস্ত্র-সচিব মঃ গ্রমিকো এক সাংবাদিক সম্মেলনে জাপান-শান্তি-চুক্তিকে ‘একটি নতুন যুদ্ধের খসড়া’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এশিয়াবাসীর দিক হইতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের উক্তিই সত্য, না মঃ গ্রমিকোর উক্তিই সত্য তাহা জাপান-শান্তি-চুক্তি রচনার পদ্ধতি এবং উহার বিষয়বস্তু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। ‘দি নিউ স্ট্রেটসম্যান এণ্ড নেশান’ পত্রিকা পণ্যস্ত এই শান্তি-চুক্তিকে প্রকারান্তরে ‘Whiteman’s treaty’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, কোণিয়া যুদ্ধ অবস্তু হওয়ার পূর্ব পণ্যস্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে তেমনি আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ১৯৪৭ সালে জাপান-শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের অভিপ্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়ার জন্তই ইহা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল তা ঠিক নহে। রাশিয়া চাহিয়াছিল, বৃহৎ পবিত্র-সচিব সম্মেলনে জাপান-শান্তি-চুক্তির খসড়া রচিত হউক। তেঁটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে বলিয়াই রাশিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা মা করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, তেঁটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিব অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বুটেনেরও বহিয়াছে। পটস্ভূ চুক্তিতে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, সশস্ত্র শত্রুতাকে উপরে আরোপিত সর্ববলীতে যাহা বা স্বাক্ষরকারী, তাহারা শান্তি-চুক্তির প্রাথমিক বচনাব কাণ্ড (preparatory work of peace settlements) করিবেন। পটস্ভূ চুক্তির এই সর্বটই রাশি কাণ্ডকারী কবিতো চাহিয়াছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাহিয়া

জাপানের বিরুদ্ধে যে-সকল দেশ যুদ্ধবোষণা করিয়াছিল তাহারা সকলে মিলিয়া জাপ শাস্তি-চুক্তি বচনা করিবে। এই মতভেদের জগত জাপ শাস্তি-চুক্তি বচনাব কাজ আবশ্যক বা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু কোরিয়ায় যুদ্ধ আবশ্যক না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপ শাস্তি-চুক্তির জগত তেমন গবজও প্রকাশ কবে নাই। কোরিয়ায় যুদ্ধ আবশ্যক হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সামরিক খাঁটি হিসাবে জাপানের গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর হইতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা 'রাশিয়ার সম্প্রসারণ' এবং 'রুশ সাম্রাজ্যবাদ'এর ধ্বনি তুলিয়া পৃথিবী গ্রাসের যে চেষ্টা করিতেছিল, কোরিয়া যুদ্ধেব অজুহাতে এশিয়ায় তাহা কার্যকরী করিবার এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। জাপান একক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে থাকায় রাশিয়াকে বাদ দিয়াই জাপানের সহিত শাস্তি-চুক্তি করার পক্ষে আমেরিকাব কোন অন্তরোধও নাই। এই জগত কোরিয়া যুদ্ধ আবশ্যক হওয়ার পর ১৯৫১ সালের মধ্যেই জাপানের সহিত শাস্তি-চুক্তি সম্পাদনের জগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে জাপ শাস্তি-চুক্তি সম্পর্কে একটি মার্কিন পরিকল্পনা বচিত হইয়া যায় এবং ২৬শে অক্টোবর (১৯৫০) মার্কিন গবর্ণমেন্ট উহা রাশিয়ার সহকারী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মালিনকে হস্তে অর্পণ করেন। এ সম্পর্কে রাশিয়া যে-সকল প্রশ্ন উপস্থাপন কবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাব যে উত্তর প্রদান কবে, সে-সম্পর্কে গত মাস মাসে (১৩৫৭) মাসিক বন্ধুঘণ্টাতে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই খসড়া-চুক্তি জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ফিলিপাইনকে দিয়া গ্রহণ করাষ্টাব জগত মিঃ ডুলেস স্বল্প-প্রাচ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। চীনের পক্ষে কে স্বাক্ষর করিবে এবং ফরমোসা দ্বীপটি কি হইবে, এই দুইটি প্রশ্নের মোমাঁসা করিবার জগত মিঃ ডুলেস বিলাতেও গিয়াছিলেন। এই সকল আলোচনাব পর জাপ শাস্তি-চুক্তির পরিবর্তিত খসড়া জুলাই মাসেব মধ্যভাগে প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্তিত খসড়া সম্পর্কে রাশিয়া এবং ভারত যে-সকল আপত্তি উপস্থাপন করিয়াছিল, সেগুলি সমস্তই যে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই খসড়ারও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া ১৫ই আগষ্ট (১৯৫১) জাপ শাস্তি-চুক্তির চূড়ান্ত খসড়া প্রকাশিত হয়। সুতরাং পটমুদ্রা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া এই শাস্তি-চুক্তি পত্র রচিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে ভুল হইবে না। রাশিয়া যে এইরূপ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে বাজী হইবে না, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জানিত। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে মিত্র-সংগঠনশীল বোম্বায বলা হয় যে, এই বোম্বায স্বাক্ষরকারীদের কেহই জাপানের সহিত পৃথক্ সন্ধি করিতে পারিবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদিও মনে কবে যে, এই বোম্বায শুধু জয়লাভ না হওয়ার পূর্বে পর্যন্তই বলবৎ ছিল, তথাপি রাশিয়া এবং চীনকে বাদ দিয়া এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত বোম্বাযও যে লজ্জিত হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জাপানের অধিকাংশ যে সকল দ্বীপ ছিল সেগুলি সম্পর্কে এই চুক্তিতে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। পার্লামেন্টের বোম্বাযণেব সময় যে সকল দ্বীপের উপর জাপানের অধিকার ছিল সেগুলিকে চারিটি পথায় বিভক্ত করা যায় : (১) যে-সকল দ্বীপ

জাপানের অঙ্গীভূত, (২) যে-সকল দ্বীপ জাপান ১৯১৯ সালের শান্তি সম্মেলনে ম্যাণ্ডেট হিসাবে পাইয়াছে, (৩) যে-সকল দ্বীপ জাপান রাশিয়ার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল এবং (৪) যে, সকল দ্বীপ চীনের সহিত সম্পাদিত শিমোনোসকী সন্ধি অনুসারে জাপানের রাজ্যভূক্ত হইয়াছে। লীগ অব নেশানসের ম্যাণ্ডেট অনুসারে মাশাল, কেবোলাইন প্রভৃতি যে সকল দ্বীপের উপর জাপানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেগুলি দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিসিপেব অধীনে আছে। এই দ্বীপগুলি উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিসিপ তো বজায় থাকিবেই, তা ছাড়া বিউকিউ, বোনিন, ভলকেনো দ্বীপ, রোজারিও দ্বীপ, পাবেস ভেলা দ্বীপ এবং মাংকাস দ্বীপের উপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিসিপ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা যে একরূপ বাজ্যবিস্তার তাহাতে সন্দেহ নাই। কায়বো সিদ্ধান্ত বাজ্যবিস্তারের বিরুদ্ধেই বোম্বায করা হইয়াছে। বোনিন দ্বীপ জাপানের অঙ্গীভূত ছিল। পেঙ্গাডোরেস দ্বীপের নামট জাপানের অধিকারে আসার পর বিউকিউ বাধা হয়। কায়বো ও পটমুডামের বোম্বায এই দ্বীপ চীনেব প্রাপ্য। স্প্যাটিলি দ্বীপ এবং পাসেল দ্বীপের অধিকারও জাপান পবিত্যাগ করিল। কিন্তু এই দ্বীপ দুইটি স্বাধীন হইল, এ কথা বলা হয় নাই। এক সময়ে এই দ্বীপ দুইটি চীনের রাজ্যভূক্ত ছিল। জাপান ফরমোসা, দক্ষিণ-শাখালিন এবং কুইলস দ্বীপের উপর অধিকার পবিত্যাগ করিল, কিন্তু ফরমোসা চীনকে এবং দক্ষিণ-শাখালিন এবং কুইলস দ্বীপ রাশিয়া পাইবে এ কথা বলা হয় নাই। পটমুডাম চুক্তিতে শেবোক্ত দুইটি দ্বীপ রাশিয়াকে দেওয়া হইয়াছে এবং ফরমোসা ও পেঙ্গাডোরেস দ্বীপ দেওয়া হইয়াছে চীনকে। দক্ষিণ-শাখালিন ও কুইলস দ্বীপ রাশিয়ার দখলেই রহিয়াছে। কিন্তু চুক্তিপত্রে রাশিয়ার দখলে থাকা সন্ধে নৌবহতা রুশ-মার্কিন সম্পর্কে আরও তিক্ত করিয়া তুলিবে মাত্র। চীনেব বাজা ফরমোসাকেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাব দখলে রাখিতে চায়। কিন্তু উহাব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

জাপ শাস্তি-চুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই চুক্তি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাপানকে একত্রিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থায় যোগদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আসলে জাপানের এই সার্বভৌমত্ব একটা কথাব কথা মাত্র। শাস্তি-চুক্তি বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপান স্বেচ্ছায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিতেছে, ইহার মত অসত্য আর কিছু নাই। জাপান আমেরিকাব দখলে রহিয়াছে এবং দখলে থাকার জগতই মার্কিন তাঁবোদার গবর্ণমেন্ট জাপানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিতেই এই গবর্ণমেন্ট শাস্তি-চুক্তি স্বাক্ষর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি করিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী জাপানের ভিতরে এবং চারি পাশে মার্কিন স্থল-সৈন্য, বিমান ও নৌবাহিনী রাখিবার অধিকার আমেরিকা লাভ করিল। এই বাহিনীকে স্বল্প প্রাচ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বক্ষার কাজে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত জাপান আর কোন রাষ্ট্রকে জাপানে খাঁটি স্থাপন করিতে দিবে না। জাপানে কি পরিমাণ মার্কিন সৈন্য রাখা হইবে, চুক্তিতে তাহা কিছুই বলা হয় নাই। আমেরিকা যে যত খুশী সৈন্য জাপানে রাখিতে

পারিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাপান শাস্তি-চুক্তিতে এইরূপ কথা অবশ্যই আছে যে, জাপান তাহার কম্যুনিষ্ট চীন অথবা চিয়াং কাইশেক বাহ্যিক সহিত ইচ্ছা চুক্তি করিতে পারিবে। কিন্তু জাপান যে চিয়াং কাইশেকের সহিতই চুক্তি করিবে, এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। কম্যুনিজম ধ্বংসের জন্ত রাশিয়া এবং কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত যুদ্ধ করার অভিপ্রায়েই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শাস্তি-চুক্তি করিয়াছে। এই যুদ্ধে এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে নিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যও এই চুক্তির মধ্যে পরিষ্কৃত। এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে লেলাইয়া দিয়া যদি কম্যুনিষ্ট চীন এবং রাশিয়াকে ধ্বংস করা যায়, তাহা হইলে এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসপত্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমেরিকার দৃষ্টিতে ইহারই নাম শাস্তি!

### রাশিয়াকে মুক্ত করিবার আয়োজন—

গত আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে জাখানীর মার্কিন-অধিকৃত অঞ্চলে ষ্টাটগার্টের নিকটবর্তী কোন এক স্থানে রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা ( Russian emigrant ) রুশদের বিভিন্ন পাঁচটি দলের এক গোপন সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনের স্থানের নামটি গোপন রাখা হইলেও উদ্দেশ্যটি গোপন রাখা হয় নাই। রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার একটি কেন্দ্র ইউরোপে স্থাপন করিবার জন্ত একটি পরিকল্পনা গঠন করাই ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা যে বিশ হাজার রুশ ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব এই সম্মেলনে নিজেদের মধ্যে সমস্ত মতভেদের অবসান করিয়া কম্যুনিষ্টদের হাত হইতে রাশিয়াকে মুক্ত করিবার জন্ত না কি একাবন্ধ কম্যুনিষ্ট গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহাদের এই একা কুরুপ দুটু ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না বটে, কিন্তু ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবের পর রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের জন্ত এইরূপ আয়োজন এই প্রথম। এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ১৯১৭ সালের অস্থায়ী রুশ গবর্নমেন্টের প্রধান মন্ত্রী আলেকজান্ডার কেরেনস্কী। ত্রিশ বৎসর পূর্বে যিনি রাশিয়ার জনগণের সমস্ত সমাধান করিতে নিজের অযোগ্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত করিয়াছিলেন, রুশ-জনমানসের পরিচয় রাখিতেও যিনি সমর্থ হন নাই, সেট কেরেনস্কী ত্রিশ বৎসর পরে রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের জন্ত সম্ভব প্রচেষ্টা করিতে কুরুপে উত্তোষী হইলেন, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়।

গত জানুয়ারী ( ১৯৫১ ) মাসেও এইরূপ একটি সম্মেলন হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্মেলনের মত তাহা সাকল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। রাশিয়া হইতে নতুন বাতারা আসিয়াছে তাহারা প্রগানতঃ সৈন্যদলভাগী এবং উদ্বাস্ত ( displaced persons )। তাহারা কেরেনস্কীকে নির্বিষ সমাজতন্ত্রী বাহুজীবী বলিয়া মনে করে। আবার কেরেনস্কীর দৃষ্টিতে তাহারা হয় রাজতন্ত্রী, না হয় ফ্যাসিষ্ট। কিন্তু রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা রুশদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতভেদ অপেক্ষা কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিয়া কুরুপ নতুন রাশিয়া গড়িয়া তোলা হইবে, তাহা লইয়াই গুরুতর মতভেদ। এই গুরুতর মতভেদের জন্তই গত জানুয়ারী মাসের ( ১৯৫১ )

সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু ব্যর্থ হইলেও উপায় নাই। রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদেব এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্নমেন্ট প্রত্যক্ষ ভাবে এই প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন না। রুশ-জনমুক্তির মার্কিন কমিটি ( American Committee for the Liberation of the peoples of Russia ) নামক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের এই আয়োজনের জন্ত অর্থ যোগাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্তা ইউজেন লিয়নস্ ( Engene Lyons )। একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র হইতে এই প্রতিষ্ঠান রাশিয়ার লৌহ-যবনিকার অন্তরালস্থিত জনগণের মধ্যে প্রচারণা-কার্য্য হো চালাইবেই, তা ছাড়া রুশ-জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্ত বিভিন্ন পত্রিকা ইত্যাদিও প্রকাশ করিবে। কাজেই কুরুপ নতুন রাশিয়া গঠিত হইবে তাহা লইয়া রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসা রুশদের মধ্যে মতভেদ হইলেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান তাহা শুনিবে কেন? কুরুপ নতুন রাশিয়া গঠিত হইবে তাহা পাবে কথা। আগে চাই রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদ এবং উহার জন্ত প্রথমই প্রয়োজন চলিয়া-আসা রুশদের একাবন্ধ প্রয়াস। এই জন্ত আগষ্ট মাসের ( ১৯৫১ ) শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আভ্যন্তরীণ মতভেদ দূর না হইয়া পারে নাই। কিন্তু ইহাতেই সমস্ত সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত মনে করে যে, ভারী তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে রাশিয়ার পরাজয় হইলে এই সকল চলিয়া-আসা রুশ দ্বারা রাশিয়ায় নতুন গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু রাশিয়ার পবাজয়ের জন্ত রুশ-জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষাব বিদ্য বলিয়া গণ্য করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। বেতার, পুস্তিকা ও পত্রিকার মাধ্যমে রুশ-জনগণের নিকট কি প্রচার করা হইবে? প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের ভগ্নাবশেষ এখনও হয়ত রুশিয়ায় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের সময় রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ইউক্রেন অঞ্চলে প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার কথা জানানরা প্রচার করিয়াছিল। তাহাদের এই প্রচারণা সত্য হইলে বলিতে হয়, জাখানীর আক্রমণাত্মক মনোভাব এই সকল অসন্তুষ্ট রুশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমর্থন আয়োজন, প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত পরমাণু বোমা, বিরাট নৌ ও বিমানবহন এবং রাশিয়ার চারি দিক বেঁধে রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট দেশে প্রতিষ্ঠিত মার্কিন সামরিক বাহিনী কম্যুনিষ্ট শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট রুশদিগকেও মুগ্ধ করিতে পারিবে কি? এইরূপ অসম্ভব রুশের সংখ্যা কত তাহা কেহই জানে না। কিন্তু তাহা রাশিয়ার জনগণকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধানে বাস করিবার লোভ দেখাইয়া কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারিবে কি আমেরিকার দখলে জাপানের অবস্থা তাহা চক্ষের সম্মুখেই দেখি পাউতেছে। কাজেই রাশিয়ার জনগণের নিকট চলিয়া-আসা রুশগণ কি উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদের আবেদন করিবে, সে সমস্ত বড় সহজ নয়। কেন্দ্রীভূত শাসনাধানে ইউক্রেন হইতে তাজিকিস্থান পর্যন্ত একাবন্ধ রাশিয়া আজ পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিবর্গ

অন্ততম। বস্তুতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত রাশিয়ার সমকক্ষ শক্তি আর নাই বলিলে ভুল হয় না। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্ততম শক্তিশালী রাশিয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত রুশ নাগরিক হিসাবেই কি রাশিয়ার জনগণের নিকট ষ্ট্যালিনকে অপসারিত করিবার জ্ঞান আবেদন করা হইবে? ইহাই যদি আবেদনের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে রাশিয়ার সোশালিজ্‌ড, শিল্প এবং ঐক্যবদ্ধ কৃষি-ক্ষেত্রগুলির (collective farms) কি হইবে? রাশিয়ার কি আবার বান্ধিগত মালিকানায় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গঠিত হইবে কিম্বা মালিক? উভার বিনিময়ে রুশ কৃষক ও শ্রমিক তাহাদের লব্ধ অধিকার ত্যাগ করিবার পথ প্রশস্ত করিতে রাজী হইবে কি? অবশ্য ঐক্যবদ্ধ রাশিয়ার ধারণা বর্জন করিয়াও আবেদন করা যাউতে পারে। বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু জাতি লইয়া সংযুক্ত সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (U. S. S. R.) গঠিত হইয়াছে। এই সকল সংখ্যালঘু জাতির মধ্যে মুসলমানও আছে। ঐক্যবদ্ধ রাশিয়ার পরিবর্তে এই সকল সংখ্যালঘু জাতির নিকট এবং মুসলমানদের নিকট আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের নামে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার আবেদন করা হইবে কি? কম্যুনিষ্ট শাসন উচ্ছেদ করিবার আবেদন করিতে হইলেই উল্লিখিত প্রশ্নগুলি না উঠিয়া পারিবে না। সংযুক্ত রাশিয়াই থাকিলে, না রাশিয়াকে গণ-বিরোধ করা হইবে, রাশিয়ার জনগণের কাছে ইহা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়? সর্বোপরি প্রশ্ন থাকিবে কম্যুনিষ্ট শাসন হইতে মুক্ত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে স্বাধীন হওয়ার প্রশ্ন।

উল্লিখিত প্রশ্নগুলির কোন সমাধান না হইলেও চলিয়া-আসা রুশদের চরণ প্রশস্ত গোপন পথে (Black high ways) রাশিয়ার লৌহ-যবনিকার অন্তরালে না কি প্রচার কার্য চালাইতেছে। রাশিয়ার অভ্যন্তরে বহু আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেল গঠিত হইয়াছে এবং চলিয়া-আসা রুশগণ এই সকল আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। শুধু রাশিয়া হইতে চলিয়া-আসাদেরই নয়, পূর্ব-ইউরোপের কম্যুনিষ্ট দেশগুলি হইতে চলিয়া-আসা লোকদেরও না কি বিভিন্ন দল গঠিত হইয়াছে। এই সকল দল এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের নিকট হইতে সাহায্য পায় নাই, কিন্তু সাহায্য পাওয়ার আশা তাহাদের আছে। এই আশায় তাহাদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু চলিয়া-আসা রুশদের চরণ যে-ভাবে গোপন পথে রাশিয়ার ভিতরে ঘাভায়াত করিতেছে, তাহাতে পশ্চিম-জাৰ্মানীতে কতকটা আশঙ্কার স্রষ্টা না হইয়া পারে নাই। তাহাদের আশঙ্কা, পশ্চিম-জাৰ্মানী হইতে গোপনে রাশিয়ার ভিতরে এইরূপ প্রচার-কার্য চলিতে থাকিলে এই অভ্যুত্থানেই রাশিয়া পশ্চিম-জাৰ্মানী আক্রমণ করিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার সত্যই কোন কারণ আছে কি না, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু রাশিয়া হইতে কম্যুনিষ্ট শাসনের উচ্ছেদের জ্ঞান মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় চলিয়া-আসা রুশদের এই আয়োজন, শুধু ঠাণ্ডা-মুন্ডের একটা নূতন রূপ বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। ভাবী তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামে রাশিয়া পরাজিত হইবে, এই আশার ভিত্তিতেই এই আয়োজন চলিতেছে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

## ইরাণের তৈলশিল্পের ভবিষ্যৎ—

ইরাণের তৈল-সমৃদ্ধ সমাধানের জ্ঞান বুটেনের লর্ড প্রীভি সীল মিঃ ষ্টোক্সের নেতৃত্বে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি দলের সহিত ইরাণ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি দলের যে-আলোচনা গত ১০ই আগষ্ট (১৯৫১) আরম্ভ হইয়াছিল, ২২শে আগষ্ট তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মিঃ হারিম্যান ও মিঃ ষ্টোক্স উভয়েই অবশ্য বলিয়াছেন যে, আলোচনা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, মৌমাংসার জ্ঞান আবার আলোচনা আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু আবার আলোচনা আরম্ভ করিবার জ্ঞান কে উত্তোগী হইবে—বুটেন, না ইরাণ, এই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে উল্লিখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি, সে-সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কি সত্ত্বে তৈল-সমৃদ্ধতার সমাধান হইতে পারে সে-সম্পর্কে আট দফা সম্বলিত এক প্রস্তাব গত ১৩ই আগষ্ট মিঃ ষ্টোক্স ইরাণ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি দলের হস্তে প্রদান করেন। এই আটটি দফা সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু গত ১৫ই আগষ্ট মিঃ ষ্টোক্স বৃটিশ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া যে বিবৃতি দেন তাহা হইতে বুঝা যায়, কি ভাবে তৈলশিল্প পরিচালিত হইবে, কি ভাবে তৈল বাজার-জাত করিতে হইবে এবং এংলো-ইরাণীয়ান অয়েল কোম্পানী কিরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে, তাহারই ভিত্তিতে আটটি দফা রচিত হয়। তৈল-শিল্প ইরাণ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ঐ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করণের নীতি স্বীকার করিয়াই এই প্রস্তাব রচনা করা হইলেও কাঙ্ক্ষিতঃ তৈল উৎপাদন ও বাজার-জাত করিবার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ কর্তৃক বহাল রাখাই এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ইরাণের তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হইলেও খিড়কি পথ দিয়া তৈলশিল্পের উপর বৃটিশ কর্তৃক কয়েম রাখিবার জ্ঞানই এই প্রস্তাব করা হয়। ইরাণ গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিবর্তে তিন দফা সম্বলিত এক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে বুটেনের নিকট তৈল বিক্রয় করিতে, উভয় পক্ষে দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইরাণ রাজী হওয়ার এবং তৈলশিল্পে বৃটিশ টেক্‌নেশিয়ানদিগকে বহাল রাখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর ২১শে আগষ্ট তারিখে মিঃ ষ্টোক্স এক নূতন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে আট দফার পরিবর্তে একটি মাত্র সত্ত্ব আছে। এই সত্ত্বটি হইল এই যে, ইরাণের নিয়ন্ত্রণাধীনে বৃটিশ ম্যানেজার কর্তৃক আবাদানের বৃটিশ কর্মচারিবৃন্দ পরিচালিত হইবে। এই প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া মিঃ ষ্টোক্স জানান, “চক্ষিণ ঘটনার মধ্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা আমি ফিরিয়া বাইব।” ইরাণ গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

মিঃ ষ্টোক্সের শেষ প্রস্তাবও আসলে তাহার আট দফা সম্বলিত প্রস্তাবের কেমোডোরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ ইরাণের তৈলশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব হইলেও বৃটিশ কর্তৃকই বহাল থাকিবে। যোগ্য পরিচালনের প্রশ্ন তুলিয়া, বুটেন ইরাণের তৈলশিল্পের উপর কর্তৃত্ব করিতে চায় এবং এই কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কাতেই বৃটিশ কর্তৃক চারীরাও ইরাণীদের অধীনে কাজ করিতে অস্বীকৃত। বৃটিশ প্রস্তাবের



স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরা বলেন —

# জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণই জাতীয় উন্নতির মূল

জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের উপর — তাই ভূমিট হওয়ার সময় থেকেই সন্তানকে নিরাপদে রাখা মা-বাবার কত ব্যা। চিকিৎসকেরা জানেন, প্রসবাস্তিক স্ত্রীতিকা-জরের পরিণাম খুব সাংঘাতিক; অথচ সন্তানসম্ভবা নারীরা এই বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রায়ই সচেতন নন। তাঁরা জানেন না যে এর দরুন তাঁদের একেবারে বক্ষ্যা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। প্রসবপথের ঝিল্লীতে অথবা মুখে ক্ষত হলে রোগ-জীবাণু সেখান দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে, আর তার ফলেই শরীরের রক্ত বিষাক্ত হয়ে স্ত্রীতিকা-জ্বর দেখা দেয়।

## সব সময় এক সিল্পি 'ডেটল' কাছে রাখবেন

রোগ-জীবাণু স্বেযোগ পেলেই আক্রমণ করে। এই চির-জাগ্রত সংক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে আপনার চিকিৎসক জীবাণুনাশক 'ডেটল'-এর উপর একান্তভাবে নির্ভর করেন। তাঁর পরামর্শ নিন এবং ঘরে 'ডেটল' রাখুন, আর চিকিৎসকের মতো আপনিও 'ডেটল' ব্যবহার করে সংক্রমণের বিতীষিকা থেকে আশ্রয়লা করুন।

### মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্তু :

'ডেটল'-এর ক্রিয়া মুহূ অথচ অব্যর্থ — এজন্তু মহিলাদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় এর তুলনা নেই। 'ডেটল' মানব-শরীরের পক্ষে অস্বস্তিকর কিন্তু জীবাণুর পক্ষে মারাত্মক। বিনামূল্যে 'মডার্ন হাইজিন ফর উইমেন' (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্তু লিখুন।



# 'DETTOL'

TRADE MARK



পিছনে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার লইয়া ব্রুটেন ও আমেরিকার মধ্যে যত বিরোধই থাকুক, ইরানের তৈলশিল্পে ব্রিটিশ কর্তৃক বিলোপ হওয়ার প্রতিক্রিয়া অস্ত্রাঙ্গ অনগ্রসর দেশে বিদেশী মূলধনের উপর কিরূপ হইবে, তাহা কি ব্রুটেন, কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না। বিশেষতঃ ইরানের তৈলশিল্পের উপর ব্রিটিশ কর্তৃক বিলোপ হইলে রুশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা মোটেই উপেক্ষার বিষয় বলিয়া তাতারা মনে করিতে পারে না। কাজেই তৈলশিল্পকে সত্য সত্যই রাষ্ট্রীয়ত্ব কবিরার দুর্গতির জঙ্ঘ ব্রুটেন এবং আমেরিকা উভয়েই যে ইরাণকে এমন শিক্ষা দিতে চাহিবে, যাহাতে অস্ত্র কোন দেশের একপ তুর্বাঙ্কি আর না হয়, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। উপযুক্ত টেকনেশিয়ানের অভাবে ইরাণেব তৈলশিল্প অচল হইয়া পড়িবে, এই যুক্তিটা যদি শেষ পর্যন্ত মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইরাণেব তৈল চালান দেওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিবার জঙ্ঘ অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে কি না, তাহা অনুমান করা সহজ নয়। পাবক উপসাগরে সে-সকল ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করা হইয়াছে সেগুলি কোন্ প্রয়োজনে ব্যবসৃত হইবে তাহা কে জানে? অবশ্য ইরাণেব আভ্যন্তরীণ সমস্যাও বড় কম নয়।

ইরাণের তিনটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের তুদে দলকে বে-আইনী করা হইয়াছে। এই দল তৈলশিল্প রাষ্ট্রীয়ত্ব করণের সমর্থক। কম্যুনিষ্টরা জাতীয়তাবাদীদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের অন্তরালে থাকিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ধনী ও ভূম্যপিকারী শ্রেণী ইহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারে নাই। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মতমদ মোসাদেকের জাতীয়তাবাদী দলের (Nationalist party) সদস্যরা সক্রিয়-সম্পন্ন পুঁজিপতি এবং ভূম্যপিকারী। সৈয়দ আবুল কাসেম এল-কাসাইনর ফিদাইয়ন-ই-ইসলাম দলটি গোড়া ইসলাম দল। এই দলের সদস্যরা সকলেই ইসলামের জঙ্ঘ প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই দলের জনৈক সদস্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আলী রাজমারাকে হত্যা করিয়াছে। ডাঃ মোসাদেক ইহাদের হাতে নিহত হওয়ারই আশঙ্কা করেন। ইরাণ মজলিসের অনেক সদস্য গোপনে ইঙ্গ-ইরাণীয়ান তৈল কোম্পানীর নিকট হইতে বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন। তৈল-শিল্পের উপর ব্রিটিশ কর্তৃক না থাকিলে ইহাদের এই বৃত্তি বন্ধ হইয়া যাউবে। এই জঙ্ঘই আপোষ মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার ইহার কারণ হইয়াছেন। এদিকে সম্মুখে আসিতেছে সাধারণ নিকরান। গবর্ণমেন্টের পরিবর্তন হইলেই তৈল-সমস্যার মীমাংসা ব্রুটেনের অনুকূলে হওয়া সহজ হইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশের অল্পকূল প্রস্তাব মানিয়া লইবার জঙ্ঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইরাণের উপর আরও বেশী চাপ দিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বিদেশী মূলধনকে সাদরে আমন্ত্রণ কবিরার পরিণাম কি হইতে পারে, ইরাণের তৈল-সমস্যা তাহার অভ্যন্ত প্রমাণ।

### ইঙ্গ-মিশর সমস্যা—

শুধু ইরাণেই নয়, মিশরেও ব্রিটিশ প্রভাব প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর সন্ধি পরিবর্তনের ব্যাপারেই

শুধু সমস্যা দেখা দেয় নাই, সুরেজ ক্যানাল অবরোধ লইয়াও নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। গত ২৬শে আগষ্ট (১৯৫১) মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশা ব্রিটিশকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিশর পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বে ব্রুটেন যদি নূতন এবং গঠনমূলক কোন প্রস্তাব উপস্থাপন না করে, তাহা হইলে সন্ধি পরিবর্তনের আলোচনা শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। ১৯৩৬ সালে যে ইঙ্গ-মিশর সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে এই মর্মে একটি বিধান আছে যে, ১০ বৎসর পরে পরাম্পরের সুবিধার জঙ্ঘ এই সন্ধির পরিবর্তন করা যাইবে। মিশর গবর্ণমেন্ট ১৯৪৬ সালে এই সন্ধির পরিবর্তনের জঙ্ঘ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আলোচনা কাসিয়া যায় এবং মিশর গবর্ণমেন্ট ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে নিরাপত্তা পরিষদে এই সমস্যা উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অতঃপর সন্ধি পরিবর্তনের জঙ্ঘ নূতন আলোচনার ক্ষুদ্রপাত হয় ১৯৫০ সালের নবেম্বর মাসে।

মিশর পার্লামেন্টেব নূতন অধিবেশন উদ্বোধন প্রসঙ্গে ১৬ই নবেম্বর (১৯৫০) মিশরের বাজা ফারুক যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সুরেজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত অপসারণ এবং মিশরের সহিত সূদান সংযুক্ত করিবার দাবী পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। মিশরের রাজার এই বক্তৃতার উত্তরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন ২০শে নবেম্বর (১৯৫০) তারিখে কমন্স সভায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নীতি ঘোষণা করেন। সুরেজ ক্যানাল হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত অপসারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা শুধু ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য এবং মিশরের সমস্যা নয়। অস্ত্রাঙ্গ দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্নও ইহার সহিত জড়িত। কমন্স সভায় তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে রক্ষা-ব্যবস্থাহীন হইয়া পড়িবে, এমন কোন ব্যবস্থা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সম্মত হইবেন না। সূদান সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সূদানীরা যথাসময়ে নিজেরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করিবে, এই নীতিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অবিচলিত আছেন। এই ঘোষণা সত্ত্বেও মিঃ বেভিনের বক্তৃতায় একটা আশার সুর মিশর ভূমিতে পাইয়াছিল, কারণ, তিনি এই আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শ্রায়সঙ্গত ভিত্তিতে ব্রুটেন এবং মিশরের মধ্যে একটা মীমাংসা হইতে পারে। মিঃ বেভিনের এই ঘোষণার পর নূতন আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পথ তৈয়ার হইল।

গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫০) লণ্ডনে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত মিশরের পররাষ্ট্র-সচিবের এক আলোচনা হয়। অতঃপর গত ১১ই এপ্রিল (১৯৫১) ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মিশর গবর্ণমেন্টের নিকট এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ১৯৩৬ সালের সন্ধিতে যে রক্ষা-ব্যবস্থার সর্ব আছে, তাহার পরিবর্তে নূতন ইঙ্গ-মিশর রক্ষা-ব্যবস্থার চুক্তির ভিত্তিতে এই প্রস্তাব রচিত হয়। মিশর গবর্ণমেন্ট ২৪শে এপ্রিল তারিখে এই প্রস্তাব সম্পর্কে যে উত্তর দেন, তাহাতে সুরেজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে ব্রিটিশ সৈন্ত অপসারণ এবং মিশরের সহিত সূদানকে সংযুক্ত করার দাবী পুনরায় উপস্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইহাতে অবশ্যই রাজী হইতে পারেন নাই, কিন্তু আলোচনার দ্বার খোলা রাখিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

দুসারে ৬ই জুন (১৯৫১) বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এক প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে রক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া স্থানান্তর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে আলোচনা চালাইতে অনুরোধ করা হয়। মিশর গবর্ণমেন্ট ৬ই জুলাই তারিখে উহার যে উত্তর দেন, তাহাতে তাহাদের পূর্ব দাবীর কোন পরিবর্তন করা না হইলেও আলোচনা চলিতে থাকে। এই অবস্থায় গত ৩০শে জুলাই (১৯৫১) বর্তমান বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মরিসন ইঙ্গ-মিশর সম্পর্ক সম্বন্ধে কমন্স সভায় যে বিবৃতি দেন, তাহাতেও সমস্তাটি আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। মিশর মনে করে, এই বিবৃতিতে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। অতঃপর গত ১৮ই আগষ্ট (১৯৫১) মিঃ মরিসন মিশরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক ব্যক্তিগত বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় বুটেনের নাই। মিশর বাহাতে আলোচনার দ্বার রুদ্ধ না করে তাহার জন্তও অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহার পর ২৬শে আগষ্ট তারিখে মিঃ নাহাশ পাশা যে বিবৃতি দেন, তাহাতে বৃটিশের নিকট 'নূতন এবং গঠনমূলক প্রস্তাব' দাবী করা হইয়াছে। এই দাবী অনুযায়ী বৃটিশ গবর্ণমেন্ট নূতন প্রস্তাব রচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বৃটিশ যে মিশর ছাড়িয়া যাইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে সুয়েজ ক্যানালে অবস্থিত বৃটিশ সৈন্ত-বাহিনীকে হযত কম্যুনিষ্ট-বিরোধী স্বাধীন দেশগুলির সম্মিলিত বাহিনীর অঙ্গ বা অংশ বলিয়া অভিহিত করা হইবে। হযত অগ্গাভ দেশের সৈন্তও নামে মাত্র কিছু কিছু থাকিবে, কিন্তু কার্যকরী শক্তি হিসাবে থাকিবে বৃটিশ সৈন্ত-বাহিনী এবং ইঙ্গ-মিশর চুক্তিকে উত্তর-আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে আঞ্চলিক চুক্তির রূপ দেওয়া হইবে। মিশর এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইবে কি না, সে-সম্পর্কে কিছু অন্তর্ধান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। কারণ, ইঙ্গ-মিশরীয় সন্ধি বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া মিশর ঘোষণা করিতে পারে, কিন্তু সুয়েজ ক্যানাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্ত বলপূর্বক অপসারিত করিবার ক্ষমতা মিশরের নাই।

সুয়েজ ক্যানালের ভিতর দিয়া ইজরাইলগামী বৃটিশ জাহাজ যাইতে না দিয়া মিশর ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের মধ্যে নূতন জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতেই মিশর সুয়েজ ক্যানালের পথে হাইফার তৈল শোধনাগারে তৈলবহনকারী জাহাজ যাইতে দিতেছে না। ইহাতে ইজরাইল এবং বুটেন দুইয়েরই ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু আব্বাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বৃটিশের কাছে হাইফার শোধনাগারের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইজরাইল মিশরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিসরে ইজরাইলগামী জাহাজ অবরোধ সম্পর্কে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। গত ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) নিরাপত্তা পরিষদে ইজরাইলগামী জাহাজ অবরোধের নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে এই অবরোধ তুলিয়া লইবার নির্দেশ দিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বুটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স এই প্রস্তাব উপাধন করিয়াছিল। আটটি দেশ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভারত, স্বাভাবিকভাবে চীন এবং রাশিয়া ভোট দেয় নাই। মিশর যে এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবে সে-সম্বন্ধে কোন ভরসা যেমন

দেখা যায় না, তেমনি নিরাপত্তা পরিষদে উক্ত বিষয়ের আলোচনার সময় রাশিয়া মিশরকে সমর্থন করায় কম্যুনিষ্ট-বিরোধীদের মধ্যে বিশ্বাসের সঞ্চার না করিয়া পারে নাই। ইঙ্গ-মিশর সম্পর্কের অবনতির সুযোগে মিশরকে রাশিয়া তাহার দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে, বুটেন এবং আমেরিকার পক্ষে এই আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। মিশরের কয়েকটি সংবাদপত্র এবং কয়েক জন রাজনীতিবিদ রাশিয়ার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। মিশর রাশিয়ার দলে যোগ দিবে, ইহা মনে করা কঠিন। মিশরে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হইলেও গত ছয় মাসে এমন কতকগুলি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, যাহারা না কি ব্যাপক ভাবে কম্যুনিজম প্রচার করিতেছে। কিন্তু এগুলিকে সত্যই কম্যুনিজমের প্রচাবক বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। আসল কথা, মিশরে জীবিকা নির্বাহের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে, মিশরীয় নেতারা দেশে এবং বিদেশে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেছেন, মিশরের রাজা ইউরোপের প্রমোদকেন্দ্রগুলিতে প্রচুর অর্থ লুটাইয়া দিতেছেন, কিন্তু মিশরের জনসাধারণ ছুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাউতেছে না। ফলে মিশরের সাধারণ মানুষের মনে যে তীব্র অসন্তোষ জাগ্রত হইয়াছে, এই পত্রিকাগুলি তাহাকেই মুখর করিয়া তুলিতেছে মাত্র।

### কম্যুনিজমের বিকল্প—

ব্র্যাকপুলে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে 'বিভানিজমের' সহিত সংগ্রামে মিঃ এটলাই জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক দল যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা সম্মেলনের উদ্বোধন দিবসে মিঃ ব্র্যাটের বক্তৃতায় বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। অঙ্গ-সঙ্ঘার প্রশ্ন লইয়া মতভেদের ফলে মিঃ বিভান বৃটিশ মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগের পর তাহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভানবাদ বা 'বিভানিজম' নামে এক নূতন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। বিভান তাহার 'একমাত্র পথ' (One Way Only) নামক পুস্তকে তাহার নীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃটিশ শ্রমিকদের মধ্যে বিভাগবাদ এত বেশী প্রসার লাভ করিয়াছে যে, বৃটিশ শ্রমিক দলের নেশনাল একজিকিউটিভের সদস্যরা অতিমাত্রায় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রমিক দল 'প্রথম কর্তব্য—শান্তি' (First Duty—Peace) শীর্ষক যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন যাহাকে আগামী পার্টি সম্মেলনের কার্যনীতির বিবরণী বলিয়া অভিহিত করা হইলেও উহা বিভানবাদের সমালোচনা এবং প্রতীবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এক বৎসব পূর্বে শ্রমিক দল 'শ্রমিক এবং নয়া সমাজ' (Labour and the New Society) নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় যে বিপুল আশাবাদের অভিযুক্তি দেখা গিয়াছিল, এক বৎসর পরে প্রকাশিত 'প্রথম কর্তব্য—শান্তি'র মধ্যে তাহার বিপুল-বিসর্গও দেখা যায় না। এই পুস্তিকায় অঙ্গসঙ্ঘার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ বিভানের সহিত শ্রমিক দলের বড়কর্তাদের বিরোধটার মূল কারণ অঙ্গসঙ্ঘা নয়। আসল বিরোধ অর্থনীতি লইয়া। কোরিয়া যুদ্ধ এবং কম্যুনিজম বিরোধের প্রয়োজনীয়তায় অঙ্গসঙ্ঘাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং অঙ্গসঙ্ঘার প্রয়োজনে 'নয়া সমাজ' গঠনের কার্যসূচীকে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত

স্থগিত বাধা হইয়াছে। ইহাতে বিম্মিত হইবার কিছুই নাই। হিটলারের অভ্যুদয়ের পর বৃটিশ শ্রমিক দল ফ্যাসিজম নিরোধের জন্ত সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিকে রুগিয়াছিল, এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক।

বিভানবাদকে দমন করাই বৃটিশ শ্রমিক দল এবং বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একমাত্র সনাত্তা নয়। পূর্ব-বালিনে অমুষ্ঠিত বিশ্ব-যুব সম্মেলনও শ্রমিক দলের কর্তাদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছে। জর্নৈক বৃটিশ যুবক পূর্ব-বালিনের বিশ্ব-যুব উৎসবে যোগদানের পর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় তাহার পিতা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিলেই সমস্তার সমাধান হইবে না, গোপনতার অন্তরালে থাকিয়া কম্যুনিজম আরও অধিকতর প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে, এই আশঙ্কা বৃটিশ শ্রমিক নেতারা উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। মিঃ রবার্ট তাঁহার বক্তৃতায় শুধু বিভানবাদের নিন্দাই করেন নাই, পূর্ব-বালিনের বিশ্ব-যুব উৎসব তরুণদের উপর যে রূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার প্রতিরোধের উপায়ও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "The time has come when we have to rally all our spiritual forces to wrestle for the souls of these boys and girls against the principalities and powers and rulers of darkness in high places, and we may lose the battle if we rely exclusively upon a programme of national defence in form of guns, and munitions of war" অর্থাৎ "উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অন্ধকারের শাসকবর্গ এবং শক্তির কবল হইতে আমাদের বালক-বালিকাদের আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্ত আমাদের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়োগ করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের জাতীয় রক্ষা-ব্যবস্থার কর্তৃপক্ষকে যদি যুদ্ধের জন্ত বন্দুক-কামান নির্ম্মাণের মধ্যেই আবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাইতেও পারি।" কিন্তু পূর্ব-বালিনের বিশ্ব-যুব উৎসব তরুণ-তরুণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে কেন, ইহাই কি প্রধান প্রশ্ন নয়? পূর্ব-বালিনে যে সময়ে বিশ্ব-যুব উৎসব হইয়াছে, সেই সময় মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়েও আর একটি বিশ্ব-যুব সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলন হইয়াছে মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে। পূর্ব-বালিনের বিশ্ব-যুব উৎসবের প্রতিবেদকরূপে এই সম্মেলন অমুষ্ঠিত হইয়া থাকিলেও বিশ্বের বিশ্ব হইবে না। কিন্তু মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে অমুষ্ঠিত এই বিশ্ব-যুব সম্মেলন বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয়? লণ্ডনের 'অবজারভার' পত্রিকার কুটনৈতিক সংবাদদাতা সেবাস্টিয়ান হাফনার দৃষ্টি করিয়া লিখিয়াছেন, 'পূর্ব-বালিনের তৃতীয় বিশ্ব-যুব উৎসব যে রূপ প্রচার লাভ করিয়াছে, মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব-যুব উৎসব সে রূপ প্রচার লাভ করে নাই।' কিন্তু তাহার দৃষ্টি করিবার কারণ নাই। প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব-বালিনের উৎসব বহুল প্রচার লাভ না করিয়া পারে নাই। কিন্তু ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রকৃত সমস্তা ঠাঁড়াইয়াছে কম্যুনিজম

মার্কিং যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিজম ধ্বংসের জন্ত বিপুল সমরায়োজন করিতেছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাশিয়া এবং নয়ান চীন ধ্বংস হইলেও আদর্শবাদ হিসাবে কম্যুনিজম ধ্বংস হইবে কি না চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাহা না ভাবিয়া পারেন না। তাহারা কম্যুনিজমের বিরুদ্ধ আদর্শবাদ কি হইতে পারে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। বৃটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক সদস্য Mr. Emrys Hughes বলিয়াছেন যে, কম্যুনিজমকে পরাজিত করিবার একমাত্র উপায় তাহার বিরুদ্ধ অর্থনৈতিক কর্তৃপক্ষী প্রদান করা। এই কর্তৃপক্ষীতে শ্রমিকদিগকে সত্যিকার আশা দিতে হইবে। কিন্তু কি এই কর্তৃপক্ষী? ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করার কথা, শ্রমিকদিগকে আশ্বাস দেওয়া, এই নূতন শোনা যাইতেছে না। বৃটিশ শ্রমিক দল গত ২৭শে আগষ্ট (১৯৫১) এক মেনিফেস্টো প্রকাশ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের জন্ত আন্তর্জাতিক উত্তমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীরা এখনও তাহাদের অধিকার বজায় রাখিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তাহাদের এই মেনিফেস্টো হইতে মনে হয়, সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের এবং প্রত্যেক দেশে ধনতন্ত্রবাদের রক্ষকে পরিণত হইয়াছে। ইহাই কি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধ?

যুদ্ধবিরতি আলোচনার অচল অবস্থা—

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনা গত ২৩শে আগষ্ট (১৯৫১) ভাস্কিয়া যাওয়ার পর পুনরায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসান হওয়ার কোন লক্ষণ এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। পূর্ব-দিন রাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিমান কয়েসওএর নিরপেক্ষ অঞ্চলে 'নাপালম' আগুনে বোমা বর্ষণ করিয়াছে, এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভাস্কিয়া দেওয়া হয়। ইহার আগে এবং পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য ও বিমানবাহিনী কর্তৃক কয়েসওএর নিরপেক্ষ অঞ্চল লঙ্ঘনের যে সকল অভিযোগ কম্যুনিষ্টরা উপস্থিত করিয়াছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল রীজওয়ে সেগুলি সমস্তই সরাসরি অগ্রাহ করিয়াছেন। অভিযোগগুলিকে নেহাৎ বানানো গল্প বলিয়া অগ্রাহ করিবার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে অভিযোগের বিবরণ সম্পর্কেও সামান্য কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮ই আগষ্ট তারিখে (১৯৫১) কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে সর্বপ্রথম অভিযোগ করা হয় যে, যুদ্ধবিরতির আলোচনা চলিতে থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিমান হইতে উত্তর-কোরিয়ায় বিসাক্ত গ্যাস বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। বিষবাস্প প্রয়োগের বিরুদ্ধে ৫ প্রবল জনমত রহিয়াছে, ইটালী-আবেসিনিয়া যুদ্ধের সময় তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর গত ১৯শে আগষ্ট কম্যুনিষ্টদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা হয় যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্য নিরপেক্ষ অঞ্চলে অবস্থিত কম্যুনিষ্টদের উপর গুলীবর্ষণ করা এক জন লোক আহত এবং এক জন লোক নিহত হইয়াছে ইহা 'যুদ্ধবিরতি চায় না' এইরূপ কোন রাজনৈতিক দলের কাণ্ড বলিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। ১৯ই আগষ্ট তারিখে অমুষ্ঠিত আরও একটি অভিযোগ এই যে, কম্যুনি

করা হয় এবং জাপানীরা ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু এই অভিযোগেরও কোন প্রতিকার হয় না। অবশেষে ২৩শে আগষ্টের পূর্ব রাত্রে কয়েসঙের নিরপেক্ষ অঞ্চলে আগুন-বোমা বর্ষিত হওয়াব পূর্ব কমান্ডিষ্টদের পক্ষে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালানো সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাগিয়া যাওয়ার পরও কয়েসঙ অঞ্চলের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হইয়াছে। ২৭শে আগষ্ট কমান্ডিষ্টদের পক্ষ হইতে এই অভিযোগ করা হয় যে, চীনের মূল ভূগণ্ডের উপর মার্কিন বিমান দুই দিন হানা দিয়াছে। আরও অভিযোগ করা হয় যে, কয়েসঙের নিরপেক্ষ এলাকায় গ্রেহরারত কমান্ডিষ্ট সামরিক দক্ষী দলকে হত্যা করিবার জন্য মার্কিন ও দক্ষিণ-কোরীয় সৈন্য উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। ১লা সেপ্টেম্বর (১৯৫১) পিকিং রেডিও হইতে বলা হয় যে, মার্কিন বিমান বার বার কয়েসঙের নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করিয়াছে। নিরপেক্ষতা ভঙ্গের অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার এখানে স্থানাভাব। কিন্তু জেনারেল রীজওয়ে অভিযোগগুলি শুধু সরাসরি অগ্রাহ্য করেন নাই, তিনি যে ভাষায় অভিযোগগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত রূঢ়। তিনি কেন অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় অভিযোগগুলি তদন্ত করিতে অস্বীকার করিলেন, তাহা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই অস্বীকৃতির ফলেই কমান্ডিষ্টদের পক্ষে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করা কঠিন

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষতঃ জাপান শান্তি-চুক্তি সম্মেলনের প্রাক্কালেই যুদ্ধবিরতি ভাগিয়া যাইবার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি হইল কেন?

কোরিয়া যুদ্ধে কমান্ডিষ্টরা হারিয়া যাইতেছে এবং যুদ্ধে বহু কমান্ডিষ্ট নিহত হইতেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবী সত্য হইলে কমান্ডিষ্টরা যুদ্ধবিরতি আলোচনা ভাগিয়া দিবার জন্য মিথ্যা করিয়া অভিযোগ তুলিয়াছে এ কথা স্বীকার করা যায় না। অচল অবস্থা জাপান শান্তি-চুক্তি সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অমুকুল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। আমেরিকা কমান্ডিষ্টদের ধ্বংস করিতে চায়। কোরিয়া যুদ্ধে বহু কমান্ডিষ্ট নিহত হইতেছে, ইহাই তাহার দাবী। সুতরাং যুদ্ধ চলিতে থাকিলে আরও বেশী করিয়া কমান্ডিষ্ট নিহত হওয়ার ফলে কমান্ডিষ্টরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং কমান্ডিষ্টদের নিরোধের কাজ অনেক সহজ হইবে, আমেরিকার মনে একপ ধারণা সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও বিশ্বয়ের বিষয় হইবে না। ৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) জেনারেল রীজওয়ে কয়েসঙ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য কমান্ডিষ্টদের নিকট আবার এক বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অভিযোগগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পিকিং বেতারে এই প্রস্তাবকে একটা কৌশল (trick) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।



যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ভারতবর্ষ পর্যটন

# সাময়িক প্রসঙ্গ

রাজাগোপালাচারী প্রেস বিল

“বুটিশ আমলে যুদ্ধকালে অথবা বিপ্লবের দিনে তাহাদের সাম্রাজ্য

রক্ষার স্বার্থে বেন-তেন-প্রকারেণ জনমত দাবাইয়া রাখিবার

জন্ত মুদ্রায়ন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রয়োজন ছিল। আজ আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছি বলিয়া বলিতেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যদি সরকারী ও কংগ্রেসী নেতাদের প্ররুত উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রায়ন্ত্রের উপর যত কিছু বাধা-নিষেধ আজও রহিয়াছে, সে সমস্ত অপসারিত করা উচিত। মুদ্রায়ন্ত্র সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হইলে গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। সংবাদপত্র বাহাতে বিশেষ বিশেষ ধনিকগোষ্ঠীর কবলিত না হয়, তাহা দেখাও গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের কর্তব্য। বুটেনে ‘লগুন টাইমস’কে ট্রাস্ট সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। বিলে এইরূপ কোন বিধান থাকিলে তাহা বরং দেশের উপকারে লাগিত। শ্রেষ্ঠ-সহায়তাপুষ্ট কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের নিকট হয়ত এতটা আশা করা অসম্ভব হইবে, কিন্তু বুটিশ শাসনের চরম অত্যাচারের দিনে প্রেস আইনেব যে সমস্ত বিধানের বলে এই নেতারা বিপন্ন হইয়াছেন, কাজে বাধা পাইয়াছেন, সেই বস্তুপাচা আইনগুলিকে আবার জীয়াইয়া তুলিবার প্রবৃত্তিটা অন্ততঃ তাহাদের সংযত করা উচিত ছিল। এটা লোকে অবশ্যই আশা করিতে পারে। প্রেস বিলটিকে জনমত সংগ্রহের জন্ত প্রচার করিবার দাবী করা হইয়াছে। রাজাজী উহাকে তাড়াতাড়ি কোন মতে সিলেক্ট কমিটি ঘুরাইয়া আনিয়া ক্রিট মেজরিটির জোরে পাশ করাইয়া লইতে চাহিতেছেন। স্বাধীন ভারতে সংবাদপত্র দমন আইনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। বিরোধী দলের পত্রিকাগুলিও এদেশে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে। কোথাও ভুল সংবাদ প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতিবাদ পাঠানো মাত্র পত্রস্থ করে। স্বাধীনতাব পর নিজেদের দেশ গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ সরকারী কর্তাদের যতটা আছে বলিয়া দাবী করা হয়, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের তদপেক্ষা বেশী ছাড়া কম নাই। সাংবাদিক বৈঠকে সম্পাদকমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ করিয়া গভর্ণমেন্ট আজ পর্যন্ত যতগুলি অত্যাচার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি তাহার রক্ষা করিয়াছেন। সংবাদপত্র সমূহ নিজেরা যেখানে গভর্ণমেন্টের সহিত যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতাব জন্ত যত্ববান, সেখানে তাহাদের হাতে নূতন করিয়া শিকল পরাইবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? কোন কোন সংবাদপত্র কোন কোন মন্ত্রী বা সরকারী কক্ষচারীর দুর্নীতি অথবা খেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিয়া দেন, ইহাকে সমগ্র গভর্ণমেন্টের উপর আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া না লইয়া যদি দুর্নীতি ও খেচ্ছাচারিতা অপসারণে যত্ন লওয়া হয়, তবেই তো আর কোন সম্ভব হয় না। প্রকাশিত সংবাদে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধনের ক্ষেত্র সব সময়েই

লাভ করিবার পরেও গভর্ণমেন্ট মুদ্রায়ন্ত্রের কর্তৃত্বের জন্ত এত উৎসাহী হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া লোকে ইহাই মনে করিবে যে, কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট দেশে ডিক্টেটরী প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। দুই-চারিটি সংবাদপত্র যদি সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে না চান, তবে সাংবাদিকরাই যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহাদিগকে সাংবাদিকতার মাত্রার মধ্যে রাখিতে সক্ষম হইবেন। কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট যদি সংবাদপত্রেরে অবিশ্বাস করেন, গায়ের জোরে, আইনের দাপটে মুদ্রায়ন্ত্র দাবাইয়া রাখিবেন বলিয়া মনে করেন, তবে খুব ভুল করিবেন। মেটরনিক, বিসমার্ক, রুশিয়ার জার বাহা পারেন নাই, চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী তাহা সাধন করিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।”

—দৈনিক বঙ্গমতী।

## বর্ধিত রেশন

“পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্ত্র রেশনের কর্তৃত্ব বরাদ্দ সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনর্বহাল হইবে, দৈনিক নয় আউন্সের স্থলে বার আউন্স করিয়া খাদ্যশস্ত্র দেওয়া হইবে, এই ঘোষণা কয়েক দিন পূর্বেই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত কে এম মুন্সী কলিকাতায় আসিয়া করিয়া গিয়াছেন। সেই ঘোষণা অমুয্যারী রেশনে প্রদত্ত খাদ্যশস্ত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট উত্তম হইয়াছেন, ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে রেশন দোকানগুলি হইতে বর্ধিত হারে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে রেশন গ্রহণকারীদের পক্ষে পরম সুসংবাদ। কিন্তু সত্ত্বপ্রচারিত একখানি প্রেসনোটে বর্ধিত রেশনের প্রকার সম্বন্ধে যে বিবরণ মিলিতেছে, তাহা তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কর্তৃত্ব রেশনে প্রতি সপ্তাহে এক সে-চাউল এবং এক সের গম পাওয়া যাইত। বর্ধিত রেশনে প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যাইবে এক সের চাউল এবং এক সের দশ ছটাক গম বা গমজাত দ্রব্য। ‘আব’ মার্কা অর্থাৎ তুলুভোজী বলিয়া চিহ্নিত ব্যক্তিগণের বর্ধিত বরাদ্দের ইহাই স্বরূপ ‘ডবলিউ’ মার্কা অর্থাৎ গমভোজী বলিয়া চিহ্নিত ব্যক্তিগণের বরাদ্দ হইবে দুই সের দশ ছটাক গম বা গমজাত দ্রব্য, তাহাতে চাউল কিছুই মিলিবে না। অথচ চাউলের অপ্রচুর বরাদ্দ লইয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অভিযোগ। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ভাত খাইতেই অভ্যস্ত। প্রতি সপ্তাহে এক সের মাত্র চাউলে ভাত খাইয়া কাটান তাহাদের পক্ষে কষ্টকর ও পীড়াদায়ক। সে কষ্ট ও পীড়ার কারণ বর্ধিত রেশনে দূর হইল না, চাউলের পরিমাণ এত আলোচনার পরেও পশ্চিমবঙ্গের রেশনে বৃদ্ধি করা হইল না ইহা সকলেই দুঃখেব সহিত লক্ষ্য করিবেন। অবশ্য চাউলে পরিবর্তে আটার ক্রটি খাওয়া ইতোমধ্যে একপ্রকার চালু হইয়া গিয়াছে। রেশনে গোড়ার দিকে যে আটা দেওয়া হইত, সে আটা খাইয়া পরিপাক করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হইত না, সে আটা দ্বারা চেষ্টা করিয়াও ভাল ক্রটি তৈয়ারী করা যাইত না, ইহা ছিল অভিযোগ। তত্পরি রেশনের আটার মধ্যে নানা প্রকার ভেজালের প্রাচুর্যের অভিযোগও উঠিয়াছিল। রেশনে আট বদলে গোটা গম দেওয়ার ব্যবস্থায় সেই সমস্ত অভিযোগ হইয়াছে এবং রেশনে প্রাপ্ত গম নিজেদের ইচ্ছামত ভাঙ্গাই আটা তৈয়ারী করিয়া খাইতে রেশন-গ্রহণকারীরা অভ্যস্ত হই উঠিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান গমের বরাদ্দ এক সেরের

হইয়াই তাহা লইতেন। কিন্তু বার্ষিক বরাদ্দ এক সের দশ ছটাকের সবটাই যে গোটা গম পাওয়া যাইবে, এমন কোন আশাস সরকারী ঘোষণায় নাই। প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, গম গমজাত দ্রব্য দেওয়া হইবে। 'গমজাত দ্রব্য' কথাটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা একটি অনির্দিষ্ট ব্যাপক অর্থবোধক সংজ্ঞা—এই প্রশ্ন উঠিতেছে। গমজাত দ্রব্যের মধ্যে জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, মাইলো ইত্যাদি শস্তও ধরা হইবে কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাই। মাইলো এ লাল জোয়ার যে বেশনে দেওয়া হইবে, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সীর উক্তিহীন তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কলিকাতার বিরুদ্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, তত্বলভোজীদের পক্ষে মাইলো উপাদেয় খাদ্যশস্ত্র এবং এই শস্ত বেশনে দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট বিদেশ হইতে আনীত শস্তের উপর নির্ভর করিয়াই বেশনের বরাদ্দ বৃদ্ধিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা প্রেসনোটে খুলিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু মাইলো, জোয়ার, ভুট্টা ও বাজরা ইত্যাদির কথা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন নাই,—গমজাত দ্রব্য বলিয়াই ব্যাপারটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গমজাত দ্রব্য বলিতে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট গোটা গম ছাড়া আর কি কি বস্তু দিবেন, বা দিতে পারেন, তাহা সময় থাকিতে সকলকে জানাইয়া দেওয়াই উচিত।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

### পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

“অধীকাব করিবার উপায় নাই, বাংলার ভৌগোলিক কাঠামোটাই পৰিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; দুই-দুই বার অঙ্গচ্ছেদের ফলে বাংলা আজ পশ্চিম-বাংলার স্বল্প-পরিসর আয়তনের মধ্যে কোনক্রমে টিকিয়া আছে। তাহাব আর্থিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকগণের বর্তমান সমস্যা এই ব্যাকুগ্রাউণ্ড মনে রাখিয়াই সমাধানের পথ খুঁজিতে হইবে। বিধ্বস্তপ্রায় অর্থনীতিকে সঞ্জীবিত করার পণ্ড প্রয়াসের মধ্যে সমাধানের পথ পাওয়া যাইবে না। কিংবা এই বিধ্বস্তপ্রায় আর্থিক কাঠামোর প্রত্যস্ত আঁকড়াইয়া যে-সব মধ্যবিত্ত কোন বকমে আপন অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর, তাহাদের আভ্যন্তরীণ স্বার্থ-সংঘাতের স্তম্ভ মৌমাংসার দ্বাবাও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ভাষণ সঙ্কটের সম্মুখীন, ইহা অনস্বীকার্য এবং এই কাবণেই বর্তমান সঙ্কটের যথাযথ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমস্যার উপলব্ধি করা প্রয়োজন। অজ্ঞা সমাধানের নামে সমস্যা আবও জটিল হওয়া বিচিত্র নয়। বিধ্বস্তপ্রায় অর্থনীতির পক্ষে উদ্বাস্ত সমস্যা একটি গুরুতর বোঝা সন্দেহ নাই। উদ্বাস্ত সমস্যার ঐতিহাসিক ব্যাকুগ্রাউণ্ড সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গের স্বল্প-পরিসর আয়তন এবং মূর্খ অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে এ রাজ্যের তথাকথিত আদিম অধিবাসীরাই যথার্থ কল্যাণ সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; সূত্রগাং উদ্বাস্ত সমস্যার যথার্থ সমাধানও যে প্রায় অসম্ভব, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, উদ্বাস্তগণকে খোদাইয়া দিলেই

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সহজতর হইবে। অর্থনীতিকে নতুন কাঠামোর মধ্যে ঢালিয়া সাজাই প্রাথমিক প্রয়োজন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ অপরিহার্য এবং অত্যাশঙ্কক। আঞ্চলিক প্রসারণও প্রয়োজন। সমবায়ী সংস্থার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ এবং সুসংহত জীবনযাত্রার প্রবর্তন করিতে হইবে। তবেই সমস্যার সমাধানের সূত্রটি হস্তগত হওয়া সম্ভব।”

—সত্যযুগ।

### রেলে এংলো-ইণ্ডিয়ান

“স্বাধীনতার পর শিয়ালদহ, বাণাবাট, নৈহাটি প্রভৃতি ষ্টেশনের এবং এই এলাকার রেলের গুরুত্ব খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা এখন সীমান্ত অঞ্চল, এখানে এখন দক্ষ এবং স্বদেশপ্রেমিক কন্মচারী মোতায়েন করা উচিত। প্রথমটা তাহাই কব হইয়াছিল। শিয়ালদহ ডিভিসনের সমস্ত উচ্চপদে ভারতীয় অফিসার বসানো হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের কমনওয়েলথ ভুক্তির পর হাওয়া ঘুরিয়া গেল। উচ্চপদস্থ প্রায় সমস্ত ভারতীয় অফিসারকে সরাইয়া এংলো-ইণ্ডিয়ানদের নিযুক্ত করা হইল। ইহার ফল কি হইতে পারে একটি ঘটনায় তাহা বিশেষ ভাবে বুঝা গেল। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাবত সরকার পাকিস্থানের ব্যবস্থার বিব্রত হইয়া কয়লা বন্ধ করিলেন। রেলের চীফ কমিশনার বাখলে কলিকাতা হইয়া আসাম যাওয়ার সময় ষ্টেশনে কয়লাব মালগাড়ী দেখিয়া বলিয়াছেন যে, উহা যেন না যায়, দুই-এক দিনের মধ্যেই গাড়ী বন্ধ করিবার লিখিত আদেশ আসিবে। বাখলে আসাম যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহের



অবনোদনাথের জন্ম-বার্ষিকীতে গৃহাত আলোকচিত্র।

শিল্পাচার্যের পাশে শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়।

এংলো-ইণ্ডিয়ান ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মালগাড়ী রওনা করিয়া দিলেন। নৈহাট্টাব সহকারী স্টেশন-মাষ্টার উজা আটকাইলেন। সম্বাদ পাঠিয়া ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্বয়ং নৈহাট্টা ছুটিলেন। সহকারী স্টেশন-মাষ্টার তাঁতাকে বলিলেন যে, চীফ কমিশনার গাড়ী ছাড়িতে মৌখিক নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, ডি-এস-এব লিখিত আদেশ ভিন্ন তিনি গাড়ী ছাড়িবেন না। ফিবিস্কিপুঙ্গব অতটা সাহস পাইল না। গাড়ী আটকাইয়া গেল। ইতাব পব ফিবিস্কিয়া সংযত হয় নাহি, বরং ইতাদের সাহস আবও বাড়িয়া গিয়াছে। বেলেব তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ এংলো-ইণ্ডিয়ানদের দখল করিয়াছে—(১) ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (পার্সোনাল), সমস্ত কন্সটাবলের নিয়োগ এবং বদলী ইতাব হাতে। কাবমুড়ি নামক এংলো-ইণ্ডিয়ান বর্তমানে এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। (২) ডিভিসনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, শিয়াদহত। ইনি শিয়াদহত এলাকায় সীমান্ত বেলেব সফলক কন্সটাবল। গত দিন প্রভ পড়ে ছিলেন বাথগেট, এখন আসিয়াছেন গিলান। (৩) সুপারিন্টেন্ডেন্ট বোলিষ্টক। ইঞ্জিন, মালগাড়ী, যান্ত্রিগাড়ী প্রভৃতি সমস্ত ইতাব হাতে। এই পদে এখন আছেন ডানিয়েল। এংলো-ইণ্ডিয়ানদের পুষ্টিতা কত দূর পর্যন্ত গিয়াছে তাব একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। বেব-স্টেশনগুলিব শ্রেণীবিভাগ আছে। বাণাঘাট ছিল 'সি' শ্রেণীর স্টেশন, স্বাধীনতাব পব ইতাব গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় উতাকে এখন 'এ' শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল।

ইংরেজ আমলে বেলে ইংরেজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের জগা ভাল বাড়ী এবং নেটিভ ভাবচায়দের জগা বাড়ী নামক থোপ তৈরী হইত। গলষ্টন নামক এক জন লোকো ইনস্পেক্টর বাণাঘাটে বদলী হইয়া গিয়াছেন। সেখানকাব ইউরোপীয়ান টাইপ বাড়ীতে ট্রাফিক ইনসপেক্টর গুপ্ত বাস করেন। গলষ্টন নেটিভ কোয়ার্টার থাকিবেন না, তিনি গুপ্তকে সবাইয়া এই বাড়ীতে ঢুকিবে চাহিলেন। গুপ্ত পশমখাদ্যাদা-বলে এই বাড়ীতে থাকিতে অধিকারী। তিনি বাড়ী ছাড়িতে আপত্তি করিলেন। গলষ্টন ঢালাক লোক, আব বেশী ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়া নীচেব তলায় থাকিলেন। কলিকাতা হইতে পবিবাব লইয়া বাণাঘাট যাইতে গলষ্টনের ইচ্ছা ছিল না বলিয়া ইতা সম্ভব হইল। ইতাব পব ক্যামেবণ নামক এক চেড ট্রেন এগজামিনাব বাণাঘাট বদলী হইল। ইতাব পরে এক জন বাঙ্গালী এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি আগব গ্রহণ কবায় ক্যামেবণ সেখানে বদলী হইয়াছে। ইনি ভাস্ত্র মাসে বাড়ী ছাড়িতে চান না বলিয়া ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত এই বাড়ীতে থাকিবাব অনুমতি চাহিয়াছেন। এটি ভারতীয় টাইপ বাড়ী। ক্যামেবণেব চামড়া সাদা, এক জন ভাবতীয়ের পর এই পদে আসিলে কি হইবে, চেড ট্রেন এগজামিনাবের কোয়ার্টার তাহার পছন্দ হইল না। একেবাবে স্টেশন-মাষ্টারের বাড়ীৰ উপব তাহার নজব পড়িল। চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজার ক্রীজে, এন, দাস জানাইলেন যে, ওখানে যিনি আছেন তিনিই থাকিবেন। ক্রীযুক্ত দাসেব সন্ধিপ্ত মন্তব্যে কর্তারতাব স্বব লক্ষা করিয়া ক্যামেবণ বৃষ্টি আব ঘাঁটাওয়া লাভ নাই। সে তখন নৈহাট্টাব একটি ইউরোপীয়ান টাইপ কোয়ার্টারের উপর নজর দিল। নৈহাট্টা 'এ'

গ্রেড স্টেশন। ডেপুটি চীফ কমার্সিয়াল ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে এই চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। বাণাঘাটে কুপার ক্যাম্পের কাছে তিন-চারিটি ইউরোপীয়ান বাংলা আছে, সহর হইতে দূরে বলিয়া সে সেখানে যাইতে চায় না। বাণাঘাটে ক্যামেবণের পছন্দ মত বাড়ী ছুটিল না বলিয়া এবার এক মোক্ষম চাল দেওয়া হইল। কলিকাতায় চাঁৎপুর ইয়াড 'বি' গ্রেড স্টেশন বলিয়া পরিগণিত। এখানে একটি চমৎকাব ইউরোপীয়ান টাইপ কোয়ার্টার আছে। ক্যামেবণের নজব এই বাড়ীটির উপর পড়িল। কিন্তু 'এ' গ্রেড স্টেশনেব কন্সটাবল 'বি' গ্রেড স্টেশনে বদলী হইতে পারে না। ধূর্ত কারমুড়িব বুদ্ধি খেলিল—বাণাঘাটকে 'বি' গ্রেড এবং চাঁৎপুরকে 'এ' গ্রেড স্টেশন বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সূতবাং 'বি' গ্রেড বাণাঘাটের ফিবিস্কিকে চাঁৎপুরেব বাড়ী দেওয়া গেল। অর্থাৎ একটা ফিবিস্কিকে পছন্দ মত বাড়ী পাওয়াইয়া দেওয়াব জগা বাণাঘাটের তায় একটি ট্রাফিক কন্সটাবল স্টেশনের গুরুত্ব কমাইয়া দেওয়া হইল! ভাবত-পাকিস্তান যুদ্ধ অসম্ভব না হইতে পারে, স্বয়ং নেহরু ইতা তাঁহার গত প্রেস কনফারেন্সে বলিয়াছেন। যদি যুদ্ধ বাধে তখন বাণাঘাট সৈন্য ও বসদ সবববাহেব একটি প্রধান বাঁটি হইবে ইতাকে সন্দেহ মাত্র নাহি। জাতীয় জীবনেব এই সন্ধিক্ষণে বাতাব একটা এংলো-ইণ্ডিয়ানেব আবদাব বক্ষার জগা এই স্টেশনের গুরুত্ব কমাইয়া দিতে পারে তাহাদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয় এবং এক মুহূর্তেব জগা বেলেব গুরু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত বাথা দেশেব পক্ষে মাঝামাঝি ক্ষতিকর হইতে পারে। এংলো-ইণ্ডিয়ানবা মাইনবটি বলিয়া তাহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশেব অনিষ্ট কবিয়া ইতাদিগকে মাথায় তুলিয়া নাচিতে হইবে, এমন কোন সত্ত মানিতে আমবা রাজী নই।”

—যুগবাণী।

### বর্ধমানের ভূভিক্ষ!

“গঙ্গা অঞ্চলের চাষীদের অবস্থাটা হয়েছে ভাগের মায়েব মতন। গঙ্গার ওপরে থেকেও তারা গঙ্গা পাচ্ছে না। বর্ধমান সীমানাব লোকগুলো পাছে চোরাকাববারে মেতে চরিত্র নষ্ট করে বসে, তাই ১৫ সের খাবার চালও তাদের কার্টোয়া-পাইহাটের বাজার হতে নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। আব ওপারের ওরা তো ডাকসাইটে চরিত্রহীন, তার ওপর নদে জেলার লোক, অতএব তাদের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার দায় কারো নাই। “ঘরেও নহে পবেও নহে—যে জন আছে মাঝখানে” বেচারাদের অবস্থা হয়েছে ত্রিশছুর মত।—বর্ধমানে: এরা বলছে, “গায়ে গায়ে সস্তা চালের দোকান খুলে রেশন কার্ড-পিছু চাল বিলি করে বাঁচাও আমাদের।” সরকার বলছেন:—“অশান্তি হয়ে দেব না,—মরো তাতে ক্ষতি নেই। আর চালের ডিলাবী করার জং লাইসেন্স দিতে পারব না। তবে যদি তোমাদের বৈধ্য থাকে তাহলে যে গায়ে মৃত্যুব বান ডেকেছে, সেখানে বিশেষ ব্যাপার হিসাবে দখল কবে দশ মণ পর্যন্ত চাল দিতে পারি—তাও সস্তা দরে নয়, যখন হ বাজারদর হবে, সেই দরে।” তিন হাজার লোকের গায়ে দশ ম চাল! লোকগুলো বোকা হলেও কংগ্রেসী অফিসারদের মত তার কানা নয়। অতএব গঙ্গা-বাহুর গিয়ে এবার ঘটি-বাটিও শেষ হচে চলেছে—চোরাবাজার জিন্দাবাদ! “পেট চালাই না চাষ চালাই

অবস্থায় পড়ে চাষের দিকে নজর দেবার সঙ্গতি হচ্ছে না। কৃষি-  
রূপ দিয়ে সস্তা চালের দোকান খুলে—কে এদের বাঁচাব দায়িত্ব  
নেবে? তার চেয়ে কমিউনিষ্টদের পেছনে পাওয়া কবে বাস্তবকার  
দায়িত্ব অনেক জরুরী। শ্রাবণের গৈয়ো পথে কোমব-ভর্তি কাদার  
বদলে ধূলা ওড়ে।—চাঁচ নেই, মুনিসের কান্ড নেই, চোখের সামনে  
দিয়ে বাইফেল পাঠাবায় মুখে গ্রাস গাম ততে বিদেয় নিয়ে যায়—  
উলঙ্গ, হাড়পাঁজবা বেব কবা মাল্লসগুলো তা-পিত্তাশে চেয়ে থাকে।  
হঠাৎ বুকফাটা কান্নার আর্দ্রনাড়ে চাবি দিকের বাতাস জমাট বেঁধে  
যায়। পঙ্কানদের ছেলোটো মাথা গেল। বোগের কথা জিজ্ঞাসা  
কবছেন? বোগ—অনাচার। গাঁসের মাথায় শকুন ওড়ে, পঞ্চাশের  
আকাল এবাব ঠেকায় কে? কংগ্রেসী বাইফেলের কড়া পাহারায়  
এবাব পঞ্চাশের আকাল ছড়িয়ে পড়বে গাঁয়ে গাঁয়ে। লক্ষ্য বালাই  
নেই—ল্যাংটা হঠেই তেঁ সবাই জয়েছে—তাঁই ল্যাংটা হয়ে, পেট  
কোলে ক'বেই যেতে হবে। শকুনের মস্তব গতিতে—এগিয়ে আসা  
মবণের আহ্বান।”

—বর্দ্ধমানের ডাক।

### ট্যাক্স বৃদ্ধি

“এসেসব মহাশয় এবাব মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ত্রিগুণাধিক  
বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি কাহার ইচ্ছিতে চক্ষুলক্ষ্য ত্যাগ করিয়া  
অসম্ভবকে সম্ভব কবিলেন? বাতাবা বাড়ী ভাড়া দেয়, তাহাদের  
ট্যাক্স বৃদ্ধিতে কেহ আপত্তি করে না। বিশেষতঃ এখন ভাড়া তাব  
ত্রিগুণাধিক। কিন্তু বাতাবা এত দুর্দ্ধিনে অন্ন-বস্ত্রাভাবে ভীর্ণ-শীর্ণ,  
তাহাদের এত ট্যাক্স বৃদ্ধি হয় কি হিসাবে? তাহাব উপব বাতাবা  
ট্যাক্স বৃদ্ধি দবখাস্ত সুনানী কবিয়া সেট হারই বজায় বাখিয়াছেন,  
তাহাদের স্বয়ং এবং তাহাদের বন্ধু-বান্ধবদের ট্যাক্সের তুলনা করিয়া  
তাহারা কি তাহাই বজায় বাখিয়াছেন? নেহাং নিলক্ষ স্বাধপর  
না হইলে কখনই জনসাধারণের এ সর্বনাশে কেহ আনন্দ লাভ করিতে  
পাবে না। তাহাদের বাড়ীর ট্যাক্সের তুলনা করিয়া দেখিলে আসল  
সত্য ধরা পড়বে। আমরা আশা করি, নবীন চেয়ারম্যান ভাইস-  
চেয়ারম্যান এ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণের আবেদনে কর্পাস  
কবিলেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে জনসাধারণের পত্র প্রকাশিত হইতে  
আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ভদ্রলোকের ট্যাক্স বৎসরাধিকও  
না কি বাকি আছে, আদায় হয় নাই। এবং আদায়কারী মিউনিসি-  
প্যাল কর্তৃপক্ষের উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে গালি দিয়া তাড়াইয়া  
দেন। ইহা কি সত্য? এতাবৎ কাল পুরাতন চেয়ারম্যান ভাইস-  
চেয়ারম্যান এ বিষয়ের প্রতিকার করেন নাই কেন? তৃতীয়তঃ,  
এবার কাহার কত ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্বানুপাতে তাহা কত,  
তাহার তালিকা চেয়ারম্যান মহোদয় প্রকাশ করিবার আদেশ দিবেন  
কি? যদি অসম্মতি দেন, তবে আমরা পারাবাহিকরূপে প্রকাশ  
করিব। এবং ট্যাক্স কাহার কত বাকি আছে তাহারও জায় দিলেও  
তাহা প্রকাশিত হইবে। মিউনিসিপ্যালিটির গলদ অনেক। মিউনি-  
সিপ্যাল সম্পত্তির লিষ্ট কি নতুন বোর্ড মিলাইয়া লইয়াছেন? পুরাতন  
চেয়ারম্যানের নামে কর্টেজ দবে যে সব জিনিষপত্র আসিয়াছিল,  
সেগুলি কোথায় গেল? তাহার সংবাদ জানা নবীন বোর্ডের চেয়ারম্যান,  
ভাইস-চেয়ারম্যানের প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ অবহিত হইলে পর পর  
অসংখ্য অনেক বিষয় জানাইব।”

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

### প্রতিজ্ঞা

“ইংবাজদের হাত থেকে কংগ্রেসের হাতে সমস্ত আসাব ৪ বৎসর  
আত্মস্থানিক ভাবে পূর্ণ হলো। যদিও বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের  
হঃশাসন প্রায় মাড়ে পাঁচ বছর হ'তে চললো। এই হঃশাসনের  
সর্বনাশা পবিণাম লিখে জানাবাব কোন প্রয়োজন নেই। অন্ত্রাভাব,  
বস্ত্রাভাব, চিকিৎসাভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। নারী ও  
শিশুর হত্যা উপবাপে অপবাদী এই সরকারের অগণতান্ত্রিক কার্যের  
ফিবিষ্টি লিখে শেষ করা যায় না; আর তাব উপব স্বাধীনতা  
সর্বশেষ নিদর্শন প্রতিবাদ করার অবিকার হবণ কবে শাসনতন্ত্র  
সংশোধন। এই ছুরাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনতাব প্রথম  
প্রতিবাদ ঘনিত হয় ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ-কলিকাতাব উপনিধাচনে  
শরৎ বাবুর বিজয়ে। সেট প্রতিবাদ শান্তিশালী হয় হাওড়া  
মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চন্দ্রনগর পৌরসভাব নিবাচনে। বাংলাব  
মচেতন জনতা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাবের প্রতিবাদকে সম্মিলিত  
প্রগতিশীল রূকেব মধ্যে রপায়িত কবছে, সংগঠিত কবছে। বাংলাব  
জনসাধারণের দাবীতেই আজ সমস্ত বামপন্থী দল, প্রগতিশীল সংস্থা  
ও ব্যক্তি মিলিত কমন্সফ্রন্ট ভিত্তিতে এগিয়ে চলেছে—এই মিলিত  
কমন্সফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য, এই স্বৈরাচারী সরকারের শাসন গতম করে  
জনগণের প্রকৃত সরকার প্রতিষ্ঠা কবতে হবে—যে সরকার বর্তমান  
মুনাফাবাজী অর্থনীতিকে ভেঙ্গে ফেলে জনকল্যাণকামী মাদারগণের



রামকৃষ্ণ মিশনের নব-নির্বাচিত সভাপতি স্বামী শঙ্করানন্দ



প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। প্রত্যেকটি মানুষকে সুখে বেঁচে থাকবার সুযোগ দেবে, সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আজ এই ৪ বৎসরের মেকী স্বাধীনতার অত্যাচারে নিষ্পেষিত বাংলার প্রত্যেকটি নব-নাভীর কাছে আমাদের আবেদন এই স্বৈরাচারেব অবসান করার শপথ গ্রহণ করে আগামী নির্বাচনে সম্মিলিত প্রগতিশীল ব্লকে শক্তিশালী করে তুলতে ও বিজয়ী করতে নিজেবা সক্রিয় ও সংগঠিত হোন। আজ বাংলার জনসাধারণেব এ হলো জীবন-মরণ সমগ্রা।”

—চলিশ পরগণার ডাক।

### কাহাকে ভোট দিব !

পূর্বে কংগ্রেসে ত্যাগী পংচবিত্র ও নিষ্ঠাবান কর্মীদের সংখ্যাধিক ছিল, কিন্তু এখন কংগ্রেসে শুধু স্বার্থসরস চরিত্রহীন ভাগ্যবেষীদের আচ্ছাদ। যজ্ঞের আসরে এখন অপদেবতাবা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। অগ্নি আনরা একথা বলিতেছি না কংগ্রেসে খাটি লোক নাই। আছে বলিয়াই এখনও প্রতিষ্ঠান টিকিয়া আছে। প্রতিষ্ঠানের বিচ্যেব হয় বাহারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তাহাদের চরিত্র দ্বারা। কংগ্রেসে আজ দুর্নীতিপরায়ণ লোকেবই প্রাধান্য। কাজেই কংগ্রেসে সরসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দুঃস্থ-স্বরূপ কাছাড়ের কংগ্রেসের বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। বর্তমানে কাছাড় জিলায় বাহারা কংগ্রেসের কর্ণধার, জাঁহাদের অনেকেবই কংগ্রেসেব সঙ্গে কশ্মিন্ কালেও কোন সম্পর্ক ছিল না। কেহ পুরুষায়ক্রমে ভারতেব স্বাধীনতা-সংগ্রামেব বিবোধিতা করিয়া আসিয়াছেন, কংগ্রেস কাষ্যোপলক্ষে স্বগৃহে আগত নিরপরাধ ও অহিংস কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মাথা ফাটাইয়া অতিথিপবায়গতা ও দেশভক্তিব পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিয়াছেন। কাহাবও সূতা চুবি, মিলিটারী কন্ট্রোল্ট, ব্ল্যাক মার্কেটিং প্রভৃতির উজ্জ্বল বেকর্ড আছে; আবার কাহারও বিরুদ্ধে ব্যাস্তেব টাকা মাথা, জাল, প্রতাবণা প্রভৃতিব অভিযোগ খুলিতেছে, কেহ বা ৪২এব আন্দোলনে নাকে খত দিয়া কারামুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং এই প্রকাষে নিজেব তথা কংগ্রেসের সুনাম বৃদ্ধি কবিয়াছেন। এ-তেন গোববময় ঐতিহ্যেব অধিকারী যে প্রতিষ্ঠানেব কঙ্ককর্তৃগা, সে-প্রতিষ্ঠানেব প্রতি জনসাধারণ যদি শ্রদ্ধায় লুইয়া না পড়ে অথবা এই সব কবিতকথা পুরুষরা যদি স্বয়ং নির্বাচন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন অথবা কংগ্রেসেব মার্কী দিয়া যে কোন প্রার্থীকে যদি নির্বাচনেব আসবে সামাইয়া দেন এবং জনসাধারণ যদি কংগ্রেসের নামে শ্রদ্ধাবিগলিত চিত্ত হইয়া তাহাদিগকে ভোট না দেয় তবে কি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়? কাজেই আমাদের বক্তব্য—কংগ্রেস অথবা অন্য যে কোন দলই প্রার্থী দাঁড় করান না কেন,

প্রার্থীর যোগ্যতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। এইবার কোন প্রতিষ্ঠানের নামেই বাজে মাল চালানো যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, মনোনয়নের বেলায় প্রার্থীর অতীত ও বর্তমান কার্যাবলী, শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্রবল, কঙ্কক্ষমতা, স্বদেশায়ুযাগ ইত্যাদির বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। নির্বাচকমণ্ডলীরও কর্তব্য হইবে কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্ধ ভক্তিব বশবর্তী না হইয়া উপরিউক্ত মাপকাঠিতে বাহারা যোগ্য বিবেচিত হইবেন কেবল তাহাদিগকেই ভোট দেওয়া।

—জনশক্তি।

### পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভা

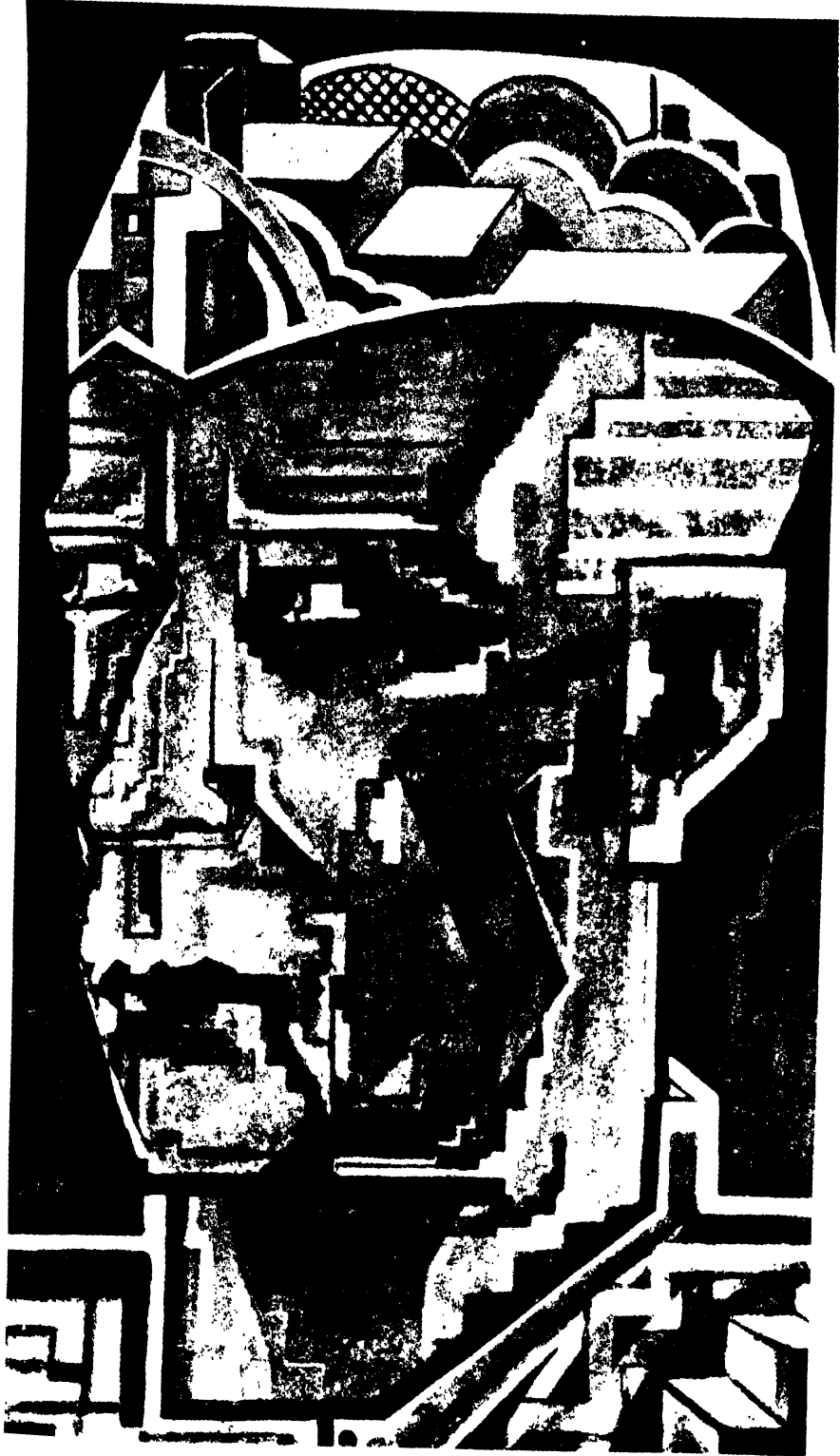
কবি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাভূটী গত ১৫ই আগষ্ট পরলোক গমন কবেন। বাঙলা ১৩০২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর্বে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। বাংলাবস্থায় কলিকাতায় তিনি গির্জাশিক্ষা কবেন। অসহযোগ আন্দোলনেব সময় তিনি সবকারী কাজ



ত্যাগ কবিয়াছিলেন। তিনি পাইকপাড়া মণীন্দ্র শ্রুতি বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শেষ বয়স পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি সিংধি বৈষ্ণব সাংঘলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ছিলেন। সাহিত্যিক, বাগ্মী এবং শরম বৈষ্ণব হিসাবে তিনি বাঙলায় পরিচিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের আত্মা শান্তি লাভ করুক।

### সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, “বসুমতী রোটারী মেসিনে” শ্রীশশীভূষণ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

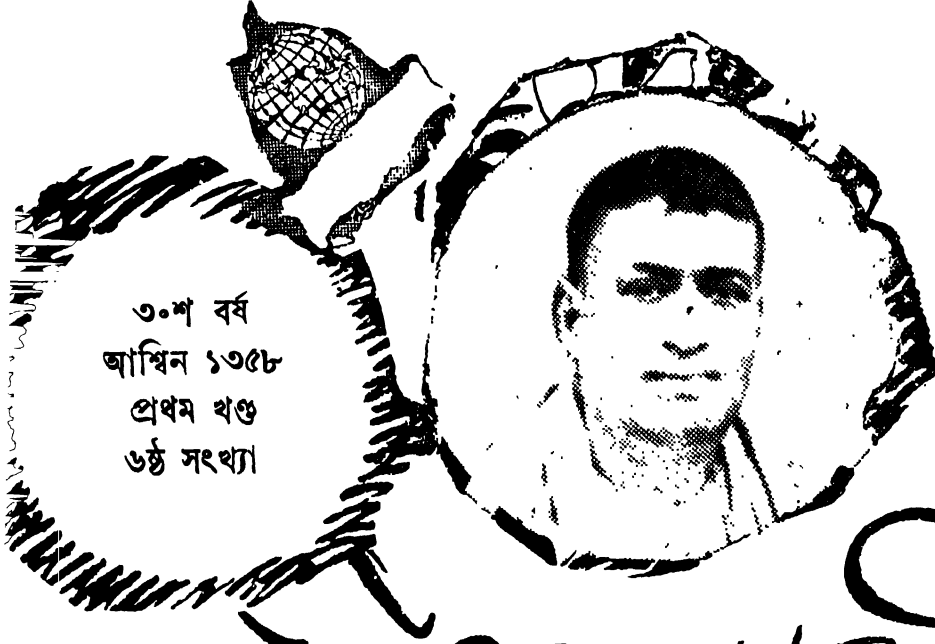


স্বাধীন ভারতবর্ষের স্থপতি—জওহরলাল

—শ্রীমতী ঠাকুর আঁকিত



সত্যশচন্দ্র যুথোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



৩০শ বর্ষ  
আশ্বিন ১৩৫৮  
প্রথম খণ্ড  
৬ষ্ঠ সংখ্যা

# জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধি

কথা য় ত

“যত জ্বীলোক সব শক্তিরূপা। সেই আত্মশক্তিই  
জ্বী হয়ে, জ্বী রূপ ধরে রয়েছেন।”

“যে ব্যক্তি জনশূন্য মাঠের মাঝে ঘোড়শী যুবতীকে মা  
বলে চলে যেতে পারে, সেই প্রকৃত তাগী ব্যক্তি।”

“সর্বদা মনে সদস্য বিচার করবে। বিচার ক’রে সংকে  
গ্রহণ ও অসংকে ত্যাগ করবে।”

“লোক—পোক। মানুষ বলতেও যতক্ষণ, মন্দ বলতেও  
ততক্ষণ, সুতরাং তাদের কথায় কাণ না দেওয়াই উচিত।  
মানুষের যশ ও নিন্দা উপেক্ষা করে ঈশ্বর-পথে অগ্রসর হবে।”

“জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি জ্বীলোক। ঈশ্বরের বাহির বাটী  
পর্যন্ত জ্ঞান যেতে পারে, কিন্তু ভক্তি অন্তঃপুর পর্যন্ত যায়।”

“জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈতজ্ঞান, একই কথা।”

“ঈশ্বরের ভাব পাকলে, তাকে প্রেম বলে।”

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার পেনগুপ্ত

তৃতীয়

দক্ষিণেশ্বরে চর পাঠিয়ে দিল কেশব। লক্ষ্য করবে রামকৃষ্ণকে। চোখে-চোখে রাখবে। রাত-দিন পাহারা দেবে। ঠিক-ঠিক খাটি কিনা, না, আছে কিছু বুজুক।

হ্যাঁ, ভালো কথা, বাজিয়ে নাও, যাচাই করে নাও। পরের মুখের ঝাল খাবে কেন? কেন মেনে নেবে শোনা কথা? নিজে এসো, বসো, দেখ পরখ করে। তন্ন-তন্ন করে দেখ।

কিন্তু পরীক্ষার পর প্রমাণে যদি পরিতৃপ্ত হও, তখন কী হবে? কোন্ দিকে যাত্রা করবে?

তিন জন ব্রাহ্ম-ভক্ত এল দক্ষিণেশ্বরে। তাদের মধ্যে এক জন প্রসন্ন। পালা করে রাত-দিন দেখবে রামকৃষ্ণকে আর কেশব সেনকে রিপোর্ট দেবে। পোশাকী আর আটপোরে এমন কিছু ভেদ আছে নাকি রামকৃষ্ণের। সে মনে-মুখে এক কি না। সে কি সত্যিই জিতাসন, জিতাশ্বাস, জিতেন্দ্রিয়? সে কি সত্যিই পরিমুক্তসঙ্গ?

রামকৃষ্ণের ঘরের মধ্যে ঢলে এল সটান। বললে, 'রাগে আমরা ও-ঘরে শোব।'

বেশ তো, শোও না! ঢালাও নিমন্ত্রণ রামকৃষ্ণের।

কিন্তু শুবি তো চুপ করে শুয়ে থাক। তা না, কেবল 'দয়াময়', 'দয়াময়' করতে লাগল। নিরাকার কিনা, তাই ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। তাঁর ঐশ্বর্যই তো দয়া। সূর্যের ঐশ্বর্যই যেমন আলো। সূর্যকে যদি 'আলোময়' 'আলোময়' বলা যায়, কিছুই বলা হয় না। নতুন কিছু বল। ডাকার মতন করে ডাক। যে-ডাকে শুধু দয়া দেখাতে আসবে না, ভালোবাসায় গলে জল হয়ে যাবে।

ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেশবের স্তুতি আরম্ভ করল। বলল, 'কেশব বাবুকে ধরো, তা হলেই তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি।'

আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? কি করে দেখব তবে সেই সুখপ্রসন্ন বদনের স্নেহময় সুষমা?

মা কি আমার সামান্য? মা আমার অনন্তরূপিণী। মা আমার কালানুশ্রামলাঙ্গী, বিগলিতচিকুরা, খড়্গা-মুণ্ডাভিরামা। মহামেঘপ্রভা, শ্মশানালয়বাসিনী। বলতে চাও, এমন রূপটি আমি দেখব না নয়ন ভরে? দেবন না তো, আমার নয়ন হল কেন?

শোনো, কমলাকান্ত কি বলছে। দেখ, শুনতে-শুনতে দেখ কিনা চোখের সামনে।

সমর আলো করে কার কামিনী!

সজল জলদ জিনিয়া কায়

দশনে প্রকাশে দামিনী॥

এলায়ে চাঁচর চিকুর পাশ

সুরাসুর মাঝে না করে ত্রাস,

অটুহাসে দানব নাশে

রণপ্রকাশে রঙ্গিনী॥

কিবা শোভা করে শ্রমজ বিন্দু

ঘন তনু ঘেরি কুমুদবন্ধু

অমিয় সিন্ধু হেরিয়ে ইন্দু

মলিন, এ কোন্ মোহিনী॥

এ কি অসম্ভব ভব-পর্যাব

পদতলে শব সদৃশ নীরব

কমলাকান্ত কর অনুভব

কে বটে ও গজগামিনী॥

এই রণরামা নীরদবরণীকে দেখব না আমি? আহা, দেখ, দেখ, শোণিত-সায়রে যেন নীল নলিনী ভাসছে!

তবুও ব্রাহ্ম-ভক্তরা কেবল 'দয়াময়' 'দয়াময়' করে। ঘুমুতে দেবে না রামকৃষ্ণকে।

তখন রামকৃষ্ণের ভাবাবস্থা হল। সেই অবস্থায়

একটু থেকে বললে সেই ভক্তদেরঃ ‘এ ঘর থেকে চলে যাও বলছি।’

যেন বজ্রবোমের আদেশ। ভক্তরা তখন পালিয়ে যেতে পথ পায় না। ঘর ছেড়ে তখন বারান্দায় গিয়ে শুলো।

কাপ্তেনও এমনি পরীক্ষা করে নিয়েছিল। যেদিন দিনের বেলায় প্রথম দেখলে রামকৃষ্ণকে, ঠিক করলে রাতের বেলাও দেখে যেতে হবে। দেখে যেতে হবে রাতেও এ সূর্য সমপ্রভই থাকে কিনা। কোণটিতে চুপি-চুপি রইল চোখ মেলে। দেখল এ সূর্যের উদয়াচলই আছে, অস্তাচল নেই।

আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি, যেমন করে শানের উপরে মহাজনে টাকা বাজায়। বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় মালের টুটা-ফুটা। ভক্ত হয়েছিস বলে বোকা হবি কেন? বুঝে-সুঝে দেখে-শুনে নিবি। সন্দেহই যদি রাখবি তবে সন্ধান জানবি কি করে?

নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে এসেছে। ঠাকুরের ঘরটিতে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। কোথায় তিনি? কলকাতায় গিয়েছেন। ফিরবেন কখন? এই এলেন বলে।

তা হোক, এই সোনার সময়। দেখা যাক কেমন তাঁর সোনার উপর বিতুষা!

ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করলে নরেন। ঠাকুরের বিছানার নিচে আলগোছে লুকিয়ে রাখলে।

সে-তল্লাটেই আর রইল না তার পর। সিঁধে চলে গেল পঞ্চবটী। কেউ যেন ঘৃণাক্ষরে না টের পায়!

কতক্ষণ পরেই ফিরে এলেন ঠাকুর। দেখতে পেয়েই নরেন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। এবার বোঝা যাবে কাঞ্চনত্যাগের মহিমা। ঘরের মধ্যে আগে-ভাগে ঢুকে ঠিক কোণটি বেছে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

যেমন নিত্য বসেন তেমন বিছানায় এসে বসলেন ঠাকুর। কিন্তু গা ঠেকিয়েছেন কি না ঠেকিয়েছেন চীৎকার করে উঠলেন। যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসেছেন এমনি দগ্ধকর যন্ত্রণা। কী হল? ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল সকলে। বিষাক্ত কিছু দংশন করল নাকি? কই, বিছানায় কিছু দেখা যাচ্ছে না তো!

ঠাকুর সরে দাঁড়ালেন খাটের থেকে। কাছাকাছি যারা ছিল সবল হাতে ঝাড়তে লাগল বিছানা। টং—টং করে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল মেঝের উপর। ওটা কি? ওটা একটা টাকা দেখছি না? বিছানায় এল কি করে?

নরেন তাড়াতাড়ি চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বুঝেছি, বুঝেছি। আনন্দে ঠাকুর বিহ্বল হয়ে উঠলেন। তুই আমাকে পরীক্ষা করছিস।

বেশ তো, নিবিই তো পরীক্ষা করে। কত পরীক্ষা করেছেন মথুর বাবু। ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। তোদের যার যেমন মন চায় যাচাই করে নে। যা চাই তা পাব কিনা—এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস তখন যাচাই করা ছাড়বি কেন?

তোদের সকলের সন্দেহ নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শাস্তিতে।

দক্ষিণেশ্বরের জমিদার নবীন রায়চৌধুরীর ছেলে যোগীন। বিয়ে করেছে, তবু রোজ রাতে বাড়ি যায় না, প্রায়ই ঠাকুরের কাছটিতে পড়ে থাকে। যখন আর-আর ভক্তরা কাছে-ভিতে কেউ নেই, তখন ফাঁকতালে ঠাকুরের কোন কাজে লেগে যেতে পারে কিনা, তারই আশায় জেগে থাকে।

সেদিন সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ভক্তেরা বিদায় নিয়েছে। যোগীন বসে আছে একলাটি।

‘কি রে, বাড়ি যাবি না?’

‘কেউ আজ নেই আপনার কাছে। ভাবছি, আমিই তবে থেকে যাই রাতখানা।’

ঠাকুর খুশি হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত আলাপ করলেন একটানা। আলাপের বিষয়ও সেই এক-টানের বিষয়। অটনে-অনটনে সেই এক ঈশ্বরের টান।

রাত দশটায় জলযোগ করলেন ঠাকুর। যোগীনও খেয়ে নিল কালীঘরে। ঠাকুর শুয়ে পড়লেন তাঁর বড় খাটটিতে। সেই ঘরেই মেঝেতে বিছানা পাতল যোগীন।

মাঝ রাত। ঠাকুরের একটবার বাইরে যাবার দরকার হল। তিনি তাকালেন যোগীনের দিকে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা। কেমন শায়া হল ঠাকুরের, ডেকে ঘুম ভাঙলেন না। নিজেই দোর খুলে বেরিয়ে গেলেন। একা-একা চলে গেলেন ঝাড়ুল্লা।

খানিক পরেই ঘুম ভেঙে গেল যোগীনের। এ কি, ঘরের দরজা খোলা কেন? ঠাকুর কোথায়? বিছানা শূন্য। এত রাত্রে কোথায় গেলেন তিনি একা-একা? গাড়ু-গামছা তো সব ঠিক-ঠিক জায়গায়ই আছে। আর, তাই যদি যাবেন, তবে তাকে দাঁড়িয়ে দিতে নিয়ে গেলেন না কেন সঙ্গে করে? তবে বোধ হয় চাঁদের আলোয় একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

কই, গঙ্গার কাছাকাছি কোথাও তিনি নেই তো! যোগীন বাইরে এসে উৎসুক চোখে দেখতে লাগল চার দিক। কোথাও সাড়াও নেই শব্দও নেই। হঠাৎ বকের মধ্যে ধাক্কা খেল যোগীন। ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে মহাবৎখানায় যাননি তো?

ভয় করতে লাগল যোগীনের। দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলা তিনি তা পালন করেন না? ডুব-ডুব জল খান?

না, এর একটা হেস্ত-নেস্ত দেখে যেতে হবে। মহাবৎখানার কাছাকাছি এগিয়ে গেল যোগীন। নিম্পলক চোখে চেয়ে রইল দরজার দিকে। ব্যাপারটা অজ্ঞায় হচ্ছে তবু নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই।

দরজা খুলে ঠাকুর বেরিয়ে এলেই দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে যোগীন। পথ ভুলেও আসবে না এ তল্লাটে।

সমস্ত আকাশ-বাতাস যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে। একটি গাছের পাতাও নড়ছে না। উৎসুক একটা প্রতীক্ষা মুহূর্তের মালায় স্তব্ধতার মন্ত্র জপ করে চলেছে। যিনি অচ্যুত তিনি যেন এখুনি বিচ্যুত হয়ে পড়বেন!

চট চট—চটি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন আসছে পঞ্চবটীর ওদিক থেকে। কান খাড়া করল যোগীন। এ তো সেই পরিচিত পদশব্দ। সর্বাস্থে শিউরে উঠে তাকাল চন্দ্রালোকে। সত্যিই তো, ঠাকুরই তো আসছেন।

কে কাকে ধরে ফেলে! যোগীনের ইচ্ছে হল মাটির সঙ্গে মিশে যাই? যে মাটিতে তিনি পা রেখেছেন সেই পদম্পর্শনের মাটিতে।

‘কি রে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?’ কাছে এসে প্রশান্ত বয়ানে জিগগেস করলেন ঠাকুর।

অধোমুখে চূপ করে দাঁড়িয়ে রইল যোগীন।

অস্তরদর্শী বুঝেছেন এক পলকে। তবু অপরাধ নেনার নাম নেই। তবু আশ্বাসের স্নেহছত্র মেলে ধরলেন স্বচ্ছন্দে। বললেন, ‘বেশ, বেশ, এই তো চাই। সাধুকে সহজে বিশ্বাস করবি নে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি। নে, চল, ঠিক করেছিস, এখন ঘরে আয়।’

ঠাকুরের পিছু-পিছু ঘরে ঢুকল যোগীন।

সারা রাত আর ঘুম এলো না যোগীনের। মনে-মনে বারংবার ক্ষমা চাইতে লাগল সেই ক্ষমাময়ের কাছে।

ভগবানকে ছোট করেছেন বলে ব্যাসদেব যেমন ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে জগদীশ্বর, তুমি রূপবজ্রিত, অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপকল্পনা করেছি। তুমি অখিলগুরু, বাক্যের অতীত, অথচ আমি স্তবস্ততি করে তোমার অনির্বচনীয়তা নষ্ট করেছি। তুমি সর্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থভ্রমণ করে তোমার সেই সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডন করেছি। আমি ঘোরতর অপরাধী। আমার এই বিকল্পতা-দোষত্রয় মার্জনা করো।’

তেমনি করেই আকুল অনিদ্ৰায় ক্ষমা চাইতে লাগল যোগীন। তুমি সংশয়পরিবেশশূন্য। অথচ আমি আমার আবিল মনের কুটিল সন্দেহের ছায়া ফেললাম তোমার উপর। প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। তোমার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমাদের ঘনচ্ছন্ন দৃষ্টি—সংশোধন করে দাও।

‘কাকে সাধু বলে মশাই?’ এক প্রতিবেশী এসে জিগগেস করলে রামকৃষ্ণকে।

‘যার মন-প্রাণ-অস্তরাঙ্গা ঈশ্বরে নত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামকাঞ্চনত্যাগী। যিনি স্ত্রীলোককে মাতৃবৎ দেখেন, পূজো করেন। সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কথা কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে আপামর সকলের সেবা করেন।’

সাধুর আশা নেই, আসক্তি নেই। সে সত্য সন্তুষ্ট। সে বহিনির্শেষ্ট। তার আরম্ভ-উত্তোগ নেই। তার সর্বত্র সমবুদ্ধি। তার ফলেও যা অফলেও তাই। তার কাছে নিন্দা-নান্দী এক কথা। শত্রু-মিত্র এক জন। তার গতি চঞ্চল কিন্তু মতিটি স্থির। তার দেহ-লেশ নেই। সে প্রহ্লাদ মূর্তি। হেতু নেই অথচ ভক্তি। অকারণে অবারণ ভক্তি।

প্রহ্লাদকে যখন কৃষ্ণ বর দিতে চাইলেন, প্রহ্লাদ কী বললে? বললে, ‘যদি বর দেবেনই তবে এই বর দিন, আমায় যারা কষ্ট দিয়েছে, তাদের যেন অপরাধ না হয়। তারা যেন কষ্ট না পায়।’ যে সাধু সে প্রহ্লাদের মতই সর্বভূতে হিতকামী।

তেমনি এক জন সাধু এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। অক্ষতপুণ্যলেশ। অপঙ্কতোয় অচ্ছাদ সরোবর। তাঁর নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস। অভয়প্রদ আশ্রয়কেতন। তাঁকে দেখবে চলে দলে-দলে।

ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগল কেশব সেন। সাধারণ বক্তৃতামঞ্চ থেকে, এমন কি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে বসে। স্বশাস্ত্ররূপ স্বরূপানন্দ রামকৃষ্ণ। একেবারে বালকস্বভাব। ঘরের কাছে এই অনন্ত ধনের খবর না নিয়ে যাবে তোমরা বিদেশের বিপণিতে?

শুধু রসনা নয়, তেজস্বিনী লেখনী চালালে কেশব। শুলভ সমাচার, সানডে মিরর আর থিইষ্টিক কোয়ার্টারি রিভিউতে লিখতে লাগল।

ওরে আর কেউ নয়, কেশব সেন বলছে, কেশব সেন লিখছে। যেমন তপ্ত ভাষা তেমনি দীপ্ত লেখা। এ কি ফেলা চলে? দেখছিস, বলতে-বলতে কেশবের গৌর আনন কেমন আরক্ত হয়ে উঠছে। একেই বুঝি বলে প্রতাপপ্রতিভা। কি রে, কি বলছিস, যাবি একবার দক্ষিণেশ্বর? স্বচক্ষে দেখে আসবি?

আর, ওদিকে রামকৃষ্ণ ডাকছে আকুল কণ্ঠে : ওরে, তোরা কোথায়? তোদের ছাড়া আমি যে থাকতে পারছি না। আকাঠের মাঝে কোথায় তোরা সব চন্দন তরু? ধীরতার মাঝে বেগ, জড়তার মাঝে বল, ভীরুতার মাঝে বীর্য—কোথায় তোরা সব সৈনিক সন্ন্যাসী। চলে আয়। বন-জঙ্গল ভেদ করে নদী-নালা সাঁতরে তীরবেগে বায়ুবেগে মনোবেগে চলে আয়। আমি তোদের জন্তে কত কথা কত ভাব কত ভালোবাসা নিয়ে বসে আছি। কত গান কত সুর কত নৃত্য। কত স্বাদ কত রুচি। চলে আয়, চলে আয়।

হুয়া

কয়পাটের হাটতলা। সারদাকে নিয়ে এসেছেন শ্যামাসুন্দরী। এসেছেন পিলে দাগাতে।

শিবমন্দিরের অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। জ্বরে-জ্বরে সবাই সারা হয়ে গেল। পিলে দাগানো

লোকটিকে ঘিরে সবাইর কাতর ঔৎসুক্য। কার কখন ডাক পড়ে। সবাই পিলে দাগাবে।

খানিকটা আগুন, লোহার শিক আর একটা কি পাতা। এই শুধু সরঞ্জাম। এতেই পিলে পালাবে দেশ ছেড়ে। আর মাথা তুলতে পাবে না।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আবার ফিরতে হবে বাড়ি। কত রাজার পথ! শ্যামাসুন্দরী অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। ‘মেয়েকে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে আছি বাবা। যদি একটু এদিক পানে হাত দাও। মেয়ে আমার জ্বরে-জ্বরে বুক-বুক হল।’

‘এই যে যাচ্ছি, মা। দেখছ তো গাহকের ভিড়—’

‘তোমার জন্তে একখানা নতুন কাপড় এনেছি। চান করে পরো। একটু জল খাও, তাও এনেছি তোমার জন্তে—’

লোকটি বুঝি এতক্ষণে সজাগ হল।

‘কিন্তু নতুন পাতায় নতুন আগুন নাও। মেয়ে আমার গঙ্গাজলের মতন শুচি।’

তাই হল। পিলে দেগে দিল সারদার।

পিলে আরাম হল বটে, কিন্তু সংসারের দারিদ্র্য আর যায় না। শ্যামাসুন্দরী বাঁড়ুযোদের ধান ভানে। ষোল কুড়িতে এক আড়া। এক আড়া ধান ভেনে চার কুড়ি ধান পায়। মায়ের সঙ্গে সারদাও হাত লাগায়।

গাঁয়ে কালীপূজা হবে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে পূজোর চাল জোগাড় হচ্ছে। তাদের বাড়ির বরাদ্দ চাল জোগাড় করে রেখেছেন শ্যামাসুন্দরী। কিন্তু গাঁয়ের মোড়ল নব মুখুজে নিলে না সে চাল। কি নিয়ে আড়াআড়ি হয়েছে কে জানে, শ্যামাসুন্দরীর পূজোর চাল ফিরিয়ে দিলে। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত রাত কাঁদলেন। বললেন, ‘কালীর জন্তে চাল করেছি, নিলে না, ফিরিয়ে দিলে? এখন এ চাল আমার কে খায়? কাকে দিই?’

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়েছেন। রাত হয়েছে। হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখে দোরগোড়ায় কে এক জন সুন্দরী স্ত্রী বসে আছে চুপচাপ। বসে আছে পায়ের উপর পা দিয়ে মুখ-হাত-পা সব লাল। প্রথম সূর্য উঠলে যেমন হয় তেমনি অরুণ বর্ণের ঝলস দিয়েছে চার দিকে।

স্ত্রীলোকটি কাছে এসে গা চাপড়ে-চাপড়ে ওঠালে শ্যামাসুন্দরীকে।



‘তুমি কীদছ কেন ? তোমার কালীর চাল আমি খাব ।’

শ্যামাসুন্দরী তো অবাক । মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধোলেন : ‘তুমি কে ?’

‘ঐ যে গো—এর পরেই যার পূজো হয় । সেই আমি ।’

পরদিন সারদাকে জিগগেস করলেন শ্যামাসুন্দরী : ‘গায়ের রঙ লাল, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে—ও কোন ঠাকুর রে সারদা ?’

‘জগদ্ধাত্রী ।’

‘আমি জগদ্ধাত্রীর পূজো করব ।’

কিন্তু গুটুকু চালে হবে না । আরো চাল লাগবে । বিশ্বাসদের থেকে দু আড়া ধান আনালেন শ্যামাসুন্দরী । ধান আনালেন তো রুটিও নামল অঝোরে । এক দিনও ফাঁক নেই, সৃজি গিয়েছে বনবাসে । চাটাই বিছিয়ে ধান মেলে বসে আছি কবে থেকে ।

শ্যামাসুন্দরী হতাশার সুর ধরলেন : ‘কি করে তবে আর তোমার পূজো হবে মা ? ধানই শুকুতে পাল্লুম নি, তবে চাল করব কি করে ?’

চার দিকে রুটি, শ্যামাসুন্দরীর ধানের চাটাইয়ে রোদ । জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ !

কাঠের আগুনে সঁকে মৃতি শুকিয়ে রঙ দেওয়া হল । পূজোর পর প্রতিমা বিসর্জনের সময় শ্যামাসুন্দরী মূর্তির কানে বলে দিলেন, ‘মা জগাই, আবার আর বছর এসো । আমি বছর ভোর তোমার সব জোগাড় করে রাখব ।’

জগদ্ধাত্রীর পূজো করেই শ্রী ফিরল সংসারের ।

মেয়েকে শ্যামাসুন্দরী বললেন, ‘তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজো হবে ।’

সারদা থমকে গেল । বললে ‘আমি আবার কি দেব ! ও সব লাঠা আমি পারব নি । একবার পূজো তো হল, আবার কেন ?’

রাত্রে স্বপ্ন দেখল সারদা । তিন জন কে-কে দাঁড়িয়েছে তার সামনে । বলছে, ‘আমরা কি তবে যাব ?’

‘কে তোমরা ?’

‘আমি জগদ্ধাত্রী—আর এরা জয়া-বিজয়া ।’

‘না মা, তোমাদের যেতে বলিনি, কোথা যাবে তোমরা ? তোমরা থাকো, যেও না ।’ গলায় ঝাঁচল দিয়ে জগদ্ধাত্রীর পায়ে গড় করল সারদা ।

সারদা আর কি দেবে ! শ্রম দেবে, সেবা দেবে । অন্তরের নিষ্ঠা দেবে ।

জগদ্ধাত্রীর পূজোর সময় সারদা গিয়ে তাই বাসন মেজে দেয় ।

‘সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীর পূজোতে জয়রামবাটি যাই—বাসন মাজতে হয় কিনা ।’ বললেন শ্রীমা ‘শেষকালে যোগীন সব কাঠের বাসন করে দিলে । বললে, মা, তোমাকে আর যেতে হবে না বাসন মাজতে ।’

প্রতিমা বিসর্জনের সময় জগদ্ধাত্রীর কানের গয়না একটি খুলে রাখলে ।

‘সেইটিই মনে করে মা আবার আসবেন পরের বছর ।’ বললেন শ্রীমা ।

মা আমাদের রাজরাজেশ্বরী ।

তার ফিরে আসতে আভরণের আকর্ষণ লাগে না । তিনি যে দীন-দরিদ্রের মা । শুধু একটি কাতর ‘মা’ ডাক শুনেই তিনি চলে আসেন । ডাকও লাগে না, অন্তরে আকুলতা থাকলেই হল । প্রার্থনার চেয়েও বড় হচ্ছে আকুলতা । মুখের চেয়েও মৌন । মুখে বললেই শুনবেন, আর মনে বললে শুনবেন না, মা কি আমাদের বধির ?

মা আমাদের অমৃতভাষিণী অম্লপূর্ণা । ‘অচক্ষু সর্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান ।’

কোনো ভয় নেই । মা সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী ।

পঞ্চম

তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছে সারদা । যাচ্ছে পদব্রজে ।

সঙ্গে ভূষণ মণ্ডলের মা ও আরো ক’জন বর্ষীয়সী মহিলা । আর যাচ্ছে লক্ষ্মী, আর তার ভাই শিবরাম ।

কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—আট মাইলের দাঁকা । আরামবাগ পেরিয়েই তেলোভেলোর মাঠ । সে মাঠ পেরিয়ে তারকেশ্বর । তার পরে আবার আরেক মাঠ—কৈকলার মাঠ । কৈকলার মাঠ পেরিয়ে বৈতলবাটি । বৈতলবাটি থেকে গঙ্গা পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর ।

তেলোভেলো আর কৈকলা এই দু মাঠ ঝাকাতের আস্তানা । আর ঐ মাঠ ছাড়াও পথ

নেই। পথচারীদের উপর কখন যে হামলা হবে তা ডাকাতে-কালীই বলতে পারেন। তেলো আর ভেলো, পাশাপাশি দুই গ্রাম, মাঝখানের মাঠে এক ভীমদর্শনা করালবদনা কালীমূর্তি। ঐ ডাকাতে-কালী। দস্যুদের আরাধনীয়। ধাত্তদা ধনদায়িনী। ডাক-নাম 'তেলেভেলোর ডাকাতে-কালী। ভূতপ্রমথসেবিকা ঘোরচণ্ডী। রণরামা।

শুধু লুণ্ঠন নয়, চক্ষুর পলকে খুন করে ফেলা, লাশ লোপাট করে দেওয়া। যাকে বলে গায়েবী খুন। ডাকাতের সে লাঠি বজ্রের চেয়েও নৃশংস। টাকা-কড়ি যা আছে খুলে দিচ্ছি বুলি ঝেড়ে—এটুকু প্রস্তুত হবারও সময় দেয় না। আগে লাঠি, শেষে লুট। কাড়ো আর মারো নয়, মারো আর কাড়ো। এর থেকে একমাত্র উপায় হচ্ছে দল পাকিয়ে পথ হাঁটা। দল দেখে ডাকাতেরা যদি ভয় পায়। দল থাকলে পথচারীদের অন্তত সাহস বাড়ে।

সন্দের বেশ আগেই পৌঁছেছে আরামবাগ। চলতে চলতে সারদার পা দুখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রাতটা আরামবাগে কোথাও বিশ্রাম করলে হয়! কিন্তু সঙ্গীরা নারাজ। তারা বলে, ঈশ্বর লাগবার আগেই বেলাবেলি তেলোভেলোর মাঠ পেরিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। এখনো দিবা দিন আছে, সহজেই বেরিয়ে যেতে পারব। মিছিমিছি এক রাত নষ্ট করি কেন?

পথক্রান্তির কথা কাউকেও বললে না সারদা। তোমরা যখন চলেছ, আমিও চলি তোমাদের পিছে-পিছে।

কেবলই পিছিয়ে পড়ছে থেকে-থেকে। পা টেনে-টেনে তবু চলে এসেছে চার মাইল। কিন্তু তার সঙ্গীরা কোথায়?

সঙ্গীরা থেমে পড়ছে বারে-বারে। থেমে পড়ছে যাতে পা চালিয়ে এসে সারদা তাদের সঙ্গে ধরতে পারে। কিছুতেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছে না মেয়েটা।

‘কাঁহাতক তোমার জন্তে এমনি করে দাঁড়াই বোলো তো!’ বিরক্তি জানায় সঙ্গীরা: ‘বেলা চলে পড়ল, এখন একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও।’

সাধ্যমত পদক্ষেপ দ্রুত করে সারদা। কিন্তু তার সাধ্য কি, সঙ্গীদের সঙ্গে তাল রাখে। আবার সে পিছিয়ে পড়েছে। বিশ-পঁচিশ হাত নয়, প্রায় সিকি মাইল।

‘এমনি করে চললে কি করে চলবে?’ আবার ধমকে ওঠে সঙ্গীরা: ‘তোমার জন্তে কি সবাই শেষকালে ডাকাতের হাতে মারা পড়বে? পশ্চিমের আকাশখানা একবার দেখছ?’

সন্কার শেষ লালিমাটুকুও মিলিয়ে যায় বৃষ্টি।

সতিহৈ তো! তার একলার অক্ষমতার জন্তে সবাই কেন বিপন্ন হবে? ওদের কি দোষ! ওদের দেহে যখন শক্তি আছে তখন ওরা যাবেই তো আগ বাড়িয়ে। নিজের সুবিধের জন্তে ওদের সে অসুবিধে ঘটাবে কেন?

‘তোমরা আমার জন্তে আর দাঁড়িয়ে না—চলে যাও সোজামুজি।’ সঙ্গশূন্যতার ভয়ে এতটুকু কাতর নয় সারদা। নেই এতটুকু অসহায়তার সুর। বললে, ‘একেবারে তারকেস্বরের চটিতে গিয়ে ওঠো। আমি সেখানে গিয়েই ধরব তোমাদের। আমার শরীর আর বইছে না—আমি যাচ্ছি আস্তে-আস্তে।’

‘যত শিগগির পারিস বেরিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। চার দিক ঈশ্বর হয়ে এল। মাঠের বড় দুর্নাম—’

পিছনে ফিরে তাকিয়েও দেখল না। সারদাকে ফেলেই দ্রুতবেগে এগিয়ে গেল সঙ্গীরা। মিলিয়ে গেল চোখের বাইরে। জনমভূমিহীন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সারদা একা।

শদীরে আর দিচ্ছে না, তবু কষ্টে পা টেনে-টেনে চলেছে। অন্ধকারে পথ-ঘাটের ইসারা পাচ্ছে না। কোথায় যেতে কোথায় চলে আসছে কে জানে।

‘কে যায়!’ কে-একজন বাঘের গলায় ভমকে উঠল।

প্রকাণ্ড একটা কালো লোক চোখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দৈত্যের মতন চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর বালা, কাঁধে মস্ত লাঠি।

‘কে যায়!’

‘তোমার মেয়ে গো—সারদা।’

নির্জন মাঠের মধ্যে, সন্কার অন্ধকারে, আমার মেয়ে! লোকটার কানে কেমন যেন অদ্ভুত শোনালা এত বছর ধরে ডাকাতি করছি, কই, এমন কথা তে কখনও শুনিনি!

সারদার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল ডাকাতি স্থির প্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল সারদা। প্রতিমা মতই স্থির নেত্রে।

‘কে তুমি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?’

‘বাবা, দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছিলাম। চলতে পাচ্ছিলাম না, তাই আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গিয়েছে। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছি।’

‘দক্ষিণেশ্বরে যাচ্ছ কেন?’

‘দক্ষিণেশ্বরে যে তোমার জামাই থাকে। রাণী রাসমণির কালীবাড়ি আছে না? সেই কালীবাড়িতে তিনি থাকেন। তাঁর কাছেই আমি যাচ্ছি।’

কেমন যেন মধুময় লাগল কণ্ঠস্বর। বাগদি ডাকাতের বৃকের ভিতরটা আনচান করে উঠল। শুধু ডাকাতের নয়, সেই কণ্ঠস্বরের আমেজ এসে লাগল যেন আরো এক জনের কানে। কাছেই কোথায় ছিল, ছুটে এল সে ব্যাকুল পায়ে। সারদা তো অবাক, এ যে দেখি স্ত্রীলোক। দেখেই বুঝল, বাগদি-ডাকাতের স্ত্রী।

তার হাত দুখানা চেপে ধরল সারদা। যেন অকূলে কুল পেল।

‘তুমি কে গা?’ ডাকাত-পত্নীর চোখে স্নেহকরুণ জিজ্ঞাসা।

‘তোমার মেয়ে সারদা। চিনতে পাচ্ছ না? যাচ্ছিলুম দক্ষিণেশ্বরে, তোমার জামাইর কাছে। সঙ্গীরা পিছে ফেলে আগে-আগে পালিয়ে গিয়েছে। ঝাঁক। নির্জন মাঠে অন্ধকারের মধ্যে কী বিপদেই পড়েছিলুম, মা! তোমাদের পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। তোমাদের না পেলে কী সর্বনাশ যে হত কে জানে।’

প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কঠিন পাথর ফেটে বেরুল সুধা-ধারা। দয়ালীন মরুভূমির আকাশে নত্ন মেঘের মাধুর্য।

‘মেয়ে আমার নেতিয়ে পড়েছে যে গো। কিছু ওকে খেতে দাও আগে।’ ডাকাত-বউ বললে ডাকাতকে।

‘না, আমি এগোই। তারকেশ্বরে গিয়ে ধরব আমার সঙ্গীদের।’

অসম্ভব, পথের মাঝেই পড়বে টাল খেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েকে কেউ পাঠাতে পারে না এ বিপদের মুখে। এ ঘোর অন্ধকারে, জনশূন্য মাঠের মধ্য দিয়ে। তার শরীরের এই অবসন্ন অবস্থায়।

তার চেয়ে চলো, কাছে-পিঠে যে দোকান আছে, সেখানে তোমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করি। রাত ফুরুলে খোঁজা যাবে ফের পথের নিশানা। তোমার সঙ্গীদের উদ্দেশ।

তেলো-ভেলোর ছোট একটি মুদি দোকান। সেখানেই নিয়ে গেল সারদাকে। নিজের হাতে শয্যা রচনা করল ডাকাত-বউ। ডাকাত নিজেকে নিয়ে মুড়ি-মুড়কি কিনে আনল।

বাপের দেওয়া খাবার তৃপ্তি করে খেল সারদা। মায়ের করা বিছানায় শুলো আরাম করে। ছোট মেয়েকে মা যেমন করে ঘুম পাড়ায় তেমনি করে ডাকাত-বউ ঘুম পাড়াল সারদাকে। আর সারা রাত লাঠি-হাতে দুয়ার আগলে দাঁড়িয়ে রইল ডাকাত-বাবা।

কোথায় সব কিছু লুটপাট করে, চাই কি গুম খুন করে ফেলবে—তা নয়, নিরাপত্তা দীর্ঘ রাত্রি দুয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে!

উপায় কি! এ যে তার মেয়ে। যে মেয়ে সেই আবার মা!

ভোরে ঘুম ভাঙতেই মেয়েকে নিয়ে এগোলো তারকেশ্বরের পথে। ক্ষেতে কড়াইশুঁটি ফলেছে। তাই ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ডাকাত-বউ দিতে লাগল সারদাকে। বললে, ‘তোমার খিদে পেয়েছে, খা।’ মুখ ধোয়া হয়নি, তবু ছোট মেয়ের মত তাই খেতে লাগল সারদা। স্বাদে অপূর্ব মাতৃস্নেহ।

চার দণ্ড বেলা হয়েছে, পৌঁছল তারকেশ্বর।

‘আমার মেয়ে কাল সারা রাত কিছু খায়নি। যাও, শিগগির-শিগগির বাবাকে পূজো দিয়ে বাজার করে নিয়ে এসো। মাছ-তরকারি দিয়ে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে হবে।’ ডাকাত-বউ তাগিদ দিল স্বামীকে।

বাগদি-ডাকাত বাজার করতে ছুটল। তার মেয়ে শ্বশুর-ঘরে যাচ্ছে। যাবার আগে বাপের বাড়িতে আজ তার শেষ খাওয়া।

সঙ্গীদের সন্ধান পেল সারদা। ‘ওমা, তুই বেঁচে আছিস? আসতে পেরেছিস পথ চিনে? কোথায় ছিলি তুই সারা রাত?’

বাবা-মার কাছে ছিলাম। ছিলাম নির্ভয়ের আশ্রমে, নিশ্চিন্তের প্রোড়নীড়ে। বাৎসলা-রসের সরসীতে।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায়ের পালা এল। যাত্রীদল এবার বৈজাটের পথ ধরবে।

বাগদি বাপ-মা কাঁদতে লাগল অঝোরে। মেয়ে সারদাও নিজেকে সামলাতে পারল না। সেও কান্নায়

ভেঙে পড়ল। এক রাতের পরিচয়ে এক জন্মের সম্পর্ক। কণ্ঠের একটি মাতৃ সম্বোধনেই অনন্ত জীবনের বন্ধন।

এমন মেয়ের বিচ্ছেদ সয়ে কি করে বাঁচবে তারা ? কাঁদতে-কাঁদতে অনেক দূর পর্যন্ত এগোল বাগদি-বাগদিনী।

বাগদিনী কড়াইশুঁটি ছিঁড়ে মেয়ের ঠাঁচলে বেঁধে দিল যত্ন করে। বললে, ‘মা সারু, রাতে যখন মুড়ি খাবি, তখন এগুলো দিয়ে খাস।’ বলতে-বলতে নিজের ঠাঁচলে চোখ চেপে ধরল।

বাগদি বললে, ‘যদি পায়ের বোঝা স্ত্রী না সঙ্গে থাকত, সোজা তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতাম। দেখে আসতাম জামাইকে।’

‘কিন্তু বলো দক্ষিণেশ্বরে তুমি যাবে।’ সারদা পিড়াপিড়ি করতে লাগল।

রাজি করাল ডাকাত-বাবাকে। মাঝে-মাঝে গিয়ে মেয়েকে না দেখে এসে কি সে থাকতে পারবে ? মা কি মেয়েকে পাঠিয়ে দেবে না তার নিজের হাতে গড়া মোয়া-নাছু ?

পথ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ডান্ন দিকের রাস্তায় বাবা আর মা চলে গেল, সারদা আর তার সঙ্গীরা চলল বাঁ-দিকে। যত দূর দেখা যায় বাবা আর মা ফিরে-ফিরে তাকায় আর কাঁদে। সারদাও থেকে-থেকে তাকায় পিছন ফিরে আর ঠাঁচলে চোখ মোছে।

ডাকাতের ছদ্মবেশে কে এরা বাগদি-বাগদিনী ?

জানিস আমরা কী দেখলুম ? গাঁয়ে ফিরে এসে বলতে লাগল বাগদি-দম্পতি। দেখলুম, স্বয়ং কালী এসে দাঁড়িয়েছেন। যে কালীর পূজা করি সেই কালী।

বলো কি গো ? দেখলে ? ঠিক তাই দেখলে !’

সত্যি-সত্যিই দেখলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখি এমন সাধ্য কি। আমরা যে পাণ্ডী। আমরা পাণ্ডী বলে যে রূপ গোপন করে ফেললে। সারাক্ষণ দেখতে দিলে না।

চকিতে যখন একবার দেখেছি তখন পলকেই পাপ চলে গিয়েছে। চকিতের দেখাই অনন্ত কালের দেখা। যা চকিত তাই চিরকালিক।

[ ক্রমশঃ।

## হায় হার্বার্ড !

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল আবিষ্কার করেছিলেন টেলিফোন। টেলিফোন যখন কথা বলার মাধ্যমরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখনও গ্রাহাম আবিষ্কারের নেশায় মগ্ন। গ্রাহাম ছিলেন উপকারী, জনগণের সেবা করতে পেলে অল্প কিছুতে দৃষ্টি থাকতো না। টেলিফোন আবিষ্কারের আগে, পিতা মেলভিলকে সাহায্য কবতেন গ্রাহাম। মেলভিল তখন এক উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত, মুকদের মুখে কথা ফোটাতে। উপায়টি হ’ল Visible speech. বিভিন্ন জায়গায় কেন্দ্র স্থাপিত হ’ল, মেলভিল শিক্ষা দেবেন মুকদের। গ্রাহাম পিতাকে সাহায্য কবছেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাহাম ম্যাবেল জি হার্বার্ডকে বিবাহ কবলেন। গ্রাহাম টেলিফোন আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকেন, হার্বার্ড পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। টেলিফোন আবিষ্কৃত হ’ল, গ্রাহাম আয়োজ্য করলেন মুকদের মুখে কথা ফোটাতে। কেন ? মুকদের প্রতি গ্রাহাম কেন এত দৃষ্টি দিলেন ? হার্বার্ড, যিনি গ্রাহামকে সাহায্য কবতেন পেলে স্বর্গস্থ পোতেন তিনি যে ছিলেন শৈশব থেকে মুক। যত্ন কথা বললে শীর কুপাদৃষ্টিতে, সেট গ্রাহাম কিন্তু দ্বী হার্বার্ডকে কখনও কথা বলতে সক্ষম হ’লেন না।

# ভদ্রলোকের ছেলে

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমাদের এই বেঁচে থাকা  
যদি বলি মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক  
বিশ্বাস করবে কি ?  
ভদ্রলোকের ছেলে আমরা  
কাছ, কোঁচা দিয়ে কাপড় পরি ।  
ধোবদুস্ত পাঞ্জাবীর তলায়  
করাল দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখি  
আত্মনিগ্রহের দুঃসহ যন্ত্রণায় ।

আমরা ভদ্রলোকের ছেলে !  
বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না কথাটা উচ্চারণ করতে,  
কুলি মজুর চাষা ভূশো ছোটলোকদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলি  
কী দুর্মনীয় আমাদের অভিজাত্যবোধ !  
কী হৃদয়বিদারক আগাদের ভদ্রতা !

কেমন আছেন ?  
পরিচিতেরা পথে-ঘাটে প্রশ্ন করে  
( এ ছাড়া আর কি প্রশ্নই বা আমাদের আছে ? )  
মনে মনে জানি এর উত্তর  
বৈদান্তিক নৃত্রের মতো সংক্ষিপ্ত :  
ভালো আছি !!!  
আহা কী মর্মান্তিক শিষ্টাচার !  
প্রগল্ভ হয়ে ওঠে বিষন্ন গম্ভীর মানব-সত্তা  
কুকড়ে-মরা লজ্জার স্বগত ভাষণে ।

এক জন পেশাজীবী শুষ্কমেজাজী সিংহবিক্রম মজুর  
আমাদের চেয়েও সুখী  
আমাদের চেয়েও মহান্  
ক্লান্ত ভাষায় গর্জনে কোরে ওঠে মজুরীর দাবীতে,  
সত্যতার বনিম্বাদ ওরা বিন্দবের অগ্রদূত ।

আর আমরা ?  
 মহা মাননীয় ভদ্রলোকের ছেলে  
 টেঁচিয়ে কথা বললে জাত হারাই  
 গ্রায্য পরিশ্রমের দাম চাইতে মাথা কাটা যায় ।  
 লাহিত ভদ্রজীবনের সক্রিয় অহঙ্কারে  
 আমাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না ।  
 উন্নাসিক পরিভাষায় গজুরীর নাম দিয়েছি সম্মান-মূল্য  
 ব্রাহ্মণ্য প্রথায় দক্ষিণা বললে আরো খুশি হই ।  
 আহা আমরা ভদ্রলোকের ছেলে !!

ভদ্রলোকের ছেলে আমরা  
 প্রবঞ্চিত জ্ঞান-গরিমার ঔদ্ধত্যে  
 দারিদ্র্যকে পুষে রাখি সংসারকে পথে বসিয়ে ।  
 আমাদের যশোগৌরবের কঙ্কাল  
 তিমিরগর্ভ জন্মভূমির অশ্রু-সমুদ্রে  
 দিশাহারা ফসফরাসের মতো জ্বলে ।  
 আমাদের ধারালো বুদ্ধির সিঁড়ি ভেঙে  
 একচেটে ব্যবসায়ীদের জাতীয় শিল্পোন্নয়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী ।  
 আর আমরা ?  
 নির্লোভ নিরাসক্ত নির্বিকার  
 বুদ্ধিবিলাসের শুচিবায়ুগ্রস্ত অমায়িক ভদ্রলোকের ছেলে !

আমাদের মেকী আভিজাত্য দেগে  
 লাটসাহেবও লজ্জা পায় !  
 আর ভাষ্টিবনের কুকুরগুলো খেঁচায় ল্যাজ নাড়ে ।  
 পথের মাঝখানে কোনো ওৎপাতা পাওনাদার  
 গলায় গামছা দিতে এলে  
 পথের ভিখিরীটাও সহানুভূতিতে বলে ওঠে :  
 আহা যেতে দাও, যেতে দাও,  
 হাজার হলেও ভদ্রলোকের ছেলে !!  
 পদাঘাতের ধুলো মুছে মুছেই আমাদের পরিচ্ছন্নতার মহিমা ;  
 আত্মবিশ্বাসের বৃষ্টিকদংশনেই আমাদের প্রশংসনীয় সংঘম !  
 সত্যিই আমরা ভদ্রলোকের ছেলে !

ভদ্রলোকের ছেলে আমরা ভদ্রলোকের ছেলে !  
 আমাদের শিক্ষিতা সেবাদাসী অধ্যক্ষীদের  
 শতকরা নব্বই জনের টি, বি,  
 মনু না কি বলে গেছেন :  
 'নার্থ্যস্ত যত্র পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতাঃ !'  
 আর কাচ্ছা বাচ্ছা বংশধরগুলো যেন চলন্ত লিভার পিলে  
 মাথার ভারে টলে পড়ে  
 ঔপনিবেশিক অনাহারের ঘূর্ণী ঝড়ে ।

পুরাণ ইতিহাস মহাকাব্য হাতে  
 তাদের কী রোগাধর নামকরণ !  
 আহা নাম !  
 আহা ভদ্রলোকের ছেলের নাম !  
 শ্মশানঘাটে মৃত্যুর নাম-পারিজের খাতায়  
 লিখতে লিখতে কনিষ্ঠঃপ্রার্থী কেরানী বাবর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে !  
 চিতায় অগ্নিদানের মন্তোচ্চারণের মাড়িপোড়া বামুন  
 থেকিয়ে ওঠে, আহা কী নাম !  
 ভদ্রলোকের ছেলের প্রাগৈতিহাসিক স্বর্গারোহণ পর্বে :  
 বলো হরি হরিবোল ! রাম নাম সত্য হয় !  
 জলন্ত চিতার শিখায় শিখায়  
 স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করে ।  
 শ্মশান-বৈরাগ্যের শাস্তিগতকে  
 দার্শনিক হয়ে ওঠে—  
 শোকান্তসিঁথি ভদ্রলোকের ছেলে আহা ভদ্রলোকের ছেলে !

যদি বলি : কি হলে কি হতে পারতুম  
 এই আফশোমই জীবনটা হাওয়াই বেলুনের মত ক্রমশঃ  
 স্বীকার করবে কী ?  
 দ্বিছু রায়ের নন্দলালই অধিকাংশ সুবিধাবাদী ভদ্রসন্তানের  
 জীবন দর্শন ।  
 'আর আনাদের মধ্যে যে সব ভদ্রলোকের ছেলেরা  
 সংস্কৃতি ও শিক্ষা-সাধনার ব্রত নিয়েছি  
 স্বাধীন ভারতের আত্মস্বপ্নপরাগণ রাষ্ট্রনেতাদের কাছে  
 যাদের জীবন-যাপনের কোনো অঙ্গীকার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই—  
 নিঃশব্দ রক্তক্ষরণে যাদের দীর্ঘশ্বাস শূন্যশ্রমী,  
 তাদের ভদ্র-জীবনের সৌজত্ববোধই  
 আজ তাদের প্রশমিত জীবনের চরম অভিশাপ !  
 এই নিবিকল্প শুদ্ধাচারই তাদের সাধনার শত্রু ।  
 তাই আজ অত্যাচারের প্রতিবাদ  
 সবপ্রকার শোষণের বৈপ্লবিক বিরোধিতা  
 সামাজিক জীবন-স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী  
 আমাদের গলা দিয়ে বেরোয় না,  
 আমাদের মুষ্টিবদ্ধ বাহু জলে ওঠে না  
 আমাদের রক্ত বকের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ  
 অগ্নিগিরির লাভা উদ্গীরণ করে না,  
 নিরাপদে বেচে থাকার অহংবসব দীনতায় !  
 আমরা যে বিজ্ঞানভিক্ষু ভদ্রলোকের ছেলে ।

আহা আমরা ভদ্রলোকের ছেলে ;  
 বনেদী আঁস্তাকুড়ের উচ্ছিন্নভোজনেই আমরা খুশি

ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যতার ফুটপাতে শুয়ে  
কংগ্রেসী ফুলবাগানের গন্ধ শুঁকি  
আর বিকলাঙ্গ পূর্ণ স্বরাজের কূটনৈতিক আত্মবিসোপে

ভাগ্যাকাশের তারা শুনি ।  
আমাদের এই পোষমানা জীবন কাঁ নিরীহ !  
কাঁ নিদারুণ বৈদ্যপরায়ণ !  
শাস্তির ললিতবাণী শুনি আর স্বপ্নজাল বুনি  
ছিন্নমস্তা জীবনের চট্টচটে লালায়  
নির্বিনাদী মাকড়সার মতো !  
আহ! ভদ্রলোকের ছেলে আমরা ভদ্রলোকের ছেলে !

তবু তুমি স্থির জেনো মনে  
শতাব্দীর অগ্নি-ঝড়ে শ্রেণীচ্যুত ভদ্রলোকের ছেলে  
আমাদেরি হাড়ে হাড়ে দধীচির অগ্নিচোখ মেলে  
নিঃশেষে ভুলেছে আজ অর্থহীন ভদ্রতার মোহ  
মহামানবতা মগ্নে মুক্তি-সাধনায় ।  
অদ্বিতীয় অহংকার একাকার আঘাতে আঘাতে  
আমাদেরি শুভ্র চেতনায় ।  
ভদ্রলোকের ছেলে আমরা !  
নির্মম নিষ্ঠুর গালাগালি  
মনে হয়, এ যেন বিদ্রূপ !  
হে মানুষ, খেটে-খাওয়া অসংখ্য মানুষ  
আমরা আজ তোমাদেরি দলে  
তোমাদেরি বহাঙ্গীত লবণাক্ত অশ্রুর অতলে  
জলন্তস্তে পরিণত  
লৌকিক বুদ্ধির বাষ্পে প্রচণ্ড টাইফুন !  
ভদ্রলোক ! আহ! ভদ্রলোক !  
হুণের পুতুল আজ নোণাজলে ঝাঁপ দিয়ে  
একাকার মানুষের বিপ্লবের সামুদ্রিক ঝড়ে ।  
ইতিহাস উন্টে যায়  
কীটদষ্ট প্রাচীন পাতায়  
লেখা থাকে বেদনার লজ্জার অক্ষরে  
এক দিন পৃথিবীতে ছিল :  
ভদ্রলোকের ছেলে আহ! ভদ্রলোকের ছেলে !



# ବ୍ରହ୍ମମାଳା

ତ୍ରୀପ୍ରାଣତୋଷ ଷଟକ

ପକ—ପାକା, ସିନ୍ଧୁ, କ୍ରିମ୍, ବୟସ୍କ, ବୟସ୍କ ।  
ପକ୍ଷ—ପାର୍ଶ୍ବ, ମାସାର୍ଦ୍ଧ, ଦଳ, ପାଞ୍ଚା ।  
ପକ୍ଷପାତ—ଗଣତା, ଅନୁଗ୍ରହ, ସହକାରିତା ।  
ପକ୍ଷବାନ—ଡାନାୟୁକ୍ତ, ପାଞ୍ଚାବିଶିଷ୍ଟ ।  
ପକ୍ଷାନ୍ତରେ—ଅନ୍ତପକ୍ଷେ, ନତୁବା ।  
ପକ୍ଷୀ—ପାଖୀ, ବିହଙ୍ଗମ ।  
ପକ୍ଷ—କର୍ଦ୍ଦମ, କାଦା, ପାକ ।  
ପକ୍ଷ—ଫଡ଼ିକ୍ସ, ପତକ୍ଷ ।  
ପଟ—ଛବି, ଚିତ୍ର, ଛବିଯୁକ୍ତ ପତ୍ରାଦି ।  
ପଠନ—ଅଧ୍ୟୟନ, ପାଠକରଣ, ପଢ଼ନ ।  
ପଢ଼ୁଣୀ—ପ୍ରତିବାସୀ, ପ୍ରତିବେଶୀ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ।  
ପାଞ୍ଚିତ—ବିଦ୍ବାନ, ଗୁଣବାନ, ବୃଦ୍ଧ, କୋବିଦ ।  
ପାତ୍ତନ—ଗ୍ରାମ, ନଗର, ବସତି, ପ୍ରାସାଦ ।  
ପାତ୍ର—ଦଳ, ଲିପି, ପାତା, ଚିଠି ।  
ପଥ—ବନ୍ଧ୍ୟା, ପଦବୀ, ଯାଗ ।  
ପଦାତିକ—ପଦାତି, ପଦଗାମୀ, ପତି, ହୃତ୍ୟା ।  
ପଦାବଳୀ—ପଦଶ୍ରେଣୀ, ହନ୍ଦ ।  
ପଦାର୍ଥ—ବସ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୋଚର ।  
ପଦ୍ଧତି—ପଥ, ଶ୍ରେଣୀ, ରୀତି, ପଦବୀ ।  
ପନ୍ଥୀ—ଉପାଧି, ନାମ, କୁଳସଂଜ୍ଞା ।  
ପନ୍ଥ—ପକ୍ଷଜ, କମଳ, ସରୋଜ, ବ୍ୟବିଶେଷ ।  
ପନ୍ଥନାଥ—ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଜାପତି, ବିଷ୍ଣୁ ।  
ପନ୍ଥ—ଶ୍ରୋକ, ହନ୍ଦ, ବ୍ୟବହାର, ରୀତି ।  
ପନ୍ଥଗ—ଭୂଜଙ୍ଗ, ଅହି, ସର୍ପ, ବିଷଧର ।  
ପବିତ୍ର—ଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଚି, ପବିତ୍ର, ନିଷ୍ଠା ।  
ପନ୍ଥ—ପୟସ, ହୃଦ୍ଧ, ଜଳ, ଲଳିତ ।  
ପନ୍ଥନାଥ—ପ୍ରଣାଳୀ, ନଳ, ନର୍ଦ୍ଦୟା ।  
ପନ୍ଥମନ୍ଥ—ଭାଗ୍ୟବାନ, ଅଦୃଷ୍ଟବାନ ।  
ପନ୍ଥସା—ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ।  
ପନ୍ଥୋଧର—ଘେଷ, ଜଳଧର, ଶୁଭ, ବନ୍ଧୋଜ ।  
ପନ୍ଥ—ଅନ୍ତ, ଦୂରସ୍ଥ, ପଶ୍ଚାତ୍, ଶତ୍ରୁ ।  
ପନ୍ଥକଳା—ସ୍ବଚ୍ଛ, ତେଜୋମୟ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ।  
ପନ୍ଥ—ପରୀକ୍ଷା, ପରହାସି, ବିବେଚନା ।  
ପନ୍ଥହନ୍ତ—ପରାଧୀନ, ପରତନ୍ତ୍ର, ପରବଶ ।  
ପନ୍ଥ—ପରକାଳେ, ଅନ୍ତତ୍ର, ଇତରମଧ୍ୟେ ।  
ପନ୍ଥ—ପରୁ, ଉତ୍ସବ ।  
ପନ୍ଥ—କୋକିଳ, ପିକ୍ ପକ୍ଷୀ ।  
ପନ୍ଥମୁଖ୍ୟ—ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ବର, ଶ୍ରେଷ୍ଠକର୍ତ୍ତା, ପରାତ୍ପର ।  
ପନ୍ଥମାତ—ଆଶାସ, ଶାନ୍ତନା, ଉତ୍ତମ ଜାତ ।  
ପନ୍ଥହଂସ—ସୋମୀ, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତି ।

ପରମାଣୁ—ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ, ଲେଖ, କଣ ।  
ପରମାତ୍ମ—ପାୟସ, କ୍ଷୀରିକା ।  
ପରମାୟୁ—ଜୀବନକାଳ, ଆୟୁ ।  
ପରମ୍ପର—କ୍ରମାଗତ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ।  
ପରମ୍ପରା—ଆତ୍ମପୁରସ୍କାର, ସାରାବାହିକ ।  
ପରଲୋକ—ପରକାଳ, ଉତ୍ତରକାଳ ।  
ପରଶାଢ଼ା—ଜଳ, ଶ୍ରାବକ, ଚାଟୁବାଦୀ ।  
ପରଶୁ—ବୁଢ଼ାଳି, ବୃଦ୍ଧା, ଟାଣି ।  
ପରଶ୍ବ—ପରଶୁ, ଆଗାମୀ ବା ଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ।  
ପରାକ୍ରମ—ବିକ୍ରମ, ପ୍ରୋତାପ, ଶକ୍ତି ।  
ପରାଗ—ପୁଷ୍ପରେଣ, ଧୂଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହ ।  
ପରାଜୟ—ପରାତ୍ତବ, ହାର ।  
ପରାଜୟୀ—ପରାଜିତ, ପରାସ୍ତ, ପରାହତ ।  
ପରାବଜ୍ର—ତୁଚ୍ଛକାରୀ, ଅବଜ୍ଞକାରୀ ।  
ପରାମର୍ଶ—ବିବେଚନା, ମନ୍ତ୍ରଣା, ଯୁକ୍ତି ।  
ପରାୟଣ—ପକ୍ଷପାତୀ, ତତ୍ପର ।  
ପରିକଲ୍ପନା—କୌଶଳ, ଶୈଳୀ, ଉପାୟ ।  
ପରିକୀର୍ତ୍ତନ—ପ୍ରସାବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ।  
ପରିକ୍ଷା—ଖାତ, ଧାନା, ଗଡ଼ ।  
ପରିଗତ—ଜ୍ଞାତ, ବିଦିତ, ଚେଷ୍ଟିତ, ପ୍ରାପ୍ତ ।  
ପରିଗ୍ରହୀତ—ପ୍ରାପ୍ତ, ସ୍ବୀକୃତ, ଲବ୍ଧ ।  
ପରିସ—ଗଦା, ମୁଦ୍ଗର, ଶୂଳ, କାଚପାତ୍ର ।  
ପରିଚୟ—ଜ୍ଞାନ, ଜିଜ୍ଞାସାବାଦ, ଜ୍ଞାତସାର ।  
ପରିଚର୍ଯ୍ୟା—ସେବା, ଅନୁରୂପ, ଉପାସନା ।  
ପରିଚାରକ—ଉପାସକ, ସେବକ, ଅନୁଚର ।  
ପରିଚିତ—ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନତ, ବିଦିତ, ଅବଗତ ।  
ପରିଚ୍ଛେଦ—ବନ୍ଧ, ବେଶ, କାପଡ଼, ପରିଧେୟ ।  
ପରିଚ୍ଛେଦ—ପରିହିତ, ବେଷ୍ଟିତ ।  
ପରିସ୍ଥିତି—ଶୀମା, ବ୍ୟବଧାନ, ନିଷ୍ପାତ୍ତି ।  
ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ—ଶୀମାୟୁକ୍ତ, ପରିମିତ, ପରିକୃତ ।  
ପରିଚ୍ଛେଦ—ଶୀମା, ବିତାଗ ।  
ପରିଜ୍ଞାନ—ପୋଷ୍ୟବର୍ଗ, ପରିବାର, ସ୍ବଜନ ।  
ପରିଜ୍ଞାପନ—ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧାନ, ବିଜ୍ଞାପନ ।  
ପରିଗତ—ପକ୍ଷ, ପାକା, ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ।  
ପରିଗୟ—ବିବାହ, ଦାରପରିଗ୍ରହ, ପାଣିଗ୍ରହ ।  
ପରିଗାୟ—ଭାବାନ୍ତର, ଶେଷ, ଉତ୍ତରକାଳ ।  
ପରିଗାୟଦର୍ଶୀ—ଦୂରଦର୍ଶୀ, ବିଜ୍ଞ, ବିବେଚକ ।  
ପରିତାପ—ସାତନା, ହୃଦ୍ଧ, ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଭା ।  
ପରିତ୍ରାଣ—ବ୍ରହ୍ମା, ଉଦ୍ଧାର, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ।  
ପରିଧି—ବେଡ଼, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ପରିବେଶ ।

পরিপক—পরিণত, পাকা, সুজীর্ণ।  
 পরিপন্থী—শত্রু, বিপক্ষ, ঠগ।  
 পরিপাক—সম্পূর্ণতা, সুজীর্ণতা, পক্বতা।  
 পরিপাটী—উত্তম, যথাক্রম, ধারা, স্নন্দর।  
 পরিপূর্ণ—পূরিত, সম্পূর্ণ, ভরা, প্রচুর।  
 পরিব্রাজক—সন্ন্যাসী, ভ্রমণকারী।  
 পরিভাষা—কথোপকথন, শাস্ত্রসংক্ষেপ।  
 পরিমণ্ডল—চক্র, গোল, গ্রহাদির পথ।  
 পরিমল—সুগন্ধ দ্রব্য, চন্দনাদি চূর্ণ।  
 পরিমাণ—মাপ, সংখ্যা।  
 পরিমিত—মাপিত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন।  
 পরিশেষ—অন্ত, সীমা, অঞ্চল, সমাপ্তি।  
 পরিশ্রম—উত্তোষ, চেষ্টা, অত্যায়াস।  
 পরিশ্রান্ত—ক্লান্ত, অতিশ্রান্ত।  
 পরিসং—সত্য, গোষ্ঠী।  
 পরিস্কার—নির্মল, স্বচ্ছ, শুদ্ধ।  
 পরিসীমা—শেষ, অবধি, অন্ত, ইয়ত্তা।  
 পরিহাস—কৌতুক, বিদ্রোপ, ক্রীড়া।  
 পরুষ—নিষ্ঠুর, কক্কশ বাঁকা, কঠিন।  
 পরে—পশ্চাতে, শেষে।  
 পরেদ্যঃ—পরদিনে, কল্য, আগামী দিনে।  
 পরোক্ষ—অগোচর, অসমক্ষ, অসাক্ষাৎ।  
 পৰ্ণ—পত্র, পলাশ বৃক্ষ, পাণ, তাঁমূল।  
 পৰ্বত—শৈল, গিরি, অচল, অদ্রি।  
 পর্য্যাক্ষ—গাট, খট্টা, পালঙ্ক।  
 পর্য্যটন—ভ্রমণ, বেড়ান, আকুঞ্জন।  
 পর্য্যায়—ক্রম, পালা, যথাক্রম।  
 পলক—চক্ষু-পল্লব, অক্ষিপট, নিমেষ।  
 পলাল—পোয়াল, খড়, বিচালী।  
 পলিত—খড়িত, লোলিত।  
 পলিতা—বর্জিত, বর্জিকা, শলিতা।  
 পাংশু—ধূলি, পরাগ, রেণু, রজঃ, ভস্ম, পাশ।  
 পাঁজরা—পঙ্কর, পাঁজড়া, পশুকা।  
 পাঁজা—রাশি, বোঝা, আঁটি, গাদা।  
 পাক—পরিপাক, জীর্ণ, ঘূর্ণ, রন্ধন।  
 পাকনা—আবর্ত, ঘূর্ণাজল, পাকচক্র।  
 পাকিম্ব—পরিপক, পাকল, পাকা।  
 পাখা—পালখ, পক্ষ, ডেনা, ডানা, ব্যজন।  
 পাগ—পাগড়ী, উষ্ণীষ, শিরোবেষ্টন বস্ত্র।  
 পাগল—উন্মত্ত, উন্মাদ, বায়ুগ্রস্ত।

পাচড়া—কণ্ডুরোগ, কচ্ছ, ক্ষতবিশেষ, পান।  
 পাছ—পাছ, পশ্চাত্তাগ, পৃষ্ঠদেশ।  
 পাছাড়—মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ, মল্লক্রিয়া।  
 পাজা—ভাটা, ইষ্টক আখা, ইষ্টকস্তূপ, পাটকেল, পাটকল।  
 পাজী—অধম, হেয়, তুচ্ছ, নীচ।  
 পাটল—বর্ণবিশেষ, আশুপাণ্ড।  
 পাটা—পটুকা, তক্তাবিশেষ।  
 পাঠ—অধ্যয়ন, পড়া, অধ্যায়, শিক্ষা।  
 পাঠক—অধ্যয়নকারী, অধ্যাপক।  
 পাঠগুরু—শিক্ষক, অধ্যাপক।  
 পাঠশালা—বিদ্যালয়, অধ্যয়নগৃহ।  
 পাড়—তট, তীর, কূল।  
 পাড়া—পল্লী, পল্লীগাম, ক্ষুদ্র গ্রাম।  
 পাণ্ডা—পূজারী, পরিচারক, যাজক।  
 পাণ্ডিত্য—বিজ্ঞা, শাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান।  
 পাণ্ডুরোগ—রোগবিশেষ, নেবা।  
 পাণ্ডুলিপি—পাণ্ডুলেখা, পাতড়া, পসড়া।  
 পাথর—পাথান, উপল, শিলা।  
 পাদ—পা, পদ, অংগ।  
 পাদাক্ষ—পাদচিহ্ন, উদ্দেশ।  
 পাদুকা—বিনামা, উপানয়, জুতা।  
 পাপ—অধর্ম, অপরাধ, অঘ, পাতক।  
 পারক—সমর্থ, দক্ষ, পটু, পারগ, সক্ষম।  
 পারিষদ—সহচর, সভাসদ, পার্শ্বদ, পাশদ।  
 পারশ্ব—তিরস্কার, কটুক্তি, অহুযোগ।  
 পার্থক্য—পৃথক হওয়া, বিভিন্নতা, পৃথকতা।  
 পালকী—শিবিকা।  
 পাশক—অক্ষ, পাণ্ডি, পাশা।  
 পিচ্ছল—পিচ্ছল, চিকণ।  
 পিচ্ছান—হঠান, থামান, পাছ।  
 পিঞ্জর—পঙ্কর, খাঁচা, বক্ষস্থল।  
 পিঠা—পূপ, পিঠক, পিঠে।  
 পিণ্ড—পিণ্ড, বর্জুল, গোলাকার বস্তু।  
 পিতা—তাত, জনক, বাপ, পিতৃদেব।  
 পিতৃব্য—পিতৃভ্রাতা, খুড়া, কাকা।  
 পিতুল—তৈজস, ধাতুবিশেষ।  
 পিপীলিকা—পিপীড়া, পিপীলক, পিপড়ে।  
 পিপুল—পিপুলী, উষণ বিশেষ।  
 পীড়া—ব্যধি, রোগ, ব্যথা, তাপ।  
 পীযুষ—অমৃত, সুধা, গোদুগ্ধ।



( শ্রীচরিত্র শেঠকে লিখিত )

শ্রীশ্রীচরিত্র

বমনা, ঢাকা

জুলাই ১৩, ১৯৩৩

শ্রদ্ধাম্পাদেয়,

৪১, লীডার রোড, এলাহাবাদ সিটি

২৫।১।১৯৩৩

কল্যাণবরেষু

আপনার “প্রতিভা” পড়িলাম। আগাগোড়া না পড়িলে ত গল্পের বই বা নাটক পড়া হয় না তাই সবটাই পড়িলাম। প্রতিভার চরিত্রটি খুব ফুটিয়াছে। সংসারে ওরূপ চরিত্র নাই এ কথা বলা চলে না। তবে কবি-কল্পনায় ও-চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে। ঐটি বোধ হয় আপনার প্রদান চরিত্র। প্রতিভাই উমানাথের সকল স্ফুটন পূরস্কার। বহির্জগতের পুরস্কার অন্তর্জগতেরও পুরস্কার।

আপনি অর্থাগমের জন্ত দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কেমন করিয়া যে বই লেখেন বুঝিতে পারি না। এরূপ একথানা বই লিখিতে কম সময় যায় না, কম ভাবনা ভাবিতে হয় না। আপনি সে ভাবনাব সময় পান কেমন করিয়া।

আপনার বই দু’খানি আমি স্বল্প করিয়া আমার পুস্তকালয়ে রাখিয়া দিলাম।

শুভার্থী

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৪১ লীডার রোড

এলাহাবাদ, ৬।১।১৯৩৪

শ্রদ্ধাম্পাদেয়

আপনার ১৫ই নভেম্বর তারিখের চিঠিখানি যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। তাহাতে আপনি বামচন্দ্র গাঙ্গির মৃত্যুর অমুসন্ধানের কথা জানাইয়াছিলেন। আমার কণ্ঠশক্তি কমিতেছে এবং নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এই জন্ত যথাসময়ে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না। ক্রটি মার্জনা করিবেন। কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষামন্দির সম্বন্ধে আমার যত কিছু লিখিয়া পাঠাইতেছি।

আপনি কিছুদিন পূর্বে মেজর বামনদাস বসুর Ruin of Indian Trade and Industries বহির Introduction অনুবাদ করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ বহির বাংলা অনুবাদ অজ্ঞ এক জন ছাপিবীর অমুদ্রিত মেজর বসুর পুত্র ডাক্তার ললিত মোহন বসুর নিকট চাহিয়াছেন। কিন্তু আপনি যদি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমি শ্রীমান ললিতকে আপনাকেই অনুবাদ প্রকাশের অধিকার দিতে বলিয়াছি। এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানাইলে বাধিত হইব।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন। আমি দীর্ঘকাল চক্ষুবোগে ভুগিতেছি। ১৩ই পর্যন্ত এখানে থাকিব।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আমি কিছু দিন বিশ্রামের জন্ত কল্যাণে আসিয়াছি। দু’ বাগিল চিঠির উত্তর দিতে বাকী আছে। অনেক মাস আগেকার চিঠি বাহির হইতেছে। তাহাব মধ্যে একখানি আপনাকে পাঠাইতেছি। ইহা বড় পূর্বে আপনাকে পাঠান উচিত ছিল। তখনও ছোকরাটির মৃত্যুর বৃত্তান্ত হয়ত পাওয়া যাইত না। কাবণ তাহা ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে ঘটে। বামচন্দ্র গাঙ্গির মাতা শ্রীমতী কুমুদিনী বাঙ্গালী মেয়ে (আমার পরিচিত), পিতা মান্দাজী (তিনিও আমার পরিচিত)। ছোকরাটির মৃত্যু হয় চন্দননগরের Savoy Hotel-এ। আপনি দয়া করিয়া একবার খবর লইলে বাধিত হইব। যখন জবাব দিবেন তখন অল্পস্থল কবিতা সেট সঙ্গে প্রেরিত চিঠিটি ফেরত দিবেন।

আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন।

আপনার

শ্রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪০

সম্মানীয় নিবেদন

ভারতবর্ষের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ধ্বংসবিষয়ক প্রবন্ধটি অনেক দিন হইতে আমার নিকট রহিয়াছে। জিনিষটি যে ভাল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আইনবৎ অবস্থা এখন যেহেতু তাহাতে উহা বাংলা ভাষায় না ছাপাই ভাল। দেশী ভাষায় প্রকাশিত জিনিষের উপর কর্তৃপক্ষের নজর খুব তীক্ষ্ণ ও কড়া।

শ্রীযুক্তা অনুকূপা দেবীর অভিভাষণটি সংক্ষিপ্ত করিয়া ছাপিব, তাহা তাঁহাকে বলিয়াছি। কিয়দংশ সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। শেষ করিয়া আশাটের প্রবাসীতে ছাপিব।

নারী শিক্ষামন্দির দেখিবার খুব ইচ্ছা আছে। এখন ত ছুটি। ছুটি পর যাইব। কোন এক ববিবারে যাইব।

বিনীত নিবেদক

শ্রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

কলেজ অব সাইন্স

২৬।৪।২৩

শ্রদ্ধাম্পাদেয়

‘বসুমতীতে’ ‘বাঙ্গালীর সামর্থ্যের অপচয়’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ক্রমশঃ ইউরোপীয় ও আবঙ্গালীরা বাঙ্গালীকে সমস্ত কার্যক্ষেত্রে হইতে বিভাজিত করিতেছে

তাঁহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। তাঁহাৰ প্রধান কারণ আমাদের অলসতা, শ্রমবিমুখতা ইত্যাদি। আপনি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রকৃত diagnosis কৰিতে পারিয়াছেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেব বসুমতীতে “বন্ধে ও বাংলা” শীৰ্ষক প্রবন্ধে ইহাৰ আরও বিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

বিনীত

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বায়।

কলেজ অব সাইন্স

১০।২।২০

শ্রদ্ধাঙ্গদেবু

আমাব ইদানীং সমস্ত বাংলা (গদ্য প্রচুর করে) এমন কি ভাবতবর্ষ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। আমি কাল মাত্র আলিগড় হইতে আসিয়াছি, কাল আবার চট্টগ্রাম যাইতেছি—সেখানে হইতে ফিফিয়া আসিয়া নানা স্থানে এবং পরে গুজরাট যাইতে হইবে। বাঁশি বাঁশি পূর জমা হয়, উত্তর দিয়া টাা ও সাধ্য। শব্দচন্দ্র দাস সখকে আপনি interest হইতেছেন শুনিয়া সুখা হইলাম।

আপনার পুস্তকাগারে ব্যবসায়—স্বত্বা: আপনাব প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে ছাপাইলে সমাজেব উপকার হইবে—আইনাদ সহকারে ভূমিকা লিখিয়া দিব।

পু:—আপনাব “প্রতিভা” পাঠিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

বিনীত

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বায়।

কলেজ অব সায়েন্স

৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯২০

প্রিয় হরিচন্দ্র বাবু

এই পদবাহক শ্রীমান শব্দচন্দ্র দাস, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রায় ২০ বৎসর কাজ করিতেছে ও আমাব বিশেষ অল্পগত এবং আশ্রিত। তিনি আপনার নিকট যাইতেছে ইহাৰ কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রনগরে গত বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: গত অগস্ত্য মাসে ইহাৰ ভগ্নীপতিব হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে ইহাৰ প্রমথ্য উক্ত মৃত ব্যক্তিৰ বিষয় সম্পত্তিৰ বিষয় অবগত হইবেন—একণে বাহাতে এই বাল-বিধবাব চিবকাল ভরণপোষণ হয় তাহাৰ ব্যবস্থা আপনি এক স্থানীয় ভদ্রলোকেরা কবিয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত এবং অর্থী হইব।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র বায়।

শ্রীশ্রীচবি: শব্দ:

৩০২ আপাব মার্চু'লার বোড

কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট, ১৯২০

নমস্কাৰান্তে সন্নিয় নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত বাবু বামলাল মল্লিক বৈবাহিক মহাশয় প্রভৃতিব মুখে মহাশয়ের স্বকৃতিব প্রতি অনুবগ ও স্বজাতীয় সামাজিক উন্নতিব বলবতী ইচ্ছাব বিষয় অবগত হইয়া পূৰ্ব আমন্দলাভ কবিয়াছি। মহাশয়ের পুরোক্ত গুণ, উদারতা এবং মহাত্ম্যবতাব সচিত মিলিত হইয়া, আপনি সাধারণ চক্ষের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছেন। ব্রহ্মপ দর্শনীয় বস্তুব দর্শনলাভ ইচ্ছা চন্দ্রে প্রবল হওয়ায় মহাশয়ের দর্শনলাভ সুখেব অনুসন্ধান কবিতৈছি। নানা কাযে ব্যস্ত থাকায় ঐ সুযোগ

ঘটিয়া উঠিতেছে না। আমি এক্ষণে কয়েক দিন কলিকাতায় অবস্থিতি কবিব। মহাশয় কবে কলিকাতা আসিবেন জানিতে পারিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া পূৰ্বম স্তীতি লাভ কবিব। অল্পগত পূৰ্বক এই সংবাদ দানে স্তখী কবিবেন। ইতি

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

মায়াপুৰী, দার্জিলিং

১৩ই জুন ১৯২১

মান্যবাবু,

বহু দিন পূৰ্বে আপনার সহিত পরিচয় হইয়াছিল, আপনার আমাকে শ্রবণ আছে কি না জানি না।

কৃষ্ণভাষিনী নাবী শিক্ষামন্দিবে একটি শিক্ষয়িত্রী স্থান খালি আছে কাগজে দেখিয়া আমাব মামাত ভাইএব মেয়ে সেই কাজের জন্য আবেদন কবিতৈছে। মেয়েটি শাস্ত্র সশীলা, তাহাৰ পিতা বঙ্গা দেশে উকিল—সেই জন্য privately B. A. দেয় এবং Mathematics এ Honours নিতে পাবে নাই, নতুবা ইহাৰ অন্তের মাথা খুব ভাল। চন্দ্রনগরব কাছে বলিয়া উঠাকে এখানে কাজেব জন্য আবেদন কবিতৈ বলিয়াছি। যদি আপনারা নিতে পাবেন তাহা হইলে অল্পগত পূৰ্বক যদি একটু শীঘ্র জ্ঞান তবে বাধিত হই, কাবণ অল্পগত ইহাৰ জন্য চেষ্টা কবিতৈছি। কলিকাতা হইতে দূবে পাঠান আমাব ইচ্ছা না।

আমাব শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিবেন।

বিনীত

অবলা বসু।

এলগিন রোড, কলিকাতা

শ্রদ্ধাঙ্গদেবু ও পুৰাতন বন্ধুবাবু—

আজ দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে আপনার ১১ই জুন তারিখের চিঠি পেলাম—কিন্তু তৎসঙ্গে প্রেরিত ‘আমাব টিপ’ ফসকে গেল। আমাব দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমার মেয়েব সৌভাগ্য, ছেলে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা খেয়ে খুশী হয়েছেন।

দার্জিলিং প্রিয় বন্ধু গগেন বাবুব সঙ্গে সমস্তক্ষণ দেখা ও কথা। যখন তাঁর কাছে শুনলাম যে ‘তঁাকে আম পাঠিয়েছেন, সত্যি কথা বলতে কি মনে হলো তবে কি আমায় ভুলে গেছেন? সেবার আম পাঠাবার কথা তো ভুলি নি। যাই হোক আমটাই আসল নয়, আসল হচ্ছে আপনার সেই প্রেম ও প্রীতি যা ফলেযু “শ্রী” ও “তিমসাগর”। আন্তরিক ধন্যবাদ। এমন বন্ধু কয়জন আছেন?

বয়স হলো কত? আমাব ৬৫ মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এ বয়সে যে স্বাস্থ্য ও শক্তি অল্পভব কবছি পূৰ্বে কখনো তা কবিনি। দোস্তি কাকে বলে তা জানি না। পাঠাড়ে উঠতে নামতে কষ্ট নেই। ৮।১ দিনে ৪টি বক্তৃতা ও ৬টি conference কবলাম। গিয়েছিলাম না গরম এড়াতে না change এ না rest এব জন্য। rest কাকে বলে জানি না; change of occupation ই rest. রাত ২।৩টা পর্যন্ত জাগলে তাব পরদিন দিনে ঘুমুছি না। কেন? “মনেন হি জীবতি।” আব এক স্থিতির তাড়না ও তাগিদ আমাকে পাগল কবে তুলেছে। তাই ছুটেছিলাম পাঠাড়ে, তাই ঘুরে বেড়াচ্ছি বাঙ্গলাব নানা স্থানে। মে মাসেব ঐ ১০.৫।১০.৬

প্রথমে ১০ মাইল বাসে কবে ছোটনাগপুর অঞ্চলে ঘুরেছি। আমার এ কাজ আপনাদের 'follow up' কাজ।

এক দিন ডাকুন আপনাদের চন্দননগরে। বসি আপনার নৃত্য-গোপাল স্মৃতিমন্দিরে ভেলে ও মেয়েদের কাছে। সকলের শোনা চাই। আপনি preside করবেন।

I. A. B. A. র কুনয়, বিও নয়, অ-পথ থেকে মেয়েদের ঘোরাতে চলে। M. A. পাশ কবে দেশের কথা ও যা যা অবস্থা জ্ঞাতব্য, সে সব কিছু জানে না। ভিগ্নব মোতে যাতে নম্বব বেশী পাওয়া যায় সেই রকম বিষয় বেছে নিয়ে স্বাস্থ্য যৌবন, পরীক্ষার ও দুর্ভাবনা ও মুখস্থের জাঁতায় পিশে কি হয়ে বেরোচ্ছে! কোথায় বিবাহ? কিসের আকর্ষণ! "সোনা ফেলে আঁচলে গেরো!" মোড় ফেরাতে হবে। ১৫১৬ থেকে ১৭১৮ এই দুই বৎসরে ভারতীয় ও বাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের মূল তত্ত্ব ও তথ্যগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অভিনব প্রণালীতে সরল ভাবে তাদের মনে মুদ্রিত করে দিতে হবে। আপনার সঙ্গে পরামর্শ যে বিশেষ আবশ্যক। কেন না শিক্ষাদান যে আপনার জীবনের প্রধানতম এক ব্রত। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

আপনার গুণমুরক্ত  
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র।

এখন কেমন আছেন? কোনোও বিশেষ অসুখ কি! জানানবেন।

(৬প্যাবীচাদ মিত্রকে লিখিত)

প্রিয় মহাশয়,

১৮৬৪ সালে কলিকাতা ত্যাগের সময় আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম। তাহাব পূর্ব এই প্রথম আপনার নিকট হইতে পত্র পাওয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের ভুলি না। বাঙলায় যে কয়টি আনন্দময় বৎসর কাটাওয়া আসিয়াছি, তাহাব কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে।

আলালের ঘবেব দুলালের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া বড় খুশী হইয়াছি। আমার বরাবরই মনে হয়, এই গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার রচনা রস ইচ্ছা হস্তবসেব মতই উল্লেখযোগ্য। কখনও কখনও কোন ইংরাজী পত্রিকায় এই পুস্তকের উপর একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু কাজের এত চাপ যে সামান্য অবসরও পাই না, অন্যথায় বড় দিন পূর্বেই উঠা করিতাম।

বইখানি ইংল্যাণ্ডে ছাপিলে লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এক টাকার পরিবর্তে এখানে ৫৬ টাকা লাগিবে। এখানে বাঙলা হবফে ছাপিবার ব্যয় অত্যধিক। লোক যখন প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক ইংল্যাণ্ডে ছাপিয়া ভাবতে বেচিবার কথা বলে তখন আমি তাহাদের ভাণ্ডিকুলাব সোসাইটির পুস্তক দেখাইয়া বুঝাইয়া দিই, কত সম্ভাব্য বই ছাপা যায়। উহাতে পুস্তকের সৌষ্ঠব বাড়িবে বলিয়া আমি মনে কবি না বরং উহাতে পুস্তকের বৈশিষ্ট্য ক্ষয় হইবে এবং ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইংরাজ শিল্পীর হাতে পড়িয়া পুস্তকখানির সাজ-সজ্জাব রূপান্তর ঘটিবে এবং যে জাতীয়তা এবং সত্য পুস্তকখানিব বিশেষ আকর্ষণ, তাহাতে বৈদেশিক ছাপ পড়িবে। ব্যাপারটি ঠাড়াইবে বাঙলা প্রবাদ বাক্য শেত চামব আর কোষ্ঠী পাটের মত।

আশা করি, পুস্তকখানি আপনি কলিকাতায় পুনর্মুদ্রিত করি লইবেন। আরও পরিষ্কার লম্বা লম্বা হরফে লাইনে লাইনে বেরা কাক রাখিয়া ছাপা যাইতে পারে। তাহা হইলে ইহা সন্দেহ এক খণ্ড পুস্তক হইবে।

আশা করি, আমি ভারত ত্যাগ করিয়া আসার পর হইতে আপনি ভালই আছেন। কেশ্বিজ্ঞে সংস্কৃতের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করিতে পাওয়া আমি বড়ই সম্ভ্রষ্ট হইয়াছি এবং সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের শিষ্য গ্রহণ করায় আমি যে কতদূর লাভবান হইয়াছি, তাহাও এখন অমুখাবন করিতে পারি। ইতি ফিজ উইলিয়ম স্ট্রীট, কেমব্রিজ এডওয়ার্ড বি কউয়েল। ১১ই এপ্রিল, ১৮৬১

পূর্ণিয়া, ভটপাড়া  
৩০/৭/৪৭

শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়

হেমেন্দ্র বাবু! তোমাদের পত্র পেয়েছি ভাই, তাতে বিপন্নই হয়েছি। শরীর আর ভাল থাকছে না। শরৎ ভায়াব ছেলের অসুখের কথা শুনে পর্যন্ত মনও দুর্বল হয়ে পড়েছে। টাকা ফেরৎ নিলে পাছে তা মনে আঘাত করে, তাই আজো তা পাবিনি। কিন্তু ইচ্ছা মতো লেখাও আসছে না।

বইখানা নাড়াচাড়া করছিলাম। এমন সময় তোমার পত্র পেলুম। এবার পূজা-বার্ষিকীর "দেশের মাটি" নামকরণ দেখে ভাবী আনন্দ পেলুম। তোমার সম্পাদনায় সে সার্থক হবে।

কিন্তু আমি কি করি। আজ আমার টাকা ফেরতের দিন ছিল। রইলো। যদি সপ্তাহ খানেক একটু ভাল থাকি, সেই অপেক্ষায় রইলুম। লেখা আমার আনন্দের জিনিস, তাতে ত আমার অসাধ নেই, বরং না লিখলে ভাল থাকি না। কিন্তু যা তা লিখতে পারি না। যদি একটু ভাল থাকি ঠোঁট নিশ্চয়ই পাবো ভাই। এখন প্রীতি নমস্কার জানাই। শরৎকে ভালবাসা জানালুম আর ছেলের জন্তে ভগবানের কৃপাপ্রার্থী রইলুম।

তোমার শুভাকাজী

শ্রীকেশবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূঃ—আমার বয়স ৮৫ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন ভাই ভুলচকের দিন। তাই পরিচিতদের (বান্ধবদের) "আপনি আপনি" বলে সম্বোধন করতে নিজেই লজ্জা পাই। "তুমি-তোমার" বলে আপনি এসে পড়ে। অপরাধ করছি না তো? সে ক্ষেত্রে ক্ষমা চাইতে আমার কিছু মাত্র স্কোচ নাই। তোমার বয়স হয়েছে এবং তুমি সত্যই বড় সাহিত্যিক, তাই কথাটা জানালুম ভাই। কিছু মনে কর না। এটা আমার আপলজি বলে নিও।

তোমার একান্ত আপনাব—কে:

ভারতী অফিস

২২ স্কিয়া স্ট্রীট, কলি: ১১২১১১২

ভাই হেমেন্দ্র,

তোমার চিঠি এইমাত্র পেলাম। কাল তোমার বইয়ের খবর নেবার জন্তে থিয়েটারে একবার গিয়েছিলাম। বইখানি ভালো করে যাতে গুণায় তার জন্তে তুমি বতটা ব্যস্ত, তার চেয়ে আমি ক:

কারণ তোমার নিশ্চয় আমার গায়ে বাজে। থিয়েটারে আমরা “প্রস্তাবনা” তুমি নতুন করে লিখে দিয়েছ। আমার ইচ্ছা হল প্রস্তাবনা জিনিষটা বিককুল বাদ দেওয়া, কিন্তু দেখলুম থিয়েটারওয়ালাদের ইচ্ছে ওটা রাখা এবং তুমিও একটা নতুন লিখে দিয়েছ। সেই জগ্গে চূপ করে গেলুম, কিন্তু “প্রস্তাবনা”টা আমাকে একবার দেখতে দিলে ভাল করতে। হয়ত একটা নতুন ধরণের প্রস্তাবনা suggest করতে পারতুম। কিন্তু যাক তা নিয়ে খুঁংখুঁং করে কাজ নেই। এখন তোমার গানগুলোর খালি রিহাৰ্সাল চলছে—কথা আরম্ভ হয়নি। আরম্ভ হলে একদিন শুনে যাব। তুমি যদি দশ-বাঁবে দিনের মধ্যে ফিরে এস, তাহলে তুমিও উপস্থিত থাকতে পারবে—কারণ তার আগে বোধ হয় বিশেষ কিছু হয়ে উঠছে না। যে-রকম দেখছি ওরা ভয়ানক তাড়াহুড়ো করে বইখানা খুলবে। এবং একসঙ্গে অনেকগুলো বই হাতে নেওয়া হয়েছে। তাই আমার ভয়-ভয় করছে।

বুড়োর সঙ্গে দেখা হয়—অবশেষে-সবরে। সে গোবরের বাড়ি আড্ডা গেড়েছে। সত্যেন সকাল-বিকেল হেসিয়ে বেড়াচ্ছে। চাকর ছেলের অসুখ নিয়ে বিব্রত। কাজেই ভারতীয় কুঞ্জে সন্ধ্যাপীপ ছলে না। কি করব? তার উপর আজ সকালে এই দুঃসংবাদ পেলুম যে, আমাদের বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়বার জগ্গে নোটিশ দিয়েছে। বোধ হয় বাড়িটা ওরা বিক্রি করে ফেলবে। এতে আমি একেবারে দমে গেছি। ছাপাখানা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ নিবে আসছিল, কোনো রকমে তাকে জাগাবার চেষ্টা করছিলুম, এই তেতালাব নীডটিকে ছাড়তে হবে শুনে আমার সমস্ত উৎসাহ একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। এমন ঘর পাব কোথায়? তুমি জান না ছাপাখানার মতন বাড়ি পাওয়া ভারি শক্ত, অনেক কষ্টে এই বাড়ি পেয়েছিলুম। আবার যে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে মরব এমন বৈধা এখন আমার নেই, কাজেই হয়ত চাকিস্তান বিসর্জন দিতে হবে। অদৃষ্ট কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে ভাবচি।

তুমি চিঠিতে যে interesting আলোচনার সূত্রপাত করছ, তাতে যোগ দেবার ইচ্ছা থাকলেও আজকে মন নিবৃত্ত হচ্ছে। আজ ক’দিন থেকে সমস্ত মনটা এমন একটা অলসতায় ভরে রয়েছে যে কোনো কাজেই তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। এই অবস্থাটা বড় মারাত্মক, একে আমি বড় ভয় করি। কিন্তু কি করব?

তোমাদের খবর কি? বেশী করে চিঠি দিয়ো। তোমার চিঠি আমার ভালো লাগে। আমরা ভালো আছি। মোহন-লালের গল্প বোধ হয় পৌঁছে বেরোবে।

বিদায় মাগে  
মণিলাল।

ভারতী অফিস  
২২, স্কিয়া স্ট্রিট  
কলি., ৪১২১১১১

ডাই হেমেক্স

তোমার চিঠি পেলুম। তোমার বইখানার জগ্গ আমি ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। ওরা কি যে করচে কিছুই খবর পাচ্ছি না। গানের সুর দেওয়া হয়েছে শুনেছি, কিন্তু মাথামুণ্ডু কি সুর যে দিলে

কিছুই জানি না। হয়ত এমন বেয়াড়া সুর দিয়ে বসবে যে শুনে আংকে উঠতে হবে। ওরা হয়ত ভালো সুরজ্ঞ হতে পারে কিন্তু কতটা রসজ্ঞ সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে। তুমি আমার উপর ভাব দিয়ে নিশ্চিত আছ বলে আমি আবার উতলা হয়ে উঠেছি। আমি যে ওদের বাহ্যিক মধ্যে সৌন্দর্যেই পাবিনি। গোলেমালে কি হয়ে যাচ্ছে কিছুই টের পাচ্ছি না। ওরা অবশ্য সৌরীরেব পরামর্শ নিচ্ছে কিন্তু জিনিষটাকে দরদ দিয়ে দেখবার মতো সৌরীরেব অবসর কোথায়? সে যে বাস্তবগীশ! নিজের কাজেই সে তেমন মন দিতে পারে না, তা আবার অন্তরে? তার পূর্ব থিয়েটারওয়ালারা “বাণী প্রতাপ” “জীবন সন্ধ্যা” দু’খানা খোলবার জগ্গে মেতে উঠেছে, তোমার বইখানার উপর কতটা মমতা রেখেছে ভগবানই জানেন। যা-হোক তা-হোক কবে খুললে বইখানা মাটি হয়ে যাবে। ওর ভিতর অনেক সূক্ষ্ম জিনিষ আছে—সেগুলোকে ধাবড়া করে ফেলে সর্বনাশ! আমি কি করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না, অথচ সময় হুহু করে বহে যাচ্ছে। তুমি হয়ত জান না ভিতরে ভিতরে আমি অমর বাবুকে বগাবর উক্ক আসছিলুম তোমার বইখানা নেবার জগ্গে, কেবল সতীশ লোকটার বাধায় এতদিন হয়নি, সে যেমন অন্তর্দীন হয়েছে, অমনি বইখানা নেবার সুবিধে হয়ে গেছে। এখন বইখানা যদি না উৎসাহ তাহলে শুধু যে মনে দুঃখ পাব তা নয়, অমর বাবুর কাছে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। সে জগ্গে একটা মস্ত বড় দায় আমার রয়েছে। থিয়েটারওয়ালাদের গাফিলতিতে যে বই মাটি হল সে কথা হাজার মাথা খুঁড়েও তাদের বোঝানো যাবে না, কারণ নিজের দোষ বুঝতে পারে এমন বুদ্ধিমান লোক জগতে দুর্লভ। শেষে দোষ পড়বে বইয়ের উপর। মিসবকুমারীকে ওরা যে Successful করে তুলেছে তার কারণ ওরা অনেক দিন ধরে ঐ নিয়ে পড়ে ছিল। সময় না দিলে অভিনয় জিনিষটাকে ঠিক মতো খাড়া কবে তোলা যায় না। আমাদের তো একটু-আধটু অভিজ্ঞতা আছে, তাতে দেখছি দিনে দিনে এবং যত দিন যেতে থাকে ততই নিজের মধ্যে চরিত্রের বিকাশ হতে থাকে। প্রথমটা তোতা পাখী হয়ে থাকতে হয়। শেষে অল্পে অল্পে চরিত্রের সঙ্গে একশা হতে পারা যায়। এই অবস্থায় না পৌঁছলে কিছুতেই অভিনয় করা চলে না—যে মত বড়ই অভিনেতা হোক না। দিনে দিনে দেখতে দেখতে অনেক খুঁটিনাটি জিনিষ (যা হচ্ছে অভিনয়ের প্রাণ) ক্রমশ খুলতে থাকে। এই জগ্গে সময়ের দরকার। ওরা যে ভাবছে ছোট জিনিষটা এক নিমেষে মেরে দেব—সেটা মস্ত ভুল। এ ক্ষেত্রে আকার নিয়ে ছোট-বড় বিচার করা চলে না। কিন্তু এ কথা কে তাদের বোঝাবে? ক্রিষ্টমাসের আর কতই বা বাকি? এখনো ওরা রীতিমত রিহাৰ্সাল আরম্ভ করেনি। তবেই বুঝব ওরা তোমার বইয়ের জগ্গ কতটুকু সময় দেবে। ওরা এ পর্যন্ত এই রকমই করে এসেছে, ওরা হচ্ছে অভিজ্ঞ, আমরা গায়ে পড়া হয়ে বলতে গেলে আনাড়ি বলে আমাদের কথা উড়িয়ে দেবে। তুমি এ সময় এখানে থাকলে ভালো হত—এই কথাই আমরা কেবল মনে হচ্ছে। তোমার বিশ্রাম-সুখে ব্যাঘাত দিতে যদিও আমার মায়ার করছ, তবুও কেবল মন চাইছে তোমার এখানে থাকা দরকার।

এত কথা লিখে এখন ভাবচি তোমাকে এ সব লিখে লাভ

হল কি? তুমিই বা এর উপর করবে কি? কিন্তু কি কবল? আমি এমন উত্তলা হয়ে আছি যে না লিখে পাবলুম না। তত পাবে হয়ত এত ভাবনার কারণ নেই, বইখানা শেষে উঠবে যাবে। আপাতত তাই বলে মনকে অশ্বাস দেওয়া যাক। কি বল?

তুমি ঠিক কোন্‌ তাবিখে আসছ?

ভাবতীর কুঞ্জ যদি তুমি অটুট রাখতে পাব তোমাকে বাতলা দেব। কিন্তু আমি দেখছি অলক্ষ্যে থেকে কে যেন আমার ভবিষ্যৎটাকে ভারি ঘোলাতে আবদ্ধ করেছে। কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে আমায় ফেলবে—তাবই একটা সড়সড় ভিতরে ভিতরে চলেছে। কারণ নানা খুঁটিনাটি আমার বিপজ্জীবন করেছে—এবং তাদের সঙ্গে লড়াইর শক্তি যেন আমার কে হরণ করে নিয়েছে। আমার ভালবাসা নিও।

মণিলাল।

শ্রীশ্রীভগ্না

৭/১০/৩১

ভাই হেমেন্দ্র,

তুমি আচ্ছা লোককে গানের বরাত দিয়েছ—আমি কি গান লিখতে পারি? তুমি গান-রাজ্যের একটা মস্ত দিগ্‌গজ হয়ে এই ফরমাস আমাকে কবলে? যাক তোমার বাকবতাব অনুবোধ যখন আদেশেবই কাছাকাছি, তখন গান-নামে যাহোক কি লিখে পাঠালাম, দেখো যদি তোমার কাজ চলে। যেটা তুমি দেখে গিয়েছিলে এবং যেটা আমি 'নাচবে' দেব বলেছিলাম, ইতিমধ্যে তোমার তাগিদের অভাবে সেটা বেহাত হয়ে গিয়েছে—সে জন্ম কমা করে।

তোমার স্বপ্ন-লেখা দেখাবার জন্ম উৎসবক বইলাম; নতুন উপজ্ঞাস 'পবীর প্রেম' আমাকে এত বয়সে উৎসর্গ করে ভালো কবলে কি মন্দ কবলে, জানি না! তবু একসঙ্গে আনন্দিত ও বাদিত হলাম, জানিয়ে রাখছি। কবে নাগাদ তাঁব দেখা মিলবে?

অনেক দিন স্বপ্ন কানে যায়নি, অথচ অন্তবেব মোটেই অভাব নাই। এক দিন স্মৃতিধা করে এসো না। অন্ততঃ ত্রিপুরাকুমাবেব শরণ নেওয়া যেতে পারবে।

কেমন আছ? উভয়ে আমাদের প্রীতি সম্ভাষণ নেবে।

তোমার স্নেহ-মুগ্ধ

যতীন বাগচী।

ইলাবাস

হিন্দুস্থান পার্ক, বদনগঞ্জ

২/৬/৩৭

বঙ্গবন্ধু,

এদিকে অনেক দিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই—প্রতি সপ্তাহে কাগজের পত্রপুটে তোমার মনের খবর পাইলেও দেহেব ও সাংসারিক খবর কিছুই পাই না। অথচ সে জন্ম সর্কদাই মন উৎকণ্ঠিত থাকে। ৬০ বছর বয়স হইয়াছে, তাহার উপর গাড়ী-ঘোড়া নাই, তাই যাতায়াতের তৎপরতা হারায়া নিজে ইচ্ছামত খবর লইতে পারি না। তুমিও এদিক আর বহুদিন মাড়াও না। পত্রোত্তরে বোমার ও ছেলেপুলের খবর জানাইয়া স্থখী করিবে।

আজ একটু বিশেষ প্রয়োজনে তোমাকে অনুবোধ কবিতৈছি, আগামী শনিবার বেটার সময়ে একবার অতি অবগ্ন আসিবে। মাত্র ৭/৬ জন সত্কার সাহিত্য-বন্ধু ও দবনী সঙ্গী লইয়া একটি ছোট্ট মিলনেব আয়োজন কবিতৈছি। অভিপ্ৰায় এখন বলিব না—সাফাতে আলোচনা করিব। এই ৭/৬ জনেব এক জনেবও অনুপস্থিতিতে অভিপ্ৰায় সিদ্ধ ত হইবে না অধিকন্তু বিশেষ অন্তবায় ঘটবে। বিশেষতঃ তোমার অনুপস্থিতি ত কল্পনাই কবিতে পারি না। এক জন বিশিষ্ট বসন্ত সাহিত্যিকেব সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হইবে, যিনি সত্যই তোমার বস-বচনাব পক্ষপাতী, তাঁহাব সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ-পরিচয় সম্ভবতঃ নাই। সে যাই হোক, শনিবার বেটায় তোমার আসা চাই-ই চাই। নতুবা বিশেষ দুঃখিত ও নিবাস হইব। এ বয়সেও একটি সাহিত্যিক কাফ্যভাব লইব একরূপ স্থিৰ কবিয়াছি। তোমার পরামর্শ, সাহায্য ও শুভ ইচ্ছা না জানিলে তাহা স্থিৰ কবিতে পারিতৈছি না। তাই তোমার শুভাগমন একান্ত ভাবেই প্রত্যাশা করিব। নিরাশ করিও না।

আমার শরীফটা একবকম করিয়া চলিতৈছে—মানর অবস্থা কিন্তু শোচনীয়। তবু খানিকটা কৃষ্ণবৃত্তির জন্ম এই চেষ্টা। ছন্দাব শেষ সংখ্যায় যে লেখা দেখিলাম ভালই লাগিল। সে সম্বন্ধে আলোচনাও কবা যাইবে। প্রীতি সম্ভাষণ নিও।

তোমার যতীনদা।

পুনঃ—আসিবে যে তাগ এক ছবে জানাইয়া নিশ্চিন্ত করিবে। ইতি—

যতীনদা।

হিমালয় কুটীৰ, কাশিয়া:

৩/৭/৩০

ভাই হেমেন্দ্র

আমরা যথা সময়ে এখানে পৌঁছিয়া উপরেব ঠিকানায় আস্তানায় গাড়িয়াছি। তোমাদের জলপাইগুড়ি আসিবার কথা ছিল কি হইল? যদি জলপাইগুড়ি আসা হয়, তবে আশা করি এখানেও একবাব দর্শন দিবে। 'নাচবে' কাগজ দেখিতে পাই না। একখানা কবিয়া এখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিও। আমরা ভালই আছি। প্রধান কাফ্য আহাব ও ভ্রমণ। তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিও।

তোমার

প্রভাত দাদা।

৫, যত্ন মিত্র সেন, শ্রীমবাজাব

কলি: ৮ই মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় হেমেন্দ্র বাবু

অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। আপনি তো তুলিয়াও একবার স্মরণ কবেন না। আমি বাব বার অন্তবেব ভূগিয়া একেবারে কাবু হইয়াছি! বঙ্গীয় মহাকোষেব জন্ম 'অভিনয়' শব্দটি লিখিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। করেক বার তাগিদও দিয়াছি। এখন ঠিক দেড় মাসেব মাথায় 'অভিনয়' শব্দ আসিয়া পড়িবে। লিখিয়া রাখেন নাই ইহা ঠিক। অল্পগ্রহ কবিয়া যত সম্ভব পাবেন লিখিয়া দিয়া উপকৃত করিবেন। আশা করি ভালই আছেন। ইতি

ভবদীয়

শ্রীঅম্বাচরণ বিদ্যাবৃষণ।

# কোন্সান-পাণ্ডনা

অ, আ, ই

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কতক্ষণ।

গাঢ় অন্ধকার নেমেছে শহর কলকাতায়। অতিবাহিত হয়েছে কর্মচঞ্চল দিন। বিশ্রান্তিতে মগ্ন এখন শহরবাসী। ঘরে ঘরে স্তব্ধতা। শীঘ্র শয্যাগ্রহণ এবং শীঘ্র শয্যাভ্যাগে অভ্যস্ত মানুষ—নিদ্রা যাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়েছে। অদূরে চিৎপুর পল্লী, ফেরিওয়ালাদের ডাক অস্পষ্ট শ্রুত হচ্ছে। ক্ষীণ চিৎকার। শুধু সর্পসাক্ষী আকাশে দেখা যায়, বোলাটে চন্দ্রিকালোকে দেখা যায় চলোমি। চঞ্চল তরঙ্গ। সারি সারি মেঘ উড়ে চলেছে। যেন দলে দলে চলেছে অভিসারিকা, লজ্জায় আবৃত করে মুখবিশ; কেশরাশিতে আর গুচ্ছ গুচ্ছ অলককেশ। গৃহমন্ডল হাওয়ায় বৃক্ষশাখা কাঁপছে। কিম্বৎক্ষণ পূর্বে শৃংগল ডেকেছিল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, স্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

পূজা শেষ হয়েছে, তারও কি মন্য বলছেন পুরোহিত। গৃহ-দেবতার বেদীমূল থেকে উঠে গিয়ে নাট-মন্দিরে বসে তখনও বনি পূজা করছেন। কয়েক মুহূর্ত ধীর শান্ত হন, হঠাৎ মশকদল ময়োচ্ছাদিত হয়। স্তব না স্তোত্র। চাণক্যম্বল না বানধাটিক! মোহমুদগর না শাস্তিশতক। ভক্তির উচ্ছ্বাসে ও স্বর্গীয় গীতি-বন্ধারে মুগ্ধিত হয়ে ওঠে নাট-মন্দির। চির অমোঘ শাসিবাক্যে কি অপূর্ব মধু। পুরোহিত বৈদিক স্তব্ধ বলছেন। প্রকময়ী কবিতা।

নানালঙ্কারে সুশোভিতা কে এক জন নারী।

নাট-মন্দিরে উঠে ভক্তিনয়ন ভঙ্গীতে হয়তো চলেছিল প্রণাম করতে। পুরোহিত চকিত হয়ে বললেন,—কে যায়?

লালপাটুদিশিষ্ট পটবস্ত্র। তাহলরাগরক্ত ওষ্ঠাধর। মাথায় অল্প গুণ্ডন, বস্ত্রাঞ্চলে দোষিত কর্ণ। পদদ্বয়ে অলঙ্কৃত। গমনোচ্ছতা বাক্যব্যয় করে না। ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করে পুরোহিতের উদ্দেশে। অপরিচিতাকে দেখে দ্বিমুখে যেন হতবাক হন পুরোহিত। বলেন,—সীতার সিন্দুর অক্ষয় হউক। কিন্তু কি পরিচয়?

নারী তথাপি যৌন থাকে! গলগগ্ন বস্ত্রাঞ্চল খুলে কয়েকটি রোপামুদ্রা পুরোহিতের পদপ্রান্তে রাখে। প্রণামী দেয়। পুরোহিত বলেন,—কি আকাঙ্ক্ষা?

বিনয়ভঙ্গীতে বসে নারী। সুমিষ্ট সুরে বলে,—বক্তব্য আছে। প্রতিকার জানতে চাই।

—তৎপূর্বে তুমি কে জানাও। কদাপি তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তুমি কে মা? পুরোহিতের কথায় বিস্ময়।

—আমি এক জন প্রতিবেশী। এই গৃহের সর্বময়ী কত্রী কুমুদিনী আমাকে কত্রীর মত স্নেহ করতেন।

—তথাস্থ। বক্তব্য কি? পুরোহিত শুধোলেন।

পূর্ণশশী। শশী বো। অপক্লপ রূপময়ী পূর্ণশশী বক্তব্য বলে না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে কবজোড়ে বসে থাকে। পুরোহিত লক্ষ্য করেন বধুটিকে। মনে হয় অতি সুলক্ষণা, ভাগ্যবতী। বুলন্ত বেল-লঠনের আলোয় দেখা যায় হু'চোখে জলবিন্দু। সত্যিই কান্দে পূর্ণশশী। কি অব্যক্ত দুঃখে কে জানে। শিশিরবিন্দুর গ্রায় টলমল করে হু'ফোটা জল। শুভ্র কপোলে বনি গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। পুরোহিত বললেন,—লক্ষ্মী পূজার দিন, মা লক্ষ্মী বৃথা কান্দো কেন? অভীক্ষা ব্যক্ত কর'।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে বললে পূর্ণশশী,—পুরোহিত মশাই, লোক পাঠানো, দয়া করে পায়ের ধলো দেবেন আমাদের গৃহে? জানাবো বক্তব্য। এখন আমি যাবো কুমুদিনীর পুত্রবধূকে দেখতে। ক'দিন দেখা নেই।

—কখন মা? কবে? পুরোহিতের কথায় কোতুহল।

পূর্ণশশী আশ্বস্ত হয়ে বলে,—যখন সুবিধা হবে।

পুরোহিতের ভাবানু দৃষ্টি ধমকে থাকে কয়েক মুহূর্ত। পূর্ণশশী বলে,—যদি দয়া হয়।

পুরোহিতের কথায় আশ্বাস।—মাগামী কল্য বেল একটায়। লোক পাঠিও, আমি উপস্থিত হব।

কথা শুনে হয়তো খুশী হয় পূর্ণশশী! ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে নাট-মন্দির। বলে,—যে আজ্ঞে।

পুরোহিত সন্ধ্যায় দেখেন গৃহাভিমুখে গমনোচ্ছতা ঐ বধুটিকে। মনে হয়, এমন সুলক্ষণা নারী কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন অপূর্ব রূপ। যেন সাক্ষাৎ প্রতিমা। পূর্ণশশী তখন অন্ধকারে বিলীয়মান।

তখন হু'জনে বসেছিল পালঙে। খুব কাছাকাছি।

বাইরে স্তব্ধ রাত্রি। ঘনান্ধকার। টুকরো কথা শোনা যায়। কোথা থেকে ভেসে আসে। গৃহলয় পুকুরে মধ্যে মধ্যে শব্দ হয়, জল চলকায়। মাছ লাফাচ্ছে পুকুরে। কি'কি' ডাকছে অবিরাম। হগলী থেকে ক'ঘর প্রজা এসেছিল হুপুয়ে। খাজনা দিয়ে গেছে। কাছারীতে টাকা বাজে। লোহখণ্ডে টাকা পরীক্ষা হচ্ছে, মাওয়াজ হচ্ছে ঠং ঠং। নায়ের পরীক্ষা করছেন, দেখছেন আসল না নকল। গচল



না অটল। খাড়া আদায়কারী গমস্তা জনা কয়েক সাহায্য করছে নায়েবকে। লাল খেরোর থলিতে টাকা পুরছে। প্রজাই-পাটা-কব্জাতি মেলাচ্ছে মুহুরী। মহল এবং প্রজাদের নাম। কত জমি, জমাই বা কত। বকেয়া কিছু আছে না নেই। একেক জমি একেক বায়নাকায় বিলি হয়েছে। যেমন জমি তেমন খাজনা। ফাঁকা জমি না জমিতে ঘর-বাটা। ধানজমি না সজীক্ষেত। জমিতে পান-তামাকের চাষ না বাঁশঝাড়। ফলবাগান না শুধু তৃণপূর্ণ জমি। অত্যাচারী কাজ মিটে গেছে। ফাঁকা হয়েছে কাছারী। নায়েব এতক্ষণে টাকা গুণতে লেগেছেন। হগলীর প্রজাদের খাজনা দেওয়া টাকা।

—কণা আছে বললে যে? বললে রাজেশ্বরী। বললে,—আমি ভুঁয়ে বসি, কে কোথায় দেখবে। বলতে বলতে পালঙ থেকে উঠে পড়ে রাজেশ্বরী। মেঝের বিছানো গালচেয় বসে।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—কে দেখবে! বলছিলাম পিশীমা আসতে চেয়েছে, ভোরে গাড়ী যাবে। পিশে মশাই গাড়ী পাঠাতে বলে গেলো।

—বেশ তো। বললে রাজেশ্বরী। বললে,—পিশীমা বেশ লোক।

কৃষ্ণকিশোর বলে মুহূর্তে,—বেশ তো বললে হবে না। তোমাকে রেঁধে খাওয়াতে হবে পিশীমাকে। পিশীমা বলেছে নৌ যদি রেঁধে খাওয়ায় তো যাই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকে রাজেশ্বরী। কি বলবে ভেবে পায় না। বলে,—বেশ তো। তবে আমি রেঁধে দিলে হয়তো পিশীমার রুচবে না। আমি তো ভাল রাঁধতে জানি না। হাত পুড়ে যাওয়ার ভয়ে ঠাণ্ডা যে উম্মনের ধারে যেতে দিতো না। রাজেশ্বরী কথা বলে, কিন্তু কথায় যেন জড়তা। মুখে গাভীয়া। চোখে ভয়াবহ দৃষ্টি।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—পিশীমা মুখ ফুটে খেতে চেয়েছে। যা জানো রেঁধে দিও।

মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পিশীমার জন্তে কি রাঁধবে? ভেবে পায় না রাজেশ্বরী। রাঁধবে অথচ রুচবে না মুখে, তখন লজ্জায় যে মরে যাবে রাজেশ্বরী। শাকের ঘন্ট, এঁচোড়ের দম না মাছ-শাক। কৈ-কপি, কৈ মাছের হরগোদী, না পটলের দোম্বা। মাছের দম-পোক্ত না মুড়োর মুড়ি-ঘন্ট। কাঁচা ইলিশের বাল না দই-ইলিশ। লাউ-চিঙড়ী না চিঙড়ীর মালাইকারী।

—যাই তবে, যোগাড় দিয়ে আসি। বললে রাজেশ্বরী।—বলে আসি বামুনদিদিকে! বলতে বলতে প্রায় উঠে পড়ে। বলে,—ভোরে গাড়ী যাবে বলেছো, জোগাড় করে না রাখলে—

কৃষ্ণকিশোর হেসে ফেললে।—থাক থাক, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। বামুনদিদই রাঁধবে। পিশীমা বলেনি, আমিই বলছিলাম পিশীমার হয়ে।

কণা কঁটা শুনে বসে পড়লো রাজেশ্বরী। বললে,—তাই বল'। আমি ভাবছি সত্যিই বুঝি পিশীমা—

ক্ষণেকের জন্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল রাজেশ্বরী। আশৈশব লালিত-পালিত হয়েছে ষাঁর কাছে তিনি তো কখনও রাঁধতে বলেননি। রেঁধেই খাইয়েছেন যখন রাজেশ্বরী যা খেতে চেয়েছে। ঠাণ্ডা মনে পড়ে যায় হঠাৎ, বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। রাজেশ্বরী ভাবে ঠাণ্ডা মাকে, ঠাণ্ডা মার কথাবার্তা। কত সময়ে কানে শোনা যায়, যেন ডাকছে ঠাণ্ডা। রাজেশ্বরী বসে থাকে চুপচাপ।

কৃষ্ণকিশোর লক্ষ্য করে রাজেশ্বরীকে। দেখে ক্রৌঞ্চপক্ষী, অদৃশ্যপূর্ব। আয়ত চোখ। কুঞ্চিত কেশ। গাল দুটোতে ফাগ মেখেছে বুঝি, ঠোটে আলতা। আকৃতিটা কুশ, তবুও কত যে কোমল। চোখে ভ্রমরকৃষ্ণ তারা, বীরমধুর কটাক্ষ চঞ্চল। কবরীস্পৃষ্ট খেত শুভ্র গ্রীবা। অলঙ্কারহীন স্নডোল বাহ। পদ্মারক্ত কোমল করপল্লব, অঙ্গুলিতে হীরকাসুরীয়া। রাজেশ্বরী কি পটে আঁকা ছবি! ঘরে ঘর-আলো-করা রূপপ্রভা থাকা সত্ত্বেও তবুও, তবুও অত্মে কেন আসক্তি!

খতিয়ে দেখছিল কৃষ্ণকিশোর। দেখছিল কত তফাৎ। আইভিলতা, লিলিয়ান, গহরজান ও রাজেশ্বরীতে কত পার্থক্য। প্রথমা রূপগর্বে যেন অন্ধ, দ্বিতীয়া পাশ্চাত্য রূপচ্ছায়ায় পরিপূর্ণ হ'লেও হিমশীতল, কমলের শ্রায় কোমল; তৃতীয়া রূপবতী, তবুও বুঝি দলিত ও অনাদৃত, যে জন্ত স্নেহময়ী, প্রেমভিক্ষু। রাজেশ্বরী! ঘর-আলো-করা রূপ, রূপে মুগ্ধ করে, দগ্ধ করে না। তবুও, তবুও অত্মে কেন আসক্তি! গহরজান বাইজীর স্মৃতিতে মন কেন মথিত হয়। মূল্য না দিলে যে-মুখে হাসি ফোটে না সে-মুখ না দেখায় কি ক্ষতি।

—তুমি লেখাপড়া করতে, ছেড়ে দিয়েছো? হঠাৎ কথা বললে রাজেশ্বরী। বললে দীপ্ত কর্তে,—আমি চাই তুমি পাঠ ত্যাগ না কর'। অতাবের জন্তে কত কে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়, তুমি কেন ছাড়বে?

কথাগুলো শুনে কিঞ্চৎ বিস্ময় বোধ করে কৃষ্ণকিশোর। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, উত্তর দেয় না কথার। উত্তরটা খোজে যেন মনে মনে। বলে,—কাছারীর কাজ দেখতে হলে লেখাপড়া সম্ভব হবে না।

উত্তরটা যেন মুখে অপেক্ষা করছিল। রাজেশ্বরী বললে,—লেখাপড়া না শিখে কাছারীর কাজ দেখা যাবে?

ভাবছিল কৃষ্ণকিশোর কি বলবে এ কথার উত্তরে। ভাবছিল উত্তর দেবে, না দেবে না। বললে,—কাছারীর কাজ শিখেছি। লেখাপড়া যা শিখেছি চলে যাবে।

রাজেশ্বরী বললে একটু হেসে,—লেখাপড়া কি শেষ হয়?

—বৌ আছে? কে এয়েছে দেখো।

দাসীদের মধ্যে কে এক জন কথা বললে। লজ্জায় আত্ম-গোপন করে। বাইরের দালান থেকে। বললে।—কে এয়েছে দেখো।

দালানের দেওয়ালে দেওয়াল-গিরি। কুরকুরে হাওয়ায় আলোর শিখা কাঁপছে। দালানটাও কাঁপছে। রাজেশ্বরী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখে। দেখে সেই বোটি, সেই পূর্ণশশী। যজ্ঞের দিন থাকে দেখেছিল, চেনা-জানা হয়েছিল যার সঙ্গে। একমুখ হাসে রাজেশ্বরী। বলে,—কত ভাবছি আমি। দেখাই পাওয়া যায় না। আসব বলে গেলেন, আমি রোজ ভাবি আজ বুঝি—

কথা বলতে বলতে রাজেশ্বরী এগিয়ে যায়। প্রণাম করতে যায়। পূর্ণশশী বলে,—থাক থাক। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধরে রাজেশ্বরীকে। বলে,—কত দিন দেখতে না পেয়ে চলে এলাম। ঘরে কি হচ্ছিল? ছাড়া কোথায়।

লাজ্জিত হয় রাজেশ্বরী। মাথা নুকায় পূর্ণশশীর বকে। কুম্ভকিশোর উঠে আসে ঘর থেকে। দেখে সেই বধুটি, কুমদিনার কাছে যে শ্লোক পড়তো। দৃষ্টি-বদল হয় কয়েক মুহূর্ত। পূর্ণশশীর মুখে হাসি। চোখেও বুঝি হাসি। মৃষ্টি মুহূর্ত হাসি। দেওয়াল-গিরির আলোয় গা-ভর্তি গয়না—বিালিক তুলছে বিজ্ঞানীর মত।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি কথা হয়, বসা হবে না? বললে রাজেশ্বরী।

পূর্ণশশী সহাস্তে বলে,—চল' ঘরে চল; বসি গে।

কুম্ভকিশোর ঘর থেকে বেরিয়ে যায় পড়ার ঘরের দিকে। লেখাপড়ার কথা শুনে ভাল লাগে না কিছু। লেখাপড়ার নাম শুনে বিরক্ত হয়। পড়তে হ'লে কত কষ্ট করতে হয়। সকল কিছু ভুলে পড়তে হয় শুধু। কতগুলো বিষয়, ভাষাও নয় একটা। জ্ঞানলাভ সহজে কি হয়। লেখাপড়া—স্মৃতি থেকে যে মুছে গেছে কত দিন।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে পূর্ণশশী বিস্মারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কক্ষটি প্রশস্ত, সুশোভিত। হর্যাতল পাদম্পর্শসুখজনক গালচেয় আবৃত। গবাক্ষে পর্দা। কত শত মহার্ঘ সামগ্রীতে সাজ্জত। পূর্ণশশীকে দেখে রাজেশ্বরী। পটবস্ত্র পরিহিতা পূর্ণশশী, পবিত্র এক আবেশে যেন বিহ্বল। রাজেশ্বরী বলে,—মান্দরে আসা হয়েছিল?

পূর্ণশশী বলে,—হ্যাঁ, পুরোহিত মশাইয়ের সঙ্গে কিছু কথা ছিল। কথা হয়ে যেতে দেখতে এলাম তোমাকে। ভালো আছে? স্বস্তির-বর ভাল লাগছে?

মুখাকৃতিতে কৃত্রিম হাসি ফোটাতে চেষ্টা করে রাজেশ্বরী। বলে,—হ্যাঁ। ভাল লাগছে। তবে একা থাকি। দু'টো কথা কই, তেমন কে আছে?

—স্বামী তো আছে। কথা কও যত খুশী। বললে পূর্ণশশী। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে। বলে,—শাস্ত্রীর চিঠি-পত্র পাও?

রাজেশ্বরী বলে,—আমি পাই কৈ? তাঁকে দেখতে সাধ হয়। কিয়ৎক্ষণ রাজেশ্বরীকে দেখে পূর্ণশশী। দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গয়নাগুলি দেখে। হস্ত স্পর্শ করে দেখে। জিজ্ঞেস করে,—কে দিয়েছে?

রাজেশ্বরী বলে,—শাস্ত্রীর গয়না, আমি পেয়েছি।

—চমৎকার। বললে পূর্ণশশী—তোমাকে বিমর্ষ দেখছি, মুখে হাসি কৈ?

রাজেশ্বরী চমকে ওঠে বুঝি। বকের ভেতরটা কি দেখতে পেয়েছে পূর্ণশশী। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, দিদি—

—কি হয়েছে বল'তো। বললে পূর্ণশশী। বললে,—বল', লজ্জা কি? মুখটি যে শুকিয়ে গেছে।

চোখ দু'টো বুঝি ছলছলিয়ে ওঠে হঠাৎ। কাঁপতে থাকে ওষ্ঠাধর। রাজেশ্বরী বলে,—দিদি, নেশা করে। দেখলাম, ঐ অবস্থায় দেখলাম। কথা বলতে বলতে চোখে আঁচল চাপে রাজেশ্বরী।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। বিষয়টা লঘু করে দিতে চায়। রাজেশ্বরী যাতে ভেঙে না পড়ে তাই হাসতে হাসতেই বলে,—যুগের হাওয়া বউ, যুগের হাওয়া। বল'তো নেশা করে না, কত জন লোক আছে? টাকা কোথা থেকে যে আসে ভাবতে হয় না। ব'সে ব'সে দিন কাটে। নেশা তো করবেই। তবে তুমি—

—আমি যে ভয় পাই দিদি। কথাব নাবোই কথা বলে রাজেশ্বরী।—নেশাকে যে ভয় হয় দিদি।

—বল'তো শশী বোদিদি, বুঝিয়ে বল'তো।

কোথায় ছিল অনন্তরাম। ঘরে ঢুকেই বললে কথাগুলো। কোথা থেকে শুনেছিল কে জানে! বললে,—বল'তো শশী বোদিদি। মেয়েটা কাঁচ যে, জানবে কোথেকে! জ্ঞান হয়েছে কিছু! ঠলতে দেখেই বেবাক দাঁত-কপাটি লোকে গেছে। কত দেখতে হবে, কত শুনেতে হবে। সাহস দিয়ে যাও তো শশী বোদিদি।

কথার মাঝে হঠাৎ অনন্তরামকে কথা বলতে দেখে পূর্ণশশীও কিছুটা সাহস পায় নেন। বলে,—তাই তো আমিও বলাছি। তোমাকে বুক বাঁধতে হবে। শুধরোতে হবে। যাতে খারাপ-ভাল বুঝতে শেখে দেখতে হবে। ঘরে ঘরে হানেশাই হচ্ছে। ভেঙ্গে পড়লে চলে? কথা বলতে বলতে কথা থামায় পূর্ণশশী। থেমে থাকে থানিক। বলে,—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে? ছেলে তো ভাল ব'লেই জানি। কে ধরালে কে?

রাজেশ্বরী বলে,—হ্যাঁ ছেড়ে দিয়েছে।

অনন্তরাম বলে,—বল'না শশী বোদিদি। বসিরকে জানো? তা তুমি জানবে কোথেকে? বেশ ছিল, বসির শেখালে পাওয়াতে, শেখালে—

কথার শেষাংশটা বলতে গিয়ে বলে না অনন্তরাম। জিব কাটে। বলে,—যাই হোক, শশী বোদিদি, তুমি যে কথাটা বলেছো, খাটি কথা। বোদি শুধরোতে চেষ্টা করুক, যদি কিছু হয়, ঠিক ব'লেছি কি তুমিই বল'শশী বোদিদি? তুমিই বল'।

দাসীদের এক জন দেখা দেয় দু'হাতে দুটি পাত্র ধ'রে। বলে—ছজুর বলে পাঠিয়েছে, না খেয়ে গেলে চলবে না।

হেসে ফেললে পূর্ণশশী। মুক্তাবরা হাসি। বললে,—  
কে থাকবে ?

অনন্তরাম বলে,—দেখো শশী বৌদিদি, দেখো, আপ্যায়িতটা  
দেখো। তোমাকে খেয়ে যেতে হবে। বলে পাঠিয়েছে।

দার্সা পাত্র দুটি পূর্ণশশীর সম্মুখে উপস্থাপিত করে চলে  
যায়। আশায্য দেখে হাসতে হাসতে বললে পূর্ণশশী,—  
অসময়ে খাওয়া যায় ?

অনন্তরাম বলে,—ত' হোক শশী বৌদিদি, যা হয় খাও।

পাত্রপূর্ণ জল। থালিতে দুটি লবঙ্গলাতিক। ও দুটি  
পাটিমাপটা। হয়তো গৃহে প্রস্তুত।

রাজেশ্বরী ফিসফিসিয়ে বললে,—অনন্ত, কোথায় গেল  
বল' তো ? দেখতে নাপেনেই ভয় করে।

হেসে ফেলল অনন্তরাম। হাসতে হাসতেই বললে,—  
দেখো শশী বৌদিদি, দেখো। ভয় কাকে বলে দেখো।  
দেখেছি আমি, দেখেই আসছি। পড়ার ঘরে বসে আছে।

পড়তে বলেছে রাজেশ্বরী। বলেছে, লেখাপড়া করতে  
হবে।

খুশী হওয়ার চেয়ে মনটা বিষন্ন হয়ে উঠেছে কথাগুলো  
শ্রুনে। পাঠ চুকিয়ে দিয়েছে লেখাপড়ার। হাঁফ ছেড়ে  
বৈচেছে। কেচে গল্প করতে হবে শেষে। কৃষ্ণকিশোর  
ভণ্ড পড়ার ঘরে যায়। পাঠ্য গ্রন্থ তোলাপড়া করে।  
বাঙলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ। কুলস্তু লণ্ঠনের শিখা হাওয়ায় কাঁপছে  
দপদপিয়ে। মনে হয় অক্ষরগুলো বঁধি কাঁপছে। গ্রন্থ-পুস্তায়  
লিখিত অক্ষর। স্থল বৃক সোশাইটির প্রকাশিত কয়েকটি  
পাঠ্য-পুস্তক। সংস্কৃত কোমলী ও কলাপ। অলঙ্কার, স্মৃতি,  
সাংখ্য ও মামাংসা।

—আমি চাই তুমি লেখাপড়া কর'। বলেছে রাজেশ্বরী।

কথাগুলো শ্রুনে খুশী হওয়ার চেয়ে কথাগুলোতে ধা  
খেয়েছে মনে। পড়তে কি শুধু রাজেশ্বরী বলেছে! মা  
কুম্ভিনী বলেছিলেন। পিশাখা বলেছিলেন। পণ্ডিত  
মশাই তো বলেই ছিলেন। কত কথা বলেছিলেন।

খড়-ঘরে খটা বাজতে থাকে। ক'টা বাজে ? বোধ করি  
আটটা। কথা বলতে বলতে পূর্ণশশী বলে,—উঠি ভাই আমি।  
আটটা বেজে গেলো। অনন্ত তুমি আমাকে পৌছে দেবে।  
সময় হবে ?

অনন্তরাম বলে,—কি যে বল' শশী বৌদিদি !

পূর্ণশশী বললে—দেখো বউ, কিছুতে ভেঙ্গে পড়' না তুমি।  
কত ধকল সহিতে হবে। ভেঙ্গে পড়লে চলে ?

কথা বলতে বলতে উঠে পড়লো পূর্ণশশী। কাছেই থাকে  
সে। প্রতিবেশী। আবক্ষ গুঠন টেনে গৃহোদ্দেশে যাত্রা  
করে পূর্ণশশী। সদরে গিয়ে জিজ্ঞেস করে অনন্তরামকে,—  
অনন্ত, পড়ার ঘর কৈ ?

অনন্তরাম বলে—ঐ যে। ঐ তো আলো জলছে।  
পড়ছে।

অদূরে বরটি দেখে পূর্ণশশী। দেখে কয়েক মুহূর্ত  
কেন দেখে কে জানে !

কলকাতা শহর হ'লে কি হবে, আঁধার হ'তে না হ'তে  
জনতা নিশ্চয় হয়ে যায়। পথে কচিং লোক দেখা যায়।  
যে যার গৃহে ফিরে অর্গল তুলে দেয় ! বিশেষতঃ শহরের  
কয়েকটা অঞ্চলে গাটকাটা, সিঁদকাটা এবং মাতালদের  
উপদ্রবে মানুষ অতিষ্ঠ, ত্রস্ত হয়ে থাকে। দিবাপেক্ষা নিশীথে  
দুঃখ ও দুর্বৃত্তদের লীলা চলে। যে ভক্ত লোকজন একত্র না হয়ে  
চলতে সাহসী হয় না। পূর্বে কত ভগাবহ ডাকারি ও লুণ্ঠন  
হ'ত। যত্নপি ইংরেজী কোম্পানি বাচাচুর কর্তৃক সুর্য্যবস্ত্র  
হওয়াতে ঈদৃশ দস্যুবৃত্তি হ্রাস হয়েছে। তথাপি শহরের কয়েক  
অঞ্চলে এখনও দুঃখ লোক উৎপাত করে।

শুরু পক্ষ। আলোয় আলো হয়ে আছে দিগ্দিদিক।  
আকাশে মেঘের জটলা চলেছে। ফটক থেকে পথে পৌছতেই  
পূর্ণশশী বললে,—অনন্ত, তুমি পিছনে চল'। আমি আগে  
যাই।

পূর্ণশশীকে মনে হয় কেমন যেন ভয়ানক। কিয়ৎদূর যেতে  
সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললে,—অনন্ত, লোকগুলো  
যদি যেতে বাধা দেয় তুমি আক্রমণ করবে।

বিস্মিত হয় অনন্তরাম। বলে,—কিছু তো বুঝতে পারছি  
না শশী বৌদিদি। তোমাকে যেতে বাধা দেবে কেন ?

—যা বলছি শোন'। সময় হ'লে বলবো। ভীত কণ্ঠে  
বললে পূর্ণশশী। কিছু দূরে পথিপার্শ্বে দেখা যায় ক'জন  
লোক। ভদ্র ব্যক্তি হ'লে কথা ছিল না, কিন্তু লোকগুলিকে  
দুর্বৃত্ত বলেই মনে হয়। বেশ-ভূষাও কেমন বিষদৃশ।  
কলাকার আকৃতি।

অনন্তরাম বলে,—ভয় নাই শশী বৌদিদি। কোন শূয়োরের  
বাচ্চার সাহস হবে না। তুমি চ'লে চল'।

রুদ্ধশ্বাসে পথটুকু চলে যায় পূর্ণশশী। পথিপার্শ্বে লোক  
ক'টি কেন যে ছিল বোঝা গেল না। লোকগুলির উদ্দেশ্য  
যে ব্যর্থ হয়েছে বোঝা যায়। নিকটবর্তী হ'তেই লোকগুলির  
কেউ কেউ কথা বলে।

অনন্তরাম বলে,—কান দিও না শূয়োরের বাচ্চাদের  
কথায়।

—বডিগার্ড লিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

—গয়না ক'টা খুলে দিয়ে যাও দিদি।

—মুগটা দেগিয়ে যাও।

কিছু দূরে কতকগুলো কুকুর। লোক দেখে ডাকডাকি  
করে। দুর্বৃত্ত ক'জন দেখতে দেখতে কোথায় লোপাট হয়ে  
যায়। কুকুরগুলো শুধু ডাকে।

গৃহে পৌছে স্বস্তি-শ্বাস ফেলে পূর্ণশশী। বলে,—অনন্ত  
দেখলে তো ?

—দেখলাম তো। বুঝলাম না তো কিছু। বললে অনন্তরাম।

—বৃষাবে কোথেকে? সময় করে আসো তো ব'লবো।  
দী হয়ে গেছে ফিরতে, নয় তো বলতাম। বললে পূর্ণশশী।  
পাপাতে হাঁপাতে।

অনন্তরাম বললে,—বেশ কথা। তুমি যাও, আমি  
খাসি।

পূর্ণশশী তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে যায় অনন্তরামকে ছেড়ে।  
বহির্দ্বারে অর্গল তুলে। অশ্চর্য্য হয়ে অনন্তরাম পথ চলে।  
ভেবে পায় না দৃশ্যটার তাৎপর্য্য।

ঘরে কেউ ছিল না।

রাজেশ্বরী জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে আকাশে চোখ তুলে।  
শৈশব থেকে আকাশ দেখতে ভালবাসে সে। ঠাণ্ডা হাওয়া  
ব'লতো, রূপকথা ব'লতো। ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা  
জাগো রে—

রাজেশ্বরী ব'লতো,—সাত ভাই চম্পা কোথায় থাকে ঠাণ্ডা?  
ঠাণ্ডা বলতেন,—ঐ আকাশে।

আকাশে? আকাশ দেখতো রাজেশ্বরী। শুক্ল পক্ষ।  
আলোয় আলো হয়ে আছে শহর কলকাতা। দূরে দূরে  
ইতস্ততঃ বিকিণ্ড গালোকবিন্দু। জলছে টিম-টিম ক'রে।  
আকাশে রূপালী চুম্বক, দপ-দপ করছে। কে দেখে না  
আকাশ! স্নেহ-হঃস্নেহ কে দেখে না আকাশ! শিশু, যুবা,  
বৃদ্ধ কে দেখে না আকাশ! জানে না ঐ গোলাক্কের মধ্যে  
কত অজ্ঞাত বিজ্ঞান। তবুও আকাশ দেখে মানুষ।  
বায়ুপ্রেম কিছই দৃষ্ট হয় না ঐ অপ্রবেশ্য আকাশে, দেখা যায়  
কেবল অজস্র গ্রহ-উপগ্রহ। দিগদর্শী হাওয়া-অগ্নিস  
আকাশ-লীলা লক্ষ্য করে! বায়ুশূন্য আবহাওয়া জানায়।  
আবহচিত্র দেখে মানুষ বোঝে আকাশ থেকে বারিবর্ষণ হবে।  
অদ্রিত কত? জোয়ার-ভাঁটার সময়।

বিঁবিবি কীর্তন স্পষ্টতর হয়। শহর কলকাতা হয়  
সুস্পষ্টতর। নৈশ আকাশে উড্ডীয়মান পেচক।

আকাশে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে থাকে রাজেশ্বরী। জানে  
না আকাশ-বিজ্ঞান, তবুও দেখে আকাশ। কত আশা ছিল  
মনে, মনটা বুঝি ভেঙ্গে গেছে কেন কে জানে। নেশাগস্ত  
স্বামী—

আকাশ যেন লাঘব ক'রে দেয় মনের আলোড়ন।  
আকাশ কেড়ে নেয় বৃক-ফাটা কষ্ট। রাজেশ্বরী চোখ তুলে  
দাঁড়িয়ে থাকে। দেখে আকাশ। দেখে মেঘের জটলা।  
দেখে জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক। নক্ষত্রমণ্ডল। আকাশ-বিজ্ঞান  
জানে না রাজেশ্বরী। জানে না ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি,  
অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, মরীচিকে। জানে না কোথায়  
ক্যাসিওপিয়া। কোথায় বৃষ, বৃহস্পতি, শুক্র! কোথায় দেখা  
যায় ছায়াপথ—বিচ্ছুরিত আলো। মুগ্ধ হয়ে দেখে রাজেশ্বরী।  
দেখে কণ্ঠ, চিত্রা, তুলা।

হঠাৎ চোখে পড়ে দূর-দূরান্তরে নক্ষত্র খসে প'ড়লো

তীরবেগে। আকাশ থেকে পানিত হ'ল ভুলোকে। রাজেশ্বরী  
জানে না, ঐটা উল্কা।

—আত কত হ'ল, খাওয়া-দাওয়া হবে না?

এলোকেশীর কথায় বিরক্তি। ঘরে ঢুকেই বললে  
কথাগুলো। বললে,—ডাকতে পাঠাও সোয়ামীকে। ভালো  
ছেলে তো। খেয়াল হয় না, মানুষগুলো না খেয়ে আছে।

রাজেশ্বরী জানলা ত্যাগ ক'রে পর্যাঙ্কে বসলো। বললে,  
—না, ডাকতে হবে না। পড়তে গেছে যে। সময় হ'লেই  
আসবে।

কাছাকাছি ঘরে যেন ঝাড়-লগ্নন ছলে উঠলো। শব্দ হ'ল  
চুং-চুং। রাজেশ্বরী বললে,—নাচ-ঘর কে খুলেছে এলো?

এলোকেশী বিরক্ত হয়েই বলে,—ঘর সাফ করছে যে।  
পেয়াদা দাঁড়িয়ে আছে, নোকজন সাফ করছে।

রাজেশ্বরী উঠে যায়। এত দিন শুনেছে নাচ-ঘর আছে।  
দেখতে যায় ঘরটা।

নাচ-ঘর। পরোপলক্ষে বাইনাচ হ'ত নাচ-ঘরে।

অন্তঃপুরবাসীদের উপভোগের জন্য ঘরটি তৈয়ারী হয়েছে  
কত যুগ আগে। চক্কিমাটি দ্বারযুক্ত বৃহৎ কক্ষ। উত্তম  
কার্পেটে আবৃত কক্ষতল। পাশাপাশি কতগুলি আলোর ঝাড়।  
ক্যাবিনেট আলমারী ও সোফা ধারে ধারে সজ্জিত।  
ব্রাকেটে বালর ঝুলছে। দেওয়াল-গাঞ্জে ছবি। রাজেশ্বরী  
কাছে গিয়ে দেখে চিত্রশোভা। অবাক হয়ে  
দেখে। টিন প্রিন্ট ছবি। চেনে না, বোঝে না, তবুও  
দেখে।

বৃষাবে কোথেকে। ছবিতে যে বিদেশী। 'লর্ড ক্লাইভ।  
ওয়াটস। ওয়ারেন হেস্টিংস। ইলাইজা ইম্পে। ক্লেভারিং।  
ফিলিপ ফ্রান্সিস। ভ্যান্সিটার্ট। সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত জেফস।  
কর্ণেল কিড। লর্ড কর্ণওয়ালিস। ওয়েলেসলী।  
হ্যালিডে। সিসল বিডন। থে। কাম্বেল। রিচার্ড টেম্পল।  
বেলী। জে, ই, ডি বেথুন। রিপন। বেকিঙ্ক। মেও, ডেভিড  
হেয়ার। ক্যানিং প্রভৃতিদের ছবি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি।  
পূর্বপুরুষদের ইংরেজ-ভক্তির নিদর্শন।

কত যুগ পূর্বে যে কক্ষটি নাচে-গানে মুগ্ধিত থাকতো  
কে জানে! বাইজীদের বর্গ-বঙ্কার, নৃত্যচ্ছন্দ কি এখনও  
শ্রুত হয়! কক্ষটির দুই বিপরীত দেওয়ালে দু'টি আয়না।  
প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। ঝাড়-লগ্ননের প্রতিবিম্ব।  
শত সহস্র ঝাড়-লগ্নন দেখা যায়। 'অন্তঃপুরবাসীদের হাস্যলাস্ত্র  
কি এখনও যোহ স্মৃতি করে? এখনও কি পাওয়া  
যায় আভর-গোলাবের সুগন্ধ! যে-কক্ষে পূর্বে খেলার  
সামগ্রীরূপে পুষ্পমালা হেলাফেলা হ'ত তথায় কি দু'-  
একটা শুষ্ক পার্শাডিও পাওয়া যাবে না! দুম্বল্য কার্পেটে  
কি দেখা যাবে না কিঞ্চিৎ অলঙ্কারেখা! মথমলের বালিসে  
একটি কি দু'টি চূর্ণ কেশ

পেয়াদা এবং অগ্ন্যাত্ত লোকজন মর্শ্বদ-মুস্তির গ্রায় দণ্ডায়মান থাকে। রাজেশ্বরী দেখে। আয়ত আঁখি-মুগল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কক্ষটি। নাচ-বর দেখছে রাজেশ্বরী।

দালানে শুয়ে পড়েছিল এলোকেশী।

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু নিদ্রা জয় করে ফেলেছে এলোকেশীকে। এলোকেশী দালানে গড়িয়ে পড়েছে ঘুমে অচেতন হয়ে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে রাজেশ্বরী ডাকলে,—এলো, তুমি তো আচ্ছা লোক! উঠে পড়ো। লোকে কি ভাববে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো এলোকেশী। বললে,—ঘুমিয়েছি আমি? পড়ে আছি, কি করবো?

রাজেশ্বরী বললে,—অনন্তকে বল' ডাকতে। পড়া শেষ করতে বল'।

—বলি। বলে এলোকেশী। উঠে যায় দালান থেকে।

রাজেশ্বরী ঘরে গিয়ে বসে পর্যাঙ্কে। মুদিত চক্ষে বসে থাকে। নাচবর থেকে শব্দ আসে ঠুং-ঠাং। বাড়-লঠনের শব্দ। ঘর সাফ করছে লোকজন।

টায়রাটা লুকিয়ে রেখেছিল।

কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। পাঠ্য-পুস্তক প'ড়ে থাকে। গহরজান যে মনটা আধিকার ক'রে আছে। টায়রাটা দিলে গহর কত যে খশী হবে।

—খাওয়া-দাওয়া করতে হবে যে। ডের পড়েছে। অনন্তরাম বললে ঘরে ঢুকে। বললে,—তোকে পড়তে দেখা আমি হাতে স্বর্গ পাই। লেখাপড়া ক'রে মাহুম হ', চোখ টাটাতে কত লোকের।

—লেখাপড়া ক'রে কি হবে! বললে কৃষ্ণকিশোর। কৃষ্ণ মেজাজে। বললে,—কষ্ট ক'রে পড়ে লাভটা কি হবে? পড়বে গরীব লোক, প'ড়ে চাকরী করবে। উপার্জন করবে।

—লেখাপড়া গরীবদের জন্তে! কথাটা ব'লে হেসে ফেললে অনন্তরাম। হতাশ-হাসি। হাসতে হাসতে বললে,—চাকরীর জন্তে শুধু লেখাপড়া? আশ্চর্য! কে শেখালে?

কৃষ্ণকিশোর আঁ কুঁচকে বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকরীর জন্তেই লেখাপড়া। লেখাপড়া জানা লোক হ'লেই চাকরী পেয়ে যায়। আমাকে চাকরী করতে হবে না। যা আছে বেশ হেসে-খেলে চলে যাবে।

হেই-হেই ক'রে ওঠে অনন্তরাম। বলে,—ছি, ছি, অতা বলি নাই। বলতে চাই নাই। লেখাপড়া, বিদ্যা, বিদ্যা জ্ঞান হয় যে! বিদ্যা না থাকলে মাহুম মাহুম হয়? বিদ্যা লোক পূজা পায়। বিদ্বান লোক—

কথার মাঝেই কথা বলে কৃষ্ণকিশোর। বলে,—শি-দিতে হবে না, থাক।

অনন্তরাম তবুও বলে—দেখো, আমাকেই দেখো লেখাপড়া জানলে চাকর হয়ে থাকতাম! হুঁজুগ্য যে মুখ হয়ে আছি। যাই হোক, চল, খাবে চল। ভাত-টাপ কড়কড়িয়ে গেল।

অনন্তরাম ভাবে, যে ব'বে না তাকে ব'বিয়ে কি হবে। কথার শেষে বর থেকে বেরিয়ে যায় অনন্তরাম। হতাশ-মনে। অনন্তরাম বোঝে, দৃষ্টি ছজুরের বদলে গেছে, ভাব পরিবর্তন হয়ে গেছে। সম্প্রতি পেয়ে ভোল পালটে গেছে।

খাওয়া হয়ে গেতে পর্যাঙ্কে বসেছিল হুঁজন।

রাজেশ্বরী বললে,—পণ্ডিত মশাইকে ডেকে পাঠাবে?

অবাক-চোখে তাকায় কৃষ্ণকিশোর। কৌতূহলী হয়ে বলে,—পণ্ডিত মশাইকে! তুমি জানলে কোথেকে?

হেসে ফেলে রাজেশ্বরী। বলে,—বল' তো কোথেকে?

কৃষ্ণকিশোর বলে,—কে জানে। পণ্ডিত মশাইকে ডেকে কি হবে?

রাজেশ্বরী বলে,—পড়বে তুমি। বললাম যে, আমি চাই তুমি লেখাপড়া ত্যাগ না কর'।

কৃষ্ণকিশোর বললে,—দেখা যাবে। পণ্ডিত মশাইকে ডাকাতে হবে? পণ্ডিত মশাইকে ডাকিয়ে পড়বো আমি ঘুম-চোখে তাকিয়ে থাকে রাজেশ্বরী। লঠনের আলো চোখ হুঁটো তবুও জ্বল-জ্বল করে। বলে,—হ্যাঁ। লেখাপড়ায় কত জ্ঞান হয়। লেখাপড়ায়—

কথাগুলো শোনে কিন্তু মন ছুটে চলে কোথায় রাজেশ্বরী জানে না। কৃষ্ণকিশোর ভাবছিল, কতক্ষণে ফর্সা হবে আকাশ। কতক্ষণে আলো ফুটবে। কুসুম ছড়া আকাশে। কতক্ষণে দেখা দেবে গ্রহপতি আদিকে সহস্রাংগ সূর্য।

জড়োয়া টায়রাটা যেন শূন্যে দেখতে পায় কৃষ্ণকিশোর আকাশ শুভ্র হ'লে টায়রাটা—

[ ক্রমশঃ ]

## —আগামী সংখ্যায়—

আত্ম-স্মৃতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

## আখ্যান

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নাটককে বলে দৃশ্যকাব্য। বাংলা থিয়েটার যঁারা দেখেন, তাঁরা জানেন, বাংলা নাটকে কাব্য আছে সামান্যই, দৃশ্য আছে যথেষ্ট। সেগুলি সব সুদৃশ্য হলে ক্ষোভ ছিল না।

অভিনয়ে দৃশ্যপট ব্যবহারের প্রবল বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেটা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর নাটক সবই কাব্যপ্রধান। কবিতা ছিল তাঁর জীবন ধর্ম্মে। যা লিখেছেন তাই হয়েছে কাব্য। এমন কি শিশু-শিক্ষার সহজ পাঠেও তার প্রকাশ। বলা যায় না, হয়তো তিনি শুভঙ্করের ধারাপাত নূতন করে লিখলে তাতেও কাব্যের স্বাদ পাওয়া যেতো।

কবির বিশ্বাস, অভিনয় বাপারটা গতিশীল, দৃশ্যপটগুলো স্থায়ী। জীবন্ত মানুষের আবৃত্তি, সঙ্গীত ও নৃত্যালীলার সম্মিলিত সচল অভিব্যক্তির পথে সেগুলি অচল বিঘ্নভূপ। সময়ে পরিত্যজ্য। অভিনয়ের পরিপূর্ণ উপভোগ দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে। চিত্রিত পট ও নিশ্চিত দৃশ্য তার সেই কল্পনাশক্তিকে পদে পদে বাহত করে।

মলী সেন কবি নন। নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল বলেও কোন দাবি করেন না। কিন্তু সহজাত বুদ্ধি, ইংরেজীতে যাকে বলে কমনসেন্স, সেটা তীক্ষ্ণ। লোকচরিত্রে গভীর জ্ঞান নেই বটে, কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর মনুষ্যগুলিকে ভালো করেই চেনেন। জানেন, এদের পুরুষেরা বড় চাকরী করে, মোটা মাইনে পায়। মেয়েরা দামী গাড়ি চড়ে, ভারি গয়না গড়ায়। আর যাই করুক, এরা জেমস্ জয়েস পড়ে না। থার্ড প্রোগ্রামের নাম শুনেলে থার্ড ডিগ্রির কথা ভেবে আঁতকে উঠতে পারে। এদের জন্মে চাই অল্প বাবস্থা।

রবীন্দ্রনাথেরই লেখা উদ্ভূত করে মলী সেন বলেন, “সংসারে বেশীর ভাগ লোকই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছেন পা-ঝাড়া দিয়ে; পিতামহের চারটে মুখ আছে শুধু বড় বড় কথা বলার জন্মে। তাদের জন্ম গাছে জল দেওয়ার দৃশ্যে শকুন্তলার হাতে শুধু জলের ঝারি দিলেই যথেষ্ট নয়, ভালপালা শুদ্ধ গাছের গুঁড়িটাকেই ষ্টেজের উপর খাড়া করা চাই।”

কথাটা মিথ্যা নয়। আমাদের দর্শকেরা সিনেমা দেখতে গিয়ে চায় গান, নাটক দেখতে গিয়ে ম্যাজিক। তাই সিনেমার কুন্দনন্দিনী যদি বিষ খেতে খেতে একখানা করুণরসায়ক গান না ধরে, তবে সে শুধু নিজেই মরে না, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রযোজককেও

# উন্মোচক

যাযাবর

মারে। প্রাণে নয়, ধনে। থিয়েটারের ইঙ্গ যদি দর্শকদের চোখের সামনে রথে চেপে ষ্টেজ থেকে শূণ্যে না মিলিয়ে যায়, তবে অচিরে প্রেক্ষাগৃহটিই শূণ্য হওয়ার আশঙ্কা।

আজকের অভিনয়ে ষ্টেজ গাছের গুঁড়ি খাড়া করার ভার যিনি নিয়েছেন, ইংরেজী অক্ষরে তার নামের উচ্চারণ ‘রয়’। আসলে অবশ্য গাছের গুঁড়ি নয়,—সমুদ্রে ভাসমান প্রমোদ-তরণী। কারণ অভিনয়ের পালাটি অভিজ্ঞান শকুন্তলম নয়,—স্বপনকুহলী। এতে তরুআলবালে বারিসিঞ্চনরতা সখিপরিবৃত্তা শকুন্তলার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না; দেখা যাবে জ্যোৎস্না রজনীতে সমুদ্রবক্ষে বীণাবাদিনী রাজকণ্ঠা মঞ্জুশ্রীকে।

মাসামুসেট থেকে ডিগ্রি ও ওয়েস্টিং হাউস থেকে ট্রেনিং নিয়ে মিষ্টার এন. সি. রয়, অর্থাৎ শ্রীমান নিখিলচন্দ্র রায়, বর্তমানে স্থানীয় এক নামজাদা এমেরিকান কোম্পানীর রেসিডেন্ট ডিরেক্টর। কিন্তু সোসাইটিতে এঞ্জিনীয়ার বলে তাঁর পরিচয়টা সত্য হলেও আংশিক মাত্র। এ যেন ইংলণ্ডের রাজনীতিতে উইনস্টন চার্চিলের পরিচয় দিতে বলা,—লীডার অব দি অপোজিশান।

নিখিল রায়ের স্বন্ধ মোটেই বৃষের ছায় নয়, তাঁর ভুজদ্বয়কেও ঠিক শালপ্রাংশু বলা চলে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের শ্লোকের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে গেলে তাঁকে দিব্যকাস্তি বলা কঠিন। তবুও গণ্ডে কয়েকটি বসন্তের গুটিচ্ছি বাদ দিলে বাঙ্গালী হিসাবে মোটামুটি তিনি সুপুরুষ, একথা একমাত্র স্বভাবনিবন্ধক ব্যতীত আর সবাই স্বীকার করে। টেনীসে স্নমস্ত মিশ্র বা দিলীপ বোসের পরেই তাঁর র‍্যাংকিং হবে এমন সম্ভাবনা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ছুঁতিন বারই তিনি সেমিফাইনাল অবধি উঠেছেন। ক্লাব টুর্নামেন্টে কাপ পেয়েছেন একাধিক। ব্রিজ খেলায়ও তাঁকে পার্টনার পেলেন রাবার জেতার সম্ভাবনা

থাকে। তাঁর জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত প্রমাণ এই যে, একাদিক্রমে তিন বছর তিনি ক্লাবের সেক্রেটারী নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও সদস্যদের মধ্যে কেউ পদত্যাগ করে নতুন ক্লাব গঠার উদ্যোগ করেনি।

নিখিলের চরিত্রে আর একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি একজন সুদক্ষ অভিনেতা। স্বপনকুহেলীর নায়িকা সিংহল রাজকুমারী মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় মলী সেন। নায়ক তাঁরই প্রণয়মুগ্ধ বিদেশী রাজকুমার ইন্দ্রজিতের অংশে—নিখিল রায়। বন্ধুবান্ধবীরা ঠাট্টা করে বলেন,—“গিয়ার গার্মণ আণ্ড ওয়ালটার পিভ্রন। একেবারে ষ্টার কষ্ট।”

অভিনয় নিখিলের নেশা, এঞ্জিনীয়রিং তাঁর পেশা। ছুটোতেই তাঁর পারদর্শিতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ দিতে বন্ধুপরিবার নিখিল আলোর মালায় ছেয়ে দিয়েছেন অভিনয় মঞ্চ। মানবদেহে শিরা-উপশিরার মতো অসংখ্য দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক তার যোজনা করেছেন ষ্টেজের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। বৃহদাকার আর্ক ল্যাম্পগুলি ঝুলছে উপর থেকে। বিভিন্ন সুইচ নিয়ন্ত্রণে সেগুলির বিচ্ছুরিত আলোক বচায় প্রাবলিত অভিনয় মঞ্চে কখনও দেখা যাবে রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা দ্বিপ্রহর, কখনও আভাস দেবে অস্তগামী সূর্য্য-কিরণে রক্তিম আসন্ন সন্ধ্যার, কখনও বা সৃষ্টি করবে শুক্লা রজনীর মৃদুস্বপ্ন চন্দ্রালোক। প্রয়োজন মতো সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়ে গভীর অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া যাবে সম্পূর্ণ মঞ্চপীঠ।

অভিনয়ের সর্বশেষ অঙ্কে আছে, সবেগে আন্দোলিত রাজপুত্রের তরণী ঝঙ্কারবিধ্বংসী সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গাবাতে ভেসে যাচ্ছে কূল থেকে অকূলে, চোখের সমুখ থেকে দৃষ্টির অন্তরালে। প্লাইউড, কার্ডবোর্ড ও টিনশিট দিয়ে তৈরী হয়েছে ময়ূরপংখী নৌকা। তার তলদেশে গোলাকার কাণ্ডের ঝাঁটা। অদৃশ্য দড়ির সাহায্যে ছলে ছলে চলবে কৃত্রিম জলের উপরে কৃত্রিম তরণী—সত্যিকার জলযাত্রার ভঙ্গিতে। সমুদ্রের ঢেউ, তার গর্জ্জন, তরণীর আন্দোলন ও গতি সমস্তই সৃষ্টি করা হবে বৈজ্ঞানিক শক্তির সহায়তায়। তার জন্ম ষ্টেজের নীচে বসানো হয়েছে বিভিন্ন অংশশক্তিবিশিষ্ট ছোট বড় গুটিকয়েক মোটর এবং একটি ট্রান্সফর্মার। আনা হয়েছে নানা আকৃতির রেল, নানা মাপের রোলার। ছোট বড় কপিকল, দাঁতওয়ালা চাকা,

সরু-মোটা শিকল, লোহার প্লিং, কাঠের হাতল ইত্যাদি অগণিত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম।

একটার পর একটা সুইচ টিপে শেষবারের মতো সমস্ত বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং দেখাছিলেন নিখিল রায়। উৎসাহের আতিশয্যে ক্ষিপ্ত তাঁর ভঙ্গি, আত্মতৃপ্তির অভিব্যক্তি তাঁর মুখে, চোখে, সর্ববঙ্গে। নিজের পরিকল্পনার সার্থক রূপায়নে আত্মপ্রসাদ লাভ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু নিখিলের বর্তমান উৎসাহ ও আনন্দের কারণ কেবলমাত্র নিজস্ব এঞ্জিনীয়রিং বুদ্ধির প্রশংসনীয় পরিণতি নয়। যাকে দেখাচ্ছেন সেই বিশেষ ব্যক্তিটির উপস্থিতি এবং আগ্রহও নিখিলের মনে কম প্রভাব বিস্তার করেনি। বস্তুতঃ সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে মলী সেন প্রত্যেকটি আলোক নিয়ন্ত্রণের কৌশল এমন গভীর উৎসুকতার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে, তাতে যে কোনো বিশেষজ্ঞের মনেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। মাঝে মাঝে একটি ছুটি প্রশ্নের দ্বারা মলী সেন ব্যাখ্যাকারীর সেই উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলছিলেন। স্বল্প পরিসর স্থানে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুইচ, গিয়ার, লিভার ও গ্যাজেটগুলি টিপে, টেনে, খুলে বা বন্ধ করে দেখাতে গিয়ে উৎসাহে উদ্দীপ্ত নিখিলের হাত মাঝে মাঝে অতর্কিতে মলী সেনের হাতের আঙ্গুল বা বাহুর একাংশ স্পর্শ করছিল।

সমস্ত বোঝানো ও দেখানো শেষ হয়ে গেলে মলী সেন বিষ্ময় ও আনন্দে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ক্ষণেক অপেক্ষা করে নিখিল প্রশ্ন করলেন, “কেমন হয়েছে বলুন, মিসেস সেন।”

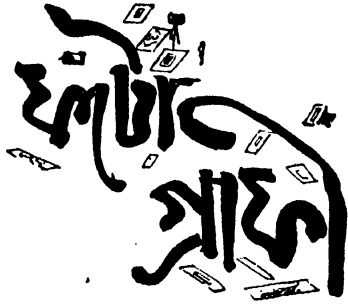
মলী সেন কিছু না বলে শুধু একবার নিখিলের পানে তাকালেন। বলার প্রয়োজন ছিল না। তাঁর চোখের উজ্জ্বল চাহনি, তাঁর আননে আনন্দের আভা। তাঁর অধরে পরিতৃপ্তির ঈষৎ হাস্যরেখা যে কোণে উজ্জ্বলিত প্রশংসার চাইতে মুখরতর, নিখিলের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিপূর্ণ পুরস্কার।

পুনরায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন,

“কী ভাবছেন?”

স্মিত হাস্তে মলী সেন উত্তর করলেন, “কিছু না।

[ ৮৩৫ পৃষ্ঠায় জ্যেষ্ঠব্য ]



আকাশ-পটে



—কুমারী কৃষ্ণা

( দ্বিতীয় পুরস্কার )



যাত্রা

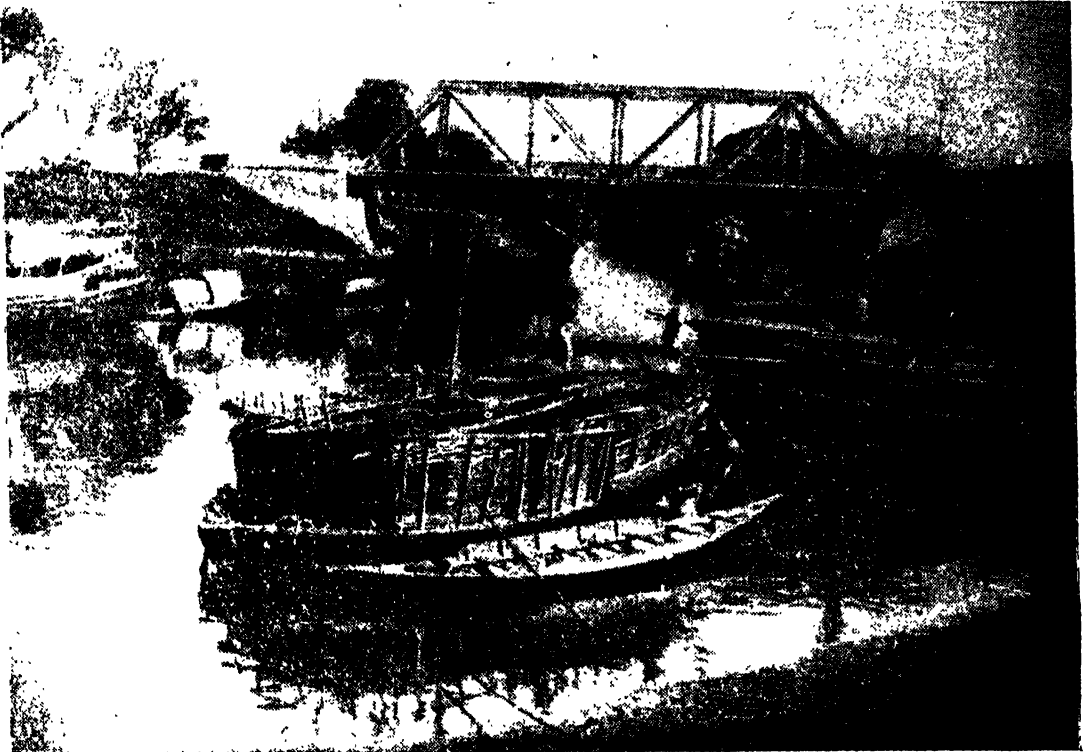
( প্রথম পুরস্কার )

—মনসিকুমার ভট্টাচার্য্য ( কলিঃ )





ভোরবেলায় —দীর্ঘাকুয়ার চৌধুরী (কলি-২৭)  
(তৃতীয় পুনরাব)



উট্টাডঙ্গা ব্রিজ

—বিল্টু গুপ্ত (কলি-৩)

## প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ৬৭৯সংখ্যার বসু ও নেতাজী  
সুভাষচন্দ্র বসুর একত্রে গৃহীত প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল।

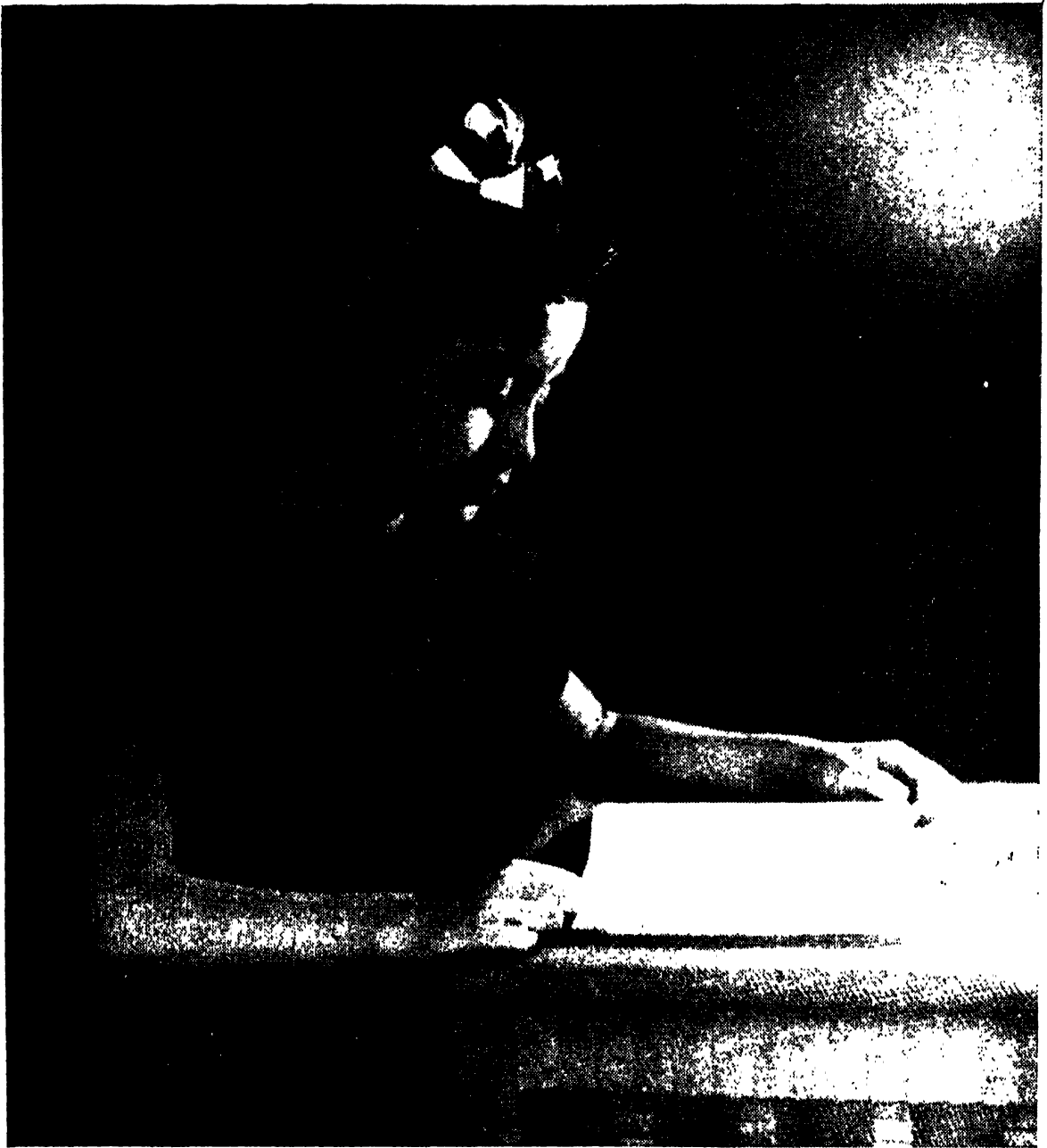
যাত্রী

—জ্যোতিবিন্দনাথ বসু ( বর্ধমান )



জল-প্রপাত

—শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য ( কলি-১১ )



কণ্ঠকা

—নিখিলকুমার দত্ত (কলি-৬)

## প্রতিযোগিতা

বিষয়

বিখ্যাত ষ্টেশন

প্রথম পুরস্কার ১৫৯

দ্বিতীয় পুরস্কার ১০৯

তৃতীয় পুরস্কার ৫৯

ছবি পাঠাবার শেষ দিন ২৪শে কার্তিক

# বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দনাথ মিত্র



কালের আগোণ বিধানে সবই ক্রমে বিস্মৃতির গহ্বরে

চলে যায়। সেই বিস্মৃতির বহু থেকে বাঁচাবার জন্তে

মানুষ রেখায় লেখায় পুস্তরে মুদ্রায় অতীতকে যত্নে গাঁথি রাখবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথের ণায় মহামানবের স্মৃতি-কথা এইরূপে গ্রথিত হয়ে অসংখ্য গ্রন্থমালায় পরিণতি লাভ করে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এত দিন যা সঞ্চিত হয়ে আমার নিঃসর জীবনের একতারায় বেজেছে, তাই সকলের সঙ্গে উপভোগ করতে ইচ্ছা হয়। কি জানি কখন আমার একতারার তার ছিঁড়ে যায়; তখন আর শত চেষ্টায়ও সুরের এই কলিটি উদ্ধার করা যাবে না।

১৯৩২ সাল; রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন দু'বছরের জন্তে। আমার এ কথাটি মনে আছে তার বিশেষ কারণ, ঐ একই সময়ে আমি বাংলার 'রায়তলু লাহিড়ী অধ্যাপক' হয়ে নবেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করি। রবীন্দ্রনাথ 'অধ্যাপক' হওয়া পছন্দ করেননি। তাই তাঁকে বলা হতো 'আচার্য'। আচার্য ত তিনি বটেই; তারও চেয়ে যদি কিছু বড় সম্মান থাকে, তবে সে সম্মানও যে তাঁর প্রাপ্য ছিল, এ বিষয়ে কোনও ভুল নেই।

ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি রবীন্দ্রনাথের এক জন অমুরাগী ভক্ত ছিলাম। এবারে আরও নিকটে একই ক্ষেত্রে তাঁকে পাওয়া যাবে, এই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। কবি তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন; ছুটলাম শান্তিনিকেতনে। বললাম, 'আপনি যেন অস্বীকার করবেন না। কিছুই ত কাজ নয়। আপনার উপস্থিতিতেই—তাও মাঝে-মাঝে—আমরা খুসী হবো। আর আপনি ত মারা জীবনই আমাদের দিয়েই এসেছেন—এমন নিঃশেষে আপনাকে উজাড় করে কেউ কোনও দিন কোনও জাতিকে দেয়নি। এখন আপনি শুধু আমাদের এক আগ্রহ দেখা দিলেই আমরা সুখী হবো।' কবি আমার কথায় যেন সম্মত হলেন বলে বোধ হলো। কিন্তু কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্তৃপক্ষদের অমুরোধে কতকগুলি প্রকাণ্ড বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ভালই হলো। কিন্তু তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে আমি ভেবেছিলাম যে, এ ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হতে পারবে না। আমার আশা ছিল, কবি জীবনের শেষভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু জনসংঘট্টের সম্মুখে বক্তৃতা দেবার পরিশ্রম ত কম নয়। অত পরিশ্রম বেশী দিন করা চলবে না—এবি বাবর পক্ষেও না। আমার আশঙ্কাই ফলোড়িল।

তিনি মাঝে মাঝে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন, আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। তারা কত সম্ভব-অসম্ভব প্রশ্ন করে তাঁকে বিব্রত করে তুলতো, কবি তাতে খুসীই হতেন। কিন্তু কবি পার পেতেন তাঁর অভ্যস্ত বক্তৃতা-ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়ে। কখনও রাশিয়া, কখনও আমেরিকা ভ্রমণের গল্প করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে শুনতো। এক দিন বাগ্‌বের সুরেন্দ্রনাথ সেনের বহু অরুন্ধতী কবিকে গানের দ্বারা সম্বর্ধনা করলো। অল্প দিন শিল্পী কুলদারজুন রায়ের দৌহিত্রী কল্যাণী চক্রবর্তী বক্তৃতায় তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিল। শ্রীমতী অরুন্ধতী ও কল্যাণী এখন কলেজে অধ্যাপনা করছেন। রবীন্দ্রনাথ এই সব তরুণদের মনে কি প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, তা বঙ্গনা করা যেতে পারে! তাঁরাও কবিকে তাঁদের নবীন প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে অর্তিসক্ত করেছিলেন এবং কবি যে তাতে আনন্দই পেয়েছিলেন, এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। গল্পই হোক আর ভ্রমণ-কাহিনীই

হোক, যা-ই তিনি বলতেন, তারই মধ্যে এমন একটি তরুণ সজীব পরিহাস-রসিকতা থাকতো, যার জন্তে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। আমরা ছাত্রাবস্থায় তাঁর যে সব বক্তৃতা শুনেছি, তার মধ্যেও যে অদ্ভুত বেগশীলতা থাকতো, তাঁর গল্পে-আলাপে-কথায় সেই গতিচ্ছন্দের একটুও অভাব লক্ষিত হতো না। এর জন্তে শুধু বাংলা ভাষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী নয়, আরও অনেক ছাত্র-ছাত্রী এসে জুটতেন। ফল হলো এই যে, আমার যে বিভাগ জীবনীশক্তির অভাবে এত দিন মূর্খ হয়ে আসছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা পেয়ে তার দেহে নূতন কর্মশক্তির আবির্ভাব হলো। এ কথা আমি ভুলতে পারি না যে, কবি তাঁর বিরাট ব্যক্তিসত্তার আলোক যখন বাংলার তরুণদের দিকে ঘূর্ণয়ে ধরতেন, তখন সে আলোয় বর্তমানের মূল্য অনেক বেড়ে যেতো এবং ভবিষ্যতের ছবি উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। এর প্রভাব যে কতখানি তা আমি সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি।

‘বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রভৃতি যে কয়েকটি বক্তৃতা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, সেগুলি ভাসার চমৎকারিতায়, ভাবের শিল্পচাতুর্যে ও কণ্ঠের মাধুর্যে অপূর্ণ হয়েছিল, এ কথা না বললেও চলে। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁরই মতো—অল্প উপমা দিয়ে ঠিক বোঝানো যায় না। আমি শুধু আমার অধ্যাপক-জীবনের অভিজ্ঞতাই আজ বলবো। কবি মাঝে মাঝে অর্থাৎ যখন তিনি কলিকাতায় থাকতেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে উপস্থিত হতেন। এরূপ আনন্দপ্রদ উপস্থিতির সংখ্যা বেশী না হলেও, এই বহু-প্রতীক্ষিত ঘটনা বেশ একটি আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করতো। এক দিনের কথা মনে পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণকে ১৮ নং কক্ষে সমবেত হতে বলে আমি কবিকে আনতে গেলাম। কবি এসে অধ্যাপকের আসনে মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে উভয় শ্রেণীর নাম ( Roll Call ) ডাকলাম। আমার উদ্দেশ্য এই যে, কবিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, তিনি রীতিমতো অধ্যাপকরূপেই আমাদের মধ্যে এসেছেন এবং ছেলেমেয়েদের মনেও সেই অশ্রুপঙ্কতা যত দূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাবে ধারণা করিয়ে দেওয়া। এরূপ সুযোগ অবশ্য

বেশী ঘটে উঠেনি। তার কারণ এই সময়ে তাঁর শরীর খুব ভাল যাচ্ছিল না। যা হোক, কবি চেয়ারে বসেই কাব্য সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুরু করে দিলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম; তার কারণ মঞ্চের উপর ছ’খানা চেয়ারের স্থান ছিল না। ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন, বসবার স্থানের অল্পতা ও উপস্থিতির সংখ্যাধিক্যের দরুণ। প্রায় এক ঘণ্টা কাল আলোচনা চললো। ছাত্র-ছাত্রীরা কবির ‘সাজাহান’ কবিতার সম্বন্ধে সনালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। বেশ সংযত ভাবে এবং শ্রদ্ধার সচিত্র কবিকে তাঁরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বিব্রত করে তুললেন। আমার মনে হয়, সোদন বাংলা ভাষার স্নাতকোত্তর বিভাগ বেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয়ই দিয়েছিল। কবি অসীম ধৈর্যের সহিত সংস্কৃত প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। কিন্তু ক্রমশঃ বিষয়টি জটিলতার চরমে উঠছে দেখে কবিই বণে ‘ভঙ্গ’ দিলেন; তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে, অন্যতদেই পাঠশেষের ঘণ্টাধ্বনি হলো।

তাঁর এই অধ্যাপক বা আচার্যপদ ছ’বৎসরের বেশী স্থায়ী হয়নি, এই আমার ব্যক্তিগত দুঃখ। এটা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ক্ষতি। রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনের সুশীতল বনবীথিচ্ছায়ায় শিক্ষকতা করছিলেন বহু দিন থেকে। তাঁর নিজের রচিত শিক্ষায়তনে তিনি কি ভাবে অধ্যাপনা করতেন তার বহু ইতিহাস আছে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিতান্ত অল্পপরিসর সময়ে তিনি কি ভাবে আপনাকে মানিয়ে নিয়েছিলেন, তা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এম-এ পাস করার পর থেকেই তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি। সাহিত্য পরিষদের ছাত্রাধ্যক্ষরূপে তাঁকে অল্পরূপ পরিবেশের মধ্যে অভ্যর্থন করেছিলাম একাধিক বার, প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করবার সময়ও তাঁকে ছাত্রদের সংস্পর্শে নিয়ে আসবার আনন্দ লাভ করেছিলাম আমি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে যেমন ‘আচার্য’র আসনে দেখেছি এবং যেমন উন্মুক্ত অসংকোচে আলাপ-আলোচনা করতে দেখেছি, এমনটি দেখবার সুযোগ আমার আর কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে বাংলা দেশ ভগ্নী নিবেদিতাকে স্মরণ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের শুভ প্রচেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরে এর বিবাহ সভা আহূত হয়, সেখানে বিবেকানন্দ-শিষ্যাব অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হলাম।

তার একটি মাত্র স্মৃতিমন্দির—“নিবেদিতা বিজ্ঞানতন” নারী-শিক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়ে কলিকাতায় (নিবেদিতা লেন) যে গড়ে উঠেছে তার প্রতি দেশবাসীর সক্রিয় সহায়ত্ব আকর্ষণ করতে চাই। একমাত্র এই বিজ্ঞানতনেই ভগ্নী নিবেদিতাকে প্রতি বৎসর স্মরণ করা হয়; কিন্তু বাংলার তথা ভারতের প্রত্যেক নারীশিক্ষা-মন্দির ও শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে “নিবেদিতা দিবস” পালন করা উচিত। জাতির দারুণ সঙ্কটের দিনে তিনি তাঁর অধ্যাত্ম সাধনা, তাঁর নিজস্ব শিক্ষা-পদ্ধতি ও তাঁর অমূল্য জীবন আমাদের সমগ্র জাতিকে দান করে গিয়েছেন। অথচ, গভীর দুঃখের কথা এই যে, ফরাসী ভাষায় সম্প্রতি তাঁর একটি জীবনী ছাপা হয়ে গেল, কিন্তু বাংলায় তাঁর উপযুক্ত একখানিও জীবনী লেখা এ পর্যন্তও হোল না।—অথচ সে জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান এই বাংলা দেশের এক প্রবীণ সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর ‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ণ বিল্ডু’ পত্রিকাদিতে বেখে গেছেন, সে কথা একালের সাংবাদিক-নায়েক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দক্ষিণেশ্বর সভায় বলেছিলেন। আত্ম সংক্ষেপে বিস্তৃতপ্রায় নিবেদিতা-জীবনীর কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করি।

নিবেদিতার পিতা স্কটল্যান্ডবাসী Samuel Richmond Noble ইসাবেল ( Isabel )-নাম্নী ধর্মপ্রাণা ক্যাথলিক কুমারীর পাবিত্রহণ করেন। ১৮৬৭ সালে জন্মকাল থেকে, ১৮৭১ পর্যন্ত অর্থাৎ মাত্র চার বৎসর জ্যেষ্ঠা কন্যা Margaret Noble উত্তর-আয়ারল্যান্ডে ( Dunganon, County, Tyrone ) দিদিমার বাড়িতে কাটিয়েছিলেন। তাঁর পিতা সামান্য ব্যবসা ছেড়ে Devonshire এ পাদ্রীর কাজ নিয়ে সম্মানদের ইংল্যান্ডে আনেন এবং Halifax College এ মার্গারেট ও তাঁর আর দু’টি ভগ্নী পড়াশুনা করেন। কিন্তু মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে পিতা বেতারেও নোবেল পুরস্কার গমন করায়, জ্যেষ্ঠা কন্যা অতি অল্প বয়সে কেম্‌উইক্ ( Keswick ) বিজ্ঞানতনে চাকুরী নিতে বাধ্য হন।

এই যুগেই সুপ্রসিদ্ধ নূতন “শিক্ষা-আইন” প্রণয়নের ফলে—ইংল্যান্ডের গণশিক্ষার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছিল। কুমারী মার্গারেট এ সময়ে এক আদর্শবাদী ইংরাজ যুবক সহকর্মীর সংগে, Ruskin, Emerson প্রভৃতিদের রচনা গভীর ভাবে পাঠ করতেন। সেই যুবকটির সংগে তাঁর বিবাহের কথা উৎসাহের সংগে সংগে যুবকের অকালমৃত্যু এসে নিজের ছোট সংসারটি গড়ে তোলার আশা একেবারে নিমূল করে দিল। কিন্তু বিবাহটি বিঘ্নমানবই যে তাঁর সংসার, স্মরণ বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ যে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি হবে—সেই জগ্নাই কি ‘তরুণ জীবনের উপর এই বজ্রাঘাত ? ‘বজ্রাদপি কঠোরাপি, মূর্খনি কুসুমাদপি’ ভারতের এই শাশ্বত বাণী—নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যকে লেখা চিঠিতে দু’বার উল্লেখ করেছিলেন কি সেই উদ্দেশ্যেই ?

যাই হোক, মার্গারেট চেষ্টার ( Chester )-এর বাসিকা বিজ্ঞানতনে কিছু দিন কাজ করে London-এর অন্তঃপাতী উইম্বলডন ( Wimbledon ) শিশু-শিক্ষালয়ে ( Nursery ) যোগদান করেন। Froebel, Kindergarten প্রভৃতি নানা শিক্ষা-প্রণালী



ভ

## নিবেদিতা

শ্রীকালিদাস মাগ

আরম্ভ করে, তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেন। এ যুগে দেখি, তিনি Ruskin School এবং Sesame Club নিয়ে মেতে আছেন। তাঁর মাতৃভূমি আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে সব আইরিশ বিপ্লবী জীবন বিপন্ন করে কাজ করতেন, তাঁদের সংগেও মার্গারেট নোবলের গভীর যোগ ছিল। ১৮৯৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ চৌধুরী বৎসব ইংল্যান্ডে কাটিয়ে দেশে ফিরবার আগে এই আইরিশ বিপ্লবীদের সংগে সংযোগ বেগেছিলেন তার প্রমাণ পাঠ, এবং পরবর্তী যুগে ববদাব অধ্যাপক বিপ্লবী অরবিন্দের সংগে নিবেদিতার বন্ধুত্ব হয় সে কথা পরে বলব।

ইতিমধ্যে আর এক আধ্যাত্মিক বিপ্লবীর আবির্ভাব হোল। প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সিকাগো ( Chicago ) শহরে হাজির হলেন; এবং সেই বিবাহিত ধর্ম-সম্মেলনে ( Parliament of Religions ) ভারতের সনাতন ঐক্য-মন্ত্র ও বেদান্তের অর্ধেক-তত্ত্ব প্রচাণ করে সকলকে মুগ্ধ করলেন। প্রায় দুই বৎসর আমেরিকায় প্রচার করে ১৮৯৫ সালের নভেম্বরে বিবেকানন্দ লণ্ডনে আসেন। সেইখানে মার্গারেট প্রথম স্বামিজীর ভাষণ শোনেন এবং ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৬ সালের এপ্রিলে স্বামিজী আর একবার লণ্ডনে এসে এই বছরের শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে বেদান্ত প্রচাণ করেন

এবং ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে সিংহল বন্দর কলকাতাতে নেমে প্রায় চার বৎসর পাবে গুরুভ্রাতাদের সংগে মিলিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিব্বোধানেব (১৮৮৬) পব দশ বছর কেটে গেছে, মনে বাথতে হবে।

লণ্ডন ছাড়বার পূর্বে স্বামিজী একখানি পত্রে লেখেন—  
“I have plans for the women of my country, in which you, I think could be of great help to me...” (ভারতীয় নারীর উন্নতিকল্পে আমার কিছু পবিকল্পনা আছে এবং তুমি (নিবেদিতা) সেই ক্ষেত্রে আমাকে প্রভূত সাহায্য করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।)। এই সময়ে স্বামিজী তাঁব শিষ্যকে ভারতমাতার কাছে যেন উৎসর্গ কবে তাঁব নাম দেন “নিবেদিতা” এবং তিনিও সর্বান্তঃকরণে “গুরু” বলে স্বামিজীকে গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ভারতমাতার অমচায় সন্তানদের সেবা কবে তাঁব উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা নিবেদিতা দিয়ে গেছেন। নানান সংগ্রামের পর ১৮৯৮ সালে (১৮শে জানুয়ারী) নিবেদিতা ভারতে পদাশ্রয় করেন এবং স্বামিজীব আশ্রয়িকার শিষ্য ও শিষ্যাঙ্গের সংগে বেলুড থাকেন; তখন সেখানে সবে মাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ “মিশনেব” জগা একটু জমি কেনা হয়েছিল। ১১ই মার্চ ১৮৯৮ স্বামিজী প্রথম প্রকাশ্য সভায় ভারতবাসীর কাছে তাঁকে “নিবেদিতা” বলে পরিচয় কবান এবং “The influence of Indian spiritual thought in England” (ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তার প্রভাব ইংলণ্ডে) এই বিষয়ে এক প্রাণবশ্পূর্ণ বক্তৃতা দেন। সেটি শুনে কেউ কেউ মগ্ধ্য কবেছিলেন যে, বাগ্মিণ্য এমন কি এ্যানি বেসান্টকেও (Besant) হয়ত নিবেদিতা ছাড়িয়ে যাবেন। ১৬ই মাচ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে “গায়ত্রী” দেন এবং একটি কবিতা উৎসর্গ কবেন। মে থেকে অক্টোবর (১৮৯৮) স্বামিজী তাঁব শিষ্যাদিব সংগে নিবেদিতাকে, উত্তর-ভারতের বত তীর্থ—কুমায়ুন ও কাশ্মীর প্রভৃতি পবদর্শন কবান। স্বামিজীব দিব, জীবনালোকে নিবেদিতা যেন নবদৃষ্টি লাভ কবে ভারতমাতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির যে অপূর্ণ বন্দনা ও ব্যাখ্যা লিগ্নিতে শুরু করেন, সেগুলি আমাদের জাতীয় সাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ। এখন সেগুলির সম্পূর্ণ অনবাদ বাংলা ও হিন্দীতে প্রকাশিত হওয়া উচিত।

কলিকাতায় কবে (১১ই নভেম্বর, ১৮৯৮) বোসপাড়ায সঙ্ক গলির একটি ছোট ভাড়া বাড়িতে প্রথম নারীশিক্ষা-মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৯ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী Albert Hallএর বিরাট সভায়—প্রেস-বিশিষ্ট বালাব মাছুসকে যেন সাহস দিবার জগা—নিবেদিতা “Kali the Mother” প্রবন্ধ পাঠ করেন—সেই সভায় অধ্যাপক বহুনাথ সর্কাক মতায় উপস্থিত ছিলেন। শুনেছি, বহুনাথ R. G. Kar Collegeএব প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দেব সাতচর্যে নিবেদিতা প্রেস বোগীদের নিজ হস্তে শুশ্রূষা কবেছেন। তাঁব কোলেই প্রোগ্রাক্ত এক শিশু, তাঁকেই ‘মা’ ভেবে জড়িয়ে ধবে চক্ষু বজ্জছিল।

নিবেদিতা যেন অন্তর মস্ত্রে দীপ্তা নিয়েছিলেন। বালাব যে বিপ্লবী দল তিলক ও অববিন্দেব প্রেরণায় প্রাণ দিতে বাঁপিয়ে পড়বে, তাদের সংগেও যোগাযোগেব সূত্রপাত এ সময় হয়।

কারণ পরে দেখি তাঁর নিজস্ব “বিপ্লবী সাহিত্যে”র সংগ্রহ বালাব দেশের সর্বভাগী দেশপ্রেমিকদেরই তিনি দিয়ে গেছেন। ভারতের ‘জাতীয় চিত্রশালা’ কোন দিন গড়ে ওঠে, সেখানে মবকতদীপহুহিতা নিবেদিতার চিত্র রামমোহন রায়ের পাশেই রাখতে হবে, কারণ নারী-প্রগতির পুরোধা রামমোহনই প্রথম উৎপীড়িত আইরিশ জাতির পক্ষ সমর্থন করে ১৯ শতকের গোড়ায় প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি রামমোহনেব সহকর্মিগণ আয়ল্যাণ্ডের সঙ্গে শুধু যোগ রক্ষা করেননি, প্রিন্স দ্বারকানাথ আয়ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং ১৮৮৫ সালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে আয়ল্যাণ্ডে প্রচুর অর্থ সাহায্যও পাঠিয়েছিলেন। সেটি সঙ্কতজ্ঞ চিন্তে স্বরণ কবে আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা, ১৯৪৩এব বাংলা দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা আমাদের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন।

১৮৯৯ সালের জুন মাসে স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে “বুদ্ধচাবিণী”র পদে বরণ কবেন; এবং তাঁবা সমুদ্রপথে ৩১শে জুলাই লণ্ডনে নামেন। ১৯০০ সালের ২৪শে জানুয়ারী, নিবেদিতা নিউ ইয়র্কে “ভারতীয় শিল্প” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং বোসপাড়ায সেই স্থলটির জগা অর্থ সংগ্ৰহ করতে থাকেন। সেপ্টেম্বর মাসে Parisএ (Religious Congress) ধর্ম-সম্মেলনের অববিশন শেষ করে Britteny থেকে নিবেদিতার কাছে বিদায় নিয়ে স্বামিজী ভারতবর্ষে ফিবে আসেন। ১৯০১ সালে দেখি, জাপানী সাহিত্যিক শিল্পী Okakura বিবেকানন্দকে জাপানে ধর্ম-সম্মেলনে নিয়ে বাবাব জগা পাথেয় হিসাবে টাকা পাঠাচ্ছেন। ১৯০২ সালের গোড়াতে দেখি, Okakura বিবেকানন্দ ও ধর্মপালকে সংগে নিয়ে বুদ্ধগয়া ও সারনাথ প্রভৃতি পরিদর্শন কবেছেন। এই বছর জানুয়ারী মাসে মনোী রমেশচন্দ্র দত্তেব সংগে এক জাহাজে নানা বিষয়ে আলোচনা করতে কবতে ভগ্নী নিবেদিতা মাস্ত্রাজে নামেন এবং সেখানকার এক বিরাট সভায় রমেশচন্দ্র নিবেদিতার জীবন ও সাধনার গভীর ব্যাখ্যা করেছিলেন।

১৯০২ সালে জানুয়ারীতে নিবেদিতা যখন তাঁর গুরুকে দেখলেন তখন তাঁব বয়স মাত্র উনচল্লিশ, অথচ জীবন-প্রদীপ নিক্রাণোমুখ। ১৯০০ সালে (২৬শে মে) আমেরিকা থেকে নিবেদিতাকে তিনি লেখেন, “আমার অনন্ত আশীর্বাদ জেনো। কিছুমাত্র নিরাশ হোয়ো না। ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম। আমাদের অঙ্গে গৈরিকবাস ত বুদ্ধক্ষেত্রেরই মৃত্যুসজ্জা; ব্রত উদ্বাপন প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জগা বস্তু হওয়া নয়।”

গুরুব এবং শিষ্যের হৃজনের জীবনেই এটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাঁদের শেষ নিশ্বাসেব সঙ্গে সংগ্রাম করে গুরু উনচল্লিশে এবং শিষ্যা চুয়াল্লিশ বছরেই দেহত্যাগ করেছিলেন, অথচ কত বড় আত্মত্যাগ, সাধনা ও সিদ্ধি এই স্বল্পপরিসর হুটি জীবনেতে দেখি।

মৃত্যুর পাঁচ মাস আগে নিবেদিতাকে স্বামিজী শেষ চিঠি লিখেছেন (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯০২):—

“সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্ভূত হোক, মহামায়া স্বয়ং তোমার হৃদয়ে এবং বাহ্যতে অধিষ্ঠিতা ইউন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত ইউক এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর—এই আমার প্রার্থনা।”

নিজের জীবনের দশ বছরও বাকি নাই এটি যেন বুঝেই ভগ্নী নিবেদিতা প্রতি মুহূর্তে তাঁর গুরু তথা ভারতমাতার সেবায় উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর একান্ত নিঃসঙ্গ জীবনের চিন্তা ও ভাবনার কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু তাদের ছাপ আছে—“My Master as I saw him” প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ছ’টি পত্রিকায়। সে কথা প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বলেছেন। ‘প্রবাসী’ এই সময়ই শুরু হয়; ‘বন্ধু এ স্বজাতা’ থেকে আরম্ভ করে ‘ভারতমাতা’ প্রভৃতি বহুগুলি চিত্র শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু প্রভৃতি তাঁর শিষ্যেরা দেশকে উপহার দিয়েছেন তাদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়ালে একমাত্র কলাশিল্প প্রবীণা নিবেদিতাই করেছেন—প্রথমে ‘প্রবাসী’তে এবং পরে ‘Modern Review’ পত্রিকায়। ১৯০২-৩ সালে নিবেদিতাকে দেখি শ্রীঅরবিন্দেব নিমন্ত্রণে বরোদায়। ১৯০৪ সালে নিবেদিতা তীর্থযাত্রায় যোগ দিলেন জগদীশচন্দ্র, ববীন্দ্রনাথ ও যদুনাথ সরকারের সঙ্গে এবং ববীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প ‘কাবুলিওয়ালা’র ইংরাজী অন্তর্বাদ (‘Modern Review’এ ছাপা) এটি আইরিশ লেখিকাব পাশ্চাত্য জগতের কাছে শ্রেষ্ঠ অবদান। ১৯১১ সালে তাঁর অকাল-মৃত্যুর পরই ববীন্দ্রনাথ ‘প্রবাসী’তে ‘ভগ্নী নিবেদিতা’ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন; তাই মধ্যে কবিত্বের কী গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে আজও পড়ে মুগ্ধ হতে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-৬) নিবেদিতা পূর্ববঙ্গের বঙ্গা ও ছত্রিশ-পাঁড়িতদের সাহায্যার্থে গিয়ে কঠিন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং বুঝেছিলেন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে আর সময় বেশী নেই। হয়ত সেই জন্মই মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি অর্থাৎ সংগ্রহ করতে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে শেষ বাব যান। ১৯১১ সালে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল Universal Race Congress-এ যে অপূর্ণ ভাষণ দেন তার প্রথম ব্যাখ্যা নিবেদিতাই এ দেশের কাগজে করেছিলেন। মেটারলিন্ক (Maeterlinck)-এর ‘নীল পাখী’ নাটকের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনাই যেন তাঁর শেষ লেখা আমরা পড়েছি। ঠাণ্ডা খবর এল আচার্য জগদীশচন্দ্রের ‘নায়াপুরী’ধামে নিবেদিতা শেষ শয্যা নিয়েছেন। বসুজায়া শ্রীমতী অবলা দেবী প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন:—

“আমি যখন ত্রিগিনী নিবেদিতার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, তখন উমা হৈমবতীর কথা আমার মনে হঠাৎ জ্বলিল। সে কথা তিনিই বলিয়াছিলেন (অবনীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ চিত্র ‘উমা’ ও নিবেদিতার ব্যাখ্যা স্তম্ভ্য), উমা যেমন পার্বতী হইলেও পিতৃালয়ে আসেন, হিমপ্রধান দেশের এই দুহিতা তেমনই তাঁহার ভারতীয় আবাসে আসিয়াছিলেন।”

১৩ অক্টোবর ১৯১১ শেষ দিন। শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভগ্নী নিবেদিতা বসলেন:—‘নৌকা ডুবছে কিন্তু সূর্যোদয় দেখে যাবো।’

“The boat is sinking..but I shall see the sun rise !”

অমর আত্মা মৃত্যুকে জয় করে যেন চিবস্তন বাণী দিয়ে গেলেন। নিবেদিতা-হৈমবতীকে তার পিএলয়ে আনবার জন্ম কি আমরা আজও প্রস্তুত হয়েছি? স্বাধীন ভারত থেকে স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডে যদি তাঁর স্মৃতিকল্পে এমন কিছু আমরা পাঠাতে পাবি যার জন্ম আইরিশ জাতি কিছু দিন মনে রাখবে, তবেই ভগ্নী নিবেদিতার কাছে হয়ত স্বর্ণ শোধ হবে।

এক দিকে বোসপাড়া গল্পের সেই ছোট বালিকা বিজালয় নিয়ে যেমন জননীর মত একনিষ্ঠ সেবা, অল্প দিকে তেমনি স্বদেশী যুগে (১৯০৪-১১) ভারতমাতার উপযুক্ত কন্ঠাব মত কী বিচিত্র সংগ্রাম ও সিদ্ধি! যে কোনও বিকৃত সমালোচনাই আশ্রক, ভগ্নী নিবেদিতা যেন দেশমাতৃকার অতন্দ্র রক্ষিণী—সুবধা যন্ত্রির অদ্বাধাতে কত প্রতিপক্ষের মতই না তিনি খণ্ড খণ্ড করেছেন; আবার তন্ময় হয়ে দেখেছেন ও আমাদের দেখিয়েছেন “স্বাধীন ভারতের” ভবিষ্যৎ গৌরবোজ্জ্বল মুখ! সত্যিই নিবেদিতা যেন জন্মে জন্মে এই দেশেই জন্মেছেন। অথচ তাঁর উপযুক্ত স্মৃতি ও পুণ্য জীবনী যে কেন এত কাল রচিত হয়নি, ভেবে লজ্জায় ও ব্যথায় মন আকুল হয়। শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় নয়, বাজনৈতিক স্বাধীনতা-সংগ্রামেও ভগ্নী নিবেদিতার দান যে কত বড়, সে কথা অনেকে ভুললেও আমাদের ভোলা চলে না। শ্রীঅরবিন্দেব সঙ্গে বরোদায় সাক্ষাৎ (১৯০৩) থেকে তাঁকে রাজরোষ হতে রক্ষা করার জন্ম বাংলা থেকে চন্দ্রনগর হয়ে পণ্ডিতাবী পাঠান (১৯১০) পর্যন্ত—কত অধুনা বিখ্যতপ্রায় অথচ নিগূঢ় ইতিহাসই নিবেদিতার সঙ্গে জড়ান আছে! ভারতের অল্প সবাই মনে নাই বাথুক, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক নব-নারীর একান্ত কর্তব্য ভগ্নী নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতি চিরজাগৃত রাখা। তাঁর বহু সাময়িক রচনা এই কলিকাতার নানা পত্রিকাদিতেই বিক্ষিপ্ত ও অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে; সেগুলির পুনরুদ্ধার করা, পুনঃপ্রচার করাও আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁর নামে যে নিবেদিতা নারী-শিক্ষায়তন বাগবাজারে প্রায় ৩০৪০ বছর নৌবে কাজ করে চলেছে, সেখানে অনেক বিশিষ্ট সেবিকা ও শিক্ষার্থিণী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন নিজে দেখেছি; তাঁর হীরক-জয়ন্তী (১৮৯৮-১৯০২) হাস্য। তাই আশা হয়, তাবাই এ কাজের ভার নিয়ে ভগ্নী নিবেদিতার সমগ্র রচনাবলী ও জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করে আমাদের জাতিকে স্বমুক্ত করবেন। আগামী ১৯৫২ (জানুয়ারী)তে আবার স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জন্মোৎসব; তাঁর মানন কন্ঠা ভগ্নী নিবেদিতাকেও সেই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন ও সমগ্র জাতি সন্মত হ্রদয়ে স্মরণ করবে, এই আশায় এই রচনা উৎসর্গ করে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

“শুধু মনোপলিতে জন্মে না কখনও আড্ডা,

যেমন শুধু সলিললোকে জন্মে না নাটক।”



# ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

শ্রীনিবাস চৌধুরী

ভারতবর্ষের বাজরনৈতিক আয়তন অনেক বার পরিবর্তিত হইয়াছে। মৌর্য আমলে ভারতবর্ষ উত্তরে হিন্দুকুশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত ছিল অর্থাৎ ব্যাকট্রিয়া বা আফগান তুর্কিস্থান বাদে পশ্চিমে হিরাট পর্যন্ত সমগ্র আফগানিস্থান মৌর্য ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিমাংশের মতে হিমালয় নহে, হিন্দুকুশ ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক উত্তর সীমানা। ( "The first Indian Emperor ( Chandra Gupta ), more than two thousand years ago, entered into possession of that "Scientific frontier" sighed for in vain by his English Successors and never held in its entirety by the Mughal monarchs of the 16th and 17th centuries" —V. Smith ) গুপ্তীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত কবুল সহ সমগ্র পূর্ব-আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দিল্লীতে তুর্ক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে আফগানিস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। মুঘল আমলে আবার আফগানিস্থান ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নাদির শাহ আফগানিস্থান দখল করিবার পর হইতে উহা স্থায়ী ভাবে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং বলা যায় যে, শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বে, যাহা দেশের ভৌগোলিক আয়তনকে খণ্ডিত করে, এমন কোনকণ রাজনৈতিক আয়তন পরিবর্তনের ব্যবস্থা বা সীমানা নির্ধারণ স্থায়ী হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কথা বলিতে বিদেশীরা যে সাব-কন্টিনেন্টের কথা বলেন আমবা সেই সাব-কন্টিনেন্টাল বা ভৌগোলিক ভারতবর্ষের কথা বলিব।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানকে প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যে ব্যক্তি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ, সে-ও বলিতে পারিবে যে সভ্যতা ও শক্তিতে এই ভূখণ্ডে অধিবাসিগণ কোন সময়ে উন্নত হইয়া উঠিলে, অপরকে দান করিবার মত সম্পদ নিজেব ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইলে তাহাদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্র প্রথমে উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে, পবে দক্ষিণ-পূর্বে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইবে। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ অবিচ্ছিন্ন স্থলপথে সহজে পরিচালিত হইতে পারে কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণে সমুদ্র অতিক্রম করা আবশ্যক।

উপরে আফগানিস্থান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা (বর্তমান নাম তাজিকিস্থান), উত্তর-পশ্চিমে ইরান ও উত্তর-পূর্বে চীনা তুর্কিস্থান বা সিন্ধিয়া, মোঙ্গোলিয়া, মাকুরিয়া ও চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের ইতিহাস অনেকটা পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগের ইতিহাস ফরাসী ও ডাচ পশ্চিমাংশের চেষ্টায় খানিকটা উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি দুর্জয় রহস্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত কবে। এই দুর্জয় রহস্য দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্রপথে ভারতবাসীর অভিযান কাহিনী।

এই অভিযানকে দুর্জয় রহস্য বলিবার কারণ আছে। যে কারণ কি, বলা হইতেছে : দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী খৃঃ পূঃ চারি হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্বে সুমেরিয়া ও বেবিলোনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। এক জন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম-ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন, ইহা খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খৃঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৪০০০ বৎসর পূর্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (J. R. A. S. xx. 336, 337; xxi. 204)। হিন্দুদিগের মধ্যে চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এইকণ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয়, চান্দ্রমাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে উহা খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্বে আসিয়াছিল; কারণ, সারগণের সময়ে (নিও-বেবিলোনীয়ান মতে সারগণের কাল খৃঃ পূঃ ৬৮০০ বৎসর) উহা প্রাচীন রীতি বলিয়া পরিগণিত হইত।

খৃঃ পূঃ অষ্টাদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে মিশরের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রমাণ অবিচ্ছিন্ন হইয়াছে। মিশরে খৃঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরের কবরে ভারতীয় মসলিন ও নীল (indigo) পাওয়া গিয়াছে (J. R A S xx 206)। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের (খৃঃ পূঃ ১৭শ হইতে ১৬শ শতাব্দী) চতুর্থ এমেনোফিস চক্র প্রত্যেকে পূজিত 'এটেন' নামে পরিচিত স্বয়ং দেবতার উপাসনার প্রচলন করেন। মিশরীয় গ্নাত্যবিজ্ঞানী কোন কোন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিশরে এই উপাসনা ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধর্মের এবং ইহাব মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহারাই এমন অনুমানও করিয়াছেন যে, চতুর্থ এমেনোফিসের পিতা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয় ছিলেন। মিশরীয় ইতিহাসের মতে চতুর্থ এমেনোফিসের মাতা রাণী তাই-এর স্বামী ছিলেন মিশরে বৈদেশিক আগন্তুক।

খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে কার্থেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ-আমেরিকায় ভারতবর্ষের সহিত ধর্ম ও কৃষ্টিগত সম্পর্কের প্রমাণ অবিচ্ছিন্ন হইয়াছে মেক্সিকোর মায়া জাতির মধ্যে। এই সম্পর্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মায়া জাতির নিকট হইতে অনেক ভারতবর্ষীয় জিনিষ পবে আজটেক জাতি গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপ দুই-চারিটা বিচ্ছিন্ন তথ্যের টুকরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অধ্যায়ের কথা অস্পষ্ট আলোকের রেখার মত চোখের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চাহে সে অধ্যায়ের পরিচয় কবে পাওয়া যাইবে?

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির কথায় আসা যাউক।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দুইটি দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্কের পরিচয় তাহাদের নাম বহন করিতেছে—ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার। ইন্দোনেশিয়ার অপর নাম "Insulindia" বা দ্বীপময় ভারত।

এ দুইটি দেশ ছাড়া ব্রহ্ম, মালয়, শাম (থাইল্যান্ড) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত। ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে ফিলিপাইন, পাপুয়া ও অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সমুদ্রপথে বাতায়াত সহজ ও সাধারণ ব্যবস্থা হইলেও ব্রহ্ম-শাম-মালয়-ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারত স্থলপথে সংযুক্ত। এই স্থলপথেই আজাদ-হিন্দ বাহিনী শাম হইতে ব্রহ্ম অতিক্রম করিয়া ইন্দু ও কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রহ্মের ইতিহাসের সঙ্গে শামের ইতিহাস, শামের ইতিহাসের সঙ্গে মালয়েব ইতিহাসের সংযোগ আছে। ইন্দোচীনেব ইতিহাসের সঙ্গে শামের ও চীনের ইতিহাসের সংযোগ আছে। সুমাত্রা হইতে নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বীপমালা লইয়া গঠিত ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আলাদা। ফিলিপাইনস্ ও অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সীমান্তবর্তী দুইটি অঞ্চল, তাহাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ আলাদা ও ভারতবর্ষের সহিত এই ইতিহাসের সম্পর্ক নাই।

প্রথমে এশিয়ার ভূভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা হইতেছে।

আমরা যাগ বলিতে যাঠিতেছি, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে ভৌগোলিক পুবাণ বলা যায়। এই পুবাণ এখানে বলিবার একটু কারণ আছে। সে কারণ এই যে, কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী পণ্ডিত দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী উপজাতির সহিত অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী আত্মীয়তার কথা তুলিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) নাম এই আত্মীয়তা-সূচক। এই নামের অর্থ এই যে, দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী উপজাতির পূর্বপুরুষ ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ এক গোষ্ঠীভুক্ত। মালয়ের আদিবাসীদিগকেও এই গোষ্ঠীভুক্ত বলা হয়। এই মতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার কথা পবে বলা হইবে, এখানে একটি মাত্র যুক্তির উল্লেখ করা হইতেছে। সে যুক্তি এই যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এক কালে স্থলপথে সংযুক্ত ছিল।

ইহা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা নহে, ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কথা। আপনাদের মতের পরিপোষক হিসাবে তাঁহারা ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণের অনুমানকে কাজে লাগাইয়াছেন।

ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানিগণের মতে এক কালে (পার্মো-কারবনিফারাস আমলে) এখন যেখানে ভারত মহাসাগর দেখা যায় সেখানে ও তাহার উত্তরে দুইটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল। উত্তরের ভূভাগ পূর্ব হইতে পশ্চিমে পৃথিবীর উত্তরাংশ জুড়িয়া অবস্থিত ছিল। এই উত্তর মহাদেশের নাম দেওয়া হইয়াছে অঙ্গারা (Angara)। দক্ষিণে অবস্থিত ভূভাগ অস্ট্রেলিয়া, ভারতীয় উপদ্বীপ, দক্ষিণ-আফ্রিকা জুড়িয়া বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে গণ্ডোয়ানা (Gondwana)। এই দুই ভাগের মধ্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া অবস্থিত ছিল একটি বিস্তৃত সমুদ্র। কালক্রমে দক্ষিণ মহাদেশ ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও বহু বিচ্ছিন্ন, বৃহৎ ভূভাগ জলমগ্ন হয়। ফলে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মধ্যে একটি বোজক ইহা ব পরেও বর্তমান ছিল। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে লেমুরিয়া। মাডাগাস্কার হইতে পূর্বে মানদ্বীপ ও লাক্স দ্বীপ পর্যন্ত এই বোজক

অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে এই এক বৃহৎ ভূভাগ আন্দামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এখন যেখানে বঙ্গোপসাগর রহিয়াছে তাহা এই ভূভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, মালয় দ্বীপপুঞ্জ এক কালে বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা ও মালাক্কা লইয়া এশিয়া মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ও পশ্চিম দিকে সেলিবি, মোলাক্কাস (Moluccas), নিউগিনি ও সলোমন দ্বীপ লইয়া অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। পূর্বের অংশকে ইন্দো-মালয় ও পশ্চিমের অংশকে অস্ট্রোন-মালয় নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমগ্র অঞ্চলকে মালয়ান আর্ক (Malayan arc) নাম দেওয়া হয়। ইহা এশিয়ার আগ্নেয়গিরি-বলয়ের এক অংশ।

ভূতত্ত্ব-বিজ্ঞানের এই পুরাণ অবলম্বন করিয়া প্রোঁ অস্ট্রালয়েড জাতির কথা উঠিয়াছে, অস্ট্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর (Austrian family of languages) কথা উঠিয়াছে, আরও অনেক কথা উঠিয়াছে। যথাস্থানে সে সকল কথার উল্লেখ করা হইবে।

এইবার অস্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইনস্ এবং ইন্দোনেশিয়ার সেলিবি, নিউগিনি প্রভৃতি সম্পূর্ণ আদিবাসী উপজাতির অঞ্চল বাদ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই সকল অঞ্চলের বিস্তারিত পবিচয় দেওয়া যাঠিতে পারে। এই সকল অঞ্চলের মধ্যে পড়ে ইন্দোচীন, শাম বা থাই দেশ, ব্রহ্ম, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া। সিংহল ভারতবর্ষের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র, সুতরাং সিংহলের কথা কিছু বলা বাহুল্য।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পর্ক আছে, সেই অঞ্চলগুলির কথা বলিতে গিয়া প্রথমে যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। ভারতবর্ষের সঙ্গে স্থলপথে যে সকল অংশ সংযুক্ত তাহার মধ্যে একমাত্র শামেব দক্ষিণে প্রলম্বিত মালয় উপদ্বীপ ছাড়া আর কোথাও ইসলামধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শুধু ইন্দোচীনের একটি ধ্বংসপ্রায় উপজাতিব মধ্যে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলিত থাকিলেও ব্রহ্ম হইতে দক্ষিণ-চীন সাগরের উপকূলবর্তী আনাম ও তাহার উত্তরে টাংকিং পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে। ইন্দোনেশিয়াতে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু কিছু প্রচলন থাকিলেও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শুধু হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলের স্থাপত্য-শিল্পের বিষয়কব উন্নতির সাক্ষ্য বহন করিয়া বহু মন্দির চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম কেন এই ভাবে বিপর্যস্ত হইল, কেন ইসলামধর্ম বাধা পাইল না, তাহা এ পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় নাই বা নির্ণয় কবিবার চেষ্টা করা হয় নাই।

দ্বিতীয় যে জিনিষটি চোখে পড়ে তাহার কথা বলা হইতেছে। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় ভারতবর্ষীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দলে দলে ভারতবর্ষ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতীয় উপনিবেশিকগণের সংখ্যা পূর্ণ করিয়াছিলেন; আপনাদের ধর্ম, ধর্মশাস্ত্র, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান এই সকল উপনিবেশে প্রচাৰ কবিয়াছিলেন; বিস্তীর্ণ শক্তিশালী রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন কবিয়াছিলেন। সে সকল সাম্রাজ্য অনেক

দিন লুপ্ত হইলেও ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের প্রচাৰিত ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠানের অল্প পরিচয় ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় এখনও রহিয়াছে, নাই শুধু ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান অধিবাসীদের চেহারা ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের কোন ছাপ। কোন এক সময়ে, অল্পমান করা যায় হিন্দু আমলের শেষের দিকে, ভারতবর্ষ হইতে নতুন জনপ্রবাহ গিয়া ঔপনিবেশিকগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা বন্ধ হইয়াছিল। স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন ভারতীয়গণ আপনাদের রক্তের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই, অল্প রক্তের মিশ্রণে ভারতীয় রক্তের শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় যে জিনিষটি আকর্ষণ করে তাহা ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের মধ্যে সাদৃশ্য।

এই রাজনৈতিক ইতিহাস নাটকের মত বোমাঙ্ককর। নাটক আরম্ভ হইল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ায়—প্রাচ্য বাণিজ্যের দখল লইয়া।

প্রাচীন যুগে যেমন কার্থেজ মধ্যযুগে সেইরূপ ভেনিস কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, প্রাচ্যেব বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের শিল্পসম্ভার পশ্চিম জগতে বটন করিবার অধিকার হস্তগত করিয়া। কার্থেজের যে সমৃদ্ধি রোমের ঈর্ষা জাগাইয়া পিউনিক যুদ্ধের হৃদ্রপাত করে তাহার মূলে প্রাচ্য বাণিজ্য। ক্ষুদ্র সহর যে ভেনিসের খ্যাতি এখন রূপ-কথার মত শুনায় তাহার উন্নতির মূলে ছিল এই প্রাচ্য বাণিজ্য।

যুরোপ ও মিশরে তুর্ক জাতির অভ্যুদয় হইলে ভেনিসের বাণিজ্যপোত-বাহিনীর প্রাচ্য সমুদ্রে আসিবার পথ রুদ্ধ হইল। রূপকথার ঐশ্বৰ্যের খনি প্রাচ্য বাণিজ্য ভেনিসের হস্তচ্যুত হইল। ভেনিসের সমৃদ্ধির মূলে শেষ আঘাত হানিল পতু'গীজ জাতি উত্তরাংশা অন্তরীপের পথ আবিষ্কার করিয়া।

১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট দুইখানি পতু'গীজ জাহাজ আসিয়া কালিকটের কাছে ক্যানানোবে নোঙ্গর ফেলিল। এই জাহাজ দুইখানার নায়ক ছিলেন ভাস্কো ডা গামা। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য পতু'গালের রাজা ডন ম্যানোয়েল এই জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য তখন আবাব ব্যবসায়ীদের হাতে। আরব ব্যবসায়ীদের প্রাণপণ বিরোধিতা ও কালিকটের দ্রুদ্রষ্টিসম্পন্ন, বীর জামোরিণের আজীবন শত্রুতা সত্ত্বেও পতু'গীজবা যে ভাবে পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে, সিংহলে, বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলিতে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া চলিল সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

ক্ষুদ্র দেশ পতু'গালের লোকসংখ্যা তখন দশ লক্ষ মাত্র। এই ক্ষুদ্র দেশ ও ক্ষুদ্র জাতি নৌশক্তি ও ঐশ্বৰ্যে ১৬শ শতাব্দীতে যুরোপের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল প্রাচ্য বাণিজ্যের দৌলতে। ভাস্কো ডা গামা দেশে ফিরিলে সমগ্র যুরোপে হৈচৈ পড়িয়া গেল। যুরোপের প্রাচ্য বাণিজ্য-নীতির আমূল পরিবর্তন হইল। ক্ষুদ্র পতু'গালের ক্ষুদ্র রাজার নতুন উপাধি হইল "Lord of the Conquest, Navigation and Commerce of Ethiopia, Arabia, Persia and China."

তার পূর্ব স্পেন ও পতু'গালেব সম্মিলিত রাজ্যের রাজা হইলেন ২য় ফিলিপস। যুরোপে ফিলিপসের তখন দোদ'ও প্রতাপ, ইংরাজ ও ডাচ জাতি তাঁহাব ভয়ে সন্ত্রস্ত। শক্তিশালী ডাচ রাষ্ট্র দীর্ঘকাল

ফিলিপসের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়া এই তথ্য আবিষ্কার করিল যে, ফিলিপসের ঐশ্বৰ্যের ভাণ্ডার পতু'গালের প্রাচ্য বাণিজ্যে আঘাত না করিলে তাহাব স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। প্রাচ্য, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বাণিজ্য হইতে পতু'গাল যে সম্পদ আহরণ করিত তাহাব সবটুকু খবচ হইত ইংরাজ ও ডাচের সঙ্গে যুদ্ধে। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণেলিস হুটমানের নায়কত্বে চারখানা ডাচ জাহাজ প্রাচ্য সমুদ্রে রওনা হইল।

এক শত বৎসর প্রাচ্য বাণিজ্যে একাধিপত্য ভোগ করিবার পরে পতু'গীজের হাত হইতে প্রাচ্য বাণিজ্য ছিনিয়া লইল ডাচ জাতি। ১৭শ শতাব্দীতে ডাচ নৌশক্তি পৃথিবীতে অজেয় হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে পতু'গীজদের অবিকৃত রাজ্য ও বন্দর প্রায় সবগুলি তাহারা কাড়িয়া লইল। তাহারা ফরমোসা, মালাক্কা, সিংহলের জাফনিপতন অধিকার করিল, উত্তরাংশা অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করিল ও সমগ্র ইন্দোনেশিয়া কবলিত করিয়া বাটাভিয়া সহর প্রতিষ্ঠা করিল। তখন হইতে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ-অধিপত্য আরম্ভ হইল।

ডাচ জাতির সফলতায় প্রলুব্ধ হইয়া ইহার পর ইংরাজ প্রাচ্য সমুদ্র পাড়ি দিল। বাটাম, মোলাক্কাস, সুমাত্রা, শ্রাম, মালয় ও মসুলিপত্তনে তাহারা এজেন্সী খুলিল। কয়েক বৎসর পরে মুরাটে এজেন্সী স্থাপিত হইল। তখনকার দিনে ইংরাজ ডাচ জাতির অমুগ্রহে ব্যবসায় চালাইত, তাহাদেব প্রধান খাঁটি ছিল ইন্দোনেশিয়ায়। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার আখোয়ানায় কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটিল। ডাচবা যেখানে যে ইংরাজকে পাঠিল নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিল। ইন্দোনেশিয়া, শ্রাম, মালয়, জাপান হইতে ব্যবসায় গুটাইয়া ইংরাজ ভারত অভিমুখে রওনা হইল। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচের হাতে মাঝ পাঠিয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসিয়া ইংবাজের বরাত খুলিয়া গেল। ইতিমধ্যে ফরাসীরা প্রাচ্য সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়াছিল।

১৫শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পতু'গীজ, ডাচ, ইংরাজ ও ফরাসীর কামড়াকামড়ি চলিয়াছিল প্রাচ্যে বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তারের জন্য। ভারতবর্ষ ও সিংহল হইতে ব্রহ্ম, শ্রাম, মালয়, সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা, ইন্দোচীন, চীন, ফিলিপাইনস ও জাপান পর্যন্ত পূর্বে ও পশ্চিমে পারস্ত, আরব, আফ্রিকা পর্যন্ত এই জাতিগুলির কলহ ও দস্যুবৃত্তিব ক্ষেত্র হইয়াছিল। কলহ থামিলে দেখা গেল ভারতবর্ষে ইংরাজ, ইন্দোচীনে ফরাসী ও ইন্দোনেশিয়ায় ডাচরা সাম্রাজ্য কাঁদিয়া বসিয়াছে।

ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়া যুরোপের বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যলোভী দস্যু জাতিদিগের কবলিত হইবার পরে ব্রহ্ম তাহার স্বাধীনতা হারাইল, একমাত্র শ্রাম তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই নাটকের যেমন প্রথম অঙ্কে তেমনি শেষ অঙ্কেও বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। নির্ধাপিত প্রতাপ ইংরাজ ও ডাচ জাতি একই সময়ে ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, যদিও আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া জল বোলা করিবার সনাতন অভ্যাস তাহারা ত্যাগ করিতে পারে নাই। ইন্দোচীনে দেশসেবক এক আমেরিকার সাহায্য-পুষ্ট ফরাসী শৌবকদিগের লড়াই এখনও শেষ হয় নাই। ব্রিটিশ অধিকৃত মালয়েও লড়াই চলিতেছে।

[ ক্রমশঃ। ]

# কুমা যুনেব নরখাদক বাঘ

জিম করবেট অবলম্বনে

বিপ্যাত শিকারী জিম করবেট বলেন, যে কোন কারণেই হ'ক, স্বাভাবিক খাত্ত থেকে বঞ্চিত না হ'লে এবং দৈব দুর্ভাগ্য বশত: বাঘ না হ'লে বাঘ মানুষ মারে না বা মানুষ খায় না। করবেট সাহেব লিখেছেন, "A tiger is a large hearted gentleman with boundless courage and that when he is exterminated—as exterminated he will be unless public opinion rallies to his support—India will be the poorer by having lost the finest of her fauna."

করবেট সাহেব লিখেছেন, কুমায়ুনেব হু'টি নরখাদক বাঘ পাঁচশ' পঁচিশটি মানুষ মেরেছিল এবং এর প্রধান কাবণ ছিল, স্বাভাবিক খাত্তের অভাব এবং মহামারীতে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ও মৃতদেহগুলির উপযুক্ত সংকারের অভাব। কদম্রয়গের এক নরখাদক চিতার কবলে একশ' পঁচিশ জন হতভাগ্যের মৃত্যু হয়। করবেট সাহেব দু'বছর ধবে অমানুষিক চেষ্টার পর বাঘটিকে শিকার করেন। এই শিকারের আগে তিনি কুমায়ুনের জঙ্গলে বাঘ শিকার করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পূর্বেই বলা হ'য়েছে, কুমায়ুনের হু'টি নরখাদক বাঘ পাঁচশ' পঁচিশটি মানুষের জীবন নষ্ট করেছিল। করবেট সাহেব এই বাঘ দুটি শিকার ক'রে কুমায়ুনেব অধিবাসীদের জীবন রক্ষা করেন। সেই কাতিনীই এখানে আলোচিত হবে। চম্পাবন্তের নরখাদক বাঘটি নেপালে হুশ' লোকের প্রাণনাশ করে। তখন নেপালীরা দল বেঁধে বাঘটাব পেছনে লাগে এবং সে নেপাল ত্যাগ করে এসে কুমায়ুনের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। কুমায়ুনে এসে সে নিশ্চেষ্ট থাকে না, আরও মাত্র হুশ' চৌত্রিশ জনকে ভবব্রত্যা থেকে মুক্তি দেয়। তখন মিঃ বার্থাউড নৈনিতালের ডেপুটী কমিশনার; করবেট সাহেব নৈনিতালে গেলে মিঃ বার্থাউড তাঁকে খবর দেন, বাঘটি মারার জন্ত। এর আগে বাঘটাকে মারার জন্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং সৈন্ত ও বিশেষ শিকারী দল প্রেরিত হয়েছিল—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত: কোন লাভ হয়নি। করবেট সাহেব মিঃ বার্থাউডকে জানানেন যে, তিনি রাজী আছেন হুটি সন্তে। প্রথমত: পুরস্কার ঘোষণা বাতিল ক'রতে হবে এবং দ্বিতীয়ত: বিশেষ শিকারী দল ও সৈন্তদল প্রত্যাহার করতে হবে। মিঃ বার্থাউড সন্ত মেনে নিলেন এবং তার কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল, দবিধুরা ও ধনাঘাটের মধ্যবর্তী পালিগ্রামে জটনকা স্ত্রীলোক নিহত হয়েছে। স্ত্রীলোকটি নিহত হবার পাঁচ দিন পরে করবেট সাহেব পালিগ্রামে উপস্থিত হলেন।

গ্রামটির অধিবাসী ব'লতে জন পঞ্চাশেক পুরুষ, নারী ও শিশু। তারা দম্বরমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে এবং বেশ একটু বেলা থাকতেই দরজায় খিল এঁটেছে। করবেট সাহেব গ্রামে পৌঁছলে তাঁর লোক জন মিলে একটা অগ্নিকুণ্ড করলে তিনি তার ধারে ব'সে চা খেতে লাগলেন। তখন এদিকে-ওদিকে দুটি-একটি দরজা অতি সন্তর্পণে খুলে হু'-এক জনকে বাইরে আসতে দেখা গেল। বাড়ীগুলির অবস্থা দেখে বোঝা গেল, গত পাঁচ দিন ধরে কেউ

বাড়ী থেকে বেরোয়নি। বাঘের মুখে জীবন দেওয়ার চেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে, সেও ভাল। বাঘটা যে তখনও কাছাকাছি রয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া গেল। প্রতি দিন রাতেই অতি নিকটে তার গজ্জন শোনা যায় এবং দিনেও সাহস করে বেরোলে তার দর্শন মেলা বিচিত্র নয়। গ্রামের মোড়ল শিকারীর জন্ত একখানা ঘর ঠিক করে দিলে, কিন্তু ঘরটি ছোট ব'লে করবেট সাহেব ঘরের বাইরে রাত কাটাতে মনস্থ করলেন। তাঁর লোক-জন ঘবে রইল আর তিনি বাইরে রাস্তার ধাৰে একটা গাছের তলায় বনুক হাতে ক'রে বাঘের অপেক্ষায় বসে রইলেন। তাঁদের আলো থাকলেও আশে-পাশের অন্ধকার ছিল খুব গাঢ় এবং যখন বাতাসে গাছের ডাল-পালাগুলি আন্দোলিত হ'চ্ছিল, তখন তাদের ছায়াগুলি দেখে মনে হ'চ্ছিল যেন দশ-বাবটা বাঘ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এই বাস্তাটী দিয়ে বাঘটা প্রত্যাহ যাতায়াত করতো, কিন্তু এদিন তার আর কোনো পাতা পাওয়া গেল না। ভোরের দিকে মিঃ করবেট গাছতলায় ব'সে ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোর বেলা তাঁর লোক-জন এসে তাঁকে জাগায়।

পাঁচ দিন আগে গ্রামের যে স্ত্রীলোকটিকে যেখানে মারা হয়েছিল সেখানে গ্রামের কেউ যেতে চায় না, কেবল দূর থেকে দিক নির্দেশ করে দেয়। ঘটনার দিন জন কুড়িক স্ত্রীলোক ও বালিকা আধ মাইল দূবে গুরু-বাছুরের জন্ত গাছের পাতা কেটে আনতে গিয়েছিল। একটি মেয়ে পাতা কেটে গাছ থেকে নামার সময় বাঘটা নীচে থেকে তাব পা কামড়ে ধরে। তখন মেয়েটি গাছ থেকে প'ড়ে যায়, আর বাঘটা তাকে মুখে কবে তুলে নিয়ে চলে যায়। "ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন" নামক সবার ছবিতে এই ঘটনাটি দেখান হয়েছে। অজ্ঞাত সকল রমণীর চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে। বাঘটা চলে গেলে তাবা উদ্ধ্বাসে কোন রকমে গ্রামে ফিরে আসে। তখন ঠিক দুপুর। বাড়ীর পুরুষেরা বাড়ীতে ভাত খেতে এসেছিল। ঘটনা শুনে তারা লাঠি-সোটা, ঢোল প্রভৃতি নিয়ে ঘটনা-স্থলে যাত্রা করল। যেখানে মেয়েটিকে মারা হয়েছিল, সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা কি করবে ভাবছে, এমন সময় ত্রিশ গজ দূর থেকে বাঘটা একবার গজ্জন করে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বীরপুরুষেরা যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। গ্রামে ফিরে এসে সবাই পরস্পর পরস্পরকে দোষ দিতে লাগলো। সকলেই বলে, 'ও যদি ছুটে না পালাতো তাহলে আমি কিছূতেই ছুটতাম না।' শেষে বুদ্ধিমানেরা বললেন যে, তাই যদি সত্য হয়, সকলেরই যদি সাহস থাকে, তাহলে আবার ঘটনা-স্থলে যাওয়া যাক। এই ভাবে তিন তিন বার যাওয়া এবং আসা হল। শেষ বার এক জন বন্দুকের আগুয়াজ করতে বাঘটার ঘন ঘন গজ্জন শোনা যেতে লাগল, তার পর আর কেউ ওদিক মাড়াতো সাহস করল না। বন্দুকধারীকে যখন জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, সে বনের মধ্যে গুলী না করে শূন্যে গুলী ছুঁড়ল কেন, তখন সে বললে—বাঘটা একেই রেগেছিল, তার উপর গায়ে গুলী লাগলে আরও রেগে গিয়ে নিশ্চয়ই তাব ভবলীলা সাজ করতো। সাহসী বীর বটে!

সারা সকালটা করবেট সাহেব গ্রামে চার দিক ঘুরে দেখলেন,

কিন্তু বাঘের পদচিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না। একটা বানাম গাছের তলায় তিনি প্রান্তরাশ সেরে নিলেন; এমন সময় গ্রামের মোড়ল এসে তাকে বললে যে, মাঠ থেকে গম কাটা হবে, তিনি যদি পাহারা দেন তাহলে নির্বিঘ্নে কাজটি সমাধা হতে পারে, নইলে কখন যে সাক্ষ্যে মুহূদূতের সম্মুখীন হ'তে হবে, তা কেউ বলতে পারে না। সাহেব রাজী হলে গম কাটা শুরু হল এবং সাহেব বন্দুক কাঁধে ক'রে পাহারা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার মধ্যে পাঁচটা ক্ষেতের গম কাটা হয়ে গেল। সাহেবের উপস্থিতিতে গ্রামের অধিবাসীরা সাহস ফিরে পেল এবং কতকটা স্বচ্ছন্দ ভাবে চলাফেরা আরম্ভ করল। কিন্তু তারা কিছুতেই তাঁকে বাঘের আশ্তানার কাছে নিয়ে যাবে না। শেষে সাহেব তিনটি পাহাড়ে-ছাগল অব্যর্থ লক্ষ্যে শিকার করার তাদের আস্থা জন্মে এবং তারা সাহেবকে যেখানে শেষ রমণীটি নিহত হয়েছিল, সেইখানে নিয়ে যেতে রাজী হয়। তখনো পর্য্যন্ত সেই জ্বীলোকটির সন্ধান হয়নি। কারণ তার শরীরের কোন অংশই সংগ্রহ করা যায়নি। এখন সেই জ্বীলোকটির আত্মীয়রা অমরোধ জানালেন, যদি বৃত্তদেহের কোন অংশ এমন কি অস্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তবে যেন নিয়ে আসা হয় শেষকৃত্য সমাপনের জন্ত।

ঘটনা-স্থলে গিয়ে দেখা গেল, যেখানে হতভাগ্য রমণীর প্রাণবায়ু বার হয়েছিল সেই জায়গাটিতে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন রয়েছে এবং খানিকটা রক্ত পড়ে জমে আছে। জীবনের মায়ার সে গাছের যে ডালটি আঁকড়ে ধরেছিল, সেই ডালে তার হাতের চামড়া খানিকটা ছিঁড়ে গিয়ে আটকে ছিল। শুষ্ক রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ ক'রে একটি ঝোপের মধ্যে গিয়ে জ্বীলোকটির কাপড় এবং কয়েক খণ্ড হাড় পাওয়া গেল। বাঘটা তার শরীরের কোন অংশ বাকী রাখেনি। সেই অস্থি কয়খানি কাপড়ে জড়িয়ে এনে তার আত্মীয়দের দেওয়া হ'ল।

পালিগ্রামের কাছে আর একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটেছিল! গ্রামের পাশে সরকারী রাস্তার ওপরে কয়েক একর জমি নিয়ে এক ব্যক্তি বাস করত। লোকটির স্ত্রী ও তার দিদি এক দিন পাহাড়ের উপর ঘাস কাটতে গিয়েছিল। এমন সময় বাঘটি হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হয়ে বড় বোনটিকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোন ভাই দেখে কান্ডে হাতে করে বাঘের পেছনে ছুটেতে থাকে। সে চাঁৎকার করে বলতে থাকে, 'দিদিকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে বাও।' এই অবিখ্যাত দৃশ্যটি গ্রামের অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ করেছিল। কয়েক শত গজ অগ্রসর হওয়ার পর বাঘটা তার শিকার নামিয়ে রেখে ফিরে ঝাঁড়ায় এবং গজ্জন ক'রে পশ্চাচ্ছাবনকারিণীর দিকে এক লাফ দেয়। তখন সেই বীর রমণী ছুটেতে ছুটেতে কোন রকমে গ্রামে এসে হাজির হয়। গ্রামের লোক-জন বাঘটার অনুসন্ধান গিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে এসে দেখে হতভাগ্য রমণীটি তার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

করবেট সাহেব বললেন যে, যে বাঘটা তার দিদিকে হত্যা করেছে, তিনি তাকে মাঝবার জন্ত এসেছেন, তখন সেই রমণী হাত ছুটি বৃক্ষ ক'রে সাহেবের পাদস্পর্শ করল।

মিঃ করবেট বাঘ মারবার সঙ্কল্প জানালেন বটে, কিন্তু বাঘের সন্ধান যে কোথায় পাওয়া যাবে, তা বলতে পারা বড়ই কঠিন। কয়েক শত বর্গ-মাইল ধ'রে এর বিচরণ-ক্ষেত্র এবং বাঘটার বিশেষত্ব

এই যে, একবার সে যেখানে শিকার ধরে, সেখানে আর দ্বিতীয় বার প্রত্যাবর্তন করে না। করবেট সাহেব লিখেছেন, এ যেন সেই ছোটো খড়ের গাদার মধ্য থেকে একটি সূচ বের করা।

তিনি তিন দিন ধরে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে বাঘের সম্ভাব্য অবস্থান-ক্ষেত্রগুলি চুঁড়ে বেড়ালেন, কিন্তু কোথাও মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়া গেল না। তখন তিনি পালি-গ্রামের পনের মাইল পূর্বে চম্পাবতে ফিরে যাবার মনস্থ করলেন। প্রভুত্ব যাত্রা করে সূর্য্যাস্তের মধ্যে তিনি চম্পাবতে পৌঁছলেন। তাঁর দলে প্রথমে আট জন ছিল, পরে পথিমধ্যে আরও বাইশ জন এসে যোগ দেয়। এই অঞ্চলের পথ-ঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। সেজন্ত সকলে দল বেঁধে চলাফেরা করতো। পথিমধ্যে যারা করবেট সাহেবের দলের সঙ্গে মিলিত হয়, তারা দু'মাস আগে একবার চম্পাবতে এসেছিল। তাদের মুখে এক করুণ কাহিনী শোনা গেল।

দু'মাস আগে কুড়ি জন লোকের একটি দল চম্পাবতের বাজারে যাচ্ছিল। বেলা ঠিক দুপুরের সময় তারা এক নারীর করুণ আর্তনাদ শুনতে পায়। কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখে, একটি বাঘ এক উল্লম্ব নারীকে মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর জ্বীলোকটি অসহায় ভাবে করুণ আর্তনাদ করছে। দেখতে দেখতে বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকগুলির পক্ষাণ গজ দূর দিয়ে বাঘটা চলে গেল, আর হতভাগ্য জ্বীলোকটি কাতর স্বরে "রক্ষা করো" রক্ষা করো" বলে চাঁৎকার করা সম্বন্ধে এই কুড়িটি বীরপুরুষের এমন সাহস হল না যে, তার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণ পরে জ্বীলোকটির গ্রামের লোক-জন (প্রায় ৬০ জন) মাইল খানেক দূরে এক উপত্যকার ধারে বৃত্তদেহ আবিষ্কার করে। বাঘটা জ্বীলোকটির শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে খেয়ে নিয়েছিল, আর কিছু করেনি।

চম্পাবতের তহশীলদারের কথা মত মিঃ করবেট কয়েক মাইল দূরে এক ডাক-বাংলোর যাবার স্থির করলেন। সেই অঞ্চলে না কি বহু লোক নিহত হয়েছিল, সেখানে পৌঁছবা মাত্র দু'জন লোক এসে খবর দিলে যে, দশ মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে বাঘের আক্রমণে একটি গরু নিহত হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে করবেট সাহেব বুঝতে পারলেন যে, আক্রমণকারী একটা চিতা বাঘ, তিনি যে নরখাদকের সন্ধান করছেন, সে নয়। চিতার পেছনে ছুটে তিনি সময় নষ্ট করতে চাইলেন না, বাংলোর ফিরে এলেন।

বাংলোটা ছিল ঠিক পাহাড়ের উপর। পরদিন পাহাড়ের অদূরবর্তী গ্রাম থেকে এক জন এসে খবর দিলে, বাঘে আবার একটি তরুণীকে নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিকারী তাঁর রাইফেল নিয়ে তার সঙ্গে সেই গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখলেন, বিভিন্ন বয়সের নরনারী ও শিশুর দল জটলা করছে। সাহেবকে দেখে সবাই একসঙ্গে ঘটনা জানাতে চায়। সাহেব তখন এক জনকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে আসল ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। লোকটি এক ফালং দূরবর্তী কয়েকটি ওক গাছের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললে, জন বারো স্ত্রী-পুরুষ ওই গাছের তলায় শুকনো কাঠ কুড়াতে গিয়েছিল, এমন সময় একটা বাঘ অতর্কিতে সেখানে হানা দেয় এবং বোল-সতের বছর বয়সের এক তরুণীকে আক্রমণ করে। তখন অবশিষ্ট লোকেরা গ্রামে ফিরে আসে এবং

সাহেবকে খবর দিতে লোক পাঠার। মেয়েটিকে আক্রমণ করার পর যে কি হল, সে দিকে আর কেউ দৃষ্টি করেনি।

মিঃ করবেট তখন তাদের গোলমাল করতে নিষেধ ক'রে সেই ওক গাছগুলির দিকে অগ্রসর হ'লেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, যেখানে বালিকাটি আক্রান্ত হয়েছিল, সেখানে খানিকটা রক্ত পড়ে রয়েছে আর সেখান থেকে রক্তের দাগ পাহাড়ের দিকে চ'লে গিয়েছে। সেই দাগ ধ'রে অগ্রসর হ'য়ে মেয়েটির শাড়ীখানা পাওয়া গেল এবং আরও কিছু দূরে পাওয়া গেল তার সায়। এবার সে একটি নয় তরুণীকে নিয়ে যায়, কিন্তু এবার তরুণী আর জীবিত ছিল না। সাহেব বাঘটার অনুসরণ করে চলেছেন, তখন পেছনে শব্দ পেয়ে সাহেব ফিরে দাঁড়ালেন, দেখলেন—একটা লোক রাইফেল হাতে তাঁর দিকে আসছে। তিনি কাকেও আসতে বারণ করা সঙ্গেও সে কেন এল, জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, তহশীলদার তাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস তার হয়নি। কি আর করা বাবে! সাহেব তাকে ভারি রুট জুতো খুলে ফেলতে বললেন। রবার সোলের জুতো না থাকলে বাঘের অনুসরণ বুঝা এবং বিপজ্জনক। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর সাহেবের সাহায্যকারী আর যেতে চায় না। কেবলই সাহেবের হাত টেনে ধ'রে বলতে থাকে, চার দিক থেকেই বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, আর এগিয়ে কাজ নেই। পাহাড় থেকে আর্দ্র পথ নামার পর প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়া পাওয়া গেল। লোকটিকে তার উপর অপেক্ষা ক'রতে ব'লে সাহেব সেই পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আরও অগ্রসর হ'লেন। কিছুক্ষণ পরে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। রক্তের দাগ জলের ধার পর্যন্ত গিয়েছে। বাঘটা বোধ হয় সেখানে আহািরে মন দিয়েছিল, কিন্তু শিকারীর আগমনের শব্দ পেয়ে সে আর সেখানে থাকতে সাহস করেনি। জলের ধারে রয়েছে খানিকটা রক্ত এবং বাঘের খাবার দাগ। আর একটি স্থল্লর পদার্থ সেখানে পড়ে ছিল, সেটি হ'চ্ছে সেই তরুণীর একখানি কোমল পা। হাঁটুর কিছু উপর থেকে পা'টিকে যেন কোন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। পা দিয়ে তখনো রক্ত ঝরে পড়ছে। পাখানির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় শিকারীর বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। জলাশয়ের পাড় প্রায় পনের ফুট উঁচু। তার উপর থেকে বাঘটা শিকারীর উপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল। শিকারী তা দেখতে পাননি, কিন্তু তিনি বন্দুকের নলটি উঁচু দিকে করে ট্রিগারের উপর আঙ্গুল দিয়েছিলেন, তাই দেখে বাঘটা সরে যায়। এটা অনেকটা intuition বলেই আকস্মিক ভাবে ঘটে গিয়েছিল। নইলে এই শিকার-কাহিনী আর কাউকে শুনতে হ'ত না। বাঘটা যখন চ'লে যায়, তখন খানিকটা মাটি খসে পুকুরের জলে এসে পড়ে, শিকারী কেবল সেইটাই লক্ষ্য ক'রে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।

আবার অনুসরণ শুরু হ'ল। বাঘটা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠল। এটা তার ৪৩৬তম মানুষ শিকার। এর আগে অনেক বার সে আহািরের সময় উদ্ধারকারী দলের অনুসরণে বাধা পেয়েছে, কিন্তু এবারের ভায়া এত দূর পর্যন্ত এসে কেউ তার পেছনে লাগেনি। কাজেই সে এবার গর্জন করে প্রতিবাদ জানাল। গর্জন শুনে শিকারীর ভয়ও হ'ল, আশাও হ'ল।

ভয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু আশা এই যে, বাঘটা যদি আক্রমণ করে, তা হলে তাকে শিকার করা সম্ভব হবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু বাঘটা কেবল ভয় দেখাতেই চেয়েছিল। কারণ গর্জন করার পরও যখন সে দেখলে যে, সাহেব নাছোড়বান্দা, তখন সে গর্জন ত্যাগ করলে।

করবেট সাহেব একাদিক্রমে চার ঘণ্টা বাঘটার অনুসরণ করে এসেছেন। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বুললেন, এখন না ফিরলে সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফেরা বাবে না। পাহাড়ের উপর তিনি তাঁর যে সাহায্যকারীকে রেখে গিয়েছিলেন সে ভাবছিল, সাহেব এতক্ষণ বাঘের পেটে। কিন্তু এখন সাহেবকে ফিরতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

পরদিন বন পিটিয়ে বাঘ শিকারের আয়োজন হল। তহশীলদার জানিয়ে দিলেন, লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলেও কাউকে কিছু বলা হবে না। বাঘটা স্থানীয় অধিবাসীদের মনে যে বিতর্ষিকা জাগিয়ে তুলেছিল, তাতে জঙ্গল ঠেঙ্গাবার জন্য লোক জোগাড় করা শক্ত ছিল। কিন্তু দুপুরের মধ্যে দুশ' অটোনবুই জন লোক নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হ'ল।

যথাসময়ে অভিযান আরম্ভ হ'ল। বনের ভেতর থেকে বাঘটার যে খাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা ছিল, শিকারী তার মুখে রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। এ দিকে জঙ্গল ঠেঙ্গান শুরু হল। ভীষণ চীৎকার, ঢাক-ঢোলের শব্দ এবং বন্দুকের আওয়াজে বাঘটা বেরিয়ে এল, কিন্তু গুলী করার আগেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'ল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাড়া খেয়ে আবার বেরিয়ে আসতেই সাহেব পর পর দুটো গুলী চালালেন। এর আগেই একটা গুলী ছোঁড়া হ'য়েছিল। সাহেবের কাছে মোট তিনটে গুলী ছিল। শেষের গুলী দুটো বাঘের গায়ে বিদ্ধ হলেও সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু ঘুরে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকলো। সাহেব তখন তহশীলদারের বন্দুকটা নিয়ে একটু অগ্রসর হতেই বাঘটা বেরিয়ে এসে মাথার উপর একটা পাথরের উপর থা ক'রে দাঁড়াল। মনে হ'ল, এইবার শিকারীর উপর লাফিয়ে পড়বে। সাহেব সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলী ছুঁড়লেন। আগের গুলীতেই বাঘটা ঘায়েল হ'য়েছিল। এবার সে ধরাশায়ী হ'ল। বাঘটার মুখের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার উপরের ও নীচের দুটো কুকুরে দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। দাঁতের দোষের জন্য স্বাভাবিক ভাবে জীব-জন্তু শিকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে এবং তার পর থেকেই সে মানুষ খেতে আরম্ভ করে।

গ্রামবাসীদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাদের পরম শত্রু নিপাত হ'য়েছে। এইবার তারা নির্ভয়ে চলাফেরা ও কাজ-কর্ম করতে পারবে। সাহেবের সম্মানার্থে এক ভোজের আয়োজন হল। নৈনিতালে ফিরে যাবার পথে পালিগ্রামের পাশে যে জ্রীলোকটি বাঘ কর্তৃক তার বোন নিহত হবার পর বোবা হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে সাহেব দেখা ক'রে বাঘের চামড়া দেখিয়ে জানানলেন যে, তার বোনের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হ'য়েছে। সাহেবের কথা শুনে জ্রীলোকটি পিছন ফিরে ছুটতে লাগল আর তার স্বামী ও অসন্তান লোক-জনদের ডাকতে লাগল, সাহেব কি এনেছে দেখবার জন্য। কি অসম্ভব

ব্যাপার! জীলোকটি আকস্মিক ভাবেই তার বাকুশক্তি ফিরে পেল, যেমন ভাবে সে সেই শক্তি হারিয়েছিল।

এর পর মিঃ করবেট কুমায়ুনে আরও কয়েকটি নরখাদক বাঘ শিকার করেন। তার মধ্যে চৌগড়ের নরখাদক বাঘটি ত পাঁচ বছরে বিভিন্ন গ্রামের ৬৪ জনের প্রাণনাশ করেছিল। পূর্ব-কুমায়ুনের—উত্তর থেকে দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল, পূর্ব থেকে পশ্চিমে তিরিশ মাইল—মোট দেড় হাজার বর্গ-মাইল অঞ্চলে এই বাঘটা তার সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। শীতকালে এই অঞ্চলটি তুষারে ঢেকে যায়, আর গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যের তাপে উপত্যকাগুলি ঝলসে যায়। এই অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামগুলি বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবার কোন বড় রাস্তা নেই। সরু সরু পথগুলি ঘন জঙ্গল ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে। বাঘের উপদ্রবে যখন এই পথ দিয়ে চলা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, তখন আর যাতায়াত চলে না। তখন একটা উঁচু জায়গা থেকে কোন লোক চীৎকার করে পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোক-জনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সংবাদ আদান-প্রদান চলে।

খবর নিয়ে জানা গেল, কালাআগার পাহাড়ের উত্তর ও পূর্ব দিকের গ্রামগুলিতে বাঘটার উৎপাত বেশী। কালাআগার পর্বতশ্রেণীটি দৈর্ঘ্যে চল্লিশ মাইল এবং উচ্চে ৮৫০০ ফুট এবং শীর্ষদেশ ঘন জঙ্গলে ভরা। এই পাহাড়ের উত্তর মুখ বরাবর একটা পথ কয়েক মাইল পর্যন্ত চলে গেছে। পথটা ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কখনও বা বনের প্রান্তভাগ দিয়ে অগ্রসর হ'য়েছে। এই পথেবই একটা বাকি কালাআগার ফরেষ্ট বাংলা। শিকারী জিম করবেট চার দিন হেঁটে এপ্রিলের সন্ধ্যায় এই বাংলায় পৌঁছলেন। এই অঞ্চলে বাঘটার শেষ শিকার হ'য়েছিল এক বাইশ বছর বয়সের যুবক। কালাআগার বাংলায় পৌঁছবার পরদিন সকালে যুবকটির ঠাকুমা করবেট সাহেবের কাছে এসে তার একমাত্র নাতি এবং জগতে এক মাত্র আত্মীয়ের মৃত্যুকাহিনী বর্ণনা করে জানালে যে, সাহেব যদি বাঘ শিকারের জন্য টোপ হিসাবে তার তিনটি দুখোলা মোষ নেন, তাহলে সে অন্ততঃ এইটুকু তৃপ্তি পাবে—পৌত্রের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে সে সাহায্য ক'রতে পেরেছে। এত বড় বড় মোষ সাহেবের কোন কাজে লাগবে না, কিন্তু তিনি বুঝাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না—তিনি বললেন, নৈনিতাল থেকে তিনি যে চারটে বাছা মোষ এনেছেন, তাদের ব্যবহারের পর তিনি বুঝার মোষগুলি নেবেন। নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ থেকে আগত মোড়লদের কাছ থেকে জানা গেল, দশ দিন আগে বাঘটাকে কুড়ি মাইল দূরবর্তী একটা গ্রামে শেখবার দেগা গেছে। এই গ্রামটি কালাআগার পাহাড়ের পূর্ব দিকের ঢালু অংশে অবস্থিত। এখানে বাঘটা এক দম্পতীকে মেরে ভোজ লাগিয়েছিল।

পরদিন সকালে জিম করবেট কালাআগার বাংলা থেকে সেই বন্ধ পথ দিয়ে যাত্রা ক'রলেন। পাহাড়ের প্রান্ত থেকে দু' মাইল দূরবর্তী ডালকানিয়া গ্রামে যেতে হবে, কারণ সেইখানেই না কি বাঘের আড্ডা। কিন্তু পথে কয়েক জন লোক এসে খবর দিলে যে, এই দিন সকালে ডালকানিয়ার দশ মাইল উত্তরে

এক গ্রামে বাঘটা এক দল জীলোককে ফসল কাটার সময় আক্রমণ ক'রেছে। সাহেবের তাঁবুবাহী লোক-জন আট মাইল হেঁটে আসার পর আরও দশ মাইল যেতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সাহেব তাদের ডালকানিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে একাই যাবার স্থির করলেন। পথটা অত্যন্ত খারাপ এবং ঘন জঙ্গলে ভরা, তার উপর যে কোন সময় নরখাদক ব্যাজ্র-পুঞ্জবের আবির্ভাব হ'তে পারে। কাজেই খুব ধীর গতিতে অগ্রসর হ'তে হ'ল। ফলে নির্দিষ্ট গ্রামে পৌঁছতে যখন আরও কয়েক মাইল বাকী, তখন সূর্যাস্তের পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেন। সাহেব একটা ওক গাছে উঠে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করলেন। কয়েক ঘণ্টা ঘুমের পর গাছের তলায় কয়েকটা জানোয়ারের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সাহেব বুঝতে পারলেন, কয়েকটা ভালুক 'করফল' গাছে উঠছে। এই গাছে এক রকম জামের মত ফল হয়, ভালুকের খুব প্রিয় খাদ্য। ভালুক যখন খায়, তখন বড় গোলমাল করে, কাজেই আর ঘুমান সম্ভব হ'ল না।

সকালে তিনি গ্রামে গিয়ে দেখলেন, পাঁচ একর জায়গায় দুখানি কুটার ও একটি গোয়াল—এই হল গ্রাম আর তার চার দিক জঙ্গলে ঘেরা। তিন জন জীলোক যখন ফসল কাটছিল, তখন বাঘটা আসে, কিন্তু আক্রমণের আগেই তাকে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল বলে তার উদ্বেগ সফল হয়নি। সে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় এবং সেখানে আর একটা বাঘ তার সঙ্গে যোগ দেয়। পরে বাঘ দুটো পাহাড়ের গা বেয়ে উপত্যকায় নেমে যায়। সারা রাত দুই কুটারের অধিবাসীরা জেগে কাটায় এবং বাঘের গর্জন শুনতে থাকে। শিকার না ধরতে পেরেই বোধ হয় বাঘটা আক্রোশে গর্জন করেছিল। সাহেব আসার কিছুক্ষণ আগেও না কি তাব ডাক শোনা গিয়েছিল। সাহেব আগে থেকেই জানতেন যে, বাঘটার সঙ্গে একটা বড় বাছা বাঘ আছে।

গ্রামের লোকবা খুব অতিথিপবায়ণ। সাহেব সারা রাত জঙ্গলে কাটিয়েছে জেনে তারা সাহেবের খাবারের আয়োজন করতে চাইল। কিন্তু তারা অত্যন্ত গরীব ব'লে সাহেব রাজী হলেন না। তিনি কেবল একটু চা চাইলেন, কিন্তু চা না থাকায় তাঁকে দুধ দেওয়া হ'ল। গ্রামবাসীদের অতুরোধে শিকারী বাকী ফসল কাটার সময়টা পাহারায় রইলেন এবং দুপুরের সময় যে উপত্যকা থেকে বাঘের গর্জন শোনা গিয়েছিল, সেই দিকে যাত্রা করলেন।

একটা রাত সাহেব গাছেই কাটিয়ে দিলেন। পরদিন খবর পাওয়া গেল, বাঘে একটা গরু মেরেছে। ঘটনা-স্থলে যাবার পথেই অপ্রত্যাশিত ভাবে বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা খাঁড়ের মধ্যে বাঘ দুটো তখন আহায়ে মন দিয়েছে। সাহেব একটা ভাল জায়গা বেছে নিলেন। কিন্তু যত্নশীল হল, কোনটা ধাড়ী আর কোনটা বাছা। ধাড়ীটিকেই আগে মারার দরকার, কারণ বাছাটা এখনো তত ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেনি। গায়ে বং একটার গাট হলদে আর একটার ফিকে। তিনি ঠিক ক'রলেন, বয়স বেশী হওয়ার দরুন গাট বং ফিকে-হয়ে গিয়েছে। স্তরতঃ বার বং ফিকে সেই ধাড়ী। তিনি সেইটাকেই গুলী করলেন, অপরটা চম্পট দিল। এক বছর পরে জিম করবেট এই বাঘটাকে শিকার করতে সমর্থ হন।

অনুবাদক—হরকিশ্বর ভট্টাচার্য

# পল্লী সাহিত্যে পূর্ববাণ

শ্রীকামিনীকুমার রায়

আমাদের বৈষ্ণব পদাবলী বঙ্গসাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের পূর্ববাণের যে বর্ণনা আছে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই তাহার সহিত অল্প-বিস্তর পরিচিত। মানবীয় ভাব ও ভাষা লইয়া তাহা রচিত হইলেও উহার মূলে রহিয়াছে একটা আধ্যাত্মিক উপাদান, অতি মানবীয় প্রেরণা। কিন্তু পল্লীকবিদের পূর্ববাণের চিত্রগুলিতে সে অতীন্দ্রিয় জগতের কোনও আভাস নাই, যাহা আছে তাহা সাধারণ মানুষের অমুরাগ-রঞ্জিত হৃদয়ের ভাষায় তাহাদের হৃদয়েরই অভিযুক্তি। অনেক পল্লীগাথায়ই দেখা যায়, নায়ক-নায়িকারা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া বিবাহের বহু পূর্বেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তিলে-তিলে তাঁহাদের অমুরাগ গাঢ় হইয়াছে এবং সমাজের বিধান বা মাতা-পিতার মতের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহারা পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াছেন। কখন যে কি অবস্থায় কিসেব প্রেরণায় নব-নারী একে অন্বেষণে প্রতী আকৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে পূর্ববাণের উল্লেখ হয়, তাহার কোন সূত্র নির্দেশ করা যায় না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্বদাই ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপায়িত প্রেরণায় পূর্ববাণের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তাহা গভীর অমুরাগে পরিণত হয়। চারি চক্ষুর মিলনের পর হইতে পূর্ববাণ নব-নারীর চিত্তে একটা ব্যাকুলতা জাগাইয়া তোলে, পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাইতে চায়, মিলিত হইবার জন্ত তাহাদের চিন্তা, চেষ্টা ও আগ্রহের অবধি থাকে না। কিন্তু তাহাদের দীপ্ত মিলন প্রায়ই সহজে ঘটিয়া উঠে না, নানা দিক হইতে বাধা আসে। পিতা-মাতা বাধা দেন, অবস্থার অসমতা বাধা দেয়। এইরূপে নানা বাধার সম্মুখীন হইয়া অপ্রাপ্তির অসীম বেদনায় অমুরাগী চিত্ত আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে, গোপন অভিযানের পালা চলে; কিন্তু তাহাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তি কোথায়? লজ্জা ভয় মান ত্যাগ করিয়া, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া কয় জন আর ঘরের বাহির হইতে পারে? এই যে না-পাওয়ার ব্যাকুলতা, এই যে মিলনাকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি, এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইহা চিরকালের মানব-হৃদয়ের।

কবে কোন যুগে বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে বাজিয়াছিল বাঁশী, সেই বাঁশী আজও বাজিতে শুনি বাংলার গোষ্ঠে-মাঠে, নদীকূলে। সে বাঁশীর স্বরে রাধার সব কিছু এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল, তিনি 'বড়ায়ি'কে বলিয়াছিলেন—

“কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।  
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোষ্ঠে গোকূলে।  
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।  
বাঁশীর শব্দে মো আউলাইলোঁ রাক্ষন।  
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জন।  
দাসী হজাঁ তার পাএ নিশির্বো আপনা।”

বাঁহার বাঁশীর স্বরে আমার এই অবস্থা, জানি না সেই কলীধারী কেমন? আমার সাথ হইতেছে তাঁহার পদে নিজকে দাসীরূপে একেবারে সমর্পণ করিয়া দিই।

বাংলার এক পল্লীবালাকেও বাঁশীর স্বরে ঠিক এইরূপই ব্যাকুল দেখিতে পাই। বলরামের কথা সাজুতী রোজ নদীর ঘাটে জল আনিতে যায়, বাঁশীর শব্দ শুনে, আনমনা হইয়া যায়, শুক হইয়া ঝাঁড়াইয়া থাকে, কে বাঁশী বাজায় বুঝিতে পারে না। জল থাকিলেও জল ফেলিয়া ঘাটে যায়। দূরে বাজে বাঁশী। কি আকর্ষণ সে বাঁশীর!

“ভরা না কলসীর জল জমিনে ঢালিয়া।  
জলের ঘাটে যায় কলসী লইয়া।

সোতেতে ভাসায়ে কলসী শুনে বাঁশীর গান।  
বাঁশীর সুরে হইরা নিল অবলার প্রাণ।

দূরে, কেয়া বনের ওপারে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে বাঁশী বাজে। ঘন-কৃষ্ণ মেঘ অতি দ্রুতগতিতে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়। সাজুতী ভাবে,—

—“কোন গহনে বাজে বাঁশী অই না মধুর সুরে।  
নিতি নিতি জলের ঘাটে বাঁশীর গান সে শুনি।  
বাঁশীর সুরে মন পাগলা হইলাম উম্মাদিনী।  
আজি আসি কালি আসি ফিইরা ফিইরা যাই।  
যে জনে বাজাইল বাঁশী তারে দেখতে নাই সে পাই।  
সাঁতার যদি জানতাম আমি দেখতাম বিচারি  
মনচোরা ভ্রমর বন্ধু আনুতাম তারে ধরি।

সাজুতী এক দিন স্বান করিতে জলে নামিয়াছে, তন্ময় হইয়া বাঁশী শুনিতেছে। সহসা দেখে, স্রোতের টানে কলসী নাগালের বাহিরে ভাসিয়া চলিয়াছে। আশঙ্কায় তাহার বুক দুক-দুক করিয়া উঠিল! তাই তো, মাতা-পিতাকে সে কি বলিবে? আকাশের দেবতা পবনকে ডাকিয়া সে মিনতি করিল,—

“আসমানের দেবতা বায়ু রে উজান বহাও পানি।  
স্রোতের কলসী মোর তুমি দেও আনি।”

বাঁশীধারী নিকটেই কোথায় ছিল, কলসীর মিনতি তাহার কানে পৌছাইল। সে সাজুতীর কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিল,—‘বাতাসকে ডাকিতেছ, বাতাস কি কথা শুনে? আমি তোমার কলস আনিয়া দিতেছি।’

“বাতাসে না শুনে কথা কয়না। আমার কথা ধর।  
আমি আত্ম দিবাম কলসী তুমি বাও ঘর।”



নিভৃত জলের ঘাটে, কেয়া বনের ধারে সহসা চারি চক্ষুর মিলন হইল।  
সাজুতী চিনিলা, বশীধারী আর কেহই নহে—তাহার পিতার  
মহিমরক্ষক (মইষাল), বাথান-বাড়ীতে থাকে। পল্লীকবি  
তাহাদের এই মিলন-চিত্রটি এই ভাবে আঁকিয়াছেন—

“একেলা আছিল কন্ডা হইল দুই জন।  
জলেব ঘাটে চারি চক্ষুর হইল মিলন।  
মনে মনে কয় কন্ডা মন সাক্ষী করি।  
বাপেব মৈষাল তুমি থাক বাথান বাড়ী।  
লাজেতে হইল কন্ডাব বস্ত্রজবা মুখ।  
পরথম যৌবন কন্ডার এই পরথম স্থখ।”

মইষাল কলসী তুলিয়া দিয়া বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে বাথানে  
চলিয়া গেল, সাজুতীও বাড়ী দিয়িল; কিন্তু তাহার মন যেন আজ  
আর তাহার বশে নাই।

“সেই বাঁশী বাজাইয়া মইষাল গোষ্ঠে যায়।  
আজি কেন স্তম্ভর কন্ডা ফিবা ফিবা চায়।  
আজি কেন মইষাল তোমার হইল এমন।  
তোমার হাতের বাঁশী হইল দূষণ।  
নিতি নিতি হইলে দেখা এমন না হয়।  
আজি কেন স্তম্ভর কন্ডার জীবন-সংশয়।”

‘ঐ বাঁশী তো প্রতিদিনই শুনি, ভাল লাগে শুনি; মইষালকেও  
চিনি, দেখি। কিন্তু আজ যেন সব আর এক রকম হইয়া গিয়াছে।’  
পূর্বরাগের এই বীতি।

“আব দিন বাজে বাঁশী না লাগে এমন।  
আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়িয়া লয় মন।  
এই বাঁশী সেই বাঁশী নয় বাজে নয় তানে।  
বিনাথ মইষাল আইজ মবিল বাথানে।”

সাধারণ পল্লীবাসীর পক্ষে মাতা-পিতার শাসন, কুলমানের ভয়  
উপেক্ষা করা সহজ নয়। সাজুতীর এখন কেবল মন বুরে; ঘরে  
আর তাহার ভাল লাগে না, অথচ বাস্তবের উদ্দেশ্যে বাহিব হইতেও  
পারে না। সামান্য বাথাল সে, তাহার পিতারই ভৃত্য, আশ্রিত;  
তাহাদের মিলন-পথে পিতা নিশ্চয়ই বাধা দিবেন। সাজুতীর  
হৃদয়ে অপ্রাপ্তির একটা তীব্র ব্যাকুলতা। কিন্তু মইষাল বন্ধুকে  
প্রাণের কথা সে কি করিয়া জানায়! মনে মনে বলে:—

“মইষ রাখ মইষাল বন্ধুরে ক্ষীর নদীর পাড়ে।  
মজিল অবোলায় মন তোমাব বাঁশীর সুরে।”

রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া মহিষ বাগিতে তাহাব কতই না কষ্ট হয়!  
সে কি বিল হইতে পদ্মের পাতা তুলিয়া আনিয়া মাথায় ধরিতে  
পারে না?

“রইসে কেন পুড়রে বন্ধু মেঘে কেন ভিজ।  
বিলে আছে পউদের পাতা আজ্ঞা মাথায় ধর।  
সুজ্ঞন চিত্তা পিরীত করা বড় বিষম লেঠা।  
ভাল ফুল তুলিতে গেলে অঙ্গে লাগে কাঁটা।  
রে বন্ধু অঙ্গে লাগে কাঁটা।”

জানি, মনের মানুষকে সহজে পাওয়া যায় না, তার জন্ত অনে-  
দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। তোমার জন্ত যে আমার অন্তবে কি বেদনা,  
তাহা দেখাইবাব উপায় কি? যদি সম্ভব হইত বুক চিবিয়া  
দেখাইতাম।

“লাজ বাসি মনের কথা কইতে নাহি পাবি।  
দেখাইতাম বুকের দুঃখ বুক মোর চিরি।  
রে বন্ধু বুক মোর চিরি।  
কইতে নাহি পারি কথা বাপ মায়ের কাছে।  
লীলারী বাতাসে মোর অন্তর পুড়া গেছে।

\* \* \* \*

ঘরের বাহির হইতে নারি কুলমানের ভয়।  
অবলা নারীর মনে আর কত বা সয়।  
মনেরে বুঝাই কত মন না মানে মানা।  
এ ভরা যৌবন কলসী দিনে দিনে উনা।”

আমার যৌবন-কলসীব জল যে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে।  
মনকে আর কত দিন বুঝাইয়া রাখিব। সম্বন্ধে সীমা যে অতিক্রম  
করিয়া যাউতেছে।

“পশু-পক্ষী-এ নাই সে জানে না জানে পবন।  
মনের আমার দুঃখ কথা জানে আমার মন।  
পক্ষী যদি হইতাম বে বন্ধু উড়িয়া উড়িয়া।  
তোমাব মুখ দেখিতাম বন্ধু ডালেতে বসিয়া।  
ইচ্ছা হয় তোমাব লাইগ্যা ছাড়ি কুলমান।  
মুছাইয়া শীতল করি তোমার অঙ্গের ঘাম।  
তুমি যথা থাক বে বন্ধু আমি থাকি তথা।  
বৌজকালে ছায়ার লাগ্যা শিবে ধবি পাতা।  
রে বন্ধু শিরে ধবি পাতা।

এক ত শীতল জলের হাওয়া আর ত শীতল জানি।  
তা হইতে অধিক শীতল ডাবেব মধ্যে পানি।  
তা হইতে অধিক শীতল যৌবনে পিরীতি।  
তা হইতে অধিক শীতল মনোবাস্তব পতি।  
রে বন্ধু মনোবাস্তব পতি।”

এই তো সাজুতীর অবস্থা। দেহ মাত্রই তাহার ঘবে পড়িয়া আছে,  
মন কেবলই গোষ্ঠে, মাঠে, নদীর কূলে বাস্তবের অম্লসবণ করিয়া  
ফিরিতেছে। রাখাল সে, পথে-প্রান্তরে রৌদ্রে-জলে কষ্টের তাহার  
অবধি থাকে না, সাজুতী সেবা করিবার এতটুকু স্রবোপায় পায় না!  
কত সাধ তাহার মনে জাগে, জাগিয়া অন্তর-কোণেই বিলীন হয়।  
জলের হাওয়া, ডাবেব জল, যৌবনে পিরীতি, সকলই শীতল। কিন্তু  
যে যাহাকে কামনা করে, তাহাকে যদি পতিরূপে লাভ করিতে পারে,  
তবে উহাই হয় সকলের চেয়ে শীতল ও স্তম্ভর। কয় জনের  
ভাগ্যে তাহা ঘটে?

ওদিকে মইষাল-এর তন্ময়তাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। নদীর  
ঘাটে চারি চক্ষুর মিলন হইতে তাহার চিত্তও পূর্বরাগের সঞ্চার  
হইয়াছে; সেও আর পূর্বের মত কর্তব্য কার্যে মন দিতে পারিল  
না, সাজুতীর রূপের পাখারে তাহার নয়ন-মন ডুবিয়া গেল, বিশ্বজগৎ

গজার কাছে সাজুতীয় হইয়া উঠিল। আকাশের তারা দেখিয়া জ্ঞান স্বপ্নের চোখ দুইটির কথাই তাহার মনে পড়ে, ঘন-ক্লেশ মেঘের চাঁটুটি দেখিয়া ভাবে, কত হইতেছে এই সময়ে নীলাধরী পরিয়া জলে ঠাইতেছে! নদীর জলে তরঙ্গের লহর উঠে, সে-লহর মইয়ালকে সাজুতীর দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়; পাতায় ঘরা প্রস্তুতিত পদ্ম তাহার মানস-পটে কল্পার পদ্মমুখই জাগাইয়া তালে।

“আসমানতে ফুটে তারা ছিন্ন ভিন্ন দেখি।  
মৈমাল ভাবে এই মত কল্পার দুইটি আঁখি।  
আসমান জুড়া কাল মেঘ উড়া উড়া যায়।  
নীলাধরী পরা কত জলের ঘাটে যায়।  
নদীতে উঠে খেঁয়া ঢেউ লীলুয়াবী বাতাসে।  
মৈমাল শুইয়া ভাবে কল্পার দীঘল লম্বা কেশে।  
জলের উপর পড়দের ফুল চারিদিকে পাতা।  
মৈমাল ভাবে কল্পার মুখ পিউরী দিয়া গাঁথা।”

এই সকল চিত্র আমাদিগকে রাধাকৃষ্ণের রূপানুরক্তির চিত্রগুলিই স্মরণ করাইয়া দেয়। সেগুলি এত পরিচিত যে, এখানে তাহাদের পুনরুৎপাদন নিম্নয়োজন। পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় ‘ধোপার পাট’ পাল-গানটিতে এক রাজপুত্র ও রজককল্পার প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের পূর্ববঙ্গের চিত্রগুলিও সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্যের দিক দিয়া হৃদয়ের অপূর্ণ অভিযুক্তি! প্রতিদিনেব দেখাশুনা এবং রূপানুরক্তি হইতে উভয়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সঞ্চার হয়; ক্রমে দুইয়েই দুইয়ের জন্ত পাগল হইয়া উঠে! কিন্তু তাহাদের মিলনের পথে প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়ায়,—সামাজিক অসমত ও অবস্থার বৈষম্য।

রাজপুত্র অসীম আকুলতা লইয়া রজকনন্দিনীর পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, আত্মনিবেদন করে, বলে,—

“কাপড় যে ধওলো কত করিয়া সোহাগ।  
এই না কাপড়ে পাইছি তোমার পাঁচ আঙ্গুলের দাগ।  
এই কাপড় পাইয়া আমার ঘুচিয়াছে সন্দ।  
কাপড়ে পাইছি তোমার মালার গন্ধ।”

মুগ্ধা বালিকা হৃদয়-ভাব সংযত রাখিয়া রাজপুত্রকে নিবৃত্ত করে, উভয়ের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থার বৈষম্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় :—

“তোমার না বাপ মাও রাজ্যের না রাজা।  
বাপের ধোপা আমার বাপ তোমার বাপের পরজা।  
চান্দ হইয়া কেন জমিনে বাড়িও হাত।  
লোকে যে বলিবে মন্দ শুনিয়া পরচাং।”

কিন্তু রাজপুত্র বাস্তবতার মিনতি শুনে কই? সে তাহাকে পাইবার জন্ত সর্ব্বশক্তি পণ করিয়া বসে,—

“রাজ্যধন যা আছে লো কত বাপেরে কহিয়া।  
সর্ব্বশক্তি তোমাতে দিয়া করবাম তোমাতে বিয়া।”

রজকনন্দিনী তবু তাহাকে বুঝায়, বারণ করে। কিন্তু তাহার চিন্তেও কি কম ব্যাকুলতা! রাজপুত্র যে কখন তাহার হৃদয়ের সবখানি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে! মনের আশুকে সে আর কত দিন চাপা দিয়া রাখিবে? দুইয়েই যে দুইয়ের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! গোপন করিয়া আর লাভ কি? ‘পট্টই বলিয়া উঠে—

“আমাইচা নদীরে যেমন পাগল হইয়া যায়।  
মনেরে বুঝিয়া বন্ধু রাখা নাহি যায়।  
শুইলে স্বপনে দেখি তোমার চান্দ মুখ।  
নিশাকালে অভাগীর এই মাত্র মুখ।”

বাস্তবতাকে পাওয়ার পথে তাহার কত বাধা! কুলের ভয়, মানের ভয়, ভয় গুরুজনের। প্রতিক্ষণ তাহার মন বুরে, অসীম আকুলতা লইয়া ঘর-বাহির করিতে থাকে। হৃদয়-তন্ত্রীতে করুণ রাগিনী বাজিয়া উঠে :—

‘ঘর কইলাম বাহির রে বন্ধু পর কইলাম আপন।  
অবলার কুলভর হইল দ্বন্দ্বণ।’

ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময় চিন্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে,—

“কিসের কুল কিসের মান আর না-বাজাও বাঁশী।  
মনপ্রাণে হইয়াছি তোমার ক্রীচরণের দাসী।

মিলনের আকুল আগ্রহ লইয়া বাস্তব আসে, আসিয়া হৃদ্যাগপূর্ণ রাত্রিতে আঙ্গিনায় ভিজে। সে এই অভাগীর জন্ত কত কষ্টই না পাইল! তাহার ইচ্ছা হয় ডাকিয়া বলে,

“বুড়ি পড়ে টুপুর টুপুর বাইরে কেন ভিজ।  
তার পাছে মানের পাতা কাইটা মাথায় ধর।  
ভিজিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে।  
অভাগী নিকটে থাকলে মুছাইতাম কেশে।”

জল-ঝড় থামিয়া যায়, কিন্তু বাঁশীর ধ্বনি থামে কই? উহা যে অবিরত কানের ভিতর দিয়া মরমে আসিয়া পৌঁছিতেছে, উহা যে কেবলই বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিতেছে! চারি দিক এখন নীরব নিশ্চুপ, কিন্তু বাহির হইবার কি জো আছে, চন্দের উদয় যে আবার বাদ সাধিল!

“সংসার ঘুমাইয়া আছে কেবল বাজে বাঁশী।  
হইয়া ঘরের বাহির কোন্ পথে আসি।  
কাটা গেছে কাল মেঘ চন্দের উদয়।  
এই পথে যাইতে গেলে কুলমানের ভয়।”

আশ্চর্য্য এই হৃদয়ানুরাগ! ডালপালা নাই হৃদয়-বৃক্ষে ফুলের মতো ইহা ফুটিয়া থাকে, কেহ ইহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারে না। বাস্তবতার জন্ত ইহা সব কিছু ত্যাগ করিতে পারে।

“ডাল নাই পাল নাই ফুটিয়া না বইতে রে ফুল।  
বন্ধুরে পাইলে আমার কিসের জাতি কুল।”

নাটিকা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছে, ‘জানি না এই অনুরাগের স্রোত আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে, কোথা হইতেই বা ইহা আসিল,

কি করিয়াই বা আসিল, কেনই বা আসিল? আমি যে ইহার কোন কুল-কিনারা পাইতেছি না।

বাহিত্র আমার সোনার পাখী; স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যেমন প্রভাত আসে তেমন অপর সূর্যের বেশে তিনি আমার কাছে উড়িয়া আসিয়াছেন। ইহাকে কোথায় রাখিব? ইহাকে রাখিবার মতো উপযুক্ত স্থান আমার কোথায়?—ইনি রাজার ছেলে, আমি সামান্য নারী, আমার যশ-সংসার ইহার মোটেই উপযুক্ত নয়। “আমার স্বর্গের কল্পনার চেয়েও ইনি বড়।” ইহাকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে পারি না, অথচ না পারিলেও বাঁচি না,—এ যে আমার প্রাণ-পাখী!

“নদীকে কোন্ দিকে যাও বইয়া।

কোথেকে আইলরে নদী কিসের লাগিয়ারে।

কোন্ দিকে যাও বইয়া।

সোনার বরণ পরভাতরে আবেশ চাকামাথা।

কোন পাখী উড়িয়া আইল সোনার বরণ পাখা।

জমীনে পড়িলে পাখী জমীনখানা বেড়ে।

আসমানে উড়িলে পাখী আসমান না ছুড়ে।

এই পাখী ধরিতে গেলে খাঁচা নাই যে পাই।

কোথায় রাখি প্রাণের পাখী কোন্ বা দেশে যাই।

আবার সন্দেহ জাগে,—আমি বাহার জন্ত পাগল, সে কি আমার কথা মনে করে? সে তো রাজার ছেলে—আমার পক্ষে অতি বড়। বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীতি শোভা পায় না, উল্লা কলঙ্কই বহন করিয়া আনে। আমার পক্ষে তাঁহাকে পাইতে যাওয়া বামনের চাঁদ ধরার মতই হাঙ্গর। ইহাই আমার সামান্য।

‘আমারে কি আছে মনে সেত রাজার বেটা।

বড়র সঙ্গে ছোটর পিরীতি দশের মধ্যে খুটা।

বাউন হইয়া কেন চান্দে বাড়াই হাত।

পরবোধ দিতে পোড়া মনে না পাই কিছু আর।’

পল্লী-সাহিত্যে তথা পল্লীগাথাগুলিতে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগের এইরূপ দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সন্দেহ ও অপ্রাপ্তির আকুলতার কত যে কথা ও চিত্র আছে, তাহা বলিয়া, দেখাইয়া শেষ করা যায় না। আমরা পল্লীকবিদের পূর্বরাগের বর্ণনার আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতেছি। হয়তো অমতে অল্পচি হইবে না।

“চারি চক্ষু এক হইল রে পরাণ কাড়া লইল।

কোন্ দৈবে মনের মানুষেরে আত্মা দেখাইল।”

নদীর ঘাটে কেয়া বনেব ধারে ‘মাধব’ ও ‘সোনাই’র চারি চক্ষুর মিলন হইতে উভয়ের মধ্যে পূর্বরাগের সঞ্চার হয় এবং ক্রমে তাহা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। মাধব আর সজ করিতে না পারিয়া মনের ভাব খোলাখুলি জানাইয়া সোনাইকে শেষে এক পত্র লিখিয়া বসিল। তদন্তরে সোনাই জানাইল,—

“শুন রে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন।

বিয়া নাই সে হইল মোর পুরথম ঘোঁষন।

বাও মাতুল মোর আছে আছে তারা ঘরে।

বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভাল বারে।

ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধু রে যদি কেওয়া বনে।

নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে।

তুমি যদি হইতে রে বন্ধু আসমানের চান।

রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান।

তুমি যদি হইতে রে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।

তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি।

একে ত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।

দারুণ দুঃখের ছালা কেমনে রইয়া সহ।

যেদিন দেখাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।

সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে বাটে।

মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।

অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা।”

এক বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া পূর্বরাগের এইরূপ তন্ময়তার চিত্র অল্প কোথাও বড় দেখা যায় না। এখানেও অপ্রাপ্তির সেই অসীম আকুলতা, ঈপ্সিত মিলনের পথে সংসার-সমাজের বাধা। প্রকৃতির স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি ও সহজ বিকাশের মধ্যে নায়িকা আপনাকে সর্বপ্রাণে মিশাইয়া দিতে চায়! কিন্তু পারে কই? তাহার চারি দিকে কত বাধা। সে বাধা অতিক্রম করিয়া ফুলেব মত ফুটিয়া ওঠা, চাঁদের মত হাসিতে পারা সহজ নয়। এই না-পারার বেদন তাহাকে পীড়া দেয়, তাহার সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া একট কল্লপ সুর উৎপিত হয়।

পূর্বরাগের উন্মেষে নায়িকার চোখে-মুখে, চাল-চলনে কথা-বার্তায় এমন একটা ভাব ফুটিয়া উঠে যে, অপরের দৃষ্টি এড়াইলেও, সমবয়সী এবং সখীদের দৃষ্টি তাহা এড়ায় না। নদের চাঁদের অনুরাগে মহয়ার মন অগ্নিশিখা বুরিতেছে; পালক-পিতা হোমড়া টের না পাইলেও সখী পালক তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছে মহয়া কাহারো সঙ্গে বড় মিশে না, জলের প্রয়োজন না থাকিলেও সন্ধ্যাকালে একাকী জলের ঘাটে যায়; রাত্রিতে তাহার নিদ্র হয় না, নীরবে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়ে; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উদাস দৃষ্টিতে নদেরচাঁদের বাড়ীর দিকে সে চাহিয়া থাকে পালক জিজ্ঞাসা করে, ‘সখি, ব্যাপার কি? মনের কথা খুলেই বল না, শুন।’ মহয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উত্তর দেয়, ‘সখি, বি আয় বলিব! মনের আগুন তো কিছুতেই আর নিবাইতে পারিতেছি না। ভিন্ন দেশে যাওয়া ছাড়া আর গতান্তর দেখি না :—

“এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন্ন দেশেতে যাই।

বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই।”

পালক বলে, ‘শুন সখি, আমার কথা শুন; তুমি সাত দিন জলের ঘাটে যাইও না, দেখিবে তোমার মন ফিরিয়া গিয়াছে। নদেরচাঁদ যদি খোঁজ করিতে আসে, স্পষ্ট বলিয়া দিব,—মহয়ার আর ইহজগতে নাই।’ অল্প দিকে চিত্ত বিনিয়োগ করিতে পারিলে পূর্বরাগের অসহায় অবস্থা হইতে কতকটা আত্মরক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু মহয়া যে তাহার অজানিত ভাবেই অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে।

গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বীরবরণ (১২৯০)। যৌবনে যোগিনী। সম্পাদক—ভাবী সম্রাটের ভারত ভ্রমণ (সাপ্তাহিক—১৮৭৫)।

গোপালচন্দ্র বসাক—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কৌতুকদর্পণ (১৮৭৩)।

গোপালচরণ মিত্র—সাহিত্যিক। পবিচালক—সুদর্শন (১৮৭৫)।

গোপাল দাস—বৈষ্ণব পদকর্তা। ইঁহাব আসল নাম—রাম-গোপাল চৌধুরী। ইঁহাবা শ্রীখণ্ডবাসী। ইনি ‘গোপাল দাস’ ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ—রসকলবলী (১৫৬৫ শক)।

গোপাল দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বসবতিমঞ্জরী, বতিশাস্ত্র।

গোপাল দাস—পদকর্তা। গ্রন্থ—ভক্তিবক্তাবলী (১৫৯০ খৃঃ)।

গোপাল দাস—কবি। নামাস্তব—শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণবিলাস।

গোপাল দাস চৌধুরী—গ্রন্থকার। জমিদার। অম্ববাদ-গ্রন্থ—বিভুক্ষমার্গ (অম্বদোষ কৃত—১৯১৩), বোধি (শাস্ত্রিদের কৃত—১৩৪০)।

গোপালধন চুডামণি—অম্ববাদক। অনূদিত গ্রন্থ—মহাভাবত (১৮৬৭)।

গোপাল জায়ালঙ্কার—স্মৃতি পণ্ডিত। প্রকৃত নাম—রাম-গোপাল জায়পঞ্চানন। জন্ম—১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে। নদীয়া-নিপতি মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। গ্রন্থ—উদ্ধাহনির্ণয়, গাঁচাব-নির্ণয়, তিথিনির্ণয়, দায়নির্ণয়, সম্বন্ধনির্ণয়, শুদ্ধিনির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত-নির্ণয়, দুর্গোৎসবনির্ণয়।

গোপাল ভট্ট, গোস্বামী—পদকর্তা ও ছয় গোস্বামীর অগ্রতম। জন্ম—১৪৯৩ খৃঃ দাঙ্গিগাত্যেব কানৈবী ত্যেব শ্রীবঙ্গক্ষেত্রের বলগেতা গ্রামে। মৃত্যু—১৫৭৮ খৃঃ। পিতা—বেঙ্গট ভট্ট। ইনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্য। গ্রন্থ—চবিত্তি-বিস্ময়, গোলকবস্ত্র বর্ণন, কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের টীকা।

গোপাল ভট্ট—গ্রন্থকার। সেনবংশীয় নবপতি দ্বিতীয় বল্লালসেনের শিক্ষাগুরু। গ্রন্থ—বল্লালচরিত (১৩০০ শক)।

গোপাল ভট্ট—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—গোপালবঙ্কাকব।

গোপাল রায়—হিন্দী গ্রন্থকার ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৬ খৃঃ গাজীপুর। হিন্দী গ্রন্থ—বিজ্ঞানবিনোদ, চিত্রাঙ্কন, দেশদান, স্তম্ভদা, দি নিউ বাবু, মানবকীৰ্ত্তন (অম্ববাদ), ভাটমন্তী, গুহলক্ষী, গুপ্তভেদ, দেববাণী-জ্যোতি, বচন, বড়া ভাই। ইনি বহু বাংলা ডিটেকটিভ বইয়ের হিন্দী তর্জমা করেন।

গোপাললাল বসু—সাহিত্যিক। সম্পাদক—ভাবতবর্ষীয় গ্রন্থ পত্রিকা (১৮৭৫)।

গোপাললাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—ভাবতবর্ষীয় ইতিহাস, জ্ঞানচন্দ্রিকা (১৮৩৮ খৃঃ)।

গোপাললাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—মনোহরদর্পণ (১৮৭৩)।

গোপাল বসু—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—চৈতন্যমঙ্গল।

গোপিকা মোহন—বৈষ্ণব কবি। গ্রন্থ—বাদিকামোহন।

গোপীকৃষ্ণ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—চবিত্তি-বিস্ময়।

গোপীনাথ—জ্যোতির্বিদ। গ্রন্থ—বিবিক্রম শতক বা জাতকের টীকা।

গোপীনাথ—টীকাকার। গ্রন্থ—উজ্জ্বলা (কেশব মিশ্র কৃত তর্জমার টীকা)।

মা হি তা

মেবকা-বসু

(পব-প্রকাশিত পব)

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার গোস্ব

গোপীনাথ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—সিদ্ধসাব।

গোপীনাথ দীক্ষিত—টীকাকার। পিতা—ভৈরব। টীকাগ্রন্থ—প্রত্যাদ বা তর্জ-নিবন্ধের টীকা।

গোপীনাথ পুরোহিত—হিন্দী গ্রন্থকার। নিবাস—জয়পুর। এম, এ, বায় বাহাদুর। জয়পুর ষ্টেট কাউন্সিলের সেক্রেটারী। গ্রন্থ—ভট্টচরিত্রাঙ্কন, প্রেমলীলা, মানভবন, ভেনিস কা ব্যাপারী (হিন্দী অম্ববাদ), মিহতা, বাবেল, সত্য চবিত্র চমৎকার, সত্যভামা সঃবাদ।

গোপীনাথ বসু—কবি। নামাস্তব—পুণ্ডরীক, বালাব নবাব হোসেন শাহের (১৪৯৭-১৫২৬) মন্ত্রী। ইঁহাবই ভ্রাতা ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিনয়’ প্রণেতা মালাধর বসু। গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

গোপীনাথ মৌনী—মহাবাহুবী পণ্ডিত। নিবাস—কাশী ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গ্রন্থ—শব্দলোক-বসু, তর্জমাসাটীকা, পদার্থবৈকটিকা।

গোপীনাথ বাত, টি. এ.—প্রত্নতত্ত্ববিদ। জন্ম—১৮৭২, এরা নরেশ্বর। নিবাস—ত্রিগুণাম। ট্রান্স্‌কোব ষ্টেটের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্থপারিনটেনডেন্ট। গ্রন্থ—‘Travancore Archaeological Series (১৯১৩), The Elements of Hindu Iconography (১৯১৩)।

গোপীকৃষ্ণ দাস—সাহিত্যিক। সম্পাদক—আদিনা (ত্রৈমাসিক—১৩৩৭)।

গোপীকৃষ্ণ দাস—বৈষ্ণব গ্রন্থকার। জন্ম—মেদিনীপুর জেলার দাবেন্দা গ্রামে গোপবংশে। পিতা—রসময়। ইঁহাবা সকলেই গামানন্দ প্রভুর শাখা। গ্রন্থ—বসিকমঙ্গল।

গোপীমোহন গোস্ব—ইংরেজ শিক্ষাবিদ। গ্রন্থ—বিজয়বল্লভ (১৮৬৩), জ্যোতির্বিবরণ (১৮৭৩)।

গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—আনোয়ার মাহেলী (ফার্সী ভাষায়—১৮৭৫ খৃঃ)।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্গীতজ্ঞ ও গ্রন্থকার। জন্ম—বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর গ্রামে। সঙ্গীতনাট্যক উপাধি লাভ। ইনি দীর্ঘকাল বদমানবাজের সভাপায়ক ছিলেন। সঙ্গীত গ্রন্থ—সঙ্গীতচন্দ্রিকা, ১ম, ২য়, তানমালা, গীতমালা, সঙ্গীতলহরী, গীতদর্পণ। সম্পাদক—সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা, (১৩৩৫—৩৯)।

গোবর্দন আচার্য—হিন্দী কবি। গৌড়বাজ লক্ষণসেনের পঞ্চ-বহু সভাপ অগ্রতম রত্ন। গ্রন্থ—আবসম্ভতা (কাব্য)।

গোবর্দনবান মাপববাম ত্রিপাঠী—শুভ্ররাতি সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৫ খেড়া জেলায় নদীহাড় নামক স্থানে। আইন ব্যবসায়ী (১৮৮৩-১৮৯৮), বোম্বাই। গ্রন্থ—সারস্বতজ্যে (১৮৮৫)

স্নেহসমুদ্র (দার্শনিকভাষ্য), সাম্প্রদায়িক জীবন, Conflict of law between converts & non-converts in India.

গোবিন্দ রায়—সাম্প্রদায়িক। অজ্ঞাতম সম্পাদক—ঢাকা-প্রকাশ (সাপ্তাহিক, ১৮৮১-৮২ ঢাকা হইতে প্রকাশিত—প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সাবাদপত্র)।

গোবিন্দ অধিকারী—প্রসিদ্ধ ধাত্রাওয়াল। জন্ম—১১০৫ (অন্ধে) হুগলী জেলায় অন্তর্গত থানাকাল-রসনগরের জাঙ্গীপাড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৮৭০ খৃঃ। ইনি একাধারে যাত্রা, কীর্তন ও কথকতায় বিশেষ নাম করেন। পালাগল্প—শুক-দাবী পালা, চড়া-নুপুংর দ্বন্দ্ব।

গোবিন্দ আচার্য—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গোবিন্দ ভাগবত।

গোবিন্দকান্ত বিজাভূষণ—গ্রন্থকার। জন্ম—পাবনা সালগিয়া গ্রামে। গ্রন্থ—লঘুভাবত (কাব্যোক্তিতাস)।

গোবিন্দচন্দ্র আচার্য—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রদায় (দৈনিক পত্র, ১৮৭০)।

গোবিন্দচন্দ্র বোস—গ্রন্থকার। শিক্ষা—এম, এ, বি, এল। গ্রন্থ—চিত্তবিনোদিনী (১৮৭৫)।

গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বসন্ত নির্ঘণ (১২২৩)।

গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত—সাম্প্রদায়িক। সম্পাদক—সংবাদ-সম্প্রদায়বল্লভ (সাপ্তাহিক—১৮৭৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—স্বাধীনকবি। জন্ম—১২৬১ বঙ্গ, ৪ঠা মার্চ ঢাকা জেলায় ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর গ্রামে। পবে বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণগাঁয়ে বাস করেন। মৃত্যু—১৩০৫ বঙ্গ। পিতা—বামননাথ দাস। মাতা—আনন্দময়ী। শিক্ষা—ছাত্রোত্তীর্ণ, ঢাকার নর্মাল স্কুল, ঢাকা মেডিকেল স্কুল। কর্ম—বিভিন্ন জেলায় জমিদারী কর্ম। গ্রন্থ—প্রেম ও ফুল, কুসুম, অশ্রু, কঙ্গুরী, চন্দন, ফুলঝু, বৈজয়ন্তী, প্রহর, শোক ও সাধনা, গীতাবলী-বাস্তববাদ।

গোবিন্দচন্দ্র দে—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সত্যধর্ম-প্রকাশিকা (মাসিক—১৮৪৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। নিবাস—বাবাণসী। সম্পাদক—কাশীবার্তা প্রকাশিকা।

গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—কুলীনকুলজনা কাব্য (১৮৭১?)। সম্পাদক—সংবাদ বসুদেব (সাপ্তাহিক—১৮৪৯ খৃঃ)।

গোবিন্দচন্দ্র বায়—কবি। জন্ম—বারিশাল জেলায় মৌরপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ-বংশে। পবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কাশীধামে জোমিওপাথ চিকিৎসা শিক্ষা কবিতা আগ্রায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। গ্রন্থ—গীতি-কবিতা, ১ম (১২৮৮), ২য় (১২৮৮), ৩য় ও ৪র্থ। যমুনালহরী, জাতীয় সঙ্গীত।

গোবিন্দ দত্ত ত্রিপাঠী—হিন্দী গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বিরহ-সরোবর।

গোবিন্দ দাস—কবি। জন্ম—চট্টগ্রামেব দিয়াঙ্গ বা আনোয়ার গ্রামে। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল, মনসাও গীতি।

গোবিন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—নিগম গ্রন্থ।

গোবিন্দ দাস—ভক্ত গ্রন্থকার। গ্রন্থ—কালিকামঙ্গল, গীত-চিন্তামণি, ভক্তিরস।

গোবিন্দ দাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—গুরুড পুণ্য, গীতাসার।

গোবিন্দ দাস কর্মকার—কবচা-লেখক। জন্ম—১৫০৮ খৃঃ

বর্ধমানের উপকণ্ঠে কাকননগরে। পিতা—গায়দাস কর্মকার। মাতা—নাদবী। ইনি মহাপ্রভুব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণেব নিত্যদায়ক-রূপে সঙ্গী ছিলেন এবং কবচা বচনা করেন। গ্রন্থ—কবচা (বা স্মৃতিলিপি)।

গোবিন্দ দাস, সেন, কবিবর—পদকৃত। জন্ম—১৫৩৮ খৃঃ বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে। মৃত্যু—১৮১২ খৃঃ। পিতা—চিরঞ্জীব সেন। মাতা—সুনন্দা। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য। গ্রন্থ—সঙ্গীতমাধব (নাটক), কর্ণামৃত (কাব্য), গৌরাখ্যান, একান্তপদ, গীতামৃত।

গোবিন্দ দৈবজ—ঢাকা-কবি। পিতা—নীলকণ্ঠ দৈবজ। গ্রন্থ—বায়ু-ধাবা। (মুহূর্ত চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা)।

গোবিন্দনাথ দত্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—লঘু বামায়ণ, সম্পাদক—দাসী (১৮৯৭ খৃঃ)।

গোবিন্দনাথ সেন—কবি। নিবাস—১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরিদপুর জেলায় ভান্ডাবাড়ী গ্রামে। ইনি কার্টোয়ায় মুন্সেফের কাগ করতেন। গ্রন্থ—পদচিন্তামণিমালা (সঙ্গীত-গ্রন্থ)।

গোবিন্দনাথায়ণ মিশ্র—হিন্দী গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৫০। গ্রন্থ—সারস্বত সপ্তম, প্রাকৃত বিচার, বিলজ্জিত বিচার।

গোবিন্দ নায়বাগীশ—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে। পিতা—কুন্দনাথ নায়বাচস্পতি, ইনি নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রন্থ—পদার্থগণনাব টীকা, জায়বহুত, জায়বহুত ব্যাখ্যান, সমাসবাদ, জায়-সংক্ষেপ।

গোবিন্দ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কবি। গ্রন্থ—বন্ধুতাব এঁই কি ফল? (১৩৭৬), মিত্রলাভ (১২৭৭)।

গোবিন্দ প্রসাদ রায়—সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। সম্পাদক—ঢাকা প্রকাশ। গ্রন্থ—ব্যাকরণ-সার।

গোবিন্দ প্রসাদ রায়, বিজ্ঞাবিনোদ—গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৩৮ খৃঃ পাবনা জেলায় গায়েনবাটা গ্রামে। মৃত্যু—১৩০৪। পিতা—রাধানাথ রায়। ইনি কাশীতে শিক্ষালাভ করেন এবং নবদ্বীপ হইতে ‘বিজ্ঞাবিনোদ’ উপাধি প্রাপ্ত হন। কর্ম—বঙ্গপুর জেলা কাকিনার ভূম্যধিকারীদের প্রধান অমাত্য। গ্রন্থ—কৈলাস চবিত্ত মুখ্যী, তবিবাস তত্ত্বসার ১ম, ২য় খণ্ড, অষ্টাদশ মতাবিজ্ঞা, লীলাবতী বঙ্গানুবাদ।

গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিবর, বায়মাহেব—সংস্কৃত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৭০ খৃঃ ২২এ আগষ্ট হাও জেলার শাঁকরাইল (মাতুলালয়ে) গ্রামে। পিতা—যোগেন্দ্রচ বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হেয়ার স্কুল—১৮৮৭ খৃঃ বি, এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ), কবিত্ত উপাধি লাভ (১৮৯৫), ব বাহাদুর (১৯২১)। গ্রন্থ—ভাগবত-কুশমাজলি, শান্তিসোপান, হে ও পরমার্থ, স্মৃতি-সুধানিধি, স্ততিকুশমাজলি, কলাগণিকা, পাগল প্রলাপ, প্রণেয় কথা, জ্ঞানকুশমাজলি। Arjans moral গোবিন্দ ভট্ট গোবিন্দরাজ—মাত’ পণ্ডিত। জন্ম—১১-১২ শতাব্দী। পিতা—মাধব ভট্ট। ঢাকা-গ্রন্থ—মঞ্জরী (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি টীকা), মহাসংহিতার টীকা, স্মৃতি-মঞ্জরী।

গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী—কবি। গ্রন্থ—বাল্যরজন (কবি ১৮৭২)।

গোবিন্দ সেন—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—বাংলাব ইতিহাস (মাশম্যান-কৃত—বঙ্গমুদ্রা, ১৮৪০)।

গোবিন্দরাম সিদ্ধান্তবাগীশ—টাকাকাব। জন্ম—১৮শ শতাব্দির প্রথম ভাগে ফরিদপুর জেলাব ধামুকা গ্রামে। গ্রন্থ—দীৱরঞ্জিকা, চণ্ডীর টাকা, মতিসন্তোষ টাকা।

গোবিন্দাচারী—গ্রন্থকাব। কাশীবাঈ। গ্রন্থ—সাধন স্তবোধ, যোগিনী-দশা (১৮৫৩)।

গোবিন্দানন্দ—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—ভাষ্যরত্নপ্রভা (শারীরক ভাষ্যেব টাকা)।

গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ—জ্যোতিষবিদ পণ্ডিত। টাকাগ্রন্থ—অর্থবহুপ্রভা, অর্থকৌমুদী।

গোভিল—সূত্রকাব। গ্রন্থ—গৃহসূত্র।

গোবক্ষনাথ—নাথ-গুরু। জন্ম—১৫শ শতাব্দি। পিতা—মহেশেন্দ্রনাথ। গ্রন্থ—গোবক্ষন-হিত।

গোলোকচন্দ্র কব—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—সাধন-কথা।

গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন—দার্শনিক পণ্ডিত। জন্ম—১৮০৬ খৃঃ নবদ্বীপ। মৃত্যু ১৮৭৮ খৃঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে। পিতা—হরচন্দ্র ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—সামান্য-নিকৃষ্টি, সবা-বিচার, অবচ্ছেদান্তে নিকৃষ্টি, পল্লবক্ষণ বিবেচনী, গোলোকন্যায়বহীম।

গোলাম হোসেন খাঁ তবতখা, সৈয়দ—ঐতিহাসিক। পিতা হিদায়ত আলি খাঁ। গ্রন্থ—সিয়ার-উল-মুতাক্বরিণ।

গোষ্ঠবিহারী দে—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—সিকুবালা (১৩০১), আনন্দমঞ্জরী (১৩০১)।

গোসাই দাসগুপ্ত—সাংবাদিক। সম্পাদক—সংবাদ দ্বিজবাজ (১৮৫৯)।

গৌড়পাদ আচার্য—গ্রন্থকাব। জন্ম—৬-৭ম শতাব্দি। (গৌড়বাসী)। গ্রন্থ—মাতৃকাবিকা, চিদ্ৰবিলাসানন্দ (টাকাগ্রন্থ)। সাংখ্যকারিকা ভাষ্য, উত্তরগীতাভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণাভ্যুত্থাভাষ্য।

গৌতম—ধর্ম-সূত্রকাব। গ্রন্থ—গৌতমধর্ম-সূত্র।

গৌরকিশোর রায়—গ্রন্থকাব। নিবাস—চন্দননগর (ভুগলি)। শিক্ষা—বি, এ। গ্রন্থ—লক্ষ্মীর কথা।

গৌবণ্ডানন্দ ঠাকুর—বঙ্গীয় কবি। জন্ম—শ্রীখণ্ড। গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্য-সঙ্গীত।

গৌরগোবিন্দ বায়, উপাধ্যায়—ব্রাহ্ম সমাজেব আচার্য ও পণ্ডিত। জন্ম—পাবনা জেলাব সিংবাজগঞ্জ মহকুমাব বাগবাটী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৮ বঙ্গ। ইনি সংস্কৃত ভাষা ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। কর্ম—পুলিশ-বিভাগে চাকুরী গ্রহণ, পরে চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। গ্রন্থ—গীতার সমন্বয় ভাষ্য, বেদান্তসমন্বয় ভাষ্য, শ্রীকৃষ্ণেব জীবন ও ধর্ম।

গৌব ভট্টাচার্য—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—‘পদ্মসবা’ নামক গ্রন্থেব টাকা।

গৌরমোহন বিজ্ঞানদ্বার—পণ্ডিত ও গ্রন্থকাব। কর্ম—Calcutta School Society & The School Book Societyর অধীনে শিক্ষকতা, পরে মুদ্রক। গ্রন্থ—ঐশিক্ষা-বিধায়ক (১৮২২), কবিতামৃত-কূপ।

গৌব-সুন্দর—পদকর্তা। পদ সংগ্রহ গ্রন্থ—কীর্তনানন্দ।

গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত—সংকলয়িতা। ‘বিবাদার্ণবসেতু’ গ্রন্থেব অন্ত্যতম সংকলয়িতা।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—পণ্ডিত ও গ্রন্থকাব। রঙ্গপুর জাদালতের দেওয়ান। গ্রন্থ—জ্ঞানাজ্ঞান (১৮২১)।

গৌরীকান্ত রায়—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—চন্দ্রকান্ত।

গৌরীদাস—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী।

গৌরীনাথ নিয়োগী—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—আশা মণিচিকা (১৮৭২ খৃঃ)।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। গ্রন্থ—ন্যায়সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী (কাশী, ১৯৪১ সংবত)।

গৌরীমোহন দাস—সংকলয়িতা। গ্রন্থ—পদকল্পলতিকা (সংকলন গ্রন্থ)।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, তর্কবাগীশ—কবি, গ্রন্থকাব ও সম্পাদক।

নামান্তর—শুভ্রশুভ্র ভট্টাচার্য। জন্ম—১২০৭ (১৭৯৯ খৃঃ)।

শ্রীহটে ইটা পবণাব পাটগাও গ্রামে। মৃত্যু—১২৬৫। পিতা—জগন্নাথ ভট্টাচার্য। গ্রন্থ—শ্রীমদ্বগবদ্গীতাব বঙ্গমুদ্রা, চণ্ডী (মূল ও টাকা), পাকবাজেশ্বর (১৭৬৫ শক), ভূগোল (১৮৫৩), জ্ঞান-প্রদীপ, ১ম (১৮৪৮), ২য়, ৩য় (১৮৫৩), নীতিরত্ন মহাভাবত ১ম, ২য়। সম্পাদক—সম্মান বসরাজ (মুদ্রাবাদ, সাম্প্রতিক, ১৮৩৯-১৮৫৬), সংবাদ ভাস্কর (সাম্প্রতিক, ১৮৩৯), হিন্দুবক্ত কমলাকর (পত্রিকা ১৮৫৭ খৃঃ), জ্ঞানামেঘণ (বাংলাবিভাগ)।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকাব।—মহাভয়, নদীয়াব গৌরব, ঢাকাব গৌরব ২৪ পরগনার গৌরব।

গৌরীশঙ্কর হীরচাঁদ ওঝা—ঐতিহাসিক। নিবাস—রাজপুতানা, উদয়পুর। গ্রন্থ—কোশোংসব স্বাবক সংগ্রহ (হিন্দী, ১৯৮৫ সং), রাজপুতানেকা ইতিহাস, ২ খণ্ড (১১২৭-৩২ খৃঃ), মহাকালীন ভারতীয় সংস্কৃতি (প্রয়াগ, ১৯২৮), প্রাচীন লিপিমাল্য, (উদয়পুর, ১৮৯৪), শোলাকীর কা ইতিহাস, নাগবন্দরী কী উৎপত্তি।

ঘনরাম চক্রবর্তী—প্রাচীন কবি। জন্ম—১৬৭৯ খৃঃ বদমান জেলার খণ্ডঘোষ থানাব অধীন কৈয়ড পবণনার বৃন্দপুর গ্রামে। পিতা—গৌরীকান্ত চক্রবর্তী। মাতা—সীতা দেবী। কবিত্ব উপাধিলাভ। বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র বাজেব বাজকবি। গ্রন্থ—শ্রীধর্মমঙ্গল (কাব্য—১৭০৯ খৃঃ), সত্যনাবায়ণ ব্রতকথা।

ঘনশ্যাম—জ্যোতিষবিদ। পিতা—কায়স্থ গোপাল দাস। গ্রন্থ—নপত্তিযাত্রামঙ্গলম্।

ঘনশ্যাম চক্রবর্তী—গ্রন্থকাব। নামান্তর—নবহর দাস। জন্ম—নবদ্বীপ। নিবাস কাটোয়া। পিতা—জগন্নাথ চক্রবর্তী। গ্রন্থ—ভক্তিবক্তাকর, গৌবচরিত চিত্তামণি, শ্রীনিবাসচরিত, নবোত্তমবিলাস, গীতচন্দ্রোদয়, চন্দ্রসমুদ্র, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, ব্রজপবিত্রমা, নবদ্বীপ পবিত্রমা, লীলাসমুদ্র (পদসংগ্রহ)।

ঘনশ্যাম দাস—পদকর্তা। জন্ম—বর্ধমান জেলাব শ্রীখণ্ড গামে বৈজ্ঞ বংশে। পিতা—দিব্যাসিত। গ্রন্থ—গোবিন্দরত্নমঞ্জরী, কণীমৃত (সং-কাব্য)।

ঘসীরাম—গ্রন্থকাব। এম, এ, বি, এল। নিবাস—মীরট।

গ্রন্থ—দয়্যাবাম চবিত (হিন্দী)।

চক্রচূড়ামণি—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চূড়ামণি (জ্যোতিষ গ্রন্থ), সিদ্ধান্ত-শিরোমণি টীকা।

চক্রপাণি দত্ত—পণ্ডিত। পিতা—নানাদেব পাদ। জন্ম—১১শ শতাব্দী বঙ্গদেশে। গ্রন্থ—চক্রদত্ত বা সর্গসাবসংগ্ৰহ (বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ)।

চক্রবর্তী—জ্যোতির্বিদ। পিতা—তত্ত্বজ্ঞানসিংহ বামন। গ্রন্থ—যজ্ঞচিন্তামণি (জ্যোতিষগ্রন্থ)।

চক্রপাণি দত্ত—গ্রন্থ—বিজয়কল্পলতা।

চণ্ড মহারাজ—বঙ্গাকবিকবি। গ্রন্থ—প্রাকৃতলগ্নম (১৮৮০)।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকাব। জন্ম—১২৬৪ বঙ্গ, শ্রাবণ ২৪ পবণনাব অন্তর্গত বাবামতের নলকুড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৩ বঙ্গ। পিতা—রামকমল সার্বভৌম। গ্রন্থ—তুটখানি ছবি (১১৯৫ বঙ্গ) মনোবাব গৃহ (১২৯৯), না ও ছেলে (১২৯৮), কমলকুমার, পাপী নবজীবন লাভ, বিজ্ঞানগবেষ জীবনী সাক্ষরন।

চণ্ডীচরণ মজুমদার—কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। মৃত্যু—১৯০৫ খৃঃ ১লা ডিসেম্বর। গ্রন্থ—জুবিলী (কবিতা)।

চণ্ডীচরণ মুন্সী—ঐতিহাসিক। জন্ম—(অনু) ১৭৬০ খৃঃ। তাত্ত্বিক ইতিহাস (১৮০৫ খৃঃ)।

চণ্ডীচরণ সেন—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৪৫ খৃঃ বাগবগঞ্জ জেলা বাসড়া গ্রামে। মৃত্যু—১৯০৬ খৃঃ কলিকাতা। পিতা—নির্মল সেন। শিক্ষা—প্রবেশিকা (বিশাখা—১৮৬৩), নিয় ওকালত পরীক্ষা (১৮৭৮ খৃঃ) ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ (১৮৭০), মুন্সেফ ও সবজজ (১৮৯১)। গ্রন্থ—এট কি বামেব অযোগ্য (১৮৯২), দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১২৯৭), কামি বাবা, টমকাকার কুটীর (১৮৮১), চল্লিশ বৎসর (অনুবাদ, ১৩০০) জীবন-গতি নির্ণয় (১৮৮৩), লক্ষ্মীনাথ, লড মেটাকফেব জীবনী, মহারাজ নন্দকুমার, অযোগ্য বা বেগম।

চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ। পিতা—ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি। গ্রন্থ—শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, উদ্ভাস্ততত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, দায়ভাগ, শুদ্ধিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্তবিবেক (শুলপাণিকৃত), দণ্ডকচন্দ্রিকা, আত্মিকতত্ত্ব, কৃত্যতত্ত্ব, শুদ্ধিদিপিকা।

চণ্ডীদাস—পদকর্তা। জন্ম—১৪১৭ খৃঃ বীরভূমেব অন্তর্গত নাগরুবে। মৃত্যু—১৪৭৭ খৃঃ। পিতা—ভবানীচরণ (কাচাবও মতে হুগাদাস বাগচী) মাতা—ভৈরবী স্ত্রীমণী। ইনি বামুলী দেবীর পুত্র ছিলেন। ইনি স্ত্রীয়ায় ও শীকুল-ভক্তিপন্থায় ছিলেন। গ্রন্থ—পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডেশ্বর—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চণ্ডেশ্বর জাতক (১৫৮৭ খৃঃ), প্রসঙ্গচণ্ডেশ্বর বা চণ্ডেশ্বর প্রসঙ্গিকা।

চণ্ডেশ্বর ঠাকুর—স্মার্ত পণ্ডিত। ১৪শ শতাব্দীর প্রাবল্যে মিথিলাব রাজা হরি সিংহের অমাত্য। পিতা—বীবেশ্বর ঠাকুর। গ্রন্থ—কৃত্যবদ্ধাকব, বিবাদরত্নাকব (১৮৮৭)।

চক্রভূষণ—বঙ্গীয় কবি। কাব্যগ্রন্থ—হবিচরিত।

চক্রভূষণ মিশ্র—জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। গ্রন্থ—চক্রভূষণমিশ্র-নির্দেহ।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—প্রাচীন কবি। গ্রন্থ—বাইস কবি মনসা।

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—সাংবাদিক। সম্পাদক—কমলিনী (মাসিক। ১২৮৪ বঙ্গ)।

চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ—অনুবাদক। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ। অনূদিত গ্রন্থ—বদ্বংশ (বঙ্গানুবাদ)।

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিত ও ভাষ্যকার। জন্ম—১৭৫৮ শকাব্দ ময়মনসিংহেব শেখপুর গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৬ বঙ্গ। পিতা—রাধাকান্ত তর্কবাগীশ। নবদ্বীপ হইতে তর্কালঙ্কার উপাধিলাভ। অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ (১৮৮৩), মহামহোপাধ্যায় (১৮৯৭)। গ্রন্থ—গোভিল গৃহসূত্রের ভাষ্য, সত্যপরিণয়ম্ (ঢাকা, ১৭৭১), সত্যবতী চম্পু (বাং), প্রবেশনতকম্ (ঢাকা, ১২৭৬ শক), যুবরাজ-প্রশস্তি, কৌমুদীমুদ্রাকরম্, আনন্দভবঙ্গিনী, শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্য, ভাবপুষ্পাঞ্জলি, গৃহসংগ্রহ ভাষ্য, শিক্ষা, বৈশেষিক সূত্রভাষ্য (১৮৮৭), কৃষ্ণমাজলিটীকা, তত্ত্বাবলী (মটীক)। উদ্ধাতচন্দ্রালোক, কান্ততত্ত্বম্—প্রাকিয়া, চন্দ্রবংশম্।

চন্দ্রকান্ত শিকদার—কবি। গ্রন্থ—পতিত পাবতী (১২৬৭ বঙ্গ)।

চন্দ্রকিশোর বসু মজুমদার—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—মদমহাশ্মা (১৮৭৪ খৃঃ)।

চন্দ্রকিশোর বায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—শ্রীমন্ত সঙ্গদাগর (পাক্ষিক, ১২৯২)।

চন্দ্রকুমার চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—স্বকৌতুকচন্দ্রিকা।

চন্দ্রকুমার বায়—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—মহাবাজ বাজবল্লভ ও তাহার উদ্ভবদিকাবিগণের বৃত্তান্ত।

চন্দ্রচন্দ্র—আত্মবৈদিক। গ্রন্থ—(অষ্টাদ্ধ হৃদয়ের টীকা) পদার্থচন্দ্রিকা।

চন্দ্রনাথ বসু—গ্রন্থকাব ও সমালোচক। জন্ম—১২৫১ বঙ্গ হুগলী জিলা কৈকালী গ্রামে। মৃত্যু—১৩১৭ খৃঃ। পিতা—সীতানাথ বসু। শিক্ষা—এন্ট্রান্স (১৮৬০) ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, এম, এ (১৮৬৬), বি, এল (১৮৬৭), হাইকোর্টে ওকালতী ও পরে এডুকাট ম্যাজিস্ট্রেট। অধ্যক্ষ, জয়পুর কলেজ। লাইব্রেরিয়ান, বেঙ্গল লাইব্রেরী (১৮৭১), পরে বাংলা সরকারেব অনুবাদক। গ্রন্থ—ফুল ও ফল, শকুন্তলাতত্ত্ব, ত্রিধাবা, পুণ্ডপতি-সংবাদ, সাবিত্রীতত্ত্ব, হিন্দুতত্ত্ব, কঃ পন্থা, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি, বেতালে বহু বহু ও হিন্দুতত্ত্ব। সম্পাদক—বঙ্গদর্শন (১২৯০)।

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। সম্পাদক—বঙ্গমিহির। (ভবানীপুর মিশন কলেজ ১২৮০ বঙ্গ)।

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—Life of late Dasarath Roy (বহুবর্ষপূর্ব, ১৮৭৪ খৃঃ)।

চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—অনুবাদক। অনূদিত গ্রন্থ—রোগবিনিশ্চয় (১৮৭১)।

চন্দ্রনাথ শর্ম্মা—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—লক্ষ্মণবর্জন (শ্রীরামপুর, ১৮৭১)।

চন্দ্রনারায়ণ জায়পকানন—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। জন্ম—ফরিদপুর। গ্রন্থ—চান্দীপাঠিতা (জায়ের টিগুনী)।

চন্দ্রপ্রভ সূরী—জৈন ধর্ম্মাচাৰ্য। ১২শ শতাব্দী। গ্রন্থ—দর্শনশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্তকোষ, জায়বতাব বিবৃতি।

চন্দ্রভাবতী—অসমীয়া কবি। প্রকৃত নাম—হরিচরণ অনন্ত কল্লী। গ্রন্থ—বামায়ণ (অসমীয়া ভাষায়)।

চন্দ্রবংশ সাহিত্য—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—নলিনীমোহন (১২৯৭ বঙ্গ)।

চন্দ্রমোহন ঘোষ—গ্রন্থকাব। নিবাস—কলিকাতা। গ্রন্থ—  
ছন্দঃসারসংগ্রহ (১৮৯৩)।

চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—বসন্ত-পাগলিনী  
(১২৯২), পশুপতিসম্বাদ (১২৯২)।

চন্দ্রমোহন সেন—সাহিত্যিক। সম্পাদক—জ্ঞানভেদ (মাসিক,  
ঢাকা, ১২৮৪)।

চন্দ্রশেখর—বৈদ্যাকরণিক। গ্রন্থ—বৃত্তিমৌক্তিক, পিঙ্গলছন্দঃসূত্র  
(১৬৭৬ শক)।

চন্দ্রশেখর কব—ঔপন্যাসিক। বি. এ। গ্রন্থ—হৈমবতী, স্তবলা,  
সংকথা, ছ'আনাজ, পাপের পরিণাম, অনাথ-বালক।

চন্দ্রশেখর দাস—পালা-বচয়িতা। ইঁচাব পূর্বে আব কেহ যাত্রা-  
পালা রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। যাত্রা-পালা—  
—হবিবিলাস।

চন্দ্রশেখর দেব—সাহিত্যিক। নিবাস—কোমগুণ। ডেপুটি  
কালেক্টর। সম্পাদক—জ্ঞানোদয় (সংবাদপত্র, ১১৫৮  
বঙ্গ)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্বাদ  
জ্ঞানোদয় (সাপ্তাহিক, ১৮৫১ খৃঃ)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যিক। জন্ম—১১৫৬ বঙ্গ, ১১ই  
কার্তিক। পৈতৃক নিবাস নদীয়া জেলায়। মৃত্যু—১৩২৯, ২৮  
কার্তিক, বহরমপুরে। পিতা—বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। শিক্ষা—  
এন্ট্রেন্স পরীক্ষা (বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল), এফ. এ. ও বি. এ.  
(প্রেসিডেন্সী কলেজ)। শিক্ষকতা—বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল,  
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, হেড মাস্টার, পুটুরা স্কুল। বি. এল।  
আটন ব্যবসায়, বহরমপুর, কলিকাতা হাইকোর্ট, কিছুকাল মহারাজা  
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এন্ট্রেন্স ম্যানেজার, পরে বহরমপুরে বাস।  
গ্রন্থ—মঙ্গলবারী কাগজ, কৃষ্ণলহরী মনোরমকাব্য, উৎসাহ প্রেম, বস-  
গ্রন্থাবলী (বহরমপুর), সম্পাদক—মাসিক সমালোচনা (শামপুর),  
উপাসনা (মাসিক, ১৩১১—১৩১৯)। সনাতন ধর্মোপদেশিনী  
(মাসিক—১২৭৭)।

চন্দ্রশেখর বসু—গ্রন্থকাব। জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ। পিতা—  
কালিদাস বসু। গ্রন্থ—মানবকাব্য (১২৭৩), প্রলয়তরঙ্গ, পবলোক-  
তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, বেনাস্তদর্শন, হিন্দুরূপে উপদেশ, অধিকারতত্ত্ব,  
বক্তৃতা-কুস্তমাজলি।

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি—স্মৃতিপণ্ডিত। নিবাস নবদ্বীপ! গ্রন্থ—  
স্মৃতিপ্রদীপ, স্মৃতিসারসংগ্রহ, সঙ্কল্প-ভগ্নবচন, ধর্মবিবেক।

চন্দ্রশেখর বাজপেয়ী—কবি। জন্ম—১৭৯৮। মৃত্যু—১৮৭৫।  
দ্বারভাঙ্গা, ঘোষপুর এবং পাতিয়ালা-বাজের সভাকবি। গ্রন্থ—  
হিম্মত হাঠ।

চন্দ্রশেখর সেন—ভূপট্যক। জন্ম—১৮৫১ খৃঃ মালদহে।  
পিতা—হরিমোহন সেন। শিক্ষকতা, চিকিৎসা ব্যবসায়, বাব-এটল।  
পৃথিবী ভ্রমণ আবরণ (১৮৮৯ খৃঃ)। গ্রন্থ—ভূপ্রদক্ষিণ।

চন্দ্র সেন—আত্মবর্ণনাবিদ। গ্রন্থ—বসোচ্ছ্রোময়।

চন্দ্রাট—আত্মবর্ণনাবিদ। গ্রন্থ—যোগবন্ধ-সমুদায়, চন্দ্রাট সারোচ্ছ্রোময়,  
বৈজ্ঞানিক-শিষ্টিকা, স্রষ্টব্যপাঠশুদ্ধি।

চন্দ্রোদয় বিজ্ঞানবিদ—বাজনীতিবিদ। সম্পাদক—চিত্তবানী।

চমনলাল, দেওয়ান—বাজনীতিবিদ। জন্ম—১৮৯২ খৃঃ।  
ভাবতবর্ষীয় ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন (১৯১০)। গ্রন্থ—কুলি।  
সহ-সম্পাদক—Bombay Chronicle.

চবক—আত্মবর্ণনাবিদ। ১৭ শতাব্দী পুরুষপুত্র (বর্তমান  
পেশাবাব)। কনিষ্কেব সভা-সদস্য। গ্রন্থ—চবক-সাহিত্য।

চান্দ দাস—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—কালকেতুর চৌতিশ।

চাঁদ—অনুবাদক। পিতা—মধুবাণী। গ্রন্থ—সিঃহামন বতীসী  
(ফার্সী অনুবাদ)।

চাঁদ কবি—হিন্দী কবি। চাঁদ ববদাই নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্যু—  
১১৯২ খৃঃ। পৃথিবীজৈব মন্ত্রী ও সভা-কবি। গ্রন্থ—পৃথিবীজৈবরাসৌ  
(হিন্দী কাব্য)।

চাঁপক্য—নামাত্তব কোটীলা, বিষ্ণু গুপ্ত। জন্ম—তক্ষশিলা।  
চন্দ্রগুপ্ত মোর্যের মন্ত্রী। গ্রন্থ—অর্থশাস্ত্র, শ্লোক।

চামুণ্ডবায়—জৈন গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—চামুণ্ডবায় পুরাণ (৯৭৮ খৃঃ,  
অন্ত), গোপ্তবায়।

চামুণ্ডা কায়স্থ—আত্মবর্ণনাবিদ। গ্রন্থ—ঐতিহ্যমিহরভাসব।

চাকচন্দ্র ঘোষ—সাহিত্যিক। মৃত্যু—১৩০৯ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক  
—বিল (মাসিক পত্র, ১২৯৪ ৯৬)।

চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ঔপন্যাসিক ও গ্রন্থকাব। জন্ম—  
১৮৭৭ খৃঃ মালদহ জেলার চাটাল গ্রামে। মৃত্যু—১৯৩৮ খৃঃ।  
পিতা—গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বি. এ (প্রেসিডেন্সী কলেজ  
১৮৯৯), এম. এ (ঢাকা—অনাগরি), অধ্যাপক কলিকাতা  
বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থ—পুষ্পপাণ্ড,  
সংগীত, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হাইফেন, দোঁটানা, মুক্তিদান,  
স্রোতের ফুল, পাগড়া, নষ্টচন্দ্র, যমুনা পুলিনের ত্রিধাবিধী, চৌবর্কটা,  
বিজাপতি, গোঁদাস ও অজ্ঞাত বৈষ্ণব মহাকবিগণিকা, আশুনের  
ফুলকি, আলোকলতা, মন-নামতি, সর্বনাশের নেশা, ধোঁকাব টাটি,  
পঞ্চদশী, তেব-ফের, জোড়াবজোড়, নোও-ছেঁড়া নৌকা, বন্ধাবলী,  
জয়শী, পাবনা উপহাস, যানব-হাট, বরিনসন কুশো, ঈশপের গল্প,  
ভাতের জন্মকথা, বেদবাণা (পার্বীমোহন সেনগুপ্ত সহ), বরিনসি  
১ম, ২য় খণ্ড। সম্পাদিত গ্রন্থ—শৃঙ্গপুরাণ, কবিকল্প চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল-  
বোধিনী, কাদম্বরী। সম্পাদক—ভাবতা, সহ-সম্পাদক—প্রবাসী,  
মডার্ন বিল্ডিং।

চাকচন্দ্র বসু—গ্রন্থকাব। গ্রন্থ—বৌদ্ধগুণে ভারত মতিলা  
(১৯০০), অশোক অনুশাসন, দশমপদ।

চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য—শিক্ষাবিদ। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ব-  
বিদ্যালয়; শান্তিনিকেতন। গ্রন্থ—বাবিণ পুরাণ, জগদীশচন্দ্রের  
আবিষ্কার (১৩৫০), বিশ্বের উপাদান (১৩৫০), প্রাবল্য খণ্ড  
(বিজ্ঞান-প্রবেশ গ্রন্থমালা), পদার্থবিজ্ঞান, ১ম-৩য়, তত্ত্বের অধ্যয়ন,  
আচার্য জগদীশচন্দ্র।

চাকচন্দ্র মিত্র—সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতা বৌদন স্ট্রীট।  
পিতা—চন্দ্রনাথ মিত্র। আদি নিবাস আটপুৰ (ভগলী)। শিক্ষা  
এম. এ. বি. এল। আটন ব্যবসায়ী। গ্রন্থ—গোঁড় ও পাণ্ডুরা।  
সম্পাদক—যমুনা (ফৌজদারী পাল সহ—১৩৩০), সঙ্কল্প (অমলাচরণ  
বিজ্ঞানভূষণ সহ—১৩২১), সহ-সম্পাদক—মানসী ও মর্মবাণী, পঞ্চপুষ্প  
(১৩৩৭), বঙ্গীয় মহাকাব্য।



চিন্তাশাস্ত্র—দার্শনিক পণ্ডিত। ১৩শ শতাব্দী। গ্রন্থ—  
জ্ঞানমকমল (প্রথম মুদ্রিত—বেনাবস, ১৯০১)।

চিত্তবজ্ঞান দাশ, দেশবন্ধু—কবি ও রাজনীতিবিদ। জন্ম—১৮৭০  
খৃঃ ঢাকা জেলায় তেলিগা গ্রামে। মৃত্যু—১৯২৫ খৃঃ দার্জিলিং  
ষ্টেশনসাইটে। পিতা—ভুবনমোহন দাশ। বাব-এটল, কলিকাতা  
হাটকোর্ট, সভাপতি—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (১৯১৭),  
অসহযোগ আন্দোলনে আইন-ব্যবস্থা পবিভাগ ও কারাবরণ (১৯২১)  
গয়া কংগ্রেসে সভাপতি (১৯২২)। গ্রন্থ—সাগর-সঙ্গীত (১৯১৩),  
মালক (১৮৯৫), মালা (১৯০৩), অন্তর্গামী, (১৯১২),  
কিশোরকিশোরী। সম্পাদক—নাবায়ণ (মাসিক পত্র ১৩২-১২৯),  
বাঙালি কথা (বাসন্তী দেবী সহ—১৩৩৮-১৩৩৯)।

চিত্রপতি শর্মা, মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিত। কোলকাতা সাহেবের  
অনৌন কর্ম। গ্রন্থ—সিদ্ধান্তপীঠ (স্মৃতিগুরু—বঙ্গভাষায়)।

চিত্তামণি—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—বমল চিত্তামণি, বমনোৎকর্ষ,  
গ্রন্থগণিত চিত্তামণি।

চিত্তামণি, চিত্তমণি যজ্ঞেশ্বর—সংবাদ ক্রমসেবী। জন্ম—১৮৮০  
খৃঃ। সম্পাদক—Leader (এলাহাবাদ), গ্রন্থ—Indian  
Social Reform, Speeches & Writings of Sir  
Pheroze Shah Mehta.

চিত্তামণি বিজ্ঞানদ্বার, কবিবর—ভাষ্যকার। গ্রন্থ—নিকম্বভাষ্য  
(হিন্দী টীকা সমেত—১৯২৫-২৬)।

চিদম্বর—সংস্কৃত কবি। গ্রন্থ—বাচন-পাণ্ডুরীয় যাদবীর।

চিবঞ্জীব ভট্টাচার্য—গ্রন্থকার। নামান্তর—চিবঞ্জীব শর্মা। প্রকৃত  
নাম—বামদেব ভট্টাচার্য। জন্ম—১৮শ শতাব্দী বর্তমান জেলায়  
গুপ্তিপাড়া গ্রামে। পিতা—সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি বঙ্গ দেশের  
যশোরস্থ সিংহের সভাপাণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থ—বিজ্ঞানমহাত্মবঙ্গী,  
মাপচম্পু, কাব্যবিলাস, বৃন্দাবনাবলী।

চিবঞ্জীব শর্মা—কবি ও সঙ্গীতকার। প্রকৃত নাম—ইলোকাননাথ  
মাণিক। ইনি নববিদ্যান সমাজকর্তৃক। ইনি শ্রীশ্রী বামকৃষ্ণদেবের  
অত্যন্ত শ্রিয় ছিলেন। গ্রন্থ—গীতবন্ধাবলী ১-৪র্থ খণ্ড, অমৃত গবল,  
ভক্তচৈতন্যচন্দ্রিকা, কেশবচরিত (১৮৯৭), ব্রহ্মগীতা (১৯০৬)  
ইত্যাদি পঞ্চকাল। সম্পাদক—নববিদ্যান (১৩০০-১৩১৬)।

চুনীলাল বসু, ডাঃ—টিকিৎসক ও গ্রন্থকার। জন্ম—১৮৬১ খৃঃ  
কলিকাতা, বাগবাজার। মৃত্যু—১৯২০ খৃঃ বাঁচা। পৈত্রিক নিবাস—  
২৪ পবগনা চাণ্ডীপোতা। বায় বাতাস (১৮৯৮), সি আই, টি  
(১৯১৫) উপাধিলাভ। গ্রন্থ—যাতা, শারীর স্বাস্থ্যবিদ্যান।

চুনীলাল মিত্র—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হীকাজুরী, পাবেব নৌকা  
(১৯১৬), ফুলেব তোড়া (১৯১৯), মাতাজী আশ্রম (১৯১৫)।

চুষন শর্মা—হিন্দী অনুবাদক। গ্রন্থ—পুণ্য পবাক্ষ কা  
অনুবাদ (বিজ্ঞাপিত কৃত সংস্কৃত মূল সহ দ্বাবাদ্য, ১৮১০ শক)।

চৈতন্যচরণ—ভক্তিশাস্ত্রবিদ। গ্রন্থ—প্রেমলহরী।

চৈতন্যচরণ অবিকারী—সংবাদপত্রসেবী। সম্পাদক—সম্মান  
জ্ঞানাজন [সাপ্তাহিক—দ্বিভাষিক (ইংরেজি ও বাংলা) পত্রিকা—  
১৮৪৭ খৃঃ]।

চৈতন্যদাস—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—রসভক্তিচন্দ্রিকা, দেহ-ভেদ-  
তত্ত্ব।

চমিকুদ্দিন মণ্ডল—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—হায় রে সেদিন কোথায়  
গেল (কবিতা—১৩০৫)।

জগদীশ দেব সরকার চৌধুরী—কবি। গ্রন্থ—অজ্ঞোহাত কাব্য  
(১৮৬৮ খৃঃ), কামিনীকদম্ব (১৭৮৫ শঃ), ত্রিসঙ্খ্যা  
(১৯৭৯ বঙ্গ)।

জগজীবন মিত্র—গ্রন্থকার। জন্ম—শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত  
ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। গ্রন্থ—মনঃসন্তোষিনী।

জগৎবল্লভ—বঙ্গীয় কবি। গ্রন্থ—মনসার ভাসান।

জগদানন্দ ঠাকুর—পদকর্তা। জন্ম—১৭০২ খৃঃ রাণীগঞ্জ  
মহকুমাব অদীন আগবডিতি দক্ষিণখণ্ড গ্রামে। মৃত্যু—(অমৃ) ১৭৮২  
খৃঃ। পিতা—নিত্যানন্দ ঠাকুর। গ্রন্থ—ভাষা শব্দার্থ (অসম্পূর্ণ)।

জগদানন্দ বায়—বৈজ্ঞানিক ও গ্রন্থকার। জন্ম—(১৮৮৯ খৃঃ)  
১২৯৬ বঙ্গ কলকাতায়। মৃত্যু—১৯৩৪। পিতা—অভয়ানন্দ বায়।

বি-এ (১৮৯০), অধ্যাপক, বোলপুর বিশ্ববিদ্যালয়। বায় সাহেব  
উপাধি লাভ। গ্রন্থ—প্রাকৃতিক, গ্রন্থনক্ষত্র, বৈজ্ঞানিক, গাছপালা  
(এলাহাবাদ, ১৯০১), পোকা-মাকড়, বিজ্ঞানের গল্প, মাছ ব্যাঙ  
সাপ, প্রকৃতি পরিচয়, বাঙ্গালার পাখী, শব্দ, পাখী, আলো, স্থির-  
বিহাং, চল-বিহাং, চুষক, আটাই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, তাপ  
(এলাহাবাদ, ১৩৩৫), দুটি বই, নক্ষত্র চেনা (কলি, ১৯৩১)।

জগদীশনাথ রায়, মহাবাজা—কবি ও সাহিত্যিক। জন্ম—১৮৬৮  
খৃঃ (১২৭৫ বঙ্গ) বাজপাঠী জেলায়। মৃত্যু—১৯২৬ খৃঃ। নাটোবের  
মহাবাজা গোবিন্দনাথের নিঃসন্তান বিদ্যা ইত্যাদি দত্তক গ্রহণ  
করেন। মহাবাজা উপাধি (১৮৭৮ খৃঃ), প্রবেশিকা (১৮৭৫ খৃঃ)।  
Bengal Land-holders Association প্রতিষ্ঠা (১৯০১),  
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৮৯৫ ও ১৮৯৭)। গ্রন্থ—সম্মানতা,  
শ্রুতিস্মৃতি, দাবাব অদৃষ্ট, নৃবজ্ঞান। সম্পাদক—মর্মবাকী (সাপ্তাহিক  
—অমূল্যচরণ বিজ্ঞানসহ—১৩২২), মানসী ও মর্মবাকী  
(মাসিক, প্রভাতকুমার মুগোপাধ্যায় সহ—১৩২২-১৩৩৬),  
মানসী (১৩২০—১৩২২)।

জগদীশনাথ লাঠিট্টা—সাহিত্যিক। সম্পাদক—সাহিত্য-সংঘ  
(১৩৩২—৩৬)।

জগদীশ গুপ্ত—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—অসাধ সিদ্ধার্থ, রূপের বাহিবে,  
শ্রীমতি, ছললেব দোলা, রোমন্থন, মহিষী, লগ্নুক্ষ, বিনোদিনী।

জগদীশ চক্রবর্তী—গ্রন্থকার। গ্রন্থ—প্রেমপুঞ্জালি (ঢাকা,  
১৯০১)।

জগদীশ তরালদ্বার—নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ১৭শ শতাব্দীর  
প্রথম ভাগে। পিতা—যাদবচন্দ্র বিজ্ঞানবাগীশ। গ্রন্থ—দীপ্তির টীকা,  
তর্কামৃত, কাব্যপ্রকাশ, বহুপ্রকাশ (টীকা ১৬৫৭ খৃঃ), শব্দশক্তি-  
প্রকাশিকা, প্রস্তাববাদ (ভাষ্য), দ্বাবভাষ্যের টীকা, মুক্তিবিচার। \*  
[ক্রমশঃ।

\* 'সাহিত্য সেবক-মঞ্জরী' মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক  
প্রকাশিত হওয়ায় উল্লেখিত এবং অনুলিখিত লেখকদিগের বিষয়ে  
প্রচুর পত্র পাওয়া যায়। পত্রালাপেছ ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য  
লেখকের ঠিকানা দেওয়া হইতেছে :—১২ বি, মোহনবাগান লেন,  
কলিকাতা।—স

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রধান সমাজসেবক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে শ্রাব সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৭—১৮৯৮) সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে বহু পুস্তক লেখা হয়েছে। এই সব পুস্তকে—বিশেষ করে ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ক্রিয়াকলাপের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা অল্প-বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। অতি সংকীর্ণ মুসলমান জমিদার ও মোল্লা মৌলভীদের মধ্যেই তাঁর আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল; সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর মতামতে কোন বৈশিষ্ট্য অথবা মৌলিকতাও ছিল না। বাজা রামমোহন বায়েব সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হলেও শ্রাব সৈয়দকে কোন মতেই ধর্মসম্প্রদায়িক অথবা দার্শনিক বলা যেতে পারে না।

শ্রাব সৈয়দের রাজনৈতিক মতামত বিশেষ ববে জাতীয় कांग्रेसের প্রতি তাঁর নেক-মনস্ক, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশে ও ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা, হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের লেঙ্গিয়ে দেওয়া ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তীব্রতর করে তোলা ভারতের ইতিহাসে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সৈয়দ আহমেদের রাজনীতি ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই পদবতী যুগের মুসলিম নীগেব আদর্শ ও রাজনীতির নীজ অঙ্কুশিত হয়।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে দিল্লী নগরীতে সৈয়দ আহমেদ গায়ের জন্ম হয়। এক বিশিষ্ট জমিদার-পরিবারেই তাঁর জন্ম হয়। এই জমিদার-বাংশের বরাবরই মোগল রাজত্ববাবে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। এমন কি, মোগল সম্রাটদের স্বাধীনতা বিলুপ্তির পাবেও এই জমিদার-বাংশের মোগল রাজত্ববাবে স্বেচ্ছা প্রতিনিধি ছিল। মোগল রাজত্ববাবের সৈয়দ আহমেদের শৈশব কাল অতিবাহিত হয়। আবদী ও পাশী সাহিত্য এবং ইসলাম মধ্যে সন্নিবিষ্টতায় মায়ের কর্যেব তত্ত্বাবধানে শৈশবে সৈয়দের শিক্ষা আবিস্ত হয়। মোগল সম্রাটের শাসনশাস্তীর অন্তঃসাম্প্রদায়িক সৈয়দ উপলব্ধি করে দেখলেন যে, দেশের প্রকৃত শাসক ব্রিটিশ। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে দূর ও নিকট আশ্রয়-স্বজনের তত্ত্বাবধানে সৈয়দ মোগল সম্রাটের রাজত্ববাবের সঙ্গে বংশগত সম্পর্ক চূর্ণিয়ে দিলেন। তাঁর পর ব্রিটিশ শাসকের অধীনে এক জন কেবাবী নিযুক্ত হন। পরে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রী ও বিজ্ঞানোরে জুজ সারগেব পদ লাভ করেন।

## সৈয়দ আহমেদ ও সিপাহী বিদ্রোহ

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়ে সৈয়দ আহমেদ ব্রিটিশ শাসকের পক্ষ অবলম্বন করেন। শুধু তাই নয়, শত্রুতা করে বিজ্ঞানোরে বহু ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্সী অবরোধকারী বিদ্রোহীদের শিবিরে এসে তিনি প্রস্তাব করলেন যে, উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী গোটা জেলাব বন্দুধ এক সরকারী দলিলে দস্তখত করে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিলে বিদ্রোহীরা শত্রু থেকে নির্বিঘ্নে ব্রিটিশদের চলে যেতে দিতে বাজী আছেন কি না? বিদ্রোহীরা এই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। সৈয়দ আহমেদ স্বয়ং পাঠায়া দিয়ে ব্রিটিশদের মীরাতে পৌছে দেন। ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন স্তরের জনতা যখন ইংল্যান্ডেব ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লিপ্ত, ঠিক সেই সময়েই

# শ্রাব সৈয়দ আহমেদ

এল-আই-মুরোজ

সৈয়দ আহমেদ খাঁ নিজের জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ কর্মচারীদের জীবন রক্ষা করলেন।

ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় তাঁর কাছে ধনী থাকলেন না; বিদ্রোহ দমনের পর সবকাদের কাছ থেকে পুস্তকাব অর্থ মোটা টাকা পেলেন আবার পেলেন বাজভুক্তির প্রতীক “নাইট স্টার অব ইণ্ডিয়া” (Knight Star of India) ও “স্রাব” উপাধি। ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা পথ্যালোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবেই হ’ল ভারতীয় মুসলমান সমাজের দাবিদা এবং আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। সৈয়দ আহমেদ নির্ধারণ করলেন যে, শিক্ষাই হ’ল ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপির একমাত্র ঔষধ।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। পাশ্চাত্যের বুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং শিল্পজ্ঞান তাঁকে প্রভাবান্বিত করে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাশ্চাত্যের সমুন্নত বুদ্ধিই হ’ল ভারতবর্ষ সহ যাবতীয় দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি পবিত্রকলা অনুসারে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কাজ আবিস্ত করেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে জাতীয় कांग्रेस প্রতিষ্ঠিত হবার পাবে সৈয়দ আহমেদ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জাতীয় कांग्रेसের বিবেচনা করার চেষ্টা গঠন করেন। সবকাদের তাঁর এই জাতীয় আন্দোলনের নিবেদিতা করার পুস্তকাব হিসাবে তাঁকে নাইসগয়েব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ৮ বার সদস্য মনোনীত করেন।

## সৈয়দ আহমেদের সাংস্কৃতিক অবদান

সৈয়দ আহমেদ “Archaeological History of Delhi”, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে রিডোহের কারণ সম্পর্কে “আমরাক-বাঘাওয়াত-হিন্দ”, “Mohomedan Commentary on the Holy Bible”, “Letters on a Journey to Europe” এবং “Essays on the Life of Mohammed” নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। ইনবিশ শতাব্দীর শেষের দিকে “সোস্তাল বিসর্গাব” নামে কথানি রাজনীতি-সাহিত্যমূলক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর যাবতীয় রচনা উর্দু ভাষাতেই পড়িত।

সৈয়দ আহমেদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অঙ্গাঙ্গিভাবে বিভাজিত। তিনি নিবেদনা করে দেখেছিলেন যে, ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম ও দাবিজোর হাত থেকে বন্ধা করতে হলে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগৃত করতে হলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করা। এই কারণেই তিনি ভারতের ব্রিটিশ শাসনায় মুসলমান অবদান বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক বৃদ্ধাপ্রভাব ও উভয়ের মধ্যে সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের একতর অভাবই ছিল সবকাদের প্রধান দুর্বলতা। এর ফলে ছিল ভারতীয়দের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার

অশাব। তিনি আবও ভেবেছিলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতীয়েরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ভারতের উন্নতির জন্যেই ইংল্যান্ড ভারত অধিকার করেছে। যখনই তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার আশ্বাদ পাবে তখনই তারা শাসকদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। শিক্ষা-বিস্তারের নামে সৈয়দ আহমেদ কোন্ লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন তাই বিশ্লেষণ নিম্নয়োজন।

সৈয়দ আহমেদের মতামতসাবে অজ্ঞানতাই হল ভারতের বাবতীয় উৎপত্তি। ভারতীয়েরা যদি শিক্ষিত হত তা'হলে তারা উপলব্ধি করতে পারত যে, ইংল্যান্ড ভারতের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল করতে আসে না। শুধু তাই নয়, এ ধরনের শোচনীয় বিদ্রোহ ঘটিত না। সৈয়দ আহমেদের নিজের কথায়: “এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নাই যে, ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ভারতীয়েরা যদি ইংল্যান্ডের শাস্তি সম্পর্কে অবগিত হত তা'হলে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ দেখা দিত না।”

সৈয়দ আহমেদ বলেছিলেন যে, ধর্মের গোড়ামী ও ধর্ম-ইতিহাসের ঐতিহ্যের প্রতি অতি-সম্প্রতি ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপবর্তনের মুসলমান শ্রেণী দেশের সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের অজ্ঞতার মূলও ছিল এই। সমাজের অভিজাতেরা তাদের ভারতের উপরে প্রাচীন আদিপুত্রের কথা গ্রহণ করে গোঁব অগ্রহণ করেন। এর জন্যেই নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল বিকল্প। এই বিকল্প মনোভাবের কারণ একটা ছিল। তাঁদের মতে নয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় শিক্ষানীতিকে আমল দেয় নাই এবং অভিজাত-পরিবারের যুবকদের হিন্দুদের পাশে এসে শিক্ষালাভ করতে বাধ্য করেন। সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের ঐতিহ্য ও প্রচার প্রতি অন্ধা, কোর্বাণের উপর অক্ষিপাশ এবং তথ্যবিশিষ্ট ধর্ম-ইতিহাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; হিন্দু, খৃষ্টান ও অগ্নাহ ধর্মমতের প্রতি সঠিকতা প্রদর্শন করার অভিধান চালানেন সত্যি, কিন্তু বাস্তবিকভাবে উদ্দেশ্য সাধন করতে ধর্মকে বাতিল করতে ছাড়লেন না। ইসলামের পবিত্র সত্য-সত্য প্রমাণ দেবার প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল উপবর্তনের মুসলমান সমাজের বৃটিশের সঙ্গে বাস্তবিক ও সামাজিক সহযোগিতার পথ প্রদর্শন করা। সৈয়দ আহমেদ যুক্তি দিয়ে বলে দেখিয়েছিলেন যে, ইসলামের বাণী অব্যয় নয়—যুগের উপযোগী তাকে খাপ খাইয়ে নিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর মতে ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম কর্তব্য হয়েছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

মুসলমান সমাজের উপবর্তনের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জগ্রে সৈয়দ আহমেদ বসমতের পূর্ব বসমত কি করেছিলেন তাই আলোচনা করা যাক।

### গাজীপুরের বৈজ্ঞানিক সমিতি

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ গাজীপুরে একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির সদস্যগণ ছিলেন মুসলমান। প্রধানতঃ সৈয়দ আহমেদের বন্ধুগণই ছিলেন এই সমিতির সদস্য। আর ইংরাজ মত সরকারী কর্মচারী আলী-গড়ের জজ মৌলভী সমিউল্লাহ খাঁ, মৌলভী সৈয়দ মেহদী আলী

খাঁ ও আরও অনেকে ছিলেন এই সমিতির সদস্য। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীরাও এই সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সমিতির সদস্যগণ ইংরাজী ইতিহাস, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি উর্দু ভাষায় অম্ববাদ করতেন। অম্ববাদ কবাই এই সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না—মুসলমান ও ইংরাজদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ও সহযোগিতা কবাই ছিল উদ্দেশ্য। জেলার অভিজাত মুসলমানগণ প্রায়ই সৈয়দ আহমেদের গৃহে সভা কবতেন এবং এই সভায় ইংরাজ কর্মচারীগণও যোগ দিতেন। মুসলমান সমাজের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তার কবাব প্রয়োজনীয়তা, ইমুলাম ধর্মে ইংরাজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার পথে অম্ববাদ নাই, এবং কি ভাবে এক জনগণ প্রথা ফলে উভয়ে পৃথক হয়েছে, এ সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদ ধারাবাহিক আলোচনা কবতেন। বৃটিশদের প্রতি মুসলমানদের অম্বগত্যের কথাও আলোচনা করতেন আবার বৃটিশদেরও ভারতীয় মুসলমান সমাজের প্রতি বন্ধুত্বাবাপন্ন হবার উপদেশ-বাণীও বর্ষণ কবতেন। ইংরাজেরাও এই সন্যোগের সম্ভাবনা কবতে ছাড়তেন না। তাঁরা মুসলমান সমাজের এক শ্রেণীর লোকের ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হবার আকাংক্ষায় প্রেরণা দিতেন এবং ভারতের বৈদেশিক শাসকের সহিত সহযোগিতা কবাব উপদেশ দিতেন।

### সৈয়দ আহমেদের পত্রিকা

১৮৭০ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ উর্দু ভাষায় বাস্তবিক-সাহিত্যমূলক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আট বৎসর ধরে পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানির নাম “ইনষ্টিটিউট গেজেট”। সৈয়দ আহমেদ ও তাঁর বন্ধুরা বিজ্ঞান, সমাজ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখতেন। মুসলমানদের ইতিহাস ও মুসলমানদের পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দাবাবাহিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হত। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বৃটিশের সঙ্গে সহযোগিতার আবশ্যকতার কথা এই পত্রিকায় নিয়মিত প্রচার কবা হত। আবও প্রচার কবা হত যে, ইসলাম ধর্ম বদ্বিশীল ধর্ম নয়। যুগের সঙ্গে তাই বেগে চলিই হল ধর্মের সাব কথা। মুসলমান যুবকদের জগ্রে একটি কলেজের আবশ্যকতার কথাও পত্রিকায় প্রচার কবা হত।

পত্রিকার কয়েক সংখ্যা লেব হতে না হতেই বিভিন্ন সভা-সমিতি থেকে এবং পত্রিকায় সৈয়দের পত্রিকার, স্বয়ং সৈয়দের ও সৈয়দের প্রস্তাবিত কলেজের উপরে আক্রমণ শুরু হল। সৈয়দ ভারতে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংস করার যত্ন গ্রহণ করেছেন—এই অভিযোগ করে তাঁকে আক্রমণকারীরা আসামীর কাটাগড়ায় দাঁড় করালে। কয়েকটি প্রবন্ধে মোল্লা মৌলভীরা লিখলেন যে, কলেজের সম্মুখে সৈয়দের এক মর্মের মূর্তি তৈরী করা হবে এবং ইমুলাম ধর্মের পৌত্তলিকতা বিরোধী নাস্তি অবমাননা করার জগ্রে ছাত্রদের সৈয়দের মর্মের মূর্তিকে প্রণাম করে কলেজে ঢুকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার অনেকে ইউরোপীয় পোষাকে ছাত্রদের চলা-ফেরার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুললেন।

এ কথা অস্বীকার কবাব উপায় নাই যে, সৈয়দের পত্রিকা মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ এনেছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

ঠার প্রচারকাঁর্ষট সমাজের উপরতলার মুসলমানদের মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গাজীপুরের বাসায় যে সব জমিদার ও সরকারী কর্মচারী সভা করতেন কেবল মাত্র ঠাদের মধ্যেই এই নয়। জাগরণ সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান জনসাধারণ ঠার আলোচনা-সভা অথবা পত্রিকা অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সংবাদই রাখত না। এই পত্রিকা মুসলমানদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা বন্ধমূল করে দিল যে, সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমান মূলতঃ এক জাতি। ভাবতের মুসলমানদের জাতীয় ও প্রাদেশিক বৈষম্যের কথা বিবেচনাই করা হ'ল না। সৈয়দের পত্রিকার সমসাময়িকী সহযোগী লিখেছিল : “এই পত্রিকা মুসলমানদের জাতীয় অমুভূতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল; সেই অমুভূতি প্রাপ্তি তারা বিশ্বস্ত হয়েছিল।” ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে এক কথা বলা অস্বাভাবিক হ'বে না যে—“জাতি” “জাতীয়তাবাদ” “জাতীয় ঐক্য” “জাতীয় সম্মান” ইত্যাদি কথাগুলি মুসলমানদের উচ্চারণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠার সৈয়দ।” এক কথা বলা ঠিক হ'বে যে—সৈয়দ আহমেদই “মুসলীম সম্প্রদায়” “মুসলীম জাতি” প্রভৃতি ধারণা মহিমামিত করতে শুরু করেছিলেন। “মুসলীম সম্প্রদায়” -এই ধারণার মধ্যে গোটা ভারতীয় মুসলমান সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুসলমানেরা যে শুধু ধর্মের দ্বারা ইকাকৃত তা নয়, জাতি হিসাবেও মুসলমানেরা এক জাতি। মুসলমানদের তিনি বিভিন্ন জাতি থেকে পৃথকীকরণ করেছিলেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে যে মাসে সৈয়দ আহমেদ আলীগড়ে মুসলীম-আংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের (Muslim Anglo-Oriental College) প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যক্তিগত চান্দায় কলেজ নির্মিত হয় এবং কলেজের সঙ্গে একটি ছাত্রাবাসও সংযুক্ত ছিল। অধিকাংশ ছাত্রই এই ছাত্রাবাসে থাকত। উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলেও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আঁবোপ করা হত। কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ইংরাজ। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সৈয়দ আহমেদ নিজেকে কলেজের প্রধান সেক্রেটারী হিসাবেই বিবেচনা করতেন। স্বভাবতই কলেজের সব ভারই ঠার উপর গুস্ত হয়েছিল। যা হোক, বহুলাংশে কলেজ ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালী অমুকরণ করে ফেলে। খেলাধুলার ব্যাপারে বেশী ভাগ সময়ই ব্যয় করা হত; খেলাধুলার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত; একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল—এই ক্লাবে ছাত্রেরা বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক করত। ছাত্রেরা প্রত্যহই মসজিদে যেত কিছু শিয়া ও সুনুইরা পৃথক ভাবে উপাসনা করত।

### আলীগড় কলেজের উদ্দেশ্য

বুটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, ইংরাজদের সব কিছুই প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং ভারতবর্ষে বুটিশ ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করার জন্তে শাসনযন্ত্রটি চালাবার উপযোগী কেরানী উৎপাদন করাই ছিল আলীগড় কলেজের একমাত্র উদ্দেশ্য। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে এই কলেজের স্থাপয়িতাগণ তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনকে যে মানপত্র প্রদান করেন তাতে এই কলেজের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল : “বুটিশের দান ও মহত্ব বুঝবার মত শক্তি আমাদের দেশবাসী যাতে অর্জন করে

সেই মত দেশবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা; মুসলমানদের বুটিশ-রাজের যোগ্য ও উপযুক্ত প্রজা হিসাবে সংগঠন করা; বিদেশী শাসকের নিকট বক্তৃতা স্বীকার করা নয়—একটি মহান সরকারের মহান অবদানের দ্বারা মুসলমানদের অমুপ্রাণিত করাই হল এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।”

অবশেষে ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে সৈয়দ আহমেদ “মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন” সংগঠন করেন। এই সম্মেলনটিকে শিক্ষামূলক হিসাবে প্রচার করা হলেও আসলে এটি ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র-প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। ১৮৮৫ খৃঃ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় আর ঠিক পর বৎসরেই সৈয়দ আহমেদ এই সম্মেলন সংগঠন করেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়—জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন যে মাসে অনুষ্ঠিত হ'ত ঠিক সেই মাসেই এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হ'ত। জাতীয় কংগ্রেসে মুসলমানেরা যাতে যোগদান করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই সৈয়দ আহমেদ এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের সর্গভারতীয় রাজনীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করেন নাট—মুসলমানদের আলোচনাকে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িক ও পৃথকীকরণ ভিত্তিতে পরিচালনা করেছিলেন সৈয়দ। এই সম্মেলনে তিনি প্রকাশ্যেই কংগ্রেস বিরোধিতা বক্তব্য নিয়েছিলেন।

### সৈয়দের শিক্ষানীতি কি প্রগতিশীল ছিল ?

সৈয়দ আহমেদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এই ছিল ধারা। কিরূপে এম মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে? এ থেকে কি শিক্ষাস্ত করা যেতে পারে? যাবতীয় সাহিত্যে—সে মুসলীম লীগের হোক, কংগ্রেসবই হোক আর ইংরাজবই হোক সবচেয়েই সৈয়দ আহমেদের কাজের একটা সদর্থক (positive) মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন এক জন “মহান শিক্ষাবিদ”। শুধু তাই নয়—বলা হয়েছে সৈয়দ আহমেদ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন বায়।

শিক্ষা-বিস্তার যে প্রগতিশীল কাজ তাতে সন্দেহ ক'ব কিছুই নাট, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য অথবা এম দাবা যে রাজনৈতিক স্বার্থ সাধন করা হবে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিক্ষানীতি আলোচনা করা ঠিক হ'বে না। সব কিছুই একত্রে আলোচনা করে দেখতে হ'বে! শিক্ষাক্ষেত্রে সৈয়দ আহমেদের অবদানের মূল্য নিকপণ করা যদি হয় তাহ'লে মাত্র একটা সিদ্ধান্তই করা যেতে পারে। আর সে সিদ্ধান্ত হচ্ছে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পৃথক করতে সৈয়দ আহমেদ সাহায্য করেছিলেন এবং ইংরাজদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের বক্তৃতা স্বীকার করতে ভারতীয়দের প্রলুব্ধ করেছিলেন। এই করে তিনি ভারতে বুটিশ শাসন সূদূত করতে সাহায্য করেছিলেন। ভারতীয় ও তাদের ঔপনিবেশিক প্রভুদের মধ্যে “পারস্পরিক বুঝাপড়া” ও “সহযোগিতা” মুসলমানদের মধ্যে বুটিশ-প্রীতি; ভারতের বুটিশ শাসনযন্ত্রটি পরিচালনা করার উপযোগী রাজভক্ত কর্মচারী সৃষ্টি করার কাজে সৈয়দ আহমেদ আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বুটিশ সংস্কৃতির কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদ

আধুনিক ঠাইলে ভারতীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য সৃষ্টির জগৎ আবেদন জানিয়েছিলেন। বাস্তবিক এই সময় হতেই উর্দু ভাষায় সাংবাদিকতার শুরু হয় এবং নয়া পথে উর্দু সাহিত্যের বিকাশ হয়। এই সময় হতেই উর্দু শব্দকোষে পার্শ্ব ভাষার প্রভাবের অবনতি ঘটে এবং হিন্দী শব্দের আবির্ভাবের বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর কারণ একটা ছিল। উর্দু ভাষাকে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে পৌঁছে দিতে ও তাদের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে উর্দু সাহিত্যে হিন্দী শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ভুলে চলবে না যে, এই বিশেষ ব্যাপারটিতেও সৈয়দ আহমেদ কেবল মাত্র মুসলমান সমাজের কথাই মনের মধ্যে রেখে চলেছিলেন। তিনি জ্ঞাতসারেই মুসলমানদের মধ্যে অতি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন এবং নিজেকে নিখিল ভারত জাতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় লোকের মনোই তাঁর সব কিছুই সীমাবদ্ধ ছিল—সমাজের নীচের তলার মুসলমানদের জন্ত তিনি কিছুই করেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে যখন সর্গভাবতীয় ভিত্তিতে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় তখন ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের অর্থ কি দাঁড়ায়? জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করাট দাঁড়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে রামমোহন রায় প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ভারতের অস্তিত্ব ও স্থান সমাজ-বিধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করেছিলেন। এই যুগে ইংরাজী শিক্ষার জন্ত ব্যাপক প্রচার অবশ্যই প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারের অর্থ হল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের বিবোধিতা করা।

সৈয়দেব মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর কর্মক্ষেত্রে আলীগড় কলেজ জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী ও ইংরাজভক্ত মুসলমান কর্মী তৈরী করেছিল।

### সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত

এইবার সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আলোচনা করা যাক। এখন পণ্যস্তু আমদা যা আলোচনা করলাম, তাতে দেখলাম যে, সৈয়দেব প্রধান আওয়াজ ছিল ইংরাজ শাসকের আত্মগত্যা স্বীকার ও মুসলমান সমাজের উপরতলার লোকের স্বার্থ রক্ষা করা। সৈয়দ আহমেদ বলেছিলেন যে, একটানা ভুলের জন্তে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিলেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে অসন্তোষের আশ্রয় ছড়িয়ে দিয়াছিলেন বলেই ১৮৫৭-৫৯ সালের ভারতীয় অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি একখানা গোটা পুস্তকই রচনা করেছিলেন। বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—রুশিয়া অথবা ইরানের প্ররোচনায় অথবা মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দ্বার আকাঙ্ক্ষায় অথবা অযোধ্যা রাজ্য ব্রিটিশ কর্তৃক দখলের ফলে অথবা সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন ব্লেট চালু করার ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল

বলে অভিযোগ করা হয়, তার কোনটাই সত্য নয়। তিনি আরও বলেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র নয় এবং যদিও সেনাবাহিনীর মধ্যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিল তাহলেও এটাকে কেবল মাত্র ভারতীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দিতে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে এ বিদ্রোহের কারণ বেশ কিছু গভীর হলেও খুবই সাধারণ। এ পর্য্যন্ত ঠিকই বললেন, কিন্তু কারণ বিশ্লেষণ করে এক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। তিনি লিখলেন : “বড়লাটের আইন পরিষদে ভারতীয়দের যোগদান না করাই হল এই অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ। এই জন্তেই ভারতের জনসাধারণ সঠিক ভাবে সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উপলব্ধি করতে পারেন নাই। এবং সরকারও জনসাধারণের মতামত জানতে পারেন নাই। ফলে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে।” মুসলমান সমাজের উপরতলার লোকের প্রতিনিধিদের যে আইন পরিষদে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল তা উল্লিখিত মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে।

### ব্রিটিশদের প্রতি সৈয়দ আহমেদের উপদেশ

সরকারের “বিষম ভুল” ও বিদ্রোহের মূল কারণ যা সৈয়দ আহমেদ দেখিয়েছেন তা হতেও আরও ভুল ও বিদ্রোহের কারণ দেখা দিয়েছিল। সেগুলিকে সৈয়দ আহমেদ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন :—

- (১) সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ কর্তৃক ভুল ব্যাখ্যা ;
- (২) ভারতীয় প্রথা সহিত সম্পর্ক-বিবর্তিত আইন জারী ;
- (৩) ভারতীয় প্রথা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার-ব্যবহারের সহিত সরকারের পরিচয় না থাকা ;
- (৪) ভারতীয়দের সহিত অবিবেচনা-প্রসূত ব্যবহার ; এবং
- (৫) সেনাবিভাগের শাসন-ব্যবস্থা।

ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদের মতামত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন : “ব্রিটিশ সরকারের সেনাবাহিনীর শাসন-ব্যবস্থা সমালোচনার যোগ্য। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে, যখন নাদীর শাহ আফগানিস্তান ও ইরান অধিকার করেন তখন তিনি হুঁট বাহিনী গঠন করেন। একটি হল আফগান বাহিনী আর অপরটি হল ইরানী বাহিনী। যখন ইরানী বাহিনী তার কঠোরকর্ম পালন করতে অস্বীকার করত তখন আফগান বাহিনী তাকে ধ্বংস করত। তেমনি আফগান বাহিনীর ব্যাপারে ইরানী বাহিনীদের প্রয়োগ করা হত। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু ভারতবর্ষে সে ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন নাই। ব্রিটিশ সরকার সেনাবাহিনীতে হুঁট বিরোধী সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমান সেনা নিয়োগ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমান সেনাদের অবাধ মেলামেশার ফলে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি রেজিমেন্টের হিন্দু-মুসলমান সেনাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ভ্রাতৃত্ব। প্রত্যেকটি রেজিমেন্টের হিন্দু-মুসলমান সিপাহী একে অপরকে ভাই ও বন্ধু হিসাবে দেখতে শিখেছে। প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট যদি পূরাপূরি হিন্দু অথবা মুসলমান সিপাহী নিয়ে গঠিত হত তাহলে এই ধরনের একতা ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠত না।

মামি বিশ্বাস করি, তাহ'লে মুসলমান রেজিমেন্টের মধ্যে এ ধরনের রসস্খোষ দেখা দিত না অথবা নতুন বুলেট ব্যবহার করতে তাবা স্বীকারও করত না।”

এইবার স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দেই সৈয়দ আহমেদ ব্রিটিশ সরকারকে হিন্দু-মুসলমানের বগডার স্বযোগ নিতে এবং হিন্দু-মুসলমানকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সেনা-আহিনী গঠন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

### মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর প্রতিনিধি

মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর প্রতিনিধি ও ব্রিটিশ শাসনের স্বার্থবাহী হিসাবে সৈয়দ আহমেদ প্রতি পদে-পদে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অল্পগত প্রজা। তিনি আরও দেখাতে চেয়েছিলেন যে, বিদ্রোহে মুসলমানদের যোগদান প্রায়তঃ এবং হিন্দুদের অপেক্ষাও মুসলমানদের যোগদানের কারণ বৃহত্তর। ঠিক একই কালে তিনি আবার বলছেন যে, মুসলমানেরা ব্রিটিশদের নিকট ক্রীতদাসের মত বিকৃত ছিল। এবং বলছেন যে, যে-সব মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন তাঁরা অতিশয় “নোচ ও জঘন্ট”। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে “ভাবতের রাজভক্ত মুসলমান” এই শিরোনাম দিয়ে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন : “সেই ছুদিনে (অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে) যদি কোন শ্রেণী ইংরাজের পাশে এসে ঈড়িয়ে থাকে তাহ'লে সে হল মুসলমান। যে-সব মুসলমান এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তাদের আমি কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না ; শুধু তাই নয়, তাদের ব্যবহাব প্রত্যেকের অন্তরে ঘৃণাব উদ্ভেক করেছে। যেহেতু তাহা এই ধরণের পাশবিক হত্যাকাণ্ডে যোগ দিয়েছিল সেই হেতু তাহা ক্ষমার অযোগ্য।”

### ওয়াহাবী আন্দোলনের নিন্দা

ঠিক একই কারণে তিনি ভারতের ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্মচারী ও ইতিহাস-কার হাট্টার লিখিত ওয়াহাবীদের সম্পর্কে পুস্তক প্রকাশিত হয়, সৈয়দ আহমেদ হাট্টার কতৃক পরিবেশিত তথ্যাদি প্রামাণ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে ‘পাইওনিয়ার’ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন। হাট্টার ওয়াহাবী আন্দোলনের গতি ও বাস্তব উদ্দেশ্য যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সৈয়দ আহমেদ তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নাই। যদিও ওয়াহাবীরা প্রথম দিকে শিখদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তবুও হাট্টার লিখেছিলেন, এ আন্দোলন পূর্বাপূর্ব ব্রিটিশ-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। কিন্তু সৈয়দ আহমেদ দেখালেন যে, ওয়াহাবীরা কেবল মাত্র শিখদের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ওয়াহাবীদের মুসলমান সমাজের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন। ওয়াহাবীদের সম্পর্কে হাট্টার যে আতংক প্রকাশ করেছিলেন—সৈয়দ আহমেদ তাকে অতিরঞ্জিত বলে রায় দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, মৌলভীরা ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াইকে পবিত্র ধর্ম বলে ঘোষণা করে যে ফতোয়া জারী করেছিলেন তার মূলে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল না—ছিল ইংরাজদের কাল্পনিক মুসলমানদের ইংরাজ শাসনের বিরোধিতা করার চিন্তা। এই ভাবে ঘটনাবলী বিকৃত করে তিনি ইংরাজদের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের একান্ত অল্পগত প্রজা।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সৈয়দ আহমেদ মুসলমান সম্প্রদায় বলতে সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় জমিদারদের কথাই বলেছেন। “ভারতের বিদ্রোহের কারণ” শীর্ষক পুস্তকে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা লিখেছেন, সে সম্প্রদায় কেবল মাত্র মুসলমান জমিদার নিয়ে গঠিত। নয়া প্রবর্তিত ইংরাজী আইন অনুসারে মুসলমানদের জমিদারী হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান কৃষক ও শিল্পীর কথা অথবা গুজরাতের মুসলমান ব্যবসায়ীদের কথা তিনি আমল দেন নাই। বিরাট ওয়াহাবী আন্দোলনে যে সব মুসলমান কৃষক যোগদান করেছিল সৈয়দ আহমেদের মতে তারা ছিল মুসলমান সমাজের শত্রু। তিনি বার বার ঘোষণা করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মুসলমানেরা ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করেন নাই। শুধু তাই নয়—মুসলমানেরা বহু ইংরাজ কাম্ভারীর জীবন রক্ষা করেছিল। সৈয়দ আহমেদ মুষ্টিমেয় জমিদার-শ্রেণীর রাজভক্তির কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এবং উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জমিদারদের প্রতি ইংরাজদের প্রসন্ন করে তোলা। তিনি আবারও দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মুসলমানদের কিছু সুবিধা দিলে—বিশেষ করে তাদের ছাত্র জমিদারী ফিরিয়ে দিলে, শাসন বিভাগে তাদের চাকরী দিলে ও তাদের শিক্ষিত করে তুললে মুসলমানেরা আন্তরিকতাপ সঙ্গে ইংরাজদের হাতে হাত মেলাবে। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পাথকটী বেশ ভাল করেই দেখিয়েছিলেন। সমাজ, আচরণ-ব্যবহার ও ধর্ম সকল দিক দিয়েই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরাট পাথক্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মতে “হিন্দুবা কৃষক, শিল্পী, ও ব্যবসায়ী আর মুসলমানেরা জমিদার ও রাজকর্মচারী।” এই কারণে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনীতেও মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের পাথক্য রাখতে হবে। এই ভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধিতার স্বযোগ নেবার জন্যে ব্রিটিশ সরকারকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন।

### গণতন্ত্রের বিরোধিতা

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত সঠিক একটা রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি বললেন, ভারতীয় মুসলমানেরা এক পৃথক্ জাতি—ভারতের অগ্রাঙ্গা ধর্মের লোকের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নাই। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ আহমেদের একমাত্র কাজ হল, মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতে না দেওয়া ও মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। কারণ দেখিয়ে তিনি বললেন—মুসলমানদের স্বার্থ ও ভাবতের অগ্রাঙ্গা জাতির স্বার্থ এক নয়। সুতরাং মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করা উচিত নয়। সৈয়দ আহমেদ জাতীয় কংগ্রেসের দু'টি মূল দাবীর বিরোধিতা করলেন : (১) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সম্প্রসারণ এবং অন্ততঃ পক্ষে অর্ধেক নির্বাচিত সদস্যের জন্মে নির্বাচন নীতির প্রবর্তন ; এবং (২) ইংল্যান্ডের পরিবর্তে ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

প্রথম দাবীটি সম্পর্কে সৈয়দ আহমেদ বললেন—যে নির্বাচনী প্রথা প্রতিটি শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে সমানোষিকার দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, মুসলমানদের হিন্দুদের অপেক্ষা কম-কম চার গুণ বেশী ভোট পেতে হবে। তা ছাড়া মুসলমানদের জন্য যদি পৃথক্

নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় তা হলেও মুসলমানদের অবস্থার কোন উন্নতিই হতে পারে না ; কারণ, হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানেরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় অনগ্রসর। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, তিনি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থ কায়ম করার জন্য আশ্রয় লুপ্ত করেছেন। সর্ব-ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করে স্বার্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন—“ইংল্যান্ডের কাছে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন তুলবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বয়ং রাখেতে হবে ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈপরীত্যের কথা। ইংল্যান্ডে কোন জাতীয় ও ধর্মীয় বৈষম্য নাই। সুতরাং সেখানে স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানের কোন বাধা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে—যেখানে আজও জাতিগত ও ধর্মগত বৈষম্য রয়েছে, শিল্প-বিস্তার প্রতিটি লোকের মধ্যে সমভাবে হয় নাই, সে দেশে আমায় মর্মে নিষেধ-প্রথা ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রবর্তন যথেষ্ট ক্ষতিকারক হবে। যত দিন এ দেশে জাতি, ধর্ম ও অগ্রগত ধর্মের বৈষম্য রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিফলিত হবে, তত দিন এ দেশে নির্বাচনী নীতি কার্যকরী হতে পারে না।” সৈয়দ আহমেদের এই মন্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ভারতের উদীয়মান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান জাতীয় কংগ্রেসের দাবীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে দুই মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থক্ষার জন্যে তিনি সম্প্রদায়গত বৈষম্য, আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্তরের লোকদের অসম বিভা-বুদ্ধির দোহাই দিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণীর সঙ্গে একমত হয়েছেন। ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী ভারতবর্ষকে যখনই কোন অকিঞ্চিৎকর রাজনৈতিক অধিকার দান করেছে তখনই তাই ঘোষণা করেছে যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে এখনও পারে নাই এবং স্বাধীনতা অর্জনের পথে তার প্রধান অন্তরায় হল তার ধর্মগত, জাতিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় অনৈক্য। এই গবেষণাটি ব্রিটিশ শাসক ভারত তার স্বার্থক্ষার্থে অর্থাৎ “ভাগ কর ও শাসন কর” নীতি চালু রাখার জন্যে আগেও চালু করেছিল ও আজও চালু রেখেছে। তাই ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণী আজও সৈয়দ আহমেদের সেখানগুলি ব্যবহার করে আসছে ; ভারতে ব্রিটিশ শাসকের ও মুসলমান জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থ অভিন্ন হয়েছে আর উভয়েই একই শত্রু হয়েছে—জাতীয় আন্দোলন।

এখন প্রশ্ন উঠবে—সৈয়দ আহমেদ জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন কেন? সৈয়দ আহমেদই সর্বপ্রথম বুঝেছিলেন জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় বুদ্ধিমানদের কুক্ষিগত এবং এদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষা এইই মাধ্যমে প্রতিকলিত হবে। তিনি দেখেছিলেন যে কংগ্রেসের সদস্যগণ সকলেই হিন্দু আর হিন্দুরা সকলেই শিক্ষিত। মুসলমান সমাজের ভূমিদারদের হিন্দুরা শিক্ষা, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়েই অতিক্রম করে গিয়েছে আর মুসলমানদের ভূমিদারী হিন্দুদেরই হাতে চলে যাচ্ছে। তিনি আরও দেখেছিলেন যে, অধিকাংশ কংগ্রেসীই মুসলমান জমিদারদের শত্রু এবং মুসলমানদের দাবীদায়কতার বিরোধিতা কববে কংগ্রেসীরাই। কংগ্রেস উদীয়মান জাতীয় বুদ্ধিজীবীর অভিব্যক্তি মাত্র আর ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার যোর শত্রু—এ কথাটা তিনি অনুভব করেছিলেন।

## সৈয়দ আহমেদের উপর ব্রিটিশ প্রভাব

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার পর অন্ততঃ দু’বৎসর সৈয়দ আহমেদ প্রকাশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু প্রতিটি অধিবেশনে যখন কংগ্রেস ক্রমাগত ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, সংরক্ষণ শুল্ক প্রবর্তন, ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ইত্যাদি দাবী উত্থাপন করতে লাগল তখনই সৈয়দ আহমেদ ঘোষণা করলেন যে, কংগ্রেসের দাবী মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী। সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত সংগঠনে ভারতে ব্রিটিশ সরকার ও তার ঔপনিবেশিক ক্রিয়া-কলাপ যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ও আলীগড় কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ বেক (Beck) যদিও তাঁর উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নাই, তবুও লিখলেন : “এ দেশের অল্পসংখ্য গণতান্ত্রিক সংস্কার গঠন বন্ধ করতে হলে ও আন্দোলনকারীদের স্তব্ধ করে রাখতে হলে আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংরাজ-মুসলমানের একতা। সুতরাং আমরা আজ চাই ইঙ্গ-মুসলমান সহযোগিতা।”

## মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের তত্ত্বদর্শী

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সৈয়দ আহমেদের রাজনৈতিক মতামত ও ক্রিয়া-কলাপের যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, তা থেকে আমরা নিয়ে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি :—

প্রথমতঃ—সৈয়দ আহমেদ যখন মুসলমানদের কথা বলেছেন, তখন তিনি মুসলমান জমিদার ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের কথাই বলেছিলেন। এই কারণেই তিনি জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর আশংকা হয়েছিল যে, কংগ্রেসের হিন্দু বুদ্ধিজীবীর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল ও অনগ্রসর মুসলমান জমিদারদের কোণঠাসা ক’বে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কোন বিশেষ সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব ও মূল্যবান : তিনি ভারতীয় মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে প্রমাণ করার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে তিনি দু’খণ্ড করে বলেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সেনাবাহিনীতে কাজে লাগাতে পারতেন তা’হলে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ ঘটত না। এর ত্রিশ বৎসর পরে জাতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে দেন নাই। জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী—এ ধারণা মুসলমানদের মধ্যে সূদৃঢ় করতে তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। এইরূপে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ভারতবর্ষের এক পৃথক জাতি আর অল্প ধর্মের লোকের সঙ্গে কোন সৌম্যদৃষ্টি নাই—হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং ইংরাজ শাসকদের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সুযোগ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ হতে আমরা এই সিদ্ধান্তই করতে পারি যে, ভারতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদের ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের স্রবক ছিলেন সৈয়দ আহমেদ খাঁ।

অনুবাদক—ললিত হাজরা।

পারদিন শালটি বোনকে নিয়ে গীয়ে গিয়েছে কোন কাজে।

সকাল বেলা একলা বসে এলিজাবেথ দিকিকে চিঠি লিখছিল। এমন সময় দরজায় খটর শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। আগন্তুক কেউ এসেছেন নিশ্চয়ই। গাড়ীর শব্দ যখন শুনতে পায়নি সে, লেডী ক্যাথারিনও হতে পারেন এবং সেই সম্ভাবনার অধঃসমাপ্ত চিঠিখানি সবিয়ে রেখে দিল সে যাতে না তাঁর, ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রশ্রবণে জঙ্ঘবিত হতে হয়। দরজা খুলে দিতেই তাকে বিস্মিত কবে ঘরে ঢুকল ডার্সি।

ডার্সিও বিস্মিত হল এলিজাবেথকে একলা দেখে। সে ভেবেছিল সবাই বাড়ীতে আছে। এ ভাবে চঠাং এসে পড়ার জ্ঞান ক্ষমা চাইলে ডার্সি। দুঃজনে আসন নিয়ে বসল। কুশল সংবাদ আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দতার বিপদ দেখা দিল। কাজেই বিষয়াস্তরের প্রসঙ্গ উপাধন ভিন্ন উপায় রইল না। এই সাক্ষট-মুহূর্তে হান্সফোর্ডে শেষ দেখা হওয়ার কথা মনে পড়ায় এবং তখন তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া সম্বন্ধে ডার্সির কি বলবার আছে জানতে কৌতূহলী হয়ে এলিজাবেথ প্রশ্ন করল—‘আচ্ছা, গত নভেম্বরে আপনারা সবাই চঠাং নোদাবিক্ত ছেড়ে চলে গেলেন যে বড়ো? তার পিঠ-পিঠ সবাই চলে আসায় মিঃ বিংলে আশ্চর্য হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। যত দূর মনে পড়ছে আপনার যাওয়ার ঠিক এক দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন। লগুন ছেড়ে আসার সময় তাঁকে এবং তাঁব বোনদের নিশ্চয় স্মৃষ্ দেখে এসেছেন?’

—‘হ্যাঁ, বহাল তবিয়েতে আছে তারা।’

কিন্তু আসল প্রশ্নের কোন জবাব পোলে না দেখে সে একটু খেমে বললে—‘যত দূর মনে হয়, মিঃ বিংলে বোধ হয় আর সেখানে ফিরছেন না, কি বলেন?’

—‘সে রকম কিছু শুনিনি আমি। তবে ভবিষ্যতে হয়ত খুব কম সময়ই সে সেখানে কাটাতে পারবে। তার বন্ধু-সংখ্যা এত এবং এমন বয়সে সে উপনীত যখন দুঃদিক বজায় রাখতে তাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে।’

—‘ওঁরা যদি নোদাবিক্তে একদমই না থাকে, তাহ’লে জায়গাটা একেবারে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। সে ক্ষেত্রে আমরা স্থায়ী ভাবে সংসার পাতে পারি সেখানে। কিন্তু মিঃ বিংলে হয়ত পড়শীদের স্রবিধার চেয়ে নিজের স্রবিধার মুখ চেয়েই বাড়ীটা নিয়েছেন। আর রাখারখিও তাঁর নিজের স্রবিধার স্বারাই বিচার্য।’

—‘ভাল দায় পোলে যদি সে বাড়ীটা বিক্রী করে তাতে আমি অবাধ হবো না!’

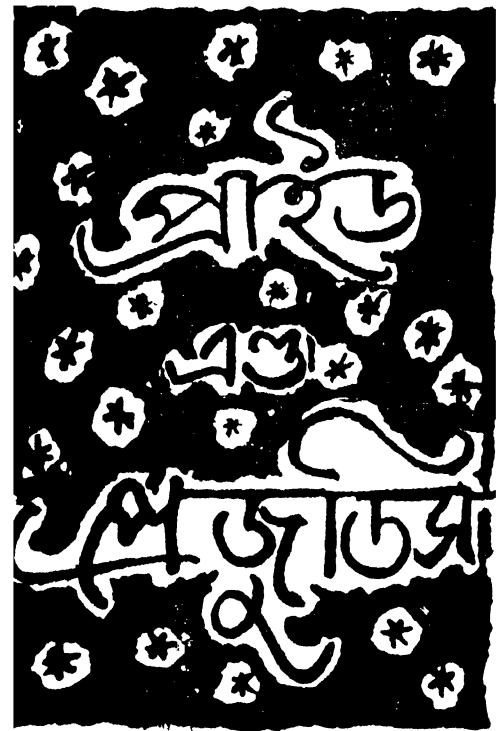
এলিজাবেথ এর কোন উত্তর দিল না, আর কথা বাড়াতেও ইচ্ছা হোল না তার। আর কথা বলার কোন প্রসঙ্গ না থাকায় সে সমস্তাট। ডার্সির যাড়ে ছেড়ে দিতে সঙ্কল্প করল।

ডার্সিও ইংগিতটা বুঝতে পেরে বললে—‘এ বাড়ীটা বেশ। মিঃ কলিল প্রথম হান্সফোর্ডে এলে, লেডী ক্যাথারিন বাড়ীটার সংস্কার করেছেন অনেক।’

—‘আমারও তাই বিশ্বাস এবং দয়া দেখানোর পক্ষে কলিলের মত এমন কৃতজ্ঞপারায়ণ আর দুটি মিলবে না।’

—‘মিঃ কলিল পত্নী নির্গাচনে খুব সৌভাগ্যবান।’

—‘তা সত্যি। এমন একটি বুদ্ধিমতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে



পাওয়ায় তার বন্ধুরা আনন্দ কবতে পারেন। সে তার জীবনকে স্রথময় ক'ব তুলবে।’

—‘নিজেব বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পার্বজনর কাছেই থাকতে পেরে তিনি খুব খুশী হয়েছেন নিশ্চয়?’

—‘এর নাম কাছে! কম পক্ষে পঞ্চাশ মাইল হবে।’

—‘সে আর এমন কি। আধ দিনেব কিছু বেশী সময় লাগে যেতে। একে অল্প দূরত্বই বলা চলে।’

ডার্সি যখন কথা বলছিল তাব মুখে এমন একটা স্মিত হাসির ভাব ছিল যা দেখে এলিজাবেথের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে—‘এ কথা আমি বলিনি যে, মেয়েদের শ্রুতর-বাড়ী বাপের বাড়ীর খুব নিকটেই হওয়া উচিত। দূরে বা কাছে কথাটা আপেক্ষিক এবং নানা অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যেখানে আসা-যাওয়ার খরচা করার মত সামর্থ্য থাকে সেখানে দূরত্ব ক্ষতিকর নয়। কিন্তু এখানে অবস্থা সে রকম নয়। মিঃ ও মিসেস্ কলিলের সাংসারিক অবস্থা মোটামুটি ভালই—তবে হামেশাট যাওয়া-আসা করার মত নয়। আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, আমার বন্ধু এই দূরত্বের অধঃক দূরে হলেও বাড়ীব খুব নিকটে শ্রুতর-বাড়ী মনে করবে না।’

ডার্সি চেয়ারটা এলিজাবেথের আর একটু কাছে টেনে নিয়ে বলল—‘বাড়ীর প্রতি এ রকম টান থাকা ঠিক নয়। সংবোধেই তো আর চিরকাল থাকাব আশা করতে পারেন না।’

এলিজাবেথ বিস্মিত হয়ে উঠল। ডার্সির মধ্যে ভাবান্তর।



আবার চেয়ারটা পিছনে টেনে নিয়ে টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে নিল।

ইতিমধ্যে শাল'টি আবার তাব বোন ফিরে এল। ডার্সিকে এ অবস্থায় দেখে তাবাও বিস্মিত হল। ডার্সি বললে যে, তুল কবে সে এখানে এসে পড়েছে। তাব পব অল্প কয়েক মিনিট থাকার পর বিশেষ কোন কথাবার্তা না বলে বিদায় নিল।

ডার্সি চলে যেতেই শাল'টি বলল—‘এর মানে কি? আমি বলছি এলিজা, ও নিশ্চয় তোব প্রেমে পড়েছে, তা না হলে ও কখনই এমন পরিচিতের মত এখানে আসত না।’

কিন্তু এলিজাবেথ যখন তাব নীববতার কাণে ব্যস্ত করল শাল'টির খুব বেশী মনঃপত হোল না। তার পব এটা-ওটা বল্লনার পর তাবা এই সিদ্ধান্তে এল যে, হাতে কোন কাজ না থাকায় এসেছে সে। বছরের এই সময় থেলা খেলার পূর্ব শেষ। বাসায় লেডী ক্যাথারিন, বই আন বিলিয়র্ড টেবিল ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু মানুষ তো আবার সাধারণ দিন ঘাব বন্দী হয়ে থাকতে পারে না? কর্ণেল ফিচ্, উইলিয়াম যে আসেন সে তাদের সাতচেষ্টা লোভে, সে ভালই লাগে এলিজাবেথের। কেন না, তিনি শুধু যে তাব এক জন ভক্ত তা নয়, তাব প্রিয় মানুষ উইকহামেরও তিনি এক জন অনুসারী। অবশ্য উইকহামের হৃদয়নায কর্ণেলের ব্যক্তিত্বে চমৎকারিত্ব কম কিন্তু মানুষটিকে তাব প্রাক্ত জন বলেই ভাল লাগে।

কিন্তু ডার্সি কেন যে হামেশাই আসা-যাওয়া কবে তার হৃদয় নির্ণয় করা কঠিন। তাদের সাতচেষ্টা লোভেই যে তার এই আসা-যাওয়া তাও বলা চলে না। কেন না, কথা সে প্রায়শই বলে না। যখন বলে যেন বাধ্য হয়েই বলে। গল্প কবাব আনন্দে নয় ভ্রমতাব তাগিদেই। কথাটিং তাকে উৎফুল্ল দেখা যায়। শাল'টি যে তাকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। শাল'টি ভাবে যে, প্রেমের প্রভাবেই ডার্সির এই নিঃশব্দ অভিনয়। বান্দবী এলিজাবেথের প্রেমেই সে পড়েছে নিশ্চয়। বোজিগে থাকতে শাল'টি তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করেছে। যখন হ্যান্সফোর্ডে আসত ডার্সি, তখনও সে তার পূর্ববন্ধুণে বিফল হয়েছে। ডার্সি এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে দেখত কিন্তু সে দৃষ্টিব ব্যগ্ননা ধরতে পারত না শাল'টি। প্রদীপ-লিখার মত অচল সে দৃষ্টি, কিন্তু তাতে অনুবাসের আলো বেশী ছিল না। আশ্চর্য্যবশত বলেই ভ্রম হোত তা।

হু-এক বাব সে তার প্রতি ডার্সির পক্ষপাতিত্বের কথা উল্লেখ করেছে এলিজাবেথের কাছে, কিন্তু এলিজাবেথ তেসেই উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা। শাল'টি আবার এ ব্যাপার নিয়ে অধিক দূর অগ্রসব হয়নি, কারণ আশা হয়ত শেষে নিবাশায় পরিণত হতে পারে।

বন্ধু প্রতি মমত্ব বশতঃ শাল'টি কখনো কখনো কর্ণেলের সঙ্গে এলিজাবেথের মিলন ঘটানোর পরিকল্পনা কবত। কর্ণেল মানুষটি ভাল। এলিজাবেথের প্রতি তাব প্রীতিও কম নয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এলিজাবেথার্মা হবার যোগ্যতা তাব পূর্বোপরিই আছে।

### ভেত্রিশ

বাগানে এলোমেলো বেড়াতে বেড়াতে বহু বার ডার্সির সঙ্গে দেখা হোল এলিজাবেথের। যেখানে আগে কেউ আসেনি সেখানে দৈবাৎ আসার অশিষ্টতায় সচেতন হয়ে উঠল সে। ডার্সিকে স্মরণ করিয়ে

দিল এলিজাবেথ যে, এ জায়গাটি তাব নিজস্ব এবং অতি প্রিয়। কিন্তু যে কোন কাবণেই হোক এর পর অনেক বার দেখা হোল ডার্সির সঙ্গে এই পথে। যেন ডার্সি যেছায় তার পথে ঘুরে মরছে। যত বাব দেখা হচ্ছে একটু অপ্রস্তুত-তাব দেখা দিচ্ছে তার মুখে। শেষ বাব ডার্সি আর কথা না কয়ে পাবলে না যেন। অসংলগ্ন কথায় আলাপ যা হোল সে মোটামুটি এমনি ধরনের:—‘হ্যান্সফোর্ড কেমন লাগছে? নিজনে বেড়াতে ভারী ভালবাসে বুঝি সে? কলিন্স-দম্পতীর গার্হস্থ্য-স্বস্তি সন্ধ্যাই বা তার মত কি? কেটে আবার এলে এলিজাবেথ বোজিগে উঠবে নিশ্চয়ই।’ কর্ণেল সন্ধ্যাে এলিজাবেথের মনোব উপাস্তে কোন স্নিগ্ধ কোমল রঙ ধরেছে কি না তাও আলাপা ভাবে যেন জেনে নিতে চাইছিল ডার্সি। কিন্তু তার এই কৌতূহলে খুসী হোল না এলিজাবেথ।

এক দিন বেড়াতে বেড়াতে জেনেব চিঠি পড়তে পড়তে এলিজাবেথ সবিষ্টয়ে দেখলে যে, ডার্সির বদলে কর্ণেল তার দিকে এগিয়ে আসছে। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে মুখে হাসি টেনে বললে এলিজাবেথ—‘আপনিও যে এদিকে বেড়াতে আসেন আমাব জানা ছিল না।’

—‘আমি বাগানটা ঘুরে দেখছি—প্রত্যেক বছরই এ রকম কবে থাকি। আপনি কি অনেক দূর যাচ্ছেন?’

—‘না, এখনই ফিরতাম।’

—‘সত্যিই, শনিবাব চলে যাচ্ছেন কেট থেকে?’—জিজ্ঞাসা করল সে।

—‘ইচ্ছা তো তাই যদি না ডার্সি বাদ সাধে। আমি তার হাতে। সে নিজের মজি মত সব ব্যবস্থা কবে।’

—‘ব্যবস্থাটা মনোমত না হলেও ‘এইটুকু আনন্দ যে, পছন্দ’ অপছন্দ কবার ভার তাব। মিঃ ডার্সির মত এমন একটিও দেখিনি, যে নিজের খেয়াল-খুশী মত কাজ করার মমতায় এত আনন্দ পায়।’

—‘হ্যাঁ, ও সব সময় নিজের মজি মত কাজ করতে চায়।’

উত্তর দিলেন কর্ণেল—‘কিন্তু আমবা সবাই তো তাই কবি। পার্থক্য এই যে, ওর অনেকের চেয়ে ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ বেশী। কারণ ও ধনী আর অনেকে গরীব।’

অনেকক্ষণ চুপচাপের পব এলিজাবেথ আবার বললে—‘আমাব ধাবণা, আপনাব ভাই আপনাকে সঙ্গী পাবাব লোভেই সঙ্গে এসেছেন। অথচ বিয়ে করে একটি পাকা সঙ্গী লাভ কবছেন না কেন যে এই আশ্চর্য! অবশ্য বোনটি এখন সাখীর মত রয়েছে। আর সে যখন ভায়েরই পুরো তত্তাবধানে আছে তখন ভাইয়ের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা, তাই না?’

—‘না। আমি আর ডার্সি দু'জনে বোধ ভাবে মিস্ ডার্সির অভিবাবক।’

—‘তাই না কি? সে কেমনতর ব্যাপাব বুঝলাম না। এ রকম দায়িত্বে কিন্তু বন্ধি কম নয়। অল্পবয়সী মেয়েদের অভিবাবক হওয়া কখন কখন ভারী মুশিল। বিশেষ করে তারও যদি ডার্সির মত স্বভাব হয়, সেও যদি নিজের ইচ্ছা মত চলতে-বলতে চায়।’

তার কথাগুলি কর্ণেল যেন গিলছে দেখলে এলিজাবেথ। কথা শেষ হতেই কর্ণেল তৎক্ষণাৎ তাকে প্রতিপ্রস্ত করে জামতে

চাইলে, কেন তার ধারণা যে মিস্ ডার্সি তার পক্ষে অস্বস্তির কারণ হবে? এলিজাবেথ স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে, তার অহুমান বাস্তব যেসেই চলেছে। সে সোজাসুজি উত্তর দিল—‘ভয় পাবার কিছু নেই। আমি তার সন্ধকে খারাপ কিছু শুনি নি। সে যে একান্ত পোষমানা মেয়ে তা আমি হালফ করে বলতে পারি। সে আমাব খুব পরিচিতা দু’টি মহিলা মিঃ বিংলের দুই বোনের খুবই প্রিয়পাত্রী। আপনিও তাদের চেনেন, এ রকম শুনেছি বোধ হয় আপনার মুখে।’

—‘কিছুটা জানি! তাদের ভাইটি ভারী সজ্জন মানুষ। আমাদের ডার্সির বিশেষ বন্ধু।’

—‘হ্যাঁ’—এলিজাবেথ উত্তর দিল শুক কণ্ঠে—‘তার প্রতি মিঃ ডার্সির প্রীতি অনন্তসাধারণ। তার সন্ধকে যথেষ্ট যত্নবান তিনি।’

—‘যত্ন? হ্যাঁ যত্ন নেন বই কি। সে সন্ধকে ডার্সির যত্নের অন্ত নেই সে কথা সত্যি। এখানে আসার সময় ডার্সি আমায় যা যা বলেছে তা থেকে এ ধারণা কববার কারণ আছে যে, বিংলে তার কাছে বিশেষ ভাবে দ্বন্দ্বী। অবশ্য বিংলেকেই উদ্দেশ্য করে বলেছিল ডার্সি সে সব কথা, তা সঠিক করে ধরে নেওয়া আমাব পক্ষে সুযুক্তি হবে না। সবটাই আমাব অহুমান মাত্র।’

—‘কি বলতে চান বুঝলাম না।’

—‘সে ব্যাপার বেশী জানাজানি হয় ডার্সি তা চায় না। যদি কোন ক্রমে সেই বিশেষ মেয়েটির পরিবারে এ কথা চালু হয়, সেটা ভারী অপ্রীতিকর হবে।’

—‘আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন—আমি বলব না কাউকে।’

—‘আর ব্যাপারটা যে সত্যিই বিংলেকে ঘিরে তা ভাববারও বিশেষ কারণ নেই। ডার্সি আমাকে যা বলেছিল তা হোল এই: কিছু দিন আগে সে এক বন্ধুকে অবিবেচনা-প্রসূত বিয়ের হাত থেকে উদ্ধার করেছে, কিন্তু কে সেই বন্ধু তার নাম-ধাম কিছুই বলেনি, তবে আমি বিংলেকেই এই ধরণের জালে জড়িয়ে পড়ার মত যুবক বলে সন্দেহ কবি। আর গেল গ্রীষ্মে হু’জনে এক সাথে কাটিয়েছিল। তাতে আমার অহুমান আরো গভীর হয়েছে।’

—‘ডার্সি কি তার এই হস্তক্ষেপে কোন কারণ বলেছিল?’

—‘আমার মনে হয়, মেয়েটির সন্ধকেই বিশেষ আপত্তি ছিল তার।’

—‘তা, কি কৌশলে তাদের পৃথক্ করলেন তিনি?’

—‘কৌশল সন্ধকে আমায় কিছু বলেনি সে’—হেসে বললেন কর্ণেল—‘আপনাকে যা বললাম তাই সে বলেছিল আমায়। তার বেশী কিছুই নয়।’

এলিজাবেথ কোন উত্তর দিল না—রাগে তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করে কর্ণেল প্রস্থ করলেন, সে ইঠাৎ এত গভীর হয়ে পড়ল কেন?

—‘আপনি যা বললেন সেই সন্ধকেই ভাবছি আমি। আপনার ভায়ের আচরণ আদৌ আমার কাছে স্তম্ভ মনে হয়নি। এ ব্যাপারে সে বিচারক হতে গেল কেন?’

—‘তার এই মাথা-গলানোকে আপনি অনধিকারচর্চা বলে মনে করেছেন বুঝি?’

—‘কোন মেয়ের প্রতি বন্ধুর অহুমাগের যুক্তিযুক্ততা সন্ধকে

তার বলবার কি অধিকার আছে তা আমি ভেবে পাই না। আর একমাত্র নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বন্ধু কিসে সুখী হবে না হবে, তা স্থির করা ও নির্দেশ দেওয়ারই বা তিনি কে? যাঁই হোক,’—নিজেকে কিছুটা সন্তরণ করে নিয়ে এলিজাবেথ যোগ করলে—‘হু’জনের কেউই এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি সন্ধকে যখন কিছু জানি না তখন লোকটিকে নিন্দা করা উচিত হবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, হু’জনের মধ্যে খুব বেশী প্রীতি হয়েছিল তা মনে হয় না।’

—‘সেটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহ’লেও এতে ভাইয়ের আমার সাফল্যের সম্মান অতি করুণ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নয় কি?’

যদিও ঠাট্টাচ্ছিলেই কর্ণেল বললেন কথাটা, কিন্তু তবুও এতে ডার্সির এমন একটি নিখুঁত ছবি ধরা পড়ল যে, সে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে কথার মোড় গ্রিয়ে বিষয়াস্তরে আলোচনা করতে করতে বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত হোল। অতিথি চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে যা শুনেছে সে সন্ধকে নির্বিরোধ পুনবালোচনা করার অবসর পেল এলিজাবেথ। তার সঙ্গে যারা সম্পর্কিত তাদের সন্ধকেই বলা হয়েছে কথাটা। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যার উপর ডার্সির এমন অসীম প্রভাব। জেনের কাছ থেকে বিংলেকে কেড়ে নেওয়ার মধ্যে ডার্সি যে থাকতে পারে এতটা ভাবেনি সে। বিংলের বোনকেই সে এ সন্ধকে দায়ী করে এসেছে এত দিন—সেই কুট কৌশলের তোতা। ডার্সি’র অহংকার, গর্ভ, ডার্সি’র ধাম-খেয়ালিপনার জন্তু জেনের এই শাস্তি—ডার্সি’র জন্তুই জেন আজ দুঃখ পাচ্ছে! সে কিছু কালের জন্তু হলেও একটি অতি স্নেহময়ী উদার হৃদয়ের সমস্ত আশা-ভরসা চুরমার করে দিয়েছে! কে জানে এই সর্বনাশ কত দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে? ‘মেয়েটির সন্ধকেই বিশেষ করে আপত্তির কারণ আছে’—বলেছেন কর্ণেল—আর এই বিশেষ আপত্তির কারণ হোল তাব এক জন মামা আছেন যিনি গ্রামেব গ্রামেব আটর্নীর আর এক মামা যিনি লণ্ডনে বাবসা করেন।

জেন সন্ধকে কোন আপত্তিই উঠতে পারে না। এমন স্নিগ্ধ-মধুর স্বভাব তার। এমন চমৎকার বুদ্ধি, এমন মার্জিত মন, আচার-আচরণ এমন হৃদয়জয়কারী। আব বাবাব সন্ধকেও বিরূপ কিছু বলা চলে না, কারণ বাবার হু’একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিলেও এত গুণ আছে, ডার্সি’র পক্ষে যা অবজ্ঞা করা কঠিন। তাঁর মত সত্তম অজ্ঞানের ক্ষমতাও ডার্সি’র নেই। অবশ্য মা’র সন্ধকে যখন ভাবতে লাগল সে, তার আত্মপ্রত্যয় কিছুটা শিথিল হয়ে এল। তবে এ ক্ষেত্রে মা বাধা-স্বকপ হননি। বন্ধুর সম্পর্ক সন্তাবনা ডার্সির অহমিকা-বোধকেই ক্ষুণ্ণ করেছে—এর আর অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত সে এই স্থির সিদ্ধান্তে এল যে, ডার্সি এ ক্ষেত্রে কিছুটা তার কুংসিত অহমিকা-বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে আর কিছুটা হয়েছে নিজে বোনকে বিংলের সাথে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকে।

ভাবতে ভাবতে হৃদয় ফোড়ে এলিজাবেথের চোখে জল এল। শেষ পর্যন্ত মাথা ধরল এবং মাথা-ধরা সন্ধ্যাব দিকে এম-বাড়ল যে, ডার্সি’র সঙ্গে দেখা না করাব সংকল্প করলে—এমন বি-রোজি-সে চায়ের নিমন্ত্রণে যেতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করলে। তাহে

সত্যি সত্যিই অশ্রু দেখে শাল'টি বেকী গীড়াগীড়ি করল না এবং স্বামীকেও গীড়াগীড়ি করতে নিষেধ করল। কিন্তু এলিজাবেথ বাড়ীতে থাকলে লেডী ক্যাথারিন হযত বাগ করতে পারেন সে-ভয় প্রকাশ না কবে পারলে বা কলিঙ্গ।

### চৌত্রিশ

সবাই বিদায় নিয়ে যাবার পর যেন ডার্সির বিরুদ্ধে নিজের মনের তিক্ততাকে বাড়িয়ে তোলার জন্তে এলিজাবেথ কেট থেকে লেখা দিদির চিঠিগুলি নিয়ে পড়তে বসল। জেন কাকর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করেনি সে সব পড়ে। পুরোনো ঘটনা পুনরুল্লেখ করে বা বর্তমান দুঃখের কোন নজির দিয়ে সে অশ্রু-ভারাক্রান্ত করেনি কোন ছত্র। কিন্তু সেই পত্রগুলির প্রত্যেকটি লাইনে জেনেব স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লভাব অভাব যেন সুস্পষ্ট বোঝা যায়। জেনেব প্রফুল্লতাই তার চিঠির আনন্দময় ষ্টাইলকে প্রেরণা দেয়, তার মনের সহজ প্রসন্নতায় কাকর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে না, তার মনেব আকাশে কদাচিৎ মেঘোদয় ঘটে। চিঠি পাওয়াব পব প্রথম যখন পড়েছিল, তখন যে অস্বস্তিকর চিন্তাভার অনুভবে আসেনি, আজ পুনরায় পড়তে বসে তাই যেন আবিষ্কার করতে লাগল এলিজাবেথ। তার দিদির দুঃখের কারণ হয়ে ডার্সি যে দম্ব প্রকাশ কবে গেল, সে কথা শ্রবণ করে দিদির প্রতি একটা স্নিগ্ধ করুণায় তার নারী-হৃদয় ভরে উঠল। সান্তনার মধ্যে এইটুকু যে, আব একটি দিন পাবেই সে বাড়ী'ব দিকে রওনা হতে পারবে। দিন পনেবোব আগেই আবার দেখা হবে জেনেব সঙ্গে। দিদির মনোভঙ্গব বেদনা সে প্রীতি দিয়ে মুছিয়ে দেবে নিশ্চিহ্ন করে।

ডার্সি যখন কেট ত্যাগ করবে, ভাইটিকেও সে সঙ্গে নিয়ে যাবে, এই চিন্তা বিস্ত্রী লাগল এলিজাবেথের। কর্ণেল তার মনোবাসনা গোপন করেননি। তার সম্বন্ধে নিজের মনে কোন আশাভঙ্গব কাণে বাধেনি এলিজাবেথ।

মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবছে যখন এলিজাবেথ, এমন সময় বাইরের ঘটাধ্বনি পাওয়া গেল। আজ সন্ধ্যা বেলা কর্ণেল একবার এসেছিলেন। হযত বা তার খোঁজ-খবর নিতে পুনরায় এ-বাড়ীতে পদার্পণ করলেন এই ভেবে তার মন অকাবণেই উল্লসিত হয়ে উঠল। কিন্তু মনের প্রফুল্লতা তার মুকুটেই ঝরে পড়ল যখন দেখলে এলিজাবেথ, যবে যে অতিথি প্রবেশ করলে সে কর্ণেল নয়, স্বয়ং ডার্সি। এলিজাবেথের স্বাস্থ্যের কুশলতার সংবাদ নেবার জন্তেই যে এই অসময়ে তার আসা, সে কথা পূর্নাহুই ঘোষণা করে ডার্সি তার শাবারিক সুস্থতার জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করলে। নব-শীতল ভ্রত্বার সঙ্গে এলিজাবেথ তার এই সৌজন্তেব সমাদর করলে। কয়েক মুহূর্ত আসন গ্রহণ কবে উঠে পড়ল ডার্সি, তার পর ঘরময় পায়চারী করতে লাগল যেন অশান্ত চিন্তে। বিস্মিত হলেও এলিজাবেথ মৌন দৃষ্টিতে দেখতে লাগল ডার্সির এই উত্তেজিত পদচারণা। কিছুক্ষণ যেন নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করলে ডার্সি, তার পর সুন্দরীর কাছে সব এসে ঝুঁকুতেজিত কণ্ঠে বললে—

‘নিজেব সঙ্গে মিথ্যে লড়াই কবলান এত দিন। হেরেও গেলাম। হৃদয়কে আমি দাবিয়ে রাখতে পারলাম না। এ কথা আজ আমার

স্বীকার করতেই হবে যে, আপনার প্রতি আমার প্রীতির সীমা নেই। আমি আপনাকে ভালবাসি।’

এলিজাবেথের কাছে এ এক অচিন্ত্য বিষয়। নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন তার সারা মুখে রক্তের জোয়ার এল। মনের সন্দেহ নিরসন হোল না। মৌনমুখী হয়ে বসে রইল সে। তার এই নির্বাকী হয়ে বসে থাকার মধ্যে ডার্সি প্রচ্ছন্ন সম্মতির ইঙ্গিত পেলে। তখন সাহসী হয়ে পুরুষ তার প্রিয় কামিনীর কাছে হৃদয়কে অব্যাহিত করে দিলে। গুছিয়ে সুন্দর করে বললে ডার্সি তার মনের কথা। এই মেয়েটির প্রতি দিনে দিনে যে ভাবে অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে তার নিজের চিত্ত, সে কথা বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় সে নিজের অহমিকার কথাও গোপন করে রাখলে না। সে জানে এলিজাবেথ তার তুলনায় কত নগণ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় কত গৌণ, পারিবারিক দিক থেকে কত বাধা তাঁর এই প্রেম-নিবেদনের সার্থকতার পথে। এ সব কথা মুক্তকণ্ঠেই সে সরবে ঘোষণা করলে। তার এই প্রগল্ভতায় সে সব যে কত ক্ষতিকর তা সে চিন্তাই করলে না যেন।

এই মানুষটির প্রতি তার বীতরাগ মনের মুক্তিকায় বহু পূর্বেই শিকড় গজিয়েছিল। তবু পুরুষের এতখানি স্নিগ্ধ অনুবাগের প্রতি সে নিষ্ঠুর হতে পারলে না। যে ব্যথা পাবে ডার্সি তার প্রত্যাশত্রে, সে কথা ভেবে মুহূর্তে তার নিজের মনও যেন ক্রান্ত হয়ে এল। কিন্তু ডার্সি যে ভাবে তা'ব হীনতাকে নিয়ে পল্লবিত করতে লাগল, তাতে মনের সকল মাধুরীই পলকে লুপ্ত হয়ে গেল, আর তার স্থান পূরণ করল একটা হ্রস্ব রাগ। ডার্সির কথা ফুটলে জবাব দেবে এই চেষ্টায় যত দূর সম্ভব আত্মসম্বরণ করতে লাগল সে। দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে ডার্সি জানাল যে, যত চেষ্টাই সে করেছে তার এই অসম সামাজিক হৃদয়ানুরাগকে বশ করতে সবই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। এখন সে প্রত্যাশা করে যে, এলিজাবেথ তার পত্নী হতে সানন্দে স্বীকার করবে এবং ডার্সির প্রেম তার মর্দান পাবে। ডার্সির চোখে-মুখে স্বীকৃতির প্রত্যাশা যেন ধর-ধর করে কাঁপছে। মুখে যতই ভয়-ভাবনার কথা বলুক ডার্সি, তার ভক্তিতে যে আত্মপ্রত্যয়েব ভাব ফুটে রয়েছে তা যেন এক নিমেষেই পড়ে নিতে পারলে এলিজাবেথ। সারা সন্ধ্যা এই মানুষটির প্রতি যে তিক্ততার প্রত্যাশা করছিল এলিজাবেথ, তার মহা সুযোগ যেন স্বেচ্ছায় তার দরজায় এসে ঠাঁড়িয়েছে। হৃদয়ের আগুনে এলিজাবেথের মুখ রাঙা হয়ে উঠল কথা বলার সময়। ডার্সির কথার জবাবে বললে সে— ‘চিরকাল হয়ে এসেছে যেমন, আমি তার অসন্মান করতে চাই না। যে ভাবেই জবাব দিই না কেন, তার আগে আপনার এত অজ্ঞ প্রীতির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। কিন্তু না। আপনার ভালবাসা কোন দিন আমি প্রত্যাশা করিনি। আজ আপনি স্বেচ্ছায় তা দিতেও আসেননি। কাউকে ব্যথা দিতে আমি চাই না। যদি কিছু দিয়েও থাকি তা দিয়েছি আমার অজান্তে। তার আয়ুও শীগগির ফুরিয়ে যাবে, এ কথা নিশ্চিত। যে সব কারণে আপনার ভালবাসা এত কাল অপ্রকাশিত ছিল, সেই সব কারণেই তাকে রুদ্ধপ্রোত করে দেবেন। তাতে আপনার কষ্ট হবে না।’

এই মুখরা মেয়েটিব দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডার্মি সব কথা-  
গুলি শুনলে। যতখানি অবাক হোল সে, তাব বেশী কোণারি  
হলে উঠল তাব মনে। মুখেব বড় ভালকা হয়ে গল বাগে, সর্গজে  
তার পরিচয় যেন বাজতে লাগল স্বম-স্বম কবে। কথা কটাবাব  
আগে মনেব প্রশান্তি থিতিয়ে নেবার জগ্গা সে মনের সঙ্গে সংগাম  
কবতে লাগল। এলিজাবেথের কথা শেষ হয়ে যাবাব অনেকক্ষণ  
পরে যেন চাপা প্রশান্তির সঙ্গে জবাব দিলে ডার্মি—‘তা’লে আপনাব  
নিকট থেকে এই প্রভাতব নিয়েই আমি ফিরে যাব। এতখানি  
অসৌজন্মের সঙ্গে আমার যে প্রত্যাখ্যান কবলেন, তাব কাবণ-  
টুকুও আমি শুনে যেতে চাই। অবজ্ঞা তাব দাম খুব বেশী নয়  
আমার কাছে।’

‘সে ক্ষেত্রে আমারও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়।’ বললে এলিজাবেথ  
—‘আমিও জানতে চাই, কি দাবীতে এ ভাবে আমার অপমানিত  
করার চেষ্টা করলেন আপনি? নিজের বিবেক, ইচ্ছা, যুক্তি এমন  
কি নিজের প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে অমিল জেনেও আপনি কেন আমাকে  
ভালবাসাব কথা বলতে এসেছেন? আমি যদি অসৌজন্ম প্রকাশ  
করে থাকি, আপনিই বা কোথায় শালীনতা দেখালেন? কিন্তু সে  
ছাড়া আপনাব বিরুদ্ধে আমার অজ্ঞ আক্রোশেব কাবণও আছে।  
কেন আছে, তাও আপনি জানেন। সে লোক আমার মমতাময়ী  
ফুলেব মত বোনেব জীবন নষ্ট করে দেবাব হীন চকাত্ত কবছে, তাব  
প্রতি যত শ্রীতিই থাক আমার সদয়ে, তাকে কি প্রশয় দিতে পাবি  
আমি? আব আপনাব ক্ষেত্রে কোন সদয়-দৌর্বল্যেব স্থান নেই,  
তা আপনি গোড়া থেকেই জানেন।’

শেষ কথাগুলি শুনে ডার্মি মুখেব বড় আবাব গাট হয়ে উঠল,  
কিন্তু কোন বাপা না দিয়ে সে এই মেয়েটিকে বলাব স্বযোগ দিলে।

‘আপনাব বিরুদ্ধে আমার হীন বাবাব হাজাব কাবণ আছে।  
আপনি যে ভাবে কাজ কবেছেন তাব কোন যুক্তি নেই, থাকতে  
পাবে না। আপনি পাবেন অস্বীকার কবতে যে, ত’টি শ্রিয় মানুষকে  
চিবদিনেব মত বিচ্ছিন্ন কবে দিয়েছেন নানা কৌশলে? পাবেন  
অস্বীকার কবতে?’

ডার্মি যে তাব কথায় বিদ্যুৎবিদ্যুত হইল, তাব জগ্গা  
এলিজাবেথের বাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বং সে চেয়ে  
দেখলে যে, একটা তাজিলোব হাসি ফুটে উঠেছে তাব মুখে।

‘পাবেন অস্বীকার কবতে সে কথা? বলুন, পাবেন?’

শাস্ত কণ্ঠে জবাব দিলে ডার্মি—‘আপনাব বোনেব কাজ থেকে  
আমার বন্ধুকে সবিয়ে নিয়ে গেছি—সে কথা অস্বীকার কবি না  
আমি। বং আমি খুদী আমাব চেষ্টাব সাবকতায়। নিজের প্রতি  
কোন দিন অতখানি মমতা দেখাইনি আমি, যতখানি দেখিয়েছি  
বিলেব প্রতি এই ঘটনায়।’

কিন্তু এই প্রভাতবে এলিজাবেথ শাস্ত হোল না। ‘এ ছাড়াও  
আবো আছে। আমাব দিদিব ব্যাপাবেব আগেও আমি আপনাব  
সম্বন্ধে আমার মত স্থির কবে ফেলেছিলাম যখন আপনাব স্বরূপ  
আমি জানতে পারি মিঃ উইকহামেব কথায়। সে সম্বন্ধে কি বলার  
আছে আপনাব? কোন বন্ধু প্রতি শ্রীতিতে আপনি তাব প্রতি  
অমন ব্যবহার কবেছিলেন? কাব উপব এ সবেব দায়িত্ব দিয়ে  
আপনি নিষ্কল হতে চান? বলুন?’

এবার ডার্মি প্রভাতব আব পূর্বেব মত প্রশান্ত হইল না।  
বাবোব সঙ্গে সে বললে—‘তাব উপব দেখছি আপনাব সম্প্রীতি খুব।’

‘তাব ছদ্মশাব কথা যে-ই শুনবে, সে-ই তাঁর প্রতি দবদী হয়ে  
উঠবে।’

‘ছদ্মশা?’ বিদ্রোহ ডার্মি বক্তব্য বিকৃত হয়ে উঠল—‘ছদ্মশা  
বড়ই। নিশ্চয়ই—খুবই ছদ্মশা।’

‘সে-ই আপনাবই কাজ। আপনিই আজ তাঁকে দায়িত্বের  
মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন। তাঁব যা পাওনা ছিল, তা থেকে  
তাঁকে বঞ্চিত কবেছেন আপনিই, অজ্ঞ কেউ নয়। তাঁব জীবনের  
সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি আপনিই নষ্ট কবে দিয়েছেন। আব আজ তাঁর  
দৈহিক-ছদ্মশা নিয়ে আপনি বিদ্রোহ কবেছেন, পরিত্যাস কবেছেন।  
কেমন, এই না?’

যবময় পাঘচারা করতে কবতে ডার্মি বললে—‘তা হলে আমার  
সম্বন্ধে এই আপনাব ধাবণা। এই ভাবে যে নিজেকে খুলে ধরেছেন,  
‘তাব জগ্গা সহজে দগ্ধবাদ। আপনাব ভিষাব মত আমার অপরাধ  
অনেক। কিন্তু তবু—’ হঠাৎ এলিজাবেথের সমীপবর্তী হয়ে বললে  
ডার্মি,—‘তবু বলছি সে সব আপনি স্বল্পে অবহেলা কবতেন যদি না  
আমার মনের সবল কথা উদ্ঘাটিত কবতে গিয়ে আমি আপনাব  
অভিমানে আবাত দিতাম। যদি মিথ্যা ভাব কবে নিজের মনের  
সঙ্গে লুকোচুরি কবে আমি এইটুকুই প্রতিপন্ন কবতে চাইতাম যে,  
আপনাব প্রতি আমার সদয়বাবো কোথাও বাদ নেই, কোন  
অন্তরায় নেই। কিন্তু আমি তা পারি না। নিজের সঙ্গে জুয়াচুরি  
করা আমার সহজাত প্রগতি নয়। যে সব কথা আপনাব কাছে  
খুলে বলেছি তাব একটি বর্ণের জগ্গাও আমি অন্তর্ভুক্ত নই। তার মধ্যে  
কোন মিথ্যা ছিল না, কোন কিছুই বানানো মনগড়া নয়। আপনাব  
ঘর যে মদ্যবস্ত সমাজে তাব মধ্যে আমার উন্নাসের কোন কারণ  
থাকতে পাবে না। যে ঘরে আমি পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন কবতে  
যাচ্ছি, তাবের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যে আমার ভুলনায় হীন, তাতে  
নিজেকে দগ্ধ মনে কবতে পাবি না, সে কি আমার অপবাদ?’

এলিজাবেথের মনে যাই হোক, সে নির্বিকার কণ্ঠে বললে—  
‘আপনি ভুল করছেন। এ কথা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না  
যে, আপনাব বাক্য-বিত্যাস আবো দৌলতবৃত্তক হলেই আমি আমার  
মত ফিবিয়ে নিতাম। সে আপনাব ভুল।’

এতখানি কচতা সবের ডার্মি নিরুত্তর হইল দেখে এলিজাবেথ  
পুনরায় যোগ দিলে—‘যে ভাবেই আসতেন আপনি প্রস্তাব নিয়ে,  
আমি আপনাকে প্রত্যাখ্যান কবতাম। আপনাব সঙ্গে পরিচয়ের  
প্রথম মুহূর্ত থেকেই আপনাব অহমিকা, আপনাব উন্নাসিকতা,  
অপবেব প্রতি আপনাব অবজ্ঞাব ভাব আমার মনে বিত্বার ভাব  
জাগিয়েছিল। তাব পূর্ব দিনে দিনে আমার সেই বিত্বাব বেড়েছে  
বই কমেনি। এ কথা আমি বিশ্বাস কবতাম, আজও কবি যে,  
পৃথিবীতে যদি কাউকে বিয়ে কবি কোন দিন, সে আপনি হবেন না  
কিছুতেই।’

‘আপনাব মনেব কথা আমি বুঝেছি,’ বললে ডার্মি—‘আব  
আমাকে লজ্জিত কববেন না! দগ্ধবাদ আপনাকে। এতখানি  
সময় আপনাব নষ্ট কবে দিলাম, তাব জগ্গা মার্জনা চাইছি  
আশা কবি শীঘ্র স্বস্থ হয়ে উঠবেন।’

আর অপেক্ষা না কবে ডার্সি দব থেকে নিষ্কান্ত হয়ে গেল। বাইরের দবজায় যখন অতিথিব বিদায়ের শব্দ পাওয়া গেল তখন এলিজাবেথের মনোব আকাশে দ্রবস্ত স্বল্প উঠেছে। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। সে নাটক অভিনীত হয়ে গেল এতক্ষণ তার ঘরে, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি মনে পড়তে লাগল একে একে। এত দিন ধরে এক প্রবল প্রেম গোপন করে বেগে এসেছে এই লোকটি তার সম্বন্ধে। এত সামাজিক অন্তরায় সত্ত্বেও এত দিন ধরে সেই প্রেম যে প্রকাশিত হোল এ চিন্তায় বিহ্বল হয়ে গেল এলিজাবেথ। আর এত লোকের মধ্যে এই দার্শনিক মানুষটি অবশেষে পালিপ্রার্থী হল তার। আকাশ-পাতাল ভাবনায় এলিজাবেথ খেই হাবিয়ে ফেললে।

এমন সময় বাইরে শালটির মাড় পেয়ে সে চকিত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। এই ভাবে প্রিয় বান্ধবীর কাছে মুখ দেখাবে সে কেমন করে?

### পর্যটন

কাল সে ভাবনা নিয়ে শুয়েছিল, সেই ভাবনা সঙ্গে কবেই আজ সকালে ঘুম ভাঙল তার। গত সন্ধ্যায় বিছানার ঘোব বেন তখনো কাটেনি এলিজাবেথের। অগা কিছু ভাবতেও পাবলে না সে। আজ সারা দিন এই একটা অস্বস্তিকর বোধ মনের উপর চেপে বসে থাকবে, এই ভয়েই এলিজাবেথ স্থির করলে প্রাতঃপ্রবেশের পরই একটু বেবোবে। বাইরে খোলা হাওয়ায় মন একটু স্বস্থ হবে। নিজের পরিচিত প্রিয় বাগানটিতে প্রবেশের মুখেই চকিতে মনে পড়ল তার যে, ডার্সি কখনো কখনো এই পথেই আসে। স্তব্ধতা সে পথ এড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেল সে। বাগানের চাবি পাশে ছুঁতিন বার পায়চারী করে এলিজাবেথ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পাকের ভিতরে তাকিয়ে দেখলে। আজকের সকাল বেলাটি প্রসন্ন-মধুর। এখন দিনে দিনে প্রকৃতির রূপ বদলাচ্ছে। গাছের কচি পাতায় নতুন বর্ণের সমাবোহ দিনে দিনে এসেছে। এক পা এগোবাব মুখেই বাগানের দাবেরী বাঁধের মধ্যে এক ভুললোককে সে দেখতে পেল। তিনি সেই দিকেই এগিয়ে আসছিলেন। যদি ডার্সি হন, এই আতঙ্কে এলিজাবেথ পিছু হটতে শুরু করেছিল। কিন্তু কয়েক পা এগোবাব আগেই যে কণ্ঠ তাকে সম্বোধন করল, পিছনে না তাকিয়েই এলিজাবেথ বুঝল সে ডার্সি। কাছে এগিয়ে এসে ডার্সি হাত বাড়িয়ে একখানি চিঠি তার হাতে দিলে, তার পর গভীর মুখে বললে, 'আপনার সাক্ষাতের আশায় এইখানেই অপেক্ষা করছিলাম, কিছুক্ষণ। দয়া করে এই চিঠিখানি আপনি পড়লে বড়ই বাধিত হব।' কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই ডার্সি দ্রুত-পায়ে বাগানের মধ্যে অন্তহিত হল।

কোন প্রত্যাশার আনন্দ না থাকলেও গভীর কৌতূহলের সঙ্গেই এলিজাবেথ চিঠিখানি পড়তে মনস্থ করলে। হুঁপাতা চিঠি ঘন করে লেখা। গলির পাখে এলিজাবেথ সেখানি পড়তে আবস্থ করলে। সকাল আটটা সময় দেওয়া শিরোনামাব পাশে।

দীর্ঘ চিঠিতে ডার্সি নিজের মনের কথা কিছুমাত্র গোপন করার চেষ্টা করেনি। স্পষ্ট ভাষায় লিখেছে তার বক্তব্য। বিশেষ করে যেখানে জেনের কথা লিখেছে ডার্সি, সেখানটি ভাল করে পড়তে লাগল এলিজাবেথ :

"সেই বল-নাচের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে, যেদিন আপনার সঙ্গে নাচবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেই সন্ধ্যায় শ্রাব লুকাসের মুখে আমি প্রথম জানতে পাবলাম আপনার ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহের প্রীতি-বন্ধনের কথা। তাদের প্রেম এত দূর অগম্য হয়েছিল যে, বিবাহের দিন ভিন্ন আব সকলই স্থবীকৃত হয়ে গেছে। সেই মুহূর্ত থেকে আমি আমার বন্ধুকে তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করতে শুরু করি এবং সেই প্রথম আমি আবিষ্কার করি যে, আপনার ভগ্নীর প্রতি তার প্রীতির সীমা নেই। আপনার ভগ্নীকেও আমি আমার পর্বে থেকে থেকে বাদ দিইনি। তাঁর আচার-আচরণ-দৃষ্টিতে একটা যদা হস্তময়তা থাকলেও এটুকু আমি দেখেছিলাম যে, আমার বন্ধু প্রীতি ও প্রেমকে তিনি বেন অতি সহজে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দিক থেকে সমপরিমাণ জল্পনাগোব লক্ষ্য আমার নজরে পড়েনি। তাঁর এই নিকটাপ আচরণ আমার মনকে ব্যাথা ভাবে দিয়েছিল। এমন হতে পারে যে, আপনার ভগ্নীকে এই দিক থেকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আপনি সে বিষয়ে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী জানেন তাঁকে। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে তবে সে জগা আমি দুঃখিত। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে পারি না যে, নৈব্যস্তিক দৃষ্টিতে দেখে সেদিন তাঁর ব্যবহারে আমার বন্ধু জল্পনাগোব প্রতি কোন মিল্ক আমন্ত্রণী আমি দেখতে পাটিনি। কিন্তু সেই কারণে আমি তাদের মিলনে অন্তরায় সৃষ্টি করিনি। ততোধিক যে কারণ সেদিন বর্তমান ছিল, আজো তার শ্রবমান ঘটেনি।"

এই অবধি বলে ডার্সি পুনরায় ফিরে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে এই দুই পরিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠাব অসাম্য। উইকহাম মধ্যম্বে ডার্সি তার বিবৃতিতেও কোন কার্পণ্য করেনি। তাদের পরিবারে উইকহামের অবস্থিতি মধ্যম্বে সে দীর্ঘ ভাবা দিয়েছে চিঠিতে। তার বাবা যে এই ছেলেটিকে গভীর ভাবে শ্রেহ করতেন এবং মুহূর্তকালে তার জগা কিছু আর্থিক ব্যবস্থাও পাকা করে গিয়েছিলেন সে কথা স্বীকার করেছে সে। নিজের দিক হতে উইকহামকে বঞ্চিত করার কারণগুলি একে একে ধাবা-বিবরণী মত ব্যক্ত করে গেছে। কি পরিমাণ অবঃপতন তার ঘটেছিল সে কথার ইঙ্গিত দিয়েছে পত্রে এবং কত দূর অগম্য হবার পর কি আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় সে তার প্রতি কঠিন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা লিখে পত্র শেষ করেছে এই প্রত্যাশায় যে, কোন ভবিষ্যৎ স্মৃতির দিকে লক্ষ্য বেগে সে আজ নিজেকে উদ্ভাটিত করতে চাইছে না, বরং তার মধ্যম্বে কোন এক জনের বিপরীত ভাব পোষণের অমৌজিকতাই সে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে মাত্র। প্রয়োজন বোধে পুনরায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে নিজেকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছে।

### ছত্রিশ

ডার্সি যে এই পত্রের মারফৎ তার নিকট পুনরায় গত রাত্রেব প্রস্তাব উত্থাপন করেছে এ প্রত্যাশা ছিল না এলিজাবেথের। তবু গভীর উদ্দীপনার সঙ্গে পত্রের প্রতিটি ছত্র পাঠ করলে সে। পত্রের ছত্রে ছত্রে তার মনে নানা ভাবাবেগের সংঘব উপস্থিত হোল। জেনের জীবন বিকাশের মুখে বিনষ্ট করার দায়িত্ব নিয়েও কোন লজ্জাবোধ করেনি ডার্সি। রচনার মধ্যে এক বিন্দু অহুতাপ নেই, দার্শনিকতা ও ঔদ্ধত্য বেন জড়ানো সমস্ত চিঠিখানিতে।

উটকছামের সম্বন্ধে ডার্সি সেখানে তাব মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেছে, সেটুকু গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করবেছে এলিজাবেথ। নিজেব সম্বন্ধে যে সকল কথা তাব কাছে স্বীকার করেছিল উটকছাম, তাব সঙ্গে এই বিবরণীও এমন নিখুঁত সাদৃশ্য যে, সে সকল সত্য হলে এই যুবকের সম্বন্ধে কোন আশাটী পোষণ করা যায় না। এইটুকু তাব অতৃপ্তির জগতে তীব্র ভাবে পৌঁছানায়ক বোধ হোল। মনেব সেট বেননাকে কি জানি কেন কোন সংজ্ঞা দিতে পারলে না এলিজাবেথ। তাব মনেব ভিতর বিশ্বাস ও আশঙ্কা যুগপৎ কাঁটাব মত বিধতে লাগল। ডার্সি কথায় মিথ্যা বলে 'উড়িয়ে দেবাব জগা' তাব মন ঢেঁল হয়ে উঠল। 'নিশ্চয়ই মিথ্যা, পৃথিবীর জবজ্বলন্ত মিথ্যা এই কামিনী'—এই কথা বলে এলিজাবেথ চিঠিখানি সবিয়ে বাগলে। প্রতিজ্ঞা করলে মনে মনে যে, এই মিথ্যাব দলিল আব সে ফিরে পড়বে না, সত্য বলে কিছুতেই মানবে না।

মনেব ভিতর ওলট-পালট নিয়ে এলিজাবেথ বাড়ীর দিকে বওনা দিল। কিন্তু তাব প্রতিজ্ঞা মুহূর্তেই ভেঙে গেল। আবাব চিঠিখানি বাব করে সে পত্রেকটি ছত্র তাক্ষর বিশ্লেষণ করে পড়তে লাগল, বিশেষ করে সেখানে উটকছাম সম্বন্ধে লিখেছে ডার্সি।

বাব বাব পড়াব পব এলিজাবেথের চোখেব উপব যেন এক নতুন জগতের সামান্য উদ্ঘাটিত হল। সবটী যেন অগা বকম হয়ে উঠল তাব চোখেব সামনে। ডার্সি বিরুদ্ধে তাব যত আক্রোশ জমেছিল দিনে দিনে, সব যেন স্বগোলকে কুয়াশার মত অস্তুরিত ততে লাগল। বিরলেব মত ব্রিদ্ধ সবল মানুষও এই ব্যাপারে ডার্সি নিবপবাদচিন্তাব কথা বলেছিল, মনে পড়ল এলিজাবেথের। যদিও দীর্ঘ দিনেব পবিচয় নয় তাদের, তবু ডার্সিকে সে যটুকু জেনেছে, বিশেষ করে এখানে আসা অবদি যে পবিচয় অধিকতর বসিষ্ট হবাব ধ্রোণ পেয়েছে, ডার্সি চবিত্রের বতটুকু সে দেখেছে তাতে দাস্তিকতা ও উল্লাসিকতাব পবিচয় থাকলেও, অধর্মিকতা ও তীব্রতার স্থান নেই। নিজেব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধদের মধ্যে ডার্সি সর্বজনের স্নেহ ও শ্রদ্ধাব পায়। এমন কি উটকছাম অবদি তাব ভাড়াহেব আকাঙ্ক্ষা করে। নিজেব বোনকে কি গভীর ভালবাসে ডার্সি, তা সে হাজার বাব দেখেছে। আব উটকছাম তাব বিরুদ্ধে যে সকল অপবাদ জমা করে বেখেছে, তা যদি সত্য তত তাব সমস্ত পৃথিবীর কায়ধর্ম ডার্সিকে কঠিন শাস্তি দিত নিঃসন্দেহে। ডার্সি যদি সত্যই অসং চবিত্রের মানুষ হোত, তাব বিরলেব মত সঙ্কলনেব সঙ্গে তাব বন্ধুত্ব হওয়াব কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিজেব নিরুদ্ভিতাব লজ্জায় মবে যেতে লাগল এলিজাবেথ। উটকছাম আব ডার্সি, দু'জনেব সম্বন্ধেই সে এত কাল অন্ধ ছিল, আশ্ববস্তি ছিল।

'কি লজ্জাজনক ব্যৱহাৱ করবেছি আমি এত কাল'—এবলে সে—'নিজেব বিচ্যাব-বুদ্ধিব উপব আমার এত বিশ্বাস! দিদি যে পৃথিবীর সব মানুষকে এত বিশ্বাস করে সবল মনে, তা নিয়ে কত ঠাট্টা করেছি তাকে। অথচ আমিই নিজের ভাস্ত বিচ্যাব-বুদ্ধিতে নির্দোষ প্রমাণ হয়ে গেলাম। কী অসীম লজ্জা! নিজের ভালবাসার জনকে আবির্ভাব করতে গিয়ে আমার দর্প আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। এক জনেব স্ত্রীত্বতে দুঃখ হয়ে, আবেক জনেব

প্রথম পবিচয়েব ক্ষণ থেকেই অবহেলিত হয়ে আমি এত কাল যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। এত কাল নিজেকে চিনিনি। যখন চিনতে পারলাম, জীবনেব মধু-লগ্ন তখন পার হয়ে গেছে।'

নিজেব কথা থেকে দিদিব কথায়, তাই থেকে বাংলােব কথায় তাব মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগল। জেনেব কথা শ্রবণ হতেই মনে পড়ল যে, তাব বিষয়ে ডার্সিব আশ্বদোষ ফালনেব চেষ্টা সার্থক হয়নি। চিঠিখানি খুলে আব একবার পড়ে দেখল এলিজাবেথ। এবাব তার বিশ্লেষণ মনকে অস্ত্র অতৃপ্তিতে আপ্রত করল। এ কথাও সে স্বীকার করতে পারলে না যে, এক দিক থেকে ডার্সি অল্পমান মিথ্যা নয়। সে নিজেও দিদিব আচরণে কদাচিত্ত অনুরাগেব বহিলক্ষণ দেখতে পেয়েছিল। বরং তাব মধ্যে যেন এক ঔনসীয়াই প্রকট হয়ে থাকত, যদিও নিবিড় প্রেমাত্মবাগে তার মন স্বতঃই প্রাবিত হয়ে থাকত।

পত্রের যে অংশে ডার্সি তাদের পবিবাবেব উপব নির্মম কটাক্ষ করবেছে, সেটুকু পড়ে তাব মন আহত পাখীর মত যন্ত্রণায় কাঁতবাত্তে লাগল। ডার্সি যে ভাবে আক্রমণ করবেছে, তার সত্যতা স্বীকার করতে পারে না সে এবং সেদিনকার বস-নাচে তাদের পরিবার যে ভাবে আচরণ করেছিল তাতে ডার্সি মত নবীন আগন্তুক ত বটেই, সেই পবিবাবেব কল্যাণ হিসাবে সে অবদি লক্ষ্যায় মবে গিয়েছিল।

ডার্সি তাকে এক তাব দিকিকে যে ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে, পবে সেটুকু তাব মনে সানন্দে গৃহীত হোল। ডার্সি এই স্ত্রীত্বিতে তাব মনেব ক্ষতে সামান্য প্রলেপ লাগলেও এটুকু এলিজাবেথ ভুলতে পারলে না যে, তাব পবিবাবেব একান্ত বাবা আপনাব জন তাদের নাম-শ্রুতিতেই জেনেব তকণ প্রাণেব প্রেম ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এই চিন্তায় তাব মন এক অভূতপূর্ব হতাশায় ও দ্রাবিনতে ভবে গেল।

হাজার বকম ভাবনায় উত্তলা হয়ে ত'পটা পবে এলিজাবেথ পথে পথে ঘূবে বেড়াল। সমস্ত ঘটনাবলী মনে মনে সে আলোড়ন করলে। ঘটনাব পরিবর্তি ও সম্ভাবনামূলিকে কত বকম করে ভাঙাচোরা করলে সে। তাব মনে যে নতুন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল, এই প্রসঙ্গ সকাল বেলা সে কথা আলোচনা করতে করতে এক সময় সে বাড়ীতে ফিরে এল। দেহে-মনে গভীর ক্রান্তি বোধ করলেও সে মুখেব হাসি বজায় রেখে বাসায় এল, যাতে তার মানসিক দ্বন্দ্বের কোন প্রকাশ না পায় অগা লোকেব কাছে।

বাড়ীতে ফেবাব সঙ্গে সঙ্গেই শালটি তাকে জানাল যে, দুই ভাই তার কাছে বিদায় নেবাব জগা এ বাড়ীতে এসেছিলেন। ডার্সি কয়েক মিনিট অপেক্ষা করেই ঢলে গেছে কিন্তু কর্ণেল ঘট্টা থানেকেব বেশী অপেক্ষা করে বসেছিল। এমন কি বাইরে তাকে ধবাব জগাও উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু এলিজাবেথের মন এই ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হল না। তাদের সঙ্গে যে দেখা হয়নি এতে বরং উল্লসিত হল তাব মন। কর্ণেলকে নিয়ে ভাববাব সময় তাব আব নেই। সকালে পাওয়া চিঠিখানি তার মনকে সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন করে বেখেছে। তার বাইরে জগাব আব কিছু নেই।

## সাঁইত্রিশ

পরেব দিন সকালে ভদ্রলোক দু'টি বোজিংস ত্যাগ করলেন। কলিঙ্গ বিদায় অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সেটাই এই শুভ সমাচার বহন করে আনল যে, গেল ক'দিন যে বিদায়ময় আবহাওয়া বহে গেছে তাব পব বেশ সুস্থ মনে উৎফুল্ল চেতনায় নিয়েই তাবা বিদায় নিয়েছে। লেডী ক্যাথারিন আর তাঁব মেয়েকে সাধনা দেওয়ার জন্য কলিঙ্গ তাদের বাসায় গেল এবং সেখানে থেকে মনের আনন্দে ফিরে এল এই বাতী নিয়ে যে, লেডী ক্যাথারিন সবাইকে তাঁব বাড়ীতে যাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন।

সেই সঙ্গে এলিজাবেথের মনে হোল, সে যদি ইচ্ছা করত এত দিনে সে তাঁব ভারী নাড়নো হয়েই আজ বেতে পাবত সেখানে এবং সে ক্ষেবে লেডী ক্যাথারিনের বোনের কথা ভেবে না হেসে থাকতে পাবল না সে। 'কি হিঁমি বলতেন? কেমন ব্যবস্থা করতেন আমার সঙ্গে?'—এই সমস্ত কথা চিন্তা করে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করতে লাগল এলিজাবেথ মনে মনে।

অতিথিদের বিদায় নিয়ে যাওয়া নিয়েই শুরু হোল প্রাথমিক আলোচনা। 'আমি ওদের অভাব অত্যন্ত বোধ করছি—আমার মনে হয়, আমার মত পক্ষপাতের অভাব এমন গভীর ভাবে কেউ অনুভব করে না'—বললেন লেডী ক্যাথারিন। 'বিশেষ করে এই ছেলে দু'টিকে আমি খুব ভালবাসি। তাবও আমার অল্পবক্ত, চলে যাওয়ায় তাবও অশান্ত থাকত হয়েছে। কর্ণেল শেষ অবধি মনের ক্ষুঁতি অনেকটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, কিন্তু ডার্মি একেবারেই মুশড়ে পড়েছে—গেল বছরের চেয়েও বেশী মনে হোল আমাব। এবানকার আকস্মিক তাব প্রতি বসব বাড়'।

অতাবের পব লেডী ক্যাথারিন মন্তব্য করলেন যে, এলিজাবেথ যেন একটু মনমরা হয়ে পড়েছে এবং নিজেই কাবণ নির্ণয় করে বললেন যে, সে হয়ত এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে চায় না।

—'তাঁই যদি হয় মা'কে লেখ সে, তুমি আরো কিছু দিন এখানে থাকতে চাও। মিসেস্ কলিঙ্গ তোমায় পেয়ে খুশীই হবে বলে আমাব বিশ্বাস।'

—'আপনার এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাব সাধ্যাতীত। পরেব শনিবারেব মধ্যেই আমাকে সববে পৌছতে হবে।'

—'সে ক্ষেবে এখানে তুমি মাঝ দু'সপ্তাহ বইলে। আমি আশা করেছিলাম দু'মাস থাকবে। তুমি আসাব আগে মিসেস্ কলিঙ্গকে আমি সেই বকমই বলেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ায় কি কাবণ থাকতে পারে? মা কি আব পক্ষকাল তোমায় এখানে থাকতে দিতে পাবেন না?'

—'কিন্তু বাবা পাবেন না। তিনি গেল সপ্তাহেই তাড়াতাড়ি ফিরে আমাব জন্য চিঠি লিখেছেন।'

—'তোমাব মা যদি পাবেন বাবাও পাবেন আব ক'টা দিন ছেড়ে থাকতে। বাপের কাছে মেয়েদের মূল্য তেমন নয়। যদি পবে পূরো এক মাস এখানে থাক, আমি তোমাদের এক জনকে লগুনে নিয়ে যেতে পারি। জুনের গোড়াব দিকে হস্তা খানেকের জন্ত সেখানে যাচ্ছি আমি।'

—'আপনার স্নেহের শেষ নেই। কিন্তু আমাকে পূব পরিকল্পনা মেনে চলতেই হবে।'

লেডী ক্যাথারিন আশা ছেড়ে দিলেন। 'মিসেস্ কলিঙ্গ, ওদের হুঁজুনের সঙ্গে এক জন চাকর দিও। দু'জন যুবকী মেয়ে একা যাবে আমাব পছন্দ নয়। এ অত্যন্ত অসুচিত। কাউকে সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এ ধরণের ব্যাপার আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। তরুণী মেয়েদের যথোপযুক্ত বক্ষা-ব্যবস্থা থাকা ভাল। গেল গ্রীষ্মে আমাব নাতনী জর্জিয়ানা যখন গ্রান্সগেট গেল আমি সঙ্গে দু'জন চাকর দিয়েছিলাম। এ সবের প্রতি আমাব কড়া নজর। মিসেস্ কলিঙ্গ, তুমি জেনকে ওদের সঙ্গে দেবে। যাক, সময় মত আমার মনে পড়েছে কথাটা। ওদের একা পাঠানো তোমাব পক্ষে অত্যন্ত নিন্দার হাত।'

—'মামা লোক পাঠাবেন।'

—'ও তোমার মামা,—তিনি চাকর রাখেন না কি? শুনে খুব আনন্দ হোল। অকোবাও এ সব কথা ভাবে। কোথায় গাড়ী বদল করবে? ব্রমলীতে নিশ্চয়। সেখানে আমার নাম করো, স্তবিধা হবে।'

যাওয়ার সঙ্কে আবো অনেক প্রশ্নই করলেন লেডী ক্যাথারিন। কিন্তু সববট উত্তর দিতে হোল না এলিজাবেথকে—এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে তাব পক্ষে। কিন্তু তবুও সতর্ক থাকতে হোল প্রতি মুহূর্তে—কাবণ, মন বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট থাকায় ভুল হয়ে যেতে পারে যে, কোথায় সে আছে। নিবালয় বসে চিন্তা করার অনেক কিছু আছে। একলা যেই হোল পবম সম্ভব নিশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ। এব পব এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন না সে একা বেড়িয়েছে আব অপ্রতীকর দৃষ্টিব জাবব কেটেছে।

ডার্মি চিঠি তাব প্রায় কর্ণস্থ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি লাইন সে বার বার অনুবাদন করেছে আর লেখকের প্রতি মনোভাব ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন আকাব ধারণ করেছে। যখন ঠিকানা লেখার কায়দাব কথা খববে এসেছে, মন অসহ বাগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখনই আবাব ভেবেছে অন্মায় ভাবে সে তিবন্ধাব করেছে ডার্মিকে, তখনই বাগটা গিয়ে পড়েছে নিজের উপবট আব হতাশ-শুরু ডার্মিব প্রতি মমতায় মন নবম হয়ে এসেছে, তার অল্পবাগে কৃতজ্ঞতায় মন ভবে উঠেছে। তাব চরিত্রে আছে সধম, তবুও তাব গ্রহণ করতে পাবলে না এলিজাবেথ, এমন কি প্রত্যাখ্যানের জন্ত মনে মুহূর্তেব অনুশোচনা এল না। এমন কি তার সঙ্গে আবাব দেখা হওয়ার বিন্দু মাত্র আগ্রহ বোধ করে না সে। তার অতীত আচরণই বিরক্তি ও অনুশোচনার আদি উৎস—তাদের পরিবারে এমন কতকগুলি দুঃখজনক ক্রটি আছে যা আরো গভীরত মর্মবেদনাব কারণ হয়ে আছে। এ সমস্ত ক্রটির প্রতিকারে আশা দ্রাশা। বাবা সে সব হেসে উড়িয়ে দিয়ে নিশ্চয়—তিনি কখনও তাঁব ছোট মেয়েদের এই বলগাহী চকলতার বাশ টেনে ধরতে চেষ্টা করবেন না। মা এব সম্ভাব্য ক্ষতি সঙ্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এলিজাবেথ জেনে সঙ্গে বহু বার ক্যাথারিন ও লিডিয়ার নিলজ্জতা শাসন করে চেষ্টা করেছে। কিন্তু মাগের যেখানে প্রশ্রয় রয়েছে সেখা শোধরানোব আশা কোথায়? ক্যাথারিন দুর্লভচিত্ত, খিটখি

এবং সম্পূর্ণ লিভিয়াব নির্দেশে চলে। তাদের উপদেশ সে তো নাচ্ছিল্য হবে উড়িয়ে দেয়! আব লিভিয়া দেখাচাবো অসাবধানী—সে কাকুর উপদেশে কর্ণপাতট কববে না। তাবা যেমন মূর্খ, তমনি অলস ও দোমাকী। মেবিটনে কোন অফিসাব এলেই তাব সঙ্গে ফ্লাটি কববে। আব লংবোর্ণ থেকে এক পা গেলেই মেবিটন—কাজেই সেখানেই অনববত্ত গতিবিধি তাদের।

তা ছাড়া জেনের জ্ঞা দৃষ্টিস্থার নিবসন হয়নি আজও। বিংলেকে আবাব জেনের তত্ত্বাবগা কবাব ডার্সিব কৈফিয়ৎ শুনেছে সে। জেন যা তারিয়েছে আবাব তা ফিবে পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিংলের ভালবাসা অকপট—তাব আচরণও নির্দোষ—অবশ্য যদি তাব বন্ধুব সন্তোষ আস্থা প্রাপন কবা যায়। এ কি কম দুঃখেব যে, সব দিক থেকে স্পৃহণীয় সুবিধাজনক ও সুখকব বিয়ে শুধু নিজেদের পবিত্রাবের মর্যতা ও শালীনতা বোধেব অভাবের জ্ঞা জেন হাবাতে বসেছে।

এব সঙ্গে আবাব উইকহামেব চবির সম্পর্কিত ব্যাপাব যোগ হওয়ায় এটা সম্ভেট ধবে নেওয়া যায় যে, চিব-সজীব মনেব সজীবতা এতট বাক্তত হয়েছ যে, এলিজাবেথেব পক্ষে প্রফুল্লতা বজায় রাখা বেশ অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

এখানে আসাব প্রথম সপ্তাহেব মত শেষ সপ্তাহেব ক'টা দিনও হামেশাই নিমন্ত্রণ আসতে লাগল লেডী ক্যাথাবিনেব ওখান থেকে। শেষ সন্ধ্যাও কাটল সেখানে। আবাব লেডী ক্যাথাবিন তাদের যাওয়া সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খুটিনাটি কথা জিজ্ঞেসা কবলেন এবং উপদেশ দিলেন।

তাবা যখন বিদায় নিল লেডী ক্যাথাবিন স্তম্ভিত মুখে তাদের শুভ প্রার্থনা কবলেন, আগামী বছব হ্যান্সফোর্ডে আসাব নিমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁব মেয়েও তাদের সঙ্গে কবমর্দন করে সৌজন্তেব পবাকীষ্ঠা প্রদর্শন কবল। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শির্শাদ সেনগুপ্ত ও ভয়স্তুকুমার ভাট্টা।

### মৃত্যুমুখে পাতলোভা

শ্রেষ্ঠতম বালে নর্তকী আনা পাতলোভা পঁচিশ বছব ধ'বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-আমেবিকা, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং সমগ্ৰ পৃথিবীকে নাচ দেখিয়ে বিশ্বমে সজ্জ ক'বে বেগেছিলেন। তখনকাব খ্যাতিমান সমালোচকবৃন্দ একরায়ে স্বীকাব কবেছিলেন, অন্ততঃ ত'পুরুষ ধ'বে পাতলোভাব মত প্রতিভাময়ী নর্তকী লোকচক্ষে দেখা যায়নি। বাশিয়াস দেট পিটার্সবার্গে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পাতলোভা জন্মগ্রহণ কবন। পাতলোভা যে নর্তকী হবেন শৈশবেই বোঝা গিয়েছিল। তখন থেকেই তিনি পাখী ও প্রজাপতিব মত উড়ে যাওয়ার নকল কবতেন। আট বছবেব মেয়ে পাতলোভা, মা মেয়েকে দেখাতে নিয়ে গেলেন চাইকোন্সিজের নাচ। মেয়ে তো নাচ দেখে বিমুগ্ধ ও হতবাক। দেখতে দেখতে এতট পাতলোভা অবাক যে, হাতেব আঙুল থেকে বস্তপাত হয়ে যাচ্ছে গেয়াল নেই। আঙুল চুষতে চুষতে নাচ দেখছিলেন পাতলোভা।

দু'বছব অতীত হয়েছ। মা পাতলোভাকে ইম্পিবিয়াল স্কুলে ভর্তি কবে দিলেন। স্কুলটি পিটার দি গ্রেট স্থাপিত করেন—যেখানে নিয়মানুবর্তিতা ছিল অতি প্রকট। কিন্তু পাতলোভা ভর্তি হওয়াব সময় থেকেই প্রতিভা দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছেন স্কুলকে। বাইশ বছব বয়সে পাতলোভা বালে দলে সুর্যোগ পেলেন। তখন থেকেই তিনি যশেব চবম শিখাবে উঠলেন। অসুখ-বিসুখ হলেও পাতলোভা নাচ থামাতেন না। প্রতি বছব সদলে পাতলোভা

নাচ দেখাতে যাত্রা কবতেন কোথাও না কোথাও। লগুনে তিনি অধিকতম অর্থ উপাচ্ছন কবেছিলেন। তিনি বসতেন, “সর্বত্র মায়াব আমাব নাচ দেখতে চায়।” মোস্কোতে যখন তিনি নাচতে গেলেন তখন এতট ভীড় হয় যে শেষ পর্যন্ত ‘বুল বিং’ পাতলোভার, নাচের ব্যাধা হয়।

পাতলোভা ট্রেনে চলেছেন। ট্রেন-দুর্ঘটনা হ'ল। অনাক্রান্ত ছিলেন পাতলোভা, কিন্তু প্রাথমিক সাহায্যেব আশায় থাকতে থাকতে বাতের বেলায় ঠাণ্ডা লাগলো। বন্ধুবান্ধব বসলেন বিশ্রাম গ্রহণ করতে। কিন্তু পাতলোভা নাচ থামালেন না। নিমোনিয়ায় ধরলো পাতলোভাকে। অস্ত্রোপচার কবতে হবে বুকে, কিন্তু অস্ত্রোপচার হলে ভবিষ্যতে কখনও তিনি নাচতে পাবেন না। সে জ্ঞা তিনি বাধা দিলেন অস্ত্রোপচাবে।

অস্ত্রের মর্মে ভুল বকেছেন পাতলোভা। কি গেয়াল হয়েছ, পাতলোভা চাইলেন একটি পোষাক। পাতলোভাব কীর্ণ কটিদেশ কাপতে লাগলো, যেমন কাপতে যখন তিনি নাচতেন। কি একটা নাচ মনে পড়েছে পাতলোভাব। পৃথিবীতে তখন অজা কিছুব প্রতি পাতলোভাব আকর্ষণ নেই, শুধু ঐ পোষাকটিব প্রতি। পাতলোভার হাত দু'টি কাপতে কাপতে প্তিব হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠলো হঠাৎ যেন স্বর্গীয় হাসি। চোখ দু'টি স্তিমিত হয়ে গেল। মৃত্যু হ'ল পাতলোভাব।





## এ্যাটম

শ্রীযামিনীমোহন কর

### দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্যাটমের বিভিন্ন ধর্ম

**প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথা বড় কাল আগে ভাবতেন মনোযীবা**  
উল্লেখ করেছিলেন বটে কিন্তু তড়িৎ (electricity)

সম্বন্ধীয় গবেষণা মঙ্গ প্রথম হয় গীসে, থুঃ থুঃ ১০০ বছর পূর্বে। গীসীয় দার্শনিকরা দেখিয়েছিলেন যে, আত্মাবকে পশ্চাত্তম বা কাপড় দিয়ে ঘষলে, তা হালকা ভিনিয়াকে, যেমন, পশম অথবা পান্নকে আকর্ষণ করে। আত্মাবকে গীক ভাসায় ইলেকট্রন বলে, তাই থেকে এই আবে। শক্তির নাম হয়েছে ইলেকট্রিসিটি। বড় দিন এই ব্যাপার ধামা চাপা পাড়ে ছিল। যোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের গিলবার্ট দেখালেন যে, কেবল আত্মাব নয়, কাচও এই ভাবে ঘষলে আকর্ষণ শক্তি লাভ করে। পূর্ববর্তী একশ' বছর ধরে এ নিয়ে আবে কোন উচ্চবাচ্য চল না। ১৭৩৩ সালে ফ্রান্সের দুফে দেখালেন যে, কাচকে সিক দিয়ে ঘষলে, কাচ ও সিক উভয়ের মধ্যেই এই আকর্ষণ-শক্তি জাগে, কিন্তু 'তাত্ত্বদের' তড়িৎ শক্তি এক ধরনের নয়। গালাকে পশ্চাত্তম দিয়ে ঘষলে তড়িৎ উৎপন্ন হয় কিন্তু তড়িৎযুক্ত যে পদার্থকে গালা আকর্ষণ করে, কাচ তাকে বিকর্ষণ করে অর্থাৎ দু'বে ঠেলে দেয়। এদের নাম দেওয়া হল কাচজাতীয় ও বস্তুজাতীয় তড়িৎ। ১৭৪৭ সালে আমেরিকায় ফ্র্যাঙ্কলিন এই দুই ভিন্ন তড়িৎ শক্তির নামকরণ করলেন ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িৎ! কাচে সঞ্চারিত তড়িৎ ধনাত্মক এবং গালায় সঞ্চারিত তড়িৎ ঋণাত্মক। ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কাচ ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত গালাকে আকর্ষণ করে কিন্তু অপর একটি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কাচকে বিকর্ষণ করে। ফ্র্যাঙ্কলিনের মতে সর্বদাই তড়িৎ সমভাবে ছড়িয়ে আছে। কোন পদার্থে তাব আধিক্য হলে সেটা ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়ে যায়, আর ঘাটতি হলে সেটা ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়। অবশ্য এটা তাঁর নিছক করনা। আধুনিক মতবাদে ইলেকট্রনের আধিক্য ঋণাত্মক এবং ভ্রাসে ধনাত্মক তড়িৎ। এ সম্বন্ধ পাবে আলোচনা করা হবে। যে তড়িৎযুক্ত পদার্থ তড়িৎযুক্ত

কাচকে বিকর্ষণ করে বা তার দ্বারা বিকর্ষিত হয়, এবং তড়িৎযুক্ত গালাকে আকর্ষণ করে বা তার দ্বারা আকর্ষিত হয় তাকে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত বলা হয়। তেমনি যদি তা তড়িৎযুক্ত কাচকে আকর্ষণ করে এবং তড়িৎযুক্ত গালাকে বিকর্ষণ করে তাকে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত বলা হয়। এই সংজ্ঞা হিসাবে কাচের ঘর্ষণ-তড়িৎ ঋণাত্মক হওয়া উচিত। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলিন ঠিক তার উল্টো নামকরণ করে বসলেন। এত দিন পরে সঠিক নামকরণ করতে গেলে স্তবধার পবিবর্তে বিপত্তির উৎপত্তি হবে বলে আজও সেই ভুল নামই চালাতে হচ্ছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইতালির শরীর-ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞান অধ্যাপক লুইগি গ্যালভানি লক্ষ্য করলেন যে, সঙ্গমস্থ বাণ্ডের পেশী খুব কাছে বাখা বৈদ্যুতিক যন্ত্রের স্কুলিঙ্গে সঙ্কচিত হয়। পূর্বে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, দু'বকম দাতব্য তৈরী বাক্য মধ্যে এক দিকটা বাণ্ডের নার্ভে এবং অপর দিকটা পেশীতে ছোঁয়ালেও এই ধরনের সংকোচন হয়। তিনি এর কাবণ-স্বকপ বললেন যে, জাতব্য তড়িতের জন্মই এরূপ হয়। ১৭৯৬ সালে ইতালির ভল্টা এই মতবাদ গুণন করে দেখালেন যে, বাণ্ডের মধ্যে তড়িতের কোন সংগ্রহ নেই। দু'বকম দাতব্য আবে মধ্যে ভিজা কাপড় বা পিচবোর্ড দিয়েও তড়িত সঞ্চিত করা যায়। আর এই তড়িতের ফলেই বাণ্ডের পেশী সঙ্কচিত হয়। পূর্বে তিনি একটা কাচের পাত্রে মালফিউবিক অ্যাসিড মেশানো জল ঢেলে তাব মধ্যে এক দিকে তামাব ও অল্প দিকে দস্তাব পাত ছুবিয়ে রাখলেন। পাত দুটির ওপরটা একটা তাব দিয়ে সংযোগ করে দেখালেন তড়িত প্রবাহিত হচ্ছে। এরই নাম হল ভল্টীয় সেল।

আপাতত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, কাচ-বেশম ঘর্ষণে উৎপন্ন তড়িৎ এবং সেলের তড়িৎ ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উভয়ই এক, পার্থক্য কেবল অবস্থাতে। প্রথমটায় তড়িৎ একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকে, তাই তাব নাম স্থিতীয় তড়িৎ; এবং দ্বিতীয়টায় তড়িৎ তাবের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাই তাব নাম চল-তড়িৎ। প্রশ্ন উঠল তড়িৎ প্রবাহিত হয় কেন?

উঁচুতে রাখা জলভরা ট্যাঙ্ক থেকে একটা নল পুকুরে নামিয়ে দিলে জল ট্যাঙ্ক থেকে পুকুরে এসে পড়ে যদিও ট্যাঙ্ক অপেক্ষা পুকুরে অনেক বেশী জল। এই প্রবাহের কাবণ হল লেভেলের তারতম্য। ট্যাঙ্কের জলের লেভেল পুকুরের জলের লেভেলের চেয়ে উঁচু, তাই উঁচু লেভেল অর্থাৎ বেশী চাপের জল নীচে নেমে আসে। তা'হলেই দেখা যাচ্ছে যে, প্রবাহ পরিমাণের ওপর নির্ভব করে না, দুই প্রান্তের চাপের তাবতম্যের ওপর নির্ভব করে। তড়িতের ব্যাপারেও এই একই কথা পাটে। তড়িৎ-প্রবাহ, পরিমাণ অর্থাৎ চার্জের ওপর নির্ভব করে না, দুই প্রান্তের তড়িতের চাপের তাবতম্যের ওপর অর্থাৎ পোটেনশিয়াল বা ভোল্টেজের ওপর নির্ভব করে। আবার যেমন জলপ্রপাতের শক্তি নির্ভব করে জলের পরিমাণ এবং পতনের উচ্চতা অর্থাৎ চাপের তাবতম্যের গুণফলের ওপর, তেমনি বৈদ্যুতিক শক্তি নির্ভব করে চার্জ এবং চাপের গুণফলের ওপর। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে

ফ্যাবাডে স্থিতীয় এবং চল-তড়িৎের প্রবাহ পাঠ্য হিসেবে দেখালেন যে, স্থিতীয় তড়িৎে চাপ অধিক কিন্তু পরিমাণ কম এবং চল-তড়িৎে চাপ কম কিন্তু পরিমাণ বেশী।

তড়িৎ-প্রবাহের অভিমুখ ধনাত্মক চার্জ থেকে ঋণাত্মক চার্জের দিকে হলে তাকে ধনাত্মক বলা প্রথা। চার্জের চিহ্ন ব্যাঙ্গিমের মাজা মার্কিকট ঠিক করা হয়, তবে আকর্ষণ-বিকর্ষণ দিয়ে নির্ণয় করা হয় না। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে চুম্বক নড়ে যায়, বায়নিক প্রক্রিয়া হয়, তা থেকেও প্রবাহের অভিমুখ নির্ণয় করা করা যায়। প্রত্যেক তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্রের সেল বা ডায়নামো ছোটো মেরু থাকে। একটা ধনাত্মক, অপরটা ঋণাত্মক। প্রবাহের অভিমুখ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকের দিকে।

প্রবাহ একই দিকে হতে থাকলে তাকে ডি, সি (direct current) বলে; কিন্তু সাধারণ জীবনে ডায়নামো (কমিউটেটর বাদে) ইনডাকশান কয়েল ইত্যাদি থেকে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয় তার অভিমুখে নির্দিষ্ট সময়ান্ত্রে ক্রমাগত উল্টোতে থাকে। এর নাম এ, সি (alternating current)। এ, সি'র সৃষ্টি এই যে, ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ইচ্ছামত ভোল্টেজ অর্থাৎ তড়িৎের চাপের অন্তর কম-বেশী করা যায়।

১৭০৫ সালে ইংলণ্ডের হম্বলী লক্ষ্য করেন যে, এক কাচের জীবেব হাওয়ায় চাপ কমিয়ে দিলে তড়িৎযুক্ত আখার থেকে আলো বাব হয়। ১৭৫২ সালে ওয়াটসনও লক্ষ্য করেন যে, স্থিতীয় তড়িৎের ক্ষরণ কম চাপের গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বায়ু অপেক্ষা দ্রুত হয় এবং সেই সঙ্গে আলো নির্গত হয়। অবশ্য ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিলে সাধারণ বায়ুর মধ্যে দিয়েও তড়িৎ-ক্ষরণ সুলভ হয়, কিন্তু গ্যাসের চাপ যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তবে কম ভোল্টেজ দিয়েও এই ধরণের তড়িৎ-ক্ষরণ সুলভ না বাব করে করা যায়। কম চাপে ক্ষরণ সুলভের মত প্রচণ্ড হয় না কিন্তু তখন অনেক রকম আলোর খেলা দেখা যায়। বিজ্ঞাপনের 'নিওন' সাইন এবং খুব ভাল উদাহরণ।

তড়িৎ আনাগোনার জগৎ তড়িৎযুক্ত কণার প্রয়োজন। এই কণাগুলিকে 'আয়ন' (ion) বলে। তড়িৎ-চাপের তাবতম্য ইলেকট্রনগুলি চলতে আবদ্ধ করে। ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাগুলি প্রবাহের অভিমুখে, আর ঋণাত্মকগুলি বিপরীত দিকে। কোন বাধা না পেলে তাদের বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। চরম বেগ নিম্ন করে তড়িৎ-চাপের তাবতম্যের ওপর। বায়ুতে সাধারণত কিছু আয়ন থাকে স্রুতবাং ছোটো তড়িৎযুক্ত প্লেটের মাঝে বায়ু থাকলে, তার আয়নাগুলি চিহ্নানুসারে ণদিক-ওদিক ছোটোছুট করে। এর ফলে ছোটো ব্যাপার ঘটতে পারে—আয়নের সঙ্গে গ্যাসের অণু ধাক্কা লাগতে পারে, যাতে করে আয়নের শক্তি কমে যাবে, অথবা যুতসই ধাক্কা ফলে আবও আয়নের সৃষ্টি হতে পারে, যাকে বলে সংঘর্ষজনিত আয়ন সৃষ্টি। যদি বায়ুর অথবা গ্যাসের চাপ কমানো না হয় অর্থাৎ সাধারণ বায়ুর চাপের সমান থাকে তবে প্রথম ন্যাপার ঘটে এবং তড়িৎ বহনের জগৎ পর্যাপ্ত আয়ন থাকে না। কিন্তু যদি বায়ুর অথবা গ্যাসের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যাপার ঘটে এবং সংঘর্ষজনিত আয়ন সৃষ্টির ফলে আয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই জগৎ খুব সহজেই তড়িৎ-ক্ষরণ হয়। যদি

চাপ খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, তবে ধাক্কাধাক্কি কমে যায়, ফলে আয়ন সৃষ্টিও কমে যায়। তখন আব সহজে তড়িৎ-ক্ষরণ হয় না।

ভেন্টার ব্যাটারিতে তড়িৎজালক বল প্রায় দ্বয় থাকে। ১৮৩৮ সালে এই ব্যাটারীর সাহায্যে ফ্যাবাডে কম চাপের গ্যাসের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। কিন্তু তখনও উঁচু দরব শোষণ পাম্প না থাকায় গ্যাসের চাপ খুব কমাতে পারেননি। ১৮৫২ সালে জার্মানির গেইসলার খুব ভাল শোষণ পাম্প তৈরী করেন এবং একটা কাচের পাত্রে বাতব ইলেকট্রোড দিয়ে গ্যাসের চাপ কমিয়ে পাঁচটি বস্ক (seal) করে দেন। তিনি ও জার্মানির অ্যা এক বৈজ্ঞানিক প্রকার, তঁর মিলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত এই ধরণের পাত্রে মর্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণ সম্পর্কে বহুবিধ পরীক্ষা চালান। তা'বা লক্ষ্য করলেন যে, ক্যাথোড অর্থাৎ ঋণাত্মক ইলেকট্রোড থেকে সংক্ষেপে বহেব আভা বা আলো বেরোয় এবং পার্শ্বের কাছে চুম্বক নিয়ে গেলে এই আভা স্থান পরিবর্তন করে। ১৮৭৬ সালে প্রকারের ছাত্র গোল্ডস্টোন দেখালেন যে, এই আভার কারণ ক্যাথোড থেকে নির্গত আলোক-বস্মি। তিনি এর নাম দিলেন ক্যাথোড-বস্মি। এই বস্মিকে চুম্বকের সাহায্যে নড়ান যায় এবং এর গতিপথে কোন বাধা দিলে ছায়ার সৃষ্টি হয়, যাতে করে প্রমাণিত হয় যে, এই বস্মি সবল বেগে ধবে যায়। ৮৭৯ থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডের ব্রুন্স আবও উঁচু ধরণের বায়ুহীন ক্ষরণ-নল তৈরী করে তা'ব মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-ক্ষরণের গবেষণা করলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ক্যাথোড-বস্মি প্রকৃত পক্ষে ক্যাথোড অর্থাৎ ঋণাত্মক ইলেকট্রোড থেকে প্রচণ্ড বেগে প্রক্ষিপ্ত ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণাবাণি। ১৮৯৫ সালে সান্সের পেরী ক্যাথোড-বস্মিকে ফ্যাবাডের চোঙ-এব উপর নিষ্ক্ষেপ করে তড়িৎমাপক যন্ত্র (electrometer) সাহায্যে বস্মির চার্জের পরিমাণ ও চিহ্ন নির্ণয়ের উপায় উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু হার্জ (রেডিও-তরঙ্গের আবিষ্কার) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আপত্তি করলেন যে, ক্যাথোড-বস্মি যে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণাবাণির স্রোত, তার প্রমাণ কই? এমনও তো হতে পারে যে, এই বস্মি তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ। যদি স্বীকারও বরো নেওয়া হয় যে, ক্যাথোড থেকে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণাস্রুত নির্গত হয় কিন্তু এই কণার স্রোতই যে ক্যাথোড-বস্মি তা'ব তো কোন প্রমাণ নেই। ১৮৯৭ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক টমসন প্রমাণ দ্বারা আপত্তি খণ্ডনের চেষ্টা করলেন। তিনি পেরীর পরীক্ষার পুনরায় করে, তা'ব সত্যতা প্রমাণ করলেন। উপরন্তু তিনি দেখালেন যে, চুম্বক কণা'ত আনলে ক্যাথোড থেকে নির্গত আভা যেমন সরে যায়, অনুরূপ ভাবে কণাস্রুতও সরে যায়। তা'ব পর তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে ক্যাথোড-বস্মির পথ বদলে চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। প্রথম আপত্তি দূর হ'ল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টা রয়ে গেল।

একটু আমিসিড-মিশ্রিত জলের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করলে জল ছোটো মৌলিক অংশে ভাগ হয়ে যায়; ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং ধনাত্মক ইলেকট্রোড অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস জন্ম হয়। তেমনি কোন বাতব সেন্টের সলিউশানের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালিত করলে দাঁড়ব অংশ ক্যাথোডে এসে জন্ম হয়। এই ব্যাপারটাকে তড়িৎজনিত বিয়োজন বা ইলেকট্রোলিসিস বলে।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত এই সম্পর্কে ফ্যাবাডে গবেষণা চালান এবং সিদ্ধান্ত করেন যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-প্রবাহের ফলে বিভিন্ন বস্তু বাসায়নিক তুল্যাক্ষ ওজন ইলেকট্রোডে এসে জমা হয়।

সূত্র হিসাবে লেখা যায়—

(ক)  $W = Z C T$ , যেখানে  $W$  ইলেকট্রোডে জমা বস্তু ওজন (গ্রাম)  $Z$  বস্তু তড়িৎ বাসায়নিক তুল্যাক্ষ,  $C$  কারেন্ট বা প্রবাহ, (অ্যাম্পিয়ার) এবং  $T$  সময় (সেকেন্ড) ;

(খ) বস্তু তড়িৎ বাসায়নিক তুল্যাক্ষ এবং বাসায়নিক তুল্যাক্ষ সমল ভেদে থাকে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ইলেকট্রোডে যে কোন বস্তু তুল্যাক্ষ ওজন (গ্রাম) প্রত্যেক করে জমা করতে ৯৬৫০০ কুলম্ব তড়িৎ প্রয়োজন হয়। (কুলম্ব হল চার্জের একক, এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট এক সেকেন্ডে প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎ পাওয়া যায় তাকে এক কুলম্ব বলে)। বৈজ্ঞানিকের সম্মানার্থে এই সংখ্যার নাম দেওয়া হয়েছে এক ফ্যাবাডে।

তাইলে তড়িৎের পরিমাণের একক পাওয়া যাবে এক ফ্যাবাডেকে অ্যাভোগাদ্রো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে। এক ফ্যাবাডে হল  $2.89 \times 10^{14}$  স্থিতীয় তড়িৎ একক এবং অ্যাভোগাদ্রো সংখ্যা হল  $6.02 \times 10^{23}$ ; সুতরাং তড়িৎের পরিমাণের একক হল  $4.80 \times 10^{-10}$  স্থিতীয় তড়িৎ একক।

১৮৮১ সালে জার্মান বিখ্যাত পদার্থবিদ হের্ডোজ বললেন যে, যেমন প্রত্যেক বস্তু পরমাণুর সমষ্টি, তেমনি তড়িৎও (ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক উভয়ই) বিভক্ত হয়ে হয়ে শেষে তড়িৎপরমাণুতে ঝাঁপবে। ফ্যাবাডেব সূত্রই এর প্রমাণ! ১৮৯১ সালে আইবিশ বৈজ্ঞানিক ষ্টোনি তড়িৎযুক্ত একক পরমাণুর নাম দিয়ে ইলেকট্রন। প্রত্যেক অণু যেমন অণু সংখ্যক (এক, দুই, তিন ইত্যাদি) পরমাণুর দ্বারা গঠিত, তেমনি প্রত্যেক আয়ন অণু সংখ্যক ইলেকট্রনের সমষ্টি। আয়নের ওজনকে তাই তুল্যাক্ষ দিয়ে ভাগ করলে, তাই মনে কত সংখ্যক টাইপের একক আছে পাওয়া যায়।

তাই পূর্ব চলতে লাগল পরীক্ষামূলক ভাবে তড়িৎযুক্ত পদার্থের একক চার্জের মান নির্ণয়ের চেষ্টা। ১৮৯৭ সালে ইংলণ্ডের টাউনসেণ্ড অনেকটা সফলতা লাভ করলেন। সামান্য অ্যাসিড-মিশ্রিত জলের মধ্যে দিয়ে বেশ ছোবালো তড়িৎ-প্রবাহ চালান হল। দুই ইলেকট্রোডে যথাক্রমে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাস ক্যাথোড পাশে জমা হল। গ্যাসের আয়নের সঙ্গে জলের আর্দ্রতা মিশে পানির মধ্যে ঘন মেঘের সঞ্চার হল। তা হলে এই মেঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তড়িৎবাহী বলা যায়। যদি সমগ্র মেঘের ওজন এবং একটি কণার আয়তন (গোলককণী মনে করলে ব্যাসার্ধ) ও ভরাক্ষ অর্থাৎ ওজন জানা যায়, তবে ভাগ করে কণার সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। তাই পূর্ব মেঘের সমগ্র চার্জ নির্ণয় করে কণার সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি কণার গড় চার্জ পাওয়া যাবে। এই উপায়ে টাউনসেণ্ড একক চার্জের অর্থাৎ ইলেকট্রনের

চার্জের পরিমাণ নির্ণয় করলেন। অবশ্য মান একেবারে নির্ভুল হল না। ১৯০৩ সালে টমশন বেডিয়াম বস্তু দ্বারা বায়ুকে আয়নে বিশ্লেষিত করে আয়নের গড় চার্জ নির্ণয় করলেন। তাতেও খুব একটা যুতসই কিছু হল না। ১৯১১ সালে মার্কিন দেশের মিলিকান, জলের বদলে তেল দিয়ে এই পরীক্ষা চালালেন। তিনি বললেন যে, পরীক্ষার সময় কিছুটা জল বাষ্প হয়ে যাওয়ায় নির্ভুল মান পাওয়া যেতে পারে না। তিনি একটি বদ্ধ পাত্রেব হাওয়ায় চাপ কমিয়ে তাই মধ্যে দশ হাজার ভোল্টেজের ব্যাটারীর ছোটো ছোটো বস্তু দুটো দাঁতব প্লেট ওকৃত্তমিক ভাবে রাখলেন। প্লেটের দুটোব ব্যাস ২২ সেন্টিমিটার আর পদব্দপাশেব মধ্যে দুব্দ প্রায় দেড় সেন্টিমিটার। ওপাশেব প্লেটের মাঝে ছোটো একটা ছিদ্র। অ্যাটোমাইজার দিয়ে কৌটা কৌটা তেল ওপাশেব প্লেটের ওপা ফেলতে থাকলেন। অ্যাটোমাইজারের মুখ থেকে তৈলবিন্দু বেগোবার সময় ধীরেব ফলে তড়িৎযুক্ত হয়ে গেল। পাত্রেব এক পাশে একটি ছিদ্র দিয়ে খুব ছোবালো আলো ফেলা হল আর দূরবীণেব সাহায্যে তৈলবিন্দুর গতি নিবীক্ষণ করা হল।

প্রথমে প্লেটগুলো ব্যাটারী থেকে অযুক্ত বেগে মাদ্যাকর্ষণের জন্য তৈলবিন্দুর অধোগতিব বেগ মাপা হল। মনে করা, বেগ  $v_1$ ; তা হলে,  $v_1 = k m g$ , যেখানে  $k$  সান্দ্রতার উপর নির্ভরশীল একটি ধ্রুবক,  $m$  তৈলবিন্দুর ভর এবং  $g$  মাদ্যাকর্ষণজনিত স্বরণ (৯৮১ সে. মি. সেকেন্ডে একক)।

তাই পূর্ব প্লেটগুলো ব্যাটারীযুক্ত করে দেওয়া হল। তাতে এমন এক তড়িৎ-ক্ষেত্র তৈরী হল, যাই ফলে তৈলবিন্দু মাদ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে ওপার দিকে উঠতে লাগল। যদি তড়িৎ-ক্ষেত্রের শক্তি  $E$  হয় এবং  $e$  বিন্দুর চার্জ হয় তবে উৎকর্ষিতা বল হল  $Ec_e$ ; কিন্তু নিম্নাভিমুখী মাদ্যাকর্ষণের বল  $mg$ ; সুতরাং লব্ধি উৎকর্ষিতা বল ঝাঁড়াল  $Ec_e - mg$ । এখন যদি তৈলবিন্দুর উৎকর্ষিতা বেগ  $v_2$  হয়, তাই হলে—

$$v_2 = k (Ec_e - mg);$$

$$\text{অর্থাৎ} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{mg}{Ec_e - mg}$$

$$\text{অতএব} \quad e = \frac{mg}{Ev_1 (v_1 + v_2)}$$

গেছেতু  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $E$  এবং  $g$  জানা আছে, সুতরাং  $m$  জানা থাকলে  $e$  নির্ণয় করা যায়। যদি তৈলবিন্দুকে গোলককণী ধরা যায় তবে তাই ব্যাসার্ধ  $r$  হলে, ভরাক্ষ  $d$  এবং সান্দ্রতা  $y$  ধরলে  $v_1 = \frac{2gr^2d}{9y}$ ।  $v_1$  পূর্বেই জানা আছে,  $g$ ,  $y$ ,  $d$  জানা আছে ধরা যায়, সুতরাং  $r$  পাওয়া গেল। অতএব  $m = \frac{4}{3}\pi r^3 d$  সমীকরণ থেকে  $m$  নির্ণয় করা যায়। তাইলেই তৈলবিন্দুতে কত চার্জ আছে অর্থাৎ  $e$ , নির্ণয়িত হল। এই মান হল  $4.774 \times 10^{-10}$  স্থিতীয় তড়িৎ একক।

[ ক্রমশঃ ]

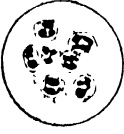


# জীবাণু-সংক্রমণ কাকে বলে ডাক্তারবাবু ?

তরুণী বসুটি জিজ্ঞাসা করলেন—

## ডাক্তার তখন জীবাণু-সংক্রমণের

খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন : আমাদের শরীরের কোথাও কেটে গেলে বা ছুঁড়ে গেলে রোগব্যাধী জীবাণু এই ক্ষতস্থান দিয়ে শরীরের ভেতরে গিয়ে বিনষ্টিকা সৃষ্টি করে। প্রথম থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে এই বিষাক্তা শুরু হয়ে যায় ও মাঝে মাঝে শরীরের রক্ত বিধাক্ত হয়ে ওঠে। রোগব্যাধী জীবাণুগুলি আকারে এত ছোট হয় যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া পালি চোখে দেখা যায় না। এই দেগুন, একজনাতীয় জীবাণুর চোরা — স্বাভাবিক আকারের চেয়ে হাজারগুণ বড়ো করে এঁর রকম দেখা যায়।



## কেটে বা ছুঁড়ে গেলে 'ডেটল' লাগাবেন :

ছাল উঠে গেলে, এমন কি আঁচড় লাগলেও অবহেলা করবেন না। চামড়া উঠলেই জীবাণু প্রবেশের রাস্তা হয়। সঙ্গে সঙ্গে 'ডেটল' লাগানো হচ্ছে আশ্বস্তার সর্বপ্রথম উপায়।



## চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়—'ডেটল' আপনাকে নিরাপদ রাখবে :



সংক্রমণের বিরুদ্ধে সব সমস্ব সবক থাকা উচিত, বিশেষতঃ চতুর্দিকে যখন মহামারী দেখা দেয়। এক গ্লাস জলে কয়েক ফোঁটা 'ডেটল' মিশিয়ে কুলকুচা করলে মুখ ও গলা জীবাণুমুক্ত হয়, গলার ঘাঘের যত্নগা কমে ও যা শুকিয়ে যায়।

## মাথার চুলকানিতে :

মাথার চুলকানি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ এবং তা দেখতে দেখতে পরিবারের সবার মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা না করলে চিরদিনের মতো মাথায় টাক পড়ে যায়। এ রোগ হওয়া মাত্র 'ডেটল' ব্যবহার করবেন — ব্যবহারের নিয়ম শিশির গায়ে লেখা আছে।



## এই পুস্তিকাটির জন্ম লিখুন—বিনামূল্যে পাবেন :

'ডেটল'-এর ক্রিয়া যুহু অশচ অব্যব — একজন মহিলাদের স্বাস্থ্যরক্ষায় এর ভূলা নেই। বিনামূল্যে "মজার হাইজিন ফর উইমেন" (মহিলাদের আধুনিক স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি) নামক পুস্তিকার জন্ম লিখুন।

'ডেটল'  
জীবাণুর  
হাত থেকে  
মুক্ত রাখে এবং  
সংক্রমণের  
বিরুদ্ধে যটতে  
দেয় না



# 'DETTOL'

TRADE MARK

এ্যাটলান্টিস (স্ট্রট) লিমিটেড, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকতা

D.B.I-4

# বাংলা সাময়িক-পত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—৬

শ্রীজ্ঞেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইং ১৮৯১

৫৬৬। রসরাজ (মাসিক) : জানুয়ারি ১৮৯১।

শ্রীচট্ট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—লালা প্রসন্নকুমার দে।

৫৬৭। শ্রীচট্ট-মহিব (সাপ্তাহিক) : ফেব্রু (১) ১২৯৭।

শ্রীচট্ট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—লালা প্রসন্নকুমার দে।

৫৬৮। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা (পাক্ষিক) :

১ চৈত্র, ৪০৫ শ্রীচৈতন্যদ।

“বৈষ্ণব ধর্মের চর্চা ও প্রচাৰ এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য।”

সম্পাদক—রাদিকানাথ গোস্বামী ও কেদারনাথ দত্ত।

৫৬৯। দাবোগোবিন্দপত্র, নং ১ : চৈত্র ১২৯৭।

এই “ডিক্টেটরি সিবিজ”এ প্রবন্ধ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ইহাব ১ম সংখ্যা—বননাথ দাসের হস্তা।

৫৭০। উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৮।

“উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি প্রথম এবং প্রধান কার্য জাতীয় স্বভাব নির্ণয় কর্যে উগ্রক্ষত্রিয় ক্রান্তির প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ ১০০ দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার।” সম্পাদক—শশচন্দ্র তাল।

৫৭১। বঙ্গপ্রভা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৮।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। প্রকাশক—বিপিনবিহারী কোলে।

৫৭২। আন্ত চিকিৎসা পদ্ধতি (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৮।

পরিচালক—আশুতোষ বায়।

৫৭৩। হিতবাদী (সাপ্তাহিক) : ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০৭ মে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ‘হিতবাদী’

প্রকাশিত হয়। সুবেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহাব প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ববীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগে সম্পাদক হন; তাঁহাব ছোট গল্প লেখার স্বরূপাত এই ‘হিতবাদী’তেই, তিনি লিখিয়াছেন :—

“আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্ছে। একটি বড় বকমেব কম্পানি ধুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্ছে। ২৫,০০০ টাকা মূলধন। ২৫০০ টাকা ক’বে প্রত্যেক অংশ এবং এক-শ অংশ আনুগত্য ১০০ কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক এবং মোস্তিনকে বাজেনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে।”

‘হিতবাদী’ নামটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টি, এবং ‘হিত’ মনোহারি চ ছল ভাঃ বচঃ এই motto টিও তিনিই বলিয়া দেন।

নানা ঝগাটে কৃষ্ণকমল বেশী দিন ‘হিতবাদী’র সহিত যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। কিছু দিন পরে পত্রিকাখানির অবস্থা শোচনীয় হয়। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ—কবিবাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, চন্দ্রোদয় বিজ্ঞানবিনোদ ও অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়, উহার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। তাঁহাব সম্পাদনায় ‘হিতবাদী’র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২১ মে ১৮৯৪। পবিশ্রম, অধাবসায় ও কক্ষতৎপরতাগুণে কালীপ্রসন্ন ‘হিতবাদী’কে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পবিগত কবিয়াছিলেন। ১৯০৭, ৪ঠা জুলাই কাব্যবিশাবদের মৃত্যু হয়। ইহাব পর সংখ্যাম

গণেশ দেউল্লভ, জলধর সেন প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ‘হিতবাদী’ পরিচালন করিয়াছেন।

৫৭৪। জমীন্দারী পঞ্চায়ত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯৮।

জমীন্দারী পঞ্চায়ত সভার মুখপত্র। সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বসু, এম-এ, বি-এল।

৫৭৫। প্রভাত সমীপ (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৮।

পরিচালক—কৈলাসচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

৫৭৬। বণবব (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৮।

আলভেশন আশ্রমের মুখপত্র। সম্পাদক—তীরা সিং।

৫৭৭। ভিৎকুদর্পণ (মাসিক) : জুলাই ১৮৯১।

চিকিৎসাভিৎকুদর্পণ মাসিক পত্র। সম্পাদক—মৌলভী জহিরুদ্দীন আহমদ, এল. এম. এস., এফ. সি. ইউ-।

৫৭৮। ইসলাম-প্রচাবক (মাসিক) : শ্রাবণ ১২৯৮।

পশ্চিমীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—মোহাম্মদ বেয়াজুদ্দীন আহমদ। দুই বৎসর চলিবার পর ইহা কিছু কাল বন্ধ থাকে। তৃতীয় বর্ষে ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল—৬ শ্রাবণ ১৩০৬।

৫৭৯। ছাত্রসখা (মাসিক) : শ্রাবণ (১) ১২৯৮।

“কতিপয় ছাত্র প্রবর্তিত। কাছাড় হাইলকান্দি ছাত্রসখা সমিতি হইতে প্রকাশিত।”

৫৮০। প্রকৃতি (সাপ্তাহিক) : ভাদ্র ১২৯৮।

সম্পাদক—অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৫৮১। প্রকৃতি (মাসিক) : ভাদ্র ১২৯৮।

“প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা করাই এ পত্রিকার উদ্দেশ্য। ১০০ টাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে” মুদ্রিত ও ফরিদপুর জিলাব ভূতপূর্ব স্কুল ডেপুটি ইন্সপেক্টর প্রভাতচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত।

৫৮২। সাহিত্য ও বিজ্ঞান (মাসিক) : সেপ্টেম্বর ১৮৯১।

সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র মিত্র। আচার্য রামেন্দ্রচন্দ্র দ্বিবেদীর অনেক প্রাথমিক রচনা এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৫৮৩। সেবক (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৮।

ঢাকা “পূর্ববঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী”র মুখপত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ দত্ত, এম. এ। দুই বৎসর চলিবার পর ‘সেবক’ কিছু দিন বন্ধ থাকে। তৃতীয় বর্ষে পত্রিকা প্রকাশিত হয়—১৩০১ সালের মাঘ মাসে, সম্পাদন করেন—পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ।

৫৮৪। চিকিৎসাভিৎকুদর্পণ (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৮।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা। পরিচালক—বাজেন্দ্রলাল সুর।

৫৮৫। ছাত্রমিত্র (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৮।

দেশীয় খ্রীষ্টানদের মুখপত্র। পরিচালক—Rev. T. B. Gwyn.

৫৮৬। সাধনা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯৮।

এই সুপরিচিত মাসিক পত্রের প্রথম সম্পাদক—স্বদীক্ষনাত ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। স্বদীক্ষনাত ২২ বৎসর বয়সকালে ‘সাধনা’ প্রকাশ করেন; তিনি তিন বৎসর—১৩০১ সালের কার্তিক পর্যন্ত পত্রিকাখানি কুতিত্বের সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষে ‘সাধনা’ সম্পাদন করেন—ববীন্দ্রনাথ; তাঁহাব একখানি পত্রে প্রকাশ :—“আমার ভাটপুত্র শ্রীযুক্ত স্বদীক্ষনাত তিন বৎসর এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন—চতুর্থ বৎসরে ইহার সম্পূর্ণ ভার

আমাকে লইতে হইয়াছিল। সাধনা পত্রিকার অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অল্প লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভরি পরিমাণে ছিল।”

৫৮৭। শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী (মাসিক) : পৌষ ১২৯৮।

বঙ্গাবন হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—রাধিকাপ্রসাদ ভাগবত-রত্নাকর ও শরৎচন্দ্র তপস্বী।

৫৮৮। হিতসাহিনী (মাসিক) : ১২৯৮ সাল।

চন্দ্রনগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

## ইং ১৮৯২

৫৮৯। বাঁকুড়া দর্পণ (পাক্ষিক...)। ১৯ মাঘ ১২৯৮।

বাঁকুড়া নগরে ১৮৯০ সনে স্থাপিত মুপার্কিজ প্রেস হইতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২, সোমবার, ‘বাঁকুড়া দর্পণ’ পাক্ষিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। ইং ১৮৯২ হইতে ১৯৩৭ সনের জুন পর্যন্ত বায় সাতেই ডাঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ছিলেন। পর্ববার্ষিক কাগজ হইতে অদ্যাবধি বায় সাতেই ডাঃ রামবাবি মুখোপাধ্যায় ইহা সম্পাদক আছেন।

৫৯০। আশা (মাসিক) : মাঘ ১২৯৮।

পরিচালক—মথুরামোহন গাঙ্গুলী।

৫৯১। মোহিনী (মাসিক) : মাঘ ১২৯৮।

প্রকাশক—কেন্দ্রাবনাথ মিত্র।

৫৯২। মিত্র (মাসিক) : জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২।

বিবিধ বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—সেখ আবদুল রহিম। কিছু দিন পরে ইহা সহিত ‘স্বপ্নাকর’ মিলিত হইয়া ‘মিহিব ও স্বপ্নাকর’ নাম ধারণ করে।

৫৯৩। জ্ঞানবিকাশিনী (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯৮।

পরিচালক—রুক্মকুমাৰ কাব্যবত্ন।

৫৯৪। প্রতিভা (মাসিক) : বৈশাখ ১২৯৯।

সম্পাদক—বেণীমাধব দত্ত।

৫৯৫। সদর ও মফস্বল (পাক্ষিক) : বৈশাখ (?) ১২৯৯।

তাতিবপুর হইতে বাজা শশিধরবাবুর বায়েব উজোগে প্রকাশিত।

৫৯৬। দাসী (মাসিক) : আশাঢ় ১২৯৯।

জন-হিতৈষণা বিষয়িণী মাসিক পত্রিকা। “বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগণের হৃদয়ে সেবার ভাব জগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।” সম্পাদক—বামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

৫৯৭। অমূল্যলন (মাসিক) : আশ্বিন ১২৯৯।

৭নং রামমোহন সাহাব সেন হইতে বান্ধব-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

৫৯৮। মাসিক উপজ্ঞাস। ১২৯৯।

“অহমসকান”-কাষ্যলর হইতে ১২৯৯ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত। ইহাতে প্রতি মাসে নতুন নতুন উপজ্ঞাস প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম উজোক্তা ও লেখক ছিলেন।

৫৯৯। স্মৃতিভা (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১২৯৯।

“সরলশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সভাবত সামশ্রমী মহাশয় ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু ভাবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে শ্রীযুক্ত ব্রজবন বিজ্ঞানিধি ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। সহকারী সম্পাদক—শ্রীশিবদন বিদ্যারবণ কর্তৃক প্রকাশিত।” ইহা একখানি সুপরিচালিত মাসিকপত্র। ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় “সংস্কার” ও ২য় বর্ষের ১ম-৩য় সংখ্যায় “বঙ্গদেশে কৃষকের অবস্থা” নামে সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬০০। শ্রীচট্টবাসী (সাপ্তাহিক) : ইং ১৮৯২ (?)।

সম্পাদক—নগেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এল। ১৩০০ সালে—সম্ভবতঃ শাবণ মাসে ইহা শ্রীচট্টবাসী ‘পরিদর্শক’ সহিত মিলিত হইয়া ‘পরিদর্শক ও শ্রীচট্টবাসী’ নাম ধারণ করে।

## ইং ১৮৯৩

৬০১। শিক্ষা-সামালোচনা (মাসিক) : ফাল্গুন ১২৯৯।

পরিচালক—অবলাকান্ত সেন।

৬০২। কল্প (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সনাতন আদ্যবত্নপ্রচারার্থ বঙ্গদেশীয় হিন্দুসমাজ [খ্রিয়সমিতি] (সোমাইটি) কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—বাগ্যচন্দ্র সেন।

৬০৩। মুশিদাবাদ হিতৈষী (সাপ্তাহিক)। ১ বৈশাখ ১৩০০।

খাগজা সমদাবাদ হইতে প্রকাশিত। প্রথম সম্পাদক—বৈকুণ্ঠনাথ সেন। কিছু দিন পরে বনোড়ারীলাস গোঁস্বামী সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন। ‘মুশিদাবাদ হিতৈষী’ এখনও প্রতি বৃহস্পতি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৬০৪। পুণিমা (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

কবি ঞ্জানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “উৎসাহ ও উজোগে” ভগ্নদী সানিভী যন্ত্র হইতে ইহা বিবর্তিত। ইহা প্রতি পূর্ণিমার দিন প্রকাশিত হইত।

৬০৫। সাথী (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সচিত্র শিশু-পত্রিকা। সম্পাদক—ভুবনমোহন রায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে ইহা সহিত ‘সখা’ মিলিত হইয়া ‘সখা ও সাথী’ নাম ধারণ করে।

৬০৬। তত্ত্ববোধ (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০০।

সম্পাদক—ধরনাথ সেন করিবত্ন।

৬০৭। মঙ্গিনী (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০০।

“মঙ্গলভোগিনী” অমৃত্যামিনী, ভক্তিব্রত প্রচাৰিণী মাসিক পত্রিকা।

৬০৮। পণ্ডিত (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০০।

কামিনীকুমাৰ কবিচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।

৬০৯। চুঁচুড়া বার্তাবহ (সাপ্তাহিক) : ১২ আশাঢ় ১৩০০ (২৫ জুন ১৮৯৩)।

চুঁচুড়া-নিবাসী দীননাথ মুখোপাধ্যায় এট সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। “চুঁচুড়া বার্তাবহ” প্রথম বঙ্গবঙ্গ হুগলী

সাবিত্রী প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমেই দীননাথ স্বয়ং মুদ্রাস্থ ও আবক্ষ-মত অক্ষর ও অঙ্ক সাহসরধাম ক্রয় করেন ও পিতাব নামানুসারে এই প্রেসের নাম “ভীষ্মক” বা “ডায়মণ্ড প্রেস” রাখেন। ভগলী জেলার অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং হিন্দুধর্ম, হিন্দুসাহিত্য ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার ও আলোচনা করাই এই সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।”

৬১০। লতিকা (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০০।

প্রকাশক—গণিণীচরণ সিংহ, যশোহর।

৬১১। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সৌভাগ্য পত্রিকা বা নব্যবজ্রদর্শন (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০০।

সম্পাদক—সাহিত্যিক সার্বজনিক মাসিক পত্র।  
সম্পাদক—চন্দ্রকিশোর বায় চৌধুরী।

৬১২। 'The Bengal Academy of Literature : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (মাসিক) : আগষ্ট ১৮৮৩।

১৮৯৩ সনের ১৭ জুলাই শোনাবাজারে বিনয়ক দেবের বাটতে 'The Bengal Academy of Literature' গঠিত হয়। সভাপতি সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলির কার্যবিবরণের সঠিত সাময়িক সাহিত্যের সমালোচনা এবং গবেষণার ফল প্রকাশের জন্য পর্বপর্য্য আগষ্ট মাস হইতে 'The Bengal Academy of Literature' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করা হইত। সভাপতি কার্যবিবরণী ও অধিকাংশ প্রবন্ধাদি ইংরেজীতে মুদ্রিত হইত। সভা-সম্পাদক ফেরদাউস চকবর্তী এই মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। ১৮৯৪, ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বসু নামে প্রস্তাবিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' নাম গৃহীত হয় এবং প্রতিএকখানি চম সংখ্যা (১৭-৩-১৮৯৭) হইতে শেষ পর্য্যন্ত (১৭ সংখ্যা, ১ জুন ১৮৯৮) "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" 'The Bengal Academy of Literature' এই নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪, ২৯এ এপ্রিল (১৭ বৈশাখ ১৩০১) তারিখে সভার সভাপতি প্রবাসিত একাডেমি অব লিটারেচার, বর্তমান ভিত্তি উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন। এই সময় হইতেই পরিষদের মুদ্রাপত্ররূপে 'সাহিত্য-পরিষদ প্রবন্ধ' নামে বাঙ্গালা বৈদ্যাসিক পত্র বঙ্গলীকান্ত হস্তের সম্পাদনায় প্রকাশের সূচনা হয়।

৬১৩। ছত্রিশচরণ (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০০।

কুড়িগাম, বাঙ্গালা হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—গমচন্দ্র দেব ও মন্থননাথ সিংহ।

৬১৪। চিকিৎসাসাহিত্য-বিজ্ঞান এবং সমীরণ (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০০।

সম্পাদক—দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বর্ষ, চম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০২) হইতে ইহা কেবল 'সমীরণ' নামেই প্রকাশিত হইতে থাকে।

৬১৫। ভাবত বান্দব (মাসিক) : আশ্বিন ১৩০০।

“লালবর্ষের ডিমাই একখানি কাগজ। কানাইলাল দে এও কোম্পানির দ্বারা প্রকাশিত। ...এখানি বিবিধ চুটকি উদ্ভূত কথায় পরিপূর্ণ।” ইহা ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়—পর্ব-বৎসর আশ্বিন মাসে।

৬১৬। হিন্দু-সুন্দর (মাসিক) : কার্তিক ১৩০০।

বাগবাজার হিন্দু-প্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত পত্র-বিষয়ক মাসিক পত্র। সম্পাদক—গামলাল গোস্বামিসঙ্কান্ত-বাচস্পতি।

৬১৭। তুষ্টি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—কালীচরণ মিত্র।

৬১৮। বিকাশ (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০০।

৬১৯। শান্তি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০০।

পরিচালক—মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।

৬২০। পুরোহিত (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিদি।

৬২১। বীণাপাণি (মাসিক) : অগ্রহায়ণ ১৩০০।

সম্পাদক—বামগোপাল সেনগুপ্ত।

৬২২। নববিধান (মাসিক) : পৌষ ১৩০০।

সম্পাদক—চিব্রাজী শর্মা (বৈদ্যোক্ত্যনাথ সাকাল)।

## ইং ১৮৯৪

৬২৩। জগদ্ধাত্রী (মাসিক) : মাঘ ১৩০০।

সম্পাদক—বঙ্গলীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

৬২৪। উষা (মাসিক) : মাঘ ১৩০০।

ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত।

৬২৫। ভীষ্ম (মাসিক) : ফাল্গুন (১) ১৩০০।

লাক্ষণবেড়িয়া হইতে রাজেন্দ্রচন্দ্র বস্তু কর্তৃক প্রকাশিত।

৬২৬। গুপ্ত সুন্দর (বৈদ্যাসিক) : ফাল্গুন ১৩০০।

পরিচালক—রামকুমার নাথ।

৬২৭। সুন্দর (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

ইটেন হিন্দু হস্তিলের সুন্দর-সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদক—বনগোমোহন ঘোষ। “দেশের যুবকদিগের ক্ষমতায় সাহিত্যাত্ম-শীলনের প্রতি অগ্রবাহ জন্মাইবার জন্যই ‘সুন্দর’ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।” বঙ্গ লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা লেখক-ব—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার বায়, বঙ্গলীকান্ত সেন প্রভৃতি বচনা ইহা পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছিল।

‘সুন্দর’ মাঝে মাঝে ছ-একটি ‘ইংরেজী প্রবন্ধও স্থান পাইত। প্রথম বর্ষের পরিকার শিবহুনাথ সরকারের “The Fall of Tipu Sultan” (I-III) ও “The New Leaven in Bengal. [An Appreciation of Babu Robindranath Tagore's Short Stories]” মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ‘সুন্দর’ যদুনাথের প্রথম বালা রচনা—“হরিদ্বার ও কুণ্ডমেল ৮১ বৎসর পূর্বে” প্রকাশিত হয়।

৬২৮। বিজ্ঞান (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

ইণ্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বুকুল্যে প্রকাশিত। সম্পাদক—টি, এন, মুখার্জী (বৈদ্যোক্ত্যনাথ মুখোপাধ্যায়)।

৬২৯। জ্যোতিঃ (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

৬২৯ক। আদর্শী (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।

সম্পাদক—বিশ্বময় চট্টোপাধ্যায়।

৬৩০। **হিন্দু-পত্রিকা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।  
যশোভর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যত্ননাথ মজুমদার,  
এ, এ, বি, এল। “হিন্দু-পত্রিকায় হিন্দু-ধর্ম-সমাজের উদ্বেগ  
ধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন  
গ্রন্থের মর্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জগাই হিন্দু-পত্রিকা  
প্রকাশিত হইল।” ইহা একগানি দীর্ঘজীবী পত্রিকা।

৬৩১। **বাসনা** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০১।  
চুঁচুড়া “বাসনা সমিতি”র তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।  
৬৩২। **সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা** (ত্রৈমাসিক) :  
শ্রাবণ ১৩০১।

Bengal Academy of Literature প্রসঙ্গে পূর্বেই  
এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

৬৩৩। **কৌমুদী** (মাসিক) : ১৩ শ্রাবণ ১৩০১।  
“কৌমুদী (দ্বিতীয় পক্ষ)—সাক্ষাৎভৌমিক ধর্মতত্ত্ব, সনাতন  
ব্রহ্মজ্ঞান এবং সর্বদ্বন্দ্বীন ধর্মসাধন সম্বন্ধীয় পাদিক পত্রিকা।”  
ইহাতে নিপিনচন্দ্র পালের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৩৪। **অবোধবোধিনী** (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০১।  
বেলগাছিয়া হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শব্দচন্দ্র দেব।  
৬৩৫। **নন্দী** (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০১।

সৈন্যবাদ, বহুবলপুত্র হইতে প্রকাশিত। জাত্যবসপ্রধান পত্রিকা।  
সম্পাদক—অবোধাননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।  
৬৩৬। **সবনন্দলা** (মাসিক) : ভাদ্র ১৩০১।

সম্পাদক—দীননাথ তর্কপঞ্চানন।  
৬৩৭। **জ্যোৎস্না** (মাসিক) : আখিন ১৩০১।  
পরিচালক—রমণীমোহন মল্লিক।

৬৩৮। **অমূল্যলন** (মাসিক) : আখিন ১৩০১।  
তত্ত্বাবধায়ক—মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানি। পত্রিকার প্রথম ভাগ  
চৈত্র-সংখ্যাতেই শেষ হয়। ইহার মতিত ‘পুরোহিত’ সম্মিলিত  
হইয়া, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩০২) হইতে ‘অমূল্যলন  
ও পুরোহিত’ নাম ধারণ করে।

৬৩৯। **প্রভা** (মাসিক) : আখিন ১৩০১।  
ঢালা—কালীপুত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—বাজেন্দ্রলাল  
চক্রবর্তী।

৬৪০। **ত্রিপুরা প্রকাশ** (সাপ্তাহিক ?) : ১৩০১ সাল।  
৬৪১। **প্রভা** (মাসিক) : পৌষ (?) ১৩০১।  
নিলা, ২৪-পত্রগণা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—পঞ্চানন  
চট্টোপাধ্যায়।

## ইং ১৮৯৫

৬৪২। **শিক্ষাদর্পণ** (মাসিক) : পৌষ ১৩০১ (জাম্বুয়ারি ১৮৯৫)।  
সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানি। প্রথম সংখ্যায় রমেশচন্দ্র  
দত্তের একটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৪৩। **চিকিৎসা ও সমালোচক** (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।  
“চিকিৎসা বিষয়ক, সাহিত্য, কবিতাদি, জ্যোতিষ, উপন্যাস প্রভৃতি  
নানা বিষয়গণী প্রবন্ধ এই পত্রিকায় আলোচিত ও প্রকাশিত হইবে  
বলিয়া উহা উপরোক্ত নামধেয় হইল।” সম্পাদক—ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায়।

৬৪৪। **সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু** (মাসিক) : মাঘ  
১৩০১।

সম্পাদক—নবীনচন্দ্র গাঙ্গা।

৬৪৫। **জ্যোৎস্না-ভাব** (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।

চুঁচুড়া, চৌমাথা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সিদ্ধেশ্বর  
গঙ্গোপাধ্যায়।

৬৪৬। **দর্শক** (সাপ্তাহিক) : মাঘ (?) ১৩০১।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত; ‘চুঁচুড়া বার্তাবহ’ পত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী।

৬৪৭। **ধরণী** (মাসিক) : মাঘ ১৩০১।

সম্পাদক—ইন্দ্রনাথায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মলুটী বাজবাটা—সাঁওতাল  
পত্রগণা। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম  
গণেশ দেউস্কর প্রমুখ লেখকবর্গের রচনা ইহা পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত।

৬৪৮। **বেদ** (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—  
কেদারনাথ দেবশাস্ত্র-বিজ্ঞানবিনোদ।

৬৭৯। **আয়ুর্বেদ প্রচার** (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

সম্পাদক—বিনোদলাল সেন।

৬৭০। **আভা** (মাসিক) : ফাল্গুন ১৩০১।

বংসব হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—মহেন্দ্রনাথায়ণ  
মুখোপাধ্যায়, জমিদার।

৬৫১। **প্রতিধ্বনি** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০২।

“সাময়িক পত্রের সাবধান প্রবন্ধগুলি উদ্ভূত করিয়া ‘প্রতিধ্বনি’  
আপনার নামের সাংখ্যিকতা সম্পাদন করিবেন। ...সকল সাময়িক  
পত্রের পাঠের ফল যাচাতে পাঠকেরা অল্প ব্যয়ে লাভ করিতে পাবেন,  
‘প্রতিধ্বনি’ সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।” স্বাধিকারী—  
বাধাগোবিন্দ প্রামাণিক।

৬৫২। **হিতৈষী** (সাপ্তাহিক) : ২৫ বৈশাখ ১৩০২।  
সম্পাদক—কালীচরণ মিত্র। “স্বদেশের ও মাতৃভাষার হিতসাধনই  
‘হিতৈষী’র ধর্ম লক্ষ্য।”

৬৫৩। **মেডিক্যাল ইন্টেলিজেন্স** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০২।

চিকিৎসা বিষয়ক বাংলা মাসিকপত্র।

৬৫৪। **জননী** (মাসিক) : বৈশাখ ১৩০২।

সয়দাবাদ, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। পরিচালক—বামাচরণ  
মুখোপাধ্যায়।

৬৫৫। **সুচিন্তা** (ত্রৈমাসিক) : বৈশাখ (?) ১৩০২।

“‘ভারতবর্ষীয় বেদ সমিতি ও তত্ত্ববিজ্ঞান’ হইতে প্রকাশিত।  
এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য বেদ প্রচার। পত্রিকার শেষার্দ্ধ ভাগ  
পুনর্মুদ্রিত স্বাধীন; প্রথমার্দ্ধ ভাগ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে পূর্ণ।”

৬৫৬। **বঙড়া দর্পণ** (সাপ্তাহিক) : বৈশাখ ১৩০২ (?)।

১৩০২ সালের গোড়াতেই এই পত্রিকার অস্তিত্বের পরিচয়  
পাওয়া যায়।

৬৫৭। **মুকুল** (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০২।

উজ্জৈব সচিত্র শিশুপত্রিকা। সম্পাদক—শিবনাথ শাস্ত্রী।

৬৫৮। **ভারতভূমি** (মাসিক) : আশাঢ় ১৩০২।

পরিচালক—বসন্তকুমার চক্রবর্তী।

৬৫৯। **সৌরভ** (মাসিক) : শ্রাবণ ১৩০২।



সম্পাদক—নটুগু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; সহ-সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । শোভাবাজার রাজবাটী হইতে প্রকাশিত । পরমায়ু—তিন মাস । ইহাতে গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল ।

৬৬০ । **মহিলা** ( মাসিক ) : শ্রাবণ ১৩০২ ।

সম্পাদক—ভাট গিরিশচন্দ্র সেন । “স্বদেশেব সত্যী আখ্যানারী-দিগেব উচ্চ জীবন ও স্ত্রীশক্তিকে আদর্শ কবিতা জাতীয়ভাবে নারীচরিত্র গঠন ও সংশোধন এবং সমুন্নত কবিত্তে প্রথম হইতে মহিলা পরামর্শ দান ও স্বল্প কবিতা আসিয়াছেন, চিরকাল সেইকপ স্বল্প কবিত্তেব কাঁতার এই মঞ্চ । বঙ্গীয় নারীমণ্ডলীতে যে সকল কুসংস্কার ও অনীতি এবং দূষিত আচার ব্যবহার বন্ধনুল হইয়া আছে এবং বিজ্ঞাতীয় অন্তঃসাব্যস্ত বিলাসাদ্ধব প্রবেশ কবিত্তেছে, চিরকাল মহিলা সেই সকলের প্রতিবাদ কবিত্তেব, দম্য, স্ত্রীশক্তি ও সদাচারেব এবং নারীচরিত্তেব অমুগায়িনী সংশিক্ষায় সমর্থন কবিত্তেব, মহিলাব এই মঞ্চ ৫ উদ্দেশ্য ।”

৬৬১ । **যক্ষদত্তী** ( মাসিক ) : শ্রাবণ ১৩০২ ।

ববাহনগর কাশীপুর হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক—বজ্রনৌকান্ত কাব্যতীর্থ ।

৬৬২ । **নদিয়াবাণী** ( মাসিক ) : ভাদ্র ১৩০২ ।

পরিচালক—সুন্দরমোহন ভট্টাচার্য, অনন্তপুর, নদিয়া ।

৬৬৩ । **মোহিনী** ( মাসিক ) : ভাদ্র ১৩০২ ।

সম্পাদক—বিমলাচরণ বায়ভৌদ্যুতী ।

৬৬৪ । **সুদর্শন** ( মাসিক ) : আশ্বিন ১৩০২ ।

ঢাকা হইতে প্রকাশিত । সম্পাদক—বদনাকান্ত ভৌমিক ।

৬৬৫ । **দীপ্তপ্রকাশিকা** ( মাসিক ) : কাশ্বিন ১৩০২ ।

সম্পাদক—বি. এম. সাত্তা ।

৬৬৬ । **বঙ্গ-জীবন** ( মাসিক ) : অগ্রহায়ণ ১৩০২ ।

সম্পাদক—তাবিবিচরণ সেন ।

## ইং ১৮৯৬

৬৬৭ । **সাহিত্য-সেবক** ( মাসিক ) : পৌষ ১৩০৩ ( জামুয়ায়ি ১৮৯৬ ) ।

“শিশু সাহিত্য সভা” কর্তৃক পরিচালিত ।

৬৬৮ । **বাণিজ্য-দর্পণ** ( সাপ্তাহিক ) : ফাল্গুন (?) ১৩০২ ।

“বাণিজ্য-বিষয়ক সংবাদপত্র ।”

৬৬৯ । **শৈশবসখা** ( মাসিক ) : বৈশাখ ১৩০৩ ।

সম্পাদক—গুরুপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ।

৬৭০ । **আখ্যাত্তর পত্রিকা** ( মাসিক ) : বৈশাখ (?) ১৩০৩ ।

৬৭১ । **পারিজাত** ( মাসিক ) : আষাঢ় ১৩০৩ ।

সম্পাদক—রসিকমোহন চক্রবর্তী ।

৬৭২ । **তত্ত্বজ্ঞান** ( মাসিক ) : আষাঢ় ১৩০৩ ।

সম্পাদক—তাবকনাথ মুখোপাধ্যায় ।

৬৭৩ । **শৈবী** ( মাসিক ) : আষাঢ় ১৩০৩ ।

কুমারখালি হইতে প্রকাশিত ; তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা । সম্পাদক—শিবচন্দ্র বিজ্ঞানবর্মা ।

৬৭৪ । **ব্রহ্মতত্ত্ব** ( ত্রৈমাসিক ) : ১৩০৩ সাল ।

“ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ।” সম্পাদক—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ।

৬৭৫ । **অদৃষ্ট** ( মাসিক ) : শ্রাবণ ১৩০৩ ।

“জ্যোতিষ—সামুদ্রিক, শিবোবিজ্ঞান, মূর্ত্তিবিজ্ঞান সংক্রান্ত মাসিক পত্রিকা ।” সচিত্র । সম্পাদক—রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ।

৬৭৬ । **ভারতীয় যন্ত্রমন্দির** ( মাসিক ) : শ্রাবণ ১৩০৩ ।

সম্পাদক—রাজকৃষ্ণ সিংহধর ।

৬৭৭ । **রমণী** ( মাসিক ) : ১৩০৩ সাল ।

সম্পাদক—চাক্রচন্দ্র বায় । “নৃতন কলিকাতা প্রেসে” শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ।

৬৭৮ । **কৌতুক** ( মাসিক ) : ১৩০৩ সাল ।

রঙ্গবসপূর্ণ পত্রিকা ।

৬৭৯ । **বসুমতী** ( সাপ্তাহিক ) : ১০ ভাদ্র ১৩০৩ ।

ইহা সাপ্তাহিক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়—২৫ আগষ্ট ১৮৯৬ তারিখে । পত্রিকা প্রচারেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইকপ লিখিত হয় :—

“প্রতি দিনই বাঙ্গলা সংবাদপত্রেব গাঠকসংখ্যাব কাসবৃদ্ধি দেখিয়া বোধ হয়, অতশুদ্ধদয় পাঠকবৃন্দ যেন কোন্ পত্রে মনোমত প্রবন্ধ পাইবেন তাহাই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন ।... ইহা অভাব যথাসাধ্য মোচনাথ চেষ্টা করিবাব জন্তই ‘বসুমতী’ প্রচারিত হইল । সংবাদপত্রেব আলোচ্য বিষয় বাঙ্গলীশিত্তে ইহাতে থাকিবে, দেশেব অভাব অভিযোগাদির কথাও থাকিবে । তত্ত্বজ্ঞান ইতিহাস, দেশ-নগরাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, বাবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দু পুণ্যতন মহিমায কথা, ধর্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, বঙ্গবহু প্রভৃতি স্বথপাঠ্য বিষয় থাকিবে । অল্পপ্রাণ বাঙ্গালী অবসন্ন প্রাণে-যাহাতে ছুটা স্বপ্নেব কথা, ছুটা অর্থেব কথা, ছুটা উপায়েব কথা, ছুটা আশাব কথা, ছুটা হাসিব কথা পড়িতে পায়, বসুমতীতে প্রধানত : তাহাবই চেষ্টা কবা যাইবে ।”

প্রথমাবস্থায় ‘বসুমতী’ব কায়াপাক্ষ ছিলেন—জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ, ১১৮ নং পুণ্যতন চিনাবাজার, কলিকাতা । ইহা “কলিকাতা নৃতন মেসিনপ্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত” হইত । প্রথমে বোমকেশ মুস্তফী এবং পরবর্তী পৌষ হইতে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কিছু দিন ‘বসুমতী’ সম্পাদন করেন বলিয়া জানা যায় । গোড়া হইতেই গ্রাঠকবর্গকে বিনামূল্যে “মূল্যবান পুস্তকাবলী, চিত্রাবলী, সৌভাগ্য উপহায” দানেব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় । এ প্রথ্য বসুমতীই বোধ হয় প্রথম প্রবর্তন করেন । ‘বসুমতী’ব গাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

৬ আগষ্ট ১৯১৪ ( ২১ শ্রাবণ ১৩২১ ) ‘বসুমতী’র দৈনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ইহার প্রথম সম্পাদক—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

১৩২৯ সালেব বৈশাখ মাসে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ বোবের সম্পাদনায় ‘মাসিক বসুমতী’ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে । \*

\* ১৩৫৭ সালেব ‘শাবদীয়া বসুমতী’তে ( পৃ. ৪৮-৫০ ) আদি ‘বসুমতী’ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি ।

শ্রীৰামদোংসব—শ্রীৰামচন্দ্রের দুৰ্গোৎসব। বিজয়া—শ্রীৰামচন্দ্রবট

বিজয়োৎসব। বামীকি রামায়ণে দেখিয়াছি—শ্রীৰামচন্দ্র

রাবণ বধের জ্ঞাত বৎসবে আদি পুৰণ স্বযাদেবকে শ্রবণ করিতেছেন।

“আদিত্যহৃদয়” জপ করিয়া স্বযাদেবের প্রসন্নতা অঙ্গন করিয়াছেন।

কিন্তু পৌরাণিক মতে রামচন্দ্র রাবণ বধে শক্তি সঞ্চয়ের জ্ঞাত শব্দকালে

অকাল বোধন পূৰ্বক জগজ্জননী মহামায়াকে জাগ্রিত করেন।

পূজায় তাঁতার তুষ্টি বিধানপূৰ্বক রাবণ বধের বর প্রাপ্ত হন। কবি

কৃতিবাসের সুপায় সেকালের বাঙ্গলাব আবালবৃদ্ধ নবনারী রামচন্দ্রের

দুৰ্গাপূজার কথা জানিত। বটতলার ছাপা রামায়ণে লেখা থাকিত—

“মতান্তবে রাবণ অধিকাকে শ্রবণ করেন”। রামচন্দ্র দেবীর অকাল-

বোধন করিয়াছেন। “অবনীতে দেবীদেহ নীলপদ্ম আছে” জানিয়া

পবনতনয়কে এক শত আট নীলপদ্ম আনিবাব জ্ঞাত পাঠাইয়াছেন।

হুম্মান গণিগা গণিগা এক শত আটটি নীলপদ্ম তুলিয়া আনিয়াছেন।

নবমী পূজার দিন সংকল্প করিয়া দেবীপদে অষ্টোত্তব-

শত সংখ্যক নীলপদ্ম সমর্পণ করিতে গিয়া রামচন্দ্র দেখিলেন

একটি পদ্ম কম পড়িতেছে। দেবীদেহেও আব নীলপদ্ম নাই।

সর্পনাশ—সংকল্প ভঙ্গ হয় যে! বাম তখন স্থির কবিলেন,

কেন, লোকে তো আমায় “কমল-নয়ন” বলে। তাহা হইলে

আমাব একটি চক্ষু উৎপাটিত কবিয়া মাতৃপদে দিয়া আমি সংকল্প

বন্ধা করি। এই ভাবিয়া বাম গেমেন পল্লবীণ লইয়া একটি চক্ষু

উৎপাটিত কবিলেন, অমনই দেবী সদয়া হইয়া পল্লবীণ শুদ্ধ বামেব

হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, আমি তোমাকে পবীড়া

কবিবাব জ্ঞাত একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, এই লও সংকল্প

পূৰ্ব কর। পূজাশেষে দেবী রাবণ বধের বর দিলেন। এসব

কথা রামায়ণ-গায়কেব ও কথকগণের নিবট শুনিয়া শুনিয়া সে-

কালের সকলেই প্রায় মুগ্ধ বলিতে পারিত। তেমনই বলিতে

পারিত এই বিজয়া,—কিসেব বিজয়া, কাহাব বিজয়া।

সেকালে প্রাচীনগণের মুখে শুনিতাম—“বামচন্দ্র দুৰ্গাপূজা

করিলেন, কিন্তু লঙ্কায় পুরোহিত কোথায়? তখন নাবদ আসিয়া

পবামণ দিলেন, ঋষিগণের মধ্যে বিশ্বাব অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন।

তাঁহাব পুত্র রাবণ নিশ্চয়ই সংরক্ষণ, অতএব তুমি তাঁহাকেই

পৌরোহিত্যে বরণ কর। বামচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত

হইলেন এবং নিজের গিয়া রাবণকে আমন্ত্রণ কবিয়া আনিলেন।

রাবণ পুরোহিতের কাছা সম্পাদন কবিলেন, নিজের বধের সংকল্প-

মন্ত্র রচনাপূৰ্বক রামচন্দ্রকে পাঠ করাইলেন। দশমী দিন দেবীর

বিসর্জনান্তে দেবীর বরে রামেব হস্তে রাবণ নিহত হইলেন। কিন্তু

রাবণ তো একেবাবেই মরিয়া যান নাই। বামকে উপদেশ দিবার

জ্ঞাত এক দিন বাঁচিয়াছিলেন। রাবণ বৎসে প্রতীত হইলে

রামচন্দ্র দেবীপ্রতিমা বিসর্জনের আয়োজন কবিলেন। বিভীষণের

দলের রাক্ষস ও রামচন্দ্রের সৈন্য বানরগণ মিলিয়া দেবীপ্রতিমা সমুদ্রে

বিসর্জন দিলেন। রাক্ষসে বানরে মিলিয়া বিসর্জনের দিন যেকপ

নৃত্যগীত করিয়াছিল, বিজয়াব দিন আজিও তাহারই অনুষ্ঠান হয়”।

কালিকা পুরাণে বিজয়ার অগ্ন নাম শাবোৎসব। শবর জাতি

প্রতিমা বিসর্জন দিয়া নৃত্যগীত করিয়াছিল, উৎসবে মাতিয়াছিল।

বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাত তাহাই প্রাচীণ বাঙালি কবায় হইতো বিজয়ার নাম

শাবোৎসব হইয়াছে। কালিকা পুরাণ—আসাম-কামরূপের পুরাণ।

প্রাচীন কালে আসামেই একাংশ মহাচীন নামে অভিহিত হইত।

শবর, পুলিন্দ, কবচ (কোচ) প্রভৃতি জাতি আসামের অধিবাসী

# বিজয়া

শ্রীচরিত্রঃ মণোপাখ্যান

ছিল। তাহাদের কোন আচাৰ-অনুষ্ঠান বিজয়াব সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকা অসম্ভব নহে। কালিকা পুরাণে দেবীর বিসর্জন সময়ে অশ্লীল শব্দোচ্চারণের শুষ্ক বিধি আছে। নৃত্যগীত ভল্লকীড়া আদিও উৎসবের অঙ্গ। যৌবনে বহু পল্লীগ্ৰামে দেখিয়াছি—কোথায় মহাষ্টমী মহানবমী সন্ধি বলিদানের পর, কোথায় নবমী পূজার দিন বলিদান শেষ হইয়া গেলে তথাকথিত উত্তরভঙ্গ সকলে মিলিয়া একটি নির্দিষ্ট বাস্তা দিয়া বা কোন নির্দিষ্ট পাড়ায় গিয়া অশ্লীল গান গাহিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাশ্য দিবালোকেও এ জ্ঞাত কাহাকেও লজ্জিত হইতে দেখি নাই। বহু দিন হইল এসব নাচ-গান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে দুব পল্লীগ্ৰামে কোথায় এখনো এই প্রথা চলিত আছে কি না জানি না।

পশ্চিমাঞ্চলে বিজয়া দশমী ‘দেশেবা’ নামে পরিচিত। প্রায় পনেরকুড়ি বৎসর পূর্বে মধ্যভারতের ওদানীতন কবদ-মিত্ররাজ্য ছত্তরপুর্বেব মহারাজা বিঘনাথ সিংহ বাহাদুরের আমন্ত্রণে কয়েক বৎসর দুৰ্গাপূজা ও দোলবাহার সময় ছত্তরপুর্বে যাতায়াত কবিয়াছিলাম। বিজয়া দশমী দিন মহারাজা শোভাযাত্রা সহ একটা নির্দিষ্ট প্রান্তরে উপস্থিত হইতেন। আমি যে কয় বৎসর উপস্থিত ছিলাম দেখিয়াছি, গাড়ীতে সর্বাগ্রে মহারাজা, তাহাব পশ্চাতে অনুকপ বানে মহারাজার গুরুপুত্র শ্রীধাম বুদ্ধাবনের পরম ভাগবত প্রভুপাদ শ্রীল গৌরগোপাল ভাগবত-ভূষণ, তাহাব পর রাজোর দেওয়ান, সেনাপতি ও সন্দ্বাষণ স্ব স্ব মধ্যাদানুসারে মোটর গাড়ীতে ও ঘোড়ার গাড়ীতে শোভাযাত্রায় যোগদান করিতেন। দুই পার্শ্বে ঘোড়াসওয়ার ও চোপদাবের দল; সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অপব জনসাধারণ; জনতা মন্দ হইত না। গিয়া দেখিতাম, প্রান্তরের নির্দিষ্ট স্থানে বৃন্দাকাব, রাবণ-মূর্তি নিশ্চিত রহিয়াছে। দুইটি বালক রাম-লক্ষণ সাজিয়া তাহাব প্রতি তাঁর নিষ্কোপ করিতেছে। এক জন হুম্মান সাজিয়া নানাকপে লোক হাসাইয়া ফিৰিতেছে। অতঃপর বাবাটি তোপধ্বনি হইত, (বুটিশের নিকট মহারাজার তের তোপের সম্মান ছিল) এবং রাবণের মূর্তিতে হুম্মান আঙন ধরাইয়া দিত। বাড়া ফিৰিয়া সকলে পরস্পর পরস্পরকে যথাবোধ্য নমস্কাব-আলিঙ্গন করিত। বিজয়ার দিন সকালে এক দল লোক নীলকণ্ঠ পাখী হাতে লইয়া মহারাজাকে দেখাইতে আসিত। মহারাজা তাহাদের হাতে টাকা দিয়া পাখীটি ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। ধীরে ত্রয়োদশ জাতি মাছ দেখাইয়া পদ্মা লইয়া যাঁত। এইরূপ উৎসব না কি উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভারতের সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। পূৰ্বকালে হিন্দুবাহগণ এই দিন দ্বিজয় বর্জিত হইতেন।

যদিও বাঙ্গলাব বিজয়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে তথাকথিত আৰ্য্য-অনাৰ্য্যের বহু আচাৰ-অনুষ্ঠানের সন্নিহিত দৃষ্টি আছে, তথাপি বাঙ্গলাব বিজয়া একান্ত আনন্দোৎসব নহে। এই আনন্দের মধ্যে দুঃখের অন্তঃসলিলা একটা স্মৃষ্ণ দাগ অমুহূত থাকে। “পূজা” বলিলে বাঙ্গলাব দুৰ্গাপূজা ভিন্ন অণু কিছু বুঝায় না। দশভূজা দুৰ্গাপ্রতিমাব

পূজা বাঙ্গালী ভিন্ন অপর কেহ কবেও না। বাঙ্গালী ধনো-  
দরিদ্র নির্দেশে পূজাব চারি দিন সকল দুঃখ সকল বেদনা ভুলিবার  
চেষ্টা কবে। অতি বড় দরিদ্রও চারি দিনের আচার্য্য সংগ্রহ করিয়া  
বাথে, যৎসামান্য মিষ্টান্নের আয়োজন করে। নিজেরা না পারে,  
ছেলে-মেয়েদের জগ্ন নৃতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনে। আনন্দময়ী  
আগমনে বাঙ্গলা বেন আনন্দে মাতিয়া উঠে। তাই বিজয়ার দিন  
বাঙ্গালীর দুঃখের দিন। মা চলিয়া গেলেন, আবাব সেই নিত্যকার  
বাস্তব সংসার, সংগ্রামময় দৈনন্দিন জীবন, অভাব-অনটন! কিন্তু দুঃখ  
কি শুধু এই জগ্ন? তাহা তো নয়। বাঙ্গালী এই জগ্নতের জননীকে  
আপন তনয়রূপে গণ্য করিয়াছে। কল্লার পিড়ালয় হইতে  
খণ্ডবালয়ে বাইবাব সময় কল্যাণে বয়সেবই হটক গবৎ শস্তর যত ধন-  
সম্পদসম্পন্ন হইউন, আনন্দের মধ্যেও যে অন্তর্গত বেদনা জনকজননী,  
ভ্রাতা-ভগিনী, বন্ধু-প্রতিবেশীর সঙ্গে তনয়র চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত কবে,  
বিজয়ার দিন সেই বেদনাতটে বাঙ্গালীর হৃদয় ভাবাক্রান্ত হয়।  
নিকটবর্তী নদী, সরোবর অথবা পুষ্করিণীতে নবপত্রিকা বিসর্জনে  
বাহির হইবার পূর্ববর্তী আচাব-অনুষ্ঠানগুলি দেখিলেও একথা  
সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

প্রণামের প্রবাহ ভাতৃদ্বিতীয় পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু  
বিজয়ার রাত্রেব সে আনন্দ স্বয়ং মরণের দিনেও মনে পড়িবে।  
অন্ধ বাহি হইয়া গিয়াছে, প্রণাম এবং কোলাহলি আব ফুয়ার না।  
প্রত্যেক বাড়ীতে যাইতে হইবে, গীতারা প্রণাম, ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের  
পাদম্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিতে হইবে। আব মিষ্টমুখ,—মিষ্টমুখ  
না করিয়া উপায় ছিল না। কত বাদ-বিসম্বাদ দলাদলি এই দিনে  
মিটিয়া গিয়াছে, কত পব আপন হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে  
পুষ্কায়ুক্রমিক বিবাহও এই একটি দিনেব জগ্ন বন্ধ থাকিত।  
সন্ধ্যাব পূর্ব হইতে বাহাব যেমন আছে সাজিয়া দলে দলে নব-নারী  
প্রতিমা দর্শনে বাহিব হইত। সেকালে এই দিন হিন্দু-মুসলমান

বলিয়া কোন পার্থক্য ছিল না। বিসর্জনের পর তথাকথিত  
নিম্ন শ্রেণীব নব-নারী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বাড়ীতে প্রণাম করিয়া আঁচল  
ভরিয়া মুড়ি-মুড়কি ও মিঠাই লইয়া যাইত। মুসলমান বালক  
যুবক ও প্রবীণের দলও মিঠাই-মুড়কি লইতে লক্ষ্য বোধ করিত না।  
গ্রামে পূজা না থাকিলে নিকটবর্তী তিন-চারিখানি গ্রাম হইতেও  
লোক আসিয়া বিসর্জন দেখিয়া যাইত।

সুদিনে যে সিদ্ধি ও অপবাজয় বাঙ্গালীর কদত্তলগত ছিল,  
বিজয়ার দিন বাড়তে অপরাজিতা লতার বলয় বান্ধিয়া এবং শিবের  
প্রসাদ সিদ্ধি খাইয়া লোকে এখন তাহার অনুবল্ল করে। কবিরাজী  
অভিধানে সিদ্ধি অপব নাম বিজয়া।

হিন্দুব প্রতিমার্তন যে পুতুল-পূজা নহে, এই বিজয়াই তাহার  
শুদ্ধ উদাহরণ। এই তিন দিন প্রতিমাকে ঘেরিয়া ভাস্কর্য্য ও  
অপর ললিতকলার সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। কত দিন  
দরিয়া কত আয়োজন, কত উৎসেগ! দুক্কে নবনীতের মত  
শক্তিকপিণী যে দেবী স্থাবর-জঙ্গম সকলভূতে বিসর্পিত রহিয়াছেন,  
অয়স্কান্তে কেন্দ্রীভূত শূন্যকিরণের মত আপনাব মগ্নকোষ হইতে  
বাহির করিয়া প্রতিমায় বাহাকে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম,  
পুনবায় তাঁহাকে হৃদয়ে প্রত্যানয়ন পূর্বক সেই প্রতিমা বিসর্জন  
দিতে হে! এতটুকু দ্বিধা কবিলাম না। এই বহস্ত বৃষ্টিতে পারে  
না বলিয়াই না নিন্দকের এমন ভেৎকোলাহল! তাই বিসর্জন  
না বলিয়া বলি বিজয়া। জীবন-যুদ্ধ সাধন-সমবে সর্ব্বই জয়দাত্রী  
বলিয়াই দেবীও অপব নাম বিজয়া। জয়া-বিজয়া দেবীর সচরী।  
এমন দেবী নিকট হইতে যদি জয় অর্জিত না হয় সে  
তোমাব সাধনাব দোষ, কষ্টের ক্রটি, পূজায় নিষ্ঠার অভাব।  
যে আবাহন করিতে জানে, সে বিসর্জনও দিতে পারে। বিসর্জন  
দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনাও তো কবিলাম—“সম্বৎসব ব্যতীতে তু  
পুনঃবাগমনায় চ।”

### কাইজার-দর্শন

তখন যুদ্ধ চলছে। চিকাগোতে জরুরী অধিবেশনে যোগদান  
করতে যাবেন হেনরী কাইজার। স্থাশানাল এয়াবপোটে বিমানে  
আবোহণ কবেছেন কাইজার। বিমানে অত্যন্ত স্থানাভাব।  
অতি কষ্টে বসতে জায়গা পেয়েছেন। ইতিমধ্যে এক জন মেজব  
বিমানে উঠলেন। মেজব, তাঁব দাবী প্রথমে স্বীকৃত হবে।  
কাইজারকে উঠতে হ'ল জায়গা ছেড়ে দেওয়াব জগ্ন। বিমান ছাড়লে  
বিমান-বক্ষাকর্ত্তী হঠাৎ মেজবকে জানালেন যিনি মেজবের জগ্ন জায়গা  
ছেড়ে দিয়েছেন তাঁব বিখ্যাত নাম।

মেজব শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন,—কাইজার! আমি তবে যে  
চিকাগোতে চলেছি কেবল কাইজারকেই দেখতে!

# রূপ রচনার রূচি রাগ

রূপের কলিকে সৌন্দর্য কুস্তমে বিকশিত করে তোলাই  
এই প্রসাধনীর সাধনা। রূপ সাধকসাদিকাদের  
নিকট তাই চিরকামা এই সৌন্দর্যের সুরমা সম্ভার।



১৮

১৮



## মার্গো সোপ নিম টথ পেপ্ট

ভূঙ্গল সুব্যাসত ময়াদুসরাজ  
কেশ তৈল

## লারনি স্নো ও ক্রীম

কান্তা মনোমদ গন্ধসার



দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ  
কলিকাতা-২৩

১৮

# অল্প-স্মৃতি

( Uncle Tom's Cabin গ্রন্থের লেখিকা অারিস্টো নীচাৰ ষ্টাউ লিখিত )

গ্ৰ্যামোত্তার

মাননীয়া

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৩

আপনার পূর্বের উত্তর লিখতে বসছি তাড়াতাড়ি। সব চেয়ে মজার কথা হোল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় এক দিনের এক শৈশবে ছোটদের জুগা লেখা আপনার কবিতাগুলি তামেশাই পড়তুম।

সে সময় প্রায়ই আপনি যে আনন্দ বিতরণ করেছেন তার জুগা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লেখার নবী লেভি হোত আমার।

আপনি জানেন যে ছেলে ছেলে আমি কেমন মেয়ে। বেশ তো, এ যদি জানবার মত এমন কিছু হয়, বিনামূল্যেই তার হিসেব পাবেন আপনি। স্বকহেই বলে বাগি আমি সামান্য মেয়েই মাত্র। বয়স চল্লিশ পেয়েছি—দেখতে বোগা একটুকুন। আমার কীপনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলিতেও এমন কিছু স্মৃতি ছিলাম না দেখতে, আমি আর এখন চোখা হো পুবানো আসবাবের সামিল।

পচিশ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয় এমন এক জন লোকের সঙ্গে যিনি গাফ, ডিক, ল্যাটিন ও আবার ভাষায় অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তা ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাঁর ঐশ্বর্য ছিল না। আমার গৃহস্থালীর উত্তোষপথে এসব সব ও বাস্তবের জুগা যে চিনামাটিব রসন কিনে ছিলাম, তার দাম ছিল মাত্র একগাব দল্লাব। হুবহু তা দিয়ে বেশ চলেছিল। তার পর এক দিন আমার হাট বিয়ে করে তার সৌ দেখাতে নিয়ে এলে আমি আমার পুঁজি হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে দেখি, বাপের বাড়ীর লোক-জনদের আপ্যায়ন করবার উপযোগী কাপ-প্লেট কিছুই অবশিষ্ট নেই যবে। তখন ভাবলাম, দশ দল্লাব খরচা করে এক প্রস্থ টা-সেট কিনে গৃহস্থালীর পুঁজি বাড়ানো দরকার। আমার মনে হয়, বহু বছর ধরে এটি ছিল আমার গৃহস্থালীর যা কিছু পুঁজি।

কিন্তু সে সময় আমি সম্পূর্ণ আর এক ধরণের ধনে অতুল ধনবতী ছিলাম। হুঁটি বমত মেয়ে হয়েছিল আমার প্রথম। নবম ফুলের মত মেয়ে। কৌকড়ান তাদেব বেশমেব মত চুল। সম্ভান ভাগ্য আমার ভালই ছিল। আমি সাতটি সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্য লাভ করি। এদের মধ্যে সব চাইতে সুন্দর সব চাইতে প্রিয় যেটি, বাড়ীর নিকটে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তাইই মৃত্যুশয্যায় ও সমাধি-ভূমিতে বসে প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম, গরীব হতভাগিনী দাসী মাঠার নিকট হতে পেটের সম্ভানকে ছিনিয়ে নিলে তার প্রাণে কতখানি আঘাত লাগে। সেই অপরিস্রব দুঃখের সময় ভগবানের কাছে আমি একমাত্র মিনতি জানিয়েছি যে, এত দুঃখ ভোগ আমার যেন বুঝা না যায়। তার মৃত্যুকালে এমন বিশেষ সম্ভাপ পেয়েছিলাম যাকে নিম্ন বস্ত্রাধি বলা যায়। তখন ভেবেছিলাম, মন বুঝি কিছুতেই প্রবোধ মানবে না যতক্ষণ না হৃদয়েব এই নিপীড়ন মহৎ মঙ্গলময় পরম হিতকর কিছু কবতে প্রবৃত্ত করতে পারবে আমার।

এই সময় আমার মনে হয়েছিল

Uncle Tom's Cabin গ্রন্থ লেখা আছে, সেই গ্রন্থেব তীব্র বেদনা বহু মর্মান্তিক ঘটনাই তাব মূলে। আজকে আর মনেব উপর তাব কোন দাগই নেই—শুধু মায়েরা যখন তাদের সম্ভানের নিকট হতে চিবকালেব জুগা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি আনুশ্রবিক ককণা ও মমতা জাগে মাত্র। দীর্ঘকাল দাবিদা, বোগ-ভোগ এবং প্রাণশক্তি ক্ষয়কারী উচ্চ আবেগাওয়াব মাঝে সংগাম করে আমার ছেলে-মেয়েবা বড় হয়েছে। নার্সারী আর বাস্তবাব এট দুইটিই ছিল আমার কর্মক্ষেত্র। আমার ভোগান্তি দেখে আমার কয়েক জন বন্ধু-বান্ধব দয়াপরবশ হয়ে আমার লেখা টুকে পাঠিয়ে দিত আমার নামে বার্ষিক

সংকলনে আর সম্পাদকবা দবাজ হাতে টাকা দিতেন। এই ভাবে প্রথম পাওয়া টাকা দিয়ে আমি পালকের একটি খাট কিনেছিলাম। যেহেতু দাবিদার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এবং বিয়েতে কোন যৌতুক পাঠনি আর আমার স্বামীও বিপুল সংখ্যক পুস্তকেব দিব্যটি গুণাগাব আর পাণ্ডিত্য ছাড়া কিছু ছিল না—শয্যা আর উপাদানে অর্থ ব্যয় করাটাই সব চেয়ে কার্যকরী মূলধন বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হোল আমার কাছে। এর পর থেকে ভাবলুম যেন পবশ পাথর খুঁজে পেরেছি আমি। কাজেই যখন নতুন কাপ-প্লেট বা মাছবের প্রয়োজন হোত, অথবা বছর শেষে সাংসারিক আয়-ব্যয়েব হিসেবে জমাৎ অঙ্ক কিছু পড়বে না বস্ত্তাম—আমি তখন আমার বিস্তৃত বন্ধু ও আমার স্ত্রণ-ছপের সমভাগিনী, সর্পকর্মপটায়সী পরিচালিকাকে বলতাম—‘বদি ছেলে-মেয়েদের দেখিস মার এক দিনের জুগা সংসারেব লাগাম ধরিস তাহলে কিছু লিখে এটি বিপদ-বৈধবণা পার হতে চেষ্টা করি।’ এই ভাবে আমি লেখিকা হলাম। গোড়াব দিকে খুব সাধারণ ভাবেই এবং বন্ধু-বান্ধববা যাবা যশের জুগা প্রত্যেক লেখার সঙ্গে আমার নাম জুড়ে দিত, তাদের কাছে প্রবল প্রতিবাদ করতুম। যুক্তবাজ্যেব কোন বঙ্গপণ্ডিত্যর বেশ টিকোল নাক আমার কোন কাঠি-খোদাই ছবি দেখতে পান যদি, হো জানিয়ে বাগি সে আমার স্বাভাবিক পিনমন্ত্রতাকে উপেক্ষা করেই করা হয়েছে—আমার পাঁচ হাজার বন্ধু ও জনসাধারণের অপ্রতিবোধ্য আগ্রহপ্রতিশ্রোষাই বটেছে এ বকম। প্রতীচো আমার জীবন সম্বন্ধে একটা কথা আমি বলতে চাই, যা বহু ইংরেজ বমণী অপেক্ষা আপনি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে পাবেন।

আমি সবথেকে হুঁমাইল দ্বে গ্রামে বাস করতুম। জানেন তো, যবকল্পার কাজেব লোক সব সময় মচবে পাওয়া যায় না, আর গ্রামে পাওয়া হো একপ্রকার অদৃষ্টব—এমন কি যাগা খুব বেশী মাইনা দিতে ইচ্ছুক তাদের পক্ষেও। কাজেই আমার মত হস্ত-দবিত্ত আর অধিক কি আশা করতে পারে, যাব দেবার মত পাথিব সম্পদ নেই বললেই চলে। পবম সপীষকপা ইংবেজ মেয়ে আনাকে যদি না পেতুম, তাহলে এটি অনিশ্চয়তা এবং সাংসারিক জোয়াসেব মধ্যে পড়ে কিছুতেই বাঁচতুম না। এক দিন জানাৎ হুংখ-দৈক্স তাড়িত হয়ে আমাদের তটে এসে উপনীত হয়েছিল এবং স্বথ সেমন নেয়াযিব সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেও তেমনি আমার সমস্যাে থেকে গেছে। কাজেই যখন আমাদের স্থলেব সম্পত্তি ছোট ছোট ভাগ করে কম ভাডায় ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হোল, তখন আর আমার আনন্দের সীমা বটল না। এইবার কয়েকটি গরীব পরিবার আমাদের বাসস্থানেব আশে-পাশে বসতি নিল—এদের মধ্য হতে দরকার হলে পরিচালিকা সংগ্রহ করতুম। জন বারো মুক্তিপ্রাপ্ত দাস-পরিবারও

এই দলে ছিল এবং প্রয়োজনের সময় আমি তাদের শরণাপন্ন হতুম। কৃষ্ণকায়দের যদি কেউ সন্দেহ দেখতে চান তাহলে গীয়ে আমার মত কৃষ্ণ শিশুকে বুকে নিয়ে এবং আবেগপূর্ণকণ্ঠে পবিত্র হয়ে ক্ষণ স্বাস্থ্যে নিপতিত হতে হবে এবং সাধা বাতীতে ঘবকলাব কাজ দেখাব কেউ থাকবে না। তখন ভালমামুষ আমার বুড়ী আঁট ফাঙ্কিকে কেউ যদি দেখেন—তার কালো চেপটা মুখ, দীর্ঘ নিটোল পবিপুষ্ঠ বাত, পিপের মত বড় এবং পবিপুষ্ঠ বুক, উচ্চকিত প্রাণখোলা হাসি, —তবেই একমাত্র কালো আদমীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

হতভাগিনী এলিজা বাক—তাব নাম ইংলেণ্ডে পৌছেছে জানতে পারলে তাব চোখ বিস্ফাবিত হবে—সেই ছোট দাস-জীবনের প্রতিমূর্তি। মোটা-মোটা শান্ত সরল মনস্তানব্রী—সব সময় আমাদের বাড়ির দুয়ারে আসে—মনে করে যেন এটি একটি আবাদভূমি, যেখানে সাতশো লোক পাটে। ভার্জিনিয়াব দাস-জীবনের অভিজ্ঞতা তাব আছে। মৌরনে নিশ্চয়ই সে খুব সন্দেহ ছিল—নিগো আব শাদা উভয়ের সম্মুখিত সে—মধুর কণ্ঠ, চাল-চলন মার্জিত ও শোভন। যে পবিবারে লালিত সে সেখানে দাঁড়ি আঁব নাসেব কাজ করত। পবিবারটির অবস্থা যখন পড়ে এসে, তাবা তখন তাকে লুস্তানিয়াব এক আবাদে দিবা করে দিয়েছিল। প্রায়ই আমায় সে বলত, কেমন করে হঠাৎ এক দিন তাকে জোব করে একটি গাড়ীতে তুলে দেওয়া হয়—তার কবীরা যাবে বন্দী অবস্থায় চাঁৎকাব করছেন—তাকে নিয়ে যেতে দেখে জানলা দিয়ে গাত বাড়িয়ে আকুল ভাবে ডাকছেন। লুস্তানিয়াব অভিজ্ঞতার কথা আমায় সে বলেছে। যে সব হতভাগ্য দাস চাবুকে ক্ষত-বিক্ষত হোত, ওয়ব দেবাব জন্ত রাখে সে গোপনে তাদের কাছে হোত, সেবা করত তাদের—ওয়ব দিত। কাজেই শেষ পর্যন্ত কেনটাকিতে চালান দেওয়া হোল তাকে। তাব সবশেষ প্রভুই তাব সমস্ত সন্তানব জনক। এ নিয়েও সে এমন লজা ও সংযমেব সঙ্গে কথা বলত সে, সত্যিই তা অসাধারণ। তাকে সে স্বামী বলেই বলত এবং আমার সঙ্গে অনেক দিন কাটানোব পরই আমি জানতে পেয়েছিলাম তাদের সম্পর্কেব প্রকৃত স্বরূপ কি! কোন দিন ভুলব না, তাব জন্ত সেদিন কী দুঃখ বোধ করেছিলাম এবং তাব বিনীত আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াসে যে ভাব উদয় হয়েছিল আমার মনে—“জানেন তো হিসেস ষ্টাট, দাসী-মেয়েদের নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।” তার হুঁটি সুন্দরী মেয়ে ছিল—তাদের মাথাব চুল আব চোখ জোড়া এত অপকৃপ—আমি তাদের আমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে স্থলে তুলি করে দিয়েছিলাম। আমি যে-সমস্ত দাসদের সম্পর্কে এসেছি তাদের কাছ থেকেই দাস-প্রথাব বিচিত্র ইতিহাস দৈবান্ত জানতে পেয়েছি—সময়ান্তবে ইয়ত সে ইতিহাস নিশ্চয় হয়ে যাবে।

আপনি জানতে চেয়েছেন আমেরিকায় বই বিক্রী করে কত লাভ হয়েছে আমার। সারা জীবন দাবিদ্র্যে কাটিয়ে এবং শেষ জীবনও দাবিদ্র্যে কাটাতে হবে, জেনে বই লিখে অর্থোপার্জনের চিন্তা মাথায় আসেনি কখনো। কাজেই প্রথম তিন মাসেব বিক্রয়-লব্ধ দশ হাজার ডলার হাতে পেলাম যেদিন, সেদিন কেমন একটা মনোরম বিষয় বোধ করেছিলাম! আমার ধারণা, আরো অত টাকাই পাওনা হয়েছে আমার এত দিনে।

যুক্তরাজ্য ও কানাডায় কৃষ্ণকায় শিক্ষকদের শিক্ষার জন্ত উত্তর

প্রদেশে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে আমার। বইয়ের অপ্রত্যাশিত বিক্রয়-লব্ধ অর্থ থেকে এদের মঙ্গলের জন্ত চিরস্থায়ী কিছু করাট আমার আন্তরিক অভিপ্রায়। আমেরিকান বা ইংবেজ পুস্তক প্রকাশকদের তুলনায় আমার আয় খুবই কম। তবুও আয়ের মোটা অঙ্কই আমি এই ভাবে খরচ করতে ইচ্ছুক এবং আমার প্রব বিশ্বাস, আমেরিকান ও ইংবেজ প্রকাশকগণও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এ বিষয়ে। দাসদের মুক্তি সাধনে শিক্ষাব মত আব কোন কিছুই এমন তড়িৎ-সহায়ক হবে না।

আমি এমন একটি পুস্তক রচনায় লিপ্ত যাতে Uncle Tom's Cabin এবং মতই সমান মাল-মশলা থাকবে। যে তথ্য ও দলিলের উপর নির্ভর করে গল্পটি বচিত, তাব সবটাই এতে থাকবে—তা ছাড়া অজ্ঞাত বহু নথিপত্র, মামলাব বিবরণ, দলিল—দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীর সাফা-প্রমাণাদিও আছে, যা Uncle Tom's Cabin এবং প্রত্যেকটি বিবরণকে সমর্থন করবে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই বই লেখার উদ্দেশ্যে তথ্যাদি পর্যবেক্ষণেব পূর্বে আমি জানি বলে যা মনে করেছিলাম তখন, এখন দেখছি এই অঙ্ককাব জগতের গভীরতাব একটুও পরিমাপ করতে পারিনি আমি। আদালতের মামলায় যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে তা এতই অবিখ্যাত সত্য যে, যখনই সে সব কথা ভাবি, মন নিবিড় বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ে। মনে হয় বইখানি শুধু পড়লে চলবে না, সদয় দিয়ে অমুত্তর করতে হবে এবং ফলে সে অশুভ্ণিত সত্তা হয়ে তদমুত্তর কিছু করাও চাই।

এই সমস্ত বিষয় লিখতে বসে আমি অসহ্য বেদনা বোধ করছি সত্যি কথা বলতে কি, যেন নিজের হৃদয়েব শোণিতে লিখছি Uncle Tom's Cabin লেখাব সময় বড় বার মনে হয়েছে শরী বুনি এত দম ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু ভগবানের কাছে আমি রাত-দিন মিনতি করেছি তিন যেন আমায় শেষ বদা করতে সাহায্য করেন শেষ পর্যন্ত সামর্থ্যাতীত শক্তি দিয়েছিলেন তিনি আমায়।

হৃৎস্পন্দেব মত এই সব নিঃশব্দ-কাহিনী! এ কি আমারই দেও ঘটেছে! ভাবী পাথবেব মত এ আমার বকে চেপে আছে—আমা জীবনে তাপেব ছায়া ফেলেছে। আরো বেশী সে, নিজের ভায়েব মত দক্ষিণাঞ্চলের জন্ত আমি বেদনা বোধ করি—প্রতিটি অত্যাচারের ক লিখতে আমার হৃদয় ব্যথায় টন-টন করে ওঠে। যেন ভয়ংক প্রতিক্রিয়াব হয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে পারিবাধিক বলস্বেব কথা বিব করতে বাধ্য হচ্ছি। অনেক সময় মনে হয়, আমার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়: কিন্তু তবুও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এদের মঙ্গল জন্ত কিছু করা হয়েছে দেখে যেন মরি।

মেতে নিশ্চয়ই লওনে পৌছব। সেখানে নিশ্চয়ই দেখা হ আপনার সঙ্গে। এত লোক আমায় দেখতে চায় কি বেশী ক তো—স্বপ্নের মত মনে হয়।

যদি বসন্ত অবধি জীবনেব মেঘদা থাকে—তাহলে সের্বসীয়া কবর, মিন্টনের মালবেরী গাছ আব পূর্বপুরুষের দেশের মাটি দে আশা করছি। পুবোনো ইংল্যান্ড! সেদিন যেন সত্যিই আসে! ইতি

আপনাদের প্রিয়

এইচ. বি. ষ্টাইল।

অমৃতবাদক—জয়ন্তকুমার ভাট

# ভক্ত কবীর

(পূর্ণ প্রকাশিতের পূর্ব)

উপনিষদের দাস (শান্তিনিকেতন)

ডাঃ সব আচার্য ভাণ্ডারকাবের মতে ভক্তিভাবের দীর্ঘ পদ্যবন্দে পাওয়া যায়। আচার্য ফিফিওমোহন সেন বলেন, “বেদে বশিষ্ঠাদি বংশে, বক্ষ প্রভৃতি দেবতার স্তবে ভক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।” উপনিষদের যুগে এই বাক্য প্রচলিত হয়, এই ভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে। ডাঃ ভাণ্ডারকাব বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক, কঠ প্রভৃতি উপনিষদে পদ্যবন্দে প্রাতি প্রেমের নিদর্শন পেয়েছেন। কঠোপনিষদে “পঠিত বলা হয়েছে, ‘পদ্যবন্দা পঠিতা ভক্তি-শাস্ত্রা আছে তার প্রাতি পদ্যবন্দা প্রমাণ তন, সে-ই বিদ্যা আদি দ্বারা তাঁকে প্রাপ্ত হয়।’ এই জগৎ ভবেরা তাঁর করেন বোধে যাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলা হয়েছে।” আসন্ন নীচ ডাঃ আচার্য কিছুই নয়। আচার্য ফিফিওমোহন সেন বলেন, উপনিষদের পদ্যবন্দা অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে প্রেমভক্তি-এই নিদর্শন।

এই ভক্তি ভাব সম্বন্ধে: মনোবন্দী আচার্যের অনুবর্তী অনাচার্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন, “অথবা” হয়ত ভাণ্ডারকাবের ভাবের আচার্য-অনাচার্য উভয়ের মতোই উদ্ধৃত হয়েছিল। তবে মনে হয়, আচার্যদের ক্ষেত্রে কোর পেয়েছিল অনাচার্যদের সম্পর্কে থেকে। আচার্য ফিফিওমোহন সেন বলেন, “আচার্যের এক দিন ভক্তি অপেক্ষা যোগযজ্ঞ-কিয়ামতের বা অজ্ঞা দিকে বিস্ময় ব্রহ্মজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন ছিলেন। আচার্যদের পূর্ববর্তী দ্বাবিধ প্রভৃতি জাতির মধ্যে ভক্তির ভাব ছিল বেশি। আচার্যদের জ্ঞানের সঠিক এই ভক্তিবাদ মিশ্রণ ভাবতে দেখানো গভীর ও উদার হওয়া উচিত লাগিল।” বেদে ও উপনিষদে ভক্তি নিদর্শন থাকলেও ভক্তি কথায় কিছু ব্যবহৃত হয়নি। ডাঃ ভাণ্ডারকাবের মতে বাস্তবের খণ্ড অজ্ঞানের কাছে গীতা প্রকাশ করলেন ওগনই ভক্তিদর্ম একটি সূত্রিষ্ঠিত ধর্ম নিল। ভগবদ্গীতাই ভক্তিদর্ম বা একান্তিক ধর্ম প্রচারের প্রাচীনতম নিদর্শন। ভদবদগীতার রচনা-কাল নিয়ে মতভেদ আছে। তবে ডাঃ ভাণ্ডারকাবের মতে উগা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে প্রথম দিককার পদ্য নয় বলা যায়। ভক্তির জগৎ চাই ভগবানকে। অর্থাৎ বৈয়াক্তিক কোনো দেবতা বা ঈশ্বর না থাকলে ভক্তি সম্ভবে না। কেন না, শুদ্ধ তত্ত্ব মাত্রের প্রতি মানুষের প্রেম জন্মে না। এ থেকেই আর একটা কথা এসে পড়ে। ভক্তির জগৎ এক দিকে চাই যেমন ভগবানকে তেমনি অজ্ঞা দিকে চাই ভক্তিকে। প্রেমের বাজা ছুঁয়ে বাজা; একাকী প্রেম হয় না। অবশ্যি আচার্যের সম্ভবপর। কিন্তু তা সম্ভব শুধু তাত্ত্বিক মানুষের ক্ষেত্রে। এ বকম মানুষ অসাধারণ। সাধারণ মানুষের কাছে এ সব কথা বিশেষ মূল্য নেই।

বেদে দেবতাবাদ আছে। কিন্তু তাঁরা মানুষের কাছে আসতে পারেননি, যোগ-যজ্ঞের জটিল জালে বাধা পড়েছেন। তাঁদের প্রতি মানুষের ভক্তি পবিষ্ট হয়নি; তাঁদের স্বাধীন মানুষের অন্তরে তুষা মেটেনি। উপনিষদের নিঃসঙ্গ ব্রহ্ম নৈব্যক্তিক তত্ত্ব মাত্র। এঁকে নিয়ে বুদ্ধিপ্রধান আচার্য ঋষিদের তত্ত্বজিজ্ঞাসা পরিভ্রম হয়ত হয়েছিল কিন্তু সর্গসাধারণের হৃদয়কে ইনি তৃপ্ত করতে পারেননি। তার প্রমাণ আছে উপনিষদেই। উপনিষদের

যুগে বৈদিক যোগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ধর্মের ক্ষেত্রে বন্ধনমুক্ত আধ্যাত্মিক ভাব আত্মপ্রকাশ করে একাধিক ভাবে। তাই দেখি, উপনিষদে শুধু নিঃসঙ্গ ব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতবাদই প্রচলিত হয়নি। সঙ্গ ব্রহ্মবাদের কথাও এতে আছে। সঙ্গ ব্রহ্ম ভক্তের ভগবান। অবতারবাদের মূলও উপনিষদেই আছে।

উপনিষদের আদর্শনা থেকে মনে হতে পারে যে, অদ্বৈতভাব ভক্তির বিবোধী। নাবদ ভক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গ ব্রহ্মসারে ভগবদ্-বিষয়ক প্রেমেরই ভক্তি বলে নির্দেশ করলে তাই হয় বটে। কিন্তু ভক্তি ও জগৎ সঙ্গ ও আছে। ভক্তিবসামুদয়কে বলেন, ‘জগৎ অতীতকালীন জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা ভাবিত এমন যে একবিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাই উত্তরা ভক্তি।’ নিকৃষ্টাদিক স্বরূপেরও এমনি ভক্তিবাদ হতে পারে। কয়েকই অদ্বৈতভাব ভক্তির বিবোধী বলা চলে না। তা ছাড়া, ভক্তদের মতে অদ্বৈতবোধাত্মক ভক্ত। জ্ঞানমার্গী হলেও তারা পদ্য ভগবদ্-প্রেমেরই সাক্ষ্য। কেন না, বোধাত্মক ভাবে ও ভক্ত হতে নেই। জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন বলে যে মনে হয়, তা নয়। এই অদ্বৈতের জগৎ জীব প্রতিনিয়ত ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাকে বিনয়িত হওয়া জরুরী ব্রহ্মরূপ উপলব্ধি জগৎ। এই আকর্ষণ পদ্য প্রেমের আকর্ষণ; ব্রহ্মের প্রতি আত্মসমর্পণের প্রতি এই প্রেম। কাজেই, জ্ঞানমার্গী বোধাত্মক প্রেমিক, তাঁরা ভক্ত।

তবে সাধারণতঃ ভক্তি দ্বৈতবাদীই বটে। সাধারণ মানুষের ভক্তি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৈদিক দেবতাকেই খোজে। সে ভক্তি এমন এক জন দেবতাকে চায় যিনি ভক্তদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন, তাদের আপদে-বিপদে রক্ষা করবেন, তাদের সুখ-সম্পদ দেবেন, তাদের দেবেন মুক্তি। এই জগৎ মানুষকে বৈদিক একাধিক দেবতার পূজা; এই সব দেবতা যে ভিন্ন নন, একই পরমাত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এ তত্ত্ব উপনিষদেই পাওয়া যায়। আর এই পরমাত্মার প্রতি ঋষিদের প্রেমের তথ্য ভক্তির পবিচরণ আছে উপনিষদেই।

এই পরমাত্মাই ভগবান।

‘নির্দেশ’ নামক একখানা বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায়, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে ভারতবর্ষে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বলদেব, বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেবতা, এমন কি পশুপক্ষীর পূজাও প্রচলিত ছিল। কালক্রমে সকল দেবতার পূজাকে আতিক্রম করে ভারতের একটি বৃহৎ ভাষা বাসুদেব-পূজা প্রবল হয়ে ওঠে। খৃষ্ট জন্মাব্দ তিন-চারশ বছর আগে থেকেই বাসুদেবের পদ্যবন্দে পূজিত হতে থাকেন। তাঁর ভক্তদের বলা হত ভগবত। ভগবত-ধর্ম ভাবতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবল ছিল। এমন কি কোনো কোনো গ্রীসদেশবাসীও এটি গ্রহণ করেছিল। বৈদিক যোগ-যজ্ঞ বিশেষ করে সেই সব যোগযজ্ঞে পশুপক্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপই সম্ভবতঃ বেদবাহ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। আর বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিকদের মধ্যে প্রচলিত উপ তপশ্চর্যাও বিবোধী ছিল। ভক্তিদর্মেও গোড়ায় আসনা এই ছাঁট লক্ষণ দেখতে পাই। মহাভারতের শান্তিপর্বে একটি আশ্বের নাম নারায়ণীয় উপাখ্যান। এই নারায়ণীয় উপাখ্যানে উপাখ্যান আকারে ভক্তিদর্মেই আলোচনা আছে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভক্তিদর্মেই বলা হয়েছে একান্ত ধর্ম আর ভক্তিকে বলা হয়েছে একান্ত ভাব। পরমাত্মার নাম নারায়ণ বা হবি। ইনিই বাসুদেব।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিছি, বৈদিক যাগ-যজ্ঞের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উপনিষদের গভীর অব্যাহতাবের উদ্ভব হয়। সে ভাব অহিংসামূলক। নাব্যবহার উপাখ্যানের আলোচনা করলে দেখা যায়, এতে এক দিকে যেমন বলা হয়েছে যাবা অহিংস এবং একান্ত ভাবে পবনাদ্বারা ভক্তি করে তাবাই তাঁকে পাণ্ড, আবাব অল্প দিকে যাগ-যজ্ঞের ধারাতাকে একেবারে অস্বীকার না করে তাই সঙ্গে উপনিষদিক অহিংস ভাবের সমন্বয় করা হয়েছে। এই উপাখ্যানের বস্তু উপনিষদের কাচিনী থেকে নিয়ন্ত্রিত তথ্যগুলি জানতে পাওয়া যায়। বস্তু উপনিষদের যে যজ্ঞ করছিলেন তাতে পশুবলি হয়নি। তাঁর যজ্ঞে হোম করা হয়েছিল আবণ্যকেব (উপনিষদ এর অন্তর্গত) বিধি অনুসারে। যজ্ঞের প্রধান দেবতা পরমেশ্বর হ'ল। যাগ-যজ্ঞের দ্বারা এই হাবির দর্শন পাওয়া যায় না। যেমন পাননি বৃহস্পতি; বৃহস্পতিনের দ্বারাও পাওয়া যায় না, যেমন পাননি একত, দ্বিত এবং ত্রিত; শুধু ভক্তিরূপে যে তাঁর পূজা করে সেই তাঁর দর্শন পায়, যেমন পেয়েছিলেন বস্তু উপনিষদ। এর থেকে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। একান্ত ধর্ম এক দিকে শাস্ত্রীয় ধারা মেনে চলেছে আর এক দিকে শুধু ভক্তির উপর জোব দিয়েছে। আমরা দেখতে পাব ভক্তিদর্শনের এই দুই দিক—একটি শাস্ত্রীয় যাগ এবং একটি শাস্ত্র-নিরপেক্ষ—এই দুইটিই পবনতী কালে সম্পৃষ্ট আকার নিয়ে বেড়ে উঠে। নাব্যবহার উপাখ্যানের এই একান্ত ধর্মের ধারা বহন করে পবনতী যুগের বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভব হয়। ভাবতীয় প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিবেকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবতার মধ্যে পবন একেব উপলব্ধি ভাবতীয় সাধনার এক চরম সিদ্ধি। ভাবতীয় দেব-মণ্ডলে বহু দেবতা আছেন সকলেই ব্রহ্মণ: রূপকল্পনা ব্রহ্মের রূপবিশেষ। ভাবতের এই একেব সাধনাই নারায়ণ, বাসুদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ এই সব ভিন্ন দেবতাকে এক দেবতা করে তুলে। অবশিষ্ট ভাবতবর্ষেও ধর্মের ক্ষেত্রে উপ সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়েছে এ কথা সত্য, কিন্তু তা কখনও ভাবতের এই পবন ঐক্যবিশ্বাসিনী মৌলিক সাধনাকে ধ্বংস করতে পারেনি। তাই দেখি, যুগে যুগে এই দেশে এমন সব সাধকের আবির্ভাব হয়েছে যারা সমস্ত ভেদ-বিভেদের বাইরে গিয়ে সেই একেব কথা বলেছেন। আবায় দেবতার বিভিন্নতা অধ্যসারে ভক্তিদর্শনের মধ্যে কালে কালে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, মৌব, গান্ধপত্য এই পাঁচটিই প্রধান। এর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রভাব বেশী। বৈষ্ণব ধর্ম প্রাচীনতমও বটে। কেন না, আমরা আগেই বলেছি, ভাগবতধর্ম বা নাব্যবহার উপাখ্যানে ব্যাখ্যাত একান্ত ধর্মই পবনতী কালে বৈষ্ণব ধর্মের রূপ নেয়। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার প্রমাণ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই পাওয়া যায়।

মানুষ দেখে প্রকৃতির কমনীয় রূপ, সে রূপ দেখে তার চোখ, জুড়ায়, তার মন খুশিতে ভরে উঠে; দেখে প্রকৃতির এমন সব কাজ যাতে করে তার স্বাধ-সমৃদ্ধি বাড়ে; সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটেতে দেখে যাতে করে তার কল্যাণ হয়। মানুষ এসব দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমন দেবতার প্রতি তার মন প্রীতিতে

ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। এই দেবতার পূজা করে সে। তাঁকে ভালবাসে। বিষ্ণু এমনি দেবতা। তাই বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের ধর্ম। আর অতি প্রাচীন কালেই মানুষের স্বাভাবিক সদয়বৃত্তির মধ্যে এর উদ্ভব হয়েছিল অন্তর্মান করা যায়। আবাব এই প্রকৃতিরই ভয়ঙ্কর রূপও মানুষ দেখতে পায়। বড়-বড়-বড়পাত, বলা, মহামারী, তিস্র জন্তু-জানোয়ার মানুষের জীবন বিপন্ন করে, তার মৃত্যু ঘটায়; সংসারে এমন সব ঘটনা ঘটে যাতে করে তার জীবনের স্বাধ-শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সবও সে দেবতার কাজ বলে মনে করে। এমনি দেবতাকে মানুষ ভয় করে। তাঁর পূজা করে ভয়ের জুড়। তাঁকে যে ভক্তি করে সেও ভয়ে ভয়ে। এমনি দেবতা রুদ্র। পবনতী কালে তিনিই শিবরূপে পজিত হন। কাজেই শিব ধর্মও বৈষ্ণব ধর্মেরই মত প্রাচীন বলা যায়। আদিত্যে কল্যাণময়, আনন্দময় দেবতার বর্ণনা আব ভীষণ ভয়ঙ্কর ধংসকারী দেবতার বর্ণনা পৃথক্ হলেও পরে একই দেবতার আনন্দময় প্রিয় রূপ ও ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা করা হয়েছে। তাই দেখা যায়, যিনি রুদ্র তিনিই শিব; যিনি সহাবক তিনিই বক্ষক ও পালক; যিনি কালী কবালী ভয়ঙ্করী বগচণ্ডী তিনি ববান্ধবদাত্রী জগজ্জননী। সূত্র্য বৈদিক দেবতা, গণপতিকেও বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে কোনো স্বতন্ত্র প্রবল স্বী-দেবতার কথা পাওয়া যায় না। শাক্ত মতের উদ্ভব হয় খৃষ্টীয়েরও পাবনতী যুগে। অবশিষ্ট গোড়া শাক্তেরা এ কথা মানেন না। তাঁদের মতে শক্তিপূজা বেদের চেয়েও প্রাচীন। সে যাই হোক, যে মতের যখনই উৎপত্তি হোক না কেন, এ কথা ঠিক যে, ভক্তির ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই বৈষ্ণব মতই প্রবল ছিল। অতীত মত সময়-বিশেষে ও স্থান-বিশেষে প্রবল হয়ে আসার ক্ষমতা হয়ে এসেছে। কিন্তু বৈষ্ণব মত ববাবই আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রেখেছে। আজও ভক্তির ক্ষেত্রে বৈষ্ণব মতই সর্বাধিক প্রভাবশালী, তার পব শাক্ত ও শৈব মত। অতী মতের আব পৃথক্ অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। মনে হয়, প্রথমে উদ্ভব-ভাবতেই বৈষ্ণব মতের উদ্ভব হয়। কিন্তু দক্ষিণেই হয় এর বিশেষ পরিপূষ্টি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এ বকম সময় বৈষ্ণব ধর্ম তামিল দেশে প্রবেশ করে। তার পব উদ্ভব-ভাবতে যখন হিন্দুধর্মের পুনবুত্থান হল তখন আবাব তার প্রভাব মাঝামাঝি দেশের হিন্দুর দিয়ে দক্ষিণ দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সেখানে হল আলোয়ার বলে পরিচিত ভক্তদেব আবির্ভাব এবং তখন থেকেই দক্ষিণে ভক্তিদর্শন বিশেষ জোর বাঁধল।

মোট বার জন আলোয়ারের নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ে এঁদের জন্ম হয়। এঁদের মাসিক কাশ-নির্ঘণ কঠিন। তবে এই দ্রাবিড় ভক্তগণ যে একাদশ শতকের পূর্বে জন্মেছিলেন, এ কথা বলা যায়। আমরা পূর্বেই ভক্তিদর্শনের দুটো ধারার কথা উল্লেখ করিছি। একটি শাস্ত্রীয়, অগাটি শাস্ত্রের ধারার না, প্রেমভক্তির সহজ পথ ধরে চলে। ভক্তিদর্শনের এই অশাস্ত্রীয় ধারাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন স্বকীয় সাধনা। তিনি বলেছেন, “...ভাবতবর্ষের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তার অন্তরে জিনিষ। সকল প্রকার বাস্তবিক দশা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সমস্তির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ



নয়, এবং মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প, বস্তুত, এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয় এবং সমাজ-শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরীকৃত হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসাহিত হয়েছে বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ করে। ষাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রসঙ্গের প্রকাশ তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য প্রণোদ্য লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ করেছেন তা 'ন মেষয়া ন বহ্নাঃ প্রতেন'।

ভক্তদের মধ্যেও তাঁর ছ'টি দল দেখা যায়। এক দল শাস্ত্র মানাব দল আর এক দল না-মানাব দল। এদের সব ভাবী সুন্দর নাম আছে। প্রথম দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত 'লোকবেদপাথ্য' অর্থাৎ যারা লোকাচার ও বেদাচার মেনে চলতেন, মুসলমানেরা এদের বলেন বাশবা আব বাউলবা বলেন দৌলভূবী। দ্বিতীয় দলকে মধ্যযুগে বলা হ'ত "অনোভো-সাত-পাথ্য" অর্থাৎ ষাঁরা অনুভব-প্রত্যক্ষ সত্য মেনে চলতেন; মুসলমানেরা এদের বলেন বেশবা আব বাউলবা বলেন বে-ভূবী অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত। দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবদের মধ্যেও এই দুই দলই ছিল। প্রথম দলের ভক্তদের বলা হ'ত আচার্য্য আর দ্বিতীয় দলের ভক্তরা আলোয়াব নামে পরিচিত ছিলেন। আলোয়াবরা প্রেম ও ভক্তির সহজ পথের সাধক। তাঁদের উপাত্ত দেবতা বিষ্ণু নারায়ণ। আলোয়াবরা ছিলেন সত্য সত্যই 'বে-ভূবী'। তাঁরা সব দিক দিয়েই বন্ধনমুক্ত। শাস্ত্রের বন্ধন, জাতিভেদের বন্ধন, সংস্কৃত ভাষার বন্ধন সব তাঁরা ঘাটিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সমাজের অতি নিয়ন্ত্রণের মানুষ। কিন্তু তাঁদের প্রেমভক্তি, তাঁদের সাধনা, তাঁদের জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবার প্রণয়্য করে তুলে।

আলোয়াবরা আপনাদের ইষ্টদেবতার প্রতি প্রেমভক্তি থেকে প্রকাশ করেছেন দক্ষিণের জনসাধারণের ভাষা তামিলে। তাঁদের বচনাব নাম প্রবন্ধ। সব রচনাই সঙ্গীত। এই সব সঙ্গীতে প্রেমভক্তি ও আধ্যাত্মতত্ত্বের এমন অপূর্ণ প্রকাশ হয়েছে যে, দক্ষিণে আলোয়াবদের প্রবন্ধগুলিকে বৈষ্ণব-বেদ বলা হয়।

আলোয়াবদের প্রভাবে দক্ষিণে বৈষ্ণবপন্থ খুব প্রবল হয়ে উঠে। এবং সেখান থেকে আবার উত্তর-ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণাচাে বামভুক্ত ( একাদশ ), মাদ বা আনন্দ-তীর্থ ( দ্বাদশ ), নিধার্ক ( দ্বাদশ ), এই কয় জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। এঁরা এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের প্রবর্তন করেন। এঁদের উপর আলোয়াবদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এঁরাও প্রধানতঃ প্রেম-ভক্তিই প্রচার করেছেন। তবে এঁরা শাস্ত্রকে অস্বীকার করেননি। স্ব স্ব মতবাদকে শাস্ত্রায়ুক্ত দার্শনিক ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন এবং ভক্তধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানমার্গী শঙ্করের মাদ্যবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। 'দৌলভূবী' আর 'বে-ভূবী' এই দুই মতের একটা সময়ের চেষ্টা এঁদের মধ্যে দেখা যায়। বস্তুত, এই সময়কার দক্ষিণী বৈষ্ণবমতের ছ'টি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় (১) প্রেমভক্তির 'প্রবল ভাব। (২)—মাদ্যবাদের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্বন্ধে আশঙ্কা।

কবীর প্রভৃতি পরবর্তী ভক্তদের মতবাদেও এই প্রেমভক্তি ও মাদ্যর কথা বার বার এসেছে। ধর্মের গোঁড়ামি ও জাতিভেদের কঠোরতা উত্তর-ভারতের চেয়ে দক্ষিণ-ভারতে বেশী, এ কথা মনে

করবার হেতু আছে। দক্ষিণের পারিয়ার প্রতিকল্প উত্তরে নাই। আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেনের মতে কঠোর জাতিভেদের উদ্ভব আধেয়তব সমাজে। হয়ত সেই জগতই দক্ষিণে জাতিভেদের এত কঠোরতা। আর আধ্যাত্মের ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্ভবতঃ বেদবাহ্য ধর্মের প্রতিকূলতাব মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই বিশেষ করে বন্ধনশীল হয়ে পড়েছিল। সে বাই হোক, এই গোঁড়ামি ও কঠোরতার জগত 'বে-ভূবী' আলোয়াবদের 'জাতগাত-বিরোধী' প্রেমভক্তির প্রবল প্রভাব সাহেব ভক্তধর্ম একেবারে গোঁড়ামি ছাড়তে পারল না। আলোয়াব শঠকোপ ও বিক্ষুব্ধ ছিলেন অতি নীচবশীল। বৈষ্ণবাচার্য্যদের অগণ্য আচার্য্য রামানুজ এঁদের উপদেশে পেয়েছেন প্রেম ও ভক্তি। কিন্তু তবু শাস্ত্রের বন্ধন তিনি একেবারে এড়াতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে তাঁকে আপোষ করে চলতে হ'ল। বৈষ্ণবধর্ম সূত্র থেকেই ছিল হিন্দুসমাজে যাবা অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত তাদের প্রতি সদয়। আচার্য্য রামানুজ একটা খুব বড় কাজ করলেন। তিনি এই দয়াকে কাজে রূপ দিলেন। অত্যাচারের মধ্যে বিক্ষুব্ধ প্রচার করে তিনি তাদের বৈষ্ণব করে তুললেন, খোঁচলেন তাদের নীচতা। দেশীয় ভাষায় বচিত শঠকোপের ভক্তিগ্রন্থ তিরু বায়্যোমোলি (Tiru Vayamoli) প্রভৃতি আলোয়াবদের গ্রন্থকে তিনি বৈষ্ণব-বেদ বলে গ্রহণ করলেন। ভক্তি দিল সবাইকে মুক্তির অধিকার। কিন্তু ব্রাহ্মণ-ধর্মের উচ্চবর্ণের সঙ্গে নীচ জাতীয়দের সমান অধিকার দেননি। আমরা আগেই বলেছি, আচার্য্য রামানুজকেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের সঙ্গে আপোষ করে চলতে হয়েছিল বা তিনি যেচ্ছাই চলছিলেন। তিনিও ব্রাহ্মণদের জগত বিধিবিহিত পথ এবং অজ্ঞদের জগত অজ্ঞ পথের নির্দেশ দেন। নীচ জাতের বৈষ্ণবদের জগত তিনি আলাদা পণ্ডিতভাজনের ব্যবস্থা করেন।

আচার্য্য রামানুজের পব তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ছ'টি দল দাঁড়িয়ে গেল। এক দলের নাম বড়কলই, অজ্ঞ দলের নাম তেনকলই। আচার্য্য রামানুজের ব্যক্তিত্ব 'দৌলভূবী ও 'বে-ভূবী'দের একত্র করেছিল। কিন্তু তাঁর তিবোভাবের পব এঁরা আর একত্র থাকতে পারলেন না, কারণ, এঁদের পথ এক নয়। বড়কলইদের মোটামুটি 'দৌলভূবী' বলা যায় আর তেনকলইদের বলা যায় 'বে-ভূবী'। বড়কলইরা উচ্চ জাতের সঙ্গে নীচ জাতের সমান অধিকার স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মণেরদের এঁরা 'ও' উচ্চারণ করতে দেন না। এঁরা তাদের শাস্ত্রপাঠের অধিকার দেন না; শুধু মৌখিক উপদেশ দেবার কথা বলেন। এঁরা বৈষ্ণব হ'লেও ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র-শাসিত বৈষ্ণব। এঁরা গোঁড়া। তেনকলইদের এ সব গোঁড়ামি নেই। তাঁদের মতে সকল বৈষ্ণবের সমান অধিকার। তাঁরা ব্রাহ্মণ অগ্রাঙ্গণ বাচনিচার না করে সবাইকে 'ও' সহ মন্ত্র দেন।

তেনকলই ও বড়কলইদের মধ্যে আর একটি বিশেষ মতভেদ আছে। তেনকলইদের মতে মুক্তির পথ উপায় ভগবানের দয়া, প্রপত্তি বা শরণাগতি। অজ্ঞ উপায় গৌণ। সকলের আগে প্রপত্তি, তার পর অজ্ঞ বা কিছু। জীবের প্রয়াসকে তাঁরা কোনো মূল্য দেন না। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন বিভালছানা ও তার মায়ের। বিভালছানার কোনো প্রয়াস নাই; মা-ই তাকে মুখে করে

# ত্রৈলোক্য বসুমতী..

কণাক্ষরী বসুমতী-বসুমতী বসুমতী বসুমতী... নতুন এসে কবে  
পুরাতনই হ'ল অধিকাংশ। কিন্তু নারী-চিরন্তন। নারী—  
যে শব্দ কেশবদেবের নিবাস-দেবায় নিজেই মধ্যে মধ্যে  
রয়েছে চিরদিন... কেশব যে তার অন্ধকরণ। সে-রূপ  
সদনয় এ-বুকের মকড়-খিত আঙ্গিক জবাকুসুম।



সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা।  
GRJ-BI/CPS

এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। তেমনি জীবেরও কোনো প্রয়াস নাই। ভগবানই দয়া করে তাব মুক্তির উপায় করে দেন। বড়কলটাই কিন্তু ভগবানের দয়াব সঙ্গে জীবের প্রয়াসকেও একটা বিশেষ স্থান দেন। তাঁদের মতে প্রাপ্তি মুক্তিরূপে অতীতম উপায় বটে তবে একমাত্র উপায় নয়। অতী উপায়ে না হ'লে তখন এই উপায় অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেন, বানবছানা ও তাব মায়েব। বানবছানার যেমন প্রয়াস করতে হয়, তাকে শাক করে আঁকড়ে ধরতে হয়, তেমনি জীবকেও প্রয়াস করতে হয়। এই বামায়ুজ-সম্প্রদায় দক্ষিণাপথ থেকে ক্রমে উত্তর-ভাবতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু ভাবতের ধর্ম ও সংস্কৃতির অতীতম প্রদান কেন্দ্র কালীতে তাঁদের একটি বড় স্থান ছিল। এখানে এক জন শক্তিশালী মহাপুরুষ এই সম্প্রদায়ে যোগ দেন। তিনি গুরু বামানন্দ। বামানন্দ বামায়ুজ সম্প্রদায়ের গুরু বামবানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গুরু বামানন্দের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। মেকলিফ নাচেবের মতে গুরু বামানন্দ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মিত ছিলেন। কিন্তু অনেকেই এ মত স্বীকার করেন না। ডাঃ ভাভাবকাবের মতে গুরু বামানন্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন প্রয়াগের এক কানৌজীয়া ব্রাহ্মণ-পরিবারে। আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন এ সম্পর্কে বামায়ুজ দাস হরিবর কৃত ভক্তিমাল-চরিত্র-প্রকাশিকার মত উদ্ধৃত করেছেন। 'তাতে আছে, 'বামানন্দ—বামায়ুজ থেকে পঞ্চম শিষ্য।' আচার্য্য সেন অনুমান করেন, ১৪০০ খৃঃ থেকে ১৪৭০ খৃঃ পর্যন্ত গুরু বামানন্দের সময়। সে যা হোক, বামানন্দ বামায়ুজ সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন সত্তা, কিন্তু সম্প্রদায়ের অনেক সব গোড়ামি তাঁব বদান্ত হ'ল না। অনুমান হয় তাঁব গুরু ছিলেন বড়কলট দলভুক্ত। এঁরা গোড়া। বামানন্দ সম্প্রদায়ের অনেক বিবিন্যেদ উপেক্ষা করতে লাগলেন। ফলে গুরুব সঙ্গে তাঁব মতান্তর হ'ল এবং অচিরে গুরু-শিষ্যের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। বামানন্দ নিজেই সম্প্রদায় স্থাপন করলেন। গুরু বামানন্দ তেনকনটীর মত বৈষ্ণবধর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ অগ্রাঙ্গ ভেদ দৃঢ়ালেন। তিনি বললেন, দীক্ষা নিয়ে যাবা বৈষ্ণব হবে তাবা সবাই সমান, 'শ্রীদেব মধ্যে ব্রাহ্মণ-অগ্রাঙ্গ উচ্চ-নীচ কোনো ভেদ থাকবে না। কোনো বকম বাচাবচার না হবে' সব বৈষ্ণব একত্র পণ্ডিত-ভোজনা করতে পারবে। কারণ, তিনি মনে করতেন, ভক্তেরা যখন ভগবানের আশ্রয় নেন তখন তাঁদের পূর্বপরিচয় সব তাঁব মধ্যে লীন হয়ে যায়। তখন তাঁদের একমাত্র পরিচয় তাঁবা ভক্ত, তাঁবা বৈষ্ণব। গুরু বামানন্দ ছিলেন অত্যন্ত উদারমনস্ক মানুষ। তাঁব মধ্যে কোনো বকম সঙ্কীর্ণতা ছিল না জাতিধর্মনির্দেশে সবাইকে তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁব প্রধান শিষ্যদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন নিম্নশ্রেণীর মানুষ; কবীর জোলা, ববিদাস মুচি, ধনা জাঠ, সেনা নাপিত।

মতবাদেব নিক দিয়েও তাঁব এই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বিশিষ্টাধৈতবাদ প্রচাৰ করেছেন কিন্তু তাঁব সম্প্রদায়ের মধ্যে অধৈত-বৈদ্যেব পূর্ণ সমানব রয়েছে। গুরু বামানন্দ উদার ছিলেন কিন্তু বিপ্লবী ছিলেন না। নিজের শিষ্যদের

মধ্যে কোনো জাতিভেদ তিনি স্বীকার করেননি কিন্তু তিনি বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা মানতেন।

মূর্ত্তিপূজার প্রতিও তাঁব কোনো আস্থা ছিল না মনে হয়। আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন গ্রন্থ-সাহেবে উদ্ধৃত গুরু বামানন্দের একটি বাণীব কথা উল্লেখ করেছেন তাঁব "ভাবতীয় মধ্যযুগেব সাধনার দারায়"। তাতে বামানন্দ বলেছেন—"কেন আর ভাই মন্দিরে যাউতে আমায় ডাক, তিনি বিশ্বব্যাপী, আমাব হৃদয়-মন্দিরেই তাঁব দেখা পাইয়াছি।" তবে তিনি মূর্ত্তিপূজাব বিবোধীও ছিলেন না।

গুরু বামানন্দ জীবের একে ভেদ এবং ব্রাহ্মণ সংগত স্বীকার করতেন কিন্তু তাঁব শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এ সব ঘানতেন না। গুরুব উদার শিক্ষাব এটি আব একটি নিদর্শন। গুরু বামানন্দের শিক্ষা, তাঁব সাধনাব প্রদান কথা হ'ল ভক্তিত, মুক্তিরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। 'অনন্তভাবে ভগবানের শরণাগতি, অর্থেভুক্ত প্রেম, বিনা মর্মে আত্মসমর্পণ এই ভক্তির লক্ষণ। সাধনায় যেহে এই যে নৃত্যকে দুখা করে তোলা এইটিই বামানন্দের প্রধান দান। এই জুই বোধ হয় বলা হয়—

"ভক্তী দাবিড উপজা লায় বামানন্দ,

প্রগটি ক্রিয়া করীবেন সন্তুদীপ নবপণ্ড।"

দাবিডে উৎপত্তি হ'ল 'ভক্তি'ব, 'তাকে নিয়ে এলেন বামানন্দ আব কবীর তাকে সন্তুদীপ নবপণ্ড পৃথিবীতে প্রচার করলেন। এব মানে হ'ল, ভক্তিকেই মুক্তিব উপায় বলে প্রথমে দাখিবাত্যে প্রচাৰ করা হয়। বামানন্দ সেই মতটিকে প্রথমে উত্তর-ভারতে প্রচাৰ করলেন আব তাঁব শিষ্য করীব তাকে সবত্র ছড়িয়ে দিলেন। গুরু বামানন্দ আব একটি বড় কাজ করেন। আলোয়াবদের মত তিনিও জনসাধারণের ভাষায় তাঁব ভক্তিমর্ম প্রচার করেন। আচার্য্য বামায়ুজের উপাঙ্গ নাবায়ণ, বিষ্ণু ও শ্রী। তবে পববর্তী কালে বামায়ুজ সম্প্রদায়ে বামও উপাঙ্গ হন। গুরু বামানন্দের উপাঙ্গ বাম। বাম যে নাবায়ণ, তিনি বিষ্ণুব অবতার, এ বিশ্বাস পৃষ্ঠাঙ্কের প্রথম কয়েক শতকেই প্রচাৰ লাভ করেছিল। তবে বামের উপাসনা একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়।

আমাবা দেখেছি, গুরু বামানন্দের উপাঙ্গ ছিলেন বাম। তিনি দীক্ষা দিতেন রামমন্ত্রে। যে-ভক্তি গুরু বামানন্দের প্রধান দান তা এই রামেব প্রতি ভক্তি। গুরু বামানন্দের আগেও বামকে উত্তর-ভারতে বিষ্ণুব অবতার বলে মানা হ'ত। কিন্তু তাকে পবায়ণের পবব্রজ বলে গণ্য করা হ'ত না। বাম যে ত্রিধাতীত পরব্রজ এ কথা গুরু বামানন্দই প্রচাৰ করলেন উত্তর-ভারতে। তিনিই এই বামভক্তিকে নিয়ে এলেন দক্ষিণ থেকে। আচার্য্য ক্ষিত্তিমোহন সেন বলেন, "বামানন্দ যদিও প্রচলিত বাম নাম ব্যবহার করিয়াছেন তবু তাঁর ঈশ্বর এক, প্রেমময়, নিরঞ্জন। তিনি নিগুণ ব্রহ্ম নহেন; তিনি মনের মানুষ প্রেমের বন্ধু।" গুরু বামানন্দের প্রধান শিষ্যদের অগ্রতম কবীরদাস। তিনি গুরুব কাজ থেকে পেলেন এই রামমন্ত্রে দীক্ষা। কবীরদাসেব জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে যেমন নানা গল্প প্রচলিত হয়েছে তেমনি তাঁব দীক্ষা সংক্ষেপে একটি গল্প আছে।

কবীরদাস ছেলেবেলা থেকেই কেমন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। সংসারের কাজ-কর্ম তাঁব মন বসে না। কালীতে নানা সম্প্রদায়ের

বহু সাধুর বাস। কবীরদাস এই সব সাধু-সন্তদের সঙ্গ করে বেড়ান। হিন্দু সাধুদের সঙ্গ করার ফলে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর মন বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষা নেবেন বলে সম্বন্ধ করেন। কিন্তু কে দেবে তাকে দীক্ষা? মুসলমান জোতার ছেলেকে কোন হিন্দুগুরু দীক্ষা দেবেন? কবীরদাস ভেবে আকুল হলেন। গুরু রামানন্দের তখন খুব নাম। তাঁর উদারতার কথা সবার মুখে-মুখে। কবীরদাস স্থির করলেন গুরু রামানন্দের কাছে থেকেই দীক্ষা নেবেন। কিন্তু সরাসরি গুরুর কাছে যেতে ভয়সা পেলেন না। যতই উদার হোন না কেন গুরুজী, মুসলমানের ছেলেকে তিনি দীক্ষা দেবেন এ কথা ভাবতেও সাহস করলেন না কবীরদাস। অথচ, দীক্ষা নেবাব ভগ্না তাঁর প্রাণ ছটফট করছে, দীক্ষা তাঁকে নিতেই হবে, যেমন কবেই হোক না কেন। নৈলে তিনি বাচবেন না। কিন্তু উপায় কি? অনেক ভেবে-চিন্তে কবীরদাস এক উপায় স্থির করলেন। কৌশলে নিতে হবে দীক্ষা।

রাতের শেষে যখন ভোরের আলো শিউরে ওঠে পূর্ব আকাশে তখন গুরু রামানন্দ বান গঙ্গান্নানে। কবীরদাস গিয়ে তাঁর স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে রইলেন অন্ধকারে। গুরু রামানন্দ প্রতি-দিনকার মত নিশ্চিন্ত মনে জলে নামছিলেন, হঠাৎ অন্ধকারে কিসের উপর পা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল অভ্যস্ত ইষ্ট নাম—রাম রাম রাম, এ কার পায়ে পা দিলাম গো, আতা বেচারী!

হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালেন কবীরদাস। তাঁর মনস্বামনা পূর্ণ হ'ল; তিনি পেলেন দীক্ষা। গুরুজীর পায়ে কাছ মাখা রেখে বললেন—প্রভু, আমি আপনাব অধম সেবক, আপনি আমাব গুরু। আজ আমাকে আপনি রূপা কবে দীক্ষা দিলেন।

বিস্মিত হ'লেন গুরু। বললেন, সে কি, বাপু! কবীরদাস বললেন, গুরুজী, আমার অনেক দিনের সাধ আপনার কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মুসলমানের ছেলে আমি। আমাকে আপনি দীক্ষা দেবেন এতটা আশা করতে সাহস হ'ল না। তাই আপনার স্নানের ঘাটে সিঁড়ির উপর পড়ে ছিলাম। মনে আশা ছিল অন্ধকারে আমার গায়ে পা ঠেকলেই আপনার মুখ দিয়ে ইষ্টনাম বেবিবে আসবে আর তা হ'লেই আমাব আশা পূর্ণ হবে। আপনার পদস্পর্শে আজ আমি ধন্য হয়েছি। পেয়েছি দীক্ষা। সব শুনে পবম ধ্রীত হলেন গুরু। কবীরদাসকে শিষ্য বলে অঙ্গীকার কবলেন। পণ্ডিতেরা অনেকেই কিন্তু এই গল্প বিশ্বাস করেন না। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন “এ সব বাজে কথা। কারণ, রামানন্দ আচার মারিয়া চলেন নাট বলিয়া তাঁর নূতন পাত্তর আবস্ত। তাঁর বহু শিষ্যই সমাজবিধি অনুসারে বজ্ঞনীয়।” গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষার গুণে তার শিষ্যদের অনেকের মধ্যেই ধর্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ উদারতা দেখা যায়। অল্প ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। সম্প্রদায়ের এমন কি অল্প ধর্মের সাধু-সন্তদের সুলে ও তাঁরা অবাধে মেলামেশা করতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন, আবশ্যিক মত উপদেশ গ্রহণ করতেন তাঁদের কাছ থেকে। এ বিষয়ে গুরু রামানন্দ স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর শিষ্যদের বিশেষ সহায়তা করেছেন। তিনি ছিলেন উৎকৃষ্ট পরিব্রাজক। তাঁর প্রধান বার জন শিষ্যকে নিয়ে তিনি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতেন, সাধুসঙ্গ

করতেন, মায়াবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ করতেন এবং জাতিবর্ণ-নির্বিষয়ে সবাইকে মন্ত্র দিতেন। কবীরদাস যে জোলাদের মতো জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন ধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ কোনো গোঁড়ামি ছিল না। তা ছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই নানা সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদের সঙ্গ করাব ফলে কবীরদাসের মন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছিল। এর উপর, তিনি পেলেন গুরু রামানন্দের উদার শিক্ষা ও মহৎ সান্নিধ্য। ফলে, সকল রকমের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক-তাব গণ্ডী তিনি অতিক্রম করে গেলেন।

এই জন্ম, এক দিকে যেমন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে অনাচারী ধর্মতীন পাশও বলে গালাগাল দিত, তেমনি অন্য দিকে আবার উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁকে আপন বলে দাবি করত। কবীরদাসের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিয়ে হিন্দুরা যেমন নানা কাহিনী বচনা করেছে তেমনি করেছে মুসলমানেরা। কবীরদাসের গুরু সম্বন্ধেও হিন্দু মুসলমানের মত ভিন্ন। হিন্দুরা বলেন, কবীরদাস গুরু রামানন্দের শিষ্য আর মুসলমানেরা দাবি করেন সেক তত্ত্বি সাত্তব ছিলেন তার গীর্। কোনো কোনো পণ্ডিত উভয় মতের সমঞ্জস্য করেন এই ভাবে। তাঁরা বলেন, সম্ভবত মৌর্যের কবীরদাসের উপর প্রভাব পড়েছিল গুরু রামানন্দের তার পবে তিনি সেখ তত্ত্বি সাত্তবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতই গুরু রামানন্দকেই কবীরদাসের গুরু বলে স্বীকার করেন। আর স্বয়ং কবীরদাসের পদেই এ কথাব স্পষ্ট স্বীকৃতি রয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অসার বাহাচাব সর্বস্বতা, জ্ঞানমার্গীদের শুদ্ধ তর্কজাল, যোগপন্থীদের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতা ধর্মের নানা পরস্পর-বিরোধী মতবাদ যখন কবীরদাসের সহজেই ভগবদ্বিশ্বাসী চিন্তকে দুঃখে দ্বন্দ্ব অভিভূত কবে দিচ্ছিল, যখন পথ না পেয়ে তাঁর ভগবদ্ব্যুপাী হৃদয় যাতনায় ছটফট কবছিল তখনই এলেন গুরু রামানন্দ। কবীর বলছে: “রামানন্দকে যেই গুরু পেলাম অমনি সদ্‌গুরুব প্রত্যাপে সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব মিটে গেল, মিটে গেল সব দ্বিধা।”

তবে গুরু রামানন্দের মত উদার গুরুর শিষ্য এবং স্বয়ং স্বভাব উদার কবীরদাসের পক্ষে সেখ তত্ত্বি সাত্তবের কাছ থেকেও উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সম্ভবপব। বস্তুতঃ, কবীরদাস যে রকম উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তাতে তিনি যে বহু সাধুসন্তের কাছ থেকে উপদেশ পেয়েছিলেন তা অনুমান করতে পারা যায়। এটি নিন্দার কথা নয়, গৌরবেরই কথা। মহৎ যারা তাঁরা যার কাছ থেকে সামান্য কিছুও শিক্ষা করেন তাঁকেই গুরু বলে স্বীকার করেন। ভাগবতের একটি উপাখ্যানে আছে গুরু অসংখ্য। এমন কি বেণী, ইষুকার, মৌমাছি এদেরও গুরু বলে ধরা হয়েছে। কবীরদাসের জীবনেও আমরা এমনি মহত্বের পবিচয় পাই। কথায় আছে, ‘গুরু মিলে লাখ লাখ শিষ্য না মিলে এক।’ কবীরদাস ছিলেন এমনি হৃদভ শিষ্য। অবশি, গুরু রামানন্দও ছিলেন হৃদভ গুরু। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেন, “তিনি রামানন্দের কাছে সব চেতনা লাভ করিলেন; তাঁর কাছে ধর্ম সাধনা গ্রহণ করিলেন; জাতিভেদ, পৌত্তলিকা, তীর্থব্রত, মালা, তিলক প্রভৃতি কিছুই ধার দাবিলেন না। সকল কুসংস্কারের মূলে তিনি প্রচণ্ড আঘাত করিলেন।”

# বিল্বী বাংলা

শ্রীতাবিশিষ্ট চক্রবর্তী

৬

সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৮৫৪-৫৫ সালে কোম্পানীর আমলাতন্ত্র ও অত্যাচার ও কু-শাসনের ফলে বাংলার নিরীহ সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

ওয়ারবাদের পরাক্রম হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিন্ত হয় নাই। ইহারা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। সিপাহী যুদ্ধের সময় পূর্ব-পাঞ্জাবের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত ওয়ারবী সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট দল ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই বৎসর পরেই বিপ্লবের পুণ্যভূমি বাংলা দেশেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের শয্যা বাজিয়া ওঠে।

১৮৫৪ সালের প্রথম ভাগ হইতেই সাঁওতালগণের মধ্যে অসন্তোষ ও অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। ঐ বৎসর ভাল ফসল হইলেও দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। বীরভূমের বিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় এক উজ্জল চিত্র আঁকিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেন। নতুন বেল নিষ্কাশনের কাজে অনেক স্থানীয় সাঁওতালগণ নিযুক্ত হইয়া বেশ স্ত্রেই আছে বলিয়া তিনি পত্র লেখেন। কিন্তু বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ঐ ভাবে চাপিয়া বাধা সম্ভব হইল না। বাগনাদিহীৰ সিধু ও কাম্বু ভাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল দল কোম্পানীর কথ্যচারীদের কু-শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম আবেদন-নিবেদন করে। কিন্তু ইহাদের কোন আবেদন শোনার মত সময় উক্ত বিটিশ বণিকদের ছিল না। খাজনা আদায় করা ছাড়া আর তাহাদের অন্য কাজ ছিল না। পরে সাঁওতালগণ ইংরাজ জেলা-কমিশনারের নিকট তাহাদের অভিযোগ দূর করার জন্য বলে, অস্ত্রাখ্য নিজেরাই তাহারা অস্ত্রাখ্যের প্রতিকার করিবে। কিন্তু কমিশনার সাহেব অভিযোগের কোন কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি দেখিলেন যে, নিবন্ধ সাঁওতালদের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবেই খাজনা আদায় হইতেছে।

সাঁওতালদের প্রথমে কোন প্রকার সশস্ত্র সংঘর্ষের পবিত্রনা ছিল না। কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে আবেদন কবিতা ব্যর্থ হইয়াছিল সেই আবেদন কলিকাতায় গিয়া গভর্নর জেনারেলের নিকট পেশ করা হই উদ্দেশ্য ছিল।

অবশেষে সাঁওতালদের জাতীয় প্রতীক শাল গাছের ডাল হাতে লইয়া চর সমূহ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ভাবী বিদ্রোহের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। প্রায় ত্রিশ সহস্র সাঁওতাল তীব্র-ধনুক ও বর্শায় সজ্জিত হইয়া ১৮৫৫ সালের ৩শে জুন কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। কলিকাতা যাত্রার পূর্বে সাঁওতালদের নেতাগণ ভাগলপুর ও বীরভূমের কমিশনারগণকে চরম পত্র প্রেরণ করে। ইহা ছাড়া কলিকাতা যাটবার পথে যে সকল থানা পড়ে সেই থানা সমূহে ইনস্পেক্টরদের ও ভারী কর্তৃপক্ষের বিষয় জ্ঞাপন করে।

সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের অভিযোগ পূরণের ব্যবস্থায় নিবাশ হইয়া সাঁওতালগণের কলিকাতা অভিমুখে অভিযান আবশ্যক হয়। সাঁওতালগণ তাহাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের লইয়া বিরাট এক শোভাযাত্রা সহকায়ে চলিয়াছে। তাহাদের দলের সম্মুখে মাদল ও ঢাকী দল সাঁওতালদের আগমন-বার্তা ঘোষণা করিতে কবিত্তে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বাধা প্রাপ্ত হইয়া সাঁওতালদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সমগ কপ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

৭ই জুলাই ১৮৫৫ সাল। সাঁওতালদের বস্ত্রক্ষয়ী সংগ্রামের প্রথম দিবস। যত দিন গ্রাম হইতে আনীত খাজ তাহাদের সঙ্গে ছিল তত দিন সাঁওতালগণ কোন প্রকার লুণ্ঠনের প্রয়োজন বোধ করে নাই। কিন্তু তাহাদের বসদ নিঃশেষিত হওয়ায় পূর্ব তাহারা গ্রামের লোকের নিকট হইতে সাহায্য ও থাবা লুণ্ঠন দাবী তাহাদের প্রয়োজন মিটাইত।

বিদ্রোহী নেতার আদেশে সাঁওতাল সৈনিকদের খবচের জ্ঞান প্রত্যেকটি পরিবারের উপর প্রায় সাড়ে ৭ টাকা মতন খাজনা ধাওয়া করে। ঐ সময় কোম্পানীর এক জন বেতনভোগী ইনস্পেক্টর সাঁওতালদের অগ্রগতিতে বাধা দিবার চেষ্টা করে। বিদ্রোহী সাঁওতাল দাতৃত্বকে চুবিব অপরাধে হেস্তাব কবিতা বাদিয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই সাঁওতাল দল সিপ্ত হইয়া ওঠে এবং ইনস্পেক্টরকে তাহাব দলবল সহ বাদিয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার হওয়ায় পূর্ব সিধু নিজে ইনস্পেক্টরকে হত্যা করে। ইহা ছাড়া আবও নয় জন পুলিশ নিহত হয়। ঐ ইনস্পেক্টর ও পুলিশ-হত্যার ফলে সাঁওতালদের স্ত্রণ বরভাব জাগ্রত হইয়া ওঠে।

ঐ ঘটনার পূর্ব এক পক্ষ কাল যাবৎ বিদ্রোহী সাঁওতাল দল গ্রামে পূর্ব গ্রাম নির্দিষ্টারে লুণ্ঠন কবিতা আশ্রয় দিয়া ছাটাইয়া দেয়। হাজার হাজার গৃহপালিত পশু লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজ সৈন্য প্রতিরোধ করিতে গিয়া বয়েক স্থানে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীদের শস্ত্র দুই জন ইংরাজ মহিলা সহ বয়েক জন ইংরাজ নিহত হয়। ইংরাজদের কারখানা ও তাহাদের আবাসস্থল বিদ্রোহীদের অস্ত্রগ্রহের উপর নির্ভর কবিত্তে লাগিল। বারো শত কোম্পানী সৈন্যের একটি দল বিদ্রোহীদের আশী মাইলের নিকটে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

২৫শে জুলাই জেনারেল লয়েডের অধীনে এক দল সৈন্য বিদ্রোহীদের দমনের জন্য প্রেরিত হইল। ইহা ছাড়া স্থানীয় জমিদারগণ ও ইংরাজ ব্যবসায়ীগণও বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করে। মর্শিদাবাদের নবাব এক দল প্রশিক্ষিত হস্তী ও সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বাঙ্গিক ক্ষমতার অধিকারী এক জন ব্রিটিশ কমিশনার নিযুক্ত হইল।

সাঁওতালদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বলা অপেক্ষা ইংরাজ কর্তৃক নিরীহ সাঁওতালদের নির্যাতন হত্যা বলাই সঙ্গত। যখনই কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যাইত, তখনই ম্যাজিস্ট্রেট সদলবলে জঙ্গল ঘিরিয়া বিদ্রোহী সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেন, অস্ত্রাখ্য নির্দিষ্টারে হত্যা করা হইত। একবার ৪৫ জন সাঁওতাল একটি কুটীবে আশ্রয় নেয়। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের সকলকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। ইহার উত্তরে এক ঝাঁক তীব্র কোম্পানী সেনাদের উপর আসিয়া পড়িল। ঐ সময় সিপাহীগণ ঐ মাটির কুটীবে দেওয়ালে গর্ত করিয়া এক ঝাঁক

গুলী চালাইল। ইহার পুনরুন্নয়ন সাঁওতালদের আত্মসমর্পণের কথা বলায় কুটারের দরজা সামান্য খুলিয়া পুনরায় তাহারা এক ঝাঁক তীর নিক্ষেপ করিল। এই সময় যুদ্ধের ফলেও কয়েক জন কোম্পানী সিপাহী বিশেষ ভাবে আহত হয়, সমগ্র গ্রাম সেই সময় জ্বলিতেছিল, কতক্ষণ তীর ও গুলী বিনিময়ের পর সাঁওতালদের কুটার নিস্কৃত হয়। ইহার পর কোম্পানীর সৈন্যরা কুটারে প্রবেশ করিয়া শোণিতাপ্লুত এক বৃদ্ধকে মৃতের স্তূপের উপর কুঠার হস্তে ঝাঁড়াইয়া থাকিতে দেখে। এক জন বৃদ্ধের নিকট গিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করার জ্ঞাপন করিলে সেই বৃদ্ধ শাপিত কুঠাবের আঘাতে সৈনিকটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে।

Major Jervis বিদ্রোহীদের অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, “ইহা একেবারেই যুদ্ধ নয়। সাঁওতালরা আত্মসমর্পণ করা কাকে বলে তাহা জানে না। যতক্ষণ যুদ্ধের দামামা বাজিতে থাকিবে ততক্ষণ গুলী কবিতা হত্যা না করা পর্যন্ত তাহারা দাঁড়াইয়া থাকিবে। সাঁওতালদের তীব্র-বুদ্ধি হইয়া আমাদের সৈনিক নিহত হইত বলিয়াই আমরা গুলী চালাইতে বাধ্য হইতাম। রণ-দামামা স্তব্ধ হইলে তাহারা কিছু দূর পিছু হটিয়া যাইত। কোম্পানীর সৈনিকগণ এই ভাবে সাঁওতালদের হত্যা করিতে বিশেষ কুঠা বোধ করিত।”

আগষ্ট মাসে মাঝামাঝি সাঁওতালদের কণ্ঠতংপরতা স্তিমিত হইয়া আসিল। কোম্পানীর পক্ষ হইতে বিদ্রোহের নেতা ব্যতীত আর প্রত্যেককে মাজ্জিনাব বোষণা করা হয়। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানাইলেন যে, গত সাত সপ্তাহ ধরিয়া সমস্ত শান্ত আছে। সাঁওতালদের কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ স্বরকালেব জ্ঞান বর্তমান ছিল।

ইহা এক মাস পরে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের আর একটি সংবাদ প্রকাশ যে, “বিদ্রোহিণীরা আশীটি গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।” ডাক সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং সমগ্র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত। বিদ্রোহী দল দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল অপরবোধে নিকটবর্তী বঙ্গদলদের আর এক দল সিউড়ীর নিকটবর্তী তেলাবুর্নীর নিকট অপেক্ষা করিতেছে। “ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১২ হইতে ১৪ হাজার।”

মুচিয়া কোমনাজেলা, বামা ও সুনন্দা মাঝির নেতৃত্বে প্রায় তিন হাজার বিদ্রোহী ১৬ই ও ১৭ই সেপ্টেম্বর কয়েকটি থানা ও গ্রাম দখল করে। থানার দারোগা ও বকলুজেরা বৈগতিক দেখিয়া এক কাপড়ে পলায়ন করে। বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্বাভাসেই থানা আক্রমণের সংবাদ অবগত হইয়া প্রয়োজনীয় দলিল সমূহ দেওঘরে স্থানান্তরিত করেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সৈন্য-সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গভীর জঙ্গল ও দূরত্বের জ্ঞান কোম্পানী কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠাইতে অস্বীকার করেন।

Mr. Wardকে এই ঘটনাব বিষয় উল্লেখ করিলে তিনি বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, এক দল সৈন্যকে রাণীগঞ্জ হইতে জামতাড়া পাঠান হইতেছে, তাহারা বর্ষার শেষে অস্ত্র সৈন্য না আসা পর্যন্ত থানা সাতনা, অপরবোধ এবং আফজলপুরে অপেক্ষা করিবে। বর্ধমানের কমিশনারের নিকট সিউড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে আরও জানা যায় যে, বিদ্রোহী সাঁওতাল দল অস্ত্রান্ত্র দলের

সহিত যোগদান করার জ্ঞান বিভিন্ন স্থানে জমায়েৎ হইতেছে। সৈন্যদল আসিয়া পৌছান মাত্র আমি থানায় পুলিশ ফোর্স পাঠাইব এবং বাহাতে ডাক চলাচল করে তাহারা ব্যবস্থা করিব। বর্তমানে হলদিগড় পাহাড়ে রামা মাঝি তাহারা ২ শত লোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। ঐ অঞ্চলের পথচারীদের সর্বত্র লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে। বর্তমানে দেওঘরে অসামরিক কোন অফিসার না থাকা বিশেষ দুঃখের কারণ। ইহা পূর্বেই আপনাকে জানাইয়াছি।”

উক্ত পত্রে তিনি আরও বলেন যে, “সিদ্ধ মাঝির নেতৃত্বে পাঁচ হইতে সাত হাজার সাঁওতাল তেলাবুর্নীর অন্তর্গত স্থলিয়াটাকু অধিকার করিয়া পুকুর কাটিয়া মাটির বাঁধ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের আরও শক্তিশালী করিয়াছে। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে দুর্গা পূজার ব্যবস্থাও করিয়াছে; এবং এই জ্ঞান নানগুলিয়া থানা লুণ্ঠন করিয়া আসার পথে গ্রাম হইতে দুই জন ব্রাহ্মণকে ধরিয়া আনিয়াছে, গতকলা আমাদের যে গুপ্তচর আসিয়াছে তাহার মুখে অবগত হইলাম যে, বঙ্গদলদের দল আসিয়া পড়িলে তাহারা সিউড়ী অভিমুখে অভিযান করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।”

এই যুদ্ধের সময়েও সাঁওতালদের শালীনতার অভাব ছিল না। জয়ের অব্যবহিত পরেও তাহারা শত্রুকে সাবধান না করিয়া আক্রমণ করিত না। ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তাবিখে বীরভূমের স্থানীয় লোকদের মধ্যে সাঁওতালদের আক্রমণের সংবাদে অত্যন্ত ভীত হইতে দেখা যায়। “বিদ্রোহী দল এক জন ডাক-হরকরাকে পশ্চিমঘে আটক করিয়া ডাক লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং তাহাকে সাঁওতালদের জাতীয় শাল গাছের তিনটি পাতাযুক্ত একটি ডাল বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পৌছাইয়া দিতে বাধ্য করে। তিনটি পাতার অর্থ যে, তাহাদের দৈ স্থানে উপস্থিত হইতে আর তিন দিন বিলম্ব আছে।

অবশেষে পশ্চিম জেলা-সমূহ ৪ মাস সাঁওতালদের দখলে থাকার পর ১৩ই নভেম্বর উক্ত অঞ্চলে সামরিক আইন ঘোষণা করা হয়। ব্রিগেডিয়ার এল, এস, বার্ড বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে অবিনায়কের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৫৫-৫৬ সালের শীতকাল শেষ হইবার পূর্বেই সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সাঁওতালদের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। সাঁওতালগণ দলে দলে আত্মসমর্পণ করে। ইহার পর সাঁওতাল নেতৃবৃন্দদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের প্রহসন চলে। বীরভূম জেলে এক জন সাঁওতাল নেতা বকে যে, “তোমরা আমাদের যুদ্ধ কবিতা বাধ্য করিয়াছ। আমরা বাহ্য তাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা কোন উত্তর দিলে না। কিন্তু যখন আমরা প্রতিকারের জ্ঞান সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিলাম তখন জঙ্গলে নেকড়ে বাঘের স্থায় আমাদের নির্বিচাবে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ।”

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার পর পুরাতন অত্যাচারী পুলিশ-কর্মচারীদের বিদায় দেওয়া হয় এবং সাঁওতাল-প্রধান স্থানসমূহে ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এই বিদ্রোহের পর কোম্পানী কর্তৃপক্ষদের চৈতন্যোদয় হইল যে, এত দিন তাহারা কেবল মাত্র খাজনা আদায় করিয়াছে কিন্তু প্রতিদানে নিরীহ সাঁওতালদের কিছুই দেয় নাই। এই ছয় মাস বিদ্রোহের ফলে ইংরাজের যে ব্যয় হয় তাহা দশ বৎসর শাসন করার ব্যয় অপেক্ষাও অধিক।

[ ক্রমশঃ।



## রাধারাণী দেবী ও অপরাজিতা দেবী

জ্যোতি:প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই শিল্পই সার্থক যাহা শিল্পী হৃদয় দিয়া আঁকে, হাত দিয়া

নহে। সদয় দিয়াই তাহা বৃক্ষিত হয়। কবি ও শিল্পী  
অভেদ। ভালো লাগাই হ'ল আসল কথা, ভালো লাগাব অর্থ অণিকব  
জ্ঞান আত্মবিশ্বাস, ইহা হইতেই তৃপ্তি, সেই তৃপ্তিই শিল্প ও কবিতাব  
বিচারের মানদণ্ড। ইহা আবেগ বা উত্তেজনা নহে, অণিকব  
আত্মবিশ্বাস হইলেও, অণিকব চন্দ্রানন্দ নহে—ইহা একটি শাস্ত্র-  
মধুর অমুভূতি। রাধারাণী দেবীর কয়েকটি কবিতা “প্রকাশ  
অমুভূতি জাগায়। তাঁহার কাব্যগুণের সখ্যা চাবধানিব বেশী নয়,  
এতো অল্প লিখিয়া প্রচুর কবিতাখানি ও সাহিত্যিক সন্মান  
ইদানিং আর কোন মহিলার জন্যে ঘটয়াছে কি না সন্দেহ।  
ইহার মূলে রহিয়াছে বচনার বয়েকটি বৈশিষ্ট্য—জীবন-বহন সখ্যক  
নারীর মুখে স্পষ্ট উদ্ভি, তেজোময় গভীর সংঘত আবেগ, বলিষ্ঠ  
বুদ্ধি প্রকাশ যাহা ঈশ্বর ও সমাজের ডাক্তরে প্রচলিত কোমল বাস্তব  
আবেদনের স্কন্ধের স্তবের পবিপৃষ্ঠ, যাহা কাব্যের আঙ্গিকে উজ্জ্বল-  
মধুরে মিশাইয়া নিভীক আলোচনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন  
করে। কবিতায় তাঁহার মত বিচাৰ অপেক্ষা বসেব বিচাৰ বাঞ্ছনীয়,  
যেহেতু তিনি কবি, সঞ্চারক বা বক্তা নহেন।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিবে—কথাসিঁদুর, ছোট গল্প, কপকথায়,  
সমালোচনায় তাঁহার বুদ্ধি ও উজ্জ্বল, পথ্যবোধশক্তি ও সত্য-প্রীতি  
প্রকাশ পাঠিয়াছে। স্বর্গীয় শব্দচন্দ্রের অসমাপ্ত উপন্যাস “শেষের  
পরিচয়” রাধারাণী দেবী একে একে অধিক লিখিয়া, বচনার ধাৰা  
অব্যাহত রাখিয়া উপন্যাসটি সমাপ্ত করিয়া, কথাসিঁদুর নৈপুণ্যেব  
পরিচয় দিয়াছেন।

### প্রথম পর্য্যায়

কবি নবেন্দ্র দেবেব সহিত পবিত্রিত হইবার পূর্বে নানা  
সাময়িক পত্রে তাঁহার রচিত কবিতা ও গল্প ‘রাধারাণী দত্ত’ নামে  
প্রকাশিত হইত। ১৩৩৬ সালের ফাল্গুনে তাঁহার প্রথম প্রচারিত

কাক্যগ্রন্থ ‘লীলাকমল’ পূর্বরচিত অনেকগুলি কাবিতার সঞ্চয়ন।  
যে-সব মাসিক পত্রিকার স্নেহ-অঙ্কে লীলাকমলের দলগুলি প্রথম  
আঁখি মেলিয়াছিল, ভূমিকায় কবি মনোজ্ঞ ভাষায় তাহাদের  
ধন্যবাদ দিয়াছিলেন; কবিগুরুব আশীর্বাদি সঞ্চয়ে ‘লীলাকমল’  
পরিপূর্ণ লাভণ্যে প্রস্তুত। শব্দ-চয়নের সুখমা ও কৌশল, ললিত  
ভঙ্গীতে ছন্দেব লীলাবিলাস এবং অন্তরের অমুভূতিব প্রাঞ্জল প্রকাশ  
কাবিতা কবিতাকে মাধুর্য্যে ভবিয়া দিয়াছে।

‘লীলাকমল’কে কবি বলিতেছেন—“জলবালা” সূর্য্যস্বয়ম্বরা, উজ্জ্বল  
তাঁহার মৃণাল গ্রীবাটি প্রসারিত করিয়া তরুণ দিবালোকে উজ্জ্বল  
ধবলীকে দেখিতে চাহিতেছে, মানব-জীবনে এ যেন যৌবনের  
প্রথম উন্মেষ—

“জাগিলো যৌবনপদ্ম। টুটিল সহস্রদল কার।

ফুটিল গো ফুল।

আপন-অন্তর গন্ধে আপনা-বিশ্মৃত আত্মহার

—বিহবল আকুল।

যৌবন জাগিলো যদি অন্ধ অন্তরের গন্ধ গানে

উন্মীলিয়া আঁখিপদ্ম, বিষয়ে তাবালো বিখপানে—

কোথা সেই প্রেম সূর্য্য? তুখ্য বাব ধনিলো তাহার

বদেব স্পন্দনে—

তাঁহি তবে পূর্ণ পাত্র অমৃত-উজ্জল উপহার

দেহেব নন্দনে।”

ছন্দ ও বিষয়-বৈচিত্র্যে ‘লীলাকমল’ স্বত্বপাঠ্য, ‘বসন্তের প্রতি  
বনলক্ষ্মী’, ‘দ্রাব্য ব্যথা’, ‘আসন্ন-আঘাত’, ‘বর্ষা-বিদায়’ প্রভৃতি  
কয়েকটি কবিতা আবৃত্তিব উপযোগী।

এই সময় আসিল কবির প্রস্তুতি ও ছন্দনামের অন্তর্বালে  
পর্বোদ্য (experiment) যুগ। “অপবাজিতা দেবী” নাম  
লইয়া রাধারাণী দেবী বাংলাব কাব্য-সাহিত্যে মহিলাদিগের রচনায়  
সম্পূর্ণ নারীজনোচিত স্বকীয়তা ও নারীব অভিজ্ঞতা-সুলভ সামাজিক,  
অর্থনৈতিক, সাংসারিক এমন কি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বর্ণনায়  
বৈশিষ্ট্য আনিয়া তাহা বজায় রাখা যায় কি না—এই নূতন ধরণের  
পর্বোদ্য দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ আয়নিয়োগ করিলেন। এই ছন্দনামে  
রচিত প্রথম বসন্তের কবিতাগুলি ১৩৩৭ সালে ‘বৃকের বীণা’ বা  
‘অপবাজিতা দেবীর কবিতার খাতা’ নামে প্রকাশিত হয়।  
জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হইয়া কবি পর পর ‘আঙ্গিনার ফুল’,  
‘পূর্ববাসিনী’ ও ‘বিচিরকপিণী’ নামে আরও তিনখানি গ্রন্থ  
প্রকাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যচর্চায় প্রমথ চৌধুরী  
শ্রীমতী অপবাজিতা দেবীর রচনার অতি উজ্জ্বলিত প্রশংসা করিয়া-  
ছিলেন। “সহজ লেখা” যে সবাপেক্ষা কঠিন তাহা কবিগুরু বহু বার  
বলিয়াছেন। সবল অলঙ্কারেব শ্রেষ্ঠ সবলতা। সাধারণ (চলতি)  
ভাষায় বাঙালীর সাধারণ জীবনেব অতি সাধারণ ঘটনাগুলি সহজতম  
ছন্দে প্রকাশেব মৌলিকতার জ্ঞান এই দুই মনীষীর আশীর্বাদ লাভে  
কবি আত্মগোপনের অভিযান ও পর্বোদ্য সার্থক করিয়াছিলেন।

বহু পূর্বে (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমতী কামিনী সেনের ‘আলো  
ও ছায়া’, প্রকাশিত হয়, পুস্তকে বচয়িত্রী হিসাবে তাহার নাম  
ছিল না। পরে কবি ভ্রমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ লাভ করিয়া  
ও পুস্তকখানিব জনসমাজে সমাদর দেখিয়া কবি নিজ নাম প্রকাশ  
করেন। কবি রাধারাণীর আত্মগোপনে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

বিষয় নির্বাচনে, বিশ্লেষণে ও বচনাভঙ্গীতে ‘অপরাজিতা দেবী’ ও শ্রীযুক্তা বাধাবাণী দেবীর এতো পার্থক্য যে প্রথমটি ছদ্মনাম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কিন্তু নারীস্বদেশের কমরীয় স্পর্শ, নারী-মানসিকতার বিচিত্র গতি ও একটি সংলগ্ন স্বচ্ছন্দ অল্পভূতি এই দুই নামীয় বচনার গভীরে একই ধরণের আন্তরিকতা, তীব্রতা ও Matter of fatness মিশিয়া আছে। আনন্দ লইয়াই এই কবির খেলা, বৈবাগ্য, হতাশা, স্বদেশপ্রেম, দুঃখবাদ এমন কি করুণ রসও তাঁহার উপভব্য নহে। তথাপি অধিকাংশ কবিতাই রসোত্তীর্ণ—‘জন্মদিনে’ কবিতার আরম্ভে—

“নটকানা রং কাশ্মীরি সাড়ী ? না না, গুটা তুলে রাখো ;  
ও ভাই বৌদি ! এস না লক্ষ্মী একটু এখানে থাকো !  
কোন সাড়ী আব্রাউজের আমাকে সবচেঁমানাবে ভালো  
বলো না এদেব—দাঁড়া না মালতি ! বাদামি কিম্বা কালো  
চোবুল-তোলা ফিন্‌ফিনে ঐ জুজের স্মার্ট ? ছি ছি !  
তোমাবো কি ভাই মোটে কচি নেই ? আট শেখা মিছিমিছি !  
কি বললি বেলা ? ঝপোলী জবীর লাল বেনাবসী যেটা ?  
আবে বাম ! বাম ! হাসবে সবাই, ভাববে মেডুয়া এটা”

\* \* \* \* \*

“দিনেব সুক”তে—

“কাজের সময় বত ছুটু’মি, ঝকুমাঝি আসা তোমাব কাছে !  
গুজজন কেউ দেখে ফেলে পাছে ! ভয়ে ভয়ে আসি,  
কে কোথা আছে !  
দিলে খোঁপা খুলে—মিছিমিছি—ছি ছি—আঁচলে মাথালে  
‘লাভ মি’ ছাই !  
তোমাব জালায় আলুখালু বেশ ! কাঁ কোবে ঘবের  
বাইরে বাই !!

তোমার কি বলো ? দেখবে সকলে, ঠায় এক মনে পড়চে ছেলে !  
‘যত নটেব গোড়া বউচাই’, বোলবে এ ঘবে যে কেউ এলে !  
চায়ের পেয়লা দিতে এসে এত বিপদ ঘটাবে আমি কি জানি ?  
সকাল বেলাই দ্বোবে দিলে খিল—লজ্জা কি নেই একটুখানি ?”  
হায় ! এ পুণাতন বাস্তব সংসার-সম্মা শুধু কবির ছাঁতেই রহিয়া  
গেল ! সে আনন্দ, সে সংগম সে প্রীতি, সে অতিমধুর গুজজন-  
ভীতি আব কি ফিবিবে ?  
‘বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি’—

এ’ তো গেল ভাই কর্তব্য কথা,—গিল্লির হাল শোনো ;  
বাজাব আক্রা, তবিত-তবাবী মেলে নাকো ভালো কোনো ।  
ভিজ্জে ঘুঁটে দিয়ে উত্তন ধরানো ব’লে বোঝাবার নয় !  
তাও আজকাল কতো দাম জানো ?—পয়সায় খান-ছয় !  
বান্ধা চাপাতে দেবী হ’য়ে যায়, আপিসের ভাত ‘লেট’  
আধা-খাওয়া ক’বে নিত্য ছোটেন, নইলে চলে না পেট !  
ফাটা ছাদ দিয়ে জল ঝবে’ ঝবে’ বিছানা বান্ধ ভেজে ;  
রোদেব অভাবে স্যাংসে’তে সদা শোবাব ঘরের মেঝে ।  
নড়ে’ বসি হেন ঠাইটুকু নেই, একতলা ছোট বাড়ী ;  
ঘরের ভিতরই দেয়ালেব গায়ে মেলে দিই ধুতি শাড়ী ।  
খন্দর দিদি আজ’ হ’লে যে কেচে তোলা কী কঠিন,  
বর্ষায় শুধু শুকোতেই লাগে সমানে তিনটি দিন ।

‘খণ্ডিতা’কে দেখুন—

“বাড়ী ফিরে এলে কেন ? ‘হু’ডিও’তে থাকলেই পাব’তে ।...  
ভোর হয়ে গেছে আজ ‘সেটে’ব শেষেব কাজ সাং’তে ?—  
—থাক থাক ! জানা আছে । রাতভোর ছিল কাজ যোগানে,  
দিনের বেলাও কেন কাটাও না সর্বদা সেখানে ?—  
...না, না—সরো । সব বাও, ছাড় হাত, ছুঁয়োনা’ক’ আমাকে ।  
চা’—চাই ? পারবো নাকো—বলো ডেকে খানসামা রামাকে ।  
চূপ, কবো । সকালেই বাসিমুখে মিছে কথা কোয়ো না ।  
চরিত্র হারিয়েছ,—মিথোবাদীও মিছে হোয়ো না । ইত্যাদি ।  
মনে পড়িতেছে, ববীন্দ্রনাথ শরৎকুমারী চৌধুরাণীর “সুভবিবাহ”  
পড়িয়া বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—“মেয়েব কথা মেয়েতে যেমন  
করিয়া লিখিয়াছে এমন কোন পুরুষ গ্রন্থকাব লিখিতে পাবিত না ।”  
‘অভিসাবিকা’, ‘উৎকর্ষিতা’, ‘বিপ্রলঙ্কা’, ‘কলহাস্তরিতা’,  
‘স্বাধীনভর্ষুকা’, ‘সেবিকা’ প্রভৃতি এক একটি স্বয়ংপূর্ণ অনবদ্য কাব্য-  
চিত্র । ইহাকে Pen-picture বলিলে Gardinerএব Pillars  
of Society, Thackeray’s English Humoristsএর  
রচনাব ধারার সহিত তুলনীয় ।

“পুরবাসিনী” কবিতা পুস্তকে ‘ঠিকে কী’র বর্ণনা ও তাহার  
কার্যক্রম কলিকাতাবাসী বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি-পরিচিত  
ইহলেও রচনানৈপুণ্যে উপভোগ্য হইয়াছে । দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে  
বাঙালীর সংসাবে যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়, কবি সরল  
উদার্যে আন্তরিকতার সহিত তাহাব ছবি আঁকিয়াছেন । সরসতা  
শালীনতাব সীমা লঙ্ঘন কবে নাট, ভাষা ভাবেব সহিত অধিকাংশ  
স্থলে সামঞ্জস্য বক্ষা করিয়াছে ।

### দ্বিতীয় পর্য্যায়

১৩৩৯ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ইহাতে ২১শে চৈত্রের মধ্যে কবি  
কয়েকটি সনেট রচনা করেন—“বচনাব সময় ধাবণা ছিল এগুলি  
অমুদ্রিত দপ্তরের মধ্যেই থাকিবে । এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির নিশ্চিন্ত  
থাকাতেই বচনাগুলি একান্ত ভাবে নিজেব ব্যক্তিগত উচ্ছাস হয়ে  
পড়েছিল । ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে খাতা-পত্রের ভিতর থেকে  
চৌত্রিশটি সনেট বেছে নিয়ে আমার স্বামী ক্ষুদ্র বইএর আকারে  
‘সী’খিমোর’ নাম দিয়ে প্রকাশ করেন । আমি তখন কঠিন  
বোগশয্যায় । আমাকে বিব্রিত করার উদ্দেশ্যে বইখানি আমার  
সম্পূর্ণ অজানিতেই ছাপা হয়েছিল । ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে  
আমাদের বিবাহের বাব্বিকী দিনে তিনি আমাবই রচিত এই সনেট  
কয়েকটি মুদ্রিত পুস্তকাকারে আমাব হাতে উপহাস দেন ।”

[ ‘সী’খিমোর’েব ভূমিবাব অংশ ]

‘সী’খিমোর’ কবির ব্যক্তিগত উচ্ছাসময় কবিতাব সমষ্টি ইহলেও  
সাহস সারল্য ও প্রেমের প্রতি নিষ্ঠাব পরিচয়ে বহুজনীন হৃদয়বোধন  
পাইয়া কবিকে প্রশংসাব উচ্ছাসনে স্তম্ভিত্তি কবিয়াছে । সনেটগুলির  
রচনায় কোমল ও কর্ণাভেব সমন্বয় হইয়াছে । সমালোচনার উদ্দেশ্যে  
কবির এই স্তম্ভুর জীবন কাব্য স্বচ্ছ আন্তরিকতা ও প্রেমের দীপ্তিতে  
ভাষার হইয়া আছে । সপ্তম সনেটে কবির ব্যক্তিগত জীবনের  
ভাবৈশ্বৰ্য্য-মাধুরী স্নিগ্ধ শব্দদলে বিকশিত হইয়াছে ।

প্রেম-অভিষেক কবি দ্বিজব লাভ করিয়া বুঝাইলেন প্রেমের



পরশ স্তম্ভের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, হৃদয়কে স্বর্গ করিয়া দেয় ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রেমের শুচিস্পর্শেই ফুটিয়া উঠে । এই ভাব নূতন না হইলেও প্রকাশের মাধুর্য্যে কবির কয়েকটি রচনাকে মনোহর করিয়াছে ।

“বনবিহগী” ছোট বড় কয়েকটি কবিতার সংকলন ; অধিকাংশই ১৩২১ সাল হইতে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত । নূতনগুলিকে চেনা যায় । বিষয় ও ছন্দবৈচিত্র্যে “লীলাকমলে”র মতোই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য । প্রকৃতির বন্দনায়, আত্মজিজ্ঞাসায়, মানবতার পূজায় কয়েকটি কবিতা হীরকখণ্ডেব মতো সমৃদ্ধ । সহজ সরল ভাবে কবি শিশিরবিন্দু, কাঁচা ধান, রক্তকমল, শিউলি ফুল প্রভৃতির সার্থকতা বুঝাইয়াছেন । নীল চন্দ্রাতপতলে ‘হংসবলাকা’র খেত শতদলে গতি-শীল মালা রচনা দেখিয়া বলিতেছেন—

\* \* \* শরতের হে স্তম্ভের দূত !

আকাশ-ধরণী মাঝে এক কি ছবি রচিলে অদ্ভুত !

তব পক্ষ সঞ্চালনে গতিব উন্মুক্ত রূপ হেরি

লোকে লোকে বাবা লাগি কঁাদে চিত্ত—আরো কতো দেবী ?

‘বনবিহগী’র নীড় মানসলোকে ও মৃত্তিকালোকে ; কবি উভয় লোকেই তাহার নীড়েব সঞ্চয় রাখিয়াছেন । মানবতার অর্চনা কবির স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়াই বোধ হয় মৃত্তিকালোকের সঞ্চয় অধিক মনোহারী লাগিল । বিশিষ্ট শিল্পবৃন্দের সাহায্যে পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে । ভূমিকায় ঋণ স্বীকার করিয়া কবি বলিয়াছেন, এ কালের মনোরঞ্জন বনবিহগীর এ গীতি যদি অক্ষম হয় সে জগৎ তাহার অভিযোগ নাই ; ইহার প্রাচীন সুরটি সে যুগের ধনিরই জ্যোতক বলিয়া তাঁহাব ধারণা ।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ‘ভুবনেশ্বরী’ স্বর্ণপদকের জগ্না নিন্দাচিত্ত করিয়া প্রতিভাবাদর করিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় যে জ্ঞান-সাধনা ও মৌলিকধর্ম সম্মান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সম্বন্ধনা যে শুধু নিয়মিত পরীক্ষায় বিশিষ্ট ভাবে উত্তীর্ণ স্নাতকগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা দেশের গৌরবের কথা ।

রাধারাগী দেবী অনেক দিন লেখা বন্ধ রাখিয়াছেন—বাঙালীর পারিবারিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে কতো রকমের পরিবর্তন হইতেছে এগুলিব কাব্যচিত্র তাহার নিকট আশা কবি । হৃদয়-মুকুর যে স্বার্থে ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া গেল !

## সব চেয়ে আন্তরজনক সময়

শ্রীহিন্দ্রা দেবী

চল্লিশ বছর বয়সে নারীর জীবনে আসে এক মহা পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের মুখে তার মনে সৃষ্টি হয় এক অজানিত আন্তর । অনিশ্চিত আশঙ্কা তার মনকে পীড়িত করে, তার মনে জাগে নানা প্রকার বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন । তার সৌন্দর্য্য কি নষ্ট হয়ে যাবে, প্রেমের স্পৃহা আর থাকবে না, পুরুষের সম্বন্ধে আগ্রহ কমে যাবে, নারী তখন আত্মবিশ্বস্ত হবে ? জীবনে পরিবর্তনের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু এই আশঙ্কার কোন কারণ নেই । অধিকাংশ নারীই এই বয়ঃ-সন্ধি কাল অনায়াসে অতিক্রম করে এবং অনেকে অজানিত ভাবেই ।

প্রায়ই দেখা যায়, নারীর এই আশঙ্কার প্রধান কারণ অসুস্থ এবং সঠিক সংবাদের দ্বারা এই আশঙ্কা দূর করা যায় । অধিকাংশ নারীই চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণের আগেই সাহসের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনার সম্মুখীন হবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং তাদের সাদৃশ্য জ্ঞানও জন্মায় এবং একবার প্রকৃত ঘটনার সম্মুখীন হলে ভয় থাকে না । মেয়েদের জীবনে কতকগুলি বাধা-ধরা নিঃসৃত আছে । যেমন আটশ দিন অন্তর ঋতু, দশ মাস গর্ভধারণ এবং তার পর বেশী বয়সে (৪৫—৫০) ঋতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ । বালিকা বয়স থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় নারীর জীবনে পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সে নিজেকে স্বাভাবিক ভাবেই খাপ খাইয়ে নেয় । কিন্তু ঋতু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হবার সময় যে পরিবর্তন আসে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে অনেক নারীই কষ্টবোধ করে । অনেক সময় নানা রকম ব্যাধিরও সৃষ্টি হয় । তাই চল্লিশের কোঠায় পা দিলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার । চল্লিশের কোঠায় পৌঁছলে মেয়েদের যে শারীরিক পরিবর্তন আসে তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রধানতঃ মেয়েদের নিজেকে উপরই নির্ভর করে । অবশ্য চিকিৎসক এন্টোজেন, থাইরয়েড, ভিটামিন বি প্রভৃতি ওষুধ বাংলাতে পাবেন এ বিষয়ে নারীকে সাহায্যের জ্ঞাত । দরকার হলে অবশ্যই চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত । এই শারীরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত শত শত নারীর চিকিৎসা করেছেন এমন এক জন চিকিৎসক বলেন,—“ঋতু বন্ধ হয়ে যাবার পর শরীরে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাকে কোন প্রকার গুরুত্ব না দেওয়াই হল এর সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা ।”

নিজের প্রতি প্রত্যেকেই একটা আকর্ষণ আছে । নিজের প্রতি লক্ষ্য রাখা অবশ্য ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি ভাল নয় । নরনারী যদি কেউ নিজের কথা ভাবে, তাহলে সে হবে ভীষণ স্বার্থপর এবং অমূল্য সময় তার বুখাই নষ্ট হবে । এক শ্রেণীর মহিলা আছেন, তাঁরা এ বিষয়ে এত বেশী ভাবেন যে, তাঁদের জীবন দুর্ভাগ্য হয়ে উঠে । তাঁরা ভাবেন যে, স্বামী বোধ হয় আর ভালবাসবেন না । নিজের শরীরের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে গেলে আর কি নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে ?

জীবনের এই অধ্যায়ে নারীর দৈহিক কামনা বৃদ্ধি পেতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে । এরূপ অবস্থায় স্বামী যদি ঠিক ভাল রেখে চলতে না পারেন তাহলে নারীর অহুস্ত বাসনা বা অবান্ত্রিত বস্তু তাকে উৎকট রোগগ্রস্ত করে তোলে । কিন্তু এ কথা মাত্র অল্প কয়েক জন নারীর সম্বন্ধেই খাটে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর বয়সের আধিক্যজনিত ঋতু বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দম্পতির জীবনে প্রকৃত স্নেহ আসে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় সহজ সম্পর্ক এবং স্নেহ সাহচর্য্যে জীবন হয়ে ওঠে মধুর । ঋতু চূড়ান্তরূপে বন্ধ হয়ে যাবার পর যৌন-সম্পর্কের অবসান হয়, এ ধারণা ভুল । এ সময়ে যৌন-বাসনা নষ্ট হয়ে যাবে এমন কোন কথা নেই । প্রেমের মাধুর্য্যও নষ্ট হয়ে যায় না, বরং প্রেম হয়ে ওঠে আরও গভীর । সম্ভাবনামূলক সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়ায় সম্ভাবনাপ্রসবজনিত শারীরিক ক্ষয় হয় না এবং তার ফলে শরীরের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় । ছোট ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ব্যক্তিও থাকে না, কারণ তখন তারা

বড় হয়ে উঠে। এই সময়ে দম্পতির জীবনে চরম উৎকর্ষ সাধনের স্তযোগ আসে। এ সময়ে যদি তরুণ হবার সাধ যায় অথবা মনে হয় জীবনে আর কিছু বইল না, তাহ'লে সফট হয় গোলযোগের। নইলে এ বয়সে মাথা ঘামাবার বা অনর্থক আতঙ্কিত হবার কোন কাণ নেই।

অধিক বয়সে পুরুষের জীবনেও পবিবর্তন আসে, কিন্তু তা নারীর মত বৈপ্রতিক নয়। কিন্তু পবিণত বয়সে তিনি যদি চান তাঁর স্ত্রী পূর্বের মতই তরুণী থাকবেন অথবা তিনি যদি অতিরিক্ত মাত্রায় বুঢ়া হয়ে যান মনে, তাহ'লেই অনর্থ বাধবে। মোট কথা, স্ত্রী জীবন যাপন করতে হলে নিজেদের মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য বেখে চলতে হক্কে। পবিণত বয়সে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির যে স্তযোগ আসে তা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ কবাব দায়িত্ব উভয়েই।

## কেন আমি শিক্ষয়িত্রী আছি ?

লৌলা গ্রেস আর্ডম্যান

[লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের কানিয়নের ওয়েস্ট টেম্পাস স্টেট কলেজের শিক্ষয়িত্রী। 'দি ইয়ার্স অফ দি লোকাস্ট' নামে উপন্যাস লিখে তিনি পুস্তক পান। সাহিত্যে খ্যাতি পেয়েও তিনি শিক্ষয়িত্রীবা কাজে লিপ্ত আছেন।]

“উপন্যাস লিখে পুস্তক পাওয়ার পবেই সংবাদপত্রের এক বিপোর্টাব আমাকে প্রশ্ন কবেন—‘এবাব আপনি নিশ্চয়ই শিক্ষয়িত্রীবা কাজ ত্যাগ কবেন?’

“তৎক্ষণাৎ না ভেবেই আমি উত্তর দিলাম, ‘অবশ্যই না।’

“এই উত্তর দেওয়ার পব সংবাদপত্রে সংবাদ বেকল এবং তার শিবোনামা দেওয়া হল—‘তিনি শিক্ষাদান কাধ্যে লিপ্ত থাকবেন।’ যেন আমার পুস্তক পাওয়ার বড় খবর নয়, বড় খবর হল আমার শিক্ষাদানের কাজ ত্যাগ না করা।

“আমার একপ ধারণাব প্রথম কারণ, তাক্ষণ্যকে নতুন করে সজীবিত করাব স্তযোগ শিক্ষকের আছে। তরুণের আগ্রহ ও অসুস্থস্বাস কতকটা আস্থহ না কবলে তাদের সঙ্গে মেলা-মেশা কবা যায় না।

“আমি মাদ হ'বছব কলেজে শিক্ষকতা কবছি। এব আগে আমি একটা জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াতাম, ক্রাসে ধবা-বাধা নিয়মে পড়ানকে শিক্ষাদান বলে না, ক্রাস-ক্রমের বাইবে বোলাধূলা, বেডান, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতিও শিক্ষার অঙ্গীভূত।

“আমি যখন প্রথম শিক্ষাদানের কাজ আরম্ভ কবি, তখন আমার বয়স ছিল কম এবং আমি একটু বোকা ছিলাম। একটা বিস্তারিত কার্ধ্যসূচী তৈরী কবেছিলাম। তাতে ছোট-ছোট বালিকাদের এমন পৌসাক প'বে আসতে হত, যাতে তাদের ঠিক গোলপের কুঁড়িব মত দেখায়। আমি বেছে বেছে স্তম্ভরী বালিকাদের নিয়ে এই অস্থান করতাম।

“এই দেখে এক দিন প্রিন্সিপ্যাল প্রশ্ন কবিলেন, ‘জিনি কার্ভারের কি হবে?’ জিনি কার্ভার দেখতে মোটেই ভাল ছিল না। আমি বললাম, ‘জিনি আমাকে অস্ত্র কাজে সাহায্য করতে পাবে।’

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ‘তাকে আপনার একটি গোলপ ক'রে নিন না? সে ভাল গান গায় এবং তাব মা ভাল সেলাই করে, কাজেই সে খুব ভাল পোষাক প'বেই আসতে পাবে।’

“আমি প্রতিবাদ কবতে যাছি দেখে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, ‘স্তম্ভন, প্রত্যেকেরই অস্ত্রত: একবারও মনে হওয়া দবকাব যে. তার কাজ কেবল পদ্দাব আড়ালে নয়, মঞ্চেব সামনেও তাকে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষক হিসেবে সাফল্য অজ্ঞান কবতে হলে আপনাকে এই কথাটি মনে বাখতে হবে যে, প্রত্যেককে তাব ব্যক্তিগত বিকাশের স্তযোগ দেওয়া দরকাব।’

“তাঁর উপদেশ আমি গ্রহণ করলাম। ফলে জিনি কেবল গোলপই হল না, পবন্তরী জীবনে আস্থশক্তিতে বিধাস তাকে নাবীত্বেব পূর্ণ মধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কবল।

“শিক্ষকতার জন্ত আমি আমাব নিজেব চিন্তাধাবাব বিশ্লেষণ কবতে বাধ্য হই। আমাব অভিমত যে অনাস্ত, তা সঠিক ভাবে নির্ণয়েব জন্ত আমাকে আমাব বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা কবে দেখতে হয়।

“শিশুবা বড়দের ভীষণ ভাবে নকল কবে। একবার একটা ঘটনায় আমাব বেশ শিক্ষা হয়েছিল। আমি একটি ছাত্রীকে একটি কাজ কবতে বলেছিলাম একটু অনমোযোগিতাব সঙ্গে। তাই দেখে একটি ছোট মেয়ে ব'লে উঠলে—‘কাজটা ঠিক ভাবে কববো, না, আপনি যে ভাবে দেখিয়ে দিলেন সেই ভাবে?’ এ থেকে আমি বুঝলাম, ছোট ছেলে-মেয়েদের কীকি দেওয়া বা তাদের প্রতি কোন বকম অবহেলা দেখান অজায়। তাদের শিক্ষা দেবার আগে নিজে সং, ঐকান্তিক ও কক্ষক্ষ হওয়া দবকার।

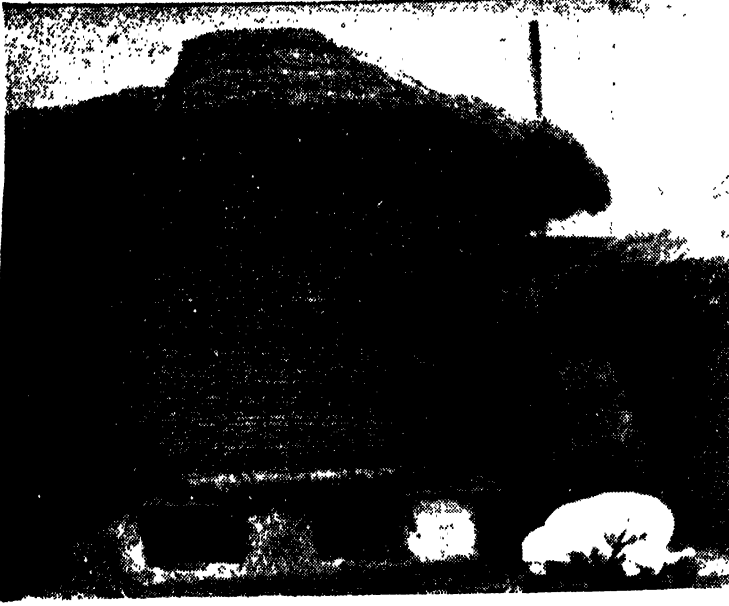
“আমি শিক্ষাদান কাধ্যে লিপ্ত থাকতে চাই, তাব কাণ হৃদয়েব নোঙ্গর ফেলবাব এ অতি স্তম্ভব বন্ধব।

“ছে.ল-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হলে তাদের ভালবাসতে শিখতে হবে। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যাবে না। শিক্ষকতাব কাজে মনের বিকাশ সাধনের যথেষ্ট স্তযোগ পাওয়া যায়। পড়াবার সময় ক্রাসে নিজের কোন ক্রটি প্রকাশ পেলে ছেলে-মেয়েদের দল তাই নিয়ে হাসাহাসি করে। কিন্তু তাতে ক্ষেপে উঠলে চলবে না। শাস্ত এবং সহজ ভাবেই তাকে গ্রহণ কবে নিজেকে আস্থসংবরণ কবতে হবে এবং একটা সংশোধন ক'বে ছেলে-মেয়েদের মন জয় ক'রতে হবে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্কের পর্যায়ে ফেললে চলবে না। তাদের পক্ষে চপলতা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষকের ত আর চপলতা প্রকাশ কবলে চলবে না। তাঁকে দৈর্ঘ্য এবং আস্থসংযম ক'বে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার কবতে হবে।

“আমি শিক্ষয়িত্রীবা কাজে খুব আনন্দ পাই এবং সেই জগাই এ পেশা আমি ছাড়তে চাই না।

“অর্থের সমস্তা অবশ্য একটা বড় প্রশ্ন। কিন্তু আমি এতে বু বোমী অস্তবিধা বোধ কবিনি, কোন বরমে চলে গেছে। আমেরিকা শিক্ষকদের বেতন অবশ্য খুবই কম এবং তাব কাণ আমেরিকা অধিবাসীবা এখনও শিক্ষকের মধ্যাদা বা মূল্য উপলব্ধি কবতে শেখেনি। স্কুলে যদি ভাল শিক্ষক বাখতে হয়, তা হলে তাতে উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে কবা দবকাব, নইলে শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।’

গম্বাদিক—কেতকী দেবী



## স্বাধীন দেশে মেয়েদের কর্তব্য

ত্রিংশাপতি মাঝি

গাছ বসাতেন, পশ্চিমে পশুপক্ষী পালনের গো-  
ও সার প্রস্তুতের জায়গাকে ভাল ভাবে প্রতি-  
রক্ষা করতেন। উত্তর দিকে রান্না-ঘরে আত্মা-  
ও গৃহ পরিষ্কারের যাবতীয় সরঞ্জাম নির্দিষ্ট  
থাকতো, পূর্ব দিকে শাকসব্জী চাষের জায়গা ও  
বীজ-চারা তৈরীর ব্যবস্থা হতো। গৃহের সম্মুখে  
মধ্যভাগে গোলাভরা ধানের গোলা রক্ষা হতো।  
ধানের গোলায় মেয়েরা সকালে গোময় দিয়ে  
প্রণাম করতেন, সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে  
গৃহলক্ষীর সামনে গলায় আঁচল দিয়ে স্বামি-পুত্রের  
মঙ্গল কামনা করে আরাধনা করতেন।

আজ অধিকাংশ পরিবারে ধানের কোন  
গোলা নাই, এর হয়তো নানা কারণ আছে ;  
কিন্তু ধানের জমিতে ধান উৎপাদন করিয়ে সে  
জমির ধান গোলাজাত করে রাখবার শুভবুদ্ধি

পশ্চিম-বাঙলায় ৩৫ হাজার গ্রাম এবং ১১২টি সহর। গ্রামে ও  
সহরের মধ্যে অধিকাংশ দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহগুলি  
ভগ্নপ্রায়। নবাগত পরিবারের মধ্যে অনেকের গৃহ নাই—কোন কোন  
পরিবারে নাম মাত্র গৃহরূপে এক-একটি চালা-ঘর নির্মিত হয়েছে।  
এরূপ অবস্থায় গৃহের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠার কাজ  
কিরূপ দ্রবস্থায় মধ্যে নিপতিত হয়েছে তা সকলের ভাবা দরকার।  
আর্থিক উন্নতির কাজে এ দেশে মেয়েরা চিরদিন সহায় ছিলেন।  
কিন্তু আজ তাঁদের গৃহমন্দির লীঠান হয়েছে বলেই অসহায় শিশু-  
পুত্রদের নিয়ে তাঁরা সকল দিকে পঙ্গু হতে চলেছেন। এ জন্ত বাঙ্গালী  
জাতিকে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির প্রতিষ্ঠার জন্ত সার্বজনীন আয়োজন  
করবার কাজে সর্গশক্তি সমর্পণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ গৃহ-  
প্রতিষ্ঠার কথাই আলোচনা করছি।

ঘনবসতিপূর্ণ পল্লীর তৎপর লোকসংখ্যা হ্রাস পায় না।  
অনেকে ঘন-তেন-প্রকারে জীবন বাপন করেও বহু জনের মধ্যে  
নিজকে বিলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু যদি কোন কর্মক্ষেত্রে স্বন্দর ভাবে  
প্রতিষ্ঠা করে এবং গৃহাদির ভাল ব্যবস্থা করে অনেককে তথায়  
বসবাসের জন্ত আহ্বান-জানানো যায় এবং তাদের কর্মের সংস্থানের  
কেহ ভাব গ্রহণ করেন তাহলে সহজ সরল উপায়ে ঘনবসতিপূর্ণ  
লোকালয়ের লোকসংখ্যা হ্রাস পায়। পশ্চিম-বাঙলার বড় বড়  
সহরের আশে-পাশে এইরূপ পল্লী ও কম-ভূমি অনেক স্থাপিত হয়েছে,  
কিন্তু এইরূপ আরো বহু পল্লী স্থাপন করা প্রয়োজন। এই সব  
পল্লীর প্রত্যেকটি পরিবারের জন্ত একটি শয়ন-ঘর, একটি রান্না-ঘর,  
একটি গোয়াল-ঘর, একটি ধানের জায়গা ও কয়েকটি পরিবারের  
মধ্যে কুপ, নলকুপ এবং পল্লীর মধ্যে যদি জলাশয় স্থাপিত হয়,  
তাহলেই গৃহগুলি স্বন্দর ও মনোরমরূপে গড়ে ওঠে নতুবা গৃহের  
শাস্তি ও আনন্দ রক্ষা হয় না।

আমাদের দেশের মেয়েরা গৃহের চারি পাশে চারি প্রকারের  
আয়োজন করেছিলেন। দক্ষিণ প্রান্তে ফুলের ও নিম-বেলের

যদি পরিবারের না হয় তাহলে অল্প উপায়ে টাকা উপার্জন করবার  
এবং কিনে খাবার মতি-গতিই প্রবল হয়। দেশের যৌবতর  
হৃদয়ে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ যদি দেশে প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন  
করবার দিকে দৃষ্টি দিতেন, তাহলে দেশের দূর-দূরান্তে ও মজুবগণ আজ  
এতটা অসহায় ও বিপন্ন হতো না। নানা জায়গায় জলসেচের  
ছোট-বড় পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু এই গুরুতর খাত-সঙ্কটের  
মধ্যেও উপরোক্ত কারণে ধান-গম চাষের তাগিদ বিশেষ নাই বললেই  
চলে। অথচ এমন এক দিন ছিল যেদিন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরাও  
হাসিমুখে নিজের হাতে ধান সেদ্ধ করে ধান হতে চাল তৈরী করতেন  
—গোয়াল পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে জ্বালানী সমস্তার সমাধান  
করতেন। এই ভাবে ঘরের টাকা ঘরে থাকতো, অথবা খাতের ও  
টাকা-পয়সার অপচয় হতো না—এমন কি মেয়েরা এই সব নানা  
কাজের মধ্যে দিয়ে নিজেরাই পুষ্টির খাত সংগ্রহ করে পরিবারের  
স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতেন।

বর্তমানে স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করে মেয়েরা দেশ-বিদেশের কথা  
ভাবতে শিখেছেন—সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে পারদর্শিনী হয়ে উঠছেন  
—নীতি ও সুরুচির পরিচয় দিয়ে পারিবারিক জীবনে শান্তি স্থাপন  
করছেন ; কিন্তু এক দিন সঙ্গীতে, বাজে, আল্পনায়, উল্লুধ্বনিতে  
যেরূপ নর-নারীর প্রাণ আনন্দে উজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো, সেই আনন্দ  
এখন আর নাই বললেই চলে। কারণ, এখন অস্তরের যোগাযোগ  
অপেক্ষা বাহ্যিক জাঁকজমক ও চাকচিক্যই সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠেছে।  
পল্লীর নারী রান্না মাটির উপর আল্পনা দিয়ে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে  
উৎসব-মঞ্চকে অপরূপ করে তুলতেন—সকলে সঙ্গীত-কীর্তন দ্বারা  
পরম্পরের হৃদয়ে গভীর ভাবের সঞ্চার করতেন।

আজ ভাবহীন, দরদহীন আড়ম্বর ত্যাগ করে বিজ্ঞানভবনেই  
মেয়েদের সর্বশেষ উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। মেয়েদের কৃত্রিম  
অভিমান ও কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে ফুল-ফলের বাগান, সবজী বাগান,  
গাভী পালন ও সার প্রস্তুত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করতে হবে—কুটার

শিল্পে অভিজ্ঞ হতে হবে। প্রাথমিক চিকিৎসা, বোগীব সেবা, নারী-মঙ্গল ও শিশুপালন কাজে আগ্রহ দেখাতে হবে। তবেই তাঁরা সংগঠন ও সংহতি শক্তির দ্বারা জাগ্রত হয়ে সমাজ-সেবায় নিযুক্ত হতে পারবেন। মেয়েদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে, ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেই এ জাতি আজ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাঁদের বাহ্যতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তিব জোরেই আজ গৃহগুলি অতীব সঙ্কটের মধ্যেও টিকে রয়েছে। জাতি যদি এই সঙ্কটের দিনে তাঁদের সমস্ত সমাবানের জ্ঞান যোগ্য করে তুলতে পারে তবে তাঁরা পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে হেয় হবেন না। বন্ধনের নানা গণ্ডী সৃষ্টি করে এ জাতি মেয়েদের মহাশক্তিকে পঙ্ক করে রেখেছিল। তাই আজ বাঙলার গৃহ, বাঙলার পল্লী, বাঙলাব সমাজ জগতের নিকট ভিক্ষার্থী। ভিণাবী জাতি সমাজকে—দেশকে কোন প্রকারেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। কাজেই সর্বপ্রকারে শিক্ষিতা হয়ে দেশের মায়েরা যদি দেশের যোগ্য সম্ভান গড়ে তুলতে পারেন তা'হলেই এ জাতি ব্রহ্মাওপতিব সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।

গৃহের অভ্যন্তরে আজ শিশু কল—বালক-বালিকাগণ খাড়াইন। মেয়েরা যদি সজ্জবদ্ধ হয়ে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য উন্নতির ভাব ধারণ করেন তা'হলে সত্যি গৃহগুলি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকা এবং গ্রাম পরিষ্কার করার কাজে এখনও অনেকে উদাসীন। সেইরূপ বোগীর সেবা-যত্নের প্রতিও অনেকে লক্ষ্যহীন। এমন কি, খাদ্যভব্য তৈরী করার প্রতিও অনেকের লক্ষ্য নাই।

## গৃহস্থালী

হাসিরাশি দেবী

গৃহ আর গৃহস্থালী নিয়ে কেন আর আজকের দিনে মেয়েদের মন সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না, তা একটা ভাবনার কথা বটে। পুরাতনপন্থীরা বলবেন:—“মেয়েকে কাজের কথা বলবো কখন?—বললেই তো জবাব দেবে—বা রে, স্কুলের পড়া নেই বুঝি?—গানের মাঠাব তো এলেন বলে! জানো,—আজ আমাদের ক্লাব থেকে অমুক জায়গায় যাওয়া হচ্ছে! কাল তো ‘তমুক’ সিনেমা ‘কন্সেশান’ দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্তো। না গেলেই নয়।” ইত্যাদি।

মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলে এ ছাড়াও বলবে,—“আব কোনও কাজ নাই না কি? নিজেব জামা-কাপড় জুতোর তদারক তো নিজেই করি। তাছাড়া একটু-আধটু ছেঁড়া, বোতাম টাকা—ও তো নিজেই কবি সব। আবার চা তৈরী, জলপান,—এ সব দেই না বুঝি চাইলে?”

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে দেখা যায়, দশ-এগারো বছর বয়স থেকে পনেরো-ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত এ সব করে যেটুকু সময় তারা পায়, তাতে একটু ছুটাছুটি, একটু-আধটু পুতুল খেলা,—সত্যিই এ সবের ইচ্ছে তাদের ফুরায় না, এবং এগুলো ফেলে সংসার-ঘর আর গৃহস্থালীর কাজে মন বসানোও তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভাবিক। ফলে তারা যে গৃহস্থালীর কাজ সবকিছু অনভিজ্ঞা হবেই, এ তো জানা কথা। অথচ ঠাকুরমা-দিদিমার দল যখন

‘কানাই লাল মিত্রের’  
সোমরাজ  
কবিরাজী কেশতৈল  
দ্বাথার যোগের দ্ব্যর্থ  
সুগন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ

খবরমুলা :-

\* তিল তৈল \* কদম্ব বতায়ল  
\* কদম্বারাইডিন

\* সোমরাজ বীজ  
\* মহাভূষরাজ  
\* বস্ত ও শ্বেত চন্দন  
\* ব্রাহ্মী \* আমলা

\* ঘাস্ক (কন্দুরী) \* চন্দন তৈল  
\* তেলা তৈল \* চামেলী তৈল  
\* বার গুলোট \* ল্যাভেণ্ডার  
\* ইতর্দী বিখ্যাত সেন্ট

উপকারীতা :-

\* দ্বাথার যোগে  
\* চুল ওঠা বন্ধ করিতে  
\* চুল বাড়াইতে  
\* অনিদ্রায় নিতদ্রুয়ানে  
'সোমরাজ কেশতৈল'  
\* সর্বোৎকৃষ্ট \*

বলেন, “অমন বয়সে আমাদের খশুর-ঘর করতে হয়েছে তখন স্বভাবতঃই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনের ছবি। সেদিনে ঠাকুরমা আর দিদিমারা লাল চেলী আর নোলক পরে, পায়ে মল বাঁজিয়ে চোখের জল ফেলে খশুর-বাড়ী যেতেন সেই পরিবারের ভবিষ্যৎ মান-সম্মান, শুভ-অশুভের দায়িত্ব নিতে, সেদিন তাঁর সঙ্গে যেত সান্দ্রানাদাত্রীকূপে পবিচাবিকা, প্যাঁটরা, বাস্ক, চিনেমাটির খেলনা, কালীঘাটেব বেঙ্গে পুতুলের সাজানো সংসার। প’ড়ে থাকতো কেবল বাপের বাড়ীর উঠানে, কি দালানের পেছনে ইটের পর ইট সাজানো খেলাঘবে হাঁড়ি, বেড়ী, হাতা আব খুস্তী। খেলার থেকেই যে জীবনের সূত্র সেদিন ছিল, শেষ ছিল সেট খেলারই একটা বড় সংস্করণেব মধ্যে।

কিন্তু এখনকার দিনেব মেয়েবা বড় একটা সে খেলা খেলো না। এমন কি ঐ ধরণেব খেলাব যে কোনও দামই ভবিষ্যৎ দেবে না, তাও ভাবতে সুরু করেছে। অথচ আমাদের ঘব-সংসার পরিচালনা সম্বন্ধে আজও কোনও নূতন পদ্ধতিব চলন হয় নাই। এই অবস্থায় যদি ছোটবেলাটা নূতনত্বের আবহাওয়ায় বেখে, বড় হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরাতন পন্থায়, সেই গতানুগতিক ভাবে ঘব আব গৃহস্থালীর মধ্যে ফিরে যেতে হয়, তা’হলে এই দুই অবস্থার মধ্যে মীমাংসার আশা কি সব জায়গায় সমান হতে পারে?

আজকালকার শিক্ষার ধারা বহুমুখী। অথচ শিখবার সময় পাওয়া যায় এত কম যে, কেবল মাত্র ঐ বকম খেলাধলা কিবা গল্প-কাহিনীব মধ্যে থেকে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব। এই কারণেই ছাত্রাবস্থা থেকে যখন এই সব মেয়েদের এসে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হয়, তখন তাদের অতীত ও বর্তমান নিয়ে জীবনে যে সম্ভব বাধে, তার ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দেয় বিরক্তিকর, তিক্ত অবস্থায়। শিক্ষাকালীন সময়ে ধীরে নিজেদের ব্যয়-বাছল্যাতার দিকে নজর দেবারও অবকাশ পাননি, বর্তমান দিনে তাঁরাই নিজেদের আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণ যোগাযোগ ক’রে লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখে হন বিচলিত। স্থিতি ক’বে নেন, জীবনে চাকুরী ছাড়া অর্থগমেব অগ্র পন্থা নাই। এ জন্ম চাকুরীক্ষেত্রে আজকের দিনে যে সব মেয়েদের কাজ করতে দেখি, তাঁদের প্রায় সকলকেই ঘব ও গৃহস্থালীর বাইবে আটকে থাকতে হয় দশটা থেকে চারটে-পাঁচটা অবধি। বাকি সময়টুকুব জন্ম তিনি যে ছুটি পান, সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে দেখতে হবে তাঁর ঘব-সংসার, স্বামী এবং সন্তান। নিজের স্বাস্থ্য যদি এতেও ভালো থাকে, তা’হলে তো তিনি ‘বাহবা’ পাবারই উপযুক্ত, কিন্তু তা যদি না থাকে, তা’হলে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কাজের জন্ম লোক রেখে কি তিনি লাভবান হতে পাবেন?

হয়তো এ বিষয়ে অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা জানাতে পারেন, কিন্তু আমার আশা খুবই কম। তাছাড়া আজকালকার সময়

সমস্যায় পরিপূর্ণ। নিত্য নূতন অভাব আর দুর্ভাবনার সঙ্গে লড়াই করার জন্মে আমাদের সকলকেই যে ভাবে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে, তাব কোনও নির্দিষ্ট সময় কিবা নিশ্চয়তা নাই। সে জন্ম মনে হয়, এ সব বিষয়ে বুঝে-সুঝে কাজ করাই ভালো।

গৃহস্থালী বলতে অবশ্য চেয়ার-টেবিল কি হাঁড়ি-বেড়ীই ধরা চলে না, ধরতে হয় এগুলোর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ নিকটতর বা অবিচ্ছেদ্য তাদেরও। যেমন খাচ্চ-পরিষ্কার। এখনকার দিনে সহরে আমরা যা-ও বা রেশন পাই, সহর থেকে কিছু দূরবর্তী জায়গাগুলিতে যে তা-ও পাওয়া যাচ্ছে না, তার ধারা-বিবরণী আমরা প্রায় প্রত্যেক দিনই পড়ছি দৈনিক সংবাদপত্রে। এই অবস্থায় একটি মাত্র সংসার—অবশ্য যে সংসার অধিকাংশ সহরবাসীদের মত ঘব-ভাড়া নিয়েই গুছাতে হয়, সে সংসারের আয় হিসাবে ব্যয় করাই যদিও ঠিক, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেই তা হয় না। ঘব-ভাড়া, তার পর সাধারণ ভদ্র গৃহস্থের পক্ষে অপরিহার্য শিক্ষা ও সভ্যতার খরচ কুলিয়ে ‘খাওয়ার দিকেই অভাব দেখা দেয় বেশী; এবং এই দিকের দৈন্য এত দিন যত লজ্জাতেই ঢেকে রাখা যাক, এখন এই কম রেশন পাওয়ার বাজারে তাকে ঢেকে রাখা একেবারেই যেন অসম্ভব অবস্থায় দেখা দিয়েছে; তাই রেশনের দোকানের পাওনা ছাড়াও বাজার থেকে লুকিয়ে যা দু’গুণ দাম দিয়ে ঘবে আনতে হয়, তার বিপক্ষে নীতিবাগীশদের নীতিকথার বজা বইতে থাকলেও পেটের ক্ষিদে তার নিষেধ মানে না। এবং এই নিলজ্জা ক্ষুধার ছালায় আমাদের চোখের সামনে থেকে যদি একাল্পবর্তী পরিবারের আদর্শ, গুরুজনদের খাওয়ার পরে খাওয়া, অতিথি সেবা প্রভৃতি চিরচরিত সুখ্যাতির স্বপ্নগুলি মিলিয়ে যায়, তার জন্ম মেয়েবা দায়ী নন। আগেকার দিনে সকলের খাওয়ার পরে মেয়েবা ও বধূরা যখন খেতে বসতেন, তখন বেলাই তো দ্বিপ্রহর। আর এখনকার দিনের মেয়েদের বেলা সাড়ে নয়টা না বাজতেই স্নান করে নিতে হয় কলের জলে, না হলে জল পাওয়া যায় না। খাওয়া সারতে হয় পৌনে দশটায়, আর কণ্ঠস্থলে হাজিরা দিতে হয় বেলা সাড়ে দশ কি এগারটার মধ্যে। এ বকম অবস্থায় ঘরে তারা থাকতে পান কতক্ষণ? কতক্ষণ পীড়িতের সেবা করার মত ফুরসৎ পান তাঁরা—কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন কারো দুঃখ, কষ্ট বা মান-অভিমানের অপেক্ষায় নিজেও না খেয়ে, না উঠে, চুপচাপ ব’সে থাকতে? যুগের গতিধক্ষে মানব-সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে, মানবত্ব যদি তার আওতায় চাপা প’ড়ে যায়, তার জন্মেই বা নাশি জানানো যাবে কাব কাছে? তবু এখনও যেটুকু আশার আলো—ক্ষীণ হলেও বহু দূর থেকে চোখে পড়ে—সেটুকুর মূলমন্ত্র হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। শিক্ষা সংস্কারশূন্য হোক, কিন্তু সংস্কৃতি—যা যুগে যুগে সব সময়ে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত—তা থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

## আত্মশুদ্ধি

“ঈশ্বকে যদি দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পবিত্র কর—অন্তরে

যদি কোন গুট পাপ পোষণ করিয়া থাক, তাহা দূর করিয়া দাও।”

—মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ

# যাত্রাপথে চলচ্চিত্র

এক

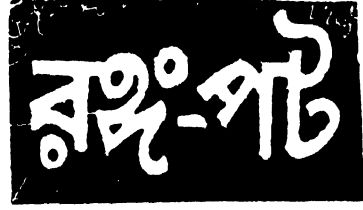
কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস ট্যাগোরের কোন

কোন উক্তি জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষতঃ তাঁর খ্যাতি সম্পর্কীয় উদ্ভট উক্তিগুলি। কিন্তু তাঁর একটি উক্তি প্রাধান্য-যোগ্য। তিনি বলেছেন : “অর্থ অপব্যবহারের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারতীয় চলচ্চিত্রগুলি।”

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। নাট্যজগতে তখনও চলছে ক্লাসিক থিয়েটারের যুগ। তখন পাশ্চাত্য দেশেও চলচ্চিত্রের শৈশবকাল। সেই সময়ে ক্লাসিক থিয়েটারে নির্বাক ছবি দেখাতেন রয়েল বায়হোপ কোম্পানীর স্বর্গীয় হীরালাল সেন। এবং ঠাঁর থিয়েটারেও (ও মাঝে মাঝে মিনার্ভা থিয়েটারে) বিনি ছবি দেখাতেন তাঁর নাম হচ্ছে, স্বর্গীয় শ্রীমলাল শেঠী। তারও আগে শ্রীম বাবু আমার মাতুলালয়ে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করতেন। সে সব ছিল খণ্ড খণ্ড দৃশ্যের চিত্র। হয়তো দেখানো হ'ল লণ্ডন সহরের একটি রাজপথের দৃশ্য। সায়েব-মেম্বা ফুটপাথের উপর দিয়ে ব্যস্ত ভাবে আনাগোনা করছে, গাড়ী নিয়ে ঘোড়াগুলো যাচ্ছে এদিকে ওদিকে, ছোকরা বোচা খবরের কাগজ এবং একটা কুকুর ছুটে চলে গেল লাজ নাড়তে নাড়তে—বাস, দূরিয়ে গেল একখানা ছবি। তার পর স্বক হ'ত এই রকম আর একখানা ছবি দেখানো। অর্থাৎ নতুন কোন দৃশ্য। সব ছবির আকারই একরকম। আজকের বালকবাও সে সব ছবিকে অকিঞ্চিৎকর ব'লেই মনে করবে। কিন্তু সে যুগের আমরা এই সব ছবি দেখে দম্বরমত বিম্বিত, উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে উঠতুম। ছবির মানুষ টেঁটে যায়, ছবির ঘোড়া ছুটে চলে এবং ছবির কুকুর করে লাঙ্গুলান্ধোলন! আমাদের পক্ষে তাই-ই ছিল যথেষ্টরও বেশী। সচল ছবি হবে আবার সবাক, কেবল তাই-ই যে কারুর কল্পনায় আসত না, তা নয়; ছবির ভিতরে পাওয়া যাবে যে একটানা গল্প ও নাট্যাভিনয়, এতটাও কেউ আশা করতে পারত না।

সাধারণ বঙ্গালয়ের নাট্যাভিনয় শেষ হ'লে পর আসত এমন সব চুটকি ছবি দেখাবার পালা, যেন ভূবিভাজনের শেষের দিকে চাটনি। দর্শকদের আগ্রহাধিক্য ক্রমেই এটা রেওয়াজ ঝাঁড়িয়ে গেল। কলকাতায় তখনও কোথাও নিয়মিত ভাবে ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়নি, স্থায়ী চিত্রগৃহ ছিল তো কল্পনাতীত ব্যাপার। যে চলচ্চিত্র আজকাল রঙ্গমঞ্চের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হয়ে ঝাঁড়িয়েছে, তাকেই সর্বপ্রথমে সাদরে আশ্রয় দিয়েছিল আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়। এ যেন যেচে খাল কেটে কুমীর ডেকে আনা। তবে অল্প দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি যে বকম হয়ে উঠেছিল, তার উপরে নির্ভর করে নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, সাধারণ রঙ্গালয়ের আমন্ত্রণ না পেলেও কুমীর নিশ্চয়ই আসত নিজের জন্তে নিজেই খাল কেটে।

ছবিতে আমি প্রথম গল্প পাই ঠাঁর থিয়েটারের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে। গল্প তো ভারি! একটা পাগলা কোন গতিকে রক্ষী চোখকে ঝাঁকি দিয়ে গারদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। রক্ষীরা যখন তা জানাতে পারলে, তখন মল বেঁধে করলে তার পশ্চাদ্ধাবন। তারাও ছোটো, পাগলাও ছোটো,—এ পথে, সে পথে, এ বনে, সে বনে, কখনো উপর থেকে নীচে লাফিয়ে, কখনো পাঁচিল ডিঙিয়ে, কখনো নদী পেরিয়ে, এই ধরা পড়ে পড়ে, আবার সে তাঁত চাড়িয়ে পালায়, তার পর গ্রেপ্তার হ'ল শেষ পর্যন্ত।



শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তুচ্ছ আখ্যান, কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সঞ্চালিত হ'ত প্রচুর উত্তেজনা। ও-রকম সব দৃশ্য যে কেবল সে যুগেই উদ্দীপনা সৃষ্টি করত, তা নয়; আজকালকার প্রমাণ—অর্থাৎ পূর্বা মাপের চিত্র-নাট্যেরও এক অংশে যখন এই শ্রেণীর পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য দেখানো হয়, তখনও দর্শকরা সমভাবেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। একটুও পবিবর্তিত হয়নি জনসাধারণের প্রকৃতি।

ছবিতে গল্পের খোলসটাই বেড়ে উঠতে লাগল ক্রমে ক্রমে। ছোট ছোট কাহিনীকে ক্রমে বড় ক'বে হুলে ছবিকারবা পক্ষের গায়ে দেখাতে লাগল বিখ্যাত সব উপাখ্যান ও নাট্যকে। চলচ্চিত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ বহল না। পক্ষী তখনও মঞ্চের সঙ্গে পালা দিতে পারত না বটে, কিন্তু হয়ে উঠল সে বীতিমত লোকপ্রিয়।

পূর্বোক্ত হীরালাল সেন ও শ্রীমলাল শেঠী কেবল সাধারণ রঙ্গালয়েই ছবি দেখাতেন না, ক্রিয়াক্ষম উপলক্ষে সহরের ও মফস্বলের অনেক ধনী-বাড়ীতেও ছবি দেখাবার জন্তে আহূত হতেন। আর্থিক লাভ হ'ত তাঁদের যথেষ্ট। এই ভাবে ছবি দেখাবার হিড়িক-হু হু ক'বে বেড়ে উঠতে লাগল।

বাঙালীরা ভালো ক'বে কিছু তালিয়ে বোকাবার আগেই পাকা ব্যবসাদার ম্যাডানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল ছবির বাজারের দিকে। অনেক কিছু সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা হলেন আশাখিত। কিন্তু তখনও তাঁরা নিজেরা চিত্র-প্রদর্শনী ব্যবসায়ের ভিতরের কথা বিশেষ কিছুই বুঝতেন না, অতএব আত্মবল করলেন শ্রীমলাল শেঠীকে। শ্রীম বাবু সঙ্গে তাঁদের কি একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেল। ছবি দেখাবার জন্তে ম্যাডানরা কলকাতার ময়দানে ফেললেন তাঁবু। চিত্র প্রদর্শনী চলতে লাগল নিয়মিত ভাবে। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের আসন বেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। প্রতি নতুন চিত্র দেখাবার জন্তে আমরা সেখানে গিয়ে জনতা সৃষ্টি করতুম। তখন কোন ছবিরই পবনায়ু এখনকার মত দীর্ঘ হ'ত না বটে, কিন্তু দুই হাতে টাকা লুটতে লাগলেন ম্যাডানরা।

প্রতি হপ্তাতেই দেখানো হ'ত একখানি বা একাধিক হাসির ছবি। চাপ্লিন নামের নাম কেউ তখনও শোনেনি। সে সময়ে হাওয়াভিনয়ে সবসেরা ছিলেন ফরাসী চিত্র-নট ম্যাক্স লিগার। আমার মতে তিনি ছিলেন চাপ্লিনের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর অভিনেতা। পোষাক শিল্পীর মত তিনি কৃত্রিম “মেকআপ” ও উদ্ভট পোষাক, টুপী, জুতো এবং ছড়ি প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতেন না, বস সৃষ্টি করতেন কেবল স্বাভাবিক ভাবভিনয় ও অঙ্গভাব প্রভৃতির দ্বারা। চাপ্লিনের আগেকার চিত্রনাট্যগুলির মধ্যে থাকত প্রচুর পবিমাণে “লো-কমেডি”র উপাধান এবং অভিনয়ও হ'ত তারই উপযোগী। কিন্তু ম্যাক্স লিগারের চিত্রনাট্যগুলির আখ্যান হ'ত অধিকতর সূক্ষ্ম ও উচ্চ-শ্রেণীর। যাকে বলে জোর ক'রে কাঁড়কুড় দিয়ে হাসানো, তিনি কোন দিনই সে ধাবও মাড়াতেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ম্যাক্স

লিগার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্থান করেন সৈনিকরূপে এবং চিত্র-জগতে প্রবেশ ক'রে লক্ষপ্রতিষ্ঠা হন চার্লস চ্যাপলিন। শাস্তি-প্রতিষ্ঠার পর ম্যাক্স লিগার আবার ছবির পদায় দেখা দেন এবং তখনও তাঁর শক্তি ছিল অটুট। কিন্তু চ্যাপলিন তখন বাজার মাং ক'রে ফেলেছেন এবং অনতিকাল পরে ম্যাক্স লিগারও হন অকালে পরলোকগত। তার পর থেকে হাসির ছবিব মূল্যকে চ্যাপলিন হয়ে আছেন একেধরের মত। হারল্ড লয়েড তাঁর খানিকটা নিকটস্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমকক্ষ হ'তে পারেননি। আমেরিকায় ম্যাক্স লিগারের সমসাময়িক এক জন প্রতিভাবান হাস্যবসানিতা ছিলেন, তাঁর নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না—জন বুন কি? ভাণ্ডারি ছিল না তাঁর অভিনয়েও।

ম্যাডানদের দাঁবুতে কেবল হাসির ছবিই দেখানো হ'ত না, চিত্রে কপায়িত উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস ও নাটক প্রত্নবৃত্তিও অভাব ছিল না। আব থাকত প্যাথিওর গেম্বটে সাময়িক খবর। প্রথম যুগে এখানে ফরাসী ছবির আধিপত্যই ছিল বেশী, তাব পব ইংরেজি ছবি, তার পর ইয়াফি ছবি। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ সমস্ত উটে-পাটে দেয়। ফরাসীরা পিছনে হটে, এগিয়ে আসে আমেরিকানরা।

সেই নিরাক্ষর যুগে চিত্রনাট্যের কুশীলবরা সমাপ্তে যোগ দিত না বটে, কিন্তু অত্যা উপায়ে ছবিকে সুখর কবাব চেষ্টা হয়েছিল তখনই। বিজ্ঞাপিত হ'ল, আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে চিত্র-নটের মুখে শোনা যাবে গানের কথা। এই অভাবিত কিন্তু প্রফলে প্রেক্ষাগৃহে জমে উঠল দলে দলে বিখিত দর্শকের ভিড়। ছবি দেখলুম। গানের কথাও স্তনলুম। অঙ্গভঙ্গি সহকায়ে গান গাইলেন প্রখ্যাত হাস্যগীতিগায়ক শ্রাব হারি লডাব। কৌশলটা জানা গেল না বটে, কিন্তু এইটুকু বুঝলুম, ফোনোগ্রাফের বেকডেব সঙ্গে যে কোন উপায়ে চিত্রে প্রদর্শিত নাটকীয় ক্রিয়াব যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। খালি গান আব ছবি, ফেরে অত্যন্ত সৌম্যবন্ধ, ব্যাপারটা নূতন হ'লেও পরীক্ষা বিশেষ ফলপ্রদ হ'ল না। অল্প দিন পরেই দর্শকদের কাছে ক'মে গেল তাব নূতনত্বের চাকচিক্য। যন্ত্রও ছিল না নিদোষ। প্রায়ই চিত্র-নটের ভাবভঙ্গি বা মৌখিক অভিনয়ের সঙ্গে মিলিত না গানের বাণী (শব্দদেবের অনবদানহায় আভ ও মায়ে মায়ে দেখা যায় যে ক্রটি)। তখন এ শ্রেণীর গীতিচিত্র দেখানো বন্ধ ক'বে দেওয়া হ'ল।

ক্রমবদ্ধমান দশক-সখ্যা দেখে বিচক্ষণ ম্যাডানরা নিশ্চিত ভাবেই উপলব্ধি কবতে পারলেন যে, ছবির লজাব খার নামবে না, চড়তেই থাকবে। তখন সব কোলটুকু নিজের দিকে টানবাব জন্মে দবকার হ'ল ম্যাডান-প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে গ্রাম বাবুকে সবিয়ে দেওয়া। গ্রাম বাবু সঙ্গে আমাব পরিচয় বাতিমত ঘনিষ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কি সন্তে তিনি ম্যাডানদের সঙ্গে যোগ নিয়েছিলেন আমি তা জানি না। এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি আসল কারণও আমার অজানা। কেবল এইটুকুই জানি, ম্যাডানদের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা নিয়ে গ্রাম বাবু নিজের সব দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্য বারো বৎসর আগে বুদ্ধ গ্রাম বাবু এসেছিলেন আমার বাড়ীতে। আমি তাঁকে বলেছিলুম, "বাংলা চিত্র-জগতে আপনি আব হীরালাল বাবু পথিকৃত হয়েও শেষ পযান্ত পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। আব সেই পথে আপনাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ম্যাডানরা হয়েছে ধনকুবের।"

গ্রাম বাবু একটু হেসে লজাটে হস্ত স্থাপন ক'বে বলেছিলেন, "কপাল!"

কপালই বটে, শাঙালীর কপাল! কোথা রাম রাজা হবে, না রাম গেল বনবাসে।

তার পর ম্যাডানরা নিজেরের চলবার পথ শাক। ক'রে বাধিয়ে নিলেন। একে একে সহরের নানা জায়গায় নির্মাণ করতে লাগলেন চিত্র-গৃহের পর চিত্র-গৃহ। বাংলা দেশে তাঁদের সমযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ রইল না, ছবির বাজারে তাঁরা একচেটে অধিকার বিস্তার ক'রে বসলেন। তাব পর তাঁরা কেবল বিলাতী ছবি আমদানি ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, নিজেরাও হলেন চিত্র-নির্মাতা। সর্ব-প্রথমে তাঁরাই টালিগঞ্জে খোলেন প্রকাণ্ড ষ্টুডিও। ছবির ব্যবসারে তাঁরা কত টাকা লাভ কবেছিলেন তার হিসাব আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোটি কোটি টাকা। কিন্তু এমন চলতি একচেটে ব্যবসায়, এমন অভাবিত সৌভাগ্য, এমন দূঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত বিরাট প্রতিষ্ঠান, কেমন ক'রে যে অত্যন্ত কালের মধ্যেই একেবারে নশ্রাং হয়ে গেল, সে রহস্যের হদিস পাওয়া যায় না। ম্যাডানদের উত্থান এবং পতন দুই-ই হচ্ছে বিস্ময়কর। এখানেও ওঠে ঐ কপালের কথা। কপাল, ভাগ্য, ভবিতব্যতা।

আর একটা কথা বলি প্রসঙ্গক্রমে। চিত্র-জগতে দম্বরমত কায়েম হয়ে ম্যাডানরা চেয়েছিলেন বাংলা নাট্য-জগতেরও দখলিকার হতে। কিন্তু বিলাতী ছবি আনিয় এবং জনপ্রিয় উপন্যাসিকদের রচনা নির্বাক চিত্রে রূপায়িত ক'রে অজচ্ছল টাকা কামানো যতটা সহজ, মনীষায় এবং নাট্যপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতিকে ভোগা দেওয়া যে ততটা সহজ নয়, এ সত্যটুকু ম্যাডানরা বহু বিলম্বে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা বেশী মাহিনার লোভ দেখিয়ে সংগ্রহ করলেন বাংলার কয়েক জন নামজাদা, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর নট-নটী। পার্সী থিয়েটারে আগা হাসার নাট্যকাররূপে অত্যন্ত লোকপ্রিয়। তাঁর একথানা নাটক বাংলায় কপাস্তবিত ক'বে কর্তারা ভাবলেন, দাবার এক চালেই হবে কিস্তীমাং। ফলে পাওয়া গেল অশুভিষ। বাঙালীরা সে নাট্যাভিনয়ের দিকে এক রকম ফিরেও তাকায়নি বললেও চলে।

তখন কর্তাদের হ'ল হ'ল। তাঁরা বুঝলেন, বাঙালীদের জন্মে চাই উচ্চশ্রেণীর নাট্যকার ও নট-নটী। তাঁরা পর্দা দিলেন অপারেশন মূখোপাধ্যায় ও তারামূল্যরীবা কাছে। যদিও তাঁদের আর্থিক অবস্থা তখন সম্ভল ছিল না, তবু বাংলা বঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ হেবে তাঁরা বেশী টাকাব টোপ গিলতেও নারাজ হলেন।

কর্তারা তখন নাচাব হয়ে গেলেন সৌখীন নাট্য-জগতের ধুরন্ধর শিল্পী শ্রীশিরকুমার ভাড়াড়ার কাছে। এলেন তিনি এবং তাঁর সঙ্গে এলেন নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। সেই মণিকাকন-সংযোগের সুফল ফলতে বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু বিদেশীদের অধীনে থেকে জাতীয় নাট্যকলার উন্নতি সম্ভবপর নয় বুঝে অল্প দিন পরেই শিরিবকুমার আবার প্রস্থান করলেন যবনিকার অন্তরালে। তবু ম্যাডানরা হাল ছাড়লেন না, নিয়ে এলেন আর এক জন প্রখ্যাত সৌখীন অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে। কিন্তু তখন ফুটে' হয়েছিল ম্যাডানদের নৌকা। একা নির্মলেন্দু তাকে সামলাতে পারলেন না। হ'ল ভরাডুবি।

কিন্তু ম্যাডানরা বাংলা নাট্য-জগতে রেখে গেলেন স্মরণীয় অবদান। তা হচ্ছে তাঁদের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ে শিরিবকুমার ও নির্মলেন্দুর আত্মপ্রকাশ। ম্যাডানরা নিক্ষেপা ডুবলেন, তীরে তুলে রেখে ছ'টি বয়।

[ ক্রমশঃ ]

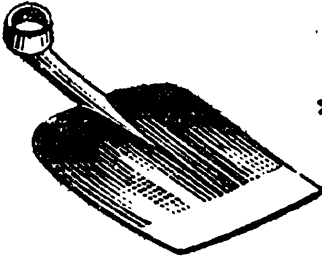


# টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতির সাহায্যে

## খাদ্য উৎপাদন বাড়ে

মজবুত, বহুদিন টেকে ও কাজের পক্ষে জুতসই ব'লে এদেশের চাষীরা  
প্রথমেই বেছে নেন এগ্রিকো যন্ত্রপাতি — চাষের পরিশ্রম সার্থক  
করতে এগ্রিকো তাঁদের চাই-ই।

চাষ বা সের প্রত্যেকটি  
কাজের জন্যই  
এগ্রিকো যন্ত্রপাতি পাবেন



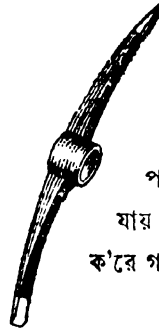
মাথুচী (দক্ষিণ ভারতের কোদাল) :

সোয়ান-নেক ও বারো ছরকম প্যাটার্ণের তৈরী হয়। ধারাল মুখ  
ও জুতসই গড়ন — চমৎকার কাজ পাওয়া যায়।



কোদাল :

প্রযোজন অনুযায়ী পাঁচ রকম  
প্যাটার্ণের পাওয়া যায়। অল্প  
সব এগ্রিকো যন্ত্রপাতির মতো  
এগুলিও পাণ-দেওয়া হাই-  
কার্বন ইস্পাতের তৈরী।



গাঁইতী ও বীটার :

বিভিন্ন কাজের জন্য চার রকমের  
প্যাটার্ণ। মুখের ধাব যাতে না পড়ে  
যায় সেজন্য মুখগুলি খুব শক্ত ও মজবুত  
ক'রে গড়া। খুব টেকসইও বটে।

## টাটা এগ্রিকো যন্ত্রপাতি

টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড

বিক্রয়-কেন্দ্র : ২৩-বি, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা

শাখাসমূহ : বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, আমেদাবাদ, কানপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, বিজয়নগর  
ক্যান্টনমেন্ট এবং জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট



# ফোটো-বাস

ডিরোজিও

শ্রীতারানাথ রায়

কলকাতার ১৫৫ নং লোয়ার সারকুলার রোডের মস্ত তিনতলা বাড়ী। এই বাড়ীতে ১৯৩ বছর আগে (১৮০১, ১৮ই এপ্রিল) জন্মেছিলেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও—বাংলার, মাত্র বাংলার নয়, গোটা ভাবতের বিপ্লবের মন্ত্রগুরু। জ্ঞাতে তিনি বাঙ্গালী—ইউরেশিয়ান। বাবা ফ্রান্সিস ডিরোজিও জেমস্‌ স্কট এণ্ড কোম্পানীর এক্সেলসি হাউসের চিফ একাউন্ট্যান্ট ছিলেন। লুই তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সোফিয়া জনসনের পুত্র। ছয় বছরের শিশু মাকে হারিয়েছিলেন। তখন তাঁর ভাব নিলেন সেকালের কলকাতার প্রবীণ শিক্ষাগুরু ডেভিড ডামও। স্থলে আট বছর—মাষ্টারদের প্রিয়তম—সহপাঠীদের সন্ধার। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তেনরীর বয়স যখন চোদ্দ বছর, তখনই পিতাব ফাৰ্থে তাঁকে চাকুরী নিতে হয়েছিল। খুড়ো আর্থার জনসন ছিলেন তারাপুর নীলকুঠির (ভাগলপুর) মালিক। হ'বছব কোরাগীগিরি করে লুই খুড়োব নীলকুঠিতে গিয়ে কাজ করতে লাগলেন। কলকাতার চাইতে তারাপুর তাঁর ভাল লেগেছিল। পল্লীর মনোরম দৃশ্য, পাখীর গান, উদার মাঠের খোলা হাওয়া—তাঁর ভাল লাগত। সব চাইতে ভাল লাগত গঙ্গার কুল-কুল গান। তারঙ্গের সে গান বালকের মনের কবি কান পেতে শুনত।

তখন থেকেই লুই কবিতা লিখে 'জুভেনিস' ছদ্মনামে কলকাতার পত্রিকাগুলোতে পাঠাতেন। কবি 'জুভেনিসের' তখন বেশ নামডাক হয়েছিল। এক বছর ভাগলপুরে থাকা। নীলকারদের নিখমতা তাঁর মুক্ত মনকে পীড়া দেয়। ভাল লাগে না। নিপীড়িতদের আর্ন্তনাদ তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে। লুই নীলকর খুড়োর গোলামীতে ইস্তফা দিয়ে ফিরলেন কলকাতায়। যে কবিতাগুলো ছাপা হয়েছিল তাই নিয়ে এক-খানি কাব্য-গ্রন্থ ছাপতে ব্যস্ত রইলেন 'লুই'। প্রথম কবিতার বই যখন বেঙ্গল তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তেরো। এই সত্তেরো বছরের ছেলেই হিন্দু কলেজে—স্নাত্তকেব প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ মাষ্টারের চাকরী পেলেন (১৮২৬, নভেম্বর)। বেতন মাসে ১৫/- টাকা। কলকাতার হিন্দু কলেজের এই খুদে ফোর্থ মাষ্টারের প্রথম কাব্য-গ্রন্থের প্রশংসা করল বিলিতি পত্রিকাগুলো পর্য্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কলেজে তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন, তরুণ হিন্দু ছাত্ররা তাঁর চার পাশে ঘিরে দাঁড়াল।

অদ্বুত পড়াতে ডিরোজিও। বাইরের কবিতার ছাঁদে তাঁর প্রধান কবিতা 'ককিব অব জাজিবা' ছাত্রদের মুখে-মুখে। ছাত্রদের শোখাবার কৌশল তাঁর এমন অভিনব ছিল যে, প্রেসিডেন্সীর গুরুগম্ভীর মাষ্টাররা তাঁকে হিংসে করতে লাগল।

ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব। তারই প্রভাব পৃথিবীর ছড়িয়ে পড়েছে। বিপ্লবের প্রভাব প্রত্যেক তরুণের অন্তরে উত্তেজনা এনেছে। সেই সময় সমাজ ও রাষ্ট্রের শেকল ভাঙ্গবার মন্ত্র দিয়েছিলেন ডিরোজিও। মন্ত্র পেলেন তাঁর তরুণ ছাত্ররা—বৃক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, হরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারজন মুখোজ্জ, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী।

বাংলায় তখন ইংরেজকে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনে সাহায্য করছে যেমন বাঙ্গালী মাতঙ্গররা, সমাজের অর্থনীতিক ও ধর্মের কাঠামো চূর্ণ করার জন্তুও সাহায্য করছে ইংরেজ পাদরী ও তাদের বাঙ্গালী তাবদাব ও বন্ধুরা। হিন্দুয়ানী নষ্ট করা ইওদের উদ্দেশ্য ছিল; বিদেশী লুণ্ঠনকারীদের শাস্তা করার বৃদ্ধি কেউ দিচ্ছিল না। ২০ বছরের কিশোর ডিরোজিও কিন্তু বিপন্ন দেশের দিকেই নজর দিয়েছিলেন।

ডিরোজিও এ জন্তে মাণিকতলাব বাগানে তাঁর ছাত্র-বন্ধুদের নিয়ে যে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন করেছিলেন, তোমরা যাকে 'ডিবেটিং ক্লাব' বল, ভারতে বোধ হয় এই প্রথম ক্লাব। ডিরোজিও তাঁর বৈকালী পত্রিকা 'দি হেম্পারাস' প্রকাশ করলেন, তাঁর ছাত্র-বন্ধুদের পত্রিকা 'দি এনকোয়ারার' প্রকাশে সাহায্য করতে লাগলেন। সেদিন ডিরোজিও টম পেনের "এজ অব রিজন্", "রাইটস্ অব ম্যান"র ভাবে বাংলার তরুণদের উৎসুক করা হত। পাদরীদের পত্রিকা 'জ্ঞানাবেশণ', আর রামমোহন রায়ের 'রিফর্মার' বইই খৃষ্টান-আলোকে দেশের দুঃখ দূর করার স্পষ্টী কল্পক না কেন, তরুণদের মুখপত্র 'এনকোয়ারার' স্পষ্ট ভাবায় বলেছিল—"যা ভাল বুঝব, মন বা বলবে সত্যি তাই করব।" তারা বলল—"We have blown the trumpet and we must continue to blow on"—আমরা তুর্ধ্যধ্বনি করেছি—তুর্ধ্যধ্বনি করেই চলব। ৮০ বছর পর মাণিকতলার বাগানে যে ঘোমার বস্ত্রনিদাদ হয়েছিল, ডিরোজিওর শিষ্যদের তুর্ধ্যধ্বনিতে তারই আরাগত।

হিন্দু কলেজে ফোর্থ মাষ্টারী করবার সঙ্গে সঙ্গে ডিরোজিও 'ইণ্ডিয়ান গেজেট'র সাব-এডিটরেব কাজ করতেন। তাঁর শৈশব ভাগ সময় কাটত ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে। দেশেব হৃদশা এ সময় চরম। তাঁরা এ হৃদশার প্রতিকার কি করে হবে তার কথাই ভাবতেন।

ডিরোজিওর এই 'ইয়ং বেঙ্গল' দল কলকাতা তোলপাড় করতে লাগল। ওরা হিন্দুয়ানী মানে না, খৃষ্টানী মানে না, পুরোনো কোন কিছুই মানে না—মানে মাত্র অস্তরের বিবেক আর বাইরের মাতৃভূমি।

এতে হিন্দু কলেজে অভিভাবকরা ছেলে পাঠাতে শঙ্কিত হল। কলেজের পরিচালকরা ভীত হলেন। ডিরোজিওর কৈফিয়ৎ তলব করা হল। সত্যি কথা বলবার স্পষ্টী কারো নেই। অভিযোগ—তুমি সবাইকে শুনিয়ে বলেছ, ভগবান নেই।

ডিরোজিও অকাটা জবাব দিলেন। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও কলেজের ডিভিটার জবাবে খুশী হলেন। কিন্তু কলেজের পরিচালকরা হৈ-চৈ করতে লাগল। ডিরোজিও পদত্যাগ করলেন।

তাঁর ছাত্রবন্ধুরা সেদিন কি করেছিল জানা নাই। একাডেমীর বৈঠক তার পর কিছু দিন চলেছিল। কলেজ ছাড়বার পর ডিরোজিও "দি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মাতৃভূমি তাঁর কাছে আরও অনেক আশা করেছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মাত্র তেইশ বছর বয়সে (১৮৩১, ২৬শে ডিসেম্বর, সোমবার) কলকাতার তিনি মারা যান। বন্ধুরা তাঁকে কলকাতার সাউথ পার্ক স্ট্রীটের কবরখানায় সমাধি দেয়।

## বুইক গাড়ীর স্রষ্টা

জয়ন্তকুমার ভাট্টা

ডেভিড বুইক ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এক অখ্যাত সহবে জন্মগ্রহণ করেন। মেকানিক হিসেবে অতি কষ্টে দিন গুজরান যখন অসম্ভব হোল, নতুন দেশে নতুন করে ভাগ্য পরীক্ষার সংকল্প নিয়ে বুইক আমেরিকায় পাড়ি জমানোর জন্ত প্রস্তুত হতে লাগলেন। সে হোল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই বছরই বসন্তে তিনি খবর পেলেন ডেট্রয়টবাসী এক দূর্ব-সম্পর্কীয় আত্মীয় তার নামে কয়েক শত ডলার রেখে স্বর্গগত হয়েছেন। এই অপ্রত্যাশিত সম্পত্তির দাবী-দাওয়া জানাতেও তাঁকে যেতে হবে আমেরিকায়। শুরু হোল নতুন জগতে নতুন জীবনের গোড়া-পত্তন। কিন্তু ডেট্রয়টে যে সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডেভিড, তাদের ঘরের মত তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। দু'হাতে পয়সা লুঠ করার দিন বহুদিন আগেই গত হয়েছে আমেরিকায়। সে সব দিন এখন গল্পকথায় এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সহজে দমবাব পাত্র ডেভিড ছিলেন না। ছোটখাট একটা লোচাব কারখানা কেনার সুযোগ আসতেই বাঁপিয়ে পড়লেন তাকে। কিন্তু কারখানা-জাত মাল স্থানান্তরে পাঠানোর সমস্যা ভাবিয়ে তুলল তাঁকে। কারখানার মাল বেচে দু'পয়সা যা হাতে আসে, ঘোড়ার গাড়ী করে মাল আনা-নেওয়া করতেই তা খরচা হয়ে যায়। ব্যবসায় লাভ করতে হলে এই মাল আনা-নেওয়ার খরচা কমাতেই হবে। ডেভিড অবসর সময়ে Combustion Engine নিয়ে গবেষণা চালাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেল। এর মধ্যে এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়নি যেদিন তিনি আট ঘণ্টার কম খেতেছেন। এক দিনও কাজে ছুটি নেননি তিনি—এমন কি রবিবারেও নয়। এই ভাবে কঠোর পরিশ্রম এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কাগজে-কলমে স্বল্প খরচায় চলাচলোপযোগী একটি 'ইন্টারনাল কমবাসশন এঞ্জিনের' (Internal Combustion Engine) খসড়া তৈরী করলেন। এবার এই খসড়া-পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। আবও একটি বছর কাটল অর্থাৎ ডেভিডের 'বুইক এঞ্জিন' আবিষ্কার সম্পূর্ণ হোল। আবেও এক বছর পরে ডব্লিউ, সি, ড্রাফ্ট নামক এক জন অংশীদারের সহযোগিতায় বুইক মোটর কম্পানী স্থাপিত করলেন। অল্প ত্রুটি দ্রুতগতিতে কারখানার কাজ অগ্রসর হতে লাগল। বুইকের এত দিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

কিন্তু কথাই বলে, মানুষ ভাবে এক আর হয় আর। ঠিক যে সময় সবে লাভ হতে শুরু হয়েছে, ব্যবসায় এবং মূলধনের টাকা ঘরে ফিরে আসার উপক্রম হয়েছে, সেই সময় বুইক সাংঘাতিক অসুখে পড়লেন। প্রথম তিনি ডেট্রয়ট ছেড়ে যেতে রাজী হননি, কিন্তু ডাক্তারেরা তাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বাস্থ্যবোধে যেতে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। বুইক শেষ পর্যন্ত বাধ্য হলেন ডাক্তারের উপদেশ মেনে নিতে।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ায় বুইকের স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল—ডেট্রয়টে আবার ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ আবার নতুন করে

আক্রমণ হোল রোগের। আবার তাঁকে শয্যা নিতে হোল। এবার কিন্তু দ্রুত উন্নতি আশাও সন্দেহপরাহত হোল। রোগের খরচ চালাতে এত দিন বুইকের মূলধনে হাত পড়েনি। কিন্তু বসে থেলে কুবেরেরও ধন ফুরিয়ে যায়—জমান টাকা ক্রমশঃ তলানিতে এসে পৌঁছতে লাগল। বুইক একের পর এক কারখানার শেয়ার বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রোগের মাণ্ডল জোগাতে কাবপানার সমস্ত শেয়ার বিক্রী হয়ে গেল বুইকের! কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা হোল, স্বাস্থ্যের অবস্থাও ক্রমশঃ ভালোর দিকে যেতে লাগল—বুইক দ্রুতস্থায়ী ফিরে পেলেন আবার। কিন্তু ইতিমধ্যে পথের ধূলায় এসে দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। যে বুইক গাড়ীর সঙ্গে তাঁর নাম চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হয়ে গেছে—সে-নাম এখন তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে উঠল। এমন কি পুরোনো মডেলের একখানা পুরোনো বুইক কেনার মত সজ্জিতও নেই তাঁর।

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল বুইকের। সেই সাক্ষাৎকারে একটি মর্মস্পর্শী বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে কাগজে :

—‘আমার প্রাক-জীবনের প্রায় প্রত্যেক বছর দুয়াবে দুয়াত ধর্ণা দিয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকে আজ কোড়পতি। তাঁদের অনেকে পরোক্ষ ও অপোক্ষ ভাবে আমার আবিষ্কারের দ্বারা সেই অ উপায় করেছেন। আমি তাঁদের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইনি—চেরো কাজ। কিন্তু তাঁরা আমায় দেখে দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন। বৌকী দশ ডলার দিতে রাজী হয়েছেন কেউ-কেউ। কিন্তু আঁ তো দয়া বা ভিক্ষার প্রত্যাশী নই। গতর খাটানোর মত আঁ আমার যথেষ্ট শক্তি আছে। আমার বয়সের লোকের পক্ষে ভবিষ্যৎ সৎকে হতাশা অত্যন্ত কষ্টকর নয় কি?’

এই সাক্ষাৎকারের কথা কাগজে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কম্পানী অনেকে তাঁর একটা ব্যবস্থা করার সাধু সংকল্প প্রকাশ করলে কিন্তু সংকল্প সংকল্পই রয়ে গেল—বাস্তবে আর তা পরিণত হ উঠল না।

অবশেষে যে লোক সহজেই কোড়পতি হতে পাবত, সে সওদা-অফিসে কেরানীর চাকুরী নিতে বাধ্য হোল। বেতন খুবই কম কায়ক্লেপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্গাহ হয় মাত্র। অবসর সময়ে ডো অল্প কাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি যখন চাকুরী দরখাস্ত করেন, তাঁর পরিচয় জানতে পেরে এক জন বিশ্বাসুরে বসেছিল—‘আপনি এই সামান্য মাহিনার কাজের জন্ত দর করেছেন?’

—‘কাজ তো করতেই হবে—না হলে অনাহার মৃত্যু দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন তিনি।

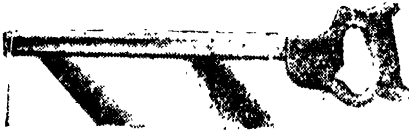
১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই হতাভাগ্য আবিষ্কারক বিদায় নিয়ে পৃথিবী থেকে। যে দরিদ্র অবস্থায় ভাগ্য-পরিবর্তনের অ এক দিন তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন, সেই দরিদ্র অবস্থা তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে পৃথিবীর মাটিতে। তাঁরই পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত বুইক মোটর কাব কম্পানী আমেরিকাব দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান এবং তার মডেলের আজ জগদ্বিখ্যাত।

## করাত

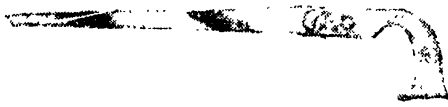
হরকির্পর ভট্টাচার্য



হামেসাই ব্যবহৃত হয় যে কবাত



সোজা কাটিতে হয় যে কবাত



গোলাকায় বস্তু কাটে যে কবাত

মামুস যত বকমেব যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে, তাব মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্যকর আবিষ্কার হল করাত। বনের বড় বড় গাছ কেটে তা থেকে নানা রকমেব আসবাবপত্র, কড়ি-ববগা, দরজা-জালনা, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি কত জিনিষই না তৈরী হচ্ছে! এই সব জিনিষ তৈরীর মূলে আছে করাত। শুধু কাঠ কাটারই নয়, লোহা কাটারও করাত আছে। আজ-কাল প্রধান প্রধান সহরে বৈদ্যুতিক কবাতের ব্যবহার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে।

করাতের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা যায় না, তবে লোহের আবিষ্কারের পরই যে কবাত তৈরী হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে প্রস্তর-যুগ এবং ব্রোঞ্জ-যুগেও না কি করাত ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লৌহ-যুগেই আসল কবাত তৈরী আবম্ভ হয়। গাছ কাটার প্রয়োজনে অনেক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়, তার মধ্যে দুইটি লোকের দ্বারা পরিচালিত খাদ-করাত অন্যতম। গাছেব গুঁড়িকে গর্তের মধ্যে ফেলে ঠেকানো দিয়ে উঁচু করা হয়; তার পর গুঁড়ির তলায় গর্তের মধ্য থেকে এক জন এবং গুঁড়ির উপর থেকে এক জন—এই দু'জনে মিলে করাত চালায়। আজ পর্যন্ত এই কবাতের আকার বেশী বদলায়নি বটে, কিন্তু কার্যকারিতা অনেক বেড়ে গেছে ইম্পাতের উৎকর্ষের ফলে। আজ-কাল বাজারে হরেক রকমের করাত দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই সব করাত তৈরী করা হয়। সাধারণ এক জনে চালানো হাত-করাতই বেশী ব্যবহাব হয়। এর অবশ্য ছোট বড় এবং পাত ও দাঁতের তারতম্য আছে। মোটা শক্ত কাঠ চেরার করাত এক রকম, পাতলা কাঠ চেরার এক রকম—বিভিন্ন জিনিষ তৈরীর জন্য বিভিন্ন রকম করাত। কাঠ গোল ক'বে কাটিতে হলে তার করাত হবে এক রকম। কবাতের পাত ও দাঁত প্রদেশের অসম্বাদী বিভিন্ন রকমের হয়।

শাঁখের করাত আবার দু'মুখো—যেতে-আসতে কাটে। লোহা-কাটা করাত আবার আর এক রকমের। অলঙ্কার বা অস্ত্র ধাতব পদার্থ কাটার জন্য অমুদ্রক করাত আছে। অত্যধিক ব্যবহারের ফলে করাত ভোঁতা হয়ে যায়—সে জন্য সেগুলি অতি সাবধানে শাণ দিয়ে নিতে হয়। যত ক'বে রাখতে পারলে একখানা করাত মাঝা জীবন চলতে পারে।

আজকাল বড় বড় সহরে কাঠ চেরাইয়ের জন্য বৈদ্যুতিক করাত ব্যবহার করা হয়। এগুলি গোল চক্রাকার। বিদ্যুতের সাহায্যে সজোবে ঘূর্ণিয়ে এর দ্বারা বড় বড় গাছের গুঁড়ি চিরে ফেলা হয়। ঠিক স্তম্ভদর্শন চক্রের স্তায় দেখতে এই করাত। সাধারণতঃ এক জনের ব্যবহারের জন্য হাত-কবাতই বেশী কাজে লাগে। এব পাত হাতলেব দিকে একটু মোটা এবং বেশী চওড়া থাকে। এক তাতে একবার সামনের দিকে এবং একবার পিছনের দিকে কবাত ক্রমাগত চালাতে থাকলে কাঠ আপনি চিরে যায় এবং কাঠেব গুঁড়াগুলি দু'দিক দিয়ে ঝবে পড়ে। হাতকা কাজের জন্য যে সব করাত ব্যবহাব হয়, তাব পাত খুব পাতলা এবং দাঁতগুলিও তদনুসারে। করাত চালান বড় কঠিন কাজ। দেখলে মনে হবে, এত সহজে কাঠ চিরে যাচ্ছে, এ অনাস্থ্যসেই ক'বা যায়। কিন্তু করাত হাতে নিয়ে চালাতে গেলে আনাড়ী লোকে হয়ত কবাত ভেঙ্গেই ফেলবে। কবাত চালান একটি বিশেষ শিল্পকাব্য, নিপুণ শিল্পী না হলে কবাতের কাজ সম্ভব নয়।

## কিছুক্ষণের ভ্রমণ

বুমুর দ্বায়

টাইগার হিলে যাওয়া হইবে। খুব ভোরে উঠিয়া নির্জন পথ দিয়া যাইয়া আমবা মোটেবে চড়িলাম। একটি মোটেবে বাবা, আম এবং অস্ত্র একটি মোটেবে প্রীতি পিসী, কিরণ পিসী উঠিলেন। মাঝে মাঝে অস্ত্র গাড়ীটি খাবাপ হইতে থাকে। তখন প্রায় চারটা। ভোরেব আলো দেখা দিয়াছে। পথের দুই ধারে ঘন গাছের সারি। গাড়ী ধুম ধেন পার হইয়া অনেক উঁচুতে উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী টাইগার হিলে পৌছিল। নামিয়া দেখিলাম, অনেক গাড়ী দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। আমবা সকলে যোবানো পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। উঠিতে কাহারও কাহারও কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা টাইগার হিলেব উচ্চতম জায়গায় একটি গোল ঘরের ছাদে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, অনেকে সূর্যোদয় দেখিতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা বেঙ্কের উপর দাঁড়াইয়া আকাশে রামধনুর রঙ দেখিতে লাগিলাম—হঠাৎ সূর্যোদয় হইল। দূরবীণ দিয়া দূরে এভারেষ্টের চূড়া দেখিতে পাইলাম। টাইগার হিল হইতে শিলচল লেকে গেলাম। দু'টি বাধানো পুকুরের মত দেখিলাম। শিলচল হইতে দার্জিলিং সহরে জল আসে। শিলচল লেক হইতে ক্যান্ডেটার ফার্মে গেলাম। ফার্মে শুকর, গরু প্রভৃতি দেখিলাম। একটি বিলাতী বাঁড় ছিল। বাঁড়টিকে দেখিয়া আমার খুব ভয় করিল। বাঁড়টি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। শিলচল হইতে আমরা ঘুম মনাস্থীতে গেলাম। মনাস্থীতে বুদ্ধদেবের একটি স্তম্ভ আছে। আমাদের বাত্মা খুব আনন্দদায়ক হইয়াছিল।

## ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

উজ্জয়িনী ভ্রমণের পর রাণী সেদিন বেশভূষা পরিবর্তন করে প্রাসাদ-কক্ষে ফিরে আসতেই মহারাজ গঙ্গাধর পাণ্ড সত্যাশ্রম তাঁকে বললেন : অলিন্দ থেকে তোমাদের খেলা দেখছিলাম। দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আগের যুগের মারাঠা বীর্যবানদের বণরঙ্গিনী মূর্তিতে বর্ণধাত্রী ! তাঁরাও এমনি কবে সেজে-গুজে ঘোড়ায় চড়ে দেশেব জগ্গে লড়াই করতেন। এখন যেন সে সব স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলি, ইংরেজরা যখন দেশবন্দ্যার ভার নিয়েছেন, আমাদের বলেছেন—তোমাদের কোন ভয় নেই, আরাম করে গদীতে বসে থাক, প্রজারা কলের পুতুলের মতন সেবা করবে ; হাজারিমা কিছু বাধলেই আমরা আছি। কাজেই, এখন আর আগেকার মতন মারাঠা মেয়েদের বণচণ্ডী তোয়ে এ ভাবে মহলা দেওয়া কি ঠিক হবে ? জানো, বেসিডেন্ট এলিস সাহেব রাজ্যের সব খবর রাখেন—তিনি যদি শোনেন যে, তুমি আগেকার মত মেয়ে-পটন তৈরী করে মহলা দিচ্ছ, তা'হলে কিন্তু খুশি হবেন না—তখুনি আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন।

স্বামীর কথা শুনে রাণীর শ্রুতির মুখখানা নিম্নে যেন ঢায়াই কালো হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকলেও তিনি রাজদরবারের প্রতিদিনের খবর সংগ্রহ করতেন। দরবারে কি কি কথা হয়, কে কি বলে, মহারাজের কি বকম মনোভাব—সবই তিনি শাগ্রহে শুনতেন। এর ফলে তিনি ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক দিন দিল্লীর মোগল বাদশা এবং তার পর পুণার পেশওয়াদের যে বিপুল প্রতাপ ছিল, ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা স্বাধীন ভাবে থাকলেও, তাঁদের কাছে সর্দাই মাথা নিচু করে থাকতেন, তাঁদের দৃতকে দেবতার মতন শ্রদ্ধা করতেন ; এখন সে প্রতাপ ও সম্মান কলকাতায় বসে ইংবেজ বড়লাট বাহাদুরই লাভ করছেন। ঝাঁসীর রাজদরবারে এলিস নামে যে ইংবেজ দূত বেসিডেন্টরূপে উপস্থিত থাকেন, তাঁর কি দপদপা ! স্বয়ং মহারাজ পৃথক সিংহাসনে বসেও যেন সর্দা শশব্যস্ত হয়ে থাকেন। অথচ তিনি ইংবেজ সরকারের অধীনস্থ নৃপতি নন—স্বাধীন ও মিত্রবাজরূপে পরিগণ্য। রাণী জেনেছেন, বেসিডেন্ট সাহেব যদি কোন কাজের জগ্গ অজ্ঞায় সুপারিশও করেন, মহারাজ সেখানে অমানবদনে সম্মতি জানিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করে দেন। এই স্বত্রে এমন কতিপয় কাজ হয়েছে, যার জগ্গে রাজ্যের ততবিল ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রজাদের অসুবিধাও ঘটেছে। কিন্তু মহারাজের সেদিকে দৃষ্টি নেই ; বেসিডেন্ট এলিস সাহেবের তুষ্টিতেই তাঁর তুষ্টি। এ সব কথা মনেব মধ্যে বাণী আলোচনা করে মনে-মনেই ব্যথা বোধ করেন—যুগ ফুটে কোন দিন বলেননি মহারাজকে। কিন্তু আজ তাঁর ঘোড়ায় চড়া নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে রাজা বেসিডেন্ট সাহেবের কথা তুলতেই তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ যেন ফাঁ করে কে ভেঙে দিল, আর রাণীর মনের ভিতরে ক্রুদ্ধ কথাগুলি ভড়-ভড় করে বেরিয়ে এল। রাণী বলতে লাগলেন : আমার যখন বিবাহের কথা হয়, তখনই আমি শুনেছিলাম, এক স্বাধীন রাজ্যের রাণী হতে আমি

চলেছি। বিবাহের পূর্ব মহারাজের কাছে আমি এই রাজ্যের যে সব কথা শুনিছি, তা থেকেও বুকেছিলাম, মহারাজ স্বাধীন। কিন্তু এই মাত্র আমাদের যে সব কথা আপনি বললেন, সে ত কোন স্বাধীন রাজ্যের মুখের কথা নয় ! বেসিডেন্ট এলিস সাহেব ইংবেজ রাজ্যের দূত ; ঝাঁসীর স্বাধীন মহারাজকেও যে তাঁর মন যুগিয়ে চলতে হবে—এ কথা যে কল্পনাবৎ অতীত। এক রাজ্যের দূত আর এক রাজ্যের দরবারে থাকেন—নিজেব রাজ্যের স্বার্থ-সুবিধা দেখবার জগ্গ। কিন্তু জানি, মহারাজের দরবারে ইংবেজ সরকারের দূত এমন সব বাচুতি কাজ করেন যাকে অনধিকার চর্চা বলা যায়। অথচ, মহারাজ অমানবদনে তাঁর বেয়াদপি সহ্য করেন। হয়ত এই জগ্গেই আপনি এইমাত্র আমাদের বলেছেন যে, রাজ্যের রাণী মেয়ে-পটন তৈরী করছেন, এ কথা যদি বেসিডেন্ট জানতে পারেন, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবেন। তা'হলেও আমি মহারাজকে নিবেদন করছি, যদি সত্যিই তাই হয়, মহারাজ যেন বেসিডেন্ট সাহেবকে বলেন—বাণীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে, আপনার দেশেব মেয়েরা ঘোড়ায় চড়ে বিলেতের রাজপথে বেড়িয়ে বেড়ায় বাণী শুনেছেন। রাণীর দেশেব মেয়েরা দেশেব স্বাধীনতা রক্ষা করবার জগ্গে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন, এ কথা নিশ্চয়ই বেসিডেন্ট সাহেব শুনেছেন। এ দেশেব মেয়েরা ইদানিং সে পাট তুলে দিয়েছেন বলেই রাজ্যের পূর্ব বাজ্য স্বাধীনতা হারিয়েছে। ঝাঁসীর স্বাধীনতা যাতে বরাবর বজায় থাকে, সেই জগ্গেই

## ডকুনের নতুন ওষুধ নিউট্রল-লাইসাইড

“আমি ‘লাইসাইড’ পাইয়াছি ও ব্যবহার করাই-  
য়াছি। আপনার প্রেরিত ডকুনের ঔষধ বিশেষভাবে  
কার্যকরী। লোকে জানিতে পারিলে ইহার বহুল  
বিক্রয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।...আপনার  
ঔষধের ও ব্যবসায়ের উন্নতি কামনা করি।”

শ্রী কে, কে, দাস ; Rajapalayam, S.I. Rly.

প্রতি প্যাকেটের জগ্গ দুই আনা ডাকটিকেট পাঠাইবেন।

বাংলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় কয়েকটি জেলায় এই  
“লাইসাইড” পরিবেশক প্রয়োজন। উচ্চহারে কমিশন দেবো।

# নিউট্রল

Dept. M. B.

১৯, বগুলা রোড ; কলিকাতা-১৯

ঝাঁসীর রাণী পুরানো পাট বজায় রেখেছেন। তিনি দেশবাসীকে জানাতে চান—ঝাঁসীব মেয়েরা প্রয়োজন হোলে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ঘোড়ায় চড়ে রণস্থলে পাওয়া করবে—রাণী থাকবেন তাদের আগে !

কথাগুলি শুনতে শুনতে মহারাজ গঙ্গাপুর অবাক বিষয়ে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিছুক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও নির্গত হলো না। যে-সব কথা তাঁর দরবারের বিচক্ষণ অমাত্যগণও মহারাজের সম্মুখে বলতে সাহস পান না, বরং প্রভুব তুষ্টি-বিধানের জ্ঞাত প্রতিবাদ কবতেও কুচিৎ, রাণী কি না অসজ্ঞাচে অপ্রীতিকর ছেনেও তাঁর মুখের 'উপরেই' এ ভাবে বিষবর্ষণ করে গেলেন ?

মহারাজকে নিরুত্তর দেখে বাণী এবাব কোমল কণ্ঠে বললেন : আমার কথাগুলি হয়ত অপ্রিয়, কিন্তু অজায় নয়। যে সব কথার পিছনে সত্য নেই, আমি তা বলি না।

মহারাজ মুহূর্তে বললেন : আমি জানতাম, তুমি অন্দরমহল, পড়াশোনা আর খেলাধুলা নিয়েই থাক ; দরবারে সব ব্যাপার নিয়েও তুমি যে চিন্তা কব, আমায় তা জানা ছিল না।

রাণী বললেন : আমি ত শুধু গৃহিণী নই—আমি যে আপনার রাজ্যের রাণী। সহধর্মিণী বলেই আপন আমাকে মন্ত্র পড়ে গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যের কথাও আমাকে জ্ঞাতে হয়।

মহারাজ এখন গলাব স্বব গাঢ় কবে বললেন : বেসিডেন্ট সাহেবের কথা তুলে তোমাকে ও-কথা বলা হয়ত আমায় উচিত হয়নি, কিন্তু তুমি যা বললে—বেসিডেন্টের মন খোঁচাতে বাজো এমন কাজও আমি কবেছি, যার জন্তে তহবিলের ক্ষতি এবং প্রজাদের অনিষ্ট হয়েছে—এমন একটি ঘটনায় কাজের কথা তুমি বলতে পার ?

রাণী কিছু মাত্র চিন্তা না কবেই বলে উঠলেন : ঠাা মহারাজ, সেট একটি কথা থেকেই আমার সব কথা প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি নির্ভয়েই বলছি, শুনুন—লালা মৌরচাঁদ আর শেঠ মদনলাল, এই দুই ব্যক্তিকে আপন নিশ্চয়ই জানেন। এরা দু'জনেই ইংরেজের আমদানী। বেসিডেন্ট সাহেব আপনাকে জানানলেন—মৌরচাঁদ ভারি হুঁসিয়ার লোক, ঝাঁসী বাজ্যে কতকগুলো আফগান জায়গীরদার আছেন, মৌরচাঁদ তাদের সবাইকে বাধ্য করবার কলকাঠি জানে। ওরা প্রায়ই রাজ্যে কামেলা বাধায়। তা ছাড়া, হিন্দু জায়গীরদাররাও মৌরচাঁদকে মানবে। তার কাবণ, মৌরচাঁদের তাঁবেয় অনেক জঙ্গী লোক আছে, আর ইংরেজ সরকারও ঐ খুব খাতির। অতএব মৌরচাঁদকে বাতাল কবা হোক। মহারাজ এ কথা শুনেই আপ্যায়িত হয়ে গেলেন, তখন ইংরেজের ঐ হাতের পুতুলটিকে মোটা টাকা তংখা দিয়ে বাতাল কবলেন। অথচ, কোন প্রয়োজনই ঐ ছিল না। বছর সাপিয়ানা ছয় লাখ টাকা লালা মৌরচাঁদকে ঝাঁসীর তহবিল থেকে দিতে হয়। এবই সঙ্গে সঙ্গে হাজির করলেন আপনার বেসিডেন্ট শেঠ মদনলালজীকে। এ লোকটা যেমন টাকার কুমার, তেমনি ইংরেজদের চাটুকার এক দালাল। নানা রকম ব্যাপারে রাজ্যের খরচ বাড়াবারই পরামর্শ দেন ঐ বেসিডেন্ট

মহারাজকে ; টাকার অভাবের কথা সেরেসা থেকে উঠলেই তখন বেসিডেন্ট সাহেব ঐ শেঠ মদনলালজীকে দেখিয়ে দেন। চড়া শুদে কর্জ নিয়ে মহারাজ সেই খরচ মিটিয়ে ঠাফ ছেড়ে বাচেন। কিন্তু রাজ্যের ক্ষণ যে দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে, সে কথা মনে করেন না কোন দিন।

রাণীর আগের কথাতই মহারাজ বিষয়াভিভূত হয়েছিলেন, এখন লালা মৌরচাঁদ ও শেঠ মদনলালের কথা শুনে বিষয়ের উপর বিষয়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। রাণীর এই স্পষ্ট কথা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনের বিচিত্র আভা তাঁরও মনেব উপর এক অদ্ভুত আলোকপাত করল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহারাজ বললেন : তোমার কথা শুনে আমি সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছি রাণী ! যে ঘটনার কথা লোকমুখে শুনে তুমি তা থেকে তলিয়ে তলিয়ে এত কথা ভেবেছ, আমরা সে ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষিষ্ট থেকে এমন করে কোন দিনই ভাবিনি। তবে, তুমি যে অনুমান করেছ, তা যে মিথ্যে নয়, অধুনা নানা সূত্রে আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। এখন মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে তখন যদি পরামর্শ করতাম, তা'হলে হয়ত এ ঘটনা ঘটতে পেত না। কিন্তু এখন সত্যিই নিরুপায় হয়ে পড়েছি। লালা মৌরচাঁদ যে ভাবে রাজ্যের বুকে চেপে বসেছে, তাতে ওকে সবাবার জন্তে হাত বাড়ানো মানাই, সে হাত ইংরেজ বেসিডেন্ট সাহেবের উপরে চালানো। তাব পব, শেঠ মদনলালজীর কাছে আমাদের দেনাও কম নয়। ওকে বিদেয় করতে হলে সমস্ত দেনা-পর ওর চুকিয়ে দিতে হয়। কিন্তু তহবিলে এখন টাকার অভাব।

বাণী বললেন : টাকার যখন অভাব, তখন বাড়তি খরচ কমানোই আগে উচিত। অন্দরমহলে থেকেই আমি দেখতে পাই, ব্যবস্থাসে মহারাজের এত বাড়তি খরচ, যাকে অজায় বা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ও-সব দিকে কারুর লক্ষ্যই নেই। কিন্তু মহারাজ যদি অন্দরমহলের হিসাব দেখেন ত সত্যিই অবাক হয়ে যাবেন। আমার আগে যে খবচ হোত, আর আমি এসে সমস্ত অন্দরমহল হাতে নেবার পব দেখবেন খবচ কত কমে গেছে। অবিশিষ্ট, আমার আমলে কোন কোন কাজে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু যে খরচ কমানো হয়েছে—তার তুলনায় এ খরচ কিছু নয়। আমি যে সব বাড়তি খরচ কবে চলেছি—সেগুলো বাজে নয়। তাতে অনেক লোক খেতে-পবতে পাচ্ছে, আর রাজপুত্রীরা জীবুদ্ধিও হচ্ছে।

মহারাজ বললেন : আমি আগেই সে-সব জেনেছি। আর সে কথা আমি বার-মহলেব কর্তাদেরও বলেছি। বেশ, এখন থেকে আমি সব বিষয়েই তোমার সঙ্গে পরামর্শ কবে চলব রাণী, তোমার মঞ্জুরী ছাড়া এব পব কোন কাজই করব না।

মনে মনে তরুণী বাণী ঐ কামনাই করছিলেন, তিনি যেমন নামে বাণী, তেমনি কাজেও যেন সত্যিকার রাণী—মহারাজের বাগ্যা সহধর্মিণী হতে পাবেন। তাই কথাগুলি শুনেই মাথা নিচু করে মহারাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম কবলেন। এই দিন থেকেই রাণী লক্ষ্মীবাদি হলেন মহারাজ গঙ্গাপুরের প্রকৃত সচিব। এখন থেকে তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্যও অনেক বেড়ে গেল।

[ ক্রমশঃ।

আপনার  
নিষ্পন্ন মুখরোগ  
নিয়ন্ত্রণ রাখতে

এই দু'ভাবে  
যত্ন নেবেন



মুখখানি ফরসা ও মল্লণ রাখতে হলে দুটি ক্রীম  
আপনার চাই-ই—একটিতে ময়লা কাটবে, অপরটি মুখশ্রী নিখুঁত  
বাখবে। বাত্রিতে মাখবেন ত্বক্ নিষ্পন্ন রাখার জন্ত সুমিশ্রিত তৈলাক্ত  
ক্রীম—পণ্ডস কোল্ড ক্রীম। আর দিনের বেলায় রঙ-কালো-করা শূখ্যালোক  
থেকে মুখশ্রী বাঁচানোর জন্তে মাখবেন সূর্যকটিল হাঙ্কা একটি ক্রীম—পণ্ডস  
ভ্যানিশিং ক্রীম।

আপনার 'রূপচর্চায়' এই নিয়ম মেনে চলুন:



রোজ রাতে  
ত্বক্ নিষ্পন্ন করার জন্ত সারা মুখে  
পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মেখে মালিশ  
ক'রে বসিয়ে দিন। তাতে লোম-  
কূপের সমস্ত ময়লা বেরিয়ে  
আসবে। তারপর মুছে ফেলেলেই  
মেখেবেন, মুখখানি কেমন উজ্জ্বল  
ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

রোজ ভোরে  
হাঙ্কা ভাবে পণ্ডস ভ্যানিশিং  
ক্রীম মেখে মুখশ্রী নিখুঁত রাখুন।  
এ মাখবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে  
যাবে কিন্তু অদৃশ্য একটি সূক্ষ্ম  
স্তর দিনভোর রঙ-কালো-করা  
শূখ্যালোক থেকে মুখশ্রী অগ্নান  
রেখে দেবে।

পণ্ডস

একমাত্র কনসেশ্যনেসার্স :  
জিওফ্রে ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ  
বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ।

# দাঁড় মোচন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তখন ওরা থাকত দোতলা তেতলায়, আর ভূপেনরা ছিল ওদেরই একতলার ভাড়াটে। তমুশ্রীর বাবা হাজার টাকা মাইনে পেতেন আর ভূপেনের বাপ কোথায় কেরানীগিরি করতেন দেড়শো টাকা বেতনে।

পদমর্যাদার তফাৎ থাকলেও তমুশ্রীর বয়েস তখন পনেরো, আর ভূপেনের বয়েস আঠারো। অর্থাৎ যে বয়সে মেয়েরা বীর-পূজা করতে শুরু করে আর যে বয়সে কিশোরী তার দেহে-মনে অমুভব করতে থাকে পৌরুষের প্রথম উদ্ভাপ। আই এম সি ফেল করা ভূপেনের সেই পুরুষ মূর্তি ম্যাট্রিক পড়া তমুশ্রীর চোখে পড়ল পাড়ার সরস্বতী পূজা উপলক্ষে। গেম্বী আর সাদা প্যান্ট পরা ভূপেন জিমনাস্টিক দেখিয়ে যখন সকলের উল্লসিত করতালি কুড়িয়ে নিলে, সেই মুহূর্ত থেকে একটা নতুন গর্ব আর আধিকারের আনন্দে সমস্ত চেতনা মগ্ন হয়ে গেল তমুশ্রীর। তাদের একতলার ভাড়াটে ভূপেন আজকের এই জনসমাবেশের মধ্যে অনন্ততার গোরবে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে—এই পরম বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কখন যে ভূপেনের ওপর একটা অধিকার বোধ জন্মে গেল, টেরও পেল না তমুশ্রী।

একতলার থেকে দোতলার চুরারোহ সিঁড়িটা দেখতে দেখতে একটা মাত্র ছোট ধাপে রূপান্তরিত হল। মর্যাদার তারতম্য ভুলে গিয়ে, আত্মীয়-স্বজনের দৃষ্টি এড়িয়ে এক দিন বিমুগ্ধ চোখে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ালো স্বপ্নমগ্না কিশোরী আর নবজাগ্রত পুরুষ। তারও পরে একটা বৃষ্টিনামা সন্ধ্যায় প্রায়াক্ষকার সিঁড়ির নিচে ভূপেনের বা হাতেব কান্ডে আঙুলে নিজের আংটিটি পরিয়ে দিয়ে তমুশ্রী বললে, আমি তোমাকে ভুলব না।

কিন্তু পনেরো বছরের কিশোরীর পৃথিবী। সে তো স্বর্ষ ওঠার আগে আকাশে এক পোচ অস্বাভাবিক রঙ, সে তো হালকা কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি-জড়ানো ঘাসের ওপর কয়েক কথা শিশির। কতক্ষণ তার আয়ু? রঙ, কুয়াশা আর শিশিরের শূন্য রূপ একটু পরেই পর আলোয় ছিন্নছিন্ন হয়ে যায়, সাদা জাল হলদে বাড়িগুলোর কৌণিক তীক্ষ্ণতা আন্তে আন্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কালো পীচের পথে চিক-চিক করে উজ্জ্বল মক্ষণ ট্রামের লাইন আর গ্যারাজের দরজা খুলে ক্লিনার যখন গাড়িটা সাফ করতে থাকে, তখন তার চকচকে শরীরটার ওপরে একটা বস্তু দীপ্তি বাক-বাক করতে থাকে।

ট্রামের লাইন আর বাকবাক গাড়ি। ভূপেনের বাবা বাড়ি বদলালে, ট্রামটা কত পেছনে ছিটকে পড়ল কে জানে। আর গাড়িটা তমুশ্রীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলল—আংটি পরিয়ে দেওয়া সন্ধ্যাটা কোথায় যে হারিয়ে গেল জানতেও পারল না তমুশ্রী।

তবু একটা অবচেতন ভয় লুকিয়ে আছে তমুশ্রীর মনে—লুকিয়ে আছে একটা স্মরণোপন আতঙ্ক। সোদনের সেই ‘কাফ-লাভের’ মোহ কবে কেটে গেছে চোখ থেকে—আজ সে কথা ভাবলে কী অদ্ভুত হাস্যকর মনে হয় সে সব। মনে পড়ে যায় ভূপেনের ভুল ইংরিজিতে কথা বলার চেষ্টা, তার

গায়ে বেরাড়া রকমের ছিটের শার্ট, পায়ের ময়লা কেড্‌স জুতো আর চোখের নির্বোধ দৃষ্টি। কী ছিল সোদনের ভূপেনের মধ্যে? কিছুই না। নিজের মনের ভেতরেই সে তাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল—কিছু শারীরিক শক্তির বিশেষত্বে ভরা অত্যন্ত সাধারণ একটি ছেলেকে নিজের বন্ধনার সাম্রাজ্যে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল সে।

জীবনে ওটা একটা অভিজ্ঞতার পর্ব মাত্র, তার বেশি কিছুই নয়। কিন্তু তবু ওই আংটিটা। কিছুই বল যায় না, কোন দিন হয়তো প্রেতের মতো অন্ধকার ঠেলে ওই আংটির অধিকার নিয়ে ভূপেন এসে দাঁড়াবে—কোন দিন হয়তো! আংটির ওপর মিনেতে গোদাই করা তার নামের স্বাক্ষর—হয়তো ওইটে দিয়েই সোদন ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করবে। আঠারো বছর বয়সেই আই এম সি ফেল করে অমন স্বাস্থ্য নিয়ে যে মাথা দাঁড়াতে পারে, তাকে বিশ্বাস নেই!

কিন্তু এ ভয়টাও ফিকে হতে হতে প্রায় মিলিয়ে এসেছিল। মিলিয়ে এসেছিল বারো বছর ধরে। কিন্তু কে জানত, বারো বছর পরে চন্দননগর থেকে কলকাতা ফেরার পথে শ্রীরামপুরে এসে গাড়িটা এমন করে বেকে বসবে, আর কোতুলী জনতার ভেতরে সকলের ওপরে নিজেকে তুলে ধরে প্রশ্ন করবে দীর্ঘকায় ভূপেন : কী—কী হয়েছে?

চন্দননগরে মামাবাড়ি। মামাতো ভাই পুলকের প্রথম ছেলের অন্নপ্রাশন। সোরাংশুদেই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অফিসের জরুরি কাজে কাল সন্ধ্যাতে আচমকা সোরাংশুকে চলে যেতে হল দিল্লীতে।

তমুশ্রী ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। আগে থেকেই পছন্দ করে একটা হার কিনে রাখা হয়েছে, হাতে করে সেটা পৌছে দেওয়া যাবে না—এই দুঃখটা তাকে আরো বেশী পীড়ন করতে লাগল। স্মরণে গাড়িটা নিয়ে নিজেরই পেরিয়ে পড়ল সে।

গোল বাধল ফেরার মুখে। শ্রীরামপুর বাজারে এসে ঠাঁট বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির।

বার কয়েক হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে বার্থ চেষ্টা করে তমুশ্রী যখন ঘর্মাক্ত রক্ত-মুখে উঠে দাঁড়ালো, তখন চার পাশে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। এই সমস্ত আধুনিক মেয়ের গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহসটা যে এমন একটা পরিণতিতে এসেই থামতে বাধ্য—এই জাতীয় একটা তৃপ্ত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে; জনতার চোখে দেখা যাচ্ছে বিক্রম আর কোতুলকের কটাক্ষ।

তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টিতে তাকালো তমুশ্রী। সামনে যে লোকগুলো সব চাইতে বেশী হাসাহাসি করছিল, তাদেরই এক জনকে কঠিন গলায় সম্ভাষণ করলে সে।

—এক জন মোটর যেকানিক ডেকে দিতে পারেন কেউ?

ব্যস্ত যারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, তারা এবারে গৌরবে চরিতার্থ হয়ে গেল।

—হাঁ—হাঁ, এখনি ডেকে দিচ্ছি—

তমুশ্রী বললে, ধন্যবাদ।

কিন্তু সে কথা শোনবার আগেই তিন-চার জন ছোটোছুটি করে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। তমুশ্রী ক্রান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো, তার পর ব্যাগ থেকে যখন ক্রমালটা বের করতে যাবে, এমন সময়ে ভিড়ের মাথার ওপরে ভূপেনের গম্ভীর গলা শুনতে পাওয়া গেল : কী—কী হয়েছে ?

তমুশ্রী চমকে উঠল।

না, ভূপেনকে তখন যে সে চিনতে পারল তা নয়। চারদিকের ক্রোড়াক্ত চাপা গুঞ্জনের মধ্যে ওই কণ্ঠস্বরটা এমন গম্ভীর আর সহজ যে, না তাকিয়ে উপায়ই ছিল না। নগণ্য দীনতার ভিড়ের ভেতরে কোথা যেন পুরুষের আবির্ভাব ঘটল। যেন দেখা দিল সেই পুরুষ—যে কাপুরুষতার আক্রমণের ভেতরে নিজের শালগ্রাম মূর্তি বাড়িয়ে দিয়ে উদ্ধার করে বিপন্ন নারীকে।

—কী হয়েছে গাড়ির ?—তেমনি গম্ভীর সবল গলায় জানতে চাইল ভূপেন।

—এই যে—এক জন মোটর মেকানিক এসে পড়েছে !—সোল্লাস অভ্যর্থনা জেগে উঠল একটা।

—মোটর মেকানিক ?—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভূপেনের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি থমকে গেল তমুশ্রীর। বিকেলের বিষল আলোয় বারো বছর পরে আবার দুজনে দুজনের দিকে নির্বাক চোখে তাকিয়ে রইল। ভূপেনের সেই চওড়া কপাল আর কৌকড়া চুল, তমুশ্রীর পাণ্ডুর বিষল মুখ আর চিবুকে একটা কালো তিল—ভুল করবার অবকাশ নাত্র দিলে না।

বোবা বিশ্বাসে আর স্ফটিক আশঙ্কার খোঁচায় যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল তমুশ্রী। আর ভূপেনের চোখের ওপর শাদা পর্দার মতো কী একটা ছলে উঠল বারকয়েক। কিন্তু ভূপেনই সামলে নিলে আগে। ময়লা হাফ শার্ট আর কালিমাখা পাঞ্জামা-পরা মোটর মেকানিক এগিয়ে এসে সহজ গলায় জানতে চাইল : কী হয়েছে আপনার গাড়ির ?

আপনার গাড়ির। একবার চমকে উঠেই একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল তমুশ্রী। ভূপেন তা'হলে চিনতে পারেনি তাকে। বারো বছর! মাত্র দু'বছরের পরিচয় বারো বছরে মুছে যাওয়া এমন কি অস্বাভাবিক ঘটনা ? প্রথম প্রেমের স্মৃতি মেয়েদের মনে চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে থাকে, কিন্তু পুরুষের বহুবচিত্র জীবনে তা একটা পুরোনো চিঠির মতোই কোথায় চাপা পড়ে যায় যেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কখনো হাতে ঠেকলে খামটা খুলে দেখারও আগ্রহ জাগে না।

বলিষ্ঠ প্রাকৃতিক্যাল মানুষের হাতে ভূপেনই গাড়ির বনেটটা খুলে ফেলল : কী হয়েছে ?

—ঠাট নিচ্ছে না।

কয়েক লহমা তাকিয়েই ভূপেনের অভ্যস্ত দৃষ্টি ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

—পেট্রল-পাইপে ময়লা জমেছে আপনার। তেল আসছে না।

—তা হলে ?

—পাইপ খুলে পরিষ্কার করতে হবে।

—কতক্ষণ লাগবে ?—তমুশ্রীও সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

—দু'ঘণ্টা।

—দু'ঘণ্টা !—তমুশ্রী আঁতকে উঠল।

—যদি বলেন, দশ-বারো মিনিটের মধ্যে কাজ চালানো গোছের করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে ঠিক সুবিধে হবে না। পথে আবার আচমকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে—তখন হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন।

—তাই তো !—বিস্মত মুখে তমুশ্রী তাকালো।

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে দিতে চেষ্টা করব—ভূপেন আশ্বাস দিলে : আপনি গাড়িতে উঠে বসুন, আমরা এটাকে আমার কারখানায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

নিরুপায় আয়ুগমর্পণের ভঙ্গিতে তমুশ্রী গাড়িতে উঠে বসল। সমস্ত মন আতর্ক্যে বলে উঠতে চাইল, আমি অন্য মেকানিককে দিয়ে গাড়ি ঠিক করে নেব—তোমাকে আমার দরকার নেই। কিন্তু কিছুতেই বলা গেল না সে কথা। কোনো অপরাধ নেই ভূপেনের, মেকানিক হিসেবে তার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কোনো পরিচয় এখন পর্যন্ত পায়নি তমুশ্রী। তা ছাড়া একটা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসেছে ভূপেন। বাড়িয়ে দিয়েছে তেল-কালিমাখা পেশীবহুল হাত, অমুমতির জন্তে কিছুমাত্র অপেক্ষা না করেই খুলেছে গাড়ির বনেট। সম্পূর্ণ অপরিচিতের ভূমিকায় এমন একটা সহজ শক্তিতে দেখা দিয়েছে যে, তাকে বাধা দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোথাও।

ষ্টয়ারিংটা আলগা ভাবে ধরে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল তমুশ্রী। আস্তে আস্তে এগিয়ে গাড়ি ভূপেনের কারখানায় সামনে এসে দাঁড়ালো।

একটা পেট্রলের গন্ধ-ভরা কালো ক্রমালে কপাল মুহূর্তে মুহূর্তে ভূপেন এগিয়ে এল। হাসল অপ্রতিভ হাসি।

—দু'ঘণ্টা না হোক, ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবেই। আপনি গাড়িতে বসে থাকবেন এতক্ষণ ?

তমুশ্রী হাসতে চেষ্টা করল : কী করব আর ?

—কিছু যদি মনে না করেন—ভূপেন আবার লজ্জা হাসি হাসল : আমার বাড়ি কাছেই। এই দু'পা আমার স্ত্রী রয়েছেন—ওখানে গিয়েও অপেক্ষা করা পারেন।

স্ত্রী ! তমুশ্রী আবার একটা চমক খেলো। কিন্তু আ এস-সি ফেল করে মোটর মেকানিক হয়েছে বলেই তার ঘ স্ত্রী জুটবে না—এমন একটা প্রশ্ন তোলাই তো অসঙ্গত আজ পাঁচ বছর মাথায় সিঁদূর পরেছে তমুশ্রী, হয়তো তা আগে সংসার বেধেছে ভূপেন। আর—আর কে বলতে প তার দেওয়া সেই ছোট আংটিটি ভেঙে স্ত্রীর গলার হা সজেই মিশিয়ে দিয়েছে কি না শেষ পর্যন্ত।



—আমি না হয় এখানেই বসি—মুহু গলায় তমুশ্রী জবাব দিলে।

—মিথ্যে কষ্ট পাবেন। তার চাইতে আমার বাড়িতেই চলুন।

তমুশ্রী আবার চোখ তুলল। সেই গম্ভীর সবল গলা ভূপেনের। কুণ্ডা নেই তার ভেতর, দীনতা নেই, সংশয়ের জড়তা নেই লেশমাত্রও। একটা শক্তিশালী পৌরুষ—যে পৌরুষকে সে প্রথম অনুভব করেছিল সরস্বতী পূজোর পাণ্ডালে—ইলেকট্রিকের আলোয় চিকচিক করে ওঠা ঘর্ষিত পেশল শরীরে।

সে আকর্ষণের আজো কি কিছু অবশিষ্ট আছে ভূপেনের মধ্যে? তমুশ্রী বঝতে পারল না। কিন্তু রক্ত-কণিকার কেন্দ্রে কেন্দ্রে পনেরো বছরের কিশোরী অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তমুশ্রী নেমে এল।

—চলুন—

কারখানার পেছনে কাঠা দুয়েক পোড়ো জমির পরেই ভূপেনের বাড়ি। বড় বেশি কাছে, অস্বাভাবিক রকমের কাছে। দূরত্ব এত কম যে, এর মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব কোনো কিছু ভেবে নেওয়া যায় না, পুরুষ ভূপেনের মধ্যে কোনো বর্বরের আশ্রয় আছে কি না এবং কোনো একটা রহস্যময় বিভীষিকার মধ্যে টেনে নিয়ে সে চলেছে কি না, এমন কিছু ভেবেও রোমাঙ্কিত হওয়া যায় না। মাঝপথে ইঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মুহূর্তের জতো দ্বিধায় ছলবার সময়টুকু পর্যন্ত দিলে না ভূপেন। তার আগেই ঠক-ঠক করে একটা ঈঁট-বের-করা একতলা বাড়ির সে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিলে বাইশ-তেইশ বছরের একটি কালো-কালো বধু। তার পর তমুশ্রীকে দেখেই পিছিয়ে গেল হুঁপা। ভূপেন বললে, আসুন। গরীবের বাড়ি। কষ্ট আপনার একটু হবেই। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকলে বিব্রত হতেন অনেক বেশি।

কালো বউটি ভাগর চোপের কোঁতুহলী দৃষ্টি একবার বলিয়ে নিলে তমুশ্রীর সম্বন্ধে, তার পর জিজ্ঞাসু বিব্রত ভঙ্গিতে তাকালো ভূপেনের দিকে।

সহজ ভাবেই ভূপেন ব্যাখ্যা করে দিলে : একা গাড়ি নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিলেন। গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, মেরামত করতে দেড় দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। মেয়েছেলে কোথায় বসে থাকবেন, তাই নিয়ে এলাম। তুমি ওকে একটু চা-টা খাওয়াও রমা, গল্প-টল্প করো।

রমা হাসল : আসুন।

ভূপেন বললে, আমি আর দেবী করব না। দেখি চটপট আপনার গাড়িটাকে গায়েস্তা করে দিতে পারি কি না।—ব্যবসায়ীর আয়ত্ত্ব হাসি হাসল ভূপেন, ফিতে-খোলা কাবলী চটিটাকে চটচটিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

রমা বললে, বসুন দিদি—দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

দিদি। তাকিয়ে দেখল তমুশ্রী। না, এখানেও জিততে

পারেনি ভূপেন—জিততে পারেনি তার পৌরুষের জোরে। কালো রঙের গোলগাল একটি বেঁটেখাটো মেয়ে, পানের রসে রাঙানো মুখ। আই-এস-সি ফেল করা ভূপেন বিয়েতেও ফেল করেছে, সরস্বতী পূজোর পাণ্ডালের সেই বীরের বীরাজনা আর যেই হোক—এ নয়।

রমা আবার বললে, ঘরের ভেতরে বড় গরম। বারান্দার এই চেয়ারটাতেই বসুন। এখানে একটু হাওয়া গেলছে তবু।

—বেশ তো—তমুশ্রী বারান্দায় উঠে এল। খান দুই রঙ-ওঠা ময়লা চেয়ার পড়ে আছে, বসল তারই একটাকে টেনে নিয়ে। চায়ের পেয়ালার গোল গোল দাগ ধরা একটা টিপয়ের ওপরে নামিয়ে রাখল হাতের ব্যাগটা।

—এইবার একটু চা করি আপনার জন্তে?—রমা হাসল। খুব সহজেই হাসতে পারে মেয়েটা—সেই সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে হেসে ওঠে চোখ দুটো। এইবার মনে হল বর্ণার জলে জ্যোৎস্না ছলে ওঠার মতো ওই হাসিটুকুই ভূপেনের কন-সোলেশন প্রাইজ, কালো যেদে ওইটুকুই যা রূপালি রেখা।

—এত তাড়া কেন? বসুন না একটু গল্প করি—তমুশ্রী অবস্থাটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করল এতক্ষণে।

—চা-টা আগে নিয়ে আসি, তার পরে গল্প হবে—চোখে-মুখে আবার এক ফালি হাসি বিকীর্ণ করে রমা সামনের ছোট উঠোনটুকু পেরিয়ে আরো ছোট রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

এই তবে ভূপেনের সংসার—এইখানেই এসে তা হলে শেষ পর্যন্ত নীড় বেঁধেছে সে। সন্দেহ কী, তাদের বাড়ির একতলার ঘুয়াটের চাইতে এ অনেক খারাপ। দেড়শো টাকা মাইনের বাপের চাইতে ভূপেনের রোজগার অনেক কম। তা না হলে দুখানা টালীর ঘর, দু হাত বারান্দা আর দশ হাত উঠানের বারো আনা জোড়া একটা পুঁই মাচা নিয়ে সে খুশি হয়ে আছে কী করে?

দড়িতে গামছার সঙ্গে কুলডে ছেঁড়া গেঞ্জী, লুঙ্গি আর ময়লা শাড়ী, একটা ঢাকনা-খোলা বড় টিনের কোটোয় কয়েক শো বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি; পায়ের কাছে হিন্দী ছবির গানের বইয়ের গোটা কয়েক ছেঁড়া পাতা; একটা কুলুঙ্গিতে তোলা গোটা কয়েক আধ ছেঁড়া সিনেমা সাপ্তাহিক; উঠানের একধারে শুপাকার জং-ধরা লোহা-লকড় আর টোল-খাওয়া গোটা দুই নাড়-গার্ড—পুরোনো মোটরের পার্টস্।

এই বাইরের চেহারা—ভেতরের রূপটাও এ থেকেই কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত এইখানেই এসে থেমেছে ভূপেন, তার প্রথম পুরুষ এইখানে এসেই নিজের পুরো হিসেবটা চুকিয়ে দিয়েছে। অথচ! একটা অবাস্তব ভাবনা অकारণে বিদ্রোহের মতো চমকে গেল তমুশ্রীর মনে। সেই পনেরো বছর বয়সের প্রাতিশ্রুতি যদি আজ পালন করতে হত, পালন করতে হত এই সাতাশ বছর বয়সে? রাত দশটায় হয়তো সর্বাঙ্গে কালি মেখে বাড়ি ঢুকত ভূপেন, ওই ইদারার ভাঙা বালুটিটা দিয়ে ঝপ-ঝপ করে জল ঢেলে সারা

করত স্নান, নুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে হুশহাশ শব্দে খেত আধ সের চালের ঠাণ্ডা ভাত, তার পর একটা বিড়ি ধরিয়ে হিন্দী ছবির গানের বই খুলে শুরু করত সুর ভাঁজতে। আর তমুশ্রী—

ভাবনাটা এই পর্যন্ত এসেই থেমে গেল, আতঙ্কে শুরু হয়ে গেল শরীর। ভাগিগাস, পনেরো বছরের প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই—ভাগিগাস বাড়ি বদল করার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেনও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! আরো ভাগ্যে, ভূপেন আজ তাকে চিনতে পারেনি, না—কোনো মতেই না!

কিন্তু আশ্চর্য! নিজের অগোচরেই একটা বেদনা বোধ করল তমুশ্রী: আশ্চর্য! কী করে ভুলতে পারল ভূপেন, যেমন করে এত সহজেই নিমূল করে দিতে পারল বারো বছর আগেকার সেই পোর-নাগা সন্ধ্যাটাকে! এত সংবেদন-হীন পুরুষের মন, এমন সহজেই তার ওপরে জমে ওঠে পলিমাটির স্তর! আর একটু মননসয় হওয়া উচিত ছিল ভূপেনের, নীরবেই শক্ত শরীরটার ভেতরে মেলে রাখা উচিত ছিল আর একটুখানি ফাঁকা আকাশকে। মোটরের কলকন্ডা নাড়াচাড়া করতে করতে কেন এমন ভাবে যান্ত্রিক হয়ে ওঠে মানুষ—নিজের একান্ত মূর্ত-গুলোর জন্তে কেন এতটুকু নিজের জায়গা ফেলে রাখতে পারে না?

আংটিটা। কোনো এক অশুভ মুহূর্তে সেই মারাত্মক অভিজ্ঞান নিয়ে দেখা দেবে, তাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেষ্টা করবে ভূপেন। হঠাৎ এক একটা ঘুম-ভাঙা রাতে সৌরাংশুর পাশে শুয়ে সে দুর্ভাবনাটা পাথরের মতো তার বুকে চেপে বসেছে, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে আচমকা জমে গেছে রক্ত, পিপাসায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলা। কিন্তু বিশ্বাসিতর এই নিশ্চিন্ততার চেয়ে দুঃস্থতির সে নিশ্চিন্তা ছিল অনেক ভালো। সে ভয়ের সঙ্গে ছিল উত্তেজনার একটা চঞ্চলতা, ছিল একটা রোমাঞ্চকর আত্মপীড়নের আনন্দ; কিন্তু নিভাবনার এই শীতলতা স্পন্দিত আতঙ্কের সেই প্রাণটুকুকে নিষ্কর ভাবে গলা টিপে ধরেছে। নিষ্করতা বই কি! হয়তো সত্যি সত্যিই সেই ভাঙা আংটির কণাগুলো নিজের সমস্ত পরিচয় হারিয়ে, বর্ষা সেই সন্ধ্যাটিকে হারিয়ে ওই কালো বউটার ঘামে ভেজা সন্ধ্যারটার সঙ্গে সঙ্গে পেতলের মতো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ উঠে পড়তে ইচ্ছে করল তমুশ্রীর। ছুটে যেতে ইচ্ছে করল বাড়ির বাইরে। কিন্তু তার আগেই দু হাতে ছুটো চায়ের পেয়ালা নিয়ে রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এল রমা।

উঠোনটুকু পার হয়ে রমা এঁগিয়ে আসতে লাগল। তমুশ্রী তাকিয়ে রইল তার চওড়া-পাড় লাল শাড়িটার দিকে—সীমাস্তরীণ স্বামি-সোভাগ্যের প্রতীক। সোভাগ্যই বটে! এত সহজেই যে ভুলে যেতে পারে, যার জীবনে বিশ্বাসিতর আবির্ভাব ঘটে এমন হৃদয়হীন অবলীলায়, তার গৃহিণী হতে পারা ভাগ্যবতীর লক্ষণ সন্দেহ কী! কিন্তু আজ যদি হঠাৎ দ্বারা যায় রমা? পেশলদেহ স্থল-মস্তিষ্ক মোটর মেকানিক

ভূপেন কত দিন বিরহ-বিলাপ করবে তার জন্তে? ছ' মাস—এক বছর? তার পর এই রকম আর একটা কালোকালো মেয়ের কপালে সিঁদুর পরিবে ভূপেন তাকে ঘরে আনবে, এই বউয়ের হার ভেঙে তার জন্তে নতুন করে চাঁড় গড়িয়ে দেবে। ভূপেনরা এই-ই করে, এই-ই ভূপেনদের নিয়ম।

টিপসটার ওপরে সস্তার পেয়ালাটা নামিয়ে দিলে রমা। হাতলের নিচে কালো ময়লার রেখা—কালচে চায়ের রঙ। চুমুক দেবার প্রবৃত্তি হয় না।

কাঠের একটা চৌকি টেনে নিয়ে নিজের পেয়ালা হাতে রমা পাশে এসে বসল।

—টা নিন দিদি! দুখানা বিস্কুট দেব?

—না-না, কিছু দরকার নেই। অনেক খেয়ে বেরিয়েছি, এখন আর কিছুই খেতে পারব না।

রমা চুপ করে রইল। একবার ভীক ভীক চোখে তাকিয়ে নিলে তমুশ্রীর দামী শাড়িটার দিকে, তার প্রসাধন-মার্জিত পরিচ্ছন্নতার ওপর। যেন ব্যবধানটার পরিমাপ করে নিলে। তার পর কী বলতে গিয়েও থেমে গেল—যেন কী বলা উচিত ঠিক করতে পারল না।

চায়ে একটা চুমুক দিয়ে তমুশ্রী পেয়ালাটা নামাল। কপালে মস্ত একটা জলজলে সিঁদুরের টিপ মেয়েটার। সোভাগ্য—স্বামি-সোভাগ্য! হঠাৎ ভূপেনের ওপর অর্থহীন ক্রোধে মনটা তিক্ত হয়ে উঠল তমুশ্রীর। এর চাইতে উজ্জ্বল, এর চেয়ে তীক্ষ্ণধার কারো আবির্ভাব কি ভূপেনের জীবনে অসম্ভব ছিল? বলা যায় না—তেনন কেউ এলে হয়তো আরো একটু উদ্বেগ উঠতে পারত ভূপেন, হয়তো নুঙ্গি পরে মিনেমার গান গাওয়ার চাইতে আরো একটু পরিমার্জিত পরিশীলিত হওয়া অসম্ভব ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু—

—আপনি কি কলকাতাতেই থাকেন?—রমার দ্বিধাজড়িত জিজ্ঞাসা।

—হঁ।

—ও।—রমা আবার চুপ করল।

পুঁইমাচার ওপরে একজোড়া চড়ুই পাখি এতক্ষণ তমুশ্রীকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল, এবার সে রমার দিকে ফিরল।

—আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?

বাপের বাড়ির প্রশ্নে রমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল কথা বলবার মতো সহজ কিছু যেন খুঁজে পেল সে।

—দুর্গাপুরে—বর্ধমান জেলায়।—রমা সাগ্রহে জানা চাইল: আপনি দুর্গাপুরে গেছেন কখনো?

—না।

—যাবেন একবার। ভারী সুন্দর জায়গা—রমা গাি হয়ে উঠল: নদী আছে, শালবন আছে। আর ধানের ক্ষে মাঠের পর মাঠ জুড়ে ধান—তার আর শেষ নেই।

—বাঃ—খুব সুন্দর তো!

—হাঁ, খুব সুন্দর। যখন ধান পাকে, কী যে চমৎক লাগে দেখতে! কিন্তু এখন তার অর্ধেক নষ্ট হয়ে গে

সেই যে মিলিটারীরা এসেছিল না আমাদের দিকে? সব একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। আমাদেরও দেড়শো বিঘে ধানী জমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল—এখনো কেরং পাওয়া যায়নি। তার ওপর পড়ে আছে ওদের ভাঙাচুরা ঘর, লোহা-লকড়, এরোপ্লেনের টুকরো—এই সব!

—ওঃ!—তমুশ্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে প্রায়! বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে নামছে উঠানে। আর কতক্ষণ—কতক্ষণ তাকে বসিয়ে রাখবে ভূপেন? এই সংকীর্ণ টালীর ঘরের আরো সংকীর্ণ বারান্দায়—চুর্গাপুরের ধানক্ষেতের মতোই এই শ্যামল সাধারণ মেয়েটার পাশে?

ঘরের ভেতর থেকে একটা গৌড়ানির আওয়াজ এল।

—ও কি!—চমকে উঠল তমুশ্রী।

—ছেলেটা!—রমার মুখে বিস্ময়তার ছায়া পড়ল : জ্বরে ভুগছে।

ছেলে! তা হলে ছেলেও হয়েছে ভূপেনের। সংসারী হওয়ার কোথাও এতটুকু বাকী রাখেনি, নিজের জন্তে এতটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি কোথাও।

অকারণে তমুশ্রীর মনটা আবার সংকীর্ণ হয়ে এল : কী জর?

—কী আর হবে? ম্যালেরিয়া।

—চলুন দেখি—তমুশ্রী উঠে দাঁড়ালো।

—কী আর দেখবেন?—রমা সংকুচিত হয়ে উঠল : প্রায়ই তো ভুগছে।

—চিকিৎসা হয় না?

—কুইনিন পায়। উনি ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দেন সময় পেলে। ইন্জেকশনও দেওয়া হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু জানেন তো কী পার্জী রোগ। একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

—ওর বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। চলুন, কাছে গিয়ে বসি।

—থাক না। জ্বর হলে ওই রকম পড়েই তো থাকে।

কিন্তু তমুশ্রী স্থল না। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পা বাড়ালো।

প্রায় অন্ধকার ঘর, বাইরে থেকে এসে ঢুকলে প্রথমটা কিছুই দেখা যায় না ভালো করে। বিস্মাদ গন্ধে ভরা কেমন একটা দম-আটকানো উত্তাপ। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে যখন ওই উত্তাপ আর গন্ধটা খানিক অভ্যস্ত হয়ে এল, তখন তমুশ্রী দেখতে পেল খাটের উপর ময়লা কাঁথা জড়িয়ে বছর ছয়কের একটি শীর্ণ ছেলে জ্বরে ঝুঁকছে। কতগুলো বাসন্ত-তোরঙ্গ, লক্ষ্মীর পট আর কাপড়-চোপড়ে অসংখ্য ঘরটাকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস কবরের মত মনে হল।

তমুশ্রী আস্তে আস্তে ছেলেটার কপালে হাত রাখল। জ্বরের উত্তাপে ঠাণ্ডা হাতটা যেন জ্বালা করে উঠতে চাইল তার। ছেলেটা একবার চোখ মেলে তাকাতো চাইল, তার পরেই আবার নেতিয়ে পড়ল আচ্ছন্নতার মধ্যে।

—এ যে অনেক জ্বর—তমুশ্রী গভয়ে বললে, তিন-টিন হবে বোধ হয়।

—তা হবে—রমা স্বাভাবিক ভাবেই জবাব দিলে।

—একটু জলপাট দিলে হয় না?

—দরকার হবে না। বিকেলেই ছেড়ে যাবে।

খাটের একটা কোণায় তমুশ্রী বসে পড়ল। ভূপেনের ছেলে—ভূপেনের স্ত্রী—ভূপেনের সংসার। আঠারো বছরের পুরুষ একটা মোটর মেকানিকের মধ্যে এসে ফুরিয়ে গেছে চিরকালের মতো। অসহ্য ক্রোধে ভূপেনকে ধরে একটা প্রাণপণে ঝাঁকানি দিতে ইচ্ছে করল তার। সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয়ের পালা চুকিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছে করল : আমি—আমি সেই তমুশ্রী। ভালো করে তাকাও আমার দিকে, তাকাও আমার সেই পনেরো বছরের কালো গভীর চোখের ওপর। তার পর নতুন করে জীবনের প্যাঙালে পরিপূর্ণ আলোর মধ্যে তুমি এসে দাঁড়াও। আবার পৃথিবী করতালি দিয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করুক, আবার তোমার সবল শরীরে শক্তিমান তারুণ্যের অসীম সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, তোমার গ্রীক-শৌর্ষের ওপরে অ্যাপোলোর আশীর্বাদ সৌর কণায় কণায় বারে পড়ুক। এই ঘর নয়, এই বুক-চাপা অন্ধকার নয়, এই স্ত্রী আর অসুস্থ সম্ভানের ঘানির মধ্যে নয়—অক্ষরন্ত প্রাণের উৎসবে হোক তোমার শাপমোচন!

চট্‌চটিয়ে ফিতে-খোলা কাবলী-চটির আওয়াজ পাওয়া গেল।

—উনি এলেন—রমা বললে ফিস্‌ফিস্‌ করে।

উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে ভূপেন। তার সবল গম্ভীর স্বর ভেসে এল সেই মৃত-আলোর দেশ থেকে।

—কোথায় গেলেন? গাড়ি তৈরী আপনার।

—তৈরী?—তমুশ্রী উঠে দাঁড়ালো বিদ্রোহবৎসে। দম-আটকানো অসুস্থ ঘরটা থেকে প্রায় এক লাফে বেরিয়ে এল বাইরে।

ভূপেন হাসল : যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলাম, তার আগেই হয়ে গেল।

—দত্তবাদ।

—দাঁড়ান—এক মিনিট—ভূপেন পাশের ঘরটায় ঢুকল, বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

—চলুন।

রমা দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। কালো গোলগাল বউ, লাল-পাড় শাড়ী, কপালে জলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। সীমন্তিনী ভাগ্যবতী স্ত্রী। তার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল তমুশ্রী : আসি ভাই তা হলে। খুব খুশি হয়েছি আলাপ করে। নমস্কার—

—নমস্কার—রমা হাসল, হয়তো বলতে চাইল আবার আসবেন। কিন্তু বলাটা এত অর্থহীন যে, সেটা বুঝতে পেরেই আর কথা খুঁজে পেল না।

—চলুন—ভূপেন আবার ডাকল।

সেই সংক্ষিপ্ত এতটুকু পথ। কিছু 'প্রাণবান' আগে, কোনো একটা এলোমেলো বস্তুনাথ বোম্বাঙ্কিত হয়ে ওঠবার আগেই তমুশ্রী ভূপেনের কাবখানার সামনে এসে দাঁড়ালে। 'বাক্যক' কবছে সুন্দর গাড়িটা—'মজ্জা-বসে' দিব্য পবিত্রাব কবে দিয়েছে ভূপেন।

—দেখে নিন—একবার তে তব উকি-ঝুঁকি দিয়ে ভূপেন তমুশ্রীকে অমুবোধ জানালো।

গাড়িতে উঠল তমুশ্রী। সুইচ খুলে চাপ দিলে ষ্টার্টাণে। আনন্দিত মোম্বাঙ্কিত মতো গুঞ্জন কবে উঠল গাড়িটা—যেন গ্রাণ্ড টাঙ্ক বোড দিয়ে এখন ডান মেলে দিতে চায়।

—কত দেব আপনাকে?—আবল্ল মুখে অবরুদ্ধ স্ববে জানতে চাইল তমুশ্রী।

ভূপেন স্বচ্ছ হাসি হাসল : কত আবেদন? বেশ কিছু কবতে হয়নি, গোটা পাঁচেক দিলেই হবে।

কাপা হাতে ব্যাগ খুলে একটা পাঁচ টাকার নোট ভূপেনের দিকে বাড়িয়ে দিলে সে। ভূপেন সেটা অভ্যন্ত পবাক্ষকের মতো আলোব দিকে তুলে দেখে নিলে একবার।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদ—এতক্ষণে যেন মুক্তির নিশ্বাস পড়ল তমুশ্রীর। যেন পালিষে বাচল একটা অপমৃত্যুর শ্মশান থেকে। তব—তব! আঠাবো! বহুবৈব প্রথম পুরুষ মবে গেছে তাব, আশঙ্কা আব উৎকণ্ঠা তাব নিহৃত সঙ্কষকে আজ সে চিবকালেব মতো ভূপেনের চিত্রিতম্বৈব সঙ্গে নদীব জলে ভাসিয়ে দিয়ে এল!

তমুশ্রীর কান্না আসতে লাগল। আজ যেন তাব একটা গোপন ঐশ্বৰ্যেব ভাণ্ডাব শূন্য হবে গেল—যেন ফাঁকা হয়ে গেল সব। চলন্ত মোটরবৈব অস্বাভাব হাওয়াতেও এখনে সে

ভালো কবে নিশ্বাস নিতে পাবছে না, সেই বদ্ধ ঘরের কঙ্ক উত্তাপটা এখনো তাব হৃৎপিণ্ডে চেপে বসে আছে। এত দিন পবে যেন সে বিজ্ঞ হয়ে গেছে।

ইচাৎ পাবেব কাছে নীল কাপড়ে নোট এখনো ছোট জিনিস চোখে পড়ল। কী ওটা? কখন এল? তীক্ষ্ণ মনেছে সেটাকে তুলে নিতেই তাব কোলের ওপর গাড়িয়ে পড়ল একটা চকচকে ছোট জিনিস। বিবণ মিনাব আংটি। 'তমুশ্রী'—হবফ ক'টা এখনো স্পষ্ট পড়তে পাবা যায়।

ঐশ্বাৰ্য্যেব ওপর মুঠো শক্ত হয়ে—এল—স্বন্দল হয়ে এল দৃষ্টি। সবটাই তা'হলে ভূপেনের অভিনয়—হাশব নিপুণ অভিনয়। ইচ্ছে কবেই ভূপেন তাকে নিয়ে গেছে তার বাড়িতে, পবচয় কবিয়ে দিয়েছে তাব স্ত্রীব সঙ্গে, দেখিয়েছে মোটব মেকানিকের জীর্ণ অন্ধকার সংসাবেব রূপ! সেই জন্তেই পাঁচ টাকার নোটটাকে অনন ভাবে আলোয় তুলে পবীক্ষা কবে কবে দেখেছে সে।

আঘাত! আঘাত দিয়েছে ভূপেন। আঘাত দিয়েছে দীনতাব আভিজাত্যে। আজ তমুশ্রীর প্রাণ তাকে ভব নেই, তমুশ্রীপাই তাব ভয়। আজ নিজের গণ্ডীব ভেতব থেকে তমুশ্রীদেব সে নির্বাঙ্কিত ববে দিতে চায়। যার কাছ থেকে সে পালাতে চাইছিল, সে-ই তাব কাছে পলাতক! ওই আংটিটা ফিবিয়ে দেওয়া তমুশ্রীর ভয়মোচন নয়, তাব নিজেরই দায়মোচন।

ইচ্ছে কবল গাড়ি ঘুবিয়ে সে ফিবিয়ে যায়—ড্যাশ, কবে ভূপেনের কাবখানাব ওপর গাড়িটাকে চুবাব কবে দেয়। কিন্তু তা কবল না তমুশ্রী। আংটিটাকেই সে সামনে ছুঁড়ে মেলে দিলে। আব বযেক সেকেন্ডেব মধ্যে তাবই গাড়ির চাকায় চেপ্টে গিয়ে ছোট আংটিটা একবার পিচেব মবে মিলিয়ে গেল।

**টোল ও কোম্পানীর**

**দাদ ও কার্ডের**  
মেম্বার মালয়

**কিউটা-টোন**  
পোড়া মেদনা ও চর্মরোগের জন্য

**নিম্ন মালয়**  
থোস পাঁচড়া ও চলমানীর জন্য

**বরানগর, কলিকাতা**

**DR. J. L. DRAKE & CO.**  
SOLE PROPRIETORS

**DR. J. L. DRAKE & CO.**  
LONDON

**DR. J. L. DRAKE & CO.**  
LONDON

**DR. J. L. DRAKE & CO.**  
LONDON

## বাঁ দী

অমরেন্দ্র বোস

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কিছু দেখা যাচ্ছে না—শুধু জল, বর্ষার ঘোলাটে কোঁপানি, মাথায় ফেনার ফুল। এই আছে, এই নেই, আবার ছড়িয়ে পড়ল-সহস্র সহস্র। যেমন কাপুটা, তেমনি ঢেউ, তেমনি জন্মাচ্ছে রাশি রাশি ফুল। আকাশের দিকে স্তবকে স্তবকে ঠেলে উঠছে। বৃষ্টি বা অভিনন্দন জানাচ্ছে মৌসুমী কালো মেঘকে।

অমাবস্তার হৃদান্ত ভাটা। নদী তবংগ ঠেলে চলেছে দক্ষিণে, সমুদ্র-সংগমে। যে কখনও কানে শোনেনি, সে এ নদীর শব্দ, শোষানি, ঢেউয়ের মন্তন দূর থেকে কল্লনাট করতে পাববে না। পূর্ব-বাঙলার মানচিত্রে যে সক সুরু নীল শিবির মত পদ্ম-মেঘনার শাখা-নদী উদ্ভব থেকে দক্ষিণে চলে গেছে বংগোপসাগরের দিকে, এ নদী তাদেরই একটি ভগিনী অথবা বেহায়া ননদ। নামটিও চমৎকার—ঠাকুরঝিতলার গাও।

পায়বা নদীর-সব চেয়ে চওড়া বাকটা দেখানো এসে শেষ হয়েছে, যেখানে পঁচিশ ত্রিশ হাজার মণী মহাজনী ভবানুলোকেও (বড় নৌকা) দেখায় ছোট ছোট শিশু-পাখার মত, সেইখানেই দেখা ঠাকুরঝির সংগে। শুধু বেহায়াপনা, কুটিল হাস্য। ভয়ে শিউরে ওঠে নৌকাপথযাত্রী। পৃথিবীতে কি কোথায়ও কুল আছে? স্থল আছে মানুষের ঘেচ্ছা বিহাবের? বর্ষাকাল হলে তো কথাই নেই, শাস্তি নেই, স্বস্তি নেই, শুধু অবিশ্রান্ত আতঙ্ক। একটানা গর্জানি। ঠাকুরঝি যদিও বা কখনও থামে। প্রমত্তা হয়ে ওঠে পায়রা। উল্লাসে, লোভানি, লাফানি ঠেলে দেয় আকাশে। ঢেউয়ের মাথা



একটি মেঘের মতন বসন্ত হলে তাকে বলে 'মলোপ'।

ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে হাজার হাজার আভের টুকরা। আবার তা মিলিয়ে যায় দেখতে দেখতে।

এমনি একটা বর্ষার দিনে ঠাকুরঝিতলায় ভিতরে এক গঞ্জে একথানা আটমাল্লাই পান্দী বাঁধা। বাবে পায়বা নদীর একটু পাশ কাটিয়ে কোনও এক জমিদারী মহলে। জমিদার সুলেমান সাহেব নৌকাবাস-কামরায়। সংগে তার এক তরুণী বিবি। বোধ হয় সপ্তম পক্ষের। বিবি এবং সগেবের তদ্বিব তদারকের জন্য এক জন বাদীও এসেছে নায়ে। সেও বিবির তুলের তুল দেখতে। অবস্থা ও সাজ-সজ্জায় বৈগুণ্য না থাকলে কে যে বিবি, আর কে যে বাদী তা বোঝা কঠিন হত। দু'জনারই দাঁতের স্নুপের পংক্তি হীবার মত। বিবির গালে তিল আছে, বাদীর গালের সে অভাব পূর্ণ করেছে ছোট একটি টোল। হাসি হো মুখে লেগেই আছে সারাক্ষণ। তবে বিবি ও বাদীর হাসিতে 'পাখা' আছে প্রচুর। এক জন হাসে খুশিতে, আর এক জন খুশি কবতে। আরও বৈয়মা আছে চাল-চলনে। এক জন যখন আইনত দাবী করে শয্যা, আর এক জন তখন আশংকায় বাত্রি জাগে কখন হয় ধর্ষিতা। সুলেমান মন্তপ অসংযমী।

ঠাকুরঝিতলার গাওর প্রায় এক বাক ওপরে একটা ছোট গালের মধ্যে কয়েকখানা লম্বা ধবধে ডিঙি বৈঠা পুঁতে 'পাখা' কবে বেখেছে একদল ডাকু। তাদের নায়েপ পাটাতনের তলে সুতীক্ষ্ণ হাতীয়াবগুলো গোছান—রামদা, ল্যাজা, পাকা বাঁশের পোক্ত লাঠি। সড়কি এবং চালও আছে গাওরের চমের।

মাঝিগিরি কবে পেট ভরে না—এই তিন পুরুষ তো গত হল বাপ্পা খেটে জসিমের। সেই 'খোজার' সেজে খোজ দিয়েছে সুলেমান সাহেবের গতিবিধির।

ডাকুরা বড্ড কাঁপরে পড়েছে। সুলেমান সাহেব নাও খুলছেন না, ওরাও কিছু করতে পারছে না। পায়বা নদীর পাশাপাশি না হলে তো কোনও জুত কবার উপায় নেই। ওরা সাধারণ ধান-কাটা কৃষাগদের মতই বেঁধে-বেঁচে থাওয়ার অভিনয় করছে। আর গালাগালি দিচ্ছে খোদাকে। বর্ষাকালে বাড়ীতেও উপোস, খাটতে নেমেও তাই। শিকার কাঁদে পা দিচ্ছে না।

ওদের ইচ্ছা কবে নদীর মাতলামি একেবারে থামিয়ে দিতে—ঠাণ্ডা কবে দিতে সেই শীতের গাওর মত। যেন শীতল-পাটি বিছান। কিন্তু গরীব যতই দুঃসাহসিক কাজে নামুক—তাদের ইচ্ছা মতই তো আর অহংকারী জমিদার নাও খুলবেন না।

বাদীর নাম আমিনা। সে এক কাঁকে রসুই-খোশে এফে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, 'নাও গোলবা কখন মিএ?'

'যখন তোমার গাও ডুইবা মবাব ইচ্ছা হইবে, কইও।'

'ও-মা কয় কি! আমি মরুম ক্যান পানিতে ডুইবা—বুড়া হইছ, তুমিই মব।'

'তয় গাওর দিকে না চাইয়া কথা কও ক্যান? দেখ ন আসমান-জমিন একাকার—ক্যাবল মাথা-ভাড়া ডেউ।'

তা আমিনা দেখেছে। তবু ভাবছে, যত সহর কাছারী-বার্জ দশ জনের ভিতর বেতে পারে, ততই তার পক্ষে মংগল। বিবক্ষণে কি বুঝে যে তার মা এই নামে তাকে ডুলে দিয়েছিল

আমিনা সবে মাত্র উনিশ বছরে পা দিয়েছে, এখনও কৌমাৰ্য্য তার অক্ষত। সে প্রভুদেব সমস্ত মহিমাই জানে, তাই একান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে।

আমিনা চেয়ে দেখল, কেমন জলেব ঢলক খেলছে মাঝ দরিয়ার। তা'র পৰ খানিকটা দূৰে সে কি উদ্ভাস্ত আকালন! পায়রা নদী আর ঠাকুবঝি যেন গিলে খেয়েছে সমস্ত সবুজ তীর ও তট। অনেকক্ষণ চাইলে মাথা ঘূরে যায়। কুলতীনঝড়া সমুদ্র সে কখনও দেখেনি, কিন্তু এই বর্ষার কালো মেঘের পটভূমিতে যে গুরুত্বা জলবাশি দেখতে পায়, তার চেয়ে যে ভয়ংকর কিছু আছে সে তা ভাবতেই পারে না।

তবু নিশ্চয় মত সে খানিক বাদে ফের জিজ্ঞেসা করে, 'নাও গোলবা না?'

মাঝি বিরক্ত হয়ে বলে, 'না। তোমার মত পাগল তো দেখি নাই এ জিন্দায়!'

প্রকৃতির খেয়াল-খশি মানুষের অহুমানের বাইরে। অনিচ্ছুক মাঝিকেও হঠাৎ গাঙের দিকে চেয়ে নাও খোলার হুকুম জারি করতে শোনে আমিনা।

'সামাল, সামাল বান আইছে ঠাকুবঝির বুক ভাইজা। সত্তর খোল, পারা তোল ইব্রাহিম, জসিম, কোরামং।'

সবাই মিলে লঙব-কাছি গোছায় আর ডাক ছাড়ে, বদর, বদর। সিল্লি মানন্ত, কবে পাঁচ গীরের দরগায়। খোদা ওদের যেন জান (প্রাণ) না যায়—ইজ্জৎ যেন বাঁচে বুড়া মাঝির। সে জীবনে এমন বেকায়দায় পড়েনি কখনও।

আমিনা দেখল যে, ঠাকুবঝি পাগল হয়েছে, আর বুকের

ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে বেসামাল ঢেউ। সে কি তার তড়পানি!

নৌকা মাঝ দরিয়ায় আনা সম্ভব না হলেও কয়েক রশি ভিতরের দিকে এসে অপেক্ষা করতে লাগল বানোব ঢেউয়ের মুখোমুখি হওয়াব জ্ঞা। এ-সময় না কি পারে থাকা নিতান্ত পিপীলনক। হোড়ের ধাক্কায়, পাবেব ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে ওর চেয়েও হাজার গুণ শক্ত নৌকা।

আমিনা খাস-কামরায় এসে লক্ষ্য করল যে, বিবি সাহেবা জড়িয়ে পরল স্থলেমান সাহেবকে ভয়ে। 'কই বান, বড় ডব করে আমার।' 'তা বইলা পেত্নী'র মত ভর করতে পারবা না।। চূপ কইরা বইলা আল্লার নাম কবো।'

আমিনা মনে মনে একটু না হেসে থাকতে পারল না। দার ঠেকলে মাতালের মুখ দিয়েও বড় বড় কথা বের হয়। কিন্তু তাতে মন ভিজল না তো বিবি সাহেবার।

আমিনা খাস-কামরার একটা নকসি থাম ধরে ঝাঁড়িয়ে রইল।

বানের ডাক ক্রমে কাছে এল।

যখন ঠাকুবঝির হুঁপার ছাপিয়ে একেবারে কাছে এসে পড়েছে বান, তখন বি জানি কি ভেবে মাঝি হঠাৎ ঘুরিয়ে দিল পান্দুসীথানা। মুখোমুখি বানের ধাক্কা না নিয়ে, বানের উদ্ভাম গতিককে আয়ত্তে আনল নায়ের পিছনের দিকে তুফান বাধিয়ে। ভেসে চলল পান্দু—উদ্ধার মত এগিয়ে চলল উত্তরে। পায়রা রইল অনেক দূরে পড়ে।

নায়ের গতি মন্দীভূত হয়ে এল প্রায় সাড়ে তিন বাঁক ওপরে গিয়ে। তাব মানেই হচ্ছে প্রায় চার পাঁচ ক্রোশ।



একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ যখন কথা বলে তাকে বলে 'জায়লগ'



চুটি মেয়ে যখন কথা বলে তাকে বলে 'কাটালগ'

প্রত্যক্ষ পৃথু আস্ত কতটুকুই বা সময় লাগল। বিস্তর বেলা যে পড়ে গেল। নিবনে কোনও মনুষ্য-বসতি নেই। থাকলেও তাঁর বাসিন্দারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। ভয় আছে ডাকাতি রাহাজানীর।

‘কি করবা বহম?’ মাথিকে জিজ্ঞাসা করলেন সুলেমান।

‘হুজুর এইখানেই লুণ্ঠ ফেলুম। হাজারটা হাতীতে হাওল লাগাইয়া টানলেও এই উজানে নাও পিছাইব না। গজে দিকম ভাটা হইলে।’

‘কিছু...’

আমিনা বুক মদ ফুটিয়েছে। যাক, বেশ হয়েছে।

আমিনার বাপ ও মা এমন শ্রমদ্ব ছিল না। শ্রমেন বেন মোটেই নয়। কিন্তু তাদের ওরো কি হবে জহাল এ স্বর্ণলতা? উদাহরণ দেখাতে গোড়াকি এসে তাই এ যেন বাদশাজাদী। উদাহরণ বলতে কোনও সময়ই সম্ভব নয়। তবে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকে সত্যের সঙ্গে। কিন্তু আমিনার বেলা এটা ছিল নিছক সত্য। ওর পিতা ও মাতার মতো একটা আইন সম্মত সম্পদ ছিল স্বামি জীব, কিন্তু তা চিরাবর্তিত প্রথাগম্যী হুজুর-বংশ মাথক মাকে নদীর উত্তীর্ণ চ’রো জমির মত ভবন দখল করে ভোগ করতেন।

পুরুষটাকে খাটিয়ে নেওয়া হত যশ দ্বি নেওয়া সম্ভব, আর মেয়ে লোকটাকে তাব সাবা দিনমানের পাখির পূব কথা হত অশ্রুনিতে ভোগের সামগ্রী। বোনা-পোনাও মুখে কিছু টব-চাটোনীও তো দরকার। কচিৎ আঁব অভাব নেই বতাদের।

এমনি একটা চক-চাটনির পরিণতি আমিনা।

তা হক, তবু সে শ্রমদ্ব, মাথা হয় দেখলে। খাং জাল হয় সমস্ত ভলিয়ে ভাবলে।

ধাক্কায় ধাক্কায়, আশঙ্কায়, অপব্যবহারে আমিনার মা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে যে চোখে দেখতে পেত না, তা নয়—অন্ধ হয়েছিল তাব মনের চোখ। ‘হাই সে সুলেমান সাহেবেব খাস বাদী করে দিয়েছিল মেয়েকে। বলছিল, ‘নয়া (নতুন) সাদী হইলে কত মাহুস কামে, শায়ে বাপ-বাবর কথা ভুইলা যায়। বছর অন্তর একবার আসে কি আসে না। হুঃ যে আইচ কান্দিস আমিনা, কাইলট হইত যাবি এ বড়ী মায়েবে ভুইলা। কত দেখলাম, আমাব বয়স হইল দেড় কুদি।’ ধাপাপাতের ওপেব সামাগ্র একটু হাদিবাব না থাকলেও বড়ী অগ্র বিসর্জন ববে কি যেন এক স্তমহান অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশ কায়। এব’ তা সে বাধ্য হয়ে সন্তি করল নিজেই। কুড়াল দিয়ে অনেকটাই কোপ মাবে। কিন্তু সে নিজের পা নিজে কোন দিন আবার কবেনি, সে বুঝতেই পাববে না আমিনার মা’ব মর্মব্যথা।

আমিনা খানিকটা মন মরা হয়ে নায়ে উঠে গেল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে মাকে ভুলবে না কিছুতেই আঁব এর জজ প্রতিজ্ঞাব কি ই বা প্রয়োজন? তার চাবদিকে যে বিপন্ন এক বড়ী মায়েব অশ্রু-সজল মুখখানা জাড়া আঁব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বত বাব সে চোখ মুছে বেবলট দেখছে ঐ একই ছবি। নদী, জল এতাকার।

সকাল একটু প’বটী ডিমসে স্নান করা হইল। কাল

শোবানি গজানিও সেই সঙ্গে করে গেল। বাতি জ্বল প্রত্যেক কামরায়। বান্না-বান্নার জোগাড হল, সাতিয়াব নিয়ে হুশিয়ার হয়ে রইল পাইক পাঁচ জন।

‘আমিনা একটু সঁবাব দে।’

‘বোতল খালি হুজুর।’

বোতলেব মালিক তা জানতেন ভাল কবেই। তবু কেন যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘তোদেব আঁব খেঁদাল হইবে কবে! এখন পানি ঢাল বোতলে।’

স্বরাগন্ধী জল এল কপাব গ্রাসে। তাও কতকটা সঁবাব সামিল। বোতল ছিল অনেকগুলোই খালি। কিন্তু হেমন ক্রিয়া হল না। তবু কিছুটা বেসামাল ভাব দেখাতে লাগলেন সুলেমান সাহেব।

‘যদি এখন আইসা ডাকাইতে ধবে আমাগো।’

নতুন বিবি একেবারে কাতব হয়ে প’দ। ‘খোদাব কসম চপ করেন।’

‘যদি চায় তোমাবে?’

‘আম্মা গো।’ আত’নাদ শোনা যায় বামা-কাপ’ব।

নয়া বিবিব মুখেব দিকে তাকিয়ে একটা পাশবিক আমোদ উপভোগ করেন সুলেমান।

এই সূত্রে একটা ছোট ঘটনা মনে প’দ আমিনাব।

সুলেমানের মা এক বাটী তুপ বেগেছিলেন এক দিন দাস দিয়ে। বাড়ীপ পাশেব এক উদ্বাস কৃষাণব বিপদল এসে গেয়ে শোন সেই তুপ। পরদিন ওং পেতে রইলেন সুলেমানের মা একখানা বিটি হাতে কবে। বিসীর্ণ বিড়ালটা আর কাছ বেঘল না। দরে এসে মের্ডমের্ড কবতে লাগল। তখন বদ-মেজাজী সুলেমানের মা’ব মাথায় একটা অদ্ভুত নেশা ঢাপল। তিনি ত্রিধ দাবব জানলা গলিসে পানিকটা গরম ফান ছিটকে দিলেন বিপদালাব গায়। বিড়ালটা চকিতে সামলে নিল—কিন্তু গরম ভাপেব ভসে সে আঁত নাদ কবে পালাল।

তাঁবই তো ছেলে। আমিনা ভাবল—তবে না বেন ডাকু? শৈশবে আমিনা যা প্রত্যক্ষ কবেছে, এখনও তাব তা সঠিক মনে আছে।

সুলেমান আঁবাব বলতে লাগলেন, ‘চিলাও ব্যান? একটু বড়-তামাসাও বোঝ না। ডাকু হাম্‌ই যাদ দিয়, সঁব সাদী কবলাম ক্যান সখ বইরা?’

নয়া বিবি কথা বলে না। বেন তাব বাখাস কবে আসছে না।

‘তুই কি কও আমিনা? এতগুলো বৌ থাকতে আঁবাব সাদী করলাম ক্যান? কি, জবাব দে, ডব নাই—দিল-খোলা কথা ক’।’

আমিনা প্রভব চোখেব দিকে বারেক তাকিয়ে বলে, ‘খুশি হইলে আপনাবা তো হুজুর কুকুর-ছাঁও কেনেন।’

‘কি হাবামজাদী, যত বড় মুগ না তত বড় কথা। বন্ধুকা কই, আমার দোলালাডা?’

এ সুলেমান সাহেবের ঠাটা না সত্যি মের্ডাজ, বোঝা গেল না। অর্থাৎ কিনা বুঝতে সময় দিস না, সত্যিকারের ডাকুব দল। তাবা ‘মাব-মাব’ কবে ঘিরে ধবল পান্সী। মুখে গাদেব মুগোসেব মত কাপ’ড জডান।

বন্ধুকে টোটা ভরলেন সুলেমান সাহেব। সামাগ্র নেশাব খোঁা শিনি কাটিয়ে উঠে বাদশাহী মেজাজে পাণ হলেন।

শেষের মত পা ফেলে ফেলে বাইরে বের হলেন। কামরার ভিতর রইল বাঁদী ও নতুন বিবি। কিন্তু শেষ ফেউ ব'নে গেল উপোসী ডাকুর সংখ্যা ও হিম্মত দেখে। এর মধ্যেই তারা মাঝি-মল্লাদের কাবু করেছে হাত-পা বেঁধে। খোজাক জসিমের পাস্তা নেই।

‘তোমরা কি চাও?’

‘টাকা।’

সুলেমান সাহেব কয়েক তাড়া নাট ছুঁড়ে দিলেন।

‘আব কি?’

‘গয়না।’

একটা সোনার অলংকার বোঝাই বাস্র ঠেলে দিলেন সুলেমান।

‘এখন আবার কি চাও? খাড়াইয়া রইছ নে?’

‘আত্মা গয়না পাববে বেটা?’

সুলেমান সাহেব চিস্তিত হলেন। বলে কি এরা?

‘ভাবেন বি গুজুব, আপনাব কত বিবি আছে, এই নতুনডিরে মেহেবাবানী কইবা খয়বাব (দান) দেন।’

‘তা হইবে না।’

পূর্বে মন্তই ছোকরা সদাঁর ডগব দেয়, ‘এ তো পার্শ্ব ইচ্ছায় ঘাড়ে কোপ না। ডাকাতের খাতায় নাম লেখাইয়া, লুটের সেবা মাল ফেইলা যামু না। গয়না গুজুব পাববে কে? ময়না না হইলে খাঁচায় বইসা নাচবে কে?’

সুলেমান আব বাক-বিতণা না বলে ভিতরে চলে যান এবং

উজ্জল মশালের আলোকে যার চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ডাকাতের হাতে তুলে দেন, তাকে দেখে হকচকিয়ে যায় ডাকুর দল। এ কি বেহেশতের পবী?

কিন্তু নৌকায় নিয়ে গিয়ে তাব মুখ বাঁপতে হয়। হাত-পা বাঁধার প্রয়োজন হয় না—চারদিকে জল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ডাকাতের নৌকাগুলো মিনিয়ে যার উড্ডস্ত পাখীর মত অন্ধকারে।

সুলেমান দাঁতে দাঁত ঘষেন বাগে তুখে অপমানে।

নৌকাগুলো চলতে চলতে এক স্থানে এসে থেমে পড়ে। নদী নয়—ঠাকুরঝির উজান বাক শেষ হয়েছে এট কিছুখণ্ড—নদীর সামিল খাল। যেমন নিজ'ন, তেমনি ঘিগি গাউপালা, ল'ণ বেতসে হ'পার ঠাশা। বড়-ছোট সব গাছই একাবাব—শুধু নিবিড় ঘন কালি। জোনাকি জলছে হীরা'র মত। পোকা-মাকড়, বগা জন্তু ছাড়া অজা কিছু বে এখানে আছে, তা ভাবাই যায় না।

লুঠনের সমস্ত সামগ্রী ভাগ হয় গেল। শুধু কিছু ঢাকা গাছিত বইল ছোকরা সদাঁর'বের হাতে মামলা মব'ন'ব বায়েব আশ কায়। অজ্ঞাত অনেক ঠকাঠিক হয়, কেউ গোপন করে সোনার হীর, কেউ বা টাকাকড়ি—বিশ্ব বমজানবে দলে সে সব হুংসাব ছো নেই। তাই অল্প বয়স হলেও বমজানকে ভক্তি বিশ্বাস করে বয়স ডাবুবা।

একটি মাত্র বিবি, অনেক দিন পাব পাওয়া গোট, কেউ আর সেদিকে নজর কবল না। সেবা মাল সদাঁর'বেরই ভাগে থাক। ও

## অধিতীয় লিভার টনিক

কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে। অধিকন্তু বস্তৃকণিকা গঠন, খাদ্য পরিপাক, বোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি লিভারের দৈনন্দিন কার্যেও সহায়তা করে। কুমারেশ লিভার ও পেটের পীড়ার অমোঘ ঔষধ মাত্র নহে—ইহা একটি অধিতীয় লিভার টনিক এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়।

## কুমারেশ

১ লিভারকে সুস্থ ও সতেজ রাখে—



ও, আর, সি, এল, লিঃ  
মালকিয়া - হাওড়া



নিরে কি ঝামেলা কম ! যদি বাধা না হয় তবে অতিষ্ঠ হয়ে যেতে হবে অত্যন্ত দৈর্ঘ্যকালকেও । কোথায় গুম করে রাখা—আবার কে দেখে, কার কাছে ফাঁস করে দেয় যত গোপন তথ্য । সেই জন্ত সুলতানী হলেও দাগিদের বোঝা বইল, যে বোঝা বইতে পারবে তার কাঁধে ।

‘মিঞা, সেলাম—দেখা হইবে পরন্তু বিছানে ঠাকুরখিতলার জাটে ।’

‘সেলাম, খাইক সাবধানে । সুলেমান সাহেব কিন্তু সহজ মুনিয়া না ।’

আপাতত কিছু লাভ হলেও ওরা একটা অতি গুরুতর আশংকা নিয়ে যে ঘর বাড়ী দিকে নাও খুলল ।

জনহীন জংলা খালের পারে নিবিড় অন্ধকারে একটি অপরিচিতা নারী ও একটি পুরুষ একথানা ছোট্ট নায়ে বয়ে গেল—বাদের ভিতর কোনও প্রেম নেই, পরিচয় নেই, শুধু সাপে-নেউলে সম্বন্ধ ।

ধূতা বিবি ভাবছে : আব কি, এখন দেবে মুরগীর মত গলায় ছুরি বসিয়ে—বিসমিল্লা বলে ।

ডাকু সদরার স্থির করছে : ও ছাড়া পেলে দেবে ফাঁসি কার্টে যে-কোন উপায়ে লটকে ।

পূবো-হাওয়া একটু কমেছিল, আবার বেড়ে এল । সংগে সংগে বর্ষা । এখন আরও নিবিড় সোঁতা খাল দরকার । এত মেহনতের পর আর এ জল সহ্য হয় না । রমজান বৈঠা তুলল । ঐ অন্ধকারেই একটা সোঁতা খালে গিয়ে ঢুকল ।

এক পসলা বৃষ্টি ঝবে আকাশটা একটু পরিষ্কার হল ।

কেন জানি একটু অলাপ করতে ইচ্ছা হল রমজানের ।

একটা মালা দিয়ে নায়ের জল ফেলতে ফেলতে ডাকু জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার নাম কি বিবি ?’

কি যেন জবাব এসে কিন্তু বোঝা গেল না । মুখের কথা কাপড়ে জড়িয়ে গেল ।

ডাকু বিবির মুগের বাঁধন খুলে দিল । ভয় কি ? যাবে কোথায় এই আঁধারে এই জল-ঝড়-কাদায় ?

‘এক গেলাস পানি থামু ।’

এত জল খবল তবু তৃষ্ণা ! মমতা হল ডাকুর । কেন একে বেঁধে বেগেছে এতক্ষণ ?

‘গেলাস তো নাই ।’ একটু লজ্জা বোধ করল ডাকু ।

‘আচি ভইবাই দেন ।’

ডাকু এক মালা জল দিল নদী থেকে তুলে । ‘খাও ।’

জল খাওয়া শেষ হলে রমজান ফের জিজ্ঞাসা করল, ‘বিবি তোমার নাম ?’

‘আ-মিনা ।’ তিনটি অক্ষর একটু ভাগ করে টেনে টেনে বলল বিবি ।

‘তুমি না ? কও কি তুমিনা ?’

একটা দিয়াশলাইর কাঠি জালাল ডাকু ।

‘আমি বিবি না, বান্দী, আমার নাম আমিনা । আপনাকে ঠিকাইছে মিঞা ।’

‘সত্য না কি ?’

‘দেখেন এখন নোটগুলা জাল কি না—হাফের বড় ধড়িবাড় ।’

আরও গোটা তিনেক কাঠি ছেলে ভাল করে আমিনার মুখখানা দেখে রমজান বলল, ‘না তা পারে নাই ।’

প্রগলভা আমিনার চোখের পাতা সম্বত হয়ে এল । এ তো ডাকুর ভাষা, ডাকুর দৃষ্টি নয় । আমিনা জাত-বান্দী । প্রেমের বেসাতি করার ওদের বড় একটা সুযোগ হয় না । কিন্তু বেসাতি করে ঠকতে জিততে এমন কি মরতেও দেখেছে অনেককে ।

আবার দমকা পূবো-হাওয়া এল । এল জলের ঝাপটা যেমন আসা উচিত । রমজান উঠে নাও সামলাতে গেল । আমিনা বসে বইল খানিকটা শুকনা জায়গা খালি করে দিয়ে । রমজান তো আর বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজবে না । ছুঁয়ের ভিতর এসে বসবে কোথায় ?

‘কিছু খাব না ?’

এ কি আপ্যায়ন ! গলায় তো ছুঁনি দিল না ।’

‘আছে কি ?’

‘পানি পাস্তা ।’

‘সেই সন্ধ্যার ? ও আমাগো মুখে ঝেঁটে না ।’

রমজান হাসে । ‘তুমি সত্যই বান্দী । ক্যাবল বান্দী না বেহারা । কোনও নয় বিবির এমন মুরদ হইত না রমজান সন্ধারের সাথে মসকরা করতে । তুমি তাম্বুর কইরা দিলা । কি, কিছু খাবা না কি ?’

আমিনা চুপ করে থাকে ।

রমজান একটা লক্ষ জালায় । বাতাসের ভয়ে আঁড়াল করে রাখে একথানা পাটাতনের তক্তা দিয়ে । গলুই গোপ থেকে একটা মেটে বাসনে ভাত তোলে সযত্নে । ‘কি, খাবা না কি চারডি—আমার কিন্তু প্যাট জইলা যায় ।’

ভাতের পরিমাণের দিকে একবার তাকিয়ে আমিনা বলে, ‘আমি খাইছি সাঁঝের ওস্তে ।’

‘ভাল...আমার দোষ নাই কিন্তু...’

‘না, না—এখন তাড়াহাড়া খাইয়া লক্ষটা নিভান গুণমস্ত ।’

কথাটা ঠিক । রমজান গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাত ।

আর আমিনাও এতক্ষণ বাদে উজ্জ্বল আলোকে সুযোগ পেয়ে কি যেন গিলতে থাকে হুঁচোখ ভরে !

রমজান যত সম্বৎ সম্বৎ খেয়ে লক্ষটা নিভিয়ে দিল এক ফুঁকে । আমিনা যেন স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে উঠে কাপড়-চোপড় সামলে বসল । কি লোভনীয় স্বপ্ন দেখছিল তা সেই জানে ! রামদা ও স্যাজার স্ত্রীসকল ফলার কাছে বসে এক আসন্ন মৃত্যুর কথা ছাড়া আর কি-ই বা ভাবা চলে ?

তবু আমিনা ভাবছিল : এমন ডাকুর সংগে কি ভাব হয় না ? কেমন বলিষ্ঠ দুর্ধর্ষ । আবার কত নরম মন । যেন কেয়া কাঁটার ভিতর বাদলা ভিজা সুগন্ধ ।

‘বিবিজান খাইলা না তো ষেণা কইরা, এখন শুইবা না ?’

‘ঘুম আইলে তো ।’

‘আইবে ক্যামনে ? খালি প্যাটে কি নিদ্ আসে ? তখন কইলাম খাইতে, অকুচি জমিল—এখন কেমন ঠেকে ? তোমার লক্ষে (জন্ত) আমিও পাকুর না শিখানে মাথা দিতে ।’

‘বদি মিঞা আমি ঘূমের ভান কইবা চুপচাপ থাকতাম চকু বইজা ?’

‘ভান করতে চাও, ভান—কার কাছে? লাজা দেখছ নি?’  
সত্যই লাজার ডগার একটা খোঁচা দেয় রমজান আমিনার গায়।

‘উঃ! মা গো!’ শিউবে উঠে আমিনা সরে বসে।

‘বেল্লিকের মত চিট্কাইও না, অত জোরে দাগা দেই নাই। দেখি একখান হাত দাও।’ আমিনার একখানা হাত জোর করে টেনে এনে রমজান পীড়ন করতে লাগল। ‘আমাব নিদ্ আইছে, যদি পালাও তব্ব মতিতুব কইবা ছাড়ম।’

নির্ধাক্ আতংক ও বিশয়ে আমিনা চূপ করে রইল।

বিচক্ষণ বাদেই নাকের ডাক শোনা গেল রমজানের।

বন্দিনী আমিনার বড় ইচ্ছা হল পালাবাব। সে বট্টি হাত ছাড়িয়ে নেবে। ভাবল লাফিয়ে পড়বে, তার পর ছবস্ত সঁাতাব।

কিন্তু কোন্ কূলে গিয়ে উঠবে সে? এক পারে মদুপ সুলেমান—  
অগ্নি পারে ক্রোধাক্ত বামদা হাতে এক ডাকুব সদাঁর। নাম রমজান।  
রমজানের মধ্যে তব্ব সে ইতিমধ্যেই যেন দেখতে পেয়েছে একফালি  
কোমল উজ্জ্বল চাঁদ, কিন্তু সুলেমানের ভিতর তো শুধু অন্ধকার।  
দোজকের কালি। আমিনা কিছু স্থির করতে পাবে না।

তার আবার লিপ্সা হা পলায়নব। এ যেন একটা অন্ধ  
সংস্কার।—সত্য নয়, অথচ স্ফূট বিশ্বাস। কিন্তু কি করে  
পালাবে?

ঘুমিয়েই তো পড়েছে রমজান! নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে  
একটানা। যদি ভান হয়? আমিনা যে চাতুর্ধেব অশ্রয় নিতে  
চেয়েছিল, এ যদি তাই হয়? পরীক্ষা করে দেখতে চায় বন্দিনীকে?

পরীক্ষানয়, সত্যই মুক্তি—দৃঢ় মুক্তি শিখি। হয়েছে ডাকুর।

আমিনা উঠবে। উঠে অন্ততঃ খাল-পাবের এক জংগল। ঝাড়ে  
আত্মগোপন করবে?...কিন্তু সুলেমানের মূর্তি যে দেখা যায়।  
আমিনা তার শাড়ীতে জড়িয়ে একেবারে পড়ে গেল রমজানের  
গায়ের ওপর।

ছিঃ! ছিঃ! সে করল কি?

‘ভাবছ কি বিবিজান—’ ডাকু হুঁহাতে শব্দ করে জড়িয়ে  
থরল তার ঢকল প্রগলভা শিকাব। ‘চালাকি কবো চাও আমার  
সাথে?’

আমিনা দ্রুতদ্রুত বুকে মিথ্যা কথা বলল গুটি কয়েক,  
‘আমি তো পালাই নাই মিত্রা।’

‘তবে চূপ কইরা থাকো।’

ভয়ে লজ্জায় চূপ করেই বইল আমিনা। অন্ধকারে, নির্জন  
নীরবে সাজা খাটল একটু পূর্বের অবিস্ময়কাবিতাব জন্ম। কিন্তু  
কেন জানি ভালই লাগল—স্বাদ গেল অগাধ। আনন্দ গেল অপূর্ণ।

একটা অসহ্য পুলকে ব্যথায় সাঁবা রাত ঘুমতে পাবল না  
আমিনা। রমজানের চোখেও ঘুম এল না। কত হৃচ্ছস্তার  
ভিতরও কি যেন অনাস্বাদিত স্তব্ধ পেয়েছিল সে।

হুঁজনে ধীরে ধীরে কথা হল অনেক। যে ভারসাম্য নির্দেশের  
কাঁটাটা দোতুল তুলছিল হুঁজনীর মধ্যে তা একটা কেন্দ্রে এসে  
স্থির হয়েছে। এক জন অপবকে সাহস কবছে ভরসা করতে।  
আমিনা যতটুকু পরিচয় পেয়েছে রমজানের, তাতে বুঝেছে যে,  
রমজান নিতান্তই ডাকু নয় এবং রমজানও বুঝেছে যে, আমিনাও



**আর্থনিক**  
**গিনি সোনার**  
**অলঙ্কার বৈচিত্র্য**

RCD

Phone  
3468-B.B

**আর.সি.দেও সন্ন**  
**ডুয়েলার্স**  
১১১-বহুবাজার স্ট্রীট-কলিকাতা

**আর্ডিজাতোর**  
**গৌরব!**

একাহুই বাদী নয়। ওরা উভয়ে ঘোলা জলে পড়েছে কি যেন চক্রান্তে।

‘বাদী যাটবেন না?’

‘যামু তো—কিন্তু একটু সবুর করো।’

‘কয়জবেব (ভোবের) তারা যে দেখা যায় আসমানে।’

‘কইলা কি—ভোব হটছে!’ রমজান উঠে বসে। আবছা আলোতে একটা আত্মক-বিস্মল ছায়া দেখা যায় তার মুখে। যে দিনেব আলোব ফল জগৎ উন্মুগ, সেই আলোর ভয়ে যেন রমজান অস্থির।

‘অমন করেন ক্যান মিঞা? কি হটছে?’

‘কিছু না। দেখলাম যে বিচানের আব কত বাকী। এখনও দেয়ী আছে গড়ি থানেক।’

‘বাদী যাটবেন কখন?’

‘যামু তো—কিন্তু এখন আব সময় নাই যে।’

‘তয় থাকবেন কই?’

‘এই খালেরই চৌদ্দ বাক উপবে এক জংগলে। চলে, দেইখো কোনও কষ্ট হটবে না।’

‘না হটলেই ভাল। কিন্তু—’

‘তা যদি গোল (মান) করত তয়, এইখানেই সাইবা লও।’

‘আপনে একটু আবডালে যান।’

রমজান কুলে উঠে অদৃশ হয়ে বইল।

মান দেব আমিনা নায়ে গিয়ে একখানা শাড়ী পড়ল বেশ দামী। এবার আব তফাৎ রইল না বিবির সংগে। রূপ তো ছিল আর অসামান্যই।

‘ভাগ্যে আমি শাড়ী ‘আনছিলাম ক’খানা। না হটলে পরতা কি?’

‘দিশেনই যা হটুক জোগাড় কইবা। মাইয়া লোকের সরম আকর ভার তো পুরুষ মান্নদের উপব।’

‘আমি কি তোমার পুরুষ মান্ন?’

‘জানি না।’ একটা স্বামটা মারে আমিনা।

‘কিছু জান না, কিন্তু রইল তো কাছা ধটবা।’

‘এখন দেইখা শুটনা পথ চলেন—যেন উছটি (হোট) খান না মধ্যে পথে। বইল হটল যে।’

নাও ঠেলতে ঠেলতে রমজান সোঁতা খালের আগার দিকে এগিয়ে চলে। ‘উছটি পাওয়া আমার তোমার হাতে না আমিনা।’

‘তয় কাব হাতে মিঞা? যত মুঞ্চিল তত আসান। খোদার বিচাব এক তবফা না।’

একটা বাংগ হাসি হাসে রমজান।

আমিনা হুঃখিত হয়।

কিন্তু চলন্ত নৌকা ঠিকই চলে এগিয়ে। প্রগতি অব্যাহত চিবিদন।

রমজান বার বার শাড়ী পরা আমিনার দিকে তাকায়। কি যে রমজান ভাবে, কি যে সে দেখে তা যেন বুকেও বোঝে না আমিনা। কিন্তু গোঁবব অহুত্বের কবে মনে মনে। এত দিন জমিদার-বাড়ীর সম্পর্কে থেকে সে যে আনন্দ না পেয়েছে, তার সহস্র গুণ আনন্দ উপভোগ করে এই ছোট্ট নায়েব ভিতর বসে। স্বরণ হয় মা’ব কথা।

দিন আশুক, সন্ধ্যোগ আশুক, সে সমস্তই দেখাবে মাকে। কিন্তু সেদিন কি আসবে তাব নসিবে? বুড়ো মা, কমতাপন্ন জামাইর ঘবে চারটি স্ত্রের অন্ত খেয়ে দীর-সুস্থে বয়স পেয়ে কি চোখ বুঁজবে? এত আশংকার মধ্যে এ যে আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে ধরার কল্পনা!

কি ভাবছে আমিনা? এ কি স্বপ্ন দেখছে সে দিনের বেল। জেগে জেগে?

‘মুখখানা কালা কইরা বইসা বইছ ক্যান? ফিধা পাটছে বুকি খুব?’

‘না।’

‘ভাঁড়াও ক্যান?’

‘না গো না।’

‘তয় বুকি মনে পড়েছে মায়েব কথা?’

এবার সজল হয়ে ওঠে আমিনার চোখেব পাতা।

‘বোঝলাম বোঝলাম, আমবা তোমাগো কেও না। তা মিখা। কি—সাক্ষাট তো মা। দশ মাস দশ দিন...তা তো সত্যই।’ রমজানের প্রচ্ছন্ন হিংসটা একেবারে এমন ভাবে প্রকাশ পায়—যেন বালকের হাত থেকে একটা কৌটার ঢাকনি খুলে পড়ে গেল খানিকটা সামগ্রী।

আমিনা অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে থাকে।

একটা অতি-নির্জন স্থানে গাছ-পালার নীচে এসে নৌকা থামে। সোঁতা গাল এখানে একেবারেই সুরু হয়ে গেছে। এপার-ওপার ডিঙিয়ে পারাপার হওয়া যায় অনায়াসে। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে মানুষ কখনও এখানে আসতেই পারে না।

কুলে উঠে কয়েকটা পাকা পেঁপে ও জামরুল নিয়ে এল রমজান। ওগুলো বেখে সে আবাব গেল কুলে। এবাব নিয়ে এল বুনে। নানকল হুঁটো পেড়ে। যত তাড়াহাতি আসা উচিত ছিল, তার চেয়ে অনেক দ্রুত সে ফিরে এল।

‘আপনে মিঞা কি বান্দর? গাছে ওঠলেনই বা কখন আর পাটরা আনলেনই বা কখন?’

‘সে কথা শুইনো পরে—আগে খাইয়া লও।’

হুঁজনে একজ হয়ে ফলগুলো পেট ভরে খায়। আমিনা একেবারে তৃপ্ত হয়ে গেছে।

‘বিবিজান আমার মুখের দিকে একটু চাও।’

এমন করে অহুরোধ কবলে আমিনার মত প্রগলভারও চোখের পাতা বুজে আসে, গলার স্বর যায় বন্ধ হয়ে। সে তাকাতোও পারে না, কিবা কিছু বলতেও পারে না।

‘কই বিবিজান চাইয়া দেখবা না? সত্যই কি আমি বান্দরের লখান (মত) দেখতে? মুখটা কি আমার তোমার মতই লবণ-পোড়া?’

আমিনা সত্রীড় কটাক্ষে তাকায়। কোনও জবাব দেয় না। কিন্তু এক সময় ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ছলে বলে, ‘লবণ-পোড়া ছালুন না চাখলেই হয়।’

যেন শুনেও শোনেনি রমজান, ‘কি কইলা কি?’ আবার সে সাগ্রহে চেখে দেখে মুন-কটা ব্যঙ্গন।

‘সাধে কয় ডাকাইত? পুলিশ ডাকু?’

আবার জড়িয়ে ধরে বমজান। 'ডাকো না?'

আমিনা তার গায় এলিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন যাইবেন  
মিঞা বাড়ী?'

'যায় তো, কিন্তু...'

আমিনা যে এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ একেবারে বুঝতে পাবে না,  
তা নয়। তবু তাব ঔৎসুক্য হয় অত্যন্ত। কেমন ঘব, কেমন  
হুয়াব, কেমনই বা মিঞার পাড়া-পড়শী? প্রিয়জনব নিকট-পরিচয়  
আমিনা পেয়েছে, এখন সে জানতে চায় তাব পরিমণ্ডল। যে  
পরিমণ্ডলের মধ্যে সে শিকড় মেলে দেবে—টবেব গাছের আশা হয়েছে  
অভিনব।

বঙ্গাব-হাওয়া একটু থমকে ছিল, আবার তা পূব কোণ ঠেলে  
বইতে লাগল। সংগে সংগে দেখা দিল কালো জ'লো-মেঘ। দিনের  
আলো পড়ল ঢাকা। হু'জনে সাবা দিনটা কাটিয়ে দিল নায়েব  
ভিতর।

রাত্রির আধারে জল-বুট্টি মাথায় কবে কবে নৌকা খুলল বমজান।

'কই যান?'

'বাড়ী।'

তাড়াতাড়ি গলুইর দিকে ছুটে আসতে যায় আমিনা।

'তুমি জলে ভিটজো না।'

'এ তো ইলশাঙড়ি।'

'তয় বইস। মানা কবলে তো শোনবা না।'

প্রায় আদ প্রহব বাদে নৌকা এসে বমজানের গাঁয়েব কাছে  
থামে।

'কথা কইও না আমিনা, পুলিশ থাকতে পাবে ওং পাটন্তা?  
তোমাব পরনেব শাড়ীখানা বদলাও। যদি দবা পড়ে, তোমার  
সাহেব সনাক্ত করে।'

'ভাল কইছেন, আমিনা তাব বান্দী! বিবিব শাড়ীও তো  
অদল-বদল হইতে পাবে। ভয় আপনার, আপনে ত'শিয়াব হইয়া  
চলেন।'

এত বুদ্ধি আমিনাব। বমজান বিস্মিত হয়ে থাকে। ইচ্ছা কবে  
এই অন্ধকাবেও মুখখানা একবার দেখতে।

হাওয়া আসে, মেঘ সবে যায়—মাঝে মাঝে তাবা দেখা যায়  
আকাশে।

জল থৈ-থৈ করছে ঢাব দিকে। খাল, মাঠ, গ্রাম একাকার।  
শুধু ব্যাং আব পোকা-মাকড়ের ডাক, মধ্যে মধ্যে গাছ-পালাকে  
আশ্রয় করে জলছে জোনাকী।

আমিনা আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা কবে, 'এ সব কু-কাম কবেন  
ক্যান মিঞা?'

অতি সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু জবাব দেয় না বমজান।

বাড়ীব কাছে এসে বমজান কান খাড়া কবে কি ফেন শোনে।  
তার পর খানিকটা এগিয়ে যায়।

'যদি আমাবে ধরতে আসে কেও, আমি কিন্তু পানিতে ডুব

সুন্দর ডিজাইন ও  
নিখুঁত ব্লক  
এ দুয়ের সমন্বয়  
হবে



বেঙ্গল ফটো টাইপ কোঃ  
সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত

৪৬/১ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট কলিকাতা-৯ ফোন-১৭০২ বি,কি

দিয়—যদি না উঠি ভাইবো না। তোমার ভয় কি, তুমি তো হইবা সাকী।’

ধক করে উঠল আমিনাব বুকটা। এত আগ্রহ করে বাঁজী এসে লাভ হল কি? কিন্তু তখন আব ফেবাব উপায় নেই।

‘এই তো আমাব বাড়ী।’

‘ঘর কই?’

‘পোড়াইয়া গেছে। ঐ দেখো না আধপোড়া ভিজা চাল ভাইজা—চুটরা পইরা রইছে।’

‘এমন ডাকাইত কেডা—ও মিঞা এমন ডাক কে?’

‘তোমার মনিব সুলেমান সাহেব, আমাবও মনিব আমিনা। বড় জমিদার, সে কিন্তু এই গবীরেবে চেনে না।’

রমজান অতি সংক্ষেপে এখানে একটি গল্প বলে। গল্প নয়, সত্য ইতিহাস।

সুলেমান সাহেবেব জমিদারী অনেকগুলো ডিহিতে বিভক্ত। তারই একটা ডিহির মধ্যে রমজানদেব বাস। খাজনা ঠিক সময় আদায় না দিতে পাবায় কাকবই নেই এক কানি ফসলেব জমি। দৈব-দুর্ভাগ্য কিবা অজ্ঞান্যব দক্ষ খাজনা না দিতে পাবা যদি অপরাধ হয়, তবে সে অপরাধেব জ্ঞা দায়ী বাবা তাবা ওদের পিতা-পিতামহ। কিন্তু যোল আনা ভোগটা ভুগছে রমজানেরা। ছুমিহীন কৃষাণ, পেশার অভাবে হয়েছে ডাক। চুরিচামারী করে আব পেট ভরে না।

আমিনা চূপ করে শুনল—বুঝল সব ঠাণ্ডা মস্তিকে। সে তাব নসিব-ভরা দেখতে পেল অর্ধে পানি। তাব আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করল না ওখানে। ‘মিঞা নাও খোলেন।’

‘কোথায় বাবা?’

‘বেদিকে দুই চক্ষু যায়—কিন্তু এখানে আব না। কলিজা আমার অইলা যায়।’

‘পুলিশ, পুলিশ যে আছে ঠেতে-ঠেতে।’

‘তাতে হইছে কি? নাকেব উপব এক হাত পানিও যা চৌদ্দ হাতও তাই। আপনাদের লইয়া ভাঁটি দিম্ব ঠাকবখিতলাব একেবাবে জ্ঞাস সীমায়—সমুদ্রবেব চবে।’

‘কি আশায়?’

অতি সাধারণ বাদী এক রক্তময়ী নাবীব মত হাসে।

‘কি আশায় আমিনা?’

এবারও রমজান অন্ধকাবে শুধু হাসি শুনতে পায়। ‘হুমি যে ক্যাবল হাসো?’

‘হাসি আপনাব বকম-সকম দেইখা। পুরুষ মানুষ হাতে টাকা আছে, গায় হিম্বা আছে—নয়া চর বন্দেজ লইয়া ঘর বাঁধবেন, ধান কইবেন, ভাবনা কি?’

খুশি হয়ে রমজান জিজ্ঞাসা করে, ‘তুমি কি করবা?’

‘আমি ক্যাবল কান্দুম।’

‘ক্যান আমিনা, এ কথা কও ক্যান?’

‘আমি তো বেহালা, আপনে তো ছবি, চামেসা যা দিলে আর কি ককম।’

‘তোমাগো কি হামেসা আমবা খালাই? সারা দিনেব হাডভাঙা মেহনতেব পর একটু বাজাট—তা সইবা না ক্যান?’

‘মিঞা এটুক আব বোরলেন না—ক্যাবল তুংগেই কি মানুষ কান্দে? অতি স্তখেও আসে চৌক্ষে পানি।’

নৌকা সোঁতা খাল বেয়ে গাঙের মুখে আসতে আসতে ভোব হয়ে যায়। বাড়ীতে দাঁড়াবাব স্থান নেই, নায়ে থাকারও উপায় নেই—এখন ওবা আশয় নেবে কোথায়? যদি দিনটা গতকল্যের মতও মেঘলা থাকত। বজাটাও ত্যাং যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সূর্য উঠছে তার সবগুলো আলোব পেখম মেলে। নদী ঠাণ্ডা, কিন্তু ওদিকে যে এগুতে সাহস হচ্ছে না। নিকটেই গল্প—গুলিশ এসে নিশ্চয়ই হানা দিয়েছে আজ।

সারা দিনটা ওবা আশ্বগোপন কবে রইল সেই পূর্বেব সোঁতা খালের মাথায়। ফল-মল খেল যেমন স’গ্রহ কবা যায়।

সন্ধ্যা বেলা আমিনা এক অদ্ভুত সন্ধ্যায় সাজল। আল্লায়িত কুন্তল বাঁধল উঁচু গোঁপা কবে। একখানা কম দামী ছাপাব শাড়ী পবল নতুন ঢংয় ফেবতা দিয়ে। গায়েব জামা খুলে ফেলে শাড়ীব আঁচল জড়িয়ে নিল বুকে বেশ আঁটো-সাঁটো করে। ‘ত’-একখানা ছোট হাতিয়াব ছাড়া বডগুলো ঢেলে দিল ভলে। রমজানকে বলে নায়েব চৈ কেটে কবল অন্ধক। এক গোছা বজনীগন্ধা জোগাড় কবে গোঁপায় ঝুঁজে দিল একটু হেলিয়ে।

রমজান বলল, ‘বাস: চেনাই তো যায় না তোমাবে। তার পব—’  
‘আপনার ডর কি, আপনে তো মাথের বইছেন। চূপ কইরা শুইয়া থাকেন পাটাতনের তলে।’

নৌকা যখন ছোট খাল ছাড়িয়ে বড় গাঙে এসে পড়ল, তখন এক হাতে কৃত্রিম মূলতা-বঁড়শির সূতো ছাড়ার ভান করতে লাগল আমিনা, অন্ম হাতে তাব বৈঠা।’

স্তম্ভখে গল্প...বড় বড় কোষ নৌকা দেখে বোকা গেল জেলার চুনোপুঁটি অফিসাররাই কেবল আসেনি, বড় বড় চাউসগুলোও জড়ো হয়েছে। একটি সামান্য বাদীব জ্ঞা কত মায়া এবং কর্তব্য জ্ঞান সুলেমান সাহেবেব।

কিন্তু কি আশ্চর্য, সে বাদী এ সমস্ত গুণেব মর্যাদা বুঝল না। চল কাকি দিয়ে একখানা গেরো গানেব গমক তুলে। ঠাকুরঝিব জল-স্থল উত্তবোল। সপ্তর্ষি বাঁপছে যেন ঐ সুরে:—

খসম খসম আমার আইলা না

কহু ( লাউ ) গাছে ধরছে বে কহু

ছানুন চাইখা গেলা না...

খসম খসম আমার আইলা না।

একখানা চৌকিদারের নাও থেকে প্রশ্ন হয়, ‘কে যায়?’

আমিনা জবাব দেয় নেয়ে জেলেনীদের ঢংয়ে, ‘এক নাইয়া জাইলার বি—নাম আসমানী।’ ‘টচ’ জলে ‘ত’-তিনটা—সত্যই তো, যৌপায় ফুল, হাতে বঁড়শি, নেয়ে বেদের মেয়েই বটে। ছ’দিন যায়ে সমুদ্রের চরে ঘাদের দেখা যায় তাঁরা রমজান ও আমিনা নয়—মহকং ও মেহেনী।

## জনাতিস্ক

[ ৭৪০ পৃষ্ঠার পর ]

“কিছু না কী রকম? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, চুপ করে ভাবছেন।”

“চুপ করে আছি তা দেখতে পাচ্ছেন বটে, কিন্তু ভাবছি দেখছেন কেমন করে?”

“বাঃ রে, চুপ করে আছেন বলেই মনে হচ্ছে ভাবছেন। নইলে ভাবনা কি আর চোখে দেখা যায়?”

“যায় না বুঝি? যাক, বাঁচালেন। ভাগিস পুরুষ মানুষদের দৃষ্টিশক্তিটা খাটো। আমরা মেয়েরা কিন্তু আপনাদের ভাব এবং ভাবনা দুইই দেখতে পাই। কী, হাসছেন যে বড়? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? এঞ্জিনীয়ার মানুষ, হাতে কলমে পরীক্ষা না করে কিছুই মানতে চান না। আচ্ছা, আপনি এখন কী ভাবছেন বলবো? শুনতে চান? থাক, থাক, আপনাকে অমন রাঙা হয়ে উঠতে হবে না। ভয় নেই। আমি বলছি না।”

হেমন্তে সুপক ধাতুর স্বর্ণাভ ক্ষেত্রের উপরে হঠাৎ এক ঝলক রৌদ্রের মতো মলী সেনের মুখে চোখে একটি নিঃশব্দ কোতুকোজ্জ্বল হাস্যোচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল।

বিস্তৃত নিখিল কী করবেন, কী বলবেন ভেবে না পেয়ে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অকারণেই তাঁর ললাটে শ্বেদবিন্দু সঞ্চারিত হতে থাকল।

বৈজ্ঞানিক তার বা সুইচ ইত্যাদির সংস্পর্শে পাছে কারো কোন বিপদ না ঘটে সেজন্য সুইচ বোর্ডটি স্বভাবতঃই স্টেজের এমন একটি নিভৃত অংশে রাখা হয় যেখানে একমাত্র অভিজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো উপস্থিতি বা যাতায়াতের সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ব্যবহৃত বিদ্যুৎ অপেক্ষা অধিকতর শক্তির বিদ্যুৎ এবং মোটর, ট্রান্সফর্মার ও অন্যান্য নানাবিধ জটিল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ, সেজন্য নিখিল অধিকতর সতর্কতায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন। স্টেজের নিভৃত কোণে কিছুটা উঁচুতে পৃথক একটি সুদৃঢ় মঞ্চ তৈরী করে তার উপরে সুইচ বোর্ড ও কন্ট্রোল গিয়ারগুলি বসিয়েছেন, যাতে অসতর্ক কেউ সেখান দিয়ে যাতায়াতের সময় হাত বাড়িয়েও তার সংস্পর্শে না আসে। মঞ্চটির চার দিক টিউবের

রেলিং দিয়ে ঘেরা, ওঠা নামার জন্য আছে ক্ষুদ্রাকায় একটি কাঠের সিঁড়ি। সেই রেলিংএর উপর দেহের ভার ঈষৎ গুস্ত করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন মলী সেন।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে নিখিলের সঙ্কট লক্ষ্য করে অত্যন্ত সহজ ভাবে বললেন, “কী ভাবছিলেন, শুনবেন? ভাবছিলেন, আপনার এই পরিশ্রম, এই পরিকল্পনা, এত সাজ-সরঞ্জাম, এই সার্থক কারুকলার যোগ্য হবে কী আমাদের অভিনয়?”

হঠাৎ কেমন যেন বিচলিত বোধ করলেন নিখিল। নিজের অলক্ষিতেই বুঝি সুইচ বোর্ডের কাছ থেকে সরে মলী সেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, “মিসেস সেন, আপনাদের অভিনয় এর যোগ্য কি অযোগ্য জানিনে। সে কথা আমি কখনও ভাবিনি। আমার সামনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য। সে আপনি। আমি যা কিছু করতে চেয়েছি, যা কিছু করেছি সবই আপনার পছন্দ হবে, আপনি খুশি হবেন, এই মনে করে।”

কথাগুলি যেমন করে বলা হলো, তেমন করে বলার কল্পনামাত্র ছিল না নিখিলের মনে। তাঁর নিজের কাছেই সেগুলি ছাপার অক্ষরে কেতাবী বক্তৃতার মতো মনে হলো। গলার স্বরটাও নিজের কানেই অতিমাত্রায় নাটকীয় শোনালো। অথচ জ্যামুক্ত তীরের মতো সচ্য উক্ত বাক্যগুলিকেও আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কোনো মতেই। ছিঃ ছিঃ! মিসেস সেন কী জানি কী ভাবলেন। অনুশোচনা হলো নিখিলের।

মিসেস সেন সত্যি কী ভাবলেন, তা বোঝার উপায় ছিল না। বাইরে অপরাহ্ন বেলার রৌদ্রালোক ম্লান হয়ে এসেছে। ভিতরে স্টেজের নিভৃত অংশের এই অপরিমিত মঞ্চটিতে আলোর প্রবেশপথ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষীণ আলোক এক্ষণে ক্ষীণতর হয়েছে। নিরুত্তর পার্শ্ববর্তিনীর মুখমণ্ডলে তাঁর মনোভাবের যদি কোন ইঙ্গিত প্রতিফলিত হয়েও থাকে, আসন্ন সন্ধ্যার এই স্বল্পালোকিত মুহূর্তে তা কোনক্রমেই আর দৃষ্টিগোচর নয়। তাই আপন প্রগলভতার অসামান্য মূঢ়তা স্মরণ করে লজ্জা ও অনুতাপে কেবলি ক্লিষ্ট হতে থাকলেন নিখিল রায়।

“জানেন, আপনার সঙ্গে আমি আর কথা বলছি নে?”

কিছুটা অভিমান, কিছুটা বাধা এবং কিছুটা বা অনুযোগের সুর মেশানো ছিল মলী সেনের কণ্ঠে।

অপরিসীম বিষ্ময়ে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন, “মানে?”

“মানে, আমি ভীষণ রাগ করেছি।”

নিখিলের শব্দা তা শুনে অহতুক নয়। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার নিদারণ প্রতিকূল প্রত্যক্ষ করে নিখিল মনে মনে নিঃশব্দে বারবার দ্বিধার দিলেন। কেন বলতে গেলেন ঐ কথাগুলি? ক্রুদ্ধ অভিভাবকের সম্মুখে অপরাধী বালকের মতো অসহায় নিখিল আপন স্পন্দিত আঁচরণের সমুচিত দণ্ড লাভের আশঙ্কায় নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন মুহূর্ত্ত গণনা করতে লাগলেন।

“আপনি আমার কোনো কথা রাখেন না; আপনার সঙ্গে আড়ি।”

কপট কলহের ভঙ্গিতে বললেন মলী সেন।

না, এ তো ঠিক শাস্তি বিধনের দ্বারা নয়! কণ্ঠে তো উত্তম রোষের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চিত হতে না পেরে সংশয়ের স্বরে নিখিল জিজ্ঞাসা করলেন,

“আপনার কথা রাখিনে? কই, আমি তো মনে করতে পারিনে কবে আপনার কোন কথা অগ্রাহ্য করেছি।”

“করেননি? আজ দুপুরে খেতে এসেছিলেন? এতবার অনুরোধ করে লোক পাঠালেম, কান দিয়েছেন তাতে?”

আঃ! কী অস্বস্তি!! দূর দিগন্তে যাকে অগ্নিশিখা বলে ভয় হয়েছিল, দেখা গেল, সেটা প্রত্যুষের অরুণ রঙে রঙ্গিন লঘু মেঘখণ্ড মাত্র। নিখিল আপন স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরে পেয়ে সহজ কণ্ঠে বললেন,

“ও, এই? আমি ভাবছিলাম, কী জানি সাংঘাতিক কিছু বা।”

“এটা সাংঘাতিক নয় বুঝি?”

“না, একবেলা ভাত না খাওয়াটা আমাদের মতো মুটে মিস্ত্রীদের পক্ষে কিছুই নয়। পাওয়ার হাউসে—”

মলী সেন হাস্যচপল কণ্ঠে বাধা দিয়ে বললেন, “থাক, থাক। অত বিনয় প্রকাশের প্রয়োজন নেই। আপনি যে আপিসের বড় সাহেব, সে আমরা সাংঘাতিক জানি।”

নিখিল সহাস্য বললেন, “হাঁ, বড় সাহেব বটে,

তবে শুধু পাখার নীচে বসে দস্তখৎকারী নই। দরকার হলেই আস্তিন গুটিয়ে হাতুড়ি, রেঞ্চ ধরতে পারি। পাওয়ার হাউসে ব্রেকডাউন হলে কতদিন সকাল থেকে রাত অবধি একটানা কাজ করতে হয়। আদালী চাপরাশীরা বুদ্ধি করে কখনও ছ এক টুকরো রুটি বা ছ একটা সিদ্ধ ডিম জোগাড় করে আনে। কখনও বা শ্রেফ চা আর সিগারেট। কতবার এমন হয়েছে। আজ তো আপনার কেনা কেক, সন্দেশ, আপেল, নাসপাতিতে রীতিমতো ভুরি ভোজন বলা চলে।”

মলী সেন যুক্ত দুই কর প্রণামের ভঙ্গিতে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, “মানছি, আপনারা সব ঋণিতুল্য লোক। বশিষ্ঠ, জামদগ্নির লেটেস্ট এডিশন। উকীলকে বিচরণ করেন। আপনারা শুধু ধোঁয়া নিয়েই বাঁচতে পারেন। আমরা মর্ত্যালোকের ক্ষুদ্র জীব, পা ছুটি ধুলো কাদার মাটিতে। আমাদের যে বস্তু না হলে চলে না।”

“বেশ তো, মর্ত্যালোকের মর জীবেরা মর্তমানের কাঁদি নিয়ে বসে থাকে না। আমরা কি আপত্তি করেছি?”

অনুপ্রাসযুক্ত উত্তরটা খুব সুচতুর হয়েছে ভেবে মনে মনে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন নিখিল।

“না করেন নি। কিন্তু তবুও আপনাদের কথা ভেবেই কলা গিলতে গেলেও গলায় আটকে আসে তাদের, সে খবর রাখেন? জানেন, আমাদের আপনি আজ সারা দিন না খাইয়ে রেখেছেন?” নিখিলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন মলী সেন।

গভীর বিষ্ময়ে নিখিল বললেন, “আমি না খাইয়ে—মানে—আপনি—আপনি আজ খাননি দুপুর বেলা? সে কী? কেন?”

ঈষৎ হাস্য করে মলী সেন বললেন, “যোগী ঋষিদের নিয়ে বিপদই তো ঐ। মুনিঠাকুর, আপনাদের তৃতীয় নয়নটা আছে কপালের কোন্‌খানে বলতে পারেন? জানলে সুবিধে হতো। আমাদের এত ভুগতে হতো না।”

এ সব কথার সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ নিখিলের সাধ্যাত্ত নয়। কিন্তু একথা বুঝতে কষ্ট হলো না যে, মলী সেনের এই স্বৈচ্ছাকৃত অনাহারের পশ্চাতে তাঁর নিজের সম্পর্ক আছে এবং সে সম্পর্ক কেবলমাত্র পাকযন্ত্রের নয়, হৃদযন্ত্রেরও বটে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে নিখিল বললেন, “কী করি বলুন, তখন এখানে নিজে দাঁড়িয়ে না করালে কিছুতেই মিস্ত্রীরা সন্ধার আগে এসব শেষ করতে পারতো না। অভিনয়ের সময় ঠেজে আলোই জ্বলতো না। জানেন তো, ফাঁকি দিতে পারলে আমাদের লোকগুলি কুটোটিও নড়াতে চায় না। তা’ ছাড়া এসব ব্যবস্থাগুলি জটিলও কম নয়, হাতে ধরে দেখিয়ে না দিলে ওদের পক্ষে করাও অসম্ভব। কিন্তু আমার জন্যে আপনি কেন না খেয়ে বসে রইলেন? অথায়, ভারি অথায় আপনার।”

“বসে আর রইলেন কোথায়? টেবিলে দু’জনের খাবার সাজিয়ে নিয়ে আপনাকে ডাকতে পাঠালেন। আপনি এলেন না। অপেক্ষা করে বেলা গড়িয়ে গেল। ঘড়ির কাঁটা একটা থেকে দুটোয়, দুটো থেকে আড়াইটার কোঠায় পৌঁছল। প্লেট ধরে সমস্ত খাবার-দাবার দিয়ে দিলেন চাকর-বেয়ারাদের।”

আসলে কথাটা সত্য নয়। না খেয়ে থাকেননি মলী সেন। বরং সর্ষেবাটা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধা ঝালের মাছটা ছবার চেয়ে নিয়েছেন।

নিখিলের খাওয়ার আয়োজন তিনি যথেষ্টই করেছিলেন। টেবিলে অপেক্ষাও নেহাৎ অল্প করেননি। অবশেষে নিখিল আসবেন না! নিশ্চিত জেনে বুদ্ধিমতী মেয়ে মাত্রেই যা করা উচিত, তিনি তা-ই করেছেন।

মলী সেনের বিশ্বাস, এসব ক্ষেত্রে এমন সামান্য একটু অতিরঞ্জন দোষের কিছুই নেই। হৃদয়ের ব্যাপারে মলী সেন নিজেকে মনে করেন একজন খাঁটি আর্টিষ্ট। তিনি বলেন, “ঘটনার সত্য আর আর্টের সত্য এক নয়। যা ঘটেছে তার চাইতে যা ঘটলে ঠিক হয় তার উপরেই আর্টিষ্টের পক্ষপাত। নীতিবাগীশেরা যাই কেন না বলুন;—সত্যম্ শিবম্ হতে পারে, কিন্তু সুন্দরম্ নয়। প্রয়োজন মতো একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে না দেখালে সত্য চিরকাল শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে থাকে, কোনোকালেই নীরস তরুণের হয় না।”

রিক্তবাদীরা প্রশ্ন করে, “যথা?”

“যথা, পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে থাকে সত্যিকার ঘটনা। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে আছে সত্যিকার আর্ট। যেমন পত্রিকার পাতার ফটোগ্রাফে পাই অবিকৃত সত্য, শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবিতে দেখি উপভোগ্য আর্ট।” শুনে ক্লাবে, পার্টিতে তাঁর ভক্তমণ্ডলী সপ্রশংস বিষয়ে মুখবাদান করে মন্তব্য করেন,—“মাই গম্। হাউ ক্লেভার।”

নিখিল ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। কিলো ওয়াট বোঝেন, এম্পায়র জানেন, ভোল্টেজ চেনেন। আর্টের সুরু গলি-ঘুঁজিতে তাঁর গতায়ত নেই। তিনি সহজ সরল বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝলেন, এই অতিথিপরায়ণ কোমলহৃদয়া মহিলাটি আজ তাঁরই জন্ম সারাদিন অভুক্ত। অতান্ত দুঃখিত হলেন। হৃদয় কণ্ঠে বললেন, “কেন বলুন তো অনর্থক না খেয়ে কষ্ট পেলেন?”

মলী সেন বললেন, “দেখছি, এঞ্জিনিয়ার সাহেবের নোট বইতে সবই আছে; শুধু লেখা নেই—পাগলা যাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাবো তায়?” কিন্তু এ কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কী, আলোচ্য প্রসঙ্গে তাদের সম্পর্কই বা কোনখানে, তা নিখিলের কাছে স্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে গান্ধীযোরা সঙ্গে বললেন, “রাগ করে আজ ভেবেছিলাম, থাকুন না আপনি উপোস করে। আমার ভারি ব্যয়েই গেল তাত। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, একমাত্র অভিনয়ের ব্যাপার ছাড়া আপনার সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই রাখবো না। কিন্তু প্রতিজ্ঞার মুষ্টিলাই এই যে, সেটা না ভাঙ্গা পর্যন্ত মনে আর স্বস্তি থাকে না। এই দেখুন না, পাঁচটা বাজতে না বাজতেই খোঁজ নিতে এলেন, বেয়ারাগুলি চা আর খাবার দিয়েছে কি না।”

নিখিল কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে মলী সেন বলতে লাগলেন, “জানেন মিষ্টার রয়, ভগবান লোকটা বড় একচোখো রেফারী। জীবনের খেলায় পুরুষেরা কেবলই ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গোল করে, আর মেয়েরা কেবলই পড়ে গিয়ে গিয়ে গোল হারে। তিনি হুইসল হাতে নিয়ে নির্ধিকার চেয়ে দেখেন,—বোধ হয় উপভোগই করেন,—ফাউল দেন না গ্যালারী থেকে জুতো আর ইটপাটকেল ছুঁড়ে নারবার আশঙ্কা নেই কি না।”

মলী সেনের কণ্ঠের সূক্ষ্ম আবেদন যেন সহস্র সহস্র অদৃশ্য তরঙ্গ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই কাত্যবাকুলতা তাঁর তরী দেহটিকে ঘিরে এক গম্ভীর অথ বেদনাবিধুর ভাবাবেগের নিঃসৃত আবেষ্টন রচনা করলো।

হঠাৎ দুই পদক্ষেপে হুইচ বোর্ডটার কাছে গিয়ে হুইচ টিপে আলো জ্বলে দিলেন নিখিল। ঘুমো ব্যক্তিকে অকস্মাৎ সজোরে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলার মতো নিজেকে তিনি যেন সবল আঘাতে



দ্বারা মোহাবিষ্ট স্বর্গরাজ্য থেকে আত্মচৈতন্যবাস্তবতায় ফিরিয়ে আনলেন।

আলো জ্বালাব সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চে ঠিক নীচে কাব যেন দ্রুত পদধ্বনি ও গুণ পতন শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে “কে এখানে?” বলে হাক দিলেন নিখিল। ছুঁজনেই বেগি এল উপর দিয়ে যাঁকে নীচে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন। সেখান থেকে মেজের উপরে শুধু শাড়ির একটি প্রান্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। নিখিল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলেন। মলী সেনও তাব গন্তগমন করলেন।

“এ কী? এ যে নীবজা! তুমি এখানে? এমন করে শুয়ে?” — বিস্ময় বিস্তারিত নয়নে নিখিল তাকালেন।

কিন্তু তাব জিহ্বাসার উত্তর পাওয়াব পূর্বেই সেখানে ঝড়ের বেগে উপস্থিত হলেন বাস্তব-সমস্ত সিদ্ধনাথ। কোনো দিকে দৃষ্টিপাতমাএ না করে বললেন,

“এই যে মিসেস সেন, আপনি এখানে। আপনাকে না খুঁজেছি হেন স্থান নেই। আর একটু দেরী হলেই খবরের কাগজে নিকাদেশের বিজ্ঞাপন ছাপতে হতো, তা হা হা ( অটহাস্য )। উ, কম করে বার দশেক না কোন আপনাব দোতলাব বাবান্দা আর গ্রিগবমে ছুটেছি। গাড়িতে ব্যথা ধরে গেছে। একটু বাতের পাও আছে কি না। এটা পৈত্রিক, ঠাকুর্দা মশায়েবও ছিল। মেজ শ্যালক আয়াক্ষেদ কলেজের প্রফেসর। বাবস্থা দিলেন, —পুবানো ঘি গরম করে সকাল সন্ধা মালিসেব। গিল্লীকে বললেম, শালা না হলে আর এমন ঠাট্টা কেউ করে? ঘি নতুনই মেলে না তাব আবার পুবানো। দাদাকে বল, এখন থেকে দালনা মালিশেব বাবস্থা দিতে, নইলে রোগী জুটেবে না। হা হা হা।”

সিদ্ধনাথ এক নিশ্বাসে কথা বলেন। দম ফুটিয়ে নিজে না থামা পর্যন্ত তাকে কিছু প্রশ্ন করা বুধা। তাব অটহাস্য শেষ হলে, মলী সেন জিজ্ঞাসা করলেন, “বাপাব কী সিদ্ধনাথ বাব? খুঁজছিলেন কেন?”

“খুঁজছিলেন কেন? অভিনয় স্কু হওয়াব আর ঘটনাখানেক মাএ বাকী, দর্শকেরা আসতে স্কু করেছে। এদিকে অপর্ণাব মা বলে পাঠিয়েছে, — অপর্ণাব অসুখ, সে আজ পার্ট করতে পাবে না। ডোবালে দেখছি।”

“কী সর্বনাশ! অপর্ণার যে প্রথম দৃশ্যই

পার্ট।” এখন উপায়? উদ্বেগে মলী সেনের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

সিদ্ধনাথ বললেন, “না, না, আপনি উতলা হবেন না। মনে উদ্বেগ থাকলে আপনাব পার্ট নষ্ট হবে। আপনি এসব ভাববেন না। অপর্ণার ভাব আমি নিচ্ছি।” চাব পাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমুপর্ণে বললেন, “অসুখ না হাতি! আসল বাপাব কমপ্লিমেন্টারী। চাবখানা করে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেওয়া হয়েছে তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের জন্তে। অপর্ণাব মাএ আবও চাবখানা চাই। তাই নিয়ে বাগড়া।”

চাব বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, যেন অতি মাঝামাঝি এক গুণ সাময়িক তথ্য উদ্ঘাটিত করলেন।

মলী সেনকে আশ্বাস দিলেন, “তা সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি। আপনাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু এদিকে ভাড়া করা চেযাবগুলো যে এখনও এসে পৌঁছল না। যাবা টিকেট কিনেছে তাবা বসবে কোথায়? ডোবালে দেখছি।”

মলী সেন পুনরায় উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “আা, এখনও চেযাব আসেনি? তা’হলে কী হবে?”

‘আহা, আপনি চকল হচ্ছেন কেন? আমি সব বাবস্থা করছি। আপনি স্থির হয়ে নিজেব পার্টেব কথা ভাবন তো। আপনি বাস্তব হবেন না।’

যেকপ বাস্তবতা সঙ্গে এসেছিলেন ঠিক সেকপ বাস্তবতাই প্রস্থান করলেন সিদ্ধনাথ।

মলী সেন নিখিলকে বললেন, “বাই, একটু গরম করিব চেষ্টা করিগে। তা নইলে স্টেজ-ফাইটএ ধরবে। আপনি ওয়াশ চান তো উপবেব বাথরুমে চলে যান। নতুন সাবান, তোয়ালে সমস্ত ঠিক করা আছে। বেশী দেবী করবেন না যেন, আমি ড্রেসিং রুমে পেযালা নিয়ে বসে থাকবো কিন্তু।”

ইতিমধ্যে নীবজা উঠে দাড়িয়ে নিজ বসন স্তবিস্তাস্ত করছেন। নিখিল দেখলেন, মলী সেনের প্রস্থানপথে অপলক নেত্র তাকিয়ে আছেন নীবজা। নিখিল দৃষ্টিবিশ্রাবদ, কবি কিম্বা সাহিত্যিক নন। সে নেত্র শূণ্যগত কি অগ্নিগত, তা বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

নীবজা কৈফিয়তেব সুরে বললেন, “আমাব কানের একটা ইয়াবিং কোথায় হাবিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখছিলেন এখানটায়, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেছি।”

নিখিল বললেন, “এই অন্ধকারে খুঁজলে পাওয়া যায় কখনও ? দাঁড়াও আমি একটা টর্চ নিয়ে আসছি।”

নীলজা বাধা দিয়ে বললেন, “না, মিছে পবিত্রান কববেন না। নিশ্চয়ই এখানে নয়, অথ কোথায হাবিয়েছি।” বলে প্রস্থানোত্তম কবলেন।

নিখিল পিছন থেকে এগিয়ে এসে নীলজাব বাম বাহু লক্ষ্য কবে বললেন, “এ কী, এত বক্তৃ কিসেব ? পড়ে গিয়ে কোথাও কেটে যায়নি তো ?” বলে আপন দক্ষিণ হস্তে নীলজাব বাহুটি তুলে ধরলেন। “ইস, অনেকটা কেটেছে যে। এখনও বক্তৃ বোবোচ্চে। তাডাতাডি একটা বাণ্ডেজ কবা চাই।”

নীলজা সড়োবে নিখিলেব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, “কিছু দবকাব নেই। ও কিছু নয়, সামান্য কাটা। ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে ফেললেই হবে। আপনি যান।”

“দবকাব নেই মানে ? এ সব ধূলো-বালিও মথো সেপটিক্ হতে কতক্ষণ ? চল হামাব সঙ্গে মিসেস সেনেব কাছে। তাঁব কাছে নিশ্চয়ই ডেটল পাওয়া যাবে।” বলে পুনবায নীলজাব বাহুটি হাতে তুলে নিলেন।

‘আমাব কি হযি, মিষ্টাব বয। আপনি কেন

অনর্থক এই নিয়ে ফাচ্ কবছেন ? আপনাব পায়ে পড়ি। আপনি যান। আপনাব কখি ঠাণ্ডা হযে যাবে।”

নীলজাব কঠেব কঠোব তিত্ততা নিখিলক অঘাত কবল। বিস্মিতও কবল। নিশাদে নীলজাব বাহুটি নিজেব হাত থেকে মুক্ত কবে দিলেন।

নীলজা নিখিলেব দিক দৃষ্টিপাত নাং না কবে মতেজ পদক্ষেপে ষ্টেজেব অপব প্রান্তেব দ্বারোদ্যেশে বওনা হলেন।

সামনে তাবিযে চলতে চলতে — এ কী ? হঠাৎ আলোগুলি কি সব নিস্তেজ হয়ে এল ? চোখে ঝাপসা দেখায কেন ? বকেব কাছে জামাব কাছট ভিজে ঠেকে যেন ! জনদ্ভি বাবলো কোথেকে ? দুই হাত নিজেব চক্ষে স্থাপন কবলেন নীলজা। তাইতো, চোখে জল কেন ? নিজেব বাছেই নিজে আবিষ্কাব কবলেন নীলজা, তিনি কঁাদছেন। শ্রাবণ দিনেব মেঘকল্পন আকাশ থেকে বাবি বগবেব মতো গ্যামাঙ্গী নীলজাব ঘনরূপ দুই নয়ন থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তাঁব কপোলে, কণ্ঠে, বক্ষে “বসনে। অবিবাম বেগে। অজস্র ধাবায। [ ক্রমশঃ।

বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা :- ‘বি.বি.সরকারের’ সৌত্র, লায়ন প্রকাশকের \*  
পরিচালনা

আধুনিকতম অলঙ্কার শিল্প প্রতিষ্ঠান

**বি.বি.সরকার**

কোম্পানি লিমিটেড

১৬০-১. বহুবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন :- বি. বি. ১২৫৩ .

# আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রাশিয়ায় আবার পরমাণু বোমা বিক্ষোৰণ—

রাশিয়ায় সম্প্রতি আর একটি পরমাণু বোমার বিক্ষোৰণ ঘটান হইয়াছে, ওয়া অক্টোবর (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রেস সেক্রেটারী মিঃ য়োশেফ শট সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করিবার পর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মঃ ষ্ট্যালিন উল্লিখিত ঘোষণার সত্যতা স্বীকার করায় পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে বিশ্বয়াকুল চাকল্য সৃষ্টি না হইয়া পারে নাই। রাশিয়া যে পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা অবশ্য নতুন কথা কিছু নয়। ১৯৪৯ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে বিশ্ববাসী সকলেই এ কথা জানে। ঐ তারিখে বৃটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা গবর্নমেন্ট যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে যদিও সোভিয়েট রাশিয়ার এলাকার মধ্যে ‘স’-এর বিক্ষোৰণ ঘটবার প্রমাণ পাওয়ার কথাই শুধু উল্লেখ করা হইয়াছিল, পরমাণু বোমা বিক্ষোৰণের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই, তথাপি ঐ যুক্ত বিবৃতি হইতে ইহাও বুঝা গিয়াছিল যে, রাশিয়ারও পরমাণু বোমা আছে। আজ ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী গঠন, পশ্চিম-জাৰ্মানীকে অস্ত্রসজ্জিত করা এবং ইউরোপীয় বাহিনীতে পশ্চিম-জাৰ্মানীর সৈন্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত পরমাণু বোমা এবং সুদূর প্রাচ্যে জাপান শাস্তি-চুক্তি, জাপান-মার্কিন রক্ষা-চুক্তি ও আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় শাস্তি-চুক্তি পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনে যখন ভাবী তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে রাশিয়াকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করিবার সুদৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সময় রাশিয়ায় দ্বিতীয় দফা পরমাণু বোমা বিক্ষোৰণের সংবাদ এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বানচাল করিয়া দিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। মঃ ষ্ট্যালিন শুধু পরীক্ষামূলক ভাবে পরমাণু বোমা বিক্ষোৰণের কথাই স্বীকার করেন নাই, তিনি ইহাও জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পরমাণু বোমার আরও পরীক্ষা করা হইবে। তাহার এই উক্তিকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিছক কাঁকা আওয়াজ বলিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গ উপেক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ শট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর জন্ত রাশিয়ার উপর দোষ আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার পরমাণু শক্তি পরিকল্পনা শুধু শাস্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হইতেছে, রাশিয়া এইরূপ ভাণ করা সম্বন্ধে রাশিয়া পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ার করিয়া বাইতেছে, উল্লিখিত পরমাণু বোমা বিক্ষোৰণ ঘটাইবার ঘটনা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি কবিত্তেছে? গত সেপ্টেম্বর (১৯৫১) মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ গর্ডন ডীন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ব্যয়-ববান্ধ নির্ধারণ কমিটির গোপন বৈঠকে যে রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে তিনি ইহাই

জানাইয়াছেন যে, পরমাণু বোমা উৎপাদনের কাজ যথেষ্ট দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বর্তমানে যে পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে সেগুলি বিশেষ কার্যকরী হইবে। তাঁহাব রিপোর্ট হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, পরমাণু অস্ত্র শুধু পরমাণু বোমার মধ্যেই আব আবদ্ধ নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী পরমাণু অস্ত্র বা এটমিক আর্টিলারী (atomic artillery) তৈয়ার করা হইতেছে। উক্ত রিপোর্টে মিঃ ডীন বলিয়াছেন যে, ‘পরমাণু অস্ত্রগুলি এক্ষণে সাময়িক প্রয়োগের জন্তও ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে পরমাণু অস্ত্র-বিস্তৃত অঞ্চলগুলি সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য বলিতে পারে যে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার জন্তই তাহার এই পরমাণু বোমা তৈয়ারীর এইরূপ বিপুল আয়োজন। মঃ ষ্ট্যালিন আমেরিকার এই দাবীর যে উত্তর দিয়াছেন, এই সঙ্গে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন, ‘শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, অস্ত্রাভ্যাস দেশও, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়াও পরমাণু অস্ত্র নির্মাণের গোপন রহস্য অবগত আছে, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই পরমাণু বোমা নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার থাকুক ইহাই তাঁহার চান।’ মঃ ষ্ট্যালিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ‘ইহা কি সম্ভব যে, শান্তিকে নিরাপদ করিবার জন্ত এইরূপ একচেটিয়া অধিকার থাকা প্রয়োজন? ইহাব বিপরীতই কি অধিকতর সত্য নয়? প্রকৃতপক্ষে শান্তিকে নিরাপদ করিবার প্রয়োজনে এইরূপ একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ করাই কি সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রয়োজন নয় এবং তার পরই কি বিনা সর্তে পরমাণু অস্ত্রশস্ত্র নিষিদ্ধ করাই কি আবশ্যক নয়?’

পরমাণু বোমা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল কেন, কাহার জন্ত, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। কিন্তু পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবী এবং রাশিয়ার দাবীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটা কাহারও অজানা নয়। পরমাণু বোমা তৈয়ারীর প্রণালী প্রকাশ করা এবং তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলিকে অবিলম্বে বিনষ্ট করা হউক এবং ভবিষ্যতে কেহই পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে পারিবেন না এইরূপ চুক্তি করা এবং এই চুক্তিকে কোনরূপে ভঙ্গ করা মানব জাতির বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়ার ঘোষণা করাই ছিল রাশিয়ার দাবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু বোমা তৈয়ারীর প্রণালী প্রকাশ করিলে রাজী নয়, কিন্তু অপর কোন রাষ্ট্রই পরমাণু বোমা সম্বন্ধে গবেষণাও করিতে পারিবে না, অথচ পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালীতে থাকিবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বৃষিতে পারিবে যে, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক পরমাণু উন্নয়ন কর্তৃক-শক্তি সম্ভাব্যজনকরূপে কার্যকরী হইয়াছে, আমেরিকার জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আর আশঙ্কা নাই, তখনই আমেরিকা এই কর্তৃক-শক্তির হাতে পরমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালী অর্পণ করিবে এবং তৈয়ারী পরমাণু বোমাগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ইহাই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়ত মনে করিয়াছিল যে, অপর কোন রাষ্ট্রের পক্ষে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর ইঞ্জিনীয়ারিং দিক আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক পরমাণু উন্নয়ন কর্তৃক-শক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই থাকিবে প্রাধান্য। কাজেই এই কর্তৃক-শক্তি কখনই সম্ভাব্যজনকরূপে কার্যকরী হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ারই স্বাভাবিক।

পবমাণু বোমা প্রস্তুত-প্রণালীকে একচেটিয়া করিয়া রাখিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায়ে বঙ্গাই বাশিয়া পবমাণু বোমা তৈয়ারী সম্বন্ধে গবেষণা আবস্ত করিয়াছিল কি না, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিশ্চয়োক্ত। অনেকে মনে করেন, বাশিয়া ১৯৪৩ সাল হইতেই পবমাণু বোমা নিষ্পাদনে চেষ্টা করিতেছে। গত ৬ই অক্টোবর (১৯৫১) মঃ ষ্ট্যালিন পবমাণু অস্ত্র সম্পর্কে বৃটিশ এবং মার্কিন নীতিব তীত্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বুটেন এবং আমেবিকার নীতিই বাশিয়াকে পবমাণু বোমা প্রস্তুত করিতে বাধ্য করিয়াছে।

বাশিয়াব চতুর্দিকস্থ দেশগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, উত্তর আটলান্টিক-চুক্তি, পশ্চিম ইউরোপের বক্ষা-ব্যবস্থা, জাপ শাস্তি-চুক্তি প্রভৃতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সমর্থ-সম্পদ এবং পবমাণু অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি হইতে ইহা মনে করা স্বাভাবিক যে, ভারী তৃতীয় যুদ্ধ হইলে বাশিয়াব সক্তি। এই অবস্থায় বাশিয়াও আত্মরক্ষার আয়োজন করিবে, ইহা অস্বাভাবিক কিন্তু নয়। মঃ ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, “রাশিয়া নিবস্ত্র স্বয়ংস্বাধ্য আকাশ হইতে আক্রমণকারীদের ইহাট অবশ্য অভ্যস্ত। কিন্তু বাশিয়া ইহাতে রাজী নয় এবং সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় সে আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইতে চায়।” পবমাণু বোমা নির্মাণের দিক হইতে বাশিয়া অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে, পবমাণু বোমার সংখ্যার দিক হইতে সে বাশিয়া অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। বাশিয়াও যে এ কথাটা ভাবিয়া দেখে নাই তাহা নয়। স্ত্রুজবল্যাত্মক পত্রিকা ‘দি ট্যাট’ (Die Tat) সোলভিয়েট বাশিয়ায় অতি শক্তিশালী অস্ত্র বা স্তপাব ওয়েপনস্ (super weapons) নিষ্পাদন যে সবাদ দিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। উক্ত পত্রিকা ভূমিক জাখ্যাণ বিজ্ঞানীর নাম প্রকাশ না করিয়া ঈর্ষ্যার নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন: “The production of atom bombs, large rockets and jet-fighters is being driven forward in Soviet Union with all means because, although technical parity with the West has been reached, the Kremlin still has many worries about quantity.” অর্থাৎ ‘সোলভিয়েট ইউনিয়নে পবমাণু বোমা, বৃহৎ বকেট এবং জেট ফাইটার নির্মাণের কাজ সর্বপ্রযত্নে চলিতেছে। কারণ, যদিও টেকনিক্যাল দিক হইতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের স্ত্রিত সমকক্ষতা অর্জিত হইয়াছে, তথাপি পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেমলিনের এখনও যথেষ্ট চিন্তা বহিয়াছে।’ উক্ত জাখ্যাণ বিজ্ঞানী সম্প্রতি মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি আবারও বলিয়াছেন যে, রুশ বিজ্ঞানীরা জাখ্যাণ বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় এন্টি-এয়ারক্রাফট বকেট নিষ্পাদন করিতেছেন। বৃহৎ সময় জাখ্যাণীতে একপ এন্টি-এয়ারক্রাফট বকেট নির্মিত হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ বন্ধ শেষ হয় তখন উহার পরীক্ষা চলিতেছিল। উহারই অল্পকালে রাশিয়ায় এন্টি-এয়ারক্রাফট বকেট নির্মিত হইতেছে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাশিয়া পরমাণু বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়ার কয়েক মাস পর হাইড্রোজান বোমার কথা বিশেষ ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৫০ সালের ৩১শে জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের পবমাণু শক্তি কমিশনকে হাইড্রোজান বোমা তৈয়ারীর কাজ চালাইয়া বাইতে তিনি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য ইহার আগেই নবেম্বর মাসে (১৯৪৯) পবমাণু শক্তিব কংগ্রেস কমিটির সদস্য ডেমোক্রাট সিনেটর এডুইন জনসন বলিয়াছিলেন যে, পরমাণু বোমা অপেক্ষাও বহু গুণ শক্তিশালী স্তপাব বোমা তৈয়ারীর কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। স্তপাব বোমা বলিতে তিনি হাইড্রোজান বোমাকেই যে বুঝাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হাইড্রোজান বোমার কথা ইহার অনেক পূর্বে ১৯৪৬ সালেই অবশ্য শোনা গিয়াছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী মিঃ জন ম্যাকলয় বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই বৎসরের মধ্যে হাইড্রোজান বোমা তৈয়ার করিতে সমর্থ হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ারীর কাজ কি ভাবে কৃত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা কিছুই বুঝা যায় নাই। বাশিয়াও যে হাইড্রোজান বোমা সম্পর্কে উদাসীন নয় তাহা ‘ইন্টেলিজেন্স ডাইজেস্ট’ (Intelligence Digest) সম্পাদক মিঃ কেনেথ ডি কারসি (Mr. Kenreth de Courcy) মন্তব্য হইতে আমরা জানিতে পারি। সম্প্রতি তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে বাশিয়া পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হাইড্রোজান বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবে। ইহা কোন জ্যোতিষিক গণনা নহে। লৌহ-স্ববনিকার অন্তরালে অবস্থিত কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি এই সবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৪৯ সালে বাশিয়া যে পবমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছিল, মিঃ কেনেথ ডি কারসি অনেক পূর্বেই সে-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। হাইড্রোজান বোমা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, গত মার্চ বা এপ্রিল মাসে সাকলোর সহিত পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং অধ্যাপক পন্টেকোরভোর (Prof. Pontecorvo) পরিচালনায় এই কাজ অগ্রসর হইতেছে।

পবমাণু বোমা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া নয়। তবু বাশিয়া হাইড্রোজান বোমা তৈয়ার করিতেও সমর্থ হইবে। মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার উল্লিখিত বিবৃতিতে বলিয়াছেন, সোলভিয়েট ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগের বিবোধীও শুধু নয়, উহা নিষিদ্ধ করিবার এবং উহার উৎপাদন বন্ধ করিবারও পক্ষপাতী। পরমাণু বোমা সম্বন্ধে মঃ ষ্ট্যালিনের এই মন্তব্যের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পবমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণে রাজী হইবে, ইহাতে ভরসা করিবার মত কিছু দেখা যায় না। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এ-পর্যন্ত মঃ ষ্ট্যালিনের বিবৃতি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর টম কলানী বলিয়াছেন যে, পরমাণু নিয়ন্ত্রণে মার্কিন প্রচেষ্টায় বাশিয়াব বিরোধিতার সহিত মার্শাল ষ্ট্যালিনের উক্তির সামঞ্জস্য নাই। সামঞ্জস্য নাই কথাটা যে ভুল, পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রাশিয়াব প্রস্তাব আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পাওয়া যায়। মার্কিন প্রস্তাবের পবমাণু বোমা নির্মাণ কোর্শল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখা দাবী ছিল। আজ বাশিয়াও পবমাণু বোমা তৈয়ার করিয়াছে বলিয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পবমাণু শক্তি

নিয়ন্ত্রণে রাজী হইবে, সে-সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছু নাই। বরং সিনেটর এডুইন জনসন (ডেমোক্র্যাট) বলিয়াছেন, ‘মার্সীল ষ্ট্যালিনের ঘোষণা বিবেচনা করিয়াও কোরিয়া যুদ্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি।’ কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা ব্যবহারের দাবী মার্কিন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ গর্ডন ডীনও উত্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণ-কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, “I think when a situation arises where, in our carefully considered judgment, use of any kind of weapon is justified, we are now at the place where we should give serious consideration to the use of an atomic weapon, provided that it can be used effectively from the military stand point and that it is no more destructive than is necessary to meet the particular situation.” অর্থাৎ ‘এমন অবস্থার যদি উদ্ভব হয় যেখানে আমাদের সৃষ্টিস্থিত বিবেচনায় যে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা উচিত, তাহা হইলে আমরা এমন একটি অবস্থায় পৌঁছিয়াছি যেখানে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। অবশ্য ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সামরিক দিক হইতে এই অস্ত্র কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং উহা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধ্বংসাত্মক না হয়।’

কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা প্রয়োগ করিবার এই একান্ত আগ্রহের মূলে কি রহিয়াছে, তাহা অস্বাভাবিক কঠিন না হইতে পারে, কিন্তু মিঃ ডীনের বক্তৃতা হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পরমাণু বোমা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করেন, রাশিয়ায় পরমাণু বোমা তৈয়ারীর পরিকল্পনার লক্ষ্য যুদ্ধে পরমাণু বোমার ব্যবহারকেই একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া। কারণ, রাশিয়ায় পরমাণু বোমা থাকিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পরমাণু বোমা ব্যবহার করিতে চাহিবে না। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে, ভাবী যুদ্ধে রাশিয়া তাহার অতুলনীয় লোকবলের সুবিধাকেই কার্যকরী করিতে পারিবে বলিয়া মিঃ ডীন মনে করেন। এই জন্তই পরমাণু যুদ্ধে এমন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যেখানে জনবলের সুবিধা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। ইহাকেই তিনি শান্তির প্রকৃত আশা বলিয়া মনে করিতেছেন। কে যেন বলিয়াছিলেন : “God now a days seems to have a partiality towards those possessing greater resources and greater striking power.” অর্থাৎ ‘বাহাদুর প্রচুর সামর্থ্য এবং আঘাত হানিবার অধিকতর শক্তি আছে ভগবান আজকাল তাহাদের দিকেই থাকেন বলিয়া মনে হয়।’ মিঃ ডীন এই তথ্যটি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবে আর রাশিয়া চূপ করিয়া বসিয়া থাকিবে, এ সম্বন্ধেও কোন ভরসা তিনি করিতে পারিতেছেন না। এই জন্তই আক্রমণের স্বরূপে উহা তিনি বন্ধ করিতে চান। তিনি মনে করেন, ইহাতে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীও সাবধান হইবে।

তাঁহার দৃষ্টিতে কোরিয়া যুদ্ধই বোধ হয় আক্রমণের স্বরূপ এবং ভাবী আক্রমণকারী রাশিয়া। কিন্তু কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়া কি হইবে বলিয়া আমেরিকা মনে করে? কোরিয়া যুদ্ধে পরমাণু বোমা বর্ষণের দায়িত্ব রাশিয়ার উপর চাপাইবার চেষ্টা চলিতে পারে, বলা হইতে পারে, রাশিয়ার জন্তই আমেরিকা কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মার্কিন তাঁবদাররাও তাহাতে সায় দিবে। কিন্তু এশিয়ার জনসাধারণ তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে না।

### কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন—

কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) ভিক্টোরিয়া ফলসে যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল তাহা বার্ষিক হওয়ার বুঝা যাইতেছে, আফ্রিকাবাসীকে কীকি দেওয়া অত্যন্ত সহজ নয়। দক্ষিণ-বোডেশিয়া, উত্তর-বোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ড এই তিনটি দেশকে একত্রিত করিয়া এই ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। দক্ষিণ-বোডেশিয়া স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ। উত্তর-বোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ড ব্রিটিশ প্রটেক্টরেট অর্থাৎ ব্রিটেনের আশ্রিত রাষ্ট্র। স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত দক্ষিণ-বোডেশিয়ায় ইউরোপীয়দেরই প্রাধান্য। ফেডারেশন গঠনের দাবী তাঁহারাও উপস্থিত করিয়াছেন। দক্ষিণ-বোডেশিয়ায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ছয় ভাগ হইলেও শাসন-শক্তি তাঁহাদের হাতে। ১৯৩৬ সালে তাঁহারা উত্তর-বোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডকে দক্ষিণ-বোডেশিয়ায় অঙ্গীভূত করিবার দাবী উপস্থাপন করেন। এই দাবী সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট একটি রয়েল কমিশনও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-বোডেশিয়া এবং নাসাল্যাণ্ডের আফ্রিকানরা দক্ষিণ-বোডেশিয়ার অঙ্গীভূত হওয়ার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি উপস্থাপন করায় উক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তার পরেই আবশ্য হইল দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম। যুদ্ধের মধ্যে এ-সম্পর্কে আর কোন কথা হয় নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলন আরম্ভ হয়। অঙ্গীভূত করার প্রস্তাবে আফ্রিকানদের আপত্তিও কথা বিবেচনা করিয়া উহাকে ফেডারেশন নাম দিবার প্রস্তাব করা হয়। তিনটি গবর্নমেন্টের স্বাভাবিক রক্ষা করিবার এবং ফেডারেল আইন সভায় আফ্রিকানদের প্রতিনিধি প্রেরণের প্রস্তাব করা হইলেও উহা আফ্রিকানদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই।

ফেডারেশন সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভিক্টোরিয়া ফলসে একটি বেসরকারী সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনে উত্তর বোডেশিয়ার ইউরোপীয়দের নেতা মিঃ রয় উইলেনস্কী আফ্রিকানদিগকে অষ্টম ডোমিনিয়নের লোভ দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু গণভোট গ্রহণের দাবীতে রাজী হন নাই। কিন্তু ফেডারেশন গঠনের নীতি সম্মেলনে স্বীকৃত হইয়াছিল। উত্তর-বোডেশিয়ার আইন সভায় ‘কেন্দ্রীয় আফ্রিকা গঠনের ব্যবস্থা করিবার জন্ত ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল, দুই জন আফ্রিকান এবং দুই জন ইউরোপীয় উহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। ইউরোপীয়রা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। গত নবেম্বর (১৯৫০) মাসে ব্রিটিশ

গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করেন যে, ফেডারেশন গঠনের প্রথম সম্পর্কে আলোচনাব জন্ম একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে। তদনুসারে আহূত সম্মেলনে আফ্রিকানদের জন্ম বক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিয়া ফেডারেশন গঠনের সুপারিশ করা হয়। যে ফেডারেল আইন সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়, তাহাতে ইউরোপীয়দের একচ্ছত্র প্রাধান্য তো থাকিবেই, তাছাড়া দক্ষিণ-রোডেশিয়াকে কতগুলি বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা আছে। সম্মেলনে গৃহীত ফেডারেশন সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে আফ্রিকানদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে জনমত স্বাক্ষ্রে প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইবার জন্ম বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ জেমস গ্রিফিথস্ এবং কমনওয়েলথ সম্পর্ক সংক্রান্ত সচিব মিঃ গর্ডন ওয়াকার উক্ত রাজ্য তিনটি পরিভ্রমণ করেন। আফ্রিকানরা এইরূপ ফেডারেশনের বিরোধী তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বাকী রহিল না। কিন্তু দক্ষিণ-রোডেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্যার গডফ্রে হাগিল দাবী করেন যে, হয় উত্তর রোডেশিয়া এবং নাশালাণ্ডের সহিত ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে, না হয় তাঁহারা দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নের সহিত যোগদান করিবেন। দক্ষিণ-রোডেশিয়ার আফ্রিকানরাগণ কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে দক্ষিণ-আফ্রিকার ডাঃ মসানের পাটিয় অনুকরণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন। এই অবস্থায় ভিক্টোরিয়া ফলস্ অনুষ্ঠিত সম্মেলন ফলশ্রুতি হওয়ায় আশা করা সম্ভবও ছিল না। সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় আফ্রিকানরা খুশী হইয়াছে এই কাণে যে, কেন্দ্রীয় আফ্রিকা ফেডারেশন আর একটি দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়নে পরিণত হইত।

অষ্টম ডোমিনিয়নে আফ্রিকানদের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, দক্ষিণ-আফ্রিকার দিকে চাতিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। দক্ষিণ বোডেশিয়ার আফ্রিকানের সংখ্যা ২০ লক্ষ। যেতান্সদের অধীনে তাহারা অল্প ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতেছে। উত্তর-রোডেশিয়া এবং নাশালাণ্ডে আফ্রিকাবাসী এবং এশিয়াবাসীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ ৫২ হাজার। সেট স্থলে খেতকারীদের সংখ্যা ৪০ হাজারের বেশী নয়। এশিয়ার অধিবাসীদের মতই যেতান্সদের শোষণ, নিপীড়ন এবং আধিপত্য হইতে মুক্তিলাভ করাই আফ্রিকাবাসীদেরও সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান সমস্যা।

### আজ্জেন্টিনায় নকল বিদ্রোহ—

লাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে চিরবিদ্রোহের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক-দেশে না এক-দেশে বিদ্রোহ প্রায় লাগিয়াই আছে। কিন্তু সম্প্রতি গত ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫১) আজ্জেন্টিনায় যে সামরিক বিদ্রোহ অকস্মৎ দপ করিয়া অগ্নিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধাপিত হইয়া গেল, তাহার তাৎপর্য বুঝিয়া উঠা কঠিন বলিয়াই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, প্রকৃত সংবাদ পাওয়াই দুরূহ। যুদ্ধের সময় আজ্জেন্টিনা ছিল নাৎসীবাদের অনুসারী, যুদ্ধের পরে হইয়াছে নাৎসী-বিরোধী। রিপাবলিকান বা প্রজাতান্ত্রিক আজ্জেন্টিনার অর্ধ-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের উপর যে ডিক্টেটরশিপ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বাদ দিয়া এই ব্যর্থ বিদ্রোহের স্বরূপ বুঝিয়া উঠা সম্ভব নয়। পেরণের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের পরিণতি এসোগলিজেম না হইয়া হইয়াছে ফ্যাসিজমের

মধ্যে। আজ্জেন্টিনার শ্রমিক প্রতিষ্ঠান 'জেনারেল কন্ফেডারেশন অব লেবার' গবর্ণমেন্টের উত্তোঙ্গে গঠিত ও পরিচালিত। সৈন্য-বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে না পারিলে ফ্যাসিষ্ট শক্তি সূদূর হইতে পারে না। তাহা হইলে আজ্জেন্টিনার এই ব্যর্থ সামরিক বিদ্রোহের স্বরূপ কি?

কেহ কেহ মনে করেন যে, পেরণ-শাসনের বিরুদ্ধে কিছু দিন ধরিয়া আজ্জেন্টিনার অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা গভীর অসন্তোষ প্রধুমায়িত হইতেছিল। আগামী নবেম্বর মাসে (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্ম নির্বাচন হইবে। এই নির্বাচনে গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) প্রেসিডেন্ট সেনর জোয়ান পেরণের পত্নী সেনোরা ইভা পেরণ ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্ম প্রার্থী হওয়ায় এই অসন্তোষ আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অনেকে মনে করেন, ইহাতে পেরণিষ্টা দলের মধ্যে ফাটল ধরিবার আশঙ্কাও দেখা দিয়াছিল। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সামরিক বিভাগের আপত্তি জন্ম সেনোরা ইভা পেরণ ভাইস-প্রেসিডেন্টশিপের জন্ম প্রতিবন্ধিতা করিবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবু এই বিদ্রোহ কেন হইল? এই বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন দৃঢ়তাই যে শুধু দেখা যায় নাট তাহা নয়, বিদ্রোহের জন্ম কোনরূপ প্রস্তুতি হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। কোন রকমে যেন একটা বিদ্রোহের অভিনয় করা হইয়াছে মাত্র।

এই তথাকথিত বিদ্রোহটা যে একটা কৃত্রিম, একটা বানানো ব্যাপার, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পেরণ-গবর্ণমেন্টের বিরোধী দলগুলির মধ্যে রেডিক্যাল পাটিই প্রধান বিবোধী দল। তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সেনাবাহিনী চম্ভক্ষেপ চাছেন নাই। প্রকাশ্যেই এ কথা তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন। নির্বাচন আইন অনুসারে প্রত্যেক পাটিকেই প্রেসিডেন্ট পদের জন্ম এক জন করিয়া প্রার্থী দাঁড় করাইতে হয়। নতুবা পাটির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবে, ইহাই আইনের বিধান। কিন্তু নির্বাচন আইনের বিধানগুলি পেরণিষ্টা দলের অনুকূল করিয়াই রচিত হইয়াছে। জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনের কোন উপায়ই বিরোধী দলগুলিকে দেওয়া হয় নাই। বেতারযোগে প্রচার করিবার কথা জনসভা আহ্বান করিবার অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত। তাহাদের কোন সংবাদপত্রও নাই। পেরণ-গবর্ণমেন্ট কখনই কোন সংবাদপত্রের উপর নিবেদাজ্ঞা জারী করেন না। কিন্তু কোন সংবাদপত্র যদি পেরণ-গবর্ণমেন্টের কোন সমালোচনা কবে, তাহা হইলে হয় উহার মালিকানা-স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া উহাকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়, না হয় উহাকে পত্রিকা ছাপিবার কাগজ এবং বৈজাতিক শক্তি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই বিরোধী দলের কোন সংবাদপত্র না-থাকা মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নয়। পেরণিষ্টা দলের পক্ষ হইতে সেনর পেরণ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে বিবোধী দলগুলি সম্মিলিত ভাবে যে এক জন প্রার্থী দাঁড় করাইবেন, তাহারও উপায় নাই। সেনর পেরণ অল্প দলেব সহিত কোয়ালিশন করিয়াই প্রেসিডেন্ট হইয়াছেন। তাহার পরেই নির্বাচন আইন এমন ভাবে সংশোধন করা হইয়াছে যাহাতে পেরণকে পরাজিত করিবার জন্ম বিরোধী দল একাবন্ধ না হইতে পারে। পেরণিষ্টা-বিরোধী ভোটগুলিকে বিভক্ত করিয়া রাখাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

নির্বাচনে জয়লাভ করিবার পক্ষে সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা শুধু পেরণিষ্টা দলের একচেটিয়া থাকা সত্ত্বেও কৃত্রিম বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়া বিরোধী দলগুলির গলা চাপিয়া ধরিবার এই প্রয়াস কেন, এই প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইতে পারে। ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদের জন্ত ইভা পেরণের প্রার্থী হওয়া সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে আশায়ুরূপ জনসমাবেশ করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য লক্ষাধিক বালক-বালিকার সমাবেশ করা সম্ভব হইলেও উহা এক হস্তাকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পদের জন্ত রেডিক্যাল পার্টির প্রার্থী মনোনয়ন উপলক্ষে প্রায় ৮০ হাজার লোকের সমাবেশই শুধু হয় নাই, এই উপলক্ষে যে-বিপুল উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে পেরণিষ্টা পার্টির জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। নির্বাচন যাত্রাতে নিরীক্সে, বিনা বাধায় এবং সহজে পাড়ি পড়ে, তাহার জন্ত কৃত্রিম বিদ্রোহ ঘটাইয়া বিরোধী দলগুলিকে কোণঠাসা করিয়া রাখিবার আগ্রহ হওয়া খুব স্বাভাবিক। সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনাব কথা পূর্বে হইতেই তিনি জানিতেন, এ কথা প্রেসিডেন্ট পেরণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্রোহও অতি সহজেই দমিত হইয়াছে। কাজেই বিদ্রোহের তাৎপর্য বুঝা খুব কঠিন হওয়ার কারণ নাই। নির্বাচন যাত্রাতে স্বাধীন ভাবে না হইতে পারে, তাহার জন্তই এই নকল বিদ্রোহের ব্যবস্থা।

### অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি—

অষ্ট্রেলিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করিবার উদ্দেশ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫১) যে ‘রেকার্ডেগাম’ বা জনমত গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে গবর্ণমেন্ট পক্ষই পূর্বাভাসিত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী করিবার পক্ষে ১৭,৩৭,০০০ ভোট এবং বিপক্ষে ১৮,১৮,০০০ ভোট হওয়ায় ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়ার জনগণের অধিকাংশই কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী করা সমর্থন করে না। ইতিপূর্বে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে বে-আইনী করিবার জন্ত অষ্ট্রেলিয়ার যুক্ত-রাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দিয়া যে আইন পাশ করা হইয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়ার হাইকোর্ট উহাকে শাস্তির সময় শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। গত ১৮ই জুন (১৯৫১) অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি উচ্ছেদের জন্ত তাঁহাকে ক্ষমতা না দেওয়া হইলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্ত তিনি গণভোট গ্রহণ করিবেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির উচ্ছেদের ক্ষমতা পাওয়ার জন্তই এই গণভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল।

যাহারা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে বে-আইনী করিবার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে তাহারা কম্যুনিজম পছন্দ করে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবু তাহারা বিরুদ্ধে ভোট দিল কেন? কেহ কেহ মনে করেন, ইহা বিরোধী দলের নেতা ডাঃ ইভার্টের ব্যক্তিগত জয়। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জয় সম্ভব হইয়াছে যে সকল কারণে, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। প্রথমতঃ, শুধু তাহাদের দার্শনিক মতবাদের জন্তই কম্যুনিষ্টদিগকে শাস্তি দেওয়া তাহারা পছন্দ করে

না। দ্বিতীয়তঃ, কম্যুনিষ্ট পার্টি বিলোপ আইনে কম্যুনিজম এবং কম্যুনিষ্টের সংজ্ঞা এত ব্যাপক করা হইয়াছে যে, উহা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্টের বিরাগভাজন যে-কোন সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করিবার জন্ত প্রয়োগ করা চলিবে। তৃতীয়তঃ, ক্রম-বর্ধমান মূল্যফীতি, মুদ্রাফীতি, প্রয়োজনীয় জব্যের দৃষ্টাপ্যতার জন্ত সকলেরই মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কম্যুনিজমের সমস্ত অপেক্ষা এই-গুলিই তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। ‘রক্ষা-ব্যবস্থা আয়োজন আইনের’ প্রতিক্রিয়া দৈনন্দিন জীবনের উপর কিরূপ হইবে, তাহাও তাঁহারা অনুমান করিতে পারিতেছেন না। বিশেষতঃ ১০ হাজার সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এবং জনকল্যাণমূলক কার্যগুলি যে ভাবে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে বহু শ্রমিকের বেকার হওয়ার আশঙ্কা। এই সকল মিলিয়াই বিরোধী ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

### মাল্যের সমস্যা—

মালয় ফেডারেশনের ব্রিটিশ হাই কমিশনার শ্রীর হেনরী গার্নে গত ৬ই অক্টোবর (১৯৫১) কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহীদের গুলীতে নিহত হওয়ার বুঝা যাইতেছে যে, তিন বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া মালয়ে কম্যুনিষ্ট দমনের যে-চেষ্টা চলিতেছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দমনের জন্ত ত্রিগসু পরিকল্পনাকে একটা বিরাট সামরিক অভিযান বলিলে একটুও অতুক্তি করা হয় না। কম্যুনিষ্টদিগকে ভাতে মারিবার জন্ত কোন ব্যবস্থাই বাকী রাখা হয় নাই। কম্যুনিষ্টদিগকে খাণ্ড যোগাইবার অপরাধে কাসী পর্য্যন্ত দেওয়া হইতেছে। অথচ যে-অঞ্চলকে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং সুবক্ষিত বলিয়া মনে করা হয়, সেইখানেই মালয়ের সর্বোচ্চ ব্রিটিশ অফিসার কম্যুনিষ্টদের হাতে নিহত হইলেন। শ্রীর হেনরী গার্নে মালয় ফেডারেল গবর্ণমেন্টের সর্বময় কর্তা। মালয় ফেডারেল গবর্ণমেন্টের রাজধানী কুয়ালা-লামপুর হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী ফেজার পাঁচড়ে তাঁহার গ্রীষ্মাবাস। ১৯৪৮ সালে এক দল ইউরোপীয়ের উপর কয়েকটি গুলীবর্ষণ ব্যতীত কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত এই রাস্তার উপর কোন সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যকলাপ হয় নাই। শ্রীর হেনরী যখন কুয়ালালামপুর হইতে তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে যাইতেছিলেন, সেই সময় গরিলাদের গুলীতে নিহত হন। দলের অগ্গাণ্ডদের সহ লেডি গার্নে অগ্নি মোটরে ছিলেন বলিয়া গুলীর ধারাবর্ষণের মধ্যেও তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন।

শ্রীর হেনরী গার্নে ছিলেন মালয়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিভূ। তিনি নিহত হওয়ায় আর এক জন প্রতিভূ তাঁহার স্থান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু মালয়ের আসল প্রশ্ন স্বাধীনতা। মালয়কে স্বাধীনতা দিলে হয়ত সন্ত্রাসবাদ নিরোধ করা অনেক সহজ হইত। মালয়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ বোল আনা বজায় রাখিয়াও কি করিয়া মালয়কে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, ব্রিটিশ শ্রমিক গবর্ণমেন্টও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মালয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের মত কোন প্রতিষ্ঠান নাই, ইহা একটা কারণ হইতে পারে। সম্প্রতি ইউনাইটেড মালয় নেশনাল অর্গেনাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি দাতো ওন বিন জাফর উক্ত দল পরিত্যাগ করিয়া মালয় স্বাধীনতা পার্টি (Independence

for Malaya Party) গঠন করিয়াছেন। ভারতে কংগ্রেসের মতই মালয়ে এই নূতন দলকে মালয়েব জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই পার্টি গঠিত হইয়াছে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১)। সার্কভোম বাহু হিসাবে মালয়েব স্বাধীনতা অঙ্গন করাষ্ট এই নূতন দলের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

দাতো ওন নূতন দল কেন গঠন করিলেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া বলিয়াছেন, “আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, নয়টি মালয় রাষ্ট্রে নয় জন শাসকের শাসন প্রতিষ্ঠিত, নয় জন ‘মন্ত্রীমোদার’ বা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত এবং ফেডারেল কাউন্সিল গঠিত হইয়া মালয় ফেডারেশন গঠিত হওয়ায় আর কিছুই বাকী বহিল না। কিন্তু আমি দেখিতেছি অবস্থা অন্যরূপ। আমি বলিতে পারি যে, আমাদের বক্ষকগণ আমাদের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য পালন করেন নাই।” এই বক্ষকগণ যে ব্রিটিশ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাব এই উক্তি মালয়েব সকল সম্প্রদায়েব অধিবাসীদের কাছেই হস্তাকব বলিয়া মনে হইবে। দাতো ওনই মালয় ইউনিয়ন গঠনের পবিকল্পনার বিক্ষেপে আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং দাবী করিয়াছিলেন মালয় রাষ্ট্রগুলি স্বাভাবিক পক্ষ করিয়া শাসকদিগকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবাব। এই আন্দোলন চালনা করিবাব জন্ত তিনিই মালয়েব সামন্ত সদাব, আভজাত শ্রেণী এবং ব্যবসায়াদিগকে লইয়া ইউনাইটেড মালয় নেশনাল অর্গেনাইজেশন গঠন করেন। মালয় ফেডারেশন পবিকল্পনার তিনি অগ্রতম বচসিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যখন ফেডারেশন গঠনে রাজী হইলেন, তখন তিনি এবং আবও বসেক জন মালয়ী এবং ব্রিটিশ প্রতিনিধি মিলিত হইয়া যে ফেডারেশন পবিকল্পনা গঠন করেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাকেই কায্যকরী করিয়াছেন। দাতো ওন ফেডারেল গবর্ণমেন্টে স্বরাষ্ট্র বিভাগেব ভাবপ্রাপ্ত সদস্য। পদ-মর্যাদায় মালয় ফেডারেশনের তাহা কমিশনারেব পদেই তাঁহাব স্থান। তাহার নূতন পার্টি ব্রিটিশ সমবাদপত্রগুলি অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ লাভ করিয়াছে। তাহাবা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রিটিশেব নিষেধে এই পার্টি গঠিত হয় নাই। স্বাধীনতার অবরণে মালয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বহাল রাখিবাব জন্তই যে এই নূতন দল গঠিত হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা হওয়াই খুব স্বাভাবিক।

### মধ্য-প্রাচীতে বিক্ষোভ—

মধ্য-প্রাচীতে বিশেষ করিয়া ইরানে এবং মিশরে ব্রিটিশ বিরোধিতা তথা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাব যে প্রবল আন্দোলন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাব প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া ওঠা খুব সহজ বলিয়া মনে হয় না। ৪ঠা অক্টোবরে (১৯৫১) মধ্যে ইরান হইতে সমস্ত ব্রিটিশ বস্ত্রবিদ্ বা টেকনেশিয়ানদিগকে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়ার ফলে ইরানের তৈলখনি হইতে কাষ্যত: ব্রিটিশ অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে। গত ২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫১) ইরান গবর্ণমেন্ট যে নূতন প্রস্তাব করেন, তাহাতে ব্রিটিশ মানেজার নিযুক্ত করিবাব প্রস্তাব সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত ‘নিউজ উইক’ পত্রিকা লিখিয়াছেন যে,

আবও আলোচনা চালাইবার ভিত্তিধরূপ ইরানের প্রস্তাব গ্রহণ করিবাব জন্ত মার্কিন রাষ্ট্রবিভাগ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও ব্রিটেন সাধারণ নিয়মের ঘোষণা করিবাব পবও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কেন নূতন প্রস্তাব ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে অস্বীকার করিলেন, তাহা সমস্ত দুঃখের। ব্রিটেন তৈল-সমগ্র্য লইয়া নিরাপত্তা পরিষদের দাবস্ত হইয়াছে। কিন্তু ইরান আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে—ব্রিটেনের অভিযোগ শ্রবণ করিবাব অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের নাই। কারণ, উহা ইরানের ঘোষণা ব্যাপ্য। এদিকে মিশর ১৯৩৬ সালেব ইঙ্গ মিশর চুক্তি বাতিল করিবাব এবং মিশরের রাজাকে স্বদানের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করিবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইরাক উপস্থিত করিয়াছে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি পবিবর্তন করিবাব। এংলো-ইরানীয় তৈল কোম্পানীর সহিত ইরানের বিরোধে ইরাকেব নীতিতে ইরান সন্তুষ্ট হয় নাই। পাবস্ত্র উপসাগরে পাহারা দিবাব জন্ত ব্রিটিশ বয়েল নৌবাহিনীর ইরাকের বন্দর ব্যবহারে ইরাক আপত্তি কবে নাই। ব্রিটেন যদি সত্য ইরানে বলপ্রয়োগ করিতে চায়, তাহা হইলে ইরাকের বিমান বাহিনীগুলি ব্রিটেন এই উদ্দেশ্যে ব্যবহাব করিবে, এই আশঙ্কা ইরান উপেক্ষা করিতে পাবে নাই।

মবক্তোতে ফার্স সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতিভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া মিশর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। সিবিরার কাছে এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হয় নাই। কারণ, সিবির্য তাহার সৈন্তবাহিনীর জন্ত ফ্রান্সের নিকট হইতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পাওয়াব প্রত্যাশা করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লিবিয়া আগামী ১লা জানুয়ারী (১৯৫২) স্বাধীনতা লাভ করিবে। এদিকে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে যে, ব্রিটেন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া লিবিয়াকে গ্রাস করিতে উজ্জত হইয়াছে। বস্ততঃ, ব্রিটেন এবং লিবিয়ার মধ্যে একটা রক্ষা-চুক্তি করিবাব জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন লিবিয়ায় সৈন্ত রাখিতে পারিবে। ব্রিটেন আবাব লিবিয়াকে আর্থিক সাহায্যও দিতে চায়।

মধ্য-প্রাচ্যে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান প্রব্র—রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার নিরোধ করা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সঙ্গে নিজেব প্রভাবও বিস্তার করিতে চায়। ফ্রান্সও সিরিয়া ও লেবাননে তাহাব দ্বিত প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যে কাড়াকাড়ি ভাব একেবারেই নাই, তাহা নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা এখন আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করিয়া শক্তি ক্ষয় করিতে চায় না। মধ্য-প্রাচ্যে রক্ষা ব্যবস্থাব অজুহাতে তাহারা মধ্য-প্রাচীতে তাহাদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির শাসকশ্রেণী দাবী জনগণের দাবী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জনগণের দাবী অল্প বস্ত্বেব দাবী, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবাব দাবী। কিন্তু শাসকশ্রেণী চায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া এই দাবীকে দাবাহই রাখিতে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর উপর চাপ দিয়া অর্থা তাহাদিগকে ‘ব্ল্যাক মেইলিং’ করিয়া নিজেদের শাসন-ক্ষমতাকে স্থায়ী দান করিতে। ইরানের তৈল-সমগ্র্য, সয়েজ ক্যানাল এবং স্বদান সম্পর্কে মিশরের দাবীর প্রকৃত মূল এইখানেই। মিশ-



যে মধ্য-প্রাচ্যী রক্ষা-ব্যবস্থায় যোগদান করিতে চতুঃশক্তির আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহাও বড় রকমের একটা চাপ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

### পশ্চিম-জার্মানী—

১০ই হইতে ১৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৫১) পর্য্যন্ত ওয়াশিংটনে বৃহৎ পররাষ্ট্র-সচিবত্রয়ের সম্মেলনে পশ্চিম-জার্মানীর সহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে মতৈক্য হইয়াছে। পশ্চিম ইউরোপের রক্ষা-ব্যবস্থায় ইউরোপীয় বাহিনীতে জার্মান সৈন্য গ্রহণ সম্পর্কেও তাঁহারা একমত হইয়াছেন। অতঃপর অটোম্যাতে উত্তর-আটলান্টিক ট্রিটি কাউন্সিলের অধিবেশন ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে উত্তর-আটলান্টিক মিত্র-গোষ্ঠীতে গ্রীস ও তুবস্বকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তই একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পশ্চিম-জার্মানী সাক্ষাত্ত সমস্তার সমাধান হইয়া গিয়াছে তাহা মনে করিবার যেমন কোন কারণ নাই, তেমনি পূর্ব-জার্মানীর লোক-পরিষদের অমু্যোদানদ্বারা প্রধান মন্ত্রী তের গ্রোটেওল একব্যবন্ধ জার্মানী গঠনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে জার্মান সমস্তার এক নূতন জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। পশ্চিম-জার্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনাউস পত্রপাঠ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেও জার্মান জনগণের মধ্যে উদ্ভাব প্রতিক্রিয়া উপেক্ষার বিষয় হইবে না।

পশ্চিম-জার্মানীর সমস্তা বাতীত ইটালীর শাস্তি-চুক্তি পরিবর্তনের সমস্তাও বড় কম জটিল নয়। ইটালী উত্তর-আটলান্টিক গোষ্ঠীর অগ্রতম সদস্য। কিন্তু শাস্তি-চুক্তি অমু্যায়ী ইটালী অন্তঃসজ্জা বাড়াইতে এবং সৈন্যসংখ্যা তিন লক্ষের বেশী করিতে পাবে না। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে ইটালীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত শাস্তি-চুক্তির পরিবর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু সমস্তা এই যে, রাশিয়া এই চুক্তিতে অগ্রতম স্বাক্ষরকারী এবং শাস্তি-চুক্তির পরিবর্তন করিতে হইলে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সকলেবই সম্মতি প্রয়োজন। রাশিয়াকে বাদ দিয়া কিরূপে ইটালীর সহিত শাস্তি-চুক্তি পরিবর্তন করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাও পশ্চিমী শক্তিবর্গের আর এক সমস্তা।

### কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা—

সুদীর্ঘ অচল অবস্থার পর গত ১০ই অক্টোবর (১৯৫১) পানমুনজুনে আবার কোরিয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধবিরতি কমিটির (Armistice Committee) আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। এ পর্য্যন্ত শুধু আলোচনার স্থান সম্পর্কেই মীমাংসা হইয়াছে। এখনও নিরপেক্ষ অঞ্চলের পরিধি ও উহার রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মীমাংসা হওয়া বাকী রহিয়াছে। এ সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার পর যুদ্ধবিরতি কমিটির আলোচনা আরম্ভ হইলেই যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নির্ধারণের পুরাতন সমস্তা আবার নূতন হইয়া দেখা দিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবী করে, কম্যুনিষ্টদের বিপুল সংখ্যক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কিন্তু তথ্যবঞ্চিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষেও হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতি বড় কম হয় নাই। কম্যুনিষ্টদের 'জেট ফাইটার' মার্কিন ভারী বোম্বার্ক বিমানগুলির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম্যুনিষ্টদিগকে ঘায়েল করিবার জন্ত সর্বাত্মক আঘাত করা সত্ত্বেও কোরিয়া যুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের শক্তির প্রাধান্যই লক্ষিত হইতেছে। কোরিয়ায় পরমাণু বোমা বর্ষণের কথা আবার উঠিয়াছে। ১৯ই অক্টোবর (১৯৫১) পিকিং রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, পরমাণু বোমা তৈয়ারীর উপায় একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ারই জানা আছে তাহা নয়। ইহার অর্থ চীনেরও পরমাণু বোমা আছে।

### বৃটিশ নির্বাচন—

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ২৫শে অক্টোবর (১৯৫১)। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত হয়ত নির্বাচন শেষ হইয়া ফলাফল প্রকাশিতই হইয়া যাইবে। নির্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক, উহাতে বৃটেনের বর্তমান সঙ্কটের সমাধান কতটুকু হইতে পারে, তাহাই শুধু এখানে আমরা আলোচনা করিব। বৃটেনের বিগত সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫০ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। এই নির্বাচনে শ্রমিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাত জনে আসিয়া ঠাঁড়ায়। নির্বাচনের পর হইতেই পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের দাবী উঠে। অবশেষে এক বৎসর আট মাস পরে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন হইতেছে। এই নির্বাচন উপলক্ষে প্রধান দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল অর্থাৎ শ্রমিক দল এবং টোরা বা রক্ষণশীল দল যে-নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কি পররাষ্ট্র-নীতিতে এই দুই দলের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নাই। বৃটেনের যাহা মূল সমস্তা, তাহা সমাধানের প্রশ্ন লইয়া এই নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেছে না। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা পথ্যস্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, এই মূল সমস্তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এই সমস্তা উপাধান করিলে কোন দলেরই কোন স্তবিধা হইবে না। 'সাণ্ডে অবজারভার' পত্রিকাও অল্পকণ কথাই বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এই নির্বাচনে স্বতন্ত্র দুইটি রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির মধ্যে কোন একটির পক্ষে বা বিপক্ষে বৃটিশ ভোটারগণ ভোট দিবেন না। বৃটেন কি ভাবে পরিচালিত হইবে তাহা নয়, কোন্ দল দেশ পরিচালন করিবেন, এই নির্বাচনে তাহাদের ভোট দ্বারা তাহাই শুধু নির্ধারিত হইবে।

বৃটিশ শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দলের মধ্যে নীতিগত দিক হইতে বিশেষ কিছুই পার্থক্য আর নাই। মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র-নীতি গোড়া হইতেই রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতির ধারা অমু্যসরণ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। শ্রমিক দলের পররাষ্ট্র-নীতি এবং রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্র-নীতি এক এবং অভিন্ন। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনের সময় আভ্যন্তরীণ নীতিতে বৃটিশ শ্রমিক দলেব একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বটে, কিন্তু ১৯৫০ সালের নির্বাচনের সময়ে আভ্যন্তরীণ নীতিতে বৃটিশ শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দলের পার্থক্য খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। উক্ত নির্বাচনের পরে বৃটিশ শ্রমিক দলের নীতি শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা বৃটিশ শিল্পপতিদিগকে অসন্তুষ্ট না করার পথেই পরিচালিত হইয়াছে।

শ্রমিক দল এবং রক্ষণশীল দল উভয় দলেই ক্ষমতা পাইলে ৪৭০ কোটি পাউণ্ড ব্যয়ের অন্তঃসজ্জা পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার প্রতিজ্ঞা দিয়াছেন। একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রাধিকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বহাল রাখা সম্পর্কেও উভয়

দলের নির্বাচন-প্রতিষ্ঠতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। কর-নীতি সম্পর্কে রক্ষণশীল দল বলিয়াছেন যে, লাভের পরিমাণ অত্যধিক হইলে অতিরিক্ত লাভ-কর ধায়া করিবেন। শ্রমিক দল ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত লাভ করার পথই বন্ধ করা হইবে। তাঁহারা ইতিপূর্বেই লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। উজাকে আরও প্রসারিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের প্রচুর সম্পদ এবং অনর্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে। কিন্তু ধনী শ্রেণীকে এই ভাবে শোষণ করিলে তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন নিয়োগ না-ও করিতে পারেন। এই আশঙ্কা নিরোধের জন্ত তাঁহারা জানাইয়াছেন, প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্ত রাষ্ট্রের পরিচালনাধীনে নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইবে। শ্রমিক দল আবও জানাইয়াছেন যে, যখনই সম্ভব হইবে মজুরি, অল্প আয় এবং উত্তরাধিকারহীন প্রাপ্ত অল্প সম্পত্তির উপর ট্যাক্স হ্রাস করা হইবে। শ্রমিক দল নারী ও পুরুষের বেতনের পার্থক্যও দূর করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যদিও ইতিপূর্বে তাঁহারা উহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। গৃহনির্মাণ ব্যাপারে রক্ষণশীল দল বৎসরে তিন লক্ষ গৃহ ও শ্রমিক দল বৎসরে দুই লক্ষ গৃহ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। রক্ষণশীল দল সবকারী ব্যয় হ্রাস করিবার আশ্বাস দিয়াছেন, তবে জন-কল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস করার কথা বলিতে তাঁহারাও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। শ্রমিক, বেকার-সমস্যা নিরোধ এবং মূল্যহ্রাসের

প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন। অবশ্য অন্তঃসঙ্ঘাত যত দিন চলিবে, তত দিন বুটেনে বেকার-সমস্যা দেখা দিবার কোন কাণ্ড নাট। রক্ষণশীল দল লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কবণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবে এবং অল্প কোন শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করিবে না। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প ব্যতীত আর যে সকল শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে কোন পরিবর্তন করা হইবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুটেনে রক্ষণশীল দলের শাসনই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চায়, যদিও শ্রমিক গবর্ণমেণ্টও আমেরিকার আনুগত্য কবিত্তে ক্রটি করে নাই। বৃটিশ শ্রমিক দলে ভাঙ্গন ধবিবার যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক দলের জাতীয় নির্বাচক সমিতিতে মিঃ মরিসন, মিঃ ডালটন, মিঃ শিনওয়েল এবং মিঃ গ্রিফিথসের পরিবর্তে মিঃ বিডান এবং তাঁহাব দলভুক্ত মিসেস কাসল এবং মিঃ টম ডিবার্গ স্থান পাওয়ায় বৃটিশ শ্রমিক দল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকতর বিরাগভাজন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃটিশ নির্বাচনের ফলাফল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব দ্বারা অনেক-খানি নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না। ফ্রাংক ভোটের অর্থ্যৎ বাতাব কোন দলভুক্ত নহেন তাঁহাদের ভোট দ্বারা শ্রমিক দল ও রক্ষণশীল দলের ভাগ্য নির্ধারিত হইবে। ইহার উচ্চবিন্ত শ্রমিক এবং নিম্নবিন্ত মধ্যশ্রেণীর লোক। তাঁহারা কোন পক্ষে ভোট দিবেন তাহা অসম্ভব।

## —সাহিত্য-পরিচয়—

(প্রাপ্তি-স্বীকার)

**কেতকী** (স্ববিজ্ঞান—১১)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

**MAHATMA (Life of Mohandas Karamchand Gandhi)—Vol I. (1869-1920)—D. G. Tendulkar.** Distributors, The Times of India Press, Fort, Bombay 1. Rs 25/-

**INTRODUCTION TO THE STUDY OF HINDUISM—Bepin Chandra Paul.** Yugayatri Prakashak Limited. 41/A, Baldeopara Road. Cal—6. Rs. 4/8-

**বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ**—জওহরলাল নেহরু। প্রকাশক—শ্রীশ্রবশচন্দ্র মজুমদার। শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস, আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। কলিকাতা—১। মূল্য বারো টাকা আট আনা।

**প্রাচীন ভারতে নারী**—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

**গোর্থ-বিজয়**—শ্রীগঙ্গানন মণ্ডল সম্পাদিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

**রূপাবলী** (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ)—নন্দলাল বসু। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি ভাগ মূল্য এক টাকা।

**অধ্যাত্ম যুক্তাবলী**—স্বামী ভূমানন্দ। প্রকাশক—শ্রীশশীল-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪৬ নং আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর, ২৪ পবগণা। মূল্য পাঁচ টাকা।

**সম্বন্ধ-নির্ণয়** (সপ্তম পরিশোধ)—শ্রীমানিকচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যা-বিনোদ সঙ্কলিত। ১৩৪ নং হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

**অ্যাং ব্যাং**—শ্রীশৈল চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বাব আনা।

**ম্যাও ম্যাও**—শ্রীশৈল চক্রবর্তী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য বাব আনা।

**চীনের যুক্তি-সংগ্রাম**—সুপ্রকাশ বসু। সেকুবা পাবলিশার্স, ইণ্ডোলা মার্কেট, কলিকাতা—১৪। মূল্য এক টাকা বার আনা।

**অন্তরায়**—শ্রীকুলবজ্র মুখোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ২০৩/১১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

**রৌজ-জ্যোৎস্না**—হুশীলকুমার গুপ্ত। বাইটাস কর্ণার। ১০৪/১৪ গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা—৩৬। মূল্য এক টাকা।

**শিক্ষা-প্রসঙ্গ**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চৌধুরী। ভারতী বুক ষ্টল, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য উল্লেখ নাই।

**গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা** (প্রথম ভাগ)—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর-কে পাবলিশিং কোং ১১১এ গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা—৫। মূল্য আড়াই টাকা।

**আমি তত্ত্ব**—শ্রীশ্রীমুদ্রেন্দ্রনাথ। ১২১১ নং কালিদাস পাতিতুডি লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

# সাময়িক প্রসঙ্গ

শুধুই ভাষণ

“গতকাল্য সত্যবতী নগরে (নয়াদিল্লী) কংগ্রেসের ৫৭তম

অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন সারবস্তু আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। লাহোর কংগ্রেসে এবং লন্ডনে কংগ্রেসে সভাপতির আসন হইতে তিনি যে চিবস্তরগায় অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কথা আমরা বাদই দিলাম। কিন্তু কংগ্রেসের ছয়টি বৎসরের ইতিহাসে এমন অসার অভিভাষণ আর কেহ প্রদান করেন নাই। কংগ্রেস ভুল পথে পরিচালিত হওয়া, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বাঙ্গালার অধিবেশনে সে সম্পর্কে তাঁহার সতর্কবাণী উচ্চারণ করা এবং তাহার ফলে কিছু পরিবর্তন হওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কংগ্রেস কোন্ দিকে তাকাইবে, কোন্ পথে অগ্রসর হইবে, এই জিজ্ঞাসাও তিনি তাঁহার অভিভাষণে উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এই জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিবার প্রয়াস অভিভাষণের কোথাও আমরা দেখিতে পাইলাম না। তিনি সমবেত প্রতিনিধিদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শুধু একাডেমিক আলোচনার জন্ত তাঁহারা মিলিত হন নাই, তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে এবং কণ্ঠস্বচী নির্দ্ধারণ করিতে। কিন্তু কি এই বাস্তব অবস্থার স্বরূপ, তাহার কোন ইঙ্গিত দিবার চেষ্টা করেন নাই। কোথাও সস্তা দার্শনিকতার আড়ালে বাস্তব অবস্থাকে তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আর যেখানে দার্শনিক সাজিবার চেষ্টা করেন নাই সেখানে তাঁহার বক্তব্য অত্যন্ত সাধাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস কি ভুল পথে চলিয়াছিল? নেহরুজীর সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ট্যাগুনজীকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা যে ভুল পথ বলিয়াই তাঁহার কাছে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ট্যাগুনজীকে সভাপতির আসন হইতে বিতাড়িত করিয়া এবং তাঁহাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া কংগ্রেসের কর্তৃত্বভার দল সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কংগ্রেসে ইহা যে একটা পরিবর্তন তাহাতেও সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের সত্যকার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কংগ্রেস যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে। তিনি মনে করেন, ঘটনাবলীর বিবর্তনে লোকের মনে বিভ্রম সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদিগকে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। সেই জন্ত মূলনীতি সম্পর্কে নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ও উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিভাষণের কোথাও স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল না। পররাষ্ট্রনীতি, খাজ-সমস্যা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, হিন্দু কোড বিল, জমিদারী উচ্ছেদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই তাঁহার উচ্চ অত্যন্ত ভাষা-ভাষা

হইয়াছে। কোথাও কোন গভীরতা নাই। মহাত্মা গান্ধীর কথা তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ না করিলেই নেহরুজী ভাল করিতেন। গডসে মহাত্মাজীর নম্র দেখকেই শুধু ধ্বংস করিতে পারিয়াছে। কিন্তু কংগ্রেস ধ্বংস করিয়াছে মহাত্মাজীর প্রাণশক্তিকে। মহাত্মাজীর জয়গান কবিত্তে করিতে তাঁহার আদর্শকে একদম বিলোপ করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কংগ্রেস প্রদর্শন করিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যে আর সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, উহা যে পৃথিবীর একটা অংশের মাত্র প্রতিনিধি, সে-সম্পর্কে নেহরুজীর সতীত কাহারও মতভেদ হইবে না। জনসাধারণ শাস্তি চাহিলেও রাষ্ট্রনায়কগণ সমর-সজ্জা কেন করিতেছেন নেহরুজী তাঁহার কারণের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। তিনিও শাসক-শ্রেণীরই এক জন। তাই শাসক-শ্রেণী এবং জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানটা তাঁহার দৃষ্টিতে ধরা না পড়াই স্বাভাবিক। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিবপেক্ষ অথবা ‘পেসিভ’ এ কথা তিনি স্বীকার না করিয়া ভালই করিয়াছেন। নিরপেক্ষতার আবরণে গা ঢাকিয়া ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকে যোগদান করিলে আমেরিকা সম্ভষ্ট হয় না, আমেরিকা চায় নগ্ন আনুগত্য। কিন্তু নেহরুজী আবরণের মায়া কাটাষ্টয়া উঠিতে পারেন নাই। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা নির্বাসক। কান্সার তাহার প্রমাণ। নেহরুজী মনে করেন, কম্যুনিজম প্রাণশক্তিকে বিনাশ করিয়া দেয়। কম্যুনিজম সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন কথা আমরা বলিতে চাই না। কিন্তু গণতন্ত্র শক্তি এবং সন্ত্রাসবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, স্বাধীনতার চারি বৎসরে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। এক দিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং স্থিতিবস্থা এবং আর এক দিকে পরিবর্তন ও প্রগতিশীলতার মধ্যে বিরোধের কথা বলিতে যাওয়া তিনি হিন্দু কোড বিলকে প্রগতিশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যে-কোন পরিবর্তনকেই যদি প্রগতি বলিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু সমাজে শিশু-শ্রম সৃষ্টি অবশ্যই প্রগতি।” —দৈনিক বঙ্গমতী।

মিশর

“মিশরীয় পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে : বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কেবল মাত্র যে সজ্জাব্যবস্থার সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়, উভয় পক্ষের সামরিক তোড়জোড়ও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে দ্রুতগতিতে। এক দিকে যেমন নূতন নূতন ব্রিটিশ সেনাদল সাইপ্রাস হইতে মিশর অভিমুখে ছুটিয়া সুর্য্যোজ্জ্বল খাল অঞ্চলের ব্রিটিশ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিতে চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি আবার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে মিশরীয় সৈন্যদল ও ট্যাঙ্কবহন স্থাপিত হইতেছে। পরিখা খনন ও কাঁটা তারের বেড়া নির্মাণ করিয়া রক্ষা-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইতেছে। ইহারই মাঝে মাঝে চলিতেছে ইতস্ততঃ ছোট-খাটো সজ্জা ও চোরাক্রমণ। পরিপূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির পশ্চাতে হইতে যখন এই ধরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ পরিচালিত হয় তখন অসম্মান করা অসম্ভব হইবে না যে, তাহা আসন্ন একটি বৃহত্তর সজ্জাব্যবস্থার সূচনাব্যবস্থা হইবে ; বস্তুতঃ সে কর্মভংগপ্রভা অসহিষ্ণু রণদেবতারই অস্থির অঙ্গসঞ্চালন। আরও কৌতুকাবহ ঘটনা হইল এই যে, এক দিকে যখন মাঝে মাঝে এইরূপ সশস্ত্র সজ্জা ও সামরিক প্রস্তুতি পরিচালিত হইতেছে, অপর দিকে মিশরীয় কড়পক্ষ তখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বর্জন ও

অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই দুইটি আন্দোলনের সাধনার ও সিদ্ধির পীঠস্থান ভারত : বর্জন ও অসহযোগ নীতির মন্ত্রদ্বারা স্বয়ং মহাত্মাজী স্বয়ং নেতৃত্বে ভারতীয় সে আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়াছেন ও পরিচালনা করিয়াছেন এবং তাহা করিতে গিয়া উল্লিখিত আন্দোলন দুইটিকে যে মূল নীতিটির নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়াছেন তাহার নাম নিরুপদ্রব বা অহিংস নীতি। তাই তাহার প্রবর্তিত ও পরিচালিত আন্দোলন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারত তাহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানে যে, বিবোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আন্দোলনকারী পক্ষ যেখানে সামরিক শক্তিতে ও সংহতিতে অগ্নি পক্ষ অপেক্ষা দুর্বল, প্রবল পক্ষ সেখানে তাহার নিজের স্বার্থেই চাহিবে—সে আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিকতার খাত হইতে সমর্থ ও সংগ্রামের পথে টানিয়া আনিতে। মিশরীয় কতৃপক্ষেরও যে সে তবু জানা না আছে তাহা নয় : মিশরীয় প্রেস সিগিকেট একটি বিরাট ব্রিটিশ হুর্ভিসন্ধি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, মিশরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বানচাল করিয়া দিবার হুর্ভিসন্ধি বশে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ বিক্ষোভকারী জনতাকে সম্মুখ লিপ্ত হইবার জগ্ন প্ররোচিত করিতেছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ইহা সনাতন অপকৌশল এবং পদ-শাসন হইতে মুক্তিকামী পক্ষ সে আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করিবেন ঠিক সেই পরিমাণ—যে অনুপাতে সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল তাহার এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হইবে। মিশরীয় জনসাধারণের মনোভাব যে ব্রিটিশ-বিবোধী হইবে তাহা আর বিচিত্র কি, কিন্তু তথাপি মিশরের স্বার্থেই সে বিবোধিতা

সংঘত ও সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক এবং যেহেতু বিদ্রূক জনতাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবার মত শক্তিশালী কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোন নেতা মিশরে নাই, সেই কারণে সে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে মিশর গবর্ণমেন্টকেই।”

—আনন্দবাহা পত্রিকা।

### রাজবন্দীদের মুক্তি চাই

“সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম দাখিলের আর একটা মাসও বাকী নাই। ১০ই নভেম্বর সরকারী নোটিশ পড়িবে। ১৯শে নভেম্বর নাম দাখিলের শেষ দিন। অথচ, আজও কয়েক শত রাজবন্দী পশ্চিমবঙ্গের কারা প্রাচীরেব অন্তরালে। নির্বাচনে যোগ দিবার কোন সুযোগই তাহারা পাইবেন না। কংগ্রেসী সরকার সে সুযোগ দিতে বাছী ন’ন। গত ১৬ই অক্টোবর পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন, নির্বাচনে যোগ দিবার জগ্ন রাজবন্দীদের মুক্তি দিবার কথা সবকাব চিন্তা করিতেছেন না। মাদ্রাজে পৃথক রাজবন্দীদের মুক্তি দিবার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহা ভাবিতেও ভয় পান। প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে ইহারা পতনের ভয় দেখিতেছেন। ভয় পাইবারই কথা। কংগ্রেসী কু-শাসনের বিকক্ষে দেশবাসী যে জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, কংগ্রেসী শাসকদের তাহাতে ভয় পাইবারই কথা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলি যে একাবদ্ধ ফ্রন্ট গঠিত হইয়াছে ও ইহা ব্যাপকতর হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, কংগ্রেসী শাসকরা তাহাতে শঙ্কিত। তাই তো বিবোধী পক্ষের গলা টিপিয়া ধরার জগ্ন



নিখুঁত  
অলঙ্কার

# পিসি আড

## ডুয়েলার

১২৫-বি.বহুজার ফ্রীট.কলিকাতা-১২



আইন-কাছন সব প্রস্তুত। শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত ও জনপ্রিয় শ্রমিক-কৃষক নেতাদের তাই লোকচক্ষুর অন্তরালে কাবাগাণে পরিচা বাণ্য হইয়াছে। কংগ্রেসী শাসকরা জানে, এই সব আত্মত্যাগী কর্মী জনতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে বামপন্থী ঐক্যের শক্তি শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। কংগ্রেসী কর্তাদের পবাক্ষয় স্থানিচিত্ত কবিতা তুলিবে। তাই, রাজবন্দীদের কাবাব লৌচ-কবাটেব অন্তরালে রাখিয়াই নির্বাচন চালাইবাব চক্রান্ত কংগ্রেসী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এ চক্রান্ত বার্থ করিবাব দায়িত্ব বামপন্থী দলগুলি। নির্বাচনের পথ সহজ সরল নয়। কংগ্রেসী দুঃশাসনের বাবা চূর্ণ করিয়াই নির্বাচনী সংগ্রাম অগ্রসর হইবে। রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলন সেই নির্বাচনী সংগ্রামেবই অংশ। প্রতিটি দলের প্রতিটি নির্বাচনী সভায় এই আওয়াজই ধনিত হইক—বাজবন্দীদের মুক্তি চাই। এই আওয়াজ ধনিত হইক প্রতিটি জিলায়, প্রতিটি জন-সমাবেশে।”

—বাপীনতা।

### ধৌকাবাজি

“কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী জাতীয় কবণেব ধৌকাবাজি জনতা-ব কাছে আমাদের স্বাধীনতা-ব স্বরূপ তুলিয়া ধরিয়াছে। বহু অর্থ শোষণ ও আমাদের দেশেব সম্পদে ভাণ্ডার ভর্তি করিয়াও স্বাধীন আমলে শোষণের ক্ষেত্রে ইংবাজ একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া বসিয়া আছে, এ কথা আর একবার সত্য প্রমাণিত হইল। শুধু ট্রাম কোম্পানীই নহে, ভারতবাসী বহু বকমেব শিল্প সংগঠন আজ ইংবাজেব আয়ত্তাধীন। অথচ সবগুলিই গড়িয়া উঠিয়াছে আমাদের দেশেব সম্পদে, শ্রমে। আজও এই শোষণ চলিয়াছে বিবান গতিতে। অথচ স্বাধীনতা পাইয়াও ঐগুলি দেশেব নিজের সম্পদ কবিবাব সামর্থ্য আমাদের নাই। আজ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বন্ধুগুলি বহুতে না বাগিয়াও ইংবাজ সমানে যে লুণ্ঠ চালাইতেছে তাহার প্রহরী আজ আমাদের নেতৃবৃন্দ তথা সবকাব। জনসাধারণেব স্বার্থকে ধূল্য লুটাইয়া দিয়া জাতীয় কবণেব মিথ্যা আশা দিয়া ইংবাজেব শোষণের যন্ত্রকে আরও দৃঢ়তর কবিবাব যে যত্নবদ্ধ কবা হইয়াছে, জনতা-ব অন্তরায় আজ তাহা চাপা থাকিলেও আগামী দিনের আগন্ত জনতা এই সব যত্নবদ্ধ কোন দিনই ক্ষমা কবাবে না।”

—বাপভূম-বার্তা।

### বিজ্ঞানসম্মত সেচ চাই

“পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক খাজ-ঘাটতি প্রায় ১’৫ লক্ষ টন চাল এবং ২’৫ লক্ষ টন গম। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তগণ আসাব পাবে এই ঘাটতির পরিমাণ অবশুই বাড়িয়াছে। সেই বাড়তি ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ টন চাল। পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমি পুনরুদ্ধার করার অসুবিধা অনেক, সেই জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের পতিত জমি উদ্ধারে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার হালকা ও ছোট টাক্তিরের সাহায্যে যত দূর সম্ভব পতিত জমি পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ কবিয়াছেন। বঙ্গবিভাগের পূর্ব পশ্চিমবঙ্গে বীজ বপনের কোন ফর্মাই ছিল না—সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে ভালো বীজ সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

দুই শত একর করিয়া ছোট বীজ তৈয়ারীর ফার্ম তৈয়ারীর পরিকল্পনা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে দুইটির কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। সার উৎপাদনের জন্ত সহরের মিউনিসিপ্যালিটিকালিক ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। গ্রামে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুতের জন্ত প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের জন্তও ব্যবস্থা হইয়াছে। এইকপ উৎসাহ দানের ফলে কয়েকটি কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত হইয়াছে। শস্তা উৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের মধ্যে আশাতীত উৎসাহ দেখা যায়। এই প্রতিযোগিতাব ফলে কোনও কোনও স্থানে গড়-পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। গ্রহিব সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত সেচ। আমাদের দেশের মৌসুমী বড় খামখেয়ালী। কোনও বৎসরে সে আসে নির্ধারিত সময়ের আগেই, কোনও বৎসব বা নির্ধারিত সময় পরেও তার দেখা পাওয়া যায় না। কোনও বৎসব তার দান বা বড় বেশি, কোনও বৎসর সে দুপণ। ফলে দেশে হয় অনাবৃষ্টি—নয় অতিবৃষ্টি অর্থাৎ চাষেব সর্বনাশ। সেই জন্তই মৌসুমীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কবা চলে না—প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত সেচের।”

—অজয়।

### মালদহে ভূখা-মিছিল

“বেদিন হট ত মালদহ Procurement অফিস বসিয়াছে, সেদিন হটতে মালদহবাসীরা খাজাভাব দেখা দিয়াছে, বেদিন হটতে মালদহবাসীকে প্রতিবেশী জেলা পশ্চিম-দিনাজপুর হটতে খাজা-চাউল আনয়নেব অধিকার হটতে বঞ্চিত কবা হইয়াছে, সেই দিন হটতে মালদহবাসীরা অদৃষ্ট উপদান শুরু হইয়াছে, বেদিন হটতে একই জেলাব হবিবপূর্ব বামনগোলা থানাব অধিবাসীদিগেব শত আপত্তি অগ্রাহ্য কবিয়া দুইটি থানাকে এক পৃথক কর্তন এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে, সেই দিন হটতেই শুরু হইয়াছে অপরাপব থানাগুলিতে ছহু কবিয়া ধান-চাউলের দাব বৃদ্ধি হটতে। ইতাবই ফলে এক দিকে মালদহবাসীর ঘরে ঘরে অনাভাব ও হাতাকাব, শত শত গরীব গাড়েয়ান লেকাব হইয়াছে, অপব দিকে মুষ্টিমেয় জনকয়েক জমিদার-জোতদার শ্রেণী লোক কনট্রোল ও কডনেব সুরোগে D. P. Agency লইয়া আবও ধনবান হইয়া উঠিয়াছে। মালদহে ভূখা-মিছিল বাতিব হটবার ইতাই হটল অন্তর্নিহিত কারণ। কর্তন এলাকাব বাতিবে জেলার সর্বত্রই আজ চাউলের মূল্য মণকরা ৫০/- টাকার কাছাকাছি। কংগ্রেসী শাসনে মালদহবাসীর যে আজ চরম খাজাভাব দেখা দিয়াছে, এ ছরবস্থা তাহাদের ইংরেজ রাজত্বে এমন কি ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও ভোগ করিতে হয় নাই। পশ্চিম-দিনাজপুরেও সরকার ঠিক একই অবস্থার সৃষ্টি কবিয়াছেন ৭০/- টাকা মণ দরে লক্ষ-লক্ষ মণ ধান সংগ্রহ কবিয়া জেলার বাহিরে চালান দেওয়ার ফলে সেখানকার চাষীরা আজ নিঃস্ব ও অনাভাব-কষ্ট পাউতেছে। ইতা আমাদের কথা নহে। পশ্চিম-দিনাজপুরে বর্তমান কংগ্রেস সেক্রেটারী মহাশয়ের অনশনেই ইহার ফলস্ত প্রমা-বিত্তাছে। দলে দলে লোক ভূখা-মিছিল কবিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-নিকট ধরা দিতেছে, মালদহে যদি স্থায়ী ভাবে ভূখা-মিছিল ক-করিতে হয়, তবে আমরা বিশেষ ভাবে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ কবলাম, তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা হওয়া উচিত।”

—উদয়ন

## দুর্গোৎসব

“প্রতি বৎসরের জায় এই বৎসর বিশেষ কবিয়া বাংলা দেশে দুর্গাপূজা সমাপ্ত হইয়াছে। ভগবান শিবামচন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বিধব বিপদে পড়িয়াছিলেন। দুর্গাপূজা কবিয়া রাবণ-ধ্বংসের ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাব পূজায় শ্রীরাঘচন্দ্রের দুর্গতে নাশ হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত আমাদের গীতাবা দুর্গাপূজা কবিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের দুর্গতি তো নাই। দুর্গতি আছে যাহা বা পূজা করিতে পারে না, যাহাদের পূজা করিবার অর্থ নাই। সেই জন্ত তাহাদের দুর্গতি দূর হয় নাই। কিন্তু আজকাল সার্বজনীন দুর্গাপূজা হইতেছে। এবার আমাদের দুর্গতদের দুর্গতি দূর হওয়ার কথা। কিন্তু সমাজের দুর্গতি যে সব আছে তাহা বা মধ্যে প্রবান দুর্গতি হইতেছে সমাজের অর্থ বৈধম্য। দুর্গা মাতা সবলকেই একটি বব দিয়া গিয়াছেন। দুর্গতি দূর হউক। ভগবান বামচন্দ্র দুর্গাব নিকট হইতে বব পাইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়াছিলেন না। বীতিমত জীবন-প’ করিয়া লড়াই কবিয়াছিলেন না। সমাজের মধ্যে যাহাদের বৈশী কিছু আছে তাহা বা আরও বৈশী কবিবার জন্ত চেষ্টা কবিব। কিন্তু বৈশী কবিবে কি কবিয়া? অপারগ শোষণ ছাড়া হইবার পথ নাই। দেশের ধনী মহাজনবা নানা ববম কৌশল কবিয়া আরও ধনোৎপাদনের চেষ্টা কবিবে। কিন্তু সমাজের বৈশীর ভাগ লোক যাহারা গরীব তাহাদিগকেও চেষ্টা কবিত্তে হইবে যাহাতে শোষণ বন্ধ করা যায়। বসিয়া থাকিলেই শোষণ অব্যাহত থাকিতে চলিতে থাকিবে। যদি সেই গরীব লোকদের দুর্গতি দূর করিতে হয় তবে যে পথে শোষণ আছে সে পথে তাহাদিগকে ত্যাগ কবিত্তে হইবে। যে পথে শোষণ আছে সে পথে তাহাদিগকে নিষ্ঠার সহিত জীবন পণ কবিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিলে দুর্গতি নাশ হইবে না। বীতিমত কার্য্য করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, গ্রামে গ্রামে ধনীরা টেকিকে ধস করিবার জন্ত ধান-কুটা কণ আনাইয়া দেশের গরীব লোকের দুর্গতি আরও বাড়াইয়া দিতেছে। গভর্ণমেণ্ট ধান-কুটা বল চালাইতে নিষেধ করা সত্ত্বেও কল আনাহতেছে ও বানীতে ধান কুটাইতেছে। কিন্তু যেখানে গরীব লোকেরা শোষিত হইতেছে সেখানে তাহারা নিরব দর্শকের মত কেবল মাথায় হাত দিয়া দেখিতেছে। এই সব শোষণ বন্ধ কবিবার জন্ত তাহারা গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিতে পারে। তাহাও যদি কবিত্ত না চায় তাহা হইলে ধনীরা দুর্গাপূজা কবিয়া যে বর লাভ কবিয়াছে তাহাতে তাহাদের দুর্গতি নাশ করিতে গিয়া গরীব লোকদের দুর্গতি বাড়াইয়া দিবে। এর জন্ত চাই সর্ব রকম দুর্গতি দূর কবিবার জন্ত স্বাবলম্বন চেষ্টা। সেই স্বাবলম্বন চেষ্টার কথা দিয়া শোষণ চিবতবে বন্ধ হইয়া যাহবে ও দুর্গতি দূর হইয়া যাইবে। বর্তমান যুগের গরীবতার মহাত্মা গান্ধী সমাজের এই দুর্গতির কথা নানা ভাষায় নানা ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। সেই পন্থা অবলম্বন কবিয়া সমাজের দুর্গতি দূর কবিত্তে হইবে। এই পথ ছাড়া আর কিছু পথ নাই। সব পথেই শোষণ আছে।”

— গ্রামসেবা ।



একলীতে দুর্গোৎসব

## জাগো দোকান কর্মচারী

“দোকান কর্মচারী, জাগো। তোমার আশে-পাশে কলেব কুটি, কারখানার মজুর, ক্ষেত্রের ভূমিহীন চাষীবা আজ ভেগে উঠছে। অফিসের কেবা-গা, স্কুল-কলেজের শিক্ষকের ভিতর বাঁচবার জ্ঞান তাগিদ এসেছে। চেয়ে দেখ—তোমার শ্রমের দ্বারা যে মুনাফা হয়েছে তাব দ্বারা বড় বড় বাড়ি-গাড়ী হয়েছে বটে, কিন্তু তোমার থাকবার বাসস্থান পেটকের অন্ধকারময় বাসস্থান হতেও নিরুপ্ত। তোমার খাওয়া, অপাওয়া বললেই চলে, তোমার শিশু আজ অনাহারে মরিচ। তোমার পরিবারের পবনে শতছিন্ন বসন। বোলে তোমার ঔষধ নাই—পথ্য নাই। মৃত্যু ছাড়া তোমার বিশ্রাম নাই। তবুও বতস্পন তুমি বেঁচে আছ, ততস্পন তোমাকে হাসিমুখে খরিকারের সামনে আসতে হবে। তোমার চন্দয়ের যন্ত্রণাকে ভুলে গিয়ে পথা নিয়ে তোমায় মসগুল হয়ে থাকতে হবে। নচেৎ তোমার চাকুরী নাই। অশ্রুণ বাক কামাট করলে চাকুরী হতে তোমায় জবাব হয়। তোমার আনন্দ কোথায়? অথচ সাধা দুনিয়াব লোকের মনোবঞ্জনব জ্ঞান তোমার অস্বাস্থ্য সাধনা। কিসে জনসমাজ সজ্জ হইবে, তাব জ্ঞান তোমার চির উৎকর্ষ। কিসে তোমার দোকান-মালিকেব দু’টি পয়সা মুনাফা বেশী আসবে, তার জ্ঞান তোমার আশ্রয় প্রয়াস। তোমার মূলধন মায় তোমার শ্রম দেখানি। এই মূলধন ভাঙ্গিয়ে তোমার পবিবাববর্গকে প্রতিপালন করিতে হয়। এই মূলধনকে যে রক্ষা করবে, তাব জ্ঞান ধ্বংস পাওয়া, বাসস্থান বা আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন তাব ব্যবস্থা কোথায়? বসন বন্ধি হওয়ার সাথে সাথে চাকুরী হতে তোমায় জবাব দেওয়া হয়। কাজ করিতে করিতে কাজের খড়্গতা হয়, তখন অভিজ্ঞ লোকের দাম বৃদ্ধি হয়। আব তোমার কপালে ঐধন চাকুরী হতে ছাটাই চলে। জীবনের সঞ্চয় যে যৌবন ও স্বাস্থ্য তা’ যতক্ষণ অটুট থাকে, ততক্ষণ তোমার কদর। শেষ জীবনে তোমার অল্পবস্ত্র সংস্থানের কোন উপায় থাকে না। নিরুপায় জীবন নিয়ে তোগাকে মৃত্যু পথান্ত অপেক্ষা করিতে হয়। মৃত্যুর পর তোমার আশান-খবচও জোগাড হয় না। তোমার সম্মান-সম্মতির হুগতিব আব পবপার থাকে না। তুমি তোমার স্বাস্থ্য দিলে, রক্ত জল কবে দিয়ে, দোকান-মালিকেব যে মুনাফা কবে ‘গেলে তা’ তোমার ভোগে এল না। তাই সময় এসেছে তোমায় এবার জাগতে হবে। তোমার বাঁচবার দাবী নিয়ে তোমাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। সংগ্রাম বিনা কোন কাজ হয় না। মনে রেখো জীবনটাই সংগ্রামময়। তোমায় ত’ জন্ম হতেই সংগ্রাম করতে হচ্ছে—দোকানেও ত’ খরিকারের সাথে সাথে সংগ্রাম করতে হয়। কার্কেই জীবনকে পূর্ণরূপে ভোগ করতে হলে তোমায় আজ সংগ্রাম হতে হবে। তোমায় আজ জাগতে হবে।”

—দোকান কর্মচারী

## সমবায় সমিতি চাই

“কয়েক দিনের পূর্বের একটি সংবাদ আমাদের মনকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। সংবাদটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর করিলে অল্পকাল ঘটনাব সন্ধান প্রায় সর্বত্রই মিলিলে।

সংবাদটিতে প্রকাশ, কেতুগ্রাম থানার অজয় নদীর তীরবর্তী একটি পল্লীর জমিদার কৃষক সকল জায়গা হইতে বিফল মনোরথ হইয়া কৃষি-বিভাগেব কর্মচারীর পরামর্শ মত বর্ধমান জেলা কেন্দ্রীয় সর্বাধিক সমবায় সমিতির কার্যালয়ে দেড় হাজার বিঘা জমির ধান বন্কার সাহায্য চাহিতেছেন। প্রস্তোত্তবে আরও জানা গিয়াছিল, জমির নিকটেই অজয়-সংলয় বিলে প্রচুর জল আছে। কেবল মাত্র জল তুলিয়া জমিতে দিবার উপযোগী ব্যবস্থাই কৃষকের একমাত্র দাবী। কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক বিষয়টিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়া সহায়ত্বের সহিত সাময়িক ভাবে পাশ্প কিনিতে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, এই সংবাদও আমবা পাইয়াছি। কিন্তু পাশ্প ক্রয় কবিতো ও সেই যন্ত্র সেখান পথান্ত লইয়া বাইতে যে সময়েব প্রয়োজন হইবে, ততটুকু সময় পর্যন্ত ধান বন্কা পাইবে কি না সে বিষয়ে কৃষকটি সন্দেহ প্রকাশ করায় কাজেব অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটনাটির গুরুত্ব বেশী নাই ইহা আমবা জানি। এইকপ ঘটনা যে বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থায় অহরহ ঘটিতেছে এ সংবাদও আমাদের কাছে নূতন নয়, তবুও ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে ও বর্তমান ভারতের সংগঠন কর্মী হিসাবে আমাদের দায়িত্বকে আমরা একেবারে অস্বীকার কবিতো পারিতেছি না। জলসংরক্ষণ ও জলসেচন ব্যবস্থাই বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার সর্বপ্রথম করণীয় কাজ। ইহার অভাবে কৃষকগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে কৃষিকার্যে উৎসাহ হারাইতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের দ্বারা উৎপন্ন ফসল বাঁচাইবার প্রচুর সম্ভাবনা তো বাংলা দেশে আছেই, ইহা ছাড়াও উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন নলকূপ বসাইয়াও ফসল বাঁচান বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত চিন্তা, সজ্ঞতি ও সামর্থ্যে ইহা সম্ভব হইতেছে না। হাজার বিঘা অথবা দেড় হাজার বিঘা জমির মালিক সম্মিলিত হইয়া সমবায় সমিতি গঠনের দাবা এই কাজ আবস্ত করিলে কেবল মাত্র যে ফসল বাঁচান সম্ভব হইতে পারে তাহা নহে, জেলায় সম্পদ সৃষ্টির কাজেও সাহায্য করা হইবে। বর্ধমান জেলার কৃষক সমাজের এই দিক দিয়া দৃষ্টিভঙ্গী পবিবর্তনের আশু প্রয়োজন বোধ হইতেছে। জেলার সংগঠন কর্মিগণ জেলাব কৃষক সমাজকে ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিতে উদ্যোগী হউন, এক্ষণে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।”

—বর্ধমানের কথা।

## উদ্বাস্তুদের দাবী

“পশ্চিমবঙ্গ সরকার হঠাৎ এক আদেশে কেবল মাত্র সরকারী তাঁবুস্থিত উদ্বাস্তুগণ ব্যতীত কোন উদ্বাস্তুকে কোন প্রকার সাহায্য দিবেন না বলিয়া ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক ভাবে উদ্বাস্তুদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে অর্ধাশন অনশন দেখা দিয়াছে এবং শীঘ্রই উদ্বাস্তুদিগকে চরম অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। বর্ধমান জেলার আগন্ত উদ্বাস্তু-সংখ্যার শতকরা ৭৫ জন সরকারী সাহায্য ও বেসরকারী সহায়তায় সরকারী তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পুনর্কাসন স্রব করিয়াছে এবং বহু কষ্টে নিজদিগকে স্রবুচ ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত

হইয়াছে। এমন সময় মধ্যপথে সরকার তাহাদিগকে এমন ভরা ভাৱে ডুবাইবাব পরোয়ানা জারী করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমবা হতবাক্ হইয়াছি। ভারতব ভাগ্যাকাশে দুষ্ট গ্রহস্বরূপ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাহাব সাম্প্রদায়িক বিষবাস্পে বাতারা তিষ্ঠিতে না পাবিয়া শত শত পুরুষেব পুত্র-পবিত্র জন্মভূমি ছাড়িয়া ছন্নছাড়া হইয়া এ দেশের পথে-প্রান্তরে বাবাবের জায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের পুনর্কাসন ও পুনঃ সংস্থানের জন্ত বাষ্ট্রের খেটুকু দায়িত্ব তাহা তাঁহারা এড়াইয়া চলিতেছেন। ঐ সমস্ত উদ্বাস্তদেব পুনর্কাসনের জন্ত যে পরিমাণ সবকাবী ঋণ দেওয়া হয় তাহা এক দিকে অপধ্যাস্ত এবং বাহাও দেওয়া হয় তাহাতে সবকাবের স্তূৰ্ণ পরিকল্পনাবিহীন ব্যবস্থায় এ-পর্যাস্ত কোন উদ্বাস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়ী ভাবে প্রাতীত হইতে পারে নাই। ঐ অবস্থাতেই সবকাব এক দিকে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া পুনর্কাসন কাষের অগ্রগতি বন্ধ কবিলেন, অজ্ঞা দিকে আবাব প্রদত্ত ঋণেব টাকা আদায় কবিত্তে উজত হইয়া অর্ধ-সমাপ্ত পুনর্কাসন ব্যবস্থাব চিবসমাধি ঘটাইতে চলিয়াছেন। উদ্বাস্তগণ পূর্ববঙ্গে পবিত্র জাত্যাহাদের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ কবিত্তে এবং তাহা হইতে দীণ মেয়াদে পুনর্কাসতি ঋণ আদায়েব ব্যবস্থা করিবাব জন্ত সবকাবের নিকট দাবী জানাইয়া আসিত্তেছে। ঐ দাবী তাহাদের জায্য দাবী—ইহা ভিক্ষা নহে। ভারত-পাক চুক্তি অনুযায়ী ঐ ব্যবস্থা কবিবাব ভাব ভাবত ইউনিয়ানের। আজ পর্যাস্ত ভাবত সরকার যে অজস্র অর্থ উপাস্ত পুনর্কাসন খাতে ব্যয় কবিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সবকাব ও বাজ্য সবকাবের অব্যবস্থাব জন্ত তাহাব বত অংশ ভলে গিয়াছে। এহবাব অর্ধপথে সাহায্য বন্ধ করিয়া সবকাব অবশিষ্ট সমস্ত টাংট নষ্ট কবিলেন এবং অজ্ঞা দিকে একটা জীবন্ত স্তবংবন্ধ জাতিকে ভিণাবী বাবাবের পবিত্র কবিয়া সমাজেব সন্দর্শন দ্রাকিয়া আনিবিলেন। আমরা সবকাবকে ঐক্যপ আশ্রণ লইয়া খেলা না কবিবাব জন্ত সাবধান কবিত্তিছি।”

—দারিদ্র্যবদন।

### পাকিস্তানে আতঙ্ক

“ভারতের সহিত পাকিস্তানেব সন্ধি হইয়”ছে। প্রধান মন্ত্রী ভাষণে বলিত্তেছেন যে, পাকিস্তান সন্ধি-সর্গ পালন কবিত্তেছে না—অধিকন্তু ভীষণ ভাবেই ক্রম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সীমান্তে সীমান্তে নানা অনাচার সংঘটিত কবিত্তেছে। ভারতব পক্ষে সে সব অত্যাচার সহ কবা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানী মন্ত্রিগণও হুমকি দেখাইয়া বলিত্তেছেন—যুদ্ধ অনিবারণ্য নহে। ভারত এ সমুদয় শুনিয়া এ-কেন অনাচার-অত্যাচার দেখিয়াও নিরস্ত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সীমান্তবর্তী জনসমূহ যে ভীষণ বিপদে পড়িয়াছে এবং অতর্কিত কি আতঙ্ক ভোগ কবিত্তেছে, তাহা ভগবান ভিন্ন কেহ জানেন না। ভারতেরও বর্তব্য তাহার প্রজাবর্গের এ অন্তর্দীপ্ত অচিরে নিবৃতি করা। ক্রিয়া—রাজনীতি নহে। শত্রুকে শাসন কবাই রাজনীতি বলিয়া সর্বত্র শাস্ত্রসম্মত। শাসনের দোষ-ত্রুটি অত্যাচার-অনাচার না থাকিলে পূর্ব-পাকিস্তান

হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু পিতৃ-পিতামহেব ঘব-সংসার জমি-জায়গা বেড়-বাগিচা ছাড়িয়া চলিয়া আসিত্তেছে কেন? ইহা যে বাস্তবীকৃত অত্যাচার তাহা না বলিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গব মুসলমানগণের প্রতি কোন অত্যাচার হইতেছে কি? দেশ ছাড়িয়া পলায়ন কবিবাব মত তাঁহাদের কোন ঘটনা ঘটয়াছে কি? বাজ্যসমতা তাঁহাদিগকে সর্বদা রক্ষা কবিত্তেছেন। পূর্ববঙ্গে ইহাব সম্পূর্ণ অন্যব, ববং বিপবীত আচরণ। হিন্দুগণকে উৎখাত কবিয়া মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাই কি ইহাব উদ্দেশ্য নয়? ইংবাজেব আমলে হিন্দু-মুসলমান সমান ভাবে প্রতিবাসীভ জায় স্থখে বাস কবিত্ত, আজ তাহাব অতিক্রম হওয়ার বাজার অক্ষমতা প্রতিপাদিত হইতেছে। হিন্দুকে বিতাড়িত কবিয়া হিন্দুর ঘব-বাড়ী জমি-জায়গা আত্মসাৎ কবিয়া বড় হইবাব এ প্রচেষ্টা নিতাস্ত দুর্বলতা ও অত্যাচারেবই পবিচয়—ভগবদ্বিশ্বাসী মনে এ ভাবে অমঙ্গলেবই সৃচনা কবে।”

—মেদিনীপুৰ-তিঠৈষী।

### বঙ্গ বর্গনে অব্যবস্থা

“শিলচর সহরেব কো-অপারেটিভ ষ্টোর মাবক্ষতে যে কাপড় দেওয়া হইতেছে তাহা সাপাবণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতাব বাহিরে। এ সম্বন্ধে আমরা পূবে একবাব আলোচনা কবিয়াছি। আমাদের ভবসা ছিল, অপূজাব পূবে সম্ভা দবেব কাপড় আমদানী হইবে কিন্তু আমাদের সে আশা মোটেই ফলবতী হয় নাই। নূতন কোন চালান আসে নাই—পূবে যাচা ছিল তাহাই চড়া দরে বিক্রয় হইতেছে, অজ্ঞা কথায় বলিত্তে গেলে ক্রেতাদের উপব জোর কবিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। দুষ্টান্তস্বরূপ অধিকাণুর কো-অপারেটিভ ষ্টোবেব কথা উল্লেখ কবা হাইতে পাবে—এখানে একখানা ধুতি



ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি ভারতবর্ষ ও আমেরিকাব বন্ধুত্ব মাতে দুট হর সেজ্ঞ কয়েকটি গাছ মৈত্রী-নিদর্শন পাঠিয়েছেন। মিয়ামি পার্কের সুপারিটেণ্ডেন্ট বিমানপোন্তেব হুঁজন ষ্ট্রয়ার্ডের নিকট থেকে গাছগুলি গ্রহণ করছেন। মিয়ামি পার্কে ঐ গাছ পোতা হবে।



অথবা সাড়ি কিনিতে গেলে তৎসঙ্গে ২৮/০ গজ দরের ৫ গজ সাটিং নেওয়া বাধ্যতামূলক—প্রয়োজন না থাকিলেও নিতে হইবে। একে ত চাল-ডালের খরচ জোগাইতেই প্রাণান্ত, তার উপর হয়ত এক ব্যক্তি অতি কষ্টে একখানা ধুতির টাকা জোগাড় কবিল। তার শুধু ধুতিরই প্রয়োজন—সাটিংএব প্রয়োজন নাই এবং প্রয়োজন থাকিলেও বেশী দামের সাটিং তাহার উপযোগী নহে (যেমন মুটে-মজুর এবং দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী) কিন্তু তবুও নয় টাকা অতিবিক্ত অর্থাৎ মোট প্রায় ১৫/- খরচ না কবিলে সে ধুতি পাইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তির ৬/- জোগাড় করিতেই গলদ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, সে ১৫/- জোগাড় করিবে কোথা হইতে? গবর্ণমেন্ট সর্বসাধারণের সুবিধার জন্ত কো-অপারেটিভ ষ্টোর সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু বর্তমানে যাহা চলিতেছে তাহা জুলুমবাজি ভিন্ন আর কিছু নহে। অধিকাংশ কো-অপারেটিভ ষ্টোরে ৮/১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা গজ দরের কিছু সাটিং কাপড় আসিয়াছিল কিন্তু ২।০ গজের অন্ততঃ ২।৩ গজ মলমল না নিলে সাধারণ ক্রেতাদের ভাগ্যে ইহার একটি সাটিং কাপড় ছুটে না। কম মূল্যে যে কোন রকম কাপড় নিতে হইলে সঙ্গে চড়া দামের সমপরিমাণ কাপড় নিতে সাধারণ ক্রেতার বাধ্য। শীত আসিয়া পড়িয়াছে—এ সময় দরিদ্র লোকদের উপর পাতলা মলমল চাপাইয়া না দিয়া তাহা কিছু দিন আটকাইয়া রাখিয়া শীতের শেষে দিলে এমন কি মহাভাবত অশুভ হইয়া যাইত? ব্যবসা করিব অথচ সর্বপ্রকার ঝুঁকি জনসাধারণের ঝাড়ে চাপাইয়া দিব—ইহার কি অর্থ হয়? ট্রেডিং কো-অপারেটিভের পক্ষে কাপড় সবরকম সম্ভব না হইলে জনসাধারণকে তাদের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিতে হইবে, নতুবা যা দিতে পারেন তাহা পক্ষপাতশূন্য ভাবে জনসাধারণের প্রয়োজন ও ক্ষমতানুযায়ী নিতে দেওয়াই সরকার-পৃষ্ঠপোষিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শোভন হয়। পূজার সময় ছেলে-মেয়েকে একটা জামা দিতে না পাবা যে কত বেদনাদায়ক তাহা হয়ত ক্ষমতামত্ত কর্তৃপক্ষ ভুলিয়া গিয়াছেন, নতুবা এ ভাবে দরিদ্র জনসাধারণের উপর জুলুম চালাইতেন না। জনসাধারণকে কেন এ ভাবে হয়বাণী করা হইতেছে, আশা করি, গবর্ণমেন্টের টেক্সটাইল বিভাগ ও সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ষ্টোব সে বিষয়ে সন্তুষ্ট দিয়া বাধিত করিবেন। —জনশক্তি।

### বর্ধমান পৌরসভা

“বর্ধমান পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় বহু দিন হইতেই নানাকণ্ড বিগৃহ্ণ ও অনাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সহরবাসী ও কদমতাপ্রাপ্ত হিতাকাঙ্ক্ষী কমিশনারগণের নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও পৌরসভা পরিচালন ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গলদ দ্রুতকরণে কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই। দুই বৎসর পূর্বে সহরবাসীর বিশেষ আত্মভাজন ও অগ্রগত সেবক ডাঃ নন্দকুমার গাঙ্গুলী ও শ্রীশ্রীকুমার মিত্র মহাশয় অভ্যন্তরে থাকিয়া পৌরসভার অনাচার ও দুর্নীতি দ্রুতকরণে শত চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হন এবং জনসাধারণের স্বার্থ ও আত্মসম্মান রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া পদত্যাগে বাধ্য হন। আশা করা গিয়াছিল যে, এই দুই জন প্রভাবশালী কমিশনারের পদত্যাগে পৌরসভার অপরাধের কর্তৃকর্ত্তী ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের চৈতন্যদায়

হইবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, পদত্যাগকারী দুই জন কমিশনারই পৌরসভার বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য অভিযোগ দেখাইয়াছিলেন, তাহার প্রতিকারার্থেও স্বায়ত্তশাসন বিভাগ কোনরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করে নাই। অথচ সাধারণ ভাবে তদন্তের ব্যবস্থা করিলে আজিও অভিযোগগুলি প্রমাণিত হইতে পাবিত বলিয়া আমরা মনে করি। স্বায়ত্তশাসন মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যে তদাবক করিয়া দোষত্রুটি দূর করিবাব জন্ত স্বায়ত্তশাসন বিভাগের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য বহিয়াছে। অথচ পৌরসভার বিরুদ্ধে পৌর সদস্যগণের দ্বারা আনীত অভিযোগগুলির কোনরূপ তদন্ত অনুসন্ধান না হওয়ায় এই বিভাগের উপর জনসাধারণ তথা বর্ধমান সহরবাসীর আস্থা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সাম্প্রতিক এক সংবাদে প্রকাশ, পৌরসভার আভ্যন্তরীণ গলদ ও অনাচারের প্রতিকার কবিত্তে হইলে পৌরসভার বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থার অবসান হওয়া প্রয়োজন মনে করিয়া কয়েক জন সদস্য মন্ত্রিসল ও বি-গায় কমিশনারের নিকট আবেদন করিয়াছেন। পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থায় যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে, সদস্যগণের সভায় সাম্প্রতিক অপ্রীতিকর ঘটনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বিবাত বডবড, অপচয় ও বিশৃঙ্খলার ফলে পৌরসভা বর্তমান অবস্থায় অধঃপতিত হইয়াছে তাহার নিরপেক্ষ তদন্ত অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও বি-গায় বডবডগণ পৌরসদস্যগণের আবেদনে সাড়া দিয়া এই সেবা-প্রতিষ্ঠানটিকে সহরবাসীর প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত কবিবাব জন্ত চেষ্টা কবিলে আমরা সুখী হইব”। —বর্ধমান।

### দারিদ্র্য

“বিদেশী শাসনে যে দারিদ্র্য ধীরে ধীরে জাতির জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিল তাহা বর্তমানে অতি দ্রুত জাতিকে নিঃশ্ব ও নিঃস্বল কবিত্তা ফেলিতেছে। বর্তমান সময়ে বাঁচিবাব ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মিটাইয়া চলিতে পাবে একপ লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে লইয়া সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। জনসাধারণকে লইয়াই সমাজ এবং তাহাদের মধ্য হইতেই দেশের সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। আজ জনসাধারণের যে অবস্থা তাহা বর্ণনারও অতীত। দারিদ্র্যের কঠোর ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া জাতির জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সামান্য কয়েকটি বৎসরের মধ্যে কেন এমন হইল তাহার কারণ চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, মূল্যের গলদ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাবই ফলে দরিদ্র দ্রুত অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে ও ধনী ধন তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা সমাজে সঙ্গতি, শান্তি ও শৃঙ্খলা কখনও আনিতে পারে না। ইহার ফলে যে বিশৃঙ্খলা, বৈষম্য ও ব্যভিচার অনিবার্য হইয়া দেখা দেয়, তাহাব পূর্কভাবে পূরণবি ভাবে দেখা দিয়াছে কিন্তু নায়কগণ এখনও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা লইয়াই গবেষণা ও আলোচনা করিতেছেন। কঠিন দারিদ্র্যজনিত দুঃস্থাবর মধ্য দিয়া জনসাধারণকে কি অবস্থায় চলিতে হইতেছে তাহাব সত্যিকার খবরাখবর রাখিলে একপ নির্দিকার ও নির্দিকল্প মনোভাব কখনও দেখা দিতে পারিত না। আহাের সংস্থান নাই, অথবা আহাের সংগ্রহের সঙ্গতি নাই বলিয়া

অনাহারে মৃত্যুকেও অনাহারে মৃত্যু নয় বলিয়া বিবৃতি প্রত্নভিত্তিতে যুক্তি দেখানোর প্রয়াসে স্তম্ভিত হইতে হয় এই মনে করিয়া যে, ইহাকে অস্বীকার করাতে রূঢ় বাস্তবের সহিত পরিচয়ের অভাব কত অধিক! দুই বেলা পেট ভরিয়া দুই মুষ্টি আহার দেশের কয় জন আজ করিতে পারিতেছে? বাহার তাহা করিতে পারিতেছে না তাহার কারণ কি? দুর্লভের বশে মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যকে লইয়া বাহার ছিনিমিনি খেলিতেছে এবং মূল্য ধাপে ধাপে বাড়াইয়া মানুষের ক্রয়-শক্তির বাহিরে লইয়া ফেলিতেছে, মাগ, গীভাতা বাড়াইয়া তাহার সম্মুখীন হওয়ার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র এবং দারুণ দুর্ভিক্ষতার চিহ্ন। সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের অস্তিত্ব নাই এবং সমাজ তথা জনসাধারণকে বধেব জ্ঞাত বহুপরিচর প্রতিক্রিয়াশীলদের রোধ করিবার মত সাহস ও শক্তির যদি অভাব দেখা দেয়, তবে দেশ-ছোড়া দারিদ্র্য ও অনটন অনিবার্য। আমরা এইরূপ একটা অবস্থার মধ্য দিয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছি।

—ত্রিস্রোতা।

### সোসালিষ্ট পার্টি চাই কেন?

“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রবৃত্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কিছু দিন পূর্বে দেশে এসেছিলেন। কেন, সে কথা পবিত্রাব বলা হয়নি, কাবণ এ সব ভয়ানক গোপনীয় কূটনৈতিক ব্যাপার কি না? তবে ওয়াশিংটনে প্রত্যাভর্তন করেই তিনি যখন হঠাৎ বিনা কারণে বিবৃতি দিলেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণে “নিরপেক্ষ” কথাটির ঠিক জুঁজু হয়নি, তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে কি সলা-পরামর্শ তাঁর সঙ্গে নয়াদিল্লীতে হয়েছে। চার বছর অনেক বাগাডম্বরের পর এখন “নিরপেক্ষ” পররাষ্ট্রনীতি কথাটি আর চললো না। বিজয়লক্ষ্মী বর্ণিত নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতের নীতি “ইউনাইটেড নেশনস”-এর স্বপক্ষে, স্বাধীন জাতিসমূহের স্বপক্ষে। মনের উদ্বেগ এই কথাটি কথার মধ্যেই চমৎকার বোঝা যায় কিন্তু মার্কিনীরা যদি না বোঝে? তাই আর একটু পরিষ্কার বলা দরকার—“ইউনাইটেড নেশনস”-এর সাধারণ পরিষদে ৫১ বারের মধ্যে ৩৮ বার ত তোমাদের দিকেই ভোট দিয়েছি, ১১ বার ভোট দিই নি এবং ২বার মাত্র তোমাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছি। আরো একটু আছে—“আমাদের বড় বছরের অভিজ্ঞতা স্বভাবতই আমাদের গতি নির্দেশ করেছে সব প্রথম একনায়কত্বের বিরুদ্ধে, তা উপনিবেশবাদই হোক আর কমিউনিষ্ট আক্রমণই হোক।” “নিরপেক্ষ” পররাষ্ট্রনীতির সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা সম্বন্ধে এখন কি আর কোন সন্দেহ আছে?

ভারতীয় সোসালিষ্ট পার্টি বৈদেশিক ব্যাপার-বিশেষজ্ঞ রাম-মনোহর সোহিয়া সিঙ্গাপুরে বলেন যে, ১০,০০০ ব্রিটিশ ফৌজ দিয়ে “কমিউনিষ্ট সম্রাসবাদ” দমন করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন, সোসালিষ্ট পার্টি। আর একবার প্রমাণ হোল যে, বুর্জোয়াদের রথে লিখতী পাড়িয়ে সাম্যবাদ-বিরোধী পিশাচ অভিযানকে সাহায্য করাই সোসালিষ্ট পার্টিগুলির লক্ষ্য।

—জনসাধারণ।

### খাদ্য-সমস্যা

“পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যা! ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। এ বৎসর প্রথমটা অনাবৃষ্টির জন্য ফসলের ভবিষ্যৎ খুব

খারাপ বলিয়া মনে হইয়াছিল। চাউলের দরও অনেক চড়িয়া গিয়াছিল। পরে বৃষ্টি হওয়ার শেষ রক্ষা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাউলের দর কমিতে চাহিতেছে না। গত চাঁপ বৎসরে চাউলের দর ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী গেজেটে ইহার যে সাম্প্রতিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহা একত্র করিয়া দেখিলে আশঙ্কা হয় যে বাংলা দেশে খাদ্যের অবস্থা সত্যি সন্দেহ হইয়া উঠিতেছে। এবার আর এক বিপদ হইয়াছে—বহু ধান-জমিতে পাট চাষ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষে খুব লাভ হইবার সম্ভাবনা কম, কাবণ পাট পচাইবাব ও ধুইবার জলের এখানে একান্ত অভাব। শ্রোতের জল ছাড়া বন্ধ পচা জলে ভাল পাট ওঠে না। কলিকাতার নিকটবর্তী যে সকল স্থানে পাট হইয়াছে সেখানে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পাট গাছ ভালই হইয়াছে কিন্তু জলের অভাবে ভাল পাট বাহির হইতেছে না। এবার ধানের জমিতে পাট চাষ করায় খাদ্যসমস্যা বাড়িয়াছে, ডলাব সমস্যার সমাধান কতটা হইবে বলা যায় না। পাট বা তুলায় নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইয়াও যে বৃহত্তম বস্ত্রশিল্প এবং খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে চটকল চালানো যায় ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, আমাদের খাদ্যের উপরেই বেশী ঝোক দেওয়া দরকার। খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব গেজেটে হইতে সঙ্কলন করিয়া নীচে দেওয়া হইল। ইহাতেও কমল বৃদ্ধি আন্দোলনের ব্যর্থতাই স্মৃতি হইতেছে:

| জেলা            | জুলাই '৪৮ | জুলাই '৪৯ | জুলাই '৫০ | আগষ্ট '৫১ |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| বর্ধমান (কালনা) | ২০        | ২০।০      | ২২।৮      | ২১।৫      |
| বাবুঘুম         | ১৬        | ১৭।৫      | ২২।০      | ১৬।০      |
| বাঁকুড়া        | ১৮        | ১৬        | ১৯        | ১৬।০      |
| মেদিনীপুর       | ১৭।০      | ১৭।৫      | ২১        | ২২।০      |
| হুগলী           | ২৬।০      | ২৬        | ২৪        | ৩২        |
| হাওড়া          | ২১।৮      | ২১।৫      | ২১।৫      | ৪০        |
| ২৪ পরগণা        | ২৬।০      | ৩২        | ৩২        | ৪৪।০      |
| নদীয়া          | ২৪।০      | ১২।৮      | ৩০।৭      | ৩২        |
| মুর্শিদাবাদ     | ২১।০      | ২২।৮      | ৪০        | ২২।০      |
| পশ্চিম দিনাজপুর | ২৪        | ১০        | ২৩        | ৩৫।০      |
| মালদহ           | ৩৩।০      | ২৪        | ২৪        | ৩৩।০      |
| জলপাইগুড়ি      | ৩০।০      | ২২।৮      | ৩২        | ৪২।৮      |

এই সমস্ত দর ঐ সব জেলায় সর্বোচ্চ মূল্য। কতকগুলি বাড়তি কর্ডন এলাকা ছাড়া অধিকাংশ গুলেই উহাই চাউলের মূল্য। এই ভাবে উত্তরবঙ্গের প্রতি বৎসর দাম বাড়িতেছে ইহা খুব আশঙ্কার কথা। খাদ্যের অপচয়ও বড় বেশী হইতেছে। গত বৎসর শ্রীরজনী প্রামাণিকের সভাপতিত্বে অপচয় তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উহার সদস্য শ্রীমাতা তরু হালদার মফস্বলের প্রোকিউরমেন্ট গুদাম দেখিতে চাটিলে তাঁহাব সহিত কমিটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর মতভেদ হয়। শ্রীযুক্ত হালদার অপচয় খুব বেশী হইতেছে বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি অপচয় ধরিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে কমিটির কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ক্রীদেবেন সেন খাদ্যসচিবকে প্রেরণ করিয়া যে সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহাতে অপচয় অতি সাংঘাতিক রকমের হইতেছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। খাদ্যমন্ত্রী চাউলের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন:

১৯৪৮-৪৯

১৯৪৯-৫০

মণ

মণ

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| বর্ষারম্ভে মজুত ধান       | ১৮,১২,৭৫৩   | ১৭,২১,২১২   |
| ঐ চাউল                    | ১৫,১৭,৩৩৩   | ৩১,৭৩,৫৬৭   |
| বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান      | ৭১,৪০,০৩৬   | ১৮,৭০,০৫৪   |
| ঐ চাউল                    | ১,৫৩,৮৫,১৬০ | ১,৩৭,২৪,৩৮৮ |
| বৎসরের মধ্যে বিক্রীত চাউল |             |             |
| এ গ্রুড                   | ২,১২,৭১০    | ১,২৩,৭৮৭    |
| বি "                      | ১,৩২,৮৫,৪২০ | ১,৩৪,৪৬,১১৬ |
| বৎসরান্তে মজুত ধান        | ১৭,২১,২১২   | ৩৩,০৩,০৪২   |
| চাউল                      | ৩১,৭৩,৫৬৭   | ৩০,৪২,৮৩৫   |

“বৎসরান্তে মজুত ও বৎসর মধ্যে ক্রীত ধান চাউলের পরিমাণ বৎসর মধ্যে বিক্রীত ও বৎসরান্তে মজুত ধান চাউলের সমান হইত। সামান্য অপচয় হইতে পারে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭০,৫১,৬৭৪ মণ চাউল ঘাটতি হইতেছে এবং ১৯৪৯-৫০ সালের ঘাটতিব মাত্রা আরও বাড়িয়া দাঁড়াইতেছে ৫৮,০১,৮৭৫ মণ। খ্রীস্টাব্দে সেন খাতিমজীকে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাঁচ মিনিট সময় চাহেন। কিন্তু মিলাইতে পারেন না, কোন কৈফিয়ৎও দিতে পারেন না, অগত্যা ভখনকার মত দায় এড়াইবার জন্য তিনি নোটিশ চাহেন এবং সে নোটিশ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, খাজ সম্বন্ধে আলোচনা এড়াইবার চেষ্টা না করিয়া ব্যবস্থাপনামতে ঐ আলোচনা হইতে দিলেই ভাল হইত। খাতিমজী তত্পরপক্ষে হিসাবেব এট মাঝামাঝি গলদ বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাষ্টেন। খাজসমস্তা লইয়া বিরোধী পক্ষ আলোচনা করিতে চাহিতেছেন আব সবকাব পক্ষ কেবলই উহা এড়াইয়া যাইতেছেন ইহা উচিত নহে। বাংলার খাজসমস্তা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টা ছাড়া উহার সমাধান সন্দেহপূর্বক। খাজসমস্তাকে রাজনীতির বাস্তব উত্তার সমাধানের জন্য সকলের সমান ভাবে চেষ্টা ও যত্ন করা একান্ত আবশ্যক।”

—প্রবাসী।

### পণ্ডিত নেহরুর যুদ্ধযাত্রা ?

“খাজ নয়, বস্ত্র নয়, বেকার সমস্যা বা অনাহার মৃত্যু নয়, চোরাকারবার, মনোফ্যাক্জীও নয়, শাহানশাহ নেহরু অবশেষে যুদ্ধ-যোষণা করিলেন সাম্প্রদায়িকতাব বিরুদ্ধে। সত্যবতী নগবে খুশিব রোশনাই জ্বলিল, লোকে গমগম করিল, বাকবিতণ্ডাব ঝড় বহিল; তার পর উচ্চ ববে শাহানশাহেব বর্ণ-ছন্দ্যর সত্যবতী নগরের আকাশ-বাতাস আন্দোলিত করিল—সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা সাবধান! অমাত্যবর্গ ঐক্যতানে শাহানশাহের প্রতিধ্বনি করিলেন—সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা এবার সাবধান। কংগ্রেসী প্রচারেব জয়ঢাক সংবাদপত্রগুলি চাঁৎকারে সারা দেশ মুখর করিল—আব রক্ষা নাই, সাম্প্রদায়িকতাবাদীবা এবার খুব সাবধান। কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, শত্রু-মিত্র, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জানিল—নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত নেহরু, ভারত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধে যাইতেছেন।”

—গণবার্তা।

### আততায়ীর গুলীতে নিহত জনাব লিয়াকৎ

“বিগত ২১শে আশ্বিন বাওয়ালপিণ্ডিতে এক যক্ষ্মতাকালে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের হাজবা জেলার অধিবাসী সৈয়দ আকবর নামক আততায়ীর হস্তে গুলীবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। গুলীবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিয়াকৎ পড়িয়া যান এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় কিয়ৎক্ষণের মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করেন। উল্লেখিত জনতা আততায়ীদেহ দহনভিন্ন করিয়া ফেলে। লিয়াকতেব মৃত্যুতে পাকিস্তানে চল্লিশ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় শোক পালন ঘোষিত হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-পাঞ্জাবে বিত্তশালী জমিদার-বংশে লিয়াকতেব জন্ম হয়। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ পরীক্ষা দেন। অক্সফোর্ডে এম্বটার কলেজে আইন পড়িয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইনার টেম্পলে ওকালতি ব্যবসায় নিয়োজিত হন। কিন্তু শীঘ্র



তাঁহাকে ভাবতবর্ষে ফিবিয়া বাজনীতিতে লিপ্ত হইতে হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মুসলিম লীগে যোগদান করিতে হয়। লিয়াকৎ যুক্তপ্রদেশে পবিত্রদের সদস্য ছিলেন ১৯২৬ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কায়েদে আজম জিন্নার সম্পর্কে আসেন, যখন তিনি লীগের জেনারেল সেক্রেটারী নিয়োজিত হন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে লিয়াকৎ পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে বড়লারের কাউন্সিলে অর্থমন্ত্রীরূপে নিয়োজিত হন পাকিস্তান সৃষ্টি হইলে তিনি ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লিয়াকৎ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করিতে লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট মি: ট্রুম্যান কর্তৃক আহূত হইয়া তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে তিনি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে ‘বস্ত্রমুষ্টি’ দেখাইয়া জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। লিয়াকতেব মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই তাহাদের অগ্রতম বিশিষ্ট নেতা ও বন্ধুকে হারাইয়াছে, লিয়াকতেবের আত্মা শান্তিলাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।”









